নতুন ১৫ বছর মেয়াদী ক্রমবর্ধমান নির্দিষ্টকালীন জমা পরিকল্পনা

১৯৬২ সালের ১লা জুন থেকে, সর্বোচ্চ মাসিক ৩০০৲ টাকা জমা দেওয়া যেতে পারে এই রকম ১৫ বছরের নতুন হিসেব চালু করা হয়েছে। বর্তমানের ১০ বছর মেয়াদী হিসেবে, সর্বোচ্চ মাসিক জমার পরিমাণও ঐদিন থেকে বাড়িয়ে ২০০৲ টাকা করা হয়েছে।

আয়কর রেহাই ঃ

জীবন বীমার প্রিমিয়াম এবং প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে জমা টাকার মতো ১০ এবং ১৫ বছরের হিসেবের ক্ষেত্রেও সর্বোচ্চ ১০,০০০৲ টাকা অথবা আয়ের এক চতুর্থাংশ যেটা কম হয়—সেই অনুযায়ী আয়কর রেহাই পাওয়া যায়।

করবিহীন সুদ ঃ

১০ এবং ১৫ বছরের জমায় যথাক্রমে আয়করবিহীন শতকরা ৩·৮ এবং ৪·৩৲ টাকা চক্রবৃদ্ধি সুদ পাওয়া যায়।

নিকটবর্তী পোষ্টঅফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক থেকে অন্যান্য বিবরণী পাওয়া যায়।

ক্রমবর্ধমান নির্দিষ্টকালীন জমার মাধ্যমে নিয়মিতভাবে সঞ্চয় করুন

৫ বছর/১০ বছর এবং ১৫ বছরের নতুন হিসেব

জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা

DA 62/162 (Beng)

756.3
.005/41

সূচীপত্র

বিংশ শতাব্দী
সপ্তম বর্ষ : ১ম সংখ্যা
আষাঢ় ১৮৮৪

লেখক		বিষয়
সম্পাদকীয়	১	আমাদের কথা
	২	আণবিক অস্ত্রমুক্ত এশিয়া
অবধূত	৩	আশাপূর্ণার সংসার (উপন্যাস)
প্রমোদ সেনগুপ্ত	৯	গান্ধী—রলাঁ সাক্ষাৎকার (প্রবন্ধ)
তরুণ সান্যাল	১৬	উন্মাদ ইচ্ছা (কবিতা)
শ্যামসুন্দর দে	১৬	সকাল সন্ধ্যা শুধু (কবিতা)
অনন্ত দাশ	১৬	স্বাক্ষর (কবিতা)
প্রসাদকুমার বসু	১৭	বস্তি (নাটক)

চমৎকার কারিগরী !
অপূর্ব স্বর ক্ষেপণ !

সারা বিশ্বের শব্দতরঙ্গ গ্রহণ !

- ম্যাজিক-ক্যান টিউনিং ইণ্ডিকেটর সহ ৬ ভালভ্
- দুইটি ওয়েভব্যাণ্ডের জন্য শর্টওয়েভ ব্যাণ্ডস্প্রেড কন্ট্রোল সহ ৪টি ওয়েভব্যাণ্ড
- ৬টি পুশবাটন্
- ওয়ালনাট কাঠের পাতলা পাতে তৈরী ট্রিমলাইনড্ কেবিনেট
- শর্টওয়েভ মাইক্রো টিউনিং
- অবিরাম টোন্ কন্টোল

মূল্য ৩৭৫৲ টাকা তদুপরি ৩০৲ টাকা উৎপাদন শুল্ক ও স্থানীয় কর অতিরিক্ত

আরও ২টি উল্লেখযোগ্য নূতন মডেল :

স্পেশাল সুপার ৬৯২—ডবলিউ ও ৩টি লাউড স্পীকার সমেত—৫৭৫৲
সুপার আর. এ. ১০১—৩২৫৲ টাকা

SIEMENS
INDIA

সিমেন্স

'ট্যাণ্ডার্ড' সুপার ৬৯১—ডবলিউ ও

পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও আন্দামানের পরিবেশক :
নান এণ্ড কোম্পানি ৯এ, ডালহৌসি স্কোয়ার ইস্ট, কলিকাতা - ১

লেখক		বিষয়
সরোজকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	২৫	হিন্দুযুগে রাজা (প্রবন্ধ)
অর্ণব চট্টোপাধ্যায়	৩৭	মার্ক্সবাদী ও বুর্জোয়া স্বাদেশীকতা (আলোচনা)
বিভূতিভূষণ রায়	৪০	মানুষ দেখার দর্পণ (সম্পূর্ণ উপন্যাস)
শ্রীজ্ঞানপাপী	৮২	আজব দুনিয়া (হাসকৌতুক)
অর্ণব সেন	৮৩	প্রতিবিম্ব : ঈশ্বরীর মুখ (গল্প)
মহাদেব চট্টোপাধ্যায়	৮৯	সোভিয়েত ইউনিয়নে মূল্যবৃদ্ধি (অর্থনীতি)
জীবনময় দত্ত	৯১	ঘুষ (গল্প)
জ্যাঁ রিশার ব্লখ	৯৪	স্তালিন স্মৃতি চিত্র (আলোচনা)
বিচিত্রবীর্য	৯৯	হীরক শহর আমস্টারডাম (প্রবন্ধ)
অভয় বসু	১০১	ঊর্ধ্বমুখী গতি (খেলাধূলা)
রঞ্জন মজুমদার	১০৪	রঙ্গজগৎ

প্রচ্ছদ

নীতিশ মুখোপাধ্যায়

আলোক চিত্র-শিল্পী

প্রশান্ত মুখোপাধ্যায় ও শিব সাধন

এই সকল পরস্পর-বিরোধী গুণের একত্র সমন্বয়ে প্রস্তুত

নিবে কালি শুকায় না;
কিন্তু কাগজে দ্রুত শুকায়।

রঙের যথেষ্ট গভীরতা, তবু
অবাধে লেখা এগিয়ে চলে।

লেখা ধুয়ে-মুছে যায় না;
অথচ কলম পরিষ্কার রাখে।

সুলেখা কালি

• • • অন্য কোন কারণে না হ'লেও অন্ততঃ এই কারণেই
সুলেখা আজ সর্বোচ্চ বিক্রয়ের গৌরব অর্জন করেছে • • •

সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ কলিকাতা • দিল্লী • বোম্বে • মাদ্রাজ

বাসবদত্তার

গৃহস্থবধূর ডায়েরী ৭·০০

(আধুনিক সমস্যার চিত্র)

মোহিতলাল মজুমদারের

কাব্য-মঞ্জুষা (সম্পূর্ণ ও টীকা সহ)

ডঃ মনোরঞ্জন জানার

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস (সাহিত্য ও সমাজ) ৮·০০

রবীন্দ্রনাথ (কবি ও দার্শনিক) ১২·৫০

Prof. W. T. Webb's

EVERYBODY'S LETTER-WRITER Rs 5·00

(28th Ed)

Contains about 500 letters

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দের

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ৭·০০

শ্রীমৃণালকান্তি দাশগুপ্তের

মুক্তপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ (২য় সংস্করণ) ৬·০০

পরমারাধ্যা শ্রীমা (৩য় সংস্করণ) ২·৫০

রূপ হতে অরূপে ২·৫০

শ্রীসন্তোষকুমার কুণ্ডুর

বাসুদেব ঘোষের পদাবলী ৪·০০

শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়ের

রবীন্দ্র-সাহিত্যের নব রাগ ৫·০০

নিরঙ্কুশের

ধন্বন্তরী ক্লিনিক্স্ [সরস হাসির নাটক] ১·৫০

শ্রীসুনীল দত্তর

বর্ণ-পরিচয় ২·৫০

[বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনী অবলম্বনে নাটক]

অধ্যাপক শ্রীরমণীমোহন চক্রবর্তীর

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক কাল ৫·০০

ভারতী বুক স্টল

প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা

৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট :: কলিকাতা-৯

পোষ্ট বক্স—১০৮৩১

ফোন—৩৪-৫১৭৮ : গ্রাম—Granthlaya

গল্প ও কবিতা সংকলন

তরুণ উদীয়মান সাহিত্যিকদের গল্প ও কবিতা সংগ্রহ করে একটি সংকলন পুস্তক প্রকাশ করা হচ্ছে।

বিশেষ বিবরণীর জন্য ২০ নঃ পঃ ডাকটিকিটসহ যোগাযোগ করুন :—

সাহিত্য সম্পাদক

মিলনী, ধলভূমগড়, সিংভূম।

বিজ্ঞাপনদাতা ও এজেন্টগণ সত্বর লিখুন।

সাহিত্য প্রতিযোগিতা :—

প্রতিযোগিতায় যোগদানেচ্ছুগণ ছোটগল্প ও কবিতা ১৫ নঃ পঃ ডাকটিকিটসহ পাঠিয়ে লিখুন।

সাহিত্য সম্পাদক

মিলনী।

(ধলভূমগড়-সিংভূম)

নিখুঁত লাইন ও হাফটোন

প্রতিষ্ঠান

হিন্দুস্থান প্রসেস ওয়ার্কস

১৩ গনেন্দ্র মিত্র লেন, কলিকাতা-৪

756.3
B05141

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

বিংশ শতাব্দী

আষাঢ়
১৮৮৪
সপ্তম বর্ষ
১ম সংখ্যা

"সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই"

আমাদের কথা

পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় আজ আর নেই। একাশীতম জন্মদিনই তাঁর মৃত্যুর দিনেও পরিণত হয়েছে। জন্মদিন ও মৃত্যুদিনের এই মিলন হয়ত আকস্মিক তবু আমাদের তা পৌরুষ ব্যঞ্জক জীবনের কথা মনে পড়িয়ে দেয়—যাঁর জীবনেও একাশীতম জন্মদিন মৃত্যুদিন রূপে এসেছিল।

ডাঃ রায়ের বিস্তৃত জীবন কথা আলোচনার সময় এখন নয়—তবু এ কথা মনে রাখা যে, জীবনের যে ক্ষেত্রে তিনি পদার্পণ করেছেন সে ক্ষেত্রেই তিনি বিজয়ীর আসন লাভ করেছেন। কোথাও তিনি পরাজিত হন নি।

অসাধারণ চিকিৎসক হিসাবে তাঁর কর্মজীবনের সূত্রপাত। পরবর্তীকালে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নির্বাচন দ্বন্দ্বে পরাজিত করে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রবেশ—চিকিৎসা-বিজ্ঞানের আইন-সভায়, পৌরসভায়, বিশ্ববিদ্যা[illegible] সংসদগুলীতে সর্বত্রই অপরাজিত থেকেছেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।

অবশেষে এই দি[illegible] রাখলেন

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়

[ফটো : বিংশ শতাব্দী]

আণবিক অস্ত্রমুক্ত এশিয়া

গত মার্চ মাস হইতে জেনেভায় সপ্তদশ জাতি নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইতেছে। তিনমাস অতিক্রান্ত হইয়াছে—নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি সম্পন্ন হওয়া দূরে থাকুক সেদিকে একটি পদক্ষেপও সম্ভব হয় নাই। শুধু তাহাই নহে নিরস্ত্রীকরণ আলোচনা চলাকালেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটাইয়া পৃথিবীর আকাশ বাতাস বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছে। অথচ নিরস্ত্রীকরণের সর্বপ্রথম ধাপ হওয়া উচিত আণবিক অস্ত্র বিসর্জন দেওয়া। জেনেভার নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন সফল হইবে এইরূপ আশা কম।

সমগ্র বিশ্বে নিরস্ত্রীকরণ সফল হউক বা না হউক এশিয়াকে আণবিক অস্ত্রমুক্ত রাখিতেই হইবে। এখনও পর্যন্ত যাহারা আণবিক অস্ত্রের অধিকারী সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন ও ফ্রান্স যদি আণবিক অস্ত্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইয়া নিজেদের খুশি ডাকিয়া আনিতে চাহেন তবে আমরা নিরুপায়। কিন্তু আমরা এশিয়ার ভাগ্যকে কলঙ্কিত হইতে দিতে চাহি না। পৃথিবীর যে অর্ধেক মানব এশিয়ায় বাস করে, তাহারা আণবিক অস্ত্রের ধ্বংসলীলা কামনা করে না। গত মহাযুদ্ধে এই এশিয়ার মানুষকেই আণবিক অস্ত্রে বলি দেওয়া হইয়াছে হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে। দশ লক্ষ মানুষ আণবিক অস্ত্রে বীভৎসভাবে নিহত হইয়াছে। চিরপঙ্গু হইয়াছে অগণ্য জনসাধারণ। অথচ এশিয়া আণবিক অস্ত্রের উদ্ভাবন বা প্রয়োগ করে নাই। আজও যেগুলি আণবিক বিস্ফোরণ ঘটান হইতেছে তাহার শতকরা পঁচাত্তরটি হইতেছে এশিয়ায়। পশ্চিমীরা এশিয়ার আকাশ বাতাসকে বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে। ইহার ফলে শুধু যে বর্তমান মানবজাতি ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে তাহা নহে ভবিষ্যত মানবসন্তানদের জন্যও চিরপঙ্গুত্ব অনিবার্য হইয়া উঠিতেছে।

পশ্চিমীদের আন্তরিকতায়, তাহাদের মানবতাবোধে আমাদের আস্থা কম। গত ষোল বৎসরেও অগণ্য মানবের আকুল আর্তনাদ তাহাদের আণবিক অস্ত্র পরিত্যাগ করাইতে পারে নাই। ভবিষ্যতেও পারিবে তাহার আশা সুদূর পরাহত। আমাদের পরিষ্কার বক্তব্য, তাঁহারা যদি আণবিক অস্ত্র লইয়া মত্ত হইতে চান, তাহাতে আমাদের বাধা দিবার সামর্থ্য নাই। তবে সেই বিস্ফোরণ তাঁহারা নিজেদের ঘটাইতে পারিবেন না, বারবুদায় তাঁহারা স্বচ্ছন্দে ধ্বংসলীলা জাকিয়া আনিতে পারেন। আণবিক অস্ত্র বিস্ফোরণ ক্রিসমাস দ্বীপে ঘটান চলিবে না, ইচ্ছা করিলে ঐ উদ্দেশ্যে তাঁহারা ব্রিটেনের সাত হাজার দ্বীপের যে কোন একটিকে তাঁহারা বাছিয়া লইতে পারেন। মোট কথা এশিয়াকে আণবিক অস্ত্র মুক্ত রাখিতেই হইবে।

আর ঠিক এইখানেই পশ্চিমীদের আপত্তি। তাহারা এশিয়ার বুকে আণবিক যুদ্ধের ভয়াবহতাকে ডাকিয়া আনিতে বদ্ধপরিকর। জাপানের নিকট হইতে ছিনাইয়া লওয়া—ওকিন-আওয়া দ্বীপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সর্ববৃহৎ আণবিক ঘাঁটি নির্মাণ করিয়াছে; কলম্বত পাকিস্তানকেও আণবিক অস্ত্রে সজ্জিত করিয়াছে। চীনও আণবিক অস্ত্র নির্মাণে উদ্যোগী হইয়াছে। ঠাণ্ডা যুদ্ধ আজ যদি কোনক্রমে উত্তাপ পাইয়া পরিণত হয় তবে এশিয়ায় আণবিক অস্ত্রের ব্যাপকতম ধ্বংসলীলা দেখা দিবার দুর্ভাবনাও আজ দেখা দিয়াছে। আর সেই ধ্বংসের হাত হইতে নিরপেক্ষ ভারতও যে রক্ষা পাইবে না তাহা নিশ্চিত।

মানবসভ্যতা আজ বারি করিতেছে, ইহা কোনক্রমেই ঘটিতে দেওয়া যায় না। সুপ্রাচীন ও সভ্য এশিয়াকে আণবিক অস্ত্র হইতে মুক্ত রাখিতে হইবে। সেজন্যই পণ্ডিত জওহরলাল উদ্যোগী হইয়াছেন, তাঁহার নেতৃত্বে ভারতীয় পার্লামেন্টের একটি প্রতিনিধিদল এশিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্রের পার্লামেন্টের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন, এশিয়াকে আণবিক অস্ত্র মুক্ত করার ব্যাপারে তাঁহারাও যেন উদ্যোগী হইয়া ওঠেন, একটি সম্মেলনের মাধ্যমে এশিয়াকে আণবিক অস্ত্র মুক্ত করার ব্যবস্থা যেন সম্পূর্ণ করা হয়।

আমরা এই উদ্যোগকে সম্পূর্ণ সমর্থন করি। আজ যদি এশিয়া বাঁচে তবে আগামীকাল পৃথিবী বাঁচিবে।

। পনর ।

১৩৪৩ সাল, ভাদ্র মাস। কাশের পশ্চিমে প্রান্তের দেবাদিদেব কোটেশ্বর ভৈরব দর্শন হওয়ার পর—মহানাবা হিংলাজ দর্শন সোল আনা সম্পন্ন হোল। আষাঢ় শ্রাবণ ভাদ্র তিনটি মাস নিশ্চিন্ত হোয়ে কাশীর ঘাটে মনের আরাম এবং এবং বচনের দ্বারা তীর্থ সেবা করার পর বেঁচে থাকার নতুন একটা উদ্দেশ্য খুঁজে বার করতে হবে। নিষ্কর্মা বিনা কারণে বাঁচার চেয়েও মরণ ঢের ভাল, এটা শুধু কথার কথা নয়। কথাটার সত্যি মিথ্যে যাচাই করতে চান যদি, বিনা উদ্দেশ্যে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে দেখুন। দেখবেন, অসম্ভব ব্যাপার। কয়েক দিন না যেতে যেতেই হয় কবিতা লিখতে শুরু করেছেন, নয়ত এক নম্বর ওস্তাদজীর কাছে দ্রুপদী তালিম গ্রহণ করেছেন, কিংবা ছবি আঁকতে লেগে গেছেন। করছেনই একটা না একটা কিছু, নিজের জন্যে যদি না করেন পরের জন্যে করছেন। নিষ্কর্মা হোয়ে কিছুতেই কেউ বাঁচতে পারে না, শেষ পর্যন্ত কি করলে আশপাশের মানুষে খানিক উত্তমমধ্যম দেয় তার উপায় ঠাওরাতে বসে যায়।

এই যে ব্যাধি, কাজ না করলে কিছুতেই বেঁচে থাকা সম্ভব নয়, এই যে মানসিক বদ্ধকড়ানি এর মূলটা কোথায়।

ব্যাধিটা চিনিয়ে দিলেন পরমানন্দজী, তাই তাঁর কাছেই জিজ্ঞাসা করলাম মুক্তির উপায়। আকাশ থেকে পড়লেন একেবারে—"কেন! এখানে আপনার কি এমন অসুবিধে হচ্ছে মহারাজ! নিশ্চয়ই হচ্ছে অসুবিধে, বলুন এখনই দেখি কি করতে পারি।"

বললাম—"একদম এক ছিটে অসুবিধে হচ্ছে না, সেইটেই ভারী অসুবিধে বলে মনে হচ্ছে। পনর দিন তো হোয়ে গেল আর কত পারা যায়। একটা কিছু করতে দিন না নিয়ে খানিকটা তবু—"

পরমানন্দ বললেন,—"খানিকটা তবু কি! খানিকটা ধান বরাতে চান? বেশ তো বাগান করুন না আমাদের সঙ্গে! আমরা সবাই রোজ খানিকটা সময় বাগানের কাজ করি। কাল থেকে আপনিও আসুন আমাদের দলে দেখবেন কি মজা। কপি আলু পালং টম্যাটো—"

হার মানলাম। কপি আলু পালং বাজারে কেনে, না ফলালেও আমার দুঃখ নেই। খিদে যখন পায়, তখন খাবার মত কিছু একটা পেলে খাই। খানিকটা খেতে খেতে খিদে থাকে না হাপাসা চুকে যায়। তারপর ও নিয়ে মাথা ব্যথা করার মত মাথা আমার ধড়ের ওপর নেই। সেই কথাটাই বুঝিয়ে বলতে গেলাম পরমানন্দজীকে —"তা, তা না হয় বাগানের কাজেই লাগব কাল থেকে। কিন্তু ও আর কতটুকু বলুন, ওতে আছেই বা কি। কয়েক কোদাল মাটি কোপালেই কি মনের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাব। মন যা চাইছে, তার সন্ধান কি করলে পাওয়া যায় সেই উপায় বাতলান।"

"মন আপনার কি চাইছেন?" পরমানন্দজীর চোখে সেই অদ্ভুত আলোটা চিকচিকিয়ে উঠল। বললেন—"কি চাইছেন আপনার মন? রহস্য? প্যাঁচ? সাদা দিলে ব্যাপারটাকে অযথা জট পাকাতে আর সেই জট ছাড়াতে গিয়ে হিমসিম খেতে পারলে মন আপনার শান্ত হয়। সাদা ব্যাপার হোল, আপনি বেঁচে আছেন। যতদিন না মরবেন, ততদিন বেঁচে থাকবেনও। এই বাঁচার ব্যাপারটাকে পাঁচ রকমের পাঁচটা সমস্যার ভেতর জড়িয়ে না ফেলতে পারলে সুখ পান না। এখানে এসেছেন, নিশ্চিন্ত হোয়ে কয়েকটা দিন বেঁচে ঘুমিয়ে শান্তিতে কাটিয়ে দিয়ে যাবেন। কিন্তু মন উঠছে না আপনার, কই রহস্য কোথায়! তন্ত্র সাধনাটা হচ্ছে কোথায়! এরাও তো দেখছি, দিব্যি খাচ্ছে দাচ্ছে ঘুমচ্ছে। তা হলে কাজের কাজগুলো কি লুকিয়ে করে! কি সেই কাজের কাজ! কেমন তার—"

বাধা দিয়ে বললাম—"না না আপনাদের গুপ্ত আচার অনুষ্ঠানের ভেতর যাওয়ার জন্যে—

পরমানন্দ বললেন—"গুপ্ত নয় প্রকাশ্য। সবই আমাদের প্রকাশ্য সাধনা। আলো হাওয়া জল এ যেমন সকলের সম্পত্তি আমাদের সাধনাও তেমনি সবারের মনো।

গালভরা বুলি, অধিকারী অনধিকারী ভক্তি বিশ্বাস, ত্যাগ বৈরাগ্য ও দশুক চৌঁয়ালির ধার আমরা ধারি না। সবাই অধিকারী, সুস্থ চিত্তে বেঁচে থাকার অধিকার সকলের আছে। সুস্থ চিত্তে বেঁচে থাকতে হোলে যা করা প্রয়োজন তার নামই তান্ত্রিক সাধনা। সেই সাধনাই আমরা সবাই করছি।"

চুপ করতে হোল। পরদিন শুনলাম, সকাল সন্ধ্যা সর্বক্ষণ দেখছি, সবাই ব্যস্ত। বিরাট সংসার আশাপূর্ণা দেবীর। সব শুদ্ধ হাজার খানেক স্ত্রী পুরুষ কাচ্চা বাচ্চার সংসার। রাস্তা ঘাট ঘর বাড়ী পরিষ্কার রাখা, রাস্তার বাতি জ্বালানো থেকে শুরু করে, বাচ্চাদের স্কুল চালানো পর্যন্ত সমস্ত কাজ এরা করছেন। খাবার দেবার জন্যে আলাদা জাতের লোক নেই, কাপড় ধোওয়ার জন্যেও নেই, জাত বলতে কিছু নেই। যে মেয়েটিকে কাল দেখলাম মায়ের মন্দিরে বসে চন্দন ঘষতে, আজ সকালে তাকেই দেখছি কোমর বেঁধে রাস্তায় ঝাড়ু দিতে। কপালে ত্রিপুণ্ড্রক চর্চ্চিত্তে কাল যিনি মায়ের সামনে আসনে বসে নিষ্ঠুত ভাবে পূজা করছিলেন, আজ তিনি ঠেলা গাড়িতে ময়লার টব তুলে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যাচ্ছেন। স্বয়ং পরমানন্দজীর ব্যাপারও গোলমেলে। দেখলে মনে হবে উনিই ওখানকার কর্তা। বাইরে থেকে লোকজন এসে ওঁর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করেন, ওঁর আলাদা আসন রয়েছে, লাইব্রেরী রয়েছে, অফিস রয়েছে। কিন্তু অত সব থাকতেও ওঁর কিছুই নেই। নির্দিষ্ট সময়ে উনি ওঁর গদির ওপর বসেন একটি বার—সামান্য সময় বাইরের লোকদের দর্শন দেন। তারপর কাজ, সব রকমের কাজ। গরু আছে এখানে, তাদের জন্যে খুবই আধুনিক ব্যবস্থানের গোশালা আছে। তাদের জন্যে ছোট হাসপাতালও রয়েছে। পরমানন্দজী সেই গরুগুলোকে নিয়ে পড়ে আছেন। হুকুম করে লোক খাটাচ্ছেন না, নিজে খাটছেন সবারের সঙ্গে সমানে। গোবর পরিষ্কার নিজে করছেন, গরুদের স্নান নিজে করাচ্ছেন, নিজে তাদের খাওয়াচ্ছেন। আশাপূর্ণার সংসারে খুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত যাবতীয় কাজ সবাই করে যাচ্ছে পরম তৃপ্তিতে। একটি মাত্র কাজ করবার মানুষ নেই সেখানে, হুকুম করবার মানুষ নেই। কেউ কাউকে কিছু করবার জন্যে হুকুম করে না। কারণ হুকুম করে তো আর কাউকে দিয়ে কোনও রকম সাধনা করানো যায় না।

আশাপূর্ণার দরবার। দেবীর নাম আশাপূর্ণা। কচ্ছ মহারাজার কুলদেবী। নবরাত্রিতে ভয়ানক রকম ধুমধাম হয়, স্বয়ং মহারাজ চলে আসেন আত্মীয় পরিজন নিয়ে। পুত্র ক্ষয় এবং রুগ্ন জয় এই দুই কামনায় মহাদেবীর মহাপূজা হয়। অন্যত্র বলিদান দেওয়া হয় না কিন্তু, মায়ের রক্তখাওয়া। দু'দিনও গত মায়ের সংসারে কোনও নিয়ম কানুন থাকে না। তারপর যে যার স্বস্থানে চলে যায়। মা আশাপূর্ণা তাঁর ছোট্ট সন্তানদানিকে গুছিয়ে নিয়ে শান্তিতে বাস করেন।

দেবী ব্যাঘ্রবাহিনী। কচ্ছের যাবতীয় গৃহস্থের দেবীর বিশেষ রকম অনুগৃহীত। কচ্ছ মহারাজার এলাকায় বাঘ মারার হুকুম নেই। একবার নাকি কোথাকার এক সাহেব এসে মেরেছিল একটা বাঘ। ফল সাংঘাতিক হোয়েছিল, আশাপূর্ণা মায়ের বিশাল পাষাণ শরীর থেকে রক্ত ঝরতে লাগল। ছুটে এলেন মহারাজা, সংবাদ পেয়ে, হতো দিয়ে পড়ে রইলেন মায়ের সামনে। হুকুম হোল, নৃপুরকে মাকে স্নান করাতে হবে, নরমাংসে ব্যাঘ্রকুলের তর্পণ করতে হবে। তাই করা হোল, একশ আটটি নরবলি দেওয়া হোল। মা তুষ্ট হোলেন। বর্তমান মহারাজার বৃদ্ধ প্রপিতামহের আমলে ঘটেছিল সেই ব্যাপারটা, মাত্র আড়াই শ'বছর আগেকার ব্যাপার। তাই সেটা এখনও কেউ ভুলতে পারে নি। কচ্ছের যে কোনও গ্রামে গেলেই আশাপূর্ণার স্থানে একশ আট নরবলির ঘটনাটা সবাই শুনতে পাবে। সবাই সন্ত্রস্ত হোয়ে থাকে কিনা, কে জানে, আবার কবে আচম্বিতে কেউ একটা বাঘ মেরে বসবে। তা হোলেই লাগল হুলুস্থুল, একটা বাঘের বদলে একশ' আটটা মানুষ জোটানো তো আর সোজা কথা নয়।

সোজা কথা দুনিয়ার কোথাও নেই। দেবতার মহিমা বোঝবার জন্যে দেবতার অপার নিষ্ঠুরতা প্রমাণ করাই চাই। মানুষের চেয়ে দেবতা চরম অসহায়, মর্জি হোলে মানুষ একটা দেশ বা একটা গ্রাম ধ্বংস করে আপন মহিমা প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। দেবতা তাও

পারেন না, মানুষের দ্বারা অনুষ্ঠিত যে কোনও ভয়ঙ্কর বীভৎস কাজকে নিজের কাজ বলে দাবি করে তার ফলভোগ করেন। যুগযুগান্ত এই-ই চলে আসছে। মানুষের ওপর নির্ভরতা ছাড়া দেবতার আর অন্য কোনও পথ নেই। যদি কখনও মানুষ খুনখারাপি করা ত্যাগ করে, সেদিন দেবমহিমাও ম্লান হোয়ে যাবে।

পরমানন্দের সব চেয়ে কাছের মানুষ ধ্রুব মহারাজ। তিনিও গেরুয়াধারী, তাঁর অঙ্গেও রঙিন কাপড়। ধ্রুব মহারাজ বিজ্ঞানের শেষ পরীক্ষা দিয়ে এসেছেন। যখন মাত্র ছাব্বিশ, চব্বিশ ঘণ্টা স্বহস্তে ঘোড়ার সেবা করেন। এক পাল ঘোড়াও আছে মায়ের সংসারে, বেঁটে বেঁটে আরবী টাট্টু, দানা পানির পরোয়া না করে দু'চার দিন অনায়াসে সওয়ার পিঠে নিয়ে ছুটতে পারে তারা। ধ্রুব মহারাজ ঘোড়াদের কর্তা, ঘোড় সওয়ারদেরও সর্দার। এক ঘর বল্লম তলোয়ারও ধ্রুব মহারাজের হেপাজতে থাকে। তোড়জোড় দেখে মনে হোল, খুনোখুনি করবারও প্রয়োজন হয় ওঁদের মাঝে-মাঝে। খাদকা কি আর কেউ অস্ত্রশস্ত্রে শান দিয়ে এক পাল লড়ুয়ে ঘোড়ার তোয়াজ করতে থাকে।

যথেষ্ট জমাটা হোল ধ্রুব মহারাজের সঙ্গে। বাঙলা দেশটা বিশেষতঃ কলকাতা সহরটা দেখবার সখ তাঁর অত্যন্ত তীব্র। কলকাতার গল্প করতে করতে জমাটা ক্রমে উঠল। তাই একদিন সাহস করে জিজ্ঞাসা করে ফেললাম—"অত অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে করেন কি আপনারা? দেখে মনে হচ্ছে, মাঝে মাঝে লড়াই করতেও নামতে হয়। আপনাদেরও তাহলে দুশমন আছে।"

ধ্রুব মহারাজ বললেন—"আমাদের দুশমন নয়, দস্যুর দুশমন। বাঙলা দেশে ডাকাত নেই? রাজস্থান বেশী দূরে নয়, ওধারে সিন্ধু। তার ওপর সমুদ্র তো রয়েছেই। কাজেই মাঝে মাঝে খারাপ খবর আসে। তখন ছুটতে হয়। কোথাও ডাকাতি হোয়েছে শুনলে আমরা দৌড়ই, আমাদের ঘোড়াগুলো ভয়ানক রকম ভুখড়, দু-তিন দিন সমানে দৌড়ে ঠিক ডাকাত দলের নাগাল পাইয়ে দেবে। দু'একটাকে খতম করে মুণ্ড নিয়ে এলেই দেশের লোক সন্তুষ্ট, জ্যান্ত ধরে আনতে পারলে তো কথাই নেই। স্বয়ং মহারাজ এসে খুশী মনে মায়ের পুজো দেন।"

খটকা লেগে গেল। জিজ্ঞাসা করলাম—"জ্যান্ত ধরে আনলে ডাকাতগুলোর বিচার হয় বুঝি? কে বিচার করেন?"

পরমাশ্চর্য হোয়ে পড়লেন ধ্রুব মহারাজ, সভ্য জগতের সভ্য বিশ্ববিদ্যালয় যাকে বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ ডিগ্রি দিয়েছে, তিনি হাঁ হোয়ে গেলেন। ডাকাতদের আবার বিচার! বাঙলা দেশে কি ডাকাতদেরও বিচার হয়। ডাকাতরা কি বিচার বিবেচনা করে লোক খুন করে বেড়ায়! ডাকাতদের বিচার তো তারা নিজেরাই করে রেখেছে, হয় নয় মার। জ্যান্ত ডাকাত ধরে আনলে তাকে দিয়ে মায়ের পুজো হয়। মুণ্ড কেটে আনলে মুণ্ডও মায়ের সামনে নিবেদন করে দেওয়া হয়। এর আর বিচার আচার কি আছে!

টুঁ শব্দটি করতে পারলাম না।

তারপর আর মায়ের সামনে গেলাম না। মায়ের মন্দিরের সামনে পাথরে বাঁধান উঠোনটাতে পা দিতে হবে তো। ঠিক ঐ খানেই এই সে দিন তিন তিনটে জ্যান্ত মানুষকে ছটি গেড়ে বসিয়ে এক এক চোপে কেটে ফেলা হোয়েছে। হাঁ, এই সেদিন, সাত আট মাস আগে শীত কালে। ধ্রুব মহারাজই শোনালেন সেই গল্প। শীতকালেই ডাকাতরা বেশী আসে। মায়ের স্থান থেকে বত্রিশ মাইল দূরে একটা গ্রামে ডাকাত পড়ল। তারপর দিন সেই সংবাদ এসে পৌঁছল আশাপূর্ণার সংসারে। সব সুদ্ধ আট জন আর আটটা ঘোড়া চলে গেল। সারা রাত ছুটে অকুস্থলে পৌঁছে ডাকাতদের পেছনে ধাওয়া করতেই লেগে গেল অনেকটা সময়। তারপর আড়াই দিন সমানে ঘোড়ার পিঠে বসে রইল সবাই, সব শেষে একটা পাহাড়ের মধ্যে মিলল ডাকাতদের সন্ধান। ভয়ঙ্কর লড়াই হোয়েছিল সেখানে। শেষ পর্যন্ত তিনটে জ্যান্ত ডাকাতকে ধরে আনা গিয়েছিল এই যা লাভ।

"আপনাদের তরফে কেউ খুন জখম হয় না বুঝি!" কথাটা জিজ্ঞাসা না করে থাকতে পারলাম না। ধ্রুব মহারাজ বললেন—"হয় বৈ কি দু'চার জন। তবে আমরা হার মানি না। গত বারেও তিনটে মানুষ আর তিনটে ঘোড়া কিরল না, তা' হোক, মায়ের পুজোর জন্যে ডাকাত তিনটেকে তো পাওয়া গেল। আর মুণ্ডও এসে ছিল অনেকগুলো। আমাদের লোকসান হয় নি।"

লোকদান।

স্তম্ভিত হোয়ে দুই নরবলির কলেবরের মুখখানির পানে তাকিয়ে রইলাম। এদের লাভ লোকদান জানটা কত সূক্ষ্ম!

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণ আশাপূর্ণার সংসারে স্বীকার করে না। একটা বাঘ খুন করবার বদলে একশ আটটা মানুষ বলি দেওয়াটা যে অত্যধিক রকম বেহিসেবী ব্যবস্থা, সে কথা তাঁদের বোঝায় কে। মানুষ সস্তা, বাঘ সস্তা নয়। তাছাড়া এমন মানুষ যে অনেক রয়েছে, যারা একেবারে না থাকলে দেশের শান্তি, দশের শান্তি। সেই সব আগাছা রেখে লাভ কি। বাগিচা ভালো থাকবে ভালো জন্মাতেন না হোলে সেগুলোকে শেষ করে দিলে কি দোষ হয়। আগাছা যদি থাকে বাগানে, দেখবেন আস্তে আস্তে সমস্ত বাগানটাই তারা গ্রাস করে ফেলবে আগাছা কি রাখতে আছে।

তাই আশাপূর্ণার সংসারে কারাগার নেই, বিচারালয় নেই। বিচারালয় নেই বলে জুরিও নেই। জুরি নেই বলে সাক্ষী দেবার মানুষও নেই। সাক্ষী নেই বলে উকিল মোক্তার পুলিশ দারোগাও নেই। দুটো পরলা উপার্জনের কোনও ফিকির নেই সেখানে। ফিকির নেই যে সমাজ ব্যবস্থায়, সেখানে মানুষ শান্তিতে বাস করবে না কেন। অন্তত্তেও যদি তুমি শান্তি না পাও, তাহলে তোমার বিদেশ হও। বিদেশ না হোয়ে যদি ওখানে বসেই তুমি ওখানকার শান্তিটুকু বিষিয়ে তোলবার চেষ্টা কর, তাহলে আর কি করা যাবে। বোঝা যাবে, মায়ের মর্জি হোয়েছে আর একটি নরবলি পাবার, সুতরাং চল মায়ের সামনে। বিধিপূর্বক মন্ত্র পড়ে নিবেদন করে দেওয়া যাক। মায়ের মহিমা আর এক হাত বৃদ্ধি পাবে।

মায়ের মহিমায় মায়ের স্থানে অশান্তি থাকতে পায় না, অশান্তি মা গ্রাস করে ফেলেন।

বললাম একদিন পরমানন্দজীকে, "এত নরবলি কেন? নরবলিতে সত্যিই কি দেবী তুষ্টা হন?"

পরমানন্দজী বললেন—"তা আমি জানব কেমন করে। এই মঠে এই প্রথাটা বহু যুগ ধরে চলে আসছে। যাঁরা চালু করেছিলেন তাঁরা বোধ হয় জানতেন দেবী নরবলিতে তুষ্টা হন কি হন না। আমরা ও নিয়ে মাথা ঘামাই না। প্রথাটা রয়েছে যখন, তখন থাকুক না। ক্ষতি তো কিছু করছে না।"

"ক্ষতি করছে না!" প্রায় আর্তনাদ করে উঠে মুখ বন্ধ করলাম।

পরমানন্দজী বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন আমার পানে। তারপর মাথা দুলিয়ে বললেন—"করছে বৈকি। আজ এই মুহূর্তে বুঝতে পারলাম, ক্ষতি করছে। ঐ নরবলির ব্যাপারটা জানতে পেরে এত বেশী ব্যথা পেয়েছেন আপনি যে এখানে আপনার নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে। খুবই ছোট দেখেছেন আপনি মনে, কাজেই খুবই ক্ষতি করছে।"

বললাম—"আমার কথা ছেড়ে দিন, আমি এখানে বেড়াতে এসেছি, দু'দশ দিন পরে চলে যাব। কিছুদিন পরে ভুলেও যাব এখানকার কথা। কিন্তু ধর্মের দোহাই দিয়ে দেবতার স্থানে এই রকম নৃশংস কাণ্ডকারখানা, এটা যে চালু থাকবে। মা করুণাময়ী মায়ের কাছে লোকে আসবে মায়ের করুণা পাবার জন্যে, মাকে ঘৃণার মত ভয় করবার জন্যে নয়। মানুষ ধরে এনে কেটে কেলা হয় শুনলে কোন মানুষের প্রাণে ভাব ভক্তি প্রেম করুণা বেঁচে থাকে। রাক্ষসীর কাছে তো লোকে যায় না, মায়ের কাছেই যায়। এই কি সেই মায়ের স্থান?"

পরমানন্দ তৎক্ষণাৎ আমার কথায় সায় দিলেন। বললেন—"আমিও ঠিক ঐ কথাই বলি। কেন রে বাপু মানুষ মারতে হয়, দূরে কোথাও মার। এই যে এত বড় যুদ্ধটা চলছে দুনিয়ায়, হাজার হাজার লক্ষ কোটি মানুষ মারছে আকাশ থেকে, বোমা ফেলে, সেই রকম ভাবে মারলেই হয়। মায়ের স্থানে ও হাঙ্গামা রাখা কেন। তা' শুনবে কি কেউ আমার পরামর্শ। বলে, বেশ তো চলছে। মায়ের আসনে কম অন্যায় কম চুরি চামারি জোচ্চুরি চলছে এ দেশে। মায়ের ওপর থেকে যেদিন লোকের ভক্তি শ্রদ্ধা চলে যাবে, সেদিন এ দেশটাও বোম্বাই করাচী কলকাতার মত বজ্জাতের আড্ডা হোয়ে উঠবে। আমি আর কি করতে পারি বলুন, এদেশের রাজার পুরুত বংশের ছেলে

আমি। বাবের পুজোটা চালাই, আমার দিন চলে যায়। আমি কেন এ সমস্ত ব্যাপারে নাক গলিয়ে নিজেরে সর্বনাশ ডেকে আনব। রাজা ইচ্ছে করলে আমাকে খেদিয়ে দিয়ে আর এক পুরুত রাখবেন। আমি কি আর কোনও প্রথা পালটাতে পারি।"

বুঝলাম, এ ব্যাপার নিয়ে উনি আমার সংগে আলাপ করতেও অনিচ্ছুক। ঠিক করলাম, এবার সরতে হবে। ভৈরবীর খোঁজ করলাম। এখানে পৌঁছনো ইস্তক ভৈরবী চুটকিকে সংসার করছেন। রান্না, বাসন মাজা, ঘর দরজা সাফ করা সমস্ত কাজ মহিলাদাই করেন, ভৈরবীও তাঁদের সংগে আছেন। কখন খান, কি খান, কোথায় ঘুমান, জানতেও পারি না। জানবার চেষ্টাও করিনি। আমি যেখানে থাকি, যে বাড়িতে থাকি, সেখান থেকে অনেক তফাতে ভৈরবী থাকেন। নিশ্চিন্তই ছিলাম; আর নিশ্চিন্ত থাকা গেল না। ডাকিয়ে আনালাম একটা ছোট্ট মেয়েকে দিয়ে। জিজ্ঞাসা করলাম—"এখানেই থাকবে নাকি বাকী জীবনটা, এখান থেকে বেরতে হবে না।"

ভৈরবী বললেন—"কাজ শেষ হোয়েছে আপনার? আপনার কাজ শেষ হোয়ে থাকলে এখানে থেকে আর লাভ কি? পুজোর সময় কাশীতে থাকলে বেশ হয়। পুজোও তো এসে গেল।"

"আমার কাজ!" আকাশ থেকে পড়লাম—"কি কাজ আমার।"

ভৈরবী বললেন—"তা আমি জানব কেমন করে। সবাই বলে, তাই শুনি। এখানে নাকি আপনি এঁদের তন্ত্র শেখাচ্ছেন।"

চুপ করে গেলাম। এ সমস্ত কথা এখানে কে কি উদ্দেশ্য রটিয়েছে!

বিনা উদ্দেশ্যে। যেখানে সবাই বেঁচে আছে উদ্দেশ্য বিহীন হোয়ে, সেখানে কেউ কোনও উদ্দেশ্যেই কিছু করে না। বিনা উদ্দেশ্যে বেঁচে থাকার মত একটা অপার্থিব শক্তি এরা অর্জন করেছে। সেটি কি!

অবশেষে সেই শক্তির দর্শন পেলাম।

যেদিন চলে আসব, তার আগের দিন অর্ধেক রাতে পরমানন্দজী এসে চুপি চুপি ঘুম থেকে তুলে বললেন—"চলুন। রহস্যটা না জেনে গেলে আপনার লোকসান হোয়ে যাবে। তাঁকে ডেকে আনলেন। আশাপূর্ণা মায়ের এখানে অনর্গল অনেকগুলো দিন অপচয় হোয়ে গেছে। চলুন, যা দেখতে এসেছেন, আজ দেখতে পাবেন।"

চললাম।

আকাশে একটু একটু মেঘ জমেছে তখন, ছেঁড়া ছেঁড়া সাদা সাদা পেঁজা তুলোর মত মেঘ আকাশময় চলে বেড়াচ্ছে। তার অনেক পেছনে মলমলা চাঁদ—ঘুরে চুলুচুলু অবস্থায় জবুথবু হোয়ে বসে আছে। আমরা দুজন পা চালালাম। আশাপূর্ণা মায়ের মন্দিরের চারিদিকে মানুষের বাস, তারপর ক্ষেত। সব পার হোলাম। আরম্ভ হোল উঁচু নীচু এবড়ো-খেবড়ো নোড়ানুড়ির জঙ্গল। নীরবে আমরা পার হচ্ছি। প্রায় ঘণ্টাখানেক হাঁটবার পরে দূরে একটা ছোট পাহাড় দেখা গেল। পরমানন্দ বললেন—"ঐ পাহাড়টার তলায় আমাদের পৌঁছতে হবে। একে পড়েছি প্রায়, অর্ধেক রাত পার হোলে তবে দর্শন করেন। শুকতারা ওঠা চাই। ব্রাহ্মমুহূর্তের আগেই আমাদের ফিরে নিতে হবে। মনে মনে গুছিয়ে নিন আপনার প্রশ্নগুলো। যা জানতে চান, বলবেন। যা জানাতে চান তাও বলবেন। কোনও রকম দ্বিধা করবেন না।

জিজ্ঞাসা করলাম—"ইনি কে?"

"ওঁকেই জিজ্ঞাসা করবেন" বলে খাড়া চড়াই উঠতে সুরু করলেন পরমানন্দজী। আমি ঠিক পিছনে আছি। চড়াইটা যেখানে শেষ হোল, সেখানে থেমে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—"এইবার আমার হাত ধরে আসুন, এবার নামতে হবে। খুব পুরনো সিঁড়ি, ভেঙেচুরে গেছে। সাবধানে নামবেন আমার হাত ধরে, আসুন।"

তারপর নামা, ঘোর অন্ধকারে নামা। সেই নামার শেষে সঠিক ভাবে পৌঁছন গেল। চোখ মেলে দেখলাম! ছোটখাট একটি রাজপাট বলা চলে। মোটা মোটা থামের মাথায় ছাত। প্রায় প্রত্যেকটি থামে এক একটি প্রদীপ জ্বলছে। আলো তাতে বিশেষ হচ্ছে না, তবে অন্ধকারটা কতখানি অন্ধকার তা মালুম হচ্ছে। একটার পর একটা থাম পেরতে লাগলাম, সর্বশেষে থামতে হোল। আর এগবার উপায় নেই, সামনে এক অন্ধকার পাষাণ।

পরমানন্দ বললেন—"বসুন এখানে হাটু গেড়ে।

মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে বলুন, মা দর্শন দাও। তুমি বলেছিলে, দর্শন পেয়ে তাই এসেছি।—মা দর্শন দাও।

মা বললেন পরমানন্দ ঠিক তাই করলাম। মনে মনে আকুল ভাবে বললাম, মা দর্শন দাও। একটি বার দর্শন দাও মা, নতুবা এ জীবন রাখব না। এখানে এসেও যদি তোমার দর্শন না পাই তা হলে—

তা হলে কি করব বা করব বলতে হোল না। আগে আগে সেই অন্ধকারে আলো দিয়ে গড়া এক মানবী মূর্ত্তি ফুটে উঠল। হাত চারেক সামনে শূন্যে স্থির হোয়ে রইল সেই মূর্ত্তি। মূর্ত্তিটি আলোর তৈরী, শুভ্র জ্যোতি ছাড়া আর কিছুই নয়।

পাশ থেকে পরমানন্দজী ধীরে ধীরে উচ্চারণ করতে লাগলেন—

স্বাহা স্বধা কলৌরূপা শুভাং পীযূষ বাহিনীম্।
অতস্ত্বাং বীজরূপাঞ্চ পালয়িত্রীম্ বিনাশীনিম্।

আমি মুগ্ধ হোয়ে গেলাম। কি দেখছি, কি শুনছি, কিছুই তখন মস্তিষ্কে প্রবেশ করছে না। ছোট খাট এক মানবী মূর্ত্তি, কমলাদেবী রঙের আচ্ছাদনে মুখখানি ছাড়া সমস্ত দেহ আবৃত। চোখ দুটি ঘোর নীলবর্ণ অর্দ্ধ নিমীলিত। ছোট্ট দেহটির ভেতরে যেন সাদা আলো জ্বলছে। এ কি কোনও পুতুল! না ভ্রম দৃষ্টি বিভ্রম! যা দেখছি, তা' সত্যি দেখছি না, এইটা অবিশ্বাস ভরে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইলাম।

তারপর কথা। পরিষ্কার হিন্দীতে মা বললেন "বাচ্চা যা দেখছে তা' বিশ্বাস করতে পারছে না।"

পরমানন্দজী বললেন—"মা তুমি ওকে বিশ্বাস করিয়ে দাও।"

তখন সেই আলোক মূর্ত্তি থেকে একখানি আলোর তৈরী হাত বার হোল। হাতখানি ধীরে ধীরে উঠল আমার মাথার দিকে। তারপর সেই মূর্ত্তিটি ভেসে এল আরও অনেক কাছে। হাতখানি ঠেকাল আমার মাথার ওপর। সঙ্গে সঙ্গে যেন ঘুম ভেঙে গেল আবার। সম্পূর্ণ সজাগ অবস্থায় মনে মনে বললাম—"চৈতন্যরূপিণী, চৈতন্য দান কর।"

আস্তে আস্তে অস্ফুট মিষ্টি সুরে মা বলতে লাগলেন "তুমি আমি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যেখানে যা কিছু দেখছ, সমস্ত আলো থেকে সৃষ্টি হোয়েছে। আলোর সন্তান আমরা, আমরা জ্যোতির সন্তান। আসল তুমি ঠিক আমার মত—জ্যোতিষ্মান্। এখান থেকে মহাব্যোম, মহাব্যোম থেকে অনাদি অনন্ত মহাশূন্যে অবাধে বিচরণ করতে পার তুমি, যদি তুমি নিজেকে চিনতে পার। তোমার ঐ খোলসটা আসল তুমি নও। তোমার কামনা বাসনা সংস্কার গিয়ে গড়া আর এক খোলস আছে সেটাও তুমি নও। তারপর আসল তুমি—জ্যোতির সন্তান জ্যোতির্ময়। সৃষ্টি থেকে সেই জ্যোতি সর্বত্র ছড়াচ্ছে, জ্যোতি রূপান্তরিত হয় না, জ্যোতি কখনও নিভেও যায় না। জ্যোতির স্বভাব বহু বিচিত্র রূপে প্রকাশ পাওয়া। এই সৃষ্টির খেলা। নিজেকে খুঁজে বার করবার চেষ্টা কর। সমস্ত সংস্কার থেকে মুক্ত হবার জন্যে চেষ্টা কর। তা' হলে আর শান্তি অশান্তি থাকবে না।"

আর কি জিজ্ঞাসা করা যায়!

তাড়াতাড়ি বলে ফেললাম—"মা, সেটা কি এ জীবনে সম্ভব হবে।"

মা অতি অপরূপ হাসি হাসলেন।

জ্যোতি মিলিয়ে গেল।

আবার যাত্রা শুরু হোল। এবং সেটি হোল পরদিন সকালেই। দু'খানি কম্বল দুটি কমণ্ডলু দু'প্রস্থ করে কাপড় চাদর দিয়ে বিদায় আমাদের পরমানন্দজী। যা কিছু তা তো সব কোটেশ্বরের ওখানেই রয়ে গেছে। নতুন কাপড় চাদর চড়িয়ে নতুন কম্বল ঘাড়ে নিয়ে রওয়ানা হোলাম। প্রথমে জল পথে [illegible] তারপর রেলে চেপে সমুদ্রের কিনারায়। স্টীমারে সমুদ্র পার হোলেই মহালক্ষ্মী বন্দর। কাথিওয়াড়ে পৌঁছে গেলাম। নবরাত্র দেবার জন্যে ঘাটে।

আজও মাঝে মাঝে মনে পড়ে আমি জ্যোতির সন্তান, আমার আসল রূপ জ্যোতির রূপ।

মা আশাপূর্ণার জ্যোতির্ময়ী রূপ আমি দর্শন করেছি। মা অভয়া অভয় দান করেছেন।

হবে, নিশ্চয়ই হবে। একদিন না একদিন ঠিকই নিজেকে চিনে উঠতে পারব।

—সমাপ্ত—

গান্ধী—রলাঁ সাক্ষাৎকার

প্রবোধরঞ্জন সেনগুপ্ত

১৯২৮ সালে আন্তর্জাতিক যুব শান্তি কংগ্রেসে ও ভিয়েনাতে যুদ্ধ বিরোধী অসহযোগীদের আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে গান্ধী নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। এই দুই কংগ্রেসে গান্ধীর উপস্থিতি যে একান্ত প্রয়োজনীয় সে সম্বন্ধে রম্যাঁ রলাঁ গান্ধীকে লিখেছেন যে সমগ্র পৃথিবীর শান্তিকামী যুব সমাজ সবচাগ্রহ এশিয়া ও ভারতের শান্তিবাণী গান্ধীর নিকট থেকে শুনবার জন্য উৎগ্রীব হয়ে আছে।

রলাঁ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর নিতান্ত গুণমুগ্ধ। বিশেষ করে গান্ধী এই অশান্তিময় ও হিংসাপরায়ন বর্তমান পৃথিবীতে মানুষকে একটা শ্রেষ্ঠতর নৈতিক আত্মিক শক্তির পথ-প্রদর্শক এই ছিল একদিকে রলাঁর বিশ্বাস এবং এই বিশ্বাস নিয়েই তিনি ১৯২৩ সালে গান্ধী-জীবনী লিখে ভারতের বাইরে সমগ্র পৃথিবীর নিকট গান্ধী ও গান্ধীবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেছিলেন।

গান্ধী ১৯২৮ সালে স্থির করেছিলেন যে ঐ দুই কংগ্রেসে উপস্থিত থাকার জন্য তিনি ইয়োরোপ ও রলাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন, কারণ এই সাক্ষাৎ মতাদর্শের দিক থেকে উভয়ের পক্ষ থেকে বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল।

মীরাবেন কে (Miss Slade) দিয়ে গান্ধী রলাঁকে লিখলেন, (১৬ই মার্চ): বাপু আপনাকে জানাতে বলেছেন যে কংগ্রেসগুলিতে উপস্থিত থাকা তাঁর নিকট গৌণ। আপনার সঙ্গে দেখা করার গভীর আহ্বান তাঁকে মুখ্যত প্রভাবান্বিত করেছে। এই আহ্বান সব সময়েই ছিল, কিন্তু আপনার সাম্প্রতিক চিঠিগুলি পাবার পর থেকে তা এখন একান্ত জরুরী হয়ে পড়ছে। যদি আপনার কোনো অসুবিধা না হয়, তাহলে বাপু আপনার সঙ্গে কিছুদিন থাকবেন, যাতে করে তিনি আপনাকে সব পরিষ্কার করে বোঝাতে পারেন, আপনারা পরস্পরকে বুঝতে পারেন, এবং যাতে করে আপনাদের মধ্যে নগ্যতম ভুল বোঝাবুঝিগুলিও চিরতরে নিশ্চিহ্ন হতে পারে।" (Inde, p. 195)।

অন্তরের আহ্বান আসা সত্ত্বেও কিন্তু গান্ধী কোনো কারণেই ঠিক এসময়েও ইয়োরোপে গেলেন না। তাছাড়া আরও একটা বিষয় রলাঁকে খুব আশ্চর্যান্বিত করল গান্ধী তাঁর ১৯১৪ সালের যুদ্ধের সমর্থনকে ব্যাখ্যা করার কাজটা রলাঁর ও আরও অনেকের সনির্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও এড়িয়ে যাচ্ছেন। রলাঁ বলছেন এটা তাঁর পক্ষে "বোকা বোকা কাঠিন।"

রলাঁ এই সময় গান্ধীকে যে চিঠি লিখেছিলেন (১৬ই এপ্রিল) তা কেবলমাত্র গান্ধীবাদই নয়, বর্তমান জগতের সংকট-সমস্যার আলোচনায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। "আপনি হচ্ছেন এমন একজন ব্যক্তি যাঁর অন্তরের শক্তি কর্মের মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে ওঠে। আমার কর্ম

১। রম্যাঁ রলা বিভিন্ন বিষয়ে দিনপঞ্জী লিখতেন। সেগুলি তাঁর মৃত্যুর পর আট দশ খণ্ডে ফরাসী ও নানা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। এই ডায়েরী গুলির মধ্যে একখণ্ড Inde শুধুমাত্র ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ৫০০ পৃষ্ঠা। এতে রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, রলা, সুভাষ বোস, জগদীশচন্দ্র বোস, নেহেরু, লাজপত রায় এবং আরও অনেকের বহু মূল্যবান অপ্রকাশিত চিঠিপত্র, ও কথোপকথন রয়েছে। এই বইএর বাংলা অনুবাদের copyright সংগ্রহ করেছেন Radical Book Club-এর শ্রীবিমল মিত্র।

সর্বদাই আমার চিন্তাকে অনুসরণ করে চলে। আমার জীবনের উপাদান (essence) হল আমার চিন্তার মধ্যে যে ভূমিকা আমাকে গ্রহণ করতে হয়েছে তার জন্য সত্য চিন্তা, স্বাধীন চিন্তাই হচ্ছে আমার পক্ষে অবলম্বনীয় আবশ্যকতা ও প্রেরণা এই কর্ম থেকে, জানা ও বোঝার অবিরাম প্রচেষ্টা থেকে, বিরত হইনি।

"আপনার ইয়োরোপে আগমন খুবই সঙ্গত ও ভাল হবে। তাতে আপনি ইয়োরোপের যুব সমাজের সংস্পর্শে আসতে পারবেন—সে যুব সমাজের পক্ষে আপনার সাহায্য, আপনার উপদেশ ও আপনার আলোক নিতান্ত প্রয়োজন। এর চাইতেও আরও বেশী প্রয়োজন ও অত্যাবশ্যক (আপনি ইয়োরোপে আসুন, আর নাই আসুন) যে আপনি যুদ্ধ, শান্তি, অহিংসা সম্বন্ধে আপনার মতবাদ ও বিশ্বাস সমস্ত পৃথিবীর শ্রোতাদের নিকট সম্পূর্ণ পরিষ্কার সুস্পষ্ট ও সঠিক ভাবে ব্যক্ত করুন। আমরা দুজনেই বয়স্ক, যে কোনোদিন আমরা অদৃশ্য হয়ে যেতে পারি। আগামী অর্ধ শতাব্দী ধরে জগতের যে যুব সমাজকে একটা ভীষণ বোঝা বইতে হবে, সেই যুব সমাজের জন্য একটা testament রেখে যেতে হবে যা তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারে। আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি যে তাকে একটা ভয়ঙ্কর সংকটের সম্মুখীন হতে হবে। আমার কোন সন্দেহ নেই যে এমন একটা সংঘের যুগ, এমন একটা জগৎব্যাপী মহাযুদ্ধের যুগ আসছে, যার তুলনায় অতীতের যুদ্ধগুলি ছেলে খেলা বলে গণ্য হবে। আমাদের দুজনকে হয়ত সেই দানবের সম্মুখীন হতে হবে না, কিন্তু যাদের হবে তাদের জন্য আমরা কি নৈতিক ধর্ম রেখে যাচ্ছি। সেই নয় খাদক দানব—সে কারও জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকে না—তার প্রতিই বা আমাদের কী বক্তব্য? আপনার কী আদেশ? আরও একটা কথা দেখা প্রয়োজন যে আমাদের কথা যেন ধ্বংসমূলক না হয়। দুঃখের বিষয়, এ সম্বন্ধে আমাদের সব থেকে বড় উদাহরণ স্বয়ং যীশুখৃষ্ট—যাঁর প্রশংসনীয় ধর্মগ্রন্থে ধ্বংসমূলক এত অত্যধিক অংশ আছে সেগুলিকে তাঁর অসৎ অনুচরেরা অপকর্ম ব্যবহার করেছে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ও আমরা দেখেছি কি ভাবে সকল দেশের ভণ্ড রাষ্ট্রনায়করা এবং সাধু অসাধু পাদ্রীরা যুদ্ধ, হত্যা ও প্রতিহিংসার ইন্ধন যোগাবার জন্য বাইবেলের উক্তিগুলিকে ব্যবহার করেছে। ভবিষ্যত সংকটের দিনে গান্ধী-উক্তিতে যেন স্বার্থবাচক কিছু না থাকে। আর একটি কথা—যে নির্দেশ তিনি দেবেন, তার সমস্ত ফলাফল বিচার করে তা দেবেন। আরও তাঁকে দেখতে হবে মানুষের কোন্ শক্তির উপর নির্ভর করে তিনি সে নির্দেশ দিচ্ছেন।

"আমি এখানে মাত্র কয়েকটি প্রশ্ন তুলে ধরলাম—সে প্রশ্নগুলি আমি জানি যে যুবকদের মধ্যে আজ আলোড়ন সৃষ্টি করছে। আমার উত্তর আমি এখানে দিচ্ছি না আমার প্রশ্ন এখানে ওঠে না, কারণ আপনার পার্শ্বে আমার স্থান দ্বিতীয়। ...নৌকার হালধারে আপনি বসে আছেন, এই কক্ষের মধ্যে নৌকার গতি নির্ণয় করে নাবিকদের আদেশ করার ক্ষমতা আপনারই আছে। সেই আদেশ দিন। সে বন্দর আমরা ত্যাগ করে এসেছি (১৯১৪ সালের যুদ্ধ সম্বন্ধে আমরা এক মত হতে পারছি না, আর তা আমাদের আলোচনাকে জটিল করে তুলছে) তার কথা ভেবে কাজ কী? সে-বন্দর আমাদের গন্তব্যস্থান—ভবিষ্যৎ—তারই কথা আমাদের ভাবতে হবে। প্রিয় বন্ধু আপনার সঙ্গে এইরূপ স্বাধীনভাবে আলোচনা করার জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি জানি নৈতিকভাবে আমি আপনার পদস্পর্শ করারও উপযুক্ত আমি নই। কিন্তু ইয়োরোপের শ্রেষ্ঠতর অংশ আজ যে সমস্ত উদ্বেগ ও প্রশ্নের দ্বারা জর্জরিত সেগুলি আমি জানি। আমি তাদের কথাই আপনার নিকট পৌঁছে দিলাম।" (পৃঃ ১৯৭-৮)

এর কিছুদিন পরে মীরাবেন রলাঁকে জানালেন যে তাঁর চিঠিগুলি গান্ধীকে "গভীরভাবে দুশ্চিন্তায় ফেলেছে।" নানা কারণে ইয়োরোপ যাওয়া তিনি আপাতত স্থগিত রাখছেন। যে বিশ্ববাসী ইয়োরোপ তাঁর কাছে প্রত্যাশা করে তা এখনও প্রস্তুত হয় নি, তা ছাড়া ইয়োরোপকে সেবা করার জন্য ভারতের কাছে তাঁর উদ্বাহরণই শ্রেষ্ঠ।

রলাঁর উক্ত চিঠির তাৎপর্য বুঝবার জন্য স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে সেই সময় ইয়োরোপে বুদ্ধিজীবীদের নিকট

গান্ধী অথবা লেনিন, অহিংসা অথবা হিংসা সংক্রান্ত অথবা বিপ্লব—এইগুলি ছিল সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন; অনেক প্রবন্ধ, পুস্তিকা ও বই এর উপর লেখা হয়েছিল, এবং অনেকেই আশা করতেন যে গান্ধীবাদ ইয়োরোপকে একধারে প্রতিক্রিয়াশীলতা ও অন্যধারে লেনিনবাদের হাত থেকে বাঁচাবে।

ইংলণ্ডে হাউণ্ড টেবল কনফারেন্স সেরে গান্ধী পৌঁছলেন ভিলনভে (সুইটজারল্যাণ্ডে) রলাঁ যেখানে থাকতেন, ৭ই ডিসেম্বর ১৯৩১। গান্ধী তাঁর দল বল নিয়ে ৫ দিন রলাঁর অতিথি হয়েছিলেন। এই ৫দিন ধরে জগতের দুই মনিষীর মধ্যে বর্তমানকালের প্রায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলি নিয়েই আলোচনা হয়েছিল।

প্রথম দিন গান্ধীর নির্বাক দিবস। তবু আলোচনা সুরু হল। রলাঁই শুধু বলে গেলেন—দেড় ঘণ্টা ধরে। গান্ধী শুনে যাচ্ছেন, আর নোট নিচ্ছেন। বর্তমান জগতের সমস্ত সমস্যাগুলি পরিষ্কার ভাবে একটা একটা করে রলাঁ তুলে ধরলেন—সাম্রাজ্যবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ, যুদ্ধ ও শান্তি, অহিংসাবাদ ও বিপ্লব, পুরাতন সমাজ ব্যবস্থা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের নূতন দুনিয়ার সৃষ্টি।

রলাঁ সুরু করলেন ১৯০৮-১৯১৪ সালের একটা পটভূমি দিয়ে—কি হিংস্রভাবে সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের স্বার্থের জন্য যুদ্ধ সুরু করল ও কিভাবে আদর্শবাদী, উদারপন্থী ও সমাজতান্ত্রিকরা পর্যন্ত তাতে অংশ গ্রহণ করলেন ও তাঁদের আদর্শ বিচ্যুত হলেন, যুদ্ধের পরও রাষ্ট্রের কর্ণধাররা শান্তিস্থাপনে অক্ষম হলেন জনসাধারণের মন হতাশায় পূর্ণ হয়ে উঠল। আজ সব কিছুরই মালিক ও চালক পশ্চিমের ধনশক্তি; যা মানুষের সমস্ত জীবনকে বিষাক্ত করে তুলেছে। এই ধনশক্তিরই একটা অংশ ফ্যাসিবাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। বর্তমানে যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নই একমাত্র প্রশ্ন নয়। "দুনিয়া জুড়ে যে শোষণ চলেছে তারই বিরুদ্ধে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। ...যে সত্যাগ্রহ সফল হতে পারে তা হচ্ছে অস্ত্র উৎপাদনের ও অন্যান্য কারখানাগুলির শ্রমিকদের সত্যাগ্রহ, প্রলেটারিয়টদের সত্যাগ্রহ। অর্থ শক্তির অস্ত্রোপায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য এরাই হল প্রধান নায়ক। যান্ত্রিক সভ্যতার অগ্রগতির ফলে একটি উৎকৃষ্টতর শ্রমিক-শ্রেণীর জন্ম হয়েছে যার মধ্যে শৈহিক ও মানসিক উভয় কর্মেরই সামঞ্জস্য ঘটেছে। দানবীয় ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে এরাই বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদের সম্মুখে যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে তা হচ্ছে কৌশলের (tactics) প্রশ্ন। তাদের লক্ষ্য পরিষ্কার: প্রলয়ঙ্করী জনসাধারণকে বিজয়ী হতেই হবে। কিন্তু কোন্ উপায়ের দ্বারা—হিংসা বা অহিংসার দ্বারা সে লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে। সেই উপায়ই হবে শ্রেষ্ঠ যে-উপায় ন্যায়-ধর্ম (just order) স্থাপন করতে পারবে। অহিংসা কি তা পারবে?" ইয়োরোপ ও ভারতবর্ষের সমাজ ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক আন্দোলনের পার্থক্য দেখিয়ে রলাঁ বললেন যে কৌশল ভারতে উপযোগী, ইয়োরোপের পক্ষে তা উপযোগী নাও হতে পারে।

রলাঁ বলে চললেন: "সাইমন, বর্তমানে অবস্থাটা এইরূপ। ১৯১৭ সালে ভীষণ আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে শ্রমিকরা রুশ দেশে একটা নূতন জগত স্থাপন করেছে। তারা অস্ত্রবলে বলিয়ান। এই অস্ত্রবল আত্মরক্ষার জন্য তাদের নিতান্ত প্রয়োজন। পুরাতন জগতই এতে তাদের বাধ্য করেছে। পাঁচটি প্রধান শক্তির দ্বারা যুগপৎ সশস্ত্র আক্রমণ ও তারপর থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নকে ধ্বংস করার জন্য দুনিয়ার অর্থ শক্তির অবিরাম উস্কানী ও অঘন্য ষড়যন্ত্র। সোভিয়েত ইউনিয়ন আত্মরক্ষা করে যাচ্ছে। আমরা পাশ্চাত্যের লোকরা কি করব? হাত গুটিয়ে শান্তভাবে বসে থাকব সোভিয়েতকেও তাই করতে বলব? আমরা বিশ্বাস করি যে সোভিয়েত ইউনিয়ন যদি ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে দুনিয়ার মানুষের আশা ভরসা নষ্ট হয়ে যাবে। রুশ-বিরোধী আক্রমণের প্রতিরোধের জন্য শ্রমিকদের ধর্মঘট করতে হবে? কিন্তু তা যদি করতে হয়, তা হবে বিদ্রোহ, গৃহযুদ্ধ—এ কথাটা ভাল করে বুঝতে হবে। আপনি আমাকে বলবেন যে ইয়োরোপের শ্রমিক-শ্রেণী আত্মবিসর্জন করুক! কার জন্য আত্মবিসর্জন? ধরাময় ভগবানে বিশ্বাস থাকলেই সে কথা উঠতে পারে। কিন্তু ভগবানে বিশ্বাস করে না তারা বিশ্বাস করে

একটি আদর্শে একটি নামে। এটা কম কথা নয়। যদি কেউ এই আদর্শকে বাস্তববাদের নাম করে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করে আমি তার তীব্র প্রতিবাদ করি: এই আদর্শই হচ্ছে মানুষের সব থেকে বীরত্বপূর্ণ আত্মোৎসর্গের উৎস। কিন্তু এই আত্মোৎসর্গ অহিংসা বোঝায় না। আমি আবার বলি, সমস্যাটা দাঁড়াচ্ছে এই রকম—এটা হচ্ছে বাস্তব কর্মের সমস্যা, যে কর্মকে হতে হবে খুব ফলপ্রসূ এবং অনতি বিলম্বে। এতে যদি বাধা আসে, তা মানুষের দ্বারাই হক অন্য যে ভাবেই হোক, তাকে নির্মম ভাবে অপসারণ করতে হবে। আমি গান্ধীকে সোভিয়েত বিচারের impeccable character এর কথা বললাম। ...লেনিনের মত লোকের কোনো প্রকার ব্যক্তিগত হিংসা ছিল না। সমগ্র জাতির কল্যাণ সাধনই ছিল তার জীবনের মূলমন্ত্র। যে উপায়কে তিনি কার্যকরী ও শ্রেষ্ঠ ভেবেছেন সেই উপায়ই তিনি মানবের কল্যাণের জন্য অবলম্বন করেছেন। এই উপায়ের বিরুদ্ধে অহিংসাকে একটা আদর্শ হিসাবে দাঁড় করালেই চলবে না, উভয় উপায়ের ফলাফলের মূল্য দিয়েই তাদের বিচার করতে হবে।" (পৃঃ ২৫৬)

গান্ধী রলাঁর কথাগুলি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন ও মাথা নিচু করে এক মনে নোট নিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু রলাঁ যখন বস্তুবাদের সমর্থনে বললেন যে রুশের লোকরা মানবের ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্য আত্মোৎসর্গ করেছে ও পাশ্চাত্যের নেকী বাক্‌সর্বস্ব ও আত্মত্যাগ-বিহীন আদর্শবাদের তুলনায় সোভিয়েত দেশে তিনি মানুষের শ্রেষ্ঠ আদর্শ দেখতে পান, তখন গান্ধী আশ্চর্য হয়ে মাথা উঁচু করেছিলেন।

ভিলনুভে রলাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষ হলে গান্ধী মুসোলিনীর নিমন্ত্রণে ইতালী ভ্রমণে যাবেন। রলাঁ এইবার সেই প্রশ্ন তুললেন। ফ্যাসিবাদের প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতি, তার হিংস্রতা ও বর্বরতার কথা, তার সাম্রাজ্যবাদী দেশ, তার গণতন্ত্র ও জনবিরোধী চরিত্র এ সবই বললেন, রবীন্দ্রনাথকে ছলচাতুরী ও মিথ্যার দ্বারা ফ্যাসিস্টরা কিভাবে তাদের নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধির কাজে ব্যবহার করবার চেষ্টা করেছিল সেকথাও গান্ধীকে স্মরণ করিয়ে দিলেন। ইতালী ও অন্যান্য দেশের জনসাধারণ ও যে-সব শ্রেষ্ঠ মানুষ ফ্যাসিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও হিংস্রতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে, তার উপর মুসোলিনির নিমন্ত্রণে গান্ধীর এই ইতালী ভ্রমণের কি কুফল ফলতে পারে সেকথাও রলাঁ গান্ধীকে চিন্তা করে দেখতে বললেন।

পরদিন আবার যখন বৈঠক বসল প্রথমেই ইতালীর কথা উঠল। রলাঁ বললেন যে রাষ্ট্রের অতিথি হয়ে গান্ধীর ইতালীতে যাওয়াটাই মুসোলিনির পক্ষে নৈতিক জয়। গান্ধী রলাঁকে আশ্বস্ত করে যা বললেন তার সারমর্ম হচ্ছে এই যে তিনি ঠিক রবীন্দ্রনাথ নন, মুসোলিনি তাঁকে তার কাজে লাগাতে পারবে না। তাছাড়া অহিংসার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে মুসোলিনিকে বলার সুযোগও তিনি পাবেন।

তারপর যে-সব সমস্যাগুলি রলাঁ তুলে ধরেছিলেন সে সম্বন্ধে গান্ধী বললেন: "আমি আমার জীবনে যে কোনো সিদ্ধান্তেই আসি না কেন, আমি তা কোনোদিনই ইতিহাস থেকে নেই নি। আমার চরিত্র গঠনে ইতিহাসের ভূমিকা খুবই কম। আমার পন্থা হচ্ছে পরীক্ষামূলক empirique। এবং আমার সিদ্ধান্তগুলি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত। আমি বুঝতে পারছি এর ফলে ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব। আমি অনেক পাগলকে জানি যারা অনেক বিষয়ে বিশ্বাস করে ও তাদের সেই ভুলগুলি সংশোধন করা অসম্ভব, কারণ সেগুলি তাদের অভিজ্ঞতা। একজন পাগলের অভিজ্ঞতা ও আমার অভিজ্ঞতার মধ্যে ব্যবধান খুবই কম। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার অভিজ্ঞতার উপর আমার বিশ্বাস করে যেতে পারে না। পুরাতনকালের ঋষিদের অভিজ্ঞতাগুলি তাঁদের অনুভূতির (intuition) উপর নির্ভরশীল ছিল। তাঁরা যে ভুল করেন নি তা সকলেই জানেন এবং ইতিহাসই তা প্রমাণ করে দিয়েছে। আমিও গর্ব করে বলতে পারি যে আমার বিশ্বাসগুলিও ভিত্তিহীন নয়।

"গতকাল আপনার কথাগুলি শুনে আমি ভাবছিলাম: বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের কর্তব্য কি? এক্ষেত্রে আমি বলতে পারি না যে আমার

মত এই রকম (অর্থাৎ যেমন আপনি পারেন)। যে-সব সমস্যাগুলি আপনি আমার সামনে তুলে ধরেছেন সেগুলি সাংঘাতিক সমস্যা। অহিংসানীতি ভারতবর্ষে সফল হয়েছে, এবং ভবিষ্যতেও হবে, কিন্তু এটা নিশ্চিত যে ইয়োরোপে তা সফল হবে না। কিন্তু সে কারণে আমি চিন্তিত নই। আমি বিশ্বাস করি যে অহিংসানীতি সকল দেশেই প্রযোজ্য। কিন্তু আমার মনে হয় যে আমার এই বাণী আমি ইয়োরোপকে দিতে পারি না। অনেক সৎ ইংরেজকে আমি বলেছি 'যতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের মনে বিশ্বাস না জাগবে, আপনারা এক পাও নড়বেন না, কিন্তু আমি, দুনিয়ার সমস্ত লোক বিশ্বাস না করলেও, আমি তাতে বিশ্বাস করব।'

"রুশ দেশে যা ঘটছে তা একটা ধাঁধা। আমি রাশিয়া সম্বন্ধে খুব কমই জানি, কিন্তু রুশ পরীক্ষণের চূড়ান্ত সফলতা সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। রাশিয়া হল অহিংসানীতির একটা প্রতিবাদ (denial)। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে রাশিয়া সফলতা লাভ করছে। কিন্তু সফলতার পশ্চাতে রয়েছে পশুশক্তি।... আমার পরিচিত যে-সব ইংরেজ (এবং আমেরিকানও) রুশ দেশ ভ্রমণ করেছেন তারা আমার মনে হয় নিরপেক্ষ, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ভাল বলেছেন, আবার কেউ কেউ খারাপ বলেছেন।[১] লর্ড লোদিয়ান, বার্নার্ড শ ও আরও কয়েকজনের সঙ্গে আমি এই সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। লর্ড লোদিয়ান নিঃসন্দেহে বলতে পারেন না এই পশুবল কতদূর পর্যন্ত রুশ সমাজকে নূতন ছাঁচে ঢালতে পারবে। বার্নার্ড শ এ সম্বন্ধে খুব উৎসাহের সঙ্গে লিখেছেন, কিন্তু আমার সঙ্গে আলোচনায় সে উৎসাহ দেখান নি। তা ছাড়া আমি তাঁর সঙ্গে সে সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনাও করিনি। তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এতই আগ্রহান্বিত যে আমরা শুধু সে সম্বন্ধেই কথাবার্তা বলেছি।"[২] আমি ইয়োরোপে যা দেখেছি তাতে আমার মনে হয় যে অহিংসা ছাড়া তার আর গতি নেই। সুখের বিষয় যে এর জন্য একটা বড় সংগঠনের প্রয়োজন হয় না। এমন একজন মহাপুরুষের এখানে প্রয়োজন যিনি অহিংসায় বিশ্বাসী হবেন, তার জীবন্ত আদর্শ হবেন। ততদিন পর্যন্ত সেই মহাপুরুষের আবির্ভাব না হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, আশা করতে হবে, ও ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে।" (পৃঃ ২৬৪-৫)

রলাঁ বললেন খ্রীশ্বখৃষ্টের মতবাদ প্রচার হতে ১০০ বৎসর লেগেছিল। এতদিন অপেক্ষা করতে পারলে ইয়োরোপেও হয়তো অহিংসাবাদ সফল হতে পারত। কিন্তু ফ্যাসিবাদ যেভাবে হিংস্র পন্থার দ্বারা এই মুহূর্তে ক্ষমতা দখল করবার চেষ্টা করছে ও মানুষের সমস্ত আশা ভরসা, সুখ শান্তিকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছে এবং যার ফলে ইয়োরোপের জীবনে একটা গভীর সংকট দেখা দিয়েছে, তাতে অপেক্ষা করার সুযোগ কোথায়?

তার উত্তরে গান্ধী বললেন যে মানুষ সত্য সত্যই মূর্তি পূজারক : খৃস্টানরাও তার ঊর্ধ্বে উঠতে পারে নি। পরোক্ষেন্দ্রিয়ের মধ্যে অন্তত একটা দিয়ে মানুষ তাকে দেখতে চায়, অনুভব করতে চায় অথবা স্পর্শ করতে চায়। "অহিংসা গ্রহণ করবার পূর্বে মানুষ তারও সফলতা সম্বন্ধে চাক্ষুষ প্রমাণ দেখতে চাইবে। ভারতবর্ষ সেই প্রমাণ দিচ্ছে। ভারতবর্ষে যদি তা সফল হয়, তাহলে সবই সহজ হয়ে যাবে। আমার বিশ্বাস এই সফলতা অর্জন করতে আরও দশ বৎসর লাগবে। এইভাবে যদি ভারতবর্ষ সত্যকারের স্বাধীনতা লাভ করতে পারে, সারা জগৎ অহিংসার চাক্ষুষ প্রমাণ পাবে এবং আমি মনে করি যে তখন ইয়োরোপীয়রা দেখতে পারবেন যে এই পন্থা কত সহজ কিন্তু

১। রবীন্দ্রনাথ তাঁর "রাশিয়ার চিঠি"তে লিখেছিলেন : "আমি রাশিয়াতে আসচি শুনে অনেকলোকই আমাকে উৎসাহ দিয়েছে। এমন কি অনেক ইংরেজের মুখেও ওদের প্রশংসা শুনেছি।" (পৃঃ ১৯)

২। গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যখন বার্নার্ড শ চলে যাচ্ছিলেন, সাংবাদিকরা গান্ধী সম্বন্ধে তাঁর মতামত জানতে চেয়েছিলেন। শ বলেছিলেন :

"Why, that is not a man but a Phenomenon. You must really giue me some time to recover from the shock."

...রতে যদি হিংসা ছড়িয়ে পড়ে অথবা হিন্দু মুসলমানের ...ধ্বংস হয়ে যায় ও তার ফলে যদি ভারতে বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টি হয়, তাহলেও আমার বিশ্বাসই আমার সান্ত্বনা থাকবে।...যে ভাবেই হক স্বাধীনতা এসে পৌঁছিবে, তা আসছে, এসে গিয়েছে। আমি মনে করি যে, যখন সময় আপনারা সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে পারবেন। কিন্তু আমি আপনাদের এ বিষয়ে কোনো প্রস্তাবই দিতে পারবো না। ইয়োরোপের অবস্থা মনে হয় খুব গণ্ডগোলে।" (পৃঃ ২৬৩)

বলা। সব প্রশ্নগুলি করেছিলেন গান্ধী তার একটারও লোকাসুজি উত্তর দিচ্ছেন না দেখে বলা আবার বললেন যে অবস্থাবিশেষে অহিংসা অসহযোগ আন্দোলন খুবই কার্যকরী হয় তাতে সন্দেহ নেই। উনবিংশ শতাব্দীতে ইয়োরোপেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে এইরকম আন্দোলন হয়েছিল। কিন্তু আজকার অবস্থায় কি তাকে সব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়? যেমন আজ ইয়োরোপে ও এশিয়ার অসংখ্য নারী ও শিশুদের খনিতে ও কারখানায় ভয়ানকভাবে শোষণ করা হচ্ছে। এইসব নিষ্পেষিত শ্রেণীগুলির মুক্তির উপায় কি? কিম্বা ধরুন, যদি পশ্চিম ইয়োরোপ, আমেরিকা, জাপান আবার গোটা এশিয়াকে আক্রমণ করে—যেমন তারা অতীতে করেছিল এবং যার জন্য তাঁরা পুনরায় প্রস্তুত হচ্ছে—তাহলে এসব দেশের ও অন্যান্য মানুষের কি কর্তব্য? বলা তারপর একটু জোর দিয়েই বললেন যে এই অবস্থায় ইয়োরোপের শ্রমিক শ্রেণীকে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করাই হল প্রধান কাজ—"ইয়োরোপে বর্তমানে জাতীয় প্রশ্নের চাইতে সামাজিক প্রশ্নটাই প্রধান হয়ে উঠেছে। আজকের গোটা দুনিয়াটাই দুইটি আন্তর্জাতিকে বিভক্ত হয়েছে—ধনপতি আর শ্রমিকশ্রেণী—এবং তারা পরস্পর বিরোধী।"

গান্ধী বললেন, "ইংলণ্ডে ৩০ লক্ষ বেকার আছে। আমি মালিকদের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। তাঁদের সঙ্গে শ্রমিকদের সম্বন্ধ ভাল। তাঁরা শ্রমিকদের বলেছিলেন যে, প্রতিযোগিতায় [illegible] নয়, বিদেশের [illegible] পরস্পরের

প্রতি বিদ্বেষ নয়। কিন্তু তাঁরা যে তাঁদের উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রি করতে পারছে না, যাচ্ছার নেই। মালিকরা যদি তাঁদের সব মূলধন ধ্বংস করে দেন, তাতে বেকারদের কতটুকু দুঃখ ঘুচবে? আমি শ্রমিকদের বলেছি: 'নিজেদের সাহায্য নিজেরাই কর, ভুটর শিল্পগুলি আবার কর।' সাহায্যের দ্বারা কোনো লোকের পক্ষেই জীবনধারণ করা উচিত নয়।" মালিকদের দ্বারা শ্রমিকদের, সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা উপনিবেশের লোকদের শোষণের প্রশ্নের উত্তরে গান্ধী বললেন, "এর প্রতিকার কি শ্রমিকদের হাতেই নয়? তারা শোষকদের সঙ্গে সহযোগিতা না করলেই তো পারে।"

পরের দিনের আলোচনায় জার্মানী প্রসঙ্গ তুলে বলা বললেন যে জার্মান যুব-সমাজ আজ একটা প্রচণ্ড শূন্যতার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে—তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধ বেকারী জীবন, বাস্তবক্ষেত্রে ও নৈতিকভাবে। তারা আজ সবকিছু করতে প্রস্তুত—বিপ্লব, যুদ্ধ, ফ্যাসিবাদ। ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় জার্মানীই হচ্ছে আজ মহান আদর্শ প্রচারের সর্বোৎকৃষ্ট ক্ষেত্র। গান্ধী জার্মানীতে না যাওয়ার জন্য বলা খুবই দুঃখিত। জার্মানী ও ইয়োরোপের অন্যান্য জাতিগুলির কার্যকলাপ এশিয়ার উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করবে এবং বলা খুলে করে বললেন যে ভারতীয়রা ইংলণ্ড ছাড়া ইয়োরোপের আর কিছুই জানে না।

জার্মানী সম্বন্ধে গান্ধী শুধু মাত্র বললেন যে তাঁর আশ্রমে যে-সব ইয়োরোপীয়রা আসেন তাদের মধ্যে জার্মানরাই তাঁর আশ্রমের শৃঙ্খলা সব থেকে ভালভাবে মেনে নিতে পারেন। তার পরেই তিনি মালিক-শ্রমিকের প্রশ্নে আসলেন। তিনি বললেন: "মালিক-শ্রমিকের মধ্যে সংঘর্ষ আমি অনিবার্য বলে মনে করি না। আমি মনে করি তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধান করা খুবই সম্ভব, যদিও তা এখনো সহজ কঠিন।" বেকার সমস্যা সম্বন্ধে বলেন: "এর প্রতিকারের প্রক্রিয়া হল শ্রমিকদের [illegible]

এইভাবে জীবনকে পুনর্গঠনের কাজে মালিকদের কিছুই করবার নেই।" শ্রমিকদের সম্বন্ধে গান্ধী বললেন যে যদি তাদের মধ্যে সম্পূর্ণ ঐক্য থাকে, তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে তারা যে কোনো শর্ত মালিকদের প্রতি dictate করতে পারবে।

রলাঁ বললেন: "আমিও তাই মনে করি। কিন্তু মানুষের দুর্বলতার কথাটাও একটু স্মরণ রাখা প্রয়োজন। বাস্তব জীবনে শ্রমিকরা সম্পূর্ণ ঐক্য স্থাপন করতে পারে না। কারণ মালিকরা চক্রান্ত করে: তারা শ্রমিকদের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করে: তাদের একটা অংশকে হাত করে নেয়। এইরূপ অবস্থায় শ্রমিকদের আর একটা অংশ যারা সচেতন ও কর্মঠ ও যারা বাস্তব অবস্থা বুঝতে পারে, তারা মনে করে যে শ্রমিকদের ঐক্যের জন্য বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। এবং এরই নাম হচ্ছে শ্রমিকদের একনায়কত্ব।

গান্ধী খুব জোরের সঙ্গে বললেন: "আমি তার সম্পূর্ণ বিরোধী। কারণ তার অর্থ হবে যে শ্রমিকরা মূলধন বাজেয়াপ্ত করে নেবে। আদপে পৌঁছবার জন্য এটা হল সব থেকে নিকৃষ্ট পন্থা। তারপর গান্ধী রলাঁকে বোঝাতে লাগলেন কি ভাবে তিনি আহমদাবাদের সুতাকলের শ্রমিকদের সংগঠন করেছেন: "আমি তাদের শিক্ষা দেই যে তারাই হচ্ছে প্রকৃত মূলধনের অধিকারী কেন না মূলধন স্বর্ণ-রৌপ্য মুদ্রা দ্বারা গঠিত নয়, শ্রমিকদের কাজ করার ইচ্ছা ও ক্ষমতার দ্বারাই তা গঠিত। এইটাই তাদের অক্ষুণ্ণ মূলধন। বর্তমানে অবশ্য আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শ্রমিকরা মালিকদের দ্বারা শোষিত হবার বিপদের সম্মুখীন হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি শ্রমিকদের dignity of labour-এর কথাই শেখাব। যদি প্রয়োজন হয় আমি বছরের পর বছর অপেক্ষা করব ও তাদের সংগঠন করার চেষ্টা করব। কিন্তু আমি কখনই হিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত একনায়কত্ব স্বীকার করব না।...আমি শ্রমিকদের একমাত্র এইরূপ শিক্ষা দিয়ে থাকি: শ্রমিকদের কেবলমাত্র একটা কারখানার উপর নির্ভর করার প্রয়োজন নেই। আমি আহমদাবাদের শ্রমিকদের শিক্ষা দেবার চেষ্টা করি যাতে করে কারখানার উপর নির্ভরশীলতা থেকে তারা সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হতে পারে। যা তারা তাদের ন্যায্য পাওনা বলে মনে করে তা যদি তারা ওখান থেকে না পায়, তাহলে চরকা কেটে অথবা পাথর ভেঙ্গে যে সম্বল আয় হবে তাতেই তাদের সন্তুষ্ট হতে হবে। সুনিপুণ কারিগররা অনিপুণ শ্রমিকদের ঘৃণার চক্ষে দেখতে পারবে না। কারখানার বেশী বেতনে অসম্মানজনক কাজ করার চাইতে, কারখানা ত্যাগ করে কম লাভেও স্বাধীনভাবে কাজ করা উচিত।" পৃঃ ১৯৪-১৫।

...কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এরকম একজন পবিত্র কমিউনিস্ট বিরোধী লোক হলেও গান্ধী বলশেভিজমের অপবাদ থেকে রেহাই পেলেন না। রলাঁর অতিথি থাকাকালিন গান্ধী একদিন জেনেভা সহরে অহিংসা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার পর তাঁকে একজন প্রশ্ন করেন যে, যদি কোনো বিদেশী সৈন্যদল সুইটজারল্যাণ্ড আক্রমণ করে তাহলে সুইসরা কি তাদের সশস্ত্র বাধা দেবে না তাদের সঙ্গে অহিংস অসহযোগ করবে? গান্ধী জবাব দিয়েছিলেন বিদেশী শত্রুকে নিশ্চয়ই বাধা দিতে হবে: দেশের সমস্ত পুরুষ নারী, শিশু মিলে তাদের পথ রোধ করে দাঁড়াবে, কিন্তু বিনা অস্ত্রে। এর পরেও যদি বিদেশীরা তাদের পদদলিত করে কিম্বা হত্যা করে তাদের দেশ দখল করে, তাহলে জগতের বিবেক এমনভাবে জেগে উঠবে যে তাতে বিদেশী আক্রমণকারীরা দমে যাবে ও সুইটজারল্যাণ্ডেরই শেষ পর্যন্ত জয় হবে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে সুইসরা মহাপুরুষের এই সরল উক্তি সরলভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। পরদিন সুইস সংবাদপত্রগুলি তারস্বরে চেঁচিয়ে বলল—গান্ধী হচ্ছেন একজন বলশেভিক দালাল:: সুইসরা যাতে শত্রুকে বাধা না দেয় গান্ধী এই চান—বলশেভিকদের হাতে দেশটাকে তুলে দেওয়াই তাঁর মতলব। তিনি যে রলাঁর অতিথি হয়েছেন এইটাই তো সব থেকে বড় প্রমাণ যে তিনি বলশেভিকদের দালাল: গান্ধী যদি বেশীদিন সুইটজারল্যাণ্ডে থাকার মতলব করেন তবে তাঁকে বহিষ্কারের ব্যবস্থা করা হক।

উন্মাদ ইচ্ছা | তরুণ সান্যাল

সাগর দোলায় তিক্ত নীলাভ,
পুবের আকাশ রক্তিম লাল,
আমি চাই তাই পশ্চিম পার
ফুরিতে, ঢেউয়ের অন্তরাল,
বেলা বেড়ে গেলে দু চোখে রৌদ্র
...সাগর নীলাভ কিন্তু শ্যামল
আমি চাই হতে উত্তরে ডাঙা
সামনে নৃত্যপাগল জল।

ছায়া পড়েছিলো জলের উপরে
খাড়া বিদ্যুৎ দিগন্তরে
তারপর এলো বৃষ্টি ও ঝড়
নগ্ন মন্দির ঢেউয়ের পরে,
আমি হতে চাই তখন জলের
গভীরে, গভীরে হাঙর দল,
দোলাক বৃষ্টি, দোলা ও সাগর
কটু ও কষায় ক্ষুধিত জল।

এপারে ওপারে বিশাল ব্যাপ্তি
সিঁড়ি ধাপে ধাপে উঠে মিলায়,
চাঁদ উঠে আসে, মন রলরোলে
কাটায় সফেদ চূড়া নীলায়,
আমি হতে চাই ঘন শুভ্রতা—
চন্দ্রালোকিত বালুর বুকে
অতিদন্তুর লোভের লীলায়
ফুরিতে হাস্য নীলার মুখে।

তারাগুলি যায় জলের অতলে
নিরবধি দোলা তিক্ত লোনা
ডুবে যেতে চাই, মরে যেতে চাই,
উর্চ আলোকিত চূড়ায় সোনা
তারপর জলে কে বিস্ফোরণ
হানে বিস্তারে দারুণ বলে
গোলন্দাজেরা কাটাবে কামান
নীকরে, আমারি মরণ রোলে॥

সকাল সন্ধ্যা শুধু | শ্যামসুন্দর দে

সকাল সন্ধ্যা এমন করে কে
ডাকছে চেয়ে চেয়ে
ঘরের কোণে লুকিয়ে রাখা কুঁড়ি
ফুটবে কখন কেমন করে জানি
দুইটি চোখের কাজল মায়ায়
কখন আকাশ ঢাকে
মেঘের গর্জন
বৃষ্টি আসে রিমঝিমিয়ে
সারা সকাল বেলা
রামধনুর আশায় চোখ ভাসে
কান্না যদি পান্না হয়ে জ্বলে
মনের মাঝে জমছে রাশি রাশি
ঘরের কোণে লুকিয়ে রাখা কলি
ফুটবে কখন কে জানে
জানলা দিয়ে রোদের আলো এসে
সকাল বিকাল খোঁজ নিয়ে যায় শুধু॥

স্বাক্ষর | অনন্ত দাশ

বিমর্ষ বিহ্বল রাত বিস্তারিত আমার সম্মুখে
অশ্রুর আরক্ত কণা বয়ে যায় সারাটা প্রহর
হে দুঃখ লতিকা প্রেম, আহা কত বিরহের বুকে—
স্মৃতিটুকু বেঁচে আছে, বেঁচে আছে বিশ্বচরাচর।
আবার কখনও বন্দী মেঘজালে, হে উষা আমার
পশ্চিমে ভাসালে ছবি কত প্রিয় মুখ মনে পড়ে,
দীপাবলী নিভে যায়, কণ্ঠে দোলে শত শুষ্ক হার
এ ঘন দুর্যোগরাতে কেবা আছে আমার শিয়রে!

সমস্ত সাফল্য আজ তবু দিই তোমার দুহাতে
কতদূরে শান্ত মাঠ, নম্র, স্নিগ্ধ ফুলের বাগান
সকলই তোমার প্রিয়; তবু এই বিষণ্ণ প্রভাতে
রেখে যাই ম্লান স্মৃতি, কমনীয় মুখের সন্ধান;
কে অধর ছুঁয়েছিলো মুখর, উদার পিপাসায়
সংগীতে স্বাক্ষর তার রেখে যাই আয়ের রেখায়।

বস্তি

প্রসাদকুমার বসু

[সময় সকাল। বস্তীর একাংশ। দুপাশে সারি সারি ঘর। কথা কইতে কইতে নিখিল ও সুচরিতার প্রবেশ।]

নিখিল। (সহাস্যে) হঠাৎ আবার এ বেয়াল চল কেন তোমার সুচরিতা?

সুচরিতা। (ঈষৎ মৃদুকণ্ঠে) তার মানে?

নিখিল। না, মানে; হঠাৎ আবার বস্তিতে কেন?

সুচরিতা। (মৃদুকণ্ঠে) সে কৈফিয়ৎ নাই বা নিলে।

নিখিল। (মৃদু হেসে) না, কৈফিয়ৎ ঠিক নয়। তবে বিনা, এখানে ঠিক মানায় না তোমাকে।

সুচরিতা। (রুষ্টভাবে) সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। (থেমে) তবে এটা জেনে রেখো, আমি আসতাম না কোনদিনই। নেহাৎ তুমি আজ বলেই—

[সুচরিতা কি যেন বলতে যাচ্ছিল। সহসা অদূরে বহুলোকের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা যেতেই সুচরিতার মুখের কথা মুখে রয়ে গেল।]

সুচরিতা। (বিস্ময়ে) ব্যাপার কি?

[নেপথ্যে বহু লোকের চীৎকার] পকেটমার, পকেটমার। ধর ধর, পালিয়ে গেল। এই যে, এদিকে। [অনেক লোকের দ্রুত ধাবমান পদশব্দ শোনা গেল। একটি ১৪।১৫ বছরের ছেলে প্রবেশ করলো। ছেলেটির খালিগায়ে। পরনে ছেঁড়া হাফপ্যাণ্ট ও গেঞ্জি। পেছনে পেছনে কয়েকজন লোক ছুটে প্রবেশ করে ছেলেটিকে ধরে ফেললো।]

জনতা। (উত্তেজিত সমবেত কণ্ঠে) এইবার যাবে কোথায় বাছাধন! (চারদিক থেকে কিল চড় ঘুঁসি পড়তে লাগলো। নিখিল ও সুচরিতা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো) বার কর শিগ্‌গির ব্যাগ্, বার কর।

প্রথম ব্যক্তি। (হাতের ছাতা দিয়ে ছেলেটিকে মারতে মারতে) মেরে ফেলবো ব্যাটাকে, খুন করে ফেলবো একেবারে। হতচ্ছাড়া, পাজী কোথাকার। বল ব্যাটা, কোথায় রেখেছিস মনিব্যাগ, বল শিগ্‌গির। মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দোব নইলে। (ছাতা দিয়ে মারতে মারতে) বল্ শিগ্‌গির কোথায় রেখেছিস! (সকলে মিলে মারতে লাগলো)

দ্বিতীয় ব্যক্তি। (সহসা নীচু হয়ে ব্যাগটি কুড়িয়ে নিয়ে উল্লাসে চীৎকার করে উঠলো) এই যে, পাওয়া গেছে। ব্যাটা হজম করতে পারেনি দেখছি!

জনতা। (দ্বিগুণ উৎসাহে প্রহার করতে করতে) মেরে খুন করে ফেলুন শয়তানটাকে। ছাড়বেন না। আড়ং ধোলাই দিয়ে দিন—একাজ যেন আর কোনদিন করতে না পারে বাছাধন, (দ্রুতলোহেলো-ভাবে প্রহার চলতে লাগলো। মারের চোটে পরেশ মাটিতে লুটিয়ে পড়লো)

পরেশ। (আর্তনাদ করতে করতে) উঃ মাগো; মরে গেলাম! আর মারবেন না, মরে যাবো। আমি মরে গেলে আমার মাকে দেখবার আর কেউ থাকবে না। তার বড় অসুখ বাবু, তার বড় অসুখ। (হতাশায় কাঁদতে লাগলো)

প্রথম ব্যক্তি। (দাঁতমুখ খিঁচিয়ে) আবার ন্যাকামি হচ্ছে, নচ্ছার কোথাকার! মায়ের অসুখ তো ডাক্তারের কাছে না গিয়ে লোকের পকেটে হাত ঢুকোতে গিয়েছিলি কেন রে হারামজাদা? (রাগের চোটে হাতের ছাতা দিয়ে পরেশের মাথায় আর এক ঘা বসিয়ে দিল। এদিকে জনতার প্রহার পুরোদমেই চলছে আগলো)

নিখিল। (সহসা দুহাতে ভিড় সরিয়ে দিয়ে) দেখুন, অনেকই হয়েছে; আর নয়। আর মারলে মরে যাবে ছেলেটা। তখন পুলিশ আপনাদেরই নিয়ে টানাটানি করবে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। ঠিক কথা। চলুন ওকে পুলিশেই দিয়ে দেওয়া যাক। চলুন্যাটা, চল।

[সকলে মিলে পরেশকে টেনে নিয়ে চললো]

পরেশ। (আর্তনাদ করতে করতে) ছেড়ে দিন আমাকে; আপনাদের পায়ে পড়ি, ছেড়ে দিন। (জনতা তাকে টেনে বাইরে চলে গেল। পরেশের আকুল আর্তনাদ নেপথ্য থেকে শোনা যেতে লাগলো) আর কক্ষনো চুরি করবো না। আপনাদের পায়ে পড়ি বাবুরা, এবারটির মত ক্ষমা করুন। (পরেশের আর্তনাদ ও জনতার কোলাহল ধীরে ধীরে দূরে সরে গেল)

নিখিল। (ব্যথিত সুরে) ছেলেটা আজ পকেটমার! অথচ কিছুদিন আগেও ওকে ঐই বয়সে স্কুলে যেতে দেখেছি! এদিকে ওর মাকে ধরেছে বক্ষায়। (একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে) একেই বলে দারিদ্র্য।

সুচরিতা। (ব্যথিতকণ্ঠে) চেষ্টা করলে কি কিছু করা যেত না নিখিল?

নিখিল। (উদাসভাবে) হয়তো যেতো। কিন্তু তাতে লাভের চেয়ে লোকসানই হত বেশী। অন্যায়ের সাজা হওয়া দরকার। তারই মধ্য দিয়ে অন্যায়কারী তার অন্যায় বুঝতে শিখবে।

সুচরিতা। কিন্তু পরেশের মায়ের কি হবে?

নিখিল। (নির্লিপ্তভাবে) কি আর হবে? সে মরবে। জীবন দিয়ে দারিদ্র্যের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে তাকে।

সুচরিতা। কিন্তু তাকে কি বাঁচানো যায় না কোনমতেই

নিখিল। (হারানো কণ্ঠে) না। পরেশের মা-ই তো আর একা নয় সুচরিতা। এরকম বস্তির খোপে খোপে তার মত হাজার হাজার রোগজীর্ণ মা-বোন-স্ত্রী বাপ-ছেলে-ভাই আজ এমনি অসহায়ভাবেই মরছে। পারো কি তাদের সকলকে বাঁচাতে? তা যখন পারো না তখন এ একটার জন্যেও কিছু করবার দরকার নেই। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করুক সকলে মিলে।

[সহসা দ্রুতবেগে শ্যামের প্রবেশ। বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। দীর্ঘ ব্যায়ামপুষ্ট চেহারা। পরিধানে খালকোচা মারা ধুতি, গায়ে হাফশার্ট। পেছনে একজন কনস্টেবল সহ পুলিশ ইন্সপেক্টরের প্রবেশ।]

শ্যাম। এই যে নিখিল দা, ইন্সপেক্টর বাবু এসেছেন রমেনবাবুর সুইসাইডের ব্যাপারে আপনার সঙ্গে উনি কথা বলতে চান।

ইন্সপেক্টর। (নমস্কার করে) নমস্কার, আপনিই নিখিলবাবু?

নিখিল। (প্রতিনমস্কার করে) আজ্ঞে হ্যাঁ।

ইন্সপেক্টর। দেখুন নিখিলবাবু, আমাদের এনকোয়েরি একরকম শেষ। ডেড্‌বডিটা এবার ময়নাতদন্তে পাঠাতে পারলেই হয়। (থেমে) কিন্তু আপনাকে যে একটু হেল্প করতে হবে।

নিখিল। (নিরুৎসাহভাবে) বলুন, কি রকম সাহায্য আপনি চান?

ইন্সপেক্টর। আচ্ছা রমেন বাবুর সঙ্গে আপনার পরিচয়টা কি রকম ছিল?

নিখিল। প্রতিবেশী হিসেবে যতখানি থাকা উচিত।

ইন্সপেক্টর। আচ্ছা, ভদ্রলোক করতেন কি?

নিখিল। সে খবরটা কি এখনও দরকার হবে ইন্সপেক্টরবাবু? (থেমে) তবে এটা ঠিক, ভদ্রলোকের পেশাটাও ভদ্রলোকের মতই ছিল—জাল-জোচ্চুরি করতেন না।

ইন্সপেক্টরবাবু (ব্যস্তভাবে) না না, আমি ঠিক সেটা যিন করতে চাইনি। মৃতের সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় সংবাদ হিসেবেই এগুলো দরকার, এই পর্যন্ত। থাক্ সে কথা, রমেনবাবুর মৃত্যু সম্বন্ধে আপনি যদি স্থানীয় বিশিষ্ট লোক হিসেবে আমাদের কাছে একটা স্টেটমেণ্ট দেন তো আমাদের খুব উপকার হয়।

নিখিল। স্টেটমেণ্ট আমি দিতে পারি, কিন্তু তাতে আপনাদের অসুবিধেই বাড়বে।

ইন্সপেক্টরবাবু। (মৃদু হেসে) সেটা আগে থেকে কি করে বুঝেছেন আপনি? (থেমে) থাক্, তাহলে আপনার স্টেটমেণ্টটা দিন, আমি লিখে নিই। (ইন্সপেক্টরবাবু পকেট থেকে নোটবুক ও পেন্সিল বার করলেন) বলুন এইবার।

নিখিল। (গাঢ়কণ্ঠে) রমেনবাবুর সঙ্গে পরিচয় আমার বছর পাঁচেকের। ভদ্রলোক চাকরি করতেন কোন একটা কাপড়কলে। আর কয়েকমাস হলে রিটায়ারের ফলে চাকরী যায় তার। তারপর বেকার। সরকারী হস্তক্ষেপের দাবি জানাতে গিয়ে, খেয়েছিলেন পুলিসের লাঠি। সে আঘাত হজম করতে গিয়ে মাসখানেক বিছানায় পড়ে থেকে যখন উঠে দাঁড়ালেন তখন একমাত্র সম্বল ভিক্ষাবৃত্তি। তারপর একটা চাকরীর জন্যে তিনি হন্যে কুকুরের মতো ছুটোছুটি করে বেরিয়েছেন রাস্তায় রাস্তায়। কিন্তু কে দেবে চাকরী? অক্ষম হতাশায় শেষ দিকটা কেমনই যেন পাগলের মত হয়ে গিয়েছিলেন ভদ্রলোক। রাস্তায় রাস্তায় লোকের কাছে হাত পাততেও দেখা গেছে তাকে – উপায়ন্তর না দেখে রমেনবাবু ভিক্ষে করেছেন শেষে। একেই বলে আত্মহত্যা—এমনি করেই সে মানুষকে করে তোলে ভিখিরী, ভিখিরীকে রাস্তার কুকুর।

(ইন্সপেক্টরবাবু লিখছিলেন। নিখিলকে থামতে দেখে মুখ তুলে তাকালেন)

ইন্সপেক্টর। তারপর?

নিখিল। (ভারী গলায়) তারপর আর কিছু নেই।

ইন্সপেক্টর। কিন্তু তার আত্মহত্যার কারণটা—

নিখিল। (তিক্তকণ্ঠে) আত্মহত্যার কারণ? আত্মহত্যাটা যে তিনি পস করে করেননি এটা যে কেন আপনারা বুঝতে পারেন না সেটাই আশ্চর্যের। (থেমে ব্যাপ্ত ভাবে) আমায় মাপ করবেন ইন্সপেক্টরবাবু, এর বেশী কিছু আমার জানা নেই। আগে জানলে তাকে একটা স্বীকারোক্তি লিখে দিয়ে যেতে বলতাম।

ইন্সপেক্টর (ক্ষুব্ধকণ্ঠে) আমার ওপর অবিচার করবেন না নিখিলবাবু। আমি হচ্ছি হুকুমের চাকর—সেলামি করি অপরের। প্রয়োজনের খাতিরেই আপনাকে বিরক্ত করতে বাধ্য হচ্ছি। না হলে—

নিখিল। (অনুতপ্তকণ্ঠে) সত্যিই, ভারী অন্যায় হয়ে গেছে ইন্সপেক্টরবাবু এইরকম একটা ট্রাজেডি দেখে নিজেকে কি রকম যেন হারিয়ে ফেলেছিলাম হঠাৎ। যা খেয়ে খেয়ে নীরেট পাথর হয়ে গেছি। তবুও যাকে মাঝে কোথা থেকে অদ্ভুত একটা অনুভূতি যেন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। যাক্, কিছু মনে করবেন না যেন।

[সহসা একজন কনস্টেবলের প্রবেশ ও ইন্সপেক্টরকে সেলাম]

ইন্সপেক্টর। কেয়া রামদীন, হো গিয়া?

রামদীন। জী হ্যাঁ!

ইন্সপেক্টর। লে যাও গাড়িমে।

[সেলাম করে রামদীনের প্রস্থান

ইন্সপেক্টর। নিখিলবাবু, অনেকই বিরক্ত করলাম আপনাকে; মাপ করবেন।

নিখিল। (লজ্জিতভাবে) আমি সত্যিই খুব দুঃখিত ইন্সপেক্টরবাবু।

[নেপথ্যে কনস্টেবলদ্বয়ের শুশিয়ারী শোনা গেল—হট্ যাও হট্ যাও। পরমুহূর্তে বস্ত্রাবৃত রমেনবাবুর মৃতদেহ বহন করে দুজন কনস্টেবল প্রবেশ করলো।

পিছনে উচ্ছ্বসিত ভাবে কাঁদতে কাঁদতে রমেনবাবুর স্ত্রী ও পুত্র কন্যার প্রবেশ]

রমেনবাবুর স্ত্রী। (উচ্ছ্বসিত ভাবে কাঁদতে কাঁদতে) ওগো, তোমরা সবাই মিলে ওকে কোথায় নিয়ে চললে গো ? ওগো তোমরা কেন ওকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছ গো ?

রমেনবাবুর পুত্র কন্যা। (কাঁদতে কাঁদতে) ও বাবা, বাবাগো, তুমি কোথায় গেলে। বাবা, বাবাগো।

[সুচরিতা হঠাৎ মূর্চ্ছিতের মত পড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু নিখিল তাকে ধরে ফেললো]

ইন্সপেক্টর। (ব্যস্ত ভাবে) কি হল ?

নিখিল। কিছু নয়, সামান্য শক্ লেগেছে।

ইন্সপেক্টর। রামদীন, লে যাও।

[কনষ্টেবলরা মৃতদেহকে নিয়ে চলে গেল। রমেনবাবুর স্ত্রী ও পুত্র কন্যারা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে কাঁদতে তাঁদের অনুসরণ করলো। ইন্সপেক্টরবাবু, নিখিল ও শ্যাম ব্যথিত অন্তরে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো]

ইন্সপেক্টর। আচ্ছা, চলি তা হলে নিখিলবাবু।

নিখিল। (নির্লিপ্তভাবে) আচ্ছা।

[ইন্সপেক্টরবাবুর প্রস্থান]

সুচরিতা। (শয়নে নিয়ে কাতরভাবে) এখানে আর একটা মুহূর্ত্তও থাকতে পারছি না আমি দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে।

নিখিল। (ম্লান হেসে) কিন্তু এরা পারে। আর না পারলেও উপায় নেই, জোর করেই থাকতে হবে। এরা বড় নিঃস্ব, এরা বড় অসহায়।

সুচরিতা। কিন্তু কেন ? কে দায়ী এর জন্যে ?

নিখিল। (দীর্ঘশ্বাস চেপে) দায়ী এদের ভাগ্য। আর সে ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছে একদল স্বার্থপর মানুষ। তাদেরই লোভ তাদেরই প্রতারণা ধীরে ধীরে এদের নীচের দিকে ঠেলে নামিয়ে দিয়েছে। আর এদেরই মাথায় পা দিয়ে ধাপে ধাপে তারা সমাজের মাথায় উঠে গেছে—বিভেদের সমুদ্র সৃষ্টি করেছে দুয়ের মাঝখানে। আর নিরাপদ দূরত্বে থেকে মজা লুটছে দুহাতে।

[সহসা হন্তদন্তভাবে মনোরঞ্জনবাবুর প্রবেশ। ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। গায়ে একখানা কতুয়া, পরণে ধুতি। কোঁচাটি ভাঁজ করে কোমরে গোঁজা। পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি। গলায় কণ্ঠি। কপালে ও হাতে চন্দনের রসকলি আঁকা]

মনোরঞ্জনবাবু। (ব্যস্তভাবে) এই যে নিখিল, তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম।

নিখিল। (নির্লিপ্ত কণ্ঠে) কেন ?

মনোরঞ্জনবাবু। (সহসা কাঁদো কাঁদো ভাবে) বড় দুর্ভাবনায় পড়ে গেছি নিখিল। তুমি ছাড়া আর কাকেই বা জানাবো দুঃখের কথা, কেই বা শুনবে। এমনিতেই তো লোকে কত রকম কথা বলে। আমার তো নামই হয়ে গেছে বাড়ি-খেকো গোঁসাই। তার ওপর আবার এই কেলেঙ্কারি।

নিখিল। (অন্যমনস্কভাবে) ব্যাপারটা কি ?

মনোরঞ্জনবাবু। (বিস্মিতভাবে) সে কি, কিছুই শোন নি ! এদিকে তো সারা পাড়া টি টি হতে আর বাকী নেই।

নিখিল। (রুক্ষভাবে) না মনোরঞ্জনবাবু, সব কিছু শোনবার মত সময়ও পাই না, ধৈর্যও নেই। তা ছাড়া ওসব শুনতে গেলে পাগল হয়ে যেতে হবে। (থেমে) থাক্, আসল ব্যাপারটা কি তাই খুলে বলুন।

মনোরঞ্জনবাবু। (ইতস্ততঃ করতে লাগলেন) কিন্তু— ! এদিকে এস না একবার।

নিখিলবাবু। (রুক্ষভাবে) কিছু দরকার নেই তার। এদের সামনেই বলতে পারেন, লজ্জা করবার কিছু নেই।

মনোরঞ্জনবাবু। (কাঁদো কাঁদো ভাবে) নিখিল, সুধাটার আজ কদিন থেকে কোন খোঁজ খবরই নেই। সেই যে পরশু সন্ধ্যেবেলায় বেরিয়েছে, এখনও পর্যন্ত ঘরে ফেরে নি। কি যে হল, কিছু বুঝতে পারছি না। ভয়ে ভাবনায় হাত-পা একেবারে সেঁধিয়ে গেছে পেটের মধ্যে। সুধার মা তো কেঁদে কেটে মুর্চ্ছা। কি যে করি নিখিল ! এখন তুমিই আমার ভরসা। (নিখিলের একখানা হাত চেপে ধরলেন)

নিখিল। (বিরক্তভাবে) ওঃ, এই ব্যাপার। (হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে) দেখুন, মনোরঞ্জনবাবু এ রকমটা

যে একদিন হবে তা আমি জানতাম। তাই অনেক আগেই, আপনাকে সাবধান করেছিলাম। কিন্তু শোনেন নি সে কথা। আমার কথাগুলো বড় খারাপ লেগেছিল সে দিন। ভেবেছিলেন, আপনাদের আকাশ থেকে পড়া সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে আমি হয়তো আর পাঁচজন প্রতিবেশীর মতই হিংসে করছি। সে দিন হয়তো ভেবেছিলেন, পায়ের ওপর পা দিয়ে এমনি করেই নিশ্চিন্ত আরামে কেটে যাবে চিরটাকাল। (কণ্ঠস্বরে খানিকটা ঘৃণা প্রকাশ পেল)

মনোরঞ্জনবাবু। (কাতরভাবে) কাটা ঘায়ে তুমি আর নুনের ছিটে দিও না নিখিল। নিজের জ্বালায় জ্বলছি, আর জ্বালা বাড়িও না তুমি।

নিখিল। (স্নেহ ভরে) বলতে তো হবেই মনোরঞ্জনবাবু। আগুনে হাত দিলে হাত পুড়বেই। হাত দেবার আগে চিন্তা করা উচিৎ ছিল। (থেমে) একটা কথা কি জানেন মনোরঞ্জনবাবু? এ সংসারে এমনি কোন জিনিষ পাওয়া যায় না দাম দিতে হয় সবেরই। এই যে নিশ্চিন্ত আরাম সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এরই মূল্য হিসেবে দিতে হয়েছে সুধাকে। যাকে নিজের হাতে বিক্রি করেছেন তাকে আর ফেরৎ পাবার মিছে আশা কেন?

মনোরঞ্জনবাবু। (ব্যাকুল ভাবে) তবুও তো সে আমার মেয়ে আমি তার বাবা। তার জন্যে মন যদি ব্যাকুল হয়ে ওঠে সেটা কি অন্যায়? (থেমে) আমার ভাগ্য নিখিল, সবই আমার ভাগ্য।

নিখিল। (বিরক্তভাবে) ভাগ্য! হ্যাঁ, সত্যিই ভাগ্য! কিন্তু সে ভাগ্য আপনার নিজের হাতেই গড়া মনোরঞ্জনবাবু। তার জন্যে আজ আর আফশোষ করা মিছে। যাক সে কথা। দেখি, কি করা যায়। (থেমে) এসব নোংরা ঘটিতে আর ইচ্ছে যায় না। (শ্যামের দিকে ফিরে) শ্যাম, কি করা যায় বলতো?

শ্যাম। (ইতঃস্তত করে) এসবের মধ্যে আর নাই বা জড়ালেন নিখিলদা?

নিখিল। (ম্লান হেসে) উপায় নেই শ্যাম। না জড়াতে চাইলেও আপনা থেকেই জড়িয়ে যায় পায়ে। পাঁকে বাস করে কি আর পাঁক বাঁচিয়ে চলা যায়? থাক, ওকথা ভেবে লাভ নেই কোন। কিন্তু একটা কথা দরকার।

শ্যাম। (চিন্তা করে) আচ্ছা দেখি। বেহোটা হয়তো খোঁজখবর দিতে পারে। সুধাটাকে ওইই তো মাটি করেছে। (থেমে) দেখি, দুটো ছোকরা আছে কিনা।

নিখিল। (মনোরঞ্জনবাবুর দিকে ফিরে) পুলিশে নিশ্চয়ই খবর দিতে চান না মনোরঞ্জনবাবু, কি বলেন?

মনোরঞ্জনবাবু। (ব্যস্তভাবে) না না নিখিল, ওকাজও নয়। কেলেঙ্কারীর আর শেষ থাকবে না তাহলে।

[রাদুকে সঙ্গে করে শ্যামের প্রবেশ। রাদুর চেহারা লম্বাটে। বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। পরনে আদ্দির পাঞ্জাবি ও চলচলে পায়জামা। পায়ে অধুনিক ডিজাইনের চপ্পল। ঠোঁটের ফাঁকে ধুমায়িত সিগারেট। চোখে-মুখে কি একম নিশ্চিন্তের একটা ছাপ। দেখলেই নীচ সমাজে চলাফেরা করে বলে মনে হয়। কথাবার্তায় ইতরসমাজীয় একটা উচ্চারণ দোষ]

নিখিল। এই যে রাদু তোমাকেই খুঁজছিলাম।

রাদু। ব্যাপার কি বড়দা, হঠাৎ অধমকে তলব কি জন্যে?

নিখিল। আচ্ছা রাদু, পুনদান পরশু রেসোরেসার সুধা নাকি তোমার সঙ্গে কোথায় বেড়াতে বেরিয়েছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ফেরেনি সে! তুমি কি খবর-টবর কিছু জান?

রাদু। (কৃত্রিম বিস্ময়ের সুরে) অবাক করলেন যে বড়দা! (থেমে) আচ্ছা বলুনতো, কোন শালা এসব পট্টি মারলো আপনার কাছে, দেখি একবার তাকে। আমার নামে বদনাম, ব্যাটা খুদু ছেখছ কাঁদ দেখনি। (থেমে) দেখুন ওসব কারবারে আমি নেই। কে কোথায় রাত বিরেতে চরতে যায় সে খবরে আমার দরকারই বা কি মশাই। [লম্বা যেন গভীর ঘৃণার জ্বলন্ত সিগারেট মাটিতে ফেলে দিয়ে পায়ে করে মাড়িয়ে দিল। তারপর একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে মুখ বেঁকিয়ে] তাছাড়া, ওসব নোংরামি আমার ধাতেও সয় না। আর বলতেকি ওতে তেমন পয়সাও নেই আজকাল।

নিখিল। (কঠিন সুরে) সেতো ঠিকই রাধু, কিন্তু ব্যাপারটা কি জান, অনেকেই নাকি দেখেছে।

রাধু। (বিরক্তভাবে) কেন বলাই বিরক্ত করছেন, বললাম তো জানি পাড়ার-টাড়ার কেউ নিশ্চয়ই দেখুন, কোন জায়গায় হয়তো ঘর নিয়ে জমিয়ে বসেছে।

শ্যাম। (হুঙ্কার দিয়ে লাফিয়ে এসে রাধুর একখানা হাত বজ্র মুষ্টিতে চেপে ধরে) তবে রে হতভাগা! এটা কি তোর তাড়ির আড্ডা পেয়েছিস নাকি? কার সঙ্গে কথা বলছিস খেয়াল নেই? ভাল চাস তো চট্ করে বলে ফেল, নইলে মেরে চাক কখানা গুঁড়ো করে দোব তোর। (হাতের মধ্যে ধরা রাধুর হাত খানায় প্রচণ্ড চাপ দিতে লাগলো)

রাধু (যন্ত্রণায় শিউরে উঠে) আরে, গেল গেল, হাতটা ভেঙ্গে গেল একেবারে! ছাড় নাইরি, ছাড়। (শ্যামের বজ্রমুষ্টি হাতাতে চেষ্টা করতে লাগলো)

[শ্যাম রাধুর হাতখানা ছেড়ে দিল।]

রাধু। (হাতখানাকে অন্য হাত দিয়ে বুলোতে বুলোতে) উঃ, একেবারে গুঁড়ো হয়ে গেল হাড়-গুলো! হাত তো নয় যেন হাত! (পুনরায় হাত বুলোতে বুলোতে) কি যে মাইরি পাড়াগেঁয়ে ইয়ার্কি করিস, বুঝিনা। এতসব গুণ্ডার কারবার কি

শ্যাম। (ক্রুদ্ধ কণ্ঠে) কাজলামি রাখ রেখো, জলদি বলে ফেল।

রাধু। (হাত বুলোতে বুলোতে) বলছি বাবা, বলছি, সবুর কর একটু। উঃ, হাতখানা টন্‌টন্ করছে এখনও। (নিখিলের দিকে ফিরে) শুনুন বড়দা, সুধার জন্যে ভাববেন না, ও ঠিক আছে। পরশু রাতের ট্রেণে অনকয়েক ছোকরার সঙ্গে মধুপুর গেছে চাওয়া খেতে। খানদানি ঘরের ছেলে সব, প্রচুর পয়সা। রোজগার ভালই হবে। ঘাবড়াবেন না, কদিন পরেই ফিরবে। আমি দাদা পাতে-পাঁচে থাকি না। কিন্তু কি করি? পাড়ার মেয়ে—বললে পৌঁছে দিতে, দিলাম। ব্যাস, এই পর্যন্ত। আচ্ছা

বড়দা, ছাড়ুন তাহলে। (মধু যাইবার উপক্রম করলো)

নিখিল। হ্যাঁ. এস। অনেক উপকার করলে রাধু।

রাধু। (জিভ কেটে) সেকি বড়দা, একি একটা কথা হল। পাড়ার ছেলে. তাছাড়া আপনি বলে কথা। আচ্ছা, চলি ; দরকার হলে খবর দেবেন। (যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে গম্ভীর ভাবে) কিন্তু একটা কথা। (শ্যামকে দেখিয়ে) ঐ শেয়ো পাঁঠাটাকে একটু সামলে দেবেন। নইলে কোনদিন হয়তো একটা ফৌজদারি কেস হয়ে যাবে বলে রাখলাম। আচ্ছা, নমস্কার। (হাতখানার হাত বুলোতে বুলোতে শ্যামের দিকে আড়চোখে তাকাতে তাকাতে রাধুর প্রস্থান।)

নিখিল। (রুক্ষভাবে) সবই তো শুনলেন মনোরঞ্জনবাবু, আর কিছু জানতে চান ?

মনোরঞ্জনবাবু। (স্তিমিত কণ্ঠে) থাক নিখিল, অনেক হল. আর নয়। দেখাবার মত যেটুকু মুখ ছিল সেটুকুও আজ পুড়ে গেল। (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) সবই আমার কপাল নিখিল. সবই আমার কপাল।

[বলতে বলতেই মনোরঞ্জনবাবুর প্রস্থান]

নিখিল। (সুচরিতাকে উদ্দেশ্য করে দেখে) এইই হচ্ছে আমাদের জীবন—শুধু নয়ই নয় কুৎসিত। অভাব মানুষকে নরকে টেনে নিয়ে যায় এমনি করেই। আর কাছে সমাজ নেই. মনুষ্যত্ব নেই, হৃদয় নেই। কিন্তু একটা জিনিষ শুধু অক্ষয় হয়ে থাকে—সেটা হচ্ছে পেটের জ্বালা।

সুচরিতা। (দীর্ঘশ্বাস চেপে) সত্যিই তাই।

[সহসা কলসী কাঁখে মিনতির প্রবেশ। বয়স পঁচিশের কাছাকাছি। চেহারা শীর্ণ। গায়ের রং ফর্সা কিন্তু কঠোর দারিদ্র্যে পোড়া। পরণে একখানা পাতছিন্ন মিলের শাড়ি।]

নিখিল। কি মিনতি, খবর কি ?

মিনতি। আর খবর ! (সহসা ধরা গলায়) আমি আর পারছি না নিখিলদা. মরণ হলেই বাঁচি।

নিখিল। (বিস্মিতভাবে) কেন, হল কি ? হঠাৎ মরণের ওপর অত টান কেন ?

মিনতি। (ধরা গলায়) টান না থেকে. আর উপায় কি ? যার সংসার তার কোন পাত্তা নেই—মদ খেয়ে রাস্তায় ঘাটে পড়ে থাকে। মদের পয়সা ঠিক জুটছে অথচ কচি ছেলেটার জন্যে একফোঁটা বার্লি জোটে না। কি কপাল করেই এসেছি। নিজের জন্যে ভাবিনা. কিন্তু কচি ছেলেটা। সেটার কি দোষ। বাছা আমার না খেতে পেয়ে দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। (মিনতি লজ্জা কেঁদে ফেললো)

নিখিল। শৈলেন কোথায় ? তাকে তো দেখছি না কদিন ধরে ?

মিনতি। (নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে) দেখবেন কোথা থেকে. সে কি আর এ তল্লাটে আছে। কিছু রোজগার করছে বোধহয়। ব্যাস, কাল থেকে আর বাড়ি মুখো হয় নি। হয়তো দেখবেন, মদ খেয়ে নালায় মুখ গুঁজে পড়ে আছে।

নিখিল। (চাপা আক্রোশে) হতচ্ছাড়া স্কাউণ্ড্রেল। বউ ছেলেকে খাওয়াবার মুরোদ নেই অথচ মদের পয়সা জোটে ঠিক ! আশ্চর্য ! রাস্কেলটাকে একবার সামনে পেলে হয়, চাবকে পিঠের চামড়া তুলে নোব। যেন পকেট থেকে একটা টাকা বের করে মিনতির হাতে দিয়ে) আচ্ছা. টাকাটা রেখে দাও : ছেলেটার জন্যে বার্লি কিনে নিও। আর হ্যাঁ. শৈলেনটা এলে পাঠিয়ে দিও আমার কাছে। বলবে, ডেকেছি।

[চোখ মুছতে মুছতে মিনতির প্রস্থান]

[সহসা নেপথ্যে শৈলেনের স্খলিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল। শৈলেন নেশার ঝোঁকে গান ধরেছে]

নিখিল। [শ্যামের দিকে ফিরে] শৈলেন না ?

শ্যাম। হ্যাঁ. শৈলেনদাই।

[গান গাইতে গাইতে শৈলেনের প্রবেশ। শৈলেনের বয়স বত্রিশ তেত্রিশ। পরণে ছেঁড়া খাঁকি ফুলপ্যান্ট, গায়ে ছেঁড়া গেঞ্জি, পায়ে ছেঁড়া ক্যাম্বিসের জুতো। সে রীতিমত টলছে।]

শৈলেন। (গান) মাল খেয়ে হবে পরাণ রাখা দায়।

সখিরে—

নিখিল। (দাঁতে দাঁত চেপে) এস, চাবকে তোমার নেশা ছুটিয়ে দিচ্ছি একেবারে। স্কাউণ্ড্রেল কোথাকার।

[শৈলেন এগিয়ে এসে সহসা নিখিলদের দেখে দাঁড়িয়ে পড়লো]

শৈলেন। (স্খলিত কণ্ঠে) কি ব্যাপার, হঠাৎ বেলা বয়ে গেছে নাকি এখানে ? (সহসা সুচরিতাকে দেখে) কে বৌদি বিদুষী, তুমি আবার কোথা থেকে উড়ে এসে এখানে ?

নিখিল। (বজ্র গম্ভীর কণ্ঠে) শৈলেন।

শৈলেন। (থমকে গিয়ে পরে) আরে, হিরো যে তুমিও আছ তা হলে ! কিন্তু হিরোইনটিকে জোটালে কোথা থেকে ? এযে বাবা খাস পরকল্প !

[নিখিল সহসা প্রচণ্ড ক্রোধে শৈলেনের গালে একটা চড় কষিয়ে দিল। শৈলেন পড়তে পড়তে কোন রকমে টাল সামলে নিল]

নিখিল। (রাগে দাঁতে দাঁত চেপে) রাস্কেল কোথাকার ! মদ খেয়ে খেয়ে উচ্ছন্নে গেছ একেবারে ! মেয়েদের সম্মান পর্যন্ত রাখতে হুঁশ থাকে না।

[শৈলেন গালে হাত চেপে নিখিলের দিকে বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো। ওর নেশা তৎক্ষণে ছুটে গেছে। নিজের ভুল বুঝতে পেরে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যেতে চাইলো]

শৈলেন। (অবরুদ্ধ কণ্ঠে) তুমি, তুমি আমাকে মারলে নিখিলদা ? (শৈলেন ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললো) মারো, মারো সকলে মিলে মারো। চার দিক থেকে মার খাচ্ছি। সমাজ মারছে, সংসার মারছে, ভগবান শুদ্ধু মারছে। মার খাবার জন্যেই তো জন্মেছি আমরা ! মারো, মারে আরো মারো।

[শৈলেন শিশুর মত কাঁদতে লাগলো]

নিখিল। (অনুতপ্তভাবে) সত্যিই খুব অন্যায় করেছি রাগের চোটে মাথাটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আমায় তুমি মাপ কর শৈলেন।

শৈলেন। (কাঁদো কাঁদো ভাবে) মাপ ! হ্যাঁ, মাপতো করতেই হবে। না করে তো কোন উপায় নেই।

নিখিল। (আবেগে) শৈলেন, তুমি যদি মানুষ হতে তাহলে কোন দুঃখ থাকতো না। আরে কচি ছেলেটার একফোঁটা বাপ জোটে না অথচ তুমি মদ খেয়ে পয়সা ওড়াচ্ছো ! এ দেখছে কার মেজাজ ঠিক থাকে বলতে পার ?

শৈলেন। (কাঁদো কাঁদো ভাবে) কি করবো বলতে পার বউ ছেলেকে খাওয়াতে-পরাতে পারি সে ক্ষমতাও নেই। দাদা চোখে ওদের দিকে তাকাতেও পারি না, বুকটা জ্বলে যায় হু হু করে। তাই দুটো পয়সা জুটলেই মদ খাই, মদ খেয়ে ভুলে থাকবার চেষ্টা করি। (থেমে) মেরেছো, ভাল করেছো। আমি সত্যিই অন্যায় করেছি। পারতো তুমি আমায় ক্ষমা কর নিখিল দা। (প্রস্থান)

[সহসা গোবিন্দর প্রবেশ]

গোবিন্দ। দিদিমণি, আপনি এখানে ? এই যে জামাইবাবুও রয়েছেন।

নিখিল। হ্যাঁ গোবিন্দ, ভাল আছ তো ?

গোবিন্দ। হ্যাঁ জামাইবাবু (থেমে সুচরিতাকে উদ্দেশ করে) আপনার কি দেরী হবে দিদিমণি ?

সুচরিতা। আমি যাবো না, এখানেই কদিন থাকবো ঠিক করলাম ! তুমি গাড়ি নিয়ে ফিরে যাও গোবিন্দ।

গোবিন্দ। আচ্ছা। (প্রস্থান)

নিখিল। তুমি কি পাগল হলে সুচরিতা ? তুমি কি থাকতে পার ?

সুচরিতা। (দৃঢ় কণ্ঠে) পারি। অন্ততঃ চেষ্টা করে দেখবো। আমায় তুমি বাধা দিওনা আর। বাধা দিলেও তা মানবো না।

নিখিল। কিন্তু তা নয় বাই দিলাম। কিন্তু এখানে তুমি করবে কি ?

সুচরিতা। কিছু না তোমার পাশে থেকে তোমার সহধর্মিণী হবার চেষ্টা করবো। তুমি আমায় আশীর্বাদ কর, আমি যেন সফল হতে পারি।

নিখিল। বেশ, তাই হোক সুচরিতা।

[পর্দা পড়ে গেল]

॥ যবনিকা ॥

হিন্দু যুগে রাজা

সরোজকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে একটা কথা বলা বিশেষ প্রয়োজন বলেই মনে হয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগের এই 'সঙ্কীর্ণ' শ্রেণীস্বার্থ আমাদের দেশের দর্শন ও সমগ্র সংস্কৃতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। নিজেদের স্বার্থে ব্রাহ্মণেরা বিষ্ণুর আত্মাকে পৃথুর শরীরে প্রবেশ করিয়ে যে জন্মান্তরবাদের সৃষ্টি করেছিল, তা থেকে আমরা আজও মুক্তি পাই নি। গোড়ার দিকে দেবতার আত্মা মানুষ রাজার শরীরে প্রবেশ করত; পরে মানুষের আত্মাই দেব প্রভাবিত হোয়ে জন্মাতে লাগল; আরো পরে সব মানুষের আত্মারই পুনর্জন্ম হতে লাগল—শেষ অবধি চল কর্মফল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে এখানে জন্মান্তরবাদেরও একটা ক্রমবিকাশ রয়েছে। পৃথিবীর ভিতর কোন প্রাচীন সভ্যতাই ভারতের মত জন্মান্তরে বিশ্বাস করে নি। গ্রীক দর্শনে Socrates আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করলেও জন্মান্তর সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নি। Plato উচ্চশ্রেণীর ভাববাদী (Idealistic) দার্শনিক হলেও জন্মান্তর সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট মতামত তাঁর নাই। Aristotle যথেষ্ট বাস্তববাদী ছিলেন। জন্মান্তরবাদের সৃষ্টি ভারতেরই বিশেষত্ব। বর্বরযুগের এক অন্ধ বিশ্বাসকে নির্ভর করেই ভারতের দার্শনিকেরা "সত্যের" ঘোষণা করেছিলেন। আর আজও আমাদের দেশের দার্শনিক ও সাহিত্যিকেরা এই দর্শনের গৌরবই করে থাকেন। সাধারণ মানুষের স্বর্গ ও নরকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আস্থা থাকুক আর নাই থাকুক, এই বাস্তব দুনিয়ার দুঃখ দুর্দশার সঙ্গে তাদের যথেষ্ট পরিচয় ছিল। সুতরাং পর জন্মের ভয় দেখিয়ে তাদের জোর করে "ধার্মিক" তৈরি করে অবাধ শোষণ করবার এই'টই ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। যেখানে ব্রহ্মার আদেশে বৈশ্যের কর্তব্য ছিল ধন ও ধান্য দিয়ে অপর বর্ণের ভরণপোষণ ও শূদ্রের কর্তব্য সেবা (১০।৮) সেখানে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় কোন প্রকারের ভ্রম না করেই পরের শ্রমের ফল-ভোগী হবে আর উচ্ছৃঙ্খল দুষ্কর্ম করবে তাতে আর সন্দেহ কি ? "কৃতানি যানি কর্মাণি দৈবতৈ মুনিভিস্তথা। ন চরেত্তানি ধর্মাত্মা শ্রুত্বা চাপি ন কুৎসয়েৎ"। (শা ২৮৪। ১৭) দেবতা আর মুনিরা যে সব দুষ্কর্ম করেছেন ধর্মাত্মার তা করা উচিত নয়; কিম্বা সে সব কথা শুনে তার কুৎসাও করা উচিত নয়। ভারতের ভিতর স্বাধীন মতামতের সৃষ্টি কোন দিনই হয় নি। যে দর্শনের গৌরব আমরা আজও করি, সে দর্শন আমাদের দেশের মানুষের ভিতর কোনদিনই বিচার শক্তির (rationality) সৃষ্টি করে নি। প্যালিওলিথিক (paleolithic) যুগের সম্পূর্ণরূপে বর্বর মানুষের বিশ্বাস আজকের সভ্যতার যুগে সব দেশ থেকেই সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়েছে; কিন্তু আমাদের দেশের মৃত মানুষের অশরীরী আত্মা আজও খাদ্য আর পানীয়ের জন্য লালায়িত থাকে। আর আমরা এই নিয়ে আজও গৌরব করি।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে পৃথুর ভিতর বিষ্ণুর আত্মা প্রবেশ করেছিল। বিষ্ণু ছিলেন ত্রিমূর্তির অন্যতম দেবতা; সুতরাং অন্যান্য দেবতা অপেক্ষা নিশ্চিত ভাবেই শ্রেষ্ঠতর—স্বয়ং ভগবান। ব্রাহ্মণেরা বিষ্ণুকেই

পরব ব্রহ্ম বলে প্রচার করে এসেছে। ব্রহ্মা ও শিব ত্রিমূর্তির জন্য দুটি দেবতা হলেও হিন্দু সমাজ নিশ্চিত ভাবেই বিষ্ণুকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করে এসেছে। ঐতিহাসিকেরা বলেন, এই ত্রিমূর্তির আবির্ভাব হয়েছিল বৈদিক যুগের শেষের দিকে। নিজেদের স্বার্থে ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয় রাজাকে এই সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান প্রদান করলেও পরের যুগে যখন ব্রাহ্মণদের প্রতিপত্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তারা ক্ষত্রিয় রাজাকে এ সম্মান দিতে প্রস্তুত ছিল না। সেই জন্য আমরা দেখতে পাই যে মনুর যুগে একদিকে রাজার যেমন উন্নতি হয়েছিল, অন্য দিকে তেমনি অবনতিও হয়েছিল। মনু বলেছেন যে রাজা আটটি প্রধান দেবতার অংশ দিয়ে ভগবানের দ্বারা সৃষ্ট হয়েছেন। এই আটটি দেবতাই ছিলেন বৈদিক যুগের বিষ্ণুর আত্মার দ্বারা প্রভাবিত হওয়া অথবা বিষ্ণুর মাত্রাযুক্ত হওয়া অপেক্ষা দেব অংশ সৃষ্ট হওয়া নিশ্চয়ই রাজার পক্ষে উন্নতির কারণ ছিল। কিন্তু ভগবান বিষ্ণুর পর ভারতীয় সমাজে প্রায় সম্পূর্ণরূপে অচল বৈদিক দেবতাদের অংশ দ্বারা সৃষ্ট হওয়ায়, পূর্বের তুলনায় রাজাদের সম্মানের হানিও নিশ্চয়ই হয়েছিল। তবে রাজাদের পক্ষে সান্ত্বনা এই ছিল যে মনুর যুগে ব্রাহ্মণেরা রাজাদের শুধুমাত্র বৈদিক দেব অংশে সৃষ্ট বলে ঘোষণা করেই ক্ষান্ত হয় নি; এ যুগে তারা বৈদিক দেবতাদেরও সৃষ্টি করেছিল (মনু ৯।৩১৪, ৩১৫)। ব্রাহ্মণদের হাতে বৈদিক দেবতা আর ইতিহাসের কি অপমান! অথচ মজার কথা এই হল যে এই ব্রাহ্মণরাই বেদকে আজও প্রামাণ্য বলে ঘোষণা করে, আর আমরাও তা নির্বিবাদে স্বীকার করি। ব্রাহ্মণরা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখবার জন্য ক্ষত্রিয় রাজাকে ভগবানের অংশ বলে স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিল না।

হিন্দু সমাজ ও ধর্মে রাজা সম্পূর্ণরূপেই দেবতা। কিন্তু আজকের দিনেও গোঁড়া ও প্রতিক্রিয়াশীল লেখকেরা এ কথা স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। মনুসংহিতা আলোচনায় বলা হয়েছে, "রাজতন্ত্র যদিও দৈব-নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান, কিন্তু রাজা স্বয়ং কোন অর্থেই দেবতা নহেন। কোন ভারতীয় রাজাই নিজেকে দেবতা আখ্যা দেন নাই, এবং কেহই তাঁহার জীবদ্দশায় দেবতা হিসাবে পূজিতও হন নাই।" (ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস; প্রথম খণ্ড, প্রথম ভাগ পৃঃ ১১৬) যোড়হস্ত মনু বর্ণিত রাজা ও তাঁকে একটা আদর্শ বলে প্রচার করাই এঁদের উদ্দেশ্য। খুব সমাজে ধর্ম প্রচারের জন্য আমাদের দেশে এক উৎকট আন্দোলন যে ভাবে আরম্ভ হয়েছে, তাতে এই সন্দেহই হয় যে আজ যাঁরা ক্ষমতা ও প্রাচুর্যের আসনে বসে আছেন, তাঁরা মনুর যুগের শ্রেণী সংঘর্ষকে সম্পূর্ণরূপে ধামা চাপা দিয়ে, মিথ্যা ও ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে যুক্তিবাদের বিক্ষোভকে প্রতিহত করবার জন্যই মনু বর্ণিত ধর্ম ও সমাজের এক নূতন ব্যাখ্যা করে, তার এক সুন্দর ছবি সকলের সম্মুখে তুলে ধরতে চান। মানুষ ও তার সমাজের যে একটা ক্রমবিকাশ আছে, আর এই বিকাশের পথে আমরা আজও অনেক পিছনে পড়ে আছি—এই কথাটি যেন পূর্বে, তেমনি আজও লোকচক্ষুর অন্তরালে রেখে শ্রেণী বিশেষের স্বার্থে প্রচার আজ বোধহয় সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছেছে। এরা কিন্তু যাই বলুন না কেন, মনু স্বয়ং কি বলেছেন তা দেখাই প্রথম প্রয়োজন। মনু খুব স্পষ্ট ভাষায় রাজাকে দেবতা বলে ঘোষণা করেছেন, "ইন্দ্রানিলযমার্কাণামগ্নেশ্চ বরুণস্য চ। চন্দ্রবিত্তেশয়োশ্চৈব মাত্রা নির্হৃত্য শাশ্বতীঃ"। (মনু ৭।৪) ইন্দ্র, বায়ু, যম, সূর্য, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, কুবের এই আটটি দেবতার সারভূত অংশ থেকেই ভগবান রাজার সৃষ্টি করেছেন। "যস্মাদেষাং সুরেন্দ্রাণাং মাত্রাভ্যো নির্মিতো নৃপঃ"। (মনু ৭।৪) যে হেতু এই সব শ্রেষ্ঠ দেবতাদের অংশ দিয়ে রাজা সৃষ্ট হয়েছেন। তিনিই (রাজা) অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য, যম, কুবের বরুণ ও ইন্দ্র। (৭।৭) "মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি। (৭।৮) তিনি মনুষ্যরূপে মহান দেবতা। এরপরও মনু দ্বারা বর্ণিত রাজার দেবত্বকে অস্বীকার করা সত্যকে অপলাপ করাই হয়।

কোন ভারতীয় রাজা নিজেকে দেবতা আখ্যা দিয়া ছিলেন কিনা, সে সম্বন্ধে একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিকের মত এখানে উদ্ধৃত করতে চাই। "That the Gupta kings were raised to the dignity, not of a mere god but the Supreme Deity, is

quite clear from the fact that Kumargupta and Buhdhagupta adopted the title of "Parama-Daivata" in their formulary in the Damodar-pur copper plate grants." (Bhandarkar : Some Aspects of Ancient Hindu Polity. P. 164) ডাঃ ভাণ্ডারকার আরো বলেছেন, Corresponding to, Parama-Daivata of the Damodar pur grants we have parama esvara of somewhat later plates. The last phrase also must be taken to mean precisely the some thing." (ibid foot note) বৌদ্ধদের প্রভাবিত অশোক নিজেকে দেবানাং প্রিয় বলেই সন্তুষ্ট ছিলেন ; কিন্তু মনুর বংশধরেরা রাজাকে পরমেশ্বর আখ্যা দিতে মোটেই দ্বিধা করেন নি।

রাজার উৎপত্তি সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য দেশের দ্বিতীয় মতবাদ হোল Social Contract। এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে এ মতবাদের আংশিক সমর্থক ছিলেন কৌটিল্য। তিনি বৈবস্বত মনুর নামোল্লেখ করলেও কি পরিস্থিতিতে মনুকে রাজপদে অভিষিক্ত করা হয়েছিল, সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই আলোচনা করেন নি। ঐতিহাসিকেরা বিশ্বাস করেন যে মহাভারতের যে অংশে আমরা ঐ ঘটনার উল্লেখ পাই সে অংশটি ভরদ্বাজ দ্বারা রচিত হয়েছিল (ibid p. 135) ভরদ্বাজ ছিলেন কৌটিল্যের পূর্ববর্তী। রাজা ও রাজনীতি সম্বন্ধে একটি প্রকাণ্ড পুস্তক রচনা করা সত্ত্বেও কৌটিল্য যে কেন রাজা ও রাজনীতির উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করেন নি, বরং অনেক কথাই গোপন করবার চেষ্টা করেছেন—এটা বড়ই আশ্চর্য ঠেকে। তিনি পৃথু সম্বন্ধে একটি কথাও বলেন নি। আমাদের দেশে Social Contract মতবাদের কোন অস্তিত্বই ছিল না।

উপরে উল্লিখিত ঐ দুটি মতবাদ ছাড়া পাশ্চাত্ত্য দেশে আর একটি মতবাদ গড়ে উঠেছে—সেটি হল মার্ক্সীয় মতবাদ। এই মতবাদ সম্বন্ধে Engels বলেছেন, "The State is an organisation of the possessing class for its protection against the non-possessing class." (Selected works vol II p. 291 আমাদের দেশের ধর্মগ্রন্থের বিশ্লেষণ করলেই দেখা যায় যে ধর্মগ্রন্থের লেখকেরা এই মতবাদকেই পরোক্ষভাবে সমর্থন করেছেন।

গণজীবনের পর যে সমাজ ব্যবস্থা আমাদের দেশে চালু হয় সে সমাজের রক্ষক ছিলেন রাজা, যার সৃষ্টির মূলেই আজকের দিনের স্টেট বা রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু স্টেট কোনদিনই সমাজের সব মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে নি। স্টেট বা রাজশক্তি যাদ্বিকই হোক আর আজকের দিনের কল্যাণমূলকই হোক—তা সব সময়েই সম্পত্তিপন্ন মানুষেরই প্রতিনিধিত্ব করে এসেছে। এ সম্বন্ধে Lenin বলেছেন, "According to Marx, the state is an organ of class rule, an organ for the oppression of one class by another. it is the creation of "order" which legalizes and perpetuates this oppression by moderating the conflict between the classes---That the state is an organ of the rule of a definite class which cannot be reconciled with its antipode (the class opposite to it) is something the petty bourgeois democrats will never be able to understand." (Selected works : vol II Port I p. p. 204-205) পেটি বুর্জুয়া শান্তিক ও প্রজাতন্ত্রানুরাগী ব্যক্তিরা যে সত্য স্বীকার করতে প্রস্তুত নন, সে সত্য আমাদের দেশের ধর্মগ্রন্থের বিশ্লেষণ করলেই খুব সহজে দেখতে পাওয়া যায়। মহাভারতে বর্ণিত পৃথুর রাজ্যাভিষেকের মন্ত্রগুলি দেখলেই বুঝতে পারা যাবে যে রাজার সৃষ্টি হয়েছিল সমগ্র কৃষক, শ্রমিক ও দরিদ্র সমাজের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে ভূস্বামিবৃন্দ ও ধনী ব্রাহ্মণ শ্রেণীর রক্ষার জন্য। তখনকার যুগে এই ব্রাহ্মণ শ্রেণীই ছিল সর্বাপেক্ষা সম্পত্তিপন্ন ও সমগ্র সম্পত্তির একমাত্র মালিক ; আর এরাই নিজেদের সম্পত্তি রক্ষার জন্য আধুনিক পর্যায়ের রাজশক্তির সৃষ্টি করেছিল।

মনু খুব স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন, "সর্বং স্বং ব্রাহ্মণস্যেদং যৎকিঞ্চিজ্জগতীগতম্। শ্রৈষ্ঠ্যেনাভিজনেনেদং সর্বং বৈ ব্রাহ্মণোঽর্হতি। ১।১০০ জগতে যা কিছু সম্পত্তি আছে তা সবই ব্রাহ্মণদের নিজস্ব। যে হেতু

তারা সর্বশ্রেষ্ঠ, সে জন্য সব সম্পত্তির মালিক হবার তারাই যোগ্য। এ যে শুধু দম্ভোক্তি ছিল তা নয়, মনু প্রবর্তিত রাজশক্তি, সমাজ ব্যবস্থা ও আইন কানুনের বিশ্লেষণ করলেই দেখতে পাওয়া যাবে, যে সমাজের নিয়ম কানুনগুলি এমন ভাবে তৈরি হয়েছিল, যাতে ব্রাহ্মণদের মালিকানার কোন প্রকারেরই ব্যাঘাত না হয়। সর্ব-স্যাধিপতিহি সঃ" ৮।৩৭ তিনি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সব সম্পত্তিরই অধিকারী। মহাভারতেও আমরা ঠিক অনুরূপ চিন্তাধারা দেখতে পাই, "বিপ্রস্য সর্বমেবৈতদ যৎকিঞ্চি-জ্জগতীগতম্" (শা ৭০।৭, ১০।১১) জগতে যা কিছু সম্পদ আছে বিপ্রই তার মালিক। পতির অভাবে স্ত্রী যেমন দেবরকে পতি করে, ব্রাহ্মণের পর ভূমি সে রূপ ক্ষত্রিয়কে পতি করে। (শা ৭০।১২) এই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আঁতাতের নামই ছিল রাজশক্তি ও ধর্ম।

রাজার কর্তব্য সম্বন্ধে মহাভারতে খুব স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করা হয়েছে, যে রাজা সব সময়েই পান, বসন আর ভোজ্যবস্তু দিয়ে ধনী ব্যক্তিদের পূজা করবেন আর সঙ্গে সঙ্গে বলবেন, 'আপনারা আমার উপর আর প্রজাদের উপর অনুগ্রহ করুন। 'ধনিনঃ পূজয়েন্নিত্যং পানাচ্ছাদনভোজনৈঃ। রক্ষ্যাস্তাননুগৃহ্লীয়ুরং প্রজাঃ সহ ময়েতি বৈ। ৮৬।২৯। এই হীন চাটুবাদের কারণ হিসাবে বলা হয়েছে যে ধনী ব্যক্তিরাই রাজ্যের প্রধান অঙ্গ, আর এই ধনী ব্যক্তিরাই নিঃসন্দেহে সব প্রাণীদের ভিতর সর্বশ্রেষ্ঠ।' ৮৫।৩০ তোষামদকারী সাহিত্যিক ও দার্শনিকেরা রাজার ন্যায়পরায়ণতা আর ধর্মের যে ছবি এঁকেছেন, তা শুধু নগ্ন শোষণকে গোপন করবার প্রতারণা-সূচক কৌশল (camouflage) ছাড়া আর কিছুই নয়। কৌটিল্য এ রূপ বিধান অথচ তোষামদ-কারীদের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। (কৌ ২।৭) এই রাজশক্তির দরিদ্র কৃষক বা শিল্পীর (বৈশ্য ও শূদ্র) প্রতি কোন সহানুভূতিই ছিল না। প্রয়োজন বোধে নিজেকে আর ধনী সম্প্রদায়কে রক্ষার জন্য খুব সহজেই এই বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে আত্মরক্ষা করতে এদের মোটেই বাধত না। বাহিরের শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকলেই গ্রামের লোক ও অন্যান্য সাধারণ মানুষকে তাদের গ্রাম থেকে এনে, সহরের রাজ-পথে ও সহরতলীতে বাস করান হত; আর রাজা সৈন্য সামন্ত আর ধনী ব্যক্তিদের নিয়ে (ক্ষত্রিয় আর ব্রাহ্মণ) নিরাপদ দুর্গের ভিতর আশ্রয় গ্রহণ করতেন। (শা ৬৭।৩৫, ৩৬) যাতে শত্রুর সমস্ত ক্রোধ এই অসহায় ব্যক্তিদের উপরই পতিত হয়। রাজশক্তি কোনদিনই সমগ্র সমাজের প্রতিনিধিত্ব করে নি। যে সব সময়েই দলপতিদলকে তোষণ করে এসেছে আর দরিদ্রের শাসন ও শোষণ করেছে। আজকের দিনের তথাকথিত কল্যাণ-মূলক স্টেটের বিশ্লেষণ করলেও একই ছবি চোখে পড়ে।

এ কথা সর্বজন বিদিত যে আর্যদের শ্রেণী বিভক্ত সমাজে যা কিছু ভোগ্যবস্তুর উৎপাদন হত, তা বৈশ্য ও শূদ্র শ্রেণীই করত। কৃষিভিত্তিক সমাজের প্রধান সম্পত্তি ছিল ভূমি ও পশু। বৈশ্যের কর্তব্য কৃষি ও পশুপালন হলেও তারা ভূমি বা পশুর মালিক ছিল না। তারা যা কিছু শ্রম করত, তার জন্য তাদের বেতন দেওয়া হত—এ কথা আমরা মহাভারত ও মনুসংহিতা থেকে জানতে পারি। (শা—৫৯।২৭, ২৮) যা কিছু শিল্পের উদ্ভব হয়েছিল তা শূদ্রদের দ্বারা সম্পাদিত হলেও তারা শুধু মাত্র বেতন প্রাপ্ত হোত। (ম ৮।৩২৬, ৩৯৭) কৌটিল্যের যুগে শিল্পের মালিকানার ভিতর একটা পরিবর্তন হয়েছিল; কিন্তু তাতে শূদ্রদের বিশেষ কিছু সুবিধা হয়েছিল বলে মনে হয় না। (কৌ ২।২৩, ২৪) মনু বৈশ্য ও শূদ্রদের ভিতর কোনই তফাৎ করেন নি। (৮।২০২) তাদের কোন প্রকারের স্বাধীন মতামতও ছিল না। (৮।৪১৮) সুতরাং এই সব শ্রেণী ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে থাকবে; আর তাদের বিদ্রোহকে দমন করবার জন্যই দণ্ডধারী রাজার সৃষ্টি হয়ে থাকবে। আর্যদের সমাজে যে এ রূপ বিদ্রোহ হয়েছিল তার আভাস আমরা মহাভারতে পাই। (শা ৭৪।১২-১৭, ২৪-২৭)

মনু বলেছেন দণ্ডধারী রাজা না থাকলে, "স্বাম্যঞ্চ ন স্যাৎ কস্মিংশ্চিৎ প্রবর্তেতা সমোত্তম।" (৭।২১) মালিকানা থাকবে না, সুতরাং অধম অর্থাৎ দরিদ্র লোকেরা উত্তম অর্থাৎ ধনী হয়ে উঠবে। এই যুগের বীভৎস দণ্ডনীতির ব্যাখ্যানেই যে এই ধনী সম্প্রদায় সম্পত্তি ভোগ করত তাও মনু বলেছেন, "দণ্ডস্য হি ভয়াৎ সর্বং

জগদ্ভোগায় কল্পতে।" (৭।২২) কেবল মাত্র দণ্ডের ভয়েই মানুষ ভোগ করতে সক্ষম হয়। ভোগ্য বস্তুর উৎপাদক ছিল বৈশ্য আর শূদ্র; তাদের রক্ষিত করে ভোগ করত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়; সুতরাং দীর্ঘতমা দণ্ডনীতির আশ্রয় না নিলে এ কাজ সম্ভব ছিল না। রাজদণ্ডের অর্থ ছিল সম্পত্তিশালীকে সম্পত্তিহীন শ্রেণীর বিরুদ্ধে রক্ষা করা; যদিও এই সম্পত্তিশালী শ্রেণী সম্পত্তির উৎপাদনের জন্য কোনই শ্রম করত না। মহাভারত বলছেন, রাজা রক্ষা না করলে পাপীরা ধান, বস্ত্র, অলঙ্কার ও নানাবিধ রত্নহরণ করে (শা ৬৮।১৬) আর সৎপথাশ্রিত মানুষের বধ, বন্ধন কিম্বা সর্বপ্রকার কষ্ট হোরে থাকে (শা ৬৮।১৯)। এই পাপী ছিল দরিদ্ররা এ কথা মহাভারত মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছে (শা ৮।১৩, ১৪)। হিন্দু সমাজের রাজশক্তি যে একমাত্র ধনী সম্প্রদায়েরই প্রতিনিধিত্ব করত এ কথা আমাদের ধর্মগ্রন্থ ও নীতিশাস্ত্র থেকেই জানতে পারা যায়।

সংখ্যালঘু ও আপাত দৃষ্টিতে দুর্বল মনে হলেও এই ধনী সম্প্রদায় যথেষ্টই ক্ষমতাশালী ছিল—এ কথা আমরা সহজেই কল্পনা করতে পারি। মহাভারতও এ কথা অকপটে স্বীকার করেছে, "অধনং দুর্বলং প্রাহুর্দমেন বলবান্ ভবেৎ। সর্বং ধনবতা প্রাপ্যং সর্বং তরতি কোশবান্"। (১২৬।৫০) মনস্বীরা বলেন যে দণ্ডের দুর্বল আর ধনবান সবল হয়ে থাকে, ধনবান লোক সব সুখই পায় আর সমস্ত বিপদ থেকে উত্তীর্ণ হয়। কৃষি-যোগ্য ভূমি আর পশু সম্পদ কতকগুলি হাতে কেন্দ্রিত হবার ফলে পূর্বের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে আর বহু ব্যক্তি বেকার হয়ে যায়। এই সব বেকার লোক নিজেদের অস্তিত্বের জন্য ধনী ব্যক্তিদের গলগ্রহ হয়ে উঠে, আর সঙ্গে সঙ্গে এই ধনী ব্যক্তিদের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। এই ধনী ও ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিরাই ছিল ধার্মিক "... বলাদ্ধর্মঃ প্রবর্ত্ততে। বলে প্রতিষ্ঠিতো ধর্মো..."। ১০ পা ১০০।৬ বল থেকে ধর্ম উৎপন্ন হয় আর বলেই ধর্ম প্রতিষ্ঠিত থাকে। কিন্তু বিশাল সংখ্যক দরিদ্র জন সাধারণের ভিতর এই 'ধার্মিক' মানুষের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য হওয়ায় তাদের রক্ষারও প্রয়োজন ছিল। এই ধনী সম্প্রদায়কেই মনু দুর্বল বলে বর্ণনা করেছেন। সংখ্যার দৃষ্টি থেকে এরা নিশ্চয়ই নগণ্য, সুতরাং দুর্বল ছিল। দণ্ডধারী রাজা এদেরই রক্ষা করতেন।

ধনী সম্প্রদায়কে দরিদ্রদের শোষণ করবার জন্য আর তাদের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যই রাজার সৃষ্টি হয়েছিল। এই রাজা ছিলেন দণ্ডধারী। ধনী সম্প্রদায়ের পদলেহী সাহিত্যিকেরা এই রাজদণ্ডকে ন্যায়দণ্ড বলেই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু যেমন রাজার দেবোৎপত্তির বেলায়, ঠিক তেমনি দণ্ডের বেলায়ও তাঁদের মতামত শুধু ভুলেই নয়, বরং সম্পূর্ণরূপে পক্ষপাত দুষ্ট ও ভ্রম-জনক (misleading)। মনু সংহিতা আলোচনায় বলা হয়েছে, "দণ্ড কথাটিকে প্রায়ই শাস্তি অর্থে গ্রহণ করা হইয়া থাকে। শাস্তি যদিও দণ্ডের বিভিন্ন অর্থের মধ্যে একটি অর্থ, কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে যেখানে দণ্ড বিশ্বের নিয়ম ও শৃঙ্খলার প্রতিমূর্তি এবং বৈদিক ঋতের পরবর্তী রূপ হিসাবে গৃহীত হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রে শাস্তি হিসাবে দণ্ডের ব্যাখ্যা যথেষ্ট নয়।" (ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস; প্রথম খণ্ড, প্রথম ভাগ পৃঃ ১১৪)

এ কথা আজ সকলেই জানে যে অবস্থার পরিবর্তনের বহির্বিশ্বের সম্পর্কে এসে মনু প্রতিষ্ঠিত বর্ণাশ্রম আজ ভাঙনের মুখে। কিন্তু বর্ণাশ্রমের আধারে যে মনস্তাত্ত্বিক ধর্মের প্রতিষ্ঠা সপ্তাতিপন্ন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় করেছিল, তা আজও অব্যাহত থাকলেও এই বিজ্ঞান ও সমাজবাদের যুগে মনুর দণ্ডোক্তি সম্ভব নয়। তাই রাজাকে আড়াল করবার জন্য তার একটা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা না করলে সাধারণ মানুষকে ঠকান সম্ভব হয় না। এ সব লেখক রাজদণ্ডকে "বিশ্বের নিয়ম ও শৃঙ্খলার প্রতিমূর্তি" বলুন আর "বৈদিক ঋতের পরবর্তী রূপই" বলুন, মনু নিজে কি বলেছেন, তা দেখাই প্রথম প্রয়োজন।

দণ্ড সম্বন্ধে মনু বলেছেন যে পূর্বে ব্রহ্মা রাজাদের প্রয়োজনের জন্য সর্বপ্রাণীর রক্ষাকর্তা ধর্মস্বরূপ পুত্র রাজদণ্ডকে সৃষ্টি করেছিলেন (৭।১৪) দণ্ডই রাজা, দণ্ডই পুরুষ, দণ্ডই নেতা, দণ্ডই শাসক, দণ্ডই চারিটি আশ্রমের প্রতিভূ (৭।১৭) দণ্ডই শাসিতা, দণ্ডই ধর্ম, দণ্ড সব সময়ে জাগ্রত থেকে সকলকে রক্ষা করে (৭।১৮) পরমেশ্বরের দণ্ডের ভয়েই দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, রাক্ষস,

পক্ষী, সর্প প্রভৃতি জগতের উপকার সাধন করছে। (৭।২৫) দণ্ডের এই বর্ণনার ভিতর এরা বিশ্বের নিয়ম ও শৃঙ্খলা বা বৈদিক ঋত কোথায় দেখতে পেয়েছেন, তা অবশ্য এঁরাই জানেন। পরমেশ্বর যদি দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, রাক্ষস প্রভৃতি দিয়ে জগতের উপকার সাধনের জন্য এতই উৎসুক ছিলেন, তা হোলে তিনি সেরূপ ভাবেই তাদের সৃষ্টি করতে পারতেন—দণ্ডের কোন প্রয়োজনই থাকত না। যে দণ্ডকে এই শ্রেণীর লেখকেরা বিশ্বের নিয়ম বলে বর্ণনা করেছেন, তাঁরা বোধ হয় ভুলে গেছেন যে আর্যদের সমাজের ভিতরই পূর্বের যুগে দণ্ডের শাসন ব্যতীতই প্রজারা পরস্পরকে রক্ষা করত আর সেইটিই ছিল তাদের ধর্ম (শা ৫৮।১৪)। আবার দণ্ডনীতি আশ্রয়কারী রাজা পুরুষ বলী ব্রাহ্মণদের দণ্ড থেকে ব্যত্যাহৃত দিয়েছিলেন: এ কথা বিশেষভাবে অঙ্গীকার করবার পরই তিনি রাজপদে অভিষিক্ত হতে পেরেছিলেন। "অদণ্ড্যা মে দ্বিজাশ্চেতি···" (৫৮।১০৮) কি কি ক্রিয়া ও প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়া আর্য সমাজের সেই চিরাচরিত ধর্ম পরিবর্তিত হয়ে নূতন দণ্ডনীতি আশ্রিত ধর্ম উৎপত্তি লাভ করেছিল, তা আমাদের দেশের ধর্মগ্রন্থই সাক্ষী দেয়। সব দেশের ইতিবৃত্ত অনুশীলন করলেই আমরা মানুষের সমাজের এই ক্রম-বিকাশ দেখতে পাই। কিন্তু সমাজের এই ক্রমবিকাশকে গোপন করাই এই শ্রেণীর লেখকদের প্রধান উদ্দেশ্য।

মনু বর্ণিত দণ্ডের ভিতর বৈদিক ঋত থাকুক আর নাই থাকুক, একটি কথা খুব স্পষ্টভাবে সকলের চোখে পড়ে; আর তা হল যে যাঁরা এই দণ্ডের সৃষ্টি করেছিলেন ও এই দণ্ড শাসন করতেন তাঁদের একটি মাত্র উদ্দেশ্যে ছিল—সমাজের ভিতর একটা ভীষণ ভয়ের আবহাওয়া সৃষ্টি করে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা। প্রয়োজন হলে প্রতিরোধকারীকে অমানুষিক শাস্তি দিয়ে নিশ্চিহ্ন করা।

দণ্ডের এই রূপই মনু কল্পনা করেছেন। "যত্র শ্যামো লোহিতাক্ষো দণ্ডশ্চরতি পাপহা" ।৭।২৪ দণ্ডের রূপ "শ্যামে" আর "লোহিতাক্ষো"। এই কথা দুটিকে ব্যাখ্যা করে মনুর ভাষ্যকার মেধাতিথি বলেছেন "বিরূপো দণ্ডঃ দুষ্টেষ্বো ভয়ানক ভব হেতুত্বং শ্যামতয়া দুষ্ট হেতুত্বং লোহিতাক্ষত্বেন"। দণ্ডের রূপ দু প্রকার দুষ্টদায়ী আর ভয়ঙ্কর। দণ্ড শ্যাম বর্ণ যে হেতু ভয়ঙ্কর আর দুষ্টদায়ী যে হেতু রক্ত চক্ষু। এইটিই হল শোষক ও প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর চোখে 'বৈদিকঋত'। শাসক ও শোষক-শ্রেণীর চোখে অবশ্য এই হল "বিশ্বের নিয়ম ও শৃঙ্খলার প্রতিমূর্তি"। ভোগ্যবস্তুর উৎপাদক নিরীহ শ্রেণী যতক্ষণ নির্বিবাদে মুখবুজে শোষণকে সহ্য করে, ততক্ষণ সে কর্তব্যনিষ্ঠ, ধার্মিক; কিন্তু যে মুহূর্তে সে মনুষ্যত্বের দাবি নিয়ে, মানুষের মত অবস্থায় বেঁচে থাকবার জন্য নিজের প্রাপ্য তলব করে, তখনই সে হয় পাপী; আর তখন ঐ রাজদণ্ড বা ন্যায়দণ্ড তার উপর পতিত হয়। দণ্ডনীতি আশ্রিত বর্ণাশ্রম ধর্মের সোজার যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, আজকের দিনেও তার ভিতর এক চুলও পরিবর্তন হয় নি। তবে তফাৎ এই, পূর্বে যে কথা স্পষ্ট ভাবে স্বীকার করা হত, পরের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত তা মিথ্যা আর ভণ্ডামীর আবরণে আবৃত করে রাখা হয়েছে।

মনুর কথা ছেড়ে দিলেও আমাদের দ্বিতীয় প্রধান ধার্মিক গ্রন্থ মহাভারতে এ সম্বন্ধে কি বলা হয়েছে তা আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। মনুর মত মহাভারতে কোন কথাই গোপন করা হয় নি। মহাভারতে খুব স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে দণ্ড দু প্রকারের গোপনীয় আর প্রকাশ্য। প্রকাশ্য দণ্ড আট প্রকারের, গোপনীয় দণ্ড বহু প্রকারের (শা ৫৮।৪০) এই আট প্রকার প্রকাশ্য দণ্ড হল, হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি, শকট, নৌকা, চর ও উদ্বেষ্টা (শা ৫৮।৪১) মোটা কথায় রাজ্যের সৈন্য সামন্ত আর পুলিশ বাহিনী। যারা একবার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল, তারা নিজেদের ক্ষমতাকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী আর অটুট রাখবার জন্য যে কোন প্রকারের হিংসা বৃত্তি অবলম্বন করতে পেছ পা হয় নি; আর এটিকেই তারা ন্যায় ও ধর্ম বলে ঘোষণা করেছিল। কিন্তু শ্রেণী বিভক্ত সমাজে এক শ্রেণীর ন্যায় অন্য শ্রেণীর পক্ষে অন্যায়ই হয়ে থাকে।

গোপন দণ্ডের বর্ণনাও মহাভারতে পুংখানুপুংখরূপে করা হয়েছে। "অপ্রকাশ্যেতানি কৌরব্য! প্রকাশানি বলব্যহ। অপ্রকাশ্যপ্রকাশোক্তাংস্তান্ যোগা বিবাদয়ঃ।

(৬৮।৪২) হে কৌরব নন্দন, এই অষ্টবিধ দণ্ডের প্রকাশ্য অঙ্গ ; আর গোপনীয় অঙ্গ তপায় দর্ভ প্রভৃতি, অঙ্গুলির কাষ্ঠময় বিদ্ধ প্রভৃতি আর বিষ প্রভৃতি চূর্ণ ঔষধ সকল। এই বিষ যে প্রতিদ্বন্দ্বী ও অবাঞ্ছনীয় মানুষের বিরুদ্ধে বিশেষ ভাবে ব্যবহার করা হত, তাও মহাভারত স্বীকার করেছে (৬৮।৪৫)। সুতরাং বিশ্বের নিয়ম ও শৃঙ্খলার প্রতিমূর্তি আর বৈদিক ক্রতের রূপান্তর ছিল হত্যা আর বিষপ্রয়োগ। যারা দুর্বল তাদের শুধু তীরের ডোরেই (প্রকাশ্য দণ্ড দিয়ে) আয়ত্বে আনা হত ; আর যারা ছিল শক্তিশালী তাদের বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হোত। এটাই ছিল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শ্রেণীর ধর্ম।

আর্যদের দণ্ডহীন গণ সমাজ ক্রমবিবর্তনের ফলে যে "চতুর্দংষ্ট্র, অষ্টপাৎ শঙ্কু কর্ণ" দণ্ড যুক্ত ধনতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রে সমাজে পরিবর্তিত হোয়েছিল তার ইতিবৃত্ত খুবই চিত্তাকর্ষক হলেও তা নিয়ে এখানে আলোচনা সম্ভব নয়। তবে এ কথা খুবই সত্য যে দণ্ড স্বয়ং বিষ্ণুই হোন আর ব্রহ্মার পুত্রই হোন শ্রেণী বিভক্ত হিন্দু সমাজে রাজার ন্যায় দণ্ড চিরদিনই ধনী মানুষের স্বার্থে নিজের প্রচণ্ডতাই প্রকট করে এসেছে।

কৌটিল্যের অপরাধ ছিল যে তিনি সকলের কাছে "বৈদিক ক্রতের এই ভণ্ডামী ভেঙ্গে দিয়ে এই দু' প্রকারের দণ্ড, বিশেষ করে গোপনীয় দণ্ড কি ভাবে প্রয়োগ করতে হয় তার উপায়গুলি স্পষ্টাস্পষ্টি বর্ণনা করেছেন। আর এ জন্য ব্রাহ্মণ সমাজ তাঁকে কোন দিনই ক্ষমা করে নি। মহামতী বান বলেছেন, "বিষ্ণু বা তেষাং সাম্প্রতং যেষামতি নৃশংস প্রায়োপ দেশ নিঘৃণং কৌটিল্য শাস্ত্র প্রমাণং"। (কাদম্বরী বম্বে সংস্করণ পৃঃ ১০৯) যারা কৌটিল্য শাস্ত্রকে প্রামাণ্য বলে স্বীকার করে তাদের কাছে ন্যায় বলে কিছু আছে কি ? যে হেতু এর বিধিগুলি যেমনি নৃশংস তেমনি ঘৃণিত। (স্থান ভাবে বাণের সমস্ত উক্তিটি উদ্ধৃত করা গেল না)। অথচ অতীতে কোন ব্রাহ্মণ লেখক বা সাহিত্যিক মনু বা মহাভারতকে নিন্দা করেছেন বলে অন্ততঃ আমার জানা নাই। আধুনিক যুগেও কৌটিল্য দুর্নাম থেকে মুক্তি পান নি। তিনি বলেন ভারতের ম্যাকিয়াভেলী। এ কথা সর্বজন বিদিত যে, যে সব প্রক্রিয়ার দ্বারা রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে শ্রেণী বিভক্ত সমাজকে রক্ষা করেছিল ও পরে সাম্রাজ্যে পরিবর্তিত হোয়ে মানুষের অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট গোষ্ঠীগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে নিজের ভিতর অন্তর্ভুক্ত করেছিল, সে প্রক্রিয়াগুলিও মানবতার দৃষ্টি থেকে যেমনি নৃশংস, তেমনি ঘৃণ্য। অথচ মজার ব্যাপার হল যে রাজতন্ত্র বা সাম্রাজ্যবাদীদের স্তাবক এই সব সাহিত্যিক শ্রেণী কৌটিল্যের নিন্দা করেছে। রুদ্রদামন বা সমুদ্রগুপ্তের প্রশস্তিতে মহাকাব্যের রচনা করা হয়েছে, কিন্তু ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে অশোকের নামও খুঁজে পাওয়া যায় না।

পূর্বের গণতন্ত্র আর বর্ণাশ্রম ধর্মের মধ্যে সব চেয়ে বড় পার্থক্য হল পূর্বের সমাজ ব্যবস্থার ভিতর ক্ষত্রিয় প্রাধান্য শেষ হয়ে ব্রাহ্মণ প্রাধান্যের সৃষ্টি। আর্যদের গণ যুগে সমাজের ভিতর ব্রাহ্মণদের যে কোন গুরুত্বই থাকুক না কেন তাদের সমাজে প্রাধান্য ক্ষত্রিয়েরই ছিল। এ কথা আমরা ঋগ্বেদ থেকেই জানতে পারি। ঋগ্বেদের প্রায় এক চতুর্থাংশ শুধুমাত্র ইন্দ্রের প্রশস্তিতেই রচিত হয়ে ছিল। ইন্দ্র ব্রাহ্মণপুত্র হয়েও ব্রাহ্মণগণ বা ধর্মের জন্য পূজিত হন নি, বরং তিনি পূজিত হয়েছেন ক্ষত্রিয় গুণ ও ধর্মের জন্য (শা ২২।১১)। ইন্দ্র ছাড়া অন্যান্য বৈদিক প্রধান দেবতারাও যেমন অশ্বিনীকুমার, রুদ্র, বিশ্বদেব, মরুদ্গণ প্রভৃতিও ক্ষত্রিয় ধর্মের জন্যে পূজিত হয়েছিলেন (শা ৬২।১০)। ক্ষত্রিয় ধর্ম যে ব্রাহ্মণ ধর্ম অপেক্ষা বেশী পূজ্য ও পুরাতন সে কথা মহাভারতকেও বাধ্য হয়েই স্বীকার করতে হয়েছে। "ক্ষাত্রো ধর্ম্মো-হ্যাদিদেবাৎ প্রসূতঃ পশ্চাদন্যে সেষু ভূতাশ্চ ধর্মাঃ"। (শা ৬২।২১) ক্ষত্রিয় ধর্ম আদিদেব অর্থাৎ নারায়ণ থেকেই জন্মলাভ করেছিল, তার পর অন্যান্য ধর্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, বৈশ্য শূদ্র ধর্ম এই ক্ষত্রিয় ধর্ম থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। অন্যান্য সমস্ত ধর্মই ক্ষত্রিয় ধর্মের ভিতর সন্নিবিষ্ট আছে, সে জন্য ক্ষত্রিয় ধর্মকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয় (৬৩।২২) ; অন্যান্য ধর্ম নানা ভাবে নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু ক্ষত্রিয় ধর্মের গুণেই অন্যান্য ধর্ম আবার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। অন্যান্য ধর্ম যুগে যুগে নানা ভাবে উৎপন্ন হয়েছে, সে জন্য মনস্বীরা ক্ষত্রিয় ধর্মকে জ্যেষ্ঠ

ধর্ম বলেন (৬২।২৬) কিন্তু বর্ণাশ্রম ধর্মে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য নির্বিবাদী ।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে ব্রাহ্মণেরা প্রভূত সম্পত্তির বলে উঠেছিল, তারা সমস্ত রাষ্ট্রীয় সম্পদের মালিকানা দাবী করত । কি কি ক্রিয়া ও প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে এ পরিবর্তন সম্ভব হয়েছিল, তা এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় না হলেও এইটুকু বলা চলে যে ব্রাহ্মণ্য সভ্যতাকে নষ্ট করে যে প্রচুর ধন সম্পদ আর্যদের হস্তগত হয়েছিল তার অধিকাংশই ব্রাহ্মণদের হস্তগত হয়, যার বিস্তারিত বিবরণ আমরা বিশেষ ভাবে শান্তি পর্বের ২৯ অধ্যায়ে পাই । তা ছাড়া সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার, মুদ্রার চলন, কৃষিতে মুক্তি, দাস প্রথা, জমির বন্ধক প্রভৃতি নানা উপায়ে অর্থ কতকগুলি হাতে কেন্দ্রিভূত হয়ে উঠে । যার ফলে গণ-যুগের ক্ষত্রিয় প্রাধান্য শেষ হয়ে বর্ণাশ্রম যুগের ব্রাহ্মণ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় ।

এ পরিবর্তন ভারতেরই বিশেষত্ব নয় । অন্যান্য সভ্য দেশের প্রত্নতত্ত্ব আলোচনা করলেই আমরা এই পরিবর্তন দেখতে পাই । এ সম্বন্ধে Engels বলেছেন, "The new aristocracy of wealth, in so far as it did not from the outset coincide with the old tribal nobility, forced the latter, permanently into the back ground (in Athens, in Rome, among the Germans.)" Selected Works. vol II. p. 286 । এর ফলে আমাদের দেশে বর্ণাশ্রম ধর্মের নায়ক ক্ষমতা এমন এক শ্রেণীর হাতে এসেছিল যারা শুধু সব প্রকার ফলপ্রসূ কর্ম থেকেই বিরত থাকত না, বরং যারা যুদ্ধ বিগ্রহ থেকেও বিরত থাকত ।

পূর্বের আলোচনায় দেখাবার চেষ্টা করেছি যে এই ব্রাহ্মণ শ্রেণীকে রক্ষা করবার জন্য যে নূতন ক্ষত্রিয় শ্রেণী সৃষ্ট হয়েছিল, তাদের সঙ্গে বৈদিক ক্ষত্রিয়ের কোন সম্পর্ক ছিল না তাদের অধিকাংশই ছিল বৈশ্য, শূদ্র বা অনার্য । বৈদিক ক্ষত্রিয় নিশ্চিহ্ন হয়েছিল ; এ জন্যই ব্রাহ্মণেরা দাবী করত যে তারাই ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি করেছে ।

মনু সংহিতা আর মহাভারতে আমরা এ রূপ উক্তি দেখতে পাই। (মনু ৯।৩২০, ৩২১ ; শা ২২।৬, ৪৫।২৪, ২৫)। প্রাচীন ভারতের ঐতিহাসিক কালের কোন রাজবংশই নিজেকে নিশ্চিত ভাবে ক্ষত্রিয় বলে দাবী করতে পারে না। নন্দবংশকে শূদ্র বলেই ঐতিহাসিকেরা বর্ণনা করেন। মৌর্য বংশকে ব্রাহ্মণরাই বৃষল বলেছে। গুপ্ত বংশও ক্ষত্রিয় ছিল না। যে ধর্ম বর্ণসংকরের বিরুদ্ধে এমন নির্মমভাবে জিহাদ ঘোষণা করেছিল, সে ধর্ম প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে কুমার দেবীর বিবাহ সমর্থন করত না।

প্রত্নতাত্ত্বিকেরা সন্দেহ করেন যে আর্যদের সমাজে এই বিরাট পরিবর্তন হারাপ্পা সভ্যতারই প্রভাব। বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক অধ্যাপক Piggott বলেছেন, "If we are right in thinking that the Harappa civilisation like most of its contemporaries in Western Asia, was largely priest ruled, the growth in power of the Brahmins over the ksatriyas, which is a common place of Vedic evolution, might fall naturally into its place as a phenomenon arising from a blending of two cultural traditions." (Prehistoric India p. 286)। হারাপ্পার পতন হয়েছিল নিশ্চয়ই ; কিন্তু তিন হাজার বছরের চেয়েও বেশী পূর্বে অনার্য হারাপ্পা আর্যদের সমাজে যে ছাপ অঙ্কিত করেছিল, তা আজও মুছে যায় নি ; অনার্যদের যতই ঘৃণা করা হোক না কেন, অনার্য যাজকদের প্রভাব থেকে আর্য ব্রাহ্মণ বা যাজক মুক্তি পাই নি, বরং উভয় যাজক সম্প্রদায়ই কালক্রমে মিলিত হয়ে একটি মাত্র যাজক শ্রেণীর সৃষ্টি করে থাকবে। মহাভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ শ্লোক থেকে এ সন্দেহ স্বীকৃত হয়। কি রূপ পুরোহিত হওয়া উচিত—যুধিষ্ঠিরের এই প্রশ্নে ভীষ্ম বলেছেন, "গৌরো বা লোহিতো বাপি শ্যামো বা নীরুজঃ সুখী। অক্রোধনোঽচপলঃ সর্বতশ্চ জিতেন্দ্রিয়।" (১০।২) গৌর বর্ণই হোন, রক্তবর্ণই হোন আর শ্যাম বর্ণই হোন নীরোগ, সুখী, অক্রোধন স্বভাব, অচঞ্চল ও জিতেন্দ্রিয় (ব্যক্তিই পুরোহিত হবার যোগ্য)। দাসী পুত্র ঋষি কাক্ষিবান আর ঋষি ঐলূষ যেমন বেদমন্ত্র রচনা করেছিলেন, তেমনি কৃষ্ণবর্ণ কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র রচনা করেছিলেন। কৃষ্ণবর্ণ শ্রীকৃষ্ণ আর শ্যামবর্ণ দশরথ পুত্র রামচন্দ্র হিন্দু সমাজে অবতার। সুতরাং পরের যুগের যে ধর্ম আর দর্শনের সৃষ্টি হয়েছিল তা কতখানি আর্য আর কতখানি অনার্য তা বলা খুবই কঠিন।

গণযুগের আর একটি বিশেষত্ব হল যে গণের প্রতিটি মানুষ একটি নির্দিষ্ট ভৌগলিক সীমার ভিতরই আবদ্ধ থাকে। এই সীমার ভিতরের সব মানুষই তার আপনার জন আপনার আত্মীয়। "It was dependent on the condition that the members of a gens, or say, of a tribe should live together in the same territory, be its sole inhabitants." (Engels : ibid p. 267) বর্ণাশ্রম ধর্মের যুগে সমাজের শাসক সম্প্রদায় অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরা এই গুণটি হারিয়ে ফেলে। দণ্ডনীতি আশ্রয়কারী প্রথম রাজা পৃথুর পুরোহিত শুক্রাচার্য বলেছেন, সর্প যেমন গর্তের ভিতরস্থিত ইঁদুরকে গ্রাস করে, সে রকম ভূমি ও অবিরোধকারী রাজা আর অপ্রবাসী ব্রাহ্মণকে গ্রাস করে। এর ফলে এই ধনী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের ভিতর দেশপ্রেম উদ্বুদ্ধ হতে পারে নি, কিন্তু তা ভবিষ্যতের আলোচনার বিষয়।

বর্ণাশ্রম ধর্মে দণ্ডনীতি আশ্রয়কারী , রাজশক্তির বিকাশকে প্রধানতঃ দুটি ভাগে ভাগ করা চলে। প্রথম যখন আর্যদের সমাজে শ্রেণী সংঘর্ষ কিছু সময়ের জন্য স্তিমিত হয়ে যায়, নূতন ধনী সম্প্রদায় সমাজের দরিদ্র সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণরূপেই দমন করতে সক্ষম হয় ; আর রাজশক্তি ও ব্রাহ্মণদের নিতান্ত অনুগত ভৃত্য রূপে আত্মপ্রকাশ করে। আর দ্বিতীয়, বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার ফলে আর্যদের শ্রেণী সংঘর্ষ আবার তীব্র হয়ে উঠে ; আর এই বিবাদমান দুটি শ্রেণীই নিজেদের স্বার্থে রাজশক্তির উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠে ; ফলে রাজা ব্রাহ্মণদের আওতা থেকে নিজেকে খানিকটা মুক্ত করে স্বাধীনভাবে বিকাশ লাভের চেষ্টা করে। এ সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল।

মার্ক্সবাদ ও বুর্জোয়া স্বাদেশিকতা

অর্ণব চট্টোপাধ্যায়

আমাদের দেশে, আমরা যারা মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী বলে নিজেদের মনে করি, তাদের অনেকেই আজ জাতীয় আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির মার্ক্সবাদী মূল্যায়ন করতে পারছি না। সন্দেহ, দ্বিধা ও নিষ্ক্রিয়তার পাঁকে আটকে পড়েছি আমরা। মার্ক্সবাদী বলে পরিচয় দিয়েও দৈনন্দিন জীবন-সংগ্রামের জরুরী সমস্যাগুলির পাশ কাটিয়ে গা বাঁচিয়ে চলার চেষ্টা করছি এবং সেই চেষ্টার সাফাই দেবার জন্যে কেউ সব দায় চাপিয়ে দিচ্ছি নিঃ ক্রুশ্চেভের ভুলনীতির ওপর, কেউবা দায়ী করেছি চীনের নেতাদের নেতাদের "বেয়াড়া রকমের গোঁড়ামীকে।" আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল আন্দোলনের নেতৃত্ব ও বিশ্বশান্তি রক্ষার আন্দোলনের প্রয়োজনা আমাদের হাত থেকে উদারপন্থী বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে চলে যাচ্ছে একথা আজ অনস্বীকার্য। দেশের চরম দক্ষিণ-পন্থী প্রতিক্রিয়া শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের বলগাও আজ নেহরু কৃষ্ণ মেননের হাতে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জঙ্গীবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের হালের যুদ্ধমুখী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে আমরা জনগণ ও জনমতকে সংগঠিত করার চেষ্টা করি না। আমাদের মার্ক্সবাদী পার্টি আছে, শান্তি সংসদ আছে। আমাদের শান্তি নেতারা আন্তর্জাতিক শান্তি পুরস্কার পান, ঘন ঘন দেশ-বহির্দেশান্তরে গিয়ে বিভিন্ন বিশ্ব জমায়েতে যোগ দেন। কিন্তু দেশের মধ্যে তাঁদের কোন সংগ্রামী আন্দোলন নেই। বড় জোর ন'মাসে ছ'মাসে এক আধটা দায় সারা সভাসমিতি করে বা শান্তি উৎসব কি ছাত্র উৎসব করে আমরা খালাস। বিভিন্ন সংগঠন আছে আমাদের, কিন্তু এক কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়া অন্য কোন গণ সংগঠনের মূলধন নেই এমন কি ট্রেড ইউনিয়নের পর্যন্ত নয়। অতীতে ছিল কিন্তু আজ নেই। লাওসে মার্কিন হামলার বিরুদ্ধে বা মহাশূন্যে পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষার বিরুদ্ধে জনমতকে ব্যাপকভাবে জাগিয়ে তোলার কর্তব্য সম্পর্কে আমরা সচেতন নই। অথচ এইটেই হচ্ছে আসল শান্তি সংগ্রাম। জাপানের ও ইন্দোনেশিয়ার জনগণ তাদের প্রগতিশীল পার্টির নেতৃত্বে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের যারমুখো নীতির বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। সেই সংগ্রামের দরুন আইসেন হাওয়ার জাপানে যেতে পারেননি। ইন্দোনেশিয়ার মার্ক্সবাদী পার্টি জনগণের চেতনা ও সংগ্রামশক্তিকে এমনভাবে জাগিয়ে তুলতে পেরেছে যে বুর্জোয়া নেতা সুকার্নোকে সেই পার্টির মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলতে হয় যে সে পার্টি ইন্দোনেশিয়ার এক শক্তিশালী দেশভক্ত পার্টি।

আমাদের এই নিষ্ক্রিয় অবস্থা হোল কেন? হোল এই জন্য যে আমরা আমাদের কাজের নীতি ও কৌশল নির্ণয় করছি দেশের মাটিতে পা রেখে নয়, আন্তর্জাতিক

ক্ষেত্রে কয়েকটি দেশের কূটনৈতিক চালের উপর নির্ভর করে। সোজা কথায় রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে কূটনৈতিক সম্পর্কের সঙ্গে আমাদের দেশের মালিকার শ্রেণী সম্পর্ক গুলিয়ে ফেলছি। একটি সামান্য উদাহরণ দিই। ভিলাই কারখানা রাশিয়ানরা গড়ে দিচ্ছে বলে সেখানে আমরা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন করতে ভয় পেয়েছি। অথচ শ্রমিকদের দুরবস্থা ভিলাই, রাউরকেল্লা ও দুর্গাপুরে একই রকম। রাশিয়া, জার্মানী, ইংল্যাণ্ড বা আমেরিকা, কারখানা যেই গড়ুক তার দায়িত্ব শুধু কারিগরী সাহায্যদানের। পরিচালনা ও প্রশাসনের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। এই সব কল কারখানা ভারতের সর্বহারা শ্রেণীর মানগত উন্নতি করবে, কিন্তু সেই উন্নতি সর্বহারা শ্রেণীকে আমরা যদি সংগঠিত না করি তাহলে তাদের বৈপ্লবিক গুণগত উন্নতি তো হবেই না, বরং বুর্জোয়া শ্রেণী একদিন তাদের প্রতিবিপ্লবের স্বার্থে ব্যবহার করবে দেশী ও বিদেশী পুঁজির তল্পিবাহক তথাকথিত শ্রমিক নেতাদের সাহায্য নিয়ে।

শান্তি সংগ্রামের প্রধান উপকরণ কী? একথা অনস্বীকার্য যে আজকের দিনে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামই হচ্ছে সেই উপকরণ। যত দেশ সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে মুক্তি লাভ করবে, ততই শক্তিক্ষয় হবে সাম্রাজ্যবাদের এবং সাম্রাজ্যবাদ যত কোনঠাসা হবে ততই তাকে পারমাণবিক অস্ত্র বর্জন ও নিরস্ত্রীকরণে বাধ্য করা যাবে। সেইজন্যে শান্তি সংগ্রামের প্রাণশক্তি হচ্ছে ব্যাপক সংগ্রামী জনসাধারণ। সেই ব্যাপক জনচেতনা জাগ্রত ও সংহত করার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের ওপরতলার শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন নেতাদের সঙ্গে মিলিত হবার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু মেহনতী জনগণকে বাদ দিয়ে রাজেশ্বরী নেহরু, সাহেব সিং সোখে, সর্দার হুকুম সিং প্রমুখ নেতাদের নিয়ে শান্তি সংগ্রাম করা যায় না। বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের ছোট বড় সমস্ত রকমের যুদ্ধবাদী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে গণ আন্দোলন ছাড়া বিশ্বশান্তি সংগ্রাম জোরদার হবে না, হতে পারে না, সাম্রাজ্যবাদকে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বাধ্য করানো যেতে পারে না। মার ছাড়া অন্য কোন ভাষা সাম্রাজ্যবাদ বোঝেনা। কোরিয়া ও কিউবা থেকে আরম্ভ করে, অ্যাঙ্গোলা ও লাওস পর্যন্ত এই সত্য কথাটাই প্রমাণিত হয়েছে। কোরিয়ায় প্রচণ্ড মার খেয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সন্ধি আলোচনায় বসতে বাধ্য হয়েছিল। ভিয়েৎনামে দিয়েন বিয়েন ফুর বিপর্যয়ে, লাওসে, আগেরবার তার উপত্যকায় এবং এবার নামখায় যুদ্ধে মার্কিন তাঁবেদার বাহিনী যখন অস্ত্রশস্ত্র ফেলে, জুতা খুলে ১০০ মাইল রাস্তা চার দিনে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করে, তখনই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আলোচনায় বসতে বাধ্য হয়, তার আগে নয়। সেই সঙ্গে একথাও মনে রাখা দরকার সাম্রাজ্যবাদ, তার সুবিধামত যে কোন সময়ে যে কোন চুক্তিপত্র ছিঁড়ে ফেলে আক্রমণ চালাতে পারে। শান্তি, সহাবস্থান, নিরস্ত্রীকরণ ইত্যাদি যে কোন বিষয়ে তারা বেকায়দায় পড়ে যে চুক্তি করে সুবিধা পেলেই তা ভঙ্গ করে। ভিয়েৎনাম, লাওসের ও আলজিরিয়ার বর্তমান পরিস্থিতিই তার প্রমাণ। সুতরাং অগণিত শান্তিসেনাকে সর্বদা তৈরি ও সজাগ থাকতে হবে।

কেউ কেউ বলবেন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হাইড্রোজেন বোমা ও রকেট আছে। সে মরীয়া হয়ে যদি সেই সব অস্ত্র নিয়ে মহাযুদ্ধ বাধিয়ে দেয় তখন তো সবই যাবে। কিন্তু কোরিয়ার যুদ্ধে যদি পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করা না হয়ে থাকে যখন সমাজতান্ত্রিক শিবির এত শক্তিশালী ছিল না, তাহলে আজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে সেই অস্ত্র প্রয়োগ করা আরো অনেক বেশি কঠিন। বিশ্বের জনমতই সেদিন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে অ্যাটম বোমা ব্যবহার করতে দেয়নি। সেই বিশ্ব জনমতই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে আবার পারমানবিক অস্ত্র বর্জন করতে বাধ্য করবে যদি দেশে দেশে আমরা সেই জনমতকে জাগিয়ে তুলতে পারি।

মার্ক্সবাদের বক্তব্য হচ্ছে যে বিজ্ঞান বা যন্ত্র কৌশল (পারমাণবিক অস্ত্র) কোনদিনই ইতিহাসের ভাগ্য নির্ধারণ করে না, নির্ধারণ করে মানুষ।

এবারে আবার রাজনীতির কথায় আসা যাক।

আমরা মুখে আমাদের সর্বহারা আন্তর্জাতিকতার কথা বলি কিন্তু কার্যত আমরা ক্রমে ক্রমে বুর্জোয়া স্বাদেশিকতার মাধ্যে আত্ম-বিস্মৃত হতে বসেছি। সেই জন্যেই আজ পদে পদে "একতা ভেঙ্গে যাবার ভয়ে"

বুর্জোয়া শাসক শ্রেণীর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কতকগুলি সাম্রাজ্যবাদ-প্ররোচিত পদক্ষেপে বাধা তো দিচ্ছিই না, কখনো কখনো সমর্থন পর্যন্ত করছি "দেশপ্রেমের" নামে। এই ধরনের মনোবৃত্তির সাফাই দিচ্ছি এই বলে যে এটা না করলে আমরা একঘরে হয়ে পড়ব আমাদের একতা ও সংহতি নষ্ট হবে। গত সাধারণ নির্বাচনের আগে কোন কোন নেতা নির্বাচনে জেতবার আশায় এইভাবে নিজেদের ঐকান্তিক "দেশ-প্রেম" ঘটা করে জাহির করেন। দুঃখের বিষয় নির্বাচনের পর দেখা গেল জনসাধারণ ঠিক তাঁদেরই সবচেয়ে বেশি করে হারিয়ে দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে তাঁরা আজ জনগণ থেকে কতখানি বিচ্ছিন্ন। এইসব অতীতের বীর যাদের সমস্ত শিক্ষা দীক্ষা ও ত্রুটি সংশোধন হয়েছিল স্ট্যালিনের দৌলতে, এঁরা আজ সেই স্ট্যালিনের নিন্দাবাদে পঞ্চমুখ। ব্যক্তি পূজা অবশ্যই মার্ক্সবাদ বিরোধী। কিন্তু স্ট্যালিনের ব্যক্তিপূজা থেকে অবশ্যই যদি তাঁরা শিক্ষা গ্রহণ করে থাকেন তাহলে পঞ্চাশোত্তর বয়েসে আজ তাঁদেরই আগে রাজনৈতিক মঞ্চের নেতৃত্ব ত্যাগ করে সরে দাঁড়ানো উচিত কারণ তাঁদের নতুন কিছু আর দেবার নেই—এখন তাঁরা প্রগতির অন্তরায় মাত্র। কিন্তু আফশোষের কথা এই যে তাঁদের রাজনৈতিক দলে ঠিক তাঁদের নিচের তলায় মার্ক্সবাদী শিক্ষা দেবার কোন বালাই তাঁদের ছিল না। কাজে কাজেই নিচের তলা থেকে নতুন নেতৃত্ব উঠে আসাও কঠিন। সত্যিকার, শ্রমিক শ্রেণী থেকে দু'এক জন যাঁরা উপরের দিকে উঠেছেন তাঁরাও নিচের তলার সঙ্গে নাড়ীর টান খুইয়ে বসে পাতি বুর্জোয়া সুলভ আচার বিচারের দিকে ঝুঁকে থাকেন।

বুর্জোয়া স্বাদেশিকতা ও বুর্জোয়া পার্লামেন্টবাদের গোলকধাঁধার আটক পড়ে আমরা হাবুডুবু খাচ্ছি। একবার যাচ্ছি বাঁয়ে, একবার ডাইনে। কে কখন বাঁয়ে বা ডাইনে যাব, কেউ বলতে পারে না। তাওয়া বুকে আমরা পাশবদল করি। আসলে এই বদলের মধ্যে নীতির কোন বালাই নেই। এমনটা কেন হোল? অনেকে বলবেন আমাদের দলের নেতৃত্বের প্রায় সবটুকুই হচ্ছে পাতি বুর্জোয়া। কিন্তু পাতি বুর্জোয়া তো হবেই।

বিপ্লবের আগেকার রাশিয়া, চীন এবং ভারতবর্ষ (আগেও ছিল এখনো আছে) আধা-ঔপনিবেশিক ও আধাসামন্ততান্ত্রিক দেশ। গ্রামে ও শহরে পাতি বুর্জোয়ার আধিক্য এই দেশ তিনটির একটি বিশেষত্ব। কিন্তু ঐতিহাসিক কারণে প্রথম দুটি দেশে বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক দলের পক্ষে অত্যধিক শক্তিশালী হওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু অন্য দিকে এই তিনটি দেশেই জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে পাতি বুর্জোয়া শ্রেণী ব্যাপকভাবে অংশ গ্রহণ করেছে শুধু নয়, কর্তৃত্বসম্পন্ন বিপ্লবী নেতৃত্বের মধ্যে পাতি বুর্জোয়া শ্রেণীর ভূমিকাও অসামান্য হতে বাধ্য। চীন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি পাতি বুর্জোয়া শ্রেণী থেকে বেশ বড় একটি সংখ্যা দলে টেনে নিয়েছে কারণ এ সব দেশের নেহনতী চাষী মজুর অত্যন্ত পশ্চাৎপদ ও নিরক্ষর। এই দুটি দেশের কমিউনিস্ট পার্টি পাতি বুর্জোয়া জনসমুদ্রে আকণ্ঠ ডুবে থাকার ফলে পার্টির অধিকাংশ সদস্য আসে পাতিবুর্জোয়া শ্রেণী থেকে যারা তাদের সঙ্গে আনে। ছোট বড় নানা আকার ও আয়তনের পাতিবুর্জোয়া চিন্তাধারার লেজুড়। ঔপনিবেশিক দেশে এ হবেই। কিন্তু তাতে ঘাবড়াবার কিছু নেই। রাশিয়াতেও এমন কি বিপ্লবের পরেও এই ব্যাপার যে ঘটেছে সেদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে লেনিন বলেন:— "সোভিয়েট আমলে, আপনাদের সর্বহারা পার্টির মধ্যে আরো বেশি সংখ্যক বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবির আমদানী হবে।··· কিন্তু পুঁজিবাদ যে মানবীয় কাঁচামাল সৃষ্টি করেছে তাকে বাদ দিয়ে সাম্যবাদ গড়া যাবে না। বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের পার্টি থেকে বার করে দিলে হবে না। তাদের বশ করে নতুন ছাঁচে ঢালাই করতে হবে···।"

এই দায়িত্ব আমরা পালন করতে পারিনি। পারি নি অভিজ্ঞ, শিক্ষিত ও প্রভাবশালী নেতৃদল গড়ে তুলতে। লেনিনের নির্দেশ আমরা ভুলে গিয়েছি যে, "অভিজ্ঞ ও প্রভাবশালী নেতৃদল গড়ে তোলা অত্যন্ত কঠিন সময়সাপেক্ষ কাজ। কিন্তু সেই রকম নেতৃদল বাদ দিয়ে সর্বহারার একনায়কত্ব, তার ইচ্ছার একতা শুধু কথার কথাই থাকবে।" আমরা পার্টির স্তরে

তবে এমন যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে তুলতে পারিনি যাঁরা চরম সঙ্কিক্ষণে, "নির্ভীক ও বুদ্ধিমত্তার ভাবে মানুষের কর্তব্য জনগণের সামনে তুলে ধরতে পারেন এবং শ্লোগান তুলে বা জনগণের বৈপ্লবিক কর্মোদ্যোগ থেকে আরো সামনে এগিয়ে থাকে···। কোন কোন ক্ষেত্রে স্থানীয় নেতৃত্ব এই ধরণের শ্লোগান দিয়েছেন যেমন বাংলা দেশে বিকল্প সরকারের শ্লোগান। কিন্তু, সেই রকম নেতারা ভারতে সংখ্যায় বেশি নন। বৈপ্লবিক শ্লোগান দিলেও সাংগঠনিক দুর্বলতার দরুণ সেটি যতটা কার্যকরী হতে পারত তা হয়নি। বহুদিন যাবৎ আমাদের আন্দোলনের আঙ্গিক (অর্থাৎ সংগঠন), আন্দোলনের উপকরণের, তুলনায় অনেক পেছিয়ে পড়ে আছে। এইটি আমাদের একটি শোচনীয় দুর্বলতা যাকে চাপা দেবার জন্যে আমরা নানারকম কথাবার্তা বলি যেমন, বিকল্প সরকারের ডাক সময়োপযোগী নয় ইত্যাদি। কমিউনিস্ট পার্টির প্রোগ্রাম (অর্থাৎ উপকরণ) অন্য যে কোন পার্টির চেয়ে অনেক বেশি সমৃদ্ধ, মেহনতী মানুষের সঙ্গে পার্টির যোগ অনেক বেশি, এই সব বলে আমরা আত্মসন্তুষ্টি লাভ করি। কিন্তু সংগঠন? সেটা কি জরুরী নয়? আমরা কি নতুন ইক্কা-পন্থীদের মত মনে করি আন্দোলন চালিয়ে গেলে সংগঠন আপনে তৈরি হয়ে যাবে? কিন্তু সর্বহারা শ্রেণীর পার্টি তার সমস্তটুকু ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে সংগঠনের মূল্য বুঝতে শিখেছে। যে কোন সংগ্রামী পার্টির সংগ্রামের সাফল্য নির্ভর করে সংগঠনের উপর। আমাদের পার্টির আঙ্গিকের অনুন্নত ও নড়বড়ে অবস্থার ফলে উপকরণের উন্নতি ও অগ্রগতি অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ আমরা এক শোচনীয় স্থানু অবস্থায় পড়ে আছি, আমাদের কর্মোদ্যমে ঘুণ ধরেছে, আমাদের বামপন্থী সংগ্রামী কথাবার্তার সঙ্গে আমাদের কাজের কোন মিল নেই। এই অবস্থায় উপদলীয় চক্র উপচক্র গজিয়ে ওঠা খুবই স্বাভাবিক এবং ক্রমাগত বামপন্থী ও দক্ষিণ পন্থী ত্রুটি বিচ্যুতি না ঘটে পারে না বিশেষ করে এইজন্য যে পার্টির ভিতরের ও বাইরের পরিবেশের চরিত্র পাতিবুর্জোয়া। এই পাতিবুর্জোয়া উপাদানগুলিকে নতুন ছাঁচে গড়ে তোলবার চেষ্টা না হলে, মার্ক্সবাদ লেনিনবাদ ও পাতিবুর্জোয়া ভাবাদর্শের মাঝখানে স্পষ্ট গণ্ডীরেখা টানা না হলে পাতিবুর্জোয়া উপাদানই পার্টির মধ্যে প্রাধান্য লাভ করার চেষ্টা করবে। পার্টির ইতিহাসে বার বার বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী ত্রুটি বিচ্যুতি পার্টির মধ্যে পাতিবুর্জোয়া প্রাধান্যেরই প্রতিফলন। বিভিন্ন দেশের ইতিহাসে এটাই দেখা গিয়েছে যে জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে সম্মিলিত ভাবে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময়ে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদের আবির্ভাব হয়। সেই সময়ে নেতৃত্বের একটি অংশ শ্রমিক শ্রেণীর নীতি ও বুর্জোয়া শ্রেণীর নীতির মাঝখানে ঠিকমত সীমারেখা টানতে না পেরে বুর্জোয়া প্রোগ্রাম ও লক্ষ্যের সঙ্গে নিজেদের লক্ষ্যকে এক করে দেখতে থাকেন। তখন একতার ওপর জোর দিতে গিয়ে মূলনীতিগত পার্থক্য তাঁরা অবহেলা করতে থাকেন। উদারপন্থী জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রোগ্রামের সঙ্গে পার্টি প্রোগ্রামের আর কোন পার্থক্য থাকে না। এই ধরণের ব্যাপারের দৃষ্টান্ত হিসেবে এবারকার নির্বাচনে উড়িষ্যায় কমিউনিস্ট পদপ্রার্থীদের পরাজয়ের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। নির্বাচনের প্রচারের সময় মুখ্যমন্ত্রী বিজয় পট্টনায়কের প্রোগ্রামের সঙ্গে কমিউনিস্ট প্রোগ্রামের বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। কমিউনিস্ট পার্টি শ্রেণী সংগ্রামের ভিত্তিতে স্বতন্ত্র নিজস্ব কোন প্রোগ্রাম দিতে পারেনি।

এবার দেখা যাক আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে আমাদের অবস্থাটা কি রকম। চীনের সঙ্গে সীমান্ত বিরোধের ব্যাপারে আমাদের নির্দিষ্ট কোন মত নেই বরং মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে আমরা একাধিকবার প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে চীনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছি এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর 'দেশ বিপন্ন' আওয়াজে সায় দিয়েছি, দেশকে বাঁচাবার জন্য আমরাও লড়াই করব, একথা বলতেও ছাড়িনি। সীমান্ত সম্পর্কে পাকিস্তান —চীন যোগাযোগের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া শাসক শ্রেণীর সঙ্গে সদা মিলিয়েছি। প্রশ্ন হচ্ছে আজকের যে, ভারতবর্ষ সেটা কার দেশ? মার্ক্সবাদী পার্টির 'দেশ' আর বুর্জোয়া পার্টির 'দেশ' কি এক? শ্রমিকের কি

মাতৃভূমি আছে?

আধুনিক যুগের অভ্যুদিত জাতিগুলি সম্পর্কে বলতে গিয়ে স্ট্যালিন লিখছেন—বুর্জোয়া শ্রেণী এবং তার জাতীয়তাবাদী পার্টিগুলিই এই সব জাতির প্রধান নেতৃত্বশক্তি। 'জাতীয় ঐক্যের' স্বার্থে জাতির মধ্যে শ্রেণীতে শ্রেণীতে শান্তি, অন্যের অঞ্চল জবর দখল করে নিজের জাতির সম্প্রসারণ, অন্য জাতি সম্পর্কে অবিশ্বাস ও বিদ্বেষ প্রচার···সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে হাত মেলানো, এই সবই হচ্ছে এই সমস্ত জাতির ভাবাদর্শ, সমাজ ও রাজনীতিগত সম্বল এবং এই সব ছলবল কৌশলের অস্ত্র নিয়ে বুর্জোয়া—শাসক শ্রেণী, ব্যাপক জনসাধারণের মন সামাজিক সমস্যা ও শ্রেণী সংগ্রামের দিক থেকে 'জাতীয়' সমস্যার দিকে, শ্রমিক বুর্জোয়া উচ্চ শ্রেণীর কাছে যেটা 'সাধারণ' সমস্যা সেই দিকে আকৃষ্ট করে। তার ফলে সমস্ত জাতি-অধ্যুষিত শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা ব্যাহত হয়। এখানেই শেষ নয়। আর একটি কৌশলও ব্যবহার করা হয় যা হচ্ছে অধিজাতিগুলিকে পরস্পরের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করা যার ফলে এক জাতি অপর জাতির বিরুদ্ধে লাফা লাফায়া করে।···এই কৌশল যেখানে সফল হয় সেখানে সর্বহারা শ্রেণীর হয় সর্বনাশ। সেই রাষ্ট্রে সমস্ত জাতির শ্রমিক শ্রেণীকে একতাবদ্ধ করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে।" (স্ট্যালিন)

ভারতে সীমান্ত বিরোধের মধ্যে, চীনবিরোধী প্রচারের হিড়িকের মধ্যে এবং হিন্দু-মুসলমান ও বাঙ্গালী—অবাঙ্গালী লাফার মধ্যে, স্ট্যালিনের এই উক্তির সারবত্তা প্রমাণিত হচ্ছে।

আমরা কিন্তু মার্ক্সবাদ লেনিনবাদের এই সব সার তত্ত্ব ভুলে যেতে বসেছি শুধু নয়, অন্য কোন দেশের পার্টি যদি আমাদের এগুলি মনে করিয়ে দিয়ে সাহায্য করতে চায় আমরা তাতে রেগে উঠে বলি এটা আমাদের ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপ।

এই ধরণের মতিগতি সম্পর্কে লেনিন কি বলে ছিলেন দেখা যাক। 'সর্বহারা বিপ্লব ও দলত্যাগী কাউটস্কী' প্রবন্ধে তিনি লেখেন যে উইলহেলম্-এর অধীনে কোন জার্মান বা জেবেনসোর অধীনে কোন ফরাসী যেন বলে যে সমাজতন্ত্রী হিসেবে শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে আমার দেশকে রক্ষা করা আমার অধিকার ও কর্তব্য তখন সে সমাজতন্ত্রীর মত যুক্তি দেয়না, আন্তর্জাতিকতাবাদী বা সর্বহারা বিপ্লবীর মত যুক্তি দেয়না, যুক্তি দেয় পাতিবুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীর মত। কারণ এই যুক্তি থেকে শ্রমিকের পুঁজির বিরুদ্ধে শ্রেণী সংগ্রামের কথা উবে যায়···বাকি থাকে শুধু সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ। আমার দেশের ওপর অন্যায় করা হচ্ছে, এইটুকুই আমার পক্ষে, যথেষ্ট।···এই ধরণের লোক শুধু 'নিজের দেশ' ছাড়া আর কিছু দেখতে পায়না, 'নিজের' বুর্জোয়া শ্রেণীকে সকলের ওপরে স্থান দেয়।" 'রাষ্ট্রসঙ্ঘ কমিউনিজম্' সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেনিন বলেন যে এই শান্তিবাদী জাতীয়তাবাদ যা বুর্জোয়া শাসনের অধীনে থেকে সমাজতান্ত্রিক দেশের 'আক্রমণের' বিরুদ্ধে 'পিতৃভূমি রক্ষার কথা বলে, তা হচ্ছে 'নিজের' বুর্জোয়া শ্রেণীর আক্রমণাত্মক স্বার্থ রক্ষার সামিল।

শ্রমিকের পার্টির কর্তব্য এই ক্ষেত্রে হচ্ছে যুদ্ধ বিশেষ কে করতে চাইছে এবং কার স্বার্থে করতে চাইছে সেটা বিচার করে দেখা এবং সেই বিচারের ভিত্তিতে কর্মনীতি নির্ধারণ করা।

কাশ্মীরের প্রশ্ন ও চীন-ভারত সীমান্তের প্রশ্ন কিছু চিরস্থায়ী ব্যাপার নয়। সাময়িক কোন ঘটনার ভিত্তিতে পার্টির কর্মনীতি নির্ধারিত হতে পারে না। এ সম্পর্কে লেনিন বলছেন :—

কোনো যুগে কোন্ শ্রেণী কেন্দ্রীয় শক্তি হিসেবে সেই যুগের উপকরণ নির্ধারিত করছে, ঘটনাচক্র প্রধানত কোন দিকে যাচ্ছে এবং সেই যুগের ঐতিহাসিক পরিস্থিতির বিশেষত্ব কী, তা আমরা জানতে পারি।···একমাত্র সেই ভিত্তিতেই (বিভিন্ন দেশের ইতিহাসে এক একটি বিশিষ্ট ঘটনার ভিত্তিতে নয়) আমরা আমাদের কর্মকৌশল নির্ধারণ করতে পারি।"

আমরা কিন্তু লেনিনের এই নির্দেশ মেনে চলছি না। সাময়িক সুবিধা লাভ করার জন্য, গা বাঁচিয়ে আরামে থাকবার জন্য আমরা "মার্ক্সবাদের শিক্ষার বৈপ্লবিক দিক ও অন্তসার বাদ দিচ্ছি, মুছে দিচ্ছি এবং বিকৃত করছি। আমরা সেই সব জিনিষ সামনে তুলে ধরে

সেগুলির গুণগান করছি যেগুলি বুর্জোয়া শ্রেণীর কাছে গ্রহণযোগ্য।" (লেনিন)

কাশ্মীর সম্পর্কে আমাদের মত মার্ক্সবাদ সম্মত নয়। আজকে ভারতে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র আছে, পাকিস্তানে নেই, এই ভিত্তিতে কাশ্মীরের সম্পর্কে অপরিবর্তনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, সাময়িক ঘটনার ভিত্তিতে নীতি নির্ধারণ করার সামিল। কাল যদি পণ্ডিতজী না থাকেন এবং দেশে চরম দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়া ক্ষমতা দখল করে এবং সেই সঙ্গে পাকিস্তানে আয়ুবশাহীর পতন ঘটে ও পার্লামেন্টারী শাসন বা নাসেরের মত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নেতার আবির্ভাব ঘটে তখন কোন যুক্তিতে আমরা কাশ্মীর সম্পর্কে আমাদের বর্তমান মত বজায় রাখব? ভারতে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র আছে বলে আমরা যদি কাশ্মীরের ভারত ভুক্তি দাবি করি তাহলে চীন যে অরুণাচল চীনের বলে দাবি করছে সেটা এবং ভুটান, ও সিকিমের চীনভুক্তিও আমাদের সমর্থন করতে হবে কারণ চীনে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয়ত, ভারতের সরকার ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন কাশ্মীরের জনসাধারণের জীবনের কতটা উন্নতি করেছে সেটাও কি আমাদের বিচার্য নয়? আজ পর্যন্ত কাশ্মীরে কোন ভূমি সংস্কার করা হয়নি, তাদের অবর্ণনীয় দারিদ্র্যের কোনই সুরাহা হয়নি। আমাদের নীতি নির্ধারণের সময় সে কথা কি ভেবে দেখতে হবে না? আমরা যে যুক্তি দিয়ে কাশ্মীরের ভারত ভুক্তি দাবি করি সেই একই যুক্তি দিয়ে লাদাখের চীন ভুক্তি সমর্থন করা যায়।

চীন পাকিস্তানের সঙ্গে বসে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের সীমানা সাময়িকভাবে নির্ধারণ করে নিতে চাইছে, তাতেও আমাদের আপত্তি। কিন্তু কেন? আপত্তি, এবং কোন্ যুক্তিতে? প্রথমত চীন পরিষ্কার বলেছে যে সেই সীমানা নির্ধারণটা সাময়িক মাত্র এবং কাশ্মীর সম্পর্কে ভারত ও পাকিস্তানের বোঝাপড়া হয়ে গেলে আবার নতুন করে আলোচনা হবে। কাশ্মীরের যে অঞ্চলে বার্কিণ রকেট ঘাঁটি গিলগিটের অবস্থান সেখানকার সীমানা নিরাপদ করার জন্য চীনের পক্ষে ভারত ও পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষের দুরভিসন্ধির জন্যে অনির্দিষ্ট কাল অপেক্ষা করা বিপজ্জনক। এই অপেক্ষার সুযোগ নিয়ে অনির্দিষ্ট সীমান্তে কোনো প্ররোচনা সৃষ্টি করে সাম্রাজ্যবাদীরা গিলগিট থেকে আক্রমণ চালাতে পারে। সেই বিপদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করার চীনের নিরাপত্তার পক্ষে অত্যন্ত জরুরী।

১৯৫০ সালে তিব্বতের মুক্তির সময় থেকে আরম্ভ করে, দালাইলামার ব্যাপার এবং সীমান্ত বিরোধের মধ্যে দিয়ে চীন ভারতের শাসক শ্রেণীর যে মূল্যায়ন করেছে তার যথার্থতা প্রতিপন্ন হয়েছে, সাম্রাজ্যবাদের কুক্ষিগত জাতিসংঘের কঙ্গোর প্রতি বিপ্লবী হস্তক্ষেপে ভারতের সহযোগিতার মধ্যে, এখনো অ্যালজিরিয়া সরকারকে স্বীকার না করার মধ্যে, এবং ভিয়েৎনামে হো চি মিন্ সরকারের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের মিথ্যা অভিযোগে, আন্তর্জাতিক কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে ভারতীয় প্রতিনিধির সমর্থন দেওয়ার মধ্যে। এইসব ব্যাপার এবং ভারতের মধ্যে শাসক শ্রেণীর জনবিরোধী নীতির মধ্যে এই সত্যই প্রতিফলিত হচ্ছে যে মূলত ভারত ও পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর চরিত্রে গুণগত কোন পার্থক্য নেই। পার্থক্য আছে শুধু প্রশাসনের আঙ্গিকে, উপকরণে নয়। ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণী, পাকিস্তানের বুর্জোয়া শ্রেণীর চেয়ে অনেক বেশি পাকা বলে তারা গণতন্ত্রের আনুষ্ঠানিক রূপ বজায় রেখে বুর্জোয়া স্বৈর শাসন চালায়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দুটি শিবিরের সঙ্গে দরাদরি করে এবং মহাযুদ্ধে তাদের কোন লাভ হবে না এটা বুঝে আপাতত শান্তি সংগ্রামে কিছুটা সাহায্য করে পাকিস্তানের বুর্জোয়া শ্রেণী অত পাকা ও ঝুনো নয় এবং অত্যন্ত দুর্বল। বলে তারা সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ লেজুড় হয়ে পড়েছে। কিন্তু সেখানেও জনমত আজ জেগে উঠছে। চীন এইসব কিছু বিচার বিবেচনা করে সুদূর প্রসারী দৃষ্টি নিয়ে তার নীতি নির্ধারণ করে আসছে, কোন সাময়িক অস্থায়ী ব্যাপার বা ঘটনার ভিত্তিতে চীনের পার্টি কর্তৃত্বের কর্মপন্থা ঠিক করেনি এবং করবে না। এই কারণেই সে কাশ্মীরপ্রশ্নে কোনো পক্ষ অবলম্বন করেনি।*

* এই প্রবন্ধটি আলোচনার জন্য উপস্থিত করা হল। এই বিষয়ে ভিন্ন মতের প্রবন্ধ আমরা সাগ্রহে প্রকাশ করব। —সম্পাদক।

মানুষ দেখার দর্পণ

● বিভূতিভূষণ রায়

১৯৫২ সাল।...

পর পর দু'বার ম্যাট্রিক ফেল করে তৃতীয় বারে পাশ করলাম। তৃতীয় বিভাগে অবশ্য।

ম্যাট্রিক পাস করার পর পড়ার প্রতি ঝোঁক পড়ল। ভাবলাম, কলেজে ভর্তি হব। আই, এ পড়ব।

আমাদের বাড়ি রাজসাহী জেলার নাটোর মহকুমায়। নাটোরে তখন কোন কলেজ ছিল না।

ম্যাট্রিক পাস করে কলেজে পড়তে হলে নাটোরের ছেলেদের হয় রাজসাহী, নয়তো পাবনায় পড়তে আসতে হত।

বাবাকে বললাম, বাবা আমি কলেজে পড়ব।

বাবা আমার কথা শুনে হাসলেন। বিদ্রূপের হাসি। বললেন, কলেজে পড়বি তুই?

বললাম, কেন, আমি কি কলেজে পড়তে পারি না?

—নিশ্চয়ই না। যে ছেলে দু'দুবার ফেল করে ম্যাট্রিক পাস করে। সে কিনা পড়বে কলেজে। কলেজে পড়া তোর পক্ষে বিলাস।

মন দমে গেল বাবার বাক্যবানে। বাবার কাছ থেকে এমন আঘাত পাব, এ আমি কল্পনা করি নি।

বাবার কাছ থেকে কোন সহানুভূতি না পেয়ে ধর্না দিলাম মার কাছে।

মাকে অনুনয়-বিনয় করে কলেজে পড়ার কথা বলতেই মার মন গেল ভিজে। মা বললেন, আচ্ছা দাঁড়া, তোর বাবাকে বলে মত করাই। সত্যি তো এ বয়সে না পড়েই বা কি করবি।

মা বাবাকে বললেন, ফল কিছু হল না। বাবা তাঁর সংকল্পে অটল, অবিচলিত।

বাবা বললেন, শিবুকে কলেজে পড়াবার মানে টাকার শ্রাদ্ধ। পাস ও জীবনে করতে পারবে না।

মা অনেক করে বাবাকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন। বাবা বুঝলেন না। অবশেষে মা নারী জাতির মোক্ষম অস্ত্র প্রয়োগ করলেন। কান্না ভেজা সুরে মা বলে উঠলেন, শিবুকে কলেজে পড়াব, এ আমার অনেক দিনের সাধ। মা হয়ে সেই সাধ যখন পুরা করতে পারলাম না, তখন—

নন্দার সৌন্দর্য্যের গোপনকথা...

'ত্বক সৌন্দর্য্যের জন্য **লাক্স**-ই আমার পছন্দ'

রূপ লাবণ্যের জন্য কুমারী নন্দা
লাক্স টয়লেট সাবান ব্যবহার করেন।
লাক্স মাখুন লাক্সের কোমল
ফেনায় পরশে চেহারায় নতুন
লাবণ্য আসবে। লাক্স মাখুন
লাক্সের মধুর গন্ধ আপনার
চমৎকার লাগবে। লাক্স মাখুন
লাক্সের রামধনু রঙের থেকে
মনের মতো রঙ বেছে নিন।
আপনার প্রিয় সাবানটিও পাবেন।
ত্বক সৌন্দর্য্যের যত্ন নিন, লাক্স মাখুন।

চিত্রতারকাদের বিশুদ্ধ, কোমল সৌন্দর্য্য-সাবান

নন্দা, পরবীণ চিত্রের 'আর আউর কাল' ছবিতে নায়িকার ভূমিকায়

রূপসী নন্দা বলেন– **'লাক্স সাবানটি চমৎকার আর রঙগুলিও কি সুন্দর!'**

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

LTS. 12/56 BG

বাবা আইনজ্ঞ ব্যক্তি। মোক্তার। কান্না, আবেগ তাঁকে চট করে বাগেল করতে পারে না।

মার অভিমানহত বিক্ষুব্ধ অশ্রুজল বাবার মন নরম করতে পারল না। বাবা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। কোন মতেই আমাকে কলেজে ভর্তি করবেন না।

বাবা বললেন, শিবু কলেজে পড়বে, এর চেয়ে আনন্দের কথা আর নেই। সত্যি তো আমিও চাই, ও কলেজে পড়ুক। আই. এ বি. এ পাস করে মানুষ হোক। সব বাপই ছেলেদের মানুষ করতে চায়। আমিও চাই। আমারও তো অনেক সাধ, কিন্তু সাধ্যি কতটুকু বল? আমি জানি, শিবু কখনো আই, এ বি, এ পাস করতে পারবে না। পাস করার ছেলে ও নয়। আমার আর তিনটে ছেলে মেয়ে আছে, তাদের ভবিষ্যতও ভাবতে হবে। শিবুকে কলেজে পড়াতে গিয়ে আমি তো তাদের জলে ফেলে দিতে পারি না। তা ছাড়া দিন দিন যে আর্থিক দুর্গতি ঘনিয়ে আসছে, চরতো এর পর থেকে খাওয়া পরাই ছোটা মুস্কিল হবে। শোন ছেলের বাজে আবদারে কান না দিয়ে কিসে ছেলের মঙ্গল হয়, সংসারের হালচাল ফেরে, তাই করতে বল।

—সে মঙ্গলটা কি, শুনি? মা জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে প্রশ্ন করলেন।

—শিবুর একটা চাকরি যোগাড় করা। সাহেব-সুবোদের ঘরে ওর চাকরি যোগাড় করতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না আমাকে। চাকরির কথা শুনে মার মন গেল পালটে। তিনি যে সংকল্প নিয়ে বাবার কাছে এসে ছিলেন, তা আর বোপে টিকল না।

অভাবের সংসার আমাদের। কায়ক্লেশে দিন চলছে। বাবা একজন বার্থ মোক্তার, পসার তাঁর নেই বললেই চলে। আমাদের চেয়ে মার অভাবের অনুভূতি বেশী। সংসারের ধার দায়িত্ব তাঁর কাঁধে। মাসের শেষে আমাদের চারটে ভাই বোনের মুখে দু'গ্রাস করে অন্ন তুলে দেয়া যে কত [illegible] ছাড়া আর কেউ উপলব্ধি করেন না।

চাকরি হওয়া সম্ভব শুনে মা বরং খুশিই হলেন। তাঁর অভাবী মনের দ্বারে আমার চাকরির সংবাদটা কিছুটা আশার আলো জ্বালাল।

বাবার কথা মিথ্যে হয় নি।

সাহেব-সুবোদের ধরাধরি করে তিনি একটা চাকরি জুটিয়ে দিলেন। চাকরি অতি সাধারণ। মাটোর এল, ডিও কোর্টের কনফিডেনশিয়াল ক্লার্ক।

জীবনে এই প্রথম চাকরি। তাও আবার হুকুমা শাসকের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে।

প্রথম প্রথম চাকরি করতে ভারী অসুবিধে হত। কোনই অভিজ্ঞতা ছিল না চাকরি সম্পর্কে।

আস্তে আস্তে চাকরির আউঘাট সব রপ্ত হয়ে গেল, ডুবে গেলাম কেরাণী জীবনের একটানা একঘেয়েমীতে।

যে সময়ে আমি চাকরিতে ঢুকি, তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। ব্রিটিশ সৈন্য সসম্মানে পেছু হঠতে সুরু করেছে। যাদের সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না বলে প্রবাদ ছিল, তারাই সূর্যালোক থেকে বঞ্চিত হতে যাচ্ছে। তাদের পায়ের তলার মাটি যাচ্ছে সরে, জাপানী বোমার ঘায়ে মসনদ কাঁপছে।

ছোট হুকুমা সহর মাটোর।

এখানকার মানুষগুলো সরল, নির্বিরোধী। তাই সদ্য-পাস করা তরুণ আই. সি. এস অফিসারকে মাটোর হুকুমা শাসনের ভারার্পণ করা হত।

আমার প্রথম অফিসার হলেন সি, এইচ, ম্যাকলীন। খাস সাহেব।

বয়স প্রায় সাতাশ।

ম্যাকলীনের ইংরেজী উচ্চারণ খুব স্পষ্ট। আমরা তাঁর ইংরেজী বুঝতে বেগ পেতাম না। বাংলাও তিনি জানতেন এবং বলতেনও। তবে উচ্চারণে দোষ ছিল।

প্রথম দিন কাজে যোগ দিয়েই ম্যাকলীন ফরমান জারী করলেন যে, প্রতিটি উচ্চ নীচ কর্মচারীকে সময়মত অফিসে হাজিরা দিতে হবে, কাজে ফাঁকি দেয়া চলবে না। ফাঁকি ধরা পড়লেই কঠোর সাজার ব্যবস্থা করা হবে।

ম্যাকলীনের ফরমান হাতে পেয়ে সকলেই তটস্থ। চাকরির ভয় প্রত্যেকের আছে, তাই চাকরি বাঁচানোর দায়ে বাবু থেকে আরম্ভ করে আর্দালি পর্যন্ত সব বাবুরাই সময়মত হাজিরা দিতে লাগল।

একে ম্যাকলীনের অল্প বয়স, তার ওপর তিনি অত্যন্ত ঘাবড়োপাদী। ভেবে চিন্তে কাজ করা তাঁর

কুণ্ঠিতে লেখা ছিল না। মাকে মাকে খাপছাড়া রায় দিয়ে বসতেন।

বারের উকিল মোক্তারেরা তাঁকে ঠাট্টা করে বলত, পাগলা হাকিম। মাথা গরম হাকিম।

প্রথম দিন কর্মভার জারী করার পরেই তিনি কোর্ট বার্বুদের সব ডেকে পাঠালেন। আমরা গেলাম তাঁর কাছে।

জনা আটেক কেরাণীবাবু ভিড় করে দাঁড়াল তাঁর টেবিলের আশে পাশে।

ম্যাকলীন এক এক করে প্রত্যেকের নাম জিগ্যেস করলেন, কে কি কাজ করে, কোর্টে কত রকমের কাজ আছে এই সব খুঁটিনাটি বিষয় তিনি জেনে নিলেন। হেড ক্লার্ক রমেশ বাবুই সমস্ত ব্যাখ্যা করলেন।

আমার পরিচয় জানবার পরেই ম্যাকলীন বলে উঠলেন, You don't go. I have a business with you।

আমি কনফিডেন্সিয়াল ক্লার্ক। ম্যাকলীনের সঙ্গে আমার সম্পর্ক অন্য রকমের।

আমি আর পাঁচটা কেরাণীর মত বেলা দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত কাজ করেই মুক্তি পাই না। আমার বিস্তর কাজ। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত হাকার মতন সাহেবকে অনুসরণ করতে হয় আমাকে। এস ডি ওদের চাকুরী জীবনের গৃহিনী হল কনফিডেন্সিয়াল ক্লার্করা।

আমি না হলে ম্যাকলীনের নিজস্ব দপ্তর কানা। গোপন কাইলের রাজত্বে আমার বিচরণ। আমি গুপ্ত ভাণ্ডারী। কাকেও কিছু বলতে পারব না। আমার ওপর আদেশ আছে, আমার বুক কাটতে পারে, কিন্তু মুখ ফুটবে না কখনো।

একে একে সকলকে বিদায় করার পরে ম্যাকলীন আমাকে নিয়ে পড়লেন।

তাঁর খাস কামরার এক কোণায় আমি ছিলাম দাঁড়িয়ে। আমাকে তিনি কাছে ডাকলেন বললেন, Sitdown।

বললাম তাঁর মুখোমুখি একটা চেয়ারে।

ম্যাকলীন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন, তোমার বয়স কত?

বললাম, উনিশ চলছে।

— Only nineteen! strange! ম্যাকলীন কপালে চোখ তুলে বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

সত্যি বলতে কি, আমার তখন উনিশ বছর বয়স নয়। উনিশ তার দু'বছর আগে পেরিয়ে এসেছি।

আমার আসল বয়স না বলে ম্যাট্রিক সার্টিফিকেটে লেখা বয়স জানালাম তাঁকে।

ম্যাকলীন প্রশ্ন করলেন, এত অল্প বয়সে চাকরি করতে এসেছ? এখন ও তো লেখা পড়ার বয়স আছে— পড়লেই পার।

বললাম, বাবা পড়াতে পারলেন না স্যার। বড় অভাবের সংসার আমাদের।

ম্যাকলীন আর কোন প্রশ্ন করলেন না। একেবারে নিশ্চুপ হয়ে গেলেন।

প্যান্টের পকেট থেকে সিগারেটের টিন বের করে একটা সিগারেট আলতো করে ঠোঁটে চেপে ধরলেন।

সিগারেট ধরিয়ে, বার দুয়েক ঘোরে ঘোরে টান মেরে বলে উঠলেন, Now you may go।

আমি ম্যাকলীনের খাস কামরার দরজা ঠেলে যেই বাইরে বেরুতে যাচ্ছি, এমন সময় আবার তিনি ডেকে উঠলেন, হেই youngman, একটু শোন—

আবার এসে দাঁড়ালাম তাঁর সামনে, বিনীত ভাবে বললাম, কিছু বলবেন স্যার?

—Yes। মাথা নাড়লেন ম্যাকলীন বললেন, তোমার নামটা যেন কি বললে?

বললাম, শিবশেখর রায়।

—Yes, yes। শিবশেখর রায়। আমি কিন্তু শুধু রয় বলেই ডাকব, কেমন?

—তাই ডাকবেন। বলে বেড়িয়ে এলাম খাস কামরা থেকে।

কনফিডেন্সিয়াল ক্লার্কের চাকরীতে যেমন আছে প্রচুর তেমনি বিপদও সংখ্যাতীত। একটু চুন খসলে সাহেবের বিরাগ ভাজন হবার সম্ভাবনা। আবার সাহেব খুশি থাকলে পদোন্নতি অবধারিত।

বয়েকটি অতিরিক্ত কর্তব্য করতে হয় কনফিডেন্সিয়াল ক্লার্ককে। সেই অতিরিক্ত কর্তব্যের মধ্যে

প্রধানতম বেটি, সেটি হল প্রতিদিন সকালে সাহেবের কোয়ার্টারে হাজিরা দেওয়া, জরুরী চিঠি পত্র থাকলে সাহেবের নজরে আনা।

সকালের নিত্যকর্মের ধারটি সারবার জন্যে ম্যাকলীনের কোয়ার্টারে ফাইল পত্র নিয়ে যখন চুকলাম, তখন তিনি সবেই ঘুম থেকে উঠেছেন।

আর্দালি মারফত আমার আগমন সংবাদ পেয়ে ম্যাকলীন আমায় ভেতরে ডেকে পাঠালেন।

আমাকে দেখেই ম্যাকলীন ভ্রু কোঁচকালেন, why have you come to me?

আমার কারণ ব্যক্ত করলাম।

ম্যাকলীন বললেন, নো নো তুমি এভাবে রোজ সকালে আমার বাসায় আসবে না।

বললাম, আমার যে নিয়ম আছে স্যার।

—নিয়ম! ম্যাকলীন তির্যক দৃষ্টিতে তাকালেন আমার দিকে, তারপরে বললেন, নিয়ম বলে কিছু নেই। একমাত্র প্রয়োজনের সময়ই তুমি আসবে। গভর্মেণ্ট তোমাকে উপরি মাইনে দেবেনা প্রতিদিন সকালে আমার বাসায় আসার জন্যে।

ম্যাকলীনের উদারতায় মুগ্ধ হলাম। প্রথম দিনই পারিবারিক পরিবেশে তাঁর যে পরিচয় পেলাম, তাতে আশা হচ্ছে, মানুষটি ভাল হবে।

আমরা কেরানীর জাত। সাহেবের ভালো-মন্দের সঙ্গে আমাদের চাকরি জীবন গুত প্রোত ভাবে জড়িত।

আমি খুশি মনে ফিরে আসছিলাম, এমন সময় ম্যাকলীনকে বলতে শুনলাম, রয়, যেওনা। একটু চা খেয়ে যাও।

শুধু চা নয়, চায়ের সঙ্গে বেশ জলযোগও জুটে গেল। দু'জনে এক টেবিলে বসে ভোগ্যবস্তুর সদ্ব্যবহার করলাম।

দেখলাম, ম্যাকলীনের কোন বাছবিচার নেই। আমি কেরাণী বলে [illegible] অফিসারী মনোবৃত্তি তাঁর এখনো গজায়নি। আমরা এক টেবিলে বসে [illegible] করতে করতে সকালের জলযোগ করলাম।

সাহেব আর কেরাণী দুটো আলাদা জাত। কারো সঙ্গে কারো মিল নেই। যেন দুটো সমান্তরাল সরল রেখা—আয়ুষ্কাল পাশাপাশি চললেও এক বিন্দুতে মেলার উপায় নেই।

ম্যাকলীন সাহেব। সিভিলিয়ান। আমি বংশবদ কেরানী। লেখাপড়া শিখিনি তাই কেরানী হয়েছি।

ম্যাকলীনের সঙ্গে আমার কোথাও মিল নেই।

না চেহারায়, না অর্থে না বিদ্যায়। তবু মনে হল আমার, তিনি কোথাও যেন আমার সমধর্মী। এক জায়গায় গভীর মিল আছে আমার সঙ্গে তাঁর। সে মিল ভদ্রতায়।

ম্যাকলীন সিভিলিয়ান, স্কাদরেল অফিসার হয়েও ভদ্র। অফিসার আর ভদ্রলোকের আকাশ পাতাল পার্থক্য।

ভদ্রলোকের ঐশ্বর্য বিনয় প্রকাশে, আর অফিসারের বক্তব্য ক্ষমতার দম্ভে। ভাল চৌকোষ অফিসার হতে হলে দম্ভ প্রকাশ করতেই হবে।

ম্যাকলীন জিগ্যেস করলেন, তোমার বাবা কি করেন, রয়।

—মোক্তারি।

—কোথায় মোক্তারি করেন?

—আপনার কোর্টে?

তোমার বাবাকে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে তো?

—দেব স্যার। একদিন তাঁকে নিয়ে আসব এখানে।

ম্যাকলীন আরো অনেক কথা জিগ্যেস করলেন আমাকে। তার বেশীর ভাগই পারিবারিক।

সাহেবগোষ্ঠীর একজন হয়েও ম্যাকলীনকে আমার ব্যতিক্রম মনে হল। তিনি আমার সঙ্গে ঘোল মেজাজে গল্পগুজব করে চলেছেন।

মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের সংস্পর্শে আসা নাকি সাহেবদের পক্ষে বারণ। তাঁরা থাকবেন দূরে, মানুষের ঊর্ধ্বে।

মানুষের মধ্যে নেমে এলে, মানুষের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনার অংশীদার হলে সাহেবরা আর শাসন করতে পারবেন না। একমাত্র শাসনের জন্যেই প্রয়োজন দূরে দূরে থাকা।

ম্যাকলীন নিজের কথাও যথেষ্ট বললেন। নিজের

কথা বলতে গিয়ে এতটুকু কুণ্ঠিত হলেন না তিনি।

ম্যাকলীন বললেন, আমার বাবা ছিলেন আইরিশ, বা অ্যামেরিকান। উত্তরাধিকার সূত্রে বাবার কাছ থেকে পেয়েছি মুক্তির স্বাদ, স্বাধীনতাপ্রিয়তা—মার কাছ থেকে পেয়েছি উচ্ছৃঙ্খলতা।

ম্যাকলীন অবিবাহিত। মা বাবা তাঁর দুজনেই গত হয়েছেন বছরখানেক আগে।

লাহোরে কার্পেটের ব্যবসা করতেন ম্যাকলীনের বাবা। ম্যাকলীন বাবার কাছেই মানুষ। লেখাপড়া তিনি লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ে করেছেন।

ম্যাকলীন ওধার আই, সি, এস। যুদ্ধের সময় আই-সি-এস পরীক্ষার্থীদের লণ্ডনে না পাঠিয়ে দেরাদুনে শিক্ষা দেয়া হত।

ম্যাকলীন দেরাদুন থেকে আই-সি-এস পাস করেন।

ম্যাকলীন কখনো ভারতের বাইরে যান নি। তিনি বললেন, একবার আমার স্বদেশ আয়ার্ল্যাণ্ডে যাব, গিয়ে স্বদেশ-সাধক ডি ভ্যালেরার প্রশান্ত মূর্তি দর্শন করব।

ইংরেজ জাতির প্রতি ম্যাকলীনের তীব্র বিতৃষ্ণা। ইংরেজরা বণিকের জাত। লোভ আর স্বার্থ নিয়ে তাদের কারবার।

ম্যাকলীন বললেন, I hate the English. They are exploitors।

ইংরেজ জাতির সম্পর্কে মন্তব্য শুনে চমকে উঠলাম। ভাবলাম, এত শুধু সস্তা কথার ফুলঝুরি নয়, এ যে রীতিমত প্রচারসিদ্ধ বাণী। হৃদয় থেকে উৎসারিত।

আরো অনেক কিছু বললেন তিনি। তার কোনটি সাধারণ, কোনটি অসাধারণ।

অসাধারণ কথাগুলো আজো ভুলিনি—ভোলারও নয়। মনের মণিকোঠায় ম্যাকলীনের অসাধারণ কথাগুলো জ্বল জ্বল করছে।

বেলা বাড়ছিল। প্রায় ন'টা হতে চলল। আমি ওঠবার জন্যে উপযুপরি করছিলাম।

ম্যাকলীন বুঝতে পারলেন আমার মনের অবস্থা। বললেন, তোমার এবার উঠতে হবে, না?

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম। হ্যাঁ, উঠতে হবে। অফিসের সময় হয়ে আসছে।

আমি উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে ম্যাকলীনও উঠে দাঁড়ালেন।

বাইরের গেট পর্যন্ত তিনি আমার পেছন এলেন।

আমি গেট খুলে রাস্তায় নেমে ম্যাকলীনকে দুহাত তুলে নমস্কার করলাম। ম্যাকলীনও প্রতিনমস্কার জানালেন, হাসি মুখে বলে উঠলেন, আবার এসো কিন্তু।

দোষগুণ নিয়ে মানুষের সৃষ্টি। কেউ নিছক ভাল, কেউ বা নিছক খারাপ, এমনটি কখনো হয় না।

ম্যাকলীনও দোষেগুণে মানুষ। তাঁর যেমন ছিল ভাল গুণ, তেমনি ছিল ছোটখাট দোষ।

তাঁর দোষগুলোর বেশীরভাগই খামখেয়ালীপনা থেকে উদ্ভূত।

ম্যাকলীনের উগ্র খামখেয়ালীর পৌরাণে কেরানী-বাবুদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠত, মাঝে মাঝে অবিবেচনাপ্রসূত আদেশ জারী করে তিনি আমাদেরকে প্রাণান্তকর অবস্থার মধ্যে ফেলতেন।

ম্যাকলীন ছুটির ব্যাপারে বড়ই নির্মম ছিলেন। কাউকে সহসা ছুটি দিতে চাইতেন না। ছুটির দরখাস্ত হাতে এলে এককথায় তিনি ছুটির আবেদন নাকচ করে দিতেন।

এস-ডি-ও কোর্টের নাজিরবাবু, সীতানাথ হালদার দশদিনের ছুটি প্রার্থনা করে দরখাস্ত পেশ করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী গর্ভবতী, দু-চারদিনের মধ্যে সন্তান প্রসব করবেন—সীতানাথ ছুটির দরখাস্তে এই কারণ দেখিয়েছিলেন।

সীতানাথ আরো জানিয়েছিলেন যে, তাঁর স্ত্রী বর্তমানে তার পিতৃগৃহে অবস্থান করছে। পিতৃগৃহেই সে সন্তান প্রসব করবে। স্ত্রীর সন্তান প্রসবের সময় স্বামীর উপস্থিতি একান্ত অপরিহার্য এবং অবশ্য একটি সাংসারিক ধর্মও বটে। অতএব এই সব কারণগুলো সহানুভূতির সঙ্গে অনুধাবন করে তাঁর ছুটি মঞ্জুর করা হয় যেন।

ম্যাকলীন সীতানাথের ছুটির দরখাস্ত না-মঞ্জুর করে মন্তব্য লিখলেন এই বলে যে, স্ত্রীর প্রসবের ব্যাপারে

স্বামীর করণীয় কিছু নেই। তাছাড়া সীতানাথ ডাক্তার নয় যে, সে তার স্ত্রীর ডেলিভারি করাতে পারবে। প্রয়োজন পড়লে সীতানাথের স্ত্রীকে হাসপাতালে পাঠান যেতে পারে। সীতানাথের ছুটি নিঃপ্রয়োজন। তাকে দৈনন্দিন কাজ করতে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে।

সীতানাথ ছুটি না পেয়ে মুষড়ে পড়লেন।

তার স্ত্রী আসন্ন প্রসবা। তারও পর পিতৃ গৃহে। শ্বশুর-কুলের আত্মীয় স্বজনই বা কি ভাববে, যদি তিনি স্ত্রীর প্রসবের সময় উপস্থিত থাকতে না পারেন!

আত্মীয় স্বজনের ভাবনাও বড় কথা নয়, বড় কথা হ'ল তাঁর স্ত্রী। প্রতি স্ত্রী সন্তানের জন্ম দেবার সময় একান্ত প্রিয়জন স্বামীর উপস্থিতি কায়মনবাক্যে কামনা করে। প্রসব বেদনার সময়ে দেখতে চায় স্বামীর মুখের উৎকণ্ঠিত অভিব্যক্তি, পেতে চায় স্বামীর সান্নিধ্য।

সীতানাথ নিরুপায়। স্ত্রীর অভিলাষ পূর্ণ করতে অসমর্থ।

সীতানাথের চোখের কোণ ভিজে উঠল, টস টস করে দু'ফোটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল গালে। তিনি কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখের জল মুছে উদাস দৃষ্টিতে তাকালেন আমার দিকে।

আমার অবস্থা ঠেকল। কারো চোখের জল আমি সহ্য করতে পারি না।

মন আমার বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল ম্যাকলীনের অদ্ভুত আদেশ দেখে। আমি কেরানী হলেও মানুষ। হৃদয় বলে একটি অদৃশ্য পদার্থ আমার বুকের অন্তরালে দিনরাত কাজ ক'রে যাচ্ছে।

সীতানাথকে বললাম, আমি আপনার ছুটি মঞ্জুর করার ভার নিচ্ছি। দিন আপনার দরখাস্ত।

—তুই আমার ছুটি মঞ্জুর করিয়ে দিবি! সীতানাথ বিশ্বাস অবিশ্বাস মাখা দৃষ্টিতে তাকালেন আমার দিকে।

সজোরে বললাম, হ্যাঁ, করিয়ে দেব। দিন আপনার দরখাস্ত আমার হাতে।

বিস্মিত, বিমূঢ় সীতানাথ কম্পিত হস্তে তাঁর ছুটির দরখাস্তখানা আমার হাতে তুলে দিলেন।

আমি দরখাস্তটি নিয়ে ম্যাকলীনের কাছে যাবার জন্যে পা বাড়াতেই হেড ক্লার্ক রমেশবাবু টিপ্পনি কেটে উঠলেন, সীতানাথ এবার বুঝি চাকরিটা খাইলা। তুমিও প্যাসে বুদ্ধিহীনের দলে ভিড়লা?

আমার মেজাজ ধাঁ করে চড়ে গেল রমেশবাবুর গা-জ্বলা মন্তব্যে। আমি ম্যাকলীনের কাছে যাবার পরিকল্পনা ত্যাগ করে সীতানাথের দিকে তাকালাম।

সীতানাথও ভড়কে গেলেন। বললেন, ও শিবু, সাহেবের কাছে গিয়ে কাজ নেই ভাই। বউ মরলে বউ পাব, কিন্তু চাকরি গেলে চাকরি আর পাব না।

রমেশবাবুর চোখে মুখে বিদ্রূপের হাসি খেলে গেল। তিনি আমাকে বললেন, ও ব'শধ, আপনারা হলেন গিয়া ছেইলামানুষ, আইন কানুনের ধার ধারেন না। বলি, কোন সাহসে সীতানাথের দরখাস্ত নিয়া আপনি সাহেবের কাছে যাইতেছেন? সাহেব কি আপনারে দেইখা তাঁর অর্ডার ক্যানসেল কইরা দিবেন? জানেন না বুঝি, হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না? আপনি সাহেবের কাছে গেলে আপনার হয়তো কিছু হইব না, ছেইলা-মানুষ বইলা মাপ পাইয়া যাবেন, কিন্তু সীতানাথ তো মাপ পাইবে না। সে যে সিনিয়র ক্লার্ক। সাহেব তখন ধরবেন সীতানাথকে, বলবেন তুমি পরকে দিয়া সুপারিশ করাইতেছ?

রমেশবাবুর যুক্তি আমার মন স্পর্শ করলো না। কেন জানি না, আমার একটা দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গেছে সামান্য ক'দিনের মধ্যে, যে ম্যাকলীনকে ভালভাবে বোঝাতে পারলে তাঁর কাছ থেকে সুবিচার পাওয়া যাবে।

আমি সীতানাথকে দরখাস্ত ফেরত দিয়ে বললাম, কাল অফিসে এলে বুঝতে পারবেন। জেনে রাখুন, আপনার ছুটি পেয়েগেছেন।

সেদিন সন্ধে বেলায় ম্যাকলীনের কাছে এলাম।

অফিসে হাকিমের চোয়ারে-বসা ম্যাকলীন আর পারিবারিক পরিবেশে ম্যাকলীনের মধ্যে দুস্তর প্রভেদ।

আমি ভাবলে অবাক হয়ে যাই, কি করে একই মানুষ নিজেকে দুভাবে প্রকাশ করতে পারে!

অফিসের ম্যাকলীন গম্ভীর, বদমেজাজের। পারিবারিক পরিবেশের ম্যাকলীন হাস্যোজ্জ্বল, রসিক, দিলদরিয়া।

ম্যাকলীন বললেন, তোমার হেপাজে আমার ভয় হয়, ডর।

হাসতে হাসতে বললাম কেন স্যার?

বললেন, হয়তো একটি কাজের ফিরিস্তি শোনাতে বসবে।

লজ্জিত হলাম আমি। বললাম, না স্যার, কাজের কথা বলব না।

—তা হলে আজ ফ্রীলি তোমার সঙ্গে গল্পগুজব করতে পারি?

—তা পারেন।

কথা আরম্ভ হল। ম্যাকলীন বলতে লাগলেন তাঁর বাবার কথা। বাবার প্রতি তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা। বাবার 'ভাইনামাইট' তাঁকে নাকি গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছে, তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। ম্যাকলীন বললেন, My father is my ideals। আমি এমন আদর্শবাদী ব্যক্তি খুব কম দেখেছি। জীবনে তিনি কখনো মিথ্যা কথা বলেন নি।

আরো অনেক কথা হল। আমিও বাদ গেলাম না কথা বলা থেকে।

যে জন্যে ম্যাকলীনের কাছে এসেছিলাম, সেই কথাটা পাড়লাম অবশেষে। বললাম, একটা প্রার্থনা জানাব স্যার?

—No। বাড়িতে আমি কারো প্রার্থনা শুনি না। ম্যাকলীন হেসে উঠলেন।

ব্যাপারটা বোধগম্য হল না আমার। তবে কি সীতানাথের ছুটি মঞ্জুর হবে না? ভাবলাম আমি।

ম্যাকলীন তাকালেন আমার দিকে। হাসি হাসি মুখে বললেন, আচ্ছা বল তোমার প্রার্থনা।

আশা পেলাম অনেকটা।

বললাম, সীতানাথ হালদারের ছুটিটা মঞ্জুর করে দিন স্যার। বেচারী বড্ড অসুবিধেয় পড়েছে।

ম্যাকলীন বললেন, তুমি কেন সীতানাথের জন্যে প্লীড করতে এসেছ? Have you any interest in it?

—Interest আছে স্যার। গভীর আবেগ ও দৃঢ় কণ্ঠে বলে উঠলাম, আমার interest মানবতার জন্যে। একজন মানুষ ছুটি না পেয়ে চোখের জল ফেলবে—মানুষ হয়ে সে দৃশ্য সহ্য করি কি করে?

ম্যাকলীন বিস্ফারিত চোখে আমার দিকে তাকালেন। যেন কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আমার মুখের রেখায় কি যেন খুঁজলেন, তারপর অনুচ্চ কণ্ঠে বলে উঠলেন, সীতানাথকে ছুটি না দিয়ে আমি কি অবিচার করেছি, ডর?

এ এক কঠিন প্রশ্ন। আমার পক্ষে এর উত্তর যোগান দুঃসাধ্য।

আমরা দুজনে সমান সমান পদের চাকরিজীবী হলে ম্যাকলীনের প্রশ্নের উত্তর আমি এক সেকেণ্ডে দিয়ে ফেলতাম।

আমি বললাম, বিচার অবিচারের কথা নিয়ে আলোচনা করে লাভ নেই স্যার। দয়া করে আপনি ছুটিটা মঞ্জুর করে দিন।

—ছুটি আমি নিশ্চয়ই মঞ্জুর করব। ম্যাকলীন বার কয়েক ঘাড় আন্দোলিত করলেন। বললেন, কিন্তু তার আগে তোমায় বলতে হবে, আমি অবিচার করেছি কিনা?

মহা ফ্যাসাদে পড়লাম আমি।

ম্যাকলীন সীতানাথকে ছুটি না দিয়ে অবিচার করেছেন কিনা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। আমি কেরাণী। তিনি হাকিম। একটা মহাকুমার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তাঁর মনের ওপর তাঁরই অবিচারের কথা কেরাণী হয়ে বলা যায় কি? যায় না। কেননা ম্যাকলীন পারিবারিক পরিবেশে যতই অফিসারত্বের নির্মোক খুলুন, আসলে তিনি হাকিম। অফিসারি দম্ভ তাঁর রক্তে রক্তে।

ছুটি না দিয়ে ম্যাকলীন অবিচার করেছেন—এই সরল উক্তি আমার মুখ দিয়ে প্রকাশ হওয়া মাত্রই আমি তাঁর বিষ-নজরে পড়ে যাব। ফলে বাস করে যেমন কুমীরের সঙ্গে লড়াই করা যায় না, তেমনি চাকরি করতে এসে ওপরওয়ালার কুনজরে থাকা চলে না।

আমি ম্যাকলীনের প্রশ্নটাকে এড়াবার চেষ্টা করলাম বললাম, বিচার অবিচার বোঝার মত বুদ্ধি আমার নেই স্যার। আমি সামান্য চাকরে।

ম্যাকলীন অট্টহাস্য দিয়ে উঠলেন। তাঁর সশব্দ হাসির ঝংকার ঘরের নিস্তব্ধতাকে ভেংগে খান খান করে দিল। ম্যাকলীনের কুকুর টমি প্রভুর হাসি শুনে বাইরে থেকে ছুটে এসে তাঁর পায়ে আছড়ে পড়ল।

ম্যাকলীন বললেন, যে, সাহস করে সত্যি কথাটা বলতে পারলে না দেখে আমি দুঃখিত।

লজ্জায় মাথা হেঁট করলাম আমি। আমার চোখ মুখ কান আরক্তিম হয়ে উঠল।

—Be courageous···ম্যাকলীন ভারী গলায় বললেন, I love intrepidity and hate Cowardice।

ম্যাকলীনের গলার স্বরে ঝাঁজ এবং আবেগ দুই-ই এক সঙ্গে ফুটে উঠল। তিনি গভীর আবেগে উচ্চারণ করলেন intrepidity আর ঝাঁজ মিশিয়ে বললেন cowardice। দুটো ইংরেজি শব্দ দু'ভাবে আমার মনে ধাক্কা দেয়।

সন্ধে পেরিয়ে গেছিল। আদালি এসে কখন টেবিলে দেজ বাতি রেখে গেছে—লক্ষ্য করি নি।

আমি মাথা তুলে দেখলাম, ম্যাকলীনের মুখের ডান পাশটায় আলো পড়েছে। আলো পড়ে ফর্সা লাল মুখ যেন আরো জ্বল জ্বল করছে!

আমার সাদা মুখে চোখে গ্লানির ছোঁচ পড়ে গেছে। ভয় মিশ্রিত লজ্জায় আমি ভারাক্রান্ত। আমার কথা বন্ধ।

ম্যাকলীন খালি গায়ে চেয়ারে বসেছিলেন। পরণে তাঁর খাকি চাকু প্যান্ট।

আমরা দুজনে বারান্দায় বসেছিলাম।

বারান্দার নীচে ছোট্ট লন। লনের চারপাশ দেশী-বিদেশী ফুলগাছের বিচিত্র বাহারে সুসজ্জিত।

বেশ কিছুক্ষণ আমরা নিস্তব্ধ রইলাম। এক ঘেয়ে নিস্তব্ধতা আমার ভাল লাগছিল না, আমি বলে উঠলাম, এবার যাই স্যার?

এক্ষুণি যাবে? ম্যাকলীন সজল দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন।

বললাম: হ্যাঁ, যাই স্যার।

ম্যাকলীন বললেন, আচ্ছা তবে এসো।

পরদিন অফিসে ঢুকেই এক বিচিত্র সম্বর্ধনা লাভ করলাম সীতানাথের কাছে।

সীতানাথ আমাকে তাঁর দু'বাহুর মধ্যে আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর সবল বাহুর চাপে আমার দম বন্ধ হবার উপক্রম হল।

অতিকষ্টে বললাম, সীতানাথদা ছাড়ুন ছাড়ুন, প্রাণ যে বেড়িয়ে যায়!

কে কার কথা শোনে!

সীতানাথদা আমাকে ছাড়বার নাম করলেন না, জড়িয়ে ধরে রইলেন তেমনি ভাবে।

আমি আবার বললাম, সীতানাথদা আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে—ছাড়ুন, ছাড়ুন!

আনন্দ আবেগে তিনি যেন জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন। আমার মত ক্ষীণজীবীকে শক্ত করে বাহু পাশ দিয়ে বাঁধলে যে কি অবস্থা দাঁড়াতে পারে—এ বোধ তাঁর লুপ্ত হয়ে গেছে।

অতিকষ্টে সীতানাথদার সবল বাহু পাশ থেকে মুক্তি পেয়ে আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

আমার বুকের ভেতরটা হাঁস ফাঁস করছিল, রক্তশিও চাপ পেয়ে কাঁপছিল থর থর করে।

সীতানাথ বললেন, সত্যি আর জন্মে তুই আমার ভাই ছিলি। তোর উপকার আমি ভুলবনারে।

রমেশবাবু তাঁর চশমার আড়াল থেকে সব লক্ষ্য করছিলেন।

সীতানাথের এতখানি উৎফুল্লতা তাঁর বোধহয় ভাল লাগে নি।

তিনি একটু ঝেকের সুরে সীতানাথকে বলে উঠলেন, বলি ও রসয়, আনন্দ করলেই কি দিন চলবে? কাজ কর্ম কি সব জলাঞ্জলী দিলেন? যান, কাজে যান—সিয়া চালান টালানগুলোন পাশ করেন। সাহেব অমনি টুরে বাইর হইবেন।

রমেশবাবু হেডক্লার্ক। অফিসের বড়বাবু। তাঁকে মান্য করা কর্তব্য।

রমেশবাবুর কথায় সীতানাথ লজ্জা পেয়ে চুপ্পে পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। যাবার আগে তিনি আর একবার তার হাত দিয়ে আমার কাঁধটা স্পর্শ করলেন।

সীতানাথ চলে যেতেই রমেশবাবু আমাকে ডাকলেন। আমি গেলাম।

রমেশবাবু বললেন, বসেন।

বসলাম তাঁর পাশের চেয়ারে।

রমেশবাবু মিনিট দু'তিন খস খস করে লেখালেখি

করলেন. তারপরে চোখ তুলে বললেন, সাহেব কি অর্ডার করছেন. তা দ্যাখছেন ?

বললাম না দেখি নি।

—এই দ্যাখেন। বলে রমেশবাবু ড্রয়ার থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে আমার হাতে দিলেন।

অভিনব আদেশ দিয়েছেন ম্যাকলীন। এমনটি আমি নিজেও কল্পনা করি নি।

ম্যাকলীন লিখেছেন, সীতানাথ ভালদারকে অবিলম্বে তার স্ত্রীর কাছে যেতে আদেশ দেয়া হচ্ছে। তার ছুটি যতদিন প্রয়োজন, ততদিন সে নিতে পারবে। অতঃপর ছুটিছাটার ব্যাপারে কড়াকড়ি করা হবে না। যে কোন কর্মচারী যে কোন প্রয়োজনে ছুটি পাবে। বিশেষ জরুরী প্রয়োজন পড়লে কেবলমাত্র দরখাস্ত পেশ করে ছুটি নিতে পারবে এবং সে ক্ষেত্রে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের সম্মতি না নিলেও চলবে।

রমেশবাবু ধীরে গলায় প্রশ্ন করলেন, আপনি সাহেবরে কিছু বলছিলেন ?

মিথ্যা কথা বলতে পারলাম না। বললাম, হ্যাঁ, বলেছিলাম।

—কি বলছিলেন ?

সীতানাথদার ছুটির সম্পর্কে যে সব কথার অবতারণা হয়েছিল, মোটামুটি তাই বললাম। রমেশবাবু মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনলেন, শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন।

বেশ কিছুক্ষণ তিনি দম ধরে থাকলেন। বুঝলাম, ম্যাকলীনের সঙ্গে আমার এতখানি মাখামাখি রমেশবাবুর সহ্য হচ্ছে না।

রমেশবাবু চোখের চশমাটা খুলে টেবিলের ওপর রাখলেন। পকেট থেকে রুমাল বার করে চোখের কোলে লেগে থাকা সূক্ষ্ম শিঁচুটি মুছে আবার চশমাটা চোখে দিলেন।

আমি ওঠার তাল করছিলাম, এমন সময় রমেশবাবু বলে উঠলেন, সাহেবের এই চালাও অর্ডারের মানে কি হইতে পারে—বোঝেন ?

—না বুঝি না। সঙ্গে সঙ্গেই বলে ফেললাম।

—আপনি কি কইয়া বুঝেবেন—আপনি যে ছেইলা মানুষ। সে দিন চাকরিতে ঢুকছেন। সাহেব দুদিনে যে এই চালাও অর্ডার দিয়া ফেললেন. এর সকলটা যে আমারে সামলাইতে হইব। বাঙালী ঘরের বউ-এর পেট কি কখনো খালি যায় ? যায় না। বছর বছর তারা সোনা বিয়ায়। এখন অফিস শুদ্ধ কর্মচারী যদি বউ সোনা বিয়াইব বইলা ছুটি লয়, তবে আমি কি করি ? আমি তো মরছি মশয় ! বলে করুণ দৃষ্টিতে রমেশবাবু আমার দিকে তাকালেন।

রমেশবাবুর সকরুণ দৃষ্টির উদ্দেশ্য ছল আমার সহানুভূতি আকর্ষণ করা। কিন্তু এক্ষেত্রে আমি নির্বাক। কোন সহানুভূতি দেখাতে পারব না তাঁকে।

পাওনা ছুটি নেয়া কর্মচারীদের একটি অধিকার বলে গণ্য হওয়া উচিত। ম্যাকলীন সেই অধিকার স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাঁকে ধন্যবাদ।

হেডক্লার্ক রমেশবাবু নাকি কায়দা পেতেই ম্যাকলীনের চালাও অর্ডারের বিপক্ষে কথা বলুন না কেন, আমার মন কিন্তু কিছুতেই ভিজবে না।

আমি বললাম, সাহেবের অর্ডার কর্মচারীদের পক্ষে ভালই হবে। তিনি সুবিচার করেছেন। তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

রমেশবাবু আমার কথায় হঠাৎ চুপ করে গেলেন। কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে একেবারে অন্য প্রসঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করলেন। বললেন সাহেব খুব ভাল মানুষ, না ?

—ভাল বলেই তো মনে হচ্ছে।

—আমার কথা কিন্তু কন না ? অমায়িক হাসি ফুটে উঠল রমেশবাবুর মুখে।

—না আপনার কথা এখনো বলেনি।

—কোন কোন বিষয়ে আপনার লগে সাহেবের কথা হয়। রমেশবাবু একটা কায়দা লোক। ম্যাকলীনের সঙ্গে আমার হৃদ্যতা কতটা পরিমাণে গাঢ় হয়েছে, তা তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন ক'রে জানতে চান।

বললাম, বেশীর ভাগ পারিবারিক বিষয় নিয়ে আমাদের মধ্যে আলাপ হয়।

—তাহলে তো আপনে অনেক দূর অগ্রসর হইছেন দেখা যায়।

ভারী বিশ্রি শোনালো রমেশবাবুর উক্তিটা। মনে

হল তাঁর কথার কিসের ইঙ্গিত আছে।

আমি কঠিন স্বরে বলে উঠলাম, আপনি কি বলতে চান ভাল করে খুলে বলুন।

—এই দ্যাখো! রমেশবাবু সরল হাসির ভঙ্গি দেখালেন, বললেন, তারা আমার একেবারে সোলাপান—বুদ্ধিশুদ্ধি কম। আলি আবের সোহ্রাও তারা, আবের সোহ্রাও। পরের উবগারের কাম নাই। বিপদে পড়লে কোন শালাই কাছে আসে না। অনেক ঠেইকা তত্ত্ব শিখছি।

বুঝলাম, রমেশবাবু অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করেছেন তাঁর 'আপনি' সম্বোধন হঠাৎ 'তুমিতে' নামিয়ে আনবার মধ্যে খানিকটা অন্তরঙ্গতার সুর টের পাওয়া যাচ্ছে।

রমেশবাবুকে চিনতে আমার বাকি নেই। তিনি একটি ভাঁজা স্বার্থবাজ ব্যক্তি। স্বার্থ সিদ্ধির জন্য হেন কাজ নেই, যা তাঁর পক্ষে করা অসম্ভব।

আমি উঠলাম। আর ভাল লাগে না এই সব ব্যক্তির সংগ।

অফিসে এমন একটি দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই, যার সংগে প্রাণ খুলে দুদণ্ড স্বার্থবিহীন কথাবার্তা বলা যায়। বেলা প্রায় দুটো। টিফিন আওয়ার্স।

আমি হাঁটতে হাঁটতে কোর্ট প্রাঙ্গনের বাইরে এসে দাঁড়ালাম।

কোর্টের শেষ প্রান্তের প্রাচীন অশ্বত্থ গাছের নীচে বসলাম। জায়গাটা বেশ নির্জন। লোক সমাগম নেই।

নির্জন জায়গায় বসতেই আমার মন বিচিত্র বর্ণ ভাবনার দোলায় পাক খেতে লাগল, অপার উদ্বেল ভাব-সমুদ্রে আমি গেলাম ডুবে।

জীবনের নানান না-মেটা স্বপ্ন সাধ ভেসে উঠল মনের সামনে।

হায়, হায়, কোন কিছুই করতে পারলাম না। কারো কাজেই এলাম না। দেশ জাতি জনতাকে ভুলে গেলাম। শুধু আত্মচিন্তা। ষাট টাকা মাইনার কেরানীগিরি।

লেখাপড়া শেষ হল না বলে কেরানীগিরি করছি। এক ঘেয়ে কাজ করে মনের প্রেরণা নষ্ট করে দিয়েছি। আমার দিয়ে আর বড়ো কাজ হবে না। আমি যেন পোড়া মাটি—পুতুল তৈরীর কাজে লাগব না।

অথচ ইচ্ছা ছিল, আশা ছিল, বড়ো হবো। মানুষের মতো মানুষ হবো। দশজনে চিনবে, জানবে, খাতির করবে। কিন্তু কিছুই হল না। হারিয়ে গেলাম, ফুরিয়ে গেলাম, মিশে গেলাম। জীবনের আগুন ছাই হয়ে গেল।

আর ভাল লাগে না। ট্রেনে হিঁচড়ে চলার মধ্যে নিদারুণ-গ্লানি। এ গ্লানি সহ্যের অতীত।

অফিসে ফিরে এলাম।

মন ভারক্রান্ত, উদাস উদাস। কাজ করতেও ইচ্ছা নেই।

ম্যাকলীন টুরে বেরিয়ে গেছেন, যাবার আগে কয়েকটি জরুরী কাজ করতে বলে গেছেন।

কাজগুলো নিয়ে টেবিলে বসলাম। নিতান্ত যন্ত্রের মতো কলম চালাতে লাগলাম। ঘণ্টা দেড়েক কাজ করলাম কাজের ফাঁকে ফাঁকে অশান্ত চিন্তার উদয় হতে লাগল। চিন্তা একবার গ্রাস করলে, দূর করা দুরূহ। কোন মতে কাজগুলো শেষ করে বাড়ি ফিরে এলাম।

সকাল সকাল বাড়ি ফিরতে দেখে মা বললেন, আজ যে বড়ো সকালে ফিরলি?

কোন উত্তর দিলাম না মাকে, মাথাটা একটু নেড়ে পাশ কাটিয়ে নিজে ঘরে এলাম।

ঘরে এসে জামা কাপড় ছাড়ার উপক্রম করতেই গীতার আবির্ভাব হল। গীতা আমাদের প্রতিবেশিনী। তার বাবা মুন্সেফ কোর্টের বড়বাবু।

ছোট থেকে গীতার সংগে আমার পরিচয়। বয়সের দিক থেকে আমরা সমবয়সী না হলেও খুব বেশী ছোট বড় কেউই নই। বড় জোর গীতা আমার চেয়ে দু'আড়াই বছরের ছোট।

গীতা এবার প্রাইভেটে ম্যাট্রিক পাশ করেছে। নাটোরে কলেজ নেই বলে তারও পড়া বন্ধ। এখন গীতা বাড়িতেই বসে আছে। তার বাপ-মা অবশ্য বিয়ের চেষ্টা চরিত্তির করছেন, কিন্তু পাত্র মিলছে না। এ কে সে ব্রাহ্মণ কন্যা, তায় আবার সুন্দরী, কাজেই সৎ পাত্র তার ভাগ্যে জোটা মুস্কিল।

গীতার সামনেই আমি জামা কাপড় ছাড়লাম। গীতাকে লজ্জা পাবার আমার কিছু নেই। বলতে গেলে সে, আমাদের পরিবারেরই একজন। যখন তখন, কারণে অকারণে, আমাদের বাড়িতে যাতায়াত করছে।

আমি গীতাকে বললাম, এমন অসময়ে আসা হল যে?

গীতা বলল. আমার একটা কাজ করে দিতে হবে

—কি কাজ করতে হবে?

—বলছি, আগে তুমি একটু জিরিয়ে নাও।

বলে গীতা আমার বিছানার ওপর বসল। বালিসটা বিছানার পাশ থেকে টেনে নিয়ে নিজের কোলের ওপর রাখল, তারপর দু'হাত দিয়ে বালিসের দু'পাশটা চাপ দিতে লাগল।

হাত খানেক ব্যবধান রেখে গীতার পাশে বসলাম, বললাম, এবার বল, কি বলবে?

গীতা বলল, আজকে আমার এক বান্ধবীর বিয়ে, তাকে উপহার দেবার মত একটা বই কিনে দিতে হবে।

বললাম, এ আর এমন কি কাজ! পয়সা দিও, কিনে এনে দেব'খন।

গীতা সংগে করে টাকা এনেছিল। আঁচলের খুঁট খুলে দু'টো টাকা বের করে আমার হাতে দিয়ে বলল, সন্ধের আগেই বইটা পাই যেন।

বললাম, আচ্ছা তাই পাবে।

আমি উঠে পড়লাম। এবার হাত মুখ ধোব। গামছাটা কাঁধে চড়ালাম। স্যাণ্ডেল ছেড়ে খড়ম পড়লাম। বাড়িতে আমি খড়মই পরি

এমন সময় গীতা ডেকে উঠল, শিবুদা।

নতুন অপরিচিত কণ্ঠস্বরে ডাকল গীতা। আমার চমক লাগল। গীতার এমন কণ্ঠস্বর আমি আগে কখনো শুনিনি।

মনে হল, গীতার ডাক যেন আর্তিতে আকুল। কিছু সে বলতে চায় আমাকে, অথচ বলবার ভাষা পাচ্ছে না, শুধু ডাকের আর্তিতে বলার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

বললাম, কিছু বলবে?

গীতা মাথা উঁচু করে তাকাল আমার দিকে। কিছুক্ষণ চেয়ে চেয়ে কি যেন আমার মধ্যে দেখল। আমি বুঝতে পারলাম না তার চাহনীর রহস্য। সত্যি মেয়েদের মন বোঝা দায়।

গীতা বলল. আমার বয়সটা কত জানো?

এ আবার কেমন ধারা অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। কি প্রয়োজন থাকতে পারে অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করার!

বললাম, কতই আর হবে, আঠার উনিশ। তুমিতো আমার চেয়ে ছোট।

গীতা এগিয়ে এল, আমার পা ঘেঁষে দাঁড়াল। আমি স্পষ্ট অনুভব করলাম, তার নিঃশ্বাস ভারে ভারে পড়ছে, নাসারন্ধ্র নিঃশ্বাস নেবার সময় ফুলে উঠছে।

গীতা বলল, তুমি কিছু বোঝ না, খুব বোকা।

আমি হেসে উঠলাম তার কথায়, বললাম, সেটা কি এত দিনে জানলে?

—এতদিন জানবার প্রয়োজন পড়েনি।

—আজ বুঝি প্রয়োজন পড়ল?

গীতা এবার আমার গায়ে গায়ে মিলে দাঁড়াল। তার অবাধ্য চুলগুলো আমার ঘাড়ে ঠেকছিল।

—আমার দিকে ভাল করে তাকাও দেখি? বলে উঠল গীতা।

গীতার কথাবার্তার অসংলগ্নতা আমার যেন কেমন ঠেকল। সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে এক দুর্বোধ্য হেঁয়ালীর মতো ঠেকছিল। মনে হচ্ছিল, আমি যেন আলো আঁধারের পাকে জড়িয়ে রয়েছি।

আমার এক বন্ধু বলেছিল, মেয়েদের মন আর ম্যালেরিয়া জ্বর যেমন হঠাৎ আসে কম্প দিয়ে আবার হঠাৎ ছাড়ে ঘাম বেরিয়ে, তেমনি হ'ল গিয়ে মেয়েদের মন।

মেয়েদের মনের তল নেই। এই এক ভাব, পরক্ষণে আর এক ভাব। এখন চঞ্চল, চটুল, পরক্ষণেই আবার গম্ভীর, সমাহিত।

আমি গীতার দিকে তাকালাম। বেশ ভাল করেই তাকালাম, কিন্তু কোন বৈচিত্র্যের সন্ধান পেলাম না। তবে তার টানা চোখের কোলে ঈষৎ ক্লান্তির ছাপ যেন দেখতে পেলাম।

বললাম. এই তো তাকালাম তোমার দিকে।

গীতা বলল, কিছু দেখতে পেলে না আমার মধ্যে?

—না তো। আমি অপ্রস্তুতের মতো মাথা নাড়লাম।

গীতা হাসল। ম্লান, করুণ হাসি। হাসির পর তার মুখের চেহারা কালো হয়ে গেল।

গীতা বলে উঠল, তুমি না পুরুষ?

সর্বনাশ! এঁরার আমি সত্যি সত্যি চমকে উঠলাম!

এতক্ষণে গীতার মনোগত অভিপ্রায় বুঝতে পারলাম। কথায় আছে মেয়েদের বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না। গীতা নারী। নারীর ধর্মানুযায়ী তারও মুখ ফোটেনি।

গীতা ভাবে ভঙ্গীতে তার যন্ত্রণা আমাকে জানাবার প্রয়াস করেছে আমিও বুঝতে পেরেছি এতক্ষণে।

গীতার মর্মযাতনা বুঝতে পারার সংগে সংগেই সারা রাজ্যের লজ্জা এসে আমার গ্রাস করল। আমি মাথা নিচু করে চুপ করে রইলাম।

গীতা আমার গায়ে ঠেলা মেরে বলল, তুমি একটি কাপুরুষ!

আমি প্রস্তুত ছিলাম না এমন কথা শোনার জন্যে। গীতার মুখ থেকে কাপুরুষ কথাটা উচ্চারিত হবার কয়েক সেকেণ্ড পর আমার ভেতরকার পৌরুষবোধ আর্তনাদ করে লাফিয়ে উঠল। আমি ভুলে গেলাম যে গীতা আমার প্রতিবেশিনী। আজন্মের পরিচিতা।

আমি ঝপ্ করে তার হাত ধরে ফেললাম। আমার গা কাঁপছিল, কান গরম, চোখে আগুন ঠিকরে পড়ছিল।

গীতাও বিহ্বল হয়ে গেল। এতখানি হয়তো সে-ও আশা করতে পারেনি।

এর আগে গীতার গা-হাত আমি স্পর্শ করেছি। সে স্পর্শ যাদুকরতাহীন। তার মধ্যে কোন বৈচিত্র্যের আস্বাদ পাইনি কিন্তু আজ গীতাকে এক বিশেষ ভাবাবেগে স্পর্শ করতেই আমার অনুভূতির সব দুয়ার হা হয়ে খুলে গেল। আমি ভেতরে ভেতরে পুলকের কাঁপুনি অনুভব করলাম। আমার স্নায়ুমণ্ডলী উত্তপ্ত হয়ে উঠল।

গীতা কটকা মেরে হাতিয়ে নিয়ে দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেড়িয়ে গেল। যাবার আগে বলে গেল, আমি ভুল বলেছি, তুমি কাপুরুষ নও।

রাতে ভাল ঘুম হল না। গভীর রাত পর্যন্ত গীতার কথাই ভেবেছিলাম।

সত্যি মেয়েটা রীতিমত আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করিনি যে গীতার হঠাৎ এমন পরিবর্তন দেখা দেবে!

গীতার সংগে আমার পরিচয় অনেক দিনের। জ্ঞান হওয়া থেকে তাকে আমি দেখে আসছি। আমার চোখের সামনে গীতার কতো পরিবর্তন দেখলাম। আগে সে ফ্রক পরত, ছুটে ছুটে চলত, লোক লজ্জার পরোয়া করত না। সেই ফ্রক পরা চঞ্চল গীতা বর্ষাকালের পুই শাকের মতো হঠাৎ বেড়ে উঠল, তার গায়ে লাগল মাংস, সরু প্যাকাটির মতো অবলম্বন হাত দুটো ঝুলে কেঁপে কেমন সুডৌল হল। বুকের ওপর প্রদীপ যৌবনের স্বাক্ষর আশ্চর্য ভাবে রেখাঙ্কিত হয়ে উঠল। হাঁটিনে চলনে এল সংযম। সে ফ্রক পরা ছেড়ে শাড়ি পরা ধরল।

নদী এবং নারীর এক গতি, একই মতি।

নদী আনে ভাঙন, নারী জ্বালে প্রেমের আগুন। কূল ভাঙা, কীর্তিনাশা নদীর মতো নারীও নিজেকে দীপ্তিহীন প্রেমের আগুনে দহন করে, কখনো বা কূল ভেঙে, সমাজ সংসারের বাঁধন অতিক্রম করে ঘাটা আঘাটায় ছুটে যায়। নদীর মতো নারীও উদ্দাম, অনির্দিষ্ট। তার মধ্যে বেগ আছে, নিষেধ নেই।

পরদিন বেশ দেরীতে ঘুম ভাঙল।

ঘুম ভাঙতেই দেখি আমার পায়ের দিককার জানালা দিয়ে শরৎকালের নরম রোদ্দুর ঘরে প্রবেশ করেছে। আমি উঠে পড়লাম। হাত মুখ ধুয়ে, এক কাপ চা খেয়ে, বগলে ফাইল পত্র নিয়ে ছুটলাম ম্যাকলীনের কাছে।

ম্যাকলীন আমাকে বললেন, So you have come। চলো আজ এক জায়গায় যাই।

আমি বলে উঠলাম, কয়েকটা জরুরী কাজ—

—Dwon with your কাজ। ম্যাকলীন চিৎকার করে উঠলেন, কাজ চিরকাল থাকবে করতেও হবে।... 'men must works, and women must weep' আজকে আর কাজ নয়, চলো বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসি। ফাইল পত্র যা সংগে এনেছ, টেবিলের ওপর

রেখে দাও। পরে আমি সই সাবুদ করে দেব।

অগত্যা আমাকে ম্যাকলীনের সংগে বেরুতে হল।

ম্যাকলীন নিজেই জীপ চালাতে লাগলেন। আমি তাঁর পাশের সীটে।

জীপ চলেছে ছুটে। সহর ছাড়িয়ে মাইলটেক পথ অতিক্রম করার পর একজায়গায় জীপ থামল। ম্যাকলীন বললেন, এইখানে নামো।

নামলাম দু'জনে।

জীপ থেকে নামতে না নামতেই এক দঙ্গল ছেলের পাল এসে আমাদের ঘিরে ধরল। ছেলেগুলো ভদ্র পরিবারের নয়। কালো, পেট টিপটিপে পালে স্ফীত দেহ ওদের। পরনে প্যাণ্টের বাহুল্য নেই।

ম্যাকলীন ছেলের ভিড় ঠেলে হেঁটে চললেন। কয়েক গজ হাঁটার পর একটা খোলার ঘরের সামনে এসে থমকে দাঁড়ালেন, দাঁড়িয়ে হাঁক দিলেন, সালাম সালাম।

ঘরের ভেতর থেকে উত্তর এল যাই।

সালাম ঘরের ঝাঁপ সরিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াতেই দেখল যে বোধ ম্যাকলীন তার সামনে দণ্ডায়মান।

ম্যাকলীনকে দেখে সালাম যেন কোঁচোর মতো মাটিতে মিশে যাবার চেষ্টা করল। তার উৎকণ্ঠা ও কৌতূহলে তার মুখের চেহারা মুহূর্তের মধ্যে বদলে গেল। তার ঠোঁটে ধরল কাঁপন, গলার স্বরে জাগল জড়তা।

—হুজুর! সালামের গলার ভেতরে অস্ফুট ধ্বনি শোনা গেল।

ম্যাকলীন হাসলেন। বোধহয় তিনি সালামের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন। বললেন, তোর নাকি ছেলে হয়েছে?

সালাম অতি বিনয়ে হাত কচলাতে কচলাতে বলল, হ্যাঁ হুজুর, আমার বউএর ছেলে হয়েছে।

সালাম ম্যাকলীনের অতি প্রিয় আর্দালি। ম্যাকলীনের রান্না-বান্না ও ঘর-কন্নার কাজ সালামই করে। তা ছাড়া লোকটা খুব অমায়িক, বিশ্বাসীও বটে।

ম্যাকলীনের দু'জন আর্দালি। একজন সালাম, অপর জন নন্দ। নন্দ বাজার হাট, বাইরের কাজ করে, আর সালাম খাটে, ম্যাকলীনের সংগে চুরে বেরোয়।

ম্যাকলীন বললেন, তোর বউএর ছেলে হয়েছে, এতো একটা সুখবর—তা এমন সুখবরটি আমায় জানাস নি কেন?

—আপনাকে জানাব! সালাম পিট পিট করে ম্যাকলীনের দিকে তাকাল।

সালামের পিটপিটে চাহনীর রহস্য আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। বুঝলাম, সে ম্যাকলীনের প্রশ্নে বিস্মিত। এমন প্রশ্নের সম্মুখীন জীবনে সে দ্বিতীয়বার হয় নি।

সালামের স্ত্রী এর আগেও সন্তানের জন্ম দিয়েছে, কিন্তু কোন এস-ডি-ও ভুলেও কখনো জিজ্ঞাসা করে নি যে তার ছেলে বেঁচে আছে কি মরেছে!

সালাম চোদ্দ টাকা মাইনার আর্দালি। সে কী বছর একটি করে নতুন সন্তানের জনক হয়। ইতিমধ্যেই সালাম ছ'টি সন্তানের জনক হয়েছে। সেই ছ'টির মধ্যে চারটি জীবিত-দু'টি মৃত।

দরিদ্র অবহেলিত আর্দালির সন্তান জন্মগ্রহণ করা যে একটি সুখবরের পর্যায়ে পড়ে এবং তার জন্যে মহকুমার হর্তাকর্তা বিধাতা সংবাদ নিতে নিজে ছুটে আসেন, এই অপ্রত্যাশিত ও অভূতপূর্ব ব্যাপারটি সালামের মনে ভীষণ ভাবে রাগ কাটল। অপরিসীম বিস্ময়ে সালাম অভিভূত হয়ে পড়ল, তার পূর্বেকার ধারণা সব ওলোট-পালট হয়ে গেল। সে দুই হাত জোর করে ম্যাকলীনের হাসি হাসি মুখের দিকে বাষ্পাকুল নয়নে তাকিয়ে রইল। এমন সময় ম্যাকলীন বলে উঠলেন, তোর ছেলেকে আমরা দেখব। বাতাসে কম্পমান বেতস লতার মতো, সালাম কেঁপে উঠল, পুলকিত সংকোচে বলে উঠল, হুজুর!

ম্যাকলীন আবেগপ্রবণ ব্যক্তি। সূক্ষ্ম সাংসারিক বুদ্ধি তাঁর নেই। তিনি সালামের সংকোচের কারণ বোঝার চেষ্টা করলেন না, আমাকে তাঁর সংগে যেতে ইশারা করেই সালামের ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

সালাম ভাবলেশহীন। হতবাক। বিহ্বল। মন্ত্র চালিতের মতো সে তার স্ত্রীর আঁতুর ঘরের সামনে দাঁড়াল।

আমি সালামের ঘরের দিকে তাকালাম। একটি মাত্র ঘর। তার জানালা নেই। দিনের বেলায় ঘরে একরাশ

তাদের সংগে কথা ক'য়ে সুখ নেই। জানো বস, আমি একটু বাচাল—কথা না বলে থাকতে পারি না।

আমি মনে মনে বললাম, আপনার সংগে কে কথা বলবে স্যার। আপনার পদটি যে কথা বলার অন্তরায়। আপনি দূরে আমরা মাটির প্রদীপ। আপনি বনস্পতি, আমরা চলার তৃণাঙ্কুর। আপনার সংগে আমাদের কোথাও মিল নেই, আর নেই বলেই আমরা আপনাকে এড়িয়ে চলতে চাই, সাহস পাই না কথা বলার।

ম্যাকলীন প্রসঙ্গান্তরে এলেন। বললেন, Roy, have you any aim in life?

চমকে উঠলাম আমি। Aim! ষাট টাকা মাইনার কেরাণীর জীবনে aim! ম্যাকলীনের প্রশ্ন ভেতরকার চাপা বিক্ষুব্ধ চেতনাকে আবার জাগিয়ে তুলল।

বললাম, আগে aim ছিল, এখন নেই।

—why not? কেন নেই?

অবান্তর প্রশ্ন! এ প্রশ্নের উত্তর নেই। কেরাণীর জীবনে Aim থাকতে পারে না, থাকাটাই একটা কষ্ট-কল্পনা।

আমি হাসলাম। ম্লান হাসি। বললাম, লেখাপড়া শিখি নি স্যার, কোন যোগ্যতা নেই, কাজেই জীবনে কি করে aim থাকবে!

ম্যাকলীন একেবারে মৌন হয়ে গেলেন। হয়তো আমার কথার মধ্যে প্রচ্ছন্ন ব্যথা ছিল, যা তাঁকে মনে মনে আঘাত করল।

ম্যাকলীন ভাবলেশ আই, সি, এস হলে চবে কি, মনটা তাঁর পলি মাটির মতো নরম। এমন নরম মন অফিসারকুলে সুলভ নয়।

ম্যাকলীন কিছুক্ষণ মৌন থাকার পর বললেন, জানো বয়, জীবনে আমারও কোন aim নেই। আই, সি, এস পরীক্ষায় পাস করাটা আমার জীবনে একটা এ্যাকসিডেণ্ট। তোমরা হয়তো ভাব, আমি খুব সুখে আছি। কিন্তু সুখ আমার মোটেই নেই। আমি একটি ছন্নছাড়া জীব। আকাশে ভাসমান মেঘের মতো কেবলি হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমার ভেতরে কতো যে দুঃখের তাড়না, তা কাউকে বুঝিয়ে বলতে পারি না। সময় সময় ভাবি, আমি কোথাও চলে যাই। কিন্তু—বলেই ম্যাকলীন থামলেন। আমি ম্যাকলীনের কথাগুলো শুনে কেমন যেন বিচলিত হয়ে গেলাম।

মানুষ এক আশ্চর্য জীব। তার ওপরের ঐশ্বর্য দেখে ভেতরের দারিদ্র্য বোঝা যায় না। ম্যাকলীন দুঃখী নিজেই তিনি স্বীকার করলেন। জানি না, ম্যাকলীনের দুঃখ কোথায়!

রবিবার। ছুটির দিন।

কাজ কর্ম নেই। তাই ম্যাকলীনের কাছে এসেছিলাম।

সকালের দিকে ম্যাকলীনের কাছে এলেই আমার জলযোগটা জুটে যায়। এ একটা আমার উপরি পাওনা। রীতিমত লোভনীয় পাওনা বলা চলে।

টেবিলের দু'পাশে বসে গল্প করতে করতে আমরা দু'জন চা খাচ্ছিলাম।

ম্যাকলীনের দ্বিতীয় আর্দালি নন্দ চা পরিবেশন করছিল।

চা পর্ব শেষ করে আমরা এসে খোলা বারান্দায় বসলাম।

অঘ্রাণ মাসের শেষ দিক। একটু একটু শীত পড়েছে। সূর্যের তেজও অনেকটা স্তিমিত।

সকাল আটটা প্রায় বাজে। খোলা বারান্দার প্রায় সবটাই রোদে ভর্তি।

ম্যাকলীনের পরণে ট্রাউজার, গায়ে হাত কাটা গেঞ্জি। মুখে খোঁচা খোঁচা লাল দাড়ি গজিয়েছে। দু'দিন থেকে দাড়ি শেভ করেন নি, হয়তো বা শেভ করার কথা ভুলেই গেছেন। আমি কিংবা নন্দ দাড়ি শেভ করার কথা মনে করিয়ে না দিলে, তাঁর দাড়ি শেভ হয় না।

বললাম, আজ শেভ করবেন স্যার। দাড়ি বেড়েছে।

ম্যাকলীন ঈষৎ হেসে গালে হাত বোলালেন। বললেন, এটাই আমার দ্বারা হয় না। বড্ড একঘেয়ে কাজ।

কয়েক মাসের মধ্যে ম্যাকলীনের সংগে আমার সম্পর্ক অনেকটা সহজ হয়ে এসেছে, বাইরের অচেনা লোক আমাদের দু'জনের বাক্যালাপ শুনলে বুঝতে পারবেনা যে আমি ম্যাকলীনের অধীনে একজন নিম্নপদস্থ কর্মচারী।

আজকাল ম্যাকলীনের সংগে ঠাট্টা ইয়ারকী করি। অবশ্য মাত্রা রেখে।

ম্যাকলীনও কখনো মাত্রার বাইরে যান নি।

ছুটি ছাটায় দিনে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তুর কোন মাথামুণ্ডু থাকে না। কথা একবার আরম্ভ হলেই হয়। ব্যস! আর দেখতে হবে না। দুরন্ত গতি নিয়ে কথার গাড়ি চলবে লক্ষ্যহীন গন্তব্যস্থলে।

আজকে কথা উঠল দেশপ্রেম সম্পর্কে।

ম্যাকলীন বললেন, বুঝলে রয়, যে কোন প্রেমেই মায়া আছে। অনুভূতি থেকে প্রেমের জন্ম। অনুভূতি যতো প্রবল হবে, প্রেম ততোই গভীর হবে। দেশকে যারা ভালবাসে, দেশের সম্পর্কে তাদের অনুভূতি, ভাবনা চিন্তা খুব বেশী। আর যারা দেশকে ভালবাসে না, দেশানুভূতির প্রশ্ন যাদের শ্রদ্ধা নেই, তারাই তাওহার্ড কোন কিছুকে তারা ভালবাসতে পারে না। বাইবেল বলেছেন 'He who loves not his Country, can love nothing।'

বড় সুন্দর কথা। শুনলেই প্রাণ মন আন চান করে ওঠে। এমন সহজ ভাষায় এতো গভীর বিষয় কখনো কেউ বলতে পারে না, যদি তার মধ্যে দেশপ্রেমের অনুভূতি না থাকে। ম্যাকলীন নিঃসন্দেহে দেশপ্রেমিক।

ম্যাকলীন বলে চললেন, আমি কখনো আমার নিজের দেশ আয়ার্ল্যাণ্ডে যাই নি। এবার যাব ভাবছি। আমার দেশের কল্পিত ছবি মাঝে মাঝে আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে, আমি তখন কেমন উন্মনা হয়ে যাই। বাবার কাছে শুনেছিলাম, আয়ার্ল্যাণ্ড নাকি সুন্দর জায়গা! সেখানকার মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য মনের সমস্ত সংকীর্ণতা দূর করে দেয়। বসন্তকালে গাছে গাছে ডাকে কোকিল, খালে পাহাড়ের ঝরণা জল জমে, নদীতে ছেলেরা নৌকা ভাসায়। নৌকার মাঝি মাল্লারা তোমাদের দেশের মত ভাটিয়ালি সুরে গান গাইতে গাইতে নৌকা বায়। রয়, সব দেশই এক। সব মানুষের মধ্যেই সেই এক চিরন্তন সুরের হিল্লোল, কিন্তু তার বাহার বিচিত্র।

—হুজুর!

কথার তাল কেটে গেল নন্দর ডাকে।

ম্যাকলীন বিরক্ত হলেন। বেশ আবেশ দিয়ে তিনি কথা বলতে সুরু করেছিলেন, এমন সময় মূর্তিমান প্রতিবাদের মতো হাজির হল নন্দ—ম্যাকলীনের দ্বিতীয় আর্দালি।

—কি চাই? ম্যাকলীন বিরক্তি সহকারে প্রশ্ন করে উঠলেন।

—টাকা দেন—বাজার যাব।

—মনসেপ! টাকা আমার পকেটে থাকে?

নন্দ কি ভাবল জানি না, হঠাৎ চলে গেল ম্যাকলীনের সামনে থেকে।

কিছুক্ষণ পরে এসে বলল, টেবিলে মাত্র দুটো টাকা আছে। দু'টাকায় বাজার হবে না, আরো এক টাকা চাই।

—আর এক টাকা লাগবে? Then I am undone! বলে ম্যাকলীন আমার দিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকালেন।

বুঝলাম, ম্যাকলীন অর্থ শূন্য। মাত্র দুটো টাকাই ছিল তাঁর সম্বল।

বিনয় এবং কুণ্ঠা নিয়ে বললাম, আমার কাছে কয়েকটা টাকা আছে, দেব স্যার?

—তুমি দেবে? দাও। কিন্তু চেয়ে নিও আমার কাছ থেকে। পকেট থেকে পাঁচ টাকার একটা নোট বের করে নন্দর হাতে দিতেই তার মুখচোখ খুশিতে ঝলমল করে উঠল, তার ঘাতি গোঁফজোড়া যেন চুকচুকে মুখমণ্ডলে যেন কেউ বিদ্যুৎ জ্যোতি মেখে গেল।

নন্দ টাকাটা বুক পকেটে গুঁজে পেছন ফিরে হাঁটা দিচ্ছিল, এমন সময় ম্যাকলীন বলে উঠলেন, এই শোন!

নন্দ ফিরে তাকাল।

ম্যাকলীন বললেন, রয়, তোমাকে একটা মজা দেখাচ্ছি।

নন্দ জিজ্ঞেস করল, আমায় কিছু বলবেন হুজুর।

—হ্যাঁ বলব। আগে তুই পাঁচ টাকা ভাঙ্গিয়ে নিয়ে আয়। খুচরো পয়সা আনিস যেন।

নন্দ টাকা ভাঙ্গাতে চলে গেল।

নন্দ যাবার পরে ম্যাকলীন আমাকে বললেন, এই ব্যাটা নন্দ একটা পয়লা নম্বরের চোর। ওর চুরি আমি হাতে নাতে ধরতে পেরেছি। তিন টাকার বাজার থেকে ও এক টাকা চুরি করে। কাল আমি বাজারে গিয়ে জিনিস পত্তরের দর জেনে এসেছি। বাজারে বাংলা বিক্রী

হচ্ছে বারো আনা সের দরে, আর নন্দ আমাকে হিসেব দেয় পাঁচ সিকি সেরের। আন্দাজে সের দেখলাম দু'আনা আর নন্দর কাছে সেই আন্দাজে সের চার আনা। দেখলাম, এমনি করে বেশী বেশী হিসিনেবে দাম বলে ও ব্যাটা প্রতিদিন তিন টাকার বাজার থেকে এক টাকা চুরি করে। বুঝলে রঘু, তাই আমি ঠিক করেছি, এবার থেকে নন্দর চুরির মাত্রা আমিই ঠিক করে দেব। ওর লোভটা বড্ড বেশী বেড়ে গেছে। মানুষের অতো লোভ ভাল নয়।

টাকা ভাঙিয়ে নন্দ ফিরে এল।

ম্যাকলীন নন্দর হাত থেকে খুচরো পয়সাগুলো নিয়ে বললেন, তুই দুই হাত চিত্ কর দেখি?

নন্দ ম্যাকলীনের দিকে বোকা দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে দুই হাত চিত্ করল।

ম্যাকলীন নন্দর ডান হাতে গুণে গুণে ছ'আনা এবং বাঁ হাতে দু'আনা পয়সা রেখে মুচকি হেসে বললেন, জানিস নন্দ, কাল আমি বাজারে গেছলাম, গিয়ে দেখলাম, মাংস বিক্রী হচ্ছে বারো আনা সের দরে। রোজ আমার আধ টিন আধ সের মাংস লাগে না?

নন্দ মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ, হুজুর।

—বার আনা সের মাংস হলে আধ সের মাংসের দাম কত হয় জানিস? আট আনা। তা ছ'আনা তোর ডান হাতে আর দু'আনা তোর বাঁ হাতে দিয়েই। ডান হাতের পয়সাটা আমার বাজার খরচ, বাঁ হাতেরটা হল গিয়ে তোর—

নন্দ হতবাক। বিমূঢ়। এই পরিস্থিতিতে সে পড়বে বা পড়তে পারে, ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করে নি।

ম্যাকলীন জিজ্ঞেস করলেন, কিরে হিসেব বুঝলি?

নন্দ কি বলবে—উত্তর খুঁজে পেল না। কেবল মিট মিট করে অসহায় চাউনিতে তাকিয়ে রইল ম্যাকলীনের দিকে।

আমার অবস্থা শোচনীয়। রাজ্যের লাজি আমার পেটের নাড়ি ভুঁড়িতে পাক খাচ্ছিল। আমি কোন মতে হাসি সম্বরণ করেছিলাম।

ম্যাকলীনের রসিকতা মারাত্মক। এমন রসিকতা মুখ বুঁজে হজম করা দুষ্কর।

হাসির খোরাক জোটাতে গিয়ে নন্দকে যে ভাবে অপমান করলেন ম্যাকলীন, তা নন্দ সহ্য করতে পারল না। সে ম্যাকলীনের সামনে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল। লজ্জা, অপমান ও সংকোচে নন্দ চুপসে যাওয়া কানুসের মতো সংকুচিত হয়ে পড়ল।

মানুষ অনেক সময় ইচ্ছে করেও চুরি করে, কিন্তু চোর অপবাদ সহ্য করতে পারে না।

নন্দ এতদিন নির্বিবাদে বাজারের পয়সা চুরি করে এসেছে, কেউ তাকে বাধা দেয় নি। কিন্তু হঠাৎ আজ তার চুরি-বিদ্যার কারসাজি ধরা পড়াতে, তার আত্ম-সম্মানে প্রচণ্ড ঘা লাগল।

ম্যাকলীন হিসাব করে আড়াই টাকার বাজার খরচ দিয়েছিলেন। আড়াই টাকার মধ্যে দু'টাকার বাজার আর আট আনা নন্দর। ওটা তার চুরির মূল্য।

নন্দ সে দিন আর চুরি করে নি। দু'টাকার বাজার করে, বাকী পয়সা সে সালামের হাতে ফেরত দিয়ে উধাও হয়ে গেল।

ম্যাকলীন নন্দকে অনেক খোঁজা খুঁজি করেছিলেন। পান নি।

নন্দ পালাবার পর থেকে দিন কয়েক তিনি কেবল নন্দ প্রসঙ্গই আলোচনা করতেন, বলতেন রঘু, আমি ভুল করেছি, মস্ত ভুল করেছি। নন্দকে ও ভাবে অপমান না করলেও হত। ছেলেটা আমার জন্যে খুব feel করত।

নন্দ সেই যে পালাল, আর ফিরল না। বেচারী যেন হারিয়ে গেল। বিরাট পৃথিবীর গোলক ধাঁধায় তার সমস্ত পরিচয় মুছে গেল।

দীর্ঘ দিন নন্দকে আমি মনে রেখেছিলাম, ব্যক্তিগত ভাবে তাকে খুঁজে বার করার চেষ্টাও করেছিলাম, কিন্তু আমার চেষ্টা ফলপ্রসূ হয় নি।

মানুষের মিছিলে নন্দ মিলিয়ে গেল। নাম হীন, পরিচয় হীন এক অশিক্ষিত গ্রাম্য যুবক শুধু আমার মনের খাতায় কয়েকটা স্মৃতির আঁচড় রেখে গেল। নন্দকে আমার বড়ো ভাললাগত। তার কালো কুঁদে গ্রাম্য চেহারার মধ্যে কেমন এক অসংযত সৌন্দর্য ফুটে উঠত, বড়ো বড়ো ডাগর চোখের দৃষ্টিতে দুষ্টুমীর চাপা খেয়াল লুকিয়ে থাকত।

মনে এক দুর্বাহিত অপমানের জ্বালা নিয়ে নন্দ পালাল। পালান ছাড়া নন্দর অপমান ভোলার আর কোন গত্যন্তর ছিল না।

নন্দ পালিয়ে কার কি ক্ষতি করল জানি না, তবে ব্যাকলীনের একটু ক্ষতি সে করে গেল।

প্রাণবন্ত, উচ্ছ্বাসপ্রবণ ব্যাকলীন ধীরে ধীরে কেমন যেন বদলে যেতে লাগলেন নন্দর পালাবার পর থেকে। তিনি হাসি মসকরা ছেড়ে দিলেন।

হাসতে হাসতে, এক অসতর্ক মুহূর্তে যে আঘাত তিনি নন্দকে দিয়েছিলেন, সেই আঘাতের প্রতিশোধ নিতে লাগলেন নিজেকে আত্মপীড়ন করে।

অর্থাৎ চিরকালের মতো হল রসিকতা বিসর্জন দিয়ে।

নারী চরিত্র দুর্বোধ্য।

আশ্চর্য! যে গীতা ছিল শুধুমাত্র আমার পরিচিত প্রতিবেশিনী, সেই গীতা হঠাৎ পালটে হল আমার প্রিয়তা।

গীতা কি ভাবে এবং কেন যে আমায় ভালবেসে ফেলল, আমি কিছুতেই বুঝতে পারলাম না, ধীরে ধীরে আমিও গীতার দিকে ঝুঁকে পড়লাম। আমার মন গেল ডুবে গীতার চিন্তায়।

একদিন কথাচ্ছলে বললাম, আচ্ছা গীতা কি দেখে তুমি আমায় ভালবেসে ফেললে?

গীতা বলল, বলতে পারব না, তবে ভাল লেগেছিল বলেই তোমাকে ভালবেসে ফেললাম।

হয়তো বা গীতার কথাই ঠিক। ভাল লাগার পেছনে যুক্তি নেই। 'Love is blind।' সব ভালবাসাই অন্ধ।

যে মাটিতে ফসল ফলে না, বন্ধ্যা—সেই মাটির প্রেমেও মানুষ প্রাণ দেয়। প্রেম ব্যাখ্যাতীত।

প্রেম জীবনের বিলাস ঘর, দেবতার দুর্লভ আশীর্বাদ। প্রেমের জন্যে নরেও দুখ। যে মানুষ কারো প্রেম পায় নি, জীবনের কোন দুর্যোগ মুহূর্তে শোনে নি কোন নারীর নিভৃত আশ্বাস বাণী, সে আর যাই হোক বড়ো অভাগা। তার সব থেকেও কিছু নেই। পৃথিবীর শাশ্বত সম্পদ থেকে সে বঞ্চিত। তার জীবন বৃথা।

গীতা আমার জীবনে নেশা ধরিয়ে দিল।

কেরাণী জীবনের একঘেয়ে ক্লান্তির মধ্যেও গীতার ভালবাসা আমাকে মাতিয়ে তুলল।

প্রেমে পড়লে মেয়েরাও কেমন বদলে যায়। তাদের মনের কোমল অনুভূতিগুলো প্রেমের স্পর্শে সচেতন হয়ে ওঠে।

গীতার কথাবার্তা, হাবভাবের মধ্যেও কেমন কোমল মাধুর্যতা ফুটে উঠতে লাগল।

গীতাকে বললাম, তোমার আমার ভালবাসার পরিণতি কি জানো?

গীতা নির্বোধ চাহনী মেলে বলল, জানি না।

—বিচ্ছেদ!

গীতা চমকে উঠল। তার চমক-লাগা মূর্তি দেখে আমার মন আবুদি বিবুদি করে উঠল।

পারত পক্ষে গীতাকে আমি আঘাত দিই না। আর ভুলে কদাচিৎ দিয়ে ফেললেও সে আঘাতের বেদনা গীতার চেয়ে আমিই অনুভব করি বেশী করে।

গীতা আমার কোলে মাথা রেখে শুয়েছিল। আমি তার চুলের গুচ্ছ নিয়ে খেলা করছিলাম।

গীতা উঠে পড়ল। শাড়ির আঁচলটা ভাল করে গায়ে জড়াল। মাথার অবিন্যস্ত চুলকে হাত দিয়ে চেপে চেপে সাজিয়ে নিল, তারপরে ক্লান্ত স্বরে বলল, শিবুদা, আমি আর পারি না। জীবনটা বড্ড ভারী ভারী মনে হয়।

বললাম, আমারো কি ভাল লাগে গীতা?

—তোমরা হলে পুরুষ মানুষ। কত তোমাদের কাজ। তোমাদের একটা ভাল না লাগলে আর একটা ভাল লাগবে। কিন্তু আমাদের যে সে উপায় নেই। আমরা মেয়েমানুষ। ছোট একফালি জায়গার মধ্যেই আমাদের মরণ বাঁচন। কাজেই আমাদের বাঁধন ধারণাও সব একমুখো। আমরা চাই শুধু ঘর।

আশার শেষ নেই।

জীবনের সব আশাই কি মেটে? মেটে না।

গীতা চায় ঘর। চায় বর। তার বরণীয় বর বোধহয় আমি।

কিন্তু আমি কি তার আশা পূরণ করতে পারব!

পারব না: আমি এক অধম অক্ষম কেরাণী। মাইনে

মাইনায় জীবন আরম্ভ করেছি, একশ'টাকায় শেষ করব।

গীতাকে সুখী করা আমার সাধ্যের অতীত। ভালবাসার ধনকে ভেঙে কষ্ট দিতে চাই আমি চাই, গীতা সুখী তার কল্যাণ আমার কাম্য।

বললাম, গীতা তুমি আমাকে ভুলে যাও। আমার দুঃখ দৈন্যের মধ্যে নিজেকে আর জড়িও না। তুমি সুখ পাবে না।

গীতার দুচোখ ছাপিয়ে কান্না এল। দু'ফোঁটা তপ্ত অশ্রু তার গাল গড়িয়ে আমার হাতে এসে পড়ল।

গীতা আচ্ছন্ন কণ্ঠে বলে উঠল, তোমাকে পাওয়াই আমার চরম সুখ। আমি তোমাকেই চাই।

মনে মনে বললাম, তা হয় না। মন বড় বিচিত্র জিনিষ। আজ যেটা ভাল লাগছে বলে মনে হয়, কাল সেটা বিষিয়ে যায়।

নারী পুরুষের ভাল লাগার স্তর ভেদ আছে। নারী চায় শক্ত করে বাঁধতে, পুরুষ চায় শক্ত করে ছাড়তে। এই দুই বাঁধন-ছাড়ার টানাপোড়েনে কখন কে কোথায় ছিটকে পড়বে, কেউ বলতে পারে না।

গীতা আমার কাছে সরে এল বাঁ হাতটা আমার ঘাড়ে রাখল।

আমি স্পষ্ট অনুভব করলাম, তার সর্ব শরীর যেন কাঁপছে। বললাম, তোমার খুব জ্বর হচ্ছে না?

গীতা মৃদু হাসল। হাসতে গিয়ে তার মুখের অভিব্যক্তিতে কারুণ্যের ছায়া পড়ল।

গীতা বলল, শিবুদা' একটা কথা বলব? সহ্য করতে পারবে? বললাম, বল কি, তোমার কথা সহ্য করতে পারব না? একশো বার পারব। বল, কি বলবে?

গীতা ইতঃস্তত করছিল। বুঝলাম, তার মুখে সে কথা আসছে না। অতি কষ্টে এবং সলজ্জ ভঙ্গীতে গীতা বলে উঠল, বাবা আমার বিয়ে ঠিক করে ফেলেছেন। হয়তো আসছে মাসের মধ্যেই বিয়ে দিয়ে দেবেন।

—তাই নাকি! এতো বড় সুখবর! তাহলে বিরাট একটা খাওয়া পাচ্ছি। বলে আমি হেসে উঠলাম।

ভগবান জানেন, আমি হাসলাম, না কাঁদলাম! মানুষ কাঁদল হলেও অনেক সময় হেসে হাসি দিতে পারে না। আমার হাসিটা সত্যিকারের হাসি কিনা, কে বলবে!

হাসি আসবার পরে মনে হল, আমার বুকের ভেতরটা যেন কেমন ছটফট করছে, পাঁজরের একপাশে ছুঁচলো ব্যথার রেশ জেগে উঠেছে।

গীতা বলল, কথাটা শুনে তুমি হাসতে পারলে? আশ্চর্য পাষাণ লোক তো তুমি!

আমি নির্বাক। আর কিছু বলতে চাই না গীতাকে আমার বলা বোধহয় আজ থেকেই শেষ হয়ে গেল।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হল। মা শাঁখ বাজালেন। শাঁখের ধ্বনি আমার দুকানের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করে একেবারে বুকে গিয়ে ঘা মারল। বুকটা ঈষৎ কেঁপে উঠল।

গীতা অপেক্ষমান। আমি জানতাম, আমার জীবন এক টুকরো বন্ধ্যা জমি। ফসলের সম্ভাবনা নেই।

গীতাকে কেন্দ্র করে মনের মধ্যে অনেক কল্পনার ইমারত গড়ে তুলেছিলাম, কিন্তু আজকের এই ব্যর্থ সন্ধ্যায় সেই ইমারত ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। গীতা হারিয়ে গেল।

না, এবার গীতাকে বিদায় দেব। আর কিছুদিন পরে সে পরস্ত্রী হবে, তার ওপর আমার বিন্দুমাত্র অধিকার নেই।

আমাকে ছেড়ে গিয়ে গীতা সব কিছুই পাবে। পাবে ঘর বর। হবে গৃহিণী। তার ভাগ্যে ফাঁক নেই। যা নেই তাও পাবে, যা আছে তাও থাকবে।

কিন্তু আমার ভাগ্যে সবটাই ফাঁকি। আমি কিছুই পেলাম না। সব দিকে সব হারালাম।

বললাম, বেশ গম্ভীর স্বরে বললাম, গীতা তুমি বাড়ি যাও।

গীতা মুখ তুলে আমার দিকে তাকাল, বলল, তুমি আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছ শিবুদা?

—হ্যাঁ তাই দিচ্ছি। তুমি বাড়ি যাও।

গীতা হঠাৎ শিরদাঁড়া খাড়া করে আমার মুখোমুখি দাঁড়াল। চোখের দৃষ্টি বিস্ফারিত করে অস্বাভাবিক-ভাবে তাকাল। আমি তার দৃষ্টি সহ্য করতে পারলাম না, মাটির দিকে মাথা নামিয়ে নিলাম।

গীতা ধীর অথচ বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলল, আমাকে তাড়িয়ে দেবার অধিকার তোমার নেই। তুমি তাড়িয়ে দিলেও আমি জোর করে থাকব।

আমি হতবাক। বিমূঢ়।

গীতা মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী ঘরের এক ভীরু মেয়ে। কিন্তু এ যেন মেয়ের মুখ দিয়ে কেমন করে এমন সংঘর্ষিত বাক্য স্ফুরিত হল, শুধু এই চিন্তাই আমার মনকে গভীরভাবে নাড়া দিল।

আমি কিছুটা অভিভূত হলাম গীতার অধিকার আদায়ের স্পর্ধিত সাহস দেখে।

জানি না, জানতেও চাই না, গীতা তার বাক্যের সত্যমূল্য শেষ পর্যন্ত রক্ষা করতে পারবে কি না! না পারলেও ক্ষতি নেই।

ভাবের চরম উত্তেজনায় হঠাৎ যে স্পর্ধিত বাক্য গীতা উচ্চারণ করেছে তা আমার জীবনে এক চরম এবং পরম সত্য।

আজ বুঝতে পারলাম, প্রেম জীবনে এক সাধনা। প্রাণ মনে প্রেমের যে অনন্ত আকুতি ছটফট করে সেই আকুতি প্রকাশ করতে গিয়ে মেয়েরা কখনো কখনো নিজেকে হারিয়ে ফেলে, ভুলে যায় সমাজ সংসার, লোকলজ্জা।

গীতাও ভুলে গিয়েছিল নিজেকে। নিজের উদ্দাম প্রেমকে প্রকাশ করতে গিয়ে সে দারুণ এক দহন-করা বাক্য বলে ফেলেছে।

গীতা আমার জীবন থেকে হারিয়ে যাবে, হয়তো তাকে ভুলে যাব আমি, কিন্তু কখনো ভুলব না যে, কোন এক ব্যর্থ সন্ধ্যায় এক প্রেম পাগলিনী নারী তার উদ্দাম প্রেমকে স্থায়ী করতে গিয়ে একটা প্রচণ্ড-সুন্দর বলিষ্ঠ বাক্য উচ্চারণ করে আমাকে অবাক করে দিয়েছিল।

ম্যাকলীন টুরে বেড়িয়েছিলেন।

অফিসে তাঁকে না পেয়ে সন্ধ্যের সময় তাঁর কোয়ার্টারে হাজির হলাম।

আমার বগলে কতকগুলো জরুরী ফাইল যার কাজ সমাপ্ত করা দরকার।

ম্যাকলীনের প্রিয় আর্দালি বালাম আমায় দেখে মুচকি হাসল। তার হাসির রহস্য আমার বোধগম্য হল না।

ম্যাকলীনের কোয়ার্টারে আমার অবারিত দ্বার। যখন তখন যে-কোন অবস্থায় তাঁর কাছে যাবার ছাড়পত্র তিনি আমাকে আগেই দিয়ে রেখেছেন।

ভরা পূর্ণিমার সন্ধ্যে। চাঁদ উঠেছে। বসন্তকালের আকাশে শুভ্র পুঞ্জ পুঞ্জ সাদা মেঘের মেলা। কোয়ার্টারের সামনে ফিককার উঠোনে একটা ইজিচেয়ারে বসে আছেন ম্যাকলীন।

আমি ম্যাকলীনের সামনে দাঁড়ালাম। ম্যাকলীন বললেন, বসো বয়।

বসলাম ম্যাকলীনের পাশের একটা চেয়ারে।

ম্যাকলীনকে কেমন ক্লান্ত দেখাচ্ছে আজ। এমন বাউণ্ডুলে চেহারা আগে কখনো চোখে পড়েনি। চুলগুলো উস্কোখুস্কো। মুখে সেই অমায়িক হাসির প্রলেপ নেই।

চেয়ারে বসবার পরই আমার নজর পড়ল ম্যাকলীনের পাশের ছোট্ট টিপয়ের দিকে। দেখলাম, টিপয়ের ওপর একটা কাঁচের গ্লাস, দুটো লেবেল মারা রঙচঙে বোতল।

বোতল দুটো মদের।

ম্যাকলীন জিজ্ঞেস করলেন, what for you have come?

অতি ধীরে এবং সভয়ে আমার উদ্দেশ্য জানালাম।

এর আগে আমি ম্যাকলীনকে কোনদিন মদ খেতে দেখিনি। মদ যে তিনি খান, এমন আভাসও কোনদিন পাইনি।

আজকে ম্যাকলীনকে মদ খেতে দেখে আমি রীতিমত বিস্মিত হলাম এবং কিছুটা ভীতও হলাম। বলা যায় না, মাতাল অবস্থায় কি করতে কি করে বসবেন—তার ঠিক কি!

ম্যাকলীন বোতলের ছিপি খুলে গেলাসে মদ ঢেলে চক চক করে খানিকটা খেয়ে নিলেন, তার পরেই একটা চুরুট ধরালেন।

চুরুট ঘরিয়ে বললেন, আজ কোন কাজ করব না। তুমি ফাইলগুলো নিয়ে যাও।

এই-ই আমি চাচ্ছিলাম। এতক্ষণে আমার বুকের

ভেতরটা একটু হালকা হল। আমি কবে দুটো দম নিয়ে মন ছাড়লাম।

বাপস্ বাঁচা গেল !

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই ম্যাকলীন প্রশ্ন করে উঠলেন, কোথায় যাচ্ছ ?

—বাড়িতে স্যার।

—এখন বাড়িতে যাবে কেন ? বাড়ির প্রতি তোমার এতো টান কেন ? বসো।

অগত্যা বসতেই হল।

ম্যাকলীন একটা বোতল শেষ করে আর একটা বোতলের ছিপি খুললেন। আমি তাঁর মদ খাওয়ার ভঙ্গীটি সভয়ে লক্ষ্য করছিলাম। কারণ ইতিপূর্বে এতো কাছ থেকে কাউকে মদ খেতে দেখিনি।

মিনিট দশেক ম্যাকলীন কোন কথা বললেন না।

সন্ধে উতরিয়ে রাত নামল। বসন্তের হিমেল বাতাস গায়ে এসে কাপটা মারছিল। আমার শীত শীত করছিল।

ম্যাকলীন ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে শুয়েছিলেন, হঠাৎ তিনি মাথা তুলে আমার দিকে ঘোলাটে দৃষ্টিতে তাকালেন, তারপরে বললেন, রয় তুমি কখনো ড্রিংক করেছ ?

আমি তক্ষুণি বলে উঠলাম, না স্যার—কখনো ও জিনিষ স্পর্শ করিনি।

স্পর্শ করনি। Then you hate liquer ?

সভয়ে বললাম, না স্যার, hate করি না। তবে কোনদিন খাইনি। খেতে কেমন তাও জানি না।

—will you take wine, Roy ?

চমকে উঠলাম আমি। ম্যাকলীনের কথা বিশ্বাস করতে পারলাম না। তিনি কি পরীক্ষা করছেন আমায় ?

শঙ্কিত গলায় বললাম, না স্যার।

আমার উত্তর শুনে ম্যাকলীন হেসে উঠলেন। বেখাপ্পা হাসি। তার যেন কোন মানে নেই। হাসির দমকে তাঁর দেহের সবল মাংসপেশীগুলো নাচতে লাগল।

হাসি থামলে পর ম্যাকলীন বললেন, তোমার এই সিম্পল রিজেকশন্ আমার বড্ড ভাল লাগল রয়। Really you are good boy. I love you.

পুলকিত হলাম ম্যাকলীনের মন্তব্যে।

আমার ঘাড়ে হাত রেখে দম্বেছে আবার তিনি বললেন, কিছু খাবে রয় ?

বললাম, তা খেতে পারি স্যার।

—That's Good। বলেই ম্যাকলীন সালামকে হাঁক দিলেন :

সালাম কাছে এলে বললেন, রয়কো লিয়ে কুছ্ খানা লাও।

সালাম খানা নিয়ে এল। এক প্লেট মাংস ও দুটো বড়ো বড়ো কেক্।

আমি খাওয়া সুরু করলাম। ম্যাকলীন আমার খাওয়া গভীর মনযোগ দিয়ে দেখতে লাগলেন।

খাওয়া শেষ হলে জিজ্ঞেস করলেন, আর চাই ?

বললাম, না স্যার। পেট ভরে গেছে।

দেখতে দেখতে দ্বিতীয় বোতলটিও ম্যাকলীন নিঃশেষ করলেন। এইবার আর তিনি মাথা সোজা করে বসে থাকতে পারলেন না, গা এলিয়ে দিলেন ইজিচেয়ারের ওপর।

আমার মনের মধ্যে কাজের কথাটা বার বার যেন খোঁচা দিচ্ছিল। জরুরী কাজ। কালকের মধ্যে শেষ করে না ফেলতে পারলে ওপর থেকে কৈফিয়ত তলব হবে।

ভাবলাম, আর একবার জরুরী কাজের কথাটা ম্যাকলীনকে বলি, কিন্তু বলতে সাহসে কুলোল না। এখন তাঁর যে অবস্থা, তাতে কাজ করাও কঠিন। চোখ লাল। জবা ফুলের মতো। মুখ থমথমে। কথায় জড়তা। হাত পা কেমন যেন অবশ হয়ে নেতিয়ে পড়েছে।

আমি অধম কেরানী মাত্র। কাজের জন্যে আমার তেমন দায়-দায়িত্ব নেই। কাজ হলেও আমি সুনাম পাব না, না হলেও আমার শাস্তি হবে না। সব দায়িত্ব ম্যাকলীনের। তিনি হাকিম। কিন্তু তবু আমার মন মানছিল না। মনে হচ্ছিল, ম্যাকলীনকে দিয়ে কাজগুলো সমাধা করানোই আমার দায়িত্ব। কাজ না করার ফলে ম্যাকলীন কোন কৈফিয়তের জালে জড়িয়ে

পড়ুন—এ আমি চাই না। এই চরম্ভাতা খামখেয়ালি মানুষটার ওপর আমার অপরিসীম মায়া। মনে হয়, ম্যাকলীন যেন আমার নিজের লোক। আমার মনে তিনি স্থায়ীভাবে গেঁথে রয়েছেন।

যেখানে বসেছিলাম আমরা, তার আশপাশে ঝিঁঝিঁ ডাকছিল। ঝিঁঝিঁর একটানা সুর রাতের নিস্তব্ধতাকে আরো গাঢ় করে তুলল।

জ্যোৎস্নালোকিত নিশুত রাত আমার মনে এক মারাত্মক কল্পনার জাল বিস্তার করল। আমার মন যেন ভাষা মেলে ভেসে গেল। আমি উধাও হয়ে গেলাম এক স্বপ্নিল জগতে।

জানিনা, আমি কতক্ষণ কল্পনার সমুদ্রে অবগাহন করছিলাম। আমার সম্বিৎ ফিরল ম্যাকলীনের গম্ভীর কণ্ঠস্বরে।

সে এক আশ্চর্য কণ্ঠস্বর ম্যাকলীনের। মনে হল, তিনি যেন লম্বা ঘুম থেকে জেগেই কথা বলতে আরম্ভ করেছেন।

—রয়, আমি বোধহয় বদলি হয়ে যাচ্ছি। বড়ো করুণ অথচ গম্ভীর শোনাল ম্যাকলীনের কথা।

আমি নিশ্চুপ। দুঃখে বিদীর্ণ। ম্যাকলীনের বদলির কথা শুনে আমার বুকের ভেতরটা হাহাকার করে উঠল।

ম্যাকলীন বলে চললেন, আমার এক বন্ধু চিঠি লিখেছে যে, আমার নাকি বদলি হবার টার্ম এসে গেছে। দু'এক মাসের মধ্যেই গভর্নমেণ্ট আমাকে বদলি করবে। বুঝলে রয়, বদলি হতে আমার মন চায় না। বেশ ছিলাম এখানে। তোমাদের পাঁচজনের স্নেহ ভালবাসা পেয়ে আমার সব ব্যথা আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

আমার আগেই মনে হয়েছিল যে ম্যাকলীনের কোথায় যেন একটা প্রচণ্ড ব্যথা আছে। সে ব্যথা বোধ করি ভয়াবহ। যার জ্বালা ভোলার চেষ্টায় তিনি ছন্নছাড়া জীবনবৃত্তি গ্রহণ করেছেন।

ম্যাকলীন বললেন, তোমার কে কে আছে রয়?

বললাম, আমার সকলেই আছেন স্যার। মা বাবা ভাই বোন।

—You are really lucky but I am .....

বলেই ম্যাকলীন থেমে গেলেন। একবার আমার টচ্ছে জাগল, ম্যাকলীনের অসমাপ্ত কথার সূত্র ধরে একটা প্রশ্ন করে বসি, কিন্তু করার সাহস পেলাম না।

ম্যাকলীন আজ নেশাগ্রস্ত। নেশার ঘোরে তাঁর অনেক কিছুই বলতে মন যাচ্ছে, কিন্তু বলতে তাঁর বাধা আসছে। বাধা আমি। আমার পদ। আমি কেরানী যা চলে তিনি চরম্ভো সব কিছুই খুলে বলতেন।

আমি ম্যাকলীনের বিশ্বাসভাজন। শুধু কনফিডেন-শিয়াল ক্লার্ক বলে বিশ্বাসভাজন নই, ব্যক্তিগতভাবেও আমি বিশ্বাসী। অন্তত ম্যাকলীন তাই মনে করেন বলে আমার ধারণা।

আমার ধারণা যে মিথ্যা নয়, তারই এক জলন্ত প্রমাণ পেলাম আজ।

স্রোতে ভাসন্ত মানুষ খড়কুটো আঁকড়ে ধরেও বাঁচার অক্ষম চেষ্টা করে। ম্যাকলীনের কাছে আমিও খড়কুটোর মতো তুচ্ছ।

কিন্তু কি আশ্চর্য, ম্যাকলীন আমার মতন তুচ্ছ ব্যক্তিকে আজ আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরলেন। নিজের ব্যথা বেদনা প্রকাশ করার তাড়নায় আকুল হয়ে উঠলেন।

ম্যাকলীনের ব্যথিত কাহিনী শুনে আমি দু ফোঁটা তপ্ত অশ্রু ফেলতে পারি, তাঁর বেদনায় নীরব সহানুভূতি জানাতে পারি, কিন্তু তাঁর উপকারে আসতে পারি না। পারিনা, এই জন্যে যে, আমার স্থান তাঁর অনেক নীচে। আমি অধম, আর তিনি উত্তম। আমি কেরানী। তিনি হাকিম। আমার জীবন কাটে অসম্মান আর হীনতার মধ্যে, তাঁর জীবন এগোয় সুপরিগতি আর প্রাচুর্যের দিকে।

এ পৃথিবীর আর কেউ জানুক বা না জানুক, অন্তত আমি জেনে গেলাম যে একজন তরুণ আই-সি-এস রাজকর্মচারীর জীবনে কি নিদারুণ ব্যথার ক্ষতচিহ্ন! প্রত্যহ সেই ক্ষতের যন্ত্রণায় তিনি ক্ষতবিক্ষত হচ্ছেন। কেউ এগিয়ে আসছেনা তার ক্ষতচিহ্ন নিরাময় করতে। তিনি দিনে রাতে তাড়িত বেদনাহত মানুষের মতো ছুটে বেড়াচ্ছেন। তাঁর ছোটার না আছে লক্ষ্য, না আছে বিরাম। হায়রে হতভাগ্য রাজকর্মচারী!

ম্যাকলীন যখন লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ে বি-এ পড়েন, তখন একজন ইংরেজ তরুণীর সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। আলাপ ক্রমশ প্রণয়ে রূপান্তরিত হয়।

তরুণীর নাম মার্গারেট। তার বাবা লাহোরের এক ব্যাঙ্কারীর ম্যানেজার। মোটা মাইনে পেতেন মার্গারেটের বাবা। মার্গারেট প্রাচুর্যে এবং সুখের মধ্যে বেড়ে উঠেছিল।

ম্যাকলীনের বাবার কার্পেটের ব্যবসা ছিল। একসময়ে এই ব্যবসা থেকে প্রচুর পয়সা তিনি কামিয়েছিলেন কিন্তু হঠাৎ তাঁর ব্যবসা পড়ে গেল। খুচরো বাজারেও তিনি কুলে কেঁপে উঠতে পারলেন না।

ম্যাকলীনের বাবা ছিলেন উদার, ধর্মভীরু। ব্যবসা করতে গেলে যে বিসর্জন দেন নি। মিথ্যা কথা তিনি বলতেন না।

কার্পেটের ব্যবসায় লোকসান যাবার ফলে ম্যাকলীনের বাবার বাজারে প্রচুর ধার দেনা হয়েছিল। ধার দেনায় জর্জরিত হয়ে তিনি অত্যধিক মানসিক কষ্ট পাচ্ছিলেন।

ম্যাকলীনের বাবার আর একটি অশান্তি ছিল তাঁর অ্যাংলোইণ্ডিয়ান স্ত্রীকে নিয়ে। ম্যাকলীনের মায়ের দুর্ব্যবহার ও উচ্ছৃঙ্খলতা ক্রমশ বাড়ছিল। ম্যাকলীনের বাবা স্ত্রীর দুর্ব্যবহার ও উচ্ছৃঙ্খলতায় উত্যক্ত হয়ে উঠেছিলেন।

ম্যাকলীনের মা দু-হাতে টাকা উড়োতেন। পোষাক পরিচ্ছদে, আহারে-বিহারে তাঁর আভিজাত্য ও জাঁকজমক না দেখালে চলত না। ম্যাকলীনের বাবা স্ত্রীর অভিলাষ সাধ্যমত পূরণ করতে চেষ্টা করতেন। যতদিন তাঁর সামর্থ ছিল, ততদিন তিনি স্ত্রীকে টাকা দিয়ে এসেছেন।

ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ম্যাকলীনের বাবা দেনার দায়ে পড়লেন। বাজারে তাঁর প্রচুর ঋণ। ঋণ শোধ দেবার উপায় নেই তাঁর। তিনি মহা ফাঁপড়ে পড়লেন।

ম্যাকলীনের বাবা বাড়ির বাইরে বেরোন ছেড়ে দিলেন। রাস্তায় নামলেই তাঁকে দেনদারেরা ছেঁকে ধরত, লোকে ঠাট্টা ইয়ারকী করত।

ম্যাকলীনের বাবা মুখ বুঁজে সব সহ্য করতেন। পাঁয়ত্রিশ প্রাণ তাঁর, বলশালী সুদৃঢ় দেহ। কাউকে বড় গলায় তিনি কিছু বলতেন না। পৃথিবীতে তাঁর কেবল দুটি শান্তির আশ্রয় ছিল। এক—ভগবান যীশু। অপর—তাঁর পুত্র ম্যাকলীন। ম্যাকলীনকে তিনি প্রাণাপেক্ষা ভালবাসতেন, নিজের আদর্শে তাকে মানুষ করে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন।

মায়ের চরিত্রের সংস্পর্শ থেকে দূরে সরিয়ে রাখবার জন্যে ম্যাকলীনের বাবা ম্যাকলীনকে বাড়িতে থাকতে দেন নি। তিনি ম্যাকলীনকে লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। ছেলেকে তিনি বাড়িতে আসতে দিতেন না।

ম্যাকলীনের বাবা যতই নিঃস্ব হতে লাগলেন, ততই ম্যাকলীনের মার অত্যাচার বাড়তে লাগল। রাতদিন তিনি স্বামীর সঙ্গে টাকা পয়সা নিয়ে খুনসুটি করতেন, স্বামীর অক্ষমতাকে বিদ্রূপ করতেন। ম্যাকলীনের বাবা স্ত্রীর গঞ্জনা নীরবে হজম করতেন।

ভালমানুষ হওয়াই একটা অপরাধ। যৌবনে যখন তাঁর দেহে মনে প্রচুর বল ছিল, তখন তিনি যা চেয়েছেন, তাই করেছেন। ধার চাইতে এসে কাউকে ফিরিয়ে দেন নি। স্ত্রীকে মুঠো মুঠো টাকা দিয়ে তাঁর বিলাস ব্যসনের বাসনা চরিতার্থ করেছেন। যারা একদিন তাঁর কাছ থেকে হাত পেতে টাকা নিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেনি, তারাই তাঁর অসময়ে মুখ টিপে হাসাহাসি করত, তাঁর নামে নিন্দা রটাত।

কিন্তু ম্যাকলীনের বাবা বেপরোয়া। নিন্দা গ্লানি তিনি গায়ে মাখতেন না।

ম্যাকলীনের মার অত্যাচার যেদিন চরমে উঠে ম্যাকলীনের বাবার বৈর্যচ্যুতি ঘটার উপক্রম হত, সেদিন তিনি তাঁর পিতৃদত্ত পুরনো বাইবেল নিয়ে পড়তে বসতেন, নয়তো তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতেন। বেরিয়ে গিয়ে সটান হাজির হতেন ছেলের হোস্টেলে।

ছেলের হাত ধরে হোস্টেল থেকে বেরিয়ে এসে লাহোরের নির্জন রাজপথে ঘুরে বেড়াতেন আর স্বপ্ন দেখতেন, ম্যাকলীন বড়ো হবে। বাড়া চরে মানুষের মতন মানুষ হবে। তিনি যে শিক্ষা ম্যাকলীনকে এতদিন দিয়ে এসেছেন, সেই শিক্ষা পরিপূর্ণভাবে সে আয়ত্ত করতে পারবে। তিনি যে প্রবঞ্চনার জ্বালা ভোগ করছেন, সেই জ্বালাও যেন ম্যাকলীনকে কখনো

দহন না করে। ম্যাকলীন যেন মানুষের ওপর আস্থা রাখতে পারে। অন্তত অবিশ্বাস, সীমাহীন বঞ্চনার মধ্যেও বাস করে ম্যাকলীন ঈশ্বরের একমাত্র আশীর্বাদ ভালবাসাকে জীবনে প্রতিষ্ঠা করতে পারে। ভালবাসাই জীবনের একমাত্র মাধুর্য। ভালবাসাহীন জীবন শুষ্ক—মরুভূমির মতো উষর।

লাহোর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি-এ পাস করে ম্যাকলীন আই-সি-এস ট্রেনিং নিতে দেরাদুন গেলেন। ম্যাকলীন আই-সি-এস পরীক্ষায় পাস করলেন।

যেদিন ম্যাকলীনের আই-সি-এস পাস করার সংবাদ তাঁর বাবার কাছে পৌঁছুল, সেদিন তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। তাঁর চোখমুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি নতমস্তকে যিশুর কাছে তাঁর পুত্রের মঙ্গল কামনা করে ম্যাকলীনকে এক চিঠি লিখলেন। চিঠিতে জানালেন যে, ম্যাকলীন যেন সত্য-পথে চলে। সত্যের পথ ভয়ানক কুটিল। ভয়ংকরও বটে। ভয় দেখে বা ফাঁকি দিয়ে জয় করার প্রলোভনে কখনো যেন সত্যভ্রষ্ট না হয় ম্যাকলীন।

ম্যাকলীনের মার শেষ জীবন কেটেছিল নিদারুণ দ্বন্দ্বের মধ্যে। তিনি চিরজীবন বড়ো হাওয়ার মতো কামনা বাসনার পেছনে ছুটে নিজেকে ক্ষত বিক্ষত করলেন। তিনি না পেলেন স্বামী সুখ, না পেলেন পুত্রের স্নেহ।

ম্যাকলীনের মা অবশেষে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর নারী জীবন অসার্থক হয়ে গেল। তিনি হতাশায় ভেংগে পড়লেন। বাঁচার আশা তাঁর তিমিত হয়ে এল।

ম্যাকলীনের মা কোনদিন নিজের অন্তর্বনের খোঁজ করেন নি। কেবল বেয়ালের তাড়নায় হন্যে হয়ে ছুটে ছুটে তিনি নিজের নারীত্ববোধকে পঙ্গু করে রেখেছিলেন। যখন তিনি নিজের অন্তর্বনের দিকে দৃষ্টি দিলেন, তখন দেখলেন, তিনি হারিয়ে গেছেন, ফুরিয়ে গেছেন, তাঁর বিশ্বাস ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। মন মরে গেছে। মরা মন নিয়ে নারীত্বের সাধনা চলে না। তাই তিনি পৃথিবী থেকে পালাবার পথ খুঁজতে লাগলেন।

ম্যাকলীনের বাবা রোগশয্যায়। তিনিও মহাজীবনের পবিত্র স্পর্শের আশায় দিন গুনছেন। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ভগবান যিশু। রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে তিনি মৃত্যুর কল্পনা করতে লাগলেন।

মৃত্যু! কতো সুন্দর! মৃত্যুর উদ্দেশ্য এক জীবন থেকে আর এক জীবনে উৎক্রান্তি।

ম্যাকলীনের বাবা ভাবতে লাগলেন, যেখানে তিনি আশ্রয় পেতে যাচ্ছেন, সেটা ভগবানের রাজত্ব। সেখানে কামনার গন্ধ নেই, নেই লালসার ঘৃণ্যতা। ভগবানের রাজত্ব অপরূপ, আনন্দময়। সেখানে কেবল চলছে প্রেম আর ভালবাসার নিষ্পাপ খেলা।

বর্ষাক্লান্ত রাত। আকাশ ঘন কালো মেঘে ছেয়ে গেছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ঝড় বইছে। ঘন ঘন মেঘ ডাকছে।

ম্যাকলীনের বাবা বিছানায় শুয়ে আছেন। ঘুম নেই তাঁর চোখে। তিনি উদাস দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছেন কড়িকাঠের দিকে।

এমন সময় ম্যাকলীনের মা গিয়ে বসলেন স্বামীর মাথার কাছে। বসে স্বামীর কপালে হাত রাখলেন।

বহুদিন, কতোদিন তা স্মরণ হয় না ম্যাকলীনের বাবার, তিনি আবার স্ত্রীর কোমল করপল্লবের স্পর্শ অনুভব করলেন।

ম্যাকলীনের বাবা তাঁর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলেন, বলে উঠলেন, রেবেকা! তুমি!

ম্যাকলীনের মা রেবেকা নীরব। কথা বলার স্পৃহা নেই তাঁর। রেবেকা জীবন থেকে ভাষাকে দূর করতে চান। ভাষাই কামনার ইন্ধন যোগায়।

ম্যাকলীনের বাবা রেবেকার মাথায় হাত রাখলেন, বললেন, তুমি কিছু বলবে?

রেবেকা বললেন, না ডেভিড, আমি কিছু বলব না। শুধু তোমার কাছে কিছুক্ষণ বসব।

প্রায় ঘণ্টা খানেক স্বামীর কাছে বসেছিলেন রেবেকা। জীবনে এই প্রথম তিনি পরম শ্রদ্ধা নিয়ে স্বামীর কাছে বসলেন।

স্বামী-সুখ কাকে বলে রেবেকা কোনদিন বুঝতে চেষ্টা করেন নি। হঠাৎ ক্লান্ত হয়ে যখন স্বামীর প্রশান্ত আশ্রয়ে নিজেকে সঁপে দিলেন, তখন বুঝতে পারলেন, সারা জীবনটা কেবল তিনি ভুলেই কাটিয়ে

এসেছেন। স্বামীর কাছ থেকে উঠে আসার আগে রেবেকার চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল। চোখের জল মুছে রেবেকা স্বামীকে বললেন, ডেভিস, আর আমার বাঁচার ইচ্ছে নেই। তোমাকে আমি অনেক কষ্ট দিয়েছি। তুমি আমায় ক্ষমা করো। আর ম্যাকলীনকে আমার আশীর্বাদ জানিও। না না, আশীর্বাদ জানাতে আমার ভয় হয়। জীবনে আমার কোন সুকৃতি নেই। তাই হয়তো আশীর্বাদ মিথ্যা হয়ে যাবে। তার চেয়ে ম্যাকলীনকে বলো যে আমি তার মঙ্গল কামনা করে গেছি।

ডেভিস রেবেকার কথা শুনে হতবাক হয়ে গেছিলেন। তিনি অবাক হয়ে রেবেকার দিকে তাকিয়ে থেকে ভেবেছিলেন, বড়ো দেরী করে রেবেকা তার ভুল বুঝতে পেরেছে। জীবনের শুরুতে যদি সে ভুল বুঝতে পারত তাহলে রেবেকার জীবনটা এমন ব্যর্থ হত না!

সত্যি সত্যি রেবেকা পালিয়ে বেঁচেছিলেন।

সেদিনই শেষ রাতে তিনি গলার দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে জীবনের জ্বালা জুড়োলেন।

স্ত্রীর আত্মহত্যায় ডেভিস আরো ভেঙে পড়লেন। তাঁর রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল এবং বাঁচার আশা প্রায় ক্ষীণ হয়ে এল।

ম্যাকলীন আই, সি, এস পাস করে দেরাদুনে বসে আছেন। তাকেও তিনি কোন খবর দিলেন না। মরবার আগের দিন কেবল একটা পোস্টকার্ডে দুছত্র চিঠি লিখে জানিয়ে দিলেন যে ম্যাকলীন যেমন তার মার মৃত্যু সংবাদ সহ্য করেছে, তেমনি যেন সহ্য করতে পারে তার বাবার মৃত্যু সংবাদ।

ব্যস, এইটুকু লিখেই তিনি থেমে গেছিলেন, আর লিখতে পারেননি।

বাবার চিঠি পেয়ে ম্যাকলীন ছুটে এসেছিলেন লাহোরে, এসে বাবাকে দেখতে পাননি। লাহোরে পৌঁছুবার দুদিন আগেই তাঁর বাবার মৃত্যু হয়েছিল।

বাবার মৃত্যু ম্যাকলীনকে দিল নিদারুণ আঘাত। তিনি মুষড়ে পড়লেন। তাঁর চলার পথ অন্ধকার হয়ে গেল।

ম্যাকলীন তাঁর বাবাকে মনে করতেন, তাঁর জীবনের অভ্রান্ত গাইড। তিনি মাঝে মাঝে বলতেন, My father is my hero of life। আমি তাঁর আদর্শে মানুষ।

ম্যাকলীন তাঁর বাবার শেষকৃত্য শেষ করলেন। তাঁর বাবার হাজার তিরিশেক টাকা ঋণ হয়েছিল। ম্যাকলীন বাবার কার্পেটের ব্যবসা বেচে দিয়ে পনেরো হাজার টাকা পেলেন। সেই পনেরো হাজার টাকা পাওনাদার দের মিটিয়ে দিয়ে বাকী পনেরো হাজার টাকার ঋণের বোঝা নিজের মাথায় তুলে নিলেন।

লাহোরের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করার আগে ম্যাকলীন তাঁর প্রিয়তা মার্গারেটের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। মার্গারেট আগের মতন আপ্যায়ন করল না তাঁকে। মাপা ভদ্রতায় যেটুকু জিজ্ঞাসাবাদ করা প্রয়োজন, তাই সে করল।

মার্গারেটের কাছ থেকে শেষ বিদায় নিয়ে তিনি ফিরে এলেন কর্মস্থলে।

সমস্ত মানুষ ও জীব জগতের ওপর ম্যাকলীনের বিতৃষ্ণা ধরে গেল। কাকে তিনি বিশ্বাস করবেন? পুরুষ? না। নারী? না। কাউকেই বিশ্বাস করবেন না।

আশ্চর্য! যে মার্গারেট ছিল তাঁর হৃদয় মনের সহচরী সে-ও মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে, ভুলে গেছে। তার নাকি নতুন প্রিয়ত জুটেছে।

নতুন প্রিয়তকে কেন্দ্র করে মার্গারেট আবার সুখ স্বপ্ন দেখছে। একদিন ম্যাকলীনকে সে তার সব কিছু দিয়েছিল, সব দিয়ে ম্যাকলীনকে পেতে চেয়েছিল, অথচ সেই ম্যাকলীন যখন তার দ্বারে গিয়ে উপস্থিত হলেন, তখন সে জানাল নিরুৎসব অভ্যর্থনা।

মেয়েদের মন কখনো শূন্য থাকে না। মার্গারেটেরও মন শূন্য থাকেনি। ম্যাকলীনের অনুপস্থিতিতে সে আর একটি মানুষ জুটিয়ে নিয়েছে।

কর্মস্থলে ফিরে এসে ম্যাকলীন কাজ আরম্ভ করলেন। তাঁর মন বিতৃষ্ণ, হৃদয় ক্ষতবিক্ষত।

ম্যাকলীনের অন্তর দিনরাত বার্থ প্রেমের জ্বালায় জ্বলে পুড়ে যেতে লাগল। তিনি পাগল হয়ে যাবার উপক্রম হলেন।

প্রেম জীবনের আশীর্বাদ, কিন্তু সেই প্রেম যদি ব্যর্থ হয়, যদি জীবির শূন্যতা ধরা পড়ে প্রেমে, তবে তার

মতো অভিশাপ আর কিছু নেই।

ম্যাকলীনের জীবনও অভিশপ্ত হয়ে উঠল, আশা আকাংক্ষা কামনা বাসনা তাঁর গেল মিলিয়ে। তিনি হয়ে গেলেন অন্য এক ধরণের মানুষ। ভালবাসাহীন, বিশ্বাস, কর্তব্য-নিষ্ঠুর এক যান্ত্রিক মানুষ। যাঁর পরিচয় মানুষ ম্যাকলীন নয়, আই, সি, এস ম্যাকলীন।

ম্যাকলীন থামলেন। তাঁর কাহিনী শেষ হল। শেষ হল না কাহিনীর বিষাদ-ক্লিষ্ট কাহিনী। পাক খেতে লাগল। আমি বাড়া দুঘণ্টা বজ্রাহতের মতো অভিভূত হয়ে ম্যাকলীনের কাহিনী শুনছিলাম।

রাত ন'টা বেজে গেছে।

আকাশে অগণিত তারা জ্বল জ্বল করছে। বসন্তের মন-খুনো-করা ঈষৎ হিমেল বাতাস মাতালের মতো বইছে।

আমি মার্গারেটের কথা ভাবছিলাম। মার্গারেট ম্যাকলীনকে একেবারে শেষ করে দিয়েছে। ম্যাকলীন দেউলে হয়ে গেছেন। বাবা মার মৃত্যু শোক হয়তো তিনি ভুলতে পারতেন যদি মার্গারেটকে পাশে পেতেন!

মার্গারেটের প্রতি আমার ঘৃণা জন্মাল। তাকে আমি কখনো দেখিনি, দেখবো বলে আশাও নেই। কিন্তু কেন জানি না, আমার চোখের সামনে একটা কল্পিত মেমসাহেবের মূর্তি ভেসে উঠল। সে মুখে কলঙ্কের গভীর ক্ষতচিহ্ন, চোখের দৃষ্টিতে সর্বস্ব কেড়ে নেবার ইশারা।

রাত বাড়ছে।

ম্যাকলীনের কাছ থেকে বিদায় চেয়ে নিলাম, বললাম, এবার যাই স্যার?

—যাবে? আচ্ছা যাও। কিন্তু—

বলেই ম্যাকলীন তাকালেন আমার দিকে। তাঁর দৃষ্টির খোলাটে ভাবটা কেটে গেছে। মুখ পরিষ্কার, চলচলে।

ম্যাকলীন ধরা গলায় বলতে লাগলেন, তোমায় একটা উপদেশ দিয়ে রাখি বয়, ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। Don't belive women. They are imposters। আমি আজ নিঃস্ব হয়ে গেছি। ভালবাসার অপর পিঠ হল ঘৃণা। Now I hate the women. My belief for womanhood in ebbing···একমাত্র মার্গারেট, হ্যাঁ দ্যাট্ উইচ আমাকে শূন্য করে দিয়েছে। আমি ভাসিয়ে গেছি। আমার সমস্ত সম্ভাবনা লুপ্ত। I am completely ruined, lost···

অফিসে যেতে একটু দেরী হয়েছিল।

হেডক্লার্ক যোগেশবাবু বললেন, খাইছেন হ'শর। সাহেব আপনারে দু'দুবার খোঁজ করছিলেন। যান, গিয়া দেখা করেন।

ম্যাকলীন খাসকামরায় বসে চুরুট টানছিলেন। এজলাসে বসে মদ্যপান করা নিষিদ্ধ। ম্যাকলীন খন খন চুরুট টানেন বলে এজলাস থেকে উঠে এসে মাঝে মাঝেই খাস কামরায় বসেন।

পর্দা সরিয়ে খাসকামরায় ঢুকতেই চোঁচট খেলাম—why are you so late? ম্যাকলীন হুংকার ছাড়লেন, আজ আমি তোমাকে ক্ষমা করব না। I must punish you।

আমি বলির পাঁঠার মতো ভয়ে কাঁপছিলাম। আমার গলার ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল।

ম্যাকলীন সজোর গলায় জিগ্যেস করলেন, কেন অফিস আসতে দেরী হলো?

বললাম, বাড়ির কাজে আটকে পড়াতে—

—No no. That is a lame excuies। বাড়ির কাজের জন্যে অফিসের কাজ নেগলেক্ট করা চলবে না। যাও, কাজে যাও। বলে তির্যক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন ম্যাকলীন।

আমি মাথা হেঁট করে খাস কামরা থেকে বেড়িয়ে এলাম।

নিজের চেয়ারে বসে ভাবতে লাগলাম, নাঃ এ চাকরি থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল। এর চেয়ে পান বিড়ির দোকান করলে আত্মসম্মান থাকত। চাকরি! গোলামী! কোন স্বাধীনতা নেই। পান থেকে চুন খসলে চোখ রাঙানি আর ধমক। সামান্য কয়েকটা টাকার জন্যে আত্মমর্যাদা ও নিজের মনুষ্যত্ববোধকে খাটো করে রাখা।

রমেশবাবু চাপা খুশিতে মশগুল। ম্যাকলীন আমার হুকুম দিয়েছেন শুনে তিনি আশাতীত উল্লসিত।

রমেশবাবু খুশির ভাবটা যথাসম্ভব গোপন করে বলে উঠলেন, ও স'শয় কথা কন না ক্যান? বলি হইল কি? আমি নিচুপ। গ্লানি আর অপমানে আমার মন তিক্তবিরক্ত।

কেরাণী জীবনে অনেক দুর্ভোগ। সেই দুর্ভোগের সম্মুখীন হলাম আজ। ম্যাকলীন আমার হুকুম দিয়েছেন, শাস্তি দেবেন বলে শাসিয়েছেন। কিন্তু আমার অপরাধ কি? দেরী করে অফিস আসা? সে তো অনেকেই আসে। কই, তাদের বেলায় তো শাস্তির প্রশ্ন ওঠে না!

আমাকে উপদেশ দিতে রমেশবাবু মুখর হয়ে উঠলেন, বলতে লাগলেন, চাকরি! এ এক গড্ডলিকা ভায়া। চাকরি বজায় রাখতে হইলে সব দিক চোখ কান খাড়া রাখতে হইব। আমরা হলাম গিয়া ছা পোষা মানুষ—

বিদ্রোহ করে উঠল মন। রমেশবাবুর এক ঘেয়ে উপদেশ শোনার মতো ধৈর্য নেই আমার।

চেয়ার ছেড়ে উঠে এলাম।

ভাল লাগে না, মোটেই শুনতে ইচ্ছে হয় না এদের নির্জীব মনের কাকুতি। সেই এক কথা। আমরা ছা-পোষা মানুষ, আমরা গরীব কেরাণী। আমাদের মুখ বুজে সব সহ্য করতে হবে।

কিন্তু কেন সহ্য করব? আমরা কি মানুষ নই? একশবার মানুষ। মনুষ্যত্বের মর্যাদা আমাদেরও আছে। আমরাও পারি শাসনের নাম করে পীড়ন করবার অধিকারকে খর্বিত করতে।

উন্মুক্ত কোর্ট প্রাঙ্গণে কিছুক্ষণ ঘুরলাম। ঘোরার ফলে মনের বিক্ষুব্ধতা কিছু কমল। বেলা এগারোটা বাজলে পর আবার এসে নিজের চেয়ারে বসলাম।

কাজে হাত দিতে না দিতেই শুনতে পেলাম রমেশবাবুর কণ্ঠস্বর।

মনে হল, রমেশবাবু তাঁর কণ্ঠস্বরে চড়া সুরে তুলেছেন। তিনি বলছেন, আপনি ঘন ঘন চেয়ার ছাইড়া কোথায় যান?

বললাম, কেন কি হয়েছে?

—কি হইছে? আসেন এই দিকে—দেখাই।

—আমায় যেতে হবে না, আপনিই বলুন।

—সাহেব আপনারে ওয়ারনিং দেছেন।

ম্যাকলীন আমায় ওয়ারনিং দিয়েছেন? অসম্ভব। অবিশ্বাস্য। আমি নিজে চোখে দেখলেও বিশ্বাস করব না।

অফিসে আসতে সামান্য একটু দেরী হয়েছে—এই অপরাধে তিনি আমায় ওয়ারনিং দিতে পারেন না। আমাকে শাস্তি দেবার মতো মনোবল ম্যাকলীনের নেই। থাকতেও পারে না।

ম্যাকলীনকে আমি চিনি. জানি। অতি কাছে থেকে তাঁকে অহরহ দেখছি। আমার দেখার ভুল হতে পারে না।

ম্যাকলীন আমার প্রতি মাত্রাতিরিক্ত সদয়। আমাকে শাস্তি দিলে আমি যতটুকু না দুঃখ পাব, তার চেয়ে ঢের ঢের বেশী দুঃখ পাবেন তিনি।

রমেশবাবু বললেন, দ্যাখেন তো স'শয়, আপনারে নিয়া মহা ঝামেলায় পড়লাম। এখন আমি কি করি—কইতে পারেন? আপনি হলেন গিয়া আমার স্নেহভাজন. আপনারে তাই চট্ কইরা কিছুই কইতে পারি না।

রমেশবাবুর প্যানপ্যানানি শুনতে ভাল লাগল না, আমি উঠে এলাম তাঁর কাছে বললাম কই দেখি সাহেব কেমন ধারা ওয়ারনিং দিয়েছেন?

রমেশবাবু ছোট্ট একটুকরো কাগজ আমার হাতে এগিয়ে দিলেন।

ম্যাকলীন আমায় মোটেই ওয়ারনিং দেন নি। তিনি লিখেছেন যে, আমি যেন প্রত্যহ সময়মত অফিসে হাজিরা দেবার জন্যে সচেষ্ট হই। ব্যস! আর কিছু লেখেন নি তিনি।

আমি কাগজের টুকরোটুকু পড়ে পকেটে ভরতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় রমেশবাবু হাঁ হাঁ করে উঠলেন, বললেন আরে করেন কি, করেন কি! নাঃ আপনি একেবারে পোলাপান। দ্যাখছেন না, কাগজটার নীচে সাহেবের সই আছে? ওটা অফিস ফাইলে থাকবো জিজ্ঞেস করলাম, কেন অফিস ফাইলে থাকবে?

—হায় কপাল! এই বুদ্ধি নিয়া আপনি চাকরি

করতেছেন। সাহেব আপনারে ওয়ারনিং দেছেন কি ঠাট্টা করতে? সাহেবের ওয়ারনিং আপনার সার্ভিস বুকে নোট করাইতে হইব না? এই দ্যাখেন, রেকর্ড রুম থেইকা আপনার সার্ভিস বুক কল করাইছি, সার্ভিস বুকে ওয়ারনিং নোটেড করাইয়া সই এর লাইগা সাহেবের কাছে পাঠাইয়া দিব।

আমি কোন কথা না বলে কাগজটা ফিরিয়ে দিলাম রমেনবাবুকে। রমেনবাবু হাসি মুখে কাগজটা নিয়ে ড্রয়ারের মধ্যে গুঁজে দিলেন।

বেলা গোটা চারেকের সময় ম্যাকলীনের চেম্বারে ঢুকলাম। চেম্বারে বসে বসে ম্যাকলীন চুরুট টানছিলেন।

আমায় দেখে ম্যাকলীন বলে উঠলেন, হ্যালো রয়, হোয়াট নিউজ?

আমি গম্ভীর। আমার মুখ ভার। আমি কোন কথা না বলে ম্যাকলীনের সামনে দাঁড়ালাম।

—কি ব্যাপার, তোমায় যেন কেমন দেখাচ্ছে আজ। বললেন ম্যাকলীন।

আমার হাতে একটা ফাইল ছিল। ফাইলটা টেবিলের এক পাশে রাখলাম, বললাম আজকেই চিঠি-গুলো সই করে দেবেন স্যার। কালকের সকালের ডাকে ছাড়ব।

—Excuise me, Roy. I am very tired। তুমি বরং কাল সকালেই আমার কোয়ার্টারে এসো।

ফাইলটি হাতে তুলে নিলাম। টেবিল থেকে ফাইল তুলতে গিয়ে ম্যাকলীনের সংগে আমার চোখাচোখি হল। ম্যাকলীন বলে উঠলেন, তোমাকে যেন খুব গ্রেভ দেখাচ্ছে আজ। কি হয়েছে? বললাম কিছু না স্যার।

—No no. I can't belive। নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। বলো, আমায় খুলে বলো কি হয়েছে?

আমি সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম। সুযোগ মিলে গেল। বললাম আপনি আমায় যে ওয়ারনিং দিয়েছেন, সেটা কি সার্ভিস বুকে নোট করতে বলেছেন?

—ওয়ারনিং? কিসের ওয়ারনিং? ম্যাকলীন ভ্রু কুঞ্চিত করে তাকালেন আমার দিকে। বললেন, আমার তো কিছুই মনে পড়ছে না। আমি বললাম, আমি আজ দেরী করে অফিস এসেছিলাম বলে আপনি একটা ওয়ারনিং দিয়েছেন আমায়। হেডক্লার্ক বললেন, আপনার ওয়ারনিং নাকি আমার সার্ভিস বুকে নোট করা হবে।

আমার কথায় ম্যাকলীন মুহূর্তের মধ্যে রাগ করে জ্বলে উঠলেন, তাঁর চোখ মুখ কান লাল হয়ে উঠল। তিনি কঠিন স্বরে বলে উঠলেন, হেডক্লার্ক বড্ড বেশী বেড়ে গেছে। দাঁড়াও, ওকে আমি উচিত শিক্ষা দিচ্ছি।

আমি ম্যাকলীনকে আর একটু উত্তেজিত করার জন্যে অভিমানাহত গলায় বলে উঠলাম, আমি আর চাকরি করব না স্যার। আপনি আমায় মুক্তি দিন।

—কি মুস্কিল! ম্যাকলীন চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে আমার সামনে দাঁড়ালেন, সস্নেহে বললেন, বিশ্বাস করো রয়, আমি তোমায় ওয়ারনিং দেই নি। I love you। আমি তোমায় ওয়ারনিং দিতে পারি না।

—কিন্তু হেডক্লার্ক বললেন, আপনি নাকি ওয়ারনিং দিয়েছেন।

—রেখে দাও তোমার হেডক্লার্ক। বলেই ম্যাকলীন কলিং বেল টিপলেন।

কলিং বেল টিপতেই আর্দালি সামনে এসে দাঁড়াল। ম্যাকলীন আর্দালিকে বললেন, হেডক্লার্ককে ডাক।

আর্দালি পেছন ফিরে চৌকাঠের কাছে দাঁড়াতেই তিনি বলে উঠলেন, এই শোনো। তোমায় ডাকতে হবে না, আমিই হেডক্লার্কের কাছে যাচ্ছি। এসো রয়, তুমিও এসো।

বলেই গট্ গট্ করে হাঁটা ধরলেন ম্যাকলীন। আমিও তাঁর পেছন পেছন হাঁটতে সুরু করলাম।

হেডক্লার্কের ঘরে ম্যাকলীন ঢুকতেই অফিসময় একটা চাঞ্চল্যের সাড়া পড়ে গেল। যে যেখানে ছিল ছুটে এসে চেয়ারে বসল। বসে কপট মনোযোগের সংগে কাজ করতে লাগল।

আমার বুকের ভেতরটা দুরু দুরু করছিল। ভাবছিলাম, এ ভাবে ম্যাকলীনকে উত্তেজিত না করলেই চলত! রমেনবাবু আর যাই হোন, আমার গুরুজন তো বটে। তাঁকে শিক্ষা দেবার জন্যে এতটা না করাই উচিত ছিল।

একে ম্যাকলীন প্রচণ্ড খামখেয়ালী, তার ওপর তিনি

রেগে গেছেন। বলা যায় না, রাগের মাথায় রমেশবাবু একটা কিছু ক্ষতি করে বসতে পারেন!

ম্যাকলীন হেডক্লার্কের টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, সেই কাগজটা দিন।

ম্যাকলীনকে দেখে হেডক্লার্ক ঘাবড়ে গেছেন। তিনি বিস্মিত চোখের দৃষ্টি মেলে সভয়ে জিগ্যেস করলেন, কোন কাগজটা স্যার?

—কোন কাগজ? ম্যাকলীন একটা ধমক দিয়ে উঠলেন, ভুলে গেছেন কোন কাগজ?

আমি ম্যাকলীনের পেছনে নিশ্চল পাষাণ-মূর্তির মতো দাঁড়িয়েছিলাম। রমেশবাবু আড়চোখে একবার আমার দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলে উঠলেন, মাপ করবেন স্যার, আমার ভুল হইয়া গেছে। কাগজটা আমি দিতেছি—

বলে ড্রয়ার খুলে ম্যাকলীনের লেখা চিরকুটটি তাঁর হাতে দিলেন। ম্যাকলীন হাত বাড়িয়ে চিরকুটটি নিলেন। তারপরে প্রশ্ন করে বললেন, লেখাপড়া কতদূর করেছেন?

—আজ্ঞে এণ্ট্রান্স পাস করছিলাম।

—ইংরেজি পড়ে বুঝতে পারেন?

রমেশবাবু মাথা নেড়ে বললেন, আজ্ঞে পারি স্যার।

—পড়ুন কি লেখা আছে এতে।

ম্যাকলীন চিরকুটটি রমেশবাবুর চোখের সামনে ধরলেন। রমেশবাবু কাঁপা গলায় পড়লেন। পড়ার পর শূন্য দৃষ্টিতে ম্যাকলীনের দিকে তাকালেন।

অফিস শুদ্ধ লোক ম্যাকলীনের কাণ্ডকারখানা দেখছিল। তারা সব অবাক হয়ে গেছে। কেউ ভাবতেও পারে নি, ম্যাকলীন হেড ক্লার্কের ওপর চড়াও হয়ে তাঁকে এমন ভাবে অপদস্থ করবেন।

ম্যাকলীন রমেশবাবুর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে বললে, রমেশবাবু যে কাজে আপনার অধিকার নেই, সেই কাজ কখনো করার চেষ্টা করবেন না। মনে রাখবেন, আপনার অনেক উপরে আমি। এবারকার মতো মাপ করলাম, ভবিষ্যতে এর পুনরাবৃত্তি হলে আমি কিন্তু নির্মম হব।

ম্যাকলীন চিরকুটটি কুটি কুটি করে ছিঁড়ে রমেশবাবুর টেবিলে ছুঁড়ে দিলেন। তারপর তিনি আর কিছু বললেন না, যেমন ভারি পা ফেলে গট্ গট্ করে ঘরে ঢুকেছিলেন, তেমনি গট্ গট্ করে হেঁটে বেরিয়ে গেলেন।

ম্যাকলীন বেরিয়ে যাবার পর ঘরের আবহাওয়া হালকা হল। সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল।

আমি লক্ষ্য করলাম, রমেশবাবু ভয়ে বিস্ময়ে আশংকায় চুপসে গেছেন। তাঁর মুখের রেখায় বেদনার চিহ্ন। চোখ দুটো মৃত্যু প্রতিক্ষিত রোগীর মতো ফ্যাকাশে, বিবর্ণ।

মিনিট কয়েক কাটল। অফিস নিস্তব্ধ। ব্যাপারটা যে কি কেউই আঁচ করতে পারছিল না।

রমেশবাবু নিজেকে খানিকটা প্রকৃতিস্থ করে নিয়ে আমাকে জিগ্যেস করলেন, কইতে পারেন, ব্যাপারটা কি হইছে?

আমি গম্ভীর গলায় বললাম, আমি কিছু জানি না।

—ও তা হইব। বলে রমেশবাবু আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে কি যেন খুঁজতে লাগলেন।

দিন কুড়ি পর হঠাৎ একদিন সালাম আমাদের বাড়ির দোরগড়ায় এসে হাজির।

সালামকে দেখেই বুঝতে পারলাম, আমার তলব পড়েছে। বিনা ভূমিকায় সালাম বলল, বাবু চলেন। সাহেব ডাকছেন।

লন্ড্রে ছাপিয়ে আসছিল। আমি কিছুক্ষণ আগেই অফিস থেকে ফিরেছি। হাতমুখ ধুয়ে চা জল খাবার খেয়ে একটু আজ্ঞায় বেরুবার কথা ভাবছিলাম, কিন্তু তা আর হল না।

সালামকে বললাম, তুমি যাও, আমি এক্ষুণি যাচ্ছি। জামা কাপড় পরে, হাতে একটা টর্চ নিয়ে কিছুক্ষণ পরে আমি রওনা দিলাম। ম্যাকলীনের কোয়ার্টারে যখন পৌঁছুলাম; তখন কোর্টের ঘড়িতে ঢং ঢং করে সাতটা বাজল।

ম্যাকলীন ঘরে বসেছিলেন। আমার পদ শব্দ পেয়ে বলে উঠলেন, ইয়েস রয়, কাম্ ইন।

ঘরে ঢুকে ম্যাকলীনের পাশে বসলাম।

ম্যাকলীন আজো মদ গিলেছেন। তাঁর চোখ লাল, কথায় জড়তা, মুখ ভার, থমথমে।

ম্যাকলীন ইদানীং মদ খাওয়ার মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছেন। সাদাদের কাছে শুনেছি আগে রাত ছাড়া মদ ছুঁতেন না। কিন্তু এখন দিন রাত, যখন তখন মদের বোতল নিয়ে বসে পড়ছেন। বোতল বোতল মদ গিলছেন।

ম্যাকলীন মদ্যপ হয়েও একটা গুণ তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করেছি। তিনি বন্ধু বান্ধব নিয়ে কখনো মদ খান না। নাটোর সহরে বহু গণ্যমান্য মদ্যপ ব্যক্তি আছেন, যাদের সংগে ম্যাকলীন ওঠা বসা করেন, কিন্তু কখনো তাঁদের সংগে এক টেবিলে মদ খান না।

ম্যাকলীন খামখেয়ালী হলে হবে কি, তাঁর কয়েকটি আত্মসম্ভ্রম আছে। তাঁর চরিত্র দুর্বোধ্য। ব্যক্তিত্বও প্রবল। তিনি কি চান, কি ভালবাসেন, একমাত্র আমি ছাড়া আর কেউই জানে না।

বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে ম্যাকলীন অত্যন্ত রাশভারী, নির্মম—কিন্তু তাঁর ধারে কাছে এসে, দৈনন্দিন জীবনের সুখ দুঃখ ব্যাথার ধারায় নিজেকে ভাসিয়ে নিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, মানুষটার বাইরের রূপের আকাশ-পাতাল তফাত।

ম্যাকলীন না নির্মম, না রাশভারী। তাঁর দিল মাটির মতো নরম ও সংবেদনশীল নয়। তাঁর হৃদয় উদার, রুচিবোধ উন্নত।

ম্যাকলীনের মধ্যে প্রচুর সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু কোন সম্ভাবনাই কাজে লাগল না। তিনি হারিয়ে গেলেন, ফুরিয়ে গেলেন। তাঁর সব থেকেও তিনি সর্বহারা।

মনে হয়, পৃথিবীতে তারাই বেশী ঠকে, যাদের হৃদয় মনে সরলতা আছে। ম্যাকলীনও ঠকেছেন। ঠকে দেউলিয়া হয়ে গেছেন। তাঁর বাবাও নিজেকে নিঃশেষ করে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। কিছুই রেখে যাননি। কোন লক্ষ্য তাঁর ছিল না।

ম্যাকলীনের বাবা মরে বেঁচেছেন। ম্যাকলীন জীবিত থেকে মরতে বসেছেন।

হ্যাঁ, এ মরা ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে। ম্যাকলীনের জীবন অনির্দিষ্ট, পরিকল্পনাহীন। এত বড় তাঁর চাকরি! আই. সি. এস. যাকে লোকে বলে, হেভেন্স বর্ণ পোস্ট—তার প্রতি তাঁর কোন মায়া নেই।

আসলে ম্যাকলীন একটি ছন্নছাড়া জীব।

যার জীবনে কোন বাঁধন নেই, সেই রাশ-ছেঁড়া ঘোড়ার মতো অনির্দেশ লক্ষ্যের পানে ছুটে চলে। ছোটাতেই তার আনন্দ। ম্যাকলীন চলেছেন ছুটে, তাঁর লক্ষ্য অস্থির। জীবনের দ্বিতীয় পথ তিনি পাড়ি দেবেন লক্ষ্যহীন পরিকল্পনা নিয়ে।

প্রবঞ্চনা মানুষের জীবনে এঁকে দেয় অভিশাপ। যে প্রবঞ্চিত, তার জ্বালা বোঝার মতো সহদয়ীমন খুব অল্প লোকেরই থাকে। ম্যাকলীন প্রবঞ্চিত। প্রবঞ্চনার জ্বালা ভুলতে গিয়ে আজ তিনি ছন্নছাড়া জীবনচর্যার মেতে উঠেছেন।

মার্গারেট ম্যাকলীনকে প্রবঞ্চিত করে সুখী হয়েছে কিনা জানিনা, জানতেও চাই না। তবে এই টুকু জানি, কোন এক অলস অবসর মুহূর্তে সেই শ্বেতাঙ্গিনী নারী নিশ্চই অনুভব করবে ম্যাকলীনের মর্মব্যাথা।

ভালবেসে যে মানুষটা কাঙাল হল, তাকে কি বলে সান্ত্বনা দেওয়া যায় জানিনা। আর তাছাড়া, ম্যাকলীনকে সান্ত্বনা দেওয়ার বাসনা।

ম্যাকলীন নিজেকে নিঃস্ব করে মার্গারেটকে সব কিছু বিলিয়ে দিয়েছিলেন। মার্গারেট ম্যাকলীনের প্রেমকে করেছে অপমান। বিশ্বাস দিয়েছে গুঁড়িয়ে। মার্গারেট ম্যাকলীনকে প্রবঞ্চিত করে সুখী হবে না—হতে পারে না। মার্গারেট একদিন বয়সের ভারে নুয়ে পড়বে, তার প্রচণ্ড সুন্দর স্বাস্থ্যে এসে লাগবে স্থবিরত্বের ছোঁয়া, দেহের সৌন্দর্য হবে ম্লান, সেদিন এই নারী নিশ্চয়ই অনুতাপ করবে ম্যাকলীনের জন্যে।

সেদিন মার্গারেটকে দুফোঁটা চোখের জল ফেলতে হবে তার উদার প্রাণ ভাগ্যাহত প্রাক্তন দয়িতকে স্মরণ করে। হয়তো ম্যাকলীন আর তখন পৃথিবীতে থাকবেন না, তাঁর কবরের ওপর গজিয়ে উঠবে নাম না জানা শুল্পবৃক্ষ। কিন্তু মহাকাল এই অনুতাপ-জর্জরিতা নারীর দুফোঁটা ব্যথিত অশ্রুজলের চিরন্তন সাক্ষী হয়ে থাকবে।

ম্যাকলীনের দিকে তাকিয়েছিলাম। মানুষটার

প্রতি আমার অগাধ শ্রদ্ধা। ম্যাকলীনকে আমি ভুলতে পারি না। তাই এমন করে নিজেকে নিঃশেষ করার দুঃখ আমাকে সইতে হয় না।

ম্যাকলীন একদিন কথাচ্ছলে আমাকে বলেছিলেন বন্ধু পৃথিবীতে কারো ওপর দাবী রেখনা। দাবী থেকেই কামনা বাসনার জন্ম। আমি দাবী করে ঠকেছি। তাই আজ আমি নিঃস্ব। সর্বহারা।

সেদিন বুঝিনি ম্যাকলীনের কথার মর্মার্থ। আজ বুঝতে পারছি।

ম্যাকলীনের জীবনে কোন দাবীই প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তিনি পাননি মাতৃস্নেহ, বঞ্চিত হয়েছেন বাবার স্নেহ থেকে, দেখেছেন পিতার জীবনের শোকাবহ পরিসমাপ্তি। পৃথিবীর কোন স্বজন বান্ধব জানায়নি তাঁকে সমবেদনা, তাঁর চোখের জল মুছিয়ে দেবার জন্যে এগিয়ে আসেনি কোন নারীর পেলব কোমল হস্ত। ম্যাকলীনের জীবন শূন্য-শূন্য, রিক্ততায় ভরা।

রাত বাড়ছিল।

ম্যাকলীন নির্বাক, নিস্পন্দ। ডেকে এনে কেন আমার সঙ্গে ব্যাকালাপ করছেন না, বুঝতে পারলাম না.

হয়তো ম্যাকলীনের বলার কিছু নেই, শুধু আমার সান্নিধ্য লাভের আশায় আমায় ডাকা।

আমি ম্যাকলীনের মৌনতা ভাঙলাম, বললাম, আমাকে কেন ডেকেছেন স্যার?

—কেন ডেকেছি, শুনবে? ম্যাকলীন হাসলেন। সে হাসি যেন বিষাদক্লিষ্ট। ম্যাকলীনের হাসি দেখেই আমার মনে একটা আশংকা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। আমি অধীর আকুলতা নিয়ে তাঁর কথা শোনার জন্যে উৎকর্ণ হয়ে রইলাম।

ম্যাকলীন বললেন, Roy, my days are numbered here। আজ আমি বদলীর অর্ডার পেয়েছি। আসছে মাসে তোমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছি—

আমার মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল ম্যাকলীনের বদলীর আদেশ শুনে। এত তাড়াতাড়ি তিনি বদলি হবেন, এ ধারণা কখনো করিনি।

আমি প্রগলভের মতো বলে ফেললাম, স্যার আপনার বদলীর অর্ডারটা বন্ধ করা যায় না?

—হোয়াট - বদলির আদেশ বন্ধ? ম্যাকলীন প্রাণখোলা হাসিতে ফেটে পড়লেন।

আমি নিজের প্রগলভ উক্তিতে লজ্জা পেলাম। ভাবলাম, নির্বোধের মতো কথাটা না বললেই ভাল হত।

ম্যাকলীন বললেন, কি করে বদলীর অর্ডার বন্ধ করে? তাছাড়া অর্ডার বন্ধ করার মালিক আমি নই। আমি বদলি হতেই চাই। এক জায়গায় বেশীদিন থাকতে আমার মন চায় না।

আমি বললাম, আপনি চলে যাবেন শুনে এখন থেকে আমার মন ভার ভার লাগছে। সত্যি বলতে কি স্যার, আপনি যেন আমার নিকটতম প্রিয়জন হয়ে গেছেন।

ম্যাকলীন বলে উঠলেন, That is quite natural। আমারও কি কম দুঃখ হচ্ছে তোমাদের ছেড়ে যেতে। তোমরা, বিশেষ করে তুমি, আমার জন্যে কতো করেছ— সেতো আমার অজানা নয়। তোমরা আমাকে যা দিয়েছ, তার বিনিময়ে আমি তোমাদের কিছুই দিতে পারিনি। তবে হ্যাঁ, তোমাদেরকে আমি একটি জিনিস দিতে পেরেছি। ভালবাসা। যেটা আমার আজন্মের শিক্ষা। আমার বাবার শিক্ষা। রয়, আমার জীবনের অনেক ইতিহাস তুমি আমার কাছে শুনেছ। তুমি বুঝতে পারবে, আমার কোথায় ব্যথা। আমি জীবনে প্রচুর ঠকেছি; অবিশ্বাস, বঞ্চনা আর বিড়ম্বনার মধ্যে দিন কাটিয়েছি। আমাকে এবং আমার বাবাকে পদে পদে কতো মানুষ কাঁকি দিয়েছে, আঘাত করেছে, তবু আমার মন থেকে ভালবাসা উবে যায়নি। অবহেলিত উপেক্ষিত মানুষের জন্যে আমার অন্তরাত্মা ব্যথায় ছটফট করে। এজলাসে বসে যখন আমি হাকিমের কলম ধরে সাধারণ মানুষকে সাজা দেই, তুমি বুঝবে না রয়, তার জন্যে আমি প্রাণে কতো ব্যথা পাই। সময় সময় আমার মন বলে, আমি যে-কাজ করি, তার সবটুকু পাপ কাজ। কারণ আমি বুঝেছি যে চেয়ারে আমি প্রতিদিন বসি, সেই চেয়ারে বসে মানুষের মঙ্গল করাতো দূরের কথা, মানুষের দুঃখও বোঝা যায় না। তাই কিছুদিন থেকে ভাবছি, এ চাকরি ছেড়ে দিয়ে অন্য কিছু করব

কি না। হয়তো তাই করতে হবে। চাকরি আর পোষাচ্ছে না আমার।

ম্যাকলীনের বক্তব্য শুনে আমি বিস্ময়াভিভূত। আশ্চর্য! শ্বেতাঙ্গ জাতিকে এতদিন জেনে এসেছি শত্রু বলে। তারা আমাদের সবকিছুকে গ্রাস ক'রে বসে আছে। গুলি বারুদ বেয়নেটের খোঁচায় আমাদের সোজা হয়ে দাঁড়াবার সামর্থটুকু কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু আজ এক পরিচিত শ্বেতাঙ্গের মুখ থেকে এক অশ্রুতপূর্ববাণী শুনে আমার মন শ্রদ্ধায় ভরে উঠল। ভাবলাম, যে মানুষের হৃদয় আছে, তার কাছে জাতের বিচার বড়ো কথা নয়, রঙের তারতম্য তুচ্ছ। ম্যাকলীন শ্বেতাঙ্গ হয়েও মানুষ। মহৎ মানুষ। তাঁর মন ভৌগলিক জটিলতায় বদ্ধ নয়, সাদা কালোর বিচারে তিনি অন্ধ নন, তিনি দেখেন হৃদয়, দেখেন মনুষ্যত্ব। যা সর্বকালের, সর্বদেশের।

ম্যাকলীনের অধীনে মাস আষ্টেক হল কাজ করছি। এই আট মাসে কতো ঘটনা ঘটে গেছে, ম্যাকলীনের চরিত্রের কতো মহৎ দিক আমার কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

একটা ঘটনা মনে পড়ছে। দেশময় বিপ্লবাগ্নির আন্দোলনের আলোড়ন। হাজার হাজার মরণপ্রাণ যুবক যুবতী কারাবরণ করছে। নাটোর শহরেও বিপ্লবাগ্নির আন্দোলনের ঢেউ এসে লেগেছে।

নাটোর মহকুমার সুলতান সমর রায় বিপ্লবাগ্নির আন্দোলনের প্রথম শহিদ। সমরের বয়স ছিল মাত্র উনিশ বছর।

সমরকে নাটোরের সদর দারোগা গুলি করে মেরেছিল। ম্যাকলীন সমরের মৃত্যু সংবাদ শুনে মর্মাহত হয়েছিলেন। তিনি সদর দারোগাকে ডেকে এনে জিগ্যেস করেছিলেন, দারোগাবাবু আপনি কাকে মেরেছেন জানেন?

দারোগাবাবু কোন কথা বলতে পারেনি। আমি দারোগাবাবুর পাশে দাঁড়িয়ে তার নিষ্ঠুর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

দারোগাবাবুর সামনেই ম্যাকলীন আমাকে বলেছিলেন, বুঝলে রয়, আমার হাতে ক্ষমতা থাকলে এক্ষুনি আমি দারোগাবাবুকে গুলি করে মারতাম। সমর মরে তোমাদের দেশকে বাঁচিয়ে গেছে, আরো দিন ও'ওয়ার্ড জেন্টলম্যান দেশের কলংক হয়ে থাকবে। আমি বলছি রয়, তুমি দেখে নিও, ব্রিটিশরা আর বেশীদিন তোমাদের দেশে রাজত্ব করতে পারবেনা। যারা একটা তরুণকে ভয় পায়, যাকে মারতে এই সব কাওয়ার্ডদের মায়না করে পোষে, তাদের রাজত্ব স্থায়ী হতে পারেনা। কখখনো পারেনা।

সেদিন মনে হয়েছিল, ম্যাকলীনের মন্তব্য বুঝি আবেগের প্রতিফলন। কিন্তু আবেগতো জীবনের সমগ্র রূপ নয়। আবেগের নীচে আছে প্রেম, ভালবাসা প্রেম না থাকলে অনুভূতি আসেনা। সেদিন এবং আজকের মন্তব্য মিলিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে, ম্যাকলীনের মন্তব্যগুলো শুধুমাত্র আবেগের ফুলঝুড়ি নয়, প্রেমের নির্যাস, অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত উচ্চারণ।

নিস্তব্ধ বাদন্তি রাত। রাতের মায়াবী নিঃস্তব্ধতা আমাকে অভিভূত করে ফেলেছে। ম্যাকলীনের ফুল বাগানে ফুটেছে হাস্নুহানা। বক্ষিমা বাতাস ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছে চাম্পুহানার উগ্র গন্ধ। জানালা গলে ম্যাকলীনের অকলংক মুখের ওপর পড়েছে চাঁদের কিরণ।

চাঁদের আলোয় ম্যাকলীনকে ভালভাবে দেখলাম, দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। ছফুট লম্বা এক প্রিয়দর্শন শ্বেতাঙ্গ নিরাসক্ত চিত্তে, স্থির নেত্র মেলে ইজিচেয়ারে শায়িত। তাঁর মুখে হাসির রেখা, কপালের বলীরেখা ঈষৎ কুঞ্চিত। মনে হচ্ছিল, ম্যাকলীন যেন গ্রীকপুরাণের এক অপরূপ ভাস্কর্য-মূর্তি, যে মূর্তি প্রেম ভালবাসার ধ্যানে আত্মময়। যার নিজস্ব কোন কামনা বাসনা নেই। তার মাত্র একটি ব্রত। কল্যাণ। কল্যাণের পবিত্র ধারাকে রক্তমাটির বুকে প্রবাহিত করার সাধনায় সে ধ্যানস্থ।

কোর্টের ঘড়িতে ঢং ঢং করে দশটা বাজল। বাড়ি যাবার জন্যে আমি উশখুশ করছি। বেশী রাত অবধি বাইরে থাকা বাবা পছন্দ করেন না।

আমি বলে উঠলাম, এবার উঠি স্যার?

—কটা বাজল? ম্যাকলীন প্রশ্ন করলেন। তাঁর প্রশ্ন শুনে মনে হল, এতক্ষণ তিনি বুঝি ঘুমিয়েছিলেন।

বললাম, এইমাত্র দশটা বাজল।

—তবে তো রাত হয়েছে। এইবার তুমি এসো।

আমি উঠলাম। একা একা আমার অনেকটা পথ হাঁটতে হবে। অবশ্য ভয়ের কোন কারণ নেই। রাতে টর্চ আছে, তার ওপর রাস্তায় লোক চলাচল এখনো বন্ধ হয়নি।

গেটের কাছ অবধি এসে আমায় থমকে দাঁড়াতে হল।

ম্যাকলীন পেছন থেকে ডাক দিলেন, রয় একটু থামো।

আমি দাঁড়ালাম। ম্যাকলীন গেটের কাছে এসে বললেন, চলো তোমায় কিছুদূর এগিয়ে দেই।

আমি বললাম, আমি একাই যেতে পারব স্যার। আপনাকে কষ্ট করে আসতে হবেনা।

ম্যাকলীন আমার নিষেধ শুনলেন না। তিনি আমার ঘাড়ে হাত রেখে বললেন, লেট্‌স গো।

রাস্তায় নেমে দুজনে পাশাপাশি হাঁটছিলাম। বেশ কিছুদূর ম্যাকলীন হেঁটে এলেন।

আমাদের বাড়ি আসবার পথে একটা দীঘি পড়ে। দীঘির নাম নীল-গম্ভীরা।

নীল-গম্ভীরার নীল জলে চাঁদের আলো পড়েছে। বাতাসে দীঘির জল তিরতির করে কাঁপছে।

ম্যাকলীন দীঘির পাড় ঘেঁসে দাঁড়ালেন, দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে কি একটা চিন্তা করে নিলেন। তারপরেই তাঁর সেই স্বভাব-সিদ্ধ গম্ভীর স্বরে বলে উঠলেন, রয়, পৃথিবীতে বেঁচে থাকাটাই একটা মহা সমস্যা। কি করে বাঁচতে হয়, এ বোধ যার নাই, তার কাছে বাঁচাবরার মধ্যে কোন তারতম্য নেই। আমার বাবা বাঁচতে শিখেছিলেন, কিন্তু মায়ের জন্যে বাবা বেশী দিন বাঁচতে পারেননি। বাবা বলতেন, বাঁচতে হলে একটি সাধনা করা দরকার। হয় একান্ত ভাবে পেয়ে বাঁচার সাধনা, নয় নিঃশেষে হারিয়ে বাঁচার সাধনা। রয়, কোনটাই আমার জীবনে সিদ্ধিলাভ করেনি। আমি ব্যর্থ-সাধক। বাঁচার মূল্য আমি বুঝতে পারিনি।

চৈত্রের মাঝামাঝি। গুমোট গরম। দিনের বেলায় গরমে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়।

বিকেল পাঁচটার পর অফিস থেকে বাড়ি ফিরতে না ফিরতেই ঝম ঝম করে বৃষ্টি নামল। ঘাড়া একঘন্টা মুষলধারে বৃষ্টি হল। ধুলি ধূসর নাটোর সহরের রুক্ষ রূপ অকাল বর্ষণে কিছুটা কান্তিময় হয়ে উঠল। গুমোট গরমের ভাবটাও কমল।

বৃষ্টির পর বইতে সুরু করল মিঠে বাতাস। আমি ঘরের জানালা কপাট খুলে দিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে অনেক কথাই ভাবছিলাম। ভাবনার মধ্যে নিজের কথাই বেশী ছিল।

জীবনটা আমার বৃথা গেল। কোন কাজেই নিজেকে লাগাতে পারলামনা। বাইশ বছরের এমন সুন্দর উদ্ধত যৌবন শুধু কলম পেষার একঘেয়েমীতে নষ্ট হতে বসেছে।

লেখাপড়া শিখিনি, তাই কেরানী হয়েছি। মা মাঝে মাঝে দুঃখ করে খেদ জানান, বলেন, তোকে নিয়ে আমার কতো আশা ছিল। তুই বড়ো হবি, মানুষের মতন মানুষ হয়ে আমাদের দুঃখু কষ্ট ঘোচাবি। কিন্তু—

শুয়ে শুয়ে নিজের মনে মনেই বলে উঠি, মাগো, আমি তোমার অক্ষম সন্তান। আমায় ক্ষমা করো। আমি পারিনি তোমার বাঞ্ছিত লক্ষ্যে পৌঁছুতে।

এক এক সময় ভাবি, বড়ো হয়েই বা কি হবে। ম্যাকলীনও তো বড়ো হয়েছেন। টাকা পয়সা, মান সম্মান ক্ষমতা, কোন দিকেই তাঁর ঘাটতি নেই, কিন্তু তবু কি তাঁর মনে ভরেছে? ভরে নি। তিনি চির-অসুখী।

এ জগতে আমরা অস্থায়ী যাত্রী। আমাদের যাত্রা পথ সংকীর্ণ। জীবনের কয়েক বছরের হাসি কান্নার অভিনয় শেষ করে আমরা বিদায় নেব। বিদায় নেবার কালে পেছনের দিকে তাকাব না। তাকিয়ে দেখব না, কি রেখে গেলাম আর কি দিয়ে গেলাম!

যে বড়ো তাকেও যেতে হবে। যে ছোট সেও যাবে। যাওয়া-আসার নিয়মের রাজত্বে বড়ো ছোটোর মূল্য কি?

মনে মনে বলে উঠলাম, মাগো আমি বড়ো হতে চাই

আমি যেমন আছি তেমনি থাকব। ধুলি ধূসরিত

নাটোরের পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমি একদিন ক্লান্ত হব। আমার দেহ পড়বে লুটিয়ে। মাটির আশ্রয়ে জন্ম নিয়ে মাটির বুকেই দেহ রাখব। আমি চাই না অর্থ, চাই না যশমান। ভোরের শিশিরসিক্ত তুল ধল, প্রভাতের রক্তিম সূর্যকিরণ দেখে দেখেই আমার দিন কাটবে: পাখীর কাকলী, ভোরের মিঠে হাওয়া, নাটোরের মাথার উপর উন্মুক্ত নীলাকাশের অদৃশ্য হাতছানি আমায় নিয়ে যাবে বেদনা-অতীত সুদূরে।

—শিবুদা!

আমার ভাবনা চিন্তা এলোমেলো হয়ে গেল গীতার ডাকে। আমি চোখ তুলে গীতার দিকে তাকালাম, বললাম এসো।

গীতা আমার পাশে এসে বসল। বসে বলল, এই অবেলায় শুয়ে আছো কেন?

আমি নিরুত্তর। আমার পক্ষে নিরুত্তর থাকাই বাঞ্ছনীয়।

গীতা তার কথার জবাব না পেয়ে বলল, কি কথা বলছ না কেন? শরীর খারাপ নাকি?

বলে তার ডান হাতটা আমার কপালের দিকে বাড়িয়ে দিল। আমি বাধা দিলাম, বললাম আমার কিছু হয় নি, তুমি হাত সরিয়ে নাও।

—হাত সরিয়ে নেব! কেন? গীতার চোখে মুখে অভিমান যেন ঝকঝক করে উঠল।

বললাম, আমার গায়ে হাত দেওয়া তোমার উচিত নয়।

—ও তাই বুঝি!

প্রায় মাস খানেক পরে গীতাকে দেখছি। এই একমাসের মধ্যে তার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। গীতার গায়ে যেন একটু মাংস লেগেছে। আগেকার সেই চঞ্চল চটুল রূপ বিলীন হয়ে সুন্দর মিটোল পরিপাটি রূপের লাবণ্য গীতার সারা দেহে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

গীতাকে দেখে আমার মন প্রাণ ভরে উঠলো, ইচ্ছা জাগল তাকে দু'বাহু বন্ধনে জড়িয়ে আদর করি।

কিন্তু আমার ইচ্ছার রাশ টেনে ধরতে হল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, এতদিন কেন আস নি গীতা?

গীতা ব্যথা ম্লান গলায় বলল, মা আজকাল বাড়ির বাইরে যেতে দেন না।

—তা হলে আজ কি করে বেরুলে?

—মা বাড়ি নেই—সিনেমায় গেছেন। তাই তোমার কাছে চলে এসেছি।

—তোমার মা যদি জানতে পারেন যে আমার কাছে এসেছিলে।

—মা কি করে জানবেন?

—ধর, আমি যদি বলে দেই।

—তুমি বলবে! গীতা খিল খিল করে হেসে উঠল।

গীতার হাসি অনুপম। হাসলে তার দু'গালে টোল পড়ে।

গীতার মতন অমন সুন্দর করে হাসতে অন্য কোন মেয়েকে আমি দেখি নি।

গীতার মন-কেড়ে-নেয়া হাসি আমাকে যেন সব ভুলিয়ে দিল। আমি ভুলে গেলাম যে সে বাগদত্তা। আর কয়েক দিন পরেই তার বিয়ে।

আমি গীতার হাত ধরে জোরে টান দিতেই গীতা ভয়ার্ত গলায় বলে উঠল, শিবুদা!

আমার সম্বিৎ ফিরল। ছি ছি, এ আমি কি করছি! গীতার ওপর আমার কোন অধিকার নেই—এ কথা কি আমি ভুলে গেছি?

আমি খুব লজ্জা পেলাম আমার ছেলেমানুষীতে, বললাম তুমি রাগ করলে গীতা?

গীতা হাসল। ম্লান হাসি। তারপরে বলল, রাগ? রাগ কেন করব শিবুদা। তোমার ওপর কখনো আমি রাগ করতে পারব না।

সন্ধে পেরিয়ে রাত হতে চলল। ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত। জানালা গলে আমার দৃষ্টি আকাশের গায়ে গিয়ে ঠেকল।

তারাময় আকাশ। আকাশের এক কোণে আধখানা পাণ্ডুর চাঁদ। চাঁদের আশে পাশে ছেঁড়া ছেঁড়া ধূসর মেঘ। মেঘের টুকরোগুলো সরতে সরতে চাঁদকে ঢেকে ফেলল।

ঘরে আলো নেই, অন্ধকার। গীতা আমার গায়ে হাত রেখে বলল, একটা কথা বলব—রাখবে শিবুদা?

—না না, অত সহজ কথা নয়। ভেবে চিন্তে বলো রাখতে পারবে কিনা ?

আমি হেসে ফেললাম, বললাম কি মুস্কিল! তোমার কথা না শুনেই কি করে ভাবব ? আগে কথাটা বলো, তারপরে ভেবে চিন্তে বলব—রাখব কিনা।

গীতা বলল, না থাক বলব না। বললে তুমি রাখতে পারবে না। সে সাহস নেই তোমার।

আমার মনে একটা অজানা সন্দেহ কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠল। কি এমন কথা বলতে চায় গীতা, যা রক্ষা করতে সাহসের প্রয়োজন।

আমি জোর দিয়ে বললাম, বলো কি বলবে ? তোমার কথা রাখবার মতন হলে আমি নিশ্চয়ই রাখব।

গীতা খানিকক্ষণ চুপ করে থাকল। আমি তার হাতটা আমার মুঠোর মধ্যে পুরে বার দুয়েক চাপ দিলাম। গীতা হাত আর সরিয়ে নিল না। আমি আর একটু দূরে অগ্রসর হলাম। তার মাথায় হাত রাখলাম। মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে ক্রমশঃ নীচের দিকে হাত নামিয়ে আনছিলাম, এমন সময় আবেগ-কম্পিত স্বরে গীতা বলে উঠল, শিবুদা তুমি আমায় নিয়ে পালিয়ে যেতে পার ?

অন্ধকারে সাপের গায়ে পা দেবার মতো আমি চমকে উঠলাম। আমার সর্বশরীর থর থর করে কেঁপে উঠল গীতার কথায়। সর্বনাশ! একি বলল গীতা! এই কথা বলবার জন্যে কি সে আমার কাছে এসেছে!

বেশ কয়েক সেকেণ্ড সময় নিল আমার শরীরের কাঁপন থামতে। আমি ভাবলাম, গীতার এ কথার জবাব দেবার সাহস আমার কোন কালেই হবে না। গীতা যা মুখ ফুটে উচ্চারণ করল, তা আমি ভাবতেও ভয় পাই। ওঃ কি সর্বনেশে কথা! সামান্য একটা মুখের কথা মানুষকে যে কি ভাবে তোলপাড় করে, তার আগাগোড়া বদলে দিয়ে কি ভাবে নতুন করে গড়ে, তা আমি এই প্রথম উপলব্ধি

ভয় ? হ্যাঁ, ভয় পাচ্ছি। এ ভয় আমার কোন কালেই দূর হবে না। গীতা যা কামনা করে, তা কখনো সম্ভব কিনা, হয়তো সেও তা ভাবে নি কোনদিন।

গীতাকে নিয়ে পালিয়ে যাব, এ কথা আমার মনে একদিনের তরেও উদয় হয় নি। গীতাকে আমি স্নেহ করি ভালবাসি। আমাদের মধ্যে ভালবাসাবাসির উদয় হয়েছিল অকস্মাৎ। আমি কোন দিন গীতাকে নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করি নি। আমাদের ভালবাসা একটা পরিণত রূপে গিয়ে দাঁড়াবে, এও আমি অনুভব করি নি।

কিন্তু কি আশ্চর্য, গীতা আমার চেয়ে অনেক বেশী দূর অগ্রসর হয়েছে। সে মনে প্রাণে চেয়েছে আমাকে। আমাকে পাওয়ার জন্যে সে যে কোন অসম্ভব কাজ করতে রাজি।

আমি আবার বললাম, গীতা তুমি বাড়ি যাও। যে কথা আজ তুমি বললে, সে কথার পরিণতি কি, হয়তো তুমিও চিন্তা করনি। কালকে ভেবে চিন্তে আবার এসো আমার কাছে—তোমার জবাব পাবে।

—আমি ভেবে চিন্তেই আমার কথা বলেছি।

—বোধহয় বলনি। ভাবলে এমন কথা বলতে পারতে না।

—আমি চিরকাল এ কথা বলতে পারি। কিন্তু আর কখনো বলব না। প্রেমকে তুমি যদি করেছ খেলা খেলা। আমাকে তুমি পেতে চেয়েছ অনায়াসে। কিন্তু জেনে রেখো, আমি অনায়াসলব্ধ বস্তু নই। আমি নারী। আমারও নারীত্বের সম্মান আছে। আমি ভাঙ্গলে একবারই ভাঙ্গি, গড়লে একবারই গড়ি। বারে বারে ভেঙ্গে ভেঙ্গে নিজের আত্মমর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করতে চাই না। প্রেম আমার কাছে সাধনা আর তোমার কাছে পোষাকী বিলাস। বেশ তোমার বিলাস নিয়ে তুমি থাকো, আমি চলে যাচ্ছি। আর কোনদিন তোমার সামনে দাঁড়াব না—

গীতাকে আমার বলার কিছু নেই, সান্ত্বনা দেওয়াও নিষ্প্রয়োজন।

ভাবলাম, গীতা কাঁদুক। কেঁদে কেঁদে তার মনের ভার লাঘব করুক। যা অসম্ভব, তা যদি কেউ সম্ভব করার কল্পনা করে, তবে তাকে আঘাতই হবে কাঁদতেই হয়। গীতাও কাঁদুক। তার কান্না আমার প্রাণে বাজলেও আমি নিরুপায়।

হয়তো গীতা আমার সম্পর্কে নানান বিরূপ ধারণা মনে গড়ে তুলছে। হয়তো ভাবছে, আমি নির্মম। মন বলে আমার কিছু নেই।

গীতার যা ইচ্ছা ভাবুক।

কান্না থামলে পর গীতা উঠে দাঁড়াল। আমিও তার সংগে সংগে উঠে দাঁড়ালাম।

আমাদের দু'জনের মুখেই কথা নেই।

গীতা তার শাড়ির আঁচল দিয়ে ভাল করে রগড়ে চোখের কোণ মুছল, তারপর আঁচলটা পিঠের ওপর ফেলে দিল।

ঘরের দোর গড়ার কাছে এসে গীতা থামল। ব্যথিত কণ্ঠে বলে উঠল, শিবুদা পারলে না আমায় গ্রহণ করতে? এমনি করেই আমায় ভাসিয়ে দিলে। আমি নিষ্কৃপ। বুকটা আমার জ্বালা করছিল, মনে হচ্ছিল কেউ বোধহয় একটা গরম শিক আমার বুকের ভেতরে চেপে ধরে আছে।

গীতা আর কিছু বলল না, অন্ধকারের মধ্যে তর তর করে হেঁটে গিয়ে মিলিয়ে গেল।

গীতা চলে যাবার পর আমি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে আবার বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম।

জীবনের একটা বিশিষ্ট অধ্যায়ের যবনিকাপাত করলাম আজ।

গীতা আমার জীবন থেকে হারিয়ে গেল চিরকালের মতো। প্রেম মহান কিনা জানি না, তবে এটুকু বুঝলাম যে প্রেমে ব্যথা আছে। সে ব্যথা দুঃসহ। মর্মান্তিক।

নারী সম্পর্কে ম্যাকলীন যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, আমি তা করি নি। ম্যাকলীন নারী বিদ্বেষী। একবার আঘাত পেয়েই তিনি আঘাতকেই বড়ো করে দেখেছেন।

গীতাকে আমি ভালবাসি। এ ভালবাসা আমার আজীবনের সঞ্চয়।

কোন দিন গীতা জানবে না যে তার মনের অন্তরালে এক নীরব প্রেমিক আছে, যে কেবল তাকেই চিরকাল স্মরণ করে যাবে, তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ নিবেদন, অস্পষ্ট ভালবাসাকে বয়ে বেড়াবে সর্বক্ষণ।

গীতার কাছে আমার কোন কামনা নেই। আমি চাই সে আমাকে ভুলে থাক। চিরকালের মতো ভুলে থাক।

ম্যাকলীন বিদায় নিচ্ছেন।

বিদায় মানেই বেদনা।

কাছে থেকে যাকে প্রতিনিয়ত দেখেছি, যার প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য পেয়ে লাভ করেছি আনন্দ, তার বিদায়ে যে কি নিদারুণ মর্ম-বেদনা তা বুঝিয়ে বলা দুষ্কর।

ম্যাকলীন নাটোর থেকে চলে গিয়ে ফিরে পাবেন আর এক কর্মময় জগত—যেখানে তাঁর আধিপত্য প্রশ্নাতীত, প্রতাপ অখণ্ড। কিন্তু আমি এই ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে পচে মরব। আমার দিন কাটবে চিরাচরিত জড়ত্বহীন গতিতে। দশটা আর পাঁচটা পর্যন্ত কলম পিষে।

ম্যাকলীন ঢাকা জেলার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে বদলি হয়ে যাচ্ছেন। কালকের ভোরের ট্রেনে নাটোর পরিত্যাগ করে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হবেন।

নাটোরে ম্যাকলীন বেশ জাঁকিয়ে বসেছিলেন। তাঁর সুনাম সুখ্যাতি হয়েছিল। দরদী মানুষ বলে তাঁকে অনেকে ভালবাসত।

ম্যাকলীনের বদলীর খবর শুনে শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা তাঁর সংগে দেখা করতে এলেন। ম্যাকলীন সকলকেই প্রসন্ন হাসিতে সম্ভাষণ জানালেন। যার যা প্রাপ্য ছিল, তাকে তাই দিয়ে গেলেন। অফিসের কেরানীবাবুরা ধর্ণা দিয়ে নিজেদের সার্ভিস বুকে লিখিয়ে নিলেন প্রশংসিত মন্তব্য। ম্যাকলীন কউকেই বঞ্চিত করলেন না।

আমি দেখা করতে গেলাম সব শেষে।

আমাকে দেখে ম্যাকলীন বলে উঠলেন, আমি

তোমাকেই খুঁজছিলাম। তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ দরকার।

দরকারের কথা শুনে আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালাম।

ম্যাকলীন বললেন, আজ তোমাদের বাড়ি যাব। চলো এখনি যাই।

আমি ম্যাকলীনের কথায় অবাক। পরিবর কেরানীর বাড়ি তিনি নিজে যেতে চাইছেন, এতো রীতিমত এক সৌভাগ্য! কিন্তু এমন অসময়ে কি করে তাঁকে বাড়ি নেওয়া যায়।

ঘড়িতে দেখলাম রাত প্রায় আটটা বাজে। রাত আটটায় কিছু যায় আসে না, আসল কথা হল বাড়ির হালচাল।

ঘর দোরের অবস্থা শোচনীয়। কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে বসতে দেবার মত টেবিল বাইরের যে ঘরে বাবার অফিস, সে ঘরে দুজন মক্কেল এসে আস্তানা গেড়েছে আজ দুদিন হল।

বাইরের ঘরে ম্যাকলীনকে বসতে দেয়া যায় না। ঘর ভর্তি ধুলো, আর অসংখ্য গোড়া বিড়ির টুকরোর মধ্যে কোথায় নিয়ে বসাব তাঁকে।

আমি এক দুর্ভাবনায় পড়লাম। দুর্ভাবনার জন্যে বাবাকেই দায়ী মনে হল। মনে মনে বাবার ওপর রাগ না করে পারলাম না। কি দরকার ছিল সোঁয়ো মক্কেলদের বাইরের ঘরে আশ্রয় দেবার? নাটোরে হোটেল নেই নাকি? পয়সা খরচ করলে দিব্যি হোটেলে থাকতে পারে।

আমার মুখে হয়তো দুর্ভাবনার ছাপ পড়েছিল, তাই দেখে ম্যাকলীন বলে উঠলেন, কি, তোমাদের বাড়িতে নিয়ে যাবে না আমাকে?

—নিশ্চয়ই নিয়ে যাব। এক্ষুণি চলুন স্যার। আমি সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠলাম।

ম্যাকলীন ড্রাইভারকে জীপ বার করতে বললেন। ড্রাইভার জীপ বার করে কোয়ার্টারের সামনে এসে দাঁড়াল। আমরা দুজনে সামনের সীটে পাশাপাশি বসলাম।

আমাদের বাড়ির সামনে জীপ থামিয়ে ড্রাইভার বার কয়েক জোরে জোরে হর্ণ বাজাল। হর্ণের শব্দ শুনে বাড়ির ভেতর থেকে বাবা বেড়িয়ে এলেন।

বাবার পরনে লুঙ্গি। গলায় ময়লা পৈতে। মুখে জলন্ত বিড়ি।

ম্যাকলীনকে জীপের ভেতর বসে থাকতে দেখে বাবা মুখের বিড়িটা চট্ করে ফেলে দিয়ে সবিস্ময়ে জিগ্যেস করে উঠলেন, আপনি স্যার!

—ইয়েস মিস্টার রয়, অ্যাট লাস্ট আই অ্যাম ইওর গেস্ট। সহাস্যমুখে বললেন ম্যাকলীন।

জীপ থেকে নামলাম দুজনে।

ম্যাকলীনকে বাইরের ঘরে না বসিয়ে নিয়ে যাওয়া হল বাবার ঘরে।

আমার ছোট ছোট ভাই বোনগুলো হাত পা ছড়িয়ে বাবার চৌকির ওপর ঘুমুচ্ছিল। ম্যাকলীন আমার ছোট্ট বোনের পায়ের কাছে ধপ্ করে বসে পড়ে ওর কচি পা দুটো হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন।

বাবা বললেন, আপনি এই চেয়ারটায় বসুন স্যার।

ম্যাকলীন চেয়ারে বসার অনুরোধ রাখলেন না, বললেন, নো, নো আমি এখানেই ভাল আছি। আমি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের খুব ভালবাসি।

ম্যাকলীন পকেট থেকে সিগারেটের টিন বের করে দুটো সিগারেট হাতে নিলেন। একটা সিগারেট তিনি তাঁর ঠোঁটের কোণে চেপে, আর একটি সিগারেট বাবার দিকে এগিয়ে দিলেন। বাবা সবিনয়ে ম্যাকলীনের অফার প্রত্যাখান করতে চাইলে তিনি বলে উঠলেন, লজ্জা কি নিন।

বাবা সলজ্জোচে সিগারেটটি হাতে নিলেন, কিন্তু ধরালেন না।

বাবার পরণে আধময়লা লুঙ্গি, গায়ে জামা নেই। তিনি ম্যাকলীনের সামনে এ অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে কুণ্ঠা বোধ করছিলেন।

বাবা বললেন, আপনি একটু বসুন স্যার—আমি আসছি। বাবা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই ম্যাকলীন আমাকে বললেন, রয়, আই অ্যাম অ্যালোন ইন্ দিস ওয়ার্ল্ড্। তোমার মতন আমার যদি ছোট ভাই বোন থাকত তাহলে আমার একাকীত্বের বোঝা

অনেকটা কমত। মানুষ একা থাকলেই উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়ে।

কিছুক্ষণ পরেই বাবা কিউকাট হয়ে ফিরে এলেন। বাবার পরণে ধোপদুরস্ত ধুতি, গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবী মাথার চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো।

ম্যাকলীন বাবার দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন, এবার আপনার খবর বলুন, মিস্টার রয়?

বাবা বললেন, আমার আর খবর কি স্যার। দিন কোনরকমে চলে যাচ্ছে।

ম্যাকলীন বললেন, দিন চলা নিয়েই কথা। আমরা ট্রাভেলার। পৃথিবীর পথে পাড়ি জমাতে এসেছি। কোনমতে গন্তব্যস্থলটুকু পার হতে পারলেই আমাদের মুক্তি।

আরম্ভ হল ম্যাকলীনের কথা। বাবা এবং আমি নির্বাক শ্রোতা।

সহজ কথায় জীবন-চরণের নিগূঢ় তাত্ত্বিকে বিশ্লেষণ আরম্ভ করলেন।

ম্যাকলীন বলতে লাগলেন, মিস্টার রয়, দিন চলা যেমন থেমে থাকে না, তেমনি জীবনচর্যাও থমকে যেতে পারে না। জীবন মানেই গতি। আমরা গতির সূত্রে আবদ্ধ। আপনাদের কবি রবীন্দ্রনাথ জীবনকে গতির ছন্দে বেঁধেছিলেন বলেই তিনি মহাকবি। মৃত্যু হল জীবনের গতিশীলতার অবসান। জীবনকে আমরা বুঝতে পারি, আনন্দ আবেগ অনুভূতির স্পর্শে জীবনের স্বাদ গ্রহণ করি। কিন্তু মৃত্যুকে বুঝতে পারি না। মৃত্যু একটা প্রহেলিকা। সেক্সপীয়রের ভাষায় 'Death, the undiscovered country, from whose bourn on traveller returns···

ম্যাকলীনের আবেগকম্প্র কথা ঘরের পরিবেশে একটা ভাবমূর্ছনার কথাগুলো প্রতিহত হতে হতে মিলিয়ে গেল।

আমি ম্যাকলীনের মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। তিনি কি বলছেন, তা শোনবার জন্যে নয়। কারণ ম্যাকলীনের কথা আমি অনেক শুনেছি। ম্যাকলীনের বচন ভঙ্গিমা ও বলার মধ্যে যে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসের সুর থাকে, তাই কেবল আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করি।

বাবাও ম্যাকলীনের কথাবার্তা শুনে এবং তাঁর সহজ সারলা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তাঁর চোখে মুখে ফুটে উঠল প্রচ্ছন্ন বিস্ময়।

ম্যাকলীনকে গরম লুচি ভেজে দেয়া হল। তিনি খান কয়েক লুচি খেয়ে উঠে পড়লেন।

ওঠার সময় আমাকে জিগ্যেস করলেন, তোমার মাদার কোথায়?

আমি বললাম, পাশের ভিতর আছেন।

—ডাক তাঁকে। তাঁর সংগে দেখা করে যাই।

মা ম্যাকলীনের সামনে আসতে রাজি হচ্ছিলেন না। অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে অবশেষে মাকে ম্যাকলীনের সামনে আনতে পারলাম।

ম্যাকলীন মাকে দুহাত তুলে নমস্কার করলেন।

মা লজ্জায় জড়ো-সড়ো হয়ে ঘরের এক কোণায়, এক মাথা ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়েছিলেন।

ম্যাকলীন মাকে বললেন, আপনার ছেলে আমার অত্যন্ত প্রিয়। ওর আমি কিছুই করতে পারিনি। আমি আশীর্বাদ করছি জীবনে ও সুখী হবে।

মা চিত্রার্পিত। কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মার এই অবস্থা দেখে আমার রীতিমত অস্বস্তি জেগে উঠল।

ম্যাকলীন বলে চললেন, আমার অফিসে যতগুলো লোক কাজ করে তার মধ্যে আপনার ছেলেই একমাত্র সৎ। এতটুকু অন্যায় ও কোনদিন করেনি। রফকে আমি আমার ছোটভাইয়ের মতো ভালবাসি।

ম্যাকলীনের মুখ থেকে আমার প্রশংসা শুনে বাবার চোখ মুখ খুশিতে জ্বল জ্বল করে উঠল। তিনি স্নেহার্দ্র দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ঘন ঘন মাথা নাড়তে লাগলেন।

মার অবস্থা বুঝতে পারলামনা। তিনি নিশ্চল পাষাণ মূর্তির মতো দাঁড়িয়েছিলেন।

ম্যাকলীন বেশীক্ষণ আর বসলেননা। হাত ঘড়ির দিকে নজর দিয়ে বেড়িয়ে এলেন বাইরে।

আমি জিগ্যেস করলাম, আপনার সংগে যাব স্যার?

—না, তোমার আর যেতে হবে না। জীপে বসে ম্যাকলীন বললেন।

ট্রাইডাণ্ট জীপের হেড লাইট জ্বালিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। জীপ চলবার আগে ম্যাকলীন তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন বাবার দিকে।

বাবা ম্যাকলীনের হাত স্পর্শ করতেই ধরা গলায় ম্যাকলীন বলে উঠলেন, মিস্টার রয়, বড়ো ব্যথা নিয়ে এখান থেকে আমি চলে যাচ্ছি। কেউ আমার ব্যথা জানে না। একমাত্র আপনার ছেলেই আমার ব্যথা বুঝতে চেষ্টা করেছে। রিয়ালি, আই লভ্ হিম। কি ইজ্ এ সাভ্‌লি বয়। আমি তার কিছুই করতে পারিনি……

আর কথা সরলনা ম্যাকলীনের। তাঁর গলা কান্নার দমকে বন্ধ হয়ে গেল। দুফোটা তপ্ত অশ্রু ম্যাকলীনের চিবুকে গড়িয়ে বাবার হাতে পড়ল।

বাবা বিস্ময়ে বিমূঢ়। তিনি অপলকে কেবল ম্যাকলীনের দিকে চেয়েছিলেন। তাঁর দৃষ্টি ঝোবা।

ম্যাকলীন চলে গেলে পর বাবাকে ডাকলাম, বাবা!

আমার ডাকে বাবার সম্বিৎ ফিরল।

ম্যাকলীনের জীপ রাস্তার ধুলো উড়িয়ে যে পথ দিয়ে যাচ্ছিল, সেই পথের দিকে দৃষ্টি তুলে বাবা অন্যমনস্কের মতো বলে উঠলেন, লোকটা বড়ো উদার প্রাণের! আমরা কেউই ওকে চিনতে পারলামনা!

আশ্চর্য! ভালবাসার কি অপরূপ মহিমা!

আত্মীয় নয়, স্বজন নয়, বন্ধুও নয় একজন বিদেশী রাজকর্মচারী—অথচ এই রাজকর্মচারীর ভালবাসার পাত্র হলাম আমি! জানিনা এ কোন ধরণের ভালবাসা! এ ভালবাসার মূল্যই বা কি।

এ ভালবাসার মূল্য নেই। অমূল্য, অক্ষয়। স্বার্থলেশ-শূন্য। এর বিচার চোখের নয়, মনের।

ম্যাকলীন বাবার মনও জয় করে গেছেন। বাবা মাকে বলছিলেন, আমার মৃত্যু পর্যন্ত মনে থাকবে যে একজন শ্বেতাঙ্গ রাজকর্মচারীর দুফোটা তপ্ত অশ্রুর স্পর্শ আমি পেয়েছি: আমার জীবন ধন্য হয়ে গেছে। যে শ্বেতাঙ্গরা আমাদেরকে দিচ্ছে বেদনা, যারা অহরহ উৎপীড়নে প্রবঞ্চিত তাদের সমস্ত অপরাধ আমি ক্ষমা করেছি মনে মনে।

সমষ্টির পাপের প্রায়শ্চিত্ত দুএক জনই করে। ইতিহাস তার সাক্ষী। গান্ধীজী একক্ষণী সাম্প্রদায়িকতার প্রথম বলি।

তিনি অমর। তাঁর জীবন দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করে গেছেন পাপের। সে পাপ সাম্প্রদায়িক হিংস্রতার, সে পাপ ধর্মের জিঘাংসার, সে পাপ কাপুরুষতার।

যেখানেই হানাহানি হবে, যেখানে দেখা দেবে বিদ্বেষের আগুন, সেখানেই গান্ধীজীকে আবার নতুন করে বলি হতে হবে। কারণ তিনি আমাদের বিবেক, আমাদের ধর্মবোধের প্রাণশক্তি:

ম্যাকলীন গান্ধীজী নয়, তাঁর মতো হবার সাধনাও নেই ম্যাকলীনের। কিন্তু তবু গান্ধীজীর আদর্শের সংগে ম্যাকলীনের জীবনাদর্শের একটা অতি ক্ষীণ যোগসূত্র যেন রয়েছে।

মানুষের সাধনা ক্ষুদ্র থেকে বৃহতের দিকে ধাবমান। মানুষের বিবেকের সংগ্রাম হল মহৎ মনুষ্যত্বকে কেন্দ্র করে। ঘৃণা নয় প্রেম, হিংসা নয় শান্তি। পৃথিবীর অটল অবিমিশ্র প্রশান্তির সংগে ব্যক্তিজীবনের একাগ্রতা মরীচিকার মায়াবন্ধন ছিন্ন করে সত্যের আনন্দময় সত্তার প্রকাশ এবং বাণীরূপের সাধনা ধ্যানের সাধনায় রূপান্তরিত করার মধ্যেই রয়েছে মহৎ মনুষ্যত্বের আদর্শ নিহিত।

মানুষের জীবনে দুটো আদর্শের ধারা। একটি প্রাত্যহিক জীবনের, যেখানে সে চায় সুখ সমৃদ্ধি বিলাস। অপরটি—ক্ষুদ্রতার সংকীর্ণ বেড়াজাল ভেদ করে যেখানে সে হতে চায় মহৎ এবং তার জন্যে আত্মসুখ সমৃদ্ধি হেলায় তুচ্ছ করে সে মহাজীবনের বজ্র-কঠিন ব্রত পালন করে। আদর্শ মানুষেরই সৃষ্টি। আর এই নিজের সৃজিত আদর্শের জন্যে যে মানুষ দুঃখ পায়, আঘাত পায়, বিসর্জন দেয় জীবন—সেইতো মহামানব।

ম্যাকলীন আদর্শবান পুরুষ বললে তাঁর সম্পর্কে বেশী বলা হবে। তিনি আর পাঁচটা মানুষের মতো চলতি পথে চলার মানুষ। ছোট সুখ, ছোট ব্যথা, কুচক্রের আবর্তনের মতো দৈনন্দিন জীবনের হাসি কান্নার সমন্বয়ে তিনি একটি অতি সাধারণ মানুষ। কিন্তু তবু ম্যাকলীন সাধারণ নন। সাধারণের সংগে কোথায় যেন তাঁর একটা অমিল আছে।

আর কেউ জেনেছে কিনা জানিনা, কিন্তু আমি জেনেছি যে, ম্যাকলীন একজন মানব-প্রেমিক। আমার একবছরের চাকুরি জীবনে ম্যাকলীনের অনেকগুলো মানব-প্রেমের নিদর্শন দেখেছি।

নাটোর থেকে বিদায় নেবার পূর্ব মুহূর্তে ম্যাকলীনের বিষাদাচ্ছন্ন করুণ মূর্তি দেখে আমার মন জমাট বেদনার উত্তরোল হয়ে উঠেছিল।

ভোর রাতে ম্যাকলীনকে নাটোর স্টেশনে ট্রেণে তুলে দিতে আমরা তিনজনে এলাম।

ম্যাকলীন একটি বছর নাটোর মহকুমার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিলেন। আশা করেছিলাম, ম্যাকলীনকে বিদায় জানাতে অনেকেই স্টেশনে হাজির হবে।

কিন্তু কি আশ্চর্য, আমি, দালাম আর রঘু ভ্রাইভার বাদে আর কারও দেখা পাওয়া গেলনা স্টেশনে।

দুনিয়ার এই-ই নিয়ম! অস্তমিত সূর্যকে কেউ পুজো করে না। ম্যাকলীন আর নাটোরের এস, ডিও নন। যেদিন থেকে তিনি তাঁর অফিসের কার্যভার চুকিয়ে দিয়েছেন, সেদিন থেকেই তাঁর সব কিছু শেষ হয়ে গেছে। তিনি এখন আগন্তুক। তাঁকে আর কেউ আজুনি প্রণত হয়ে সেলাম জানায়না কিংবা সভয় বিনয়ে বিগলিত হয়ে বাক্যালাপ করতে আসে না।

ট্রেণ এল।

ম্যাকলীন ফার্স্ট ক্লাশ কামরায় উঠলেন। দালাম ম্যাকলীনের মালপত্র কামরায় তুলে দিল।

ট্রেণ ছাড়ার আগে পর্যন্ত ম্যাকলীন নিস্তব্ধ ছিলেন। আমি ভাবছিলাম, যে মানুষটা একটি গোটা বছর ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমার সংগে কথা কয়েছেন, তিনি হঠাৎ কথা বন্ধ করে নির্বোক হয়ে গেলেন কেন!

ট্রেণ ছাড়ার হুইসিল পড়ল।

ম্যাকলীন আমাকে কাছে ডেকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন। আমিও নিজেকে ম্যাকলীনের বুকে সঁপে দিলাম।

ম্যাকলীন বললেন, বয় তোমাকে আমি কিছুই দিতে পারিনি। তুমি আমার অনেক করেছ। আজ যাবার সময় তোমাকে আমার জীবনের একটা শ্রেষ্ঠ ধন দিয়ে যাচ্ছি—বলে তিনি বুক পকেট থেকে একটা ফটো বার করে আমার হাতে দিলেন।

আমি ফটোটি হাতে নিয়ে ফটোর ওপর চোখ বোলালাম, দেখলাম, এক প্রৌঢ় ভদ্রলোকের পাশে ম্যাকলীন দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

ম্যাকলীন বললেন, আমার পাশে আমার বাবা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমার বাবা আমার জীবনের সবটুকু জুড়ে রয়েছেন। হি ইজ্ মাই রিয়াল গড্। যাকে আমি সবার চেয়ে বেশী ভালবাসি, সেই বাবার ফটোই তোমাকে দিয়ে গেলাম। ভরসা রাখি, তুমি এই ফটো সযত্নে রেখে আমাকে চিরকাল মনে রাখবে।

আমি মাথা নেড়ে ম্যাকলীনের কথায় সায় দিলাম। আমার গলা ধরে এসেছিল। ভাষা আমার মুখ দিয়ে বেরুচ্ছিলনা, প্রচণ্ড কান্নার আবেগ ভেতর থেকে ঠেলা মারছিল।

আমি কান্না সংবরণ করতে পারলামনা, আমার দুচোখে জল ধারা নামল।

ম্যাকলীনও কেঁদে ফেললেন। কাঁদতে কাঁদতে বললেন, বয় আমাকে ভুলোনা, কখনো ভুলোনা। আমি সত্যি হতভাগ্য। তোমাদের স্নেহ ভালবাসাই আমার বাঁচার পাথেয়···

ট্রেণ ছেড়ে দিল।

আমি ট্রেণ থেকে নেমে গেলাম। যতক্ষণ ট্রেণ আমার দৃষ্টির সীমানায় ছিল, ততক্ষণ আমি বেদনা-কাতর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম ম্যাকলীনের কামরার দিকে।

ট্রেণ আমার দৃষ্টির অগোচরে মিলিয়ে যেতেই আমি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বাড়ির দিকে হাঁটা দিলাম।

— স মা প্ত —

শ্রীজ্ঞানপাপী

কলিকাতা খেলার মাঠে দুইটি নতুন চিত্রের আবির্ভাব হইয়াছে—রেফারী ও দর্শক।

O

"দয়া করিয়া পাসপোর্ট দিন বৈদেশিক মুদ্রা ঘরে বানাইয়া লইতে পারিব।"

জনৈক বিদেশ গবেষেচ্ছুক ব্যবসায়ীর প্রার্থনা।

যিনি বিদেশী মুদ্রা বানাইতে পারেন পাসপোর্ট বানাইতে তিনি কি সত্যই অপারক!

O

নেহরু জানাইয়াছেন যুদ্ধ বিরতি সীমারেখা অনুযায়ী কাশ্মীর বিভাগের প্রস্তাব তিনি আমেরিকার নিকট করিয়াছিলেন।

এতদিনে ঝুলির বেড়াল.....

O

বিশ্ববিখ্যাত নভোবিজ্ঞানী জে. বি. এস. হালডেন নিজের বাথরুম ও ড্রইংরুমে গবেষণাগার স্থাপনের বিকল্প হিসাবে পদত্যাগ করিয়াছেন।

বিভাগীয় মন্ত্রী শ্রীহুমায়ুন কবীর জানাইয়াছেন ইহাতে তাহার কিছু যায় আসে না।

ঠিক কথা।

কবীর সাহেবের জন্যে তো বাথরুম নয়—দিল্লীর ডিরেক্টরিয়েটের বর্ষাতক বরাদ্দ আছে।

O

ভারত নাকি রাশিয়ার নিকট হইতে মিগ বিমান কিনিবে।

ছবে ঢোরে কামারে এখনও দেখা হইয়াছে [illegible] —আর ধরবার।

O

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ভারতকে একঘরে নিরস্ত্রীকৃত হইয়া পথ দেখাইতে অনুরোধ জানাইয়াছেন।

পাকিস্তান, চীন, নেপাল কে কে নিরস্ত্রীর পথ দেখাবে?

O

ছবি বিশ্বাস গত হইয়াছেন।

"তুমি কি কেবলি ছবি"—ফিল্ম ক্যানেলের রবীন্দ্র সঙ্গীত।

O

সারারাত্রি বাস চলাচলের প্রস্তাব উঠিয়াছে।

—সঙ্গে সঙ্গে এ্যাম্বুলেন্স চলারও ব্যবস্থা রাখা চাই।

O

বিদেশে যাইবার জন্য ব্রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পারমিট লাগিবে—সরকারী ঘোষণা।

পরলোক স্বদেশ না বিদেশ এ প্রশ্নের মীমাংসা চাই।

O

ব্রিটেন কমন বাজারে প্রবেশ করিয়াছে।

কমন-ওয়েলথের ওয়েলথ্ এখন হইতে কমন বাজারে বিক্রয় হইবে।

O

রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণন আমবাগানের মধ্যে জনসাধারণের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

মামণির কড়া হুকুম বিকেলে ছটার মধ্যে বাড়ি ফিরতে হবে। এক ঘণ্টা বাইরে বেরনোর ছুটি। পাঁচটা থেকে ছটা, পাঁচ মিনিট বেশি হলে কৈফিয়ৎ দিতে হবে। হ্যাঁ, সেই সঙ্গে পরের দিন বিকেলে রজতের বাইরে বেরনো বন্ধ।

বাড়ির সামনে বেশ কিছুটা জমিতে সাজানো বাগান। সাদা কাঠের গেট থেকে বাঁকা ফেলা রাস্তা এসেছে গাড়ি-বারান্দার নিচে পর্যন্ত। বাড়ি ফিরতে দেরি হলে মামণি সেই বারান্দার ওপর দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবে। স্থির মূর্তি, নিশ্চল পুতুলের মতো। দেখলেই ভয়ে হিম হয়ে আসে রজত। মামণির ওই নিশ্চল মূর্তি দেখলেই রজত বুঝতে পারে একটা কিছু অস্বাভাবিক ঘটবে। কিন্তু এমনিতে মামণি অমন নয়। রাতে

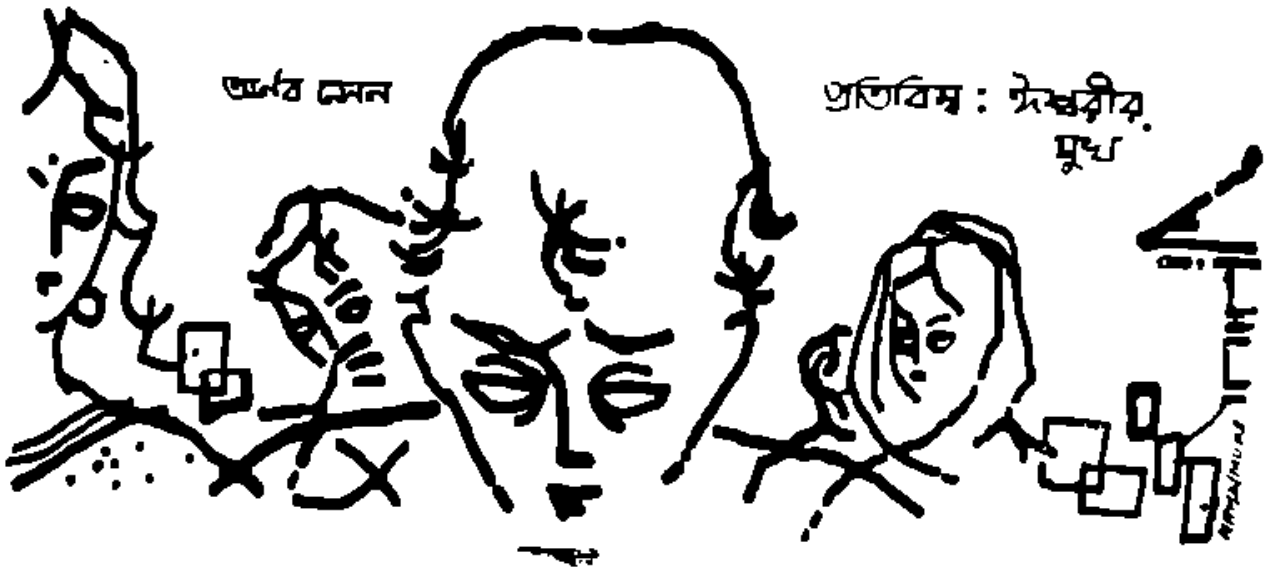

শোবার পর কত আদর করে তাকে, এমন কি এখনও শুতে যাওয়ার আগে মামণি আদর করে তাকে চুমু দেয়। মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়, কত সুন্দর সুন্দর কথা বলে। কিন্তু রাগলেই একেবারে বদলে যায় মামণি। এ যেন অন্য কেউ।

মামণি এখনও ভাবে ও যেন ছেলেমানুষ। এমনি-ভাবে ওকে আদর করে যে লজ্জা পায়। ও বলে, 'দেখ, আমি বড় হয়ে গেছি। তুমি অমন করো না।' মামণি বলে, দূর পাগলা! বড় না ছাই! এখনও আমি তোকে কোলে নিতে পারি। দেখবি?' রজত বলে, 'না না থাক।; মামণি আদর করে, 'রজু' বলে ডাকে ওকে। কিন্তু রজত জানে আসলে মামণি তার নিজের মা নয়। মামনি তাকে ঠিক নিজের মার মতোই অবশ্য ভালবাসে। সবাই তাই বলে। অবশ্য নিজের মাকে বিশেষ মনে নেই।

রুমিদি ওকে বিশেষ বকে না। এই জন্যে বেশ ভাল লাগে রুমিদিকে। রুমিদিকে মামণি বলে দিয়েছে ওকে কড়া শাসনে রাখতে। ও সামনেই বলেছে, 'শোনো, ছেলের পড়ার ভার তোমাকে দিলাম। কিন্তু কড়া শাসনে রাখবে। বড় বাঁদরেমো ছেলে।' রুমিদি বড় লাজুক। আর মামণিকে খুব ভয় করে রুমিদি তা রজত বুঝতে পারে। রুমিদির কথা মামণির কাছেই শুনেছিল রজত। লেখাপড়ায় খুব ভাল মেয়ে রুমিদি। সবে বি-এস-সি পাশ করেছে। এখানকার স্কুলের টিচার হয়েছে ওদের বাড়িতেই থাকবে, আর রজতকে পড়াবে।

বাবার সঙ্গে রুমিদির বাবার পরিচয় ছিল। সেই সূত্রেই রুমিদির আসা। তাছাড়া মামণি বলে, 'মেয়েরা যত যত্ন নিয়ে পড়ায়, ছেলেরা তা করে না।

প্রথম প্রথম রজতের একটু লজ্জা করত রুমিদির কাছে পড়তে। ক্লাসে সেটুকু কেটে গিয়েছে। তাছাড়া রুমিদি খুব ভাল গল্প জানে! বোঝাতেও খুব সুন্দর। ইংরিজিও রুমিদি ভাল জানে। কত কবিতা বলে পড়াতে পড়াতে। তবে রুমিদি তাকে বকে না মোটেই, বরং বন্ধুর মতো কথা বলে। তাই রজতের ভাল লাগে রুমিদিকে।

কিন্তু পাপি এই নিয়ে খোঁটা দিতে ছাড়েনি।

সেদিন বিকেলে রজত বেরয়নি। বসে আছে বাগানের কৃষ্ণচূড়া গাছটার দোলনার ওপর। এমন সময় পপি এল। পপি পরেছে আকাশনীল নাইলনের ফ্রক, ভেতরে সাদা সার্টিনের লেস দেওয়া হাতকাটা জামা। পপি আসতেই রজত তার দিকে হেসে বলল, 'কি খুব যে সাজা হয়েছে!

পপি ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, আহা! কি এমন সেজেছি! তোমার রুমিদির মতো না।

রজত বলল, 'যাও যাও। রুমিদি সাজেই না। রুমিদির মতো হতে তোমার সাত জন্ম ঘুরে আসতে হবে।'

পপি গম্ভীর হয়ে স্বামী বিবেকানন্দের মতো হাত জড়ো করে বলল, 'অবশ্য মেয়ে টিচারের কাছে পড়াশুনা করাটা গৌরবের বিষয়। তুমি বোধ হয় এ শহরের একচ্ছত্র সম্রাট এ বিষয়ে।'

'পপি। পাকামি করো না। তোমাদের মেয়েই-স্কুলে কি শেখায় তা জানা আছে।'

পপি হাসল বিদ্রুপের সুরে। তারপর বলল, 'তুমি তো বলতে মেয়েরা পড়াতেই পারে না। তাই বলছি আমাদের মেয়ে ইস্কুলের মেয়ে টিচাররা যখন পড়াতে পারে না। তখন রুমিদিও পড়াতে পারে না ধরে নিতে হবে। কারণ রুমিদি আমাদের স্কুলের টিচার।'

'হয়েছে, হয়েছে, থামো।' রজত বলল।

পপি এগিয়ে এসে দোলনার দড়িটা ধরল। 'এই লক্ষীটি একটু নামো। আমি চড়ি এবার।' রজত দোলনা ছেড়ে দিয়ে নেমে এল। পপি লাফ দিয়ে উঠে দুলতে লাগল। রজত বসল গাছের গুঁড়ির গায়ে ঠেস দিয়ে। গাছটায় এবার ফুল ধরতে আরম্ভ করেছে সবে। কয়েকটি মোটে ফুটেছে রক্তরঙের কৃষ্ণচূড়া। সূর্যটা ঢেলে পড়েছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই ডুবে যাবে। আকাশ ভরে উঠেছে নানা রঙের মেঘে। কেমন যেন বিষণ্ণ শান্তি! ভাল লাগে না। তবু ভাল লাগে। কতকগুলো পাখি উড়ে গেল। নদীর চরের কাশ-গাছগুলো বাতাসের ঝাপটে দুলছে। মামণি তখন চুল বাঁধছে বোধ হয়। রুমিদি বাজারে গেছে কি কি জিনিষ কিনবে বলে। মামণির আজ শরীর ভাল নেই। অল্প জ্বর হয়েছিল কাল রাতে। রুমিদির কাছে পড়ে বলে পপি ঠাট্টা করল। আরও দু'একজন ক্লাসের বন্ধুত্ব করেছে। অবশ্য তার বন্ধু নেই বললেই চলে। একটি দুটি কি তিনটি। খুব বেশি মিশতে ভালও লাগে না ওর। কেমন যেন ওরা। রুক্ষ, রূঢ় কর্কশ। ওরা মোটে সুন্দর না, কথাবার্তায়ও না, ব্যবহারেও না। ভাল লাগে না ওদের। মনের মতো বন্ধু তার কই! নেই, একজনও নেই। এ ভাল লাগে না। তবে পপি তার বন্ধু। পপিকে তার মন্দ লাগে না। পপি থাকে পাশের বাড়িতেই। অনেক ছোটবেলা থেকে ওরা বন্ধু। মামণি বলে একই ব্রহ্মের প্রায় ওদের। পপি পড়ে এক ক্লাস নিচে। মামণি বলে, মেয়েটার শরীরের বাড় নেই।' মাসিমা, মানে পপির মা বলেন, 'মেয়েটা বাড়বে কি করে? যা দুরন্ত, কেবল ছুটোছুটি, হৈ চৈ। কিচ্ছু খাবে না ভাল করে। না খেলে শরীর ভাল হয়?'

'এই! কি বোবার মতো আছ চুপচাপ?' পপি দুলতে দুলতে বলল।

'ভাল লাগছে না।'

'কেন? কি হলো? টফি খাবে? একটা টফি ছুঁড়ে দিল পপি রজতের দিকে। রজত টফিটা নিল না।

'এই রজু! কি হলো বলো না?' পপি দোলনা থামাল। 'জানো একটা ব্যাপার হয়েছে। তোমাকে বলব আজ।' হঠাৎ বিষণ্ণ গম্ভীর মনে হলো পপিকে মাথা নিচু করে পপি পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মাটি খুঁড়ল।

রজত হঠাৎ যেন ভয় পেয়ে গেল।

'কি হয়েছে? তার গলার স্বর কেঁপে গেল।

'তোমার কি হয়েছে বলো।'

'এমনি মন খারাপ।' তুমি বলো না কি ব্যাপার?

'ও। টফিটা খাও, বলছি।' পপি আবার পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মাটি খুঁড়ল। তারপর বলল, 'ছিঃ, ওরা কি নোংরা!'

'কারা?' রজত আবাক হয়ে জানতে চাইল।

'কারা আবার? ওই মিলিরা!' ঘৃণায় কঠিন হলো পপির ঠোঁট, ঝকঝক করে উঠল দু'চোখ। 'ওরা কি বলেছে জানো?'

'কি ?'

'মাকে বলেছে, যখন তখন মেয়েটাকে লাফিয়ে লাফিয়ে রঞ্জুদের বাড়ি যেতে দেবেন না। একটা কিছু ঘটে যেতে পারে। আপনার মেয়েও বড় হয়েছে রঞ্জুও আর ছেলেমানুষ নেই। ওদের অত মেলামেশা ভাল দেখায় না।'

'কেন ওরা এমন বলল ?' এক পলকায় ন্যাকাশে মুখে রজত পপির দিকে চাইল। তাছাড়া কি ঘটে যেতে পারে ?

'অনেক কিছুই ঘটতে পারে। ওরা যেমন নোংরা তেমনি ওদের কথাবার্তা। থাক ওসব। কিন্তু শোনো রঞ্জু, মা আমাকে সাবধান করে দিয়েছে আর তোমাকে আমি বলে দিচ্ছি, এখন থেকে তুমি আমাকে ছোঁবে না। তুমি বড় ছেলেমানুষী করো।'

'আমি কি করি ?'

পপি বলল, 'হ্যাঁ, বোঝো না আমরা বড় হচ্ছি। তুমি কেন আমার হাত ধরো ? চুমু ধরো ? কেন ঐ তুমি ওই সমস্ত ছেলেমানুষী করো ? ওরা তো নোংরা চোখে আমাদের সম্পর্কে দেখবে।'

'দেখুকগে বয়ে গেল।' রজত উদাসীন গলায় জবাব দিল।

'না, তা নয়। তুমি বড় বড় হচ্ছো, আমি বড় হচ্ছি। এটা বুঝতে শেখো। এবার বাড়ি যাই।'

পপি চলে গেল। রজত কিরছিল বাড়ির দিকে মন্থর পায়ে। হ্যাঁ বড় হচ্ছে, পপি বড় হচ্ছে। চিরদিন ও ছেলেমানুষ থাকবে না। এরই নাম যৌবন। ওর শরীরের কমনীয়তাকে নষ্ট করে, ওকে রুক্ষ কর্কশ করে সে আসবে। তার হাতদাগগুলো তো আগে এমন ছিল না। পপির পায়ে হাত ও রঙ মিলিয়েছে, কে ফর্সা বেশি। কিন্তু আজকাল মেলে না। পপির হাত বেশি ফর্সা হচ্ছে, অনেক নরম, সুন্দর। ওর হাত কর্কশ হয়ে আসছে। এরপর লোমগুলো আরও ঘন হবে, শক্ত হবে কি বিশ্রী লাগবে তখন।

ঘরে ঢুকেই রজত গিয়ে দাঁড়াল আর্শির সামনে। ঝুঁকে পড়ল আর্শির ওপর। রাতের ইলেকট্রিক আলোতেও বোঝা যাচ্ছে নরম কালো রেখা নামছে জুলপির কাছ থেকে। লম্বা জুলপির মাঝখানে থাকা গোড়াটা চুল বেড়ে গেলে কি সুন্দর লাগে। ও তখন ঘুরিয়ে দেয় একটু। মানিয়ে নিয়েছে। কিন্তু এও থাকবে না। কর্কশ কালো দাড়ি গজাবে ওর। তখন নিজেকে সুন্দর লাগবে না। পপি আগে গালে গাল রাখত। কিছুদিন আগে পর্যন্তও। ওর মনে আছে, ও বিছানায় শুয়ে পড়ছে গল্পের বই। হঠাৎ পপি ছুটে এসে লাফিয়ে পড়ল। তারপর তার গালে গাল রেখে লুটিয়ে পড়ল তার গায়ে। 'আঃ কি নরম গাল।' টিপে টিপে বলত পপি। কিন্তু পপির গাল তখন ওর চেয়ে শক্ত ছিল। তাছাড়া পপির শরীরটা মোটেই নরম না। রোগা, কাঠি কাঠি শরীর। ওর এই গায়ে লুটিয়ে পড়াটা বড় বিরক্তিকর। তবু ওই পপির স্বভাব। পপি একদিন তাকে ঘরে গোপনে কানে কানে একটা কথা বলেছিল, 'এই রঞ্জু একটা কথা জিজ্ঞেস করব। কাউকে বলবে না দিব্যি করো।' 'কি কথা ?' রজত জিজ্ঞেস করেছিল। পপি বলল, 'আচ্ছা আমার দিকে চাও। আমাকে এখন সুন্দরী বলা চলে ?' 'হ্যাঁ বলা চলে।' রজত উত্তর দিয়েছিল। কিন্তু তারপর থেকেই কেমন যেন বদলে যাচ্ছে পপি। রজত লক্ষ্য করে দেখেছে। পপির স্বভাব, চেহারা, কথাবার্তা, সবকিছু যেন বদলে যাচ্ছে। পপি আর আগের মতো হৈ চৈ করে না। পপি সাজতে শিখেছে। অনেক নতুন নতুন কথাবার্তা শিখেছে। পপির ঠোঁটে, গালে, কপালে, কোমল কমনীয়তা আসছে।

বিকেলে সেদিন কিরতে তার দেরি হয়নি। বরং সন্ধ্যের আগেই ফিরেছিল রজত। পড়ার টেবিলে বসে খাতার ওপর এলোমেলো হিজিবিজি কাটছিল। রুমিদি এসে ঘরে ঢুকল।

'কি রঞ্জু। আজ যে ভাল ছেলের মতো পড়তে বসে গেছ সন্ধ্যে হতে না হতেই ?'

রজত হাসল। 'সন্ধ্যে তো হয়েছে।'

'হুঁ, বুঝলাম বকুনির ভয়ে।' রুমিদি মুখ টিপে হাসল। তারপর বসল চেয়ার টেনে নিয়ে।

'দেখি, খাতাটা দেখি। একী, কি সব হচ্ছে ? বসে বসে হিজিবিজি কাটছ, দুষ্টুছেলে। এই পড়া হচ্ছে !'

'কি করব তাহলে ?'

'কেন ? পড়বে। তোমার নিজেরও তো একটা দায়িত্ববোধ থাকা উচিত। তাই না ? তাছাড়া তুমি আজকাল যেন কেমন হয়ে গেছ। কোনকিছুই তোমার ভাল লাগে না। সব সময় মনমরা হয়ে থাকো। কি ব্যাপার বলতো ?'

রজত মাথা নিচু করে হাসল।

'কোথায় মনমরা হয়ে থাকি ?'

'রজত।' রুমিদি মৃদুস্বরে ডাকল। তারপর রজতের হাতের ওপর হাত রাখল রুমিদি। ঠাণ্ডা, নিরুত্তাপ হাত, কিন্তু স্নিগ্ধ। রজত মুখ তুলল, 'কি বলছ ?'

রুমিদি কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। শূন্য অর্থহীন দৃষ্টিতে চাইল রজতের দিকে। এই চোখ রুমিদির নয়। কিন্তু এমন চোখে রুমিদি ছাড়া অন্য কেউ চাইতে পারে বলে রজতের মনে হয় না। একটু ইতস্তত করল রুমিদি। তারপর বলল, 'দেখ রজত, তোমাকে আমি বলতে চাই না। কিন্তু তুমিও বড় হচ্ছ, একথা ভুললে চলবে না। তোমার মামণিই তোমাকে একথা বললে ভাল করতেন, কিন্তু তিনিই বলতে বলেছেন আমাকে।' রুমিদি চুপ করল, হাত সরিয়ে নিল রজতের হাতের ওপর থেকে। রুমিদি মাথা নিচু করে বসে রইল। পেনসিল দিয়ে হিজিবিজি কাটল রজতের খাতার ওপর। রজত রুমিদির দিকে চাইল। রুমিদির কপালের ওপরের চুলগুলোর আলো পড়ে লালচে আভা দিল। সরু সাদা সিঁথিটা একটু বাঁকানো মাথার এক পাশে। কেন অমন করে চুল বাঁধে রুমিদি ? রজত দেখল, রুমিদি আজ জমাট রক্তের মতো কুমকুমের টিপ পরেছে। রজত দেখল, রুমিদির খোঁপায় রজনীগন্ধা। আজ বাসানে রজনীগন্ধা ফুটেছে, তার মনে পড়ল।

'কিছু বলবে রুমিদি ?'

'হ্যাঁ।' রুমিদি আর কিছু বলল না।

রজত আবার বলল, 'কি বলো না ? তোমার কিছু হয়েছে ?'

হঠাৎ রুমিদি সোজা হয়ে বসল।

'শোনো রজত, একথা তোমাকে যখন বলতেই হবে, বলে ফেলাই ভাল। কথাটা হলো পাপির সঙ্গে তোমার মেলামেশা নিয়ে। তোমরা—' রুমিদি আবার মাথা নিচু করল। পেনসিল দিয়ে হিজিবিজি কাটল। রজত দেখল রুমিদির হাত কাঁপছে থরথর করে। 'তোমরা দুজনেই বড় হচ্ছ। তোমাদের মেলামেশা একটু কম হওয়াই ভাল। তাই না ? পৃথিবী বড় নিষ্ঠুর, রজত। কেউ কাউকে ক্ষমা করে না। দয়া করে না।'

রজত রুমিদির শেষ কথাগুলোর মানে ঠিক বুঝল না। কিন্তু সে টেবিলের ওপর মাথা রাখল। না, সে কাঁদেনি। ভেবেছিল কাঁদবে, কিন্তু তা পারল না।

রুমিদি উঠে দাঁড়াল। রজতের মাথার ওপর হাত রাখল রুমিদি। 'তুমি কাঁদছ ?'

'না।'

'তুমি বিশ্বাস করো, তোমাকে আমি একথা বলতাম না। কিন্তু মামণি বলে দিয়েছেন, আমাকেই বলতে হবে।'

মাথার ওপর রুমিদির হাতের আঙুলগুলো চুলের মধ্যে নড়াচড়া করছে। রুমিদির আঙুলগুলো কেমন যেন এলোমেলো ছন্দহীন হয়ে আসছে। রুমিদি কি আরও কিছু বলতে চায় ? নিরুত্তাপ সান্ত্বনার মতো রুমিদির আঙুল গুলো আরও নিচে নামল। 'রজত তুমি কিছু মনে করো না।' ঠিক সেই মুহূর্তে সে কঠিন হতে পারল। রুমিদির আঙুল তার গাল ছুঁয়েছে। রজত উঠে দাঁড়াল, ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল রুমিদির হাত। সে মেয়েলি হবে না, সে পুরুষ।

'কেন ? কেন, তোমরা মিথ্যে দুর্নাম দাও ? আমি কি করেছি ?' চিৎকার করে উঠল প্রাপণন শক্তিতে রজত। এমন কর্কশ, এমন ভয়াবহ চিৎকার এ বাড়িতে কোনদিন শোনা যায়নি।

মামণি ছুটে এলেন। রজত কাঁপছিল থর থর করে। ঘৃণায় তার চোখ ছোট, কুঁচকে-যাওয়া, গালের চামড়াগুলোও যেন কুঁচকে গেছে, কালচে লাল হয়ে উঠেছে। হাতের আঙুলগুলো পর্যন্ত যেন বদলে গেছে।

রুমিদিকে ঘর থেকে চলে যেতে বললেন মামণি।

রুমিদি ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরও অনেকক্ষণ উঠান কথা না বলে মামণি চেয়ে রইলেন রজতের দিকে। মামণির চোখের দিকে চাইল রজত। মামণি স্থির মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে। এই মূর্তি ও চেনে। এক মুহূর্তে তার দাহকারী আত্মা যেন সংকুচিত হলো, গুটিয়ে নিল নিজেকে সে শামুকের খোলার মধ্যে। ফ্যাকাশে বিহ্বল ভীরু দৃষ্টিতে সে চেয়ে রইল মামণির দিকে। মামণির চোখ যেন দুসহ চাবুকের মতো আছড়ে পড়ল তার মুখের ওপর, তার শৌর্যের ওপর সে ক্লান্ত অবসন্নের মতো বসে পড়ল চেয়ারে। তার মাথা ঝিমঝিম করছিল, অন্ধকারের পর্দা দুলছিল চোখের ওপর।

পরের দিন সকালেও তার জ্বর ছিল। মাথাটা ভার ভার মনে হচ্ছিল। রজত জানলা দিয়ে বাইরে চাইল। নীল আকাশে দু'এক টুকরো সাদা মেঘ, উজ্জ্বল রোদ্দুর ভরা আকাশ, নদীর চরের কাশবন দুলছে হাওয়ার ঝুরঝুর ঝাপটে। জানলার পর্দাটা উড়ে উড়ে জানা ঝাপটাচ্ছে। আশ্চর্য! কাল সে কেন অমন রাগল? কিইবা ছিল রাগের? রুমিদি যা বলেছিল তাতো সে পাপির কাছে আগেই শুনেছে। কিন্তু কেন ওরা এমন ভাবে? রুমিদি হয়ত বলতে চায় নি। তবে রুমিদির গলা কাঁপছিল কেন? ও কথা বলতে গিয়ে রুমিদি অমন করছিল কেন? রুমিদি কাল যেন কেমন হয়ে গিয়েছিল। রুমিদি পাপিকে পছন্দ করে না কেন? পাপিটাও রুমিদিকে দেখতে পারে না একেবারে। রুমিদির নাম পর্যন্ত সহ্য করতে পারে না পাপি। না, কাল আমি সত্যিই অন্যায় করেছি। ছি, ছি, রুমিদি কি ভাবল? আমি রুমিদির ওপর রাগ করি নি। না, আমার অমন করা ঠিক হয় নি। কিন্তু আমার কেমন যেন মনে হলো হঠাৎ। আমি তো নই, এ যেন অন্য কেউ। আমার মধ্যে অন্য কেউ ভর করেছিল? ছি, ছি, আমি মুখ দেখাবো কেমন করে রুমিদির কাছে? রুমিদি কাল এসেছিল আমার বিছানার পাশে। দাঁড়িয়েছিল মাথা নিচু করে। মামণি আমাকে ওষুধ খাইয়ে দিচ্ছিল গ্লাসে করে। আমি রুমিদির দিকে চাইতে পারিনি ভাল করে। আমার কেমন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল মাথার মধ্যে। রুমিদির চোখ কুলো কুলো। কান্নার মতো। রুমিদি চুল খুলে ফেলেছিল। রজনীগন্ধা ছিল না। কুমকুমে টিপ ছিল না। ঘরের ম্লান সবুজ আলোর নিচে বিষণ্ণ লাগল রুমিদিকে। রুমিদি কি কিছু বলতে চেয়েছিল?

রজতের জ্বর নেই। কাল সে ভাত খেয়েছে। মায়ের মোল রান্না করেছিল মামণি নিজে। রুমিদি ছিল রান্না ঘরে। কিন্তু খাওয়ার সময় মামণিই শুধু ছিল। তখনই শুনল মামণির কাছে। রুমিদি চলে যাবে।

মামণি বললেন, 'রুমি, চলে যাবে। তুমি বোধহয় জানো না। ও আর থাকবে না এখানে।'

রজত উত্তর দেয় নি। মাথা নিচু করে বসেছিল ও।

মামণি আবার বললেন, 'যেতো অবশ্য ঠিকই—ঠিক সময়েই। কিন্তু চলে যাচ্ছে আগেই। শ্রাবণের মাসেই হয়ত যেতো, কিন্তু তুমি যা ব্যবহার করেছ! তুমি বোধ হয় জানো না, শ্রাবণের মাসেই রুমির বিয়ে। তাই বলছি, ও যেতো ঠিকই, কিন্তু তোমার জন্যে যাচ্ছে আগে আগেই।'

দুপুর বেলাদ পাপি এল। রজত তখন বসে বসে গল্পের বই পড়ছিল। দুপুরে ঘুমনো চলবে না, মামণির বারণ।

'এই যে একেবারে ভাল হয়ে উঠেছ দেখছি।'

'হ্যাঁ।' রজত উত্তর দিয়ে মুখ ফেরাল পাপির দিকে। আর ও চমকে উঠল। তার মনে হলো, সে যেন রুমিদির দিকে চেয়ে আছে। কিন্তু না, পাপিই। ডালিয়ার শাড়ি পড়েছে পাপি। হালকা রঙটা। সাদা জামা। পান্না সবুজ পাথরের মালা গলায়। কপালের জমাট-রক্ত রঙের কুমকুমের টিপ। ঘন কালো চোখের তারার পাশে সাদা পটভূমি। দীর্ঘ পল্লবের নিচে নিপুণ কাজলের টান। পাপি এমন সাজতে পারে? রুমিদির মতো?

'কি দেখছ? সাজ?' গম্ভীর হলো পাপি।

'খুব যে সাজা হয়েছে।'

'হ্যাঁ, তা তো হবেই। মেয়েদের একটু সাজতে হয়। ছেলেদের দরকার নেই। তবে মেয়েদের কথা আলাদা। হুঁ, শুনলাম সব। তাই এলাম এতদিন পরে।' পাপি হাসল অপরিচিতের মতো।

'কি শুনলে?' রজত যেন ভয় পেল।

'কিছু না, তোমার কীর্তি। থাক্ রুমিদির বিয়ে

তো নিশ্চয়ই মায়ের কাছে শুনলাম। দেখি, কি হয়?' পপি ঝুপ করে বসে পড়ল রজতের পাশে।

'পপি!' রজত গলায় চিৎকার করে উঠল। 'তোমার—তোমার কি? রুমিদির বিয়ে তো তোমার কি?' তার গলার স্বর কাঁপছিল।

'না, আমার কি? কিছুই নয়। মেয়েদের তো একদিন বিয়ে হবেই। আমারও হবে, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। তবে তুমি তো ন্যাকা ভালো মানুষ। জানো না বোধহয় তোমার রুমিদি ভালবেসে বিয়ে করছে সেই রোগা মতো—সুনীলবাবুকে, যে লোকটাকে সুনীলদা বলে, আর যে লোকটা আসে পাতানো বোনকে দেখার জন্যে তোমাদের বাড়ি। ছি, ছি, লজ্জাও করে না! ওই লোকটার সঙ্গে আবার তোমার রুমিদি বাঁধে বেড়াতে যায়। খুব তো ভাল মেয়ে, ভাল মেয়ে বলত লোকে। এখন ছি ছি করে। এর নাম ভাল মেয়ে।' পপি ঘৃণায় মুখ বিকৃত করল।

'পপি', একটা ভয়াল চিৎকার থমকে থেমে গেল। রজত লম্বা মুঠো ধরল তার দু-হাত দিয়ে পপির গলা। পপি চিৎকার করতে গিয়ে বিস্ফারিত চোখে রজতের মুখের দিকে চেয়ে থমকে দাঁড়াল। 'বলো, তুমি ভাল মেয়ে?' পশুর মতো বিকৃত গলায় বলল রজত, 'বলো তুমি ভাল মেয়ে?' শক্ত হলো হাতের বাঁধন। মাথাটা যেন ঝিম ঝিম করছে। থর থর করে কাঁপছে তার হাত। সে ঝুঁকে পড়েছে পপির মুখের ওপর। তার চোখের সামনে কাঁপছে এক মুঠো সৌন্দর্য যা তার হাতের মুঠোয়। তাকে সে ভেঙে চুরে গুঁড়িয়ে বিধ্বস্ত করে দিতে পারে। 'বলো তুমি ভাল মেয়ে? বলো, হ্যাঁ, বলো।' রজত আস্তে আস্তে ঢিলে করল হাতের বাঁধন।

পপির চোখের পাতা ভিজে আসছে। রজত হাত সরিয়ে নিল। আবার সে চাইল পপির মুখের দিকে। তারপর সে ক্লান্ত গলায় বলল, 'না, আমি শুনতে চাই না।'

পপি পালিয়ে গেল না। রজত বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে পড়ে ছিল। পপি বসে রইল বিছানাতেই। রজত শুয়ে শুয়ে শুনল মাথার মধ্যে শোঁ শোঁ শব্দ। তোষারের ঝড়ের শব্দ যেন আছড়ে তার মাথার মধ্যে ভেঙে যাচ্ছে চেতনা, স্মৃতি, তার ছেলেবেলা, তার খেলা, বাগানের দোলনা, রজনীগন্ধা, রুমিদির খুশি, রুমিদির জন্যে তার কেন মন কেমন করল। কিন্তু আমি এখন থাকব না। আমার কৈশোর, আমার সোনার ছেলেবেলা, ছেলে বেলার পপি সব ভেঙ্গে চুরে কোথায় মিলিয়ে যাবে। আমি রজত, রজু—পপি আমার বন্ধু? পপি যেন ফুলের নাম। আমি সেদিনও পপিকে দোদনা দুলতে দেখেছি। কিন্তু সেই পপি থাকবে না। আমি ক্লান্ত, আমি মরে যেতে চাই। আমি ভীষণ একা। রুমিদি আমার ওপর রাগ করে চলে যাচ্ছে। রুমিদির বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। পপিও বড় হচ্ছে, পপিও চলে যাবে। আমি একা থাকব। আমি কেমন করে থাকব? মামণিকে আমি ভয় পাই, এখনও ভয় পাই।

'রজু।' পপি ডাকল। অসীম নৈঃশব্দের ওপর দিয়ে, দুপুরের ক্লান্ত নির্জনতায় পপির গলার স্বর যেন কেঁপে কেঁপে ঘুরল ঘরের মধ্যে। পপি উঠে গেল। পপি চলে যাচ্ছে, পপি যেন দাঁড়াল একবার। 'রজু, আমি ভাল মেয়ে নই। আমিও রুমিদির মতো। কিন্তু রজু, পপি দরজার পাল্লা ধরল, 'আমিও রুমিদির মতো। তবে তুমি —'তুমি আমাকে ভালো বলো।'

রজত পড়েছিল বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে। তার অন্ধকার চোখের সামনে অস্পষ্ট মুখের আবছায়া প্রতিচ্ছবি। পপিকে সে কি ঈশ্বরী ভেবেছিল কোনদিন? এই পপি কি তার কাছে কোনদিন শিল্পের প্রতীকের মতো শাশ্বতী হয়ে ধরা পড়েছিল! হা, ঈশ্বর তুমি বলো! তোমার মতো করেই আমি তো পপিকে দেখেছি। পপি, আমার ঈশ্বরী! তুমি তোমার প্রতিবিম্ব দেখিও না। পপি তুমি রুমিদির মতো মানবিক ছবি হয়ো না। রজত চিৎকার করে বলতে চাইল। কিন্তু তখনই ভেসে এল বাতাস। তীব্র শয়তান পলাতক হাওয়া আবার হারানো ঈশ্বরীর মুখকে ভাসিয়ে দিয়ে গেল। পপি আর ঈশ্বরী রইল না। সে হলো রমণী। নারী।

সোভিয়েত ইউনিয়নে মূল্যবৃদ্ধি

মহাদেব চট্টোপাধ্যায়

প্রায় প্রতি বছরই সোভিয়েত ইউনিয়নে খাদ্যদ্রব্যের দাম কমান হচ্ছিল। যুদ্ধের পর থেকে অন্তত দু'বার সেখানে খাদ্যদ্রব্যের দাম কমেছে। হঠাৎ দেখা গেল শতকরা তিরিশ ভাগ মাংসের দাম এবং শতকরা পঁচিশ ভাগ মাখনের দাম বেড়ে গেল। এ ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করে সারা পৃথিবীতে এখন হৈ চৈ চলছে। কেউ কেউ বা একে সোভিয়েত অর্থনীতির সঙ্কট বলছেন। ব্যাপারটাকে একটু তলিয়ে বোঝা যাক্। গত দশ বছরে ফ্রান্সের মাংসের দাম বেড়েছে দ্বিগুণেরও বেশী। ভারতবর্ষে দেড়গুণ দাম হয়েছে মাছ, মাংস, মাখন প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্যের—এসব যদি সংকট না হয়, ক্রমাগত দাম কমার পরে একবারের এই মূল্যবৃদ্ধিতে সোভিয়েত ইউনিয়নে আর্থিক সঙ্কট দেখা দিয়েছে একথা কেমন করে বলা চলে।

আসল ব্যাপারটা হল সোভিয়েত ইউনিয়নে কৃষি ও শিল্পের বিকাশ যে সমান তালে হচ্ছে না একথা সে দেশের রাষ্ট্রনায়করা ১৯৫৩ সাল থেকে বলে আসছেন এবং তার প্রতিকারের জন্যে কতকগুলি ব্যবস্থাও করেছিলেন। এর ফল হিসেবে ১৯৫৩—'৬১ সালের মধ্যে কৃষির উৎপাদন শতকরা আটভাগ বৃদ্ধি পায়। যে সব পশুপক্ষী মানুষের আহার্য বলে গণ্য তাদের উৎপাদন প্রভূত পরিমাণে বেড়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন এখনও সেখানে অপর্যাপ্ত। ১৯৫৩ থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে জনসংখ্যা বেড়েছে দু কোটি পঞ্চাশ লক্ষ এবং এর মধ্যে দুকোটি আশি লক্ষ চলে শহরে। টাকার অঙ্কে আয় বেড়েছে শতকরা প্রায় ৮৭ ভাগ অর্থাৎ চার হাজার দুশো কোটি রুবল। তাছাড়া সেখানে বেকার সমস্যা নেই, স্বাস্থ্যের জন্যে অনিশ্চয়তা নেই অসুখ বিসুখে চিকিৎসার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। সন্তান পালনের ভারও রাষ্ট্রই নিয়েছে. ফলে এই আয় সোভিয়েতের জনসাধারণ নানাভাবে খরচ করে চলেছে।

মানুষের সব থেকে বেশী প্রয়োজন হল খাদ্য, বস্ত্র এবং আশ্রয়ের স্থান তারও পরে। সুতরাং আয়ের অধিকাংশটাই যে ভাল ভাল খাদ্য ক্রয়ের জন্য ব্যয়িত হবে তাতে আর আশ্চর্যের কি? আর মাংসজাত দ্রব্য আর মাখনের চেয়ে পুষ্টিকর খাদ্যই বা কি আছে। ফলে দেখা যাচ্ছে ১৯৫৩ সালে যেখানে ১৭ লক্ষ ৫১ হাজার টন মাংস বিক্রি হয়েছে ১৯৬১ সালে সারা সোভিয়েত ইউনিয়নে সেই বিক্রির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে

৪০ লক্ষ ৩৩ হাজার টন। ঠিক তেমনি ভাবেই দুধ যখন বিক্রি হত বছরে ১১ লক্ষ ৮০ হাজার টন আর ১৯৬১ সালে বিক্রি হয়েছে ১৩ লক্ষ ৯৩ হাজার টন। এবং মাখন বিক্রির পরিমাণ বেড়েছে ৩ লক্ষ ৩০ হাজার টন থেকে ৬ লক্ষ ৩২ হাজার টন। তবুও লোকের চাহিদা মিটছে না অর্থাৎ লোকের ক্রয়ক্ষমতা যে পরিমাণে বেড়েছে, এগুলির উৎপাদন তার সঙ্গে তাল রেখে বাড়তে পারছে না। তাছাড়া লোকের ক্রয় ক্ষমতা বেড়ে গেছে কিন্তু এগুলির দাম ছিল সর্বনিম্ন স্তরে ফলে এগুলির উৎপাদক যারা তারা নানান দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। এই সব নানা কথা বিবেচনা করে সোভিয়েত সরকার মাংসাদির পাইকারী দাম শতকরা ৩৫ ভাগ ও খুচরা দাম শতকরা ৩০ ভাগ এবং মাখনের দাম শতকরা ২৫ ভাগ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এর ফলে যারা এগুলি উৎপাদন করে থাকেন তারা লাভবান হবে এবং উৎপাদন যাতে আরো বৃদ্ধি পায় তার দিকে আরো মনোযোগী হবেন। জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা যথেষ্ট রয়েছে এবং তা প্রতি বছরেই বেড়ে চলেছে। ফলে এই বর্ধিত দামে মাংস কিংবা মাখন কিনতে কোনই অসুবিধা হবে না। অর্থাৎ এক কথায় বলা চলে যে নীতি সোভিয়েত সরকার গ্রহণ করেছেন তাতে জনসাধারণের ভাগ্যে এইসব উন্নত ধরণের খাদ্য আরো বেশী করে জুটবে এবং উৎপাদনকারীরাও যথেষ্ট লাভবান হবেন।

সাময়িকভাবে যে ব্যবস্থা সোভিয়েত ইউনিয়ন গ্রহণ করছে তা মোটেও আর্থিক সঙ্কটের চিহ্ন নয় বরং তা হল আর্থিক সমৃদ্ধির লক্ষণ।

সোভিয়েতের অপ্রত্যক্ষ কর

সম্প্রতি অর্থমন্ত্রী মোরারজী দেশাই ভারতের জনসাধারণের উপর করবৃদ্ধির সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের নজীর তুলেছেন। তিনি বলেছেন ভারতের জনসাধারণ যা কর দেয় সোভিয়েত ইউনিয়নের জনসাধারণ তার থেকে চতুর্গুণ অপ্রত্যক্ষ কর দেয়।

এখন দেখা যাক সোভিয়েত ইউনিয়নে অপ্রত্যক্ষ কর ব্যাপারটা কি? প্রত্যক্ষ কর বলতে সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রায় কিছুই নেই যতটুকুও বা আছে ১৯৬৫ সালের মধ্যে তাও দূর হয়ে যাবে। সোভিয়েত বাজেটের শতকরা বিরানব্বই থেকে তিরানব্বই ভাগ অপ্রত্যক্ষ থেকে আসে এব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। ব্যক্তিগত মালিকানা সেখানে না থাকার ফলে কারখানার ট্রেন বাস ট্রামে ব্যবসায় বাণিজ্যে যৌথ কৃষিতে কিংবা ব্যাঙ্ক ইন্সিওরেন্সের মারফতে যা কিছু লাভ হয় সবই জমা হয় সরকারী কোষাগারে, এবং বছরে বছরে এই জমার পরিমাণ যে বেড়ে চলেছে সে ব্যাপারেও কোন সন্দেহ নেই, ১৯৫৫ সালে যেখানে সোভিয়েতের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলির তিন হাজার ছ'শ অ্যাশিকোটি রুবল লাভ হয়ে ছিল ১৯৬০ সালে সেখানে লাভের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে পাঁচহাজার ছ'শ পঞ্চাশকোটি টাকা। স্বভাবতই এর কারণ হল নিত্য নতুন উদ্ভাবনের সাহায্যে উৎপাদনের ব্যয় কমিয়ে আনা। আগেই বলেছি ব্যক্তিগত মালিকানা সেখানে নেই সুতরাং মুনাফার টাকা মালিকের ঘরে জমা হয় না। যে টাকা সেখানে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি লাভ করে তার কিয়দংশ ব্যয়িত হয় কলকারখানার উন্নতি সাধনে কিন্তু অধিকাংশই জমা হয় সরকারী কোষাগারে। যেমন বলা যেতে পারে ১৯৫৫ সালে সোভিয়েত কোষাগারে জমা পড়েছিল তিন হাজার চার'শ পঞ্চাশ কোটি রুবল এবং ১৯৬০ সালে জমা পড়ে ছিল চার হাজার নয়'শ নব্বই কোটি রুবল অর্থাৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলির যথাক্রমে লাভের শতকরা ৯০ ও শতকরা ৯৫ ভাগ।

অর্থাৎ পুঁজিবাদী দেশে অথবা ভারতবর্ষেও যে টাকা পুঁজিপতিরা মুনাফা হিসেবে পকেটে ভরেন শ্রীমোরারজী দেশায়ের ভাষায় সেটা হল সোভিয়েত ইউনিয়নের অপ্রত্যক্ষ কর। সোভিয়েত ইউনিয়নের এই টাকা ব্যয়িত হয় জনস্বার্থে এবং জনকল্যাণকর কাজে। অর্থাৎ উদ্বৃত্ত মূল্য হিসেবে জনসাধারণ যা দেয় সেটা আবার তারাই ফিরে পায়। কিন্তু এখানের মুনাফা সরাসরি চলে যায় পুঁজিপতিদের পকেটে। শ্রীমোরারজী দেশাইয়ের আপত্তি সম্ভবতই এইখানেই। সোভিয়েত ইউনিয়ন তো সোনার ভারত নয়।

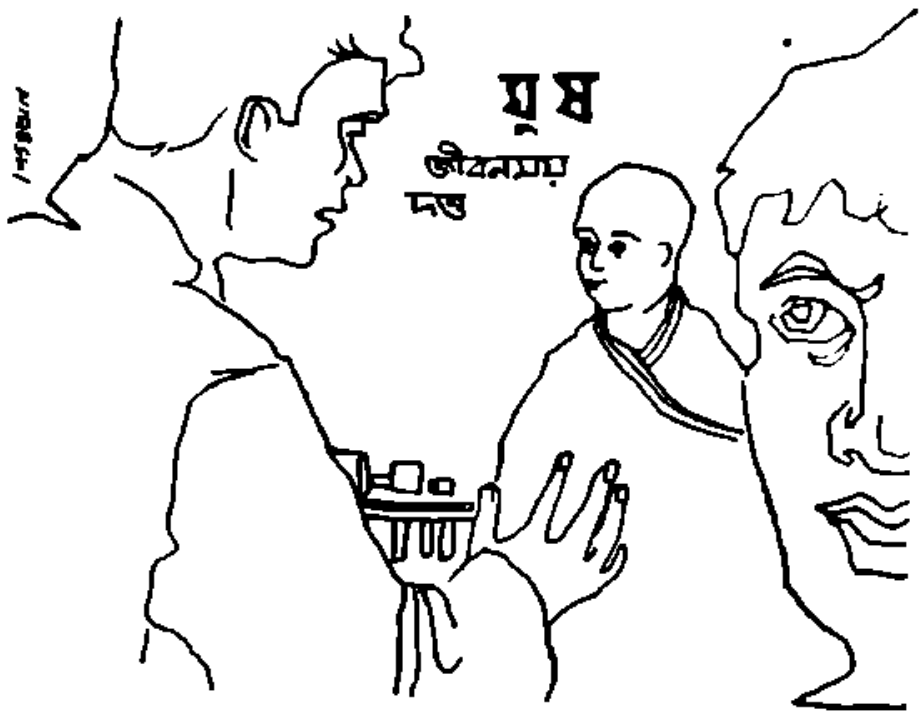

এক জায়গায় চাকরী করলেও দুজনে কথা বলে না কেউ কারো সঙ্গে। দেখা হলে মুখ ঘুরিয়ে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যায়।

অবশ্য চিরদিনই এ রকম একটা সম্পর্ক ওদের মধ্যে ছিল না। ভালই ছিল সম্পর্ক।

ওমপ্রকাশের একটা বদনাম ছিল। তার পেছনে কারণও ছিল। নইলে একজন সোয়ার ডিভিসান কেরানীর পক্ষে ও রকম ঠাটে থাকা কিছুতেই সম্ভব নয়। বাড়িতে পোষ্যির সংখ্যাও কম নয়। তবুও ওমপ্রকাশের চালে-চলনে অন্যান্য অফিস কর্মীর চেয়ে একটা পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ত।

বছরে দুবার এই সুযোগ পেত ওমপ্রকাশ। ইনস্টিটিউটে ছাত্র ভর্তির সময়। আজকাল টেকনিকাল ট্রেনিং-এর কদর সব জায়গায়, সকলেই গভর্নমেন্ট ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের ছাপ মারা সার্টিফিকেট চায়। তাই ভর্তির সময় দরখাস্ত পড়ে হাজার হাজার। ট্রেড মাত্র আঠারটা। সিটের সংখ্যা কোন ট্রেডেই তিনের কোঠা ছাড়িয়ে নেই।

সুতরাং ওমপ্রকাশের কোন অসুবিধাই হয় না। ছাত্র পিছু পঞ্চাশ ষাট, সত্তর, সময় সময় একশ পর্যন্ত পায়। খুব গোপনে আর কৌশলে কাজ সারতে হয়...

ওমপ্রকাশকে। জানাজানি হয়ে গেলেই সর্বনাশ। এ ব্যাপারে ওমপ্রকাশও কম সেয়ানা নয়। যাদের ভর্তির যোগ্যতা আছে হয়ত সামান্যের জন্য আটকে যাবার আশঙ্কা তাদের মতো ছেলেরাই ওর শিকার। তাদের উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠাভরা মুখগুলো ওমপ্রকাশের ভর্তি না হবার ভয়-ধরানো কথা শুনে নানা রকম জ্যামিতিক রেখায় কলঙ্কিত হয়ে ওঠে। সেদিকে তাকিয়ে ওমপ্রকাশ জাল পাতে। হাতের সুতো ছাড়ে। সময় মতো টান দেয়।

শিকার আটকা পড়ে। কথাবার্তা হয়। লেন-দেন ঠিক।

বছর তিনেক আগে স্টোর-ক্লার্ক দদন তেওয়ারী একজন আত্মীয় ছিল। ওমপ্রকাশ কথা দিয়েছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে আশি টাকার বদলে অন্য একটি ছেলেকে ভর্তির ব্যবস্থা করে দেয়। সেই কাল হোল ওমপ্রকাশের। বিচ্ছিরি একটা জট পাকালো দদন। ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর কানে পর্যন্ত ঘটনার বিবরণ পৌঁছালো। অবশ্য সে সব মিথ্যা প্রাযাণাদি অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে করতে হয়েছিল। ওমপ্রকাশের চাকরিই চলে যেত। নেহাৎ বড়সাহেবের মুরুব্বী থাকায় বেঁচে গেল সে যাত্রা। তবে ওকে নামিয়ে দেয়া হোল। রুটিন ক্লার্ক। দপ্তর আর ইনস্টিটিউট ছাড়ানো না।

সেই জন্যই হোক দদনকে ওমপ্রকাশের জায়গায় বদলী করা হল।

সেই থেকেই কথা বন্ধ। একটা ফাটল, একটা ফাঁক রয়েই গেছে।

চেয়ারেই দোষ বোধ হয়। বছর ঘুরতে না ঘুরতে দদনও শুরু করলো। তবে ঘরে-পরে, বুঝে-শুনে।

প্রতিশোধের অদম্য ইচ্ছাটা ওমপ্রকাশের মনের মধ্যে বারবার ছোবল মারে। বুকের ভেতরের পাঁজরাগুলো যেন কেঁপে ওঠে সেই আঘাতে।

সব সময় লক্ষ্য রাখে দদনের ওপর। চেষ্টা করে হাতে নাতে ধরতে। ছায়ার মতো ঘোরে দদনের পেছন পেছন। কিন্তু পরপর দুটো বছরই বিফল গেলো।

ওমপ্রকাশ ধৈর্যপ্রতিজ্ঞ হয়। ওকে ধরতেই হবে। না হলে আর এ জীবনে সুযোগ আসবে না। তিক্ত স্মৃতির তাড়নায় শুধু জ্বলতেই হবে। এই ভর্তির মরশুমটা শেষ হলেই ওর বদলীর সম্ভাবনা আছে। বিশ্বস্ত সূত্রেই জেনেছে খবরটা। সুতরাং হাতছাড়া হয়ে গেলে হতাশা আর নিরুপায়ের বেদনার বোঝা বয়ে বেড়ানো ছাড়া আর উপায় থাকবে না।

ওল্ড ব্যাচের পরীক্ষাও শেষ হয়ে গেলো।

রেজাল্ট্ বেরোতেও দেরী হলো না।

গাদায় গাদায় দরখাস্ত পড়ছে। নতুন মুখ, নতুন মানুষের আনাগোনা।

অফিসের সকলেই ব্যস্ত। দদনও।

অনেকগুলো মুখই দদনের কাছে কাজে অকাজে ঘোরাফেরা করে। গুজ-গাজ, ফুস-ফাস। হাসি। পান খাওয়া। সিগারেটের ধোঁয়ার কুণ্ডলী।

কিছুই চোখ এড়ায় না ওমপ্রকাশের। শিকারী বিড়ালের মতো ওঁত পেতে থাকে সব সময়।

দুটো মুখ ওমপ্রকাশের প্রায় চেনা হয়ে গেলো। বৃদ্ধ আর যুবক। বাপ আর ছেলে।

প্রায়ই আসে। জীর্ণ পোষাক। শীর্ণ দেহ।

অনেক আকুতি করে পড়ে বাপের মুখ দিয়ে। দদন রাজী হয় না।

ওমপ্রকাশের চোয়ালদুটো শক্ত হয়ে ওঠে। দাঁতে দাঁত চাপে। শয়তান। কথাবার্তা পাকা হয়ে যায়। সময়ও।

ইনস্টিটিউট বন্ধ হয়ে গেছে। ছাত্রের আনা গোনা বন্ধ। নতুন লোকও নেই। অফিস যে ছুটি হয়ে গেছে। ফাঁকা অফিস। দদন চেয়ার ছেড়ে উঠে আসে। এদিক ওদিক তাকায়।

প্রিন্সিপালের রুমের দরজাও বন্ধ। অফিস পিওনরাও চলে গেছে। দারোয়ান অফিসরুমের দরজা জানালা বন্ধ করছে।

কারো সন্দেহ করার কিছু নেই। কাজের চাপ পড়লে দদন প্রায়ই অফিস ছুটির পরও কাজ করে। অন্যান্য দিন প্রিন্সিপাল বা অন্য দু-একজন সহকর্মীও থাকে। আজ কেউ নেই। কেন কে জানে। কেমন যেন একটা রহস্যময় স্তব্ধতা। দদন মনে মনে ভাবে, সুবিধাই হবে।

—শুনুন।

চমকে পেছন ফিরে তাকালো দদন। বাপ আসি নি। ছেলে এসেছে। বারান্দার কোণে রাখা গোদরেজের বড়ো বড়ো আলমারীর পাশ থেকে অস্ফুট কণ্ঠে ডাকলো ছেলেটি।

—এদিকে এস। সকালে আসনি কেন?

ছেলেটি চুপ। শুধু এগিয়ে আসে অন্ধকার ছেড়ে।

—এদিককার ব্যবস্থা সব হয়ে গেছে। ভর্তি হয়ে যাবে। তোমাদের কতদূরে।

দদনের কথা শুনে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো ছেলেটি।

—তোমার বাবা আসেন নি কেন? দদন চাপা গলায় আবার প্রশ্ন করলো।

কোন উত্তর নেই।

—তোমার বাবা কোথায়? আবার একই প্রশ্ন দদনের।

এবারও কোন উত্তর নেই। মাথা ওঁতেই কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো ছেলেটির গাল বেয়ে।

—বাবা নেই। ছোট্ট উত্তর।

—নেই মানে? প্রচণ্ড বিস্ময়ে আঁতকে উঠলো দদন। সঙ্গে সঙ্গে অশোভন প্রশ্নের আকস্মিকতায় কুঁকড়ে গেলো নিজের মধ্যে। ছেলেটির মাথায় চুল নেই একটাও। পরিষ্কার করে কামানো।

ভাবতেই অবাক লাগছিলো দদনের। গতকালও বুড়ো ভদ্রলোক এসেছিলেন। সব কথাবার্তা কয়ে গেছেন। আর আজ।

জিজ্ঞেস করলো—কি হয়েছিলো?

—সকালের দিকে টাকা নিয়ে আপনার কাছে আসবেন বলে বেরিয়েছিলেন। রাস্তায় বাসের নীচে পড়ে···বলতে পারলো না আর। ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললো ছেলেটি।

—কেঁদো না, কাঁদলে তো আর তিনি ফিরে আসবেন না। নিয়তি টেনে নিয়েছেন। সান্ত্বনা দেয় দদন।

—এই নিন। বাবা কথা দিয়েছিলেন। দেখবেন যেন ভর্তি হতে পারি। নইলে··বলতে বলতে কটা কাগজের টুকরো দদনের হাতে গুঁজে দিলো ছেলেটি। তারপরই নিরুদ্ধ কান্নার বেগটাকে সামলে নিয়ে বারান্দা থেকে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেলো। দদন মুঠো করে চেপে ধরলো টাকা কটা। কিন্তু অন্যান্যবারের মতো কোন শিহরণের স্রোত বয়ে গেলো না ওর মেরুদণ্ড বয়ে। বুঝতে কষ্ট হলো না টাকাগুলো কোথায় ছিল।

কথাটা মনে হতেই দদন শিউরে উঠলো একটুখানি।

হয়ত ছেলেটির মৃত পিতার রক্তের দু-একটা ছিটে এখনো লেগে রয়েছে নোটগুলোয়।

হঠাৎ সব ওলোট পালোট হয়ে গেলো। মুহূর্তের মধ্যে দদনের চোখের সামনে থেকে সব মুছে গেলো। গোদরেজের আলমারী, কোণে জমানো নোংরার স্তূপ, দুটো বেঞ্চি সব। শুধু ভেসে উঠলো একটি মুখ। নিজের চোদ্দ বছরের ছেলের মাথা কামানো মুখ।

আতঙ্কে আবারো শিউরে উঠলো দদন।

: না না এ আমি নেব না। কিছুতেই না। শোন, আমি তোমার ভর্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছি। কিন্তু না, কিছুতেই না। সত্যি বলছি শুধু একবার আমায় বিশ্বাস কর···চিৎকার করে ওঠে দদন।

কিন্তু কেউ নেই সেখানে। ছেলেটি অনেক আগেই চলে গেছে।

একটা শব্দ হতেই পেছন ফেরে দদন।

আলো আঁধারিতেও চিনতে কষ্ট ওমপ্রকাশকে।

বুকটা একটা অজানা ভয়ে কেঁপে ওঠে দদনের। তা সত্ত্বেও মুখে ফুটে ওঠে ম্লান হাসি।

—প্রিন্সিপাল, অফিস সুপারিনটেনডেন্ট, ওয়ার্কশপ কোঅর্ডিনেটর, দারওয়ান সবাই এসে গেল প্রায়। আমিই খবর দিয়েছিলাম। দাও টাকাটা আমায় দাও। তুমি সামনে দিয়ে বেরিয়ে যাও।

ওমপ্রকাশ তাড়াতাড়ি কথাটা শেষ করেই হতভম্ব দদনের হাত থেকে নোট কটা নিয়ে দ্রুত বারান্দা থেকে পেছন দিকে নেমে গেলো।

বারান্দার সামনের দিক থেকে একসঙ্গে অনেকগুলো জুতোর শব্দ ভেসে এলো।

স্তালিন স্মৃতি চিত্র

জ্যাঁ রিশার ক্লখ

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

দশম ও অষ্টমবার সাক্ষাতের কথা। তিন বছর পেরিয়ে যেতে হবে এক লাফে। জয়লাভ হয়েছে স্তালিনগ্রাদে. আর তারই পাশাপাশি জয়—উত্তরে ভেরোনিঝে দক্ষিণে কাকেশাস্ অঞ্চলে। একটার পর একটা ক্ষমাহীন অবিশ্রান্ত আঘাতে উক্রাইন ও ককেশাস থেকে বিতাড়িত শত্রুপক্ষ একেবারে সম্পূর্ণ পরাজয়ের মুখে। তারা বিতাড়িত হয়েছে বিয়েলোরুশিয়া থেকে বিতাড়িত আক্রিকা থেকে। অত্যন্ত কঠিন অবস্থার মধ্যেও মিত্রসৈন্য ফ্রান্সের উপকূলে অবতরণ করছে। মুক্তি পেয়েছে পারী। রক্তাক্ত ক্ষতচিহ্ন নিয়েও ফ্রান্স তার অবশিষ্ট শক্তিতে উত্থিত হয়েছে। শুধু সমুদ্র-কূলের দুই একটি ছোট ঘাটো অঞ্চল ছাড়া আমাদের দেশ শত্রুর কবল থেকে একেবারে মুক্ত। আর, পুনরুজ্জীবিত ফ্রান্সের প্রথম আন্তর্জাতিক চুক্তি পর-রাষ্ট্রের সঙ্গে এদেশের প্রথম যুদ্ধোত্তর সন্ধি স্বাক্ষরের জন্য জঁসিয়ে বিদোকে সঙ্গে করে মস্কোয় এসে পৌঁছলেন জেনারেল দা গল্।

ফরাসী প্রতিনিধিদলকে সংবর্ধনা জানাবার জন্য যে ছোটখাটো মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করা হয় পৌঁছনোর পরের দিনই, সেখানে আমি উপস্থিত ছিলাম। আট দিন বাদে সন্ধি উপলক্ষে ও অতিথিদের বিদায়ের আগে ক্রেমলিনের এক প্রকাণ্ড হলে স্তালিন সরকারী ভোজসভার নিমন্ত্রণ জানালেন। (৮০ জনের মতো ব্যবস্থা, সোভিয়েত সরকারের গণসচিব ও লাল ফৌজের পার্টিদের সকলেই প্রায় নিমন্ত্রিতদের মধ্যে।)

সরকারী কর্মচারীদের ছাড়া বাকি অল্প কজনকে নিমন্ত্রণ করা হয়, আমি তাদের অন্যতম, এমন কি মনে হয়, ফরাসী, সোভিয়েত ও মিত্রপক্ষীয় সব ধরেই নিমন্ত্রিতদের মধ্যে আমিই ছিলাম একমাত্র বে-সরকারী লোক। বলতে বাধা নেই, আগের সপ্তাহের সেই ভোজের মতো এবারও আলাপের প্রথাগত তালিকাটিতেই আমার মন ছিল সব চেয়ে বেশি। সাঁ-সিমঁ নিজেই যেমন বলেছেন, চোখের খিদে মেটাবার মতো যথেষ্টই ছিল সে-তালিকায়, আর সেদিক থেকে নিজেকে বঞ্চিত করার কোনও চেষ্টাই আমি করিনি। স্তালিন তাঁর প্রধান অতিথিকে সঙ্গে করে যেখানটিতে বসেন, কপাল গুণে (শুধু কপাল ?) তারই ঠিক মুখোমুখি টেবিলের উল্টোদিকে আমার আসন পড়ত প্রত্যেক ভোজে। সেই অতি সুস্বাদু ভোজের দু-এক গ্রাস খাওয়া হয়ত আমার কম হয়ে থাকবে, কিন্তু আমার মুখোমুখি আসীন যাঁরা তাঁদের আকার ইঙ্গিত, চালচলন, চরিত্রিক বৈশিষ্ট্য, কথাবার্তা কিছুই আমাকে এড়াতে পারেনি।

আগের রবিবারের ভোজ সভায় সোভিয়েত সরকারের নেতা ও অস্থায়ী ফরাসী সরকারের নেতা উভয়েরই ব্যবহারের মধ্যে যথেষ্ট কুণ্ঠা, জড়তার যথেষ্ট অভাব ছিল ; কিন্তু আজ এই সন্ধ্যার নিমন্ত্রণে দেখলাম স্তালিন খুব খোশ-মেজাজে আছেন। স্বাস্থ্যপান উপলক্ষ্যে পররাষ্ট্র সচিব মলোতভের সরকারী বিবৃতির আনুষ্ঠানিক প্রতিভাষণ দিলেন বিদেশী অতিথিরা.

তারপরেই স্তালিন স্বয়ং উঠে স্বাস্থ্যপানের প্রস্তাব করলেন। সেই শুরু হল দফে দফে বানিয়ে বলা তাঁর চমৎকার বক্তৃতা একটার পর একটা। সোভিয়েত সরকারের প্রত্যেকটি প্রধান শাসন বিভাগ, লালফৌজের প্রত্যেক সামরিক অঙ্গের উল্লেখ করলেন তিনি একে একে। বিভাগীয় ও সামরিক নেতারা সকলেই সেই টেবিলে উপস্থিত। নাম করে তাঁদের প্রত্যেকের উদ্দেশ্য স্বাস্থ্যপানের সময় রসিকতা করে খুব মেজাজী ভাবে তিনি তাঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করলেন বক্তৃতায়, আর সমবেত সেই সব মার্শাল ও জেনারেলদের পরিচয় করিয়ে দিলেন ফ্রান্সের প্রতিনিধিদের সঙ্গে।

দু একটা মজার চুটকি ঘটনার কথা বাদ দিয়ে যাই। স্তালিন একবার (সেই নিয়ে কি পনেরোবার না বিশ বার হল?) স্বাস্থ্যপান প্রস্তাব করেন সেই কথাই তাড়াতাড়ি বলে ফেলি। তাঁর যেন আর ক্লান্তি নেই। উঠে বললেন: "মলোতভ আমার দিকে কটমট করে তাকাচ্ছে। তা সত্ত্বেও আমি তার একবার স্বাস্থ্যপান করতে চাই।" তারই পরে শুনলাম তিনি বলছেন:

"ফ্রান্সের যা আমরা সবচেয়ে শ্রদ্ধা করি, তার মধ্যে আছে তার ফাশিস্ত-বিরোধী যোদ্ধাবৃন্দ, রণক্ষেত্রে তার সৈন্যবাহিনী, সমশত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে যাঁদের শোণিত মিশেছে আমাদের শোণিতে, সাহসে শৌর্যে ও বিনয়গুণে যারা আমাদের যোদ্ধাদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জন করেছেন। এই প্রতিনিধি যে-মানুষটি, ফরাসী স্বেচ্ছাবাহিনী নর্মান্দি—নিমেনের সেই সেনাপতির স্বাস্থ্যপান করি।"

তারপর দেখি এক আশ্চর্য ব্যাপার। স্তালিন আসন ছেড়ে সেই প্রকাণ্ড হলের প্রায় আধাআধি এগিয়ে গেলেন লেফটিন্যাণ্ট কর্ণেল পুইয়াদের সঙ্গে দেখা করতে। স্বাস্থ্যপানের সময় অন্য সকলের সঙ্গে যেমন গেলাস ঠুকতে হয়, এবার আর তেমনটি না করে মার্শাল দেখলায় নিজের ডানহাতে সেই ফরাসী লেফটিন্যাণ্ট কর্নেলের হাতখানি জড়িয়ে পরস্পর সংলগ্ন হয়ে একত্র পান করার যে প্রথা সেই ভঙ্গিতে স্বাস্থ্যপান করলেন।

পাশে যাঁরা বসেছিলেন, খুবই উত্তেজিত হয়ে তাঁরা তক্ষুনি আমাকে বুঝিয়ে বললেন, এ হচ্ছে ভক্তীয় প্রথা। যারা এমনভাবে পরস্পরের বাহুলগ্ন হয়ে মদ্যপান করে, ভক্তীয় প্রথা অনুযায়ী তারা একই রক্তস্রোতে আমৃত্যু ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে বাঁধা।

সমবেত সকলের মধ্যে যথেষ্ট আবেগ ও বিস্ময় দেখা গেল। স্তালিনের অন্য সব কাজ ও আচরণের মতো এ ব্যাপারটা নিয়েও লোকে অনেক চিন্তা করেছে। কিন্তু আমার মনে হয় যে এই ঘটনায় চিন্তার খোরাক অফুরন্ত।

ফরাসী যোদ্ধাদের সঙ্গে, ছাতিয়ার হাতে লড়াই করে যে সৈনিকেরা তাদের সঙ্গে, ভালমন্দী ও ভাগ্যের উত্তরাধিকারী, বিপ্লবীদের বাহিনী ও বন্দিদের সহযোগী যে সাধারণ পদাতিক ও সামান্য সিপাই তাদের সকলের সঙ্গে স্তালিন তাঁর আত্মীয়তাবোধ ব্যক্ত করলেন এইভাবে।

সেই সন্ধ্যাতেই আরো একটু পরে এই কথা আরও স্পষ্ট বোঝা গেল। এমন একটা ঘটনা ঘটল যা খুব সাধারণ ব্যাপার বলা যায় না, আর লোকে সে কথা জানেও না খুব বেশি। চারজন ফরাসী ব্যক্তি শুধু এর সাক্ষী। এই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাটি আমি কখনও ভুলতে পারবনা।

রাত প্রায় দেড়টা নাগাদ আমরা স্তালিনের নিজের ছোট সিনেমা হলটিতে গেলাম। ক্রেমলিনের মধ্যে তিনি এটি তৈরী করেছেন। অবসর সময়ে এইখানে তিনি তাঁর পছন্দসই সোভিয়েত ও বিদেশী ফিল্মগুলি প্রদর্শনের বন্দোবস্ত করেন। মনে হল হলটিতে প্রায় পঞ্চাশ ষাটজন লোক ধরে। আরামকেদারাগুলির মাঝে মাঝে বসানো টেবিলে সাজান ফুলদানি, ফুলের ডালা, পিরিচ গেলাস।

কয়েকটি টুকিটাকি ব্যাপার ঘটল যার স্থান শুধু কূটনীতির ইতিহাসে, সে বিষয়ে আমি কিছু বলছি না। তারপর জেনারেল দ্যগল, মসিয়ে বিদো ও তাঁদের সঙ্গীরা কেউ ঘুমোতে গেলেন, কেউ বা গেলেন ফিরে কাজ শুরু করতে, কারণ ততক্ষণে শল্কিচুক্তি কোন অতলে ডুবে গেছে, তাকে আবার টেনে তোলা দরকার। আমরা তখন বসে সোভিয়েত মার্শাল ও

গণপরিচালকের সঙ্গে, তাঁদের আর তখন অন্য কোথাও যাবার তাড়া নেই। আর ক্রেমলীনের মধ্যে তখনও সেখানে উপস্থিত রয়েছে এই কজন: বিমানবাহী বিমানের অধ্যক্ষ জেনারেল পেতি, মস্কো-নিজেমেন রেজিমেন্টের সেনাপতি লেফটেন্যান্ট কর্নেল পুইয়াদ, জেনারেল স্টাফের সামরিক কেন্দ্রের জনৈক কর্মচারী, মস্কোতে ফরাসী দূতাবাসের সংবাদ বিভাগের কর্তা আর আমি।

স্তালিন শ্যাম্পেন আনিয়েছিলেন। তিনি পাঁড়িয়ে আছেন, আর তাঁকে ঘিরে আমরা পাঁচজন ফরাসী। হাসতে হাসতে তিনি লেফটেন্যান্ট কর্নেল পুইয়াদকে জিজ্ঞাসা করলেন:

"—আমাদের কথা বিমান ইয়াক—৩ নিয়ে খুশি ত আপনারা—?

—"চমৎকার মার্শাল। আমরা তো খুব খুশি এই বিমান-বহরের কাছে পেয়ে, একেবারে সেরা জিনিস যেমন চেয়েছি চলে, তেমনি চালানো সহজ, লড়বার মতো গতিবেগও যথেষ্ট…।"

—"বেশ ভালো বলেন। মনে হয় আরও ভাল জিনিস বানাতে পারব আমরা। ইয়াকভ্লেভকে জিজ্ঞেস করুন। ঐ ত দাঁড়িয়ে কথা শুনছে এখানে।

(মার্শাল ইয়াকভ্লেভ হচ্ছেন সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বপ্রধান বিমাননির্মাতা। তাঁরই নামে ঐ বিমানের নাম রাখা হয়েছে। সোভিয়েত মার্শাল ও জেনারেলদের মধ্যে দাঁড়িয়ে তিনি কথাবার্তা শুনছিলেন।)

স্তালিন বললেন: "ইয়াক—৯ বিমান চেনেন? আচ্ছা আমাদের বিমান বহর যদি ইয়াক—৯ দিয়ে সাজাই তো কী বলেন?"

পুইয়াদ বললেন: 'না—না, ও সব কিছু করবেন না মঁসিয়ে মার্শাল। ইয়াক—৯ ভালো বিমান, বলা যায় খুবই ভালো বিমান। কিন্তু বিনা দ্বিধায় নিজের কথা বলতেও পারি, ইয়াক—৩ আমি পছন্দ করি বেশী।"

স্তালিন: 'আচ্ছা শুনুন, ইয়াক—৯ সম্বন্ধে আমার ধারণা এই। খুব ভারি জার্মান চ্যাম্পবাহিনীর সঙ্গে লড়াইতেও আমরা আমাদের পদাতিকদের অপরাজেয় করে তুলেছিলাম কি করে জানেন? আমরা তাদের জুড়ে দিয়েছিলাম খুব জবরদস্ত গোলন্দাজ বাহিনীর সঙ্গে: এই পদ্ধতির ব্যবহার আগে আর কখনও হয়নি। এই আক্রমণের মুখে শত্রুরা একেবারে হতভম্ব হয়ে, আষাঢ় চষে পড়ে। বিমানযুদ্ধেও গোলাগুলির অনুরূপ প্রয়োগের কথা ভেবে দেখুন না একবার? ধরুন, ইয়াক—৯ বিমানে যদি আমি ২০ বা ৪০ সাইজের কামান বসাই: ও কী ভীষণ তেজ গোলার! দূর থেকেই শত্রুকে ঘায়েল করে দেওয়া যায়, কোন ঝুঁকি নেই, শত্রুপক্ষের একখানা বিমানও রেহাই পাবে না।"

—"না—না মঁসিয়ে মার্শাল। আমি মোটেই একমত নই আপনার সঙ্গে।" —"কেন নয়?" স্তালিন জিজ্ঞেস করলেন। প্রতিবাদে তিনি এতটুকু বিরক্তি হন নি। ফরাসী দেশের এতটুকু একটি মানুষ তাঁর কোন ভয় নেই, সহজ তাঁর আচরণ। দরদভরা চোখে স্তালিন তাঁর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন।

লেফটেন্যান্ট কর্নেল পুইয়াদ বললেন:—"আমার বিচারে বিমানের উৎকর্ষ তার গতি কৌশলে; অস্ত্রসজ্জায় নয়। তত্ত্বের দিক থেকে একথা খুবই ঠিক যে আপনার ঐ গোলাবর্ষণের ফল শত্রুর উপর খুবই সাংঘাতিক হতে পারে। কিন্তু আমি পাইলট থাকব বিমানের মধ্যে: শত্রুর বিমান একবার যদি পিছন দিক থেকে এসে আমাকে ধরে ফেলতে পারে, তাহলে আর আপনার ঐ কামান বন্দুক আমার কী কাজে লাগবে? দুই পাইলটের কে আগে এসে অপরের লেজে ঠোক্কর দিতে পারে এই হল সমস্যা। যে আগে পৌঁছবে সেই পারবে প্রতিপক্ষকে জব্দ করতে। আর বিমান দুখানির মধ্যে যেখানা ভারী কম, যার গতি বেশী দ্রুত সেই পারবে আগে পৌঁছতে। তা ছাড়া, মঁসিয়ে মার্শাল আপনার ঐ যে দুই কামানের কথা বলছেন…।"

স্তালিন হেসে খুব বন্ধুভাবে বললেন:—"মলোদিয়েৎস্ ক্রানৎসুজ। (সাবাস ফরাসী তুমি।) শক্ত লোক বটে, ভারী একগুঁয়ে। এমনি লোক আমি চাই। এমনি দুনিয়া আমাদের যে শক্ত না হলে চলে না। নরম হলেই সর্বনাশ, একদম পিষে মেরে ফেলবে।"

যাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন, তাদের হাতে হাতে শ্যাম্পেনের গ্লাস তিনি করে বললেন : "আসুন।"

তারপর আবার :

—"আমাদের শ্যাম্পেন তেমন খারাপ নয়, নয় কি? তবে আপনাদের দেশে যেমন তার মতো নয়। ও রকমটি আর পাওয়া যায় না। বেশ কয়েক বছর চলে আমি ফ্রান্স থেকে একজন কারিগর আনিয়েছি: ফলে একটু ভালো হয়েছে জিনিসটা, কিন্তু এখনও যথেষ্ট নয়।"

"লড়াইয়ের আগে আমরা তৈরি করতুম এক কোটি বিশ লাখ বোতল শ্যাম্পেন। এখন মাত্র সত্তর লাখ। আর ফ্রান্সে আপনারা বানাতেন প্রায়, তিন কোটি বোতল। দশকোটি বোতল শ্যাম্পেন কামনা করে ফ্রান্সের স্বাস্থ্যপান করি আমি।" বলে তিনি পইয়াদের সঙ্গে গ্লাস ঠুকলেন।

—"আপনার ভবিষ্যদ্বাণী মানতে আমি খুবই রাজী, মঁসিয়ে মার্শাল। তবে শুধু এক সর্তে : এর সবটা যেন আমাদের ফরাসীদের খেতে না হয়। কারণ, তাহলে আমাদের দিয়ে আর কিছু হবার আশা নেই।"

—"সত্যি কথা অনেক! আচ্ছা, বলুন তো, আপনাদের ক-ডিভিশন ফৌজ আছে সবশুদ্ধ? অর্থাৎ, হাতিয়ার নিয়ে লড়াইতে নামবার মতো ক-ডিভিশন?"

পইয়াদ বললেন : "বেশ ভালো অবস্থায়, লড়াইতে নামবার মতো ফৌজ পাঁচ ডিভিশনের বেশী নেই।"

—"সে কি? ফ্রান্স এত বড়ো দেশ, হাতিয়ার নিয়ে তৈরী ফৌজ তার শুধু পাঁচ ডিভিশন। ফরাসী সেনাবাহিনীর শক্তি হোক আট ডিভিশন এই কামনা করে আমি স্বাস্থ্যপান করি।"

অতি সামান্য ব্যাপার একটা। লেফটেন্যান্ট কর্নেল পইয়াদ ধূমপায়ী। কথা বলার সময় নিজেরই সিগারেটের একটুখানি ছাই অলক্ষ্যে তাঁর সামরিক পোষাকে পড়ে যায়। স্তালিন ছিলেন তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে। দেখতে পেয়ে মনেহয় হেসে তিনি সন্তর্পণে ছাইটা ঝেড়ে ফেললেন, তারপর বললেন, আর বলতে গিয়ে চোখমুখ যেন গাম্ভীর্যে ভরে উঠল :

—"ফরাসী ও সোভিয়েত যোদ্ধাদের মধ্যে পরস্পর ভুল বোঝবার কোন সম্ভবনা নেই। যত গোল বাধায় কূটনীতি বিশারদরা, তারা কোন কাজের নয়। আমাদের উচিত ওদের দূর দাবিয়ে রাখা। ঐ দেখুন আবার কে এলো : মলোতভ বুঝি! লোকটা ওদেরই মধ্যে মন্দের ভালো, ও কে না হয় দাবাড় করা যাবে অবশেষে।"

কার্যত মলোতভ প্রায় ঘণ্টায় ঘণ্টায় স্তালিনের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে খবর দিয়ে যাচ্ছিলেন কী করে দুই পক্ষের কূটনৈতিক প্রতিনিধিরা আলাপ আলোচনার সাহায্যে মতামতের পার্থক্য কমাবার জন্য কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। এতক্ষণে চুক্তি ঠিক হয়েছে, তাই মলোতভ এসেছেন স্তালিনকে নিয়ে যেতে। সন্ধির সর্বশেষ কয়েকটি বিষয় একটু দেখে দিয়ে তাতে সই করতে হবে তাঁকে। স্তালিন তাই আমাদের ওখান থেকে বিদায় নিলেন। যাবার সময় খুব রঙ্গ করে বললেন :

—"যাই এখন বাঘের মুখে মাথা পেতে দিই।"

তখন ভোর সাড়ে চারটা। ঘণ্টা তিনেক ধরে আড্ডা দিয়েছি আমরা।

স্তালিনের মধ্যে যে কতখানি রসিকতা, স্ফূর্তি, বন্ধুত্ব ও খোসমেজাজী ভাব দেখেছি তা আর বলে বোঝাতে পারব না।

কতবার যে তিনি নিজের হাতে ক্রমাগত আমাদের শ্যাম্পেনের পাত্র ভরে দিয়েছেন। আমাদের কত খুঁটিনাটি তত্ত্ব নিলে গিয়েছে কত রসিকতায়, বেচারী রুশ দোভাষী তার ঠেলায় যেই খেই হারিয়ে ফেলেছে অমনি অতি বাছা বাছা বুলিতে তাকে বিদ্ধ করেছেন স্তালিন। দেখে মনে পড়ছিল জেনারেল তোতির কাছে শোনা গল্প আগের বছর যখন মার্শাল স্তালিন তাঁকে নিমন্ত্রণ করেন সেইকথা।

সাক্ষাতের পর জেনারেল পেতি অনুমতি চেয়েছিলেন রণক্ষেত্রের সেই সব এলাকা দেখার যেখানে সবচেয়ে আধুনিক ও সবচেয়ে গোপন সামরিক যন্ত্রের প্রয়োগ করা হচ্ছে। উত্তরে স্তালিন বলেন :

—"ফরাসীদের কাছে আমাদের গোপন করার কিছু নেই। আপনার যেখানে ইচ্ছা যেতে পারেন।"

হেনারেল শেতি চমৎকৃত না হয়ে পারেন না যে স্তালিন সম্পর্কে তাঁর ধারণা যে ভাষায় তিনি আমার কাছে প্রকাশ করেছিলেন, তা আমি উদ্ধৃত করি। আরো অনেক কিছুর মধ্যে একবার খুব আকর্ষ হয়েই তিনি বললেন:

অবাক হয়ে যেতে হয় দেখলে যে এতখানি যাঁর বুদ্ধি, চিন্তার এত স্পষ্টতা তথ্যের উপর এত দখল, এত তীক্ষ্ণধী যে মানুষটা সে কী করে এত সরল হতে পারে, ফরাসীরা যাকে বলে এত 'ভালোমানুষ'।

তবে, এই ভালোমানুষী, মোলায়েমভাষী ব্যক্তিটিই আবার দরকার হলে রাজনৈতিক বা কূটনৈতিক আলোচনায় খুবই কঠিন, এমনকি মাঝে মাঝে একটু কঠোর হতে পারেন। শোনা যায় মলিয়ে চার্চিল ও আরও কয়েকজনের মনে এই আলাপাচারী ব্যক্তিটির স্মৃতি বেশ খানিকটা অপ্রিয় হয়ে আছে। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বের এই দুই দিকের মধ্যে অসামঞ্জস্য কিছু নেই: নম্রতাই তাঁর সংগঠনতার ভিত্তি; নম্রতারই অপর দিকে তাঁর অনমনীয়তা সেই সব বিষয়ে যেখানে তিনি বোঝেন কিছুতেই আপোস করা চলে না।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে বিশেষ করে স্তালিনের সঙ্গে ফ্রান্সের সম্পর্কের কথা হচ্ছে। ভয় হয় না যদি এই প্রসঙ্গে এমন কতগুলি তথ্যের অবতারণা করি যা এখনও লোকে সবটা ভুলে যায়নি। এ বিষয়ে—বিশদভাবে জানা যায় সোভিয়েত সরকারের এক প্রধান শত্রু দেশত্যাগী রুশ রাজনৈতিক কর্মী মিলিউকভের রচনা থেকে। মিলিউকভ ছিলেন ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পরে প্রতিষ্ঠিত অস্থায়ী সরকারের প্রাক্তন পররাষ্ট্র সচিব। "রুশদেশের ইতিহাস" নামক গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে মিলিউকভ লিখেছেন যে বিপ্লবের আগে জার-সরকার ফরাসী ব্যাঙ্কগুলি থেকে যে ধার করেছিল, স্তালিন ১৯২৬ সালে তা শোধ দেবার প্রস্তাব করেন। অথচ, যার নেবার সময় থেকে জার শাসনের বিরোধীরা সকলে, এমন কি তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে নরমপন্থীরাও বলেছেন যে এই ঋণ স্বীকার করা হবে না কিছুতেই।

যাইহোক ১৯২৬ সালে স্তালিন ফ্রান্সকে ১৮৬০ কোটি পৌঁয়া করে ফ্রাঁ দেবার প্রস্তাব করেন। তাছাড়া, ফ্রান্সকে তিনি সবচেয়ে—"সুবিধাপ্রাপ্ত জাতি" হিসাবে স্বীকৃতি দিতেও রাজী হন। এই সুবিধা পেলে তখনকার শিল্পের একটা প্রকাণ্ড বাজার মিলত, এবং সম্ভব হত পাঁচশালা পরিকল্পনাগুলির ঠিক পূর্বাহ্নে সোভিয়েত ইউনিয়নে মার্কিন, ব্রিটিশ ও জার্মান শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামা।

বিনিময়ে স্তালিন কি চেয়েছিলেন? চেয়েছিলেন ৫ বছরের মধ্যে ১২ কোটি ডলার পর্যন্ত ধার, যা হত তখনকার তিনশো কোটি পৌঁয়াকার ফ্রাঁর সমান।

পৌঁয়াকার সরকার সেই প্রস্তাব শুষ্কভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এই সব বলশেভিক, আর তাদের তথাকথিত সমাজতন্ত্র গঠনে আস্থা কি? আর কে এক স্তালিন—তার কথারই বা কি দাম?

মনে রাখা উচিত, ফরাসী সরকার তখন একদিকে উত্তমর্ণ হিসাবে দাবী উড়িয়ে বেড়াচ্ছে, আর একদিকে ঠিক তখনই আমেরিকার কাছে তার ঋণ সে বেমালুম অস্বীকার করে।

এ কথাও ফরাসীদের মনে করিয়ে দিতে চাই যে সারা সোভিয়েত ইউনিয়নে একটি মাত্র বিদেশী পতাকা উড্ডীন আছে, এবং উড্ডীন আছে এমনই এক জায়গায় যাকে কোটি কোটি সোভিয়েত দেশবাসী তাদের জাতীয় বিবেকের পীঠস্থান বলে মনে করে। লেনিনের মাথার ঠিক পিছনে, রেড স্কোয়ারে সমাধিসৌধের অভ্যন্তর দেখতে পাবেন প্যারী কমিউনের পতাকা।

মস্কোর বলশয় থিয়েটারে মঞ্চের পর্দায় সোভিয়েত বিপ্লব ও প্যারী কমিউনের প্রধান প্রধান ঘটনার তারিখগুলি সব একই সঙ্গে মুদ্রিত আছে, এ কথা সোভিয়েত দেশ ফরাসী বা বিদেশী যে কোনও পর্যটিকই লক্ষ্য করে থাকবেন।

• •

মনে করিয়ে দেওয়া দরকার কি যে সোভিয়েত নৌবাহিনীর দুটি প্রকাণ্ড জাহাজের নাম রাখা হয়েছে "মারা" ও কম্যুন দ্য প্যারী"?

হীরের সহর আমষ্টারডাম

বিচিত্রবীর্য

হল্যাণ্ডের হীরক শিল্পটি প্রায় ৪০০ বছরের প্রাচীন। ষোড়শ শতাব্দীতে এন্টোয়াপ যখন হীরক শিল্পের কেন্দ্র ছিলো এবং স্পেনীয় শাসনের বিরুদ্ধে নেদারল্যাণ্ড যখন বিদ্রোহ ঘোষণা করে তখন অনেক হীরক শিল্পী আমষ্টারডামে পালিয়ে আসেন; এঁদের দলে যোগ দেন স্পেন ও পর্তুগালের ইহুদী উদ্বাস্তুগণ। এই রকমভাবেই হল্যাণ্ডে হীরক-শিল্পের সুরু হয়।

প্রথমদিকে, হীরক সাধারণত ভারত থেকে আসতো। ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে পর্তুগীজ উপনিবেশ ব্রাজিলে হীরক আবিষ্কৃত হয়। লিসবনস্থিত ওলন্দাজ কন্সাল, ব্রাজিলের সমস্ত হীরক—যেখানে যতেষ্ট হীরক পাওয়া যেতো—হল্যাণ্ডে পাঠাবার একটি চুক্তি করতে সমর্থ হন। এর ফলে ওলন্দাজ হীরক শিল্প ও ব্যাবসায়ে বিপুল বিস্তৃতি ঘটে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে হল্যাণ্ডে, ফরাসী দখলে থাকবার সময়, হীরক শিল্পের সমৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটে কিন্তু কিছুদিন পরেই আবার আগুতে আসতে শিল্পটি সজীব হয়ে ওঠে। প্রায় ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ বাষ্পীয় শক্তি অশ্ব শক্তিকে বিতাড়িত করে। এরপরে কুটীর শিল্প থেকে কারখানা শিল্পে রূপান্তরিত [illegible]

সময়ে আমষ্টারডামের সমস্ত হীরক শিল্প একটি বাড়িতে কেন্দ্রীভূত ছিল ফলে একটি ষ্টীম এঞ্জিন ১৬৮টি মেশিন চালাতো। ইঞ্জিনটি খুব কম ভাড়ায় হীরক কর্মীদের দেওয়া হয়েছিলো।

এই শিল্পটিরও ব্যবসাতে চরম মন্দা ভোগ করতে হয়েছে। চড়া বাজারের পরই অত্যন্ত মন্দা দেখা দিতো, ফলে কুশলী শিল্পীরা অন্য দেশে বা অন্য শিল্পে চলে যেতো।

ফ্রাঙ্কো প্রুশিয় যুদ্ধের পর (১৮৭০-৭১) দক্ষিণ আফ্রিকায় হীরক খনি আবিষ্কৃত হওয়ার পর, হীরক শিল্পে আবার সমৃদ্ধি দেখা দিল। আমষ্টারডামে যথেষ্ট পরিমাণ কাঁচমালা আসতে লাগলো এবং পল কাটা হীরকের চাহিদাও খুব বেড়ে গেলো। প্রধান খরিদ্দার দেশগুলি হ'ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, ফ্রান্স, রুশিয়া এবং বল্কান দেশগুলি। তখন কুশলী কর্মীর অভাব দেখা দিলো ফলে পারিশ্রমিকের হার অত্যন্ত বেড়ে গেলো। তখন যাঁরা সেই সহজলভ্য অর্থ সঞ্চিত করে নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন সেইগুলিকেই উন্নত করে বর্তমানে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয়েছে। হাজার হাজার [illegible] গঠিত আমষ্টারডামের এই শিল্পটি বর্তমানে

বিশেষ বিখ্যাত এবং এখানেই রয়েছেন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ হীরক কারিগর। চতুর্থ এবং সপ্তম রাস্তার ভেতর দিয়ে আমস্টারডামের বিশ্বের হীরক রাজধানী বয়ে গেছে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হীরক শিল্পের ওপর ভীষণ আঘাত হানে এবং হাজার হাজার কর্মীর মধ্যে মাত্র কয়েক শত যুদ্ধের ধ্বংস থেকে পরিত্রাণ পান।

ওলন্দাজ হীরক শিল্প এখনও প্রধানতঃ আমস্টারডামে কেন্দ্রীভূত; বর্তমানে এখানকার প্রায় ৩৪টি প্রতিষ্ঠানে মোটামুটি ১০০০ কর্মী আছেন। অন্যান্য দেশে হয়তো এর চাইতে অনেক বেশী প্রতিষ্ঠান ও কর্মী আছেন, কিন্তু হীরক শিল্পের গুরুত্ব, এই শিল্পে নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা দিয়ে স্থির করা যায় না, উৎপন্ন সামগ্রীর গুণের ওপরে তা নির্ভরশীল। হীরক সংশ্লিষ্ট সবত্র ব্যাপারে 'হল্যাণ্ডে প্রস্তুত' কথাটি অত্যন্ত বেশী পরিচিত। শিল্প চাতুর্যে এবং ব্যক্তিগত নিপুণতায় হল্যাণ্ডের হীরক শিল্প পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠতর।

বিশ্বের সর্ববৃহত্ 'কুলিনান' হীরকটিসহ বিশ্ববিখ্যাত অনেক পাথর আমস্টারডামে কাটা হয়েছে। এই হীরকটির ওজন ছিলো ৩০২৪ ক্যারেট (১ ক্যারাট, প্রায় ০.২ গ্রামের সমান। পাথরটি প্রায় ১০ সেঃ মীঃ (৩.৯৩") লম্বা, সাড়ে ৬ সেঃ মীঃ (২:৫৩") প্রস্থ এবং ৫ সেঃ মী (১.৯৬") পুরু ছিলো। রঙও ছিলো অত্যন্ত চমৎকার। এই পাথরটি থেকে ২টি বড়, ৩টি মাঝারি এবং ৯৬টি ছোট হীরক কাটা হয়। ৫৩০ ক্যারাটের একটি পাথর সহ সব চাইতে বড় হীরক বৃটিশ রাজকীয় হীরক ভাণ্ডারে রয়েছে।

৮০০ ক্যারাটের আর একটি বড় হীরক 'কোহিনুর' মণি কাটার জন্যও দুই জন শিল্পীকে লণ্ডনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো। বিশ্বের ক্ষুদ্রতম হীরকটিও হল্যাণ্ডে কাটা হয়, এটির আকার হল একটি পিনের মাথার মতো ওজন মাত্র ০.২৪ মিলিগ্রাম। এতে ৫৮টি পল কাটা হয়েছিলো।

আমস্টারডামের হীরক শিল্পের যন্ত্রপাতি অত্যন্ত আধুনিক। তাছাড়া একটি বড় প্রতিষ্ঠান হীরকের রঙ পরীক্ষা করার একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেছে। এই যন্ত্রটির প্রধান কাজ হল মার্চ মাসে, উত্তর মেরুর দ্বিপ্রহরের মতো আলো সৃষ্টি করা। এই রকম আলোতে পাথরের রঙ ও গুণ পরীক্ষা করতে অনেক সুবিধে হয়। মণি তৈরি করলে বেশী দাম পাওয়া যায় বলে হীরক খণ্ড সাধারণতঃ কাটা হয়। তবে যে হীরক প্রস্তর পাওয়া যায় তার মধ্যে শতকরা মাত্র ২০ ভাগ, কাটার উপযোগী হয়। অবিশুদ্ধতা, অস্বচ্ছতা রঙের বৈসাদৃশ্য ইত্যাদি থাকলে সেই রকম পাথর পল কাটার অযোগ্য হয়। পালিশের বিশেষ পদ্ধতি অনুযায়ী মণিতে যে ঔজ্জ্বল্য আসে, তাতেই তার দাম বাড়ে। আমস্টারডামের হীরক পালিশকারীগণের যে পরম্পরাগত কুশলতা আছে তার ফলে এঁরা অত্যন্ত সুন্দর জিনিষ তৈরি করতে পারে।

প্রাকৃতিক গুণ, বিশেষ করে এগুলির অত্যধিক কাঠিন্যের জন্যও এগুলি মূল্যবান। হীরক বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়। শিল্পে সাধারণতঃ হীরকের ছোট ছোট টুকরো অথবা বলতে গেলে হীরক চূর্ণ ব্যবহৃত হয়। মণি পালিশ করার জন্য যে পেষণ চাকা ব্যবহার করা হয় তাতে এই গুঁড়ো দেওয়া হয়। হীরক চূর্ণের আকার অনুযায়ী পেষণচক্রের কার্যকারিতা নিরূপিত হয়।

হীরক বাছাই করাতেও যথেষ্ট নৈপুণ্যের প্রয়োজন। আমস্টারডামের হীরক শিল্পীরা সূক্ষ্ম হীরক খণ্ড বাছাই করতেও এতো নিপুণ যে ২০০টি টুকরোতে এক ক্যারেট হয়। এগুলি তো সূক্ষ্ম যে একটির ওজন, এক গ্রামের এক হাজার ভাগের এক ভাগ।

কাঁচ কাটার জন্য, লেখা বা এনগ্রেভ করার জন্য, ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে ড্রিল করার জন্য, রেকর্ড বাজাবার পিনে, অতি সূক্ষ্ম তার তৈরি করার জন্য ইত্যাদি নানা কাজে হীরকের টুকরো ব্যবহৃত হয়।

রেডিও এ্যাক্টিভিটি বিশ্লেষণের জন্যও সম্প্রতি হীরক ব্যবহৃত হচ্ছে। নিভা নূতন ক্ষেত্রে এগুলির ব্যবহার হচ্ছে। হীরকের ব্যবহার সম্পর্কে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে এবং এর জন্য নতুন নতুন যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করতে ওলন্দাজ হীরক শিল্প সব সময়েই সাহায্য করতে পারে।

খেলাধুলা

ঊর্ধ্বমুখী গতি

অজয় বসু

অ্যাথলিটদের সামর্থ্য ও ক্ষমতার শেষ কোথায়? কোথায় এর সঠিক উত্তর?

দিন কাল বদলে যাচ্ছে। অ্যাথলেটিকমানের ক্রমোর্ধ্বায়নের নিত্য নব নজীরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আজ আর নিশ্চিন্তে কথা বলার উপায় নেই। অথচ একদিন অ্যাথলিটদের যোগ্যতার পরিমাপে মতামত প্রকাশ করাই ছিল অ্যাথলেটিক অভিজ্ঞ তথা বিশেষজ্ঞ-মানের প্রচলিত রেওয়াজ।

সেদিন তাঁরা কথার ফুলঝুরি ছড়িয়েছেন। নিজেদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার মূলধনে গজ ফিতে-আর স্টপওয়াচের কাঁটায় মানুষের সামর্থ্যকে তাঁরা মেপে রাখতে চেয়েছেন। কিন্তু আজ বিশেষজ্ঞদের দুঃসাহসেও ভাঁটার টান। এই শেষ, আর ঐতনো কারুর পক্ষেই আর সম্ভবপর নয়—এমন কথায় সোচ্চার হয়ে ওঠা তাঁদের পক্ষেও আজ অসম্ভব।

বিশেষজ্ঞরা ঠেকে শিখেছেন, অ্যাথলিটরা তাঁদের ঠকিয়ে শিখিয়েছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমসাময়িককাল পর্যন্ত অবস্থা একরকম ছিল। কিন্তু উত্তরপরিস্থিতি ভিন্নতর। উত্তরকাল আনবিক যুগ। আর সেই যুগের ধর্মের সঙ্গে তাল রাখার নেশায় অ্যাথলিটদের উর্ধ্বগতির ভূমিকার গতিও ঊর্ধ্বমুখী। ঊর্ধ্বে আরও ঊর্ধ্বে উঠে যাবার তাগিদে তাঁরা ভূমির সীমা ছাড়িয়ে মহাকাশেই ছড়িয়ে পড়তে চাইছেন।

আরও ঊর্ধ্বে ওঠার, আরও জোরে ছোটার এবং আরও দূরে চলে যাবার সর্বাত্মক সাধনায় অ্যাথলিটরা সম্প্রতি কি করেছেন তারই এক সংক্ষিপ্ত বিবরণী পেশ করা আমার উদ্দেশ্য। এ বিবরণ সাম্প্রতিক ইতিহাস, একেবারেই চলতি বছরের সাফল্যের পুরানো নজীর বড় মুখে অপোচিত বলেই সেগুলিকে আজ আর আলোচ্য বিষয়ভুক্ত করছি না।

এ বছরের বড় কীর্তি মাইল দৌড়ে পিটার স্নেলের নতুন রেকর্ড। এক মাইল দৌড়ে চার মিনিটের বাধা ভেঙে ছিলেন সর্বপ্রথম ইংলাণ্ডের রোজার ব্যানিষ্টার। সেই দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হয়ে কালে কালে অনেক অ্যাথলিটই ব্যানিষ্টার প্রদর্শিত পথে পা বাড়ান। তাঁদেরই একজন স্বনামধন্য হাঠ ইলিয়ট। অস্ট্রেলিয়ার তরুণ এই ইলিয়ট চার মিনিটের বা তারবার ভেঙে শেষ পর্যন্ত মাইল দৌড়ের বিশ্ব রেকর্ডটিকে নামিয়ে আনেন তিন মিনিট ৫৮·৬ সেকেণ্ডে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইলিয়টের বিশ্বরেকর্ডের মর্যাদা রইলো না। বছর তিনেক যেতে যেতেই নিউজিল্যাণ্ডের পিটার স্নেল হাঠ ইলিয়টকে পেছনে ফেলে দশমিক এক সেকেণ্ডে এগিয়ে গেলেন। পিটার স্নেল রোম অলিম্পিয়াডের আটশ মিটার দৌড়ের বিজয়ী। তবু তাঁর পেশীবহুল জোয়ান চেহারার কাঠামো দেখে দৌড়ে তাঁর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেকে তেমন নিশ্চিন্ত ছিলেন না। কিন্তু আজ আর সন্দেহ ও অনিশ্চয়তার বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। কোচ আর্থার লিডিয়ার্ডের তত্ত্বাবধানে পিটার স্নেল নিজেকে এমনভাবে গড়ে তুলেছেন যে মাকারি পাল্লার দৌড়ে আজ তিনি বিশ্বে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এই অনন্য প্রতিভার সাধনার মাইল দৌড়ের বিশ্বরেকর্ডটি যে অদূর ভবিষ্যতে কমতে কমতে কোথায় এসে দাঁড়াবে তা কেই বা বলতে পারে। সেদপর্যন্ত তিন মিনিট পঞ্চাশ

সেকেণ্ড ? না তার ও কমে ? কে জানে।

অবিস্মরণীয় নিগ্রো অ্যাথলিট জেসি ওয়েন্সের ব্রডজাম্পের বিশ্ব রেকর্ড বহুদিন ছিল অন্যদের নাগালের বাইরে। ১৯৩৫ সালের মে মাসে ২৬ ফুট সোয়া ৮ ইঞ্চি অতিক্রম করে ওয়েন্স সাফল্যের যে নজীর রেখেছিলেন তা অতিক্রান্ত হতে সময় লাগলো কমপক্ষে পঁচিশ বছর। পঁচিশ বছরের সাধনা সফল ও সার্থক হলো আর এক নিগ্রো তরুণ, রালফ বোস্টনের কৃতিত্বে। পূর্ব নজীরকে পেছনে রেখে বোস্টন এগিয়ে গেলেন প্রথমে ২৬ ফুট সোয়া ১১ ইঞ্চি দূরে—তারপর আরও দূরে, একেবারে সাতাশ ফুটের ওপরে।

চার্লস ডুমাস একদিন যেমন হাইজাম্পে সাত ফুটের বাধা, রোজার ব্যানিষ্টার যেমন মাইল দৌড়ে চার মিনিটের বাধা ভেঙে করেছিলেন, রালফ বোস্টনও তেমনি ব্রডজাম্পে সাতাশ ফুটের গণ্ডী পেরোলেন। কিন্তু সেখানেই এই কাজের শেষ নয়। দেখতে দেখতে এগিয়ে এলেন রুশ তরুণ ভের-শুভালেসিয়ান। ২৭ ফুট ১ ইঞ্চি লাফিয়ে যখন তিনি ডিঙিয়ে গেলেন রালফ বোস্টনের ২৭ ফুট সোয়া ১ ইঞ্চির নজীরকে। ভবিষ্যতে আর কেউ যে এক লাফে পুরো সাতাশটি পার হয়ে যাবেন না, এমন কথা যেন আজ জোর দিয়ে বলার উপায় নেই। সেইজন্যই বিশেষজ্ঞরা আজ মৌনব্রত অবলম্বন করেছেন।

এই ডুমাস, ব্যানিষ্টার আর বোস্টনের পাশাপাশি আছেন আল্‌ফ ওটার, জন উলসেন প্রমুখেরা। ওটারের কৃতিত্বে ডিসকাস নিক্ষেপে দু'শ ফুটের আর উলসেনের সাফল্যে পোল ভল্টে ষোল ফুটের বাধা সরেছে। এবং দুজনের সাফল্যের নজীরে চিহ্নিত হয়ে আছে এ বছরেরই ইতিহাস।

মার্কিন তরুণ আল্‌ফ ওটার পুরানো, প্রতিষ্ঠিত অ্যাথলিট। তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায় মেলবোর্ন ও রোম অলিম্পিকের স্বর্ণপদক জমা রয়েছে। গত ১৮ই মে যুক্তরাষ্ট্রে কলিসিয়াম বিলে অনুষ্ঠানে ২০০ ফুট দাড়ে ৫ ইঞ্চি দূরে হাতের ডিসকাসটি ছুঁড়ে দিয়ে বিস্ময়ের কেতাবে তিনি নতুন স্বাক্ষর এঁকেছেন। বড়ো কীর্তি তাঁর সন্দেহ নেই। তবু সে স্বাক্ষরটি আজ মুছে যেতে বসেছে। কারণ পক্ষকালের মধ্যেই আর এক তরুণ ২০২ ফুট সোয়া ২ ইঞ্চি দূরে ডিসকাস ফেলার খ্যাতি লাভ করেছেন। এই তরুণের নাম ভ্লাডিমির ক্রুদেনেভ, জন্ম ও বাস সোভিয়েত মুলুকে। এখানেও যেন এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় রুশ-মার্কিন দ্বন্দ্ব চিরন্তন।

পোলভল্টে অবশ্য এ দ্বন্দ্ব নেই। সেখানে মার্কিন শ্রেষ্ঠত্বই অনস্বীকার্য। মার্কিন তরুণ বব গটৌস্কি ১৫ ফুট পৌনে দশ ইঞ্চি। গ্রাহাম ডেভিস ১৫ ফুট সোয়া ১০ ইঞ্চি উঁচুতে উঠে পোল ভল্টে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে যে সাম্রাজ্য বিস্তার করে দিয়েছিলেন সে সীমানা আরও প্রসারিত হয়েছে চব্বিশ বছর বয়স্ক জন উলসেস এবং সাতাশ বছরের ডেভ টর্কের চেষ্টায়।

উলসেস ও টর্ক দুজনেই মার্কিন নৌ বিভাগের অফিসার। উলসেস গত মার্চের শেষ লগ্নে একেবারে ষোল ফুট পৌনে এক ইঞ্চি ওপরে ওঠে পোলভল্টে সর্বপ্রথম ষোল ফুটের বাধা ডিঙিয়ে যান। একমাস না যেতেই ডেভ্ টর্ক ওঠেন আরও ওপরে, ষোল ফুট ২ ইঞ্চি উ.ধ্ব।

প্রথম জন উলসেস এবং পরে ডেভটর্ক ষোল ফুটের গণ্ডী ছেড়ে এবারে উঠলেও দুজনেই কিন্তু ব্যবহার করেছেন কাঁচ-তন্তুতে নির্মিত এক বিশেষ ধরণের পোল বা দণ্ড। লাফাবার সময় দণ্ডটি ধনুকের মতো বেঁকে, পরে অ্যামুক্তির আনন্দে অতর্কিতে সোজা হয়ে ছুটে আসে। ওই বিশেষ ধরণের দণ্ড ব্যবহারের ফলে লাফাবার সময় উলসেস ও টর্ক বিশেষ সুবিধা পেয়েছেন বলে তাঁদের রেকর্ডকে স্বীকার না করার আবেদন উঠেছে। জানি না সে প্রতিবাদ মান্য করা হবে কি না। তবে পোলভল্টের সময় যে কোনো দণ্ড ব্যবহারের কথাই আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিক সংস্থার বিধানে স্বীকৃত হয়ে আছে। বিশেষ এক দণ্ড ব্যবহারের জন্যে জন উলসেসের কৃতিত্বের স্বাক্ষর স্থায়ী হয় কিনা তা ভবিষ্যতে লক্ষ্যণীয়।

এ যুগে তরুণীরাও বিশেষ পিছিয়ে নেই। ক্রমোন্নত ক্রীড়া মানে পৌঁছোবার সংকল্পে মার্কিন তরুণী উইলমা

ডডলফ রোম অলিম্পিক আসরের নায়িকার আসন যে অধিকার করে নিয়েছিলেন সে কথা আমরা জানি। তারও আগে ফ্লোরিডার ইউলাণ্ডা বালাস সব প্রথম বিভাগীয় ক্রীড়ায় বহু মূল স্বীকৃত বাধাকে অতিক্রম করে প্রথম সফল পদক্ষেপ ঘটিয়েছিলেন।

মেয়েরা ছফুট উঁচুতে উঠতে কোনোদিন পারবেন না বলে উচ্চমন্য পুরুষেরা একদিন যে অভিযোগ করতেন ইউলাণ্ডার ভূমিকায় ছিল সেই অভিযোগেরই বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। ১৯৫৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইউলাণ্ডা সব প্রথম ছ ফুটের বাধা ডিঙিয়ে যান। পরবর্তী কালে তিনি উঠেন আরও ওপরে। গত বছরেই তিনি পৌঁছেছেন তুঙ্গে, ৬ ফুট সোয়া তিন ইঞ্চিতে এখন যাঁড়ে ছ ফুটে উঠতে আর কতোই বা দেরী।

উচ্চমন্য পুরুষের বিচারে মহিলাদের জন্য আগে একুশ ফুটের দূরত্বই ছিল শেষ সীমানা। কিন্তু সে সীমানাও ক্রমশই প্রসারিত হতে চলেছে। গত বছরেই সর্ব প্রথম আর্মান তরুণী ডিলুডর ক্লব একুশ ফুটের সীমারেখা ডিঙিয়ে যান। তারপরে যুক্তরাষ্ট্রের জো আইট এবং শেষ পর্যন্ত রাশিয়ার তাতায়ানা সেলকাং-তা এগিয়ে যান ২১ ফুট ৩ ইঞ্চি দূরে। সেলকাং-তা সম্প্রতি আরও কিছু করেছেন। ১০ই জুন একদমকে একেবারে ২১ ফুট ৪.৯ ইঞ্চি অতিক্রম করে জড়ো করেছেন চাঞ্চল্যের উপকরণ। এর পর কি? দাঁড়ে একুশফুট বা পুরো বাইশ ফুট?

নারী অবলা—সবলের ধারণা তাই। কিন্তু রুশ তরুণী তামারা প্রেস সে ধারণার মূলে প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়েছেন। ৬১ ফুট সোয়া ইঞ্চি দূরে লৌহ গোলক নিক্ষেপ করে শটপুটে তিনি ষাট ফুটের বাধা অতিক্রম করেছেন এই সব প্রথম—জুনের দ্বিতীয় পক্ষে।

তামারা অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন। রোম অলিম্পিকের আগের কদিন থেকে ওই জুনের আগের কদিন পর্যন্ত নানান অনুষ্ঠানের সূত্রে তিনি গোলক নিক্ষেপ করে আসছিলেন ৫৬ থেকে সাড়ে আটান্ন ফুটের মধ্যে। বড়জোর ছুঁড়েছিলেন ৫৮ ফুট ৩ ইঞ্চি। কিন্তু তারপরই ষাট ফুটের পর্যায়ে এই অনন্যসাধারণ সাফল্য।

জন উলাণ্ডার দারুণ পোলভল্টে বোম বাধা দিচ্ছে।

তামারার আশে-পাশে আর কেউই নেই, যদিও রুশ মহিলা মূলুকে তো নয়ই। মনে হয়, আরও বেশ কিছুদিন তিনি শটপুটে একাধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবেন।

ডিসকাস নিক্ষেপেও তামারার হাত আছে। সঠিক হিসেবে তাঁর ডিসকাস নিক্ষেপে ১৯৩ ফুট ৩ ইঞ্চি অতিক্রমের নজীরটিই বর্তমানে বিশ্বশ্রেষ্ঠ দূরত্ব। আশা করা যায় যে শটপুটে ষাট ফুটের বাধা অতিক্রমের মতো তামারা প্রেস একদিন ডিসকাস নিক্ষেপেও দু'শ ফুটের গণ্ডীর বাইরে চলে যেতে পারবেন।

তখন নারী অবলা নয়। এখনও নয়। সবল পুরুষ যদি তার উচ্চারিত অভিযোগ তামারাকে দেখেও আজ ফিরিয়ে নিতে রাজী না হয়, তাহলে তার কপালের দুঃখ ঘুচাবে কে?

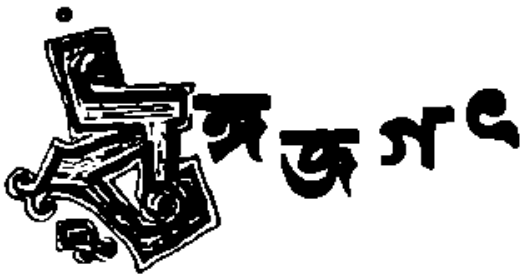

মহত্তর চিত্রসৃষ্টি "কাঞ্চনজঙ্ঘা"

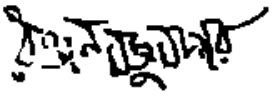

চিত্রনাট্য, কাহিনী, সংগীত পরিচালনা—সত্যজিৎ রায়। আলোক চিত্র—সুব্রত মিত্র। সম্পাদনা—দুলাল দত্ত। রূপসজ্জা—দুর্গাদাস মিত্র। অভিনয়—ছবি বিশ্বাস, অরুণ মুখোপাধ্যায়, অনিলকুমার রায়, সুব্রত সেন, অনুভা গুপ্তা, পাহাড়ী সান্যাল, হরিধন বন্দ্যোপাধ্যায়, করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়।

পথের পাঁচালী থেকে সুরু করে অদ্যাবধি আমরা যতগুলি সত্যজিৎ রায়ের চিত্রপ্রয়াস দেখতে পেয়েছি, সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' চিত্রটি তার মধ্যে এক অসাধারণ চিত্রালেখ্য বলে মনে হয়েছে। এ চিত্রের কাহিনীকার স্বয়ং তিনিই এবং চিত্রনাট্য, সংগীত ও পরিচালনার দায়িত্ব সর্বাংশে তাঁরই। এক্ষেত্রে তিনি যে নিঃসন্দেহে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছেন তা স্থির সিদ্ধান্তে বলা চলে।

নানাবিধ কারণে 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' চিত্রটি ভারতীয় চলচ্চিত্রে ইতিহাসে এক বিশিষ্ট ব্যতিক্রম এবং অনিবার্য কারণেই এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। ভবিষ্যতের কথা বলা মুস্কিল কিন্তু আজ পর্যন্ত যতগুলি ভারতীয় চিত্র দেখেছি 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র মত একটি অনাড়ম্বর মৌলিক ছবি দেখার অভিজ্ঞতা ইতিপূর্বে হয়নি। সমকালীন জনমানসে যে সংশয়, অদৃষ্টপূর্বতা ও দ্বিধা-দৈর্ঘবিলো আমরা অবস্থী—সেখানে সত্যজিৎ রায় নিঃসন্দেহে এক দৃপ্ত মননশীল চেতনা পরিবহন করেছেন তাঁর এই অভিনব কাহিনী চিত্রে। এই চিত্রে আমরা তাঁর সূক্ষ্ম ভাবাবোধ উপস্থাপনায় ব্যতিক্রম এবং পরিবেশনে রুচিজ্ঞান, রসপ্রবণতা ও পরিমিতিবোধ সংক্রান্ত লক্ষণগুলি সুস্পষ্ট আকারে দেখতে পেয়েছি। অর্ধকৌলিন্যে অভিজাত উচ্চবিত্তদের শূন্যগর্ভ মানসিক জগতকে তিনি প্রচ্ছন্ন শ্লেষের ভংগীতে প্রকাশ করেছেন—তেমনই সমাজের নিম্নমধ্যবিত্তদের প্রখর বুদ্ধিচেতন মনোভাবের প্রতিনিধিমূলক চরিত্রগুলির বস্তু সম্পর্কে উপলব্ধি, আবেগ, দুঃসাহস ও হটকারীসূচক মুহূর্তগুলিকে অনবদ্য ভংগীতে উপস্থিত করেছেন নাটকে—আর সেই একই কারণে এই দুই পরস্পর বিরোধী নাট্যগতিকে সাবলীল অনুষ্ঠানে অপূর্ব সামঞ্জস্য বিধান করেছেন।

'কাঞ্চনজঙ্ঘা' চিত্রের চমকপ্রদ গল্প বর্ণিত হয়েছে কলকাতার প্রখ্যাতনামা ধনী, পাঁচটি কোম্পানীর ডিরেক্টর রায়বাহাদুর ইন্দ্রনাথ সপরিবারে দার্জিলিং শহরে ছুটির অবসর ভোগ করতে এসেছিলেন। ছুটির মেয়াদ শেষ হবে যেদিন দার্জিলিং ছাড়বেন ঠিক তার আগের দিন বিকেল বেলার কয়েকটি ঘণ্টার ঘটনা এর চিত্রকাহিনী। অভিজাত ঔদাসিক এবং রক্ষণশীল প্রকৃতির মানুষ ইংরেজী রায়বাহাদুর খেতাবে ভূষিত—ইন্দ্রনাথের সাথে এসেছিলেন স্ত্রী লাবণ্য, বড় মেয়ে ও তার স্বামী যথাক্রমে

অনিমা ও শঙ্কর—তাদের কন্যা সন্তান টুকলু, কনিষ্ঠা মনীষা ও শ্যালক বিপত্নীক জগদীশ। এঁরা সবাই সমাজের শীর্ষস্থানীয় মানুষ। আর একটি পরিবার এসেছিল—নিম্ন মধ্যবিত্ত অর্থে অসচ্ছল পরিবারের বেকার যুবক অশোক তার অসুস্থা মা এবং ক্রমাগত পোড় খাওয়া রুক্ষ প্রকৃতির কাকাকে নিয়ে—যাদের স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের বাসনায়। বিলেত ফেরত ইঞ্জিনীয়ার তরুণ যুবক প্রণব এসেছিল রায়বাহাদুর ইন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে—উচ্চবিত্ত সমাজের মর্যাদাসম্পন্ন চাকুরে প্রণবের সাথে মনীষার বিবাহের উদ্যোগ করেছিলেন রায়বাহাদুর। দার্জিলিং ভ্রমণের প্রাক্কালে মনীষার সংগে যাতে প্রণব অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে পারে সেদিকে রায়বাহাদুরের সযত্ন প্রয়াস ছিল!

স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য এলেও স্থূল জীবনধর্মে বিশ্বাসী অশোকের কাকা অতীতে রায়বাহাদুরের পুত্র অনিলের গৃহশিক্ষক ছিলেন। তাই প্রথম দর্শনেই তিনি তার স্বাভাবিক তোষামুদে চাটুকারিতায় ইন্দ্রনাথকে খুশী করার চেষ্টা করতে না করতেই বেকার ভাইপোর জন্য একটা চাকরীর সুপারিশ করে বসলেন। সেখানেই ঘটনাচক্রে অশোকের সাথে মনীষার আলাপ। সূত্র ছিল পারস্পরিক শিক্ষাজীবন।

পিতার ইচ্ছানুসারে মনীষা প্রণবের প্রতি বাগ্‌দত্তা হলেও অন্তরের কোন আকর্ষণ সে বোধ করেনি। সুদর্শনা-স্বপ্নভাষিনী মনীষা বাবার বিরুদ্ধাচারণের আশঙ্কায় প্রণবকে শুধুমাত্র দলাদান করেই নিষ্কৃতি পেতে চেয়েছিল কিন্তু প্রেম সম্পর্কে প্রণবের দৃষ্টিভংগী ভিন্নতর হওয়ার শেষ পর্যন্ত সে মনীষার কাছে দুর্বহ হয়ে দাঁড়াতে লাগলো। এমনই এক দুর্বল মুহূর্তে দার্জিলিং এর পথে আবার দেখা হয়ে যায় অশোকের সাথে মনীষার। প্রণবকে এড়াবার জন্যই সে প্রায় ঝরিয়া হয়ে ওঠেছে তখন অথচ প্রণব সাগ্রহে মনীষার অন্তরকে স্পর্শ করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। এই দুই পরস্পর বিরোধী মনোভাবের দ্বন্দ্বে অবশেষে মনীষাই জয় লাভ করতে সক্ষম হলো। প্রণব যাবার সময় বন্ধু সম্পর্কে তার উপলব্ধির কথা জীবন দর্শন এবং বিশেষভাবে নরনারীর প্রেমের ক্ষেত্রে সিকিউরিটির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মন্তব্য করে বিদায় গ্রহণ করলো। ইন্দ্রনাথের ইচ্ছা এখানে পরাভূত হল।

ইন্দ্রনাথ এক নাতিদীর্ঘ আভিজাত্যবোধ সম্পন্ন দৃষ্টিভংগীর মানুষ। তার সেই স্বেচ্ছাচারী দৃষ্টিভংগীর কাছে পরিবারের সকলেই নিঃসহায়ে আত্মসমর্পিত। বড় মেয়ে তারই নির্বাচিত পাত্র বিবাহ করে জীবনে ঘোরতর অসুখী। পিতা হিসাবে ইন্দ্রনাথ তার অধিকার টুকু ষোল আনাই কার্যকরী করে নিতে অভ্যস্থ। তাঁর মতের বিপক্ষে মন্তব্য করার অর্থ ভয়াবহ। স্ত্রী লাবণ্য তাই স্বাতন্ত্র্যহীনা এক নির্লিপ্ত জীবন যাপন করে এসেছেন স্বামী সন্তানের সংসারে—স্বামীর কর্তব্যগুলি অন্যায্য জেনেও প্রতিবাদ করতে সাহস পান নি কখনও।

ইন্দ্রনাথের চরিত্রচারিত্রার বিষয়ের ফল প্রতিভা হয় অন্তর্মুখী বড় মেয়ে অনিমা ও জামাতা শঙ্করের মধ্যে। প্রাক্ বিবাহ সময়ে অনিমা ভালোবাসতো কলেজ যুবককে কিন্তু পিতার কথার অবাধ্য হবার মানসিক শক্তি না থাকার ফলে সে বাধ্য হয়ে বিবাহ করেছিল শঙ্করকে অথচ অনুরাগ ছিল ছিল পূর্ব প্রণয়ীর প্রতি। বিবাহের পর শঙ্করের কন্যা টুকুলুর জননী হবার পরও সে তার অভ্যস্থ জীবনপ্রণালীকে ত্যাগ করতে পারেনি-একথা শঙ্কর কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারে ফলে সেও তার সমস্ত জীবন সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়ে মদ ও জুয়ার নেশায় মেতে ওঠে আর মাঝখানে মাসের পর মাস এবং বছর ধরে মিথ্যা সুখী দাম্পত্য জীবনের অভিনয় চলতে থাকে পরস্পরের মধ্যে।

ইন্দ্রনাথের পুত্র অনিল ধনীর প্রগলভ সন্তান যৌবনের অপরিমিত আবেগে সমস্ত উদ্যোগকে নাহিংসে নিয়ে এসেছে মস্টামীর পথে। তার পারিবারিক শিক্ষা ও বিশেষ সামাজিক চরিত্রটি অনিবার্য রূপ নিয়েই ফুটে বেরিয়েছে চিত্র কাহিনীতে।

বিপত্নীক প্রৌঢ় জগদীশ ইন্দ্রনাথের একমাত্র শ্যালক। সমস্যাহীন জীবনে পাখীর নেশায় মেতে আছেন। তাবৎ পক্ষীকুল সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে ফেরেন তিনি ঘুরবীন হাতে বনেজঙ্গলে।

এই সব চরিত্রগুলিই 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' চিত্রের প্রধানতম পুরুষ। এদের মধ্যে প্রত্যক্ষ হয় এক বিশেষ সামাজিক সমস্যা। দাম্ভিক ইন্দ্রনাথ চিরকালের ইংরেজ ভক্ত, প্রভুত্বকামী এক বিশালকায় শিল্পপতি। অর্থের প্রাচুর্যে স্ফীত মানুষটিকে ঘিরে যে সমাজ সেই সমাজের অন্তঃসারশূন্যতা এক বিপুল ট্রাজেডী। দেশ ও কাল সম্পর্কে মানুষের স্বতন্ত্র বোধ সম্বন্ধে ইন্দ্রনাথ এক নির্দয় ও অশুভ চিন্তাধারা পোষণ করেন দেশবাসীকে হেয় প্রতিপন্ন করে বিদেশীদের প্রশংসায় মুখর হতে বিধা জাগে না তাঁর অন্তরে—খেটে খাওয়া মানুষের খেয়ে পরে বেঁচে থাকার ন্যূনতম দাবীকে যিনি ঔদ্ধত্য হিসাবে চিহ্নিত করে ধিক্কার দেন সমস্ত দেশের শাসন প্রণালীকে—তাঁর চোখে জামাতা হিসাবে প্রথমেই স্বীকৃতি পেয়ে ইঞ্জিনীয়ার প্রণব ব্যানার্জী তাঁর দৃষ্টিতে প্রণব সাহেব সুবোধের দেশ প্রত্যাগত 'ম্যানারলস' জানা ছেলে মোটা মাইনে আর বড় চাকুরে সুতরাং যে কোন মেয়ের চোখে সে একজন লোভনীয় স্বামী। মেয়েদের কাছে বিবাহ সম্পর্কে মতামত নেওয়ার কোন প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন না এক্ষেত্রে ইন্দ্রনাথ এমন কি স্ত্রীর কাছ থেকেও না।

এরই মধ্যে অশোকের চরিত্র এক স্বতন্ত্রমুখীন অভিব্যক্তির সূচনা করে। নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের শিক্ষিত অথচ বেকার সন্তান পরিমিত আশা আকাঙ্ক্ষাবোধের সাথে সহজাত সামাজিক সংস্কারের মধ্যে মানুষ। অসচ্ছল অবস্থার মধ্যেও জীবনে সাধারণভাবে হলেও বাঁচা তুলে দাঁড়াবার আগ্রহ তাকে সর্বদাই উদীপ্ত করে, প্রখর বুদ্ধি চেতন ও অনুভূতি প্রবণ এই যুবক জীবনের অপূর্ণ বহুবিধ আশা ও আকাঙ্ক্ষায় নিয়ত দোদুল্যমান। জীবনে এই সর্বপ্রথম তার দার্জিলিং ভ্রমণ। দার্জিলিং ও তার পশ্চাৎপটে সুবিশাল পর্বত-মালার মধ্যে যে অপরিসীম সৌন্দর্যের বিশালত্ব তাতে সে বিস্মিত বিমুগ্ধ। কলকাতার প্রাত্যহিক জীবনের যন্ত্রণা ও গ্লানিবোধের বাইরে এই সুবিশাল প্রকৃতির ব্যাপ্তি দর্শনে সে অভিভূত এবং পুলকিত, কিন্তু এরই অবসরে তার কাকা যখন তাকে বেকার জীবনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে রায়বাহাদুর ইন্দ্রনাথের উমেদারীতে এগিয়ে যান তখন অশোক আশ্চর্য রকম মর্মাহত হয়। কাকার এই অনাবশ্যক ক্ষুদ্রতায় অশোক অন্তরে তীব্র গ্লানি অনুভব করে অথচ এই ঘটনার কিছুকাল পরেই যখন স্বয়ং ইন্দ্রনাথ অকস্মাৎ তাকে ঘিরে একটি ক্ষুদ্র ফরমাস্ খাটিয়ে নিতে চেষ্টা করেন, বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে সে সাগ্রহে আদেশ পালন করতে এগিয়ে যায়। সে মুহূর্তে ইন্দ্রনাথকে খুশী করার প্রচেষ্টাটুকু অশোকের ব্যবহারে পরিলক্ষিত হয়। আশা ও আশঙ্কার ক্রমাগত দোদুল্যমান অশোক তার মধ্যবিত্ত সামাজিক চরিত্রের মাঝখান দিয়ে পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে। আবার এই অশোক আন্তরিক ধনীর দারিদ্রের প্রতি তাচ্ছিল্য—ইংরেজ ঔপনিবেশিক প্রভুদের প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্য প্রকাশ—স্বদেশবাসীকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা ইন্দ্রনাথের চরিত্রে যখন মূর্ত

দেখতে পায় তখন সে অকস্মাৎ দৃপ্ত ভংগীমায় ঘুরে দাঁড়ায় এবং ইন্দ্রনাথকে স্তম্ভিত করে দিয়ে সে মোটা মাইনের চাকুরীর প্রস্তাবকে দৃঢ়তার সাথে প্রত্যাখ্যান করে বসে। এই পরস্পর বিরোধী মূল্যবিস্তসম্পন্ন চরিত্রে অশোক সর্বদাই দোদুল্যমান যে মনীষার মত মেয়ে যেন তার দিকে এক স্বচ্ছ ও মোহমুক্ত মন নিয়ে এগিয়ে আসার চেষ্টা করে তখন মনীষাকে ভুল বিবেচনা করে এবং অনিবার্য কারণেই মনীষাকে শূন্যগর্ভ উচ্চবিত্তের প্রতিনিধিস্থানে করে আঘাত হানতে সুরু করে। সত্যজিৎ রায়ের এক অনবদ্য সৃষ্টি এই অশোকের চরিত্র যে আবেগে উচ্ছলতায়, আনন্দে বেদনায় কখনও উচ্চকিত কখনও বা বিমর্ষ। নিজেকে সে অকপটে জ্ঞাপন করে আবার আত্ম সম্ভ্রমে উচ্চকিত হয়ে নিজেকে গৌরবান্বিত করে আবার সুযোগ গ্রহণ না করার আক্ষেপে নিজেকেই অভিযুক্ত করে বসে।

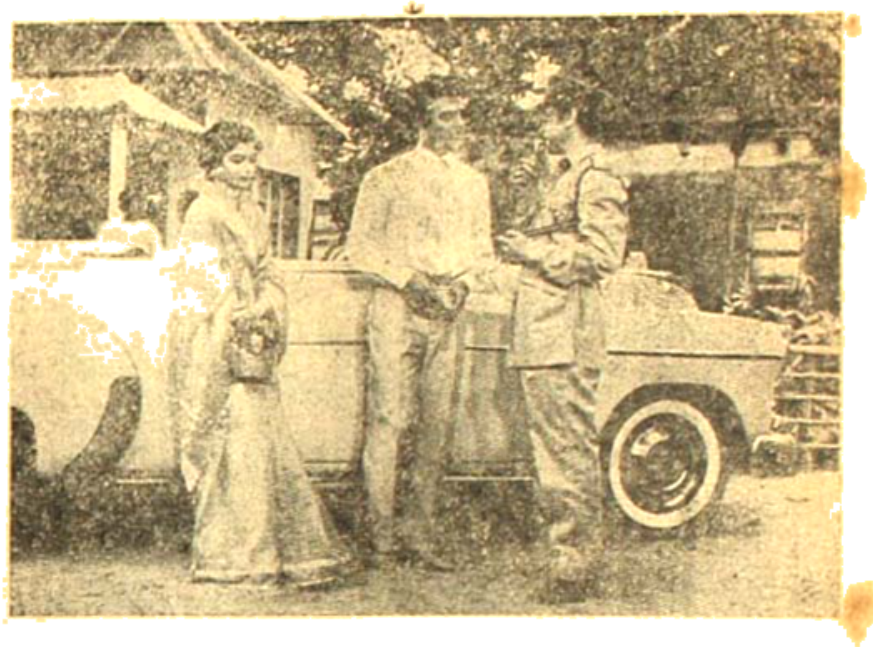

হরিদাস ভট্টাচার্য পরিচালিত ও রাজকুমার মৈত্রের কাহিনী অবলম্বনে "শেষ অঙ্ক" চিত্রের একটি বহির্দৃশ্যে শর্মিলা ঠাকুর, উত্তমকুমার ও দীপক মুখোপাধ্যায়।

চিত্র হিসাবে 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' এক অতি উচ্চ পর্যায়ের অনন্যসাধারণ মানবিক-কাহিনী-সমৃদ্ধ চিত্রালেখ্য। সন্দেহ নেই ভারতীয় চলচ্চিত্রে এ ধরণের প্রচেষ্টা ইতিপূর্বে হয়নি। শ্রেণী চরিত্রের মূল্যায়নের জন্যই এ চিত্রের অবতারণা নয়, কিন্তু শ্রেণী চরিত্র এই বিশাল দেশে যেখানে কোটী কোটী মানুষ অনাহার অথবা অর্ধাহারে, কুশিক্ষায় এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যে পর্যুদস্ত সেখানে শ্রেণী বিন্যাস বিশেষ করে উচ্চ মূল্যবিস্তসম্পন্ন সাম্প্রতিক চরিত্র এক বিপুল অভিশাপ। সত্যজিৎ রায় অপূর্ব চমৎকারীত্বেই এই চিত্র-কাহিনীকে উপস্থিত করেছেন, স্থানবিশেষ শ্লেষের কষাঘাতে—কখনও বা ব্যঙ্গভরে আবার কখনও বা অকৃত্রিম সত্যপ্রকাশের সরলতাগুণে। মনীষার চরিত্র বিশ্লেষণে তিনি প্রতীক ব্যবহার করেছেন যেমন করেছে অনিমা ও শঙ্করের ক্ষেত্রে। প্রতীকগুলি বুঝে নিতে কষ্ট হয়নি কেবলমাত্র তাঁর উপস্থাপনার গুণে। আর একটি চরিত্র তাঁর সার্থক সৃষ্টি সেটি হচ্ছে এক ভুটিয়া বালক ভিক্ষুকের চরিত্র। বালকটির মুখে এক গোর্খা লোক সংগীতের ব্যবহার নিঃসন্দেহে নাটকীয় পরিবেশ রচনায় সহায়তা করেছে। এ চিত্রের আবহ সংগীতের ব্যবহার কাহিনীকে প্রাণবন্ত করেছে।

অভিনয় উৎকর্ষতা 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' চিত্রের এক মূল্যবান সম্পদ। প্রথমেই হৃদয়গ্রাহ্য করে তোলেন ছবি বিশ্বাস তাঁর চরিত্র রায়বাহাদুর ইন্দ্রনাথের ভূমিকায়। অধুনা লোকান্তরিত ছবি বিশ্বাস মহাশয় তাঁর অভিনয় প্রতিভার অম্লান স্বাক্ষর রেখে যেতে সক্ষম হয়েছেন এ চিত্রে। অশোকের চরিত্রে অরুণ মুখোপাধ্যায় জনৈক নবাগত। তাঁর স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল অভিনয়ে অশোকের চরিত্রটি চমৎকার রকম বিশ্বাসযোগ্য হয়ে দেখা দিয়েছে। পারদর্শিতা দেখিয়েছেন নবাগতা নায়িকা অলকানন্দা মুখোপাধ্যায় তাঁর অভিনীত মনীষার চরিত্রে। স্বপ্নভাবিণী অনুভূতি প্রবণ এবং ভাবুকতা মনীষা চরিত্রে

তার অভিনয় আকর্ষণ করে সংবেদনশীল। সুব্রত সেন শক্তিমূলক ভূমিকায় যথার্থ পরিমিতিতে অভিনয় করেছেন। অনুভা গুপ্তা চরিত্রানুগ হলেও ক্ষেত্র বিশেষে মনে দাগ কাটতে সক্ষম হয়েছেন। আপনভোলা জগদীশ চরিত্রে পাহাড়ী সান্যালের অভিনয় চরিত্রানুগ। মন আকর্ষণ করেছেন বিশ্বনাথন। দাবদীল ভঙ্গীমায় তিনি প্রবলের চরিত্র চিত্রন করেছেন আগাগোড়া। অনিল চট্টোপাধ্যায় ক্ষণেকের জন্য হলেও প্রগলভ ধনী সন্তানের চরিত্রে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। করুণা ও হরিধন বন্দোপাধ্যায় এর অভিনয় প্রয়াস চমৎকার।

চিত্রগ্রহণ 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' চিত্রে আশাতীত রকম সফলতামণ্ডিত। মনোরম পার্বত্য শহরের পটভূমিকায় উদ্যান রংএ গৃহিত ফটোগ্রাফী কাহিনীর মেজাজ অনুযায়ী পরিবেশন করেছেন সুব্রত মিত্র। শব্দগ্রহণ সম্বন্ধে আর একটু সতর্ক হওয়ার প্রয়োজনীয়তা ছিল। এ ছাড়া অন্যান্য কলা কৌশল বিভাগের কাজ প্রশংসনীয়।

একান্ত নিজস্ব প্রয়োগ রীতিতে এবং গতানুগতিক পদ্ধতির উর্ধ্বে চিত্রায়িত কাঞ্চনজঙ্ঘা চিত্রটি সত্যজিৎ রায়ের এক বলিষ্ঠ চলচ্চিত্রায়ন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিত্রগুলির মধ্যে অন্যতম এই চিত্রটি বিদেশের দুর্বিবেচনে বিপুল আলোড়ন তুলতে সক্ষম হবে বলে আমার ধারণা।"

চিত্রের পরিক্রমা—

'অযাত্রার তারা'র সাফল্যের পর পরিচালক পিনাকী মুখোপাধ্যায় তার পরবর্তী চিত্র 'সাক্ষী' চিত্রের কাজে বিশেষ ব্যস্ত আছেন। সম্প্রতি চিত্রটির নাম পরিবর্তনের এক ঘোষণা প্রচারিত হয়েছে প্রযোজক এম. কে. জী প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে। বর্তমানে চিত্রটির নামকরণ করা হয়েছে "রক্তপলাশ"। মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সুরারোপে 'রক্তপলাশের' কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিওর ফ্লোরে। অনিল চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, ছায়া দেবী, কমল মিত্র, দীপক মুখোপাধ্যায়, ও নবাগত শিশু শিল্পী বাসুদেব এ চিত্রের বিভিন্ন চরিত্রগুলি রূপায়িত করছেন পদ্মাশ্যাত নায়ক নিরঞ্জন রায়ের সাথে। চিত্রের সম্পাদনা আলোক-গ্রহণে রয়েছেন যথাক্রমে রবিন দাস ও অনিল গুপ্ত।

* *

ঘনশ্যাম দাস বনকুলওয়ালা লিখিত 'সুবর্ণরেখা' চিত্রটি পরিচালনা করছেন খ্যাতনামা পরিচালক ঋত্বিক ঘটক স্বরচিত চিত্রনাট্যে। গতানুগতিকতার উর্ধ্বে স্বতন্ত্রধরণের বক্তব্যে উপস্থাপিত চিত্রটি বারো আনাই বহির্দৃশ্যে গৃহিত। বর্তমানে ডাবিং প্রথায় শব্দ গ্রহণ করা হচ্ছে চিত্রটির ইণ্ডিয়া ফিল্ম লেবরেটরীতে। 'সুবর্ণরেখার' বিভিন্ন চরিত্রগুলি রূপদান করছেন বাংলা ও বোম্বের লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পী অজিত ভট্টাচার্য, মাধবী মুখোপাধ্যায়, জহর রায়, বিজন ভট্টাচার্য, গীতা দে, উমানাথ ভট্টাচার্য। সংগীত পরিচালনা করছেন বাবাহাদুর খাঁ। ইনি ব্যক্তিগত জীবনে আলী আকবর খাঁ সাহেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। সম্পাদনা করছেন শ্রীরমেশ যোশী।

*

সলিল দত্ত ছিলেন অগ্রদূত গোষ্ঠীভুক্ত। সম্প্রতি তিনি গোষ্ঠীর আওতার বাইরে এসে নিজের ছবি সুরু করেছেন "সূর্যশিখা" কাহিনী অবলম্বনে। দ্রুত বেগে সুটিং হচ্ছে টেকনিশিয়ান ষ্টুডিওতে। নায়ক নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করছেন বাংলা দেশের দুই জনপ্রিয় শিল্পী—উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া চৌধুরী। সংগীত পরিচালনা করছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়।

* *

পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় স্বরচিত চিত্রনাট্যে বনফুলের কাহিনী অবলম্বনে 'বর্ণচোরা' চিত্রের কাজ প্রায় শেষের দিকে এনে ফেলেছেন। এর প্রধান ভূমিকা দুটিতে অভিনয় করছেন অনিল চট্টোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা রায়। অন্যান্য চরিত্রে ভানু বন্দোপাধ্যায়, গঙ্গাপদ বসু, রাজলক্ষ্মী দেবী প্রমুখেরা অভিনয় করছেন।

* বাংলাদেশে সত্যজিৎ রায়ের ছবির এক বিশেষ মূল্য আছে। সেই কারণে ছবিটির আলোচনা অনেক বিলম্বে হলেও প্রকাশিত হলো।

। রঙ্গমঞ্চ

'পরিচালক তপন সিংহ সদ্যসমাপ্ত 'পুরী' গিয়েছিলেন তাঁর পরবর্তী চিত্র সমরেশ বসুর গল্প অবলম্বনে নাট্যায়িত "নির্জন সৈকতে"র লোকেশান স্থির করতে। সম্প্রতি তিনি কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেছেন। অনিল চট্টোপাধ্যায় 'নির্জন সৈকতে' চিত্রের প্রধান ভূমিকায় চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন বলে জানা গেল :

•

'অগ্নিশিখা' চিত্রের পর রাজেন তরফদার পরবর্তী চিত্র সম্পর্কে কোন ঘোষণা করেননি। তবে যতদূর শোনা যাচ্ছে তিনি সম্ভবতঃ প্রযোজক শ্রীঅমর দত্তের 'চৌধুরী বাড়ী' গল্পটি চিত্রায়িত করার উদ্যোগ নিচ্ছেন। 'অগ্নিশিখা' চিত্রটি দর্শক মহলে আশানুরূপ সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়নি তাই তাঁর পরবর্তী চিত্র সম্পর্কে আমাদের প্রগাঢ় কৌতূহল রয়ে গেছে।

• •

পরিচালক জীবন গাঙ্গুলী বর্তমানে সমরেশ বসু লিখিত 'দুইনারী' চিত্রটির শুটিং করছেন স্টুডিও দাশগাই কোপারেটিভে। সুপ্রিয়া চৌধুরী ও কাজল গুপ্ত যথাক্রমে একে একে দুই নারী। প্রধান পুরুষ হলেন নির্মল কুমার। বিকাশ রায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু নামজাদা শিল্পী সমৃদ্ধ এ চিত্রের সংগীত পরিচালনা করছেন প্রখ্যাতনামা আধুনিক ও রবীন্দ্রসংগীত গায়ক হিমেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। সম্পাদনা ও আলোক-চিত্র গ্রাহক হিসাবে রয়েছেন যথাক্রমে কমল গাঙ্গুলী ও দীনেন গুপ্ত।

•

শ্রীসুধীর মুখার্জী' মহাশয়ের যোগ্য প্রধান সহকারী শ্রীবিনু বর্মন আজ স্বতন্ত্র ভাবে পরিচালনা করছেন "এক টুকরো আগুন" চিত্রটি। ভূমিকালিপিতে রয়েছেন বিশ্বজিৎ, ভানু বর্মণ, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুভা গুপ্তা, ছবি রায় প্রভৃতি প্রখ্যাতনামা শিল্পীগণ। সংগীত পরিচালনা করছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

• •

পরিচালক কনক মুখোপাধ্যায় তাঁর শিবানী ফিল্মসের দ্বিতীয় নিবেদন "মায়ার সংসার" চিত্রের কাজ সম্পূর্ণ করে পরবর্তী চিত্রের জন্য কাহিনী নির্বাচনে ব্যস্ত আছেন। 'মায়ার সংসার' চিত্রে বিভিন্ন ভূমিকায় বাংলা দেশের প্রখ্যাতনামা শিল্পী সন্ধ্যারাণী, বিশ্বজিৎ, সুলতা, অসিতবরণ, বিকাশ, দীপ্তি রায়, শ্রীবিনি বিশ্বাস, কমল মিত্র, তরুণ কুমার ও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় অংশ গ্রহণ করেছেন। দীর্ঘদিন অনুপস্থিতির পর সুপরিচিতা শিশু শিল্পী শিখাদাস বর্তমানে সুদর্শনা তরুণী 'মায়ার সংসার' চিত্রে একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। সম্পাদনা, চিত্র গ্রহণ ও সংগীত পরিচালনা করেছেন যথাক্রমে অমিয় মুখোপাধ্যায়, হেমন্তকুমার ও রবীন চট্টোপাধ্যায়।

•

সত্যজিৎ রায়ের আগামীকাল অপুর সংসার ও দেবী খ্যাতনামা শর্মিলা ঠাকুর কে পুনরায় দেখতে পাওয়া যাবে পরিচালক হরিদাস ভট্টাচার্যের 'শেষ অঙ্ক' চিত্রে।

রহস্যমূলক এই সম্বাদ চিত্রে শর্মিলা ঠাকুরের সাথে অভিনয়ে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। এই চিত্রে বিকাশ রায়, কমল মিত্র, উৎপল দত্ত প্রমুখ বিশিষ্ট শিল্পীগণ অংশ নিয়েছেন। বর্তমানে এন, টি স্টুডিও নং এক ফ্লোরে শেষ অঙ্ক চিত্রের শুটিং চলেছে পূর্ণবেগে।

• •

'প্রবেশ নিষেধ' খ্যাত পরিচালক বর্তমানে 'পলাশের রঙ্গ' চিত্রের শেষ পর্যায়ের শুটিং ও সম্পাদনা করছেন। ইতিমধ্যে খবর পাওয়া গেল তিনি তাঁর পরবর্তী চিত্র 'সিঁদুরে মেঘ' এ নায়কের ভূমিকায় অশোককুমার কে চুক্তিবদ্ধ করবার অভিপ্রায় নিয়ে শীঘ্রই বোম্বের পথে যাত্রা করবেন। তাঁর বর্তমান চিত্রে "পলাশের রঙ্গ" চিত্রে বিভিন্ন ভূমিকায় মঞ্জু দে, অসীমকুমার, মঞ্জুলা সরকার প্রভৃতিকে দেখতে পাওয়া যাবে।

• •

দীর্ঘদিন বাদে মৃণাল সেন 'খবর' হয়েছেন। সম্প্রতি তিনি তাঁর প্রতিশ্রুত ছবির কাজ সুরু করেছেন টেকনিশিয়ান স্টুডিও ফ্লোরে। কালী বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকায় এই ছবির শুটিং দ্রুত এগিয়ে চলেছে। মৃণাল সেনের বর্তমান ছবি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য আগামী সংখ্যাতে জানাবো আপনাদের।

• •

পরিচালক সুধীর মুখার্জী তাঁর ছবি "দাদাঠাকুর" চিত্রের শেষ পর্যায়ের সম্পাদনায় ব্যস্ত। আধুনা লোকান্তরিত জনপ্রিয় শিল্পী শ্রীছবি বিশ্বাস এই চিত্রের নাম ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেছেন। বলতে গেলে ছবি বিশ্বাস মহাশয়ের এই শেষ পূর্ণদৈর্ঘ্যের ছবি। পার্শ্ববর্তী ভূমিকাগুলিতে তরুণ কুমার ও সুলতা চৌধুরী অংশ গ্রহণ করেছেন। বহু নবাগতাকে 'দাদাঠাকুর' চিত্রে দেখতে পাওয়া যাবে প্রতিশ্রুতি শিল্পীদের পাশাপাশি। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এই চিত্রের সংগীত পরিচালক ও বিভূতি ঘোষ আলোকচিত্র গ্রাহক।

• • •

বাংলার জনপ্রিয় শিল্পীরা এখন অনেকেই বোম্বের হিন্দি চিত্রে অভিনয়ে চুক্তিবদ্ধ। সুপ্রিয়া চৌধুরী কিশোর কুমার পরিচালিত "দূর গগন কা ছাও মে" ছাড়া আর দু'টি নতুন হিন্দি চিত্রে স্বাক্ষর করেছেন তার মধ্যে অন্যতম পরিচালক হৃষিকেশ মহেশ কাউল। বিশ্বজিৎ সংগীত পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায় প্রযোজিত চিত্র "বিশ সাল বাদ"-এ সাফল্যের পর এখন বহু হিন্দি চিত্রে নায়কের ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য আমন্ত্রণ পাচ্ছেন। সন্ধ্যা রায় অভিনয় করছেন হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়ের ছবিতে তিনিও বহু নতুন হিন্দি চিত্রে অভিনয়ে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন।

কমল মজুমদার পরিচালিত "অভিসারিকা" চিত্রের একটি দৃশ্যে সুপ্রিয়া, ভারতী, অনিলচন্দ্র ও নির্মলকুমার।

লোকান্তরে শ্রীছবি বিশ্বাস

বিগত ১১ই জুন সিঙ্গাপুর হইতে এক মর্মান্তিক সংবাদ এ দেশে টেলিফোনযোগে 'ছবি বিশ্বাস' এক মোটর দুর্ঘটনায় শোচনীয়ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। নিউ থিয়েটার্স একদল স্টুডিওতে শুটিং

চলাকালীন এই দুঃসংবাদ এসেছিল। খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গে দুটি যন্ত্র হয়ে গেল। উপস্থিত অভিনেতৃগণ ও কলাকুশলীরা ছুটলেন টেলিফোন বুথগুলোর উদ্দেশ্যে—আর, জি, কর হাসপাতালের লাইন অনেকক্ষণ থেকে 'ব্যাম্ড', টেলিফোন ভবন খবর সরবরাহ করলেন 'ছবিবাবু মৃত, সঙ্গের অন্যান্য আরোহীগণ সকলেই' অল্প-বিস্তর আহত, স্ত্রী ও নাতনী জয়ন্ত সংজ্ঞাহীন অবস্থায় হাসপাতালে স্থানান্তরিত হয়েছেন তাঁদের অবস্থাও সংকটজনক।' খবরটি রটনা হবার সাথে স্টুডিও পাড়ায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এলো। উত্তমকুমার ছল ছল চোখে বেক আপ তুলতে তুলতে দৌড়ালেন আর, জি, করের উদ্দেশ্যে। অনুপ গাঙ্গুলী, বিকাশ রায়, কমল মিত্র প্রমুখ ছবিবাবুর দীর্ঘদিনের সহযোগিরা যে যেমন ভাবে পারলেন একমুহূর্ত সময়ের অপচয় না করে ছুটলেন শেষবারের মত তাদের প্রিয় 'ছবি কে' দেখতে, অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করতে। উপস্থিত কলাকুশলী ও অন্যান্য অভিনেতাদের মুখে ভাষা ছিল না এই মর্মান্তিক খবরের জন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না আকস্মিকতায় সকলেই স্তম্ভিত ও শোকাভিভূত।

পিনাকী মুখোপাধ্যায় পরিচালিত "রক পলাশ" চিত্রের রোমান্টিক অবসরে সন্ধ্যা রায় ও অনিল চ্যাটার্জী।

আশ্চর্য ব্যাপার মৃত্যুর সময় ছবি বিশ্বাস দৈহিকভাবে সুস্থ ছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে তাঁর নানা প্রকার শারীরিক অসুস্থতা চলছিল, প্রবল হাঁফানীতে কষ্ট পাচ্ছিলেন এ নিয়ে সকলের দুশ্চিন্তা ছিল। কিছুদিন আগে দাঁঠাকুরের আউটডোর সুটিং উপলক্ষে 'দীঘা'য় গিয়ে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। কাজ বন্ধ করে সকলে শঙ্কিত ভাবে তাঁকে নিয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন। সে যাত্রা আবার সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং পুনরায় স্বাভাবিক কাজ কর্ম সুরু করে দেন। মৃত্যুর দিন তিনি যাচ্ছিলেন পৈত্রিক ভিটা বারাসাতের কাছে 'ছোট জাগুলিয়া' গ্রামে। সাথে ছিলেন স্ত্রী ও আদরের নাতী জয়ন্ত। অসুস্থ হয়ে পড়ার পর থেকেই তিনি নিজে মোটর চালনা বন্ধ করে ছিলেন স্ত্রী ও বন্ধু বান্ধবদের আপত্তিতে। সেদিন হঠাৎ খেয়াল চাপলো নিজেই গাড়ী ড্রাইভ করবেন। ড্রাইভারকে পাশে বসিয়ে নিজে বসলেন স্টিয়ারিং হুইল নিয়ে—সুস্থ শরীর ও মানসিক প্রসন্নতা নিয়ে সস্ত্রীক যাত্রা করেছিলেন বাল্যকালের স্মৃতিবিজড়িত পিতৃভিটার উদ্দেশ্যে কিন্তু এ যাত্রাই যে তাঁর জীবনের শেষযাত্রা কে জানতো।

শ্রীছবি বিশ্বাস মহাশয়ের জন্ম হয় ১৯০০ সালের ১৩ই জুলাই। পিতার নাম ভূপতি নাথ বিশ্বাস। চার ভাইয়ের মধ্যে ছবি ছিলেন কনিষ্ঠতম। তাঁর আসল নাম ছিল শচীন্দ্রনাথ দে বিশ্বাস, কিন্তু বন্ধু মহলে তিনি ছবি নামে সুপরিচিত ছিলেন। আদরে যা আদর করে রেখেছিলেন নামটি পরে কর্মজগতেও তিনি এই নামে পরিচিত হয়ে যান। জন্মের মাত্র দশমাস পরে তিনি মাকে হারান এবং জেঠাইমার অপরিসীম স্নেহে লালিত পালিত হন।

তাঁর শিক্ষা সুরু হয় কলকাতার নবীন চন্দ্র দত্ত স্ট্রীটের এক কিণ্ডার গার্ডেন স্কুলে। সেখান থেকে

কুমিল্লার বঙ্গ সেনের মেস্টাল কলিজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন। হিন্দু স্কুলে পঞ্চম শ্রেণী থেকে তাঁর বিদ্যাভ্যাস শুরু হয়ে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করেন। এরপর প্রেসিডেন্সি কলেজে। সেখান থেকে কয়েকজন সহপাঠিকের সাথে একত্র পড়াশুনার বাসনায় ভর্তি হন বিদ্যাসাগর কলেজে।

পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে আবৃত্তি ও গান বাজনার দিকে তাঁর ঝোঁক ছিল বাল্যকাল থেকে। গলা দুলাল হলেও অভিনয়বোধ তাঁর কোন কালেও ছিল না। এজন্য বন্ধুমহলে তিনি বরাবরই জনপ্রিয় ছিলেন। কলেজে ভর্তি হবার পর তিনি ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের সংস্পর্শে আসেন এবং সেখানে দ্বিজেন্দ্রলাল, শিশির কুমার ভাদুড়ী ও নরেশ মিত্র মহাশয়ের সঙ্গে পরিচিত হন। ধীরে ধীরে তিনি বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠীর সাথে জড়িত হতে থাকেন এই সময়। স্বর্গতঃ রমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের কবিকঙ্কণ নাট্য সমাজ, ছাওড়া নাট্য সমাজ, বাহুব সমাজ প্রভৃতি তৎকালিন প্রখ্যাতনামা দলগুলিতে তিনি নিয়মিত অভিনয়ের তালিম নিতে থাকেন। সে সময়ে তাঁর অভিনয় উৎকর্ষতার জন্য তিনি বহুস্থানে অভিনন্দন লাভ করেন।

১৯২০ সাল থেকে তাঁদের পারিবারিক অবস্থা খারাপের দিকে যেতে শুরু করে এবং ১৯২০ সালে পিতার মৃত্যুর পর অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। এই আর্থিক দুর্যোগের মধ্যে ১৯২৯ সালে তাঁর বিবাহ হয়। এই সময়টা তিনি তার পৈত্রিক ভিটে বাহাদুরাত মহকুমার 'ছোট জাগুলিয়া' গ্রামে কিছুদিনের জন্য অবস্থান করেন।

চিত্রে অভিনয়ের প্রথম অনুরোধ আসে শ্রীপ্রিয় নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের তরফ থেকে 'বিদ্রোহী' চিত্রের জন্য। বিভিন্ন কারণে সে চিত্রে তাঁর পক্ষে অভিনয় করা সম্ভব হয়নি বটে। এরপরই তিনি এস্ত কোম্পানীর চিত্র "অন্নপূর্ণার মন্দির" চিত্রে তিনি অংশ গ্রহন করেন। এই তাঁর সর্বপ্রথম চিত্রাবতরণ। নাটমঞ্চে যোগদান করেন 'সমাজ' নাটকে দ্বিতীয় নাটক 'মিরকাসেম'। চিত্রাভিনয়ের পরিমানে তাঁর প্রাথমিক যুগের চিত্র যথাক্রমে "অন্নপূর্ণার মন্দির" (১৯৩৬), 'চাষার নিধি' (১৯৩৭), 'চোখের বালি' (১৯৩৮), চাণক্য লমি'ষ্ঠা (১৯৩৯) 'নিমাই সন্ন্যাস' ও 'সমাধি' (১৯৪০), 'এপার ওপার' 'কর্ণার্জুন' 'নর্তকী' 'প্রতিশোধ' 'বাংলার মেয়ে' (১৯৪১) এবং এ পর্যন্ত, মৃত্যু কাল অবধি তাঁর অভিনীত চিত্রের সংখ্যা আড়াই শতেরও বেশী। সম্প্রতি মুক্তি প্রাপ্ত চিত্রের তালিকায় রয়েছে 'অগ্নিশিখা' 'অতলজলের আহ্বান' 'বধূ' প্রভৃতি মুক্তি অপেক্ষায় রয়েছে 'দাঁঠাকুর' 'একটুকরো আগুন' 'হাইহীল' 'উত্তরায়ন' ও আরও বহুচিত্র।

ছবি বিশ্বাস তাঁর অভিনয় প্রতিভার স্বীকৃতি হিসাবে ১৯৫৯ সালে কেন্দ্রীয় সঙ্গীত নাটক একাডেমী কর্তৃক সম্মানিত হন ও রাষ্ট্রপতি পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৫৮ সালে বার্লিন ফেস্টিভালে তার অভিনীত 'কাবুলীওয়ালা' চিত্রটি পুরস্কার লাভ করে। ১৯৬১ সালে ভারতীয় চলচ্চিত্র ডেলিগেশানের সভাপতি হিসাবে তিনি জাকার্তা (ইন্দোনেশিয়া) চলচ্চিত্র গিয়েছিলেন। ষ্টুডিও কলাকুশলী মহলে তিনি অসাধারণ জনপ্রিয় ছিলেন দুঃস্থ কলাকুশলীদের সাহায্যার্থে তার সহযোগিতা স্মরণীয়। বিগত ইন্দপুরী ষ্টুডিও শ্রমিকদের ধর্মঘটের সময় তিনি তাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন এবং এই শ্রমিকদের সাহায্যার্থে আয়োজিত এক প্রদর্শনী ক্রিকেট ফেস্টিভালে তিনি সক্রিয় সহযোগিতা দান করেন।

মৃত্যুকালে এই অমর চিত্র শিল্পী স্ত্রী, দুই পুত্র, পুত্র বধূ, এক কন্যা ও পৌত্র রেখে গেছেন।

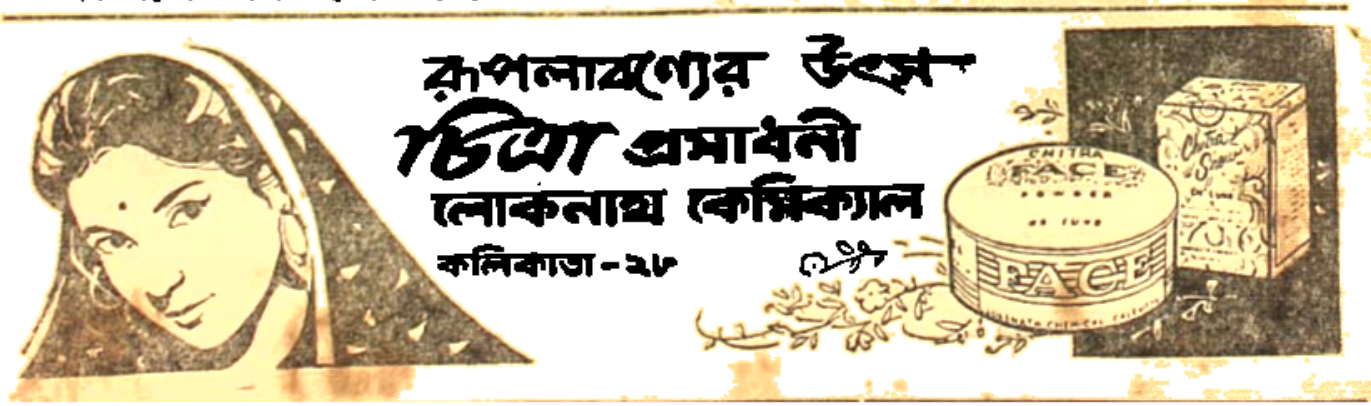

বিংশ শতাব্দী

শ্রাবণ ১৮৮৪ শকাব্দ ১৩৬৯

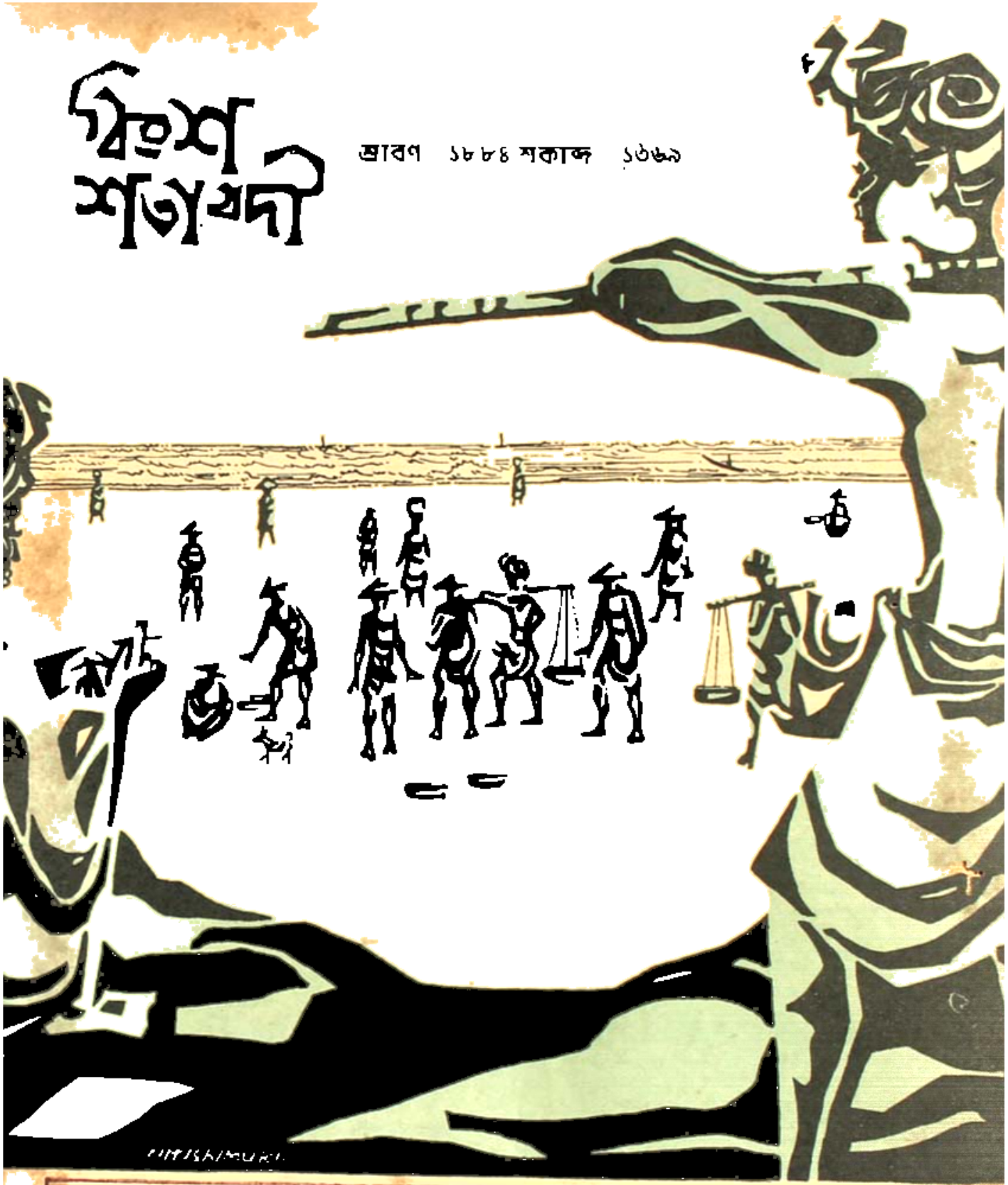

ফোন ২২-২২২৫
৮-এ
ন্যাশনাল বাজার স্ট্রীট
রেটিনা

সূচীপত্র

বিংশ শতাব্দী
সপ্তম বর্ষ : ২৪ সংখ্যা
শ্রাবণ ১৮৮৪

লেখক		বিষয়
সম্পাদকীয়	১১৩	আমাদের কথা
এ. গারবন্ধি	১১৪	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (আত্মকথা)
	১১৬	বিশ্ব-নিরস্ত্রীকরণ কংগ্রেসের ঘোষণা পত্র (প্রবন্ধ)
অশোক মুখোপাধ্যায়	১১৮	উইলিয়ম ফকনার (বিশ্ব-সাহিত্য)
জগদীশ ভট্টাচার্য	১২১	বালগোপালের ব্রজধামে (প্রবন্ধ)
দিলীপ দত্ত	১২৭	রোদ্দুরের স্বাদ (গল্প)
	১৫৩	নতুন বই (পুস্তক সমালোচনা)
অমল হালদার	১৩৪	বিবাহ বিচ্ছেদ (প্রবন্ধ)
মণি গঙ্গোপাধ্যায়	১৩৭	এই মাটির মানুষ (জীবনী)
জীবন ভৌমিক	১৪৫	জল সাপ (গল্প)
গোবিন্দ চক্রবর্তী	১৪৯	ভেতরে বাইরে (কবিতা)
পরেশ মণ্ডল	১৪৯	শুধানে গোলাপ লাল (কবিতা)
মধু গোস্বামী	১৪৯	হে স্বদেশ (কবিতা)
দিলীপকুমার মিত্র	১৫০	জার্মাণ শান্তি চুক্তি ও পৃথিবীর ভবিষ্যৎ (প্রবন্ধ)
ব্রজেন সাহা	১৫৫	পদধ্বনি (উপন্যাস)
ডঃ রঘুবীর	১৮৬	সর্বভারতীয় ভাষা সম্মেলন (প্রবন্ধ)
অমিয়াংশু বিশ্বাস	১৮৮	অমর নাথের তুষার ক্ষেত্রে (ভ্রমণ)
রঞ্জন মজুমদার	১৯৫	রঙ্গজগৎ
প্রবোধ সেনগুপ্ত	২০৩	ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জী (সংকলন)

অঙ্গসজ্জা
নীতিশ মুখোপাধ্যায়

বিপুলায়তন শারদীয়

কথামালা

মহালয়ার পূর্বেই প্রকাশিত হবে।

এই সংখ্যায় সম্পূর্ণ উপন্যাস লিখবেন

সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

একটি সম্পূর্ণ গোয়েন্দা উপন্যাস লিখবেন

দিলীপকুমার মিত্র

এ ছাড়া নানা ধরণের অজস্র গল্প ও বিচিত্র রচনা

আজই অর্ডার দিন।

দাম—দুই টাকা।

কথামালা ঃ ২০, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৫ ফোন : ৫৫-৪৪২৫

এই সকল পরস্পর-বিরোধী গুণের একত্র সমন্বয়ে প্রস্তুত

নিবে কালি শুকায় না;
কিন্তু কাগজে দ্রুত শুকায়।

রঙের যথেষ্ট গভীরতা, তবু
অবাধে লেখা এগিয়ে চলে।

লেখা ধুয়ে-মুছে যায় না;
অথচ কলম পরিষ্কার রাখে।

সুলেখা কালি

• • • অন্য কোন কারণে না হ'লেও অন্ততঃ এই কারণেই
সুলেখা আজ সর্বোচ্চ বিক্রয়ের গৌরব অর্জন করেছে • • •

সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ কলিকাতা • দিল্লী • বোম্বে • মাদ্রাজ

প্রবন্ধ পত্রিকা

আষাঢ় সংখ্যা এখনও পাওয়া যাচ্ছে

সূচীপত্র

নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত : নীহার শ্রদ্ধাঞ্জলি
কালীকুমার দত্তশাস্ত্রী : কঙ্কালী-কথা
ক্ষেত্র গুপ্ত : নাটকার মহেন্দ্রলাল
সুনীল জানা ও তপন : পূর্ববঙ্গ-গীতিকা
দিলীপ মুস্তাফি : চেখভ ও রবীন্দ্রনাথ
অমলেন্দু ঘোষ : রামকমল সেনের অভিধান
বাণীকুমারী চক্রবর্তী : বাংলা প্রণয় গাথা-কাব্য
সাধীর করণ : ভাষা-উপভাষা প্রসঙ্গ
রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত : সাম্প্রতিক গল্প

দাম : প্রতিসংখ্যা এক টাকা
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা বারো টাকা

প্রবন্ধ পত্রিকা

শ্রাবণ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে

সূচীপত্র

রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত : দামিনী ও রবীন্দ্রনাথ
দেবব্রত চক্রবর্তী : ভাষণ, সাহিত্য—অনুকৃতি
সুধীর করণ : রাঢ় দীমান্তের উপভাষা
মৃণালকান্তি ভদ্র : জীবনানন্দ দাশ : অভিব্যক্তি ও উত্তরণ
বাণীকুমারী চক্রবর্তী : বাংলা প্রণয়-গাথা-কাব্য
বাণীক রায় : আধুনিক নাটকার

দাম : প্রতিসংখ্যা এক টাকা
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা : বার টাকা

প্রবন্ধ পত্রিকা

শারদীয় সংখ্যা মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে।

সম্ভাব্য লেখক সূচী

দীনেশচন্দ্র সেন, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, নীরেন্দ্রনাথ রায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ মিত্র, রথীন্দ্রনাথ রায়, দেবীপদ ভট্টাচার্য, আদিত্য ওহদেদার, ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, নরহরি কবিরাজ, ধরণী সেন, শঙ্খ ঘোষ রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত, ভাস্কর বসু মৃণালকান্তি ভদ্র, অশোক মুস্তাফি, দিলীপ মালাকার প্রভৃতি।

দাম দুই টাকা

আজই অর্ডার দিন

প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ ২৭, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৫ ফোন : ৫৫-৪৪২৫

বিংশ শতাব্দী গ্রাহকদের জন্য

একটি জরুরী ঘোষণা

প্রতি সংখ্যা 'বিংশ শতাব্দী'র মূল্য ৭৫ নয়া পয়সা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা **নয় টাকা (সডাক)** ষান্মাসিক **সাড়ে চার টাকা (সডাক)**। প্রতি সংখ্যা 'বিংশ শতাব্দী' আনুমানিক পৃষ্ঠা সংখ্যা একশ আঠাশ। এছাড়া শারদীয় সংখ্যা ও অন্যান্য বিশেষ সংখ্যাগুলি আরতন যথেষ্ট বর্ধিত হয়ে থাকে। শুধু আরতনেই নয়, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, চিত্র সর্বদিকেই এই পত্রিকার মান যথেষ্ট উন্নত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া পাঠক ও গ্রাহকবর্গের সুবিধার জন্য আমরা একটা বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। বিংশ শতাব্দীর **যাঁরা বার্ষিক গ্রাহক** কেবল তাঁরাই **অতিরিক্ত মূল্য ছাড়া শারদীয় সংখ্যা** সমেত অন্যান্য বিশেষ সংখ্যাগুলি পাবার অধিকারী। আমরা যে নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করছি সেই অনুসারে **আগামী মহালয়ার মধ্যে যাঁরা বিংশ শতাব্দীর গ্রাহক হবার জন্য মাত্র পাঁচ টাকা পাঠাবেন তাঁদের ষান্মাসিক গ্রাহক হিসাবে গণ্য করা হবে** এবং কোন অতিরিক্ত মূল্য ছাড়া শারদীয় সংখ্যা সমেত ছয় মাসের পত্রিকা পাঠান হবে। শারদীয় সংখ্যার রেজেস্ট্রি খরচ এর মধ্যে ধরা হয়নি **শারদীয় সংখ্যা যাঁরা ডাকে নেবেন শারদীয়া সংখ্যার রেজেস্ট্রি খরচ ৫০ নঃপঃ এই সঙ্গে তাঁদের পাঠাতে হবে।** যাঁরা শারদীয় সংখ্যা **হাতে নেবেন** তাঁরা **পাঁচ টাকা পাঠাবেন।**

কেবল মহালয়ার মধ্যে যাঁরা গ্রাহক হবেন তাঁদেরই এই সুবিধা দেওয়া হবে। কারণ ষান্মাসিক গ্রাহকরা বর্ধিত মূল্য ছাড়া শারদীয় সংখ্যা পাবার অধিকারী নন। মহালয়ার মধ্যে যাঁরা গ্রাহক হবেন তাঁরা পাঁচটি সাধারণ সংখ্যা, যার দাম ৩'৭৫ নয়া পয়সা এবং **প্রায় পাঁচ শত পৃষ্ঠার শারদীয়** সংখ্যার মূল্য ৩'৫০ নয়া পয়সা—একত্রে ৭'২৫ নয়া পয়সার পত্রিকা **পাঁচ টাকায় পাবেন।** রেজেস্ট্রিযোগে শারদীয়া সংখ্যা পেতে হলে একত্রে **সাড়ে পাঁচ টাকা** পাঠাতে হবে। **যাঁরা বার্ষিক গ্রাহক হবেন তাঁরা ৯৲ টাকা এবং রেজিষ্ট্রি খরচ ৫০ নঃপঃ পাঠাবেন।**

আষাঢ় মাসে 'বিংশ শতাব্দী'র বর্ষ সুরু। ঐ সময় থেকে গ্রাহক হওয়া সুবিধাজনক। কিন্তু গ্রাহকেরা বছরের যে কোন সময় থেকে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হতে পারেন। মণি অর্ডার, চেক বা ক্রস পোস্টাল অর্ডারে চাঁদা পাঠাতে পারেন। চাঁদা পাঠানোর সময় পরিষ্কার হরফে নাম ও ঠিকানা এবং কোন মাস থেকে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হতে চান তার স্পষ্ট উল্লেখ থাকা দরকার

॥ অবিলম্বে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হোন ॥

নিবেদক—

প্রচার সচিব।

টাকা পাঠাবার ঠিকানা :—

বিংশ শতাব্দী

২০, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৫

ফোন—৫৫-৪৪২৫

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

বিংশ শতাব্দী

শ্রাবণ
১৮৮৪
সপ্তম বর্ষ
২য় সংখ্যা

"খবরের উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই"

আমাদের কথা

'বিংশ শতাব্দী'র উন্নয়নকল্পে আমরা পাঠকদের কাছ থেকে যে মতামত আহ্বান করেছিলাম তাতে অভাবিত সাড়া পাওয়া গিয়েছে। 'বিংশ শতাব্দী'র কাছ থেকে তাঁরা কী প্রত্যাশা করেন তা জানিয়ে প্রায় এক হাজার চিঠি তাঁরা লিখেছেন। স্বভাবতই বিভিন্ন পাঠকের মতামত বিভিন্ন। তবু তাদের মধ্যে কতকগুলি ব্যাপারে ঐক্য আছে। তাঁরা প্রায়ই সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন "বিংশ শতাব্দী" আর পাঁচটা পত্র-পত্রিকা থেকে স্বতন্ত্র ধরণের। তা সত্ত্বেও 'বিংশ শতাব্দী' তার নামের যোগ্য হয়ে উঠতে পারে নি। আধুনিক জীবন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্ত ধারা যথাযথ ভাবে "বিংশ শতাব্দী"র মধ্যে প্রতিফলিত হয়ে উঠতে পারে নি। আরও বহু বিচিত্র বিষয়ের সন্নিবেশ এর মধ্যে প্রয়োজন।

উপন্যাস সম্পর্কে তাঁদের অধিকাংশের মত হল :—খুব বেশী মাত্রায় ধারাবাহিক উপন্যাস না রাখা। প্রতি সংখ্যায় একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস প্রকাশের অনুরোধ বহু পাঠক জানিয়েছেন। গল্প বিভাগ সম্পর্কে তাঁদের অভিযোগ সর্বাধিক। তাঁদের মতে এটি হোল "বিংশ শতাব্দী"র দুর্বলতম বিভাগ।

আমরা পাঠকদের মতামতগুলির সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। আমরা এ রকম প্রার্থনা করি না যে "বিংশ শতাব্দী" ত্রুটি মুক্ত। তাঁদের এ অভিমত আমাদের যাত্রাপথের ঠিক নির্ণয়ে সাহায্য করবে বলে তাঁদের অসংখ্য ধন্যবাদ।

আধুনিক জীবন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্ত ধারা "বিংশ শতাব্দী"র মধ্যে প্রতিফলিত হতে পারছে না, এ আমাদের মর্মান্তিক উপলব্ধি। এ ব্যাপারে আমরা আমাদের সীমাবদ্ধ সামর্থ্য যতটুকু করতে পারতাম ছাপার কাগজের ওপর সরকারী নিয়ন্ত্রণের ফলে তা আমাদের জন্য সাধ্যাতীত। "বিংশ শতাব্দী"র স্বল্পপরিসর এ ব্যাপারে সব থেকে বড় অন্তরায়।

উপন্যাস সম্পর্কে পাঠকদের বক্তব্য আমরা মেনে নিয়েছি। প্রতি সংখ্যায় একটি করে সম্পূর্ণ উপন্যাস দেবার চেষ্টা আমাদের থাকবে। তা সত্ত্বেও এ কথা সত্য, সর্বক্ষেত্রেই একটি সংখ্যার স্বল্পপরিসরের মধ্যে উপন্যাসের স্থান সংকুলান হওয়া সম্ভব নয়। সে ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য রাখব উপন্যাসটি দীর্ঘ দিন ধরে প্রকাশ না করে প্রতি কিস্তিতে অনেকখানি করে দিয়ে দুটি বা তিনটি সংখ্যায় উপন্যাসটিকে শেষ করা। গল্প সম্পর্কে তাঁদের অভিযোগের প্রতিকার দুভাবে হতে পারে? প্রথমটি হল, খ্যাতনামা লেখকদের বাদ দেওয়া। অন্যটি হোল, তরুণ প্রতিভার সন্ধান। আমরা দ্বিতীয়টিরই বেশী পক্ষপাতী। আমরা আয়োজন করছি যাতে শীঘ্রই গল্প লেখক ও পাঠকদের সম্মিলিত বৈঠকের ব্যবস্থা হতে পারে। সেখানে যে কোন তরুণ লেখক ও উৎসাহী পাঠক উপস্থিত থাকতে পারবেন। সেই বৈঠকে গল্প পড়া হবে এবং পাঠকরাই লেখার উন্নতি সম্পর্কে মতামত দেবেন ও সেইখানেই রচনা মনোনয়ন করা হবে।

পাঠকদের প্রত্যেকটি অভিমত আমরা গভীর মনোযোগের সঙ্গে অনুধাবন করছি। বলা বাহুল্য এ ব্যাপারটি যথেষ্ট সময় সাপেক্ষ। আমরা আশা করি পূজা ও পূজা পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে তাঁদের নির্দেশ মেনে নেওয়ার প্রয়াস আমরা উপস্থিত করতে পারবো।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

এ. গারবভি

[অতি সম্প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়নে 'কালাপাহাড ও অন্যান্য গল্প' এই নামে তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের এই গল্প সংকলন রুষ ভাষায় অনূদিত হয়ে আত্ম-প্রকাশ করেছে। বই খানির সম্পাদনা করেছেন দানিলচুক। যারা বাংলা ও ইংরাজী থেকে তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের গল্পগুলির অনুবাদ করেছেন তাদের মধ্যে বাঙ্গালী কথাসাহিত্যিক ননী ভৌমিকও রয়েছেন। সংগ্রহটিতে নয়টি গল্প স্থান পেয়েছে। এগুলির মধ্যে রয়েছে. কালাপাহাড, ডাইনী, সন্যাতন, প্রতীক্ষা, অগ্রদানী প্রভৃতি তারাশঙ্করের উল্লেখযোগ্য গল্পগুলি।

আধুনিক যুগের আর কোন বাঙ্গালী লেখকের আর কোন গল্পগ্রন্থ রুষ ভাষায় অনূদিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। বইখানির প্রকাশ উপলক্ষে এ. গারবভি লেখক ও বইখানির পরিচিতি হিসাবে যে ভূমিকা লিখেছেন এখানে সেটির সম্পূর্ণ অনুবাদ প্রকাশ করা হল।

তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়কে রুষ সাহিত্যিক ও সমালোচকরা কোন দৃষ্টিতে দেখে থাকেন, বাঙ্গালী পাঠকরাও সে বিষয়ে জানতে আগ্রহী বলে আমাদের বিশ্বাস।— সম্পাদক।]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপনের জন্য এই বছর গ্রীষ্মকালে কলকাতায় একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বহু খ্যাতনামা লেখক, সমালোচক সাংবাদিক সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের জন্য কি কি আয়োজন করা হয়েছে, সভায় যখন তা বিশদভাবে বর্ণিত হচ্ছিল, উপস্থিত সকলেই গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনছিলেন। সমস্ত সভায় নৈঃশব্দ্য বিরাজ করছিল। যিনি বক্তা তিনি বলে চলেছিলেন, সোভিয়েত দেশে এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের কোন কোন বই অনূদিত হবে, কতগুলি প্রদর্শনী, বক্তৃতা ও ছায়াছবি সেখানে দেখানো হবে রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে।

এই বক্তার বক্তৃতা শেষে, সভাপতি আর একজনকে বলতে অনুরোধ করলেন। যিনি উঠলেন, সকলেই তাঁকে চিনতেন, ভদ্রলোক ধনী, প্রভাবশালী এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে বিরুদ্ধ মনোভাবাপন্ন—যদিও তিনি কখনও সে দেশে যান নি। রিপোর্টাররা কলম তুলে নিলেন – কারণ তাঁরা কুৎসার গন্ধ পেয়েছিলেন। ভদ্রলোক বলতে শুরু করলেন এবং সত্যই তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে নিন্দাবাদে মুখর হয়ে উঠলেন। তিনি সেই সব নিন্দার পুনরাবৃত্তি করে চললেন যা দেশে দেশে প্রতিক্রিয়াশীলরা সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে করে থাকে।

সভাতেই একস্থানে এক কৃশতনু কৃষ্ণবর্ণ ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। তিনি উঠে দাঁড়ালেন, চোখে মুখে প্রবল ব্যক্তিত্বের ছাপ। উঠে বললেন, আমি এই কথাগুলির একটিও বিশ্বাস করি না, এগুলি কুৎসা। আমি সোভিয়েত ইউনিয়নে ছিলাম, আমি তাদের জানি। আমি আমার সোভিয়েত সহকর্মীদের জানি এবং তাদের শ্রদ্ধা করি।

যিনি এই কথাগুলি বললেন, তাঁর কথার প্রতিবাদ করতে পারে সেখানে এমন কেউ ছিল না। ইনি সর্বজন শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমি এখানে এই ঘটনাটির উল্লেখ করছি এ কথা বোঝাবার জন্য নয় যে তারাশঙ্কর সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে কতখানি প্রীতি মনোভাবাপন্ন। এই ঘটনাটির উল্লেখ করলাম, কারণ আমার ধারণা এই সত্যনিষ্ঠাই তারাশঙ্করের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য—যা একমাত্র সৎ ও মহৎ শিল্পীদের মধ্যেই সম্ভব।

একথা সুবিদিত, সমকালীন ভারতীয় সাহিত্যগুলির মধ্যে বাংলা সাহিত্যের স্থান সর্বোন্নত, রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন। আর আধুনিক বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হলেন তারাশঙ্কর

বন্দ্যোপাধ্যায়। এইটুকুর পরেও আরও একটি কথা না বললে তারাশঙ্করকে ব্যাখ্যা করা যায় না তা হল তাঁর সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যই হল সহানুভূতি এবং সত্যনিষ্ঠা।

বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলের এক ক্ষুদ্র গ্রামে তারাশঙ্করের জন্ম। কিছু জমিও তাঁদের ছিল। তাঁর মা চাইতেন ছেলে ডাক্তার কিম্বা এ্যাডভোকেট হোক। কিন্তু তারাশঙ্কর তা হননি। অল্প বয়স থেকেই তিনি দেশ সেবায় নামলেন। ভারতবর্ষ সে সময়ে ইংরাজদের অধীন, সুতরাং ইংরাজদের অধীনতা পাশ থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করা তাঁর জীবনের ব্রত হয়ে দাঁড়াল। গান্ধীজীর নেতৃত্বে যে অসহযোগ আন্দোলন হয়েছিল তাতে তিনি অংশ নিয়েছিলেন। এর অনিবার্য পরিণতিতে তারাশঙ্কর গ্রেপ্তার হলেন। আদালতে তাঁকে উপস্থিত করা হলে বিচারক প্রশ্ন করলেন, "তুমি বিপ্লব করে দেশের স্বাধীনতা আনতে চাও।"

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

তারাশঙ্কর নির্ভীকভাবে উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ আমরা স্বাধীনতা চাই।"

বিচারক আবার বললেন, "তোমার নিশ্চয় জানা আছে, এর নাম রাজদ্রোহ।"

তারাশঙ্কর চুপ করে রইলেন যদিও জানতেন চুপ করে থাকার অর্থ এখানে কি?

বিচারে তারাশঙ্করের জেল হল।

এই সত্যনিষ্ঠাই তারাশঙ্করের সাহিত্য জীবনেও আলোক বর্তিকার কাজ করেছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তিনি সমান সৎ, সত্যনিষ্ঠ এবং জীবনাশ্রয়ী। চটুল প্রেমের গল্প কিম্বা খেলো লেখা তিনি কখনও লেখেন না। তাঁর সাহিত্যের উপজীব্য হল আমাদের জনসাধারণ, গ্রাম-বাংলা। হয়ত কোন ভিক্ষুক, অন্নদানী, নিঃস্ব কোন রাজা বা জমিদার-তনয়, অন্ধ বালক অথবা সনাতনের মত নিরন্ন কৃষক এদের অমর করেছেন তারাশঙ্কর তাঁর সাহিত্যের যাদুদণ্ডের স্পর্শে। যে রাজ্য ছিল অনাবিষ্কৃত, দুঃপ্রবেশ্য সেইখানে হানা দিয়েছেন তারাশঙ্কর। বাংলা সাহিত্যের দিগন্তকে তিনি করে দিয়েছেন বিস্তৃততর।

তিরিশের দশকে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে। 'কল্লোল' নামে এক অভিনব সাহিত্য পত্র প্রকাশিত হত সে সময়। তাতেই তাঁর প্রথম গল্পটি প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রথম লেখাই সকলকে চমকে দেবার পক্ষে যথেষ্ট হয়েছিল। কারাবাস থেকে ফিরেও তারাশঙ্কর রাজনীতির পথ পরিত্যাগ করেননি। গ্রামে ফিরে তিনি যুব আন্দোলন গড়ে তোলার দিকে সক্রিয় মনোযোগী হয়েছিলেন। তাঁর ব্যক্তি জীবনের এই অভিজ্ঞতা তাঁর সাহিত্যকে সমৃদ্ধতর করে তুলেছে। বাংলা সাহিত্যের স্বাদ অন্যরকম তবু আমরা যুব পাঠকদের বলতে পারি, টলস্টয়ের সঙ্গে তারাশঙ্করের সাদৃশ্য রয়েছে।

তারাশঙ্কর রবীন্দ্রনাথের প্রতি অসীম শ্রদ্ধাশীল কিন্তু তাঁর সাহিত্য রবীন্দ্র প্রভাব মুক্ত। বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের যুগের কোন সাহিত্যিকের পক্ষে এ যে কত কঠিন তা আমরা এখানে বসে কেবল অনুমানই করতে পারি। বাংলাদেশে রবীন্দ্র পরবর্তী লেখক গোষ্ঠী গঠনে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবদান সর্বাধিক।

এই মহান লেখকের সঙ্গে আমাদের পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেবার উদ্দেশ্যেই এই বইখানি সংকলিত হল।

বিশ্ব-নিরস্ত্রীকরণ কংগ্রেসের ঘোষণাপত্র

সর্বাত্মক নিরস্ত্রীকরণ ও শান্তির জন্য বিশ্ব-কংগ্রেসের অধিবেশনের শেষ দিনে, ১৪ই জুলাই তারিখে, যে-ঘোষণা গৃহীত হয়, তাহার পূর্ণাঙ্গ পাঠ এখানে দেওয়া গেল :—

"বিশ্বের চতুর্দিক হইতে আমরা মস্কোয় আসিয়াছি। আমাদের পেশা বিভিন্ন রকম ও মতবাদ ভিন্ন ভিন্ন। এক সপ্তাহ ধরিয়া ধারণাতীত খোলা মন লইয়া আমরা আলোচনা করিয়াছি মানবজাতির উপরে কৃষ্ণচ্ছায়া-বিস্তারী পারমাণবিক যুদ্ধের বিপদ হইতে উদ্ভূত প্রশ্নগুলি সম্পর্কে। ইহা আমাদের পরস্পরকে আরও ভালো ভাবে জানিতে সহায়তা করিয়াছে এবং এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হইয়াছি আজ যে-পরিস্থিতি প্রত্যেকটি দেশকে ও জাতিকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিতেছে তাহাকে প্রতিহত করার পথ খুঁজিয়া বাহির করা সম্ভব।

"সমরাস্ত্র উৎপাদনের প্রতিযোগিতা জাতিতে জাতিতে মন-কষাকষি ও অবিশ্বাস বাড়াইয়া তোলে। এই মন-কষাকষি ও অবিশ্বাস অস্ত্রোৎপাদনের প্রতিযোগিতাকে জোরদার করিয়া তোলে। এইভাবে এক দুষ্টচক্রের সৃষ্টি হইয়াছে। অস্ত্রশস্ত্রের ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা ক্রমেই ভয়াবহ রকম বাড়িয়া চলিয়াছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও যুদ্ধকে প্রতিহত করার জন্য এক যুদ্ধ বাধাইবার দাবি তোলা হইতেছে। কিন্তু আমরা দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস করি যে নিরস্ত্রীকরণ শুধু এক অবশ্য পালনীয় কর্তব্যই নহে, ইহা সম্ভব। ইহা আজ আর শুধু মানবজাতির শ্রেষ্ঠ মনীষীদের এক স্বপ্নই নহে। ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম ইহা হইয়া দাঁড়াইয়াছে আমাদের প্রত্যেকের এক বাস্তব কর্তব্য।

"অস্ত্রসজ্জার প্রতিযোগিতার বোঝা তুলিয়া লইলে উহা প্রত্যেকের পক্ষেই কল্যাণকর হইবে। নিরস্ত্রীকরণের ফলে যে অর্থসম্পদ উদ্বৃত্ত থাকিবে তাহাকে নিয়োগ করা যাইবে সর্বদেশের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য। এ পর্যন্ত যে সব দেশ অর্থনৈতিক দিক দিয়া কম অগ্রসর অবস্থায় রহিয়াছে, নিরস্ত্রীকরণের ফলে উদ্বৃত্ত তহবিল নিয়োগ করিয়া সেইসব দেশে উন্নয়নের হার দ্রুততর করা যাইবে। নিরস্ত্রীকরণের ফলে সমস্ত বৈদেশিক সামরিক ঘাঁটির বিলোপসাধন ও সমস্ত বৈদেশিক সেনাবাহিনীর অপসারণ ঘটিবে যাহার ফলে জাতীয় মুক্তির জন্য সংগ্রামরত জাতিসমূহের সহায়তা হইবে। নিরস্ত্রীকরণকে অবশ্যই হইতে হইবে সর্বাত্মক, সামুহিক ও কড়াকড়ি রকম আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণাধীন।

"নিরস্ত্রীকরণকে বাস্তবে সফল করিয়া তোলার পথে যে সব বাধা বিপত্তি রহিয়াছে সেগুলি আমরা বিশদভাবে অনুশীলন করিয়াছি এবং আমরা জানি যে উহাকে সফল করিয়া তোলা কঠিন। এমন লোকও আছে যাহারা এমনকি আলোচনারও বিরোধী—কেহবা এর বিরুদ্ধতা করিতেছে অজ্ঞতা ও জড়তার জন্য, কেহবা উহার বিরুদ্ধতা করিতেছে ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য কিম্বা সামরিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা হইতে। কিন্তু তবু আমরা এ বিষয়ে সুনিশ্চিত যে সমস্ত বাধাই উত্তীর্ণ হওয়া যায়। প্রত্যেকটি নিরস্ত্রীকরণ-পরিকল্পনারই দুর্বল দিকগুলিকে দেখানো যাইতে পারে; কিন্তু আমরা মনে করি যে অস্ত্রসজ্জার প্রতিযোগিতা চালাইয়া যাওয়ার চেয়ে সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য এক আপোস রফায় রাজি হওয়া ভাল।

"কিন্তু অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে নিরস্ত্রীকরণ আপনা হইতেই আসিবে বলিয়া বিশ্বাস করাটা হইবে এক বিপজ্জনক ভ্রান্তি। যাহারা বছরের পর বছর ধরিয়া আলোচনা মুলতুবী রাখিতেছে সেই কূটনীতিবিদ ও সামরিক বিশেষজ্ঞদের উপর নির্ভর করিয়া থাকা অসম্ভব। একমাত্র সর্বদেশের জনগণের প্রয়াসই সযত্নবান বাধির কঠোর পথে রাষ্ট্রনীতিবিদদের বাধ্য করিতে পারে। ব্যক্তিগত ও বিচ্ছিন্ন প্রতিবাদ যথেষ্ট নহে। অস্ত্রসজ্জার প্রতিযোগিতাকে ও সর্বপ্রকারের যুদ্ধপ্রস্তুতিকে প্রতিহত করার জন্য এক মহাশক্তিশালী গণআন্দোলন গড়িয়া তোলার সময় আসিয়াছে।

"মানবজাতি যদি গত ১৭ বৎসর ধরিয়া এক পারমাণবিক যুদ্ধের অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হওয়ার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকে, তাহা হইলে উহা সর্বোপরি

শান্তির জন্য সংগ্রামরত জনগণের অক্লান্ত প্রয়াসের ফলেই হইয়াছে। কিন্তু একথা আমাদের খোলাখুলি স্বীকার করিতেই হইবে যে এখনো এমন অনেকে আছে যাহারা অস্ত্রসজ্জার প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে সক্রিয় সংগ্রাম হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছে। এখনো এমন অনেকে আছে যাহারা ইহার বিপদ সম্বন্ধে সজাগ নহে, যাহারা এখনো ইহার ভয়াবহতার পূর্ণ গুরুত্ব উপলব্ধি করে নাই, শান্তিকে রক্ষা করার জন্য তাহাদের দায়িত্বও উপলব্ধি করে নাই। এবং ইহাদের সকলের উদ্দেশ্যে আমরা বলি: 'আমরা যে কালে বাস করিতেছি সেই কালের বিপদ উপলব্ধি করুন, নিরস্ত্রীকরণ ও শান্তির জন্য যাহারা সংগ্রাম করিতেছে তাহাদের দলে যোগ দিন।'

"সময় অপেক্ষা করিয়া থাকে না। শীঘ্রই পারমাণবিক ও হাইড্রোজেন অস্ত্রশস্ত্র কয়েক ডজন দেশের অস্ত্রাগারে গিয়া আশ্রয় পাইতে পারে এবং এইসব অস্ত্রশস্ত্র উৎক্ষেপণ নিক্ষেপণের উপায় উপকরণ এত উন্নত হইয়া উঠিতে পারে যে নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে।

"আমরা পারমাণবিক বোমার ও অনুরূপ অস্ত্রাদির সর্বপ্রকার পরীক্ষাকার্যের দৃঢ় বিরোধী—প্রধানত এই কারণে যে উহারা বর্তমান পুরুষের ও ভবিষ্যৎ পুরুষদের জীবন ও স্বাস্থ্যের পক্ষে ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক, এবং দ্বিতীয়ত এই কারণে যে উহার ফলে পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জার প্রতিযোগিতার গতি বৃদ্ধি ঘটিবে। সমস্ত পারমাণবিক শক্তির গভর্নমেন্টের উদ্দেশ্যে আমরা আবেদন জানাইতেছি। অবিলম্বে তাঁহারা যাহাতে পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রের সর্বপ্রকার পরীক্ষাকার্য পরিত্যাগ করার জন্য এবং সর্বত্র—জলে, স্থলে, ভূগর্ভে, বায়ুমণ্ডলে ও ঊর্ধ্বাকাশে—এই প্রকারের সমস্ত পরীক্ষাকার্য চিরতরে নিষিদ্ধ করার জন্য মতৈক্যে পৌঁছান, সেজন্য আমরা তাহাদের নিকট আবেদন জানাইতেছি।

"ইহা হইবে সর্বপ্রকারের পারমাণবিক অস্ত্র ও তাহাদের উৎক্ষেপণ-নিক্ষেপণের উপায়-উপকরণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও বিলুপ্ত করার পথে প্রথম পদক্ষেপ। আমাদের প্রধান ও জরুরী কর্তব্য হইল কড়াকড়ি রকম আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রাধীনে সর্বাত্মক ও সামুহিক নিরস্ত্রীকরণকে কার্যকরী করার জন্য গভর্নমেন্টগুলিকে দিয়া এক চুক্তি সম্পাদন করানো। সুতরাং, এই চুক্তি যাহাতে দ্রুত সম্পাদিত হয় তাহার জন্য আমরা বদ্ধপরিকর ও কার্যকরী মন লইয়া প্রত্যেকটি প্রস্তাব ও পরিকল্পনাকে আলোচনা করার জন্য আহ্বান জানাইতেছি।

"জনমতের চাপে ও নিরপেক্ষ দেশগুলির কার্যকলাপের ফলাফলে নিরস্ত্রীকরণের মূল নীতিসমূহ সম্পর্কে প্রধান আলোচনাকারী শক্তিসমূহের দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব কিছুটা পরস্পরের নিকটতর হইয়াছে। কিন্তু এখনো গুরুতর রকমের মতবিরোধের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। শুধু জনগণ যদি তাহাদের চাপকে আরো তীব্র করিয়া তুলিতে পারে তাহা হইলে চুক্তি সম্পাদিত হইতে পারে।

"আরো ভালরকম পারস্পরিক বোঝাবুঝি সৃষ্টি করা ও অবিশ্বাস দূর করার লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করিতে পারে শান্তির শক্তিগুলিই। আমাদের বিশ্বাস, এই লক্ষ্য সাধনে আমাদের এই কংগ্রেস এক শক্তিশালী দান রাখিয়াছে। এই কংগ্রেসে যাহার সূত্রপাত ঘটিল, তাহাকে অনুসরণও আরো শক্তিশালী করিয়া তোলার পথ প্রত্যেকটি দেশের ও প্রত্যেকটি সংস্থার সামর্থ্য অনুযায়ী বাহির করিতেই হইবে। নিষ্ক্রিয়তা শান্তির আদর্শের পক্ষে ক্ষতিকর। পারমাণবিক মৃত্যুর আতঙ্ক হইতে মানবজাতি যেদিন মুক্ত হইবে, সেইদিনটির উষাকালকে নিকটতর করিয়া তোলা আমাদের সকলের উপরেই নির্ভর করিতেছে। আমরা যাহারা শান্তি চাই তাহারা বহু সংখ্যক। আমরা সকলেই যদি কাজে নামি, এবং যাহারা কাজে নামিবে তাহারা সকলেই যদি বন্ধুত্বের সহিত একযোগে কাজে নামে, তাহা হইলে আমাদের সকলের এক অভিন্ন লক্ষ্য যে স্থায়ী শান্তি, সেই শান্তির পথ অবাধ ও উন্মুক্ত হইবে।" •

• ভারত সহ পৃথিবীর মোট ১২১টি রাষ্ট্রের ২৪৭৬ জন প্রতিনিধি এই বিশ্ব কংগ্রেসে সমবেত হয়ে বিশ্ব-শান্তি রক্ষার আবেদন জানিয়েছেন। এই সম্মেলনের গুরুত্বের কথা চিন্তা করে আমরা মূল প্রস্তাবটি এখানে প্রকাশ করলাম। —সম্পাদক।

উইলিয়ম ফকনার

অশোক মুখোপাধ্যায়

হেমিংওয়ের পর আর একজন সাহিত্য মহারথী তাঁর দিগ্বিজয়ী তরবারী নামিয়ে রাখলেন, ইনি বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক উইলিয়ম ফকনার।

গত ৬ই জুলাই মিসিসিপির অন্তর্গত অক্সফোর্ড শহরে ৬৪ বৎসর বয়সে এই প্রখ্যাত লেখকের জীবনদীপ নির্বাপিত হল।

পাতলা ফিপফিপে এই পাতলা মানুষটিকেই ১৯৪৯ সালে নোবেল পুরস্কার দ্বারা সম্মানিত করা হয়। সাহিত্যের জন্য তিনি এই পুরস্কার লাভ করেন। কিন্তু তিনি নিজের সম্পর্কে বলেছিলেন "আমি তো সাহিত্যিক নই, আমি সাহিত্যিকার মাত্র"। তাঁর সমালোচকেরা বলেন ফকনারের গল্প উপন্যাসের নায়ক নায়িকাদের প্রতিদিনকার আটপৌরে জীবনে কথাবার্তা তাঁর রচনায় নবরূপে রূপায়িত হয়ে উঠে। এ বিষয়ে তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা রয়েছে।

উইলিয়ম ফকনার ১৮৯৭ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর মিসিসিপির নিউ আলবানিতে জন্ম গ্রহণ করেন। কয়েকবছর পরেই তিনিও তাঁর পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে অক্সফোর্ডে চলে আসেন।

অনেকবার পড়াশুনোর ফলে তাঁদের পরিবার নিঃস্ব হয়ে পড়ে। বিদ্যালয়ের শিক্ষার মাপকাঠিতে মাপলে তাঁকে শিক্ষিত বলা চলে না। তবে দারিদ্র্যের কঠিন পেষণে নিষ্পিষ্ট হয়ে তাঁর কাব্য প্রতিভা ভাস্বর হয়ে উঠেছে। অন্ন সংস্থানের জন্য তাঁকে স্কুলের কাজ, পুলিশের চাকরী, কলাবনির কুলিগিরি, কেরাণীর চাকরী —সবই করতে হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সতেরো বছর বয়সে কানাডার বিমান বহরে যোগদেন। পরে বৃটিশ বিমান বাহিনীতে ভর্তী হয়ে ফ্রান্সদেশে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেন, যুদ্ধের পর বাসভূমি মিসিসিপি শহরে ফিরে বছর দুই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন, তারপর স্থানীয় এক ডাকঘরে পোষ্ট মাষ্টারের কাজে নিযুক্ত হন। ১৯২২ সাল থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত তিনি উক্ত কাজে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯২২ সালে "ডাকল ডালার" পত্রিকায় তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। ১৯২৪ সালে জনৈক বন্ধুর অর্থানুকূল্যে তাঁর প্রথম কাব্য গ্রন্থ "দি মার্বেল ফন" প্রকাশিত হয়।

এর অল্প কাল পরেই তিনি নিউ অরলিয়নে চলে

বাসবদত্তার

গৃহস্থবধূর ডায়েরী ৭·০০

(আধুনিক সমস্যার চিত্র)

মোহিতলাল মজুমদারের

কাব্য-মঞ্জুষা (সম্পূর্ণ ও টীকা সহ) ১০·০০

ডঃ মনোরঞ্জন জানার

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস (সাহিত্য ও সমাজ) ৮·০০

রবীন্দ্রনাথ (কবি ও দার্শনিক) ১১·৫০

Prof. W. T. Webb's

EVERYBODY'S LETTER-WRITER Rs 5·00

(28th Ed)

Contains about 500 letters

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দের

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য

শ্রীমৃণালকান্তি দাশগুপ্তের

যুগপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ (২য় সংস্করণ) ৬·০০

পরমারাধ্যা শ্রীমা (৩য় সংস্করণ) ২·৫০

রূপ হতে অরূপে ২·৫০

শ্রীসন্তোষকুমার কুণ্ডুর

বাসুদেব ঘোষের পদাবলী

শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়ের

রবীন্দ্র-সাহিত্যের নব রাগ ৫·০০

নিরঞ্জনের

ধন্বন্তরী ক্লিনিক্স্ [সরস হাসির নাটক] ১·৫০

শ্রীসুনীল দত্তর

বর্ণ-পরিচয় ২·৫০

[বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনী অবলম্বনে নাটক]

অধ্যাপক শ্রীরমণীমোহন চক্রবর্তীর

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক কাল ৫·০০

ভারতী বুক স্টল

প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা

৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট :: কলিকাতা-৯

পোষ্ট বক্স—১০৮৩১

ফোন—৩৪-৪১৭৮ : গ্রাম—Granthlaya

হান। মিসিসিপিতে পোস্ট মাস্টারের কাছে তিনি যে অর্থ সঞ্চয় করেছিলেন তারই সাহায্যে এই স্থান সম্ভব হয়েছিল।

এখানে আসার পরই প্রখ্যাত আমেরিকান লেখক শেরউড্ অ্যাণ্ডারসনের সঙ্গে তাঁর আলাপ পরিচয় হয়। মিঃ অ্যাণ্ডারসনই তাঁকে উপন্যাস রচনায় উৎসাহ দেন।

তাঁর প্রথম উপন্যাস "সোলজার্স-পে" এক যুদ্ধ ফেরত সৈনিকের স্বপ্ন-ভঙ্গের করুণ আলেখ্য। ১৯২৬ সালে এই উপন্যাস প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্থানীয় সাহিত্য সমাজে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯২৯ সালে তাঁর পরবর্তী উপন্যাস "মসকুইটোজ"। এটি নিউ অরলিয়ন্সের ভবঘুরেদের উপর একটি বিদ্রূপাত্মক ব্যঙ্গ রচনা। "শারটোরিস"—এইটিই তাঁর প্রথম রচনা যার মধ্যে ফকনারের প্রকৃত বাস্তবধর্মীতার বৈশিষ্ট্য প্রকাশমান। এরপরে তিনি যে সকল গল্প, উপন্যাস রচনা করেছেন, তাদের মধ্যে একটির সঙ্গে আর একটির সম্পর্ক রয়েছে। "ইয়োকনাপাটাও" নামে একটি কাল্পনিক কাউন্টি আর এই কাউন্টির প্রধান পরুষ "জেফারসন" রয়েছে এই সব উপন্যাসের পটভূমিকায়।

ঐ বৎসরেই তাঁর "দি সাউণ্ড এ্যাণ্ড ফিউরী" প্রকাশিত হয়। তাঁর লেখার মধ্যে দুর্বোধ্যতা এতই প্রবল ভাবে প্রকট ছিল যে প্রকাশকেরা ছাপতে সাহসী হয়নি। সাহিত্য মূল্য বিচারে এই পুস্তকটি সমালোচকদের স্বীকৃতি লাভ করে। তাঁর লেখক জীবনের সাফল্যের সূচনা এ সময় থেকেই। তাঁর প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে কোন সাময়িক পত্র বলেছেন :—

"Distortion is his medium, grotesque are his personae, and he is not above draping some of his scenes for the most theatrically gothic effects. Yet he is a long way from Poe, like Hawdthorne' witchcraft, Faulkner's distortion and violence and decaying cropes lie close to the heart of the Society. Like Hawdthorne he is an anatonist of mares, for in the Faulknerian world the original sin of black slavery troubles the Sleep of all, wraps the character and twists the mind."

"দি সাউণ্ড এ্যাণ্ড ফিউরী" সম্বন্ধে ফকনার বলে, ছিলেন যে আমার যদি কিছু বক্তব্য থাকে তাহলে সেটা প্রকাশ করাই আমার কর্তব্য এই প্রকাশের কোন ধরা বাঁধা ছককাটা পথ নেই, আমি যে ভাবে খুশী বলব যার গরজ থাকবে সে ঠিক বুঝে নেবে।

সমালোচকবৃন্দ তাঁর এই পুস্তকটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রকৃতই যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা মূলক উপন্যাস রচিত হয়েছে তারই মধ্যে এটিই অন্যতম। অনেক সমালোচক তাঁকে স্বধর্মচ্যুত, দুর্বোধ্য, মিস্টিক বলে গালিগালাজও করেছেন, কিন্তু ফকনারের তাতে কোন ভ্রুক্ষেপ ছিল না। তিনি কোন সমালোচনা পড়তেন না, কোন প্রবন্ধ সমালোচনা সাময়িক পত্র পত্রিকা তাঁর বাড়িতে আসত না।

"এ্যাজ আই লে ডাইং" তাঁর পরবর্তী উপন্যাস এটিও সাংবাদিকগণের এবং সমালোচকবৃন্দের প্রশংসাধন্য হয়েছিল, কিন্তু এই বই দুটি অর্থের দিক দিয়ে বিশেষ সাফল্য অর্জন করে নি। "দি সাউণ্ড এ্যাণ্ড দি ফিউরী" উপন্যাসখানি তিনি প্রথম 'দি স্ট্রীম অব কনশাসনেস' পদ্ধতিতে রচনা করেন।

অবশেষে তাঁর "দি স্যাংচুয়ারী" উপন্যাসখানি প্রকাশিত হয়। 'স্যাংচুয়ারী' প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি এত জনপ্রিয়তা অর্জন করেন নি। এই তাঁর প্রথম জনপ্রিয় উপন্যাস, 'স্যাংচুয়ারী' লেখার সময়েও দারিদ্র্যের সঙ্গে সমানভাবে সংগ্রাম করতে হয়েছে, 'স্যাংচুয়ারী' উপন্যাসে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন, কয়েক বছরের মধ্যে ঐ বই এর ১১ লক্ষ কপি বিক্রয় হয়। এক আঠার বছরের কুমারীর উপর বলাৎকারের জঘন্য কাহিনীকে অবলম্বন করে এই উপন্যাসের নানা কুটিল ঘটনা বিস্তৃতি লাভ করেছে বইখানি নিয়ে বিদেশে তুমুল আলোচনার ঝড় তুলেছিল।

এর পরবর্তী দশ বৎসরের মধ্যে তিনি "লাইট ইন আগস্ট," "অ্যাবসলম্," "অনভ্যানকুইশড," নামে তিনটি উপন্যাস, একটি কাব্য গ্রন্থ এবং চলচ্চিত্রের জন্য কয়েকটি নাটক রচনা করেন। কোন কোন সমালোচকের মতে "লাইট ইন আগস্ট"ই নাকি তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস।

১৯৪৯ সালে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পরে তাঁর সাহিত্যিক জীবন এই কয়েকটি বিশেষ রচনার জন্য খুব সমুজ্জ্বল। "দি হ্যামলেট" "গো ডাউন মোসেজ এ্যাণ্ড আদার স্টোরিজ" "ইনট্রুডার ইন দি ডাস্ট" "রেকুয়েম ফর নান্" ও "এ ফ্যাবল" উক্ত উপন্যাসগুলির মধ্যে "লাইট ইন আগস্ট" এ এক গর্ভবতী কুমারী মেয়ের নিরুদ্দিষ্ট প্রেমিকের জন্য দেশ দেশান্তরে খুঁজে বেড়াবার এক করুণ কাহিনী পাওয়া যায়। এবং 'ইনট্রুডার ইন দি ডাস্ট' উপন্যাসখানি তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির অন্যতম রাজ রাস্তার মাঝে এক নিরপরাধ নিগ্রোকে গাছে বেঁধে নিষ্ঠুরভাবে প্রহারের জন্য কতিপয় সুসভ্য শ্বেতকায় সংঘবদ্ধভাবে আয়োজন করেছে। এবং তাদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে তাঁদেরই এক ১৬ বছরের তরুণ। "এ ফ্যাবল" নামে গল্পটি ১৯৫৪ সালে রচিত হয়। ফকনারের মতে এইটিই তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্প ঐ বছরে উক্ত গল্পের জন্যই তাঁকে মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পুলিৎসার পুরস্কার দ্বারা সম্মানিত করা হয়।

এরপরেও তিনি আরও কয়েকটি উপন্যাস ও গল্প লিখেছিলেন। 'দি টাউন', 'দি ম্যানসন', 'দি ওয়াইল্ড পামস', 'গ্রীন বার্ড' 'মাইসেস গ্যামবিট' 'আঙ্কল উকলি এ্যাণ্ড আদার স্টোরিজ' ইত্যাদি।

নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর তিনি জাপানে আমেরিকার সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন। তাঁর স্যাংচুয়ারী উপন্যাসটির পরবর্তী খণ্ড "রেকুয়েম ফর নান" উপন্যাসটি আলবর্ম কাম নাট্যরূপ দিয়ে সফল হয়েছেন।

গত বসন্তকালে তাঁর শেষ রচনা "দি রীভারস" নামে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। এটি হল ১৯০৫ সালের পটভূমিকায় লেখা একটি তরুণের বিপদসঙ্কুল অভিযানের কাহিনী। এ কাহিনীর মূল চরিত্র উইলসন ড্রমার।

ফকনারের রচনায় মৃদুতার স্পর্শ নেই, তিনি তাঁর রচনায় বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রবঞ্চনার উপরে তীব্র আঘাত হেনেছেন। মানবিক মর্যাদা, মানুষের মহিমা ও সহনশীলতাকে স্থাপন করেছেন আদর্শের সুউচ্চ শিখরে। ১৯৫০ সালে নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করার সময়ে তিনি তাঁর প্রখ্যাত ভাষণে বলেছিলেন "আমার বিশ্বাস এই পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্বই কেবলমাত্র বজায় থাকবে না। মানুষ বেঁচে থাকবে তার সকল মানবিক মর্যাদা ও মহত্ত্ব নিয়ে। জীব জগতে মানুষের বাকশক্তি আছে বলেই মানুষ অমর নয় তার দয়াপ্রদর্শন, ত্যাগ স্বীকার ও সহ্য করার মত হৃদয় আছে ও শক্তি আছে বলেই সে মৃত্যুহীন। এসকলই কবি ও সাহিত্যিকের উপজীব্য হওয়া উচিত।

সাম্প্রতিক কালে তিনি ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্কিন সাহিত্য সম্পর্কে বক্তৃতা দান ও সাহিত্য রচনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। প্রধানতঃ দক্ষিণাঞ্চলের নিগ্রো সম্প্রদায়ের মধ্যে সাহিত্যের প্রসার উন্নতি বিধানের উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৬০ সালে "উইলিয়ম ফকনার ফাউণ্ডেশন" গঠন করেন। এই ফাউণ্ডেশান থেকে বৃত্তিদানের ব্যবস্থা আছে, এবং প্রতি বছর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের জন্য পুরস্কার দানেরও ব্যবস্থা হয়েছে।

॥ কবিকাহিনী ॥

। পাঁচ ।

কবিকাহিনীর কাব্যবিচারের প্রারম্ভে এই গ্রন্থ সম্পর্কে পঞ্চাশোত্তর রবীন্দ্রনাথ কি বলেছেন তা ভেবে দেখবার বিষয়। জীবনস্মৃতিতে ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত নিজের লেখা সম্বন্ধে কবির একটি সাধারণ মন্তব্য আছে। তিনি বলেছেন, "ভারতীর পাতে পাতে আমার বাল্যলীলার অনেক লজ্জা ছাপার কালির কালিমায় অঙ্কিত হইয়া আছে। কেবলমাত্র কাঁচা লেখার জন্য লজ্জা নহে—উদ্ধত অবিনয়, অদ্ভুত আতিশয্য ও সাড়ম্বর কৃত্রিমতার জন্য লজ্জা।"

এই সাধারণ বক্তব্যই বিশেষিত হয়েছে কবিকাহিনী প্রসঙ্গে। তিনি বলছেন, "যে বয়সে লেখক জগতের আর সমস্তকে তেমন করিয়া দেখে নাই, কেবল নিজের অপরিস্ফুটতার ছায়া-মূর্তিটাকেই খুব বড়ো করিয়া দেখিতেছে, ইহা [কবিকাহিনী] সেই বয়সের লেখা। সেইজন্য ইহার নায়ক কবি। সে কবি যে লেখকের সখা তাহা নহে,—লেখক আপনাকে যাহা বলিয়া মনে করিতে ও ঘোষণা করিতে ইচ্ছা করে, ইহা তাহাই। ঠিক ইচ্ছা করে বলিলে যাহা বুঝায় তাহাও নহে—যাহা ইচ্ছা করা উচিত, অর্থাৎ যেবনটি হইলে অন্য দশ জনে মাথা নাড়িয়া বলিবে, হাঁ কবি বটে, ইহা সেই জিনিসটি। ইহার মধ্যে বিশ্বপ্রেমের ঘটা খুব আছে—তরুণ কবির পক্ষে এইটি বড় উপাদেয়, কারণ ইহা শুনিতে খুব বড়ো এবং বলিতে খুব সহজ। নিজের মনের মধ্যে সত্য যখন জাগ্রত হয় নাই, পরের মুখের কথাই যখন প্রধান সম্বল, তখন রচনার মধ্যে সরলতা ও সংযম রক্ষা করা সম্ভব নহে। তখন যাহা স্বতই বৃহৎ তাহাকে বাহিরের দিক হইতে বৃহৎ করিয়া তুলিবার দুশ্চেষ্টায়, তাহাকে বিকৃত ও হাস্যকর করিয়া তোলা অনিবার্য।" [ভারতী, জীবন-স্মৃতি।]

কবির এই আত্মবিশ্লেষণ একদেশদর্শী আত্মনিন্দার অত্যুক্তিতে পরিপূর্ণ। আসলে কিশোর রবীন্দ্রনাথের মানসলোকে কবিখ্যাতির যে বাসনা ছিল কবিকাহিনীর কবি তারই আদর্শায়িত রূপ। কবিজীবন কি হওয়া উচিত তারই বিশ্লেষণ। এমনটি হওয়াই তো স্বাভাবিক। যে সারস্বত সন্তানের কবিজীবনই মুখ্যজীবন তাঁর কৈশোর লগ্নে সে জীবন সম্পর্কে কবিমানসের স্বপ্ন-কামনাই প্রকাশিত হয়েছে কবিকাহিনীতে। এবং পূর্বেই বলা হয়েছে, আঠারো বছরের সেই স্বপ্নই রবীন্দ্রনাথের আশী বছরের জীবনসাধনায় সার্থকতার রূপ নিয়ে বাস্তবীভূত হয়ে উঠেছে। সুতরাং কবিকাহিনীতে "নিজের অপরিস্ফুটতার ছায়ামূর্তিটাকেই খুব বড়ো" করে দেখানো হয়েছে—এই অপবাদ দিয়ে তার গুরুত্ব লাঘব করা সমীচীন হবে না। কবিকাহিনীর কবি-জীবনের স্বপ্ন যে অলীক নয়, তার প্রমাণ সমগ্র রবীন্দ্রজীবন।

প্রথম সর্গে কবির বাল্য, কৈশোর ও যৌবনলগ্নের প্রকৃতিচেতনার সঙ্গে বিহারীলালের প্রকৃতিচেতনার আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করার বিষয়। বিহারীলাল তাঁর 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যখানি 'উপহার' দিয়েছেন কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যকে। বঙ্গসুন্দরীর প্রথম সর্গের নাম 'উপহার'। এই উপহারে কবি বিহারীলাল তাঁর আত্মকাহিনীকেই ভাষা দিয়েছেন। বঙ্গসুন্দরীর সেই কবিকাহিনীতে দেখা যাচ্ছে লোকালয়ে কবির চিত্ত হাহাকার করে উঠছে। 'সর্বদাই হু হু করে মন।' এই স্বার্থভ্রষ্ট লোকালয় ছেড়ে

'শূন্যময় নির্জন শ্মশানে' গিয়েও কবি যেন একটু তৃপ্তি লাভ করেন। মনুষ্যনিবাস তাঁর কাছে দুর্বিসহ, তাই তিনি প্রকৃতির বুকে জ্বালা জুড়াতে চাইছেন। কবি বলছেন,

কভু ভাবি কোন করণার
উপলে বন্ধুর ধার ধার,
প্রচণ্ড প্রপাত ধ্বনি,
বায়ু বেগে প্রতিধ্বনি
চতুর্দিকে হতেছে বিস্তার ;—

গিয়ে তার তীর-তরু-তলে,
পড়ি পড়ি নদীর পায়লে,
ডুবাইয়ে এ শরীর
শব-সম রব স্থির
কান দিয়ে জল-কলকলে।

যে সময় কুরঙ্গিনীগণ,
সবিস্ময়ে ফেলিয়ে নয়ন,
আমার সে দশা দেখে,
কাছে এসে চেয়ে থেকে,
অশ্রু জল করিবে মোচন ;—

সে সময়ে আমি উঠে গিয়ে,
তাহাদের গলা জড়াইয়ে,
মৃত্যুকালে মিত্র এলে,
লোকে যেন চক্ষু মেলে,
তেমনিতর থাকিব চাহিয়ে।

[বঙ্গসুন্দরী, প্রথম সর্গ, ৯-১২]

কবিকাহিনীতেও দেখি, প্রাপ্তযৌবন কবি যখন কাননে কাননে আপন মনে একাকী ভ্রমণ করে বেড়াত, তখন,

বনের হরিণগুলি, আকুল নয়নে আহা
কবির মুখের পানে রহিত চাহিয়া।

• •

শীর্ণ নির্ঝরিণী যেথা করিতেছে মৃদু মৃদু
উঠিতেছে কুল কুল জলের কল্লোল,
সেখানে গাছের তলে একাকী বসিয়া কবি
নীরবে নয়ন মুদি থাকিত শুইয়া ;
তৃষিত হরিণ শিশু সলিল করিয়া পান
দেখি তার মুখপানে চলিয়া যাইত।

প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতাবোধে অবশ্য বিহারীলালের কবিতার উদ্ধৃতাংশ রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতাংশের চেয়ে অনেক গভীর। কিন্তু বিহারীলালের কাব্য যে কবি-কাহিনীর বাক্‌প্রতিমা-নির্মাণে বিশেষ ভাবে প্রভাবশীল হয়েছিল তার পরিচয় পাওয়া যাবে কবিকাহিনীর হিমালয় বর্ণনার মধ্যে। তা ছাড়া বিহারীলালের 'সর্বদাই হু হু করা মন' রবীন্দ্রনাথের কবিমানসেও সঞ্চারিত হয়েছিল।

। ছয় ।

কিন্তু বিহারীলালের জীবনবোধের সঙ্গে কবি-কাহিনীর জীবনবোধের মিল আংশিক ও অনেকটা বহিরঙ্গগত। কবি কাহিনী রচনার উৎসমূলে শেলির 'Queen Mab' ও 'Alastor'-এর প্রেরণা বিস্ময়কর। কবিকাহিনী একাধারে রবীন্দ্রনাথের 'কুইন ম্যাব' ও 'অ্যালাস্টর'। অ্যালাস্টর শেলির কবিকাহিনী।

There was a poet whose untimely tomb
No human hands with pious
reverence reared.

• • •

He lived, he died, he sung, in solitude.

কবিকাহিনীর কবির বাল্যদশার মতো অ্যালাস্টরের কবির বাল্যকালও কেটেছে এক জাগর-স্বপ্নে :

By solemn vision, and bright silver dream,
His infancy was nurtured. Every sight
And sound from the vast earth and
ambient air
Sent to his heart its choicest impulses.

যৌবনে পদার্পণ করে কবি পরিত্যাগ করলে তার পরিচিত ঘরসংসার—'To Seek strange truths in undiscovered lands.' শেলি সেই কবিমানসের বিশ্ব-পরিক্রমার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে গ্রন্থের 'ভূমিকা'য় বলেছেন,

"It represents a youth of uncorrupted feelings and adventurous genius led forth by an imagination inflamed and purified through familiarity with all that is excellent and majestic, to the contemplation of the Universe. He drinks deep of the fountains of knowledge, and is still insatiate. The magnificence and beauty of the external world sinks profoundly into the frame of his conceptions, and affords to their modification a variety not to be exhausted. • • But the period arrives when these objects cease to suffice. His mind is at length suddenly awakened and thirsts for intercourse with an intelligence similar to itself."

কবি স্বপ্নসরণিতে তার সেই জীবনের দোসরের সন্ধান পেল।

He dreamed a veiled maid
Sate near him, talking in low solemn tones.
Her voice was like the voice of his
own soul
Heard in the calm of thought ;

বলাই বাহুল্য, শেলির এই মানসসঙ্গিনীর সাক্ষাৎ মর্ত্যলোকে পাওয়া সহজসাধ্য নয়। তাকে কবি সেই আলো দিয়ে গড়েছেন যে আলো never was on sea or land. সেই আলো কবির নিজের আত্মার মধ্যেই বর্তমান। তারি ইসারায় কবির বিশ্বপরিক্রমা। এই মানস-সুন্দরীর সন্ধানেই শেলির অ্যালাস্টরের কবির জীবনাবসান হয়েছে। ভূমিকায় তিনি যাকে বলেছেন, 'interesting situations of the human mind' তাকেই সমালোচকগণ বলেছেন শেলির সর্বাত্মক প্রেমতত্ত্ব বা "pan-erotic element." এই যথার্থ দোসরের সন্ধান—এই 'psyche-epipsyche strategy'র আরম্ভ অ্যালাস্টরে, কিন্তু তার বিবর্তন ও পরিণতি তাঁর 'রিভোল্ট অব ইসলামে', 'প্রমিথিউস আনবাউণ্ডে', 'এপিসাইকিডিয়নে,' 'এডনাইসে' এবং 'দি ট্রায়াম্ফ্ অব লাইফে'।

শেলির সঙ্গে এখানেই রবীন্দ্রনাথের যুগপৎ মিল ও অমিল দেখতে পাওয়া যায়। শেলি তাঁর আদর্শকে চিরদিনই সন্ধান করেছেন, কিন্তু কোনোদিনই তাঁর সাক্ষাৎ পান নি। শেলির মতো রবীন্দ্রজীবনও এক মানস-সুন্দরীর আগমন স্বরে অতিবাহিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বাস্তব জীবনেই তাঁর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। মৃত্যুর দ্বার দিয়ে তাঁর সেই বাস্তবীই হয়েছেন তাঁর চিরদিনের মানসী। এক্ষেত্রেও সীমার মধ্যেই তাঁর অসীমের সহিত মিলন সাধনের পালা। শেলির সঙ্গে তাঁর পার্থক্য এখানেই। অ্যালাস্টরের কবির সঙ্গে কবিকাহিনীর কবির পার্থক্যও অনুরূপ। কবিকাহিনীর কবি পেয়েছিল তার আত্মার দোসরকে বনবালিকা নলিনীর মধ্যে। ভালোও বেসেছিল তাকে। কিন্তু তার সিন্ধুহৃদয়কে সেই ভালবাসা পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি দিতে পারে নি। চিরঅতৃপ্ত হৃদয় নিয়ে তাই সে বেরিয়েছিল বিশ্বপরিক্রমায়। কিন্তু অনতিবিলম্বেই কবি বুঝতে পারল, প্রেমের সন্ধান যে পেয়েছে তার কাছে প্রেমহীন প্রকৃতির কোনো আকর্ষণ নেই। প্রেমহীন প্রকৃতি দেবতাহীন মন্দিরের মতো। তাই কবি ফিরে এলো নলিনীর কাছে। কিন্তু ততদিনে নলিনী কবির বিরহে প্রাণত্যাগ করেছে। কিন্তু "সে বালিকা, সে নলিনী, সে স্বর্গপ্রতিমা" মৃত্যুর মধ্য দিয়ে কবিমানসে অমর আসনে প্রতিষ্ঠিত হল :

যাহার মোহিনী মূর্তি হৃদয়ে হৃদয়ে
শিরায় শিরায় আঁকা শোণিতের সাথে,
যতকাল রব বেঁচে যার ভালবাসা
চিরকাল এ হৃদয়ে রহিবে অক্ষয়।

দেহবন্ধনমুক্ত সেই নলিনীই হল কবির আজীবন-সঙ্গিনী মানসসুন্দরী।

দেহ-কারাগার মুক্ত সে নলিনী এবে
সুখে দুখে চিরকাল সম্পদে বিপদে,
আমারই সাথে সাথে করিছে ভ্রমণ।
চিরহাস্যময় তার প্রেমদৃষ্টি মেলি,
আমার মুখের পানে রয়েছে চাহিয়া।
রক্ষকদেবতা সম আমারি উপরে
প্রশান্ত প্রেমের ছায়া রেখেছে বিছায়ে।
দেহকারাগার মুক্ত হইলে আমিও
তাহার হৃদয় সাথে মিশাব হৃদয়।

শেলি, যাকে 'Daemon of the world' বলেছেন রবীন্দ্রনাথের আঠারো বছরের পরিভাষায় সেই হয়েছে 'প্রকৃতিদেবতা'। পরবর্তী জীবনে রবীন্দ্রনাথ তাকেই বলেছেন 'জীবনদেবতা'।

মৃত্যু কবির আনন্দসুন্দরীকেই শুধু অবিনশ্বর করে রাখল না, মৃত্যুই হল জীবনের শিক্ষাগুরু। মৃত্যুই ব্যক্তি-জীবনকে বিশ্বজীবনের সঙ্গে যুক্ত করল। এদিকে বিশ্বপ্রকৃতির কাছে কবি এই মন্ত্র পেল যে, যা সুন্দর তাই শিব। সুন্দর প্রকৃতিরাজ্যে অশিব কিছুই নেই। তাই প্রকৃতিকে সম্বোধন করে কবি বলল,

অমন সুন্দর আহা নলিনীর মন,
জীবন্ত সৌন্দর্য, দেবি, তোমার এ রাজ্যে
অনন্ত কালের তরে হবে না বিলীন।
যে আশা দিয়াছ ছলে ফলিবে তা দেবি,
একদিন মিলিবেক হৃদয়ে হৃদয়।

বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে এই আশ্বাসবাণী পেয়েছে বলেই কবি বলছে,

বাজাও রাখাল তব সরল বাঁশরী!
গাও গো মনের সাধে প্রমোদের গান।
পাখীরা মেলিয়া সবে গাইতেছে গীত,
কানন ঘেরিয়া সবে রহিতেছে বায়ু,
উপত্যকাসব সবে ফুটিয়াছে ফুল;
তখন তোদের আর কিসের ভাবনা?

ব্যক্তিজীবন থেকে বিশ্বজীবনে উত্তরণের এই মানস-বিবর্তনটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয়। পরবর্তী-কালে 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থে "বিশ্বনৃত্য" কবিতায় কবি যে কথা বলেছেন তারি প্রথম ভাবকলিকাটি মুকুলিত হয়েছে কবিকাহিনীতে। কবি বলছেন,

সমস্ত প্রকৃতি যবে থাকে গো হাসিতে,
সমস্ত জগৎ যবে গাহে গো সংগীত,
তখন ত তোরা নিজ বিজন কুটীরে,
ফুলতম আপনার মনের বিষাদে
সমস্ত জগৎ ভুলি কাঁদিস্ না বসি।
জগতের, প্রকৃতির ফুল্ল মুখ হেরি,
আপনার ক্ষুদ্র দুঃখ রহে কি গো আর?

আত্মকেন্দ্রিক কবিকাহিনী এখানেই বিশ্বমুখীনতা লাভ করেছে। রবীন্দ্র-কবি-মানসের এও এক মুখ্য বৈশিষ্ট্য। এবং এক্ষেত্রেও রবীন্দ্র-মানস শেলি-মানসের সহোদর। স্টপফোর্ড ব্রুক বলেছেন, শেলি দুটি জগতে বাস করতেন ; একটি তাঁর আপন হৃদয়ের জগৎ, আরেকটি সমগ্র মানবজাতির জগৎ। "One was the world of mankind and its hopes, the other was the world of his own heart. His poetic life was an alternate changing from one of these worlds to the other. He passed from poetry written for the sake of mankind, to poetry written for his own sake and to express himself ; from the Shelley who was inspired by moral aims and wrote in the hope of a regeneration of the world, to that other Shelley who, inspired only by his own ideas and regrets, wrote without any ethical end, and absolutely apart from humanity."

কবিকাহিনীর রবীন্দ্রনাথও দুই জগতের অধিবাসী। এক জগতে কবিকথাই মুখ্য, আরেক জগতে মুখ্য হয়ে উঠেছে বিশ্বজীবন।

। সাত ।

কবিকাহিনী বিশ্বকাহিনীতে উত্তীর্ণ হবে শেলির 'কুইন ম্যাবে'র সাক্ষাত্য লাভ করেছে। এই প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণীয়। স্বীকরণ-ক্ষমতায় রবীন্দ্রমানস শেলিমানসেরই সহোদর। শেলির উপর অন্যের প্রভাব-প্রসঙ্গ আলোচনায় অধ্যাপক কার্লস বেকার [Carlos Baker] বলেছেন, Shelley displayed a singular capacity for projecting himself imaginatively into the literature he admired, and his reading became for him a part of his actual experience, like any other emotional or intellectual adventure which arose from his contact with flesh-and-blood people. "[Shelley's Major Poetry, পৃ ২৭] রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও এই কথা সত্য। তিনি যে সারস্বত লোকে আইসনর বিহার করেছেন সেখানকার নরনারী তাঁর কবিমানসে একাংশের স্থায়ী বাসন্দা হয়ে উঠেছে।

কবিকাহিনীর সঙ্গে কুইন ম্যাবের নামাদিক দিয়েই সাদৃশ্য রয়েছে। শেলিজায়া শ্রীমতী মেরি বলেছেন কুইন ম্যাব কবির আঠারো বছর বয়সের রচনা। কিন্তু তখনি তাঁর চিত্ত আর্ত ও নিপীড়িত মানুষের প্রতি করুণা ও সমবেদনায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে। কুইন ম্যাবের টীকায় শ্রীমতী মেরি লিখেছেন, "He was animated to greater zeal by compassion for his fellow-creatures. His sympathy was excited by the misery with which the world is burning."

এই মৈত্রী ও করুণায় প্রবুদ্ধ হয়ে শেলি কুইন ম্যাবে দুই জগতের ছবি আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। একটি ছবি হল জগতের অতীত ও বর্তমান দুঃখ দুর্দশার, আরেকটি ছবি হল অনাগত ভবিষ্যতের যখন ভূতলে স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হবে। শেলির আজীবন এই বিশ্বাস ছিল যে, এই দুই জগতের ব্যবধান একদিন নিশ্চয়ই ঘুচে যাবে। শেলি 'পরীক্ষক' পত্রিকার সম্পাদককে লেখা এক চিঠিতে লিখেছেন, "I am a devoted ememy to religious, political, and domestic oppression." নবম সর্গে বিভক্ত, 'কুইন ম্যাব' কাব্যের প্রথম সাতটি সর্গে শেলি ম্যাব অর্থাৎ পরীদের রাণীর কণ্ঠে অতীত ও বর্তমান পৃথিবীর অন্যায় অত্যাচার, এবং উৎপীড়িত ও নিষ্পীড়িত মানুষের দৈন্য দুর্দশার বর্ণনা করেছেন। অষ্টম সর্গে ম্যাব আত্মাকে বলছে, তুমি অতীত ও বর্তমানকে দেখেছ, এবার ভবিষ্যৎকে দেখ। 'Learn the secrets of the future !' নবম সর্গে কবি ভবিষ্যতের সেই পৃথিবীকে বলছেন, 'reality of Heaven !' সেই বাস্তবীভূত স্বর্গভূমির বর্ণনায় কবি বলছেন,

> The lion now forgets the thirst for blood ;
> There might you see him sporting in the sun

Beside the dreadless kid ; his claws are sheathed,
is teeth are harmless, custom's force has made
His nature as the nature of a lamb.

এই হিংসা বেষহীন পৃথিবীতে মানুষও যেন নবজন্ম লাভ করেছে :

Here now the human being stands adorning
This loveliest earth with raintless body and mind ;
Blessed from his birth with all bland impulses,
Which gently in his noble bosom wake
All kindly passions and all pure desires.

বলাই বাহুল্য, কবিকাহিনীতে রবীন্দ্রনাথ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পৃথিবীর যে চিত্র রচনা করেছেন তার উপর 'কুইন ম্যাব'-এর প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে এই 'বিশ্বপ্রেমের ধর্ব'কে খাটো করেছেন। বলেছেন, নিজের মনের মধ্যে সত্য যখন স্বাভাবিক হয়নি পরের মুখের কথাই যখন প্রধান সম্বল, তখন তা নিতান্তই উপহাসের যোগ্য। এখানেও আমরা কবির সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। কবির সারা জীবনের কাব্য-সাধনার একদিকে আছে আত্মকথা, আরেকদিকে বিশ্বকথা। এই দুয়ে মিলেই কবির সারস্বত লীলাকে পরিপূর্ণতা দিয়েছে। কবিকাহিনীতে তারই প্রথম প্রকাশ। কবি-বন্ধোদর সেলি তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছেন, কিন্তু তাঁর কবিমানসও যদি একই ভাবে ভাবিত না হত, সেলির সঙ্গে যদি তিনি সমানধর্মা না হতেন, তা হলে এই তত্ত্বরাভিনয়যোগ্যতা তিনি কিছুতেই লাভ করতে পারতেন না।

আমরা যাকে বলেছি কবির মর্মগত আত্মকথা এবং সর্বগত বিশ্বকথা তার সার্থক প্রকাশ ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা' কাব্যে। বিশ্বভারতী-প্রকাশিত রচনাবলী সংস্করণের চতুর্থ খণ্ডে 'চিত্রা'র 'সূচনা'য় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "মানুষের আত্মিক সৃষ্টি কেন প্রাকৃতিক সৃষ্টিতেও আদিকাল থেকে মূল আদর্শের সঙ্গে বাহ্য-প্রকাশের সাংঘাতিক দ্বন্দ্ব দেখতে পাওয়া গেছে। আদ্যাত্মিক যুগের শ্রীহীন গাছগুলো কেন টিকতে পারল না। আজ পরবর্তী গাছগুলিতে সমস্ত পৃথিবীকে দিয়েছে শোভা। কোন্ শিল্পী রচনার সূত্রপাতে প্রথম ব্যর্থ হয়েছিল, বাধা মেনেছিল, তাতের কাজ নিষ্ঠুর-ভাবে মুহূর্তে মুহূর্তে সংস্কার সাধন করেছে একথা যখন ভাবি তখন সৃষ্টির ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে দুই সত্তার মিলন-চেষ্টা স্পষ্ট দেখতে পাই। সেই চেষ্টা কী নিষ্ঠুর ভাবে নিজেকে ভয়মুক্ত করতে চায়, মানুষের ইতিহাসে বার বার তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ***

"বাইরে যার প্রকাশ বাস্তবে সে বহু, অন্তরে যার প্রকাশ সে একা। এই দুই ধারার প্রবাহেই কাব্য সম্পূর্ণ হয়। "এবার ফিরাও মোরে" কবিতায় কর্মজীবনের সেই বিচিত্রের ডাক পড়েছে। "আবেদন" কবিতায় ঠিক তার উল্টো কথা। কবি বলেছে, 'কর্মক্ষেত্রে যেখানে কার্যক্ষেত্রের জনতার কর্মীরা কর্ম করছে সেখানে আমার স্থান নয়। আমার স্থান সৌন্দর্যের সাধকরূপে একা তোমার কাছে।' জীবনের দুই ভিন্ন মহলে কবির এই ভিন্ন ভিন্ন কথা। জগতে বিচিত্ররূপিণী আর অন্তরে একাকিনী কবির কাছে এই দুইই সত্য, আকাশ এবং ভূতলকে নিয়ে ধরণী যেমন সত্য।" পরিপূর্ণ যৌবনের অনুভূতি সম্পর্কে আশী বৎসর বয়সের এই বিশ্লেষণ থেকেই রবীন্দ্রমানসের অন্তর্মুখিতা ও বহির্মুখিতার দ্বন্দ্বলীলার সম্যক পরিচয় পাওয়া যাবে। সতেরো-আঠারো বৎসরের রচনা কবিকাহিনীতে তার প্রথম আদলটি গড়ে উঠেছে মাত্র। কবিকাহিনীর কবিস্বপ্ন রবীন্দ্রনাথেরই কবিজীবনের আদিসৃষ্টি। তাই কবির এই প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থখানিকে 'পরের অনুকরণ' বলে অগ্রাহ্য করা অযৌক্তিক হবে। কবিকাহিনীই রবীন্দ্রনাথের 'স্বপন-বৃতি সোপনচারী' কবিসত্তার আদর্শনিষ্ঠ আত্মজীবনী। এই অর্থেই গ্রন্থখানির গুরুত্ব অপরিসীম।

[ক্রমশঃ

রাতটা স্তব্ধ। লাইটটা নেবানো। ঘরটা তাই অন্ধকার। আবহাওয়া উত্তপ্ত। শ্বাস টানতে যেন একটু কষ্ট হয়। তবু ভালো। এই বেশ। চুপচাপ শুয়ে থাকা। আর চিন্তা করা। ভাবলো সুলতা। পাতলা অন্ধকারে সে বাঁ হাতটা তুললো। হাতের রেখাগুলো দেখতে চাইলো। হাতটাকে পুরোপুরি দেখা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে একটা ছায়া। সুলতা এই ছায়াটাকেই পরখ করার জন্য করলো। সুলতা শিক্ষিত

শিক্ষয়িত্রীর কাজ করে। জ্যোতিষীদের কখনো বিশ্বাস করতো না। অথচ ওর জানা শোনা একজন ওকে বলেছিলো, আপনার অনেক কষ্ট আছে। আরও কতো কি বলেছিলো। মনে নেই। কথাটা আজ অনেক দিন পরে মনে পড়লো। সেই জন্যই বা হাতটা ওপরে তুলে দেখতে চাইলো। রেখা সে চেনে না। তবু দেখতে চাইলো। মনে মনে হাসলো সুলতা। মানুষের কপালে দুঃখ থাকবে, এটা তো অতি স্বাভাবিক কথা। বিশেষত গরীব মানুষগুলো তো এই সমাজ ব্যবস্থায় কষ্ট পাবেই। একটা বাচ্চে মন্তব্য করার জন্য সুলতার মনটা উসখুস করে উঠলো।

সুলতা পাশ ফিরলো ঘুম আসছে না এখন। কখন আসবে জানা নেই। বছরের পুলো রাত্রি এমন ভাবে কাটে সুলতার। চায় না। অন্ধকারের মধ্যে দাঁত দেওয়াল চারটে তুলছে বলে মনে হচ্ছে। একটা বদ্ধ দুর্গন্ধে আছে সুলতা। সে যেন বন্দিনী। হঠাৎ ঘরে শ্বাস মনে হল নিজেকে। এতো শ্বাস যেন জীবনে কখনও হয় নি। চাপাতে লাগলো সুলতা ব্লাউজটা খুলে দিল। ঘামে ভিজে গন্ধ হয়ে গেছে। উগ্র গন্ধটা নাকে শুকুলো। নাকটা কুঞ্চিত হয়ে ওঠলো। একটু আরাম লাগছে। একটু খানি জানালাটা খোলা।

আকাশটা দেখা যায়। নীল আকাশ তারায় ভরা। আকাশটা কতো উদার। আর সুন্দর। তারাগুলো ঝিকমিক করছে। আমি যদি ওই একটা তারা হতাম। আকাশের গায়ে বাঁধা থাকতো আমার। পৃথিবীটাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম। আমি তারা। তারার মধ্যে আমি হারিয়ে যাই যদি। ধরো হারিয়ে গেছি। তা হলে? আমার বয়স পৃথিবীর চেয়ে বেশী হতেও পারে বা কমও হতেও পারে। সৃষ্টির সেই আদিকাল থেকে এই পৃথিবীটাকে দেখে আসছি। কেমন করে মানুষ এলো। সভ্যতার সৃষ্টি হোল। সব দেখেছি। আশ্চর্য ক্লান্ত মনেও এসব ভাবতে পারলো সুলতা। শিক্ষয়িত্রী সুলতা চৌধুরী ভাবনাটা কেমন তাল গোল পাকিয়ে গেলো।

পাশের ঘরে একটা শব্দ হলো। পুরনো ভাবনার সুতোটা মুহূর্তেই ছিঁড়ে গেলো। কানটা খাড়া করলো। এরপর আর কিছুই শোনা গেলো না। ঐ ঘরটায় দাদা ছিলেন। সৌমিত্র চৌধুরী এতোদিন ওই ঘরে বন্ধ হয়ে ছিলো। আমার দাদা। দাদা কেমন করে এমন হোল? অবশ্য তার হাব ভাব দেখে কল্পনা করা গিয়েছিলো বা ধরে নেওয়া চলে ছিলো একটা কিছু ঘটবে। অসম্ভব রকমের একটা কিছু হবে।

বাড়ীর পাশেই রেল লাইনের ছড়াছড়ি। সাপের মতো জড়াজড়ি করে পড়ে রয়েছে। গাড়ী ছুটছে তীক্ষ্ণ বাঁশী বাজিয়ে। ঝক্ ঝক্ শব্দ মিশছে বাতাসের গায়ে। সেই শব্দ শুনতো দাদা। কখনও বা রেল লাইনের মাঝখানে বিলটাকে দেখতো তীক্ষ্ণ চোখ দিয়ে। ক্যাপার মতো দেখতো। যেন পরশ পাথর খুঁজছে। শান্ত ঢেউ গুলো জলের গায়ে খেলতে খেলতে চলে যায়। রেল লাইন ছাড়িয়ে কারখানা। চিমনী থেকে দলিল পাকিয়ে কালো ধোঁয়া উড়ে। দূর থেকে মনে হয় ঐ ধোঁয়াগুলো বুঝি নীলাকাশের সঙ্গে মিতালি পাতাবার জন্য মিছিল করে ছুটছে। সৌমিত্র ঘরের খোলা জানালাটা দিয়ে বাইরের এই টুকরো টুকরো ছবিগুলো দেখতো। আর ভাবতো। কি অর্থ করতো কে জানে? সারাদিন চুপ করে থাকতো। না। মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে উঠতো। কি বলতো বোঝা যেতো না।

একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম দাদাকে, কি অতো ভাবছো দাদা। কথা বলো। এমনি করে থাকলে পাগল হয়ে যাবে তুমি। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো আমার চঞ্চল চোখের তারার দিকে। আমার উত্তেজনা দাদার শরীরে একটু ঘামি দোলা দিতে পারলো না। আমি বুঝি হারালাম। ডাক্তার দেখালাম। বড় বড় ডাক্তার। সবাই একসঙ্গে মাথা নীচু করলো। বুঝলাম, আশা নেই। দাদা। আমার দাদা। অথচ সেই তো সংসারের ভার নিতো আজ। কিন্তু···মা কাঁদলেন। তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা খুঁজে পেলাম না আমার অভিধান থেকে।

দাদা পাগল হ'লো। বাড়ী থেকে পালিয়ে গেলেন। কেন পালালো? এখন আমরা কি করবো? কি করি? আমি কি করবো? থানায় খবর দিলাম। রেডিও অফিসে জানিয়ে রাখলাম। আর সব পত্রিকাগুলোতেও লিখলাম। দাদাকি একটা পত্রিকাও দেখে না। আমার ছোট্ট চিঠিটা দেখে একটুও কষ্ট হয় না দাদার আশ্চর্য! কিন্তু? দাদা তো সুস্থ নেই। দাদার মস্তিষ্ক···আর ভাবতে পারলো না সুলতা।

না আর ভাবতে পারছি না। শক্তি নেই। মাথা ছিঁড়ে পড়ছে। উঃ অসহ্য যন্ত্রণা। মাথাটা যেন শরীর থেকে এখুনি আলগা হয়ে যাবে। মাথায় হাত দিলো সুলতা। উঃ কি গরম! বরফ পেলে মাথায় চাপাতাম। এইবার একটু ঘুমুবো। ঘুমুতে হবেই আমায়। চোখ বুজলো সুলতা। দাঁত মুখ খিঁচে অসাড় হয়ে পড়ে থাকার চেষ্টা করলো। পায়ের তলাটা এতো গরম। স্নায়ের শিরাগুলো শুদ্ধ আগুন হয়ে ওঠেছে। হাতের চেটো বালিশের তলায় রাখলো। একটু আরাম লাগলো। এমনি থাকলে বেশ হতো। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আবার সেই উষ্ণতা! শিরায় শিরায় আগুনের জ্বালা।

আমি কি পাগল হয়ে গেলাম না কি? পাগল! একটা চিমটি কাটলো সুলতা নিজের গায়ে। যন্ত্রণা অনুভব করলো। যন্ত্রণাবোধ আমার আছে! তাহলে? পাগলেরা কি যন্ত্রণা টের পায়? বোধশক্তি কি ওদের থাকে? দাদা পাগল হয়েছে। ওর বোধশক্তি কি

ছিলো ? কিন্তু দাদাকে যে খুঁজে বের করা উচিত। কোথায় পাওয়া যাবে ? কোথায় ?

রাত বেড়ে গেছে। পাশের বড় বাড়ীর গাড়ী বারান্দার লাইট নিভে গেছে। নিশ্চুপ হয়ে গেছে। কেবল কর্পোরেশনের বাতিগুলো চোখ মেলে রয়েছে। নিস্তব্ধতা ঘরে পড়ছে। কোথায় কোন গলিতে যেন একটা কুকুর ডাকার শব্দ শোনা যাচ্ছে। শব্দটা সুলতার কানে খুব ক্ষীণ হয়ে বাজলো। একটা লোক এলোমেলো ভাবে চীৎকার করতে করতে যাচ্ছে। সুলতাদের বাড়ীর কাছ দিয়ে। ছাদ কুঠুরী থেকে সেই রকমই মনে হচ্ছে। নিস্তব্ধতার গায়ে আঘাত লাগলো। আর মুহূর্তগুলো একটু গরম হয়ে উঠলো। বাইরের এই শব্দগুলোর সংগে একাত্ম হ'তে চাইলো সুলতা। কিছুক্ষণের জন্য। লোকটা বোধ হয় বাড়ী গিয়ে বউকে মারধোর করবে। আবার নাও করতে পারে। অনেকে নেশা করলে নিজেই বিড়বিড় করে। অপরকে টানাটানি করে না। মাতাল লোকটার চেঁচামেচি দূরে মিলিয়ে গেলো। আর সেই সংগে লোকটাকে ঘিরে যে ভাবনা ঘিরে ছিলো, সেটাও দূর হয়ে গেলো সুলতার মন থেকে।

চোখ জ্বালা করছে। মাথার যন্ত্রণাটা কমলো না। আর ঘুমও হলো না। কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে চকঢক্ করে গিলে ফেললো সুলতা। অন্ধকারে জল গড়িয়ে নিতে বিশেষ অসুবিধে হলো না। ওটা অভ্যেস হয়ে গেছে। মেঝেটায় একটু পায়চারী করে নিথর পা দুটোকে একটু চালনা করার ইচ্ছে হলো। কয়েকবার হাঁটলো সুলতা। তারপর আবার বিছানায় শুয়ে পড়লো।

সুলতা শুয়ে শুয়ে খোলা চোখে অনেকগুলো মানুষের মিছিল দেখলো। এরমধ্যে অনেককে চিনতে পারলো। আবার অনেককে পারলো না। এই তো মীরা। আবার ছোট বোন। সুলতার পরেই মীরা। কষ্ট হয় মীরার জন্য। শুকনো গোলাপের মতো বাসি মুখ। কি একটা অবাক যন্ত্রণা বুকে করে যেন দিন কাটাচ্ছে। ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরেছে মীরা। স্বাস্থ্যটা ওর বেশ সুন্দর। আর চেহারাটাও। একটা রূপের ভাব আছে। পা থেকে কোমর, কোমর থেকে বুক সব কিছুতেই যেন ছন্দ আছে। নাচের ছন্দ। ব্লাউজটা যখন ওর আট সাট বুকে লেগে থাকে, তখন খুব ভাল দেখায়। মীরা যেন কি রকম হয়ে যাচ্ছে আজকাল। মনটা চঞ্চল হ'য়ে ওঠে প্রায়ই। নিচতলার অতনুকে দেখলে যেন পাগল হয়ে ওঠে। কতদিন লক্ষ্য করেছি কারণে অকারণে ও নিচে নেমে যায়। ডেকে সাড়া পাওয়া যায় না। অতনুকে চোখে দেখার জন্য মন ছটফট্ করে বোধ হয়। চোখের ওপর চোখ রাখা। মুহূর্তের জন্য। এর মধ্যে অনেক আনন্দ বেদনা, আশা। কিন্তু মীরার এই মেলামেশা আমার ভালো লাগে না। বলবো একদিন ডেকে ওকে, বয়স হয়েছে তোমার মীরা। সব কিছু বুঝে চলা উচিত। আর তাছাড়া···তাছাড়া কি ? ভাবতে পারলো না সুলতা। সুরটা যেন ঠিক ধরতে পারলো না। অতনুরা ওদের ভাড়াটে। ভাড়াটের সংগে অত মেলামেশা করাটা কি উচিত ? সম্মান বলে একটা জিনিষ আছে। কিন্তু মীরা যদি বলে বসে ভাড়াটে হয়েছে তো কি হয়েছে ? অতনু পুরুষ। এটাই ওর সব চেয়ে বড় পরিচয়। আর আমি নারী। পুরুষের কাছে নারীর চাওয়ার একটা স্বাভাবিক দাবী আছে। অতনুর কাছে সেই দাবী আমি রাখতে চাই। তবে কি জবাব দেবে সুলতা ? সত্যি মীরা কি এতো নিচে নামতে পারবে ? কই আমাকে দেখ তো মীরা ? আমার দিকে একবার চেয়ে দেখ। তোদের জন্য আমি যোগিনী সেজেছি। মানবকে ফিরিয়ে দিয়েছি। মানব কি তোর অতনুর চেয়ে অসুন্দর ছিলো ? লেখাপড়া কি কম জানতো তোর অতনুর চেয়ে ? না কিছুতেই কম ছিলো না ? তবু মানবকে আমি আমার জীবনের মাটি থেকে উপড়ে ফেলেছি তোদের মুখ চেয়ে। বলবো আমি মীরাকে। সবই বলবো। হ্যাঁ চেঁচিয়েই বলবো। না। আমি ভালবাসি না মীরু, তোমাদের এই গোপন অভিসার। তোমার ভালর জন্যই বলছি। কি ভাল করবো আমি মীরার ? কত টুকু ? লেখা পড়া শেখাবো। মানুষ করবো। মানুষ করা মানেই তো সেই মাস্টারী, নয় তো কেরানী-গিরি। তবু চেষ্টা করবো। ফেরাবো আমি ওকে। এ সব কথা তো কতো দিন ভেবেছি। বলি বলি করেও তো বলতে

সন্ধ্যাকে
আশ্চর্য !
চৌধুরী ভাবলো।
মেয়েদের বক্তের সঙ্গে এমনি অঙ্গাঙ্গিভাবে

মিথিলটা
পায়ে পায়ে এগোচ্ছে। বিদ্যাপতি
যোগ। না সুলতার।
কেমন যেন পায়ে পড়া স্বভাব। কথা বলার প্রয়োজন না
চৌধুরীর ভাবি বিশ্রী
সুলতার বুকের দিকে
ছিলো বিদ্যাপতি। স্কুলের
বিদ্যাপতির টেবিলের অপর
পার্শ্বে বসে কথা বলছিলো পড়ার কথার চেয়ে
পারিপার্শ্বিক কথাই বেশি করেছিলেন বেশি। একটা
সুলতাকে ঘিরে নেচে বেড়াচ্ছিলো।

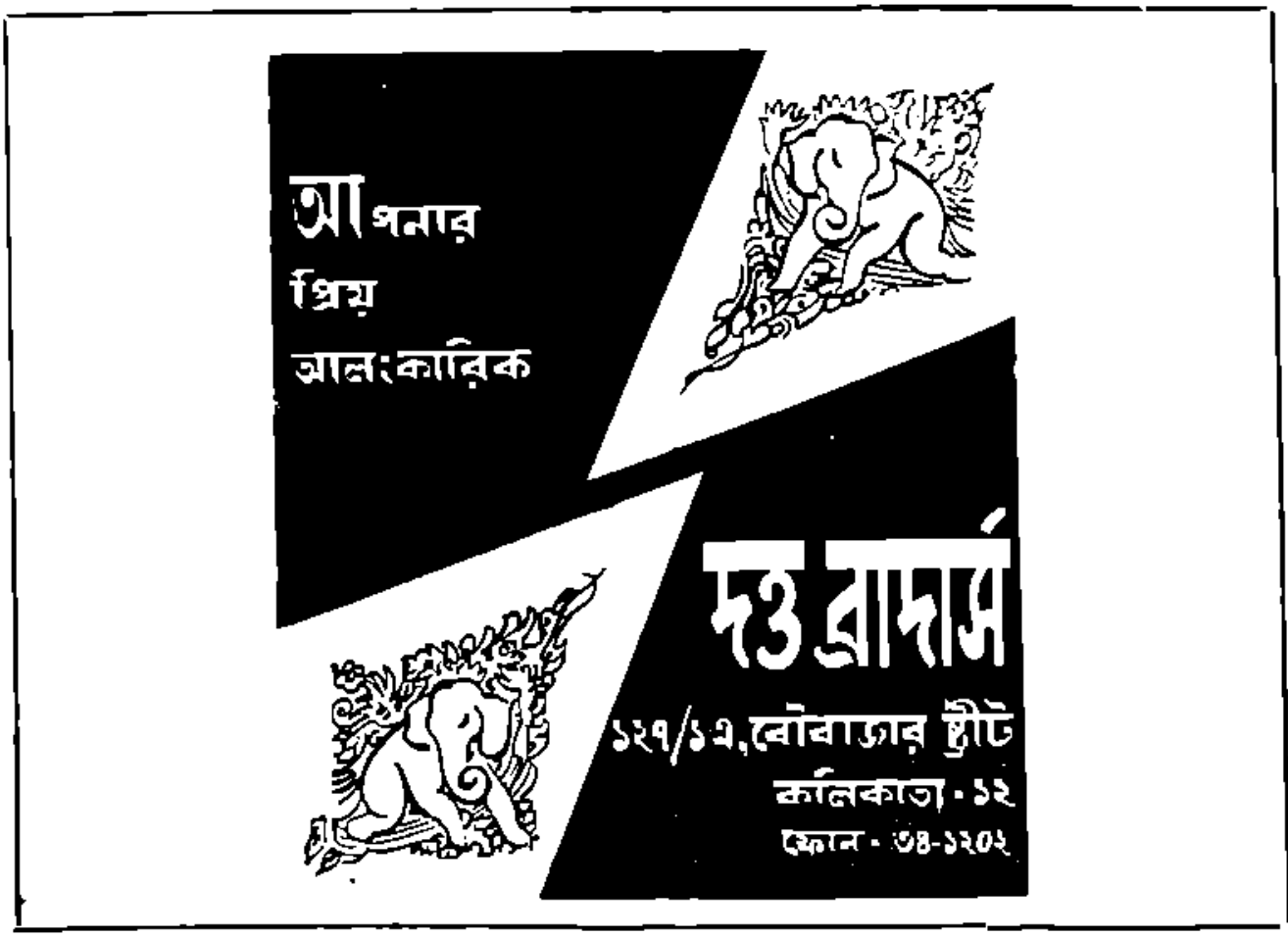

বিদ্যাপতির হাসিটাকেও অদম্ভব রকমের ভয় করছিলো। সমস্ত পুরুষ জাতটার ওপর ঘৃণা জমে উঠেছিলো। ইচ্ছে করছিলো বিদ্যাপতির চেম্বার থেকে এখনই বেরিয়ে পড়ার। চাকুরী করতে এসে ইস্তফা দিতে পারবে না সুলতা। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও উঠতে পারলো না। চেয়ারের সংগে আঠার মতো আটকে রইলো ওর কোমর। ইচ্ছে করছিলো বুকটাকে ঢেকে একটু নড়ে চড়ে বসতে। তা ও পারে নি সেদিন সুলতা। আবিষ্টের মতো বসেছিলো। তবে বিদ্যাপতির শেষ কথাটা শুনে খুব খুশি হয়েছিলো।

—হ্যাঁ আপনার মতো ইয়ংদেরই দরকার আমার স্কুলের জন্য। মাসের প্রথম থেকেই জয়েন করবেন। বিদ্যাপতির গোঁফের ফাঁক দিয়ে চটুল হাসি বেরিয়ে এসেছে। আশ্চর্য, সমস্ত ঘৃণা উবে গিয়েছিলো সুলতার। যে ঘৃণায় এতোক্ষণ ভরেছিলো সুলতার মন, সেখানেই আবার অনেক শ্রদ্ধা জন্ম নিলো বিদ্যাপতির জন্যে।

হেডমাস্টার। নিবারণ চট্টোপাধ্যায়। খুব চমৎকার লোক। সব সময় হেসে কথা বলেন। ব্যবহার জানেন। ছাত্রদের সংগে যেমন, শিক্ষকদের সংগেও তেমনি। মাথা পাকা চুলে ভর্তি। চোখে মোটা চশমা। একটা শ্রদ্ধা জাগে ভদ্রলোকের ওপর। সুলতাকে তুমি করেই বলেন নিবারণ বাবু। বাবার মতো দেখতে অনেকটা নিবারণ বাবুকে। সেই শান্ত, সৌম্য মূর্তি। রেগে গেলে চুপ করে থাকেন। রাগটাকে দমন করেন।

—সুলতা, তুমি বরং কয়েকদিন বিশ্রাম নাও। শরীরটা দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে তোমার। সেক্রেটারীকে বলে ঠিক করে দিই। বলছিলেন নিবারণ বাবু।

সুলতা অবাক্ হচ্ছিলো। সত্যিই কি শরীর খারাপ হয়ে গেছে নাকি? বাইরেও তাহলে শরীরের কৃশ ভাবটা ফুটে ওঠেছে। না ওটা সুলতার মনের দুর্বলতা।

—না মাস্টার মশাই, দরকার নেই। এমনিতেই ঠিক হয়ে যাবে। সুলতা হেসে জবাব দিয়েছে। কিন্তু বাংলার টিচার রমা দেবীর সামনেও সুলতাকে কথা শুনতে হয়েছে—কি করিস তুই আজকাল। চেহারাটার দিকে কি মজর দিস্? যা হাল হয়েছে এরই মধ্যে! ক'দিন রেস্ট নে। চা খেতে খেতে বলছিলেন রমা দি। রমা দেবীর কথাটা শুনে চায়ের স্বাদটা যেন হঠাৎ বিস্বাদ লাগছিলো সুলতার কাছে। মনে হল, সত্যই তার শরীর খারাপ হয়ে গেছে। ভীষণ ক্লান্তি বোধ করলো। শরীরটা যেন অবশ হয়ে আসতে লাগলো। চোখ দুটো ভেতরে টানছে। চা শেষ করতে পারেনি সুলতা। ঘণ্টা পড়ার সংগে সংগে প্রাত্যহিক নিয়মানুসারে ক্লাসে ঢুকেছে।

আরশুলা আর ইঁদুরের পাশাপাশি বেড়ে গেছে আরও তীব্র ভাবে। শব্দগুলো কানে আসছে সুলতার। বিশ্রী শব্দ। ভয়ংকর শব্দ। মৃত্যুর সিগন্যাল যেন। একটা সংকেত শুনতে পেলো সুলতা। আমি মরবো। মরে যাবো। বাঁচবো না। বাঁচতে ইচ্ছে করে না আমার। মৃত্যুর আহ্বান শুনতে পাচ্ছি। সুলতার স্বাস কি বন্ধ হয়ে আসছে? ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। মানুষ মরার আগে যেমন হয়, ঠিক তেমনি হয়ে গেছে সুলতার। পাশের বাড়ীর পিন্টু বেবার মারা গেলো, ওর শেষ সময় সুলতা বসেছিলো শিয়রের পাশে। নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে পিন্টুর চোখ দুটো স্থিমিত হয়ে এলো। হাত পা ঠাণ্ডা। সাপের গায়ের মতো। নিঃসাড় হয়ে পড়ে আছে পিন্টুর দেহটা। সুলতা তখনও বুঝতে পারে নি, পিন্টু এইবার মরবে। বুঝতে পারলো যখন পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে গেলো পিন্টুর চোখ। পলক পড়লো না, চোখের পাতা বুজলো না অনেকক্ষণ পরও। পিন্টুর মার চিৎকারে আরও স্পষ্টভাবে বুঝতে পারলো যে পিন্টু সত্যি সত্যি মরে গেছে। পিন্টু। সেই ছেলেটা। সুন্দর স্বাস্থ্য নিয়ে ঘোরাফেরা করতো। ঘাম জড়ানো দেহটা নিয়ে খেলার পর ফিরে আসতো। মাঝে মাঝে আসতো সুলতার কাছে। গল্পের বই চেয়ে নিয়ে যেতো। চোখের সামনেই চলে গেলো পিন্টু। এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিলো। পুড়ে ছাই হয়ে গেলো বলবান স্বাস্থ্যটা। মৃত্যু! কি বীভৎস আর কর্কশ। সুলতা আজ সেই কর্কশকেই আহ্বান করবে। বাঁচতে ইচ্ছে করছে না। একটু ও না। আবিষ্টের মতো উঠে বললো সুলতা।

আলমারির কাছে এগিয়ে গেলো। সমস্ত হতাশা ওকে চেপে ধরেছে। শিশুর মতো সে ও উধাও হয়ে যাবে। হাতটা বাড়ালো। একটা শিশি চেপে ধরলো। মালিশের ওষুধ। ওপরে বড় অক্ষরে 'বিষ' লেখা রয়েছে। হাতিয়ার পেয়ে গেছে সুলতা। এর সাহায্যে নিজেকে ধ্বংস করা যায়। সুলতার বুকটা কাঁপতে লাগলো। শিশির ঢাকনাটা খুলে ফেলার জন্য প্রস্তুত হলো। চোখের সামনে সোটা শিশিটাকে মেলে ধরলো। অনেকক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো কালো ওষুধ গুলোর দিকে। মৃত্যু। মৃত্যুর রঙ ওই কালো মালিশের ওষুধের মতোই কালো। সুলতা হাসলো। হাতটা অল্পস্বল্প কাঁপছে। সেই সংগে বুকটাও। আবার ঘামতে শুরু করেছে সুলতার সারা শরীর। কপাল বেয়ে টপ্ টপ্ করে ঝরছে ঘাম। দেরী করা চলবে না। বিদ্যুতের ঝিলিকের মতো এক ঝটকায় শিশিটার মুখটা খুলে ফেললো সুলতা। একটা কাগজে খস্ খস্ করে লিখলো। হাতটা চুকিয়ে একদলা কালো বিষ মুখের কাছে তুলে ধরলো। হঠাৎ আয়নার দিকে চোখ পড়লো সুলতার। কে? কে এটা? একি, সুলতার চেহারা! একি আমি? আমি এই রকম কুৎসিৎ! এতো বিশ্রী কেন? এমন হয়ে গেছি কেন? না, আমি তো এমন ছিলাম না। এর চেয়ে আরও অনেক সুন্দর ছিলাম। হ্যাঁ অনেক সুন্দর। মানব তার সাক্ষী। সে আমায় ভালবেসেছিলো। আয়নার প্রতিফলিত চেহারাটার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো সুলতা।

মা। কি সুন্দর আমার মা। মীরা। অতনু। স্কুল। বিদ্যাপতি। নিবারণ বাবু। রেবা দি। সুমিতা। নমিতা। কিরণ—সিনেমার রিলের ছবি কতগুলো ছবি দেখতে পেলো সুলতা। একসংগে অনেকগুলো দৃশ্য। ওরা সবাই ডাকছে। আরও একটু দূরে ওরা সবাই চলছে এগিয়ে। ওই বিছিলটার সংগে এগিয়ে চলছে। সুলতা অনেক পিছনে পড়ে আছে। ওরা সবাই পেছনে ফিরে তাকিয়েছে। সুলতার আসার জন্য কি অপেক্ষা করছে? সুলতাও যাবে ওদের সংগে। ওই বিছিলটার সংগে এগিয়ে যাবে।

—আমিও যাবো তোমাদের সঙ্গে। দাঁড়াও, আমিও যাবো। আমিও।

চীৎকার করে উঠলো সুলতা। সংগে সংগে চেতনাহীন দেহটা লুটিয়ে পড়লো মেঝের বুকে। চীৎকারের বীভৎস শব্দে ঘুম ভাঙলো সুলতার মার। ছুটে এলেন তিনি। পেছন পেছন মীরাও। দরজাটা ভেজানো ছিলো। ধাক্কা দিতেই খুলে গেলো। সুলতার চোখ বোজা। মাথা ফেটে কিলবিল দিয়ে রক্ত ঝরছে। মালিশের শিশিটা কিটবে পড়ছে ঘরে। মাথাটা ভেঙ্গে গেছে শিশিটার। আয়োডিন দিয়ে ভাল করে ক্ষত জায়গাটা বাঁধলো মীরা। ডেটল দিয়ে পরিষ্কার করে নিলো আগে। সুলতার দেহটাকে ধরাধরি করে খাটের ওপর তুললো। চোখে মুখে জল ছিটিয়ে দিলো। অনেকক্ষণ পর চোখ খুললো সুলতা।

মীরা আনন্দে কেঁদে ফেললো। সুলতা জড়িয়ে ধরলো মাকে। নিভাননী সুলতার কপালে চুলে পিঠে স্নেহ ঢেলে দিলেন হাত বুলিয়ে।

মীরা ওঠে গেলো,—একটু দুধ নিয়ে আসি মা।

সুলতা বাধা দিলো না। মায়ের বুকে মুখ গুঁজে পিট্ পিট্ করে তাকিয়ে রইলো। গলা জড়িয়ে ধরে বললো,—ওই মালিশের ওষুধ ফেলে দাও না মা! নিভাননী দেবী কথা মতো কাজ করলেন। সুলতা বাইরের দিকে তাকালো।

কি, চমৎকার রোদ উঠেছে। সকালটা এতো সুন্দর! ভোরের রঙে নতুনত্ব খুঁজে পেলো যেন সুলতা। এই এতো বছরের মধ্যে ওই রঙের অর্থ যেন বুঝতে পারে নি আর একটা অদ্ভুত স্বাদ খুঁজে পেলো।

দাদার খবর কিছু পেলে মা? মায়ের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো সুলতা! নিভাননী আজ নির্বিকার কণ্ঠে উত্তর দিলেন পাওয়া যাবে। ভাবিস্ না। ভুই ঘুমো।

সুলতা কথা বাড়ালো না। সে আরামে চোখ বুজলো। সকালের নরম রোদ্দুরের আমেজটা মনে মনে অনুভব করার চেষ্টা করলো। রোদ্দুরের স্বাদ যেন শিরায় শিরায় ছড়িয়ে পড়ছে।

নতুন বিচিত্রা

আধুনিক বাংলা কাব্যের সূচনা—সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক: এডুকেশনাল এণ্টার প্রাইজার্স, কলিকাতা-১৯। মূল্য—২·৫০।

শ্রীযুক্ত সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'আধুনিক বাংলা কাব্যের সূচনা' গ্রন্থটি 'রাম গুণাকর ভারতচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্ত', 'জাতীয়তাবাদী রঙ্গলাল', 'বাংলা কাব্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত', 'বাংলা কাব্যে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়', 'বাংলা কাব্যে বিহারীলাল চক্রবর্তী' ও 'বাংলা কাব্যে নবীনচন্দ্র সেন'—এই সাতটি প্রবন্ধের সংকলন।

'রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র' প্রবন্ধে লেখক ভারতচন্দ্রের সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে তাঁর কাব্যে সমকালীন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়া ও প্রতিফলনের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তারপর ভারতচন্দ্রের কাব্যবস্তুর সারসংক্ষেপ করেছেন অতি অল্প কথায়। কবির শব্দসম্পদ বর্ণনা-কৌশল প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনাও অত্যন্ত স্বল্পরেখ। ভারতচন্দ্রের কাব্যে যে অশ্লীলতার অভিযোগ অনেক কাল ধরে চলে আসছে সে অভিযোগকে তিনি যুগ বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষাপটে রেখে বিচার করেছেন।

ঈশ্বর গুপ্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিহারীলাল চক্রবর্তী এবং কবি নবীনচন্দ্র সেন সম্পর্কিত আলোচনার ধারাও একই রীতির। সমস্ত প্রবন্ধগুলিতেই তিনি সমকালীন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত আলোচনাকে প্রবন্ধের মুখবন্ধ হিসাবে ব্যবহার করেছেন।

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ বিবর্তনের উঠা পড়া ব্যক্তিমানুষের মানসিকতাকে প্রভাবিত করে। প্রভাবিত করে বলেই সাহিত্যের সঙ্গে ইতিহাসের নিগূঢ় সম্পর্ক বর্তমান।

প্রবন্ধকার তাঁর প্রবন্ধে সাহিত্য ও ইতিহাসের পারস্পরিক সম্পর্কের কথা মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হন নি। তাই তাঁর এ সমালোচনা ঐতিহাসিক ধারার অনুবর্তন।

আলোচ্য প্রবন্ধগুলিতে লেখক কোন নতুন কথা বলবার চেষ্টা করেন নি। তিনি যে কালটাকে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছেন তা বহু আলোচিত। কিন্তু পুরানো কথাকে নতুন ভঙ্গিতে সুন্দরভাবে বলবার ক্ষমতা প্রবন্ধকারের করায়ত্ত। সে ক্ষমতার অধিকারে সব প্রবন্ধগুলি সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে। এখানেই প্রবন্ধগুলির সার্থকতা।

গ্রন্থটিতে মুদ্রণ-প্রমাদ যথেষ্ট রয়েছে। ত্রুটিপূর্ণ পরিবর্তে সূত্র পত্রী রূপে ইংরিজির উল্লেখ মুদ্রণ প্রমাদ কি না সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহের অবকা

মেঘে ঢাকা চাঁদ—শ্রীমতী নিবেদিতা নাথ। প্রকাশক: নাথস্ ব্রাদার্স অফ্ টাইপরী। ৮।২, চন্দিটোলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩।

পঞ্চাশটি কবিতার সংকলন 'মেঘে ঢাকা চাঁদ।' কবি পরিচিতিতে দেখি শ্রীমতী নাথ কিশোরী এবং এই যুগ সন্ধিকালের উচ্ছ্বাস ও আন্তরিকতা তাঁর সবকটি কবিতাতেই পরিস্ফুট। জীবনের বিভিন্ন দীক্ষা ও বিচিত্র অনুভূতিকে ভিত্তিমূলে করে তাঁর সবকটি কবিতা রচিত আর অধিকাংশ কবিতার মধ্যেই রয়েছে মিল ছন্দের প্রতি ঝোঁক। আমাদের বিশ্বাস, শ্রীমতী নাথের অকাল মৃত্যু না হলে বাংলা সাহিত্যে তাঁর আরো অবদান থাকত।

বিবাহ বিচ্ছেদ

অমল হালদার

কিছুদিনের আকর্ষণকে চিরজীবনের সম্পর্কে পরিণত করবার অভিপ্রায় নারী পুরুষের প্রথমে ছিল না। ক্রমশঃ সামাজিক প্রয়োজনে সাময়িক ভালোলাগাকে বিবাহ বন্ধনে পরিণত করবার তাগিদ এল। নবজাতকের লালন পালনের দায়িত্ব নির্দিষ্ট করবার সুবিধা না থাকলে অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে সমাজের উন্নতি ও বিকাশ সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে বিবাহ মানব-সভ্যতার অগ্রগতির পথে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ধাপ। আমরা বিবাহের বন্ধন মেনে নেবার পর সমাজের বনিয়াদ দৃঢ় হয়েছে।

সমাজ রক্ষার তাগিদে যে অনুষ্ঠানকে প্রথম স্বীকার করে নিয়েছি ধীরে ধীরে তার সঙ্গে ধর্ম যুক্ত হয়ে গেল। দ্বৈচ্ছাকৃত বন্ধন ক্রমশঃ আইনের চোখে স্বীকৃতি লাভ করল। আজকের ভালোলাগাকে চিরস্থায়ী করবার জন্য ধর্ম, আইন ও সামাজিক প্রথা যখন ষড়যন্ত্র করল তখন আমাদের খেয়াল হলো এই অনুষ্ঠানের মধ্যে এক বিরাট ফাঁকি রয়ে গেছে। ভালোলাগা শেষ হয়ে যাবার পরেও যখন বন্ধন থেকে যায় তখন তা দুঃসহ লাগে। বিবাহে বন্ধনকে শিথিল করবার জন্য শুরু হল সংগ্রাম। দীর্ঘকাল সংগ্রামের পর বিবাহ বন্ধন কোনো কোনো ক্ষেত্রে ছিন্ন করা আইন সিদ্ধ হল। ইংলণ্ডে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করবার সূচনা হয়েছে একশ'বছর পূর্বে। ১৯৫৭ সালে সে দেশে বিবাহ বিচ্ছেদের শতাব্দী পূর্ণ হয়েছে। এই উপলক্ষে সমাজ বিজ্ঞানীরা আলোচনা করবার সুযোগ পেয়েছেন। একশ'বছর ধরে বিবাহিত নর-নারীর সম্পর্ক বিবর্তিত হয়েছে কোন পথ ধরে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক সবচেয়ে অন্তরঙ্গ এবং এর প্রকৃতি সমাজের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং সমাজ বিজ্ঞানীর পক্ষে এই একশ' বছরের ইতিহাস বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ইংলণ্ডে খৃষ্টান বিবাহ এবং আমাদের বিবাহ বিচ্ছেদের মধ্যে একটি পার্থক্য প্রথমেই চোখে পড়ে। ইংলণ্ডে বিবাহ বিচ্ছেদের আইন ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে বর্তমান রূপ লাভ করেছে। আমাদের আইন প্রথম থেকেই যতটা উদার ইংলণ্ডের আইন তেমন ছিল না।

রিফরমেশান পর্যন্ত বিবাহ সম্পর্কিত মিয়মকানুনের

কর্তৃত্ব ছিল গির্জার উপর। ইংলণ্ডের সাধারণ আইন বিবাহের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারত না। নর নারীর যৌন সম্পর্ক বৈধকরণই বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য। খৃস্টান ধার্মিক সম্প্রদায় যৌন জীবনের বিরোধী ছিলেন। শুধু তাঁরা নন; পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ই নারী-সঙ্গের বিরুদ্ধবাদী। তাই ধর্মের জন্য যাঁরা জীবন উৎসর্গ করেন তারা অবিবাহিতের সন্ন্যাসী। সৃষ্টি রক্ষার জন্য বিবাহকে স্বীকার করে নেওয়া অত্যাবশ্যক, এই হল খৃস্টান ধর্মযাজকদের মনোভাব। বিয়ের প্রতি সহানুভূতি না থাকায় যথাসম্ভব বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। গির্জার অধিকার যতদিন ছিল ততদিন সাধারণতঃ দু'রকমের বিয়ে প্রচলিত ছিল। বর কনে গির্জায় গিয়ে খৃস্টান রীতি অনুযায়ী যখন বিয়ে করে সেটাই আসল বিয়ে; সে বিয়ে বাতিল করানো প্রায় অসম্ভব হত। গির্জায় না গিয়ে নারী পুরুষ যদি ভবিষ্যতে স্বামী স্ত্রীরূপে বসবাস করবে বলে শপথ করে তাহলে এই সম্পর্ককে বিবাহের মর্যাদা দেওয়া হবে।

গত বছর বা তার বেশী বয়সে কোনো ছেলেমেয়ে অভিভাবকের অনুমতি না নিয়ে এরূপ বিয়ে করতে পারত। দ্বিতীয় শ্রেণীর বিয়ে প্রধানত দরিদ্রদের মধ্যে হ'ত কারণ তাহলে গির্জার প্রাপ্য অর্থ দিতে হত না। বিয়ের ফীটা বেশ মোটা ছিল। আর এ ধরণের বিয়েতে সম্পর্ক ছিন্ন করা ছিল অপেক্ষাকৃত সহজ। মধ্যযুগে গির্জার কর্তৃপক্ষ এমন বিবাহ বিচ্ছেদ অনুমোদন করতেন না যার ফলে স্বামী বা স্ত্রী পুনরায় বিয়ে করতে পারে। শুধু ব্যভিচার ও চার বছর যাবৎ কেউ একজন যদি অপরকে ত্যাগ করে দূরে থাকে তাহলে স্বামী-স্ত্রীকে পৃথকভাবে বাস করবার অনুমতি দেওয়া হত।

রিফরমেশানের পর ধর্মযাজকদের হাত থেকে ক্ষমতা চলে গেল। দেশের সাধারণ আইন বিবাহের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হল। বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্বন্ধে কিছু সামান্য সুযোগ সত্ত্বেও সাধারণ-লোক তার দ্বারা উপকৃত হত না। 'প্রাইভেট অ্যাক্ট' অনুসারে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা পরিচালনা করতে অন্তত দশ হাজার টাকা খরচ হত। সুতরাং এর যা কিছু সুবিধা একমাত্র ধনীরাই নিতে পারত। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হওয়ায় গভর্ণমেণ্ট লর্ড ক্যাম্পবেলের সভাপতিত্বে ১৮৫০ সালে বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পর্কে রিপোর্ট দেবার জন্য রয়েল কমিশন নিযুক্ত করা হয়। এই কমিশনের প্রস্তাবানুযায়ী ১৮৫৭ সালে ম্যাট্রিমনিয়েল অজেন্স অ্যাক্ট পাশ হবার ফলে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা বিচার করবার জন্য একটি পৃথক আদালত স্থাপিত হয়েছিল। বিবাহ-বিচ্ছেদ এরপর অনেক সুলভ হয়ে যায়। তথাপি দরিদ্রশ্রেণীর নিকট যার সাধ্যাতীত রয়ে গেল। এই আইনের বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ উঠল এই যে আইন মেয়েদের চেয়ে পুরুষদের বিবাহ ছিন্ন করবার সুযোগ অনেক বেশী দিয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ আসলে যতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়, স্ত্রী-স্বামীর বিরুদ্ধে ঠিক সেই অভিযোগ আনলে তার কিছুই প্রায় হয় না। আইনের চোখে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে এই পার্থক্যটা সমালোচনার বিষয় হয়ে ছিল।* ডাঃ জনসন প্রমুখ অনেকে পৃথক ব্যবস্থার সমর্থক ছিলেন। তাঁদের যুক্তি ছিল এই যে, স্ত্রী ব্যভিচারিণী হলে স্বামীর উপর অন্য পুরুষের সন্তানের পিতৃত্ব বর্তানোর আশঙ্কা থাকে। ১৯২০ সালের সংশোধিত আইনে স্বামীর সামান্য ব্যভিচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেও বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার স্ত্রী লাভ করেছে। শুধু যে স্বামী-স্ত্রীর অধিকারের পার্থক্য ছিল তা-ই নয়; ধনী দরিদ্রের মধ্যেও পার্থক্য এসে পড়ে ছিল। ১৯২০ সাল পর্যন্ত বিবাহ বিচ্ছেদের সকল মামলা করতে এত টাকার প্রয়োজন ছিল যে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত জনসাধারণের পক্ষে বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনের সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না।

এর প্রয়োজন হলে মফস্বলের আদালতের সাহায্যে দম্পতি সম্পর্ক রহিত করতে পারত, বিবাহ-বিচ্ছেদের সুবিধা লাভ করবার মতো অর্থবল ছিল না তাদের। একশ'বছরে ধরে নানা পরিবর্তনের ফলে ইংলণ্ডের বিবাহ সংক্রান্ত আইনটি আমূল পরিবর্তন ঘটেছে (আলোচ্য বইয়ের পরিশিষ্টে আইনটি দেওয়া হয়েছে) তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমতঃ সেকালে বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যাপারে স্বামী অধিকতর সুবিধা লাভ করত. এখন স্বামী-স্ত্রীর সমান অধিকার।

দ্বিতীয়তঃ ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত ব্যভিচার ছিল বিবাহ বিচ্ছেদের প্রধান কারণ ; ঐ বছর থেকেই আইনে কয়েকটি নতুন কারণ যোগ করেছে। তৃতীয়তঃ ১৯৪৯ সালে 'লিগ্যাল এইড্ড স্পিকটেন্স' চালু হওয়ায় দরিদ্র জনসাধারণ বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা করবার সুযোগ পেয়েছে।

ইংলণ্ডের বিবাহ-বিচ্ছেদের পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে গত একশ' বছরের মধ্যে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কে আশ্চর্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই সামাজিক পরিবর্তনের ঢেউ আমাদের স্পর্শ করবে না এমন কথা বলা যায় না। পৃথিবীর সকল দেশেই সমাজ জীবনের রূপ প্রায় একই ছাঁচে গড়ে উঠেছে। আন্তর্জাতিক যোগাযোগের এটা অবশ্যম্ভাবী ফল। ১৮৭৬-১৮৮০ সালে ইংলণ্ডে গড়ে প্রতি বৎসর ৪৬০ বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন পেশ করা হয়েছিল। ১৯৫১-'৫৪ সালে-তা বৃদ্ধি পেয়ে বার্ষিক গড় হয়েছে ৩৩, ১৩২। ১৯১১ সালে দশ হাজার বিবাহিত নর-নারীর মধ্যে শতকরা ১.৩৮ জন বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদন করে ছিল; ১৯৫০ সালে এই শতকরা সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় সাতাশ। বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রয়োজন সমাজে যে কিরূপ দ্রুত বেড়ে চলেছে এই পরিসংখ্যান থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। এক যুগের বিবাহিত জীবন বার্থ হয়েছে বলে পূর্বে স্ত্রী পুরুষ ভদ্রলোক সম্বন্ধে যেরূপ চক্ষুলজ্জা ছিল পড়ত, এখন ক্রমশঃ সেই চক্ষুলজ্জার ভাবটা দূর হয়ে যাচ্ছে। তাই দেখতে পাই যে, ১৯১৩ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ করে পুনরায় বিয়ে করেছে এমন নর-নারীর শতকরা হার ছিল প্রায় ৪৮; ১৯৫১ সালের হিসাব থেকে দেখা যায় যে, শতকরা ৭৬ জনেরও বেশী আবার বিয়ে করেছে। স্মৃতিশূন্যতা এবং বিবাহ ও প্রেম সম্বন্ধে ভাবালুতা ধীরে ধীরে যে দূরে সরে যাচ্ছে এটা তারই প্রমাণ।

আর একটি হিসাব থেকে দেখা যাবে বিয়ে ভাঙবার জন্য মেয়েরাই ক্রমশঃ বেশী উদ্যোগী হয়ে উঠছে। ১৮৫৭ থেকে ১৮৬০ সালের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদনের শতকরা ৬২টি করে ছিল স্বামী আর ৫৮টি স্ত্রী; ১৯৫১ সালে স্ত্রী করেছে শতকরা ৭৭টি এবং স্বামী ৪৩টি। ব্যভিচারের অভিযোগে যে সব বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদন করা হয়েছে তাদের বেশীর ভাগই করেছে স্বামী। গত কুড়ি বছরের হিসাব থেকে দেখা যায় যে, পুরুষের তুলনায় মেয়েরাই ব্যভিচারের জন্য বেশী দায়ী ১৯৫৪ সালে ব্যভিচারের অভিযোগের শতকরা ৫০টি করেছে স্বামী ৩৯টি করেছে স্ত্রী। হিসাব থেকে আর একটি জিনিসও ধরা পড়ে। স্বামীকে-স্ত্রীরাই ত্যাগ করে চলে যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে। ত্যাগ করে চলে যাবার অভিযোগ স্বামীদের কাছ থেকেই বেশী এসেছে। শুধু একটি ক্ষেত্রে স্বামীর বিরুদ্ধে মেয়েদের অভিযোগ অনেক বেশী, সেটা হল নিষ্ঠুর ব্যবহারের অভিযোগ। এখানেও কিন্তু মেয়েরাই ক্রমশঃ প্রাধান্য লাভ করেছে। ১৯৩৮ সালে স্বামী-স্ত্রীর নিষ্ঠুর ব্যবহারের জন্য বিবাহ বিচ্ছেদের যে সব আবেদন করেছে তাদের শতকরা হার ভোট সংখ্যার মত ৭৪:—১৯১০ সালে এই হার দাঁড়িয়েছে ২০৮। স্বামীর নিষ্ঠুর ব্যবহার করবার যে একচেটিয়া অধিকার এতদিন ছিল স্ত্রী ধীরে ধীরে তার অংশ গ্রহণ করছে।

এই সব হিসাব থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মেয়েরা যে পুরুষের চেয়ে বেশী গার্হস্থ্যভীরু দাম্পত্য জীবনে একনিষ্ঠ এবং চরিত্রবতী এমন ধারণা সরকারী পরিসংখ্যানের পরিপ্রেক্ষিতে আর থাকে না।

O. R. Gregor বিবাহ বিচ্ছেদের এক শতাব্দীর ইতিহাস পর্যালোচনা করেছেন Divorce in England. নামক গ্রন্থে, কিন্তু বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্প্রতি আইনসিদ্ধ হয়েছে। কয়েক বছর পূর্বে সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকার সংবাদে দেখেছি যে একমাত্র আলিপুর জেলা আদালতেই প্রায় 'চারশ' বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা বিচারাধীন। অতএব ম্যাকগ্রেগরের বইটির মূল্য আমাদের নিকট শুধু তথ্যগত নয়; ইংলণ্ডের এক শতাব্দীর অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বিবাহ-বিচ্ছেদ সংক্রান্ত সমস্যাগুলি সমাধান করতে সহায়তা লাভ করবে। আমাদের কর্তৃপক্ষ-বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদনের এমন বিশ্লেষণমূলক পরিসংখ্যান সংকলন করলে আমাদের সামাজিক জীবনের মূল্যবান তথ্য পাওয়া যাবে।

'এই মাটির মানুষ'

মণি গঙ্গোপাধ্যায়

"ছেলে আমার কেন এমন হল!"

কান্নায় ভেঙে পড়ল মেরীর কণ্ঠস্বর। কাসির দমক সামলে জোসেফ তাকালেন স্ত্রীর পানে। বেচারির চোখের কোলে দিনিস্থ রজনীর ম্লান রেখা ভোরের আবছা আলোতেও চোখে পড়ল, চোখে পড়ল সারা মুখে ক্লান্তির কালিমা। রুগ্ন স্বামীকে সামলাতে গিয়ে বেচারির সারা রাত দু-চোখের পাতা পড়ে না। পাশের বিছানায় ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে আছে। এক ফালি নরম আলো দোয়াদী পাতের মত লাফিয়ে পড়ল বিছানার মাথার দেয়ালে। সূর্য উঠছে, ধীরে ধীরে জাগছে নাজারেথ। একটু দূরের মাটির টিলার মাথায় লাল ফালর দুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা মুরগি, গলা ফুলিয়ে এখনি ডাক দেবে। পাহাড়ের গা বয়ে ভেসে এলো এক ঝলক বাতাস। মার্চ মাস শেষ হয়নি, বাতাসে অশান্ত সমুদ্রের কণ্ঠের কাপটার স্পর্শ জড়ানো। আবার কাসির দমক এসে গেছে। কাসতে কাসতেই প্রশ্ন করলেন জোসেফ—কি আবার হল? ছেলেরাতো বেশ ঘুমুচ্ছে।

—পাশের ঘরের বিছানা খালি পড়ে আছে, সেই রাত থাকতে উঠে কোথায় চলে গেছে।

—কোথা আবার যাবে···। কাসির বেগে মাঝ পথে থেমে গেল জোসেফের কণ্ঠস্বর। মেরীও উঠে পড়লেন—রুগ্ন স্বামীকে আর বিরক্ত করেই বা কি হবে!

ধীরে ধীরে আলো ফুটছে আকাশে, আলো ছড়িয়ে পড়ছে নাজারেথের বুকে। ছোট্ট জনপদ নাজারেথ, দিনের আলোয় কোলাহল নেই, নেই রাতের অন্ধকারে অসংখ্য অশান্তির প্রেতচ্ছায়া। এই শান্ত পাহাড়ীদের মধ্যে শত্রু নেই, নেই বিদেশী শাসকের রক্তচক্ষু। শঙ্কাই থাকে নাজারেথে। মানুষের মনে আনন্দ নেই কিন্তু তার চোখে আছে আশার আলো। ইহুদীরা পরাধীন, বিজেতার প্রতি বিজিতের ক্ষোভ তাই পুঞ্জীভূত হয়ে আছে প্রত্যেক মানুষের মনে, প্রতিটি কুটিরের কোণে। তবুও হাসিমুখে কাজ করে নাজারেথের মানুষ, নির্ভাবনায় নিদ্রা যায়।

বাইরে স্ত্রীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—উঠোন নিকোতে নিকোতে আপন মনে বকে চলেছেন মেরী।

জোয়ান ছেলে, ছেলেখেলে দিন কাটিয়ে, সারাদিন খাটুনির পর শোবে আর ঘুমুবে তা নয় ছেলে আমার রয় আকাশের পানে চেয়ে চুপ করে বসে আছে আর

নয়তো নিশ্চিন্তে চোখ বুজে বসে ধ্যান করছে। এত যে ভাবনা তাও বুঝি না।

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন জোসেফ, ছাঁচাবেড়ার গায়ে কাটা ছোট্ট জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। ধোঁয়া ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কাসির দমক কমতে আরম্ভ করেছে, বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরে শক্তি ফিরে আসবে। রাস্তার পাশে কুয়োতলায় ভীড় জমতে শুরু করছে। আজ রবিবার, ঘরদোর নিকোতে হবে, স্নান সেরে, ধোয়া জামা কাপড় পরে সকলে মিলে যেতে হবে উপাসনায়। কিন্তু বিশু তো কই এখনও এলো না! কোথায় গেল ছেলেটা?

সবে তো ষোল বছর বয়স, এখনই ওর এত ভাবনা কিসের? মুখের হাসিটাও কেমন করুণ, চোখ দুটো সর্বক্ষণ স্বপ্ন মাখানো। কেন এমন হয়? এ কোন নতুন যুগের হাওয়া বইছে কে জানে। বেশ মনে পড়ছে, সেই কোন ফেলে আসা অতীতে গ্যালিলিতে বিদ্রোহের আগুন জ্বলেছিল, সে আগুনের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়েছিল নগর জনপদ নাজারেথে। সে বহুদিনের কথা, আজ সে আগুন রোমক সম্রাটের শাসনের দাপটে নিশ্চিহ্ন। আজকের তরুণরা আর মাথা তুলে দাঁড়ালে আশ্চর্য হবার কিছু ছিল না। এরা কিন্তু মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে না। মাথার ওপর রাজ্যের চিন্তা নিয়ে ভাবছে, সংসার করছে, আর রাতের অবসরে দিচ্ছে নিশ্চিন্ত নিদ্রা। ঠিক নিশ্চিন্ত যে তাও নয়। স্তব্ধ রাতের বুকে থেকে থেকে চমকে ওঠে আর্ত মানুষের চীৎকার—হে ঈশ্বর তুমি কোথায়? কবে আসবে তোমার আবির্ভাবের শুভলগ্ন?

একজন মানুষের আর্তি নয়, জোসেফ প্রতি রাতে চাঁকানির টান দামলাতে দামলাতে শোনেন, হঠাৎ অন্ধকারের বুক চিরে যেন সারা নাজারেথ আর্তনাদ করে ওঠে। কেঁপে ওঠে গাছের পাতা, দুলে ওঠে আকাশের আচ্ছাদন। ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখতে দেখতে যেন কেঁদে ওঠে সারা ইজরায়েল। কান্না গুমরে ওঠে ইজরায়েলের বুকের গভীরে, মৃত্তিকায় প্রোথিত অসংখ্য মৃতের অস্থির রন্ধ্রে রন্ধ্রে, সুদূরে প্রসারিত শিকড়ে শিরায় শিরায়।

গর্ভযন্ত্রণায় আর্তনাদ করে ওঠে ইজরায়েলের আত্মা। তাই মনে হয় জোসেফের, নাজারেথের মানুষের জীবনে শান্তি বুঝি আগ্নেয়গিরির মুখে ছড়ানো ছাইয়ের মত। বুকে জ্বলছে আগুন, পরাধীনতার জ্বালায় জ্বলছে প্রতি ইহুদীর বুক। সেই অগ্নি যন্ত্রণায় জ্বলতে জ্বলতে প্রতিটি ঘুমন্ত নরনারী স্বপ্ন দেখে, নতুন দিনের স্বপ্ন।

স্বপ্ন জোসেফও অনেক দেখেছেন, সেদিনও সে দেখার শেষ হয়নি। বহু বিনিদ্র রজনীতে বুক ভরে নিশ্বাস নেবার প্রানপণ চেষ্টায় বিছানার ওপর উঠে বসতে হয় জোসেফকে। জানলার ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ে এক ফালি আকাশ, চোখে পড়ে আকাশের বুকে আলো আর আঁধারের লুকোচুরি। হঠাৎ আঁধারের বাধা সরিয়ে ফুটে ওঠে একটা তারা' তারপর আর একটা। মনে পড়ে যায় মানুষের অন্তরজুড়ে ঘনিয়ে ওঠা বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব। ইজরায়েলের আকাশে আর আলো নেই, অন্ধকার ক্রমশঃ ঘনীভূত হচ্ছে। কোথায় সেই ধ্রুবতারা যার প্রজ্ঞার আলোয় দূর হবে পুঞ্জীভূত অবিশ্বাসের অন্ধকার?

বহুদিন এমন সব প্রশ্ন বিচলিত করেছে জোসেফকে, বিয়ে করে সংসার পাতবারও আগে। তারপর একদিন ঘর আলো করে এলো যিশু। ইজরায়েলের অন্ধকার আকাশ আর কিছুদিন মনে আলোড়ন তোলবার সুযোগ পায়নি। তারপর সংসার বড় হয়েছে আর দারিদ্র থেকে থেকে বুকের পুরনো ক্ষতে টেনেছে ধারালো দাগ। বিপর্যস্ত জোসেফ ইহুদীদের বহু যত্নে ঘরে রাখা বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। তখন শান্তি খুঁজেছেন দর্শনের দীপ্ত মহিমার মধ্যে। সেখানেও শান্তি পাননি, দার্শনিকদের মধ্যে মেলেনি মতের মিল।

নিজে মূর্খ হলেও খুঁজে খুঁজে বার করেছেন পণ্ডিত আর সাধুসজ্জনের। একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে শুনেছেন পুরাকাহিনী—মহাপুরুষদের জীবনী ও বাণী। সংগ্রহ করেছেন অসংখ্য উপদেশ, সোনালী ভবিষ্যতের স্বপ্নজেজাল সব ছবি।

স্মৃতির পটে আঁকা সেইসব ছবি নিয়ে নাড়াচাড়া করে চলেছেন জোসেফ। মনে পড়ে যায় মহাপুরুষ হিলেলের বাণী—যা কিছু তোমার নিজের বিরক্তিকর

কারণ, তা অন্যের প্রতি প্রয়োগ করোনা। ঠিক এমনি কথাই চারশো চারশো মাইল দূরে বসে বলেছিলেন এপিকুরাস—ভাল কিছু লাভ করার চেয়ে ভাল কিছু দেওয়ার মধ্যে বেশী আনন্দ। কিন্তু এত শাস্ত্রের সম্পদ বুকে নিয়ে, মহাপুরুষদের অসংখ্য অনুশাসন অনুসরণ করেও ইজরায়েলের ইতিহাস ভাল কিছু হয়নি, আনন্দের জোয়ার নামেনি ইহুদীদের জীবনে।

বরঞ্চ থেকে থেকে প্রচারিত হয়েছে একাধিক বিপরীত মত। হিলেলের শিষ্যরাই প্রচারিত করেছিলেন নূতন জীবনবেদ—শাস্ত্রের অনুশাসন পালনে বিচ্যুত হলে চলবে না, কিন্তু তাই বলে সর্বস্বত্যাগী সাধু হবারও প্রয়োজন নেই। শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন না করে নারী ও সুরা উপভোগে বাধা নেই। অর্থাৎ ঈশ্বর বিশ্বনিয়ন্তা হিসাবে যত কঠোরই হোন না, পিতা হিসাবে তিনি স্নেহের প্রতিমূর্তি। যে পৃথিবীতে তাঁর স্নেহের অজস্র প্রকাশ, সেখানে মানুষ ভিন্ন কে আহরণ করবে চুম্বন আর সুখ। এই নিয়মের প্রতিধ্বনি তুলেই যেন টালমুড বলেছেন—সকলকে নিয়ে হেসে খেলে জীবন-যাপনেই আছে স্বর্গের স্বাদ।

কিন্তু যুগাবসানে এমন লোভনীয় মতবাদেও তুষ্ট হয়নি মানুষ। শোনা গেছে বিদ্রুহবাদীদের বিদ্রুপ—অলক্ষ্য, অনন্ত ঈশ্বরকে খুশী করবার জন্য অসংখ্য বলির প্রয়োজন কেন? ইহুদীরা যদি ঈশ্বরের নির্বাচিত ভক্ত, সর্বশ্রেষ্ঠ প্রিয় সন্তান, তবে তাদের দুর্দশার শেষ নেই কেন? কেন তাদের পায়ে যুগের পর যুগ দাসত্বের শৃঙ্খল জড়ানো?

কাছে আর কাউকে না পেয়ে জোসেফই কতবার এইসব প্রশ্নের উত্তর জানতে চেয়েছেন পুরোহিতদের কাছে। এক অনিবার্য নূতন স্রোতের আঘাতে এইসব পুরোহিতদের কেমন যেন দিশেহারা মনে হয়। স্রোত যত বেগবান হচ্ছে পুরোহিতরা যেন তত জোরের সঙ্গে শাস্ত্র আঁকড়ে ধরছে, সকলকে করতে চাইছে ক্রিয়াকর্মে নিষ্ঠার প্রতি সচেতন। পুরাতন সংস্কার যেন প্রাণপণ চেষ্টা করছে নব্য সংস্কৃতিকে বাধা দেবার। সব পুরোহিতের মুখের তাই সেই একই উত্তরের পুনরাবৃত্তি। কুচক্রী ফরিশীরা প্রবল বলেই তার চাষের জমি হয় উর্বরা, পূজা দেয় বলেই তার বীজ ফলপ্রসূ। বলির রক্তে পবিত্র ইজরায়েলের মাটি, সেই মাটির উপরে গড়া আকাশচুম্বী জেরুজালেমের মন্দিরে বাস করেন বিশ্বের ঈশ্বর। শাস্ত্রের অনুশাসন মেনে চললেই আবার ইহুদী জাতি তার স্বাধীনতা ফিরে পাবে, এই পবিত্র দেশেই আবার অধিষ্ঠিত হবে রাজনৈতিক ক্ষমতায়। ইজিপ্ট, ব্যাবিলন, এ্যাসিরিয়া একের পর এক বহু সাম্রাজ্যের পতন দেখেছে অতীত ইতিহাস, রোমেরও তেমনি পতন হবে। কিন্তু সে পতন দেখে যাবার সৌভাগ্য কি জরাক্রান্ত জোসেফের হবে!

সারা বিশ্বে যে বিভিন্ন মতবাদের বিরোধ ঘনিয়ে উঠেছে, অনিশ্চয়তার অন্ধকারে মানুষ যে আজও এ সব সংবাদ জোসেফের অজানা নেই। নানা দেশের ব্যবসায়ীদের মুখে মুখে কত সংবাদই না ছড়িয়ে পড়ে নাজারেথের মানুষদের মধ্যে। জোসেফের পরিচিত পুরোহিতরা কিন্তু তখনও অক্লান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলেছেন শাস্ত্রের অনুশাসন, শাস্ত্রে যতটুকু লেখা আছে ততটুকু, তার বেশীও নয় কমও নয়। ভোরের নরম আলোয় নিশ্বাস নিতে নিতে জোসেফের ভাবতে ভাল লাগে যে জেরুজালেমের বুকে যেন রাত্রি নামে তখন প্রার্থনার শেষে শয্যায় আশ্রয় নিয়ে পুরোহিত আর সাধু-সন্তের নিদ্রাও হয় স্বপ্নমুখর। অসংখ্য ইহুদীর মত তাঁদেরও স্বপ্ন রঙ্গায়িত হয় মহাত্মা ড্যানিয়েলের বাণীকে কেন্দ্র করে, মহাত্মা ড্যানিয়েলের ভবিষ্যদ্বাণী—প্রথম ব্যাবিলন, দ্বিতীয় এ্যাসিরিয়া আর তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের সাম্রাজ্য, একের পর এক ঈশ্বরের ভক্তদের করেছে নির্যাতন আর একের পর এক ঘটেছে ধ্বংস। তারপর চতুর্থ পশুর আবির্ভাব, যেমন ভীষণ তেমনি দুর্দান্ত, দৈত্যের মত শক্তিশালী, লোহার মত কঠিন তীক্ষ্ণাগ্র অস্ত্রের মত ধারালো তার দাঁতের পাটি সেই দাঁত দিয়ে শত্রুকে সে ছিন্ন ভিন্ন করে আর সব শেষে পায়ের তলায় পিষে নিঃশেষ করে দেয়।

ভবিষ্যতের বুকে দাবনার আলো ফেলে রোমের অভ্যুত্থানের এই চিত্র প্রত্যক্ষ করেছিলেন মহাপুরুষ ড্যানিয়েল।

পঞ্চনার আলো দিয়ে প্রত্যক্ষ করেছিলেন আগামী দিনের ছবি—প্রথমে তিন সাম্রাজ্যের মত রোমেরও পতন অনিবার্য। তারপর সারা বিশ্বের শাসনভার অর্পিত হবে ঈশ্বরের নির্বাচিত ভক্ত ইহুদীদের উপর। এই স্বর্গরাজ্যের শেষ হবে না, পৃথিবীর সব মানুষ এই নূতন শাসন সাদরে বরণ করে নেবে। অতীতেও স্বর্গ থেকে নেমে এসেছিলেন এক দেবদূত, পৃথিবীর সব মানুষকে নিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন এক স্বর্গরাজ্য। এই রকম সোনালী স্বপনের শেষ নেই, শাস্ত্র আর পুরাণের পাতায় পাতায় লেখা আছে ত্রাণকর্তার আগমনবার্তা, বলা আছে আবির্ভাবের শুভলগ্নের দিনক্ষণ। জোসেফের মনে পড়ল উপাসনা মন্দিরে শোনা আশার বাণী—ইহুদী নরনারী তোমরা জাগো, দেখ তোমাদের কাছে এগিয়ে আসছেন তোমাদের রাজা। ন্যায় হচ্ছে তাঁর একমাত্র নীতি, সত্য তাঁর জীবনের একমাত্র অবলম্বন, সংযমে সিদ্ধি লাভ করেছেন তাই তিনি তুণাদপি সুনীচ। তিনি আসছেন একটি গাধার পিঠে চড়ে। বান্তিকদের তিনি শোনাবেন পরমা শান্তির বাণী আর সপ্ত সাগর বিস্তৃত হবে তাঁর সাম্রাজ্যে।

জোসেফের মনে প্রশ্ন জাগে—কে সেই ত্রাণকর্তা? কোথায় কোন ঘরে রূপ নিচ্ছে সেই আদর্শ জীবন? এমন প্রশ্ন প্রতি ইহুদীকে বার বার আঘাত করে বিরলের ক্ষণিক অবসর মুহূর্তে, আচ্ছন্ন করে তাদের রাত্রির অবকাশ। জেরুজালেমের মন্দিরে আসীন পুরোহিত প্রধানদের মনেও হয়তো জাগে এমন শত শত প্রশ্ন। কে এই ত্রাণকর্তা? কোথায় তিনি? তিনি কি এই প্যালেস্টাইনের কোথাও লুকিয়ে আছেন? কিন্তু হেরডের মৃত্যুর পর যেমন হয়েছিল আবার যদি তেমনি হয়? এই বিদেশী শাসকের অত্যাচারের অবসরে, জনগণের আতিথ্য সুযোগে যদি ভণ্ড প্রতারকের দল পরিত্রাতার মুখোস পরে বাধা ডাঙা দেয়? দেশ জুড়ে ভণ্ড প্রতারকের অভাব নেই আর সাধারণ মানুষ তো অবশ্য বিপাকে প্রতারিত হবার জন্য প্রস্তুত হয়েই আছে। গ্যালিলির তরুণ বিদ্রোহীরা নিজেদের সুবিধার জন্য যে কোনও সুযোগ নিতে কুণ্ঠিত হবে না। অসংখ্য তথাকথিত সাধু সন্ন্যাসীর মায়াজাল রচিছে আর শোনাচ্ছে অনাগত রাম রাজ্যের চিত্তাকর্ষক কাহিনী। এই সব চিন্তার পথ বেয়ে জেরুজালেমের রাত্রিও নিশ্চয়ই চমকে ওঠে কোনও পুরোহিতের আকুল প্রার্থনায়—হে ঈশ্বর! এই সব ভণ্ড প্রতারকের হাতে যেন ইহুদীদের সযত্ন রক্ষিত বিশ্বাস লাঞ্ছিত না হয়, তোমার নামের মাহাত্ম্যের আড়ালে তারা যেন না শাস্ত্রকে কলঙ্কিত করে। সকলে জানুক যে ইহুদীদের ত্রাণকর্তা আজও মাটির পৃথিবীতে আবির্ভূত হন নি।

রাত্রির রথ এগিয়ে চলে, ভক্তের মন দুলে ওঠে আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে। জেরুজালেমের ভিক্ষুক থেকে রোম আর আলেকজান্দ্রিয়ার ধনী—সব ইহুদীই স্বপ্ন দেখে সেই অনাগত ত্রাণকর্তার। ধনী আর পণ্ডিতের দল ভার্জিল আর হোরেসের লেখার সঙ্গে পরিচিত। তাঁরা জেনেছেন যে পৃথিবীতে স্বর্ণযুগ আর সুদূরে নয়। জোসেফ অনেককেই অবশ্য বলতে শুনেছেন যে ভাগ্যদেবী রোমের প্রতি সুপ্রসন্না, রোমক সাম্রাজ্যের পতন কল্পনাতীত। কিন্তু ড্যানিয়েলের ভবিষ্যদ্বাণী নিশ্চয়ই মিথ্যা হবে না। ব্যর্থ হবে না ধার্মিক হিলোর আশ্বাস—মানুষ আর ঈশ্বরের মাঝে মিলনের সেতু স্বরূপ আসছেন এক জ্যোতির্ময় পুরুষ। তিনি সব ইহুদীকে নেবে, দেবেন একতার স্বর্ণসূত্রে, তাঁর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস-স্তূপের উপর গড়ে উঠবে নূতন জনপদ, নরভোজ মানুষের বাসোপযোগী হবে, নরা মাটিতে মুকুলিত হবে সবুজ তৃণের অঙ্কুর।

ঘুমন্ত জেরুজালেম স্বপ্ন দেখে তরুণ উষার, স্বপ্ন দেখে চলে সারা প্যালেস্টাইন, হয়তো স্বপ্ন দেখে সারা বিশ্বের আর্ত নরনারী।

পাহাড়ের পাশে খোলা মাঠে সবুজ ঘাসের ওপর শুয়ে আছে এক তরুণ কিশোর। প্রভাতী সূর্যের আলো এসে পড়েছে তার দেহে, দৃষ্টি তার নীল আকাশে স্থির নিবদ্ধ। নির্জন, নিস্তব্ধ দানুদেশ। একটু দূরে একপাল মেষ স্বচ্ছন্দে চরে বেড়াচ্ছে। কিশোর কিন্তু মেষ চরাতে আসে নি। সময় এবং সুযোগ পেলেই সে বাড়ি থেকে পালিয়ে আসে এই দানুদেশে। চলে আসে সুনীল আকাশের বুকে চোখ মেলে শুয়ে থাকার অপূর্ব আনন্দ আস্বাদনের আকর্ষণে। পাহাড়ের চূড়া ছাড়িয়ে, বেক-

লোক পায় হবে না কি পাওয়া যায় সকলের পিতা ঈশ্বরের দেখা। মুসা আর তারও আগে অনেক ভক্ত অনেকবার তাঁর দেখা পেয়েছেন। এ সবই অবশ্য শোনা কথা। কিন্তু সেই উদার আকাশের নীচে, স্তব্ধ উপত্যকায় সত্যিই তাঁর উপস্থিতি যেন অনুভব করা যায়। মনে হয় তিনি দূরে থেকেও যেন পাশেই রয়েছেন। সমুদ্রের বাতাস যখন অলিভকুঞ্জে মর্মরিত হয়, পাহাড়ী ঝর্ণা যখন পর্বতের উচ্ছলতায় পাথরে পাথরে তোলে কিঙ্কিনীর ঝঙ্কার, সাদা সাদা মেঘের সারি এসে যখন দূরের পাহাড়ের চূড়া ঢেকে দেয়, তখন সেইসব রহস্যঘন মুহূর্তে কানে ভেসে আসে ঈশ্বরের আহ্বান। তিনি ঊর্ধ্বলোকে বাস করেন, তাই হয়তো এই পার্বত্য পরিবেশে তাঁর আনাগোনা—আরও নীচের সমতলভূমি তাঁর স্নেহ স্পর্শ বঞ্চিত।

এক এক দিন আরও উঁচুতে, ট্যাবর পাহাড়ের চূড়ায় উঠে দাঁড়ায় কৌতূহলী কিশোর। ডান দিকে দূরে চোখে পড়ে সামারিয়ার পর্বতশ্রেণী, কারমেল পাহাড়ের হেলানো চূড়োটা মনে হয় এখনই বুঝি টুপ করে খসে পড়বে সমুদ্রের জলে। আরও দূরে জনপদের অস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। এক এক বার বুক দুলে ওঠে অপর পারের লোক দেখা হয় নি, দেখা হয় নি দিগন্তের রেখা-আঁকা বন্দর। তাতে অবশ্য দুঃখও নেই। অনেক বইয়ে, অসংখ্য অর্ণবপোতের গল্প তো শোনা হয়েছে। বিভিন্ন দেশের, বিচিত্র সব মানুষের অনেক কাহিনী সঞ্চিত হয়েছে স্মৃতির ভাণ্ডারে। এই একান্ত অবসরে সেইসব স্মৃতির ভেলায় ভর করে কল্পনার আকাশে উড়ে যায় কিশোরের মন।

আকাশ আর মাটি, কাহিনী আর কল্পনার মিতালি নিয়ে মেতে থাকায় মুখর হয়ে ওঠে কিশোরের অপূর্ব অবসর-মুহূর্ত।

এই পরিবেশটুকু তার ভারী পছন্দ। গালিচের মত নরম সবুজ ঘাসের বুকে শুয়ে থাকতে এত ভাল লাগে। বাদাম গাছের নিবিড় ছায়ায় সূর্যের আলো উপভোগ করা যায় কিন্তু উত্তাপ নেই। কত কাছ দিয়ে সাদা বক পাখা মেলে উড়ে যায়। মেষপালকরা মেষের দল নিয়ে আসে, তারা কেউ তাকে বিরক্ত করে না। নিরীহ মেষের দল কি সুন্দর! কি শান্ত! মনে প্রশ্ন জাগে—মূক মেষের দল প্রার্থনা করতে পারে না বলেই কি ঈশ্বরের স্নেহ-বঞ্চিত? তাঁর স্নেহের আকাশ তো ছড়িয়ে আছে আকাশে বাতাসে, ছড়িয়ে আছে বাদাম গাছের পাতায় পাতায়। সুতরাং সেই প্রশ্ন মুখর মুহূর্তে এক মুগ্ধ কিশোরের সর্বাঙ্গে স্নেহ ছড়িয়ে পড়াতেই বা বাধা কোথায়!

কিশোর জানে প্রথম প্রশ্নের উত্তর আনে বিশ্বাসের পথ বেয়ে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান সর্বদ্রষ্টা।

বেলা বেড়ে ওঠে। কিশোর যিশু উপত্যকার অসংখ্য অভিনব আনন্দ আয়োজনের মায়া কাটিয়ে পা বাড়ায় বাজারের সহরের পথে। ছোট্ট সহর নাজোরেথ। পথের দু' পাশে সাদা সাদা বাড়ির সার। বাবা গভীর ছুতোর। রবিবার না হ'লে ব'সে ব'সে চেয়ার তৈরী করতেন। হাতের কাছে যন্ত্রপাতি জুগিয়ে দেবার ভার যিশুর। মাঝে মাঝে প্রতিবেশীদের কেউ আসেন, শাস্ত্রের অনুশাসন আর বিদেশীর শাসন নিয়ে প্রায়ই আলোচনা হয়। মন দিয়ে প্রত্যেকটি কথা শুনে যায় যিশু, হঠাৎ এক এক দিন এসে পড়েন এক পুরোহিত। তারপর তাঁর জেরার সামনে বাবার বিব্রত হওয়ার পালা। দৈনন্দিন জীবনে শাস্ত্রের অনুশাসন একটু ক্ষুণ্ন হ'লেই রুষ্ট হন পুরোহিত। বাবা ভয়ে কাঁপতে থাকেন, দুর্বল বুক হাঁপরের মত ওঠানামা করে। ঘণ্টাখানেক আর কোন কাজ হয় না, শেষ হয় না হাতের চেয়ারটা তৈরী করা। পুরোহিতরাই কি তা হলে ঈশ্বরের একমাত্র ভক্ত!

তাই যদি হয় তা হলে বাবা নিয়মিত শাস্ত্রপাঠ করেন কেন? শাস্ত্রপাঠ শুনতে তার ভালই লাগে। গতকাল রাতেই তো বাবা আর মায়ের পাশে স্থির হয়ে বসে শুনেছে মহাত্মা ড্যানিয়েলের বাণী। ছোট ছোট বোনেরা সামান্য শুনেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ চমক ভেঙ্গে গেল যিশুর পাশ দিয়ে উপাসনা মন্দিরের পথে চলে যাচ্ছে একদল ছেলেমেয়ে। জোরে পা চালাল যিশু। পথ চলতে চলতে ভাইবোনদের কথা, বাবার কণ্ঠস্বর, মায়ের মুখ বার বার মনে ভেসে এলো। আর বার বার আঘাত করে গেল আশ্চর্য একটা অনুভূতি—এদের মাঝখানে থাকলে কিছুতেই এক মনে ঈশ্বরের কথা ভাবা যায় না।

বাড়িতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে মা ওকে উঠলেন—কোথা ছিলে এতক্ষণ ? উপাসনার সময় যে উত্তরে গেল তা বুঝি খেয়াল নেই। খুড়োর সঙ্গে জায়গে গালগল্প চলছিল নিশ্চয়ই।

খুড়ো অর্থাৎ সাইমন, বাবার বড় সম্পর্কের ভাই। গালগল্প মানে জেরুজালেমের গল্প। খুড়ো শুধু জেরুজালেমের মন্দিরে তীর্থ করে আসে নি, বেশ কিছুদিন এক মঠে সাধনাও করেছিলেন। খুড়োর মুখের গল্প তার কাছে লোভনীয় ঠিকই কিন্তু তার চেয়ে লোভনীয় নির্জনে বাবার গালচের পুরে স্বপ্ন দেখা! উপত্যকার নিঃসঙ্গ আসরের কথা মা জানেন না। ধোয়া পোষাক পরে একটা টুলে বসে আছেন বাবা, ছেলেমেয়েরা কর্সা জামাকাপড় পরে প্রস্তুত। চট্ করে গামছাটা টেনে নিয়ে কুয়োতলার পথে পা বাড়াল বিশু। মা তখনও বকে চলেছেন। মায়ের কথাগুলো তার অজানা নয়, অনেকবার শোনা গোপন সেই কামনাটুকু। বুকের গোপন ক্ষত থেকে উৎসারিত স্রোত। জেরুজালেমে সে তীর্থযাত্রার বাসনা কতদিন থেকে যে পোষণ করে আছেন বাবা আর মা। কিন্তু আজও সে স্বপ্ন সফল হয়নি, পথ খরচের প্রয়োজনীয় অর্থ নেই।

বেলা আরও বেড়ে উঠেছে। কুয়োতলার পাশ দিয়ে উপাসনা-সভায় যাবার পথ। কুয়োতলায় আর ভীড় নেই। খানিকটা এগিয়ে ধনীদের বাড়ির পাশ দিয়ে রাস্তা। বড় বড় বাড়ি, প্রত্যেক বাড়ির সামনে ফল আর ফুলের গাছে ছায়াবিবিড় বাগান। উপত্যকার পাদদেশে বাস্তারের সহরে জলের অভাব নেই, জমি তাই উর্বরা। বাউসাহগুলোর মাথা আকাশ ছোঁয়ার আশায় হতে বাড়িয়েছে, খেজুরগাছগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে দিয়েছে পাল্লা। বাগানে বাগানে আঙ্গুরলতা সবুজ ফলের ভারে আনত, আপেল গাছে লাল সোনালী রঙের সমারোহ।

হঠাৎ কারার আওয়াজে চমক ভেঙ্গে গেল বিশুর। ছোট বোনটা চেঁচিয়ে কেঁদে উঠেছে। বাগানগুলো কাঁটা গাছের বেড়ায় ঘেরা। ধুলোয় কাঁটা গাছের অস্তিত্ব সহজে টের পাওয়া যায়নি। ছোট মেয়েটাও পায়নি। জোড়ের বশে একটা পাকা আপেলের দিকে হাত বাড়িয়েছিল বেচারি, কাঁটায় আটকে হাতটা কেটে গেছে। টস্ টস্ করে কয়েক ফোঁটা রক্ত ঝরে পড়ল ধুলোয়। বিশুর বড় বড় চোখদুটোও ততক্ষণে জলে ভরে উঠেছে।

কিশোর বিশু সব দেখে, মানুষের অন্তরের রহস্য জানবার আশায় উজ্জ্বল তার টানা টানা চোখে বিস্ময় ঝলকে থাকে। বহুবার দেখেছে ধনীদের বাড়ি আর বাগান দেখতে দেখতে পথচারীদের মুখে পড়ে ঈর্ষার ছায়া। কিন্তু ঈর্ষার কারণ কি ? টাটকা ছাগলের দুধ, বিশুদ্ধ পনীর, গাছপাকা খেঁজুর—বাঁচবার জন্য মানুষের এর বেশী আর কী প্রয়োজন ? ঈশ্বরের চোখে একজন ধনী আর একজন দরিদ্র ভূতোর কি সমান নয় ? আবার বিশুর মনে ছায়া ফেলল বাবা আর মার গোপন বাসনার কথা—দরিদ্র বলেই সম্ভব হয়নি জেরুজালেমে তীর্থযাত্রা। পরক্ষণেই মনে হল—কামনার জ্বালায় ঈর্ষার প্রয়োজন কি ! তা ঈশ্বরকে জানালেই তো হয়।

কিন্তু কেমন করে কোথায় বসে জানাবে ?

উপাসনা সভায় পা দিয়েই প্রশ্নটা মনে চমকে উঠল। তখনই বড় ঘরটা জুড়ে ভীড় জমতে শুরু করেছে। ভীড় আরও বাড়বে। প্রথমে প্রার্থনা হবে তারপর শাস্ত্রপাঠ। বেশ ভারিক্কি চালে মঞ্চের উপর উঠে আসন গ্রহণ করছেন এক ভদ্রলোক—সহরের এক অভিজাত ধনী। সেদিন শাস্ত্রপাঠের ভার তাঁরই। ভদ্রলোক পণ্ডিত, ধ্যান-ধ্যানও যথেষ্ট করেন। আদর্শ ইহুদীর জীবন-যাপন করেন। বিশুর কিন্তু আজানা নেই যে সহরের কেউই তাঁকে ভালবাসে না, আর বোধ হয় তাঁর অন্তরেও কারুর প্রতিই সত্যিকারের ভালবাসা নেই। তবে কি ধন বিনিময়ে কিছুই হয় না যদি তার পিছনে মন না থাকে !

বিশু ঘাড় উঁচু করে দেখবার চেষ্টা করে, চেষ্টা করে মন দিয়ে সেই ভদ্রলোকের পাঠ শোনবার। কিন্তু কেবল যেন ভাল লাগে না, সবকিছু বিস্বাদ মনে হয়। ইতিমধ্যে উপাসনার অবসরে শ্রোতাদের মধ্যে তর্ক শুরু হয়ে গেছে। প্রত্যেকেই পাশ্ব আউড়ে নিজের মত

প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত। উত্তেজনা লেগেই চলেছে। বিশু চঞ্চল হয়ে উঠল। এই কোলাহলে তার মানসিক শান্তি ব্যাহত হয়, অন্তরের উপাসনা হয় বিঘ্নিত।

এর চেয়ে অনেক শান্তি ছড়িয়ে আছে তার প্রিয় পার্বত্য উপত্যকায়। সেখানে উড়ন্ত বকের পাখায় আঁকা অসীমের আমন্ত্রণ, পাহাড়ী ঝর্ণার তালে তালে সুরের রিমি-ঝিমি, আকাশে মেঘের লুকোচুরি আর তারই ফাঁকে ফাঁকে আভাসিত নীল, নীরব রহস্য লোক।

অথবা চলো মানুষের সঙ্গে মানুষের পরিচয়ের আনন্দলোকে। চলো নগরের প্রান্তে রাজপথের পাশে। নাক্তারেথের বুক চিরে রাজপথ দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে প্রসারিত। সেই পথের উপর দিয়ে পণ্য নিয়ে অবিরাম চলে উটের দল, গাধা আর খোড়ার টানা গাড়ির সারি, চলে সৈন্য, চলে বণিক, চলে সাধারণ মানুষ—এক নগর থেকে অন্য নগরে। রাজ-পথের দৌলতে নাক্তারেথে বিদেশীর আনাগোনার শেষ নেই। ক্রমাগত চলেছে মানুষের মিছিল—নগরে আসছে পণ্য-ব্যবসায়ী আর পণ্ডিতের দল, আসছে কত শত দুঃখী মানুষ আর অসংখ্য মদমত্ত, বর্বর অভিযাত্রী। হঠাৎ এক এক দিন নগরকে সচকিত করে এসে পড়ে রোমক সৈন্যের দল। চৈ চুয়োভের তোড়ে, হুকুমের হুঙ্কারে ছোট নগর সরগরম হয়ে ওঠে। হরিণের মত ক্ষিপ্র, নেকড়ের মত হিংস্র এইসব বিদেশীদের দেখলেই লুকিয়ে পড়ে নাক্তারেথের মানুষ। সামনে পড়লেই সৌম্যদর্শন রোমক সম্রাটের প্রতীক ঈগলের সামনে মাথা নোয়াতে হবে।

উপাসনা সভা ছেড়ে উঠে পড়ে বিশু চুপি চুপি চলে আসে রাজপথের পাশে। গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে নির্নিমেষ নয়নে দেখে মানুষের মিছিল। কান পেতে শোনে বিচিত্র সব আলাপ-আলোচনা। জানবার আগ্রহের তার শেষ নেই—সে সব শুনতে চায়, সব জানতে চায়। ছোট নগর নাক্তারেথে রাজপথের যাত্রীরা নিয়ে আসে বাইরের পৃথিবীর সংবাদ। আলেজান্দ্রিয়ার বণিকের মুখে পাওয়া যায় সেখানকার বিশাল পাঠাগারের খবর। নীল নদের তীরে তপস্যারত সাধু-সন্তদের কাহিনী শুনিয়ে যায় অপর একজন ভবঘুরে। পথিকের মুখেই পাওয়া যায় গ্রীসের অতীত সমৃদ্ধির রোমাঞ্চকর বর্ণনা, শোনা যায় সেই বিরাট দার্শনিকের কথা, যিনি পথের ধারে দাঁড়িয়ে শুরু করতেন তার তত্ত্বালোচনা। আর কানে আসে সেই প্রাজ্ঞ পুরুষের বাণী—যে নিজেকে জানবার চেষ্টা করে সেই ঠিক পথে চলে, সেই প্রকৃত সুখের সন্ধান পায়।

সূর্য মাথার উপর উঠে এসেছে, রাজপথ জনবিরল হবার মুখে। এখনই বাড়ির পথে ছুটতে হবে, মা খাবার সাজিয়ে বসে থাকলে আর রক্ষা থাকবে না। আজ রবিবার, তাই ছুতোরশালায় বসার তাগিদ নেই, নেই বিকালে পাঠশালা যাওয়ার ঝামেলা। উপাসনা সভাতেই পাঠশালা বসে, গুরুমশায়ের কাছে পাঠের পাঠ নিতে হয়। ভুল হলে বরাতে জোটে বেত্রাঘাত। আজ অবশ্য ভয় বা ভাবনার কিছুই নেই। খাওয়া শেষ হলেই ছুটি। তারপর উপত্যকার আশ্রয়ে যাদের বুকে লুটিয়ে পড়ার বাধা কোথায়।

বাধা যে কিছু নেই তা নয়, অন্ধ বাবাকে টুকিটাকি সাহায্য না করলে চলে না। রবিবার হলেও'

কাজ কিছু থাকেই, তাদের টুলটার পা জোড়া দেওয়া বা নতুন একটা চেয়ার তৈরী করা। ক্রুশ তৈরীর কাজ এসে পড়লে আর নিস্তার ফেলবার সময় থাকবে না। রোমক শাসন কর্তার হুকুম অমান্য করলে মৃত্যুদণ্ড চমকে উঠবার ভয় নিয়ে তখন কাজে হাত দিতে হয়, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে না দিতে পারলে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হওয়ার ভয়ে বুক দুরুদুরু করে। কাজে ভার অবশ্য শাসনকর্তা ক্রুশের করবার পাঠান—গ্যালিলির কোনও বিদ্রোহী যুবক ধরা পড়লেই প্রয়োজন হয় ক্রুশের। বিদেশী শাসকের আইনে ক্ষমা নেই—বিদ্রোহের শাস্তি ক্রুশবিদ্ধ করে মৃত্যুকে বরণ করা। এইসব কারণে ক্রুশ তৈরী করতে যে ভাল লাগে তা নয়। প্রতিবেশী-দের ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যও কিছু কিছু অর্জন করতে হয়। তবু শাসকের হুকুম অমান্য করা যায় না, মন না চাইলেও মাথা পেতে স্বীকার করে নিতে হয় তাদের।

দিনের শেষে অবসরে বন্ধুদের সঙ্গে এইসব আলোচনা-তেই সময়টা কেটে যায়। সান্ধ্য আকাশের তলায় বসে সারা আর তাঁর বন্ধুদের আলাপ—আলোচনা একমনে শুনে যায় যিশু। সকলের মুখেই এক অভিযোগ—বিশৃঙ্খলা আর বিদেশীর অত্যাচার কীভাবে বিষিয়ে তুলেছে। এই বিশাল ভূখণ্ড না কি এতদিন ইহুদীদের অধিকারে ছিল। আর এখন রোমক সম্রাট শুধু দেশের অধীশ্বরই নন, তিনি ইহুদীদের কাছে ঈশ্বর এবং পূজা আদায় করেন। অস্ত্রের শক্তিতে রোমকরা এই দেশ জয় করেছে, এমন কি জেরুজালেমের মন্দিরের পবিত্রতাও নষ্ট হয়েছে বিদেশীদের স্পর্শে।

বিদেশীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়নি তা নয়। হেরডের ক্রীতদাস সাইমনের বিদ্রোহ সফল হয়নি। নাজারেথ আর গ্যালিলিতেও একদিন জ্বলেছিল এই বিদ্রোহের আগুন। গ্যালিলির তরুণ জুডার হাতে উড়েছিল স্বাধীনতার পতাকা। সেদিন অসংখ্য তরুণ স্বীকার করে নিয়েছিল জুডার নেতৃত্ব, প্রতিটি ইহুদী ঘর ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য পাঠিয়েছিল এই সংগ্রামের প্রস্তুতিতে, পুরোহিতরা দিয়েছিলেন আন্তরিক আশীর্বাদ। তবু সে বিদ্রোহ সফল হয়নি। রোমক সেনাপতি ভেরাসের হাতে পরাজিত হয়েছিল এই স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিকরা। গভীর অরণ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন জুডা। যাবার আগে বলেছিলেন—এই পরাধীনতার জ্বালা আমাদের যত অসহ্য হবে, যত তীব্র হবে আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম, তত সুগম হবে আমাদের ত্রাণকর্তা, শাস্ত্রোক্ত সেই দৈব পুরুষের আবির্ভাব।

জুডা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিলেন, প্রাণ দিয়েছিলেন ক্রুশের কাঠে। জাতি কিন্তু জুডাকে ভোলেনি। ভোলেনি তাঁর আশ্বাস যে রাজনৈতিক স্বাধীনতার পথ বেয়েই আসবেন ইহুদীদের নবজীবনের উদ্গাতা জ্যোতির্ময় পুরুষ।

যিশু কিন্তু ভোলে না। রাজপথে আহরিত, পার্বত্য উপত্যকায় আভাসিত সব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে রাখে তার স্মৃতিতে। তার জানবার আগ্রহের শেষ নেই। মনে প্রশ্নেরও অন্ত নেই। ইহুদীরা যে হেতু ঈশ্বরের নির্বাচিত ভক্ত অতএব এতগুলো পাহাড় আর এতগুলো সহর তাদের অধিকারে চাই—এ কেমন যুক্তি? স্বাধীনতার জন্য অস্ত্র হাতে বিদ্রোহের প্রয়োজন কি? ঈশ্বরের অধিকারটুকু নিয়ে মানুষ খুশী হতে পারে না কেন?

মন্দিরই বা কেন, নিজের মনটুকু আয়ত্তে আনতে পারলে আর কি চাই! যিশুর রাত্রির প্রথম প্রহরও মুখর হয়ে থাকে এই ধরনের অসংখ্য প্রশ্নে। দিন শেষ হয়ে রাত্রি নামে পৃথিবীর বুকে, রাত্রি আচ্ছন্ন করে নাজারেথের আকাশ। স্থির চোখে বিছানায় শুয়ে থাকে যিশু, ভাবে মহা চিন্তার গভীরে। মাঝে মাঝে পাশের ঘরে বাবার কাশির আওয়াজে চমক ভাঙে, ছোট জানলার ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ে একটা তারা ধপ ধপ জ্বলছে। তারাটার পানে চোখ রেখে শুয়ে থাকে মনে হয় তারার নরম আলো যেন ছড়িয়ে পড়ছে তার গা বেয়ে, এক অপার শান্তিতে ডুবে যাচ্ছে তার সারা সত্তা।

ঘুম নেমে আসে যিশুর দু'চোখ বেয়ে। ঘুমিয়ে পড়ে সারা নাজারেথ। অন্ধকার আকাশের বুকে জেগে থাকে তারার আলো—ঈশ্বরের আশীর্বাদের অতন্দ্র সাক্ষী।

[ক্রমশঃ]

১

ঘরে দুরকম আলো ছিল। একটা অল্প শক্তির সবুজ আলো, অন্যটা পঁচাত্তর শক্তির সাধারণ। এ ঘরটায় ওরা দুজন আজ রাত কাটাবে।

বিনু মাসী শেলবারের মত তদারক করে খাটের নীচ এবং ঘরের চারপাশটা দেখে নিল। তারপরে বড় এক ঘটি খাবার জল টেবিলের ওপর রেখে বেরিয়ে গেল।

পেলব ঘরে ঢুকে দেখল শম্পা চেয়ারে হেলান দিয়ে মাথাটা সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকিয়ে বসে আছে। সবুজ আলোটা রহস্যময়। পাখাটা সোঁ-সোঁ শব্দ করে বাতাস ভুলে শম্পার সুশোভন শরীরে জড়ানো বেনারসীটাকে ফেলে ফেলে দিচ্ছে। পেলবকে দেখতে পেয়ে শম্পা উঠে দাঁড়াল। আস্তে আস্তে দক্ষিণের খোলা জানলার কাছে এগিয়ে গেল। কথা নেই। বৈদ্যুতিক পাখার সোঁ-সোঁ শব্দ। রজনীগন্ধার গন্ধ। পেলব বুঝতে পারল না সে কী করবে। এই পরিস্থিতিতে পুরুষের কী করা উচিত। শম্পা ঐ খানেই নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে। জানলা খোলা। শম্পার সমস্ত শরীর জ্যোৎস্না-প্লাবিত। যেন এক বিখ্যাত শিল্পীর আঁকা একটা রঙিন তৈল চিত্র।—পেলবের তাই মনে হচ্ছিল। পেলবের ইচ্ছে করছে এইখানে শম্পার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে। জ্যোৎস্নার সমুদ্রে দাঁড়িয়ে চোখে চোখ রেখে নীরব সংলাপ করতে। পেলবের আরও

অনেক কিছু ইচ্ছে করছে। শম্পার কি কিছু ইচ্ছে করছে না? না কি ওই যে ওই ভাবে স্থির দাঁড়িয়ে থেকে সান্ধ্যনীল আকাশের নক্ষত্র দেখছে—ওটাই তার ইচ্ছে! হবেও বা। সবার ইচ্ছে ত সমান হয় না। পেলব কী করবে তবে। সবার ইচ্ছের সঙ্গে পেলবের সম্পর্ক নেই। শম্পার ইচ্ছেই পেলবের ইচ্ছে। পেলবের ইচ্ছেই শম্পার ইচ্ছে। শম্পার ওপর একবার ভীষণ রাগ হল পেলবের। অদ্ভুত। 'অদ্ভুত' শব্দটা পেলবের মুখ দিয়ে কেমন করে যেন বেরিয়ে গেল। পেলব এই শব্দটাকে মনের মধ্যেই রাখতে চেয়েছিল। চিন্তা পূর্ণোচ্ছ্বাস হলেই বোধহয় তা কথায় প্রকাশ হয়। শব্দ হয়ে বেরিয়ে যায়। শম্পা ঘুরে দাঁড়াল। ওইখানেই জানলার কাছে। জ্যোৎস্নার এক চতুষ্কোণ কালির মধ্যে। ঘুরে দাঁড়িয়ে এমনভাবে পেলবের দিকে তাকাল যেন সে নিতান্ত অসহায়। সে ওই জ্যোৎস্নার বেড় থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না। পেলব ঘরের আলো নিবিয়ে দিল। জ্যোৎস্নার চতুষ্কোণ কালিটা উজ্জ্বলতর হল। অসাবধানতার জন্যে পেলবের হাত লেগে ফুলদানী ঘড়িটা টেবিলে কাত্ হয়ে গেল। শম্পা ফিরে তাকাল। ঘরে আলো ছিল না। শুধু জ্যোৎস্নার ফেনা বিক্ষিপ্ত। শম্পা দেখতে পেল ঘড়ির সমস্ত জল ঘরের মেঝেতে পড়ে গিয়ে কেমন ছোট ছোট সাপের মত গড়িয়ে যাচ্ছে। সাপ—সাপ—সাপ। ঘরের মধ্যে অযুত সহস্র সাপ কিল্‌বিল্ করে বেড়াচ্ছে। শম্পার এই অনুভূতির কথা পেলব জানতে পারল না। পেলব এগিয়ে এল। শম্পার পাশে। আদুরে করে শম্পার চিবুকটা তুলে ধরে পেলব বললে—'এস।' শম্পা পেলবের কাছে ঘন হয়ে দাঁড়াল। স্তব্ধতা। শম্পার হাত ধরে পেলব ওকে জ্যোৎস্নার চতুষ্কোণ কালি থেকে বের করে আনলে।

ওরা দুজন নিঃশব্দে সুন্দর খাটের ওপর পাতা নতুন বিছানায় বসল। শুদও বলা চলে। শম্পার মুখের কাছে মুখটা নিয়ে পেলব বললে···

'তুমি ত এ পর্যন্ত একটাও কথা বললে না।'

শম্পা রজনীগন্ধার মালাটা গলা থেকে খুলে রেখে মিষ্টি করে বললে—'আলোটা নেভালে কেন?'

'তোমাকে ভাল করে দেখব বলে।'

'অন্ধকারে বুঝি ভাল দেখা যায়!'

'তুমি যে শম্পা—বিদ্যুৎ অন্ধকারেই উজ্জ্বল।'

'যাচ্ছ যে।'

'আলোটা একবার জ্বালব?'—শম্পা পেলবকে জিজ্ঞেস করে।

পেলব উঠে গিয়ে সাদা আলোটা জ্বালাল। 'ইস্, জলগুলো সব পড়ে গেল। তোমার জলের দরকার হবে না ত!' পেলব শম্পাকে জিজ্ঞেস করে। 'তোমার প্রয়োজন না হলে আমারও হবে না।' শম্পা দুষ্টুমি হেসে জবাব দেয়। পেলবকে উৎফুল্ল দেখায়।

'এই আলোটা বড় চোখে লাগছে—নিবিয়ে দেব?' পেলব অনুমতি চাইল।

একেবারে অন্ধকার ভাল না—নরুকটা জ্বলুক।' শম্পার ইচ্ছে।

'কেন—ভয়?' পেলব জিজ্ঞেস করে।

'কীসের ভয়।' শম্পার অনুসন্ধিৎসা।

পেলব ঘরের আলোর রং পরিবর্তন করল। 'এই আলোটা রোমান্টিক।' পেলব বলে। 'এই রাত্রিটাই রোমান্টিক।' শম্পা কথা বাড়ায়। ওরা দুজন শুয়ে পড়ল পাশাপাশি। প্রথমে মুখোমুখি। পরস্পরের নিশ্বাস পরস্পরের শরীরে প্রতিহত হতে লাগল। পরে দুজনে দুপাশে ফিরে শুল। কথা নেই। শব্দ। সুমোট গরম। পাখা ঘোরার অবিরাম কোঁ-কোঁ আওয়াজ। মাঝে মাঝে ভেসে আসা ফুলের গন্ধ। ইঁদুরের উৎপাত। ঘুম নেই।

'একটা কথা বলব?' পেলব রচিত-স্তব্ধতা ভাঙে।

'বল।'—শম্পার মিষ্টি চাপা স্বর।

'বিয়ের আগে আমার সম্বন্ধে কিছু শোন নি?'

'হুঁ—উঁ।'

'কী শুনেছ?'

'শুনেছি তুমি স্বাস্থ্যবান সুন্দর, ভাল চাকরী কর···।'

'আমাদের সবাইকে কেমন লাগছে।' পেলব পাশ-ফিরে শুল।

'ভাল' শম্পা পাশ-ফিরে না শুয়েই উত্তর দিল।

'এবার একটু ঘুমোও' পেলব আবার ঘুরে শুল।

শুশ্রূষা। ফুলের সুবাস। সবুজ আলো। প্রেম। ভালবাসা ; বেঁচে থাকা।

শম্পার বয়স একুশ। সুশ্রী লাবণ্যবতী। শম্পার চিন্তা :

পেলবকে সব পরিষ্কার বলাই ভাল। কি অসহ্য। আবার কি সুন্দর। পেলব কেমন ঘুমুচ্ছে। নির্বিকার। সুখী মানুষ ইচ্ছে মত যখন তখন ঘুমোতে পারে। আমি ওর বিবাহিতা স্ত্রী। মোহময় রাত্রের অন্ধকারে প্রিয় পাত্রীকে, পাশে রেখে কেমন উদাসীন ভাবে পেলব শয়ান রয়েছে। কোনও উত্তেজনা নেই। কত উত্তাপ। অথচ পেলব উত্তেজিত নয়। ব্যক্তি বিশেষকে দেখে কোনও সিদ্ধান্তে আসা ভুল। পেলব আমার স্বামী। সহধর্মী-সহধর্মী। ওকে নিয়েই আমার জীবন কাটবে। ওর কাছে সব পরিষ্কার বলাই ভাল। ভবিষ্যতে কোনও দিন হঠাৎ এ-সব জেনে পেলব যেন উত্তেজিত না হয়। তখন জীবন ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। জীবনই জীবনকে ভাঙে। অন্য কিছু নয়। বাবা শান্তিপ্রিয়, মানুষ। তা না হলে মানসকে আমি হত্যা করতাম? পৃথিবী থেকে একটা জান্তব বর্বর মনের বিনাশ সাধন করতাম। পারিনি। পারিনি নয়। করিনি। বাবার মুখ চেয়ে, আমাদের সংসারের শান্তি রক্ষণের জন্য আমি সরে গেছি। কেউ জানতে পারেনি মানস আমার বাবার স্নেহভাজন হয়েছিল। প্রধান কারণ মানস প্রেসিডেন্সীর সেরা ছাত্র। আমিও মানসকে পছন্দ করতাম। ভালবাসতাম কিনা জানি না। অথচ মানস বলত 'শম্পা আমার জীবনের একমাত্র নারী।' আমি পেলবকে ঠকাব না। মানস আমাকে শোষণ করেছে, নির্মম ভাবে প্রতারণা করেছে। আমি এর প্রতিশোধ নিতে পারতাম। কিন্তু বাবা তা করতে দিলে না। সমস্ত কিছু চাপা দিয়ে বিয়ে দিয়ে দিল। আমি কী করব। আমি কী করতে পারি। আমার কী করা উচিৎ! পেলবের সঙ্গে আমার বিয়ে না হলেই ত ভাল হত। কেননা বিয়ে করে পেলবকে আমি প্রতারণা করছি। পেলব তুমি কিচ্ছু জান না। তুমি কত ভাল। যদি সে কথা জানতে যে কথা আজ তোমার বিবাহিতা স্ত্রী শম্পার শরীরে বৃশ্চিকের মত দংশন করছে! আমার ইচ্ছে ছিল না। সত্যি পেলব আমার ইচ্ছে ছিল না। শুধু আমাদের সংসারের শান্তির জন্যে তোমার জীবনের এই নগ্ন রাত্রিতে কলঙ্কের কাঁদা ঘুঁড়তে এলাম। আমি জানি আমি না বললে পেলব এসব কিছু জানতে পারবে না। কিন্তু সারা জীবন এমন এক ভয়ংকর সত্যকে আমি কী ভাবে বুকের মধ্যে পোষণ করব। মানস যদি আমাকে বিয়ে করত তা হলে কোনও জ্বালা থাকত না। কিন্তু মানস অমানুষ। সম্পূর্ণ অন্য ধাতুতে গড়া এক বর্বর পুরুষ। কাপুরুষ। আমার সে বছর পরীক্ষা দেওয়া হল না। আই-এ পরীক্ষা দিতাম। ইতিমধ্যে মানস আমার শরীরে কলঙ্কের হাজার বীজ প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে। সেদিন ভাবতে পারিনি মানস পালিয়ে যাবে। মানস অস্বীকার করবে। বাবার অনুরোধও সে রাখল না। অথচ আমার স্থির বিশ্বাস ছিল আমি মানসের বৌ হব। আমি এ কথা পেলবকে কী করে জানাব। হিঃ হিঃ হিঃ। টাকা দিয়ে ডাক্তারের মুখ চেপে রেখেছিলেন বাবা। কেউ জানতে পারেনি। আমার ছোট বোনও না। ওষুধ খেয়েছি তিন দিন। বাড়ী থেকে বের হইনি একদিন। কয়েকদিন পর আমার শরীরে অনুপ্রবিষ্ট হাজার হাজার কলঙ্কের বীজ এক তাল রক্ত হয়ে বেরিয়ে গেল। শরীর হাল্কা হল। মনটা ভীষণ ভারি। জীবনের প্রতি অনীহা আমার কোনও দিন ছিল না। থাকলে সে সময় আত্মহত্যা করতাম। কী আশ্চর্য! পেলব ত আমাকে একবারও কাছে টানতে চাইল না। হয়ত ভাবছে আমি ঘুমোচ্ছি। আমি ক্লান্ত। সত্যি আমি ক্লান্ত। পেলব তুমি আমার স্বামী। অগ্নি সাক্ষী রেখে মন্ত্র উচ্চারণ করে তুমি আমায় গ্রহণ করেছ। আমি তোমার সারা জীবনের সুখ-দুঃখের অংশীদার হব। মাটিতে গড়িয়ে পড়া জলগুলো কেমন লম্বা লম্বা সাপের মত হয়ে রয়েছে। বৈদ্যুতিক পাখার বাতাস থেকে থেকে সাপগুলির সরু শরীরে কম্পন তুলছে। আমি স্থির করলাম। পেলবকে এ সব কিছু জানাব না।

পেলব সেনের বয়স সাতাশ। সুদর্শন স্বাস্থ্যবান। পেলব সেনের চিন্তা :

কী আশ্চর্য্য ভাবে কুল শয্যার রাত কুরিয়ে যাচ্ছে। এত ক্লান্ত তবুও ঘুম নেই। শম্পা কী সুন্দর নগ্ন শরীর ছড়িয়ে দিয়ে ঘুমোচ্ছে। আহা, ও ঘুমোক। ভারি লজ্জা ওর। আমি কথা না বললে কথাই বলে না। এই এতক্ষণ সুপ্ত আগ্নেয়গিরির মত নিথর হয়ে পড়ে আছি একবার একটা কথা বললে না—গায়ে গা ছোঁয়ালে না। অসহ্য। অসহ্য।···আমি ওকে বিয়ে করেছি এই প্রতিজ্ঞা করে যে সারাজীবন ওকে আমি ভালবাসব। ওর সুখ দুঃখের সমভাগ নেব। আমি যেন বিয়ে করে বেঁচে গেছি। বাঁচার জন্যে বিয়ে করেছি। বাঁচার জন্য ভালবাসা দরকার। ভালবাসা পেলে বাঁচা যায়। ভালবেসেও বাঁচা যায়। আমি শম্পাকে ভালবাসব। অথচ রুবি আমায় কত ভালবাসত। আমার ফাঁসী হওয়া উচিত।···শম্পার শরীর থেকে একটা সুন্দর গন্ধ আসছে। আমার খুব ইচ্ছে করছে। আমার অনেক কিছু ইচ্ছে করছে। কিন্তু না। শম্পা ঘুমোক। ওকে জাগাব না। শম্পাকে একটা কথা বলে রাখব। আমি বললেই ব্যাপারটা সহজ হবে। শম্পা আমার বিবাহিতা স্ত্রী। ওকে আমি ভালবাসব। ও আমার আপন জন। রুবির কথা শম্পাকে বলব। জানি না ও এসব শুনেছে কি না। হয়ত সে-সব কিছু শুনেছে বলেই আজকের এই রাত্রিটাকে সে হত্যা করলে। কিংবা হয়ত সে-সব জেনে আমাকে সহজভাবে নেবার জন্যে পরিকল্পনা করছে। মেয়েদের জীবনে এটা একটা ট্রাজেডী। বা হয়ত এসব কিছুই নয়। জীবনের এই একটি বিশেষ রাত এইভাবেই সে কাটাতে চায়। রাত কেটেও গেল প্রায়। জল পিপাসা পেয়েছে। অথচ পাওয়ার কথা নয়। পেলেই যেন ভাল হত। জলসুলো পড়ে গেল। রুবির কথা মনে হলে কষ্ট হয়। শম্পাকে আমি সব বলব। ও নিশ্চয় ক্ষমা করতে পারবে।

বিয়ের কয়েকদিন পরেই রুবি আত্মঘাতী হল। আমি ওকে নিতে পারলাম না বলে। সত্যি বলতে, আমার তখন সে অবস্থা ছিল না। সবেমাত্র বি-এ পাশ করে বেরিয়েছি। মনে অসীম উদ্দীপনা। চোখে নানা রঙের স্বপ্ন। রুবির কথা মনেই হতো না বড় একটা। কিন্তু রুবি ছিল 'সিন্সিয়র'। সে মনে মনে আমাকে নিয়ে একটা জগৎ তৈরী করেছিল। আমি তা জানতে পারিনি। সে আমাকে জানায় নি। অথচ আমারই জানা উচিত ছিল। আমি জানতে পারিনি বলেই নির্বিঘ্নে অন্য এক যুবকের সঙ্গে রুবির বিয়ে হয়ে গেল। আমি যে জানতে পারিনি এবং জানতে পারলে রুবিকে মরতে দিতাম না এ কথাই শম্পাকে বলব। শম্পা এর বিচার করুক আমি শাস্তি নেব। আমার জীবনের সব' সত্য-মিথ্যা শম্পার জানা প্রয়োজন। তবেই শম্পাকে আমার নিজের মত করে পাব। নিজেকে লুকিয়ে রেখে পরকে আপন করা যায় না। ভোর হয়ে আসছে। রাতের কলস ভেঙে গেল। অন্ধকার নেই। শুধু আলো। আরও বেশী আলো। বাইরে শির-শির বাতাস। আমার বুকের মধ্যে ঝড়। শম্পার চুলের গন্ধ। শম্পা আমার বিবাহিতা স্ত্রী। গলাটা শুকিয়ে আসছে। একটা তীব্র পিপাসা। একটু উত্তাপ। আমার খুব ইচ্ছে করছে সকালের সূর্যের আলোয় শম্পার মুখটা একবার দেখি।

পেলব শম্পার দিকে ফিরে শুয়ে বাঁ হাতের কনুইয়ে ভর দিয়ে মুখটা উঠিয়ে শম্পার কপালে ডান হাতটা রাখল।

'এই।'

'উঁ।'

'কই।'

'কী।'

'শম্পা।'

শম্পা পেলবের দিকে তাকাল। ওরা হাসল। শব্দহীন।

ঘরের মেঝে থেকে লম্বা লম্বা জল সাপগুলো ততক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

ভেতরে-বাইরে | গোবিন্দ চক্রবর্তী

আমি যেন সেই মাছিটা
কাচের জারের গায়ে
বারবার যে হয়রাণ হচ্ছে—
ভেতরে অঢেল চিনি, মিছরি, পেঁড়া আর বাতাসা
—বারবার যে উড়ে এসে বসছে :
ঠোঁট, জিভ আর পায়ে পা ঘসছে,
অথচ কিছুই, কিছুই ছুঁতে পারছে না কিছুতেই।
যদিও সবই সাজানো থরে-থরে
চোখের ওপর।
চিনি, মিছরি, পেঁড়া আর বাতাসা :
তার অফুরন্ত আগ্রহের ক্ষুধা আর লোভ :
তার জন্ম-জন্মান্তের আশা-দুরাশা—
তার সবৈশ্বর্য !

একটি মশাকেও আমি দেখেছিলাম
এক চলন্ত ট্রামের কামরায়।
উজ্জ্বল আলোয়
যাত্রীদের মাথার ওপর
চক্রাকারে যে পাক দিচ্ছিল।
বোধহয় এই ধারণায়—
ট্রামটাই এই পৃথিবী
এবং সব ধরা ছোঁয়ার বাইরে
সেও একটি গ্রহটহই কিছু
পৃথিবীরই আকাশে।

অথচ জানলার বাইরেই
ঠিক তখনি হাঁ-হাঁ করছিল
অসংখ্য গ্রহ নক্ষত্রে স্পন্দমান
নিস্তরঙ্গ সেই মহাশূন্য
পৃথিবী—যেখানে চোখেই পড়ে না
এমন এক কুচি বালুকণা মাত্র।

ওখানে গোলাপ লাল | পরেশ মণ্ডল

কে যেন তোমার মতো আমার ইচ্ছাকে নেপে ফুকে
একটি গোলাপ-চারা পুঁতেছিল, বলেছিল লাল
ফুল হবে : কিন্তু পরে দেখলাম হয়েছে হলুদ।
বলো না বলো না তুমি, কি হবে ফুলের রঙ বলে
তার চেয়ে অকম্পিত লেকের জলের ছায়া দাও
হয়তো তবুও শান্তি পাবে না, হয়তো এই ছায়া
মুছে যাবে মন থেকে অন্ত এক দীর্ঘ অন্ধকারে।

অসংলগ্ন বহু কথা, অনেক আক্ষেপ জমে আছে
তোমাকে শোনাবো একে একে। তুমি সরল কল্লোলে
সব কিছু ভেঙে দিয়ে ডুবে যেয়ো অনন্ত শয়নে।
আমার কিছুই নেই : বিলাপ সম্বল মাত্র আজ
তাই তো কাপড়ে মুখ ঢেকে-ঢুকে বসে আছি একা,
পথচারী তুমি এসে খুলে দিলে ঘুমের বন্ধন
এবার দেখার পালা—নাটকের শুরু ও সমাধি।

চললাম নদীর তীরে, কারা যেন আকাশের নিচে
আসন পেতেছে, কারা ডাকছে খুব জোরে জোরে আর
তাদের চোখের পাতা হাসি নিয়ে খেলা করছে যেন,
ওখানে গোলাপ লাল, ওখানে আমার তীর্থ আছে।

হে স্বদেশ | মধু গোস্বামী

পেয়েছ সে নীলকান্ত মণি,
তার জয় বুকে নিয়ে ছোট
হে স্বদেশে ; হও স্রোতস্বিনী,
দীপালিতে দীপ্ত হোয়ে ওঠ।

কঠিন সংযমে কৃশ দেহ
নীলকণ্ঠ তাপসেরে ডাক,
তার প্রাণে এ প্রাণ অজেয়,
সেই কীর্তি ঊর্ধ্বে তুলে রাখ।

জার্মান শান্তিচুক্তি ও পৃথিবীর ভবিষ্যৎ

দিলীপকুমার মিত্র

ইতিহাসের শুরু থেকে, যখনই কোন যুদ্ধ বেধেছে, মানুষ সব সময়েই একটা শান্তিচুক্তি করবার চেষ্টা করেছে। নতুনভাবে শুরু হয়েছে জীবন। বিভিন্ন রাষ্ট্রের ভেতর ফিরে এসেছে শান্তিপূর্ণ স্থায়ী সম্পর্ক। রোমের দুমুখো দেবতা তার যুবক আর বৃদ্ধের দুটো মুখ দিয়ে ভবিষ্যৎ আর অতীতের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। যুদ্ধ যখন শুরু হত তাঁর মন্দিরের দরজা খোলা হত: যখন শেষ হত, তখন সে দরজা আবার বন্ধ করে দেওয়া হত। কিন্তু আজ হিটলারের পতন চূর্ণ হবার পর সতেরো বছর কেটে গেছে। কিন্তু জার্মানি জেনাসের মন্দিরদ্বার আজও বন্ধ করেনি।

জার্মানির সঙ্গে শান্তিচুক্তি না হবার ফলে দুনিয়ার তার অবর্ণনীয় পরিণাম নিয়ে সমরবাদের অভ্যুত্থান ঘটেছে। মানুষের পক্ষে অত্যন্ত অপরিহার্য এই প্রশ্নকে চাপা দেবার জন্যে পশ্চিমী শক্তিগুলো কাণ্ডজ্ঞানহীনের মত অস্ত্রোপচার তুলে ধরেছে। কোনোরকম জার্মান শক্তিচুক্তি না থাকার ফলে, তার সুযোগ নিয়ে তারা প্রথমে দুটো-তিনটে অঞ্চল ভাগ করেছে জার্মানিকে চার শক্তি চুক্তি লংঘন করে পৃথক কারেন্সির সৃষ্টি করেছে এবং শেষ পর্যন্ত পশ্চিমী আঞ্চলিক রাষ্ট্র গঠন করে তাকে নাটোর অন্তর্ভুক্ত করেছে। এবং এখন এর এক্সেস অধিবেশন অনুযায়ী, নিজেকে পারমাণবিক অস্ত্রে সজ্জিত করতে চলেছে। তারা অবশ্য আমাদের আশ্বাস দিচ্ছে যে এই সমস্ত অস্ত্রসজ্জা শান্তিকেই সুরক্ষিত করবে। জার্মানির ইতিহাসে দু-দুবার কি আমরা এইসব আশ্বাসের অন্তঃসারশূন্যতার প্রমাণ পাইনি? এইসব আশ্বাসের অন্তঃসারশূন্যতার প্রমাণ কি আমরা পাইনি কোরিয়ায়, ভিয়েৎনামে, কিউবায় আর লাওসে? তাহলে কি করে আমরা এই আশ্বাসে নির্ভর করতে পারি যেখানে জার্মান সমরবাদ—যারা দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধের সৃষ্টি করেছিল—তাদেরকে আবার অস্ত্রসজ্জিত করা হচ্ছে।

এটা স্পষ্ট যে এসবের উদ্দেশ্য শান্তি প্রতিষ্ঠা নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিণামকে চাপা দেবার জন্যে এই সব চেষ্টা। ১৯১৯ আর ১৯৪১ সালে যা তারা শুরু করেছিল আবার তাই শুরু করতে চায়। এইজন্যেই হিটলারপন্থীদের সবাইকে আবার পশ্চিম জার্মানির গদিতে বসানো হচ্ছে।

জার্মান সমরবাদের পুনরভ্যুত্থানের বিপদ যে কতখানি, দূরদর্শী রাজনীতিক মাত্রেই সেটা বুঝতে পারছেন। সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী বন্দরনায়েক বলেছেন:

"……জার্মান সমস্যাটা আমাদের কাছে গত যুদ্ধের উত্তরাধিকার হিসেবে এসেছে। এবং যত তাড়াতাড়ি এ প্রশ্নের সমাধান হয়……শান্তির পক্ষে ততই ভাল……। বৃহৎ শক্তিগুলিকে তাদের নিজের নিজের এলাকা থেকে সমস্ত বিদেশী সৈন্য অপসারণে রাজী হতে হবে।

ঘানার রাষ্ট্রপতি নক্রুমা আরও পরিষ্কার বলেছেন: আমার মতে জার্মান শান্তিচুক্তি বহু আগেই স্বাক্ষরিত হওয়া উচিত ছিল।……দুনিয়ার জাতিগুলির এই দুটি রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেওয়া উচিত যাতে তাদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সম্ভব হয়। এই স্বীকৃতি যে শান্তি রক্ষায় অভূতপূর্ব সাহায্য করবে এ বিষয়ে আমি স্থির নিশ্চিত…।

উভয় জার্মান রাষ্ট্রের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ বলেছেন: "জার্মানি ও পশ্চিম বার্লিনের ক্ষেত্রে এ নীতি প্রয়োগ করা হলে তার অর্থ হবে বিভিন্ন সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীকে স্বীকার করে নেওয়া…বাইরের সমস্ত হস্তক্ষেপ ভুলে নেওয়া এবং শত্রুতা বৃদ্ধির সমস্ত সম্ভাবনাকে দূর করে দেওয়া…। উভয় জার্মানির সার্বভৌমত্বকে বিরাট একটা বাস্তব হিসেবে মেনে নেওয়াই কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয়। কাণ্ডজ্ঞান একথাও বলে যে পশ্চিম বার্লিনকে বৃহৎ শক্তি-সংঘর্ষের বা মতাদর্শগত বিরোধের লীলাক্ষেত্র করা উচিত নয়…"

প্রেসিডেন্ট সুকর্ণের অভিমত সংক্ষেপে জার্মানির

বর্তমান বাস্তব পরিস্থিতিরই অভিব্যক্তি। জার্মানির বিভাগ যতটুকু না রাজনৈতিক তার চেয়ে বেশি সামাজিক। দুটো জার্মান রাষ্ট্র দুটো বিপরীত সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিফলন।

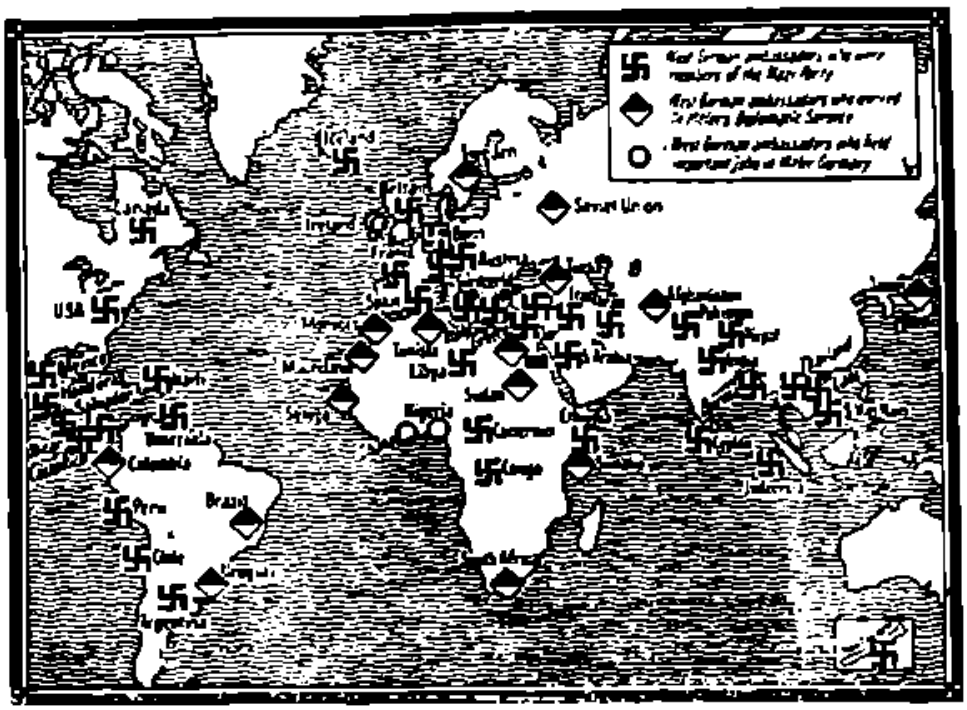

মনে রাখবেন : এটা ১৯৬২ সালের মানচিত্র, ১৯৩৩ সালের নয়।

পশ্চিম জার্মান রাষ্ট্র সেইসব ব্যক্তিকেই ক্ষমতাসীন রেখেছে যারা বারবার শুধু জার্মান জনগণেরই নয়, সমগ্র ইওরোপের জনগণের জীবনে এনেছে অবর্ণনীয় দুর্ভোগ। এই জাতীয়তা-বিরোধী শক্তিই বিংশ শতাব্দীর শুরুতে প্রথম মহাযুদ্ধ বাধাবার জন্যে ত্রিশক্তি চুক্তি করেছিল।

আবার কুড়িটি জার্মান একচেটিয়াগোষ্ঠীর এই শক্তিজোটই ডয়েস পরিকল্পনা থেকে পাওয়া ডলার নিজেদের পুনরুজ্জীবিত করে হিটলারকে গদিতে বসিয়েছিল। আর এই হিটলার ছিল কমিন্টার্নবিরোধীর চুক্তির নায়ক। এই চুক্তিতে সেদিন যারা স্বাক্ষর দিয়েছিল সেইসব রাষ্ট্রই পরে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে হিটলারের পররাজ্যগ্রাসী যুদ্ধে তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল। হিটলার অবশ্য যুক্তভাবে "বোলশেভিকবাদের" ওপর আক্রমণ চালাবার আকাঙ্ক্ষায় ব্রিটেন এবং আমেরিকার দলে সন্ধি করতে চেয়েছিল। কিন্তু সে চেষ্টা তার ব্যর্থ হয়। চ্যান্সেলারিতে আত্মহত্যার অব্যবহিত আগে হিটলার রিবেনট্রপ প্রতিনিধি হ্যাভেলকে বলে ছিলেন : "সবকিছুর ওপর আমার বিতৃষ্ণা এসে গেছে। আমি যখন চলে যাব, তারপর বহুদিন যাবত তোমাদের রাজনীতি চালিয়ে যেতে হবে।" বনের শাসকরা সত্যিই হিটলারের এই শেষ ইচ্ছাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। রাইনের তীরে ইতিহাস আজ স্তব্ধ। যুদ্ধমন্ত্রী স্ট্রস বলছেন, "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এখনও শেষ হয় নি।" এ্যাডমিরাল ক্ষেলাখ মনে করেছেন যে ফেডারেল রিপাবলিক "নাৎসীবাদের ভেতর যা কিছু শ্রেষ্ঠগুণ" তারই উত্তরাধিকার লাভ করেছে। প্রেসিডেন্ট লুবকে জার্মান যুদ্ধযন্ত্র সুপেশ্বরকে আশ্বাস জানিয়েছেন "জার্মান সেনাবাহিনীর অগ্রগামী ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ণ রাখতে।" ত্রিশক্তি চুক্তি ও কমিন্টার্ন-বিরোধী আঁতাতের ঐতিহ্য বহন করছে নাটো। আজ তাকে আণবিক অস্ত্রসজ্জার সজ্জিত করা হচ্ছে।

জার্মান ফেডারেল রিপাবলিক হল প্রতিহিংসাপরায়ণ সমরবাদী আর কোটিপতিদের শক্তির প্রতিভূ। বোটে একুশজন মন্ত্রীর মধ্যে সোনেরোজনই পুরোনো নাৎসী। নাৎসী শাসনের অনুগত দলত্যাগী হিসেবে চ্যান্সেলর আদেনাওয়ার যে পেন্সন পান এ পর্যন্ত কোনও কর্মচারী তা পাননি। প্রাকযুদ্ধ শস্ত্র-নির্মাণ কারখানা ক্রুপ, স্টাহলওয়ার্ক-এর সঙ্গে তাঁর স্বার্থ জড়িত। তাঁর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ স্টেট সেক্রেটারি গ্লোবকে ছিল ৬০ লক্ষ ইহুদী হত্যার আদর্শগত গুরু। এ্যাডলফ আইখমান গ্লোবকের পরিকল্পনাকেই কার্যকরী করেছিলেন শুধু। বুন্দেস্তাগের সভাপতি ডাঃ গের্স্তেনমেয়ার

রিবেনট্রপের বৈদেশিক মন্ত্রিদপ্তরে উচ্চপদস্থ কর্মচারী হিসেবে কাশিস্ত গোয়েন্দা বিভাগে কাজ করেছিলেন। এই ব্যক্তিটির অতি সহজার ঔপনিবেশিকতা বিশেষ রয়েছে। ১৯৬১ সালে লুমুম্বা হত্যা সম্বন্ধে সে বলেছিল "ক্ষমতাসীন লুমুম্বা সবকিছু নষ্ট করে দিতে পারে।" বৈদেশিকমন্ত্রী ডাঃ প্রভার ছিলেন নাৎসী পার্টি এবং এস. এস-এর একজন সক্রিয় কর্মী। রাইন আর রুহ এলাকার অর্থনৈতিক স্বার্থবহালদের সংগে এঁর ঘনিষ্ঠতা অতীতেও ছিল আজও আছে। এরাই ক্ষমতা দখলের জন্য হিটলারকে অর্থ যুগিয়েছিল। রাইন ওয়াল্টের প্রেসিডেন্ট শাখটের টীম উপদেষ্টা ছিলেন। বন সরকারের যুদ্ধ মন্ত্রী স্ট্রস হিটলারের সেনাবাহিনীর শিক্ষাবিভাগে কাজ করতেন। 'নাটো'র কেন্দ্রশক্তি হিসেবে বন সেনাবাহিনীকে পারমানবিক অস্ত্রে সুসজ্জিত করে গড়ে তুলবার ব্যাপারে এঁরাই উৎসাহ সবচেয়ে বেশী।

ফেডারেল রিপাবলিক সেনাবাহিনীর সেনানীমণ্ডলীতে ১৬০ জন সেনা ও নৌবাহিনীর অধ্যক্ষ আছেন। তাদের প্রত্যেকেই হিটলার বাহিনীর চয় সেনাধ্যক্ষ বা সেনা-বিভাগের অফিসার ছিলেন। এদের ভেতর শাস্তিপ্রাপ্ত যুদ্ধাপরাধীও আছেন ছয় জন। প্রধানতম হলেন হিটলারী অভিযানের প্রধানতম পরিকল্পনাকারী এডলফ হোয়েহিলার। এই হোয়েহিলারই আবার এখন নাটোর কুখ্যাত এম-সি ১৪ প্ল্যানের মস্তিষ্কস্বরূপ। এ প্ল্যানের উদ্দেশ্য হল বন সেনাবাহিনীর দ্বারা নির্বিচার পারমানবিক আক্রমণ চালিয়ে পূর্ব জার্মানীকে "মুক্ত" করা এবং এমন কি ১৯৩৯ সালের পূর্ব সীমান্তকেও ছাড়িয়ে ওডার-নীস সীমান্ত পেরিয়ে ফেডারেল রিপাবলিকের সীমারেখাকে প্রসারিত করা। এমনিভাবে হোয়েহিলারের মস্তিষ্ক-প্রসূত এই প্ল্যান পটসডাম চুক্তি অনুমোদিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফলকেও সংশোধিত করতে চায়। বন সেনাবাহিনীর চীফ অফ স্টাফ কুর্ৎস্ তার যুদ্ধাপরাধের জন্য ২৫ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল।

বনের বৈদেশিক দপ্তর হিটলারপন্থী কূটনীতিকে পরিপূর্ণ। সমগ্র কর্মচারী সংখ্যার শতকরা ৮৪ জনই তারা। মোট ৮০ জন বৈদেশিক দূতের মধ্যে ৭২ জনই হল প্রাক্তন নাৎসী।

সংক্ষেপে এইটেই হল ফেডারেল রিপাবলিকের ছবি—যার শাসকরা "শান্তি" আর "স্বাধীনতার" কথা আওড়ায়। পশ্চিম শক্তিগুলির, প্রধানত মার্কিন সমর্থন-পুষ্ট হয়ে এবং এক—পা এক—পা করে এগুবার হিটলারী পদ্ধতির অনুসরণ করে তারা পটসডাম চুক্তির বাধাতা-মূলক সমস্ত শর্তই ভঙ্গ করেছে। পটসডাম চুক্তিতে জার্মান সমরবাদীরা যাতে আর মাথা তুলতে না পারে তার জন্যে জার্মানি থেকে সমরবাদ আর নাৎসীবাদের উচ্ছেদ ঘটিয়ে তাকে বিকেন্দ্রীভূত করে সেখানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এইসব সমরবাদী আর ফাশিস্তরা, যারা ঔপনিবেশিকতাবাদীও বটে, অস্ত্রের শক্তিতে জার্মান গণতান্ত্রিক রিপাবলিকের সামাজিক ব্যবস্থাকে পাল্টে দিতে চায় এবং পটসডাম চুক্তি আইন সঙ্গত ভাবেই সোভিয়েতের প্রাপ্য তার যে পূর্ব অংশ, তাকে ফেরত দিয়ে ছিল সেটা আবার ফিরে দখল করতে চায়। চতুঃশক্তি চুক্তিতে জি, ডি, আর-এর অংশ হিসেবে স্বীকৃত পশ্চিম বার্লিনকেও তারা অবিরাম সামরিক প্ররোচনা এবং শেষ পর্যন্ত সশস্ত্র আক্রমণের ঘাঁটি হিসেবে নিজেদের কুক্ষিগত করে রাখতে চায়। কোনও রাষ্ট্রই চায়না তার বুকের কাছাকাছি একটা ছুরি উদ্যত থাকুক। বাস্তবিক পক্ষে জার্মান ডেমোক্রাটিক রিপাবলিকের গভীর অভ্যন্তরে অবস্থিত পশ্চিম বার্লিন তার বুকের ওপর উদ্যত ছুরিকা বিশেষ। যে কোনও সময় এ তার বুকে অনুপ্রবিষ্ট হতে পারে। এ যেন একটা টাইম বোমা যে কোনো সময় বিস্ফোরণ ঘটে যাবে।

পশ্চিমী শক্তিবর্গ আর বন-শাসকরা জি. ডি, আর-এর অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে চায়। আডেনাউয়ের কলোগে ১৯৬১ সালের এপ্রিলে তাঁর পার্টি সম্মেলনে বলেছেন সমগ্র জার্মানি ফেডারেল রিপাবলিকের মত সংবিধান না পাওয়া পর্যন্ত জার্মান ঐক্যের প্রশ্নই ওঠেনা··· কোনও রকমের আপস না করে জি, ডি, আর শাসনের অবসান ঘটানোই হবে বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য ও ধারিত্ব।

প্রাক্তন নাজী এবং অধুনা বনের উদ্বাস্তুমন্ত্রী সীবর ঘোষণা করেছেন :

"চেকোস্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড আর সোভিয়েত ইউনিয়নের কোনক্রমেই মনে করা উচিত নয় যে, আমরা

ওডার আর নাইসের পরবর্তী অঞ্চলগুলোর আশা একেবারে ছেড়ে দিয়েছি। এটা হল মধ্য ও পূর্ব ইওরোপের সমস্ত জনগণের মুক্তির প্রশ্ন ···এবং নিশ্চয়ই এটা করা দরকার।

পূর্ব ইওরোপের এই "মুক্তির" জন্য প্রাক্তন নাজীরা পারমাণবিক অস্ত্র পাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। আর যে পূর্ব জার্মানীকে এরা গ্রাস করতে চায় সেখানকার শাসন ব্যবস্থাটা কি রকমের? এটা এমন একটা শান্তিকামী রাষ্ট্র যা ইওরোপের ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিচ্ছে। পটসডাম চুক্তির প্রতিটি শর্ত এই যে রাষ্ট্র অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলেছে, এখানে ক্ষমতা পরিচালনা করে মেহনতী মানুষ। এই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব এবং বিকাশই জার্মান সমরবাদকে পঙ্গু করে দিচ্ছে। জার্মান ডেমোক্রাটিক রিপাবলিকই জার্মান ভূমিতে সর্ব প্রথম শান্তিকামী রাষ্ট্র। ইওরোপের কোনও রাষ্ট্রের কাছে এ আশংকাজনক নয়। একচেটিয়াপতিদের ক্ষমতা এখানে নষ্ট হয়ে গেছে। নির্মূল হয়ে গেছে সমরবাদী আর ফ্যাশিস্তদের ক্ষমতা। ফেডারেল রিপাবলিকের দিকে বারবার এরা অনাক্রমণ চুক্তির প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে গেছে, সম্পূর্ণ ও সর্বাঙ্গীন নিরস্ত্রীকরণের, পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধ করণের এবং মধ্য ইওরোপে পারমাণবিক অস্ত্রবর্জিত অঞ্চল সৃষ্টি করার প্রস্তাবের এরা অকুণ্ঠ সমর্থক এবং সর্বশেষে এর চেয়ারম্যান ওয়াল্টার উলব্রিখ্‌ট্‌ বা বলেছেন, "দেশসব নতুন জাতি ও জনগণ তাদের স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করছে তাদের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক মুক্তির সেই কঠোর সংগ্রামকেও এ রাষ্ট্র সমর্থন করে।"

জি. ডি. আর—এর শাসন পরিচালনা কাদের হাতে রয়েছে। চেয়ারম্যান উলব্রিখ্‌ট্‌—এক প্রবীন

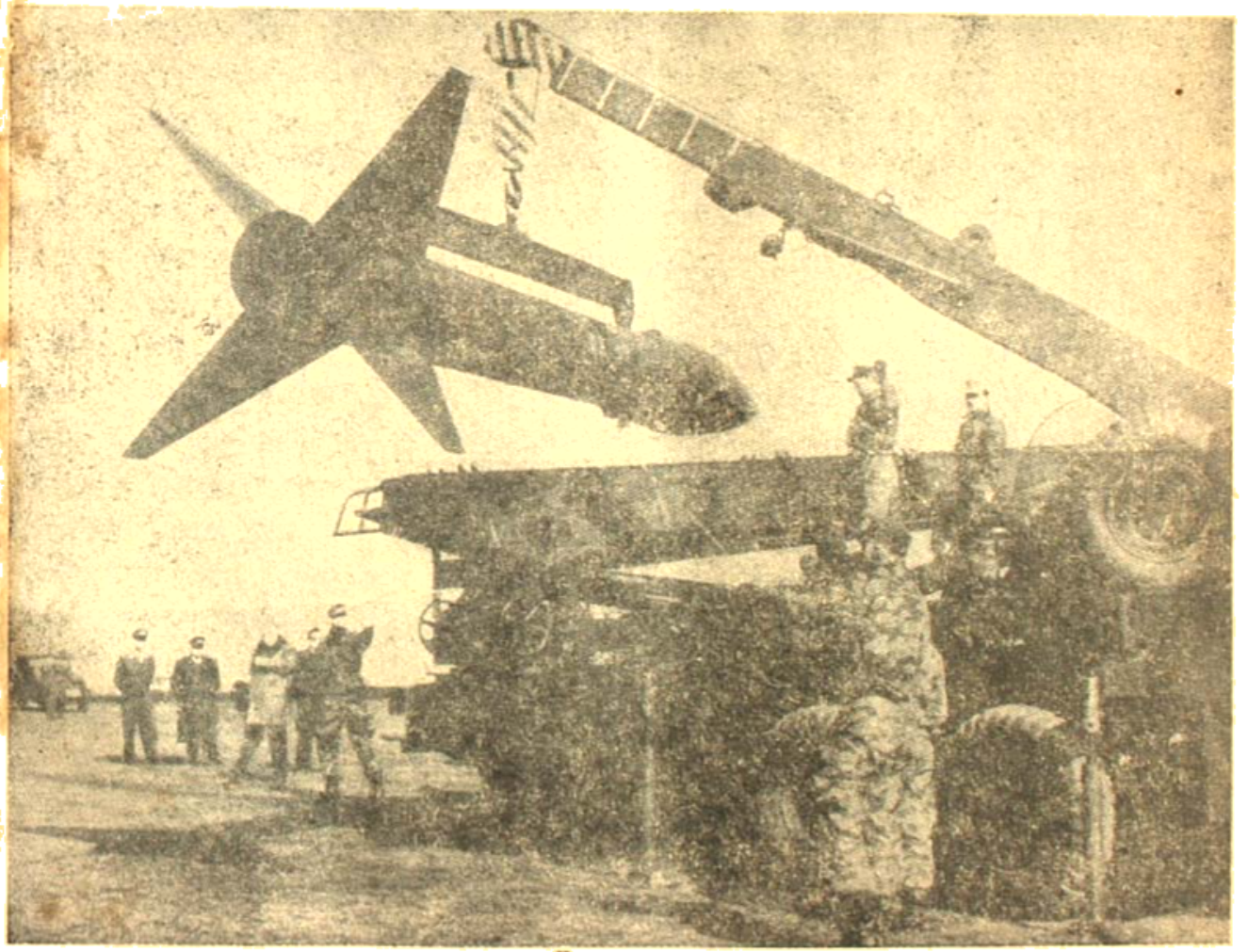

পশ্চিম জার্মানীর অস্ত্রসজ্জা।

পরিবারে এঁর জন্ম। কার্ল লাইবনেখ্‌ট—এর পাশে দাঁড়িয়ে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের ইনি বিরোধিতা করেছিলেন। বারবার কারাযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে তাঁকে। হিটলারী শাসনের বিরুদ্ধে আত্মগোপন করে সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। লোক পরিষদের সভাপতি হোহানেস ডিকম্যান তাঁর গণতান্ত্রিক কাজকর্মের জন্য নাৎসীদের দ্বারা অভিযুক্ত হয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী হ্রোটেউল একজন শ্রমিক সন্তান। একাধিকবার গেস্টাপো তাঁকে ধরে কারারুদ্ধ করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কার্ল মারনলড এক শ্রমিক পরিবারের সন্তান। ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে ইনি আত্মগোপন অবস্থায় দুঃসংগ্রাম চালিয়েছেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী রোলস্‌ আদালতে ফ্যাশিস্ত বিরোধীদের পক্ষ সমর্থন করতেন বলে নাৎসীরা তাঁর ওপর বাধানিষেধ আরোপ করে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী জেনারেল চফম্যান হিটলারের আমলে জার্মানির একজন ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ছিলেন এবং স্পেনে গৃহযুদ্ধে সংগ্রাম করেন। সুদক্ষ এই সেনানায়ক ১৯৫৯ সালে জেনেভায় বলেছিলেন : "আমরা যুদ্ধের সেনানায়ক নই, যুদ্ধবিরোধী সংগ্রামের নায়ক।"

জি. ডি. আর পার্লামেণ্টে ৪৬৬ জন সদস্যের মধ্যে ২৮৬ জনই শ্রমিক, ৩৬ জন অফিস কর্মচারী, বুদ্ধিজীবী ৪১ জন এবং ৪২ জন কারিগর।

জি. ডি. আর-এর ২৬ জন মন্ত্রীর ভেতর একজনও কখনও নাজী পার্টির সদস্য ছিলেন না। এদের ভেতর ১৯ জনই আইনসঙ্গত বা বেআইনীভাবে হিটলারী শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন এবং এর ফলে তাঁদের হয় জেলে, নতুবা কনসেণ্ট্রেশন ক্যাম্পে নিক্ষেপ করা হয়েছে।

এই হল নতুন জার্মান রাষ্ট্র যাকে পশ্চিম স্বীকার করতে চায় না। বরং মার্কিন প্রতিরক্ষা সেক্রেটারি ম্যাকনামারা ঘোষণা করেছেন যে "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পারমাণবিক অস্ত্রের পেছনে ১৫০০ কোটি ডলার ব্যয় করবার পরিকল্পনা নিয়েছে" কেননা, পারমাণবিক অস্ত্র কৌশলের ভূমিকাই এখন নাটোর সম্মুখে মূল সামরিক প্রশ্ন।"

পশ্চিম বার্লিনে বিপুল সামরিক মহড়া চলেছে। চ্যান্সেলর আদেনাওয়ের দাম্ভিক পশ্চিম বার্লিন সফরের পর জি. ডি. আর সীমান্তে তার বিরুদ্ধে পরিচালিত অন্তত ৯৩টি প্ররোচনামূলক ঘটনা ঘটেছে।—এবং এতে তিনজন সীমান্ত প্রহরী নিহত হয়েছেন। এখন খবর পাওয়া যাচ্ছে যে নাটোর এথেন্স অধিবেশনের পর অকেন শহরের কাছাকাছি পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণের জন্য একটি কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। এখানে ১৩০০ বিশেষজ্ঞকেও নিয়োগ করা হয়েছে। এই সব বিশেষজ্ঞ সাহারা মরু-ভূমিতে করাসী আণবিক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এর অর্থ আসছে জার্মান একচেটিয়া সংস্থা আই. জি ফারবেন, ডেগুসা আর সিমেন্স—এর কাছ থেকে—যারা হিটলারি যুদ্ধযন্ত্রকেও খাড়া করে তুলেছিল। নাটোর ভূতপূর্ব সৈন্যাধ্যক্ষ ফিল্ড্‌মার্শাল মণ্টগোমারি "সানডে এক্সপ্রেস"এ লিখেছেন : "ফেডারেল জার্মানির আজ পশ্চিম ইওরোপের সবচেয়ে শক্তিশালী সেনাবাহিনী রয়েছে। আমরা যদি ইওরোপীয় সমাজের সভ্য হই (এখানে কমন-মার্কেটের কথা হচ্ছে) তাহলে আমাদের সশস্ত্রবাহিনী···হয়তো কোন জার্মান সৈন্যাধ্যক্ষের ...আজ্ঞাধীন হবে।"

জার্মান সমরবাদ যে দুটি বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়েছিল তার পরিণাম যে শুধু ইওরোপের জনসাধারণকেই ভুগতে হয়নি—সমগ্র দুনিয়ার মানুষকেই ভুগতে হয়েছিল, তার সাক্ষী রয়েছে ইতিহাস। উভয় জার্মান রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তিচুক্তি বিস্ফোরণোন্মুখ বর্ষা ইউরোপের উত্তেজনাময় পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাতে বিপুল অবদান রেখে। এই ধরণের একটা শান্তিচুক্তি পটসডাম চুক্তির ভিত্তিতেই একটা আত্মঘাতী পরমাণবিক যুদ্ধের সম্ভাবনাকে সাফল্যের সঙ্গে রোধ করবে। যুক্তিমের নাজী ও সমরবাদী ছাড়া এরকমের একটা চুক্তি থেকে কারুরই কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। হোয়েসিন্সার অবশ্য বলেছেন যে "রিয়ুনিজমের পরিবর্তন ঘটানো যায় না একে শুধু ধ্বংস করা চলে।"

কিন্তু যুগ বদলে গেছে। পটসডাম-বিরোধী মনোভাবকে প্রতিরুদ্ধ করার সময় এসে গেছে। এই প্রতিরোধ করতে হবে শান্তি চুক্তির মাধ্যমে। তবেই ইতিহাসের বুকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অধ্যায় শেষ হয়ে শুরু হবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার নতুন স্বাক্ষরের অধ্যায়।

প দ ধ্ব নি

● ব্রজেন সাহা

প্রথম অধ্যায়

১৯৩৩ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের এক সন্ধ্যা।

জীবনগঞ্জের বড় বাড়ীর বর্তমান কর্তার একমাত্র কুমারী কন্যা সুচারু, দোতলায় তার নিজের ঘরে তখন প্রসাধন সমস্যা নিয়ে খুব বিব্রত। অনেকক্ষণ ধরে সে চেষ্টা করছে—প্রায় সংগ্রামই করছে—নিজেকে খুব সাদাসিধে অথচ বেশ সুন্দর পোষাকে সাজাতে।

কৃষ্ণপক্ষের মাঝামাঝি। সন্ধ্যার অনতি পরেই বড় বাড়ীর অলিতে গলিতে অন্ধকার ঘনিয়ে উঠছে। সুচারুর ঘরে টেবিলের উপর একটা বড় সাইজের সুদৃশ্য টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। তারই আলোতে দেয়ালে টাঙানো সোনালী ফ্রেমে বাঁধা পাঁচ ফুট লম্বা একটি বিলিতী আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, সুচারু নিজের বেশভূষা পরীক্ষা করছে—আর বারবার খালি সাড়ী পাল্টাচ্ছে। কোনোটাই আজকের দিনের পক্ষে—সুচারুর মতে ঠিক মানানসই হচ্ছে না।

দিনটির একটি বিশেষত্ব আছে। আজ কোনো সামাজিক আমন্ত্রণ নয়—বা সাধারণ যাত্রা থিয়েটার অথবা অন্য কোনো সামাজিক পাল পার্বণের দিনও নয়। এ সব ক্ষেত্রে সুচারু সহজেই উপযুক্ত বেশভূষা বেছে নিতে পারে।

জীবনগঞ্জের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে আজ বাংলার স্বনামধন্য চারণ কবি মুকুন্দ দাসের দলের যাত্রাভিনয়।

বছর পাঁচেক ধরে সুচারু জেলার সদর শহরে মেয়েদের স্কুলে পড়াশুনো করছে। এই মাস দুই হলো প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে সে বাড়ীতে এসেছে। মুকুন্দ দাসের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে অনেক কাহিনী শুনেছে সে। বছর দুই আগে তাদের স্কুলেই একবার মুকুন্দ দাসের যাত্রাভিনয় দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল তার। এই জন্যেই বেশভূষা বিষয়ে সুচারুর মনে আজ এতো সঙ্কোচ আর এতো ভয়। অভিনয় কালে বিবেক-বেশধারী মুকুন্দ দাস নানা বিষয়ে বক্তৃতা করে থাকেন। সে বছর প্রসঙ্গক্রমে তিনি শুদ্ধ সমাজের মেয়েদের উগ্রবিলাসিতাকে প্রচণ্ড ভাবে সমালোচনা করেন। তাই শুনে আসরভর্তি মেয়েদের

সে কি লজ্জা!—অনেকক্ষণ পর্যন্ত মাথা তুলতে পারে নি কেউ।

সুচারুর চার পাশে রঙ বেরঙের ভাঁজ ভাঙা দামী দামী সাড়ী স্তূপীকৃত হয়ে জমে উঠেছে। কি উগ্র রঙের সমাবেশ তাদের বাড়ীতে। এতগুলো কাপড়ের মধ্যে একটাও এমন পাওয়া গেল না যেটার রঙ চোখ ধাঁধানো নয়—অথবা যেটার পাড় ও আঁচলের মধ্যে জরির কাজের বাহার কিছু কম। খুব মুস্কিলেই পড়লো সুচারু। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে যে একটা মানানসই কাপড়ের অভাবেই আজ মুকুন্দ দাসের গান শোনা হবে না তার। কি আশ্চর্য!

গায়ের বেশীর ভাগ জরিকালো অলঙ্কারই খুলে রেখেছে সুচারু। গৌরবর্ণ মুখশ্রীতে সামান্য পাউডারই মেখেছে—কেবল গরমের দিনের ঘামটাকে ঠেকানোর জন্যে একটুখানি পাউডার মাখা। ঘামের গন্ধ কিছুতেই সহ্য হয় না সুচারুর। কাজল বা সুর্মাও আজ চোখে দেয়নি সে। এদিককার সমস্যা মোটামুটি সমাধান করা গেছে—কিন্তু জামা কাপড়ের সমস্যা নিয়ে সত্যি সত্যিই চিন্তিত হয়ে পড়ল সুচারু। যদি তার সাড়ীর রঙের বাহার দিয়ে মুকুন্দ দাস বৈরক্তিতে কোনো কথা বলেই ফেলেন বা কোনো বিদ্রূপাত্মক গান গেয়ে বসেন—তবে জীবনগঞ্জে আর মুখ দেখানোর উপায় থাকবেনা। পর পর এতগুলো সাড়ী পরে পরীক্ষা করে দেখলো সুচারু। এই সব কাপড় পরে আয়নার সামনে দাঁড়ালে তার সামনে তা নিজেরই মনে হয় সে যেন কোনো ঐতিহাসিক নাটকের নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করতে যাচ্ছে। বেছে বেছে কিছুটা ফিকে রঙের সাড়ীও সে দেখলো—কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটু অনাবশ্যক জাঁক জমক যেন থেকেই যায়।

অবশেষে সুচারু সাদা জমিনের একখানি তাঁতের কাপড় তার মায়ের আলমারী থেকে খুলে নিয়ে এলো। এর পাড় ও আঁচলে জরির কাজের চাক চিক্য এতোটা উগ্র নয়।

ঘড়িতে তখন সাড়ে সাতটা বেজে গেছে। এতো দেরী করা মোটেই উচিত হয় নি আজ—যা ভীড় হবে মুকুন্দ দাসের গান শুনে।…তাড়াতাড়ি আলোহালো ভাবে কাপড়টি পরে সুচারু দাঁড়ালো আয়নার সামনে। হ্যাঁ, এবার যেন অনেকটা মানিয়েছে তাকে—বেশ পরিচ্ছন্ন, শান্ত—কিছুটা গাম্ভীর্যভরা। সাদা জমিনের সাড়ী পরে এর আগে আর কখনও বেড়াতে যায় নি সুচারু। সত্যিই তো, কি এখন খারাপ দেখাচ্ছে তাকে? দর্পণে প্রতিফলিত নিজের অবয়বের দিকে গভীর মনোযোগের সঙ্গে তাকালো সে। দূরে ঘন কালো আকাশের মিট মিটে তারাগুলোও প্রতিফলিত হয়েছে আয়নায়—এক গুচ্ছ নক্ষত্রের মাঝে সাদাসিধে পরিচ্ছদে ঢাকা স্বল্পালঙ্কৃতা নিজের প্রতিচ্ছবির দিকে চেয়ে মৃদু হেসে সুচারু আপন মনে বলে উঠলো—কি এমন মন্দ দেখাচ্ছে!

সুচারু যখন নিজেকে প্রায় প্রস্তুত করে তুলেছে—এমনি সময় বাড়ীর প্রধান পরিচারিকা নিত্য এসে ম্লান মুখে চাপা বিরক্তি ও হতাশা প্রকাশ করে, বলল—শুনেছ? কর্তাপী আবার বেঁকে বসেছেন—যাবেন না।

—সেকি!—বলতে বলতে সুচারু তাকালো নিত্যর দিকে। কথাটা যেন সে বিশ্বাসই করতে পারে নি।

—আমি কি মিথ্যে কথা বলছি?…কর্তাপী না গেলে আমারও যাওয়া হবে না।—

—নিত্য বলল দুঃখ প্রকাশ করে।

সারাটি দিন ধরে মায়ের পিছু পিছু ছায়ার মতন ঘুরেছে সুচারু। কত খোসামোদ কত অনুনয় বিনয় করে অবশেষে সন্ধ্যার দিকে মাকে সে রাজি করাতে পেরেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই "না"-ই বহাল রইল! মায়ের ব্যবহারে তীব্র অভিমানে আহত হয়ে সুচারু বলল—তুমি যাবে না কেন? তুমি বরং কারো সঙ্গে চলে যাও—আমারই যাওয়া হবে না আজ। মুকুন্দ দাসের গান শোনা এবার আমার কপালে নেই।…থাকগে, আর দেরী করো না, সোপালের মা। আর দেরী করলে কিছুতেই জায়গা পাওয়া যাবে না।

সুচারুর মা চিন্তামণি ঘরের বাইরে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়েছিলেন। এগিয়ে এসে তিনি মেয়েকে বললেন—আমার কথা শোন টুনু! নিত্যকে সঙ্গে নিয়ে তুই যা। আমার বুকে শূন্য শোকের আগুন—আমার আবার কিসের গান বাজনা। দা বুঝে রাগ করিস নি।

মায়ের কম্পিত কণ্ঠস্বর শুনলেই সুচারুর মনের অভিমানের বোঝা হাল্কা হয়ে যায়। দয়ানুভূতিশীল দার্শনিকের মতন সে বলল—পুত্র শোক কার ঘরে নেই মা? তাই বলে তুমি এভাবে আত্মহত্যা করবে?

গত বছর এমনি আর কাঁঠালের দিনে সুচারুর ন'বছর, যে ছিল পরিবারটির মধ্যে সব চাইতে বুদ্ধিমান ছেলে, মাত্র কয়েক দিনের জ্বরে বিকারগ্রস্ত হয়ে অকালে প্রাণ-ত্যাগ করেছে। স্থানীয় ডাক্তারেরা কেউ রোগই চিনতে পারে নি। বালবিধবা পুত্র বধূটি যেন জীবন্ত আগুনের শিখা। সুচারুর কথার উত্তরে চিন্তামণি বললেন—আত্মহত্যা করতে পারলে আমি বাঁচতাম রে টুনু।··· আমার যা মনের অবস্থা তাতে কি কেউ যাত্রাগান শুনতে পারে?—এতটুকু বুদ্ধি নেই তোর?

—আমি তো হাজার বার বলেছি, মা!—মুকুন্দ দাসের গান আর সাধারণ যাত্রা—এক জিনিস নয়। মহাপুরুষকে দেখলেও শান্তি পাবে। চল মা—একটি বার চল।—সকাতর অনুরোধে জানিয়ে বলল সুচারু।

—তোর জ্বালায় আমি একটু কাঁদতেও পারি না, টুনু! আমাকে পাগল বানাবি তুই। আমি বলছি, নিতাকে নিয়ে তুই যা।

—তোমাকে ফেলে আজ আমি যাবো না—কিছুতেই যাবো না। মুকুন্দ দাসের গান শুনতে কেন যাবেনা তুমি?—সুচারু দৃঢ়তর কণ্ঠে বলল।

—আরেকটা দিক ভেবেছিস তুই? তোর বাবা নেই বাড়ীতে—এ অবস্থায় আমি কার কাছে বলে যাবো? হাজার হোক, এ বাড়ীর বৌ আমি। চিন্তামনি বললেন।

সুচারুও তেমনি প্রতিবাদ জানিয়ে বলল—পঞ্চাশের উপর তোমার বয়স যা। এখনো তুমি নিজেকে 'বৌ' মনে কর?

—কেন মনে করবো না? মেয়েছেলে যতদিন বেঁচে থাকে ততদিনই সে শ্বশুরবাড়ীর বৌ থাকে। এ বাড়ীর বৌরা কখখনো নিজেদের আত্মীয় ছাড়া কারো বাড়ীতে গান-বাজনা শুনতে যায় না।—দৃঢ়স্বরে বললেন চিন্তামণি।

—ঐ তো, আবার ভুল করলে তুমি। কতোবার বলেছি—কারো বাড়ীতে নয়, ইস্কুলের ময়দানে—তাও মুকুন্দ দাসের গান।—সুচারু বলল প্রতিবাদ জানিয়ে।

—এ বাড়ীর বৌ-ঝিরা যেখানে সেখানে যায় না, এটাই নিয়ম। এ নিয়ে তর্ক করা চলে না টুনু! তোর বাবাকে জানিস তো! আর তুইও তো বড় হয়েছিস। এ বছর তোর আঠারো চলছে।

—আশ্চর্য কথাই বলছ মা! তোমাদের এমন বৌদি হতে আমি কোনোদিনই পারবো না। মেয়েছেলে বলে আমরা যেন মানুষ নই! মুকুন্দ দাসের গান, তাতেও এত কথা! ঠিক আছে, আমি যাবো না—সেই ভাল। গোপালের মাকে কারো সংগে পাঠিয়ে দাও।

* *

মাকে রাজি করিয়ে লোক-লস্কর সংগে নিয়ে সুচারু যখন বাড়ীর ফটক পার হয়, রাত্রি তখন প্রায় পৌনে নয়টা। অন্ধকার রাত্রি—শ্রাবণের। পথে চিন্তামণির কিরকম গা ছম ছম করতে লাগল। সংগের লোকজনদের নির্দেশ দিয়ে তিনি বললেন—দুগাপদ আলো নিয়ে তুমি আগে আগে যাও। ইরাসিন, আর দারোয়ান থাকো পেছনে··· বাবাঃ, কি অন্ধকার।

চিন্তামণি অত্যন্ত সতর্কভাবে এবং ধীরে ধীরে পা ফেলছিলেন। প্রতি পদক্ষেপেই যেন আঁৎকে উঠেছিলেন তিনি। মায়ের এই বিব্রত অবস্থা লক্ষ্য করে সুচারু বলল—ভয় পাচ্ছো মা?

অতি ক্ষীণ কণ্ঠে প্রায় কিস্ কিস্ করে চিন্তামণি বললেন—দেখছিস না, চারদিকে কি অন্ধকার। একটা বাতি জ্বলছে না কোনো ঘরে—কোনো মানুষের সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। কুকুরগুলো খালি ঘেউ ঘেউ করে ডাকছে।

নিতা বলল—গাঁয়ের লোক কি আর ঘরে আছে আজ। মুকুন্দ দাসের গান শুনতে, সবাই পাগল হয়ে ছুটে গেছে।

—তাই! তাই এত নিরালা।···আর আমি তো কত বছরের মধ্যেও এই পথ ধরে হাঁটেনি।—বললেন চিন্তামণি।

—আমরা গেতে যাত্রা সুরু হয়ে যাবে। সুচারু বলল।

—তা হোক। তবু আমি দৌড়তে পারবো না বাপু— চিন্তামণি আপত্তি জানিয়ে বললেন—একে আমার শরীর মোটা, একটু ওঠা-নামা করলেই বুকের ভেতর যেন হাতুড়ি পেটে। আর আমার কি হেঁটে চলা অভ্যেস আছে কখনো। চল্লিশটা বছর তো একটা বাড়ীর দেওয়ালের ভেতরই কাটিয়ে দিয়েছি। জীবনে যে কদিন আমি পায়ে হেঁটে পথ চলেছি, তা আমি আঙুলে গুণে বলতে পারি!—সতর্কভাবে পা ফেলতে ফেলতে চিন্তামণি বলে চললেন।

—কিন্তু তুমি এতো আস্তে আস্তে হাঁটছো না। আমার কেমন পা ধরে আসছে। সুচারু আবার বলল।

চিন্তামণির অন্তরালে নিত্য ফিক করে হাসলো একটু।

—কি করবো বল। আমাকে বললেই আমি পারবো না—কিছুতেই না। তোদের পাল্লায় পড়ে আমি খুব তাড়াতাড়ি হাঁটছি—হাঁপিয়ে উঠছি আমি—বললেন চিন্তামণি।

সুচারু খানিকক্ষণ চুপ করেই রইল। তার দৃঢ় বিশ্বাস যে, অভিনব ইতিমধ্যে নিশ্চয় সুরু হয়ে যাচ্ছে—রাত তো কম হয়নি।

পথের বাঁক ঘুরতেই নদীর হাওয়া গায়ে লাগছে। ঝাপ্সা ঝুরঝুরে হাওয়া। এরই মধ্যে নদীর হাওয়া ঠাণ্ডা হয়ে উঠছে।

—আঃ! বাঁচা গেল! কি সুন্দর হাওয়া। নে, এবার একটু পা চালা—এবার পারবো। চিন্তামণি সুচারুকে উৎসাহ দিয়ে বললেন।

এবার সকলে কিঞ্চিৎ দ্রুতবেগে হাঁটতে সুরু করলো। চিন্তামণির মনে হলো, তিনি যেন আজ ছেলেবেলাকার মতো দৌড়াচ্ছেন। আজ এতদিন পর মাঝিবেলার পরমের দিনে নদীর ধারে হাঁটতে হাঁটতে চিন্তামণির মনে পড়ল বিস্মৃতপ্রায় শৈশবের কথা—কৈশোরের কথা! এমনি এক ছোট নদীর ধারে আরেক গ্রামের এক বড় বাড়ীতে তাঁর জন্ম। চিন্তামণির পিতৃকুলে বহু-পুরুষের অধিষ্ঠান। ছেলেবেলায় সেই বাড়ীতে সাঁতার কাটতেন—এমন কি বর্ষার দিনেও। কি ভালো লাগতো তখন। তারপর একদিন চতুর্দোলায় চড়ে, বিরাট সমারোহপূর্ণ উৎসব-পরিবেশে তিনি এসেন জীবনগঞ্জের বড় বাড়ীতে বধূ হয়ে। সেই থেকে আজ চল্লিশ বছর—একটি বাড়ীর দেওয়ালের ভিতরেই কাটিয়ে দিলেন তিনি! মাথায় অবগুণ্ঠন দেওয়া, আস্তে আস্তে কথা বলা, সদা-সর্বদা লজ্জায় শঙ্কিত থাকা—এবং কর্তার অনুমতি নিয়ে কদাচিৎ বাইরে যাওয়া। এই তো চল্লিশ বছরের জীবন। ছোট্ট একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চিন্তামণি বললেন—তাই তো রে, টুনু! চল্লিশটা বছর কি করে চারটে দেওয়ালের ভেতর কাটিয়ে দিলাম, তাই ভাবছি।

—সত্যি অবাক লাগে আমার মা। এ আমি কিছুতেই কল্পনা করতে পারি না। চলতে চলতে সুচারু বলল।

—নে, পা চালা। হাঁটতে হাঁটতে বোধহয় পায়ের জড়তা কেটে যাচ্ছে! এখন যেন পারবো। চালা। পা চালা।—চিন্তামণি বললেন।

গত দু-মাস ধরে চিন্তামণি, সুচারু সম্বন্ধেই সব চেয়ে বেশী চিন্তা করছেন। সুচারু এবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে বাড়ীতে এসেছে। এবার মেয়ের বিয়ের চেষ্টা সুরু হবে। কি রকম ঘরে তার বিয়ে হবে কে জানে? মা অভিমানী আর স্বাধীনচেতা মেয়ে।...এসব নিয়ে চিন্তামণি কিছুটা দুশ্চিন্তাও ভোগ করছেন। সত্যিই তো, সুচারু কিছুতেই তার মায়ের মতন জীবন কাটাতে পারবে না—অসম্ভব।

• • •

সমবেত বিশাল জনতার বিরাট কলরব—দূর থেকেই শোনা যাচ্ছে। অন্ধকার জনহীন নীরব পল্লীপথ—এত বড় কলরব এরা কেউ কোনোদিন আর শুনেনি। চকিতের মধ্যে চিন্তামণির হৃদপিণ্ড কেঁপে উঠল যেন। শঙ্কিত কণ্ঠে তিনি বললেন—ওরে বাবা! শ্রীক্ষেত্রের সাগর পাড়ে এলাম নাকি! টুনু! কত লোক হবেরে? মনে হয়, সাগর যেন গর্জে উঠেছে।

—গান বোধহয় সুরু হয়নি, মা! তাই একটু গোলমাল হচ্ছে। গ্রামের আসর; কত আর লোক হবে। মাকে ভরসা দিয়ে সুচারু বলল।

কিন্তু আরেকটু এগিয়ে সরু পথটা সরাসরি ভেতর দিকে মোড় ঘুরতেই, সুচারুর গলাও শুকিয়ে গেল।

সত্যিই এক অনারণ্য! এর আগে আরও কয়েকবার ইস্কুলের মাঠে সে যাত্রা অথবা কবিগান শুনতে এসেছে। কিন্তু এই এতো বড় মাঠটা ভরে গিয়েও চারদিকে মানুষ উপচে পড়তে পারে—তা সে কোনোদিন কল্পনাও করেনি।

প্যাণ্ডেলটির তিন দিকে লম্বা লম্বা টিনের ঘর একদিকে পুকুর। টিনের ঘরগুলোর পেছনে অতি পুরোনো আম-কাঁঠালের বাগান। প্যাণ্ডেলে তো তিল ধরনের ঠাঁই-নেই-ই—তারপর টিনের ঘরগুলোর সামনের বেড়া খুলে দিয়ে ঘরের ভেতর পর্যন্ত লোক বসানো হয়েছে। তাতেও কুলোয়নি ঘরের চালে চালে কত মানুষ! এমনকি গাছগুলোর ডাল পালায় পর্যন্ত মানুষ! আশ্চর্য্য আকর্ষণ এই চারণ কবির।···জীবন ধন্য!

জনতার এই বিশাল সমাবেশ দেখে সুচারু হতাশ হয়ে পড়লো। সে বলল হবেনা মা! আজ ফিরে যেতেই হবে। এর মধ্যে ঢুকতে পারবো না।

চিন্তামণি চমকে দাঁড়ালেন। সঙ্গের লোকেরাও দাঁড়িয়ে পড়লো। ফিরেই যেতে হবে, না! আমাদের কত বেশী দেরী হয়ে গেছে! হতাশ হয়ে সুচারু বলল।

—দাঁড়া! ফিরে যাবো কি? গান তো এখনো আরম্ভ হয়নি দেখছি। খালি ঢোলকের চাঁটি শোনা যাচ্ছে।···এতদূর পায়ে হেঁটে এসে ফিরে যাবো? চিন্তামণি বললেন।

জীবনগঞ্জের এলাকার মধ্যে, মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে, পায়ে হেঁটে যাত্রাগান শুনতে এসে তিনি বসবার জায়গা না পেয়ে ফিরে যাবেন—এটাও চিন্তামণি কল্পনা করতে পারেন না। তাঁরই শ্বশুরকুলের কোন পূর্বপুরুষ এই পল্লীটির প্রতিষ্ঠাতা সেই সাদেই এর নাম হলো "জীবন গঞ্জ"! আজ যে ইস্কুলে মুকুন্দ দাসের যাত্রা হচ্ছে, সেই জমিটা চিন্তামণিরই শ্বশুর দান করে গেছেন। গাঁয়ের যে কোনো ব্যাপারেই তাঁদের সেরেস্তা থেকে মোটা হারে চাঁদা যায়। এই অবস্থায় সকলের মতো তাড়াহুড়ো করে আসতে পারেন নি বলে, তিনি ফিরে যাবেন? চিন্তামণি জিজ্ঞাসা করলেন,—এ গানের ব্যবস্থা কারা করলো? জানিস কিছু? আমাদের রাইমোহন কোথায়?

রাইমোহন পোদ্দার হলেন জীবনগঞ্জের ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট—স্থানীয় বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তিজন। সম্পর্কে সুচারুর মামাতো ভাই, অবশ্য একটু দূরে সম্পর্কে। গঞ্জের বিভিন্ন ব্যাপারে রাইমোহনই এখন কর্তা। তাই চিন্তামণি জিজ্ঞাসা করলেন—রাইমোহন কোথায়?

জীবনগঞ্জের গ্রাম্য-খলাদলির কিছুটা খবর সুচারুর জানা আছে। তাদের দেরেস্তার ম্যানেজার দুর্গাদাস বাবু একজন পয়লা নম্বরের গ্রাম্য রাজনীতি বিশারদ। তিনি প্রায়ই সুযোগ পেলে সুচারুর সঙ্গে গ্রাম্য-দলাদলি নিয়ে গল্প করেন। গ্রাম সম্পর্কে সুচারু তাঁর নাতিনী। সেই সুযোগে তিনি শিক্ষিতা নাতিনীর কাছে নিজের পাটোয়ারী বুদ্ধির সাফল্যের বিচিত্র নতুন নতুন কাহিনী বিস্তারিত পরিবেশন করে থাকেন। চিন্তামণির প্রশ্নের জবাবে সুচারু তাই বলল—ওঁরা নেই এর মধ্যে। গঞ্জে আজ যারা প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছেন, তাঁরাই মুকুন্দদাসের গানের ব্যবস্থা করেছেন—স্বদেশী-ওয়ালারা।

—কারা তবে? চিন্তামণি আবার জিজ্ঞেস করলেন। এতটা ভেতরের খবর তিনি রাখেন না।

আজকের এই অনুষ্ঠানের প্রধান সংগঠকের নাম সুচারু জানতো দুর্গাদাস বাবুর কাছেই আজ সকালে সব কথা শুনেছে সে। তথাপি তাঁর নামটি মায়ের কাছে বলতে সুচারুর কেমন বাধো-বাধো ঠেকছে। তার নাম কৃষ্ণসুন্দর। এই গাঁয়েরই এক সাধারণ ঘরের ছেলে সে। সম্প্রতি সে জীবনগঞ্জের মুন্সেফী আদালতে ওকালতি সুরু করেছে। এই কৃষ্ণসুন্দর ছিল সুচারুর মৃত দাদার ঘনিষ্ঠতম বাল্যবন্ধু। তার নাম শুনলেই চিন্তামণি কেঁদে উঠতে পারেন। আরও একটা কথা আছে—কৃষ্ণসুন্দরের সঙ্গে সুচারুদের পরিবারের বর্তমান সম্পর্ক বেশ কিছুটা তিক্ত। তাই সুচারু সহজে এই নামটি বলতে পারলোনা।

—কিছুই জানিস না তা হলে?—চিন্তামণি মন্তব্য করলেন।

—ঐযে, কৃষ্ণসুন্দর বাবু, আর তার দাপোপাপরা। সুচারু বললো অবশেষে।

—আমার সই-এর ছেলে? কেষ্ট? চিন্তামণি অস্ফুট

স্বরে জিজ্ঞেস করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরও মনে পড়লো অনেক দিনের অনেক দুঃখের কথা—তিক্ততার কথা।... তথাপি চিন্তামণি গানের আসর থেকে ফিরে যেতে রাজি হতে পারলেন না। তিনি বললেন—এক কাজ কর, টুনু। ইরাদিন কে বল, কেষ্টকে গিয়ে আমাদের কথা জানাতে। আমরা নাহয় একটু দাঁড়িয়েই থাকি।

—তা হলে বরং কাছে গিয়েই দাঁড়াই চল। একটু এগিয়ে চলনা বলল সুচারু। এতক্ষণে বেচারা আশ্বস্ত হয়েছে যে, চলত জায়গা মিলতেও পারে।

পুকুর পাড়ের পথ ধরে তারা আরও খানিকটা এগিয়ে গেল।

ইরাদিনকে কৃষ্ণসুন্দরের খোঁজে পাঠিয়ে দিয়ে, সুচারুরা আসরের দিকে ধীর পদক্ষেপে এগোতে সুরু করল। অদ্ভুত এক রোমাঞ্চকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে আজ। সামনের দিকে হাঁটতে হাঁটতে সুচারু কেবল আসরের দিকটাই দেখছে। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। ঘন অন্ধকারের বুকে যেন একটা উজ্জ্বল আলোকের দ্বীপ গড়ে উঠেছে আজ। আলো-আঁধার খেলা সবচেয়ে বেশী জমে উঠেছে আসরের তিনদিকে ঘিরে আম-কাঁঠালের বড় বড় গাছগুলোর মাথায় মাথায়। ঘন সন্নিবিষ্ট কালো কালো অসংখ্য পাতার বুকে পাম্পোম্যাক্স-বাতির আলোর রশ্মি মালোর শেষ স্পর্শ লাগছে যেন। ওদিকটার আলো আঁধারের কি চমৎকার মেশামেশি। গাছে গাছে মানুষ গুলোকে কেমন দেখাচ্ছে। পাতার আড়ালে ছোট ছোট আগুনের ফুলকি জ্বলে উঠছে—বিড়ি খাচ্ছে বোধ হয় মাঝে মাঝে ডাল-পালাগুলো নড়ে নড়ে উঠছে। অভাবনীয় দৃশ্য বটে!

—মা ঐ দেখো! গাছের ডালে কত মানুষ! সুচারু বলল।

—তাই তোরে! এ দেখছি ভয়ানক অবস্থা! মানুষ দেখছি ক্ষেপে উঠেছে আজ!

—চিন্তামণি মন্তব্য করলেন প্রত্যুত্তরে। সবাই যেন আজ মরিয়া হয়ে রাত জেগে গান শুনতে চাইছে—কি আশ্চর্য।

—কৃষ্ণসুন্দর বাবুকে কোথায় খুঁজে পাবে ইরাদিন? অসম্ভব।—সুচারু আবার হতাশ হয়ে পড়লো।

—তা হলে এক কাজ কর না। দুর্গাপদকেও পাঠিয়ে দে আরেক দিকে আমাদের সঙ্গে কেবল দারোয়ান থাকলেই চলবে।—চিন্তামণি নির্দেশ দিলেন।

লণ্ঠনটা দারোয়ানের হাতে দিয়ে দুর্গাপদও চললো কৃষ্ণসুন্দরের খোঁজে।

• •

স্কুল প্রাঙ্গণের প্রবেশ-পথের কাছা কাছি, নদীর ধারে জেলা বোর্ডের উঁচু সড়কের উপর সারি সারি দোকান-পাট বসে গেছে। পান-বিড়ি-সিগারেট-দেশলাই এসবের খুব চাহিদা। ছোট ছোট কেরোসিন-টিনের বাক্সকে টেবিল বানিয়ে—তার উপর দোকান-পাট সাজানো। অধিকাংশ দোকানের সামনে একটি করে মোটা সলতের কেরোসিনের ডিবা। কেরোসিনের বাতির লালচে শিখাগুলো প্রবল বিক্রমে কালির শিখায় চারদিক প্রায় আচ্ছন্ন করে ফেলছে। কি উৎকট গন্ধ। মা ও মেয়ে দু'জনেই নাকে রুমাল দিল—আঁচলের খুঁট দিয়ে নিজও তার নাকের বাঁশী দুটি চেপে ধরলো।

এরই মধ্যে কিন্তু বেচাকেনা হচ্ছে মন্দ নয়। কত রঙ বেরঙের কথা বলে দোকানদাররা খদ্দের আকর্ষণ করছে। কেউ বলছে—আসুন, মুখবিলাস পান। ভাল মসলা—আসুন। —কেউ বলছে বেসম বাহার—

সব চাইতে বেশী জমিয়েছে ঐ পানওয়ালাটি। ঐযে পনেরো ষোল বছরের একটি ছেলে। মাথায় একটি পাগড়ী বেঁধেছে—এবং বেশ আকর্ষণীয় অঙ্গভঙ্গী করে ক্ষিপ্রহস্তে পান সাজাচ্ছে আর হড়া কেটে খুসী মেজাজে বলছে—আসুন! আসুন!

মুকুন্দ দাসের পান।
আর মঙ্গল দাসের পান।
আসুন আসুন।
মঙ্গল দাসের পান।
আর মুকুন্দ দাসের গান।
এমন দিন আর পাবেন না।
আসুন! আসুন!
মুকুন্দ দাসের গানের আগে,
মঙ্গল দাসের পান। আসুন।
আসুন! আসুন! এদিকে আসুন।

মুকুন্দ দাসের গান।
আর সেই সঙ্গে মঙ্গল দাসের মিঠা পান!
খেয়ে যান! নিয়ে যান। আসুন!
এমন দিন আর পাবে না। আসুন।
আসুন! আসুন! মঙ্গল দাসের পান
খেলে পরে।
সমস্ত অমঙ্গল যায় যে দূরে। আসুন!
এ পান খেয়ে জঙ্গলে গেলেও মঙ্গল,
এ পানের নাম দুর্মঙ্গল। আসুন। আসুন।
বাংলার বিখ্যাত কবি মুকুন্দ দাসের গান।
আর জীবন গঙ্গের কবি মঙ্গল দাসের পান।
আসুন! আসুন! বুঝে পান খাবেন। আসুন!

আশ্চর্য স্বতঃস্ফূর্ত কবির শক্তি এই সাধারণ ছেলেটির। সুচারু অবাক হয়ে শুনল তার হুঙ্কার বাহার। তার দোকানে খদ্দের এবং ভিড়ও একটু বেশী।

মঙ্গল দাসের দোকানের পাশেই একটা চা-বিস্কুটের দোকান। কাঠের উনানে একটা পুরানো ময়লা কেৎলী বসানো। ছোট ছোট কয়েকটি কাঁচের গ্লাসে চা বিক্রি হচ্ছে। চা-পিয়াসীরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই চা খাচ্ছে। এখানেও বিক্রী মন্দ নয়। চাওয়ালা ছেলেটিও হাঁকছে—তার অবশ্য কবির শক্তি নেই—সে কেবল একটানা সুরে বলছে—আসুন! গরম চা! ভাল আদা-চা। আসুন।...

কত রকমের লোক যে চা খাচ্ছে। সাধারণ কুলক থেকে ভদ্র লোকরা পর্যন্ত।—এই পরিবেশে, প্রায় অন্ধকার গ্লাসে চা খাওয়া কোনো মানুষের পক্ষে কি করে সম্ভব হতে পারে, তাই সুচারু ভাবে।...তাই তো! কৃষ্ণ সুন্দর বাবুও এই ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়েই দিব্যি চা খাচ্ছেন—সঙ্গে আরো ক'জন সঙ্গী-সাথীও দেখা যাচ্ছে।

দোকানটির সামনে একটা ছোট গ্যাস-লাইট জ্বলছে। অস্পষ্ট স্নিগ্ধ আলোকে কৃষ্ণ সুন্দরের বিপর্যস্ত অবস্থা দেখে সুচারুর কেমন হাসি পেলো। নেতৃত্বের কি দুর্গতি আজ! বেচারা বোধহয় ইস্ত্রি করা খদ্দরের কাপড় ও দাদা পাঞ্জাবী গায় দিয়ে এসেছিল। সাদা খদ্দরের চাঁদর বারো মাসই তিনি গলায় ব্যবহার করে থাকেন। গায়ের ঘাম আর বাইরের ধুলো বালি মিশে জামা-কাপড়ের অবস্থা খুবই শোচনীয়। বাঁ কাঁধের নীচের দিকে জামার কাপড় অনেকটা ছিঁড়েও পড়েছে—নিশ্চয় কোনো ধস্তাধস্তিতে। এত সখের গলার চাঁদর আর গলায় নেই। কবির দলের সওয়ালরত সরকারের মতো গলার চাঁদর এবার কোমরে বাঁধা। মাথার বড় বড় উল্টানো চুলগুলো কপালের দু'পাশে পড়েছে ছড়িয়ে—ফলে নাক বরাবর একটি সিঁথির মতো রেখা দেখা যাচ্ছে। এতো ঘামছেন ভদ্রলোক যে, নাকের ডগা থেকে টপ্ টপ্ করে ঘাম চুঁইয়ে পড়ছে—বোধহয় নিজের হাতের চায়ের কাপের উপরেই।

তথাপি কি উৎসাহ দেখো—সাঙ্গোপাঙ্গদের সঙ্গে কি উৎসাহ নিয়ে আলোচনা করছেন। নেতাই বটে—দুর্গাদাস বাবু নিঘো বলেন না। আঙুল দিয়ে কৃষ্ণসুন্দরকে দেখিয়ে দিয়ে সুচারু তার মাকে বলল—ঐযে, মা। ঐযে উনি!—এতো কাছে...

—কৈ!...তাইতো। ইয়াসিন আর দুর্গাপদ অনর্থক ঘুরে আসলে। ডাকনা একবার। আর দাঁড়াতে পারছিনা—কৃষ্ণসুন্দরকে দেখতে পেয়ে চিন্তামণি বললেন।

জমকাল সিং-কে ডেকে সুচারু বলল—দারোয়ান। ঐ বাবুটিকে ডাকাতো! ঐযে কোমরে চাঁদর-বাঁধা।

দারোয়ানের সঙ্গে সঙ্গে সুচারু ও দুর্গা এগিয়ে গেল সেই দিকে। এই জায়গাটায় লোকজন খালি যাতায়াত করছে—আর চারদিকে শত মানুষের কণ্ঠে একটানা কোলাহল। রাস্তার উপর নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে থাকতে চিন্তামণির কেবল সঙ্কোচ বোধ হতে লাগল। তিনিও দু'পা পিছিয়ে গিয়ে অদূরবর্তী তরুণ আম গাছটার ঘন ছায়ার অন্ধকারে একটু গা-ঢাকা দিয়ে দাঁড়ালেন। নিত্যও তাঁকে অনুসরণ করল।

চায়ের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে কৃষ্ণসুন্দর এগিয়ে এলো দারোয়ানের কাছে।

তারপর কৃষ্ণসুন্দর সুচারুকে দেখতে না পেয়ে জিজ্ঞেস করল দারোয়ানকে—কৈ? তোমার দিদিমণি কোথায়?

—ঐ তো বাবু, আপনার সামনে।—সুচারুকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দারোয়ান বললে।

—তাই তো, আমি চিনতেই পারি নি টুনু!—মৃদু হাসলো কৃষ্ণসুন্দর বিস্মিত চোখে চেয়ে রইলো সুচারুর দিকে।

—কি করে চিনবেন বলুন—আপনারা সব নতুন নতুন লীডার হচ্ছেন। না চিনবারই কথা।—সুচারুও পরিহাসচ্ছলে বলল একথা।

—না না। শোনো! এমন পদ্মপাপড়ি ছাড়া, দামী জমিনের কাপড় পরে এমন সালাসিধে অবস্থায় তোমাকে আর কোনোদিনই দেখিনি। তাই চিনতে পারি নি প্রথমটায়। যা হোক, এত দেরী করে এলে কেন? চলতে ফিরতে তোমাদের বড় বেশী সময় লাগে।—কৃষ্ণসুন্দর চা খেতে খেতে তেমনি পরিহাসচ্ছলে বলল।

—যাহে কথা বললেন না। এখনো পান আরম্ভ হয় নি।—আমরা কি জানতুম যে হাটে বাজারে আপনারা ঢোল পিটিয়েছেন। এখন দেখছি টাল সামলাতে পারছেন না। গায়ের জামা কাপড় পর্যন্ত ছিঁড়ে নিয়ে যাচ্ছে দেখছি। এই তো আপনাদের নেতৃত্বে।··· মোহন পোদ্দার যদি আজ কর্তা হতেন—কিংবা আমাদের দুর্গাদাস বাবু—তা হলে কখনো আমরা এসে এতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থাকতাম না। ওদের লোকেরা এসে আমাদের আদর করে নিয়ে বসাতো।—অনেকক্ষণ পর্যন্ত মনের ঝাল মিটিয়ে কথা বলতে পেরে সুচারুর মনটা একটু হাল্কা হলো এবার। মুকুন্দ দাসের পান, ভালোজায়গায় বসে শুনতেই হবে। না হয় তারা একটু দেরীতেই এসেছে।—শুনুন!—আবার বলতে সুরু করলো সুচারু—আমাদের ভালো জায়গায় বসিয়ে দিতেই হবে।

—কি বলছো তুমি টুনু! অবস্থাটা বুঝতে পারছো না? কি করে ঢুকবে তুমি? কোনো নিয়ম কানুন এখন আর কেউ মানছে না। একটু দাঁড়াও! আরেকটু পরে কোথাও বসিয়ে দেবো।—অবস্থার গুরুত্বটা কৃষ্ণসুন্দর বুঝিয়ে বলল।

—কিন্তু মা ও এসেছেন যে।—সুচারু বলল।

—মাসীমা কৈ তিনি?—নিমেষের মধ্যে কৃষ্ণসুন্দর চঞ্চল হয়ে উঠলো।

চিন্তামণি বাস্তবিক কেঁদেই ফেললেন। তাঁর মৃত পুত্রের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল এই কৃষ্ণসুন্দর। এতদিন পর কৃষ্ণসুন্দরকে 'মাসীমা' বলে কাছে এসে দাঁড়াতে দেখে চিন্তামণির মনে আবার পুত্র শোকের আগুন নিমেষের মধ্যে জ্বলে উঠল। কাঁদতে কাঁদতেই তিনি বললেন—তুমি এতো নিষ্ঠুর হলে কি করে কেষ্ট। আজ দু'বছর ধরে সাথে বসবাস করছো, অথচ আমাকে একবার দেখবার ইচ্ছাও করে না তোমার? আমার ছেলে বেঁচে থাকলে এতোটা কঠোর হতে পারতে না।

কৃষ্ণসুন্দর নীরবে চিন্তামণিকে প্রণাম করে দাঁড়িয়ে বলল—মাসীমা!···চলুন, বসিয়ে দিই আপনাকে। একটু ঘুরে সেই পেছন দিকে গিয়ে মেয়েদের ঘরে ঢুকতে হবে। এদিক দিয়ে যেতে পারবেন না।···নিতাদিও এসেছো দেখছি—এসো টুনু। দারোয়ান, তোমাকে এদিক দিয়েই ঢুকতে হবে।

চায়ের কাপটা দোকান ওয়ালার কাঠের বাক্সের মধ্যে রেখে দিয়ে এসে কৃষ্ণসুন্দর সুচারুদের সঙ্গে নিয়ে আসরের পশ্চিম দিকে চলে গেল।···

দ্বিতীয় অধ্যায়

মেয়েদের বসবার ব্যবস্থা হয়েছে প্রাঙ্গণের উত্তর ও পশ্চিম দিকের বড় বড় টিনের ঘর দুটোতে—আর ভদ্র পুরুষেরা বসেছেন পূব দিকের লম্বা টিনের ঘরে। সব ঘরেরই সামনের দিকের লম্বা লম্বা টিনের বেড়া সরিয়ে ফেলা হয়েছে। আর সাধারণ মানুষেরা বসেছে প্রাঙ্গণের উপর ঘন ঘাসের বিছানায়। স্থানীয় বিশিষ্ট পরিবার সমূহের পুরুষ ও নারী সকলের জন্যই একটু পৃথক ভাবে বসবার বন্দোবস্ত আছে। উত্তর দিকের ঘরের পূব প্রান্তের বারান্দায় খানকতক চেয়ার পেতে অভিজাত ও ভদ্র ঘরের মহিলাদের বসানোর ব্যবস্থা। এরই গা ঘেঁসে পূবের ভিটার ঘরের উত্তর কোণের বারান্দায় অভিজাত ও ভদ্র পুরুষদের জন্যে চেয়ার পাতা। মেয়েদের ঘরে গ্রামেরই কয়েকটি কুমারী মেয়ে স্বেচ্ছাসেবিকা হয়ে সবাইকে সাহায্য করছেন। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন এই পাড়েরই একটি বাল বিধবা আদারবয়সী মহিলা। বাঃ! জীবন গড়ের বেশ উন্নতি হচ্ছে—এতটা শৃঙ্খলা এর আগে আর এখানকার কোনো

যাত্রা বা কবি গানেই সুচারু দেখতে পায়নি। একজন স্বেচ্ছাসেবিকার সাহায্যে সুচারু, তার মা ও নিত্যকে নিয়ে, নারী-জনতার মধ্যবর্তী সংকীর্ণ পথের উপর দিয়ে অতি সন্তর্পণে বারান্দায় গিয়ে উঠতে পারলো। বাঃ! কি চমৎকার জায়গাটি ওদের জন্যে।...অনেকেই এসেছেন। মুন্সেফ বাবুর স্ত্রী, উকিল পাড়ার বৌ-ঝিরা, থানার দারোগার স্ত্রী ও মেয়েরা—পরিচিত সকলেরই কুশল-সংবাদ জিজ্ঞাসা করতে করতে সুচারুরা একেবারে আসরের কাছাকাছি গিয়ে বসতে পারলো। বাঁশী জমির উপর উঠানের এক কোণে, নতুন করে তিনটি চেয়ার এনে পেতে দেওয়া হয়েছে। চেয়ারে বসতে বসতে চিন্তামণি বললেন—বাপরে। কতক্ষণ কোথায় ধরে গেছে। দে, নিত্য চাওয়া দে একটু।

দু'খানি তাল পাতার হাত পাখা সঙ্গে নিয়েই এসেছিল নিত্য—তার উপর এই ছিল নির্দেশ। দু'জনে দু'খানি পাখা হাতে নিয়ে, সুচারু ও নিত্য চিন্তামণিকে হাওয়া করতে লেগে গেল। রুপোর ডিবা থেকে একটা পান খুলে মুখে দিয়ে চিন্তামণি বললেন—কেষ্ট কিন্তু জায়গাটা করে দিয়েছে বেশ! এখান থেকে সব শোনা যাবে—সব দেখা যাবে।—বাবাঃ! কি কলরব!

কলরবই বটে! সুচারু তাকালো প্রাঙ্গণের দিকে! যেদিকে তাকানো যায়, খালি মানুষের মাথাই দেখা যাচ্ছে। আসরময় ভলন্টিয়ার—চারদিকে ঘুরে ঘুরে তাঁরা লোক জনকে ঠিক মতো বসাচ্ছেন—ছোটখাটো বিবাদের মিমাংসা করে দিচ্ছেন। ইতি মধ্যে কৃষ্ণসুন্দর এবং জীবনগঞ্জের হাই-স্কুলের হেড-মাস্টার মশাই মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে চারদিকে ঘুরে ঘুরে কি যেন বলছেন। বোধ হয় জনতাকে শান্ত হতে বলছেন ওঁরা, গান সুরু হবে এবার—মুকুন্দদাসের যাত্রা-গান!...

আজ কি পালা? জিজ্ঞেস করলেন চিন্তামণি।

যাত্রাদলের কিছু লোক ঘুরে-ফিরে আজকের নাটকের "প্রোগ্রাম" ও অভিনেতা বেশ ধারী মুকুন্দদাসের ছবি বিক্রি করছে। একখানি ছবি ও প্রোগ্রাম কিনলো সুচারু। প্রোগ্রাম দেখে মাকে লক্ষ্য করে বলল সে—সমাজ! আজ সমাজ-পালা হবে, মা। খুব ভালো বই শুনেছি।

• •

অবশেষে যাত্রাভিনয় সুরু হলো—সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রবীন গায়ক মুকুন্দ দাসের আবির্ভাবে মন্ত্রমুগ্ধ সমুদ্র গর্জনের মতো বিশাল জনতার কোলাহল নিমেষের মধ্যেই মিলিয়ে গেল। মনোযোগ দিয়ে অভিনয় দেখতে লাগল সুচারু। কিন্তু প্রথম দৃশ্যের মাঝামাঝি, হঠাৎ একটি বিসদৃশ ঘটনা সুচারুর চোখে পড়লো। অভিজাত পুরুষ মহলের একটি অপরিচিত লোক বেশ সেজেগুজে এসেছে—গান শুনতে। গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবী গায়ে, গলায় তাঁতের চওড়ার সাদা চাদর। ঘড়ি, চশমা, সোনার বোতাম, সোনালী বন্ধন—আজকের আসরে কোনো পুরুষ মানুষই এতো ফিট-কাট সেজে আসেনি। মুকুন্দদাসের যাত্রাভিনয়ের দিকে ভদ্র লোকের বিন্দুমাত্র মনোযোগ নেই। অত্যন্ত বিসদৃশ ভাবে তিনি কেবল হাঁ করে তাকিয়ে থাকেন সুচারুর দিকে। আচ্ছা উৎপাত তো—

—দু'তিনবার লোকটির সঙ্গে সুচারুর চোখা চোখি হয়ে গেল। চোখে চোখে নজর পড়লেই চোখ ফিরিয়ে নেন। প্রথম দৃশ্য শেষ হতেই সুচারু ফিস ফিস করে পার্শ্ববর্তিনী নিত্যকে জিজ্ঞেস করলো—ঐ লোকটি কে গোপালের মা? ব্যাপারটা নিত্যর চোখেও পড়ছিল—সে বলল—তিনি হচ্ছেন রাইমোহন বাবুর শালা। ঐ যাকে সবাই শালাবাবু বলে ডাকে?

—ও! বলে সুচারু নিজের চেয়ারটাতে একটু ঘুরিয়ে বসল। রাইমোহন পোদ্দারও শ্যালকের পাশেই বসে আছেন।...সুচারু আবার অভিনয়ের দিকে মনোযোগ দিল সত্য—কিন্তু কিছুতেই সে স্বস্তি বোধ করতে পারছিল না।

*

যাত্রাভিনয় শেষ হতে হতে রাত দুটো বেজে গেল। মুকুন্দ দাস ও তাঁর দলের প্রত্যেকটি অভিনেতার অভিনয়-নৈপুণ্যে এই বিশাল জনতা এতক্ষণ পর্যন্ত যাবতীয় অসুবিধার মধ্যেও শান্ত, সংযত ভাবে যাত্রাভিনয় আস্বাদন করেছে। সন্তুষ্ট চিত্তে সবাই বাড়ি ফিরে যাচ্ছে।...নাটকের বিষয়বস্তু—এবং মুকুন্দদাসের তেজোগর্ভ বলিষ্ঠ বক্তৃতা বহুমানুষের অন্তরকে স্পর্শ করেছে। ফেরার পথে গুরুগম্ভীর জনতার শান্ত সংযত পদধ্বনিতে

অভিনয়ের সাফল্যই প্রমাণিত হচ্ছে।

'সমাজ' নামক নাটকে মুকুন্দ দাস বাংলা দেশে প্রচলিত কয়েকটি সামাজিক অত্যাচারের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন। নাটকটির কেন্দ্রীয় বক্তব্য এক বাল-বিধবার জীবনের সকরুণ পরিণতি সম্বন্ধে। এত বড় বিশাল জনতার আসরে অভিনয়ের এই সাফল্য সুচারু মোটেই আশা করেনি।—সত্যি বিস্ময়কর। তাদের ইস্কুলে মেয়েরা মাঝে মাঝে থিয়েটার করে থাকে। পর পর তিন বছর ধরে সে নিজেও তাতে অভিনয় করছে —সে জানে কাজটা কত কঠিন। সব চাইতে তার ভালো লেগেছে—বালবিধবার ভূমিকায় সেই ছেলেটির অভিনয়। কি নিখুঁত আর কত জীবন্ত! গলার আওয়াজটা তার কত মিষ্টি। আত্মহত্যার দৃশ্যে সে যখন ঐ গানটি গাইলো—"ভারত আমার যাবে আমি গো বিধবাবালা।" আসরে এমন লোক বোধহয় কেউ ছিল না, যে চোখের জল না ফেলে থাকতে পেরেছে। [illegible]র অভিনয় দেখা গেলো আজ! জীবনে এই দিনটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ধন্য মুকুন্দ দাস!

আরও একটা জিনিস এবার সুচারুর চোখে পড়েছে। গঞ্জের যাঁরা প্রতিষ্ঠিত মাতব্বর, তাঁরা সবাই এবার দর্শক মাত্র। একদল তরুণ কর্মী গঞ্জের এইসব ব্যাপারে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসছেন এবং তাঁদের মধ্যে কৃষ্ণ-সুন্দরও একজন। দুর্গাদাসবাবুর কথা অন্তর: অংশতঃ সত্যই বুঝা গেল।

ইয়াসিন দুর্গাপদ এবং দারোয়ানের সঙ্গে খেয়া হতে হতে যাত্রার আসর প্রায় খালি হয়ে গেল। রাত্রি গভীর! উপরের দিকে তাকালে দেখা যায় একখণ্ড কুয়াশা জলো মেঘের উপর কুয়াশা অষ্টমীর আধো চাঁদ কখন উঠে গেছে। এইবার ঘরে ফেরার পালা।···

এমন সময় ডাকতে ডাকতে কৃষ্ণসুন্দর এসে দাঁড়ালো ওদের সামনে।—মাসীমা!

—না বাবা! সত্যিই ভাল লাগলো আজ। এত সুন্দর যাত্রা আমি আর শুনি নি। তোমরা তো খুব খেটেছও দেখছি।—চিন্তামণি মন্তব্য করলেন।

—মুকুন্দ দাসের গান! এ ভালো না লেগে উপায় নেই, মাসীমা!—তা হলে আসুন এবার। লোকজন তো সঙ্গেই আছে দেখতে পাচ্ছি। আসি—বিনয়ে বলল কৃষ্ণসুন্দর।

—আমাদের সঙ্গেই তুমি চলো কেষ্ট! এত রাতে রাস্তা দিয়ে আমার কেমন ভয় করে। দিন কালতো ভালো নয়।—চিন্তামণি বললেন চাপা গলায়।—গা ভর্তি গয়না নিয়ে এসেছি, মেয়েটা সঙ্গে। চলো—তারা এক সঙ্গেই বাড়ীর দিকে চলতে সুরু করলো।

তৃতীয় অধ্যায়

সুচারুদের সেরেস্তার ম্যানেজার দুর্গাদাস ভট্টাচার্য এই গাঁয়েরই লোক। সেই প্রথম যৌবনে তিনি এ বাড়ীর কাজে ঢুকেছেন—এখন তাঁর বয়স ষাটের কাছা কাছি। জীবনগঞ্জের সমাজে তিনি একজন প্রতিপত্তি-শালী ব্যক্তি। অত্যন্ত চতুর মানুষ এই দুর্গাদাসবাবু। তাঁর একটি বিশেষ গুণ এই যে, তিনি খুব ভাল অভিনয় করতে পারেন। এই একটি গুণের জন্য গঞ্জের বহু মানুষ দুর্গাদাসবাবুর অনুরক্ত—কেউ কেউ বা অনুগতও।

সেদিন বেলা ঘটার আগে দুর্গাদাসবাবুর পক্ষে আর সেরেস্তার কাজ আরম্ভ করা সম্ভব হয়নি। ম্যানেজার মশাই স্বয়ং এবং সেরেস্তার সব কর্মচারী—সকলেই কাল রাতে মুকুন্দ দাসের যাত্রা শুনছে।

সেরেস্তার তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসে, গড়গড়ার নলটা মুখে দিয়ে সোঁয়া টানতে টানতে ভৃত্যকে বললেন তিনি—নাতনী আবার কি করছে রে?

—এই তো ঘুম থেকে উঠলেন। বোধ হয় চা-টা খাবেন এখন। প্রত্যুত্তরে বলল ভৃত্য।

—একটু ডেকে দে ওকে। একবেলা না দেখলে কেমন কাঁকা কাঁকা লাগে আমার। ভৃত্যকে নির্দেশ দিলেন দুর্গাদাসবাবু।

—আর গলা শুকোতে হবে না। আমি এসেছি দুদ্দো!

—বলতে বলতে এক পেয়ালা চা নিয়ে সুচারু ঢুকলো দুর্গাদাসবাবুর ঘরে।

—এই যে নতুন গিন্নী! মেঘ না চাইতেই জল।··· গান কেমন শুনলেন কাল? চায়ের কাপটা নাগালে হাত

বাড়িয়ে নিতে নিতে দুর্গাদাসবাবু বললেন।

—গানের কথা বলতেই তো এলাম আজ। আপনারা যাত্রাগান করে থাকেন—আর মুকুন্দ দাসের যাত্রাও শুনলাম দুবার। আপনি যে বলে থাকেন—জমকালো পোষাক আসাক না হলে গ্রামদেশের আসরে যাত্রা জমে না। কৈ, এ কথা তো ঘটছে না?—সুচারু বলল।

নিজের মতামতের উপর দুর্গাদাসবাবুর অটল আস্থা রয়েছে। তাই তিনি বেশ গম্ভীর ভাবে বললেন—এই ধরণের পালা অভিনয় করা আমাদের পক্ষে সম্ভবই নয়। মুকুন্দ দাসের ভূমিকায় অভিনয় করবে কে? একদিকে গায়ক—সেই সংগে সুবক্তা। বক্তৃতার ছলে কাল কত কথা বললেন তিনি তা খেয়াল করেছ? কাজেই আমার 'সিতরী' ঠিকই আছে, নতুন গিন্নী।

'নতুন গিন্নী' কথাটায় প্রবল আপত্তি জানিয়ে সুচারু এবার বলল—আর 'নতুন গিন্নী' বলতে হবে না। মুকুন্দ দাস কাল আপনাদের মতন মানুষকেই চাবুক মেরে গেছেন। এই বয়সে আর সখের কথা বলবেন না এখন।

সুচারুর বুদ্ধিমত্তার জন্যই দুর্গাদাসবাবু তার উপর এত সন্তুষ্ট। মেয়েটি ঠিক মন বুঝে কথা বলতে পারে। এইবার তাঁর চরম শত্রু রাইমোহন পোদ্দারের কথা এসে গেল। চায়ের কাপটা হাত থেকে রাখতে রাখতে দুর্গাদাসবাবু গদ গদ কণ্ঠে বললেন—যা বলেছ, নতুন গিন্নী! মুকুন্দ দাস একটা মহাপুরুষ—সত্য কথা বলতে কোনো ভয় নেই মানুষটার। কি রকম বুকের পাটা দেখো। থানার সামনে দাঁড়িয়ে বাপের বেটার মতন ইংরেজ দরকারকে কি রকম ঠুকে গেলেন।

—সত্যি চমৎকার। আমি তো আরেকবার শুনেছি। সেবার মেয়েদের বিলাসিতাকে ঠুকেছিলেন। ওরে বাবা! কি বিদ্রূপ! আমার এখনো মনে আছে।—সুচারু হাসতে হাসতে বলল।

—সব চাইতে বেশী জব্দ হয়েছেন কাল, আমাদের পোদ্দার মশাই। কেমন কিনা?—দুর্গাদাসবাবু সহাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন।

—ওরে বাবা! জব্দ বলে জব্দ! কাল যখন মুকুন্দ দাস পুরুষ মানুষের একাধিক স্ত্রী গ্রহণের ব্যাপারকে সমালোচনা করতে আরম্ভ করলেন, রাইমোহনবাবু সে কি অবস্থা! আমি তাকিয়ে দেখি একেবারে মাটির দিকে চেয়ে আছেন তিনি সত্যি, বিনা দোষে আগের বৌদিকে পরিত্যাগ করলেন।—বলতে বলতে সুচারু বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল।—

—আমার পাশেই বসেছিলেন তো! দেখলাম, রাগে একেবারে টগবগ করছেন। তাঁর ধারণা, কৃষ্ণসুন্দরই ব্যাপারটা মুকুন্দ দাসকে জানিয়ে দিয়েছে—এবং সেই মতে মুকুন্দ দাস এ সব কথা বলছেন।—আমার কাছে কানে কানে এ কথা বলেই রাইমোহনবাবু উঠে আসেন।—দুর্গাদাসবাবু বললেন। তারপর তিনি চোখ টিপে বললেন—আরেকটা জিনিষ বুঝতে পেরেছ?

—কি?

—রাইমোহন পোদ্দারের পায়ের তলা থেকে মাটি ক্রমশঃ সরে যাচ্ছে?—এটা বুঝতে পেরেছ?—বলতে বলতে দুর্গাদাসবাবু তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন সুচারুর দিকে।

—খুব পেরেছি! কাল যে জীবনগঞ্জে এতবড় একটা ঘটনা ঘটে গেল, রাইমোহন পোদ্দারকে কেউ কোনো কথা জিজ্ঞাসাই করে নি।

ব্যস! এই হচ্ছে কথা! এইটে বুঝতে পেরেছো বলেই তোমাকে 'নতুন গিন্নী' বলে আনন্দ পাই। ব্যাপারটার তাৎপর্য কি? অর্থাৎ—

—রাইমোহনবাবুর পতন আসন্ন এই তো?

—ঠিক কথা! জীবনগঞ্জের আসরে এবার পার্থের আবির্ভাব ঘটছে—বুঝলে, নতুন গিন্নী! আমি থাকবো পার্থ-সারথির মতো। প্রকাশ্যে কোনো কিছুতে নেই। সামনের ইলেকশানে দেখা যাবে। আর ক'দিন···। রাইমোহন পোদ্দারের প্রেসিডেন্টগিরি শেষ হয়ে আসছে। এবার কুরুক্ষেত্র মহাসমর আসন্ন।···দুর্গাদাসবাবু নাটকীয় ভঙ্গীতে হাসতে লাগলেন।

এমন সময় ভৃত্যটি ঘরে ঢুকে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বলল—পোদ্দার মশাই আসছেন, দেখছি।

—সেকি! এই অসময়ে!···তুমি তবে বাড়ির ভেতরে যাও টুনু! কি মতলব কে জানে!—বললেন দুর্গাদাস বাবু।

রাইমোহন পোদ্দার ওরফে আসেনি। সঙ্গে এসেছে লাঠি বন্দুক সহ দু'জন দেহরক্ষী। দেহরক্ষী সঙ্গে না নিয়ে রাইমোহন পোদ্দার চলা ফেরা করে না। কয়েক বছর আগে এক কৃষকের সঙ্গে একটা চাষের জমির দখল নিয়ে রাইমোহন পোদ্দারের বন্দুকের গুলিতে দু'জন কৃষক জমিতেই নিহত হয়। মামলা বাধল বটে—রাইমোহনের তলবও হল ফৌজদারী আদালতে। কিন্তু তার বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ কৃষকেরা প্রমাণ ক'রতে পারেনি। জলের মতো টাকা ছড়িয়ে রাইমোহন অনেক সাক্ষীর মুখ বন্ধ করতে পেরেছেন। কাজেই "ছোড়া খুনের মামলায়" আসামী বেকসুর খালাস হয়ে বেরিয়ে আসে। —সেই থেকে সঙ্গে দেহরক্ষী না নিয়ে বাড়ীর বাইরে কোথাও যাননা রাইমোহন।

পাইক পেয়াদা নিয়ে রাইমোহন সেরেস্তায় ঢুকতেই দুর্গাদাস বাবু উচ্চ গলায় বলে উঠলেন—সর্বনাশ রায় সাহেব একেবারে সশরীরে—দলবলে! আসতে আজ্ঞা হউক! আসুন। চেয়ারে বসতে বসতে রাইমোহন বলল—কেন ঠাট্টা করছেন আমাকে, ভট্টাচার্য মশাই! মামলাতে তো এখনো হইনি?

চোখ ঘুরিয়ে হাসতে হাসতে দুর্গাদাস বাবু বললেন—দেখুন! পুলিশ সাহেব স্বয়ং যে আপনার গুনো তদির করছেন—এসব কি আমি খবর রাখি না মনে করেন? আমিও তো মাঝে মাঝে সদরে গিয়ে থাকি—না—কি? যে কৌশলে আপনি মোটা অঙ্কটার স্বদেশী আসামীদের ধরিয়ে, এ দেশটাকে ঠাণ্ডা করেছেন—তার একটা পুরস্কার মিলবে না? "রায় সাহেব"-তো সাধারণ কথা, আপনার পক্ষে "রায় বাহাদুর" হতেই বা কতক্ষণ!

—ওসব কথা থাক! জীবন গঞ্জের অবস্থাটা বুঝতে পারছেন? এতবড় একটা ঘটনা ঘটে গেল—অথচ আমাদের একটা মৌখিক জিজ্ঞাসাবাদও করলনা। রাইমোহন সোজাসুজি সঙ্গে বলল।

—নতুন লাটার গজাচ্ছেন সব!—বললেন দুর্গাদাস বাবু। তারপর তিনি গলার আওয়াজ নামিয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন—শুনুন রায় সাহেব! এ হচ্ছে ঈশান কোণের মেঘ!···কিন্তু বড় তুফান হয়ে যায় না। দামনেই ইলেকশান—সরকারের একটু চিন্তা করে দেখবেন।

উপেক্ষার হাসি হাসতে হাসতে রাইমোহন বলল—ইলেকশান? ইলেকশান এখনো সাত হাত জলের তলায়।···আচ্ছা! পরে কথা হবে! আমি একটু পিসিমার সঙ্গে দেখা করবো।

—আচ্ছা, তবে ফেরার সময় দয়া করে আরেকবার···—দুর্গাদাস বাবু বললেন।

সুচারুদের বাড়ির ভেতর ঢুকলো রাইমোহন। চিন্তামণি তখন ভিতর বাড়ির বারান্দায় পাড়ার বয়স্ক মহিলাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। মুকুন্দদাসের 'সমাজ পালা' নিয়েই কথা হচ্ছে। প্রসঙ্গক্রমে নিজের বাল-বিধবা পুত্র-বধূর কথাও উঠে গেল—সঙ্গে সঙ্গে চিন্তামণিও দুঃখের কথা বলতে বলতে অঝোরে চোখের জল ফেলছিলেন এমনি সময় পেছনের দরজায় দাঁড়িয়ে রাইমোহন ডাকলো—পিসিমা!

ডাক শুনে চোখের জল মুছতে মুছতে চিন্তামণি উঠে এসে বললেন—কি বাবা, হঠাৎ···

—একটা খুব জরুরী কথা আছে, পিসিমা—রাইমোহন নিচুগলায় কঠোর গলায় বলল।

সখাসভা মহিলাদের বসতে বলে, রাইমোহনকে সঙ্গে নিয়ে চিন্তামণি নিজের শোবার ঘরে বসলেন বসে বললেন—

—কি কথা, রাইমোহন? তোমার গলার আওয়াজ শুনে আমার কেমন বুক ধড়-ফড় করছে। বল।

নিজের বক্তব্যকে মনে মনে বেশ গুছিয়ে নিয়ে রাইমোহন বলতে সুরু করল—পিসিমা! আমাকে ভুল বুঝোনা কিন্তু। পিসেমশাই থাকেন না বাড়িতে। বড়দা থাকেন সহরে। এই বাড়ির যদি কোনো কলঙ্ক রটে, সেটা আমার গায়ে লাগে কি না বল?

কলঙ্কের কথা শুনে চিন্তামণি আঁৎকে উঠলেন। তাঁর বাল-বিধবা পুত্র-বধূটি এখন বাপের বাড়িতে আছে। কি খবর কে জানে। তিনি ভয়ে ভয়ে বললেন—কলঙ্ক! কিসের কলঙ্ক?

—বলছি,—রাইমোহন বলল—টুনুর বিয়ের কি করলে?

কলঙ্কের কথার সঙ্গে রাইমোহনের মুখে সুচারুর বিবাহ প্রসঙ্গের যোগাযোগ লক্ষ্য করে চিন্তামণির প্রমাদ গুনলেন। মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে তিনি সামলে নিলেন সুচারুর বিবাহ প্রসঙ্গের কোনো উত্তর না দিয়ে তিনি দৃঢ়স্বরে জিজ্ঞেস করলেন—কলঙ্কের কথা কি বলছিলে?

চিন্তামণির কণ্ঠের কঠোরতা উপলব্ধি করে রাইমোহনও কথার মোড় ঘুরিয়ে দিল। অপেক্ষাকৃত মোলায়েম সুরে বলল—পিসিমা! আমাদের জীবনগঞ্জতো আর সহর নয়। এখানে মেয়ে একটু বড়ো হলেই পাঁচজনে পাঁচ কথা বলে থাকে।

এতক্ষণে চিন্তামণি বুঝতে পারলেন যে কলঙ্কের কথাটা হচ্ছে সুচারুর নামে। তিনি কঠোরতর কণ্ঠে বললেন—বল তুমি। ভগবান আমাকে সব কিছু সইবার ক্ষমতা দিয়েই বোধ হয় গড়েছেন। বল···পাঁচজনে কি বলছে বল।

—দেখো পিসিমা! মুকুন্দদাসের গান শুনতে গিয়ে আমাদের টুনু কাল, ওপাড়ার কেষ্টর সঙ্গে এত মাখামাখি করলে কেন? পাঁচজনের দোষ কি বল? লোকে যেমনি দেখবে তেমনি বলবে।—রাইমোহন বলল।

—দেশের পাঁচজনের কি মাথা খারাপ হয়েছে, রাইমোহন? টুনু কাল আমার চক্ষের আড়ালে কোথাও যায়নি। কারা তোমার পাঁচজন শুনি? কে বলছে এসব কথা—বল।—চিন্তামণি দৃঢ়তার সঙ্গেই বললেন।

চিন্তামণির প্রতিক্রিয়ায় শঙ্কিত হয়ে রাইমোহন চুপ করে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

এইবার চিন্তামণি তিরস্কারের সুরে বললেন—রাইমোহন! এইসব "পাঁচজন" তোমারই লোক। এদের সঙ্গেই তুমি চলা ফেরা কর। এরাই তোমার হাতের লাঠি।

—পিসিমা! আমি একটা প্রেসিডেন্ট! বলতে গেলে, একটা রাজ্য-শাসন করি আমি। আমার কাণে সব কথা আসবেই। পাঁচজনের দোষ ধরে দেখোনা, পিসিমা! রাইমোহন বলল। চিন্তামণি তেমনি দৃঢ়স্বরে বললেন—দেখো, রাইমোহন, তুমি প্রেসিডেন্টই হও আর যা-ই হও, তুমি মানুষ নও। নিজের বৌকে তুমি বিনাদোষে পরিত্যাগ করেছ—তারপর তুমি আবার বিচারকের আসনে বসতে চাও? তোমার সঙ্গে কোন-দিন যেন আমাকে টুনুর বিয়ের কথা বলতে না হয়—এমন দুর্ভাগ যেন কোনোদিন না আসে আমার জীবনে।

—পিসিমা! তুমি রাগ করেছ আমার উপর।···কিন্তু এটাও চিন্তা করে দেখো—পিসেমশাই থাকেন দূরে—তোমাদের সম্বন্ধে কোনো কথা আমার কানে গেলে, সেটা তোমাকে জানানো আমার কর্তব্য কিনা, বল।··· অবিচার করোনা আমার উপর···

—অবিচারটা কে করছে, রাইমোহন? টুনু তোমার ছোট বোন নয়?

—চিন্তামণি বললেন।

ঠিক সে সময় হাসিতে উচ্ছল সুচারু এসে ঘরের দরজায় দাঁড়ালো। চোখে-মুখে তার তখনো রাত্রি জাগরণ-জনিত ক্লান্তির চিহ্ন লেগে আছে। খিল খিল করে হাসতে হাসতে সুচারু বলল—জীবনগঞ্জের 'পলিটিকস-এ কাল তোমরা হেরে গেলে কিন্তু। নতুন 'লীডার'-দেরই এক হাত জিৎ হয়ে গেল! গঞ্জের সবাই বলছে একথা।

—কিসের হার-জিৎ? কিসের কথা বলছ তুমি? —বুঝতে পেরেও রাইমোহন পোদ্দার না বুঝার ভাণ করল।

অতএব সুচারুও নিজের বক্তব্যকে সবিস্তারে ব্যাখ্যা করে বলল—জীবনগঞ্জের ইতিহাসে এবার নতুন ঘটনা ঘটতে সুরু করেছে। ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি—রাই-মোহন পোদ্দারকে হারা জীবনগঞ্জে কোনো বড় কাজ হতে পারে না। কিন্তু এবার হয়ে গেল। তোমাদের বাদ দিয়ে এবার মুকুন্দদাসের গানের মতো বিরাট ব্যাপার জীবনগঞ্জে ঘটলো। তোমাদের বাদ দিয়েই কয়েক হাজার মানুষের এই বিরাট জনতাকে সামলানো সম্ভব হলো—কোথাও কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি—বল, সত্যি কি না?

—এখনও তুমি ছেলেমানুষ, টুনু!—রাইমোহন পোদ্দার হাসবার চেষ্টা করে বলল—কিছুই বুঝোনি

তুমি।—আমি যদি কাল পুলিশ সাহেবকে বলে থানার অতিরিক্ত পুলিশ রাখার ব্যবস্থা না করতাম, তবে কালকের আসরে কত কি যে ঘটতো, তা তুমি কল্পনাও করতে পারো না।··· দাঁড়াও।

—তা বটে!—তেমনি বিদ্রূপের সুরে সুচারু বলল। সুচারুকে ধমক দিয়ে চিন্তামণি বললেন—তুই যা, টুনু! বেটাছেলেদের ব্যাপারে তুই নাক গলাতে যাস কেন? যা,এবার। রাইমোহনের জন্যে একটু চায়ের ব্যবস্থা, করতে বল। যা—···

—না না, পিসিমা! চা এখন খাবো না—রাগে ও অভিমানে রাইমোহন বলল।

—তাহলে পান পাঠিয়ে দে। নিত্যকে বল।—চিন্তামণি বললেন।

সুচারু চলে গেলে রাইমোহন আক্ষেপ করে বলল—তুমিই দেখো, পিসিমা! জীবনগঞ্জে আমরা প্রায় পাঁচশ ঘর অভিজাত মহাজন বসবাস করছি। সকলের ঘরেই মেয়ে আছে—তারা বড়ও হয়েছে টুনুরই মতন। টুনু ছাড়া আর কোনো মেয়ে আমার মুখের সামনে দাঁড়িয়ে এমনি কথা বলতে পারতো?—তুমি একবার চিন্তা করে দেখ, পিসিমা!

—মেয়ে আমার সহরে থেকে লেখা পড়া শিখেছে, রাইমোহন। ও একটু আলাদা ধরণের হবেই। এই জন্যই ভালো করে না দেখে শুনে কারো হাতে আমি দঁপে দিতে পারি না মেয়েকে। তোমার পিসেমশাই তো মহাজনী কারবার নিয়েই একেবারে উন্মাদ। ওদিকে মেয়ে যে বড়ো হচ্ছে।—চিন্তামণি বললেন কৈফিয়তের সুরে।

—পিসেমশাইর উপর দোষ দিওনা, পিসিমা।—রাইমোহন আবার সতেজ হয়ে উঠল।—টুনু এতো লেখাপড়া শিখুক, তা তিনি কোনো দিন চাননি। পিসেমশাই বিজ্ঞলোক।

রাইমোহনের ঠেঁস দেওয়া কথায় চিন্তামণি আবার উত্তপ্ত হয়ে তিনি খোলাখুলি বললেন, দেখো রাইমোহন। বিদ্যুতার কথা তুমি আমাকে শুনিও না। তোমার বড়-বৌর অবস্থাটা আজ কি? আমার বিধবা ছেলে-বউটির কি গতি হবে বলত? যদি ওরা একটু লেখাপড়া জানতো—তবে এতোটা দুর্গতি ভুগতে হতো না তাদের। এইসব দেখেই আমি মনে করি মেয়েদের লেখাপড়া শেখা খুবই উচিত। কাজেই টুনু আমার সহরে থেকে পড়াশুনা করে একটা পরীক্ষা দিয়ে এসেছে—এটাকে মোটেই আমি অনুতাপের বিষয় বলে মনে করি না। ···তবে আমার মেয়েকে যোগ্য পাত্রের হাতে দিতে হবে। পাঁচজনের পাঁচকথায় কান না দিয়ে, যদি পারো টুনুর জন্যে ভালো দেখে সম্বন্ধ নিয়ে এসো।—চিন্তামণি এবার যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করলেন। কারণ, ক্ষতি করার ক্ষমতা রাইমোহনের যথেষ্ট আছে।

রুপোর কৌটায় করে পান নিয়ে নিত্য এলো এ ঘরে। কৌটা থেকে পান তুলে নিয়ে মুখে দিতে দিতে রাইমোহন মৃদু হাসো বলল—টুনুর বিয়ের সম্বন্ধের কথা বলতেই আমি এসেছি পিসিমা। আমার শ্যালকের সঙ্গে।

জিজ্ঞাসু চোখে রাইমোহনের দিকে তাকিয়ে চিন্তামণি বললেন—তোমার কোন বৌ-র ভাই?

—ছোট—ছোট তরফের। নাম প্রাণেশ!—বি-এ পাশ করেছে। ওদের অবস্থা-ব্যবস্থা তো তোমাদের জানাই আছে।—বলল রাইমোহন।

ঐ যে, যে-ছেলেটি কাল গানের আসরে তোমার পাশে বসেছিল?

—ঐ প্রাণেশ?—চিন্তামণি জিজ্ঞেস করলেন।

—হ্যাঁ, ঐ প্রাণেশ। চমৎকার ছেলে!—রাইমোহন বলল।

চিন্তামণি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে পড়লেন। প্রসঙ্গটা এড়াবার উদ্দেশ্যে তিনি গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—আচ্ছা। পুজোর সময় তোমার পিসেমশাই বাড়ী আসবেন। আমি বলবো···

রাইমোহনও আর বসলোনা। দু'চারটে সাধারণ কথার পর সেও সেদিন ফিরে চললো দুর্গাদাস বাবুর সেরেস্তার দিকে।

চতুর্থ অধ্যায়

পর পর কয়েকটি বছর একটানা কলকাতার কোনো মেস-বাড়ীতে কাটিয়ে এসে, মাত্র বছর দুই হলো কুঞ্জসুন্দর

আমার জীবনগল্পের পৈতৃক ভিটায় বসবাস করছে। জীবনগল্পের ছোট নদীটি গল্পের পূব দিক দিয়ে দক্ষিণ মুখে প্রবাহিত হতে হতে যেখানটায় পশ্চিমমুখী হয়ে মোড় ঘুরেছে, সেই বাঁকে সুপরিচিত কদমতলার ঘাটের কাছে কৃষ্ণসুন্দরের পৈতৃক ভিটা। এক সময় বাড়ীর চার ভিটায় চারটি বড় বড় টিনের ঘর ছিল—ঘরের চারদিকে ছিল ভালো কাঠের ফ্রেমে আঁটা টিনের বেড়া ঘরের মেঝে ছিল পাকা। বাস গৃহটি ছিল ঠিক নদী তীরের পথের উপর—বাংলো-প্যাটার্নের সুন্দর দোতলা—কাঠের পাটাতন করা, শক্ত ঘর। সে সব ঘর এখন নেই। গত ক'বছর ধরে চারটে ভিটেই খালি পড়ে ছিল। কৃষ্ণসুন্দর কলকাতা থেকে ফিরে এসে, মাত্র একটি ভিটের মাঝারি রকমের একখানি ঘর তুলেছে—আর একখানি রান্না-খাওয়ার ঘর মাত্র। তিন তিনটে বড় ভিটে এখনো খালি পড়ে। পারিবারিক জীবনে কৃষ্ণসুন্দর বড় নিঃসঙ্গ। মা-বাবা মারা গেছেন—ভাই-বোন বা নিকট-সম্পর্কিত কোনো আত্মীয়, কাছাকাছি কেউ নেই। পিতার আমলের ভৃত্য নিবারণই তার একমাত্র সঙ্গী। বছর কয়েক আগে কৃষ্ণসুন্দরদের পারিবারিক জীবনে পর পর কয়েকটি বিপর্যয়কর ঘটনা ঘটে—সেই ইতিহাস যথাসময়ে বলা হবে।

জ্যৈষ্ঠ শেষ—আষাঢ় সুরু। গত পনেরদিনের মধ্যে পাঁচ-ছয়বার প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়ে গেল। কলকাতার অট্টালিকায় কয়েকটি বছর কাটিয়ে এসেছে কৃষ্ণসুন্দর। নদীমাতৃক অঞ্চলের বর্ষার মোহিনী-রূপ সেখানে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। বাড়ীর ধারে কদমতলার ঘাটে আশৈশব পরিচিত পুরোনো কদম গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে, রোজ দু'বেলা করে কৃষ্ণসুন্দর বর্ষা-ঋতুর আবির্ভাবদৃশ্য লক্ষ্য করছে। মনে হয়ে যেন অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গে বহুদিন পর আবার নতুনভাবে বছরে একবার করে দেখা-সাক্ষাৎ হচ্ছে। মাটির বুকেই নবোদ্গত ঘাসের ডগায় কচি রঙ ক্রমশঃ ঘন সবুজে রূপান্তরিত হচ্ছে ছোট নদীটির ওপারে দিগন্ত-বিস্তৃত আবাদী জমি—ধানের কচি ডগাগুলো দিনে দিনে বাড়ছে সবুজ পাতার অজস্র নিশান উড়িয়ে পাটের চারাগুলো মাথা উঁচিয়ে দাঁড়াচ্ছে। ছোট বড় সকল গাছে গুচ্ছ গুচ্ছ কিশলয়ের ছড়াছড়ি। নদীর ধারের হিজলবনে অজস্র আবীর-রাঙা ফুলের ফুলঝুরি। বড় বড় নতুন সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে কদমফুল ফুটছে অসংখ্য সংখ্যায়—ছোট নদীর ক্ষীণ জলধারা এবার পরিপুষ্টি লাভ করে দুই তীরের সীমারেখাকে স্পর্শ করছে—আর ক'দিনের মধ্যেই জলরাশি কূল ছাপিয়ে বাট-ঘাট প্লাবিত করে দেবে। বর্ষার ঘোমটার পূর্বাভাস ঘোষণা করে পাগলা পাগলা পুবালী হাওয়া বইছে। বর্ষা আসছে।

দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে কৃষ্ণসুন্দর খুব সচেতন। সেই সময় বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বাংলার কৃষক ভারগ্রস্ত কৃষক ও কৃষিজীবীদের জীবনের ভয়াবহ সঙ্কট সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা চলতো। কৃষ্ণসুন্দরের ইচ্ছা হলো দেশব্যাপী অনুষ্ঠিত এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে। গ্রামাঞ্চলে কর্মরত মানুষের সঠিক অবস্থা বর্ণনা করে একটি প্রবন্ধ লিখছিলো কৃষ্ণসুন্দর। এই উদ্দেশ্যে সে মাঝে মাঝে গ্রামে গ্রামে ঘোরাফেরা করতো এবং প্রবন্ধের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতো। গত আট-নয় মাস ধরে নিয়মিতভাবে এই কাজটি করে যাচ্ছে কৃষ্ণসুন্দর। মুকুন্দ দাসের যাত্রাভিনয় সংগঠিত করা উপলক্ষে তার এই কাজটি কয়েকদিন ধরে বন্ধ ছিল। যাত্রাভিনয়-সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব প্রতিপালন করার পর, আবার কৃষ্ণসুন্দর তথ্য-সংগ্রহের কাজে হাত দিল।

আজ নদী পার হয়ে ওপারের একটি গ্রামে যাওয়ার পালা। গ্রামটির নাম 'সোনাচণ্ডী'। বিকেলের দিকে কৃষ্ণসুন্দর সোনাচণ্ডী-গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে এসে হাজির হলো। এ পাড়ায় দেবনাথ সম্প্রদায়ের বসতি। তাঁতের বিচিত্র কাপড় বুনা হল এদের বংশগত উপজীবিকা সোনাচণ্ডীর তাঁতের কাপড় সবিশেষ প্রখ্যাত—বিশেষত এখানকার শাড়ী কাপড়ের ডিজাইনের আঁচল ও পাড়ের রকমারি বাহার। এই অঞ্চলের পল্লীকবিগণ বারবার সোনাচণ্ডীর বাহারে শাড়ীর প্রশস্তি রচনা করেছেন।—খেয়া পার হয়ে সোনাচণ্ডীর মাঠে পা দিতেই এসব কথা মনে পড়লো কৃষ্ণসুন্দরের। আজ সে তাঁতী-সম্প্রদায়ের অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার কাজ

সুরু করবে। একটি ছোট বেতের বোনা স্যুটকেসে কাগজ পত্র নিয়ে কৃষ্ণসুন্দর সোনাচড় গ্রামে ঢুকলো।

গাঁয়ের দক্ষিণ প্রান্তে অনেকখানি জায়গা জুড়ে তাঁতী-পাড়া। লম্বা পরিষ্কার খালী জমি—বহুকাল ধরে এই একই জায়গায় সোনাচড়ের তাঁতীরা বংশানুক্রমে বিচিত্র কাপড়ের 'টানা' দিয়ে আসছে। স্থানটি এই অঞ্চলে সুপরিচিত। দূরের ব্যবসায়ীরা পর্যন্ত এখানে এসে তাঁতীদের দাদনের টাকা গচ্ছিয়ে যায়।

আজ বিকেলেও সেই চিরাচরিত প্রথায় অনেকেই কাজ করেছিল তাঁতীপাড়ায়। প্রায় আড়াই হাত লম্বা পুরু পুরু 'ব্রাস' দিয়ে 'টানার' সুতোর ভাতের কেন মাখাচ্ছিল সবাই। 'ব্রাস' হাতে নিয়ে সবাই কেমন দৌড়ে দৌড়ে কাজ করছে।

কর্মরত একজন তরুণ তাঁতী কৃষ্ণসুন্দরকে দেখে ব্রাস হাতেই থমকে দাঁড়ালো—এবং উচ্চ গলায় ডেকে বলল—এই যে এদিকে এসো কেষ্ট ভাই!...

তরুণটির নাম মহেন্দ্র। পাঠশালায় পড়ার সময় সে ছিল কৃষ্ণসুন্দরের অন্তরঙ্গ সহপাঠী। মহেন্দ্রের কাছে গিয়ে কৃষ্ণসুন্দর হাসি মুখে বাল্যবন্ধুকে সম্ভাষণ জানালো—কেমন আছ মহেন্দ্র?—বলতে বলতে সে মহেন্দ্রর টানার কাছাকাছি ঘাসের উপর বসে পড়ল।

হাতের ব্রাসটা কেনের গামলায় চুবিয়ে রেখে কৃষ্ণসুন্দরের মুখোমুখি বসে মহেন্দ্র বলল—আমার কথা শোনা নি কিছু?

—কি কথা বল দিকি নি? কৃষ্ণসুন্দর জিজ্ঞেস করল।

—তীব্র বিক্ষোভে ফেটে পড়লো মহেন্দ্র বলল—সুদ খোর মহাজনের যন্ত্রণায় বাবা আমার বটতলায় বসেছেন সন্ন্যাসী হয়ে। আজ তেরো দিন, শোনো নি তুমি?

মহেন্দ্রের পিতাকে কৃষ্ণসুন্দর খুব শ্রদ্ধা করতো। লোকটি এই অঞ্চলের সেরা তাঁতী। সোনাচকের কত নতুন শিল্পীকে তিনি নিজে হাতে কাজ শিখিয়ে দিয়েছেন। কয়েক বছর আগে জেলার সদর সহরের স্বদেশী মেলায় পাড়ের ও আঁচলের কারুকার্যের জন্য তিনি একটি সোনার মেডেল পেয়েছিলেন। এই মানুষটির শোচনীয় পরিণতির কথা শুনে কৃষ্ণসুন্দর দুঃখিত ও বিস্মিত হলো। সন্তর্পণ কণ্ঠে সে বলল—ব্যাপারটা খুলে বল তো মহেন্দ্র!

—শোনো, আজ ক'দিন ধরে তোমার কাছে যাবো-যাবো মনে করছি। আর যাবো কি ছাই; হাতে আইন খরচাটাও নেই···

—মহেন্দ্র বলল।

—কি, কোনো মামলায় পড়েছো?—জিজ্ঞেস করল কৃষ্ণসুন্দর।

—মামলাই তো! তোমাদের জীবনগঞ্জের ঐ রাই-মোহন পোদ্দার—বেটা খুনী! আমাদের নামে নালিশ করেছে শালা।—মহেন্দ্র বলতে লাগল—

—আমার বাবা তো সরল মানুষ—সারাটা জীবনই ঠকলেন এজন্য। টাকা ধার আনবার সময় তিনি সাদা কাগজে দস্তখত দিয়ে আসেন। সেই টাকা আর শোধ করা যায় নি। রাইমোহন পোদ্দার করেছে কি, সাদা দলিলে পাঁচশ টাকা বেশী লিখেছে। বেশী দামের ইষ্টাম্প ছিল কিনা।—তার উপর কড়া সুদ ধরে নালিশ করেছে।

মহেন্দ্রের কথা শুনে কৃষ্ণসুন্দর উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলো—তোমার বাবা কোথায়?

—ঐ যে বললাম—বটতলায়? একবার চিন্তা করে দেখো কৃষ্ণসুন্দর! আষাঢ় মাস!—একেক দিন আকাশ ভেঙ্গে বিষ্টি নামে। এই অবস্থায় বুড়ো মানুষটা বটতলায় পড়ে থাকে, একটা চালা ঘরে। বাড়ীতে সারা দিন মার কান্নাকাটি। আমার বাচ্চাগুলো দাদু দাদু বলে চিৎকার করছে। এর উপর অভাব তো লেগেই আছে।···মাথা ঠিক থাকে কিনা বল? কোনদিন যে কার মাথা কাটিয়ে আন্দামানে যাই···

—এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলল মহেন্দ্র।

মহেন্দ্রের কথা ধীরভাবে শুনে কৃষ্ণসুন্দর দৃঢ়ভাবে বলল—শোন মহেন্দ্র। কারো মাথা কাটিয়ে—বা সন্ন্যাসী হয়ে কি উপকারটা হবে বল?—আদালতে এই সত্য কথাটা প্রমাণ করতে হবে যে দলিলে টাকার অঙ্ক বাড়িয়ে লেখা হয়েছে এবং এত কড়া হারে সুদ দেওয়ার কথা ছিল না।···দলিলে কারা কারা সাক্ষী ছিল তাদের নাম আগে যোগাড় করতে হবে।

কৃষ্ণসুন্দরকে মহেন্দ্র একেবারে জড়িয়ে ধরলো।

ইতিমধ্যে আরও দু'একজন তাঁতী নিকেতনের কাজ ফেলে দিয়ে ওদের ঘিরে দাঁড়িয়েছে। তাদের মধ্যে একজন বলল—উকীলবাবু! জীবনগঞ্জের মহাজনদের অত্যাচারে আমরা মারা গেলাম।…আমাদের এই সোনাচড়ের তাঁতীরা জীবনগঞ্জের মহাজনদের সুদের টাকা কম খাওয়ায় নি। মনে করুন—আমরা একটা ব্যবসা করি। ঘর পিছু অন্ততঃ দুটো করে তাঁত চালাই। সময়ে অসময়ে পুঁজির টানাটানি পড়লে আমরা দু'চারশ' টাকা ধার থাকি—আবার সুদে আসলে তা পরিশোধ করেও দিই। আজ ক'বছর ধরে কাজ কারবার মন্দ। লোকের হাতে পয়সা নেই—কাপড় কিনবে কি করে? এই অবস্থায় ওদের একটু সবুর সইবে না? জমি জমা, চাল-গোরস্তী, বাড়ী-ঘর, মায় তাঁত পর্যন্ত নিয়ে টানাটানি করছে। সোনাচড়কে এরা শ্মশান বানিয়ে ফেলতে চায়।—এসবের কি কোনো প্রতিকার হবে না উকীলবাবু?…শুনছি, নানান কারখানার খাতক-কর্মকরা নাকি সমিতি গড়ছে। আমরাও কি বসে পড়ে পড়ে মার খাবো?

—রাইমোহন পোদ্দার হচ্ছে কুবীরদের সর্দার।—আরেকজন বলল।

সন্ধ্যার পর তাঁতী পাড়ায় গিয়ে কৃষ্ণসুন্দর অনেকের সঙ্গেই আলাপ আলোচনা করলো—এবং তার প্রস্তাবিত প্রবন্ধের জন্য অনেক তথ্যও সংগ্রহ করল।

• •

সোনাচড় থেকে বাড়ীতে ফিরে এসে গা-হাত-পা ধুয়ে খাওয়া দাওয়া শেষ করে কৃষ্ণসুন্দর যখন নিজের বৈঠকখানা ঘরে বসল রাত্রি তখন প্রায় এগারোটা বেজে গেছে। এই তার দৈনন্দিন জীবনের অভ্যাস। শুয়োবার আগে কৃষ্ণসুন্দর বিকেলের ডাকে আসা চিঠি পত্রগুলো পড়ে—তারপর পরদিনের মামলাগুলোর প্রয়োজনীয় নোট তৈরী করে। অবশেষে কাজ শেষ করে খানিকক্ষণ সে চুপচাপ বসে থাকে নদীর দিকে চেয়ে। খুব বেশী রাত্রিতে শুয়োতে হয় কৃষ্ণসুন্দরকে।

বৈঠকখানা ঘরের পূব ও দক্ষিণ দিকের জানালা দরজা খুলে দিয়ে কৃষ্ণসুন্দর নিজের চেয়ারটিতে বসে একটা সিগারেট ধরালো—এবং টেবিলের উপর একপাশে রক্ষিত চিঠিপত্রগুলো দেখতে সুরু করলো। অধিকাংশই দামুলি চিঠি—মক্কেলের কিংবা বন্ধুবান্ধবের চিঠি। কিন্তু একখানি চিঠি খুলে পড়তে সুরু করতেই কৃষ্ণসুন্দর কেমন গম্ভীর হয়ে উঠল। জীবনে এই ধরণের চিঠি সে আর কোনো দিন পায় নি। চিঠিখানি এইভাবে লেখা হয়েছে:

প্রিয় কৃষ্ণসুন্দরবাবু।

আশা করি আপনার মনে আছে। মুকুন্দ দাসের যাত্রাগানের আসরে একজন দরবেশ আপনাকে অনুরোধ করেছিল একটু বসবার জায়গা করে দিতে। সেই দরবেশই আপনার কাছে এই চিঠি লিখছে। আপনার সঙ্গে আমার বিশেষ কথা আছে। আমি শুনেছি আপনি গত কয়েকমাস ধরে গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে কুষ্ঠগ্রস্ত মানুষের সমস্যা সম্পর্কে গবেষণা করছেন। আপনার এ উদ্যম প্রশংসনীয়। উপরোক্ত সমস্যার সহিত সংশ্লিষ্ট কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে চাই। যদি আপনি রাজি থাকেন তবে নিম্নঠিকানায় পত্র দিবেন—আমি আপনার সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা করবো। আমার সম্বন্ধে গোপনীয়তা রক্ষা করবেন—এই অনুরোধ। ইতি—

অভিনন্দন সহ

দরবেশ

চিঠির শেষে দূর গ্রামের অন্য একটি মানুষের নাম ও ঠিকানা দেওয়া আছে। চিঠিখানি খুব মনোযোগের সঙ্গে পড়ল কৃষ্ণসুন্দর। আপাততঃ রহস্যময় মনে হলেও শেষ পর্যন্ত চিঠির মর্মার্থ সে বুঝতে পারলো। চিঠি খানি এসেছে কোনো বে-আইনী রাজনৈতিক দলের কোনো আঞ্চলিক নেতৃস্থানীয় পলাতক কর্মীর কাছ থেকে। অন্যত্র দেশপ্রেমিক ইংরেজ সরকারের কারাগারে বন্দী থাকা সত্ত্বেও—কিছু সংখ্যক শক্ত কর্মী আত্মগোপন করে দেশের নানা স্থানে আন্দোলন পরিচালনা করছেন। তাঁদেরই একজন তার উপর আস্থা স্থাপন করে এই চিঠিতে তাকে সংগ্রামী জীবনের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

যদিও চিঠিখানি খুবই অভিনব, তথাপি কৃষ্ণসুন্দরের মনে হলো—সে যেন কতদিন ধরে এমনি একটা দুঃসাহসী আহ্বানের জন্য মনে মনে প্রতীক্ষা করেছিল। তৎক্ষণাৎ

সে চিঠিখানির একটি সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখে ফেলল। অজ্ঞাত পরিচয় প্রবাসের প্রস্তাবে পূর্ণ সমর্থন ও সম্মতি জানিয়ে চিঠিলেখা শেষ করে কৃষ্ণসুন্দর ডাকলো—নিবারণদা!

খাওয়া দাওয়া শেষ করে বাসনপত্র গুছিয়ে রেখে এই মাত্র নিবারণ তামাকটি ধরিয়েছে। কৃষ্ণসুন্দরের ডাক শুনে সে হুঁকো টেনে ধুঁয়া ছাড়তে ছাড়তে এসে হাজির হলো। খুব হাসি হাসি মুখ আজ নিবারণের।

—এই চিঠিখানি খুব জরুরী! কাল ভোরের ডাক ধরিয়ে দিতে হবে। নাও—ধর।—বলে চিঠিখানি নিবারণের হাতে দিল কৃষ্ণসুন্দর।

হাত পেতে চিঠি নিতে নিতে নিবারণ মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে বলল—সব মক্কেলের চিঠি সব পড়া হয়ে গেছে?

—কেন! কিছু বলবে!—কৃষ্ণসুন্দর বলল।

—আরেক মক্কেলের চিঠি আছে—বড় মক্কেল।—নিবারণ তার রসিকতার ভঙ্গীতেই বলল।

—কৈ সে চিঠি? দাওনি তো! বলল কৃষ্ণসুন্দর।

নিবারণ তার বড় বড় চোখগুলো ঘুরিয়ে বলল—আজ একটা কাণ্ড ঘটে গেল।

—কিছুই বুঝতে পারছি না, নিবারণ দা। কি ব্যাপার কি!

—আমাদের নেত্যকে চেনোতো? ঐ যে বড় বাড়ীর কি?

—হ্যাঁ। কি হলো তার?

—ওর কিছু হয় নি।…আজ সন্ধ্যের একটু আগে নেত্য এসে একখানি হাত চিঠি দিয়ে গেল।—বলতে বলতে নিবারণ তার মুদ্রাদোষ অনুসারে জিভ কেটে হাসলো। এবং নীলাভ রঙের একখানি খাম কৃষ্ণসুন্দরের হাতে দিল।

—কার চিঠি? কৃষ্ণসুন্দর জিজ্ঞেস করল।

—কি করে বলবো? কোনো কথার জবাবই দেয় নি নেত্য।…তবে খামের উপরের লেখা দেখে মনে হচ্ছে যেন মেয়েলোকের হাতের লেখা।—নিবারণ এবার প্রাণ খুলেই হাসলো। তারপর আবার বললো নিবারণ—খোলো না, দেখি কার চিঠি।

নিবারণের উত্তেজনা লক্ষ্য করে কৃষ্ণসুন্দর কেমন কৌতুকবোধ করলো। সে ও হাসতে হাসতে বলল—তোমার এত কৌতূহল কেন নিবারণদা?…

—যাও! কি যে বল?—সলজ্জভাবে প্রতিবাদ জানালো প্রবীণ নিবারণ। বড় বাড়ীর চিঠি কিনা—তাই দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে কে লিখেছে—এবং কি লিখেছে? খোলো দেখি—

সুচারুর হাতে লেখা কৃষ্ণসুন্দরের কাছে খুব অপরিচিত নয়। খামের উপরে ইংরেজী হরফে লেখা নাম-ঠিকানা দেখেই কৃষ্ণসুন্দর বুঝতে পারলো যে এ হচ্ছে সুচারুর হস্তাক্ষর। খামটি খুলল কৃষ্ণসুন্দর। খামের ভেতর চিঠি পাওয়া গেল দু'খানি। একটি চিন্তামণির লেখা—আরেকটি সুচারুর। চিন্তামণির চিঠি খানিই আগে পড়তে শুরু করলো কৃষ্ণসুন্দর।

কে কে লিখেছেন?—উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করলো নিবারণ।

বড় বাড়ীর গিন্নী আর তাঁর মেয়ে।—চিঠি পড়তে পড়তে কৃষ্ণসুন্দর জানালো।

কি লিখেছে মায়ে-ঝিয়ে? জিজ্ঞেস করলো।

দাঁড়াও! আগে পড়ে নি। দু'খানি চিঠিই মনোযোগ দিয়ে পড়তে শুরু করলো কৃষ্ণসুন্দর।

সংক্ষিপ্ত দু'খানি চিঠি। এর মধ্যে চিন্তামণির চিঠিখানি একটু সবিস্তারে লেখা।

কি? লিখেছে কি? তামাকের ধুঁয়া ছাড়তে ছাড়তে নিবারণ আবার জিজ্ঞেস করল।

হাসতে হাসতে বলল কৃষ্ণসুন্দর—মারাত্মক কিছুই লেখেনি নিবারণদা। লিখেছে যে ওদের মেয়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ করেছে—এখন আরও কিছুদিন পড়তে চায়। সে বিষয়ে আমার সঙ্গে একটু 'পরামর্শ' করবে। তাই ওদের বাড়ীতে একবার যেতে লিখেছে। মায়ে-ঝিয়ে এক কথাই লিখেছে।

—সাবধান, কেষ্ট! ওদের সংসর্গে যেতে পারবে না তুমি। বাড়ীর খালি ভিটেগুলোতে এখনো বেগুনের চাষ হচ্ছে। তোমার বাবা, তোমার মা—এরা কেন অসময়ে মারা গেলেন—কী ভাবে মরলেন ওরা এসব কথা

শুনলো না তুমি। সাবধান! সহসা নিবারণ অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠলো। ওদের যখন টাকা আছে, তখন পরামর্শের অভাব হবে না। তোমার মতো 'এলেমদার' আরও আছে জীবনগঞ্জে।

নিবারণের উত্তেজনা দেখে কৃষ্ণসুন্দরের মনের চাপা ভাবটা নিমেষের মধ্যে কর্পূরের মতো উড়ে গেল। গম্ভীর কণ্ঠে বলল সে—আচ্ছা যাও। তুমি ঘুমোও গে, নিবারণদা।…

•

নিবারণ চলে গেল কৃষ্ণসুন্দর চিঠিপত্রগুলো গুছিয়ে রেখে লণ্ঠন বাতিটা খুব কমিয়ে দিয়ে বৈঠকখানা ঘরের এক কোণে রাখলো। তারপর ঘরের বাইরে গিয়ে উন্মুক্ত সিঁড়িতে খালি গায়ে বসে একটি সিগারেট ধরালো কৃষ্ণসুন্দর।

আষাঢ় মাসের শুক্ল পক্ষের মাঝামাঝি। দূরদিগন্তে, আবাদী জমির শেষপ্রান্তে, পর্বতাকার বিরাট বিরাট মেঘের সমারোহ—কাজলা মেঘের শীর্ষে শীর্ষে আলো-চাঁদের আলোর ফুল সুবিন্যস্ত একটানা রেখাটি ঘন স্পষ্টতার কথা বলছে। রাত্রি গভীর। অদূরে ক্ষুদ্র নদীটির ধির্‌ল সতেজ জলধারা। নদীর দিক থেকে বেশ শীতল হাওয়া আসছে। হাওয়ায় ভেসে আসছে কদম ছিজল বকুলের মিশ্রিত গন্ধের কোয়ারা। কিছুদূরে খেয়াঘাটের কাছাকাছি মাঝিদের ঘাঁটি—সেখান থেকে ভাটিয়ালী গানের সুর ভেসে আসছে। সুন্দর এই জীবন-গন্ধ। আর সুন্দর এই পৈত্রিক ভিটাটি। তার বাবা ছিলেন একজন নামজাদা কবিরাজ। যৌবনে নিজে উদ্যোগী হয়ে জীবনগঞ্জে একটি কবির দল গঠন করে-ছিলেন তিনি। নদীর বাঁকের কদমতলার কাছাকাছি এই মনোরম জায়গাটিও সেই কবিমনেরই নির্বাচন। এই ভিটের মায়া সম্বন্ধে কৃষ্ণসুন্দরের সত্তা বারবার দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যায়। কেন সে জীবনগঞ্জে পৈত্রিক ভিটায় আবার নতুন করে ঘর বেঁধে বসবাস করবে না? একেকবার মন তার উন্মুখ হয়ে উঠে—আবার মনে হয় কেন সে সহরে গিয়ে আরও বেশী অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করবে না? নিজের সৌরুদকে আরও বৃহত্তর ক্ষেত্রে পরীক্ষা করবে না কেন সে?…মানসিক এই দ্বন্দ্বের জন্যই কৃষ্ণসুন্দরের বাড়ীর তিন তিনটে ভিটে এখনও খালি—এখনো ওখানে নিবারণের উদ্যোগে বেগুনের চাষ হয়। …আরও কতোবারের মতো আজও কৃষ্ণসুন্দরের মনে পড়লো এসব কথা। আজকাল প্রায়ই তার মনে এইসব কথা জাগছে। এবং এটাও সে বুঝতে পারছে যে দু'এক বছরের মধ্যেই তাকে এ সম্বন্ধে একটা কিছু সুরাহা করতে হবে।

প্রতিদিনের মতো আজও গভীর রাত্রিতে বাইরে উন্মুক্ত আকাশের তলায় একাকী বসে বসে—খানিকক্ষণ পর্যন্ত আকাশ পাতাল অনেক কিছুই চিন্তা করলো বিভ্রান্তরত কৃষ্ণসুন্দর। তারপর অভ্যাস মতো ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লো সে। একবারও কৃষ্ণসুন্দরের মনে হয় নি যে যেদিনটি তার জীবনে আজ চলে গেল—তার গুরুত্ব অপরিসীম।

পঞ্চম অধ্যায়

একমাত্র পুত্র কৃষ্ণসুন্দরের পড়াশুনা যাতে ভালো ভাবে চলে, সেই উদ্দেশ্যে তার বেহিসেবী পিতা গোপনে কড়া সুদে বন্ধুস্থানীয় সুচাঁদুর পিতার কাছ থেকে কিছু টাকা কর্জ নিয়েছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণসুন্দর যে বছর এম-এ ক্লাসে ভর্তি হয়, সে-বছরই অতর্কিতে তাদের উপর মহাজনের হামলা সুরু হয়।

মামলা শেষ হওয়ার আগেই কৃষ্ণসুন্দরের বৃদ্ধ পিতা হতাশায় প্রাণত্যাগ করলেন—তিনি প্রায় বিনা চিকিৎসায় মারা যান। আদালতের নির্দেশক্রমে মহাজন পক্ষ তাদের জমি-জমা ক্রোক করে নেয়—বসত-বাড়ির ঘরগুলো পর্যন্ত নির্মমভাবে ভেঙ্গে নেয় তারা। কৃষ্ণসুন্দরের জননীও এই মর্মান্তিক আঘাত সইতে পারলেন না। স্বামী-স্বসুরের ভিটায় শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করার সৌভাগ্যটুকু বজায় রাখবার জন্যে তিনি একদিন গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন।

কৃষ্ণসুন্দরের এম-এ পড়া আর হলোনা। একটা সওদাগরী অফিসে দিনের বেলায় চাকুরী সংগ্রহ করে, রাত্রিবেলায় কৃষ্ণসুন্দর আইন পড়তে থাকে। তিন বছরে আইন পড়া শেষ করে, বছর দুই আগে সে আবার পৈত্রিক ভিটায় ফিরে এসেছে এবং জীবনগঞ্জের মুন্সেফী

আদালতে ওকালতি শুরু করেছে। গত দু'বছরের সুচারুদের বাড়ীতে একবারও যায়নি সে।

সমস্ত পরিস্থিতির আরেকটা দিকও কৃষ্ণসুন্দর বিস্মৃত হতে পারছে না! তার মা ছিলেন চিন্তামণির ঘনিষ্ঠ বান্ধবী—তাঁরা দু'জনে 'সই' পাতিয়েছিলেন। সেই সূত্র ধরে সুচারুর মেজদা, ছোড়দা এবং সুচারুর সঙ্গেও কৃষ্ণসুন্দরের ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠে একেবারে শৈশব-কৈশোর থেকে।

এই ছোটখানার মধ্যে মা ও মেয়ের চিঠি কৃষ্ণসুন্দরের টেবিলের উপর পড়েই রইলো। চিঠির মর্ম অনুধাবনে সে বড় বাড়ীতে গেলো না। আবার তার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয় বলে কোনো সংবাদও পাঠালো না সে।

সেদিন রবিবার। স্থানীয় হাইস্কুলের হেড-মাস্টার মশাই-এর বাড়ীতে সেদিন প্রবেশিকা পরীক্ষার গেজেট এসেছে। সকাল বেলায় চা খেয়ে কৃষ্ণসুন্দর বেরিয়ে পড়লো গেজেট দেখতে—জীবনগঞ্জের স্কুলের ছাত্ররা কেমন পাশ করেছে তা জানবার জন্যে।

হেড-মাস্টার মশাই-এর বৈঠকখানায় বসে গেজেট দেখতে দেখতে কৃষ্ণসুন্দর সুচারুর নামটাও খুঁজলো। কয়েকদিন আগে সুচারুর ছোড়দা কলকাতা থেকে তার পাশের সংবাদ মাত্র জানিয়েছে—কিন্তু কোন্ বিভাগে সে পাশ করলো, তা জানাতে পারেনি। গেজেট খুঁজে কৃষ্ণসুন্দর দেখলো যে, সুচারু প্রথম বিভাগে পাশ করেছে। খুশীতে কৃষ্ণসুন্দরের মনটা ভরে গেল—মনে হলো, তার, সে যেন কোনো পরম আত্মীয়ের সাফল্যের সংবাদ জানতে পেরেছে।···সুচারুর এই সাফল্য জীবনগঞ্জের ইতিহাসে উপেক্ষার যোগ্য নয়। যদিও এর আগে জীবনগঞ্জের আরও দুই একটি মেয়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ করেছে—কিন্তু সুচারুর মতো প্রথম বিভাগে পাশ করেনি কেউ।···অন্ততঃ আজকের দিনটিতে সুচারু এবং চিন্তামণির সঙ্গে দেখা না করাটা বোধহয় খুবই অসঙ্গত—হয়তো বা অশোভনও। হেড-মাস্টার মশাই এর বাড়ী থেকে বেরিয়ে কৃষ্ণসুন্দর নদীর ধারের পথ ধরে বড়-বাড়ীর দিকে এগোতে লাগলো।

আষাঢ় মাসের সকাল বেলা, প্রায় গোটা আকাশটা পুরু পুরু কাজলা মেঘে আচ্ছন্ন। তারা নদীর বুকে বড় বড় মেঘের কালো ছায়া ছড়িয়ে পড়েছে। ছোট ছোট আবর্ত রচনা করে ছোট নদীটি দক্ষিণ মুখে ছুটেছে—মাঝে মাঝে দেখা যায়, একটি দুটি কচুরি পানা কেমন দ্রুত তালে স্রোতের জলে ভেসে ভেসে চলছে।

হাঁটতে হাঁটতে কৃষ্ণসুন্দর যখন সুচারুদের বাড়ীর কাছে এসে পৌঁছোলো—তখন বেলা প্রায় আটটা। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের তলায় সমস্ত পরিবেশ মনমরা রোদে অবসন্ন।

নদীতীরে বিরাট বাড়ী। নদীর তলদেশ থেকে লম্বা লম্বা সিঁড়ি উঠেছে একেবারে বাড়ীর সীমানা পর্যন্ত। একটি ঝিকে সবুজ রঙের পানসী নৌকা ঘাটে বাঁধা। নদীর কল-ধারা বাড়ীর পাকা-বাঁধানো ঘাটের গা ঘেঁসে চলে গেছে—ঢেউগুলো এসে ধাক্কা দেয় বাড়ীর ঘাটের সিঁড়িতে।

বড়-বাড়ীর কাছা কাছি এসে কৃষ্ণসুন্দরের স্বভাবতঃ বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ক্রমশঃ মন্থর হয়ে এলো। মনে পড়লো তার নিবারণের কথা—তার সাবধানবাণীর কথা। অতীতের তিক্ত ইতিহাসের কথাও বারবার তার মনকে তীক্ষ্ণভাবে খোঁচাতে লাগলো।···তথাপি শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণসুন্দর বড়-বাড়ীর ভেতরে প্রবেশ করলো। কয়েক পা এগিয়ে একবার সে পেছন ফিরে তাকালো—যেন একটা নিষিদ্ধ কাজ করতে যাচ্ছে, এমনি ভাবে তাকালো সে। বুকের ভেতর অস্বাভাবিক দ্রুত স্পন্দন অনুভব করলো কৃষ্ণসুন্দর—সে যেন যুগ-যুগান্তরের বাধা অতিক্রম করেছে আজ।

সঙ্কুচিত পদক্ষেপে বড়-বাড়ীর অন্তঃপুরে ঢুকতেই নিত্যর সঙ্গে কৃষ্ণসুন্দরের মুখোমুখি দেখা।

—ওরে বাবা! পুবের চাঁদ তাহলে পশ্চিমদিকে উঠলো?—এই বলে নিত্য সম্ভাষণ জানালো কৃষ্ণসুন্দরকে।

—কেমন আছো তোমরা নিত্যদি?—প্রত্যুত্তরে কৃষ্ণসুন্দর জিজ্ঞেস করল।

—কি করে ভাল থাকি বল? আজ কদিন হলো চিঠি দিয়ে এসেছি? পথের দিকে চেয়ে চেয়ে আমাদের চোখ যে ক্ষয়ে গেল।—

—রসিকতাচ্ছলেই বলল নিত্য। তারপর সে আকুল

দিয়ে নীচের একটা ঘর দেখিয়ে বলল—যাও। এঘরে যাও। ...কই গো, টুনু! কে এসেছে, দেখো।

• •

সুচারু তখন চিন্তামণির ঘরে বসে নিবিষ্ট মনে তার বাবার চিঠি পড়ছিল। চিঠি এসেছে গতকাল সন্ধ্যার ডাকে। তার বাবা এই দীর্ঘ চিঠি, প্রধানতঃ তার সম্বন্ধেই লিখেছেন। কাল রাত্রিতেই সে চিঠি পড়েছে—আজ আবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ছে। নিত্যর ডাক শুনে মাথা না তুলেই বলল সে—কে এসেছে? ভিতরে পাঠিয়ে দাও।

—একবার উঠে এসোনা।...আচ্ছা মেয়ে! দেখোনা কে এসেছে।

—বলতে বলতে ঘরের দরজার গিয়ে দাঁড়ালো নিত্য।

—বলছি, ভেতরে পাঠিয়ে দাও—আমার মন ভালো

কে—কে এসেছে?

—সুচারু বাঁকের সঙ্গে বলল।

একটু এগিয়ে গিয়ে কৃষ্ণসুন্দর নিত্যর পাশাপাশি দরজায় দাঁড়ালো। 'ও, আপনি?' বলে সুচারু দৌড়ে এলো দরজার দিকে—আসতে আসতে উৎফুল্ল হয়ে আবার বলল—আপনি এসেছেন!...আসুন।

সংবাদ পেয়ে চিন্তামণিও এলেন। কৃষ্ণসুন্দরের মুখোমুখি একটি চেয়ারে বসলেন তিনি—আর সুচারু দাঁড়িয়ে রইলো অদূরে খাটের এক কোণে।

প্রথমে চিন্তামণিই কথা সুরু করলেন। তিনি আক্ষেপ করে বললেন—আমি এক অশান্তিতে পরেছি, বাবা। কিছুতেই টুনুকে কলেজে পড়তে দেবেন না কর্তা। ওদিকে মেয়েও নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। মনের দুঃখে মেয়ে তেল মাখছেনা মাথায়। এসব পাগলামি করে কি লাভ বলত? খালি আমার অশান্তি বাড়ানো।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে কৃষ্ণসুন্দর বলল—ব্যাপারটা খুব দুঃখেরই হলো, মাসীমা। জীবনগঞ্জের ইতিহাসে যে মেয়েটি সর্বপ্রথম প্রথম বিভাগে পাশ করতে পারলো—তারই আর কলেজে পড়া হবে না দুঃখের নয়?

—বিভাগ—টিভাগ এখনো, জানিনি কিন্তু। ছোড়দা কেবল পাশের খবরটাই জানিয়েছেন:—সুচারু বলল।

—সেকি! তোমরা গেজেটের খবর রাখোনা? —কৃষ্ণসুন্দর বলল।—এইমাত্র আমি দেখে এসেছি। কাল বিকেলের ডাকেই হেডমাস্টার মশাইর কাছে গেজেট এসে গেছে।

—তাই নাকি?—বড় সুসংবাদ জানালে বাবা। এই মেয়ের পড়াশুনোর জন্য আমাকে কি কম গঞ্জনা সইতে হয়েছে?...অথচ ছেলেরা কেউ এত ভালো পাশ করতে পারেনি। এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কৃষ্ণসুন্দর। লেখাপড়া শিখতে পারলে, মেয়ে আমার মানুষের মতো মানুষ হবে।—এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বললেন চিন্তামণি। তিনি হাত জোড় করে ইষ্টদেবকে স্মরণ করলেন।

সুচারুর কাছে এ শুভ সংবাদ অপ্রত্যাশিত নয়। পড়াশুনায় সে অবহেলা করেনি কোনো দিন। কিন্তু তার এই সাফল্যকে সে কৃষ্ণসুন্দরের মতো এতোটা তলিয়ে দেখতে পারেনি। সত্যই তো জীবনগঞ্জের ক'টি মহিলা এর আগে মাট্রিক পাশ করেছেন, তারা কেউ প্রথম বিভাগে যাননি তো! তাই তো। সে নীরবে এক দৃষ্টে কৃষ্ণসুন্দরের দিকে চেয়ে রইল। সুচারু বুঝতে পারলো যে, তার সাফল্যের সংবাদে কৃষ্ণসুন্দরের আনন্দ অত্যন্ত আন্তরিক—এবং তার কলেজে পড়া হবে না শুনে, তার বেদনাও বোধহয় তেমনি আন্তরিক।

একটি ছোট্ট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চিন্তামণি আবার বললেন—শোন, বাবা তোমাকে যে জন্যে আসতে লিখেছি। টুনু বলছে, মেয়েরা নাকি বাড়ীতে বসেও কলেজের পড়া পড়তে পারে?

—তা পারে—কিন্তু। কৃষ্ণসুন্দর বলল।

—তুমি আমাকে সেই ব্যবস্থা করে দাও বাবা! কলেজের পড়া পড়াতে পারেন, এমন কাউকে পাওয়া যাবে না, এখানে?—চিন্তামণি আবার বললেন।

—আমাদের জীবনগঞ্জের ইস্কুলে ভাল ভাল শিক্ষক কয়েকজনই আছেন।—কৃষ্ণসুন্দর জানালো তারপর সে সুচারুর দিকে চেয়ে আক্ষেপের সুরে বলল—তা হলে

কলেজে পড়া হলো না তোমার?

—কি করি বলুন?—বলতে বলতে সুচারু এগিয়ে এসে চিন্তামণির পাশে দাঁড়ালো। এবং উত্তেজিত কণ্ঠে আবার বলল মার দিকে চেয়ে সব সহ্য করছি। নইলে একেবার মন আমার বিদ্রোহী হয়ে উঠে।··· বাড়ীতেই বা পড়াশুনো কি করে হবে বলুন? বুড়ো ম্যানেজারবাবু সেরেস্তার কাজ নিয়েই বিব্রত। ওঁকে দিয়ে এসব কাজে কোনো সাহায্যই পাওয়া যাবে না। আমার মাষ্টার চাই, কোন কোন বিষয় পড়বো এ সব ঠিক করতে হবে কে দেখে আমাকে পরামর্শ?

—তুমিই এসবের দায়িত্ব নাও, কৃষ্ণসুন্দর!—চিন্তামণি উপরোধের সুরে বললেন।

—কিন্তু সত্যিই কি আপনারা ওকে কলেজে পাঠাবেন না? বাড়ীতে বসে শেষ পর্যন্ত পড়াশুনা হবে কি?—কৃষ্ণসুন্দর তথাপি বলল।

—সে হবে না, কৃষ্ণসুন্দর!···আর বলে লাভ নেই! কর্তার চিঠি টেবিলের উপরই পড়ে আছে—কিছুতেই ওকে রাজি করানো গেলোনা—আক্ষেপ করে বললেন চিন্তামণি।

—শুনুন! যা হবে না, তাই নিয়ে কথা বলে লাভ কি বলুন? চিৎকার করলেও মরুভূমিতে জল মেলে না। অন্ততঃ বাড়ীতে যাতে পড়তে পারি সে ব্যবস্থাটা আপনি খেটে-খুটে করে দিতে পারবেন কি না, বলুন। সুচারু বলল।

চীনা মাটির সুগঠিত থালায় করে কিছু পাকা আম আর আনারস কেটে সাজিয়ে এনে কৃষ্ণসুন্দরের সামনে টেবিলের উপর রাখলো নিত্য।—সঙ্গে রাখলো কাঁচের গ্লাসে এক গ্লাস জল। চিন্তামণি বললেন—খাও, বাবা।···আজ দু'বছর পর তুমি আমাদের বাড়ীতে এলে। আজ আবার কত কথাই মনে পড়ছে—হাত-মুখ-ধুয়ে-জল কটি মুখে দাও।

খেতে খেতে কৃষ্ণসুন্দর সুচারুর সঙ্গে পড়াশুনোর বিষয় নিয়েই আলোচনা করতে লাগলো। চিন্তামণি দেখে বিস্মিত হলেন যে, সুচারুর ব্যবহারে বা কথা বলার ভঙ্গীতে কোনো জড়তাই নেই। আরও লক্ষ্য করলেন তিনি, তারা দুজন যেন এক ধাতুতে গড়া। এতো সাদৃশ্য উভয়ের চরিত্রে—ব্যবহারে—কথাবার্তায়—এমনকি রুচিতে পর্যন্ত। সুচারুকে যেন এই মুহূর্তে অনেক বেশী সুখী বলে মনে হয়।—বেচারার মাথার চুলগুলো রুক্ষ—অভিমানে আজ কদিন ধরে চুলে তেল দিচ্ছে না। চোখ দুটো পর্যন্ত ভাংগা ভাংগা শুকনো মনে হয়—বোধহয় হতাশায়—অশান্তিতে। হঠাৎ মনে হলো চিন্তামণির কৃষ্ণসুন্দরের সঙ্গে পড়াশুনোর আলাপ করতে করতে, সুচারুর বিশুষ্ক চোখ দুটো যেন আবার সজীব হয়ে উঠছে। চিন্তামণি আর বেশীক্ষণ তাকাতে পারলেন না ওদের দিকে। মাটির দিকে চেয়ে চেয়ে তিনি অনেক কিছু ভাবতে লাগলেন—তারপর ধীরে ধীরে উঠে নিত্যর সঙ্গে রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত আলাপ আলোচনার পর, বেলা প্রায় এগারোটার কাছা কাছি সময়ে কৃষ্ণসুন্দর চেয়ার ছেড়ে উঠলো। উর্ধাকাশ তখন মেঘ মুক্ত হয়ে উঠছে। চক চকে রোদের আলো মুক্ত আনন্দে নিরাকাশের মেঘ লোকে ছড়িয়ে পড়ছে। ভিতর-বাড়ীর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এলেন চিন্তামণি—সঙ্গে নিত্য এবং সুচারু।

কৃষ্ণসুন্দর উঠানে কয়েক পা এগোতেই সুচারু খুব খুশী মেজাজে পেছন থেকে ডেকে বলল—শুনুন!

ডাক শুনে ফিরে দাঁড়ালো কৃষ্ণ সুন্দর এবং সুচারুর দিকে তোষা চোখে তাকালে।

—খুব বেশী দেরী করবেন না কিন্তু! পুব পাড়া থেকে পশ্চিম পাড়া আসতে আপনার সাতদিন লাগলো।—তেমনি মৃদু হাসতে হাসতে অনুযোগ জানিয়ে বললে সুচারু।

কৃষ্ণসুন্দর নীরবেই ফিরে চলে গেল। ঠিক সেই সময় চিন্তামণি ও নিত্য পরস্পরের দিকে চোখ তুলে তাকালো—যেন একে অন্যের মনোভাব অনুধাবনে বুঝতে চেষ্টা করলো।

কৃষ্ণসুন্দর চলে গেলে তারা তিনজনেই ফিরে এলেন। সুচারুর স্নানের জন্য মেয়েদের ঘাটে সাবান-গামছা, জামা কাপড় পাঠিয়ে দিতে নিত্যকে নির্দেশ দিয়ে চিন্তামণি সুচারুকে বললেন—উনুন! আজ মাথায় তেল দিয়ে স্নান

করতে যাও। ছিঃ! কি রকম দেখাচ্ছে—একেবারে বন-মানুষের মতন। তেল দাও আজ।

—না, না! পড়াশুনো আরম্ভ করে তবে মাথায় তেল দেবো।—আবদারের সুরে বলল সুচারু।

মায়ের আদেশ, হাসতে হাসতে লঘু ভাবে অমান্য করেই সুচারু স্নানের ঘাটের দিকে চলে গেল। সুপ্রচুর বৃষ্টিপাতে টল টলে জলে ভরা বড় পুকুর—নিরিবিলি ঘাট। মেয়েদের ঘাটের দু'ধারে আব্রু রক্ষা করবার জন্য উঁচু দেওয়াল দেওয়া হয়েছে। সিঁড়ি বেয়ে ঘাটের দিকে নামতে নামতে সুচারু ভাবতে লাগলো, তার মা এবং কৃষ্ণসুন্দরের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর কত পার্থক্য। কয়েক দিন ধরে মাথায় তেল না দেওয়ার ফলে মায়ের চোখে তাকে বন-মানুষের মতো রুক্ষ দেখায়—আর কৃষ্ণসুন্দর বার বলে গেলেন,—মাথায় তেল না দিয়ে সখের 'কপালকুণ্ডলা' সেজে লাভটা কি বল? কতো পার্থক্য। —আপন মনে হাসতে লাগলো সুচারু।

আজ কদিন ধরেই খুব গরম। বেলা প্রায় মাথার উপর। নতুন বর্ষার ভরা জলে যেন কাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে। ঘামে সর্বাঙ্গ ঘিন ঘিন করছে সুচারুর।···বাবা। কৃষ্ণসুন্দরবাবু কী ঘেমেছিলেন সেদিন।···দুর্গাবাসবাবুর মতে তিনিই হচ্ছেন জীবনগঞ্জের উদীয়মান "লীডার"।··· ঘাটের উপর থেকে পার্শ্বস্থ আম্রকুঞ্জের ঘন শীতল ছায়া তখনো চলে যায়নি। গায়ে সুগন্ধি সাবান মাখতে মাখতে সহসা সুচারুর মন গম্ভীর হয়ে উঠলো। সত্যিই তো! কৃষ্ণসুন্দরবাবুর জীবনটা কি! সব চাইতে বেশী আঘাত পেয়েছেন তিনি আমাদের কাছ থেকে। তাঁর বাবা বন্ধুর কাছ থেকেই টাকা ধার নিয়েছিলেন—এই হঠাৎ আক্রমণের জন্য তিনি মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি ছিলেন জীবনগঞ্জের বিখ্যাত কবিরাজ। বোধহয় অভিমানেই তিনি বিনা চিকিৎসায় প্রাণত্যাগ করলেন। কৃষ্ণসুন্দরের না ছিলেন চিন্তামণির প্রিয় সখী—তার মধ্যে এই কাণ্ড। তিনি তো আত্মহত্যাই করলেন। এত তিক্ততার মধ্যেও সুচারু কৃষ্ণসুন্দরকেই ভাবলো, তাকে পড়াশুনোয় সাহায্য করতে। আশ্চর্য এই মানুষটার উপর। সুচারুর আস্থা অত্যন্ত গভীর—সেই বিশ্বাস যে অপাত্রে নয়, আজ তা প্রমাণিত হয়ে গেল। তিনি সাহায্য করতে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেন।—

ঘাটের বাঁ পাশে নানান দূরে সাদা ও লাল সাপলা বন-বর্ষার জল পেয়ে থালার মতো পাতাগুলো মাথা উঁচিয়ে উঠছে। দুধের মতো সাদা—আর রক্তাভ সাপলার জায়গাটা ছেয়ে গেছে। নিস্তরঙ্গ জলের বুকে সাপলা ফুলের প্রতিচ্ছবিগুলো স্পষ্ট দেখা যায়—জল পড়তে ইচ্ছা সুচারুর। আরও দূরে, জলের ধারে একটা শুকনো গাছের গুঁড়ির উপর সুচারুর রাজহাঁসটি বসে। এই সবে মাত্র বড় হয়ে উঠলো হাঁসটি। আজকাল সারাদিন খালি গলা ছেড়ে ডাকে। বেচারা বোধহয় নিজের মতন কাউকে খুঁজছে—

পুকুরের পরিচ্ছন্ন শীতল জলে ঝাঁপিয়ে স্নান করতে করতে আবার সুচারুর মনে পড়লো কৃষ্ণসুন্দরের কথা—এবার তার মনে পড়লো—কৃষ্ণসুন্দরের জীবনের সাংঘাতিক নিঃসঙ্গতার কথা। সত্যিই তো। আপনার লোক বলতে কেউ নেই ওঁর। বাবা-মা বেঁচে থাকলে, কৃষ্ণসুন্দরের জীবনটা কতো সুন্দর হতো আজ।···বোধ হয় এই জন্যেই তিনি খুব কম বয়সে এতো গম্ভীর হয়ে উঠেছেন। কত আর বয়স হবে?—পঁচিশের বেশী নয়। আগের তুলনায় কথা বলেন অনেক কম।···

···বাবা! দু'বছর! দু'বছর পর তিনি এ বাড়ীতে এলেন। মা ঠিক গুনে রেখেছেন।

রাজহাঁসটা তখনো পাঁক পাঁক করছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রতি রবিবারের মতো সেদিনও কৃষ্ণসুন্দর দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর, একটু গড়িয়ে উঠে, রবিবারের সংবাদপত্র দুটো ভাল করে পড়তে বসলে। ইংরেজী ও বাংলা দু'খানা পত্রিকা রাখে সে। বেলা তখন গোটা-তিনেক। বেশ গরম চলছে আজ ক'দিন ধরে। নদীর ধারে কদম গাছের ঠাণ্ডা ছায়ায় চেয়ার-টেবিল পেতে কৃষ্ণসুন্দর পত্রিকা পড়তে বসেছে। দেশের ও বিশ্বের রাজনৈতিক সংবাদ সম্পর্কে তার কৌতূহল অত্যন্ত গভীর। তাই সংবাদপত্রও সে খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ে থাকে।

কিন্তু আজ তার সংবাদপত্রে মন বসছে না। একটা

লঘু অপরাধজনিত অনুশোচনা এবং সেই সঙ্গে একটা মৃদু আশঙ্কা, তার মনকে বারবার পীড়িত করছে। আজ সকাল বেলায় সুচারুদের বাড়ী গিয়ে এবং তাদের সঙ্গে আবার মেলামেশা সুরু করে দিয়ে—সে ঠিক কাজ করেছে কি না? এই প্রশ্নটি বারবার তার বিবেকবুদ্ধিকে খোঁচা দিচ্ছিল। এইভাবে সবকিছু তিক্ততা বিস্মৃত হয়ে গিয়ে আবার তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা পাতানো—যে কোনো মানুষের আত্মসম্মানবোধের পক্ষে আপত্তিকর কি না? সুচারুর পড়াশুনার ব্যাপারে তাকে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি সে আজ দিয়ে এসেছে। ···তারাও কি ঐসব তিক্ত ঘটনাগুলোর কথা একেবারেই ভুলে গেছে? চিন্তামণিই বা কি করে আবার কৃষ্ণসুন্দরকে ডাকতে পারছেন?—কি রকম ধরণের মানুষ তাঁরা? মনে মনে হাসলো কৃষ্ণসুন্দর।··· পিতার ঋণ পরিশোধ হতে বোধহয় আরো কিছু বাকী আছে। চক্রবৃদ্ধি সুদ কিনা, কে জানে?···

দুই পেয়ালা চা দুই হাতে নিয়ে নিবারণ এলো কলতলায়। এক পেয়ালা চা কৃষ্ণসুন্দরের টেবিলের উপর রেখে—আরেক পেয়ালা নিজে নিয়ে, একটা কাটা গাছের শুকনো গুঁড়ির উপর বসলো নিবারণ।

—খাও,—চা খাও। বলতে বলতে নিবারণ নিজেও এক চুমুক চা মুখে দিল।

নিবারণের হাবভাব দেখেই কৃষ্ণসুন্দর বুঝলো যে, আজ তার বিশেষ কোনো বক্তব্য আছে। এই নিবারণের সঙ্গে কৃষ্ণসুন্দরের নিবিড় ঘনিষ্ঠতা, একেবারে শৈশব থেকে। এই গাঁয়েরই এক নিতান্ত গরীব ঘরে নিবারণের জন্ম। তার বাবা ছিল একজন ফেরিওয়ালা। মাথায় করে পান-সুপারি নিয়ে চালের বিনিময়ে বেসাতি করতো তার বাবা কৃষক পল্লীতে। ছেলেবেলা থেকেই নিবারণ হয়ে উঠলো সুকণ্ঠ গায়ক। কৃষ্ণসুন্দরের কবিয়াল পিতা এই ছেলেটিকে নিজের কবির দলে ভর্তি করে নেন। এখানেই কিছু লেখাপড়া শেখে নিবারণ। সুকণ্ঠ গায়ক হিসাবে এই অঞ্চলটায় সুনাম অর্জন করেছিল নিবারণ। বাস্ত ভর্তি রুপোর মেডেলগুলো এখনো সে বাঁচিয়ে রেখেছে। একবার এক কবির আসরে নিবারণ নিমাই-সন্ন্যাসের একটি গান গেয়েছিল—কবি-গানের সুরে। সেদিনের আসরে উপস্থিত ছিলেন এক সদ্য পুত্রহারা জননী। নিবারণের কণ্ঠে গান শুনে তিনি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন।···কৃষ্ণসুন্দরের পিতাই উদ্যোগী হয়ে নিবারণকে ঘর-সংসার সাজিয়ে দিলেন। মাত্র কয়েক বছর সংসার করার পর, নিবারণের স্ত্রী মারা গেল—মাসখানেক পরে শিশু পুত্রটিও চলে গেল। ঠিক সেই সময় কবির দলটাও গেল ভেঙ্গে—দেশের অবস্থা তখন ভয়ানক খারাপ—কবিগান আর চলে না। নিবারণ কিছু দিনের জন্য বেরোলো তীর্থ ভ্রমণে। বছর দুই ঘুরে এসে নিবারণ শেষ পর্যন্ত আশ্রয় নিল কৃষ্ণসুন্দরের পিতার নিকট। আর সংসারী হলো না সে। সেই থেকে আজ পর্যন্ত এই নিঃসম্পর্কিত নিবারণ কৃষ্ণসুন্দরদের সঙ্গে নিজের ভাগ্যকে একেবারে মিশিয়ে ফেলেছে।

চা খেতে খেতে মৃদু হেসে সসম্ভ্রমে বলল কৃষ্ণসুন্দর—কিছু বলবে নিবারণ দা?

নিবারণও তেমনি মৃদু হেসেই বলল—আমার সঙ্গে এই লুকোচুরির কি দরকারটা ছিল বলি?

—কিসের লুকোচুরি?—কৃষ্ণসুন্দর জিজ্ঞেস করল।

—আজ সকালে তুমি বড় বাড়ীতে যাওনি?—বলতে বলতে তীক্ষ্ণভাবে চাইলো নিবারণ কৃষ্ণসুন্দরের দিকে।

নিবারণের কথার উত্তরে কৃষ্ণসুন্দর সহসা কিছু বলতে পারলো না—সে বিহ্বলের মতো তার অভিভাবকটির দিকে তাকিয়ে রইলো মাত্র।

—আমার চোখে ধুলো দেওয়া সহজ নয়। অনেক দেশ ঘুরেছি, অনেক মানুষ দেখেছি আমি। উড়ে যাওয়া পাখীর পাখনা গুণি আমি।—বিজয় গর্বে বলল নিবারণ।

—তাতে হয়েছে কি বল দেখি?—নিবারণকে শান্ত করবার জন্য কৃষ্ণসুন্দর হাল্কাভাবে হাসতে হাসতে বলল।

—দেশের লোকে ভাববে তোমার কোনো মেরুদণ্ড নেই। বাড়ীর ঘরগুলো পর্যন্ত ভেঙ্গে নিয়ে গেল যারা, তাদের মেয়ের লেখাপড়া হবে কি হবে তা, নিয়ে তোমার এতো মাথা-ব্যথা কেন?

নিবারণের উত্তেজনা দেখে কৃষ্ণসুন্দর দস্তুর মতো

আতঙ্কিত হয়ে উঠলো। নিবারণের গোঁ সে জানে। এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে একটা কিছু হেস্তনেস্ত না করে সে ছাড়বে না। ছেলেবেলায় এমনি কোনো ছোট খাটো বিষয়ে তার সঙ্গে মতবিরোধ ঘটলে নিবারণ এমন চাপ সৃষ্টি করতো কৃষ্ণসুন্দরের উপর যে নিরুপায় বালকের তখন মনে পড়তো আরব্য উপন্যাসের সিন্দবাদ বণিকের কাঁধে-চড়া সেই বুড়ো মানুষটির কথা। এতদিনকার দাগর পারের সেই বুড়োটা তার ঘাড়ে আবার চাপছে। অনুনয় করে কৃষ্ণসুন্দর বলল—নিবারণদা না বুঝে হৈ-চৈ করে তুমি কেলেঙ্কারী বাঁধিও না। আমি তো কতো লোকেরই কতো কাজ করে দিই।

—কতো লোকের সঙ্গে ওদের তুলনা হয় না—নিবারণ হুঙ্কার দিয়ে উঠলো—

—ওরা মহাজন—জোঁকের জাত—

—আচ্ছা এবার থামো তুমি। আমাকে পত্রিকাটা পড়তে দাও।

—কিঞ্চিৎ বিরক্তি প্রকাশ করে কৃষ্ণসুন্দর বলল।

নিবারণও ভ্রূকুটি করে তাকালো কৃষ্ণসুন্দরের দিকে। তারপর সে রাগে গজ গজ করতে করতে চায়ের পেয়ালা দুটি নিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। বিরক্ত মনেই কৃষ্ণসুন্দর পত্রিকা পাঠে মনোযোগ দিতে চেষ্টা করতে লাগলো।

• •

সেদিন বিকেলে কৃষ্ণসুন্দরের হাতে কোনো কাজ ছিল না। রবিবারের বিকালে তার কোনো কোনো মক্কেল দূর থেকে তার সঙ্গে আইনগত বিষয়ে পরামর্শ করতে আসে বলে—সেদিন সে কোনো গ্রামে কাজ করতে যায় না। বাড়ীতেই অপেক্ষা করে। আজ তার কিছুতেই বাড়ীতে থাকতে ইচ্ছা হচ্ছিল না।··· কৃষ্ণসুন্দর শূন্য মনে তাকিয়ে রইল ভরা নদীর দিকে। আজ বিকেলটায় নদীর ধারে একাকী বেড়িয়ে এলে মন্দ হয় না। নদীর উত্তর দিক থেকে একটা একটানা 'ঘুম্ ঘুম্' শব্দ ভেসে আসছে। বোধহয় বিকেলের লঞ্চ আসছে। বেলা প্রায় সাড়ে চারটে বেজে গেছে। পড়ন্ত রোদের হরিদ্রাভ বর্ণালীতে অপরাহ্নের আভাস ফুটে উঠছে। এমনি সময় ছেলেবেলায় তারা নদীর ধারে দিয়ে দল বেঁধে স্কুল থেকে বাড়ী ফিরে আসতো। বহুদিন পর আজ একটু বিভ্রান্ত উপভোগ করা যাক—আজ সে একটু বেড়াতে বেরোবে ঠিক করলো। আরেকটু রোদ পড়ুক। কৃষ্ণসুন্দর আবার পত্রিকা পাঠে মনোনিবেশ করল।

পনেরো বিশ মিনিট পরে হঠাৎ কৃষ্ণসুন্দরের কানে গেল—কে যেন তাকে নাম ধরে ডাকছে। হাতের পত্রিকাটি টেবিলের উপর ফেলে রেখে কৃষ্ণসুন্দর সাড়া দিতে দিতে উঠে গেল বৈঠকখানা ঘরের দিকে। গিয়ে দেখে লম্বা ছিপ ছিপে গড়নের তারই সমবয়সী এক তরুণ বৈঠকখানার ছোট ফুলের বাগানটির বেড়া ধরে দাঁড়িয়ে আছে। বোধহয় কৃষ্ণসুন্দর অন্যমনস্ক ছিল বলেই আগন্তুককে সহসা চিনতে পারলো না।

—কি, চিনতে পারলে না? কৃষ্ণসুন্দরের বিব্রত অবস্থা দেখে, আগন্তুক হাসি মুখে জিজ্ঞেস করলো দূর থেকেই।

—কে? হরিদাস নয়? আশ্চর্য! এতো বদলে গেছো তুমি!—

কৃষ্ণসুন্দর বিস্ময়ের মধ্যে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো।

হরিদাস হলো কৃষ্ণসুন্দরের স্কুল জীবনের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ সহপাঠী। দূরের গ্রামের এক অভিজাত পরিবারের এক বাঁদীর গর্ভে তার জন্ম। সেই পরিবারের কর্তা (যিনি বস্তুতঃ হরিদাস জন্মদাতা) হরিদাসকে পড়াশুনার সুযোগ করে দেন। জীবনগঞ্জের ছাত্রাবাস থেকে হরিদাস স্কুলে পড়তো। খুব কম বয়স থেকেই এই গোত্রহীন ছেলেটি স্বদেশী আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে থাকে। এইভাবে দশম শ্রেণীতে পড়বার সময় হরিদাসকে ছাত্রাবাস থেকে গ্রেপ্তার করে নেওয়া হয়। সেই থেকে আজ পর্যন্ত আর দুই বন্ধুতে দেখা সাক্ষাৎ হয় নি। অন্তরঙ্গ বাল্যবন্ধুকে এই ভাবে অতর্কিতে ঘরের দরজায় দণ্ডায়মান দেখে কৃষ্ণসুন্দর তাকে জড়িয়ে ধরলো।

—ইস! কত দিন পর—হরিদাস! আয়, ঘরে আয়।—গদ গদ কণ্ঠে বলল কৃষ্ণসুন্দর।

—না, ভাই ঘরে যাবে না এখন। আমি আর এক মিনিটও দাঁড়াবো না এইখানে। এই চিঠিটা ধর, আমি

যাই। বলে হরিদাস ছোট্ট একটা ভাঁজ করা কাগজ কৃষ্ণসুন্দরের হাতে গুঁজে দিয়ে বলল—রয়।

—সে হয় না, হরিদাস। তোকে আমি ছাড়তে পারবো না এ ভাবে। অসম্ভব। ঘরে আয়। এ কার চিঠি? বলল কৃষ্ণসুন্দর। মৃদু হেসে ফিস ফিস করে বলল হরিদাস—দরবেশের চিঠি।

—সে কি?—কৃষ্ণসুন্দর আরও বিস্মিত হলো।

—সব কথা পরে বলবো। লঞ্চ-ঘাটা থেকে আমার পিছু নোয়েন্দা লেগেছে। আমি আর দাঁড়াবো না—বলে হরিদাস সত্যিই নদীর বাঁকের অদূরে খেয়াঘাটের দিকে ঝড়ের বেগে ছুটে চলে গেল।

বেড়ার গায়ে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণসুন্দর অনেকক্ষণ পর্যন্ত খেয়াঘাটের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। সেই ছেলে-বেলাকার অন্তরঙ্গ বন্ধু হরিদাস। ইংরেজ সরকার তাকে বছরের পর বছর কারাগারে বন্দী করে রাখতে পেরেছে—কিন্তু তার নিষ্ঠাকে দমাতে পারে নি—তার মনুষ্যত্বকে দাবিয়ে রাখতে পারে নি—। সেই হরিদাস। অনেকক্ষণ ধরে কৃষ্ণসুন্দর তাকিয়ে রইলো। খেয়া নৌকাতে উঠলো হরিদাস—উঠেই সমস্ত পরাধীর মধ্যে মাথা গুঁজে উপুড় হয়ে বসে পড়ল সে। একবার এদিকে ফিরেও তাকালো না!..

বাল্যবন্ধুর দেওয়া চিরকুটখানি খুলে পড়লো কৃষ্ণসুন্দর। তাতে লেখা আছে যে "ডাকাতের বিলের" পশ্চিম দক্ষিণ প্রান্তের বটতলার কাছাকাছি একটা জায়গায় নৌকার মধ্যে দরবেশ থাকবেন। কৃষ্ণসুন্দর যেন অবশ্যই সেখানে যথাসময়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে আজ। যাতে কৃষ্ণসুন্দরের মনে কোনোরূপ আশঙ্কা না জন্মে, এজন্যই তার বাল্যবন্ধু হরিদাসকে আজ পাঠানো হলো।

ডাকাতের বিল এখান থেকে কয়েক মাইল উত্তরে। পশ্চিম দিকে তাকিয়ে কৃষ্ণসুন্দর একবার দেখলো বেলা কতদূর গড়িয়েছে। তারপর সে নিবারণকে ডেকে অনুচ্চ গলায় বলল—নিবারণদা! দীনবন্ধুকে ডাকো। এখুনি নৌকা নিয়ে বেরোবো আমি। এই অবেলায় কোথায় বেরোবে? আজ না রবিবার? নিবারণ জানতে চাইলো।

জবাবে কি বলতে হবে তা ঠিক করতে না পেরে কৃষ্ণসুন্দর বলে বসল—আজ তো পূর্ণিমা! নৌকোতে করে জ্যোৎস্নায় একটু মোহনায় বেড়িয়ে আসবো। ডাকো দীনবন্ধুকে।

—এতো বেলা থাকতে পূর্ণিমা? কাকে বুঝাও তুমি?...আচ্ছা দীনবন্ধুকে ডেকে দিচ্ছি—বলতে বলতে নিবারণ ঘাটের মাঝিকে ডাকতে চলে গেল।

নৌকাতে উঠেই কৃষ্ণসুন্দর মাঝিকে বলল—উত্তর দিকে ভাসাও। দেরী করো না।

দীনবন্ধু বলল—নিবারণদা আসুক! এলেই দড়ি খুলে দেবো।

—নিবারণদা যাবে নাকি?—কেন?—কৃষ্ণসুন্দর জিজ্ঞেস করল। মাঝি কিছু বলবার আগেই গজর গজর করতে করতে নিবারণ দৌড়ে এলো ঘাটের দিক থেকে—আমিও যাবো। পূর্ণিমা রাত্রির ঝিল-মিল দেখতে আমারও সাধ যায়।

নৌকায় উঠে নিবারণ মাঝিকে বলল—চালা এবার। ...ঘরে আমি তালা দিয়ে এসেছি। ফিরে না আসা পর্যন্ত লোক থাকবে বাড়ীতে—দরকার হলে সারারাত পাহারাও দেবে।...চালা, দীনবন্ধু!

কৃষ্ণসুন্দর মনে মনে ভাবলো—সিন্দবাদ নাবিকের সেই বুড়োটা এবার তার ঘাড়ে ভালো ভাবেই চেপেছে। ...প্রকাশ্যে আর কোনো বক্তব্য না করে, নৌকার আগা গলুইয়ের দিকে গিয়ে একাকী চুপ করে বসে রইল সে।

কৃষ্ণসুন্দরের নৌকাখানি ডাকাতের বিলের সেই নির্দিষ্ট বটগাছটির কাছাকাছি এসে পৌঁছোতে পৌঁছাতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল। বিলের অপর প্রান্তে বহুদূরে দিগন্ত রেখার উপরে মেঘলোকের অবরোধ ভেদ করে পূর্ণিমার পূর্ণচাঁদ দেখা দিচ্ছে। সেই দিকে চেয়ে চেয়ে কৃষ্ণসুন্দর আপন মনে বলল—বাঃ! আজ রাত্রিটা বেশ কাটবে।

নৌকার ছৈ এ ধাক্কা দিয়ে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণসুন্দর চারি দিকে খুঁজতে লাগলো। কোথায় দরবেশের নৌকা। বটগাছের ও পাশে একটা ছোট নালার মুখে দেখা যায় এক সঙ্গে কয়েকটি নৌকা লাগিতে বাঁধা। একটি চক্রের মতো ব্যূহ রচনা করে নৌকো গুলো বাঁধা—সব গুলো নৌকোর আগা গলুই এসে এক জায়গায় মিলেছে। মাঝিকে নির্দেশ দিয়ে কৃষ্ণসুন্দর বলল—ওদিকে ফেরাও।

আরও কয়েক গজ এগোতেই নৌকার সেই বুথ থেকে একজন উঁচু গলায় হেঁকে জিজ্ঞেস করলো—কোথাকার নৌকা?

সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণসুন্দর চাপা গলায় বলল জীবনগঞ্জের।

—এদিকেই—প্রত্যুত্তরে আশ্বস্ত করলো কণ্ঠস্বরের মালিকটি।

এবার আর কৃষ্ণসুন্দরের চিনতে ভুল হলো না। সে ডেকে বলল—হরিদাস?—ইতি মধ্যে পারে হেঁটে চলে এসেছে। মাঠের পথে এখনো জল উঠেনি।

—হ্যাঁ-এগো-হরিদাসই ডাক দিলো আবার।

কৃষ্ণসুন্দরের নৌকাও যথারীতি চক্রের মধ্যে প্রবেশ করলো। আগা গলুইতে দাঁড়িয়ে নিবারণ নিজে লগি পুঁতে নৌকার দড়ি বাঁধলো তাতে।

একটা বড় গোছের ডিঙিতে গিয়ে উঠলো কৃষ্ণসুন্দর। হরিদাস তাকে হাত ধরে নিয়ে ছৈ-এর ভেতরে বসালো।

পাটাতনের উপর বসতে বসতে কৃষ্ণসুন্দর লক্ষ্য করলো যে, নৌকাটির মুখ-পুয়ারের সামনে দরবেশ বেশ-ধারী এক ব্যক্তি ব'সে আছেন। তাঁকে কেন্দ্র করেই আরো কজন তরুণ ছৈ-এর ভেতর বসে। এতক্ষণ তাঁরা বোধহয় কোনো বিষয়ে আলোচনাই করছিলেন—সে আসতেই সব চুপ।

দরবেশটির বয়স কতো, ঠিক বুঝা যাচ্ছে না। মাথায় লম্বা চুল—গাল ভর্তি দাড়ি। গায়ের রঙ বেশ ফর্সা একটু ফ্যাকাসে। পরিধানে কালো আচকান—গলায় নীলাভ রঙের কাঁচের মালা! প্রথমে দরবেশকে, তারপর সকলকেই হাত জোড় করে অভিবাদন জানালো কৃষ্ণসুন্দর। দরবেশকে লক্ষ্য করে হরিদাস বলল—এবার তবে বৈঠকের কাজ সুরু করা যাক।

দরবেশ বাধা দিয়ে বললেন—কৃষ্ণসুন্দরবাবুর সঙ্গে সবার পরিচয় করিয়ে দাও আগে।

একে একে হরিদাস সবার সঙ্গেই কৃষ্ণসুন্দরের পরিচয় করিয়ে দিল। এরা সবাই জেলার কৃষক সংগঠনের সক্রিয় কর্মী। পাশা পার্শি ইউনিয়নগুলো থেকে এরা এসেছেন। তারপর দরবেশকে দেখিয়ে হরিদাস বলল—ইনি হচ্ছেন জেলা কৃষক সংগঠনের একজন নেতৃস্থানীয় কর্মী। আমাদের এ অঞ্চলটায় আন্দোলনের চার্জে আছেন তিনি। অবশেষে কৃষ্ণসুন্দরকে দেখিয়ে সে বলল—আর ইনি হচ্ছেন আমার বাল্যবন্ধু কৃষ্ণসুন্দরবাবু। সম্প্রতি জীবনগঞ্জের মুন্সেফী আদালতে ওকালতি করছেন।

—নমস্কার ভাই! একজন বলে উঠলেন।

হরিদাস আবার বলতে সুরু করলো—এঁর আরও পরিচয় হচ্ছে এই যে, তিনি ছেলেবেলা থেকেই আমাদের সঙ্গে চলতেন—যোগাযোগ রাখতেন। কলেজে পড়বার সময় ইনি ছাত্র-আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য অংশ নেন! তারপর চাকুরী করতে যান এক ব্রিটিশ কোম্পানীর অফিসে সেখানে ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলনে নেতৃত্ব নেবার অপরাধে চাকুরী থেকে বরখাস্ত হন। তারপর থেকে তিনি জীবনগঞ্জের উকিল।

আব্দুল রেজাক নামে একজন কর্মী সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন—বেশ করেছেন। আমাদের এ অঞ্চলে এমনি একজন কর্মী দরকার। নানান রকম আইনের ঝামেলায় পড়তে হয় আমাদের।

দরবেশের সম্মুখে কতকগুলো কাগজ-পত্র। কর্মীদের মধ্যে একজন সাদা কাগজ নিয়ে বসেছে সকলের বক্তব্যের সারমর্ম লিখে রাখতে। একটা মাত্র লণ্ঠন মাঝ-খানে রাখা হয়েছে।

কৃষ্ণসুন্দরকে লক্ষ্য করে দরবেশ বললেন—শুনুন, কৃষ্ণসুন্দরবাবু। আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে গিয়ে এমন পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয়েছে আমাকে, যা ঠিক স্বাভাবিক নয়। হরিদাসের কাছে আপনার সম্বন্ধে যেসব কথা শুনেছি তাতে আমার দৃঢ়বিশ্বাস জন্মেছে যে, কৃষক আন্দোলনের পক্ষ থেকে আমরা আপনাকে পাবো। আপনাকে সঙ্গে পেলে বিশেষ সুবিধে হবে এই যে, কৃষক আন্দোলনের আইনগত দিকগুলো আপনি ভালভাবে দেখতে পারবেন। আশা করি আপনার অমত হবে না?—

—জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকালেন দরবেশ কৃষ্ণসুন্দরের দিকে।

এতক্ষণ পর্যন্ত সকল কথাই কৃষ্ণসুন্দর খুব মনো-যোগের সহিত শুনছিল। সে বুঝল—এবারে তার কথা বলা দরকার। একবার সে হরিদাসের দিকে চোখ তুলে তাকালো—দেখলো, হরিদাস তার মুখের দিকে উদগ্রীব

হয়ে তাকিয়ে রইল। ধীর গম্ভীরভাবে কৃষ্ণসুন্দর বলল—এখানে এসে অবধি আমি ছেলে কৃষক আন্দোলনের গতিবিধি বেশ মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি। আজ যখন আমার কাছে এইভাবে অতর্কিতে আহ্বান এসেছে—আমি তাই সাড়া না দিয়ে পারবো না। আপনাদের প্রস্তাবে আমি সানন্দেই সম্মত আছি। কর্মীদের মধ্যে একজন খুশীর উত্তেজনায় বলে উঠলো—ইনক্লাব জিন্দাবাদ!

—কিন্তু, কৃষ্ণসুন্দর আবার বলল মাস খানেকের মধ্যেই আমি কলকাতা যাবো পরীক্ষা দিতে। সেখান থেকে ফিরে এসে, কাজে হাত দিতে চাই।

—পরীক্ষা দেবেন আপনি?—কি?—এঁ-এ?—দরবেশ জিজ্ঞেস করলেন হাসিমুখে।

—হ্যাঁ!—দৃঢ়স্বরে বলল কৃষ্ণসুন্দর।

—বেশ পরীক্ষা দিয়ে এসেই কাজ সুরু করবেন। তার আগে প্রাথমিক ধরণের কিছু কাজ করে যান না। আপনি তো কৃষক এলাকায় ঘুরছেনই—সেই সঙ্গেই আন্দোলনের প্রাথমিক কাজ গুলো করা যাবে।—দরবেশ বললেন হাসি হাসি মুখে।

খানিকক্ষণ চিন্তা করে কৃষ্ণসুন্দর রাজি হলো।

—আসুন তবে, কি ভাবে কাজ সুরু করতে হবে সে সম্বন্ধেই আজ আলোচনা। দরবেশ বললেন।

•

রাত্রি প্রায় সাড়ে আট-টায় এই গুপ্ত বৈঠকের অধিবেশন শেষ হলে যে যার গাঁয়ের দিকে আবার নৌকা ছাড়লো। বিদায় নেবার সময় আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে হরিদাস

বলল—নব-যুগের পথে তোকেও সাথী পেয়ে বড় খুশী হলামরে কৃষ্ণসুন্দর। এই তো আমাদের পথ।··· আজকের রাত্রিটা চিরকাল মনে থাকবে।

প্রত্যুত্তরে কৃষ্ণসুন্দর বলল—এতদিন পর দেখা তোর সঙ্গে, একটু প্রাণ খুলে কথাও বলতে পারলাম না।

—হবে। এখন সুযোগ যবে নিশ্চই···হাসতে হাসতে যমুনা বলল।

এবার কৃষ্ণসুন্দরের কেবং যাত্রা উত্তর থেকে দক্ষিণে, ভাটার টানে। কৃষ্ণসুন্দরের মাঝি পাল তুলে দিল।

মনিরের সঙ্গে কথা বলবার জন্য নিবারণের প্রাণ পাখী ছটফট্ করছিল। মনিরকে শুনিয়ে শুনিয়ে সে বলতে লাগল আমাকে আগে থাকতে জানালে আমি সব ঠিকঠাক করে রাখতাম না? এই চাঁদনী প্রহর রাত, জলের উপর একটু চা খেতে পারলে কি আরামটাই না হতো। একবার বলতে দোষ ছিল কি?

—কখন বলি তোমাকে নিবারণদা? তুমি তো কগড়া করেই অস্থির।

—কৃষ্ণসুন্দরও বলল অভিমান ভরে।

—থাক গে! আমি জিজ্ঞেস করি, এই দরবেশটিকে? জিজ্ঞেস করতে করতে কৃষ্ণসুন্দরের কাছে এগিয়ে এলো নিবারণ।

কৃষ্ণসুন্দর ঠিক এই প্রশ্নটির সম্মুখীন হওয়ার জন্যই মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছিল। সেও মৃদু হাসতে হাসতে বলল—খুব নাম করা দরবেশ উনি। তুমি দরবেশ বিশ্বাস করো?

—তা করবোনা কেন? মনিরামপুরের পীরের দরগায় বছর বছর 'সিন্নি' দিয়ে আসি।···তবে ইনি কি রকম দরবেশ, কে জানে?

কৃষ্ণসুন্দর জানে যে, নিবারণ এই দরবেশকে যে ভাবেই হউক ভালো করে একবার নিশ্চয়ই দেখে নিবেছে। তাই সে কৌতুক করে বলল—দেখে শুনে তোমার কেমন মনে হলো?

—তা মনে হবেছে। তেজী পুরুষ বলেই মনে হয়েছে। কথাবলার ভঙ্গীও ভালো।—নিবারণ বলল।

—ওঁর কথাও তুমি শুনেছ নাকি?—কৃষ্ণসুন্দর প্রমাদ গনলো।

—শুনিনি! দূর থেকে হাত মুখ নাড়া দেখেই বুঝেছি! কত লোক দেখলাম—নিবারণ সগর্বে বলল।

নিবারণকে প্রসঙ্গান্তরে আকৃষ্ট করবার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণসুন্দর বলল—এক কাজ কর, নিবারণদা! চা না হয় নাই খাওয়ালে। অনেকদিন তোমার গান শুনিনি। এই চাঁদনী রাতে, এই ফাঁকা বিলের জলে একবার গলা ছেড়ে গাও তো আজ। কবি-গানের সুরে গাও।

এই জায়গায় নিবারণের দুর্বলতা। গান গাইবার সুযোগ পেলে নিবারণ খাওয়া-খাওয়া পর্যন্ত ভুলে যায়। এক ছিলিম তামাক খেয়ে অনতিবিলম্বেই সে প্রাণ খুলে গাইতে আরম্ভ করলো—তার প্রথম যৌবনের প্রিয় গানগুলো।

তিথি পূর্ণিমা হলেও আষাঢ় মাস। বেশীর ভাগ আকাশটাই কালো কালো পর্বতাকার মেঘে ঢাকা। পূব-উত্তর কোণ থেকে হাওয়া বইছে। আকাশের মেঘ তাই গতিশীল। মাঝে মাঝে চলমান মেঘমালার ফাঁকে ফাঁকে পূর্ণিমার চাঁদ অল্প সময়ের জন্য উঁকি দেয়। রাত্রিটা বাস্তবিক কি সুন্দর! নৌকার আগা গলুইর দিকে একাকী বসে আছে কৃষ্ণসুন্দর। পেছনের দিকে বসে নিবারণ পূর্ণ গলায় কবির সুরে গান গাইছে। মাঝি দীনবন্ধু পালের রশিটা একটা কড়ার সঙ্গে বেঁধে দিয়ে হালটি ধরে বসে আছে মাত্র। একে ভাটার টান-তার উপর অনুকূল বাতাস। সেত নিবারণের গানের সঙ্গে সোহার টানছিল। অল্পক্ষণের মধ্যে তাদের নৌকা এক দৌড়ে বিল পার হয়ে জীবনগঞ্জের নদীতে এসে পড়লো।

কৃষ্ণসুন্দর খুব মনোযোগের সঙ্গে নিবারণের গান শুনছে। আশৈশব সে কবি-গানের সুরের পরিবেশে মানুষ হয়েছে। এই উদাত্ত কণ্ঠের বলিষ্ঠ সুর সহজেই তার মনকে মজিয়ে ফেলে।

এতক্ষণে নিবারণ বিচ্ছেদ গান গাইতে সুরু করেছে। গাইছে:—

"আমি পাখী হলে উড়ে যেতেম
বিধি দিলে পাখা গো—সহনী।
আর তো হবে না অবলা নারী।

প্রাণ ঢেলে গাইছে নিবারণ। কৃষ্ণসুন্দর তন্ময় হয়ে

শুনছে গানটি। শুনছে হঠাৎ তার কানে বাজলো—কাছেই কে যেন জোর গলায় 'নিবারণ' 'নিবারণ' বলে ডাকছে। মাথা তুলে চেয়ে দেখলো কৃষ্ণসুন্দর—সামনা পুরে উজান দিকে যাচ্ছে একটি বেশ বড়-সড় পানসী নৌকা। নৌকার সামনে দাঁড়িয়ে আছে একজন বন্দুকধারী।

নিবারণকে ডেকে কৃষ্ণসুন্দর বলল—নিবারণদা! দেখোতো তোমাকে ডাকছে কে?

- কে ডাকে?—বলে গান থামিয়ে নিবারণ উঠে দাঁড়ালো। তারপর জোর গলায় হেঁকে বলল—কাকে ডাকছেন?

—তোমাকেই নিবারণ। পাল নামাও আগে। পাল নামাও।—

পানসীর ছাদ থেকে একজন ডেকে বললেন।

—দুর্গাদাসবাবুর গলা শুনছি?—কৃষ্ণসুন্দর বলল।

—তাই তো! নারদ ঠাকুরের গলাই যেন শুনছি। পাল গুটাও, দীনবন্ধু!

—মাঝিকে নির্দেশ দিল নিবারণ।

কৃষ্ণসুন্দরের নৌকা পানসীর কাছাকাছি এলে, দুর্গাদাসবাবু ছাদের উপর থেকে পাটাতনের উপর দাঁড়িয়ে সবিস্তারে যা বললেন তার সার মর্ম হচ্ছে এই—

—পুত্র শোকাতুরা চিন্তামণির মনকে খানিকটা ভার-মুক্ত করবার উদ্দেশ্যে সুচারু নানা ভাবে চেষ্টা করছে। পূর্ণিমা রাতে নতুন বর্ষার জল দেখবার জন্য মেঘনার মুখ পর্যন্ত নৌ-বিহারের বাসনা করে মাকে নিয়ে আজ সুচারু বেড়াতে বেরিয়েছে। এই মেয়েটির খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্য প্রবীণ দুর্গাদাসবাবুকে লাঠি বন্দুক নিয়ে সঙ্গে আসতে হয়েছে। অথচ সেরেস্তার কত দরকারী কাজ ফেলে আসতে হয়েছে ইত্যাদি। বাকীটা কথা সবিস্তারে বিবৃত করে দুর্গাদাসবাবু অবশেষে বললেন—টুনুর বিশেষ অনুরোধ যে তুমি এবং নিবারণও আমাদের সঙ্গে চল। তিনি আজ নিবারণের গান শুনবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।...উঠে এসো নিবারণ। বাবুকে নিয়ে উঠে এসো। আমাদের গান শুনিয়ে যাও।

—ওপাশে তাকালেই দেখা যায় চিন্তামণি সুচারু এবং নিত্য পানসী নৌকার ভিতর থেকে জানলার ধারে বসে তাদের দিকেই তাকিয়ে আছে।

প্রবল আপত্তি জানিয়ে নিবারণ বললো—এখন কি করে গান গাইবো! বাড়ী গিয়ে এখন ভাত রাঁধতে হবে যে।

—আরে এক রাত ভাত না খেলেও চলবে। খাবার-দাবার আমাদের সঙ্গেই আছে। রাজ-সঙ্গিনীর সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছি, বুঝতে পারছ না?—উঠে এসো নিবারণ।—দুর্গাদাসবাবু বললেন।

নিবারণও সহজে স্মরবার পাত্র নয়। সেও তেমনি দৃঢ়ভাবে বলল—তা হয় না, ঠাকুর মশাই! ঘাটের মাঝিটাকে আমার দুটো ভাল-ভাত রেঁধে খাওয়াতেই হবে। বেচারা সারা দিন লগি ঠেলেছে।

অত মিঠাই-এ এর পোষাবে না।—

মাঝিকে নৌকা ছাড়তে নির্দেশ দিল নিবারণ।

কৃষ্ণসুন্দর এতক্ষণ পর্যন্ত নীরবেই দাঁড়িয়েছিল—দুর্গাদাসবাবু কয়েকবার অবশ্য তাকালেন তার দিকে—কিন্তু সে নিবারণের কথার উপর কোনো কথাই বললো না।

ভাটার টানে সহজেই কৃষ্ণসুন্দরের হাল্কা নৌকা দক্ষিণ মুখে এগিয়ে চলল তর্ তর্ করে। কয়েক গজ দূরে গিয়েই নিবারণ পাটাতনের উপর বসে পড়লো। নীরবে এক খিলিম তামাক ধরিয়ে নিবিষ্ট চিত্তে সে খানিকক্ষণ টানলো। তারপর একগাল ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সে আপন মনে বলল—আমার কাছে কোনো মায়াবিনীর যাদু টিঁকবে না। রাজনন্দিনী যাবেন জল ভরতে। আর আমি যাবো ছত্র ধরতে।

কৃষ্ণসুন্দর মনে মনে হাসতে হাসতে বললো—হরিদাস সত্যিই বলেছে, আজকের রাতটি চিরকাল মনে থাকবে।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

সাধনার সৌন্দর্যের গোপন কথা...

' লাক্স আমায় সুন্দর রাখে '

সুন্দরী চিত্রতারকাদের গুপ্ত সৌন্দর্যের গোপন কথা হোল লাক্স! আপনাকে দেখুন! লাক্সের ঐশ্বর্যময় ফেনার পরশে আরও কত সুন্দর, আরও মধুর! ··আপনিও লাক্স ব্যবহার করেননা? লাক্স মাখুন··আপনার কুসুম কোমল ত্বকের পরশে প্রস্ফুটিত হবে নতুন লাবণ্য আনন্দে! লাক্স মাখুন··· সুবাসভরা লাক্সের ছন্দে ছন্দে আপনার হৃদয়ের আনন্দ! লাক্স মাখুন··· লাক্সের মাদুর লতে বিউটি খেলা খেলে জনের মতো তা খেলে নিতে পারবেন। আপনার প্রিয় সাবানটিও পারবে। সুন্দরীদের জন্য লাক্স টয়লেট সাবান ব্যবহার করুন।

চিত্রতারকাদের
বিশুদ্ধ, কোমল
সৌন্দর্য্য-সাবান

সুন্দরী সাধনা বলেন 'লাক্স সাবানটি আমি ভালবাসি আর এর রঙ গুলোও আমার ভারী ভাল লাগে!'

HS. 111-X52 BG

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

সর্বভারতীয় ভাষা সম্মেলন

ডঃ রঘুবীর

ভারত ইংরাজের রাজনৈতিক শাসনপাশ হইতে ১৯৪৭ সালে মুক্তিলাভ করিয়াছে।

১৯২৮ সালের প্রারম্ভে ইংরাজরা ভারতীয়দের ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য এক পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছিল যাহাতে তাহারা (ভারতীয়রা) তাহাদের শাসনকার্যে সহায়তা করিতে পারে। মেকলে ইংরাজী ভাষা শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল এমন একটা জাতি সৃষ্টি—যাহারা বর্ণে ভারতীয় কিন্তু চিন্তাধারায় ও রুচিতে ইংরাজ হইবে। ইংরাজী শিক্ষার সাহায্যে যাহাতে সম্মান, প্রতিপত্তি ও জীবিকা অর্জন করা যায় তাহার ব্যবস্থা ইংরাজরা করিয়াছিল। গত একশত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া আমরা দেখিয়া আসিতেছি এক শক্তিমান ইংরাজী-ভাষা-শ্রেণী জাতিকে। যাহাদের কেবলমাত্র ইংরাজী ভাষার উপরই আগ্রহ আছে। তাহাদের নিজস্ব মাতৃভাষার জ্ঞান এতই দুর্বল যে তাহাদের জন্য অন্ততঃ পক্ষে কয়েক মাস বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত, যাহাতে তাহারা ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা ব্যবস্থা, আইন-প্রণয়ন, ইত্যাদি ক্ষেত্রে কার্য চালাইয়া যাইতে পারে।

এই ইংরাজী ভাষাবিদেরা সংখ্যায় খুবই অল্প, (প্রায় দুই-শতাংশ) এবং অভিজাতশ্রেণীয়। সংখ্যায় অত্যল্প হইয়াও তাহারা সরকার, আদালত ও সেনাদলের সমস্ত ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে।

স্বাধীন হইয়া আমরা জীবনের সর্বক্ষেত্রেই স্বাধীনতা কামনা করিয়াছিলাম। ভাষার ক্ষেত্রে আমরা আশা করিয়াছিলাম যে মাতৃভাষাই হইবে আমাদের জীবনের একমাত্র মাধ্যম। কিন্তু ইংরাজীবিদেরা আমাদের এই প্রচেষ্টাকে প্রায় পনের বৎসরের জন্য বাধা দিয়া রাখিয়াছে এবং যাহার পরে তাহারা বলিবে যে ইংরাজী ভাষা আর চলিবে না—ইহার এইখানেই ইতি।

আগামী ১৯৬৫ সালে এই পনের বৎসর শেষ হইবে। সম্মান ও প্রতিপত্তির জন্য জাতির এই ব্যগ্রতা আজ আবার লোপ পাইতে বসিয়াছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী, ঘোষণা করিয়াছেন যে তিনি পুনরায় ইংরাজী ভাষাকে ভারতের "জাতীয় ভাষা" করিবার জন্য সংসদে প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন। আইনতঃ কথাটা হওয়া উচিত ছিল "সহযোগী জাতীয় ভাষা"। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইংরাজী ভাষা যে অবস্থায় যেরূপ ব্যবহারে সীমিত সেরূপ অবস্থাতেই থাকিবে এবং অনির্দিষ্ট কালের জন্যই থাকিবে।

ভারতীয় ভাষার পক্ষে ইহা হইল এক ভয়ানক ও

মোক্ষম আঘাত। অনেকে এই অভিমত পোষণ করেন যে এই আঘাত কেবলমাত্র কেন্দ্রের হিন্দী ভাষার পক্ষেই ক্ষতিকারক। কিন্তু ইহা সত্য নয়। ইহা প্রত্যেকটি ভারতীয় ভাষার পক্ষে ক্ষতিকারক। ইংরাজী ভাষা যে কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারে ব্যবহৃত হইবে তাহা নহে, ইহা প্রত্যেকটি রাজ্যে, স্কুল-কলেজে, আইন-আদালতে, ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইবে। ইহা হইল গণতন্ত্রকে অস্বীকার করা। ইহা হইল সাম্রাজ্যবাদীদের অত্যাচার চালাইয়া যাওয়া। আমরা সংগ্রামের দ্বারা ইহাকে দূরীভূত করিব স্থির করিয়াছি।

কেন্দ্রীয় সংসদের পরবর্তী অধিবেশন আগামী ৬ই আগস্ট (১৯৬২) আরম্ভ হইবে। আমরা আগামী ১১ই ও ১২ই আগস্ট আমাদের সংগ্রামের প্রস্তুতির জন্য এক "সর্বভারতীয় ভাষা সম্মেলন"এর আয়োজন করিয়াছি। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য হইল সরকার যাহাতে সংবিধানকে সম্মান দেয়, যাহাতে ১৯৬৫ সালে ইংরাজী ভাষার ব্যবহার শাসন ব্যবস্থা, আইন-আদালত ইত্যাদি ক্ষেত্রে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। এবং বাধ্যতামূলক ভারতীয় ভাষার প্রচলন করা হয়। প্রত্যেকটি ভারতীয় ভাষা প্রচলন করা হয়। প্রত্যেকটি ভারতীয় ভাষা সুন্দর এবং উপযুক্ত। প্রত্যেকটি রাষ্ট্র এক ভাষী এবং রাষ্ট্রের অধিবাসীদের মাতৃভাষাই হইবে রাষ্ট্রের সরকারী ভাষা। ইহাই স্বাভাবিক যে প্রতি রাষ্ট্রেই মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হইবে এবং ইহাতে প্রতিটি লোক সমভাবে লাভবান হইবে। গণতন্ত্র বলিতে ইহাই বুঝায় যখন প্রতিটি রাষ্ট্রের তন্ত্র (আইন-কানুন) জনগণের (রাষ্ট্রের অধিবাসীদের) ভাষায় লিখিত হয়। আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের জন্য হিন্দী, যাহা শতকরা ৪০ জনের ভাষা, হইবে একমাত্র ভাষা।

বহু ভাষার জন্য ভারতীয় ঐক্যকে কৃত্রিম বলা যাইতে পারে, কিন্তু এই কৃত্রিমতাকে দূর করিয়া হিন্দী ভাষা (ভারতীয় ভাষা) দিয়াই তাহাদিগকে পরস্পরের সহিত এক সুদৃঢ় ঐক্যে আবদ্ধ করা যাইতে পারে। ভৌগলিক সম্পর্কানুযায়ী হিন্দী ভাষাকে গ্রহণ করা হইয়াছে এবং ইহা অনুযায়ী হিন্দী কেন্দ্রীয় অঞ্চলে প্রচলিত।

হিন্দী ভাষা—কাশ্মিরী, পাঞ্জাবী, অসমীয়া, বাংলা, ওড়িয়া, তেলেগু, কানাড়ী, মারাঠী, গুজরাটি, সিন্ধী, নেপালী ভাষার অনুরূপ। তামিল এবং মালয়ালম ভাষাও হিন্দী ভাষা হইতে বেশী ভিন্ন নহে।

ভারতীয় ভাষার মধ্যে ঈর্ষাপরায়ণতা কেবলমাত্র ইংরাজী ভাষার মেয়াদকেই বৃদ্ধি করিবে। এই সমস্যার সমাধানের জন্য উপযুক্ত চিন্তা বিচক্ষণ ব্যক্তিরা করিবেন এবং আগামী "সর্বভারতীয় ভাষা সম্মেলনে" সহায়তা করিবেন।

ইংরাজী ভাষা নয়, কেবলমাত্র ভারতীয় ভাষারই একমাত্র জন্মগত ও জাতিগত অধিকার আছে হিন্দী ভাষার সহযোগী ভাষা হইবার, এই অধিকার কেবলমাত্র একখণ্ড কাগজের (আদেশের) দ্বারা কাড়িয়া লওয়া যাইবে না।

[এই প্রবন্ধের সকল বক্তব্যের সহিত আমরা একমত নহি। ডঃ রঘুবীর সর্বজন শ্রদ্ধেয় মনীষী। হিন্দী ভাষার স্থান সম্পর্কে আমাদের ভিন্নমত থাকিলেও ইংরাজী ভাষা সম্পর্কে আমরা তাঁহার সহিত একমত। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া তাঁহার প্রবন্ধটি প্রকাশ করা হইল। —সম্পাদক।]

যাঁহারা এই সম্মেলনে যোগদানে ইচ্ছুক তাঁহারা দয়া করিয়া নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।*

অনুবাদক—বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

*অধ্যাপক রঘুবীর। আহ্বায়ক সর্বভারতীয় ভাষা সম্মেলন, হুজখাস এনক্লেভ্, নিউ দিল্লী-১৬।
(HAUZ-KHAS ENCLAVE, NEW DELHI-16)

অমরনাথের তুষারক্ষেত্রে

অমিয়াংশু বিশ্বাস

শ্রীনগর থেকে পহলগাঁও পৌঁছালাম সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায়। উদ্দেশ্য অমরনাথ দর্শন। দুই পর্বতশ্রেণীর মাঝে এই লিডার উপত্যকা। উপত্যকার বুক চিরে লিডার নদী (বা নীলগঙ্গা) প্রবাহমানা। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছে, সূর্যদেব পাহাড়ের পিছনে আশ্রয় নিয়েছেন। নতুবা, সাড়ে সাতটার আগে কাশ্মীরে সূর্যাস্ত হয় না অন্তত এই আগস্ট মাসে। শ্রাবণী পূর্ণিমা তিথি উপলক্ষ্যে ভারতের সকল প্রান্তের লোক এসে জড় হয়েছে এখানে। প্রায়ান্ধকার গোধূলিতে মহাভারতের এই মিলনমেলায় এসে নামলাম।

আজ রাতের মত আমরা খালসা হোটেলে আশ্রয় নিলাম। কাল ভোরে (২৩শে আগস্ট) আমরা অমরনাথের উদ্দেশ্যে যাত্রা করব। এ পথের বৈশিষ্ট হল কোন চটি বা হোটেল নেই সুতরাং আশ্রয় ও আহার্যের ব্যবস্থা নিজেদের নিয়ে যেতে হয়।

পরিবহন ব্যবস্থার মধ্যে ঘোড়া ও ডাণ্ডি ইত্যাদি রয়েছে কিন্তু আমরা পদব্রজে যাত্রা করা ঠিক করেছিলাম। হেঁটে না গেলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পুরোপুরি উপভোগ সম্ভব নয় এবং ইচ্ছামত চলাও যায় না। এ সকল দুর্গম পথে নিজের পা ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করা উচিত নয়।

আমাদের মালপত্র ও তাঁবু ইত্যাদি বহন করে নিয়ে যাওয়ার জন্য দুটো ঘোড়া ও একজন কুলী করা হল। আবশ্যকীয় জিনিষপত্র অর্থাৎ হ্যারিকেন, বর্ষাতি এবং আরও অনেক টুকিটাকি ভাড়া করা হল।

এই ৫।৬ দিনের যাত্রার উপযোগী সব দরকারাদি এখানে ভাড়া পাওয়া যায়। এছাড়া আরও নিলাম খাবার, চা ইত্যাদি। কুলীটি রাত্রে হোটেলের বারান্দায় শুয়ে রাত কাটাল।

ঘোড়া ভাড়া করা সম্বন্ধে এখানে কয়েকটি কথা

বলছি। এই তীর্থযাত্রার ক্ষেত্রে ঘোড়া প্রধান সহায়, সে জন্য এই নিয়ে টানা হেঁচড়ার অন্ত নাই। বহুকাল ধরে যাত্রীরা দুর্ভোগ ভোগ করে আসছেন। রাত্রে হয়ত ঘোড়া ভাড়া করা হল, সকালে যাত্রার পূর্বমুহূর্তে জানা গেল যে ঘোড়াওয়ালা বেশী ভাড়ার লোভে অন্য তীর্থযাত্রীর সাথে রওনা হয়ে গিয়েছে।

এই হয়রানি বন্ধ করার জন্য কাশ্মীর গভর্নমেণ্টের টুরিস্ট বিভাগ এখন সচেষ্ট হয়েছেন। তহশিলদারের দপ্তর থেকে এখন ঘোড়া ও কুলীর বন্দোবস্ত দেওয়া হয়ে থাকে এবং তজ্জন্য অগ্রিম ভাড়া সেখানেই জমা দিতে হয়। অমরনাথ থেকে ফিরে ঘোড়াওলা ও কুলী সম্বন্ধে ভাল রিপোর্ট দিলে তবেই দপ্তর থেকে তাদের টাকাটা দেওয়া হয়।

পহলগাঁওয়ের এক উপত্যকা।†

পহলগামের রাত্রি ভোর হল। কুলী মালপত্র চাপাল ঘোড়ার পিঠে। আমাদের যাত্রা হল শুরু। তারিখটা হল, ২৩শে আগস্ট ১৯৬১ সাল।

আজকের গন্তব্যস্থল হল দশ মাইল দূরবর্তী চন্দনওয়াড়ি। রাস্তায় বের হয়ে দেখলাম আকাশ বেশ মেঘাচ্ছন্ন; কিছুদূর চলতে না চলতে টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়তে শুরু হল। লিডার নদীর সেতু পার হবার সময় দেখি কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী বক্সীসাহেব ছাতা মাথায় অফিসার পরিবৃত হয়ে বসে রয়েছেন। উদ্দেশ্য অবশ্যই তীর্থযাত্রীদের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন। গত রাত্রেও তাঁকে দেখেছিলাম পহলগাঁওয়ের তহশিলদারের দপ্তরে যাত্রীদের সাহায্য করতে।

ক্রমশঃ চড়াই শুরু হল। পথ কোথাও ৫।৬ হাত, কোথাও বা তার বেশী কিছু চওড়া। তবে মোটামুটি-ভাবে চন্দনওয়াড়ি পর্যন্ত জিপ গাড়ী যাতায়াত করতে পারে।

অত্যন্ত পিচ্ছিল আঁটাল মাটিতে পা বসে যাচ্ছিল এবং কয়েকবার জুতাও খুলে গেল মাটিতে আটকে যাওয়ার দরুন।

ধীরে ধীরে আমরা উপরে উঠছি। গিরিরাজ হিমালয় ক্রমেই যেন তার রহস্যের দ্বার খুলে দিচ্ছে আমাদের চোখের সামনে। সামনে যতদূরে দৃষ্টি যায় ক্যারাভান চলেছে, পিছনেও তাই। একটু দাঁড়ালেই পিছন থেকে গুঁতো খাচ্ছি।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে—পাহাড় মৃন্ময়, সেজন্য তার গায় দিগন্তবিস্তৃত ভুট্টার ক্ষেত। এর ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট পাহাড়ী গাঁ, কত অজানা ফুলের সমারোহ। দুটি কাশ্মীর দুহিতা জলের কলস মাথায় নিয়ে তাদের নম্য রংয়ের সালোয়ার হাঁটুর উপর তুলে অনায়াস সুন্দর ভঙ্গীতে সেই কর্দমাক্ত পিছল পথে আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল রোদ্রে হাওয়ায় টাটকা ছেঁড়া ফুলের মত। দৃষ্টি ক্ষণিকের জন্য স্থির হয়ে রইল তাদের শুভ্র সুঠাম সুন্দর পদযুগলের উপর।

পথ নীলগঙ্গার সাথে সাথেই চলেছে। তার কলধ্বনি এবং বন্য উচ্ছলতা, তার সঙ্গে উর্মিমালা ও উপলখণ্ডের আছড়ে পড়া আমাদের মনকে মাতিয়ে রাখছে চড়াই-উতরাইয়ের অমানুষিক পরিশ্রম সত্ত্বেও।

ক্রমে পথ ফুরিয়ে এলো। মাত্র একমাইল রাস্তা বাকি রয়েছে। আমার জুতা জোড়ার অবস্থা কাহিল। তার ছিলচ্যুতি ঘটেছিল সুতরাং সেই কর্দমাক্ত পিচ্ছিল বন্ধুর পথে চলতে খুবই কষ্ট হচ্ছিল।

অবশেষে এই স্যাৎসেতে ভিজে সন্ধ্যায় চন্দনওয়াড়ি (বাংলায় চন্দনবাড়ী বলা চলে) এলাম।

পাহাড়ের প্রাচীর ঘেরা এই আধবর্গমাইল জায়গায় আমরা আজকের রাত কাটাব। তাঁবুর জন্য ঘোরাঘুরি করতে করতে একজায়গায় চায়ের দোকান দেখতে পেয়ে

আমরা বসে পড়লাম, অর্থ গিলেন ঠাণ্ডাতে শরীরটাকে একটু তাতিয়ে নেবার জন্য।

অমরতল বন্ধুর জমিতে প্রায় শ পাঁচেক তাঁবু। এর মধ্যেই আমাদের অস্থায়ী শিবিরটি একটু নিরিবিলিতে যাটান হয়েছিল। ভিতরে ঢুকে দেখি আমাদের অন্যতম সঙ্গী বেওয়ারাম উবু হয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে বিড় বিড় করে কি যেন বকছে। ভাল করে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর জানা গেল যে সে এই ভয়ানক (হিন্দিতে খতর নক) রাস্তায় আর একপাও এগুতে রাজি নয়। অনেক বুঝানোর পরও যখন তাকে আর রাজি করান গেল না তখন পর্বতারী বললেন যে তাঁরও কপালে এবারের মত অমরনাথজী দর্শন লেখা নেই কেন না তিনি বেওয়ারামের অভিভাবক হিসাবে এসেছেন সেজন্য তাকে একলা ছেড়ে দিতে পারেন না।

রাত্রে স্থির হল, পর্বতারীরা ফিরে যাবেন। তাঁদের কম্বল, শীতবস্ত্রাদি, অন্যান্য আবশ্যকীয় জিনিষপত্র ও বরফ ইত্যাদি (যার mountaineering shoe বা পাহাড়ে চড়বার জুতো ছিল আমাকে খুবই সাহায্য করেছিল, কেন না নিজের জুতোর যা অবস্থা হয়েছিল তাতে অমরনাথ পর্যন্ত যাওয়ার ক্ষমতা আমার ছিল না।) দিয়ে যাবেন এবং আমাদের ফিরে না আসা পর্যন্ত শ্রীনগরে অপেক্ষা করবেন।

সে রাতে আমরা খাওয়া দাওয়া করলাম সঙ্গে যা পুঁজো খাবার নিয়ে গিয়েছিলাম তাই দিয়ে।

রাত এগারটার কাছাকাছি। তবুও আমাদের এই অস্থায়ী নগরী ঝিমিয়ে পড়েনি। বাইরে প্রচণ্ড কুয়াশা ও শীত, এর ভেতরেও মিলিটারীদের বাইকে হারিয়ে যাওয়া লোকজনের নাম ঘোষণা কানে আসছে।

২৪শে আগষ্ট—

পর্বতারীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা আবার চলতে শুরু করলাম। গতকাল রাতে শুনেছিলাম 'উপরে' নাকি ভীষণ বরফ পড়ছে। এই 'উপর' সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না। গত রাতের কুয়াশা ও পর্বত শ্রেণীর চেহারা দেখে ও হিমালয়ের শীতের স্পর্শ পেয়েই শিউরে উঠেছিলাম। সকালে যাত্রার আগে পাহাড়ী ঝর্ণার বরফগলা জলে স্নান করলাম। এই অবগাহনের অনুভূতি কখনই ভুলব না। ডুব দিয়ে মনে হল পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গিয়েছি, অথচ জল থেকে উঠে মনে হল সমস্ত ক্লান্তি ধুয়ে মুছে গিয়েছে।

পুলিশ ও মিলিটারী আবহাওয়া অনুকূল নয় বলে বেলা বাড়বার আগে যাবার অনুমতি দেয়নি। এবার রাস্তার চেহারা পালটে গেল। পহলগাঁও থেকে চন্দন বাড়ি আসবার সময় দেখেছিলাম পাইন গাছের সারি। এবার চোখে পড়ল দেবদারু এবং আরও নাম না জানা অনেক তরুলতা। মোড় কেটে যাওয়ায় দেখলাম রৌদ্রালোকিত গিরিশৃঙ্গকে যদিও তা তুষারমণ্ডিত নয়।

পথ এখন মোটেই আগের মত নয়। বেশ সঙ্কীর্ণ ও প্রস্তরাকীর্ণ। নীলগঙ্গার পাশাপাশি চলেছে। ঘণ্টা খানেক পর দর্শন পেলাম সুপ্রসিদ্ধ 'পিস্সুর চড়াই'এর। একে কুখ্যাতই বলা চলে। বহুলোক এর নীচ থেকেই ফিরে যায় এর কলেবর দর্শন করে। পাদদেশ থেকে প্রায় সাড়ে দশ হাজার ফুট উঁচু। এর খাড়াই বা ascend ৪৫°/৫০° হবে আমার অনুমান মত। যাই হোক আমাদের মনোবল তখনও অক্ষুণ্ণ ছিল এবং আমরা প্রায় অলৌকিক সাধন করেছিলাম। রাস্তা দিয়ে না উঠে সংক্ষিপ্ত পথে আমরা এক ঘণ্টায় এই পাহাড় অতিক্রম করেছিলাম।

একবার এই চড়াই উঠতে উঠতে হাঁপিয়ে যাওয়ায় এক পাথরের গায় ঠেস দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছি, একজন কুলী এসে বলল, 'বাবু এখানে বেশী বসবেন না।' কৌতূহলী হয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলল যে আশপাশের গাছগুলি একপ্রকার বিষাক্ত গ্যাস ত্যাগ করে যার ফলে বেশীক্ষণ বসলে ঘুম পায়। আর এইরকম স্থানের পাশে ঘুমান মানেই মৃত্যুবরণ করা।

চড়াই ভেঙ্গে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আবার চলতে শুরু করলাম। পথ আপাত দৃষ্টিতে সমতল বোধ হলেও কিছুদূর গিয়ে আবার চড়াই শুরু হল। আমরা এখন এগার হাজার ফুটের উপর দিয়ে চলেছি। বড় গাছপালার সংখ্যা ক্রমেই কমে আসছে। ঠিক পিস্সুর চড়াই এর পর ফুলে ভরা পিস্সুর উপত্যকা দেখলাম। কতরকমের নাম না জানা ফুল হিমালয়ের থরথরা বিশাল বক্ষের স্নেহরসসিক্ত হয়ে আপন খেয়ালে বাহার খোলাচ্ছে। মনে হল এদের সঙ্গে নিয়ে গিয়ে সভ্য জগতে বরফুমী ফুল বলে বিক্রি চালিয়ে দেওয়া যায়।

বেলা প্রায় সাড়ে পাঁচটা। সূর্যাস্ত হতে এখনও দেরী আছে। আরও অনেক পরে সূর্য অস্ত গেল। সূর্যাস্তের কিছুক্ষণ পরে সুউচ্চ পাহাড়ের চূড়ায় তার রক্তাভ রশ্মি এবং একই সাথে চাঁদকেও দেখলাম দুই পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিতে। সে দৃশ্যের যথাযথ বর্ণনা করার ক্ষমতা আমার নেই—তবে যা দেখেছি তার তুলনা নেই। পৃথিবীতে এত আশ্চর্য সৌন্দর্য আমাদের দর্শনাপেক্ষায় আছে তা জানা ছিল না। চর্মচক্ষে আজ যা দেখে গেলাম মনশ্চক্ষে তা আমৃত্যু দেখব।

এক পশলা বৃষ্টি এসে রাস্তাকে পিচ্ছিল, কষ্টসাধ্য ও বিপজ্জনক করে দিয়ে গেল। প্রায় চৌদ্দ হাজার ফুটের উপর এখন আমরা। বাতাস পাতলা হয়ে আসায় ফলে (অক্সিজেনের ভাগ কম) শ্বাস নিতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। মাঝে মাঝে দুরত্ব নির্দেশক ফলকে দেখতে পাচ্ছি। Slow and steady wins the race' কোথাও বা 'Trust your own feet only'

এই রকম একটি ফলক দেখে বুঝলাম যে আমরা শেষনাগের কাছাকাছি এসে পড়েছি। দূর থেকে পাহাড়ী নদীর খরস্রোতের গম্ভীর আওয়াজ অস্পষ্ট ভাবে কানে এল। কুয়াশায় ঢাকা মৃদু চন্দ্রালোকে পথ দেখে সাবধানে চলতে হচ্ছে। শেষনাগের হ্রদ থেকে হিমেল হাওয়া এসে এক অপার্থিব অনুভূতি এনে দিচ্ছে মনে।

শেষনাগের শেষ চড়াই ভাঙবার সময় দেখলাম প্রায় হাজার ফুট নীচে সেই হ্রদের দৃশ্য। বিশাল পরিধি নিয়ে এই হ্রদের বিস্তৃতি, মৃদু চন্দ্রালোকে আরও অপার্থিবরূপে ধারণ করেছে আর তাকে ঘিরে আছে কুয়াশার আবরণ।

কাছের পাহাড় থেকে কয়েকটা হিমবাহ এসে হ্রদের বুকে লীন হয়ে গেছে। হিমবাহ ও তুষারগাত্রে জ্যোৎস্নার ঝিলিমিলি, পর্বতের বিশাল ব্যাপ্তি, পল্বলের বিস্তৃতি, স্বল্পালোকিত চাঁদের আলোয় দর্শিল পথ আর সর্বোপরি অজানা রহস্যময় পথের ডাক আমাদের মনপ্রাণ উদাস করলো।

এই হিমবাহ আর হ্রদ, এই পর্বতগাত্রের জমাট বরফের ভিতর থেকে চাঁদের আলোয় বিচ্ছুরিত নীলাভ দ্যুতি আমাদের স্মৃতিপট থেকে কখনও মুছে যাবে না।

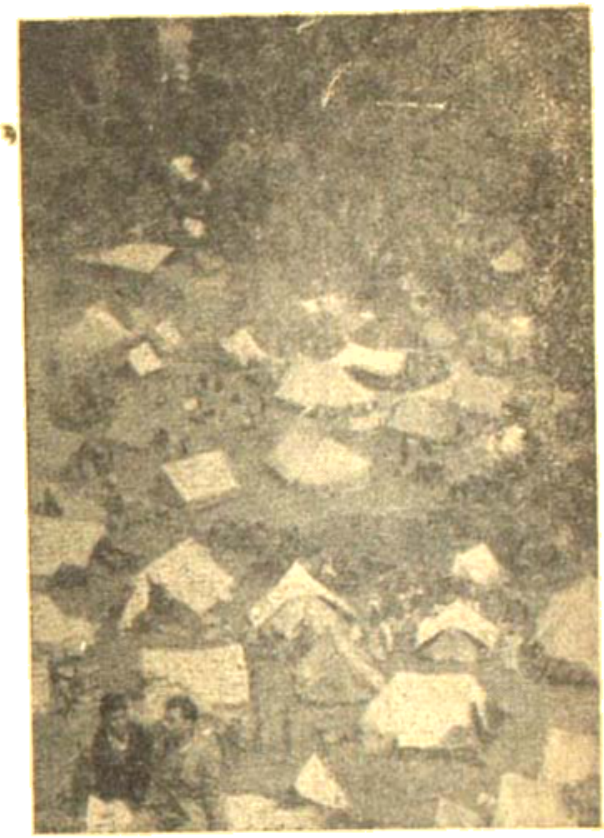

চাঁদের পাহাড় আর হিমেল হ্রদ পেরিয়ে আমরা শেষনাগের উপত্যকায় এসে পৌঁছলাম। আমাদের ঘোড়া এখনও এসে পৌঁছায়নি সুতরাং আকাশের তারকা-খচিত চাঁদোয়ার নীচে ভগবানের অকৃপণ দাক্ষিণ্যের কথা মনে করে মনকে সান্ত্বনা দিয়ে শীতের মধ্যে কাঁপতে কাঁপতে বসে বসে অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় ছিল না।

প্রায় আড়াই ঘণ্টা পরে রাত বারটার পর ঘোড়া-ওলার দেখা পাওয়া গেল। তাঁবু খাটিয়ে সে রাত্রে কোন মতে শুয়ে পড়লাম। রাত্রে একবার তাঁবু থেকে বেরিয়েছিলাম। হিমালয়ের বিশাল গম্ভীর রূপ আমি সে সময় যেমন অনুভব করেছিলাম আর কখনও সেরকম করি নি।

আকাশের গায়ে গাঢ় কালিমার ঢাকা সীমারেখায় রহস্যময় ভয়াবহতা নিয়ে প্রতিভাত। মূর্তিমান আমার সামনের পাহাড়শ্রেণী জ্যোৎস্নালোকিত

নিস্তব্ধতার রূপ নিয়ে সমস্ত চরাচরকে গ্রাস করার জন্য অপেক্ষা করছে। তার ভয়াল গম্ভীর রূপ আমায় অভিভূত করল। যুগ যুগান্তরের নীরবতা তার সমস্ত অবয়বে বিরাজ করছে আর তার সাথে আবহমানকাল ধরে তুষার রূপ তার অঙ্গে অঙ্গে জমাট বেঁধেছে। বাল্যকালের কোন এক বিস্মৃত দিনে ধরিত্রীর বক্ষস্পন্দন থেকে জন্ম নিয়েছিল অভ্রভেদী হিমাচল কেউ তার হিসাব রাখে না। পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতমালার এক পাণ্ডবর্জিত দুরূহ কোণে দাঁড়িয়ে তার অন্তরকে সত্যিই রহস্যময় বলে মনে হচ্ছিল আমার।

আজ ২৫শে আগষ্ট :

চলতে শুরু করে বুঝতে পারলাম—যে আমরা কত ক্লান্ত। অবশ্য একবার চলতে শুরু করলে ক্লান্তি কমে আসে। শ্বাস নিতে সবারই কষ্ট হচ্ছিল।

চড়াই এর ভাগ কমে এসেছে, এখন শুধু উৎরাই। শেষনাগ থেকে যেন গড়িয়ে চলেছি নীচের দিকে। শেষনাগ প্রায় ১৪০০০ ফুট উঁচু।

—বেকারদের বিরাট সুযোগ—

ঃ ইলেকট্রিক এ্যাণ্ড রেডিও গাইড ঃ

বাড়ীতে বসে ইলেকট্রিক ইঞ্জিনীয়ারিং, রেডিও তৈয়ারী ও মেরামত, ওয়ারিং ইত্যাদি শিখুন। মাত্র ৫০৲ টাকায় বাড়ীতে বসে কি করে "ট্রানজিসটার রেডিও" তৈয়ারী করা যায় শিখুন। রেডিও এবং ইলেকট্রিক বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণের জন্য ৪০০ শত ছবিসহ এক অভিনব পুস্তক পাওয়া যায়। দাম মাত্র ৮'৫০ টাকা, ভি. পি. পি. খরচা অতিরিক্ত ২৲ টাকা।

নিম্নলিখিত বই পাওয়া যায় :

টেলারিং এবং কাটিং (ছবিসহ) ৫৲, সাবান এবং গন্ধ দ্রব্য তৈয়ারী—৫৲, ফটোগ্রাফী শিক্ষা—৫৲। লিখন এবং অঙ্কন, পরিবর্ধিত সম্পূর্ণ নূতন সংস্করণ ৪০০ শত ছবি সহ—৬৲। বিবাহিত জীবন ৮৮টি ছবি সহ ৫৲। ভি. পি. পি. খরচা অতিরিক্ত—১৲ প্রতিটি বইয়ের জন্য।

GLOBE BOOK DEPOT (N.P.-15)

HALKA No-23. ALIGARH CITY

গাছপালার চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও। বৃক্ষবিহীন তুষারমণ্ডিত গিরিশৃঙ্গে দৃষ্টিকে প্রতিহত করছে প্রতিমুহূর্তে। সূর্যকিরণ-ঝলসিত তুষার শুভ্র কিরিটিনী। মাঝে মাঝে পাথরের চিহ্ন চোখ পড়ে ছোট ছোট গুল্মে ও ঘাসে ঢাকা পর্বতগাত্রে।

এখানে আমাকে একটু বিপদে পড়তে হয়েছিল। আমরা সর্টকাট করতে গিয়ে ঘোড়ার ভিড় কাটাবার জন্য পাহাড়ের গায়ে ছোটপথ আবিষ্কার করলাম। এই পথ-গুলি হয়েছে পশুচারণের ফলে। এর প্রস্থ ৮ ইঞ্চি থেকে ১ ফুটের বেশী নয় কোথাও। কিছুক্ষণ আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার ফলে বেশ পিছল। যেখানে এই পথে উঠলাম সে জায়গাটা আসল পথ থেকে পাঁচ ফুটের বেশী উঁচু হবে না। কিন্তু যেতে যেতে এর উচ্চতা ক্রমেই বাড়তে থাকল। তাকিয়ে দেখি আসল পথ ৩০০।৭০০ ফুট নীচে হবে। যাত্রী ও ঘোড়াদের খেলনার মত মনে হচ্ছে। অতি সন্তর্পণে লাঠির উপর ভর দিয়ে এগুচ্ছি। ভরসা এই যে পা যেমন পিছলাচ্ছিল লাঠিও সেই পরিমাণে নরম মাটিতে বসে যাচ্ছিল। যদি এতেও না কুলায় তবে নীচে গড়িয়ে পড়তে হবে রাস্তার উপর। আবার রাস্তার উপরেই যে পড়ব তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়। পথ আটকাতে না পারলে পড়তে হবে চারশ ফুট খাদের অতলে।

এই রকম চিন্তা করতে করতে এগুচ্ছি—এমন সময় পা সত্যিই হড়কাল, লাঠিও বাঁচাতে পারলে না আমায়। পড়তে পড়তে এক গোছা ঘাস মুঠো করে ধরে রইলাম। ভাগ্যকে ধন্যবাদ যে সেই ঘাসের গোড়া আলগা হয়ে মাটি থেকে উঠে আসে নি। তা হলে সে দিন হতে আমার নাম পৃথিবীর এই বিকিকিনির হাটের খাতা থেকে চিরদিনের জন্য মুছে যেত।

স্নায়ুমণ্ডলী প্রচণ্ড এক ধাক্কায় প্রায় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। সাহস সঞ্চয় করে ধীরে ধীরে ঘাসের গুচ্ছের উপর ভর দিয়ে বুকে হেঁটে উঠে বসলাম সেই বিপজ্জনক পথের উপর। এরপর যে এগিয়ে যাব সে সাহসটুকুও আর নেই। আরও মুস্কিলের কথা দলের সবাই এগিয়ে গেছেন এবং এ রাস্তায় আর কেউই হাঁটে না। এখন

সময় এক সাধুর দেখা পেলাম। সে আমার কাদামাখা অবস্থায় ঐ রকম ভাবে বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করল, "বেটা! তেরা ক্যা হুয়া।"

উত্তর দিলাম, "মেরা গোড়া পিছল গয়া থা, ঔর মাঁয় গির রহা থা। বাচ গয়া লেকিন চলনেকি হিম্মত নহি পড়তি।"

সে বলল, "বেটা মেরা হাত পাকড়, ঔর মেরা সাথ সাথ চল।" উত্তর দিলাম, "বহুত শুক্রিয়া আপকো। মাঁয় থোড়া আরাম লেকর ফির চল সকুঙ্গা।"

"অমর নাথজী তুমকো কৃপা করে।" বলে সে চলে গেল।

আবার নামতে শুরু করলাম। একটা নেড়া পাহাড়ের উপর থেকে দেখতে পেলাম পঞ্চতরণীকে। সারি সারি তাঁবু পড়েছে পাহাড়ের গায়। এর উপত্যকার প্রায় সবটুকু জুড়েই বিশাল এক প্রবাহিকা আর তার ভিতর দিয়ে কয়েকটি স্রোতস্বিনী বয়ে গেছে।

মাঝে মাঝে পার্বত্য ঘাস জমি, পরিষ্কার হিমশীতল জল, নুড়ি পাথর, দূরে পাহাড়ের গায় ক্যাম্পের সারি ও বরফের চূড়া যেন এক অন্তারতীয় দৃশ্যের ইংগিত নিয়ে এল। পারিপার্শ্বিক দৃশ্যের বিন্যাসের ভিতর এমন কিছু ছিল যাতে মনে হল আমরা ভারতের সীমানা ছাড়িয়ে মধ্য এশিয়ার জনমানবহীন প্রান্তরে এসে পড়েছি। এরকম মনে হওয়ার আরও কারণ রয়েছে। এখানে কিছু সংখ্যক ঘোড়াওয়ালার সাক্ষাৎ পেলাম যাদের মুখ চোখ এবং দাড়ির মধ্যে আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থানের আফ্রিদী ক্রুরতা প্রচ্ছন্ন। পরে জিজ্ঞাসা করে জেনেছিলাম যে এরা সীমান্ত অঞ্চলের পাঞ্জাবী (পাঞ্জাবী হিন্দু বা শিখদের সাথে আকৃতিগত সাদৃশ্য নেই) মুসলমান।

বৈতরণী পার হয়ে নাকি স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে হয় কিন্তু আমরা পঞ্চতরণীর প্রান্তরে প্রথম মুক্তির নিশ্বাস নিলাম। এর পরে আমাদের কল্পরাজ্য অমরনাথ।

প্রবাহিকার ঘাস জমির উপরেই 'কুণ্ডু স্পেশালের' যাত্রীদের তাঁবু পড়েছে। এগিয়ে চললাম—পায়ে ভিজে ঘাসের স্পর্শ নিতে নিতে। নুড়ি পাথর ও জলা ডেপ্পে একটি সাঁকো পেরিয়ে এসে পড়লাম পাহাড়ের গায় ক্যাম্পের সারির ভিতর। এই পাহাড়ের ঠিক পিছনেই অমরনাথের গুহা তবে সোজাসুজি অতিক্রম করার উপায় নেই বলেই ঘুরে যেতে হয়।

কুলীটিকে তাঁবু খাটাবার নির্দেশ দিয়ে কিছু খাবার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। ফিরে এসে দেখি তাঁবু খাটান শেষ। দু'পাশের পর্বতমালার দিকে তাকালাম। এক পাহাড়ে ধূসর রুক্ষতা ও আর একটিতে বরফের শুভ্রতা। ছোট ছোট স্রোতস্বিনীগুলি যে দিক দিয়ে এসেছে সেই দিককার পাহাড়ের চূড়াগুলি বরফে সম্পূর্ণ ঢাকা। এর তলায়ও স্থানে স্থানে বরফ জমে রয়েছে। আমাদের যাত্রাপথও শীতকালে ১৫।২০ ফুট বরফে ঢাকা থাকে। তবে বৃক্ষলতার চিহ্ন কোথাও নেই। এর রুক্ষ শিলার বিস্তীর্ণ পাহাড়ী প্রান্তরই আমায় মনে করিয়ে দিয়েছিল মধ্য এশিয়ার কথা।

২৬শে আগষ্ট :

আজ শ্রাবণী পূর্ণিমা। আমাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত

অমরনাথ পৌঁছবার দিন। এখান থেকে অমরনাথ মাত্র ৫ মাইল, তবে সেখানে থাকবার কোন বন্দোবস্ত নেই অর্থাৎ ক্যাম্প ফেলবার মত সমতল ক্ষেত্রের অভাব। সুতরাং দর্শন সেরে ফিরে আসতে হয় সেইদিনই। সকালে উঠে দেখি কয়েকটা ঘোড়া তাঁবুর বাইরে মরে পড়ে রয়েছে অনাবৃত আকাশের নীচে সারারাত কাটানর ফলে।

হাঁটতে শুরু করি। এখন পদচালনা অভ্যস্তবৎ হয়ে গেছে। মনের ভিতরের ইচ্ছেটাই যেন সব, শরীরটা কিছু নয়। হাঁটছি মনেরই নির্দেশ এবং দেহ অনিচ্ছা সত্ত্বেও মনের কাছেই আত্মসমর্পণ করেছে।

কয়েকটা বাঁক ঘুরবার পরই দেখতে পেলাম একটি গুহা এবং তার ভিতর থেকে ধুঁয়া বার হচ্ছে। কুলী বলল ওই হল গুহাতীর্থ এবং প্রায় সাথে সাথেই শুনি সহস্র কণ্ঠে 'জয় বাবা অমরনাথকী জয়'। দর্শন সেরে যাঁরা ফিরে আসছেন তাঁরা 'জয় শঙ্কর' 'জয় শঙ্কর' বলতে বলতে আসছেন এবং আমাদের মুখ থেকে অজানিতে বেরিয়ে এল 'জয় শঙ্কর'।

একটি বরফের সেতু পেরিয়ে এলাম। এই ধরণের সেতু রাস্তায় আরও কয়েকটি দেখেছি। এগুলি প্রাকৃতিক নিয়মে সৃষ্ট। শীতকালে বরফের স্তূপ জমে থাকে, বরফ গলতে শুরু করলে ঝরণাগুলি এদের বুক বিদীর্ণ করে চলে যায়, উপরের অংশটুকু শুধু ঝুলে থাকে সেতুর আকারে।

যেখান থেকে গুহামুখ প্রথম চোখে পড়েছিল, সেখান থেকে খুব বেশী উঁচু বলে মনে হয় নি। কিন্তু যত এগুচ্ছি ততই এর উচ্চতা বাড়ছে। আরও এগিয়ে দেখি কমপক্ষেও হাজার ফুট উঠতে হবে আমাদের।

নীচ দিয়ে অমরগঙ্গা বয়ে গেছে ক্ষেপার মত গতির তীব্রতা নিয়ে আর এরই হিমশীতল পুণ্য বারিতে অবগাহন করছে সহস্রাধিক পুণ্যার্থী। আমরা স্নান করতে পারিনি তাড়াতাড়ি ফেরার কথা থাকার জন্য। সেইদিনই শেষনাগ ফেরা স্থির ছিল।

ধীরে ধীরে উঠতে শুরু করি গুহার উদ্দেশ্যে। অবসাদে ভেঙ্গে পড়লেও বিশ্রাম নেবার চেষ্টা করিনি। কয়েকজন বয়স্ক স্ত্রীপুরুষকে দেখি কুলীর সাহায্যে উঠতে। বলাবাহুল্য ঘোড়া ও ডাণ্ডির গুহামন্দিরে প্রবেশ নিষিদ্ধ সুতরাং যাঁরা ঘোড়া ও ডাণ্ডিতে এসেছেন তাঁদেরও কষ্ট করে এটুকু পথ উঠতেই হচ্ছে। কয়েকটি বৃদ্ধাকে পথের ধারে শুয়ে থাকতে দেখলাম। একজন পশ্চিমা বৃদ্ধাকে মাঝ পথ পর্যন্ত উঠিয়ে নিয়ে আসি। তিনি অনেক ধন্যবাদ দেওয়ার পর জিজ্ঞাসা করলেন যে আমার বাড়ী কোথায়। আমি বাঙ্গালী জানাতে তিনি বললেন যে বাংলা মুলুকের লোকেরা বড়ই সহানুভূতি-শীল হয়। অনুরূপ মন্তব্য আরেকজনের মুখে শুনেছিলাম তাঁকে জল দান করাতে।

আরও আধঘণ্টা চলার পর গুহামুখ পেলাম। একদল নগ্ন সন্ন্যাসী ধুনি জ্বালিয়ে বসে রয়েছে। গুহামুখ প্রায় পঞ্চাশ ফুট চওড়া। ভিতরে প্রচণ্ড ভীড়, বাইরে থেকে শুধু রেলিং দেখা যাচ্ছে। আমরা একে একে দর্শন করার মনস্থ করি। প্রথমে স্বামিজী ও মুখার্জি গেলেন পরে যাই আমি ও ব্যানার্জিবাবু। কয়েকজন করে ভিতরে যেতে দেওয়া হচ্ছে। লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম, প্রায় আধঘণ্টা পরে ভিতরে যাওয়ার পালা এল। রেলিং ঘেরা চত্বরের মধ্যে বরফের বেদীর উপর বরফের শিবলিঙ্গ। বেদী ও শিবলিঙ্গ অভিন্ন। উচ্চতায় প্রায় সাড়ে তিনফুট। লোকে তার উপরেই হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। অমরনাথজীকে স্পর্শ করে প্রণাম করলাম।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

---

* আলোকচিত্র : প্রশান্ত মুখোপাধ্যায়।
† আলোকচিত্র : লেখক।

"আগুন" নাটকীয় গতির বিবর্তন

রঞ্জন মজুমদার

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—অসিত সেন। সংলাপ ও কাহিনী—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। আলোকচিত্র—অনিল গুপ্ত। সম্পাদনা—তরুণ দত্ত। শব্দগ্রহণ—বাণী দত্ত। চরিত্রচিত্রণে—নির্মল কুমার, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যারাণী, সন্ধ্যা রায়, কণিকা মজুমদার।

বর্তমান দশকে বাংলা দেশে চলচ্চিত্রে নবতর আঙ্গিক প্রয়োগ কুশলতায় সমৃদ্ধ শক্তিশালী পরিচালকদের অন্যতম অসিত সেন তাঁর বিগত চিত্রগুলি মারফৎ দর্শক মহলে সুপরিচিত। প্রয়োগরীতির ব্যতিক্রমে অসিত সেন ইতোপূর্বে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তাঁর নিজস্ব বর্ণন ভঙ্গিমায়, উপস্থাপনায় স্বকীয়ত্বে এবং ঘটনাবহুলে চিত্রকাহিনীর নাট্যবিন্যাসে। ক্ষেত্র বিশেষে তিনি সফল হয়েছেন আবার ত্রুটীও ধরা পড়েছে ইতঃস্তত, কিন্তু পরিচালন ক্ষেত্রে তাঁর সুগভীর মননশীলতাটুকু সর্বত্র সর্বাগ্রে দৃষ্ট হয়েছে; কাহিনীকে চলচ্চিত্রোপযোগী করে তুলে নিজস্ব প্রয়োগ পদ্ধতীর দ্বারা জোরালো অথচ সুঘন ভঙ্গিমায় পর্দায় উপস্থিত করার লক্ষণগুলি তাঁর যেমন অকপট তেমনই সুমার্জিত ও রুচীশীল। আমার এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাবে বর্তমান অসিত সেন পরিচালিত আলোচ্য চিত্রে।

কাহিনীকার তারাশঙ্করের শক্তিশালী কলম-প্রসূত কাহিনী 'আগুন' বাংলা দেশের সাহিত্যক্ষেত্রে এক বিপুল অবদান। অন্তর্নিহিত নাটকীয় গতিবেগ সম্পন্ন এই

কাহিনীর চিত্রলেখ্যের সংলাপ রচনা করেছেন লেখক স্বয়ং; সংলাপ ফেলাফেলা হয়েছে নিঃসন্দেহে কিন্তু ঈষৎ 'কেতাবী' থেকেছে তেমনই ক্ষেত্রবিশেষে। নাটকীয় আবেগ-সমৃদ্ধ মুহূর্তগুলি বাদে ক্ষেত্রবিশেষে সংলাপগুলি কিঞ্চিৎ বক্তৃতাধর্মী হয়ে পড়েছে বলে আমার বিশ্বাস। চলচ্চিত্রে 'দৃশ্যতার' প্রশ্নটি যদি প্রথম বিবেচিত হয় তাহলে চিত্রনাট্য ও সংলাপের মধ্যেও তার সমন্বয়ের প্রশ্নটিও সেই সাথে বিবেচনা করে দেখা দরকার।

আগুন চিত্রের প্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে মুখ্যত তিনটি চরিত্র প্রাধান্য পেয়েছে। শৈশবকাল থেকে একসঙ্গে খেলাধুলো-পড়াশুনো ও পাশাপাশি একই গ্রামে বসবাসের মধ্যে দিয়ে বড় হয়েছে চন্দ্রনাথ, নিরু ও হীরু। চন্দ্রনাথ নিম্নবিত্ত ঘরের প্রখর বুদ্ধি-চেতন সন্তান, জীবনে বড় হওয়ার প্রবল উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে নিম্ন বিত্ত ঘরের সপ্রতিভ বন্ধু-বৎসল সন্তান আর অপরিসীম বিত্তের অধিকারী ধনীর দুলাল হীরু; নানাবিধ বৈষম্যের মধ্যে এই তিনজনের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব উত্তরকালে বড় হয়ে এবং বৈসদৃশ্যে হয়েও সে বন্ধুত্ব অম্লান রয়ে গেছে।

জীবনে প্রতিষ্ঠালাভের উচ্চাকাঙ্ক্ষা নানক মানসিকতা চন্দ্রনাথকে স্বাভাবিক জীবনধারা থেকে ব্যতিক্রমমুখীন করে দিয়েছিল আত্মবিশ্বাস নামক আচরণটি তাকে দুর্বিনীত করেছিল পর্যায়ক্রমে উচ্চাশা তাকে এত অনুপ্রাণিত করেছিল যে সে কোন বিষয়ে প্রথম স্থান পাওয়া ছাড়া দ্বিতীয়স্থানে বসতে পারতো না। এই প্রবলতর উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাকে অবশেষে গৃহত্যাগে বাধ্য করলো দাদা তার স্পর্ধিত আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে তিরস্কার করায় সে পৈত্রিক সম্পত্তির নিজের অংশটুকু ও যাবতীয় আসবাবপত্র বিক্রি করে দিয়ে সন্ন্যাস করলো।

অন্যতম বন্ধু নিরু ওরফে নরেশ মুখোপাধ্যায় ভাবপ্রবণ লেখক হলেও বাস্তববুদ্ধি-বিবর্জিত নয় কোন কালেও। চন্দ্রনাথের ঔদ্ধত্য সময়-বিশেষ তার কাছে পীড়াদায়ক হলেও সে চন্দ্রনাথকে গভীরভাবে ভালো-বাসতো। চন্দ্রনাথ নতুন কিছুর সৃষ্টির উন্মাদনায় অন্তরে যে তীব্র গতীবেগ অনুভব করতো তা নিরু উপলব্ধি করতো সহৃদয় বন্ধুসুলভ উদারতায়। চন্দ্রনাথের গৃহত্যাগে বিশেষ করে বিদায়ের মুহূর্তে সাক্ষাৎ না করে যাওয়ায় নিরু মর্মাহত হয়।

চন্দ্রনাথ গৃহত্যাগ করে যুদ্ধে যোগ দিল, কিন্তু মানুষে মানুষে উন্মত্ত হানাহানি, মানুষের জীবনের অনর্থক অপব্যয় ইত্যাদি পাশবিকতা তার অন্তরে তীব্র বেদনার সঞ্চার করলো সৈন্য বিভাগ ত্যাগ করে চন্দ্রনাথ বেরিয়ে পড়লো তীর্থ থেকে তীর্থান্তরের উদ্দেশ্যে বৈরাগ্যের ঝুলী কাঁধে নিয়ে। সাথে তার যুদ্ধক্ষেত্রে পাওয়া জনৈক বন্ধুর লাঠি, কিন্তু তাতেও সে যেন তৃপ্তি পেল না প্রতিষ্ঠালাভের পথে ক্রমশঃ সে যেন মিয়মান হয়ে পড়তে লাগলো দিনের পর দিন, এমন সময় আগ্রায় ঘটনাচক্রে পরিচয় হল মীরার সঙ্গে। মীরার সান্নিধ্যে ও সহচর্যে চন্দ্রনাথ কিছুটা আত্মস্থ হল এবং কালক্রমে পথের সাথী লাঠিটি ফেলে চন্দ্রনাথ মীরাকে বিবাহ করলো। মীরার পরামর্শে ও তদ্বিরে চন্দ্রনাথ তার চিরদিনের ঈপ্সিত পথে এগিয়ে গেল ছোটখাটো একটা ব্যবসা থেকে সুরু করে নিজের পরিশ্রম ও বুদ্ধির বলে চন্দ্রনাথ অনতিকালের মধ্যে অসম্ভব উন্নতি করে বসলো।

কিন্তু এরপর যতই দিন যেতে লাগলো চন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে নিজের কাজকর্মের মধ্যে এত বেশী ডুবে রইলো যে স্ত্রী ও সন্তানের কথা যেন তার আর মনে থাকে না। কী করে সে আরও বিত্তবান হবে, জীবনে আরও বেশী প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করবে, এই শেষ পর্যন্ত চন্দ্রনাথের দিনরাতের ধ্যান রূপ হয়ে রইলো।

এমন সময় নিরু এলো সেখানে। নিরুকে দেখে দীর্ঘদিন অদর্শনের পর চন্দ্রনাথ প্রচণ্ড উল্লসিত হল কিন্তু নিরু যখন দেখলো চন্দ্রনাথের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি তখন সে ব্যথিত হল বিশেষত মীরার মত স্ত্রীকে ক্রমাগত অবহেলা নিরুর কাছে যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠলো।

প্রসঙ্গত এলো হীরুর কথা। হীরু এমনই এক স্বভাবের ছেলে যাকে ভগবান অকৃপণ হাতে ঢেলে দিয়েছেন বংশ মর্যাদা, প্রভূত সম্পদ শিক্ষার কৌলিন্য ও সৌন্দর্য। অপরিমিত ভোগ বাসনায় যার প্রাত্যহিক দিন-গুলি কাটে নিতান্ত স্বচ্ছন্দতালে। জীবন সম্পর্কে বিশেষ কোন দায়িত্বহীন হীরুর বক্তব্য যে সে পৃথিবীতে জনৈক অতিথি ভোগে বিলাসে দিন কাটানো নিয়ে হচ্ছে কথা। পিতৃমাতৃহীন আশৈশব অফুরন্ত সমবায়ের মাঝে বাস

করে করে বিষয় সম্পর্কে' গুরুত্ববোধ তার অনিবার্য কারণেই কমে গেছে। বন্দুক হাতে করে বনজঙ্গলে পাখী শিকার, নিত্য মদ্যপান ও নারীর সাহচার্য ছাড়া জীবন যার কাছে অন্ধকার, কাশ্মীর ভ্রমণ করে এসে যে বলে পৃথিবীতে একমাত্র স্থান কাশ্মীরের অধিপতি হয়ে জন্মানো উচিত ছিল তার এবং সে ধরনের কিছু হলে সে সেখানকার সুন্দরী-নারীদের সাহচার্য একান্তে আদায় করবার অধিকার পেতে পারতো এ হেন হীরু ভুল নিশানায় শিকার করে বসলো জনৈক অরণ্যদুহিতাকে। যাযাবর শ্রেণীর মেয়েকে ঘরে তুলে আনলো হীরু অকৃত্রিম উদারতার।

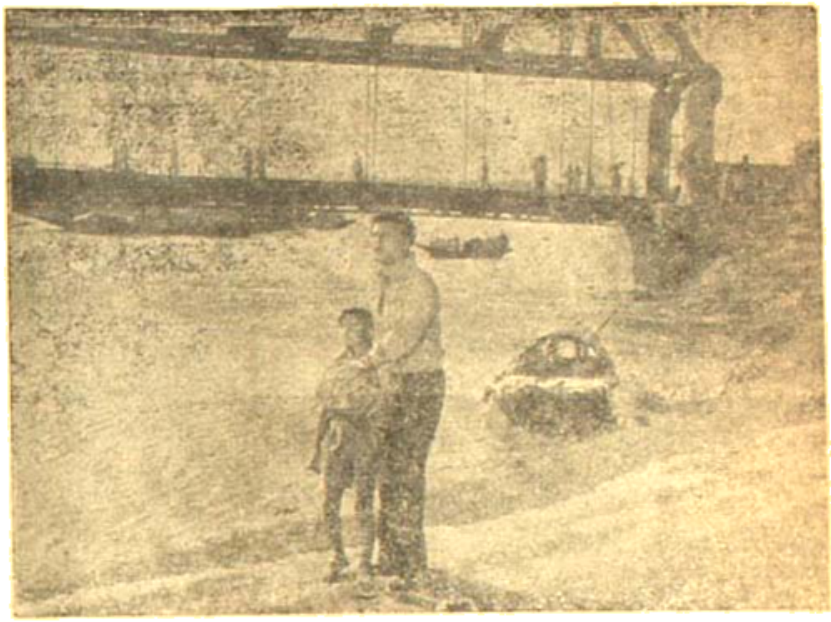

'রক্তপলাশ' চিত্রের একটি নাটকীয় মুহূর্তে অনিল চট্টোপাধ্যায় ও জনৈক।

দু'দিনের খেলায় মেতে যে নারীকে সে ঘরে এনেছিল ভেবেছিল দু'দিন বাদেই কানাকড়ি মূল্য পরিশোধ নিয়েই হয়তো সে মেয়ে নিজের পথে চলে যাবে। কিন্তু ঘটনাচক্রে যাযাবরী তাকে যে শুধু গভীর ভাবে ভালো-বেসে ফেললো তা' নয়, মাতৃত্বের সমস্ত সম্ভাবনা নিয়ে ভোরের কাজলপরা চোখের সামনে দুয়ার আগলে দাঁড়ালো চন্দ্রনাথের।

এই ব্যাপক সমস্যার মুখে সাহিত্যিক নরেশ ওরফে নিরুর আগমন। হীরু তার অভিপ্রায়ের কথা ব্যক্ত করলে নিরুকে—হীরু তার যাযাবর সন্তানকে পৃথিবীর আলো চোখ মেলে দেখতে দিতে চায় না। যাযাবরী তার সম্ভাবনাময় মাতৃত্বের গৌরবে ঢলঢল হয়ে বাস্তব পরিস্থিতির কথা ভাবেনি—কিন্তু আড়াল থেকে যেদিন হীরুর অভিপ্রায়ের কথা জানতে পারলো শঙ্কিতা হরিণীর মত নিঃশব্দে সে পলায়ন করলো অজ্ঞাতবাসের উদ্দেশ্যে। হীরু যাযাবরীকে প্রাণপণে খুঁজলো কিন্তু কোথাও সন্ধান না পেয়ে হঠাৎ আবিষ্কার করে বসলো যে নিজের অজ্ঞাতসারে কখন যেন সে যাযাবরীকে গভীরভাবে ভালোবেসে ফেলেছে কিন্তু সেই ভালোবাসা যখন উন্মুখ হয়ে উঠলো মুখোমুখি আলাপনের আকাঙ্ক্ষায় তখন সে পালিয়ে গেছে নিষ্ঠুর নির্মম ও শক্তিশালী পিতার হাত থেকে নিজের সন্তানকে নিরাপদ করবার জন্য। হীরু ভেঙ্গে পড়লো এতদিনের রক্ষিত সব মোহ তার ভেঙ্গে গিয়ে আসল মানুষটির চেহারা আত্মপ্রকাশিত হয়ে পড়লো নিরুর চোখে।

এই নিরুর চোখেই ধরা পড়ে গেল চন্দ্রনাথও একদিন। স্ত্রী পুত্রের দায় দায়িত্ব এক রকম ত্যাগ করে যে ব্যক্তিটি জন্মাগত রক্ত হতে আরম্ভ করেছিল তার শুরুটা অবশ্য ছিল স্ত্রীর স্নেহ ভালোবাসা আর কর্মের পথে অকুণ্ঠ প্রেরণা। প্রথম বার সাক্ষাতের সময় নিরু যখন ক'লকাতায় ফিরবে বলে বিদায় নিতে গিয়েছিল চন্দ্রনাথের কাছে, চন্দ্রনাথ প্রশ্ন করেছিল, তাদের দু'জনের মধ্যে, আবার কবে সাক্ষাৎ হবে,—নিরু বলেছিল 'আর সাক্ষাৎ হবে 'না' কেন, কেন আর সাক্ষাৎ হবে না—' প্রশ্ন তুলেছিল চন্দ্রনাথ। নিরু শান্তভাবে বলেছিল—'কারণ তুই এমন জায়গায় উঠে গিয়েছিস সেখান থেকে আর সহজ ভাবে নামা যায় না নামতে হলে লাফিয়ে পড়ে নামতে হয়. আর আমি—আমরা সেই একই জায়গায় রয়ে গেছি—সুতরাং, সাক্ষাতের প্রশ্ন অবান্তর—'। সেই চন্দ্রনাথ যে এত দ্রুত এত মর্মান্তিক ভাবে নিঃশেষিত হয়ে যেতে শুরু করবে;

তা নিয়ে স্বপ্নেও ভাবেনি, ব্যবসা ক্ষেত্রে বিপুল দেনা, ভারদায় হারিয়ে উলঙ্গ অবস্থা, শিশুসন্তান অবহেলায়-ঔদাসীন্যে নিজেরই কারখানায় ফার্নেসের আগুনে কলসে মৃত স্ত্রী—প্রকৃত প্রস্তাবে উন্মাদ—নিজের মানসিক জগত উন্মাদ করে বেসামাল ; নিয়ু সংবাদ পেয়ে ছুটে এলো বটে, হীরুকে রাজী করালো তার অগাধ বিত্ত নিয়ে চন্দ্রনাথের পাশে দাঁড়াবার, কিন্তু প্রায় সর্বহারা চন্দ্রনাথ ততদিনে ব্যবসাপত্র বিক্রি করে দিয়ে বদ্ধ উন্মাদ স্ত্রীকে সাথে নিয়ে কলকাতার পথে যাত্রা করেছে। পথিমধ্যে স্ত্রী মাঝা চলন্ত ট্রেণ থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করলো।

যাদাবরী চলে যাবার পর সেই আঘাতই হীরুর পক্ষে কাল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল—দীর্ঘদিন শরীরের প্রতি অপরিমিত অত্যাচারের ফলে হীরু যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছিল, ভেবেছিল শেষের কটিদিন চন্দ্রনাথের সাহায্যে আসবে। তার উচ্চাশাকে পূর্ণতার রূপ দিয়ে যাবে কিন্তু তা আর সম্ভব হল না। হীরু জীবন্মৃত হয়ে বেঁচে রইলো শুধু।

নিয়ু লেখক, তার দুই প্রিয়তম বন্ধুকে সে দেখে ছিল। কলেজের প্রিন্সিপ্যাল একদা চন্দ্রনাথের নামকরণ করেছিলেন 'কালপুরুষ'। আখ্যায় ভূষিত করে সেই কালপুরুষকে নিয়ু সর্বদা লক্ষ্য করেছে—লক্ষ্য করেছে ভোগে বিলাসে মত্ত হীরুকে, আর জীবনের একটা অর্থ খুঁজে বার করতে চেষ্টা করেছে নির্ণয় করতে চেষ্টা করেছে জীবনের মূল্যমান। চন্দ্রনাথ বলেছিল, 'নিয়ু, যা দেখেছিস আর যা শুনেছিস তার বাইরে কিছু লিখতে চেষ্টা করিস না—' নিয়ু সে কথা রেখেছিল। সে যা দেখেছে তার বাইরে একটি অক্ষরও লিখতে চেষ্টা করেনি।

সমগ্র কাহিনীটি পরিচালক অজিত সেন বলেছেন এখন এক দৃষ্টিকোণ থেকে যা চলচ্চিত্রের ভাষ্যে এখনও সার্বজনীন হয়ে উঠতে সক্ষম হয়নি তাঁর পরিচালনগুণে অবশ্য কাহিনী বুঝতে কারও খুব একটা অসুবিধায় পড়তে হয়নি। 'ফ্লাশব্যাক প্রথায় গল্পটি ক্রমাগত বলার প্রয়াসটুকুর মধ্যে অবশ্যই নতুনত্ব আছে কিন্তু রসগ্রহণের প্রশ্নে সাধারণ দর্শকের কাছে তা যে কতটুকু আবেদন আনতে পারবে। বলা মুস্কিল।

অভিনয় করেছেন সকলেই প্রথমশ্রেণীর। সর্বপ্রথম নাম আসে নির্মলকুমারের, দীর্ঘদিন বাদে তাঁর এই বলিষ্ঠ অভিনয় প্রত্যেকটি দর্শককে মুগ্ধ করেছে চরিত্র চিত্রণে তাঁর আন্তরিকতা সর্বদাই স্মরণযোগ্য, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় অপূর্ব অভিনয় করেছেন কিছু স্থানে স্থানে 'লেভেল' ঠিক রাখতে পারেননি অনিল চট্টোপাধ্যায়ের সাবলীল অভিনয় আমরা যেমনটি আশা করেছিলাম তেমনটি পেয়েছি। সন্ধ্যা রায় যাদাবরীর চরিত্রটি এঁকেছেন সুনিপুণ ভাবে। সন্ধ্যারাণীর অভিনয় আশানুরূপ হয়েছে। অন্যান্য প্রত্যেকটি চরিত্র সুঅভিনীত।

আলোকচিত্র গ্রহণ করেছেন অনিল গুপ্ত। চিত্রের প্রথমাংশটুকু সম্বন্ধে জোর করে কিছু বলা যায় না বটে কিন্তু তারপর থেকে শেষ পর্যন্ত তার ফটোগ্রাফী কাহিনীর নাটকীয় মেজাজকে রক্ষা করেছে।

সুরারোপ করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। সন্ধ্যা রায়ের মুখে গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া গানটি সুগীত। এচিত্রে আবহ সঙ্গীত রচনায় তার অবদান স্মরণীয়। 'এ মণিহার আমায় নাহি সাজে' গানটি আবহ সঙ্গীতের মাধ্যমে বাজিয়ে তিনি যে নাটককে কতখানি সাহায্য করেছেন তা প্রায় প্রত্যেকটি দর্শকই হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়েছেন।

সম্পাদনার কাজটি লক্ষ্যণীয়, কিন্তু লেবরেটরীর কাজ অপরিচ্ছন্ন বলে ধরা পড়েছে পর্দায়। শব্দ গ্রহণ প্রশংসনীয়। কলাকৌশলের অন্যান্য কাজ আশানুরূপ হয়েছে।

সংবাদ পরিক্রমা :

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'অভিযান' চিত্রের কাজ বর্তমানে প্রায় শেষের দিকে। তাঁর পরবর্তী চিত্র সম্বন্ধে চিত্রামোদী মহলে জল্পনা কল্পনার শেষ নেই। কিছুদিন আগে শোনা গিয়েছিল তিনি এরপর নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'মহানগরী' অবলম্বনে চিত্র নির্মাণ করবেন ; ইদানীং শোনা যাচ্ছে তাঁর পরবর্তী চিত্রের পরিকল্পনা চলেছে 'সোপী গায়েন-বাঘা বায়েন' গল্পকে অবলম্বন করে।

প্রাচীন বঙ্গদেশের পটভূমিতে এই গল্পটি সত্যজিৎ রায়ের পিতামহ কর্তৃক লিখিত।

*

মৃণাল সেন তাঁর 'পুনশ্চ' চিত্রের পর আবার চিত্র-নির্মাণে অগ্রসর হয়েছেন। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখিত ও মৃণাল সেন কর্তৃক স্বয়ং চিত্রনাট্যায়িত 'অবশেষে' চিত্রের কাজ সুরু হয়েছে টেকনিশিয়ান্স ষ্টুডিওতে। আলোকচিত্র গ্রহণ করছেন ক্যামেরাম্যান শৈলজা চট্টোপাধ্যায় ও শিল্প নির্দেশনা করছেন বংশীচন্দ্র গুপ্ত। নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। বসন্ত চৌধুরী রয়েছেন নায়কের চরিত্রে।

কুমারী মন চিত্রের একটি দৃশ্যে : জ্ঞানেশ মুখার্জী ও অনিল চট্টোপাধ্যায়।

* *

রাজেন তরফদার তাঁর 'অগ্নিশিখা' চিত্রের পর তাঁর পরবর্তী চিত্র, প্রযোজক অমর দত্ত মহাশয়ের 'চৌধুরী বাড়ি' চিত্রনাট্যে ব্যস্ত আছেন। কাহিনীকার হচ্ছেন ডাঃ বিশ্বনাথ রায়। বাংলাদেশের জনপ্রিয় শিল্পী সমন্বয়ে "চৌধুরী বাড়ি" চিত্রের কাজ অনতিবিলম্বে সুরু হবে।

* *

জনপ্রিয় নায়ক উত্তমকুমার এবার স্বয়ং চিত্রপ্রযোজনায় অগ্রসর হচ্ছেন প্রতিষ্ঠিত পরিচালকদের নিয়ে। এ পর্যন্ত উত্তমকুমার অনেকগুলি চিত্রকাহিনী সত্ত্ব ক্রয় করেছেন যার প্রথমটি তিনি করছেন পরিচিত পরিচালক মানু সেনকে দিয়ে। আলোচনায় জানা গেছে তপন সিংহকে দিয়ে সুবোধ ঘোষের বিখ্যাত উপন্যাস "জতুগৃহ", অসিত সেনকে দিয়ে নীহাররঞ্জন গুপ্ত মহাশয়ের "উত্তর ফাল্গুনী" চিত্রটি পর পর চিত্রায়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। উত্তমকুমার প্রযোজক হিসাবে নিতান্ত নবাগত না হলেও এতগুলি ছবির দায়িত্ব এক সাথে নিয়েছেন এদিক দিয়েও তিনি এক নতুন নজীর সৃষ্টি করতে চলেছেন। আমরা তাঁর সাফল্য কামনা করছি।

* *

প্রখ্যাতনামা গায়ক শ্যামল মিত্র এবারে চিত্র প্রযোজনায় ব্রতী হয়েছেন। তিনি পর পর দু'টি চিত্র নির্মাণের সঙ্কল্প নিয়েছেন। উত্তমকুমারকে নায়ক ভূমিকায় রেখে তাঁর প্রথম ছবি 'স্বর্ণস্বাক্ষর' পরিচালনা করবেন অগ্রদূত পরিচালক গোষ্ঠী। দ্বিতীয় চিত্রটি করাবেন তিনি পরিচালক সুধীর মুখার্জীকে দিয়ে। ভূমিকালিপিতে রয়েছেন যথাক্রমে নায়কের চরিত্রে অনিল চট্টোপাধ্যায় ও নায়িকার চরিত্রে সুলতা চৌধুরী।

* *

সমরেশ বসু লিখিত "নির্জন সৈকতে" চিত্রের কাজ সুরু করেছেন বাংলা দেশের সফলতম পরিচালক তপন সিংহ। তিনি নিজেই এর চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। প্রযোজনা করছেন 'হাতীমার্কা' এন. টির সরকার প্রোডাকশনস্। নায়ক নায়িকার ভূমিকায় রয়েছেন যথাক্রমে অনিল চট্টোপাধ্যায় ও শর্মিলা ঠাকুর। অন্যান্য

চরিত্রগুলিতে অভিনয় করেছেন, তরুণ মজুমদার চট্টোপাধ্যায়, অমর মল্লিক, ছায়া দেবী,

অনাগত সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি নবাগত। বিখ্যাত ক্যামেরাম্যান অনিল গুপ্ত এ ছবির আলোকচিত্র প্রধান সহকারী পরিচালক রবীন চট্টোপাধ্যায় চিত্রের সুরকার—কণ্ঠে শিল্প অনিল চট্টোপাধ্যায় ও

'সূর্য শিখা'

তরুণতর

অভিনব প্রেমের সহকারী পার্থপ্রতিম রায়চৌধুরী রূপালীর প্রযোজনায় সুরু করছেন তাঁর আশাপূর্ণা দেবীর "ছায়া সূর্য" ছবিটি। প্রস্তুত করছেন মৃণালকান্তি চট্টোপাধ্যায়। "ছায়া সূর্য" চিত্রের নায়ক নায়িকার ভূমিকায় অবতরণ করছেন যথাক্রমে নির্মলকুমার ও শর্মিলা ঠাকুর। সংগীত বাবলুরা এবং আলোকচিত্র

সাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরীর বহুপঠিত উপন্যাস "দ্বীপের নাম টিয়া রং" এর চিত্রনাট্য রচনা করছেন ঋত্বিক ঘটক। চিত্রের পরিচালনা করছেন সুরু বাগচী। বাংলা দেশের প্রখ্যাতনামা সহকারী পরিচালকদের

শিল্পি সংস্থার প্রযোজনায় রাধা ফিল্ম স্টুডিওতে অগ্রসৃত গোষ্ঠীর পরিচালনায় গৃহীত হচ্ছে "নবদিগন্ত" নামে চিত্রটি। পূর্বে এই চিত্রের নাম ছিল "ভাঃ চৌধুরী" সম্প্রতি এক ঘোষণায় নাম পরিবর্তনের কথা জানা গেছে। ভূমিকায় পূর্ববৎ সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও বসন্ত চৌধুরী নায়ক নায়িকার চরিত্রে রূপদান করছেন। সন্ধ্যা রায় এই চিত্রের একটি বিশিষ্ট চরিত্র রূপায়িত করছেন।

•

ছায়া ছবি প্রতিষ্ঠানের হয়ে পরিচালক সলিল দত্ত স্বরচিত কাহিনী ও চিত্রনাট্যে দ্রুত শুটিং করছেন তাঁর প্রথম ছবি "সূর্য শিখা" চিত্রের। প্রধান ভূমিকা নিতে রয়েছেন বাংলা দেশের দুই জনপ্রিয় শিল্পী—উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া চৌধুরী। সংগীত ও আলোকচিত্র পরিচালনা করছেন যথাক্রমে রবীন চট্টোপাধ্যায় ও বিজয় ঘোষ।

• •

ঋত্বিক ঘটক স্বরচিত চিত্রনাট্য তুলছেন "সুবর্ণরেখা"। আর দিন দুয়েক শুটিং করলে চিত্রটি প্রাথমিক নির্মাণ কার্য শেষ হবে বলে ঋত্বিক ঘটক জানিয়েছেন। বোম্বের অভি ভট্টাচার্য 'সুবর্ণরেখা' চিত্রের প্রধানতম চরিত্রে অভিনয় করছেন। নায়িকার চরিত্রে রূপদান করছেন মাধবী মুখোপাধ্যায়। একটি টাইপ চরিত্র সৃষ্টি করেছেন জহর রায়। বাহাদুর খাঁ 'সুবর্ণরেখার' সংগীত পরিচালক এবং দিলীপ মুখোপাধ্যায় আলোক চিত্র গ্রাহক। রমেশ যোশী চিত্রের সম্পাদক।

• •

"মিস্টার এণ্ড মিসেস চৌধুরী" চিত্রের সাফল্যের পর পরিচালক অসীম পাল পুনরায় চিত্র নির্মাণে অগ্রসর হয়েছেন সম্প্রতি। শৈলেশ দের "মহাকালীর মায়না" গল্প অবলম্বনে স্বরচিত চিত্রনাট্যে তিনি 'দুই বাড়ী' চিত্রটি সুরু করেছেন রাধা কিম্ব স্টুডিওতে। নায়ক ও নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করছেন অনিল চট্টোপাধ্যায় ও তন্দ্রা বর্মণ। এ ছাড়া পার্শ্ব চরিত্রগুলিতে রয়েছে পাহাড়ী সান্যাল, জহর রায়, জহর গাঙ্গুলী, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, রেণুকা রায় ও রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি আরও অনেকে। আলোকচিত্র, সম্পাদনা এবং সংগীত পরিচালনায় রয়েছেন যথাক্রমে কানাই দে, অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায় ও কালীপদ সেন।

• •

পরিচালক চিত্ত বসু তার সদ্যসমাপ্ত চিত্র শুভদৃষ্টির সম্পাদনায় ব্যস্ত। 'শুভদৃষ্টি' চিত্রে নায়ক ও নায়িকার ভূমিকায় রয়েছেন 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' খ্যাত অরুণ মুখোপাধ্যায় ও সুপরিচিতা নায়িকা সন্ধ্যা রায়। বাংলা দেশের বহু প্রখ্যাতনামা শিল্পী এ চিত্রে অংশ গ্রহণ করেছেন। ছবিটি মুক্তি প্রতীক্ষায় রয়েছে।

• •

প্রযোজক তারা বর্মণ এর পঞ্চমতম নিবেদন, কমল মজুমদার পরিচালিত 'অভিসারিকা' চিত্রের কাজ সম্পূর্ণ শেষ হয়ে বর্তমানে মুক্তি প্রতীক্ষায় রয়েছে। নির্মল-কুমার ও সুপ্রিয়া চৌধুরী অভিনীত এই চিত্রটি আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি কলকাতার প্রেক্ষাগৃহগুলিতে 'তাস পিকচার্সের' পরিবেশনায় মুক্তি লাভ করবে। এ চিত্রের আলোক চিত্রগ্রাহক, সম্পাদনা, শিল্প নির্দেশনা ও সংগীত পরিচালনায় রয়েছেন যথাক্রমে দীনেন গুপ্ত, কমল গাঙ্গুলী, সুনীত মিত্র ও সলীল চট্টোপাধ্যায়।

• •

বোম্বেতে ধীরে ধীরে বাংলা দেশের নায়িকা সুপ্রিয়া চৌধুরী তাঁর স্থান করে নিচ্ছেন স্থানীয় প্রতিযোগিতার মধ্যেও। কিশোরকুমার পরিচালিত—বর্তমানে সমাপ্ত প্রায় "দূর গগন কী ছাঁও মে" চিত্রটিতে তিনি কিশোর বিপরীতে নায়িকার ভূমিকায় সাবলীল অভিনয় করছেন। সম্প্রতি বোম্বের অন্যতম প্রগতিশীল পরিচালক মহেশ কাউল এর একটি হিন্দি চিত্রে তিনি নায়িকার ভূমিকায় স্বাক্ষর করেছেন। এ ছাড়া জনপ্রিয় মারাঠী চিত্র পরিচালক সদাশিব রাও কবি তাঁর হিন্দি চিত্র "বেগানা" চিত্রে সুপ্রিয়া চৌধুরীকে নায়িকার চরিত্রে অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ করেছেন।

• •

অবশেষে এগিয়ে এসেছেন বিখ্যাত শান্তারাম! তাঁর বহুদিনের ইচ্ছা একটি বাংলা চিত্র নির্মাণের—বাংলা চিত্রের উৎকর্ষতা তাকে বারংবার মুগ্ধ করেছে বলেই তাঁর এই সদিচ্ছা। সম্প্রতি "কাঁচের স্বর্গ" চিত্রের সাফল্যের পর পরিচালক 'যাত্রিক গোষ্ঠী' যখন আর একটি নাটকীয় চিত্র নির্মাণের পরিকল্পনা করছিলেন—অকস্মাৎ তাঁরা নিমন্ত্রণ পেলেন শান্তারামের কাছ থেকে—বোম্বেতে তিনি "যাত্রিক" গোষ্ঠীকে দিয়ে একটি বাংলা চিত্র প্রযোজনা করবেন। এরা রাজী হলেন—গল্প স্থির হল মনোজ বসুর 'পলাতক'। অনুপকুমার প্রধান চরিত্রে অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হলেন—হলেন আর আর প্রয়োজনীয় কলাকুশলীরা ও অভিনেতৃবর্গ।

• •

বোম্বেতে ইতিপূর্বে অনেক বাংলা ছবি হয়েছে, কিন্তু 'যাত্রিক' গোষ্ঠীর মত এমন নিষ্ঠাবান চলচ্চিত্র কুশলীদের সেখানে শান্তারামের সৌজন্যে চিত্র নির্মাণের মত ঘটনা একটি অতি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা বলে বিশ্বাস করি। বাংলা দেশের কলাকুশলীদের প্রশংসায়

সারা দেশ ভরে উঠুক এই কামনাই আজ করি। 'যাত্রিক' গোষ্ঠী তাদের প্রচেষ্টায় সাফল্যমণ্ডিত হবেন বলে আমরা পূর্বাহ্নেই আমাদের অভিনন্দন জানিয়ে রাখি।

* *

প্রখ্যাতনামা সংগীত পরিচালক সলিল চৌধুরীকে এবার চিত্র পরিচালক রূপে দেখতে পাওয়া যাবে; বোম্বে প্রত্যাগত এই সংগীত পরিচালক কলকাতার একটি স্টুডিওতে "অমৃতস্য পুত্রাঃ" নামক গল্পটি চিত্রায়িত করবেন স্বরচিত চিত্রনাট্যে। এই চিত্র কাহিনীর প্রধান দুটি চরিত্রে অংশ গ্রহণ করবেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায় ও তরুণ কুমার। এখনও কলাকুশলী নির্বাচনের বিষদ তালিকা অবশ্য পাওয়া যায় নি। কিন্তু এ চিত্রের সংগীত পরিচালনা করবেন স্বয়ং সলিল চৌধুরী।

চিত্র পরিচালনার ব্রতী অগ্রগামী সোষ্ঠী ইদানিং তাঁদের সর্বাধুনিক নিবেদন রবীন্দ্রনাথের গল্প অবলম্বনে "নিশীথে" চিত্রের কাজ সম্পূর্ণ করছেন। সম্প্রতি তাঁরা আরও দুটি চিত্র পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছেন—প্রথমটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্প অবলম্বনে "দুইবোন" ও অপরটি সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের এক ছোটগল্প অবলম্বনে নাট্যায়িত চিত্র কাহিনী। অনতিবিলম্বে তাঁরা ছবি দুটির কাজ সুরু করবেন স্থানীয় একটি স্টুডিওতে।

*

উত্তমকুমার তাঁর নিজস্ব প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান মারফৎ সুপরিচিত পরিচালক অজয় কর মহাশয়ের দ্বারা শরৎচন্দ্রের "গৃহদাহ" চিত্রটি পুনরায় চিত্রায়নের উদ্যোগ নিয়েছেন। "গৃহদাহ" চিত্রের প্রথম সংস্করণটি নির্মাণ করেছিলেন প্রখ্যাতনামা পরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়া এবং প্রধান চরিত্রটিতে স্বয়ং তিনি অভিনয় করেছিলেন। বর্তমানে এ চিত্রের প্রধান ভূমিকায় উত্তমকুমারকেই দেখা যাবে।

কার্লোভিভেরি চলচ্চিত্র উৎসব :

সম্প্রতি কার্লোভিভেরি চলচ্চিত্র উৎসবে জুরীদের বিচারে এ বছরের প্রথম পুরস্কার লাভ করে সোভিয়েত চিত্র "নাইন ডেজ অফ্ ওয়ান আওয়ার" ছবিটি। উৎসবের প্রধান পুরস্কার দুটি লাভ করে পর্যায়ক্রমে একটি বৃটিশ ছবি ও অপর একটি ইতালীয়ান চিত্র। টনি রিচার্ডসন পরিচালিত বৃটিশ চিত্রটির নাম "এ টেস্ট অফ্ হনি" ইতালীয় চিত্রটির নাম "আকাটোন"। ভারতীয় প্রতিযোগী চিত্র 'গঙ্গা যমুনা' এই উৎসবে পুরস্কৃত হয় এবং দিলীপকুমার তার 'গঙ্গা যমুনা' চিত্রে অভিনয়ের জন্য উৎসব কমিটির কাছে বিশেষ ডিপ্লোমা লাভ করেন।

'কার্লোভিভেরী' উৎসবে দেশ বিদেশের জুরীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ভারতীয় চিত্রাভিনেত্রী পদ্মশ্রী উপাধি প্রাপ্তা শ্রীমতী নার্গিস।

সিডনী ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল :

সম্প্রতি সিডনীতে আয়োজিত বিশ্ব চলচ্চিত্র উৎসবে বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্র ইতিমধ্যেই প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়েছে। ভারত সরকার ফেস্টিভ্যাল কমিটির আহ্বানে পাঠিয়েছেন সত্যজিৎ রায় পরিচালিত "পোস্ট মাস্টার ও সমাপ্তি" চিত্রদ্বয়।

কান্ ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল :

বাংলা দেশের জনপ্রিয় নায়ক অনিল চট্টোপাধ্যায়কে তাঁর আহ্বান চিত্রে অভিনয়ের উৎকর্ষতা লক্ষ্য করে ফেস্টিভ্যাল কমিটি স্বয়ং এক নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছিলেন ফেস্টিভ্যালে যোগদানের জন্য। কিন্তু বর্তমানে অনিল চট্টোপাধ্যায় দেশের বাইরে যাওয়া সম্ভব নয় বলে দুঃখের সাথে তাঁদের সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হয়েছেন তিনি। অনিল চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি বহুসংখ্যক চিত্রে নায়কের ভূমিকায় অভিনয়ে চুক্তিবদ্ধ।

ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জী

● প্রমোদ সেনগুপ্ত

জুলাই

[বিশ্ব ইতিহাসের স্মরণীয় ঘটনাগুলিকে জিজ্ঞাসু পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত করিবার প্রয়াসেই এই ঘটনাপঞ্জী সংকলন করা হইতেছে। এই সংকলন ত্রুটিমুক্ত নয়। কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এই তালিকা হইতে বাদ পড়িয়াছে। পাঠকগণ যদি এই 'ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জী' সংকলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন তবে ভ্রান্তির পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় এই সংকলনটি সম্পূর্ণ হইতে পারে। বিশ্ব ইতিহাসের বিশেষ করিয়া বাংলাদেশের প্রধান ঘটনাবলীর নির্ভুল সন ও তারিখ পাঠকদের প্রেরণ করিতে অনুরোধ করা হইতেছে। এইরূপ সংযোজন স্বীকৃতি সহযোগে ঘটনাপঞ্জীতে স্থান লাভ করিবে।

—সম্পাদক বি: শ:]

১লা—১৮০৪, ফরাসী লেখিকা জর্জ সাঁদের জন্ম (মৃত্যু—৮ই জুন ১৮৭৬)।

—১৮৫৭, বিদ্রোহীদের দ্বারা লক্ষ্ণৌ অবরোধ।

—১৮৮২, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জন্ম। (মৃত্যু—১লা জুলাই ১৯৬২)।

—১৯২১, চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা।

—১৯৫২, উত্তর প্রদেশে জমিদারী বিলোপ আইন প্রচলন।

—১৯৫৩, কলিকাতায় ট্রামভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু।

—১৯৫৪, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় হাই কমিশনারের অফিস অপসারণ।

২রা—১৮০০, ইংলণ্ডের সহিত আয়ার্লণ্ডের মিলন।

—১৯৫৪, গুয়াটেমালায় সরকার ও বিদ্রোহীদের মধ্যে শান্তি স্থাপন।

৩রা—১৮৬৬, সাডোয়ার যুদ্ধে প্রুশিয়ার নিকট অষ্ট্রিয়ার পরাজয়।

৪ঠা—১৭৭৬, আমেরিকার জনসাধারণ কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণা।

—১৮০৭, ইটালীর স্বাধীনতা ও সংগ্রামের অন্যতম নায়ক গ্যারিবল্ডির জন্ম (মৃত্যু—২রা জুন ১৮৮২)।

—১৯০২, স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যু।

—১৯৪২, নাৎসী বাহিনীর হাতে সেবাস্তোপোলের পতন।

—১৯৪৬, যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ফিলিপাইনের "স্বাধীনতা" স্বীকার।

—১৯৪৮, কাশ্মীরে ভারতীয় সেনাধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার ওসমান যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত।

—১৯৫৩, ট্রামভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে কলিকাতায় সাধারণ ধর্মঘট; পুলিশের গুলিতে ৩জন নিহত।

৫ই—১৯২৩, বার্দপুরে ধর্মঘটী শ্রমিকদের উপর পুলিশের গুলিবর্ষণ।

৬ই—১৪১৫, ক্যাথলিক চার্চ কর্তৃক বোহেমিয়ার সংস্কারক

জন হাসকে জীবন্ত দগ্ধ করিয়া হত্যা। (জন্ম—১৩৬২)।

—১৮৫৭, কলিকাতায় প্রথম গ্যাস বাতির প্রবর্তন।

—১৮৫৮, ইংরেজ অর্থনীতিজ্ঞ জন হবসনের জন্ম (মৃত্যু—১লা এপ্রিল ১৯৪০)।

—১৮৯০, ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের জন্ম (মৃত্যু—১৪ই আগষ্ট, ১৯৩৬)।

—১৯১৭, পুণাতে ভাণ্ডারকার ওরিয়ন্টাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট স্থাপিত।

—১৯১৯, মঙ্গোলীয়ার জনগণতন্ত্র স্থাপিত।

—১৯৪৮, রামোদর স্যালী কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা।

—১৯৫৫, বেলগ্রেডে নেহেরু-টিটো যুক্ত বিবৃতি।

—১৯৬২, নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যিক উইলিয়ম ফকনারের মৃত্যু। (জন্ম : ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৮৯৭)।

৭ই—১৮১৬, ইংরাজ ঔপন্যাসিক ও বাগ্মী শেরিডানের মৃত্যু।

—১৮৮৪, জার্মান লেখক লেয়ন ফএষ্ট ভাঙ্গলারএর জন্ম।

—১৯৩৭, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক প্রদেশে কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব গ্রহণে সম্মতিদান।

—১৯৩৭, "মার্কোপোলো ব্রীজ ঘটনা"র ফলে চীন ও জাপানের মধ্যে যুদ্ধারম্ভ।

—১৯৫০, দক্ষিণ আফ্রিকায় আফ্রিকা ও এশিয়াবাসীদের পৃথক করার জন্য "গ্রুপ এরিয়া বিল" পাশ।

৮ই—১৬২১, ফরাসী লেখক লা ফন্টেইনের জন্ম (মৃত্যু—১৬৯৫)।

—১৭০৯, পোলটাভার যুদ্ধে পিটার দি গ্রেটের নিকট সুইডেনের রাজা দ্বাদশ চার্লসের পরাজয় ও রুশ-সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়।

—১৭৯৭, ইংরেজ রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ এডমন্ড বার্কের মৃত্যু (জন্ম—১৭২৯)

—১৮৫৩, ৪টি যুদ্ধ জাহাজ লইয়া আমেরিকার কমোডর পেরীর জাপানে আগমন ও তাঁহার "স্বাধীন বাণিজ্যের" দাবী।

—১৯৪০, মার্শাল পেতাঁ কর্তৃক ফ্রান্সকে একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্র রূপে ঘোষণা।

—১৯৪৮, শ্রীরাজাগোপালাচারী কর্তৃক কংগ্রেস-মুসলীম লীগ বোঝাপড়ার ভিত্তি হিসাবে নূতন প্রস্তাব ঘোষণা।

—১৯৪৪, ভারতে খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রত্যাহার।

৯ই—১৯০৫, লর্ড কার্জন কর্তৃক বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত ঘোষণা।

—১৯৪৮, ভারতের পাওনা ষ্টার্লিং পরিশোধ সম্পর্কে ইঙ্গ-ভারত চুক্তি স্বাক্ষর।

—১৯৫২, অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় হেলসিংকিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রথম যোগদান।

১০ই—১৫০৯, সুইস ধর্ম-সংস্কারক জন ক্যালভিনের জন্ম (মৃত্যু—২৭শে মে ১৫৬৪)।

—১৭৫৭, ক্লাইভ কর্তৃক বাংলার শেষ নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা নিহত।

—১৮২০, অক্ষয়কুমার দত্তের জন্ম (মৃত্যু—১৮ই মে ১৮৮৬)।

—১৮৬৬, রুশ সার্জন ও শরীরতত্ত্ববিদ ভোরোনভের জন্ম (মৃত্যু—১লা সেপ্টেম্বর ১৯৫১)।

—১৮৭১, ফরাসী লেখক মার্শেল প্রুস্ত্-এর জন্ম (মৃত্যু—১৮ই নভেম্বর ১৯২২)।

—১৮৮৮, জাপ সাহিত্যিক টোইওহিকো কাগাওার জন্ম।

—১৯৪৩, মিত্রবাহিনী কর্তৃক সিসিলি আক্রমণ।

—১৯৫১, কোরিয়াতে যুদ্ধ বিরতির আলোচনা শুরু।

—১৯৫৩, বেরিয়ার অপসারণ ও গ্রেপ্তার; ২৩শে ডিসেম্বরে আরও ৬ জনের সহিত প্রাণদণ্ড।

১১ই—১৭৯৩, ফরাসী বিপ্লবী নেতা মারাতের হত্যা। হত্যাকারী সারলট কর্ডেকে বিপ্লবী ট্রাইবুনাল কর্তৃক ১৭ই জুলাই গিলোটিনে প্রাণদণ্ড।

—১৮২৩, কলিকাতায় বাষ্পচালিত পোতের প্রথম আগমন।

—১৯০৩, ধর্মঘট বেআইনী করিবার বিলের বিরুদ্ধে সারা জাপানে জাতীয় ধর্মঘট।

১২ই—১৪৫০, ইংলণ্ডে কৃষক বিদ্রোহের নেতা জন কেড এর যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু।

—১৯০৪, চিলির জাতীয় কবি পাবলো নেরুদার জন্ম।

১৩ই—১৮১৩, সাহ সুজাকে পরাজিত করিয়া রণজিৎ সিংহের "কোহিনুর" উদ্ধার।

—১৮৭৪, সাঁওতাল বিদ্রোহের সূচনা।

—১৯৪৬, মার্কিন কংগ্রেস কর্তৃক ব্রিটেনকে ডলার ঋণদানের প্রস্তাব অনুমোদন।

১৪ই—১৭৮৯, ফরাসী বিপ্লবের সূচনা—"বাস্তিল" কারাগার ধ্বংস।

—১৯৪৫, ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে ব্যর্থতা ঘোষণা পূর্বক সিমলা সম্মেলনের পরিসমাপ্তি।

১৫ই—১৮৪১, রুশ কবি ও সাহিত্যিক লেরমন্টভের মৃত্যু (জন্ম—১৮১৪)।

—১৮৫৭, —কানপুরে ইংরেজের হত্যা।

—১৯৩৭, মস্কো ভলগা খালের উদ্বোধন।

১৬ই—১৯১৮, বিপ্লবীদের নির্দেশে রাশিয়ার সর্বশেষ সম্রাট জার দ্বিতীয় নিকোলাসের প্রাণদণ্ড।

—১৯৪৫, নিউ মেক্সিকোর মরুভূমিতে পরীক্ষামূলক-ভাবে প্রথম আণবিক বোমা বিস্ফোরণ।

১৭ই—১৮৭০, ফ্রান্স ও প্রুশিয়ার মধ্যে যুদ্ধারম্ভ।

১৮ই—১৮৫৭, বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত।

—১৯০৬, আমেরিকান নাট্যকার ক্লিফোর্ড ওডেটস্-এর জন্ম।

—১৯২০, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত।

—১৯৩৬, স্পেনে গৃহযুদ্ধের সূচনা।

—১৯৪৪, জাপানের উগ্র যুদ্ধবাদী তোজো সরকারের পতন।

—১৯৪৭, ভারতীয় স্বাধীনতা আইনে ব্রিটিশ সম্রাটের সম্মতিদান।

—১৯৪৮, ব্রহ্মদেশে রাকোসী সরকারের অপসারণ।

১৯শে—১৯০৫, আমেরিকান সাংবাদিক এডগার স্নোর জন্ম।

—১৯০৯, মালয়ালী কবি আন্না বালমানির জন্ম।

—১৯৫৬, আসোয়ান ড্যাম নির্মাণের জন্য আমেরিকা কর্তৃক মিশরকে ঋণদানে অস্বীকৃতি।

২০—১৮৮০, জার্মান দার্শনিক কাউট কাইজারলিং-এর জন্ম (মৃত্যু—২৫শে এপ্রিল ১৯৪৬)।

—১৯০৫, বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে ব্রিটিশ পণ্যদ্রব্যের বয়কট আন্দোলন শুরু।

—১৯৪৪, কয়েকজন জার্মান হিটলারের প্রাণনাশের চেষ্টা।

—১৯৫২, মিশরে জেনারেল নাগীবের ক্ষমতা দখল ও ২৩শে জুলাইতে রাজা ফারুকের রাজ্য ত্যাগ; ১৮ই জুন, ১৯৫৩, মিশরের গণরাষ্ট্র ঘোষণা।

—১৯৫৪, জেনেভায় ৫৬ দিন আলোচনার পর নয়টি রাষ্ট্র কর্তৃক ইন্দোচীনে যুদ্ধ বিরতি চুক্তি স্বাক্ষর।

২১শে—১৮৯৮, নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত আমেরিকান লেখক আরনেষ্ট হেমিংওয়ের জন্ম। "ফেয়ারওয়েল টু আর্মস" ১৯২৯, "ফর হুম দি বেল টোলস্" ১৯৪০।

১৮৮৬, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু।

—১৯১১, গুজরাটি কবি ও সাহিত্যিক উমাশঙ্কর জোশীর জন্ম।

—১৯১৩ ফিলিপাইনস মুক্তি সংগ্রামের নেতা লুইস তারুকের জন্ম।

—১৯৪৬, শ্যামদেশের রাজা আনন্দ মহিদলের রহস্যজনক মৃত্যু।

—১৯৪৮, কমিনফর্ম হইতে যুগোস্লাভিয়া বহিষ্কৃত।

—১৯৫৪, ইন্দোচীনে ছাত্র-বিক্ষোভকারীদের উপর পুলিশের গুলিবর্ষণ। ২০ জন হত ও ৪০ জন আহত।

২২শে—১৮২২, জার্মান বৈজ্ঞানিক মেণ্ডেলের জন্ম (মৃত্যু—৬ই জানুয়ারী ১৮৮৪)। বংশ পরম্পরাগত গুণাধিকার নিয়মের আবিষ্কারক।

—১৯৩০, কারারুদ্ধ অবস্থায় দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের মৃত্যু।

—১৯৪৬, ফেরুজালেমের ব্রিটিশ হেডকোয়ার্টার সন্ত্রাসবাদীদের বোমা নিক্ষেপে বিধ্বস্ত।

—১৯৪৭, গণপরিষদ কর্তৃক ভারতের অশোকচক্র শোভিত নিশান গ্রহণ।

—১৯৫০, রাজা লিওপোল্ডের সিংহাসন আরোহণের প্রতিবাদে বেলজিয়ামের জনসাধারণের বিদ্রোহ; ১লা আগষ্টে লিওপোল্ডের রাজ্য ত্যাগ।

—১৯১৩, পুলিশ কর্তৃক কলিকাতা ময়দানে সংবাদ-সংগ্রহরত সাংবাদিকদের প্রহার ও গ্রেপ্তার।

—১৯১৫, ভারতের অন্তর্গত কচ্ছ রাজ্যে সাংঘাতিক ভূ-কম্পন। আনজার সহর ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রভূত ক্ষতি।

২৩শে—১৮৫৬, মহারাষ্ট্রীয় রাজনীতিক বাল গঙ্গাধর তিলকের জন্ম।

—১৮৯৮, সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম।

২৪শে—১৭৮৩, দক্ষিণ আমেরিকার বিপ্লবী নেতা ও রাষ্ট্র-নীতিজ্ঞ সাইমন বলিভারের জন্ম (মৃত্যু—১৭ই ডিসেম্বর ১৮২০)।

—১৮০২, ফরাসী লেখক আলেক্সান্ডার ডুমার জন্ম (মৃত্যু—৫ই ডিসেম্বর ১৮৭০)।

—১৮৮১, রুশ সমালোচক ও লেখক নিকোলাই চের্নেশেভস্কির জন্ম (মৃত্যু—১৮৮৯)।

—১৮৭০, কালীপ্রসন্ন সিংহের মৃত্যু (জন্ম—১৮৪০)।

—১৮৮৭, প্রসিদ্ধ বাগ্মী কৃষ্ণদাস পালের মৃত্যু।

—১৯২০, লোজানে তুরস্কের সহিত মিত্রশক্তির সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত।

—১৯২৬, বোম্বাইর প্রেসিডেন্সীর অর্থমন্ত্রী শ্রীচিন্তামন দেশমুখের পদত্যাগ।

২৫শে—নাৎসী সন্ত্রাসবাদীগণ কর্তৃক অষ্ট্রিয়ার চ্যান্সেলার ডাঃ ডলফাস নিহত।

—১৯৪৩, ইতালীর সর্বময় কর্তা মুসোলিনীর পদচ্যুতি ও গ্রেপ্তার।

—১৯৪৬, নয়া দিল্লীতে পর্টুগালের লিগেসন বন্ধ করিয়া দিবার জন্য ভারত সরকারের দাবী।

২৬শে—১৮০০, ফ্রান্সে বিপ্লবের ফলে ফুরবো সম্রাট অষ্টাদশ লুই-র সিংহাসনচ্যুতি ও তৎস্থলে লুই ফিলিপের সিংহাসনারোহন।

—১৮৫৬, অর্জ বার্নার্ড শ-এর জন্ম (মৃত্যু—২রা নভেম্বর ১৯৫০)।

—১৮৯১, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের [illegible] সেপ্টেম্বর ১৮৯১)

—১৮৯৪, [illegible]

—১৯৪৪, মিত্র শক্তিবর্গের পটাসডামের ঘোষণা।

১৯৪২, মিশরের রাজা ফারুকের সিংহাসনচ্যুতি ও নির্বাসন।

—১৯৪৬, মিশর কর্তৃক সুয়েজখাল জাতীয়করণ।

২৭শে—১৮৫৭, কুমার সিংহের বিদ্রোহ ঘোষণা।

১৯৫৩, উত্তর কোরিয়া ও চীনের মধ্যে যুদ্ধ বিরতির চুক্তি স্বাক্ষরিত।

—১৯৫৪, ইজিপ্টের খাল অঞ্চল হইতে ইংলণ্ড কর্তৃক ৭৩,০০০ সৈন্য ২০ মাসের মধ্যে অপসারণ করিবার জন্য ব্রিটেন-ইজিপ্ট চুক্তি স্বাক্ষর।

—১৯৫৫, ব্রিটেনে সাধারণ নির্বাচনের ফলে চার্চিল সরকারের পদচ্যুতি ও এটলির নেতৃত্বে শ্রমিকদলের সরকার গঠন।

২৮শে—১৭৫০, জার্মান সঙ্গীতজ্ঞ সেবাস্তিয়ান বাখ-এর মৃত্যু (জন্ম—১৬৮৫)।

—১৭৯৪, ফরাসী বিপ্লবী নেতা রোবসপিয়ের প্রাণদণ্ড।

১৮০৪, জার্মাণ দার্শনিক লুডভিগ ফয়ারবাখের জন্ম (মৃত্যু—১০ই সেপ্টেম্বর ১৮৭২)।

—১৮৪৮, কলিকাতায় প্রথম বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন।

—১৯১৪, অষ্ট্রিয়া কর্তৃক সার্বিয়া আক্রমণ।

—১৯৪৩, জার্মানীর প্রেসিডেন্ট ও সমরনায়ক হিণ্ডেনবুর্গের মৃত্যু।

—১৯৪৩, ইটালীতে ডেগাসপেরী সরকারের পতন।

২৯শে—১৮৭০, ঐতিহাসিক সুরেন্দ্রনাথ সেনের জন্ম।

—১৯৪৭, প্রাগে প্রথম আন্তর্জাতিক যুব উৎসব।

—১৯৫৫, লোক সভায় নয়া পয়সা প্রচলন সম্বন্ধে আইন পাশ।

৩০শে—১৯১১, মোহনবাগানের আই, এফ, এ, শীল্ড জয়।

—১৯৫৮, কবিরাজ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু। (জন্ম : ২৩শে ডিসেম্বর ১৮৮৫)।

৩১শে—১৭৮৪, ফরাসী দার্শনিক ভিদেরোর মৃত্যু (জন্ম—[illegible])।

আগষ্ট

১লা—১৭৪৭, ভারউইনের পূর্ববর্তী ফরাসী ক্রমবিকাশ-বাদী লামার্কের জন্ম (মৃত্যু—১৮ই ডিসেম্বর ১৮২৯)।

—১৭৯৮, নীলনদের যুদ্ধে নেলসনের নেতৃত্বাধীনে ব্রিটিশ নৌ-বাহিনীর নিকট ফরাসী নৌ-বাহিনীর পরাজয়।

—১৮৪৬, ইংলণ্ডে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যু।

—১৮৯৪, চীন ও জাপানের মধ্যে যুদ্ধারম্ভ।

—১৯২০, লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের মৃত্যু।

—১৯২৭, নানচাং-এর বিদ্রোহ, চীনা লাল ফৌজের জন্ম।

—১৯৩৬, প্যারিসে আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলন আরম্ভ।

—১৯৫৫, কলিকাতা লাহোর ট্রেন চলাচল ৮ বৎসর বন্ধ থাকিবার পর আবার সুরু।

২রা—১৭০৪—ব্লেনহিমের যুদ্ধে ইংরাজ অষ্ট্রিয়ান বাহিনীর নিকট ফরাসী বাহিনীর পরাজয়।

—১৮৫৮, ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব শেষ।

১৯২২, টেলিফোনের আবিষ্কর্তা আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেলের জন্ম।

১৯৩৩, ষ্টালিন হোয়াইট সি—বল্টিক খালের উদ্বোধন।

—১৯৫০, ইংরেজ মহিলাকে বিবাহ করিবার অপরাধে ইংরেজ সরকার কর্তৃক বেচুয়ানা ল্যাণ্ডের (আফ্রিকা) রাজা সেরেটেখামার প্রতি দেশত্যাগের আদেশ।

৩রা—১৪৯৬, 'রেনেসাস শহীদ' এটিয়েন ডোলেকে আগুনে পুড়াইয়া হত্যা।

—১৮১৩, ইংগ-মারাঠা যুদ্ধের আরম্ভ।

—১৯০৪, ইয়ং হাসবাণ্ডের নেতৃত্বে ব্রিটিশ বাহিনী কর্তৃক তিব্বতের রাজধানী লাসা অধিকৃত।

—১৯১৪, পানামা খালের মধ্য দিয়া প্রথম জাহাজ চলাচল।

৪ঠা—১৭৯২, ইংরেজ কবি শেলীর জন্ম (৮ই জুলাই ১৮২২ সালে জলে ডুবিয়া মৃত্যু)।

—১৮৫৯, নরওয়েজিয়ান লেখক ক্নুট হামসুনের জন্ম (মৃত্যু—১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫২)।

—১৮৭৪, স্প্যানিশ কবি ও শিশু সাহিত্যিক হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান এণ্ডারসেনের মৃত্যু।

—১৯১৪, ব্রিটেন কর্তৃক জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা।

—১৯৪৬, বোম্বাইয়ের নিকট ট্রম্বে নামক জায়গায় ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম আণবিক শক্তির উৎপাদন কেন্দ্রের সাফল্য।

৫ই—১৮৪৩, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ সৃষ্টির আইন পাশ।

—১৮৮৪, পণ্ডিত নীলকণ্ঠ দাসের জন্ম।

—১৮৯০, ফরাসী ঔপন্যাসিক গী দ্য মোপাসাঁর জন্ম।

৬ই—১৬৬০, স্পেনীয় চিত্রশিল্পী ডিয়েগো ভেলাসকুয়েজের মৃত্যু।

—১৮০৯, ইংরাজ কবি লর্ড টেনিসনের জন্ম।

—১৯০৬, অগ্নিযুগের স্বদেশী পত্রিকা "বন্দেমাতরমের" প্রকাশ।

—১৯২৫, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু।

—১৯৪৫, মার্কিন বিমান কর্তৃক হিরোশিমা শহরে প্রথম আণবিক বোমা নিক্ষেপ।

—১৯৫২, ভারতীয় পার্লামেণ্ট কর্তৃক নিরাপত্তা বিল পাশ।

—১৯৫২, বহুমুখী বিক্রয় কর প্রবর্তনের প্রতিবাদে সমগ্র বোম্বাই রাজ্যে সর্বাত্মক হরতাল।

৭ই—১৮৩৯, কাবুলে ব্রিটিশ বাহিনীর প্রবেশ।

—১৮৫১, বটতলায় 'ডেভিড্ হেয়ার একাডেমির' প্রতিষ্ঠা।

১৮৭১, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম (মৃত্যু—৫ই ডিসেম্বর ১৯৫১)।

—১৯০৫, বাংলা বিভাগের কার্জনী চক্রান্তের প্রতিবাদে সারা বাংলায় তীব্র আন্দোলন।

—১৯০৫, কলিকাতার জনসভায় বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভের সিদ্ধান্ত।

—১৯৪১, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মহাপ্রয়াণ।

—১৯৪৬, পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপাল ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু।

৮ই—১৯১৯, আফগানিস্থানের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের তৃতীয় যুদ্ধের শেষ ও রাওয়ালপিণ্ডির সন্ধির দ্বারা আফগানিস্থানের স্বাধীনতার স্বীকৃতি।

—১৯৪০, হিটলার কর্তৃক ইংলণ্ড আক্রমণ সুরু।

—১৯৪২, কংগ্রেস কর্তৃক "ভারত ছাড়" আন্দোলন আরম্ভ সিদ্ধান্ত।

—১৯৪২, কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী শেখ আবদুল্লার পদচ্যুতি ও তৎস্থানে বক্সী গোলাম মহম্মদের নিয়োগ।

৯ই—১৮৭১, বিমানপোতের অন্যতম আবিষ্কর্তা অরভিল রাইটের জন্ম।

—১৯৪২, ইংরেজ সরকার কর্তৃক কংগ্রেসী নেতাদের গ্রেপ্তার। আগষ্ট আন্দোলনের সুরু।

—১৯৫৩, গোলাম মহম্মদ বক্সী (জন্ম—১৯০৭) কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত।

—১৯১৪, ব্রেড সহরে বুগোস্লাভিয়া, গ্রীস ও তুর্কী কর্তৃক বলকান চুক্তি স্বাক্ষর।

১০ই—১৭৯২, বিপ্লবী জনতা কর্তৃক ফরাসী সম্রাটের প্রাসাদ বিধ্বস্ত।

—১৯০০, ব্রিটিশ বাহিনীর নিকট সোয়াজিল্যাণ্ডের পরাজয় বরণ।

—১৮১০, সংযুক্ত ইটালীর প্রতিষ্ঠাতা কাউণ্ট কাভুরের জন্ম (মৃত্যু—৬ই জুন ১৮৬১)।

—১৯১৩, দস্যুসর্দারদের গুলিতে আলিপুরের জেলা জজ মিঃ গার্লিকের মৃত্যু।

—১৯৪৫, জাপানের বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ।

—১৯৪৭, পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন।

—১৯৫২, শ্রী এম, পি, কৈরালার নেতৃত্বাধীন নেপালী মন্ত্রীসভার পদত্যাগ।

১১ই—১৮০৭, আমেরিকার হাডসন নদীবক্ষে পৃথিবীর প্রথম বাষ্পীয় পোতের যাত্রারম্ভ।

—১৯০৮, ক্ষুদিরাম বোসের ফাঁসী (জন্ম—৩রা ডিসেম্বর ১৮৮৯)।

—১৯১৯, ব্রিটিশ শিল্পপতি ও সমাজ হিতৈষী এণ্ড্রু কার্নেগীর মৃত্যু।

—১৯৫২, জর্ডানের রাজা তালালের সিংহাসনচ্যুতি এবং রাজা হোসেনের সিংহাসনারোহন।

—১৯৫৪, মিঃ মহম্মদ আলীর স্থলে চৌধুরী মহম্মদ আলী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত।

১২ই—১৭৬৫, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক বঙ্গ, বিহার এবং উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ।

—১৭৭৪, ইংরাজ কবি রাবার্ট সাদের জন্ম।

—১৮৫১, ভারত হিতৈষী বিটন্ সাহেবের মৃত্যু।

১৯৪৪, 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রভৃতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সুরেশচন্দ্র মজুমদারের মৃত্যু।

১৩ই—১৬০২, সম্রাট আকবরের সভাসদ আবুল ফজল নিহত?

—১৮৪৮, রমেশচন্দ্র দত্তের জন্ম (মৃত্যু—৩০শে নভেম্বর ১৯০৯)।

—১৮৮৮, টেলিভিসনের আবিষ্কর্তা জন বেয়ার্ডের জন্ম।

—১৮৯২, ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার অপরাধে মণিপুরের জেনেরাল টিকেন্দ্রজিতের ফাঁসী।

—১৯১০, আধুনিক নার্সিং ব্যবস্থার পুরোধা ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের মৃত্যু।

—১৯৪৬, ইংরেজ লেখক এইচ, জি, ওয়েলস্-এর মৃত্যু (জন্ম—১৮৬৬)।

১৪ই—১৩২১, ইতালীয় কবি দান্তের মৃত্যু।

—১৪০৭, জার্মাণ বৈজ্ঞানিক গুটেনবার্গ কর্তৃক মুদ্রাযন্ত্রের উদ্ভাবন।

—১৮৩৭, ইংরেজ লেখক জন গলস্ওয়ার্দির জন্ম (মৃত্যু—৩১শে জানুয়ারী ১৯৩৩)।

—১৯২৩, তুরস্কের রাষ্ট্রপতি পদে কামাল পাশার নির্বাচন।

—১৯৩৭, আন্দামানের রাজবন্দীদের মুক্তির দাবীতে কলকাতায় ধর্মঘট ও শোভাযাত্রা।

—১৯৪১, প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ও মিঃ চার্চিল কর্তৃক "আটলাণ্টিক চার্টারে" স্বাক্ষরদান।

—১৯৪৫, মিত্রশক্তির নিকট জাপানের আত্মসমর্পণ—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান।

১৫ই—১৭৬৯, ফরাসী সম্রাট প্রথম নেপোলিয়নের জন্ম।

—১৭৭১, ব্রিটিশ কবি স্যার ওয়াল্টার স্কটের জন্ম।

—১৮৫৭, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত।

—১৮৭২, দার্শনিক শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের জন্ম। (মৃত্যু ৫ই ডিসেম্বর ১৯৫০)।

—১৮৮৮, টমাস লরেন্স (আরবের লরেন্স)-এর জন্ম (মৃত্যু—১৯শে মে ১৯৩৫)।

—১৯৩০, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনকারী বিপ্লবীদের কারামুক্তি।

—১৯৪৭, ভারত ও পাকিস্তানের স্বাধীনতা লাভ।

—১৯৫০ আসামের প্রবল ভূমিকম্প।

—১৯৫৩, ভারত সরকার কর্তৃক রুশ-জার্মান কোম্পানির সহিত দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা নির্মাণের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর।

—১৯৫৫, গোয়া সত্যাগ্রহীদের উপর গুলিবর্ষণ।

১৬ই—১৯৪৬, মুসলীম লীগ আহোজিত "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের" পরিণামে কলিকাতায় প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ।

—১৯৫৩, নেহেরু-মহম্মদ আলি আলোচনা সুরু।

১৭ই—১৫৭৬, ইতালীয় চিত্রশিল্পী টিশিয়ানের মৃত্যু।

—১৭৬১, ভারতে প্রথম মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়াম কেরীর জন্ম।

—১৭৮৬, প্রুশিয়ার সম্রাট ফ্রেডারিক দি গ্রেটের মৃত্যু।

—১৮৫০, ফরাসী ঔপন্যাসিক বালজাকের মৃত্যু।

—১৮৫৫, সাঁওতাল বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পণ করার জন্য সরকারী ঘোষণা প্রচার।

—১৯৩২, ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক সাম্প্রদায়িক সংবিধানের (কমিউনাল এওয়ার্ডের) ঘোষণা।

—১৯৩৪, মস্কোতে সোভিয়েৎ লেখকদের প্রথম কংগ্রেসের উদ্বোধন।

—১৯৪৯, ইন্দোনেশিয়ার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপিত।

—১৯৫৪, আমেরিকার পার্লামেণ্ট কর্তৃক কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী করিয়া আইন পাশ।

১৮ই—১৮৮৬, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের মৃত্যু।

—১৯০০, বিজ্ঞানসাধী পণ্ডিতের জন্ম।

—১৯৪৪, নাৎসীগণ কর্তৃক জার্মাণ কমিউনিস্ট পার্টির নেতা আর্নষ্ট থেইলমান নিহত।

১৯শে—১৪০০, রোমান সম্রাট অগাস্টাসের মৃত্যু।

১৬৭২, উন্মত্ত জনতার হস্তে হল্যাণ্ডের রাষ্ট্রনায়ক জন ডি উইটের মৃত্যু।

—১৮১৯, বাষ্পীয় ইঞ্জিনের আবিষ্কর্তা জেমস ওয়াটের মৃত্যু।

—১৮৭৪, ভারতবর্ষে ছয় আনা দামের ডাক টিকিটের প্রথম প্রচলন।

২০শে—১৮২৬, রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক 'বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্ম' মতবাদ যুক্ত একেশ্বরবাদী সভা স্থাপন।

—১৮৬০, বিদ্রোহী নেতা রাও সাহেব (নানা সাহেবের ভাগিনেয়)-এর কানপুরে ফাঁসী।

—১৮৬৪, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর জন্ম (মৃত্যু—৬ই জুন ১৯১৯)।

—১৯০৬, রাজনীতিক ও গণিতজ্ঞ আনন্দমোহন বসুর মৃত্যু।

—১৯৩২, ইংলণ্ড ও ডোমিনিয়নগুলির মধ্যে ওটাওয়া বাণিজ্য চুক্তির সহি।

২১শে—১৭৯৬, ফরাসী ঐতিহাসিক জুল মিশলেটের জন্ম (মৃত্যু—১৮৭৪)।

—১৯৩৯, জার্মান সোভিয়েত ১০ বৎসরের শান্তি চুক্তি ঘোষণা ২৪শে আগস্ট এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

—১৯৪০, আততায়ী হস্তে রুশ বিপ্লবীনেতা ট্রটস্কীর মৃত্যু (জন্ম—১৮৭৯)।

—১৯৫২, কাশ্মীর গণপরিষদ কর্তৃক কাশ্মীরে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গ্রহণ।

২২শে—১৬৩৪, প্রথম খলিফ ও হজরত মহম্মদের উত্তরাধিকারী আবু বকরের মৃত্যু।

—১৭৯১, ইংরেজ বৈজ্ঞানিক মাইকেল ফ্যারাডের জন্ম (মৃত্যু—২৫শে আগস্ট ১৮৬৭)।

—১৮১৪, প্যারীচাঁদ মিত্রের জন্ম (মৃত্যু—২৩শে নভেম্বর ১৮৮৩)।

—১৮১৮, ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংসের মৃত্যু।

—১৮৬২, ফরাসী সঙ্গীতকার দেবুসীর মৃত্যু।

—১৮৭৭, ভারতীয় শিল্পকলার ঐতিহাসিক আনন্দকুমার স্বামীর জন্ম (মৃত্যু—৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৭)।

—১৯২২, আইরিশ জাতীয়তাবাদী নেতা মাইকেল কলিন্স নিহত।

—১৪৮৪, বসওয়ার্থের যুদ্ধে প্ল্যাণ্টাজেনেট রাজবংশের জয়—ইংলণ্ডে দুই গোলাপের যুদ্ধের অবসান।

২০শে—১৯২৭, আমেরিকার শ্রমিকনেতা সাকো ও ভেনজেটির প্রাণদণ্ড।

—১৯০৯, রুশ জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত।

—১৯৪৬, পশ্চিম ইওরোপের ১৮টি দেশ কর্তৃক সুয়েজখালকে আন্তর্জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত।

২৪শে—৭৯, ভিসুভিয়াসের অগ্ন্যুৎপাতে পম্পিয়াই নগরী ধ্বংস।

—১২২৭, জেঙ্গিস খানের মৃত্যু (জন্ম—১১৬৭)।

—১৬৯০, সুতানটিতে ইংরাজ বাহিনীর পদার্পণ।

—১৮৮৩, ফ্রান্সের শক্তির দ্বারা চীনের নিকট হইতে আনাম প্রদেশ (ভিয়েটনাম) ফ্রান্স কর্তৃক অধিকার।

—১৯২৭, মিশরের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতা জগলুল পাশার মৃত্যু।

—১৯৪২, সোশিয়ালিস্ট ও কৃষক-মজদুর প্রজা পার্টিদ্বয়ের মিলন।

—১৯৫৪, ব্রেজিলের প্রেসিডেণ্ট জেনেরাল ভার্গাস আত্মহত্যা।

—১৯৫৪, মিশরকে আমেরিকা কর্তৃক সাহায্যদানে অসম্মতি।

—১৯৫৫, সোফিয়া কর্তৃক নতুন সোসালিস্ট পার্টি গঠনের ঘোষণা।

২৫শে—১৮৩৭, ইংরাজ বৈজ্ঞানিক মাইকেল ফ্যারাডের মৃত্যু।

—১৯০০, জার্মান দার্শনিক নীটশের মৃত্যু।

—১৯৩৬, রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে সোভিয়েট বিপ্লবী নেতৃত্বয় জিনোভিয়েভ, বুখারিন ও কামেনেভের প্রাণদণ্ড।

—১৭৭৬, ইংরাজ দার্শনিক ডেভিড হিউমের মৃত্যু।

—১৯৩৬, সুয়েজখাল সম্পর্কিত ইঙ্গ-মিশরীয় চুক্তির স্বাক্ষর।

—১৯৪৪, প্যারিস নগর জার্মান অধিকার হইতে মুক্ত।

২৬শে—১৩০৩, আলাউদ্দিন খিলজি কর্তৃক চিতোর অধিকার ও পদ্মিনীর ও অন্যান্য নারীদের জহরব্রতে আত্মদান।

—১৩৪৬, ক্রেসির যুদ্ধে ইংরাজ বাহিনীর নিকট ফরাসী বাহিনীর পরাজয়।

—১৮৮৪, ফরাসী লেখক জুল রোমাঁর জন্ম।

—১৯২৭, কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের উদ্বোধন।

২৭শে—১৫৭৬, ইটালিয়ান চিত্রকর টিসিয়ানের মৃত্যু (জন্ম—১৪৭৭)।

—১৭৭০, জার্মান দার্শনিক হেগেলের জন্ম (মৃত্যু—১৪ই নভেম্বর ১৮৩১)।

—১৭৭৬, ব্রুকলিনের যুদ্ধে বৃটিশ বাহিনীর নিকট আমেরিকান বিপ্লবী সৈন্যদলের পরাজয়।

—১৭৮৯, ফরাসী বৈপ্লবিক এসেম্বলী কর্তৃক "মানুষের অধিকার নীতি" ঘোষণা।

—১৮১৩, ড্রেসডেনের যুদ্ধে ফরাসী বাহিনীর নিকট রুশ ও অস্ট্রিয়ান বাহিনীর পরাজয়।

—১৮৪২, অহিফেন যুদ্ধের অবসানে চীনের সহিত পশ্চিমী শক্তিদের চুক্তি স্বাক্ষরিত।

—১৮৭১, আমেরিকান লেখক থেওডর ড্রাইজারের জন্ম (মৃত্যু ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৪৫)।

—১৯০, মার্কিন মনস্তত্ত্ববিদ উইলিয়াম জেমসের মৃত্যু।

—১৮৮৩, অগ্ন্যুৎপাতের ফলে ভারত মহাসাগরস্থিত আকাতোয়া দ্বীপে পৃথিবীর বৃহত্তম বিস্ফোরণ।

২৮শে—১৭৪৯, জার্মান কবি ও ঔপন্যাসিক গ্যেটের জন্ম।

১৮২৮, রুশ ঔপন্যাসিক লিও টলস্টয়ের জন্ম।

—১৮০০, ইংলণ্ডে দাস প্রথার উচ্ছেদ।

—১৯১৪, জার্মান বাহিনী কর্তৃক বেলজিয়ামের বিখ্যাত সংগ্রহশালা লুভেঁ বিধ্বস্ত।

২৯শে—৩০ (খৃষ্টপূর্ব) মিশরের সম্রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রার আত্মহত্যা।

—১৬৩২, ইংরেজ দার্শনিক জন লকের জন্ম (মৃত্যু—২৮শে অক্টোবর ১৭০৪)।

—১৮০৯, মার্কিন কবি অলিভার ওয়েণ্ডেল হোমসের জন্ম।

—১৮৪২, চীনের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের আফিং যুদ্ধে শেষ ও ইংরেজ কর্তৃক হংকং অধিকার।

১৮৪৪, ইংরাজ সাহিত্যিক এডওয়ার্ড কার্পেণ্টারের জন্ম।

—১৮৬০, বেলজিয়ান নাট্যকার মেটারলিঙ্কের জন্ম (মৃত্যু—৬ই মে ১৮৪৯)।

৩০শে—১৬৪৯, আওরংজেব কর্তৃক দারার হত্যা।

—১৭৪৮, ফরাসী বিপ্লবের চিত্রকর ডাভিডের জন্ম (মৃত্যু - ২৯শে ডিসেম্বর ১৮২৫)।

—১৮৮৮, কানাইলাল দত্তের জন্ম।

১৯১৮, আততায়ীর গুলিতে সোভিয়েট বিপ্লবের প্রবর্তক লেনিন আহত।

—১৯৪৪, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা হইতে শ্রী ভি, ভি, গিরির পদত্যাগ।

৩১শে—১২, অত্যাচারী রোমান সম্রাট কালিগুলার জন্ম (২৪শে জানুয়ারী ৪১ সালে নিহত)।

—১৮৬৭, ফরাসী কবি বোদলেয়রের মৃত্যু।

—১৮৭০, ইটালিয়ান শিক্ষাবিদ মারিয়া মণ্টেসোরীর জন্ম (মৃত্যু—৬ই মে ১৯৫২)।

—১৯১৮, রুশ বিপ্লবী নেতা লেনিনের মৃত্যু।

'ভুল' তালিকায় সংযোজন

১লা—১৮৮২, যশোহর জেলা হইতে খুলনা ও বগেরহাট এবং ২৪পরগণা হইতে সাতক্ষীরা এই তিনটি মহকুমা লইয়া খুলনা জেলার সৃষ্টি।

—১৮৮২, ইংরেজ কবি ও নাট্যকার জন ড্রিঙ্কওয়াটারের জন্ম। রচনাবলী—Cophetua—1911, Rebelion—1914, Abraham Linconl—1918, Mary Stuart, Oliver Cromwell—1921, Robert E. Lee—1923, Bird in hand—1928.

—১৮৮৯, লণ্ডন নগরের স্বাধীন নাগরিকরূপে সম্রাট ৫ম জর্জের সম্মান লাভ।

—১৯১২, লেডী এষ্টার ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের প্রথম মহিলা সদস্যপদ লাভ করেন।

১৯৪৯, মধ্য ভারতের পূর্বতন করদ রাজ্য ভারতের সহিত যুক্ত হয়।

—১৯৪৯, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর দেশীয় রাজ্য কচ্ছের শাসন ভার ভারত-সরকার গ্রহণ করে।

—১৯৫০, কালিকটে বেতার কেন্দ্র স্থাপিত হয়।

—১৯৫৩, যুদ্ধ সংস্কারের ফলে চেকোশ্লোভাকিয়ার বিশৃঙ্খলা, গোলযোগ ও অসন্তোষের সৃষ্টি।

—১৯৬১, ত্রিপুরার প্রশাসনের ব্যবস্থা পুনঃস্থাপিত হয়।

—১৯৬২, ইহুদী নিধন যজ্ঞের হোতা গেষ্টাপো দলের প্রধান কর্মকর্তা কর্ণেল আইখম্যানের ফাঁসী হয় গ্রীন উইচ সময় রাত্রি ১টা. ৫৮মি. তেল আবিভের নিকট

২রা—১৯৪৩, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু সিঙ্গাপুরে পৌঁছেন।

—১৯৪৬, জি. আই. পি., বি. বি. সি. আই., ই. আই., বি. এ. প্রভৃতি বিভিন্ন রেল কোম্পানীর কর্মিগণ কর্তৃপক্ষকে ধর্মঘটের নোটিশ দেয়।

৩রা—১৮০৮, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জেফার্সন ডেভিসের জন্ম। মৃত্যু—৬ই ডিসেম্বর, ১৮৮৯। কংগ্রেস সভাপতি হন—৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৬১ ও ফেব্রুয়ারী, ১৮৬২।

৩রা—১৮৬৫, ৭ম এডওয়ার্ডের ২য় পুত্র ৫ম জর্জের ভোর রাত্রি ১—০৮ মি, জন্ম।

মৃত্যু—২০শে জানুয়ারী, ১৯৩৬।

—১৮৮৭, উত্তর সাগর ও বাল্টিক সাগরের মধ্যবর্তী কীয়েল খাল (Kiel canal) খনন সুরু।

—১৯৫৯, কমনওয়েলথ্‌এর অধীন সিঙ্গাপুর রাষ্ট্রের স্বাধীনতা লাভ।

৪ঠা—১৭৩৮, গ্রেট ব্রিটেন ও আয়র্লণ্ডের রাজা তৃতীয়

অঙ্কের জন্ম। মৃত্যু—২৯শে জানুয়ারী, ১৮২০।

—১৭৯৮, আয়ার বিদ্রোহী লর্ড এডওয়ার্ড-ফিট্‌জিরাল্ডের মৃত্যু। জন্ম—১৭৬৩।

—১৮৫৭, সিপাহী বিদ্রোহের ফলে অযোধ্যা হইতে ব্রিটিশ শাসনের সমস্ত চিহ্ন মুছিয়া যায়। ইহা ১৪ই জুন পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

—১৮৬২, মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইংলণ্ড যাত্রার জন্য বঙ্গদেশ ত্যাগ করেন।

—১৯২০, ভার্সাইয়ের Trianon এ বাজেয়ী ও মিত্রশক্তির মধ্যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়।

—১৯৪০, ডানকার্ক হইতে ব্রিটিশ সৈন্যপলায়ন।

—১৯৪৩, সিঙ্গাপুরের এক সভায় রাসবিহারী বসু সুভাষচন্দ্র বসুকে স্বাধীনতা সংঘের সভাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত করেন।

৫ই—১৭২৩, ব্রিটিশ Economist Adam Smith-এর জন্ম। মৃত্যু—১৭ই জুলাই, ১৭৯০।

—১৭৭১, ৩য় জর্জের ৫ম পুত্র আর্নেষ্ট অগষ্টাসের জন্ম। মৃত্যু—১৮ই নভেম্বর, ১৮৫১।

—১৭৮৩, জোসেফ ও এটিএন নামক দুইজন ফরাসী ভ্রাতা।

—১৯১৪, (গুরুবার) অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় Doctor of Music উপাধি প্রাপ্ত সৌরিন্দ্রমোহন ঠাকুরের মৃত্যু। জন্ম—১৮৪০।

—১৯৪৩, সিঙ্গাপুরে মিউনিসিপ্যাল ভবনের সম্মুখস্থ ময়দানে আজাদ-হিন্দ-ফৌজ পরিদর্শনকালে নেতাজী সুভাষচন্দ্র এক নূতন শ্লোগান দেন—'দিল্লী চলো'।

৬ই—১৪১৫, ইতালির জগদ্বিখ্যাত শিল্পী মাইকেল এঞ্জেলোর জন্ম। মৃত্যু—১৫৬৪।

—১৮৬৭, ভারতীয় প্রথম বিচারপতি শম্ভুনাথ-পণ্ডিতের মৃত্যু। জন্ম—১৮২০।

৭ই—১০২৯, স্কটল্যাণ্ডের রাজা রবার্ট ব্রুস্ এর (১ম রবার্ট) মৃত্যু। জন্ম—১২৭৪।

—১৮৫৯, ফরাসী বাহিনী ক্রিমিয়া যুদ্ধের অন্য বন্দর সেবাস্তোপোলের Mamelon দুর্গ অধিকার করে।

—১৮৫৭, ইংরেজ সৈন্য দিল্লি ক্যান্টনমেন্ট পুনরধিকার করে।

—১৮৫৭, মধ্য রাত্রে অলঙ্করের সিপাহীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া পরদিন বিজয়োল্লাসে লুধিয়ানা শহরে প্রবেশ করে। ৯ই জুন লুধিয়ানা ত্যাগ করিয়া ২২ তারিখে দিল্লীতে বিদ্রোহীদের সাহত মিলিত হয়।

—১৮৭৫, ডাঃ ইউ এন ব্রহ্মচারীর জন্ম।

৮ই—১৬২৪, পোলাণ্ডের রাজা জনের জন্ম। মৃত্যু—১৭ই জুন, ১৬৯৬। তাঁহারই শাসনকালে পোলিশবাহিনী তুরস্ককে পরাজিত করে।

—১৮৫৭, দিল্লীর সিপাহী বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য একদল ইংরেজ ও গুর্খা সৈন্য দিল্লীর সম্মুখে উপস্থিত হয়।

৯ই—১৬৪০, জার্মান সম্রাট ২য় ফার্দিনান্দের পুত্র ১ম লিওপোল্ডের জন্ম। মৃত্যু—৫ই মে, ১৭০৫।

—১৭৮১, ব্রিটিশ ইঞ্জিনীয়ার জর্জ স্টিফেনসনের জন্ম। মৃত্যু—১২ই—আগষ্ট, ১৮৪৮।

—১৮০৬, হাজি মহম্মদ মহসীন ১ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি শিক্ষার উন্নতিকল্পে দানপত্র সম্পাদন করেন।

—১৮৫৯, ব্রিটিশ নাবিক স্যার ফ্রেডারিক চার্লস্ ডোভ্‌টন ষ্টার্তির জন্ম। মৃত্যু—১৪ই মে, ১৯২৫।

—১৮৬৩, আফগানিস্তানের শাসনকর্তা দোস্ত মহম্মদের মৃত্যু।

—১৯০৯, নাসিকে বিনায়ক দামোদর সাভারকরের ভ্রাতা গণেশ সাভারকর 'লঘু অভিনব ভারত মেলা' নামক রাজদ্রোহমূলক পুস্তক প্রকাশের অপরাধে রাজদ্বারে অভিযুক্ত ও দ্বীপান্তরিত হন।

—১৯১৮, আইনবলে রাশিয়ার সর্বপ্রকার ধর্মঘটকে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

১০ই—১৬৮৮, ইংলণ্ডের রাজা ২য় জেম্‌স্ এর পুত্র ৩য় জেম্‌স্ এর জন্ম।

—১৭৭৩, আমেরিকার ঔপনিবেশিকদিগকে স্বাধীনতা দানের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়।

—১৯৪০, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইতালীর যুদ্ধ

যোষণা (২য় বিশ্বযুদ্ধ)।

১১ই—১৭৫৭, ইংরেজ ও নবাব সিরাজ উদ্দৌলার মধ্যে যে গোপন চুক্তি হয়, তাহা কলিকাতায় ইংরেজদিগের হাতে দেওয়া হয়।

—১৮৫১, টাসমানিয়ার রাজধানী হোবার্টে ব্রিটিশ ঔপন্যাসিক মেরী অগষ্টা ওয়ার্ডের জন্ম। পদবী হামফ্রি ওয়ার্ডের সহিত ১৮৭২ অব্দে বিবাহ হয়। মৃত্যু—২৪শে মার্চ ১৯২০। রচনাবলী—Milly Olly—1881 ; Robert Elsmere—1888 ; David Grieve—1892, Marcella—1894, Lady Rose's Daughter—1903, The Marriage of William Ashi—1905 ; Missing—1917 ; Fields of Victory—1919.

—১৮৭৯, বঙ্গের লর্ডলি রোনাল্ডস্-এর জন্ম।

—১৯১৭, গ্রীসের রাজা ১ম জর্জের পুত্র কনষ্টাইনের সিংহাসন-চ্যুতি। মৃত্যু—১১ জানুয়ারী, ১৯২৩।

১২ই—১৭৭৬, ভার্জিনিয়া এসেম্ব্লিতে বিল অব রাইট্স্ পাশ হয়।

—১৮১২, ইংরেজ লেখক চার্লস্ কিংস্লীর জন্ম। মৃত্যু—২৩শে জানুয়ারী, ১৮৭৫। রচনাবলী—Alton Locke, Yeast—1849 ; Hypatia—1853 ; The Westward Ho ;—1855 ; The Hero—1856 ; The Water Babies—1863 ; Hereward the wake—1866.

—১৮৫৭, আলিগড় বিদ্রোহীবাহিনী দিল্লীর বিদ্রোহী সম্রাট বাহাদুর শাহের সহিত দিল্লীতে মিলিত হয়।

—১৮৭৭, বাল-গঙ্গাধর তিলকের 'কেশরী' প্রবর্তিত শিবাজী রাজ্যাভিষেক হয়।

—১৯০৫, বৈধ উপায়ে ভারতের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন উদ্দেশ্যে গোপালকৃষ্ণ গোখেল কর্তৃক Servants of Indian Society স্থাপিত।

—১৯১৪, বটকৃষ্ণ পালের মৃত্যু। জন্ম—১৮৩৫।

—১৯৪১, লণ্ডনের সেন্ট জেমস্ প্যালেসে বেলজিয়াম, চেকোস্লোভাকিয়া, ফ্রান্স, গ্রীস, লুক্সেমবার্গ, নেদারল্যাণ্ডস্, নরওয়ে, পোলাণ্ড, যুগোস্লাভিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, গ্রেট ব্রিটেন, নিউজিলাণ্ড ও দঃ আফ্রিকার মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

১৩ই—১৮৫৭, লর্ড ক্যানিং 'গ্যাগিং এ্যাক্ট' নামে একটি আইন প্রবর্তিত করেন। এই আইনের বলে 'দুরবীন' 'সুলতান-উল-আখবার' ও সমাচার সুধাবর্ষণ' এর বিরুদ্ধে মামলা আনা হয়।

—১৮৬৫, আয়ার্ল্যাণ্ডের কবি উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস এর জন্ম। মৃত্যু—২৮শে জানুয়ারী, ১৯৩৯। ১৯২৩ অব্দে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। রচনাবলী—

The Countess Kathleen—1892 ; The Celtic Twilight—1893 The Secret Rose—1897 ; The Shadowy waters—1900 Cathleen in Hoolihan—1902 ; Deirdre—1907 ; Reveries—1916 A Vision—1926 The Tower—1928 ; The Winding Stair—1929, Insects and Butteflies—1934 ; Full Moon in March—1935 ; Dramatics personal—1936.

১৫ই—১৯১৭, কাইজার ২য় উইলিয়মের কন্যা সোফিয়ার গর্ভে রাজা কনষ্টান টাইনের ঔরসজাত আলেকজাণ্ডার গ্রীসের সিংহাসনে আরোহন করেন। মৃত্যু—২৫শে অক্টোবর, ১৯২০।

১৪—১৬৪৫, নর্থাম্পটন শায়ারের Nasebyতে অলিভার ক্রমওয়েল ১ম চার্লসকে পরাজিত করেন।

—১৮০০, নেপোলিঅ বোনাপার্টি ইতালীর অন্তর্গত Marengo নামক স্থানে অষ্ট্রিয়ার সৈন্যদলকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন।

—১৮১৫, ব্রিটিশ ও নেপোলিঅঁ'র মধ্যে ওয়াটার্লু'র যুদ্ধে নেপোলিঅঁ বোনাপার্টি পরাজিত হন।

—১৮৩৯, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সম্বাদ প্রভাকর কে দৈনিকে পরিবর্তিত করা হয়।

—১৮৫৭, ঝাঁসিতে সিপাহী বিদ্রোহ আরম্ভ হয়।

—১৯৪৬, International Atomic Development Authority-এর মাধ্যমে ভবিষ্যতের পরমাণু যুদ্ধকে নিয়ন্ত্রিত করিবার উদ্দেশ্যে

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে রাষ্ট্রসঙ্ঘে বাঙ্ক পরিকল্পনা দাখিল করা হয়।

১৫ই—১৩৮১, ২য় রিচার্ডের রাজত্বকালে ইংরেজ বিদ্রোহী ওয়াট টাইলার নিহত হন।

—১৭২৮, দিল্লী সম্রাট ২য় আলমগীরের পুত্র শাহ আলমের জন্ম। মৃত্যু—১০ই নভেম্বর, ১৮০৬।

—১৭৮৫, কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি হেনরী টমাস কোলব্রুকের জন্ম। মৃত্যু—১০ই মার্চ, ১৮৩৭।

—১৯১২, স্যার তারকনাথ পালিত রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞানের দুইটি অধ্যাপক পদের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে এককালীন ১৫ লক্ষ টাকা দান করেন।

—১৯১৯, ক্যাপ্টেন আলকক ও লেঃ ডব্লিউ ব্রাউন হাওয়াই জাহাজে আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করিতে চেষ্টা করেন।

১৬ই—১৭২২, ডিউক অব মার্লবরো জন চার্চিলের মৃত্যু। জন্ম—১৬৫০। তিনি ১৩.৮.১৭০৪ তারিখে ব্লেনহিম-এ ফরাসী ও বেভেরিয় সৈন্যদিগকে, এবং ফরাসী সৈন্যদিগকে ২৩.৫.১৭০৬ তারিখে Ramillies-এ, ১১—৭—১৭০৮ তারিখে Oudenardeতে ও ১১—৯—১৭০৯ তারিখে Malplaquet-এ পরাজিত করেন।

—১৭৫২, স্পেনের প্রধানমন্ত্রী Guilio Alberoni-এর মৃত্যু, জন্ম—১৬৬৪। ১৭১৪ অব্দে প্রধানমন্ত্রী হন।

—১৮৭৮, লীগ অব নেশনস্-এর প্রাচীনতম এ্যাচভোকেট এলবার্ট থমাস্-এর জন্ম। মৃত্যু—৭.৫.১৯৩২।

১৭ই—১২৩৯, ৩য় হেনরীর পুত্র ১ম এডওয়ার্ডের জন্ম। মৃত্যু—৭.৭.১৩০৭।

—১৭০৩, মেথোডিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা জন উইলী'র জন্ম। মৃত্যু—২.৩.১৭৯১।

—মধ্য প্রদেশের প্রধান ইংরেজ সেনাপতি স্যার হিউ রোজ গোয়ালিওর আক্রমণ করেন।

১৮ই—১৮১৭, টেমস্ নদীর উপর ওয়াটার্লু ব্রীজের উদ্বোধন হয়।

—১৮৩১, ইংলণ্ডে ১০৬—২২ ভোটে তৃতীয় সংস্কার আইন পাশ হয়।

—১৮৫৭, ৬টি কামান সহ মিরাটের বিদ্রোহী বাহিনী দিল্লীতে পৌঁছায়। কামানগুলি জেনারেল বার্নার্ডের যুদ্ধে ব্যবহৃত। পরদিন তাহারা ব্রিটিশ সৈন্যকে আক্রমণ ও পরাজিত করে।

—১৮৮৪, ফরাসী প্রধানমন্ত্রী এডুওয়ার্ড দালাদিয়ের-এর জন্ম।

—১৯৩১, জার্মানী তুর্কী অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন। ১৯৪৩, লর্ড ওয়াভেল ভারতের বড়লাট হন।

—১৯৫৯, আইরিশ নেতা ডি ভ্যালেরা বিপুল ভোটাধিক্যে প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হন।

১৯শে—১৪৬৩, গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ার্লণ্ডের রাজা ১ম জেম্স্-এর জন্ম। মৃত্যু—২৭.৩.১৬২৫।

—১৬২৩, ফরাসী দার্শনিক Blaise Pascal-এর জন্ম। মৃত্যু—১৯.৮.১৬৬২।

—১৯৪৩, মিশরকে রিপাবলিক বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

২০শে—৮৪০, রোম—সম্রাট শার্লমেন বা চার্লস্ দি গ্রেট-এর পুত্র ১ম লুই-এর মৃত্যু।

—১৭৫৬, নবাব সিরাজউদ্দৌলা ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ অধিকার করেন। ২রা জানুয়ারী, ১৭৫৭ তারিখে ইংরেজ উহা পুনরধিকার করে।

—১৭৬০, ডিউক অব ওয়েলিংটনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রিচার্ড কলী'র (মার্কুইস অব ওয়েলেসলী) জন্ম। মৃত্যু—২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৮৪২।

—১৮৭৭, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ইংলণ্ডের সিংহাসন লাভ।

—১৯৪৪, আসাম হইতে জাপ সৈন্য বিতাড়িত হয়।

—১৯৪৭, যুবরাজ করণ সিং নিয়মতান্ত্রিক শাসক রূপে কাশ্মীর শাসন করিতে থাকেন।

২১শে—১৭৫৭, নবাব সিরাজউদ্দৌলার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য লর্ড ক্লাইভ মাত্র ৮শত ইউরোপীয় ও ২হাজার ২শত সিপাহী সৈন্য সহ কাটোয়ায় পৌঁছেন।

—১৮১৪, ভারতের গভঃ জেঃ সিলবার্ট এলিয়ট-এর (আর্ল অব মিণ্টো) মৃত্যু। জন্ম—১৭৫১।

—১৮২৬, ভারতের ভাইসরয়, ফ্রডারিক টেম্পল্ ব্ল্যাকউডের (মার্কুইস অব ডাফরিন এণ্ড আভা) জন্ম। মৃত্যু—১২,২,১৯০২। ভাইসরয়; ১৮৮৪—৮৮।

২২শে—১৮৩০, ইংলণ্ডে Peter James Bassyকে যুপকাষ্ঠের সাহায্যে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। আইন করিয়া ১৮৩৭ সালে এই প্রথা রহিত হয়।

—১৮৯৭, পুণা সহরের প্লেগ কমিশনার মিঃ র‍্যাণ্ড ও লেঃ আয়ার্স্ট নামে অপর এক রাজকর্মচারী লাট প্রাসাদে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজ্যাভিষেক উৎসব যোগদানান্তে যখন গৃহে ফিরিতেছিলেন, তখন তাঁহারা পথিমধ্যে নিহত হন। ফলে দামোদর চাপেকার আদালতে অভিযুক্ত হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন।

২২শে—১৯১১, সম্রাট ৫ম জর্জ ও রাণী মেরীর রাজ্যাভিষেক-ক্রিয়া।

—১৯২১, সম্রাট ৫ম জর্জ উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের বেলফাষ্ট নগরীতে নূতন পার্লামেণ্টের উদ্বোধন উপলক্ষে স্বরচিত বক্তৃতা দেন।

—১৯৫০, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু।

২৩শে—৭৯, রোম-সম্রাট Titus Flarvius Sabinus Vespasianus-এর মৃত্যু।
জন্ম—৯ অব্দ।

—১৮৯৬, ৫ম জর্জের জ্যেষ্ঠ পুত্র Edward Albert Christian George Andrew Patrick David Windsor-এর (৮ম এডওয়ার্ড) জন্ম হয় সাবের অন্তর্গত রিচমণ্ডে হোয়াইট লজ ভবনে সন্ধ্যা ৯-৫৫ মিঃ। ২৩শে জুন, ১৯১০ তারিখে প্রিন্স অব ওয়েলস্ হন। ২০.১ ১৯৩৬ তারিখে ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহন করেন। কিন্তু মার্কিন মহিলা মিসেস সিমসনকে বিবাহ করিবেন বলিয়া তিনি ঐ বৎসরই ১১ই ডিসেম্বর সিংহাসন ত্যাগ করেন। বিবাহ—৩,৬,১৯৩৭।

—১৯৪৯, কোডিয়া-ইস্কল রাজপথ আপক্যুবল মুক্ত হয়।

—১৯৬০, জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ কুসিয়ামা ও মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিঃ ডগলাস ম্যাক আর্থারের মধ্যে জাপ-মার্কিন চুক্তির দলিল বিনিময় হয়।

—১৯৬১, প্রায় ৪ মাসে কালব্যাপী রাষ্ট্রপতির শাসনের অবসান হইবার পর শ্রীবিজয়ানন্দ পট্টনায়কের নেতৃত্বে ৭জন সদস্য লইয়া গঠিত উড়িষ্যার নূতন মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করেন।

২৪শে—১৩১৪, স্কটল্যাণ্ডের ব্যানকবার্ন নামক স্থানে রবার্ট ব্রুস ইংলণ্ডের রাজা ২য় এডওয়ার্ডকে যুদ্ধে পরাজিত করেন।

—১৩৪০, নেদারল্যাণ্ডের Sluys নদী তীরে ইংরাজ-ফরাসী নৌ-যুদ্ধে ফরাসী সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত হয়।

—১৭৫৭, (শুক্রবার) স্ত্রী লুৎফউন্নিসা ও ৪ বৎসর বয়স্কা কন্যা উম্মৎ জহরাকে লইয়া নবাব সিরাজউদ্দৌলা রাজধানী ত্যাগ করিয়া ভগবান-

সকল রকমের সুন্দর ও মজবুত
বই এবং লেজার বাঁধাইয়ের
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

রামকৃষ্ণ বুক বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
৯০, শোভাবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৫।

পোলা হইতে নৌকাযোগে রাজমহলের দিকে যাত্রা করেন।

—১৮৪০, Horatia Robert kitchener (kitchener of khartoorn) এর জন্ম। ইহাকে ১৯০৯ সাল পর্যন্ত ভারতের প্রধান সেনাপতি ছিলেন।

—১৯১২, ২য় আফগান যুদ্ধের (১৮৮৮-৮০) সেনাপতি স্যার জর্জ পমাট হোয়াইট-এর মৃত্যু। জন্ম—১৮৩৫।

—১৮০৭, জার্মানীর Tilsit-এ ফরাসী, রুশ ও প্রুশিয়ার মধ্যে যে সন্ধি হয়, তাহাতে প্রুশিয়া Elbe নদীর পশ্চিমাংশের আধিপত্য হারায়।

—১৮৪৬, ইংলণ্ডে হাউস অব লর্ডস কর্তৃক শস্য আইন (Repeal of Corn Law) বিধিবদ্ধ হয়।

—১৯১৭, ১ম বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকা হইতে প্রেরিত সৈন্যদল জেনারেল পার্শিং এর নেতৃত্বাধীনে ফরাসী ভূমিতে পদার্পণ করে।

—১৮৩৮, 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের উদ্গাতা কবি বঙ্কিম-চন্দ্রের জন্ম। মৃত্যু—১৩ই এপ্রিল ১৮৯৪।

—১৯০২, ইংলণ্ডের রাজা ৭ম এডওয়ার্ড কর্তৃক Order of Merit (O M.) উপাধি সৃষ্ট হয়।

—১৮৪৬, আয়ার জাতীয় নেতা চার্লস ষ্টুয়ার্ট পার্নেল এর জন্ম। মৃত্যু—৬,১০,১৮৯১।

—১৮৮০, আলবামার অন্তর্গত টাসকাম্বিয়ায় হেলেন এ্যাডম্স্ কেলারের জন্ম। রচনাবলী—The Story of my life—1902; Helen keller's Journal—1938।

—১৮৮৭, মাতুলালয় বর্দ্ধমানের অন্তর্গত পাতিল-পাড়ায় কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের জন্ম। মৃত্যু—১৭,৯,১৯৪৪।

—১৯৪৯, ৮: ভারতের পূর্বতন হিন্দুরাজ্য মণিপুর ভারত-ভুক্ত হয়। ইহা ৰ-শ্রেণীভুক্ত রাজ্য।

—১৯৫৬, লণ্ডনে কমনওয়েলথের নয়জন প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক শুরু। ইহা ৩রা জুলাই শেষ হয়।

২৮শে—১৪৯১, ৮ম হেনরীর জন্ম। মৃত্যু—২৮শে জানুয়ারী, ১৫৪৭।

—১৭৫৭, মীরজাফর আলীকে বাংলার নবাব বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

২৮শে—১৮০৮, সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম।†

—১৮৮৩, ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী গ্যিয়ের লাভালের জন্ম। দেশদ্রোহের অপরাধে প্রাণদণ্ড—১৫ই অক্টোবর, ১৯৪৫।

—১৯০৫, হাওড়া ষ্টেশন হইতে গোরা অভিমুখে প্রথম সত্যাগ্রহী দল (৯জন) বোম্বাই মেলযোগে যাত্রা করেন।

২৯শে—১৮৪১, ব্রিটিশ আবিষ্কারক স্যার হেনরী মর্টন ষ্ট্যানলীর জন্ম। মৃত্যু—১০ই মে, ১৯০৪।

২৯শে—১৯৪৯, বাংলা নাট্যশিল্পের যুগ স্রষ্টা শিশিরকুমার ভাদুড়ির মৃত্যু।†

৩০শে—১৯০৮, সাইবেরিয়ার 'তুঙ্গুস' বনভূমির উপর ভোর ৭টায় প্রকাণ্ড অগ্নিপিণ্ড পতিত হয়। ইহার জ্যোতি ছিল শুক্র গ্রহ অপেক্ষাও বেশী।

—১৯১১, সম্রাট ৫ম জর্জ ও রাণী মেরীর অভিষেক উপলক্ষ্যে ইংলণ্ডের প্রায় ১ লক্ষ বালক-বালিকাকে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়।

—১৯৩৪, কোয়েটায় ভয়ানক ভূমিকম্প।

—১৯৫৯, নেপালে নূতন সংবিধান প্রবর্তন।

* সংযোজক—লক্ষ্মীকান্ত অধিকারী
† অমর বর্দ্ধন

বিংশ শতাব্দী

ভাদ্র | ১৮৮৪ শকাব্দ | ১৩৬৯

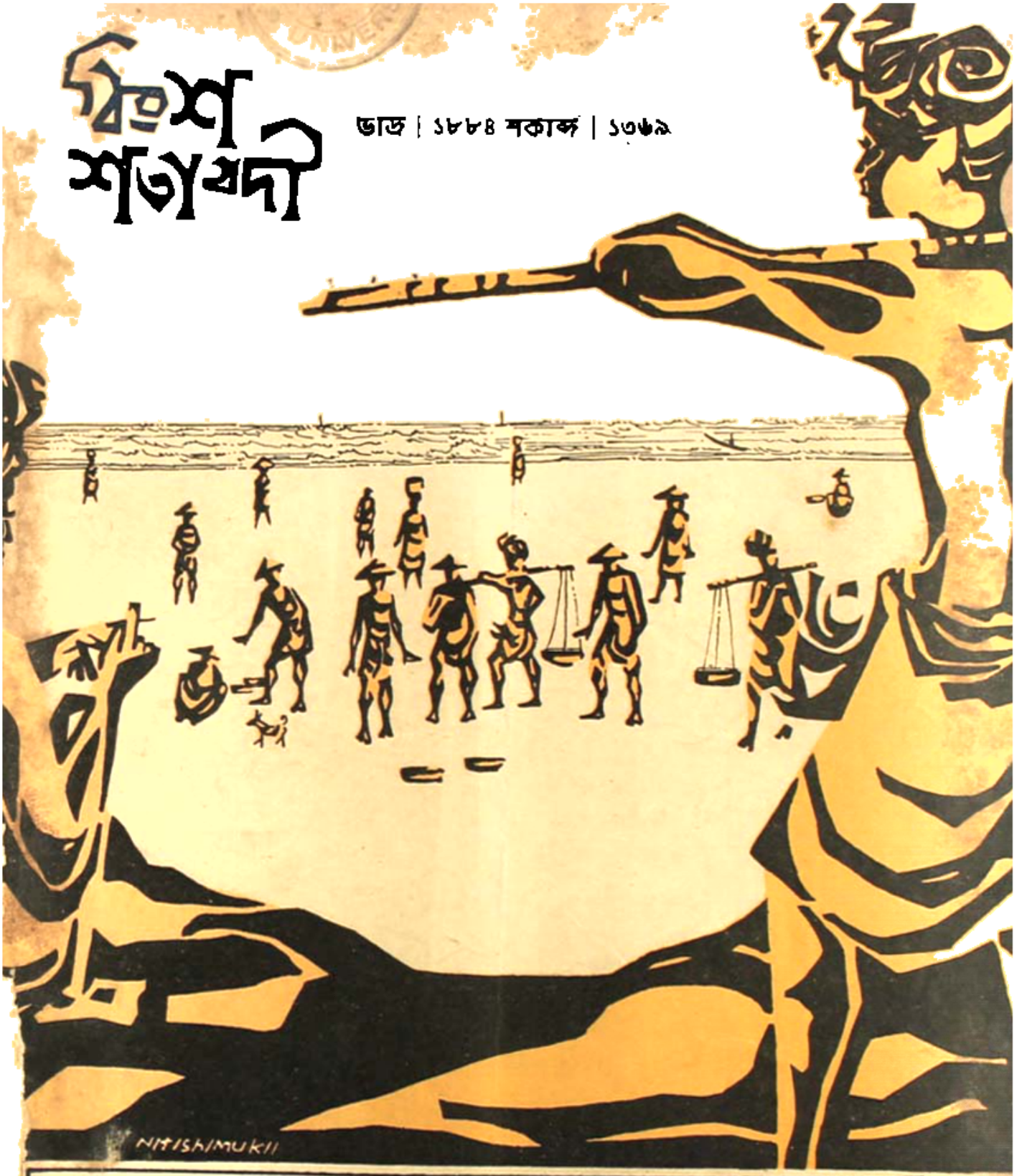

রেটিনা
ফোন ২২-২২২৫
৮-এ
নাল বাজার স্ট্রীট
কলিকাতা

সূচীপত্র

বিংশ শতাব্দী

শপ্তম

লেখক		
সম্পাদকীয়	২১৭	আমাদের কথা
বিজয় শর্মা	২১৮	আধুনিক যুদ্ধের বাস্তবতা (প্রবন্ধ)
ইভেইলো পেত্রোক	২১	অভিনেতা (গল্প)
	২২৪	পাঠকের চোখে (মতামত)
সুরজিৎ মুখোপাধ্যায়	২২৫	কাঁচের খেলা (গল্প)
মণি গঙ্গোপাধ্যায়	২২৯	এই মাটির মানুষ
	২৩৮	কয়েকটি বিদেশী কবিতা (কবিতাগুচ্ছ)
অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়	২৪১	চাওয়ার আকাশ (গল্প)
অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়	২৪৯	ষ্ট্যালিন প্রসঙ্গে (আলোচনা)
ত্রিদেব সাহা	২৫৬	পদধ্বনি (উপন্যাস)
পরিমল সাহা	৩০০	মা হওয়ার জন্য (গল্প)
অমল হালদার	৩০৫	সাধারণের কাহিনী। প্রবন্ধ
সন্তোষ দত্ত	৩০৭	কমন মাস্টের রাজনী
অমিয়াকান্ত বিশ্বাস	৩১০	অমর নাথের গুহার ক্ষেত্রে (ভ্রমণ)
অজয় বসু	৩১৩	অনন্ত উইন্টারভেডন (খেলাধূলা)
প্রমোদ সেনগুপ্ত	৩১৭	ঐতিহাসিক ঘটনা

অঙ্গসজ্জা

নীতিশ মুখোপাধ্যায়

রূপলাবণ্যের উৎস

চিমো প্রসাধনী

লোকনাথ কেমিক্যাল

কলিকাতা – ২৮

আরও কম সময়ে

মাল পাঠাবার জন্য

যে কোনো দিনের যে কোনো অর্ডারকে অবশ্যই বাতিলযোগ্য করে দেওয়া যায়। এই বাধার সম্মুখীন হয়ে সঠিক স্থানে মাল পৌঁছে দেওয়ার পথে যাতে বিঘ্ন না হয়।

নির্ধারিত সময়ে মাল পৌঁছে দেওয়ার পথে বাধা এলে রেলওয়ের সহজলভ্য দুইটি ট্রানজিট সার্ভিসের সুযোগ গ্রহণ করে আপনি অনায়াসে তাকে দূরীভূত করতে পারেন।

নামমাত্র কিছু অতিরিক্ত মাশুল দিলে আপনার বোঝা বিশেষ ট্রেনযোগে দূরবর্তী স্টেশনসমূহে আপনার মালপত্র পাঠানো সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

আপনার জন্য দেওয়া আপনার মালপত্র পৌঁছবে

চাঁটনেগর	তৃতীয় দিনে
কটক	চতুর্থ দিনে
রায়পুর	পঞ্চম দিনে
দুরগ্	পঞ্চম দিনে
নাগপুর	ষষ্ঠ দিনে
বেজওয়াদা	সপ্তম দিনে
বোম্বাই	অষ্টম দিনে
মাদ্রাজ	অষ্টম দিনে
বাঙ্গালোর সিটি	দ্বাদশ দিনে
ইত্যাদি	ইত্যাদি

ফাস্ট ট্রানজিট সার্ভিস

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

IPB/SE/4-62

প্রবন্ধ পত্রিকা

আষাঢ় সংখ্যা এখনও পাওয়া যাচ্ছে

সূচীপত্র

নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত : নীরব প্রার্থনাঞ্জলি
কালীকুমার দত্তশাস্ত্রী : কঞ্চুকী-কথা
ক্ষেত্র গুপ্ত : নাটকার বঙ্কিমচন্দ্র
সুধাংশু ভট্টাচার্য : পূর্ববিলা-গীতিকা
দিলীপ মুস্তাফি : চেখভ ও রবীন্দ্রনাথ
অমলেন্দু ঘোষ : রামকমল সেনের অভিধান
বন্দিকুমারী চক্রবর্তী : বাংলা প্রণয় গাথা-কাব্য
সুধীর করণ : ভাষা-উপভাষা প্রসঙ্গ
রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত : সাম্প্রতিক গল্প

দাম : প্রতিসংখ্যা **এক টাকা**
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা বারো টাকা

প্রবন্ধ পত্রিকা

শ্রাবণ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে

সূচীপত্র

রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত : কাদম্বরী ও রবীন্দ্রনাথ
দেবব্রত চক্রবর্তী : জীবন, সাহিত্য—অনুভূতি
সুধীর করণ : বাংলা সাময়িকের উপভাষা
মৃণালকান্তি ভদ্র : জীবনানন্দ দাশ : অন্তরঙ্গে ও উত্তরণ
বন্দিকুমারী চক্রবর্তী : বাংলা প্রণয়-গাথা-কাব্য
বারীন রায় : আধুনিক নাটকার

এক টাকা
চার টাকা

প্রবন্ধ পত্রিকা

শারদীয় সংখ্যা মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে।

সম্ভাব্য লেখক সূচী

দীনেশচন্দ্র সেন, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, নীরেন্দ্রনাথ রায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ মিত্র, রথীন্দ্রনাথ রায়, দেবীপদ ভট্টাচার্য, আদিত্য ওহদেদার, ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, নরহরি কবিরাজ, ধরণী সেন, শঙ্খ ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত, ভাস্কর বসু মৃণালকান্তি ভদ্র, অশোক মুস্তাফি, দিলীপ মালাকার প্রভৃতি।

দাম দুই টাকা

আজই অর্ডার দিন

প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ ২০, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৫ ফোন : ৫৫-৪৪২৫

বিংশ শতাব্দী গ্রাহকদের জন্য

একটি জরুরী ঘোষণা

প্রতি সংখ্যা 'বিংশ শতাব্দী'র মূল্য ৭৫ নয়া পয়সা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা **নয় টাকা (সডাক)** ষান্মাসিক **সাড়ে চার টাকা (সডাক)**। প্রতি সংখ্যা 'বিংশ শতাব্দী' আনুমানিক পৃষ্ঠা সংখ্যা একশ আঠাশ। এছাড়া শারদীয় সংখ্যা ও অন্যান্য বিশেষ সংখ্যাগুলি আয়তনে যথেষ্ট বর্ধিত হয়ে থাকে। শুধু আয়তনেই নয়, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, চিত্র সর্বদিকেই এই পত্রিকার মান যথেষ্ট উন্নত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া পাঠক ও গ্রাহকবর্গের সুবিধার জন্য আমরা একটা বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। বিংশ শতাব্দীর যাঁরা **বার্ষিক গ্রাহক** কেবল তাঁরাই **অতিরিক্ত মূল্য ছাড়া শারদীয় সংখ্যা সমেত** অন্যান্য বিশেষ সংখ্যাগুলি পাবার অধিকারী। আমরা যে নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করছি সেই অনুসারে **আগামী মহালয়ার মধ্যে যাঁরা বিংশ শতাব্দীর গ্রাহক হবার জন্য মাত্র পাঁচ টাকা পাঠাবেন তাঁদের ষান্মাসিক গ্রাহক হিসাবে গণ্য করা হবে** কোন অতিরিক্ত মূল্য ছাড়া শারদীয় সংখ্যা সমেত ছয় মাসের পত্রিকা পাঠান হবে। শারদীয় সংখ্যার রেজেস্ট্রি খরচ এর মধ্যে ধরা হয়নি। **শারদীয় সংখ্যা যাঁরা ডাকে নেবেন শারদীয়া সংখ্যার রেজেস্ট্রি খরচ ৫০ নঃপঃ এই সঙ্গে তাঁদের পাঠাতে হবে।** যাঁরা শারদীয় সংখ্যা **হাতে নেবেন** তাঁরা **পাঁচ টাকা পাঠাবেন।**

কেবল মহালয়ার মধ্যে যাঁরা গ্রাহক হবেন তাঁদেরই এই সুবিধা দেওয়া হবে। কারণ ষান্মাসিক গ্রাহকরা বর্ধিত মূল্য ছাড়া শারদীয় সংখ্যা পাবার অধিকারী নন। মহালয়ার মধ্যে যাঁরা গ্রাহক হবেন তাঁরা পাঁচটি সাধারণ সংখ্যা, যার দাম ৩·৭৫ নয়া পয়সা এবং **প্রায় পাঁচ শত পৃষ্ঠার শারদীয়** সংখ্যার মূল্য ৩·৫০ নয়া পয়সা—একত্রে ৭·২৫ নয়া পয়সার পত্রিকা **পাঁচ টাকায় পাবেন।** রেজেস্ট্রিযোগে শারদীয়া সংখ্যা পেতে হলে একত্রে **সাড়ে পাঁচ টাকা** পাঠাতে হবে। **যাঁরা বার্ষিক গ্রাহক হবেন তাঁরা ৯৲ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ৫০ নঃপঃ পাঠাবেন।**

আষাঢ় মাসে 'বিংশ শতাব্দী'র বর্ষ সুরু। ঐ সময় থেকে গ্রাহক হওয়া সুবিধাজনক। কিন্তু গ্রাহকেরা বছরের যে কোন সময় থেকে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হতে পারেন। মণি অর্ডার, চেক বা ক্রস পোস্টাল অর্ডারে চাঁদা পাঠাতে পারেন। চাঁদা পাঠানোর সময় পরিষ্কার হরফে নাম ও ঠিকানা এবং কোন মাস থেকে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হতে চান তার স্পষ্ট উল্লেখ থাকা দরকার

॥ অবিলম্বে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হোন ॥

নিবেদক—

প্রচার সচিব।

টাকা পাঠাবার ঠিকানা :—

বিংশ শতাব্দী

২০, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৫

ফোন—৫৫-৪৪২৫

ডাক্র
১৮৮৪
সপ্তম বর্ষ
৩য় সংখ্যা

"সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই"

আমাদের কথা

আলজেরিয়ার পর পশ্চিম ইরিয়ান। সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে আরও একটি দেশ মুক্ত হল পশ্চিম ইরিয়ান প্রকৃতপক্ষে ইন্দোনেশিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ—বহু যুক্তি তর্কেও একথা ডাচ সাম্রাজ্যবাদীদের বোঝান যায় নি—তারা একটি মাত্রই ভাষা বোঝেন, সে ভাষা হল শক্তি প্রয়োগের ভাষা। যেমন করে পর্তুগালের অংশ বলে পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদীরা দাবী করতেন, ইরিয়ান সম্পর্কে তেমনি দাবী উত্থাপন করেছিলেন ডাচ সাম্রাজ্যবাদীরা।

গোয়ার মুক্তির পর ইরিয়ানের মুক্তি আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সোয়েকার্ণো বলপ্রয়োগে ইরিয়ানকে মুক্ত করার সঙ্কল্প ঘোষণা করেন। ডাচ সাম্রাজ্যবাদীরা এবং তাদের অনুচরেরা এ জন্য তাঁর জীবন বিপন্ন করার চেষ্টাও করেছিল। পশ্চিম ইরিয়ানের অধিবাসীদের গণপ্রতিরোধ, সেই সঙ্গে ইন্দোনেশিয় গেরিলা যোদ্ধাদের অভিযানের ফলে শেষ পর্যন্ত ডাচেরা ইরিয়ানের স্বাধীনতা স্বীকার করেছে। আমরা পশ্চিম ইরিয়ানের মুক্তিকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সাম্রাজ্যবাদের দিন শেষ হয়ে এসেছে। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের আগে পৃথিবীর শতকরা ৭০ ভাগ জনসংখ্যা এবং শতকরা ৬৭ ভাগ ভূভাগ সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশরূপে গণ্য ছিল। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তর যুগে অতি দ্রুত সে অবস্থার অবসান ঘনিয়ে আসছে। বর্তমানে পৃথিবীর মাত্র শতকরা আড়াইভাগ ভূভাগ এবং শতকরা ৪ ভাগ মানুষ সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিক শাসনে রয়েছে। এমন দিন আর দূরে নয়, যখন সাম্রাজ্যবাদের চিহ্নটুকুও নিঃশেষে মুছে যাবে।

ইরিয়ানের মুক্তিতে সেই দিকেই মানব সভ্যতা আর এক ধাপ অগ্রসর হল।

আনবিক যুদ্ধের বাস্তবতা

বিজয় শর্মা

প্রাক্তন মার্কিন যুদ্ধ সচিব জর্জ মার্শালের মার্শাল-পরিকল্পনার কথা সকলেরই জানা আছে। আর্থিক সাহায্য দিয়ে দেশগুলিকে অধীন রাখার পরিকল্পনা করে ইনি খ্যাত হয়েছিলেন। মার্শালের পরে এসেছিলেন জন ফস্টার ডালেস। আইসেনহাওয়ারের যুদ্ধ সচিব হিসাবে তিনিও তার কৃতিত্বের পরিচয় রেখে গেছেন। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ সচিব হলেন ম্যাকনামারা। বাঁশের চেয়ে বোধ হয় কঞ্চি সর্বক্ষেত্রেই দড় তাই এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনিও স্বনামধন্য হয়ে উঠেছেন।

এঁর অবদান হল 'আনবিক যুদ্ধের আইন' প্রণয়ন। আনবিক যুদ্ধের নিয়ম কানুন কি হওয়া উচিত সে সম্পর্কে তার প্রস্তাব তিনি জানিয়েছেন আর প্রেসিডেন্ট কেনেডি সে ব্যাপারে তৎক্ষণাৎ পূর্ণ সম্মতি ঘোষণা করেছেন।

যুদ্ধ চাই, আনবিক যুদ্ধ, তবে কিনা সে আনবিক যুদ্ধ হবে মানবিক। মানুষই যখন আনবিক অস্ত্রের উদ্ভাবনকর্তা তখন 'মানবিক আনবিক' যুদ্ধ চওয়াই প্রয়োজন। সুতরাং তিনি রকেট ও পরমাণু যুদ্ধের নিয়ম প্রণয়ন করে বলেছেন, নিউইয়র্ক বা ওয়াশিংটনের মত বড় বড় সহরে আনবিক অস্ত্র ক্ষেপণ না করার ব্যাপারে যেন অন্য পক্ষ সম্মত হন। এই অস্ত্র কেবল ব্যবহার করা হবে ছোট সহর এবং সৈন্যবাহিনীর উদ্দেশ্যে। এর ফলে আনবিক অস্ত্রে মৃত্যু ও ধ্বংসের পরিমাণ অনেক কমে যাবে। এই হল মানবিক ধরণের আনবিক যুদ্ধ। চমৎকার!

মেগাটন বোমা যে সাধারণ ধরনের কামানের গোলা নয়, সে কথাটাও কি মিঃ ম্যাকনামারা জানেন না? জানেন নিশ্চয়, তবু হয়ত আশা রাখেন তিনি জানলেও সাধারণ মানুষ হয়ত জানে না, তাই তাদের বিভ্রান্ত করা যেতে পারে এই কথায়। মার্কিন বিশেষজ্ঞরাও বলেছেন, ২০ মেগাটনের একটি বোমার বিস্ফোরণ যদি কোথাও ঘটে তবে তার ১৫ মাইলের মধ্যে প্রাণের চিহ্ন লুপ্ত হয়ে যাবে এবং তার আগুনের লেলিহান শিখায় ধ্বংস হবে বহু শত মাইল। নিউইয়র্কে যদি বিস্ফোরণ ঘটে ফিলাডেলফিয়াও রক্ষা পাবে না। তাছাড়া ২০ মেগাটনের হাইড্রোজেন বোমা তো আজকে ফুদে বোমার পর্যায়ে পড়ে। ৫০, ১০০ বা তার চেয়ে বড় মেগাটন বোমা ইতি মধ্যেই নির্মিত হয়ে গেছে।

—বেকারদের বিরাট সুযোগ—

ঃ ইলেকট্রিক এ্যাণ্ড রেডিও গাইড ঃ

বাড়ীতে বসে ইলেকট্রিক ইঞ্জিনীয়ারিং, রেডিও তৈয়ারী ও মেরামত, ওয়ারিং ইত্যাদি শিখুন। মাত্র ৫০৲ টাকায় বাড়ীতে বসে কি করে "ট্রানজিসটার রেডিও" তৈয়ারী করা যায় শিখুন। রেডিও এবং ইলেকট্রিক বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণের জন্য ৪০০ শত ছবিসহ এক অভিনব পুস্তক পাওয়া যায়। দাম মাত্র ৮'৫০ টাকা, ভি. পি পি. খরচা অতিরিক্ত ২৲ টাকা।

নিম্নলিখিত বই পাওয়া যায়:

টেলারিং এবং কাটিং (ছবিসহ) ৫৲, সাবান এবং গন্ধ দ্রব্য তৈয়ারী—৫৲, ফটোগ্রাফী শিক্ষা—৫৲। লিখন এবং অঙ্কন, পরিবর্ধিত সম্পূর্ণ নূতন সংস্করণ ৪০০ শত ছবি সহ—৬৲। বিবাহিত জীবন ৮৮টি ছবি সহ ৫৲। ভি. পি. পি. খরচা অতিরিক্ত—১৲ প্রতিটি বইয়ের জন্য।

GLOBE BOOK DEPOT (N.P.-15)

HALKA No-23. ALIGARH CITY

Bata

বাটার রবার স্লীপার : অবাধ গমন যত্রতত্র

যুদ্ধ চাই। আনবিক যুদ্ধ করব অথচ আনবিক অস্ত্র প্রযুক্ত হবে বড় শহরে নয় কেবল সৈন্য বাহিনীর উদ্দেশ্যে এবং ছোট ছোট শহরে। এ হল অতি হাস্যকর প্রস্তাব। কে, কী জানে সৈন্য বাহিনী বড় সহরেই তাদের আস্তানা রাখে। তা ছাড়া বড় সহরের মানুষের প্রাণের দাম আছে, ছোট সহরের বাসিন্দারা অমানুষ—এ কথা ভাবতে পারা মুস্কিল। তা ছাড়া যদি রকেট-পরমাণু যুদ্ধ বাধে তবে সে যুদ্ধ, আইনকানুন মেনে চলবে এ আশা করা বাতুলতা।

তবু যে ম্যাকনামারা এই প্রস্তাব করতে পেরেছেন তার কারণ আছে। আনবিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে সমস্ত পৃথিবীর মানুষের ঘৃণাই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধোন্মাদ থেকে বিরত রেখেছে। যদি এই নতুন কৌশলে, আনবিক আনবিক যুদ্ধের মনোভাব দেখিয়ে তাদের যুদ্ধ বিরোধিতাকে হ্রাস করা যায় তবে কোটি কোটি মানুষের হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠান করতে তারা বিলম্ব করবে না।

'আর যুদ্ধ নয়' গ্রন্থে মার্কিন বৈজ্ঞানিক লিনাস পলিং দেখিয়েছেন, আনবিক যুদ্ধ সুরু হলে খুব কম করেও ৮০ কোটি মানুষের মৃত্যু ঘটবে। আনবিক অস্ত্রের হাত থেকে আত্মরক্ষা আদৌ সম্ভব নয়।

এই একটি মাত্র ব্যাপারই আনবিক যুদ্ধের সম্ভাবনাকে চিরতরে রোধ করার আন্দোলনের পক্ষে যথেষ্ট। আনবিক যুদ্ধ যে এখনও সুরু হতে পারেনি তার কারণ হল ঐ অস্ত্রে সোভিয়েত ইউনিয়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের থেকে অনেক অগ্রসর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জানে এখন যুদ্ধ ঘোষিত হলে সোভিয়েত ইউনিয়ন ধ্বংস হোক বা না হোক মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের একটি রক্ষিকাও জীবিত থাকবে না। আমেরিকার যুদ্ধ অর্থনীতি তাই দামামা বাজিয়ে বলে চলেছে, জোরে আরো জোরে চল—আনবিক অস্ত্রে রাশিয়াকে শেষনে ফেলতে হবে।

এই মানেই ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের অন্তর্নিহিত শক্তির পরীক্ষা চলেছে। শত চেষ্টা করেও অস্ত্রের উন্নতিতে সোভিয়েত ইউনিয়নকে ধরে ফেলা দূরে থাকুক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্রমাগতই পেছিয়ে পড়ছে। দিনের আলোর মত ক্রমাগত এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠছে সোভিয়েত অস্ত্রের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের অসাধ্য।

তা হলে উপায় কি? মার্কিন অর্থনীতি কেমন করে সঙ্কটের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবে?

যতদিন যাবে ততই যদি সোভিয়েত অর্থনীতি ও সমরাস্ত্র উন্নত হয় তাহলে এই মুহূর্তই হল যুদ্ধ আরম্ভের পক্ষে সর্বাধিক প্রশস্ত সময়।

মরীয়া হিটলার যে ভুল করেছিল, মরিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও সেই ভুল করতে উদ্যত হয়েছে। তারা বারবার বলেছে, অতর্কিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর আনবিক অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, প্রথম চোটেই কাবার করতে হবে সোভিয়েত ইউনিয়নকে।

হিটলারের পথের পরিণতিও হবে হিটলারের পরিণতিতে। এই রকম যুদ্ধ বাধলে প্রথম চোটে সোভিয়েত ইউনিয়নের মারাত্মক ক্ষতি হবে সন্দেহ নেই। কিন্তু পৃথিবীর এক ষষ্ঠাংশ এলাকা ও ২২ কোটি জনসংখ্যা প্রথম আক্রমণে নিঃশেষ হবে না। কিন্তু পাল্টা আক্রমণ কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রুখতে পারবে?

আমাদের দেশেও একদল তথাকথিত বুদ্ধিজীবী আছেন যারা সোভিয়েত ইউনিয়ন আনবিক অস্ত্রের বিস্ফোরণ ঘটালে তার স্বরে প্রতিবাদ করেন কিন্তু পশ্চিমীদের ব্যাপারে মৌনই থাকেন। তারা এ কথা ভুলে যান, সোভিয়েত ইউনিয়ন এ পর্যন্ত ৮০ বার আনবিক অস্ত্রের পরীক্ষা চালিয়েছেন, কিন্তু পশ্চিমীরা পরীক্ষা চালিয়েছেন ২৪০ বার।

পৃথিবী যে আজও মার্কিন তাঁবেদারে পরিণত হয়নি, আজও যে 'মানবিক আনবিক যুদ্ধ' মানুষকে গ্রাস করতে পারে নি, নতুন নতুন হিরোশিমা এবং নাগাসাকির সৃষ্টি হয় নি তার একমাত্র কারণ সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং তার দুর্জয় রকেট পরমাণু অস্ত্র।

যারা দুষ্কৃতিকারী আর যারা তাদের প্রতিরোধ করেছেন তাদের একাসনে বসানোর বিভ্রান্তি থেকে আমাদের দেশের এই পণ্ডিত মূর্খরা মুক্তি পাবেন কবে?

অভিনেতা

ইভেইলো পেত্রোভ্

গত পরংকালে আমাদের গ্রামে বেড়াতে গিয়েছিলাম। দিন দুই একটু আয়েস করে বিশ্রাম করার পর একদিন মাঠে শিকার করতে বেরুলাম। দুপুরবেলা রোদ যখন খুব প্রখর হয়ে এলো তখন মিতিয়ু চাচার বাড়ের পুকুর-টার ধারে একটু জল খাবার জন্য আসলাম। দুটো ছোট ছোট পাহাড়ের মাঝখানে বন্য উপত্যকাটা একেবারে নির্জন। পুকুরের ধারে ধারে নলখাগড়ার ঝোপগুলোর মধ্যে মাঝে মাঝে গাছগুলো নাড়িয়ে উঠার 'ছলাৎ' 'ছলাৎ' শব্দ শোনা যায়—আর শোনা যায় ক্বচিৎ কোন নিঃসঙ্গ ব্যাঙের ডাক। সেই ক্ষণিক শব্দের রেশটুকু মিলিয়ে যাবার পর নিস্তব্ধ, নিস্তরঙ্গ পুকুরের নীল জল যেন সবুজ-ঘাসে-ঢাকা পুকুরের পাড়ে টান টান হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ার আহবান জানায়।

মিতিয়ু চাচা কিন্তু ঘুমিয়ে ছিলেন না। তাঁর গাদা-রঙ করা কাঠের ঘরটার কাছে এগোতেই আমি তাঁর গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম। তিনি যেন কাউকে ধমকাচ্ছিলেন:

"ব্যাটা ছাগল চোর! তুই আমাকে কখনো ঠকাতে পারবিনে:

"দ্যাখ্ খবরদার! গালাগাল দিবিনে! আমি তো বিলতোই খেলছি তুই ই-শুরু···"

গলার স্বর শুনে বুঝতে পারলাম যে দোষের কথা বলেন পাল্টী কানতিন। অমনি আমার মনে পড়ে গেলো যে সন্ধ্যার খাবারে যোগদান করার আগে মিতিয়ু চাচা রোজই বিকেলে পাল্টীমশাইর বাড়ি গিয়ে তাঁর সঙ্গে ব্ল্যাক গ্যাম খেলতেন। এরা দুজনেই ব্ল্যাকগ্যামন খেলা এতো ভালোবাসতেন যে আহারনিদ্রা ছেড়ে সারা দিন রাত ধরে ব্ল্যাকগ্যামন ঘুঁটি চালতে তাদের একটুও ক্লান্তি বোধ হতো না। তাই পাল্টী কনস্তাদিনের কণ্ঠস্বর শুনে আমি মনে মনে ভাবলাম: "এই-ই বলে খেলার খেলা! এই লেখার টানেই বুড়ো পাল্টীমশাই দুপুরের রোদে পুরো দিন বিলোমিটার পথ হেঁটে মিতিয়ু চাচার এ মহলে ব্ল্যাকগ্যামন খেলতে এসেছেন।

"ধাম্।" আবার মিতিয়ু চাচার রুদ্ধ কণ্ঠস্বর কানে আসে। "শীগ্রী ঘুঁটিটা যেখানে ছিলো সেখানে রেখে দে।"

"কেন ধাপ্পা? দুবার ছেলে পাঁচ আর তিন পেয়েছি আমি।"

"না; পাঁচ আর এক।"

"কক্ষনো না, পাঁচ আর তিন।"

"আমি বলছি পাঁচ আর এক।"

"এ রকম জানা লোকের সঙ্গে আমি খেলবো না।"

"তুই সব সময় এরকম করে ঠকাতে চেষ্টা করিস। কিন্তু আমার চোখে কক্ষনো ধুলো দিতে পারবিনে, বলে দিলুম।"

মিতিয়ু চাচার মতো শান্ত, গোবেচারা গোছের একটি বৃদ্ধ লোক এই ভরা দুপুর বেলায় গাছের শীতল ছায়ায় শুয়ে বিশ্রাম করার বদলে বন্ধ ঘরের গুমোট গরমে বসে বসে 'ব্ল্যাকগ্যামন' খেলছেন আর তাঁর ছেলেবেলার বন্ধু বৃদ্ধ পাল্টীর সঙ্গে তুই তোকারী করে ঝগড়া করছেন—এই কথা ভেবে আমি একটু অবাক হয়ে গেলাম।

হোম সিনেমা প্রজেক্টর

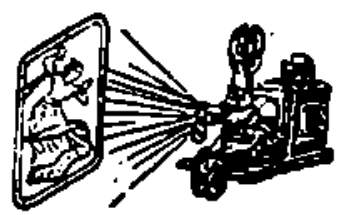

নিজের বাড়ীতে বসে যথার্থ সিনেমা দেখবার আনন্দ উপভোগ করুন। ৮ঁ বা ইলেকট্রিকসিটি উভয়ের সাহায্যেই চালানো যায়। ৩৫ মিলিমিটার ফিল্ম, যা সিনেমায় ব্যবহার করা হয়, এতেও তা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এতে স্ক্রীনের ওপর উজ্জ্বল ফোকাস প্রতিফলিত হয়। পূর্ণাঙ্গ ছবির আকার ৪'×৪ ফিট। নানা রংয়ের ছবি এতে স্বয়ংক্রিয় ভাবেই চলেফেরা ও অভিনয় করে থাকে। প্রতিটি প্রোজেক্টরের সঙ্গে ১০ গজ ফিল্ম ও সচিত্র নিয়মাবলী বিনামূল্যে দেওয়া হয়। মূল্য—১৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা, ভি, পি, পি, চার্জ—৪ টাকা ৫০ নয়া পয়সা। স্পেশাল (ভি লুক্স) কোয়ালিটি অতিরিক্ত ফিল্ম—প্রতি গজ ৫০ নয়া পয়সা, স্ক্রীন—৩ টাকা। অগ্রিম ৫ টাকা অবশ্য প্রেরণীয়।

TECHNICAL STORES

117/592, PANDU NAGAR, KANPUR.

"দ্যাখ্, তুই ভগবানের নাম করে থাকলেও বড্ডো মিছে কথা বলিস" মিতির্ চাচার আবার গলা শোনা যায়।

"মিছে কথা আমি বলিনি, মিছে কথা বলিস তুই আর তা বলিস খেলতে জানিস না বলে।" পাল্টামশাই উত্তেজিত ভাবে উত্তর দেন।

"আমি খেলতে জানিনে, না তুই খেলতে জানিস না?"

"দ্যাখ, আমরা কুড়ি বছর ধরে খেলে আসছি। এর মধ্যে তুই আমাকে শুধু একবার হারাতে পেরেছিলি—তাও আমি নেহাৎ দয়া করে ছেড়ে দিয়েছিলাম বলে।"

"বুড়ো বয়সে তোর স্মরণ শক্তি একেবারে লোপ পেয়েছে! সেজন্যই তোর মনে পড়ছেনা যে এই কয়েক বছর আগেই তোকে খেলায় হারিয়ে তোর কাছ থেকে ১০০ 'লেভার বাজী জিতেছিলাম, আর সেই ১০০ লেভা' দিয়ে ইস্টারের পূর্বের দিন একটা নতুন টুপী কিনে ছিলাম। সরাইখানার সবলোক তার সাক্ষী ছিলো।"

"তুই এতো চাক পেটাস বলেই তো আমি তোর সঙ্গে খেলতে চাইনে।"

"বেশ, তাহলে খেলিস নে।"

"না:। এই শেষ বার খেলবো, শুধু তোকে আরো একবার হারাবার জন্য।.....তু আমার কাছ থেকে ১০০ লেভার বাজী নিয়েছে! আর তোর বুঝি মনে পড়েনা সেবারে খেলায় তোর সরাই খানার সকলের সামনে তোকে যে ক্রসের উপর 'ব্ল্যাকম্যানন' বোর্ডটা রেখে চুলু খেতে হয়েছিলো?"

তারপর কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর মিতির্ চাচাকে উত্তেজিত কণ্ঠে বলতে শোনা যায় 'ও-তো-গে! ঠিক এই জিনিষটাই আমি চেয়েছিলাম। এখন আর আমার ঘুঁটি পেরিয়ে যেতে পারবে না। যতোক্ষণ দুই আর চার না পাচ্ছ ততক্ষণ ঘুমোও গিয়ে এবার।"

কিন্তু পাল্টামশাই ঘুঁটি চেলে বোধ হয় ঠিক দুই আর চারই পেয়ে যান, আর তাঁর ঘুঁটিগুলো নির্বিবাদে এগোতে থাকে। খেলায় তাঁর জিত অবশ্যম্ভাবী দেখে মিতির্ চাচা আর ধৈর্য্য রাখতে পারেন না। তিনি রেগে চেঁচিয়ে উত্তেজিত ভাবে বলল তুই একটা ঠক্, জোচ্চোর।"

'দ্যাখ্, মুখ সামলে কথা বলিস।'

"ছাগল চোর!"

"নরকের কীট? হাত নাড়াবার ক্ষমতা নেই খেলতে আসে দ্যাখ্ ভগবান দেখছেন সবই উপর থেকে।"

"তোর ভগবানের দাড়ি ছিঁড়ে ফেলে আমি!" মিতির্ চাচা চেঁচিয়ে জোরে টেবিলে ঘুসি মারেন। ব্ল্যাকগ্যামনের ঘুঁটিগুলো ছড়িয়ে মেঝের পড়ার শব্দ শোনা যায়।

এরকম উত্তেজিত পরিস্থিতিতে দুই বুড়োর মধ্যে যাতে হাতাহাতি সুরু হয়ে না যায় সেজন্য আমি আর বাইরে চুপ করে দাঁড়িয়ে না থেকে দরজায় টোকা দেই।

অমনি মিতির্ চাচা তার স্বাভাবিক শান্ত কণ্ঠে ভেতর থেকে সাড়া দিয়ে বলেন: "ভেতরে এসো।"

দরজা খুলে অবাক হয়ে দেখি তিনি একাই বসে আছেন।

"আপনি কার সঙ্গে খেলছিলেন?" হতবুদ্ধি হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করি তাঁকে।

"কেন? একা একটু খেলছিলাম," খুব অবিচালিত ভাবে ব্ল্যাকগ্যামন বোর্ডটা সরিয়ে রাখতে রাখতে তিনি উত্তর দেন।

"মোটেই না, পাল্টামশাই কোথায়?"

"কোন পাল্টার কথা বলছো? সে ব্যাটা আর কোন দিন এমুখো হবে না।"

ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম হতেই হাসতে হাসতে আমার পেট ফেটে যাবার যোগাড়। মিতির্ চাচা কিন্তু নির্বিকার ভাবে বসে একটার পর একটা দুর্বোধ্য বীজ চিবিয়ে যাচ্ছিলেন। আমাকে ওভাবে হাসতে দেখে তিনি একটু জিজ্ঞাসু নেত্রে আমার পানে তাকালেন।

"সত্যি! আপনার খুব বড়ো অভিযোগ!" কোন রকমে সামলে আমি তাঁকে বললাম।

"অ্যা?" মিতির্ চাচা তাঁর স্বাভাবিক শান্তভাবে জবাব দিলেন। মানুষ যখন একা থাকে তখন সে তার যা খুসী তাই হতে পারে। তখন অভিযোগ করা তো সামান্য ব্যাপার, তখন ইচ্ছা করলে এমনকি বিপজ্জনক হওয়া যায়। আসলে কী জানো, মানুষ যখন একা থাকে তখন সে তার সত্যিকার ব্যক্তিত্বকে খুঁজে পায়।"

রোজপরার কাপড়

সানলাইটে কেচে

কত ফরসা, ঝলমলে!

পরিষ্কার, ঝলমলে, ধব্‌ধবে ফরসা কাপড়!
সানলাইটে কাপড় কাচার এই গুণ!
সব কাপড়জামা বাড়ীতে সানলাইটে কাচুন···

সানলাইট—উৎকৃষ্ট ফেনার, খাঁটি সাবান

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

S.SDA-BEN 80

পাঠকের চোখে বিংশ শতাব্দী

সাধারণ অর্থে বাংলার গল্প উপন্যাস কবিতার নিকট সম্বন্ধ নেই কিন্তু তথ্য-তত্ত্বসমৃদ্ধ বা বিশ্লেষণমূলক রচনা পাঠকে তুলনায় খুবই দীর্ঘ। কাজেই বিংশ শতাব্দীর কাছে আমি সেই লেখা আশা করি যা জ্ঞানতৃষ্ণা বাড়ায়, বৈজ্ঞানিক যুক্তি-চিন্তাকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা করে। বিংশ শতাব্দী মোটের ওপর ভালই, অন্ততঃ বাজারের যে কোন সিনেমা-সাহিত্য পত্রিকার চাইতে ঢের উচ্চস্তরের। তবে আমার মনে হয় এর অলঙ্করণ আরো শোভন হওয়া দরকার।

সুশান্ত চক্রবর্তী
ওল্ড ভবন, ২১৯৩ নতুন বাগ, লখ্‌নৌ।

বিংশ শতাব্দীর ছাপা সাধারণ দুর্বল, বানান ভুলও প্রচুর কাগজ কি আরো ভাল করা সম্ভব নয়?

শঙ্করানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়
ডিমাই নগর, ডিমাই—১

ভালো রান্নী হ'তে হ'লে চাই

কুকমী

গুঁড়া মশলা

কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (সাইস) প্রাঃ লিঃ
২৩১, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলি-৭
ফোন:-৩৩-১২৩২

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত মাসিক পত্রিকার মধ্যে অনেক দিক থেকে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে বিংশ শতাব্দী। এত অল্প মূল্যে এই কালোবাজারী যুগে এমন একখানি আদর্শ পত্রিকা আর দ্বিতীয় নেই। তবে বিংশ শতাব্দীর ছোট গল্পগুলির মান উন্নত নয়। কবিতাগুলি খুবই দুর্বোধ্য লাগে কিন্তু প্রবন্ধগুলি আমাকে খুবই আনন্দ দেয়।

নজরুল হক্‌
মালঞ্চ, বোলপুর, বীরভূম।

বর্তমানে আপনারা যে সব গল্প, কবিতা পরিবেশন করে থাকেন, তা অতি নিকৃষ্ট, পড়ার অযোগ্য আপনারা আর একটু সচেষ্ট হলে বিংশ শতাব্দী তার পুরোনো গৌরব পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হবে।

হাসান মুরশীদ, গ্রামঃ গোগলবাটি,
পোঃ রাধাবল্লভহাট, বীরভূম।

বিংশ শতাব্দীর কয়েকটি নতুন বিভাগ খোলা উচিৎ। সাধারণ সংখ্যাতেও বর্তমান যুগের শক্তিধর লেখকদের লেখা দেওয়া উচিত। স্বল্পমূল্যে পত্রিকা সরবরাহ করার যে ব্রত আপনারা নিয়েছেন তা অভিনন্দনযোগ্য।

জিতেন্দ্র কুমার দাস
পোঃ পালংঘাট,
জয়ন্তীয়া পাহাড়, আসাম।

মাসিক, পাক্ষিক, ও সাপ্তাহিক ভালো পত্রিকা ছাপা আমার একটা ঝোঁক। বিংশ শতাব্দীর মান যে সব পত্রিকার উর্ধ্বে।

নিত্যানাথ চট্টোপাধ্যায়
জনাই, জেলা—হুগলী।

দর্শনের নিবেদন

কলিকাতার বাজের বাজারের সঙ্গে কোন কোন সাহিত্য পত্রিকাগুলির তেমন কোন বিশেষ প্রকৃতির পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায় না। দর, দাম, ছবি, ভাক থেকে আমাদের সাহিত্যে নোংরা বাজারের সকল রীতিনীতিই উপস্থিত হচ্ছে আজকাল।

কিন্তু অন্য পত্রিকা থেকে "বিংশ শতাব্দী" মাসিক পত্রিকা স্বতন্ত্র, দিনে দিনে বিংশ শতাব্দী অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠছে। সম্পাদনা প্রভৃতি সকল দিক থেকেই প্রথমাবধি এটি বাংলার শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকাগুলির অন্যতম বলে আমার মনে হয়।

শ্রীকালীপদ দাস
১নং রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট কলি ৬।

কালার খেলা

সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়

শেষ রাতে ঘুম ভেঙে গেল তমালের।

উঠোনে নারকেল গাছটা বনস্য পুতুলের নেয়ারের মতো মাথা দোলাচ্ছে। আকাশে পাতলা মেঘের আস্তরণ। একটাও তারা নজরে পড়ে না। ম্লান কালি চরিটাকে দেখে বাসি কমলা লেবুর কোয়ার মতো মনে হল তমালের।

এখনও সকাল হতে দেরী আছে। চা হতে সেই সাতটা। মেজদি, সোনাদি, ছোড়দা, দাদা, মা—সবাই উঠবে, মুখ ধোবে—তারপর। ততক্ষণ আর একটা ঘুম অনায়াসে দেওয়া যাবে।

তমাল চোখ বুজল। কিন্তু তার গায়ে এ কার হাত? তমাল হাত ছুঁয়ে ছুঁয়ে সেই হাতটাকে অনুভব করতে চেষ্টা করল। রোগা রোগা অস্থিসার আঙুল। মায়ের হাত। তার পাশে মা কেন সে তো মেজদির পাশে শোয়। মনে হতেই চোখ খুলে ফেলল তমাল।

একি! এ কোথায় শুয়ে আছে সে? বারান্দার এক কোণে। মাদুরের ওপর। হাজার গরম পড়লেও সে তো বারান্দায় ঘুমোয় না। বারান্দায় ঘুমুতে তার ভয় করে। তার জন্যে মেজদিকেও ঘরে শুতে হয়। মেজদি পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে গল্প না বললে তার ঘুম আসে না।

তবে কি কাল রাত্রে অঙ্ক পারে নি বলে মাস্টার মশাই কান মলে দিয়েছিল। আর তাই সে রাগ করে বারান্দায় শুয়েছে? না, তা তো নয়। তমাল একটু

উঁচু হল। ম্লান চাঁদের আলোয় অস্পষ্ট হলেও কাউকে চিনতে অসুবিধে হচ্ছে না। মায়ের পাশে সোনাদি, তারপর মেজদি, ছোড়দি, একেবারে শেষে ছোড়দা!

ছোড়দি নড়ছে। এপাশ ওপাশ করছে। নিশ্চয়ই জেগে আছে। ঘুনোলে তো অত তাড়াতাড়ি এপাশ ওপাশ করত না। তমাল একবার ডাকবে ভাবল। না থাক্। ডাকলে ভাববে, ভয় পেয়েছে তাই ডাকছে। কাল সকালে ভীতু বলে ক্ষ্যাপাবে। তার চেয়ে না ডাকাই ভাল।

ঘরে চটিপায়ে কে যেন পায়চারি করছে। তমাল কান পাতল। এ চটির শব্দ সে চেনে। বাবার চটির শব্দ। বাবা এত রাতে পায়চারি করছে কেন? কি হয়েছে? ভাবতে গিয়ে সব কিছু আস্তে আস্তে মনে পড়ল তমালের। কালকের ঘটনাটা সব কিছুকে এলোমেলো করে দিয়েছে।

সূর্যটা তখন তেঁতুল গাছটাকে ছাড়িয়ে প্রায় মাঝ বরাবর এসে পৌঁছেছিল। তমাল চুল কাটছিল ঘরের কাগজের জামা পরে। আর মেজদি সাবান দেবে বলে এক রাশ ময়লা কাপড় জামা নিয়ে বসেছিল উঠোনে। তমাল নাপিতকে বলছিল—'খবরদার। বাবার কথা শুনে যেন ছোট করে চুল কেটে দিও না।' মেজদি শুনতে পেয়ে বলেছিল – 'দাঁড়া, বাবাকে ডেকে তোর স্টাইল বের করছি।' আর তখনই বাবা প্রায় ছুটতে ছুটতে বাইরের বৈঠকখানা ঘর থেকে এসে চলে গিয়েছিল ওপরে। তমাল ভেবেছিল, এই রে, মেজদি বাবাকে বলে দেবে। কিন্তু মেজদি বাবাকে দেখে বলতে সাহস পায় নি। বাবাকে এত গম্ভীর মুখে, এত তাতাতাড়ি চলতে তমাল কখনো দেখে নি। বৌদি ছোড়দি সবাই পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করেছিল। কি হয়েছে? তারপর ব্যাপারটা বুঝতে ওপরে চলে গিয়েছিল। মেজদিও উঠে গিয়েছিল হাত ধুয়ে। দোতলা থেকে মৃদু গুংগোল ভেসে আসছিল। অস্ফুট কলরব। তমাল অস্বস্তি বোধ করছিল নাপিতের কাঁচির মধ্যে। 'শুধু পেছনটা কেটে দাও তাহলেই হবে'। নাপিতকে সে তাড়া লাগিয়েছিল।

এমন সময় ছোড়দি নেমে আসতেই তমাল জিগ্‌গেস করেছিল—কি হয়েছে রে?

—জানিস্‌ না। টেলিগ্রাম এসেছে। বুবুলদার খুব অসুখ।

বুবুলদার অসুখ। শুনে তমালের মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আর চারদিন পরে বুবুলদার আসবার কথা। কাটিহার থেকে। অসুখ হলে তো আসতে পারবে না। তমালের প্রায়ই অসুখ হয় বলে ও জানে, অসুখটা ভারি বিশ্রী। খালি তেতো মুখে শুয়ে থাকতে হয়। বড্ড ফাঁকা ফাঁকা লাগে, মনে হয়, কেউ নেই। কেউ নেই।

চুল কাটা হয়ে গেলে তমাল শান্ত ছেলের মতো বাথরুমে ঢুকে পড়েছিল। অন্যদিন হলে সে আস্তে আস্তে জল ঢালত, মোড়কে নিমপাতা আঁকা গাঢ় সবুজ রঙের সাবানটা অনেকক্ষণ ধরে গায়ে ঘসত, তারপর বাইরে থেকে ছোড়দা ধমক দিলে লালচোখে বেরিয়ে আসত। কিন্তু কাল সে সেসব কিছুই করে নি। মাথাটা গুঁড়ি করে সাবান বুলিয়ে, গায়ে দুমটি জল ঢেলে বেরিয়ে এসেছিল। কিছু ভাল লাগছিল না। খেতে বসে পোনা মাছের মুড়োটা খুব ছোট দেখেও ঠাকুরের সঙ্গে ঝগড়া করতে ইচ্ছে হয় নি। তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে সোজা ওপরে।

মা তখন শুয়ে শুয়ে কাঁদছিল। মেজদি, বৌদি একপাশে বসেছিল চুপ করে। তমাল মাকে বলেছিল 'অসুখ হয়েছে তো কাঁদবার কি আছে?' মা কিন্তু কান্না থামায় নি। সুরটা আরও উঁচুতে উঠেছিল। 'ওরে বুবুল রে।' তমালের বিরক্ত লেগেছিল। এ প্যান-প্যানানি কান্না তার ভাল লাগে না। এখান থেকে সে সরে এসেছিল বাবার ঘরে। বাবা তখন দাদাকে বলছিল—'অসুখ যদি একটু কম থাকে তা হলে কালকের ট্রেনেই নিয়ে আসিস্‌। আর—' বাবা কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গিয়েছিল। কয়েকটা মুহূর্ত পেরিয়ে যাবার পর বলেছিল—'আর যদি তেমন কিছু হয়, আমাকে একটা টেলিগ্রাম করে দিয়ে যা কর্তব্য করিস্‌।' বাবার স্বরটা ক্রমশঃ ভারী হয়ে ডুবে গিয়েছিল। তমালের ভাল লাগে নি। এরা সবাই অশুভ আশঙ্কা করছে। খুব অসুখ হলেই কি মানুষ মরে যায়? তবে? তমাল জানালার শিক ধরে বাইরে তাকিয়েছিল। বাইরে তখন দমকা হাওয়ায় ধুলো উড়ছিল। ঘুরঘুর করে ধুলো জমেছিল গেটটার পাশে করবী গাছের পাতায়। তবু ওরই মধ্যে ফুলগুলো কি আশ্চর্য লাল! ফুলে বোধহয় ধুলো লাগে না।

কিছুক্ষণ পর রিক্সা চেপে দাদা আর বিনু কাকা বেরিয়ে গিয়েছিল। স্টেশনের রাস্তাটা জানালা দিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। তমাল সেই দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে পোস্টাফিসের লাল সাইকেলটা দেখতে পেয়েছিল। তারপর সাইকেলটাকে করবী গাছটার কাছে থামতে দেখে সে চেঁচিয়ে উঠেছিল—বাবা টেলিগ্রাম।

বাবা সিঁড়িতে চটির শব্দ তুলে নীচে নেমে গিয়েছিল। পিয়নটা বৈঠকখানায় ঢুকে যাওয়াতে তমাল দেখতে পাচ্ছিল না। জানালার শিকে মাথা ঠেকিয়ে কৌতূহলী চোখ দুটোকে যতদূর সম্ভব নীচে করে রেখেছিল। কয়েক মুহূর্ত পর পিয়নটা চলে গিয়েছিল সাইকেল নিয়ে। কিন্তু বাবা···

কিছু ভাববার আগেই টের পেয়েছিল তমাল। পাশের ঘরে কান্নার সুউচ্চ চীৎকারে গোটা বাড়ীটা কেঁপে উঠেছিল। মাঘরাতে মেঘ ডাকলে বুকটা যেমন দুরদুর করে ওঠে, অনেকটা তেমনি। তমাল ছুটে পাশের ঘরে গিয়েছিল।

মেজদি, ছোড়দি, বৌদি হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল মাটিতে। মা কাত হয়ে কাঁদছিল—নাকের প্রান্ত বেয়ে টপটপ করে জল পড়ছিল ক্রমাগত। বাবা দাঁড়িয়েছিল চেয়ারের পিঠ ধরে। চোখ দুটো কেমন স্থির। মরা মাছের চোখের মতো ধূসর। তমাল ভয় পেয়েছিল। বাবাকে দেখে। সবার অলক্ষ্যে সে পালিয়ে এসেছিল কোণের ঘরে।

বুবুলদা নেই।

তমালের চোখ দুটো জ্বালা করছিল, কিন্তু কান্না আসছিল না। সেই ঝড়ের মতো হাসিটা, যেটা শুনলে তমালের বুকের ভেতরটা গুরগুর করতো সেটা আর কোনদিন এই বাড়ীর ঘরে ঘরে ছুটোছুটি করবে না—এ কথা তমাল ভাবতেই পারছিল না। বরং প্রতি মুহূর্তে

তার মনে হচ্ছিল, এই একুশি বিছা থেকে বুবুলদা যাবে আর তমালের দুই কাঁধ ধরে কাকুনি দিয়ে বলবে—না, তোকে আর আদর করা যাব না, বড্ড বড় হয়ে গ্যাছিস্।

অন্ধকার বিছানায় মুখ গুঁজে শুয়েছিল তমাল। এলোমেলো কথা মাথার ভেতরে পাক খাচ্ছিল। এই ত আগের বার বুবুলদা এসে সাঁতার শিখব বলে তমালের সে কি অনুনয়! 'সাঁতার শিখিয়ে দাও বুবুলদা।' তারপর বুবুলদার কাঁধ ধরে একেবারে পুকুরের মাঝখানে। চারপাশে জল। অনেক দূরে ঘাট আর কাঁকড়াচুলো ডেঁতুল গাছটা। খুব ভাল লেগেছিল তার। খুশীতে হাততালি দিতে যেতেই কিন্তু ছবিটা মুছে গিয়েছিল। শুধু নীল জল। লাউডগা সাপের মতো সবুজ নীল। তমাল অসহায়ের মতো হাত বাড়িয়েছিল। জল খেয়েছিল কয়েক ঢোক। বুবুলদা এসে টেনে তুলেছিল ওকে। 'কিরে জল খেয়েছিস্? না তোর দ্বারা কিচ্ছু হবে না।'

বুবুলদার কথায় তমাল রেগেছিল আবার লজ্জাও পেয়েছিল। বুবুলদার দুষ্টুমি করে ছেড়ে দেওয়ার জন্য রাগ আর জলে ভেসে না থাকতে পারার জন্য লজ্জা। অক্ষমতার লজ্জা। এবার তাই বুবুলদা এলে সে যে একটু একটু সাঁতার শিখেছে তা দেখিয়ে দেবে ভেবে ছিল। কিন্তু বুবুলদা আর কোন দিন আসবে না। তার অক্ষমতাকে ঠাট্টা করে আর কোনদিন হাসবে না। সেই দমকা হাওয়ার মতো হাসিটা লুটোপুটি খাবে না ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে।

তমাল সারা বিকেল ছটফট করেছিল। সন্ধ্যার মুখে পুকুরে স্নান করে এসে শুয়ে পড়েছিল বাবার ঘরে। তারপর লোকজনের সান্ত্বনা, মায়ের কান্নার বিচিত্র সুর শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। আর কিছু স্মরণ নেই। কে যে ওকে বারান্দায় নিয়ে এসেছিল, এই মাদুরের ওপর শুয়ে দিয়েছিল কিচ্ছু মনে নেই।

•

তমাল ভালো করে মায়ের দিকে তাকাল। মায়ের সারামুখে বেদনার ছায়া। বোজা দুই চোখের কোণে জলের দাগ। সারারাত্রি কেঁদে কেঁদে এখন বোধহয় একটু ঘুমিয়ে পড়েছে। উঠানের নারকেল গাছটা মাথা দোলাচ্ছে সমানে। শিরশির বাতাস। শীতশীতু তমাল নিজের শরীরের দিকে তাকাল। আর অবাক হল। ঠাণ্ডা লাগবে বলে তমালের বুক পর্যন্ত মা ঢেকে দিয়েছে আঁচল দিয়ে। তার ওপর হাত রেখেছে।

তমাল ভাবল। মা সারারাত্রি বুবুলদার জন্য কাঁদলেও, তারই ভেতর একসময় তমালের রুগ্ন দুর্বল শরীরটার কথা ভেবে আঁচল চাপা দিয়েছে। বুবুলদার ভাবনায় মায়ের চিন্তাকে অধিকার করে থাকলেও অন্ততঃ এক-মুহূর্তের জন্য তমাল বড় হয়ে উঠেছে সেখানে। আজ থেকেই বুবুলদা একটু একটু করে হারিয়ে যাচ্ছে। ক্রমে ক্রমে এই মুহূর্তটা ভ্রূণ অবস্থা থেকে শরীরী রূপ নেবে প্রহর, দিন, মাসকে গ্রাস করে ফেলবে। বাইরের ঘরের দেওয়ালে বুবুলদা থাকবে শুধু ছবি হয়ে।

তমাল স্পষ্ট দেখতে পেল, বুবুলদা আস্তে ডুবে যাচ্ছে পুকুরের মাঝখানে। কাছাকাছি কেউ নেই। অসহায় হাতটা একবার দেখা দিয়ে শেষবার মত অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর শুধু নীল জল। সবুজ নীল। অসংখ্য লাউডগা সাপ চারদিকে বুবুলদা···সাপ।···সাপ।

পলকের মধ্যে তমালের দুচোখ জলে ভরে গেল। গতকাল যে কান্নাকে সে ইচ্ছে করেও ঝরাতে পারেনি আজ সেই কান্না বিনা আয়াসে সহস্র ধারে ঝরে পড়ল। তমাল অনুভব করল, পুতুলখেলার সঙ্গে কান্নার খেলার কোন তফাৎ নেই। অন্য সব খেলার মতই কান্নার খেলাও সময় বিশেষের জন্য। ক্ষণিকের জন্য।

অন্ধ আক্রোশে তমাল মায়ের হাতটাকে বুকের ওপর থেকে নামিয়ে দিতে গেল। কিন্তু পারল না।

আহা, মা কাল সারা রাত্রি কেঁদেছে। বড়ো দুঃখ পেয়েছে মা। মা আমার।

'এই মাটির মানুষ'

মণি গঙ্গোপাধ্যায়

ইহুদীদের বুকে আগুন জ্বলে, বিজেতার বিরুদ্ধে বিজিতের ক্রোধ পুঞ্জীভূত হয়। ঋতুচক্র বেয়ে এগিয়ে চলে কালের রথ, পার হয় মাস আর বছরের সামান্য সীমারেখা।

নাজারেথের ধূলি-ধূসর পথে হঠাৎ একদিন দেখা গেল বিশুকে। কিশোর ইতিমধ্যে যুবকে পরিণত হয়েছে। সবল পুষ্ট দেহ, একমাথা ঘাড় পর্যন্ত ঝোলানো কালো চুলের মাঝখানে সিঁথিকাটা. এক সহাস্য, সৌম্য তরুণ। ভ্রমণশিক্ষু, কর্মপটু তরুণ। নির্মল পাহাড়ী বাতাস তার দেহে দিয়েছে উজ্জ্বল স্বাস্থ্য, রবির শ্যামলিমা অঙ্গে মাখিয়েছে কোমল লাবণ্য। হন হন করে পথ বেয়ে চলছিল বিশু—অত্যন্ত ব্যস্ত, কেমন যেন উদ্বিগ্ন। অন্যদিন এই পথটুকু পার হতে তার কত সময় লেগে যায়, কয়েক পা এগিয়েই দাঁড়াতে হয়, কারুর না কারুর সঙ্গে কথা বলতে হয়। বন্ধু, ধোবা, বিশু, নারী নাজারেথের সব মানুষের সঙ্গেই বিশুর ভাব। তার সরল ব্যবহার, মধুর স্বভাব আর মিষ্ট কথাবার্তার জন্য সকলেই তাকে ভালবাসে। সকলের সঙ্গেই তার অন্তরঙ্গ ব্যবহার, সকলেরই সে প্রিয়পাত্র।

অন্যদিন হলে এখনই পাশের কুটির থেকে জনের দিদিমার ডাক শুনে দাঁড়িয়ে পড়তে হত, এগিয়ে গিয়ে শুনতে হত মাতির বিরুদ্ধে বুড়ার অসংখ্য অভিযোগ। সহাস্য বিশুর সান্ত্বনা শুনে তৃপ্ত হতেন বুড়া। শুধু কি এই। কতদিন ফেরার পথে বিশুদের সঙ্গে খেলায় মেতেছে বিশু। কোনও দিন সহরের প্রান্তে যেখানে বারবণিতাদের আবাস, সেখানে তরুণী মাথার দাওয়ায় বসে একমনে শুনেছে ভ্রষ্টা নারীর অতীত জীবনের কাহিনী। ওঠবার সময় মাথা এগিয়ে দিয়েছে এক পাত্র উগ্র পার্বত্য সুরা। হাসিমুখে পাত্র হাতে তুলে নিয়ে পান করেছে বিশু, তারপর পা বাড়িয়েছে বাড়ির পথে।

সব আসরেই বিশুর অবাধ গতিবিধি, সব আলাপ আর আলোচনার জন্যই তার অন্তর অবারিত। সকলেই যে তাকে একটু অদ্ভুত, একটু অসাধারণ ভাবে, তার প্রতি কেন কে জানে একটু অনুকম্পা পোষণ করে, এও সে জানে বলেই আশ্চর্য হয়। অনুকম্পা কেন? সে নির্লোভ বলে? অন্যে যেখানে রেগে ওঠে সেখানে সে হাসে বলে। এই সেদিন এক ধনীদের ভোজ সভায় সে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করবার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিল। শাস্ত্রের সহজ, সরল মর্মকথা শোনার পর শ্রোতাদের কত আপত্তি, তার প্রতি কি অন্যায় আক্রমণ। তার কিন্তু ধৈর্যচ্যুতি হয়নি, চলে আসবার সময় হেসে বলে এসেছিল হয়তো আপনারা যা বলছেন তাই ঠিক, আমারই ভুল।

শাস্ত্র বিশু পড়েছে, ভাল ভাবেই পড়েছে, কিন্তু তাই বলে যে তার ভুল হবে না এমন নয়। তাই সব আসরেই সে যোগ দেয়, কথা বেশি বলে না কিন্তু সব

দিয়ে অপরের প্রত্যেকটি কথা শোনে। প্রতিটি মানুষের সুখ-দুঃখের, উত্থান-পতনের ইতিহাস তাকে আকৃষ্ট করে, অন্তর ছুড়ে তোলে চিন্তার ঝড়। মানুষকে জানবার, তার প্রতিটি কর্মের উৎস আবিষ্কারের আগ্রহ যিশুর অসীম। আর সবচেয়ে যা আশ্চর্য, মানুষের মনের কথা কোন অদৃশ্যলোকে সহজেই সে বুঝতে পারে, তার অন্তরে বসে কোন অদৃশ্য শক্তি যেন বুঝিয়ে দেয় কোনটা ভাল আর কোনটা মন্দ। কিন্তু ভাল আর মন্দ দুয়ের প্রতিই তার সমান ভালবাসা। তার অন্তর বার-বার উৎসুক হয়ে দেখতে চায় মানুষের মনটুকু আর সেই কারণেই কারুর প্রতি তার ঘৃণা নেই, কোনও কাজেই নেই ক্ষমার অভাব। তার এই উদার ভালবাসার টানেই বহু মানুষ এগিয়ে আসে তার কাছে, নিঃসঙ্কোচে বলে প্রাণের কথা।

আজ কিন্তু কারুর কথা শোনবার সময় নেই যিশুর। যোসেফ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, বেশ বাড়াবাড়ি অসুখ। সংসারের নানা কাজের মধ্যে সামান্য অবসরে অভ্যাস মত ছুটে গিয়েছিল পার্বত্য উপত্যকার নির্জনতায়। সেখানেও চঞ্চল মন নিয়ে বেশিক্ষণ বসা সম্ভব হয়নি। বাবার কথা মনে পড়তেই উঠে পড়েছিল, ছুটে চলেছিল বাড়ির পথে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল এক আত্মীয়ের সঙ্গে, হন্তদন্ত হয়ে তাকেই খোঁজে বেরিয়েছে মনে হল।

আত্মীয় বলে উঠলেন—কোথায় ছিলে এতক্ষণ? বাড়িতে এদিকে…"বাড়িতে? কি হয়েছে বাড়িতে?…"

আত্মীয় কি উত্তর দিলেন কানে এলো না, ঝড়ের বেগে বাড়ি লক্ষ্য করে ছুটলো যিশু। চোখ দুটো কেমন ঝাপসা হয়ে আসছে, বার বার চোখের সামনে ভেসে উঠছে বাবার রোগশীর্ণ পাণ্ডুর মুখ।

আশ্চর্য, চরমতম বিপদের মুখে পরমতম সেই বিশ্ব-পিতার কথা একবারও মনে এলো না যিশুর।

সকাল না হতেই ছুতোরশালায় বাটালি হাতে কাজ শুরু করেছে যিশু। অনেক কাজ পড়ে আছে। বাবা অসুস্থ হবার পর থেকেই জমতে শুরু করেছিল কাজ। তারপর বাবার মৃত্যু হল। এখন শুধু সময় মত করদায়েসি কাজের যোগান দেবার দায়ই নয়, সংসারের অনেকগুলো মানুষের ভরণপোষণের দায়িত্বও যিশুর। সে দায় সে স্বীকার করে নিয়েছে, মাথা পেতে গ্রহণ করেছে দায়িত্ব। একমনে কাজ করে যায় যিশু, তার নিপুন হাতের স্পর্শে গড়ে ওঠে সুন্দর সব আসবাব। ইতিমধ্যেই যিশুর হাতে তৈরী জিনিষের বেশ দুনাম হয়েছে, বাজারেরের বাইরে থেকেও আসছে ক্রেতা। এমন চললে সংসার চালানো খুব কঠিন হবে না।

একমনে কর্কশ কাঠের গায়ে তীক্ষ্ণ বাটালি চালিয়ে যায় যিশু। একটা ক্রুশ তৈরীর কাজ সে পেয়েছে। রোমক শাসনকর্তাদের প্রায়ই ক্রুশের প্রয়োজন হয়। রোমের আইনে বিদ্রোহীর শাস্তি-মৃত্যু। সে মৃত্যুর ব্যবস্থা কিন্তু অস্ত্রের আঘাতে অথবা ফাঁসির দড়ি গলায় পরিয়ে দিয়ে নয়। ঢাক-ঢোল পিটিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয় মৃত্যুর দিন। তারপর নির্দিষ্ট দিনে সহরের রাজপথ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় শৃঙ্খলিত বন্দীকে। সহরের বাইরে রুক্ষ, শুষ্ক বধ্যভূমিতে অপেক্ষা করে থাকে নির্বাক, নিষ্ঠুর, কঠোর মৃত্যুর প্রতীক কাঠের ক্রুশ। অগণিত ভীত নরনারীর চোখের সামনে বন্দীর দেহ শুইয়ে দেওয়া হয় ক্রুশের গায়ে, দেহের অস্থিমজ্জা ভেদ করে প্রবিষ্ট হয় তীক্ষ্ণ গজালের অগ্রভাগ। যন্ত্রণার উৎক্ষেপনে দুলে দুলে ওঠে ক্রুশ, ব্যথায়, বেদনায় দুলে ওঠে মর্মাহত নরনারীর বুক। ক্ষতস্থান থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরে পড়ে, শুষ্ক মাটি মুহূর্তে শুষে নেয় বিন্দুটুকু পর্যন্ত। ক্রুশবিদ্ধ বন্দীর চোখে নেমে আসে অন্ধকার যবনিকা, শেষ হয় শাস্তির প্রহসন। বিষাদাচ্ছন্ন নরনারী ফিরে যায় গৃহের পথে। দিন শেষ হয়, রাত্রি আসে। কালো আকাশের পটভূমিকায় ছায়ার মত দাঁড়িয়ে ক্রুশচিহ্ন—মৌন প্রকৃতির বুকে এক মূক প্রশ্নের মত। এই মৃত্যুর বীজ থেকেই কি অঙ্কুরিত হবে মৃত্যুঞ্জয়ী বীর? এই মাটির মানুষের মধ্য থেকেই কি মূর্ত হবে ইহুদীদের পরমপুরুষ?

একমনে ক্রুশ তৈরী করে চলে যিশু। সাধারণতঃ ক্রুশ তৈরীর হুকুম আসলেই যার কাছে হুকুম আসে সে বিব্রত বোধ করে, বিরক্ত হয়। আবার একজন বিদ্রোহী ইহুদীর মৃত্যুদণ্ড হয়েছে আর সেই দণ্ডের

প্রয়োজনে ক্রুশ তৈরী করা, এ পাপ ছাড়া আর কি! পারিশ্রমিক যতই লোভনীয় হোক, এমন কাজে কোনও ইহুদীরই রুচি থাকবার কথা নয়। তবু হুকুম পেলে তা মানতেই হয়, পাপ জেনেও শাস্তির ভয়ে সময় মত তৈরী ক্রুশ পৌঁছে দিতে হয় শাসকের দরবারে। যিশুর কিন্তু এই সব মানসিক বিকারের কোনও লক্ষণই নেই। পরমযত্নে ক্রুশ তৈরী করে যিশু, কেন কে জানে এ কাজে সে এক আশ্চর্য আকর্ষণ বোধ করে। অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলে কর্কশ কাঠকে মসৃণ করবার প্রয়াসে। এক সময় কাজ শেষ হয়। কপালের ঘাম মুছে বিশ্রাম নেয় যিশু। দুহাতের মাঝে মুখ রেখে, মসৃণ কাঠের বুকে কপালটুকু ছুঁইয়ে ক্ষণিক বিশ্রাম। কাঠের বুক থেকে এক অজানা সৌরভ সঞ্চারিত হয় তার চৈতন্যে, সঞ্চারিত হয় শান্ত, শীতল অস্তিত্বের এক বিরল স্পর্শ। মনে হয় আরও, ক্রুশের সঙ্গে আরও নিবিড় পরিচয়ের অপেক্ষায় দিন গুনছে জীবনের অদৃশ্য ভবিষ্যৎ।

এমন কত অবাস্তব, অলৌকিক কথাই না মনে হয় কিন্তু কারুকে বলা যায় না। অন্যের কাছে তার মনের কথা, অন্তরের দ্বন্দ্ব, চিন্তার ধারা কোনও মূল্যই পাবে না। এখনই সকলে তাকে অন্যদের চেয়ে একটু আলাদা, একটু অদ্ভুত ভাবে, এর পর হয়তো উন্মাদ বলে বাতিল করে দেবে। আর শুধু অন্যের কথাই বা কেন, নিজের মায়ের কাছেই কি মন খুলে কথা বলে একটু হাল্কা হবার সুযোগ আছে! একটু পরেই খেতে বসলে মা সামনে এসে বসবেন। শুরু করবেন সংসারের অভাব আর অভিযোগের কাহিনী দিয়ে, শেষ করবেন অনুযোগ মিশ্রিত চোখের জলে। বার বার মা জানাবেন বিয়ের অনুরোধ। সে অবশ্য উত্তর দেবে না কারণ উত্তর তার নিজেরই জানা নেই। শুনতে শুনতে সে হয়ে অন্যমনস্ক হবে, ততই প্রখর হবে মায়ের অনুযোগ। শেষ পর্যন্ত কাঁদতে কাঁদতে উঠে যাবেন মা, বলতে বলতে যাবেন—কেন? কেন বিয়ে করবে না তুমি?

মায়ের প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে যিশু নিজেও তো কত কেঁদেছে। কত বিনিদ্র রাত্রি প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছে নির্বাক তারা ভরা আকাশের বুকে, কত অবসর মুহূর্তে নির্জন পার্বত্য উপত্যকায় উদাস বাতাসের মর্মরে শুনতে চেয়েছে বিশ্বপিতার বাণী। কিন্তু উত্তর পাওয়া যায়নি, হয়নি সমস্যার সমাধান। প্রতীক্ষা করতে হবে, হয়তো এক আকস্মিক মুহূর্তে অসংখ্য চিন্তার জটিল জাল ছিন্ন করে, অন্তর দীপ্তিত হয়ে প্রতিভাত হবে প্রতীক্ষিত নির্দেশ। অন্ধকার অপসারিত হয়ে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে আলোর উল্লাস, নির্দিষ্ট হবে জীবনের চলার পথ।

দিন এগিয়ে চলে, চলার পথের সন্ধান কিন্তু অতো সহজে পাওয়া যায় না। প্রতীক্ষার প্রহর প্রসারিত হয়। মানুষের সঙ্গে, দীর্ঘ অবহেলিত মানুষের সঙ্গে মেলা-মেশায় সমৃদ্ধ হয় অভিজ্ঞতার সঞ্চয়। যে সব ভবঘুরেকে কেউ কাছে ডাকে না, যিশু তাদের আদর করে ডেকে আনে ছুতোর শালায়, আন্তরিক সহানুভূতির স্পর্শে শোনে তাদের দুঃখের কাহিনী। ভ্রষ্টা নারীর কাছে যায়, পাশে গিয়ে বসে, মিষ্ট কথায় শুনিয়ে আসে সান্ত্বনার বাণী।

এইসব অবহেলিত, অবজ্ঞাপীড়িত নরনারীকে কেন্দ্র করেই মুখর হয়ে ওঠে বিনিদ্র রাত্রির প্রহর। নির্জন অবসরে, রাত্রির অন্ধকারে চলে আলোর সন্ধান—মানুষের অন্তরের আলো। যে ইহুদী রাজার ভয়ে কর আদায় করে সে কেন ঘৃণার পাত্র হয়? ঘৃণ্যবণিতাকে কেন বার করে দিতে হবে সমাজের গণ্ডীর বাইরে। আশ্চর্য হয়ে যিশু দেখেছে এই সব মানুষ কত নির্ভরে তাদের অন্তর অবারিত করে দেয়। জীবিকার্জনের অন্যান্য প্রচেষ্টায় বিফল হয়ে এদের কেউবা নিয়েছে কর আদায়ের কাজ, কেউ বা নেমেছে দেহ বিক্রীর ব্যবসায়। ধ্যান মগ্ন যিশুর চিন্তার আকাশে ফুটে ওঠে এক একটি আর্ত নরনারীর মুখ, অন্তরের গভীরে বসে কে যেন বার বার কিছু বলে উঠতে চায়, তার ভাগ্যকে বেঁধে দিতে চায় এদের ভাগ্যের সঙ্গে। ক্ষণিক প্রেরণায় প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে যিশু, মনে হয় এরাই বুঝি তার চলার পথের নিশানা। মন্ত্রের মত জপ করে পাকের মধ্যেই তো আছে পঙ্কজের ফুটে ওঠার আভাস, অত্যাচারের আঘাতেই আছে মুক্তির আস্বাদ।

দিনের আলো কিন্তু নিয়ে আসে নৈরাশ্য। মানুষের প্রতি মানুষের ব্যবহারে ব্যথিত না হয়ে যেন উপায় থাকে না। বিদেশীর শাসন তবু সহ্য হয়, কিন্তু পুরোহিতদের

অনুশাসন অসহ্য। অথচ এই ধর্মের ভাণ, ধর্মকে পথে ঘাটে অন্যকে ঠকাবার কাজে ব্যবহার। যিশু বুঝতেই পারে না কেন পুরোহিতেরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে অন্যের ক্রিয়াকর্মের শাস্ত্রবিধি-পালনের তদারক করে। শাস্ত্র যে প্রতিটি মানুষের প্রতি পদক্ষেপে লাঞ্ছিত হচ্ছে এ কথা গবেষণা করে জানবার প্রয়োজন নেই। ধনীরা ক্রীতদাসদের বছরের পর বছর পশুর মত ব্যবহার করছে, দরিদ্রের প্রতি চলছে অমানুষিক অত্যাচার, বিবিচার শোষণ। জ্ঞান হবার পর থেকে তো যিশু দেখছে নাজারেথে দরিদ্রের সংখ্যাই বাড়ছে, ধনীর নয়। সত্যিকারের ধার্মিক একজনও চোখে পড়েনি, শুধু দাদু আর অন্ধ পুরোহিতদেরই তো রাজত্ব। তাই ইহুদীদের শাস্ত্রের অনুশাসন, ধর্মের ইতিহাস, দাদুসেন্দ্রের জীবন ও বাণী সব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানবার পরও যিশুর মনে প্রশ্ন থেকে যায় এ কেমন কথা যে পাণ্ডিত্যের চাবিকাঠি, সম্পদের দক্ষতা ভিন্ন খোলা যাবেনা ভগবদ্রাজ্যের আনন্দ-নিকেতন?

মনের এইসব কথা সকলকে বলা যায় না। তবু একদিন বলতেই হয় অথবা কে যেন বলিয়ে নেয়। সেদিন রবিবার, সারা নাজারেথ অবসরের অবসাদে আচ্ছন্ন। সন্ধ্যার শান্ত পরিবেশে যিশু নিজের কুটিরের দরজায় বসেছিলেন। চারপাশে বসেছিল তাঁর সমবয়সের দল দরিদ্র, অবহেলিত, অপমানিত মানুষ আর দুচারজন প্রতিবেশী। ওরা কিছুদিন ধরে প্রায়ই আসে—তার কাছে মনের কথা বলবে বলে, তার মুখে সান্ত্বনার বাণী শুনবে বলে। মাথার ওপর নক্ষত্রখচিত আকাশের চাঁদোয়ার তলে বসেছিল যিশু। কানে আসছিল বেড়ার আড়ালে মায়ের রান্নাকর্মের আওয়াজ। এই অপূর্ব অবসরে তার মনে নেমে এলো এক পরম প্রশান্তি, তার অন্তর যেন আপনি কথা কয়ে উঠলো, উৎসারিত হল উপলব্ধির আলোয় আভাসিত শাস্ত্রের বাণী আর ব্যাখ্যা। কথায় কথায় এসে পড়ে মহাত্মা হিলেলের বাণী, "যা কিছু তোমার নিজের বিরক্তির কারণ তা অন্যের প্রতি প্রয়োগ করোনা।" যিশু বলে চলে—কিন্তু যা শুনি তাতে মনে হয় জেরুজালেমের পুরোহিত—পরিচালিত ধর্মপরিষদ এই উপদেশের সাক্ষাৎ প্রতিবাদ। এইসব নিষ্ঠাবান ভক্তরা না কি বলছেন,—"পৃথিবীতে জন্ম না নিতে হলেই মানুষের পক্ষে সবচেয়ে শুভ হত।" আমি বলি, এর চেয়ে মিথ্যা আর কিছু হতে পারে না। যে পৃথিবীতে এত আলো, যেখানে অবারিত পার্বত্য উপত্যকার বিছানো রয়েছে অফুরন্ত শান্তি, যেখানে শান্ত মেষ, সুন্দর ফুল আর পবিত্র শিশুর দলকে দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়, সেই পৃথিবীতে ভগবানের বিরুদ্ধে কথা বলার চেয়ে অন্যায় আর কি হতে পারে।

আশ্চর্য নতুন সব কথা, পরম আশ্বাসে উজ্জ্বল নতুন আলোর ইসারা। মুগ্ধ শ্রোতারা উৎসাহিত হয়, শুনতে চায় যিশুর মুখের কথা। স্থির, সমাহিত যিশু বলে চলে, দাদুসেন্দ্রের বাণীর মাধ্যমে তার অন্তর থেকে তীব্র বেগে উৎসারিত হয় নিজস্ব জীবনবেদ। ঈশায়ার গ্রন্থের ঈশ্বর যেন তার কণ্ঠে কথা বলে ওঠেন—"কেন তোমরা ঈশ্বরের উদ্দেশে দিনের পর দিন অসংখ্য বলির আয়োজন কর? ভেড়ার মাংসে, পশুর চর্বিতে ঈশ্বরের বিন্দুমাত্র স্পৃহা নেই। ধূপের ধোঁয়ায় ঈশ্বরের নিশ্বাস বন্ধ হয়। তোমাদের সকলের হাতে হত্যার স্পর্শ, রক্তের কলঙ্ক। অনুতাপ করো, সত্যিকারের সৎ কাজ করতে শেখো।" বহুৎ জীবনের মন্ত্র সঞ্চারিত হয় মুগ্ধ, মূক মানুষের মনে, রাতের আকাশ থেকে ঈশ্বরের আশীর্বাদের মত ঝরে পড়ে বিন্দু বিন্দু শিশিরকণা। হিমেল হাওয়ায় বার বার কেঁপে ওঠে শ্রোতার দল, এক আশ্চর্য অনুভূতির শিহরণে কেঁপে ওঠে যিশুর বুক। শেষে কম্পিত কণ্ঠে জীবনমন্ত্র উচ্চারিত হয় হোসিয়ার বাণীতে—"আমি ভালবাসার কাঙাল, বলিদানের নয়।"

আসর শেষ হয়, মন্ত্রমুগ্ধের মত বাড়ি ফিরে যায় শ্রোতার দল। যিশুর বুকের কম্পন কিন্তু তখনও থামে না। দেহের কোষে কোষে যেন ক্রোধের জ্বালা, রক্তের কণায় কণায় এক অসহ্য চাঞ্চল্য। উঠে পড়ে যিশু, স্বপ্নের ঘোরে পথ পার হয়ে চলে। হঠাৎ চমক ভেঙ্গে যায়, দেখে কখন নিজের অজান্তে চলে এসেছে পার্বত্য উপত্যকার নির্জন পরিবেশে। ডুমুর গাছের তলায়, ছায়ার অন্ধকারে বসে বার বার প্রার্থনা করে—আমার অন্তরে যেন কারুর বিরুদ্ধে ক্রোধের কণাও না থাকে। গাছের পাতায় বাতাস মর্মর তোলে, যিশুর মন ধীরে ধীরে শান্ত হয়।

রাতের অন্ধকার আঁচল মেলে ধরে, বাঁশের বুক থেকে ভেসে আসে সদ্য ফোটা কুলের সুবাস। মাটির বুকে দেহ এলিয়ে, আকাশের তারার পানে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বিশুর মনে হয়—এই তো পরম শান্তি, এই বিশ্বনিয়ন্তা, অনন্ত স্নেহের আধার বিশ্বপিতার বুকের পাশটিতে শুয়ে থাকা।

সংসারের চাকা থামে না। প্রাণপণ পরিশ্রমে জীবিকা আহরণ থেকে বিশুরও রেহাই নেই। সংসারের দাবী বেড়েই চলে আর তীব্র থেকে তীব্রতর হয় মায়ের অনুযোগ। এখন আর শুধু খাওয়ার সময়টুকু দখল করেন না মা, মাঝে মাঝে চলে আসেন হুতোর শালায়, চীৎকার করে জানান তাঁর দাবী—কেন তুমি বিয়ে করবে না? আমার শরীর তো আর লোহায় তৈরী নয়, দুদিন বাদে ভেঙ্গে পড়লে কে ধরবে এই সংসারের হাল?

সত্যি, কে ধরবে এই সংসারের হাল! কে যে ধরে, কে যে জীবনের তরণীকে সংসারের সাগর পার করে পৌঁছে দেয় মৃত্যুর পারে! বিশুও তো এই প্রশ্নেরই উত্তর চায়, ভেদ করতে চায় জীবনের নিগূঢ়তম রহস্যকে। কিন্তু সে কি সম্ভব সংসারের মায়ায় বদ্ধ হয়ে? অথবা নিজেকে সবার মাঝে, সব মানুষের কাছে বিলিয়ে দিয়ে? মায়ের দাবী অন্যায় নয়। গভীর রাত্রির মোহাচ্ছন্ন প্রহরে এক এক দিন এই দাবীকে কেন্দ্র করে স্বপ্নের জাল বুনতে বেশ ভালই লাগে। নারায়ণের শান্ত, স্বচ্ছন্দ জীবন, একটি ছোট্ট সংসার—স্ত্রীর মঙ্গলস্পর্শে প্রহর, সন্তান সন্ততির কলকাকলীতে মুখর। তার নিজের প্রয়োজন অত্যন্ত সামান্য, প্রত্যহ একটু দুধ আর একমুঠো বেতুর জুটলেই যথেষ্ট। এ তো প্রাণধারণের প্রয়োজন। তখনই নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করে—আর কিছু প্রয়োজন নেই? দেহের ক্ষুধা তৃপ্তির? নারীর ভালবাসায় তৃপ্ত হওয়ার?

স্বপ্নের জাল হঠাৎ ছিঁড়ে যায়! চাঁদের আলো হঠাৎ যেন ঢাকা পড়ে মেঘের আড়ালে। অন্ধকার অন্তরের গভীরে আবার শুরু হয় সত্যের সন্ধান। নারীর প্রতি সামান্যতম আকর্ষণের রেশ কোথাও চোখে পড়ে না। সূক্ষ্মতম অনুভূতির তারেও নেই কামনার ক্ষীণতম ঝঙ্কার। অথচ জীবনে নারীর বিচিত্র রূপ দেখার সুযোগ হয়নি তা নয়। অনেকের মনের কথা সে শুনেছে, তাদের মধ্যে দুএকজন রেখে গেছে মন দেওয়ার ইসারা। কিন্তু তার বৈরাগ্যবিধুর অন্তরে নেই সামান্য বিক্ষেপের সাড়া, কোনোদিনই ছিল না। নারীদেহের কোনও আকর্ষণই কি আছে? এই তো মাস কয়েক আগে সে গিয়েছিল মাসুদালা সহরে। সহর দেখতে যায়নি, গিয়েছিল বিখ্যাত বারবণিতা মেরীর নাম শুনে। মাসুদালার মেরী, আগুনের মত তার রূপ, আগুনের মতই কামনার জ্বালায় জ্বলছে বরতনু। দেশে দেশে তার নাম ছড়িয়ে পড়েছে। রোম থেকে, আলেকজান্দ্রিয়া থেকে ধনীরা তার প্রাসাদের দরজায় আসে ক্ষণিক রতিরসের আশায়। বিশু নিজের চোখে দেখে এসেছে মানুষের লালসার এই বিচিত্র লীলা। সকাল থেকে সন্ধ্যাবধি রাত গভীর রাত পর্যন্ত বৃদ্ধ, প্রৌঢ়, কিশোর—ধনী আর দরিদ্র বণিক আর শাসক সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বারাঙ্গনার দরজায়। প্রত্যেকেই এনেছে বহুমূল্য উপঢৌকন, প্রত্যেকেই উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে কখন আসবে তার ডাক। দূর থেকে দেখে আর কাছে এগিয়ে যাবার প্রবৃত্তি হয়নি বিশুর। কি করে এই কামকলুষ নিহিলে যোগ দিয়ে! দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর মেরীর অন্দরে প্রবেশের সুযোগ পেয়েই বা কি হবে! পুরুষের কামনার দংশনে ক্ষতবিক্ষত, বিষ নিশ্বাসে বিপর্যস্ত এক নগ্ন নারী-দেহের পঙ্কিল পরিবেশে মিলনে কোন চরিতার্থতার সন্ধান?

সংসারের জীবনে কোনো সার্থকতাই খুঁজে পায় না বিশু। তার বৈরাগ্যবিধুর মন যেন অন্য কিছু চায়, এই গতানুগতিকতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন কোনো অস্তিত্ব। উদাস ভাবনায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে তার দিন আর রাত। মায়ের অনুযোগ যত তীব্র হয় ততই তীব্র হয় তার সংসারের পাশ মুক্ত হওয়ার বাসনা।

বাসনা বুক জুড়ে বসে থাকে, হাতে জড়িয়ে থাকে সংসারের শত কাজ। দিন পার হয়ে মাস আসে, বিশুর মনে হয় এই হুতোরশালায় বন্দী হয়ে থাকাই বুঝি তার নিয়তি, বিশ্বপিতার নির্দেশ। সামনেই উৎসব, দুদিনের জন্য কাজ থেকে ছুটি পাওয়া যাবে। উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করে বিশু। উৎসবের দিন ভোর না হতেই

বেরিয়ে পড়ে বাড়ি থেকে, পথ ধরে এগিয়ে চলে। পথ কিন্তু এবার নির্জন উপত্যকায় প্রসারিত নয়। এক নূতন সম্প্রদায়ের খবর পেয়েছে যিশু—এক মরমী সাধক সম্প্রদায়। খবর অনেকদিনই পেয়েছে, পরম আগ্রহে সংগ্রহ করেছে তাদের ইতিহাস। সেদিন চলেছে সেই সম্প্রদায়ের আখড়ায়।

ছোট্ট এক ভাববাদী সম্প্রদায়, সভ্য মাত্র হাজার চারেক। একদল দরিদ্র ইহুদী সাধক এই নূতন ভাবধারার নীরব বাহক সভ্যরাও সকলেই ইহুদী। এদের উদ্দেশ্য কোনো বড় রকমের সংস্কার বা দেশব্যাপী আন্দোলন নয়—ব্যক্তিগত সামান্য সংগতি নিয়ে, পবিত্র জীবন-যাপনের মধ্য দিয়ে আত্মোন্নতি। মরুভূমির প্রান্তে এই সম্প্রদায়ের প্রথম উৎপত্তি। তারপর ধীরে ধীরে সভ্যরা লোকালয়ে প্রবেশ করেছে, সংসার পেতেছে গ্রামে এবং ছোট ছোট সহরে। সম্প্রদায়ের নির্দিষ্ট নিয়মনিষ্ঠার মধ্যে থেকে সভ্যরা সংসার করে এবং সংসারে থেকেই সাধনাও করে। অনুমোদিত জীবিকার্জনের সুযোগ-সুবিধা পেলেই হল, তারপর দেখতে দেখতে গ্রামে বা সহরে ছোট্ট একটা গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। বেলাশেষে, আদানপ্রদান সব গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। নিজেদের ভাবধারার চর্চা নিয়েই এরা তৃপ্ত - রাজনীতি নিয়ে কারুর বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই, ভাবনা নেই মন্দিরের প্রাধান্য নিয়ে।

যিশুর চোখের উপরেই ধীরে ধীরে গ্যালিলিতেও এই সম্প্রদায়ের প্রভাব প্রসারিত হয়েছে। নাজারেথের প্রান্তেও এক গোষ্ঠীর সন্ধান পেতে বিলম্ব হয়নি। কিছু কিছু লোক যাতায়াত শুরু করেছে সেখানে, যিশুও গিয়েছিল—কোনও প্রচারের ফলে নয়, আদর্শ জীবনের অনিবার্য আকর্ষণে। উৎসবের ছুটির সুযোগে আবার চলেছে সেখানে।

শেষ পর্যন্ত যাওয়া আসাই সার হল, অন্তরে কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। বেশ কয়েকদিন সম্প্রদায়ের সভ্যদের সংগে অন্তরঙ্গ হয়ে মিশেছে যিশু, লক্ষ্য করেছে তাদের জীবনযাত্রার প্রণালী। এই সেই, এই জীবনই আমি চাই—এমন কথা কিন্তু মনকে একবারের জন্যও নাড়া দিয়ে যায় নি। রাতের অন্ধকারে, নিজের নিঃসঙ্গ গভীরতায় বিচার-বিশ্লেষণই কি কম করেছেন। শাস্ত্র-বিরুদ্ধ এবং নাস্তিকসুলভ হলেও এদের সূর্যবন্দনা ভাল লাগে, ভাল লাগে এদের ভ্রাতৃত্ববোধ ও সাম্যভাব। আরও ভাল লাগে এদের অর্থের প্রতি বৈরাগ্য, অস্ত্রের প্রতি ঘৃণা এবং বলিদানের প্রতি বিতৃষ্ণা। তবু প্রশ্ন থেকেই যায়। এরা এত বেশী উপবাস করে কেন? সম্প্রদায়ের সভ্যদের মদ্যপান নিষিদ্ধ কেন? সকলের সংগে মিশে হাসলে, আমোদ করলে, সংগীতের আনন্দ উপভোগ করলে কী দোষ হয়? ভেষজ নিয়ে এরা গবেষণা করে, জ্যোতিষের রহস্য নিয়ে নাড়াচাড়ায়ও শেষ নেই। কিন্তু এ সবের মধ্যে এত গোপনীয়তার কি আছে? নিজেদের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রেখে নূতন রহস্য সৃষ্টিতেই বা এদের এত উৎসাহ কেন? সকলকে ভালবাসাই যদি এদের আদর্শ হয় তা হলে সম্প্রদায়ের বাইরের মানুষকে সযত্নে পরিহার করার অর্থ কী?

যিশুর মনের গোপন-গভীর মাটিতে যে আদর্শের কুঁড়ি বিকশিত হবার মুহূর্ত গুনছে, তার সংগে এই মরমী সম্প্রদায়ের আদর্শের অনেক মিল আছে। কিন্তু অমিলও বড় কম নয়। আর সেই কারণেই এই সম্প্রদায়ের কাছে নিজেকে সঁপে দেওয়া যিশুর পক্ষে সম্ভব হল না।

দিন যায়। যিশুর নীরব-প্রতীক্ষার সাধনা আর সাঙ্গ হয় না। এই সময়েই একদিন কানে এলো, জর্ডন নদীর তীরে, বনের ধারে এক সাধুর আবির্ভাব। সাধুর পদ্ধতি—শুদ্ধিস্নান ও মন্ত্রদান। মন্ত্র—অনুতাপেই মানুষের মুক্তি। সাধুর নাম জন। মাথায় গভীর জটা, আবক্ষ শ্মশ্রু, পরণে উটের চামড়ার আলখাল্লা, কোমরে চামড়ার বন্ধনী। উপবাস ও উপাসনায় দেহ ক্ষীণ কিন্তু বিশ্বাসের আলোয় আগুনের শিখার মত দীপ্ত।

বিশ্বাস, জলন্ত বিশ্বাস। সাধনার প্রথম স্তরে অনেক বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত, আলৌকিকত্বের আকর্ষণে বিক্ষিপ্ত হওয়ার পর পরমপ্রাপ্তি। জন শুনেছেন অন্তরদেবতার নির্দেশ—চরম বোঝাপড়ার দিনের আর দেরী নেই। ঐহিক জীবনের অসারতা সম্বন্ধে সজাগ হবার এখনও সময় আছে মানুষের। মানুষের? কোন মানুষের? হয়তো স্বজাতি ইহুদীদের? কিন্তু কে

শুনবে জনের মত সামান্য মানুষের সাধনালব্ধ সত্য? উদ্‌ভ্রান্ত সাধক ঈশায়ার বাণীর মধ্যে সান্ত্বনা খোঁজেন, তোমার প্রচেষ্টা যদি অরণ্যে রোদন হয়, তবুও জানবে যে তুমি সেই অনাগত ত্রাণকর্তার পথ সহজ ও সুগম করছো।

কিন্তু পথিকৃৎ-এর পথ সহজ নয়, সুগম তো নয়ই। জন নিরস্ত হলেন না। জর্ডনের তীরে, পার্বত্য অঞ্চলে, স্বজাতি দরিদ্র পশুপালকদের মধ্যে তাঁর বাণী বিতরণের জন্য প্রস্তুত হলেন। সরল মানুষেরা নিশ্চয়ই সাগ্রহে, সানন্দে গ্রহণ করবে এক নিরীহ তপস্বীকে। পরিবেশও প্রতিকূল নয়। উদার, নির্জন প্রকৃতি সেখানে নিয়ত মন্ত্র নিঃস্বনছায়ার খেলায়, অলৌকিক সেখানে অবিরত পরিণত হচ্ছে বাস্তবে—সেখানেই তো প্রথম উচ্চারিত হবে নবজীবনের মন্ত্র!

পশুপালকরা শুনলো, উৎসাহিত হল। ধীরে ধীরে জনের প্রভাব বিস্তৃত হল অদূরবর্তী জনপদে। এক জনপদ থেকে আর এক জনপদে। শত শত আর্ত নরনারী আসে। জর্ডনের তীর পরিণত হয় তীর্থক্ষেত্রে। বারিস্নানে শুদ্ধিস্নান করেন জন, জলদমন্দ্রে ঘোষণা করেন—স্বর্গরাজ্য ওই আগত, তোমরা এখনও অনুতপ্ত হও।

অদূরবর্তী জেরুজালেমের মানুষ তখন জ্বলছে অতৃপ্তির জ্বালায়, অত্যাচারের কশাঘাতে। জনের কথা জেরুজালেমে পৌঁছল। কিন্তু সত্য আর অধিকাংশ কল্পনার রঙে রঙীন সে কাহিনী! দন্ডপ্রাপ্তের ইহুদীদের বিচার বা বিশ্লেষণের আর অবসর নেই। শাস্ত্রোক্ত ত্রাণকর্তার প্রতীক্ষায় অনেক বিনিদ্র রাত পার হয়েছে জেরুজালেমের মানুষ। জনের আবির্ভাব এই আর্ত মানুষদের মনে আবার জ্বালিয়ে দিল আশার দীপ। আলো তার ক্ষীণ কিন্তু অনেক মানুষের কামনার উপচারে তা হয় তো উজ্জ্বল হবে, হয় তো দেবে পথের নিশানা।

এই চিন্তাই আচ্ছন্ন করেছিল জেরুজালেমের পুরোহিতদের, ধর্মের ধ্বজাধারীদের দিন আর রাত। স্বর্ণ মন্দিরের নিভৃত প্রকোষ্ঠে নিশ্চিন্তে বাস করেন প্রধান পুরোহিত আর তাঁর সহকর্মীরা—ইহুদীদের ভাগ্যনিয়ন্তা কর্মপরিষদ। সেখানেও পৌঁছেছে এই সংবাদ—প্রায় এক

বাসবদত্তার
গৃহস্থবধূর ডায়েরী ৭·০০
(আধুনিক সমস্যার চিত্র)

মোহিতলাল মজুমদারের
কাব্য-মঞ্জুষা (সম্পূর্ণ ও টীকা সহ) ১০·০০

ডঃ মনোরঞ্জন জানার
রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস (সাহিত্য ও সমাজ) ৮·০০
রবীন্দ্রনাথ (কবি ও দার্শনিক) ১২·৫০

Prof. W. T. Webb's
EVERYBODY'S LETTER-WRITER Rs 5·00
(28th Ed)
Contains about 500 letters

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দের
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য

শ্রীগোপালকান্তি দাশগুপ্তের
মুক্তপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ (২য় সংস্করণ) ৬·০০
পরমারাধ্যা শ্রীমা (৩য় সংস্করণ) ২·৫০
রূপ হতে অরূপে ২·৫০

শ্রীসন্তোষকুমার কুণ্ডুর
বাসুদেব ঘোষের পদাবলী

শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়ের
রবীন্দ্র-সাহিত্যের নব রাগ ৫·০০

নিরঙ্কুশের
ধন্বন্তরী ক্লিনিক্স্ [সরস হাসির নাটক] ১·৫০

শ্রীসুনীল দত্তর
বর্ণ-পরিচয় ২·৫০
[বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনী অবলম্বনে নাটক]

অধ্যাপক শ্রীরমণীমোহন চক্রবর্তীর
বাংলা সাহিত্যের আধুনিক কাল ৫·০০

ভারতী বুক স্টল
প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা
৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট :: কলিকাতা-৯
পোস্ট বক্স—১০৮৩১
ফোন—৩৪-৫১৭৮ : গ্রাম—Granthlaya

শতাব্দী পরে আবার না কি ইহুদীদের মাঝে আবির্ভূত হয়েছেন এক মহাপুরুষ। জুডিয়ার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে এই আবির্ভাবের কাহিনী। লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রীতে না কি ভরে উঠেছে জর্ডনের তীর। অজ্ঞ, সাধারণ মানুষের এই অবাধ সমাবেশকে আর তুচ্ছ করা চলে না। আর তা ছাড়া এই শুদ্ধিদাতা না কি দণ্ডপ্রাপ্তির বিরুদ্ধে প্রচার চালাচ্ছেন। ফলে রোমক শাসনকর্তা কৈফিয়ত তলব করেছে।

অবিশ্বাসের কালোছায়ার আচ্ছন্ন প্রধান পুরোহিতের শীর্ণ, রক্তরেখায় বিদীর্ণ মুখ। সন্দেহের সাপ থেকে থেকে উঁকি মারছে তাঁর সহকর্মীদের মনে। প্রচারকের ছদ্মবেশে আবার এক নূতন প্রতারকের আবির্ভাব হল না কি!

নাজারেথে বসে যিশুও শুনছেন। পরিচিতদের মুখে মুখে প্রত্যহ অসংখ্য সংবাদ আসে! জর্ডনের তীরে জনের অলৌকিক কার্যকলাপের সংবাদ। পরিচিতরা তীর্থদর্শন করে আসে, যিশু তাদের কাছ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নেয়—জনকে দেখতে কেমন? কেমন তাঁর কণ্ঠস্বর? কি তাঁর বাণী? একদিন তীর্থ প্রত্যাগত বন্ধুকে শুধোলেন—কেমন দেখলে?

—সত্যিই আশ্চর্য। আমি জানতে চাইলাম, আমার কর্তব্য কি। তিনি বললেন "যার দুটো জামা আছে সে যার একটাও নেই তাকে একটা দেবে।"

—তারপর? আগ্রহে কেঁপে ওঠে যিশুর কণ্ঠস্বর।

—আর একজনের প্রশ্নের জবাবে বললেন "যা তোমার ন্যায্য প্রাপ্য তার বেশী জোর করে আদায় করো না।"

যত শোনে যিশুর অস্বস্তি ততই বেড়ে ওঠে। অবসর পেলেই চলে মনের সঙ্গে বোঝাপড়া। ভাববাদী সম্প্রদায়ের সঙ্গে বহু মিল সত্ত্বেও ইনি একজন প্রচারক। একজন তপস্বী অথচ গ্রহণ করেছেন লোকশিক্ষার ব্রত। একজন সাধক, স্বয়ং আর্ত মানবের জন্য নিয়ে এসেছেন আশার বাণী। এই বিচার-বিশ্লেষণের পথে বার বার আসে এক সত্যের স্পর্শ। আশ্চর্য শিহরণ সেই সত্যের অনুভূতিতে। এই শুদ্ধিদাতার বাণীতে যেন প্রতিধ্বনিত হচ্ছে যিশুর নিজের অন্তরের অসংখ্য গোপন কথা, সযত্নলক্ষিত ভাবধারা। পুরোহিতদের ক্রিয়াকর্মের আড়ম্বর, বলিদান আর প্রাণহীন পূজা পার্বণের অসারতা, ধনসম্পদ সংগ্রহের অযৌক্তিকতা সকলের মধ্যে তা সমান বণ্টনের প্রয়োজন—তার মনেও তো এতদিন এইসব চিন্তাই আলোড়ন তুলেছে।

আত্মজিজ্ঞাসার আলোড়নে থেকে থেকে যিশুর জন্য সমুদ্র উদ্বেল হয়। সংসারের ভার মনে হয় অসহ্য। অন্তর ঠিক কি চায় তা জানা নেই কিন্তু কিছু যে চায় তাতেও সন্দেহ থাকে না। বিপর্যস্ত তরুণ বাড়ি ছেড়ে আশ্রয় নেয় পার্বত্য উপত্যকার নিস্তব্ধতায়। ধ্যানের সমাহিত স্তব্ধতায় ধীরে ধীরে অন্তর শান্ত হয়। সবুজ ঘাসের গালিচায় ঈশ্বরের কোলের পাশটিতে শুয়ে এক সময় যিশু ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে, ঈশ্বরের সিংহাসন শোভিত স্বর্গরাজ্যের স্বপ্ন। স্তব্ধ নিশীথে স্বপ্নের জাল বিদীর্ণ করে অন্তরের গোপন গভীরে মন্ত্রিত হয় অন্তরদেবতার বাণী—তুমি ওঠো, জাগো! বিশ্বজনকে বজ্র নির্ঘোষে জানাও, যে সত্যকে তুমি জেনেছো! অপসারিত কর মিথ্যার মুখোশ!

ঘুম ভেঙ্গে গেল। সম্মোহিতের মত যিশু উঠে বসল। প্রকৃতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে তখনও সেই স্বর্গীয় সুর মন্ত্রিত, পত্রমর্মরে সেই বাণীর সঞ্চারণ, তারায় তারায় সেই সঙ্কেতের ইসারা! চৈতন্যের আলোয় তৃতীয় নয়ন উন্মীলনের পরম মুহূর্ত! জর্ডনের তীর কতদূর! কতদিন লাগবে সেখানে পৌঁছতে?

জর্ডনের তীর, আর্ত মানুষের তীর্থক্ষেত্র। সঙ্কীর্ণ পাড়ে জড়ো হয়েছে অসংখ্য যাত্রী, অগণিত পশু। অধিকাংশই দরিদ্র মানুষ। বৃদ্ধ, বৃদ্ধা আর রুগীর সমাবেশ চোখ এড়াবার নয়। কেউ ক্লান্তি ভরে শুয়ে আছে, কেউ বা বসেছে প্রার্থনায়। নিরানন্দ মানুষের দল অনেক কামনা বুকে নিয়ে প্রতীক্ষারত। কিন্তু এমন আবহাওয়ায়, এই প্রাণহীন পরিবেশে কিসের প্রতীক্ষা?

ঘুরে দাঁড়াতেই চোখে পড়ল প্রশ্নের উত্তর, শুদ্ধিদাতা জন আছেন দূরের একটা চাতালে। চারদিকে প্রচণ্ড কোলাহল। সেই কোলাহলকে ছাপিয়ে থেকে থেকে শোনা যাচ্ছে জনের সাবধান বাণী—তোমরা অনুতপ্ত

হও, স্বর্গরাজ্য অদূরাগত।

হঠাৎ কোলাহল শুরু হল। জনকে লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছে জনকয়েক পুরোহিত। পোষাকের আভিজাত্যে এবং পদক্ষেপের উদ্ধত ভঙ্গীতেই তাদের পরিচয় প্রকট। জেরুজালেম থেকে কর্ম পরিষদের প্রতিনিধিরা এসেছে তদন্তের প্রয়োজনে। তীর্থযাত্রীরা তাচ্ছিল্যভরে পথ ছেড়ে দিয়েছে, তদন্তকারীরা এসে দাঁড়িয়েছে উন্নতশির জনের সামনে।

একজন প্রশ্ন করল—কে আপনি?

এই প্রশ্নের পিছনে লুকনো সন্দেহটুকু জনের বুঝতে দেরী হল না।

সন্দেহের নিরসন করে তিনি উত্তর দিলেন—আমি খৃষ্ট নই।

—তাহলে আপনিই কি এলিজা?

—না।

এইবার তদন্তকারীদের দলপতি এগিয়ে এসে প্রশ্ন করল—আপনি কি একজন দিব্যপুরুষ?

—না।

তবে আপনার পরিচয় কি?

এক মুহূর্তের স্তব্ধতা। গাছের পাতাগুও যেন উত্তরের আশায় উন্মুখ হয়ে আছে। উন্মুখ যিশুর কণ্ঠেও উদ্বেল হয়ে উঠেছে উত্তর। উত্তর, ঠিক যিশুর উত্তরই উদ্গারিত হল জনের কণ্ঠে—আমি মহাপুরুষ ঈশায়া বর্ণিত সেই মানুষ, যার কাজ অনাগত ত্রাণকর্তার পথ সহজ এবং সুগম করা। ঘমকের সুর ধ্বনিত হল দলপতির কথায়—খৃষ্ট, ঈশায়া বা দিব্যপুরুষ না হয়েও কোন অধিকারে আপনি শুদ্ধিস্নান করছেন?

—আমার শুদ্ধিস্নান বারিস্নানে। কিন্তু সেই দিব্য-পুরুষ আসছেন, যাঁর তুলনায় আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। তিনি আগুনের দহন দানে তোমাদের শুদ্ধি দেবেন। তীব্র কণ্ঠে তীক্ষ্ণ তীরের মত প্রতিপক্ষকে আঘাত হানলেন জন।

আঘাত লেগেছে যিশুর বুকে। ধ্যানের গভীরে কখন তলিয়ে গেছে যিশুর সারা সত্তা। বুক জুড়ে বাজছে জনের সেই দীপ্ত ঘোষণা—আসছেন সেই দিব্যপুরুষ····। রোমকূপের প্রতি প্রতি এ কি অবাক রোমাঞ্চ! সহসা কোন আলোর রাজ্যে উত্তরণ! স্বপ্ন আর জাগরণের দোলায় দুলছে কেন্দ্রীভূতি, অস্ফুট এক প্রশ্নের উত্তর চৈতন্যের মাঝে ধরা দিয়েও যেন দূরে সরে যাচ্ছে।

পরের দিন যিশুর শুদ্ধিস্নানের ডাক এলো। জর্ডন নদীর ঘোলাটে ঈষদুষ্ণ জলে দাঁড়িয়ে জন আর যিশু। দুজনেই উলঙ্গ। জন স্থির দৃষ্টিতে দেখলেন নবাগত শিষ্যকে। লোকটি দরিদ্র কিন্তু ব্যক্তিত্বের জোরে সহজেই সম্রাটের সম্মান দাবী করতে পারে। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জন আর যিশু—বর্তমান আর ভবিষ্যত। মরুভূমির বাসিন্দা জন আর তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে শ্যামলা প্রকৃতির দুলাল যিশু। তেজস্বী, তাপস জন আর তাঁর হাত ধরে দাঁড়িয়ে স্বপ্নালু কবি যিশু। নম্র, নীরব যিশু মাথা নত করে বসল উগ্র, মুখর জনের সামনে। জন এক হাত রাখলেন যিশুর মাথায়, অন্য হাতে দান করলেন শুদ্ধিস্নান।

পলকে সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ল এক তীব্র পুলকানুভূতির স্পন্দন। ধ্যানাচ্ছন্ন যিশুর অন্তর ভরে গেল জ্যোতির তরঙ্গে। ধীরে ধীরে চোখের সামনে উন্মোচিত হচ্ছে স্বর্গরাজ্যের স্বর্ণ দুয়ার। অসীম শূন্য বেয়ে নেমে আসছে এক শ্বেতশুভ্র বলাকা। কাছে, আরো কাছে। সহসা মর্মে তীব্র যন্ত্রণার মত ঘনিভূত হল অনাহত ধ্বনি—এই আমার প্রিয় পুত্র, এরই মাঝে আমি প্রকাশিত।

বিশ্ববিধাতার বাণী, পিতার কণ্ঠস্বর। এ কণ্ঠস্বর যিশু বহুবার শুনেছে—পার্বত্য ঝর্ণার কুলুকুলু ধ্বনিতে অন্ধকার আকাশে অসংখ্য নক্ষত্রের দ্যুতিতে, নিষ্পাপ শিশুর কলকাকলীতে। সে দিন যা ছিল আভাসে আজ তাই বৃত্ত হয়েছে আশ্বাসে। পুত্রের প্রতি পিতার আহ্বান আজ আর চিনতে ভুল হয়নি। আর ভুল হবে না।

[ক্রমশঃ]

কয়েকটি বিদেশী কবিতা

★

জাপানের কবিতা

ঠিক জানি
সে আর আসবে না কখনো।

গোধূলির আলোয় আলোয়
অনেক ঝিঁঝিঁ যখন একটানা ডাকতে শুরু করে
আমি দরজায় যাই—
তার-ই প্রতীক্ষায়।

—অনামা।

যদিও খুব ইচ্ছে করে
জগদ্দল পাথরের মতো বসে থাকি
এইসব মুখর ভালোবাসার ধরা-ছোঁয়ার ভিতরে ;

বয়সের চোরাটান থেকে
কিছুতেই তবু
ঘুরে সরাতে পারি না নিজেকে।

য়্যামানোনে ওকুরা।
(৬৬০-৭৩৩ খৃঃ)

৩

শুরুতেই যদি তোমার প্রতি
অবিশ্বাসী রাখতে
তাহলে আজ এতোকাল পরে
এতোকথা বলে অবিরাম ;

এমন দুঃখ জানতে হতো না আমাকে।

—স্যাকানোনে হ'ত্তে লেডী ওটামো।
(৮০০ খৃঃ)

স্পেনের কবিতা

শিকারী | ফেদেরিকো গ্রাসিয়া লর্কা

পাইন গাছগুলোর মাথার উপর।
চারটি পায়রা তারা
হাওয়ার ভিতরে।

চারটি পায়রা
চক্কোর দিয়ে দিয়ে উড়ছে।
তারা ভাসিয়ে নিয়ে চললো আহত
তাদেরই চারটি ছায়া।

পাইন গাছগুলোর গুঁড়ির নিচে।
পায়রা চারটি
শুয়ে রয়েছে মাটির উপর।

অনুবাদ : অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

স্মৃতি | চার্লস মেজ

দৃষ্টির দর্পনে সব কাঁপে
সকলের শস্য দেশে চলাফেরা, অথবা দাঁড়ায়
ছায়ার অনুকরণে

সব ঘাস, নিচের পাপড়ি, ভগ্নাংশ মানুষে
দুঃখিত অথবা পাথরে ম্লান
এবং অবাক বিস্ময়ে সেখানে

তারা পৃথিবীর শেষ দিনের জন্য উন্মুখ
এবং শেষতম জল দুর্দম্য
অজস্র প্লাবন

সময়ের বিকৃত মস্তিষ্কের চরে শায়িত
নগ্ন প্রস্তর—নিঃশব্দ হাসি
কঠোর, তারা নির্মম

নিশ্চিত মৃত্যুতে মুক্ত
জল ও আকাশ, তাদের ক্ষুব্ধাত্ম ইচ্ছা

দুর্ভাগ্য তীরে অপেক্ষমান।

কৃষক | এ্যালুন লেইটিস্

দুগর্ভ বৃষবৃন্দ তীরে নগ্ন শিশু গুল্ম
নৃত্যশীল, কণ্ঠে সরোবর সুর, এবং অলস শায়িত
ধূসর, উরু ভেজে বিবর্ণ, অর্ধজাগরিত
সুসিক্ত রোপদেশ পার্শ্বে।

অদূরে উচ্চস্বর কলকণ্ঠ নারীদের প্রস্তর খনন
মস্তক শোভিত তার, স্বচ্ছল গতি—
হৃদয়ের সহজ মসৃণ স্রোত
সৃষ্টির চিরন্তন নির্মাণে যেখানে কাঁটা শস্য স্পর্শমান।

ক্ষয়িষ্ণু পাহাড় আর বিষণ্ণ শস্যের বুকে
নৈনিকের ইতঃস্তত পদক্ষেপ
জাগরণে ইতিহাস সুস্থিত, বিপন্ন বিস্ময়;
তাদের মৃত্যু নিরীক্ষণে রত কৃষক নিরবধিকাল।

অনুবাদ : তাপস গুপ্ত

ছটি গ্রীক কবিতা | অডিসিয়ুস এলিটিস

১

তোমাকে যখন দেখিনি, তুমি ছিলে আলো।
প্রেম আসার আগে, তুমি ছিলে ভালবাসা।
আমার চুম্বন যখন তোমাকে আবিষ্ট করলো।
তুমি একটি নারী।

ভালবাসো
আবিষ্কারের গোর সমুদ্র,
ঢেউয়ের ওপর মাথা উঁচু করে আছে
তার স্বপ্নের সী-গাল।
সবচেয়ে উঁচু মাস্তুলে
একজন নাবিক
হাওয়ার মুখে ছড়িয়ে দিল একটি গান।
ভালবাসো,
তার গান
তার সমুদ্র যাত্রার দিগন্ত বলয়
এবং দূরস্মৃতির প্রতিধ্বনি।
একটি পাথরের ওপর ভিজে পায়ে
মেয়েটি
প্রতীক্ষা করছে একটি জাহাজের।

ভালবাসো
তার জাহাজ
এবং বৈশাখের খেয়ালী ঝড়
প্রত্যাশার ভেলার মতো।
ঢেউ-ভাঙার ফীণ শব্দের ওপর একটি দ্বীপ
একটি দ্বীপ
তার ফিরে আসার ইঙ্গিত।

অনুবাদ : কৃষ্ণ ধর

ইলিয়া এরেনবুর্গের দুটি কবিতা

॥ ১ ॥

ঘাসগুলি চারিপাশে বিস্তৃত রয়েছে যেন দাস।
বিনম্র শিশির দ্যুতিময়।
ভরত পাখিটি তার ছাপ ফেলে কোমল আকাশে
উড়ে গেল এমন সময়।
এবং কেবল তুমি, সুবিশাল তরু,
রয়ে গেল কর্তব্যের স্থানে
যেন সৈন্য, দেহ দিয়ে ঊর্ধ্বলোক আবৃত করার
ভার আছে যার 'পরে—এই কথা জানে।
এবং যখন অগ্নি তোমাকে শিখায় ঢেকে দিল
যন্ত্রণায় শাখাগুলি এঁকে বেঁকে ওঠে।
ম'রে গেলে অভিনয় ধীর শান্তভাবে,
যেভাবে মরণ নামে মানুষের ঠোঁটে।

॥ ২ ॥

তুমি শাখা ছুঁয়েছিলে ; শাখায় মর্মরধ্বনি হল।
সুঠাম, শ্যামল নিদ্রা তারুণ্যের মতো অচতুর।
কাউকে সান্ত্বনা দিতে এসকল বড় অপ্রতুল ঃ
পত্রের মর্মর কিম্বা গ্রীষ্মের উজ্জ্বল বারিপাত।
যখন, বিধৌত, অনুশোচনার শেষে ক'রে পড়া ;
জগৎ সুস্পষ্ট—সব এক বিন্দু সলিলে বিধৃত ;
যখন এগিয়ে আসে কুসুমের গুরুভার ঘ্রাণ,
আগে কোনোদিন ঘ্রাণ যে কুসুম বিস্তৃত করেনি।
ভাগ্য যেন ভেঙে পড়া জগরের মতো, তাতে বহু
ফাটল বা বাঁকা পথ, ফাঁসির রজ্জুর মতো বাঁকা।
না, মানুষ সহজেই অনাবিল সান্ত্বনা পায় না।
তবু আমি বৃষ্টি আর শাখাদের কথা বলে চলি ঃ
আমরা জিতব, সারা পৃথিবীর সজীবতারাশি
আমাদের পক্ষে, সব অঙ্কুর, তারুণ্য, রক্তনালী,
এই নীল মহাকাশ—যেন অনাহত কিশোরের
আনন্দিত পরিচ্ছদ, সব স্বর, সকল আলোকে,
সব শিশু যারা হেসে ছুঁড়ে ফেলে বল, পাখিদের
সুস্বর, ধীরবন্ধুনীদের অশ্রুজলধারা।

পাস্তেরনাকের কবিতা

কিছুকাল আগে এই বনের কম্পিত অঙ্গে দিয়ে
বৃষ্টিধারা চ'লে গেছে, আমিনের দলের মতন।
লিলির পাতারা বড় ভারী হয়ে গেছে, টোপ পেয়ে।
গির্জার বাতির কানে জল গিয়ে আঘাত করেছে।

শীতল পাইন বনে লালিত-পালিত হয়ে তারা
শিশিরের গুরুভার বহনে অক্ষম, মনে হয়।
দিনের প্রেমিক নয়, একা একা বড় হয়ে ওঠে,
এমন কি ঘ্রাণ চালে সেও একা—একা ঘ্রাণময়।

যখন গ্রামের সান্ধ্য চায়ের আসর ব'সে থাকে,
মশকরাশিরা ওড়ে পালের মতন কুয়াশায়,
এবং নিশীথ যেন গীটারের মতো বেজে ওঠে
দুঃস্বনিভ অন্ধকারে ইভান-দা-মারিয়াতে যায়,

তখন সকল কিছু শিউলির মতো ঘ্রাণময়।
গ্রীষ্ম আর মুখ, চিন্তা। প্রত্যেক ঘটনা যা অতীতে
হয়তো উদ্ধার ক'রে আনা যেত, আর ভবিষ্যতে
সৌভাগ্যের হাত থেকে প্রাপ্ত হওয়া যায় আচম্বিতে।

অনুবাদক ঃ বিনয় মজুমদার

এখন এক এক সময় হঠাৎ নিজেকে খোঁজে সুনন্দা। মনটা উদাস হয়ে যায়, কর্তব্যের অনেকগুলো বেড়া ডিঙিয়ে ছুটে বেরিয়ে যায় খুশীর খোলা মাঠে। টেবিলে কলেজের বই পড়ে রয়েছে কয়েকটা পাতা ওল্টায় অলস হাতে। বেশ ছিল কলেজের দিনগুলো। ভাবনা তখনও ছিল, কিন্তু তা বেদের মত। আসত আর উড়ে যেত। এখনকার মত চেপে তো বসে না। কিন্তু এই হঠাৎ মূর্তি কতক্ষণই বা। আবার একটু পরেই নেমে আসে চোখের ভারী পাতায় বোবা সুর। চেপে বসে বুকের ওঠা-নামায় কারো আলিঙ্গন নয়, সংসারের রুক্ষ বোঝা। বেশ মনে আছে, বলেছিল সুশোভন, চোখ দুটো তোমার লাভলি। কে জানে এখন কোথায় সব সময় হাসি মাখা সেই দুরন্ত ছেলেটা। কাউকে ভালবাসার অধ্যায় ওর কাছে আজ বিগত ইতিহাসের বিবর্ণ পাতাই যেন। তবু সেই অতীত

ইতিহাসের মিষ্টি মন টেনে আনতে একজন এখনো তো রয়েছে। স্বপন, ওর অফিসেরই একটা ছেলে। ওর অনুরাগের অন্ত নেই, অনুযোগেরও।

এক এক সময় বকে সুনন্দা, দিনরাত খালি বক বক। ধ্যেৎ তো।

কেন এতো বক বক করি জানো? যাতে এই বোবা মেয়েটার মুখ ফোটে। রেগে যায় সুনন্দা, যারে আমি বোবা নাকি।

মরতো কি? তোমার মত এই বয়েসের মেয়েরা কত কথা বলে জানো? কত হাসে জানো?

জানি না। জেনে আমার দরকার নেই। তুমি তো এক মহা পণ্ডিত। কটা মেয়ে তুমি দেখেছো শুনি?

একটাও না। তোমাকে যখন দেখেছি, পৃথিবীতে আর কোনো মেয়ে দেখবার আমার দরকার নেই।

চোখ ফিরিয়ে নিতে চায় সুনন্দা। কান সরিয়ে নিতে চায়। এসব ওর শুনতেও মানা। কিন্তু পারে না। আশ্চর্য সুন্দর কথাগুলো। এক এক সময়

লোভ হয়। স্বপনের বুকের কাছে মুখ এনে আবেশে আর আবেশে অনেকক্ষণ এমনি কথা শোনে। পারে না। কর্তব্যের কড়া অনুশাসনে আর সংসারের চাপে সেই উষ্ণতা মনের আকুল চাওয়া কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। সেই মনকে খুঁজতে বার বার হাত পিছলে যায়।

মাইনের দিন নোটগুলো হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ ভাবে সুনন্দা। টাকাটা হাতব্যাগে পুরে নিজের চেয়ারে ফিরে এসে ও উদাস আর বোবা হয়ে যায়। ভাবনা শুধু এই দিনটাই নয়। ভাবনা ওর রোজ, গাদা গাদা। কত কম এই টাকা ক'টা ওর দরকারের তুলনায়। অফিসে অন্য আর যে সব মহিলা সহ-কর্মিনীরা আছে টাকা হাতে ভাবনা তাদেরও এই দিনটায়। তবে ওদের ভাবনার সঙ্গে সুনন্দার ভাবনার কতই না তফাত। ওরা ভাবে কি ক'রে খরচ করবে টাকাগুলো। তাই দরকার না থাকলেও একটার জায়গায় আর দুটো বাড়তি শাড়ি কেনে, পয়সা ওড়ায় চোটেলে আর সিনেমায়। আর সুনন্দাকে মরা লোভীর মত আঁকড়ে ধরতে হয় মাইনের টাকা। নিজের জন্যে একটা পয়সাও খরচ করতে ভয় হয়। ছেঁড়া শাড়িটাই কোনো রকমে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরে চালায়, ঘরের দরজা বন্ধ করে ছুঁচ সুতো হাতে সেলাই করতে বসে। ক্ষয়ে ক্ষয়ে পায়ের ছেঁড়া চটিটায় আর কিছু নেই। তবু প্রাণভরে ফেলতে পারে না। তার এই মাইনের টাকা ক'টার ওপর সংসারের সবাই চেয়ে রয়েছে। অতগুলো চোখের লুব্ধ দৃষ্টি থেকে একটা পয়সা এদিক ওদিক করবার সাধ্য কি তার।

ছুটির পর বাইরে আসতে স্বপন বলল।

মাইনে পেয়েছো, খুব খুশী মনে হচ্ছে।

কই আবার। মৃদু হাসল সুনন্দা।

আচ্ছা বাবা, খুশী নয়। হলতো? নাও চলো, এখন খাওয়াও দেখি কিছু ভালমন্দ। খুব খিদে পেয়েছে।

বেশ, চল।

কিন্তু সেলনা স্বপন, দাঁড়াল। বলল, কিছু খরচ করবার কথা বলতেই অমনি মুখ গম্ভীর হ'ল তো? এক নম্বরের কঞ্জুস হয়েছো তুমি।

না, না, চল না। সুনন্দা বাধা দিল। কি খাবে বল।

না, থাক বাবা। তোমাকে খাইয়ে খরচা ক'রে দারা মাস তোমাকে হেঁটে অফিসে আসতে হবে, তা আমি চাই না।

এর কোন জবাব দিতে পারলনা সুনন্দা। কি যেন বলতে যাচ্ছিল. ও বাধা দিল,—কথা নয়, চলো। জোর করে টেনে নিয়ে গেল সেই চেনা হোটেলটায়। পর্দা টানা কেবিনে টেবিলের মুখোমুখি বসল দু'জন। রোস্ট চিকেনের অর্ডার দিল।

সত্যি, এ তোমার ভারি অন্যায়। সুনন্দা বলল।

খাওয়ানো তো ভাল কাজ। এর মধ্যে তুমি অন্যায় কোথায় দেখলে?

তাই বলে রোজ রোজ তুমি খাওয়াবে কেন।

ও! এই কথা। হাসল স্বপন। কি জানো, আমার আছে তাই খাওয়াই, পারি, তাই খাওয়াই। তা ছাড়া, তোমাকে খাইয়ে লাভ অনেক। তুমি কিছুই খেতে চাও না। অন্য কাউকে খাওয়াতে হ'লে এভাবে দুদিনেই যে কতুর হয়ে যেতাম।

সুনন্দা তাকাল চোখ তুলে। না হেসে পারল না। বলল, কথায় তোমার সঙ্গে কে পেরে উঠবে। এমন কথায় ভোলাতে পারো যে কি বলব। কিন্তু সত্যি, এ আমার বড্ড বারাপ লাগে।

কিন্তু আর একটা কথা শুনলে তোমার বড্ড ভাল লাগবে।

কি কথা?

এমনি নিরিবিলিতে তোমাকে মুখোমুখি বসিয়ে খাওয়াতে আমার যে ভারি ভাল লাগে সুনন্দা।

নীল চোখ দুটোর তারিফ করেছিল সুশোভন। সেই নীল চোখ দুটো তুলে মাঝে মাঝে এই অবাক ছেলেটার দিকে তাকাবার দরকার হয়। তাকায় তাই, কথা বলে না, শোনেই কথা। এমন সুন্দর কথাগুলোর জবাবে কারই বা ভাল লাগে কথা বলতে?

বি, এ টা পাশ ক'রে চাকরিই যে করতে হবে ভাবেনি সুনন্দা। এ বাড়ির মেয়ে কেউ কখনো চাকরি করেনি এর আগে। সখ ক'রে চাকরি করতে গেলেও

যে প্রচণ্ড বাধা আসবে জানতো ও। কিন্তু আজ তো এ চাকরির সখ নয়, প্রচণ্ড প্রয়োজন। তবু বাধা আসতই ঠিক। সখের চাকরি নিদারুণ প্রয়োজন হয়ে দেখা দিত না। বাবার চাকরি দিশী কায়দায়। মাইনে মন্দ ছিল না। ট্রাম থেকে পা পিছলে হাসপাতালে। ডান পা কাটতে হ'ল একটা চোখ নষ্ট। চাকরি গেল। পেনসন নেই। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড আর গ্র্যাচুইটির ক'টাই বা টাকা। আর সে টাকায় এই বিরাট সংসারের ক'টাই বা দিন? তবু হয়ত এ ধাক্কা সামলে ওঠা যেতো। দাদা, আটাশ বছরের হাসিখুশী জলজ্যান্ত ছেলেটা দুদিন বিছানায় ছটফট্ ক'রে একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। এক গাদা কান্না বাড়িতে। সেই কান্নার পেছল পথেই পথে নামল সুনন্দা। এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা বাবার সামনে রাখল। বাবা সেটা পড়ে তাকালেন মেয়ের দিকে, তারপর হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন।

মাইনের টাকা হাতে নিয়ে অনেক চিন্তা ওর। ছোটো ভাইবোন দুটোর স্কুলের মাইনে। মার জন্যে একটা শাড়ি কিনতেই হবে। বাবার সার্টগুলো একটাও তো আস্ত নেই। তা ছাড়া বাজারের খরচা তো আছেই। সবার ছোট ভাই বুবুল অনেকদিন থেকেই একটা ফুটবলের বায়না করছে। এবার ওকে একটা না কিনে দিলেই নয়।

একটা ফুটবলের কত দাম হবে? জিজ্ঞেস করল স্বপনকে।

ফুটবল? অবাক হয়ে তাকাল স্বপন। তুমি খেলবে নাকি?

হাঁ। ওইটেই বাকি আছে। হাসল সুনন্দা। ছোট ভাইটাকে কিনে দিতে হবে। বল না কত দাম?

কি জানি। হবে একটা কিছু।

পরের দিন ফুটবল কিনেই চাকরির স্বপন।

দাম কত?

দাম নিয়ে তোমার কি দরকার: আমার নাম নাও তাহলেই হবে।

তোমার ওপর মাঝে মাঝে আমার এমন রাগ হয় যে কি বলব। ইচ্ছে করছে ফুটবলটা তোমার মুখে ছুঁড়ে মারি।

হাসল স্বপন। বলল, ইচ্ছে যখন করছে, তাই মার। তবে দোহাই পরে কান্নাকাটি কোরনা যেন।

কান্নাকাটি করব কেন?

না, কেন জানি মনে হল, তাই বললাম।

চাকরি করছে সুনন্দা, তার মাইনের টাকাতেই বলতে গেলে সংসারটা এক রকম চলছে। তাই বাড়ির সবাই তাকে ভয় করে, সমীহ করে চলে। বাড়ির সবারের এই ব্যবহার তার একটুও ভাল লাগে না। বিশ্রী রকমের অস্বস্তি লাগে। তাই কি সে রুক্ষ হয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন? ভালবাসার চেয়ে এ বাড়িতে ভয় আর শ্রদ্ধা বেশী বলেই কি? তবু মাঝে মাঝে আবদার করে সবার ছোট ভাই অবুঝ বাবলু। সবাই ওকে বকলেও সুনন্দা বকে না। ওর ভালই লাগে এই আবদার।

গুন গুন করে গান গাইছে সুলতা। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পাউডার ঘষছে মুখে অনেকক্ষণ ধরে। চেয়ে চেয়ে দেখল সুনন্দা। হাসি পেল। সেজেগুজে থাকবার বড় সখ ওর। এ সখ এক সময় সুনন্দারও ছিল। এখন আর নেই। কোন ফাঁকে হারিয়ে গেছে সে মন। বেশ ভাল দেখতে হয়েছে সুলতাকে। সাজলে তো আরো ভাল দেখায়। কিন্তু মনের মত ক'রে সাজাবে ওকে সাধ্য কি সুনন্দার। বাবার এ অবস্থা না হ'লে আর দাদা বেঁচে থাকলে আরো ভাল করে সাজত ও: সাজত সুনন্দা। থাক সে কথা, কি হবে ভেবে। একটা কান্না-ভেজা চাপা নিশ্বাস বুক থেকে বাইরে ঠেলে দেয়। বেশ চেহারাটা হয়েছে সুলতার। সুনন্দার চেয়ে বছরের দুয়েকের ছোটো। কিন্তু লম্বায় ওর মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে। কে বিশ্বাস করবে ছোটো বোন বলে।

সুলতা ডাকল এসে, দিদি, পাউডার কুরিয়েছেরে।

কুরোক। পাউডার মুখে মেখে নবাবী করবার অবস্থা আমাদের নয়। কোন রকমে পেট ভরাতে হবে, ব্যাস্।

আর কোন কথা বলল না। ম্লান মুখে চলে গেল।

পরের দিন অফিস থেকে ফেরার পথে একটা পাউডারের কৌটো কিনে আনল। ডেকে দিল ওকে, এই নে।

বাজে খরচা করলি তো।

বেশ করেছি। তোকে পাকামো করতে হবে না। এটা নে, আর ভাগ এখান থেকে।

ভাগল না। দু'হাতে সুনন্দাকে জড়িয়ে ধ'রে এক গাদা চুমু খেল মুখে। বলল, দিদি তুই ওয়াণ্ডারফুল।

এই ছাড় বলছি। তুই একেবারে গোল্লায় গেছিস হতভাগী।

সংসারের এই অভাব অভিযোগ আর দুঃখ কষ্টের দিকে স্বপনের কোন খেয়াল নেই। ও নিজের সাজ-গোজ নিয়ে ব্যস্ত। খেয়াল খুশীতেই নিজের মধ্যে মগ্ন। বয়েস তো কম হয়নি। অবুঝ নয়। তাই বাড়ির সবাই বকাবকি ক'রে। রাগ স্বপনেরও হয় মাঝে মাঝে। গুম হয়ে বসে থাকে। কিন্তু সে আর কতক্ষণের জন্যে। কান্নার সঙ্গে কিছুতেই ও সুর মেলাতে পারে না। হঠাৎ হেসে তাকে বেসুরো করবেই। ওর চাল চলন ও ব্যবহারে মধ্যে মধ্যে সুনন্দাও চটে ওঠে। তারপর ভাবে এইতো ভাল। দুঃখ দৈন্যের মধ্যে থেকে দুঃখকে ভুলে থাকতে পারা সহজ কাজ নয়। শক্ত মনের দরকার। সেও যদি হতে পারত ওর মত এমনি নির্বিকার আর উদাসীন। তবে—

তবে হয়ত হাসতে না পারার অভিযোগ করতে পারত না স্বপন, বলতে পারত না, বোবা মেয়ে। একা একা চুপ চাপ বসে নানা ভাবনা ভীড় করলেই স্বপন চলে আসে। কোথা থেকে হঠাৎ যে এল ও: কাছে এল, অনেক কাছে। সরাতে কিছুতেই পারে না। ভাল ছেলে স্বপন, বড্ড ভাল। এত ভালছেলেদেরই তো ওর বড্ড ভয়। ওকে ভালবাসে স্বপন: এ ভালবাসার মধ্যে একটুও ছলনা নেই, মিথ্যের একটা রেণুও নেই। কিন্তু প্রতিদানে কি দিতে পারল সুনন্দা? করুণার একটা কণাও নয়—অনুরাগের একটা পরশও নয়। তবু স্বীকার করতে লজ্জা নেই সুনন্দার, ওর ভালবাসে স্বপনকে, ও ভালবাসে স্বপনকে। কিন্তু বিয়ে? সে তো অসম্ভব।

কেন অসম্ভব? প্রশ্ন তুলেছিল স্বপন।

অবুঝের মত কথা বোলোনা। আমার বিয়ে হয়ে গেলে সংসারটা যে ভেসে চুরমার হয়ে যাবে।

আর কেউ হলে অবুঝই হ'ত। চেঁচিয়ে, আমি কিছু জানি না, জানতে চাই না। এ তোমার সব মিথ্যে কথা। আর তারপর দু'হাতে বুকের কাছে টেনে উন্মাদ আলিঙ্গনে হয়ত তচ্‌নচ্‌ ক'রে দিত যৌবনের জ্বালা ধরা দেহের নিষেধের বেড়াগুলো।

কিন্তু ভাল স্বপন, বড্ড ভাল। তাই চুপ করেই রইল।

মাইনের পরের দিন এনেছিল কয়েকটা নোট দশ টাকার। বলল, এই নাও।

অবাক হ'ল সুনন্দা। মানে, কার টাকা?

ভয় নেই, হাসল স্বপন, চুরি করিনি। আমার এত টাকা লাগে না। বাড়িতে টাকা পাঠাতে হয় না, কাউকে সাহায্যও করতে হয় না। যা মাইনে পাই তা সবই আমার একার খরচের জন্যে। অনেক বাঁচে আমার। একা কত আর খরচ করব।

টাকা নেয়নি সুনন্দা। বলল, পাগলামি কোরনা।

ভালবেসে লোকে কত কিই তো ক'রে। আমি না হয় পাগলামিই করলাম।

সুনন্দা বলল, টাকা আমি নেবোনা।

বেশ না নাও, এই ফর্মে সই তো ক'রে দাও। তোমার নামে একাউণ্ট খুলে ব্যাংকে টাকাগুলো জমা করব প্রতি মাসে।

না। মাথা নাড়ল সুনন্দা।

তা হ'লে জোর ক'রে সই নিতে হবে। আমার সঙ্গে গায়ের জোরে নিশ্চই তুমি পারবে না।

হাত তুলবে মেয়েমানুষের গায়ে?

উপায় নেই।

গুণ্ডা কোথাকার।

জবাবে আবার হাসল স্বপন।

আশ্চর্য লাগে ওর স্বপনকে। কেমন এক কমনীয়, স্নিগ্ধ, সুন্দর ভালবাসা এ ছেলের। ভালবাসায় বিদ্রোহ নেই, রুক্ষতা নেই, নেই কোন উন্মাদনা। চেনা জানা বেশ ক'টা বছরের। কিন্তু একদিনও তো মুখোমুখি বসার এতগুলো প্রহরে হাত বাড়ায়নি স্বপন হাত ধরবার জন্যে, একবারও তো মেলেনি অনুরাগের উন্মাদনা মুহূর্তে

উন্মাদ পরশ। ও জানে, এসব ভাললাগে না সুনন্দার, এসব ও ভালবাসে না। তাই তো ও ছেলের অনুরাগের এত ক্ষান্ত, পরিমিত প্রকাশ। বড় লোকের ছেলে স্বপন। চাকরি তো সখ। বাড়িতে টাকা পাঠাতে হয় না। মাইনে যা পায়, নিজেরই জন্যে সব খরচ ক'রে। আনন্দ আর খুশীই ওর জীবন। তাই দুঃখ হয় সুনন্দার, নিজের দুঃখে ওর জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে যাবার জন্যে। কি পাবে সুনন্দার কাছে স্বপন? এখানে কান্না ছাড়া আর কিছু নেই। তবু কেন যে ও কাছে আসে। বড় কষ্ট হয় সুনন্দার। তবু ঠেলতে পারে না জোর ক'রে। কি যে মায়া শান্ত ছেলেটার অশান্ত চোখ দুটোয়।

তাই তো বলল সেদিন,—একটা কথা বলব।

বল। বোবা মেয়ে কথা বলতে চায় এতো বড় আনন্দেরই কথা।

না, ঠাট্টা নয়। আমাকে ভালবেসে দুঃখই পাচ্ছ শুধু।

কে বললে?

এ কথা কাউর বলে দেবার দরকার নেই। শোনো, পৃথিবীতে অনেক মেয়ে রয়েছে-তের ভাল আমার চেয়ে। তারা বোবা নয়। অনেক কথা বলতে পারে, অনেক হাসতে পারে। লক্ষ্মীটি, তাদের কাউকে বিয়ে ক'রে তুমি সুখী হও।

হাসল স্বপন। বলল, তোমার উপদেশের জন্যে ধন্যবাদ।

উপদেশ দেবার আমার সাহস কৈ। এ অনুরোধ।

বেশ, অনুরোধই হ'ল। কিন্তু জানো কি যে আকাশে তারার দল অসংখ্য, কিন্তু চাঁদ একটাই।

এরপর আর কথা বলা যায় না। জানে সুনন্দা। এ তো জানা নয়, নতুন ক'রে খোঁজা নিজেকে। তারপর রাতের বিছানায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদা। এক এক সময় মনে হয় সুনন্দার কথায় এমন না ভুলিয়ে ও যদি হাত বাড়াতো, যদি এই দেহের নিষেধের বেড়াগুলো ভেঙে চুরমার ক'রে দিত, অনেক ভাল হ'ত তা হলে। রাগ করতে পারতো, ঘৃণায় ঠেলে সরিয়ে দিতে পারতো। কিছুই তো করে না স্বপন, তবু সুনন্দার উঁচু বুকের ওঠানামায় শিহরণের ঢেউটা জমে যে একটা একটা ক'রে।

বাবা সারারাত বক্ বক্ করে বাড়িতে। সেই একসিডেন্টের পর কেমন যেন হয়ে গেছে। মা নিরুদ্দেশ। সুলতার পর বিমান। আগামী বছর ম্যাট্রিক দেবে। ওর ওপরই সবার ভরসা। ভাবে সুনন্দা, কবে পাশ করে বেরুবে বিমল, কবে চাকরি করবে। এখনো তো অনেক-গুলো বছর। তার আগে নিজের সম্বন্ধে কোনো কিছুই ভাবতে পারে না সুনন্দা। আর সুলতা? ওর ওপর তো কোনই ভরসা নেই। মন নেই ওর পড়াশোনায়। খালি সাজগোজ আর আড্ডা এ বাড়ি ও বাড়ি। সিনেমার বই পড়া আর সিনেমা দেখে বেড়ানো। বকলেই খিল খিল ক'রে হাসি।

এক এক সময় বলকায় সুনন্দা, খালি দিকি তোর হাসি! মাথা-মুণ্ডু নেই যেন তখন এতো হাসির কি আছে।

বারে, হাসি পায়।

কই আমার তো পায় না।

জবাব দিতে পারে না। তবু থেমে থাকতে গিয়ে আবার হাসিই পায় ওর। রোজ এতো ফেরেগুরে কোথায় যায় ও? পাড়াশুদ্ধু তো চেনা ও মেয়ের। নানা কায়দায় ওর ভাক। ভারি সুন্দর দেখতে হয়েছে সুলতাকে। এই অভাবের সংসারে এত হাসি আর এত স্বাস্থ্যভরা যৌবন ও কি ক'রে জমায়? অবাক হয়ে ভাবে। এবার বিয়ে দিলে হয় সুলতার। এ মেয়েকে যে দেখবে সেই ভালবাসবে। কিন্তু রোজ ওর এই সাজগোজ কেন—কার জন্যে? চোখেমুখের চেহারার রোজ কেন এই বর্ণচ্ছটার পরিবর্তন? ওকি কাউকে ভালবেসেছে?

সুলতা ডাকল, দিদি।

কিরে। ফিরে তাকাল সুনন্দা।

দশটা টাকা দিবি? একটু থেমে বলল সুলতা।

কেন, এত টাকা কি হবে।

বারে, এত আবার কোথায়। ও হাসবার চেষ্টা করল।

এ সংসারে দশটা টাকাই অনেক। ওতে এ বাড়ির দু'দিন সন্ধ্যায় খাওয়া হয়, তা জানিস।

জানতে চায় না ও। মুখ কোচকালো। রাতদিন হাসি মেয়ের কান্নার কথা শুনতে একটুও ভাল লাগে না।

আবার শুধোল সুনন্দ, কি করবি দশ টাকায়।

এমনিই, দরকার আছে।

তোর দরকার মানে তো সিনেমা থিয়েটার দেখা, হোটেলে খাওয়া আর বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে চৈ চল্লা করা। এ ভাবে নবাবি করবার জন্যে আমার কাছে টাকা নেই।

সুলতা তবার শুনে চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর ভেঙে উঠল, নিজে তো নিত্যি হোটেলে খাটাও লুকিয়ে আমাদের। তার বেলায় বুঝি নবাবি হয় না?

কে বললে। ওর দিকে সোজাসুজি তাকাল সুনন্দা।

কে বলবে আবার। আমি নিজেই তো দেখেছি কতদিন তুই আর তোর অফিসের স্বপনবাবু নিত্যি চপ্, কাটলেট, অমলেট মারছিস।

দেখেছে, দেখুক। ভয় নেই সুনন্দার। সন্দেহ করুক, ভালবেসেছে স্বপনকে। তাতেও ভয় নেই। বলল, তা খাই। তা স্বপনই আমায় সব সময় খাওয়ায়। আমি কোন দিনই খরচা করি না।

আমি অতো বোকা নই, সব বুঝি। মিথ্যে বলে কোন লাভ নেই।

মিথ্যে? রাগে আর লজ্জায় কেঁদে ফেলেই উঠল সুনন্দা। তারপর ঠাস্ ঠাস্ করে দুটো চড় কষালো ওর নরম গোলাপি গালে।

চড় খেয়ে একটুও কাঁদল না সুলতা, চেঁচালও না। গুম্ হয়ে রইল সারাক্ষণ নিজের ঘরে। আর এই কাণ্ড করে অনুশোচনার শেষ নেই সুনন্দার। কেন যে লাত উঠল এমনি করে। বলেছে না হয় মিথ্যে। বলুক। ওর জায়গায় আর যে কেউ এই কথাই বলতো। অফিসে অস্থির হয়েই রইল সুনন্দা। কাজে মন বসল না।

রাতে নিজের থেকেই ওর কাছে এল। ডাকল, এই

খুব লেগেছে না কিরে ?

দূর, ছেলে ফেলল সুলতা, তোর হাতে জোরই নেই। তারপরই ওর বুকে মুখ লুকিয়ে কেঁদে ফেলল। বলল, আমায় ক্ষমা করবি দিদি।

এতো হাসিখুশীর মেয়ে কাঁদে কেন ? যারা ভালবাসতে পেরেছে, তারাই তো কাঁদতে শেখে। তবে কি কাউকে ভালবাসে সুলতা ? তাই, একরাশ প্রশ্ন করল সুনন্দা। হাসি যখন কান্নায় ভেঙেছে, মন ভাঙল। দিদির কোলে মুখ লুকিয়ে মন খুলল হাসিখুশীর মিষ্টি মেয়ে।

দূরছ, ভাল ছেলে। জাতে মেলে না, তা হ'ক।

বাবা যা যে রাজি হবে না। সুলতা ভয়ে ভয়ে বলল।

সে আমি দেখব। তোর ভয় নেই।

কিন্তু তার আগে তুই বিয়ে করবি না দিদি ?

কাকে। তাকাল সুনন্দা হেসে।

বারে, স্বপনবাবুকে। ভাল তো বাসিস।

কে বললে ?

এ সব কেউ বলে নাকি আবার। হাসল সুলতাও।

প্রতিবাদ করল না সুনন্দা। ধরা পড়ে ভয়ও পেল না একটু। স্নিগ্ধ হাসি ছড়িয়ে বলল, আগে তোরটা তো হোক।

এ সংসারে সুনন্দাই এখন সব। জানে সে। তাকে সবাই মানে। তার কথাই এ বাড়ির আজ শেষ কথা। তাই বাবাকে সুলতার বিয়ের কথা জানাতে কোন ভয় নেই। হাসিখুশী এই মেয়ে হেসেই যাক, এ কামনা ওর অন্তরেরই। দাদা থাকলে এ ভাবনা ভাবতে হত না, হয়ত বিয়েই হয়ে যেত সুনন্দার এত দিনে। কিন্তু ভাগ্য ওকে ঠেলেছে চাকরিতে, এই অভাবভরা সংসারের ভার নিতে। একটা অন্ততঃ ভাল আর সুন্দর কাজ করুক ও এ সংসারের ভার নিয়ে।

সব শুনে বাবা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। হয়ত মনের সংস্কারের সঙ্গে যুদ্ধ করতেই সময় গেল। তারপর বললেন, বিয়েতে টাকা লাগবে তো।

—টাকার জোগাড় হয়ে যাবে।

আবার নীরব রমানাথ। ভাবছেন কি যেন। মুখ তুললেন। বাট, তোমাট এবাউট ইউ ? তোর বিয়ে ?

ভারি মোকার মত প্রশ্ন। ভাবল সুনন্দা। তবু ভাল লাগল বাবার মুখে এ কথা শুনে। একরাশ যৌবন আর এক বুক কামনা নিয়ে এ বাড়িতে আরো একটা মেয়ে রয়েছে ভোলেনি বাবা। হেসে জবাব দিল, আমি এখন বিয়ে করলে এ সংসার যে ভেসে যাবে।

রাইট্, রাইট্। রমানাথ বিড় বিড় করে বললেন।

অফিসের ছুটির পর ডাকল সুনন্দা, শোনো, একটা কথা বলব।

একটা কথা কেন, এক হাজার, এক লক্ষ কথা বলতে পার।

ঠাট্টা নয়। আমার নামে যে টাকাগুলো জমাচ্ছে, দাওনা। দেবে ?

বারে, দোবনা মানে ? তোমারই তো টাকা। তোমার সই ছাড়া ও টাকা ব্যাংক থেকে ওঠানোও যাবে না।

তা জানি। ঘাড় নাড়ল সুনন্দা।

কিন্তু টাকাগুলো নিয়ে হবে কি ? বিয়ে করবে ?

বিয়ে ঠিকই করেছো। তবে কোরব না, দোব। সুলতার। দেখেছো তো ওকে ? ভারি চমৎকার দেখতে হয়েছে, না ? জানো, ও ভালবেসেছে। এমন মেয়েকে কোন ছেলেই না ভালবাসবে, বল ?

ছোট বাচ্চারই মত হাসি-খুশীতে আজ চঞ্চল হয়ে উঠেছে সুনন্দা। এত কথা তো এক লপ্তে কখনো বলে না। অবাক হয়ে তাকাল স্বপন।

কথা থামেনা সুনন্দার। আর জানো, ছেলেটা আমাদের পাল্টা ঘর নয়। তাই ভারি ভয় ওর। হতভাগা মেয়ের কাণ্ড দেখো। তবে দাদা বেঁচে থাকলে, আর বাবার এই চাল না হলে এই বিয়ে কি সহজে হত ভেবেছ। অনেক কাণ্ড করতে হ'ত। বাড়িতে হুলস্থুলই পড়ে যেতো।

তাই তুমি সাহস করে বিয়ে দিচ্ছ ?

হ্যাঁ। আর তোমার টাকায়। ভগবান তোমার ভাল করবেন।

জবাবে বলল স্বপন, একজনের ভালো করে তুমি। ভগবান তোমাকেই আশীর্বাদ করবেন।

বিয়ে হয়ে গেল দুলতার,। অনেক কাজ করল সুনন্দা, অনেক খাটল। কে বলবে এই সে হাসতে না-জানা বোবা পাথরের মেয়ে। বিয়ের অনেক কাজ করতে হল স্বপনকে। তাই দেখল সে। অবাক হয়ে দেখল। উল্টোলে লাবণ্যভরা মুখে গাল রেখে নেমেছে ঘাম। যেন মুক্তোরই কেটা।

বর বউ চলে যাবার পর নিঝুম হয়ে এল উৎসবের বাড়িটা। আর কেমন যেন উদাস ক্লান্তি লাগল সুনন্দার সারা দেহে আর মনে। বলল স্বপনকে, বড্ড টায়ার্ড লাগছে। চল না, গঙ্গার ধারে সেই ঝাউগাছটায় গিয়ে বসি কিছুক্ষণ।

ঝির ঝিরে হাওয়া বইছে। ছোট ছোট ঢেউ জলে। অনেকক্ষণ সূর্য ডুবে গেছে, তবু আকাশটা এখন লাল। সেই লাল লাল ছায়া চিক চিক্ করছে জলে।

অনেকক্ষণ কোনো কথা নেই দু'জনের। স্বপন এক মুঠো ঘাস ছিঁড়ল। একটা ঢিল ছুঁড়ল জলে।

বোবা হাওয়া ভাগ্যিস সুনন্দাই। জানো, দাদা বেঁচে থাকলে আর বাবার এই হার্টসিডেন্ট না হলে অফিসে চাকরি করতে হত না। আর আলাপও হত না তোমার সঙ্গে।

ভালই তো হত। কষ্ট পেতে না!

ভাল না ছাই। এক আশ্চর্য মানুষকে জীবনে জানতে পারতাম না কোনদিন।

কি হ'ল জেনে। ম্লান হাসল স্বপন।

কিছুই কি হল না। জানতে পারলাম ভাল হওয়ার কত কষ্ট, কত জ্বালা।

বড্ড ভাল যে তুমি। তাই দিয়েই গেলে শুধু, চাইতে পারলে না।

কিছুই তো চাইনা আমি। বোবা একটা বিধবা মেয়েকে শুধু।

স্বপনের কথাগুলো হঠাৎ এই নির্জন গঙ্গার তীরে ঘন সান্নিধ্যে ওকে কেমন যেন উন্মনা, আকুল ক'রে দিল।

কি আছে আমার? কি দিবে আমায়? কিছু নেই,। কিছু নেই। বড্ড যে। বড্ড যে গরীব আমি। দেখো চেয়ে দেখো, দেখো খুঁজে দেখো।

উত্তেজনায় থর থর ক'রে কেঁপে উঠল সুনন্দা। তারপর ওর প্রশস্ত খোলা বুকে কাঁপিয়ে পড়ে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠল।

তীরু মেয়ের আকুল আত্মসমর্পণের এ এক আশ্চর্য পুলক জাগা অভিজ্ঞতা স্বপনের। জ্বালাময় যৌবন দেহের সব গ্রন্থি এই মুহূর্তে শিথিল। বোবা মেয়ের সমস্ত কামনা বাসনা এই মোহময় গঙ্গার তীরে, নিস্তব্ধ নির্জনে বেদনা-মথিত উন্মনায় হঠাৎ ফুটে উঠেছে অজস্র মুখে।

তবু করলনা কিছু স্বপন। করতে পারল না। চোখের জলের ফোঁটাগুলো মুছিয়ে সরিয়ে দিল, মুখে উড়ে-পড়া চুলগুলো উঠিয়ে দিল। তারপর আস্তে বলল, অনেক রাত হয়েছে, উঠবেনা এবার?

দরজার কাছে শব্দ হতেই ফিরে তাকালেন রমানাথ। কে?

লঘু পায়ে বিষণ্ণ এক মেয়ে এগিয়ে এল। আমি বাবা। আর পাশে বসতো। অনেকদিন তোকে দেখিনি। দেখি ভাল করে। সারাদিন অফিসে খাটিস। বড্ড রোগা হয়ে গেছিস।

কেমন অস্বস্তিকর বাবার কথাগুলো। বাবার কপালে আর চুলে একটু হাত বুলিয়ে ও উঠে পড়ল তাড়াতাড়ি।

উঠলি? শোনরে। সেই ছেলেটা তোদের অফিসের কি যে নাম, ওয়াণ্ডারফুল বয়। ওকে তুই ভালবাসিস, না? বিয়ে করবি?

ছটফট্ ক'রে উঠল সুনন্দা। বলল বেশ রাত হয়েছে, এবার তুমি ঘুমোও তো বাবা।

রাত হয়েছে? হ্যাঁ, তা হয়েছে। কিন্তু হ্যারে, তুই এ বাড়ির বড় মেয়ে, তোরই হওয়া উচিত সবার আগে বিয়ে।

কিন্তু না হয় সবার ছোটো হয়েই তোমার কাছে রইলাম বাবা।

রাইট্, রাইট্। মাথা নাড়লেন রমানাথ। পাশ ফিরলেন। জানে সুনন্দা, চোখের জল লুকোবারই জন্যে।

আলোচনা

স্ট্যালিন প্রসঙ্গে

অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়

কমরেড স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে এক অভিযান শুরু হয়েছে। এই অভিযান শুরু করেছেন সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির বর্তমান নেতৃবৃন্দ। সোভিয়েত পার্টির নেতৃবৃন্দের স্ট্যালিন-বিরোধী অভিযানের নেতৃত্ব করছেন কমরেড ক্রুশ্চেভ। সোভিয়েত ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টির বিংশ কংগ্রেস (১৯৫৬ ফেব্রুয়ারী) থেকেই বিশেষভাবে এই অভিযান শুরু হয়। অন্ততঃপক্ষে তখন থেকেই সর্ব প্রথম সোভিয়েত ইউনিয়নের বাইরে কমিউনিস্ট মহল এবং সর্বসাধারণ এই অভিযানের কথা জানতে পারে।

বিংশ কংগ্রেসে ১৯৫৬ সালের ২৩শে, ২৪শে ফেব্রুয়ারি কমরেড ক্রুশ্চেভ কংগ্রেসে যোগদানকারী প্রতিনিধিদের এক রুদ্ধদ্বার অধিবেশনে কমরেড স্ট্যালিনের দোষ-ভুল-ত্রুটি সম্পর্কে একটি রিপোর্ট দেন। আমাদের কাছে যতখানি রিপোর্ট করা হয় তা থেকে জানা যায় বিংশ পার্টি কংগ্রেসের সময় সোভিয়েত পার্টির আমন্ত্রণক্রমে অন্যান্য দেশের কমিউনিস্ট পার্টি থেকে সৌভ্রাতৃত্বমূলক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত প্রতিনিধিদের পূর্বোক্ত রুদ্ধদ্বার অধিবেশনে উপস্থিত থাকতে বলা হয় নি; এবং তাঁরা উপস্থিত ছিলেন না। এই অধিবেশনে স্বয়ং কমরেড ক্রুশ্চেভের রিপোর্টের কোন মূল দলিল তাঁদের সরবরাহ করা হয় নি।

বিংশ পার্টি কংগ্রেসে সোভিয়েত পার্টির প্রতিনিধিদের রুদ্ধদ্বার অধিবেশনে ক্রুশ্চেভ স্ট্যালিনের যে সমালোচনা-রিপোর্ট দেন তার সরকারী মূল দলিল বা বিশদ বিবরণ কোনদিন পৃথিবীর সাধারণ মানুষের কাছে এমন কি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের কাছে প্রচার করা হয় নি। বিংশ পার্টি কংগ্রেসে যোগদানকারী প্রতিনিধিদল যতটুকু রিপোর্ট করেন তা থেকে স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগগুলি নিম্নরূপ জানা যায়:—

(১) শেষ জীবনে স্ট্যালিন নাকি ব্যক্তি-পূজা চর্চার দোষে দুষ্ট হন।

(২) তিনি নাকি পার্টি গণতন্ত্র ও সোভিয়েত সংবিধানে মৌলিক গণতন্ত্র লঙ্ঘন করেন এবং অসংখ্য নিরপরাধ সোভিয়েত নাগরিককে অযথা নির্যাতন এমন কি গণ-হত্যাকাণ্ড পরিচালনা করেন। এই পার্টি শৃঙ্খলার জন্য স্ট্যালিন কমরেডসুলভ বুঝানর নীতির পরিবর্তে সাংগঠনিক বিধানের উপর বেশী জোর দিতেন।

(৩) তিনি শ্রেণী সংগ্রাম সম্পর্কে ভুল তত্ত্ব প্রচার করেন।

বিংশ পার্টি কংগ্রেসের গুপ্তভাবে অধিবেশনে ক্রুশ্চেভ প্রদত্ত স্তালিনের সমালোচনামূলক রিপোর্টের এক সংক্ষিপ্ত অনুলিপি বলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র বিভাগ থেকে ১৯৫৬ সালের ৪ঠা জুন একটি দলিল প্রকাশিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র বিভাগ থেকে দাবি করা হয় যে কমিউনিস্ট দুনিয়ার সূত্রে এই অনুলিপিটি পাওয়া গেছে। ক্রুশ্চেভের রিপোর্টের অনুলিপি বলে কথিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র বিভাগ থেকে প্রচারিত এই দলিলটি অন্ততঃপক্ষে আমাদের দেশে কমিউনিস্টদের মধ্যে এবং দরদী মহলে বিপুল আলোড়ন এনে দেয়। এই দলিল গভীর মনোনিবেশের সঙ্গে পড়া ও আলোচনা হতে থাকে। যতদূর শোনা গেছে বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিতেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত এই দলিলটি আলোচনার ভিত্তি হয়ে ওঠে, এমন কি সোভিয়েত পার্টিতেও অবস্থা এইরূপই হয়।

ভারতে কমিউনিস্টদের মত দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদল স্তালিনের সকল সমালোচনা নির্ভুল বলে বিবেচনা করেন; অপর মত সমালোচনাকে অন্যায় অসত্য ও উদ্দেশ্যমূলক বলে বিবেচনা করেন।

স্তালিনের সমালোচনা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাব: অবশ্য ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সরকারী মত নয়:— স্তালিনের অবদান বহু কিন্তু শেষ জীবনে ব্যক্তি-পূজার প্রভাবে কিছু কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি এবং ভুল ঘটে। কিন্তু এই ভুলগুলি ঠিক কি কি তা কোনদিন সরকারী ভাবে বলা হয় না। যতদূর জানা আছে ভারতের পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে তা বিশদ বিশ্লেষণের চেষ্টাও হয় নি। পার্টির সদস্যদের মধ্যে সেগুলি বুঝাবার চেষ্টাও হয় নি। ফলে যে যার মত ধারণা গড়ে তোলেন।

১৯৫৬ সালের ৩০শে জুন সোভিয়েত পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি "ব্যক্তি পূজার চর্চা ও তার ফলাফল কাটিয়ে ওঠা সম্পর্কে" শিরোনামায় একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে।

কিন্তু বিশেষ লক্ষ্যণীয় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র বিভাগ থেকে প্রচারিত স্তালিন সম্পর্কে কমরেড ক্রুশ্চেভের রিপোর্ট বলে কথিত যে দলিলটিকে ভিত্তি করে কমিউনিস্ট মহলে তুমুল আলোচনা চলে, দীর্ঘকাল পর্যন্ত সেই দলিল সম্পর্কে সোভিয়েত পার্টির পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করা হয়। দলিলটি সঠিক না মিথ্যা সে সম্পর্কে দীর্ঘকাল কোন কিছু বলা হয় না সোভিয়েত পার্টির পক্ষ থেকে। বহুকাল পরে ক্রুশ্চেভ এই রকম একটি দলিলের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

কমরেড স্তালিনের বিরুদ্ধে সোভিয়েত পার্টির বর্তমান নেতৃবৃন্দ যে অভিযান শুরু করেছেন তাকে আরও পরীক্ষা করে দেখতে অগ্রসর হবার আগে কমরেড ক্রুশ্চেভ ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এই ব্যাপারে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তার কয়েকটি দিক বিশেষভাবে আলোচনা করা দরকার।

(ক) স্তালিন কেবলমাত্র সোভিয়েত পার্টির নেতা ছিলেন না; তিনি ছিলেন লেনিনের পরে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সেরা নেতা। লেনিনের পরবর্তী কালে আন্তর্জাতিক নেতা হিসাবে অন্ততঃপক্ষে বিংশ কংগ্রেসের আগে পর্যন্ত স্তালিনের শ্রেষ্ঠত্ব ছিল সর্বজনী স্বীকৃত। এই পরিস্থিতিতে স্তালিন সম্পর্কে সোভিয়েত পার্টির নেতৃবৃন্দের বক্তব্য আগে থেকে বিশ্ব কমিউনিস্ট মহলে প্রচার করে, তাঁদের বক্তব্যের যথার্থতা সম্পর্কে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনকে উপলব্ধি করাবার ধৈর্য না ধরে, অন্যের কী বক্তব্য আছে তা শোনার কোন প্রয়োজন অনুভব না করে সোভিয়েত পার্টির নেতৃবৃন্দ এক তরফা ভাবে এই স্তালিন বিরোধী অভিযান চালু করে দেন। তাঁদের এই কাজ পদ্ধতির দিক থেকে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঐক্যকে চোখের মণির মত সযত্নে রক্ষা করার জন্য সদা সর্বদা সচেষ্ট থাকার দায়িত্ব ও কর্তব্যের পরিপন্থী। সোভিয়েত পার্টি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সুযোগ্য পার্টি বলেই এ ব্যাপারে সোভিয়েত পার্টির দায়িত্ব সর্বাধিক। অন্ততঃপক্ষে মার্কসবাদ লেনিনবাদী নীতি অনুসারে এইরূপ আচরণই উচিত। কিন্তু সোভিয়েত নেতৃবৃন্দের আচরণে কমিউনিস্টসুলভ বিনয় ও নম্রতার পরিবর্তে

শ্রেষ্ঠত্বের যে অভিব্যক্তি ও দম্ভ প্রকাশ পেয়েছে তা সোভিয়েত জাতীয়তাবাদের এক পরিচয়।

(খ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে বিংশ কংগ্রেসে স্তালিন সম্পর্কে ক্রুশ্চেভের রিপোর্ট বলে কথিত যে দলিলটি নিয়ে সারা পৃথিবীতে তুমুল তোলপাড় হয় দীর্ঘকাল সে বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন এবং পরে ক্রুশ্চভ কর্তৃক এ রকম দলিলের অস্তিত্ব সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকাশ নেহাত একটি ন্যাকামী ও ভণ্ডামী বলে পরিগণিত হওয়ার যোগ্য। সোভিয়েত পার্টির নেতারা এমন একটা দলিল—ক্রুশ্চেভকে ভিত্তি করে সারা পৃথিবীতে তোলপাড় চলেছে—তার সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন এটা কোন সাধারণ-বিবেচনা-সম্পন্ন ব্যক্তির কাছে গ্রাহ্য হতে পারে না। সোভিয়েত নেতৃবৃন্দের এই নীরবতা আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার একটি নিদর্শন এবং এজন্য তাঁদের লজ্জিত হওয়াই উচিত ছিল। অন্ততঃ পক্ষে উক্ত দলিলের পাঠ যে নির্ভরযোগ্য ছিল, তা "ব্যক্তি পূজার চর্চা ও তার ফলাফল কাটিয়ে ওঠা সম্পর্কে" শিরোনামায় সোভিয়েত পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ১৯৫৬ সালের ৩০শে জুন তারিখের প্রস্তাব থেকেই বিশ্বাস-যোগ্য ভাবে স্পষ্ট।

এই সম্পর্কে আরেকটি ঘটনা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৫৬ সালের নভেম্বর মাসে ইমরে নাগিকে (Imre Nagy) পার্টির কিছু আভ্যন্তরীণ ব্যাপার "বাইরে পথে" নিয়ে যাবার জন্য নিন্দা করা হয়েছিল। কি বিষয় ইমরে নাগি পার্টির বাইরে নিয়ে গিয়েছিলেন? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রচারিত দলিলটি সম্পর্কে দাবি করা হয় যে "কমিউনিস্ট মহল সূত্রে প্রাপ্ত।" ইমরে নাগির নিন্দার সঙ্গে এর কোন সম্পর্কে ছিল কিনা? প্রশ্নের প্রাসঙ্গিকতা স্পষ্ট।

বিংশ পার্টি কংগ্রেসে স্তালিনের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ তাঁর ব্যক্তিপূজার চর্চার প্রতি অনুরাগ ও ক্ষমতা প্রিয়তা, শ্রেণী সংগ্রাম সম্পর্কে ভুল তত্ত্ব এবং পার্টি গণতন্ত্র ও সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাংবিধানিক আইন কানুন লঙ্ঘন ও অসংখ্য সোভিয়েত নাগরিককে নির্যাতন ও হত্যা ইত্যাদি অভিযোগের ও স্তালিন বিরোধী অভিযানে এসে স্তালিন বিরোধী একটি ভাবাদর্শ-গত সংগ্রামে বিকাশ লাভ করেছে। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ২২-তম পার্টি কংগ্রেসে তার একটি পর্যায় সম্পূর্ণ হয়েছে। একটি পর্যায় কারণ এই সংগ্রাম আরও চলবে তা সুস্পষ্ট।

বাবিংশ কংগ্রেসে স্তালিনের শ্রেণী সংগ্রাম সম্পর্কে ভুল তত্ত্ব ছাড়াও মার্কসবাদ লেনিনবাদী ভাবাদর্শের বিচারে স্তালিনের ভাবাদর্শগত আরও কতকগুলো ভ্রান্তি খুঁজে বার করা হয়। সেগুলি নিম্নরূপ—

(ক) স্তালিনের ব্যক্তিপূজা প্রীতির পরিণতি হিসাবে পার্টির ক্ষেত্রে সোভিয়েত রাষ্ট্রিক কাজকর্মের ক্ষেত্রে এবং সমাজ বিজ্ঞান সংক্রান্ত কাজের ক্ষেত্রে অনিষ্টকর পরিণামের উদ্ভব হয়।

(খ) বৈপ্লবিক তত্ত্ববিকাশের ক্ষেত্রে স্তালিন যে একচেটিয়া অধিকার দাবি করছেন, তত্ত্বের ব্যাপারে শেষ কথা বলার যে অধিকার তিনি নিজের জন্য আত্মসাৎ করেছিলেন এবং তত্ত্বগত সমস্যাকে প্রশাসনিক পদ্ধতির সাহায্যে সমাধানের জন্য তাঁর যে কামনা ছিল, তাতে সামাজিক বিচারের বিকাশ গুরুতর ভাবে বাধাপ্রাপ্ত হত ও শৃঙ্খলিত থাকত। মার্ক্স, এঙ্গেলস, লেনিনের মহান তাত্ত্বিক উত্তরাধিকার ও আমাদের সমগ্র পার্টির তত্ত্বগত কাজকর্মকে ছোট করে দেখছেন। স্তালিনকে বড় করে দেখাবার জন্য তাঁর কাজ, প্রবন্ধ, বক্তব্যকে এমনটি হয় না "ঐতিহাসিক" ইত্যাদি শব্দ দ্বারা প্রশংসা করা হোত, সেগুলি তার প্রাপ্য ছিল না।" ["উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সামাজিক বিজ্ঞান বিভাগের প্রধানদের সম্মেলনে সুসলভের রিপোর্ট" ইং নিউজ এ্যাণ্ড ভিউজ ফ্রম দি সোভিয়েত ইউনিয়ন, ১৩ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৬২]

স্তালিন তত্ত্বগত দিক থেকে আর কী কী ভ্রান্তির দোষে দুষ্ট ছিলেন। সোভিয়েতের স্তালিন সমালোচক পণ্ডিতদের মতে দোষগুলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

(ক) সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বইটি কেবলমাত্র স্তালিনের চরিত্রের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং তাঁর সম্মান বিধানের জন্য ইতিহাসের ঘটনাবলীকে প্রায়ই খাপ খাওয়ান হয়েছে। অক্টোবর বিপ্লব, সাহচর্যুক্ত সমাজতন্ত্র নির্মাণের ইতিহাস বিবৃত করতে গুরুতর সব ভুল করা হোয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে যথাযথ বলা হয় নি; আর কতকগুলির

গুরুত্বকে খাটো করা হয়েছে এবং গুরুত্বের সকল কিছু প্রধানতঃ স্তালিনের ব্যক্তিকতার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।

(খ) দেশ রক্ষা পরিচালনায় লেনিন ও পার্টির ভূমিকাকে তুচ্ছ করে দেখান হয়েছে; এমন কি, সামরিক ঐতিহাসিক রাজিনের নিকট লেখা স্তালিনের সুবিখ্যাত চিঠিতে সামরিক তত্ত্ব ও সামরিক কৌশল বিকাশে লেনিনের যে ভূমিকা ছিল তাকে নাকি বেমালুম অস্বীকার করা হয়েছে। ঐতিহাসিক এম, এন, দোক্রাভস্কির বৈজ্ঞানিক উত্তরাধিকারের প্রতি ভুল মনোভাব নেওয়া হয়।

(গ) ডায়েলেকটিকাল ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সম্পর্কে বইটিতে—যেটিকে নাকি বৈজ্ঞানিক চিন্তার চরম উৎকর্ষ বলে বিবেচনা করা হোত, সে বই দার্শনিকদের বৈজ্ঞানিক চিন্তা এবং কাজকর্মকে ক্ষতিগ্রস্তই করেছিল।

(ঘ) স্তালিন Low of Negation of Negation সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন এবং সমাজতন্ত্রের আমলে উৎপাদিকা শক্তির প্রকৃতির সঙ্গে উৎপাদন সম্বন্ধের মিলনের প্রশ্নে ভুল ব্যাখ্যা দেন।

(ঙ) সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিজয়লাভের পরেও, শোষক শ্রেণীগুলির বিলুপ্ত হবার পরেও শ্রেণী সংগ্রাম তীব্রতর হবার ভুল থিসিস স্তালিন প্রবর্তন করেন।

(চ) অর্থনৈতিক বিজ্ঞানও পিছিয়ে পড়ে থাকে। Economic Problem of Socialism in the U. S. S. R. বইটিতে সমাজতন্ত্রে পণ্য উৎপাদন ও মূল্যের নিয়ম সম্পর্কিত প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে ব্যর্থ হন। জাতীয় অর্থনীতিকে পণ্য-মুদ্রা সম্পর্ক ব্যবহারের সম্ভাবনাকে ছোট করে দেখা হয়, যৌথ কৃষি সম্পত্তি ও পণ্য সঞ্চালন ১৯৪২ সালেই উৎপাদিকা শক্তির অগ্রগতির পক্ষে বাধা হয়ে উঠছে বলে জোর দেওয়ার ভুল করেছিলেন স্তালিন। কার্যক্ষেত্রে এই তত্ত্ব সামগ্রিক ভাবে কৃষি উৎপাদন বিকাশ সম্পর্কিত সমস্যাবলীর সমাধানে। যৌথ কৃষির বিকাশকে অস্বীকার করা হয়। সমাজতন্ত্রের কমিউনিজমে রূপান্তরণের পথ সম্পর্কে স্তালিন ভুল ব্যাখ্যা দেন। [সূত্র—সুসলভের বক্তৃতা থেকে সোভিয়েত পার্টির বাবিংশ কংগ্রেস এবং সমাজ বিজ্ঞান প্রধানদের কর্তব্য। News & Views from the Soviet Union. Feb. 13.1962. Vol XXI. NOII.]

স্তালিনের কোন অবদান আছে কী? মার্ক্সবাদ লেনিনবাদ বিকাশে স্তালিনের কোন সৃজনশীল ভূমিকা আছে কী?

"অবশ্য জে. ভি. স্তালিনের রেকর্ডে পার্টি ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের জন্য কাজ ছিল; অন্যান্য ক্ষেত্রের মধ্যে তত্ত্বের ক্ষেত্রেও কাজ ছিল। সেইজন্য তাঁর সমস্ত কাজকে ভুল বলে নাকচ করে দেওয়া কারুর পক্ষে উচিত নয়। তাঁর কাজের প্রতি সমালোচনামূলক মনোভাব নিতে হবে; বিশেষভাবে তাঁর শেষ জীবনের কাজের প্রতি, যখন তিনি নিজেকে পার্টি জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিলেন, নিজেকে তত্ত্বের ব্যাপারে বিধান দাতা বলে বিবেচনা করতেন, তখন তিনি অনেক তত্ত্বগতভুল করেছিলেন, এবং মার্ক্সবাদী লেনিনবাদ তত্ত্ববিকাশে গুরুতর ক্ষতিসাধন করেছিলেন। [সুসলভের রিপোর্ট ঐ]

তাহলে স্তালিনের সমালোচকরা পার্টি ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের জন্য স্তালিনের অবদান সম্পূর্ণ নাকচ করে দেন নি। তাঁর শেষ জীবনের কাজ সম্পর্কেই তাঁর অভিযোগ। তাহলে স্তালিনের সমালোচনা করতে গিয়ে কেবলমাত্র "ভুলের" ফিরিস্তি উল্লেখ না করে তাঁর অবদানগুলির উল্লেখ করা হয় নি কেন?

বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের তাত্ত্বিক বিকাশের দিক থেকে লেনিন দেখান যে পুঁজিবাদী বেষ্টনী থাকতেও একটি দেশে সেখানে শ্রমিক শ্রেণী ক্ষমতা দখল করেছে সেখানে সমাজতন্ত্র নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ করা সম্ভবপর।

পরবর্তীকালে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের অভিজ্ঞতা এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে স্তালিন দেখান যে পুঁজিবাদী বেষ্টনী থাকা সত্ত্বেও একটি দেশের পক্ষে এককভাবে কমিউনিস্ট সমাজ নির্মাণের কাজে সাফল্যের সঙ্গে অগ্রসর হওয়াও সম্ভবপর।

সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি। অষ্টাদশ কংগ্রেসে ১০ই মার্চ, ১৯৩৯ প্রদত্ত কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্টে বলা হয়:—"আমরা কমিউনিজমের দিকে এগিয়ে চলেছি।"

[প্রবলেমস্ অব লেনিনিজম, ১৯৪৭ সালে করেন ল্যাঙ্গুয়েজ পাবলিশিং প্রকাশনী পৃঃ ৬৩৭]

রাষ্ট্রের প্রশ্ন নিঃসন্দেহে অন্যতম মূল ব্যবহারিক গুরুত্বসম্পন্ন প্রশ্ন। রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্ক্সীয় মতবাদে বলা হয়ে থাকে যে কমিউনিজমে রাষ্ট্র থাকবে না। সমাজ যত কমিউনিজমের দিকে অগ্রসর হবে ততই রাষ্ট্র "উবে" যেতে থাকবে।

রাষ্ট্র সম্পর্কে এই সাধারণতত্ত্বের কথা তুলে সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৯৩৮-৩৯ সালে সমাজতান্ত্রিক কর্তব্য সফলভাবে সমাধা হবার পর প্রশ্ন ওঠে, এখন কী সোভিয়েতে রাষ্ট্রতন্ত্র উঠিয়ে দেওয়া হবে না? অথবা তার মৃত্যু ঘটাবার ব্যবস্থা করা হবে না? অষ্টাদশ পার্টি কংগ্রেসে প্রদত্ত কেন্দ্রীয় কমিটি রিপোর্টে দেখান হয় যে সোভিয়েতের বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে যে কমিউনিজমের দিকে এগিয়ে চলার যুগেও রাষ্ট্র রাখতে হবে।"

এই রিপোর্টে দেখান হয় যে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিকাশের দ্বিতীয় স্তরে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিজয় সম্পূর্ণ হওয়া এবং নূতন সংবিধান গৃহীত হওয়ার পর রাষ্ট্রের পরিবর্তন ঘটেছিল। "দেশের অভ্যন্তরে সামরিক দমনমূলক কাজ শেষ হয়ে গেছে, তার মৃত্যু ঘটেছে। কারণ শোষণের উৎখাত হয়ে গেছে; দেশের আর কোন শোষক অবশিষ্ট নেই এবং তাই কাউকে দমন করার কাজও নাই। এই দমনমূলক কাজের স্থান নিয়েছে নূতন কাজ: সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তিকে চোর ও জনগণের সম্পত্তিহরণকারীদের হাত থেকে রক্ষা করার কাজের দায়িত্ব বর্তিয়েছে রাষ্ট্রের উপর। বৈদেশিক আক্রমণের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার কাজ পুরোপুরি থেকে গেছে···। এখন দেশের ভেতরে আমাদের রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য থাকছে, শান্তিপূর্ণ অর্থনৈতিক সংগঠন এবং কৃষ্টিগত শিক্ষামূলক কাজ। আমাদের সেনাবাহিনীর, দমনের যন্ত্রগুলির এবং গোয়েন্দা বিভাগের নজর এখন আর দেশের অভ্যন্তরে দিকে নিবদ্ধ নেই, তা দেশের বাইরের দিকে বৈদেশিক শত্রুর দিকে নিবদ্ধ।" (অষ্টম পার্টি কংগ্রেসের রিপোর্ট এ পৃঃ ৬৩৭)

সমাজতন্ত্র গঠন করে সমাজ কমিউনিজমের দিকে অগ্রসর হবার যুগেও রাষ্ট্র রাখা দরকার হতে পারে এই সিদ্ধান্ত মার্ক্সবাদ লেনিনবাদ তত্ত্ববিকাশে নিশ্চই একটি নতুন অবদান।

বিশ্ব বিপ্লব বিকাশের পরিপ্রেক্ষিত এবং গতি পথ সম্পর্কে স্তালিন :

বিশ্ব বিপ্লব বিকাশের পক্ষে পরিপ্রেক্ষিতের প্রশ্ন খুবই জরুরী প্রশ্ন। পরিপ্রেক্ষিত স্বচ্ছ না থাকলে পথ চলতে অন্ধের মত হাতড়াতে এমন কি দিকভ্রষ্ট হবার বিপদ থাকে। সোভিয়েত বিপ্লবের পর বিশ্ব বিপ্লব বিকাশের সামনে পরিপ্রেক্ষিত কী দেখা দেয়। এ সম্পর্কে ১৯২৪ সালেই স্তালিন বলেন, "খুব সম্ভবতঃ বিশ্ব বিপ্লব বিকাশের পথে এক একটি পুঁজিবাদী দেশ পৃথক পৃথক ভাবে সাম্রাজ্যবাদীর একটি কেন্দ্র এবং এই দেশগুলির বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পাশাপাশি এক একটি সোভিয়েত ব্যবস্থা সম্বলিত দেশে পৃথক পৃথকভাবে সমাজতন্ত্রের কেন্দ্র, এবং এই দেশগুলির বিশ্বসমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সৃষ্টি হবে। এবং এই দুই বিশ্ব ব্যবস্থার মধ্যে সংগ্রামে বিশ্ব বিপ্লবের বিকাশের পাতা ভরে উঠবে।" [স্তালিন : অক্টোবর বিপ্লব ও রুশীয় কমিউনিস্টদের কর্মকৌশল। ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯২৪। লেনিনবাদের সমস্যাবলী. মস্কো করেন ল্যাঙ্গুয়েজ পাবলিশিং হাউস, ১৯৪৭ ; পৃঃ ১২২-১২৩]

আবার :—"এইভাবে বিশ্ব বিপ্লবের বিকাশে অগ্রগতির পথে দুইটি আন্তর্জাতিক কেন্দ্র গড়ে উঠবে : একটি সমাজতান্ত্রিক কেন্দ্র : এই সমাজতান্ত্রিক কেন্দ্র নিজের দিকে সমাজতন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট সকল সমস্ত দেশকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করবে ; আর একটি হবে পুঁজিতান্ত্রিক কেন্দ্র : এই কেন্দ্র পুঁজিতন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট সমস্ত দেশকে তার নিজের দিকে আকর্ষণ করবে। বিশ্ব আর্থনীতিক ব্যবস্থা বিজয়ের জন্য এই দুই কেন্দ্রের মধ্যে লড়াই সারা পৃথিবীতে পুঁজিতন্ত্র ও কমিউনিজমের ভাগ্য নির্ধারণ করবে, কারণ বিশ্ব পুঁজিতন্ত্রের চূড়ান্ত পরাজয়ের অর্থ হচ্ছে আন্তর্জাতিক আর্থনীতিক ব্যবস্থায় সমাজতন্ত্রের বিজয়।"

[স্তালিন : ১৯২৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন সফরকারী প্রথম আমেরিকান শ্রমিক প্রতিনিধিদলের সঙ্গে

১৯ সেপ্টেম্বর সাক্ষাৎকারকালে শ্রমিক প্রতিনিধিদলের ১২নং প্রশ্নের জবাবে : দুই ভল্যুম সংস্করণ লেনিনের সিলেকটেড ওয়ার্কস ১ম ভল্যুম পৃঃ ৪৩-৭৪]

স্তালিনের অবদান ও মূল্যায়ন

কমরেড স্তালিনের অবদানের যে কয়টি দিক আগে উল্লেখ করা হল নিঃসন্দেহ সেগুলি মার্ক্সবাদের বিকাশের ইতিহাসে সম্পূর্ণ নূতন জিনিষ। এক দিক থেকে তা ঐতিহাসিক বলে প্রশংসনীয় হওয়ার যোগ্যতা রাখে। এগুলি এজন্যও ঐতিহাসিক যে এই ধারণা ইতিহাসের গতিপথকেও প্রভাবিত করে। কারণ, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বেষ্টনী থাকা সত্ত্বেও একটি দেশে শ্রমিক শ্রেণী ক্ষমতা দখল করে সেই দেশে সমাজতন্ত্র নির্মাণ সম্পূর্ণ করতে পারে—এই ধারণা লেনিন দিয়ে যান। লেনিনের বিশ্ব বিপ্লবের তত্ত্বের আলোকে স্তালিনই প্রথম দেখান যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা—বেষ্টিত অবস্থা সত্ত্বেও একটি দেশ কমিউনিজম নির্মাণের দিকেও সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে যেতে পারে।

কমিউনিস্ট সমাজে পার্টির রাষ্ট্র থাকা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে সম্পর্কেও ঠিক এই কথা সমানভাবে প্রযোজ্য।

বিপ্লবের সংগ্রামে, বিশেষত বিশ্ব কমিউনিস্ট ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য পরিচালিত বিশ্ববিপ্লবের সংগ্রামের পক্ষে নির্ভুল পরিপ্রেক্ষিতের গুরুত্ব সম্পর্কে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। বিশ্ববিপ্লবের বিকাশের বাস্তব তথ্য আজ তর্কাতীতভাবে প্রমাণ করছে যে ১৯২৪ সালে কালের কুয়াশা ভেদ করে স্তালিনের দূরদৃষ্টি বিশ্ব বিপ্লব বিকাশের অগ্রগতির ধারার যে রূপরেখা তুলে ধরেছিল বিশ্ব বিপ্লব সেই ধারাতেই এগিয়ে এসেছে এবং আজও চলেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, আর সোভিয়েত ইউনিয়নকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা। বিশ্ব আর্থনীতিক ব্যবস্থা বিজয়ের জন্য এই দুই ব্যবস্থার মধ্যে সংগ্রামই দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তর যুগের ইতিহাসের পাতাগুলি ভরে তুলছে। আর যে দৃষ্টিতে এই পরিপ্রেক্ষিত ফুটে উঠে, সেই দূরদৃষ্টি তাঁরই হতে পারে সমাজ বিজ্ঞানে যার দখল অত্যন্ত গভীর।

জনগণতন্ত্রে প্রকৃতি নির্ধারণে স্তালিনের অবদান :

সকলেরই জানা আছে যে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তর যুগে ইওরোপে জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির আবির্ভাবের পর সেই রাষ্ট্রগুলির প্রকৃত চরিত্র নিরূপণ নিয়ে বিশ্ব-কমিউনিস্ট মহলে গভীর আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল। এবং সেদিন স্তালিনই সমগ্র পরিস্থিতি ও জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির অবস্থা বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে, জনগণতন্ত্রগুলি চলেছে নতুন যুগে নতুন পরিস্থিতিতে নতুন রূপে শ্রমিক একনায়কত্বের আবির্ভাব। এই সমস্ত রাষ্ট্রের পরবর্তী বিকাশের পক্ষে এই উপলব্ধির বৈপ্লবিক তাৎপর্যের গুরুত্ব যে কোন মার্ক্সবাদ লেনিনবাদীর কাছে বিশদভাবে বলা বাহুল্যমাত্র। এই সকল দেশের পার্টির পক্ষে সঠিক স্ট্র্যাটেজী (পরিপ্রেক্ষিত) ট্যাক্‌টিকস (কর্মকৌশল) নির্ধারণে তাঁদের রাষ্ট্রের চরিত্রের প্রকৃতি নির্ধারণ ছিল অত্যাবশ্যক শর্ত। এখানে ভুল হলে স্ট্র্যাটেজী ও কর্মকৌশলেও তাঁদের হত ভুল। আর স্তালিনই তার হাত থেকে জনগণতান্ত্রিক দেশের পার্টিগুলিকে রক্ষা করেন। স্তালিনের এই আন্তর্জাতিক গুরুত্বসম্পন্ন অবদান কী ঐতিহাসিক নয় ?

এইবার সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ যে সব সমালোচনা উপস্থিত করেছেন সেগুলির মূল্য বিচার করে দেখা যাক।

এই প্রসঙ্গে সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তার মার্ক্সবাদ লেনিনবাদ বিরোধী চরিত্র সম্পর্কে গোড়ার দিকেই বলা হয়েছে। মতবাদগত লড়াই চালাবার একটি পদ্ধতি মার্ক্স এঙ্গেলস লেনিনই প্রতিষ্ঠা করে গেছেন তাঁদের কাজের দ্বারা।

স্তালিনের বিরুদ্ধে সোভিয়েত পার্টির বর্তমান নেতৃবৃন্দ যে সমস্ত সমালোচনা তুলেছেন এইবার সেগুলির বিবেচনা করা যাক। আমরা প্রথমেই শ্রেণী সংগ্রাম সম্পর্কিত তত্ত্ব নিয়ে বিবেচনা করব। স্তালিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে যে তিনি নাকি এই মতবাদ পোষণ করতেন যে "সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিজয়লাভের পরেও শ্রেণীসংগ্রাম তীব্রতর হয়ে উঠতে থাকে।"

এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় যে স্তালিনের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ প্রকাশ করতে গিয়ে সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ

এখনও অবধি একথাটি জানান নি যে কখন এবং কোথায় স্তালিন উপরোক্ত মত প্রকাশ করেন। সমালোচনা করার মার্ক্সবাদ লেনিনবাদসম্মত পদ্ধতিই বটে! একজনের বিরুদ্ধে বিশেষতঃ অভিযোগের জবাব দিতে যিনি আজ উপস্থিত নেই, এমন লোকের সমালোচনা করতে গিয়ে লোককে সূত্রটি জানতে দিয়ে তাঁদের নিজস্ব বুদ্ধি বিবেচনা খাটাবার সুযোগ দেওয়া হয় নি।

অপর পক্ষে স্তালিনের অন্যরূপ অভিমত বিভিন্ন জায়গাতেই পাওয়া যায়। আমরা স্তালিনের কয়েকটি উদ্ধৃতি পাঠকদের বিচার বিবেচনার জন্য নীচে দিচ্ছি। উল্লেখযোগ্য যে স্তালিনের এই সকল বক্তব্য সে সময়েই যে সময় "স্তালিন-যুগ" সব চেয়ে "ঘৃণ্য" এবং "রক্তাক্ত যুগ" বলে চিত্রিত করা হচ্ছে :

"এইভাবে জাতীয় অর্থনীতির সমস্ত ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিজয় এখন একটি বাস্তব তথ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।" এর থেকে কী বোঝায়?

"এ থেকে বোঝায় যে মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের উচ্ছেদ করা হয়েছে, তার অবসান ঘটান হয়েছে, আর উৎপাদনের উপায়গুলির এবং যন্ত্রপাতির উপর সমাজতান্ত্রিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, এই সমাজতান্ত্রিক মালিকানা আমাদের সোভিয়েত সমাজের সুদৃঢ় বুনিয়াদ রূপে প্রতিষ্ঠিত।"

শ্রেণীকাঠামো সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয় :

"সংযুক্ত সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের আর্থনীতিক জীবনের এই সমস্ত পরিবর্তনের দরুণ সামগ্রস্যপূর্ণভাবে আমাদের সমাজের শ্রেণী কাঠামোও পরিবর্তন ঘটেছে।

* "এখন সমস্ত শোষকশ্রেণীর অবসান ঘটান হয়েছে।"

"এখন আছে শুধু শ্রমিক শ্রেণী আর আছে কৃষক-শ্রেণী আর আছে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়।"

কিন্তু এই সোভিয়েত শ্রমিক শ্রেণী, কৃষক শ্রেণী, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ও ছিল সম্পূর্ণ নতুন সামাজিক শ্রেণীসমূহ।

"একথা ভাবলে ভুল করা হবে যে এই সমস্ত সামাজিক শ্রেণীসমূহও এই সময়ের মধ্যে কোনও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায় নি। এ কথা ভাবা ভুল হবে যে তারা পুঁজিতন্ত্রের যুগে যেমন ছিল তেমনি থেকে গেছে।

"সোভিয়েতের শ্রমিক শ্রেণী শ্রেণী যুক্ত সম্পূর্ণ নতুন শ্রমিক শ্রেণী যা মানব জাতির ইতিহাসে এর আগে অজ্ঞাত ছিল। সোভিয়েতে কৃষকশ্রেণী যৌথ শ্রমের উপর বিকশিত যৌথ সম্পত্তির ভিত্তিতে গঠিত। আমাদের আর্থনীতিক ব্যবস্থায় কৃষক শ্রেণী এক সম্পূর্ণ নতুন কৃষক সমাজ।

"আমাদের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ও এক নতুন ধরণের মেহনতী বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় যা পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে এ পর্যন্ত দেখা যায় নি।"

শ্রেণী কাঠামোতে এই পরিবর্তনের তাৎপর্য কী ছিল?

"প্রথমতঃ এর তাৎপর্য হচ্ছে বিভিন্ন সামাজিক গ্রুপের পার্থক্য অবিচল ভাবে হ্রাস পাচ্ছে।"

"দ্বিতীয়তঃ এর তাৎপর্য হচ্ছে, এই সমস্ত সামাজিক গ্রুপের মধ্যে অর্থনৈতিক বিরোধ হ্রাস পাচ্ছে, মুছে যাচ্ছে। শেষ কথা তাদের মধ্যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বও হ্রাস পাচ্ছে, মুছে যাচ্ছে।" এই ভিত্তিতেই প্রবর্তিত হল নূতন সংবিধান।

"নূতন সংবিধানের খসড়া এই ভিত্তিতে গঠিত হয়েছে যে সমাজে পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন শ্রেণী আর নেই।" সমাজ দুইটি মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ শ্রেণী—শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক শ্রেণী নিয়ে গঠিত।"

এরই থেকে সংবিধানে গণতন্ত্রীকরণের প্রক্রিয়াকে আরও অগ্রসর করা হয়েছিল।

[সংযুক্ত সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রিপাব্লিকের অতিরিক্ত অষ্টম কংগ্রেসে (২৫শে নভেম্বর, ১৯৩৬) প্রদত্ত রিপোর্ট সংযুক্ত সোস্যালিস্ট সোভিয়েত রিপাব্লিকের খসড়া সংবিধান সম্পর্কিত রিপোর্ট।]

কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করতে হলে প্রাথমিক কর্তব্য ও দায়িত্ব হল সূত্রটি উপস্থিত করা। সোভিয়েতের বর্তমান নেতৃবৃন্দ তা করেন নি।"

---

* স্তালিন প্রসঙ্গে আর কোন আলোচনা আপাততঃ প্রকাশ করা হবে না। —সম্পাদক

প দ ধ্ব নি

● ব্রজেন সাহা

সপ্তম অধ্যায়

ছদ্মবেশী পলাতক এক বিপ্লবীর সঙ্গে অত্যন্ত আকস্মিকভাবে কৃষ্ণসুন্দরের যোগাযোগ স্থাপিত হয়ে গেল। তার ব্যক্তিগত জীবনে এই অলক্ষিত ঘটনাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, একথা কৃষ্ণসুন্দর দুই এক দিনের মধ্যেই বুঝতে পারলো। সাবালক হওয়ার আগে থেকেই কৃষ্ণসুন্দর সাধারণ দশজনের কাজ করে অভ্যস্ত। কিন্তু এতোদিন সে ছিল একটি ব্যক্তি মাত্র। আর এখন থেকে সে একটি দেশ-জোড়া শক্তিশালী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছে। এই সামান্য যোগাযোগটুকুর ফলে, কর্মী হিসাবে কৃষ্ণসুন্দর নিজেকে আরও বেশী উপযুক্ত বলে মনে করতে লাগলো। গভীর আত্মবিশ্বাস উপলব্ধি করল সে। গত তিন দিন সমানে কৃষ্ণসুন্দর নির্বিঘ্নভাবে আশেপাশের গ্রামগুলোতে গিয়ে গণ-সংযোগ করেছে। বিকেল বেলার আদালত থেকে ফিরে এসেই আবার বেরিয়ে পড়ে কৃষ্ণসুন্দর—আর বাড়ীতে ফিরে আসে গভীর রাত্রিতে।…

এদিকে নিবারণের মনের অবস্থাও ভাল নয়। তার অনিবার্য হঠাৎ কেমন গম্ভীর হয়ে উঠেছে। গত তিন দিন ধরে দুজনের মধ্যে কথাবার্তার প্রায় বন্ধ। এতোটা বাড়াবাড়ি নিবারণেরও ভাল লাগছিল না

সেদিন কি একটা উপলক্ষে স্কুল ও আদালতে ছিল ছুটির দিন। কৃষ্ণসুন্দর যথারীতি সকালে ঘুম থেকে উঠে বৈঠকখানা ঘরে ঢুকে গেল।

অনতিপরেই চা ও সকালের খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকলো নিবারণ। নিবারণ আজ একটু পরিপাটি করেই খাবার তৈরী করেছে। ঘি-মাখানো মুড়ি, ডিমের বড়া প্রভৃতি সুন্দর ভাবে প্লেটে সাজিয়ে এনে টেবিলের উপর রাখলো সে। তারপর সস্নেহে বলল—

—একটা কথা বলতে চাই।

—বল না।—কৃষ্ণসুন্দর হাসিমুখে বলল।

—বলছি, একবার যখন বোকামি করেই ফেলেছো—তার খেসারৎটা না দিয়ে উপায় কি?—নিবারণ বলল।

—খেসারৎ আবার কিসের?—কৃষ্ণসুন্দর কিছুটা চমকেই উঠল।

—ঐ যে, বড়-বাড়ীর ঐ মেয়েটার ফুট-ফরমাস যোগানো।—নিবারণ তার বিরক্তিকে চেষ্টা করেও চেপে রাখতে পারলো না।

—কি বলছো তুমি, নিবারণ দা। বেচারা পড়তে চাইছে—ওকে একটু সাহায্য করা—কৃষ্ণসুন্দর প্রতিবাদ জানিয়ে বলল।

—ঐ তো! ঐ কথাই বলছি—মুহূর্তের মধ্যে গলার স্বর মোলায়েম করে ফেলল নিবারণ—বলছিলাম কি, আজ যখন ছুটির দিন—কোনো কাজ নেই এ বেলা—গিয়ে বরং মাষ্টার ঠিক করে দিয়ে এলে হয় না? কথা যখন দিয়েই ফেলেছ।

—আমি সেদিন এ কথাই বলতে চেয়েছিলাম নিবারণদা। না বুঝেই হৈ-চৈ করে তুমি পাড়ার লোককে জানাচ্ছিলে।—কৃষ্ণসুন্দর বলল অনুযোগের সুরে।

—বুঝেছি, যাও। কথা যখন দিয়েছ—হাতাটা নিয়ে

যেয়ো কিন্তু। আর বেশী দেরী করো না।—বলে নিজের কাজে চলে গেল নিবারণ।

প্রাতঃরাশ শেষ করে কৃষ্ণসুন্দর বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লো। ছাতা মাথায় হাঁটতে হাঁটতে সোজা গিয়ে উঠলো জীবনগঞ্জ স্কুলের প্রধান শিক্ষক অতুল বাবুর বাড়ীতে। অতুলবাবু নিজের বৈঠকখানায় একাকী বসে, তখনো দৈনিক পত্রিকা দেখছেন এবং একমনে তামাক টানছেন। কৃষ্ণসুন্দরকে বৈঠকখানা ঘরে ঢুকতেই দেখেই তিনি বললেন—এসো? কেমন আছো? বসো—

প্রণাম জানিয়ে বসতে বসতে কৃষ্ণসুন্দর বলল—

—ভালোই আছি, মাস্টার মশাই! একটা বিশেষ প্রয়োজনে আপনার কাছে এসেছি।

—বল।

সুচারুকে পড়াবার প্রসঙ্গ উত্থাপন করলো কৃষ্ণসুন্দর। কথা শুনে মাস্টারমশাই এমন ভাবে তাকালেন তার দিকে যে, কৃষ্ণসুন্দরের মনে হলো—তিনি যেন খুব বিস্মিত হয়েছেন তার মুখে এই প্রসঙ্গ শুনে। কৈফিয়ৎ দেবার ভঙ্গীতে কৃষ্ণসুন্দর বলল—সুচারুর মা আমাকে বাড়ীতে ডেকে নিয়ে গিয়ে বিশেষ ভাবে বলেছেন। বেচারা ভালোভাবে পাশ করেও কলেজে পড়তে পাবে না। বাড়ীতে থেকেই পড়তে চায়।

—সে তো বুঝলুম, কৃষ্ণসুন্দর!—অতুলবাবু বেশ গম্ভীর ভাবে বললেন।—তুমি কি চাও যে, এই বুড়ো বয়সে আবার আমি বেগার খাটতে যাই?

—সেকি, মাস্টার মশাই?—কৃষ্ণসুন্দরও চমকে উঠলো অতুলবাবুর কথা শুনে।

—শোন তবে বলছি। অতুলবাবু আবার বলতে সুরু করলেন—টুনুর যে ভাইটি এখন ডাক্তারী পড়ছে, তাকে আমি পড়িয়েছি পুরো দেড় বছর। আমার প্রাপ্য সমস্ত টাকাই ওরা সুদ বাবদ কেটে নিয়েছে।...বেগার কিনা, বল?

লজ্জায় আর মুখ তুলে চাইতে পারলো না কৃষ্ণসুন্দর। কাদের পক্ষ হয়ে সে কথা বলতে এসেছে?... হাতের হুঁকোটা এক পাশে রেখে দিয়ে অতুলবাবু আরও বিক্ষোভ প্রকাশ করে বললেন—আমার পিতৃ-শ্রাদ্ধের সময় ওদের মেয়েরা থেকে কয়েক শ' টাকা ধার নিই। দলিলে সই দিয়ে এমন পাপচক্রের মধ্যে পড়ে গেছি যে আজ পর্যন্ত ঋণ মুক্ত হতে পারলাম না।

—আশ্চর্য!—কৃষ্ণসুন্দর বললো।

—আশ্চর্যই তো!...তবে শোনো। তুমি যখন এসেছ, আর টুনু যেহেতু আমার মেয়ের বন্ধু, আমি পড়াবো ওকে। ডাক্তার হোক্ একজন বেহেড্ছেলে লেখা পড়া শিখতে চায়—এ ব্যাপারে উদাসীন থাকতে পারবো না। তবে এবারে আমাকে প্রতি মাসের টাকা অগ্রিম দিতে হবে।—অতুলবাবু বললেন।

—মাস্টার মশাই! বিনা কারণে আপনি ক্ষুব্ধ হন নি। ...সুচারুর মাকে আমি একটা কথা দিয়ে ফেলেছি। দয়া করে আপনি রাজী হোন—এবারের টাকার জন্য আমি দায়ী থাকবো।—সবিনয়ে বলল কৃষ্ণসুন্দর।

—ওদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমার সম্পত্তিটা গ্রাস করা। সে কি বুঝি নি? তোমাকে বলছি গোপনে শোনো। তোমার বাবার মতো এতোটা সরল নই আমি। আমার সম্পত্তি,—স্থাবর-অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি, আমি বেনামী করে ফেলেছি। দেখি আমাকে ধরে কিসে!

অতুলবাবু বললেন।...চল যাবো। তুমি যখন আসতে পেরেছো—ওদের ঘরে—আমিও পড়াতে পারবো। চল।

অতুলবাবুকে সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণসুন্দর ঢুকলো সুচারুদের বাড়ীতে। দীর্ঘ ছয় বছর পর আবার আজ সে দ্বিতীয়বারের মতন বড় বাড়ীর পুরোনো অথচ চকচকে কটকটা পার হলো। আজ সে অনেকটা সহজ ভাবেই ভেতর বাড়ীতে মেয়েদের মহলে ঢুকলে পারলো। নিত্যর সাহায্যে সুচারুকে খুঁজে বার করে অতুলবাবুর বসবার ব্যবস্থা করলে কৃষ্ণসুন্দর। তারপর সুচারুকে মাস্টার মশায়ের কাছে বসিয়ে দিয়ে সে সরাসরি ঢুকলো চিন্তামণির ঘরে। অতুলবাবুর বিক্ষোভের কথা শান্ত ভাবে অথচ সবিস্তারে সে বলল চিন্তামণির কাছে। লজ্জায় সঙ্কোচে চিন্তামণির ইচ্ছা হলো—মাটির সঙ্গে মিশে

যেতে। মাটির দিকে চেয়েই তিনি আক্ষেপের সুরে বললেন—এর পরেও তিনি তোমার কথায় আবার এ বাড়ীতে পা দিয়েছেন?—আমি কি করি বলত? মেয়ে যে কি রকম ঘরে জন্ম নিয়েছে, সেটা একবার নিজে চিন্তা করে না? কেবল আমার অশান্তি বাড়ানো। কোন মুখে আমি আবার ভদ্রলোককে বলি যে আমার মেয়েকে পড়াবেন।

—না। তিনি পড়াতে রাজি হয়েছেন।—কৃষ্ণসুন্দর বলল।

—সে কি আমি বুঝি নি, কৃষ্ণসুন্দর! তোমার কথায় তিনি রাজী হয়েছেন বটে। কিন্তু এই অবস্থায় কেউ খুশী মনে পড়াতে পারে কি?—

…চল দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে, মাস্টার মশাই-এর কাছে আমি দু'টি কথা বলবো।—বললেন চিন্তামণি।

সুচারুকে ঘর থেকে সরিয়ে আনা হলো। তারপর চিন্তামণি মাথার কাপড়টা আরও একটু টেনে দিয়ে দরজা আড়াল করে বাইরে দাঁড়িয়ে ঘরের ভেতর উপবিষ্ট অতুলবাবুকে উদ্দেশ্য করে এবং কৃষ্ণসুন্দরকে সম্বোধন করে বললেন—কেষ্ট! আমার হয়ে তুমি মাস্টার মশাইকে বলো, সমস্ত ব্যাপারটার জন্যে আমি ক্ষমা চাইছি।

অপ্রস্তুত হয়ে অতুলবাবু বললেন—কি সম্বন্ধে; কেষ্ট?

চিন্তামণি আবার বললেন—মাস্টার মশাইকে বলো আমাকে ক্ষমা করতে। আমার প্রবাসী ছেলের অকল্যাণ হবে। এই তো সেদিন আমার বুক খালি করে একজন চলে গেল।—

—বলতে বলতে চিন্তামণির দু'চোখ বেয়ে ঝর্ ঝর্ করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

—কি ব্যাপার কেষ্ট?—বিব্রত অতুলবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন।

—সব কথাই আমি খুলে বলেছি, মাস্টার মশাই!—কৃষ্ণসুন্দর প্রত্যুত্তরে বলল।

—কেন তুমি ওসব কথা আবার বলতে গেলে?—বললেন অতুলবাবু। তারপর তিনি অন্তরালবর্তিনী চিন্তামণিকে লক্ষ্য করে বললেন—দয়া করে শুনুন আমার কথা। বিশ্বাস করুন। দুঃস্বপ্নের মধ্যেও কোনো দিন ছাত্রের অকল্যাণ কামনা করি না।—আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না।

আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে চিন্তামণি বললেন—আমি সে কথা বলিনি, কেষ্ট। পুত্র শোকে কাতর বলেই আমার মনে এসব কথাও জাগছে…মাস্টার মশাইকে বলো তুমি, সবটা টাকাই আমি পরিশোধ করে দেবো। আর টুনুর বেলায় আমি নিজে দায়ী রইলাম।

• •

সন্ধ্যা-আহ্নিক না করে নিষ্ঠাবান অতুলবাবু কোনো কিছু মুখে দেন না। কিন্তু কৃষ্ণসুন্দরকে কিছু না খাইয়ে ছেড়ে দিতে কিছুতেই রাজি হলেন না চিন্তামণি। কাজেই অতুলবাবু একাকী ফিরে গেলেন—আর কৃষ্ণসুন্দরকে বসতে হলো আরো খানিকক্ষণ।…

—থাক আমার বই-পত্র আনার সঙ্গে সঙ্গেই মাস্টার ঠিক হয়ে গেল। আপনাকে সত্যি ধন্যবাদ।—খুশীমনে হাসতে হাসতে বলল সুচারু।

—এরই মধ্যে বই-পত্র পেলে কোথায়? কৃষ্ণসুন্দর জিজ্ঞেস করলো।

—জ্যেঠা দা এরই জন্যে তাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন কলকাতা থেকে। আগেই বলে রেখেছিলাম কি না।—বললো সুচারু—তারপর সে আবার বলল—জানেন না, নতুন বই, নতুন বিষয় পড়তে, আমার কি আনন্দ।

—কাল থেকে তো নতুন-পড়া সুরু হবে তোমার। এইবার খুসী মনে পড়ো।—উৎসাহ দিয়ে বলল কৃষ্ণসুন্দর।

—হ্যাঁ! কাল থেকেই আমার নতুন জীবন সুরু হবে সত্যিকারের নতুন জীবন। কলেজের কোর্স পড়বো। লজিক, সিভিক্স এইসব বলতেও কত ভাল লাগছে! আপনাকে যে আমি কি বলে ধন্যবাদ জানাবো। রোজ পড়াশুনো করবার আগে, একবার করে প্রার্থনা করবো—ভগবান যেন আপনাকে জীবনসঙ্গের সত্যিকারের লীডার বানিয়ে দেন।—বলতে বলতে খিল-খিল করে হেসে উঠলো সুচারু। তারপর হঠাৎ সে প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে গম্ভীরভাবে বলল—আচ্ছা! সেদিন রাত্রিতে আপনি আর আপনার নিবারণ এমন কাঠের মতো দাঁড়িয়ে ছিলেন কেন, বলুন তো? একবার আমাদের পানসীতে উঠতে

দোষ ছিল কি? বেচারা দুর্গাদাসবাবু কত সাধা সাধি করলেন। নিবারণের কি রকম রুক্ষ রুক্ষ মেজাজ! লোকটা এতো ভাল গান গায়, অথচ এমন কাঠ-খোট্টা হলো কি করে!

নিবারণের পক্ষ সমর্থন করে কৃষ্ণসুন্দর বললো—নিবারণদা কিন্তু বলেছে সত্যি কথাই। বেচারাকে সত্যিই এতরাতে বাড়ী গিয়ে আবার ভাত রাঁধতে হয়েছে।

—কিন্তু আপনি এলেন না কেন? আমি আপনাকেও ওর সঙ্গে ভাত রাঁধতে হয়েছে। জানেন? দুর্গাদাসবাবু একটু মনক্ষুণ্ণ হয়েছেন। এতো ডাকা ডাকি করলেন ভদ্রলোক।···একটা জিনিষ সেদিন আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম। নিবারণের কথার উপর একটি কথাও আপনি বলতে পারলেন না।—হাসতে হাসতে বলল সুচারু।

—সেদিন তোমরা কতদূর গেছলে? কতো রাতে ফিরলো?

—কথার মোড় ঘুরাবার জন্য কৃষ্ণসুন্দর জিজ্ঞেস করল।

—নাঃ! বেশীদূর যাওয়া হলো না। মেঘনার মুখ অবধি গিয়েই ফিরে আসতে হলো। দুর্গাদাসবাবু আর এগোতে সাহস পেলেন না।···আচ্ছা, আপনিই বা সেদিন কোথায় গেছলেন?

—সুচারু জিজ্ঞেস করলো।

—তোমাদেরই মতন বর্ষার জল দেখতে—পূর্ণিমা রাতে বেড়াতে।

—হাসতে হাসতে বলল কৃষ্ণসুন্দর।

সুচারু বিশ্বাস করলো কৃষ্ণসুন্দরের কথা। খুসী হয়ে সে বলল—সত্যি! আমাদের জীবনগঞ্জ জায়গাটা কি সুন্দর বলুন তো। আমার তো আর কোথায় গিয়ে থাকতে ভালই লাগে না।—বললো সুচারু।

খানিকক্ষণ এমনি এলো মেলো আলোচনা চললো দু'জনের মধ্যে। তারপর ফিরে আসবার সময় হাসতে হাসতে বলল কৃষ্ণসুন্দর—এবার কিন্তু আমার দায়িত্ব শেষ হলো। পড়াশুনো তোমার ভালোই চলবে।

—তা বলে এ বাড়িতে আর আসবেন না আপনি?

—মাঝে মাঝে আসবেন, নিবারণের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে হাল্কা হাসিতে অনুযোগ জানিয়ে বললো সুচারু।

কৃষ্ণসুন্দর এবার গম্ভীর হয়ে উঠলো। প্রত্যুত্তরে আর কোনো কথা না বলেই সে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

অষ্টম অধ্যায়

নতুনভাবে পড়াশুনো সুরু করতে গিয়ে সুচারুর জীবনযাত্রা পদ্ধতিতে একটি নতুন শৃংখলাও প্রবর্তিত হলো। খুব সকালে ঘুম থেকে উঠতে হয় তাকে।

—বেলা সাড়ে ন'টা পর্যন্ত অতুলবাবু পড়ান। সকালের পড়াশুনো শেষ করেই সুচারু একবার যায় দুর্গাদাসবাবুর ঘরে।—খানিকক্ষণ সেখানে গল্প-গুজব করার পর স্নানের ঘাটে যায় সুচারু। খাওয়া দাওয়ার পর দুপুরে একটু গড়িয়ে নেয়—তারপর খানিকক্ষণ আবার বই নিয়ে বসে। সম্প্রতি নতুন একটা অভ্যাস দেখা দিয়েছে তার চরিত্রে। প্রায় প্রতিদিনই বিকেলের দিকে বেড়াতে বেরোয় সে। পাড়ার দুইটি সমবয়সী মেয়েকে সঙ্গিনী জুটিয়ে নিয়েছে সুচারু। ঠিক সন্ধ্যার সময় আবার বাড়ি ফিরে এসে গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়াশুনোয় বসে।

মেয়ের চাল-চলন দেখে বিস্মিত হন চিন্তামণি। একেকদিন তিনি বলেন নিত্যর কাছে—মেয়েটা আমার বড় বেশী স্বাধীনচেতা হয়ে যাচ্ছে।

সেদিনও সকালের পড়াশুনা শেষ করে, বই-পত্র গুছিয়ে রেখে, সুচারু দুর্গাদাসবাবুর ঘরে গেলেন। সেরেস্তার সংলগ্ন একটি ছোট ঘরে একলা বসেন দুর্গাদাস বাবু। একটি ভৃত্য সব সময় দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে। সুচারুকে ঘরে ঢুকতে দেখে দুর্গাদাসবাবু যথারীতি অভিনন্দন জানিয়ে বললেন—আসতে আজ্ঞা হউক, নতুন গিন্নি! তোমার কেষ্টঠাকুর যে এখনো এলেন না। কোথায় মুরলী বাজান তিনি, কে জানে!

গ্রাম-সম্পর্কে দুর্গাদাসবাবু সুচারু এবং কৃষ্ণসুন্দর উভয়েরই ঠাকুর্দা। এই সুবাদে তিনি দু'জনের সঙ্গেই রসিকতা করে থাকেন। আজকাল তিনি দু'জনকে মিলিয়ে রসিকতা করতে সুরু করেছেন। সুচারু তাই

প্রতিবাদ জানিয়ে বলল—কি যাতা বলছেন? আমার কোনো কেউটেরও নেই। কারো মুরোদী বাজানোর ধার ধারি না আমি। তারপর সে দুর্গাদাসবাবুকে সম্বোধন করে বলল—আপনার খবর সেখানে গিয়ে পৌঁছেছে কি না, তাই বা কে জানে। আপনার কাজের যা ঢং!

এই প্রসঙ্গে জীবনগঞ্জের গ্রাম্য দলাদলির কথা একটু বলতে হচ্ছে। সুচারুর যে মেজদাটি সম্প্রতি মারা গেছে, সে ছিল রাইমোহন পোদ্দারের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। নানা-রূপ সামাজিক ব্যাপারে দু'টি পরিবারের মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন প্রতিযোগিতা চলছে। এটা আসলে প্রভুত্বের লড়াই। প্রধানতঃ এই কারণেই রাইমোহন পোদ্দার সম্পর্কে সুচারু একটা তীব্র বিদ্বেষভাবে পোষণ করে থাকে। এই জন্যই সে দুর্গাদাসবাবুর সঙ্গে গ্রাম্য দলা-দলি বিষয়ে উৎসাহ নিয়ে আলোচনাও করে থাকে। মাঝে মাঝে সে দুর্গাদাসবাবুকে পরামর্শও দেয় আজকাল। আজ তারই পরামর্শে কৃষ্ণসুন্দরকে দুর্গাদাসবাবুর সেরেস্তায় আসতে সংবাদ দেওয়া হয়েছে। একটা জরুরী বিষয়ে গোপন পরামর্শ আছে আজ।

দেওয়ালে টাঙানো ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন দুর্গাদাসবাবু—খবর পেয়েছে ঠিকই! ওর মতো মানুষের তো ঠিক সময় মতো ঘড়ির কাঁটার কাঁটায় চলা উচিত। এরা হচ্ছে, নবযুগের সব 'লীডার'।...

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সুচারু জানালা দিয়ে পথের দিকে তাকিয়ে দেখছিল। হঠাৎ সে শান্ত কণ্ঠে মৃদু হাস্যে বলল—তিনি না এসে পারেন না। ঐ যে—আসছেন—'নবযুগের লীডার'।

কৃষ্ণসুন্দর ঘরে ঢুকতেই দুর্গাদাসবাবু উৎফুল্ল হয়ে বললেন—এই যে, এসো—এসো—জীবনগঞ্জের পার্থ। নতুনগিন্নি তোমাকে পার্থ বলেন—আর আমাকে বলেন, পার্থ-সারথি।...দেখা পড়া শিখলে মেয়েদেরও কি রকম বুদ্ধি হয় দেখো।

—মিছে কথা বলবেন না ধরা করে। ঐসব নামকরণ আপনি নিজেই বার করেছেন।...আর মেয়েদের বুদ্ধি আপনাদের চাইতে অনেক বেশী, মনে রাখবেন।

—প্রতিবাদ জানিয়ে সুচারু বলল।

—ঐ হলো। তোমার মনের কথাটাই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়েছে, নতুনগিন্নি। দুর্গাদাসবাবু মৃদু উচ্চ-হাস্য করে বললেন।

—আবার ঐ কথা! আমি থাকবোনা কিন্তু এ ঘরে।

—'নতুনগিন্নি' কথাটায় আপত্তি জানিয়ে বললো সুচারু।

—কেন মিছিমিছি রাগ করছে, বল দেখি, কৃষ্ণসুন্দর।

'নতুনগিন্নি' কথাটার রকমারি অর্থ হতে পারে। আমি যদি বলি, নতুনগিন্নি মানে নতুন কালের গিন্নি, তাহলে কার কি আপত্তি থাকতে পারে? আমাদের কাল কি আর আছে?—তেমনি হাসতে হাসতে প্রবল উৎসাহ ভরে বললেন দুর্গাদাস বাবু।

তথাপি প্রবলতর আপত্তি জানিয়ে বলল সুচারু—কোনো বাজে কথার দরকার নেই এখন। কাজের কথায় আসুন। বেলা কম হয়নি।

ভৃত্যকে ডেকে এক ছিলিম তামাক দেবার নির্দেশ দিয়ে কৃষ্ণসুন্দরের দিকে ঘুরে বসে অনুচ্চ গলায় সানন্দে বললেন দুর্গাদাস বাবু—পোদ্দার মশাইকে জব্দ করবার মতো একটা সুযোগ পাওয়া গেছে—একেবারে সুবর্ণ সুযোগ! কৃষ্ণসুন্দর নীরবে তীক্ষ্ণ চোখে তাকালো দুর্গাদাসের দিকে। তিনি এবার ফিসফিস করে বললেন—দিন কয়েক আগে পোদ্দার মশাই আমাকে ডেকে, একখানি নাটকের বই দিয়ে বললেন—এটাকে অভিনয় করতে হবে। বইটি পাঠিয়েছেন পুলিশ সাহেব। প্রত্যেকটি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই নাটক যার যার এলাকায় অভিনয় করতে। মৃদু হেসে কৃষ্ণসুন্দর বলল—তারপর।

—আমি ভাবলাম,—দুর্গাদাসবাবু বলে চললেন—হঠাৎ পুলিশসাহেব এতো বড় নাট্য-রসিক হয়ে উঠলেন কেন? আমার তো পড়াশুনো করবার সময় নেই—তাই নাতনীকে দিলাম পড়তে। সে তো নাটক পড়ে একেবারে রেগে আগুন। বলল—জীবনগঞ্জের সমাজে এ নাটক কিছুতেই অভিনয় করা চলে না। ওরই কথায় তোমাকে খবর দিয়েছি।

—হুঁহুঁ!—সুচারু এবার আলোচনায় যোগ দিল—নাটকটি আগাগোড়া স্বদেশী আন্দোলনের কুৎসায় ভরা। আমি তো পড়ে অবাক! এই সেদিন মাত্র এখানে

মুকুন্দ দাসের যাত্রা হয়ে গেল। এ যেন তারই প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে।

সুচারুর কথা শুনে মনে মনে কৃষ্ণসুন্দর খুব পর নাই খুশী হলো। ধীর শান্ত ভাবে কৃষ্ণসুন্দর বলল—এ নাটকের খবর আমরা জানি। পাশের ইউনিয়ন থেকে যোগাড় করে আনিও পড়েছি বইটা। জীবনগঞ্জের অভিনেতাদের ব্যাপারটা জানিয়েও দেওয়া হয়েছে। কেবল আপনাকেই বলা হয় নি।···এটা একটা জঘন্য অপচেষ্টা!

—বুঝেছি! ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন দুর্গাদাসবাবু। আমাকে তোমরা এখনো বিশ্বাস করতে পারো না। তোমাদের ভাষায় আমি গ্রাম্য রাজনীতি করে থাকি।

—না না, তার জন্যে নয়।—কৃষ্ণসুন্দর তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলল—আপনি হচ্ছেন ইউনিয়ন বোর্ডের ভাইস প্রেসিডেণ্ট। বিশেষতঃ আপনি হলেন নাটকের রাজা। রাইমোহনবাবু আপনাকে না জানিয়ে পারবেন না, সে আমরা জানতাম।

—সে কথা ঠিক। আমাকে কেবল জানিয়েছে, তাই নয়। এই নাটকের মহড়ার জন্য উদ্যোগ নিতেও বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেছেন পোদ্দার মশাই। কিন্তু এখন কথা হচ্ছে এই ব্যাপারটাকে তাল গোল পাকিয়ে.—

—বুঝেছ?—প্রেসিডেণ্ট সাহেবকে জব্দ করা যায় কি করে? তিনি তো পুলিশসাহেবকে খুশী করে 'রায় সাহেব' হতে চান। তাগাদার পর তাগাদা দিচ্ছেন আমাকে। আমি এখন কি করি বলত?

—সোজা 'না' বলে দিন। বলুন, যে নাটকের নামে এসব অপপ্রচার চলবে না।—কৃষ্ণসুন্দর বলল।

শুষ্ক হাসি হেসে দুর্গাদাস বাবু বললেন—এতো খুব সরল সহজ পথের কথা বললে হে। তাহলে তুমি আর 'পলিটিশিয়ান' কিসের? নাটকটাতো শুরু করতে হবেই—তবেই পোদ্দার মশায়ের 'রায় সাহেব' হওয়ার পথে একটা কাঁটা পড়লো। দ্বিতীয়তঃ এই ব্যাপারটাকে সূত্র ধরে জীবনগঞ্জের মানুষের কাছে লোকটার স্বরূপটা প্রকাশ করে দিতে হবে।···সামনেই ইলেকশান—বুঝতে পারছো?

—ওরে বাবা! এতোটা তলিয়ে-বুঁচিয়ে চিন্তা করছেন আপনি!—কিছুটা বিস্মিত হয়ে বলল কৃষ্ণসুন্দর। সঙ্গে সঙ্গে সুচারুও দুর্গাদাস বাবুর দিকে চেয়ে হেসে উঠলো।

—হেসো না, টুনু।···আজ এই শর্মাই হয়তো জীবনগঞ্জের ইউনিয়নবোর্ডের প্রেসিডেণ্টের গদীতে।—আঙুল দিয়ে বুক ঠুকে বললেন দুর্গাদাস বাবু। তারপর তিনি কৃষ্ণসুন্দরের দিকে চেয়ে বললেন—বুঝলে, কেষ্টভায়া? গত ইলেকশানে যারা যারা মেম্বর হলো, আমি তাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ এবং উপবীতধারী ব্রাহ্মণ। টাকার জোরে আমাকে হটিয়ে দিল পোদ্দার মশাই। সব কয়টা মেম্বরের মাথা কিনে নিল সে! এবার আমি এমন লোক চাই বোর্ডের মধ্যে যারা টাকার কাছে মাথা নোয়াবে না। আমার কুরুক্ষেত্র মহাসমরে তুমি হচ্ছো আমার পার্থ আর আমি পার্থসারথি।—দুর্গাদাস বাবু প্রাণ খুলে কথা বলে নিজের মনের দুঃখটা কিছু লাঘব করলেন। কৃষ্ণসুন্দরকে নিরুত্তর দেখে সুচারু সহাস্যে বলল—শুনুন, ওর মনের কথাটা আমি খুলে বলছি।···কেমন বলবো তো?

—দুর্গাদাস বাবুর অনুমতি চাইলো সুচারু।

—হ্যাঁ, হাঁ, তুমিই বলো। ঘাড় নেড়ে বললেন দুর্গাদাস বাবু।

—অর্থাৎ! সুচারু আরম্ভ করলো—তিনি আপাততঃ রাইমোহনদার দলে প্রকাশ্য বিরোধিতায় যেতে চান না। তিনি থাকবেন আড়ালে—আর আপনি সামনে থেকে, আপনার দলবল নিয়ে।···

—সংগ্রাম পরিচালনা করবেন। সুচারুর অসমাপ্ত কথার সঙ্গে দুর্গাদাস বাবু যোগ করে দিলেন।—অর্থাৎ তুমিই আমার পার্থ।

লঘুভাবে হাসতে হাসতে কৃষ্ণসুন্দর বলল—অর্থাৎ আমাকে আপনারা একটি কলের পুতুল বানাতে চান?

—না না না! রাখে গোবিন্দ বল! তুমি তোমার ব্যক্তিত্ব নিয়েই কাজ করবে—যেমন এখনো কাজ করে যাচ্ছো। কেবল গোপনে গোপনে, আমার সঙ্গে সদা-সর্বদা যোগাযোগ রাখবে। এই হচ্ছে কথা—দুর্গাদাস বাবু বুঝিয়ে বললেন। তারপর তিনি সুচারুকে

উপরোধের সুরে বললেন—টুনু! ভাই-ভাইদের জন্যে এক পেয়ালা চায়ের ব্যবস্থা কর না!

—নানা, ও বারো না। কোর্টে যাবার সময় হয়ে এসেছে।—আজ আমাকে রাইবোদেন পোদ্দারের বিরুদ্ধেই সওয়াল করতে হবে—বলল কৃষ্ণসুন্দর।

—তাহলে একটা মত দেখিয়ে দিয়ে যাও। শয়তানকে জব্দ করবার এই সুযোগ একবার যখন পাওয়া গেছে কিছুতেই নষ্ট করা যায় না। ব্যাকুলভাবে বললেন দুর্গাদাস বাবু।

—একটা কিছু বলুন আপনি। সুচারুও বলল।

রাত্রিকরণ পর্যন্ত আলোচনা চললো সেদিন। সুচারুও উৎসাহভরে আলোচনায় যোগ দিল। বিচার বিশ্লেষণের পর ঠিক হলো যে, জীবনপঞ্জের বিভিন্ন পাড়ার যাবতীয় নাট্যরসিকদের নিয়ে এক সভার আয়োজন করা হবে। সেই সভায় দলবল নিয়ে কৃষ্ণসুন্দর যোগ দিবে।

নাটকের বিষয় সম্পর্কে বিতর্কের পর, উপস্থিত সকলের মতামত জানতে চাওয়া হবে—দেখা যাক কি হয়?

আলোচনার শেষে সুচারুকে প্রশংসা করে কৃষ্ণসুন্দর বললো—এসব ব্যাপারে দেখছি, তোমারও বেশ মাথা খেলে।

গদগদ কণ্ঠে দুর্গাদাস বাবু বললেন—দেখো, কৃষ্ণসুন্দর! আমেকারদিন থাকলে, আমার এই নাতনীটি 'সুলতানা রিজিয়া' হতে পারতো। ওর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেখে মাঝে মাঝে আমি পর্যন্ত হিংসিমু খেয়ে যাই।—বলতে বলতে দুর্গাদাস বাবু পরম তৃপ্তিভরে হাসলেন।

• •

কৃষ্ণসুন্দর চলে যেতেই বিজয়গর্বে সুচারু বললো—কেমন বুড়ো! আমার বুদ্ধিতে কাজ হলো কিনা?—ছেলেমানুষ বলে তো উড়িয়ে দিয়েছিলেন আমার কথা।

—না না, খুব কাজ হয়েছে, নতুনগিন্নি। ঘাড় কাৎ করে মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন দুর্গাদাস বাবু।

—আবার রাতে কথা! বুড়ো কোথাকার!—সুচারু কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করে বলল।

—আমাকে 'বুড়ো' বললে, আমি 'নতুনগিন্নি' ডাকবোই।

—বললেন দুর্গাদাস বাবু।

এমন সময় দরজায় দাঁড়িয়ে চাপা গলায় ডাকলো নিতা—তোমাকে ডাকছেন, টুনু।

—কে?—চমকিত হয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল সুচারু।

—কে আবার? কর্তামণী ডাকছেন।—এসো—নিতা বলল।

চিন্তামণি অনেকক্ষণ ধরে সুচারুর জন্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন। সুচারু কাছে আসতেই তিনি বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন—তোর কি কোনো কাণ্ডজ্ঞানই নেই? কি হয়েছিল টুনু?

—কেন? কি করলাম আমি।—সুচারু প্রত্যুত্তরে বলল।

—আগে ঘরে এসো। অনেক কথা আছে আজ তোমার সঙ্গে। চল—উপরে চল।

দোতলায় উঠে—সুচারুকে নিয়ে চিন্তামণি মেয়ের ঘরে গিয়ে বললেন।

মেয়েকে মুখোমুখি বসিয়ে চিন্তামণি সরোষে বললেন—ম্যানেজার বাবুর ঘরে এতোক্ষণ তোর কি দরকার ছিল? আমি সারা বাড়ী খুঁজে হয়রান হচ্ছি।

মায়ের উগ্রমূর্তি দেখে সুচারু প্রমাদ গনলো। চিন্তামণির বুকের অবস্থা ভাল না—সামান্য উত্তেজিত হলেই বুক ধড়-ফড় করে তাঁর। মাকে শান্ত হওয়ার জন্য আবেদন জানিয়ে বলল সুচারু—এতো রাগ করছো কেন, মা? আমি আর যাবো না সেরেস্তা ঘরে।

—আমি কি তোকে সেরেস্তা ঘরে যাওয়ার জন্যে বকুনি দিচ্ছি? এতক্ষণ তুই কৃষ্ণসুন্দরের সঙ্গে ও-ঘরে বসে কি নিয়ে সলা-পরামর্শ করলি? বল—খুলে বল আমার কাছে।—চিন্তামণি তেমনি রুদ্ধ স্বরে দাবী জানালেন।

—দুর্গাদাস বাবুর সামনেই তো সব কথা হয়েছে, মা।—সুচারু ভয়ে ভয়ে বলল।

—সে আমি জানি। দুর্গাদাস বাবুকেও আমি জিজ্ঞেস করবো, তিনি কেন তোকে দলাদলির কথায় সব সময় টানেন? তিনি কি আর পরামর্শ করার লোক পান না? এতটা কাণ্ড জ্ঞান নেই তোর। সেরেস্তার ঘরে বসে, গ্রাম্য দলাদলি নিয়ে তুই সলা পরামর্শ করতে গেছিস বেটাছেলেদের সঙ্গে? বাইরে থেকে কেউ দেখলে, কি ভাববে? বললেন চিন্তামণি।

অপরাধীর মতো সুচারু বললো—আর এমন হবে না, মা। উত্তেজনা কিছুটা প্রশমিত হলে চিন্তামণি অপেক্ষাকৃত শান্ত গলায় বললেন—আজকাল তুই রোজই বিকেলে বেড়াতে যাস কেন? এখন বড় হোসনি?

—আর রাগ করো না, মা! আমি আর বেড়াতে যাবো না কোনদিন,—কোথাও যাবো না আর। দেখো তুমি। এবার তুমি শান্ত হও।

—আরও অনুনয় করে বলল সুচারু। মায়ের কথার উত্তরে অনেক কথাই বলবার ছিল সুচারুর। কিন্তু তার ভয়, পাছে বেশী রাগ হয়ে মা আবার মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়েন। মাঝে মাঝে মূর্চ্ছা যাওয়ার অভ্যাস আছে চিন্তামণির। তুমি শান্ত হও মা।

—সুচারু আবার বলল।

—কি করে শান্ত হবো বল? তুই নাকি রাস্তায়-ঘাটে, নদীর ধারে গাছতলায় যখন-তখন কৃষ্ণসুন্দরের সঙ্গে কথা বলিস।

—আরেকটি অভিযোগ জানিয়ে বললেন চিন্তামণি।

—কে বলল বলত? সুচারু জিজ্ঞেস করল।

—কেন, রাইমোহন এই মাত্র বলে গেলো আমার কাছে। সে প্রমাণ দিতে রাজি আছে।—বললেন চিন্তামণি।

—তিনি কখন এলেন? জিজ্ঞেস করলো সুচারু।

—এইমাত্র গেল আমার ঘর থেকে। ভাগ্যিস সে আজ পেছনের দরজা দিয়ে এসেছিল। যদি একবার তোকে সেরেস্তা ঘরে দেখতো সলা পরামর্শ করতে তাহলে কি কেলেঙ্কারীটাই না হতো আজ। আমি তাড়াতাড়ি ওকে পেছনের দরজা দিয়েই বার করে দিয়েছি।...

তোকে নিয়ে আমি এখন কি উপায় করি বল। আমি কি মরবো তোর জন্যে? মনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ নিটিয়ে কথা বললেন চিন্তামণি।

—তাহলে রাইমোহনদা দেখছি আমার পেছনে গোয়েন্দা লাগিয়েছেন।—বলল সুচারু।

—তা লাগিয়েছে। কিন্তু ওভাবে চলা ফেরা করবি কেন তুই? বল তো কম হয় নি—যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করেছো। আর কেন?—চিন্তামণি বললেন।

অভিযোগের সুরে সুচারু বললো—রাইমোহনদা আরেকটা কথা বলে যান নি মা। সে কথাটা আরো আগেই আমার বলা উচিত ছিল। তাহলে এত বকুনি আজ আমার ভাগ্যে জুটতো না।

—কি কথা?—চিন্তামণি সন্দিগ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন।

—ওর শালার কথা।···আমি রাস্তায় বেরোলেই তিনি আমার পিছু নেন। আমি তাই কৃষ্ণসুন্দরবাবুর সঙ্গে দেখা হলে বলি—ঐ দেখুন, লোকটা আজও আমার পেছনে পেছনে ঘুরছে।—এই ঘটনাটা সময় মতো তোমাকে না জানিয়ে আমি খুবই ভুল করেছি।—নম্রকণ্ঠে বলল সুচারু।

—ওটা একটা নচ্ছার ছেলে। বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন চিন্তামণি।—যা হোক, তোমার আর ঘন ঘন বাড়ীর বাইরে গিয়ে দরকার নেই। কৃষ্ণসুন্দরের সঙ্গে আর অত গল্প-পরামর্শ করেও কাজ নেই। এবার একটু দামলে চলো।···আচ্ছা, তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি টুনু। কৃষ্ণসুন্দরের সঙ্গে তোর এতো ঘনিষ্ঠতা হলো কি করে বলতো? ওর সঙ্গে তো গত ছ-বছর ধরে আমাদের দেখা সাক্ষাৎ নেই।

মায়ের ক্রোধ প্রশমিত হয়েছে দেখে ভরসা করে সুচারু এবার নিজের বক্তব্য বলতে সুরু করল। সে সবিনয়ে মাকে বলল—তুমি তো জানো মা, তিনি ছিলেন মেজদা এবং ছোড়দা দু'জনেরই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ওরা একসঙ্গে অনেক থিয়েটার করেছে—ক্লাব করেছেন।

—সে তো জানি। বললেন চিন্তামণি।

—ভরসা পেয়ে সুচারু আরও একটু এগিয়ে এসে বললো—তোমার মনে আছে?—ছেলে বেলায় আমি ছোড়দার সঙ্গে ক্লাবে গিয়ে ছোরা খেলা লাঠি খেলা শিখতাম।

—তারপর?—চিন্তামণি জিজ্ঞেস করলেন।

—সেই থেকেই তো ওর সঙ্গে আমার পরিচয়।—সুচারু বলল। তারপর সে অনুযোগ জানিয়ে বলল—রাইমোহনদার কথায় রাগ করে আজ আমাকে বকলে তুমি। কৃষ্ণসুন্দরবাবু কেমন মানুষ তা তুমি জানো না, মা?

—শোন্ টুনু!—স্বাভাবিক গলায় স্নেহে বললেন চিন্তামণি—আগামী মাঘ ফাল্গুনে তোর বিয়ে হবেই। একটা মাস একটু পা বেঁটে করে চলতেই হবে তোকে।—এই নিয়ম।

—আমাকে আরো কিছুদিন পড়তে দাও, মা।—প্রবল আপত্তি জানিয়ে বলল সুচারু।

—পাগলামি করিস না, টুনু।—চিন্তামণি বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করলেন—আমার চেয়ে বেশী বুঝবার চেষ্টা করিস না। আমি চাই তোর আরো পড়াশুনা হোক। বাপের ঘরে থেকে যা হবার তার বেশী হয়েছে। আমি তোকে এমন ঘর বর দেখে দোবো, যাতে বিয়ের পরেই বরং তোর পড়াশুনার পথ খুলে যাবে।···যা এবার স্নান করগে যা।

মায়ের পেছনে পেছনে নীরবে সুচারু নীচে নেমে গেল।

নবম অধ্যায়

গত দু'টি বছর ধরে কৃষ্ণসুন্দর অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করেছে। উকালতি ব্যবসায়ে সুনাম অর্জন করবার জন্য সে চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেনি। তার উপর জীবনগঞ্জে এসে অবধি, যাবতীয় সামাজিক কাজ-কর্মে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছে সে। অতএব গত দু'বছর ধরে পরিপূর্ণ বিশ্রাম বলতে যা বুঝায়, কৃষ্ণসুন্দর তা একদিনের জন্যও উপভোগ করতে পারেনি।

বিগত কয়েকটি দিন ধরে কৃষ্ণসুন্দর পরিপূর্ণ বিশ্রাম ভোগ করছে—দীর্ঘদিনের মধ্যে কর্মবিহীন জীবনের অভিজ্ঞতা এই প্রথম। আর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই কৃষ্ণসুন্দর কলকাতায় যাবে—পরীক্ষা দিতে।

তাই নিজের হাতের যাবতীয় মামলার দায়িত্ব কয়েকজন অল্পবয়সী সহকর্মীর মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দিয়েছে সে। মাত্র সোনাচন্ডের মহেন্দ্রের মামলাটা এখনো তার হাতেই রয়ে গেছে। অতএব নিয়মিত কোর্টে যাওয়ার তাগিদ নেই আজ কদিন ধরে। একটিমাত্র গুরুত্বপূর্ণ কাজ সুসম্পন্ন করা এখনো বাকি। পলাতক বিপ্লবী দরবেশের কাছে সে কথা দিয়েছে যে, কলকাতা রওনার আগেই স্থানীয় কৃষক-সংগঠন গড়ে তোলার প্রাথমিক কাজগুলো সমাধা করে যাবে। সে কাজ এখনো সুরু করাই যায়নি। গত তিনদিন ধরে শ্রাবণের অশ্রান্ত বর্ষণ সুরু হয়েছে। ভরা বর্ষার অবিরল ধারা সাত-আট দিন স্থায়ী হয়। এই প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে কৃষক এলাকায় গিয়ে কোনো কাজ হবে না। আজ তিন দিন ধরে তাই, কৃষ্ণসুন্দরের জীবনে দীর্ঘ দিন পর, একটি বিশ্রামের পর্ব চলছে।

এই কদিন ধরে ঘর-বন্দী অবস্থায়—একাকী শুয়ে—বসে বা ঘরময় পায়চারি করতে করতে, কৃষ্ণসুন্দর খানিক পড়াশুনা করেছে। আগামী পরীক্ষায় যাতে মোটামুটি ভালভাবে পাশ করতে পারে।

শ্রাবণের ধারার আজ চতুর্থদিন। সকাল বেলায় চা খেতে বসে কৃষ্ণসুন্দর জানালার ফাঁক দিয়ে একবার বাইরের দিকে তাকালো। সেদিনের আকাশটা যেন লুকোচুরি খেলছে মানুষের সঙ্গে। মাঝে মাঝে ঝম্-ঝম্ করে চারদিকে ছড়িয়ে বৃষ্টি পড়তে সুরু করে। মিনিট পনেরো বড় বড় ফোঁটার প্রবল বর্ষণের পর—হঠাৎ যেন যাদুবলে ভরা বর্ষা দুরদিগন্তে মিলিয়ে যায়। খানিকক্ষণ পর ঝম্-ঝম্ শব্দে গগন বিদারী রুদ্রদুন্দুভি বাজিয়ে কালো মেঘের প্রবল বর্ষণ আবার সুরু হয়।

আজ আর ঘরের মধ্যে কৃষ্ণসুন্দরের মন টিকছিল না। দিনরাত মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করা যার অভ্যাস, তার পক্ষে একটানা তিনদিন ঘরে বসে থাকা—একটা শাস্তি বিশেষ।

নিবারণকে ডেকে কৃষ্ণসুন্দর জিজ্ঞেস করল—নিবারণদা, আজ বেরোনো যাবে?

অভিজ্ঞ আবহাওয়া-তত্ত্ববিদের মতো আকাশের চারিটি কোণ গভীর মনোযোগের সঙ্গে পরীক্ষা করে, মাথা নাড়তে নাড়তে নিবারণ বলল—না। আকাশের আক্রোশ মেটেনি।…চুপ করে ঘরেই বসে থাকো। …আজ খিচুরি চাপাই, কি বল?

সেই সময় কদম তলার ঘাটে একটা ছোট ডিঙি এসে লাগলো। ডিঙির ভেতর থেকে তারস্বরে ডাকতে আরম্ভ করলেন দুর্গাদাসবাবু—উকীলবাবু বাড়ী আছো নাকি!…ও কৃষ্ণসুন্দর—

দরজা খুলে ঘাটের দিকে তাকিয়ে কৃষ্ণসুন্দর ডাকলো—আসুন। ছাতা নিয়ে উঠে আসুন।

—আমি বুড়ো মানুষ। আমাকে আর কষ্ট দিও না। ছাতা নিয়ে তুমিই চলে এসো—জরুরী কথা আছে বলেই ঝড়-বাদলের মধ্যে ছুটে এসেছি।—চলে এসো—দুর্গাদাসবাবু তেমনি ভাবে বললেন।

ছাতা মাথায় দিয়ে কৃষ্ণসুন্দর অগত্যা গেল কদম-তলার ঘাটে। স্বাগত-সম্ভাষণ জানাতে জানাতে বললেন দুর্গাদাসবাবু—কদমতলার কালেই কেষ্ট ঠাকুরের দয়া। যোগাযোগটা বেশ মানানসই হয়েছে।…উঠে এসো—নৌকায় উঠে এসো।

তখনো টপ্-টপ্ করে বৃষ্টিধারা ঝরছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে একবার আবহাওয়ার গতিটা লক্ষ্য করে নিয়ে কৃষ্ণসুন্দর বলল—আপনি উঠে আসুন। ঘরে বসেই কথাবার্তা বলতে সুবিধে হবে।…আসুন।

—আরে—না না। আমি কি আমার নিজের কাজে এসেছি মনে কর? এই দুর্যোগের মধ্যে নিজের কাজে কে বেরোবে আজ? কাল রাত্রিতে সেরেস্তা থেকে ফিরবার সময় স্বয়ং কর্তামা বলে দিয়েছেন—যে ভাবেই হোক আজ সকালে তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে—বিশেষ জরুরী কথা আছে তোমার সঙ্গে।

অদূরে বৈঠকখানা ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে নিবারণ এদের কথা কান পেতে শুনছিলো। এবার সে চীৎকার করে উঠলো—এই বাদলার দিনে বেরোনো চলবে না!

—থামো তুমি, নিবারণ!—দুর্গাদাসবাবু বিরক্ত হয়ে ধমক দিলেন নিবারণকে—তারপর বললেন—শোন হে, কেষ্ট! একটা বড়ো রকমের বিপদে পড়েছেন কর্তামা। তোমাকে যেতেই হবে। যার জন্যে কোন

লোক না পাঠিয়ে আমি নিজে এসেছি। উঠে এসো।

—ব্যাপার কি বলুন তো, বিপদ কিসের?—কৃষ্ণসুন্দর মাটিতে দাঁড়িয়ে থেকেই জিজ্ঞেস করলো।

—আমার কাছে খুলে বলেননি কিছুই। কিন্তু কথার ধরণেই আমি বুঝতে পেরেছি যে, একটা দাংঘাতিক কিছু ঘটেছে। চল একবার।

—উপরোধের সুরে বললেন দুর্গাদাসবাবু।

পলকাল মাত্র চিন্তা করল কৃষ্ণসুন্দর। তারপর সে দুর্গাদাসবাবুর নৌকায় উঠে ডাক দিয়ে নিবারণকে বলল—নিবারণদা! একটু বেরোতেই হচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে নৌকা ভাসিয়ে দিল মাঝি। দরজায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিবারণ একাকী আপন মনে গজর-গজর করতে থাকলো!

*

কৃষ্ণসুন্দরকে ভিতর বাড়ীর দিকে পাঠিয়ে দিয়ে, দুর্গাদাসবাবু চলে গেলেন বৈঠকখানায়। বাড়ীর ভিতর ঢুকে, কৃষ্ণসুন্দর গেল চিন্তামণির ঘরের দিকে। চিন্তামণি তখন চুপ করে বসে—পাশেই নিত্য এবং সুচারু। তারাও নীরব। কৃষ্ণসুন্দরকে দেখেই তিনি মনমরা কণ্ঠে ডাকলেন—এসো, বাবা!

কৃষ্ণসুন্দর ঘরে ঢুকতেই সুচারু ঘর থেকে চলে গেল। কৃষ্ণসুন্দর চিন্তামণির কাছাকাছি গিয়ে বসে বলল—কী, মামীমা?

চিন্তামণি প্রায় কাঁদো-কাঁদো স্বরে বললেন—বাবারে! আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে।

চিন্তামণির অবস্থা দেখে কৃষ্ণসুন্দর চমকে উঠলো। কিশোর বয়সে এই পরিবারটির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা জন্মে। তারপর এক তিক্ত ঘটনা ও দীর্ঘদিনের ব্যবধান। এতদিন পর পরিণত বয়সে এই পরিবারটির সঙ্গে আবার সে মেলামেশা করতে সুরু করেছে। মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে এখনো সে এদের সঙ্গে সহজভাবে মিশতে পারছে না। তথাপি চিন্তামণির সম্বোধনের আন্তরিকতা কৃষ্ণসুন্দরের মনকে স্পর্শ না করে পারলোনা। আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে সে বলল—কি হয়েছে মামীমা? আপনি চোখের জল ফেলছেন?

চোখের জল মুছতে মুছতে চিন্তামণি কৃষ্ণসুন্দরের দিকে একখানি চিঠি এগিয়ে দিতে দিতে বললেন—পড়ে দেখো, বাবা। কাল সন্ধ্যায় ডাকে এসেছে। আমার কিশোরগঞ্জের বোনের চিঠি—পড়ে দেখো, কি সর্বনাশ।

কৃষ্ণসুন্দর মনে চিঠিখানি পড়তে সুরু করলো। চিঠির বক্তব্য বাস্তবিক ভয়াবহ। সপ্তাহ খানেক আগে একদিন দুপুর বেলা হঠাৎ হাজার-দুই মানুষের এক জনতা চিন্তামণির বোনদের বাড়ীর সামনে এসে জড়ো হয়। চিন্তামণির ভগ্নীপতি একজন বড়দরের মহাজন। জনতা দাবী করতে থাকে—ঘরের সমস্ত তামাকে বের করে দাও। এই ভাবে উত্তেজনা বাড়তে থাকে—এবং অবশেষে জনতা চীৎকার ধ্বনিতে আকাশ কাঁপিয়ে বাড়ীর ভেতর ঢুকে লুঠ-তরাজ সুরু করে দেয়। শেষ পর্যন্ত তারা বাড়ীর ঘরগুলোতে আগুন ধরিয়ে দিতে থাকে। তিন খণ্ড বাড়ীর তেরোখানি বড় বড় টিনের ঘর পুড়ে গেছে। একমাত্র পাকা-দালানটি কোনোও ক্রমে রক্ষা পেয়েছে। সংবাদ পেয়ে পরদিন বিরাট এক সশস্ত্র পুলিশ-বাহিনী নিয়ে স্বয়ং পুলিশ সাহেব এসে ঘটনাস্থলে পৌঁচেছেন। চারপাশের কয়েক পল্লীগুলোতে পুলিশ সর্বকিছু তছ্-নছ্ করছে। দলে দলে পুরুষগুলোকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। সরকার পক্ষ থেকে দমননীতি প্রয়োগ করা হচ্ছে চূড়ান্ত নির্মমতার সঙ্গে।

চিঠি পড়া শেষ করে কৃষ্ণসুন্দর অনেকক্ষণ পর্যন্ত কোনো কথা বললো না। ঘটনার গুরুত্ব চিন্তা করে সে নিজেও শঙ্কিত হয়ে উঠলো। এই ধরণের ঘটনা ঘটতে থাকলে, কৃষক আন্দোলন অচিরেই লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। বহুক্ষণ পর তার মুখ থেকে শুধু একটি কথাই বেরোলো—"সর্বনাশ"!

—তবু যে সবাই প্রাণে বাঁচতে পেরেছে, কৃষ্ণসুন্দর! চিন্তামণি আবার বলতে সুরু করলেন—এই আমার সাতপুরুষের ভাগ্যি। আমার ভগ্নীপতি বড়ো বদমেজাজী মানুষ। অবিকল রাইমোহনের মতো। এক্কে মারে, ওক্কে ধরে—এই তার স্বভাব। কতবার কত বুঝিয়েছি আমি। কে শোনে কার কথা। কথায় বলে—বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি।

আবার খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন চিন্তামণি। কৃষ্ণসুন্দরও কোনো মন্তব্য করলো না। অতঃপর

চিন্তামণি তেমনি ভয়ার্ত কণ্ঠে বললেন—বোনের তো সর্বনাশ হয়ে গেলোই। এদিকে আমার বাড়ীর অবস্থাও তো ভাল নয়, কৃষ্ণসুন্দর। গত সপ্তাহে পর পর তিনদিন রাত প্রায় দশটার পর—কারা যেন লম্বা লম্বা 'দরাপ্পা নৌকোয়' করে হৈ হুল্লোড় করতে করতে বাড়ীর সামনে এসে জটলা করে চলে গেল। বাড়ী বরাবর নদীর বাঁক খানটায় এসে থামে—আবার দক্ষিণদিকে খানিকদূর যায় আবার ফিরে আসে—এই ভাবে প্রায় তিন চার বার। ছাদের উপর থেকে আমি স্বচক্ষে দেখেছি। কিশোরগঞ্জের চিঠি পাওয়ার পর থেকে ভয়ে আমার হাত পা অবশ হয়ে আসছে।

—শেষে কোন দিকে গেলো?—জিজ্ঞেস করল কৃষ্ণসুন্দর।

—উত্তর দিকে? মনে হলো—ঐ বাঁকটা ঘুরে মেঘনায় গিয়ে পড়ল। বললেন চিন্তামণি—তারপর তিনি কৃষ্ণসুন্দরের দিকে সকাতরে চেয়ে বললেন—বাবারে! নদীর মুখে আমার বাড়ী। এমনিতে একবার ডাকাতি হয়ে গেছে এ বাড়ীতে—তখন আমি নতুন বৌ মাত্র। ...এখন দেশের যা অবস্থা! হঠাৎ যদি পঞ্চাশজন লোকও বাড়ীতে ঢেলে উঠে আসে—বুঝবে কে বল? দারোয়ান দিয়ে কি ডাকাত ঠেকানো যায়? গাঁয়ের লোকে যে আমাদের কোন চোখে, দেখে, তা কর্তারা বুঝতে না পারেন—কিন্তু আমি তো বুঝি?

—আপনি ভয় পেয়ে গেছেন, মাসীমা।—আশ্বাসের সুরে বলল কৃষ্ণসুন্দর।

—ভয়?—চিন্তামণি আবার সুরু করলেন—কিশোরগঞ্জের চিঠি পাওয়ার পর থেকে আমার আর বুকে জল নেই। এই যে সারাটা জীবন কর্তাকে এতো করে বললাম—এভাবে লোকের সর্বনাশ করো না—কিছুতেই কান দিলেন না আমার কথায়। একটা কুকুরের ছেউ-ছেউকেও লোকে যতদূর মূল্য দেয়—এদের কাছে মানুষের ভালো কথায় ততদূর মূল্য নেই।

—শুনুন, মাসীমা! গ্রামের লোকের সহানুভূতি ছাড়া, এসব বিপদে কেউ বাঁচতে পারে না।—কৃষ্ণসুন্দর বলল।

—সে কি আমি জানি না?—ওদের খালি ভরসা পুলিশ। পুলিশ তো আসবে সর্বনাশ ঘটে যাওয়ার পর। আমার বোনের বাড়ীতেও এখন পুলিশ আসছে—সৈন্য আসছে—সবই আসছে। কিন্তু এখন এসে লাভটা কি হবে শুনি?...একবার চিন্তা করে দেখো, কৃষ্ণসুন্দর। কর্তা থাকেন না বাড়ীতে। বড়ো ছেলে ব্যবসা নিয়ে পড়ে আছে সহরে, ছোট ছেলে পড়ছে কলকাতায়। এই এতো বড়ো বাড়ীটাতে আমরা ক'জন প্রাণী থাকি? মাঝে মাঝে মনে হয়—এই রাক্ষুসে বাড়ীটা যেন আমাকে গ্রাস করতে আসছে। এমনিতেই ভয়ে মরি আমি।—তার উপর দেশের অবস্থা। মেয়েটাকে নিয়ে এ বাড়ীতে আমি থাকি কি করে বলত?—চিন্তামণি এক নিঃশ্বাসে এতগুলো কথা বলে পরিশ্রান্ত হয়ে হাঁপাতে লাগলেন।

—এতোটা ভয় পাবেন না আপনি, মাসীমা।—কৃষ্ণসুন্দর বলল চিন্তামণিকে আশ্বাস দিয়ে।

কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে চিন্তামণি বললেন সস্নেহে—এই কথাটাই আমি তোমার মুখে শুনতে চেয়েছিলাম, বাবা। তোমার ভাকে আজ জীবনগঞ্জের হাজার লাঠি বেরিয়ে আসবে—সে কথা আমি জানি। আমাকে তুমি ভরসা দাও, বাবা।

বলতে বলতে চিন্তামণি উঠে দাঁড়ালেন এবং জানালার ধারে গিয়ে, বাইরের দিকে চেয়ে দেখলেন, কাছাকাছি কেউ আছে কিনা। তারপর ফিরে এসে তিনি খাটের উপর কৃষ্ণসুন্দরের মুখোমুখি বসে, মুঠো করে তার হাত ধরে সকরুণ কণ্ঠে বলতে লাগলেন।—মনের একটা গভীর দুঃখের কথা আজ তোমাকে বলছি, কৃষ্ণসুন্দর। তোমার মা ছিলেন আমার সই! লাগালবন্দের স্নানে গিয়ে, গাছতলায় বসে ব্রহ্মপুত্রকে সাক্ষী রেখে আমরা সই পেতেছিলাম। আমার স্বামী এই সম্পর্কের মর্যাদা নষ্ট করে ফেললেন। মহাজনদের মতো অর্থপিশাচ আর হয় না।...বলতে বলতে চিন্তামণি চোখের জল ফেলতে লাগলেন।

শান্ত কণ্ঠে হাসি মুখেই বলল, কৃষ্ণসুন্দর—ও সব কথা থাক্, মাসীমা।

চোখের জল মুছতে মুছতে চিন্তামণি বললেন—তোমার বাবা ছিলেন সজ্জন—তুমি উচ্চ শিক্ষিত।

তোমার মুখে কথাই শোভা পায়, কৃষ্ণসুন্দর। কিন্তু আমি যে ভুলতে পারি না। তুমি যে আমার বাড়ীর চৌকাঠ মাড়াতে চাও না—এটাকি আমার কম দুঃখ!

চিন্তামণি উপলব্ধি করলেন যে, এই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গটা নিয়ে আর আলোচনা করা সঙ্গত হবে না। কৃষ্ণসুন্দরের হাত ছেড়ে দিয়ে তিনি আবার সোজা হয়ে বসলেন এবং পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে গিয়ে বললেন—আজ থেকে তাহলে কিছুটা নিশ্চিন্ত হলাম আমি, কৃষ্ণসুন্দর! এই বর্ষাকালটাতেই সব চাইতে ভয়। এই ক'টা দিন—তুমি অন্তত রোজ একবার করে সন্ধ্যে বেলাটায় এসে একটু খোঁজ-খবর নিয়ে যেও। তোমাকে দেখলে মনে অনেক ভরসা পাই আমি—বিশ্বাস করো।

চিন্তামণিকে সুস্পষ্টই ভরসা দিয়ে এবার কৃষ্ণসুন্দর বলল—আচ্ছা! আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না, মাসীমা। আমি সময় পেলেই এসে খোঁজ-খবর নেবো।

দশম অধ্যায়

কৃষ্ণসুন্দরের সঙ্গে কাজের কথাটুকু শেষ হয়ে গেলে, চিন্তামণি ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আকাশের অবস্থাটা লক্ষ্য করলেন। শ্রাবণের ধারা তখনো অশ্রান্ত আবেগে বইছে—সেই সঙ্গে বাতাসও এলো-পাথারি মাতামাতি করছে।

দরজার দিক থেকে ফিরে এসে চিন্তামণি খানিকক্ষণ পর্যন্ত নীরবে কৃষ্ণসুন্দরের দিকে চেয়ে রইলেন—কি যেন ভাবলেন তিনি মনে মনে। তারপর তিনি সস্নেহ অনুনয়ের সুরে বললেন—একটা কথা রাখবে, কৃষ্ণসুন্দর?

ইতিমধ্যে কৃষ্ণসুন্দর একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলো। বিস্মিত হয়ে সে একথাই ভাবছিল—আবার সে অনিবার্য ভাবে এই পরিবারটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়ছে কেন? চিন্তামণির ডাকে তার অন্যমনস্কতা কেটে গেলে—সে বলল—কি বলবেন, মাসীমা?

কৃষ্ণসুন্দর যে একটু আনমনা হয়ে পড়েছে, এটা চিন্তামণি বুঝতে পারলেন। তাই তিনি মৃদু হেসে তেমনি সস্নেহ অনুরোধের সুরে আবার বললেন—মাসীমার একটা কথা রাখো আজ!

কৃষ্ণসুন্দর চোখ তুলে তাকাতেই তিনি বাধো-বাধো কণ্ঠে বললেন—এই বিষ্টি-বাদলের মধ্যে এখন আর বাড়ী যেয়োনা। এখানেই দুটি ডাল ভাত খাও।

চিন্তামণির প্রস্তাব শোনবার সঙ্গে সঙ্গেই কৃষ্ণসুন্দরের চোখ আনত হয়ে পড়লো। গত দু'বছর ধরে অনেকবার, বিভিন্ন পাল-পার্বণ উপলক্ষে এ বাড়ী থেকে তার কাছে সামাজিক আমন্ত্রণ গেছে। একবারও সে আসে নি এ বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। কিন্তু আজ চিন্তামণির এই 'ডাল-ভাতের' আমন্ত্রণ সে উপেক্ষা করতে পারলো না। কৃষ্ণসুন্দর বলল—আচ্ছা, মাসীমা। খাবো এখানে। কিন্তু বাড়ীতে নিবারণদার কাছে লোক পাঠাতে হবে যে! তা না হলে, লোকটা সারাদিন অভুক্ত থাকবে।

নিমেষের মধ্যে উৎফুল্ল হয়ে চিন্তামণি বললেন—সে আমি লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি।···তাহলে তুমি বসো।

টুনু—টুনু কইরে। চিন্তামণি ডাকাডাকি সুরু করলেন।

নিত্য এবং সুচারু পাশের ঘরেই এতক্ষণ গল্প করছিল। চিন্তামণির ডাক শুনে দু'জনেই ছুটে এল এ ঘরে।

সুচারুকে দেখেই চিন্তামণি সাগ্রহে বললেন—ওরে টুনু! কৃষ্ণসুন্দর আজ খাবে আমাদের বাড়ীতে। তুই যা—উপরের ঘরে গিয়ে কথাবার্তা বল ওর সঙ্গে। নিত্যকে দিয়ে চা পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি। যা—আয়রে নিত্য! রান্নাঘরে চল ঠাকুরকে একটু না দেখিয়ে দিলে চলবে না।···আয়!

চিন্তামণির এই আকস্মিক ভাবান্তর সুচারু এবং নিত্য, দু'জনের কাছেই অত্যন্ত নাটকীয় বলে মনে হলো। জিজ্ঞাসু চোখে সুচারু তাকালো মায়ের দিকে। চিন্তামণি আবার বললেন—কৃষ্ণসুন্দর এতক্ষণ বসবে কোথায়? তোর পড়ার ঘরে যা।

নিত্যকে নিয়ে চিন্তামণি রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন। চিন্তামণিকে দেখিয়ে সুচারু কৃষ্ণসুন্দরকে বলল—দেখেছেন? এক রাত্রির মধ্যে আমার মা'র চেহারা কেমন ভেঙ্গে গেছে? দুশ্চিন্তায় কাল সারা রাত, দু'চোখ আর একত্র করেন নি।·····আমি দেখছি, মানুষের অতিরিক্ত ধন-সম্পদ থাকাটাই একটা অভিশাপ।

সুচারুর মুখে দার্শনিকের মতন গুরু-গম্ভীর কথা

শুনে কৃষ্ণসুন্দর কেমন কৌতুক বোধ করলো। সুচারুর কথার পৃষ্ঠে কোনো কথা না বলে, কৃষ্ণসুন্দর নীরবে হাসলো মাত্র।

—আপনি হাসছেন কেন? দেখুন না—আমাদের বাড়ীতে একবার ডাকাতি হয়ে গেছে, মাসীমার সর্বনাশের কথাতো চিঠিতেই পড়লেন, আমাদের রাইমোহনদা, প্রাণের ভয়ে পাইক পেয়াদা সঙ্গে না নিয়ে বাড়ীর বাইরে যান না। আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে এমন আরো অনেক ঘটনার কথা শুনেছি আমি। কাজেই বিত্ত-সম্পদ থাকা অভিশাপ নয় তো কি? সারাটা জীবন যদি ভয়ে ভয়ে কাটাতে হয়—তবে মানুষ হয়ে বেঁচে লাভটা হলো কি?

সুচারুর চিন্তা জগতে পরিপক্কতার লক্ষণ দেখা দিয়েছে বুঝে, কৃষ্ণসুন্দর খুব খুশী হলো। কিশোর বয়সে সুচারুর কাছে সে কত সুন্দর সুন্দর গল্প বলতো। তার মুখে গল্প শুনতে ভারী ভালবাসতো সুচারু। সেই যে মেয়েটি একদিন রূপকথার রসগুল্প হয়ে থাকতো, আজ সে পরিণত মনের অধিকারী হচ্ছে। নিজের হাতে লাগানো চারাগাছে প্রথম ফুলের কুঁড়ি দেখতে পেলে, কার না আনন্দ হয়? খুশী হয়ে কৃষ্ণসুন্দর বলল—তাহলে তুমিও মানব-জীবনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ভাবতে শিখেছ? রূপকথার জগৎ থেকে এবারে মাটির পৃথিবীতে নেমে এসেছো।

কৃষ্ণসুন্দরের কথায় রূপকথার জগতের উল্লেখ শুনে সুচারুরও মনে পড়লো—শৈশবের প্রথম কৈশোরের, সেই সব দিনের স্মৃতি কথা। এমনি কত বর্ষার দিনে, তারা তিনটি ভাইবোন আর কৃষ্ণসুন্দর বন্ধ ঘরে বসে রূপকথার গল্প আস্বাদন করতো। কৃষ্ণসুন্দরই ছিল প্রধান গল্প-কথক। বেশী পড়াশুনা করতো সে—নিত্য-নতুন গল্প বলতে পারতো। আর জীবনগঞ্জের বিখ্যাত গল্প কথক নিবারণের শিষ্য ছিল কিশোর কৃষ্ণসুন্দর।···সে সব কথা মনে পড়লো সুচারুর। সে সকৌতুকে হাসতে হাসতে বলল—না। এখনো রূপকথার জগতেই বাস করছি। তবে আজকাল মাঝে মাঝে মাটিতে নেমে আসতে হচ্ছে।

···চলুন—উপরে চলুন।···ওখানেই চা পাঠাবেন, মা।

হাল্কা ভঙ্গীতে মৃদু হাসতে হাসতে লঘু পদক্ষেপে সুচারু আগে আগে চলল সিঁড়ি কোঠার দিকে—আর কৃষ্ণসুন্দর নীরবে তাকে অনুসরণ করতে লাগল।

কৃষ্ণসুন্দরের ব্যক্তিগত জীবন শূন্যতায় ভরা—পিতা ও জননীর জীবনের অতি শোচনীয় পরিণতির পর থেকে, তার বুকের ভেতর অবিশ্রান্তভাবে যে দহনজ্বালা শুরু হয়েছে, তার হাত থেকে সহজে নিস্তার নেই তার। দুঃসহ মানসিক তিক্ততাবোধই তার সদাহাস্য উৎফুল্ল চরিত্রকে অকালে গম্ভীর করে তুলেছে।··কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এই যে, গত কয়েকখানেক ধরে চিন্তামণি ও সুচারুর সঙ্গে আবার কতকটা আগের মতো মেলামেশা করতে শুরু করার পর থেকে, তার মনের উৎকট তিক্ততাবোধও যেন ক্রমশঃ তিরোহিত হয়ে যাচ্ছে। সিঁড়ি কোঠায় পা দিতে দিতে কৃষ্ণসুন্দরের মনে আবার সেই প্রশ্নটি জাগলো—তার এই নবলব্ধ অভিজ্ঞতা কি কোনো ভ্রান্তকতা বিভোর চিত্তের মিথ্যা উপলব্ধি—না এর কোনো বাস্তব ভিত্তি আছে তার জীবনে? আজ কদিন ধরে এই একটি মাত্র প্রশ্নই বারবার তার মনে জাগছে।

—একি! আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? ডান দিকে ঘুরে সিঁড়িতে উঠুন। আমাদের সিঁড়ি পথটাও ভুলে গেলেন নাকি! সকৌতুকে বলল সুচারু।

—তোমাদের সিঁড়ি-পথ বড় অন্ধকার!

—সাবধানে উঠতে উঠতে বলল কৃষ্ণসুন্দর।

—অনেকদিন আসেননি বলে চলতে আপনার অসুবিধে হচ্ছে।

—বললো সুচারু—তাছাড়া আজকের আকাশটাও কালো মেঘে ঢাকা।···আস্তে আস্তে উঠুন।

শ্রাবণের কালো মেঘে ভরা আকাশ তার সঞ্চিত জলভাণ্ডার যেন উজার করে ঢালছে আজ। সুচারুর কণ্ঠের আন্তরিকতাপূর্ণ সাদর আহ্বান কৃষ্ণসুন্দরের মনে পুঞ্জীভূত জীবনের তিক্ততারাশির অবশিষ্টাংশটুকু যেন নিমেষের মধ্যে শ্রাবণের ধারার মতোই একেবারে বিগলিত হয়ে পড়ল।···আশ্চর্য! বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে জীবনগঞ্জের এই বনিয়াদী অট্টালিকাটি তার অশেষ দুঃখের কারণ আবার এইখানেই যেন অবরুদ্ধ হয়ে আছে তার অপরিসীম আনন্দের উৎস।···কৃষ্ণসুন্দর নীরবে মাথা নত করে সাবধানে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল।

—একি ! দেখালে মাথা ঠুকবেন যে ! এবার বাঁ-দিকে ঘুরতে হবে। কিন্তু মনে নেই আপনার।···আজ ক'বছর পর, বলুন তো ? সুচারু হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলো।

—তা অনেক দিন পরই হবে। মাথা তুলে বলল কৃষ্ণসুন্দর।

—সাত বছর পর। সেই যে বি-এ পড়বার সময় একদিন সন্ধ্যেবেলায় দোতলার এই ঘরেই বসে, সেক্সপীয়রের গল্প বলেছিলেন ? মনে আছে আপনার ? সুচারু জিজ্ঞেস করলো।

—হ্যাঁ, মনে পড়ছে। তোমার মেজদাই সেদিন আদর নিয়েছিলেন।

—কৃষ্ণসুন্দর মৃদু হাসো বলল।

—মেজদার বিয়ের পরেই তো। ওর শ্বশুরবাড়ীর লোকরা ছিল এখানে। ঘর ভর্তি লোকের মধ্যে আপনি গল্প বললেন, সেদিনই আমি জীবনে প্রথম শেক্সপীয়রের গল্প শুনতে পাই। ভারী সুন্দর বলতেন আপনি। আজকাল কেমন গম্ভীর হয়ে উঠেছেন।···আবার চোচোট খাচ্ছেন যে।···আমাকে দেখে দেখে আসুন না ? অনর্গল কথা বলতে বলতে সুচারু সিঁড়ি বেয়ে অবলীলাক্রমে উঠতে থাকলো।

এইবার কৃষ্ণসুন্দর সুচারুকে লক্ষ্য করেই সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলো—এইখানটায় অন্ধকার আরো কিঞ্চিৎ ঘনীভূত। অন্ধকার সিঁড়ির পথে পথে গৌরবর্ণ দুখানি সুডৌল পায়ের গোড়ালি তাকে পথ দেখিয়ে উপরে তুলছে। লঘু পদক্ষেপের পদধ্বনিও শোনা যায় না।··· সুচারুর পরিধানে গাঢ় নীল রঙের চাকাই শাড়ী। শাড়ীর জমিনের ঘন নীল ও সিঁড়ি কোঠার আঁধারের সঙ্গে প্রায় মিশে গেছে। মাথার পেছন দিকের কালো চুলের খোঁপাটিও যেন অন্ধকারের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। সোনার অলঙ্কারে মণ্ডিত দু'খানি পরিপুষ্ট সুবর্ণ বাহু দেখা যায় মাত্র। কৃষ্ণসুন্দরের মনে হলো সে যেন কোনো রহস্য-লোকের দ্বার প্রান্তে এসে উপনীত হয়েছে।

—এবার ডান দিকে। আবার সুচারুর সহাস্য কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

—ও! বলে মাথা তুলে চাইতেই কৃষ্ণসুন্দর দেখলো—পাতলা অন্ধকারে তারুণ্য-মণ্ডিত চাপা-রঙের বুদ্ধিদীপ্ত মুখখানি যেন সকৌতুকে ফিরে দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু হাসছে। টানা টানা দুটি চোখের শুভ্র পর্দার উপর কালো কালো চোখের তারাগুলো কেমন যেন সপ্রতিভ সৌহার্দ্যের আবেদন করা বলে মনে হচ্ছে। বিভ্রান্ত ও বিহ্বলপ্রায় কৃষ্ণসুন্দর মনে মনে ভাবলো এ কি অদ্ভুত ? না মদিরা ?

—আসুন ! আর উঠতে হবে না। এই তো আমার পড়ার ঘর। আসুন।

শ্রাবণের ধারা তখন প্রবলতর বেগে ঝরছে—বায়ু বেগও কিঞ্চিৎ উগ্রতর। ঘরে পা দিয়েই সুচারু চীৎকার করে বলে উঠলো—এই রে, সর্বনাশ হয়েছে। বিছানাপত্র সব ভিজে গেল যে। ক্ষিপ্রহস্তে সুচারু দক্ষিণ দিকের জানালাটা বন্ধ করে দিল।

—ইস্ ! কি কাণ্ড দেখুন তো ? একটু আগেও পুব দিকে থেকে ঝাপটা আসছিল। এরই মধ্যে হাওয়ার গতি কেমন পাল্টে গেছে। তারপর সুচারু পুব দিকের জানালাটা খুলতে খুলতে মৃদুহাসো বলল—হাওয়ার স্বভাবটা আমার মায়ের মেজাজের মতো—কখন যে কোন দিকে মোড় ঘুরবে, কেউ বলতে পারবে না। মায়ের কথা ভাবতে ভাবতে সুচারু নিজে নিজেই হাসলো একবার।

পুব দিকের জানালা খুলতেই—ভরা নদীর ঊর্মি-মুখর জলরাশি নজরে পড়লো সুচারুর। ছোট নদীর ভরা বুকে বাতাসের ঝাপটায় ছোট ছোট ঢেউ কেন রাশি রাশি ছড়িয়ে নেচে নেচে বেড়াচ্ছে—তীরের ফলার মতো অজস্র বৃষ্টি ধারা তির্যক ভঙ্গীতে অবিশ্রান্ত আছড়ে করে রেখেছে—দূর দিগন্ত কুয়াশা জালের মতো অজস্র জল রেণুতে আবৃত, এই স্নিগ্ধ দৃশ্যটি ক্ষণিকের মধ্যে সুচারুর মনকে আকর্ষণ করে ফেলল। বিমুগ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলো সুচারু—দেখুন ! কি অপরূপ দৃশ্য !

জানালা বরাবর, সুচারু থেকে খানিকটা দূরে মেঝের উপর দাঁড়িয়ে কৃষ্ণসুন্দর তাকালো দূরে তরঙ্গ-নৃত্য চঞ্চল নদীবক্ষের দিকে। দূর থেকে ভারী সুন্দর দেখায় এই চিরচঞ্চলা ক্ষুব্ধ নদীটিকে। কৃষ্ণসুন্দরও

মুগ্ধ বিস্ময়ে নদীর দিকে তাকাতে তাকাতে বলল—সত্যি, অপরূপ! কলকাতায় প্রবাস কালে প্রতি বর্ষায় এই নদীটির কথা মনে পড়েছে।

—বর্ষা কেন? সব সময়ই এই নদীটা সুন্দর। একেক ঋতুতে এর একেকটা রূপ আছে—ভালো করে তাকালে বেশ বোঝা যায়।...নদীটাকে সব সময় দেখবার জন্যে আমি এ ঘরটা বেছে নিয়েছি।

—কি সুন্দর, নাম না দেওয়া নদী। বলল সুচারু।

—আজকাল কবিতা লেখো তো? ছোট বেলায় কিন্তু বেশ ছড়া তৈরী করতে পারতে তুমি। আমাদের প্রত্যেকের নামেই একটা করে ছড়া তৈরী করেছিলে।... এখন এই সুন্দর ঘরটিতে বসে পড়াশুনো করবে—আর কবিতা লিখবে। মন্দ হলো না কিন্তু। সুচারুর পড়াশুনার জন্য নির্বাচিত ঘরটিকে অভিনন্দন জানিয়ে বলল কৃষ্ণসুন্দর।

—বলুন! সুচারু বলল। কবিতা নয়। এই নদীর দিকে তাকালে বিশেষতঃ রাত্রিবেলায়, আমার কেমন আপনি আপনি ভাটিয়ালী গান লিখতে ইচ্ছে হয়। সত্যি বলছি।

—বাংলা দেশের নদীগুলোর বাঁকে বাঁকেই তো ভাটিয়ালী গানের জন্মস্থান। আমার বাবাও অনেকগুলো ভাটিয়ালী গান শিখেছিলেন। মাঝে মাঝে মাঝিদের গলায় এখনো শোনা যায় সেই সব গান। নিবারণদা তো সব সময় এই সব গানই গায়। কৃষ্ণসুন্দর বসতে বসতে বলল।

অদূরে আরেকটি চেয়ার টেনে সুচারু নিজেও বসল। নিবারণের প্রসঙ্গ উঠতেই সুচারু উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। সে বলল—ইস! আপনার নিবারণের মতো এমন মিষ্টি গলা, আর এ সব গান গাইবার এমন কায়দা আমি আর দেখিনি। সেদিন কিন্তু আমরা অনেকক্ষণ ধরে নিবারণের গান শুনেছিলাম। পূর্ণিমা রাত—চিরকাল মনে থাকবে আমার। তারপর সে বেশ গর্বের সঙ্গে বলল—যদি নিবারণের মতো এমনি একটি গায়কের সাহায্য পেতাম আমি তা হলে অনেক ভাটিয়ালী গান আসতো আমার হাত দিয়ে—এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

—তাইলে আমি ঠিকই অনুমান করেছি। কবিতা লেখার অভ্যাস তোমার আছে এখনো? কৃষ্ণসুন্দর সহাস্যে বলল।

সলজ্জভাবে সুচারু বলল,—তা একটু একটু আছে। আপনার কাছে অস্বীকার করবো না। সেটা বাংলা দেশের মধ্যে আমার একজন মাত্র পাঠক।

—কে? দুর্গাদাসবাবু?—তেমনি সহাস্য জিজ্ঞেস করল কৃষ্ণসুন্দর।

—ঠিক ধরেছেন। তিনি আমার মস্ত সমঝদার।... আপনাকে পড়তে দেবো একদিন।...কি যে লিখতে হবে, কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। মনের মধ্যে তো আবোল-তাবোল কত কথাই জাগে। বলল সুচারু।

—দাও! তোমার কবিতাই পড়া যাক আজ? কৈ দেখি! কৃষ্ণসুন্দর সাগ্রহে বলল।

টেবিলের উপর সযত্নে রক্ষিত বইগুলোর পাশে একখানি সুন্দর বাঁধানো খাতা। খাতাখানি খানিকটা প্রাচীন পুঁথির আকারে পরিকল্পিত। হাল্কা নীল মলাটের উপর সোনালী কালিতে আলপনা আঁকা। খাতাখানি সযত্নে তুলে এনে সুচারু কৃষ্ণসুন্দরের হাতে সসঙ্কোচে রাখলো।

মলাটখানি তুলতেই কৃষ্ণসুন্দরের চোখে পড়লো সুন্দর হস্তাক্ষরে প্রথম পৃষ্ঠার উপরের দিকে বড় বড় হরফে লেখা আছে—"প্রথম কবিতা গুচ্ছ" আর পৃষ্ঠাটির নীচের দিকে ছোট ছোট হরফে তেমনি সুন্দর করে লেখা—"সুচারু চৌধুরী।" কৃষ্ণসুন্দর আরও কয়েকটি পাতা উল্টে দেখলো খাতাখানা। পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষরে দশটি কবিতা লেখা। বেশীর ভাগ পৃষ্ঠাগুলোই এখনো অলিখিত। প্রত্যেকটি কবিতার তলায় তারিখ দেওয়া রয়েছে।

কাব্য-চর্চায় সুচারুর আন্তরিক নিষ্ঠা দেখে কৃষ্ণসুন্দর আরো খুশী হলো। সে সহাস্যে বলল কবিতাগুলো তুমি আবৃত্তি করে পড়—আমি শুনি সেই ভাল হবে।

সুচারুর সঙ্কুচিত ভাব দেখে কৃষ্ণসুন্দর আবার বলল—তুমি তো ভালো আবৃত্তি করতে পারতে। তেমনি করে পড়না, নিজের কবিতা?

ছেলেবেলায় সুচারু কৃষ্ণসুন্দরের কাছেই কবিতা আবৃত্তি করতে শিখেছে। খাতাখানি হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে সঙ্কোচ ও জড়তা কাটিয়ে, স্বরচিত "প্রথম কবিতাগুচ্ছ" আবৃত্তির ভঙ্গীতেই পড়তে সুরু করলো সুচারু।

* *

সারাদিন শ্রাবণের অবিশ্রান্ত ধারা। দু'দণ্ডের জন্যও একবার বিরতি নেয়নি। সারাটা দিনই কৃষ্ণসুন্দর সুচারুদের বাড়ীতে গল্প গুজবে কাটিয়ে দিল; কখনো চিন্তামণির সঙ্গে, কখনো সুচারুর সঙ্গে কখনো বা দুজনেরই সঙ্গে।

সন্ধ্যার পর আবার দুজনে গিয়ে বসল দোতলার পড়ার ঘরে। বর্ষণ-মুখর শ্রাবণের কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি চারিদিক গাঢ়তর আঁধারে ঢাকা। টেবিলের উপর রক্ষিত একটি সুদৃশ্য টেবিল-ল্যাম্পের আলোতে বসে আবার সুচারু কৃষ্ণসুন্দরের সঙ্গে আধুনিক কবিতা নিয়ে আলোচনা করতে সুরু করল। কবিতা রচনা সম্পর্কে সুচারুর মনে জিজ্ঞাসার অন্ত নেই। তার ছেলেমানুষী প্রশ্ন শুনেও কৃষ্ণসুন্দর বিরক্ত হয় না। খুব দরদ দিয়ে তাকে বুঝিয়ে দেয়।

সেদিন রাত্রি প্রায় ন'টার পর বিদায় নেবার সময় সুচারু সকৃতজ্ঞ কণ্ঠে বলল—আপনার সঙ্গে মন খুলে আলোচনা করতে পারায় আমার খুব উপকার হল আজ। অনেক প্রশ্নের উত্তরই এখন কিছুটা পরিষ্কার বলে মনে হচ্ছে। কাল থেকে আবার নতুন করে কবিতা লিখবো।

—বেশ! লিখে যাও! নিষ্ঠার সঙ্গে লিখে যাও! যাঁরা কবিতা লিখতে পারছেন—তাঁরাও এই একই পথে এসিয়েছেন। দীর্ঘ সাধনার পর সিদ্ধি অনিবার্য। উৎসাহ দিয়ে কৃষ্ণসুন্দর বলল।

কৃষ্ণসুন্দর উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে পা বাড়াতে বাড়াতে বলল—আসি এবার! আজকের দিনটা ভালোই কাটলো—তোমার কবিতাও শোনা গেল। মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনা কর সুচারু! তোমার জীবনে সম্ভাবনা আছে। মৃদু হাসো সুচারু বলল—দাড়ান! পরীক্ষা পাশের পর আপনাকে প্রণাম করিমি। বলতে বলতে সুচারু, কৃষ্ণসুন্দরের পায়ের দিকে নিবিনয়ে অবনত হয়ে মাটিতে হাত ছুঁইয়ে তাকে প্রণাম করলো।

হাতে লণ্ঠন নিয়ে সুচারু আগে আগে সিঁড়ি বেয়ে নামলো—কৃষ্ণসুন্দর নীরবে অনুসরণ করলো তাকে।

বাড়ী থেকে বেরুবার সময় চিন্তামণি বললেন—আবার এসো, কৃষ্ণসুন্দর।

—আচ্ছা। বলে হাতি মেলে কৃষ্ণসুন্দর পা বাড়ালো নৌকা-ঘাটার দিকে। শ্রাবণের ধারা তখন আরও প্রবলতর আবেগে বর্ষিত হচ্ছে। বায়ু বেগ বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের তীক্ষ্ণ ঝলকানিও সুরু হয়ে গেছে। ঘন অন্ধকারে সব একাকার। দূরদিগন্তে শোনা যায় গভীর মেঘ গর্জন। "দুর্যোগের রাত্রি"—কৃষ্ণসুন্দর মনে মনে বলল।

একাদশ অধ্যায়

গোটা শ্রাবণ মাসটা বিফলে গেল। দুর্গাদাসবাবু কিছুতেই প্রস্তাবিত নাটকের-সভা জমাতে পারলেন না। সারা মাসটাই গেল বৃষ্টি-বাদলের মধ্য দিয়ে। তিনি চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেন নি—দু'দিন সভা ডেকেছেন। প্রথমদিন কাক-প্রাণীও আসতে পারেনি—এমন মুষলধারে বর্ষণ। দ্বিতীয় দিন আবার ডাকলেন শ্রাবণ মাসের শেষের দিকে। সেদিন দু'চারজন নাট্যরসিক এলেন বটে—কিন্তু তারা সংখ্যায় ছিলেন খুবই নগণ্য। দুর্গাদাসবাবু প্রমাদ গণলেন। কারণ, আর সপ্তাহ-দুই পরেই কৃষ্ণসুন্দর নাকি কলকাতায় চলে যাচ্ছে—খুবই জরুরী কাজ তার। কাজেই কৃষ্ণসুন্দর চলে যাওয়ার আগেই নাটকের-সভা ডাকতে হবে। সুচারু প্রতিদিন তাগাদা দিচ্ছে দুর্গাদাসবাবুকে।

ভাদ্র মাস সুরু হতেই—দৈত্যকার কালো কালো মেঘরাজেরা নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। বর্ষা দিনের কাজলা আকাশ অল্প কদিনের মধ্যেই নিবিড় নীলিমায় চমৎকার হয়ে উঠছে। সাদা সাদা হাল্কা মেঘের বিহার দিকে-দিগন্তরে আনাগোনা করছে। সুচারুর তাড়া খেয়ে দুর্গাদাসবাবু নিজেই লাঠি হাতে বেরিয়ে পড়লেন পাড়ায় পাড়ায়। ভাদ্রমাসের প্রথম সপ্তাহেই নাটকের

সভার জন্য দিন ধার্য হলো। সভা বসবে সুচারুদের লম্বা আই-ঢালা কাছারী-ঘরটায়। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের চেনা আরো লোক পাঠিয়ে সভার সুচারু স্থান তারিখ ও সময় প্রভৃতি সম্বন্ধে নতুন করে সচেতন করে দেওয়া হয়েছে।

গত পনেরো আগের পরিচ্ছেদে, জীবনগঞ্জের কোনো একটা সামিতি ব্যাপারে, গ্রামের বিশিষ্ট লোকদের একটা বৈঠক বসে রাইমোহন পোদ্দারের বাড়ীতে। সেই বৈঠকে রাইমোহনের সঙ্গে সুচারুর মেজদার খুব তীব্র বচসা হয়ে থাকে—এবং রাইমোহনের গুণ্ডার দল তার মেজদাকে অপমান করে সভা থেকে বার করে দেয়। অবশ্য পরদিনই রাইমোহন নিজে সুচারুদের বাড়ীতে এসে, সমস্ত ঘটনার জন্য ক্ষমা চেয়ে গেছে। কিন্তু এই ঘটনার পর থেকেই সুচারুর মেজদা কেমন মনমরা হয়ে যায়—কয়েকমাস পরেই সাংঘাতিক জ্বরে আক্রান্ত হয় বেচারা। বিকারগ্রস্ত অবস্থায় সুচারুর মেজদা খালি রাইমোহন পোদ্দারের বিরুদ্ধে কঠোর কথা বলতো। মৃত্যুর পূর্বে মেজদার সেই দুর্গতির ছবি সুচারু কিছুতেই ভুলতে পারে না।

আজকের সভায় যদি ঘুরঘুর রাইমোহন শেষটায় পরাজিত হয়, তবে দুর্গাদাসবাবুর চাইতেও অনেক গভীরতর উল্লাস অনুভব করবে সুচারু নিজে। দাম্ভিক রাইমোহন পোদ্দারের জীবনে এই হবে প্রথম পরাজয়। ...কৃষ্ণসুন্দরেরও আজ পরীক্ষার দিন। সে নিরভিমান, অমায়িক ও দরদী—এ অঞ্চলের মানুষ নাকি আজকাল তার দিকেই ঝুঁকে পড়ছে।...ক্লাব-জীবনের সেই বিশোর কৃষ্ণসুন্দর আজ নাকি জীবনগঞ্জের একজন শক্ত নেতা। সেই লাজুক ছেলেটি। যে ভাল বক্তৃতা করতে পারতো বটে, কিন্তু বলবার সময় কারো চোখের দিকে তাকাতো না। আর এমনি দ্রুত লয়ে বলতো যে, শুনে মনে হতো যেন মুখস্থ বলছে। সেই কৃষ্ণসুন্দর—দেখা যাক।

চিন্তামণিকে অনেক বুঝিয়ে, সকাতরে অনুরোধ জানিয়ে, শেষ পর্যন্ত সুচারু ঘরের অলক্ষিত অবস্থান থেকে, আজকের সভার দৃশ্য দেখবার অনুমতি অর্জন করলো। বাড়ীর আশে-পাশে যে কয়জন অন্তরঙ্গ বাদ্যযন্ত্রী আছে—সবাইকে খবর দিয়ে ডেকে আনলো সুচারু। ঘরে বসে সভার দৃশ্য দেখার মতো আনন্দের জিনিষ খুব কমই আছে। এ দৃশ্য—নাটকের মতোই আকর্ষণীয়, তবে সব জিনিষটাই কেমন এলো-মেলো থেকে যায়।

সভার নির্দিষ্ট সময় বিকাল সাড়ে চার ঘটিকা। ইষ্টদেবতাকে খুব আন্তরিকভাবে স্মরণ করে দুর্গাদাস-বাবু ঘণ্টাখানেক আগেই নিজের শোবার ঘর থেকে উঠে গিয়ে কাছারী ঘরে ফরাসের উপর তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসলেন। পূর্বকথামত ঠিক সেই সময় এক পেয়ালা চা দুটি পান নিয়ে কাছারী ঘরে ঢুকলো সুচারু। চিন্তামণি সে সব নিতাইকে বলে নিয়ে চলে-গেছেন তাঁদেরই আশ্রিত আখড়া-বাড়ীর বোষ্টমের কাছে। ভাগবত—শ্রীকৃষ্ণের জীবনী। তাই সারা মাসটাই আখড়ায় প্রতিদিন নিয়মিতভাবে অপরাহ্ণ বেলায় ভাগবত পাঠ—এবং সন্ধ্যায় আরতি-কীর্তন ইত্যাদি! অতএব সুচারুর স্বাধীনতার পরিধি আজ কিছুটা প্রসারিত।

দুর্গাদাসবাবুর সামনে চায়ের পেয়ালাটি রেখেই সুচারু সতর্ক দৃষ্টিতে সভার উদ্যোগ-আয়োজন সব কিছু নীরবে পরীক্ষা করতে সুরু করলো।

এক চুমুক চা পান করে এবং সুগন্ধি তামাক ভরা গড়গড়ার গোটা দুই ছোট ছোট টান দিয়ে দুর্গাদাসবাবু সুচারুকে লক্ষ্য করে বললেন—ব্যবস্থার কোনো ত্রুটি নেই। আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সব কাজ করিয়েছি।

—বটে? কোনো ত্রুটি নেই? খাবার জল রেখেছেন? সুচারু সহাস্যে বলল।

—খাবার জল লাগবে কেন? একি মেয়েদের মেয়ে আসছে কেউ?

—দেখেছেন? কি রকম সেকেলে আপনারা? ভাদ্রমাস—তাল-পাকানো গরম। এখানে জল রাখতে হবে—হাত পাখা রাখতে হবে।

—বল কি? এতো হাতপাখা পাবো কোথায় এখন?

—কিনে আনুন! গ্রামের বিশিষ্ট লোকেরা বাড়ীতে আসছে—একটু ভালো ব্যবস্থা করবেন না? এটা রাইমোহন পোদ্দারের বাড়ী নয়।

—কথাটা ঠিক? দুর্গাদাসবাবু গম্ভীরভাবে

বললেন এবং সঙ্গে সঙ্গে লোকজনকে জল ও পাখার ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দিলেন। তারপর আরেক চামচে চা খেয়ে দুর্গাদাসবাবু সচাকে বললেন—আর কোনো বক্তব্য আছে নতুন গিন্নি? তোমার রাজত্বে মনে হয় সুখেই থাকবো।

—থামুন! আলোর ব্যবস্থা?

—ওসব ঠিক আছে। চার কোণায় চারটে গ্যাস-লাইট—আর ফরাসের দু'ধারে দুটো "পেট্রোম্যাক্স"—চমৎকার জমবে। এখন তোমার কেষ্টঠাকুরই ভরসা।

—সেকি? এরই মধ্যে 'বোল' পালটে ফেললেন? এখন আর পার্থনা? —সুচারু হাসতে হাসতে বলল।

এবার চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে দুর্গাদাসবাবু বললেন—আমার বেলায় পার্থ—আর তোমার বেলায় কেষ্টঠাকুর। ব্যাকরণে আমার কখনো ভুল হয় না।

—থামুন!···আপনার এই ফরাস কিন্তু সরাতে হচ্ছে। সুচারু দৃঢ়ভাবে বলল।

—সেকি? এখন? দুর্গাদাসবাবু শঙ্কিত হয়ে উঠলেন।

—হ্যাঁ, এখন না সরালে কখন সরাবেন? মিটিং-এর শেষে গড়িয়ে লাভ কি?

—সুচারু বলল দৃঢ়তর কণ্ঠে।

—কি বলছ তুমি, নতুন গিন্নি! তিন-তিনটে বড়-বড় চৌকি পেতে ফরাসটা করা হয়েছে। এখন সরাবো···

—শুনুন! আপনার ওপাশের ঘরের জানালার ধারে আমরা আজ মিটিং দেখবো। এখানে ফরাস পাতা থাকলে আমরা পড়বো পেছন দিকে কি করে দেখবো তাহলে?

—সে কথা সকালে বললে না কেন?···কি মুস্কিল। এখন···

—সকালে বলবো কি করে? মাকে রাজি করাতে পেরেছি দুপুর বেলায়—খাওয়া দাওয়ার পর। আপনি তখন বাড়ী চলে গেছেন।···উঠুন। এসব ওদিকে সরাতে হবে। সুচারু তাড়া দিল দুর্গাদাসবাবুকে।

অগত্যা দুর্গাদাসবাবুকে সুচারুর নির্দেশ মতো সব কিছু আবার ওলট-পালট করতে হলো। হাঁক-ডাক করে লোকজন ডেকে নতুন করে আবার আসর গুছোতে হলো দুর্গাদাস বাবুকে। অবশেষে আবার তাকিয়ার সামনে নিজের জন্য স্বয়ং-নির্বাচিত করাসের মধ্যস্থলে বসে দুর্গাদাসবাবু ক্লান্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—ওরে বাবাঃ! তোমার জন্যে দুনিয়াটা আবার উলটে দিলাম। আজ যদি জিততে না পারি—সবটাই পণ্ড-শ্রম হবে। কম খেটেছি আমি এই বুড়ো বয়সে? কৈ—আবার সেনাপতি তো এখনো এলো না।

—আসবেন। তিনি নিশ্চয় আসবেন। কিন্তু আপনাকে একটা কথা বলছি, দাদু!

—সুচারু খুব গম্ভীর ভাবে বলল।

—কি?

—দরকার হলে আজ আপনাকেও প্রকাশ্যে রুখে দাঁড়াতে হবে। যে ভাবেই হোক আজ মেজদাকে অপমান করার প্রতিশোধ নিতে হবে।

—সুচারু চাপা গলায় বলল।

জানালা দিয়ে দেখা গেল—নদীর ঘাটের দিক থেকে প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ জন লোক জোট বেঁধে কাছারী ঘরের দিকে আসছে—সঙ্গে কৃষ্ণসুন্দর।

—আর ভয় নেই, নতুন গিন্নি! সৈন্যসামন্তসহ আমার সেনাপতি হাজির—দুর্গাদাসবাবু উৎফুল্ল হয়ে বললেন।

—ঠিক আছে! আমি যাই তাহলে—আমার কথা মনে থাকে যেন—চাপা গলায় বলতে বলতে সুচারু চলে গেল।

সন্ধ্যার পর আলো না জ্বালিয়ে সভার কাজ সুরু করা গেল না। সূর্যাস্তের আগে আসর ভর্তি হলো না।

আট দশ জন বালা সহচরীকে নিয়ে নির্দিষ্ট ঘরটিতে বসলো সুচারু। কিন্তু ও ঘর থেকে সবটা সভা ভাল করে দেখাও যায় না—অধিকন্তু লোকজনের কথাবার্তাও ভাল শোনা যায় না।

সুচারুর জনৈক বান্ধবী প্রস্তাব করলো—চল যাই! ওদিকটার বাঁধানো ঘাটে গিয়ে বসি। ওখান থেকে সব দেখাও যাবে—শোনাও যাবে সব কথা।

—ওখানে গিয়ে বসাটা ঠিক হবে কি? কাছারী

ঘরের আরো কাছে ?—সুচারু বলল।

—তাতে কি হয়েছে ? বাদলবাবু আবার বলল—জোছনা রাত, ভয়কি। চল—কামিনীফুলের গাছটাকে আড়াল করে বসবো আমরা—চল না ?

সভায় দোকজন এসেছে মন্দ নয়, প্রায় আশীজন হবে। ফরাসের উপর বসেছেন দুর্গাদাসবাবু, রাইমোহন পোদ্দার, রাইমোহনের পরামর্শ দাতা নেপাল মাস্টার, এবং আরো ক'জন নাট্যরসিক বিশিষ্ট ব্যক্তি। আর সকলে বসেছে মেঝের উপর পাতা সতরঞ্চিতে। কৃষ্ণসুন্দরকে কোথাও দেখা যায় না। অনেক খুঁজেও কৃষ্ণসুন্দরকে দেখতে পেলোনা সুচারু।

আলোগুলো সব জ্বেলে দিয়ে যথাস্থানে রাখা হয়েছে। অধিকাংশ সভ্যই নীরবে বেশ গম্ভীর ভাবে সভা আরম্ভ হওয়ার প্রতীক্ষা করছে। বেশ একটা থমথমে ভাব। দুর্গাদাসবাবুর অনুমতি নিয়ে নেপাল মাস্টার দাঁড়িয়ে প্রস্তাব করলেন যে আজকের এই সভায় দুর্গাদাসবাবুই সভাপতিত্ব করবেন। রাইমোহনও সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে নেপাল মাস্টারের প্রস্তাবকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন জানালো।

সমাগত সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে দুর্গাদাসবাবু বসে বসেই হাসি মুখে বললেন, আমরা জীবনগঞ্জের নাট্যরসিকেরা, প্রায় তিন বছর পর আজ সমবেত হতে পেরেছি। গত তিন বছর ধরে নানান কারণে এখানে কোনো যাত্রা-থিয়েটার হতে পারেনি। আশা করি সকলে মিলেমিশে চেষ্টা করলে এবার পুজোয় আবার আমরা একটা কিছু করতে পারবো। ..যা হোক, আজ প্রথমে আলোচনা হবে একটি বিশেষ নাটক নিয়ে, একথা আপনারা সকলেই জানেন। আপনারা একথাও জানেন যে, এই নাটকের উদ্যোক্তা হচ্ছেন আমাদের ইউনিয়ন-বোর্ডের সুযোগ্য সভাপতি শ্রীযুক্ত রাইমোহন পোদ্দার মহাশয়। তাঁরই ইচ্ছাক্রমে আমি, মাস্টার মশাই নেপাল-বাবুকে এই নাটক সম্বন্ধে কিছু বলতে অনুরোধ করছি।

নেপাল মাস্টারের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। জীবন-গঞ্জের এক তালুকদার ঘরের ছেলে তিনি। গলা ঝাড়তে ঝাড়তে তিনি উঠে দাঁড়ালেন, এবং প্রস্তাবিত নাটকের গুণাগুণ সম্পর্কে যথারীতি বক্তৃতা সুরু করলেন।

জ্যোৎস্নার আলোকে, রৌপালো কামিনী ফুল গাছটির পেছনে পান-বাঁধানো পুকুর ঘাটে বসে, গভীর মনোযোগের সঙ্গে সুচারু সভার কার্যক্রম লক্ষ্য করছিল।...বাইরেও কিছু লোক ঘরের চারদিকে ঘোরা-ফেরা করছে, ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলছে।.. জীবনগঞ্জের ইতিহাসে আজকের দিনটি যেন স্মরণীয় হয়ে থাকে।

নেপাল মাস্টার দাঁড়িয়ে নাটকটির পক্ষে খুব জোরালো ভাষায় বক্তৃতা দিতে সুরু করলেন। নাটকটির বিষয়বস্তুর আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য, এর অতি চমৎকার শিল্পরীতি, ইত্যাদি বিষয়ে তিনি উচ্চাঙ্গের মুহূর্তে এমন সব উচ্চাঙ্গের ভাষা প্রয়োগ করলেন, যাতে সুচারুর মনে হলো। বঙ্কিম মহাকবি সেক্সপীয়রও এমন চমৎকার নাটক লিখতে পারতেন কিনা সন্দেহ। অবশেষে বলবার আগে নেপাল-মাস্টার বললেন, আমাদের জাতীয় জীবনের সঙ্কটের ছবিটি এই নাটকে চমৎকার ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। মানুষের কাছে 'স্বরাজ' কথাটির যথার্থ তাৎপর্য কি ?—এই গুরুতর প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে এই নাটকে। এমন শিক্ষামূলক নাটক সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করতে পারলে, জীবনগঞ্জের সুনাম বাড়বে। জেলা সদরের বড় কর্তারা শুনেছি আসবেন এই নাটকের অভিনয় দেখতে।...অতএব আমি আশা করি, যে আপনারা অবিলম্বে পূর্ণ উদ্যমে এই নাটকের মহড়া সুরু করবেন।

বক্তৃতা শেষ করে নেপাল মাস্টার আবার ফিরে বসলেন রাইমোহন পোদ্দারের পাশে, নিজের স্থানটিতে। সভায় সকলেই নীরব।

সভাপতি দুর্গাদাসবাবুকে লক্ষ্য করে রাইমোহন পোদ্দার বসে বসেই বলল, নেপালবাবু তো সব কথাই বেশ গুছিয়ে বলেছেন। এখন কবে থেকে মহড়া সুরু হবে, সেই দিনটা ঠিক করুন।

সভা থেকে দাঁড়িয়ে একজন বলল, সভাপতি মশাই ! শুভস্য শীঘ্রম্। কাল থেকেই মহড়া সুরু হোক্। আজ তিন বছর ধরে জীবনগঞ্জে কোনো আমোদ নেই।

—হ্যাঁ। কাল থেকেই। আরো ক'জন বলল সমস্বরে।

সুচারু বুঝতে পারলো যে, রাইমোহন পোদ্দারও বেশ সলাপরামর্শ করেই সভায় এসেছে।...দুর্গাদাসবাবু

কিছুই বলছেন না, মাথা চুলকাতে চুলকাতে তিনি খালি তাকাচ্ছেন চারদিকে।

এমন সময় সভার এক কোণ থেকে কৃষ্ণসুন্দরের গুরু-গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল। এতক্ষণ দমকিয়ে থেকে, সে যেন এবার পাতাল ফুঁড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। ধীর গম্ভীর কণ্ঠে সভাপতিকে সম্বোধন করে কৃষ্ণসুন্দর বলল, আমাদের কিছু বক্তব্য আছে, এই নাটক সম্বন্ধে।

কৃষ্ণসুন্দরের ধৃষ্টতায় রাইমোহন বিরক্ত হলো। রাগের সঙ্গে সে বলে উঠলো, আবার কিসের বক্তব্য? সব কথাতো সেদিনবাবুই বলেছেন।

কৃষ্ণসুন্দর আবার বললো, সভাপতি মহাশয়! আমি আপনার কাছে অনুমতি চাইছি। এই নাটক সম্বন্ধে আমাদের অনেকেরই আপত্তি আছে।

নিমেষের মধ্যে রাইমোহন উত্তেজিত হয়ে উঠলো, চিৎকার করে সে বলতে থাকলো কোনো আপত্তি এখানে খাটবে না।

—থামিয়ে দিন! থামিয়ে দিন! আরো কজন বলল সভা থেকে।

ক্ষণিকের মধ্যে সভায় আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়ে উঠলো। এতক্ষণ পর্যন্ত সঙ্গিনীদের নিয়ে, বসে বসেই সুচারু সভার দৃশ্য দেখতে পাচ্ছিল। কিন্তু ঘরের ভেতরে গণ্ডগোল সুরু হওয়ায়, ঘরের চারপাশে যারা ঘোরা ফেরা করছিল, তারা সবাই গিয়ে জড় হলো কারারী ঘরের দরজার জানালায়। ফলে সুচারুরা সভার দৃশ্য আর দেখতে পাচ্ছে না, এবং কতকগুলো ক্রুদ্ধ মানুষের হট্টগোল ছাড়া কিছু শুনতেও পায় না। শান-বাঁধানো ঘাট থেকে উঠে, পুকুর পাড় ধরে দ্রুত বেগে খানিকক্ষণ হেঁটে দল বল সহ সুচারু কারারী ঘরের ঐ কোণের জানালার কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ালো। এই জানালাটার বাইরের দিকে কোনো পুরুষ মানুষ দাঁড়ায়নি।

ঘরের ভিতরের দিকে তাকিয়ে সুচারুর চক্ষুস্থির। সবস্ত মানুষ দাঁড়িয়ে পড়েছে, কেউ বসে নেই। এবং ঘরের জনতা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পরস্পরকে ঘুসি দেখাচ্ছে। কথা কাটাকাটি চলছে তীব্রতম বেগে। বাইরের মানুষেরাও আর নিস্পৃহ, উদাসীন নেই, তারাও বিক্ষোভ প্রকাশ করছে। প্রচণ্ড গোলমালের মধ্যেও সুচারু বুঝতে পারলো যে, সভার ভিতরের এবং বাইরের অধিকাংশ মানুষ দাবী করছে যে, কৃষ্ণসুন্দরকে বলতে দিতে হবে। রাইমোহন পোদ্দার তার দলবল নিয়ে অধিকাংশের এই দাবীকে বাধা দিচ্ছে। সভাপতি দুর্গাদাসবাবুর কথা শুনছেনা রাইমোহন। রাইমোহন পোদ্দারের সমর্থকেরা কোণ ঠাঁসা হয়ে ফরাসের কাছাকাছি এসে বিক্রম প্রকাশ করছে। অল্প কয়েকজন লোক সভাস্থলের বিপরীতে কোণে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন, কিন্তু বেরোবার পথ নেই। দরজা-গুলোতে মানুষের চাপ অস্বাভাবিক। গোলমাল শুনে আরো কিছু লোক ছুটে এসেছে।

সুচারু আরো তাকিয়ে দেখল, কৃষ্ণসুন্দর অক্লান্ত-ভাবে মারমুখো জনতাকে ঠেকিয়ে রাখছে। রাইমোহন পোদ্দার কৃষ্ণসুন্দরকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে ক্রুদ্ধ স্বরে গর্জন করতে করতে বলে উঠলো, এই লোকটা! এই লোকটা সব গুণ্ডাকে সভায় নিয়ে এসেছে। গুণ্ডাদলের সর্দার!

মুখ সামলে কথা বলো। বলে অন্ততঃ পাঁচ সাতজন তরুণ রাইমোহনের দিকে রুখে এলো।

ছুটে গিয়ে কৃষ্ণসুন্দর তাদের ঠেকিয়ে রাখলো।

• •

অক্লান্ত পরিশ্রমের পর কৃষ্ণসুন্দর তার পক্ষের জনতাকে শান্ত করতে পারলো—অনেককে হাতে-পায়ে ধরতে হলো তার।

রাইমোহনের দলের লোকরাও শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে চুপ করে গেল। এটাও তারা বুঝেছে যে, আজকের সভায় তাদের সংখ্যা কম। রাইমোহন পোদ্দারের দম্ভের বল্গাবিহীন অশ্ব—জীবনগঞ্জের মাটিতে আজই প্রথমবারের মতো থমকে দাঁড়ালো। কিস্ কিস্ করে সে দুর্গাদাসবাবুকে নির্দেশ দিল—সভা বন্ধ করে দিন আজ।

প্রত্যুত্তরে প্রবল আপত্তি জানিয়ে দুর্গাদাসবাবু বললেন—অসম্ভব! তাহলে কাল থেকে আর আমি জীবনগঞ্জে মুখ দেখাতে পারবো না।

নিরুপায় রাইমোহন সভাপতির তাকিয়াটা টেনে নিজেই তাতে ঠেসান দিয়ে মাথা নীচু করে, নীরবে

মাটির দিয়ে চেয়ে চেয়ে, নিজের আঙুলের নখগুলো কামড়াতে সুরু করলো।

দুর্গাদাসবাবু এবার প্রসন্ন মনে উঠে দাঁড়ালেন। যাক্, প্রথম কিস্তিতেই একহাত জেতা গেল। গ্রামের জনমতের গতি কোন দিকে যাচ্ছে, তা বেশ স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরে দুর্গাদাসবাবু নিশ্চিন্ত মনে ঘোষণা করলেন—শুনুন ভদ্রমহোদয়গণ! আমাকে আপনারা সভাপতি হিসাবে নির্বাচন করেছেন। অতএব আমাকে আমার জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে কাজ করতে দিতে আপনাদের কোনো আপত্তি থাকতে পারে না। যে বিষয়ে এইমাত্র তুমুলকাণ্ড ঘটে গেল সে সম্বন্ধে সভাপতি হিসাবে আমার মতামত বলছি, শুনুন! এই নাটক আমি নিজেও পড়িনি—সময় পাইনি। কাজেই যখন এই বইটা একেবারেই অচেনা—অতএব কৃষ্ণসুন্দর-বাবুর বক্তব্য আমাদের শোনা উচিত। দেখা যাক্ না, তিনি কি বলেন। নেপালবাবুর বক্তব্য সবাই খুব মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন। আমি বলছি—কৃষ্ণসুন্দর-বাবু এখানে এসে তাঁর বক্তব্য বলুন।

চকিতের মধ্যে কৃষ্ণসুন্দর ছুটে এসে সভাপতির ফরাসের সামনে জনতাকে লক্ষ্য করে দাঁড়ালো। কৃষ্ণসুন্দরকে দেখে সুচোরুর মনে পড়লো মুকুন্দদাসের গানের আসরের কথা। সেদিনও কৃষ্ণসুন্দরকে এমনি বিপর্যস্ত দেখাচ্ছিল। তবে জামা কাপড়গুলো আজ ছেঁড়েনি—আর মোটা চাদরটা এখনো গলায়ই আছে।

সভাপতিকে এবং সমাগত সকলকে সম্বোধন করে কৃষ্ণসুন্দর বলতে সুরু করলো—ভদ্রমহোদয়গণ! পাশের ইউনিয়ন থেকে বই সংগ্রহ করে আমরা কয়েকজন এই বই পড়েছি। এ সভার সকলেই আশা করেছিলেন যে, নেপালবাবু অন্ততঃ নাটকটার মূল কাহিনীটি সভার সকলের সামনে বিবৃত করবেন। কারণ, একথা সবাই জানে যে, কোনো নাটকের কাহিনী না শুনে, সে সম্বন্ধে কোনো মতামত দেওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। নাটকের গল্পাংশ আমি সংক্ষেপে বলছি—আপনারা শুনুন দয়া করে।

অতিরিক্ত পরিশ্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও কৃষ্ণসুন্দর বেশ গুছিয়ে, ধীরেসুস্থে প্রস্তাবিত নাটকের কাহিনী বিবৃত করতে সুরু করে দিল। প্রায় পনেরো মিনিট ধরে সকলেই কাহিনীর সারবস্তু মনোযোগ দিয়ে শুনলো। নেপাল মাস্টার এবং রাইমোহনের অবস্থা তখন শোচনীয়। কাহিনীর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে একথা খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল যে—সমবেত সকলকে তারা ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করেছে।

কাহিনী বলা শেষ করে অত্যন্ত অতর্কিতে ফরাসের উপর উপবিষ্ট নেপাল মাস্টারকে লক্ষ্য করে কৃষ্ণসুন্দর বলল—বলুন, মাস্টারমশাই! আপনিই বলুন—কাহিনীর কোনো ঘটনা আমি বিকৃত করেছি কিনা?

নেপালমাস্টারের দিকে তাকিয়ে কৃষ্ণসুন্দর মিনিট খানেক অপেক্ষা করল। কিন্তু নেপাল মাস্টার কোনো প্রতিবাদ জানালেন না। অতঃপর জনতাকে লক্ষ্য করে কৃষ্ণসুন্দর আবার বলতে সুরু করল—"ভদ্রমহোদয়গণ। আশা করি এতক্ষণে আপনারা বুঝতে পারছেন, কেন পুলিশসাহেব এতো ঘটা করে প্রত্যেক ইউনিয়নে এই নাটকটির অভিনয়ের ব্যবস্থা করছেন। এর উদ্দেশ্য জলের মতো পরিষ্কার। আমাদের গৌরবময় জাতীয় সংগ্রামের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করাই এর লক্ষ্য। পুলিশ সাহেবের উৎসাহের হেতু বুঝা যায়—তিনি নিজে ইংরেজ এবং সরকারী কর্মচারী। কিন্তু রাইমোহনবাবুর এতে এতো উৎসাহ কেন?

অতঃপর কৃষ্ণসুন্দর আলোচ্য কাহিনীর মূল পরিকল্পনার এবং প্রধান প্রধান ঘটনা ও চরিত্রগুলোর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করতে লাগলো। সমবেত জনতার ঘৃণা যখন চরম পর্যায়ে এসে পৌঁছলো, কৃষ্ণসুন্দর তখন আবেগভরা আন্তরিক কণ্ঠে আবেদন জানিয়ে বলল—বন্ধুগণ! জীবনগঞ্জের সতেরোজন দেশপ্রেমিক ইংরেজ সরকারের কারাগারে বন্দী। তাদের পারিবারিক জীবনের দুঃখ-দৈন্যের চিত্র আপনারা প্রতিদিন দেখছেন। জীবনগঞ্জের সেই কারারুদ্ধ দেশপ্রেমিকদের নামে আপনাদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি—কোনো প্রলোভনেই আপনারা আমাদের জীবনগঞ্জের গৌরবময় ইতিহাসকে কলঙ্কিত করতে সাহায্য করবেন না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদের কোন ঘৃণিত অনুচর নাটকের নামে আমাদের

মাতৃভাষাকে কলঙ্কিত করেছে। আপনারা ঘৃণাভরে এই প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করুন।

কৃষ্ণসুন্দরের বক্তৃতা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতরে এবং বাইরে তার পক্ষের লোকেরা তুমুল করতালিধ্বনি দ্বারা তাকে অভিনন্দন জানালো। করতালির কোলাহল প্রশমিত হলে, কক্ষের উপর উপবিষ্ট একজন প্রবীন নাট্যরসিক বললেন—সভাপতি মশাই, আমার একটা প্রস্তাব আছে। এই নাটকটি নিয়ে এখন বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে আজ এ সম্বন্ধে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত হবে না। এই সভা থেকে দুজন, আর কেডনাষ্টার মশাই অতুলবাবু—এই তিনজনের উপর ভার দেওয়া হোক্। তাঁদের মতামত শোনার পর, এ সম্বন্ধে যা করবার করা যাবে। আজকের সভাটা কিন্তু পণ্ড হওয়া উচিত নয়। আসরে পুজোর জন্য আর কি বই ধরা যায়, সেটা ঠিক করা হোক। রাত এখনো বেশী হয়নি।

প্রবীন ভদ্রলোকটির প্রস্তাবে সভায় অনেকেই সম্মতি জানালো। কিন্তু এই সময়ে রাইমোহন পোদ্দার উঠে দাঁড়ালো, এবং শ্লেষমিশ্রিত সুরে দুর্গাদাসবাবুকে বলতে সুরু করল, শুনুন ভদ্রঘরে মশাই! স্বয়ং পুলিশ সাহেব বই পাঠিয়েছেন, এ বই বিচার করবার অধিকার কার আছে? রাজদ্রোহী ছাড়া এই বই সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য আর কে করতে পারে!...

তারপর রাইমোহন, দুর্গাদাসবাবুর সামনে থেকে বইটা হাতে তুলে নিয়ে, সভায় সকলকে দেখিয়ে উত্তেজিত স্বরে বলল, জীবনগঞ্জের মাটিতে এই বই-এর অভিনয় হবে, অবশ্যই হবে। একথা জানিয়েই আমি সভাকক্ষ পরিত্যাগ করছি।...বিচার! রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিচার! হ্যাঁ, যাবার আগে আরেকটা কথা বলে যাই, আজ একথাটাই বুঝে গেলাম যে, জীবনগঞ্জের মাটিতে আবার 'পলিটিক্স' ঢুকেছে!...দেখা যাক্।...

দল বল সহ রাইমোহন সভাকক্ষ পরিত্যাগ করল। কাছারী ঘর থেকে বেরিয়ে রাইমোহন নাটকীয় ভঙ্গীতে উঠানে নামতেই, জনতার একাংশ আবার তুমুল বিক্রমে করতালি দিতে লাগলো। কে একজন তার স্বরে বলে উঠলো, হিপ্ হিপ্ হুররে-রে!

রাইমোহন পোদ্দার এবং তার দল বল চলে যাওয়ার পর সভার কাজ আবার সুরু হলো। এখন আর কোনো দ্বন্দ্ব নেই, তিক্ততা নেই। সবাই যেন মিলেমিশে পুজোর সময় জীবনগঞ্জে কি ভাবে আবার আমোদ আহলাদ করা যায়, সে বিষয়ে উৎসাহভরে পরামর্শ করতে লাগল।

রাত ন'টায় সভা ভাঙলো। উল্লাসের আতিশয্যে দুর্গাদাসবাবু বলে বসলেন, এবার পুজোর দিন তিনদিন সমানে ফুর্তি চলবে, যাত্রা, থিয়েটার, কীর্তন, সব। গ্রামের সমস্ত লোককে এক জায়গায় জড় করতে হবে।... জোগার কর তোমরা। টাকা পয়সার দায়িত্ব আমার।

দুর্গাদাসবাবুর এক কথায় আলোচনার মোড় ঘুরে গেল। যাত্রার জন্য একটি এবং থিয়েটারের জন্য একটি এই দুটি বই নির্বাচন করেই সভার কাজ সেদিনের মতো সাঙ্গ হলো। সভার শেষে দুর্গাদাসবাবু উঠে দাঁড়িয়ে শেষবারের মতো সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আবার ঘোষণা করলেন, তাহলে এই সাব্যস্ত হলো! সপ্তমীতে যাত্রা, অষ্টমীতে থিয়েটার, আর নবমী-রাতের প্রথমদিকে কীর্তন-পালা আর শেষের দিকে বাউল গান, ব্যস! কেউ বাদ গেল না। কাল থেকে আপনারা মহড়ায় আসবেন, এখানেই মহড়া। আসুন! নমস্কার!

সভার লোকজন চলে গেলে দুর্গাদাসবাবু কৃষ্ণ-সুন্দরকে একেবারে জড়িয়ে ধরলেন, ভায়া আমার! দিগ্বিজয়ী হও! বহুদিনের সাধ মিটালে আজ তুমি। দম্ভের পরাজয় ঘটলো আজ, চোখের সামনে। শিং উঁচিয়ে সভায় এসেছিল, লেজ গুটিয়ে চলে গেল। বলিহারি!

দুর্গাদাসবাবুর উচ্ছ্বাস দেখে কৃষ্ণসুন্দর না হেসে পারলো না। সে বলল, থামুন! থামুন! এই তো সবে সুরু! পোদ্দারও কম ঘোড়েল লোক নয়। ঠিক দেখবেন আরেকটা পথ খুঁজে বার করবে।

—তা করুক গে।...আজকে তো হেরে গেলো! দুর্গাদাসবাবু বললেন,—চল, নতুনগিন্নির সঙ্গে একবার দেখা করে যাই! একটু চা না খেয়ে পারবো না। চল। আজ তারও আনন্দের দিন!

সুচারুদের ভিতর বাড়ীতে, পুকুর পাড়ের দিকটায়, চিন্তামণির বসবার ঘরের বারান্দার সংলগ্ন জমিতে একটি

ছোট্ট বাগান আছে। বিভিন্ন ঋতুর সুগন্ধি ফুলের বাগিচা। প্রথম শরতের শুক্লপক্ষের মাঝামাঝি। যুঁই আর বেল ফুলের ঝাড়গুলো ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে। সাদা সাদা ফুলের গুচ্ছগুলো যেন চাঁদের আলোর সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেছে। বারান্দার পাতা একটি বড় গোলাকার সুদৃশ্য টেবিলের উপর কচি কচি ডালপাতাসহ একরাশ বেল আর যুঁই রেখে সুচারু বোধহয় ফুলের তোড়া বাঁধবার চেষ্টা করছে।

দূর থেকেই দুর্গাদাসবাবু হেঁকে বললেন—কি নতুন গিন্নি! এখনো জয়মাল্য গাঁথা শেষ হয়নি?

—জয়মাল্য নয়, ফুলের তোড়া! আমার নিজের জন্যই বাঁধছি।...আসুন।

বারান্দায় গিয়ে টেবিলের পাশে রক্ষিত চেয়ারে বসতে বসতে দুর্গাদাসবাবু বললেন, স্ত্রীলোক জাতটাই দেখছি স্বয়ম্বরা! তোমার দিদিকেও দেখলাম, তোমাকেও দেখছি! আজ এত বড় একটা জয়! তবু একটা জয়মাল্য জোটেনা আমার? তোমার জন্যে কি কাণ্ডটাইনা ঘটালাম আজ!

আপনি কি ঘটিয়েছেন? মাঝে মাঝে আমার মনে হয়েছে, আপনি যেন অ-থৈ জলে ঝাঁপি খাচ্ছেন। সুচারু বলল হাসতে হাসতে।

—কথাটা মিথ্যা নয়, নতুনগিন্নি! লোকটাতো আসলে বদমাস! ইচ্ছে করলে, অনেক ক্ষতি করতে পারে! দুর্গাদাসবাবু বললেন।

হাতের ফুলগুলো গুছাতে গুছাতে সুচারু ভরাক্রান্ত কণ্ঠে বলল, এতক্ষণ ধরে আমি সে কথাই ভাবছি। যাবার বেলায় দেখেছেন, কেমন শাসিয়ে গেল?

—তা গেলো! রাজদ্রোহের কথাও শুনিয়ে গেল।

—বিবর্ণ হয়ে পড়লেন দুর্গাদাসবাবু! থাক গে, যা হয় হবে। একটু চা খাওয়ার ব্যবস্থা কর। মনটা খারাপ করে দিওনা আবার!

—আপনাদের মিটিং শেষ হতেই আমি চায়ের কথা বলে দিয়েছি। সহাস্যে সুচারু বলল।

—বাঃ! বাঃ! এসব ব্যাপারে তোমার কোনো ত্রুটি নেই।—দুর্গাদাসবাবু বললেন।

—সত্যি আমি ভাবছি! রাইমোহনদা যেভাবে শাসিয়ে গেলেন তাতে আমার মনে হচ্ছে তিনি পুলিশে খবর না দিয়ে ছাড়বেন না। ওঁর সব আক্রোশ গিয়ে পড়ছে এখন কৃষ্ণসুন্দরবাবুর উপর। সত্যি কি না বলুন। সুচারু বলল।

এতক্ষণ ধরে কৃষ্ণসুন্দর নীরবে তাদের কথা শুনছিল। এবার সে সহাস্যে বলল—তার জন্যে এত ঘাবড়াবার কি আছে?

—কি বলেন আপনি? আমি বাবার মুখে শুনেছি, পুলিশের লোকজনের সঙ্গে ওঁর খুব ঘনিষ্ঠতা! কাজটা বোধ হয় ভাল হয়নি আজ! কেমনি আক্ষেপের সুরে বলল সুচারু।

কথার মোড় ফিরাবার জন্য কৃষ্ণসুন্দর বলল যাকগে ওসব। মাসীমা কোথায় বসু।

—ঠাকুরঘরে আহ্নিক করছেন। সুচারু জানালো।

চা খেতে খেতে কথাপ্রসঙ্গে সুচারুকে লক্ষ্য করে কৃষ্ণসুন্দর বলল—শোন টুনু! তুমি ভাবছো, তোমার এবং দুর্গাদাসবাবুর কথায় আমি আজ এতখানি শক হয়ে দাঁড়িয়েছি। আসলে ব্যাপারটা তা নয়। এ নাটক অভিনয়ে আমরা বাধা দিতামই।...এখনো শেষ হয়নি মনে রেখো। রাইমোহন পোদ্দার আবার চেষ্টা করবে। এত সহজে পিছু হটবার লোক নয় সে।

—সে কথা ঠিক! দুর্গাদাসবাবু চা খেতে খেতে সায় দিয়ে বললেন—তুমি আমি উপলক্ষ মাত্র। এ সংঘর্ষ অনিবার্য।

আহ্নিক সেরে চিন্তামণি বারান্দায় এলেন। তাঁকে দেখতে পেয়েই কৃষ্ণসুন্দর ডাকলো—আসুন মাসীমা! আপনার সঙ্গে কাজের কথা আছে।

—কী বাবা! এগিয়ে আসতে আসতে চিন্তামণি বললেন।

—কাল থেকে আপনার বাড়ীতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় নাটকের মহড়া হবে। রাত বারোটা পর্যন্ত লোকজন থাকবে বাড়ীতে। কাজেই আপনার ভয় আর অতোটা থাকবে না! পুজো পর্যন্ত চলবে এভাবে। বলল কৃষ্ণসুন্দর!

—সেকি বাবা। তুমি কোথাও যাচ্ছো নাকি বিস্মিত ও কিছুটা শংকিত হয়ে চিন্তামণি জিজ্ঞেস

করলেন। মৃদু হেসে কৃষ্ণসুন্দর বলল—হ্যাঁ, মাসীমা! দশ বছরে কিন্তু আমি কলকাতা যাবো।

—ওর এ কথা শুনে তো ছাড়তে হলো এবার ভাবছি পরীক্ষাটা দিয়ে দি। সবিনয়ে বলল কৃষ্ণসুন্দর।

—তাই নাকি? খুব ভাল কথা। ভগবান তোমার মনোবাসনা পূর্ণ করুক। খুব খুশী হলাম কেষ্ট!… তা এতদিন বলনি কেন? চিন্তামণি বাস্তবিক খুশী হয়ে একথা বললেন।

—অভ্যেস মানুষ তো আপনি! কতদিন কত কথা বলেছেন, অথচ এ কথাটা বেমালুম চেপে গেছেন। আপনিও কম নন। মৃদু অভিযোগ জানিয়ে সুচারু বলল।

—তুই কি কলকাতার সংগেই ঝগড়া করিস নুনু?…শোন কেষ্ট। তবে তুমি এ কদিন সন্ধ্যেবেলায় এসো আমাদের বাড়ীতে। আরো অনেক কথা আছে তোমার সংগে। ছোট ছেলেটা বাড়ী আসছে না আজ আড়াই বছর হলো। এবার পূজোর সময় যেভাবেই হোক তাকে নিয়ে আসবে তুমি। চিন্তামণি বললেন।

—কেন? বাড়ী আসছে না কেন? জিজ্ঞেস করলো কৃষ্ণসুন্দর।

—সে অনেক কথা বাবা। কোনোদিকে আমার শান্তি নেই। এসো—সব কথাই বলবো তোমায় কাছে। বললেন চিন্তামণি।

চিন্তামণি রান্নাঘরের দিকে চলে গেলে দুর্গাদাসবাবু আক্ষেপ করে বললেন—তাহলে আমরা তোমাকে চিরতরেই হারাচ্ছি কেষ্ট?

কেন? দুর্গাদাসবাবুর কথার পৃষ্ঠে বলল সুচারু।

—নতুন গিন্নী। দুর্গাদাসবাবু বললেন—রাজার হোক তুমি ছেলেমানুষ। এম এ পাশ করার পর কৃষ্ণসুন্দরের মতো ছেলে তোমার জীবনগঞ্জের মুন্সেফী আদালতে ওকালতি করবে একথা পাগলেও বিশ্বাস করবে না।

আরও খুশী হয়ে সুচারু বলল…সে তো ভাল কথা।

ভালমন্দ বিচারটা সবার কাছে একরকম নয়, নতুন নয়, নতুন গিন্নী। কৃষ্ণসুন্দর জীবনগঞ্জ ছাড়লে উপায় কি হবে বল? একটু জল পেলেই শয়তানের দল আবার গজিয়ে উঠবে।…এসব কথাতো আমাকে ভাবতে হয়। দুর্গাদাসবাবু বললেন।

—আপনি মানুষটা বড় স্বার্থপর। সুচারু বলল।

এমন সময় কৃষ্ণসুন্দর লঘুভাবে হাসতে হাসতে সুচারুকে বলল—তোমরা কি দিনরাত এমনিভাবে ঝগড়া করো নাকি?

সুচারু কিছু বলবার আগেই দুর্গাদাসবাবু গদগদ কণ্ঠে বললেন—ভারে কৃষ্ণসুন্দর। আমার নাতনীটির মতো বুদ্ধিমতী মেয়ে আমার জীবনে আমি আর একটিও দেখিনি বয়স তো কম হয়নি আমার! বুদ্ধি বিবেচনা কাণ্ডজ্ঞান রুচি আচার ব্যবহার সর্ব বিষয়ে এমন চমৎকার মেয়ে চোখে পড়ে না। আমি বলছি—টুনু যদি লেখাপড়া শিখতে পারে আর যদি সংগ পায় তাহলে সারাটা দেশে তার সুনাম ছড়িয়ে পড়বে। এই মেয়েই একদিন হয়তো বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে। ছেলেদেরও তো দেখলাম। সবাই তো আমার হাতে মানুষ। ওর জুড়ি কেউ নেই।…আচ্ছা, আজ চলি নতুন গিন্নী। পুরোনো হলেও ব্রাহ্মণীকে তো একেবারে উপেক্ষা করতে পারি না। রাত অনেক হয়েছে। বাড়ী যাই এবার।—দুর্গাদাসবাবু কৃষ্ণসুন্দরকে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

—আসুন।—সলজ্জ হাসিমুখে সুচারু বললো—নিন। ব্রাহ্মণীর জন্যে ফুলগুলো নিয়ে যান। এই আপনার জয়মাল্য।

জয়মাল্যই যদি হয় নতুন গিন্নী, তাহলে আমার অংশীদার আছে। আধেক ফুল কেননা আমার সেনাপতিকে দিতে হবে। হাসতে হাসতে দুর্গাদাসবাবু বললেন।

সংগে সংগে সুচারু ফুলের গুচ্ছটিকে দুভাগে ভাগ করতে করতে রহস্যচ্ছলে বলল—বেশীর ভাগটাই বরং আপনার সেনাপতির প্রাপ্য? তিনিই আজ…

—তাই দাও। তবে একটু বেঁধে দাও। নইলে ব্রাহ্মণী বলবেন যে আমি কুড়িয়ে এনেছি। —তেমনি পরিহাসচ্ছলে বললেন দুর্গাদাসবাবু।

ডালপাতাসহ বেল ও দুই ফুলের দুটি তোড়া বেঁধে দুর্গাদাসবাবু ও কৃষ্ণসুন্দরকে দিল সুচারু।

বারো অধ্যায়

অভ্যাস মতো সেদিনও কৃষ্ণসুন্দরের ঘুম ভাঙলো অতি প্রত্যূষে। বিছানা ছেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে উঠানে নামতেই দেখা গেল একটি সুপরিচিত দৃশ্য—বাটি হাতে নিবারণ উঠান পরিষ্কার করছে। কৃষ্ণসুন্দরকে দেখেই নিবারণ ডেকে বলল—চোখে দেখো—ওদিকটায় —ঘাটির দিকে চেয়ে দেখো।

নিবারণের নির্দেশিত জায়গাটির দিকে কয়েক পা এগোতেই কৃষ্ণসুন্দরের নজরে পড়লো—পরিষ্কার উঠানের উপর অল্প কয়টি শেফালী ফুল ছড়িয়ে আছে।

ঝাঁটা হাতে এগিয়ে আসতে আসতে নিবারণ বলল —পারোনো শেফালী-গাছটার কথা মনে আছে তোমার? কতফুল ফুটতো তখন? একেকদিন সকালে সারা উঠানটা ছেয়ে যেতো। মনে নেই তোমার? কি রকম গন্ধ ছড়িয়ে পড়তো নদীর ঘাট পর্যন্ত।

—খুব মনে আছে। আবার তেমনি হবে! এরই মধ্যে ফুল ধরে গেল গাছটাতে। বলতে বলতে কৃষ্ণসুন্দর তরুণ শেফালী গাছটির দিকে সবিস্ময়ে তাকালো।

—কি রকম যত্ন করেছি আমি। দু'বছরের মধ্যে ফুল ধরে গেল। নিবারণ বলল। তারপর সে বিক্ষোভ প্রকাশ করতে করতে বলল—বেটারা এমন নচ্ছার, বাড়ীর গাছগুলো পর্যন্ত কেটে নিয়ে গেল।

—নিবারণদা! কৃষ্ণসুন্দর হাসতে হাসতে লঘুভাবে বলল—তুমি কি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এসব স্বপ্ন দেখ নাকি?

—দেখিই তো! এ বাড়ীর চেহারাটা আগের মতন না হওয়া পর্যন্ত আমার শান্তি নেই। নিবারণ বলল—আবার সেই চার ভিটের চারটে বড় বড় ঘর, জমিজমা—সবকিছু। এ সব দেখবার আগে যদি আমি মরে যাই, তবে আমার কলজেটা পুড়বে না দেখো।

বিক্ষুব্ধ নিবারণকে আশ্বাস দিয়ে কৃষ্ণসুন্দর বলল —কলকাতা থেকে ফিরে এসেই বাড়ীঘরের কাজে হাত দেবো আবার।···কিন্তু এ বাড়ীতে থাকবে কে?

—কেন? আমি থাকবো? এম-এ পাশ করে এসে তুমি তো জেলা সদরে ওকালতি করবে। মাঝে মাঝে আসবে এখানে।

নিবারণ বলল।

—ওরে বাবা! মনে মনে তুমি সব ঠিক করে রেখেছো। কিন্তু আমি যদি অন্য কিছু করি—ধর, যদি কলকাতায় থাকি? কৃষ্ণসুন্দর হাসতে হাসতেই বলল।

—কলকাতাতেই থাকো আর দিল্লীই থাকো—পৈতৃক ভিটায় কচুবন গজাতে দেবে কেন? লেখাপড়া শিখেছ বলে কি ধানদে হবে না? নিবারণ বলল ক্ষোভের সঙ্গে।

খুসী হয়ে কৃষ্ণসুন্দর বলল—আচ্ছা! আচ্ছা! সব হবে আবার। নদীর ধারে ভিটেটায় আবার আগের মতন বাংলো ধরনের দোতলা ঘরই হবে।··· শেফালী ফুল কটা আমার টেবিলের উপর রেখো দিয়ো নিবারণদা।··· আজ এ বেলা আর কোথাও বেরোবো না।

বলতে বলতে কৃষ্ণসুন্দর নদীতীরের দিকে এগিয়ে গেল।

মধ্য-ভাদরের প্রভাত। সবে মাত্র পূর্বাকাশে গাঢ় রক্তিম বর্ণের পরিমাণ নিজেকে সাজানো শেষ করেছে। বহুদূরে দিগন্ত রেখায় নবারুণের স্পর্শে উজ্জ্বল নীলিমার বুকে তুলির আঁচড়ে টানা মসলিনের ওড়নার মতো শরতের প্রথম কুয়াশার আভাসটুকু বুঝা যায়।

···সত্যিই তো! এমন আপনার ছায়েরা পৃথিবীতে আর কোথায় সে পাবে? আর কি সুন্দর এই নদীমাতৃক অঞ্চলটি—কোনো শিল্পীর সৃষ্টিতেই এর অপরূপ বিচিত্র মাধুর্য পুরোপুরি ধরা পড়েনি। এই সেই বকুলতলা—কতদিনের পুরোনো গাছ, কে জানে! ছেলেবেলার কোঁচড় ভরে কত ফুল কুড়িয়েছে কৃষ্ণসুন্দর। সেই আমেজমাখা গ্রীষ্মের সকাল, বকুলের গন্ধে মন উতলা—মাথার উপরে পাতার আড়ালে আড়ালে অজস্র মৌমাছির গুণ গুণানি। জীবনগন্ধের পূর্বস্মৃতিই তার জীবনের শৈশব ও কৈশোরের স্মৃতি। চিরকালের জন্যে এই মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা নিশ্চয়ই একটা ভয়াবহ দুর্ভাগ্য।

গুন গুন করে একটা প্রভাতী গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে কৃষ্ণসুন্দর এগিয়ে চলল নদীতীরের উঁচু সড়ক ধরে। বট-অশ্বত্থ-গাব তেঁতুল প্রভৃতির বিচিত্র

বনস্পতির ফাঁকা পার হয়ে কৃষ্ণসুন্দর প্রায় স্কুল-বাড়ীর কাছাকাছি এসে গেলো। ঐ দেখা যায় আকাশচুম্বী দেবদারুর সারি! গ্রীষ্ম ও পূজার ছুটি ঘোষণা করার দিন দুটিতে, ছেলেবেলায় দল বেঁধে কতবার ঐ দেবদারু গাছগুলোতে উঠে ডাল পাতা ভেঙে এনেছে স্কুল ঘর সাজাবার জন্য। ঐ যে সোনালি গাছগুলো এখনো আছে—হলদে হলদে সোনালি ফুলের গুচ্ছ দিয়ে কেমন সুন্দর তারা ক্লাসগুলো সাজাতো!

এই সেই জীবনগঞ্জের হাইস্কুল। এই অঞ্চলের বহু মানুষের মতো কৃষ্ণসুন্দরেরও জীবনের এক স্মরণীয় পীঠস্থান এই বিদ্যালয়টি। এর অপূর্ণতা, ত্রুটি, সবকিছু নিয়েই সে আজীবন স্মরণীয়। বৃহত্তর বিশ্বের সঙ্গে এ অঞ্চলের ভাগ্যবান মানবশিশুরা এরই মাধ্যমে প্রথম পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে।

আজকাল প্রতিদিন সকাল বেলায় হাঁটতে হাঁটতে এসব কথা মনে জাগে কৃষ্ণসুন্দরের। বহু স্মৃতি-বিজড়িত বিদ্যালয়টির ফটকের সামনে এসে দাঁড়ালো কৃষ্ণসুন্দর। এখানে দাঁড়ালে অতীতটাকে কেমন স্বপ্নের মতন মনে হয়। মনে পড়ে, প্রতি বছর পুরস্কার বিতরণী সভায় তার বাবা তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতেন। প্রতিবার দুটিনটি করে পুরস্কার জয় করতো কৃষ্ণসুন্দর।

একবার মনে পড়ে—সুচারুর মতলব সঙ্গে সুচারুও এসেছিল সভায়। এইখানে এই ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণসুন্দরের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে, নতুন নতুন বইগুলো গভীর কৌতূহলের সঙ্গে নেড়ে চেড়ে দেখেছিল সুচারু। সে বছর কৃষ্ণসুন্দর ম্যাট্রিক ক্লাসে উঠেছিল।

এই ফটকে কতবার সে পিকেটিং করেছে। একবার মনে পড়ে—রাস্তার উপর শুয়ে থাকার অপরাধে পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করেছিল।

দীর্ঘদিন পর। আবার সেই জীবনগঞ্জ, আবার সেই রাজনৈতিক জীবন—আবার সেই সুচারু। এই বোধহয় তার জীবনের খুব স্বাভাবিক পরিণতি—কৃষ্ণসুন্দর মনে মনে চিন্তা করলো।...

স্কুলের ফুল বাগানের পরিচিত মালীর কাছে চেয়ে, ডালপাতাসহ একগুচ্ছ সদ্য ফোটা সেলফুল হাতে নিয়ে, কৃষ্ণসুন্দর আবার ফিরে চললো বাড়ির দিকে—নদী-তীরের সেই চিরপরিচিত সড়কের পথ ধরে। কৃষ্ণসুন্দরের কণ্ঠে প্রভাতী সুরের গুণগুণানি তখনো থামেনি।

•

বাড়ি ফিরে, ভরা নদীর জলে হাত মুখ ধুয়ে কৃষ্ণসুন্দর বৈঠকখানার দরজা খুলে বসতেই, নিবারণ এক পেয়ালা চা, সকালের খাবার ও এক গ্লাস জল, টেবিলের উপর রেখে গেল। খোলা দরজা দিয়ে নদীর পর পারে—সবুজ ধান ক্ষেতের বিপুল সমারোহ শোভিয়ে, ঐ যে ঘন কাজল রেখার মতো গ্রামটির পেছনে সাদা সাদা মেঘের রাজ্যে উদীয়মান শারদ সূর্যের রঙের উৎসব দেখতে দেখতে চক্ষু জুড়িয়ে যায়, চা খেতে খেতে কৃষ্ণসুন্দর সেই দিকেই চেয়ে রইল মুগ্ধ নেত্রে। প্রভাতী সুরের রেশটুকু তখনো তার মন থেকে মিলিয়ে যায়নি। সদ্য তুলে আনা বেলফুলের গুচ্ছটি সে নিজেই টেবিলের উপর রেখেছে—এবং তার কথা মতো নতুন গাছের শেফালী ফুল কয়টি একটি চীনে মাটির ছোট রেকাবিতে রেখে গেছে নিবারণ।

চা খাওয়া শেষ করে, তেমনি গুণ গুণ করে প্রভাতী সুর ভাঁজতে ভাঁজতে, ইংরেজ কবি শেলীর রচনাবলী বার করে পড়তে বসতে যাবে কৃষ্ণসুন্দর—এমনি সময় নিবারণ এসে টেবিলের সামনে ঝুঁকো হাতে দাঁড়ালো—এবং কোনোরূপ ভূমিকা না করেই বলতে সুরু করল—সুগন্ধি ফুলের খুব ছড়াছড়ি দেখা যাচ্ছে। শিখানে ফুল, পৈথানে ফুল—এতো ফুল দেয় কে তোমাকে?

প্রভাতী সুরের স্বগত আলাপন থামিয়ে কৃষ্ণসুন্দর নীরবে তাকালো নিবারণের দিকে। বিগত সন্ধ্যায় সুচারুর দেওয়া বেল-যুঁই ফুলের বিবর্ণ তোড়াটি কৃষ্ণসুন্দরের সামনে তুলে ধরে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে নিবারণ জিজ্ঞেস করলো—কাল রাতে সুগন্ধি ফুলের তোড়া কে দিলো? আবার লাল ফিতের সুতো দিয়ে বাঁধা? শিয়রের বালিশের ধারে বিছানা তুলতে গিয়ে পেয়েছি?

নিবারণের ভাবভঙ্গী দেখে কৃষ্ণসুন্দর হকচকিয়ে উঠলো। ফ্যাল ফ্যাল করে সে তাকালো বিবর্ণ ফুলের তোড়াটার দিকে। সে বুঝতে পারলো যে, আবছা-

উপন্যাসের সেই নাগর পাড়ের বুড়োটা আবার তার ঘাড়ে চেপে বসতে আসছে।

কিছুটা বিরক্তি প্রকাশ করে কৃষ্ণসুন্দর বলল—এ সব তুমি কি বলছ, নিবারণদা? তুমি কি বুড়ো হওনি?

—বুড়ো হয়েছি বলেই এ সব কথা বলতে পারছি। লোকে বলবে যে, অমর কবিরাজের ছেলেটা একটা অপদার্থ, এ বদনাম আমি সইতে পারবো না। তোমার বাবা ছিলেন আমার গুরুদেব। নিবারণও রুখে দাঁড়ালো।

—নিবারণদা! ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল কৃষ্ণসুন্দর—বড় বেশী বাড়াবাড়ি হচ্ছে। কাল সন্ধ্যায় ওদের বাড়িতে সভা ছিল—সে তো তুমি জানো। সভার শেষে দুর্গাদাসবাবু টুনুর কাছ থেকে দুটো ফুলের তোড়া চেয়ে এনে একটা আমাকে দিয়েছেন। রাগারাগি করবার আগে তুমি বরং একবার যাও দুর্গাদাসবাবুর বাড়িতে। সকাল বেলায় হৈ-চৈ করোনা আমাকে বই পড়তে দাও একটু।

নিবারণ আরও উত্তেজিত হয়ে উঠলো—কি! পড়াশুনোর ক্ষতি করছি আমি? এই যে রোজ সন্ধ্যায় গিয়ে বড় বাড়িতে আড্ডা দেওয়া হচ্ছে, তাতে পড়াশুনার ক্ষতি হয় না? কৃষ্ণসুন্দর! আমি আজ গাঁয়ের লোক জড় করবো। কড়-বাবলা অগ্রাহ্য করে ছুটে যাও, ব্যাপারটা কি?

নিবারণের মোক্ষম অস্ত্রটি ব্যর্থ হতে পারে না। অপরাধীর মতো সকাতর অনুরোধ জানিয়ে কৃষ্ণসুন্দর বলল—দোহাই তোমার, নিবারণদা! আর চেঁচামেচি করোনা।

—কেন চেঁচামেচি করবোনা আমি?—নিবারণ দ্বিগুণ উত্তেজিত হয়ে উঠলো—মায়াবিনীর যাদু মন্ত্রে তুমি ফাঁদে পা দিচ্ছ। আর তা দেখে শুনেও আমি চুপ করে থাকবো? আমি জিজ্ঞেস করি, বড়-বাড়ির সঙ্গে আমাদের এতোখানি পরিচিতের দরকারটা কি?

—ইস! নিবারণদা! তুমি যা-তা বলছ!—কৃষ্ণসুন্দর বলল।

—আমি একা বলছি, কৃষ্ণসুন্দর? জীবনগঞ্জের বহুলোক এমনকি তোমার বন্ধুবান্ধবরা পর্যন্ত তোমার চলাফেরা নিয়ে কানাঘুসো করছে। সাহস করে সামনা-সামনি তোমাকে কেউ বলছেনা। নিবারণ বলল।

নিবারণের শেষ কথাটি শুনে কৃষ্ণসুন্দর চকিতের মধ্যে চমকে উঠলো। আর কোনো কথা বলল না সে।

আরও খানিকক্ষণ পর্যন্ত একা একা গজর গজর করলো নিবারণ। তারপর সে আক্রোশের সুরে বলল—এই সব মায়াবিনীরা কত রকম তুকতাক জানে। এই ফুলের মধ্যে কোন মন্ত্র ফুঁকে দিয়েছে কে জানে মানুষ পাগল করতে পারে এরা।

কৃষ্ণসুন্দর আর কোনো কথাই বলল না। নীরবে মহাকবি শেলীর কবিতার বইখানি খুলে উদ্দেশ্যহীন ভাবে পৃষ্ঠা উল্টাতে লাগলো।

একাকী কথা বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে নিবারণ অগত্যা তার কাছে চলে গেল। যাবার আগে পায়ের ছোবে ঢিল ছুঁড়ে, সুতোয় দেওয়া লাল রেশমে বাঁধা ফুলের তোড়াটি নদীর স্রোতে ভাসিয়ে দিল নিবারণ।

•

প্রায় ঘন্টাখানেক পর কৃষ্ণসুন্দর ডাকলো—নিবারণদা!

আবার দু'কথা বলে মনের কাল আরো খানিকটা মেটানো যাবে মনে করে, নিবারণ তার কাছ ফেলে ছুটে এলো।

—কি?—দরজায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল নিবারণ।

—শোনো—কৃষ্ণসুন্দর গম্ভীর ভাবে দৃঢ় কণ্ঠে বলল—পরীক্ষা দিতে গিয়ে কিছুদিন আমি থাকবো কলকাতায়।

খুব খুশী হয়ে নিবারণ বলল—খুব ভাল কথা। এ আপদ বিদেয় হোক জীবনগঞ্জ থেকে—তারপর আবার দেশে এসো। তা না হলে এই মায়াবিনী তোমাকে অনেক দুর্ভোগ ভোগাবে।...এই ঠিক। বাড়ি ঘর পাহারা দেবো আমি। তুমি আর সে বাড়ি মুখো পা বাড়াতে পারবে না। আমি পথের উপর পড়ে থাকবো কৃষ্ণসুন্দর।

আবার নিবারণ তার কাছে চলে গেল। খানিকক্ষণ পর আবার কৃষ্ণসুন্দর ডেকে বলল—নিবারণদা, শোন। আজ থেকে বাকি কয় দিন আমি নৌকায় থাকবো। বাড়িতে তালা লাগিয়ে চল, আজই নৌকায় উঠি।

—কেন? —নিবারণ জিজ্ঞেস করল।

—দীপালীর বেন আসা হচ্ছে না, মক্কেলদের জানিয়ে যাই সে কথা!...কটা দিন নৌকা বাস করা যাক, চল। বলল কৃষ্ণসুন্দর।

—ঠিক আছে। আজ সন্ধ্যের দিকে নৌকো ছাড়বো। দীনবন্ধুকে ডাকছি। বলে নিবারণ আবার চলে গেল তার কাজে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সুচারু আশা করেছিল যে কলকাতার দিকে রওনা হওয়ার আগে পর্যন্ত প্রতি সন্ধ্যায় কৃষ্ণসুন্দর তাদের বাড়িতে অন্ততঃ খানিকক্ষণের জন্য বেড়াতে আসবে। কিন্তু নাটকের সভার পরের সন্ধ্যাটিতেই কৃষ্ণসুন্দর অনুপস্থিত। সে দিনও কাছারী ঘরে লোক সমাগম হয় যথেষ্ট—অথচ কৃষ্ণসুন্দর আসে নি।

পরদিন বিকেল বেলায় সুচারু গিয়ে উঠলো বাড়ির ছাদের উপর—সঙ্গে নিত্য। মস্ত বড় ছাদ—ঘুরে ফিরে চারদিকে বহু দূর পর্যন্ত দেখা যায় এখান থেকে।

—সব চাইতে সুন্দর দেখায় কিন্তু নদীটাকে, না নেত্যদি? দেখো, সবুজ ধান ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে নদীটা কেমন এঁকে বেঁকে চলে গেলে। বেড়াতে বেড়াতে বলল সুচারু।

—ঐ বাঁকেই তো সুন্দরবাবুর বাড়ি। চোখ টিপে হেসে বলল নিত্য।

কৃত্রিম ক্ষোভ প্রকাশ করে সুচারু বলল—আজ ক'দিন ধরে তুমি বড় বেশী বাড়াবাড়ি করছ, নেত্যদি। তোমার মতলবটা কি বলত?

প্রত্যুত্তরে নিত্য কিছু বলবার আগেই সুচারুর দৃষ্টি বিদারস্তরে আকৃষ্ট হয়ে গেল। সবিস্ময়ে বলল সুচারু —দেখো তো নেত্যদি! আমাদের ঘাটে ওটা কার নৌকা লাগলো? ভারী সুন্দর নৌকাতো! মুখ দুয়ারে কেমন আয়না বসানো।

—কেউ কোনো সম্বন্ধ নিয়ে এলো কিনা, কে জানে? —নিত্য বলল হাসতে হাসতে।

—যাও! তোমার খালি ঐ এক কথা!—সুচারু বলল।

—কেন? বাড়ীতে উপযুক্ত মেয়ে থাকলে সম্বন্ধ আসবে না?

—নিত্যও দুষ্টুস্বরে অথচ সকৌতুকে বলতে লাগলো—

—এমন পরীর মতন মেয়ে, লেখাপড়া জানা, তার উপর বাপের এত টাকা! সম্বন্ধ আসবে না কেন? দেখো না, কত ভোমরা চারদিক থেকে ভোঁ ভোঁ করে উড়ে আসে। কর্তাদী ঘটক লাগিয়েছেন।

সুচারু এবং নিত্য দুজনেই গভীর আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করছে, নবাগত সুগঠিত নৌকাটি থেকে কি রকম অতিথিরা নামছেন। প্রথমে নামলো দুজন বন্দুক-ধারী দেহরক্ষী—তারপর নৌকার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো স্বয়ং রাইমোহন পোদ্দার এবং সভার শেষে বাইরে এসে দাঁড়ালো প্রাণেশবাবু। গলায় সিল্কের চাদরটি পরিপাটি করে মোড়াতে মোড়াতে প্রাণেশ একবার বাড়ীর ছাদের দিকে তাকালো।

—হিঃ! হিঃ! আমাদের দেখেই ফেলেছে। বলতে বলতে সুচারু দৌড়ে সরে এলো ভেতরের দিকে।

মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হাসতে হাসতে নিত্য বলল বোধহয় সম্বন্ধের প্রস্তাব নিয়েই এসেছেন পোদ্দারমশাই। যাই আমি। নতুন ভিয়ার করে শালাকে সংগে নিয়ে এসেছেন।

ক্ষিপ্র গতিতে নিত্য নীচে চলে গেল।

• •

সুচারুর মনের মধ্যে একটা অপ্রীতিকর চিন্তার আলোড়ন সৃষ্টি করে দিয়ে নিত্য নীচে নেমে গেল। সত্যিই তো। প্রাণেশকে সংগে নিয়ে আজ এবাড়ীতে রাইমোহনের এভাবে হঠাৎ আবির্ভাবের কারণটা কি। সুচারুর মন ক্রমশঃ উদগ্রীব হয়ে উঠতে লাগলো—নীচের খবর জানবার জন্য।

আকাশে তখন পড়ন্ত রোদের ঝিকিমিকি সুরু হতে যাচ্ছে। স্বচ্ছ নীল শরতের আকাশ—সাদা সাদা হাল্কা মেঘের মিছিল ছুটেছে নদীর চলচলে স্রোতরেখার উপর দিয়ে—ঐযে, ঐ বাঁকে—ঐ যে কদম গাছটা দেখা যায়, ঐখানটায়ই কৃষ্ণসুন্দরের আস্তানা।

—আমি ঠিক বলেছি। বলতে বলতে আবার নিত্য

ছাদের উপরে ছুটে উলো।

ফিরে দাঁড়ালো সুচারু।

—যা বলেছি তাই। শালাকে নিয়ে পোদ্দারমশাই সরাসরি কর্তানীর ঘরে ঢুকলেন। বাবা! কি দেখে-শুনে এসেছেন ভদ্রলোক। দুহাতের আঙুলগুলোতে কত রকমারি আঙটি—নিত্য সবিস্তারে বলল।

—কোন কথাবার্তা শুনেছ তুমি। সুচারু জিজ্ঞেস করল।

—কথাবার্তা এখনো সুরু হাবভাব দেখেই বুঝতে পেরেছি—

—নিত্য হাসতে হাসতে বলল।

—অত বেশী বুঝে কাজ নেই গোপালের মা। সুচারু বলল বিরক্তি প্রকাশ করে। যাও। তুমি নীচেই যাও। একুণি ডাক পড়বে তোমার।

ঠোঁট ঘুরিয়ে হাসতে হাসতে নিত্য আবার নীচেই চলে গেল।

আজ সকাল থেকেই সুচারুর মন বিরক্তিতে ভরা ছিল। কিন্তু নিত্যর মুখে রাইমোহন পোদ্দারের অভিসন্ধির কথা শুনে তার মনটা একেবারেই বিগড়ে গেল। মনের সহজ কবিত্ব দিয়ে দেখলে—এই মুহূর্তে সুচারুর চোখের সামনে অফুরন্ত সৌন্দর্যের জগৎ ছড়িয়ে রয়েছে। দূরের পশ্চিম দিগন্তে রক্তমেঘের খেলা জমেছে। জীবনগঞ্জের আবাল্য পরিচিত প্রিয় নদীটি, ভরা ভাদরের প্রাচুর্যে, পূর্ণ কলেবর হয়ে ছুটে গেছে একেবারে সূর্যাস্তের সীমানা পর্যন্ত। অফুরন্ত সবুজের রাজ্যে এরা যেন শক্তিমান প্রহরী। গ্রামের আশেপাশে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী উড়ছে। ছোট বাদ না দেওয়া নদীটির কালো জলের বুকে, মেঘ লোকের রক্তরাগ প্রতিফলিত হয়ে ঝলমল করছে।...কিন্তু এমত কোনো কিছুই আজ সুচারুর কবিমনকে আকর্ষণ করতে পারলো না। সারাটা মনে সে তীব্র অস্বস্তি অনুভব করতে সুরু করলো।

•

নিত্য ফিরে আসতে আসতে সূর্য অস্ত গেল। ছাদের উপর থেকে দেখা যায়, দূরে পল্লীগুলোতে একটি দুটি করে প্রদীপ জ্বলে উঠেছে। নদীর বুকে মাঝিরাও যে যার ডিঙিতে বাতি জ্বালছে। সুচারু এক ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো রেলিং-এ হেলান দিয়ে। সূর্যাস্তের সংগে সংগেই শারদ শুক্লপক্ষের চাঁদের আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

—যা বলেছিলাম তাই। চা, জলপান খাইয়ে কুটুম বিদেয় করে এলাম। এক গাল হেসে বলতে বলতে নিত্য আবার ফিরে এলো সুচারুর কাছে।

—তুমি সত্যি বলছ নিত্যদি? সুচারু জিজ্ঞেস করল।

—হ্যাঁগো। আরেকদিন তোমার মার সংগে ফিস-ফাস করে গেছেন পোদ্দারমশাই। আমি একটু আঁচ করেছিলাম। আজতো নিজের কানেই শুনে এলাম। নিত্য বলল।

—কি শুনলে? সুচারু আবার জিজ্ঞেস করল।

—সব কথাই শুনেছি। বললাম তো। নিত্য আবার বলে চলল—আমি কাচের আড়িলার আউলি বাউলি করে ওঘরে গেছি বারবার। সবই বুঝে এলাম। তবে তোমার মা কিছুই বলেন নি।

—কিছু বলেন নি মা? সুচারু জানতে চাইলো।

—ঐ খালি কুশল সংবাদ জিজ্ঞেস করলেন। আর আদর যত্ন করে খাইয়ে দিলেন। নিত্য জানালো।

—রাইমোহন পোদ্দারের দুরাশাতো কম নয়। সুচারু বলল প্রায় আপন মনে।

—দুরাশা কেন বলছ? নিত্য বলল মৃদু প্রতিবাদের সুরে।

—তুমি ক্ষেপেছ গোপালের মা? মা কখনো রাজি হতে পারে এতে। সুচারু বলল।

—কিন্তু তোমার বাবা। তিনিই তো কর্তা—পোদ্দারমশাই সব দিক হিসেব করেই এসেছেন মনে রেখো নিত্য বলল।

—তোমার মনে হয়, বাবা রাজি হয়ে যাবেন। সুচারু ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল।

নিত্য গম্ভীর ভাবে বলল এবার—আমার তো মনে

হয় ভাই। কেন রাজি হবেন না বল। তোমাদের পাল্টা ঘরেদি ঘর। এঁরাও সাত পুরুষের ধনী। শুনেছি বি-এ পাশ!···এই অবস্থায় তোমার বাবা, সোদার মশাইর কথা ঠেলবেন কেন? হাজার হোক আত্মীয়—একেবারে ফেলনাও নয়।···তোমার বাবাকে আমি ভাল করেই জানি।

ভাদর মাসের স্বচ্ছ নীল আকাশ মাথার উপর। অবাধ জ্যোৎস্নার দিক-দিগন্ত প্লাবিত। সুচারু তেমনি রেলিং ধরে চুপ করে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

নিত্য আবার বলতে সুরু করলো—টুনু! তোমাকে আজ আমি দু'চারটে কথা বলতে চাই। তোমাকে আমিও লালন পালন করেছি। আমার কথা কয়টি শোনো আজ।

নিত্যর অনুনয়ে সুচারু ফিরে তাকালো। নিত্য বলে চলল—শোনো! তুমি মনে মনে যা ভাবো, তা কোনোদিন হবেনা, হতে পারে না।

—কেন পারে না, নেত্যদি। সুচারু সলজ্জ ভাবে ভয়ে ভয়ে বলল।

—পারে না, তার অনেক কারণ। নিত্য বলতে লাগল, তুমি তোমার বাবার একমাত্র মেয়ে। নিজের দালানের কার্নিশের সঙ্গে কার্নিশ মিলিয়ে, তবে তিনি তোমায় বিয়ে দেবেন। এ তোমার যাত্রা-থেটারের গল্প নয় যে, রাজকন্যা বিয়ে করল কাঠুরিয়ার ছেলেকে। কি বল তুমি?

—কিন্তু সোপালের মা। সুচারু কিছু বলতে চাইলো।

তাকে বাধা দিয়ে নিত্য বলল, কিন্তু আবার কি? খাঁটি কথা! তোমার বাবাকে তুমি জানোনা? হাড়ে হাড়ে বুঝেছি।

সুচারু জানতো যে, তার বাবার উপর এই নিত্যদির কিছুটা প্রভাব খাটে। তাই সে কিঞ্চিৎ অনুনয়ের সুরে বলল, কিন্তু এমন মানুষ সহজে পাওয়া যায় না, নিত্যদি। লোকটা একেবারে বর্ষার জলের মতো সহজ, সুন্দর।

—সব বুঝি! উচ্চ শিক্ষিত! পুরুষের মতো পুরুষ। আর মানুষও বটে।···তবু হবে না। কাজেই তোমাকে আমি ভালোর জন্যে বলছি, তুমি এই পাগলামি ছেড়ে দাও। মেয়ে-জীবন নিয়ে জন্মেছ! একবার যদি কুমারী জীবনে তোমার কলঙ্ক রটে, সারাটা জীবন তোমাকে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। লেখা পড়া জানিনে বলে, আমার কথাটা তুমি উড়িয়ে দিয়োনা, টুনু!

নিত্যর যুক্তি পূর্ণ কথার পৃষ্ঠে আর কোনো কথা বলল না সুচারু; সে নীরবে নীচের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

নদীর দিক থেকে কুর কুরে হাওয়া বইছে ছাদের সর্বত্র। মৃদু বাতাসে সুচারুর কানের দু'পাশের চুলগুলো উড়ছে। এই সুন্দরী মেয়েটিকে রাইমোহন সোদ্দারের শালা প্রাণেশ্বরের সঙ্গে মানাবে কি? লোকটার বয়স যেন একটু বেশী, এত সাজ গোজ করা সত্ত্বেও বয়সটা পুরোপুরি ঢাকা পড়েনি।

—তাইতো! লোকটার বয়স যেন একটু বেশী মনে হলো। নিত্য বলল।

সুচারু ফিরে তাকালো নিত্যর দিকে। সত্যি ভারী মিষ্টি চেহারা এই মেয়েটির। বিগত দিনে নিত্যও ছিল অপরূপ রূপসী, গরীবের ঘরে জন্মানো সত্ত্বেও তার রূপের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। সে সব দিনের কথা মনে পড়লো নিত্যর। সুচারুর দিকে তাকিয়ে তার মনে হলো, যেন কৃষ্ণসুন্দরের সঙ্গেই ওকে মানাবে বেশী। উঠতি বয়সের ছেলে, কাঁচ বাঁশের মতো গায়ের গড়ন। অনেকক্ষণ চিন্তা করে নিত্য ফিস ফিস করে বলল, একটা উপায় হতে পারে, টুনু! একেবারে অসম্ভব নয়।··· শোনো। নিত্যর কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন লক্ষ্য করে, সুচারু ভয়ে ভয়ে মৃদু কণ্ঠে বলল, কি?

—তোমার মা প্রায়ই বলতেন, "আমার বাপের সম্পত্তিটা আমি আমার মেয়েকেই দিয়ে যাবো।" তাই যদি দেওয়া হয়, তবেই ল্যাঠা চুকে যেল।

চকিতের মধ্যে সুচারুর মন আবার আশায় উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সে বলল, নিত্যদি! আমি আর কিছুই চাই না। এমন লোকের সঙ্গে গাছতলায় বাস করেও আমি সুখে থাকবো। তুমি যদি বাবাকে একবার বুঝিয়ে বল।

নিত্য আর কিছু বলল না। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে সে বলল, চল এবার নীচে যাই। রাত্রি কাল,

তোমাকে একটা ছাদে ফেলে যেতে পারবো না। চল।

—আরেকটু দাঁড়াও, নেবাদি। ভারী ভাল লাগছে এখানটায়।

—সুচারু বলল।

ঠিক এমন সময় পা টিপে টিপে ছাদে উঠলেন দুর্গাদাসবাবু—উঠেই ডাকলেন—টুনু!

—একি! আপনি এখানে—ছাদের উপর? সুচারু বিস্মিত স্বরে জিজ্ঞেস করল।

—সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে হাঁপিয়ে পড়েছি। আর তোমাদের ঘা খাড়া খাড়া সিঁড়ি।...কিন্তু সংবাদ গুরুতর। বলতে বলতে হাতের লাঠিটি ছাদের উপরে রেখে, বসে পড়লেন দুর্গাদাসবাবু।

সুচারু ও নিত্য কাছাকাছি এলে তিনি বললেন—গুরুতর সংবাদ।

—বলুন না? সুচারু জিজ্ঞেস করলো।

—আমার প্রধান সেনাপতি কৃষ্ণসুন্দর নিরুদ্দেশ। দুর্গাদাসবাবু বললেন।

—মানে? সুচারু চমকে উঠলো—কি বলছেন আপনি।

—শোনো! বসো এখানে! সব বুঝিয়ে বলছি। দুর্গাদাসবাবু হাঁপাতে হাঁপাতে সুরু করলেন—আমি ত বিরাট এক প্রোগ্রাম নিয়েছি। পাকের সময় যাত্রা-থিয়েটার-কীর্তন-বাউল গান সব এক সঙ্গে লাগানো যাবে—এ কথাতো পাঁচজনের সামনে বৌকের মাথায় বলে ফেলেছি। টাকা যা লাগে আমি দোবো, তাও কিন্তু বলেছি কার ভরসায়? কৃষ্ণসুন্দরের কি উচিত হয়েছে এ ভাবে ঘাপটি মারাটা? তোমার কাছে বলে গেছে কিছু?

আমার কাছে? কি বলছেন, দাদু! আমি যে এর বিন্দুবিসর্গও জানিনে। সুচারু বলল, সেদিন তো আপনার সামনেই মাত্র সন্ধ্যে ওঁর কথা হলো। রোজ সন্ধ্যায় আমাদের বাড়ীতে একবার করে আসবেন বলে কথা দিয়ে গেলেন পর্যন্ত।

শোনো! কাল আসেনি বলে, আজ আমি লোক পাঠাই বিকেলের দিকে নেতা-মহারাজের বাড়ীতে। সেই লোক এইমাত্র ফিরে এসে বলল—

কি বলল?

বলল বাড়ীতে কেউ নেই। ঘরের দরজায় তালা লাগানো। পাড়ার লোকেরা কেউ কিছু বলতে পারলো না। দুর্গাদাসবাবু বললেন।

বলেন কি? পুলিশে ধরেনি তো, রাত্রি বেলায় এসে—সুচারু ব্যগ্র কণ্ঠে বলল।

বিচিত্র কি! ইতিহাসে তো অনেক গুণ। নিঃস্পৃহ ভাবে বললেন দুর্গাদাসবাবু।

দাদু! সুচারু অনুরোধ করে বলল, যে ভাবেই হোক ওঁর খবর আনতে হবে। আমার ভয়ানক সন্দেহ রাজীবলোচন শোভার সেদিন কেমন শাসিয়ে গেছলো, মনে আছে?

খুব মনে আছে দাঁড়াও। থানায় এখনি পাঠাচ্ছি, বললেন দুর্গাদাসবাবু উঠতে উঠতে।

থানায় আপনি নিজে যান, দাদু। আর ওঁর বন্ধুদের কাছে লোক পাঠান। সুচারু মৃদু নির্দেশের সুরে বলল।

ওর বন্ধু কি এক জন? কীরনগাছার চারদিকে প্রতিটি গ্রামে ওর বন্ধু। তাই আমি সব লিস্টি করে লোক পাঠাবো। বলতে বলতে দুর্গাদাসবাবু ফিরে চললেন।

নিত্যাদি? চলো মাকে জানাই গিয়ে। ভারাক্রান্ত মনে বলল।

চল।

নিত্য ও সুচারু আবার নীচে নেমে গেল।

চতুর্দশ অধ্যায়

ডাকাতের বিলের গুপ্ত বৈঠকে, দরবেশ ও অন্যান্য কর্মীদের সামনে কৃষ্ণসুন্দর কথা দিয়েছিল যে কলকাতা রওনা হওয়ার আগেই সে এ অঞ্চলে কৃষক-সংগঠন গড়ে তোলার প্রাথমিক কাজগুলো শেষ করে যাবে। কিন্তু সে কাজে হাত দেওয়া হয় নি। মন্ত্রেলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করার সঙ্গে সঙ্গে এই কাজটাও শেষ করবার সংকল্প নিলো কৃষ্ণসুন্দর। যে সময় দুর্গাদাসবাবুর মুখে নাটকীয় ভাবে তার নিরুদ্দিষ্ট হওয়ার সংবাদ

শুনে সুটোবু নিশ্চিত ও ভীত হয়ে পড়ছিল, ঠিক সেই সময় কৃষ্ণসুন্দরের নৌকাটি লাগছিল সোনাচরের মহেন্দ্রদের বাড়ীর ঘাটে। আজ সোনাচরের বটতলায় গ্রামবাসীদের বৈঠক।

সোনাচরের ঘরে ঘরে তখন তাঁত চলছে পুরোদমে। ঠকাঠক শব্দে গোটা গ্রামটা মুখরিত। কৃষ্ণসুন্দরের নৌকার মহেন্দ্র উঠে বসলে সে জিজ্ঞেস করল—লোকজন আসবে তো বৈঠকে?

—ঘর পিছু একজন করে আসবেই। তাঁত বন্ধ করে সবাই আসতে পারবে না।...ও পাড়ার চাষীদেরও বলছি। ওরা আসবে সবাই। ওদের তো এখন কোনো কাজ নেই—পাট কাটা শেষ। কৃষ্ণসুন্দরকে উৎসাহ দিয়ে মহেন্দ্র বলল।

—চল, বটতলার দিকেই যাওয়া যাক। তোমার বাবার সঙ্গে কিছু কথা বলতে হবে। বলল কৃষ্ণসুন্দর।

সোনাচরের বটতলার দিকেই নৌকা ভাসানো হলো।

• •

একবার গাছ তলায় বসতে পারলে শিষ্য সেবকও কিছু জুটে যায়। মহেন্দ্রর পিতা পীতাম্বর কাবিগর সংসার পরিত্যাগ করেছেন মাত্র আড়াই মাস আগে। তাও তিনি বেশী দূরে যান নি—গ্রাম-প্রান্তের বটতলায়ই আগুনের ধুনী জ্বালিয়ে বসেছেন। তবু এরই মধ্যে জন কতক অনুরক্ত ভক্তের যাতায়াত সুরু হয়েছে বটতলায়। ভক্তরা মিলে মিশে চেষ্টা করে পীতাম্বর সাধুর কুঁড়ে ঘর খানি শক্ত করে বেঁধে দিয়েছে। গাঁয়ের কর্মকার ভক্তরা বানিয়ে দিয়েছে একটা বেশ বড়-সড় ত্রিশূল। এমন কি সাধুর খোরাকি আজকাল জুগোচ্ছে ভক্তগণই।

আক্ষেপ করে মহেন্দ্র বলল বাল্য বন্ধুর কাছে—বেশী দিন এভাবে থাকলে বাবা বোধহয় আর ঘরেই ফিরবেন না। ওর ভক্তরাই ওকে আর ঘরে ফিরতে দেবে না। দেখো না, এরই মধ্যে দোতারা খঞ্জনী নিয়ে এসে, বসে গেছে সব। রোজ সন্ধ্যেবেলায় এখানে বাউল গানের আড্ডা বসে।

ডিঙিতে বসে বটতলার দিকে তাকালে, দূর থেকেই দেখা যায় পীতাম্বর সাধুর আস্তানাটি। জোছনা রাত হওয়া সত্ত্বেও বটতলাটায় অন্ধকার। সাধুর কুঁড়ে ঘরের দরজায় একটা কেরোসিনের ডিবা জ্বলছে—সামনেই আগুনের কুণ্ড। পীতাম্বর সাধু পাশে তলায় একটি মাটির বেদীর উপর বসেছেন—বোধহয় ভক্তদের সঙ্গে তত্ত্বালাপ করছেন তিনি। সাধুর পাশে বেদীর উপর খান কতক পুরোনো বইও দেখা যায়।

পীতাম্বরের চুল দাড়ি এখনো ছোটই আছে। কপালে রক্তচন্দনের তিলক, পরিধানে রক্ত বস্ত্র—তিনি শৈব।

বটতলার ঘাটে ডিঙি ভিড়িয়ে কৃষ্ণসুন্দর গেল সাধুবাবার কাছে। নিরাভরণ এবং দীনবন্ধু মাঝিও সঙ্গে গেল নতুন সাধুকে একবার দেখে আসতে।

মহেন্দ্র বলল—বাবা! এই যে উকীলবাবু, আমার বাল্য বন্ধু। তোমার সঙ্গে গুটি কয় কথা বলবেন।

—আমাকে কেন বিরক্ত করছো? আমি এখন গান-কীর্তন নিয়ে বসবো। বিরক্তি প্রকাশ করে পীতাম্বর বললেন।

কৃষ্ণসুন্দর সবিনয়ে বলল—রাইমোহন সোদ্দার যখন নালিশ করেছে, আপনাকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করতেই হবে।

—সে ব্যবস্থা আমি করেই এসেছি, বাবা! সমস্ত জমি জমা আমি মহেন্দ্রের মার নামে দান পত্র করে দিয়েছি।...বলবে যে কাজটা আমি অন্যায় করেছি। আমি তাই সারা জীবন গাছ তলায় বসে প্রায়শ্চিত্ত করবো। দেখা যাক, ভবের পাড়ি দিতে পারি কিনা? পীতাম্বর সাধু বললেন।

—কিন্তু মহেন্দ্রকে বাঁচাতে হবে তো? কৃষ্ণসুন্দর হাসতে হাসতে শান্ত কণ্ঠে বলল।

—আসল কথা হলো, আমার আর সংসারে স্পৃহা নেই, বাবা।

—পীতাম্বর সাধু উদাসীন ভাবে বললেন—এ জীবনে সোনার মেডেলও পেয়েছি—আবার গাছতলায় বসেও দেখবো, কোন খানে সুখ বেশী। বাকি কটা দিন আর জড়াতে চাই না। লাল কাপড় পরে আর আদালতে যাব না।

দু-একজন ভক্ত এই সময় গদ গদ কণ্ঠে বলে উঠলো—জয়গুরু! জয়গুরু!

—কিন্তু আপনাকে যে আদালতে যেতেই হবে, খুড়ো মশাই! রাইমোহন সোদ্দার টানবে আপনাকে।

কৃষ্ণসুন্দর জোর দিয়ে বলল।

—কেন? —পীতাম্বর চমকে উঠলেন।

—রাইমোহন পোদ্দার প্রমাণ করবার চেষ্টা করবে যে আপনি ঋণের দায়ে সংসার ত্যাগী হয়েছেন। স্পষ্ট ভাবেই বলল কৃষ্ণসুন্দর।

কৃষ্ণসুন্দরের কথা শুনে পীতাম্বর সাধু সহসা কোনো কথা বলতে পারলেন না। ভ্রূ দুটি কুঞ্চিত করে তিনি মাটির দিকে চেয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। তারপর প্রায় স্বগত ভাবে বললেন—আমার নামে মিথ্যা দলিল দিয়ে আবার আমাকেই প্রবঞ্চক বানাতে চায়?

—এই তো অবস্থা! কাজেই আপনাকে রুখে দাঁড়াতেই হবে। আপনি আদালতে গিয়ে সত্য কথাটা বলতে পারবেন না কেন? —কৃষ্ণসুন্দর কিঞ্চিৎ উত্তেজিত হয়ে বলল।

—আদালত হলো মিথ্যার বাজার! ওই নরককুণ্ডে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না।···তবু যাবো। কিন্তু কি করে প্রমাণ করবো যে দলিল মিথ্যা?—পীতাম্বর বললেন।

—সে ভার আমি নিচ্ছি। আপনি কেবল সত্য কথা বলতে রাজি হোন। বলল কৃষ্ণসুন্দর।

—বললাম তো! যাবো আদালতে। পীতাম্বর বলল এই ঝামেলাটা মিটে গেলেই বরং লোকে বুঝবে, আমি কি ঋণের দায়েই ঘর ছেড়েছি—না আমার নিজের সত্যি কিছু আছে।

• •

সোনাচণ্ডের যে কয়জন লোক সে দিন বটতলার বৈঠকে এসেছিল, তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে কৃষ্ণসুন্দর আবার তার ডিঙিতে ফিরে এলো।

রাত তখন প্রায় দশটা। জীবনগঞ্জের ছোট নদীটির অপর পাড়ে, সোনাচণ্ডের কাছাকাছি একটি ফাঁকা জায়গায়, কৃষ্ণসুন্দরের নৌকা লগি পুঁতে জলের উপর বাঁধা হয়েছে। নদীর কূল ছাপিয়ে বর্ষার জল মাঠের উপর তিনচার হাত দাঁড়িয়ে গেছে। ভরা ভাদরের ভরা নদী, শুক্লপক্ষের রাত—দিগন্ত পর্যন্ত পরিচ্ছন্ন জোছনায় প্লাবিত।

কৃষ্ণসুন্দরের নৌকাটি তিনজন লোক থাকার পক্ষে যথেষ্ট বড়। নৌকার মধ্যেই রান্না-বান্না, নৌকার মধ্যেই জীবন। মন্দ লাগছেনা কৃষ্ণসুন্দরের কাছে। কটি দিন সে বেশ পড়াশুনো করতে পারছে।

প্রতিদিনের মতো সেদিনও কৃষ্ণসুন্দর খাওয়া-দাওয়ার পর আবার লণ্ঠন জ্বালিয়ে পড়তে বসল। নৌকার ছৈটিও বেশ শক্ত এবং প্রশস্ত। ছৈ-এর ভেতর বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে কৃষ্ণসুন্দর বই পড়ছে। পেছনের গলুইয়ের দিকে বসে নিবারণ ও মাঝি দীনবন্ধু খাওয়া-দাওয়ার শেষে বাসনপত্র মুছিয়ে এবং প্রচুর জলে পাটাতন ধুয়ে, ভাল করে মুছে তামাক খেতে বসেছে।

নিবারণ খুব মনমরা হয়ে পড়েছে। সেদিনের সেই ঝগড়া-কাঁটির পর থেকে কৃষ্ণসুন্দর আর তার সঙ্গে ভাল করে কথাই বলছেনা—তাকাচ্ছেও না তার দিকে। পড়াশুনোর অছিলায় সারাদিন পাশ কাটিয়ে থাকে—সন্ধ্যে বেলায় ঘাট মক্কেল সাড়ায়—তারপর এসে আবার বই নিয়ে বসা। ভাল লাগছেনা নিবারণের। দীনবন্ধুর হাতে হুঁকোটা দিতে দিতে নিবারণ বলল—এমন চাঁদনী-রাত! ঘুমাই কি করে, দীনবন্ধু?

—তাহলে দোতারা নিয়ে বসোনা একটু!—দীনবন্ধু প্রস্তাব করলো।

—নাঃ! দেখতে পাচ্ছিস না, পড়তে বসেছে!—কৃষ্ণসুন্দরের দিকে ইঙ্গিত করে নিবারণ বলল।

নিবারণের কথা কানে গেল কৃষ্ণসুন্দরের। লণ্ঠনটি নিবিয়ে দিয়ে সে শুয়ে পড়লো এবং নিবারণকে উদ্দেশ্য করে বলল—গাও তোমরা। আর পড়বোনা আজ।

অল্পক্ষণ নীরব থেকে নিবারণ বলল—গান থাকরে আজ, দীনবন্ধু! গল্প বলি শোন। চাঁদনী রাতে আমার গল্প বলতে ইচ্ছা করে। বহুদিনের অভ্যাস কিনা!

নিবারণের কণ্ঠস্বরের আবেগটুকু কৃষ্ণসুন্দরের মনকে স্পর্শ করলো। তার মনে পড়ে গেল দূর শৈশবের কথা। কত রূপকথা শুনেছে সে এই নিবারণের মুখে। নিবারণের সঙ্গে এই বিচ্ছেদ কৃষ্ণসুন্দরের কাছেও ভাল লাগছিল না। উৎসাহ দিয়ে বলল সে—গল্পই বল, নিবারণদা। আমিও শুনবো।

ঠিক এই কথাটাই নিবারণ প্রত্যাশা করছিল কৃষ্ণসুন্দরের কাছে। রাগের মাথায় সে নাহয় দুটি কড়া কথা বলেই ফেলেছে—তার জন্যে এই 'বয়কোট'? আজও সে অনেক কষ্টে শ্রীমানের জন্যে সুস্বাদু টাকা চাঁদা যায়

যোগাড় করে এনেছে। খুশী হয়ে নিবারণ বলল—তাহলে শোন, দীনবন্ধু! আর একটু তামাক লাগা। শোন! এ কোনো বানানো গল্প নয়। জীবনগঞ্জের মানুষের কথাই বলছি। মানুষ কি ভাবে পাগল হয় শোন!

—বলো।—তামাক সাজতে সাজতে দীনবন্ধু বলল।

নদীর বুক থেকে এদিকটায় ফুর ফুরে হাওয়া আসছে। বালিশে মাথা রেখে কুঞ্জসুন্দর চোখ বুজে শুয়ে শুয়ে, নিবারণের গল্প শুনতে প্রস্তুত হলো। সে বুঝেছে যে, নিবারণ উদ্দেশ্যবিহীন গল্প বলবেনা।

—শোন্, দীনবন্ধু! আমাদের গঞ্জের গোবর্দ্ধন হ্যাংকড়া পাগল হয়ে গেছলো জানিস?—নিবারণ জিজ্ঞেস করলো!

—হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখেছি ওকে! বাজারে গাছতলায় বসে বিড়বিড় করতো।—দীনবন্ধু সায় দিয়ে বলল।

—খালি বলতো—"হায়রে! কি করলাম!" এই ছিল কথা। এই ছিল পাগলামি।—নিবারণ বলল—বলি, শোন। ঢাকার নবাবদের একটা কাছারী বাড়ি ছিল শ্রীরামপুরে—সেখানে সে সোনারুপোর কাজ করতো। ভাল কারিগর ছিল গোবর্দ্ধন। শ্রীরামপুরের নবাবী সেরেস্তার বড় বড় আমলাদের বিবিরা ওকে ছাড়া আর কাউকে দিয়ে গয়না গড়াতেন না। এমনকি ঢাকার নবাববাড়ির বেগমদেরও একবার চিকচন্দ্র হার গড়িয়ে দেয়। নাম করা কারিগরি ছিল গোবর্দ্ধন।

—গল্পোটা বলনা। হুঁকোটা সসম্ভ্রমে এগিয়ে দিতে দিতে দীনবন্ধু বলল।

—গোবর্দ্ধনের অবস্থা ছিল বেশ সচ্ছল। জমিজমা, গরুবাছুর, বাড়ি, পুকুর সবই ছিল তার। নিবারণ আবার সুরু করলো। চৈত্রমাসে বাসন্তী পুজো হতো ওর বাড়িতে—ওটা ছিল গোবর্দ্ধনের বার্ষিক পুজো। সে বছর বাসন্তী পুজোর আগের দিন শ্রীরামপুর থেকে সে জীবনগঞ্জে আসছে নিজের বাড়িতে। পথেই পড়ে ডাকাতের বিল।

—তা পড়ে। দীনবন্ধু বলল।

—শোন বলছি, ডাকাতের বিলের ওদিকটায় ছিল এক রাজবাড়ি সে সব অনেক দিন আগেকার কথা। শেষ পর্যন্ত, রাজবাড়িটা নষ্ট হয়ে যায়। রাজাদের ঘর ভর্তি সব মোহর 'যখের ধন' হয়ে পড়ে। বুঝলি তো?

—বুঝেছি! সব দেবাংশী হয়ে গেল আর কি। দীনবন্ধু বলল।

—হ্যাঁ! দেবাংশী হয়ে এনারা সব বিলের মধ্যে আশ্রয় নিলেন।

—গোবর্দ্ধনের কি হলো? দীনবন্ধু মনে করিয়ে দিল।

—গোবর্দ্ধন তো বাড়ি আসছে। নিবারণ আবার সুরু করলো—ডাকাতের বিলের এ পাশ দিয়ে পথ। সে সময় বিলের এ ধারটায় একটা পদ্মবন ছিল। হাঁটতে হাঁটতে গোবর্দ্ধন ভাবলে—মায়ের পুজোর জন্যে গোটা কতক পদ্মফুল তুলে নিয়ে যাই। ওর বয়স তখন ত্রিশ বত্রিশ। বিলের ঘাটে গাছতলায় খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে, গোবর্দ্ধন চলল জলের দিকে। চৈত্রমাস, উঠতি বেলা—জলতেষ্টাও পেয়েছে তার। জলের ধারে যেতেই গোবর্দ্ধনের চোখে পড়লো—এক অদ্ভুত ব্যাপার।

—কি?

—এক জোড়া পিতলের ঘড়া, বেশ বড় এবং শক্ত গড়নের—ঘাটের কাছাকাছি, পরিষ্কার টল টলে জলের মধ্যে খেলা করছে। অবাক কাণ্ড আরকি! গোবর্দ্ধন আর জলে হাত দিতে সাহস পেলো না। একঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো। ঘড়া দুটোর মুখ অতি সুন্দর ঢাকনা দিয়ে বন্ধ করা। বড় বড় দুটো গোখরো সাপ ঘড়া গুলোকে জড়িয়ে রেখেছে। কি আছে এই ঘড়ার ভেতর? গোবর্দ্ধনের মনে পড়লো রাজাদের মোহরের কথা। এই কি সেই যখের ধন? গোবর্দ্ধন একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো। বহুদিনের পুরোনো ব্যাপার তো—ঘড়া দুটোর গায়ে বড় বড় লোমের মতো শ্যাওলা জমে উঠেছে।

দুজনে মিলে কেমন সুন্দর খেলা করছে! বিলের টলটলে জলে সব পরিষ্কার দেখা যায়। একটি যেন আরেকটিকে ধরতে যায়—উনি আবার পালিয়ে গেলেন দূরে। ইনি আবার সাধতে গেলেন ওঁকে। তারপর দুজনে এক সঙ্গে গড়াতে গড়াতে আবার আগেকার জায়গায় ফিরে এলেন। এসে—খানিকক্ষণ এক জায়গায় ভাসতে ভাসতে দুজনে মিলে ঘুরপাক খেতে খেতে একেবারে তলিয়ে গেলেন নীচে। আবার উঠে এলেন।

এই ভাবে অনেকক্ষণ। গোবর্দ্ধন ব্যাপারটা বুঝতে পারলো। মাথার উপরে চৈত্রমাসের রোদ খাঁ খাঁ করছে—গোবর্দ্ধনের কিন্তু হুঁশ নেই। কি আছে এই ঘড়ার ভেতর?

অবশেষে গোবর্দ্ধন একটা গামছা পরে, পরণের কাপড়টা দুভাঁজ করে মাটিতে বিছিয়ে—দেবাংশীদের উদ্দেশ্যে লুটিয়ে প্রণাম করলো। তারপর হাত জোড় করে বলল মা, ভগবতী। কাল গরীবের বাড়িতে তোমার পুজো, মা। তাই তুমি দয়া করে আজ আমাকে দেখা দিয়েছ। আমি ভিক্ষা চাইছি, মা! কিছু দিয়ে যাও আমাকে। যদি তোমরা সত্যিকারের দেবাংশী হয়ে থাকো।…

বলতে না বলতেই এঁরা দুজন গড়িয়ে গড়িয়ে জল থেকে উঠে এলেন—সাপদুটো একটু সরতেই মুখের ঢাকনা আলগা হয়ে গেল—এবং দুজনেই কাৎ হয়ে, মাটিতে পাতা গোবর্দ্ধনের পরণের কাপড়টার উপর ঢেলে দিলেন। সাপদুটো হলেন যক্ষ, এঁরা ফোস ফোস করছেন। ভয়ে গোবর্দ্ধন দূরে সরে গেল।

—কী ঢাললে? দীনবন্ধু জিজ্ঞেস করলো।

—মোহর! চৈতালী রোদে মোহরগুলো আগুনের মতো চক চক করছে। ঢেলে দিয়েই এনারা আবার জলে নেমে আগের মতো খেলতে লাগলেন। যেন কিছুই হয় নি।

মাটিতে লুটিয়ে প্রণাম জানিয়ে, মোহরগুলো পুটলি করে বেঁধে গোবর্দ্ধন বাড়ির দিকে রওনা হলো।

—গোবর্দ্ধন পাগল হলো কখন? দীনবন্ধু উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করল।

—বলছি, শোন। নিবারণ বলল—

মাইল খানেক পথ হেঁটে গোবর্দ্ধনের মনে হলো—তাইতো? বোকাটা যে খুবই হাল্কা! এত থাকতে এমন সামান্য ধন!…আবার ফিরে চলল…গোবর্দ্ধন বিলের ঘাটের দিকে। বেলা তখন ঠিক দুপুর—ঘাটে কোনো লোকজন নেই—গরু বাছুরও বড় একটা দেখা যায় না। সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গেছে গোবর্দ্ধনের। তবু সে আবার ফিরে গেল পদ্মবনের দিকে।

তখনো আছেন এরা—তেমনি খেলা করছেন। মোহরের পুটলিটা খুলে আবার কাপড় পাতলো গোবর্দ্ধন—আবার প্রণাম জানিয়ে হাতজোড় করে বলল—মা! আমি বড় কাঙাল! দয়া যখন করলেই, আর কিছু দাও আমাকে—

গোবর্দ্ধন তাকিয়ে দেখল এবারও কথায় কাজ হচ্ছে, 'জয় মা! জয় মা'—বলে চিৎকার করে উঠলো সে।

কিন্তু এবার ঘটনা বিপরীত। এবার এঁরা কাছে আসতেই, জোয়ারের জলের পুঁটি মাছের মতো লাফাতে লাফাতে একটি একটি করে সব মোহর দুটোর ভেতরে আবার ঢুকতে সুরু করল।

গোবর্দ্ধন হাহাকার করে উঠলো—মা, এ তুমি করছ কি? কিন্তু কাছে ঘেঁষবার উপায় নেই। বক্ষ দুটি ফণা ছড়িয়ে, লকলকে জিহ্বা বার করে পথ আগলে দাঁড়ালো। সব কটি মোহর তুলে নিয়ে এঁরা চলে একেবারে পদ্মবনে মিলিয়ে গেলেন এরা। সারাটি দিন বিলের ঘাটে বসে গোবর্দ্ধন কাঁদাকাটি করেছে—'মা মা' বলে কুকার দিয়ে উঠেছে—কিন্তু আর এলো না।

—সেই থেকে গোবর্দ্ধন পাগল? দীনবন্ধু বলল।

—হ্যাঁ! সেই থেকে গোবর্দ্ধন পাগল। পাগল হয়েও অনেকদিন বেঁচেছিল। সারাদিন বিড় বিড় করতো—আর মাঝে মাঝে হাহাকার করে উঠতো—"হায়রে! কি করলাম—পেয়ে ধন হারালাম।" নে! একটু তামাক লাগা এবার।

গল্প বলা শেষ করে নিবারণ ডাকলো—ঘুমিয়ে পড়েছ নাকি, কৃষ্ণসুন্দর?

বালিসে মাথা রেখেই কৃষ্ণসুন্দর বলল—না।

পঞ্চদশ অধ্যায়

দুদিনের মধ্যেই দুর্গাদাসবাবু দিকে দিকে লোক পাঠিয়ে কৃষ্ণসুন্দরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারলেন। কেবল তাই নয়, জরুরী চিঠি পাঠিয়ে তিনি কৃষ্ণসুন্দরের কাছ থেকে কথা আদায় করেছেন যে, কলকাতা রওনা হওয়ার অন্ততঃ তিনচার দিন আগে সে বাড়ী ফিরে আসবে এবং প্রস্তাবিত নাট্যোৎসবের খরচ বাবত অন্ততঃ উকীল পাড়ার চাঁদাটার একটা প্রতিশ্রুতি আদায় করে যাবে।

দুর্গাদাসবাবু সুচারুকে যথাসময়ে জানালেন যে, চিন্তার কোনো কারণ নেই। তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে

ঘুরে মক্কেলদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করছেন এবং নিবারণের আদর-যত্নে ও সুব্যবস্থায় পরমানন্দে নৌকা বিহার করছেন।

অত্যন্ত আকস্মিকভাবে কৃষ্ণসুন্দরের এই ভাবান্তরের কারণ কি? গোপনে এভাবে গা-ঢাকা দিলেন কেন তিনি? কৃষ্ণসুন্দরের মক্কেলরা জীবনগঞ্জেরই আশেপাশে থাকে। তাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের জন্য নৌকাবাসের প্রয়োজনটা কি? সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন ধাপছাড়া মনে হচ্ছে সুচারুর কাছে।

দুর্গাদাসবাবুর কাছ থেকে কৃষ্ণসুন্দরের খবর পাওয়ার পর থেকে, প্রতিটি সন্ধ্যায় সুচারু আশা করে যে, আজ হয় সে আসবে। পড়ার ঘরটিতে বইপত্র নিয়ে বসে, একা একা সন্ধ্যাটা কাটায় সে।

আজও সন্ধ্যার পর সে পড়াশুনোর ঘরে গিয়েই বসল। নিত্যকে সঙ্গে নিয়ে চিন্তামণি চলে গেছেন আখড়া-বাড়ীতে ভাগবত পাঠ শুনতে। ওদিকে বাইরের বাড়ীতে যাত্রা-থিয়েটারের মহড়া সুরু হয়েছে।

সেদিন শুক্লা একাদশী। সন্ধ্যার অনতিপরেই শরতের রূপোলী জোছনায় দশদিক উদ্ভাসিত। সুচারুর পড়ার ঘর থেকে পুব দিকে তাকালে দেখা যায়, ভরা নদীর বুকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ মালার উপর চাঁদের স্নিগ্ধ আলো কলমল করছে। কিন্তু সুচারুর মনে হচ্ছে—সব কিছুই যেন বনমরা—নিষ্প্রাণ।

ভৃত্য এসে দরজায় দাঁড়িয়ে বলল—উনি এসেছেন।

—কে? সুচারু জিজ্ঞেস করল উদাসভাবে।

—ঐ যে, উকীলবাবু! জানালো ভৃত্য।

—ওঁকে এ ঘরে নিয়ে এসো—আর চা—সুচারু বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালো।

—এ ঘরে আসবেন না উনি। বললেন খবর দাও। নীচের ঘরে বসে আছেন। ভৃত্যটি বলল।

—ও! তবে চল—বলে সুচারু নীচে নেমে গেল।

নীচে নেমে দেখলো সুচারু—চিন্তামণির পালঙ্কের এক কোণে জড় সড় হয়ে কৃষ্ণসুন্দর বসে আছে। এই আঁকা জমকপূর্ণ কারুকার্য করা কাঠ বসানো পালঙ্কটির সঙ্গে সে যেন নিজেকে কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পারছে না। দেয়ালে ঝুলানো বড় আয়নাটাতে প্রতিফলিত হচ্ছে কৃষ্ণসুন্দরের প্রতিচ্ছবি। সেই উগ্র মানুষটি এত শান্ত! খানিকক্ষণ নীরবে তাকিয়ে রইলো সুচারু সেই দিকে। বসে বসে কৃষ্ণসুন্দর সিগারেট টানছে—আর নিবিষ্ট মনে কি যেন ভাবছে।

নিঃশব্দ পদক্ষেপে ঘরের ভেতর প্রবেশ করে, কৃষ্ণসুন্দরের পিছনে দাঁড়িয়ে অতি মৃদু হাসতে হাসতে সংযত কণ্ঠে সুচারু বলল—কী? —পাগলের খবর কি?

সুচারুর কণ্ঠস্বর শুনে কৃষ্ণসুন্দর ফিরে তাকালো। প্রত্যুত্তরে সেও সহাস্যে বলল—তুমিও আমাকে পাগল বলছ?

—কেন? নিবারণও বলেছে বুঝি? সুচারু বলল।

—হ্যাঁ। গম্ভীর হয়ে উঠলো কৃষ্ণসুন্দর। তবে কি সত্যই তার আচার-আচরণে কোনো অস্বাভাবিকতা দেখা যাচ্ছে? ক্ষণিকের মধ্যেই নিজেকে সামলে নিয়ে কৃষ্ণসুন্দর সহজভাবে বলল—মাসীমা কোথায়?

—মা গেছেন ভাগবত পাঠ শুনতে। চলুন, উপরের ঘরে নিয়ে বসি। আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে। উপরে চলুন।

—উপরে গিয়ে বসুন আপনি। আমি চা নিয়ে আসছি। বলল সুচারু।

অল্পক্ষণ মাত্র সুচারুর দিকে তাকিয়ে থেকে কৃষ্ণসুন্দর দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল—কিসের কথা?

—বলবো। চলুন। সুচারু পথ দেখিয়ে ঘর থেকে বেরোলো। দোতলায় উঠে সুচারুর পড়ার ঘরে গিয়ে বসলো কৃষ্ণসুন্দর। সুচারুর নির্দেশে ভৃত্যটি আলো নিয়ে সিঁড়ি পার করে দিল।

কৃষ্ণসুন্দরের সামনে টেবিলের উপর এক পেয়ালা চা রেখে—একটু দূরে একটা চেয়ার টেনে বসলো সুচারু। নিন, চা খান। কৃষ্ণসুন্দরকে লক্ষ্য করে বলল সে।

কৃষ্ণসুন্দর অনুভব করলো যে সুচারুর কণ্ঠস্বরে অভিযোগের আভাস। চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে কৃষ্ণসুন্দর বলল—কি কথা বলবে, বল।

দাঁড়ান! আগে বলুন, কেমন আছেন। নৌকায় থেকে সর্দি জ্বর হয় নি তো? আপনার কি অভ্যেস আছে খোলা জায়গায় রাত কাটানো? কেমন আছেন, বলুন। সুচারু জিজ্ঞেস করল।

—খুব ভাল ছিলাম। ফুর-ফুরে জলের হাওয়া। এ কয়দিনে শরীর বরং ভাল হয়েছে। সরল ভাবেই বলল কৃষ্ণসুন্দর। কি বলছিলে বল।

—বলছি,—এ কয়দিন আপনি এ ভাবে গা ঢাকা দিলেন কেন? আমাদের কাউকে জানিয়ে যাওয়াটা আপনার পক্ষে মোটেই অসম্ভব ছিল না। সুচারু বলল।

—এই তোমার কথা?—লঘু ভাবে হাসতে হাসতে কৃষ্ণসুন্দর বলল।

—কথাটা সামান্য নয়। আপনার এই ব্যবহার কিছুতেই আমার কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে না। বলুন, আমাকে বুঝিয়ে বলুন। এ কথাটা আমাদের কাছে গোপন রাখার হেতু কি?—কিছুতেই বুঝতে পারছি না আমি। সুচারু বলল। কৃষ্ণসুন্দর হাল্কা ভঙ্গীতে বলল—জানিয়ে যাওয়াটাই উচিত ছিল আমার। তাহলে দুর্গাদাসবাবু এতোটা হৈ-চৈ করতেন না।

সুচারু বুঝতে পারলো যে কৃষ্ণসুন্দর তার প্রশ্নের কোনো সরাসরি উত্তর দেবে না। এ নিয়ে আর কোনো কথা বলল না সে। নীরবে কৃষ্ণসুন্দরের দিকে চেয়ে রইলো মাত্র।

—শোনো, টুনু! আমিও আজ তোমার কাছে একটা কথা বলতেই এসেছি। কৃষ্ণসুন্দর শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বলল।

—আপনি কবে রওনা হবেন?—সুচারু ঈষৎ কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো।

—দেরী আছে? আরো তিন চার দিন পর। তবে এ কয়দিন আর তোমাদের বাড়ীতে আসতে পারবো না। অনেক কাজ। কথাটা তাই আজই বলে যাবো। শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে কৃষ্ণসুন্দর বলল।

—কি এমন কাজ আপনার যে একবারও আসতে পারবেন না?—সুচারু বলল মন ভরা কণ্ঠে।

—দুর্গাবাবুর জন্যে এ কয়দিন দয়ানে ঘাটতে হবে আমাকে। গ্রামের বহু লোকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎও করতে হবে।...কথাটা শোনো।

সুচারু নীরবে তাকালো কৃষ্ণসুন্দরের দিকে। কৃষ্ণসুন্দর বলল—কলকাতা থেকে শীগগীর ফিরতে পারবো না আমি।

—কেন?—চমকে উঠলো সুচারু। এ কথা তো কোনো দিন বলেন নি?

—কথাটা এর মধ্যেই ঠিক করেছি। তাই জানিয়ে গেলাম তোমাকে।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত সুচারু কোনো কথা বলল না। চুপ করে নত মুখে বসে রইলো। তারপর সে মাথা তুলে বলল—আপনি কি সত্যি সত্যি পাগল হয়ে গেলেন? এ আপনি কি বলছেন?...কেন বলুন তো? হঠাৎ আপনি এতো ক্ষেপে উঠলেন কেন? দোহাই আপনার। সব কথা খুলে বলুন।

একটি বেদনাদায়ক কর্তব্য সম্পাদন করবার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে কৃষ্ণসুন্দর আজ এ বাড়ীতে এসেছে। সুচারুর বিহ্বলতায় খুব বিব্রত বোধ করা সত্ত্বেও সে শান্ত ভাবে বলল—আমি ক্ষেপে উঠি নি, টুনু! ধীর ভাবে চিন্তা করেই আমি পথ ঠিক করেছি। এ দলদলটার জীবনগঞ্জে থাকতে এসেই আমি বোধহয় মস্ত ভুল করেছি।

—এত সব কথা আজ বলছেন কেন বলুন তো?—কিছুই ধরতে পারছি না আমি। সুচারু আনমনে বলল।

এ সব একান্ত ভাবে আমার ব্যক্তিগত কথা। সব কথা তোমাকে বলা যায় না।...আমাকে আবার প্রবাসী হতেই হবে। বলল কৃষ্ণসুন্দর।

খানিকক্ষণ পর সুচারু আক্ষেপের সুরে কতকটা আপন মনে বললো—আপনি না কতদিন বলেছেন, জীবন-গঞ্জের হাওয়া কাটানো বড় কঠিন। এরই মধ্যে এতোটা বদলে গেলেন কি করে?

প্রত্যুত্তরে কৃষ্ণসুন্দর আর কোনো কথা বলল না না—বোধহয় নতুন কিছু বলবার ছিলও না আর।

সুচারুই আবার বলতে লাগলো—এম-এ পাশ করার পর আপনার পক্ষে আর জীবনগঞ্জের মুন্সেফী আদালতে ওকালতি করা ঠিক হবে না, এ কথা সবাই বুঝে। কিন্তু জেলাকোর্টে ওকালতি করতে আপনার আপত্তি কোথায়? এ পথটা পাল্টালেন কেন আপনি?

—হয়তো শেষ পর্যন্ত জেলা-কোর্টেই ওকালতি করবো। কিন্তু আপাততঃ কিছুদিনের জন্য আমাকে

কলকাতায় থাকতেই হবে। বলল কৃষ্ণসুন্দর।

—কেন? ওটাই আমি জানতে চাইছি। ওই কথাটার আপনি উত্তর দিচ্ছেন না। সুচারু অভিমান-বিক্ষুব্ধ কণ্ঠে অনুযোগ জানিয়ে বলল।

তথাপি কৃষ্ণসুন্দর কোন কথা বলল না। সুচারু আবার বলতে লাগল অর্ধ-স্বগত ভাবে—আপনিই না জীবনগঞ্জের নাম না দেওয়া নদীর কথা, কতদিন কতভাবে বলেছেন আমার কাছে? জন্ম-মাটির মানুষগুলোকে আপনিও ভুলে যাবেন? আপনাকে পেয়ে এরা যেন হাতে চাঁদ পেয়েছে।

সুচারুর শেষের কথা কটি কৃষ্ণসুন্দরের অন্তরাত্মায় শেলের মতো বিঁধলো। অপরাধীর মতো সে বলল—জীবনগঞ্জের সঙ্গে আমি চিরতরে বিচ্ছিন্ন হচ্ছি না, টুনু। সাময়িকভাবে—

—কেন? সাময়িকভাবেই বা কেন? সাতদিন আগেও তো আপনি এ কথা বলেন নি? আপনাকে অনুরোধ করছি—সব কথা খুলে বলুন আমাকে। বলল সুচারু।

কতক্ষণ পর্যন্ত নীরবে বসে থেকে, অবশেষে কৃষ্ণসুন্দর সসংকোচে বলল—শোনো, টুনু! জীবনগঞ্জের অনেকে কানাঘুসো করছে—আমাদের কলঙ্ক রটছে।…অতএব আর নয়…আশা করি, আর আমাকে ভুল বুঝবে না।

নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সুচারু। অনেকক্ষণ পর সে বলল—তবু আপনি কলকাতায় থাকবেন না। না হয় আমাদের বাড়ীতে নাই আসবেন—আপনি জেলা-কোর্টে এসে ওকালতি করুন। এখানেই আপনার উন্নতি হবে। এ ভুল আপনি করবেন না।

—সুচারু সজল কণ্ঠে বলল।

—সত্যিই কি আমি ভুল পথে যাচ্ছি?—কৃষ্ণসুন্দর বলল কতকটা আপন মনে।

—মারাত্মক ভুল করছেন। সুচারু বলল ব্যগ্র কণ্ঠে।

কৃষ্ণসুন্দর মাটির দিকে চেয়ে চিন্তা করতে লাগলো। অবশেষে সে কতকটা ক্লান্ত কণ্ঠে বলল— কোনটা ভুল, কোনটা শুদ্ধ, তা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না, টুনু।

—ভাল করে সব দিক চিন্তা করে দেখুন। সুচারু ব্যাকুল আবেদন জানিয়ে বলল—অনেক বুদ্ধিমান মানুষও কোনো কোনো সময় মারাত্মক ভুল করে বসেন— এ রকম গল্পতো আপনিই আমাকে শুনিয়েছেন।…আমি বলছি, আগের কথাই ঠিক। পাগলামি করবেন না।

আরও খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে, অবশেষে উঠে দাঁড়িয়ে বলল কৃষ্ণসুন্দর—আচ্ছা! আরো কদিন ভাবতে দাও আমাকে। তুমিও চিন্তা করে দেখো।…

সুচারুও দাঁড়িয়ে উঠে বলল—যাবার আগে একবার আসবেন না?

—হ্যাঁ! যাবার দিন এসে মাসীমাকে প্রণাম করে যাবো। হ্যাঁ, টুনু! জরুরী কথা ভুলেই গেছলাম। মৃদু হাসতে হাসতে বলল কৃষ্ণসুন্দর—তোমার "প্রথম কবিতাগুচ্ছের" কবিতা কটি আলাদা কাগজে টুকে, আমার সঙ্গে দিয়ে দিয়ো। কলকাতায় যখন যাবোই—ওগুলো ছাপাবার চেষ্টা করা যাবে।…ভুলোনা কিন্তু!

প্রত্যুত্তরে সুচারু একটি কথাও বলল না। আলোর প্রতীক্ষা না করে কৃষ্ণসুন্দর একাকী দ্রুতপদে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল। সুচারু তেমনিভাবে ঘরের দরজার চৌকাঠে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

* *

অনেকক্ষণ পর সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনে সুচারু বুঝতে পারলো যে নিত্য আসছে। সুচারুকে এ ভাবে একাকী দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বিস্মিত হয়ে নিত্য জিজ্ঞেস করল—কি গো, টুনু! এ ভাবে দাঁড়িয়ে আছো কেন? সুন্দরবাবুর খবর কি?

—তিনি এসেছিলেন—এই মাত্র চলে গেলেন। বলল সুচারু।

—বলে গেছে কিছু? শঙ্কিত কণ্ঠে নিত্য জিজ্ঞেস করল।

—ঘরে এসো। বলছি সব কথা। হতাশাগ্রস্ত কণ্ঠে সুচারু বলল।

দুজনে গিয়ে বসলো সুচারুর পড়ার ঘরে। অবশেষে সুচারু প্রায় কাঁদো-কাঁদো ভাবে বলল—আমারই অদৃষ্ট নিত্যদি। তিনি নাকি কলকাতা থেকে এবার আর শিগ্গীর ফিরবেন না।

—কেন বলত? এ রকম তো কথা ছিল না। সন্তর্পণ ভাবে জিজ্ঞেস করলো নিত্য—হঠাৎ বিগড়ে গেল কেন?

—জীবনগঞ্জের লোকে নাকি তলে তলে নিন্দে করছে।

—বলল সুচারু।

—তাহলে ওর দূরে যাওয়াই ভাল। নিত্য বলল ক্ষোভ প্রকাশ করে।

—তুমিও একথা বলছ, নিত্যদি? সুচারু মৃদু আর্তনাদ করে বলল।

—কেন বলবোনা, টুনু? চাপা অথচ কঠিনালো গলায় নিত্য আবার বলতে সুরু করলো—এজন্যেই তোমাকে আমি দু'একবার নিষেধ করেছিলাম, এ ভাবে মেলামেশা না করতে। তোমার কি? তোমার যদি কোনো কলঙ্ক রটে, তোমার বাবা সোনা দিয়ে কলঙ্ককে মুড়ে দেবেন। কিন্তু সুন্দরবাবু! সে শিক্ষিত—তার উপর অক্ষয় কবিরাজের ছেলে। তার এই দুর্গতি কেন? এসব ভাল নয়, টুনু। কাল সাপ নিয়ে খেলা করতে নেই। দূরে দূরে যাওয়াই উচিত। যথেষ্ট হয়েছে। তোমার বাবা বাড়ী এসে, এসব কথার আঁচ পেলে, আমাদেরও আস্ত রাখবেন না।

খানিকক্ষণ চুপ চাপ থেকে নিত্য আবার আক্ষেপ করে বলতে লাগলো—আমার সব চেয়ে বেশী দুঃখ হচ্ছে ঐ বেচারার জন্যে। যে ছেলে তোমাদের বাড়ীর ভাবা মাড়াতোনা, তোমাদের মন রক্ষা করতে এসে তার লাভটা হলো কি? আবার তাকে দেশত্যাগী হতে হলো। এমন সোনার ছেলের নামে আজ কলঙ্ক রটবে।

আক্ষেপ করতে করতে নিত্য নীচে নেমে গেল।

ষোড়শ অধ্যায়

পত্রমিত্র সকলেই সংবাদটা শুনে বিস্মিত হ'লো। এমন চমৎকার তৈরী জমি ফেলে ক'লকাতা গিয়ে সে কি করবে? মাত্র বছর দুই সময়ের মধ্যে জীবনগঞ্জের আদালতে একজন চোস্ত উকীল ব'লে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে কৃষ্ণসুন্দর। গুটি কয় আপিল উপলক্ষে জেলাকোর্টেও সে কয়েকবার যাতায়াত ক'রছে—এবং বাঘা বাঘা পুরানো উকীলের সঙ্গে সওয়াল ক'রে মামলাও জিতে এসেছে। এখন যদি সে পরীক্ষাটা পাশ ক'রে এসে, জেলাকোর্টে একবার বসতে পারে—পসার অনিবার্য্য। হিতৈষীদের অনেকেই খোলা-খুলি বলতে শুরু ক'রল—কৃষ্ণসুন্দর! তুমি ভুল ক'রছো। মক্কেলগুলো একবার হাতছাড়া হ'য়ে গেল—আবার পসার জমাতে বেশ বেগ পেতে হবে। এমন কি নিবারণও তার মত পাল্টে ফেলেছে। কৃষ্ণসুন্দরের পিতা অক্ষয় কবিরাজের নাম করে নিবারণ বলতে সুরু করলো—গুরুদেবেরও এই ইচ্ছা ছিল, কাছাকাছি থেকে থেকে জেলার সদরেই ওকালতি করবে। কুবক এলাকার কর্মীরা মনক্ষুণ্ণ হলো—কৃষ্ণসুন্দরের এই আকস্মিক সিদ্ধান্তের কারণ কি? তারাও অবাক হয়ে ভাবলো। কিন্তু কৃষ্ণসুন্দর তার সংকল্পে স্থির—অটল।

জীবনগঞ্জের পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে সে অনেকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করলো। বন্ধুলোক বাড়ীতে এসে তাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে গেল। আদালতের মুহুরী থেকে আরম্ভ করে সাধারণ ভিক্ষুক পর্য্যন্ত—বহু মানুষের সঙ্গে কৃষ্ণসুন্দরের ব্যক্তিগত পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা। এ কয়দিন সমানে বাড়ীতে লোকজন খালি যাতায়াত করছে। ক'লকাতা যাওয়াকে উপলক্ষ করে তার প্রতি গ্রামবাসীদের স্বতস্ফূর্ত আন্তরিকতার এতখানি প্রকাশ দেখে কৃষ্ণসুন্দর নিজেও কম বিস্মিত হলোনা। সে যেন তার দাবী পাওনার চাইতে অনেক বেশী পেয়ে যাচ্ছে। মনে মনে সে সঙ্কোচ অনুভব করতে লাগল। জীবনগঞ্জের বিভিন্ন পাড়ার তরুণরা আসছে দলে দলে। এ কয়দিন সমানে নিবারণ খালি চা পরিবেশন করছে লোকজনকে, আর মাঝে মাঝে খুসী হয়ে তারস্বরে ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছে—জয় গুরু! জয় গুরু! ঠাকুর, তোমার ইচ্ছা।

বইপত্র গুছোতে গিয়ে নিবারণের মনে হলো, আরেক-বার শেষ চেষ্টা করে দেখলে হয়। বৈঠকখানা ঘরে রক্ষিত আইন-পুস্তকের আলমারীর কাছে দাঁড়িয়ে নিবারণ হাসতে হাসতে বলল—আইনের বইগুলো বাড়ীতে থাক। এসব মোটা মোটা বই বয়ে নিয়ে গিয়ে লাভ কি?

—নানা, বই-পত্র সব বেঁধে দাও। কৃষ্ণসুন্দর দৃঢ়-ভাবে বলল।

—আমি বলছি কি, আরেকটু ভেবে দেখো, কৃষ্ণ-সুন্দর—নিবারণ অনুরোধ জানিয়ে বলল—আজ তিনচার ধরে এই বাড়ীতে যতো লোক যাতায়াত করছে, হিন্দু-মুসলমান, গাঁয়ের ভিনগাঁয়ের, ভদ্র-অভদ্র সব, এর সিকি-

ভাগ্যও যদি তোমার সহায় থাকে, তবে আর ভাবনা নেই। পরীক্ষাটা মন্দলমতো দিয়ে এসে, ছেলে-পরেই বসে পড়। এই ঠিক সময়। দু'বছর পরে এলে, তৈরী জমি কংসা হয়ে যাবে। আরেকবার ভেবে দেখো। ঝোঁকের মাথায় কাজ করা ঠিক নয়।

—হাসতে হাসতে অথচ দৃঢ়স্বরে বলল কৃষ্ণসুন্দর—বেশী পয়সার জমিয়ে আমার দরকার কি, নিবারণ দা? কে খাবে আমার রোজগার?

—ওটা কোনো কাজের কথা নয়, কৃষ্ণসুন্দর! আমার গুরুদেবের বাড়ীটাকে আবার আগের মতন সাজিয়ে তুলতে হবে—তবেই তুমি মানবে। অক্ষয় কবিরাজের ভিটায় ঘুঘু চড়ছে—এ তোমার সহ্য হয়, কৃষ্ণসুন্দর?—নিবারণ আবার স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করলো। অবশেষে সে অভিযোগ জানিয়ে বলল।

—আমার উপর রাগ করে, তোমার ভেদ চেপে গেছে।

—রাগ নয়, নিবারণদা!—কৃষ্ণসুন্দর শান্তভাবে বলল—তুমি সঠিক কাজই করেছ এখন তুমি ভুল চিন্তা করছো। আমার পক্ষে দূরে যাওয়া ছাড়া আর কোনো পথ নেই। কিছুদিন আমাকে চোখের বাইরে থাকতেই হবে।

চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো নিবারণ। খানিকক্ষণ সে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো কৃষ্ণসুন্দরের দিকে, অবশেষে আক্ষেপ করে বলল—না জানি কালনাগিনী কোন্ সর্বনাশ করেছে।

আর কোনো কথা না বলে আইনের মোটা মোটা বইগুলো আলমারী থেকে নাবাতে সুরু করলো নিবারণ।

* *

বিকেল বেলায় আর ঘরে থাকতে মন চাইলোনা কৃষ্ণসুন্দরের। চমৎকার পরিচ্ছন্ন আবহাওয়া সেদিন। আবার গিয়ে থাকতে হবে কলকাতার কোথো বস্তুসলির মেসবাড়িতে।

—নদীর ধার থেকে একটু বেড়িয়ে আসি, নিবারণদা। বলতে বলতে কৃষ্ণসুন্দর বেরিয়ে পড়লো। সন্ধ্যা পর্যন্ত বন্ধু বান্ধব সঙ্গে নিয়ে নদীর ধারে বেড়ালো কৃষ্ণসুন্দর। তারপর জীবনগঞ্জের লোহারপুলের উপর দাঁড়িয়ে সূর্যাস্তের মনোরম দৃশ্যটি প্রাণভরে দেখে নিয়ে কৃষ্ণসুন্দর বাড়ী ফিরে এলো।

সন্ধ্যার অনতিপরে হাত-পা ধুয়ে, খাওয়া-দাওয়া শেষ করে যখন সবের কিছু আগেই রওনা হলো কৃষ্ণসুন্দর। ঘর থেকে বেরিয়ে কদমতলার চিরপরিচিত ঘাটটির দিকে পা বাড়াতে বাড়াতে বলল সে—কতদিন পর আবার এই বাড়ী থেকে পরীক্ষা দিতে যাচ্ছি, না নিবারণ দা?

—সেই তো, বি-এ পরীক্ষা যেবার দিলে। তখন গুরুদেব জীবিত, যা ছিলেন। বলল নিবারণ। তারপর সে কাঁদো কাঁদো ভাবে বলল—ওদের কি মরার বয়স হয়েছিল?

—চল, নিবারণ দা! বলে কৃষ্ণসুন্দর ঘাটের দিকে হেঁটে চলল।

নৌকাতে উঠে নিবারণকে আন্তরিক অনুরোধ জানিয়ে কৃষ্ণসুন্দর নীচু গলায় বলল—নিবারণদা, একটা কথা রাখো আমার।

নিবারণ নীরবে তাকালো কৃষ্ণসুন্দরের দিকে। কৃষ্ণসুন্দর আবার বলল—অন্ততঃ দু'বছরের জন্য জীবনগঞ্জ ছেড়ে চলে যাচ্ছি। এত লোকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাত করেছি। বড় বাড়ীতে একটিবার দেখা না করে যাওয়াটা অশোভন হয়, নিবারণদা।

তথাপি নিবারণ কিছু বলছেনা দেখে কৃষ্ণসুন্দর আবার বলল—দুর্গাদাসবাবু, তারপর নাটকে যাঁরা মহড়া দিতে আসছেন, ওঁদের সঙ্গে। আর ওদিকে মাসীমা, এই কজনের সঙ্গে দেখা করা উচিত আমার। যাবার সময় তুমি হৈ-চৈ বাঁধিয়ো না।

কৃষ্ণসুন্দরের কথার কোনো উত্তর না দিয়ে, নিবারণ সরাসরি মাঝিকে নির্দেশ দিল—ওরে দীনবন্ধু! বড় বাড়ীর ঘাটে চল।

ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের প্রথম পর্ব। নক্ষত্রখচিত পরিচ্ছন্ন আকাশের তলায় খোলা নদীর বুকে হাল্কা অন্ধকার—ঊর্ধাকাশের চাল্কা সাদা টুকরো মেঘগুলোও বেশ উপলব্ধি করা যায়। মিষ্টি হাওয়ার প্রাণ জুড়িয়ে যায়। অসংখ্য তারকার প্রতিবিম্ব ঝলমল করছে ভরা নদীর তরতরে স্রোত-ধারার বুকে। দুলতে দুলতে কৃষ্ণসুন্দরের নৌকাখানি চলছে। পেছনের দিকে বাকীর

কাছাকাছি বসে তামাক খাচ্ছে নিবারণ—আর নৌকার আসা-গলুইতে একাকী দাঁড়িয়ে কৃষ্ণসুন্দর তমসাময়ী প্রথমরাত্রির পটভূমিকায় ভরা নদীর রূপ-রস উপভোগ করছে।

—আবার অন্তত দুবছর পর। মনে মনে বলল কৃষ্ণসুন্দর।

বড় বাড়ীর ঘাটের কাছাকাছি আসতেই হঠাৎ ঘাটের দিক থেকে টর্চের আলো এসে পড়লো একেবারে কৃষ্ণসুন্দরের মুখের উপর।

চমকে উঠে কৃষ্ণসুন্দর হেঁকে বলল—কে? কে ওখানে?

—নৌকা ঘুরাও এদিকে—কৃষ্ণসুন্দর! অপর পক্ষ থেকে বলল প্রত্যুত্তরে।

হরিদাসের গলা! মাঝিকে ডেকে বললো কৃষ্ণসুন্দর ওপাশে ভিড়াও।

দুটি নৌকা পাশাপাশি দাঁড়াতেই কৃষ্ণসুন্দর বুঝতে পারলো যে, হরিদাস একা নয়—সঙ্গে দরবেশও আছেন। বিস্মিত হয়ে কৃষ্ণসুন্দর জিজ্ঞেস করলো—বাড়ীর ঘাটে না গিয়ে এখানে বসে আছো কেন?

—আমাদের দেরী হয়ে গেল। এই মাত্র এসে পৌঁছেছি এখানে। বাড়ী গিয়ে আর নাগাল পাওয়া নাও যেতে পারে মনে করে—বড় বাড়ীর ঘাটে লগি পুঁতেছি—আবার কেমন ধারণ হলো, তুমি একবার এখানে আসতে পারো। হরিদাস বলল হাসতে হাসতে।

নিমেষের মধ্যে কৃষ্ণসুন্দরের মন সঙ্কুচিত হয়ে পড়লো। মিনিট খানেক চুপচাপ থেকে মনের জড়তা কাটিয়ে, দরবেশকে লক্ষ্য করে সে বলল—আমার চিঠি পেয়েছেন?

—চিঠি পেয়েই দেখা করতে এসেছি। হঠাৎ আপনি নতুনভাবে চিন্তা করতে আরম্ভ করলেন কেন বলুন তো? সেদিন তো বললেন, পরীক্ষা দিয়েই ফিরে আসবেন। আপনাকে নিশ্চিতই পাওয়া যাবে ধরে নিয়ে, আমরা কিছু কাজের 'প্রোগ্রাম' নিতে যাচ্ছিলাম। এমনি সময় আপনার পত্র পেলাম। হঠাৎ আপনি···

—কাজটা হঠাৎই করেছি আমি। কিন্তু এ আমাকে করতেই হবে।

—কৃষ্ণসুন্দর দৃঢ়ভাবেই বলল। যদিও সে বুঝতে পারছে যে, এ ব্যাপারে কেউ-তার সঙ্গে একমত নয়—তথাপি সে অন্য কথা বলতে পারলো না।

—আচ্ছা! নমস্কার তাহলে। দরবেশ বললেন মনমরা কণ্ঠে—আবার দেখা হবে ভবিষ্যতে।

—সে তো নিশ্চয়ই! বছর দুই-এর বেশী আমাকে থাকতে হবে না।

—হাসিমুখে বিদায় অভিবাদন জানিয়ে বলল কৃষ্ণসুন্দর। নিবারণ থাকলো নৌকাতেই। বড় বাড়ীর বাঁধানো ঘাটে নেমে কৃষ্ণসুন্দর পা বাড়ালো কাছারী ঘরের দিকে হাতে তার টর্চ-লাইট। পেছন থেকে ডেকে নিবারণ বললো—বেশী দেরী করোনা কিন্তু। ইষ্টিমারের সময় হয়ে আসছে।

হন হন করে হাঁটতে হাঁটতে কৃষ্ণসুন্দর গিয়ে ঢুকলো বহড়ার ঘরে। তখনো মহড়া সুরু হয়নি। দুর্গাদাস-বাবুকে ঘিরে বসে সবাই গল্পগুজব করছে—তামাক খাচ্ছে।

—এই যে,—এসো এসো! বলিনি, আসবেই একবার—বসো ফরাশের উপর। তামাকের ধুঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন দুর্গাদাসবাবু

—আজ মহড়া হচ্ছে না? বসতে বসতে সকলকে অভিবাদন জানিয়ে বলল কৃষ্ণসুন্দর।

—সবাই তোমার জন্যে বসে আছে। একবার সহরের ঘানিতে গিয়ে পড়লে আরকি সহজে নিস্তার পাবে? জীবনটা মাটি করলে, কৃষ্ণসুন্দর। দুর্গাদাসবাবু সুরু তিরস্কারের সুরে বললেন।

প্রত্যুত্তরে কৃষ্ণসুন্দর কিছু বলবার আগেই আরেকজন বলল—সত্য কথা কি, কৃষ্ণসুন্দর! দরদী লোকের বড় অভাব আজকাল। তোমার মতো একটা শক্তলোক কাছাকাছি থাকলে, জীবনগঞ্জের ধারাপ লোকগুলো একটু হিসেব করে চলে। সেল দুটি বছর মাথা তুলেনি কেউ। আবার ওরা উপদ্রব সুরু করবে। বিশেষতঃ রাইমোহন সোব্বার জীবনগঞ্জের অনেকের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে।

অন্য একজন বললেন—আচ্ছা! আগে তুমি গিয়ে মঙ্গলমতো পরীক্ষা দাও! তারপর গ্রামের অবস্থা জানিয়ে আমরা তোমাকে পত্র লিখবো। তখন যা হয় চিন্তা করে একটা ঠিক করো। এখন পরীক্ষাটা ভাল করে দাও।

দুর্গাদাসবাবুর আসরে কয়েক মিনিট কাটিয়ে কৃষ্ণসুন্দর গিয়ে ঢুকলো বড় বাড়ীর ভেতরের মহলে। নিত্যকে সঙ্গে নিয়ে চিন্তামণি বারান্দায় বসেই অপেক্ষা করছিলেন। কৃষ্ণসুন্দর কাছে আসতেই তিনি সস্নেহে বললেন—এসো বাবা! তুমি আদরে বলেই আজ তাড়াতাড়ি আসরটা বাড়ী থেকে চলে এসেছি। এসো চিন্তামণিকে পায়ে ধরে প্রণাম করলো কৃষ্ণসুন্দর। আশীর্বাদ জানিয়ে তিনি হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলেন—শুনলাম, কলকাতাতেই থাকবে তুমি? হাইকোর্টে ওকালতি করতে চাও বুঝি?

—সে সব ঠিক করিনি, মাসীমা। সলজ্জ ভাবে বলল কৃষ্ণসুন্দর।

—আচ্ছা বাবা! তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক। ঠাকুর তোমার মঙ্গল করুন।

—চিন্তামণি শুভেচ্ছা জানিয়ে বললেন।

নিত্যর সঙ্গেও দুচারটে কথা বলল কৃষ্ণসুন্দর। অবশেষে ঠাকুরকে ডেকে হাসতে হাসতে ধন্যবাদ জানিয়ে সে বলল—এবার তোমার হাতে অনেক চা খেয়েছি ঠাকুর। তোমার কথা মনে থাকবে।

খুশী হয়ে ঠাকুর বলল—এখনতো রোজই তিন চার কেটলী চা করতে হয়। হিচার্সেলের বাবুরা রোজ চা খাচ্ছেন।

—হ্যাঁ বাবা, কৃষ্ণসুন্দর। চিন্তামণি বললেন হাসতে হাসতে—ওঁরা যখন বলছেনই আমার বাড়ীতে, রোজ রোজ—একটু চা আর পান-তামাকের ব্যবস্থা করা দরকার।

—খুব ভাল করেছেন, মাসীমা। কৃষ্ণসুন্দর বলল।

—হ্যাঁ! এখন আমার মোটেই ভয় করে না। বারোটা—কোনোদিন রাত একটা পর্যন্ত হৈ-চৈ চলে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন চিন্তামণি।

সবার সঙ্গেই দেখা সাক্ষাৎ করা শেষ হয়েছে। নিখুঁত ভাবেই কৃষ্ণসুন্দর তার বিদায় পর্বের কর্তব্য সুসম্পন্ন করেছে। আর মাত্র একটি মানুষের সঙ্গে দেখা করা বাকি। নিমেষের দৃষ্টিতে সুচারুকে যেন খুঁজলো কৃষ্ণসুন্দর। নিত্যকে লক্ষ্য করে চিন্তামণি বললেন—টুনু কইরে? ওকে দেখছি না!

—পড়ার ঘরে। নিত্য বলল।

—তাহলে পড়ার ঘরেই নিয়ে যা কেষ্টকে। আলো নিয়ে যা। বললেন চিন্তামণি।

সময় আর বেশী নেই দেখে, কৃষ্ণসুন্দর টর্চ টিপে হন হনিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল। আলো নিয়ে এসে নিত্য দেখলো যে, কৃষ্ণসুন্দর উপরে উঠে গেছে। নিত্য আর উপরে গেল না—লণ্ঠন হাতে সিঁড়ি ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে রইল।

• •

সুচারুর পড়ার টেবিলের গা ঘেঁসে একটি ছোট খাট পাতা। গুটানো বিছানাটিতে শিয়ান দিয়ে সুচারু কাৎ হয়ে পাশ ফিরে শুয়ে আছে—মনে হয় যেন চোখ বুঁজে রয়েছে। ঘরের জানালার সীমানা পর্যন্ত রাত্রির আঁধার নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে। টেবিল ল্যাম্পের নীল কাঁচের চিমনি দিয়ে খানিকটা নীল আলো ঘরময় ছড়িয়ে পড়েছে।

ঘরের বাইরে, দরজায় দাঁড়িয়ে কৃষ্ণসুন্দর ডাকলো—টুনু!

—সুচারু কোনো উত্তর দিল না। একই ভাবে নিথর

হয়ে পড়ে রইলো। হাত ঘড়ির দিকে একবার তাকালো কৃষ্ণসুন্দর। সময় বেশী নেই। আবার ডেকে বললো সে—টুনু! সময় আর বেশী নেই। কবিতাগুলো দাও।

সহসা সুচারু বলল বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে—টুকতে পারি নি আমি। কিন্তু সে উঠলো না—একই ভাবে দু'হাতে মুখ চেপে পড়ে রইলো। আজ বোধহয় চুলও বাঁধে নি সুচারু। আলু থালু গোছা গোছা চুল মাথার চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। দূর থেকে কৃষ্ণসুন্দরের মনে হলো সুচারু যেন কাঁদছে। পায়ের জুতো জোড়া খুলে রেখে সে ধীরে ধীরে ঢুকলো ঘরের ভেতর।···হ্যাঁ! সত্যিই কাঁদছে সুচারু। নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো কৃষ্ণসুন্দর। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল আগেকার দিনের কথা—যখন তার মা বাবা জীবিত ছিলেন। এমনি প্রবাস-যাত্রার পূর্ব মুহূর্তে তার বাবা খুব গম্ভীর হয়ে উঠতেন—কিন্তু তার মায়ের পক্ষে কিছুতেই চোখের জল প্রতিরোধ করা সম্ভব হতো না।···সুচারুও চোখের জল ফেলছে আজ। হাত ঘড়ির দিকে শেষবারের মতো একবার তাকালো কৃষ্ণসুন্দর। একবার জানালার ধারে গিয়ে, নক্ষত্র খচিত অন্ধকার আকাশের তলায় ক্ষুদ্র নদীর ভরা দেহটার দিকে তাকালো কৃষ্ণসুন্দর। তারপর ফিরে এসে অতি লঘুভাবে সুচারুর পিঠে এক হাত রেখে আরেক হাতে তার হাত ধরে মৃদু মৃদু টানতে টানতে কৃষ্ণসুন্দর সস্নেহ কণ্ঠে বলল—টুনু! উঠো। পরীক্ষা দিয়েই আমি চলে আসবো। উঠো! আমি কথা দিচ্ছি।

চকিতের মধ্যে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে সুচারু ক্লান্ত চোখে তাকালো—কৃষ্ণসুন্দরের দিকে।

—সত্যিই বলছি। দাও! কবিতা গুচ্ছের খাতাটাই দিয়ে দাও। আর সময় নেই। বলল কৃষ্ণসুন্দর।

নীল ললাটে বাঁধানো "প্রথম কবিতা গুচ্ছের" অসমাপ্ত পরিচ্ছন্ন খাতাটি সুচারু তুলে দিল কৃষ্ণসুন্দরের হাতে।

—আসি। বলে কৃষ্ণসুন্দর টর্চ টিপে দ্রুত বেগে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল।

আর সুচারু তেমনি এক জায়গায় নিশ্চল প্রতিমার মতো দাঁড়িয়ে রইলো—ঘরের দরজা পর্যন্তও এগিয়ে আসতে পারলো না সে।

অল্পক্ষণ পরেই উপরে উঠে এলো নিত্য। ঘরে ঢুকেই সে কৌতূহলভরে জিজ্ঞেস করলো—শেষ পর্যন্ত কি বলে গেল সুন্দরবাবু?

—বললেন তো, পরীক্ষা দিয়েই ফিরে আসবেন। সুচারু জানালো নিত্যকে।

—চল যাই! ছাদে গিয়ে দেখি—ডিঙিটা ছাড়বে বোধহয়। বলল নিত্য।

নিত্যর সঙ্গে সুচারু গেল ছাদের উপর—সঙ্গে লণ্ঠন বাতি। ঘাটের দিকের রেলিং-এ দাঁড়িয়ে দেখা যায় কৃষ্ণসুন্দরের ডিঙিটা। দুর্গাদাসবাবু এবং আরো অনেকে একেবারে ঘাট পর্যন্ত এগিয়ে গেছেন।

চলতে সুরু করলো কৃষ্ণসুন্দরের ডিঙি। এখনো বুঝা যায় যে, কৃষ্ণসুন্দর বাড়ীমুখো হয়ে নৌকার হৈ-এ কেরান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

অন্ধকারাচ্ছন্ন নদীর বুকে কৃষ্ণসুন্দরের নৌকা অল্প ক্ষণ পরেই ভাসতে ভাসতে মিলিয়ে গেল। কেবল দেখা যায় জলের বুকে লণ্ঠনের আলোটুকু কেঁপে কেঁপে উঠছে।···নদীর বাঁক ঘুরতে তাও অদৃশ্য হয়ে গেল।

নিত্য বলল—চলো যাই। নীচে চল।

ছোট্ট একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নিত্যর সঙ্গে পা বাড়ালো সুচারু। চলতে চলতে সহসা তিরস্কারের সুরে বলল নিত্য—না জানি তোমার কপালে কোন দুঃখ আছে। আমি তাই ভাবছি, টুনু।

থমকে দাঁড়ালো সুচারু—পেছন ফিরে তাকালো আরেকবার। কিন্তু অন্ধকার আকাশ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়লো না তার। ক্ষণিকের মধ্যে মনে হল সুচারুর—তার ভবিষ্যৎটাও তো এমনি অন্ধকার। সেখানে কি কোনোদিন অজস্র নক্ষত্রের আলো ঠিকরে পড়বে না?

— সমাপ্ত —

এখন বুঝি স্নেহকে আদর করছ। ঘরে পা দিয়েই প্রথমটায় বুঝি আশ্চর্য হয়েছ। তা একটু হবে বৈকি। এমনটা হয়ত তুমি ভাবতেও পারোনি। চিনতে হয়ত একটু সময়ও লেগেছে। চেনা চেনা অথচ সঠিক বলে ধরে নিতে না পারার একটা অস্বস্তি নিয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেছে। তা বেশ কটা বছর পরে দেখলে যে। তখন যে ও আট পেরোবে পেরোবে করছিল। সবে কুঁড়ি। ফ্রক পড়ত আর এখনও ও অষ্টাদশী। আঠারয় পা দিয়েছে। কুঁড়ি আর ফুলের মতো ফ্রক আর শাড়ীর ব্যবধানটাত আর কম নয়। তেমন কিছু নূতন আর অচেনা লাগলেও তোমার চোখের দোষ দেয়া যায় না। দেহে মনে পরিবর্তন আসার পক্ষে দশ'বছরের সময়টা কম কি।

দরজার মুখে বালানের কালিতে তোমার ঘর থেকে চলকে পড়া চৌকা আলোয় জ্যামিতিক শরীরটা কেমন চমকে চমকে উঠছে। পাখাটা বুঝি ঘুরছে। অ কি স থে কে কি রে তো তুমি পাখার রেগুলেটরটা শেষ ঘর পর্যন্ত টেনে হাওয়াটাকে জোর করে দাও। যতক্ষণ না ঘাম মরে শরীরটা জুড়িয়ে আসে হাওয়ার গায়ে গা ভাসিয়ে বসে থাক। রাতের খাওয়ার পর ছাতের এই খোলা জায়গায় এসে ইজিচেয়ারে গা ছড়িয়ে সিগারেট ধরাও। এ তোমার রোজ দিনের অভ্যাস। ইজিচেয়ারে চিৎ সাঁতার কাটার চংয়ে তুমি আকাশের দিকে চোখ রেখে জ্যোৎস্না,

অন্ধকার, আকাশে হাজার তারার কণা, মেঘ যেদিনের যা, হাওয়ার স্পর্শ মুখে চোখ জড়িয়ে না আসা পর্যন্ত, দেখতে থাকতে। আর, হ্যাঁ, আমাকে শ্রোতা পেলে এটা সেটা করে তোমার অফিসের কথা বলতে বলতে প্রতিবেশী এক অফিসের যাদের পাশাপাশি টেবিলে বসে এক সময় কাজ করেছি, আমারই করিয়ে দেয়া আলাপের সূত্র ধরে পথে বা অন্য কোথাও দেখা হতে সুজাতা, চিত্রা, কল্পনাদের সঙ্গে কি কথা হয়েছিল তার গল্প করতে।

আজ যে তুমি এখানে এলে না। সেদিনের অভ্যাস গুলো কি বদলে ফেলেছ। না আমি এখানে রয়েছি বলে। আমার উপস্থিতিটা তোমার ভাল লাগবে না চোখ ফিরালেই আমাকে দেখতে পাবে। তোমার বিশ্রী লাগবে। হ্যাঁ, বিশ্রী। ভয়ংকর বিশ্রী। অসহ্য। তা না এসে ভালই করেছ। আজ বাইরেটায় বড্ড গুমট। হাওয়ার এতটুকু সির সিরানি নেই। ছাতের উপর হামাগুড়ি দিয়ে এসে পড়া রাস্তার কৃষ্ণচূড়ার ডালের একটা পাতাও নড়ছে না। কেমন যেন বেজার বেজার লাগছে আজ গাছটাকে।

এখান থেকে শোনা না গেলেও আন্দাজ করতে পারছি মেয়ের সঙ্গে গল্প জুড়ে বসেছ। দশ বছরের জমান ক্ষোভ একটি মাত্র 'বাবা' ডাকে জল হয়ে গেছে। মনে মনে তুমি ঠিকই ভেবেছ। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা স্বভাবতঃই একটু মা ঘেঁসা হয়। তা ছাড়া আট বছরের বুদ্ধির লাগি দিয়ে আমাদের মনের ঘোর প্যাঁচের তল কি করেই বা পাবে। কথায় কথায় বিক্ষোভের কেনা মনে যেতে মনে মনে খানিক হাল্কা হতে পেরেছ। পাকা উকিলের মতো প্রশ্নের আঁকড়িতে মেয়ের মুখ থেকে কথা টেনে নিচ্ছ। জবাব দিতে গিয়ে মেয়ে যখন আমাকে নিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছে তুমি চুপ থেকে ওর কথাগুলো না শোনার ভাণ করছ। তোমার ঠাণ্ডা নিস্পৃহ মুখখানা এখান থেকে বেশ ভাবতে পারছি।

বিদ্যুতের আশীর্বাদে বাইরের গুমটটা টের পাচ্ছ না। ঘামে ভেজা ব্লাউজটা আবার গায়ের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে। বুকে ঠাণ্ডা বসিয়ে অসুখ না-বাধানর কথা বলতে তুমি এখানে আসবে না। এলে তোমার বিশ্রী লাগবে। হ্যাঁ, বিশ্রী। ভয়ংকর বিশ্রী। শরীরে তোমার তাপ চড়বে। রক্তে আগুন ছুটবে।

তা কেন আসবে। কার জন্য। মেয়েত তোমার কাছেই রয়েছে। অফিসের খাটা খাটুনিতে আজ কিন্তু তোমাকে ক্লান্ত মনে হচ্ছে না। বরং কোথাও ছুটি কাটিয়ে এসেছ এমনটাই ভাবা যায়।

এতদিন পর হঠাৎ আবার কি মনে করে আসা? তোমার প্রশ্নে চন্দন বোকা বোকা চোখে তাকিয়ে থেকেছে তোমার মুখের দিকে। বলার মত জুতসই কোন জবাব খুঁজে পায়নি। এর উত্তর ও কি করে দেবে। ন'বছর পর আবার কেন এলাম এর জবাব শুধু আমিই জানি। দিতে পারি। কিন্তু তুমিত জবাব শোনার জন্য এখানে আসবে না। এলে তোমার বিশ্রী লাগবে। হ্যাঁ, বিশ্রী। ভয়ংকর বিশ্রী। ঘৃণায় তোমার নাক কুঁচকে আসবে। চোখ দু'টো ঘা-খাওয়া সাপের মত আমার গায়ে ছোবল কাটতে থাকবে।

না, বাইরে এসে কাজ নেই। তুমি তোমার ঘরেই থাক। আমাদের ঘর এখন তোমার ঘর। শুধু তোমার ঘর। ওতে আমার অধিকারের কথা ভাবা পাপ হবে। অবিশ্বাসের আগুনে আমার মুখ পুড়েছে। একে তুমি মৃত্যু বলেও ভাবতে পারো। ভাবাই বা বলি কেন। মৃত্যু বলে ধরে নিয়ে মনকে তুমি সান্ত্বনা দিয়েছ। অথচ জীবনের লোভনীয় উপকরণগুলোত আমার চারদিকেই ছড়িয়ে রেখেছিলে। সুখের পায়রা হয়ে তোমার আদর কুড়িয়েছি। পেয়ে পেয়ে পাওয়ার লোভ বেড়ে গিয়েছিল। আরো সুখ খুঁজছিলাম। অচেনা আকাশে ডানা মেলার সুখের লোভ সামলাতে পারিনি।

সেদিন অফিস থেকে ফিরে কাউকে না পেয়ে চন্দনের নাম ধরে ডেকেছ। কারো সাড়া না পেয়ে মনে মনে বিরক্ত হয়েছ। শেষটায় রাধার কাছ থেকে জেনেছ দুপুর বাসাদ কোথায় বেরিয়েছি। স্নানের রেগুলেটারটা শেষ পর্যন্ত টেনে হাওয়াটাকে জোর করে দিয়ে গায়ের ঘাম মজাতে থেকে ভেবেছ কোথায় যেতে পারি। চন্দনের সেদিন ছুটি বলে ওকে নিয়ে হয়ত কিছু কেনা-কাটা করতে বেরিয়েছি। কোন বান্ধবী বা আত্মীয়দের কারো বাড়ীও গিয়ে থাকতে পারি। ভাবনাটা নির্ভুল না হলেও অস্বাভাবিক ছিল না। এমনত মাঝে মাঝে হত।

দাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে রাধার করে দেয়া চা খেয়ে ছাতে চলে এলে। আলসের উপর শরীরের ভর রেখে রাস্তার দিকে চোখ নামিয়ে গাড়ী মানুষ রাতের শহর দেখলে। কতক্ষণ আর একা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা যায়। আমরা ফিরে এলে যাবে ঠিক করে ইজিচেয়ারটা টেনে নিয়ে বসলে। কিন্তু এক এক করে যখন শহরের শেষ ট্রাম বাসটিও বন্ধ হয়ে গেল তখন যেন তোমার কেমন ভয় হতে লাগল। শহরের রাস্তায় বেরিয়ে আবার ভালয় ভালয় ফিরে আসা সেত এক ধরণের পুনর্জন্ম।

ভয় আর ভাবনা ঘুম আর জাগার মাঝামাঝি একটা অস্বস্তির মধ্য দিয়ে রাতটা কোন রকমে কাটিয়ে দিলে। সকাল হলে বড় খাওয়া মত চেহারা নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়লে। যেখানে আমাদের যাওয়া সম্ভব (যেখানে স্বভাবতই গিয়ে থাকতাম) তেমন দু' একটা বাড়ীর আত্মীয় এবং চেনা মহলে খোঁজ নেবে ঠিক করলে। কি ভেবে তোমার বন্ধু সুজিতের বাড়ীর পথের মোড়ে গাড়ী থেকে নেমে পড়লে। সুজিতের চাকরের কাছ থেকে যা জানলে তাই যথেষ্ট মনে করে আর কোথাও না গিয়ে সোজাসুজি বাড়ী ফিরে এলে। রাধার মুখ থেকে আমাদের চলে আসার খবরের ঢেউ লাইনত আগেই জেনেছ। এবার ভিতরের খবর জানার জন্য ওকে চেপে ধরলে। হ্যাঁ, ওতে কাজ হয়েছিল। থানা পুলিশের ভয় দেখালেও যতদূর পর্যন্ত এগুবার প্রয়োজন হয়নি। তোমার ধমক খেয়ে আমতা-আমতা করে শেষটায় মুখ খুলেছিল। তোমার অনুপস্থিত সময়ে প্রায় দিনই সুজিত এ বাড়ী আসত। কথা গল্প আর হাসির তোড়ে সময় উড়িয়ে চলত। কোনদিন ওর সঙ্গে বেরিয়ে পড়তাম। তুমি জানতে একলাটি কোথাও বেরিয়েছি। ফিরে এলে কোথায় গিয়েছিলাম জানতে চাইতে। সিনেমা, গঙ্গার ধার বা কোন নাম করা রেস্তোরাঁর কথা চেপে গিয়ে ইতি উতি জবাব দিয়ে তোমায় খুশী করতাম। এসব স্নায়ুউত্তেজক ঘটনার কিছুই তুমি জানতে পারতে না। কে আর বলবে। মেয়েত তখন স্কুলে। থাকার মধ্যে শুধু রাধা। ওই জানত সব। কিন্তু সুজিতের নগদ বকশিস ওর মুখ বন্ধ করে রেখেছিল। কেউ পারে না। তুমিও তোমার ঘুষের অমর্যাদা সইতে পারো নি। সব জেনে নিয়ে কাজ ছাড়িয়ে ওকে বাড়ীর বার করে দিলে।

তা তুমি ঠিকই করেছিলে। দু'জনে বেরিয়ে পথের নির্দিষ্ট জায়গায় এসে তিনজন হয়েছিলাম। সেদিন সুজিতের জন্য তোমায় ছেড়ে গিয়েছিলাম। আর আজ মেয়ের জন্য সুজিতকে ছেড়ে এলাম।

রাধাকে বিদায় করে ঝড়ো হাওয়ায় উড়িয়ে আনা খড় কুটোর মত উদ্দেশ্যহীন ভাবে এদিক সেদিক করে অনেকক্ষণ পথে পথে ঘুরলে। মনে মনে যাবে না ঠিক করেও শেষটায় অফিসে পৌঁছে দেরী করে আসা কেরানীর মত লুকিয়ে লুকিয়ে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসলে।

ঘন ঘন কলিংবেলের বোতাম টিপে বেয়ারা পিয়নদের তলব করেছ। তোমার ঘরে ঢুকে ওরা সেলাম জানালে কি জন্য ডেকেছ ঠিক মনে করতে না পেরে ওদের উপর বিরক্ত হয়েছ। পূর্ব নির্দেশমত স্পিক কেসের ফাইলগুলো নিয়ে এ্যাসিটেন্টরা তোমার ঘরে ঢুকলে যখন তখন তোমাকে ডিসটার্ব করার জন্য কাজের নিয়ম কানুন সম্বন্ধে অপ্রাসঙ্গিক কতগুলো উপদেশ দিয়ে ওদের বেকুব বানিয়ে ছেড়েছ। স্টেনোকে ডিকটেশন দিতে গিয়ে বারবার আনমনা হয়েছ।

অফিস শুদ্ধ লোক তোমার অদ্ভুত ব্যবহারে সেদিন বিস্ময়ে থ হয়েছে। কাজের ফাঁকে এর কারণ খুঁজেছে। লিফ্টার পিরিঅডে নিজেদের মধ্যে গবেষণা চালিয়েছে। ওদের দৌড় কিন্তু ঐ পর্যন্তই। মুস্কিল হয়েছে তোমার আত্মীয় বন্ধুদের নিয়ে। মেয়েকে নিয়ে বাপের বাড়ী চলে গেছি বলে কদিন আর ক'জনকে ভোলান যায়। ব্যাপারটা আর যখন চাপা থাকেনি তখন সকলে কেমন যেন মনে মনে হেসেছে। করুণার চোখে তোমাকে দেখেছে। নিজেকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে ইচ্ছে হয়েছে। তোমার অফিসের সব চেয়ে কম মাইনে পাওয়া বেয়ারাটাও যেন তোমার চেয়ে বেশী সম্মান আর প্রতিপত্তির অধিকারী।

কোন কিছুই কালজয়ী নয়। তুমিও এই সত্যের উর্ধ্বে যেতে পারো নি। জীবনের লাভ ক্ষতির দর কষাকষি দু'দিনের। সবই মেনে নিতে হয়। ক্রমে ক্রমে সব সয়ে যায়। তুমিও মেনে নিয়েছ। মেনে নিয়ে

কিছুটা স্বাভাবিক হতে পেরেছে। অফিসে হয়েছে। বাড়ীতেও।

পাশের বাড়ীর ঘড়িতে অনেকক্ষণ আগে বারোটা বেজে গিয়েছে। এ রাস্তার শেষ বাসটা বোধহয় এতক্ষণ গ্যারেজে ঢুকে বিশ্রামে লেগেছে। নিশাচর ট্যাক্সি-গুলো কিন্তু দু'পাশের ঘুমন্ত বাড়ীগুলোকে চমকে দিয়ে এখনো যাওয়া আসা করছে। রাস্তার দু'ধারে সার বাঁধা দোকানগুলো অনেকক্ষণ আগে বন্ধ হলেও নিচের হোটেল দু'টো এখনো পাঞ্জাবী ড্রাইভারদের পানাহারে মুখর হয়ে আছে। শহরের কর্ম চাঞ্চল্য কমে আসায় খুচরো নৈশ্য শব্দগুলো বড় বেশী জোরালো হয়ে বাজছে। এক পাত্র থেকে আরেক পাত্রে ঢেলে চা তৈরী করা, ডিস গ্লাস নাড়ার হোটেল মধ্যকার প্রতিটি শব্দ এখান থেকে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। হোটেলের সামনে পথের মোড়ের কাটপাথের টিউবওয়েলের ল্যাণ্ডপটাকে বিশ্রী রকমে কাঁকিয়ে কাঁকিয়ে জল তোলার শব্দটাকে বড় বেশী একঘেয়ে আর বিরক্তিকর লাগছে।

তোমার ঘরে যে কোন শব্দ নেই। তোমরা কি ঘুমিয়ে পড়েছ। তা ঘুমাও। রাত ত আর কম হয়নি। তা ছাড়া তুমি বেশীক্ষণ না জেগে ঘুমিয়ে পড় এটা আমিও চাই। আমি তোমার ঘরে যাব। একবারটি তোমায় দেখব। তোমার কপালে নিশ্চয়ই কালি ভরা আছে। ওটা যে আমার প্রয়োজন। রাত তাড়া-তাড়িতে খেয়াল হয়নি। নয়ত সুজিতের ওখান থেকেই কাজটা সেরে আসা যেত। তা মাত্র ত গোটা কয়েক অক্ষর। স্পষ্ট করে একটা কাগজে লিখতে কতক্ষণই বা লাগবে। আর ঐ অবকাশে তোমাকে দেখে নিতে পারব। অনেকদিন দেখিনি যে। আর দেখবও না। হ্যাঁ, এই দেখাই যে শেষ দেখা।

আমি মন ঠিক করেই এসেছি। চন্দনের চোখকে লুকিয়ে আনা জিনিষটা আমার সঙ্গেই রয়েছে। সুজিত চেম্বার থেকে ফিরে এসে দেখবে আমরাই শুধু অদৃশ্য হইনি ওষুধের আলমারি থেকে তীব্র বিষের শিশিটাও উধাও হ'য়েছে।

আমার মৃত্যুর জন্য কাউকে দায়ী না করে কথা কটা চট্‌পট্‌ লিখে যেখানে সহজেই তোমার চোখ পড়বে, হ্যাঁ, সেই যে সেই টেবিলটার উপর যেখানে তোমার টুথ ব্রাশ পেষ্ট চিরুনি সাবান তেল সাজানো থাকে সেখানে রেখে হাতের এই অন্ধকারে চলে এসে খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে শিশির মধ্যকার জলীয়টুকু গলায় ঢেলে দেব।

এ ছাড়া আর যে পথ নেই। উপরের স্লেট রংয়ের আকাশের মত আমার আগ পাছ জুড়ে নিশ্ছিদ্র অন্ধ-কারের প্রাচীর দাঁড়িয়ে আছে। সুজিতের ওখানে ফিরে যাওয়া আর সম্ভব নয়। সে পথ আমিই বন্ধ করে এসেছি। চন্দনকে সঙ্গে না দেখলে ও আমায় জায়গা দেবে না। যাকে একলা পাওয়ার জন্য হল চাতুরীর শেষ ছিল না তাকে ধরা ছোঁয়ার বাইরে রেখে গেলে ও কি আমায় ক্ষমা করবে। এমনিতেই ও ভিতরে ভিতরে জ্বলছিল। মোক্ষাদুজি প্রকাশ না করলেও উত্তাপটা ওর ব্যবহারে প্রকাশ পেত। আর এ রাগের কারণ খুঁজতে কি সাত পাঁচ ভাবতে হয়। ঠিকই ধরেছি। আমার গায়ে বালি পড়লে রাগ হয় বৈকি। কিন্তু উপায়ই বা কি। জেনে শুনে মেয়েকে কি ওর ইচ্ছার হাতে খেলনা করে রেখে যেতে পারি। তাই শুধু মাত্র আমার জন্য কিনে আনা সিনেমার টিকিটটা ফিরিয়ে দিয়ে মাথা ধরার অভিনয় করেছি। এইত দুদিন আগেও একতাড়া নোট হাতে গুঁজে দিয়ে আমাদের না মেয়ের শাড়ী, ওর জন্য দুই আর সাটের কাপড় কিনে আনতে বলে চন্দনকে শরীর বিজ্ঞান বইটা নিয়ে আসতে তাড়া করায়। এক মিনিটও যেন নষ্ট করলে চলবে না। পরদিনই যেন চন্দনের পরীক্ষা। আর সেদিন বিকেলের মধ্যেই যেন সারা বছরের কোসটা ও রপ্ত করিয়ে ছাড়বে। দু'টো শাড়ীর মূল্যে আমার অনুপস্থিত সময়টুকু ও কিনে নিতে চেয়েছে। ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে মুহূর্তে আমি ভীষণ রকম প্রেমিকা হয়ে উঠি। তাই কি হয় নাকি। আমিও ওকে সঙ্গে যাওয়ার জন্য জেদ ধরি। দু'জনের পছন্দে কিনব। অনেকদিনত এক সঙ্গে কেনা কাটা হয়নি। শেষ পর্যন্ত অবশ্য বের করে ছেড়েছিলাম। নিজের ফাঁদেই যেন বাঘ আটকা পড়েছিল। বাঘ। হ্যাঁ, বাঘ বৈকি। ওর দু'চোখে রক্ত পিপাসু এক বাঘকে দেখতাম। পরিচিত সে দৃষ্টি। এ বাড়ীতে যখন আসত এমনি চোখেই ও আমার দিকে তাকাত।

আজকাল যে চোখে চন্দনের দিকে তাকায়! কথায় কথায় চন্দনের কাছে এসে আদরে আদরে গলিয়ে ওর বয়সটাকে কুঁড়ির আঠারো থেকে যেন আটে নামিয়ে আনত। অকৃত্রিম সুস্মিতের আদরের ছলে চন্দনের বয়সটাকে এমন ভাবাই স্বাভাবিক। ফুলের বুকে ঘুরে বেড়ানো কীটের মত সুস্মিতের আঙুলগুলো যখন চন্দনের হাতে এবং হাত ছেড়ে মাথার চুল ছুঁয়ে চলতে চলতে চিবুকের নিচে গলা পর্যন্ত, নেমে আসত তখন চন্দনের সংকুচিত মুখের দিকে তাকিয়ে মনে মনে নিজের মাতৃত্বকে ধিক্কার দিতাম। কথার গল্পে যতই সহজ হওয়ার ভাব দেখাক না। স্পর্শ সুখে তৃপ্ত দেহ-মনের এক বহিঃপ্রকাশ ওর চোখে মুখে ফুটে উঠত। ওসব দেখেও কিছু বলতে পারতাম না। চন্দনের সামনে কি আড়ালেও নয়। ধরা পড়ে ও যে আরো বেপোরোয়া হয়ে উঠত। মনের বাঘ থেকে সাবধান হওয়া সহজ, মনের বাঘকে কতক্ষণ আর চোখে চোখে রাখা যায়। ওর থাবার অসংখ্য নখরাঘাত আমি সয়েছি। কিন্তু তার একটিও চন্দনের গায়ে লাগার আগে আমি ওকে চোখের আড়ালে, নাগালের বাইরে যেখানে ভরসা আর বিশ্বাসের আশ্বাস আছে সেখানেই নিয়ে এলাম। তুমি ওর বাপ। সুস্মিত ওর কে!

কত যে নিশ্চিন্ত লাগল। এবার মরতেও আমার আপশোষ নেই।

আঃ! একটু যে হাওয়ার স্পর্শ পাচ্ছি। প্রকৃতি করুণা বিলাচ্ছে। কৃষ্ণ চূড়ার ঝুর-ঝুরে পাতায় পাতায় কাঁপন লেগেছে।

তুমি কি চড়া আলোটা জ্বালিয়ে রেখে ঘুমিয়ে পড়েছ। তোমার ঘরের দরজার বাইরে চলকে পড়া আলোটা তেমনি জোরালো লাগছে। কখন কখন বুঝি তেজী আলোটা নিভিয়ে সবুজ আলোটা জ্বালাতে ভুলে গেছ।

আর না। নিচের হোটেলের শব্দগুলো থেমে গেছে। পরিবেশক ছোকরাগুলো ছুটি পেয়ে এতক্ষণ নিজেদের অপরিচ্ছন্ন বিছানার মধ্যে কুকুর-কুণ্ডলী হয়েছে। বোডের টিউবওয়েলটাকে বিরক্ত করার মত বুঝি কেউ জেগে নেই। বিশ্রাম পেয়ে ওটার চোখেও বুঝি ঘুমের চুলুনি নেমেছে। এই সময়। অনুকূল সময়। এখনকার প্রতিটি আমাকে টানছে। আকর্ষণ করছে।

কি নিঃশব্দ। সব যেন স্তব্ধ হয়ে আসছে। আমি পা টিপে টিপে চলছি। শোক সভার মত স্তব্ধ প্রকৃতির সঙ্গে নিজের সত্তাকে এক করে নিয়ে খাদ্যান্বেষী বন্যের সতর্কতা নিয়ে এগুচ্ছি যেন সামান্যতম শব্দ হলেও তোমার ঘুম না ভাঙ্গে।.....আমার শরীর কাঁপছে। হাত। পা। বুকের মধ্যকার টিপ্‌টিপ্‌ শব্দ আমার কানে বাজছে। আমি আজ চোরের মত। নিজের বাড়ীতে আমি চোর।

একি তুমি এখনো ঘুমাও নি! এতো তোমারই গলার স্বর।

.....যা চন্দন তোর মাকে ডেকে নিয়ে আয়।

ভুল নয়, আমি ঠিকই শুনছি। কিন্তু একি শাস্তি তুমি আমার জন্য ঠিক করেছ। ক্ষমা করে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত তুমি আমাকে অনুতাপের আগুনে পুড়িয়ে মারতে চাইছ। এর চেয়ে প্রত্যক্ষ মৃত্যু যে অনেক সহজ আর সুখের।

চন্দন ঘরের বাইরে এসেই যে আমাকে এখানে চোরের মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পাবে। লজ্জা। না। লজ্জা করার আমার আর আছে কি। তবে ও কি ভাববে। আমি পালাব। কিন্তু এখন পালাতে গিয়েও যে ধরা পড়ে যাব।

না। আমি পালাব না। তোমার ঘরের পাশে এখানটায় যেমন আছি তেমনি দাঁড়িয়ে থাকব। তবে চন্দনকে না পাঠিয়ে নিজেই এক বারটি এস না। তোমার ঘরে ঝুলিয়ে রাখা শংকর মাছের চাবুকটা নিয়ে এসে তোমার ভালবাসার অপমানের শোধ তুলে নাও। তোমার কাছে দাবী করার আর আমার অধিকার নেই। কিন্তু দোহাই তোমার আমার এই অনুরোধটা রেখো। তোমার আঘাত যতই নির্মম হোক, জ্বালা যতই তীব্র হোক আমি তা সইতে পারব। এটা জেনো সব খুইয়েও মাতৃত্বের মর্যাদা আমি নষ্ট হতে দিইনি। যে ক'টা দিন বাঁচব (যদি বেঁচে থাকি, পুরো সিদ্ধান্তে এখনো যে আমি অটল) এর গৌরব নিয়েই বেঁচে থাকব।

সাদাকালোর কাহিনী

অমল হালদার

"আমার মনে হয়, আমাদের এ ভাবে গ্রেপ্তার করে আদালতে হাজির করা অন্যায় হয়েছে। কেননা এর দ্বারা রাষ্ট্র আমার স্ত্রীর প্রতি আমার ভালবাসা বা আমার প্রতি আমার স্ত্রীর ভালবাসাকে একটি প্রকাশ্য রাজনৈতিক ঘটনায় পরিণত করে ফেলেছে…।"

আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে এই কথাগুলো যিনি বলেছেন, তিনি জনৈক আফ্রিকান যুবক। তাঁর নিবাস দক্ষিণ আফ্রিকা। সম্প্রতি তাঁকে গ্রেপ্তার করে আদালতে হাজির করা হয়েছে। কেননা, যুবকটি আফ্রিকান হলেও সে জনৈক ইউরোপীয় যুবতী বিয়ে করেছে।

সাদা-কালোর জগৎজোড়া দ্বন্দ্বে ঘটনাটা একটু চাঞ্চল্যকর ঠেকলেও মোটেই অস্বাভাবিক কিছু নয়। এমন কি কুখ্যাত ইম-ম্যারালিটি এ্যাক্ট এর দেশ দক্ষিণ আফ্রিকায় নয়। কেন না, গল্পে উপন্যাসে তো বটেই খবরের কাগজের পাতায়ও আফ্রিকার এ ঘটনা বহুবার ঘটেছে এবং কেউ না বললেও সবাই জানে উড-মাথসিকিজার Tood Matshikiza সেই নায়কের ঘটনা বহুজনের জীবনেই আজও এখানে সেখানে ঘটছে। (Me and a European Lady did a non European thing at crown mines…' তবুও কেনেথ দেকিস-এর কাহিনীটা শুনবার মত। কেন না, সে যুদ্ধে উঠতে না পারলেও লেখক জানেন ঘটনাটা রাজনৈতিক।

আফ্রিকান হলেও কেনেথ সংগক্ত যুবক। তার গায়ের রংটাও ঠিক ততখানি কালো নয়। সাহেবদের মত আবার সাদাও নয়, মাঝামাঝি। তবে এমন রং যে, ইচ্ছে করলেই সে অনায়াসে তার জাতের বাইরে একটা ঠিকানা পেয়ে যেতে পারে।

ইসাবেল লাস্ট-এর পরিস্থিতি কিন্তু অন্য। সে ইউরোপীয় মেয়ে তার (মানে তার বাবার) টাকা আছে। কিন্তু মেয়েটি তবুও নিঃসঙ্গ। সে অসুখী। কারণ,

তার একটি মন আছে এবং সেটি এই যৌবনেও (বাকো সকলেরই নাকি থাকে) নিবারেল।

অবাক চোখে ইসাবেল দেখেছে তার চোখের সামনে ভয়ঙ্কর ঘটনা সব ঘটছে। দারিদ্র, ব্যাধি, ক্ষুধা নিষ্ঠুরতা, ঔদাসীন্য। প্রতিটি কৃষ্ণকায় মানুষের চোখে, মুখে হাতে ব্যক্তিগত জীবন ইতিহাসে যেন পড়া যায় সে কাহিনী এবং ইসাবেলের মনে হয় সেই টুকরো টুকরো কাহিনী মিলিয়েই যেন এই আফ্রিকান শহরটির সম্পূর্ণ জীবনী। আফ্রিকানদের উপর রেগে যায় সে, রেগে যায়—জীবনকে ওরা এভাবে মেনে নিয়েছে বলে। বছরের পর বছর কেন এমনভাবে ওরা হাসবে, কাঁদবে, অভিশাপ দেবে, ঘর করবে, মা কিংবা বাবা হবে! অবুঝী ইসাবেল তা ভেবে পায় না।

এই নিবারেল ইউরোপীয় মেয়েটি যে শহরে বাস করে যুবক কেনেথ সেখানে আদিবাসী। কিন্তু ওরা দুজনেই কেউ কাউকে জানে না। জানাজানি হলে দেখা যেত একজন যেমন আফ্রিকানদের কাছাকাছি হতে উদ্‌গ্রীব, অন্যজন তেমনি ফিকে চামড়াটা নিয়ে সানন্দে সাদাদের দলে মিশে যেতে রাজী।

দেখা যখন হল যেন দুজনের কেউই মুখ ফুটে একথা বলতে পারল না। কারণ মাঝখানে তাদের প্রহরী। সরকারী প্রহরী নয়—ইসাবেলের মতই একটি সাদা মেয়ে। তার নাম মিস বেল্টউইচ। তাতে তিনি আধা সাদা আধা কালো এবং তার জানা আছে সেই বর্ণ-বিন্যাসটাও হয়েছিল একদিন আফ্রিকার আদিম অন্ধকারে। সুতরাং জীবনের সেই ক্ষোভ এবং লজ্জা গোপন করার জন্যেই যেন মিস বেল্টউইচ সমাজের অন্যান্যদের চিন্তায় মেতেছেন যদিও ক্রমে বোঝা গেল, সেটা উপলক্ষ্য, মিস বেল্টউইচ এর আসল লক্ষ্য তার জীবনে যা অপূর্ণ রয়ে গেল, সুযোগ পেলে অন্যের জীবনেও তা ফাঁকা রাখবার ব্যবস্থা করা। সুতরাং বেনেথ এবং ইসাবেল কাছাকাছি হলেও কেউ কাউকে চিনল না। চিনবার সুযোগ হল না।

সেই সুযোগও একদিন এল কিন্তু সে আর দক্ষিণ আফ্রিকায় নয়। কেনেথ তখন ইংলণ্ডে। সে আইন পড়তে এসেছে। ইসাবেলও সেখানে। আবার ওদের দুজনের দেখা। এবার আর দুজনের মধ্যে কোন মিস বেল্টউইচ নেই। পৃথিবী স্বাধীন। সুতরাং ওরা দুজনে দুজনকে ভালবাসল।

সে ভালবাসায় কোন ফাঁক নেই। কিন্তু কেনেথ-এর জীবনে মস্ত একটা ফাঁকি আছে। ওর দেহ, চর্ম কোনদিন ইসাবেলকে চিন্তিত করেনি। কিন্তু কেনেথ তবুও ইসাবেলকে কোনদিন বলেনি···সে আফ্রিকান!

সে পরিচয় প্রকাশ পেল সেদিন, যেদিন নবদম্পতি ফিরে এল নিজেদের ঘরে, দক্ষিণ আফ্রিকার সেই লিণ্ডহার্স্ট শহরে। ইম-ম্যাররালিটি এ্যাক্ট অনুযায়ী গ্রেপ্তার করা হল কেনেথকে। সঙ্গে ইসাবেলকেও।

কিন্তু ওরা তখন এগিয়ে গেছে অনেক দূরে। ইসাবেল ভালবেসে বিয়ে করেছে কেনেথকে। কেনেথ ভালবেসে বিয়ে করেছে ইসাবেলকে। সুতরাং প্রশ্ন এখন কি প্রকৃতই সাদা কিংবা কালো নয়, প্রশ্ন ভালবাসা যে আইনী কিনা তাই।

আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে কেনেথ বলেছে এই ক্ষেত্রে আইনের একটি কর্তব্য এবং তা হচ্ছে আমাদের ছেড়ে দেওয়া। কিন্তু নিষ্ঠুর দক্ষিণ আফ্রিকা তা দেয় না। ভালবাসার স্বপক্ষে সে চামড়ার (এই ক্ষেত্রে রক্তের) সাক্ষী চায়।

সাদা কালো বিষয়ক উপন্যাস হলেও মামুলী ধরণের উপন্যাস নয়। তরুণ লেখক জেকবর্ডসন (বয়স ত্রিশ) নিজে জাতিতে ইহুদি। জাতিতত্ত্ব নানা দিক থেকে এবং গভীর দৃষ্টি দিয়ে দেখতে চেয়েছেন তিনি। দক্ষিণ আফ্রিকা যে শুধু সাদা আর কালো নয়, মানসিক সমস্যাগুলো যে সেখানে রাজনৈতিক আইনের চেয়ে আরও অনেক বেশী জটিল বিভিন্ন চরিত্রের বিচিত্র মনোভঙ্গীর মাধ্যমে তাই প্রমাণ করেছেন তিনি। ফলে উপন্যাস হিসাবে যে বইটি সার্থকতা হয়েছে তাই নয়, আফ্রিকার রাজনৈতিক পটভূমিটাও মোটা রকমের তত্ত্বের বাইরে অনেক দূরে বিস্তার লাভ করার অবকাশ পেয়েছে।

(The Evidence of Love : by Don Jacobson Welden field & Nicolson.)

কমনমার্কেটে রাজনীতি

সন্তোষ দত্ত

অনেকেই মনে করেন যে কমনমার্কেট বা সাধারণ বাজার জোট ইউরোপে আর্থিক পুনর্গঠন ও বাণিজ্যিক স্বার্থরক্ষার জন্যই পরিচালিত, আজকাল অর্থনীতি ও রাজনীতি বিশেষ ভাবে সম্পর্কিত। সে অর্থে এই বাণিজ্যিক জোটে কিছুটা রাজনীতি থাকবে তা সকলেই আশা করেন। কিন্তু আরও সূক্ষ্মভাবে বিচার করে দেখলে বুঝা যায় যে কমনমার্কেট জোটের আসল প্রেরণার উৎস অর্থনীতির চেয়ে রাজনীতির ক্ষেত্রেই বেশী। ব্রিটেন কমনমার্কেটে যোগদান করার জন্য যে আলাপ আলোচনা চালাচ্ছে সে প্রসঙ্গে এ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যটা ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শুধু যদি আর্থিক ব্যাপারই হত তাহলে ব্রিটেন বহু আগেই কমনমার্কেটে যোগ দিত।

বর্তমান প্রবন্ধে কমনমার্কেটের রাজনীতির কয়েকটি বিষয় নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল—

গত মে মাসের একটি সাংবাদিক সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট কেনেডি স্পষ্টই বলেছেন যে ব্রিটেন যদি কমনমার্কেটে যোগ দেয় তা হলে "স্বাধীন দুনিয়া" (কমিউনিস্ট দুনিয়া বাদে) এবং আটলান্টিক জোটের স্বার্থ রক্ষার সুবিধা হবে। "স্বাধীন দুনিয়া" এবং "আটলান্টিক জোট" এ দুটি কথার একটা রাজনৈতিক ইঙ্গিত রয়েছে কেনেডির বক্তৃতায়। অর্থনৈতিক বিষয়ে সুপণ্ডিত প্রেসিডেন্ট কেনেডি কমনমার্কেটের আর্থিক দিক সম্পর্কে আপাততঃ নীরব থেকে এরূপ মন্তব্য করার একটা বিশেষ রাজনৈতিক তাৎপর্য রয়েছে। সে তাৎপর্য হল কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে পশ্চিমী দুনিয়ার শক্তি বৃদ্ধি করা। কেনেডি একথাও বলেছেন যে ব্রিটেন কমনমার্কেটে যোগ দিলে ইউরোপের শুধু আর্থিক মঙ্গলসাধনই হবেনা ইউরোপীয় রাজনীতিতে একটা স্থায়ী অবস্থা বিরাজ করবে এবং এভাবে ইউরোপীয় সংহতি রক্ষার সুবিধা হবে। তখন একদিকে যুক্তরাষ্ট্র এবং অপরদিকে সংহত ইউরোপ এ দুয়ের মধ্যে একটা সহজ বোঝাপড়ার সম্ভাবনা থাকবে।

কমনমার্কেটের ব্যাপারে ফ্রান্সও একথা স্পষ্টই বলে দিয়েছে (ব্রিটেনের যোগদানের শর্তাবলী আলোচনা প্রসঙ্গে) যে ব্রিটেন যদি কমনমার্কেটে যোগদান করতে চায় এবং এ জোটের বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ বজায় রাখতে চায় তাহলে কমনওয়েলথের চেয়ে ইউরোপের উপরই তাকে বেশী প্রাধান্য দিতে হবে। একথার রাজনৈতিক তাৎপর্য হল এই যে কমনওয়েলথে ব্রিটেনের যে আর্থিক স্বার্থ রয়েছে তার চেয়ে ইউরোপের রাজনৈতিক স্বার্থের উপরই ব্রিটেনের নজর দিতে হবে। এ শর্ত ছাড়া

ব্রিটেনকে কমনমার্কেটের সদস্য করা চলবে না। কমনমার্কেটে একমাত্র প্রধান শক্তি হল ফ্রান্স। তাই ফ্রান্স যে শর্ত রাখবে তার নড়চড় করানোর ক্ষমতা অন্যান্য ৫টি দেশের নাই। গত মে মাসে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট দ্যগলের যে সাংবাদিক সম্মেলন হয়েছিল সেখানে এ বিষয়ে তিনি একদম নীরব ছিলেন। ফ্রান্স ও ব্রিটেনের মধ্যে এখন উচ্চপর্যায়ে আপোস আলোচনা চলেছে। এ আলোচনা পুরোপুরি না হওয়া পর্যন্ত ফ্রান্স বেশী কিছু বলতে চাইবেনা। তবে এ প্রশ্নে বর্তমানে যে বহু জটিলতা দেখা দিয়েছে তা বেশ বুঝা যাচ্ছে।

প্রেসিডেন্ট দ্য গলের মত হল এই যে ইউরোপের যে রাজনৈতিক জোট হবে তাতে সংখ্যাগরিষ্ঠতার নীতি চলবে না। অর্থাৎ ফ্রান্সের মতের প্রাধান্য রাখতেই হবে। ফ্রান্সের এই স্বতন্ত্রবাদ অনেকে ভালচক্ষে দেখেন না। তার কারণ এর ফলে একটি সুসংহত ইউরোপ গড়ে তোলার বাধা দেখা দিতে পারে এবং সোভিয়েত নেতার খপ্পরে পড়তে হতে পারে ফ্রান্সকে। অথচ ব্রিটেন কমনমার্কেটে যোগ না দিলে ইউরোপের সংহতি সাধন হয় না। ইউরোপের এই প্রধান দুটি শক্তির মধ্যে একটা স্পষ্ট বুঝা-পড়া না হলে ব্রিটেনের কমনমার্কেটভুক্তি সহজে হবে না। অবশ্য এ জন্য ব্রিটেনেরও কিছু স্বার্থ ত্যাগ করতে হবে। তাহল কমনওয়েলথ এবং বাণিজ্য বিষয় সম্পর্কিত। আর ব্রিটেনও একথা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে যে কমনমার্কেটে যোগ দিতে যত দেরী হবে ততই খারাপ। কারণ কমনমার্কেট দলগতভাবে যে সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে তাতে তার প্রভাব থাকবে না। প্রথম থেকে (১৯৫৯) কমনমার্কেটে যোগ না দিয়েই ত বহু বিষয়ে ব্রিটেনের মতামতের বালাই ছিল না। কাজেই আর দেরী নয়—বরং তাড়াতাড়ি সম্ভব কমনমার্কেটে যোগ দেওয়া উচিত। কিন্তু মুস্কিল বাধাল কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলি নিয়ে। এ সব দেশের সঙ্গে যে এতদিনের বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে তা সহজেই অস্বীকার ব্রিটেন করতে পারবেন না। আর শুধু রাজনৈতিক কারণে কমনওয়েলথের সঙ্গে একটা গাঁটছড়া বাঁধা রাখার চেষ্টা করলেও অর্থনৈতিক কারণে সাধারণ বাজারের অন্তর্ভুক্ত হওয়া ব্রিটেনের পক্ষে প্রয়োজন। কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোতে যে ভাবে আর্থিক প্রগতি হচ্ছে তাতে তাদের সঙ্গে শিল্পপ্রধান ব্রিটেনের বাণিজ্যিক সম্পর্কের ক্রমশঃ অবনতিই হবে মনে হয়। কমনমার্কেটের ব্যাপারে অন্যান্য দেশের যতই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাক না কেন অন্ততঃ ব্রিটেনের কাছে রাজনীতির চেয়ে অর্থনীতির স্বার্থই বড়। একমাত্র বৈদেশিক বাণিজ্যই ব্রিটেনের অর্থনৈতিক বনিয়াদ দৃঢ় করে। তাই ব্রিটেনের রাজনীতির গোড়ার কথাই হল তার অর্থনীতিকে শক্তিশালী ও গতিশীল করা।

আগেই বলা হয়েছে যে ব্রিটেনের কমনমার্কেটভুক্তির বিষয়ে প্রেসিডেন্ট কেনেডি বলেছেন যুক্তরাষ্ট্র এ বিষয়ের প্রতি সমর্থন জানাবে। এই সমর্থনের অন্তর্নিহিত ভাব হল এই যে ব্রিটেন যদি কমনমার্কেটে যোগদান করে তাহলে কমনমার্কেটের রাজনৈতিক জোটও তাকে মেনে নিতে হবে। আর ব্রিটেনের দেখাদেখি আরও কয়েকটি রাষ্ট্রও কমনমার্কেটের অন্তর্ভুক্ত হবে। এভাবে আটলান্টিকের পূর্ব পারে একটি সুসংহত ইউরোপীয় রাষ্ট্রগোষ্ঠী গড়ে উঠবে। আটলান্টিকের পর পারে রয়েছে প্রধান শক্তি যুক্তরাষ্ট্র। তাহলে সমস্ত বিশ্বে কমিউনিস্ট বিরোধী একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক জোট প্রতিষ্ঠিত করা সহজ হবে। কোনও একটি সংস্থার মাধ্যমের চেয়ে নিজেদের স্বকীয়তা বজায় রেখে আটলান্টিকের দুপারে এই দুটি শক্তি গোষ্ঠী বেশী সহযোগিতামূলক কাজ করতে পারে। আটলান্টিকের পূর্ব পারে প্রধান দুটি শক্তির মধ্যে ফ্রান্স আগেই কমনমার্কেটভুক্ত হয়েছে। বাকী শুধু ব্রিটেন। এখন ব্রিটেন যোগ না দিলে ঐ ত্রিশক্তি সমন্বয়—যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্স—ভাল ভাবে হয় না এজন্য যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে ব্রিটেনের কমনমার্কেট ভুক্তির উপর।

কমনমার্কেটে যোগদান করার আগে ব্রিটেন যে কমনওয়েলথের ওপর এত ওকালতি করছে তার কারণ শুধু অর্থনৈতিক নয়, এর মধ্যে রাজনীতি রয়েছে যথেষ্ট। আগে বলা হত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না। কিন্তু আস্তে আস্তে ব্রিটেনকে সাম্রাজ্যবাদ নীতির সঙ্কোচ করে বহু দেশ থেকে তাড়াতাড়ি গুটোতে হয়েছে। কমনওয়েলথ নামক সংস্থা দ্বারাই যোগাযোগ রাখা হয়েছে

সেইসব দেশের সঙ্গে। এখন কমনমার্কেটে যোগ দিলে ফ্রান্সের মতানুযায়ী কমনওয়েলথের চেয়ে ইউরোপের দিকেই বেশী নজর দিতে হয় এবং এতে কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্কে টান পড়ে। তাই কমনওয়েলথের বাণিজ্যিক স্বার্থ বজায় না রাখলে ব্রিটেনের সঙ্গে এ দেশগুলির যোগসূত্র ছিন্ন হতে পারে। বিশেষ করে ঘানা, হংকং, জিব্রাল্টার, সাইপ্রাস প্রভৃতি স্থানগুলির রণনৈতিক গুরুত্ব বিচার করে ব্রিটেন হঠকারিতার পরিচয় দিতে পারে না। এ গুলির মধ্যে কয়েকটির উপর ব্রিটেন প্রত্যক্ষ প্রভাব বজায় রাখতে চায়। কমনমার্কেট-ভুক্তির আলোচনায় এ গুলিকে একটি পৃথক মর্যাদা দিয়ে পৃথকভাবে আলোচনা করার ব্যবস্থাও হয়েছে, এতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ইউরোপে এখন প্রধান বিবাদ হল বার্লিন নিয়ে। এই বিবাদের একদিকে রাশিয়া অন্যদিকে প্রধান তিনটি শক্তি—যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স। এদের মধ্যে কমনমার্কেটভুক্ত দেশগুলির সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের একটা রাজনৈতিক সংযোগ ও অর্থনৈতিক বন্ধন দৃঢ় ভাবে রয়েছে। পশ্চিম জার্মানীর জনৈক মুখপাত্র একথা স্পষ্ট ভাবে বলেছেন যে যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য ছাড়া তাদের চলতে পারেইনা। ফ্রান্স ত কমনমার্কেটের ভিতরেই রয়েছে, বাকী থাকে যুক্তরাজ্য। যুক্তরাজ্যকে দলে না আনলে ইউরোপের রাজনৈতিক ঐক্যবন্ধন দৃঢ় হয় না। পশ্চিম জার্মানীর প্রাক্তন বৈদেশিক মন্ত্রী তাই বলেন যে ব্রিটেন যাতে কমনমার্কেটের সদস্যপদ লাভ করতে পারে সে জন্য পশ্চিম জার্মানীর চেষ্টা করা উচিত। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ১৯৫৭ সালে পশ্চিম জার্মানিই সাধারণ বাজার-জোট প্রতিষ্ঠা করে। ব্রিটেনের কমনমার্কেট-ভুক্তির ব্যাপারে পশ্চিম জার্মানীর এই সমর্থনে একটি বিশেষ রাজনৈতিক তাৎপর্য আছে বলে মনে হয়।

আফ্রিকায় ইউরোপীয় দেশগুলির যে উপনিবেশ-গুলি রয়েছে সে গুলোর স্বাধীনতা আন্দোলন উপেক্ষা করার মত নয়। এদের মধ্যে কয়েকটি ইতিমধ্যেই স্বাধীন হয়েছে।

কয়েকটির স্বাধীনতার দিন ঠিক করা হয়েছে। যেমন গাম্বিয়া। ব্রিটিশ শাসন থেকে ঐ দেশ আগামী বছর মুক্ত হবে।

অর্থনৈতিক স্বার্থেই ইউরোপের দেশগুলো এই উপনিবেশগুলিতে আধিপত্য বজায় রাখতে চেয়েছিলো। রাজনৈতিক জাগরণের ফলে তা যখন সম্ভব হচ্ছে না এ দেশগুলির উপর যাতে একটা অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব বজায় থাকে তার জন্য খুব চেষ্টা করা হল। আফ্রিকার চোদ্দটি উপনিবেশকে তাই কমনমার্কেটের উপ-সদস্য (Associate Member) করে নেওয়া হল, এই ষোলটি দেশের মধ্যে রয়েছে ফ্রান্স, পর্তুগাল, প্রভৃতি রাষ্ট্রের কয়েকটি প্রাক্তন উপনিবেশ এবং বর্তমান পাসস্বাধীন কয়েকটি দেশ। সম্প্রতি এইসব উপ সদস্য দেশগুলির সঙ্গে কমনমার্কেটের ভবিষ্যৎ সম্পর্কের ধারা কিরূপ হবে তা নিয়ে মত বিরোধ দেখা দিয়েছে কমনমার্কেটভুক্ত দেশ-গুলির মধ্যে, ইউরোপ ও আফ্রিকার রাজনৈতিক সম্পর্ক এখন কমনমার্কেটে একটি প্রধান বিষয়ে পরিণত হয়েছে। আটলান্টিকের পূর্ব পারে ইউরোপ ও পশ্চিম তীরে যুক্তরাষ্ট্র। এই উন্নত দেশগুলি নিয়ে একটি আটলান্টিক কমনমার্কেট গঠন করার বিষয়ও সম্প্রতি বিবেচিত হচ্ছে। কিন্তু আলাপ আলোচনার গতি দেখে বুঝা যায় যে যেহেতু যুক্তরাষ্ট্র স্বীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখারই পক্ষপাতী সে জন্যে এ মত একটি জোটে যোগ দেওয়ায় তত আগ্রহশীল নয়। তার চেয়ে সংহত ইউরোপের সঙ্গেই একটা বাণিজ্যিক সম্পর্ক রাখা কাম্য এবং বেশী মর্যাদাকর।

তথাকথিত স্বাধীন দুনিয়ার মধ্যেই কমনমার্কেট বিরোধী আন্দোলন সুরু হয়েছে। আগামী জুলাই মাসে কায়রোতে যে সম্মেলন হবে তাতে ৪০টি দেশ যোগ-দান করবে আশা করা যায়। ও ভাবে একটা ভারসাম্য বজায় থাকবে এবং আর্থিক ক্ষেত্রে শুধু নয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও একটা 'জোটবাদ' প্রতিষ্ঠিত হবে। কমনমার্কেট তাই শুধু অর্থনৈতিক জোটই নয়—প্রতিবাদী কমিউনিস্ট দুনিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামের একটা প্রস্তুতি মাত্র।

অমরনাথের তুষারক্ষেত্রে

অমিয়াংশু বিশ্বাস

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এবারে আমরা ফিরব। যে অতীতকে পিছনে ফেলে এগিয়ে এসেছি তার কথা আবার মনে হচ্ছে। বরফের সেতু ছাড়িয়ে এলাম। খুব জল তেষ্টা পেয়েছিল। ওয়াটার বটলটা কাছে ছিল না। অগত্যা পথের পাশে জমাট বরফের কিছুটা লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে আলগা করে নিয়ে খেতে খেতে চলি।

কয়েকটা বাঁক পেরিয়ে এসে দেখি কয়েকজন মিলিটারী বসে রয়েছে। তাদের মধ্যে একজন একটি খোলা ব্রাণ্ডির বোতল নিয়ে পরিশ্রান্ত লোকদের পান করাচ্ছে। ব্রাণ্ডির বোতল অনেকের পকেটেই দেখেছি। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই কেননা অমরনাথ ভারতের সবচেয়ে দুর্গম তীর্থ, পথকষ্টও সবচেয়ে বেশী এ রাস্তায়।

আগেই বলেছি আমাদের লক্ষ্য ছিল সেই দিনই শেষনাগ পৌঁছবার। পঞ্চতরণীতে এলাম আড়াইটার সময়। স্থির ছিল এখান থেকে ঘোড়া নিয়ে শেষনাগ ফিরবার কেননা আসবার সময় যেমন উৎরাই, যাবার সময় তেমনই চড়াই। পঞ্চতরিণী থেকে শেষনাগের উচ্চতার পার্থক্যই সবচেয়ে বেশী। এই স্বল্প সময়ে হেঁটে এতখানি রাস্তা অতিক্রম করা অসম্ভব কষ্টকর।

অমরনাথ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলব। অমরনাথের তুষারলিঙ্গ প্রাকৃতিক নিয়মে সৃষ্টি ও ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে এর ক্রমবিকাশ ও বিনাশ হয়ে থাকে। ভারতের আর কোনও তীর্থে অনুরূপ বিগ্রহ পূজিত হয়ে থাকেন বলে শুনিনি।

অমরনাথের সাথে সভ্যজগতের পরিচয় খুব বেশী দিনের নয়। প্রায় দেড়শ বছর আগে এক মুসলমান মেষপালক এই গুহার মধ্যে ঢুকে পড়ে ও ঐ রকম তুষারলিঙ্গ দেখে আশ্চর্য হয়ে লোকজন ডেকে আনে। ধীরে ধীরে এর কথা ছড়িয়ে পড়ে ও হিন্দুদের তীর্থক্ষেত্ররূপে পরিগণিত হয়।

বিগ্রহকে আমরা পূর্ণরূপে দেখতে পাইনি। পূর্ণরূপে লিঙ্গ প্রায় ছয়ফুট উঁচু থাকে। অনেকটা গলে গেছে এখন। মাসখানেক আগে এসে একে পূর্ণরূপে দেখা যেত। শ্রাবণী পূর্ণিমা উপলক্ষ্যেই যা জনসমাগম। এই দিন ছাড়া সারাবছর গুহাটি প্রকৃতির খামখেয়ালির উপরই ন্যস্ত থাকে।

ছড়িদার, পাণ্ডা ও পূজারী সবাই এই দিনেই এখানে এসে থাকে। কাল থেকে এখানে অবিশ্রান্ত বরফপাত

বিরাজ করবে শুধু দোকানের ঝুলে প্রত্যেক বছরের একটি নির্দিষ্ট দিনের তোলোচলের অচিহ্ন থেকে যাবে।

অনেক চেষ্টার পর তিনটি ঘোড়া পাওয়া গেল। ব্যানার্জি বললেন আমাদের ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে যেতে, তিনি পরে আসছেন আর একটা ঘোড়ার ব্যবস্থা করে। আমরা তিনজন অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘোড়ায় চড়ে চললাম পিছন দিকে তাকাতে তাকাতে ব্যানার্জিবাবু আসছেন কিনা।

নীল পদ্ম

যাব পথে অন্ধকার হয়ে এল। আর এল ভীষণ পার্বত্য কুয়াশা। সরু এক চিলতে রাস্তা দিয়ে চলছি, একপাশে গভীর খাদ আর অন্যপাশে খাড়াই পাহাড়। ধীরে ধীরে কুয়াশা আমাদের গ্রাস করে ফেলল। আমার কয়েক হাত আগে ঘোড়ার পিঠে মুখার্জি ছিল, সে অদৃশ্য হয়ে গেল। পিছনেও তাকিয়ে লোক দেখতে পেলাম না, অথচ সারি দিয়ে লোক চলেছে। আমি শুধু দেখতে পাচ্ছি আমার ঘোড়াকে ও লাগাম ধরে যে বাঙালি তের বছরের ছেলেটি চলেছে তাকে, আর ধোঁয়ার মত। সে বলল, জিনটা শক্ত করে ধরে থাকতে, ভয় পাবার কিছু নেই।

ঘোড়াগুলিকে ঠিক ঘোড়া না বলে খচ্চর বা অশ্বতর বলাই ভাল। তবে পাহাড়ী রাস্তায় এদের চলবার দক্ষতার তুলনা নেই। কিন্তু এদের চলবার বিশেষত্ব হল এরা পাহাড়ের দিক দিয়ে না গিয়ে খাদের দিক ঘেঁসে চলে, সেজন্য সওয়ারীদের ভয়ের অন্ত থাকে না।

পথ অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল হলেও বিক্ষিপ্ত কয়েকটি দুর্ঘটনা ছাড়া আর কিছুই ঘটেনি। শুনেছিলাম এক সাধু নাকি পড়ে গেছে খাদে আর একজন পা ভেঙেছিল। একমাত্র চাক্ষুষ দেখেছিলাম একটি বৃদ্ধাকে রক্তাপ্লুত অবস্থায় পড়ে থাকতে পা হড়কে যাওয়ার ফলে, সে বিবরণ যথাস্থানে দেব।

কিছুক্ষণ পর কুয়াশা কেটে গেল তবে মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে তাকিয়ে বিশেষ ভরসা পাই না। ব্যানার্জির জন্যও দুশ্চিন্তা রয়েছে, তারও কোনও চিহ্ন নেই পিছনে। শেষনাগে পৌঁছানর পর ভয়ানক কুয়াশা নামল। এখানকার শীতও মারাত্মক। শেষনাগের দুরাত্রিই আমাদের কাছে সবচেয়ে কষ্টকর মনে হয়েছিল। শরীরের যেখানে বৃষ্টির ছাট লাগছে সেখানটা অসাড় হয়ে যাচ্ছে। মুখার্জি আমি ও স্বামিজী বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে এক লাগ করে চা খাই ও ব্যানার্জির জন্য অপেক্ষা করতে থাকি এক দোকানের টিনের চালার নীচে ভিজতে ভিজতে। ব্যানার্জি আরও ঘন্টাদুই পরে এলেন। হেঁটেই আসতে হয়েছে তাঁকে ঘোড়া জোটেনি। অন্ধকারে রাস্তায় বারকয়েক আছাড়ও খেয়েছেন।

২৭শে আগস্ট—

একটা গোলাকার বস্তুপিণ্ডকে ঢালু পথে গড়িয়ে দিলে তার গতি কোন বাধা না পাওয়া পর্যন্ত থামে না, আমাদের অবস্থাও কতকটা সেইরকম। অবিশ্রান্ত হেঁটে চললাম নিরবচ্ছিন্ন উৎরাই পেয়ে। আবার শেষনাগ হ্রদকে দেখলাম, তবে দিনের আলোয় এই প্রথম। জল মোটেই স্বচ্ছ নয়, সবুজে সাদায় মেশান। অত্যুৎসাহী কয়েকজন নেমে গেলেন স্নান করার জন্য। হ্রদকে পাশ কাটিয়ে পিসুঘাটী অতিক্রম করে চন্দনবাড়ী এলাম।

পিসুঘাটীর কিছু আগে এক বৃদ্ধাকে দেখি রক্তাপ্লুত অবস্থায় পড়ে থাকতে। কয়েকজনকে প্রাথমিক শুশ্রূষা দিতে দেখায় আমরা আর দাঁড়াইনি। ঘন্টপাল এসে পড়ল, একে আমরা যাবার সময় শেষনাগ বলে ভ্রম করেছিলাম।

অভ্রভেদী হিমাচল আবার বৃক্ষলতায় শ্যামলিমায় রূপান্তরিত হল। স্বামিজী নানারকম গল্পে মাতিয়ে

হাঁকছিলেন, পাহাড়ের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। এক জায়গায় একটি লোককে ভুট্টা সেঁকতে দেখে আমরা কয়েকজন বসে পড়লাম সেখানে। অমৃতের মত মনে হল সেই আধপোড়া ভুট্টা। ছোট ছোট গাছাড়া পা আবার চোখে পড়ল। ঘাঘরা পরা কাশ্মিরী মেয়েরা ছাগল চরাচ্ছে, কেউ কেউ ভুট্টা খেতে আড়চোখে তাকিয়ে দেখছে।

পহল গামে এসে সেই বাদশা হোটেলেই উঠলাম। দেওয়ালে টাঙান আয়নার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠি। একমুখ না কামান দাড়ি, চোয়াল ভাঙ্গা, তামাটেবর্ণ

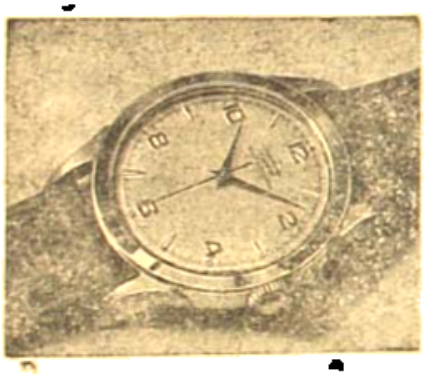

রিপেয়ারিংএ আমাদের এত সুনাম কেন ?

- আমরা প্রত্যেক ঘড়ির জন্য অরিজিনাল পার্টস ব্যবহার করিয়া থাকি।
- যে ঘড়ির জন্য যে কারিগর অভিজ্ঞ সেই ঘড়ির জন্য সেই কারিগর দ্বারাই মেরামত করান হয়।
- আমাদের কারিগরেরা প্রায় সকলেই সুইস ফার্মে ট্রেনিংপ্রাপ্ত।
- ক্রমবর্দ্ধমান মূল্য বৃদ্ধি সত্ত্বেও আমরা পূর্বের চার্জেই মেরামত করিতেছি।
- ঘড়ি মেরামতের প্রয়োজনে আমাদের সহিত পরামর্শ করিতে অনুরোধ জানাইতেছে।
- মফঃস্বলের জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা আছে।

চৌধুরী'জ

ঘড়ি, পেন ও চশমা বিক্রেতা

নেতাজী সুভাষ রোড, কলিঃ-১

ফোন : ২৩-০৬৭৩

একটি মুখ চোখে পড়ল, যাকে নিজের মুখ বলে মনে করতে অবাক লাগছিল।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে এক হোটেলে গিয়ে মাংস ভাত চাই এবং এত বেশী পরিমাণে খেতে সুরু করি যে লোকানী সন্দেহভাবে আমাদের তদ্বির করতে থাকে। অবশ্যই বুঝতে পারে যে দুর্ভিক্ষের দেশ অমরনাথ থেকে আমরা সদ্য আগত।

জটাজুটধারী স্বামিজীকে মাংস খেতে দেখে সবাই অবাক হচ্ছিল। তান্ত্রিকসাধুরা যে আমিষ আহার করেন এটা বোধহয় সেখানকার লোকদের ধারণার বাইরে। পহলগামের সেরাতের বিশ্রাম গৃহসুখের মতই সুখকর মনে হল। কুলি হাবিবকেও আমাদের ঘরেই আশ্রয় দিই। পরদিন সকালে তহশিলদারের দপ্তরে ভাগ্যদা দিয়ে ওর পাওনা টাকাটা মিটিয়ে দিলাম এবং তাকে আমাদের যথাসাধ্য পুরস্কৃত করেছিলাম।

এমন সুন্দর দেশের লোকেরা দারিদ্রে ডুবে রয়েছে। ভারত সরকারের সাহায্যের কথা বলায় হাবিব বলল, হিন্দুস্থান সরকার তাদের জন্য অনেক করছে কিন্তু তা উপর মহল ও নীচু মহলের বেড়া ডিঙিয়ে জনসাধারণের হাতে আসবার সুযোগ পায় না।

আজ ২৮শে আগষ্ট। বিকালে শ্রীনগরগামী বাসে উঠলাম। হাবিব অশ্রুসজল চক্ষে বিদায় নিয়ে চোখ মুছতে মুছতে চলে গেল। অমরনাথ পথে বহু লোকের সাথেই পরিচিত হয়েছে, চেষ্টা করে তাদের অনেকেরই মুখ মনে আনতে পারি না কিন্তু হাবিবের সেই সদাহাস্যময় মুখখানি ভুলতে পারিনি আর ভুলতে পারিনি তার বৃদ্ধকণ্ঠের "বাবুজী মেহেরবান।" শ্রীনগরে এসে আগের হোটেলে জায়গা পেলাম না। অমরনাথের তীর্থযাত্রীরা দলে দলে এসে সব হোটেল ভর্তি করে ফেলেছে। শর্ম্মাজীদের সাথে দেখা করে কিছুক্ষণ গল্প গুজব করে চলে এলাম। নতুন হোটেলের খোঁজ করতে করতে কাশ্মীর সরকারের অভিজাত 'বাদশা হোটেলের' এলাম।

— সমাপ্ত —

খেলাধুলা

অনন্য উইম্বলেডন

অজয় বসু

বার্ষিক অনুষ্ঠানের আরও একটি স্বাক্ষরে উইম্বলেডনের ইতিহাস দীর্ঘতর হয়েছে।

টেনিসের তীর্থভূমি এই উইম্বলেডন। ঐতিহ্যে এবং গুণগত বৈশিষ্ট্যে উইম্বলেডনের তুলনা নেই। টেনিসের প্রচলনে ও প্রসারে উইম্বলেডনের অবদান অবিস্মরণীয়। মর্যাদার দিক থেকে উইম্বলেডন কোর্টে আয়োজিত অল ইংলণ্ড লনটেনিস প্রতিযোগিতা অনন্য। সাংগঠনিক সাফল্যের স্পর্শে এই প্রতিযোগিতা সমৃদ্ধ। উইম্বলেডনে খেলেন যাঁরা অপেশাদারী টেনিসে তাঁদের কৌলীন্য-গর্ব আছে। যাঁরা পান শীর্ষাসন পেশাদার মহল সাদরে ও যোগ্য সম্মান মূল্যে তাঁদের বরণ করে নেন।

উইম্বলেডনে খেলা দেখতে আসেন যাঁরা, চলনে, বলনে, ও সামগ্রিক আচরণে তাঁরাও রীতিমতো অভিজাত। ফুটবলের জোর গোলে, ক্রিকেটের উচ্চকণ্ঠে উইম্বলেডনের শান্ত, সংযত মেজাজ চড়ে না। তারিফ জানাতে গিয়েও তাঁরা রাখেন পরিমিত অভিব্যক্তির প্রতি সুশিক্ষিত নিদর্শন।

উইম্বলেডনে টেনিস কোর্ট আছে গুণে গুণে পনেরোটি। সমতলভূমিতে বাছা বাছা চিকন ঘাসের কার্পেট বিছানো। অনেক পরিশ্রম ও নিষ্ঠায় এবং অঢেল টাকা ছড়িয়ে উইম্বলেডনের প্রাঙ্গণ সাজানো হয়েছে। যেন সাজানো বাগান। মাঠ আর পারিপার্শ্বিক পরিবেশের রূপ অভিন্ন। মাঠের গ্যালারিরা স্তরে স্তরে প্রাচীর বেয়ে ঊর্ধ্বমুখী হয়ে রয়েছে।

ইংরেজ রক্ষণশীল জাত। এগিয়ে যাওয়া যুগের প্রভাব সত্ত্বেও তারা সর্বত্র জাতীয় ক্রীড়াঙ্গনকে নতুন ঢংয়ে সাজিয়ে ছিমছাম করে তুলতে পারেনি। উইম্বলেডনের দর্শক আসনে তাই নতুন সজ্জার ছায়া পড়লেও আসল কোর্ট থেকে প্রকৃতির আশীর্বাদের চিহ্ন তারা মুছে দেয়নি। সেখানকার আকৃতিতে তাই প্রকৃতির অবিমিশ্র ছাপ।

এই চেহারা যে দেখেছে সেই মজেছে। তাকেই বলতে হয়েছে অস্ফুট কণ্ঠে, এমনটি কোথাও নেই! যে দেখেনি সেই ভাবে করে দেখবো খেলার মাঠের এমন চোখ জুড়ানো রূপ! যে দেখেনি, সেভাবে উইম্বলেডনে খেলার স্বপ্ন কতোদিনে সার্থক হয়ে উঠবে!

তবু সে স্বপ্ন সকলের পক্ষে সত্যে পরিণত হয় না। হয় তাঁদেরি ক্ষেত্রে যাঁরা দেশে-দেশে এবং বিদেশেও এক ক্রীড়াবিদরূপে স্বীকৃত। বাছাই পর্বে এক পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। সে পরীক্ষায় পাশ নম্বর পাওয়া গেলে তবেই সংগৃহীত হয় উইম্বলেডনে পাশপোর্ট।

উইম্বলেডনের পনেরোটি লনের মধ্যমণি হলো 'কেন্দ্রীয় কোর্ট'। সেখানেই পাতা হয় প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বের আসর। কোর্ট ঘিরে বৃত্তাকারে সাজানো গ্যালারিতে জায়গা আছে সতেরো হাজার দর্শকের।

রড লেভার—অস্ট্রেলিয়ান চ্যাম্পিয়ান

সমস্ত মিলিয়ে একটি ছোটখাটো স্টেডিয়াম বিশেষ। তবু তা ছোটই। ক্রীড়াঙ্গনের শ্যামল অস্তিত্বকে ঢেকে রাখার মতো যথেষ্ট বড় নয়।

প্রতিযোগিতার সুরুতে উইম্বলেডনের পনেরোটি লনেই কাজ সুরু হয়ে যায়। ক্রমে কাজ গুটিয়েওঠার মুখে সমস্ত কাজই কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে এই কেন্দ্রীয় কোর্টে। তখন প্রতিযোগীদের মধ্যে অবশিষ্ট থাকেন কেবলমাত্র কাজের মানুষেরাই। যাঁরা জিততে আসেন উইম্বলেডনে শুধু খেলে যাওয়াই পুণ্য করতে নয়।

এক বছরের প্রতিযোগিতায় উইম্বলেডনের কমপক্ষে ১০,০০০ নতুন বল ব্যবহার করতে হয়। পরিচালনায় নিয়োগ করতে হয় ১৪০ জন আম্পায়ার আর জন পঁচাত্তর বল-বয়কে। বয়দের কাজ খেলার মধ্যে জালের পাশ থেকে বা কোর্টের ধার থেকে বল যুগিয়ে খেলোয়াড়দের হাতে হাতে তার জোগান দেওয়া।

অন্যদের কথা উহ্যই থাকুক, এই বল-বয়দের কাজও রীতিমতো কঠিন। ঠিক সময় মতো তারা যদি প্রতিযোগী বা প্রতিযোগীনিদের হাতে হাতে বল তুলে দিতে না পারে তাহলে খেলোয়াড়দের ধৈর্যচ্যুতির আশঙ্কা দেখা দেয়। খেলোয়াড়েরাই উইম্বলেডনের নায়ক-নায়িকা, বয়দের দোষে তাঁদের মেজাজ নষ্ট হলে মূল আসরের মেজাজেও চিড় ধরে যায়। তাই বল-বয়দেরও গভীর অভিনিবেশে নিজেদের কাজের পাঠ গ্রহণ করতে হয়।

আজকাল সর্বদেশেই জাতীয় টেনিস প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। তার মধ্যে শীর্ষ পর্যায়ের অনুষ্ঠান হলো ফরেস্ট হিলসে আয়োজিত যুক্তরাষ্ট্রের, রোলাঁও গ্যারাস কোর্টে ফরাসী চ্যাম্পিয়নশিপ অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় টেনিস। কিন্তু সবার উপরের আসনটি দখল করে আছে উইম্বলেডনের অল ইংলণ্ড লনটেনিস প্রতিযোগিতা।

উইম্বলডনের শীর্ষস্থান দখলের নানান কারণ। উইম্বলডনের অতুলনীয় কোর্ট, সাংগঠনিক পরিচ্ছন্নতা এবং অনন্য ঐতিহ্য। সব মিলিয়ে তার দুর্নিবার আকর্ষণ। অল্পকথায় বলা যায় যে উইম্বলডনের আয়োজনের সূত্রেই টেনিস খেলা ইংলণ্ড থেকে প্রসারিত হয়েছে অন্যত্র। অথচ সুরুতে এই উইম্বলেডন প্রতিযোগিতা যারা হতো নামমাত্র নমো নমো করেই।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের কথা। ১৮৭৭ সালে সুরু হয়ে ১৮৮৪ সাল পর্যন্ত উইম্বলডন টেনিস অনুষ্ঠান-কেন্দ্র থাকা ব্রিটেনেও তেমন সাড়া জাগাতে পারেনি। সাড়া জাগালো সেদিন যেদিন র‍্যাকেট হাতে কোর্টে অবতীর্ণ হলেন বিখ্যাত ডোহার্টি ভায়েরা, হিউ ও রেজিনাল্ড। সেকালের নিরিখে হিউ ও রেজিনাল্ড ডোহার্টি ছিলেন প্রকৃতই সুদক্ষ খেলোয়াড় এবং তাঁদের চেষ্টায় টেনিসের ক্রীড়াগঙ্গতের মানও উঁচুতে উঠে।

ডোহার্টি ভায়েরা যতোদিন সক্রিয় ছিলেন ততোদিন উইম্বলডন প্রতিযোগিতার পুরস্কার ইংলণ্ডের বেহাত হয় নি। ট্রফিটি প্রথম ইংলণ্ডের বাইরে যায় ডোহার্টিদের অবসর গ্রহণের (১৯০৬) পর এবং উইম্বলেডনের প্রথম বিজয়ী হলেন অস্ট্রেলিয়ার নর্মান ব্রুকস (১৯০৭)। নর্মান ব্রুকস ১৯১৪ সালেও উইম্বলডনের শ্রেষ্ঠত্ব সম্মান পেয়েছিলেন এবং অন্তবর্তীকালে পেয়েছিলেন তাঁরই স্বদেশবাসী এন্টনী উইলডিং ও ১৯১৯ সালে অস্ট্রেলিয়ার জেরাল্ড প্যাটারসন।

পরবর্তী অধ্যায়ে একমাত্র ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত ছাড়া প্রতিবারই উইম্বলডন জয় করেছেন ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের বাইরের খেলোয়াড়েরা। ১৯০৪ থেকে

১৯৩৮ সালে উইম্বলডনের নায়ক ছিলেন ব্রিটেনের ফ্রেডপেরি। তাঁর কৃতিত্বের নজীরও অপরিসীম। আর কেউই পেরির মতো বারবার তিনবার চ্যাম্পিয়ন আখ্যা পান নি।

প্রথম মহাযুদ্ধের ঠিক পরের যুগে উইম্বলডন ছিল আমেরিকার বিখ্যাত বিল্ টিলডেন এবং ফ্রান্সের 'মাসকেটিয়ার্স' চেনরী কোশে, জিন বরোট্রা, রেগে লাকস্টের প্রাধান্যের যুগে। ওঁরা সবাই একাধিকবার উইম্বলডন বিজয়ীর সম্মান পেয়েছেন।

ওঁদের পরে আসরে নামেন ফ্রেডপেরি ও আমেরিকার ডোনাল্ড বাজ। বাজও উপর্যুপরি দুবার চ্যাম্পিয়নশিপ পেয়েছেন এবং বিশেষজ্ঞদের বিচারে তিনিও টিলডেন, কোশে, বরোট্রা, ফ্রেডপেরির মতোই সর্বকালের সেরা টেনিস খেলোয়াড়দের অন্যতম।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তরকালে আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়েরাই উইম্বলডনে শ্রেষ্ঠ ভূমিকা দখল করে রাখতে পেরেছেন। প্রথমে মার্কিন প্রতিনিধিরা পরে অস্ট্রেলীয় তরুণবৃন্দ ঠিক এই মুহূর্তে অস্ট্রেলীয় তরুণেরাই উইম্বলেডন অস্ত্র বিরোধী। অস্ট্রেলিয়ার ম্যাটা খেলোয়াড় লিউ হোড্ জোলাও বাজের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেই যেন পর পর দুবার (১৯৫৬-৫৭) এবং তাঁদের থেকেই অস্ট্রেলিয়ারই হুড সেতার আবার উপর্যুপরি (১৯৬১-৬২) উইম্বলডন ফাইনাল জিতেছেন। অস্ট্রেলিয়ার র‍্যাড্ল মেজম্যানও এই যুগের এক খ্যাত-কীর্তি খেলোয়াড় এবং আরও বড় আমেরিকার জ্যাক্ ক্রেমার—সর্বকালের সেরা খেলোয়াড়দের অন্যতম। যদিও তাঁদের কেউই দু'বার করে উইম্বলডন জয় করতে পারেন নি।

পারেন নি, কারণ তাঁদের অপেক্ষা সয় নি। একবার জিতেই তাঁরা পোশাদার বৃত্তি অবলম্বন করেন। উইম্বলডন টেনিসের মহিলা বিভাগে বিদেশীনির সাফল্যের প্রথম স্বাক্ষর পড়ে ১৯১৯ সালে ফ্রান্সের মাদাম সুজেন লেংলেনের কৃতিত্বে। সুজেন লেংলেন আন্তর্জাতিক টেনিসের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। একাদিক্রমে পাঁচবার এবং পরে আর একবার উইম্বলডন জয় করে ব্যক্তিগত সাফল্যের যে নজীর গড়ে রেখেছেন

তা কেউই ভাঙতে বা নতুন করে গড়তে পারেন নি। সুজেন লেংলেনের দৃষ্টান্তের সঙ্গে একমাত্র তুলনীয় আমেরিকার হেলেন উইলস মুডির কৃতিত্বের নিদর্শন। হেলেন মোট আটবার উইম্বলডন জয় করেছেন, কিন্তু সুজেন লেংলেনের মতো একাদিক্রমে পাঁচবার নয়, বড় জোর তিনবার, ১৯২৭ থেকে ১৯২৯ পর্যন্ত।

ওঁদের পর উইম্বলডনে উপর্যুপরি সিঙ্গলস ফাইনাল জয়ের কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছেন আমেরিকার লুই ব্রাউ (১৯৪৮-৫০) মরিণ কানোলি (১৯৫১-৫৩) ব্রেজিলের মারিয়া এস্থার বুনো (১৯৫৯-৬০) পথ দুর্ঘটনায় আহত হয়ে মরিণ কনোলি অকালে টেনিস থেকে অবসর নিতে বাধ্য হন। নইলে, অনেকের অনুমান হয়তো তিনিও ব্যক্তিগত কৃতিত্বের মূল্যধনে মাদাম সুজেন লেংলেন ও শ্রীমতী হেলেন উইলস মুডির কাছাকাছি এগোতে পারতেন।

ব্যক্তিগত দক্ষতা বিচারে একালের সেরাদের সঙ্গে তুলনীয় কোন টেনিস খেলোয়াড় যাঁরা আছেন তাঁদের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। পুরুষদের মধ্যে একমাত্র ডন বাজের ছাড়া অন্য কারুরই দক্ষতা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ মহল তেমন নিশ্চিন্ত নন। আর মহিলাদের কেউই অকুণ্ঠ স্বীকৃতির ভাগীদার নন।

কোন টেনিস খেলোয়াড় বলতে বর্তমানে এক মাত্র অস্ট্রেলীয় তরুণী মার্গারেটই সিঙ্গলকেই বোঝায়। কিন্তু তিনি তখনও উইম্বলেডন জয় করতে পারেনি। সদ্যসমাপ্ত প্রতিযোগিতায় তাঁর সাফল্য সম্পর্কে সবাই ছিলেন আশান্বিত। কিন্তু মার্গারেট হেরে যান একেবারে প্রথম রাউণ্ডের প্রতিযোগিতায় যুক্তরাষ্ট্রের জিন্‌ম্যকিনের কাছে। বলতে গেলে, এই মার্গারেটের পরাজয়ই এবারের উইম্বলডনের সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর ঘটনা। তিনি ছিলেন পয়লা নম্বর বাছাই প্রতিযোগিনী; অথচ হারলেন প্রথম খেলাতেই। এর আগে আর কোনো নম্বর বাছাই খেলোয়াড়কে উইম্বলডনে একেবারে প্রথম ম্যাচেই হারতে হয় নি।

সদ্য সমাপ্ত উইম্বলডন প্রতিযোগিতায় আরও অনেক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটেছে। অনুপাতে মহিলা বিভাগেই অঘটনের সংখ্যা বেশী। দুই একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

চেকোস্লোভাকিয়ার শ্রীমতী ভেরা সুকোভা বাছাই প্রতিযোগিনীর স্বীকৃতি ছিল না কিন্তু অনেক বাছাই খেলোয়াড়কে হার মানিয়ে তিনি এগিয়ে আসেন সিঙ্গলস্ ফাইনালে। যেমন এসেছিলেন পুরুষ বিভাগে অস্ট্রেলিয়ার মার্টিন মুলিগান। মুলিগানের নাম যেমন উইম্বলডন প্রতিযোগীদের বাছাই তালিকায় ছিল না, তেমনি স্বদেশের শীর্ষস্থানীয় দশজন খেলোয়াড়দের দলেও তাঁর অস্তিত্ব নেই।

অপ্রত্যাশিত ঘটনার আর এক বড় নায়ক হলেন আমেরিকার শ্রীমতী কারেণ সুসম্যান। নামপরিচিতা সুসম্যান ভাগ্যবতী সন্দেহ নেই। দেশ থেকে ইংলণ্ডে পাড়ি দিয়েছিলেন উইম্বলডন খেলতে এবং সেই দলে জীবনসঙ্গী সাহচর্যে মধুচন্দ্রিমা করতে।

উইম্বলেডন জয়ের ক্ষীণ কল্পনাও তাঁর মনে কখনো উঁকি দেয় নি। ঘটনা সবই ওই মধুচন্দ্রিমা যাপন পরিকল্পনা ঘিরে। কিন্তু বাস্তবে তিনিই পেলেন উইম্বলডন বিজয়িনীর চূড়ান্ত সম্মান। তাঁর জীবনে ১৯৬২র লগ্ন বহুমূল্য আশীর্বাদ এনেছে। এই লগ্নেই তিনি জীবনসঙ্গীর সাক্ষাত পেয়েছেন, সেই সঙ্গে অর্জন করেছেন বিশ্ব শ্রেষ্ঠ ক্রীড়ানুষ্ঠানের শ্রেষ্ঠের মর্যাদা। এমন করে সব পাওয়া ক'জনের ভাগ্যেই বা ঘটে!

চোখে দেখিনি, তবে দূর দূরান্তরে মনে হয়েছে যে এবারের উইম্বলডন হয়েছিল রীতিমতো উপভোগ্য-অপ্রত্যাশিত ঘটনার আকস্মিকতায় পুরোপুরি জীবন্ত। খেলা জমে, প্রতিযোগিতা উপভোগ্য হয় প্রতিযোগিতার তারই দূরন্ত টানে। নইলে এক তরফা অনুষ্ঠান নিয়ে কেই বা মাথা ঘামায়! শুধু অফসোস এই যে ওই আকস্মিক অঘটনে ভারতের বড় ভরসা রমানাথন কৃষ্ণন যেন বলি হয়ে গেলেন।

কৃষ্ণন ছিলেন এবার ছ' নম্বর বাছাই খেলোয়াড়। খেলার তালিকা অনুসারে সেমিফাইনালে রয় এমার্সন আর কৃষ্ণনের মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল। আর সেই খেলায় কৃষ্ণন যদি জিততে পারতেন তা হলে উইম্বলডন ফাইনালে খেলার কৃতিত্বে তিনিই ভাগ বসাতেন সর্বপ্রথম ভারতীয় হিসেবে।

এই রয় এমার্সন ও কৃষ্ণন গত দু'বছরে অনেক পরই পরস্পরের সামনে পড়েছেন এবং দুজনেই দুজনকে হারিয়েছেন কিন্তু সেমিফাইনালে ওঠা তো দূরের কথা, কৃষ্ণন ও এমার্সন, দুজনেই বিদায় নিতে বাধ্য হলেন অনেক আগেই দুর্ভাগ্যক্রমে প্রাথমিক প্রতিযোগিতার দুর্ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে।

শ্রীমতী কারেণ সুসম্যানের ভাগ্য দেখে যেমন অনেকেরই হিংসে হয়েছে, তেমনি কৃষ্ণনের দুর্ভাগ্যের কথা জেনে সমবেদনায় ও আবেগে আমরাও দোষ কম করি নি। সত্যিই এমন দুর্ভাগ্য যেন আর কারুর জীবনেই না আসে।

ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জী

© প্রমোদ সেনগুপ্ত

[বিশ্ব ইতিহাসের স্মরণীয় ঘটনাগুলিকে জিজ্ঞাসু পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত করিবার প্রয়াসেই এই ঘটনাপঞ্জী সংকলন করা হইতেছে। এই সংকলন ত্রুটিমুক্ত নয়। কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এই তালিকা হইতে বাদ পড়িয়াছে। পাঠকগণ যদি এই 'ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জী' সংকলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন তবে জাতির পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় এই সংকলনটি সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে। বিশ্বইতিহাসের বিশেষ করিয়া বাংলাদেশের প্রধান ঘটনাবলীর নির্ভুল সন ও তারিখ পাঠকদের প্রেরণ করিতে অনুরোধ করা হইতেছে। এইরূপ সংযোজন যথাযথ প্রমাণসহ ঘটনাপঞ্জীতে স্থান লাভ করিবে। —সম্পাদক বিঃ শঃ

সেপ্টেম্বর

১লা—১৭১৭, ফরাসী সম্রাট চতুর্দশ লুইয়ের মৃত্যু।

—১৭৯৪, কলিকাতায় ভারতীয়দের জন্য প্রথম হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা।

—১৯২৩, জাপানে প্রচণ্ড ভূমিকম্প।

—১৯৩৯, জার্মানী কর্তৃক পোল্যাণ্ড আক্রমণ।

—১৯৭৭, দাবা ভারতে নূতন ভারতীয় হ্যাণ্ডিক্যাপ টাইম প্রবর্তন।

—১৯৪৭, কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পুনরাবৃত্তি ও তাহার প্রতিবাদস্বরূপ গান্ধীজীর অনশন

২রা—১৮১০, সেঁদ্রার যুদ্ধে প্রুশিয়ান বাহিনীর নিকট ফরাসী বাহিনীর পরাজয় এবং ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের আত্মসমর্পণ।

—১৯৩৩, সন্ত্রাসবাদীদের গুলিতে মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বার্জের মৃত্যু।

—১৯৪০, জাপানের সহিত মিত্রশক্তির যুদ্ধবিরতি-চুক্তি স্বাক্ষর।

—১৯৪৬, পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে ভারতে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন।

—১৯৪৬, প্রসিদ্ধ গল্প লেখিকা প্রমথ চৌধুরীর ("বীরবল") মৃত্যু।

—১৭৯২, প্যারিসে বিপ্লবী জনতা কর্তৃক রাজতন্ত্রবাদী বন্দীদের হত্যা।

৩রা—১৬৯৮, ইংলণ্ডে রাষ্ট্রনায়ক ক্রমওয়েলের মৃত্যু।

—১৯০৯, জার্মানীর বিরুদ্ধে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের যুদ্ধ-ঘোষণা—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত।

—১৯৪৩, ইতালীতে মিত্রবাহিনীর অবতরণ।

—১৯৪২, নেপাল রাষ্ট্র কর্তৃক পরামর্শদাতা-পরিষদ বিলোপ।

৪ঠা—১৮৪১, চেক সঙ্গীতকার এ্যান্টনিন ডোরাকের জন্ম।

—১৮৭০, ফ্রান্সে 'তৃতীয় রিপাব্লিকে'র প্রতিষ্ঠা ঘোষণা।

৫ই—১৮৭৯, আফগানিস্তানে ক্যাভানারী নিহত।

৬ই—১৭৪৭, ফরাসী বিপ্লবী মাদুঁইস দ্য লাফায়েতের জন্ম।

—১৯৪৬, পূর্ববঙ্গে আবুহোসেন সরকার মন্ত্রিসভার পদত্যাগ ও আতাউর রহমান খাঁ কর্তৃক মন্ত্রিসভা গঠন।

৭ই—১৫৩৩, ইংলণ্ডের সাম্রাজ্ঞী প্রথম এলিজাবেথের জন্ম।

—১৯৪০, ব্রিটেনের উপর নাৎসী বিমানবহরের ঘাঁটিকা আক্রমণ সুরু।

—১৯৫১, সানফ্রান্সিস্কো নগরে জাপানের সহিত মিত্রশক্তির (রাশিয়া ব্যতীত) সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর।

—১৯২, জেনারেল নজীবের সহিত মতভেদের

ফরাসি সিংহের আলি মাহের মন্ত্রিসভার পদত্যাগ।

৮ই—১৮৫৪, ইত-ফরাসী বাহিনী আক্রমণের ফলে রুশবাহিনী কর্তৃক সেবাস্তোপোল পরিত্যাগ।

৩—১৯৪৩, মিত্রশক্তির নিকট ইতালীর আত্মসমর্পণ।

—১৯৫১, লিবিয়ার প্রতন্ত্র সাম্রাজ্যিক ঘোষণা।

—১৯৫১, কংগ্রেস সভাপতির শ্রীপুরুষোত্তম দাস-টাণ্ডনের পদত্যাগ।

৯ই—১৮৮১, ইংলণ্ডের সম্রাট উইলিয়ম মৃত্যু।

—১৮৮, করাসী ওম্ম।

—১৯১৪, মার্নের যুদ্ধে মিত্রবাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত জার্মান বাহিনীর পশ্চাদপসরণ।

১০ই—১৯১৯, সেন্ট জার্মান অষ্ট্রিয়ার সহিত মিত্রশক্তির সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর।

১১ই—১৮০৩, দিল্লীর যুদ্ধে ইংরাজ বাহিনীর নিকট মারাঠা বাহিনীর পরাজয়।

—১৯৪৮, পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মহম্মদ আলী জিন্নার মৃত্যু।

১২ই—১৯৪৬, পাকিস্তানে চৌধুরী মহম্মদ আলী মন্ত্রিসভার পদত্যাগ ও মিঃ সুরাবর্দী কর্তৃক মন্ত্রিসভা গঠন।

১৩ই—১৮১৪, ইউরোপের রাজনৈতিক ভাগ্যনির্ধারণার্থে ভিয়েনা কংগ্রেসের অধিবেশন সুরু।

—১৯৪৮, হায়দরাবাদ রাজ্যে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রবেশ।

১৪ই—১৯৩৪, সোভিয়েত রাশিয়া লীগ অব নেশনের স্থায়ী সদস্যপদে গৃহীত।

—১৯৪৮, পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল পদে খাজা নাজিমুদ্দীনের নিয়োগ ও পূর্ববঙ্গে নুরুল আমিনের মন্ত্রিসভা গঠন।

১৫ই—১৭৮৯, মার্কিণ লেখক জেমস ফেনিমোর কুপারের জন্ম।

—১৮০৫, ভারতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রদান-পূর্বক প্রথম আইন প্রবর্তন।

—১৯১৬, "সোম" যুদ্ধক্ষেত্রে ব্রিটিশবাহিনী কর্তৃক ট্যাঙ্কের প্রথম ব্যবহার।

১৬ই—১৯৫২, প্রসিদ্ধ এট-ল'ট্যাকার যোগেশ চৌধুরীর মৃত্যু।

১৭ই—১৯১১, ফিজী জেলে কলীবর্ষণের ফলে কয়েকজন রাজবন্দীর মৃত্যু।

—১৯৩৯, পোল্যাণ্ডে রুশবাহিনীর প্রবেশ।

—১৯৪৪, বর্মাতে মিত্রবাহিনীর অবতরণ।

—১৯৪৮, পাকেষ্টাইনে রাষ্ট্রসংঘের মধ্যস্থ কাউণ্ট বার্নাডোট নিহত।

—১৯৪৮, ভারতীয় সেনাদলের নিকট হায়দরাবাদ আত্মসমর্পণ।

১৮ই—১৭০৯, ইংরাজ সমালোচক ও গদ্য-চরিতকার ডাঃ স্যামুয়েল জনসনের জন্ম।

—১৯৩১, জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ।

—১৯৪২, সেবাননে রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ ও সামরিক শাসন প্রবর্তন।

—১৯৪৯, ব্রিটেনে পাউণ্ড-ষ্টার্লিংয়ের মূল্য হ্রাস।

—১৯৪৯, ভারতে টাকার মূল্যমূল্য হ্রাস।

১৯শে—১৭৪৯, ইংরাজবাহিনী কর্তৃক কুইবেক দখল।

—১৯৩৬, প্রখ্যাত ভারতীয় সঙ্গীতবিদ পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডের মৃত্যু।

২০শে—১৭৯২, ভ্যালমির যুদ্ধে বিপ্লবী ফরাসী সেনাদলের নিকট প্রুশিয় বাহিনীর পরাজয়।

—১৯৩৩, ভারতীয় রাজনীতিবিদ ও অধ্যাত্মবাদী ডাঃ এ্যানী বেশান্তের মৃত্যু।

—১৯৪৮, ভারতীয় সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান প্রেস ট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়ার প্রতিষ্ঠা।

২১শে—১৯ (খৃষ্টপূর্ব), রোমান কবি ভার্জিলের মৃত্যু।

—১৭৯২, ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ও সাধারণতন্ত্রের প্রতি।

—১৮৩২, ইংরাজ কবি স্যার ওয়াল্টার স্কটের মৃত্যু।

২২শে—১৮৬০, জার্মান জার্মানিক আর্থার শোপেন-হোয়ারের মৃত্যু।

—১৮৬৬, ইংরাজ ঔপন্যাসিক এইচ, জি, ওয়েলসের জন্ম।

—১৯১৪, জার্মান সাবমেরিণ "এমডেন" কর্তৃক

মাদ্রাজ বন্দরে গোলাবর্ষণ।

২২শে—১৭৯১, ইংরাজ বৈজ্ঞানিক মাইকেল ফ্যারাডের জন্ম।

—১৯০৯, অষ্ট্রিয়ার যুদ্ধবিদ ডাঃ সিগমণ্ড ফ্রয়েডের মৃত্যু।

২৩শে—১৮৪৬ "নেপচুন" গ্রহ আবিষ্কৃত।

২৪শে—১৯০২ শ্রীতিলতা ওয়াদ্দারের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম বিপ্লবীগণ কর্তৃক পাহাড়তলীর রেলওয়ে ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ।

২৫শে—১৯৩১, অস্পৃশ্যদের রাজনীতিক অধিকার সম্পর্কিত পুণা চুক্তির স্বাক্ষর ও গান্ধীজীর অনশন ভঙ্গ।

২৬শে—১৮২০, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম।

—১৯১৮, মিত্রশক্তির নিকট হাঙ্গেরীর আত্মসমর্পণ।

২৭শে—১৮৩৩, রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু।

—১৯০৩, কবি কাদম্বিনী রায়ের মৃত্যু।

—১৯৫২, কৃষক-মজুর প্রজা দল ও ভারতীয় সমাজতন্ত্রী দলের মিলনের দ্বারা ভারতে প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের প্রতিষ্ঠা।

২৮শে—১৮৪১, প্রখ্যাত ফরাসী রাজনীতিক ক্লেমেঁসো'র জন্ম।

—১৮৭১, "পাস্তুরাইজেশন" ও জলাতঙ্ক-নিরোধী টিকার আবিষ্কর্তা লুই পাস্তুরের মৃত্যু)।

—১৯৩৯, জার্মান বাহিনীর হাতে ওয়ারশ'র পতন।

—১৯৪২, স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধারম্ভ।

২৯শে—১৭২৫, ভারতে ইংরাজ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ক্লাইভের জন্ম।

—১৯০২, ফরাসী ঔপন্যাসিক এমিল জোলার মৃত্যু।

—১৯২২, রাজনীতিবিদ অম্বিকাচরণ মজুমদারের মৃত্যু।

—১৯৩৮, মিউনিক চুক্তির দ্বারা ফ্রান্স ও ব্রিটেন কর্তৃক জার্মানীকে চেকোস্লোভাকিয়ার "সুদেতেন" অঞ্চল অর্পণ।

৩০শে—১৯৪৩, প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু।

অক্টোবর

১লা—১৯৫৩, অন্ধ্র রাজ্য সৃষ্টি।

২রা—১৮৬৯, গান্ধীজীর জন্ম।

—১৯৪২, ভারতে সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রবর্তন।

৩রা—১৮৬৭, সেলাই কলের আবিষ্কর্তা ইলিয়াস হো'র মৃত্যু।

—১৯৩৫, ইতালী কর্তৃক আবিসিনিয়া আক্রমণ।

৪ঠা—১৬৭৯, ডাচ চিত্র-শিল্পী রেমব্রাণ্ডের মৃত্যু।

—১৯৫৭, মনুষ্যসৃষ্ট পৃথিবীর প্রথম উপগ্রহ রুশীয় স্পুৎনিক-১ ৫৬০ মাইল উর্ধ্বে উৎক্ষেপণ।

৫ই—১৮৬৪, কলিকাতায় প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যা।

—১৯৫২, ষ্ট্যালিনের অধিনায়কত্বে সোভিয়েট ইউনিয়নের কম্যুনিষ্ট পার্টির ১৯তম কংগ্রেস শুরু।

৬ই—১৯৪১, কমিনফর্ম-এর প্রতিষ্ঠা।

—১৯৫১ ইরাণ সরকারের চরমপত্র অনুসারে আবাদান হইতে এংলো ইরাণীয়ান অয়েল কোম্পানীর পশ্চাদপসরণ।

৭ই—১৮৪৯, মার্কিন লেখক ও সোয়েদা জনক এডগার এ্যালেন পো'র মৃত্যু।

—১৮৯৭, মার্কিন কবি অলিভার ওয়েণ্ডেল হোমসের মৃত্যু।

৮ই—১৯৪৪, "ওয়ার ওয়ার্ড" গ্রন্থ রচয়িতা রাজনীতিক ওয়েণ্ডেল উইল্কী'র মৃত্যু।

—১৯৪৪, মিশররাজ ফারুক কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী নাহাস পাশার পদচ্যুতি।

—১৯৫১, মিশর কর্তৃক মিশরীয় চুক্তি বাতিল।

—১৯৫৩, ব্রিটিশ গায়নার গভর্ণর কর্তৃক মন্ত্রী-সভার পদচ্যুতি।

৯ই—১৯০৪, আলজেসীর শুলিতে যুগোস্লাভিয়ার রাজা আলেকজাণ্ডার ও ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাঁসিয়ো বার্থো নিহত।

১০ই—১৮১৩, ইতালীয় সঙ্গীতকার গিউসেপ ভার্দির মৃত্যু।

—১৯৪২, ব্রিটেন ও আমেরিকা কর্তৃক চীনে বিশেষ কূটনৈতিক অধিকার পরিত্যাগ।

১১ই—১৯৫১, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা হইতে আইনমন্ত্রী ডাঃ আম্বেদকরের পদত্যাগ।

১২ই—১৪৯২, জেনোয়ার ইতিজ দ্বীপপুঞ্জে ক্রিষ্টোফোরের কদমবাসের পদার্পণ।

১৩ই—১৯২৮, ফরাসী ঔপন্যাসিক আনাতোল ফ্রাঁসের মৃত্যু।

১৪ই—১৯০৫, মেঃগল স্মিট আকবরের মৃত্যু।

—১৯৩৩, জার্মানী কর্তৃক লীগ অব নেশনসের সভ্যপদ পরিত্যাগ।

—১৯৪৪, হেগারাহের অপরাধে ফ্রান্সের যুদ্ধকালীন প্রধানমন্ত্রী মঁসিয়ো লাভালের প্রাণদণ্ড।

১৫ই—১৮৮২, সমগ্র বিশ্বে গ্রেগরিয়ান ক্যালেণ্ডার প্রবর্তন।

—১৮৭৪, জার্মানি ধার্মিক নীতুশের জন্ম।

—১৯৪৭, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে পাসপোর্ট ব্যবস্থার প্রবর্তন।

১৬ই—১৭৯৩, ফরাসী সাম্রাজ্ঞী মারী আঁতোয়ানেৎ-এর শিরশ্ছেদ।

—১৮৮৮, মার্কিন নাট্যকার ইউজিন ও'নীলের জন্ম।

—১৯০৫, বঙ্গ ভঙ্গের প্রতিবাদে সমগ্র বাংলাদেশে "রাখীবন্ধন" ও "অরন্ধন" উদ্‌যাপন।

—১৯৪১, মেদিনীপুর জেলায় প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যা ও সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস।

—১৯৭৬ পোয়েরিং, রিবেনট্রপ প্রমুখ নাৎসী নেতাদের মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যে পরিণত।

—১৯৫১, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলি খাঁ আততায়ী হস্তে নিহত

১৭ই—১৮৪৯, পোলিশ সঙ্গীতকার ফ্রেডরিক শোপাঁর মৃত্যু।

—১৮৭৮, হাওড়ার ভাসমান সেতুর দ্বারোদ্ঘাটন।

—১৯১৪, মার্কিন সৈন্যদল কর্তৃক আপ অধিকৃত ফিলিপাইন আক্রমণ।

—১৯৫৭, ব্রিটেনের সহিত ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা-লাভের চুক্তি স্বাক্ষর।

—১৯৫১, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী পদে খাজা নাজিমুদ্দিনের নিয়োগ।

১৮ই—১৮৫৯, ফরাসী ধার্মিক হেনরি বার্গসোঁর জন্ম।

—১৮৯৬, প্রসিদ্ধ-বাগ্মী মনোমোহন ঘোষের মৃত্যু।

—১৯৩১, মার্কিন বিজ্ঞানী টমাস আলভা এডিসনের মৃত্যু।

—১৯৩৯, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলীকে পদত্যাগের নির্দেশ দান।

—১৯৪১, জেনারেল তোজো কর্তৃক জাপ যুদ্ধবাদী মন্ত্রিসভা গঠন।

১৯শে—১৭৭৫, ইংরাজ ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার গল্প রচয়িতা জোনাথন সুইফটের মৃত্যু।

—১৮৭৫, বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফের আবিষ্কর্তা স্যার চার্লস হুইটস্টোনের মৃত্যু।

—১৯২২, ব্রিটেনে বনেড ল'র নেতৃত্বাধীনে সর্বদলীয় মন্ত্রিসভার পতন।

২০শে—১৯৪২, "কুইট ইণ্ডিয়া" আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে সমগ্র কেন্দ্রিয়ার জরুরী অবস্থা ঘোষণা।

২১শে—১৮০৪, ট্রাফালগারের যুদ্ধে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর নিকট ফরাসী নৌবাহিনীর পরাজয়।

—১৮৩৩, সুইডিশ বিজ্ঞানী আলফ্রেড নোবেলের জন্ম।

—১৯৪৩, সিঙ্গাপুরে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে "আজাদ হিন্দ সরকার" গঠন।

২৩শে—১৭৬৭, বক্সারের যুদ্ধে ইংরাজ বাহিনীর নিকট মীরকাসিম ও শাহ আলমের পরাজয়।

—১৯৪৭, কাশ্মীরে হানাদারী আক্রমণের মুখে কাশ্মীর রাজের ভারতে যোগদানের চুক্তি স্বাক্ষর।

২৭শে—১৮১৩, লিপজিগের যুদ্ধে মিত্রশক্তির নিকট নেপোলিয়নের পরাজয়।

২৮শে—১৯৪০, ইতালী কর্তৃক গ্রীস আক্রমণ।

২৯শে—১৯১৪, মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে প্রথম মহাযুদ্ধে তুরস্কের যোগদান।

৩০শে ১৯১৮, মিত্রশক্তির নিকট তুরস্কের আত্মসমর্পণ।

৩১শে—১৭৯৫, ইংরাজ কবি জন কীটসের জন্ম।

—১৯৪৭, কাশ্মীরে জরুরী শাসনব্যবস্থার প্রধান পদে শেখ আবদুল্লার নিয়োগ।

শারদীয়

বিংশ শতাব্দী

শারদীয় উৎসবে

চিস্রা

আধুনিক রুচিসম্পন্ন প্রসাধনী

জনসেবায় ৩৮ বৎসর

লোকনাথ কেমিক্যাল

কলিকাতা-২৮

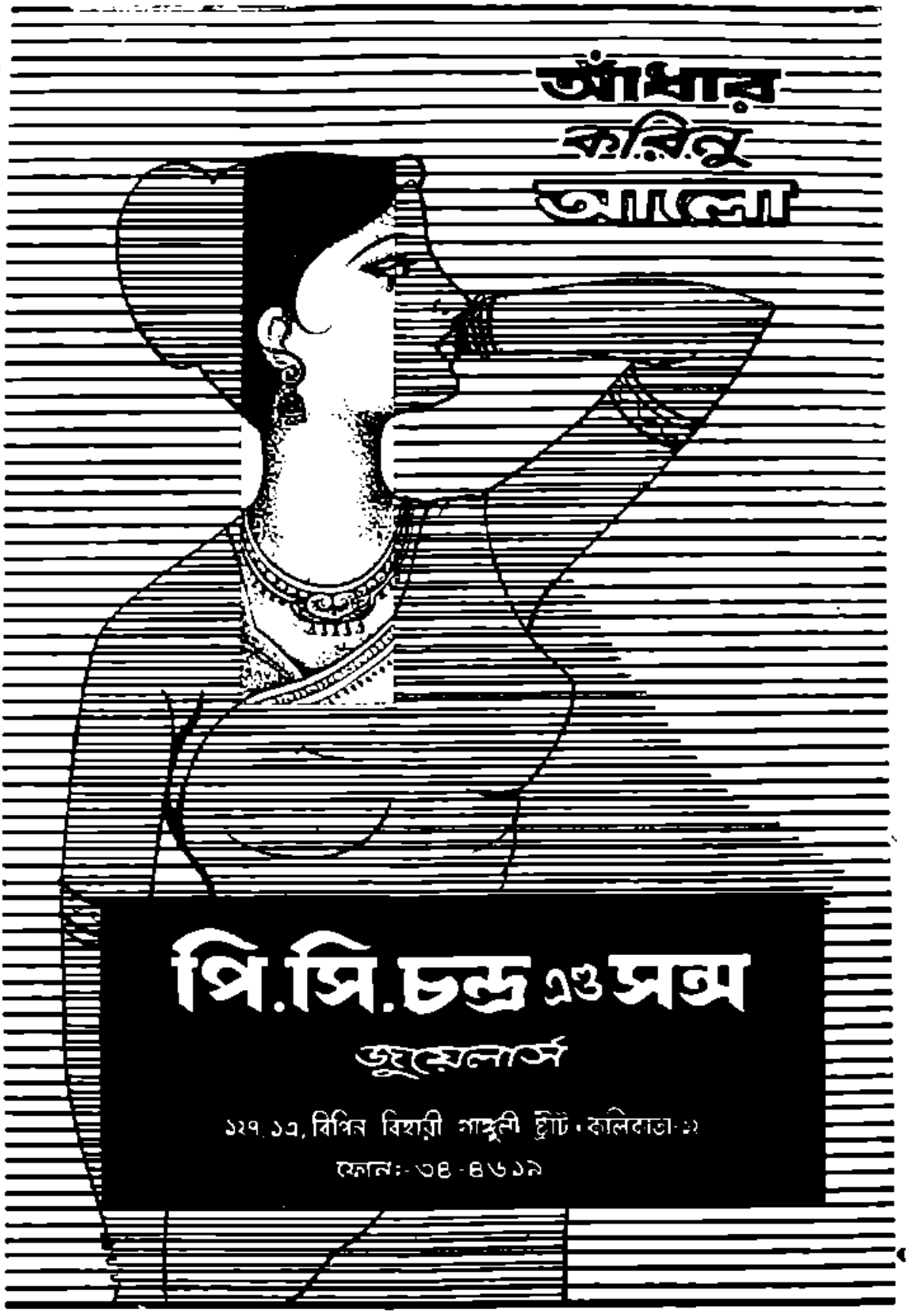
আঁধার করিনু আলো
পি.সি.চন্দ্র এণ্ড সন্স
জুয়েলার্স
১২৭.১এ, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট • কলিকাতা-১২
ফোন:- ৩৪-৪৬১৯

শারদীয় বিংশ শতাব্দীর আকর্ষণ

সম্পূর্ণ উপন্যাস

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় — বসন্ত রাগ

সুবৃহৎ উপন্যাস

সমরেশ বসু ॥ শীর্ষবিন্দু

আরও চারখানি সম্পূর্ণ উপন্যাস

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় — নীহারিকা
বিমল কর — পাদপীঠ
নীহাররঞ্জন গুপ্ত — ভানুমতী
আশা দেবী — লোহার বা

এবার পূজায়

HIS MASTER'S VOICE

হিজ মাস্টার্স ভয়েস • কলম্বিয়া

রেকর্ড নির্বাচন প্রতিযোগিতায়

১০৩ টি পুরস্কার

এবার পূজায় ২৩ খানি "হিজ মাস্টার্স ভয়েস" ও কলম্বিয়া রেকর্ড বেরিয়েছে. বিস্তারিত তালিকা তাঁদারদের দোকানে পাবেন। সেই রেকর্ডগুলি হতে আপনার পছন্দ অনুসারে ছয়খানি রেকর্ড বেছে নিয়ে আপনিও একটি মূল্যবান পুরস্কার পেতে পারেন। প্রতিযোগিতায় প্রবেশপত্র বিনামূল্যে তাঁদারদের দোকানে বা সরাসরি গ্রামোফোন কোম্পানী হতে পেতে পারেন। প্রবেশপত্র পাঠাবার শেষ তারিখ ৩১শে অক্টোবর '৬২।

প্রথম পুরস্কার
এইচ. এম. ভি রেডিও
মডেল ৪২৬১
এ.সি/ডি. সি

তৃতীয় পুরস্কার
এইচ. এম. ভি. পোর্ট
৪-স্পীড রেকর্ড প্লেয়ার
এটাচমেন্ট এ দি ফর
ট্রানজিস্টার
ব্যাটারি
চালিত।

দ্বিতীয় পুরস্কার
এইচ. এম. ভি. এডমায়রেল-৪
ট্রানজিস্টার ৪-স্পীড রেডিওগ্রাম

আরও একলক্ষটি বিশেষ পুরস্কার
বিস্তারিত বিবরণাবলী ও প্রবেশপত্র অনুমোদিত এইচ. এম. ভি - কলম্বিয়া ডীলারদের দোকানে পাবেন।

দি গ্রামোফোন কোং লিঃ : কলিকাতা ॥ বোম্বাই : মাদ্রাজ : দিল্লী

সূচীপত্র

বিংশ শতাব্দী
সপ্তম বর্ষ : শারদীয় সংখ্যা
আশ্বিন ১৩৮৪

লেখক		বিষয়
সম্পাদকীয়	৩২১	আমাদের কথা
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	৩২২	বসন্ত রাগ (উপন্যাস)
রেবতীভূষণ	৩৬৯	শুভ্রার প্রমোদ ভ্রমণ (কার্টুন)
প্রেমেন্দ্র মিত্র	৩৭০	উড়ো পাতা (কবিতা)
বিষ্ণু দে	৩৭০	তবু দেখি (কবিতা)
সুভাষ মুখোপাধ্যায়	৩৭১	এদিকে (কবিতা)
বিমলচন্দ্র ঘোষ	৩৭১	তারা শুধু বোঝে (কবিতা)

জীবন-রোগ

অবস্থো যেন বিধিনা
স্বস্থো ভবতি মানবঃ

সুস্থ মানুষকে রোগ মুক্ত করাই চিকিৎসা বিজ্ঞানের লক্ষ্য। জীবন যেমন এই শাশ্বতবাণী প্রচারিত হয়েছিল বহুশতাব্দি পূর্বে। ভারতের আর্য্যঋষিগণ ওঁদের সাধনালব্ধ আয়ুর্বেদ চিকিৎসা দ্বারা মুমূর্ষু বিবদ্ধ ব্যাধি গ্রস্তদের করেছিলেন সঞ্জীবিত; এবং দিলেন মানব জীবনে মুক্তির মহা আনন্দ।

ওঁর বিজ্ঞানে উন্নত আধুনিক সহ সবাত্রে আমাদের এই প্রতিষ্ঠানটি গত ৩০ বর্ষাধিক কাল রোগার্তের সেবায় এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। শ্বেতকুষ্ঠ, বুৎসিত এই রোগে মিশ্রিত কত সম্ভাবনাপূর্ণ নরনারীর ব্যর্থ জীবন এখানকার চিকিৎসা নৈপুণ্যে আবার সুস্থ ও সুন্দর হয়ে উঠেছে

হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর

শ্বেতকুষ্ঠ, একজিমা, সোরাইসিস ও কঠিন চর্মরোগাদি চিকিৎসায় সুপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান।

প্রতিষ্ঠাতা। পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্ম্মা, ১ নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া।
শাখা : ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ (পুরবী সিনেমার পাশে) ফোন : ৩৭-২০৫৯

লেখক		বিষয়
কৃষ্ণা বসু		বিকেলের নদী (কবিতা)
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত		অন্য ভুবন (গল্প)
সুপ্রসন্নার রায়	৩৮১	রামায়ণকার ও রবীন্দ্রনাথ (প্রবন্ধ)
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	৩৮৩	নীল হেলেন (গল্প)
সন্তোষকুমার ঘোষ	৩৮৭	তুমি আর আমি (গল্প)
সরোজ বসু	৩৯২	নীলবিন্দু (উপন্যাস)
অরুণ সেনগুপ্ত	৪২৪	যাত্রা (চিত্র)
	৪২৫	গ্রাম (চিত্র)
বাদল ভট্টাচার্য	৪৫৭	ভাগ্যবতী (চিত্র)
	৪৫৭	প্রতিষ্ঠা (চিত্র)
শশিভূষণ দাশগুপ্ত	৪৮২	বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি (নাটক)
নীহাররঞ্জন গুপ্ত	৪৯৪	ভানুমতী (উপন্যাস)
শিবরাম চক্রবর্তী	৫২১	প্রাণ সঙ্কট (হাস্য-রচনা)
অবধূত	৫২৫	ছবি (গল্প)
বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়	৫৩৩	কোরিয়া যুদ্ধের কাহিনী (প্রবন্ধ
বিমল কর	৫৪০	পায়রাগুলো (উপন্যাস)

নগদ বা সহজ কিস্তিতে

MRP

ট্রানজিস্টার রেডিও

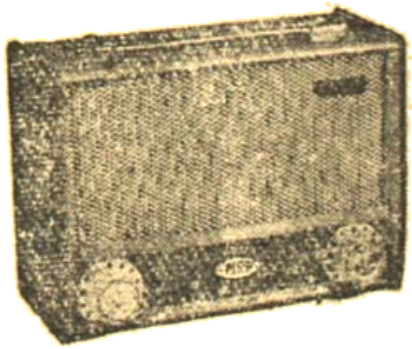

জি.ই.সি. ও ন্যাশনাল একো

অনুমোদিত বিক্রেতা

মনি রেডিও প্রোডাক্টস

১৫৭ বি, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

ফোন - ২৪ - ৫৭৪৯

সূচীপত্র

বিংশ শতাব্দী
সপ্তম বর্ষ : শারদীয় সংখ্যা
আশ্বিন ১৮৮৪

লেখক		বিষয়
শশধর	৫৮০	কাকাস্টক (ছড়া)
কার্তুনার	৫৮৪	ঝুড়োর কল (কার্টুন)
অরুণ সেনগুপ্ত	৫৮৫	দুই সখী (আলেক চিত্র)
শিবতোষ মুখোপাধ্যায়	৫৮৬	শ্যামুচাচার ভাই পো ভাই ঝি (রম্য-রচনা)
মুজফ্ফর আহমদ	৫৮৯	আমার স্মৃতিকথা (স্মৃতিকথা)
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	৬০০	নীহারিকা (উপন্যাস)
তরুণ চট্টোপাধ্যায়	৬৪৩	প্রাচীন আফ্রিকার সভ্যতা (প্রবন্ধ)
শক্তিপদ রাজগুরু	৬৪৯	সাত পুরানী (গল্প)
অমিতা গুহঠাকুরতা	৬৫৬	সাহিত্য পত্রিকা ও রবীন্দ্রনাথ (প্রবন্ধ)
চিত্তরঞ্জন ঘোষ	৬৬০	মার খেলুর বাড়ী (রম্য রচনা)
আশা দেবী	৬৬৪	লোহার বাসর (উপন্যাস)

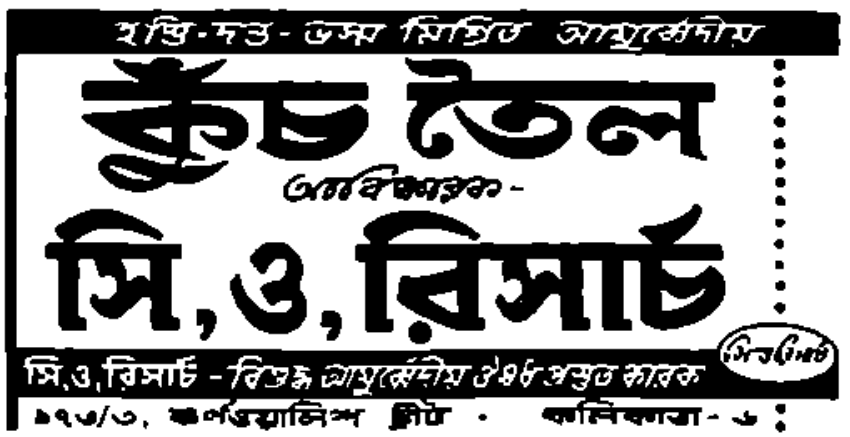

	লেখক	বিষয়
জগদীশ ভট্টাচার্য	৭০০	আকাশে ওড়ার পাখা (কবিতা)
সিদ্ধেশ্বর সেন	৭০০	চোখে সরষেফুল (কবিতা)
অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়	৭০১	বিদূষক (কবিতা)
অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়	৭০১	পৌষ মাসে মা (কবিতা)
রাম বসু	৭০১	হে আমার প্রিয় পারিজাত (কবিতা)
শ্যামসুন্দর দে	৭০২	অন্বেষা (কবিতা)
স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ	৭০৩	সাঙ্গীতিক জ্ঞানের অর্থ (প্রবন্ধ)
গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য	৭০৪	তালের মাতাল (গল্প)
গৌরদাস মুখোপাধ্যায়	৭২০	মর্ত্য সীমার বাইরে (বিজ্ঞান)

চিত্র-সূচী

নন্দলাল বসু — নটীর পূজা (ত্রিবর্ণ)

অঙ্গসজ্জা

শ্রীঅতিশ মুখোপাধ্যায়

শচীন্দ্র বিশ্বাস — কান্তিভূষণ

প্রচ্ছদ

শচীন্দ্র বিশ্বাস

সম্পাদক

ব্রজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়

— আমাদের নতুন বই —

॥ প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥

হাত বাড়ালেই বন্ধু

দাম : ৩.৫০

নানা রঙে বোনা ৪.০০

॥ শ্রীবাসব ॥

গোমতী গঙ্গা ৮.০০

এক মুঠো মাটি ৪.০০

(৩য় মুদ্রণ)

আনন্দী কল্যাণ

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

জয় যৌধেয় ৭.০০

॥ প্রমথ নাথ বিশী ॥

পদ্মা ৪.০০

॥ প্রকাশ আসন্ন ॥

নীলকণ্ঠ

এক ঝাঁক পায়রা

দিলদার

কেন পিছু ডাকে

বি শ্ব বা ণী ঃঃ ১১এ, বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৭

নিঃসঙ্গ মৌনতার কত পলঅনুপল জাগায় প্রেমের স্মৃতি শুভ্র সমুজ্জ্বল

প্রসন্নচিত্তে বসে যিনি প্রার্থনার বইটি পড়ছেন তিনি হলেন অলকা দেবী। তাঁর স্বামী ১৯৬০ সালে মারা যান। এ সংসারে তিনি একা। তাঁদের কোনো সন্তানসন্ততি নেই।

তাঁর স্বামীর মাসিক আয় ছিল ২৫০ টাকা। হঠাৎ অল্পবয়সেই হৃদরোগের আক্রমণে তাঁর মৃত্যু হয়। তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর স্ত্রীর জন্যে ৫০০০ হাজার টাকার সংস্থান রেখে যেতে পেরেছিলেন। অলকা দেবী এই টাকা তাঁর স্বামীর জীবনবীমার পলিসি * থেকে পেয়েছেন।

অর্থের দিক থেকে অলকা দেবীর অবস্থাকে সচ্ছল বলা চলে। ফলে তাঁর জীবনে খানিকটা নিরাপত্তাও এসেছে। তাঁর স্বামী সুবিবেচকের মত আগে থেকে পরিকল্পনা করে একটি জীবন বীমার পলিসি নিয়েছিলেন বলেই আজ তিনি একটা নিরুদ্বেগ প্রশান্তির মাঝে বসে তাঁর প্রার্থনার বইটি পড়তে পারছেন। যদিও আজ তিনি একা, তাঁর স্বামীর প্রেমের স্মৃতিই তাঁর মন অধিকার করে থাকে।

* মেয়াদী বীমা

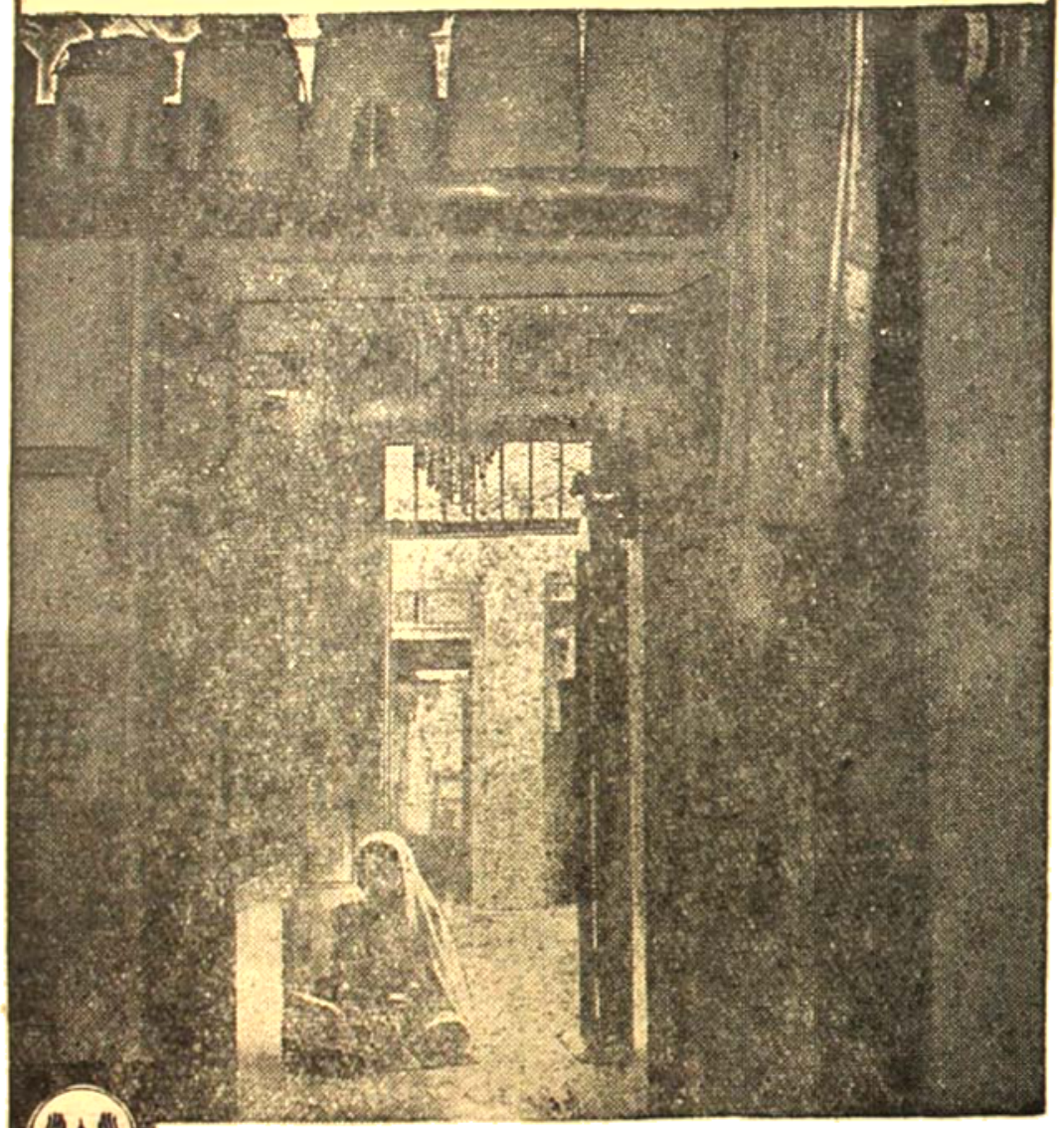

জীবন বীমার হাতেই আপনি সম্পূর্ণ নিরাপদ

BEN—ASP/LIC-78

নটীর পূজা

নন্দলাল বসু

আশ্বিন
১৮৮৪
সপ্তম বর্ষ
শারদীয় সংখ্যা

বিংশ শতাব্দী

'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'

বাঙালীর সংস্কৃতিতে শারৎকাল এক বিশেষ স্থানের অধিকারী। বর্ষার তিমির অবগুণ্ঠন অপসৃত হয়ে শরতের রৌদ্রালোক যেদিন আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে বাঙালী মন সেই দিনই উৎসবের প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে ওঠে।

শারদোৎসব বাঙালীর কাছে শুধু দেবীর আগমন ও প্রাণ বন্যায় ভেসে যাওয়া নয়, সাহিত্যচর্চাও এই উৎসবের সঙ্গে একাত্ম ভাবে জড়িয়ে রয়েছে। সাহিত্যের এই শারদোৎসবে বাংলাদেশের সাহিত্যিক, কবি, শিল্পী, ও পাঠকেরা যেভাবে অংশ নেন, ভারতের অন্যান্য প্রদেশে তার তুলনা নেই। সম্ভবত, বাঙালী মানসিকতার এটিও একটি বিশিষ্ট দিক।

জীবন বাদ দিয়ে সাহিত্য হয় না। জীবনের প্রয়োজনেই সাহিত্যের সৃষ্টি। মানুষের জীবনকে রক্তে, ঘামে ভাসিয়ে তুলবার আগ্রহ সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে ভাষা পেয়েছে।

চরম দুঃসময়ের মধ্যেও সাহিত্য সেই চিরকালীন অপরাজেয় মানুষের জয়গান গেয়েছে।

দুর্গত মানবাত্মার সঙ্গীতই হল সাহিত্য। এই সঙ্গীতের কণ্ঠরোধ অসম্ভব। পৃথিবীর যে কোন দেশের ইতিহাস আমাদের শিক্ষা দেয়, অবস্থা যত সংগীন, যত জটিল হয়েছে, বিপদ ও দুঃখের বন্যা জাতিকে যত বেশী গ্রাস করেছে, সাহিত্য ও সাহিত্যিক তত বেশী অনাগত ভবিষ্যতকে আহ্বান জানিয়েছেন। হুগো থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কেউ এর ব্যতিক্রম নন।

গত বিশ বছরে বাঙালীর জীবন দ্রুত আবর্তিত হয়েছে। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, হাঙ্গামা, দেশবিভাগ উদ্বাস্তু, বন্যা বৃদ্ধি—আঘাতের পর আঘাত এসেছে তার জীবনে। তবু বাঙালী জাতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যায় নি। এত দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের মধ্যেও সাহিত্যের শারদোৎসবকে সে অভ্যর্থনা জানিয়েছে।

আমরা বিশ্বাস করি, বর্তমান দুর্যোগের রাতেরা যখন শেষ হয়ে যাবে, তখনও 'সাহিত্যের দুই কূলে ধারা' বয়ে যাবেই। তাই সীমাবদ্ধ সামর্থ নিয়েও সাহিত্যের এই শারদোৎসবে যথাযোগ্য অংশ নিতে আমরা অগ্রসর হয়েছি। কাঠবিড়ালের সাগর বন্ধনের প্রচেষ্টা যদি কখনো হয় তবে আমাদের ত্রুটি বিচ্যুতি ও অক্ষমতা সহৃদয়রা ক্ষমা করবেন এ ভরসা আমাদের আছে।

পরিশেষে, আমাদের এ বছরের শারদীয় সংখ্যা প্রকাশ-প্রচেষ্টায় বাংলা দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ থেকে সর্বকনিষ্ঠ প্রায় সকল সাহিত্যিকই আমাদের যে ভাবে সাহায্য করেছেন, তার তুলনা হয় না। তাদের আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

বিংশ শতাব্দীর সমস্ত লেখক, গ্রাহক, পাঠক, এজেন্ট, বিজ্ঞাপনদাতা ও পৃষ্ঠপোষকদের শারদীয় শুভেচ্ছা জানাই। সেই সঙ্গে কামনা করি বাঙালী জাতের জীবনে শারদোৎসব যথার্থ উৎসব হয়ে উঠুক।

বসন্তের

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে পক্কপাণ্ডবের পক্ক রূপ এবং বিরাটকায় প্রস্তর প্রাচীর সমৃদ্ধ তীর্থস্থল মহাবলীপুরম ও উত্তরে মাদ্রাজের কাছাকাছি একটি স্থান। ১৮০০ খৃষ্টাব্দ। মাদ্রাজ শুধু নামে মাত্র সহর, প্রকৃতপক্ষে কয়েকটি গ্রামের সমষ্টি। দক্ষিণ পূর্ব দিকে—প্রায় সমুদ্র তীরে একটি সুন্দর তপোবনের মত আশ্রম। সুন্দর সুগঠিত,—কি বলব, বাড়ী?—না বাড়ী বলতে যা বোঝায় তা নয়, তবে কুটীর—? না তাও নয়। কুটীর বলতে যা বোঝায় তা থেকে অনেক সমৃদ্ধ; এবং বাড়ী বলতে যা বোঝায় তা থেকে আয়তনে আকারে স্থান সংকুলানে অনেক ছোট। চারটি পাথরের থামের মাথায় পাথরের ছাদের একটি ছয় হাত প্রস্থ বারো হাত দীর্ঘ একটি বারান্দা. তার কোলে এমনি আয়তনেরই একখানি ঘরকে দুখানি করে নেওয়া হয়েছে; একখানি ছোট একখানি বড়। সামনে যেন বৃক্ষবেষ্টনীর মধ্যে কয়েক কাঠা পরিমিত জমিতে পরিচ্ছন্ন একটি উদ্যান। কিছু দূরেই নারিকেল তাল গাছের সুদীর্ঘ সারি, তারই কোলে মহাসমুদ্রের বেলাভূমি। গাঢ় কৃষ্ণাভ নীল সমুদ্র-তরঙ্গ সাদা ফেনা মাথায় নিয়ে কল কল্লোল তুলে আছড়ে এসে পড়ছে। তরঙ্গ শীর্ষে রৌদ্রচ্ছটা বিকমিক করছে। অবিরাম কল্লোল ধ্বনিতে মুখরিত।

বারান্দায় ঘরে সজ্জার উপকরণ স্বল্প কিন্তু সেগুলি বড় সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন। ছোট ঘরখানির পাশেই অল্প একটু ঘর তো বা দশ হাত পরিমিত স্থান তফাতে আর একখানি ঘর। নারিকেল পাতায় আচ্ছাদিত একখানি মাটির ঘর। বেশ সুগঠিত ও পরিচ্ছন্ন। সামনে দুটী হৃষ্ট পুষ্ট বলদোপযোগী গাভী রোমন্থন করছে।

একটি আশ্রম, সত্যই একটি আশ্রম। নির্জন পরিবেষ্টনীর মধ্যে এমন মনোরম পরিচ্ছন্ন স্বল্পায়তন পরিবেশকে আশ্রম ছাড়া কিছু বলাও যায় না। আজ কিন্তু স্থানটি নির্জন নয়। বারান্দায় এবং বারান্দার সামনে—উদ্যানের মধ্যে বহু জনের ভিড়। উত্তেজিত অথচ চাপা কোলাহল কোন অতিকায় যন্ত্রচক্রের উত্তেজনা-চঞ্চল—বহু মক্ষিকার গুঞ্জন-ধ্বনির মত ধ্বনিত হচ্ছে। প্রতিটি লোকই মুখর—চাপা গলায় প্রত্যেকে কথা বলছেন। কথা অস্পষ্ট কিন্তু সুরে উত্তেজনা রয়েছে—উত্তপ্ত বায়ু স্পর্শের মত স্পষ্ট। কিন্তু একটি কথা বা শব্দও বোঝা যায় না—বহু জনের উচ্চারিত কথার ভিড়ে সব দুর্বোধ্য হয়ে পড়েছে এবং অদূরবর্তী সমুদ্র কল্লোলের ধ্বনি তার উপর একটি আবরণ টেনে দিয়ে তাকে আরও অস্পষ্ট করে তুলেছে। শুধু মনে হচ্ছে—একটি হায় হায় হায় হায় আক্ষেপ সব বিছুর মধ্যে। উদাস সমুদ্রের একটানা ধ্বনির মধ্যেও এবং এই কথাবার্তার চাপা কণ্ঠস্বরের মধ্যেও।

জনতার পিছন দিকে দূরে,—আশ্রম প্রবেশ পথের যে দিকে—যে দিকে ওই গাভী দুটি বাঁধা ছিল—সেই দিকে বিস্ময়তার যেন আচ্ছন্ন হয়ে স্লান মুখে দাঁড়িয়েছিল শুভ্র কন্যা লক্ষ্মী। মনে হচ্ছিল যেন রৌদ্রতাপ ক্লিষ্ট একটি শ্যামলতা। রৌদ্রম্লান পাতার মত তার সারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ক্লিষ্টতার চিহ্ন। নির্বাক হয়ে সে শুনবার চেষ্টা করছিল—কে—কি বলছে!

ওঁরা হচ্ছেন ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ শুদ্র—সকলেই কিন্তু প্রতিষ্ঠাবান এবং বিদগ্ধজন। কারও প্রতিষ্ঠা বেশী কারও কম। বৈদগ্ধেও তাই। যার যেমন বেশী প্রতিষ্ঠা সেই তেমন আগে দাঁড়িয়েছে স্বাভাবিক ভাবে। লক্ষ্মী দাঁড়িয়ে আছে একা—সকলের পিছনে। সেই শুধু নির্বাক—শুধু শুনছে।

আরও একজন নির্বাক—। অর্ধশায়িত অবস্থায় নির্বাক হয়ে শুয়ে আছেন—দক্ষিণের বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ, সুকণ্ঠ গায়ক বীণকার রঙ্গনাথন,—বৈষ্ণব সঙ্গীতাচার্য রঙ্গনাথন। তিনিও নির্বাক হয়ে শুনছেন। তাঁর কপালে আঘাত-ক্ষতকে আবৃত করে যেন শুভ্র কাপড়ের আবরণী বাঁধা, মুখ চোখ ক্লান্তে একটু। তিনিও ক্লিষ্ট।

তিনি আহত। তাই এত লোকের সমাগম। মহাগুণী আচার্য রঙ্গনাথন। সুরের যাদুকর। কণ্ঠস্বর বংশী ধ্বনির মত। শুধু তাই নয়, নিজেই তিনি গীত রচনা করেন—নিজেই সুরারোপ করে বীণা বাজিয়ে

গেয়ে বেড়ান। বড় বড় মন্দিরের প্রাঙ্গণে গিয়ে—প্রথম তাঁর নূতন গান—দেবতাকে শুনিয়ে আসেন। তারপর রাজার সভায় বীণা নিয়ে গান করেন। মন্দিরের পুরোহিতেরা তাঁর নূতন গানের সংবাদ পেলেই তাঁকে নিমন্ত্রণ পাঠান। তিনি পত্রবাহি মাথায় করে বলেন—শিরোধার্য—গিয়ে বলো। যথা সময়ে উপস্থিত হন। মন্দির প্রাঙ্গণে আসর পড়ে, বীণাধারে উজ্জ্বল আলো জ্বালা হয়, তৈলদীপ—বর্ত্তিকা,—ধূপদানি ধূপশলাকা জ্বলে। চারি পাশে হাজার হাজার শ্রোতা এসে জড়ো হয়: নিম্নশ্রেণীর শূদ্রেরা অজ্ঞাতেরা দূরে দাঁড়িয়ে শোনে। তাঁর বীণা ঝঙ্কার দেওয়া মাত্রেই মোহের সঞ্চার হয় শ্রোতার মনে। বীণা যন্ত্রপূত নয়, ঝঙ্কারের মধ্যেও কোন যাদু নেই কিন্তু তাঁর গান যাঁরা পূর্বে শুনেছেন—তাঁদের মনে জেগে ওঠে পূর্বস্মৃতি। তাই করে মোহের সঞ্চার, যাঁরা নূতন তাঁদের মনে এর ছোঁয়াচ লাগে। তিনি আলাপ সুরু করেন। কণ্ঠস্বর—বীণার ঝঙ্কারের সঙ্গে মিশে কিন্তু সত্যই মোহ সৃষ্টি করে। স্বর এমন মধুর অথচ বলিষ্ঠ। ভারতবর্ষের গানাইয়ের সুর ওঠে নেমে। তাঁদের গান সুরু হয়। গানও ভগবানের নিজের রচনা। তার মধ্যেও আছে এক নূতন ভাব ও ভাবনার প্রকাশ।

প্রতিবারই তাঁর বীণায় তিনি আঙুলের কৌশলে প্রথমেই শব্দ তোলেন—ওম্। যারা সঙ্গত করে তারাও করতাল ধ্বনিতে মৃদঙ্গ শঙ্খে অনুরূপ ধ্বনি মিশিয়ে দেয়। তারপর তিনি গেয়ে উঠেন—অনাদি সৃষ্টির আদিতে নিস্তব্ধতা শব্দের মধ্যে প্রথম নটরাজ চরণপাতে তাঁর নূপুর ঝঙ্কারের মধ্যে জন্ম নিল ধ্বনি। বিশ্বের সকল ধ্বনিই সঙ্গীত। প্রলয় তাণ্ডবের ভীম ভয়ঙ্কর নিনাদ থেকে ব্রহ্মের বংশী ধ্বনি, যুদ্ধ ক্ষেত্রের আর্তনাদ হুঙ্কার থেকে বেতসকুঞ্জে প্রণয়ী যুগলের মৃদু গুঞ্জন—আকাশের মেঘ গর্জনের বজ্রনাদ থেকে কোকিলের কুহুরব—সঙ্গীত ঝঙ্কার সবের মধ্যেই! সব আছে এবং জন্ম নেয়—নটনাথের নূপুর পাতে। হে নটনাথ—তা থেকেই প্রসাদ স্বরূপ আহরণ করেছি এই যৎকিঞ্চিৎ সুর ও সঙ্গীতকণা। তাই আবার নিবেদন করি নটনাথ, নটরাজ, তোমারই চরণে।

এটুকু তাঁর প্রতিটি সঙ্গীতের বা তাঁর সঙ্গীত সাধনারই ভূমিকা। বঙ্গদেশে এমন ভূমিকার নাম—চৈতন্যের আবির্ভাবের পর থেকে গৌরচন্দ্রিকা। ভারতীয় কাব্য শাস্ত্রে এর নাম বন্দনা। মহাভারতে ব্যাসদেব—সুরু করেছেন—

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্—দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ।"

রঙ্গনাথনেরও এটুকু তাই। এদিক দিয়ে তিনি মহাভারতের অনুরাগী এবং মহাভারতকারের অনুসরণকারী। তারপর আরম্ভ হয় আসল গান। পুরাণ থেকে কাহিনী নিয়ে তিনি গান রচনা করে তাই গেয়ে থাকেন। পালা গানের মত। কিন্তু গায়ক তিনি একক। মধ্যে মধ্যে সূত্রধারের মত—কাহিনীর সূত্রটি টেনে নিয়ে যান। আবার উপনীত হন সঙ্গীতে। যতক্ষণ গান করেন ততক্ষণ শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধ বা সম্মোহিত হয়ে থাকে। বুকের মধ্যে নানা ভাবতরঙ্গের অধিরাম উচ্ছ্বসিত হয়—করমণ্ডল বেলাভূমের সমুদ্রের মত। লোকে তাই বলে। সমুদ্রতটবাসী মানুষগুলি

"পোল্ট্রী ইনকিউবেটর"
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মুরগী, হাঁস প্রভৃতির ডিম হইতে একত্রে অধিক সংখ্যক বাচ্চা ফোটাইবার যন্ত্র। কেরোসিন তৈল অথবা বিদ্যুৎ চালিত।
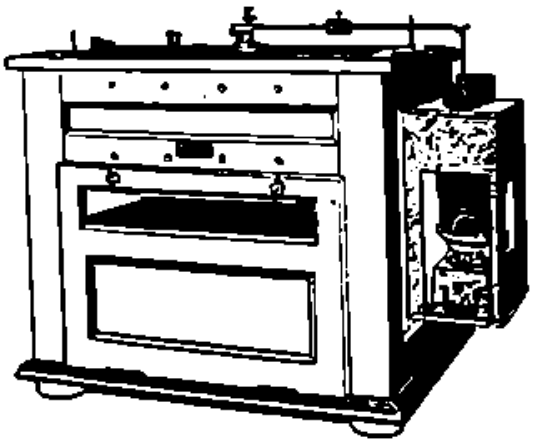
প্রস্তুত কারক :
অ্যাডেয়ার, ডট্ এণ্ড কোঃ (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা : বোম্বাই : মাদ্রাজ : দিল্লী : সেকেন্দ্রাবাদ

নাভানার বই

উপন্যাস। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
প্রথম কদম ফুল
দাম : ১২.০০

অমিয়ভূষণ মজুমদারের
গড় শ্রীখণ্ড
দাম : ৮.০০

দীপক চৌধুরীর
ফরিয়াদ
দাম : ৪.০০

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর
মীরার দুপুর
দাম : ৩.০০

প্রতিভা বসুর
তিন তরঙ্গ
দাম : ৬.০০

মেঘের পরে মেঘ
দাম : ৩.৭৫

মনের ময়ূর
দাম : ৩.০০

গল্প। প্রেমেন্দ্র মিত্রের
শ্রেষ্ঠ গল্প
দাম : ৫.০০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
এক অঙ্গে এত রূপ
দাম : ৩.০০

সন্তোষকুমার ঘোষের
চিররূপা
দাম : ৩.০০

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর
বন্ধুপত্নী
দাম : ২.৫০

প্রিয়দর্শিনী রচিত অভিনব উপন্যাস

উর্বশীর তালভঙ্গ

নিখিলবঙ্গ সংগীত সম্মেলনের নৃত্য-প্রতিযোগিতায় 'উর্বশীর তালভঙ্গ' নাচে দেখিয়ে কাপ্‌ তা'লো মন্ত্রী রায়। এমন নাচ দর্শক দেখেনি কখনো, এমন দুর্লভ আনন্দে অংশগ্রহণ করেনি কেউ। মেঘলাল চন্দ্রকুঞ্জ উত্তরীয়ে আবৃতা নৃত্যপরা বরতনু যেন বিশ্বিগালি প্যারী রোড-এ মন্ত্রী নয়—দেবরাজ ইন্দ্রের নৃত্যসভার অনন্য রঙ্গিণী উর্বশী। কেউ নাচে না, তাল নাচে না, ছন্দ নাচে না; নাচে মন, নাচে চিন্তা, নাচে অনুশীলন—এই উপলব্ধির একাগ্রতায় মন্ত্রী তার শিল্পের প্রেমে পড়েছিল। নৃত্যে উৎসর্গীকৃত জীবন অন্য-বিষয়ের উপর নির্ভরশীল হবে না, এই ছিল কঠিন সংকল্প। বিয়ে মানেই তো সংসার স্বীকার দারিদ্র্য। কিন্তু, হায়, নটনাথ তার দিক থেকে মুখ ফেরালেন। মন্ত্রী যখন এম. এ.-র ছাত্রী, উর্বশীর মতোই নির্বাসিত হ'লো শিল্পের স্বর্গ থেকে।... 'উর্বশীর তালভঙ্গ' এক স্বপ্নময়ী নৃত্যশিল্পী ও তার ঘনিষ্ঠ জগতের রূপকাশ্রিত কাহিনী—বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের আনন্দধারায় অনাস্বাদিত অমৃত যোজনা। দাম : ছয় টাকা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের চিরপ্রিয় উপন্যাস

প্রথম প্রেম

একটি যুবক, একটি যুবতী, আর এই সুন্দরকে পৃথিবী। তরু যৌবনের সমাগমে এমন একদিন আসে, যেদিন পৃথিবীকে স্বর্গ বলে মনে হয়, দেহকে মনে হয় দেবতার আয়তন, জীবনযাপনকে মনে হয় সুধা-সৌন্দর্যের উৎসব। দুর্গমের পথে দুর্লভের জন্য সুদূর তীর্থযাত্রা। সেই হচ্ছে প্রথম প্রেম। জীবনে প্রথম সংঘাত। নারী তখন নারীর অধিক, পুরুষ তখন পুরুষের উপরে। এ সেই প্রেম যার শোক নেই, গ্লানি নেই, নিরাশা নেই। জীবনে নারী হয়তো আসে বহুবার, কিন্তু, প্রেম শুধু একবারই আসে, আর সে-প্রেম প্রথম প্রেম। একটি আনন্দ উজ্জ্বল পরিচ্ছন্ন কাহিনী অচিন্ত্যকুমারের বিপুল লেখনীতে অমর হয়ে আছে। দাম : সাড়ে-চার টাকা

প্রতিভা বসুর নতুন উপন্যাস

সমুদ্র-হৃদয়

'সমুদ্র-হৃদয়' প্রতিভা বসুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। দুটি বিরুদ্ধ জগতের আলোড়নের থেকে এই অপ্রত্যাশিত কাহিনীর জন্ম। একবার সুলতান আমেদের ভালো লাগার আলো কি করে ভালোবাসার আগুনে আহুতি হলো, আর বরাবরের সবুজমহলে বন্দিনী সুলেখা তালুকদারের চির-সঞ্চিত অন্ধ আক্রোশ অবশেষে কোন্ অতলান্ত মমতায় আকুল উদ্বেল, 'সমুদ্র-হৃদয়'-এর নিয়তি-নির্দিষ্ট পরিসমাপ্তিতে তা সজল বিন্দুর রেখায় আঁকা পড়েছে। দাম : চার টাকা।

নাভানা

৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

সমুদ্রকে বড় ভালবাসে :—তারা সমুদ্র-পথের অধিকারী, তাই নিয়ে কত বিচিত্র রচনা করে, তটভূমির নারিকেল কুঞ্জ ও ঝুঁকে তালের বিলাস,—বেলাভূমির আবেষ্টনে তারা বেলাভূমিতে গিয়ে বসে, সমুদ্র কল্লোলে তাদের প্রতিধ্বনি শোনে, সমুদ্রের বাতাস তাদের নিদ্রা আনে—সমুদ্রের ঝড় তাদের ঘর উড়িয়ে ভাসিয়ে দেয়; সমুদ্রের নীলকল্লোল রংএর আভা তাদের অঙ্গ লাবণ্যে সুষমা সঞ্চার করে; জীবনের উপমায় সমুদ্র তাদের প্রত্যহের। সকালের সমুদ্র, দ্বিপ্রহরের সমুদ্র, সন্ধ্যার সমুদ্র, রাত্রের সমুদ্র, উচ্ছ্বসিত সমুদ্র, শান্ত সমুদ্রেই তাদের জীবনের প্রতিবিম্ব দেখতে তারা অভ্যস্ত। ভাবোচ্ছ্বসিত হৃদয়ের উপমা তাদের সমুদ্র। রঙ্গনাথনের গান যখন তারা শোনে—তখন তাদের হৃদয়ের উপমা রাত্রের সমুদ্রের মত। শুধু তরঙ্গের পর তরঙ্গ। অন্য চিন্তার একটি নৌকাও তখন থাকে না। তারপর কখন গান শেষ করেন রঙ্গনাথন। বীণাটি পাশে রেখে দেন। হাত জোড় করে বলেন—ত্রুটি বিচ্যুতি সব ক্ষমা কর। আপনারাও করুন—আপনারা শ্রোতা আপনারাও দেবতা!

AN OFFICE EQUIPMENT
HOUSE OF REPUTE

CCCO.

CONTINENTAL COMMERCIAL CO. PVT. LTD

SERVING
BUSINESS & INDUSTRY
SINCE 1922

FOR ALL OFFICE NEEDS

STATIONERY • PRINTING • FILING
& ACCOUNTING EQUIPMENTS
DRAWING & SURVEY REQUISITES •
OFFICE MACHINES & FURNITURE

Head Office
CALCUTTA
8/1, DALHOUSIE SQUARE EAST

Branches
NEW DELHI
M-40, BLOCK CONNAUGHT CIRCUS

Also at
KANPUR LUCKNOW
PATNA & GORAKHPUR

এতক্ষণে শ্রোতারা যেন মোহমুক্ততা থেকে মুক্ত হয়। তারা সমবেত স্বরে—ধ্বনি দিয়ে ওঠে। জয় রঙ্গনাথন।

রঙ্গনাথন হাত তোলেন—না।

স্তব্ধ হয়ে যায় শ্রোতারা পরিবেশ।

রঙ্গনাথন বলেন—না। বলুন—জয় বিশ্বরঙ্গ-পতি রঙ্গনাথন.—নটরাজ শিব-জয়!

এই রঙ্গনাথন! লোকপ্রিয়—রঙ্গনাথন। সুন্দর রঙ্গনাথন। মধুর প্রকৃতি রঙ্গীত সাধক রঙ্গনাথন।

এই গুণী গীতিকার লোকপ্রিয় রঙ্গনাথন—গত রাত্রে মাদ্রাজ সহরে এক বর্ধিষ্ণু শ্রেণীর নিমন্ত্রণে গান করতে গিয়েছিলেন, কিরাতার্জুনীয় উপাখ্যান। প্রত্যাবর্তনের পথে একদল অজ্ঞাত আততায়ী পথের মধ্যে আক্রমণ করে তাঁর মাথায় আঘাত করেছে। তিনি আহত হয়েছেন। রাত্রের অন্ধকারে মাথায় আঘাত করে তারা অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে। স্বল্প কয়েক জন সঙ্গী ছিল, তারা তাঁকে কোন রকমে বয়ে এখানে এনেছে।

ঘরের মধ্যে তিনি একখানি কাষ্ঠাসনের উপর বিছানো শয্যার সোপাকার একটি উপাধানের উপর ঠেস দিয়ে অর্ধশায়িত অবস্থায় বসে আছেন। হাতের কাছে বীণাটি রয়েছে। একখানি হাত বীণার তারের উপর অসাড় বিশ্রামে পড়ে আছে। কপালের ক্ষত স্থান পরিচ্ছন্ন বস্ত্র খণ্ড দিয়ে বাঁধা। রক্তের একটি শীর্ণ রেখার চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। রক্ত এখনও সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয় নি। সারা মুখে একটি বিষণ্ণ ক্লেদনার ছায়া পড়েছে। দৃষ্টিও তাঁর উদাস বিষণ্ণতার আচ্ছন্ন—সামনের জানালার ভিতর দিয়ে আকাশের নীলিমার মধ্যে যেন সান্ত্বনা খুঁজে ফিরছে। তাঁর শয্যার সামনে মেঝের উপর বিস্তৃত আসনে বসে আছেন এখানকার কয়েকজন অভিবিশিষ্ট ব্যক্তি। এখানকার শাসনকর্তার প্রতিনিধিও রয়েছেন তাদের মধ্যে। আরও যাঁরা আছেন তাঁরা স্থানীয় বিশিষ্ট ধনী ব্যবসায়ী, বিশিষ্ট চিকিৎসক, কয়েকজন পণ্ডিত ব্রাহ্মণও রয়েছেন, ব্রাহ্মণেরা স্বতন্ত্র আসনে বসে আছেন অদূরে।

মৃদু স্বরে কথা চলছে—একটি কথাই বিভিন্ন ভঙ্গিতে বলছেন সকলে—এ অন্যায়। এতবড় অন্যায় যায় হয় না। বর্বরতার চূড়ান্ত!

'রূপা'র বই

বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী [প্রবন্ধ] অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর দাম : ১২·০০

'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী' শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের অমূল্য অবদান এবং বিশ্বের সাহিত্য সৃষ্টির অদ্বিতীয় নিদর্শনস্বরূপ। শিল্পকলাসংক্রান্ত যাবতীয় সংজ্ঞা, তত্ত্বকথা, বিরোধ ও বিচার বিষয়ক প্রবন্ধগুলির মধ্যেও রয়েছে অপরূপ কথাচিত্র। এই গ্রন্থের প্রবন্ধাবলীতে তাঁর দ্বিমুখী প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ দেখা যায়। বাগেশ্বরী অধ্যাপক পদে অধিষ্ঠিত থেকে তিনি অধ্যাপকের মত শিক্ষা দান করেন নি, সেকালের গুরু ও গুরুর মতই দীক্ষা দিয়ে গেছেন শিল্পশাস্ত্রে।

চক্ষে আমার তৃষ্ণা [উপন্যাস] বাণী রায় দাম : ৬·০০

জন্মজন্মান্তরের তৃষিত সে আত্মা, তারই সুগভীর তৃষ্ণার কাহিনী। এই তৃষ্ণা শুধু চক্ষের নয়—অন্তরাত্মার নিবিড় অনুভূতি। অবৈধ প্রেম যদি মনে জন্মলাভ করে, যদি আত্মীয়ের মুখে কেউ চিরস্থানের প্রিয়তমকে খুঁজে পায়, যদি ভুলভ্রান্তির পথচলার বাঁকে চমকে উঠে সেই বাঞ্ছিত সত্তা নিজের হৃদয়কে মুখোমুখি দেখতে পায়, তার কি হবে?...সাহসিকা নায়িকার দুর্বার গতি অপ্রাপনীয় প্রেমের প্রতি, তাঁর পাশে গৃহিকার আত্মহনন, আতা ঠাকুরঝির মেয়ের অভিসারী পদক্ষেপ। অসংখ্য নাটকের নায়ক বিপ্লবী নিরঞ্জনের বিচিত্র চরিত্রের পাশে মায়ার প্রশান্ত ক্ষমাশীলতা এখানে উপস্থিত। বাংলা সাহিত্যের জগতে একটি নতুন আঙ্গিক ও ভাবধারার প্রখর সংযোজন।

যাদু-কাহিনী [বিচিত্র কাহিনী] অজিত কৃষ্ণ বসু (অ. কৃ. ব.) দাম : ৮·০০

মঞ্চে, নগরে বা ময়দানে বিচিত্র বিস্ময় আর রহস্য সৃষ্টি করাই যাদের পেশা বা নেশা, তাদের জীবনও তেমনি অসাধারণ বিস্ময়, রহস্য আর বৈচিত্র্যে ভরা।। এরা নানা নামে অভিহিত—ম্যাজিশিয়ান, যাদুকর, বাজীকর, ভেলকি ওয়ালা, বাদারি। এদের তাকলাগানো খেলাগুলোরও নানারকম নাম—ম্যাজিক, যাদু, ভেলকি, জাদুবিদ্যার খেল, ভোজবাজি। এদের জগতে দীর্ঘদিন বিচরণের ফলে এদের বিচিত্র জীবনধারার সঙ্গে পরিচিত হয়ে লেখক এই গ্রন্থে সন্নিবেশেছেন এদেরই কিছু কিছু বিচিত্র কাহিনী, যা কাল্পনিক কাহিনীর চাইতেও রোমাঞ্চকর।

বরবর্ণিনী [গল্প-সংগ্রহ] অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত দাম : ৩·০০

অচিন্ত্যকুমারের শিল্পসত্তা চিরন্তন তারুণ্যে অধিষ্ঠিত। জীবনের বহু দেশ তিনি দেখেছেন, শ্যামল ও ধূসর, সমুদ্র ও দিগন্ত, দেখেছেন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় দৃষ্টিতে। তাঁর অল্পকালের ঘরের বাতায়ন শাশ্বতের দিকে খোলা। তাঁরই আধুনিকতম গল্পগ্রন্থ 'ব র ব র্ণি নী'।

ছায়াময় অতীত [স্মৃতিকথা] মহাদেবী বর্মা অনুবাদ : মলিনা রায় দাম : ৪·০০

রামা, বৌদি, বিন্দা, সাবিত্রা, বিট্টো, ঘীসা প্রভৃতি এগারোটি চরিত্র-চিত্রের সঙ্কলন এই গ্রন্থে মহাদেবী তাঁর হারিয়ে যাওয়া অতীতের দিনগুলির মমতা-মেদুর স্মৃতি মন্থন করেছেন। তাঁর এই স্মৃতিকাহিনী দেশ-কাল-পাত্রের সীমারেখা অতিক্রমে সার্থক।

অস্তগামী সূর্য [উপন্যাস] ওসামু দাজাই অনুবাদ : কল্পনা রায় দাম : ৪·৫০

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর জাপানের এক ক্ষয়িষ্ণু সম্ভ্রান্ত পরিবারকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে উপন্যাসটির কাহিনী। পিতা মৃত ও মাতা ক্ষয়রোগগ্রস্তা। কাহিনীর বর্ণনাকারিণী তরুণী কন্যা কাজুকো স্বামী পরিত্যক্তা। তারই মাদক-জর্জরিত কনিষ্ঠ ভ্রাতা নাওজী কালের বিবর্তনের ধারায় আপন অভিজাত সম্প্রদায়ের সমাজ ব্যবস্থার আস্থা হারিয়ে জীবনের ঘটালো পরিসমাপ্তি। এই ভ্রাতারই মাধ্যমে সূচিত হল ভ্রাতৃবন্ধু দানাদক্ত এক ঔপন্যাসিকের প্রতি কাজুকোর প্রণয়াসক্তি এবং তারই উপহার-স্বরূপ তীব্র সন্তান কামনার বিষাদময় পরিতৃপ্তি।

রূপা

রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২

ব্রাহ্মণেরাও তাই বলছেন—কিন্তু তাদের প্রকাশভঙ্গি অতি কঠোর আর রূঢ়!—বলছেন—এ পাপ। মহাপাপ! বিদেশী রাজ শক্তির উদাসীনতাই এর কারণ। কিন্তু দেবতা ক্ষমা করবেন না।

রাজ প্রতিনিধি—শ্রীনিবাসন প্রশ্ন করে উত্তরের প্রতীক্ষায় রঙ্গনাথনেরই মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন, কিন্তু রঙ্গনাথন সেই উদাস দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে নিরুত্তর ভাবে বসে আছেন। ব্রাহ্মণদের কথা শ্রীনিবাসনের কানে যেতেই তিনি ভ্রূ কুঞ্চিত করে আবার প্রশ্ন করলেন—বলুন আচার্য, আততায়ীদের কাউকেই কি আপনি চিনতে পারেন নি!

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রঙ্গনাথন ঘাড় নাড়লেন—না।

—কাল ছিল তিথিতে ত্রয়োদশী, আজ রাত্রে পূর্ণিমা, আকাশেও মেঘের লেশ ছিল না। পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নার মধ্যেও আপনি চিনতে পারলেন না; আশ্চর্য!

পণ্ডিত চিদাম্বরম এতক্ষণ চুপ করে বসেছিলেন এবার বলে উঠলেন—আপনি রাজ প্রতিনিধি হয়ে ব্রাহ্মণ প্রকৃতি বিস্মৃত হয়েছেন শ্রীনিবাসন। রঙ্গনাথন—ব্রাহ্মণ এবং—গায়ক। সম্ভবত ভয়ে তাঁর চোখের সামনে গতরাত্রির এমন জ্যোৎস্নালোক পট সহসাই পরিবর্তিত হয়েছিল। ভয়ে বোধ করি উনি চক্ষু মুদ্রিত করেছিলেন।

তাঁর কথার মধ্যে শ্লেষ যেন রণ রণ করছিল।

এবার একটু বিষম ভাবের হাসি হেসে রঙ্গনাথন বললেন—আচার্য চিদাম্বরম—অন্তর নিষ্পাপ হলে তাতে তার স্বরূপ আবৃত হয় না, কিন্তু মৃত্তিকা-জাত কার্পাস থেকে তৈরী বস্ত্রে তারা অতি সাধারণে তাদের স্বরূপকে আবৃত করেছিল। এবং আমিও কিছু অন্যমনস্ক ছিলাম। সন্ধীরা পশ্চাতে পড়েছিল। সুতরাং সঠিক চেনা তো সম্ভবপর হয়নি!

রাজ প্রতিনিধি শ্রীনিবাসন বললেন—তারা তো কিছু যেন বলেছিল আপনাকে? কি বলেছিল?

—হ্যাঁ। বলেছিল।—ওই বিকৃত ব্যাখ্যা কোথা থেকে পেলে তুমি?

চিদাম্বরম বললেন—তাদের বাক্যবিন্যাস—উচ্চারণ—

বাধা দিয়ে রঙ্গনাথন বললেন—তারা ব্রাহ্মণ নয়—আচার্য। অবশ্য প্রাবা মুর্খ ব্রাহ্মণের তো অভাব নেই দেশে। বাক্যভঙ্গি, উচ্চারণ দিয়ে সিদ্ধান্ত দুরূহ। কিন্তু তবুও তারা ব্রাহ্মণ নয়।

চিদাম্বরম বললেন—সন্তুষ্ট হলাম রঙ্গনাথন। তোমার গানে তুমি পুরাণের যে ব্যাখ্যা করেছ তাতে তুমি আঘাত করেছ ব্রাহ্মণদেরই। তোমার হেয় মনোভাব—ওই সকল কুকুরদেরই উপর। ব্রাহ্মণদের মধ্যেও মূর্খ অবশ্যই আছে। তবুও তোমার এই সিদ্ধান্তের জন্য আমি প্রীত। তার কারণ এ নয় যে তুমি ব্রাহ্মণদের সন্দেহ কর নি নিছক প্রীতির বশে বা ভয়ে। ব্রাহ্মণ-প্রকৃতির সত্তা তুমি উপলব্ধি করেছ।

শ্রীনিবাসন বললেন—আপনি কি কাউকে সন্দেহ করেন না? কণ্ঠস্বর—অঙ্গীয় আয়তন এগুলি তো বস্ত্রাবরণের ছদ্মবেশে চাকা যায় না?

বেশ একটু চিন্তা করে নিয়েই যেন রঙ্গনাথন বললেন—না। দৃষ্টি তার সেই জানালা দিয়েই বাইরে নিবদ্ধ। বাইরে—গোশালার ধারে বিরল ক্লিষ্ট শ্যামলতার মত শুষ্ককন্যাটি গোশালার কাঠের খুঁটিটি ধরে দাঁড়িয়েই

শান্তিময়ীর আগমনে

শান্তি

আসুক ঘরে ঘরে

★

শান্তি হোসিয়ারী মিলস

কলিকাতা-১০

মিত্রালয়ের বই !

পড়বার মত বই !!

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

জননী ৬·০০

অহিংসা ৬·০০

গৌরিকিশোর ঘোষের

এই যাত্রা ৩·৫০

শিবতোষ মুখোপাধ্যায়ের

দিকবিদিক ৩·৫০

অবধূতের

গুহ্যতীর্থ ৩·০০

ঘূর্ণিবৌদি ৪·০০

অমলেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়ের

ব্যতিক্রম বর্ণ ৮·০০

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সমুদ্র মানুষ ৫·০০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

পঞ্চগ্রাম

মন্বন্তর

পাষাণপুরী

নিমাইভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অপরাজিত ৮·০০

ইতিমতী ৬·০০

ঘূর্ণিপ্রদীপ ৫·৫০

বনে পাহাড়ে ২·৫০

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

রাত্রির তপস্যা ৬·৫০

পুরুষ ও রমণী ২·৫০

রজনীগন্ধা ২·৫০

সজনীকান্ত দাসের

বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস

শনিভূষণ দাশগুপ্তের

শ্রী ৬·০০

বিমলচন্দ্র সিংহের

সাহিত্য ও সংস্কৃতি ৪·০০

বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের নানাদিক ৪·০০

মিত্রালয়ের বই !

শ্রাবণী

সৌরীন্দ্রকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ॥

বুদ্ধিজীবী মানুষদের নিয়ে লেখা
এই বিরাট উপন্যাস লেখকের
অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকৃতি।

• দাম নয় টাকা •

১২ বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট ॥ কলিকাতা ১২

মিত্রালয় : ১২ বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট : কলিকাতা-১২

আছে। বিশ্ব বেদনাক্ষত বুক—চোখে যেন ঝড় উঠেছে। তিনি ওকে চেনেন। বড় ভাল ছেলে। এখন ওকে অল্প দূরেই ওদের বাস। কন্যাটি সুকণ্ঠী। মধু হাত ধরে গান শেখে। ভিক্ষা করে বেড়াত এই কিছুদিন পর্যন্ত। তার সম্মুখে বা কাছে বিশেষ আসে নি। ভয়ে—আসে নি, অধর্মের ভয়—পাপের ভয় এবং লজ্জার ভয়ও বটে। গান—তার সাধনেও কখনও যায় নি এই সুকণ্ঠী কিশোরীর দুরাগত সঙ্গীতধ্বনি শুনে তারও কখনও কখনও ইচ্ছা হয়েছে—ডেকে ওর গান শোনেন। কিন্তু সামাজিক অনুশাসন এবং মর্যাদার শৃঙ্খলে তাকতে পারেন নি। তাঁর দুচোখ দিন পরই যে তো বিস্মৃত হয়েছেন। এক মাস আগে মধু তাঁকে একদিন ওর সঙ্গে কটি কথা বলেছিলেন। তারপর আর এদিকে আসে নি। কাল রাত্রে ওকে দেখেছিলেন। গানের সময়—অনেক দূরে চত্বরের বাইরে জনতার প্রথম শ্রেণীতে একটি কাঠের খাঁপরতেই সানন্দেই যেন ও দাঁড়িয়েছিল। তার দুটি

কপোলে—ওর চোখের অশ্রুধারা। আজও মধু—এঁর আশীর্বাদের কথা শুনেই এসেছে। নইলে এতটা নিকটে—তাঁর আশ্রমের মধ্যে প্রবেশ করে সোপানের ঘুঁটে ধরে ও দাঁড়াতে সাহস করত না। আজও ওর চোখে জল।

শ্রীনিবাসন বললেন—ও মা—কি না বলনাথন? আমি বললাম—মানুষের কণ্ঠস্বরে—আকার আয়তন এগুলি কণ্ঠাবয়বের ছন্দবেশে ঢাকা পড়ে না। আপনি—'না' বলে তাই সমর্থন করছেন?

রঙ্গনাথন বললেন—মাননীয় শ্রীনিবাসন, আমি আপনার দুটি বাক্যাংশের উত্তরেই না বলেছি। আপনার যুক্তি সত্য—ছদ্মবেশে আকার আয়তন ঢাকা যায় না—একে সমর্থন করেও বলেছি—না। আবার কাউকে সন্দেহ করি কি না—এর উত্তরেও বলেছি কাউকে সন্দেহ করি না।

চিদাম্বরম বললেন—অজ্ঞাত আততায়ী এবং রঙ্গনাথন—অসাধুতার এবং সাধুতার দুই—দূরতম প্রান্তে অবস্থান করেন শ্রীনিবাসন। রেখাটি কাল অকস্মাৎ গোলাকার হতেই মুহূর্তের জন্য—পরস্পরের নিকটতম স্থানে পৌঁছে—সংঘর্ষ হয়েছে—তারপরই আবার সরল-রেখার দূরতমপ্রান্তে চলে গেছে। সুতরাং সাধুতার উচ্চতম বা শেষতম বিন্দুতে স্থিত রঙ্গনাথন অসাধুতম ব্যক্তিকে দেখেও চেনেন নি—কণ্ঠস্বর শুনেও শোনেন নি, জেনেও জানেন না। অবান্তর প্রশ্নে লাভ নেই।

রঙ্গনাথন এবার বললেন—আচার্য চিদাম্বরম—প্রণাম আপনাকে। অনুমান অভ্রান্ত আপনার। শুধু আমি সাধুতার শেষতম বা উচ্চতম বিন্দুতে পৌঁছেছি এই কথাটির প্রতিবাদ করি। আচার্য, যে পাণ্ডিত্য সাধুতার শেষতম বিন্দুর পথ বলে দেয়—তা আমার নেই। বোধ করি আপনি ওই বিন্দুতে থেকে পথের মাঝখানের যে রেখাটি ঠিক সন্দেহের গণ্ডী অতিক্রম করতে পারে না—তার অস্তিত্বটি দেখতেও পাচ্ছেন না বুঝতেও পারছেন না আচার্য, আঘাত আমার সত্য। বেদনা দুঃখ সত্য। রক্তপাত তার সাক্ষী। যারা মেরেছে তারা ব্রাহ্মণ নয় এও সত্য। কিন্তু তারা মারলে কেন আমাকে? আমি তো তাদের আঘাত করি নি। আমার

আমাদের প্রকাশিত কয়েকখানি মনের মত পড়ার বই

—উপন্যাস—

হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়	গোধূলি লগ্ন	৩·০০
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	সীমান্তর্গ	২·৫০
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	নবনীতা	৩·০০
ঔপন্যাসিক রমেশ দত্ত	সংসার	৩·০০
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	চেনা চেনা মুখ	২·৫০
সরোজকুমার রায়চৌধুরী	পান্থ নিবাস	৩·০০

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

মানসী
বসুধারা
সোহাগ প্রদীপ
নূতনের অভিষেক
প্রিয়তমা
পাথর আলো

অশোক গুহ

প্রান্তরের সুর	২·০০

সৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়

অন্তরময়ী	২·৫০
অনুরাগিনী	১·৫০

বেলা দেবী

দ্বিধারা

—গল্পগ্রন্থ—

নরেন্দ্র নাথ মিত্র

বিদ্যুৎলতা	২·৫০

বিমল দত্ত

অপরিচিতা	২·৫০
নায়ক নায়িকা	২·৫০

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

আগমনী	২·০০

বিশ্ব বিশ্বাস

কাজোরা	২·০০
নবরূপা	১·৫০

অজয় দাসগুপ্ত

শেষের স্নান	২·৫০
অভিলাষ	১·৭৫

সমরেশ বসু

ছোট ছোট ঢেউ	২·৩০

অনুবাদ সাহিত্য

মহাকবি কালিদাস বিরচিত পুষ্পবান বিলাসম্, শৃঙ্গার-তিলকম্, শৃঙ্গার রসাষ্টকম্ অবলম্বনে

ত্রিবেণী	৩·০০

মহাকবি সেক্সপীয়রের

কয়েকখানি নাটকের

উপন্যাস রূপ :

অনুবাদক—অশোক গুহ

ওথেলো
ম্যাকবেথ
হ্যামলেট
সিম্বেলিন
কিং জন
দি টেম্পেষ্ট
কিং লিয়র
কোরিওলেনাস
রিচার্ড দি থার্ড
রোমিও জুলিয়েট
জুলিয়াস সীজার
দি উইন্টার্স টেল
টেমিং অব্ দি শ্রু
মার্চেন্ট অব্ দি ভেনিস
টুয়েলফথ নাইট
মেজার ফর মেজার
টিমন অফ্ এথেন্স
হেনরী দি এইটথ
কমেডী অফ্ এরার্স
অ্যাজ ইউ লাইক ইট
অ্যান্টনী এণ্ড ক্লিওপেট্রা
মাচ অ্যাডো অ্যাবাউট নাথিং
টু জেন্টলম্যান অফ্ ভেরোনা
এ মিড সামার নাইটস্ ড্রিম

প্রতি খণ্ডের দাম—

দুই টাকা

বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস

৫।১এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

শত্রু বলে কাউকে তো মনে করতে পারছি না।

—তুমি উদার, তাই বা কেন—উদারতম ব্যক্তি। তুমি পরম চণ্ডালও ব্রহ্মবিদ হতে পারে বলে বিশ্বাস করেছ—

—আমি মহাভারত থেকে উপাখ্যান নিয়েছি আচার্য। মহর্ষি বেদব্যাস স্বয়ং এ সত্য মহাভারতে প্রমাণিত করেছেন। কেবল দুটি বিভিন্ন অংশকে আমি একত্রিত করেছি। কিরাতার্জুনীয় উপাখ্যানের আগে ধর্ম ব্যাধ উপাখ্যানের শারদন্তুকে ভূমিকা-স্বরূপ জুড়ে দিয়েছি।

—কিন্তু তার ব্যাখ্যা সে তোমার নিজস্ব। 'কৃষ্ণবর্ণ চর্মের' অন্তরালে যিনি বসবাস করেন—তিনিই বসবাস করেন বৈকুণ্ঠে। যিনি বসবাস করেন বৈকুণ্ঠে তিনিই বাস করেন পরম পল্লীতে, সকল পতিত পল্লীতে, ওই ওদের মধ্যে ওদের কৃষ্ণবর্ণের অন্তরালে। কৈলাসে যিনি বাস করেন ভবানীপতি, তিনিও আছেন ওদের মধ্যে। ওদের কৃষ্ণ চর্ম দেখে যদি তোমার ঘৃণা হয়, ওদের পল্লীর অপরিচ্ছন্নতায়, কটু গন্ধে যদি তোমার দ্বিধা হয় কাছে যেতে তবে তোমার জানা হবে না তাঁকে। ব্রাহ্মণ তবে তুমি ব্রহ্মাভিমানী, ক্রোধে ঘৃণায় অহংকারে শিক্ষার মধ্যে তোমার জানা হয় নি ব্রহ্মকে। আমি নারী আমার ধর্মে আমি অধিষ্ঠিতা। আমার যিনি পতি তিনি শুধু আমার পত্যেই নন তিনি আমার প্রিয়, প্রিয়তম। তাঁর সেবা আমার ধর্মই শুধু নয়, সেই আমার জীবন ধর্ম, সেই আনন্দ যার স্বাদে আর ব্রহ্মের স্বাদে প্রভেদ নেই। তুমি তাতে আমার উপর ক্রুদ্ধ হলে। সে ক্রোধে কোন ক্ষতি হয় নি বা হবে না আমার। সুতরাং তোমার পরম সত্য পরম ব্রহ্মকে জানা সম্পূর্ণ হবে ব্যাধ পল্লীতে ব্যাধ ধর্মে অধিষ্ঠিত ধর্ম ব্যাধের কাছে। ঘৃণা করো না, নাসিকা কুঞ্চন করে প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে থেকো না, প্রবেশ করো। তুমি কি জানো ভবানীপতি মহারুদ্র কিরাত রূপেই দেখা দিয়েছিলেন তপস্যা পরায়ণ অর্জুনকে? অর্জুন কিরাত বলে অবজ্ঞা করেছিল, ঘৃণাও করেছিল, কিরাতরূপী ভগবান তার সে শক্তির অবজ্ঞা চূর্ণ করেছিলেন। হিমগিরির কাঞ্চনজঙ্ঘার স্বর্ণদীপ্তির প্রতিভাত স্বর্ণকান্তি কিরাত নীলগিরিতে যখন আসেন তখন তিনি সুনীল সমুদ্র লাবণ্যে অবগাহন করে হন নিবিড় নীলকান্তি।" এতো তোমারই ব্যাখ্যা রঙ্গনাথন।

—আমি কি ভ্রান্ত বা বিকৃত ব্যাখ্যা করেছি আচার্য?

—সে কথা তুমি কুচ্চান পাল্লীদের জিজ্ঞাসা কর রঙ্গনাথন।

শ্রীনিবাসন বললেন—এর মধ্যে কুচ্চান পাল্লীদের কথা তুলছেন কেন আচার্য চিদাম্বরম।

চিদাম্বরম বললেন—তার কারণ কি আজ প্রতিনিধি আপনি, আপনার অবিদিত নয় শ্রীনিবাসন? মাদ্রাজের চারিপাশ, সারা তেলেঙ্গানা ওদিকে ত্রিবাঙ্কুর কোচিনে আজ তারা গির্জা গড়ে বসেছে। মাদ্রাজে তারা সুপ্রতিষ্ঠিত। মহারাষ্ট্রে শক্তি পানিপথে প্রায় শেষ। যেটুকু অবশিষ্ট ছিল নানা ফড়নবীশের মৃত্যুতে তাও গেল। তিন বছর যেতে না যেতে পেশোয়া ইংরেজের কাছে অধীনতার খত লিখেছে। মহীশূরে সুলতান টিপু বিগত। সুলতান টিপু হিন্দু ধর্মের বন্ধু ছিল না, কিন্তু পাল্লীদেরও কঠোর শাসনে শাসিত রেখেছিল। নিজাম আজ অসহায়। দক্ষিণে ইসলাম তিন শত বৎসরেও সনাতন ধর্মের ক্ষতি করতে পারে নি।

যে কোন রকমের মেরামতে
ও
সমস্ত সংরক্ষণে অদ্বিতীয়
ব্যানার্জী ওয়াচ কোং
১০৯২ গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৫
ফোন: ৫৫-৮০৫৫

পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ কৃত

প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও সাহিত্য

পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের নাম সাহিত্য জগতে অতি পরিচিত। তাঁর মতো গবেষক, সমালোচক ও দ্রষ্টার আবির্ভাব এদেশে খুব কমই ঘটেছে। প্রাচীন ভারতকে জানতে হলে এ গ্রন্থটি অপরিহার্য। ছাত্র, গবেষক, ইতিহাস-পাঠক সকলেই এ গ্রন্থ পাঠে উপকৃত হবেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত বলে মূল্য আশাতীত সুলভ হলো। বহু প্রয়োগ চিত্র শোভিত ও উৎকৃষ্ট ছাপা বাঁধাই। ২·০০

প্রবন্ধ

ডক্টর অজিতকুমার ঘোষের

বঙ্গ সাহিত্যে হাস্যরসের ধারা ১৪·০০

ডক্টর সুশীলকুমার গুপ্তের

নজরুল চরিত মানস

রণজিৎকুমার সেনের

বাঙ্গালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য

সুধীর চন্দ্র করের

রবীন্দ্র-আলোকে রবীন্দ্র-পরিচয়

বেগম শামসুন্ নাহারের

নজরুলকে যেমন দেখেছি

সন্তোষা খাতুনের

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

অবনীভূষণ ঘোষের বিজ্ঞান-গ্রন্থ

সাপের কথা ১·২৫ **ভূত ভূত নয়**

জানলে পরে ভাঙবে ভুল

সৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ ও পরেশ সাহা সম্পাদিত

কথাশিল্পী (আধুনিক কথাশিল্পীদের সচিত্র জীবনী)

চিরঞ্জীবশঙ্কর রায়চৌধুরীর

প্রভুপাদ শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

কবিতা

দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়ের

কাগজের নৌকা

Lwis Henry Morgan's
Ancient Society

Paul Lafargue's
Evolution of Property

Karl Marx's
Critique of Political Economy

(বিস্তৃত তালিকা চেয়ে পাঠান)

উপন্যাস

নজরুল ইসলামের

ব্যথার দান ৩·৫০

দক্ষিণারঞ্জন বসুর

লাইলাক একটি ফুল ৩·০০

ভারত পুত্রমের

পান্নাবাঈ ৩·৫০

ভক্তি দেবীর

যদি জানতেম ৩·০০

মুসাফিরের

লীলালিপি ২·০০

অবিনাশ সাহার

প্রাণগঙ্গা ৯·০০

বসন্ত বিদায় ৩·৫০

পুবের আকাশ ২·৫০

অন্তরাল ৩·৬০

উপন্যাস বিচিত্রা (প্রতি খণ্ডে তিনটি করে উপন্যাস) ১ম ৪·০০ ২য় ৪·০০ (আরো চলবে)

গল্প

প্রাণতোষ ঘটকের

মুঠো মুঠো কুয়াশা ২·৫০

ভারত পুত্রমের

ফুলমতীর মন ৩·০০

ব্যঙ্গ রচনা

ভিন দেশীয়

কুলীন কলিকার পাঁচালি ২·০০

মুকুল মোদকের

বহুরূপা ২·৫০

ভারতী লাইব্রেরী ঃঃ ৬ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

কিন্তু খৃষ্টান প্রচার কেন এত যে কৌশলে ধর্মের প্রসার করে সে তো কারুর অবিদিত নাই। তার উপর নিরক্ষর অবস্থায় তারা অতি উগ্রচারে ধর্ম প্রচারে শক্তি নিয়োগ করছে। তারা অপপ্রচারের এই সম্ভার বিদেশে করে তুলে পরিশেষে তাদের খৃষ্টান করছে। সুতরাং কারণটা তুমি সম্ভবত জেনেও অস্বীকার করছ।

শ্রীনিবাসন বললেন—এ সব আলোচনা রাজনৈতিক আচার্য। অস্বীকার করছি না যে, এ আলোচনায় আমার অধিকার নাই। তবু অপরাধীকে জানতে পারলে শাস্তি নিশ্চয় দেব।

চিদাম্বরম বললেন—কারণ বশতঃ কার্য হয় শ্রীনিবাসন; কিন্তু ওই কারণটিও স্বয়ম্ভুর মত তার পূর্ববর্তী কোন কার্য বা কারণ ভিন্ন উদ্ভূত হয় না। এ আঘাত করেছে—অপপ্রচার। অপপ্রচারে উত্তেজিত করেছে—ওই খৃষ্টান ধর্ম প্রচারকেরা। রঙ্গনাথন যে ব্যাখ্যা করেছে তার সবের মূলে, তাকে বিকৃত করে বুঝিয়েছে—ওই পাদ্রীরাই। এ সংবাদ আমি নিশ্চিতরূপে জানি। অপরাধীকে আবিষ্কার করলেও তোমাকে প্রকাশ্যে তাকে সঙ্কুচিত করতে হবে শ্রীনিবাসন।

শ্রীনিবাসন বললেন—আমি প্রতিজ্ঞা করে যাচ্ছি—আমি তাদের আবিষ্কার করব, শাস্তি দেব। শুধু রঙ্গনাথনকে বলতে হবে—আমি চিনেছি—আবার আততায়ী কণ্ঠস্বর কে—শুধু এইটুক। সকলের সম্মুখে ও আমি শপথ করছি। তারপর রাজ্যপ্রতিনিধিত্ব পরিত্যাগ করতে হলে তাও করব আমি।

সকলে একবাক্যে বলে উঠল—সাধু সাধু সাধু!

ওপাশে বসেছিলেন বন্ধিষ্ণু ব্যবসায়ী গোপালন। তিনি বললেন—আততায়ীর নাম বা স্থান তিন দিনের মধ্যে আমি আপনাকে দেব মাননীয় শ্রীনিবাসন। আমি ব্যবসাদী—আমার দোকানে বহুলোকের সমাগম হয়, বহুজন কর্ম করে। এ সন্ধান পেতে আমার দেরী হবে না।

তবে আচার্য চিদাম্বরনের কথা সম্পূর্ণ সত্য। এ কথা আমিও জানি। আচার্য রঙ্গনাথন এই গান করেন—প্রথম কাস্ত্রীডয়নে। তাঁর ব্যাখ্যা বহু উচ্চরণের জ্ঞানী-গুণীর কাছে গ্রাহ্যযোগ্য হয়নি, তাঁরা ব্যথিত হয়েছেন—বলেছেন—এ তত্ত্ব, এ ব্যাখ্যা সকলের জন্য নয়; তবু অস্বীকার করেন নি, সাধুবাদ উচ্চারণ করেছেন। কিন্তু পরবর্তের মধ্যে এ ব্যাখ্যা ক্ষোভের কারণ হয়েছে। আপনারা বর্ত্তিক্কু শহর ব্যবসায়ী খৃস্টান যোশেফকে জানেন? খৃস্টান হয়েছে—ইংরাজী ভাষা শিখেছে—তবু সে যে শহর সেকথা ভুলতে পারে নি। সেও বোধ হয় কাস্ত্রীডয়নে গিয়েছিল—গান শুনতে। আমার কাছে কিছুদিন আগে সে নারিকেল আর নারিকেল দড়ির চালান এনেছিল। রঙ্গনাথনের গানের কথাই আলোচনা হচ্ছিল। আমরা সকলেই প্রশংসা করছিলাম একবাক্যে। অপূর্ব এবং হৃদয়স্পর্শী ব্যাখ্যা। যোশেফের মুখ চোখ ক্ষোভে কঠিন হয়ে উঠল—বললে—কুৎসিৎ, কুৎসিৎ—শেঠ গোপালন—অতি কুৎসিৎ ব্যাখ্যা! অতি সুকৌশলে আমাদের জাতিকে হেয় করা অবজ্ঞা করা ছাড়া আর কিছু নয়। কোথায় আমাদের পল্লীতে আবর্জনা—কোথায় দুর্গন্ধ? রঙ্গনাথন এতে ঈশ্বরের দয়া পাবে না, তার কাছে শাস্তি পাবে। এ আমি নিশ্চিত বলে দিলাম—তুমি দেখো! হাতের মুষ্টিটা দৃঢ়বদ্ধ করে বললে—আমরা পরব থেকে কৃশ্চান হয়েছি তবুও আমরা পরব। এই উক্তি এবং তার সঙ্গে এই দুর্ঘটনার এলাকা, তার সঙ্গে আঘাতকারীরা ব্রাহ্মণ নয়—

ঘরের সামনের বারান্দা থেকে কেউ বললে—ব্রাহ্মণ এবং পরব ছাড়া কি আর কারুর বা কাজেরও দ্বারা এ কাজ হতে পারে না শ্রেষ্ঠী গোপালন?

—কে? আলি মাসের সাহেব?

—হ্যাঁ আমি!

—আপনি এসেছেন? তা বাইরে কেন?

—ভিতরে স্থান সংকীর্ণ। বাইরেই রয়েছি। রঙ্গনাথন আমার বড় প্রিয় গায়ক। আমি মুসলমান হলেও এসব পালাগান শুনতে ভালবাসি। যে দিন বিষ্ণু কাঞ্চীতে রঙ্গনাথন এই গান প্রথম করেন—সে দিন আমি ব্যবসার সূত্রে ওখানে গিয়েছিলাম। রাত্রেও ছিলাম। সেখানে

বর্ণালী সুবোধ ঘোষ

অলকার শুধু শাড়ি মুখটি দেখে জন্মান্তরের সুদূরে তথা জীবনের অনেকদিনের পরিচিত একটি ভালবাসার মুখ বলে অপেলের মনে হয়। কে বলবে পরশু দিনও এই মেয়ের সঙ্গে কোন চেনাশোনা ছিল না!—আবার, দুদিনের পরিচিত এই মানুষটাকে একটা বিস্ময় বলে মনে হয়েছে অলকার—যেন কতকালের পরিচিত, তবু নতুন।..... তারপর পাঁচ বছরের একান্ত ভালবাসার পাত্র শৈলেশ্বর কোথায় তলিয়ে যায়...আর ইচ্ছা অনিচ্ছার সংগ্রামে আহত একটা মেয়েলী আত্মা যেন মরণ জলে ডুবতে গিয়ে হঠাৎ ভেসে ওঠে—আকাশের বর্ণালীর দিকে তাকিয়ে থাকে অলকা। দাম: তিন টাকা।

জলকমল সুবোধ ঘোষ

অনেক দিনের ইচ্ছা ও স্বপ্নময় সাধভরা কল্পনার ছবিগুলি চোখের উপর পিপাসার ঘোর ফুটে ওঠার এক মুহূর্তে ঝরে। কিন্তু দুঃখের ভয়ে দেখবার আশাটাই যেন মিথ্যে হয়ে গেল। কেন? তারই করুণ কাহিনী নিয়ে এই জলকমল! দাম: তিন টাকা।

কনে-চন্দন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

মুক্ত নিশ্বাসে পড়ে ফেলবার মত একটি অপূর্বসুন্দর উপন্যাস। বহু বিচিত্রচরিত্রের এক অভূতপূর্ব সমাবেশ। শৈলজানন্দের মিষ্টি-মধুর লেখনীভঙ্গির কথা সর্বজন-বিদিত। তার ওপর যে অভিনব রীতিতে গল্পটি তিনি বলেছেন, সে ভঙ্গিটি তাঁর নিজস্ব আবিষ্কার। কিন্তু শুধু ভঙ্গি নিয়েই তিনি পাঠকের চিত্ত জয় করবার চেষ্টা করেননি, মানব জীবনের এক চিরন্তন সত্যকে তিনি এমন-ভাবে উদ্ঘাটিত করেছেন, যিনি পড়বেন লেখকের প্রতি শ্রদ্ধাবনত চিত্তে সে কথা তাকে স্বীকার করতেই হবে। দাম: আড়াই টাকা।

অঙ্গীকার নরেন্দ্রনাথ মিত্র

গল্পের যাদুকর এই গ্রন্থে পনর দিনে যে গল্প শুনিয়েছেন—কস্তুরীর মত তার সুবাস পাঠকমনে রহস্যের শিহরণ জাগায়। লেখক গল্পের মাধ্যমে জানিয়েছেন—প্রেম শুধু দেহের মধ্যেই থাকে না, মনের মধ্যেও থাকে।... দেখিয়েছেন—মাতৃহীন ছেলে বাবা আর দিদির মাঝখানে আর যোজক নয়, সেও যেন স্বতন্ত্র একটা দ্বীপ। প্রমাণ করেছেন—বিশ্বের জ্বালায় মানুষ দূরে সরে যায়, কিন্তু ঠোঁটের বিষ অনোঘ।...উপসংহারে বলেছেন সব গল্পই কি আর সবাইর কাছে সত্য হয়? দাম: আড়াই টাকা।

রবীন্দ্র লাইব্রেরী

১৫/২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

শিবকাঞ্চীর একদল আধা স্থায়ী ভক্তের আলোচনা আমি শুনে এসেছি। আমাকে তারা গ্রাহ্য করে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বলছিল—এর জন্য রঙ্গনাথনের শাস্তি বিধান করবে তারা। বৈষ্ণব ধর্মের এই ওকালতির করার পন্থার প্রতি, রঙ্গনাথনের ব্যাখ্যার প্রতি তাদের আর শ্রদ্ধার শেষ ছিল না।

তাঁর কথার ঘরের ভিতরের প্রত্যেকেই স্তব্ধ হয়ে গেলেন। শৈব সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একদল অর্বাচীন কোন স্বভাবের ভক্ত আছে বটে।

শ্রীনিবাসন বললেন আচার্য চিদাম্বরমকে—আচার্য!

আচার্য চিদাম্বরম বললেন হ্যাঁ শুনলাম। একটু স্তব্ধ থেকে আবার বললেন—অসম্ভব নয় শ্রীনিবাসন। আমাদের শত্রু-মিত্রের সীমা পরিসীমা নেই। ধর্মে-ধর্মে বিরোধ সে ছেড়েই দিলাম। তারও তলে হিন্দুধর্মের মধ্যে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিরোধও আনবার্য অগ্নিবুদ্বুদের মত জ্বলছে। রঙ্গনাথন ধর্মের অগ্নিতে ঘৃত দিতে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে বিরোধের বহ্নিও জ্বলে উঠে থাকতে পারে। আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তা হলে আকার আয়তন কণ্ঠস্বর বাক বিন্যাস থেকে রঙ্গনাথনকে হত্যা করে আততায়ীর স্বরূপ অনুমান করতে হবে না। তাদের গাত্রগন্ধ থেকেই অনুমান হবে সর্বাগ্রে—। তাদের গায়ের একটি গন্ধ আছে। যেমন বৈষ্ণবেরও আছে। রঙ্গনাথন—!

শ্রেষ্ঠী গোপালন বললেন—শৈব অর্বাচীনদের সন্দেহ করে কৃষ্ণান ছোকরে এবং পাদ্রীদের ছেড়ে দেওয়া অনেকটা নিরাপদও হবে।

শ্রীনিবাসন বললেন—নিরাপত্তার কথা পরে শ্রেষ্ঠী গোপালন। আগে আচার্য রঙ্গনাথন বলুন।

রঙ্গনাথন বললেন—গন্ধের কথা স্মরণ করতে পারছি না স্বাক্ষ প্রতিনিধি। তবে হতে পারে না এমন কথা বলতে পারি না। এবং এরপর সনাতন ধর্মী মুখ গোঁড়ার দলই যে হতে পারে না তাই বা কেমন করে বলব আচার্য চিদাম্বরম, আমাকে ক্ষমা করবেন আপনি!

চিদাম্বরম বললেন রঙ্গনাথন—ভালই বলেছ তুমি তুমি উদার!

ঠিক এই মুহূর্তে একজন বারান্দা থেকে ঘরে প্রবেশ করল এবং অতি সন্তর্পণে দেওয়ালের প্রান্তভাগ ঘেঁষে গোপালনের কাছে গিয়ে অতি মৃদুস্বরে প্রায় কানে কানে কিছু বলল।

গোপালন চমকে উঠে বললেন—কই কোথায়?

—ওই যে, গোপালার কাঠের খুঁটী ধরে। আঙুলে দিকে আঙুল বাড়িয়ে সেও সবিস্ময়ে বলে উঠল—কই? ওই তো ওইখানেই তো দাঁড়িয়েছিল। কই?

সকলেই বিস্ময়ভরে প্রশ্ন করলেন—কে? কি?

—যোশেফদের গ্রামের একটি মেয়ে। লাল্লা বলে একটি মেয়ে গান গেয়ে ভিক্ষা করে সেই। ওই—গোপালার খুঁটী ধরে সেই সকাল থেকেই ওখানে দাঁড়িয়েছিল। আপনাদের কথা শুনে আমি ভিতরে বলতে এসেছি—আর দেখি নেই। আমার সন্দেহ হয়েছিল—এই কথাগুলি শুনে

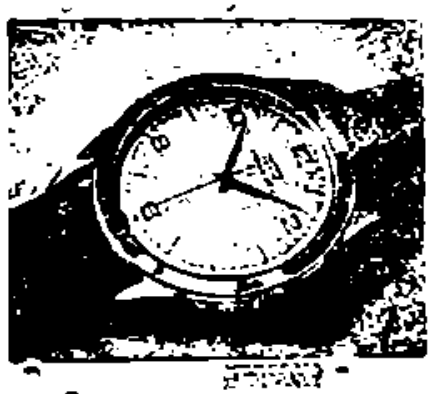

রিপেয়ারিংএ আমাদের এত সুনাম কেন?

- আমরা প্রত্যেক ঘড়ির জন্য অরিজিনাল পার্টস ব্যবহার করিয়া থাকি।
- যে ঘড়ির জন্য যে কারিগর অভিজ্ঞ সেই ঘড়ির জন্য সেই কারিগর দ্বারাই মেরামত করান হয়।
- আমাদের কারিগরেরা প্রায় সকলেই সুইস ফার্মে ট্রেনিংপ্রাপ্ত।
- ক্রমবর্দ্ধমান মূল্য বৃদ্ধি সত্ত্বেও আমরা পূর্বের চার্জেই মেরামত করিতেছি।
- ঘড়ি মেরামতের প্রয়োজনে আমাদের সহিত পরামর্শ করিতে অনুরোধ জানাইতেছি।
- মফঃস্বলের জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা আছে।

চৌধুরী'জ

ঘড়ি, পেন ও চশমা বিক্রেতা

নেতাজী সুভাষ রোড, কলিঃ-১

ফোন : ২৩-৫৬১০

অবশ্য—যে ও এখানে এসেছে সংবাদ সংগ্রহের জন্য তা হলে ঠিক যাই

রাজ প্রতিনিধি শ্রীনিবাসন—ঝিপ্রহরের সঙ্গে উঠে পড়লেন এবং ঘরের বাইরে এসে ডাকলেন—ধিরুবেল ! কোতোয়ালীর কর্মচারী ধিরুবেল এসে সম্ভ্রম ভরে অভিবাদন করে দাঁড়াল।

—দেখতো ধিরুবেল, এই স্থানটি ভাল ভাল সন্ধান করে দেখ—এখানে লঙ্কা বলে কোন পরকন্যা—

পান সেরে সে তো তার জন্য যাদের হাত ধরে ভিক্ষা করে বেড়াত। তাকে তো চিনি। সে তো এখানেই ছিল। ওই স্থানে—ওই গোশালার ধারে।

—খোঁজ—। তাকে খোঁজ দের জন্য তাকে। সন্ধান কাউকে—আশ্রমের বাইরে পাঠাও দেখি।

রঙ্গনাথন চঞ্চল হয়ে উঠলেন বললেন—আচার্য—রাজ প্রতিনিধি, কি করছেন ? এইখানে বসে আমি দেখেছি—একটি ছায়ামূর্তী পরম বালিকা গোশালার পাশে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু সে কি অপরাধ করলে রাজ প্রতিনিধি !

রাজ প্রতিনিধি বললেন—আমার কর্তব্য কর্ম বাধা আপনি দেবেন না রঙ্গনাথন। আপনি সরুন—

আচার্য বললেন—সরুন নয়, নিরোধ '

রঙ্গনাথনকে চুপ করতে হল।

● স্মরণীয় ৭ই • অ্যাসোসিয়েটেড্-এর প্রতিষ্ঠাদিবস
● প্রতি মাসের ৭ তারিখে আমাদের নূতন বই প্রকাশিত হয়

রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে
আমাদের প্রকাশনার কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

'রবীন্দ্রজীবনী'-কার
শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের
রবি-কথা ৩·৫০

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের
সৌখীন নাট্যকলার রবীন্দ্রনাথ

শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের
রবীন্দ্র-কথা

শ্রীকানাই সামন্তের
গবেষণামূলক প্রবন্ধ গ্রন্থ
রবীন্দ্র প্রতিভা

কাজী আবদুল ওদুদের
গবেষণামূলক বিরাট গ্রন্থ
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়ের
কবি-প্রণাম ৫·০০
[কবিগুরুকে নিবেদিত বাংলার কবিদের কাব্য-সংকলন]

সম্প্রতি প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য বিবিধ গ্রন্থ

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকারের
বিবিধার্থ অভিধান ৩·৫০
[বাংলা ভাষার সম্পূর্ণ নূতন প্রকার অভিধান। পনরো হাজার শব্দের সমন্বয়ে গ্রথিত]

শ্রীদিলীপকুমার রায় সঙ্কলিত
দ্বিজেন্দ্র কাব্য-সঞ্চয়ন ৮·০০
[দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠ কবিতা, গান ও কাব্য নাট্যের নানা দৃশ্য]

শ্রীদিলীপকুমার রায়ের
স্মৃতিচারণ (১ম খণ্ড)
স্মৃতিচারণ (২য় খণ্ড)
[দ্বিজেন্দ্রলাল, গিরিশচন্দ্র, বার্ট্রাণ্ড রাসেল, রোমাঁ রোলাঁ, সুরেশ সমাজপতি, এবং রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, বারীন্দ্র ঘোষ প্রভৃতির চিত্রাঙ্কন সম্বেত]

ডঃ সুকুমার ভট্টাচার্যের
বাংলা কাব্যে শিব ১০·০০

শ্যামাপদ চক্রবর্তীর
অলঙ্কার-চন্দ্রিকা

বিমলচন্দ্র সিংহের
সিদ্ধপথিক বাঙালী ৫·০০

শান্তিদেব ঘোষের
গ্রামীণ নৃত্য ও নাট্য
(সচিত্র) ৩·০০

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

শিবুদল তার চৌদ্দপুরুষের নিয়ে তল্লাস করে, করলে। লোপাটের ভড়াস্ত। ঘরের আড়াল—গাছের ঘন পল্লব ভেদ করে পাখা প্রসারণ দৃষ্টি সঞ্চালন করে দেখলে—কোথাও নেই। তাদের সঙ্গে সমবেত লোকেদেরও কিছু লোক যোগ দিলে সন্ধানে। কই—কোথায়? আশ্রম থেকে বেরিয়ে—চারিপাশ তারা দেখলে—চারিপাশে যতদূর দৃষ্টি যায় দেখলে।—কই—কোথায়?

একজন বললে—বেলাভূমি তো দেখা হয় নি!

ছুটে গেল কয়েকজন। তার পিছন পিছন আরও কয়েকজন। বেলাভূমি নির্জন। কিন্তু শব্দ বিকীর্ণ—দূরে, সুদূরে মনে হয়। দিগন্ত পর্যন্ত বালু তট চলে গেছে। ফেনে ফেনে অনন্ত গভীর সমুদ্র গর্জন করে আছড়ে আছড়ে পড়ছে। পুরন্ত বাতাস—নিরন্তর ক্রন্দন করে বয়ে চলেছে—হা—হা করে। এরদল উপকূল-বর্তী নারিকেল তাদের দীর্ঘ অঙ্গভার নিয়ে সন্তর সন্ধান করলে। কিন্তু কই?—সে কোথায়? নেই তো!

শ্রীনিবাসন বললেন—আমি এর প্রতিকার করবই। অপরাধীকে দণ্ড দেবই। সকল জনের সম্মুখে—দেবতা সাক্ষী করে শপথ করলাম আমি। সে তারা যেই হোক। সৈন্য অধ্যক্ষ অথবা কুশাসন প্রচারক নিয়োজিত বিদ্রোহী ঘোষেক—যেই হোক।

আচার্য চিদাম্বরম বললেন—শ্রীনিবাসন তোমার সংকল্পে দেবতা এবং ধর্ম তোমাকে সাহায্য করবেন।

শুনু—। রঙ্গনাথন!

—আচার্য!

—তোমাকে দৃঢ়চিত্ত হতে হবে।

—সত্য বাক্য বলব আমি আচার্য। সত্যে স্থিতির চেয়ে তো দৃঢ়তা আর হতে পারে না আচার্য?

—হ্যাঁ রঙ্গনাথন; মহাভারতে আছে—ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির—অশ্বত্থামা হত—উচ্চকণ্ঠে বলে নিম্নকণ্ঠে ইতি গজ বলে সত্য বলার নীতির নিরবরক্ষা করেছিলেন কিন্তু ধর্ম তাঁকে ক্ষমা করে নি। তাঁকে নরক দর্শন করতে হয়েছিল। মনে রেখো। চল শ্রীনিবাসন!

শ্রীনিবাসন বললেন—এখানে প্রহরার জন্য জন দুয়েককে রেখে যাই।

রঙ্গনাথন হাত জোড় করে বললেন—মার্জনা করুন—রাজ প্রতিনিধি। তার চেয়ে আমার মৃত্যুই শ্রেয়।

শ্রীনিবাসন বিস্ময়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। রঙ্গনাথন বললেন—কতদিন আমাকে প্রহরাধীনে রেখে রক্ষা করবেন আপনি? অপমান করবার জন্য কথাটা বলি নি আমি। আপনি চিন্তা করে দেখুন।

শ্রীনিবাসন উত্তর দিলেন না। প্রহরীদের নিয়ে তিনি চলে গেলেন। তার সঙ্গে শ্রেষ্ঠী সোপাসন, আচার্য চিদাম্বরম এবং তাঁদের পশ্চাত পশ্চাত—অন্য সকলেই। অল্পক্ষণের মধ্যেই আশ্রম প্রায় জন শূন্য হয়ে গেল।

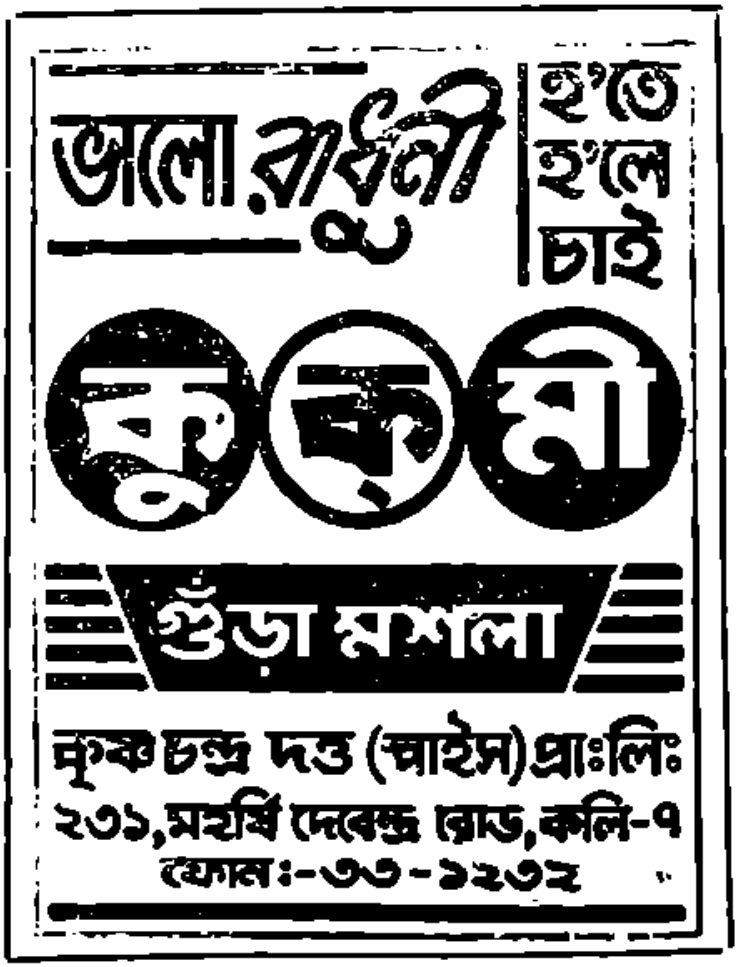

রঙ্গনাথন আশ্রমে একরকম একাই বাস করেন। জীবন তাঁর বিচিত্র। আশ্রমের সন্ন্যাসিনীদের মধ্যে কিন্তু শাস্ত্রবিদ বা পণ্ডিত তিনি নন। নিতান্ত বাল্যকালে পিতৃমাতৃহীন হয়ে অনাথে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁকে পালন করেছিলেন একজন বৈষ্ণব সাধু। রঙ্গনাথনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন তিনি—রঙ্গনাথনের সুন্দর এবং সঙ্গীতে জন্মগত অনুরাগ ও অধিকার দেখে। তিনিই তাঁকে গান শিখিয়েছিলেন। পুরাণ কথা মুখে মুখে শুনিয়ে পুরাণে পারঙ্গম করে তুলেছিলেন। তারপর পাঠিয়েছিলেন কর্ণাটক সঙ্গীতের একজন কর্ণধারের কাছে। ভক্তিবাদী বৈষ্ণব সাধু তিনি ছিলেন গুরু। বালকের অনুরাগ, অধিকার এবং সুরের দেখে তো মুগ্ধ তিনি হয়েই ছিলেন—কিন্তু তারও থেকে বেশী মুগ্ধ তাঁকে করেছিল—বালকের হৃদয়ের মমতার তৃষ্ণা। মমতার

॥ সদ্য প্রকাশিত কয়েকখানি আলোচনা গ্রন্থ ॥

মধুসূদনের কাব্যালংকার ও কবিমানস ঃ ডক্টর শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য মূল্য—৬·০০

"বইখানি পড়িয়া মনে হয়, মধুসূদন সম্বন্ধে আমাদের এত দিনকার আলোচনা অপূর্ণ ছিল, ডক্টর ভট্টাচার্যের এই আলোচনা মধুসূদন সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টি ও বোধকে অনেকখানি প্রসারিত করিয়াছে।"—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

"শ্রীমধুসূদনের সমগ্র মনুষ্য-মহিমা ও পরিপূর্ণ কবি-সত্তা-দর্শনের পথে এই স্বয়ংসিদ্ধ, অমল, অতন্দ্র প্রয়াস সহায়ক হইবে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি।" শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

মাইকেল জীবনীর আদিপর্ব ঃ অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ মূল্য—৫·০০

স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ ঘোষের 'মধুস্মৃতি'র পথে নূতন তথ্য সম্বলিত প্রামাণিক জীবনী।

বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা (চতুর্থ সংস্করণ) ঃ ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মূল্য—২·০০

পূর্ব সংস্করণে যে সমস্ত বাংলা গ্রন্থকার ও তাঁহাদের রচনার আলোচনা বাদ পড়িয়াছিল সেই ত্রুটিগুলি এইবার যথাসম্ভব পূর্ণ করা হইয়াছে। বিশেষতঃ আধুনিক ঔপন্যাসিক গোষ্ঠীর বিস্তৃততর বিবরণে অধ্যায়টি এই অসম্পূর্ণতার অনেক পরিমাণে নিরসন হইয়াছে।

যে স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় কবির প্রতিভার ঘন আলোকে বাংলার আধুনিক পাঠক সমাজ একদিন চকিত হয়ে উঠেছিল সেই অবিস্মরণীয় কবি মোহিতলাল মজুমদারের জন্মশতবার্ষিকী স্মরণীতে আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য—

মোহিতলালের কাব্য পরিক্রমা ঃ অধ্যাপক শ্রীবিজনলাল নাথ

লিখিত। বিশ্লেষণের নিপুণতায় এবং কবিপ্রতিভার সহজ নির্ণয়ে লেখকের মহানত প্রকাশের বলিষ্ঠতায় এ গ্রন্থ কাব্যামোদী পাঠক সমাজের সহজ দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। মূল্য—৪·০০

বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (দ্বিতীয় খণ্ড) ঃ ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বহু প্রতীক্ষিত দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রকাশিত হয়েছে। ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা দেশের ইতিহাস, সমাজ, ধর্ম লোক-জীবন প্রভৃতির ব্যাপক পটভূমিকায় প্রাচীন ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ যে ইতিহাস রচনার পরিকল্পনা করেছেন, তার কিছু পরিচয় ইতিপূর্বে প্রকাশিত প্রথম খণ্ডে পাঠকসমাজ পেয়ে থাকবেন। একক প্রচেষ্টায় এ ধরনের বিশাল পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার দৃষ্টান্ত এর আগে বাংলাদেশে দেখা যায় নি। সদ্য প্রকাশিত দ্বিতীয় খণ্ডে বহু নতুন তথ্য, বিচিত্র দল-উপদলের বর্ণনা, দার্শনিক পটভূমিকার বিশ্লেষণ ও সাহিত্য বিচার স্থান পাওয়ার ফলে গ্রন্থটি শুধু পুঁথির তালিকা না হয়ে সাহিত্যের যথার্থ ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। আটশ' পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ নানা দুষ্প্রাপ্য চিত্রসম্বলিত দ্বিতীয় খণ্ডটি আজকের সংগ্রহীত হবার যোগ্য। প্রথম খণ্ড নিঃশেষিত প্রায়।

প্রথম খণ্ড ঃ প্রাকচৈতন্যযুগ ১২ টাকা ৫০ ন. প.

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ চৈতন্যযুগ ১২ টাকা ৫০ ন. প.

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ ঃঃ ১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ফোন : ৪৭-৩১০৪ ঃ Telegram : Bibliophil

কাহাল ছিল। শুধু গানের জন্যই নয়, তার অপূর্ণ মমতা রাখবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে আমার খুঁজে সে ফিরত। ক্রমে তার সঙ্গীত রচনার শক্তি স্ফুরিত হল,—তখন সে গুরু সঙ্গীত গুরু তখন তাকে বিদায় দিলেন পাঠিয়ে দিলেন —বৈষ্ণব সাধুর কাছে। তাকে জানিয়েছিলেন—এর পর নিজের পথ নিজেই করে নেবে। এখন শুধু চাই—এর জীবনের লক্ষ্য-রাখবার একটি আধার। আপনি নিজে পরীক্ষা করলেই বুঝতে পারবেন।

কথাটা সত্য। এক গানের সময় ছাড়া বাকী সময় সে এক নিরবচ্ছিন্ন উদাসীনতার মধ্য থাকত! বৈষ্ণব গুরু জিজ্ঞাসা করেছিলেন—এমন উদাসীন হয়ে তুমি কেন থাক রঙ্গনাথন?

তখন রঙ্গনাথন বলেছিলেন—জানি না প্রভু। হয়তো—

—হয় তো কি রঙ্গনাথন?

—ঠিক জানি না প্রভু, মনে হয় বড় একা আমি।

—তুমি সংসার কর রঙ্গনাথন। আমি আমার গুণী শিষ্যদের বলি—তারা একটি সুন্দরী সুশীলা পাত্রী দেখে বেড়ে।

হাত জোড় করে রঙ্গনাথন বলেছিলেন—না প্রভু। না।

—কেন?

—সংসারের আমি অনুপযুক্ত। আমার ভয় করে।

—ভয় করে?

—হ্যাঁ প্রভু। বড় ভয় আমার। আপনি আমাকে পালন করেছেন। আপনি গুরু। আমি আপনার কাছে মিথ্যা বলছি না!

গুরু অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে প্রশ্ন করেছিলেন—তোমার কিসে ভয় চেয়ে উল্লাস বোধ হয়—বল তো? নিজেকে বুঝে সন্ধান করে বল। কখনও কোন মুহূর্তেই তুমি এই উদাসীনতা থেকে মুক্তি পাও না? ক্ষণেকের জন্যও কি মনে হয় না তুমি আনন্দ বোধ করছ, তুমি সুখী!

অনেকক্ষণ পর রঙ্গনাথন বলেছিলেন—হ্যাঁ প্রভু, সঙ্গীত গুরুর সঙ্গে কয়েকবার—সঙ্গীতের বড় আসরে গান গাইবার সুযোগ পেয়েছিলাম। বহু শ্রোতা মুগ্ধ হয়ে যখন আমাকে—সাধুবাদে অভিনন্দিত করেছিল—তখন মনে হয়েছিল আমি সুখী।

—একলা বসে কখনও কি আনন্দ অনুভব কর না?

—করি প্রভু। সে বিচিত্র অবিশ্বাস্য কথা। কেঁদে আমি আনন্দ পাই। যখন 'আমার কেউ নেই'—এই চিন্তা গাঢ় তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে তখন চোখ থেকে জল গড়িয়ে আসে আপনি। আরও একটি কারণে কান্না আমার পায়। মানুষের দুঃখ দেখে।

গুরুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। তিনি বলেছিলেন —এইটিই আমার শেষ প্রশ্ন।—বল রঙ্গনাথন, যখন বিপদ হয়, দুঃখ খুব গভীর হয়—কাকে ডাকতে ইচ্ছে করে? কাকে মনে পড়ে? কার কাছে ছুটে যেতে ইচ্ছা হয়?

—ঠিক জানি না। তবে বিপদে পড়লে আপনার কথা মনে পড়ে, মনে হয় আপনার কাছে গেলেই পরিত্রাণ পাব। কিন্তু দুঃখ গভীর হলে তো কাউকে মনে পড়ে না! মনে হয় আমি একা। কেউ নেই আমার।

কয়েকদিন পর গুরু তাকে ডেকে বলেছিলেন—রঙ্গনাথন, এ কয়েকদিন চিন্তা করে আমি দেখলাম। জীবনের আধেয় তোমার অমৃতের মত। সে অমৃত রাখবার স্বর্ণপাত্র নেই, পাত্রহীনা বলে তোমার এই বেদনা, এই দুঃখ। গানের প্রশংসায় তোমার আনন্দ। গানই

পূজায় নূতন গান

"ছিজ মাষ্টার ভয়েস"

ও

কলম্বিয়া

রেকর্ড শুনতে ভুলবেন না

দি মেলোডি

৮২এ ও ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা-২৬
ফোন : ৪৬-২৪৭৪

হোক তোমার কর্ম অনেক প্রশংসা পাবে—প্রতিষ্ঠা পাবে। সে সব ঘটে তুমি গোবিন্দ চরণের আহারে সঙ্গত করতে পার তবে এই জন্মেই মুক্তি হবে তোমার।

সেই সাধনাই করে আসছেন রঙ্গনাথন। একাই চলেছেন তাঁর বীণাটি হাতে। তাঁর বাবকেরা আছে, প্রয়োজন মত আসে। না—চলে একাই থাকেন। ঠিক একা নয়—পরিচারক আছে বৃদ্ধ কুঞ্জমুনি।

সঙ্গীতের জন্য খ্যাতি তাঁর হয়েছে। তাঁর গান তবে শুনলে সকল জ্ঞানের সমাগম হয়। গানের সময় তাদের মুখে দৃষ্টি রেখে তাঁর বুক ভরে ওঠে আনন্দে। গুরুর কথা স্মরণ করে মন্দিরের দিকে তাকিয়ে চোখ বুজে বলেন—তোমাতে অর্পণ করছি। গান শেষে প্রসাদী-মাল্য নিয়ে ফিরে আসেন ধনীর গৃহ থেকে সম্মান অর্থ নিয়ে ফিরে আসেন: সব থেকেই সে আনন্দ মিলিয়ে যেতে সুরু করে। বাড়ীতে এসে বীণাটি পাশে রেখে বসবার সঙ্গে সঙ্গেই উদাসীনতা আবার তাঁকে আশ্রয় করে। মাঝে মাঝে অন্যমনস্কভাবে যন্ত্রে তার ঝঙ্কারগুলি বীণার তারে মৃদু আঘাত করে, মনে হয় ধ্বনি ওঠে—কেউ নেই তার বিশ্বের মুখে স্মরণ করতে চেষ্টা করেন। স্মরণ হয় না, তার বদলে ভেসে ওঠে সপ্রশংস দৃষ্টি কোন শ্রোতার মুখ। কখনও কখনও দুঃখীজনের মুখ মনে পড়ে। কোন ভিক্ষুক। কোন নিপীড়িত মানুষ তার মধ্যে নারীর মুখও আছে কিন্তু কোন বিশেষ একটি নারীর মুখ বারবার ভেসে ওঠে না। কিছু দিন থেকে তার মনকে আলোড়িত করেছে এই শরদের দুঃখ। কিছুদিন আগে তিনি মহাবলীপুরমের সমুদ্র উটকুমারি ধরে পদ যাত্রা করেছিলেন উত্তর মুখে। এই উদাসীনতা যেন হিমাচল প্রদেশের পার্বত্য অঞ্চলে কুয়াশাও ঘন শীতে বরফ হয়ে জমে স্তূপীকৃত হয়ে তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। অনেক বেদনাতুরতা ও

সদ্য প্রকাশিত উপন্যাস

জরাসন্ধের
আবরণ
ধনঞ্জয় বৈরাগীর
দুয়োরাণী ২৷৷০
গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
সুপ্তিসাগর ৪৷৷০
নীহাররঞ্জন গুপ্তের
জতুগৃহ ৪৲
শৈলেশ দে-র
বধূ ৩৲
শক্তিপদ রাজগুরুর
কাঁচ-কাঞ্চন ৪৲
সুবোধ ঘোষের
কান্তিধারা ৩৲

কথাকলির সাহিত্য সম্ভার

প্রবোধকুমার সান্যালের
অবিস্মরণীয় সাহিত্যকীর্তি
চিত্র-বিচিত্র ৭৲

ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তের ভূমিকা সম্বলিত ও
অসিত গুপ্ত প্রণীত
এই বিশ্বের কথাসাহিত্য
ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত ও সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত
কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত। দাম—১৪৲০০

বারীন্দ্রনাথ দাশের নতুন উপন্যাস
অতনু ও জীবন দেবতা ৪৷৷০

প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত
প্রেম যুগে যুগে ১০৲
বাংলা সাহিত্যের আদিম যুগ হইতে আধুনিক যুগ
পর্যন্ত রচিত শ্রেষ্ঠ প্রেম-কবিতার একখানি উপাদেয়
সংকলন গ্রন্থ। উপহারের শ্রেষ্ঠ বই। প্রকাশ আসন্ন।

প্রশংসনীয় উপন্যাস

বিমল করের
মল্লিকা ৩৲
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
দুই নদী ২৸৩
সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের
শ্রীমতী ৪৲
বারীন্দ্রনাথ দাশের
দুলারীবাঈ ৪৲
আশাপূর্ণা দেবীর
উত্তরলিপি ৪৲
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
বৈশালীর দিন ৩৷০
সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের
তৃষ্ণা ৩৷৷০
মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের
তারার আঁধার ৩৷৷০

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি — নক্ষত্রের জ্বাল ৫৲

কথাকলি ঃঃ ১, পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা-৯ | ত্রিবেণী প্রকাশন ঃঃ কলিকাতা-১২

ভূরাক্রান্ততার পর কতদিন তারা রাত্রি কেটেছিলেন। পরদিন ভুবনেশ্বরের জীবন ভূমি ও নিম্নল মনস্তাপ নিয়ে তিনি পড়তে বসেছিলেন মহাভারত। সাবিত্রী উপাখ্যান মনকে আকৃষ্ট করেছিল। তার প্রধান কারণ মদ্ররাজ কন্যা সাবিত্রী মদ্ররাজ অশ্বপতির কন্যা। তিনি থাকতেন মাল্যবান পর্বতশ্রেণীস্থিত পদ্মসরোবর দেখতে এবং সেখানে স্নান করতে। ইচ্ছা ছিল সেখানে বসেই সাবিত্রী উপাখ্যান নিয়ে পালা গান রচনা করবেন। ওই-খানেই আছে সেই মহানিম্বতরু ভূমি—যেখানে কৃষ্ণা-চতুর্দশীর প্রগাঢ় অন্ধকারের মধ্যে মৃত সত্যবানের মাথা কোলে রেখে বসে চোখে দেখেছিলেন কৃষ্ণজ্যোতিষ্মান মৃত্যু দেবতাকে। ইচ্ছা ছিল গভীর রাত্রে বনে বসে বীণা বাজিয়ে মনে মনে গেঁথে যাবেন সুর এবং কথা। কিন্তু তা হয় নি। হঠাৎ তিনি বুদ্ধগতি হয়ে গিয়েছিলেন একখানি শবর পল্লীতে। ঝড় উঠেছিল সমুদ্রে। আকাশ নিকষ কালো মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে তার সঙ্গে প্রচণ্ড ঝড়। সমুদ্র বেলাভূমির বালুকণা উৎক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। ভেঙে পড়ছিল তাল নারিকেল শাঁর্ষ। শাখা প্রশাখা সমন্বিত গাছ গেলি গেলির শাখা ভাঙছিল, পাতাগুলি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে উড়ে যাচ্ছিল, মধ্যে মধ্যে দু-চারটি সমূল উপড়ে গিয়ে মাটিতে অন্য গাছের উপর সবেগে আছাড় খাচ্ছিল। উচ্ছ্বসিত সমুদ্র তরঙ্গ পাহাড়ের মত উঁচু আকার নিয়ে বেলাভূমি পার হয়ে স্থলভাগে এসে প্লাবন বইয়ে দিচ্ছিল। রঘুনাথ সমুদ্রকে পিছনে রেখে পশ্চিম মুখে স্বয়ম্ভুনির অভ্যন্তরে আশ্রয়ের জন্য প্রবেশ করবার চেষ্টা করেছিলেন। বহু কষ্টের পর একখানি শবর পল্লী পেয়ে বেঁচেছিলেন। কপাল দিনমান ছিল তাই পেয়েছিলেন—নইলে পেতেন না। মাতিউচ্চ পার্বত্য অঞ্চল। ঘরগুলি ছোট ছোট গাছের জঙ্গলে পরিপূর্ণ। তারই মধ্য দিয়ে পায়ে চলা পথ পেয়ে ক্ষুধা-ক্লান্ত দুঃখ ভুলে যেতে যেতে হুঁচোট খেয়ে পড়ে জ্ঞান হারিয়েছিলেন। জ্ঞান হলে দেখেছিলেন টোডা জাতীয় শবরদের পল্লীতে শুয়ে আছেন একটি ছোট কুটীরে। ঝড় তখন থেমে গেছে। ছোট গ্রাম, পনের কুড়িঘর মানুষের বাস। কুটীর মানেই কুটীর। তৃণাচ্ছাদিত কুঁড়ে। কৃষ্ণকায় সরল মনোভাবী দল। বন থেকে জীবিকা সংগ্রহ করে। এদের দক্ষিণী পুরুষদের দেখেছেন। উত্তরে কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছিল সে রূপের। মেয়েরা বুকের উপরে কাপড় পরে। কটি খোলা। পুরুষদের কাপড় সামান্য কোমর থেকে জানু পর্যন্ত। তাও অনেকের নেই, সামান্য বৌপীন সম্বল। জ্ঞান যখন হয়েছিল তখন শিয়রে বসেছিল এক বৃদ্ধা। তাকে তিনি তামিল ভাষাতেই প্রশ্ন করেছিলেন···তোমরা আমাকে বাঁচিয়েছ ?

প্রৌঢ়ার মুখে হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল, কথা সে বলতে পারে নি। এরপর খবর পেয়ে এসেছিল পল্লীর কর্তা। সে বলেছিল···বাঁচাবার মালিক তোমাকে বাঁচিয়েছে। আমরা অচেতন অবস্থায় তোমাকে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। বাঁচবে সে আশা করি নি।

কর্তার পিছনে দল বেঁধে এসে দাঁড়িয়েছিল পল্লীর সমস্ত লোক। প্রতিটি জনের দৃষ্টিতে দেখেছিলেন আনন্দ এবং নম্রতায় মিশ্রিত প্রশ্নের দৃষ্টি। অকস্মাৎ পিছন থেকে একটা তীক্ষ্ণ কণ্ঠ চীৎকার উঠেছিল। নারী কণ্ঠে কে চীৎকার করে বলেছিল—হক হক—ওর হক নে।

To Furnish or Replenish

PHYSICS, CHEMISTRY, PHYSIOLOGY,
PHARMACOLOGY & PSYCHOLOGY
LABORATORIES

Please contact specialists :

CONTINENTAL TRADING AGENCY
P-27, PRINCEP STREET,
CALCUTTA-13

Branch Office :
TERDEL BAZAR
Dist. HAVGA

Phone :
Residence : 47-5116
Office : 23-1321

Gram :
CONAGENCY
Calcutta-13

আমাদের রক্ষা নিলে! যে-যে। ছাড় পথ ছাড়।

গ্রামের কর্তা চকিত হয়ে বলেছিল - যা - যা - ওকে নিয়ে যা। এখানে এল কি করে? তারপর ওঁর বিস্মিত মুখের দিকে চেয়ে বলেছিলেন - ও পাগল।

সন্ধ্যার পর থেকে সারারাত চীৎকার করেছিল মেয়েটি। আতঙ্কের চীৎকার। যেন দলে দলে ঘাতকবাহিনী তাকে আক্রমণ করতে এসেছে। নিরাবরণ আতঙ্কে চীৎকার করছে।

কর্তা তার বীণাটি এনে পাশে রেখে বলেছিল - এটি আপনার পাশেই পড়েছিল।

- হ্যাঁ। আমার বীণা। ভেঙে গেছে, এতে আর কাজ হবে না। অক্ষত থাকলে গান শোনাতাম। তোমরা প্রাণ বাঁচিয়েছ।

- পাগল! কর্তার মুখ আবেগে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। তুমি গান গাও?

- হ্যাঁ। গাই।

- আমাদের শোনাবে? আমরা গান ভালবাসি।

- তোমরা গান গাও না? মেয়েরা নাচে না?

- নাচত। গাইত। খুব ভাল। ওই পাগল মেয়েটা সব চেয়ে ভাল নাচত। ওটা আমার মেয়ে। কিন্তু - এখন পাগল। শুধু চেঁচায়! ওই চেঁচাচ্ছে, সারারাত চেঁচাবে। মাঝে মাঝে ঘুম আসে - হঠাৎ - ঘুম ভাঙে - আর চেঁচায়। এলো - এলো। ছেড়ে দে - ছেড়ে দে! ওঃ, উপর বড় জুলুম করেছে। মরে যদি যেত -!

কৃষ্ণনাথ কি উত্তর দেবেন? কি বলবেন? চুপ করে ছিলেন নির্বাক হয়ে। কিছুক্ষণ পর বলেছিলেন -

॥ মস্কো থেকে প্রকাশিত বাংলা বই ॥

সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ

[কবির বহু চিঠি ও সফরকালীন ফটো এই সংকলনের বিশেষত্ব।]

দাম : ৩·৮৭

কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস

উপনিবেশিকতা প্রসঙ্গে

কার্ল মার্কস

ভারত ইতিহাসের কালপঞ্জী ৩·৮৭

ভি. আই. লেনিন

প্রাচ্য জনগণের মুক্তি আন্দোলন

সোভিয়েত ইউনিয়ন

আজ ও আগামী কাল

রুশ সাহিত্য

গর্কির ত্রয়ী

আমার ছেলেবেলা ১·৫০

পৃথিবীর পথে ২·৫৬

পৃথিবীর পাঠশালায় ১·৫০

পুশকিন

বেলকিনের গল্প ১·১২

দস্তয়েভস্কি

অপমান ১·২৫

সোভিয়েত বিজ্ঞানের বই

অ. ওপারিন

পৃথিবী ও আকাশ

কুরধালেভ

পরমাণুতে নূতন সোভিয়েত অধিকার

দানিন

শূন্যপরিমান

বাখারেভ

ইভান মিচুরিন—প্রকৃতির রূপান্তরের মহান সাধক ৩·৮৭

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড

১২, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। ১৭২, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর-৩

SIEMENS
INDIA

সিমেন্স এর পূজা উপহার

সীমেন্স গ্র্যান্ড সুপার ১৯০০-ডব্লিউ রেডিও ৭ ভালব, ৫টী লাউডস্পীকার ৮+৪ পুশ বাটন। মূল্য : ১৬০০৲ টাকা (উৎপাদন কর সহ) স্থানীয় কর অতিরিক্ত।

সীমেন্স স্টাণ্ডার্ড সুপার ১৯১-ডব্লিউ ও রেডিও ৬ ভালব, ৬টি পুশ বাটন মূল্য : ৪০৫৲ (উৎপাদন কর সহ)। স্থানীয় কর অতিরিক্ত

সীমেন্স স্পেশাল সুপার ৯৯২-ডব্লিউ ও রেডিও ৬ ভালব ৬+০ পুশ বাটন। ৩টী লাউডস্পীকার, মূল্য— ৫৭৫৲ টাকা (উৎপাদন কর সহ) স্থানীয় কর অতিরিক্ত।

পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও আন্দামানের পরিবেশক :

মাস এণ্ড কোম্পানি ১এ, ডালহৌসি স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা - ১

লোকেরা এসে ঘর পুড়িয়ে দিলে না ? –

কর্তা উদ্বিগ্ন স্বরে তাকে ধাত ধরে বলেছিল – উঠ্রি, উঠ্রি– সীতারাম সীতারাম। বলতে নাই। সীতারাম

–হ্যাঁ সীতারাম। ভগবান

–হ্যাঁ। ভ-গ-বান!

–ভগবান দুখ দেয় তবুও দয়াধর্ম ভুলুম করে না –। মানুষ। মানুষে করে! তারপরই চীৎকার করে উঠেছিল –ঘরে যা। মানুষ ঘরে যা!

রাত্রে বলরামকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন – উঠ্রি কেন ও কথা বললে ?

কর্তা তাকে বলেছিল সব কথা। এ গ্রাম তাদের সেই প্রাচীনকালের বাসভূমি নয়। তাদের বাস ছিল সমুদ্রের ধারে সুন্দর পরিবেশে কাছে –খানিকটা দূরে। একদঙ্গে তারা থাকত প্রায় পঞ্চাশটি পরিবার তুলসে তাদের উপর হুকুম। কিন্তু গত পনেরো বৎসরে –মারাঠা নিজাম – ইংরেজদের লড়াই হয়েছে। সেই লড়াইয়ে তাদের গোটা গ্রামটা জ্বলেছে – চারবার। পুড়ে ছারখার হয়েছে বসতীরা – একবার ইংরেজ, একবার নিজাম যার পথে যখন পড়েছে, সে জ্বালিয়েছে – জ্বলুম করেছে ওই মেয়েটাকে উঠ্রিকে – ধরে নিয়ে গিয়েছিল। ধরে রেখেছিল তিন দিন। তিন দিন পর যখন ছেড়ে দিলে – তখন ও পাগল। রাত্রি হলেই চীৎকার করে না – না – না। ছেড়ে দে! ছেড়ে দে! মেরে ফেল, মেরে ফেল! দারারাত দিনের বেলা নতুন লোক দেখলে ছুটে গিয়ে লুকোয়। লোকজন থাকলে – তখন চেঁচায়, রক্ত নে – রক্ত নে। ওরা কেন রক্ত নিলে! আমাদের গ্রামে – চারবারে তারা কুড়িজনের বেশী লোককে খুঁচে মেরেছে ও দেখেছে। সেই থেকে আমরা গ্রাম ছেড়ে এই বনে এসে – ঘর বেঁধেছি। এই দেখ – এখন ঘরগুলোকে ভাল করতে পারি নি। কুঁড়ি বেঁধে আছি। এখনও ঘর বলছে – ইখানেও নয় – চল – আরও বনের ভিতরে চল! সেখানে কেউ খোঁজ পাবে না!

বলরামের চোখ জলে ভরে উঠেছিল সারারাত ঘুমুতে পারেন নি। পরের দিন তাঁর তাদের কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এসে –মালাবার পথে সরোবরের দিকে। পথ ধরে. ফিরে এসেছিলেন মাদ্রাজের প্রান্তে তাঁর আশ্রমে

মনের মধ্যে শুধুই ভেবেছিলেন এদের কথা। এই সরল মানুষ, দীন মানুষ –রক্ষিত মানুষ, পদানত মানুষদের কথা। কেন? কেন এত অত্যাচার এদের উপর? কেন এত অবজ্ঞা? কেন এত ঘৃণা? মহাভারত মনে পড়েছিল।

মহাবলীপুরমে পাথরের বুকে খোদাই করা অর্জুনের তপস্যা কাহিনী মনে পড়েছিল * অর্জুনের তপস্যায়

যে কোনও পরিমাণ
চাউল
বাড়ীতে
পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়।
পশুপতিদাস
এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
৪৩।২, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোড, কলিকাতা-১৩
ফোন : ২৪-৪৩৮১

*এখন এই খোদাই চিত্র ভগীরথের তপস্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীতে – অর্জুনের – তপস্যা নামেই পরিচিত ছিল।

ছুটে হয়ে স্বয়ং ব্রহ্মার এসেছিলেন – কিরাত বেশে – ছলে এসেছিলেন কিরাত নারী বেশে স্বয়ং পার্বতী। এইটি অবলম্বন করেই – তিনি নূতন গান রচনা করে বললেন – এরা হেট বুড়ের বংশধর। অস্পৃশ্য নয়, পরম পবিত্র – বিপুল শক্তির অধিকারী। তারপর মনে পড়েছিল – ধর্মব্যাধের কথা। যাঁর কাছে গিয়েছিলেন ব্রাহ্মণ তুলাধার কৌশিক – ব্রহ্মকে জানবার জন্য। তার কিছুটাও অনুভব দিয়েছিলেন।

কৌশিককে ব্যাধের কাছে যাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন এক পতিব্রতা নারী। তিনিই বলেছিলেন – ঘৃণা নিয়ে যেয়ো না। মনে রেখো – ওই কৃষ্ণবর্ণ মানুষগুলির অন্তর মন্দিরে তিনি বসবাস করেন – তাঁরই বসতি সর্বোচ্চ স্বর্গে লোকের বিরাজে। এইটুকুই হয়েছিল ভূমিকা এবং ওই টুকুই কিছু বিশদ করে হয়েছিল উপসংহার। পথেই সুরু হয়ে গিয়েছিল রচনা। ফিরে এসে রচনা করেছেন – আরও কোঁছেছেন। এই রচনার সময়েও একদিন তিনি ওই পথে কন্যা সন্তার দুরাগত সঙ্গীত শুনেছিলেন। ভগবানের গুণগান করে বোধ হয় ভিক্ষা করছিল। কন্যাটি বিচিত্র। শুনেছিলেন ষোলোকের আপন জন, না কি আপন জ্যেষ্ঠ সহোদরের কন্যা। এই ব্যবসার আরম্ভ করেছিল সন্তারই বাপ। ষোলোক তখনও ষোলোক হয় নি। তবে পাষ্ঠীদের কাছে যাতায়াত ও অনেক দিন থেকেই। গির্জার সংলগ্ন বাগানেও কাজ করত। বাড়ী থেকে ঝগড়া করে পালিয়ে গিয়েছিল। তারপর সন্তার বাপের মৃত্যুর পর গ্রামে ফিরে দাদার ব্যবসায়ের ভার নিয়েছিল। অল্প চার পাঁচ বছরেই সে সমৃদ্ধ করে তুলেছে তার ব্যবসায়। এখন ব্যবসায় তার। এরই মধ্যে সে নিজে খৃস্টান হয়েছে, তার গ্রামের আরও অনেককে খৃস্টান হতে প্রলুব্ধ করেছে। মাস্টারে কোম্পানীর চাকরী বড় প্রলোভন। তার সঙ্গে পোষাক, মর্যাদা – অনেক কিছু। হিন্দুসমাজের যারা নায়ক যাদের সঙ্গে এক পথে হাটবার উপায় নেই, যাদের গায়ে কোন রকমে তাদের ছায়া পড়লে তাদের অপরাধ হয় – তাদের উপেক্ষা করার, অস্বীকার করার অধিকার পেয়ে তারা প্রমত্ত উল্লাসে মেতে উঠেছে। মুক্তিও পেয়েছে বই কি! গ্রামে তাদের এখন পাষ্টীদের পাঠশালা হয়েছে। গ্রামের ছেলে মেয়েরা শিক্ষা পাচ্ছে। সন্তারও শিক্ষা পেয়েছিল। তার মায়ের আশ্রিতেই ধর্মান্তর তারা গ্রহণ করে নি। নইলে – । না-না। তা, তো নয়। মেয়েটির গানগুলে তা তো মনে হয় না। মেয়েটি সুকণ্ঠী – তার উপর – ওই ছোড়া মেয়েটির – ওই 'উর্বশী'র চেয়েও সুশ্রী। তার উপর একটি মাদকতা আছে। শিক্ষার মাদকতা –

নগর গানের মাস্টার্দা। এই মেয়ে—। সে কি এখানে এসেছিল সংবাদ সংগ্রহ করতে? তার চোখে যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন—তা কি—শান্ত সমুদ্রের নিস্তরঙ্গতাকে চিরন্তন করে দেওয়ার মত একটি কল্পনা মাত্র! যোগেশকে তাঁর অপরিচিত নয়। তার সঙ্গীতও তাঁর পরিচিত। কতদিন তারা গান শুনে যায়—তাঁর আশ্রমের সামনে ওই বেলাভূমে বসে। দেখা হলে প্রথম হাসিতে ভরে ওঠে তাদের মুখ, চোখ প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে জ্বলন্ত প্রদীপের মত। অপরিমেয় ভালবাসা তারা ব্যক্ত করেছে—সামান্যতম উপলক্ষ্যে! আশ্রমের বাঁশের ফটকটির পাশে রেখে যায় ফুলের গুচ্ছ। সবুজ ঘাঁটা নারিকেল, পরিপুষ্ট কলা, অদ্ভুত ফলের সঙ্গে অদ্ভুত ফল—বাঁশের নতুন আধারে সাজিয়ে এনে ডাকে—আচার্য! আচার্য।

তিনি শুনতে পেলেই বাইরে এসে বলেন—এস। আমার এখানে কোন সঙ্কোচ নেই। এস।

তারা হাসি মুখে এসে পাত্রটি নামিয়ে দিয়ে বলে—আমার বুকের ফল। আপনার জন্য এনেছি।

তিনি তুলে নিয়ে বলেন—আজ আমার দেবতা—সমস্ত পৃথিবীতে ভোজন করেন ভদ্র। ফলনাথন তাদের ভদ্র ছাড়া সম্বোধন করেন না।

অবশ্য এ সব আসেন প্রথম যুগটায় পরিচয়ের সঙ্গেই বেশী হয়। যুগটায়েরাও আসে—যোগেশই এনেছে। সে একবার তাঁকে নারিকেল খোলের সুন্দর পাত্রে তৈরী করে এনে দিয়ে গেছে। তার কণ্ঠস্বর সঙ্কোচহীন কিন্তু সহজ নয়। ওই সঙ্কোচ বর্জনের প্রয়াসেই বিচ্ছুটা যেন অবাঞ্ছিতকর। ডেকে বলেছিল—সঙ্গীতাচার্য, ঘরে আছ কি?

—কে?

—আমি যোগেশ।

—এস—এস।

—তোমার জন্য এই পাত্রটি নিয়ে এসেছি। দেখ তো, সুন্দর হয়েছে কি?

—সুন্দর। সুন্দর হয়েছে ভদ্র।

—ভদ্র কেন বলছ। বল যোগেশ

—যেন তাই বলব!

DAS GUPTA & CO.
PRIVATE LIMITED
BOOKSELLERS SINCE 1886
54-3, COLLEGE STREET,
CALCUTTA-12
Phones : 34-3875 & 34-6547

—হ্যাঁ আমি তো এখন একজন কন্ট্রাক্টর কেন্টু। জান তো

—হ্যাঁ জানি।

—আমি তোমাকে সঙ্গীতাচার্য বলেই সম্বোধন করব। কিছু মনে করবে না তো?

—না না। কেন মনে করব।

—এই জন্যেই তোমার জন্যে এটি আনবার ইচ্ছা হল। ওই সব রাজন আচার্যদের আমি এ সব দিই না। তারপর বলেছিল, জান সঙ্গীতাচার্য, তোমার গান শুনবার আমার ইচ্ছা হয় কিন্তু আমরা অনেকেই তো প্রভু খৃস্টকে ভজনা করি। তাই ভয় হয় যদি প্রভু রুষ্ট হন। সাধুরা বারোয়া রুষ্ট হবেন—এ নিশ্চিত। নইলে কীর্তনের তোমার দক্ষিণা দিয়ে—গানখানা শুনে একদিন আনন্দ করতাম। তুমি যেতে আচার্য।

এরই জন্যে ডাকতে চেয়েছিল তাকে। গেলে হয় তো উচ্চ বর্ণের সমাজে, সেবকশ্রেণীর—তাঁর প্রবেশ পথ রুদ্ধ হতে পারে।

ফোলেক বলেছিল—তোমার ইচ্ছা আছে সে আমি জানি আচার্য আমারই মত তোমারও ভাবতে হচ্ছে—পুরোহিত—শিক্ষিত সমাজপতিদের কথা। হাঁ ভাববার কথা।

—হ্যাঁ ফোলেক, ভাবছি তাই।

—থাক আচার্য। তোমার গান আমরা দূরে থেকেই শুনব। কিন্তু তোমার গানে তুমি বড় বেশী কাঁদাও।

কাল রাত্রিটি—শুভ্র সুন্দর সুপরিচিত রূপটি দূর বিস্তার করে রেখেছিল। আমরা হাসতে ভালবাসি! বলে সে চলে গিয়েছিল। যেতে যেতে আবার ফিরে এসে বলেছিল—আচ্ছা একটা কথা বলতে পার?

—কি বল?

—হাসতে ভালবাসি। তোমার গানে কাঁদতে হয়। তবু যাই। আর কেঁদেও সুখ হয়। কেন বল তো? ছেলে বয়স না থাক বলেছিলেন—তোমারই মত ওর উত্তর আমি জানি না ফোলেক।

—আমার ভাইঝি। সে খুব ভাল গান গায়। খুব ভাল কণ্ঠ। আর শুনেই শিখে নেয়। বড়ো বড়ো যখন মেজাজ খারাপ হয় ওকে ডাকি। গান গাইতে বলি। শুনে মেজাজ ভাল হয়।

—হ্যাঁ। দূর থেকে ওর গান শুনেছি আমি। সুন্দর কণ্ঠ।

—ওকে দেখেছ? সুন্দর দেখতে। ওকে আমাদের খৃস্টান পাঠশালায় লেখাপড়াও শিখিয়েছি। দাদা ধরা গেল। ভার তো আমার ওপর। ইচ্ছা ছিল ভাল লেখাপড়া শেখাব, খৃস্টান করে দেব—ভাল বিয়ে হয়ে যাবে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কত ছোকরা ইংরেজ কর্মচারী আসে। তারা এখানে বিয়ে করে। তা দাদা ছিল গোঁড়া আর কুসংস্কারাচ্ছন্ন। ওর বউটা বেশী। সেই বাই ওকে হতে দেয় নি খৃস্টান। রাগ করে আমার কাছ থেকে এক মুঠো চালও নিত না। ভিক্ষে করে খেতো। আমিও খুব কড়ালোক, খুব কড়া। আমিও দিই নি। তাছাড়া আইনের ভয় আছে। জান তো, ও থেকেই ওরা বলতে পারে—আমরা এক সংসার। সব কিছুতে তাদের ভাগ আছে। মেয়েটার বিয়ে হবে—জামাই দাবী করবে। ওর মা টা অন্ত চেয়েছিল—মেয়েকে হাত ধরে গান গেয়ে ভিক্ষে করত। রোজগার ভাল হত আচার্য। মেয়েটা এখন মায়ের গোঁড়ামি পেয়েছে। মা

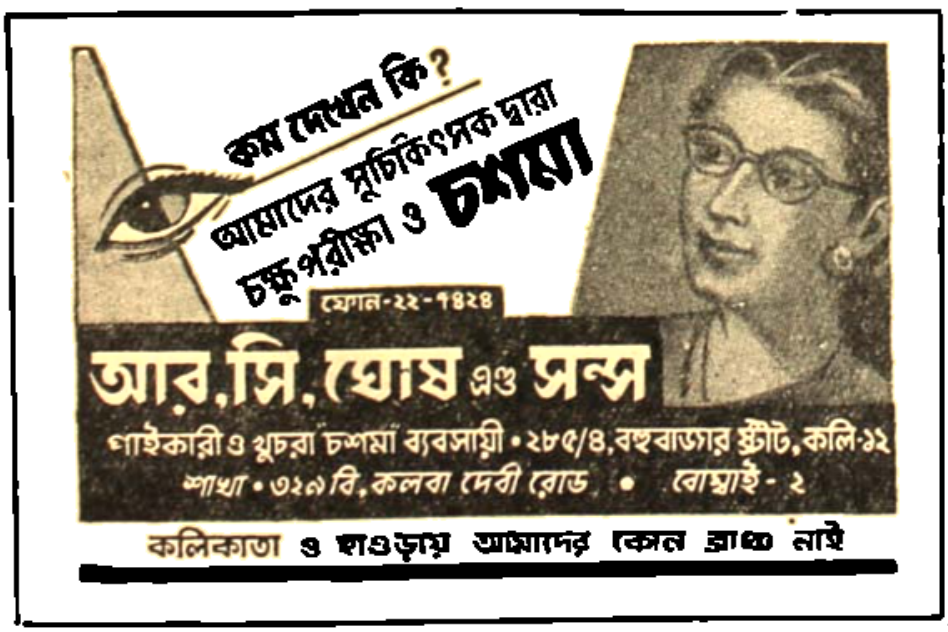

বসন্ত—ঘাচ্ছাই করে কখনও দেখ না। তার চেয়ে কোনও মন্দিরে নিয়ে আসব, মন্দিরের চারিপাশ ঘুরে দেখে—বাইরে দাঁড়িয়ে গান করবে—ওর গতি হয়ে যাবে।

অবাক হয়ে শুনেছিলেন রূপনাথন। এ সবই নতুন কিছু নয়। শুনেছেন। তিনি বৈষ্ণব—কত অদ্ভুত ভক্ত—জীবনে সন্ত হয়ে গেছে। কিন্তু এমন করে চোখের সামনে ঘটছে—অথচ জানেন না—এইটেতে বিস্ময় তাঁর।

যোশেফ বলেছিল—মেয়েটা নাচতেও পারে। এখন ওর ইচ্ছে—ভাল করে নাচ শেখে গান শেখে। কোন কনভেন্টের দলে ওকে দেওয়া যায় না আচার্য? তুমি একটু সাহায্য করতে পার না? ঠিক বলছি তোমাকে, লল্লা খুব নাম করবে। খুব ভাল গাইবে।

এ সব ঠিক পম্পাসরোবর যাবার আগের কথা। পম্পা সরোবর যাবেন—স্নান করবেন—সাবিত্রীর উপাখ্যান নিয়ে পালা রচনা করবেন এই ভাবনার মধ্যে যোশেফ লল্লা এদের কথা মনেই পড়েনি। পথে ঝড়ে বিপর্যস্ত হয়ে টোডাগ্রাম থেকে ফিরে আসবার পথে কিন্তু ওই উন্নি মেয়েটির সঙ্গে লল্লার স্মৃতি জড়িয়ে গিয়েছিল। উন্নিকে মনে হলেই তার পিছনে লল্লা এসে দাঁড়াত। মনে হত লল্লার ভাগ্যেও হয়তো এমনই দুর্গতি লেখা আছে। ভেবেছিলেন—যোশেফকে ডেকে বলবেন—যোশেফ, লল্লা তোমার ভাইঝি। দেশকাল তো দেখছ। যুদ্ধ যুদ্ধ—কাল যুদ্ধ। রাজারা সব সামুদ্রিক ঝড়ে নারিকেল সুপারী বৃক্ষের মত পড়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে লল্লাকে এমন ভিক্ষা করে বেড়তে দিয়ো না। ওর বিয়ে দাও। সংসারী করে দাও। পর্তুগীজ—সিপাহী—সে তোমার যেমন দেশী হিন্দু মুসলমান তেমনি ফিরিঙ্গী। এদের কাছে আমরা সবাই দুর্বল। তার উপর মাদ্রাজ নগর দিন দিন বড় হচ্ছে। নানান স্থানের ধনী আসছে, দুষ্ট আসছে। এরাও বর্বর। সংসারে, মানুষ—তুমি আর নারীর প্রলোভনে জন্তু হয়ে যাও। কন্যাটির বিয়ে দিয়ে ওকে কিছুটা রক্ষা কর, নিরাপদ কর।

ভেবেছিলেন বলবেন, কিন্তু তাও ভুলে গেছেন। বলা হয় নি। যোশেফও এ দিকে আসেনি। লল্লার কণ্ঠস্বর দূরে থেকে তাঁর কানে আসে নি। তিনি নিজেও

এ যুগের সাহিত্য

প্রবন্ধ ও ইতিহাস

নরহরি কবিরাজ : স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা ৫·০০

সুকুমার মিত্র : ১৮৫৭ ও বাংলা দেশ ২·৭৫

প্রমোদ সেনগুপ্ত : নীল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ ৪·০০

মুজফ্ফর আহমদ : প্রবাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন ২·০০।২·৫০

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : ভারতীয় দর্শন ৯·০০

উপন্যাস, গল্প, কবিতা

অমরেন্দ্র ঘোষ চরকাশেম

ঘূর্ণি কুটিল পদ্মার পটভূমিকায় স্বাতন্ত্র্যের আর এক জীবন ও আর এক দুঃখের দুঃসাহস ৩·৭৫

অরুণ চৌধুরী সীমানা

পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জীবনের উপর পাঁচটি গল্পের সংকলন। ১·৭৫

মনী ভৌমিক : চৈত্র দিন

স্বকীয় বৈশিষ্ট্য-সমৃদ্ধ অনাড়ম্বর আবেদনে মর্মস্পর্শী দশটি অপরূপ গল্পের সংকলন ৪·০০

। লোক বিজ্ঞানের বই ।

ইলিন ও গেরাল : মানুষ কি করে বড়ো হল ৬·৫০

ভি. আই ভ্রনস্ত : অতীতের পৃথিবী ১·৬২

গ. ন. বেরম্যান : মানুষ কি করে শুনতে শিখল ·৭৫।১·২৫

বুবলেইনিকভ : এই পৃথিবী ১·৫০

সিরাপ্লভস্ত : মহাবিশ্বের রহস্য ৬·০০

ইলিন শত সহস্র জিজ্ঞাসা ২·২৫

অধ্যাপক ভ. ভ. তিয়ের ওগানিয়েকভ সূর্য গ্রহণ ১·২৫

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ

১২, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

১৭১, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর-৪

দই
রাবড়ি
সন্দেশ
চমচম
গড়ুরাম
গ্রাণ্ডসন্স
ফোনঃ ৪৭-২৩০৭
ভবানীপুর কালীঘাট কলিকাতা

ষঠাধীশ বলেছিলেন—না।

লোকটি বিস্মিত হয়েছিল। সঠিক বুঝতে পারে নি। সে কিছুটা বিভ্রান্তের মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েই ছিল—বলতেও কিছু পারে নি—চলে আসতেও পারে নি।

ষঠাধীশ বলেছিলেন—একাম্বরেশ্বর সম্প্রতি দ্বাররুদ্ধ করেছেন। অর্জুনের তপস্যায় কিরাত বেশে যে এসেছিলেন—সেই কিরাত বেশের জন্য কি প্রায়শ্চিত্ত করবেন চিন্তা করছেন। প্রায়শ্চিত্ত শেষ হলে রত্নলাঞ্ছন পালাটিকে যখন সম্পূর্ণ করবে তখন শুনবেন একাম্বরেশ্বর।

লোকটি ফিরে এসে সব বলতেই রত্নলাঞ্ছনও একটু চিন্তিত হয়েছিলেন। তিনি কি ভুল করেছেন? কোথাও কোন অপরাধ করেছেন—মহেশ্বরের মহিমা কীর্তনে? চিন্তান্বিত হয়েই ফিরেছিলেন আশ্রমে।

আশ্রমে ফিরে আগাগোড়া রচনাটি পরীক্ষা করে দেখেছিলেন—খুঁটে খুঁটে এবং তীক্ষ্ণ সতর্কতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছিলেন। কোথাও কোন অপরাধ তো চোখে পড়ে নি! হঠাৎ মনে হয়েছিল—ব্যাস লিখেছেন—স্বর্গকান্তি কিরাতরূপী মহাদেব। হ্যাঁ এখানে তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন—হিমগিরির অরণ্যে যিনি হিমাচলে কাঞ্চনজঙ্ঘার জ্যোতিষ্মান্ত হয়ে স্বর্ণকান্তিতে বিচরণ করেন—তিনিই নীলগিরিতে বিচরণ করেন নীলাভ কৃষ্ণকান্তিতে নীলমন্ত্রের লাবণ্য অঙ্গে মেখে শবর বেশে। তাতে অপরাধ হয়েছে? না—কখনও না। আর কি? মহাভারতে অলগঙ্গের কথা নাই। তিনি অলগঙ্গের কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন—দেবতা যখন ব্যাধ শবর বেশ ধারণ করেন তখন তাঁর দেবসঙ্গকে লুকিয়ে কটুগন্ধই ধারণ করেন অঙ্গে। এতে অপরাধ হয়েছে? না। স্বীকার করতে তিনি পারেন নি।

পরদিন পত্র লিখতে বসেছিলেন তিনি। লিখেও ছিলেন—মহামান্য পূজ্যপাদ আচার্যদেব, দেবাদিদেব একাম্বরেশ্বর দ্বাররুদ্ধ করে কিরাতবেশ ধারণের জন্য প্রায়শ্চিত্তের চিন্তা করিতেছেন অবগত হয়ে—কৌতূহল বশে একটি প্রশ্ন নিবেদন করিতেছি। দেবাদিদেব কি অনাদিকাল থেকে শ্মশানবাসের নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত-কথাও চিন্তা করিতেছেন না? লিখে অনেকক্ষণ পত্রখানি ধরে বসেছিলেন। পাঠাবেন?

এই সময়েই তিনি গান শুনতে পেয়েছিলেন। সমুদ্র-

দেওয়াল লিপি সমরেশ বসু

সুখ্যাত কাহিনীকার সমরেশবাবুর গল্পের পরিচয় আজকের পাঠকদের আর নতুন করে জানবার প্রয়োজন নেই। গল্পগুলি পড়ে প্রত্যেক পাঠকই আনন্দ পাবেন এবং সেই সঙ্গে পাবেন এক নতুন অভিজ্ঞতার সন্ধান। দাম: আড়াই টাকা।

সায়াহ্নের সানাই প্রভাতদেব সরকার

এতে প্রভাতবাবু অসম বয়সী, বিপরীতধর্মী দুটি নারী-পুরুষের বিচিত্র প্রেমের কাহিনী বর্ণনা করেছেন, যার উন্মেষ, পুষ্টি এবং পরিণত পাঠককে এক অনাস্বাদিত রসের সন্ধান দেবে। সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে অভিনব, অভিতীব্র, অভূতপূর্ব এ কাহিনী। দাম: তিন টাকা।

পূর্বপাড়ার মেয়ে সরোজকুমার রায়চৌধুরী

চাঁপা পূর্বপাড়ার মেয়ে, এবং সে পশ্চিমপাড়ার ছেলে। পূর্ব এবং পশ্চিম মিলতে পারে না। তাই চাঁপার এই দুটি সন্তান সহজ সাবলীল মনুষ্যত্বে ভরে উঠতে পারে না। চাঁপা যেন পূর্বপাড়ার মেয়ে হয়েই রইল। পূর্বপাড়ার মেয়ে সরোজকুমারের এক অনন্য সৃষ্টি। স্নেহে বিদ্বেষে আনন্দে ক্রোধে বাস্তবে অবাস্তবে এক অনন্য অভিনবরূপে তীক্ষ্ণতর সৃষ্টি। দাম: তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

নাগরী সরোজকুমার রায়চৌধুরী

শুধু একটি যুগের কতকগুলি মানুষের কথা নয়। চিরকালের অভিশপ্ত মনুষ্যত্বের মর্মবাণী। দাম: চার টাকা।

কালোঘোড়া সরোজকুমার রায়চৌধুরী

সর্বগ্রাসী আগুনের দিকে ধাবমান শ্রীমন্ত এবাহের চেতনারই প্রতিমূর্তি! এই শতাব্দীর এক আশ্চর্য সৃষ্টি। মনোবিশ্লেষণের তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি ও প্রগাঢ় সমবেদনার সমন্বয়ে জীবনবেদের এক নতুন ভাষ্য। বাংলা সাহিত্যে অভিনবত্বের সংযোজন! দাম: চার টাকা।

গৃহদীপ্তি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

যে আগুন ঘর করে তাই আবার গৃহকোণে জ্বেলে দীপ হয়ে। মরুভূমির বালি তৃপ্ত হোক চলা যেখের বৃষ্টিতে চাতকাকাঙ্ক্ষ প্রার্থনায়। ঘরে-বাইরে বৈধে-অবৈধে বহু আকাঙ্ক্ষার মুক্তিস্নান যা একমাত্র অচিন্ত্যকুমারের লেখনীতেই সম্ভব। সার্থকতম রচনা। দাম: দুই টাকা।

ম্যাকসীম গোর্কী শৈলেশ বে
মা ৬·০০ হংস মিথুন ২·৫০
অনুবাদক—অশোক গুহ

রবীন্দ্র লাইব্রেরী
১৪/২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

পূজার পূর্বেই শারদ সঙ্কলন প্রকাশিত হইবে

মধুরাংশ্চ

সম্পাদক ঃ শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু

ভ্রমণকাহিনীর উপন্যাস

(১) রম্যাণি বীক্ষ্য—উৎকল পর্ব

(২) রম্যাণি বীক্ষ্য—দ্রাবিড় পর্ব

তৃতীয় সংস্করণ

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

(৩) দেবভূমি দক্ষিণ

বৃহত্তর দক্ষিণ ভারত সম্বন্ধে নূতন ধরণের একটি

ভ্রমণকাহিনীর উৎকৃষ্ট গ্রন্থ

শ্রীঅমল ঘোষ

দর্শনের প্রাথমিক গ্রন্থ—দ্বিতীয়

প্রকাশিত হইল

শ্রীরাসবিহারী দাস

ক্যাণ্টের দর্শন ১২·৩০

দার্শনিক পণ্ডিত কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য-লিখিত 'কাণ্টদর্শনের

তাৎপর্য' সম্বলিত

প্রকাশক ঃ

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ

২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

উঠে বসে

বাহবা কণ্ঠ।

লল্লা! লল্লা উৎকল অভিমুখী স্বদেশযাত্রী বয়ে নিয়ে আসছে তিরুক্কুরলের পদ। দ্রাবিড় ভারতের তামিল-তিরুবল্লুবর প্রণাম জানাচ্ছে। কি বচনাই দিয়ে গেছ! লল্লা গাইছে—

বেশ, বাঁধা ঘরে কেন এত নিছে মোচ—
বাল গোপালের চাহির কাহলী
শুনিছ নি কি তোরা কেহ?

এর আগে অবশ্য এমন করে মন দিয়ে কখনও লল্লার গান শোনেন নি রঙ্গনাথন। কানে গুঞ্জেছে—ভাল লেগেছে ওই পর্যন্ত। তখন লল্লা সম্পর্কে কোন বিশেষ কৌতূহল ছিল না। সেদিন তাঁর মনে কৌতূহলের অনেক কারণ ছিল।

ওর সম্পর্কে গোপেশের কথাগুলি রঙ্গনাথনের মনে বিস্ময়ের সঞ্চার করেছিল। খৃস্টান হয়েছে ব'লে গোপেশের তণ্ডুল মুষ্টির সাহায্যও নেয় না। খৃস্টান হবে না বলে গ্রাম ছেড়ে ভিক্ষা ক'রে খায়। ওদের পোষাকের লোভ দেখিয়েছে। ওদের প্রবল প্রচারেও মোহেও আচ্ছন্ন হয় নি। ওদের পাদ্রী হয় ও চোখে কাজল পরাতে নি মনে মনে ভেবেছিল—বাঃ—বাঃ—বাঃ।

তারপর উৎকলে দেখে—ওর সম্পর্কে একটি আলাদা কৌতূহল জেগেছিল। যদি অন্যান্য বালিকারাও এমন ক'রে সাজল হয়ে যায়! আ হা—হা—হা!

পরশু কাঞ্চীভেরমে গোপুরমের সামনে কুতোঞ্জলি-পুট লল্লার চোখের শ্রদ্ধাভাবনত দৃষ্টি দেখে অন্তরে অন্তরে স্নেহ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল।

আজ গান গাইছে—সে গান মহর্ষি তিরুবল্লুবরের তিরুক্কুরলের পদ। সপ্রশংস হয়ে উঠলেন রঙ্গনাথন অনেক শিখেছে লল্লা!

তিনি সেদিন ঘর থেকে বেরুতে পড়েছিলেন। সমুদ্রতটে এসে দেখে-ছিলেন—নারিকেল কুঞ্জে একটি বৃক্ষ-কাণ্ডে ঠেস দিয়ে বসে সে গাইছে

কৃষ্ণ গোপাল—কৃষ্ণ গোপাল—কৃষ্ণ গোপাল—

বরদরাজ—বরদরাজ—বালগোপাল!

অংশটুকু লল্লা নিজে জুড়েছে ওর সঙ্গে। বুদ্ধিমতী লল্লা! বাঃ! পিছন দিক থেকে এসে তিনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়বে—বাঃ কথাটি উচ্চারণ করেছিলেন।—বাঃ।

চমকে উঠেছিল লল্লা। চকিত ভঙ্গিতে পিছন ফিরে—তাঁকে দেখেই লজ্জায় আনত হয়ে মাটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে যেন পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে গিয়েছিল। রূপনাথন বলেছিলেন—বাঃ! তুমি তো বড় চমৎকার গান কর! সুন্দর!

লল্লা উত্তর দিতে পারে নি। নীরবে আরও একটু যেন নত হয়ে গিয়েছিল। রূপনাথন আর কথা খুঁজে পান নি! না পেয়েই বোধ হয় বলেছিলেন—থামলে কেন? গাও!

অতি মৃদু জড়িত কণ্ঠে সে বলেছিল—না প্রভু! আপনার সামনে গাইতে পারব না!

তার সে কথায় আশ্চর্য আকুতি ছিল—কথা বলতেই কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছিল। সেইটিই তার সব থেকে বড় আকুতি।

এবার রূপনাথন বলেছিলেন—তিরুক্কুরলের পদ শিখলে কি ক'রে?

—মঠে শুনেছি প্রভু! শুনে শিখেছি।

—শুনে?

—হ্যাঁ প্রভু। যেটুকু মনে থাকে লিখে রাখি।

—লিখতে পার তুমি? ও হ্যাঁ—যোগেশ বলেছিল—তুমি পাদরীদের পাঠশালায় লেখাপড়া শিখতে।

—অল্প শিখেছিলাম। তারপর মা আর পড়তে দেয় নি!

—শুনেছি।

—মা বলেছিল—লল্লা, তোর বাপ বলত কলাবন্তী আমার বরদরাজ স্বামীর কিরূপা পাবে।

—কলাবন্তী কে?

এবার মুখ তুলে স্মিত হেসে বলেছিল—আমি প্রভু। ডাক নাম আমার লল্লা। ছেলেবেলা থেকে গাইতে পারতাম—নাচতাম গান গেয়ে বরদরাজের নাম গেয়ে—তালি দিত বাপ—তাল ভঙ্গ হত না। তাই

ঃ সুন্দর রচনায় সুন্দর প্রকাশন ঃ

সদ্য প্রকাশ—

হার মানালে গো—হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ৩·০০
নতুন দিনের আলো—বিশ্বনাথ রায় ২·৫০
নারী ও নগরী—হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ৫·০০
ললিত বিভাস—সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১০·০০

আসন্ন প্রকাশ—

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত—আমার সাহিত্য জীবন (২য় পর্ব)
অকাল—সঞ্জয় ভট্টাচার্য
গোরাকালার হাবেলী—অশোক গুহ
বিনিময়—বিশ্বনাথ রায়
ওপার কন্যা—শচীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
বিহঙ্গমন—রণজিৎ সেন
লেডি চ্যাটার্লির লেখক—মণি গঙ্গোপাধ্যায়
নেতাজী সঙ্গ ও প্রসঙ্গ—নরেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্তী

সুন্দর প্রকাশন
৮এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

বাবা নাম রেখেছিল—, কাগজীতে লিখে নামটা নিয়ে এসেছিল এক বৈষ্ণব সাধুর কাছে—বাবা আমার কথা গল্প করেছিল—আমার গল্প করতো না তার। সাধু বলেছিলেন—এ কন্যা তোমার কলাবতী কন্যা—বরদরাজ কিরপা করবেন।

রঙ্গনাথন বুঝলেন—একটু হেসে বললেন—ও! কলাবতী!

—হ্যাঁ প্রভু কলাবতী! লজ্জিত ভাবে আবার সে মাথাটি নামাল!

আপন মনে রঙ্গনাথন শব্দটি বার তিনেক উচ্চারণ করলেন—কলাবতী। কলাবতী! কলাবতী।

তারপর হঠাৎ বলে উঠলেন—কলাবতী—কল্যাণী! কল্যাণী! তুমি কল্যাণী হবে তার চেয়ে!

মাথা সে আবার তুললে—কল্যাণী!

—হ্যাঁ কল্যাণী। কলাবতীও তুমি বটে—কল্যাণীও তুমি বটে! তোমার কল্যাণী রূপটিই আমার ভাল লাগে লক্ষ্মী! আমি তোমাকে কল্যাণীই বলব!

মুগ্ধ কণ্ঠে কৃতার্থার মতই সে বলেছিল—কল্যাণী!

—হ্যাঁ কল্যাণী। নৃত্যগীতে পারঙ্গমা হবে তুমি। কলাবতী নাম তোমার সার্থক হোক। কিন্তু জীবনে তুমি কল্যাণী হবে!

সুরে থেকেই সে প্রণতা হয়েছিল বেলাভূমের উপর। রঙ্গনাথন পরম স্নেহে এগিয়ে গিয়ে তার মাথায় রুক্ষ কেশরাশিতে হাত রেখে বলেছিলেন—কল্যাণী হও।

সেই ভূমিষ্ঠ অবস্থাতেই সে চমকে উঠেছিল—তার সে চমক তিনি মাথায় হাত দিয়েই অনুভব করেছিলেন। সে উঠে কাতরস্বরে বলেছিল—আমাকে ছুঁলেন প্রভু।

রঙ্গনাথন বলেছিলেন—তুমি সেদিন আমার গান শুনেছ কাঞ্চীভেরবে। শোন নি, বৈকুণ্ঠধামে যাঁর বসতি তিনিই বাস করেন পৃথিবীতে মানুষের সাদাকালো সকল চর্মের অন্তরালে। এ কি—তুমি কাঁদছ?

হাসবার চেষ্টা করে চোখ মুছে সে বলেছিল—এ শুনলে আমার কান্না পায় প্রভু। এমন কথা তো কেউ বলে না! আপনি বড় ভাল—প্রভু আপনি বড় ভাল।

হঠাৎ তাঁর মনে পড়েছিল—যোশেফকে যে কথাটা বলবেন ভেবেছিলেন সেই কথাটা! এই মেয়ে—এমন কণ্ঠস্বর—এমন সুগঠিত দেহ—নবপল্লবের মত শ্যাম দেহ-বর্ণ বা পরবর্তের মধ্যে দুর্লভ; এই দুটি দীর্ঘায়ত চোখ; এই কন্যা—আর এই মাৎস্যন্যায়ের কাল—এর—। উত্রিকে মনে পড়েছিল। তিনি বলেছিলেন—তোমার অভিভাবক কে কল্যাণী?

তিনি তার দিকে চেয়েছিলেন—সে আনত দৃষ্টিতে মাথা নীচু করে বলেছিল। নীরবতার পর এই বাক্য কটি হারিয়ে গিয়েছিল—সে ধরতে পারে নি। তিনি আবার ডেকেছিলেন—কল্যাণী।

—আমাকে বললেন প্রভু?

—হ্যাঁ। এই মাত্র যে তোমার নাম দিলাম কল্যাণী।

হেসে সে বললে—কলাবতী নামও আমার সব সময় খেয়াল থাকে না। লক্ষ্মী না বললে—হাসলে আরও একটু।

—তোমার অভিভাবক কে? যোশেফ?

—অভিভাবক? না প্রভু। মানুষ কেউ আমার অভিভাবক নেই। নিতান্ত বালিকা। বয়সে—আমার তখন ছ সাত বছর বয়স—

—জানি—যোশেফ আ মা কে বলেছে। বলেছে—সে তোমাকে খৃস্টান ধর্মে—

—ও কথা শুনতে ও আমাকে বারণ করে গেছে আমার মা। আমার বাবা বলে গেছে আমি বরদরাজের কৃপা পাব। আমার কাকা আ মা র

অভিভাবক নয়; সে আমাদের সব নিয়ে নিয়েছে। ও ব্যবসা তো আমার বাবার ব্যবসা। বাড়ী জমি তাও নিয়েছে। আমাকে হয়তো বেচে দেবে কিরিঙ্গীদের কাছে।

তার সুন্দর শান্ত চোখ দুটি উত্তেজনায় বিস্ফারিত হয়ে উঠেছিল। মসৃণ ললাটখানি ভরে উঠেছিল সারি সারি কুঞ্চনরেখায়। রঘুনাথন বলেছিলেন—তাহলে কে তোমার অভিভাবক?

—মা মরবার সময় বলে গেছে—লঙ্কা বরদরাজ তোকে দেখবেন।

কথাটা এবার ঘুরিয়ে পেড়েছিলেন তিনি—তোমার বাবা কি তোমার বিয়ের কোন সম্বন্ধ করে যান নি?

—না প্রভু।

—তোমার মা?

—তিনিও না। তিনি বলে গেছেন—এদের কারুকে বিশ্বাস নেই লঙ্কা। এরা সব ক্রীশ্চান হয়ে যাবে। তুই ওই বরদরাজের মন্দিরের চারিপাশে ঘোরু ফিরি। ভিক্ষা করবি।

—তা'হলে—

—আমি তাই করব প্রভু। গান গাইতে পারি, ছেলে-বেলা থেকে গান গেয়ে ভিক্ষা করি—বাইরে—দেবস্থানেই বেশী কেটেছে আমার। গ্রামে কখনও কখনও আসি। এদের মতন থাকা—সে আমি আর পারব না প্রভু!

সে অকস্মাৎ সমুদ্রের দিকে মুখ ফেরালে। তারপর বললে—আমি আপনার কাছেই এসেছিলাম প্রভু। কথা-কলি নাচ শিখবার আর গান শিখবার যদি কোন সুবিধা করে দেন—।

—তোমার কাকাও আমাকে বলেছিল—

—সে আমার শত্রু। তার নাম আপনি করবেন না।

পূজায় গ্রন্থমের সাহিত্য অর্ঘ

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের-
ভারতে জাতীয় আন্দোলন ১০·৭৫
মৈত্রেয়ী দেবীর
বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ ৭·৫০
মংপুতে রবীন্দ্রনাথ ৭·৫০
ডেল কার্নেগির
দুশ্চিন্তাহীন নতুন জীবন
প্রতিপত্তি ও বন্ধুলাভ
বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়ের
অমৃতের উপাখ্যান
বিশ্বদেব বিশ্বাসের
কাঞ্চনজঙ্ঘার পথে ২·৫০
শ্রীপান্থের
আজব নগরী ৩·৫০
চিত্তরঞ্জন দেবের
তারাপীঠের একতারা ৩·৭৫
শচীবিলাস রায়চৌধুরীর
ডাকটিকিটের গল্পকথা
পরিমল গোস্বামীর
স্মৃতি চিরণ ৭·০০
রোল নম্বর ২০৫ (কিশোর পাঠ্য) ২·৫০

সাধক-সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনের বিস্ময়কর সৃষ্টি
তাণ্ডব, আমৃত, শ্রীগৌরাঙ্গ ৮·৫০

(নারায়ণ গঙ্গোঃ, নৃপেন্দ্র চট্টোঃ, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী প্রমুখ পঁচিশজনের লেখা)
বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না ৩·০০
বাণী রায়ের
মধুজীবনীর নতুন ব্যাখ্যা ৭·০০
মণি গঙ্গোপাধ্যায়ের
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ২·৭৫
—উপন্যাস ও নাটক—
মনোজ বৈরাগীর
মক্কেল ৭·০০ মধুরাই ২·৫০
একমুঠো আকাশ ৫·০০ নাটক ২·০০
এক পেয়ালা কফি (নাটক) ২·৫০
আর হবে না দেরী (নাটক) ২·৫০
মায়া বসু
সূর্যশিখা (উপন্যাস) ৩·৫০
গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের
সমুদ্র নয় মন ৩·০০
শিবরামের জন্য প্রকাশিত কিশোর পাঠ্য
দাড়ুনাতির দৌড় ২·২৫

ক্রেতাদের পূজায় বিশেষ কনসেশন দেওয়া হবে।
পুস্তক তালিকার জন্য লিখুন।

গ্রন্থম ঃ ২২।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

শুধু আমার নয়। আপনারও। আজ সকালে কাকী থেকে এসে প্রামে শিখলাম। সেখানে দেখলাম কাকা আপনার নামে গজরাচ্ছে। বলছে—গান গেয়ে শবরদের আপনি অপমান করেছেন। আপনাকে দেখবে।

রঙ্গনাথন সবিস্ময়ে বললেন—আমি অপমান করেছি?

—তারা তাই বলছে।

—তুমি? তুমিও তো শবরকন্যা কল্যাণী। তোমার মনেও কি আঘাত লেগেছে?

—সেদিন রাত্রে গান শুনতে শুনতে কেঁদেছিলাম। আপনি যখন বেরিয়ে এলেন—তখনও চোখের পাতায় জল লেগেছিল। ভালবাসার মানুষ কাঁদে—সে কান্না সেইদিন কেঁদে বুঝেছি।

—তবে এরা কেন রাগ করলে বলতে পার?

—তা তো জানি না। শুধু এরাই নয়, শিবকাঞ্চীতে তারা নাকি আপনাকে কখনও ডাকবে না।

—সেটা জানি।

তারপর অনেকক্ষণ দুজনেই স্তব্ধ হয়ে ছিলেন। তিনি ছিলেন সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে—সন্ধ্যা ছিল—মাটির জগতের দিকে তাকিয়ে। সমুদ্র দ্বিপ্রহরের আভাসে—ঘনতর নীল—এবং তরঙ্গ—শীর্ণ তীরোজ্জ্বল রৌদ্রচ্ছটায় ঝলমল করে উঠে পরক্ষণেই গাঢ় নীলের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। তিনি শুধু ভাবছিলেন—কেন?

—কেন? ওরা এমনি—

—প্রভু!

—কিছু বলছ?

—আপনি আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেছেন। এবার যাবার সময় আমি চরণস্পর্শ করে প্রণাম করি!

নিশ্চয়। তুমি কল্যাণী। আর আমার প্রভুর কাছে সংসারে সব মানুষ সমান! হয় তো লঙ্কা, সবাই তিনি। ভক্ত শুধু আমি।

—কি সুন্দর কথা প্রভু!

প্রণাম করে উঠে সে বলেছিল—আমার নাচ গান শিখবার সুযোগ কি হবে না প্রভু আমি শবরী বলে?

—দেখব আমি। এবং হবে, নিশ্চয় হবে।

বেলাভূমির নারিকেল সুপারির ঘন বীথিকার মধ্য দিয়ে সে চলে গিয়েছিল। তিনি চিন্তিত মনে ফিরে এসেছিলেন।—কেন? কেন! কোথায় কোন্ ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটল?

অনেকক্ষণ পর তিনি চিন্তকে দৃঢ় করে বলে উঠেছিলেন—না আমার অন্যায় হয় নি। হয় নি। আমি সত্যকে প্রকাশ করেছি। সত্যেরও আঘাত আছে। মিথ্যাশ্রয়ী এবং স্বার্থান্বেষীরা সে আঘাতে আহত হয়। ক্রুদ্ধ হয়। হোক—তাই হোক। তিনি আবার এই গান করবেন। সারা দেশ এই গানে সুরে কথায় আচ্ছন্ন করে দেবেন।

এ সব তো এই একমাস আগের কথা। একমাস পর শুক্লা ত্রয়োদশী ছিল কাল—কাল এই গান গেয়ে ফিরবার পথে এই ঘটনা।

* * *

কালও সন্ধ্যা ছিল—বাইরে যে সব শ্রোতারা দাঁড়িয়ে শুনেছিল তাদের প্রথম সারিতে। কালও একটি দীপাধারের আলো তার মুখের উপর পড়েছিল। সে তাঁকে শ্রদ্ধা করে—গভীর শ্রদ্ধা; সেটা সে তাঁকে প্রতিবার নিবেদন-কালে জানাতে চায়; তাই সে এমন করে—দাঁড়ায় প্রতিবার। কালও তার দীর্ঘ অক্ষিপল্লবগুলি ভিজে ছিল। তিনি তাঁর মুখের

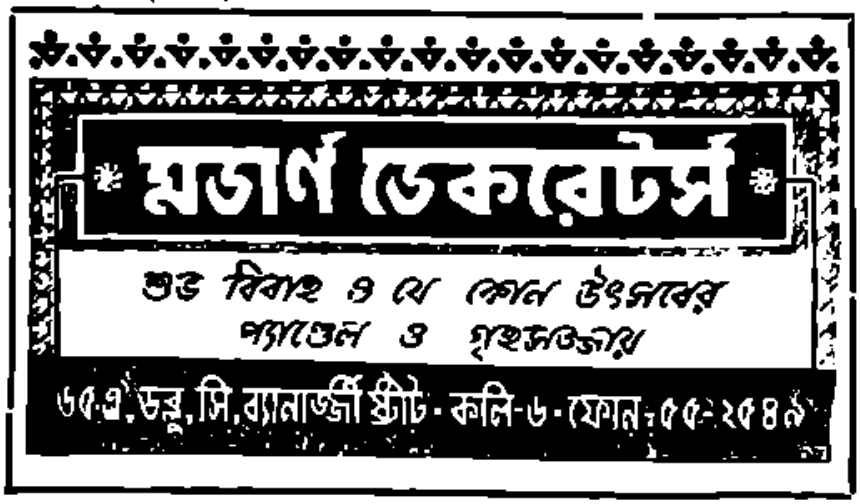

দিকে তাকিয়েছিলেন। কাল তার সঙ্গে কথা বলবার তাঁর ইচ্ছা ছিল। কিন্তু কন্যা কুমারীর একদল যাত্রী এসেছিল পার্থ সারথি ও কপালীশ্বর দর্শনে—তাঁদের এক প্রৌঢ়া কুমারী সন্ন্যাসিনী তাঁকে এসে অভিনন্দিত করতে গিয়ে তাঁর বিলম্ব করে দিয়েছিল—সেই সময় সে চলে গিয়েছিল। আজ সে এসেছিল তাঁকে অজ্ঞাত আততায়ীরা আঘাত করে আহত করেছে শুনে। ছুটে এসেছিল। এসে দূরে সোপানের চাতালে—বেদনার আর্তিতে যেন নিজে ভেঙে পড়ে—কোন রকমে খুঁটি ধরে দাঁড়িয়েছিল। চোখ ছল ছল করছিল—তিনি দেখেছেন। ঠোঁট দুটিও কাঁপছিল নিশ্চয়। শান্ত কোমল-প্রকৃতি ভক্তিমতী মেয়েটি কথা কইবার সুযোগ পেলে বোধ হয়—শুধু—'প্রভু' এই কথাটি উচ্চারণ করেই বুদ্ধবাক হয়ে যেত। চোখের কোন দুটি থেকে অশ্রুর দুটি ধারা গড়িয়ে পড়ত। ঠোঁট দুটি কেঁপে উঠত প্রবল কম্পনে। তাকে এরা ধরেছে—শবরদের চর।

কিন্তু তারা কি শবর? শবরই যদি হয় কেন তাকে তারা আঘাত করলে। তিনি তো তাদের ভালবেসেই ওই পরম সত্যকে প্রকাশ করেছিলেন—তাঁর সমস্ত জীবনাবেগ দিয়ে। তারা তো এর পূর্ব পর্যন্ত তাকে গভীর ভালবাসা দিয়ে অভিষিক্ত করেছে। এদের বালক বালিকা যুবক প্রৌঢ়—যে মুগ্ধ দৃষ্টিতে, প্রশংসা-প্রসন্ন হাসিতে তাঁর যে আরতি করেছে—তা তো ব্রাহ্মণ—শৈব—ধনী—বিদ্বানেরা করে নি। তারা দিয়েছে প্রসাদ এরা করেছে পূজা। তবে। তা ছাড়া—। গন্ধের কথা এঁরা তুলেছিলেন। কথাটা খুব যুক্তি সংগত। গাত্রগন্ধ একটা আছে। সেটা হুবহুবেলে ঢাকা পড়ে না। গাত্রগন্ধ একটা পেয়েছিলেন। সেটা কি শবরদের?

না।

তবে? শৈবদের?

তারাই বা এতটা ক্ষিপ্ত হবেন কেন? হতে পারে। ধর্মের আবেগ—প্রবলতম আবেগ। স্বর্গলোক থেকে পৃথিবীর বুকে যে বেগের প্রচণ্ডতা নিয়ে গঙ্গা ঝরে পড়েছিলেন—যে বেগের মুখে ঐরাবত ভেসে গিয়েছিল—তার থেকেও এ আবেগের বেগ, প্রচণ্ডতা—প্রবলতর, প্রচণ্ডতর।

কয়েকখানা মনে রাখার মত বই।

● আনন্দ বাগচী র
চকখড়ি ৩·৫০
কোন এক লেখকের আত্মজীবনীর ধরনে এই উপন্যাস। যে-উপন্যাস প্রথম প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পাঠক-মহলে চাঞ্চল্য জাগিয়েছিল। অনেক মুখ আর অনেক মুহূর্তের ইতিকথায় এই সুরেলা কাহিনী গড়ে উঠেছে।
আর সামান্য কিছু কপি মাত্র অবশিষ্ট আছে।

● আনন্দ বাগচী-র
রাতের বাসা ৩·০০
একটি রহস্যময় চিত্র উপন্যাস।

● শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
আলোর নেশা ২·৫০
পরম উপভোগ্য, বর্ণাঢ্য কয়েকটি গল্পের সংগ্রহ।

● লীলা মজুমদারের
লালনীল দেশলাই ৩·০০
নানা রঙের রোশনাইয়ে ভরপুর একটি উপন্যাস।

● আনন্দ বাগচী-র
তেপান্তর ২·০০
স্মরণীয় ভ্রমণগ্রন্থ।

গ্রাম : আর্ট ইউনিয়ন ফোন : ৪৫-৪৩৪৬
আর্ট ইউনিয়ন
৮০/১৫, গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬
সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলেকাতা-৯

একটা গভীর চিন্তা
করছেন তিনি। তিনি
উচ্ছেদ করতে চেয়েছেন

—আচার্য রত্নাথন

কণ্ঠস্বর শুনে চমকে
কণ্ঠস্বর। যোশেফ।

—আচার্য।

নিজেকে সংযত করে
—যোশেফ। এস—এস।

যোশেফ এসে ঢুকল। চোখে তার প্রখর দৃষ্টি—পদক্ষেপ যেন যুদ্ধকামীর মত উদ্ধত—এবং অপ্রয়োজনে দীর্ঘ ও সবল।

—তোমাকে কারা আঘাত করেছে শুনলাম রাত্রির অন্ধকারে!

একটু হেসে রত্নাথন বললেন—হ্যাঁ। মাথায় আঘাত করে—তারা দ্রুতপদে চলে গেল। দলের সদস্যরা সংখ্যায় তাদের থেকে বেশী ছিল—এবং কাছেই ছিল—নইলে হয় তো—

—আমি দুঃখিত আচার্য। কিন্তু তার থেকেও বড় দুঃখে কষ্ট যে তুমি আমাদের সন্দেহ করেছ।

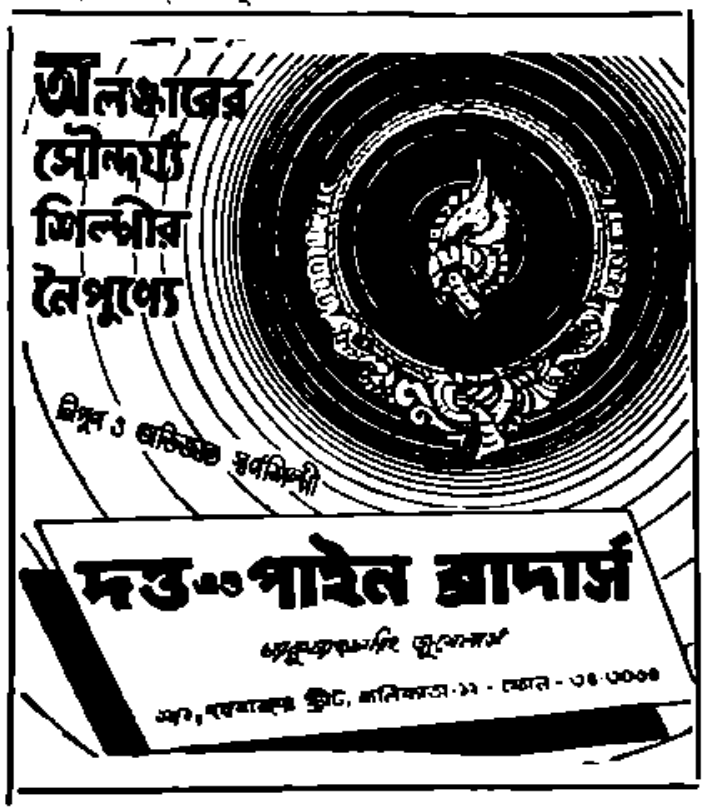

—আমি করি নি যোশেফ—করেছেন অপর সকলে। তুমি বাজারের শ্রেষ্ঠী গোপালনের দোকানে—

—হ্যাঁ—তা বলেছিলাম। মনে আঘাত লেগেছিল আমার।

—একটা প্রশ্ন করব তোমাকে?

—জেনেছি কি না? আচার্য, আমি মারলে—এই টুকু আঘাত দিতাম না। উচ্চবর্ণের হিন্দু, বিশেষ করে আমার—যারা—তারা দেহের শক্তিতে দুর্বল—ভীরু—কিন্তু কুটিল—এবং মারাত্মক তাদের বিষ। সাপের মত। এদের মাঝখানে পা দিয়ে ছেড়ে দেওয়ায় বিপদ আছে! আমি একবারে মেরে ফেলতাম।

—তা—আমি প্রশ্ন করি নি।

—ও—তবে—কখন বুঝেছি বলে জিজ্ঞাসা করছ? শোন আচার্য—কখন বুঝেও পরে ছিলাম—এটা ভুলতে পারি না।

—তাও নয় ভাই। আমার প্রশ্ন—আমি তো তোমাদের ভালবাসি—এবং সেই কথাই তো বলেছি—তবে কেন দুঃখ পেলে তোমরা?

—কেন? এ প্রশ্নে স্তব্ধ হয়ে যোশেফ তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। বোধ হয় ভেবে নিলে—তারপর বললে—কথাটা তোমার সত্য। এতটা ভাবি নি। তবে এটা সত্য—রত্নাথন—গান শুনে রাস হয় আমাদের। সঙ্গে সঙ্গে এও বলি—আঘাত আমরা করি নি। এটা বিশ্বাস করো।

—বিশ্বাস করলাম—যোশেফ।

—আমার ভাইকি লালা এসেছিল? তাকে এখানে শ্রীনিবাসন চৌকীদার দিয়ে পাহারাতে চেয়েছিল—আমাদের গুপ্তচর বলে?

—হ্যাঁ। আমি প্রতিবাদ করেছিলাম—যোশেফ। কিন্তু তারা শোনে নি।

—তাও শুনেছি। কিন্তু সে তোমার ভক্ত। ভক্তি করে—তোমার গান সে আমাদের সকলের চেয়ে ভালবাসে। তাই সে এসেছিল বোধ হয়। গুপ্তচর আমাদের নয়। আমাদের কেউই সে নয় আর। তার যা—তাকে আমাদের পর করে দিয়ে গেছে। তাকে ভিক্ষুক করে দিয়ে গেছে। যন্ত্রির

বটি দিয়ে যেতে বলেছে। সে ভিক্ষুক। শবরদের চেয়েও অন্ত্য। গুপ্তচর হলে শৈবদের, আমাদের নয়।

একটু তিক্ত হেসে বললে—চর সে কারুরই নয় রত্নানাথন—সে তোমার উচ্ছিষ্ট-সন্ধানী লোভী কুক্কুরী।

—যোগেশ্ব। রত্নানাথনের কণ্ঠস্বর উষ্ণ হয়ে উঠল এবার।

হেসে যোগেশ্ব বললে—সে দিন রাত্রি বেলায় তোমাদের আলাপ আমাদের কেউ কেউ দেখেছে, শুনেছে। তার কাছে—তুমি—বড়ভাল বড়ভাল রত্নানাথন। তুমি তার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেছ—সে তোমার পায়ে হাত দিয়েছে, তার কিছু অজানা নেই আমাদের। সে যদি আমাদের হত, তা হলে তোমার কাছে এর জন্য কৈফিয়ৎ চাইতাম। কিন্তু সে ভিক্ষুক। আমাদের সে কেউ নয়। আচার্য রত্নানাথন, তোমাকে আঘাতকারী যদি কেউ নারীর প্রতি লুব্ধ ব্যক্তি হয়—তবে তাও আশ্চর্য হব না আমি। তোমার গান শুনতে শুনতে সে যেন মোহগ্রস্ত হয়—এলিয়ে পড়ে। সে হয় তো তুমি জান না—কিন্তু আমরা জানি। শবরদের যারা পাল্য গান শুনতে যায় তারা বলেছে আমাকে। সেদিনই বলেছে—ওই কথা প্রসঙ্গে। রত্নানাথন কেমন সংকুচিত হয়ে গেলেন। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। যোগেশ্ব বললে—তুমি আঘাত পেয়েছ—তার জন্যে আমি দুঃখিত। আমি আঘাত করলে—তোমাকে হত্যা করতাম। কন্যাটা আমাদের কেউ নয়। আচ্ছা—চললাম। চলে গেল সে। রত্নানাথন দাঁড়িয়ে রইলেন স্তম্ভিতের মত।

সামনের সমস্ত কিছু যেন অর্থহীন হয়ে গেছে। দুর্বোধ্য। একটা এলোমেলো বিশৃঙ্খলা—সব যেন ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। চিত্তলোক অন্ধকার। কানে কিছু শুনছেন না।

বুকে একটা কিসের আঘাত চলছে—। অনুভবে বুঝছেন।

হে—বরদরাজ স্বামী। ক্ষমা কর। ক্ষমা কর প্রভু!

অকস্মাৎ একটি যন্ত্রণা-কাতর মৃদু আর্তনাদ তাঁর কানে এসে চুকে তাঁকে সচেতন এবং ঈষৎ চকিত করে তুললে। উঃ! উঃ! উঃ মা।

ঃ স্মরণীয় সাহিত্যের উপচার ঃ

আশাপূর্ণা দেবী
জহরী (উপন্যাস) ২·০০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
সংঘাত (নাটক) ২·০০

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
কুয়াশার রঙ (গল্প) ৩·৫০

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
বরণীয়া তুমি (উপন্যাস) ২·৫০

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
এ জন্মের ইতিহাস (উপঃ) ৬·০০

উৎপল দত্ত
এংকোর (গল্প) ৩·০০

সৌরীন সেন
অমিতাক্ষর ছন্দ (উপন্যাস) ৩·০০

নলিনী গঙ্গোপাধ্যায়
নিঃসঙ্গ নক্ষত্র (জীবনোপন্যাস) ২·৫০

শীঘ্রই প্রকাশিত হবে

চিত্তরঞ্জন ঘোষ
দৃশ্য দৃশ্যান্তর

সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
সমাপ্তি

বাণী রায়ের সম্পাদনায়
লেখিকা মন
(মহিলা সাহিত্যিকদের ছোট গল্পের সংকলন)

সাহিত্যায়ন
৮এ, কলেজ রো, কলকাতা

কি ? কে ? কোথায় ?

উঃ—হু-হু ! এতো—সেই লঙ্কা ! কিন্তু—। দিক লক্ষ্য করে রঙ্গনাথন গোশালার দিকে তাকালেন। গোশালার চালার পাশেই গরুর খাবার বিচালির স্তূপ। পোয়াল অর্থাৎ এলো খড়—স্তূপের মত করে রাখা রয়েছে। সেটার মাথা নড়ছে। শব্দ ওখান থেকেই আসছে। তিনি দ্রুতপদে এগিয়ে গেলেন। হ্যাঁ—পড়ে গেল পোয়ালের মাথাটা। পোয়ালের পিছন দিকেই ঘন বৃক্ষ বেষ্টনী। সেই দিক থেকে পোয়াল ঠেলে উঠে দাঁড়াল লঙ্কা। মাথার রুক্ষ চুলে, মুখে খড়ের কুটি লেগেছে কিন্তু সেদিকে তার লক্ষ্য ছিল না—একটা যন্ত্রণায় তার মুখ বিকৃত হয়ে উঠেছে। দাঁড়িয়ে সে যেন এই যন্ত্রণার মধ্যেও লঙ্কা দমকোচে প্রাণপণে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করেছে।

—কি হল ? লঙ্কা ! লঙ্কা !

—ওঃ কিসে আমাকে কামড়েছে—প্রভু !

—কোথায় কামড়েছে ? কোন জায়গায় ?

—পিছন দিকে। ঠিক ঘাড়ের নীচে। চুলের মধ্যে ঢাকা পড়েছে।

—দেখি দেখি !

লঙ্কার সে যেন মাটির সঙ্গে মিশে গেল, বললে—না প্রভু, আমি যাই সমুদ্রের জলে গিয়ে—ডুব দি। তাতে সেটা ছেড়ে দেবে !

—না দেখি। তোমার লজ্জার এতে কারণ নেই।

—আমি শবরী !

—না, তুমি মানুষ। অবাধ্য হতে নেই। বল পিছন ফিরে।

বলতে বলতেই তিনি নিজেই তার পিছনে গিয়ে দাঁড়ালেন। সেও অবাধ্য হল না, বসল। রঙ্গনাথন সন্তর্পণে তার ঘন-কৃষ্ণ, রুক্ষ, পোয়ালের ধুলোয় ধূসর চুলের বোঝার হাত দিলেন। লঙ্কা বললে—দেখবেন প্রভু, আপনাকেও হয়তো কামড়াবে।

রঙ্গনাথন সন্তর্পণে চুলের বোঝা ওল্টাতে বললেন—ওখানে ঢুকলে কেন ?

—ভয়ে প্রভু ! ঘরে যেন শব্দের কথা বলছিলেন শ্রেষ্ঠী গোপালন তখন বাইরে কয়েক জনে আমার দিকে আঙ্গুল দেখাচ্ছিল। আমি ভয়ে ওই পোয়ালের পিছন দিকে গিয়ে লুকিয়েছিলাম। তারপর আমার নাম করতে ভয়ে ওই পোয়ালের ভিতর—

রঙ্গনাথন বললেন—এ কি ! এ যে—!

করেছে কামড়ে !

বিদাক বৃশ্চিক জাতীয় কীট। কর্কটের মত দুটো দাঁড়ায় তার পিঠের মাংস কেটে কামড়ে ধরেছে এবং হুল দিয়ে দংশন করেছে। দাঁড়ায় কাটা ক্ষত থেকে রক্তের একটি ধারা গড়িয়ে এসেছে ! তখনও ছাড়েনি। নিষ্ঠুর আক্রোশ রয়েছে কীটটার। রঙ্গনাথন মুহূর্ত চিন্তা করে তার পশু উত্তরীয়ের ভাঁজে কীটটাকে সন্তর্পণে দুই আঙ্গুলে চেপে ধরে সজোরে টেনে নিলেন। লঙ্কা যন্ত্রনায় চীৎকার করে উঠল। উঃ—। কিন্তু অব্যবহিত পরেই নিজেকে সংযত করে শুধু হল। হাতে টিপেই সেটাকে মেরে ফেলে দিয়ে রঙ্গনাথন বললেন—লঙ্কা এ বিদাক ছোট্ট বৃশ্চিক। তুমি কি যন্ত্রনার সঙ্গে অবলম্বতা বোধ করছ ?

—হ্যাঁ প্রভু !

—তোমাকে বিশ্রাম করতে হবে। আমার কাছে ওষুধ আছে লাগিয়ে দেব। ওঠ। উঠতে পারবে ?

—আমায় কোন গাছতলায় শুইয়ে দিন প্রভু !

—না। ঘরে বিশ্রাম করবে।

—না। আর্তস্বরে সে বলে উঠল।

—না নয়। ওঠ।

—তা হলে ওই গোপালায় -

—না। না। ওঠ! এ কি তুমি যে কাঁপছ!

—বড় যন্ত্রণা হচ্ছে। আর —

মুখ ঠোঁট যেন শুকিয়ে গেছে—চোখ দুটির পাতা ঢলে আসছে। দাঁড়িয়ে ভেঙে পড়ছে! রঙ্গনাথন তাকে দুই হাত প্রসারিত করে—হাতের উপর শুইয়ে ধরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলেন। ঝিড় ঝিড় করে প্রতিবাদই করলে লল্লা কিন্তু কণ্ঠস্বর জিহ্বা যেন জড়িয়ে যাচ্ছে। রঙ্গনাথন তার মুখে খানিকটা জল দিলেন—খাও। মুখ ধুইয়ে দিলেন। মাথাটা ধোয়ানোর প্রয়োজন। পিছনের বারান্দায় নিয়ে গিয়ে প্রচুর জল ঢাললেন মাথায়। আরও খানিকটা জল খাওয়ালেন। এতে একটু সুস্থ হয়ে চোখ মেলতে চেষ্টা করলে লল্লা। রঙ্গনাথন বললেন—চুপ ক'রে শুয়ে থাক। আমি বাইরে থেকে একটা শিকড় তুলে আনি। খাওয়ালেই এবং ওইখানে ঘষে লাগালেই অনেকটা সেরে যাবে। কিন্তু কথা শুনো—উঠো না তুমি।

বাইরে এসে নিজের বাগান খুঁজে শিকড় ওষুধ তুলে এনে গোলমরিচ মিশিয়ে বেঁটে খানিকটা খাইয়ে দিলেন—কয়েক মুহূর্ত পরেই লল্লা যন্ত্রণা উপশমের আরামে বলে উঠল—আঃ। সঙ্গে সঙ্গে হাতখানি বাড়িয়ে কিছু যেন খুঁজলে?

রঙ্গনাথন জিজ্ঞাসা করলেন—কি—কি খুঁজছ?

—আপনার চরণের ধুলো একটু!

—না।

—প্রভু দিন। তাতে আমার যমে বন্ধ হবে!

এবার দ্বিধা করলেন না রঙ্গনাথন। তিনি বিশ্বাসের বলকে জানেন। নিজে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন—এবার ঘুমোও দেখি একটু।

—আমাকে এইবার বাইরে—

—চুপ কর। উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে তিনি জানালার দিয়ে তাকিয়েছিলেন। উঠে গিয়ে জানালায় দাঁড়ালেন। বুকবেণ্টনীর একটি ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে—শহর থেকে গ্রামে আসবার যে পথটা তাঁর আশ্রমের সুমুখ দিয়ে চলে গেছে—সেই পথে সুদূরে—জন দুই সওয়ার এবং কয়েক জন লোক আসছে। সওয়ারদের পোশাক যেন কোতোয়ালীর পোশাক। মাদ্রাজের ফিরিঙ্গিদের কোতয়ালী! কোথায় যাবে? এখানে নয় তো? যদি হয়! হওয়া খুবই সম্ভব! হঠাৎ তাঁর মাথাটা ঘুরল যেন আপনা আপনি।

লল্লা অবসন্ন লতার মত পড়ে আছে। বোধ হয় ঘুমে আসছে। বিষ এবং ওষুধ দুইয়ের ক্রিয়াতেই এখন ও আচ্ছন্নের মত পড়ে থাকবে কয়েক প্রহর! তারা লল্লাকে খুঁজেছিল। শ্রীনিবাসন প্রতিজ্ঞা করে গেছেন—এর প্রতিকার সে করবেই। লল্লাকে যদি ধরে। মুহূর্তে কর্তব্য স্থির করে ফেললেন রঙ্গনাথন। পাশের ছোট ঘরটির দরজা খুলে ফেললেন। ঘরটিতে আবার দুখানি ঘর। একখানি ভাণ্ডার—তার ও পাশের খানি পূজোর। পূজার ঘরে সুন্দর একখানি সিংহাসনে বরদরাজ স্বামীর অনুকৃতি, তাঁর পাশে লক্ষ্মী—আর একটি আসনে—পিত্তলের নটরাজমূর্তি। নানান ধরনের সুশোভন সামুদ্রিক শঙ্খ—কড়ি ঝিনুক দিয়ে সাজানো। ফুল বিছানো। এই ঘরে—দেবতার সামনে মেঝের উপর—

For Accuracy in Weighing
BUY "ASW" BRAND
BALANCE AND WEIGHTS
Manufactured by

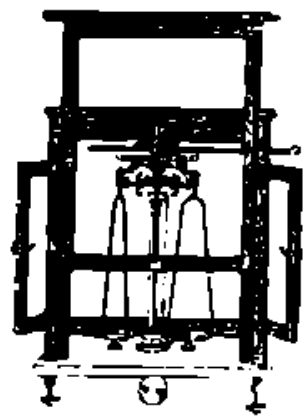

Sens.—1/10 MGM Cap.—200 GRAMS
ASIA SCIENTIFIC WORKS
78, SALKIA SCHOOL ROAD,
SALKIA, HOWRAH.
An institution of
BENGALI LABOUR AND BENGALI CAPITAL

লণ্ঠনের অস্পষ্ট আলোটা উস্কে দিয়ে শিয়রে রেখে দিলেন। মনে মনে বললেন—ওর অপরাধ কিছু নেই প্রভু। যদি অপরাধ হয়—তবে আমার। দণ্ড আমাকে দিয়ো। তুমি ওকে রক্ষা করো।

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে দরজা বন্ধ করে তালা বন্ধ করে দিলেন। তারপর ভাণ্ডার ঘর থেকে এ ঘরে এসে—দরজা বন্ধ করে আপন আসনে বসলেন।

মাথার ক্ষতে এতক্ষণে যেন যন্ত্রণা বোধ করছেন। ক্লান্তিও বোধ হচ্ছে। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে মনে মনে বললেন—হে বরদরাজ। হে বৈকুণ্ঠেশ্বর!

অন্ধকারটা যেন আস্তরের বাইরেই থামল। রঙ্গনাথন বুঝলেন—তাঁর অনুমান মিথ্যা হয় নি। যারা আসছিল তারা এখানেই এসেছে। কণ্ঠস্বরও শুনলেন—পনেরুচেট্টি।—আচার্য রঙ্গনাথন।

—আসুন।

ভিতরে এলেন কোতোয়ালীর কর্মচারী। অভিবাদন করে দাঁড়ালেন। রঙ্গনাথন উঠে বাইরে এলেন।—বলুন।

—মাননীয় শ্রীনিবাসন আমাদের পাঠালেন। বললেন—আচার্যের আশ্রম পাহারা দিতে হবে। সারা শহরে নানান গুজব রটেছে। বলছে, আচার্যের আশ্রম যে কোন মুহূর্তে আক্রান্ত হতে পারে।

—সে কি? কে আক্রমণ করবে? এবং কেনই বা করবে?

—যারা আক্রমণ করেছিল—এবং যে কারণে করেছিল তারাই করবে—সেই কারণেই করবে।

রঙ্গনাথন বিরক্ত হয়ে উঠলেন এবং চিৎকার করলেন।—না-না-না। এ ধারণা ভ্রান্ত। এ হতে পারে আপনারা যান।

—আমরা আদেশের দাস। স্থান ত্যাগের তো আদেশ নেই!

—বেশ, আমি স্থান ত্যাগ করছি।

—তা'হলে প্রভু, আমরা একজন আপনার সহগামী হব, একজন এখানে আপনার গৃহ রক্ষার জন্য থাকব। স্তম্ভিত হয়ে গেলেন রঙ্গনাথন। সারা চিত্ত বিদ্রোহী হয়ে বলে উঠল—এ কি অত্যাচার!

কর্মচারীটি বললে—শুধু তাই নয় আচার্য—মাননীয় শ্রীনিবাসন বলে দিয়েছেন যে, আপনি যেন এখন তাঁকে না জানিয়ে কোথাও গমন করতে পারেন না!

—কাঞ্জীভেরম এবং মহাবলীপুরম তাঞ্জোর-এ সব স্থান এখনও কোম্পানীর অধিকারের বাইরে। সেখানে নিশ্চয় এ আদেশ বলবৎ নয়।

—তা নয়। কিন্তু মাদ্রাজের এলাকা পর্যন্ত আমরা সঙ্গে থাকব। তারপর অন্য সীমানায় পা দিলেই আমরা ফিরে চলে আসব। আচার্য, জানেন না আমরা শুনে আসছি শহরে উত্তেজনা প্রবল। পাদরীরা উত্তেজিত হয়েছে তাদের উপর দোষারোপ করা হয়েছে বলে, হিন্দুদেরও শৈব যারা তারা উত্তেজিত হয়েছে—তাদের সন্দেহ করা হয়েছে বলে। আপনার গুণমুগ্ধেরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ—আপনার উপর আক্রমণের জন্য। ওদিকে প্রভু শ্রীনিবাসন কোম্পানীর বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছিলেন—তিনি আদেশ দিয়েছেন আক্রমণকারীদের সন্ধান করা চাইই। সারা শহরে লোক বেরিয়েছে খুঁজছে কোথায় গেল সেই পরম ভিখারিণী।

অসহায় অথচ তিক্ত কণ্ঠে রঙ্গনাথন বললেন তার জন্য আমাকেই গৃহবন্দীর মত আপনাদের প্রহরাধীনে বাস করতে হবে।

—না-না-না। আমরা আপনার আজ্ঞাধীন। আপনাকে রক্ষা করবার জন্যই এসেছি। আপনার মঙ্গলের জন্য।

আমি অত্যন্ত বিব্রত বোধ করছি। আমি মনে করি আমার শত্রু কেউ নেই। আমি কারুর শত্রু নই। রক্ষা আমাকে করেন এবং করতে পারেন একমাত্র আমার দেবতা আমার প্রভু শ্রীবরদরাজ।

কিসের যেন শব্দ উঠছে না? রঙ্গনাথন কথা বলতে বলতেও উৎকর্ণ হয়ে আছেন। প্রায় চেতনাহীন হয়ে পড়ে আছে লল্লা। তার তো নিজের উপর কোন সংযম নেই, সে তো জানে না এদের উপস্থিতির কথা।

কোতোয়ালীর কর্মচারী বললে—আচার্য জানেন না এমন কথা অনেক আছে।

দৃঢ় কণ্ঠে উষ্ণ হয়েই বললেন রঙ্গনাথন—সব কথা কেউ জানে না ভাই। ভাল—এখন আমার অনুরোধ—আপনারা কোন বৃক্ষতলে ছায়াতে বিশ্রাম করুন। আমার পূজার সময় হয়েছে। আমি পূজা করব। এ সময়—।

—নিশ্চয়। নিশ্চয়। তাই আমরা যাচ্ছি।

তারা বারান্দা থেকে নেমে গিয়ে ছায়াঘন একটি লতা-মণ্ডপের তলদেশে গিয়ে বসল।

রঙ্গনাথন ছোট ঘরটির প্রথম দরজা খুলে ভাণ্ডার ঘরে প্রবেশ করলেন। তারপর ঢুকলেন পূজার ঘরে! অসম্বৃত-বাসা লল্লা লুটিয়ে পড়ে আছে লতার মত। মুখে এখনও যন্ত্রণার ছাপ রয়েছে। তার একখানি হাত গিয়ে পড়েছে পূজোপকরণগুলির উপর। ছোট একটি ধূপাধারে ধূপশলাকা পুড়ছিল—সেটি পড়ে গেছে। হাতখানির চাপে—ধূপশলাকা নিভে গেছে। শঙ্খটি সম্ভবত এই জন্য হয়েছে। মৃদু কাতর শব্দ একটি মধ্যে মধ্যে বেরিয়ে আসছে শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে। রঙ্গনাথন নাড়ী দেখলেন। নাড়ী দুর্বল—কিন্তু আশঙ্কা করার মত কিছু নয়। একটু দুধ দিলে বোধ হয়—উপকার হত। ভোগের দুধ আছে। পূজাতে তাঁর আড়ম্বর নেই। অল্প কিছু ফুল-চন্দন-ধূপ-দীপ। আর ভোগ দুধ ও শর্করা এবং নারিকেল ও কদলী; ভোরের পূজা হয়ে গেছে। দ্বিপ্রহরের পূজার সামগ্রী সাজিয়ে তারপর তিনি সহানুভূতি-জ্ঞাপন-কারীদের সঙ্গে দেখা করেছেন। এখন দ্বিপ্রহরের পূজা কেমন করে করবেন? ভোগ না দিয়েই বা দুধ কেমন করে খাওয়াবেন লল্লাকে? লল্লা হাঁ করছে—জল চাইছে। চোখ মেলেও চাইলে একবার। চোখ রক্ত বর্ণ হয়ে উঠেছে। চোখের তারা দুটি যেন স্বচ্ছ। তিনি মৃদু স্বরে ডাকলেন—লল্লা।

লল্লা সাড়া দিলে না। আবার হাঁ করলে।

রঙ্গনাথন দেবতার চরণোদক নিলেন কুশীতে তারপর ঢেলে দিলেন তার মুখে। আবার সে হাঁ করলে, আবার, আবার। একবার আরক্ত চোখ মেলে বিভ্রান্তের মত লল্লা বললে—আঃ। তারপর তার দিকে তাকিয়ে বললে—বড় জ্বালা সর্বাঙ্গে।

বলেই আবার সে চোখ বন্ধ করলে। রঙ্গনাথন ভাবলেন একটু—তারপর সংকল্প স্থির করে—দেবতার সামনে থেকে একটু সরিয়ে পূজোপকরণগুলি আবার ঠিক করে নিয়ে বসে করজোড়ে বললেন—হে বরদরাজ। করুণাময়! যদি অপরাধ হয়, সে দণ্ড আমাকে দিয়ো। তোমার ভক্তিতে বিগলিত এই বালিকার প্রাণ রক্ষার জন্য তোমার পূজা করব সংক্ষেপে। এবং তোমার প্রসাদ দিয়েই ওর সেবা করব।

আবার লল্লা অস্ফুট স্বরে বললে—বড় দাহ, বড় জ্বালা।

শারদোৎসবে
বৃহত্তম
বিভাগীয় বিপনি
★
কমলালয় স্টোর্স
প্রাইভেট লিমিটেড
ধর্মতলা ষ্ট্রীট ঃঃ কলিকাতা-১৩

রঙ্গনাথন ভেবে নিলেন এক মুহূর্ত। তারপর আসন ছেড়ে উঠে ভাণ্ডার ঘরের কোনে রক্ষিত বড় মাটির কলসী থেকে বড় ভৃঙ্গার পরিপূর্ণ করে নিয়ে এসে বসলেন। আচমন করে—সংক্ষেপে প্রাথমিক কৃত্যগুলি সেরে—ভৃঙ্গারের জল নিয়ে উচ্চ কণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণ করে দেবতার মাথায় কুশীতে করে জল ঢেলে গোটা ভৃঙ্গারটি নিয়ে উঠে এসে লল্লার শিয়রে বসে আবার উচ্চ কণ্ঠেই উচ্চারিত মন্ত্রের সঙ্গে তার সর্বাঙ্গে জল ধারার অভিষিক্ত করে দিলেন।

আত্রেয়ী ভারতী গঙ্গা যমুনা চ সরস্বতী।
সরযূর্গণ্ডকী পুণ্যা শ্বেতগঙ্গা চ কৌশিকী॥
ভোগবতী চ পাতালে স্বর্গে মন্দাকিনী তথা।
সর্বা দুমনসো ভূত্বা ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তু তাঃ॥
সিন্ধু-ভৈরব-শোনাদ্যা যে হ্রদা ভুবি সংস্থিতা।
সর্বে দুমনসো ভূত্বা ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তু তে॥
লবনেক্ষু—সুরাসর্পি র্দধিদুগ্ধ-জলাস্রকাঃ।
সপ্তৈতে সাগরাঃ সর্বে ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তু তে॥

অভিসিঞ্চনের স্নিগ্ধতায় লল্লার দেহের জ্বালা যেন জুড়িয়ে গেল। সে আবার চোখ মেলে চাইলে। মৃদু স্বরে বললে—আরও। আঃ।

আবার এক ভৃঙ্গার জল এনে দেবতার চরণ স্পর্শ করিয়ে নিয়ে মন্ত্রোচ্চারণ করে তাকে স্নান করিয়ে দিলেন। লল্লার ধূলি-ধূসরতা ধুয়ে গেল—শুষ্কতাও মুছে গেল খানিকটা। সে আবার মৃদুস্বরে বললে—আঃ।

এবার পূজা সারলেন রঙ্গনাথন। লল্লার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগস্পর্শ না থাকলেও তার অস্তিত্বের স্পর্শ—রঙ্গনাথন অনুভব করেও নিজেকে অশুচি মনে করলেন না। পূজা সেরে ভোগ নিবেদন করে—দুধটুকু নিয়ে তিনি লল্লার মাথার গোড়ায় বসে মৃদু স্বরে ডাকলেন—লল্লা।

লল্লা চোখ মেলে চেয়ে বললে—এ্যাঁ। তারপর সকৃতজ্ঞ হেসে বললে—প্রভু।

—দুধটুকু খাও তো? হাঁ কর - আমি ঢেলে দি! হাঁ কর।

লল্লা কিন্তু হাতে ভর দিয়ে উঠতে চেষ্টা করলে। একটু উঠেই সে সভয়ে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল। তিনি এক হাতে লল্লার মুখ চেপে ধরে বললেন—চুপ কর লল্লা। বাইরে কোতোয়ালীর লোক—

থর থর করে কাঁপছে লল্লা। ফিস্ ফিস্ করে বললে—আমি শবর কন্যা, পূজার ঘরে—।

—চুপ কর। না-হলে উপায় ছিল না। দেবতা তাতে রুষ্ট হন নি। তিনিই তোমাকে রক্ষা করবেন। আমি বলছি। খাও। তুমি খাও। ওদের অনেক অর্থ দেওয়া নেওয়া করে বৃক্ষতলে বসিয়ে রেখে এসেছি। তুমি সুস্থ হয়ে ঘুমোও। আর ভয় নেই। এবার সুস্থ হয়ে উঠবে। শুধু শব্দ করো না।

বেরিয়ে দরজা বন্ধ করে রঙ্গনাথন বেরিয়ে গেলেন। লল্লা হাত জোড় করে বজ্রযোগিনীর ক্ষুদ্র অনুকৃতিটির দিকে তাকিয়ে বসে রইল। কিন্তু একটু পরেই আবার ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল।

রঙ্গনাথন বাইরে এসে দেখলেন প্রহরী দুটি বৃক্ষছায়াতলে সমুদ্রের আর্দ্রবায়ু স্পর্শে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। তিনি ওপাশের রান্নাঘরে রান্না ঘরে রান্নার আয়োজনে বসলেন। এ বাড়িতে তিনি একাই বাস করেন। এ পর্যন্ত কোন দিন শত্রুর ভয় তিনি করেন নি। রমনী-

শারদীয় পূজায় বিভিন্ন রকমের
রুচি সম্পন্ন রেডিমেড পোষাকের
বিপুল আয়োজন

★ ★
★

VIJOY GARMENTS PRIVATE LIMITED
6, DHARAMTALLA STREET,
CALCUTTA-13.
Phone : 23-5670

হীন সম্পদহীন গৃহ, থাকবার মধ্যে দুটি দুগ্ধবতী গাই। তা নিয়েও চোরের ভয় ছিল না। নিজেও সুস্থ সবল দেহ যুবা। বারোমাসি কর্মের পরিশ্রমে অভ্যস্ত। বৈষ্ণব গুরুর আশ্রমে এবং সঙ্গীত শিক্ষক আচার্যের গৃহে শ্রম-সাধ্য কর্মে তাঁদের সাহায্য করতেন। কুড়ুল দিয়ে কাঠ-চেলানো এবং নিজ হাতে কুপিয়ে বাগান করা ছিল তাঁর প্রিয় কর্ম। জলও তুলতেন কূপ থেকে। এখানে নিজের আশ্রমে এখনও কাজগুলি অবসর মত করে থাকেন। পরিচারক বন্ধু কুড়ুনির কর্মের লাঘব করে দেন। বন্ধু পরিচারক কুড়ুনির পাশের গ্রামেই বাড়ি। সে রাত্রে বাড়ি যায়, সকালে আসে। গরুদুটির পরিচর্যা করে। শহর থেকে প্রয়োজন মত জিনিসপত্র আনে। তিনি গানের নিমন্ত্রণে বাইরে গেলে সে অবশ্য এখানেই শোয়। আজ ভোর বেলাতেই তিনি তাকে পাঠিয়েছেন—তিরু আন্নিকেনি—পার্থসারথি মন্দিরে। সেখানে আজ পূর্ণিমায় তাঁর গানের কথা ছিল। দুর্ঘটনার কথা জানিয়ে মার্জনা চেয়েছেন রঙ্গনাথন। সংবাদ হয় তো তারা পেয়েছেন, কিন্তু তবু তাঁর দিক থেকে তিনি জানিয়েছেন। তাঁর দলের যন্ত্রীরা কজন কাল রাত্রে এখানে থেকে সকালে আপন আপন বাড়ী চলে গেছে। নিরীহযন্ত্র শিল্পী—তারা ভয়ও পেয়েছে। তাদের বাড়ি সব এই দিকেই কাছাকাছি পল্লীতে। বন্ধুকে না পাঠিয়ে উপায় ছিল না।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন রঙ্গনাথন। ভাগ্যে বন্ধু এখানে ছিল না। থাকলে তার চোখ এড়িয়ে বেচারা লল্লা—ওই পোষাকের মধ্যে আত্মগোপন করতে পারত না। কোতোয়ালীতে তার লাঞ্ছনার সীমা থাকত না। আজ তার চেয়ে এই বৃশ্চিক বিষ জ্বালাও তার পক্ষে অনেক ভাল।

বরদরাজ তাকে রক্ষা করেছেন। তাঁর পায়েই তাকে তিনি রেখে এসেছেন।

আবার তিনি বললেন—এবার স্ফুট কণ্ঠেই বললেন—হে বরদরাজ! তুমি পতিতের ভগবান! আজ তোমার চরণে তার আশ্রয় নেওয়ার যদি অপরাধ হয়ে থাকে—তবে সে অপরাধ আমার। তার নয়। দণ্ড দিতে হলে আমাকে দিয়ো! তুমি অন্তর্যামী, তুমি জান—তোমার জন্য তার কত আকুতি! তুমি তাকে রক্ষা কর!

* *

বরদরাজস্বামী—পতিতের ভগবান। বিপন্নের রক্ষক! অনন্ত করুণার আধার! রঙ্গনাথনের উপলব্ধি মিথ্যা নয়! তিনি সঠিক সত্যকেই উপলব্ধি করে গান রচনা করেছিলেন—"যিনি বসবাস করেন বৈকুণ্ঠে তিনিই বাস করেন পরর-পল্লীতে, সকল পতিত পল্লীতে—ওই ওদের মধ্যে—ওদের কৃষ্ণচর্মের অন্তরালে। কৈলাসে যিনি বাস করেন ভবানীপতি—তিনিও আছেন ওদের মধ্যে। ওদের কৃষ্ণচর্ম দেখে যদি তোমার ঘৃণা হয়—ওদের পল্লীর অপরিচ্ছন্নতার কটু পঙ্কে যদি তোমার দিধা হয় কাছে যেতে তবে তোমার জানা হবে না তাঁকে। ব্রাহ্মণ তনয় তুমি ব্রহ্মাভিলাষী,—ক্রোধে—ঘৃণায়—অহংকারে—শিক্ষার মধ্যে তোমার জানা হয় নি ব্রহ্মকে। আমি নারী—আমার ধর্মে আমি অধিষ্ঠিতা। আমার যিনি পতি তিনি শুধু আমার পূজ্যই নন—তিনি আমার প্রিয়—প্রিয়তম। তাঁর সেবা আমার ধর্মই শুধু নয়—সেই আমার জীবনধর্ম—সেই আনন্দ—যার স্বাদে আর ব্রহ্মের স্বাদে

With Compliments from

Nadia Scientific Company

19, Goabagan Street,
Calcutta-6.

GLASS BLOWERS AND MAKERS OF BEST QUALITY GLASS APPARATUS AND INSTRUMENTS FROM PYREX, SIGCOL & OTHER HEAT RESISTANT GLASSES

Accuracy of graduations :

Suppliers to :
Technical laboratories, College & H.S. Schools.

প্রভেদ নেই। তুমি তাতে আমার উপর ক্রুদ্ধ হলে। সে ক্রোধে ক্ষতি হয় নি, হবে না আমার। সুতরাং তোমার পরমসত্য পরম গুরুকে জানা সম্পূর্ণ হবে—ব্যাধ পক্ষীতে —ব্যাধধর্মে অধিষ্ঠিত ধর্মব্যাধের কাছে। ঘৃণা করো না, নাসিকা কুঞ্চন করে প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে যেয়ো না। প্রবেশ করো। তুমি কি জানো—ভবানীপতি মহারুদ্র কিরাত রূপেই দেখা দিয়েছিলেন তপস্যা-পরায়ণ অর্জুনকে! অর্জুন কিরাত বলে অবজ্ঞা করেছিল—ঘৃণাও করেছিল—কিরাতরূপী ভগবান তার সে শক্তির অবজ্ঞা চূর্ণ করেছিলেন—তার বুকে একটি মুষ্ট্যাঘাত করে, ঘৃণাকে উপহাস করেছিলেন—অর্জুনের ইষ্টকে নিবেদন করা মাল্যখানি তাঁর কণ্ঠে ধারণ করে। হিমগিরির কাঞ্চনজঙ্ঘার স্বর্ণ ছটার প্রতিভাত—স্বর্ণকান্তি কিরাত নীল গিরিতে যখন আসেন তখন তিনি নীল সমুদ্র লাবণ্যে অবগাহন করে হন নিবিড় নীল কান্তি।"

অপার বরদরাজের করুণা। এবং হয় তো—আশ্চর্য সত্য—তাঁর উপলব্ধি। লল্লা যেন রহস্যের মহিমা দেখিয়েই গভীর রাত্রে ঘুমন্ত প্রহরীদের ব্যঙ্গ করে অন্তর্হিতা হয়ে গেল।

অপরাহ্নে সুস্থ হয়ে উঠেছিল লল্লা। এবং কেঁদেছিল। তাঁকে বলেছিল—আর নয়—এবার আমার জ্ঞান হয়েছে—আমি দুষ্ট হয়েছি; প্রভু, এ পূজা-মন্দিরে আতুর বলে• চেতনাহীনা আমার যে অধিকার ছিল—সে আর নেই। আমার অপরাধের জন্য আমি ভাবি না প্রভু; রাজ-প্রতিনিধির শাস্তি-লাঞ্ছনাকেও আমার ভয় নেই। আপনি আমাকে বের করে প্রহরীদের হাতে সমর্পণ করুন! প্রভু!

রঙ্গনাথন বলেছিলেন—না!

—আমার জন্য বরদরাজ আপনার উপর রুষ্ট হবেন! আপনার তপস্যা—

বাধা দিয়ে রঙ্গনাথন বলেছিলেন—আমার তপস্যা এতেই পূর্ণ হবে কল্যাণী। তুমি লল্লা নও, কলাবন্তী নও তুমি কল্যাণী। তুমি থাক। দেবতার মহিমার মত তুমি এই ঘরে থাক। মিথ্যা বলব না কল্যাণী—আমি যে বরদরাজের করুণাঘনা মহিমাকে আজ প্রত্যক্ষ করছি আমার পূজার ঘরে! কিন্তু আর কথা বলো না। ওরা এখনও সন্দেহের অবকাশ পায় নি। এরপর কখন কোন মুহূর্তে সন্দেহ করে বসবে। এই প্রভুর প্রসাদ রইল—দুধ—শর্করা—কদলী। খেয়ো। দুর্বল হয়েছ—বল প্রয়োজন।

—কিন্তু কতদিন রাখবেন প্রভু—?

—ওই ওঁকে প্রশ্ন কর।

—যদি আমার অস্তিত্ব ওরা জানতে পারে তবে—আপনাকে যে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হবে। প্রভু—না—

—চুপ। তারপর স্মিত হেসে বলেছিলেন—সেই লাঞ্ছনায় আমার তপস্যা পূর্ণ হবে লল্লা।

লল্লা শব্দটির মধ্যে সংগীত আছে। শব্দটি আপনি বেরিয়ে এসেছিল কল্যাণীর পরিবর্তে! তিনি বাইরে এসে বীণা বাজিয়ে গান করেছিলেন এরপর। ওই গান।

প্রহরী দুটি বিভোর হয়ে শুনেছিল। কুড়ুমণি বাড়ী যেতে যেতেও যেতে পারে নি। কুড়ুমণি পার্থসারথি মন্দির থেকে ফিরে এসেছে একটু আগে। বৃদ্ধ মানুষ তার উপর একটু পেটুক সে। সেখানে প্রসাদ পেয়ে দুপুরে বিশ্রাম করেছে। তার উপর নদী পার—আদিয়ার নদী পার হতে দেরী হয়েছে। ফিরবার পথেই সে বাড়ী যাবার জন্য ব্যস্ত হয়েছিল। তাকে এবং প্রহরী দুটিকে তাদের রাত্রের খাবার দিয়ে তিনি বীণা নিয়ে বসেছিলেন। তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন গানে। তাঁর নিজের চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়েছিল—প্রহরী দুটি বার বার চক্ষু মার্জনা করেছিল—কুড়ুমণি ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল। তিনি যেন অনুভব করেছিলেন পূজার ঘরেও লল্লা কেঁদেছিল শুয়ে শুয়ে। রাত্রির প্রথম প্রহর পার হয়ে গেলে বীণাটি তিনি রেখে তাঁর শয্যার উপর—শুয়ে পড়েছিলেন। কান পেতে ছিলেন—নিদ্রা তাঁর আসে নি—লল্লার সাড়ার জন্য। লল্লা কি ঘুমিয়েছে? ঘুমন্ত অবস্থায় গভীর দীর্ঘায়িত শ্বাস প্রশ্বাস উঠছে কি? কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রহরী দুটির মৃদু নাসারব উঠতে সুরু করেছিল। কুড়ুমণির নাসা গর্জন—প্রবল। লল্লা কি এখনও জেগে? কই? তার শ্বাস প্রশ্বাস তো গভীর হয়ে ওঠে নি। উঠে গিয়ে দেখতেও সাহস হয় নি। কি জানি—কখন কে জেগে উঠবে। সন্ধ্যার ভোগ ও দীপারতির পর দেবতার শয়ন হয়—তারপর সে দ্বার প্রভাত পর্যন্ত খোলা হয় না। দরজা খুললে যদি শব্দে জেগে ওঠে। দরজা তিনি তালা বন্ধ

আজ করেন নি এই জন্যই। ভেজানো আছে। তবু—যদি দেখে, শব্দ হয়। রাত্রে প্রহরী দুটিকে গাছতলা দেখিয়ে দিতে পারেন নি। তারা বারান্দার পুবে।

এরই মধ্যে তাঁরও তন্দ্রা এসেছিল। হঠাৎ পায়ে কিছুর স্পর্শে তিনি জেগে উঠেছিলেন। চোখ মেলে চেয়ে দেখে তিনি যেন পাথর হয়ে গেলেন। লল্লা। লল্লা তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করছে। সে বেরিয়ে এসেছে ঘর থেকে। তাঁর কণ্ঠ থেকে একটা চীৎকার বেরিয়ে আসতে চেয়েও পথ পেলে না। কে যেন তাঁর কণ্ঠ রোধ করে চেপে ধরেছে। লল্লা কিন্তু দাঁড়াল না, কোন কথাও বললে না—প্রণাম করেই লঘু পদে ঘর থেকে বেরিয়ে ঘর এবং বারান্দার মাঝের দরজায় ক্ষণেকের জন্য দাঁড়াল; বাইরে পূর্ণিমার পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না, দুগ্ধ-শুভ্র স্বচ্ছতায় প্রকৃতি যেন ক্ষীরসমুদ্রে অবগাহন করে অমল ধবল স্পষ্টতায় স্পষ্ট; অদূরবর্তী সমুদ্রে পূর্ণিমার জোয়ার উঠেছে। তরঙ্গাঘাতের শব্দের সঙ্গে কল্লোলধ্বনি উঠেছে। লল্লা মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে—বোধহয়—বারান্দার ঘুমন্ত তিন জন মানুষকে দেখে নিয়ে সন্তর্পিত লঘু পদক্ষেপে—তাদের পাশের খালি জায়গার উপর দিয়ে—এঁকে বেঁকে বেরিয়ে নেমে গেল বারান্দা থেকে। উদ্যানে জ্যোৎস্নার মধ্যে ওকে স্পষ্ট দেখলেন। লঘু দ্রুত পদে লল্লা উদ্যান প্রবেশ মুখে আম্র প্রবেশের কটকে গিয়ে দাঁড়াল। সেও ক্ষণেকের জন্য—তারপর সে বেরিয়ে দৃষ্টির অন্তরালে যেন অদৃশ্য হয়ে গেল।

এতক্ষণে তাঁর স্তম্ভিত চেতনা ফিরল তড়িতাহতের মত। তিনি চীৎকার করতে চাইলেন—লল্লা! কিন্তু সংযত করলেন নিজেকে। এবং উঠে ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। এই গভীর রাত্রি, এই রাত্রে একা কিশোরী লল্লা কোথায় যাবে? মাৎস্যন্যায়ের কাল। রাজশক্তি সারা দেশে ভেঙে পড়েছে। গ্রামে গ্রামে হিংসক চোর ডাকাত লম্পট যুবার বেড়ার দল বেঁধে। শহরে কোম্পানীর তেলেঙ্গী সিপাই, গোরা সিপাই মদ খেয়ে সমুদ্রতটে হল্লা করে। ধনীর উদ্যান বাটিকার মত্ত কণ্ঠের স্খলিত বাক্য, তাল ছন্দ-কাটা বেসুরে ধ্বনি নটরাজের অপমান করে। ভগবানের পৃথিবীতে ধ্বনি মধ্য ভগবানের অঙ্গে নিক্ষিপ্ত হয় অশুচি আবর্জনা—এই রাত্রে ও যাবে কোথায়? তার উপর আজ সারাটা দিন বৃশ্চিক বিষে আচ্ছন্ন হয়ে ছিল—মৃত্যু যন্ত্রণার মত যন্ত্রণা ভোগ করছে—ও যাবেই বা কতদূর? দ্রুতপদে তিনি আশ্রম থেকে বেরিয়ে এলেন। কই—কোথায় লল্লা?

জ্যোৎস্না প্লাবিত পৃথিবী; গাছের তলদেশে শুধু অন্ধকার। তিনি তাকালেন—লল্লাদের গ্রামের পথের দিকে। কই? সারা বালুময় পথটা জ্যোৎস্নায় ঝিকঝিক করছে। শূন্য পথ। মাদ্রাজ যাবার পথের দিকে চাইলেন। সে দিকেও তাই। অনেক দূরে শহরের দুটো পাকা বাড়ী দেখা যাচ্ছে। আলো জ্বলছে শহর দেশে। বহু দূর থেকে ভেসে আসছে কয়েকটা কুকুরের চীৎকার। কিন্তু লল্লা কই? নেই তো! পূর্ব দিকে সমুদ্রবেলা। তবে কি এদিকে গেল? ছুটে এগিয়ে গেলেন তিনি। উচু বালুর বালিয়াড়ি ক্রমশ নিম্ন-ভূমিতে নেমে গেছে। তার পরই তাল নারিকেল সুপারি বনের সারি পূর্ণিমার চাঁদ মধ্য গগনে, গাছ-গুলির ছায়া তাদের পায়ের তলায় জমেছে ঘন হয়ে—মধ্যে মধ্যে পত্র-পল্লবের ফাঁক দিয়ে গড়া টুকরো টুকরো জ্যোৎস্না দীর্ঘ রশ্মিভল্লের মত ওই ছায়াকে বিদ্ধ করছে। বায়ু তাড়নায় পল্লব আন্দোলনে যেন উৎক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত হচ্ছে। হাঁ ওই যে—ওই চঞ্চল দোলায়মান জ্যোৎস্নার খণ্ডগুলি কখনও একটি মনুষ্য-মূর্তির মাথায় কখনও পিঠে কখনও পায়ে পড়ছে। তার আভাষ—সর্বাঙ্গ আভাসে—ছায়া মূর্তির মত দেখাচ্ছে। লল্লা চলেছে—ওই নারিকেল তালের সারির কোল ঘেঁষে ওরই ছায়ায় আত্মগোপন করে চলতে চাচ্ছে।

তিনি আবারও চীৎকার ক'রে ডাকতে গিয়ে থেমে গেলেন। প্রহরীরা জেগে উঠবে। তিনি নিজেই ছুটলেন। এসে দাঁড়ালেন নারিকেল তালের সারির মধ্যে। সামনে সমুদ্র পূর্ণিমায় উত্তাল জোয়ারে উচ্ছ্বসিত। আঘাতের পর আঘাত করছে তটভূমিতে, এক একটা বৃহৎ উচ্চ তরঙ্গ আছড়ে পড়ে এই গাছগুলির তলদেশ পর্যন্ত চলে আসছে। একটা তরঙ্গ তাঁর পা ভিজিয়ে দিল।

ওই চলেছে লল্লা। ওই। টুকরো টুকরো আলোর মধ্যে—রহস্য মূর্তির মত দেখা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। তিনি

আবার ছুটলেন দক্ষিণ মুখে। ওই মুখেই লল্লা চলেছে, দন্তবত মহাবলীপুরম-এর দিকে।

খানিকটা গিয়ে আবার তিনি দাঁড়ালেন। কতদূরে লল্লা! লল্লা, দেওনা, এত দূর পথ—তুমি দুর্বল—তুমি যুবতী, এই গভীর রাত্রি। লল্লা, তুমি দাঁড়াও। কিন্তু কই? আর তো দেখা যাচ্ছে না!

দলপ উচ্চকণ্ঠে তিনি ডাকিলেন—লল্লা!

সমুদ্রে কলরোলে ঢাকা পড়ে গেল। একটা ঢেউ আবার আছড়ে পড়ে এগিয়ে এসে তাঁর পা ডুবিয়ে দিল। আবার অগ্রসর হলেন। ডাকলেন—লল্লা!

এবার চোখে পড়ল—নারিকেল নারির ছায়ার মধ্যে সকারমান জ্যোৎস্নার একটি কালি তাঁকে দেখিয়ে দিল—একটি নারিকেল কাণ্ডে ঠেস দিয়ে বসেছে লল্লা। তার দেহের কাপড়ের কয়েকটি অংশ স্পষ্ট হয়ে উঠল। লল্লা বসেছে। ক্লান্ত হয়ে বসতে বাধ্য হয়েছে। এ কি, এলিয়ে পড়ল যেন!

দ্রুতপদে তিনি এগিয়ে গেলেন। হ্যাঁ, লল্লা নারিকেল গাছের তলায় কাত হয়ে শুয়ে পড়েছে। একটু নত হয়ে তিনি ডাকলেন—লল্লা!

চমকে উঠল লল্লা!—কে?

—ভয় নেই লল্লা, আমি।

—প্রভু! আপনি! সে আবার স্থির হল! একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—ভেবেছিলাম—পারব চলে যেতে। কিন্তু পারছি না! বড় দুর্বল বোধ হচ্ছে।

—কেন চলে এলে লল্লা? ছি—ছি—ছি! রঙ্গনাথন বসলেন তার শিয়রে। মাথাটি তুলে নিলেন—কোলে। —তুমি বেরিয়ে এলে—আমি তোমাকে—কথা বলতে পারলাম না—ওরা জেগে উঠবে বলে! তার ললাটে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন—দেখি তোমার নাড়ী।

মণি বন্ধটি হাতে নিয়ে পরীক্ষা করে বললেন—দুর্বল! এই দুর্বল অবস্থায়—কি করলে বল তো।

লল্লা চুপ করে রইল শিষ্ট বালিকার মত।

রঙ্গনাথন ভাবলেন—কি করবেন, একে নিয়ে? মহাবলীপুরম অনেক দূর। মাদ্রাজ—তার নিজের গ্রাম—তার জন্য বন্ধনরজ্জু আর নির্যাতনের দণ্ড ধরে বসে আছে। জ্যোৎস্নার একটি মোটা টুকরো এসে পড়ল তাঁদের উপর। তিনি দেখলেন—লল্লা এক দৃষ্টে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। মুহূর্তে তাঁর দৃষ্টিও নিবদ্ধ হয়ে গেল লল্লার মুখের উপর। লল্লার চুল একরাশি এবং সেগুলি ঘন কুঞ্চনে কুঞ্চিত! চোখ দুটি আয়ত, প্রশান্ত—প্রসন্ন। শুভ্রচ্ছদ দুটি—মুক্তাগর্ভ শুক্তির ভিতর দিককার মতই নীলাভ শুভ্র—গাঢ় কালো মুক্তার মতই তারা দুটি টল টল করছে—চন্দ্রালোকে দীপ্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

লল্লা বোধ হয় সচেতন হয়ে উঠল তাঁর দৃষ্টিতে। সে চোখ বুজলে। রঙ্গনাথন ডাকলেন—লল্লা।

—প্রভু।

—কি ভাবছিলে লল্লা? বলতে পারলেন না—কি দেখছিলে লল্লা, আমার দিকে তাকিয়ে? কণ্ঠস্বর তাঁর গাঢ় হয়ে এসেছে। একটা উত্তাপ যেন তাঁকে উত্তপ্ত করে তুলছে।—একটা মাদকতার ক্রিয়ার মত ক্রিয়া তাঁকে যেন আচ্ছন্ন করছে। দেহের শিরায় রক্তের প্রবাহে—মাথার স্নায়ুর মধ্যে কি যেন উষ্ণতা; কিছু যেন, সমস্ত চিত্ত আচ্ছন্ন করার মত তীব্র একটা কিছু বয়ে যাচ্ছে। মুদ্রিত-চক্ষু লল্লার ললাটে জ্যোৎস্নার প্রতিবিম্ব ফুটেছে। ললাটে হাত বুলিয়ে দিয়ে আবার ডাকলেন—লল্লা। লল্লার ললাট শীতল।

চোখ বুজেই অতি ক্ষীণ হেসে সে উত্তর দিল—ভাবছিলাম আপনিই আবার সাক্ষাৎ বজ্ররাজস্বামী।

আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে গেলেন রঙ্গনাথন। গভীর স্নেহে মুখটি আনত করে হঠাৎ থামলেন। আপন মুখের উপর তাঁর উষ্ণ নিশ্বাসের স্পর্শে চোখ মেললে লল্লা। বিস্ফারিত চোখে বললে—প্রভু।

রঙ্গনাথন উত্তর দিলেন না, বিরত হলেন না, তার ললাটে একটি চুম্বন দিয়ে বললেন—এ তোমার বজ্ররাজের আশীর্বাদ।

একমুহূর্তে কেঁদে আকুল হয়ে পড়ল লল্লা। শুধু বাক্যহীন রোদন।

রঙ্গনাথন তার কাঁধ ধরে একটু আকর্ষণ করে বললেন—ওঠ। পারবে উঠতে?

মন্ত্রমুগ্ধার মতই লল্লা উঠল। রঙ্গনাথন বললেন—

[৭১৩ পৃষ্ঠায় দেখুন]

পূজায় প্রমোদ ভ্রমণ

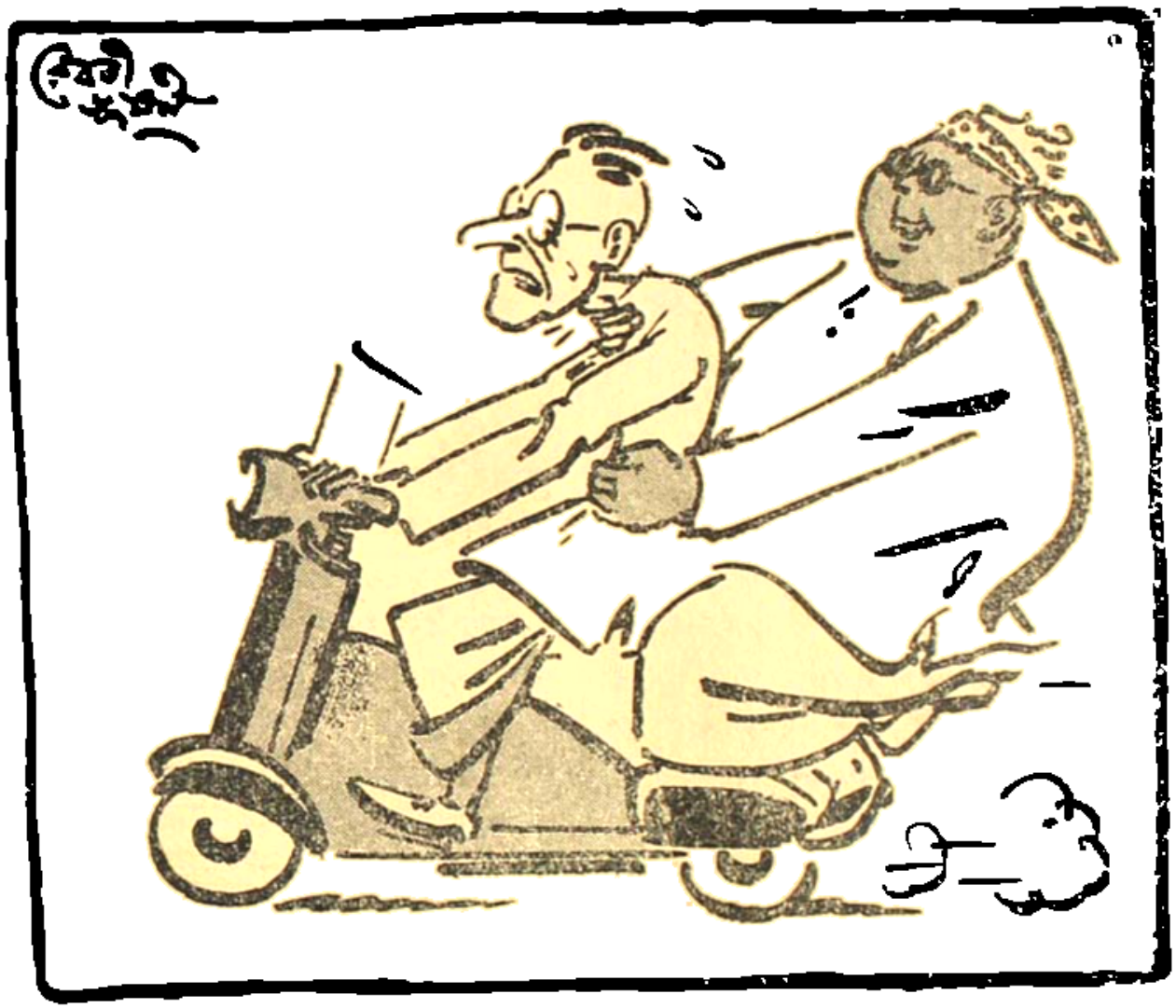

শিল্পী : রেবতীভূষণ

উড়োপাতা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

দমকা হাওয়ার ঝাপটায়
দেকে থেকে ঘরের কাগজ পত্র সব ওলট পালট
মনের ভেতরও তাই।
ভাবনাগুলো জানা না বাঁধতেই
যাচ্ছে তছনছ হয়ে।
এলোমেলো কথা,
দূরের ওই অশ্বত্থগাছের ডালপালা পাতার মতই
উদ্ভ্রান্ত হয়ে কাঁপছে সব বাঁধন যেন ছিঁড়তে।
একটা খসা পাতা খোলা জানলা দিয়ে
জানলা দিয়ে উড়ে এল ঘরে।
ঘুরপাক খেল খানিক মেঝের ওপর
এদিক ওদিক ছুটে বেড়াল বার কয়েক
আমার সঙ্গে তামাসা করতেই বুঝি।
তারপর আরেক ঝাপটায়—
হঠাৎ যেন পাখা মেলে উড়ে গেল
অন্য জানলা দিয়ে।
কি চাল কে জানে!
খাতার পাতা বন্ধ করে কলম রাখলাম তুলে।
ঘর পুছোরার দরকার নেই আর,
—মন ও।
বুঝলাম, সব কাজ ফেলে
খোলা চওয়ার জন্যেও
জানলা খুলে রাখতে হয় কখনো কখনো,
আচমকা কোন অভাবিতের কৌতুক
সাজানো গোছানো সব ছকের ঘুঁটি
উল্টে দেবে,
তারই প্রত্যাশায়।
উড়ো পাতা-ই সেই ছুটির আকাশের দূতী।

তবু দেখি

বিষ্ণু দে

তবু দেখি দীর্ঘজীবি মানুষের দীর্ঘ ইতিহাস,
যেখানে বন্ধুর অসংলগ্ন মৃত্যুময় পাথরের স্তূপ
আর কাঁটা ঝোপ, লতা, সংশয়, সন্ত্রাস,
আকাশে মসৃণ আঁকে আগামী নীলিমা
সূর্যোদয়ে, সূর্যাস্তেও, আল্‌পনার পদক্ষেপে স্থির অপরূপা।
সেইখানে সহিষ্ণুতা সৃষ্টি করে প্রত্যাশার সীমা।

তবু রুক্ষ দীর্ঘজীবী সূর্যের হুঙ্কারে দেখি দূর
প্রান্তর, নদীর ছটা, খোদাই সবুজ শালবন।
অগ্নিময় রক্ত, স্নায়ুশূন্য রৌদ্রে মমতার তাপে
কেঁপে কেঁপে সূর্যকেই ফিরে দেয় আলোর স্পন্দন।

দেখি, পাহাড়ের নীলা গ'লে যায় ক্ষণিক সন্তাপে
আর স্তব্ধ রুদ্ধ এক প্রতীক্ষায় চেয়ে থাকে
অনাঘ্র নূপুর।
কখন গোধূলিলগ্ন রাত্রি পাবে আর অবচেতন বিকাশে
কখন সে স্বচ্ছ হবে, নিদ্রিত নীরব হবে অস্থির নূপুর,
ভোরের বিভাসে পূর্ণ পল্লিত শান্ত হবে
পৃথিবীর মানবিক সব অভিলাষ।

এ দিকে | সুভাষ মুখোপাধ্যায়

ওদিকে প্রচণ্ড তর্ক 'এটা ঠিক' 'না, এইটে ঠিক' ব'লে
ঘন ঘন উঠছে নাচছে তাপমান যন্ত্রের পারদ।
কিন্তু তালের লোক তাল বুঝে কত্তালে শ্রীখোলে
লেগে—যা লেগে—যা বোলে মন তুলছে : নাচুন নাচুন।

এদিকে রাস্তার ধুলো ভাসাতে ভাসাতে বসন্তলাল নামে :
চলে যায় উদাত্তে উদাত্তে কিংকর্তব্যবিমূঢ় স্ত্রীবিহীনে
কাপড়ের দোকানগুলো। চা হুইস্কি। লক্ষিণে ও বামে।
ছিঁড়ে যায় শুঁড়ি ছুঁড়ি গণতন্ত্রের পুরনো পাশবিতে।
বাজল, এ কোরাস শেষ।

'আমার এ গানের বাসর
সবোদেশি লিতে পারবে : ঘটেই সে বানাত প্রতিমা
লোকে ছেলে দিত কলা। বারোমাস এই বাঁশি ছক।
এতদিন ধুলোয় ব'সে ব'সে পড়ল গায়ে লিখে নিয়া
পাশের পল্লিতে—
যেখানে দাঁড়িয়ে পাশে সুশীলা—ফুশিলা।
ভাল ক'রে নোড়ে চেড়ে দেখল ভারি সুন্দর বানানো
ঈশ্বরের জীব।
ফিরে এসে বানাল সে পতুল রঙিলা—
ঘরে কাটল. উপরন্তু ঘরে রইল ঘরে ঘরে। জানো?

থামো থামো। শেষে কিনা এই গল্প। ওহে, ব'সে পড়ো।
বুঝেছ? আসলে মোদ্দা হল গিয়ে চোখের ঠুলির।
কেন না সমস্যাগুলো ওর চেয়ে ঢের ঢের বড়:
পৃথিবীর মানচিত্রে নামও নেই কুমোরটুলির।

আসলে যে চরিত্রটা নিয়ে এত কাণ্ড, এত গলাবাজি
সে কিন্তু সমস্ত বোঝে এবং সে বাজারেও যায়
থলি হাতে। পৃথিবীকে ঠেলে সাজতে সেও খুব রাজী।

ভোর হবে। তাই এই অন্ধকার ব্যথায় মোচড়ায়।

তারা শুধু বোঝে

বিমলচন্দ্র ঘোষ

মানুষ যে কত বড়! মানুষকে সে কথা বোঝাতে
অনেক সময় লাগে। যে মানুষ নরে অস্ত্রাঘাতে
অস্ত্র সে নিজেই গড়ে। গাধার মাংস বর্ষাগাধা,
খাস্ত ব্রহ্ম রূপে তার নিশ্রেয়স চিড়িয়াখানাতে
বাঘের সিংহের পেটে, ঠিকাদারী চুক্তির সমাধা!

পোকা-খোটা পাখিদের দুঃসাহস কুমীরের দাঁতে
দেখেছি মাতলার চরে, কুমীর পারে না হাঁ বোজাতে
কারণ আরাম পায়, হিংসা তার কোনো নাকে-কাঁদা
মানে না: চুপ কোরে থাকে ক্ষয়িষ্ণু দাঁতের যন্ত্রণাতে
পাখিরা প্রমূর্ত সুখ। মেশে তাই কাঁচ কলায় আদা।

কৌটিল্য-কুটিল আত্মরক্ষা আর আক্রমণে ভরা
ইতিহাসে মানুষ যে হতে পারে বিমুক্ত-সংস্কার,
মরতে মরতে মারমুখো জীবন যাদের রক্তকরা
তারা শুধু বোঝে যারা দু'পায়ে নাড়ায় অন্ধকার।

বিকেলের নদী

কৃষ্ণ ধর

বসবে কাল শোভাযাত্রা

কোটাল বিষয়ে

নিরুত্তাপ বিকেলগুলি ক্লান্ত হয়ে শুয়ে আছে।

ফুলওয়ালা এসেছিল

অনেক

মালা নিয়ে

চড়া দামে বিকোবে এই আশায়।

হলো না।

যারা শোভাযাত্রায় যাবে তারা

এখনও

ফিরে পৌঁছয়নি।

এখনও

তাদের নোংরা হাত পা

কালিঝুলি মাখা শরীর

প্রাগৈতিহাসিক চেহারা।

সারা রাত ওরা ঘুমোবে

নিঃসাড় হয়ে, কেউ

জানাবে না

ভোরে ছটফটানি পাখিগুলি

ওদের ডাক দিতে আসবে।

ওরা তখন টান টান হয়ে

আড়মোড়া ভেঙে

উঠে বসবে।

সকালের দীপগুলি

ক্রমশ

একে একে

বিকেলের মধ্যেই

একে একে

বিপুল গর্জনে

এক বিশাল নদীর চেহারা নেবে।

'সর্বনাশ!' চিঠিটা পড়ে, পড়া শেষ করেই, বলে উঠল সুতপা।

'সে কি? এ তো খুব ভালো খবর।' শরদিন্দু প্রতিবাদ করল।

'খবর তো ভালোই।' লজ্জিত হবার ভাব করল সুতপা: 'তাতে আর সন্দেহ কী! কবে আসবে লিখেছে?'

'যবেই আসুক, কিন্তু তুমি সর্বনাশ বললে কেন?' শরদিন্দু দুই চোখ তীক্ষ্ণ করল।

'কী জানি কেন। হঠাৎ মুখ দিয়ে কেমন বেরিয়ে গেল।' লঘু হবার চেষ্টায় হাসল সুতপা: 'তা ছেলেটির বয়েস কত?'

'তাই ভেবেই বললে বুঝি?'

আহত শোনাল শরদিন্দুকে।

'তা অপরিচিত অনাত্মীয় লোক বাড়িতে এসে থাকবে, ভয়ের কথা বৈকি।' বলা বাহুল্য সুতপা, চিবুকে রেখা ফেলল 'মেয়েটা তো বড় হচ্ছে।'

'তুমি কী যে বলো তার ঠিক নেই।' শরদিন্দু বিরক্ত হল: 'একটা তেরো চোদ্দ বছরের ফ্রক পরা একচিলতে মেয়ে—

'যাযো। মেয়ে বড় হয়ে ওঠেনি?'

'উঠুক। মোটে ক্লাস নাইনে পড়ে।'

'ক্লাস নিয়ে কী হবে? শরীরের বাড় দেখবে না?'

'তারই জন্যে সর্বনাশ?'

'বা, সাবধান হতে দোষ কি। ছেলেটা শুনেছি আবার অবিবাহিত। একটা কলাটের মধ্যে পড়তে

অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত

অন্য ভুবন

চল তো।

'তোমার দরজাতেই বাড়াবাড়ি।'

'তবে তোমার বড় চাত পা ছেড়ে আলগা হয়ে বসে থাকতে হবে।' গম্ভীর হতে লাগল সুতপা : 'একটা ছেলে একলোর জন্যে বেড়াতে আসছে না, থাকিয়ে হয়ে বসবাস করতে আসছে. ব্যাপারটা খুব একেবারে ছেলের হাতের মোয়া নয়—'

'তুমি ছেলে কাকে বলছ? প্রায় পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর বয়েস—'

'ছেলে বলব না তো কি বুড়ো বলব?'

'ভদ্রলোক বলবে।'

এক মুহূর্ত স্তব্ধ রইল সুতপা। বললে, 'কোন ঘরে থাকতে দেবে?'

'বাইরের ঘরে। তাছাড়া আর বাড়ীত ঘর কোথায়?' শরদিন্দু চোখ টিপল : 'তবে যদি তোমার ঠাকুর ঘরটা ছেড়ে দিতে পারো—'

'একফোঁটা ঘরে ঠাকুরই থাকতে পারে, ভদ্রলোক পারে না।' সুতপা একটু হেসে দিল।

হোটেলার ছাতে, সিঁড়ি দিয়ে উঠে সুবে, ডাইনেই বাইরের ঘর। মুখোমুখি উত্তরে, বাড়ির ভিতরে ঢোকবার আরেকটা দরজা। তাই বাইরের ঘরে থাকতে হলে ভিতরের ঘরের সঙ্গে মাখামাখির দরকার নেই। খাবারটা ও ঘরেই পৌঁছে দেওয়া চলবে। কিন্তু অসুবিধে হচ্ছে বাথরুম। বাথরুম মোটে একটা।

'তাতে কী হল? সময় ঠিক করে নিলেই হবে।' শরদিন্দু উড়িয়ে দিল কথাটা।

'তা তো হবে। কিন্তু সব সময়েই কি সময় ঠিক থাকে?' সুতপা মুখে চোখে আতঙ্কের ছবি আঁকল : 'হয়ত মেয়েটা তেল মেখে নাইতে যাচ্ছে কিংবা স্নান করে বেরুচ্ছে বাথরুম থেকে, তখন যদি হঠাৎ ভদ্রলোকের দরকার হয়?'

'হবে। হয় প্রতীক্ষা করবে নয় সরে দাঁড়াবে।' শরদিন্দু তেমনি নিস্পৃহ মুখে বললেন।

'তুমি তো জানো না কেমন এলোমেলো হয়ে ঢোকে আর কী বিচ্ছিরি হয়ে বেরোয়!' চিন্তার মুখ আরো কালো করল সুতপা। বললে, 'বাড়িতে যদি আরেকটা বাথরুম থাকত!'

'বাঘো! যা নয় তা নিয়ে কথা বলে লাভ কী।' গম্ভীর হল শরদিন্দু : 'বাড়িতে সেরিং গেস্ট রাখতে হলে একটু অসুবিধে ভোগ করতেই হয়। আর এ ঠিক সেরিং গেস্ট নয়, জানাশোনার মধ্যে, আত্মীয় বলতেও অপত্তি হয় না। ওর বাবাকে আমি ছেলেবেলায় কাকা বলতাম। সেই সুবাদেই আসছে।'

'দেখো, সেই সুবাদে আমাকে যা বৌদি বলে।' সুতপা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল : 'ও সব বৌদি বলা টলা আমি সহ্য করতে পারি না।'

'তা আত্মীয়তা করতে পারলেই তো সুবিধে।' চোখ টিপল শরদিন্দু : 'বেশি আদায়ের সম্ভাবনা।'

'দরকার নেই বেশিতে। সুখের চেয়ে স্বস্তি সুখের।'

'সেন্টারে বড় চাকরি করে। মোটা মাইনে। উপরি-পাওনা যা কোন না আছে?'

'তবে একা মানুষ, কোনো একটা হোটেলে গিয়ে ওঠে না কেন?'

'বা, তাহলে আমার মাসিক দেড়শোটা টাকা হোজগার হয় কী করে?'

আবার চোখটা একটু ছোট করল শরদিন্দু : 'হোটেলে কি হোম-কমফোর্টস আছে? তাই একটু আধটু বৌদি ডাকলে কোস করে উঠো না।'

'কত দিন থাকবে?'

'বদলির চাকরি, বদলি হবেই এসেছে। দু'তিন বছর কোন না থাকবে!'

'ততদিন মেয়েটা তো আরো বড় হবে! কলেজে চুকবে!' উঠে পড়ল সুতপা : 'কি করে যে কী সামলায় ভগবান জানেন।'

একেবারে প্রথম দিনে, প্রথম মুহূর্তেই সামলানো সম্ভব হল না। ট্যাক্সিতে মাল-পত্র নিয়ে একটা লোক বাড়িতে এসেছে, সটান উঠছে সিঁড়ি দিয়ে, এ সচরাচর ঘটে না। আবাল চক্ষু মেলে সমস্ত সংসার চঞ্চল হয়ে উঠল।

'আরে তুমি কোত্থেকে?'

যেন আর কোথাও, আর কোনো জগতে, দেখা হয়েছিল তেমনি শৈশবসরলো অকপট কণ্ঠে উছলে উঠল ভদ্রলোক।

'আর আপনি কোত্থেকে?' দাঁত বেলিয়ে দিব্যি হেসে উঠল মেয়েটা।

বাস্তবত্ব'ঘিতে এ সব প্রশ্নের উত্তর নেই।

'তোমার কী নাম?'

'কুলন।' মেয়েটা আবার খলখলিয়ে হাসল। 'আপনার?'

'আমার নাম শুনলে ভয় পাবে।'

'ইস! আপনি কি জানোয়ার?'

'আমি জানোয়ারের রাজা। আমি সিংহ।'

'সিংহ পদবী হয়। সিংহ কি কখনো নাম হয়?'

'নামও হয়। আমার নাম নৃসিংহ। যে প্রহ্লাদকে রক্ষা করেছিল।'

'কাকে?'

'প্রহ্লাদকে। প্রহ্লাদের গল্প জানো না?'

'কী করে জানবো? আপনি কোনো দিন বলেছিলেন? শিখিয়েছিলেন?'

ভিতর থেকে কর্কশ কণ্ঠের স্বরে হেঁকে উঠল সুতপা 'কুলন! ওখানে কী হচ্ছে?'

কী যে হচ্ছে কে জানে। কুলন একঝুটে চলে গেল ভিতরে। দরজা বন্ধ করে দিল।

নৃসিংহের মনে হল সে যেন দিল্লী থেকে বদলী হয়ে কলকাতা আসেনি, তার দেশের বাড়িতে এসেছে। যেন খুব ভোরে উঠেছে—ঘুমের থেকে। গাছ ভরে মৃদু স্বর পাখি ডাকছে। হাওয়া বইছে ঝিরঝির করে। গ্রামের পথে শিশির ভেজা সবুজে পা ফেলে একা একা চলেছে—বেড়াতে। কুলন যেন সেই গ্রামের ভোর। সেই ঝিরঝিরে হাওয়া। শিশিরের আদর-পাওয়া সবুজের গন্ধ।

কোনো উচ্চারিত বিস্ময় নয়। বিস্ময়ের চেয়েও বিস্ময়, বিস্ময়ের ইশারা।

এমনটি যেন কোনো দিন আর দেখেনি নৃসিংহ। এমন তরো যেন হয় না।

শরদিন্দুর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বাড়ি ঘর সব দেখে নিল নৃসিংহ। এই রান্না ঘর, এই বাথরুম—

'স্নান কোথায়?' নৃসিংহ এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল।

'রান্না ঘরেই। আসন পেতে।' পলকেই অপ্রস্তুত কাটিয়ে উঠল শরদিন্দু: 'তোমার খাবার তোমার ঘরেই দিয়ে যাবে।'

'না, না, তা কেন, সবার সঙ্গে আমিও আসন পেতে খেতে পারব রান্নাঘরে।

'না রান্না ঘরে জায়গা নেই।' কোথা থেকে বেরিয়ে এল সুতপা: 'আপনি নিরিবিলিতে নিজের ঘরে বসেই খাবেন।'

বেশ একটু রূঢ় শোনাল, তা কী করা। শরদিন্দুর কী! তার তো নজর শুধু টাকার দিকে, আদায়ের দিকে। শক্ত হাতে সুতপাকেই লাগাম ধরতে হবে। দিনকাল যা পড়েছে, শিথিল হবার উপায় নেই।

'এ সময়ে বাথরুমে কে গেল?' কুলন চেঁচিয়ে উঠল।

কচি ছেলেমানুষের গলা নয়, নয় বা ভরাট যৌবনের। যৌবন এলে তো স্বর স্নিগ্ধ হত, মধুর হত। এ এক মাঝামাঝির সুর। শুধু সুতো নয়, পাকানো দড়িও নয়। কাঁচের গুঁড়ো লাগানো এ এক মাঞ্জা করা সুতো।

গলা-গলা ভারী করে সুতপা জিজ্ঞেস করলে, 'ভদ্রলোক ঘরে নি তো?'

'ভদ্রলোক তো তার ঘরে ধ্যান করছে।'

'সেটাও দেখেছিস?'

'তুমি দেখ। এইখানে দাঁড়িয়ে ঐ জানালা দিয়ে দেখা যায় কিনা।' বাথরুমে যাবার প্যাসেজে একটা নির্দিষ্ট কোণে মাকে টেনে এনে দাঁড় করাল কুলন।

'তা যায় হয় তো।' চাউনি দিয়েই কুলনের গায়ে বিষাক্ত চিমটি কাটল সুতপা: 'কিন্তু তোমার এখানে দাঁড়াবার দরকার কী। দাঁড়ালেও ঐ জানালা দিয়ে তাকাবার কী হয়েছে! বাড়িতে আর জানালা নেই? না আর সব তাকাবার দৃশ্য মুছে গেছে পৃথিবী থেকে?'

বাথরুম থেকে হাসতে হাসতে ভণ্ডুল বেরুল।

'দেখ, দেখ, ভাইয়ের কাণ্ড।' মার এত বকুনিতেও এতটুকু ভ্রূক্ষেপ নেই কুলনের। বরং ভাইয়ের দুর্ভিতিতে তারই যেন বেশি মজা।

'ভণ্ডুল! ভণ্ডুল!' ভণ্ডুল তো ছেলে, তাকে ডাকতে দোষ কী। নৃসিংহ ডাক দিল গলা ছেড়ে।

'যাই।' ডাকের মধ্যে এমন কী এক ছোঁয়া ছিল ভণ্ডুল ভাবতে থেকে কোনো মত না নিয়েই সাড়া দিয়ে উঠল।

নৃসিংহ দেখল একটা দশ এগারো বছরের ফুটফুটে ছেলে এসে দাঁড়িয়েছে। কী চাই বলুন।

'কিছু চাই না।' আরো একটু কাছাকাছি হল

নৃসিংহ।' তোমার স্কুল কটায়?'

'সাড়ে দশটায়।'

'তোমার দিদির?'

'ওরও ঐ সময়।'

'কিসে যাও? বাসে?'

'বাসে না ট্রামে!' হেসে উঠল ভণ্ডুল।

'তার মানে পায়ে হেঁটে? দুজনে এক সঙ্গে যাও?'

'এক সঙ্গে। কিন্তু ফেরবার সময় আলাদা। সব ইস্কুল এক সঙ্গেই তো ছুটি হয় না। ওদেরটা আবার একটু দূরে।'

কী অদ্ভুত নতুন লাগছে কুলনকে ভিন্ন লক্ষ্যের মধ্যে রেখে কথা বলতে। নৃসিংহ তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বললে, 'তোমার স্কুলের নাম কী?'

'আপ-টু-ডেট স্কুল। দিদিদেরটাই সেকেলে। সুখলতা না শান্তিলতা।'

প্রথম দিনেই একেবারে ঘড়ি ধরে অফিস না করলেও চলবে। সরকার এমন কিছু তলিয়ে যাবে না। ওরা আগে স্কুলে যাক।

ঘর থেকে যে দরজাটা সিঁড়ির দিকে খোলে সেটার একিয়ার তো নৃসিংহের। যতক্ষণ সে ঘরে ততক্ষণ সেটা খোলা রাখতে বাধা কোথায়!

দু ভাই বোন নেমে যাচ্ছে সিঁড়ি দিয়ে। ভণ্ডুলটা লাফাতে লাফাতে, কিন্তু কুলন আস্তে আস্তে, নিঃশব্দে।

লক্ষ্মী মেয়েটা ঠিক তাকিয়ে গেল। হেসে গেল। চকিতে বাড়ি-ঘর-দোর, মন-প্রাণ-সত্তা নির্মল করে দিয়ে গেল।

হাওয়ায় যেন উড়ে গেল একটা রঙিন আঁচল। আঁচলের থেকে আঁচলের পাড়টা সুন্দর। ইশারাটা।

দ্বিতীয় বিস্ময়ের পাত্র।

সন্ধেয় ঠাকুর ঘরে মা আর ছেলেমেয়েরা নামকীর্তন করতে বসেছে!

ভক্ত সাজতে বাধা কী। আর হরিনামের আসরে নেবেন্তন্ন কে করে। নৃসিংহ চুপিচুপি এক পাশে গিয়ে বসল।

হাঁটু মুড়ে আসন করে কেমন বসেছে কুলন। নাম করছে আর হাততালি দিচ্ছে। কখনো চোখ বুজছে, কখনো বুজছে না। যখন বুজছে তখন মাঝে মাঝে চোখ গিয়ে অজান্তে পড়ছে নৃসিংহের মুখের উপর। ঠিক হাসছে না তবে যেন বলছে, যে কোনো মুহূর্তে হেসে ফেলতে পারি। তোমার বুকে এত স্নেহ কেন? চোখে এত দয়া?

কী যে হয়েছে কে জানে, বারে বারে ভ্রূকের ধারটা টানছে হাঁটুর উপর। এক চুল নড়াতে পারছে না ঘাড়াতে পারছে না, তবু থেকে থেকে এই দুর্ভোগটা। মুহূর্তের চোখ বিগ্রহের দিকে নয়, কুলনের হাঁটুর দিকে, শরীরের কোন কোন অংশ খালি, তার দিকে। দরজিটা কুলের দিকে বড় বেশি কাপড় চুরি করেছে চোখে মুখে সেই বিরক্তি। কুলের সঙ্গে মিতালি করে শরীরের বাড়ও কেন স্থগিত থাকে নি নামের মধ্যেও সেই আর্তনাদ।

নৃসিংহের চোখও বিগ্রহের দিকে নয়।

শরদিন্দু জিজ্ঞেস করল, তুমি কি ঠাকুর দেবতা বিশ্বাস করো?'

'কিছুমাত্র না।'

'তবে ঠাকুর ঘরে হরিনামের আসরে গিয়ে বসো কেন?'

'বিশ্বাস না করলেও বসা যায়। বিশ্বাস না করলেও ভালো লাগতে বাধা নেই।' নৃসিংহ হাসল।

শরদিন্দু গম্ভীর মুখে বললে, 'আমি যেহেতু বিশ্বাস করিনে সেহেতু ওর ধারে কাছেও যাইনে।'

'ভাল করেন। কিন্তু সারা দিনের ক্লান্তির পর এই এক ধরনের বিশ্রাম, এই একটু ঘুম-ঘুম-ভাব, মন্দ কী।' নৃসিংহ হাসল। পরে সেও সামান্য গম্ভীর হল: 'মানুষ আর কী! এক ব্যাধিগ্রস্ত যন্ত্রণা। সে যন্ত্রণাকে ক্ষণিকের উপশম দেবার জন্যেই তো মানুষের জীবনভোর আয়োজন তার শিল্প সাহিত্য সংগীত ধর্ম। শুষ্ক জীবনকে ভোলাবার জন্যে, অন্য জীবনের অন্য ভুবনের পরিবেশ আনবার জন্যে—'

শরদিন্দু কথা বলল না।

জানালার পর্দা অনেক দিনই বসেছে, এবার নাম কীর্তন বন্ধ হয়ে গেল।

'কি হে আজকাল নাম-টাম করো না যে।' ভণ্ডুলকে মাঝে-মাঝে তবু পাওয়া যায়, জিজ্ঞেস করল নৃসিংহ।

'আমাদের যে কদিন পরেই পরীক্ষা।' ভণ্ডুল চোখ

মুখ গোল করল : 'তা ছাড়া মা বলে মনে মনে-করলেই হবে।'

'না করলেও হবে।' হাসল নৃসিংহ। অন্তরঙ্গের মত বললে, 'দিদি কী করছে রে?'

'পড়ছে, ভীষণ পড়ছে। ঘাড় উঁচু করে পড়ছে।'

'এ ঘরে আসে না কেন?'

'সময় কোথায়? জানেন কাকু, একবার ফার্স্ট-টার্স্ট হয়ে গেলেই মুস্কিল, ভীষণ মুস্কিল। বারে বারেই ঐরকম হতে হবে। না হলেই জবাবদিহি। দিদি একবার ফার্স্ট হয়ে পরের বার থেকেও হয়েছিল তাই তার যন্ত্রণা। আদা-জল খেয়ে তাই উঠে পড়ে লেগেছে, আবার কী করে ফার্স্ট হওয়া যায়। আমার ও সব ঝামেলা নেই।' খুশিতে ঝকমক করছে ভণ্ডুল : 'আমার শুধু টায়ে টুয়ে পাশ।'

'তোমার দিদির কোথায় কী খাটকাচ্ছে আমাকে জিজ্ঞেস করে নিলেই তো পারে।' সাহস করে বললে নৃসিংহ : 'সকেবেলায় আমার হাতে কত সময়।'

'ওরে বাবা, এ ঘরে আসবে কী!' ভণ্ডুল আতঙ্কের হাত্রা ফেলল মুখে। কানে-কানে বলার মত করে বললে, 'ওর যে এ ঘরে আসা বারণ।'

নিজেই উদ্যোগ করে কুলনদের ঘরে একদিন ঢুকে পড়ল নৃসিংহ। তক্তপোশের উপর খণ্ড-ত-এর মত বেঁকে শুয়ে কী পড়ছে কুলন, পাশেই দ্রুতপা বসে।

'কী পড়ছ?' পাশ থেকে বইয়ের উপর ঝুঁকে পড়ল নৃসিংহ।

দ্রুতপা নেমে দাঁড়াল। কিন্তু কুলন কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। শোয়া ছেড়ে উঠে বসাটা নিরাপদ হবে, না, যেমন আছে তেমনি থাকাটাই কম বিপজ্জনক—মায়ের কাছে নির্দেশ চাইল।

মায়ের চোখের সঙ্গে চোখ মেলাতে পারল না। তাই যেমন ছিল তেমনি রইল শুয়ে হয়ে।

দ্রুতপা বললে, 'এই আসছে সোমবার থেকে পরীক্ষা, এখন আর অন্য দিকে মন দেবার উপায় নেই।'

'বেশ তো,' কুলনকেই লক্ষ্য করল নৃসিংহ : 'তোমার কোথায় যদি কোনো ডিফিকালটি থাকে আমাকে দেখালে পারো, আমি ঠিক বুঝিয়ে দিতে পারব।'

দ্রুতপা মুখের পর্দাটা আরো এক প্রস্থ মোটা করল। বললে, 'না, ও হাওয়া ভালো। ওকে কাউকে দেখাতে হয় না। গত বার বাইচান্স থেকেও হয়ে গিয়েছিল, নইলে বরাবর ও ফার্স্ট।'

তবু লোকটা যায় না। দ্রুতপার ইচ্ছে হল একটা কম্বল এনে কুলনকে সাস্টাঙ্গ চাপা দেয়। আর তুই মেয়ে, তোর অমন ধনুকের মত এঁকে বেঁকে শোবার কী হয়েছে! আর পরণে তোর এমন ফ্রক যে টানলেও বন্ধ হয় না কোনো দিকে।

'তা ফার্স্ট হওয়া তো ভালো,' নৃসিংহ সরে যেতে যেতে বললে, 'কিন্তু শুধু স্কুলে ফার্স্ট হলে তো চলবে না, য়ুনিভার্সিটিতে ফার্স্ট হতে হবে।'

আর ঠিক সেই মুহূর্তে কুলন উঠে বসল আর নৃসিংহের চোখের উপর চোখ ফেলে হেসে উঠল ঝিক করে।

এমনি হাসিতে কী ছিল? কিছু না। শুধু বার নিষেধের দরুণ এই হাসিটা অন্য এক পোশাক পরে এসেছে। দরজার আরোপ করে দিয়েছে বলেই নিয়ে এসেছে আরেক জগতের স্পর্শ। আঘাতের মতো লেগেছে বলেই বেজেছে আরেক রকম বাজনা।

নইলে কোনো বাসনা নেই কামনা নেই বেদনা নেই ব্যর্থতা নেই—সত্যার এ আরেক রকম চেতনা। এর নাম কী জানেনা নৃসিংহ। শুধু আরেক বার দেখি, আরো একটু দেখি। বশ্যকে দেখে বশ হই, নির্বশকে দেখে নির্বশ হয়ে যাই।

'তোমার ঐ ভদ্রলোক বিশেষ সুবিধের লোক নয়।' শরদিন্দুর কাছে নালিশ করল দ্রুতপা।

'কেন, কী করেছে?'

'কুলনকে গিয়ে বলছে, আমাকে প্রাইভেট টিউটর রাখ।'

'তা পড়া তো আর নেবে না। তা ছাড়া নৃসিংহ এককালে য়ুনিভার্সিটির সেরা ছাত্র ছিল—'

'ছিল তো ছিল। এখন কী! তার জন্যে প্রাইভেট টিউটরি করতে দেব না। যত কেলেঙ্কারি ঐ সব ঘোরো মাস্টারদের থেকে। ভদ্রলোক তোমার সেই ছোক বলে দিও ও সব কারবারি চলবে না এখানে।'

শরদিন্দু চুপ করে গেল।

'জানলায় দাঁড়িয়ে আছিস কেন? কী দেখছিস?'

কুলনের উপর ঝুঁকে পড়ল সুতপা :

'ও আবার কেবল ! এখানে দাঁড়ালে ঐ ঘরের কিছু দেখা যায় ?'

'নাই যায়। তবু জানলায় দাঁড়ানোটা ভালো নয়। ঐ ঘরের লোকটা এখন রাস্তায় নয় তা কে বলতে পারে ?' নিজেই সুতপা জানলাটা বন্ধ করে দিল।

আর কিছু করবার না পেয়ে কাঁদতে বসল কুলন।

'ওহে—ভণ্ডুল, তোমাদের স্কুলের প্রাইজ কবে ?'

'আমার তো টায়ে টুয়ে পাস, আমার আবার প্রাইজ কী !' ভণ্ডুল কাছে এল দু পা : 'দিদির প্রাইজ পরশু। জানেন,' আরো ঘনিষ্ঠ হল : 'দিদি এবার ছোটো চার খানা বই পাবে, গতবার পেয়েছিল আট খানা।—'

মুহূর্তক্ষণ বসে ছিল নৃসিংহ, প্রাইজ নিয়ে কুলন উঠছে দাঁড়িয়ে দিতে, নৃসিংহ হঠাৎ দুহাতে তার দুহাত ধরে ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে এল। উজ্জীবিত হয়ে বললে, 'দেখি দেখি কী প্রাইজ পেলে !'

প্রাইজের বিনটা আলাদা।

কুলন সদ্য ভূলে হাসি খুশি হয়ে দাঁড়াল পাশ ঘেঁসে।

বইগুলি কোলের উপর টেনে নিল বটে নৃসিংহ কিন্তু পড়তে লাগল খানেক বই। তার ভাষা অজানা, তার অক্ষর অস্পষ্ট, অর্থ দুর্বোধ্য, অনুভব চিরন্তন ঘুমের মধ্যে। এই যে বুকি এক কবিতার মতই সুন্দর। বোঝাতে পারে না কিছু শুধু রক্তের মধ্যে গিয়ে বন্যার মত বাজতে পারে।

'উনি বই দেখছেন তো দেখুন। তুই দাঁড়িয়ে আছিস কেন ?' সুতপা এসে টেনে নিয়ে গেল কুলনকে।

নৃসিংহ ভণ্ডুলকে ডাকল কুলনের বইগুলি নিয়ে যেতে। আর বইগুলি ফেরত পেয়ে কুলন গুনে দেখল, চার নয় ছয়। প্রহ্লাদের রক্ষাকর্তা দু খানা নতুন বই যুক্ত করে দিয়েছেন। কোন দু খানা ? আহা, কী সুন্দর ছুটো বই ! কত দামী, নাম করা ! আনন্দে চোখে জল এল কুলনের। বই দুটো চেপে ধরল বুকের মধ্যে।

জারি জুরি বেশীক্ষণ টিকল না, ভণ্ডুলই ভণ্ডুল করে দিল।

'তোমার ভদ্রলোক এ সব কী আরম্ভ করল বলো।'

'কী ?'

'কুলনকে প্রেজেন্ট দিতে আরম্ভ করেছে।'

'বাঃরে। শাড়ি নয় গয়না নয়, শুধু দুটো বই।'

'আস্তে আস্তে শাড়ি গয়নাতে আসবে, ব্যস্ত কি।'

'আসুক, তখন দেখা যাবে। আর শাড়ি গয়নাও এমন কী ফেলে দেবার !'

পরিচিত কিছুতেই রাজি নয় বই ফেরত দিতে, অগত্যা সুতপা কুলনের হাত থেকে বই কেড়ে নিয়ে বললে, 'এ বই তুই পড়তে পাবি নে। পিসিমোতলাওলার কাছে বিক্রি করে দিবি। প্রেমে বইই হচ্ছে প্রথম ভোজ।'

এ আবার কোন কথা ? এ আবার কার নাম ? এই যে মনের মধ্যে একটা রামধনু জাগছে, জাগছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে, না চাওয়া না পাওয়ার রঙ দিয়ে আঁকা—এটাকে কী বলে ?

'ঈশ্বরকে ডাকতে হয় না, না ডাকলেও হয়—আপনি বলতেন না ? এ তাই হয়েছে।'

শূন্যে ছিল উঠে বসল নৃসিংহ।

এ কী অভাবনীয় ! ভাতের থালা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কুলন।

স্বপ্ন দেখছে নাকি ? না, ইলেকট্রিক বালবটাই তো জ্বলছে। হাতে ঠেকছে ঠিক টেবিলটা।

টেবিলের উপর থালা গ্লাস রেখে কুলন বললে, 'মার খুব জ্বর—'

'সত্যি ? কবে থেকে ?' অসাবধানে নৃসিংহের কণ্ঠে আনন্দ উথলে উঠল।

বুঝতে পেরেছে কুলন। কিন্তু স্বচ্ছ মুখে বললে, 'জানেন, আজ আমি রেঁধেছি। ভীষণ বিচ্ছিরি হয়েছে। আপনি কিছু খেতে পারবেন না।'

'আমি খেতে পারব না ?' তখুনি একগ্রাস মুখে তুলল নৃসিংহ। বললে, 'চমৎকার হয়েছে।'

'মিথ্যে কথা।'

'তোমার সমস্ত চমৎকার। তোমার হাতের পোড়া-খোড়াও চমৎকার। তুমি এই যে মিথ্যে কথা বললে সেটিও চমৎকার।'

'কিন্তু জানেন ভালো জিনিস পেলে আমিও ভালো

রাঁধতে পারি। আমার কী ইচ্ছে করে জানেন?' লজ্জায় আরো কোমল হল কুন্তল: 'ইচ্ছে করে আপনাকে ভালো করে রেঁধে খাওয়াই, আপনার সেবা করি, ও বাড়িতে তো পাখা নেই, আপনাকে হাওয়া করে ঘুম পাড়িয়ে দিই—'

কী বলে মেয়েটা! হো হো করে হেসে উঠল নৃসিংহ। পরে মনে হল উচ্চহাস্যটা ঠিক হচ্ছে না। তক্ষুণি গলা নামিয়ে বললে, 'আর আমার কী ইচ্ছে করে জানো? কিছু ইচ্ছে করে না। শুধু তুমি চিরকাল এমনি থাকো, আর আমি তোমাকে দেখি—'

'সত্যি আপনার এখানে কত বাধা, কী ভয়ংকর অসুবিধে!' কুন্তল অকথিত স্নেহ আনল চোখে: 'আপনার মত লোকের কি এ রকম জায়গায় পোষায়?'

'আছি, শুধু তুমি আছ বলে। সমস্ত মন মন্দির হয়ে থাকে বলে।' তন্ময়ের মত তাকাল নৃসিংহ: 'যা সুন্দর তাই আনন্দময়। তুমি তো এই ভুবনের নও, তুমি আমার অন্য ভুবনের।'

'কিন্তু কত দিন? ঐ দেখুন মা ডাকছেন।' ম্লান হাসির ছায়া ফেলল কুন্তল: 'বলে দিয়েছিলেন ভাতের থালাটা রাখবি আর চলে আসবি। আচ্ছা, বলুন তো কি হয়? চিরদিন, দাঁড়িয়ে থাকলে কী হয়! আমি কি যাবার দিনদিন যে ভদ্রলোক আমাকে দেখে ফেলবে? সিংহের কত বিক্রম তা তো জানা আছে।' বলেই মার ডাকের প্রতিধ্বনি তুলল: 'যাই মা।' আবার ঘুরেই বললে মৃদু স্বরে, 'যদি চান, বাইরেই তো আমাদের দেখা হতে পারে।' বলেই ছুট দিল কুন্তল।

বাইরে অর্থ স্কুল থেকে ফেরবার পথে! হায়, সেই দেখা কি চায় নৃসিংহ! তা কি তার অন্য ভুবনের দেখা।

শনিবার সকাল সকাল স্কুল থেকে ফিরল কুন্তল আর ভণ্ডুল—পরিন্দুর আর সুতপা ঘুগলে বেরুল মাণিকতলায় পরিন্দুর এক বন্ধু বোনকে দেখে আসতে। কথা হল সন্ধে সন্ধেই ফিরে আসবে তারা। কি এলে যেন উনুন ধরিয়ে রাখে আর যদি কোনো কারণে দেরি হয় রান্না যেন কুন্তলই চাপিয়ে দেয়। নৃসিংহের জন্যে ভাবনা নেই, সে বাইরে খাবে, ফিরবে দেরি করে।

বিকেল থেকেই নামল তুমুল বৃষ্টি আর দেখতে দেখতে মহানগরী মহাসমুদ্রে পরিণত হল।

নৃসিংহও আটকা পড়েছিল কিন্তু কোনো অসুবিধেই সে আজ গ্রাহ্য করল না। ট্রাম বাস বন্ধ, ট্যাক্সি নিজেই ভরা ডুবি তবুও না। জল কোথাও হাঁটু, কোথাও কোমর, তবু সেই জল ভেঙে চলল এগিয়ে। বর্ষণ এখনো সমানে চলেছে, তাকেই বা কে দেয় মাথা পেতে!

সব বাধা বিপদ পায়ে ঠেলে সিংহ বিক্রমে চলল নৃসিংহ।

বাড়ি যখন পৌঁছুল তখন রাত।

দরজায় তালা খুলে নিজের ঘরে ঢুকল নৃসিংহ। আলো জ্বালল। ক্রমে ক্রমে শুকনো কাপড়ে বদলাল নিজেকে।

বাড়ি ঘর নিঝুম। উনুন ধরানো হয় নি। কি আসে নি। কী করে আসবে? ফেরেনি পরিন্দু। সুতপা অনুপস্থিত।

কী না জানি করছে ভণ্ডুল! কী না জানি কুন্তল।

ভণ্ডুল পরিন্দুর ঘরে আনুষ্ঠানিক ভাবেই ঘুমুচ্ছে। কিন্তু কুন্তল? সুতপার ঘরে পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছে।

পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছে। সুষ্ঠু হতে পারেনি সতর্ক হতে পারেনি, বস্ত্র ইন্দ্রিয়ে ভেঙে ভেঙে পড়েছে। নিঃশেষে আরো কাছে এগিয়ে এল নৃসিংহ। চুলগুলি মুখের এক পাশে কাঁপিয়ে পড়েছে, চোখ দুটি বোজা। অনেক পেলবতা অনেক পবিত্রতা অনেক বন্যতা অনেক উজ্জ্বলতা মেশামেশি করে রয়েছে। দেখে দেখে কিছুতেই যেন চোখের তৃপ্তি হতে চায় না। অন্ধকার পাহাড়ের ওপরে থেকে চাঁদ উঠছে, কিন্তু উঁকি উঁকি করেও উঠছে না, সেই আলো আঁধারির মাঝখানে অন্য এক জগতের প্রান্তে অলোচরে এসে দাঁড়িয়েছে নৃসিংহ। জাগাই কি না জাগাই। ছুঁই কি না ছুঁই। ডাকি কি না ডাকি বিধ্বকর্মার অদৃশ্য আঙুলে আবরণের প্রান্ত আরো খুলি একটু সরে গেল। আরো একটু।

না, যেমন আছে তেমনি থাক। প্রসাধনে দরকার নেই, সংশোধনে দরকার নেই। আপনা আপনি ঘুমিয়েছে আপনা আপনি জাগুক।

পরিন্দুরা যেন ফিরল, নৃসিংহই খুলে দিল তার নিজের ঘরের দরজা।

সুতপা নৃসিংহকে ঘরে পেয়ে কোথায় নিশ্চিন্ত হবে, তা না, উদ্বেগাবেগের উপর উদ্বেগাবেগ হল। কেন বাড়ি ফিরেছে একা একা এই অপরাধের শাসন দরকার—তাই নৃসিংহের উপর মুখিয়ে উঠল : 'ওরা কোথায়?'

'ওরা যে যার ঘরে ঘুমুচ্ছে।'

এই ঘুমের চেহারা! ও তাহলে দেখেছে! সুতপা একটানে তুলে দিল ঝুলনকে। 'ঠাণ্ডা পেয়ে লম্বা ঘুম দিয়েছে। নির্লজ্জ বেহায়া কোথাকার। বাড়িতে যে একটা খুখু বাস করছে সেদিকে খেয়াল নেই। ছোট ভাইটাকে কাছে নিয়ে ঘুমুস নি কেন?' চড়-চাপড় মারতে লাগল সুতপা।

তার পরেই ঝুলনকে শাড়ি পরিয়ে দিল।

'এখুনি শাড়ি কেন?' পরাদিন্দু আপত্তি করতে চাইল : 'কী রকম হঠাৎ বড় দেখায় মেয়েটাকে।'

'বড় হয়েছে তো বড় দেখানোই উচিত।'

'ফ্রকগুলো ছোট হতে না হতেই শাড়ির কী দরকার! ডবল খরচ।'

'ফ্রক না হয় স্কুলের জন্যে থাকবে, বাড়িতে শাড়ি।' নৃসিংহের ঘরের দিকে কটাক্ষ করল সুতপা।

'যা হওয়া উচিত তার উলটোটা হচ্ছে।'

'তোমারই যে বিপরীত ব্যবস্থা। কোত্থেকে এক জানোয়ারকে এনে ঘরে ঢুকিয়েছে।'

'কী আশ্চর্য, নৃসিংহ কী করল?'

'করে নি, করবে। তারই জন্যে ঘুর ঘুর করছে। আমারই শাসনে আছে বলে যাবা বলতে পারছে না। শুধু শাড়ি পড়িয়ে কি সারতে পারব? বিয়ে দিয়ে দেব মেয়েটার।' গজ গজ গর গর করতে লাগল সুতপা : 'আসি' ম্যারেজ আবার ফিরে আসছে দেখে। যা দিনকাল, আসতেই হবে।'

শাড়ি পরে দাঁড়াল ঝুলন। সুতপাই বললে, দেখিয়ে আয়।

প্রথমটা চমকে গিয়েছিল নৃসিংহ। ভেবেছিল কে এক ভদ্রমহিলা এল বুঝি।

ঝুলন বললে, 'আমি।'

কোথায় শাড়ি পরে ঘুরিতে ভগ মগ হবে, তা না, ঝুলন কাঁদছে। হয়তো বুঝেছে, যে ভুবনে সে ছিল, অন্য ভুবন, সেখান থেকে সে নির্বাসিত হয়ে চলে এসেছে ধূলির ভুবনে।

'সে কি, কান্না কিসের?'

ঝুলন বলল, 'আমি ইস্কুলে ফ্রক পরেই যাব। আপনি দুপুরবেলা ঘরে থাকবেন, আমি চুপি চুপি এসে দরজায় টোকা দেব। আপনি দরজা খুলে দেবেন। খুলেই আমাকে দেখতে পাবেন আগের মত। আপনার মনের মত।'

'তারপর? তারপর যখন তোমার মা জানতে পারবে তখন তোমাকে বেদম প্রহার করবে। কেন আমার জন্যে মার খাবে?'

'মা, মা জানবেন কী করে! দুপুরে মা তো ঘুমে কুম্ভকর্ণ।' অন্তরঙ্গের মত ঝুলন গাঢ় হল, বলল, 'আপনাকে দেখা দিয়ে আমি আবার চুপিচুপি নেমে যাব। তারপর দরকারীভাবে বড়ের মত উঠব আবার সিঁড়ি দিয়ে। সদরে দমাদম ধাক্কা মারব, মা, মা, দরজা খোল বলে চেঁচাব। মা দরজা খুলে দেবেন। জানতেও পারবেন না, আমি অন্য ভুবন থেকে বেড়াতে এসেছি। তখন আবার শাড়ি পড়ে বাড়ি হয়ে যাব।'

ঠিক দুপুরবেলা দরজায় এসে টোকা দিল ঝুলন। কেউ খুলল না দরজা।

'মা, মা, দরজা খোলো।' উত্তরের সদরে প্রবল করাঘাত করতে লাগল। ডাকতে লাগল প্রাণপণ।

সুতপা আঁচল লুটোতে-লুটোতে এসে দরজা খুলে দিল বিরক্তমুখে বললে, 'কী হয়েছে!' অসময়ে স্কুল ছুটি?'

'মা, কানু কোথায়?' কান্নাভরা চোখে জিজ্ঞেস করল ঝুলন।

'তোরা স্কুলে যাবার পরেই চলে গিয়েছে বাড়ি ছেড়ে। অন্য কোথায় ভালো জায়গা পেয়েছে সেইখানে।

'মা, ঠিকানা?' ঝুলনের দু গালে দুটো জলের ফোঁটা টল টল করতে লাগল।

'ঠিকানা এখনো জানি না।'

ঝুলন জানে। মনে-মনে জানে। ঠিকানা অন্য ভুবন।

মানবিকবাদ ও রবীন্দ্রনাথ

তিলক মজুমদার রায়

মানবতাবাদ কথাটা কিছু নূতন কথা নয়। ইংরাজি humanism শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে আমরা মানবতাবাদ কথাটি ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু ইংরাজি humanism কথাটির যথার্থ প্রতিশব্দরূপে মানবতাবাদ শব্দটির পরিবর্তে মানবিকবাদ শব্দটি ব্যবহার করলেই বোধহয় সঠিক প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হয়। লক্ষ করার বিষয় এই যে humanism বা মানবিকবাদ বলতে অনেকে মনে করেন যে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের কথা, বিশ্বের সামগ্রিক মানব জাতির কথাই এই শব্দটির দ্বারা বলা হচ্ছে। কিন্তু এর একটি বিশিষ্ট অর্থ আছে মানবিক হচ্ছে মানববিষয়ক। যেমন দিব্য হল দেববিষয়ক। বা ভাগবত যেমন ভগবান বিষয়ক। সংখ্যা এখানে অবান্তর।

আমরা জানি যে পৃথিবীতে বহু নূতন জিনিস, অজস্র নূতন তথ্য, নানা নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করেছে গ্রীসদেশ। প্রাচীন গ্রীস দেশই একদা বিশ্ব-সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র ছিল। আমাদের দেশে ও দেশের বাইরে যখন বৌদ্ধধর্মের প্রচার প্রথম সুরু হয়, তখন গ্রীসদেশের সাহিত্যিকগণ মানবিকবাদের তরঙ্গ তোলেন তাঁদের সাহিত্যে ও চিন্তায়। তারপর ঐতিহাসিক কারণে গ্রীস দেশের সভ্যতা লুপ্ত হয়ে যায়। ফলে সেই সঙ্গে মানবিকবাদের ধারাটিও লুপ্ত হয়ে ছিল। বহুকাল পরে ইয়োরোপে দেখা দিল এক আশ্চর্য্য চেতনা। শিল্পের সাহিত্যের জীবনের চিন্তার নব নব মূল্যায়ন সুরু হল এই যুগে। এই যুগকে বলা হল 'রেঁনেসাঁস' বা নবজন্ম। প্রচলিত বহু ধারণা বহু চিন্তা ও সত্যমূল্য নিরূপণের দৃষ্টি বদলিয়ে গেল। সব কিছুর মধ্যে সুরু হল নূতন মূল্যবোধের সন্ধান আর তার প্রতিষ্ঠা। ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, সাহিত্য, এমন কি মানবমনের, মানব জীবনের, নূতন ব্যাখ্যাও সুরু হল এই রেঁনেসাঁসের যুগে। মানুষের জ্ঞানের পরিধি, চিন্তার দিগন্ত প্রসারিত হতে থাকলো। মানুষের সভ্যতারও পথ গেল বদলিয়ে। এবং এই রেঁনেসাঁসের যুগে ইয়োরোপে মানবিকবাদ শব্দটির বা ধারণাটি আবার প্রচারিত হতে লাগলো সে দেশের শিল্পবোধে, সাহিত্যে ও মননে। এটা আধুনিক সভ্যতার মূল্য লক্ষ্য। মানুষই সে সভ্যতার মূলকথা, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে মানুষ ব্যতীত অন্য কিছু তার মধ্যে থাকবে না। মানব-চিন্তা ছাড়াও তার মধ্যে অন্য চিন্তাও থাকতে পারে।

রেঁনেসাঁস-পূর্ব যুগে মানুষ মনে করতো যে দেবতা বা ঈশ্বর মানুষ অপেক্ষা অনেক বেশী শক্তিমান এবং পূজনীয় ভাবে মহৎ। ইয়োরোপের মত আমাদের দেশেও এই ধারণা ছিল যে মানুষ কিছুই নয়। ঈশ্বরই মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং ঈশ্বরের প্রসাদ আশীর্বাদে মানুষ পৃথিবীতে আছে টিকে আছে। কিন্তু ইয়োরোপে রেঁনেসাঁস যুগে দীর্ঘদিনের এই মতবাদটিকে অস্বীকার করা হল। বলা হল মানুষ ছাড়া অন্য কোনো স্বনির্ভর সত্য নেই। ঈশ্বর বা ভগবান মানুষের সভ্যতার উপর নির্ভর। আমরা প্রত্যক্ষভাবে মানুষকেই দেখছি। মানুষ জন্মায় এবং মানুষ মারা যায়। মানুষকে প্রত্যক্ষভাবে ভাবতে পারি। তাকে Verify করা যায়। কিন্তু ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষভাবে ভাবতে পারি না, দেখতে পারি না। সুতরাং মানুষই একমাত্র প্রত্যক্ষসত্য। আমাদের দেশের কবিও বললেন "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।"

প্রাচীনযুগে বৌদ্ধরাও বলতেন যে দেবদেবী আছেন বটে তবে বুদ্ধই সকলের অপেক্ষা বড় এবং শ্রেষ্ঠ। তিনি মানুষ। ভগবান বা দেবতা নন। অবতার নন। হিন্দুরা তাঁকে পরে অবতার কল্পনা করেছে। তাতে তাঁর উচ্চতা বাড়েনি। কমেছে।

এর পর যখন বিজ্ঞানের যুগ এলো তখন বলা হল যে পৃথিবী একটা গ্রহ আর সেটা সূর্যের চারদিকে ঘুরছে

ভৌগোলিক আবিষ্কারকগণ বললেন যে পৃথিবী ঘুরে দেখা গেল পৃথিবীটা গোল। কোথাও স্বর্গ বা নরক এসব কিছুই দেখা গেল না। যা দেখা যাচ্ছে তা হল মানুষ। যদি ঈশ্বর বলে কোন কিছু থাকে তবে তা দৃশ্যের বাইরে। তখন খৃষ্টীয় চার্চের প্রভাব খুবই বেশী। বাইবেল বিরোধী তথ্য ও তত্ত্ব প্রচার করার অপরাধে অনেককেই দণ্ড দেওয়া হল, কতকের প্রাণ দিতে হল। শাস্ত্রের বা ধর্মগুরুর বাক্যের উপর বিশ্বাস না করে যাঁরা প্রত্যক্ষজ্ঞানের উপর নির্ভর করে দাঁড়ালেন, তাঁদের নূতন পরিচয় হল humanist বা মানবিকবাদী। তাঁরা শাস্ত্রীয় বা ধর্মীয় শিক্ষা সক্রিয় করে সব কিছুকেই যুক্তির দ্বারা পরীক্ষা ও বিচার করতে চাইলেন। তাঁরা বললেন যে ভূগোল বিজ্ঞানে বা ইতিহাসে স্বর্গ নরক ঈশ্বর বা শয়তান বলে কোন কিছু নাই। যা আছে তা হল মানুষ। মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি বিচার বিবেক থাকে যা মূল্য দিতে বলে তা ছাড়া আর কোন মূল্য দিতে তাঁরা অস্বীকার করলেন। খৃষ্টান চার্চের মতে মানুষ মৃত্যুর পরে পরলোকের শেষ বিচারের পর (last day of judgement) স্বর্গে যাবে অথবা নরকে যাবে। মর্ত্যলোক তার জন্য নয়। মানবিকবাদীরা সেটি অস্বীকার করেন। তাঁরা বলতে থাকলেন যে তাঁরা কাল্পনিক স্বর্গীয় সুখে বিশ্বাসী নন। মানুষের জীবনেই পৃথিবীর বিচিত্র আনন্দকে আস্বাদন করে সার্থকতা লাভ করবেন। মানুষ ও মানব জীবনের এই যে সার্থকতা এর উপর ধর্মযাজকরা এতকাল পাহারা দিয়েছিলেন। মধ্যযুগের মানুষ ছিল নজরবন্দী। প্রাচীন গ্রীকদের মতো আনন্দময় জীবন নিয়ে বাঁচতে হবে। মধ্যযুগীয় খৃষ্টানদের মতো নিরানন্দ জীবন চাইনে। বন্ধ পুকুর ডাঙ্গতে হবে। নিষিদ্ধ ফল খেতে হবে। এটিই হল রেঁনেসাঁসের মূল সুর।

'সবার উপরে মানুষ সত্য' বলতেও কিন্তু সর্বমানব সম্বন্ধে বলা হয়নি। প্রত্যেকের মধ্যে যে মানব-সত্য আছে সেই মানব-সত্য সম্বন্ধেই বলা হয়েছে। আমাদের দেশের মতই এরা প্রাচীন ইয়োরোপীয় সাহিত্যে দেখা যায় যে মানুষকে বিপদ থেকে রক্ষা করেন বাইরের দেব-দেবীগণ। রেঁনেসাঁস এই ধারণাটিকে ভেঙ্গে দিল। মানবিকবাদীরা বললেন মানুষকে বিপদ থেকে দেব-দেবীগণ রক্ষা করেন এটা ভুল। আমাদের দেশেও মঙ্গল কাব্যগুলিতে দেখা যায় যে মানুষ যখন বিপদে পড়ে ডেকেছে দেব-দেবীগণ তাদের বিপদ দূর করে দিয়েছেন। উনবিংশ শতাব্দীর রেঁনেসাঁসের পর আমাদের দেশে যে আধুনিক সাহিত্য লেখা হলো তাতে আর দেব-দেবীদের ডাকা হলো না, তাঁরাও এসে ঘটনায় হস্তক্ষেপ করলেন না। মধ্যযুগের সাহিত্য মানবিক সাহিত্য নয়। আধুনিক সাহিত্য মানবিক সাহিত্য। আমরা পৃথিবীকে মানবিক ভাবতে শিখলাম। অলৌকিক ভাবতে আস্তে আস্তে ভুলে গেলাম। অবেরা ক্রমশঃ মানব মুখীন হয়ে পড়লাম।

রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বর ও মানুষ দুইই বিশ্বাস করতেন। কিন্তু তাঁর সাহিত্য-ভাবনায় তিনি মানবিকবাদী। তিনি জানতেন যে দেবতা মানুষকে রক্ষা করেন না। মানুষই স্বীয় বুদ্ধির দ্বারা, বীর্যের দ্বারা, জ্ঞান বিজ্ঞানের শক্তির দ্বারা নিজেকে রক্ষা করছে এবং করবেও। মানুষকে বিপদ থেকে রক্ষা করবার জন্য দেবতা বা ঈশ্বর চাই-ই একথা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করতেন না। রবীন্দ্র সাহিত্যের সুর মানুষের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাসের সুর। এই মানব-বিশ্বাসের রেঁনেসাঁস বহু ঐতিহ্যকেই তিনি এগিয়ে দিলেন। তিনি humanist tradition-এ মানুষ। পরিপূর্ণ জীবনবাদী। বন্ধদুয়ার ভেঙ্গে দেবার পক্ষপাতী তিনি। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যপাঠ করে এবং তাঁর জীবনদর্শনে আমরাও তাই মানবিকবাদী হয়ে গেলাম। রবীন্দ্র সমসাময়িক ও তাঁর পরবর্তী সাহিত্য-সেবীগণও এই ভাবাদর্শ অনুসরণ করে মানবিকবাদী হয়ে পড়লেন। তাঁদের জীবন এবং সাহিত্যও মানব জীবনের জয়গানে মুখর হয়ে উঠলো।

বিমল মুখোপাধ্যায়

তখন থেকে একটা চিঠি লিখতে চেষ্টা করছি আর খুব একে সময়ের বিরক্ত করছে আমাকে।

বাবুর আমার চেয়ে দশ পাঁচ বছরের ছোট। আজ চার-পাঁচ দিন হলো দশ একটা স্কলারশিপ পেয়ে লণ্ডনে গেছে পড়বার জন্যে। জামাইবাবু, সরকারী চাকরির সূত্রে এখানে থাকেন বলেই তিনি নিশ্চিন্তে ওকে বাবুকে আমাদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছেন বৌদি আর বড়দার কাছে অপরিচিত শহরে বাবুর দিন কি করে কাটছে।

কি করে কাটছে? না—তা নয়। মাঝে মাঝে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদতে দেখি। ঠাট্টা করে বলি: "ছি ছি, এত বড়ো মেয়ে। মার জন্যে কাঁদে। ছেলে পড়াটাকে বলে।"

ঘরে ভাইবোন বলতে বাবার তিন বছরের ছেলে। তবু ওতেই কাজ হয়। তাড়াতাড়ি চোখ মুছে কান্না মাখা হাসি মামা, কাঁদছি না তো। কক্ষনো কাঁদছি না আমি।"

বাবুর মন খারাপ যার জন্যে তাকে পাঁচিশ টাকা দামের একটা ভাল শাড়ি কিনে দেবেন বৌদি দিয়েছেন গোটা তিরিশেক রঙিন কাপড়ের টুকরো আর একখানা ছবির বই। মা টাকি-ব্লাউজের নাপ-জোখ বলেছেন। আমি নিজের কাজ ফেলেও প্রায়ই ওকে ডেকে ওদিক ওদিক বেড়াতে নিয়ে যাই তবু—

আর তো, বোন বলে।

কিন্তু আ বন্ধক করছে।

নীল রঙের একটা ছোট কাগজে চিঠি লিখতে বসেও শুরুতে কী যে লেখা আর শেষ মুহূর্তে লুকিয়ে থাকে তার মধ্যে, আকাশ ছোঁয়া উঁকি মারে। আর নীল রঙের শাড়িটা শুরুর সব ছেয়ে বেশি পছন্দ।

এক সময়ে এম-এ পড়েছি দুজনে।

পেয়ে একটা ফেয়ারওয়েলে পরাটাই দেয়নি। পরীক্ষা দেবার জন্যে ছিল। আর্থিক দৈন্যের অনেক ওপর তলায় ওর বাস।

পোস্ট-গ্র্যাজুয়েটে বসে দক্ষিণ দিন কয়েক বৈচিত্র্যের স্বাদ নিতে এসেছিল। তবু এক সপ্তাহ ঘুরে বেড়িয়েছি দিনের পর দিন— চলে গেছি বোটানিক্সে, ফকির সেখে দুবার পাড়ি দিয়েছি ডায়মণ্ডহারবারে। আমার প্রতি একটু পক্ষপাত ওর ছিল, বন্ধুদের হিংসের কাঁটা মধ্যে মধ্যে গায়ে না বিঁধেছে তা-ও নয়।

তারপর এম-এ তে থার্ড ক্লাস জুটল কপালে। শুক্লাই সান্ত্বনা দিয়ে বললে, 'রেজাল্টে কী আসে যায়? তোমার সত্যিকারের মেরিট ইউনিভার্সিটি না বুঝতে পারে, আমি তো জানি।'

শুক্লার কথাতেও ব্যথার ভারসাম্য প্রলেপ পড়ল না। পরীক্ষা দিতে হল আরেকটা—কেরানীগিরির জন্যে। চাকরি পেয়েছি এবার।

কিন্তু শুক্লা এখন প্রায় আকাশের চাঁদের মতো সুদূর। আমি যেন বৈশাখের গরমে অফিসে বসে রেজগুপ্তেসের নকল রাখছি, শুক্লা তখন নাইনিতালের লেকে বোটে চাপছে, বেড়াচ্ছে আলমোড়াতে। টাকার ভাবনা ওদের জন্যে নয়।

তবু দেখছি, শুক্লা আমাকে ভোলে নি। হঠাৎ ওর একটা চিঠি এসেছে রাণীখেত থেকে।

'এর আগে তো দুবার এসেছি, কিন্তু দারুণ ভালো লাগছে এবারে রাণীখেতকে। তোমার কথাই মনে পড়ছে বার বার। ভাবছি, তুমি সঙ্গে থাকলে বেড়ানোর আনন্দটা পুরো হত—আরো সুন্দর হয়ে উঠত দিনগুলো। কোত্থেকে দাদার এক বন্ধু মিস্টার মুখার্জি এসে জুটেছেন এখানে। বিবি ছেলেরা, দারোগের সোটা তিনেক ডেইরেট আছে য়ুরোপের, দিল্লীতে একটা দারুণ চাকরি করেন। এমনিতে বেশ ব্রাইট, কিন্তু ইংরেজি গান শুনিয়ে শুনিয়ে কান ঝালাপালা করে দেন। তুমি থাকলে বিলেত ফেরতা মুখার্জির অহঙ্কার ভেঙে দিতুম—বাংলা আবৃত্তিও যে কী চমৎকার হতে পারে, সেটা বুঝতে পারতেন ভদ্রলোক।

সত্যি, ছুটি নিয়ে আসতে পারো না—এই দিন পনেরোর জন্যে? খুব ভালো লাগত কিন্তু। মুখার্জি ভীষণ উইটি, আমার আবার অত কথা জোগায় না। তুমি থাকলে লোকটাকে অনেক খানি জব্দ করতে পারতে।'

চিঠিটা পেয়ে মন দুলছে কাল থেকে। আবার চোখের সামনে ভাসছে বোটানিক্সের সেই ছায়া ছায়া দুপুর, ডায়মণ্ডহারবারের বাঁধের পাশে ছোবড়ের বিশাল গদ্দার সেই আছড়ে পড়া—যা কখনো কখনো পুরীর বেকারকেও লজ্জা দেয়। মনে পড়ছে গুন গুন করে গান গাইছে শুক্লা, বলছে, 'এই বেশ—না? স্কুল-পালানো ছেলেমেয়ের মতো সারা দুপুর টো টো করে বেড়াচ্ছি দুজনে।'

আমি শুক্লাকে ভালোবাসি, একথা বলবার সাহস কখনো পাই নি। শুক্লা আমাকে ভালোবাসে কিনা সে কথাও কোনোদিন শুনতে পাই নি তার মুখ থেকে। তবু কাছা কাছি থাকার একটা তপ্ত মধুরতা বার বার মনে মোচ দিয়েছে, শুক্লার নীল শাড়ীর আঁচল বাতাসে গায়ে উড়ে পড়েছে বার বার, আমার হাতটা মুঠোয় নিয়ে শুক্লা খেলা করেছে কখনো কখনো, বলেছে, 'তোমার আঙুলগুলো ভারী সুন্দর—একেবারে আর্টিস্টের মতো। ছবি আঁকবার চেষ্টা করো না কেন?'

ছেড় বছরের ভেতরে শুক্লার কাছ থেকে অনেকটা দূরে সরে এসেছি—জানি, অল্প মাইনের কেরানী এখন আর তার ত্রিসীমানাতেও যেতে পারে না। পোস্ট-গ্র্যাজুয়েটের দামি দামি কাঠের বেঞ্চির সাম্যবাদ আর নয়, সেই স্কুলে পালানো দুষ্টুমি ভরা প্রহরগুলো হারিয়ে গেছে চির-কালের মতো। বৈশাখের দুপুরে অফিসের বন্ধ আবহাওয়ায় পাখাগুলোর আগুন ছড়ানো বাতাসে যখন দাহ পরীর জ্বালা করতে থাকে, তখন কখনো কখনো মনে পড়ে বোটানিকসের একটা গাছের ছায়ায় পা মেলে বসেছি দুজনে, গঙ্গার বুক থেকে ভিজে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে শরীর যেন জুড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

কাজ ভুলে অন্যমনস্ক হয়ে বসে থাকি—অফিস ফিরতি এক-একটা ক্লান্ত বিকেল শুক্লার ভাবনায় কখনো কখনো আকুল হয়ে ওঠে। কিন্তু তারপরে যে আমি—সেই আমি। রবীন্দ্রনাথের সেই হরিপদ কেরানী। আমার দুর্ভাগ্য শুধু এই, যে কোনো বাঁশির ডাক আমাকে স্বপ্ন কাননের স্বর্গে নিয়ে যায় না।

তবু শুক্লার চিঠিটা যেন ওর নীল শাড়ী, ওর একটু ঘামি লাগছে চুলের সেই গন্ধ, কটা চোখের তারার সেই কৌতুকের ঝলক—সব এক সঙ্গে বয়ে আনল আমার কাছে।

অনেক দিনের কাছে না পাওয়াটা এই চিঠির ভেতর দিয়ে যেন অনেক বেশি করে পেলো ওকে. আমার সব ভাবনাগুলো সেখানে বিবশ হয়ে এল।

নীল চিঠির কাগজ টেনে নিয়ে লিখতে বসেছি। নীল—সমুদ্রের রং, আকাশের রং, শুক্লার শাড়ীর রং, যে স্বপ্ন সেতারের ঝুলি ভেসে যেতে পারে, তার রং। কিন্তু কী লিখি? কী সম্ভাষণ করি ওকে?

ঠিক এই সময় খুকু এল।

—ছোট মামা!

—হুঁ।

—অ ছোট মামা!

এবার মাথা তুলতে হল।

—কী চাই?

—কাকে চিঠি লিখছ ছোট মামা? মা-কে?

সেই এক কথা। কোনো মতে ভুলে থাকতে পারে না।

বললুম, সেতারকে কাল চিঠি লিখব। এখন অন্য লোককে লিখছি।

—আচ্ছা মা-কে যখন চিঠি লিখবে, তখন আমাকে ডাকবে তো।

—নিশ্চয়, নিশ্চয়।

—আমি মাকে বলব, বিলেত থেকে আমার জন্যে যেন একটা এরোপ্লেন কিনে আনে। খুব বড়ো। আর লাল রঙের।

—আনবে বইকি।—খুকুর মাথার লাল রিবনটা একটু নেড়ে দিয়ে বললুম, খুব বড়ো লাল রঙের এরোপ্লেন আনবে আর তাতে চেপে আমরা সবাই মিলে কলকাতার ওপর বোঁ বোঁ করে ঘুরে বেড়াব। কেমন?

—সে চমৎকার হবে!—খুকু হাততালি দিলে, তারপরেই আবার গম্ভীর হল: কিন্তু মা কবে আসবে?

ঘুরে ফিরে আবার বললুম, আসবে শিগ্‌গীরই।

—খুব শিগ্‌গীর?

—হ্যাঁ—হ্যাঁ, খুব শিগ্‌গীর। এখন যা তো, আমার এই চিঠিটা লিখতে দে।

রাস্তায় বাঁদরওলার বাজনা শোনা গেল, খুকু ছুটল দরজার দিকে। কিছুক্ষণের জন্য স্বস্তি মিলল। আমি আবার চিঠিটা লেখবার চেষ্টা করতে লাগলুম। কিন্তু কী সম্ভাষণ করা যায় ওকে? এতদিন পরে শুক্লাকে কী নামে আমি ডাকব?

সেটা এখন থাক। পরে বসিয়ে দেব না হয়।

'তুমি যেতে লিখেছ রাণীখেতে। সেখানে মেঘ-পাহাড়—বার্চবন আমার মনে এসে এখনি ছায়া ফেলেছে। এখানে কলকাতায় আগুন জ্বলছে এখন, পথে পাঁচ গলছে, আমার জানালার পাশেই একটা কুকুর মরেছে দেখতে পাচ্ছি। যদিও এখনো এগারোটা বাজে নি। তবু মনে মনে আমি তোমার সঙ্গে চলেছি। আমার মুখে কুয়াশা এসে পড়েছে, তোমার চুলে কয়েকটা জলের কণা ছড়িয়েছে তারা। তোমার সেই ইংরেজি গানগুলা মিস্টার মুখার্জীকে অনেক সেধেসেধে শেখাচ্ছ, পৃথিবীতে যেন তুমি আর আমি ছাড়া আর কেউ কোথাও নেই!

স্বপ্ন? স্বপ্ন ছাড়া কী আর আছে বলো। 'মোর ভানা নাই আছে এক ঠাঁই'—এটা ভুলতে পারলে বেশ হত, কিন্তু ভোলবার জো কী! বাইরে থেকে গরম হাওয়া আসছে একটু পরেই জানালাটা বন্ধ করে দিতে হবে। তবু ভাগ্যিস আজ রবিবার, এই অগ্নিবৃষ্টির মধ্যে অফিসে ছোটাতে হবে না। কিছুক্ষণ নিশ্চিন্ত হয়ে কল্পনায় তোমাকে—

আবার খুকুর আবির্ভাব।

—ছোট মামা!

—কি রে?

—মা-কে কাল চিঠি লিখবে তো?

মনে মনে তীব্র বাসিক বিরক্ত ফেনিয়ে উঠল, কিন্তু খুকুকে বকুনি দেওয়া অসম্ভব। ওর করুণ শান্ত মুখ আর থেকে থেকে ছল ছল করে ওঠা চোখদুটোর দিকে তাকিয়ে বুকটা মমতায় ভরে যায়। বললুম, নিশ্চয় লিখব। লাল এরোপ্লেনের কথাও লিখব।

—আর একটা ভাল মটর গাড়ী।

—আলবৎ। মোটর গাড়ী না হলে চলে কখনো? সে তো আনবেই।

খুকু বললে, তাহলে চারটে পয়সা দাও এখন। রাস্তা দিয়ে বেলুন যাচ্ছে, কিনব একটা।

বেলুনের পয়সা দিয়ে খুকুকে বিদায় করলুম।

চিন্তাটা আবার গুছিয়ে আনতে হচ্ছে। মাঝখান থেকে সমস্ত সুরটা কেটে গেল।

"তুমি যেতে লিখেছ। কিন্তু যেতে চাইলেই কি

যা এরা দেয়? অন্তত মাস গেলে বেশ হত, কালিদাসকে নকল করে মেঘকে দূত পাঠাতুম।"

এইটুকু থাকতে চলে। হোলাবুলি প্রেমপত্রের মতো দাঁড়াচ্ছে না তো চিঠিটা? এতদিন ধরে যে কথা শুধু বলি বলি করেও বলা হয় নি, আজকে শুক্লা ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে যাওয়ার পর যে অতৃপ্ত আকুলতি থেকে থেকে বুকের ভেতর এক একটা দোলনার মোচড় দিতে থাকে—এই সংযোগে তারা কী আর রাশ মানতে চাইছে না? যে কথা মুখে বলা যায় নি। চিঠির ভেতর দিয়ে তারা কি জোর করেই বেরিয়ে আসতে চায়?

ঠিক এই ভাবে লিখব, না একটু ঘুরিয়ে?

—খুকু এসে দাঁড়িয়ে। ছোট্ট খাম বেলুন কিনেছে একটা। সেটার রং লাল। ও এখনো ছেলে মানুষ—এখনো একেবারেই ছোট: তাই চড়া লালই ওর নিখুঁত মনকে ভোলায়—আকাশ নীল, সমুদ্র নীল আর নীল স্বপ্নের খবর ও এখনো জানে না।

—ছোট মামা?

—বল।

—বেলুনটা কেমন উড়ছে দেখেছ? একেবারে ছাদ ছুঁয়েছে।

—ফাঁসিয়ে দে জানের সঙ্গে লাগলে ফেটে যাবে। আর বাইরে নিয়ে গিয়ে সুতোটা ছেড়ে দিবি কিন্তু—উড়ে গেলে যাবে একেবারে।

—কোথায় যাবে?

—তার কি ঠিকানা আছে? পাহাড় পেরিয়ে যাবে—সমুদ্র ছাড়িয়ে যাবে হয়তো—কোথায় যে উধাও হয়ে যাবে। উড়ো বেলুনের খবর কে বলতে পারে!

—অ।

চোখ বড়ো বড়ো করে শুনল খুকু, কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল। তারপর মেঝে থেকে কাগজের টুকরো কুড়িয়ে নিলে একটা।

—ছোট মামা।

—আবার কী?

—এই কাগজটায় বেশ ভাল করে লিখে দাও: 'মা'।

আশ্চর্য হয়ে বললুম, কী হবে?

—তুমি দাও না লিখে। চুপ করে বড়ো করে লেখো। তোমার ওই লাল কালি কলমটা দিয়ে।

লিখে দিলুম। জিজ্ঞেস করলুম, কী করবি রে?

—খুব মজা করবো। কিন্তু, এখন বলব না।

—আচ্ছা বেশ পালা।

খুকু বেলুন নিয়ে চলে গেল।

আবার চিঠিটা টেনে নিলুম। নীল রঙের সেই কাগজ খানা।

না, যা লিখেছি বদলাবো না। শুক্লা কি আমাকে বোঝে নি এত দিনও? ওর কটা চোখের তারার মধ্যে মধ্যে যে ছায়া নেমে এসেছে, তারও কি কোনো অর্থ ছিল না? আমার হাতের আংটির পাথরটাকে দেখতে গিয়ে ওকি অকারণে সেটাকে মুঠোর ভেতর রাখে নি? আমি কি আশা ছাড়তে পারি? যদি ছাড়বার হত, ও চিঠি কি হঠাৎ আমায় লিখত শুক্লা।

"সীতা—ছায়ারে করে কেটে গেছে কালিদাসের কাল।' তা থাক। কিন্তু মানুষ তো বদলায় নি। স্বপ্নেরা এখনো আসে যায়। মেঘদূত না থাক, চিঠিই খবর আনে। তাই—"

উঃ, আবার খুকু!

—ছোট মামা!

এবার বিরক্তি আর চাপতে পারলুম না।

—চিঠিটা আবার লিখতে দিবি না খুকু?

খুকু তার জবাব দিল না। ভারী খুশি হয়ে বললে, জানো ছোট মামা, আমি কী করেছি?

—নতুন কোনো দুষ্টুমি বুঝি?

—না—না।—খুকু কাছে এগিয়ে এল, কানের কাছে মুখ এনে বলল আমার: জানো, সেই বেলুনটার সঙ্গে 'মা' লেখা কাগজটাকে বেঁধে আকাশে উড়িয়ে দিয়েছি আমি। কত পাহাড় পেরিয়ে, সাগর পেরিয়ে—হাওয়ায় উড়তে উড়তে ওটা মার কাছে চলে যাবে। মা খুব অবাক হয়ে যাবে—না ছোট মামা?

আমি কী বলতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু তৎক্ষণাৎ থমকে গেলুম। চিঠির দিকে নজর পড়ল আমার। শুকুর মতোই তো এক অসম্ভব কল্পনায় বেলুন আমিও ওড়াতে চলেছি। আমি কেন এতক্ষণ বুঝতে পারি নি, ইউরোপের তিনটে মহাদেশের ওপারেই আর দিল্লীতে নিদারুণ চাকুরে মুখার্জির কাছাকাছি যাওয়ারও শক্তি আমার নেই? মুখার্জির ইংরেজী গানের নিন্দে বাক্‌চতুরতি ছাড়া আর কিছুই নয়? আমাকে এই চিঠি লেখা নিতান্তই শুক্লার সময় কাটানো খেলা। সে তো ভালো করেই জানে, অল্প মাইনের সামান্য কেরানীর কাছে রাণী যেত মঙ্গলগ্রহের আলো নিয়েই জ্বলছে!

আবার বাংসা আবৃত্তি—মুখার্জির ইংরেজী গানের পাশে? সোডাও কাঁজরা খেতে খেতে এ যেন ডালমুট দিয়ে মুখ বদলানো!

খুকুর উৎফুল্ল মুখের দিকে চেয়ে রইলুম কিছুক্ষণ। ওর বয়েস পাঁচ বছর। ওকে এখনো ক্ষমা করা চলে। কিন্তু আমি?

ক'সেকেণ্ড ইতস্তত করলুম জানি না, তারপর নীল কাগজটাকে কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেললুম।

সব বেলুনই সমান।

কোনোটা লাল—কোনোটা নীল।

[এক]

নলিনীকে চোখে পড়ামাত্র সুহাস চিনেছিল। দাঁড়িয়েও পড়েছিল থমকে। শুধু চট করে স্থির করতে পারছিল না সোফালির ওপর ঘুরে গিয়ে পিঠ দেখানোর সময় তখনও আছে কিনা। থাকলেও সেটা শোভন হবে কিনা।

সময় ছিল না, শোভনও হত না। বাগানটা ছায়া ছায়া হয়ে এলে কী হবে, অন্ধকারেও ওই মেয়েটির চোখ জ্বলে বিড়ালের মত, সুবোধ কালির নিচে ফসফরাসের সবুজ জ্বলে। নলিনী ওকে দেখতে পেয়েছিল। চিনেছিল।

হাত তুলে নলিনী ওকে ডাকল। সুতরাং তখন আর পেছ-পা হওয়া অসম্ভব। মেয়েটার আস্পর্ধায় সুহাস মনে মনে চটল বটে, কিন্তু পুটি পুটি এগিয়েও গেল। নলিনী ছোকরা চাকর অভয়কে ডেকে ইশারায় কী বলছে। সুহাস আন্দাজেই ধরে নিতে পারে—চায়ের কাউ এক পেয়ালা চায়ের ফরমাস।

পাশের খালি চেয়ারটা দেখিয়ে দিয়ে নলিনী বলল, 'বসুন না, সুহাসবাবু বসুন।'

কিন্তু তার উদযুদ ভাব নলিনীর চোখ এড়াল না।

ছোট করে চোখ টিপে নলিনী মুখটাকে দুষ্টু দুষ্টু করল। চেয়ারটাতে ছারপোকা বুঝি?'

অসভ্য, নির্লজ্জ! সুহাস ভর্ৎসনা করল, মনে মনে। মুখের ক্ষেত্রে অবাধিক ভদ্রতার ছবিটা আঁটাই রইল অবশ্য।

'চায়ে মিষ্টি কম হয়েছে, না সুহাসবাবু?'

সুহাস এ-কথার জবাবই দিল না।

যদিও এই গায়ে পড়া মেয়েটার চটুলতা তাকে আদৌ প্রীত করে না, বরং ভীত করে, এবং তাকে ডেকে এনে চা খাওয়ানোর কোন অর্থ সে তখন অবধি উদ্ধার করতে পারে নি, তবু সুহাসের চোখ দুটি সচল ছিল। ঘুটিয়ে ঘুটিয়ে মধুরা প্রসাদের খাস টেনো মেয়েটিকে দেখছিল।

অন্যান্য মেয়ের যাই হোক, অন্তত এই মেয়েটির অঙ্গে যত ভূষণ তার একটিরও নাম লজ্জা নয়। পোশাকের প্রত্যেকটি টাঁক শরীরটাকে পরীক্ষার্থী পড়ুয়ার মত চিৎকার করে উচ্চারণ করছে। শরীরকে যদি পাঠ্য কেতাব বলে ভাবা যায়, তবে বলা চলে, এ-বইয়ের ইন্ডেক্সটায় লাইনগুলির নীচে ছোকালো দাগ টানা, আর, আটোসাটো করে বাঁধাই বইটার সুচারুটে পৃষ্ঠা নলিনী যেন ইচ্ছে করেই হাওয়ায় উড়তে দিচ্ছে।

'কী দেখছেন ।'

'কিছু না'

'তবে কী ভাবছ'

'কিছু না ।

আরও পুষ্ট। পুরুষ নলিনী চাওয়ার উড়িয়ে দিল । 'সুহাসবাবু, আপনি ভারী চাপা মানুষ । কিছুতে মুখ খোলেন না । রিবানিহ্যাটি পরিপাটি হয়নি বুঝি ?'

সুহাস কানে খাটো এমন সন্দেহের বিন্দুমাত্র কারণ নেই তবু শেষের প্রশ্নটা করবার সময় নলিনী মুখটা সুহাসের কাছাকাছি নিয়ে এল । তখন আত্মরক্ষার বিব্রত সুহাস সাব্যস্ত করল এই মেয়েটির গলায়, ঘাড়ের চামড়ায় অবশ্যই রবারের মিশেল থাকবে নতুবা ইচ্ছামাত্র সে মাথাকে রাজহংসী করে তোলে কী করে ।

'তারা গুনছেন, সুহাসবাবু ?'

'হুঁ, না তো !'

একটু আগে নলিনীর 'কী দেখছেন' প্রশ্নের জবাবে সুহাস যখন বলেছিল 'কিছু না' তখন সে মিথ্যে কথা বলেছিল, কেন না চোখ দিয়ে নলিনীর শরীর জরীপ করছে সে কথা তো আর জবুল করা চলে না ! এবার কিন্তু সত্যি কথাই বলল । গোনবার মত তারা আকাশে ছিল না । বিকেল থেকেই গুমোট, আকাশটা সন্ধ্যার মুখে কেমন যেন রাগী রাগী থোলাটে হয়ে গেছে, মাঝে মাঝে মেঘে-মেঘে অগ্নিখেলার ঝলকি উঠেছে ।

"আজ বৃষ্টি হবে, কী বলেন ।"

ফসফরাস মণি দুটো এখন সবুজ কাচাপোকার জ্বলে-জ্বলে টিপ । "বৃষ্টি হবে, কী বলেন ?"

"হতে পারে ।"

সমস্ত শরীরটাকে ঘূর্ণি হাওয়ার মত ঘুরিয়ে দিয়ে নলিনী উঠে দাঁড়াল ।

—"যাই সুহাসবাবু । আপনার মন এখানে নেই, বুঝতেই পারছি । হয় আপনি অন্য কিছু ভাবছেন, হয় তো আমার গল্প আপনাকে 'বোর' করছে ।'

'না—না' সুহাস মৃদু গলায় প্রতিবাদ করে উঠল ।

"মুখে বলছেন 'না,' সুহাসবাবু, কিন্তু আমরা টের পাই । মুখ' হতে পারি, তবু এটুকু বুঝি । চলি কেমন ?" বলে নলিনী আর দাঁড়াল না, কয়েক পা এগিয়ে যাও বাঁকিয়ে কী দেখল তারপর পোড়া বাগান পেরিয়ে ফটক ছাড়িয়ে স্টাফ কোয়ার্টার লক্ষ্য করে চলে গেল ।

ভারী সঙ্কোচের মত বশুখানা নিয়ে মৎস্য প্রসাদকে সেদিকেই এগিয়ে যেতে দেখা গেল, সে কতক্ষণ পরে? অন্তত মিনিট কুড়ি তো হবে ।

আমার নাম সুহাস সোম, তোমার নাম নলিনী । তোমার নামটাই জানি, পদবী জানিনে । তুমি ঠিকই ধরেছিলে নলিনী, তোমার সঙ্গ আমার ভাল লাগছিল না । তার মানে এই নয় যে, আমি নারীবিদ্বেষী । আমি স্বাভাবিক, সুস্থদেহ, যুবা । শরীরের সব ক'টি গ্ল্যান্ড যতদূর বুঝি ঠিক মত কাজ করে । অন্ত-যন্ত্রাদিও সাফ এবং সক্রিয় । ফলে আমার মুখের ভিতরটা কখনই তেতো-তেতো লাগে না । ভাল গান, ছবি আর সাহিত্যের উত্তম সংবাদার না হই—কদর বুঝি । নিসর্গে এবং অন্যত্র যে সৌন্দর্য পরিব্যাপ্ত তা আমাকে নড়া দেয়, কচিৎ মুগ্ধও করে ।

তবু নলিনী দেবী, বাধ্য হয়েই আমি অদ্যুনা আমাকে ও-তলে বঞ্চিত রাখি । তিন-তিনটে পাস দিয়েছি, গল্প কবিতা আমার হাতে ভালই উৎরোয়, অন্তত না উৎরোলে সম্পাদকেরা ছাপবেন কেন । একটা উপন্যাসেরও আংশিক ধারাবাহিক ছাপা হচ্ছে । ভাল ডিবেট করতুম, খেলাধুলাতেও আমার উৎসাহ ছিল । কিন্তু এই সবের কৃতিত্বের ফলশ্রুতি কী ? ফিলসু ফিনাম্পিয়ার মধুরা প্রসাদের উদ্দেশ্যে । আমার বাবা কায়ক্লেশে ফীজ ইত্যাদি যুগিয়ে আমাকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন । ওটা আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজের অবেন্ট বিজনেস ইনভেস্ট-মেন্ট । বরং ইনসিওরেন্সের প্রীমিয়ম সোনাও বলতে পার । বাবার এখন শেষ বয়স, পলিসি মেচিওর করেছে, টাকাটা দাবি করবেন না ?

আগে চৌকস চতুর ছেলে বলে বাড়িতে খাতির ছিল, ভালভাবে পাস যে ছেলে দিয়েছে সে ভাল চাকরিও যোগাবে, বাড়িতে এই প্রত্যাশা ছিল । তাই মা রোজ সন্ধ্যার পর ভাত নিয়ে বসে থাকত । কিরতাম, সামনে বসে থাকত । যখন জলের গ্লাস মুখে তুলতাম তখন মা জিজ্ঞেস করত "খোকা কিছু হল ?"

চল আর কোথায়।" চক-চক-চক—জল গেলার শব্দ দিয়ে গলার স্বরটা ঘুরে বাকী কথাও ডুবিয়ে দিয়েছি। 'কিছুই হল না' এই কথাটা রোজ রোজ শুনে বার নিজেরও বোধ হয় একঘেয়ে ঠেকছিল, তাই একদিন দেখলাম আমার ভাত ঢাকা দেওয়া!

বুঝে নিলাম, তারপর থেকে রোজ চাপা দেওয়া ভাতই খেতে হত। কোন কোন দিন আমারও আগে ঢাকনা সরিয়ে বেরালে খেয়ে যেত।

নলিনী, লিখেটিখে কিঞ্চিৎ নাম ডাক হচ্ছিল বলে আমার বোনেদের গর্ব ছিল খুব। তারাও এক দিন বুঝে গেল, এই দাদাটিকে দিয়ে তাদের বিয়ের পণের টাকা জোগার হবার ভরসা নেই। ধীরে ধীরে আমার জামা রিপু করে দেওয়া টেওয়ার মত ভগ্নীসুলভ কর্তব্যে ও ত্রুটি ঘটতে শুরু হল।

কিন্তু নলিনী দেবী, তোমাকে আমার নলিনের কথা সবিস্তারে শোনাতে বসেছি কেন। একটা কথা মনে রেখো, যত অপবাদই জীবনে ঘটে থাকুক, আমি জাত দিই নি। আজও আমি পরিশ্রমী, সচ্চরিত্র বুরা। লেখাকেই আঁকড়ে ধরে আছি। একটু নামডাক হয়েছিল বলেই তো মথুরা প্রসাদের নজরে পড়ে গেলাম, সেই করুণা যা দুপারিশের জোরেই লভ্য। ওর নতুন ছবিতে সংলাপের ভার পেয়েছি। তোমাকে জনান্তিকে জানিয়ে রাখি নলিনী, এখানেই আমি থামব না। আমার থলিতে ছবির উপযোগী গল্পও আছে—যমুনাপ্রসাদকে দিয়ে মনোনীত করিয়ে ছাড়ব। উদ্যোগী পুরুষ আমি, এই উচ্চাভিলাষ আছে বলেই তো মথুরা প্রসাদের এক ডাকে চলে এলাম ওর উইক এণ্ডের বাংলো বাড়িতে। নিষ্ঠা আর ধৈর্য কি জয়যুক্ত হবে না?

কিন্তু নলিনী, তুমি? ঠিকই ধরেছ, তোমাকে আমি অশ্রদ্ধা করি। লোকে জানে তুমি যমুনাপ্রসাদের খাস স্টেনো, কিন্তু আমি এই ক'দিনেই বুঝে নিয়েছি তুমি আসলে কী।

ছি নলিনী, ছি, কেরিয়ারের জন্যে এতটা দিয়ে দিলে, নিজেকে এতটা নামালে?

তাই তো আজ বিকালে বাগানে চায়ের পেয়ালা অত বিস্বাদ ঠেকছিল।

তুমি জিজ্ঞাসা করেছ তোমার সঙ্গে আমাকে 'মোর' করেছে কি না। করেছে কিন্তু স্বীকার করি নি। তুমি দ্যাখনি, আমি টের পেয়েছি ওই মিথ্যে কথাটা উচ্চারণ করা মাত্র আমার ভিতর থেকে বিবেক নামে পদার্থটি বিদ্রোহ করে পলকে সনম্বর পশুতে পরিণত হয়েছে, আঁচড়ে কামড়ে আমাকে রক্তাক্ত করে দিয়েছে।

আমার নাম নলিনী, তোমার নাম সুহাস। সুহাস-বাবু সেদিন বাগানে যখন বসতে ডাকলুম, তখন সারাক্ষণ অমন জড়োসড়ো বোবা হয়ে বসে না থাকলেও পারতে। অত অহংকার কেন তোমার। তুমি কি সত্যিই ঠাউরে বসেছিলে যে, তোমার প্রেমে পড়ে আমি হাবুডুবু খাচ্ছি। তা নয় সুহাসবাবু, আমরা পোড়-খাওয়া কেরীয়র মেয়ে, অত সহজে জলে ডুবিনে।

তবে জলে আমি নামি। এই জলে নামা আর ডোবার মধ্যে মস্তবড় তফাত আছে সুহাসবাবু, তোমার মত নাক বিটকানো নিপাত ভালমানুষ সেটা বুঝবে না।

চোখে মুখে অতটা বিরক্ত নিষ্প্রভ ভাব সেদিন ফুটিয়ে না রাখলেও পারতে, সুহাসবাবু, তোমাকে প্রথম দিন দেখেই বুঝেছিলাম তুমি কোন জাতের। বিদ্বান, বুদ্ধিমান, ভালো লেখক, তোমার বড়াই খুব। আমাকে—আমাদের তুমি ঘৃণা কর। গা বাঁচিয়ে চল।

এক দিন কিন্তু বোঝাপড়া হবে সুহাসবাবু, হবেই হবে, আমরা কতখানি বিষেছি, তুমি বাঁচিয়েছ কতটুকু।

[দুই]

ঠিক এই দৃশ্যের মধ্যে গিয়ে পড়বে সুহাস ভাবতেও পারেনি। ফরাস তাকিয়া, বোতলের গড়াগড়ি—প্রত্যাশিত সবই ছিল।

এবং একমাত্র বোতলই গড়াগড়ি যাচ্ছিল না। মেম-মাংসের একটা পিসেও, যার বাপ-মার দেওয়া লেবেলের পাঠ যমুনাপ্রসাদ।

যমুনাপ্রসাদের চেতনার অস্পষ্ট তখন ভাসমান। দরজা যে খোলা আছে এটা টের পেয়ে সে প্রথম হতভম্ব হয়ে পড়েছিল। সুহাসকে কী বলবে ঠিক করে উঠতে পারছিল না।

লক্ষ্মণের অবধি ছিল না সুহাসেরও।

প্রথমে সে [illegible] পড়ে, পরে ভরসা করিতে হয় ভয়ে। যদি

ভাকবে? তার কি চাকরীও যাবে! সুহাসের হাত পা ঠিক হয়ে আসছিল। বিশেষ এবং জরুরী দরকার না পড়লে সে চুকত না এই জাতীয় কী একটা বৈধিক্ত আমতা-আমতা করে পাখিল করতে যাচ্ছিল—

যদুনাথপ্রসাদ তাকে সে সব সুযোগই দিল না।

যেন সুহাসের অপেক্ষাতেই সে ছিল। সুহাসের সম্পর্কে সে জানে উঠবে কি, যেন সুহাসের তখন যে কক্ষে প্রবেশ ঘটবে এ কথা সে জানত। সুতরাং সপ্রতিভ ভাবেই যদুনাথপ্রসাদ দুখানা নোট ঘুরে দিল সুহাসের দিকে। গড়াগড়ি যাওয়া হোতলগুলোর একটাকে দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'আউর এক।'

দেখানো পাতার মত উড়তে উড়তে নোট দুটো সুহাসের পায়ের গোড়া অবধি এল ঠিক। সুহাস ঝুঁকে পড়ে নোট দুটো কুড়িয়েও নিল।

জরাসের দুহাতে বিদেশী হোতল করে আরও যে একজন এতক্ষণ নিঃশব্দে বসে আছে, অপলক চেয়ে রয়েছে সুহাসের দিকে, চলে আসার আগে সুহাস তার দিকে ফিরেও চায় নি।

একেবারে সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছে তার কথা স্মরণ করে সুহাস ঘুরে ফেলল।

বাছাবাছি সোহান নেই, দূরের বাজারে যেতে হয়েছিল। সুহাস ফিরে যখন এল তখন আর যদুনাথপ্রসাদের যাচাই করে কিনিস নেবার মত অবস্থা নেই, সম্পূর্ণ বেহুঁশ।

এক পাশে হোতলটাকে বসিয়ে রেখে সুহাস চুপে চুপে চলে আসছিল।

"সুহাসবাবু, শুনুন।"

এর আগেও সুহাস দুবার স্পষ্ট এই ডাক শুনতে পেয়েছে। কানে তোলে নি। বিশ্বু আর না শোনার ভানও অসম্ভব। সে দাঁড়াল, এবং ওরই মধ্যে যতটুকু সময় ছিল সেই সময়ের পূর্ণ সুযোগ নিয়ে রুচির বালাই-

টুকুও ঘুটলে, দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'বেহায়া কোথাকার—বেশ্যা।'

"খুব শকড্ হয়েছেন, না?"

সৎ, সত্যবাদী সুহাস বলল, "অস্বীকার করব না, হয়েছি।"

ওর সঙ্গে পা মিলিয়ে মিলিয়ে ধাপে ধাপে সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকল নলিনী। ততক্ষণে সুহাস বুঝতে পেরেছিল নাগোড়ের পাল্লায় পড়েছে, নিষ্কৃতি নেই।

নীচের লব-এ নেমে একেবারে চার-দাকী তারা-সাকী আকাশের তলায় মুখোমুখি চল দু'জনে। লুকোচুরির দরকার নেই—একটা মোকাবিলা হয় যদি হয়ে যাক।

'শকড্ হয়েছেন, সুহাসবাবু? এবার বলুন কেন। আমার চোখের দিকে তাকান দেখি—'

কানেরা সাজিয়ে ফটোগ্রাফার যে গলায় ক্লোজ-আপ করে নলিনী যেন সেই গলা বার করেছে।

চুলকুনি অনুভব করে সুহাস অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল, 'থাক, সে কথায় কাজ কী।'

'বলতেই হবে আপনাকে।'

অত্যন্ত বিরক্ত গলায় সুহাস বলল, "আপনি একটা কথা বলবেন আমাকে? আপনি কেন এখানে কাজ করেন।"

"ওঃ, এই! সুহাসবাবু, আপনি মেনুনাপ্রসাদের কাজ নিয়েছেন কেন?"

সুহাস বলল, "টাকার জন্যে।"

"ভেবে দেখুন, আমার কথাও ঠিক তাই। টাকার জন্যে। একই কারণ সুহাসবাবু, অথচ—"

"এক হয়েও এক নয়। একটু তফাৎ আছে বইকি" —সুহাস বরীয়া হয়ে তর্ক করছিল।

"হুবহু এক।" নলিনী বলল জোর দিয়ে।

"আপনি তো শুনি পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট। তা হলে আজ আপনাকে এখানে যে ভাবে দেখেছি··· নলিনী দেবী ওটাও কি আপনার ডিউটির অঙ্গ।"

"সুহাসবাবাবু, আপনি তো স্ক্রিপ্ট রাইটার মানুষ। তবে আজ ও ফরমাস করা মাত্র বোতল আনতে ছুটলেন কেন? সেটা বুঝিয়ে বলুন।"

একটু নীচে গিয়ে সুহাস বলল "সে অনেক কথা। আপনাকে কি বোঝাতে পারব? স্ক্রিপ্ট রাইটার হিসেবে ঢুকেছি বটে, কিন্তু জানেন, আমার আশা অনেক। ধৈর্য ধরে বসে আছি, মেনুনাপ্রসাদের টুকটাক ফরমাস খেটে মন যোগাচ্ছি, কেন জানেন! আমার স্টোরিও ওকে দিয়ে একদিন কেনাতে পারব।"

বলতে বলতে সুহাসের চোখ দুটি উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল।

খুব আস্তে আস্তে হাসছিল নলিনী। "আপনি কী করে ধরে নিলেন সুহাসবাবু যে আমার কোন অ্যাম্বিশন নেই। যদি বলি আমি অ্যাকট্রেস হতে চাই।"

"অ্যাকট্রেস!" সুহাস শুধু প্রতিধ্বনি করতে পারল।

"কেন, আমার বুঝি মানায় না! আমার সে যোগ্যতা নেই।" ঈষৎ ভ্রূভঙ্গি করেছিল নলিনী, অপাঙ্গে সুহাসের দিকে চেয়েছিল।—"আপনি ভদ্রলোক, যাচাই করে দেখুন না, ঘাটতি আমার কোনখানে। সুহাসবাবু অ্যাকট্রেস আমি হবই।"

ছদ্মরাগে সুহাস বলল, "কিন্তু আপনি ভুলে যাচ্ছেন কেন, আপনারা মেয়ে—উচ্চাশার জন্যে অনেক অনেক দাম যে আপনাদের দিতে হয়।"

"ওটা আপনাদের সংস্কার। ভেবে দেখবেন সুহাসবাবু, মালিকের জন্যে মদ আনতে ছুটে আপনার যতখানি গেছে, মালিকের পাশে ওপাশে বসে তার চেয়ে আমার কিছুমাত্র বেশি যায়নি।"

দম নিয়ে নলিনী আবার বলল, "সত্যি সত্যি কী যায় সুহাসবাবু? তার ইনটেরেস্টে বাঁধা দিলে পুরুষের যদি জাত না যায়, মেয়েরা ও ছোঁয়াছুঁয়ি হলে তবে এমন কিছু খোয়ায় না। একবার চান করে নিলেই সব ধুয়ে যায়। কাল সকালে, এই আমিই যখন চান করে আপনার সামনে দাঁড়াব সুহাসবাবু, আপনি চমকে যাবেন, চিনতে পারবেন না। সব কালি ধুয়ে গেছে দেখবেন।"

সেই প্রতীতির সম্মুখে দাঁড়িয়ে সুহাসের মুখে আর কথা সরছিল না। ওপর দিকে চাইলে, দুজনের মাথার একই আকাশ, চোখ নামিয়ে তার আগেই দেখে নিয়েছে যে, পায়ের তলায় একই মাটি।

শীর্ষবিন্দু

সমরেশ বসু

সারাদিনের পথের ক্লান্তি নিয়ে ওরা দুজনে তেমনি দাঁড়িয়ে রইল বারান্দায়। এই ভাড়াটে ঘরের মালী ওদের ঘর সাজাচ্ছে ভিতরে।

ওরা দেখছে, রাজরা কিস্বা গমের চেয়ে ধানের চাষই এখানে বেশী। বাংলা দেশের প্রান্তে এই পাঁওতাল পরগণা যদিও বিহারের ভাতায় ঢুকেছে, তবু মানুষগুলির জীবনের রীতি নীতি বোধ হয় দক্ষিণের চালু দিকে। বাংলা বাংলা আভাস পাওয়া যায়। কিংবা এ শুধু বিনু সাধনের অপরিচয়ের ভুল।

ধান ক্ষেতের উত্তোলিত ডগায় রক্তাভা। রক্ত রক্ত আভাস আমলাগাছে, তাল সারির মাথায়, ফুলহীন পলাশ মহুয়ার ডালে, আর এই বাড়ির বাগানে। গোলাপী রংএর গোলাপেও যেন লেগেছে রক্তের ছিটা।

রাখালী মেয়েটা যাচ্ছে গরুর পাল নিয়ে। পর পর আরও অনেক গরু মোষের পাল নিয়ে চলেছে ছেলেগুলি। কে জানে, ওরা লাল মাটির ধুলোয় সারাদিন গড়িয়েছে কিনা। ওদের পশম-মাখা চুল লাল, সারা গায়ে লালাভা। গরুগুলির শিরদাঁড়া বেয়ে পড়েছে রক্তিম রেখা আর চারদিকে ওদের লাল মাটির গুঁড়ো।

এ বাড়ির বাগানের শেষে পুকুরটা যেন সত্যি রক্তের নিস্তরঙ্গ পুকুর। যত সন্ধে যাচ্ছে, ততই জমে জমে যাচ্ছে, কালো হচ্ছে রং। যেন কত, কত মানুষের মাংস ও কঙ্কাল আছে ওই জলের তলায়।

পুকুরের পরে মালীর কলাইয়ের চাষ। তারপরে লম্বের সীমানা ছিটিয়ে ধান ক্ষেত। ধান ক্ষেত আদিগন্ত বিস্তৃত নয়। যতটুকু পাওয়া গেছে নাবালের নরম মাটি, বর্ষার জলের ধারা বয়ে যাওয়া সংকীর্ণ প্রান্তর, ততটুকুই। সরু, লম্বা, চওড়া, গোল, চৌকো, নাবালের যেখানে যেখানে গড়া মাটি।

তারও পরে, লাল কাঁকরে লাল পাথরে, পাঁশুটে ঘাসে আর ধূসর রঙের বিস্তৃত নিরালম্বী কটির প্রান্তরে উঁচু নীচুর খেলাটা ছুটে গেছে অনেক দূর। অনেক দূরে তাল সারি, মহুয়া, ঝেবদারু, ইউক্যালিপ্টাস্ আর শালের বুড়ি ছুঁয়ে ছুঁয়ে। বুড়ি ছুঁয়ে ছুঁয়ে হাপিয়ে হাপিয়ে, মুখ থুবড়ে পড়েছে গিয়ে দূরের পাহাড়টার পায়ে। একটা পাহাড় দুটো পাহাড়। বড় পাহাড় আর ধরমারা পাহাড়। বড়টা আসছে পশ্চিম থেকে, বাঁক নিয়েছে একটু দক্ষিণে, ছুঁচলো মুখে। মনে হয়, ধূসর রঙের ছুঁচলো মুখ শুয়োরটা ডান দিকে ঘাড় বাঁকাবার চেষ্টায় আছে। উত্তর থেকে দক্ষিণে পিঠ উঁচনো ছোট পাহাড়টা ধরমারা। ধরগোশের মতই দেখতে। মাথার উপরে, ফাঁকে ফাঁকে, রক্ত-লাল আকাশ। কালোর ছায়া পড়ছে আস্তে আস্তে। আর আস্তে আস্তে রং বদল করছে বড় আর ধরমারা। খাঁজে ও ভাঁজে দু-য়ের কী যেন দেখা যায়, উলঙ্গ মানুষ একটি, হাত তুলে ডাকার মত।

বিনু আর সাধন দেখছে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। পুকুরের দক্ষিণ পারে মালীর বউটা, বাচ্চুরের মুখে স্তন্য খেতের মত ছেলের কাছে খুলে দিয়েছে বুক। উলঙ্গ কালা ও বোবা আর একটি ছেলে তলপেটের নীচে হাত দিয়ে দেখছে পুকুরের নিস্তরঙ্গ জল। একটা গরু তাকিয়ে আছে দূর পশ্চিমের আকাশে। মোরগটা নেমে এসেছে সূর্যের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে। দেখতে পেয়ে বাকী মোরগগুলি পালিয়েছে খোঁয়াড়ে। মুরগীগুলি চলেছে ওর সংগে সংগে, ধীরে ধীরে, এখনও ঠোঁট ঠুকে খুঁটে খুঁটে।

এই লম্বের আরও ছোট ছোট ভিন্ন ভিন্ন ছাড়া ছাড়া ফ্ল্যাটে মানুষের সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। সকলেরই ভিন্ন দরজা, ভিন্ন বারান্দা। বেরিয়ে এসে মিলিত হয় একটি উঠোনে, একই বাগানে, মাঠে ও পুকুরের ঘাটে।

লাল রং পড়েছে বিনুর মুখে। বিনুর কয়লা, পথের ধুলো মাখা মুখে ও বুকে চুনে। লাল দেখাচ্ছে ওর অতি সাধারণ বড় বড় দুটি বাংলা চোখ। বেশী কয়লা দেখাচ্ছে ওর বাড়তে না পাওয়া ষোলবছরের ছেলের মত গাল আর মোটামুটি উঁচু সরু নাক। আর তেঁতুলে বিছের মত দেখাচ্ছে গলায় জড়ানো সোনার হার, যার রক্ত-চোখের মত লকেটটা এসে পড়েছে বিনুর বড় করে কাটা ব্লাউজের প্রান্তে, ওর অপুষ্ট কিংবা জোয়ারের পরে ভাটার মুখে হৃদয়ান্তরের মধ্যখানে। শরীর জুড়ে, উঁচু নীচুর বাড়াবাড়ি নেই, বরং কোঁচকানো নীল শাড়িটার ভাজ সমতলের দিকেই টান।

সাধনের মাকামাঝি রোগা মুখের ধূলি ধূসর শ্যামলে রং লেগেছে। শার্টের বোতাম খোলা কণ্ঠা দেখাচ্ছে একটু বেশী করসা। আর ছিঁড়িবিঁড় কতকগুলি লালচে দাগ পড়েছে চশমার মাইনাস পাওয়ার লেন্সে। কোঁচকানো চুলে লেগেছে লাল ধুলো আর লাল আলো। ওর নিরীহ মুখ, নিরীহ ভঙ্গি, নিরীহ চাউনি ছাড়িয়ে, মাথার দিকে তাকালেই যেন যৌবন ও ব্যক্তিত্বের ছাপটুকু চোখে পড়ে।

দুজনে দাঁড়িয়ে দেখছে না, যেন নিঃশব্দে পান করছে এই রক্তিম ওঠা নানা অসমতলের সুদূর বিস্তৃত দৃশ্য।

ঘুঙুরের রুমরুম শব্দ আসছে কোথা থেকে। তারপর শোনা গেল ঘোড়ার পায়ের শব্দ। রাস্তার দিকে ফিরে তাকিয়ে দেখল, মন্থরগতি, বেঁটে ঘোড়া টানা টাঙা চলেছে একটি পশ্চিমে। চলতে চলতে উঠেছে চড়াইয়ে। উঠছে, টেনে টেনে উঠছে, তারপর আকাশের পটে উঠল ঢিবিসে চড়াইয়ের শীর্ষবিন্দুতে। ঠিক যেন যুদ্ধ ফেরতা, ভাঙাচোরা পরাজিত রথ, একটু একটু করে হারিয়ে গেল উতরাইয়ের আড়ালে।

সাধন না হেসেই যেন উল্লসিত গলায় বলল, বেশ সুন্দর, না রে ছোড়দি?

বিনুর শুকনো ঠোঁটের কোণে একটু যেন হাসি দেখা গেল। চড়াইয়ের দিকেই চোখ রেখে বলল, উঁহু!

সাধন ওর মোটা লেন্সের ভিতর থেকে একটু অবাক চোখে চেয়ে দেখল বিনুকে। জিজ্ঞেস করল, উঁহু মানে?

বিনুর ঠোঁটে হাসিটুকু স্পষ্ট হল আর একটু। চোখ না ফিরিয়ে, মুখ না ঘুরিয়ে, তেমনি করেই বলল আবার, উঁহু মানে 'ছোড়দি' নয় সাধন, 'বিনু।'

সাধনেরও যেন কিছু একটা মনে পড়ে গেল। সেও ফিরে তাকাল দূরে, বোধ হয় খরাঝারাটার গায়ে। একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, তাহলে আর 'সাধন' নয় বিনু, আমি 'ছোড়দা।'

দুজনেই চোখোচোখি করে হাসতে চেষ্টা করল একটু। তারপর বেলা শেষের আকাশের মতই গম্ভীর হয়ে উঠল দুজনে।

মালীর ঘর সুছানো হয়ে গিয়েছে। জ্বালিয়ে দিয়েছে দুটি দেয়াল বাতি। দুজনেই ঘরে ঢোকবার জন্যে ফিরতে যাচ্ছিল। সঙ্গের কাঁকর পথের ওপর কর্ কর্ মর্ মর্ পায়ের শব্দ শুনে ফিরে তাকাল দুজনেই।

একটি ছেলে আসছে। বোধ হয় ছেলে নয়, লোক। কিংবা দু-য়ের মাঝামাঝি। খাকী ফুল প্যান্ট, সাদা হাফশার্ট, সাদা নয় কালো নয় গায়ের রং, ছোটা হাড় আর কয়েকটি শিরা-স্ফুট চওড়া হাত, বড় বড় থাবা, কপাল উঁচনো মুখ থ্যাবড়া জুতো, সোজা শক্ত চুল পিছনে-ফেরানো, শক্ত চওড়া মত মুখ, মোটামুটি লম্বা এই মিলিয়ে মানুষটি। আসছে হাত দুলিয়ে, কাঁকর ছড়িয়ে ছিটিয়ে, বিনু সাধনের দিকেই তাকিয়ে।

এক মুহূর্ত দেখেই বিনু সাধন আবার ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল। লোকটি জিজ্ঞেস করে উঠল, আপনারা এখুনি এলেন বুঝি?

বুঝতে অসুবিধে হয় নি; ওদের দুজনকেই জিজ্ঞেস করা হয়েছে কথাগুলি। গায়ে পড়া আলাপে ওরা অভ্যস্ত নয়। বরং সংশয়ান্বিত হয়ে অস্বস্তি বোধ করে, তবু চাপতে পারে, কথাও বলতে পারে হেসে।

সাধন বলল, হ্যাঁ।

লোকটি কিংবা ছেলেটি, ছেলেটিই বোধ হয়, কেন না চোখের চাউনি ও হাসি দেখে সেই রকমই মনে হয়। বোধ হয় সাধনের চেয়েও ছোট। ছেলেটি একটু অস্থিরও। এর মধ্যেই দু-তিনবার প্যান্টে পকেটে হাত ঢোকাল, বার করল। জিজ্ঞেস করল, কলকাতা থেকে এলেন, না?

জবাবের অপেক্ষা না করেই বলল আবার, আর তা ছাড়া আসবেনই বা কোত্থেকে। হাওড়া থেকে দু-শো ডেবট্টি নম্বর আপ তো ঘণ্টাখানেক আগেই পাস করে গেল। তাতেই এলেন, না?

মনে মনে বিরক্ত হয়েছে সাধন। বিনুও। কিন্তু আগের চেয়েও অমায়িক ভঙ্গিতে বলল সাধন, হ্যাঁ।

—আমিও কলকাতা থেকেই এসেছি। আপনাদের বাড়ি কোথায়? কলকাতায়?

বিনু তাকিয়ে রয়েছে পশ্চিমে। পুকুরের জল কালো হচ্ছে আস্তে আস্তে।

জেরা নয়, ছেলেটা প্রায় সাধারণ বোকার মত আলাপ করতে চাইছে। সাধন বলল, ভবানীপুর।

ছেলেটি বলল, থাকি দোতলাতে।

সাধন প্রায় ঘরে ঢোকার উদ্যোগের ভঙ্গি করে বলল, অ।

ছেলেটিও যেন চলে যাবে, এমনি ভাবে পা বাড়িয়ে কাঁকর ছিটিয়ে বলল আবার, আমি উত্তর দিকের এক-ঘরওয়ালা সিঙ্গল ফ্ল্যাটটায় আছি। এত চুপচাপ আর ফাঁকা, সারাদিন কিঁকির ডাক শোনা যায়। এক এক সময় এত বিচ্ছিরি লাগে, চেঁচিয়ে গান ধরে দিই, সত্যি।

বলে হেসে উঠল। সাধন হাসল নিরীহ ভাবে। কিন্তু একেবারেই বাজে।

ছেলেটি আবার বলল, থাক, আর এক ঘর বাড়ল, তবু কথা বলার লোক পাওয়া যাবে। আমি দুদিন হল এসেছি। দরকার হলে ডাকবেন, আমার নাম অলোক ব্যানার্জি।

'অ' কিংবা 'আচ্ছা', নয় তো নিজের নামটা বলা, কোনটাই এল না সাধনের মুখে। বেড়াতে আসার সমস্ত আনন্দটা যেন মাটি হয়ে গেল প্রায়। অস্বস্তিতে চশমাটা খুলে ফেলে সে।

ঘরে ঢুকতেই একটা বিকট চিৎকার শুনে, ওরা দুজনেই জানালা দিয়ে ফিরে তাকাল বাইরের দিকে। দেখল, আলোক মালীর সেই বোবা আর কালা উলঙ্গ ছেলেটাকে ধরবার চেষ্টা করছে, আর ছেলেটা হাসতে হাসতে, তলপেটের নীচে দুহাত আরও জোর চেপে ধরে পাশ কাটাবার চেষ্টা করছে ছুটোছুটি করে।

সাধন খুব নিরীহ ভাবেই বিরক্ত হয়ে বলল, উল্লুক।

বিনু জবাব দিল, তা-ই না বটে।

উঠোন থেকে ঘরে ঢুকে মালীটা বলল, গোসল-খানার কল আছে।

বুকটা হুমড়ি খেয়ে পড়েছে সামনে। হাত পা-গুলি গাছের গুঁড়ির মত পাকানো আর শক্ত। হলদে দাঁতে সব সময় চাপা হাসি ভাব।

এই লজের কলকাতাবাসী মালিকের মালী কাশেম, মহসুমী বাসিন্দাদের নোকর। কাশেম জলবাহী ভারী, দুধে যোগানদার, কখনও কখনও রান্নার সরকার।

সাধন বলল কাশেমকে, গুটি দুয়েক ডিম চাই মালী।

—পেয়ে যাবেন বাবু।

যদিও বিদায়ী, তবুও সংবাদ ভালো বলতে পারে সে।

—আর দুধ—

—কতটা?

—আধ সের। পাওয়া যাবে এখন?

যদিও হেসেই আছে, আরও হেসে বলল কাশেম, পাওয়া কেন যাবে না? অখুনি মিলে যাবে।

—তবে দিয়ে যাও, আগে একটু চা খেতে হবে।

কাশেম বেরিয়ে গেল।

বিনু সাধন ঘুরে ঘুরে ঘরগুলি দেখল; দুটি ঘর পুবে পশ্চিমে খোলা। এ ঘর দুটিই ফ্ল্যাটের সবচেয়ে ভাল। তৃতীয় ঘরটা বাড়ির ভিতর উঠোনের দিকে, আসবাব বর্জিত—খানকয়েক চেয়ার ছাড়া। বোধ হয় বসবার ঘর হিসাবে কল্পনা করতে পারে ভাড়াটেরা। অন্য ঘর দুটিতে আছে একলা-তক্তাপোশ, দেয়াল আলমারি আর টেবিলে। এ ঘর দুটির তিন দিক ফাঁকা। পুব-পশ্চিম-উত্তর। উত্তরের কোলে বারান্দা। দরজা না খুলে জানালা দিয়ে ওরা দেখল। বারান্দার পরে সবুজ একখণ্ড জমির ওপারে আর একটি ফ্ল্যাট। সবচেয়ে ছোট, ওই গাবে-পড়া আলোক ব্যানার্জির সিঙ্গল্ ফ্ল্যাট। বোধ হয় ওইটিই। একেবারে নিরালায় গিয়ে পড়েছে। চারদিকেই ফাঁকা ওর। 'এই মুন লজ'-এর সঙ্গে যেন দুটি ছোট ছোট ঘরওয়ালা ফ্ল্যাটটির কোন সম্পর্ক নেই। যেন কাছে থেকেও দূরে। কিংবা থেকেও নেই। 'ধরণীর এক কোণে, রহিব আপন মনে'র কোন প্রসন্নতা ঘিরে নেই বাড়িটাকে। যেন 'বিষণ্ণ বুক নত মাথা, ক্লান্ত আমি, বাস করি ধরণীর কিনারে।' মুন লজ-এর সবাই এসে জড়ো হয় যে উঠোনে বাগানে মাঠে ও পুকুর ঘাটে, সেখানটার সঙ্গে যেন ওর পথ বাঁধা নেই। সামনের দরজায় ওর তালা বন্ধ। জানালাগুলি হাট করে খোলা কিছু হারাবার ভয় নেই, খোয়া যাবার ভয় নেই যেন!

সাধন বিনু ফ্ল্যাটটির দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে পরস্পরের দিকে একবার তাকাল। ওদের আকাশের মত গাম্ভীর্যে দেখা গেল একটু হাসির আভাস। সরে এল দুজনেই।

নিজেদের উঠোনের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। উঠোনের এক পাশে রান্না আর ভাঁড়ার ঘর। পাশে পেয়ারা গাছ একটি। বিনুর ভ্রূ জোড়া একটু নড়িয়ে উঠল। গায়ে পাকা পেয়ারা রয়েছে। তারপরে আবার নিরাসক্তি। ঘরে ফিরে পশ্চিম দিগন্তে তাকাল আবার। ওদিকে এখনও ঈষৎ আলোর আভাস। বিরল চলা ফেরা চোখে পড়ে। উন্মুক্ত, অবারিত প্রান্তরে হেমন্ত বাতাস যেন একটু শীতার্ত হয়ে উঠল।

সাধন আবার বলল, বেশ সুন্দর। আমার বেশ ভাল লাগছে।

বিনু হাসল। ওর বড়চোখের কূলে সেই হাসি যেন পরম বিস্ময় মাখিয়ে দিয়েছে। বলল, আশ্চর্য! আমার এক একবার মনে হচ্ছে, আমি আছি ভুলে গেছলুম। আবার মনে হচ্ছে, আমি নেই, আমি মরে গেছি।

সাধন বলল, অবাস্তব।

বিনু বলল, সবটাই আমার তাই মনে হচ্ছে।

এমন সময়ে আকাশ কাটানো বেসুরো গলার গান শুনে দুজনেই জানালা দিয়ে কিবে তাকাল। সন্ধ্যা-নামা পশ্চিমের চড়াইয়ের রাস্তাটায় আলোক একলাই চলতে চলতে গাইছে। রবীন্দ্রসংগীতের এমন বিচিত্র সুর, অদ্ভুত ভঙ্গি, এরকম নিষাদ ছোঁড়ে গলায় বোধ হয় কোনদিন, আদিগন্ত অসনতলের রক্ত-গঙ্গায় কেউ শোনে নি। কিংবা গানের জন্য নয়, এ শুধু প্রার্থনা। সুর যেখানে গৌণ, গলার স্বর যেখানে সু এবং কু-এর ঊর্ধ্বে। ও যেন ওর শক্ত ঘাড়ের ওপর মাথাটি সমস্ত শক্তি নিয়ে নত করে গাইছে,

আমার মাথা নত করে দাও হে
তোমার চরণধুলার 'পরে।

বিনু ওর শুকনো ঠোঁটে বিদ্রূপ হেনে বলল, পাগল।

সাধন বলল, যাচ্ছেতাই।

বিনু—অসভ্য! হেসে ফেলল ও।

সাধন—গাধা! ভ্রূ কুঁচকে মুখ ফেরাল সে।

এখানে শব্দ বড় জোরে বাজে। আলোকের গানের স্বর ভেসে আসছে তখনও। ধান ক্ষেত পেরিয়ে, ইউ-ক্যালিপ্টাসের গা পিছলে, দেবদারুর বাধা পেরেও ভেসে আসছে। সঠিকভাবে গাওয়ার আয়াস চেষ্টায় সুরোপুরি বেঠিক বেসুরে ও ছেঁড়ে গলায় গান। শব্দটা ধাক্কা দিয়ে দিয়ে বোধ হয় চড়াইয়ে উঠছে। বোধ হয় নয়, তাই উঠছে আর ক্রমে কালো হয়ে আসা আকাশের বুকে ওর অবয়ব ভেসে উঠছে। উতরাইয়ে যেন নেমে যাবে, তখন আর আসবে না ভেসে। আর ভেসে আসছে দরজা-বন্ধ ঘর থেকে একটি মেয়ে গলার ছেঁড়া ছেঁড়া টুকরো টুকরো অস্পষ্ট গানের সুর। বোধ হয় লজ-এরই আর এক অংশ থেকে। কিংবা উঠোনের পাঁচিলের ওপাশের ফ্ল্যাট থেকে।

সুটকেস খুলে বিনু আয়না চিরুনি রাখল টেবিলের ওপরে। আঁচল দিয়ে মুছল আয়না। একবার দেখল নিজেকে। বিশ্রী! ধুলো বালি মাখা রুক্ষতায় বিনু নিজেকে যেন এক নতুনরূপে দেখল।

আয়নার কাছ থেকে ফিরে বিনু বিনুনিতে হাত দিল। খুলতে গিয়ে থেমে বলল, সাধন, আমি স্টোভটা ধরাই তৎক্ষণে···

সাধন বলে উঠল ঘাড় নেড়ে, উঁহু উঁহু উঁহু!

বিনু ভ্রূ কুঁচকে বলল, উঁহু কী?

—উঁহু মানে 'সাধন' নয়, 'ছোড়দা।'

—ওহো!

হাসতে গেল বিনু সাধন দুজনেই। পরমুহূর্তেই একটি বিষাদের ভার মনটাকে ভরে তুলতে না তুলতে বিরক্তি ফুটে উঠল বিনুর গলায়। বলল, সব সময় আমার মনে থাকে না বাপু।

নিরীহ ভঙ্গিতেই যেন একটি কঠিন নিষ্ঠুর দৈববাণী করে সাধন, কিন্তু চিরদিন, চিরকাল, আজীবন মনে রাখতে হবে···খুড়ি বিনু।

আবার বোধ হয় ওরা হাসতে যাচ্ছিল। কিন্তু হাসি গেল না।

সাধন আবার বলল, আর স্টোভ তোমাকে ধরাতে হবে না, আমি নিজে ধরাচ্ছি। তুমি হাত মুখ ধুয়ে এস। চান করতে যেও না, এখানে এর মধ্যেই ঠাণ্ডা পড়তে আরম্ভ করে দিয়েছে।

বিনু বলল, তা যেন হল, স্টোভ ধরাব না কেন ?

সাধন বলল, সেইরকমই কথা আছে। তোমার কোন কাজ নয়, স্রেফ খাওয়া, বেড়ানো, ঘুরানো—

—কেবল সাধন বসু রাঁধবেন, বেড়াতে নিয়ে যাবেন আর বিছানা পেতে দেবেন আমাকে।

সাধন স্টোভটা টেনে ধরাতে বসল। নিরীহভাবে চাইল বিনুর কথায়। কিন্তু কেউই হাসল না।

বিনু তোয়ালে আর টর্চলাইট নিয়ে বাথরুমে যাচ্ছিল। অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে এর মধ্যেই।

সাধন উঠে বলল, দাঁড়াও।

সুটকেস খুলে, এসেন্স চোঁয়ানো মেডিকেটেড সাবানের কেক বার করে দিয়ে বলল, এসব ভুলে গেলে চলবে না।

বিনু কিছু বলল না, কেবল দুজনেই চোখে চোখে তাকাল একবার। একটু স্নেহ কিংবা সামান্য অভিমান যদিও কল্পনাই করা যায় না বিনুর নিতান্ত শান্ত বড় বড় চোখে, তবু যেন কী একবার ঝিলিক দিয়ে গেল। সাবান নিয়ে চলে গেল তৃতীয় ঘর-সংলগ্ন বাথরুমে।

ফিরে যখন এল, তখন ওর সাবান ধোয়া মুখখানি যেন আরও শীর্ণ হয়ে গিয়েছে। ছোট ছোট লাগছে চোখ দুটি, চাউনিটা রুগ্ন, ঠোঁট দুটি ফ্যাকাশে।

সাধন ততক্ষণে চায়ের জল বসিয়ে, কাশেমের দিয়ে-যাওয়া ডিম সিদ্ধ বসিয়েছে।

বিনু পাশের ঘরে গিয়ে বদলে এল জামা কাপড়।

সাধন ডিম সিদ্ধ নামিয়ে, মোটা লেপের ভিতর থেকে দেখল একবার। বলল, ড্রেস করে পরলে হত শাড়িটা ?

প্রায় নিরুপায় ভঙ্গিতে বলল বিনু, এখন না পরলেই নয় ?

যদিও মনঃপূত নয় সাধনের, তবু বলল, থাক্ এখন।

ডিম সিদ্ধ নামিয়ে কাশেমের দিয়ে যাওয়া দুধ বসিয়ে দিল সাধন সযত্নে। তারপর সুটকেস থেকে নতুন শিবন বার করে দিয়ে বলল, আরও আছে। এখন এই দিয়ে চুল বাঁধ, পুরনোগুলো ফেলে দাও। বিনুনির চেয়ে খোঁপাতেই গোঁজামিল চলে ভাল, না ?

বিনু প্রায় বোকার মত তাকিয়ে, কথা না বলে, শিবন নিয়ে সরে গেল টেবিলের কাছে। সেই কাল রাতের বাঁধা চুল খুলতে খুলতে বলল, এগুলো এখন থাকুক না, দিন তো অনেক পড়ে আছে।

সাধন বলল, ক্ষতিই বা কী। ইচ্ছে এবং অভ্যাস থাকাই তো ভাল। এখানেও অনেক মানুষ আছে, দুরকম মনে হবে পরে।

পুরোনো বিনুনির শিবনের ফাঁস খুলতে না খুলতেই বিনুর স্বল্প চুলের গুচ্ছি বেরিয়ে পড়ল। আলগোছে চিরুনি চালাতে চালাতে আয়নার দিকে ফিরল বিনু। দু-একটি নীল শিরাও যেন দেখা যায় গালে ও কপালে। দাঁতের গোড়ায় যেন একটু ব্যাথা ব্যাথা করছে। ঠাণ্ডা জল ব্যবহার করা ঠিক হল কিনা কে জানে।

সাধন স্নো পাউডার কাজলদানি রুনরুমের শিশি নিজেই বের করে দিল টেবিলের ওপর। ন্যাচারেল কলার লিপ-স্টিক, অরেল পেন্টের কৌটোও রেখে দিল সামনে।

বিনু এক চোখে দেখছে আয়নার দিকে। গুটি কয়েক ছোটখাটো ক্ষত কখনও মরতে চায় না। বোধ হয় মরবে না আর এ জীবনে। যেন গোটা কয়েক ছিনে জোঁক শুষে শুষে রক্ত খাচ্ছে এই গাল থেকে। আর এক চোখে দেখছে সাধনের কাজ। বলল, এই রাত করে কি পেন্ট করতে হবে নাকি ?

—অসুবিধে হলে শুধু স্নো পাউডারই—

বিনু ততক্ষণে প্রায় কাঁপ দিয়ে পড়েছে স্টোভের উপর। দুধ উথলে পড়ছিল আর একটু হলে। দুধ নামিয়ে স্টোভ নিবিয়ে দিল বিনু। মুহূর্তে এমন নিঝুম হয়ে গেল সব, মনে হল, রাতটাও শূন্য হয়ে গিয়েছে বুঝি। শুধু ঝিঁঝির ডাক শোনা যাচ্ছে।

বিনু বলল, ছেলেদের দিয়ে সব কাজ হয় না। কোন-দিন একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়ে বসে থাকবে। তখন সব যাবে ভেস্তে।

সাধন বলল, কিছু নয়। এ সব অভ্যাসের ব্যাপার। দুদিনেই রপ্ত হয়ে যাবে।

বিনু যেন ঠিক মানতে পারল না। কিছু বলতে গেল।

সাধন সে অবসর না দিয়ে বলল, আমি ঘুরে আসি বাথরুম থেকে। তুমি সেরে নাও।

শিবন পাকিয়ে, বড় করে খোঁপা বাঁধতে বাঁধতেই সাধন এসে চায়ের জল ছেঁকে ফেলল। স্নো পাউডার মেখে

কাজল দিল চোখে বিনু। কপালে দিল ছোট্ট একটি কুমকুমের টিপ।

সাধন ঠিক দেখছিল তাকিয়ে তাকিয়ে। বলে উঠল, অনাদির বোনকে দেখেছি, টিপটা একটু বড়ো করে দেয়, মন্দ দেখায় না।

বিনুর মুখ একটু লাল হয়ে গেল। এখনও তাহলে মুখ লাল হওয়ার মত রক্ত ও লজ্জাটুকু আছে। বলল, তার মুখ বোধ হয় ভরাট আর চওড়া, তাই বড় টিপে মানায়।

সাধন নিরীহ ভাবে বলল, হ্যাঁ, তা ঠিক। শীলার মুখখানি একটু গোল, ঠিক পান পাতার মত। মাংস আছে। হাড় সার সরু লম্বা মুখ নয়।

বিনুর মনে হল, ও যেন মাটিতে মিশিয়ে যাবে লজ্জায় ও ঘেন্নায়। একেবারেই কি হাড় সার সরু লম্বা মুখ বিনুর? একটু কোমলতা, করেক চিমটি মাংস, কিছুই কি নেই?

কিন্তু সাধন বিদ্রূপ করার পাত্রই নয়। কিছু না ভেবেই সে বলেছে। আর কিছু না ভেবেই কিনু ডিমের খোলা ছাড়াতে বসেছে। ভাবছে যেটা, সেটা তার কর্তব্যের কথা।

বিনুও এল ডিমের খোলা ছাড়াতে। সাধন বলল, থাক্ না।

বিনু বলল, রান্নাটাও ছাড়তে হবে নাকি? আমি কি অসুখ থেকে উঠেছি যে—

—তা-ই বা হল। কাল সকাল থেকে অবিশ্যি কি আসবে, মালীকে বলে দিয়েছি।

—কোন দরকার ছিল না, দুটো ত মানুষ আমরা।

—সাধারণ ভাবে দরকার নেই, এখন দরকার আছে। সেই রকম ইনস্ট্রাকশন।

বিনু তবু বলল, রান্না তো হবে কুকারে, এমন কী খাটুনি তাতে?

সাধন বলল, যেন ও কত অভিজ্ঞ। অনেক কাজ করতে গেলে সেটা বোঝা যায়।

বিনু ডিমের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে বলল, কিন্তু তিনটে ডিম সেদ্ধ কেন?

—দুটো তোমার একটা আমার।

জীবনে এ কথা প্রথম শুনল বিনু। অবাক হওয়ার চেয়েও অসহায় ভাবে বলল, খেতে পারা চাই তো।

সাধন বলল, না পারলেও খেতে হবে, ওদের মত করে।

বলে সে পাউরুটিতে মাখন মাখাতে লাগল। আর ওর নিরীহ চোখেই দেখতে লাগল বিনুকে। ডিমের পাত্র এগিয়ে দিয়ে বলল, আরম্ভ করে দাও।

বিনু যেন টেরই পায় নি, বুঝতেই পারছে না, এমনি ভঙ্গিতে বসে আছে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে কুঁকড়ে উঠছে লজ্জায় ও অস্বস্তিতে।

চুপচাপ বসে দুজনে নিঃশব্দে খাবার চিবুতে লাগল।

কাশেম এল এক কুড়ি কাঠ কয়লা নিয়ে। বলল, কুকারকে দিয়ে এ কাঠকয়লা এখন দুসের এনেছি। পরে আরও দিয়ে আসব।

সাধন বলল, ঠিক আছে।

বাইরের ঘরেরই এক কোণে কাঠকয়লা রেখে কাশেম ভিতরে এল। ঘর দুটির দিকে একবার দেখে বলল, চৌকি দুখানা-ই সিপাল আছে। হুকুম করলে ডবল একটা দিতে পারি। না তো, এ দুটো জোড়া লাগিয়ে দিতে পারি।

সাধন প্রথমে কিছু বুঝতেই পারে নি। সে তার মোটা লেন্সের আড়াল থেকে দুচোখ মেলে তাকিয়ে রইল। বিনুর গলায় একটি অদ্ভুত অস্ফুট শব্দ শুনে ফিরে তাকাল। শুধু লজ্জা নয়, বিব্রত বিরক্তিতে তার ভ্রূ কোঁকড়ানো। সাধন বলে উঠল, ও! না না, তার দরকার নেই।

কাশেম বলল, জী আচ্ছা।

সে চলে গেল। ওরা দুজনে চুপচাপ চা খাওয়া শেষ করল।

বিনু উঠে পড়ল। কুকারটা ধোয়ার মনে করে যেই কুকারে হাত দিয়েছে, সাধন বলে উঠল, তুমি বরং বাটিতে করে, চাল ডালগুলো আন্দাজ মত মিয়ে জল দিয়ে দাও। ওটা আমি ধোপতে পারব না।

বিনু একবার তাকাল সাধনের দিকে। নিশ্বাস চাপল একটি। তারপর ট্রাঙ্ক থেকে বার করল চাল-ডালের পুটলি। একটি ট্রাঙ্ক ভরতি প্রায় পুরো একটি কিচেন। তেল মসলা সবই ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। যাতে বিদেশে পৌঁছেই দোকান বাজারে ছুটোছুটি করতে না হয়।

কুকারে রান্না চাপানো হল। সাধন জানালার দিকে যাচ্ছিলো। বিনু বলল, একটু বাইরে যাওয়া যাক।

যেন অনুমতি চাইল।

সাধন বলল, ঠাণ্ডা লাগবে না তো?

—না। শুকনো জায়গা তো।

সাধন যেন খানিকটা অনিচ্ছায় রাজী হল. চল। কিন্তু মাফলারটা গলায় জড়িয়ে নাও মাথাসুদ্ধ ঢেকে দাও! তাই নিল বিনু।

দরজায় তালা এঁটে বাইরে এল দুজনেই।

অন্ধকার। বালীর ঘরে একটু আলো। একটি ফ্ল্যাটের আধ ভেজানো দরজায় আলোর রেশ। আর সব অন্ধকার। উঁচু নেই, নীচু নেই, চড়াই নেই, উতরাই নেই। আকাশ ভরে শুধু অগণিত তারা। আর কিছু জোনাকি, জ্বলে মিটি মিটি, আগুন জ্বলে না শুধু তাতে।

শুধু একটি জায়গায় চকচক করছে অন্ধকার। সেই তরল চকচকে অন্ধকার পুকুরের দিকে এগিয়ে গেল বিনু। সাধনও গেল পাশে পাশে। পুকুরের কালো চৌহদ্দিতে বন্দী তারাগুলি কাঁপচে একটু একটু।

কে একজন বসেছিল ঘাটে সিঁড়িতে নামতে গিয়ে থেমে গেল বিনু। লোকটি ফিরে তাকাল আর অন্ধকারে ঠিক পুকুরের জলের মতই চকচকিয়ে উঠল ভদ্রলোকের টাক। বিনু আর সাধন বসে পড়ল ঘাটের ওপরে, শান বাঁধানো বেঞ্চিতে।

একটু পরেই লোকটি উঠল। সিঁড়ি দিয়ে উঠে, সাধনকে বলল, আপনারা আজকেই এলেন।

—হ্যাঁ।

—কলকাতা থেকে?

—হ্যাঁ।

ভদ্রলোকের কথা বলার ভঙ্গি ও স্বরে সাধনের বোধ হয় শ্রদ্ধা জাগল। বলল, আপনি?

—সাতদিন হল এসেছি। কলকাতা থেকেই। এই তো সময়, লম্বা ছুটি পাওয়া গেছে।

লম্বা ছুটির কথার পরে ভদ্রতা করেই জিজ্ঞেস করা যায়, আপনি কী করেন।

—কলেজে পড়াই। আপনি?

সাধনের মনে হল ভদ্রলোক বিনুকে দেখবার চেষ্টা করছেন অন্ধকারে। বিনু সেটা বুঝতে পেরেই যেন মুখ ফিরিয়েছে। সাধনের আরও মনে হল, বিনুকে কেমন যেন রোহময়ী নারী মূর্তির মত দেখাচ্ছে। একটি হালকা সুগন্ধ বোধ বিস্তার করছে। অন্ধকারের কী বিচিত্র ছলনা। চরতো অন্যদিন বোধ শীলাকে এখানে এ সময়ে খুব খারাপ দেখাত। এ যৌন অন্ধকার আকাশের তলে।

সাধন জবাব দিল, আমি স্কুলে পড়াই।

অধ্যাপক বললেন, যাক আলাপ হল। আমরা থাকি দক্ষিণের অংশটায়। আসবেন সময় পেলে। দুজনেই আসবেন, আমার স্ত্রী দুঃখী হবেন খুব।

সাধন বলল, নিশ্চয়ই।

সাধনের মনে হল, অধ্যাপক আশা করেছেন, বিনুর সঙ্গে সে তার পরিচয় করিয়ে দেবে। দেবে, তার জন্যে অঢেল সময় পড়ে আছে। আপাতত যা ভাববার ভেবে নিক।

অধ্যাপক বললেন, আপনার নামটা জানা হল না।

—আমার নাম সাধন বসু। আপনার—?

—নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য।

এবং অধ্যাপক সেই সঙ্গেই জুড়ে গেলেন, আমি প্রায় প্রতি বছরই আসি। অনেকে অনেক জায়গায় যান। হিল্লি দিল্লি সমুদ্র পর্বতে। আমার কিন্তু এ জায়গাটাই ভাল লাগে। খোলা জায়গা, ড্রাই, জলটা খুবই ভাল। যখন খুশি শহরে যাওয়া যায়। সেদিক থেকেও সজনে নির্জন। ভোর বেলা বেরুলে, যে-কোনদিনই সন্ধ্যার মধ্যে পাহাড় বেড়িয়ে আসা যায়। জলস্রোতের ধারে গিয়ে পিকনিক করে ঘুরে আসা যায়। আর কি চাই।

সাধন অসহায় ভাবে ঘাড় নাড়ল, তা তো বটেই। এর বেশী আর কি চাই।

কিন্তু আর কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। সে নীরব থাকতে চায়। যৌনতা তার ভাল লাগছে।

কিন্তু অধ্যাপক নলিনাক্ষ কলকাতা থেকে এসেছেন। অভ্যস্ত জীবনের সব কিছু ছেড়ে এসেছেন, এমন কথা কেউ বলে নি। সুতরাং তিনি যখন মনে করেছেন, মুন লজ-এ একজন সম্যক ভদ্রলোককে প্রতিবেশী হিসেবে পেয়েছেন, তখন আপাতিকর প্রতিবেশীদের সম্পর্কে দুকথা না বললে

চলবে কেন? তাই তিনি এদিক ওদিক দেখে বললেন, জায়গা ভাল, এ মুন-লজ বাড়িটিও সুন্দর। একেবারে চারিদিক ফাঁকা অথচ বাগান পুকুর সবই আছে। কিন্তু আজকাল মশাই এমন সব লজার-রা আসছে, কহতব্য নয়। এই দু এক বছর দেখছি মুন লজ-এর অধঃপতন ঘটেছে। ওই যে ছোকরাকে দেখলেন, কী রকম অভব্য দেখলেন তো। কী ভাবে গায়ে পড়ে আপনাদের সঙ্গে গিয়ে আলাপ করল। আমার সঙ্গেও আলাপ করতে এসেছিল। আমার স্ত্রী আর বাচ্চাদের সঙ্গে তো আমার আগেই আলাপ জমিয়ে বসেছিল। আমি একেবারে পাত্তা দিই নি। কথা বললেই বোঝা যায়, মোস্ট আনকালচার্ড। দিন নেই রাত নেই, গাঁক গাঁক করে চেঁচাচ্ছে। বাড়ির মালী আর টাঙাওয়ালারা হচ্ছে ওর উপযুক্ত। তাদের সঙ্গেই অবশ্য ওর সময় কাটাতে হয়। ভদ্রলোক পাবে কোথায়? ওদের লোককে একদম কাছে ঘেঁসতে দেবেন না।

সাধন নিজের জন্য নয়, বিনুর জন্যই বেশী চিন্তিত হয়ে পড়ছিল। এ অন্ধকারে, মুখ না দেখেও বিনুর বিরক্তি এবং অস্বস্তি টের পাচ্ছিল। কিন্তু অধ্যাপক যে-হেতু আলোক ব্যানার্জি নয়, একজন অধ্যাপক এবং একজন বয়স্ক সেই হেতু একজন ভদ্রলোক। তাই ওকে বলতে চল, তা তো নিশ্চয়, ওকে আমি একেবারেই পাত্তা দেব না।

কিন্তু তার পরেও অধ্যাপক গেলেন না। তখনও তার কথা ছিল কিংবা তখনও বিনুকে দেখার সাধ মেটে নি। ভদ্রলোকদের বোঝানো মুশকিল যে, অনেক সময় অযাচিত কথা মানুষকে বিরক্ত করে এবং তাতে বিশ্রাম নষ্ট হয়। শরীরের ক্ষতি করে। বিশেষ এই মৌন মগ্ন বিদেশী রাত্রি যখন দেহের এবং মনের প্রতিটি রন্ধ্রে প্রবেশ করতে চাইছে। সুখাদ্যের মত ভোগ্য হয়ে উঠছে।

নলিনাক্ষ বললেন, সম্প্রতি কয়েক বছর আর একটি উৎপাত জুটেছে এসে এই মুন লজ-এ। এক আদ্যি-কর্তার বুড়ো ভবতোষবাবু। মস্তবড় অফিসার ছিলেন। রিটায়ার করেছেন। ছেলেমেয়ে নাতি নাতনী ভদ্রলোকের বিরাট সংসার। মেয়েরা সকলেই বেশ সম্পন্ন ঘরে গেছে। ছেলেরা প্রতিষ্ঠিত। ভদ্রলোকের স্ত্রীও শুনেছি অতি পুণ্যবতী দানশীলা মহিলা। কিন্তু উনি পুজোর আগেই এই মুনলজ-এ এসে উঠবেন সকলের আগে। যাবেন সবার পরে, যখন আর একটি চেয়ারও থাকবে না। এখন কোথায় বাড়ির সকলের সেবা ভোগ করবেন—তা নয়, একলা একলা এখানে এসে থাকবেন। সকাল হলেই দেখবেন, নিলজ্জের মত একটি আণ্ডারওয়ার পরে ঘাটে এসে বসে থাকবেন, তেল মাখবেন, তারপরে চান করে ফেরে, একটা হাফ প্যান্ট পরে শ্যামলা ঘাড়ার দিয়ে হইহই করে বেড়াবেন। আর এমন সব মেঠো রসিকতা করবেন যে পিত্তি জ্বলে যায়। শ্লীল অশ্লীলের ধার ধারেন না ভদ্রলোক। ওই যে আলোক ছোকরা, ওর সঙ্গে ভবতোষ-বাবুর খুব ভাব হয়েছে এখন। রতনে রতন চেনে।

সাধনকে বলতেই হয়, ও। তাই বুঝি। ভদ্রলোককে দেখি নি এখনও।

—দেখবেন, দাঁড়ান! দেখা দিয়ে ছাড়বেন উনি। বেরিয়েছেন। ফিরবেন আরও পরে! গলা শুনলেই বুঝতে পারবেন। মশাই ঘর থেকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে সবাইকে ডেকে কথা জিজ্ঞেস করবেন। আর হ্যাঁ, মালীটির সম্পর্কে খুব সাবধান থাকবেন। ও আবার এ লজারদের কথা ও লজারদের গিয়ে বলে দেয়! আপনি কখন কি খাচ্ছেন আর কখন কি করছেন, সব খবর রাষ্ট্র হয়ে যাবে। অথচ এই মুন লজ আগে কি রকম ছিল।

গলার স্বর ইতিমধ্যেই মেয়েছিল নলিনাক্ষের। এবং তাকে নড়ে উঠতে দেখে সাধন ভাবল, নলিনাক্ষ চলে যাচ্ছে। সে খুশি হয়ে বিদায়ের ভূমিকাতে বলে উঠল, আচ্ছা···

কিন্তু সেটাও অন্ধকারের কারসাজি। নলিনাক্ষ যে-খাপটা উঠেছিলেন, সেটা থেকে নেমে এলেন। সাধনের আরও কাছাকাছি হলেন। গলার স্বর তার আরও নীচু হল। বললেন, মশাই এমন হয়েছে যে, দিব্যি যুবক যুবতি এল, পরিচয় দিল স্বামী-স্ত্রী বলে। আপনার আমার মত কলকাতা থেকেই, মুন লজ-এর মালিকের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ফ্লাট ভাড়া নিয়ে চলে আসে। মালিক তো আর চাক্ষুষ দম্পতীকে দেখছে না। সাক্ষী থাকে শুধু আমাদের চোখ। কিছুই বুঝতে পারবেন না যে, আপনার চোখের সামনেই দুটি ছেলেমেয়ে স্বামী-স্ত্রীর মত অবৈধভাবে বাস করছে, ফুর্তি করছে।

সাধনের এতে অবাক হবার কিছু ছিল না। আজকাল এ-রকম ঘটনা প্রায়ই শোনা যায়। কিন্তু অবাক হল সে নলিনাক্ষের তীক্ষ্ণ চকচকে চোখের চাউনি দেখে। শহরের কাকের মত সে চোখ যেন ওকে আর বিনুকে লক্ষ্য করছে। প্রায় একটা অভ্যাসের মত। নলিনাক্ষের দৃষ্টি বোধ হয় বিনুও অনুভব করছিল। কিংবা ভদ্রলোকের গলার স্বর শুনে সে আর নিশ্চল থাকতে পারল না। একবার ফিরে তাকাল। আর নলিনাক্ষের টাক চোখ ঠোঁট প্রায় একটি স্থির প্রত্যয়ে হেসে উঠল নিঃশব্দে। বলে উঠল, হয়তো আপনি বুঝতেও পারবেন, এরকম একটা ঘটনা আপনার চোখের সামনে ঘটে যাচ্ছে। কিন্তু আপনি চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন না। মুন লজ আজকাল এই রকম হয়েছে। আচ্ছা আপনারা তাহলে বসুন। আপনাদের নির্জনতায় আর বাধা দেব না।

নলিনাক্ষ হেসে সোজা হয়ে দাঁড়াল। আবার বলল, কাল সকালে আবার দেখা হবে।

সাধন প্রায় নমস্কারের ভঙ্গিতে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়।···

ভদ্রলোকের পায়ের শব্দটা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল। কাঁকরের ওপর মসমস্ শব্দ মিলিয়ে যেতে লাগল দূরে। বিনু ফিরে তাকাল। সাধনও তাকাল ওর মোটা লেন্সের ওপর থেকে। আর সংগে সংগে সোডার বোতলের ছিপি খোলা শব্দের মত তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল, হামবাগ্!

বিনু বলে উঠল, ধুত্তুঁ!

সাধন বলল, প্যাঁচা।

বিনু বলল, একটি ন্যাকা।

সাধন—যেন দয়া করে ঘাটটা আমাদের ছেড়ে দিয়ে গেল।

বিনু—তবু বাঁচোয়া।

দূরের সেই কুকুরটা আর ডাকছে না। ঝিঁঝির ডাক যেন কোন এক অতলান্ত গভীরতা থেকে উঠে এল।

নৈঃশব্দ কোথায় সংসারের বাজনায় তাল দিচ্ছে, টিং টিং টিং!···বহুদূর থেকে, পৃথিবীর আর এক পার থেকে দুর্বোধ্য ভাষার টানা সুর ছিঁড়ে ছিঁড়ে আসছে ভেসে। 'হায় রাজা!···ধরম···অগোয়ারের··পিতা পুত···হিরিদয় ···আনকী···'

সাধন আর বিনু যেন এক অচৈতন্যের গাঢ়তায় ডুবে যেতে থাকে। ওদের দুজনেরই মন এক তন্ময়তায় আবিষ্ট। ডুবে যাই, ডুবে যাই, ডুব দিয়ে থাকি। যেন ভেসে না উঠি ওপরের আবর্জনায়।

তারপরে একটি গুনগুনানি শোনা যায় দূর থেকে। আস্তে আস্তে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।···সাধনের রাস্তা দিয়ে কারা আসছে কথা বলতে বলতে। মেয়ে আর পুরুষের গলা। কথার পরে হাসি শোনা গেল।

তারপরেই মুন লজ-এর বাগানের কাঁকুরে রাস্তায় ভারী জুতোর শব্দ শোনা গেল। কে যেন মোটা গলায় হাঁক দিল, কাশেম!

—হুজুর!

—দূর?

—চা হুজুর, আন্ডা নিয়ে আসছে।

গন্ধরা সরে যাচ্ছে। অন্ধকারের পর্দাটা এল নেমে। গাছেরা ভুতুড়ে হয়ে উঠল। সামনের পুউচ্চ চড়াই হয়ে উঠল একটি অবয়বহীন দৈত্যের মত।

সাধন বলল, অনাদি নিশ্চয় কথার খেলাপ করবে না।

বিনু চুপচাপ। সাধন আবার বলল, অনাদি ঠিক এসে পড়বে।

বিনুর গ্রীবা জড়ানো সোনার হার চিক্‌চিক্ করছে। সে মুখ ফেরাল। বিনুর দু চোখ স্নেহের স্নিগ্ধতায় উজ্জ্বল ভরে। প্রায় সান্ত্বনার সুরে বলল, শীলাও আসবে।

সাধন দূরে চোখ ফেরাল। বলল, সেই রকম কথা আছে।

বিনু বলল, সেইরকমই হবে।

এমন সময়ে আবার সেই রবীন্দ্রসংগীত। মোটা গলার চীৎকার ভেসে আসছে।

আমার যে সব দিতে হবে সে তো আমি জানি
আমার যত বিত্ত প্রভু আমার যত বাণী

সাধন বলে উঠল, সেই উদ্ধবটা আসছে।

বিনু হেসে ফেলল নিঃশব্দে। বলল, গাধার ভেঁপুর চেয়ে খারাপ।

সাধন বলল, চল খাওয়া যাক, নইলে এখানে এসে জুটবে হয়তো।

বিনু—চল।

ওরা দুজনে যখন ঘরে ঢুকে গেল, তখনি লজের গেট দিয়ে রবীন্দ্রসংগীতের অপরূপ সুর ঢুকে এল। তারপর

খেয়ে গেল।

সাধন ঘড়ি দেখল, রাত্রি মাত্র ন-টা। তবু খেতে বসল দুজনে। খেয়ে উঠে, হাত মুখ ধুয়ে ঘরে এসে সাধন বলল, শুয়ে পড়া যাক।

বিনু বলল, আচ্ছা।

সাধন যেন প্রায় চমকে উঠে বলল, দাঁড়াও, দাঁড়াও।

বলে সে টেবিলের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে, সুটকেস খুলল। একটি বিলাতী কেশ ক্রীমের কৌটো বের করে বলল, এই ওয়াকস্‌টা শোবার আগে—

বিনু দুই ঘরের দরজার দাঁড়িয়েছিল। সাধনের কথা শেষ হবার আগেই বিনু ডাকল, সাধন!

এ ডাকের সুর আলাদা, ভঙ্গি অন্যরকম। সাধন বলল, ওর সেই নিরীহ ভঙ্গিতেই—কী ছোড়দি।

বিনু বলল, গম্ভীর স্বরে, আমার কত বয়স হয়েছে জানিস?

সাধনের নিরীহ দৃষ্টি অসহায় হয়ে উঠল। এগিয়ে এসে বলল, জানি ভাই ছোড়দি।

বিনু বলল, ওর সেই শান্ত বড় বড় দুটি চোখে চেয়ে, তুই আমার চেয়ে কত ছোট। তিন বছরের ছোট তুই। তুই সেই সাধন শুধু মাথায় বড় হয়েছিস। তুই বুঝিসনে আমি আর এতটা পারি নে। আমি এত সব কোথায় পাব, কোথায় মাজব আর?

সাধন বলতে যাচ্ছিল, কেন, মুখে, গায়ে? কিন্তু বিনুর দিকে তাকিয়ে আর সে কথা বলতে পারল না। ওয়াকসের কৌটাটি বিনুর হাতে তুলে দিয়ে বলল, এইবারটি, শেষবারটি ভাই ছোড়দি। এতদিন মা বলেছে, বাবা বলেছে, বড়দি বলেছে, আমি কখনও বলি নি। এইবার বলছি, আর কখনও বলব না।

বিনুর দৃষ্টি কোমল হয়ে এল সাধনের দিকে তাকিয়ে। চোখের সামনে ভেসে উঠল শৈশবের ছবি, যখন সাধন কোন বিষয়ে আবদার করে বলত, ছোড়দি ভাইটি কর, ছোড়দি, এইটি দাও। ওয়াকসের কৌটা নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল বিনু। চাকনা খুলে যখন দুই গালে ওয়াকস্ লেবকে দিল সে, তখন তার গাল নোনা জলে ধুয়ে গেছে।

দেয়ালবাতিটা নিবিয়ে বিনু শুয়ে পড়ল। ঘর অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গেল।

এখন সকলেই ঘুমোয়। জাগে কে?

সোকা পতঙ্গ জাগে, সাপ সরীসৃপ জাগে, বুনো শুয়োর আর চিতা জাগে, খরগোশ বন-বেড়াল জাগে।

আর কে জাগে?

আর জাগে জীবনের ঘূর্ণিতে তলিয়ে যাওয়া যৌবন। হাড় মাংস রক্ত ছাড়াও যে-মনের ওপর দিয়ে আতপ্ত সময় পার হয়েছে।

সেই মনটি চায় রাক্ষস। হাড় মাংস রক্ত অনেক, এবার মন খেতে হবে।

বিনু ঘুমোতে পারে না, মনটা ওর সত্যি যেন কে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে থাকে। শুধু অন্ধকারেও চকচক করতে লাগল ওর ওয়াকস্‌লেপা জলে-ভেজা মুখ।

কেন না, বিনুর এই হতাশ হবার বয়সটাতে যমুনা নদীর মত ওপরে সে নিস্তরঙ্গ, তলে তার খরস্রোত আবর্ত ও ঘূর্ণি। যমুনার ভাঙনের এই লীলাটা কারও চোখে পড়ে না।

নিশ্চল হাত দুটি বুকের ওপর টেনে আনতে চাইল বিনু। কিন্তু লজ্জা করে। একলা একলা, এই অন্ধকারেও মরে যায় যেন ঘেন্নায়। ভূমিকাহীন নিছক ঘটনার মত এই অল্প ও প্রত্যঙ্গ নিছক এক মেয়ে, মেয়েমানুষ। যে-দেহের কাহিনীর ভূমিকা হয় বারো আনা। চার আনাটা থাকে এক বাস্তব নির্ভেজাল কাহিনীর সারাংশের মত। ভূমিকায় আছে রূপ, অপরূপ, সুঠাম উঁচু নীচু মসৃণতা। যত হাসির ছটা, চোখের খেলা, সবই থাকে ভূমিকার ছত্রে ছত্রে। সারাংশটি একটি তত্ত্বের মত, কয়েকটি তপ্ত নিঃশ্বাস, সাপের বিষ-পড়া রক্তের আবর্তনের কিছু পেশী-কুঞ্চনের লীলা।

কিন্তু যে কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে তারই ভূমিকা লিখতে আনা হয়েছে বিনুকে, এই লোহাযোয়া, করলা-ছাঁকা জলের দেশে। যেখানে বাতাস আসে, চড়াই ভেঙে, উতরাইয়ে নেমে, সেখানে। দুধে ডিম ঘি মাংস খোয়া ও বেড়ানো, সাবান ও ক্রীম দিয়ে ভূমিকা জুড়তে হবে নতুন করে।

বিনু দেখল, ছোট বোন মীনু, সাধনেরও ছোট, বাড়ির সকলের দরজায় ধাক্কা দিয়ে ফিরছে। তেইশ পেরিয়ে যাচ্ছে, ছোড়দিটা মাথার ওপর, মনে মনে কষ্ট

নিয়েও ধরছে ভয়ে ভয়ে। বোঝা যাচ্ছে টনক নড়েছে সকলের। না নড়লেও মীনু বিনু নয়। সে ইউনিভার্সিটির ঝাঁকে ফিরছে এখন বকম্ বকম্ করে। ভূমিকা আছে ওর পুরোপুরি। ওর বিয়ের গুঞ্জন উঠেছে বাড়িতে।

তেইশেরও আগে সতের বছর বয়সে যখন বিনু ম্যাট্রিক পাশ করেছিল, তখনই বোধ হয় প্রথম শুনেছিল মেয়ে বড় হয়েছে। কিন্তু এমন কিছু নয়।

ভবানীপুরের এক মোটামুটি বনেদী পরিবার ওদের। যদিও কিছু নেই, বাড়িটি ছাড়া। বাড়ির অংশের ভাড়া পাওয়া যায় কিছু। কিন্তু বনেদীয়ানার সেই ধরনের অহংকার একটি আছে এই পরিবারের যে, তারা নিছক কলকাতারই মানুষ। তারা বাইরে থেকে আসা, ফ্যাশনসর্বস্ব, মেকী অভিজাত নয়। ওদের বাড়ির প্রতিটি জানালার, প্রত্যেকটি দরজাতেই পর্দা ঝোলে না। রান্নাঘরে আসন পেতেই খায়, টেবিলের প্রয়োজন হয় না। কষ্ট করে তৈরী করা সুরে কথা বলে না বাড়িতে বাপ মা ভাই বোনের সঙ্গে। এমন কি বাড়ির বুড়োকর্তা শীতের দিনে ছাদে উঠতে না পারলে রাস্তার ধারে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে তেল মাখতে পারেন। ছেলেরা দুড়ির ওপর জামা চাপিয়ে বাজারে যেতে পারে। ছেলে-বুড়ো রকে এসে বসতে পারে সবাই। তাতে তাদের অভিজাত্য মরে না। টাকা না থাকলে এদের বনেদীয়ানার ওপরের জলুস না থাকতে পারে, কলকাতার আদি বাসিন্দা বনেদী পরিবারের গৌরব তাতে কমে না এক ছিটেও।

বিনুরা সেই রকমের একটি পুরনো বসু পরিবার। কায়স্থ কুল গৌরবের শক্ত মাটি যদিও বুদ্ধের ধাক্কায় ধসে গেছে একেবারেই, তবু ঘোষ গুহ মিত্র পেলে এখনো অন্যদিকে ঝোঁকবার ইচ্ছে মোটেও নেই। তাছাড়া এ বাড়ির পুরুষেরা বরাবরই ডিগ্রির ব্যাপারে প্রায় পাকা রেলুড়ের মত। অব্যর্থ টিপ আর নিঃশব্দ দৌড়ে ইউনিভার্সিটির চৌকাঠ ডিঙোয় যায়। সুতরাং শিক্ষার অভিমানটা আছে। মেয়েদের বেলাও ক অক্ষর গোমাংস নয় একেবারে। এখন তো মোটেই নয়। মীনু যেমন তেমন করে এবার এম-এ পাশ করে ফেলবেই। এর ওপরেও আছে, ভাল চাকরি। চাকরি করেই এ বাড়ির পুরুষেরা কলকাতায় দুটি বাড়ি করেছে, দুই বাড়িতে ভিন্ন চরে গেছে। একজন বিনুর ঠাকুরদা। আর একজন বিনুর ঠাকুরদার অগ্রজ। তাঁদের আমলে, সওদাগরি কোম্পানীতে, সাহেবদের পরেই যিনি দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা, তাঁর নাম বড়বাবু। এখনকার মত বিভাগীয় হেড ক্লার্ক মাত্র নয়। যিনি সকল বাবুর বড়, যিনি সকল দেশীয় কর্মচারীদের চালক। তাঁদের চোগা চাপকান ছিল, ঘোড়-সাড়ি ছিল, উপরি পাওনার নীচু কুঠরির ফোকর ছিল বেলাই। প্রতাপ ছিল প্রচুর। ঘরের এবং পরের ছেলেকে অফিসে এনে বসিয়ে দিলেই হত। তারই নাম ছিল চাকরি। তাই চাকরিটাও ছিল এ বাড়ির বনেদীয়ানার মধ্যেই।

কিন্তু একটা মহাযুদ্ধই রাতারাতি সারা দেশের কাঁধ ধরে দিল নাড়া। সব যেন চড়বড়িয়ে পড়ে উল্টে পাল্টে গেল। এখন বাবার পঁচিশো টাকার মাইনে হাজারে উঠেও, হালে তেমন পানি ঠেকছে না। এক মেয়ের বিয়ে দিতেই খণের খতে সই করতে হয়। করতে হয়েছে। বড়দির বিয়ের সময়েই অফিসে প্রথমে ঋণ করতে হয়েছিল। যা তা ছেলের সঙ্গে তো এ বাড়ির মেয়ের দিতে পারা যায় না। আই সি এস্ না হোক, অফিসার। বড় না হোক, মাঝারি। গভর্নমেন্টের না হোক, বড় কোম্পানীর। নইলে এ পরিবারের মান থাকে না। আর এ সব ছেলেদের অবস্থান গভীর জলে। বড় জাল চাই।

কিন্তু ধরা যে খুবই কঠিন, একটিকে দিয়েই তা মালুম করা গেছে। তবু, উপায় কী।

কেবল, চাকরির বনেদীয়ানাটাই যা টিকল না। দাদা এখ এ পাশ করেও স্কুল মাস্টারি করছে। তাও কলকাতায় নয়। হাওড়ায়, শহর থেকে দূরে। এখন আর পরের দূরের কথা, ঘরের ছেলেকেও অফিসে এনে বসিয়ে দিলেই চাকরি হয় না।

এ বাড়ির মেয়ে বিনু।

সতের বছর বয়সে বিনু যখন ম্যাট্রিক পাশ করল, তখন শুনল, মেয়ে বড় হয়েছে, যদিও এমন কিছু নয়। অর্থাৎ পড়াশুনা অনেক হয়েছে, এখন বাড়িতেই থাকুক। ধীরে সুস্থে ছেলে দেখা যাবে।

এর ছমাস আগেই বড়দি চিনুর বিয়ে হয়েছে বিশ বছর বয়সে, অবশ্য শতের বছর বলে। বরং চুরির সুযোগটা পুরোপুরি ছিল ওদের ভাই বোনেদের চেহারায়। কিন্তু চাকরির বদেদীয়ানাটা যদি বা গেছে, ইঞ্চি কুটুমের বদেদীয়ানাটা সহজে ছাড়তে পারে নি। বলে ভাগ্নি তো মচকাই নে। তা ছাড়া চিনুর বিয়েটা যে একটা স্ট্যাণ্ডার্ড হয়ে গেছে। চিনুর বর সোর্টকবিশনারে একজন মাঝারি রকমের অফিসার।

ম্যাট্রিকুলেট বিনুর বর চিনুর চেয়ে ভাল না হোক, অন্তত ও রকম তো হবেই। তা ছাড়া বিনু দেখতেও খারাপ নয়। তখন বেশ ছেলেমানুষই দেখায়। ঠিকই, তখন বিনুর গাল, বাড়তে না পাওয়া ষোল বছরের ছেলের মত নয়। স্তনদশীর সব ভূমিকায় কুহকী মায়াই ছিল সর্বাঙ্গে। তবে তার 'এমন কিছু নয়' বক্ত হওয়াটা মেনে নিতে পারে নি সে। সে-ই সবচেয়ে ভাল জানত, সে পুরোপুরি বড় হয়ে গেছে।

বাইরের ছেলেদের সঙ্গে মেশামেশি করবার সুযোগ না থাক, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে বাধা ছিল না। শ্যামবাজার থেকে আসত তখন তার পিসতুতো ভাই বরুণ। আসত প্রায় প্রতিদিনই, সবুজ রংএর ডবল ডেকারে চেপে। ম্যাট্রিক পাশ করে বরুণ তখন রিপনে ভর্তি হয়েছে। নতুন যুদ্ধের সংবাদে আর কলকাতায় নিগ্রোদের মহড়ার গল্প বলত সে। আর বলত বেট্রো বিনার্ডায় দেখা ইংরেজী ছবির গল্প।

তারপর একদিন ইংরেজী ছবির নায়কের মত ছাদের কোণে জড়িয়ে ধরে চুমো খেয়ে ফেলল বিনুকে।

লজের দাঁতানা পেরিয়ে ধানখেত থেকেই বোধ হয় শেয়াল ডেকে উঠল। জবাবে কুকুর উঠল ডেকে কাছা-কাছি কোন এক পাড়া থেকে।

বিনু ওর ঠোঁটে হাত দিল। বরুণের নয়, নিজেরই হাত, তবু এখনও কী রকম সিরসির করে। কিন্তু এ ঠোঁট সে ঠোঁট নয়, তার একটা মরা সংস্করণ মাত্র। তবু কী রকম সিরসির করে। টেনে টেনে, চিমটি কেটে কেটেও ঠিক সেই অনুভূতিটুকু খুঁজে পাওয়া যায় না আর। অথচ থার্মোমিটারের মার্কারিতে জ্বরের ডিগ্রির মত নামতে নামতেও ঠেকে আছে যেন লাল লাগটার কাছে। নইলে সিরসির করে কেন?

চোখে আর জল নেই বিনুর। ওখানকার সব রসটুকু ওর তৃষ্ণার্ত গাল যেন শুষে নিয়েছে। সবাই ঘুমোচ্ছে। শিকার পেয়েছে শুধু সেই রাক্ষসটা। হাড় মাংস রক্ত পেরিয়ে যে মনের সন্ধানে ফেরে। মনেরই সন্ধানে সে কলকাতার ভবানীপুরে যায়, দাঁওতাল পরগনার শাল তালের চড়াই উতরাইয়ে আসে।

এইখানে জাগে জীবনের ঘূর্ণিতে তলিয়ে যাওয়া উত্তপ্ত সময়।

বরুণের নিতান্ত কম বয়সের জ্বালা ছিল, জোর ছিল না। তবু সেই স্পর্শের খেলা বড় বিচিত্র। যে-দিন চুমু খাওয়া হত না, সেদিনটা মনে হত ব্যর্থ। ছাদে যাওয়ার সুযোগ না থাকলে, যেখানে হোক, সিঁড়িতে কিংবা বাথরুমের পাশে অন্ধকারে একবার। একবারটি।

সারাদিন যেন বিনু থরথর করে কাঁপত। রসা রোডের ওপর দিয়ে যত ডবল ডেকার সারা দিন ধরে যেত, সবই যেন বিনুর বুক মথিত করে ছুটত। মনে হত, এই বুঝি আসছে! বরুণ আসছে! বরুণের যে কোন সময়ের ঠিক ছিল না! দুপুরে বিকেল সন্ধে, যে কোন সময় সে আসত। কলেজ পালিয়ে আসত দুপুরে। তখন মা ঘুমোয়। সাবন মীনু যেত স্কুলে। মীনুর পরে মদনও স্কুলে যেতে শিখেছে। রুনু তখন মায়ের কোলের কাছে শুয়ে ঘুমতো।

সেই সব দুপুরের মত রোদ, মত বাতাস, আর শব্দহীন কলরবের উল্লাস, সব এখন ঘুমিয়ে আছে বুকে। এই রাত্রে জাগল।

কথা বলতে বলতে, তাকাতে তাকাতে, কোন এক মুহূর্তে যে বরুণ হাত টেনে ধরত, বিনু যেন টেরও পেত না। অন্ধ, বরুণের সামনে দাঁড়িয়ে, বিনুর বুকের মধ্যে একটি ভীরু প্রতীক্ষা কাঁপত, প্রতিটি রক্তবিন্দু মাথা কুটে মরত। তখন জীবনের কোন অতীত বোধ ছিল না। ভবিষ্যতের চিন্তা ছিল না একটুও। বর্তমান-টুকুই সব, সমগ্র মন।

বরুণের আসাটা ছিল স্বাভাবিক। তাই কোথাও

কোন সন্দেহের অবকাশ ছিল না। মা যদি ঘুম থেকে উঠে জিজ্ঞেস করত, কলেজ যাস্ নি বরুণ ?

বরুণের মুখে আশ্চর্য সব মিথ্যে কথা যেন তৈরী হয়ে থাকত।

কিন্তু বরুণের কম বয়সের জ্বালার সঙ্গে যে-জোর ছিল না, সেই জোরেরই শক্তি ক্রমে আবির্ভূত হয়ে উঠেছিল। আর আশ্চর্য, বিনু ভয় পেয়েছিল সেই শক্তি দেখে। তার সতের বছরের আকাঙ্ক্ষার গভীরতম দরজায় যখন বরুণ ওর সর্বগ্রাসী শক্তি নিয়ে আঘাত করেছিল, তখনি দরজা শক্ত হয়েছিল। ভয়ে যেন শিউরে উঠেছিল বিনু। একটা প্রতিবাদ সবলে ওর দুই-দুয়ারের অর্গল রেখেছিল বন্ধ করে।

সেই সন্ধ্যাবেলাটা স্পষ্ট মনে আছে বিনুর। ক্ষয়িত রক্তের চিহ্নে চিহ্নে এখনও তাকে অনুসরণ করছে যেন। অথচ বরুণ কবে কোথায় গিয়েছে হারিয়ে। তবু আজ এই সাঁওতাল পরগণার রাত্রির রাক্ষসী-প্রহরে, ভগ্নাবশেষের মধ্যেই একটা অসহ্য উত্তাপ সঞ্চারিত হচ্ছে। তার প্রতি অঙ্গ একটি আর্ত ব্যথায় আকুঞ্চিত হয়ে উঠছে।

সে দিন মা ছিল না বাড়িতে। দিদিকে দেখতে গিয়েছিল। শরীর খারাপ করেছিল দিদির। অর্থাৎ বিনু তখন প্রথম সন্তানসম্ভবা। কথা ছিল, বাবা অফিস ফেরত মাকে নিয়ে আসবেন। বলতে গেলে বাড়িতে সেদিন বিনু-ই কর্ত্রী। ছোটোরা সকলেই তার অধীনে। রান্না ঘরে ঠাকুরকে মা সব কিছুই নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিল।

বরুণ আসা মাত্র ছাদের অভিসারে ছুটে গিয়েছিল বিনু। কিন্তু যে মুহূর্তে বরুণ সিঁড়ির দরজায় শিকল টেনে দিয়েছিল, সেই মুহূর্তেই একটা বিছের মত কী যেন শিল্‌পিল্ করে উঠেছিল বিনুর শির দাঁড়ায়। তবু রক্তের তোলপাড় বন্ধ হয় নি। সেটা শুরু হয়েছিল বরুণকে দেখা মাত্রই। মায়ের অনুপস্থিতি সব দিক দিয়েই একটা নতুন উত্তেজনার সঞ্চার করেছিল। কেবল শিরদাঁড়ার কাঁপন আর রক্তের উল্লাসের যুগপৎ খেলাটা বিনু বুঝতে পারে নি।

বরুণের আলিঙ্গনে সে ধরা দিয়েছিল। বরুণের চুম্বনে একটু একটু করে তার চৈতন্য নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিল।

তারপর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই, তার ভিতরে অচেনা একটি মেয়ে শিউরে উঠেছিল। সচকিত আতঙ্কিত স্বরে সে চীৎকার করে উঠেছিল, না, না বরুণ !

কিন্তু বরুণ তখন দুর্জয়। অন্ধকারে অটল। মত্ততায় একটি শক্তিমান সুন্দর উনিশ বছরের নির্দোষ পশু। সে অন্ধ বোবা কালা। বিনুর কোন কথা সে শুনতে চায় নি। সমস্ত বাধাকে অগ্রাহ্য করে আদিমতম পুরুষ বর্বরের মত নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছিল।

দু হাত দিয়ে বরুণকে ঠেলে দিয়ে, আর জোরে আর্তনাদ করে উঠেছিল বিনু, পায়ে পড়ি বরুণ, তোমার পায়ে পড়ি। ছেড়ে দাও।

কিন্তু বরুণ আরও নির্দয় হয়ে উঠেছিল। বাধা পেয়ে যেন ভয়ংকর হয়ে উঠেছিল। বিনুর বাধা সন্ত্রাসে গিয়ে ছিঁড়ে দিয়েছিল শাড়ি। বিনু ওর শেষ শক্তি নিয়ে চীৎকার করে উঠেছিল, বরুণদা, আমি চীৎকার করে বাড়ির সবাইকে ডাকব। ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ব। ছাড়, ছাড় শীগ্‌গির।

বরুণ থমকে গিয়েছিল। বাধাটা যে সত্যি বাধা, এই বিস্ময়ে সে অনুসন্ধিৎসু রক্তাক্ত চোখে তাকিয়েছিল। সে নিশ্বাস ফেলছিল জোরে জোরে।

বিনু প্রথম সুযোগেই ছুটে গিয়েছিল সিঁড়ির দরজার কাছে। শিকল খুলেই নীচে। ঘরে নয়, একেবারে বাথরুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করে, চৌবাচ্চার গায়ে ঠেস দিয়ে বসে পড়েছিল।

তারপর সময়ের বুকে, উত্তেজিত মুহূর্তের তরঙ্গগুলি শান্ত হয়ে এসেছিল। সেই নিস্তব্ধতার গভীর থেকে একটি বিস্ময় চকচকিয়ে উঠেছিল বিনুর সামনে। আশ্চর্য ! কেন এই বাধা। বিনুর মধ্যে কোথায় লুকিয়েছিল এই ভয়, অনিচ্ছা, প্রতিবাদ। কে সেই মেয়েটি বিনুর ভেতরে বসেছিল, যাকে সে একটুও চিনতে পারে নি। জানতে পারে নি তার অস্তিত্ব।

তখন পারে নি। এখন জানে বিনু। এখন জানে, উনিশ-অতিক্রান্ত একটি ছেলের তুলনায় সতের-অতিক্রান্ত একটি মেয়ের চিন্তা অনেক সুপরিকল্পিত। অনেক দূরদর্শিনী। অনেক বেশী নিষ্ঠুর। অনেক বেশী শক্তিময়ী। দায়িত্ববোধহীন উল্লসিত উনিশের কিশোর রক্ত সতের আত্মসচেতন কিশোরী রক্তের কাছে নিবেদিত,

পরাজিত। সম্পর্কিত ভাইকে সে তার শেষ সীমানা পার হতে দিতে চায় নি। পারে নি। উপায় কী বিনুর! বরুণ যে তার শেষ ঘরে পৌঁছবার শরিক নয়। শেষ ঘরে যাবার পথে, পথ চলতি মানুষ বরুণ। পথেই তাকে ছেড়ে দিতে হয়। ছেলেরা সে কথা বোঝে না? মুখ ফুটে বলাও যায় না।

যদিও বিপজ্জনক, তবু সেটা খেলা। কতখানি বিপজ্জনক, সেই দিনের অভিজ্ঞতায় ধরা পড়েছিল। খেলায় যে শাঁখ বাজে না। দানাইয়ের সুর তোলে না। মালা গাঁথা হয় না ফুলশয্যার। বিনুর সে একটাই পথ। একটাই গন্তব্য। বিপথের হাতছানিতে সে এলোমেলো হতে পারে। কিন্তু সেটুকুও তার মাপাজোকা। বিপথের মাত্রাটা ছেলেরাই মাপতে জানে না। বিনুদের না জানলে চলে না।

সে কথা এখন জানে বিনু। তখন জানত না। তাই অবাক হয়েছিল নিজের ব্যবহারে। আর রচনাময়ী চরে উঠেছিল নির্বোধ বিস্মিত বিষ্ণুকে বরুণের সামনে।

তবু, আঃ! তবু কি লজ্জা, কী বিচিত্র, সেই সন্ধ্যার স্মৃতিতে, ভস্মাবশেষে এখনও কেন এত উত্তাপ! নিঃশ্বাস কেন এত দ্রুত। কেন নির্লজ্জ একটা কৌতূহল বাসনা হয়ে ওঠে। আর মাথা কুটে মরে এই আশাহীন বুকে! শ্বাস রুদ্ধ করে মারে।

মুখের ওপর হাত চাপা দিল বিনু। নিজেরই গরম নিঃশ্বাস হাতের বাধা পেয়ে ছড়িয়ে পড়ল সারা মুখে। যেন আর কারুর নিঃশ্বাস কাঁপিয়ে পড়ল ঝড়ো উষ্ণতায়।

আঃ! সব নিঃশেষে কেন ছাই হয় না।

তারপর একদিন মহড়া ছেড়ে সত্যি নিষ্প্রদীপ হল কলকাতা। বিনুর মনে হল, সেই অন্ধকারেই কোথায় যেন একদিন হারিয়ে গেল বরুণ।

আসলে বরুণের জগৎ সেই বড় হয়ে, ভবানীপুরের একটি বিনু একই খেলায় কতদিন আর ধরে রাখবে তাকে। রহস্য তার কাছে ধরা পড়ে গেল। প্রত্যাখ্যান সে টের পেল। বিনুর জ্বালানো আগুন নিয়ে সে বৃহত্তর বিস্তৃত জগতে চলে গেল। বিনু যেন বিমর্ষ হয়ে উঠল। তবে, এর পর বিনুর বিকার আসবে, এসব বলে কাব্য করা যায়। কিন্তু তার আঠারোর দেহে রক্তের যে-মুখ খুলে গেছে, সেখানে তার নিরন্তর ঘূর্ণি। নতুন প্লাবনে মনের গোটা ভূগোলটাই বদলে যাওয়ার জন্যে অস্থির, এই সত্যটা অস্বীকার করা যায় না। তাই আত্মীয় স্বজনের আদা যাওয়ার মধ্যে আর একটি বরুণ এসে গেলেই হল।

শান্ত বিনুকে ঠাণ্ডা বেড়ালের মত মনে হত তখন। ভাজার মাছটিও উল্টে খেতে জানে না। ওর মা থেকে শুরু করে ভাই বোন, গোটা কলকাতার লোকেরাও ধরতে পারত না, ও কী চাইছিল তখন।

কিন্তু তখন কলকাতায় ঘন ঘন সাইরেন নির্ঘোষে একটা আতঙ্ক বেড়াচ্ছে বুক চেপে চেপে। সওদাগরী অফিসের এক ছোটকর্তার কাছ থেকে যতখানি শোনা যায়, ততখানি শুনতে পেত বিনু। খবরের কাগজ পড়া অভ্যাস কোনকালেই ছিল না। কেবল সাধন এসে আজগুবি গল্প শোনাত সব তার ছোড়দিকে। কোথায় বোমা পড়েছে, জার্মানরা কী ভাবে মারছে রাশিয়াকে। বিনুর মনে হত আজগুবি। মীনু মদন আর রুনু, ছোটরা সিলভো গো-গ্রাসে।

ইতিমধ্যে একটি ছেলেকে বিনুর জন্যে দেখতে গিয়ে ছিলেন তার বাবা। ফিরে এসে জানিয়ে ছিলেন, পছন্দ নয়।

বিনু কিন্তু মনে মনে ভেবেছিল, বাবার সেই অপছন্দ-হওয়া ছেলেটি কেমন?

তারপর শীতের অকাল সন্ধ্যার অন্ধকারে এল জামাইবাবুর ভাই রণেন। লোকটি যেন অন্ধকার দিয়েই ঢাকা। পাতলা চুল কপাল পর্যন্ত ঢাকা থাকত। কথা বলত অন্য দিকে তাকিয়ে। বি, এ, পাশ করে বসেছিল। বিনুদের বাড়ির মতই আর একটি পরিবারের ছেলে রণেন। মিলিটারিতে চাকরি নিয়ে যাবে না কোনদিন ওরা। নইলে হয়তো একটা চাকরি জুটে যেত। কিন্তু যেখানেই যাচ্ছিল, সেখানেই বন্ড সই ছাড়া কেউ কথা বলে না। সব চাকরিতেই সামরিক ছায়া এসে পড়েছিল।

প্রথম দৃষ্টিতেই রণেন জানিয়ে দিয়েছিল, বিনুকে তার ভাল লেগে গেছে।

ভালোই, একটুও অসম্মতি নেই বিনুর। যতই লোকের ভালো লাগে, ততই সে খুশী।

কিন্তু রণেন একটি সুন্দর শুধু কথাই বলেছে। কথাগুলির কোন অর্থ ছিল কিনা আজও জানে না বিনু। তবে সে সব কথায় প্রেম ছিল, কাব্য ছিল, ব্যাকুলতা ছিল, এইটুকু মনে আছে। কখনও চাপা-গলায়, কখনও দরাজ। কখনও চুপি চুপি, কাঁপা কাঁপা, কখনও ধীরে, দ্রুত কখনও। ভ্রূ তুলে, কুঁচকে, হেসে, চোখ বুজে, মদির দৃষ্টিতে তাকিয়ে কথা বলত রণেন। কথা বলত, আর কথা বলত।

"দেখুন বনানী দেবী, (কী বিশ্রী! রণেন শুধু তাকে ভালো নামটা ধরেই ডাকত না। তারপরে আবার একটা দেবী যোগ করত।) চোখের সামনে যে রূপটা ধরা পড়ে, সেটা আসল নয়। (কেন?) রূপ আমাদের টানে। তার আড়ালে যে লুকিয়ে আছে অরূপ, রূপের অন্তরালে আমরা তাকেই খুঁজি। (মানে কী? আমার রূপ আছে, তবু কি আমি রণেনের সঙ্গে কোন খারাপ ব্যবহার করেছি?) সেই অরূপকেই মানুষ খোঁজে, আবিষ্কার করে, আর তার কাছেই নিজেকে সঁপে দেয়। (অরূপ মানে কী?) আপনি শুনেছেন সেই গানটা। অরূপ তোমার বাণী···। (না, শুনি নি) কথার রূপ তো, তার সুর-ই। কিন্তু তোমার কথার কোন সুর নেই, সুর নেই, বিশ্ব ভুবনের সব কিছুর মধ্যে, দেখা অ-দেখার মাঝে আমি তোমারই বাণী শুনি। তোমার সঙ্গে আমি একাত্ম। তাই এ সমস্ত জীবন যে তোমারই বাণী। (মা গো, এ সব কথার অর্থ কী? আর আমাকে কেন বলছে রণেন?) ওই কথাটা হয়তো বলা যেত, অরূপ তোমার দৃষ্টি। কিংবা অরূপ তোমার হাসি। বনানী দেবী, অরূপের বাস আছে সকলের মধ্যেই। আপনার মধ্যেও আছে। যা আমাদের পলে পলে চলার জীবনে ঢাকা পড়ে রয়েছে।···দেখুন, প্রেম শুধু পাত্রপাত্রীর মধ্যে একটা ছোট ব্যাপার নয়। আমি মনে করি, ঈশ্বর আর প্রেম, অর্থাৎ আমার ঈশ্বর আর প্রেমিকা, আমার কাছে এক হয়ে উঠুক।"···(উঃ ভগবান! কিন্তু রণেন আমার দিকে এমন চুলু চুলু চোখে তাকিয়ে বলত যেন, আমি সত্যি ঈশ্বর। ওর গলার স্বর কাঁপত। কিন্তু আশ্চর্য! ভেবে অবাক হতাম এর মোটা মোটা নরম হাত দুটি যেন অবশ, অসুস্থ, অনড় নিশ্চল। নাকি বরুণ-ই আবার রক্তে কোন ব্যাধি ঢুকিয়ে দিয়ে গিয়েছিল?)

"...ঈশ্বর এবং আমি, আমরা দুজনেই সমুদ্রের আবর্তে ফিরছি। না, বরং বলা ভালো, আমি ঘূর্ণিতে চলেছি, তিনি রয়েছেন স্থির জলে। আমি চর তো কূলের একটা ছেঁড়া পাপড়ি, তাঁর পায়ে গিয়ে পড়ব। আর আমার প্রেমিকা···যদি কোনদিন কেউ আসেন, যিনি ঘূর্ণিতে আমারই মত চলেছেন, একদিন আমরা পরস্পর জড়িয়ে যাব। (আমার ঠোঁট দুটো কী রকম দপদপিয়ে উঠেছিল। রণেনের ঠোঁটে দুটোও যেন কী রকম হয়ে উঠেছিল। অনেকটা বরুণের মত। কিন্তু রণেন অনড়।) আর সেই শুদ্ধ জলে আমরা দুজনেই তাঁর পায়ে পৌঁছবো।"

তবু, ভালো লাগত বিনুর। রণেনের কথা একদিন না শুনলে মনে হত, সেই দিনটি বিনু কালা হয়ে ছিল, কিছুই শুনতে পায় নি। সেও কথা বলতে চাইত রণেনের মত। রণেন ফিসফিস করে রবীন্দ্রনাথের কবিতা শোনাত, দারারাত তা-ই বাজত বিনুর কানে।

কিন্তু বাবা মা রণেনের ওপর খুশী ছিলেন না। কারণ একটা। সে বেকার। সে কোন বড় চাকরি করে না। আর যেটা মনে মনে ছিল, সেটা হল, দুই বোনের এক বাড়িতে বিয়ে দিলে, ভবিষ্যতে অশান্তি হতে পারে।

একবছর পরে রণেন হঠাৎ সরে গেল। তার চাকরি হয়েছে। যেন চাকরি না হওয়ার জন্যই তার এতদিনের এত কথার বিলাস। তার আর কোথাও যাবার জায়গা ছিল না এত দিন, তাই যেন বিনুর পরপাপর হয়েছিল। এত কথা সে কেন বলেছিল, তার যেন কোন কারণ নেই।

তখন কলকাতা থেকে লোক পালাচ্ছে। বিনুরাও পালাল কৃষ্ণনগরে। পালাতে পালাতেও কোন রকমে বিনুর বাবা একটি ছেলেকে দেখে এলেন। তারা বিনুকে দেখে গেল। বড় বেশী পণ চাইল বলে চলে না।

যদিও বাবা মা বিনুকে দেখে ভাবছিলেন, হুড়োহুড়ির কিছুই নেই। বিনুকে এখনও ছোটই দেখায়। ছোট! আহা! কী কথা যে বাবা মা বলতেন। অর্থহীন! প্রলাপ। তার থেকে বড় আর কে ছিল গোটা দেশে।

পড়াশোনা বন্ধ রইল অন্যান্য ভাইবোনদের। কেবল বাবা থাকলেন কলকাতায় চাকরির জন্যে। সপ্তাহে এক দিন আসতেন কৃষ্ণনগরে। সেখানে যাবার যোগসূত্র

ছিলেন মার এক দূর সম্পর্কের ভাই। তিনিই একটি বাসা ভাড়া করে দিয়েছিলেন শহরের ওপরে।

কিন্তু বোমার আতঙ্কটা ততদিনে কেরোর মত পাখে পাখে কৃষ্ণনগরে গিয়েও পৌঁছেছে। সেখানেও এ-আর-পি, সেখানেও সাইরেন বাজে। সব চেয়ে বড় ব্যাপার, বন্ধুরের কাগজ আসেই। বিনুর মায়েরই চিন্তা বেশী ভবানীপুরের কথা বাবার জন্যে। বাড়ির পুরুষেরা কী করে না করে, সে বিষয়ে, বউদের না হোক, মেয়েদের চিন্তা করার কথা নয় ওদের বাড়িতে। করলেও তাতে কিছু যায় আসে না।

তবু বিনু বাবার কথা ভাবত। সাধন একেবারেই নির্বিকার এবং অত্যন্ত খুঁতখুঁতে শিটপিটে স্বভাবের ছেলে সে। পরীক্ষা না দিতে পারলেও, স্কুলে না যেতে পারলেও পড়া চালিয়ে যাচ্ছিল ঠিক। আর বুড়োমানুষের মত ভ্রু কুঁচকে খবরের কাগজের সব অক্ষর খুঁটিয়ে একবার করে।

এর মধ্যেও মায়ের সেই দূর সম্পর্কের ভাই চিন্তিত হয়ে উঠলেন বিনুর জন্য। তিনি লেগে গেলেন পাত্রের খোঁজে। প্রথমে কৃষ্ণনগরের পাত্রবাজারেরই একটি ছেলে এল বিনুকে স্বয়ং দেখতে। রবিবারেই এল, যাতে বিনুর বাবার সামনেতেই সব হয়।

বিনুর কিন্তু ভালই লাগত। ভাল লাগত সেজেগুজে বসতে, নাম বলতে, হস্তাক্ষর দিতে। এই তো স্বাভাবিক, তার যে বিয়ে হবে। ছেলে স্বয়ং দেখতে এলে আরও ভালো লাগে বিনুর। মনে মনে বাছবিচার করা যায়, এমন কী মনে মনে কথাও বলা যায় লোকটির সঙ্গে।

কিন্তু পাত্রবাজারের পাত্র বাতিল হল। ছেলে এ-আর-পির ইন্সট্রাকটর। বিনুর বাবা ছেলে বললেন তার দূর সম্পর্কের সম্বন্ধীকে, এ আর পির চাকুরের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়া যায় না বাবা।

কেঁচে গেল। কিন্তু মামা ছাড়বার পাত্র নন। তিনি আরও দেখতে লাগলেন।

বিনু তখন ভাবত, মনটা যেন তার কী! ঠিক জলে ডোবা রবারের বলের মত। নিজেদের বাড়ি-ছাড়া, সপ্তাহে দু-দিন ধরে বাবার অনুপস্থিতির এই দুঃসময়ে, কত যে দুশ্চিন্তা করতে চাইত বিনু।

আরও কয়েকটি ছেলে বিনুকে বারকয়েক করে দেখে গেল। কিন্তু বাবা মায়ের মতে, কোন ছেলেই এমন কিছু নয়, যার জন্য এ দুঃসময়েও বিয়ে দিতেই হবে।

বিনু হিসেব করে দেখেছে, সেই ছেলেরা কেউ কেরানী, কেউ কোন কারখানার সুপারভাইজার। কিন্তু তাতে কী আসে যায়।

বিনু তো মাত্র বিনুই। সে-ই বা এমন কী! সে লীলা গাঙ্গুলী গায়ত্রী নয়। সে ভবানীপুরের বিনু, যে লক্ষ লক্ষ মেয়ের মত, মেয়ে থেকে বউ হওয়া যার ভবিষ্যৎ।

কিন্তু বিয়ে দেওয়া হবে, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। ভবানীপুরের বসু-পরিবারের মেয়ে চিরকাল অরক্ষণীয়া হয়ে থাকবে না। কত ভাল বিয়ে হবে, সেটাই বিচার্য।

চার বছর বাদে ওরা ফিরে এল আবার ভবানীপুরে, নিজেদের বাড়িতে। কোথায় যে কি সব পরিবর্তন হয়েছে, বুঝতেই পারল না বিনু, কিন্তু সবই যেন বদলে গেছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, ওর বাবা বদলেছেন সবচেয়ে বেশী। বাবার চেহারা বুড়িয়ে গেছে একেবারে খিটখিটে হয়েছেন আর দিনরাত্রিই বলেন আর্থিক অভাব অনটনের কথা।

অথচ সপ্তাহে দু-রাত্রি করে বাবার কৃষ্ণনগরেই কাটত। মাঝে মধ্যে ছুটিছাটাও পড়ত। তখন বাবার এই পরিবর্তনগুলি চোখে পড়ে নি। বাবার চোখের চারপাশে অনেকগুলি রেখা পড়েছে। চাউনিতে কেমন যেন একটা দুঃস্বপ্নের ঘোর। ধূমপানের অভ্যাস অল্প ছিল। লোকে টেরই পেত না উনি ধূমপায়ী। দেখা গেল, অনবরত সিগারেট খাচ্ছেন। ঠোঁটের দাগে আঙুলের রং পিঙ্গল হয়ে গিয়েছে।

কৃষ্ণনগরে টের পাওয়া যায় নি। অত্যন্ত পরিচিত ভবানীপুরের সেই বাড়িতে বাবার পরিবর্তন ধরা পড়ল। কত যে পরিবর্তন। মানুষকে এমন যুগপৎ উদার এবং উদ্বিগ্ন হতে দেখা যায় না।

ভবানীপুরের বাড়িতে কোনদিন ভাড়াটে ছিল না। কলকাতা থেকে লোক পালিয়েছে বোমার ভয়ে। অথচ কৃষ্ণনগর থেকে ফিরে দেখা গেল, নীচে একটি পরিবার ভাড়া এসেছে। খবরটা যখন কৃষ্ণনগরে শুনেছিল, তখন অবিশ্বাস করে নি। কিন্তু ভবানীপুরে নীচের ঘরে

এক ভাড়াটে পরিবার, ছবিটা বাস্তবে কল্পনা করতে পারে নি। চোখে দেখে বোঝা গেল, বাড়িটাও বদলে গিয়েছে। আর কৃষ্ণনগর থেকে এসেই দেখা গেল, মায়ের সঙ্গে তাদের ঝগড়া লাগে প্রতিদিনই। বাবার সঙ্গেও। বাড়ি ভাড়া নাকি ক্রমেই বাড়ছে কলকাতায়। অথচ এরা অনেক কম দেয়। এদের ওঠাতে হবে।

মায়ের অভিযোগ আরও গুরুতর। ভাড়াটের দুটি মেয়ের চরিত্র নাকি একেবারেই ভালো নয়। বাড়িতে দিন রাত্রি নানান ছেলেরা আসে। মেয়েদের এত ছেলে বন্ধু কেন? আর মেয়েরা যখন খুশি, বাড়ির বাইরে যাতায়াত করে। যায় কোথায়?

প্রায় জবাবের দাবি করে সরবেই প্রশ্ন করা হল ভাড়াটেদের অভিভাবককে। জবাব পাওয়া গেল, বাড়িওয়ালাদের এধরনের নৈতিক অনুশাসনগুলো তারা পছন্দ করে না।

তা হলে বাড়ি ছেড়ে যাওয়া উচিৎ, কেন না, বিনুর মা বাবা যে ছেলে মেয়ে নিয়ে বাস করেন। এটা যে ভদ্রলোকের বাড়ি।

জানা গেল, ভদ্রলোক-ছোটলোকের পরীক্ষা দিতেও তারা নারাজ। আর বাড়ি থেকে উঠতে হলেও মোদ্দা সরকারী রায় না পেলে, ওঠার ইচ্ছা নেই।

বিনুর কাছে অপরিচয়ের বিস্ময়টাই বড়। ভাড়াটেদের মেয়ে দুটিকে কেমন যেন অচেনা লাগল ওর। অথচ মায়ের মত খারাপ বলে গাল দিতেও বাধল। মনে হল, ওরা যেন হুলহুলিয়ে উলটলিয়ে একটা অস্থির বেগে বইছে।

আশে পাশে, যে-দুচারটি বাড়িতে বিনুদের যাতায়াত, সেখানে কিন্তু কোন অভিযোগ নেই। অথচ তারা প্রতিবেশী। বরং মনে হল, ভাড়াটেদের মেয়েদের ছোঁয়া যেন লেগেছে সব বাড়িতে। কিছু কম, কিছু বেশী। আসলে, চার বছরে বিনুর চোখে সবই যেন কেমন ওলটপালট ঠেকল। কিন্তু যারা পাল্টেছে, তাদের কোন খেয়াল নেই। বিনু দেখল, সবই যেন কেমন অস্থির হয়ে উঠেছে। কিসের একটা তাড়া লেগেছে সকলের। বসতে তাড়া, উঠতে তাড়া, হাসতেও তাড়া। আর সেটা সত্যি ছোঁয়াচে। বিনু তা অনুভব করল ভিতরে ভিতরে। কিংবা সেটা একটা পাগলামি কি না কে জানে। বিনুর মনে হল, একটা তাড়া খাওয়া অস্থিরতা কলকাতার আকাশে বাতাসে। রাস্তায় চলায়। সেই উনিশ শো বিয়াল্লিশ সালের শুরুর কলকাতাটা নেই।

বিনুকে একটা ধাক্কা দিয়ে গেল বাইরের আলোড়ন চিরকাল বাইরেই ছিল। ঘরে এসে তার ধাক্কা লাগত না। কিন্তু যুদ্ধান্তের নতুনকলকাতা বিনুকে যেন কেমন উদ্বিগ্ন করে তুলল। সে যে রকম মেয়ে, যে বাড়ির মেয়ে, সেই মেয়ের জীবনের একটাই প্রস্তুতি, একটাই করণীয়-র চার পাশে ভাঙনের টলোমলো ভাব। এই নতুন আবর্তে, পুরনো সিদ্ধান্তগুলি টিকতে চাইছে না যেন।

তবে? ওর কী হবে?

ভয় কী? বাঙালী হিন্দুর বাড়ির অনূঢ়া মেয়ে দে। তার কথা কি বাবা মা একেবারে ভুলতে পারেন? মেয়ে দেখানো চলল সমানে। ছেলে খোঁজা চলল উদ্‌ভ্রান্ত রাখালের গরু খোঁজার মত।

আঃ! সে-টুকুই তো ভরসা বিনুর। সে-টুকুই ভরসা।

কিন্তু সেই গরু, ঠিক সেই গরুটির সন্ধান কিছুতেই পাওয়া যাচ্ছে না। যার গোয়ালে বিনু যাবে। সবেরই একটা মানা-মানি দেখা-শোনা আছে তো।

আছে। কিন্তু বিনু দেখল, ঘীনুর পরনে শাড়ি আর ওর বুক কেঁপে উঠল। এও যেন নতুন কলকাতারই কারসাজি। কৃষ্ণনগরে থাকতেই সাধন ধুতি পরতে শুরু করেছিল। তখন চোখে পড়ে নি। কলকাতায় এসে বিনু আবিষ্কার করল, কনিষ্ঠ সাধন একটা প্রবল ঢেউয়ের মত ওর ঘাড়ের ওপর এসে পড়ছে। সাধনের মুখটা হয়েছে ঠিক ব্যাটাছেলের মত। (যেন সাধন তার আগে ব্যাটাছেলে ছিল না।) গোঁফ জোড়া হয়েছে ঘন আর কালো। চোখে উঠেছে মোটা লেন্সের চশমা। সে যায় ইউনিভারসিটিতে। নীচের তলার বসবার ঘরে, বন্ধুদের সঙ্গে প্রবল কলরবে তর্কবিতর্ক করে।...আর কলকাতাটাকে যেন সত্যি চেনা যায় না। কৃষ্ণনগর থেকে এসেই দেখল বিনু, রোজ গোলমাল, রোজ হাঙ্গামা মিটিং লেগেই আছে। মিছিল প্রতিদিন। এত বড় বড় মিছিল কখনও দেখেনি বিনু। আর ধর্মঘট। সেটাও প্রায় একটা উৎসবের মত। পথে পথে কেবল

লোক আর লোক। গাড়ি ঘোড়া কিছুই নেই। তার পরেই পুলিসের আক্রমণ। বাটন আর লাঠির মার লাগাতার আর টিয়ার গ্যাসিং। সব থেকে আশ্চর্য, ভাড়াটেদের মেয়েরাও এ সবে মেতে গেল। সাধন তো রীতিমত নেতা। বাবা রাগ করলেন সাধনের ওপর। আবার প্রশংসা করলেন কখনও। মা শুধুই ভয় পেল। তাই বিনুর মধ্যেও ভয়টাই চুঁইয়ে ঢুকল। কিন্তু বিনু লাল শাড়িটা বুকের ওপর দিয়ে ঢেউ তুলে, শ্বাসা আর বাঁধা ঘোড়ার মত ছটফট করতে লাগল। উত্তেজনায় ওকে এত আশ্চর্য সুন্দর আর যুবতীর মত দেখাল যে, বিনুর বুক থরথরিয়ে কেঁপে উঠল বারে বারে। মীনুকে বা জোর করে ধরে রাখল, কলেজে যেতে দিল না। বিনুও মনে মনে বলল, ধরে রাখুক, মীনুকে ধরে রাখুক সবাই মিলে। ওকে যেন কেউ দেখতে না পায়। বিনুর বড় বুক কাঁপছে।

মীনু বিশাল তরঙ্গ হয়ে, বিনুর ঘাড়ের কাছে যেন ফৌসফোঁসিয়ে কুঁসতে লাগল। কেন? সরে যেতে বলছিল নাকি ওকে মীনু? সরে যাও! সরে যাও! পথ ছেড়ে দাও!—

কোথায় যাব? কোথায় যাব আমি? আঃ! কী ভয়!

ভয় নেই বিনু। এই তো তোমাকে দেখতে এসেছে। ভয় কী? দেখা-দেখি তো চলছেই। বিয়ে তোমার হবেই। কর-কোষ্ঠী-গণে-রাশিতে যদি না মেলে, ছুরি-কেটে কোষ্ঠী করতে হবে। কিন্তু তোমাকে এ বাড়ির কথা ভাবতে হবে। বাবা মায়ের ইচ্ছে এবং ইজ্জতের কথা ভুললে চলবে না। বড় জামাইবাবুর স্ট্যাণ্ডার্ড খেয়াল রাখতে হবে। সম্প্রতি আবার বড় জামাইবাবু একটা গাড়ি কিনেছেন। তোমাদের পরিবারের একটা মর্যাদা আছে তো।

কিন্তু দিনগুলি কাটে কেমন করে। এমনিতে যা হয় প্রত্যহের একটা বাঁধাবরা ছক আছে। দিন আসে, দিন চলে যায়। তার মাঝখানে শান্ত নিরীহ মেয়েটি নিয়মের স্রোতে ভাসা। কিন্তু মনের খবর কে বা রাখে। মনের সময় কাটে না। ও এত সাধারণ মেয়ে, এমন কিছু নেই যা নিতে থাকবে। এত ভক্তি নেই যে ঈশ্বর নিয়ে থাকবে। সেলাই নিরর্থক মনে হয়। বই পড়তে গেলে হাই ওঠে। কারণ ও জানে, বাড়ির সবাই কানে বিনুর এক ছাড়া আর সবই বালি আর বালি। তাতে কোন কিছুই আটি ধরে না। আঁকড়ায় না।

আর এত সাধারণ মেয়ে বিনু যে একটু প্রেম করতেও শেখে নি। মেয়েরা থাকে বলে ভালবাসা। তা হলে অথচ অবসরগুলি ভরে থাকত। ভিতরতর চিন্তায়, কিছু আশায় নিরাশায়, প্রতীক্ষায়, ব্যর্থতায়, স্বার্থকতায় মনটা তেজী ঘোড়ার সবল থাকত। তবু একজনকে ঘিরে মনে মনেও কাঁদা যেত, হাসা যেত। রাগ করতে পারত, বিদ্রূপ হানতে পারত।

বিনুর হৃদয়-মনের পরীক্ষার জন্যেই যেন এই সময়ে আর একবার আবির্ভাব হল বরুণের। নতুন কলকাতার সমস্ত ইতিহাস গায়ে মেখে স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক বরুণ এল। চেনা চেনা, কিন্তু ঠিক যেন চেনা যায় না। মুখটা যেন কেমন হয়ে গেছে তার। খারাপ খারাপ। তার ওপরে সরু গোঁফ। বয়স যেন কত হয়েছে। আগের মত বক্‌বক্‌ করে না। কিন্তু ওর চোখের কালো মণি দুটির অন্ধকারে সব কথাই পড়তে পারে বিনু।

কয়েকদিন আসার পরেই বরুণ তেমনি করেই ছাদের আলসের চুমো খেল ওকে। পুরনোদিনের কথা মনে পড়ল। কিন্তু রক্তের মধ্যে তেমন শিহরণ অনুভূত হল না। আগুনের মত একটা আনন্দ ঝাপাঝাপি করে উঠল না। বরং সেই স্বয়ম্বর অনুভূতিটা অভিজ্ঞ যুবক বরুণের চুম্বনের রূঢ়তায়, সিগারেটের গন্ধে, ভেঙে গেল। ভীষণ অশ্লীল মনে হল। আর বরুণের হাত অবাধভাবে এক এক প্রত্যঙ্গ শিকারে বিনুর মনে ক্লেদ সৃষ্টি করল। বরুণের সঙ্গে ছাদে যেতে লজ্জা করল ওর। নিজেকে বিদ্রূপ করল, খুকী নাকি।

সাঁওতাল পরগণার চড়াই উতরাইয়ের এই লজের অন্ধকার ঘরে, এতক্ষণে বিনু একেবারে উপুর হয়ে মুখ গুঁজল বালিশে। চিত হয়ে শোয়ার মত বুকে আর শক্তি নেই। পদ্ম চাপার রাশ নেই গলায়, তাই মুখ চেপে থাকতে হচ্ছে। সর্বাঙ্গ সবলে ঠেলতে লাগল বিছানায়। অজ্ঞান হয়ে যাবে নাকি ও? এ সব কি হিস্টিরিয়ার লক্ষণ নুরো মাঝীমার মত?

অন্ধকারটা যেন সেই রাক্ষসের বেশে, ঘরা থেকে মুখ ভোলা পঙ্কুলের মত বলে, এখানে আমার শিকার আসে।

বরুণ ওর তেমন প্রেমিক ছিল না, যে মনের কোথাও একটু ছাঁকা ফেলবে। এ আবার কেমন মেয়ে-মন! ও নিজেই অবাক হয় এবং লজ্জাও করে। ছি ছি! একটা ছেলে আমাকে নিয়ে···। কিন্তু কী করবে বিনু। বরুণকে যে মনের কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। জোর করেও না তখন যদি একশোটা বরুণও আসত, সেই একই খেলা হত। এ নিষ্ঠুর কি মোহের, বিনু তার বিচার জানে না। কেবল এইটুকু জানে, বরুণের সঙ্গে হাতের অভিসারে তার প্রতিটি রক্তবিন্দু এক উত্তেজিত মাদকতায় ভোর হয়ে থাকত। আর আশ্চর্য! এখন বরুণের কথা মনে পড়ে না। কিন্তু মাদকতার অনুভূতিটা যেন এখনও ছাইয়ের নীচে শেষ স্ফুলিঙ্গের মত ঠোঁটে বুকে সিরসিরিয়ে ওঠে। কিংবা ওঠে না! মনেরই কোন এক দূরে স্বপ্নের ঘোরে অনুভূতিটা মরেও মরে নি।

সুতরাং বরুণ দেখল, বাকী মাত্রেই বহুসামগ্রী। তাকে কয়েকদিন এসেই আর এল না বিনু কেবলি বিনু, তার ঘরের কাছে বসে বসেই বরুণের সঙ্গে কথা বলে। কত ভাবে যে তাকায় বরুণ, কথা বলে কত ভঙ্গিতে। হয়তো বোকেও, বরুণ দাঁতে দাঁত ঘষে কত গালাগাল দিচ্ছে। তবু বিনু চোখের ও ঠোঁটের কোণে হাসেই শুধু।

তারপরে বরুণ যখন হতাশ হয়ে চলে যায়, তখন বিনু ছাদে যায় তাড়াতাড়ি। আলসে থেকে উঁকি দিয়ে দেখে বরুণকে। বরুণ চলে যায় ট্রামে কিংবা বাসে! হয়তো সিনেমা দেখতে যায়। বিনুর আরও অনেক কিছু মনে হয়। মনে হয়, হয়তো বিনুর মতই আরও কেউ আছে, সেখানে যায় বরুণ।

বিনু অবাক হয়, তার মনের মধ্যে বিদ্বেষ ধূমায়িত হয় এবং একটা হিংস্র আনন্দের আভিমুখ্য দেখে। বরুণের প্রতি সেই তার শেষ দান।

তারপর ও একলাই দাঁড়িয়ে থাকে ছাদে। বরুণের জন্য এখন কিছু ভাবনা হয় না মনে। কিন্তু একলা একলা নিজেকে নিয়ে কবে থেকে যেন ছাদে বেড়াতে শিখে গেল বিনু। আবিষ্কার করল, সংসার থেকে ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। একলা হয়ে যাচ্ছে। মা বাবা ভাই বোনের সংসারের তরঙ্গে যেন আগের মত দোলে না।

বরুণ আসা বন্ধ করে দিয়েছে।

একদিন পাশে একটি কুসুমকুঁড়ি দেখা দিল

হলদে গন্ধ, হলদে মেঘ।

আর কে বাকী রইল বিনুর চৌহদ্দিতে বলেন ওর অতি সাধারণ মেয়েলীপনাটা এখানেও প্রমাণিত। রণেনের কথার ফুলঝুরিতে একটা মন দাঁতানো খেলায় বিনু মেতে উঠত। কিন্তু প্রেম? সেটা যে ও কোনদিনই শেখে নি। মনের মধ্যে অনেক হাতড়েও, কোনখানে রণেনের চিহ্ন খুঁজে পেল না।

সংসার ও সমাজ যে ওকে শিখিয়েছে, এক বস্তুটেই মিলার জীবনের সব সার। আর সব ফাঁকি। ফাঁকি ফাঁকি খেলা।

যুদ্ধের পরে এ বাড়িতে আর সে সেই অর্ডার সেদিন নেই। মনটা তো আছেই। সেই রক্ত তো আছেই আর সেই সব, আর রক্তেরই ছাঁচে গড়া বিবেক বুদ্ধি বিবেচনা তো দূর হয় নি। সেগুলি তুষ্ট না হলে মেয়ের বিয়ে দেওয়া যায় কেমন করে

সাধনের ইউনিভার্সিটির শেষ পরীক্ষা এল ঘনিয়ে।

শত দুর্যোগেও ডুববে না, এ বিশ্বাসটুকু ছিল। কিন্তু সেই জলে ভাসা বলের মত বিনু, আর যেন ভেসে করে ভাসে না। কুটো হয়ে গেল নাকি কোথাও।

পাউডার ছেড়ে শাঁখের গুঁড়ো আনতে হল গালের জন্য। মিনে ভোকের সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে লাগল।

একটাই তো করণীয় কাজ বিনুর সারা জীবনের, তৈরী রাখা। একটি আশায়, একটি দিনের জন্য, তৈরী রাখা নিজেকে।

তারপর ও একদিন দেখল, ছাদের আলসের ধারে দাঁড়িয়ে বীনু হেসে হেসে কথা বলছে দাদাবাবুর বেকমাবার বড় ছেলে অমিলের সঙ্গে।

বিনু দেখল ও রোগা হয়ে যাচ্ছে। হাত পা-গুলি ছোট ছোট লাগছে। শরীরটাকে বহুচাপা অন্তর্বাসে চাপতে চাপতে, আরও চাপতে চাপতে বক্ষতলের ছাঁচে

ওদের ছেলেরা প্রায় কাদা কাপড়ের ভাঁজ ভেঙে কোথাও তার এক চিমটি বিদ্রোহ নেই। আর বেলা দুটোয় খেলেও যতটুকুনি খিদে, যতটুকুনি অম্বল, রাত্রি আটটাতেও এক-ই রকম।

তবু আরও সাতজন বিনু দেখতে এসে দেখা দিল।

বিনুর বাবা তো ক্ষোভে বিস্ময়ে একেবারে খ। কলকাতায় আদিবাসিন্দা কায়স্থদের একটা ছেলেও কি ভাল নেই? সবাই পূর্ববঙ্গের! কিন্তু ঘরে খেলেও তো, ও-দেশের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়া যায় না। রীতি নীতি দেশাচারে বনবে কেন? আর যারা আসে, এ বাড়ির জামাইয়ের 'ট্যাণ্ডার্ডে' তারা কেউ ধোপে টেকে না।

মেয়ে তো দেখতে সুন্দরীই ছিল। কিন্তু বিবেক বুদ্ধি বিবেচনাগুলি তৃপ্ত না হলে কী করা যায়। তাড়াতাড়ি খোঁজ করা দরকার ছেলের। তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি, আরও তাড়াতাড়ি।

সাধনটা এম. এ. পাশ করে বেরিয়ে এল। ছাত্র জীবনে একটু রং লেগে গিয়েছিল। কিন্তু সে রং ধোপে টিকল না। বাস্তবের পাটে আছাড় খেয়ে, বড় তাড়াতাড়ি বিবর্ণ হয়ে গেল। বাবা নিয়েছেন অবসর। সেকালের লক্ষ্মীসরী অফিস আর নেই। বিলাতী কোম্পানীগুলির দরুদেরা গিয়েছে। সাধনের গতি সেখানে আর হল না। কলকাতায় কোথাও শেষ পর্যন্ত সাধনের গতি হল না। এম এ-র রেজাল্টও তৃতীয় শ্রেণীর। কলেজের অধ্যাপনাও জুটল না। একেবারে শেষ গতি গিয়ে ঠেকল, হাওড়া শহরের বাইরে, এক স্কুলের মাস্টারি।

এবার যেন ঠিক হাওড়ার স্কুলের মাস্টারমশাই সংসারের দিকে ফিরে তাকাল। আর মাস্টারমশাইয়ের মতই নিরীহ গম্ভীর ভাবে বাবা মাকে বলল; কী আশ্চর্য, মেয়ের বিয়ে দিতে আর কত দেরি করবে? এতদিনে কিছুই করা গেল না?

জবাব গেল, কোথায় আর গেল। চেষ্টার তো ত্রুটি হয় নি। মুশকিল হচ্ছে, যা তা একটা ধরে দিলেই তো হল না। তোমার কালিঘাটের জ্যাঠামশাই দেখ মেয়ের কত ভাল বিয়ে দিলে। সেরকম ছেলেই তো পাওয়া যাচ্ছে না। মানে একটা···।

মানে একটা···। সাধনের মোটা লেন্সের আড়ালে, বড় বড় চোখের গভীরে আর ভুরুর নিরীহ কোঁচকানোটা যেন কেমন একটা আলো আঁধারের অস্পষ্টতায় ভাসতে লাগল। ওর ঘাড় কাত করা নিবিষ্টতায় যে কী চিন্তা আবর্তিত হল, কিছুই বোঝা গেল না। ছোড়দি বিনু ওর দুর্ভেদ্য সুদৃঢ় দুর্গের দেয়ালে মস্ত বড় ফাটলের মত হা করে এল নাকি? যে-দুর্ভেদ্যতা, সুদৃঢ়তা বাবার প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড আর গ্র্যাচুয়িটির টাকা দিয়ে ভিত্তি রচনা করেছে। কে জানে।

কিন্তু সব মিলিয়ে এটা বোঝা গেল, বসু পরিবারের বর্তমান কর্তা সে-ই। বিনুর দায়িত্ব সে কর্তব্য হিসেবেই নিয়েছে। আর সেটা নিয়েছে এ পরিবারের রক্তে মাংসে গড়া মানুষের মতই। ট্র্যাডিশনে সেও বিশ্বাস করে। তা সেটা এ যুগের পটে, যে-ভাবেই সম্ভব করা যাক।

আর করলও তাই। এ বাড়ির বাইরের ঘরে সাধনের একটা জগত আছে। তার বাইরে কতটুকু কী আছে, খবর রাখে না বিনু। সেই বাইরের ঘরের জগতে অনাদি নামটা শোনা যেত প্রায়ই। অনাদিনাথ দত্ত। ছেলের বন্ধুদের সঙ্গে মেয়েদের আলাপের রেওয়াজ ছিল না। চলও নি। মাঝে মধ্যে নামটা বাড়ির ভিতরেও ছিটকে আসত। আরও দু-একটা নাম আসত। বাইরের ঘরের রঙ্গমঞ্চে তাদের যে কার কী ভূমিকা, বিনু জানত না। জানতেও চাইতে না। ভাইয়ের বন্ধুদের সম্পর্কে সেই মেয়েলী কৌতূহল তার ক্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। মীনু বরং উঁকি ঝুঁকি দিত। আর তাতে ওকে মানাতো।

অনাদি নামের সঙ্গে, আর একটা নাম ছিটকে এসেছিল। শীলা। শীলা দত্ত। অনাদির বোন। বোঝা গিয়েছিল, অনাদিদের বাড়িতে সাধনের একটু আধটু যাতায়াত আছে। এবং হাওড়ার স্কুলের মাস্টার সাধন বসুর নিরীহ প্রাণে শীলা যে একটা ভীষণ ঝড় তুলেছে সেটাও বোঝা গিয়েছিল।

আরও জানা গেল, অনাদি যদিও এম এ টা পড়েছিল সাধনের সঙ্গে, কিন্তু বয়সে সে বছর চারেকের বড়। নানান কারণে ওর লেখা পড়া একটু বিলম্বেই হয়েছে। বর্তমানে সে বি টি রোডের এক কারখানার এ এল ও। অর্থাৎ অ্যাসিস্টাণ্ট লেবার অফিসার। খুব নাকি এফিসিয়েণ্ট ছেলে। লেবার অফিসার হতে তার খুব

দেখা দেবে না। ইতিমধ্যেই সে একটা পরীক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। তারপরে সে সুযোগ বুঝে অন্য কারখানায় যেতে পারবে।

সাধনের চিন্তার সুদূরপ্রসারী আর কী ছিল, জানা যায় নি। অনাদিকেই বলল সে। তার সেই নিরীহ ভঙ্গিতেই প্রস্তাব করে বসল বিয়ের। কারণ অনাদিকে দিয়ে সব দিকেরই বিবেক বুদ্ধি বিবেচনাগুলি তুষ্ট হতে পারে পুরোপুরি। বড়দির সঙ্গে পাল্লাটাও ঠিক থাকে।

কিন্তু একটা জায়গায় এসে থতিয়ে গেল সাধন। আর শেষ পর্যন্ত বুক কাটতে দিল না। মুখ ফুটল তার। প্যাঁচ ছেড়ে সে কুল রাখল। বাড়িতেও বাবা মায়ের সমর্থন পেল। ছোড়দি বিনুকে সে তার ছোট বোন বলে জানাল। আর সেটাও জানাল ওর সেই চিরাচরিত নিরীহ ভঙ্গিতেই।

সমস্ত ব্যাপারটা ঘটল এমন ক্ষিপ্রতায়, এমন সংক্রান্তিকালের মুহূর্তে, যখন অনাদি তার চাকরি ও পরীক্ষা নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত। সাধনের ছুটি। ওর ছোট বোন (?) বিনুকে নিয়ে বাইরে বেড়াতে যাবার সব ব্যবস্থা ঠিক ঠাক। বেরুলেই হয়।

অতএব অনাদি কিংবা শীলা যে বিনুকে দেখতে আসবে, সে সময়টুকুও হাতে নেই। তবে দেখতে আসার বাসনা অনাদির আছে। এটা বোঝা হয় তার খানিকটা কৌতূহলও বটে।

তা ছাড়া অনাদির মনের কুয়োর নিচয় কিছু রক্ষণশীলতার তলানি ছিল। অপরিচিতা অন্তঃপুরবাসিনীতে তার আপত্তি দেখা গেল না। খাঁটি আর সুন্দর মুক্তার বুঝি ঝিনুকে আবদ্ধ থাকাই শ্রেয়।

সুতরাং প্রস্তাব গ্রহণ করা হল। বিবেচনা শুরু হবে এক মাস পরে। অর্থাৎ দেখাদেখির পালা। তা ছাড়া কোন উপায় নেই। আর সেইটাই প্রাণপণে চাইছিল সাধন।

মাসখানেক সময় হাতে পেয়ে সবাই যেন দম ফেলবার অবসর পেল। সকলেই যেন ঝুঁকড়ে উঠল বিনুর স্বাস্থ্যহীন, রুগ-রোগা মূর্তির দিকে তাকিয়ে। কি করা যায়? এই কাঠামোটার ওপরে আবার মাটি লেপতে হবে, নতুন করে রং-এর পোঁছকা লাগাতে হবে।

আর এই ছুটির অবকাশ।

অতএব, সাঁওতাল পরগনার এই লক্ষ্য। দূর, ডিহি বেডানো বিশ্রাম, রোদ-পাউডার, ক্রীম। পরীক্ষার পরেই অনাদিও আসবে তার বোন শীলাকে নিয়ে। আসলে সেটাই হবে দেখাদেখি? একটু অভিনবত্বের মধ্যে, এই যা।

সাধন অনাদিকে এখানেই আহ্বান জানিয়েছে। দেখাদেখির জন্যে নয়। পরীক্ষার পরে একটু বেড়িয়ে যাবার নিমন্ত্রণ।

এ ভাবে মেয়ে দেখানোটা বসু পরিবারের ট্র্যাডিশনের বিরুদ্ধে? উপায় কী! নইলে কুল থাকে কই।

তার আগেই মাটি আর রং লেপার কাজ সারতে হবে।

বিনু উঠে বসল বিছানায়। বুক বাড়িয়ে, অন্তরের টকো জল উঠছে মুখে। ঝনঝন্ করে বেজেছে মাথা। এ-পি-সির পুরিয়াগুলি কোথায়, কোথায়?

জানালা দিয়ে থুথু ফেলে, চৌবিলে রাখা জল খেল বিনু ঢকঢক্ করে। টর্চলাইট টিপে পাউডার বের করে খেল।

এবার একটু উত্তরাইয়ে নামা, একটু তলিয়ে যাওয়া ঘুম। একটু ঘুম, একটি ভালো ছেলের সঙ্গে পাকা সম্বন্ধের মত। একটি বিয়ের মত।

সূর্য ওঠার আগেই মোরগের ডাক শোনা গেল।

সূর্য উঠল।

চড়াইয়ে রোদের ঝিকিমিকি। উতরাই তখনও ছায়ার ঢাকা পড়ে যেন ঘুমিয়ে রয়েছে। ইউক্যালিপ্টাসের ঘুসর-নীল-ঝুপালী সুঠাম গায়ে, শাল তালের মাথায় রোদ। পশ্চিমের বরা আর খরনারায় রোদ পৌঁছয় নি তখনও।

সাধন আর বিনু বারান্দায় দাঁড়িয়ে পুবদিকে তাকাল। একলা একটি পাহাড়, নাম তার ঘোড়শওয়ার। যদিও তাকে ঘোড়া কিংবা ঘোড়ার ওপর সওয়ারের মত মোটেই দেখতে নয়। নিতান্তই আকাশ খোঁচানো এক-চূড়ো এক পাহাড়। খোঁচা-খোঁচা, এবড়ো-খেবড়ো চূড়োয় তার সোনালী রোদের টোপর। তারপর কালো কুচকুচে

মুতিটা নেমে এলো নীচের দিকে।

বুক কাঁপে কাঁপানি দিয়ে, ভবানীপুরের সেই মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের নিরীহপনাটুকু ফিরিয়ে নিয়ে এল সাধন। ছোটা লেন্সের ভিতর দিয়ে দেখল বিনুকে। অস্বস্তিতে ঘিরে ধরল মন। দেখল, বিনুর পাতলা ছোট ছোট চুল ঘোলা। কী বিশ্রী! বিবন নেই চুলে। বাসি মুখ, চোখের কোল বসা। তাড়াতাড়ি বলল, বিনু তুই চান করে নে।

বিনু একটা নিশ্বাস ফেলে তার বুদ্ধি তুলে নিয়ে এল পাহাড়ের কোল থেকে। সাধনের চোখের দিকে তাকিয়ে যেন নতুন করে সম্বিৎ ফিরে পেল। বুঝল, তাকে ভালো দেখাচ্ছে না। সাধন আবার বলল, চান করে, একটা গুলি খেতে এখন না হয় এলো খোঁপা বাঁধ। আমি চা চাপিয়ে দিচ্ছি। তারপর চল বেড়িয়ে আসি।

বুদ্ধি কি-না তখন কাজে মন দিয়েছে। কিন্তু কাশের তখনও দরজার দাঁড়িয়ে। হয়তো ওরা সাধনের কথা বুঝতে পারে নি। তবু বিনু কয়েকমুহূর্ত যেন লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে রইল। তারপর সে নিজেও সাধনের মত সহজ হবার চেষ্টা করে বলল, না ছোড়দা। তুই আগে স্নান করতে, আমি ততক্ষণ চা করে ফেলি।

এমন ভাবে বলল দুজন দুজনকে, যেন চিরকালই ওরা শঙ্খপল্লবে বিনু আর ছোড়দা ডেকে এসেছে। আসলে, একটি জায়গায় তো তা-ই। যেদিন থেকে সাধন বাড়ির পুরুষ হয়ে উঠেছে, সেদিন থেকে বাড়ির সব বেয়েরাই ছোট হয়ে গেছে। ব্যাপারটা তো হবেই সৌম হয়ে গেছে। শুধু ডাকাডাকিটা একটু বন্ধ করে নেওয়া।

সেদ পর্যন্ত সাধনই চা করতে বলল, বিনু গেল চান করতে। সকাল বেলা বেরনোর প্রোগ্রামটা বাতিল করল দুজনেই। কাশেরও তাই উপদেশ দিল। বলল, এখুনি রোদ চড়ে উঠবে, ঘটি উঠবে তেতে, কষ্ট হবে বেড়াতে।

কাশের পরদা দিয়ে চলে গেল পরের বাজার করতে।

ওরা দুজনে যখন চা খাচ্ছে, তখনই জানালার বাইরে একটা প্রচণ্ড চীৎকার শোনা গেল। দুজনে চমকে ওঠবার আগেই একটা হাসির বান ডেকে উঠল।

আলোক।

সাধন না বলে পারল না, উল্লুক।

বিনু বলল, এত নির্জন, আর এত জোরে হাসি, চমকে গেছি।

কি ব্যাপার? না, তিনটে ছেলে ওকে ধরবার জন্যে ছুটছে, আর আলোক পালাচ্ছে। তার মধ্যে দুটি ছেলে কাশেরের। দুজনেই উলঙ্গ আর হাতে দুটি লাঠি অপরটির প্যান্ট পার্ট ছুতো আছে।

পশ্চিমের জানালা দিয়ে ওরা দেখছিল।

সহসা ঘটনাস্থলে আবির্ভাব হল অধ্যাপক বলিবাহ ভট্টাচার্যের। বেশ একটু রুক্ষ গলায় ডাকলেন, পিন্টু!

প্যান্ট পার্ট পরা ছেলেটি থমকে গেল ছুটতে গিয়ে অধ্যাপক ডাকলেন, চলে এস।

আলোক বলল, যাবু না, একটু খেলা করছে।

অধ্যাপক ফিরেই তাকালেন যা আলোকের দিকে তার টাক বেয়ে রোদ চলকে পড়ছে মুখে। ছেলেকেই বললেন, জান, এসব আমি একটুও ভালবাসি নে চলে এস।

ছেলেটি একবার আলোকের এবং তার উলঙ্গ বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে ফিরে গেল।

কাশেরের বোবা কালা ছেলেটাই বোধ হয় সবচেয়ে বেশী ভয় পেয়েছে।

আলোক, বিনু সাধনকে দেখতে পায় নি। পেছন থেকে ডেংচে দিল অধ্যাপককে। ছেলে দুটো হেসে ফেলল।

সাধন বলল বিনুকে, দেখছিস, আবার ডেংচাচ্ছে।

বিনুর হাসি পেয়ে যাচ্ছিল। অনেকদিন এরকম হাসতে দেখে নি। বলল, যাচ্ছেতাই।

আর সেই মুহূর্তেই মোটা গম্ভীর গলার কথা ভেসে এল, আমি যে দেখে ফেললাম রে।

আলোক চমকে উঠে পিছন ফিরল। সাধন বিনুও চমকে উঠে আলোকের দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখল, মোহাদা এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে রয়েছেন অদূরেই। মাথায় কদম ছাট! প্রায় সাদা চুল। মোটা মোটা ভুরুর নীচে, চোখের ভাব ঠিক বোঝবার উপায় নেই। অর্থাৎ হেসেছেন, কিংবা শুধু অবাক হয়েছেন, বলা যায় না। রংটা বোধ হয় ফর্সাই। দাঁড়িও তামাটে দেখাচ্ছে। লোক দাঁড়িয়ে মুখ বেশ চওড়া, প্রায় চৌকো। গায়ে

একটি চমৎকার গরম পাঞ্জাবি। হাঁটু থেকে একটু নীচে পর্যন্ত ঝালকোঁচা দিয়ে পরা ধুতি। পায়ে ফিতে বাঁধা শু। হাতে বেশ মোটা পালিশ-চকচকে ছড়ি। রীতিমত লাঠি বললেই হয়।

আলোকের ঠোঁটের কোণে হাসি। কিন্তু অপ্রস্তুত ভাব করে মাথা চুলকে বলল, তাই তো আপনি—।

—ও হে, না না, আমি দেখেছি বলে তোমাকে লজ্জা করতে হবে না।

লাঠি ঠুকে বললেন, কিন্তু ওতে হল কী? যাকে ভেংচালে, সে কি দেখতে পেল?

আলোক বলল, আমি দেখতে দিলে তো। লুকিয়ে ভেংচেছি যে।

হাত উল্টে বললেন ভদ্রলোক তাতে লাভ? ও লোকটা হল কলেজের মাস্টার। পেছু থেকে ওকে ওরকম অনেক ছাত্র ভেংচায়! ও কোনদিন দেখতে পায় না ওইরকম টাক দেখিয়ে চলে যায়। আর কি ভাবে জান তো। ভাবে, ও একটা শ্রদ্ধা ভক্তি বিদ্যা আর নীতির জাহাজ চলেছে। আর কলেজের ছেলেমেয়েরা হয় তো তখন বলাবলি করছে, 'টেকচাঁদি বেড়ে চলেছে মাইরি।'

আলোক হো হো করে হেসে উঠল। ঘরের মধ্যে বিনু সাধন চোখাচোখি করল। বিনুরও প্রায় হাসি পেয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু সাধনের মুখ দেখে হাসতে পারল না।

ভদ্রলোক চোখ বড় করে বললেন, উঁহু, হাসি নয় হে ছোকরা। ও লোকটা দেখছে চারদিকে সব খারাপ বীজাণু ওর কাছে। অশিক্ষা, কুশিক্ষা রুচিহীন আর, ওই কি বলে, আনকালচার্ড···মানে কৃষ্টিহীন বীজাণু সব তোমরা, বুঝলে তো? তার ভেতর থেকে ও ওর ছেলেকে বাঁচিয়ে নিয়ে ফিরছে।

মোক্ষমের পর লাঠি ঠুকে বললেন, অর্থাৎ, যাকে বলে একটা নৈতিক সংগ্রাম, বুঝলে?

আলোক ওর ঝুলো মাথা ঘাড় চুলকে বলল, আজ্ঞে ঠিক বুঝতে···।

—ঠিক বুঝতে পারছ না। তুমি মোস্ট আনকালচার্ড, তোমাকে দেখলে বোঝা যায়। হাসছ, দৌড়চ্ছ, চীৎকার করছ আর লোকের সঙ্গে যেচে আলাপ করছ। তুমি তো ওসব বুঝবে না।

আলোকের চোখে ঝিলিক, ঠোঁটের কোণের টিপুনিতে আসলে উদ্গত হাসিটাই কুলুপ এঁটে রাখা। বলল, একটু একটু অনুমান করতে পারি। প্রফেসর ভাবেন আমি একটা ছোটলোক।

ভদ্রলোক তর্জনী নেড়ে অমায়িক হেসে বললেন, অ্যাঃ, আই, ঠিক অর্ধেকটা বুঝেছ। কিন্তু এতেও প্রমাণ হল, তুমি আনকালচার্ড, তোমার এ ধরণের কথাবার্তা ভাবভঙ্গি, সব কিছুতে। আর তা ছাড়া, তোমার এই অসুরের মত চেহারা, অর্থাৎ দুর্বিনীত স্বাস্থ্য, আই মীন আনব্রুদি ফিগর, আর এই বেহায়া কাউবয়দের মত ঝুলো মাথা মাথার চুল, প্রথম দর্শনেই প্রমাণ করছে তুমি একটা যাচ্ছে তাই।

—বেশ! কিন্তু—

ভদ্রলোক কয়েক পা এগিয়ে এসে বললেন, কিন্তু তুমি যদি ওই অধ্যাপকটিকে তার বাড়িতে গিয়ে বল, 'স্যার আমাকে সপ্তাহে দুদিন এক ঘণ্টা করে একটু পড়াতে হবে, মাসে সামান্য একশো করে টাকা দেব আপনাকে' তা হলে কি হবে জান?

কী হবে?

—তৎক্ষণাৎ আবিষ্কার হবে, তুমি ভদ্র, রুচিবান এবং শিক্ষাপিপাসু। কিন্তু যদি পঞ্চাশ টাকা দিতে চাও, তা হলে তুমি মোটামুটি ধরণের অশিক্ষিত নিরীহ ছেলে। আর যদি পঁচিশ দিতে চাও, তা হলে নিতান্ত একটা বাঁদর হিসেবে তোমাকে করুণা করা হবে। কারণ, যা হোক, বাড়ির চাকরের মাইনেটা তোমার কাছ থেকে আদায় হবে, যদিও এটা জানা, তোমার কিছুই হবে না বুঝলে?

ভদ্রলোকের লোমশ ভুরু কুঁচকে উঠল। তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে যেন পাশাচ্ছেন আলোককে।

আলোক বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ, বুঝেছি।

—অতএব—

গলা খাঁকারি দিলেন ভদ্রলোক। গলার স্বর নীচু করে বললেন, ওকে মুখের সামনেই ভেংচাবে।

ঘরের মধ্যে সাধন হঠাৎ বিস্ময়ে বলে উঠল, কী মারাত্মক লোক!

আলোক বলল, বেগে যাবেন যে?

—তা তো রাগবেন-ই। রেগে তেলে বেগুনে জ্বলে

উঠবেন ! তেতাল হয়ে যাবেন ।

আলো । এই এমনি করে ।

বলে ভদ্রলোক এক চোখ বুঁজে ভিজে বার করে দেখালেন ।

ঘরের মধ্যে বিনু বলে উঠল, ওমা, কী সাংঘাতিক লোক !

সাধন বলল, দেখেছিস ?

আলোকের ছোটো শরীর তখন কাঁপছে । ভিতরের দুরন্ত হাসিটা চাপতে পারছে না সে । কোন রকমে বলল, গালাগালি দেন যদি ?

—ওই পর্যন্তই । কী আর বলবে । বলবে, 'অসভ্য, ছোটলোক'···আরে সে তো তোমাকে উনি আগে থেকেই মনে করছেন । কিন্তু তুমি গালাগাল দেবে না, খালি ওইটাই চালিয়ে যাবে । ও তো গায়ে হাত তুলবে না । ওটা যে ভদ্রলোকের কাজ নয় । তাছাড়া গায়ে হাত তুলতে হলে সাহস থাকা চাই । গায়ে জোর থাকা চাই । লোকটার তো আছে গুন্ডের কুস্তি আর সংস্কৃতি । রোগে কেঁপে, একেবারে ইবে করে, ছুটে যাবে পিয়নীর কাছে । বলবে, 'তাড়াতাড়ি মাথার জল দাও, বাতাস কর ।' বুঝেছ ?

আলোক বলল, হুঁ ।

বলে দু-জনেই এক মুহূর্ত চোখে চোখে তাকিয়ে রইল । পরমুহূর্তেই বোম কাটান মতো অট্টহাসিতে দু-জনেই ফেটে পড়ল । মালীর বাচ্চা দুটো কী বুঝল, কে জানে । ওই দিগম্বর দুটিও হাততালি দিয়ে, চীৎকার করে লাফাতে লাগল ।

ঘরের মধ্যে সাধন প্রায় অস্ফুট গলায় বলে উঠল ভয়াবহ ।

কিন্তু বিনুর চা পড়ে গেল চলকে । তার সারা শরীরও তখন কাঁপছে হাসির দমকে । সে তাড়াতাড়ি চায়ের কাপ মেঝেতে নামিয়ে রাখল ।

বাইরের হাসিটা হঠাৎ থেমে গেল । ভদ্রলোক বললেন, অবশ্যি যদি ওই লোকটা চালাক হয়, তা হলে সেও তোমাকে ভেংচাবে ।

অট্টহাসিটা আবার ফেটে পড়ল । এবং বিনু এবার নিজেকে কিছুতেই আর চেপে রাখতে পারল না । জানালার কাছ থেকে সরে সে চৌকির ওপরে লুটিয়ে পড়ল ।

সাধন শুধু বলল, উঃ ! তুই হাসাচ্ছিস !

বিনু কোন রকমে নিজেকে সামলে, হাঁপাতে হাঁপাতে বলল কী করব ! চাপতে পারছি না যে ।

বিনু নিজেও অবাক হল । সত্যি, এমন করে সে অনেকদিন হাসে নি ।

সাধন প্রায় চুপি চুপি বলল, জানিস, এ লোকটা নিশ্চয় সেই লোকটা ।

—কোন লোকটা ?

—সেই যার কথা কাল রাত্রে নলিনাক্ষবাবু বলেছিলেন ! সেই রিটায়ার্ড একজন হোমরা চোমরা লোক, ভবতোষ মিত্তির যার নাম । সত্যি বলেছিলেন নলিনাক্ষবাবু, লোকটা একেবারে ভালগার । অশ্লীল যাকে বলে ।

বিনু বলল, ঠিক ছেলেমানুষের মত, না ?

সাধন বলল, বুড়ো বয়সে ভীমরতি । এই লোকটার আবার বড় বড় ছেলে মেয়ে নাতি নাতনী, ভাবাই যায় না ।

বাইরে আবার ভদ্রলোকের গলা শোনা গেল, এই যদি না করতে পার, তা হলে উনি তোমাকে এইরকম অপমান করে যাবেন । কিন্তু তোমার ওই টেকচাঁদ অধ্যাপকটিকে ঢিট করতে হলে ওছাড়া উপায় নেই ।

বিনু আবার মুখে আঁচল চেপে বলে উঠল, দেখছিস, টেকচাঁদ নাম রেখেছে আবার ।

সাধন বলল, ভয়ংকর লোক !

ভয়ংকর লোকটা তখন মোরামের ওপর দিয়ে খস্‌খস্ শব্দে নিজের ফ্ল্যাটের দিকে হেঁটে চলেছেন । হাতের ছড়ি দিয়ে ছিটিয়ে চলেছেন মোরাম । প্রায় ছেলেমানুষের মতই ।

আলোক সেদিকে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত । মুখের হাসিটা তার উদাস হয়ে উঠল । কী ভাবছে সে কে জানে । বিনু দেখল, তার জামায় প্যান্টে মুখে মাথায় লাল বুলোর আস্তরণ । মালীর ছেলে দুটি এসে দুদিক দিয়ে তার হাত ধরল । আর সঙ্গে সঙ্গে আলোক ওদের দুজনকে দুদিকে নিয়ে, বাগানের মাটির ওপরেই ধপাস্ করে বসে পড়ল । হাত পা নেড়ে মেয়াতী ভাষায় গল্প জুড়ে দিল । কী যে ওদের গল্প আর কথা, কে জানে । তিন জনেই আর হেসে বাঁচছে না ।

বিনু হেসে উঠে বসেই ফেলল, সাধন ।

—কে ?

—নামটা বলে ছিল বিনু। তবু বলল, লোকটা।

সাধন বলল, আলোক ?

—হ্যাঁ।

—বাজে, বাজে।

হঠাৎ আলোকের নজর পড়ল জানালার দিকে। প্রায় যেন উতরাই গড়িয়ে নেমে এল তরতর করে। এসে দাঁড়াল একেবারে জানালায়। বলল, এই যে আপনার নামটা কিন্তু জানা হয় নি।

বিনু সরে যাবে কিনা ভাবছে। সাধন জবাব না দেওয়ার ভান করে বলল, আমাকে বলছেন ?

—হ্যাঁ।

—আমার নাম সাধন বসু।

আলোক বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে বলল, ঠিক আছে, তা হলে আমি সাধনদা বলব।

সাধনের একটু ভাবা উচিত কিনা বুঝতে পারল না। তবু ঠোঁটের কোণে একটু নিরীহ হাসি ফোটাতে হল তাকে। বিনুর অনেকদিন এত হাসি পায় নি। আলোক হাসতে দেখে ফেলবে, সেই ভয়ে সে মুখ ঘুরিয়ে ছিল।

আলোক আবার বলল, আপনারা এখন চা খাচ্ছেন ? আর আমি কতক্ষণ ঘুরে এলাম। সবাই কেমন চুপচাপ, বেড়াতে এসেছে বলে যেন সকলেরই উঠতে হ-ঘাস বসতে ন-ঘাস। আমি যে কী করি।

বস্তু যেন অসহায় আলোক। সাধন বলল, কেন ?

আলোক বলল, দেখুন না, কথা বলবার লোক নেই। আর এই যে এক মাস্টারমশাই আছেন, এইদিককার স্ল্যাটে, উনি তো আমার সঙ্গে কথাই বলেন না। আমি আবার একটু গায়ে পড়েই আলাপ করে ফেলি। এই কিছুক্ষণ আগে চলে যাচ্ছা দেখতে পেতেন। ওঁর ছেলেটা আমার সঙ্গে একটু খেলা করছিল, তা একেবারে বকে ধমকে ডেকে নিয়ে গেলেন।

একটু সমবেদনা জানানো দরকার কিনা বুঝতে পারল না সাধন। কিন্তু ভবতোষ মিত্তিরের কথা মনে করে সমবেদনা জানাতে পারল না। তবু হাসল একটু। তারপর আলোককে বারে বারেই বিনুর দিকে তাকাতে দেখে, ওর মনটা একটু উদার হল। বোধহয়, ভালই দেখাচ্ছে ছোড়দিটাকে। রং মেখেছে মুখে, শাড়িটা পরেছে ঘুরিয়ে। চুলে বোধ হয় শ্যাম্পু ঘষেছে, ফ্রেঞ্চ রিবন না দিয়েও চুলগুলিকে ফাঁপানো দেখাচ্ছে। এলো খোঁপা বাঁধবারও দরকার হয় নি। আর ওর মুখ ফেরানো লজ্জিত ভঙ্গিটা ভালই। বয়সটাও কম দেখাচ্ছে যেন।

সাধন বিনুকে দেখিয়ে বলল, আমার ছোট বোন বিনু।

আলোক হেসে বলল, তাই নাকি, দেখুন, আর একটু হলেই আমি বউদি বলে ডেকে ফেলেছিলাম আর কি।

সাধন এবার সত্যি হেসে ফেলল। বিনুও হেসে উঠল। যদিও তার মুখ লাল হয়ে উঠেছে! অনেকদিন এরকম লজ্জা পাবার অবকাশ পাওয়া যায় নি। রাগ ? রাগও করা যায়। কিন্তু এই মার্জ আর হতাশ জীবনের সেই-টাইপ্ খিটখিটে মেজাজটা প্রশ্রয় পায় নি বিনুর। রাগ করা যায় একমাত্র ছেলেটার অত ভাল স্বাস্থ্য, এত হাসি, আর যা খুশি তাই ভাববার সারল্য দেখে। রাগটা হত, ভীষণই হত হয়তো, যদি ও একটা স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী মেয়ে হত। কিংবা ওর সঙ্গে একটা ওর উপযুক্ত বউ থাকত।

আলোক আবার বলল, যা বলছিলাম সাধনদা, আমি না হয় টারবাইন মেশিন চালাই কারিগরিতে। কলেজের মাস্টার হলে কি ইলেকট্রিক টারবাইন অপারেটারের সঙ্গে কথা বলতে নেই ?

সাধনও যেন কেমন একটু কুঁচকে গেল। বলল অ, আপনি টারবাইনে কাজ করেন ?

যেন ইলেকট্রিক টারবাইন সম্পর্কে তার অগাধ জ্ঞান। কিংবা, অমন তুচ্ছ কাজের কোন গুরুত্ব নেই তার কাছে।

আলোক ইতিমধ্যে অনেকবার মাথা ছুঁড়েছে মোরাদের ওপর। পকেটে হাত দিয়েছে, চুল থেকে ধুলো ঝেড়েছে। অস্থির, ভীষণ অস্থির। চোখের দৃষ্টিও অস্থির। যেন কোথাও ওর শান্তি নেই, কোথাও ওর মন নেই। কোথাও চড়াই, কোথাও উতরাই, উঁচু নীচু উঁচু, মাঠ, কটিবন, শাল তাল, সাঁওতাল পরগনার এই প্রকৃতির মত স্থির হয়ে চলার উপায় নেই, বলল হ্যাঁ। সেইজন্যে একটু চেঁচিয়ে কথা না বলে পারি নে, কী করব ? মেশিনে কী প্রচণ্ড শব্দ জানেন তো। নির্ঘাৎ কানে কালা হয়ে যাব আস্তে আস্তে। অভ্যাস হয়ে গেছে চেঁচিয়ে কথা বলা। আর

তা ছাড়া, আমি একলা চুপ করে বসে থাকতে পারি নে। ওকে চুপ করে বসে থাকবার জন্যেই পাঠিয়ে এসেছি।

আলোক মাথা নীচু করে হাসল। যেন সে লজ্জিত এবং অসহায়।

সাধন যেন খুব অবাক হল। এমন একটা ভঙ্গিতে তাকাল, যেন আলোকের থেকে সে বয়সে অনেক বড়। বলল, চুপ করে বসে থাকবার জন্যে?

আলোক একটা উষ্ণত নিঃশ্বাস ফেলে, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল দূরের মাঠের দিকে। আর সেই দিকে মুখ রেখেই বলল, হ্যাঁ, একেবারে নিঝুম চুপচাপ থাকে বলে।

সাধন ভুরু কুঁচকে বলল, কিন্তু আপনাকে দেখে শুনে—।

আলোক বলে উঠল, টাইফাইড মেসিনেরই একটা পার্ট বলে মনে হয় তো? সেটাই তো দুঃখ। মানুষ নিজেকে বেশীক্ষণ লুকিয়ে রাখতে পারে না। লজ্জাটাই ধরা পড়ে যায়

সাধনের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হল। মানে কি এর কথার। সাধনকে বলছে নাকি।

আলোক হেসে উঠে আবার বলল, আর এই ধরা পড়ে যাওয়াই তো অপরাধ। মাস্টারমশাই নলিনাক্ষ ভটচাজ ধরে ফেলেছেন, আমি একটা ছোটলোক। তাই—। কথা শেষ করল না। হাসতে হাসতে সে হঠাৎ বিনুর দিকে তাকাল। বিনু যেন চমকে উঠল। তার হাতের কাপে চলকে উঠল চা। সহসা লজ্জায় আর একবার আরক্ত হল তার মুখ। সত্যি, লজ্জা পেয়ে আরক্ত হবার মত রক্ত এখনও আছে বিনুর! অমন বিস্ময়-বিবিষ্ট চোখে সে কেন তাকিয়েছিল আলোকের দিকে। কী দেখছিল সে। চকিতে চোখ নামিয়ে সে অপ্রস্তুত হয়ে উঠল। এদিকে ওদিকে তাকিয়ে বলে উঠল, আর চা খাবে ছোড়দা?

সাধনও যেন অবাক হয়ে বলল, চা আছে নাকি?

বলে বিনুর দিকে তাকিয়ে আরও অবাক হল।

বিনু নত মুখেই প্রায় অস্ফুটে বলল, আছে।

সাধনের মনে হল, কোথায় যেন কী একটা ঘটে গেল এ মুহূর্তে। সে চকিতে একবার আলোককে দেখে নিয়ে বলল, না, আমি খাব না থাকলে দুই বেলা নে।

বিনু দ্রুত বলে উঠল, না না, আমি খাব না। মানে—।

বলতে গিয়েও বিনুর জিভের একটা আড়ষ্টতা যেন কেটে গেল। কী যেন বলতে চাইল। পারল না। কিন্তু তার অবাধ্য চোখ চকিতে আর একবার আলোকের মুখের ওপর পড়ল। আর আলোক তার দিকেই তাকিয়েছিল।

চোখোচোখি হতেই বিনু দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে গেল। সেই মুহূর্তেই আলোক বলে উঠল, চা আছে নাকি মিনু বোস্।

মিনু বোস্! সাধন আর বিনুর কানে একই সঙ্গে বাজল এই সম্বোধনটা। কী বিশ্রী! বিনুর মনে হল। এ নামে তাকে আর কেউ কখনও ডাকে নি। একমাত্র ওদের, জামাইবাবুর ভাই তার ভাল নামের পিছনে একটা দেবী জুড়ে দিত। বিশ্রী! নাটুকে নাটুকে চঙ বলে মনে হত। তার চেয়ে নাম ধরে ডাকা ভাল। কিন্তু চায়ের কথা জিজ্ঞেস করছে কেন আলোক। সে কি খেতে চাইছে না কি! আসলে বিনু যে চায়ের কথাটা তুলেছিল আলোকের জন্যেই। লজ্জায়, এবং সাধন রুষ্ট হতে পারে ভেবেই সে থতিয়ে গিয়েছিল।

বিনু জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল আলোকের দিকে।

আলোক কাশেমের ছেলে দুটিকে দেখিয়ে বলল, তা হলে আমার ওই চেলা দুটিকে দিয়ে দিন! নইলে আমাকে এখুনি আবার স্টোভ জ্বালাতে হবে।

বলেই সে হাত তুলে ছেলে দুটিকে ডাকল।

আর সব মেয়ের মতই, বিনুর মধ্যে সেই মেয়েটি হতাশ হয়ে উঠল। ওই রুক্ষ ধূলি রক্তিম, একাকী, অজানা আর ব্যবহারে ছেলেমানুষ লোকটাকে সে চা খাওয়াতে চেয়েছিল। মালীর ছেলেদের জন্যে তার প্রাণের কোথাও টান ধরে নি।

সে চকিতে একবার সাধনের দিকে লক্ষ্য করে বলে উঠল, আপনিও খেতে পারেন!

আলোক বলল, আমি ভোর রাত্রে একবার খেয়েছি। বেড়াতে বেরিয়ে চলে গেছলাম শহরে, সেখানে দুবার খেয়েছি, আমার আর দরকার নাই।

সাধনের ভুরুর কোণে বিস্ময়। চোখে নিস্পৃহ সারল্য। বিনু যেন খুব স্বাভাবিকভাবে বলল, স্টোভ ধরালে তো আর একবার খেতেন—তা হলতো খেতাম। নেহাত-ই করতে হত বলে। কিন্তু তার আর দরকার

নেই। বলে সে ছেলে দুটোকে বলে উঠল, যা, জলদি চা খাবার গেলাস নিয়ে আয়।

ছেলে দুটো ছুটল ঘরের দিকে। এতক্ষণে বিনু বলল চা ছাঁকতে। আর শুনতে পেল, আলোক বলছে সাধনকে, যাই, কাছের কোন গ্রামে বেড়িয়ে আসি।

মোরামের উপর তার পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল।

ভুকায়ে রান্না বসেছে। বিনু বই নিয়ে বসেছে এক ঘরে। আর এক ঘরে সাধন বসেছে চিঠিপত্র লিখতে। মাত্র দুটি চিঠিই লেখার আছে। একটি মাকে আর একটি অন্যদিকে।

হঠাৎ যেন বড় বেশী নিঝুম মনে হল চারদিক।

বই থেকে বিনুর চোখ ছুটে গেল ঘোড়সওয়ারের দিকে।

কাশেম বাজার থেকে এল হাসতে হাসতে। বলল, ওই বাবুটা, এতলা বাবুটা, আলেক বাবুটা পাগল আছে।

আলেক, অর্থাৎ আলোকের কথা বলছে বোঝা গেল। সাধন বলল, কেন?

কাশেম গাল কুঁচকে, হলদে দাঁতে হেসে বলল, দুনিয়া জুড়ে খাতির করে বেড়াচ্ছে।

আজ শহরে গিয়ে টাঙা চালিয়েছে আপনা হাতে, ছিয়াত্তিসটা টাঙাবালা জানে। অর্থাৎ ছেচল্লিশটি টাঙা আছে শহরে। তারা সবাই জানে আলোকের টাঙা চালাবার কথা।

কাশেম আরও বলল, সব চেয়ে বড় ঘোড়া আবদুল্লার, দিল্লিবালা ঘোড়া। সেই টাঙা আপনা হাতে নিয়ে ছুটেছিল বাবু, তা ছিটকে পড়ে গেছে মাটিতে।

বোঝা গেল এতক্ষণে, কেন আলোকের সারা গায়ে মাথায় লালচুলো মাখামাখি ছিল।

বিনুর যেন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে গেল শুনে। কিন্তু চোট নিশ্চয় তেমন লাগে নি। তা হলে কি আবার অমন ছুটোছুটি করতে পারত।

সাধন বলল, মরবে ও রকম সোয়ারি করতে গিয়ে।

কাশেম হেসে বলল, কিন্তু আজ বিকালে আবদুল্লাকে গাড়ি নিয়ে যাবতে বলেছে এখানে। আপনা হাতে হাঁকাবে।

বিনু ভুরু কুঁচকে বলে উঠল, কেন?

কাশেম হেসে বলল, খোদা জানে সিস্টিবাবু। বাবুটা একটা বাওরা।

সাধন বলে উঠল আবার, মরতে চায়।

কেন, মরতে চাইবে কেন? বিনু মনে মনে ভাবল। আবার বিরক্ত হয়ে ভাবে, মরতেই চায় বোধ হয়। ছেলেমানুষ হলেও সবাই কি ওরকম করে? রোগগ্রস্ত বোধ হয়, কিংবা নিশ্চয় ছিট আছে মাথায়।

কাশেম আবার বলল, পাগলা আছে। মগর মানতে হবে, বাবুর দিলটা একদম সাফ, অন্তরটা আসমানের মত বড়, বাবুটা যেন কেমন। মনে হয়, ওর কোই নেই। ও একটা দুঃখী।

একটা দমকা নিশ্বাস পড়ল কাশেমের। যাবার আগে বলে গেল, আভি আসছি, জল তুলে দেব।

বিনু অনুভব করল, সাধন তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। কিন্তু বিনু তাকাল না। তার চোখাচোখি করতে ইচ্ছে করছে না। সাধন বলে উঠল, এখানে বড় বেশী সবাই পাগল দেখছি।

বিনু কোন জবাব দিল না।

আবার নিঝুম। কিঁকির ডাক শোনা যাচ্ছে। সাধন বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। অধ্যাপক ছিলেন তার বারান্দায়। সব ফ্ল্যাটের বারান্দায় প্রায় মুখোমুখি। সকলের সঙ্গে দেখা হয়। চোখে চোখে একটু ভদ্রকমের হাসিহাসি হল। নলিনাক্ষর হাতে খবরের কাগজ।

কিন্তু খবরের কাগজে চোখ দেবার আগেই, নলিনাক্ষ প্রায় লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। মুখে তার বিগলিত হাসি। সাধন তার দৃষ্টি অনুসরণ করে অবাক হয়ে দেখল, ভবতোষ আসছেন। আর বিচিত্র পোশাক ভবতোষ বাবুর। সংক্ষিপ্ত একটি আণ্ডারওয়ার। তার ওপরে একটা ছোট তোয়ালে জড়ানো। বাকী সর্বাঙ্গ খোলা। মেদের বাড়াবাড়ি মোটেই নেই। দোহারা শরীরে পেশী এখনো শিথিল হয়ে যায় নি। কিন্তু কোন ভদ্রলোক, অন্তত ভবতোষবাবুর মত একজন প্রাক্তন বড় সরকারী কর্তা, উচ্চশ্রেণীর লোক যে এভাবে বেরোতে পারেন, সাধন ভাবতে পারে নি। অবশ্য সকালে যে কাণ্ড দেখেছে, তাতে এ লোকের পক্ষে বোধ হয় সবই সম্ভব।

এ দৃশ্য বিনুরও চোখে পড়ল জানালা দিয়ে। কী রকম চাপাতে ধরণের শক্ত শোক বলে মনে হচ্ছে। আর বিচ্ছাই খুব ভারি। ভাবতেই তার শিরার মধ্যে কী রকম করে উঠল। এবং যদিও একলা সে, খুব একটা লজ্জা ও বিস্ময়ে সে মনে মনে বলে উঠল, কী অসভ্য!

তার চেয়েও বেশী বিস্ময়ে প্রায় বিহ্বল হয়ে উঠল নলিনাক্ষর কাণ্ড দেখে। সে অবশ্য সাধনেরও। কারণ গতকাল রাত্রেই লোকটা ভবতোষবাবু সম্পর্কে তাদের হুঁশিয়ার করে দিয়েছিল। আর এখন ঠিক যেন ল্যাজ নেড়ে, কিন্তু চেটে প্রভুর সামনে উৎফুল্ল একটি কুকুর।

নলিনাক্ষ বললেন, গুডমর্নিং স্যার।

ভবতোষ প্রায় চমকে দিয়ে উঠলেন, সুপ্রভাত।

বোঝা গেল, আজ এই প্রথম দেখা হল দুজনের। নলিনাক্ষ যেন গলে গিয়ে বললেন, আজকে আপনার স্নানের পোশাকটা স্যার বলেছেন দেখছি।

ভবতোষ অসংকোচে দাঁড়িয়ে বললেন, পছন্দ হচ্ছে না?

স্পষ্টই দেখা গেল, নলিনাক্ষ রীতিমতো ঘাবড়ে গিয়েছেন। তাড়াতাড়ি বললেন, না মানে, অন্যদিন পাজামা—

ভবতোষ বলে উঠলেন, না: আজ আর সে ভদ্রতা রক্ষা করতে পারলাম না। দেখলাম, এই রোদ এই বাতাসের কাছে যতই লজ্জা করব, ততই ঠকব। সারা জীবন তো এঁটে সেঁটেই এলাম, এখন পড়ে পাওয়া সোল আনা জিনিস গায়ে রাখতে পারি নি। আপনাদের কাছে তো আবার এসব অসভ্যতা।

নলিনাক্ষ যেন ধরণে মরে গিয়ে বললেন, কী যে বলেন স্যার!

আর দেখা গেল, সভ্যতার বেড়ায় বন্দী অধ্যাপকপুত্র পিণ্টু বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। সকৌতুক মুগ্ধ হাসিতে তার চোখ মুখ জ্বল জ্বল করছে ভবতোষবাবুকে দেখে। বেচারা! দেখে মনে হচ্ছে, ওর ইচ্ছেটা ও ভবতোষবাবুর হাত ধরে পুকুর ঘাটে ছুটবে! আর জানালায় উঁকি দিয়েছে নলিনাক্ষবাবুর মেয়ে।

ভবতোষ বললেন, অবিশ্যি একজন সাহেবকে সেন্টি পরে চান করতে যেতে দেখলে সেটা অসভ্যতা বলে মনে হয় না। আর এর ওপরে বুকে একটু ঢাকা দেওয়া মেমসাহেব হলে তো কথাই নেই। সে তো সভ্যতার চরম। উপরন্তু কারবারের একটা ভল নেবে যাবে।

নলিনাক্ষ ঢোক গিলে একবার জানালায় তাকালেন। আর একবার ছেলের দিকে। এবং ভবতোষবাবুর কথা যেন খুবই উপভোগ করেছেন, এমনি একটা হাসি হেসে বললেন, তা যা বলেছেন স্যার। তবে, প্রত্যহ আপনার তেল মাখাটা, সত্যি খুবই উৎসাহজনক।

প্রসঙ্গ ঘোরাতে চাইলেন নলিনাক্ষ।

ভবতোষ বাবুর কথাবার্তায় এবং নলিনাক্ষর অবস্থান সাধন রীতিমতো অস্বস্তিবোধ করছিল। কিন্তু বিনুর হাসি পাচ্ছিল।

ভবতোষ ঘাটের দিকে যেতে যেতে বললেন, তা হয় তো হবে। সারা জীবন বেকীর কারবার করে, এবার একটু খাঁটি কাজে মন দিয়েছি? তবে—

দূর থেকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, আপনাকে বোধ হয় উৎসাহিত করতে পারে নি।

নলিনাক্ষ অস্বাভাবিক হেসে বিড়বিড় কী যেন বললেন। শোনা গেল না। ভবতোষের মূর্তি ঝাউবন বিতানের আড়ালে চলে যেতেই, নলিনাক্ষ খেঁকিয়ে ধমকে উঠলেন পিণ্টুকে, কেন তুমি বাইরে এসে দাঁড়িয়েছ? যাও ভেতরে যাও।

পিণ্টু আরেকটা ভুতকে গিলে পালাতে না পালাতে নলিনাক্ষ জানালার দিকে ফিরে বেরেকে ধমকে উঠলেন, তুমি এখানে কী করছ? যাও এখান থেকে, জানালা বন্ধ করে দাও।

সঙ্গে সঙ্গে জানালা বন্ধ হয়ে গেল। নলিনাক্ষ ক্রুদ্ধ চোখে দেখলেন একবার ভবতোষের চলে যাওয়া পথের দিকে। তারপর খবরের কাগজটা টেনে নিলেন আবার।

বিনুর ভুরু কুঁচকে উঠল। লোকটা ছেলেমেয়েদের ধমকাচ্ছে কেন? সাধন উঠে দাঁড়াল। ঘরে চলে যাওয়াই উচিত এ সময়ে।

কিন্তু তার আগেই অধ্যাপক হাত তুলে ইশারা করলেন সাধনকে। বাগান পার হয়ে এসে উঠলেন সাধনের কাছে। প্রায় চুপি চুপি গলায় বললেন, দেখলেন তো ব্যাপারটা। এতদিন পুকুরঘাটে বসে অসভ্যের মত তেল মাখত। আজ আবার বাড়িয়েছে। আরে বাবা,

সাহেব লোকটি পরে যায়, সে আলাদা কথা। তুমি তো আর সাহেব নও, কী বলেন ?

সাধন প্রায় কলের পুতুলের মতো বলে উঠল, অ্যাঁ ? হ্যাঁ, তা তো বটেই। নলিনাক্ষ জানালা দিয়ে একবার ভিতরের দিকে দেখে নিলেন। আর এটা যেন জানাই ছিল বিনুর। তাই সে আগে থেকেই চোখ বাঁকিয়ে রেখেছিল বইয়ের দিকে। সাধনও বুঝল, লোকটা বিনুকে দেখছে। এবং মনে মনে খানিকটা ভরসা পাচ্ছে সে। ছোড়দিকে তা হলে লোকের দেখতে ইচ্ছে করছে। শুধু রাতের অন্ধকারে নয়, দিনের আলোতেও। আলোকের চোখ দেখেও তাই মনে হয়েছে সাধনের। অবাদিরও নিশ্চয় ভাল লাগবে।

যেদিকে চালু, সব জলের ধারাই সেদিকে যায়। সাধনেরও তাই। সব ভাবনাই এক দিকে ছোটে।

নলিনাক্ষ আরও চাপা গলায় ফিসফিসিয়ে বললেন, আর ভবতোষবাবুর এ সব বাড়াবাড়ির মানে বোঝেন তো ? আপনাদের দেখে আরও বাড়িয়েছেন। নইলে ও ভাবে আপনাদের সামনে দিয়ে যেতে পারেন ? আর ওই ধরনের খারাপ খারাপ কথাবার্তা, ছি ! তার মানে, যুবক দম্পতি দেখে—

সাধন তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলে উঠল, উঁহু, উঁহু, তা নয়।

নলিনাক্ষ বললেন, আমি বলছি আপনাকে, তাই-ই।

আর ঠিক এই কথাই ভেবেছিল সাধন গতকাল রাত্রে। লোকটার মাথায় ঢুকে আছে, তারা স্বামী স্ত্রী।

বিনু মনে মনে বলে উঠল, গাড়ল ! লোকটা কাল রাত থেকে এক যুবক স্কুল মাস্টারের যুবতী স্ত্রীকে ভাল করে দেখবার এবং আলাপ করবার কল্পনায় মেতে আছে। সাধনের দিকে একবার ভ্রূকুটি করে তাকাবার ইচ্ছে হল তার। কিন্তু নলিনাক্ষর সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে যাবার ভয়ে, চোখ তুলতে পারল না।

সাধনেরও সেই অবস্থা। সে বলল, না, মানে আপনি যা ভাবছেন, তা নয়। আমরা ইয়ে নয়, ও আমার বোন, ছোট বোন, সহোদরা··· !

মুখের থেকে নলিনাক্ষর দুগোদ্ভ টাকটাই যেন বেশী লাল হয়ে উঠল। ঘষতিয়ে গিয়ে চোখের চশমা একবার মুছলেন। আবার পরলেন। তাড়াতাড়ি বললেন, ও ! আচ্ছা হ্যাঁ, কী আশ্চর্য ! সত্যি দুঃখিত, কিছু যেন মনে করবেন না।

একথাগুলিও নলিনাক্ষ সততার সঙ্গে বলছেন কি না কে জানে। কারণ, স্বামী-স্ত্রী পরিচয় দিয়ে যুবক যুবতীরা যে এখানে এক সঙ্গে ফুর্তি করে যায়, সে কথা উনিই কাল রাত্রে বলেছিলেন। এবং এখনও, ভাই বোনের পরিচয়টাকে মনে মনে অবিশ্বাস করেছেন হয়তো।

নলিনাক্ষ আবার বললেন, অবিশ্যি তাতে কিছু যায় আসে না। মানে, ভবতোষ মিত্তিরের কথা বলছি। ওই ধরনের একটা বর্বরের মত, কোন যুবতী মহিলার চোখের ওপর দিয়ে, ছি ! ইচ্ছে করেই উনি···মানে বুঝলেন না ? ভদ্রলোক পার্ভার্ট।

বিনু মনে মনে প্রায় ভেংচে উঠল, 'যুবতী মহিলা।' লোকটা কানা না হলে নিশ্চয় বলত না। আসলে গতকাল থেকে মাথায় ঢেপে আছে, বিনু একটি যুবতী। এবং সুন্দরীও। যাচ্ছেতাই ! বিনু যদি তাই হত, তবে আজ এখানে, ওই লাওয়া বলের দেশে কেন বিনু। লোকটা নিজের চিন্তাতেই আছে। খোঁচাটা যে লাগছে কোথায়, টের পাচ্ছে না।

সাধন ওর সেই নিরীহ ভাবের মুখ করে বলল, তবে আপনি ভদ্রলোককে দেখে অমন ইয়ে করছিলেন কেন ? কেমন যেন ভয় ভয়—?

নলিনাক্ষ তেমনি চাপা গলায় বললেন, ভয়ে আর আপনাকে বলছি কি মশাই। লোকটা যে মস্ত লোক। ওর একটা কলমের খোঁচায়, এখনও অনেক কিছু ঘটে যেতে পারে। তার ওপরে, আমাদের কলেজের প্রিন্সিপাল স্বয়ং ওর কাছে জড়সড় হয়ে থাকেন। সরকারী মহলে সাংঘাতিক প্রতিপত্তি এখনও।

সাধন বলল, আচ্ছা, কিন্তু ওঁর মত লোক, অথচ আলোক ছেলেটার সঙ্গে খুব ভাব। বন্ধুর মত।

নলিনাক্ষ বললেন, সেই কথাই তো কাল রাত্রে আপনাকে বলছিলাম। কোথায় বাঘা অফিসার ভবতোষ মিত্তির, আর কোথায় একটা কারখানার মিস্তিরি। তাই বলছি, রতনেই রতন চেনে। মানে চরিত্রের দিক থেকে দুটিই সমান।

ঘর থেকে বিনু উঠে পড়ল। আর সারা হোস্টেল তেমনি নিঃসাড়। কাল থেকে লোকটা সমানে গলার সমালোচনা করে চলেছে। আর সাধন বিলবে। সে পিছনের বারান্দার গেল। সেখান থেকে পুকুরটা দেখা যায়।

ঠিক সেই মুহূর্তেই, সেই গান। আর হায়! নিখুঁত ছেঁড়ে গলার প্রচণ্ড চীৎকারে আবার রবীন্দ্র সঙ্গীত!

আমারে যা হয় তা জানো
সেই ভালো সেই ভালো
দূরে গিয়ে বহ দূরে দেবে
কাছে কেন লাজে লাজানো।

ঘর থেকে বিনু শুনতে পেল। আর সহসা চীৎকারটা তার বুকের ঘরে। বিশ্ব হয়ে নিশ্বাস আটকে দিল প্রায়। তবু চোখের দৃষ্টি পলকে উৎসুক হয়ে জানালায় ছুটে গেল। কেবল, পায়জামা পরা, খালি গায়ে, খোলাই করা পাথরের মূর্তি হেঁটে চলেছে। সিঁড়িতে গিয়ে দাঁড়াতেই ভবতোষের ডাক শিলেন, এসে পড়েছ? কাম অন্। আমার আর-একটি মিনিট, তুমি নেমে পড়।

ঝালোক লাফ দিয়ে জলে পড়ল। রোমাঞ্চিত গায় পুকুরটা চমকে উঠল। যেন আয়নাটা ভেঙে খান খান হল। কাচের টুকরোর মত ছিটকে গেল জল।

বিনুর মনে হল, নিঃসঙ্গ পুকুরটা যেন সঙ্গী পেয়ে মেতে উঠল। ভবতোষও জলে নেমে পড়েছেন। দাঁতার কাটতে গিয়ে ছেলেমানুষের মত হাতের চেয়ে পা ছাপাচ্ছেন বেশী। এ রকম বুড়ো মানুষকে সে কখনও দাঁতার কাটতে দেখে নি। আলোক ওঁকে ডাকছে দূর থেকে। উনি হাসছেন, হাঁপাচ্ছেন, হাতের ইশারা করছেন, অতদূরে যেতে পারবেন না।

আর আলোক সারা পুকুরটার বুকে যেন ঝাঁপাচ্ছে। পুকুরটা সোহাগে উছলে পড়ছে। নাচছে, দুলছে। আচ্ছা এর রান্না করে কে? বোধ হয় কুকারে চাপিয়ে দিয়ে এসেছে। কিন্তু বলছিল, স্টোভ আছে ওর। স্টোভে কুকার চাপিয়ে তো নিশ্চিন্তে বেরুনো যায় না। নিশ্চয়ই কাঠ কয়লার ব্যবস্থা করা আছে। অথবা রান্নার পার্ট-ই নেই। খেয়ে আসে হয়তো সেই শহরের হোটেল থেকে। কিংবা, মালিনীটার ঘরেই যায় কি না, কে জানে।

কথাটা মনে হতেই বিস্বাদ হয়ে উঠল বিনু। ছেলে, মালিনীটার কাছে বসে, মালিনীটার হাতে তৈরী খাবার খেতে ওর কিছুমাত্র বাধবে না। ও খাবার কী! একেবারে আচার বিচারহীন। আর মালী-বউটা ও তেমনি দেখেছে তো বিনু। আলোকের সামনে মেয়েলোকটার একটু দ্বিধা লজ্জা নেই। সকালবেলায় এমন করে তাকাচ্ছিল আলোকের দিকে, যেন ওর বুকে ঝাঁপানো ছেলেটার মতই আলোককে বুকে করে নেবে।

এর পরেই বিনুর মনে হল, আলোকের খাবার জল তুলে দেয় মালিনীটাই। চোখে দেখেনি বটে। কিন্তু এটাই আন্দাজ করছে। শুধু তাই নয়। ও বউটাই নিশ্চয় ওর ঘর পরিষ্কার করে। জিনিসপত্র গুছিয়ে দেয়।...আর এসব ভাবনা একটা নিরুপায়ী প্রপাতের মত অপ্রতিরোধ্য গতিতে আসে। ইচ্ছে করলেই থামানো যায় না। তাই বিনুর মনে হল, এবং আলোকের যখন পরীক্ষা একটু খারাপ হয়, কিংবা সন্ধ্যাবেলার দিকে একটু মাথা ধরে (এও কি সম্ভব!) তা হলে নিশ্চয় মালিনী এসে পরিচর্যা করে। মাথা টিপে দেয়।

আলোক তখনও সমানে হাপিয়ে চলেছে পুকুরের বুকে। চীৎকার করছে, হাসছে, জল ছিটোচ্ছে। সহসা রেগে উঠল বিনু। বিরক্ত হয়ে আপন মনে বলে উঠল, আঃ! এ কি অসভ্যতা! না এত লজ্জাসজ্জি ঝাপাঝাপি চীৎকার ভালো লাগছে না তার। আলোক আর ভবতোষবাবুই তো শুধু নেই এখানে। আরও লোক আছে। তাদের শান্তি নষ্ট করবার অধিকার ওদের নেই।...আর সত্যি, স্বাস্থ্যের এত ঔদ্ধত্য, এত হাসি সহ্য হয় না বিনুর। এও এক রকমের নিষ্ঠুরতা। মানুষকে নিষ্ঠুর করে তোলে। এবং অধ্যাপক ঠিকই বলেছেন। আলোক ভালো নয়। যে বেশী স্বচ্ছন্দে চলে, সহজে বলে, সে-ই খারাপ। কারণ সে বিচার বুদ্ধিহীন হয় এবং নির্বিচারেই সকল অন্যায় স্বচ্ছন্দে ও সহজে করে চলে। আলোক নিশ্চয় খারাপ। ও একলা, ও স্বাধীন, তাই ওই মালিনী আর ও...হ্যাঁ, তা ছাড়া আর কী? সকাল-বেলাই তো মনে হয়েছিল বিনুর। আর মালী-বউটার বয়সও বেশী নয়। হয়তো—হয়তো কেন, নিশ্চয়ই বিনুর চেয়েও ছোট। বয়সে ছোট এবং অভিজ্ঞ এবং অনেক

বিষয়ে পটীয়সী, আর ওরা···।

সারা গায়ে রুপালী জলের কণা নিয়ে লাফাতে লাফাতে উঠে এল আলোক। ভবতোষও উঠে এসেছেন। তিনি বললেন আলোককে, এ কি রে, তুমি তোয়ালে আনো নি। যাও যাও, তাড়াতাড়ি গা মুছে ফ্যালো গে।

বিনুর খেয়াল নেই যে সে জানালার অনেক কাছে এসে পড়েছে। আলোক গুনগুন করে, তালে তালে সিঁড়ি টপকে উচ্চতর ধাপে উঠতেই চোখোচোখি হয়ে গেল। তখনও বিনুর চোখে সন্দেহ আর বিরক্তি। সে তাড়াতাড়ি সরে আসতে গেল।

তার আগেই আলোকের এক মুখ হাসি। বলল, কী খাওয়া খাওয়ার পাইও চুকিয়ে ফেলেছেন নাকি এর মধ্যে?

বিনু রুষ্ট হতে চাইল। কিন্তু সে যেন কেমন ব্রীড়াবনত হয়ে উঠল। মাথা নেড়ে প্রায় অস্ফুটে বলল, না।

নিজের সঙ্গে নিজেরই যে কত বিরোধ। আর জানালা থেকে সরে আসা উচিত ভেবেও সরল না বিনু। আলোক যতই জানালার নিকটবর্তী হতে লাগল, ততই বিনুর শ্বাস রুদ্ধ হয়ে এল। ভিতরে ভিতরে যেন একটা তুমুল কলরব। অথচ আলোক আর তাকাচ্ছে না। স্বাভাবিক ভাবেই, অন্যদিকে দৃষ্টি রেখে চলে যাচ্ছে। কাছে, আরও কাছে এল আলোক। এইবার পার হয়ে যাবে জানালা।

বিনু হঠাৎ বলে ফেলল, আর আপনার? আপনার খাওয়ার ব্যবস্থা কী?

বিনু যেন প্রায় চুপি চুপি স্বরে কথা বলল।

আলোক থামল। হাসিটা আছেই মুখে। আর অস্থির হাত পা। খানিকটা নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, আমার? এবার গিয়ে চাপাব! কাঠ জ্বালিয়ে খিচুড়ি।

—কাঠ জ্বালিয়ে? এই নেয়ে উঠে তারপর—?

—হ্যাঁ। কাঠের জ্বালে বেতে বলেছেন উনি।

আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল ভবতোষ মিত্তিরকে। বলল, আর চান করে উঠে খিদেটাও বাড়তে থাকবে। তারপর একেবারে রাক্ষসের মত—।

কথা শেষ করবার আগেই হেসে উঠল আলোক। ভবতোষ মিত্তিরের হুংকার ভেসে এল, আরে। ভেজা গায়ে ওখানেও দাঁড়িয়ে আছ? গা মুছে এসে গল্প কর।

—এই যে যাই।

বিনুর দিকে তাকিয়ে আর একবার হাসল আলোক। বিনু লজ্জিত হয়ে উঠল। আলোক বড় বড় পায়ে দৌড় দিল প্রায়।

ভবতোষও তোয়ালে ঝটকিয়ে ওঁর আগের পথেই চলেছেন।

তারপরেও লজ্জায় কাটা হয়ে রইল বিনু। সরে এল জানালার পাশে। মনে মনে বলল, কী অসভ্য ভবতোষ মিত্তিরের লোকটা। নিশ্চয় লোকটার কপালে মস্ত একটি ইস্কুপ আছে।

আর ঠিক এই মুহূর্তেই আবার একবার চমকে উঠল বিনু। শব্দ শুনে পিছন ফিরে দেখল, কুকারটা নামিয়েছে সাধন। ও কটা চরে ছিল। এখন যেন একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। এলোমেলো হয়ে উঠল লজ্জায়। ব্যস্ত ত্রস্ত গলায় বলল, কী করছিস?

সাধন খুব স্বাভাবিক ভাবে দাঁড়াশি দিয়ে কুকারের গরম সাটিগুলি তোলবার চেষ্টা করছে। না তাকিয়েই বলল, এগুলো ধুয়ে নেওয়া ভালো। ভালটা কড়ায় করে গরম করে দিয়ে নিই।

ইস্! কখন এসেছে সাধন এ ঘরে। কতক্ষণ! সে কাছে ছিটকে এসে বলল, তা তুই এসব করছিস কেন। আমায় বলবি তো। দে, আমি করছি।

সাধন বলল, বাড়িতে তো আমি বসেই এসেছি। এসব আমারই করবার কথা। মাত্র একমাস। এখন তোমার ছুটি।

বিনুর ইচ্ছে হল, ধমক দেয়। কিন্তু এমন সে কিছুই বলতে পারল না। বরং সাধনের কাছ থেকে সরে পড়তে চাইল সে। বলে উঠল, তবে যা খুশি কর।

বিনু শুয়ে আছে। পশ্চিমের বাঙ্ক বেডটার পাশে দো-চারপড়ুমিতে অনেকগুলি গরু চরছে।

দূরে নিকুঞ্জ, কিন্তু কোথা থেকে যেন কথাবার্তা হাসির শব্দ ভেসে আসছে। নিশ্চয়ই আলোকের আর সেই বিপদের বন্ধু দুটি গিয়ে জুটেছে।

মুহূর্তটা বাক আকাশ পেরিয়ে গেছে। বরা আর ঝরাঝরার দিকে ছুটেছে সে। বেশ গরম। রোদ কাঁপছে মাঠে মাঠে।

বিনু শুয়ে আছে, খাওয়া শোয়া বিশ্রাম।

বলেছে চুপচাপ শুয়ে থাকতে। তা ছাড়া কী করবে বিনু। এই তো শুয়েছে, এখন উঠতে বললেও চট করে উঠতে পারবে না। হয়তো বুক ধড়ফড়িয়ে মরে যাবে।

অনাদি দেখতে কেমন? অনেকদিন নাকি ভবানীপুরের বাড়িতে এসেছে। কত লোক এসেছে, বিনুর তাতে কী। চোখে দেখে থাকলেও মনে করতে পারা যায় না। আশ্চর্য! কারুর কথাই এখন আর ভাবা যাচ্ছে না। একজন ছাড়া। সে যেন চিৎকার করে ছুটে এসে সামনে দাঁড়াচ্ছে। দেখা যাচ্ছে আলোকের সব কিছুতেই জোর। নিরীহ নির্বিরোধী মনের ওপরেও।

কেন যে এরকম মনে হয়। সে তো আসলে এসব কিছুই ভাবতে চায় না।

জীবনের একটাই করণীয় তার শেষ হল না আজও। অনাদির মূর্তিটি ভাবতে ইচ্ছে করে এখন। চালাকি করে, কিছু জানতে না দিয়ে অনাদিকে একবার ভবানীপুরের বাড়ির ছাদের আলসের ধারে নিয়ে যেতে হবে। তারপর···তারপর···

উড়ো জাহাজের প্রপেলারের গর্জনের মতো ভোঁভোঁ করে একটা ভীমরুল ঢুকল ঘরের মধ্যে। ঠিক যেন একটা পুতুল!

চোখ খুলল না বিনু—ওর ভয় হতে লাগল। কেবলই মনে হতে লাগল, যদি ভীমরুলটা ওর ঠোঁটে কামড়ে দেয়। খাওয়ার পরে পাউডার ঘষা মুখ খেয়ে উঠল বিনুর। সহসা দংশিত হবার বাসনায় ওর সব রক্ত উঠে এল ঠোঁটে। ভীমরুলটা নেমে এসেছে, নেমে এসেছে ওর মুখের কাছে। নিথর হয়ে রইল বিনু? কামড়াবে, ঠিক কামড়াবে। আর সে নিশ্চয় অজ্ঞান হয়ে যাবে। মরে যাওয়ার মত।

প্রকাণ্ড পতঙ্গটার পাখার মৃদু বাতাস লাগল বিনুর গালে। পরমুহূর্তেই ভোঁ-ভোঁ করে শব্দটা উঠে গেল ওপরে, কড়ি কাঠের কাছে। প্রায় একটা বিক্ষুব্ধ প্রতিবাদের মত। যেন টের পেয়েছে, ঈষৎ রক্তিম মৃদুস্নিগ্ধ এই ছোট্ট অঞ্চলটি ওদের জগতের নয়। ওখানে ওর পাওনা কিছু নেই।

বিনুর নিশ্বাস পড়ল আস্তে আস্তে। চোখ মেলে তাকাল। আর অবাক চোখে দেখল, ভীমরুল নয়। একটি মস্ত বড়, কিলিক হানা কালো ভ্রমর। নীচের আলোয় মনে হয়েছিল, পতঙ্গটার গায়ে হলদে রং-এর দাগ আছে। ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে, বিনু অভিনিবেশ সহকারে দেখল ভ্রমরটাকে। কৃষ্ণনগরে থাকবার সময় ভ্রমর চিনতে শিখেছিল সে। কিন্তু এমন কখনও মনে হয় নি, এটাকে দেখে যেমন মনে হচ্ছে যে, ও যেন ক্যাপার মত কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। মাথা ঠুকে যাচ্ছে দেওয়ালে কড়িকাঠে। খেয়াল নেই। গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে ডাকছে। আপন মনেই আছে।

ওকে দেখে যেন মানুষের কথা মনে পড়ে যায়: ওর মত এক একটা মানুষ আছে। মনে হতেই, হঠাৎ চমকে উঠল বিনু। একটা মূর্তি তার চোখের সামনে ঝলকে উঠল।

ঠিক এই সময়েই গভীর গম্ভীর গলার মৃদু কিন্তু স্পষ্ট গান ভেসে এল।

সুনীল সাগরে শ্যামল কিনারে
দেখেছি পথে যেতে তুলনাহীনারে:
সে কথা কভু আর পারে না ঘুচিতে
আছে সে নিখিলের মাঝারীতুচিতে।

নিশ্চয় রেকর্ড বাজছে। এখানে আর রেডিও কোথায় বাজবে। কিন্তু কোন ফ্ল্যাটে, কার ঘরে, কে বাজায়? ভ্রমরটা যেন শুনেই ভোঁ করে বেরিয়ে গেল জানালা গলে।

বিনু তেমনি স্থির হয়ে শুনতে লাগল।

—বাবি?

গান ছাপিয়ে কথাটা কানে এল বিনুর। জানালার কাছ থেকেই যেন। মাথা তুলে বাইরে তাকাল সে। দেখল, পিন্টু রয়েছে পুকুর ঘাটের ওপরে। পাশে দাঁড়ানো মেয়েটি নিশ্চয় ওর দিদি। অধ্যাপকের মেয়ে। খোলা-চুল মেয়েটির স্বাস্থ্য পড়ছে উপচে। গায়ের ফ্রকটা যেন ছোট হয়ে গিয়েছে। একটু যেন কটুই লাগছে দেখতে। তবু মনের মধ্যে কোথায় চিনচিনিয়ে উঠল বিনুর। ওই দেখতে-কটুর মধ্যে কোথায় একটা জয় পতাকা উড়ছে।

আঃ! হঠাৎ যেন নিজের ওপরেই বিরক্ত হয়ে উঠল

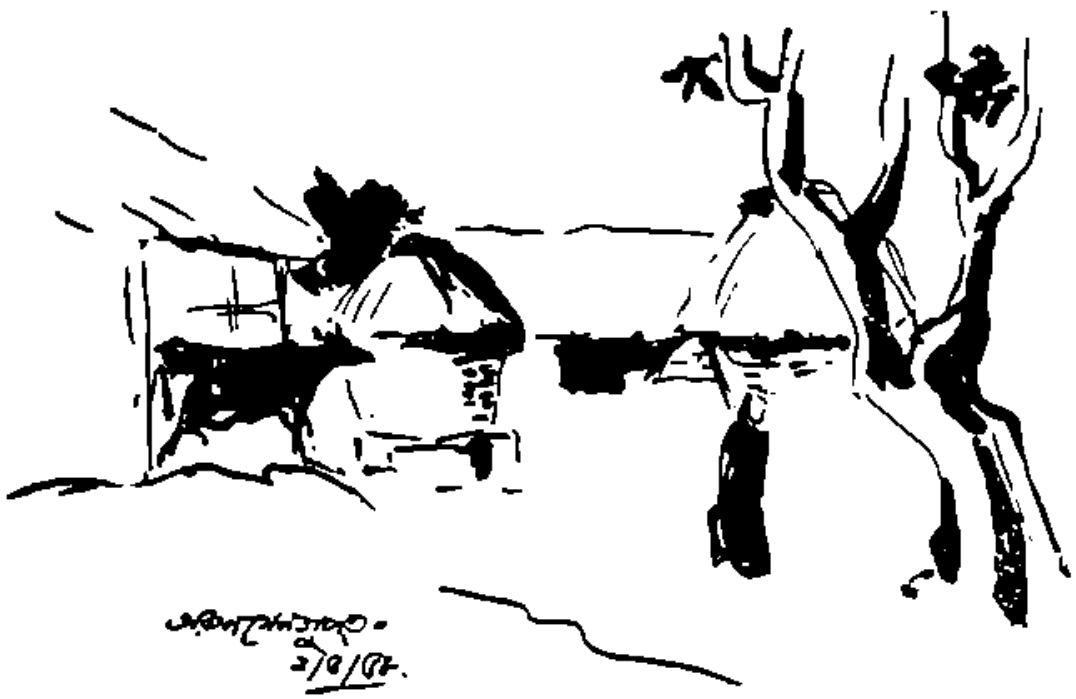

শিল্পী : অরুণ সেনগুপ্ত

বিনু। সব ভাবনা কেন একদিকেই যায় শুধু···কিন্তু আশ্চর্য! বাইরে রোদের তাপ। ওপাশে আলোক আছে। অধ্যাপকের দৃষ্টি এড়িয়ে দুপুরে দুটিতে বেরুল কী করে।

পিণ্টু আবার বলল, যাবি না দিদি?

দিদি বলল, না। বাবা জানলে বকবে।

পিণ্টু—কী করে জানবে।

দিদি নীরব। দূরে মাঠে ওর চোখ।

পিণ্টু বলল, তবে আমি যাচ্ছি।

বলে সে পা বাড়াতেই, দিদি মুখ ফিরিয়ে বলল, না।

বলতে না বলতেই মেয়েটির চোখ পড়ল বিনুর ওপর। একটু সঙ্কোচ পেল। দিদির চোখ অনুসরণ করে, পিণ্টুও তাকাল বিনুর দিকে। আর সঙ্গে সঙ্গে কয়েক পা এগিয়ে এসে বলল, আপনাদের উঠোনে একটা পেয়ারা গাছ আছে না?

মনে মনে হাসি পেল বিনুর। বলল, আছে।

—ওতে পেয়ারা হয়েছে জানেন?

হুঁ।

ততক্ষণে দিদির হাত ভাইয়ের কাঁধে পড়েছে। কিন্তু পিণ্টুর মুখে উত্তেজনার শেষ তরঙ্গের রং কেটে পড়েছে। সে আরও এক পা এগিয়ে বলল, আমাকে দেবেন কয়েকটা?

ছোট মুখটিতে বড় বড় চোখে আর ঝরা দাঁতের ফাঁকে, আঁতুড়ের ও নতুন ওঠা দাঁতে, উৎকণ্ঠিত উত্তেজনা চকচক করছে।

বিনুর একটু বায়াধরানো হাসি পেল। বলল, তুমি পাড়তে পারবে?

—হ্যাঁ।

—তবে এস।

—তবে উঠোনের দরজাটা খুলে দিন।

দিদি শেষবারের জন্যে বাধা দেবার চেষ্টা করে বলল, পিণ্টু ভাল হচ্ছে না। বাবা কদমটে পেয়ারা খেতে বারণ করেছে। পেয়ারা এখনও পাকে নি।

পিণ্টু ততক্ষণে উঠোনের দরজার কাছে চলে গিয়েছে। বিনু উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিতেই পিণ্টু ঝড়ের বেগে ঢুকল। ঢুকেই দু হাতে গাছটাকে জড়িয়ে পা তুলতে চেষ্টা করল। কিন্তু গাছের নীচের অংশ প্রায় সোজা। সোটাও সহজ নয়। পিণ্টুর ছোট ছোট হাতে পায়ে এ গাছে ওঠা দাধ্যাতীত। তবু পিণ্টু সহজে পরিত হবার পাত্র নয়।

বিনু মুখ টিপে হাসছে। দিদির গান তার কানে আসছে। একটা প্রশ্ন তার মনের মধ্যে তখনও, কোথায় বাজছে।

পিণ্টুর দিদি আস্তে আস্তে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। চোখোচোখি হল বিনুর সঙ্গে। বিনু ডাকল, এস। ভেতরে এস।

মেয়েটি চুকল। পিণ্টুর অবস্থা তখন সঙ্গিন। বুক আর জামা ছড়ে এবং ছিঁড়ে যাওয়ার অবস্থা। কিন্তু নিষ্ঠুর গাছ তাকে এক ইঞ্চিও ব্যতিত করে নি।

বিনু বলল, দাঁড়াও। একটু জিরিয়ে নাও।

—অ্যাঁ? আচ্ছা।

পিণ্টু থামল। ঘাড় তুলে তাকাল গাছের দিকে। এখনও নিতান্তই কাঁচা, সবুজ ছোট ছোট ফল। হয়তো দাঁত বসানো যাবে না। তিক্ত স্বাদে থু থু করে ফেলে দিতে হবে। তবু, পাওয়ার উত্তেজনাটাই এখন প্রবল।

বিনু অনুসন্ধিৎসু চোখে আশেপাশে দেখল। লম্বা কঞ্চি থাকলে, আকশি হিসেবে ব্যবহার করতে পারত। চোখে পড়ল না সেরকম কিছু। কিন্তু পিণ্টু সে-কথা বলল না। হয়তো ছুটবে কোথাও আকশি সংগ্রহে। বরং সে জিজ্ঞেস করল, এই দুপুরবেলা বেরুলে কী করে?

পিণ্টুর যেন জবাব মুখে তৈরী। বলল, বাবা মা এখন দরজা বন্ধ করে ঘুমোচ্ছে।

বিনুর চোখোচোখি হল মেয়েটির সঙ্গে। মেয়েটির মুখ লাল হয়ে উঠল। পিণ্টুর সহজ জবাবে বিনুও অস্বস্তিতে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি বলল, কিন্তু পরে বকবেন যে?

পিণ্টুর দৃষ্টি গাছে। ঘাড় নেড়ে বলল, না। এ সময়ে কম্পাউণ্ডের মধ্যে বেড়ালে কিছু বলবে না। ঘরে থাকলেই বকবে।

পিণ্টুর দিদি মাথা নত করল। যেন সে-ই কোন অপরাধ করেছে। এসব কথা যে এমন করে বাইরের কোন মহিলাকে বলা যায় না, সে জানে। কিন্তু রুচিবাগীশ মলিনাক্ষর এ আবার কেমন রীতি। আর ওর বউটাই বা কেমন। থাকে বিনু এখনও চোখে দেখে নি। এক

জায়গায় দেখাচ্ছে, সবই কলকা গোরো।

এখন একটা নতুন গান বাজছে। 'চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে'। এও পুরুষ গলার রেকর্ড। বিনু তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ বদলে বলল, কিন্তু কোথায় যেন যেতে চাইছিলে তুমি দিদিকে নিয়ে।

পিন্টু বলল, আলোকদার ওখানে। এখন রেকর্ড বাজাচ্ছে আলোকদা।

ও! আলোক তার গানের প্রেরণার যন্ত্রসমূহ সঙ্গে নিয়েই এসেছে। আশ্চর্য! ওর চরিত্র কিংবা ব্যবহারের সঙ্গে দাঁওতাল পরগণার এই বিঁকি ডাকা গুরু দুপুরে তন্ময় হয়ে রবীন্দ্র-সঙ্গীত শোনার কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না।

বিনু বলল, তাই বুঝি? কিন্তু ওখানে যাওয়া তো তোমার নিষেধ। সেদিনই তোমাকে তোমার বাবা বকুনি দেবেন।

পিন্টু বলল, বাবা এখন কিছু দেখতে পাবেন না। বাবার তো আসলে মার ওপর রাগ। তাই আমাদের ওপরেও রাগ।

পিন্টুর দিদি অসহায় বিস্ময়ে তাকাল ভাইয়ের দিকে। বলল, আচ্ছা, গাছে ইঁট মারব? তা হলে পেয়ারা পড়বে।

বিনু বলল, না, ঢিল মারলে পেয়ারা পড়বে না। এখনও শক্ত। তার চেয়ে আমি বরং মালীকে দিয়ে পাড়িয়ে রাখব। বিকেলে তুমি নিয়ে যেও।

পিন্টু গাছের দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্ত ভাবল। তারপরে বলল, আচ্ছা। আর দিদি, মুরগীর বাসায় দেখে আসি, আর ডিম পেড়েছে নাকি।

বিনুর সঙ্গে চোখোচোখি হল। তাকে হেসে বলতে হল, ভীষণ হুইকটে। তোমার নাম কী?

মেয়েটি বলল, মল্লিকা ভট্টাচার্য।

মল্লিকা চোখ তুলল, যেন কিছু বলবে। কিন্তু বলতে পারল না।

বিনু দেখল, মেয়েটির চোখ দুটি বড়। নাকটি টিকলো। ঠোঁট দুটি পুরু। বয়স বোধহয় ষোল হবে। এত গম্ভীর আর শান্ত মল্লিকা, মনে হয়, অনেক বুঝতে শিখে ফেলেছে। ওর কোথায়, বুক, জানা দেখেই বলা যায়, এবার শাড়ি পরা উচিত।

বিনু জিজ্ঞেস করল কোন ক্লাসে পড়?

—এবার নাইনাল দেব।

বলে, মল্লিকা ওর ফ্রকটা যেন টেনে ঘুমে ঠিক করে নিতে চাইল। তারপরে বলল, আসেন, পিন্টুটা ভারি বাজে বাজে কথা বলে।

বিনু মনে মনে বলল, তাই বুঝি! মুখে বলল, ছেলে মানুষ তো!

মল্লিকার চোখে অনুসন্ধিৎসা। সে তাকাল বিনুর দিকে। বলল, আমি যাচ্ছি। বিকেলে বেড়াতে বেরুবেন?

বিনু বলল, তা ছাড়া আর কী করব বল এখানে, বল। তোমরা বেরুবে না?

—আমরা রোজ বেরুই।

এই প্রথম একটু হেসে মল্লিকা চলে গেল। বিনু দরজাটা ধরে দাঁড়াল। রেকর্ডের গান বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

একটু পরে সত্যি বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছিল বিনু। ঘুম ভাঙল আলোকেরই চিৎকারে, এই আবদুল্লা! হট যাও।

সাধন আপন মনেই পাশের ঘরে বলে উঠল, কী রে বাবা। মাথা খারাপ নাকি।

বিনু চমকে উঠল ঘড়ঘড় শব্দে। জানালা দিয়ে বড় রাস্তার দিকে দেখল টাঙার চেয়েও উঁচু একটা ঘোড়া ছুটছে পশ্চিমের চড়াইয়ে। টাঙাটাকেই নীচু মনে হচ্ছে। আর একটি লোক ছুটছে তার পিছন পিছন। হয়তো সে-ই আবদুল্লা। আর টাঙা হাঁকাচ্ছে আলোক।

কিন্তু এত জোরে! কদমে ছুটেছে ঘোড়া। মাথার উপরে চাবুকটা পাক দিচ্ছে দেখা যায়। দেখতে দেখতে যেন টাঙাটা চড়াইয়ে উঠে, হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল উতরাইয়ে।

বিকালে বিনু নাহল। পায়ের নখ থেকে মাথা পর্যন্ত, যতখানি সাধন চাইল। কিংবা সাধন যতটা চাইল তার চেয়েও বেশী। তারপর দুজনে বেরুলো। প্রথম সাক্ষাৎ ভবতোষ মিত্রের সঙ্গে। বাঁ হাতে এক বস্তা নিয়ে যাওয়া চুরুট। ডান হাতে লাঠি। বাগানের ধারে দাঁড়িয়েছিলেন চুপ করে, দূরের চড়াইয়ের দিকে তাকিয়ে। মোরামের ওপর পায়ের শব্দ পেয়ে ফিরে তাকালেন।

সাধনের মনে হল, ভবতোষবাবুর চোখের দিকে তাকিয়ে তার শিরদাঁড়াটা কেমন নম্র হয়ে গেল। সে হাত তুলে অস্ফুটে বলে উঠল, নমস্কার।

ভবতোষ লাঠি আর চুরুটসহ হাত তুলে একটা প্রতিনমস্কারের ভঙ্গি করে বললেন, শুনেছি আপনারা ভাই বোন এসেছেন গতকাল। সাধন অত্যন্ত আপ্যায়িত হয়ে হেসে বলল, কার কাছে শুনলেন?

—আর কার কাছে। আপনাদের দলেও সে নিশ্চয় যেচে আলাপ করেছে, ওই দুর্বৃত্ত আলোকের কথা বলছি। কাণ্ডটা দেখলেন তো। অ্যান অ্যানচেইনড বীস্ট!

গালাগাল নয়, যেন সস্নেহে আদর করলেন। কিন্তু গাম্ভীর্যের মধ্যে একটা বিষণ্ণতার ছায়া দেখা গেল। খানিকটা আপন মনেই বললেন আবার, অদ্ভুত ছেলে। মনে হয়, ঈশ্বর আর শয়তান এক দলে ওর ভিতরে লড়ছে।

সাধন ওর মোটা লেন্সের ভিতর থেকে একবার বিনুর দিকে তাকাল। বিনুও তাকিয়েছিল। ভবতোষের কথা ঠিক কেউ যেন হৃদয়ঙ্গম করতে পারছে না। কিন্তু অস্বস্তি বোধ করছে।

সাধন মন রাখার মত করে বলল, পাগল।

ভবতোষ বললেন, হ্যাঁ, এক ধরনের। কিন্তু ফেরেববাজ নয়। এই আমি, আপনি- আমাদের মত।

বলে মোটা চাপা গলায় হেসে উঠলেন। স্পষ্ট করে একবার দেখলেন বিনুর পা থেকে মাথা পর্যন্ত। বললেন ভোল্ট টেক ইট ইন ব্যাড সেন্স। সংসারে আমাদের সবটাই প্রায় কাজ গোছানো আর তাংড়ানোর ব্যাপার। ওই গবেটটা এখনও ওসব কিছুই বুঝতে শেখে নি। একটা অন্য ধরণের পাগল কিন্তু—

ওঁর দৃষ্টিটা রীতিমত তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল বিনুর কাঁধের কাছ থেকে বুকের ব্লাউজের বাকঝকানে। বিনুর হাতটা আপনা থেকেই উঠে আসছিল বুকের কাপড়ের কাছে। ভবতোষ বললেন, শাড়ি ব্লাউজটা ঠিকই ছিল বটে। প্রসাধনও ভালই করেছ মা। তবে ফুলের অলঙ্কার পরে বেরুলেই ভাল মানাতো।

লজ্জা এবং বিস্ময়ের চমকে বিনু কোন কথা বলতে পারল না। সাধনের অবস্থাও প্রায় সেই রকম। তবু তার মুখ দিয়ে শুধু বেরুল, ও।

ভবতোষ বললেন, হ্যাঁ, এখন বিকেল, সন্ধে হয়ে এল বলে। এখানে কোথায়ই বা যাবে আর। চারদিকেই গাছপালা জঙ্গল। ওসব সোনার অলঙ্কার জঙ্গল তাকিয়ে দেখবে না। কিন্তু আর যারা দেখবে, অর্থাৎ দেখতে পারে, তারা হঠাৎ লোভী হয়ে উঠতে পারে। তারা ঠিক সৌন্দর্য বোঝে না। তারা গলার হারের চার ভরি ওজনটা বোঝে, হাতের বালাও কোন্ ঘরা ভরি তিনেক···।

ততক্ষণে সাধনের দৃষ্টি আতঙ্কে স্থির এবং পুরোপুরি বাক্‌রোধ হয়ে গিয়েছে। বিনুর মনে হল, চারদিকে লোভী রক্ত-চোখ তার গলা এবং হাতের দিক তাকিয়ে রয়েছে।

ভবতোষ আবার বললেন, তা বলে তোমাদের আমি এখনি ঘরে ফিরে ওসব রেখে বেরোতে বলছি নে। মাইল খানেকের মধ্যে কোন বিপদ আপদ নেই। এখানে আশে-পাশে সবখানেই গরীব লোকেরা থাকে। খুবই নিরীহ, দুর্বৃত্ত বলে তাদের দুর্নামও নেই। তবু, কী দরকার ওদের এসব দেখিয়ে। বেচারীদের মতিভ্রম ঘটানো ভালি। তবে এটা ভবিষ্যতের জন্যে মনে রাখা ভালো, বিদেশে বেড়াতে এসে ওসব গহনাগাটি না আনাই উচিত। ওগুলো যেখানে মানায়, সেখানেই ভালো।

বলে ভবতোষ পা বাড়াতে গেলেন। কিন্তু বিনু সাধন পাথর। ভবতোষকে গমনোদ্যত দেখে সাধন বলেই ফেলল, তা হলে কী করা যায় বলুন তো?

ভবতোষ বললেন, বেরিয়ে যখন পড়েছ, ঘুরে এস। মাইল খানেকের মধ্যে কোন ভয় নেই, তোমার বোন একলা গেলেও ভয় নেই। তবে বেশী রাত করো না। আর যদি আমার কথা শুনে খুব অস্বস্তি হয়, তবে গলার হারটা খুলে তোমার পকেটে রাখলেই হয়। ওটাই বেশী চোখে পড়ছে।

ভবতোষ আর দাঁড়ালেন না। কিন্তু সাধন হতবুদ্ধি কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

এক মুহূর্ত পরেই, হারটা খুলে ফেলল বিনু। সাধনের হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, তখনই বলেছিলাম, কী হবে এত সব পরে।

বলতে বলতে কানের পাথর-খচিত বাকড়ি দুটিও খুলে সাধনের হাতে দিল বিনু। বলল, নাও, পকেটে রাখ।

সাধন তাড়াতাড়ি সেগুলি পকেটে রেখে বিনুর হাতের দিকে তাকাল। বিনু বালাতেও হাত দিয়েছিল।

হঠাৎ বলল এ দুটো থাক।

সাধন বলল, সত্যি এটা আমাদের ভাবা উচিত ছিল। জায়গাটা তো তা হলে ভাল নয়।—কেন, জায়গাটার তো কোন দোষ নেই। কলকাতার মত শহরে দিনে দুপুরে ছিনিয়ে নিচ্ছে। এখানে তো নিতেই পারে।

তবু গহনাগুলি পকেটস্থ করে যেন অনেকখানি দুশ্চিন্তা ঘুচল। চোখের আড়ালে করে, স্বস্তি ফিরে এল। ওরা দুজনে পায়ে পায়ে লক-এর গেট পেরিয়ে রাস্তায় এসে উঠল।

সাধন হঠাৎ বলে উঠল, লোকটার কথাবার্তার ধরন যেন কেমন। এমন ভাবে বললে···। বিনু হেসে ফেলল। বলল আমি তো প্রথমে কিছু বুঝতেই পারি নি। যে ভাবে তাকিয়ে বলছিলেন। কিন্তু আলোকের কথা যেন কী বলছিলেন?

সাধন ঠোঁট উল্টে বলল, কী জানি। আমরা সবাই কাজ গুছোচ্ছি, মতলববাজ, আর ওঁর ওই গবুচন্দর আলোক বাঁড়ুজ্জে—ওয়ার্থলেস্!

সাধনের সঙ্গে এক মত হতে গিয়েও বিনু যেন মনে মনে থতিয়ে গেল। সে মাথা নীচু করে ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগল। কিন্তু কিছু বলতে পারল না।

সাধন মোটা লেন্সের ভিতর থেকে একবার বিনুকে দেখল। আবার বলল, আর দেখলি, প্রথম আলাপেই কেমন 'তুমি তুমি' করে বলতে শুরু করলে?

বিনু বলতে যাচ্ছিল, তা উনি বয়সে অত বড়—।

কিন্তু কথা বলবার আগেই, সামনের একটা বাঁক থেকে সপরিবারে অধ্যাপক উদয় হলেন। এবং বিনু অবাক হয়ে দেখল, ক্যাপনেবল শো রুমের একটি জীবন্ত পুতুল নলিনাক্ষর পাশে। একেবারে বেমানান অবাস্তব, প্রায় উদ্ভট। এমন কি ভদ্রমহিলার কাজল-টানা চোখের চাহনিতেও একটা দূর অপরিচয়ের ছায়া। কলকাতার দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় শ্রেণীর কলেজের অধ্যাপক নলিনাক্ষ ভট্টাচার্যের যে-পরিচয় ইতিমধ্যে পাওয়া গিয়েছে, তার সঙ্গে মহিলাটির কোন মিল নেই। অন্য কোন মহিলাই হয় তো ভাবত বিনু, কিন্তু তার আগেই অধ্যাপক পরিচয় করিয়ে দিলেন, আমার স্ত্রী···ইত্যাদি।

সাধন নিজের পরিচয় দিয়ে, বিনুর ভালো নামটা স্মরণ করবার অবসর পেল না। বলল, আর আমার ছোট বোন বিনু।

বিনু দেখল, অধ্যাপক গিন্নীর ঠোঁটে গাঢ় রং। মুখের পলেস্তারা বেশ মোটা। বিনুর থেকেও বেশী ভেজাল ওর চুলে, তাই ঘাড় থেকে টেনে তোলা উঁচু খোঁপা পিরামিডের মত দেখাচ্ছে। আর শরীরটাও ভদ্রমহিলার এঁটে কসে বেঁধে একটা শক্ত ছকে বাঁধা। অধ্যাপকের পাশে ওকে রীতিমতো তরুণী বলেই মনে হয়। বিনুর মনে হল এজন্যেই স্বাস্থ্যবতী মঞ্জুলিকা মেয়েটীর গায়ে এখনও শাড়ি ওঠে নি। ওর মা যে এখনও ছোট্ট খোকা খুকুর মা। এবং এও বোঝা গেল, অধ্যাপক যে ভদ্রমহিলার স্বামী, সেটাকে স্বীকার করার অনিচ্ছা সর্বাঙ্গে। বিনু মনে মনে খুশি হল। কিন্তু এ তরুণীটির আলোককে খুব ভালো লাগে, মনে হতেই আবার একবার চিনচিনিয়ে উঠল।

সাধনই একটু বেশী ভাবাচাকা খেয়েছে। সে একেবারেই দুজনকে মেলাতে পারে নি। নলিনাক্ষই যেন কেমন রহস্যময় হয়ে উঠলেন তার কাছে।

নলিনাক্ষ বললেন, কতদূর চললেন।

সাধন বলল, কাছেই যাব একটু। আপনারা, এই জঙ্গলের রাস্তায় কোথায় গেছলেন?

অধ্যাপক একবার পিছন ফিরে দেখে বললেন, জঙ্গলের রাস্তায় যাব কেন? সদর রাস্তা ধরেই ফিরছিলাম। দূর থেকে দেখলাম, ভবতোষ নিশ্চিন্ত আসছে। দেখেই ও-পথে নেমে পড়েছিলাম। কী বলতে কী বলবে, লোকটা যে ঠোঁটকাটা।

মঞ্জুলিকা গম্ভীর। বয়স এবং বকমকে ফ্রক আর সাজগোজের সঙ্গে তার গাম্ভীর্য বেমানান। মেয়েটা যেন কেমন বিষণ্ণ, অন্যমনস্ক। পিটুপটু করে বিনুকে দেখছে।

অধ্যাপক গিন্নী বললেন, ভারী বাজে লোক। চোখের চাউনি-টাউনি মোটেই সুবিধের নয়। আমাকে দেখলে এমন খারাপ ভাবে হাসে। অথচ এই লোকই নাকি···।

বলতে বলতেই কোঁচকানো ঠোঁটে হঠাৎ হাসি ফুটিয়ে তুললেন। বিনুকে বললেন, তা হলে আপনারা বেড়িয়ে আসুন। অবসর পেলেই আমার কাছে চলে আসবেন, কেমন?

ভদ্রমহিলার গলার স্বর সুরে, সবই যেন অস্বাভাবিক।

বিনু ঘাড় কাত করে বলল, আচ্ছা ।

দু-জন দু-দিকে এগিয়ে গেল। বিনু সাধন খানিকটা এগিয়ে, দু-জনে পরস্পরের দিকে তাকাল। আর এক লহমাই পিছন ফিরে একবার দেখল।

সাধন বলল, অদ্ভুত।

বিনু বলল আমি অবাক হয়ে গেছি।

সাধন—আমি তো ঘ মেরে গেছি। ওই লোকের ওই বউ···মানে···ওই বয়সের দাজগোজ।···বিনু হেসে উঠে বলল, একেবারে খুকী।

সাধন ওর মোটা লেন্সের ভিতর থেকে আত্মমগ্ন চোখে বিনুর দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল। বিনু অবাক হল। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে তাকাল। লজ্জা করছে তার। সে জানে, সাধন মনে মনে বিনুর তুলনা করছে অধ্যাপকের স্ত্রীর সঙ্গে।

সাধন প্রায় অস্ফুটে বলল, আজকাল সবাই বোধ হয় এক-রকমই চায়।

সাধনের 'সবাই' যে অনাদি, তা বুঝতে পারল বিনু। এবং ইঙ্গিতটাও বুঝতে পারল। সাধন তাকে ওই রকম হতে বলছে।

সাধন বলল, কিন্তু কোন্‌দিকে যাবে।

সে দাঁড়াল। বিনুও। সামনের দিকে বাঁয়ের উঁচু চড়াইটার দিকে চোখ পড়ল বিনুর। যার ডান দিক দিয়ে রাস্তা চলে গিয়েছে। বাঁ দিকে এলেবেলো কয়েকটা টিলা। শাল আর দেবদারু। পড়ন্ত সূর্যের শেষ আলোর লম্বা লম্বা ছায়া পড়েছে। আলোছায়ার এক বিচিত্র বর্ণবাহার, শব্দহীন স্তব্ধ।

বিনু বলল, ওই ছায়ায়, উঁচুতে।

চড়াইয়ে যেতে চায় বিনু।

সাধন বলল, কী হবে শুধু শুধু গিয়ে। আবার নেমে যেতে হবে।

তারপরে আবার হয় তো উঁচুতে উঠতে হবে কিন্তু সে কথা বলল না বিনু! তার চোখে পড়ল, গাছের আর এক পাশ দিয়ে দূরে প্রকাণ্ড একটা বাড়ি। বলল, আজ ওই বাড়িটা অবধি যাব।

ওরা এগুতে লাগল। আশেপাশে আরও কয়েকটা বিক্ষিপ্ত বাড়ি দেখা যাচ্ছে। পাকাবাড়ি, বাগান, ইউক্যালিপটাস আর দেবদারু বিন্যাসের ফাঁকে ফাঁকে ছবির মত বাড়িগুলি বড়লোকেদের স্বাস্থ্যাবাস।

বিনু ভেবেছিল মাটি নরম। লাল মাটি রক্তের মত নরম নয়। বরং পাথরের কুচি আর পাথরের জন্যই লাল এবং শক্ত। প্রচুর আতাগাছের গায়ে চারদিকে, অপর্যাপ্ত ফল। আতা গাছে গাছে।

চড়াইয়ের ওপর উঠে চোখ দুটি যেন জুড়িয়ে গেল। লাল মাটি আর সবুজ গাছের একটি যুগপৎ বন্যা নেমে গিয়ে যেন ছড়িয়ে পড়েছে দিগন্তে। দূরে বরা আর খারাবারার রোদ আশ্চর্য লীলা করছে। সামনের উতরাইয়ের পরেই, দূরবীক্ষ চড়াইয়ের মুখে একটি গ্রাম। ধুলো ধুলো, পাশুটে রুক্ষ গ্রাম। আর ওই গ্রামটার মাথার ওপরে সেই প্রকাণ্ড বাড়িটা। অথচ একটু আগেই মনে হল, চড়াইটার ওপরেই যেন রয়েছে।

সাধন বলল, এটা বড্ড খাড়া। আমি ডান দিক দিয়ে ঘুরে নামছি।

সাধন গাছের ছায়ায় ডান দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু পকেটে তার লাভের মুঠি শক্ত করে ধরা আছে।

দেহের শক্তি ভুলে বিনু মাঠে নেমে গেল। খেয়াল করল না, নিলাজী-কাঁটা রাশি রাশি তার শাড়িতে লেপটে গেছে।

সুদীর্ঘ মাঠ, কিন্তু ঢালু। বিনু সামলাতে পারল না, নামতেই লাগল। নামতে নামতে, আরও নামতে, হঠাৎ জল। সরু নদী, ঝিরঝির করে বইছে। ওমা! সেই গরু চরানো মাঠটা সামনেই। কয়েকটা গাছ সেখানে। একটি ছোট মেয়ে, ঘোমটা দিয়েছে মাথায়। বালি দিয়ে মাজা পিতলের নাকছাবিটা চিকচিক করছে। ঘোষের পিঠে চেপে নদী পার হচ্ছে আর অবাক হয়ে দেখছে বিনুকে। বিনুর ঠোঁট চোখ মুখের রং দেখছে। ওর নিজের মুখে লাল ধুলোয় যেন হোলি খেলার আবীর ধাবামাখি। বিনু ওর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। যতক্ষণ দেখা গেল, পরস্পরকে দেখল ওরা। মেয়েটা অদৃশ্য হতেই ধুপ করে বসে পড়ল বিনু। এ জায়গাটা আর ছাড়তে ইচ্ছে করছে না। নিবিড় ছায়ার মাঝে মাঝে বঙ্কিম আলোর দুদু কলক এক এক জায়গায় উঁকি দিয়েছে। চলন্ত জলে চাপা কল-কল শব্দ। পাখিরা

ডাকছে কোথায় বসে। ঝিঁঝির ডাকও শোনা যায়। শান্ত গম্ভীর আর বিচিত্র প্রসন্নতা। তা ছাড়া বিনু এখনও যেন হাঁপাচ্ছে। কিন্তু বসতে না বসতেই বড় নিরুম আর ফাঁকা মনে হতে লাগল। ভয় ভয় করছে মনটা। হাতের বাঁদার দিকে দেখল সে।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই নদীর ওপরে উঁচু টিবির ওপারে আলোক এসে দাঁড়াল। ঘুরে রাস্তার দিকে যেতে গিয়ে থেমে গেল বিনুকে দেখে। চেঁচিয়ে বলল, আপনি এখানে একলা যে মিস্ বোস। আপনার দাদা কোথায়? বুকে হাত চেপে সেকে বিনুর। একেবারে কাশফুলের আড়ালে। কী দারুণ চমকে গেছে। চট করে কথাই বেরুল না মুখ দিয়ে। আর কী মূর্তি হয়েছে আলোকের। সেই সকাল বেলার ধুলো মাখা জামা প্যান্ট কোন্ড নিয়ে পরেছে। এই লাল ধুলোর রং রীতিমত পাকা। আর উঠেই না হয়তো।

বিনু কোন রকমে বলল, আসছে।

আলোক বলল, আপনার বোধ হয় শান্তি নষ্ট করলাম।

বিনু বলে উঠল, না। বলেই আবার ভিতরে ভিতরে আড়ষ্ট হয়ে উঠল লজ্জায়। তাড়াতাড়ি বলল, জায়গাটা এত নিরুম বুঝতে পারি নি। আলোক হাত তুলে গাছের দিকে দেখতে দেখতে বলল, এখানে নির্জনতাই তাই। কিন্তু আপনি খুব ভয় পেয়েছেন মনে হচ্ছে। এরকম পরিবেশে এতদিনের রাত্রি পরিচিত একটি লোককে দেখে ভয় পাওয়া উচিত ছিল বিনুর। কিন্তু সে বলল, এখন আর পাচ্ছি না। বলে আলোকের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই, জলে দৃষ্টি নামিয়ে নিল বিনু। আলোক বলল, তাহলে আপনার কাছে ওপারে যাই। সে জলের দিকে তাকাল।

নদী নয়, অতি সংকীর্ণ একটি জলস্রোতের রেখাই বলা যায়। তবে যতটুকু আশ্বিনের কাল। জলের ঢল কিছুদিন আগেই করেছে। দু-পাশের মাটি এখনও অনেকখানি ভিজে আছে।

আলোক বলল, লাফ দিয়ে পার হই মিস্ বোস। একটা লং-জাম্প হয়ে যাক।

বিনু তাড়াতাড়ি বলল, কী দরকার। আসতে হয় জুতো খুলেই আসুন না। হাঁটু জল তো।

ততক্ষণে টিবি থেকে গড়িয়ে আলোক লাফ দিয়ে এপারে এসেছে।

ভয় অমূলক হলেও ভয়, তাতে বিরক্তি লাগে। বলবে না বলবে না করেও বিনু বলে ফেলল, ইস। আপনি ভীষণ ছেলেমানুষ।

একটু যেন লজ্জা পেয়ে গেল আলোক। বিনু যে অল্প বয়সের মেয়ে নয়, এটা তার ভঙ্গিতেই ফুটে উঠেছে। তবু বলল আলোক, কেন?

বিনুর সংকোচ লজ্জা কিছুই হচ্ছে না আর। সুতরাং বলেই ফেলল, সেই রকম দেখছি তো। আপনার একলা আসা উচিত নয়।

আলোক প্রায় চুপি চুপি বলল, কিন্তু একলা হবার জন্যেই পালিয়ে এসেছি মিস্ বোস।

—পালিয়ে এসেছেন?

একটা পাথর জলে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, হ্যাঁ।

ইতিমধ্যে সাধন এল। এসেই বসে পড়ে আগে আলোককে বলল, এই যে, এসে পড়েছেন দেখছি। হাত পা ভাঙে নি? না কি গাড়ি ঘোড়া দুই-ই খতম করে এসেছেন।

সাধনের পাশেই বসে পড়ে বলল আলোক। না কেউ খতম হয় নি। আবার পরশুদিন আসতে বলেছি আমরা আলোককে। সেদিন খরামারা অবধি যাব।

বিনুও বসেছে সাধনের পাশে। বলল, ছোড়দা, কথা বলো না, একটু জিরিয়ে নাও।

কিন্তু সাধনের মেজাজ বোধ হয় একটু খারাপই ছিল আলোককে দেখে। বিধ্বস্ত বকবক্ করে জ্বালাতন করবে। ছেলেটার ইচ্ছেটা কী? এসে পড়েছে এমনি, না পিছে পিছে ঘুরছে? দেখে মনে হচ্ছে, বিনুর পিছনে ঘোরবার ছেলে নয়। তবু বলা যায় না; রং চং মেখে বিনুকে খুব খারাপ দেখাচ্ছে না। এর ওপরে একটু ভালো খাওয়া আর বেড়ানো হলে অনাদির নিশ্চয় ভালো লাগবে।

কিন্তু ছোড়দির ভাবটাও ঠিক সুবিধের নয়। আলোককে দেখলেই যেন ও বেশী সুন্দরী হয়ে উঠেছে। কেন? মানুষে মানুষে দেখাদেখির মধ্যেও কোন্ সুর আছে নাকি।

বিনু কের সিনল আলোর কথার। না টেনে পারল কারণ সে নিজেকে সংযত করতে পারছে না। বলল, কী বলছিলেন? পালিয়ে এসেছেন বাড়ি থেকে?

সাধন বলল কে?

বিনু মুখ টিপে হেসে আলোককে দেখিয়ে দিল। কিন্তু এ হাসিটুকু শুধু সাধনকেই ছলনা করা।

সাধন বলল, সেটা অবিশ্যি আমাদের প্রথমেই বোঝা উচিত ছিল। কিন্তু এখন সুমতি হল কেন?

বেশ কথা বলে সাধন লেন্সের আড়ালে, নিরীহ কিন্তু বয়স্কের মত।

আলোক বলল নিলাজী-ভাটা চিবিয়ে, কী করব বলুন। ষোল বছর বয়স থেকে এ পর্যন্ত সব কথাই শুনে এসেছি, আর পারি নে। ষোল বছরের অ্যাপ্রেন্টিসশিপ থেকে অনেকখানি তো হয়েছে, আর কেন?

—কেন, কী হল?

—বিয়ে করতে বলে।

বিনুর বিস্ময়ের ও কৌতুকের অন্ত নেই। ছেলেটা বিয়ে করতে চায় না? সাধন বুড়ো মানুষের মত বলল, তা বাপ মায়ের যখন ইচ্ছে।

আলোক বলল, বাপ মা নাকি কোনকালে মরে গেছে।

এ আবার কেমন কথা। সাধন বলল, অনেকদিন মারা গেছেন বুঝি?

আলোক বলল, কী জানি, আমি কিছু জানি নে, আমার মনেও নেই। জ্ঞান হওয়া ইস্তক দেখেছি, কাকা প্রাইভেট কার্মের কেরানী, আর আমি একটা বাজে ছেলে।

—বাজে ছেলে?

—বাজেই তো। ভদ্রলোকের বাড়ির ছেলের মত আর হলাম কোথায়।

—কেন লেখাপড়া?

—কাকার ছেলেরা শিখেছে।

—আর আপনি?

আলোক বলল, লেখাপড়া আমার হয় নি, কারণ আমি তো খারাপ ছেলে। বলে অদ্ভুত একটু হাসল। বলল, যার মা বাপ নেই, এমন ছেলেকে ভালো হতে দেখেছেন কখনও? বিনু সাধনের এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা নেই। তারা চুপ করে রইল।

আলোক আবার বলল, বেঁচে আছি, সেটাই তো আশ্চর্য।

যার বাপ নেই, মা নেই, সেরকম বদমাশকে কেউ বাগ মানাতে পারে? আমি তো স্কুলে পালাবই, বাড়ি থেকে পালাবই, আমার কখনও কোথাও ঠাঁই তো হবেই না। আমার তো সবই খারাপ। আমি দেখতে খারাপ, আমার চলাকেরা খারাপ, আমার জন্য সকলের লজ্জা নেই। বলতে বলতে হেসে উঠল আলোক। সাধন যেন খানিকটা বিমূঢ় হয়ে পড়েছে। বিনু আড়ষ্ট গম্ভীর।

আলোক বলল, তার চেয়ে কাকার বাড়ি ছেড়ে আমি যদি অন্য কোন বাড়ির চাকর হতাম।...বলে আলোক দূরের দিকে তাকিয়ে নীচু গলায় বলল, আর সত্যি সাধনদা, আমার কেবলি পালাতে ইচ্ছে করত। দূরে, অনেক দূরে, লোক-চোখের বাইরে। স্কুলের মাস্টার-গুলোকে এত ঘেন্না করত, কেন না, ওরাই নাকি ঠিক বুঝত, আমার চোখগুলি বাঁদরের মত অস্থির, আমার মাথায় নিশ্চয়ই কোন বদমাশি খেলা করছে। তখন ওরা আমার মাথাটাকে পিটিয়ে শয়তানী ছাড়াতে চাইত, বলত, 'বাড়িতে কাকাকে জ্বালাবে, আর এখানে আমাদের জ্বালাবে, তা হবে না।' ঠিকই, ক্লাসে বসে আমি অস্থির হয়ে উঠতাম, আমার যেন কোথায় যেতে ইচ্ছে করত, আর কাকা কাকীমাকে ভীষণ ভয় করত আমার। এখনও ভয় করে। তবু আমি একেবারে পালাতে পারতাম না। ধরে নিয়ে আসত আমাকে, তারপরে কী করত, সেটা না বললেও বুঝতে পারেন। ...কিন্তু কোথায় যে আমি যেতে চেয়েছিলাম, কিসের জন্য যে আমি ছুটতে চাইলাম, আজও ঠিক করতে পারলাম না। তবু দেখুন, ওই কাকার চেষ্টাতেই আমি ষোল বছরে অ্যাপ্রেন্টিস হয়ে ঢুকেছিলাম, এখন আমি সিনিয়র গ্রেড টারবাইন অপারেটার! বড় বড় কেরানীদের থেকে বেশী আমার মাইনে। তবু টারবাইন অপারেটার। আমার খুড়তুতো ভাইয়েরা আপনাদেরই মত, ওই প্রফেসার ভদ্রলোকের মত। ভাই বলেও তারা আমার সঙ্গে খোলা মনে কথা বলতে পারে না। সেখানে আমি অপাংক্তেয়। তাই না হয় থাকলাম, তবু আমার সেই ছুটবার, পালাবার মন, সেটা কোনদিনই গেল না। মাঝে মাঝে সেটা বাড়ে কমে।

বলল, চাকরির দায়িত্ব, আর যেতে পরতে পাওয়ার দায়ে তেমন করে আর ছুটতে পারি নে। সাধনদা, আপনাদের বিরক্ত করছি।

সাধন শুনছিল ঠিকই, কিন্তু অবাক হয়ে ভাবছিল, এত কথা বলছে কেন, আর বলছেই বা কী করে?

বিনু ভাবছিল আর দেখছিল, ঠিক ওর চরিত্রের মতই ও কথা বলছে! হাত পা চোখ অস্থির নয় বটে, কিন্তু গলার স্বরে ওর ভিতরের অস্থিরতা খই-এর মত ফুটছে। আর সাধনের চেয়ে বিনুর বেশী মনে হচ্ছিল, আলোক একটা কী যেন বলছে। একটা কিছু যার একটি অর্থ আছে। আর বিনুর সারা জীবনের শেষ লড়াইয়ের দিনেও একটা নামহীন, যুক্তিহীন অস্পষ্ট অথচ তীব্র ব্যথা অত্যন্ত গভীরে বিঁধছে। তার ইচ্ছে করছে, আলোকের চোখ মুখ সে খুঁটিয়ে দেখবে। কিন্তু পারছে না।

সাধন বলল নিরীহ গলাতেই, না, বিরক্ত আর কিসের।

আলোক আবার একটা পাথর ছুঁড়ল জলে। বলল, জীবনের কথা আগাগোড়া ভাবলে সবাই অস্থির হয়ে ওঠে। শুনেছি, আমার বাবা মা অভাবে দুঃখে আর রোগে বিনা চিকিৎসায় মারা গিয়েছিলেন। সংসারে অনেক কিছু আছে, যার কোন প্রতীকার হয় না। কিন্তু তার থেকে অনেক বেশী ব্যাপার আছে, যার প্রতীকার আছে। এ কথা ভাবলে অস্থির হয়ে উঠি। তখনি মনে হয়, কোথাও আমার ছুটে যেতে ইচ্ছে করে। এসব পাগলামি মনে হচ্ছে তো আপনাদের?

বিনু বলে উঠল, না।

সাধন অবাক হয়ে বিনুর দিকে তাকায়। বিনুর মুখ তেমনি নীচু।

বরা, ধরাসায়র আকাশের রক্তের চাবড়ার মত মেঘ। ধরাসায়র পিঠ বেয়ে, বরার ছুঁচলো মুখ টপকে মেঘগুলি অদৃশ্য হচ্ছে আস্তে আস্তে। এই স্রোতস্বিনীর দুই কূলে ছায়া গাঢ় হয়ে আসছে।

সাধনের মনে হল, সব কথা বিনু আর আলোকের মধ্যে হচ্ছে। এবং এখন আলোক যেন আরও নীচু স্বরে আত্মগত ভাবে বলে চলেছে, কোথায় যে যেতে চেয়েছিলাম, একবার যেন টের পেয়েছিলাম সেটা। বাস একবার, আমার ছেলেবেলা থেকে খুঁজে-খুঁজে-মরা জায়গা। কিন্তু জলে মুখ বাড়ানো ঘোড়াটাকে তাড়া দিলে যেমন হয়, ঠিক তেমনি করে তাড়া খেয়ে ফিরে আসতে হয়েছে আমাকে।

আলোক হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। অনেকক্ষণ স্থির হয়ে বসেছিল ও। আর একটা পাথর তুলে নিয়ে স্রোতের দিকে লক্ষ্য করল।

বিনু বলে উঠল, কিন্তু বিয়ে কেন করবেন না, বললেন না তো?

আলোক পাথরটা হাতে রেখেই হেসে বলল, ও হ্যাঁ, এখন বিয়ের বাজারে নাকি আমার দর আছে, কারা বিয়ে দিতে চান। অচেনা কে একটি মেয়ে আসবে, আর তখনও যদি আমার পালাবার মনটা ছটফট করে, বিরক্ত হয়ে সেই মেয়েটার ঘাড়েই যত দোষ চাপাব, তারপরে হয়তো মারামারি করব। বাবা রে! আমার দরকার নেই। আমি সিনেমা ফার্টিলাইজারে একটা দরখাস্ত করেছি, পেলেই সেখানে পালিয়ে যাব। আর কলকাতায় নয়।

হাতের পাথরটা জলে ছুঁড়ে দিল সে।

বিনু অবাক হয়ে ভাবছিল, কোথায় যেতে চেয়েছিল আলোক। কী যেন একটা বলল আলোক কিন্তু ধরতে পারল না বিনু। জিজ্ঞেস করা তো যায়ই না।

সাধন বলল, সন্ধ্যে হল, ওঠা যাক।

উঠে পড়ল তিনজনেই।

রাস্তার ওপর পড়ে ভিন্ন পথ ধরল আলোক।

সাধন বলল, কোথায় চললেন?

আলোক বলল, এত তাড়াতাড়ি ফিরব না। শহরে ঘুরে আসি একটু।

বিনু একবার তাকিয়ে দেখল আলোককে। ফিরে বলল সাধনকে, কেমন যেন, না?

সাধন বলল, হ্যাঁ। অর্থহীন।

এরকম সংক্ষিপ্ত জবাব চায় নি বিনু। কথা বলতেই চেয়েছিল সে। কিন্তু সাধনের অনিচ্ছা টের পেয়ে চুপ করে গেল।

হ্যাঁ, তীব্র অনিচ্ছা সাধনের। সে অস্বস্তি বোধ করছে ছোড়দিকে দেখে। আলোকের বিষয় সে ছোড়দির সঙ্গে আর আলোচনা করতে চায় না।

অনেক রাত্রে যখন মন-খাওয়া ব্যাকপটার পায়ার আজ্ঞর হয়ে পড়েছিল বিনু, তার কোলা চোখ দুটি চকচকে ঘুমের মত ক্রীম-ভেজা মুখের ওপর ভাসছিল, তখন স্পষ্ট পায়ের শব্দে মনে হয়েছিল, ছেলেবেলা থেকে নিশি-পাওয়া আলোক কিরণ এতক্ষণে।

মনে লক্ষ-এর সবাই যে যার ঘরে আছে। একই রকম, খাওয়া, বিশ্রাম, বেড়ানো। প্রত্যহের পুনরাবর্তন। নতুন কিছু নেই।

তবু বিনুর মনে হয়, কোথায় কী সব পরিবর্তন যেন ঘটে চলেছে।

মল্লিকা এখন রোজ দুপুরে বিনুর কাছে চলে আসে। এসে যে বকবক করে, কথা বলে, তা নয়। সে এসে ডাকে। বিনু দরজা খুলে দেয়। বলে, এস। তার পরে, আজ কী রান্না হয়েছিল, কী খাওয়া হল, বিকেলে কোথায় বেড়াতে যাওয়া হবে, ইত্যাদি নানান রকম কথা। কিংবা কলকাতার কথা, নানান ঘটনা। স্কুল, দিদিমণি, পরীক্ষা, ছাত্রীদের ব্যবহার। এসব কথার ব্যাকখানে মল্লিকা যেমেটি হঠাৎ কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায়। বলে, আমার আর এখানে একটুও ভালো লাগছে না।

বিনু জিজ্ঞেস করে, কেন?

মল্লিকা বলে, কী জানি। কলকাতার বেশ অনেক বন্ধু, অনেক লোক। কলকাতার লেখা পড়াও করতে ইচ্ছে করে। এখানে কিছুই ভালো লাগে না। কেন বলুন তো?

বিনু বলে, কেন, এখানেই তো বেশ নিরিবিলি, শুধু বাবা মা ভাই রয়েছে।

মল্লিকা কী বলতে গিয়ে, চুপ করে বিনুর দিকে তাকিয়ে থাকে। বলা হয় না। বাইরের দিকে তাকিয়ে বলে না বিনুদি, নিরিবিলি ভালো নয়।

বিনু বুঝতে পারে না মল্লিকাকে। কখনও মনে হয়, মেয়েটি পাকা, কখনও মনে হয়, মেয়েটা কোন অপরাধ করে গোপন করে চলছে। আবার কখনও মনে হয়, ওর কী একটা অসুখ বিসুখ আছে, বলতে পারে না। সব সময়েই একটা চাপা কষ্ট ঘিরে ঘুরছে।

বিনু একটা বুঝতে পেরেছে, বাবা মাকে ওর ভালো লাগে না। যেন ওর বাবা মা নেই। ছেলেমানুষ নয়। একদিন বলছিল, একলা একলা পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে।

—কোথায়?

—কলকাতায়। নয় তো আর কোথাও।

—বাবা মাকে ছেড়ে যাওয়া যায় নাকি?

চুপ করে ছিল মল্লিকা। জবাব দেয় নি।

পিন্টু আরও অবাধ্য হয়ে উঠেছে মাঝে মাঝে তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। অধ্যাপকও সহজে ছেড়ে দেবার পাত্র নন। কিন্তু ঘরের মধ্যে, যতই দরজা বন্ধ করে প্রচার করুন, পিন্টুর চীৎকার ঠিকই শোনা যায়। তবু পিন্টু শাসন মেনে চলে না। সাঁওতাল পরগনার এই প্রকৃতির মতই ও অবাধ্য আর এলোমেলো হয়ে উঠছে।

বিনু কয়েকদিন গিয়েছে নলিনাক্ষর স্ত্রীর কাছে। ওর ভালো লাগে নি। ভিতরের আবহাওয়াটা যে ঠিক নয়। অধিকাংশ কাজই মল্লিকা করে। ওর মায়ের শরীর নাকি ভালো নয়। খালি শুয়েই আছেন। কথাবার্তা বিশ্রাম। যা-ও বা বলেন, তাও সব বিশ্রী উক্তি। যেন বলতে চান, জীবনে কিছুই পান নি। সুখ কী, তিনি জানেন না। যখন বলেন, তখন ভদ্রমহিলার চোখ দুটি যেন অঙ্গারের মত ধকধক করে। নিশ্বাস দ্রুত হয়ে ওঠে।

উনি শুধুই নিজের কথা বলেন। অথচ ওকে অসুখ মনে হয় না। যদিও ঘরের মধ্যে, বাইরের সেই তারুণ্যের ঝলক দেখা যায় না। অথচ বাইরে যখন বেরোন, তখন সাজ পোশাক হাস্য লাস্য সবই বদলে যায়। আর যেন চেনা যায় না। তখন ওকে খুব সুখী মনে হয়। মনে হয়, ওর অনেক সুখ।

অধ্যাপক কিন্তু নৈতিক বিচার বিশ্লেষণে সব সময়েই ব্যস্ত। এ বিষয়ে তাঁর সজাগ দৃষ্টি অতন্দ্র প্রহরীর মত। এ অঞ্চলে হাওয়া পরিবর্তনে যত বাঙালী পরিবার এসেছেন, সকলের নৈতিক সংবাদের হাঁড়ির খবর ওঁর কাছে খোলা। কিন্তু বিনুর প্রতি উনি একটু কেন যেন প্রীত। এবং তাই, বিনুর প্রতি উনি একটু বিরক্তও। কারণ উনি কথায় কথায় সাবধান করে থাকেন, 'দুর্জনের

ছলের অভাব নেই।' অর্থাৎ আলোকের।

অথচ আলোক ছাড়া, আর সকলের মধ্যেই যেন নানান মিথ্যে নানাভাবে জড়িয়ে আছে। বিনুর নিজেরও তো তাই। একটা মিথ্যের পথ ধরেই তো সে কলকাতা থেকে এখানে এসেছে। তবু যত মিথ্যে আর ছলনার দায় আলোকেরই!

মিথ্যের সঙ্গে মানিয়ে চলতে গিয়ে যখন ক্লান্তি আসে, তখনই তো সাধনের ঘর থেকে তার আলোকের ঘর দেখতে ইচ্ছে করে। তাই তো সে দুপুরে কান পেতে থাকে, কখন সেই গানের বার্তা এসে পৌঁছবে। এখন তাই মনে হয়। আলোকের ঘরের গান এখন বিনুর কাছে যেন বার্তা বয়েই আনে। এখন, ওর সেই চীৎকারগুলি শুনে মনে হয়, কাউকে শোনাবার জন্যে ও রবীন্দ্র সঙ্গীত করে না। ও-গুলি ওর স্বগত আর্তনাদ। এখন ও-সব শুনে যখন সাধন গালাগালি দিয়ে ওঠে—বিনু তখন বিষণ্ণ ও নীরব হয়ে যায়। বেড়াতে গিয়ে পথে দেখা হলে' বিনু দাঁড়িয়ে পড়ে। সাধন চলে যায় এগিয়ে।

আলোক অসাক দৃষ্টিতে তাকায় বিনুর চোখের দিকে। বিনু অন্যমনস্ক দৃষ্টি মেলে একবার দেখে তাড়াতাড়ি চোখ নামায়। দু-একটা কথা হয়। বিনুরা কোথায় গিয়েছিল বেড়াতে বেড়াতে আর আলোক কোথায় চলেছে, এমনিতর কথা। তারপরেই বিনু বলে, যাই।

আলোক বলে, আসুন।

এর মধ্যে কি কোন অপরাধ আছে?

কী জানি! অবিশ্যি, বিনুর মনে হয়, আলোকের সঙ্গে তার কী রকমের একটা জানাজানি যেন রয়েছে। বাক্যের উর্ধ্বে, কী রকমের একটা বোঝাবুঝি যেন আপনি আপনি গড়ে উঠেছে। এবং আবিষ্কার করেছে, আলোকের জন্যে ওর একটা অনুভূতি সঞ্চার হয়ে উঠেছে। যে-অনুভূতিটা ব্যথা ভরা। করুণায় জড়ানো। পরিবারের বাইরে, আর কারুর জন্যে ঠিক এরকম অনুভব করে নি বিনু।

বিনুর সারা জীবনে, কখনও এরকমটা ঘটে নি। খেতে বসলেও যে একটা লোকের কথা মনে পড়তেই হবে, এই বিস্ময়ে বিনু আপন মনে হেসেই ওঠে।

বিনুর তো মনেই পড়ে না, সে নিজেই তাকে দিয়েছিল কিনা আলোককে। কিন্তু আলোক তাদের উঠোনে এসে পেয়ারা গাছটার হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল একদিন। বিনু তাকে চা দিয়েছিল। আর একদিন আলোক একেবারে ঘরে। বিনু বুঝতেই পারে না, কে ডেকে এনেছিল ওকে। মুখ ফুটে তো কিছুই বলে নি বিনু। শুধু জানালা দিয়ে দেখা হয়েছিল। ছেলেবেলায় একটা রেকর্ড বাজানো হত বিনুদের বাড়িতে, 'চরণ ধরে বারণ করি, তেনো না আর আঁখির টানে'—ব্যাপারটা সে রকম হয়েছিল নাকি?

আলোক যে—সাধন তো রেগে তোতলা হয়ে, অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিল প্রায়।

মনে হয়, আলোক যদি একটু আর সকলের মত বুদ্ধিমান চালাক চতুর হত, তা হলে আপাতত খুশি হত বিনু। বিনুকে যদি ওর ভালোই লাগে, (কথাটা ভেবে বিনুর নিজেকেই কেমন যেন ন্যাকা ন্যাকা লাগে) তা হলে একটু আধটু মিথ্যে কথা বলতে পারা উচিত ছিল আলোকের। তা সে ভালো লাগা যেমনই হোক। মিথ্যে বললে, ওকে সবাই বুঝত, মানিয়ে নেওয়া যেত! তারপরেই এল আজকের এই অপরাহ্ণ।

ইতিমধ্যেই একটু ঠাণ্ডার আমেজ পড়েছে। রৌদ্র সহনীয় হয়ে উঠছে আস্তে আস্তে। বেলা তিনটের সময় সাধন বলল, চল বেরিয়ে পড়ি, আজ একটু দূরে কোথাও যাব।

বিনু প্রস্তুত হল। ওরা এসে যখন বাইরে দাঁড়াল, তখনও কারুর দুপুর কাটে নি। আলোকের রেকর্ড বাজানো শেষ হয়েছে। হয়তো উত্তরের পাঁচিল টপকে ধান ক্ষেত দিয়ে নেমে, বসে আছে গিয়ে গ্রামে। নয়তো, ভবতোষ মিস্তিরের ঘরে।

সাধন বলল, কোথায় যাওয়া যায়?

বিনু দূরের দিকে তাকিয়ে, সেই প্রথম দিনের দেখা ছবির মত বাড়িটা আঙুল দিয়ে দেখাল। বলল, চল আজ ও বাড়িটার কাছে যাই।

অনেকক্ষণ ধরে বাড়িটার কাছে হেঁটে আসতে আসতে, অনেক চড়াই উতরাই ভেঙে, দুজনেই হাঁপিয়ে উঠল। সাধন হয়ে উঠল বিরক্ত। বলল, বাড়িটা দেখবার কী আছে? তোর যত উদ্ভট খেয়াল।

বিনুর কিন্তু ভালোই লাগল। দরজা জানালা সব বন্ধ বিরাট প্রাসাদ। চারদিকে ঘিরে আছে আকাশ উঁচু ইউক্যালিপটাস। সামনের দিকে বাগান। ভারী লোহার গেটটা আর ভেজানো। মনে হয়, ভিতরে দেখাশোনা করার লোক আছে। বাগানের সামনের যেটুকু দেখা যায়, গোলাপ আর মরসুমী ফুলের উৎকট রং ছড়াছড়ি। তাতেও অনুমতি হয়, নিয়ত হাতের পরিচর্যা প্রতিদিনই হয়। আর এই উঁচু ভূমির ওপরে বাড়িটা যেন নিভীক দিগ্বিজয়ীর মত দাঁড়িয়ে রয়েছে। অনেক দূর অবধি দেখা যায়।

সাধন বলল, একলা থাকতে পারবে? তা হলে আমি একটু বেড়িয়ে আসি।

বিনু এখন আর সোনার অলঙ্কার পরে না। বলল, হ্যাঁ। আমি এখানেই একটু ঘুরি। তুই বেড়িয়ে আয়।

সাধন একবার দূরে মুন-লক-এর দিকে তাকাল। বোধ হয় নিশ্চিন্ত হতে চাইল, এদিকে আর আলোক আসবে না। আর নীচেই রয়েছে গ্রাম। লোকের কথা-বার্তার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। সন্ধ্যারও দেরি অনেক।

বিনু আবার বলল, ইচ্ছে হলে আমি একলাও চলে যেতে পারি এখান থেকে।

সাধন বলল, তার দরকার হবে না। আমি এসে পড়ব।

সাধন চলে গেল। বিনু আস্তে আস্তে গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ভিতরে মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। ঢুকতে ইচ্ছে করছে বিনুর। সাহস পেল না। কিন্তু অপরাধ কী? গেটটা তো খোলাই। দরজা ভেঙে চুরি করে তো ঢুকছে না বিনু। ফুলের চাতুরালি তাকে ব্যাকুল করে তুলল যেন। ইচ্ছে, বাগানের মাঝখানে গিয়ে সে লুটিয়ে পড়বে। আলসোছে শুয়ে পড়বে, ভাববে। আর প্রাণভরে গোলাপের গন্ধ শুঁকবে।

কেন, প্রাণের মধ্যে এত আবেগ মথিত হয়ে উঠছে কেন বিনুর। আগেও তো সে অনেক ফুল বাগান দেখেছে। তখন তো এরকম মনে হয় নি। এ দেশে এসে, এই এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে হঠাৎ এমন ফুলবাগানে লুটিয়ে পড়ে মেখামিশি করতে ইচ্ছে করছে কেন। যেন ফুলের মত ফুটে, গন্ধের বর্ণবাহারে সে ছড়িয়ে পড়বে। আর আলোকের ঘরে সেদিন যে-গানটা বাজছিল, সেই গানের তালে তালে সে দুলবে, 'আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে, চাও কী। হায় বুঝি তার খবর পেলে না।'

এ চঞ্চলতা কি এখন আর বিনুর সাজে। সে ষোড়শী নয়, অষ্টাদশী নয়। তখন এই অনুভূতিটা কোনদিন আসে নি। বাঙালী মেয়ের যে বয়সে সন্ধ্যা ঘনায়, এখন তার সেই আসন্ন অন্ধকার কাল। অনাদি তো আসছে ভোরের মালতীর খোঁজে। কিন্তু বিনুর যে সন্ধ্যার কুঁকলির পাপড়ি খুলছে।

এ কেমন করে ঘটল।

ভোরের মালতী সে সাজবে। সাজবে দেহে বেশে ভঙ্গিতে। কিন্তু তার সন্ধ্যাকলির রেণু অপ্রতিরোধ্য গুঞ্জু হয়ে উঠল। প্রাণের শিকড়ে শিকড়ে কোন রসের প্লাবনে সে বর্ণাঢ্য হল। কোথায় ছিল তার এই নিশীথ বেদনার গন্ধ।

গেটের লোহার দণ্ড দু-হাতে ধরে, শক্ত হয়ে দাঁড়াল বিনু। জীবনের একটাই করণীয়র শেষ কুলে এসে, এ আবিষ্কারটা বুকের মধ্যে ব্যথা ধরিয়ে দিচ্ছে। চোখের জল গলিয়ে দিতে চাইছে। তবু, সেই চোখের জলে একটা আনন্দের ছটা, অন্ধকারের হীরের মত ঝিকমিক করছে।

এইটুকুই পাওনা। এই আশ্চর্য ব্যথা আর আনন্দ। শেষ বেলায় সে আপনাকে না জানতে দিয়ে গোপনে ফুটেছে। একথা জানবে না কেউ। বয়সের চঞ্চলতা যায়। কোটার আবেগ যায় না। এই কথাটা স্বীকার করে সে যাবে ফুল বাগানে।

লোহার গেট ঠেলতে যেতেই কে যেন হেসে উঠল ভিতরে। যেন কোন মেয়ের গলা। বিনু থমকালো এক মুহূর্ত। তারপরে আবার পুরুষের অস্পষ্ট গলা। যেন মৌমাছির গুঞ্জন। হয় তো বাড়ির লোকেরাই কেউ আছে বাগানে। তাতে কী। বিনু বাগান দেখতে চায়।

সে আস্তে আস্তে গেট ঠেলে ঢুকল। প্রথমে ডাইনে, তারপরে বাঁয়ে তাকিয়ে, একেবারে স্থাণুর মত নিশ্চল হয়ে গেল বিনু। সেখানে যারা ছিল, তাদের অবস্থাও বিনুর মতই প্রায়।

বাঁ দিকের পাঁচিলের ধার ঘেঁষে, মস্ত বড় ইঁদারা,

ইঁদারার চার পাশে গোল করে বাঁধানো পরিচ্ছন্ন চত্বর। চত্বরে ছায়া পড়েছে ইউক্যালিপটাসের। সেই ছায়ায় বসে আছে সাঁওতাল মালী দম্পতি। তাদের মাঝখানে, অবিশ্বাস্য হলেও, বসে আছে অলোক। কারুর পা ছড়ানো, পা গুটনো, একটা এলোমেলো অলস গল্পের আসর। কুড়ি কোদাল, ঝুরপো, পাতা ছাটাই কাঁচি জলের ঝারি আর দড়ি বালতি ছড়ানো তাদের চার পাশে। উস্কখুস্ক চুল আর রাঙা ধুলো মাখা প্যান্ট শার্টে, অলোককে ওদের থেকে তফাত করা যায় না। মালীর উরুতে অবধি কাপড় গোটানো। মালিনীর আঁচল বিস্রস্ত, খোঁপায় অচেনা ফুল।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত অলোক উঠল। তীরের মত ছুটে এল বিনুর কাছে। বলল, আপনি এখানে?

বিনু ওর বিস্ময়ে-বদ্ধ নিশ্বাস যেন একটু একটু ফিরে পেল। ধরা টেনে তুলে বলল, আমিও তো তাই ভাবছি। এলেন কখন? টের পাওয়া যায় নি তো।

আলোক বলল, এলাম আপনারই জানালার নীচে দিয়ে। মনে হল ঘর খালি। আর নয় তো ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

বিনু ভাবল, কোনটাই নয়। ঘরে শুয়ে জেগেই ছিল বিনু। তার আচ্ছন্ন অচৈতন্যের মধ্যে আলোককে টের পায় নি।

অলোক বলল, আসুন। এ বাড়ি ফাঁকা। বাগানটা দেখবেন চলুন।

বাগানেই তো এসেছে বিনু। আলোক ডাক দেবার আগেই এসেছে। কিন্তু তার আগেই যে আলোক এসে এই বাগানের দখল নিয়ে বসে আছে, কে জানত। না কি সে-জন্যেই এ বাগানের হাতছানি দেখতে পেয়েছিল বিনু। তা হলে তো আলোককে ভাগ্যবান বলতে হয়।

কিন্তু শাশ্বতকে কি বলবে বিনু। যাকে আগলাবার ভার ছিল না, বিদায়ের ক্ষণ আটিতে হচ্ছিল, সেই ছোড়দিকে নিয়ে যে এখানে এসে এমন বিপদে পড়বে ভবে, নিশ্চয় ও ভাবে নি। এমন নিরাপদ দূরত্বে রেখে গিয়েও ওর নিস্তার নেই।

বিনু যা করবে কী। সে তো বুঝতে পারছে, তার ভাইয়ের টানে একটা উদ্যানের প্লাবন থরথর করছে। নিজের হাত দিয়ে তাকে সে থামাতে পারছে না।... এই প্রচুর মরসুমী ফুলের বর্ণের খেলা। তার চেয়ে যেন বেশী গোলাপ। গোলাপী, লাল, হলদে, সাদা—গোলাপ আর গোলাপ। বিনুর চোখে রঙ লেগে যাচ্ছে। ছড়িয়ে যাচ্ছে রক্তের কোষে কোষে, মস্তিষ্কের সীমায় সীমায়। আর রঙ ফুটে উঠছে গালে কপালে।

দুধ-ডিম-ক্রীম-স্নো-পাউডার আবহাওয়া কতখানি পরিবর্তন এনেছে কে জানে। কিন্তু সেই অবাঙালি ষোল বছরের মত ছেলের গালে, আজ একটি 'চিরদিনের মেয়ে'-এর লালিমা যেন মেখে পড়ছে দরদী। এ কি শুধু পরিবেশের মায়া। ভবানীপুরের সেই চার দেয়ালে ঘেরা, এ, পি, সি, পাউডারের লক্ষ লক্ষ পুরিয়া থেকে মুক্তি পেয়ে, এ অকস্মাৎ কোন্ দেশে পেল।

সারা দুপুর রোদে পুড়ে, সন্ধ্যাবেলায় কৃষ্ণকলির এ কি দুর্দৈব। না কি শুধু ফুলেরই গন্ধে। বিনুর হেসে উঠতে ইচ্ছে করল। কিন্তু মনে মনে বলল, দোহাই ভগবান, আমাকে কাঁদিও না।

সে দু পা এগিয়ে, আড়চোখে দেখল মালী দম্পতিকে। নীচু গলায় বলল, কিছু বলবে না তো।

আলোক বলল, ওরা যে আমার বন্ধু। ধানী আর ধানীর বউ।

বিনুর হাসি পেয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু হাসবার কি আছে। গম্ভীর ভাবেই বলল বিনু, আপনার তো সকলেই বন্ধু।

আলোক বলল, তা ঠিক। কিন্তু সকলে নয়।

বিনু একবার তাকাল আলোকের দিকে।

মালীকে বলল আলোক, বন্ধু কিছু ফুল চাই যে।

মালীটা বিনুর দিকে তাকিয়ে, মালিনীর সঙ্গে চোখোচোখি করে দুজনেই হাসল। নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে, হেসে মালি কাঁচি নিয়ে গোলাপ তুলতে গেল।

কিন্তু মালিনীর হাসি আর কিছুতেই বন্ধ হতে চায় না। জিজ্ঞেস করল, কে বটে?

আলোক যেন হকচকিয়ে উঠল। এক মুহূর্ত কথা খুঁজে পেল না। পরমুহূর্তে বলে উঠল, বন্ধু।

আলোক তাকাল বিনুর দিকে। বিনুর সারা মুখে ফুলের ছটা।

মালিনী বলল, দোস্তানী?

আলোক বলল, হাঁ।

মালিনী তাকাল মালীর দিকে। মালী তখন বস্তুর জন্য ফুল তুলছে

হঠাৎ ঘুলোর ওপর হাঁটু মুড়ে বসে আলোক দু-হাতে বিনুর শাড়ি টেনে ধরল। বলল, কত চোরকাঁটা লাগিয়েছেন। দাঁড়ান আমি একটা একটা করে সব তুলে দিচ্ছি।

প্রথমটা বিনু যেন পাথর হয়ে গেল। এবং চকিত মুহূর্তে পাথরের মূর্তির কোমর বন্ধনীতে একটি সিরসিরে চেতনা ফিরে এল। শাড়িতে টান পড়ে নাভিস্থলের কাছ থেকে একটা উর্ধ্বগতি স্রোত বেগে ছড়িয়ে পড়ল সারা দেহে।

ভয়ে যেন শিউরে উঠল বিনু। আঃ কী চায় আলোক।

কী চায় ছেলেটা। প্রায় কাঁদতে গিয়ে হেসে তাড়াতাড়ি বলল, না না থাক, আমি তুলে নেব।

আলোক বলল মুখ তুলে, আমি তুলে দিলে রাগ করবেন?

রাগ? বিনু রাগ জানে নাকি? কিন্তু দীর্ঘ দ্বিপ্রহরের পর এই অপরাহ্ণ বয়সের শাড়িতে বেঁধা নিলাজী কাঁটা তুলে দেয় নাকি কেউ?

হয়তো দেয়, দেবে, দিতেই নাকি আসছে অনাদি।

তবু হায় সন্ধ্যাকলির মনেও চুরির কী বেহায়াপনা। আলোকের কাছ থেকে এটুকু যেন শুধু চুরি করে নেওয়া। প্রায় অস্ফুটে বলল, রাগ করব কেন, কিন্তু আপনি তা বলে কাঁটা তুলবেন?

আলোক বলল, তুলিই না! এই গায়ে পড়া দেখেই লোকে পালায়, জানেন মিস্ বোস। কাকে কেন ভালো লাগে, তা বলতে পারব না। লাগলে তার কাছে ঘেঁসে থাকতে ইচ্ছে করে। আর ইচ্ছেটাকে চাপতে শিখলাম না বলে কপাল থেকে দুঃখু ঘুচলনা কোনদিন।

বিনু স্তব্ধ হয়ে গেছে। শাড়িতে টান পড়ে পড়ে, শাড়ির বন্ধনী-কেন্দ্র থেকে একটা সাপ যেন ক্রমেই জড়িয়ে ধরছে।

মালির বউটা হাসছে টিপে টিপে। বিনুর অস্বস্তি লাগছে। কিন্তু সে যেন ফুলেরই মত অসহায়, অবশ। পড়ে যাওয়ার ভয়েই যেন শক্ত হয়ে রইল। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। তারপর এক সময়ে যেন অনেক দূর থেকে বলল, চোরকাঁটা বলেন আপনারা? আমরা নিলাজী-কাঁটা বলি।

আলোক বলল, একই কথা। ওরা চোর, ওরা নির্লজ্জও বটে।

বিনুর মনে হল, সবটাই অবাস্তব। স্বপ্নের ঘোরে ঘটছে। সে একবার তাকাল আলোকের মাথার দিকে। চুপ করে থাকতে আরও অস্বস্তি হচ্ছে। তাই আবার বলল, আর এখানে, যেখানে যাই সেখানেই এই কাঁটা।

আলোক বলল, হ্যাঁ, নেই আঙুরের মত। কোটে ফুটুক, লাগে না যেন, তাই তুলে দিলাম।

কী ভেবে বলল কথাটা আলোক? আলোকের দিকে তাকাল বিনু। হঠাৎ কী রকম করুণ মনে হল মূর্তিটি। স্বপ্নের মধ্যে, ব্যথা নেবে এল একটা। মনে পড়ে গেল, কোথায় যেন যেতে চেয়েছিল আলোক। ও শুধু কোথাও যেতে চেয়েছিল। যেখানে কোনদিন যেতে পারে নি। শুধু একবার এসে গিয়েছিল, ঠাঁই পায় নি।

মালী একরাশ ডাল পাতা সহ গোলাপ তুলে এনে দিল আলোকের হাতে। আলোক সবসুদ্ধ তুলে দিল বিনুর হাতে। ইস্, কত ফুল, দু-হাত ঝুলোর না, বুক ভরে নিতে হল। বড় বড় ডাঁটিসুদ্ধ ফুল, কাঁটা অনেক। বিনুর বুকে, হাতে, গলায় কাঁটা বিঁধল। ছড়ে গেল। বেলা শেষের শেষ ঝলকের একটা সোনালী রেখা এসে পড়েছে ওর গায়ে।

আলোকের চোখের পলক পড়ল না এক মুহূর্ত।

বিনু তাড়াতাড়ি ফুলের সোহাগ তুলে মুখ আড়াল করার চেষ্টা করল।

আলোক বলল, এখন দেখছি, ফুল তুলতে গেলে গোলমাল সব মিশে গেছে।

হেসে উঠল সে। বিনু বলল, এবার কী করব।

—বসবেন?

—কোথায়?

—ওই পাথরের বেদীটায়?

বাগানের ডান দিকে শ্বেত পাথরের বেদী রয়েছে। চার দিকে তার ফুলের গাছ।

বিনু এগিয়ে গিয়ে বসল। ওর বুকের ওপর গোলাপের ঝাড়। ভবানীপুরের সেই ভিখারিনীকে যেন

হাজরাণী করে দিয়েছে। আলোক বসল ওর পায়ের কাছের ধাপে। বিনু চমকে বলল, কেন ওখানে কেন?

আলোক বলল, একই বেদী। কিন্তু ওপরের ধাপে জায়গা কম, বসলে ঠোকাঠুকি হবে।

বিনু বলল, তা হলে, আমিও নীচে বসি।

—না। এমনি করে একটু বসতে দিন।

এমন করে বললে না বলা যায় না। বিনু দেখল, আলোকের চোখেও যেন ফুলের প্রতিচ্ছায়া পড়েছে। সে সঙ্কুচিত চরে পা সরাবার চেষ্টা করল।

আলোক বলল, এমনি থাকুক না! আমার সম্মান যাবে না। আপনার পায়ে না হয় একটু অসুবিধা থাকবে।

বিনুর মুখে কথা ফুটল না।

হঠাৎ মালী বলল, ই বাবু, আমরা বাইরের কাজে যেইছি। শিকল টেনে দিয়ে যেইছি, তুরা বস।

আলোক বলল, আচ্ছা।

মালিনীটা হেসে বলে গেল, রাতভর থাকবি তো ঘরামারায় ভেগে যাস।

অর্থাৎ সাঁওতাল যুবক যুবতীরা যেখানে ভেগে গেলে সামাজিক আইনের বাইরে চলে যায়।

বিনু মাথা নীচু করে রইল। আলোক হাসল। ওরা চলে গেল। আর ফুলেরা সব সজাগ হয়ে, যেন চারদিক থেকে ওদের দুজনের দিকে ফিরে তাকাল!

বিনু বলল, আচ্ছা, একটা কথা—।

কী?

বিনু দ্বিধা করল একবার। কিন্তু সাঁওতাল পরগনার সন্ধ্যাকালের রেণু উদ্যত। উচিত অনুচিতের বুদ্ধি দিয়ে তাকে দমন করা যায় না। বলল, সেই প্রথম দিন, নদীর ধারে কী যেন বলেছিলেন, বুঝতে পারি নি।

আলোক যেন হঠাৎ চমকে তাকাল বিনুর দিকে। তারপরে মুখ নীচু করে বলল, সত্যি, সেদিন যে কী হয়েছিল, হুড়মুড় করে আমার মুখ দিয়ে সব বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু তাতে আমি লজ্জা পাই নি।

—আজ পাচ্ছেন?

—না বরং বিশ্বাস করতে পারছি নে, সে কথা বলবার এমন একটা দিন আসবে।

বিনুর চোখের দিকে তাকাল আলোক। বিনু চুপি চুপি বলল, আমার শুনতে ইচ্ছে করছে। আলোক বলল, কিন্তু সেদিন যা বলেছিলাম, সেই তো আমার একমাত্র কথা বিনু বোস।

বিনু বোস! আর শুনতে ইচ্ছে করে না বিনুর। বলল, আমার দাদু নাম রেখেছিলেন বনশ্রী। বাবা রেখেছিলেন বনানী। সবাই বিনু বলে ডাকে।

আলোকের মুখ বিনুর হাতির কাছে প্রায়। সে অস্ফুটে উচ্চারণ করল, বিনু।

বিনু বলল, কোথায় যেন যেতে চেয়েছিলেন আপনি।

আলোক বলল, চেয়েছিলাম। কী ভাবে বোঝাব সেটা জানি নে। যখন বাসুদে মার খেয়ে আর বইতে পারে না, যখন আর যুঝতে পারে না, তখন যেখানে যেতে চায়, সেখানে···কী রকম জানেন। সেই এক জাতের পাখি আর এক জাতের পাখির বাসায় ডিম পেড়ে যায়। তারপরে বাচ্চা ফোটে। তখন বাচ্চাটার যে রকম অবস্থা হয়, জীবনটাকে সেই রকম দেখলাম যেন। ছেলেবেলা থেকেই দেখলাম, ভিন্ জাতের পাখির বাচ্চাটাকে নিয়ে কী ভয়ংকর চেঁচামেচি। এ জাতের পাখিরা রেগে ক্ষেপে গিয়ে দেখল, তারা ঠকেছে, প্রবঞ্চিত হয়েছে। তখন দল বেঁধে সব ঘিরে ধরল ছোট্ট ছানাটাকে। ঠোঁট দিয়ে খুঁচিয়ে তুলে নিয়ে এল বাসার বাইরে। তারপরে হাঁক-ডাক আর দে মার।

বলতে বলতে হঠাৎ যেন আটকে গেল আলোকের গলা। ওর সারা মুখে উত্তেজনা। সাঁওতাল পরগনার দীর্ঘদিনের রোদে পোড়া তামাটে আগুনের আঁচ লেগেছে যেন।

বিনুর যেন কোথায় একটা খোঁচা বিঁধেছে। নড়তে গেলে লাগবে। সে আড়ষ্ট হয়ে আলোককে দেখছে। দেখল, আলোকের চোখে দিশেহারা যন্ত্রণা।

আলোকের স্বর গেল চেপে। বলল যেন রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনায়, ছানাটার পাখার নেই শক্তি, উড়তেও শেখে নি ভালো করে। মার খেয়ে উড়তে যায়, ঝুপ করে পড়ে। পড়ে লুকোতে যায়। খুঁচিয়ে বার করে। ওরা না মেরে ছাড়বে না। এ না বেঁচে ছাড়বে না।

আলোক একটা শব্দ করে হেসে উঠল। বলল, পুনেছি নেচারের মধ্যে নাকি কী সব লুকনো গুণটুক্ আছে।

বাংলার বুকি প্রকৃতির খেলা বলে। কারণ ওই করেই নাকি পাখিটা বাঁচে। আর আমি যেন তেমনি করে বেঁচে আছি।···

শেষ দিকে ওর গলার স্বর একেবারে খাদে নেমে গেল। মাথাটা নীচু করে রইল। বিনু ঠোঁটে ঠোঁট টিপে রইল। মনে হল, খুললেই বুকেই ভিতর থেকে একটা শব্দ বেরিয়ে আসবে। তার পায়ের কাছে, মাথা নীচু প্রকাণ্ড পুরুষটার দিকে তার তাকাতে সাহস হল না। ফুলের কাঁটারাই বুকি তার বুকে বেঁধা। জীবনের সকাল দুপুর পার হয়ে, এ কোন্ কষ্ট সারা জীবনের সংস্কার ভাসিয়ে দিতে চাইছে। আঃ। হে ভগবান, বিনুর হাত দুটিকে তুমি শাসন কর। নইলে আলোকের মাথায় লুটিয়ে পড়বে।

কিন্তু বিনু স্থির গলাতেই জিজ্ঞেস করল তারপর··· কোথায় যেতে চেয়েছিলেন।

আলোক শান্ত করে উঠেছে। সহজ গলায় বলল, বাসায়।

বিনু তাকাল আলোকের চোখে। আলোকও। তারপরে আলোক দৃষ্টিটা নামিয়ে নিয়ে এল ওর ঠোঁটের কাছে, বিনুর প্রায় লাল শাড়ির ওপরে। বলল, সন্ধ্যাবেলায় বাসায়। পা ছেলে দেবার, মুখ গুঁজে দেবার শান্তির বাসায়। সব হার যাওয়ার চোট নিয়ে যেখানে কেঁদেও সুখ। যেখানে চেয়ে দেখবার রূপ কিছু নেই, পুরু কিরে এসে একটু মাথা পেতে দেওয়া যায়, সেই বাসায়।

আলোক তাকাল। বিনু দেখল বড়ো ক্ষত-বিক্ষত পাখি একটা লুটিয়ে রয়েছে তার পায়ের কাছে। তবু তার চোখে উদ্‌গ্রীব জিজ্ঞাসা।

আলোক চোখ তুলে রেখেই বলল, বিনু, সেই বাসাটা ইঁট কাঠের নয়, বুঝতে পারছ নিশ্চয়। সেখানে আলো ঝলমলিয়ে ওঠে বলেও মনে হয় না। সেই বাসাটা যেন একটা আত্মা, যার ভিত-এর শক্তি স্নেহের ওপর দাঁড়িয়ে, একটু ভালবাসা, প্রীতি...আর হয়তো সেই বাসাটা দুঃখী।

ফুলসুদ্ধ বিনুর হাত নেমে এল নীচে। ফুল স্পর্শ করল আলোকের মুখ। বিনু বলল, একদিন তো তার খোঁজ পেয়েছিলেন।

আলোক বলল, পেয়েছিলাম।

—শুনি?

অথচ শুনতে বিনুর ভয় লাগছে। বুক কাঁপছে।

আলোক ওর স্বভাবের মতই সহজ ভাবে বলল, আমারই এক দূর সম্পর্কের বিধবা আত্মীয়া তিনি। আমারই সমবয়সী ছিলেন প্রায়। থাকতেন টালায়। বিয়ের তিন বছর পরে স্বামী মারা গিয়েছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর, একটি মৃত সন্তানও প্রসব করেছিলেন। তাঁর বাপ মা ছিলেন গরীব। তাই বাপের বাড়ি আর কোন-দিন হাওয়া হয়নি! যেখানে একদিন ছিলেন ছেলের বউ, সেই বাড়িতেই হয়েছিলেন পেটভাতা-র ঝি। তা ছাড়া তিনি যে ছিলেন বাড়ির পড়ে পাওয়া ষোল আনা, বয়সে যুবতী, জানেন তো, বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা বিধবা যুবতী বউদিকে বিয়ে করে না, কিন্তু সেবায় ভাগের অঙ্ক নিয়ে তুষ্ট হতে পারে না, হিংসে করে মরে! আসল লোকটার নির্জীতন আর অপমান বাড়ে।··· সেই আত্মীয়ের বাড়ি যেতাম প্রায়ই। পরে বুঝলাম, আমি ওঁর কাছেই যাই। তারপরে টের পেলাম, আমি ওঁর কাছে না গিয়ে আর পারি নে। মনে হয়েছিল, আমার সেই বাসাটার খোঁজ পেয়েছি। আমাকে দেখে উনি দুঃখীর চোখে চেয়ে থাকতেন। আমাকে ডেকে, আমার কথা শুনতেন। বলতেন, একটু শান্ত হও।··· হয়তো ওঁর রূপ ছিল। ভালো করে সেটা কোনদিন দেখা হয় নি। কিন্তু—বিনু রাগ করছ না তো?

রাগ? না না! তবে কেন যেন সেই বিধবাকে কল্পনা করে মনটা বিমুখ হচ্ছে, আর শ্বাসরুদ্ধ করে শুনতে হচ্ছে! বুকের মধ্যে বড় চিনচিনিয়ে উঠছে। শুনতে যেন ইচ্ছে করছে না। তবু শোনার জন্য সমস্ত ইন্দ্রিয় উন্মুখ, উদ্‌গ্রীব। বলল, না। বলুন।

—কিন্তু যেদিন উনি কাছে নিয়ে, আদর করে বললেন, 'তোমার জন্য আমি আছি আলোক', সেইদিন আমি ওঁর পায়ে মুখ দিয়েছি। এমন করে ওঁকে আমার বুকে টেনেছি, কষ্টে-উনি কেঁদে ফেলে আমাকে শান্ত করেছেন। ব্যস্, আর আমাকে পায় কে? আমি আলোক, আলোক ব্যানার্জি, দৃষ্টিছাড়া নই, আর দশজনের মতই আমারও ঠাঁই আছে, ঠাঁই আছে। ওঁর নাম ছিল বন্দনা। পাছে বন্দনা অন্য কিছু ভাবে, তাই আগেই আমরা ম্যারেজ রেজেস্ট্রির আয়োজন করলাম। কিন্তু লক্ষ করি নি, বিমুখ

পক্ষের আয়োজনও তখন সম্পূর্ণ। মুখ ফুটে কিছু বলবার আগেই, বন্দনাকে সরিয়ে দিয়েছে। শুনেছি, প্রথমে মাথা মুড়িয়ে বৃন্দাবনে পাঠিয়েছিল। পরে সেখানেই তার আত্মার সদ্গতি হয়েছে। ঢোকবার আগেই বাসা ভাঙল। আর আত্মীয়রা আমার দিকে তাদের হাতে আঁকা একটা বিজ্ঞাপন টাঙিয়ে দিলে। ওদিকে যেয়ো না, ওদিকে পাপ।

আলোক চুপ করল।

শুনতে শুনতে বিনুর বুকে যেন এক অদৃশ্য নখের নিষ্ঠুর আঁচড় লাগছিল। জ্বালা ধরছিল। তারপরে। আলোকের দিকে তাকিয়ে একটা ব্যথা তাকে ব্যাকুল করে তুলল। সে যেন নিজেকে বলল, এ কি করছে বিনু। জীবনের এই প্রান্তে এসে, তার যে সব হিসেবের অঙ্কে বাঁধা। সে কেন এত বেহিসেবী হচ্ছে। অনেক অঙ্কের পর, 'শেষরাত্রের' মিলনাত্মক দৃশ্যের সিনটা উঠতে যাচ্ছে তার। উইংস-এর আর একদিকে শেষ অঙ্কের নায়ক অনাদি প্রবেশোদ্যতে। বিনু!···বিনু···। নিজেকেই ডাক দিল বিনু। তবু বিনুর হাত এসে পড়ল আলোকের বুক বাঁধার। ফুল দুটিয়ে গেল কোলে। আনত চোখের সামনে সব কাঁপসা হয়ে উঠল। অস্ফুট গলায় বললে, শুনতে চেয়েছি বলে আমাকেই কেন বললে? কেন বললে?

আলোকের গলা গভীর খাদে নেমে গেল। বলল, তোমাকে দেখে বন্দনার কথা মনে হল। যেন সারা জীবনটা পার হয়ে এসেছ কোন কারণ খুঁজে না পেয়ে। কী একটা অপমানে গুটিয়ে রেখেছ নিজেকে। প্রথম দিনেই মনে হয়েছিল। তাই হুড়মুড় করে একদিন কথা বলতে শুরু করেছিলাম।

বিনু বলল, কিন্তু আলোক, আমি বন্দনার থেকেও পরাধীন।

আলোক বলল, সেটা অনুমান করেছি। তোমার সেই পরাধীনতা আমি কেড়ে নেব না।

—আরও অনেক কথা আলোক, সে সব তোমাকে বলতে পারব না।

—বলো না। তুমি যে শুনতে চেয়েছিলে, এই খুশিটা নিয়েই কদিন ক্ষ্যাপা হয়ে থাকব।

বিনুর মনে হল, বেদীর আর এক ধাপ নেমে, দুটিয়ে পড়ে সে তার সব কথা উজাড় করে দেয়। কিন্তু বন্দনার কথা বলেই যেন আলোক তার বুকের চার পাশে পাঁচিল তুলে দিয়েছে। সাবধান করে দিয়েছে। শুধু একটি কথাই প্রায় কান্নার বেগে বেরিয়ে এল, আলোক, এমন আর কখনও হয় নি আমার।

আলোক বলল, তোমাকে কষ্ট দিয়েছি। ক্ষমা করো।

—আর আমাকে?

—তোমাকে ক্ষমা করবার কিছুই নেই। বিনু, আজ হয় তো এক গাদা নালিশ আর অভিযোগই তোমার কাছে। কিন্তু আমি সকলের থেকে সবচেয়ে সুখী, এটা ভাবতে পারি নে। এমন কি আমার কাকার থেকে, আমার ভাইবোনের থেকেও নয়।

—তুমি সাধনী।

—আমি টারবাইন অপারেটার বিনু। পঁচিশ তিরিশ টন ওজনের সেই মেশিনটার মত, যে মিনিটে হাজার তিনেক বার পাক খেয়ে যায়। এটার সঙ্গে আজ আমার আত্মারও একটা মিল হয়ে গেছে যেন। এটা যে শুধু আমার, তা বোধ হয় নয়। সবাই পাক খাচ্ছি, স্থির হতে পারছি নে। কিন্তু আমি তো শুধু দেহ নই। তাই···চুপ করল হঠাৎ। মাথার ওপর থেকে বিনুর হাতটা হাতে তুলে নিল আলোক। বলল, সারাদিন ছুটেও সবাই সন্ধ্যায় বাসাটাকে চিরদিন খুঁজবে। তুমি, আমি···। বিনু আমি জানব, আর একটা বাসা আমি পেয়েছিলাম, কিন্তু তার চাবিকাঠি ছিল এ যুগের ভণ্ড প্যাচোয়ার হিসেবী এক বুড়োর কাছে।

—একটু বুঝিয়ে বল আলোক।

—বন্দনার থেকেও তুমি যার কাছে পরাধীন বলে বলেছ। সত্যের কাছে তো মানুষ পরাধীন হয় না, মিথ্যের কাছেই হয়। তুমি না বললে তোমার সেই পরাধীনতা আমি কাড়তে পারি নে।

বিনু তার আর একটি হাত বাড়িয়ে নিয়ে এল আলোকের কপালে।

ইতিমধ্যে সূর্য অস্ত গিয়েছে কখন। তার শেষ রক্তাভাস অন্ধকারের ছোঁয়া লেগেছে। বাতাস নেই একটুও। হেমন্ত সন্ধ্যার কোন শব্দ নেই, দোলন নেই। মৌন স্তব্ধ। পাখিরাও তেমন কলরব মুখর নয়। শুধু

পরিবর্তনের সঙ্গে ওদের একটা চুক্তি আছে।

ইদানীং ঠাণ্ডার আমেজ পড়েছে। পাতা ঝড়ছে ইউক্যালিপটাসের, তাদের গায়ে গায়ে সুঠাম শক্ত দেহের কোথাও কোথাও খোসলা বল্কলাবার ফাটল ধরেছে। দেবদারু পাম, বিশাল বনস্পতিরা সবাই যেন আকাশ পুজোয় মৌন মগ্ন। ফুলেরা এখন বিরল চোখে চুপচাপ তাকিয়ে আছে।

বিনু বলল, তুই আবার তেমনি ছুটবি।

—আমার নয় বিনু। ছোটটা জন্ম থেকে শুরু করেছিল। সকলেরই তাই। ওটা মরণ পর্যন্ত চলবে। লক্ষ্য করে দেখ, তোমাদের অধ্যাপক পরিবারটা পর্যন্ত আর এক ভাবে ছুটছে। সকলেই। আসলে সবাই—

কথা শেষ হল না। হঠাৎ গেটের কাছ থেকে শোনা গেল, ওরে এই যে, কী নাম যেন তোমার, শমন না রমন?

বিনু আলোক দুজনেই অবাক হয়ে দেখল, লোহার গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন ভবতোষ মিত্তির। কিন্তু তিনি এদিকে তাকিয়ে নেই। রাস্তার দিকে ফিরে যেন কাকে ডাকছেন।

রাস্তার দিক থেকেই জবাব এল, আজ্ঞে আমার নাম সাধন।

ভবতোষ বললেন, ও হাঁ সাধন। তোমার বোনকে খুঁজছিলে সে এই বাগানেই আছে। ওরা দুজনেই আছে এখানে।

আলোক আর বিনু পরস্পর তাকাল। বিনুর চোখে লজ্জা ও সঙ্কোচের ছায়া। সে তাড়াতাড়ি আলোকের কপাল থেকে হাত সরিয়ে নিল। হাত থেকে হাত টেনে নিল। আলোকের মুখে কিন্তু অনির্বচনীয় হাসি। সে বলল, ভয় পেও না। মিত্তির সাহেবকে খারাপ ভেব না।

বিনু উঠে দাঁড়াল। আলোক একটি একটি করে কুড়িয়ে নিল ফুল। তুলে দিল বিনুর হাতে। ভবতোষ বাবু তখন গেটে জড়ানো শিকলটা খুলছেন। সাধন এসে দাঁড়িয়েছে ওঁর পাশে।

বিনু বলল, সবটাই বড় আশ্চর্য লাগছে।

আলোক বলল, আমার কাছে সবটাই আবিষ্কারের আনন্দ।

বিনু পায়ে পায়ে গেটের দিকে এগিয়ে গেল। সাধন এগিয়ে এল। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, তার সারা মুখে উৎকণ্ঠা। উৎকণ্ঠার ফ্যাকাশে ছবি উঠেছে। ঘাম দেখা দিয়েছে বিন্দু বিন্দু। কিন্তু নিরীহ ভাবেই বলল, এই যাদু, তুই এখানে। আমি ভাবলাম, আমার আসতে দেরি দেখে বুঝি আবার পথেই গিয়েছিস। আমি আবার ঘুরে এলাম।

বিনু বলল, কোথাও যাই নি। এই বাগানেই বসেছিলাম। মালী ফুল দিলে। বাগানে বসে ওঁর সঙ্গে গল্প করছিলাম।

আলোকের দিকে তাকাল না সাধন। বলল, পাঁচিল ঘেরা বাগান, বাইরে থেকে টের পাওয়া যায় না।

ভবতোষ বললেন পাওয়া যাবে কী করে। ওরা যে বেদীটার ওপরে গিয়ে বসেছিল। ওটা হয় তো এ বাড়ির কর্তা তাঁর গিন্নিকে নিয়ে বসবার জন্যেই একটু কোণ ঘেঁষে তৈরী করেছিলেন।

ভ্রূকুটি গম্ভীর মুখে বললেন ভবতোষ। বিনু বিরক্তিতে ও লজ্জায় লাল হয়ে উঠল।

আলোক হেসে বলল, আর বসবার তেমন জায়গা ছিল না।

ভবতোষ বললেন, বসার দোষ দেখছি নে আমি। এ বেচারীর অন্তর্ধানের কথা বলছি। দুশ্চিন্তা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এর সঙ্গে আমিও ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম।

সাধন বলল, চল এবার যাওয়া যাক।

ভবতোষের দিকে তাকিয়ে বলল, যাচ্ছি।

—হাঁ এস।

বিনু তাকাল আলোকের দিকে। ছায়া তখন গাঢ় হয়ে এসেছে। আলোকের মুখের হাসিটা যেন ওর সেই টারবাইন জেনারেটরের আবর্তে সৃষ্টি বিদ্যুতের মত চিকচিকিয়ে উঠল গাঢ় ছায়ায়। আর বিনুর মুখ যেন প্রথম সন্ধ্যা তারার মত বিষণ্ণ, কিন্তু স্নিগ্ধ। একবার বোধ হয় তার ঠোঁট কাঁপল! তারপর মুখ ফিরিয়ে সাধনকে অনুসরণ করল।

অবশ্য স্তব্ধতা ঘিরে এল স্বাভাবিক ভাবার ভয় করে।

ভবতোষ তাঁর মোটা ভ্রূর ভিতর থেকে আলোককে লক্ষ্য করছিলেন। আলোক আস্তে আস্তে লোহার গেটটা বন্ধ করল। লোহার কব্জা গুঁড়িয়ে উঠল। শিকলটা

ছড়িয়ে দিল গরাদের সঙ্গে।

—এবার ?

ভবতোষ মিত্রের রোটা গলার কথাটা শোনাল যেন কোন অশরীরী আত্মার স্বরের মত।

আলোক বলল, ভাবছি।

ভবতোষ বললেন, ঘোড়া ছোটাতে যাবে, না নিজেই ছুটবে ?

আলোক হাসবার চেষ্টা করে বলল, এখন একেবারে ছুটতে ইচ্ছে করছে, না।

ভবতোষ বললেন, এখন বোধ হয় একটু চুপচাপ নিরুম হয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে না ?

আলোক একটু বিস্মিত হওয়ার মত হেসে বলল, হ্যাঁ।

—তাই ভাবছিলুম !

আলোক অন্ধকারে ভবতোষবাবুর মুখ দেখবার চেষ্টা করল।

ভবতোষ আবার বললেন, শক্ খেলেই মানুষ অবশ হয়ে পড়ে। আর নেগেটিভ আর পজেটিভ অয়্যার যখন জড়িয়ে যায়, তখন শক্ লাগেই।

আলোক দূরের দিকে তাকিয়ে ছিল। সে খুব ছটফট করছে না এখন আর। বলল, কিন্তু আলোও জ্বলে। যখন নেগেটিভ পজেটিভ যখন মিলে যায়।

আলোক কথাটা শেষ না করে নীরব হয়ে গেল।

ভবতোষ ভ্রূকুটি তীক্ষ্ণ চোখে আলোককে দেখতে চেষ্টা করলেন, হুঁ।

তারপরে বললেন, একটু হাঁটা যাক।

—সেই ছোট ঝরণাটার কাছে যাবেন ?

ভবতোষ ঝরণার পথে হাঁটতে হাঁটতেই বললেন, ওদিকটা গাঢ় অন্ধকার।

—আপনার অসুবিধে হলে—

—হবে না।

দুজনের দেহই ভারী। কাঁকর ভরা শক্ত পাথুরে রাস্তায়, দুজনেরই জুতোর শব্দ হতে লাগল। চারিদিকের নৈঃশব্দের মধ্যে, দুই ঘোড়া জুতোর ঝমঝম শব্দ, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বিজয়ী সৈনিকের ক্লান্ত পদক্ষেপে বাজতে লাগল।

অনেকক্ষণ পর ভবতোষ বললেন, আমার একবার সন্দেহ হয়েছিল, তোমরা হয় তো বাগানের ভেতরে আছ।

আলোক বলল, হাঁ, কিন্তু আমরা লুকিয়ে বসেছিলুম না।

—তা জানি। আর তুমি বলেই আমার বিশ্বাস করতে ও অসুবিধে হয় না।

অন্ধকারে কেউ কারুর মুখ দেখতে পাচ্ছে না। ভবতোষ একটু থেমে বললেন, ওই মেয়েটির লাল্, টেরিবল্ নার্ভাস টাইপ অব ইংম্যান, খুব চাপা আর অপরাধী মনোভাবের না হলে মানুষ ওরকম হতে পারে বলে আমার মনে হয় না। আতঙ্কে প্রায় কেঁদে ফেলার যোগাড় করছিল, যখন ওর বোনকে খুঁজে পাচ্ছিল না। কারণ যাদী কাপেরের সঙ্গে পথে দেখা হওয়ার যখন শুনল, ও বোন লজ্-এ ফিরে যায় নি বা ওদিকে যেতেও দেখে নি, তখন আমি দেখলুম, ছেলেটি যেন শিউরে উঠল। তারপরেই ও কাপেরকে জিজ্ঞাসা করল, তোমাকে দেখতে পেয়েছে কি না। কাপের জানাল, না। তখন ওর অবস্থা খুব খারাপ। আমাকে তড়বড় করে অনেক কথা বলে ফেলল।...ওরা কেন এসেছে এখানে, আর কারা আসবে ইত্যাদি।

ভবতোষ থামলেন। পথটা ক্রমেই উঁচুতে উঠছে। আলোক চুপচাপ। দুজনের পায়ের শব্দ বাজতে লাগল।

ভবতোষ জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কোন কৌতূহল নেই জানবার ?

—কিসের ?

—ওরা কেন এসেছে, কারা আসবে ?

আলোকের কয়েক মুহূর্ত দেরি হচ্ছিল জবাব দিতে। ভবতোষ হঠাৎ বলে উঠলেন, ও হো, হ্যাঁ, কিছু মনে করো না। আমার বুদ্ধি শুদ্ধি সব লোপ পেয়ে গেছে। তুমি নিশ্চয় আমার থেকে অনেক বেশী জান। মেয়েটির সঙ্গে যখন প্রায়ই তোমার এত কথা হয়—।

আলোক বলল, না। আমি কিছুই জানি নে, ওরা কেন এসেছে আর কারা আসবে।

—উঁ ?

ছোট জিজ্ঞাসু শব্দে একটা সন্দেহ ফুটল ভবতোষের।

আলোকের গলা শোনা গেল, বিশ্বাস করতে পারেন।

—করছি। কারণ, মিথ্যে কথা বলার ধার ধারো না বলেই তো মনে হয় তোমাকে দেখে। তবে...তোমার

সঙ্গে মেয়েটির

আমার সঙ্গে মেয়েটির—।

প্রশ্ন এবং জবাব, দুটোই অসম্পূর্ণ থেকে গেল।

ভবতোষের মুখ খানিকটা অসহায় বিস্ময়ে কোঁচকালো। বললেন, আই মাস্ট নট বিলীভ্, দ্যাট ইউ টু ওয়ার এনগ্রেজিং অ্যাজ কিসিং লাইক কিডস্।

আলোকের গলায় একটু হাসির আওয়াজ পাওয়া গেল। বলল, না, সে রকম ভাববার কোন কারণ নেই।

ভবতোষের মুখে শিশুর কৌতূহল এবং জিজ্ঞাসা। বললেন, আমি ভেবেছিলুম তোমাদের দুজনের মধ্যে ইয়ে হয়েছে।

—প্রেম ?

—হ্যাঁ, এক কথায় তো তাই বলে ব্যাপারটাকে।

আলোককে যেন কথা বলবার জন্যে চেষ্টা করতে হল। বলল, কিন্তু কথাটা খুব গোলমেলে। আমি সত্যি, কথাটার ঠিক···মানে কথাটা আমার খুব বাজে লাগে। আসলে কী জানেন, দেখলাম, আমরা দুজনে দুজনকে চিনি !

—চেন ?

—হ্যাঁ।

—আগে আলাপ ছিল বুঝি ?

—না।

—তবে ? পরিষ্কার কর।

যেন হুকুম করছেন ভবতোষ। আলোক হেসে বলল, আপনার সঙ্গে আমার প্রথম দিন আলাপের কথাটা ভেবে দেখুন। এখানে এসেই শুনেছিলাম, আপনি একজন বিরাট প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি। বাঘের কাছ থেকে গরু যেমন দূরে থাকে, আপনার কাছ থেকে সে রকম দূরে থাকাই উচিত জানতাম। আর তাই থাকতাম। কিন্তু যখন একদিন দেখে ফেললাম, দুপুরবেলা ঘরে বসে লুকিয়ে আপনি রং তুলি নিয়ে ছবি আঁকছেন, আর বাঘে মস্ত বড় একটা বাঁশের বাঁশী নিয়ে শাঁখের মত শব্দ করে বাজাবার চেষ্টা করছেন—

ভবতোষ বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, কিন্তু ওদুটোর কোনটাই আমি পারি নে।

আলোক বলল, হয়তো ওই পিস্টুর মত বাচ্চারা রং তুলি নিয়ে যা আঁকে, আপনার ছবিও যেন সেই রকমই, আর আপনার বাঁশীর সুরও সেই রকমই···আপনি রাগ করছেন না তো ?

—না। তুমি বেশ বলছ, ঠিক—

আলোক বলল, প্রথমটা অবাক হয়েছিলাম। তারপরেই আপনি একদিন হঠাৎ লাঠি উঁচিয়ে আমাকে তাড়কলেন। বললেন, 'ওহে ছোকরা, আমি দেখছি, তুমি দিন রাত্রিই বেসুরো ছেঁড়ে গলায় রবীন্দ্র সঙ্গীত করছ, আর হুড়ো-হুড়ি ছুটোছুটি করছ।' ভাবলাম, বকবেন। কিন্তু আপনার চোখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। সেখানে কোন রাগ দেখলাম না। তারপরে, আপনি যেন আপন মনেই বলে উঠলেন, 'সব মানুষ দেখছি তার জীবনের অর্থহীনতায় ভুগছে।' আপনার দিকে আর তাকিয়ে থাকতে পারলাম না।

—কিন্তু এসব কথা—

আলোক বাধা দিয়ে বলে উঠল, বলতে দিন একটু। আপনি আবার বললেন, 'স্বাস্থ্যটা দেখছি দৈত্যের মত করে রেখেছে, আর মনটাও বেশ প্রসন্ন। কিন্তু আমি দেখছি, তুমি লড়াইয়ের ময়দানের ঘোড়া, যার সওয়ার গেছে মরে।' বলে আপনি হেসে উঠলেন। তারপর ডাকলেন, 'এস, আমার সঙ্গে একটু চা খাবে এস।'

আলোক চুপ করল। ভবতোষও কথা বললেন না। দুজনেরই জুতোর শব্দ, এই সাঁওতাল পরগণার অন্ধকার নির্জনে যেন চির অশেষে বাজতে লাগল।

আলোক ডাকল, মিত্তির মশাই !

ভবতোষ বলে উঠলেন, ভোন্ট বী সেন্টিমেন্টাল।

আলোক বলল, তা হবো না। আমি আপনার কিছুই কি জানি ? আর আপনার বয়স, আপনার সমাজ, আপনার স্ট্যাটাস্, কোনটাই আপনার সঙ্গে আমার মেলে না। তবু আপনি আমাকে কাছে ডাকতে দ্বিধা করেন নি।

ভবতোষ বললেন, হুঁ ! কিছুই মেলে না, তবু যেন কোথায় একটা মিল খুঁজে পেয়েছিলুম।

আলোক বলল, ঠিক সে ভাবেই, বিনু আর আমি, দুজনকে আমাদের চেনা মনে হল। ও যদি বা আমার

শুধু একটা কথা শুনেছে, আমি ওর কিছুই শুনি নি। শুধু দেখলাম, আমাদের কাছাকাছি হতে আটকাল না। আমি জানি এতে সকলেরই অবাক হওয়ার কথা। কিংবা ঠোঁট টিপে একটু হাসির মায় প্যাঁচ দিয়ে আর কিছু খুঁজে বের করা কিন্তু, কী বলব—ওকে দেখে কী রকম মনে হল। অভব্যতা হলে ক্ষমা করবেন, ওকে দেখে, ঠিক কী ভাবে যে ওকে একটু বশ করব, একটু পরিচর্যা, সেবাও বলতে পারেন, আর তাই—কিছু একটু করবার জন্যে মনটা এত ব্যাকুল হয়ে উঠল, বোধ হয় সাহসও তাই পেলাম, ওর পায়ের কাছে বসে, শাড়ির চোরকাটা তুলে দিচ্ছিলাম। কিন্তু ও মেয়ে··· কৌতূহল আর আবেগ একটু বেশী, আমার কথা শোনবার জন্যে ওর মনটা ছটফট করছিল···।

আলোক চুপ করল। আবার বলল, এই আর কিছু নয়।

ভবতোষ বললেন, এটাকে কী বলে?

—আপনার যা খুশি বলতে পারেন।

—প্রেম?

—তার থেকে বেশী কিছু বলতে পারেন। কিংবা একেবারেই কিছু না বলতে পারেন। আপনাকে এটুকু বলতে পারি, আমরা যেন বহুদিনের হারিয়ে যাওয়া বন্ধুর মত দুজনকে দেখলাম, চিনলাম ঘনিষ্ঠ হলাম, আর তার মধ্যে কোন ফাঁক নেই। দেখলাম, আমাদের দুজনের দুজনকে না দেবার কিছু নেই। কিন্তু কারুর কাছ থেকে কেউ কিছুই নিতে পারি নে।

—কেন?

ভবতোষ নিজের গলা যেন চাপা ব্যাকুল শোনাল।

আলোকের গলাও যেন বহু থেকে শোনা গেল, আমরা প্রস্তুত নই।

দুজনেরই পায়ের শব্দ থেমে গেল। অন্ধকারেও অস্পষ্ট টিলার অবয়ব দেখা গেল। চাপা আর মৃদু কলগুঞ্জনের মত অদূরে ঝরণার শব্দ ভেসে এল। জায়গাটাকে নিবিড় অন্ধকারে ভরে দিয়েছে কয়েকটা ইউক্যালিপটাস আর অর্জুন গাছ। দিনের বেলা হলে, এই মুহূর্তে দেখা যেত, ঝরণার ধারে গিয়ে বসা যেত।

ভবতোষ হঠাৎ বলে উঠলেন, কেন নেবে না?

আলোক অবাক হল ভবতোষের কথায়। তারপরে হেসে বলল, বলছি আপনাকে, আমরা কেউই বোধ হয় প্রস্তুত নই।

আলোক দেখল, ভবতোষ নীরন্ধ্র অন্ধকারের ভিতর দিয়ে, ঝরণার দিকে এগিয়ে চলেছেন। সে তাড়াতাড়ি কাছে এগিয়ে গেল। বলল, আপনার বোধ হয় অসুবিধে হবে যেতে। আমার হাতটা ধরবেন?

—যাও।

আলোকের প্রসারিত হাতটা ধরলেন ভবতোষ। এবং পরমুহূর্তেই বললেন, প্রস্তুত হওয়াই তো তোমার উচিত।

আলোকের মনে হল, তার সঙ্গে বিনুর প্রথম দিনের দেখা থেকে আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত যে কষ্টটা একটা বন্ধ দুয়ারের সামনে বাধায় পঙ্গু এবং বোবা করে রেখেছিল, সেখানেই ভবতোষ সজোরে আঘাত করলেন। যে কষ্টটা নিয়ে সে বিনুর সামনেও নিটুট ছিল, সেই জায়গাটাই যেন কাঁপিয়ে দিতে চাইলেন।

ভবতোষ থামলেন না। অন্ধকারে ক্রমেই নীচের দিকে নামতে লাগলেন। আলোকের হাতে একবার চাপ দিলেন। বললেন, কত বড় হাত তোমার!

আলোক প্রায় শ্বাসরুদ্ধ গলায় বলল, কিন্তু শক্তি নেই।

—ভুল। শক্তিটা হাতে থাকে না, মনে থাকে। এত বড় হাতটাকে মন চালায়।···এখানে বসা যাক।

থামলেন ভবতোষ। পা দিয়ে জায়গাটা অনুভব করে বসলেন আলোককে সঙ্গে নিয়ে।

দেখা না গেলেও বোঝা যাচ্ছে, ঝরনাটা খুব কাছেই। শব্দটা উচ্চ নয়, কিন্তু স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এত স্পষ্ট, সরু মিঠে গলার মত সেই গুঞ্জন যে, গভীর মনযোগ দিয়ে শুনলে মনে হয়, তার দুর্বোধ্য কথাগুলি বোঝা যাবে।

ভবতোষ বললেন, তুমি জান, চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। এ যুগটাই তাই। তোমার ব্যক্তি জীবনের অতি স্বাভাবিক সাধকে তুমি কার জন্যে ত্যাগ করতে চাও? সমাজের জন্যে? সমাজের রয়ে গেছে। আলোক, নিজের সঙ্গে ফাঁকি বড় বিপজ্জনক খেলা।

আলোক বলল আস্তে আস্তে, হয় তো আপনি ঠিক

জানেন। কিন্তু সহযোগী বিনুকে বলেছিলাম, ওর পরাধীনতা আমি কেড়ে নেব না।

—তোমার উপযুক্ত কথা সেটা নয়।

অর্থহীন প্রলাপ। পরাধীনতাই কাড়বে।

—কিন্তু এর মধ্যে একটা অন্তরের স্বাধীনতার কথা আছে।

—সেটা একটা মিথ্যে বুলির কানুন। দুজনের অন্তরের স্বাধীনতা মেনে, পরাধীনতাকে স্বীকার করছ. একদিন ভবিষ্যৎ হয়ে দেখা দেবে। ভবিষ্যতে, একদা কোন এক এমনি রাত্রে, একজনের বুকের ভিতর থেকে এই অভিযোগ উঠবে, 'মৃদু! আমার সকল পরাধীনতাকে কেন তুমি অস্বীকার কর নি। আজ যে আমি একনিষ্ঠ দেহোপজীবিনীর জীবন কাটাচ্ছি।'

—মিস্তির মশাই।

আলোক যেন শিউরে উঠল।

ভবতোষ বললেন, কথাটা খারাপ শোনায়, কিন্তু ভেবে দেখ এটা সত্যি।

অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন ভবতোষ। বাইরে একটা শব্দ শুনেই আরও উচ্চ হয়ে উঠল।

জোনাকিরা আলো জ্বালিয়ে, ধরা ছোঁয়ার খেলা খেলছে অন্ধকারে। বাতাস নেই। বিশাল গাছগুলি অনড়। যেন উৎকর্ণ স্তম্ভিত বিস্ময়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। যেন যুগযুগান্ত ধরে এই রহস্যের দুর্বোধ্য বাণীর মর্ম আবিষ্কার করতে চাইছে। ঠাণ্ডা পড়ছে একটু একটু করে।

ভবতোষ বললেন, সারা জীবন ধরে অর্থহীনতার পিছনে ছুটে মরে লাভ কী? যদি মনে হত, পাপ হচ্ছে, তবু না হয় একটা কথা ছিল।...তোমাকে বলেছিলুম, একদিন একটা মানুষের গল্প বলব।

—হ্যাঁ।

—শোন। একটা মানুষ ছিল। তার সব ছিল। ছেলেবেলায় ছিল তার স্নেহপরায়ণ ধনী বাবা মা। লেখা পড়া শিখে সে হয়েছিল মস্ত বড় সিভিলিয়ন। সে ছিল, ইংরেজ শাসকদের চোখের মণি, চাকরি পেয়েছিল মস্ত। তার ছিল অনেক ধন-দৌলত, দাস-দাসী। তার গ্যারেজে ছিল সুন্দর গাড়ি। রাজা প্রজার মত ছিল তার শত শত কর্মচারী। তার ছিল সুন্দর বউ-ফুটফুটে ছেলে মেয়ে। সবই ছিল, কিন্তু লোকটার মনে ছিল না সুখ।—কেন? সে জানত না। দিন যায়। সে ভাবে, মনে রোগ ধরছে। সে আরও বেশী করে কাজে মনযোগ দেয়। তবু মনটা বিমনা হয়ে থাকে। আস্তে আস্তে তার চুল পাকল, মুখে রেখা পড়ল। ছেলে মেয়েরা বড় হতে লাগল। লোকে বলল, সোনার টুকরো ছেলেমেয়ে। মানুষটার একটু গর্ব হল। কিন্তু মনটা তার শান্তি পায় না। ক্রমেই সে আরও কর্তব্যনিষ্ঠ হতে লাগল। লোকে ভাবল, সে নিষ্ঠুর হয়ে উঠছে। তার বউ ঠাকুর ঘরে গিয়ে বলে, 'আমার স্বামীর কল্যাণ কর দেবতা। সারা জীবন রাজার কাজ করে করে ওঁর মেজাজটা গেছে বিগড়ে। বুড়ো বয়সে বড় উল্টোপাল্টা কথা বলতে আরম্ভ করেছেন।' তার বউয়ের ছিল সতীত্বের অহঙ্কার। তোমাদের সেই শরৎ চাটুয্যের সতী গল্পের সতীর মত। উপোস পার্বণে বোধও কাঁকি ছিল না। কোন দেবতাকেই অসুখী করে নি। রীতিমত একটা সদ্ভাবতা ছিল সতীর দেবতার সঙ্গে।...কিন্তু এ ক্ষেত্রে সেটা তেমন কাজ দিল না। দেবতা কানে কালা হয়ে রইল।...মানুষটা আরও চুপচাপ হয়ে যেতে লাগল। আরও গম্ভীর এবং উদাস। ইতিমধ্যে এল স্বাধীনতা। ভারতীয় শাসকদের কাছেও সে হয়ে উঠল অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মানুষ। কিন্তু উনিশ শো বাহান্ন সালের বেশী সে আর চাকরিতে থাকতে রাজী হল না। কর্তৃপক্ষ তাকে ধরে রাখবার সব রকম চেষ্টা করেছিল। সে রইল না। কেন? না, লোকটা আর পারছে না। তার ছেলেরা তখন উপযুক্ত হয়েছে। কিন্তু তাকে তারা ছেলেরাও ঠিক মত বোঝে নি। বোঝবার উপায়ও ছিল না। ছেলেরা ক্রমে বিরক্তই হচ্ছিল তার ওপর। আর, তার মনে হচ্ছিল, ছেলেরা কেউ তার মনের মত হয় নি। ছেলেরা লেখাপড়া শিখে, সবাই বড় বড় চাকরি আর সুন্দর সুন্দর মেয়ে বিয়ে করার জন্যেই বড় হয়েছে। আর তাই হল। সে এ ব্যাপারগুলোকে নির্বিকার ভাবে গ্রহণ করল। তার মেয়েরাও লেখাপড়া শিখে, মায়ের এবং জামাদের অনুমতি নিয়ে, উপযুক্ত ছেলেদের সঙ্গে প্রেম করল। তারপর বিয়ে করল। এ সব সে নিরাবেগ

কর্তব্যের সীমা করে গেল। তাকে যা করতে বলা হল, আর তার স্ত্রী পুত্র কন্যা আত্মীয় স্বজনেরা আক্ষেপ করতে লাগল, লোকটার মাথা গেছে বিগড়ে।...কিন্তু লোকটার শুকনো চোখ আর নির্বিকার মুখের ওপারে কান্নাটা কেউ দেখল না।...

ভবতোষ হঠাৎ থামলেন। আর করুনার দরোজা গুঞ্জন সহসা জেগে উঠল আবার। গুঞ্জন ছিলই। ভবতোষের গলার স্বরে সুর দিয়ে যেন আরহমলীত বাজছিল। গলার স্বর থেমে যাওয়া মাত্র করুনার গুঞ্জন অনেক তীব্র মনে হল।

কোনাকিদের ভীড় আরও বেড়েছে। লুকোচুরি ছোটোছুটি চঞ্চলতা দেখেছে। নিথর পাহাড়গুলোকে জড়ানো অন্ধকারের ছিদ্র খুঁজে খুঁজে ঠাণ্ডা চুঁইয়ে চুঁইয়ে আসছে।

আলোক প্রায় রুদ্ধশ্বাস গলায় বলল, তারপর?

ভবতোষ বললেন, মনে হচ্ছে, কী যা তা প্রলাপ বকছি। গল্পটা ঠিক জমাতে পারছি নে।

আলোক উদ্গ্রীব স্বরে বলল, খুব ভালো হচ্ছে।

—হচ্ছে?

—তবে শোন। তারপর...তারপর লোকটা ভাবল, কেন তার এমন হল। অনেকদিন ধরেই সে ভাবছিল। কেন সে ভিতরে ভিতরে এমন অস্থির অশান্ত হয়ে উঠেছে। এমনি ভাবতে ভাবতে, একদিন অন্ধকারে তার সামনে এসে একটা লোক দাঁড়াল। লোকটাকে দেখেই সে চমকে উঠল। দেখল, লোকটা যেন তার খুব চেনা চেনা। চেহারাটা অনেকটা তারই প্রথম যৌবনের চেহারার মত? কখন কখন তারই কিশোর বয়সের চেহারার মত দেখাতে লাগল। আবার কখন অবিকল তারই মত। লোকটাকে সে জিজ্ঞাসা করলে, কী ব্যাপার?' লোকটা বললে, 'জবাব দিতে এলুম।'—'কিসের?—'তোমার ভাবনার।—'কী জবাব?'—'জবাব একটাই।'—'বল, বল।—'তার আগে বল, আমাকে তুমি চিনতে পারলে?'—'ঠিক মত নয়।'—'আমি তোমার ভেতরেই বসে থাকি।'—'ও! হ্যাঁ।' আর আমাকে তুমি চিরকাল অস্বীকার করতে চাইলে। উপবাসে রেখে রেখে খুঁচরে খুঁচরে মারতে চাইলে। কিন্তু মনে রেখ, আমি মরিনি। আমি মরি না। আমাকে তুমি ভুলতে পারবে না।'

ভবতোষ নিজের গলা যেন একটা গহ্বরের মধ্যে চাপা পড়ে গেল। কিন্তু আলোকের কানে ঝরনার গুঞ্জন এল না। সে উৎকণ্ঠা-বিস্ময়ে বলে উঠল তারপর?

ভবতোষের গলা গহ্বরের ভিতর থেকে চাপা স্বরে বেরিয়ে এল, তারপর—তারপর লোকটা কোথায় হারিয়ে গেল। আর সে তার নিজেরই চুপি চুপি গলায় শুনতে পেল, 'এ জীবনটা নিয়ে তুমি কী করলে? পরিবেশের কাছে তুমি অপরিহার্য। তুমি তাদের পালন নিয়মের একটা খুব এলেমেলো পার্টস্। কিন্তু ভেবে দেখ, বেশের মানুষের কাছে তুমি অপরিহার্য নও। যদিও তোমার বিবেককে দেশের কাজের কথা বলে সান্ত্বনা দিতে চেয়েছে। কিন্তু আত্মা তা মানবে কেন? তার চেয়েও বড় কথা, এই গোটা জীবনটা নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাটিয়ে এলে। এক বড় একটা অনিচ্ছের কোন মূল্যই কি দেবে না? তারপরে, আরও ভেবে দেখ, যে মেয়েটিকে তুমি বিয়ে করেছিলে, তোমার স্ত্রীর কথা বলছি, যার বাপের কাছ থেকে কম করে চল্লিশ হাজার টাকার যৌতুক পেয়েছিলে, সেই মেয়েটির সঙ্গে সত্যি তোমার কোন সম্পর্ক নেই। মাত্র একটা সংস্কার বশে, একটা জৈবিক নিয়মে দারা জীবনটা কাটিয়ে এলে। এক ঘরে কাটিয়ে এলে সুদীর্ঘ সময়, কিন্তু তোমাদের মনের তারে কোনদিন একটু সুরে মিললো না। আর এ আত্ম-বঞ্চনার বুক টাটানিটা এখন তুমি টের পাচ্ছ, যখন আর সময় নেই।...তার চেয়েও বারোআনা, তোমার সমস্ত জীবনের চার পাশে এই যে সব ফাঁকির লৌহ যবনিকা দিয়ে ঘিরেছে, তারই চাপে চাপাই হয়েছে তোমার ছেলে-মেয়েরা। ওরা এক ধরণের রাজপুত্র আর রাজকন্যে তৈরী হয়েছে। দেশ পরিচয় জ্ঞানহীন ওরা। বহুনাম নেকী। খাঁটি মানুষের পুত্র কন্যা হওয়া থেকে ওরা বঞ্চিত হয়েছে। ওদের দোষ কী? তোমার বন্ধু হবার যোগ্য বলে তুমি ওদের গড়তে পার নি। এ সব কিছুরই মূল্য তোমাকে দিতে হবে। এর হাত থেকে তোমার পরিত্রাণ নেই। চুপি চুপি স্বর থামতেই, আবার সেই লোকটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। লোকটার মুখে

বাবা না বিদুষের হাসি, সে বুঝতে পারল না। লোকটা বললে, 'শুনবে?'—'শুনব।'—'তার পরের কথাগুলো আমিই বলতে এলুম।' সে কথা বলতে পারল না। যেন ভীত চোখে তাকিয়ে রইল। লোকটা বলল, 'ভয় পাচ্ছ কেন?'—'বল কী বলতে চাও।'—'তোমার ওই চুপি চুপি স্বর যে কথা বাদ দিয়ে গেল, সে কথাই আমি বলতে এলুম। তোমার মধ্যে বাপু একটু হীনমন্যতা আছে।'—'কি রকম?'—'তোমার মধ্যে বরাবরই আমি একটু বেশী কুলের টান দেখেছি, শ্যামকে তাই কাছে ঘেঁষতে দাও নি। আজ তোমার শ্যামের বিরহে বড় যাতনা। তা সে থাক গে। আমি শ্রীমতী মন্দিরা দেবীর কথা—।' নামটা উচ্চারণ মাত্র সে প্রায় আর্তনাদ করে উঠল, 'ও কথা থাক।' লোকটা বললে, 'না থাকবে না। সেই গরীব ইস্কুল মাস্টারের মেয়ে বিদুষী মেয়েটির কথাই আমি বলতে এলুম।' সে হাত জোড় করে করুণ গলায় বলে উঠল, 'ভাই এ প্রসঙ্গটা কি বাদ দিয়ে আমরা কথা বলতে পারি নে?' লোকটা নিষ্ঠুরের মত ঘাড় নেড়ে বলল, 'আজ আমাকে ভাই বলছ। অথচ আমি তোমারই ভিতরে বসেছিলুম। আমি অনেকবার তোমাকে ভাই বলে ডেকেছি, শুনতে চাও নি। তুমি সব সত্য শুনতে পার, আর মন্দিরার কথা শুনতে পার না। পারবে কেন? ওটা যে খুবই সজ্ঞানে লুকিয়ে রেখেছ। আসলে তুমি আমাদের তবু মাঝে মাঝে ভুলতে পেরেছ, কিন্তু মন্দিরাকে কখনই নয়। এখন আর ওসব চালাকি করতে হবে না। আমি তোমাকে অভিযুক্ত করতে আসি নি। স্টেটমেন্ট অব্ ফ্যাক্টসটুকু বলি শোন। মন্দিরার বাবা তোমার গৃহশিক্ষক ছিলেন। মন্দিরাকে তুমি ভালবেসেছিলে। মন্দিরা তোমাকে কোনদিন জিজ্ঞেস করে নি, "আমাকে বিয়ে করবে?" জিজ্ঞেস করে নি, ওতে সে অপমান বোধ করত। সে তোমাকে ভালবাসত। তখন তুমি ছিলে অন্য মানুষ। শিল্প-কর্ম দেশ, এই তিন আদর্শে আস্থাবান।···তার পরেই বিলেত যাবার কথা উঠল। তুমি বিশ্বাস করতে আরম্ভ করলে, সংসারে, তুমি জন্ম নিয়েছ অন্য কারণে। জানু আমলা হওয়াই যেন তোমার ভবিতব্য। তুমি আর মন্দিরার কাছে গেলে না। রাতারাতি তোমার বিয়ে দেওয়া হল। তারপরে বিলেত, তারপরে··· এই। এইখানে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। তার আগে, এই মাত্র উনিশ-শো পঞ্চাশ সালের কথা বলছি, বাংলাদেশের চিরকুমারী বিদুষী মন্দিরা দেবীকে অমুক সোসাইটিতে সরকারী বেসরকারী হোমরা চোমরারা সংবর্ধনা দিয়েছিলেন। তুমিও সেখানে উপস্থিত ছিলে। তুমি দূর থেকেই দেখছিলে, সেই ধূসর চুল, মোটা লেন্সের ওপরে দুটি বড় বড় চোখ, যদিও যৌবনের দীপ্তি আর তাতে ছিল না, কিন্তু জীবনের দীপ্তি ছিল, মুখের রেখায় বার্ধক্য থেকে যেন একটি স্নিগ্ধতাই এনে দিয়েছে বেশী, আর অত্যন্ত সাধারণবেশিনী সেই মন্দিরা দেবী। তখন তোমার বুকের মধ্যে আমি মুচড়ে উঠতে দেখেছিলাম। যত অবাক হয়েছিলাম, বিস্তর করে হেসেছিলাম তত। মন্দিরা দেবীর বক্তৃতার ঘোষণায় তুমি শুনেছিলে, "শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানের জন্ম শেষ পর্যন্ত প্রেমেই।"···তারপর পরিচয়ের পালা। তোমাকে দেখেই, যে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন, মন্দিরা তাকে বলে উঠেছিলেন, "এঁকে আমি চিনি।" তোমার বুকের মধ্যে একটা তীর যেন আমূল বিঁধেছিল, আর সেটা গিয়ে আমাকেই বেশী আঘাত করেছিল। তুমি কিছুই বলতে পারছিলে না। তোমার মুখে ছিল একটা মৃদু ব্যথার ছায়া। মন্দিরা তোমাকে জিজ্ঞেসা করেছিলেন, "কেমন আছ।" তুমি কোন রকমে বলেছিল, "ভালো।" মন্দিরা আবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, "ছেলে মেয়ে গিন্নী, সকলের খবর বেশ ভালো তো?" তুমি যেন জেনারেলের সামনে, সামান্য সৈনিকের মত যান্ত্রিক গলায় আবার বলেছিলে, "ভালো।" তারপরেই তোমার মনে হয়েছিল, তোমার সর্বাঙ্গে কাঁটা। তুমি বলতে পারছ না, শুতে পারছ না। আর আস্তে আস্তে তুমি ভয়ে আর যন্ত্রণায় আবিষ্কার করলে, নিজের চার পাশে তুমি এমন বেড়া দিয়েছ, যাতে সত্য সেখানে ঢুকতে না পারে। কিন্তু হায় সর্বের মধ্যে ভূত রয়ে গেছে।' ···লোকটা থামল। সে হঠাৎ হাত দিয়ে মুখ ঢাকল। তার মনে হল, তাকে ঘিরে রয়েছে অসীম শূন্যতা। সে শূন্যতার চাপ অসহ্য। পরিবার পরিজন বিলাস ব্যসন ঐশ্বর্য সমস্ত কিছুর মধ্যে সে যেন অকূলে ভাসছে। দেখল, সারা জীবনে তার আশ্চর্য বলে কিছুই করা

হয় নি। তার নিজের জন্যে সে কিছুই করে নি। জংকর ব্যর্থতার মুখোমুখি বসে, ভয়ে সে জিজ্ঞেস করল লোকটাকে, 'এখন আমি কী করব?' লোকটা বললে, 'বলতে ইচ্ছে করছে, একলা ঘরে বসে কাঁদ। কিন্তু সেটা কোন কাজের কথা নয়।' সে বললে, 'ভগবানকে ডাকব?' লোকটা হেসে উঠল। বললে, 'সেটা ভণ্ডামি হয়ে যাবে। ভগবানকে সব দিয়ে শান্তি পাবার মত চরিত্র তোমার নয়। তার চেয়ে, আমার সঙ্গে ভেসে পড়।'

—'কোথায়?'

—'প্রকৃতি আর মানুষের কাছাকাছি। কপর্দক এঁটে চিমটে হাতে বেরোতে বলছি নে। তবে, একলা একলা এক আনন্দের সন্ধানে ঘোরা বলতে পার। সাংসারিক কর্তব্য দায়িত্ব তো মোটামুটি সবই শেষ করেছ। এবার চল যাই, একলা হাতে দুটি কুড়িয়ে খাই গে। দূর দেশের সেই গরুচোনিয়া মাঠে গিয়ে রাখালের সঙ্গে একটু গল্প করি গে বসে। মনে আছে, ছেলেবেলায় বাঁশী বাজাতে, ছবি আঁকতে?' সে বললে, 'সে সব তো—' লোকটা বলে উঠল, 'চর্চা নেই বলছ? ভুলে গেছ? বেশ তো, আবার আরম্ভ করবে। কিন্তু তার আগে তোমার ওই চোখের কোণ দুটো মুছে ফেল বাপু। বুড়ো বয়সে আর ওসব মানায় না।' সে তাড়াতাড়ি চোখ মুছে, একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'তাই চল। তাই চল তাড়াতাড়ি।'

ভবতোষ থামলেন।

ঝরনার শব্দ উচ্চকিত হয়ে উঠল। কিন্তু এই সুপ্ত চরাচরের মধ্যে, ঝরনার শব্দ যেন এখন একটি আনন্দময় সঙ্গীতের ঝংকার বাজছে।

আলোক নিশ্চুপ, অনড়।

ভবতোষ বললেন, কেমন লাগল গল্পটা?

আলোক যেন চমকে উঠে বলল, অপূর্ব!

—কিছু বলার আছে?

—আছে।

—বল।

আলোক অন্ধকারের মধ্যে ভবতোষের মুখ দেখবার চেষ্টা করে বলল, জীবনে উপলব্ধি অনেকের হয়। কিন্তু সেই উপলব্ধি নিয়ে পথ বদলাবার সাহস কারুর বড় একটা দেখি নি। এ গল্পের নায়কের সাহস দেখে অবাক লাগল।

ভবতোষ বললেন, সাহস আছে কি না জানি নে। খবর পেয়েছি, সে বুড়ো এখন সত্যের সঙ্গে বেশ সহজ ভাবেই হাত ধরে চলেছে। আর তাই, লোকটাকে অনেকের ভালো লাগছে না।

আলোকের প্রাণের মধ্যে একটা আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। ইচ্ছে করল, হাততালি দিয়ে হেসে ওঠে। পাছে ভবতোষ কিছু ভেবে বসেন, তাই সে বলল, নিশ্চয় নায়ক সেই আনন্দকে খুঁজে পেয়েছেন?

ভবতোষ বললেন, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। তার জন্যে বোধ হয় মরার দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

আলোক সহসা বিমর্ষ হয়ে উঠল। বলল, কেন?

ভবতোষ বললেন, গল্পটা সেই জন্যেই তো তোমাকে বললুম হে। দ্যাখ, ওই বুড়ো নায়কের মত শেষ বয়সে প্রায়শ্চিত্তের সাহসের থেকে, একেবারে প্রথম থেকে সত্যের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সাহস করে চলা ভের। কেন না, ওই প্রায়শ্চিত্তের সঙ্গে একটা অনুশোচনা আর ব্যথা জড়িয়ে থাকে। সেটা বড় কষ্টের। তার থেকে, সবাই যত খুশি চমকে যাক, রেগে উঠুক, এ ক্ষেত্রে বিদ্রোহই সুন্দর। অন্তরের সত্য আর শুদ্ধির কাছে নিয়মটা কিছুই নয়। একদা তুমি আমাকে সন্ধ্যাবেলার বাসার কথা বলেছিলে। সেই সন্ধ্যাবেলার বাসাটা কি কেবল নিরীহের ব্যথার ধন? তার মনে কি একটু খুঁজবে না?

ভবতোষ দেখতে চেষ্টা করলেন আলোকের মুখ। আলোকও চেষ্টা করল। কিন্তু মুখ নেই, চোখ নেই! এই নিকষ কালো অন্ধকারে কোন অবয়ব পর্যন্ত নেই কারুর।

ভবতোষ হাত বাড়িয়ে আলোকের কাঁধে রেখে, বললেন, চল এবার উঠি।

—চলুন।

ঝরনার দু-পাশের গাছের নিবিড় অন্ধকারের বাইরে, অন্ধকারের গা থেকে একটা আলোর আভাস ফুটে উঠেছে। বোধ হয় নক্ষত্রের আলো। সাঁওতাল পরগনার প্রাচীন কঠিন প্রকৃতি যেন তার বোঝার মাথায়, যে যেখানে ছিল সেখানেই স্থির অনড় হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

চলতে চলতে ভবতোষ মিত্র তাঁর বুড়ো গলায়

গুনগুনিয়ে উঠলেন, আমি দেখার আছি, শুধু গাইতে তোমার গান।···

অন্ধকার একলা বিছানায় উৎকর্ণ হয়ে শুনেছিল বিনু। একাগ্র ওপাশ করছিল। মনে হচ্ছিল, যে-শব্দের জন্যে সে কান পেতে আছে, তা আর কোনদিন যেন বাজবে না। কিন্তু মধ্যরাত্রি পার করেই বুঝি, লোহার গেটের আর্তনাদ শোনা গেল। গেট খুলে দিল কালেব। মোহানের ওপর ঝলমলিয়ে উঠল নিশুতি রাত। এগিয়ে এল পায়ের শব্দ। উঠবে না কি বিনু! পায়ের শব্দ এগিয়ে এল শুকুরঘাট পেরিয়ে। বিনু মুখ ফেরালো। জানালাটা বন্ধ। তার ঠাণ্ডা লাগবে তাই। জানালার নীচেই পায়ের শব্দ বেজে উঠল। বিনুর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। পায়ের শব্দ তার বুকের ওপর দিয়ে এগিয়ে গেল, স্তিমিত হয়ে এল। বিনু ঠোঁট নেড়ে নিঃশব্দে উচ্চারণ করল আলোক।···

বিনু তার দুহাত বুকের ওপর তুলে নিয়ে এল। শেষ বেলার ফোটা সন্ধ্যামণির রেণু আজ সতেজ উত্তেজনায়। শিরায় শিরায় নতুন রসের প্লাবন। বুক দুরুদুরু করছে।

বিনু বুক থেকে হাত তুলে ভেজা চোখের ওপর চাপা দিল। কে জানত, না ফুটলে এক নূতন যাতনা। ফুটলে ব্যথা। আর সন্ধ্যামণি ফোটে, সকল আলোর আড়ালে, লুকিয়ে। চিরদিন বুকের আলোয় থাকবে। চোখের আলোয় জাগবে। আর···আর কবে যেন আসছে অনাদি। আজ বিকেলের ডাকে এসেছে চিঠি। রাত্রে কিন্তু আসার পর কালের চিঠি দিয়েছে। খবর এসেছে, আসছে অনাদি।

চৈত্রের পড়ন্ত বেলায় এসে পৌঁছুল অনাদি আর শীলা। আকাশে তখন রক্তাভা। সাধন গেটের কাছে ছুটে গিয়ে তাদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে এল।

মাঝারি লম্বা দোহারা অনাদি। চোখ দুটি বড় বড়। যৌবনের বিনম্র ব্যাকুলতার দীপ্তি থেকে গাম্ভীর্য বেশী দৃষ্টিতে। তার মাজিত আর রুচিশীল সাহেবী পোশাকের মতই হাসিখুশীটুকু যেন ছাঁটা কাট করা। বিনু বয়স অনুমান করতে পারল না। তবে কলকাতা থেকে প্রায় দশ ঘণ্টার ট্রেনের পথেও দেখা যাচ্ছে, অনাদির পাতলা চুলের একটিও অবিন্যস্ত হয়ে পড়ে নি। মুখ অমলিন, পরিচ্ছন্ন। ঈষৎ পাউডারের প্রলেপ আছে কি না কে জানে। কলকাতার ভোরবেলার পাউডার কি দীর্ঘতাল পরগনার শেষ বেলায়ও অম্লান থাকে। দেখে মনে হয়, অনাদি যেন ওর চলা ফেরা বেশভূষা ব্যবহার সব কিছু সতর্কভাবে বাঁচিয়ে চলেছে।

অথচ শীলাকে দেখে বোঝা যাচ্ছে, পথের ধুলো ওকে ছেড়ে দেয় নি। ট্রেনের ধোঁয়া রেহাই দেয় নি। ভোরের কলকাতার সূর্যোদয়ের মত টকটকে লাল টিপ এখন অস্তাভায় ফ্যাকাসে। কিন্তু বাইশ তেইশের রক্তের দীপ্তি চলকে পড়ছে ওর শ্যামলী মুখে। কালো গগলসের ঠুলিটা চোখ থেকে খুলে নিতেই, বড় বড় দুটি চোখ যেন অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল। চোখ দুটি বোধ হয় সুন্দর, কিন্তু শাণিত। কাজল আঁকায় একটু বেশী ঘর-ই মনে হয়। আর তার সঙ্গে চোখা নাক, ঈষৎ স্থূল ঠোঁট, সব মিলিয়ে একটি সুন্দর চটক আছে। শীলাকে রূপসী শ্যামাঙ্গিনী বলা যায়। এবং দেহের সম্পদেও শীলা ধনী। পাশে দাঁড়ালে বিনুর দারিদ্র্য প্রকট হয়ে পড়বে। একটু ঈর্ষা মিশ্রিত বিস্ময়তায় বিনু দেখল, শীলা ওর বসনসৌরবে অচেতন থাকায় ডান করলেও, কাঁধ এবং বুকের অতিরিক্ত কাটা ব্লাউজের ডান দিক শাড়ির আবরণ থেকে মুক্ত নিয়েছে। তাতে ওর পীন স্তন ঔদ্ধত্য প্রকাশ করছে। এবং ঔদ্ধত্য ওর দোহারা শরীরের প্রায় সর্বত্র। ব্লাউজের সংক্ষিপ্ত হাতার বাইরে পুষ্ট বাহুতে, অনধিক ক্ষীণ কটি ও গুরু নিতম্বে, উরু ও জঙ্ঘায়। পিঙ্ক রংএর সিল্ক শাড়িতে ওকে যেন রূপসী পিঙ্গল দেহ সাপের মত দেখাচ্ছে।

শীলার ধূলি-রুক্ষ এক গুচ্ছি চুল কপাল বেয়ে, চোখের ওপর এসে পড়েছে। ও তা সরিয়ে দেয় নি। তাতে ওর একটা চোখ প্রায় ঢাকা পড়ে গিয়েছে। আর চুলের গুচ্ছির আড়াল থেকে সেই তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু চোখের দিকে তাকিয়ে বিনুর বুকটা যেন কেঁপে উঠল একবার।

অনাদির সঙ্গে আসলে সে-ই দেখতে এসেছে বিনুকে।

সাধনেরও বুকের মধ্যে যেন কেমন ধকধক করেছিল। সে আলাপ করিয়ে দেবার জন্যে অনাদি আর শীলার দিকে তাকিয়ে বলল, বিনু। আমার···।

শীলা চোখ ঘোরাল। বোধ হয় কপট গাম্ভীর্যেই বলল, ভাগিস বললেন।

স্বভাবতই এর পরে সবাই হেসে উঠতে পারত। একটা হাসি হাসি ভাব দেখাও দিল। কিন্তু আড়ষ্টতা কাটিয়ে ওঠা গেল না যেন। সাধনের ছোট বুক, শক্ত কর। ভিতরে ভিতরে সে ঘুলঘাস হয়ে উঠল। ছোড়দিকে ভালো লাগছে তো ওদের, ছোট বড়-র কথাটা জানতে পারে নি তো কোথাও। জানলে আসবে কেন এতদূরে? তা ছাড়া কে বলবে। ক-জনা জানে আর। সাধন তো তার জীবনে একটি অসত্যই বলেছে। কিন্তু বিনুকে অত কী দেখছে শীলা। অনাদিও আড়চোখে নজর করছে।

বিনুর মনে হল, দম বন্ধ হয়ে যাবে ওর। সবাই চুপচাপ কেন? ভালো না লাগলেও, কথা বলতে দোষ কী।

অথচ কিছুই নয়। সকলেই আসলে কথার ছল খুঁজছে।

বিনুর বুক, নিরাপদ ও উদ্বাস্তু, চুলের ও মুখের চেহারা চৌদ্দ বছরে এমন ভীষণ পরীক্ষার সামনে দাঁড়ায় নি যেন কখনও। এইবার যে শেষ! না, আলোকের কথা সে ভাববে না। প্রাণ এবং প্রেম অবাস্তব। আলোক অবাস্তব। সেদিনের সন্ধ্যাবেলাটা অলৌকিক, 'সন্ধ্যা-বেলার বাসা' পৃথিবীতে নেই। অনাদি সত্য বাস্তব প্রত্যক্ষ। অনাদিই মুক্তি মোক্ষ। সন্ধ্যাকলি বনের, নিরালার, অযত্নের, অন্ধকারের। সে ফুটেছে, কেন ফুটেছে, কেউ জানবে না। জানতেও চাইবে না। সন্ধ্যাকলিও অবাস্তব। তার চেয়ে, অনাদির যত্নের, সামাজিকতার, নিরাপত্তার এবং সম্মানের টবে সে ফুটতে থাকে। সে জন্যেই তো বিনু জন্মেছে। একজন অনাদির জন্যেই তো তার সারা জীবনের প্রতীক্ষা।

তীর ছেড়ে পাথারে কে যায়। অনেক দেখিয়ে, অনেক সেজে, এইবার শেষ। আঃ! কে না জানি কবে দেখার দেবতা। এই মুহূর্তে সে কি কোন আলৌকিকতায় ঢেকে দিতে পারে না বিনুকে। চুলে নাহয় ভেজাল দেওয়া যায়। আর কোথাও কিছু দেওয়া যায় কি না, বিনু জানে না। শীলার দেহের ঔদ্ধত্যের সাহস সে কোথায় পাবে। আর এখন শীলা এসেছে। সেই তো চুল বেঁধে দিতে আসবে এর পরে।

সাধনই আবার মরিয়া হয়ে বলে উঠল, বিনু, এই আমার বন্ধু অনাদি আর শীলু।

শীলার ঠোঁটের কোণে একটি রেখা ফুটল, এবং চোখের মণি আবার ঘুরল। বলল, শীলু নয় শীলা।

সাধন তাড়াতাড়ি সংশোধন করতে গেল, ও, হ্যাঁ,—।

এবার অনাদি আর শীলা একসঙ্গেই হেসে উঠল। আর সেই সঙ্গেই সাধনও। শীলাকে বলল, যাঃ, তোমার সঙ্গে দেখছি—

—কথা বলা যায় না।

শীলা অন্তরঙ্গ উপহাসের হাসি হাসল।

অনাদি গম্ভীর এবং স্নেহের হাসি হেসে বলল, শুরু হল।

সাধন বলল, আমাকে হয়তো ও এই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাইরে ভাগিয়ে ছাড়বে।

শীলা বুকে আঁচল টেনে নিল। কিন্তু আঁচলটাই রইল না। বলল, দেখি, কত দূরে ভাগানো যায়।

বিনু জানে, সাধনের বুকের রক্ত ফুটতে আরম্ভ করেছে। শীলার নাম করলেই তার রক্তচলাচল। সে বলল, আবহাওয়া একটু যেন সহজ হয়ে এসেছে। প্রায় স্খলিত স্বরে বলল, আমি চা করি গে ছোড়দা, তোমরা বোস।

বলেই শঙ্কিত হল। কোন রকম অস্বাভাবিক শোনাল না তো। সে চকিতে শীলার দিকে তাকাল। একটু হাসি টেনে বলল, আপনি হাত মুখ ধোবেন না?

আপাতত বিনুকে ওদের কেমন লাগল, কিছুই বোঝা গেল না। শীলা বলল, ধোব এখন। চলুন আপনাদের ভাই বোনের সংসার দেখি আগে।

মোটা লেন্সের আড়ালে, সাধনের বিজ্ঞ দূরদর্শী শান্ত চোখ দুটোই যেন নেশায় চকচকিয়ে উঠছে। বিনুর মনে হল, ছেলেটা প্রতি পলে পলে একেবারে বদলে যাচ্ছে। বলল, হাঁড়ির মধ্যে উঁকি দেওয়াই মেয়েদের স্বভাব।

শীলা বলল, হাঁড়ির খবর জানতেই মেয়েরা ভালবাসে।

অনাদি হাসল। শান্ত গম্ভীর মাপাজোকা হাসি। কিন্তু শীলার কথায় কোন ইঙ্গিত আছে বলে, বোধ হয় না। ওর মুখের ভাবে এবং হাসিতে সেটা প্রমাণ হয় না।

সাধন বলল, ভাই বোনেরা সব সময়েই ঝগড়াটে থাকে। তুমি বরং তোমার ভবিষ্যতের চরকায় তেল দাও গে।

শীলা বলল, আপনার কথা ভুলে বসেছি। আসলে এটা এখন বিনুদিরই সংসার। আপনার সংসার যা হবে, তা তো বুঝতেই পারছি।

—কেন?

—কেন আবার। বুড়ো মাস্টারমশাইদের যেমন হয়, তেমনিই হবে।

বলে হেসে এগিয়ে গেল বিনুর দিকে। সাধন যেন একটু নিষ্প্রভ হয়ে অনাদির দিকে তাকাল। অনাদি হাসছিল। আর তার চোখ ছিল বিনুর দিকে। অনাদির চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হল, প্রথম দর্শনে বিনুকে বোধ হয় ওর মোটামুটি ভালই লেগেছে। লাগাটা অস্বাভাবিক নয়। কারণ, সাধনের নিজেরই মনে হচ্ছে, ধবধবে সাদার ওপর ঘোরালো কুল তোলা শাড়িতে ছোড়দিটাকে ভালই দেখাচ্ছে যেন। রহস্যটা তো কর্সা। সাদা শাড়ির একটা ছটা তাতে লেগেছে এবং ছোড়দি বোধ হয় আগেই এই পাতলা শাড়িটা বেছে রেখেছিল। যার ভিতর দিয়ে জামা রঙ-এর জামাটা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। আর আশ্চর্য, পাতলা শাড়ির আবরণের মধ্যে, দেহের যে অবয়ব ফুটে উঠেছে, তা যেন একটি পুষ্ট মেয়ের। কী একটা পরিচ্ছন্ন সৌন্দর্য যেন ওকে ঘিরে রয়েছে, পা থেকে মাথা পর্যন্ত। এমন সাজতে শিখল কবে থেকে। কিংবা ওর ভিতর থেকেই এ রূপ বিচ্ছুরিত হচ্ছে! চোখে একটু কাজল ছাড়া আর তো কিছুই করে নি। একটুও রঙ মাখে নি। অথচ মনে হচ্ছে, ছোড়দির গালে যেন রঙ লাগানো। ঠোঁট দুটি তেমন নিষ্প্রভ ফ্যাকাশে নেই আর। সেইদিন রাত্রে, যেদিন আলোকের সঙ্গে ওকে খুঁজে পাওয়া গেল বাগানে, সেদিন তো আশ্চর্য রূপসী বলে মনে হয়েছিল ছোড়দিকে। যেন সে ছোড়দি নয়, আর কোন মেয়ে। তারপর থেকে ছোড়দির সেই রূপই স্থির উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। শীলার মত তা কলকায় না। বরং একটা বিষণ্ণ উদাসীনতায় ছোঁয়ায় এ আর এক রকমের সৌন্দর্য। কী করে মানুষের এমন পরিবর্তন হয়! (যদিও জবাবটা সাধনের নিজের চোখে মুখেই রয়েছে। যদি সে দেখতে পেত, শীলার আগমনের পরমুহূর্ত থেকে তার নিরীহ শান্ত বিজ্ঞজনোচিত চেহারায় কী পরিবর্তন ঘটেছে!) এখন শীলার পাশে ছোড়দিকে খুব নিষ্প্রভ মনে হচ্ছে না।

তবু অনাদির এই দেখা, এই তাকানো থেকে কোন সিদ্ধান্তে আসা যাবে না। অনাদির চাকরির জীবনের সঙ্গে, ওর মুখের ছাঁদটা মিলে গিয়েছে। কারখানার লেবার অফিসারের সেই ভাবলেশহীন, মনের সঙ্গে বিযুক্ত মুখের ছবি। হাসি যার সত্যি হয়তো হাসি নয়। রাগ যার ভিতরের প্রসন্নতারই একটা মুখোশ হয়তো।

এমন নয়, আজ নয়। আস্তে আস্তে, একটু একটু করে লক্ষ্য করতে হবে অনাদিকে। আর অনেক কথার আড়াল দিয়ে জেনে নিতে হবে তার মনের কথা। সংসারের কাছ থেকে সাধন এ দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। তাকে সার্থক হতে হবে। জীবনে একটা মিথ্যে কথা। হয়তো একদিন সেটা জানাজানি হবে। তখন কি অনাদি তাকে ক্ষমা করবে না। অনাদি তো তার থেকে বয়সে অনেক বড়। ছোড়দির থেকেও বড়। এটা কি ঠকানো? এ ঠকানোটা কি খুব মারাত্মক? সাধন তো তার জীবনে অনেক ঠকানো দেখেছে। দেখছে নিয়ত। দারা দেশব্যাপী কত মহৎ আর বৃহৎ ব্যক্তিদের ঠগবৃত্তির কথা প্রতিদিন খবরের কাগজেই প্রকাশিত হচ্ছে। তার তুলনায় এটা আর এমন কী। খুবই ছোট, সামান্য আর একবারই মাত্র। সার্থক হতে হবে। সূচনা ভালই। শেষ ভালটা রক্ষা করতে হবে।

চাকরি, ছুটি, কলকাতা আর সাঁওতাল পরগনার কথা আলোচনা করল ওরা দুজনে। বাইরের উঠোন থেকে শীলার গলা ভেসে আসতে লাগল। সেই সঙ্গেই পিন্টুর গলাও। তারপরে চা পরিবেশন করল বিনু।

অনাদি আর বিনুর আচরণে একটা আড়ষ্টতা লক্ষ করা গেলেও, ওদের চারজনের আসরটা অমল জমে না।

সাধন শীলা অনাদি কথা বলল বেশী। বিনু প্রায় নীরব রইল সর্বক্ষণ। এও যে এক রকমের নেশা দেখা, একথাটা সে কোন সময়েই ভুলতে পারল না। সে বসে রইল প্রায় ব্রীড়াবনতা চোখে। আর অনুভব করতে লাগল অনাদির লোভী চোখের দৃষ্টি। কিন্তু তিন জনের একটি কথাও তার কানে ঢুকল না। বিনুর মনে হল, স্মৃতিহীন, চিন্তাহীন শূন্য মস্তিষ্ক তার। সে কিছুই ভাবতে পারছে না।

একটু পরেই কাদের ছুটোছুটির শব্দ পাওয়া গেল। পরমুহূর্তেই বিনু বুঝল, কাশেমের ছেলের সঙ্গে আলোক ছুটোছুটি করছে, হাসাহাসি করছে। তারপরেই আলোকের অট্টহাসি বেজে উঠল। দৌড়ে চলে যাওয়ার শব্দ শোনা গেল।

শীলা সেদিকে কান দিল না। কিন্তু অনাদির ভ্রূ একবার কুঁচকে উঠল। সাধন বলে উঠল, সেই ব্যাপারটা।

বিনু নিজেকে তাড়াতাড়ি সাবধান করল। কারণ, তার সারা মুখে যেন রক্ত ছুটে আসছে।

অনাদি বলল, কে?

সাধন বলল, আর বল কেন। একটি আজব চীজ। যাকে যাকে এমন হই-হুল্লোড় লাগিয়ে দেয়। এর ওপরে আছে রবীন্দ্রসঙ্গীত। সে আর এক ব্যাপার। দুদিন থাকলেই টের পাবে। দেখা হবে নিশ্চয়ই।

বুকের ভিতরে একটা খোঁচা খাওয়া ব্যথাকে, মুখের অস্পষ্ট হাসি দিয়ে মাখিয়ে নিতে চাইল বিনু। কারণ, অনাদি যে তাকেই দেখছে। আর বুঝতে অসুবিধে হয় নি বিনুর, অনাদির দৃষ্টি তীক্ষ্ণ এবং চতুর। বলুক না সাধন। কত তো বলেছে। কী আসে যায়। আলোক তো তার জীবন সীমার বাইরে। অনেকটা আকাশ নক্ষত্র, দূরের ওই পাহাড়ের মত।

অনাদি খুব শালীনতার সঙ্গে হেসে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, ও। বরিস্—

সাধন বলল, না, বরাস্টোরাস্।

তিন জনেই হেসে উঠল। এবং বিনুও এবার আসের থেকে স্পষ্ট করে হাসল। একটু না হাসলে তার বুকের ভিতরটা বড় রুদ্ধ মনে হচ্ছে।

সামনে চড়াই, উৎরাই খাড়া চড়াই। এতদিন শুধু চড়াইয়ের সামনে আসা গিয়েছে। এইবার আরোহণ।

আর সেই আরোহণটা চলল যেন নানান উৎসাহী কলমুখরতার মধ্যে। বিনুদের ক্লাস রীতিমত জমজমাট। ওরা চারজনে বেড়াতে যায়, চারজনে খায়। অনেক রাত অবধি তাস খেলে। টাঙা ভাড়া করে বেড়াতে চলে যায় অনেক দূরে। দূরে না গেলে কাছে। নয় তো ছোট্ট শহরটাকে পাক দিয়ে ফেরে।

বিনুর মন এবং সর্বাঙ্গ জুড়ে যেন একটা মিটার কাজ করে চলেছে। যে-মিটার প্রতিমুহূর্তে অনাদির মন এবং দৃষ্টি মেপে চলেছে। কতখানি কুঁকড়ে অনাদি। কতখানি এগোচ্ছে। বিনু বুঝতে পেরেছে, শীলার তেমন পছন্দ হয় নি তাকে। তবে সেটা শুধু রূপেই। কিংবা স্বাস্থ্যে। বয়সের কথাটা উল্লেখ করতে সাধন করে নি। রুচিতে বেধেছে হয়তো।

কিন্তু বিনুর মিটার বলছে, তেইশ বছরের বিনুর প্রতি পঁয়ত্রিশ বছরের অনাদি একটা আকর্ষণ বোধ করছে। তেইশ বছর। সাধনের বয়স কত? ছোট বোন মীনুর? না, নিজেকে বিদ্রূপ করে না বিনু। অনাদির সংশয়হীন চোখের দিকে তাকিয়ে আরও কুণ্ঠী হয়ে উঠতে থাকে বিনু। ভিতরে ভিতরে একটা লজ্জা এবং ধিক্কারের কাতর মাঝে মাঝে মাথা তুলে দেয়। আবার অতিক্রম করে যায়। লজ্জা ও ধিক্কারের সঙ্গে সংগ্রাম করে, তার চড়াইয়ের শ্বাসে সহজ হয়ে ওঠে। বিনু আড়চোখে চায়, ঠোঁট টিপে হাসে এবং লজ্জায় চোখ নত করে। সঙ্গে সঙ্গে সজাগ মিটারে লক্ষ্য করে দেখে, আর একজনের আবেগ কোন দাগে ঠেকেছে।

আচ্ছা, ওই বয়স, ওই চুরি করা বছরগুলি কোথায় যাবে বিনুর? যে জন্যে নতুন কোষ্ঠী করানো হচ্ছে তার কলকাতায়। আশ্চর্য! সাত সাতটা বছর একেবারে মুছে যাবে জীবন থেকে। মরে থাকবে চিরকাল। বিনুর সন্তানেরাও জানবে না।

না-ই জানুক! সন্তানেরা মায়ের বয়স চায় না। পুরুষেরাই শুধু মেয়েমানুষের বয়স চায়। সবটাই বয়সের পিপাসা। তিরিশকে তেইশ-জনেই সে তৃপ্ত। এই তৃপ্তিতেই তার রক্ত দোলায়িত।

বিনু দেখছে, শীলা আর সাধনকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে অনাদি। বিনুর কাছে একলা হতে চায়। চাঁর জনে যেন টাঙায় ওঠে, অনাদি অত্যন্ত সহজ ভাবে, বিনুর পাশে জায়গা নেয়। যেন ওটা অনিবার্যভাবে ধার্য হয়ে গিয়েছে। বিনু লক্ষ করে, শীলার চোখের কোণের দৃষ্টিতে তা এড়ায় না। শীলার ঠোঁটের কোণে একটু সূক্ষ্ম হাসি বক্র হয়ে থাকে। যদিও সাধনের সঙ্গে শীলার ব্যবহার আরও অনেক বেশী উগ্র। কোন লজ্জারই ধার ধারে না। বিনু দেখছে, তার নিরীহ শান্ত ভাইটি একেবারে বদলে গিয়েছে। বিনুর সঙ্গে কথা বলার সময়টুকু পর্যন্ত কোথায় নেই। যেন একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গিয়েছে। একটা অন্ধ উন্মত্ত বেগে ছুটে চলেছে। আর তাতে ওর সারা গায়ে আগুন যেন তাতোই লেলিহান হয়ে উঠেছে। তবু লক্ষ্য সেই এক, অগ্নিশিখা শীলা। শীলার ভাই। সুরম্য প্রসিদ্ধি আগুন। পতঙ্গটা তার দুর্বল পাখা ঝাপটে কেবলই পাক দিয়ে ফিরছে। আশ্চর্য। এই কি সেই সাধন।

কিন্তু ওদের হাসি কথা ব্যবহারে, কোন ইঙ্গিত করে না। যে অনাদি যদি সামান্য একটু বিনুর হাত ধরে, সেটাই অনেকখানি ইঙ্গিতময়। সেটাই বেশী করে চোখে লাগে।

সেই প্রথম যেদিন অনাদি হাত ধরল, কত অনায়াসে করেছিল। টাঙা নিয়ে সবাই ছুটে গিয়েছিল অনেক দূরে সেতাতে। যেখানে রাস্তা কেটে নালী করেছে কুলিরা। টাঙা থেকে নেবে, নালা পার হয়ে, হাত বাড়িয়ে দিল অনাদি বিনুর দিকে। চকিতে মুহূর্তে একটু থতিয়ে গিয়েছিল বিনু। চোখ ফিরিয়ে একটু খুঁজে দেখবারও চেষ্টা করেছিল, সাধন শীলা কোথায়। কিন্তু সে যে বিনুর চড়াইয়ের হাত। তাড়াতাড়ি সে হাত বাড়িয়ে দিল। অনাদি তাকে নালা পার করিয়ে নিল। টের পেল বিনু, হাত ছাড়তে এক মুহূর্ত দেরি করল অনাদি। একটু বেশী জোরেই চাপ দিল। আর বিনুর চোখের দিকে চোখ তুলল চোখাচোখি করবার জন্যে। বিনু লজ্জাবতীর মত নত চোখে, একটু লাল হবার চেষ্টা করল। এবং হাত মুক্তি পাওয়া মাত্র, আঁচলের আড়ালে, শক্ত হয়ে মুঠি পাকিয়ে গেল। কিন্তু মনে মনে বলল, এ যে আমার সেই চড়াইয়ের হাত।

সেতাতে গিয়ে যেদিন সন্ধ্যা হয়ে যায়, অন্ধকার ঘনিয়ে আসে, তখন বিনুর প্রতিটি পদক্ষেপ যেন অনাদিই সন্তর্পণে চালনা করে। সাঁওতাল পরগনার এই রুক্ষ প্রাচীন ভূমির এখানে পাথর, ওখানে খন্দ। চলতে চলতে আচম্বিতে এসে অনাদির হাত তাকে স্পর্শ করে। বিনু চমকায়। অনাদি বলে, 'দেখবেন, সাবধান।'

অন্ধকারে চলতে গিয়ে বিনুর প্রায় কাছ ঘেঁষে থাকে অনাদি। একটু এদিক ওদিক চলেই গায়ে গায়ে লাগে যেন প্রায় দুহাতে বেষ্টন করেই চলে বিনুকে। আর টাঙায় ওঠবার সময় তো নিজেই বাড়িয়েছে, অনাদি তার হাত ধরে তুলে দেবে। এবং টাঙার চাকা ও ঘোড়ার পায়ের শব্দের আবহে গলা ডুবিয়ে কানের কাছে মুখ এনে জিজ্ঞেস করে, 'বলতে আপনার অসুবিধে হচ্ছে না তো মিস্ বোস্।'

হয় তো বিনুর আড়ষ্টতা অনাদি বুঝতে পারে। সামনে ও পিছনে দুজন পাশাপাশি বসলে, যথেষ্ট ঠেসা-ঠেসি করে বসতেই হয়। ডানায় ডানায় উরুতে উরুতে ধাক্কা লাগেই। বিনু বুঝতে পারে। অসুবিধের কথা বলে আসলে অনাদি জানতে চায়, এই স্পর্শের রোমাঞ্চে বিনুর আপত্তি আছে কি না।

আপত্তি! বীনুর জীবন যৌবনের সব প্রতীক্ষা সার্থক হতে চলেছে। তার শেষ চড়াইয়ের আরোহণে শুধু পাশ মার্কের আশা নয়। সে দেখছে, ফার্স্ট ডিভিশন যেন তার কপালে নাচছে। সে আরও সহজ হয়ে উঠতে যায়। যতোখানি ঢলে না পড়লেও চলে, তার থেকে বেশী ঢলে। ঘাড় নেড়ে অস্ফুটে বলে, না অসুবিধে হচ্ছে না।

কিন্তু অনাদি যখন তাকে 'মিস্ বোস্' বলে, তখন তার একটুও অবাক লাগে না। বিশ্রী লাগে না। নাম ধরে ডাকবার কথা মনে করিয়ে দিতে মনে আসে না।

যখন শীলা সাধন কাছে থাকে না, অনাদি তখন মিনী'রাকে লক্ষ্য করে। বিনুর বুকের মধ্যে কাঁপে। ভয় হয়, হঠাৎ কোনো কারণে যদি অনাদির অপছন্দ হয়ে যায়।

কিন্তু অনাদি তখন হয় তো বলে, আপনি কথা খুব কম বলেন মিস বোস।

বিনু লজ্জিত হোয়ে বলে, কথা বলতে তেমন জানি নে।

বলেই মনে হয় ভুল বলেছে বিনু। ওতে তার দোষ প্রকাশ পায়। তাড়াতাড়ি হেসে অনাদির চোখের দিকে তাকায়। বিনুর ভয় ভাঙে। কারণ, অনাদির চোখে অবিশ্বাসের হাসিটা সে দেখতে পায়। আরোহণের কলায় সে নির্ভুল, নিখুঁত।

তবু, ভয় লাগে বিনুর। অনাদিও লম্বাচওড়া মানুষ। লম্বাচওড়া পরিপাটি পরিচ্ছন্ন প্রায় সাহেব মানুষ। কথা বলে নীচু স্বরে। হাসে ঠোঁট টিপে। যেন প্রতিটি পদক্ষেপ মাপা, প্রতিটি কথা ভাবা। পাশে পাশে প্রতিটি স্পর্শও সুপরিকল্পিত।

থেকে থেকে বিনুর মনে হয়, সবটাই হয়তো অনাদির তাকে পরীক্ষা। অন্তহীন পরীক্ষা, প্রতি মুহূর্তে, প্রতি পায়ে পায়ে। সময়ে সময়ে শ্বাসরুদ্ধ লাগে। ভাটা তাই কখনোই ছেড়ে যায় না। যেন তার সঙ্গে অনাদির একটা নিষ্ঠুর খেলা চলেছে। যেন পা টিপে টিপে, নিঃশব্দে সন্তর্পণে এ খেলায় বিনু সংগত শুধু অনাদির ইচ্ছায়, ইচ্ছাকে অবিশ্বাস করে, অনাদির মনোরঞ্জনের স্রোতে ভেসে চলেছে।

কোনো কোনো দিন সহসা লক্ষ্য করেছে বিনু অনাদি যেন চোখ দিয়ে কী হাতড়ে খুঁজছে তার শরীরে। সেই মুহূর্তে বিনু ভয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে। সে বুঝতে পারে, অনাদি তার শরীরে মাংসের ঔজ্জ্বল্যকে মাপছে। বিনু ভয়ে উচ্ছলতার ভান করে। চলতে গিয়ে অস্বাভাবিক ঢেউ তোলে শরীরের নানান প্রত্যঙ্গে। তবু ভয়ে ভয়ে কাটতে থাকে সারাক্ষণ।

তারপরেই হয়তো সন্ধ্যার ঘোর লাগা কোনো দূর আরণ্যের কান্নাকাটি, তার পাশে দাঁড়িয়ে অনাদি জিজ্ঞেস করে, আমার সান্নিধ্য হয় তো আপনার ভালো লাগে না মিস বোস?

সাহস ফিরে আসতে থাকে বিনুর। অথচ অনাদির কথাগুলি মনে হয় বানানো, কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে। তবু বিনু অস্ফুটে বলে, বেশ?

অনাদি বলে, এক এক সময় মনে হয়।

বিনু ঘাড় নেড়ে বলে, না তো!

তখন অনাদি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ায়। এত ঘনিষ্ঠ যে, বিনুর সারা শরীর শক্ত আড়ষ্ট হয়ে যায়। অথচ কত কম পরিচয়। দিনের হিসেবে নয়। অনাদিকে একটুও চিনতে পারে না, বুঝতে পারে না বিনু। এবং বিনুকে বোঝবার জন্যে কোনো চেষ্টা অনাদির আছে বলে মনে হয় না। তবু এত গায়ে গায়ে, প্রায় দেহলগ্ন হয়ে দাঁড়ায় কেমন করে অনাদি।

সে জবাব অনেক দূরে। তার আগেই বিনু দুদিন লক্ষ্য করল, শীতার্ত অন্ধকার রাত্রের টাঙায়, অনাদির হাত উঠে এসেছে তার কাঁধে। শুধু উঠে আসে নি, তারপরেও সে হাতের অস্থিরতা টের পেয়েছে বিনু। সে হাত বিনুকে আরও কাছে টেনে আলিঙ্গন করতে চেয়েছে। এবং অন্যের মতো যেন চৌরাস্তার মোড়ে দিশেহারা হয়ে থমকে থেকেছে।...কী করবে বিনু! একটা তীব্র চেতনায় আড়ষ্ট, অথচ একটা অসহ্য ভয়ে অস্থির হয়ে উঠেছে। বন্ধুদের কথা তার মনে পড়েছে। কিন্তু এ তো বন্ধুত্ব নয়। অনাদি। অনাদি!

কিন্তু অসীম করুণা অনাদির। তার বেশী সে এগোয় নি। আর সেই মুহূর্তেই বিনুর আশার ভয়ে বুক কেঁপে উঠেছে। অনাদি রুষ্ট হল না তো! বিনুর নির্বাক নিশ্চলতায় অসুখী হল না তো। চকিতে বিনু নিজে থেকেই অনাদির দেহের সান্নিধ্যে আরও ঘন হয়ে গিয়েছে। হাত সরাতে গিয়ে অনাদির হাত স্পর্শ করেছে আর বুকের মধ্যে একটা অসহনীয় কষ্টকে দাঁতে দাঁত চেপে যেন সামলিয়েছে। অনাদি তার হাতের খাবার বিনুর কাঁধে আর একটু চাপ দিয়ে, কানের কাছে মুখ নিয়ে বলেছে, খুব শীত করছে না?

তখন শীত এবং গরম, কোনো অনুভূতিই বিনুর থাকে না। সে বলেছে, এমন কিছু নয়।

কী করুণ আর বীভৎস খেলা! ঘোড়ার পায়ের শব্দ, চাকার ঘর্ষর, আর সাধন শীলার সমানে হাসি তর্ক কথাবার্তা চলতে থাকে। বিনুকে তখন আর কেউ দেখবার নেই।

তবু এ যে শেষ চড়াই।

চড়াই, সামনে চড়াই উত্তুঙ্গ। সাধনও যেন চড়াইয়ে

উঠছে। তার কণ্ঠ যেন আরও বেশী। আসল লক্ষ্য অনাদির প্রতি তার ঠিক যতো নজর রাখা হয় না। তবু মনে মনে একটু নিশ্চিন্তই। বরং তার চোখ যখন রক্তাক্ত মাংস সব শীলার খাবার পড়ে যেন দাপাচ্ছে।

ওই চড়াই উৎরাই, এই রক্তধারা মৃত্তিকা, পাহাড়, আর হঠাৎ হঠাৎ তাল গাছের জটলা, শাল অরণ্যের বিস্তার, প্রকৃতির এই স্বদেশে শীলা তার নিরীহ ভীরু সচেতন রক্তে একটা ভয়ংকর আবর্ত তুলে দিয়েছে। একটা অন্ধবেগে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে। অন্ধকারের বিভ্রান্ত চোখে যেন আলেয়ার হাতছানিতে কোন্ পানের বুকে ঝাঁপড়ে মরার ডাক দিয়ে চলেছে। সাধন স্থির হতে পারছে না। থামতে পারছে না। শীলা যেন নেশার ভূতায় তার প্রাণ নিয়ে ছুটেছে। ইচ্ছে হলেই টিপে শেষ করতে পারে।

সাধন জানত, শীলার মনে কোন কথা আটকায় না। তা বলে এত অবাধ্য, তা জানত না। সাধন লজ্জা পাবার অবকাশ পায় না। তার আগেই ওর রক্তের পাখায় কাঁপন ধরে যায়।

অনাদি আর বিনু দূরে থাকলে, ওদের দেখিয়ে বলে, দেখছেন, আপনার বোনটি কেমন কাঁদ পেতেছে। কেমন হাত ধরাধরি করে ঘনা পাঁয়াপাঁয় করছে। আর আপনার সঙ্গে তো সে রোমান্সের কোনো আশা নেই। নিন ধরুন দেখি হাতটা, ঘনাটা পার হই।

সাধন হাত বাড়িয়ে দেয়। শীলা শক্ত করে ধরে, লাফিয়ে পার হয়। কিন্তু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। একেবারে সাধনের ঘাড়ের ওপর গিয়ে পড়ে। ওর পুষ্ট বলিষ্ঠ হাত সাধনের গলা জড়িয়ে ধরে। ওর উদ্ধত শরীরের সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন সাধনকেই সামলিয়ে রাখে। বুকের ওপর নিশ্বাসের হলকা ছেড়ে, হেসে উঠে বলে, একটু জোর নেই আপনার? আবার হাঁদার মতো দেখছেন। মুরোদ তো ওই পর্যন্তই।

সাধনের মনে হয়, শীলা যেন আগুনের তীরে বিদ্ধ করেছে তার শরীর। ঈষৎ চোখ নামাতেই, শীলার উজ্জ্বিত ভাষার আলোছায়া রক্তের শ্যাম উল্লাসে উদ্ধত যুগোল প্রতিমা বক্ষে, একটা তীব্রবিদ্ধ পশুকে যেন মৃত্যুর আক্রোড়নে ঝাপাতে ব্যাগে। আর শীলার ঈষৎ খুলে রক্তাক্ত ঠোঁটে নিষ্ঠুর ছুরির মতো হাসি রক্তের। আরও নীচে চোখ যায় না সাধনের। তার গলা শুকিয়ে যায়। চোখ জ্বালা করে ওঠে। বলে, কী মুরোদ দেখতে চাও।

শীলা তাকে ছেড়ে দেয়। ঠোঁট উল্টে বলে, চেয়ে চিন্তে মুরোদ দেখা যায় না। পারলে দেখিয়ে দিতে হয়।

বলে শীলা হাসে। ধমকে বলে, নিন চলুন এখন। আপনার বোনটি তো দেখছি, দাদাকে নিয়ে কোন আড়ালে কেটেছে। আমরা চলুন ওই বুক চিতানো পাথরটায় গিয়ে বসি। আর কোথায় যান।

যেন বিজয়ের দিবে বলে। বসাস করে বসে এবং সাধন হাসে, সন্ধ্যার শেষ আলোয়, শীলা যেন পাথরের ওপর, কোন অতীত যুগের মন্দিরের গায়ে নিখুঁত প্রস্তর মূর্তি। যার প্রতিটি অঙ্গ অবাস্তব, সুন্দর এবং অমানবীয়। কিন্তু সচল। ঠোঁটের কোণে থাকে রক্তে পাক ধরানো, হাসি। পাশে বসে সাধনের রক্তে খুশী লেগেই থাকে। তবু আড়ষ্টতা কাটে না। বুকের মধ্যে খুশীর তলায় প্রাণটা যেন দুরুদুরু করে মরতে থাকে।

আর শীলা বলে, আপনি একেবারে বুড়ো হয়ে গেছেন। একেবারে বুড়ো বুড়ো বুড়ো।

যুবক সাধনের অন্তর্বিভ্রান্ত যৌবন তোৎলার মতো কী যেন বলতে যায়। বলতে পারে না। মনে হয়, তার বুকটা যেন বড় বেশী ছোট। সেখানেই সব কথা ছট্‌ফট্ করিয়ে, মাথা কুটে মরে যায়। কোনো রকমে হেসে, ভিজিত গলায় বলে, বড় বুড়ো ভাবছ, ততোটা নয়।

শীলা ঘাড় বাঁকিয়ে, ঠোঁট কুঁচকে, চোখ ঘুরিয়ে, শ্লেষের সুরে বলে, তাই বুঝি? কী করে সেটা বোঝা যায়?

আর কথা খুঁজে পায় না সাধন। তার বুকের মধ্যে শুধু প্রশ্ন উত্থিত হতে থাকে, কী করে বোঝানো যায়। কী করে। কী করে।...শীলার ঘন সান্নিধ্যে, প্রায় গায়ে গায়ে, পতঙ্গটা যেন মরণের শেষ আনন্দে কাঁপতে থাকে।

শীলা খিলখিল্ করে হেসে হঠাৎ ঘাসে কিংবা পাথরের ওপরেই চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে। তার অঁচল যায় লুটিয়ে। তার বুকের উদ্ধত যেন আকাশকে আহ্বান করে। বিস্তস্ত শাড়ির বাইরে, স্বর্ণস্তম্ভের মতো তার জানু-সন্ধি অকম্পিত সাহসে প্রকাশ পায়। সংক্ষিপ্ত জামা,

কনিষ্ঠা — শিল্পী : বাদল ভট্টাচার্য

শান্তির কোমর বরফশীতল নাপাল নাশের নাভিস্থলের কাছে শাদা চিকন মুক্ত অগ্রভাগ দিয়ে শেষের রক্তাভা খেলা করে। মানবী দেহের ওই অংশটুকু ছেড়ে সে অন্য যেতে চায় না। দুহাত লুটিয়ে পড়ে দুদিকে। রক্তিম কোলা কোলা ঠোঁটের ফাঁকে ঝকঝকে শাদা দাঁতে নিষ্ঠুর সৌন্দর্য বিলিক হানে। উচ্ছ্বিত নাসারন্ধ্র আর চোখের কালো আগুনের উজ্জ্বলতায় সাধনের সারা গায়ে, মর্মকোষে-কোষে আগুন ছড়ায়।

বিভ্রান্তির মধ্যেও একটা অন্তহীন বিস্ময়ে, সাঁওতাল পরগণার আরণ্যক পরিবেশে এই অপরূপ মানবী রূপ দেখতে থাকে সাধন। আর মনে হয়, তার ভিতরে পুড়তে পুড়তে গলতে গলতে ক্রমেই সে নুয়ে পড়ে। ভেঙে পড়ে. ক্লান্ত ভীরু পশুর মতো হাঁপাতে থাকে। রক্তের শিরাগুলি তার অতিরিক্ত লঘু এবং ক্ষীণ কি না কে জানে। কিংবা কানা বন্ধ। যেন কিছুতেই, আকাঙ্ক্ষানুযায়ী হাতে পায়ে মুক্ত হয়ে, মত্ততায় ফেটে পড়তে পারে না।

শীলা ভ্রূ কাঁপিয়ে জিজ্ঞেস করে, কী?

সে জিজ্ঞাসার মধ্যেও যেন একটা বিদ্রূপাত্মক প্রতি-শ্রুতির আভাস।

সাধন শুকনো ভাঙা রুদ্ধ গলায় বলে, তোমাকে দেখছি।

—আমাকে।

হরিণ কন্যার মতো বেঁকে যায় শীলার ঠোঁটের কোণ। চোখের ইশারা করে, ডেকে বলে, শুনছ।

—বল।

—মাথাটা নামাও না।

খুব ধীরে ধীরে, যেন মৃত্যুর খুব কাছাকাছি মাথাটা নামিয়ে নিয়ে আসে সাধন। প্রসাধন এবং দেহের মিলিত একটা গন্ধ ক্রমেই অচেতন করতে থাকে। শীলার নিশ্বাস বায়ুর সীমায় মাথাটা নেমে আসে।

শীলা চাপা গলায় ফিসফিসিয়ে বলে, তার চেয়ে, আয়না দিয়ে নিজের মুখটা দেখুন গে। দেখুন সে কীরকম বুড়িয়ে গেছেন। আপনি একটা বুড়ো বুড়ো বুড়ো।…

বুড়ো বুড়ো বুড়ো।…বুড়ো বুড়ো বুড়ো।…

শীতার্ত পশ্চিমা বাতাসে, চড়াইয়ে উৎরাইয়ে, নিষ্পত্র অরণ্যের ফাঁকে ফাঁকে একটা কথা যেন ক্লান্ত চাপা গলায় ফিস্‌ফিস্‌ করতে থাকে। তার সঙ্গে তাল দিয়ে বাজতে থাকে শীলার অলৌকিক খিলখিল হাসি। —বুড়ো বুড়ো বুড়ো।…

এই একটি কথার আবর্তে, ভবানীপুরের সেই শান্ত নিরীহ ইস্কুলমাস্টার ছেলেটির সমস্ত চিন্তা পাক খেতে লাগল। সমস্ত বুদ্ধির সামঞ্জস্য গেল হারিয়ে। মোটা লেন্সের ওপারে দূর স্থানী দৃষ্টির সূক্ষ্মতায় লেগে গেল বাতলামির ঘোর। তার নিরীহ প্রাণের শান্তিপ্রিয়তায় আগুন লাগিয়ে দিল শীলার হাসি। খান খান করে কাটল তার রাতের ঘুম। ওকে দেখলে এ সব বোঝা যায় না, মাসাধিককাল আগে কলকাতা থেকে ও এসে-ছিল অতি গূঢ় এক অভিসন্ধি নিয়ে। ধীরে মন্থরে সন্তর্পণে, পা টিপে টিপে এসেছিল। ওর নিজেরও বোধ হয় সেকথা মনে নেই। এখন ওর চলাটা পর্যন্ত যেন নেশাখোরের মতো টালমাটাল করছে।

ওর মতো চালাক ছেলের অবস্থা হয়েছে ঘোটার বাঁধা নেকের মতো। যে একটা ছোট বৃত্তে পাক খেতে খেতে ক্রমেই নিজের গলার দড়ির ফাঁসে আটকে যায়। ওর বুক থেকে মস্তিষ্কের সীমানা পর্যন্ত শীলা একটা তীক্ষ্ণ তপ্ত শলার মতো বিঁধে রয়েছে। আর ও অষ্টপ্রহর মনে মনে বলছে, শীলা আমাকে ভুল বুঝছে। শীলা আমাকে বুড়ো ভাবছে। একটা ভুল, মিথ্যে কথা জেনে আমাকে অপদস্থ করছে, কষ্ট দিচ্ছে, বিরূপ করছে। শীলা! আঃ! কি একটা দুঃসহ দুরন্ত চড়াই।

যেন ঘর্মাক্ত কলেবরে, হাঁপাতে হাঁপাতে, দাঁতে দাঁতে পিষে চড়াই ভাঙছে সাধন। আর সব সময় মনে মনে বলছে, শীলা হয় তো ছোড়দিকে অনেক বয়স্ক ভাবছে। আমাকে তার থেকেও বেশী। কী করে আমি ওকে বিশ্বাস করাব, ও আমাকে যে রকম বুড়ো ইস্কুল মাস্টার ভাবছে, আমি তা নই। আচ্ছা…আচ্ছা, শীলা যতটা বয়স ভাবছে, তার থেকে কম প্রমাণ করতে পারলে কি ও রাজী হবে? আমি তো ওকে স্কুলের কলেজের ইউ-নিভার্সিটির সার্টিফিকেটটাও দেখাতে পারি। সরাসরি আমার মায়ের কাছেও নিয়ে যেতে পারি। আমি তো…।

পঞ্চাশ্চেতেই সাধনের ভাবনা থেমে যায়। নিজের মনেই হাত চাপা দিয়ে, সভয়ে উচ্চারণ করে, পারি না। আমি পারি না প্রমাণ করতে।

কাঙালী বস্তীবিস্তি পরিবারের একটা অত্যন্ত পুরনো, নিতান্ত সেকেলে পাপে সে লিপ্ত হয়েছে। অথচ তার নিরীহ ভীরু প্রাণের উদ্ধামতায় একথা ভুলে গেল, কিসে রাঙা হয়ে শীলা ? কিসে অবাঙালী আছে শীলা ?

তার মস্তিষ্কের খোলের মধ্যে একটা পোকা কেবলি পাক খেতে লাগল। আর দুর্বল পাখার ঝিক ঝিক করে বাজতে লাগল। শীলা আমাকে বুড়ো ভাবছে। আমাকে ক্ষীণ দুর্বল অপাবগ ভাবছে। আমাকে পুরুষ ভাবছে না। যুবক ভাবছে না।…

আর, কলকাতার কর্পোরেশনের ভিক্টেকশন দেওয়া ফুটির বিকলাঙ্গ বণ্ডের মতো, অসহায় চোখে যেন সে শীলাকে দেখছে। দেখছে, যখন সকালবেলার স্বর্ণাভ রোদের কোলে, অবলেপের ছায়ায় শীলা আঁচল উড়িয়ে ছুটে যায়। চাবুকখানি দিয়ে ডাকে, 'কই বুড়োমশাই আসুন।' আর তার আঁচল থাকে ভুঁয়ে লুটিয়ে। দাপিনীর মতো ফণা তুলে, ঘাড় হেলিয়ে, তার বুকের শংখলে প্রকৃতিকে অবরোধ করে দাঁড়িয়ে ঠোঁটের ধনুকে টঙ্কার হানে।

যখন সাধনের গায়ের কাছে দাঁড়িয়ে, পিঠের কাপড় সরিয়ে বলে, 'জামাটা তুলে দেখুন তো কোনো পোকা ঢুকেছে নাকি। কী যেন একটা লাগছে। কিন্তু দেখবেন, খিমচে দেবেন না যেন।'

শেষের কথাতেই বোঝায় সাধনের অবশ ভীরু হাতের স্পর্শ আরও আদরো হয়ে ওঠে। হাত কেঁপে যায়, তবু জামা তোলা যায় না। সঙ্গে সঙ্গে সামনে ফিরে শীলা কাপড় দেয় সাধনের হাতে।—'থাক বুঝেছি। বুড়োদের হাতে ওর বেশী শক্তি থাকে না। যান, ওদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকুন গে, আমি নিজেই জামা খুলে দেখে নিচ্ছি।'

সাধনের মনে হয়, ধরিত্রী কাঁপছে। সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। যখন পাহাড়ি ছোট্ট নদীর স্রোতে শীলা তরতরিয়ে নেমে যায়। আর সাধন তীরে দাঁড়িয়ে থাকে সংশয়ে। বলে 'যেও না। কত জল যে জানে।' শীলা বলে, 'ভয় নেই আপনি। বুড়ো হলেও এ জলে ডুববেন না।' বলে আর চলে এবং যত জল, ততই কাপড় উঠতে থাকে শীলার। ওদের-অবশ বণ্ডটার চোখে রক্ত ফুটে আসে, কিন্তু পা ছোটে না। এবং বুকের মধ্যে কাঁপতে থাকে। আর দৃষ্টি যেন ঝাপসা হয়ে আসতে থাকে, যতই দ্যাখে, দুটি পায়ে স্বর্ণ স্তম্ভ উরু ক্রমেই বিশাল পেশল হয়ে ওঠে এবং স্রোতের জলে ভাসিয়ে যায়। তারপরেই মনে হয়। সাধনের মোটা লেন্সে কেউ কালো রঙ মাখিয়ে দিল। সে কানা হয়ে যায়, আর ওপার থেকে হাসির ঝারে ভেসে আসে, 'মাস্টারমশাই, ডুববেন না, আসুন।' সমস্তটাতেই সাধনের মনে হয়, সে যেন ডুবডুবিয়ে জলে পড়ে গেল। সব ভিজিয়ে যখন শীলার কাছে উপস্থিত, তখন শীলার হাসি ও লীলাতাল সবগুলার দুরন্ত শীতে কাঁপন ধরে যায়।

এই দেখছে সাধন। আর ভাবছে, 'শীলা আমাকে বুড়ো অক্ষম ভাবছে।' বেসের গলার বাঁধা দড়িটা ক্রমেই খোটার কাছে সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছে। বৃত্ত ছোট হয়ে আসছে। আর ভাবছে, 'শীলা আমাকে না চেনে চীনতাম বিঁধছে। শীলা আমাকে…।'

বিনু চড়াইয়ে উঠছে। বিনু দেখছে, সাধনও চড়াইয়ে উঠছে যেন। বিনুর শেষ চড়াই। সাধনেরও যেন শেষ চড়াই। এই প্রথম আর এই শেষ।

কিন্তু সাধনকে আর চেনা যায় না। বিনু মেয়ে তাই শীলার নিষ্ঠুর খেলাটা সে বুঝতে পারে। খেলাটা হয়ত নিষ্ঠুর হত না। যদি শীলা উপযুক্ত লোকের হাতে পড়ত। সাধন তার ছোড়দির জন্যে একটা মিথ্যের আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু বিনু জানে, তার ছোট ভাইটি চির নিরীহ। নিষ্পাপ। এখানে ও বেচারী অযোগ্য। বিনু লক্ষ্য করছে তার নিতান্ত ভাল মানুষ দুঃখী ভাইটার চোখের কোল বসে গিয়েছে। দৃষ্টি গিয়েছে ঘুলিয়ে। ওর খাওয়ার পাতে ভাত পড়ে থাকে। রাত্রে ওর জেগে থাকা টের পায়। খেতে পারছে না, শুতে পারছে না। ও ছোড়দির কথাও ভুলে গিয়েছে। বিনু বুঝতে পারছে সাধনের সামনে একটা দরজা হাট করে খোলা রয়েছে। কিন্তু ভিতরটা অন্ধকার।

অনাদিকে রোকা দেন আরো কঠিন। সে স্বল্পবাক, ধীর, মন্থর। তাকিয়ে থাকে বেশী, কথা বলে কম।

ভয় আছে, তবু অনেকখানি নিঃসংশয় বিনু। অনেকখানি নিশ্চিন্ত হয়ে উঠেছে। চড়াইয়ের অনেকখানি ওপরে সে উঠেছে। শীলের কাছাকাছি। জীবনের একমাত্র কাম্য, শেষ প্রতীক্ষার বুঝি সে সার্থক। পরম সৌভাগ্যবতী বিনু। অনাদির নির্বাচনে সে হয় তো গৃহীত। ভয় থাকলেও এ আশাটা মাথা তুলছে। তাই মনে হচ্ছে শীর্ষবিন্দু কাছেই।

আর যত উপরে উঠছে, ততোই বিনুর বুকের মধ্যে সন্ধ্যাকাল ঘনিয়ে উঠছে। এবং রাত্রি হিঁছিরে সন্ধ্যাকলি ফুটছে। যারা জীবনের সূর্যোদয়ে যে ফুল ফোটে নি, সায়াহ্নে যে ফুল দাঁওতাল পরগণায় এসে সন্ধ্যাকলি হয়ে ফুটল। সেই সন্ধ্যাকলি। সেই সন্ধ্যাকলিতে ছোঁয়া আলোক। থাকে সে অবান্তর, অচল বলে দূরে সরিয়ে রেখেছে। রাখবে চিরকাল। আর তবু, বিনু তার জীবন দেবতার কাছে চিরকাল কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে। যে-দেবতা তার নারীত্বের শেষ কাঁদনের পরম সম্মান দিয়েছেন চরম তৃপ্তি দিয়েছেন। তবু ফুল ফুটেছিল। যে ফুল না ফুটলে চরম চির অসত্য মানব জনম বিফল।

কিন্তু ফোটার ব্যথাটা থেকে থেকে অসহনীয় হয়ে ওঠে। যখন রাস্তায় বেড়াতে বেরিয়ে আলোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। বিনু চোখে হাত চাপা দেয় না। চোখের পাতা বন্ধ করে না। দৃষ্টিকে অন্ধ করে রাখে। মনে মনে বলে, 'ওখানে আলোক নেই।' আর ওর পাশেই অনুসন্ধিৎসু চোখ দুটির প্রতি ভীরু মনে সজাগ থাকে। তার কানে আসে আলোকের গলার স্বর। সাধনের সঙ্গে কথা বলে আলোক। কিন্তু কথাগুলি কানে ঢোকে না বিনুর। কতকগুলি এলোমেলো কথা বেজে ওঠে। —কোথায় চললেন?···হ্যাঁ।—করণায়।···দেরী আছে।···বেশ আছেন।···হয়তো।'···আর তার সঙ্গে সঙ্গেই শীলার হাসি বাজতে থাকে। মাঝে মাঝে সাধনের চাপা গলা, 'ইডিয়েট!' অনাদির হাসি শোনা যায়। আর গলায় করুণ বিদ্রূপ শোনা যায়, 'বেচারী, সঙ্গীহীন! হয় একটা বুড়ো মানুষের সঙ্গে ঘুরছে। নয় তো একলা। কখনো কখনো টাঙ্গা ছোটাচ্ছে। আই ফীল সরি ফর হিম।'

সাধন বলে, 'তুমি যত খুশী ফিল কর। বাট আই ডোণ্ট।' তার সময় কোথায়! কিন্তু বিনুর বুকের মধ্যে একটা যন্ত্রণা পাক খেতে থাকে। এবং শেষ পর্যন্ত তার অন্ধ দৃষ্টির সঙ্গেও চকিতে একবার আলোকের দৃষ্টি পড়ে যায়। আর যন্ত্রণাটা তৎক্ষণাৎ একটা বেদনাতুর প্রশ্নতায় ভরে ওঠে। আলোকের মুখে কোনো গ্লানি নেই। তবু চোখে জল এসে পড়তে চায়।

ঘরের মধ্যে বসে যখন, বাইরে আলোকের গলার স্বর শোনে, তখন নিজেকে বধির করে রাখতে চায় বিনু। যখন পুকুরের জল সদ্যে চলকায়, যখন সাঁওতাল পরগণার নীরবতা দ্রুতগামী ঘোড়ার পায়ের শব্দে ওচাকার ঘর্ঘরে ভেঙে যায়, গভীর রাতে মোরাবের ওপর ভারী পায়ের আওয়াজ শোনা যায়, তখন বিনু সেই চির-বিরহিনীর মতো যেন শোকুলের বাঁশী শোনে।

যখন রাতে তাস খেলার আসর বসে, তখন আলোকের ঘরে বেজে ওঠে রেকর্ড। সাঁওতাল পরগণার শীতার্ত নিস্তব্ধ রাতে গান স্পষ্ট উদাত্ত হয়ে বাজে। ওদিকে গান বাজে। এদিকে খেলা। শুধু খেলা নয়, তার মধ্যেই অন্তরঙ্গতাতে নানান চঞ্চলতা। শীলা বলে ওঠে, 'এই, ঘুরু হল। লোকটা কোলকাতায় চলে গেলেই তো পারে। বিরহীর মতো এখানে কেন?' সাধন বলে 'নন্সেন্স!' অনাদি বলে, 'বেচারী করে কী?' বলে বিনুর দিকেই তাকায়।

বিনু একটু হাসবার চেষ্টা করে, আরও মনযোগী হয়ে ওঠে খেলায়। তবু একটা অন্ধকার ঘর তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। যে ঘরের দুদিকে দুটি লোক চুপচাপ গালে হাত দিয়ে বসে আছে। একজন বৃদ্ধ একজন যুবক। আর রেকর্ডের পর রেকর্ড সাজিয়ে, বাজিয়ে চলেছে।—'হার মানা হার পরাব তোমার গলে—দূরে রব কত আপন বলের ছলে।'···'অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো সেই তো তোমার আলো'···'তুই ফেলে এসেছিস কারে, মন, মনরে আমার। তাই জনম গেল, শান্তি পেলি না রে, মন, মনরে আমার।'···'আজি যে রজনী যায় ফিরাইব তায় কেমনে···।' একটার পর একটা বাজতে থাকে। বাজতে থাকে সুকণ্ঠ গায়ক গায়িকাদের গলায়। শীলা ধমকায় সাধনকে, 'তাস

দেখুন, আমার দিকে দেখলে খেলা হবে না।' অনাদির দিকে ফিরে তাকাতে হয় বিনুকে। কারণ অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে, একবার না তাকালে ভালো দেখায় না। প্রমাণ হয় না, বিনু তার সৌভাগ্য অবহিত। আর 'টু হাইস্ট।···টু ডায়মণ্ড্।···নো বীট।' খেলার ডাক চলে। সব থেকে ভালো খেলে অনাদি, তারপরে শীলা। তারপরে বিনু, সব শেষে সাধন। খেলায় ওর একটুও মনযোগ থাকে না।

তবু যতক্ষণ রেকর্ড বাজে, ততক্ষণ একটা ঘোরে কাটে। যখন থেমে যায়, দাঁওতাল পরগণার নিরুনতা গম্ভীর হয়ে আসে, তখন আর ভালো লাগে না বিনুর। মনযোগ নষ্ট হয়ে যায়। তার শ্রবণ পড়ে থাকে বাইরে। দাঁওতাল পরগণার অন্ধকারের নিঃশব্দতা আলোককে নিশির ডাকের মতো হাতছানি দিয়ে নিয়ে যায়। এবার সে যাবে। ফিরবে অনেক রাত্রে।

ঘোর দুপুরে দুদিন বিনু পা টিপে টিপে গিয়েছিল আলোকের ঘরের কাছে। ওর ঘর সব সময়েই হাট করে খোলা। একদিন দেখেছিল আলোক ঘরে নেই। উঁকি দিয়ে দেখেছিল জানালা দিয়ে। ছড়ানো ছিটানো জামা প্যান্ট। অগোছালো বিছানায় ছড়ানো কতগুলি রেকর্ড। আর অজস্র লক্ষেন্স টফীর খালি বোতল। গলার স্বর শুনে, ভবতোষবাবুর জানালার দিকে তাকিয়েছিল। দেখছিল ভবতোষবাবু ইজেলের কাছে দাঁড়িয়ে ছবি আঁকছেন। আলোক চুপ করে বসে রয়েছে। ভবতোষ মাঝে মাঝে কী যেন বলছেন। বিনু তাড়াতাড়ি চলে এসেছিল।

আর একদিন, বেশীদূর অগ্রসর হতে পারে নি বিনু। কাছে আসবার আগেই দেখেছিল, আলোক চুপ করে বসে আছে জানালায়, দূরে মাঠের দিকে তাকিয়ে। কিন্তু সেই শীতেও আলোকের খালি গা। ওর চওড়া পিঠটাই দেখতে পেয়েছিল বিনু। একটি বলিষ্ঠ হাত জানালার গরাদের বাইরে এলিয়ে পড়েছিল। বিদেশে এসে বুঝি অনেকদিন চুল কাটা হয়নি। তাই মাথা ভর্তি বুরু চুল ঘাড়ের কাছে এসে লটিয়ে গিয়েছে।···কয়েক মুহূর্ত! বিনু জানত, গল্পের আসর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে সে। অনাদি যে কোনো মুহূর্তে বেরিয়ে আসতে পারে। কিন্তু আলোকের দিকে তাকিয়ে, একটা ঢিক ব্যথায় যেন আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল বিনু। একটা বিশাল পুরুষ, কিন্তু যেন এই পৃথিবীতে সে নিতান্তই একা। অত্যন্ত অসহায়। বিনুর একবার ইচ্ছে হয়েছিল, আলোকের মাথায় একটু হাত রাখে। ওর গায়ে একটু চাকা দিয়ে দেয়।

মনে করা মাত্র বিনু ফিরেছিল। না! ওখানে যাবে না, ওর কাছে যাবে না বিনু। আলোক নিষিদ্ধ পুরুষ, ওটা নিষিদ্ধ এলাকা। ওই পুরুষ আর ওই ঘরটা বাস্তবে নেই। বিনু তার শীর্ষবিন্দুর কাছাকাছি উঠেছে।

সে তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছিল। আর মনে মনে বলেছিল, ভগবান, আর একবার, আর একটি সন্ধ্যাবেলার বাসার সন্ধান আলোককে দিও।

একদিন হঠাৎ অনাদি জিজ্ঞেস করেছিল, ওর সংগে আপনার পরিচয় নেই?

আলোকের কথা বলেছিল অনাদি। বিনু ঘাড় কাৎ করে জানিয়েছিল হ্যাঁ।

—কিন্তু কথা বলতে দেখিনি তো।

বিনুর বুকের মধ্যে ধক করে উঠেছিল। অনাদির চোখের দিকে সে তাকায় নি। একটু অস্বাভাবিক উজ্জ্বল বিদ্রূপে সে হেসে উঠেছিল শুধু। যেন বোকাতে চেয়েছিল, ওই লোকটার সংগে সে আবার কী কথা বলবে।

অনাদিও হেসে উঠেছিল। বলেছিল, একটু কথা বললেই পারেন। বেচারী বেভাসে আপনার দিকে তাকায়!

বিনু একটু বেশী প্রগলভ হবার চেষ্টা করে বলেছিল, তাই বুঝি? আচ্ছা আপনার কথা রাখবার চেষ্টা করব।

তারপরে সহসা দুজনেই হেসে উঠেছিল। সেই বুঝি বিনু অনাদির সামনে প্রথম সশব্দে হেসেছিল। এবং অনেকক্ষণ—অনেকক্ষণ ধরে তার সে হাসির রেশ ছিল। আর এত বেশী প্রগলভ হাসির লজ্জায় চোখে মুখে হাত চাপা দিয়েছিল।

কিন্তু একটা বিষয় বিনু খেয়াল করে দেখে অবাক হয়েছে। অধ্যাপক নলিনাক্ষ যেন আগের থেকে একটু গম্ভীর হয়ে উঠেছেন। অনাদি এবং শীলার সংগেও ওদের স্বামী-স্ত্রীর আলাপ হয়েছে। নলিনাক্ষ আসেন

প্রায়ই। রাস্তায়ও দেখা হয়। অধ্যাপক গিন্নির বর্ণাঢ্য সাজ পোশাক এবং চোখে ঠোঁটে গালে রঙের বহর একটুও কমে নি। কিন্তু ওদের দুজনকেই পথ চলতে প্রায় নীরব থাকতে দেখা যায়। কেউ কারুর সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা বলে না। নলিনাক্ষকে দেখলে মনে হয় অসুস্থ, রাত্রি জাগা মানুষ।

পিণ্টুটা হঠাৎ খুব নিইয়ে গিয়েছে। আগের মত বকবক করে না, ছোটে না। খেলার জন্যে এসে ধরা দেয় না। আরও ভীরু হয়ে উঠেছে। আরও পা টিপে টিপে চলে। আর কষ্ট হয় মঞ্জুলিকাকে দেখে। ওকে শান্ত মনে হত। কিন্তু বয়সের থেকে বেশী গম্ভীর মনে হত না। এখন তাই মনে হয়। দুপুরবেলা পুকুরঘাটে চুপটি করে বসে থাকে। কিংবা কোনো গাছতলায়। প্রখর প্রখর মনে হত, বেচারীর কোনো সঙ্গী নেই। তাই একলা একলা মন মরা হয়ে থাকে। কিন্তু কাছে গিয়ে টের পেয়েছে, ঠিক তা নয়। শুধু সঙ্গীর অভাব নয়। আর কিছু। বিনু দেখেছে, মঞ্জুলিকার চুল ভালো করে আঁচড়ানো থাকে না। ফ্রকের বোতাম আটতেও ভুলে যায়। সাবানগোছার দাম দিয়েও যায় না। এবং ওর চোখের গভীরে যেন একটা কান্না থমকে আছে।

দু একদিন জিজ্ঞেস করেছে বিনু, এমন চুপচাপ বসে আছ যে?

মঞ্জুলিকা বলে, ভালো লাগে না।

বলেই, চোখের দৃষ্টি নত করে রাখে।

বিনু নিজেই হাত বাড়িয়ে বোতাম লাগিয়ে দিতে দিতে বলেছে, বোতাম লাগাও নি কেন?

মঞ্জুলিকা বলে, মনে ছিল না।

অস্বস্তি লাগে বিনুর। অথচ ওর মা সব সময়ে পরিপাটি। মেয়েকে এমন করে ঘুরতে দেয় কেন। সে কথা জিজ্ঞেস করা যায় না। যাওয়া, খাওয়া, পড়া ইত্যাদি কথা জিজ্ঞেস করে বিনু। মঞ্জুলিকা সুরহীন গলায় জবাব দেয়। অনেক কথার পর বলি বলে, আমার আর এখানে একটুও ভালো লাগছে না। কবে যে কলকাতায় যাবে।

বিনু বলে, মাকে বল না কেন?

মঞ্জুলিকা যেন ভীরু বিস্ময়ে কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ তাকিয়ে থাকে। তারপরে বলে, বললে বকবে।

—কেন?

মঞ্জুলিকা নিরুত্তর। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে। যেন কিছু বলে ফেলবে, সেই ভয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

কিন্তু পিণ্টুর কাছে অনেক বেশী সংবাদ পাওয়া যায়। পিণ্টুটির রাগ এবং ঘৃণা চাপা থাকে না। বলে, বাবা মা দরজা বন্ধ করে কেবল ঝগড়া করে। আর গালাগালি দেয়। আর খারাপ খারাপ কথা বলে।

রুচিসম্পন্ন নলিনাক্ষকে দেখলে এসব কথা বিশ্বাস করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। মঞ্জুলিকা পিণ্টুকে ধমক দেয়। পিণ্টু মানে না। বলে, বলবই তো। মাকে বাবা ছিনাল বলেছিল। মা বাবাকে পাউডারের কৌটা ছুঁড়ে মেরেছিল।

একথা যেদিন বলেছিল পিণ্টু, মঞ্জুলিকা লাফ দিয়ে উঠে পিণ্টুর মুখটা তার বুকে চেপে ধরেছিল। পিণ্টু হাত পা ছুঁড়ে, নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করেছিল। পারে নি। মঞ্জুলিকা তাকে আশ্চর্য শক্তিতে চেপে ধরেছিল। যাতে সে আর মুখ না খুলতে পারে। মঞ্জুলিকা ভয়ে থরথর করে কাঁপছিল।

বিনু তাড়াতাড়ি বলে উঠল, ওকে নিয়ে একটু বেড়িয়ে এস।

বলে সে পালিয়ে এসেছিল। কিন্তু বুকের মধ্যে কাঁপছিল। আশ্চর্য! কী অবিশ্বাস্য! প্রাণ ধরে যেন বিশ্বাস করতে পারে নি বিনু। বলতেও পারে নি কাউকে। কাকে বলবে। অনাদিকে? সাধন শীলাকে? বিনু জানে, ও সব শোনার কারুর গরজ নেই। শুনলেও শুধু নোংরা মুখরোচক আলোচনার আসর বসাবে। বিনুর নিজের মনে হয়েছে, এ সব শোনা ভালো নয়, উচিতও নয়। তবু পিণ্টু যখন বলে, তখন তার কৌতূহল বাধা মানে না।

যে দিন মঞ্জুলিকা কাছে থাকে না, সেদিন পিণ্টু স্বাধীন ভাবে অনেক কথা বলে যায়। শুনব না শুনব না করেও প্রবৃত্তিকে দমাতে পারে না বিনু। পিণ্টুর কথা থেকে সে এটুকু আবিষ্কার করেছে, একদা নলিনাক্ষদের কলেজেই পিণ্টুর মা ছাত্রী ছিল। কিন্তু

দেখাপড়া থেকে, ভদ্রমহিলা বেশী নাটক করে বেড়াত। নাচতেও পারত। কিন্তু মা দেখতে সুন্দর, তাই নাকি বাবা হ্যাংলার মতো মায়ের পিছু পিছু ঘুরত। তারপরে, বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু মা বাবার বন্ধু আর কলেজের ছেলেদের সঙ্গে খালি ঘোরে। মা ইচ্ছে করলে বাবার চাকরি নাকি খেয়ে দিতে পারে। মা বাবাকে ছেড়ে চলে যেতে চায়। বাবা যেতে দেয় না। কলকাতাতে রোজ ঝগড়া। এখানে এলেও রোজ ঝগড়া।

আশ্চর্য পাকা পাকা কথায় পিন্টু সব বলে যায়। ঠিক যেমন শোনে, যে ভাষায় শোনে, তেমনটি বলে। অথচ অবাক লাগে এই ভেবে, মঞ্জুলিকা যাদের প্রথম সন্তান, তাদের বিবাহিত জীবন নিশ্চয় ষোল সতর বছর হয়ে গিয়েছে। তবু ওদের পাশের আগুন এখনও নিভে নি।

এ আবিষ্কারে বিনুর শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসে। যেন ভয় পেয়ে সে পিন্টুর কাছ থেকে পালিয়ে যায়। কিন্তু ঘরেও যেতে পারে না। যেখানে অনাদি আর শীলা সাধন থাকে। মনে হয় চারদিকেই ছলনা, মিথ্যা আর আগুন নিয়ে খেলা।

পরমুহূর্তেই ভাবে আবার শেষ চড়াই। ছেলেবেলা থেকে মিথ্যে ছলনা কি কম দেখেছে বিনু। হয় তো এইটাই সংসারের আসল রূপ। কোথায় সে অত্যন্ত প্রকট কুৎসিৎ। কোথাও প্রত্যহের নানান গ্লানির মধ্যে মিশে থাকে।

সংসারে কত কী ঘটে। কী এসে যায়। বিনু উঠছে তার শীর্ষবিন্দুতে।

শেষ চড়াইয়ে উঠছে গাড়িটা। অরণ্য প্রায় শেষ হয়ে এল। সুদীর্ঘ চড়াইয়ের দু'পাশে এতক্ষণ এক পাশে ছিল পলাশবন। আর এক পাশে এলোমেলো অরণ্য। অর্জুন দেবদারু ইউক্যালিপ্টাস আর পলাশের ঝাড়। অল্প কিছু লোক বসতি।

এতক্ষণ আকাশ ঢেকেছিল ঘন। রোদ আড়াল করে রেখেছিল।

আকাশ ক্রমে মুক্ত হয়ে এল। গাড়ি যতই উঁচুতে উঠতে লাগল, আকাশ যেন ততই নীচে নেমে এল। রোদ ঢেলে দিল অজস্র অকৃপণ ধারায়। গাড়ির গতি মন্থর হয়ে আসতে লাগল। তৃণহীন পাথরের বিস্তার বেড়ে বেড়ে উঠল। রাস্তার দু'পাশেই, আরণ্যক আদিম পশুর পিঠের মতো ধূসর রঙের পাথর জেগে উঠল। আর চাপা গম্ভীর গর্জনের মতো শব্দটা ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠল।

ঘোড়াটার নাসারন্ধ্র ফুলছে। কাঁধের কোমরের এবং পায়ের পেশীগুলি ক্রমেই স্ফীত স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

শীলা হাসছে খিলখিল করে। টাঙার মধ্যে সাধন প্রায় আধ শোয়া, সর্বাঙ্গে র‍্যাপার মুড়ি দেওয়া। দু'হাতে র‍্যাপার জোর করে চেপে ধরে আছে শীলা। সাধন ছটফট করছে খোলবার জন্যে। শীলা ছাড়ছে না।

আরও খানিকটা দূরে এগিয়ে চলেছে আর একটা টাঙা। অনাদি আর বিনু রয়েছে সেই গাড়িতে। ওরা সামনের দিকে ফিরে বসে আছে। বিনুর গায়ের উলেন স্কার্ফ-এর এমব্রয়ডারি করা আঁচল এলিয়ে রয়েছে। পিছনেই বিনুর সীটের ওপরেই, বিনুর প্রায় কোমরের কাছে অনাদি তার হাতের ভর রেখেছে। কোটের হাতা গুটিয়ে, মনিবন্ধের ঘড়িটা বেরিয়ে পড়েছে।

এই উঁচু পাহাড় এবং একটানা চড়াইয়ের পথে, দুটো গাড়ি না হলে, চারজনের আদা সম্ভব হয় না। তবু বেলা দশটা থেকে প্রায় একটার মধ্যেই এসে পৌঁছল গন্তব্যে। এই সুদীর্ঘ চড়াইয়ের পথ, ঘণ্টায় প্রায় আট নয় মাইল বেগে এসেছে! মূলগঞ্জ থেকে তেইশ চব্বিশ মাইলের দূরত্ব। দেবী প্রপাতের গর্জন ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠছে। দেবী হয় তো দেবী। গর্জন শুনেই বোঝা যাচ্ছে, তার মুক্ত ধারার এই শীতেও প্রবল বেগ। এই উচ্চ চড়াইয়ের ভূমিতেও তার সগর্জিত পতনের কাঁপন এসে যেন লাগছে।

বেলা দশটার মধ্যেই কিছু খাবার তৈরী করে নেওয়া হয়েছে। দেবী প্রপাতের ধারে আজ চারজনের পিকনিক। এই শেষ বেড়ানো। তিন দিন পরেই কলকাতা ফিরে যাওয়া স্থির হয়েছে।

সাধন ওর র‍্যাপারের ভিতর থেকে ছটফট করতে করতে ককিয়ে উঠল, শীলা, আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

শীলা ছেড়ে দিয়ে, র‍্যাপারটা খুলে দিল। বলল, কেন? শীতের চোটে মাথা মুড়ি দিয়েছিলেন যে।

সাধনের নিঃশ্বাস পড়ছে ঘন ঘন। ঘেমে উঠেছে প্রায়। ছোট মুখটা চুলে ঢেকে গিয়েছে। চারদিকে হাতড়াতে

ব্যস্তভাবে বলল, আমার চশমাটা কোথায় গেল।

চশমা না হলে সাধন প্রায় অন্ধ। শীলা বলল, সত্যি, বুড়ো মানুষের নানান ঝঞ্ঝাট। বললেন না কেন, একটা সিকদানী নিয়ে আসতাম। ঘরে ঘরে কাশতে কাশতে বেতেন।

চশমাটা খুঁজে পেয়ে চোখে দিয়ে, সাধন একটা স্বস্তির শব্দ করল। বলল, আঃ! এখন কী সুন্দর রোদ উঠেছে। কিন্তু একি, তুমি সোয়েটার খুলে ফেলেছ! এই পাহাড়ের ওপরে তো বেশী শীত!

শীলার উচ্ছল যৌবন বর্ণের রেশমী শাড়ির আঁচল প্রায় সাধনের ব্যাপারের ওপরেই ছড়ানো। ঝকঝকে সোনালী রঙের ব্লাউজের ওপরে বাঁ কাঁধে ঈষৎ ছোঁয়ানো রয়েছে শাড়ির প্রান্ত। বাঁ হাতে সে ভর রেখেছে একটুখানি হেলে। পা ছড়িয়ে দিয়েছে গাড়ির পিছনে, সাধনের দিকে। প্রায় হাঁটুর কাছে পর্যন্ত শাড়ির আবরণ মুক্ত এক পা, রোদে চান করছে। পায়ে আলতা নেই। কিন্তু নখগুলি রক্তের রঙে এনামেল করা। সংক্ষিপ্ত ব্লাউজের নীচে আর নীবিবন্ধের ওপরে, সোনা শ্যামালো পীনোন্নত বুকের ছায়া পড়েছে। শরীর কাঁপছে শীলার। সে হাসছে। বলল, আমাকে দেখে কী মনে হচ্ছে আমার খুব শীত করছে?

সাধন যেন ভেবে পায় না, শীলার কোথায় চোখ রাখবে। চোখে চোখ রাখা যায় না। বুকের দিকে তাকাতে গেলে, দৃষ্টি নীচে চলে যায়। নীচে গেলে, আবার ওপরে আকর্ষিত হয়। বলল, তোমার তো কখনোই শীত করে না।

শীলা ঠোঁট উল্টে বলল, না মাস্টারমশাই। শীতের সময় শীত করে আমার। বুড়ো মানুষের মতো সব সময়ে আমি ঠকঠক করে কাঁপি নে।

সাধনের মনে হয়, তার চোখের কোলে যেন জোক লাগানো রয়েছে। ভিতর দিকে রক্ত টানছে চো চো করে। চোখ দুটি ক্রমেই ভিতরে বসে, তাকে যেন দুর্বল করে দিচ্ছে। আর ধপধপ করে জ্বলছে। অরণ্য আদিম দেবীর কাছে যেন নম্রমস্তক মানুষ কাঁপে, শীলার দেহের ছটায় মন ধাঁধিয়ে যেন তেমনি করেই কাঁপছে সাধন। আজ পনর দিন ধরে কাঁপছে। ভাবছে, 'আমাকে সেই ভুল ভাবছে শীলা।'

সাধন হঠাৎ গম্ভীর, প্রায় কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, আচ্ছা আমি কি সত্যি বুড়ো শীলা?

সাধনের মোটা লেন্সের ওপারে, বড় বড় চোখে মুগ্ধ-ত্রাস প্রশ্ন। জবাবের প্রত্যাশায় আরও বড় এবং লাল দেখাচ্ছে।

প্রশ্নটা শীলা এক মুহূর্ত থমকে রইল। ভ্রূ কাঁপাল একবার। পরমুহূর্তেই তার রাঙানো ঠোঁটের ছাপ পদ্মর থেকে একটা তীব্র হাসির বেগ ফেটে পড়ল। হাতের ভর শিথিল করে সে একেবারে এলিয়ে পড়ল।

সাধনের মনে হল সেই দুরন্ত হাসির বেগে শীলার জামাটা ছিঁড়ে যাবে হয় তো! ওর উত্তরল দেহের সঙ্গে সারা পৃথিবীটাই কাঁপছে যেন।

ঘোড়াটা হঠাৎ চমকে, এই চড়াইয়ের ওপরেই দৌড়বার চেষ্টা করল। গাড়িটা দুলে উঠল জোরে। টাঙাওয়ালা জিভ দিয়ে শব্দ করে, শান্ত করল ঘোড়াটাকে। ফিরে তাকাল একবার।

বিনুও ফিরে তাকাল পিছনে। কিন্তু অনাদি তাকাল না। সে তার পিছনের জানা দিয়ে, বিনুর পিঠে একটু চাপ দিয়ে স্পর্শ করল। বিনু ফিরে তাকাল অনাদির দিকে। অনাদির মুখটা এত কাছে, বিনুর শরীর আড়ষ্ট হয়ে গেল। তবু বিনু হাসল। কারণ অনাদি হাসছে।

অনাদি বলল, দুটিই উন্মাদ। ওদের নিয়ে ওদের থাকতে দিন।

কিন্তু এত কাছে অনাদির চোখ। আর এই নীল স্ফটিকের মতো আকাশ, ঝকঝকে রোদ। বিনু সহসা ভয় পেল। তার মুখের ব্রণের দাগগুলি খুব স্পষ্ট আর বিশ্রী হয়ে ওঠে নি তো। অতিরিক্ত আলোয় তাকে বেশী শীর্ণ দেখাচ্ছে না তো। সে যে তার শীর্ণবিন্দুতেই পৌঁছেছে। অনাদি তার সম্মতি এক রকম জানিয়েই দিয়েছে। কলকাতায় ফিরে গিয়ে, হয় তো অগ্রহায়ণের এই শেষ কদিনের মধ্যে শুভদিন থাকলে বিয়ে মিটিয়ে ফেলা হবে। এখন শুধু টাল সামলানো। চড়াইয়ের শিখরে স্থির শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারা। কিন্তু সাধন···সাধনটা কী হয়ে যাচ্ছে। নিরীহ শান্ত ভাইটি

কী অবস্থা নিয়ে কী চেহারা নিয়ে বাড়ি ফিরবে। যেন দুরন্ত নাগরদোলায় চেপে, ছেলেটা ভয়ে শক্ত হয়ে আছে। চোখ উলটে যাচ্ছে। চৈতন্য লোপ পাচ্ছে। বমি করছে গলগল্ করে। তবু খুশিটাকে রোধ করতে পারছে না।

শীলার হাসিটা আস্তে আস্তে থেমে এল। হাসির ক্লান্তিতে কাৎ হয়ে পড়ল সে। তাতে ওর স্তনান্তরের কাছে জামাটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল এবং অন্তর্গামিনী একটি পথ পেয়ে, গলার ঝুটো মুক্তোর মালা ভিতরে ঢুকে গেল। পাশবালিশ ভড়ানোর মতো করে একটা পা তুলে নিয়ে এল। পায়ের থেকে মাথা পর্যন্ত দেহের প্রতিটি রেখা সুস্পষ্ট হয়ে উঠল।

সাধন যেন অবশ হয়ে গিয়েছে। শীলার হাসি তখনও তার বুকে বাজছে। আর তার বুকের পাখা থরথরিয়ে কাঁপছে, পুড়ছে একটু একটু করে।

শীলা বলল, আপনি বুড়ো নন। আয়না থাকলে দেখতে পেতেন। আপনি হুতে একটা পর।

বলে শীলা নিঃশব্দে ফুলে ফুলে হাসতে লাগল। একটা অস্বাভাবিক, প্রায় হিস্টিরিয়াগ্রস্ত হাসির মতো মনে হচ্ছে। বাসি চুল তার কপালে পড়েছে এলিয়ে। কেবল সে-ই জানে কি আসে নি, দেবী ধারায় স্নান করবে বলে। ঘোরে এবং হাসির দমকে, তার উজ্জ্বল শ্যাম বুক টকটকে লাল দেখাচ্ছে।

সাধন প্রায় ফিসফিস্ করে বলে উঠল, কিন্তু শীলা আমি···আমি···আমি তুমি যা ভাবছ···।

গাড়িটা দাঁড়িয়ে গেল। টাঙাওয়ালা ঘোষণা করল, এবার উতরনে পড়েগা সাব্। আর সেই মুহূর্তেই দেবী প্রপাতের গর্জন হঠাৎ তীব্র হয়ে উঠল। সাধন দেখল, বিনুদের টাঙাটাও সামনেই দাঁড়িয়ে পড়েছে। নেমে পড়েছে বিনু অনাদি। ওদের টাঙাওয়ালাটা নির্দেশ দিচ্ছে, ঝরনার কাছেই গাছতলা আছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জায়গা। সেখানে বসেই সাহেবরা খানা খেতে পারবেন। খাবার জল যদিও সঙ্গে আছে, তবু ঝরনার জলও খাওয়া যেতে পারে। অনুমতি করলে, টাঙাওয়ালা সবই নীচে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারে।

সেই অনুমতিই তাকে দেওয়া হল। শীলা লাফ দিয়ে উঠে ওর, ভোয়ালে জামা কাপড় সহ ব্যাগটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, এটা নিয়ে যাও। কিন্তু, কলসটা কোথায়? শুধু শব্দ শুনছি, দেখতে পাচ্ছি নে তো।

টাঙাওয়ালা সামনের পথ দু হাতে বলল, এই উৎরাইটা দিয়ে নেমে যান। ডাহিনে মোড় নিলেই ঝরনা পাওয়া যাবে।

ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেটা একটা চড়াইয়ের শিখর। যেন একটা আলাদা পাহাড়। এর ওপারেই আর একটা ন্যাড়া পাহাড় দেখা যাচ্ছে। সেইদিকে আঙুল দেখিয়ে টাঙাওয়ালা বলল, ঝরনাটা ওই পাহাড় থেকে নেমে আসছে।

অনাদি সাধনের দিকে ফিরে বলল, চল যাওয়া যাক।

শীলা সকলের আগে ছুট দিল। সাধনের আর অনাদির কথার জবাব দেওয়া হল না। ব্যাগটা হাতে নিয়ে সে শীলাকে অনুসরণ করে চেঁচিয়ে উঠল, আস্তে শীলা, হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবে।

উৎরাইয়ের নীচে থেকে শীলার গলা ভেসে এল, আপনি নিজেকে সামলান।

বিনু ওদের পথের দিকে তাকিয়েছিল। অনাদি ওর সেই একই রকমের নীচু মোলায়েম গলায় বলল, ভয় পাচ্ছেন?

বিনু বলল, দুজনেই না পড়ে যায়।

অনাদি বলল, আমার বোন আর আপনার দাদা, দুজনেই কোয়াইট ট্রেন-আপ। ভয় নেই।

অনাদি হাত বাড়িয়ে পথ দেখাল। টাঙাওয়ালারা পিছনে পিছনে এল টিফিন কেরিয়ার, জলের পাত্র, গেলাস, ফ্লাস্ক্ আর ব্যাগ নিয়ে।

শীলা হরিণীর মতো লাফিয়ে ঝাঁপ নেমে, একেবারে জলস্রোতের সামনে এসে দাঁড়াল। বিশাল পাথরের অট্টহাসির মুখ থেকে যেন, সাদা ফেনলোচ্ছল সফিলা ঝরে পড়ছে। খুব উঁচু নয়। কিন্তু তিনটি পর পর ধাপে বাধা পেয়ে যেন দেবী প্রপাত ফুঁসে ফুঁসে গর্জন করে উঠেছে। বৃষ্টির ছাটের মতো জলকণা ছড়িয়ে পড়ছে অনেক দূরে। ধারা নীচে নেমেই, সমুখ দিকে এগিয়ে সহস্র বাধা পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। পরমুহূর্তেই সরোষ বাঁকে, ঘাড় ফিরিয়ে গর্জন করে ছুটে চলেছে পুবে, নীচের দিকে, যেখানে শালবনের শির জেগে রয়েছে। দেবী প্রপাত যোষণা ওখান থেকেই

হেমন্তদিঘির জনপদের ওপর ছুটে গিয়েছে।

যারা যেখানে প্রথম পতনের আবর্ত তুলেছে, সেখান থেকে একটু সরে, শীলা হাত দিয়ে জল স্পর্শ করল। সাধন এসে ততক্ষণে দাঁড়িয়েছে কাছে। জলে হাত দিতে দেখেই বলে উঠল, উহুঁ, এত কাছে জলে হাত দিও না শীলা। টেনে নিয়ে যাবে।

প্রপাতের গর্জনে সাধনের কণ্ঠস্বর প্রায় শোনাই গেল না। শীলা ভ্রূ কুঁচকে, পিছন ফিরে তাকাল। চেঁচিয়ে বলল, কী বলছেন।

বলতে বলতে শীলার চোখে দুষ্টুমির হাসি ঝলকে উঠল। সাধন বলল, বলছি যে—।

তার আগেই, অঞ্জলি ভরে জল তুলে শীলা ছুঁড়ে দিল সাধনের গায়ে। গায়ে যেন কাদা পড়েছে সাধনের। আর্তনাদ করে ছুটে পালাল সে।

শীলা হেসে পাথরের ওপর প্রায় লুটিয়ে পড়ল। বলল, এবার দুষ্টোর ভীমরতি কাটাবার ওষুধ পেয়েছি। আজ আপনাকে চোবাবো।

দূরের গাছতলা থেকে সাধন আর্তনাদ করতে লাগল, প্রীজ্ শীলা···।

অনাদি আর বিনু এসে দাঁড়াল দূরের গাছতলায়। টাঙাওয়ালারা জিনিষপত্র সব নামিয়ে দিল সেখানে। জানাল, তারা ঘোড়াকে ঘাস পানী খাওয়াতে যাচ্ছে। সাহেবরা যেন চারটের মধ্যে ওপারে উঠে যান। নইলে ফিরতে অন্ধকার হয়ে যাবে। পথটা ভালো নয়।

বিনু পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল প্রপাতের দিকে। অনাদি কোটটা খুলে রেখে দিল ঘাসের ওপর। বাতাসে পর পাতলা সিল্কের টাই উড়তে লাগল ঘাড়ের কাছে। সাধনের দিকে ফিরে বলল সে, কী জল দিচ্ছে গায়ে?

—দ্যাখ না এই শীতে···আর কী ঠাণ্ডা জল!

—নেমে পড় না।

—মাথা খারাপ! বাব্বা ও জলে নামলে নির্ঘাৎ নিউমোনিয়া।

—এই ভয়ে ভয়েই দেখছি, তোমরা সব চুপসে রয়েছ। বলে অনাদি মুখ টিপে হেসে, বিনুকে অনুসরণ করল।

দেবী প্রপাতের পাহাড়টাই গাছপালাহীন। এদিকটায় গাছ কিছু কম নেই। একটি মন্দিরও রয়েছে অদূরেই। সেখান থেকে ধোঁয়া উঠছে। আশেপাশে, নানান অচেনা জঙ্গলের ঝাড়। তাতে নানান গন্ধবিহীন ফুল ফুটে রয়েছে।

শীলা চীৎকার করে ডাকল, সাধনদা, আসুন।

সাধন তাকিয়ে রইল। কিন্তু নড়তে পারল না। সেই ওষুধ-অবশ ঘণ্ডের মতো অবস্থা। দেবী পাহাড়ের ঘুরন্ত পটে শীলা দীপ্ত শিখার মতো কাঁপছে! সে যথাসাধ্য চেঁচিয়ে বলল, জল দেবে না তো?

দূর থেকে ওরা তিন জনেই হেসে উঠল্। তারপর তিনি জনেই গাছ তলার দিকে এগিয়ে এল। সাব্যস্ত হল, বেলা প্রায় দেড়টা। খেয়ে দেয়ে বেড়ানো হবে। শীলার স্নানও তখন হবে।

সাধনের গলায় প্রায় স্বর নেই। সে কোন রকমে শ্বাসরুদ্ধ গলায় আবার ডাকল, শীলা এবার উঠে এস।

দেবী প্রপাতের প্রধান ধারা থেকে, অনেকটা পুবে, একটা বাঁকের আড়ালে জলে নেমেছে শীলা। সাধনের মনে হচ্ছে, সে একটা স্বপ্নের রাজ্যে এসে পৌঁছেছে। যেখানে স্বর্গচ্যুত মৎস্যকন্যা জলকেলী করছে তার সামনে। কিন্তু মৎস্যকন্যার দেহের গঠনে কিছু অবাস্তব অলৌকিকতা আছে। এখানে তা নেই। এখানে মৎস্যকন্যা নিখুঁত মানবী অঙ্গে হিল্লোল তুলছে। শীলার গৌর রঙ রেশমী শাড়ি, উচ্ছল গোলাপী জামা, আর অন্যান্য অন্তর্বাস ওপরের পাথরে লুটিয়ে রয়েছে। অন্য একটা নীল শাড়ি, সংক্ষিপ্ত অন্তর্বাসের ওপর জড়িয়ে সে নেমেছে। কিন্তু দেবী প্রপাতের স্রোতের তীব্রতায় সে আবরণ দুর্বল। কাচ স্বচ্ছ অগভীর। রৌদ্রচকিত জলের কোথাও সামান্যতম অস্পষ্টতা নেই। শীলার আন্দোলিত পায়ের রক্ত-রঙ নখগুলি পর্যন্ত স্পষ্ট চোখে পড়ছে। সাধন দেখছে। পায়ের আগুন লাগা পাতলাটা পুড়তে পুড়তে দেখছে স্বর্গচ্যুতের সন্ধান। দেবী স্রোত লুব্ধ পাশবিকতায় সকল আবরণ ধরে টান দিয়েছে। আর মৃত্যুর আনন্দে ক্রন্দন অবশ পতঙ্গটা দেখছে, প্রায় স্খলিত নীবিবন্ধের নীচে। ঈষৎ পিঙ্গল রেখা নিম্ন স্তম্ভের গ্রন্থি স্পর্শ করতে নেবেছে। নাভিস্থলের ওপরে, গর্ভের পেশী শিরা পাতলা সংক্ষিপ্ত স্ফুরিত অন্তর্বাসের গভীরে

চুকেছে। সুগঠিত কাঁধের নীচে, বক্ষস্থল সহসা বহ্নির ঔদ্ধত্যে আন্দোলিত। স্রোতের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর সংগ্রামে জীবন কলি।

গলা শুকিয়ে গিয়েছে সাধনের। কিন্তু তার দৃষ্টি অন্ধ হয়ে যায় নি। তার মোটা পাওয়ারের লেন্স অঙ্গারের মতো জ্বলছে। তবু চোখ পুড়ে যাচ্ছে না। শুধু রক্তের মধ্যে পুড়ে যাচ্ছে। উঠে চলে যাবার শক্তি নেই। চলচ্ছক্তি রহিত হয়ে গিয়েছে।

তবু সে আবার বলল, শীলু, উঠে এস। অনেকক্ষণ হয়েছে।

শীলার গালে। দুপাশ দিয়ে ভেজা চুল ছড়িয়ে পড়েছে। ঘাড় নেড়ে ইঙ্গিত করে বলল, আপনি নামুন আগে, তা হলে উঠব।

জবাব দিতে পারছে না সাধন। দৃষ্টি তুলে আনতে পারছে না। মাতালের সোরে কেবল বলল, আমার আর জামা কাপড় নেই। তুমি উঠে এস।

শীলা জল ছুঁড়ে দেবে না, প্রতিজ্ঞা ছিল। তবু সে দু'হাতে জল নিয়ে খেলা করল। জলের মধ্যে গা ডুবিয়ে দিল সারা শরীর। বলল, ওই জামা কাপড় পুড়ই নামুন।

—তা হলে এই পড়ে আমাকে ফিরতে হবে।

—ফিরবেন।

—অসুখ করবে।

—করুক।

নিষ্ঠুর মৃত্যুর মতো আহ্বান। কিন্তু বাঁচার সাধ বুঝি তখনও একটু বাকি অবশিষ্ট ছিল। তাই নিশ্চল হয়ে রইল সাধন। শীলা হাসতে হাসতে জলে ডুব দিল। আর বুদ্ধ বুদ্ধ উঠে নিমেষে হারাল স্রোতে। আবার উঠল। বলল, একেই বলে বুড়ো, বুঝলেন।

জলের তলায় শীলার নিম্ন দেহ এগিয়ে এল।

সহসা সাধনের হাত মুষ্টি পাকিয়ে উঠল। কিন্তু সমস্ত অস্ত্রী কাঁপতে লাগল থরথরিয়ে। প্রায় চুপি চুপি বলল, আমি বুড়ো নই শীলু

শীলা হাসতে হাসতে আবার ডুব দিল। বুদ্ধ বুদ্ধ উঠল। নিমেষে হারিয়ে গেল। শীলার উর্ধ্বাঙ্গ জলের তলায় এগিয়ে এল। মাথা তুলে বলল, শুধু বুড়ো নন। একেবারে হাবড়া বুড়ো।

সাধনের বুকের মধ্যে একটা নিঃশব্দ চীৎকার উঠল। না আমি তা নই। আমাকে ও ভুল ভাবছে।

সাধন বলতে গেল, শীলু তুমি—

শীলা সহসা জলে কাপটা দিয়ে বলল, খুব হয়েছে। দেখুন তো কটা বেজেছে।

সাধন হাতের ঘড়ি দেখে বলল, সাড়ে তিনটে।

শীলা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল।—ও মা! ছি ছি, চারটের সময় যে যেতে হবে। যান, ভেগে পড়ুন, ভেগে পড়ুন। আমি জামা কাপড় পরে নিই।

নির্দেশমাত্র সাধন উঠে, নৌকা উল্টো দিকে হাঁটা আরম্ভ করল। বেশী দূর যাবার উপায় নেই। সামনেই গাছপালাহীন পাহাড়ের বাধা। সাধন দাঁড়াল। কিন্তু পাহাড় তার চোখের সামনে নেই। নিঃশ্বাস তার এখনো আটকে রয়েছে বুকে। তার সমস্ত রক্ত যেন একটা চড়াইয়ের শীর্ষে গলিত ভূধরের মতো টলোমলো করছে। উপছে পড়বে এখুনি।

কতক্ষণ সে দাঁড়িয়ে রইল, জানে না। সহসা পিঠে ধাক্কা খেয়ে ফিরে দেখল শীলা। হাতে ভেজা জামা। কাপড় পরে নিয়েছে। চুল বুঝে, সারা পিঠে ছড়িয়ে দিয়েছে। বলল, হয়েছে বুড়ো ঠাকুর্দা, এবার ফিরে তাকান।

সাধন কথা বলতে গিয়ে থতিয়ে গেল। শীলা তার গায়ের কাছে ঘন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবু সে বলল, শীলা তুমি ভুল—।

শীলা হঠাৎ হাতের ব্যাগটা নামিয়ে রেখে বলে উঠল, সময় হলে ওরা আমাদের ঠিক ডাকবে। চলুন এই পাহাড়টায় একটু উঠি।

বলেই সে সাধনকে হ্যাঁচকা টান দিল।

সাধন বলল, বড্ড খাড়া।

—একটু উঠলে চালু পাওয়া যাবে। আসুন।

দুজনে উঠতে লাগল। সাধন আগে যাবার চেষ্টা করল। পারল না। খানিকটা গিয়েই সে পিছনে পড়ল। তার যাবার সামনে শীলার পা দেখতে পেল সাধন। কিন্তু বড় খাড়া পাহাড়। সাধনের দম আটকে আসছে। ঘাম ফুটে উঠল। এবং ওপর দিকে চোখ তুলতে গিয়ে, শীলার পায়ের দিকে তাকিয়ে, সাধনের মনে হল, সে

হুড়মুড়িয়ে নীচে পড়ে যাবে। তার হাতে যেন শক্তি নেই।

শীলার গলা শোনা গেল, কী হল? আসুন।

উঠল সাধন। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, আর উঠো না?

—হয়ে গেল বুড়োর মুখোস।

শীলা একটা চওড়া পাথরের ওপর বসে পড়ল। হাত বাড়িয়ে দিল সাধনের দিকে।—ধরুন।

সাধন তার ঠাণ্ডা হাত দিয়ে শীলার হাত ধরল। শীলা প্রায় টেনেই তুলল। টেনে বুকের কাছে নিয়ে এল। সাধনের মনে হল তার চৈতন্য প্রায় লুপ্ত।

শীলা বলল, হি হি হাঁপাচ্ছেন আপনি। সত্যি একেবারে বুড়ো হয়ে গেছেন।

সাধন যেন প্রাণপণ শক্তিতে জেদ করে বলে উঠল, না।

—না?

শীলা খিলখিল করে হেসে উঠল। সাধন দেখল, শীলার রক্তাভ ঠোঁট। তার ফাঁকে ওর ঝকঝকে সাদা দাঁত। শীলা সহসা সাধনের কাঁধে হাত দিয়ে বেষ্টন করল। পা দিয়ে সাধনের পা ধরল কুলিয়ে। বলল, আহা, বুড়োর আবার জেদ আছে।

গন্ধ! আশ্চর্য, মদের থেকে তীব্র একটা গন্ধ যেন একেবারে মাতাল করে ফেলল সাধনকে। ওর অবাধ্য শরীর দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। বলল, বুড়ো নই আমি শীলা।

শীলা আরও জোরে চাপ দিল সাধনের কাঁধে। সাধন দেখল বুকের লাল রক্ত, সাদা মুক্তা ঝিকমিক করছে। আর একটা আশ্চর্য গন্ধ। শীলা হাসতে হাসতে বলল, আমি জানি না বুঝি, আপনি বুড়ো।

সাধন বলে উঠল, প্রমাণ দিতে পারি!

আর সেই মুহূর্তে ওর বুকের মধ্য থেকে কে যেন চীৎকার করে উঠল, থাক। সাধন থাক।

—কী প্রমাণ দেবি?

—তোমাকে আমি ভালবাসি শীলু।

শীলা পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুলে, খিলখিলিয়ে হেসে উঠল।

কিন্তু সাধন আর সে হাসি শুনতে পেল না। মুখ চুপি চুপি গলায় বলল, তাই তোমাকে আমার বিশ্বাস আছে।

শীলা আরও জোরে হেসে উঠল, আর লুটিয়ে পড়ল সাধনের প্রায় মৃত শরীরের ওপর। বলল, কিসের বিশ্বাস? বুড়ো প্রেমিককে ঠকাবে আর কারুর সঙ্গে জমব না?

—না।

সাধন যেন বিকারের ঘোরে

শোন শীলু—।

সাধনের বুকের ভিতর থেকে কে যেন আর্তস্বরে চীৎকার করছে, চুপ। চুপ সাধন। চুপ চুপ চুপ।

শীলা প্রায় সাধনের মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ল। সেই ঠোঁট। জন্তু দাঁত, হাসি, গন্ধ, আর সর্বাঙ্গে মৃত্যু বেষ্টিত। শীলা বলল, কী বলুন।

সাধন কাঁপতে লাগল। বিকারের শেষ ঘোরে সে বলল, আমি সত্য. তুমি আমাকে ঠাট্টা করছ? কিন্তু··· কিন্তু···আমি—।

সাধন চুপ। বুকের ভিতরে শেষ আর্তনাদ বেজে উঠল। কিন্তু আর একটা জেদী স্বর জবাব দিল, না, শীলা আমাকে ভুল ভাবছে।

সাধন বলে উঠল, আমি বিনুর থেকেও ছোট। সত্যি বলছি শীলু, তোমাকে বলছি, আমি এখনও, এখনও··· আসলে আমি ছোট।

হঠাৎ সাধনের মনে হল সে ধাক্কা খেয়েছে। শীলা তার গায়ের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিয়েছে। ধাক্কা দিয়ে পা সরিয়ে নিয়েছে। সাধন থরথর করে কাঁপতে লাগল। কিন্তু চোখের দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়ে এল। স্বচ্ছ চোখে দেখল, সে একটা পাথরের ওপর বসে আছে। আর তার পাশে, শীলার শাণিত তীক্ষ্ণ চোখ। ঠোঁটে ক্রুদ্ধ শ্লেষের বক্রতা। তীব্র গলায় বলে উঠল, তাই বলুন। এ সন্দেহ তো আমার প্রথমেই হয়েছিল। যাক, একটা ভুল করতে গিয়ে, আর একটা বলে ফেলেছেন। ভালোই হয়েছে।

শীলা হঠাৎ নামতে আরম্ভ করল। যেন এ আর এক শীলা। আর এক ধরনের হিংস্রতা আর নিষ্ঠুরতা ফুটে উঠেছে তার মধ্যে। আর এক রকমের মৃত্যুর আঘাতে কণ্টকিত হয়ে উঠেছে সারা শরীরে।

পূর্ব শ্লেষের ই অস্তিম সুরে সাধন উচ্চারণ করল, শীলা।

শীলা নামতে নামতেই বলল, আর কিছু আমার শোনার

নেই। আপনাকে খুব সহজ বলে মনে করতাম। এখন দেখছি, মারাত্মক। সবের মধ্যে ভূত। কিন্তু জেনে রাখুন, রঙ মাখলেও আপনার দিদিকে খুকী দেখায় না। আপনার থেকে অনেক বড়ই দেখায়। কী করে আমার দাদার চোখে লাগল, জানি না। মেয়ে তো ওরকম দেখে নিয়। নিতান্ত বিশ্বাসেই বোধ হয় আপনার দিদি ভেড়া বানিয়ে ফেলেছিল।

শীলা নেমে গেল তরতরিয়ে। একবারও পিছন ফিরে তাকাল না।

সাধন আস্তে আস্তে নেমে এল। আশ্চর্য! এখন তার ঘোর নেই, বিকার নেই। তাকে শান্ত আর নিরীহই দেখাচ্ছে। কিন্তু চোখে মুখে একটা হতাশা আর আতঙ্কের ছায়া পড়েছে। আর একটা কান্না থমকানো বিস্ময়ে সে নিজের মনের অন্ধকারে হাতড়ে ফিরছে। কোথায় লুকিয়ে ছিল এই দর্মানটা! কেথায়!

এগোতে গিয়ে থামল সাধন। দেখল, একটু দূরেই, অনাদি আর বিনুর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে শীলা। অনাদির সঙ্গে শীলা কথা বলছে। আর ছোড়দি শুনছে। শুনতে শুনতে এদিকে ফিরে তাকাল বিনু। সাধন মুখ নামিয়ে নিল। কী বলছে শীলা? কী বলছে? কী বলবে সাধন ছোড়দিকে। সাধনের বুক থেকে একটা শক্ত কিছু ঠেলে উঠতে লাগল ওপরে।

আবার চোখ তুলল সে। ছোড়দি তার দিকে এগিয়ে আসছে। শীলা আর অনাদি ওপরে উঠে যাচ্ছে। ছোড়দি এগিয়ে আসছে। ওর হলদে ঢাকাই শাড়িতে লাল লাল ফুলগুলি যেন ফুটছে, নিবছে। নিবছে ফুটছে! আর তিন দিন পরেই কলকাতা ফিরে যাবার কথা। তারপরে, তারপরে···। পরিবারের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল সাধন। ছোড়দির একটা ব্যবস্থা সে করবে। সকলের সঙ্গে বসেই একটা মিথ্যাকে তৈরী করা হয়েছিল। নেতৃত্ব নিয়েছিল সাধন। কারণ, সমাজ এবং প্যাটার্ন এবং কুল, সব বাঁচাবার, এবং ছোড়দির সুরাহার দায়িত্ব নিয়েছিল সে। আঃ! ছোড়দির জীবনে সে একটা আশা এনেছিল।··· আজ ছোড়দি সব থেকে বেশী সেজেছে। হলদে রঙ-এ লাল লাল ফুল। লাল রেশমের জামা। চোখ দুটি কত বড় দেখাচ্ছে ছোড়দির। কাজল পরে আরও বড় দেখাচ্ছে। ঠোঁটে।

বিনু এসে দাঁড়াল সামনে। মুখ কুঁচকে রয়েছে ওর। কিন্তু চোখের গভীরে একটা উৎকণ্ঠিত ভয়ের ছায়া। বলল, কী হয়েছে রে? শীলা বলল, ওর দাদার সঙ্গে কী বিশেষ কথা আছে। ওরা আগে আগে একটা টাঙ্গায় চলে যাচ্ছে। আমি আর তুই যেন পরে যাই। কেন?

সাধন দুটো হাত জড়ো করে নিয়ে এল বুকের কাছে। রুদ্ধ গলায় ডাকল, ছোড়দি!

বিনু ভীত শঙ্কিত গলায় উচ্চারণ করল, ছোড়দি!

সাধন হঠাৎ দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল। মুখে পড়ল নীচের দিকে। বিনু তাড়াতাড়ি তাকে ধরে নিল। সাধনের দুহাত নিজের হাতে নিয়ে কাছে টানল। দেখল সাধন কাঁদছে। চোখ ফেটে জল আসছে। কাঁপনা ধরে যাচ্ছে তার মোটা শরীর।

বিনু সভয় উদ্বেগে জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে সাধন?

সাধন কান্নারুদ্ধ গলায় বলল, ছোড়দি, ছোট ছোড়দি আমি বলে ফেলেছি।

বিনু শ্বাসরুদ্ধ গলায় জিজ্ঞেস করল, কী বলে ফেলেছিস?

—তুই···তুই আমার ছোড়দি।

বলতে বলতে বিনুর প্রায় পায়ের কাছে ভেঙে পড়ল সাধন।

বিনুও একটা আচমকা ধাক্কায় পড়ে যাচ্ছিল প্রায়। সাধনের হাত দুটি জোর করে ধরে সে সামলে নিল। আর বুক থেকে একটা দমকা নিঃশ্বাস পড়ল। তবু কথা বলতে পারল না। আবার নিশ্বাস পড়ল। আবার, আবার। অনেকদিনের সঞ্চিত রুদ্ধ বাষ্প যেন বেরুতে লাগল। চোখের কোল দুটি চিকচিক করে উঠল জলে। তবু যেন, বহুদিন পরে প্রাণ ভরে, নতুন বাতাস থেকে নিশ্বাস নিতে লাগল।

তারপর ছোট ভাইটির জন্যে সহসা ওর প্রাণ মমতায় ও ব্যথায় ভরে উঠল। সাধনকে হাত ধরে টেনে তুলে নিল। ডাকল, ওঠ্ সাধন। কাঁদিস নে লক্ষ্মীটি।

সাধন উঠে ওর চশমাটা খুলে, মুখটা মুছল। জীবনের হতাশার শেষ কূলে দাঁড়িয়ে সে আবার বলল, আমি কী করে ফেললাম ছোড়দি।

বিনুর বুক থেকে নিশ্বাস পড়ল অনেক। বুকের ভিতরটা হাল্কা হতে হতেও একটা অন্ধকার পাট ছাড়া কিছুতেই নড়তে চাইছে না। বলল, ওসব আর থাক সাধন। চল্, ঝরণার সামনে গিয়ে একটু বসি।

ওরা দুজনে গিয়ে জলপ্রপাতের কাছে বসল। ওদের গায়ে বৃষ্টিকণার মতো জলের ছিটা লাগল। বিনু এতক্ষণ যেন কিছুই দেখেনি। সে নতুন করে দেখতে লাগল। গলিত রুপো নামছে অজোর ধারায়। বাধা পাচ্ছে, তাই প্রবল গর্জন তুলে ক্ষিপ্ত হয়ে ফুঁসছে, ফুলছে। নিমেষে বাঁক নিয়ে ছুটে চলেছে।

পাশাপাশি ভাই বোন। দুজনের হাত দুজনের হাতে। ভ্রমণকারীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় নি। এখনও নির্জন। সামনেই জলপ্রপাতের রুদ্রেশ বেগ ও গর্জন। কিন্তু দুটি প্রাণের মধ্যে ঝড়ের পরের স্তব্ধতা।

বিনুর গলা শোনা গেল জলপ্রপাতের গর্জন ছাপিয়ে। সাধন, শুধু জীবনভর বিশ্বের হাত থেকে তো বাঁচা গেল। এই ভালো হল।

সাধন আর বিনু যখন মুন-লক-এ ফিরল, তখন রাত হয়ে গিয়েছে। অন্ধকারে ঘাটের পাশ দিয়ে যাবার সময় ওরা দেখল, দুটি মূর্তি চুপচাপ বসে রয়েছে। চিনতে অসুবিধে হল না, অনাদি আর শীলা।

অনাদির গলার স্বর ভেসে এল, সাধন, তোমার সঙ্গে একটু কথা ছিল।

দুজনেই দাঁড়াল। শীলার মুখ জলের দিকে। তার উজ্জ্বল শাড়িটা অন্ধকারেও ঝলকাচ্ছে। বিনু অনুভব করল, সাধন যেন কাঁপছে। সে সাধনের হাত ধরে চাপ দিল। ভরসা দিতে চাইল। ইচ্ছে হল সে নিজেই অনাদির সঙ্গে কথা বলে। কিন্তু এই মুহূর্তে ততোটা সে পারছে না।

সে একটু সরে গিয়ে, মাধবীলতার ঝাড়ের কাছে দাঁড়াল। সাধন এগিয়ে গেল ঘাটের দিকে। অনাদির সামনে দাঁড়াল, কিন্তু বসল না।

অনাদি ইংরেজীতে বলল, আমি সব শুনেছি। আমিশি, প্রথমটায় বিশ্বাস করতে পারি নি, তুমি এরকম একটা নোংরা খেলা আমার সঙ্গে খেলবে। তোমার দিদিও তাল দিতে কোথাও একটু ভুল করে নি।

প্রত্যেকটি কথার মানেই বিনু বুঝতে পারল। অপমানে ঠোঁটে ঠোঁট টিপে চোখ বুজে রইল সে। মানুষ সকল শক্তির সাধক হয়েও, এই জন্যেই বোধ হয় নিয়তির কাছে মাথা হেঁট করে থাকে। অথচ এখানে আসার পর অনাদির ব্যবহার কি একটি অপরিচিতা মেয়ের সঙ্গে খুব শালীনতার ভরা ছিল। শীলার ব্যবহার কি খুব সুন্দর ছিল।

কিন্তু কিছু বলবার নেই। আজ আর এ পক্ষের কোনো কথাই সাজে না। শুধু নীরবে সমস্ত অপমান সহ্য করতে হবে। তবু সাধনের পাশে গিয়ে একটু দাঁড়াতে ইচ্ছে করছে। ছোড়দির ভাগ্যের সঙ্গে জড়াতে গিয়ে বেচারীর আজ এ অবস্থা।

সাধন চুপ করে রইল।

অনাদি এবার পরিষ্কার বাংলাতেই বলল, বুঝতে পারলাম না, তোমাদের পরিবারের কোনো দুর্নামের জন্যে দিদির বিয়ে হচ্ছিল না বলেই আমার ঘাড়ে চাপাতে চাইছিলে, না কি নিতান্তই মর্যাদা বাঁচাতে? আর কার্যোদ্ধারের জন্যে শেষটায় তুমি আমাকেই বেছে নিলে?

বিনু হাত বাড়িয়ে মাধবীলতার একটি ডাল চেপে ধরল। শীলা তীব্র গলায় বলে উঠল, নইলে বন্ধুত্বের মর্যাদা দেওয়া যায় কেমন করে?

সাধন নীরব। পাথরের মতো নিশ্চল।

অনাদি আবার বলল, যাই হোক, এ ভাবে আর এ আলোচনা করে কোনো লাভ নেই। তবু তোমাকে একটা কথা বলি। তোমার দিদির রূপ যৌবন চলে গেছে বলে যতোটা ঘাবড়ে গেছ, ততোটা ঘাবড়াবার কোনো কারণ নেই। এখনও সে বেশ চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে। আর ভাল করলেও, সত্যি খুব শালীন আর রুচিশীলা বলেই মনে হয়। আরও চেষ্টা কর। সাকসেসফুল হবে।

বিনুর বুকের মধ্যে পুড়ে গেল। জীবনে এই বোধ হয় প্রথম জীবনের প্রতি অসহায় ধিক্কারে, অপমানে তার চোখ দপ দপ করে জ্বলে উঠল। গলা তুলে সে একবার সাধনকে ডাকতে উদ্যত হয়ে আবার থেমে গেল। থাক। কী লাভ অনাদিকে জানতে দিয়ে যে সে সব

কথাই শুনেছে। ও পাওনা চুকে যাক মিথ্যা ঘুচুক। শাস্তি শেষ হোক।

বিনু শুনতে পেল সাধনের গলা। অবাক হয়ে শুনল, সাধন শান্ত স্তিমিত, কিন্তু নিষ্কম্প গলায় বলছে, অনাদি, তুমি যা বলবে, তাই আমাকে শুনতে হবে। পাপ আমি করেছি।

—কিন্তু সেই রক্ষা করতে পারেন নি। তীব্র ক্রুদ্ধ বিদ্রূপে বলে উঠল শীলা।

কয়েক মুহূর্ত অনাদির কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। একটু পরে সে বলল, সব থেকে অসুবিধে হচ্ছে, রাত কাটানো। বিশেষ করে শীলু তো চুকতেই চাইছে না। কিন্তু এ বিদেশ বিভূঁয়ে, রাত কাটে কোথাবই বা যাওয়া যায়। এখানে যেটাকে শহর বলে, সেখানে এমন কোনো হোটেল পর্যন্ত নেই যে রাত্রিবাস করা যায়।

সাধন বলল, অনাদি হয় তো কলকাতায় গিয়ে কখনো মুখ দেখবে না। কিন্তু তোমরা এটুকু অন্তত করা কর। আমার অপরাধ ভুলে যেতে বলছি না। আজ রাতটুকুর মতো আমাকে ক্ষমা কর।

শীলা বলে উঠল, আপনাদের লজ্জা না করলে আর আমাদের কিসের লজ্জা? রাতটা আমাদের কাটাতেই হবে। কী করব!

অনাদি বলল, তা ছাড়া আমরা কাল সকালের গাড়িতেও যেতে পারছি না। ডাকের চিঠিপত্র যদি কিছু আসে, সেগুলো নিয়ে যেতেই চাই। কাল সন্ধ্যার গাড়িতে আমরা চলে যাব।

সাধন বলল, এ বিষয়ে তুমি যা ভালো বুঝবে, তাই হবে।

খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে সাধন ফিরে এল। ভাই বোন দরজা খুলে ঘরে চুকল। সাধন তক্তপোষের ওপর নিজেকে ঢেলে দিয়ে বলল, ছোড়দি, রাত্রের জন্যে যা হোক কিছু খাবার তৈরী করতে হবে।

বিনু বলল, হ্যাঁ, করব।

—পারবি সব করতে?

—পারব। তুই একটু শুয়ে থাক।

কিন্তু বিনু বাতি জ্বালল না। সে পুব দিকে জানালার কাছে এগিয়ে গেল। পুবের পাহাড় ডিঙিয়ে চাঁদ উঠেছে। শীতার্ত চাঁদ কুয়াশা মুড়ি দিয়ে রয়েছে। পাহাড়টাকে মনে হচ্ছে দূরের অস্পষ্ট মেঘের মতো, সবই অস্পষ্ট। চাঁদের আলোয় হারাধও ভাটা নেমেছে। পূর্ণিমা গিয়েছে কয়েকদিন আগে। দূর অদূরের গাছগুলি ছায়া ছায়া।

সর্বচরাচরের মধ্যেই যেন একটা আড়ষ্ট স্তব্ধতা। সে স্তব্ধতার বুকে কি কি পোকা তার পাখার কাঁপনে ডেকে চলেছে।

কিন্তু এত নিস্তব্ধ কোনোদিন মনে হয়নি বিনুর। অথচ রাত কতটুকুই বা হয়েছে। হয় তো আটটা বেজেছে। এখানে অবশ্য শীতের রাত আটটাই অনেক রাত। কাশের সাতটার মধ্যে বিছানায় ঢুকে পড়া যায়। সারাদিন পরিশ্রমও তার অনেক।

হয় তো মুন-লক-এর কেউই এখনো বেড়িয়ে ফেরে নি। বিনু এসে পায়ে পায়ে আর একটা ঘরে চুকল। জানালার এসে দাঁড়াল। দেখল, আলোকের ঘর অন্ধকার। ভবতোষ মিত্রও ফেরেন নি মনে হচ্ছে। ওদিকে মজুরনিকাদেরও কোনো সাড়া শব্দ নেই। কেন? এখনও কি ফেরার সময় হয় নি। হেকর্ড বাজারের সময় হয় নি এখনও। যা কি. আজ সন্ধ্যার গাড়িতেই সাঁওতাল পরগণা ছেড়ে সবাই চলে গিয়েছে।

বিনুরাও দু'একদিনের মধ্যেই ফিরবে। ফিরে যাবার আগে একবার যে আলোকের সামনে দাঁড়ানো দরকার। সারা জীবন ধরে চির নবীনতা কী ভুলে সইবে বিনু। সব মিথ্যা সব গ্লানির কথা একজনকে বলতে হয়। বিশেষ সাঁওতাল পরগণার পাপের ভরাডুবির কাহিনী আলোককে না বলে গেলে, আর কাকে বলা যাবে। আলোক বিদ্রূপ করবে, ক্রুদ্ধ হবে কি ঘৃণা করবে, কে জানে। তবু বলতে হবে। আলোক তার নিজের কথা বলছে। বিনুকেও বলে যেতে হবে, আলোক আমি এই। সংসার, মানুষ, বৃহৎ জগতের কিছুই জানি নে। চিরদিন ধরে একটা বদ্ধ খালের মধ্যে ঘুরে ঘুরতে মরতে আর একটা খালের মধ্যে গিয়ে মরার পথ খুঁজে চলেছি।...'

তারপর বিনু তার কাজ শেষ করল। সকলেই খেতে

বলার অভিনয় করল মাত্র শীলা যেতেও বসে নি। সে ঘরে ঢুকে, সোজা বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়েছে।

বিনুর মনে হচ্ছিল, সে বুঝি অনাদির সামনে দাঁড়াতে পারবে না। কিন্তু সহজ ভাবেই সে অনাদিকে খাবার দেওয়া দিয়েছে। অপমানের আর বাকী তো কিছুই ছিল না। তবু সে বুঝতে পারছিল, অনাদি তাকে নির্নিমেষে লক্ষ্য করছে।

রাত অনেক হল। নিদ্রাহীন বিছানায়, বিনুর সমস্ত চেতনা উৎকর্ণ হয়ে রইল। তবু সেই পায়ের শব্দ একবারও বাজল না।

অন্ধকার ঘরে আজ আবার সেই রাক্ষসটা এল ভয়ংকর থাবা মেলে।

শীতার্ত ভোরের গা ছেড়ে যেতে অন্ধকার এখনও যেন গড়িমসি করছে।

বিনু আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এল দরজা খুলে। কাঁধের ওপর ফেলা রয়েছে তার শাল। সে দেখল, পুব আকাশের গায়ে পাহাড়ের রেখা ধীরে ধীরে ফুটছে। বন্ধ খাঁচার ভিতরে থেকে সেই মোরগটাই বোধহয় ডাকছে। ডেকে ডেকে সূর্যের ঘুম ভাঙাচ্ছে। সূর্য ওঠো! সময় হয়েছে। কোন্ দূরের মন্দির থেকে, ক্ষীণ সুরে ঘণ্টা বাজছে, টিং—টিং—টিং।···হয় তো কোনো মোষের গাড়ি চলেছে। ঘণ্টা বাজছে মোষের গলায়। কিংবা, ভোর-রাত্রে দোচনের পালা শেষ করে রাখাল বেরিয়েছে গরু-মোষ নিয়ে। বাসি-লাল ঘুমন্ত, সুপ্ত।

বিনু আস্তে আস্তে সদর দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল রাস্তার সামনে গেটের কাছে। কাশেমের ঘরের দরজা এখনও বন্ধ। গেটে লাগানো শিকল খুলে বিনু রাস্তার ধারে এসে দাঁড়াল। এই প্রথম একলা এসে রাস্তায় দাঁড়াল সে। একলা বেরুবার সময় হয়নি আগে। উপায়ও ছিল না।

আজ বিনুর মুখে রং নেই, চোখে কাজল নেই। দীর্ঘকেশিনী হবার ভেজাল দায় নেই। শাড়িটাও ঘুরিয়ে পরে নি। নিতান্ত আটপৌরে ঘরোয়া ধরনে পরা। দাদন দেখলে হয় তো চমকে যেত। চল্লিশ ঘণ্টা আগে হলে, বিনুও কল্পনা করতে পারত না। কত সন্ত্রস্ত, কত সাবধানতা। পান থেকে চুন খসবার উপায় ছিল না। এখন সেকে হঠাৎ চেনাই যায় না। মাল-লস্ক-এর বাসিন্দারা দেখলেও অবাক হয়ে যাবে।

হোক। তবু এতদিনের ছদ্মবেশ থেকে তো মুক্তি পাওয়া গেল। এখন সেই ভবানীপুরের ছাদে-ঘোরা একলা বিনু। সে যা, তাকে তাই দেখতে লোকে।

পুবের রাস্তা ধরে আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল বিনু। পাহাড়টার অবয়ব আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আকাশটা যেন সহসা চকিত হবার সম্ভাবনা হয়ে, কারুর আগমনের প্রতীক্ষা করছে। নিঃশব্দে, দূরে কাউকে যেন সে আসতে দেখছে পাহাড় অন্তরালের দিকচক্রবাল রেখার ওপার থেকে।

বিনু হঠাৎ চমকে ফিরল। একটা টাঙা আসছে। কিন্তু কোনো যাত্রী দেখা যায় না। চালক বসে আছে সামনে, সর্বাঙ্গে মুড়ি দিয়ে। মুখটা শুধু বাইরে। টাঙার সামনের দিকে ক্যানভাসের পর্দা দিয়ে ঢাকা। কোনো শীতার্ত যাত্রী হয়তো চলেছে কোথাও। শীতের স্তব্ধ ভোরে, ঘোড়ার পায়ের মন্থর শব্দ একটা অদ্ভুত শব্দে বাজছে। যেন পৃথিবীর বাইরে, এক অলৌকিক অশেষ যাত্রার ধ্বনি ঘোড়ার পায়ে। বাজছে, এবং চলছে··· চলেছে···চলেছে।

বিনু রাস্তার পাশে সরে দাঁড়াল। টাঙাটা অতিক্রম করল তাকে। আর বিনু অবাক হয়ে দেখল, পিছন দিকে পা ঝুলিয়ে আলোক বসে রয়েছে টাঙায়। একটু ঝুঁকে, হেলে, গালে হাত দিয়ে, মুখ ফিরিয়ে রয়েছে সে উল্টো দিকে। একটি পুরো হাতা নীল সোয়েটার তার গায়ে। ভেবেছিল, আলোক এখনও ঘরে হয় তো ঘুমিয়ে আছে। বেলায় দেখা হবে তার সঙ্গে।

বিনুর রাত্রি জাগা, ভেজা ভেজা নিষ্প্রভ চোখ আলোয় ঝলমলিয়ে উঠল। কিন্তু গলা দিয়ে তার শব্দ বেরুল না। এত অবাধে চোখ মেলে সে আলোককে অনেকদিন দেখতে পায় নি। তাই সে দু-চোখ ভরে শুধু দেখতে লাগল।

টাঙাটা খানিকদূর যেতে, আলোকেরই দৃষ্টি পড়ল। সে চকিত হয়ে উঠে, কী যেন উচ্চারণ করল। সঙ্গে সঙ্গে টাঙাটা থেমে গেল। নেমে পড়ল আলোক। পায়ে পায়ে এগিয়ে এল। বিনুও এগিয়ে গেল। সামনে এসে

মুখোমুখী দাঁড়াল দুজনে।

আলোকই প্রথম বলল, এ কি! এত ভোরে, একলা?

বিনু বলল, আজ একলাই বেরিয়ে পড়েছি।

আলোক বিনুর চোখের দিকে তাকাল। বিনুও তাকিয়েছিল। লজ্জা হয় তো একটু ছিল বিনুর। কিন্তু সকল দুর্যোগের শেষে যেন সে এসে রশ্মিরেখার সামনে দাঁড়িয়েছে। বিনুর যে আড়ষ্ট জড়তা আগে দেখেছিল আলোক, আজ, এখন তা নেই। কিছুদিন ধরে বিনুকে যে সে একটি কলের পুতুলের মতো দেখছিল, এখন তার চিহ্নটুকুও নেই। সেই ভীরু, মুখ আড়াল করে রাখা মেয়েটি নয়। এ বিনু নির্ভীক। চোখের কোথাও তার এতটুকু দ্বিধার ছায়া নেই। মালিন্য নেই, নিবেদনের কারুণ্য নেই। তাকে ক্লান্ত আর রুক্ষ দেখাচ্ছে। কিন্তু সব কিছুর ওপরে ছাপিয়ে উঠেছে একটি স্নিগ্ধ প্রসন্নতা। এ বিনু বৈরাগিনী। যে তার মুক্ত আত্মার ডাকে বেরিয়ে পড়েছে।

এই নতুন বিনুকে দেখে আলোক চমকে উঠল, অবাক হল। কিন্তু উৎকণ্ঠাও তার কম নয়। সে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে বিনু?'

বিনু তার কাজলবিহীন চোখ তুলে বলল, আসলে কিছু হয় নি। কিন্তু কাল অনেক রাত অবধিও তোমার ঘরে ফেরার শব্দ পেলাম না কেন?

—কাল যে আমি সন্ধ্যে থেকে কোথাও বেরুই নি।

—অন্ধকারে বসেছিলে চুপচাপ?

এবার উৎকণ্ঠা বিনুর গলায়। আলোক বলল, চাঁ।

—গানও বাজাও নি তো?

—না। এক একদিন সব যেন কেমন শূন্য হয়ে যায় এবার তাই ফিরে যাবার কথা ভাবছি।

আলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে বিনু সহসা কথা বলতে পারল না। চোখ নামিয়ে নিল। ব্যথা করে উঠল তার বুকের মধ্যে।

আলোকই আবার বলল, কিন্তু বিনু তোমাকে আজ একেবারে অন্য রকম লাগছে।

বিনু হেসে বলল, এই-ই তো আমি।

আলোক মৃদু গলায় বলল, তাই আজ তোমাকে বেশী করে চোখে পড়ছে।

বিনু চোখ তুলতে গেল। চোখে জল আসতে চাইছে।

আলোক ডাকল বিনু:

বিনু শাড়ির আঁচলে চোখ তুলে জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাচ্ছ তুমি?

আলোক বলল, এমনি চলেছি। আবদুল্লাকে বলেছিলাম, ওর গাড়ি নিয়ে একলা কোথাও ছুটব। কিন্তু ঘুম ভেঙে আর সে উৎসাহ পেলাম না। তাই ওকে বললাম, যেখানে হোক একটু নিয়ে চলুক।

বিনু এক মুহূর্ত দ্বিধা করে বলল, আমি যাব তোমার সঙ্গে?

আলোক চমকে উঠল। ওর মধ্যে যে একটা মূল্যমান বিষণ্ণতা ছিল। তা যেন সহসা নিঃশব্দে ঝরে পড়ল। জলে ভেজা ডানাভারি পাখিটা হঠাৎ সতেজে পাখি ঝাপটা দিয়ে উঠল। কোন রকমে একবার উচ্চারণ করল, তুমি যাবে বিনু।

বলতে বলতেই সে টাঙার কাছে ছুটে গিয়ে, ক্যানভাসের পর্দাটা দিল তুলে। বলল, আবদুল্লা, অপেক্ষা করো যে কাশেমের কাছে। আমি যাচ্ছি গাড়ি নিয়ে।

আবদুল্লা গাড়ি থেকে নেমে ঝা করে দাঁড়িয়ে রইল। আর তার দিল্লীওয়ালা মস্ত বড় ঘোড়া কান খাড়া করল।

আলোক বলল, এস বিনু। কোথায় যাবে বল?

বিনু হাসতে হাসতে বলল, যেখানে তুমি নিয়ে যাবে আলোক।

পরমুহূর্তেই কী ভেবে একটু গম্ভীর হয়ে বলল, কিন্তু আলোক, কোনো লোভে পড়ে যাচ্ছি নে। তোমার কথা আমাকে বলেছে। যাবার আগে আমার কথা তোমাকে না বলে গেলে চলে না।

আলোকের আকর্ষ উত্তেজনা। সহসা যেন রাজ্য-জয়ের সংবাদ এসেছে। বিনুর হাত ধরে বলল, বিনু তোমার কথা বলতে চেয়েছে, সেই আমার পক্ষে ভাগ্য। আমার কাছে সেই হবে তোমার স্মৃতিচিহ্ন। চল ওঠ।

বলতে বলতে বিনুর ওঠার অপেক্ষা না করে, সে হো মেরে তুলে বসিয়ে দিল গাড়িতে। নিজে সামনে উঠে শূন্যে চাবুক হেনে শিসের মতো শব্দ তুলল। ঘোড়াটা ভয়

থেমে, পেছিয়ে এল দু'পা। তারপরে হঠাৎ তীব্র বেগে ছুটে দিল সামনে।

আবদুল্লা চীৎকার করে উঠল, বাবু দেরী হয় তো লোনিয়াটাঁড় গাঁয়ে ঘোড়াকে একটু খাইয়ে নেবেন।

আলোকের কানে গেল। কিন্তু কোন জবাব দিল না। উপরন্তু দাঁতের মতো তার চাবুক পাক দিতে লাগল মাথার ওপর। আর ছিল ছিল গর্জনে শিস্ দিয়ে উঠল। সে পিছনে না ফিরে বলল, বিনু শক্ত করে ধর বস।

কিন্তু তার আগেই বিনু হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়েছে গাড়িতে। বারের দিকে লোহার রেলিংএ, কপাল ঠুকে কেটে গিয়েছে। রক্ত দেখা দিয়েছে। কিন্তু ব্যথার চিহ্ন নেই তার মুখে। তার সারা মুখে বিচিত্র এক হাসির ছটা। হাত দিয়ে রক্ত মুছতে গিয়ে, গালে লেগে গেল। দুরন্ত গতির বেগ, কোনো রকমে আধ বসা হয়ে একটু একটু করে এগিয়ে গেল সামনের দিকে। হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করল আলোকের শরীর।

পাহাড়ের চূড়ার দূর্গ উঠে এসেছে মেঘলোকের মতো। সন্ধ্যার আলোয় দিগন্ত উদ্ভাসিত। পথের দুই ধারের দিগন্ত জাগিয়ে ছুটেছে ঘোড়া। মাঝে মাঝে শাল তালের সুদীর্ঘ ছায়াপথ ছিটকে যাচ্ছে পিছনে।

আলোকের ঠোঁটের কোণে হাসি। চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। চীৎকার করে বলল, হ্যাঁ বিনু, তুমি দু'হাত দিয়ে আমাকে ধরে রাখ।

বিনু দু'হাত দিয়ে আলোকের কোমর জড়িয়ে ধরল। মুখ চেপে ধরল তার পিঠের কাছে।

আলোক আবার চীৎকার করে বলল, বিনু আমি রোজ তোমাকে দূর থেকে দেখেছি।

বিনু মনে মনে বলল, জানি, জানি। কিন্তু তার মর্যাদা তুমি পাও নি।

আলোক আবার বলল, আর মনে মনে বলেছি, তুমি সুখী হও। কিন্তু তোমাকে দেখে আমার কষ্ট হত।

বিনু মনে মনে উচ্চারণ করল, কারণ তুমি যে আমাকে প্রথম দিন থেকেই চিনেছিলে। কিন্তু আমার সবটুকু তোমার চেনা নেই আলোক।

আলোক তেমনি গলার স্বর তুলে বলল, বিনু তুমি লোভে পড়ে আবার সঙ্গে আসবে। এ কথা তুমি না বললেও, আমি কোনোদিন বিশ্বাস করতাম না। আজ তোমাকে যে দেখবে, সেই বুঝবে, তোমার আজ আর কোনো কিছুর ভয় নেই।

বিনু আরও শক্তি দিয়ে, গভীরভাবে আলোককে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরল। মনে মনে বলল, তোমাকে প্রথম যেদিন দেখেছি, সেই দিনই তো আমার সারা জীবনের ভয় মিটেছে। আমার আর ভয় কিসের? এই সমাজ এবং দেহের দুয়ারে মাথা কুটতে গিয়েছিলাম। মাথা কোটার সেই কলঙ্ক নিয়েই তো ফিরেছিলাম। তাতে আমার হাত ছিল না।

আলোক হঠাৎ হাত বাড়িয়ে অবলীলাক্রমে বিনুকে পাশে তুলে নিয়ে এল। বসিয়ে দিল চালকের আসনে। তারপরে বিনুর মুখের দিকে তাকিয়ে। সহসা সজোরে লাগাম টেনে ধরল সে। দ্রুতগামী ঘোড়া হঠাৎ হকচকিয়ে গেল। পা পিছলে, অনেকটা দূরে গিয়ে টাল সামলে দাঁড়াল।

আলোক মুখ নামিয়ে নিয়ে এল। উৎকণ্ঠিত বিস্ময়ে বলল, একি, কাটল কী করে। রক্ত পড়ছে যে!

বিনু যেন এতক্ষণে একটু নিঃশ্বাস ফেলল। বলল, পড়ুক। রক্ত যে আছে, সে কথাও তো ভুলে গেছলাম আলোক। দেখে তবু ভরসা পেলাম বেঁচে আছি।

আলোক তাড়াতাড়ি পকেট থেকে রুমাল বের করে ক্ষতস্থানে চেপে ধরল। ব্যথায় ও আনন্দেই যেন বিব্রত হয়ে উঠল বিনু। বলল, থাক আলোক। এমন কিছু নয়। রুমালটা নষ্ট করো না।

—কিন্তু এখনো ভাল করে বন্ধ হয় নি যে।

—হবে খনি।

আলোক পরম বিস্ময়ে বিনুর এই নূতন মূর্তি দেখল। বিনুর চোখে যেন এক আশ্চর্য দ্যুতি। রুক্ষ চুল ছড়িয়ে, পড়েছে তার মুখে। মুছে নেওয়া রক্তের দাগ তার ফর্সা মুখের এখানে সেখানে। এ মেয়ে যেন ভীরু গলায় বলে নি, আমার পরাধীনতা তুমি কেড়ে নিও না।

বিনু বলল, কী দেখছ?

—তোমাকে!

বলে হাসতে গিয়েও আলোকের মুখ যেন ব্যথাতুর গাম্ভীর্যে হঠাৎ ভরে উঠল। সামনের একটা টিলার

পাশ ঘেঁষে সে গাড়িটাকে এগিয়ে নিয়ে গেল। আর মুহূর্তেই যেন অন্য এক জগতে এসে পড়ল তারা। কতকগুলি ছোট ছোট টিলা চার পাশে ঘিরে রয়েছে। এখানে সেখানে পুটিয়ে পাল মহুয়া। ইতস্তত বাবলার ঝাড়। আর নাম না জানা অসংখ্য রঙবেরঙের ফুল। চেনা শুধু অজস্র বন্য সোলাপ।

বিনু বলল, বাঃ! কোনো দিন দেখিনি তো এ জায়গা।

গাড়ি থেকে নেমে আলোক বলল, এ রাস্তাটা এত দিন আমার একলার ছিল। আজ তুমি এলে। এস।

আলোক দু'হাত বাড়িয়ে দিল। ভর দিয়ে নেমে এল বিনু। কিন্তু শরীরে কষ্ট নেই একটু। এখন যেন ইচ্ছে করলে ও দৌড়তে পারে। বলল, তোমার এই একার রাজ্যে শান্তি নষ্ট হবে না তো।

আলোক হাত তুলে বলল, তাকিয়ে দেখ। আজ দেখছি ওদের রাজ্যে রাজ্যে বেশী ফলক।

বিনু এগিয়ে গেল। একটি পাথরের ওপর গিয়ে সে বসল। সেখানে রোদ এসে পড়েছে। আলোককে বলল, এস, বস।

—বস, আসছি।

বলে আলোক ফুলের কোপে ঝাঁপিয়ে পড়ল গিয়ে। দু'হাতে তুলে নিল ডাল-পাতা সহ রাশি রাশি ফুল। এনে দিল বিনুকে। বিনুর কোলে, বুকে, সর্বত্র ভরে দিল। তারপর বসল কাছে। বসে বিনুর চোখের দিকে তাকাল।

সেই চোখ। সন্ধ্যার বাসা খুঁজে ফেরা, দূরে নিবদ্ধ ব্যথা ব্যাকুল চোখ। এই শীতের ভোরেও কপালে দেখা দিয়েছে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

বিনু ওর মাথায় তুলে দিল হাত।

আলোক বলল, বল বিনু এবার তোমার কথা।

বিনু বিনা ভূমিকায়, অসঙ্কোচে বলে গেল তার সব কথা। তার ভয়ের, বিস্ময়ের, আশা-নিরাশার। অনেক নয়। কথা খুব সামান্যই। বিনুর নিজের প্রাণের মধ্যে যে ফাঁকির কারবার ছিল, সেই কথা। তার শেষতম চড়াই উৎরাইয়ের কাহিনী। গতকালের ঘটনাও বিনু পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যক্ত করল। তখন আলোক তার একটি হাত টেনে নিজের দুই হাতের মধ্যে তুলে নিল।

বিনু বলল, ঘৃণা হচ্ছে আমার ওপর?

আলোক বলল, না। ভাবছি, তোমার গতকালের কথা। এত সহ্য করেছিলে কেমন করে?

—পাপ তো আমিই করেছি আলোক।

কিন্তু অসহ্য কষ্টে পাপের চেয়ে দিনের পর দিন শাস্তি পেয়েছি বেশী।

বিনু তাকাল আলোকের চোখের দিকে। চোখ ভিজে আসছে। চোখ নামাল সে।

আলোক বলল, কিন্তু কেন বললে আমাকে বিনু।

—তুমি কেন বলেছিলে তোমার কথা।

—না বলে পারি নি।

—আমিও।

বলে বিনু যেন হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে উঠল। দুজন দুজনের হাতের আঙুল নিয়ে নাড়া চাড়া করতে লাগল। তাতে ওদের দুজনেরই ভিতরের আন্দোলন ধরা পড়ছিল।

বিনু বলল, অনাদির কাছে যখন বসেছি, ভুলিয়েছি, ঠেলেছি।

বলতে বলতে বিনুর গলা বুজে এল।

আলোক বলল, থাক না এসব কথা বিনু।

বিনু রুদ্ধ গলায় বলল, না, বলি।...তখন মনে হত, আমি কি সেইরকম মেয়েদের মতো, যারা ওটাকেই পেশা করেছে।

আলোকের চকিতে মনে পড়ল ভবতোষ মিত্রের কথা। তাঁর যে-কথা শুনে আলোক শিউরে উঠেছিল।

বিনুর চোখের কোণে দুফোঁটা জল চিকচিক করছে। কিন্তু মুখে তার হাসি। আলোকের দিকে তাকিয়ে বলল, আলোক, আমার এই পরিণত বয়সে, পরিণত মনে, আর কারুর বুকের কাছে আমি যেচে বসতে পারি নি। একটু বসতে পাওয়ার জন্যে, মনে মনে ছটফটিয়ে মরি নি। তাই, তোমাকে কেন বলসাম, এর বেশী কারণ আমি বলে বোঝাতে পারব না।

আলোক বিনুর আর একটি হাত ধরে, আরও কাছে আকর্ষণ করল। বিনুর এক পা সোটানো। আর এক ঝোলানো পাথরের নীচে। আলোকের আকর্ষণে ওর কোলের ফুল কয়েকটি মাটিতে পড়ল। আলোক বলল,

আমি বুঝতে পেরেছি বিনু।

বিনু বলল, কিন্তু আমাকে ভুল বুঝো না যেন।

আলোক বলল, আমার কাছে এত সংশয় কেন তোমার। আমি যে প্রথম দিন থেকেই, আমার যেটুকু বোঝবার, বুঝেছি।

বিনু আলোকের চোখের দিকে তাকাল। বুকের মধ্যে হঠাৎ কেঁপে উঠল বিনুর। সে চোখ ফিরিয়ে নিল তাড়াতাড়ি।

আলোক ডাকল, বিনু।

বিনু আবার ফিরে তাকাল। তার বুকের কাঁপুনি বেড়ে উঠল।

আলোক বলল, এবার আমার আর একটা কথা শোন।

বিনু যেন ভয়ে ও বাধায় চীৎকার করে উঠল, না, না, বলো না। আজ কিছু বলো না আলোক। তাতে আমার নিজেকে বড় বেচারা মনে হবে। কালকের পরেই আজ তুমি কিছু বললে, আমি নিতান্ত ছোট হয়ে যাব। আজ তুমি কিছু বলো না। তোমার চোখ ফিরিয়ে নাও।

আলোক বিনুর কাঁধের ওপর একটি হাত তুলে, তার চিবুক তুলে ধরে বলল, কার কাছে ছোট হয়ে যাবে বিনু। কার কাছে বেচারা হয়ে যাবে? আমার কাছে?

বিনু প্রায় চুপিচুপি বলল, আমার কাছে, আমার নিজের কাছে।

আলোক বলল না তোমার কাছে নয়, তোমার বিশ্বের কাছে। আমার দিকে একবার চেয়ে দেখ।

বিনু চোখ তুলে বলল, কিন্তু আলোক, কাল আর আজ—।

আলোক বলল, হ্যাঁ, বিনু, সত্যি মিথ্যের দুটো রঙ এমনি সুস্পষ্ট, এমনি বিপরীত। হয় তো নিষ্ঠুর, কিন্তু এই দুজনের মধ্যে অহরহ। যদি তুমি সবই মুক্ত করে এলে, তবে আজ কালের কথা বলে, আমার কথা বলতে দিচ্ছ না কেন? বলতে দাও, আজ এই সকালে বলতে দাও।

বিনু চোখ বুজল, তাকাল। আলোকের হাত শক্ত করে ধরে আবার চোখ বুজল।

আলোক গাঢ় চাপা স্বরে বলল, বিনু তোমার পরাধীনতা তুমি নিজেই দূর করেছ। তুমি আমাকে গ্রহণ কর।

বিনু যেন অসহ্য একটি বাধায় অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল, উঃ। এমন করে বলো না। এমন করে বলো না আলোক।

বিনু দুহাত দিয়ে আলোকের পা স্পর্শ করল। নুয়ে পড়ে বলল, আমার প্রাণ-ই জানে, আমার চিরদিনের ঠাঁই কোথায়। গ্রহণ করার সাহস আমার নেই।

পা থেকে বিনুর হাত তুলে নিয়ে, দুহাতে তাকে বেষ্টন করে ধরল আলোক। বলল, তবে সে সাহস আমাকেই দাও বিনু।

বিনু বলল, কিন্তু আলোক, তোমার সন্ধ্যাবেলার সেই বাসা—?

—এই তো।

—একবার চেয়ে দেখ। এই-ই কী?

বিনু যেন অকস্মাৎ নিজেকে মেলে ধরল। মুগ্ধ চাপা স্বরে বলল, চেয়ে দেখ, সংসারের চোখে যে বস্তুর দাম দশ হাজার পাচাই হচ্ছে, আমার সে তা কানাকড়িও নেই।

আলোক বলে উঠল, ওগো মেয়ে! তুমি তোমার নিজেকে কতটুকু দেখছ?

বলে দুহাত দিয়ে বিনুর মুখ কাছে টেনে, গাঢ় চুম্বনে তার ঠোঁটের মধ্যে ডুবে গেল। বিনু কাঁপতে লাগল। দুহাত দিয়ে আলোকের রুক্ষ চুল আঁকড়ে ধরল।

আলোক মুখ সরিয়ে নিয়ে এল। বিনুর চোখে কোটা কোটা জল গড়াচ্ছে। কিন্তু তার সারা মুখ, সারা শরীর যেন বন্য ফুলের রঙীন আগুন হয়ে উঠেছে।

আলোক আবার তার উত্তপ্ত গাল বিনুর গালে চেপে ধরল।

ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরে আসতে আসতে প্রথম দেখা ভবতোষ মিত্রের সঙ্গে। দুজনেই চালকের আসনে পাশাপাশি। ফুল ছড়ানো গাড়িতে। আলোকের সোয়েটার আর বিনুর শাল লুটিয়ে পড়ে রয়েছে তার ওপর। আলোক রাশ টেনে গাড়ি থামাল। বিনুর মাথায় ফুল গোঁজা।

ভবতোষ কয়েক মুহূর্ত তীব্র রোষদৃষ্ট ভ্রূ কুঁচকে

তাকিয়ে রইলেন। তারপরে হুংকার দিয়ে বললেন, হুম্! দৃশ্যটা মহাভারতের মত। এই যা। সেওড্! (অর্থাৎ, গুড!) নাউ গো এ্যাহেড, এ্যাণ্ড কেস দেম, এ্যাণ্ড দেন কেস ইওরসেলভস্।

বলে তিনি বিনুর দিকে চোখ তুললেন। বললেন, আশ্চর্য! মানুষের চেহারা কী রকম বদলে যায়। ভেরী গুড। আই অ্যাম হ্যাপী।

বিনু লজ্জায় আরও লাল হয়ে উঠল। ভরতোষ লাঠিটা শূন্যে তুলে বললেন, আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বলে তিনি নিজের পথ ধরলেন। ওঁর মোটা ভুরু মাঝে ও ঠোঁটে প্রসন্ন হাসির ঝিলিক ফুটে উঠল।

মুন-লজ-এর প্রায় গেটের কাছেই, অনাদি আর শীলা থমকে দাঁড়াল। বোঝা গেল, দূর থেকে তারা একেবারে চিনতেই পারে নি বিনুকে। কপালের পাশে কাটা, রক্তরেখা। ঠোঁটে হাসি। যেন অষ্টাদশী এক মেয়ে, চোখে তার কিশোরী স্বপ্নের ঘোর।

অনাদি যেন অবাক। শীলার চোখে বিস্ময় এবং সন্দিগ্ধ বিদ্বেষ ফুটে বেরুচ্ছে।

গাড়িটা ওদের পার হয়ে দাঁড়াল গেটের সামনে। আলোক ফুল তুলে দিল বিনুর হাতে।

আবদুল্লা বেরিয়ে এল। আলোক বলল, চল আবদুল্লা সহরে যাব।

আবদুল্লাকে নিয়ে গাড়ি এগিয়ে চলে গেল। বিনু তাকিয়েছিলেন আলোকের দিকে। আলোক পিছন ফিরে বলল, ঘুরে আসছি।

বিনু জানে, পিছনেই অনাদি আর শীলা। তার লজ্জা করছে। সাধারণ ভদ্রতায় অন্ততঃ কথা বলা উচিৎ কি অনুচিৎ, সেই সংশয়ে সে গেটের দিকে ফিরতে গিয়ে, ওদের দুজনের দিকে চোখ ফেরালো।

শীলা তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরিয়ে অনাদিকে বলল, এস।

অনাদি সঙ্গে সঙ্গে পিছন ফিরে, শীলার সঙ্গে এগিয়ে গেল।

বিনু দ্বিধাহীন প্রসন্নতায় ওদের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে, গেট পার হয়ে গেল।

অনাদি পথ চলতে চলতে বলল, সেই ছেলেটা না?

শীলা বলল, হ্যাঁ, সেই ভালগার রাস্কেলটা। মেয়েটা যে এত মোটা, তা বুঝতে পারি নি।

অনাদি বলল, কিন্তু আমি বিনুকে একেবারে চিনতেই পারি নি। ওকে যেন অন্যরকম দেখাচ্ছিল, না?

শীলা ফুঁসে উঠল, দেখাবেই তো। ডাইনি মন্ত্র জানা আছে যে। যখন যার ঘাড়ে চাপে, তখন সেইরকম।

অনাদি একটু চুপ করে থেকে বলল, কিন্তু···আশ্চর্য! যেন গলাটাও বদলে গেছে, না?

শীলা তীক্ষ্ণ চোখে একবার অনাদিকে দেখে বলল, অত লক্ষ্য করে দেখার ধৈর্য আমার ছিল না। শুধু বুঝেছি, মেয়েটা অত্যন্ত চরিত্রহীন। কালকেই তোমার সঙ্গে অত ঢলাঢলি করেছে। আবার আজই আর এক জনের সঙ্গে বনবাঁদাড় মেরে এল। ফ্যামিলিটা নিশ্চয় খুব জঘন্য ওদের।

অনাদি বলল, না আমি ভাবছি, মানে, একেবারে অপোজিট। একটু সাজে নি পর্যন্ত মেয়েটা। অথচ—। শীলা শুধু কটমট করে একবার অনাদির মুখের দিকে তাকাল। কিছু বলল না।

অনেকক্ষণ চুপচাপ চলবার পর, অনাদি হঠাৎ বলে উঠল, অবিশ্যি শীলার বিয়ের সময়েও আমরা অনেকখানি বয়স ভাঁড়িয়েছিলাম। প্র্যাকটিক্যালি, বীরেনকে দেখতেই বড় দেখায়। আসলে শীলার সমবয়সী কিংবা ছোটই হবে। শীলাকে দেখতে ছোট দেখায়, এই যা।

শীলা শীলার ওপরের দিদি। বীরেন ভগ্নিপতি।

শীলা তীব্র গলায় বলে উঠল, তার সঙ্গে এর সম্পর্ক কী? তুমি তো আর দিদির থেকে ছোট বও আর তোমাকে বিয়ে করে দিদির ওপরের দাদাও সাজানো হয় নি।

অনাদি একটু চুপ করে রইল। রক্তাক্ত টাই ধরে একটু টানল। বলল, তা ঠিক। তবে···সংসারে এসব কত কী ঘটছে; আমি অবিশ্যি ঠিক সাধনদের পরিবারের তেমন পরিচয় জানিনে। ওদের, অনেকটা গোঁড়া বলেই মনে করতাম। সে হিসেবে, ভেবে দ্যাখ, শীলা তো বিয়ের আগে খ্রিস্টধর্মেও গিয়েছিল।

দাদা!

শীলার মুখ রাগে দপ দপ করে উঠল। দিদি যে বিয়ের আগে গর্ভপাত ঘটিয়েছিল, সেই কথার ইঙ্গিত পেয়ে শীলা রাগে একেবারে থতিয়ে উঠল।

অনাদি ভালো মানুষের মতই বলল, না ভিতরে কত কী ঘটে যায়, তাই বলছি। তোর ব্যাপার তো আমি বলছি না। তুই রাগছিস কেন?

শীলার দুই চোখে আগুন ঝিলিক দিয়ে উঠল। কঠিন বিদ্রূপ হেনে বলল, তা, বোনেদের বিচারে তুমি তোমার নিজের বউ যদি বাছতে চাও, বাছো। কিন্তু আমাকে এভাবে বলতে তোমার লজ্জা হওয়া উচিৎ।

অনাদি বলল, না মানে, সেই তুলনায় বিনু—

শীলা বাধা দিয়ে বলে উঠল, একেবারে যে সাধু হয়ে উঠলে? তবু যদি তোমাকে চেনা না থাকতো। বিনুর প্রেমে পড়ে একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছ দেখছি।

অনাদি এবার ঘনকে দাঁড়াল। গলার স্বরে কোথাও তার ব্যতিক্রম দেখা গেল না। কেবল তার চোখ দুটি একটু ছোট হয়ে গেল। অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, না প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি নে। কিন্তু ওই ছেলেটার সঙ্গে বিনুকে ওভাবে দেখে আমার বুকের মধ্যে জ্বলছে। মনে হল, যেন নেশেটা শোধ নিয়ে, মুখের ওপর ছুড়ে মেরে গেল। তা আমি যেতে দেব না।

বলতে বলতে অনাদির ভাবান্তর হল। ওর চোয়াল শক্ত, চোখে আগুনের কণা।

শীলা ঠোঁট উল্টে বলল, জেলাসি!

—যাই বলিস। ওকেই আমি বিয়ে করতে চাই।

শীলা অবাক হয়ে বলল, বিয়ে?

—হ্যাঁ।

—সারা জীবনের কথা ভেবে দেখেছ?

—বিয়ে করলেই কি আর কেউ সারা জীবন বাঁধা পড়ে থাকে?

ভাই বোন দুজনেই চুপ করে, দূরের দিকে তাকিয়ে রইল।

দুপুর বেলায় ডাকে কোন চিঠি এল না অনাদিদের। কিন্তু সাধনকে সে ঘোষণা করল, শরীরটা খারাপ লাগছে তার। আজ সন্ধ্যায় যাওয়া স্থগিত।

শীলা গম্ভীর মুখে, স্তব্ধ হয়ে সব দেখতে লাগল।

দেখা গেল, ওদের চার জনের মধ্যে বিনুই সব থেকে সহজ। সব থেকে স্বচ্ছন্দবিচারিণী। কাজ করল। রান্না করল। একটু আড়ষ্টতা থাকলেও, অনাদি শীলার সঙ্গে দু একটা কথাও বলল। কিন্তু, ওর সকালবেলার সেই রূপটাই যেন থির-বিদ্যুরীর মতো, সারা শরীরে চোখে মুখে চমকাতে লাগল। ওর স্থিরতার জন্যই স্থায়ী হয়ে রইল।

বেলা চারটে বাজতে না বাজতে, বিনু আবার আলোকের সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

অনাদি সাধনকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলল, এ ভাবে ঐ ছেলেটির সঙ্গে তোমার বোনকে ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়।

সাধন একটু অবাক হল।

অনাদি আবার বলল, মানি বিনু তোমার বড়। কিন্তু তুমি নিজেই ভালো জানো, ও অত্যন্ত সরল।

সাধন বলল, ছোড়দিকে আমার আর কিছু বলবার নেই অনাদি।

—থাকা উচিত। তোমার ছোড়দি হঠাৎ একটা কোনো বিপদে আপদে পড়ে। তোমাকেই দেখতে হবে। ওদের দিকে তাকালেই বুঝতে পারবে। দ্যাট্স দে আর আই মীন···।

তাতে সাধনের কোনো বিস্ময় ছিল না। ছোড়দির মনকে আগেই জানত। কিন্তু অনাদি আবার প্রতীক্ষায়, আলোকের কাছ থেকে তাকে বারবার সরিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছে।

অনাদি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠল। আবার বলল, তা ছাড়া, সত্যি কথা বলতে কি, ট্রুথ্ ইজ ট্রুথ্। আমি হয় তো অনেক কথা তোমাদের বলেছি। কিন্তু আমি বিনুকে বিয়ে করতে চাই।

সাধন এবার আর তার বিস্ময়ের সীমা ধরে রাখতে পারল না। উচ্চারণ করল, তুমি—?

—হ্যাঁ। আশা করি, তোমাদের মান সম্ভ্রম—।

—না না। তুমি যদি সব জেনে শুনেও—।

—হ্যাঁ।

সাধন প্রায় কৃতজ্ঞ হয়ে উঠল অনাদির দিকে তাকিয়ে।

সন্ধ্যার একটু পরে বিনু ফিরল। সেই ওর বৈরাগিণী

রূপ। কিন্তু ওর বৈরাগিণীবেশের মধ্যে যেন দেবতাকে পাওয়ার আলোর ঢেউ লেগে গিয়েছে। ওর চির বন্ধ প্রাণের প্রস্রবণ, যেন দেহের দুয়ারে ভেঙে পড়েছে। আঁধারের সন্ধ্যাকলি যেন জ্যোৎস্নারাত্রে ভেসে উঠেছে সকলের সামনে।

অনাদি আর শীলা দেখল দূর থেকে। সাধন বিনুকে ডেকে নিয়ে গেল পুকুরঘাটের দিকে। ছোড়দিকে সে এমন সাবলীলা আনন্দময়ী কখনো দেখে নি। এমন অপরূপ রূপে দেখে নি। কথা বলতে গিয়ে মনে হল, একটা অপরাধ করতে যাচ্ছে সে। তবু না বলে পারল না। বলল, ছোড়দি, অনাদি ওর মত বদলেছে।

বিনু চমকে উঠে বলল, কিসের?

—ও তোকে বিয়ে করতে চায়।

বিনু সহসা ঘাড় নেড়ে বলল, না না সাধন, আর তা হয় না।

—ছোড়দি ভাই—।

—না না সাধন, আর বলিস নে আমাকে কিছু, আমি একবার জোর করে ফিরতে গিয়েছিলাম। আর পারব না।

সাধন বিনুর দু'হাত ধরে বলল, ছোড়দি, বাবা যার কথা একটু ভাব। কী মুখ নিয়ে গিয়ে তাদের সামনে দাঁড়াব।

বিনু বলে উঠল, আমি গিয়ে দাঁড়াতে পারব।

—ছোড়দি, একবারটি ভাব। তুই যে ভাবে গিয়ে দাঁড়াতে চাইছিস, তার চেয়ে এটা অনেক সুন্দর। আমার প্রতিজ্ঞা থাকে। সব দিক দিয়ে ভালো দেখায়। কোনো মিথ্যের আশ্রয়ও আর থাকছে না।

বিনু কুঁপিয়ে উঠে বলল, পারব না, পারব না ভাই।

দুজনে কেউই লক্ষ্য করেনি, কখন অনাদি এসে তাদের সামনে দাঁড়িয়েছে। সে প্রায় স্খলিত গলায় ডাকল, মিস্ বোস্!

বিনু চমকে উঠে বলল, কে?

—আমি, আপনার যদি আপত্তি না থাকে, তবে আমাকে দু'একটা কথা বলতে দিন।

বলে সে সাধনের দিকে ফিরে তাকাল। সাধন আস্তে আস্তে সরে গেল। বিনু যেন কাঁপতে লাগল ঠকঠক করে। একটা চকিত আক্রমণে সে দিশেহারা হয়ে গেল।

অনাদি বলল, বলুন মিস বোস।

বিনু বসল। অনাদিও বসল। বলল, মিস্ বোস, অন্যায় আমার কতখানি হয়েছে, একবার ভেবে দেখবেন।

বিনুর স্তিমিত গলার স্বর শোনা গেল, অন্যায়ের কোনো কথা নেই এখানে অনাদিবাবু।

অনাদি বলল, তবু যদি আপনার মনে হয়, আমি সেরকম কিছু বলেছি, তবে জানবেন খুব দুঃখেই বলেছি।

বিনু বলল, আমাদের ব্যবহারে আমার লজ্জার সীমা নেই।

—কিন্তু সে সব আমি মনে রাখতে চাই নে। বাড়িতে ফিরে গিয়ে, আমরাই বা কী বলব বলুন তো! শুধু সেই জন্যই নয়, আমার ইচ্ছে আপনার কাছে গোপন রাখতে চাই নে।

বিনু দু'হাতে মুখ ঢাকল। বলল, এসব কিছুই নয় অনাদিবাবু। আমি-আমি।—

অনাদি বলল, হয় তো আপনার বিশেষ কোনো স্থানে আমি আঘাত করছি। কিন্তু আমার ইচ্ছেটাও যেন আপনার বিবেচনায় থাকে। আপনার বাবা মা···।

বিনু নিজের মনেই ছটফটে মুখ গুঁজে মাথা দোলাতে লাগল। তার কান্নার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। সে বলল, কী আশ্চর্য! কী আশ্চর্য! আমি এত তুচ্ছ, এত তুচ্ছ, অথচ আজ···।

বিনু বিস্ময়ে যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠে মনে মনে বলল, ভগবান এ তুমি আমাকে কোথায় এনে দাঁড় করালে।

অনাদির দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। বলল, আজকের রাতটা আপনি একটু ভেবে দেখুন মিস বোস। এক কথাতেই সব শেষ করে দেবেন না।

রাত্রের সেই রাক্ষসটা আজ আরও ভয়ংকর মুখ ব্যাদান করে ছুটে এল। ছিঁড়ে খুঁড়ে টুকরো টুকরো করছে বিনুকে। সে শুতে পারছে না, দাঁড়াতে পারছে না। সে বিশ্বাস করতে পারছে না, আলোকের মাথা গুঁজে রাখা সন্ধ্যাবেলার বাসাটা ভেঙে তছনছ করবে। কিন্তু অন্য দিকটাও সে এক লহমায় উড়িয়ে দিতে পারছে না। তার শেষ করণীয়, তাদের ছুটে আসা

সাঁওতাল পরগণার। সেটাকে আগটা দিয়ে ফেলতেও তার হাত উঠছে না এখন।

কোথায় গেল সেই নির্ভীক মুক্তির দৃঢ়সংকল্পতা। সেই সাহস!

শীতেও জানালা খোলা রেখে বিনু শুয়ে পড়ল। কিন্তু খোলা চোখের সামনে তার সেই বিকট স্মৃতি রাক্ষসটা যেন রাগ করে হাসতে লাগল। মনে হল, ক্রমেই সে অচেতনা হয়ে যাচ্ছে। অন্ধকারের ঘাটটা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সেই ভয়ংকর মূর্তি ক্রমাগতই তার কানের কাছে এসে, বিদ্রূপ করে হাসতে লাগল। কোথা যেন খুট করে একটা শব্দ হল। বিনুর মনে হল, তার চোখের সামনে বল্লুলিকা এসে দাঁড়িয়েছে। স্বপ্ন দেখছে বোধহয় বিনু। দেখল, রাক্ষসটার আড়ালে, বল্লুলিকা মিলিয়ে গেল। বিনুর চেতনা লুপ্ত হয়ে গেল।

সকাল বেলা অনেকগুলি গলার স্বরে বিনুর ঘুম ভাঙল। সে উঠে বসল।

সাধন বাইরের থেকে ছুটে এসে বলল, ছোড়দি, শীগ্‌গির আয়। বল্লুলিকা জলে ডুবে গিয়েছে।

চকিতে একবার বিনুর গতকাল রাত্রের কথা মনে পড়ল। সে আঁচল গুছিয়ে ছুটে গেল বাইরে পুকুর ধারে। আর সেই মুহূর্তে ভবতোষবাবুর গলা শোনা গেল, মুইসাইড।

বিনু দেখল, পুকুরের মাঝখানে বল্লুলিকা উপুর হয়ে রয়েছে। চুলে তার কাঁধ ঢাকা। ফ্রকের পিছনে বোতাম খোলা। ফর্সা পিঠটা দেখা যাচ্ছে। শাদা ফ্রকটা ফুলে উঠেছে কোমরের কাছে। পায়ের পাতা দুটি ডুবে রয়েছে। জানু গ্রন্থি ও উরুদেশ খোলা। লাল ইজের পরনে।

নলিনাক্ষ চাঁদর মুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পাশে তার স্ত্রী। ব্লাউজের বোতামও লাগায় নি। চোখে ও ঠোঁটে বাসি রঙের প্রলেপ। ছোট ছোট চুল খোলা। ডাইনীর মতো দেখাচ্ছে। দুজনেরই চোখে একটা বীভৎস কৌতূহলের ভাব। পিণ্টু দাঁড়িয়ে রয়েছে একলা এক জায়গায়। চোখে জল নেই। সে জলের দিকে নির্নিমেষে দেখছে। আবার সকলের মুখের দিকে ফিরে তাকাচ্ছে।

বিনু দেখল, সাধন অবাদি শীলা এক জায়গায়। ভবতোষের পাশে আলোক। আরও কয়েকজন চেনাতী মানুষ ভিড় করেছে। কাশের দেখানে নেই। তার বউ বাচ্চা পুকুরের ধারে বসে রয়েছে।

বিনু পায়ে পায়ে পিণ্টুর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। কাছে টানল তাকে। পিণ্টু একবার বিনুর দিকে তাকিয়ে আবার বল্লুলিকাকে দেখল। তারপরে বলল, কাল দিদি আমাকে বলেছিল, 'আমি পালিয়ে যাব।' আমি বলেছিলুম, 'আমিও তোর সঙ্গে পালাব।' কিন্তু আমাকে ও অনেক করে বললে, 'না তুই পালাবি না। তুই বড় হয়ে পালাবি।'

বিনু আরও জোরে চেপে ধরল পিণ্টুকে তার কোলের কাছে। বলল, তখন বলে দাও নি কেন বাবাকে?

—দিদি বলতে বারণ করেছিল। কিন্তু ওতো পালায় নি। ওতো জলে ডুবে গেছে।

পিণ্টুর ছোট মুখটা ফুলে রক্তাক্ত হয়ে উঠল। তার চোখ ভিজে উঠেছে। সে প্যান্টের পকেটে হাত দিল। বলল, দিদি বললে, তোকে একটা চিঠি দিয়ে যাচ্ছি। আমি চলে যাবার পর বাবাকে দিস।

বিনু চমকে উঠে বলল, কোথায় সেই চিঠি?

পিণ্টু পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে বিনুর হাতে দিল। বিনুর হাত কাঁপতে লাগল। তবু সে ভাঁজ খুলতেই, তার চোখের সামনে গোল গোল পরিচ্ছন্ন হাতের লেখা ফুটে উঠল,—

'আমার আর বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করে না। আমার নিজের মা যদি বেঁচে থাকত, তবে কী হত, আমি জানি না। আমার এই মাকে বাবা বেশ্যা বলে। পিণ্টুর সামনেও বলে। এই যা, পিণ্টুর মা। বাবা মা সব সময় খারাপ খারাপ কথা বলে, ঝগড়া করে। নতুন মা আমাকেও খুব খারাপ খারাপ কথা বলে। আমার আর সহ্য হয় না।

নতুন মার অনেক ব্যাটাছেলে বন্ধু আছে। তাদের সঙ্গে থিয়েটার করতে যায়। অনেক রাত্রে বাড়ি আসে! সারা রাত ঝগড়া হয়। বাবা ভয় পায় নতুন মাকে। বাবার চাকরিও নাকি নতুন মা খেয়ে দিতে পারে। অথচ বাবাতে আর নতুন মাতে এক এক সময় খুব ভাব। দেখলে কেমন গা ঘিন্ ঘিন্ করে। তখন দুজনকেই

বেহুদা মনে হয়। এখানে বেড়াতে এসেও খালি খারাপ খারাপ কথা আর ঝগড়া। আমার ভয় করে, ঘেন্না হয়। আমার আর এসব সহ্য হয় না। আমার পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু কোথায় যাব। কলকাতায়, আমাদের পাড়ায় বিভূতিদা আমাকে খারাপ খারাপ চিঠি লিখত। তার সঙ্গে পালাতে বলত। আমার ঘেন্না হয়। তার চেয়ে আমার মরে যাওয়া ভাল। পিন্টুটার জন্যে কষ্ট হয়। আমার মার কথা মনে পড়লে, আমার আরও মরে যেতে ইচ্ছা করে। —ইতি, মঞ্জুলিকা।'

বিনু যেন সহসা রোরুদ্যমান কান্নাকে আঁচল চেপে আটকাল। তাড়াতাড়ি চিঠিটা নিয়ে সে ভবতোষবাবুর হাতে দিল। রুদ্ধ গলায় বলল, দেখুন, পিন্টুকে দিয়ে গিয়েছে।

ভবতোষ চিঠিটা পড়তে লাগলেন।

বিনু আলোকের হাত চেপে ধরল। আলোক বলল, কী ওটা বিনু?

বিনু বলল, মঞ্জুলিকার চিঠি।

কাশেমের সঙ্গে স্থানীয় পুলিশ এল। আনুষঙ্গিক কথাবার্তা এবং কাজ আরম্ভ হল।

শেষ বেলায় একটা প্রেত স্তব্ধতা বিরাজ করছে বুন-লক-এ। মঞ্জুলিকার মৃতদেহ মর্গে নিয়ে গিয়েছে পুলিশ। চিঠিটিও নিয়ে গিয়েছে।

ঘরের মধ্যে বসেছিল ওরা চারজনেই।

সাধন বলল, তা হলে কাল সকালের গাড়িতেই আমরা ফিরব।

বিনু জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বলল, আলোককে আমি সেই কথাই বলেছি। সেও যাবে।

সাধন বলল, কিন্তু আলোক?

বিনু বলে উঠল, হ্যাঁ, আলোক। তোরা আমাকে ক্ষমা করিস সাধন? সারা জীবন ধরে মিথ্যে আর ছলনা করে আমি থাকতে পারব না। চারদিকের এই শব ভিতরে বাইরের মিথ্যার চেয়ে, আমার আপন বিশ্বাসে মরাও ভালো।

অনাদি যেন কিছু বলতে চাইল। বিনু উঠে পড়ল। বাইরে যেতে যেতে হঠাৎ থেমে আবার বলল, আজ সকালে পুকুর ঘাটে দাঁড়িয়েই মনস্থির করেছি।

বলে সে বেরিয়ে গেল। গিয়ে দাঁড়াল আলোকের দরজার সামনে। আলোক তাড়াতাড়ি দরজার কাছে এসে বলল, এস।

বিনু ঘরে ঢুকল। জানালার কাছে বসল দুজনে।

বাইরে সাঁওতাল পরগণা ক্রমেই আরও রক্তিম হয়ে উঠছে। ছায়ারা দীর্ঘ হচ্ছে। পলাশের বিয়ে ফিরছে রাখাল ছেলেমেয়েরা। রক্তিম ধুলো উড়ছে। গাছেরা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। পুরনোর ঝাড়াই বাছাই চলেছে। ফাল্গুনে সাজবে বলে। দূরে মহুর লয়ে ঘণ্টা বাজছে কোনো চড়াইগামী মোষের গলায়। লাল মোরগটা লাফ দিয়ে পাঁচিলে উঠে, পশ্চিম দিকে মুখ করে ডাকল, সূর্য দাঁড়াও। সূর্য যেয়ো না!

আলোক তাকাল বিনুর দিকে। খানিকক্ষণ পর বিনুও চোখ তুলল। ওরা আবেগে বাহিত হল না। ওরা হাসল না। হাত ধরল দুজনে দুজনের।

দূর থেকে একটা দেহাতী টানা সুর, খুব স্তিমিত শব্দ, কেটে কেটে ভেসে আসছে।

— সমাপ্ত —

বুক্কং মরনং গচ্ছামি

অমিতাভ দাশগুপ্ত

প্রথম দৃশ্য

[বেলদহ। লাঠি ইত্যাদি ছোরা প্রভৃতি হাতে পাঁচ ছ'জন গ্রামবাসীর ধনুর্ধর প্রবেশ।]

১ম গ্রামবাসী। (চাপা গলায়) সাবধান—সাবধান,—খুব সাবধান! এই কিন্তু সেই জালিবন, কাছাকাছিই কোথাও আছে মনে হচ্ছে।

মনে হচ্ছে কি রে? এই কেমন একটা পচা গন্ধ পাচ্ছিস্ নে?

হ্যাঁ হ্যাঁ খুব পাচ্ছি—।

কিসের গন্ধ বল দেখি—

কিসের গন্ধ গো? বাঘ শেয়াল নয় তো?

ন্যারে চাঁদারাম, বাঘ শেয়ালের গন্ধ হতে যাবে কেন? পচা আঙুলের গন্ধ।

৪র্থ। ও বাবা, সে আবার কি? পচা আঙুলের গন্ধ মানে কি গো?

১ম। আঃ,—চেঁচাস্ নি বলছি গু-খেকোর ব্যাটা, চেঁচিয়ে কানে প্রাণে সব মারবি না কি?

৪র্থ। ঐ সব পচা আঙুল কি সব বলছে গো? আমার যে কেমন ভয় ভয় করছে গো।

২য়। আরে আঙুল না হলে আর অঙ্গুলিমাল নাম হবে কেন? এ পথ দিয়ে যে মানুষই যায় তাদের মেরে ধরে সর্বস্ব লুঠ করে তারপরে হাতের আঙুল কটি কেটে রাখে; তাই দিয়ে রোজ তারা আঙুলের মালা গেঁথে গলায় পরে, আর ইয়া বড় লাল টক্‌টকে সিঁদুরের ফোঁটা কপালে দিয়ে আর লাল জবাফুল কানে দিয়ে ঢাল-তরোয়াল তীর ধনু নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। মালার আঙুল বাসি পচা হলেই ফেলে দেয়। এই তো—এই তো রে—এই তো কয়েকটা পচা আঙুল পড়ে রয়েছে—

৪র্থ। ও বাবা, আমি তবে পালাই—(পলাইতে উদ্যত)

২য়। (ধরিয়া কোমরের কাপড় ধরিয়া ফেলিয়া) পালাবি কি রে পালা—তো কে তবে এই হাতের বল্লম দিয়ে একেবারে এফোঁড় ওফোঁড় করে দেব।

৪র্থ। ও বাবা গো—

১ম। হেই—চুপ চুপ, সর্বনাশ করবে শালা, চেঁচিয়ে আমাদের সব ফন্দি মাটি করে দেবে। দে রে, ওকে ছেড়ে দে,—শালা নেড়ী কুত্তা—পালিয়ে বাঁচুক। (২য় ৪র্থকে ছাড়িয়া দিল)

৪র্থ। (পলাইতে পলাইতে) দোহাই বাবা, আমার বড় ভয়—আঙুল কেটে নেবে গো—।

[চতুর্থের প্রস্থান, তৃতীয়ও হাতের ছোরা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া চতুর্থের সঙ্গে প্রস্থান করিল।]

৫ম। কি রে তোদের হচ্ছে কি? এই করে তোরা ডাকাতের সঙ্গে লড়বি? অঙ্গুলিমাল ডাকাতের সঙ্গে? হ্যা হ্যা হ্যা—

১ম। কি করতে বলিস তুই? গোঁয়ারের মত এগিয়ে গেলেই তো চলবে না—একটু ভেবে চিন্তে তো এগোতে হবে—। দু'টো তো আবার পেছন থেকে পালিয়েই গেল।

[অস্ত্রশস্ত্র সহ আর কয়েকজন লোক লইয়া ঢাল ও বর্শা হাতে একজন সর্দারের প্রবেশ।]

সর্দার। কিরে, তোরা পুরুষ না মেয়েমানুষ রে?

১ম। মেয়েমানুষ হতে গেলুম কেন সর্দার—?

সর্দার। না হয় এমন পেছিয়ে পড়ে আছিস কেন?

ম। পেছিয়ে আছি কোথায় গো?

সর্দার। পেছিয়ে না তো কি? পঞ্চাশটা ব্যাটা লাঠি সোটা বল্লম নিয়ে এই বনের পথে ঢুকেছি; আমি যত এগিয়ে যাচ্ছি পেছনে তাকিয়ে দেখছি কোন লোক নেই। এই করে তোরা অঙ্গুলিমাল ডাকাতের

সঙ্গে লড়বি ? ফুঃ ফুঃ—তবেই হয়েছে !

১ম। এগিয়ে গেলেই তো চলবে না সর্দার, একটু দেখে শুনে তো এগোতে হবে। পথের পাশে এই সব পচা আঙুল দেখতে পাচ্ছ ?

সর্দার। তা তো দেখতে পাচ্ছিই : তা জেনে শুনেই তো সবাই এসেছি। মর্দের মতো এসেছি তো চল, নইলে আমি বাড়ি ফিরে চললাম।

২য়। অত কথা শোনাচ্ছ কেন ? বেশ তো, এগোও না—। আমিও বলি, ওসব উতুপুতু করে লাভ নেই কিছু। তুমি গলা ছেড়ে তোমার সর্দারী হাঁক ছাড়ো—যে যেখানে আছে ছুটে আসুক, তারপরে চল সব ক'ই এগিয়ে—

সর্দার। এই তো চাই, এই তো মর্দের মতো কথা। তাতে সবাই শক্ত করে ধর লাঠি সোটা ঢাল বল্লম ছোরা। এই হে হে হেরে হেরে হেরে (বনের মধ্য হইতেও বহুলোক সাড়া দিয়া উঠিল—হেই হেরে হেরে হেরে—।) বাঃ বাঃ, এই তো চাই—সবাই তবে কাছাকাছিই আছে। আমরা আজ দু'কুড়ি দশ—দেখি আজ ব্যাটা আমাদের কি করতে পারে। আজ ওরই একদিন না হয় আমাদেরই একদিন। সবাই চারদিক থেকে এগিয়ে চল—হেই হেরে হেরে হেরে হেরে—

[চারিদিক হইতে আবার সাড়া উঠিল, 'হেই হেরে হেরে হেরে—। সহসা একটা বিকট চিৎকার করিয়া ঢাল তলোয়ার ও তীরধনু হাতে বাঁকড়া বাঁকড়া চুলে পাক দিয়া ডাকাত অঙ্গুলিমাল সকলের উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িল। কেহ আর কিছু করিতে সাহস না পাইয়া যে যেদিকে পারিল দৌড় দিল।]

অঙ্গুলিমাল। (তাড়া করিয়া) গেল গেল, পালিয়ে গেল—ধর সোটা কয়েকের চুল টেনে—ধর ধর ধর—(পিছনে পিছনে তাড়া করিল। নেপথ্যে আর্তনাদ শব্দ—গেলুম রে গেলুম—উঃ মাঃ—। রক্তাক্ত হস্তে কয়েকটা কাটা আঙুল লইয়া পুনঃ প্রবেশ।) হাঃ হাঃ হাঃ—মোটে সোটা পাঁচেক ধরতে পারলেম, আর সব শেয়ালের মত পেটের মধ্যে লেজ চুকিয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল। ইস, অনেকগুলো হাতের কাছে ফুটে গেছিল রে : কিন্তু একা এতগুলোকে কি করে ধরে রাখি। এটা বগলদাবা করতে ওটা কসকে যায়। (হাতের মধ্যের কাটা আঙুলগুলির দিকে তাকাইয়া) দেখি আজ কটা আঙুল পাওয়া গেল, (গনিয়া) এক গণ্ডা—দু'গণ্ডা—তিন গণ্ডা—চার গণ্ডা—দুই ; এক কুড়ি দুই হল। না, তেমন ভাল মালা তো হবে না—এক কুড়ি দুইতে আর কতটুকু মালা হবে। মোটে পাঁচটাকে ধরতে পারলুম, একটার আঙুল কাটতে আর একটা পালিয়ে যায়, সব কটার আঙুল তো আর পেলাম না,—মোটে এক কুড়ি দুটা হল। (সামনের দিকে অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া) ঐ যে কারা আমার আসছে এদিকে, গাছ-পালার আড়ালে ভাল তো দেখা যাচ্ছে না। একটা বুড়ো মানুষ আর একটা বাচ্চা মনে হচ্ছে না ? হ্যাঁ হ্যাঁ—তাই তো—তাই তো একটু কোপঝাড়ের আড়ালে লুকোই, নইলে ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবে (আস্তে আস্তে ভিতরে লুকাইল।)

[একটি ভিখারী ও বছর আটেকের একটি ছেলের প্রবেশ।]

ছেলে। বাবা, এ তুমি আমায় কোন পথে নিয়ে এলে ? এ পথে তো আমি কখনো চলি নি। পথ যে আর ফুরোচ্ছেই না।

ভিখারী। (চারিদিকে ভয়ে ভয়ে তাকাইয়া) আমিও তো তাই ভাবছি, এতো ঠিক কোশলনগরে পৌঁছবার পথ নয়। পথ ভুলই করলাম ?

ছেলে। এ যে বনের মধ্যে এসে পড়েছি, আমার যে ভয় করছে।

ভিখারী। (ছেলের মাথায় হাত দিয়া) বালাই বাবা, কিছু ভয় নেই। আয় আর একটু এগোই, একটু এগোলেই পথ একটা পেয়ে যাব।

ছেলে। চারদিক থেকে কেমন বিচ্ছিরি একটা গন্ধ আসছে বাবা—

ভিখারী। হ্যাঁ তা তো আসছে। এ কোন পথে এসে পড়লুম মধুসূদন ! (ছেলেকে জড়াইয়া ধরিয়া) না না, বাবা তোর কোনো ভয় নেই—নারায়ণ মধুসূদন আমাদের রক্ষা করবেন। আয় আমি তোকে কোলে নিয়ে দৌড়ে পালাই –

ছেলে। না বাবা, ফোলে নিতে হবে না, আমিই দৌড়ে যেতে পারব। কোন দিকে যাব বলতো ?

ভিখারী। অচেনা পথে সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে আর কাজ নেই চল বাবা, যে পথে এসেছি সেই পথেই ফিরে যাই, কাজ নেই আর আমাদের কোশল-নগরে গিয়ে। (ফিরিয়া চলিতে উদ্যত)

নেপথ্যে অঙ্গুলিমাল। এই বুড়ো আর এক পা নড়বে না ; যেখানে আছ সেখানেই স্থির হয়ে দাঁড়াও।

ছেলে। (ভয়ে চমকাইয়া) কে—কে বাবা ? বেহুঁশ—হা ভূত ?

ভিখারী। (ভীত ত্রস্তভাবে) তাই তো বাবা, তাই তো —কিহুই যে —নারায়ণ—মধুসূদন—

অঙ্গুলিমাল। (প্রবেশ করিয়া) স্থির হয়ে দাঁড়াও—

ছেলে। (বাবাকে জড়াইয়া ধরিয়া চিৎকার দিয়া) রাক্ষস বাবা, রাক্ষস—

অঙ্গুলিমাল। হাঃ হাঃ হাঃ—রাক্ষস—রাক্ষস—ঘরে ঘরে খাঁই—(অগ্রসর হওয়া)

ভিখারী। কি সর্বনাশ, কি সর্বনাশ—! সেই যে লোকের মুখে শুনেছি অঙ্গুলিমাল—সেই—

অঙ্গুলিমাল। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—ঠিক ধরেছ—ঠিক ধরেছ—সেই অঙ্গুলিমাল—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

ভিখারী। রক্ষা কর বাবা রক্ষা কর ; প্রাণে মেরো না। ও আমার দুঃখীর ধন—ভিখারীর হাতের নড়ী—প্রাণে মেরো না।

অঙ্গুলিমাল। বাঘের মুখে পড়ে কি কেউ আর ফিরে যায় ? আর দেখি নি এদিকে—একবার দেখি—(কাছে অগ্রসর)—

ভিখারী। (ছেলেকে জড়াইয়া) বাবা গো—এখন কি করি—

অঙ্গুলিমাল। (বিকটস্বরে ধমক দিয়া) হেই—আর একবার টুঁশব্দ করবি তো এই তরোয়ালের এক ঘায়ে বাপ ও ছেলে দু-ই শেষ। কাছে আয়—(যন্ত্রচালিতের মত বাবা ও ছেলের কাছে অগ্রসর হওয়া) দেখি তোদের হাতে—(উভয়ে হাত খুলিয়া দেখাইল)।

ভিখারী। কিহু নেই বাবা, কিহু নেই। ভিখারী—ভিক্ষা করতে চলেছিলুম কোশল নগরে। আমার এই বাছাকে ছেড়ে দাও—আমি ভিক্ষা করে তোমাকে অনেক সোনার মোহর দিয়ে যাব।

অঙ্গুলিমাল। (আবার বিকটকণ্ঠে ধমক দিয়া) চোপ—। দেখি হাত —। বা বা—আঙুলগুলো ছোঁড়ার তো বেশ লাল টুকটুকে। বেশ মানাবে, বেশ মানাবে আঙুলের মালায়, বেশ মানাবে। (বাপের একখানা হাত ও ছেলের একখানা হাত বাঁ হাতে ধরিয়া টানিতে টানিতে) চল চল দেখি ঐ ওদিকে ঐ চিবিটার দিকে —(আরও টানিয়া পিছন ফিরিয়া) রাখ, দুজনের দুহাত এই চিবির ওপরে রাখ—তারপরে—এই (তরোয়াল দিয়া দুজনের হাতের আঙুল কাটিল. ছেলেটা চিৎকার করিয়া উঠিল—'বাবা'—বাবা চিৎকার করিয়া উঠিল—'নারায়ণ'—। অঙ্গুলিমাল কাটা আঙুলগুলি বাঁ হাতে লইয়া দুই পায়ে বাবা ও ছেলেকে দুই লাথি মারিয়া)—পালা পালা—প্রাণে বাঁচতে চাস্ তো পালা—। (ভিখারী ও ছেলের পলায়ন। অঙ্গুলি-মাল কাটা আঙুল কটি হাতে নাড়িতে চাড়িতে) বাঃ—বাঃ—কি সুন্দর টাটকা আঙুল ! ছেলেটার আঙুল দুটো লাল টকটকে। বেশি কাটি নি, দুটো দুটো কেটে রেখেছি, বাপের দুটো আর ছেলের দুটো। ছেলের লাল টুকটুকে আঙুল দুটো মালাটার ঠিক মাঝখানে গেঁথে দেব। বাঃ—বাঃ—কেমন মজা হবে ! পলার মালা বাসি হয়ে গেছে, পচা দুর্গন্ধ হয়েছে—দূর যা (গলার মালা দূরে ফেলিয়া দিল), নোতুন মালা করি সে।

[প্রস্থান]

। দৃশ্য পরিবর্তন ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[কোশল নগরের রাজপুরীর সম্মুখে মন্ত্রী ও একটি বহু জনতা। 'আমরা রাজার সঙ্গে দেখা করতে চাই' বলিয়া জনতা কোলাহল করিতেছিল]

মন্ত্রী। এমনভাবে সবাই মিলে কোলাহল করলে আমি সৈন্য ডেকে সব লাঠিসেটা করে তাড়িয়ে দেব। (সকলে চুপ করিল) তোমাদের তো বুঝিয়ে বললাম, রাজা প্রসেনজিৎ এখন রাজপুরীর বাইরে যাবেন,

এখন তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না—আর একদিন তোমরা এসো।

১ম। আর একদিনের মধ্যে যে আমাদের মধ্যে আর কয়েকটা ঘায়েল হয়ে যাবে।

মন্ত্রী। রাজা তার কি করবেন?

২য়। এটা কি একটা ন্যায্য কথা হল মন্ত্রীমশাই? প্রজারা ঘায়েল হলে রাজার তা দেখতে হবে না?

মন্ত্রী। একটা ডাকাত এতবড় একটা জনপদের সব লোকজন ঘায়েল করে দিচ্ছে একথা বলতে তোমাদের লজ্জা হচ্ছে না?

৩য়। ঘায়েল যখন হচ্ছিই তখন লজ্জা করে আর লাভ কি হবে?

৪র্থ। সে একটা লোক তো আপনি দেখেন নি—সে লোক নয়, বনের কোনো দৈত্য-দানব হবে; তার হাতে রক্তমাখা তলোয়ার ছাড়া কেউ কখনো দেখেনি।

৫ম। আমরা পঞ্চাশ জন একদিন এক সঙ্গে গেছিলুম তার সঙ্গে জুঝতে, কেউ অক্ষত ফিরি নি, পাঁচটা লোক মেরে ফি।

১ম। আমাদের মারুন কাটুন—যা হয় করুন, কিন্তু রাজার সঙ্গে দেখা একবার না করে আজ আর আমরা ফিরছি নে।

মন্ত্রী। আচ্ছা আমি আজ আগে রাজার সঙ্গে কথা বলি—তারপরে—

৫ম। তাতে হয় না মন্ত্রী মশাই; আমাদের কথা আমরা না বললে রাজার দয়া হবে কেন?

৩য়। কিন্তু মনে করবেন না মন্ত্রী মশাই; এই আপনার কথাই এমন মিষ্টি মিষ্টি যে, তা শুনলে রাজার কাছে আমাদের কষ্টের কথাও হয়ত মিষ্টি লেগে যাবে।

[দুই জন রাজপ্রতিহারীর প্রবেশ]

১ম প্রতিহারী। সরে দাঁড়াও সব—সরে দাঁড়াও—

২য় প্রতিহারী। মহারাজ রাজপুরী থেকে বাইরে যাচ্ছেন।

মন্ত্রী। (ব্যস্তভাবে) তাই তো, রাজপুরীর সম্মুখে এত জনতা দেখলে মহারাজ প্রসেনজিৎ কি মনে করবেন! সরে দাঁড়াও সরে দাঁড়াও—একেবারে গা ঢাকা দাও সকলে—রাজা আসছেন—রাজা আসছেন—

[অপর দুই জন প্রতিহারীর প্রবেশ]

৩য় প্রতিহারী। একি, এত ভিড় কেন এখানে? মহারাজ, সে এসে পড়েছেন।

৪র্থ প্রতিহারী। (দু'এক জন লোককে ঠেলা মারিয়া) কি চাই এখানে—কি চাই—

১ম লোক। বাবা, ধমক আর ঠেলা খেতে খেতেই দেখি মরলাম।

মন্ত্রী। আর কথা নয়, কথা নয়—মহারাজ এসে পড়েছেন—চারদিকের এই কলরব লতাপাতার পেছনেই যে যেমন করে পার লুকিয়ে পড়।

[মহারাজ প্রসেনজিতের প্রবেশ, রাজা চলিয়া যাইতেছিলেন, পিছন হইতে অস্ফুট কণ্ঠস্বর শোনা গেল 'মহারাজ' —]

প্রসেনজিৎ। (সহসা পিছন ফিরিয়া) কে?

মন্ত্রী। ও সব কেউ নয় মহারাজ, কেউ নয়।

[রাজা আবার চলিয়া যাইতেছিলেন; আড়ালে আবার শোনা গেল 'আমরা কয়েকজন ছিলাম মহারাজ'—]

প্রসেনজিৎ। আবার কে?

মন্ত্রী। কেউ নয়—ওরা কেউ নয়—

প্রসেনজিৎ। ওরা কারা?

১ম লোক। (প্রস্তুত থাকিয়া) মন্ত্রী মশাইকে ভয় করি মহারাজ; আপনি একটু অভয় দিলে এগিয়ে এসে বলতে পারি আমরা কারা।

প্রসেনজিৎ। অভয় দিচ্ছি, এগিয়ে এস।

[জনতা আড়াল হইতে রাজার কাছে আগাইয়া আসিল।]

২য়। আমরা মহারাজের প্রজা; কোশল নগরের উত্তরের গলিগুলিতে বাস করি; আমাদের মহারাজ রক্ষা করতে হবে।

প্রসেনজিৎ। কেন, তোমাদের কি হয়েছে?

২য়। বিপদ মহারাজ, বিপদ।

৩য়। মহারাজের কাছে বিপদ বলছিস কি রে, বল মহা বিপদ।

প্রসেনজিৎ। তোমাদের কি হয়েছে খুলে বল।

মন্ত্রী। ওদের কথার কি আর অন্ত আছে মহারাজ? ওদের অত কথা শুনতে গেলে মহারাজের অনেক বেলা হয়ে যাবে।

প্রসেনজিৎ। হোক বেলা তোমরা বল।

৪র্থ। আহা, রাজা আমাদের দেবতা। প্রণাম হই রাজা, প্রণাম হই।

৫ম। দেবতা দিয়ে কি হবে, বল রাজা আমাদের বাপ-মা, আর পায়ের ধুলো নেই— (পায়ের ধুলো লইতে আগাইয়া যাওয়া)

মন্ত্রী। (বাধা দিয়া) হয়েছে ব্যাটা, সরে দাঁড়া।

প্রসেনজিৎ। তোমাদের কথাটা কি তাই আগে বল।

২য়। মহারাজ, বলছিলুম সেই জালিবনের অঙ্গুলিমালের কথা, তার অত্যাচারে উত্তর অঞ্চলের লোক আমরা সবাই মনে প্রাণে মরলাম।

প্রসেনজিৎ। কে সে অঙ্গুলিমাল?

১ম। ও চর এত দিনে দেখি তার নামটা পর্যন্ত মহারাজের কানে গিয়ে পৌঁছয় নি। মন্ত্রী মশাইয়ের মুখে আমাদের কান্নাকাটি দেখছি সব বৃথাই হল।

২য়। অঙ্গুলিমাল এই আমাদের উত্তর অঞ্চলের জালিবনের একটা ডাকাত মহারাজ। ডাকাত না বলে তাকে যমদূত বললেই ভাল হয়। ব্যাটা দেখতেও যেমন যমদূত—কাজেও তেমনি যমদূত।

১ম। আমাদের উত্তর অঞ্চল মহারাজ পাহাড়ী বন্য অঞ্চল, তার ভেতরে পথে ঘাটে ব্যাটা বাঘের মত ওত পেতে বসে থাকে; হাতে থাকে টাল-তরোয়াল আর তীরধনু। তার পাতলা দাদা তরোয়ালটা—কি বলব মহারাজ—সাপের জিভের মত লক্‌লক্‌ করতে থাকে, তার তীরে মাখানো থাকে গোখরো সাপের বিষ।

২য়। কাছের থেকে হোক আর দূরের থেকে হোক, আমাদের দেখতে পেলে ও হয় তীর ছুঁড়বে—না হয় খোলা তরোয়াল নিয়ে ধাওয়া করবে। তারপরে আমাদের যথাসর্বস্ব লুট ক'রে প্রাণে মেরে পা ধরে টানতে টানতে গভীর বনের মধ্যে ফেলে দেবে, না হয় আঙুলগুলো কেটে নিয়ে লাশ মেরে তাড়িয়ে দেবে।

প্রসেনজিৎ। কেন, আঙুল কেটে নিয়ে সে কি করে?

২য়। আঙুল কেটে কেটে সে নিত্য নোতুন আঙুলের মালা করে, আর তাই গলায় পরে—রোজ নোতুন একটা মহারাজ!

প্রসেনজিৎ। ওঃ—কি বীভৎস!

৪র্থ। তাহলেই দেখুন মহারাজ অঙ্গুলিমাল কি ভীষণ লাগছে; আর আমাদের কপালে মহারাজ তা প্রায় নিত্য ঘটছে।

৪র্থ। এই দেখুন মহারাজ আমাদের অনেকের হাতেরই কয়েকটা ক'রে আঙুল নেই। আমরা সেদিন পঞ্চাশটা নর একত্র হয়ে লাঠি-সোটা চাল বল্লম ছোরা নিয়ে গেলুম তার সঙ্গে যুঝতে—হাতের আঙুল দিয়ে কোনো রকমে প্রাণে বেঁচে ফিরেছি।

প্রসেনজিৎ। এত বড় সব সাংঘাতিক কথা—এ তোমরা আমাকে আগে জানাও নি কেন?

২য়। আপনার দর্শন তো আমরা পাইনে মহারাজ—আমরা মন্ত্রী মশাইকে কবে থেকে জানিয়ে আসছি।

প্রসেনজিৎ। কই মন্ত্রী, তুমি তো আমাকে এ-কথা জানাও নি কখনো।

মন্ত্রী। আজ্ঞে জানাব জানাব অনেকদিন থেকে করেছি—ঠিক জানানোটা আর হয় নি।

প্রসেনজিৎ। সে কি কথা, এতবড় একটা নরঘাতকের অত্যাচারে প্রজারা আমার উৎপীড়িত—আর তুমি সে কথাটা আমার কানে তুলতেই সময় পাও নি মন্ত্রী? আশ্চর্য!

জনতা একসঙ্গে। জয় রাজা প্রসেনজিতের—

প্রসেনজিৎ। থামো তোমরা। মন্ত্রী, কাল অতি প্রত্যূষে আমি রওনা হব এই নরঘাতক অঙ্গুলিমালকে শাস্তি দিতে; আমার সঙ্গে সুশিক্ষিত সৈন্য চাই।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞে মহারাজ।

প্রসেনজিৎ। আমি আগে ওকে বন্দী করে নিয়ে আসব; তারপরে প্রকাশ্য রাজপথের চৌরাস্তার সর্বজনসমক্ষে খাতক দিয়ে ওর গায়ের মাংস কেটে টুকরো টুকরো ক'রে পথের কুকুর দিয়ে খাওয়াব।

১ম। তবে মহারাজ ও পশুর ঠিক শাস্তি হবে।

প্রসেনজিৎ। তোমরা সব চলে যাও—আমি নিজে এর প্রতিবিধান করছি।

জনতা একত্রে। জয় মহারাজ প্রসেনজিতের।

[একদিকে জনতার ও অন্যদিকে প্রতিহারী ও মন্ত্রী সহ প্রসেনজিতের প্রস্থান।]

॥ পটক্ষেপ ॥

তৃতীয় দৃশ্য

[পাহাড়ী বন পথ। সায়াহ্ন বেলা। বুদ্ধদেব একাকী পথ চলিতেছেন; মুখে তিনি বলিতে বলিতে যাইতেছেন, 'সবে সত্ত্বা সুখিতা হোন্তু, সবে সত্ত্বা অবেরা হোন্তু, সবে সত্ত্বা অব্যাপজ্জা হোন্তু, অনীঘা হোন্তু, সুখী অত্তানং পরিহরন্তু।' দুইটি রাখাল বালক দৌড়াইয়া প্রবেশ করিল, একটিকে অপরটি তাড়া করিয়া আসিয়াছে।]

বুদ্ধ। (একটি বালকের প্রতি) ও কি ওকি, তুমি ওকে অমন ক'রে তাড়া করছ কেন?

১ম বালক। আজ্ঞা শ্রমণ ঠাকুর, তুমিই এর বিচার কর।

বুদ্ধ। (হাসিয়া) বিচার? কিসের বিচার?

১ম বালক। না হাসবার নয়; এর বিচার তোমাকে করতেই হবে।

বুদ্ধ। (কাছে ডাকিয়া আদর করিয়া) আচ্ছা কিসের বিচার শুনি।

১ম বালক। ও ওর হাতের পাচনবাড়ি দিয়ে আমার বুধি গাইয়ের গায়ে পপাং ক'রে এক বাড়ি মেরেছে।

২য়। মিছামিছি মেরেছি? বুধিগাই পেছন থেকে আমাকে অমন করে গুঁতো দিল কেন?

১ম বালক। কেন দেবে না? তুই অমন করে বুধি গাইয়ের সামনে পড়লি কেন? শ্রমণ ঠাকুর শোন, ব্যাপারটা তোমাকে বুঝিয়ে বলছি। বুধিগাইয়ের নোতুন শিং উঠছে, সকলাইকে তাই গুঁতোতে চায়। আমি ওকে বার বার বলেছি বুধির সামনে সামনে হাঁটিস নি; তা ও করেছে কি, বুধির সামনে সামনে হাঁটতে হাঁটতেই আবার একটা শিশুগাছের ডালে কতকটা হরিয়াল পাখী দেখে হাঁদার মতন হাঁ করে তাকিয়ে রইল। তখন বুধি পেছন থেকে গুঁতো মারবে না? তুমিই বল।

বুদ্ধ। (দ্বিতীয় বালককে কাছে ডাকিয়া আদর করিয়া) দোষ তোমারই হয়েছে। গোরু তো কিছু বোঝে না, তুমি তো বুঝতে পার, তোমারই একটু সামলে চলা উচিত ছিল না কি?

২য় বালক। তা বলে অমন করে গুঁতো দিলে রাগ হয় না?

১ম বালক। কেন তো, রাগ করে তুই বুধিকে একটা বাড়ি দিয়েছিস আমার আরও আরও আরও অনেক রাগ হয়েছে—আমি আমার হাতের এই পাচনবাড়ি দিয়ে তোকে পপাং পপাং করে তিন তিনটা বাড়ি দেব।

বুদ্ধ। (হাসিয়া) তাহলে যে তোমরা দুজনেই একইভাবে ভুল করলে, একই ভাবে অন্যায় করলে।

১ম বালক। কেন?

বুদ্ধ। (দুইজনকেই কাছে ডাকিয়া) তোমরা দুজনেই নিশ্চয় কৃষকের ছেলে।

উত্তরে। হাঁ।

বুদ্ধ। (প্রথমের প্রতি) ধর এ এসে তোমার ফসলের জমিতে মাটি খোঁড়ে মস্ত বড় একটা গর্ত করে দিল। ওর নিশ্চয়ই অন্যায় হল?

১ম বালক। হাঁ।

বুদ্ধ। তোমার ক্ষতিও হল, ওর রাগও হল।

১ম বালক। তা হবে না?

বুদ্ধ। তখন তুমি ওর জমির ফসল নষ্ট করে তিনগুণ বড় একটা গর্ত করে রেখে দিয়ে আসবে না?

১ম বালক। তা তো করবই।

বুদ্ধ। ও তোমার ফসল নষ্ট করে জমিতে গর্ত করে তোমার ক্ষতি করে পাপ করেছিল?

১ম বালক। হ্যাঁ—।

বুদ্ধ। তার বদলে তুমি তা হলে তিনগুণ পাপ করলে?

১ম বালক। হ্যাঁ—তা তো করলাম কিন্তু না করে আর কি করতে পারতাম?

বুদ্ধ। আমি হলে কি করতাম জান? (২য় বালকটিকে জড়াইয়া ধরিয়া) এমনি করে জড়িয়ে ধরে ক্ষমতাম, ভাই তোমার অন্যায় হয়েছে। (২য় বালককে) তুমি এখন বুঝতে পারছ বুধিকে মারা তোমার অন্যায় হয়েছে?

২য় বালক। (বুদ্ধের চীবরের মধ্যে মুখ লুকাইয়া) হ্যাঁ—।

বুদ্ধ। তা হলে এখন যাও, দুজনে বুধিকে আদর করে বাড়ি নিয়ে যাও। দেখ তোমাদের ঝগড়া বিবাদে তোমাদের গোরুগুলো আবার কোথায় চলে গেল।

২য় বালক। তুমি কোথায় যাবে শ্রমণ ঠাকুর?

বৃদ্ধ। আমি? এই সামনের বনের পথে চলে যাব।

২য় বালক। সামনে এই দিকে? ও বাবা—

বৃদ্ধ। কেন?

২য় বালক। এদিকে যে আর একটু এগোলেই ভীষণ এক মানুষখেকো রাক্ষস থাকে; তোমার কাপড় চোপড় কেড়ে নিয়ে তোমাকে মেরে ফেলে তোমার আহ্লাদ কটা কেটে নেবে যে।

বৃদ্ধ। তাই না কি? তবে একবার একটু এগিয়ে দেখেই আসি।

১ম বালক। অমন কাজও করো না শ্রমণ ঠাকুর। বেলা পড়ে এল, একটু পরেই সন্ধ্যা হবে, সন্ধ্যা বেলা এ পথে কেউ চলে না; তাতে তো তুমি আবার একেবারে একা। তুমি আমাদের সঙ্গে ফিরে চল, নইলে নিশ্চিন্ত প্রাণে বাঁচবে না।

বৃদ্ধ। (হাসিয়া) তোমরা ভয় পাচ্ছ, কিন্তু আমার তেমনি কোন ভয় নেই। তোমরা তোমাদের পথে চলে যাও—আমি আমার পথে চলি।

[বালকদের সামনের পথে আগাইয়া চলিলেন, বালক দুইটি ভয়ে বিস্ময়ে তাকাইয়া রহিল। বুদ্ধ বলিতে বলিতে চলিলেন, 'সবে সত্ত্বা সুখিতা হোন্তু, সবে সত্ত্বা অবেরা হোন্তু, সবে সত্ত্বা অব্যাপজ্জা হোন্তু']

। দৃশ্যান্তর ।

[পাহাড়ী বনপথ। ভীত সন্ত্রস্তভাবে তিন জন চাষীর প্রবেশ।]

১ম চাষী। হ্যাঁ হ্যাঁ, একজন শ্রমণ ঠাকুর বলেই তো মনে হচ্ছে। অনেক দূর যে এগিয়ে গেছে গো—আর একটু এগোলেই তো সর্বনাশ—একেবারে অঙ্গুলিমালের খপ্পরে পড়ে যাবে।

২য়। অনেকদূর এগিয়ে গেছে যে, আমরাই বা ফেরাতে আর কতটা এগোব—তা হলে আমরাই যে সেটা যমদূতের হাতে গে পড়ব।

৩য়। গলা খুলে একবার ডাক পাড়ব না কি রে?

১ম। তারপরে গলার শব্দ শুনে যদি ব্যাটা যমদূত আমাদেরই এসে সাপটে ধরে?

২য়। যা থাকে কপালে একবার ডেকে দেখি।—ওগো শ্রমণ ঠাকুর—ওগো ও শ্রমণ ঠাকুর—

৩য়। ওরে শুনেছে শুনেছে, ডাক শুনেছে—ঐ দেখ ডাক শুনে ফিরে তাকিয়েছে। আরও জোরে আবার ডাক দেখি—

২য়। ওগো ও শ্রমণ ঠাকুর—

১ম। ফিরে দাঁড়িয়েছে—ফিরে দাঁড়িয়েছে—ডাক ডাক—

২য়। ওগো ও শ্রমণ ঠাকুর, ফেরো ফেরো—

[তিনজনেই একটু আগাইয়া হাত ইসারায় ডাকিতে লাগিল।]

৩য়। ওরে আসছে—আসছে—ফিরে আসছে—

১ম। এদিকে তাকাচ্ছি ঠাকুর—এদিকে এসো—

২য়। আহা কি রূপ দেখেছিস? দশা থেকে যেন দেবতা নেমে এসেছে গো।

৩য়। যা বলেছিস ভাই, এমন চেহারা তো আর চোখে দেখি নি। শ্রমণ মানুষ, জালিবনের খবর কি আর জানে কিছু! আহা, একটু হলেই তো ব্যাটা নর-খাদক অঙ্গুলিমালের হাতে প্রাণ হারিয়েছিল আর কি।

১ম। আরে ঠাকুর গো, একটু জোর পায়ে হেঁটে এসো, আমরা প্রাণ হাতে করে তোমার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি।

২য়। একা একা কি যেন বিড় বিড় করতে করতে আসছে—পাগল টাগল নয় তো—

৩য়। কি বলছিস রে তুই, কি দেবতার চেহারা গো—ঐ মানুষ কখনো পাগল হয়? দূরে থেকে দেখে শেরাম করতে ইচ্ছে করছে যে।

১ম। একটু পা চালিয়ে এসো গো ঠাকুর—পাহাড়ী পথ।—এক্ষুনি টুপ করে সূর্য ঠাকুর কোথায় অস্ত যাবেন—আর পথ ঘাট আঁধার হয়ে উঠবে।

[একটু দূর হইতে বুদ্ধের কণ্ঠধ্বনি শোনা যাইতেছে, সবে সত্ত্বা সুখিতা হোন্তু, সবে সত্ত্বা অবেরা হোন্তু, অব্যাপজ্জা হোন্তু, অদীঘা হোন্তু, সুখী অত্তানং পরিহরন্তু।]

২য়। শ্রমণ ঠাকুর বিড় বিড় করে কি বলছে গো?

৩য়। বাবা শ্রমণ ঠাকুরদের কথা আমরা আর কি করে জানব, হয়ত কত মন্তোর-তন্তোর বলতে বলতে যাচ্ছেন।

১ম। এই যে এসো ঠাকুর, এই তোমার জন্যে আমরা প্রায় আধক্রোশ দূর থেকে দৌড়োতে দৌড়োতে

এসেছি—কি হাঁটা হাঁটি তুমি ঠাকুর (বেরুচ্ছো ?

(তিন জনের প্রবেশ) এসো ঠাকুর, তোমাকে দেখলেই কেমন পেন্নাম করতে ইচ্ছে হচ্ছে, আগে বাবা একটি বার পেন্নাম হই। (তিন জনেই প্রণাম করিল, বুদ্ধ হাত তুলিয়া আশীর্বাদ করিলেন।)

বুদ্ধ। কেন তোমরা আমার পেছনে এমন করে ছুটে এসেছ ?

২য়। সে তোমাকে পরে বলব ; এখন এসো তো দেখি আমাদের সঙ্গে—যেমন জোর পায়ে হেঁটে এসেছ তেমনি জোর পায়েই পৌঁছিয়ে চল অনেকখানি, আগে বিপদ্ হয়ে নি বাবা।

বুদ্ধ। আমাকে যে অনেকখানি এগিয়ে যেতে হবে, আমার তো পৌঁছিবে যাবার পথ নয়।

৩য়। কি সব হেঁয়ালি কথা বলছ ঠাকুর ? কোনখানে তোমার থাকা হয়।

বুদ্ধ। আকাশের নীচে যেখানে একটু ঠাঁই পাই সেখানেই থাকি।

৩য়। আরে কি মুশকিল ! বলি আজ কোথা থেকে আসা হয়েছে ?

বুদ্ধ। শ্রাবস্তী পুরের জেতবন থেকে।

১ম। চল বাবা, আমরা শ্রাবস্তী পুরের পথ চিনি, তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

বুদ্ধ। সে পথে তো এখন যাব না, আমি এগিয়ে যাব সামনের দিকে।

২য়। সামনের দিকে কি আছে তুমি তো জান না ঠাকুর—

৩য়। তাই তো আমরা দূরে থেকে তোমাকে দেখতে পেয়ে মাঠঘাট পেরিয়ে ছুটতে ছুটতে এসেছি।

বুদ্ধ। সামনে কি আছে আমি সব জানি, জানি বলেই তো এগিয়ে চলেছি।

১ম। কিন্তু জান না ঠাকুর, জানলে আর এক পাও এগোতে না, ঠক্‌ঠক্ ক'রে তোমার পা দু'খানি কাঁপতে থাকত।

বুদ্ধ। কেন ? মরণ ভয়ে ?

২য়। মরণ মানে সাক্ষাৎ মরণ, একেবারে হা-করে আসবে তোমাকে গিলতে ?

বুদ্ধ। (হাসিয়া) শোন বন্ধুগণ, শ্রমণ গৌতম দীর্ঘ রাত্রি তপস্যা করেছে, তপস্যা করে এই শ্রমণ গৌতম ক্রোধহীন হয়েছে, ভয়হীন হয়েছে, মরণকে জয় করেছে।

৩য়। কি সব কথা বলে রে !

বুদ্ধ। শ্রমণ গৌতম কখনো মিথ্যা কথা বলে না। সে যদি তপস্যা না করে থাকত, ক্রোধহীন ভয়হীন না হয়ে থাকত, মরণ বিজয় না ক'রে থাকত তবে সে তা বলত না। তোমরা ফিরে যাও বন্ধুগণ, পেছবার পথ আমার নয়—আমার এগিয়ে যাবার পথ।

১ম। এগিয়ে কোথায় যাবে ?

বুদ্ধ। অঙ্গুলিমাল দস্যুর কাছে, তোমরা যার ভয় দেখাচ্ছ তার কাছে,—কারণ শ্রমণ গৌতম সত্যকে জেনেছে সে লোভহীন হয়েছে—সে ভয়হীন হয়েছে।

(নতজানু হইয়া) এই পড়ন্ত বেলায় তোমাকে আমরা কিছুতেই অঙ্গুলিমালের হাতে ছেড়ে দেব না ; তুমি শ্রমণ মানুষ, অঙ্গুলিমাল কি তা তুমি ভাবতেও পারবে না। তুমি আজ জেতবনে ফিরে না যাও আজকের রাতটির জন্যে তুমি এই গরিব কৃষকের বাড়ি চল আমার ঘর ভাল করে খড় দিয়ে ছাওয়া আছে, আমার ঘরে ঘন দুধ দোওয়া আছে, আমার ঘরে আগুন জ্বালা আছে—তোমার কোন কষ্ট হবে না।

বুদ্ধ। ছাওয়া-ঘর পেছনে ফেলে অবারিত আকাশের নীচে বেরিয়ে পড়েছে এই শ্রমণ গৌতম, রাজঐশ্বর্য রাজ-ভোগ ধূলিমুষ্টির মতন ফেলে ফেলে এসেছে এই শ্রমণ গৌতম, যেখানে যে আগুন ছিল সব নিভিয়ে দিয়ে চলে এসেছে এই শ্রমণ গৌতম ; সত্যকে জেনে সে লোভহীন হয়েছে, ক্রোধহীন হয়েছে, ভয়হীন হয়েছে। তাকে আর তোমরা পিছনে ডেকো না—তোমাদের কল্যাণ হোক—সকে লজ্জা দূরিতা হোক্, অবেরা হোক্, অব্যাপজ্জা হোক্, অনীঘা হোক্, সুখী অত্তানং পরিহরন্তু—[বলিতে বলিতে প্রস্থান।]

চতুর্থ দৃশ্য

[পাহাড়ী বনপথ। অঙ্গুলিমাল তীরধনু ঢাল-তরোয়াল হাতে লইয়া আঙুলের মালা গলায় ঝকাক দেহে টলিতে টলিতে প্রবেশ করিল।]

অঙ্গুলিমাল। হাজারটি আঙুল হলেই মালা পূর্ণ হয়, নিরানব্বইটি হয়েছে—আর একটি—একটি আঙুল পেলেই সংকল্প পূর্ণ হত। তাই তো, ভেবেছিলাম আজকেই সংকল্প পূর্ণ করব, কিন্তু তা তো বুঝি হল না। তাই তো, প্রায় যে সন্ধ্যা হয়ে এল, তবে তো বুঝি আজ আর হল না। (এদিক-ওদিক তাকাইয়া ইতস্তত পদচারণ করিয়া) তবে আর কি করি, কাছাকাছি কোথাও কাউকে না পেলে আর কি করি,—আজ তবে বাড়িই ফিরে যাই। (ফিরিতে ফিরিতে হঠাৎ দূরের দিকে তাকাইয়া) ঐ—ঐ যেন কেউ একজন আসছে না এদিকে? হ্যাঁ হ্যাঁ—আসছে আসছে—একটি শ্রমণ ব্রাহ্মণ, হাতের থেকে না ফসকায়। (আবার তাকাইয়া) কিন্তু কি আশ্চর্য, কেমন টান হয়ে বুক ফুলিয়ে নির্ভয়ে হেঁটে আসছে। ওকি জানে না অঙ্গুলিমাল দস্যুর কথা? ওর মনে কি নেই জীবনের কোন ভয়? এই সন্ধ্যায় এই ভীষণ পথে একা একা নির্ভয়ে হেঁটে চলেছে? কি আশ্চর্য! (আবার তাকাইয়া) পালাই—গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ি; হয় তো কিছু জানে না—হয়তো দেখতে পেলে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করবে—লুকোই—(গাছের আড়ালে লুকাইল)

[খানিকক্ষণ পরে 'সব্বে সত্তা সুখিতা হোন্তু, সব্বে সত্তা অবেরা হোন্তু অব্যাপজ্ঝা হোন্তু, অনীঘা হোন্তু, সুখী অত্তানং পরিহরন্তু' বলিতে বলিতে বুদ্ধদেবের প্রবেশ; তিনি হাঁটিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন।]

(গাছের আড়াল হইতে দ্রুতপদে বাহিরে আসিয়া ঢাল তরোয়াল প্রস্তুত করিয়া অঙ্গুলিমাল বলিল)—শ্রমণ ব্রাহ্মণ, তুমি স্থির হয়ে দাঁড়াও—

বুদ্ধ। কে কে—?

অঙ্গুলিমাল। তোমার সাক্ষাৎ মৃত্যু। শ্রমণ ব্রাহ্মণ—তুমি স্থির হয়ে দাঁড়াও—

বুদ্ধ। কে, অঙ্গুলিমাল? আমি তোমাকে বলছি, আমি স্থির আছি, তুমি একবার স্থির হয়ে দাঁড়াও—।

অঙ্গুলিমাল। আশ্চর্য! আমার নাম করে ডাকল, তবে তো আমাকে জানে, তবু একটু ভয় নেই, আমার দিকে তাকিয়ে কথা বলছে—আমাকে স্থির হতে বলছে! শ্রমণ ব্রাহ্মণ, তুমি জান আমি কে?

বুদ্ধ। আমি জানি তুমি অঙ্গুলিমাল—

অঙ্গুলিমাল। (আগাইয়া গিয়া) সেই অঙ্গুলিমালকে তুমি কি বলছ?

বুদ্ধ। সেই অঙ্গুলিমালকে আমি আবার ডেকে বলছি, অঙ্গুলিমাল, আমি স্থির আছি, তুমি স্থির হও।

অঙ্গুলিমাল। অবাক করে দিলে এই শ্রমণ ব্রাহ্মণ! তুমি আমাকে ভয় পাচ্ছ না?

বুদ্ধ। কেন ভয় পাব?

অঙ্গুলিমাল। হাতে এই তীক্ষ্ণ ধারাল তলোয়ার দেখেছ?

বুদ্ধ। (হাসিয়া) দেখেছি।

অঙ্গুলিমাল। (অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে) তুমি হাসছ ব্রাহ্মণ! তুমি জান এই মুহূর্তে এই তলোয়ার তোমার দেহ থেকে তোমার মাথাকে পৃথক ক'রে ফেলবে?

বুদ্ধ। এই শ্রমণ গৌতম স্থবির হয়েছে—তাই ভয়হীন হয়েছে—আমি আবার বলছি অঙ্গুলিমাল, শ্রমণ গৌতম স্থির আছে, তুমি অস্থির—তুমি স্থির হও।

অঙ্গুলিমাল। (অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে ঢাল-তলোয়ার দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া) পাগলের মত কি কথা বলছ তুমি শ্রমণ ব্রাহ্মণ; চলতে চলতে তুমি বলছ, 'আমি স্থির আছি,' আর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছি যে আমি আমাকে তুমি অস্থির বলছ, এর অর্থ কি তোমাকে বুঝিয়ে বলতেই হবে।

বুদ্ধ। অঙ্গুলিমাল, তুমি আমার দিকে তাকাও—

অঙ্গুলিমাল। (ক্ষিপ্তভাবে) আগে তুমি আমার কথার উত্তর দাও—

বুদ্ধ। আমার দিকে তুমি তাকালেই তুমি তোমার কথার উত্তর পাবে। আমি সর্বজীবে মৈত্রীসম্পন্ন—মহাকরুণায় আমি প্রশান্ত—আমি তাই স্থির; আর তুমি? তুমি সর্বপ্রাণীর প্রতি নির্দয়—তুমি উত্তেজনায় অশান্ত—হিংসায় উন্মাদ—জীবনে তুমি অস্থির! আবার বলছি, অঙ্গুলিমাল, তুমি স্থির হও!

অঙ্গুলিমাল। তাই তো—আমি উন্মাদ! আমি অস্থির! তাই—তাই হয়ত হবে। এ শ্রমণ তো মিথ্যা বলবার

লোক নয়। (গলার অঙ্গুলিমালা ছিঁড়িয়া দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া আবার উত্তেজিত ভাবে) শ্রবণ, তাই যদি সত্যি হয়—তবে—তবে তা কেন? কেন?

বুদ্ধ। অঙ্গুলিমাল, এই শ্রবণ গৌতম তরুণ বয়সে রাজার ঐশ্বর্য, পত্নীপুত্রের অমোঘ আকর্ষণ, মাতা পিতার শোকাশ্রুসর পেছনে ফেলে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছে, কুঞ্চিত কালো কেশ মুণ্ডিত করে কষায় বস্ত্র ধারণ করে কঠোর তপস্যা করেছে, হৃদয় থেকে কামের অগ্নি মোহের অগ্নি দ্বেষের অগ্নি নিভিয়ে ফেলেছে, মৈত্রীভাবনায় চিত্তকে ত্রিভুবন ব্যাপ্ত করেছে, মহাকরুণায় নিজেকে অচলপ্রতিষ্ঠ করেছে। অঙ্গুলিমাল—(অঙ্গুলিমালের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন)—

অঙ্গুলিমাল। তুমি অমন করে আমার দিকে তাকিও না—তাকিও না—আমি তোমাকে সহ্য করতে পারছি না—কিছুতে সহ্য করতে পারছি না—। তুমি কি দেখছ? কি দেখছ আমার দিকে তাকিয়ে?

বুদ্ধ। (স্নিগ্ধ প্রসন্ন কণ্ঠে) অঙ্গুলিমাল, দেখছি তোমার মধ্যে একজন মহাকারুণিক মহাভিক্ষু তুষাগ্নিতে চাপা পড়ে কষ্টে ছটফট করছেন—তিনি যেন করে হোক বেরিয়ে আসতে চান!

অঙ্গুলিমাল। আমার মধ্যে—

বুদ্ধ। হ্যাঁ, ঠিক তোমার মধ্যে—

অঙ্গুলিমাল। দেখছ? তুমি সত্যি দেখছ? আমি—আমি যে আজীবন নরঘাতক ডাকাত—

বুদ্ধ। সে তোমার আসল রূপ নয়; আমি তোমার ভিতরে তোমার আসল রূপ দেখতে পাচ্ছি—পরম-কারুণিক—মহাভিক্ষু!

অঙ্গুলিমাল। তুমি মিথ্যা বলছ—

বুদ্ধ। শ্রবণ গৌতম মিথ্যা বলে না অঙ্গুলিমাল।

অঙ্গুলিমাল। আমি সত্য মিথ্যা কিছু বুঝতে পারছি নে—(সহসা বুদ্ধের পদপ্রান্তে নিজেকে নিক্ষেপ করিয়া) তুমি আমাকে সব বুঝিয়ে দাও—তুমি আমাকে গ্রহণ কর।

বুদ্ধ। তুমি মহাভিক্ষু—মহাকারুণিক।

। পটক্ষেপ ।

। পঞ্চম দৃশ্য ।

[শ্রাবস্তীপুরীর জেতবনবিহারের সম্মুখ ভাগ। রাজা প্রসেনজিৎ ও তাঁহার সেনাপতির প্রবেশ।]

প্রসেনজিৎ। সৈন্যদের সব কোলাহল থামিয়ে দাও সেনাপতি। কোনো সৈন্য যেন জেতবনবিহারের সীমানার মধ্যে প্রবেশ না করে, ভগবান বুদ্ধের যেন শান্তি ভঙ্গ না হয়—বিহারবাসী কেউ যেন পীড়িত বোধ না করেন। সৈন্যদের নিয়ে তুমি অদূরে বৃক্ষ-ছায়ায় অবস্থান কর, আমি একাকী নগ্নপদে বিহারে প্রবেশ করব।

সেনাপতি। কিন্তু মহারাজ, প্রজ্ঞালের কথা যদি সত্য হয়, আঙ্গুলিমাল যদি ডাকাতি পরিত্যাগ করে থাকে, তাকে এই জেতবন-বিহারে প্রবেশ করতে যদি সত্য সত্যই তারা দেখে থাকে, তবে আপনার একা একা বিহারে প্রবেশ করা তো কোনো মতেই উচিত হবে না।

প্রসেনজিৎ। আত্মরক্ষার শক্তিটুকুও কি আমাতে নেই সেনাপতি? আমি নিজে সঙ্ঘক্ষেত্রে প্রবেশ করব।

সেনাপতি। ঔদ্ধত্য ক্ষমা করবেন কোশলাধিপতি। আপনি সশস্ত্র থাকতে পারেন, কিন্তু সে নিরস্ত্র বিহারের কোন গোপন পথ দিয়ে কি ভাবে অতর্কিতে আপনাকে আক্রমণ করবে, আপনি তা হয়ত কিছুই জানতে পারবেন না।

প্রসেনজিৎ। (চিন্তিত ভাবে) তা অবশ্য হতে পারে। কিন্তু তুমি কি করতে চাও?

সেনাপতি। আমি অন্তত চার জন সুশিক্ষিত সৈন্য নিয়ে মহারাজের দেহ রক্ষার জন্যে বিহারে প্রবেশ করতে চাই। অপর সব সৈন্যও আমি একেবারে দূরে সরিয়ে দিতে চাই না, তাদের দিয়ে সমগ্র বিহারটি ঘিরে রাখতে চাই—যাতে করে দুর্বৃত্ত কোনও রকমে পালিয়ে বাঁচতে না পারে।

প্রসেনজিৎ। (একটু ভাবিয়া) তবে তাই কর; কিন্তু সেনাপতি, সর্বভাবে চেষ্টা করবে বিহারের শান্তি-ভঙ্গের কারণ আমরা যতটা কম হতে পারি। ভগবান বুদ্ধের প্রতি যেন কোন অশ্রদ্ধা প্রকাশ না পায়—অথবা যেন তাঁর অপ্রীতির কারণ না হই।

সেনাপতি ॥ যে আজ্ঞা সর্বপ্রকারে রক্ষা হবে মহারাজ।

॥ দৃশ্যান্তর ॥

[জেতবনবিহারের ভিতর। একপাশে একজন মুণ্ডিত-মস্তক কাষায় পরিহিত ভিক্ষু বসিয়া শুধু আবৃত্তি করিয়া যাইতেছেন 'নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স'। চারিজন সশস্ত্র সৈন্য ও সেনাপতিসহ রাজা প্রসেনজিতের প্রবেশ।]

প্রসেনজিৎ। ভগবান বুদ্ধ তো এখানে নেই। (ভিক্ষুর দিকে তাকাইয়া) এ ভিক্ষু তো তন্ময় হয়ে ভগবান বুদ্ধকে নমস্কার জানিয়েই চলেছেন, এঁকে বিরক্ত করা উচিত হবে না। (এদিক ওদিক তাকাইয়া) মনে হচ্ছে এই দিকে ভগবানের ধ্যানকক্ষ—এই যেন একটা দুয়ার মনে হচ্ছে। দেখি—এই দুয়ারেই একবার আঘাত করে দেখি। (দুয়ারে আঘাত ; দু'তিনবার আঘাত করিতে বুদ্ধদেব বাহির হইয়া আসিলেন) চরণে সহস্র প্রণতি ভগবান।

বুদ্ধ। একি মহারাজ, এই সশস্ত্রবেশে সসৈন্যে বিহারে আগমনের কারণ ?

প্রসেনজিৎ। অপরাধ মার্জনা করুন ভগবান ; বিশেষ প্রয়োজনে নিজে সশস্ত্রে বিহারে প্রবেশ করেছি, সঙ্গে সেনাপতি ও সসৈন্য দেহরক্ষীও নিয়ে এসেছি ; এ ছাড়া ভগবান, আরও পাঁচ শত সৈন্য বিহারের আশপাশেই অবস্থান করছে।

বুদ্ধ। কেন মহারাজ, কেন এই রণসজ্জা ? প্রতিবেশী কোনো রাজা মহারাজের রাজ্য আক্রমণ করেছে কি ?

প্রসেনজিৎ। না ভগবান্।

বুদ্ধ। তবে কি অনুগত কোনো রাজা সহসা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে ?

প্রসেনজিৎ। তাও নয় ভগবান্।

বুদ্ধ। তবে ? তবে কেন এই বিপুল রণসজ্জা ? কেন দেখছি আপনাকে আর আপনার সঙ্গের সেনাপতি সৈন্যদের এমন করে সতর্ক দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাতে ?

প্রসেনজিৎ। একটি সংবাদ পেয়ে এইভাবে সৈন্য নিয়ে এবং নিজে সশস্ত্র হয়ে কোশল থেকে এই শ্রাবস্তীতে চলে এসেছি।

বুদ্ধ। কি সে সংবাদ ?

প্রসেনজিৎ। কোশল নগর থেকে এই শ্রাবস্তী পর্যন্ত যে পর্বতময় আরণ্যপথ রয়েছে তার ভিতরে জালিবন বলে একটি বন রয়েছে, তার কথা বোধহয় বহু পর্যটক ভগবানের জানা আছে।

বুদ্ধ। জানা আছে।

প্রসেনজিৎ। সেই বনে একটি বীভৎস হিংস্র নরপশু বাস করে, তার নাম অঙ্গুলিমাল।

বুদ্ধ। তার কথাও অবগত আছি মহারাজ।

প্রসেনজিৎ। ভগবানের তা হলে দেখছি সব কথাই জানা আছে। আমি সৈন্য নিয়ে তারই সন্ধানে বেরিয়েছি। প্রজাদের কাছ থেকে তার অমানুষিক অত্যাচারের কথা শুনতে পেয়ে আমি পাঁচশত সৈন্য নিয়ে একদিনে তাকে বন্দী করে ফেলব সংকল্প করেছিলাম, দুর্বৃত্ত আমার সংকল্পের কথা সম্ভবতঃ জানতে পেরেছে। প্রজাদের কাছে সংবাদ পেলাম সে জালিবন ছেড়ে শ্রাবস্তীর অভিমুখে চলে এসেছে।

বুদ্ধ। সত্য সংবাদ মহারাজ।

প্রসেনজিৎ। সত্য সংবাদ ? ভগবান তা হলে সব সংবাদই অবগত আছেন। প্রজাদের মুখে আরও শুনেছি— (থামিয়া গেলেন)।—

বুদ্ধ। থেমে গেলেন কেন মহারাজ ? আর কি শুনেছেন বলুন ?

প্রসেনজিৎ। তাদের মুখে আরও শুনেছি ভগবান, তারা সেই নরাধম ডাকাত দস্যুকে এই জেতবন-বিহারে প্রবেশ করতে দেখেছে।

বুদ্ধ। (স্মিতহাস্যে) নরাধম দস্যু ডাকাত কেউ প্রবেশ করে নি এই জেতবন-বিহারে।

প্রসেনজিৎ। তবে বুঝলুম তাদের সে সংবাদ মিথ্যা।

বুদ্ধ। একেবারে মিথ্যা নয় মহারাজ, ভুল।

প্রসেনজিৎ। তার তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারলুম না ভগবান।

বুদ্ধ। আচ্ছা মহারাজ, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি। জেতবন-বিহারে আপনি এক নরাধম দস্যু ডাকাতের সন্ধান করতে এসেছেন—

প্রসেনজিৎ। অপরাধ নেবেন না ভগবান, প্রজাদের কাছে

মিথ্যা সংবাদ পেয়ে এসেছি—সর্বজনের কল্যাণকামনা নিয়েই এসেছি।

বুদ্ধ। আপনি অপ্রতিভ হবেন না মহারাজ, আমি সবই বুঝতে পেরেছি। আমি বলছিলাম, আপনি এই বিহারে প্রবেশ করে সেই নরাধম দস্যু ডাকাতকে যদি না দেখতে পান—

প্রসেনজিৎ। ভগবানের চরণে মার্জনা ভিক্ষা করে চলে যাব।

বুদ্ধ। কিন্তু সেই হিংস্র ডাকাতকে না দেখতে পেয়ে যদি এই বিহারে একটি পরম কারুণিক মহাভিক্ষু দেখতে পান?

প্রসেনজিৎ। অস্ত্র শস্ত্র ত্যাগ করে তাঁর চরণে প্রণত হব, তাঁর চরণ বন্দনা করে ধন্য হব।

বুদ্ধ। শেষ পর্যন্ত সত্য রক্ষা করতে হবে মহারাজ—

প্রসেনজিৎ। ভগবানের সম্মুখে কখনো সত্য ভঙ্গ করব না।

বুদ্ধ। তবে মহারাজ সম্মুখে এই মহাকারুণিক শান্ত সমাহিত ভিক্ষুর দিকে তাকিয়ে দেখুন—

প্রসেনজিৎ। কে এই শান্ত সমাহিত মহাভিক্ষু ভগবান?

বুদ্ধ। এই ভিক্ষু অঙ্গুলিমাল—

প্রসেনজিৎ। অঙ্গুলিমাল!! দীনের সঙ্গে ছলনা করবেন না ভগবান; তাও কি কখনও সম্ভব?

বুদ্ধ। (দৃঢ়কণ্ঠে) শ্রবণ গৌতম কখনও মিথ্যা কথা বলে না মহারাজ।

ভিক্ষু অঙ্গুলিমাল। নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স।

প্রসেনজিৎ। (নতজানু হইয়া) তুমি পরম ইন্দ্রজালিক ভগবান—তুমি চক্ষুষ্মান—তুমি পরম শাস্তা—তুমি মহাত্রাতা। তবে—(অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া) সেনাপতি, রক্ষিগণ—সবাই অস্ত্র ত্যাগ কর—নতজানু হও—আর মহাভিক্ষু অঙ্গুলিমালের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বল—নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স—(অঙ্গুলিমালের সঙ্গে সকলে সমস্বরে) নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্স—

নমো নমো বুদ্ধ দিবাকরায়
নমো নমো গোতম চন্দিমায়,
নমো নমো' নন্ত গুণসাগরায়
নমো নমো শাকিয় নন্দনায়।

॥ যবনিকা ॥

ভানুমতী

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

। এক ।

বালাজী রাও ।

বালাজী রাওকে প্রথম দেখি বোম্বাই থেকে পুণা যাবার পথে ডেকান কুইনে ।

ঝড়ের গতিতে তখন ডেকান কুইন ছুটে চলেছিল বোম্বাই থেকে পুণা । পথে কোথায়ও থামবে না ।

একেবারে থামবে গিয়ে সেই পুণায় । বোম্বাই ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস—ভি. টি থেকে ছেড়েছে—থামবে সেই পুণা ষ্টেশনে ।

আজ থেকে ছয় বছর আগেকার কথা ।

সাতটা বছর অনেক দিন রাত্রি সপ্তাহ, মাস ও বছরের ব্যাপার ।

সেটা উনিশ শো উনচল্লিশ সনের কথা ।

যুদ্ধের চাকরিতে আছি তখন । যুদ্ধের ডাক্তার ।

আমি আর ক্যাঃ বালকৃষ্ণ পুণা ১৩০ নং বি, জি, এইচে চলেছিলাম । একজন অপথ্যালমোলজী (চক্ষু রোগের ব্যাপার) ও অন্যজন মেডিসিনের স্পেশ্যাল ট্রেনিং নিতে ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গোলা গুলি বারুদ সারা পৃথিবী জুড়ে তখন ধ্বংস নৃত্য করে চলেছে ।

পর পর তিন চারটে কামরাতেই আমরা সব মিলিটারী পার্সোন্যাল ছিলাম ।

সকলেরই পরণে ইউনিফর্ম ।

কাঁধে বুকে ঝক্ ঝকে তক্ তকে তকমা ও ব্যাজ্ আঁটা ।

আমি আর ক্যাঃ বালকৃষ্ণ কামরার একেবারে শেষ প্রান্তে দুটো সীট অধিকার করে বসেছিলাম ।

আমি একটা রীডার্স ডাইজেস্টের পাতা ওল্টাচ্ছিলাম আর বালকৃষ্ণ বসে বসে জানালার বাইরে তাকিয়ে আপন মনে সিগ্রেট টানছিল একটা ।

হঠাৎ একটা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ধ্বনিতে বহু কণ্ঠের কামরার মধ্যে ডাইজেস্ট থেকে মুখ তুলে দৃষ্টিপাত করলাম ।

বালকৃষ্ণও ফিরে তাকিয়েছিল ।

পাঁচ সাত জন ভারতীয় ও ব্রিটিশ মিলিটারী অফিসার । তাদের মুখোমুখি বেঞ্চের উপরে বসে বেঁটে মোটা সোটা সুট—দামী সুট পরিহিত একজন সিভিলিয়ান ।

তার হাতে একটি সিল্কের রুমাল ও একটা সোনার আংটি ।

সেই আংটি ও রুমালের সাহায্যে বোধ হয় লোকটি যাদু বিদ্যা দেখাচ্ছিল তারই প্রশংসায় সব উচ্ছ্বসিত ।

কেমন কৌতূহল হলো ।

লোকটির দিকেই তাকিয়ে রইলাম ।

বয়স খুব বেশী বলে লোকটির মনে হয় না ।

খুব বেশী হলে চল্লিশের উর্ধ্বে নয় ।

বেঁটে, মোটা সোটা গড়ন ।

মুখখানি বেশ গোলাল ।

সুন্দর বুদ্ধিদীপ্ত দুটি চক্ষু । শুধু বুদ্ধিদীপ্তই নয়, দুই চোখের তারায় ঝঞ্ঝনা পাখির মত কৌতুক নাচছে ।

ব্যাক ব্রাশ করা কোঁকড়ান চুল ।

ঘাড়ি গোঁফ নিখুঁত ভাবে কামান ।

ঝক্ ঝকে মুক্তোর মতই দুপাটি দাঁত, মধ্যে মধ্যে হাসছিল লোকটি ।

হাসির সঙ্গে সঙ্গে দুপাটি দাঁত যেন বিদ্যুৎচমক ওষ্ঠের ফাঁকে ঝিকিয়ে উঠছিল ।

গায়ের রং ভালোও নয়—কালোও নয়—কুয়াশার মাঝামাঝি

লোকটা দেখলাম যাদু বিদ্যা বেশ জানে।

রুমাল ও আংটির সাহায্যেই যে আশ্চর্য আশ্চর্য খেলা দেখালো তাই নয়—একটি টাকা থেকে গণ্ডা টাকাও বের করে দেখালো।

কামরার সবাই ভিড় করে গিয়ে লোকটার চারপাশে দাঁড়ায়।

বলা বাহুল্য আমরাও গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।

বেশ কিছুক্ষণ খেলা দেখবার পর এক সময় লোকটা ঠিক আমাদেরই পাশে জায়গা ছিল বললো।

পকেট থেকে একটা দামী সোনার সিগ্রেট কেস বের করল

এবং আঙুলের চাপে স্প্রিং টিপে কেসের ডালাটা খুলে প্রথমেই তার ঠিক সামনে যে ব্রিটিশ কম বয়সী ছোকরা ক্যাপটেন বসে ছিল তার দিকে এগিয়ে ধরলো, সিগ্রেট।

ছোকরা ক্যাপটেনটি মৃদু হেসে হাত বাড়িয়ে কেস থেকে একটা সিগ্রেট তুলে নিতে গিয়ে একদৃষ্টে একেবারে সিগ্রেট কেসটার দিকে তাকিয়ে আছে, লক্ষ্য করলাম।

প্রসারিত হাতটা তেমনিই আছে, সিগ্রেট নিচ্ছে না।

কয়েকটা মুহূর্ত তারপরই স্মিতহাস্যে খুব মৃদু কণ্ঠে আবার তাগিদ দিল, সিগ্রেট—

একটু যেন বিব্রত হয়ে, একটু যেন লজ্জিত হয়েই এবারে ব্রিটিশ ক্যাপটেনটি দু আঙুলের সাহায্যে একটা সিগ্রেট তুলে নিয়ে মৃদু কণ্ঠে বলল, থ্যাংকস্—

লোকটি এবারে সিগ্রেট কেসটি আমার দিকে এগিয়ে ধরলো, সিগ্রেট—

সিগ্রেট কেসের দিকে তাকাতেই ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল।

বুঝলাম কেন কলপুরে ব্রিটিশ ছোকরা ক্যাপটেনটি অমন হাঁ করে সিগ্রেট কেসটার দিকে চেয়েছিল সিগ্রেট তুলতে ভুলে গিয়ে।

সিগ্রেট কেসটার ডালার গায়ে একটি তরুণীর ছবি লাগানো।

মাথা থেকে বক্ষদেশ পর্যন্ত ছোট্ট ছবিটি।

গায়ে একটা বল বলে অতি সূক্ষ্ম ব্রাউজের মত পরা বক্ষ পর্যন্ত ঢাকা

পরিধেয় জামা এত সূক্ষ্ম যে ফটোতেও তরুণীর নিটোল যৌবনের সুস্পষ্টভাবে যেন প্রকট হয়ে উঠেছে।

অপূর্ব সুন্দর মুখখানি তরুণীর।

আর দুটি চক্ষুর দৃষ্টিতে যেন উদগ্র একটা কামনা উপচে পড়ছে।

যৌবন আর কাম যেন সমস্ত শরীর যেন উলঙ্গ ভাবে প্রকট।

কোন পুরুষের সাধ্য নেই সে দিকে দৃষ্টি পড়লে সহজে দৃষ্টি ফেরায়

তবু এক লহমার জন্যে সেদিকে তাকিয়ে দৃষ্টি আমার ঝুলে পড়ল নীচের দিকে।

মুহূর্তের জন্য আমার পুরুষ চোখের দৃষ্টির মধ্যে যে ক্ষুধা ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল মনে হলো সে লালসার ক্ষণিক ঝিলিকটা যেন কামরা ভর্তি অতগুলো দৃষ্টির সামনে আর গোপন রইলো না।

তাড়াতাড়ি হাতটা টেনে নিলাম।

মৃদু প্রায় অনুচ্চারিত কণ্ঠে বললাম মাত্র একটি কথা, no thanks।

লোকটা মৃদু হেসে হাতটা কেস সমেত টেনে নিয়ে নিজে একটা সিগ্রেট কেস থেকে তুলে অগ্নিসংযোগ করল।

কামরার ভিতরে আর যেন কারো মুখের দিকেই তাকাতে পারছিলাম না। জানালার বাইরে তাকিয়ে রইলাম।

সময়টা ঠিক অক্টোবরের মাঝামাঝি।

রেল লাইনের দারে ধারে প্রাহাড়ের পর পাহাড় যেন ঢেউয়ের পর ঢেউ গড়িয়েছে। যেন সবুজ ঢেউ।

পাহাড়ের বুকের গা সবুজ উদ্ভিদের আস্তরণে যেন ঢেকে গিয়েছে আর সেই সবুজের গা বেয়ে নামছে রুপালী ঝর্ণার স্রোত।

ঝর্ণা নয় যেন শ্বেত বিদ্যুতের ঝিকি ঝিকি।

সেই দিকেই লজ্জা পীড়িত দৃষ্টি মেলে তাকিয়েছিলাম

আজ এই কাহিনী লিপিবদ্ধ করতে করতে মনে হচ্ছে কি কুৎসিত।

কিন্তু সেদিন তা একটি বারের জন্যও তো ওই মনে হয় নি।

বুকের মধ্যে তপ্ত একটা রক্ত স্রোত হঠাৎ হঠাৎ শব্দে আছড়ে আছড়ে পড়ছিল।

সমস্ত শরীরের প্রত্যেকটি স্নায়ুতে একটা অগ্নি স্রোত যেন ছড়িয়ে যাচ্ছিল।

লজ্জায় চোখের দৃষ্টি সরিয়ে নিয়েছিলাম বলে মনে মনে নিজেকে যেন অভিসম্পাত দিতে লাগলাম।

মনে হচ্ছিল আশা মেটে নি।

আবার যদি দেখতে পেতাম ফটোটা।

মানুষের মনের মধ্যে যে সৎ আর অসৎ দুটো প্রবৃত্তি, সে দুটো যেন আমার মনকে দুদিক থেকে টানাটানি করছিল।

হঠাৎ কানে এলো একটি কথা।

মাই নেম ইজ বালাজি রাও। আই বিলাইভ এটু ফিফটি।

ফিফটি! ব্রিটিশ স্টোকরা ক্যাপটেনটি প্রশ্ন করলো।

ইয়েস। বোম্বাই ডোমিসিউ আম ইটু মাইট ইটু আওয়ার হাউস।

তারপর ওদের কয়েকটা কথা স্পষ্ট শুনতে পেলাম না।

এবং তারপর বালাজী রাও-এর যে কথাটা কানে এলো সেটা হচ্ছে: ইয়েস দি পিকচার ইউ হ্যাভ আস্ট মাও সিন—দি ইজ মাই ওয়াইফ—

ইওর ওয়াইফ—সি ইজ—লাভলি—প্রেটি লুকিং—ফাইন—বলছিলাম—

জানি তুমি কি ভাবছো ক্যাপ্টেন—

বলতো কি।

বালাজী রাও জবাব দিল, সি উইল বি রাদার গ্ল্যাড টুমিট ইউ। এসো না। আজ রাত্রে—উই উইল ডাইন টুগেদার—

ট্রেনের গতি তখন হ্রাস হয়ে আসছে।

চেয়ে দেখি দূরে পুনা স্টেশন দেখা যাচ্ছে।

পুনা পৌঁছে গিয়েছে।

। দুই ।

নতুন জায়গা, নতুন ইউনিট।

কটা দিন বুঝে নিতেই কেটে গেল।

১৩০নং বি, কি, এইচটা কিরকীতেই ছিল।

বিরাট বেস হাসপাতাল।

প্রায় হাজার দুই মত পেশেন্টের ব্যবস্থা।

১৩০নং বি, কি, এইচ-এ কেবল হাসপাতালই ছিল এবং রুগীদের চিকিৎসারই ব্যবস্থা ছিল তাই নয়, সেটায় ডাক্তারদের নানা বিশেষ বিভাগে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা ছিল। ঐখানে তাই ন'য়াই বলতে গেলে প্রায় শ'খানেক ডাক্তার থাকত।

ডাক্তারদের থাকবার মেসও তেমন একটা ছিল না।

অনেকগুলো মেস ছিল এবং বিরাট একটা কম্পাউণ্ডে ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত ছিল মেসগুলো।

আমার আর বালকৃষ্ণর একই মেসের পাশাপাশি ঘরে জায়গা হয়েছিল।

দিন চারেক পরের কথা।

সেদিন মেসের ডাইনিং রুমে ডিনারের পর বসে তাস খেলতে খেলতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি ফিরবার ও মেসে খাবারাদির ব্যবস্থারও তেমন কিছু আমার তাগিদ ছিল না। কারণ সেদিন বালকৃষ্ণ মেসে খাবে না বাইরে কোথায় নাকি নিমন্ত্রণ আছে বলে গিয়েছিল। ফিরতে রাত ও হবে তাই বলেছিল।

একা একা কি হবে তাড়াতাড়ি মেসে ফিরে কারণ অন্যান্য দিন দুজনে রাত্রের ডিনারের পর মেসে ফিরে হয় ওর ঘরে না হয় আমার ঘরে বসে বসে অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করতাম। কিন্তু সেটার কোন সম্ভাবনা ছিল না বলেই তাস খেলতে বসেছিলাম।

তাস খেলতে কোন দিনই আমার ভাল লাগতো না।

কিন্তু নেহাৎ সময় কাটানো।

তা ছাড়া বছর পাঁচেকের মিলিটারীর চাকরি জীবনে এমন অনেক কাজ অনেক সময় করেছি বা কতকটা পারিপার্শ্বিকও করতে আমার মনের মধ্যে তাগিদ দিয়ে এগিয়ে দিয়েছে, এবং যে সব কাজ হয়তো স্বাভাবিক ভাবে কখনই করতাম না বা ভাবতেও পারতাম না।

আরো অবিশ্যি একটা কথা ছিল ওর মধ্যে।

মিলিটারী জীবনে যেমন নিয়ম ও কঠোর শৃংখলার একটা সুদৃঢ় বাঁধন ছিল আষ্টেপৃষ্ঠে আমাদের, তেমনি সেই বাঁধনের অনেকগুলো হালকা গিটও ছিল, যার ফলে অনেক অনিয়ম, অনেক ব্যভিচার, অনেক অবন্যতাই রাতের অন্ধকারে প্রকাশ পেত।

এবং সে সবের জন্য নেহাৎ মুর্খের মত অত্যন্ত প্রকাশ্য ভাবে ধরা না পড়লে কোন জবাবদিহী দেবারই কারো

প্রয়োজন হতো না।

যাই হোক, যা বলছিলাম।

সে রাত্রে ফেল থেকে তাস খেলে ফিরতে ফিরতে রাত প্রায় দেড়টা বাজা হয়ে গিয়েছিল।

রাত্রির মত দরজা চুড়োগুলো গা থেকে নামিয়ে শোবার আগে একটা স্লিপিং গাউন গায়ে জড়িয়ে চেয়ারটার উপর বসে সবে একটা সিগ্রেট ধরিয়েছি বালকৃষ্ণর গলা কানে এলো।

গুণ গুণ করে সে কি যেন একটা ইংরাজী গান গাইছে।

বালকৃষ্ণর সাড়া পেয়ে তাকে ডাকবো কিনা ভাবছি এমন সময় তারই কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, চাটার্জী জেগে আছো নাকি।

হ্যাঁ এ কিরচো বুকি ?

বালকৃষ্ণ এসে ঘরে ঢুকলো আমার।

চোখ চেয়ে দেখি বালকৃষ্ণের চোখে মুখে যেন একটা আনন্দ ও তৃপ্তির সুস্পষ্ট আভাষ।

সিগ্রেট আছে ?

নিঃশব্দে টিনটা এগিয়ে দিলাম।

টিন থেকে একটা সিগ্রেট তুলে নিয়ে লাইটারের সাহায্যে সেটার অগ্নিসংযোগ করে একগাল ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললে বালকৃষ্ণ, চ্যাটার্জী ইউ মাস্ট নট্ মিস ?

কি ব্যাপার ?

বালকৃষ্ণ আবার খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে বলে, বিয়েলি আই নেভার ড্রেমট্ অফ ইট ?

ব্যাপারটা কি হে ? কি স্থির করলি ?

বলছিলাম ফটোর সত্যিকারের মানুষটার কথা।

কি হেঁয়ালী সুরু করলে এই মাঝ রাত্রে—

হেঁয়ালী নয় হে, হেঁয়ালী নয়—কালই পারত যাও ইউ মাস্ট্ মিট হার ওয়ানস্।

কি পাগলের মত এখনো বকছো, স্পষ্ট করে বলবে তো কথাটা। বললাম আমি।

ইউ রিমেমবার চ্যাটার্জী, ট্রেনের আমাদের সেদিনকার সহযাত্রীটাকে মনে আছে ?

কোন সহযাত্রী ! কার কথা বলচো ?

আরে এখানে আসার দিন ডেকান কুইনে আমাদের সেই সহযাত্রী—ম্যাজিশিয়ান, বালাজী রাও—সঙ্গে সঙ্গে যেন বিদ্যুৎচমকের মতই সেদিনকার ডেকান কুইনের কামরার মধ্যে সেই দুপাটি চোখের সামনে ভেসে উঠলো।

সোনার সিগ্রেট-কেসটি ভদ্রলোক আমার দিকে এগিয়ে ধরে বলছেন, সিগ্রেট—

কিন্তু সিগ্রেট খাবো কি ততক্ষণ আমার চোখের দৃষ্টি গিয়ে পড়েছে সেই সোনার সিগ্রেটকেসের ডালার গায়ে লাগানো ফটোটার পরে। অতীব সূক্ষ্ম চিলে চালা পরিধেয় ব্লাউজের অন্তরাল হতে সুস্পষ্ট যৌবনের লাবণ্যময় ইঙ্গীত। ফটোটা পুনরায় মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন চোখ মুখ আবার ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে।

বালকৃষ্ণ আবার বলে ওঠে, কি হে, মনে নেই তোমার সেই বালাজী রাওর কথা। তার সোনার সিগ্রেট কেসের মধ্যে সেই তরুণীর ফটোটা।

হ্যাঁ—মনে আছে—

যাই বলো চ্যাটার্জী, তখনই কিন্তু আমি বুঝেছিলাম—

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালাম বালকৃষ্ণের মুখের দিকে।

হ্যাঁ হে—আসলে লোকটার ব্যবসা যে ম্যাজিক বা অন্য কিছু নয় বুঝেছিলাম যেমন তেমনি এও বুঝেছিলাম ঐ ফটো যার—অর্থাৎ তার ঐ স্ত্রী যদি সত্যি সত্যিই হয়তো সেই স্ত্রীই, অথবা সে অন্য কেউ হলেও তার ফটোটা চোখের সামনে তুলে ধরাই ছিল বালাজী রাওর উদ্দেশ্য। এবং ইট ইজ এ ফাকট্।

আমি বালকৃষ্ণের মুখের দিকে চেয়ে থাকি।

চেয়ে আছো কি অমন করে যা বলছি তা সত্যি।

গিয়েছিলে বুকি আজ সেখানে ?

প্রশ্নটা যেন স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আমার মুখ থেকে বের হয়ে এলো !

হ্যাঁ—although she is rather costly তবু বলবো—দেড়শটা টাকা worth spending !

বল কি দেড়শটাকা।

হ্যাঁ Just for half an hour only !

চোখের সামনে আমার যেন সেদিনকার দেখা বালাজী রাওর সোনার সিগ্রেট কেসের মধ্যেকার তরুণীর যৌবনোজ্জ্বল কামনাদীপ্ত চেহারাটা ভেসে ওঠে।

কান দুটো যেন গরম হয়ে ওঠে।

বালকৃষ্ণ বলে, আবার যাবো—

কথাটা বলতে বলতে বালকৃষ্ণ আমার পায়ের এক পাশে বসতে যাচ্ছিল কিন্তু তাকে বাঁধা দিয়ে বললাম, বালকৃষ্ণ, রাত অনেক হয়েছে—আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে if you don't mind।

Oh! I am sorry! বালকৃষ্ণ আমার ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

আলো নিভিয়ে আমি শুয়ে পড়লাম বটে কিন্তু দুচোখের পাতা থেকে ঘুম তখন আমার অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।

চোখ বুজে ঘুমের চেষ্টা করতে লাগলাম কিন্তু কোথায় ঘুম!

কেবল বোজা চোখের অন্ধকার পাতায় কামনাদীপ্ত যৌবনোচ্ছল এক তরুণীর দেহ যেন আমাকে সেই রাত্রির একক শয্যায় আচ্ছন্ন করে ফেলতে লাগল।

সমস্ত দেহের স্নায়ুতে স্নায়ুতে একটা অগ্নিস্রোত যেন শির শির করে বয়ে যেতে লাগল। কানের পাশে বার বার বালকৃষ্ণের একটা কথা ধ্বংকৃত হয়ে ফিরতে লাগলো: although she is rather costly তবু বলবো—দেড়শটা টাকা worth spending!

শুধু সেই রাত্রিই নয়।

তারপর প্রতিরাত্রেই শয্যায় আলো নিভিয়ে শুয়ে পরনের সঙ্গে সঙ্গে যেন এক কুহকিনীর যৌবনদীপ্ত কামনাউচ্ছল দেহ বল্লরী আমার সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে আমার ঘুম কেড়ে নিতে লাগল।

অবশেষে চতুর্থ দিন সন্ধ্যায় বের হয়ে পড়লাম।

কৌশলে দিনের বেলাতেই এক সময় বালকৃষ্ণর কাছ থেকে বালাজীরাওর ঠিকানাটা জেনে নিয়েছিলাম।

পুরাতন পুনা সিটিরই এক অংশে বালাজীরাও থাকে।

একটা টাঙ্গা ভাড়া করে পকেটে দেড়শটাকা নিয়ে বালাজী-পুরের উদ্দেশ্যে চললাম।

পুরাতন সিটির একটা নির্জন অংশে একটা হোটেলের সামনে এসে টাঙ্গা থামল।

আগে ওটা হোটেল ছিল না দেখলেই বোঝা যায়। যুদ্ধের কল্যাণে সেটা বোধ করি হোটেলে রূপান্তরিত হয়েছিল। একতলা বাংলো প্যাটার্নের বাগানওয়ালা একটা বাড়ি। তারই ভিতরের দুটো ঘর নিয়ে বালাজীরাও থাকে।

টাঙ্গা থেকে নেমে টাঙ্গার ভাড়া মিটিয়ে দিলাম।

গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকতেই উর্দীপরা একজন বয় এগিয়ে এলো, কিসকো মাংগতে হে মাদাম—

মিঃ বালাজীরাও এখানে থাকেন?

নামটা উচ্চারণ করবার সঙ্গে সঙ্গেই বেয়ারাটা এক গাল হেসে ফেলে। এবং হাসতে হাসতেই বলে, হ্যাঁ—আইয়ে ভিতর আইয়ে।

বেয়ারা আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে হোটেলের সুসজ্জিত লাউঞ্জে বসতে দিল।

একটা নেশার ঘোরে যেন নিজের অজ্ঞাতেই অফিসারস মেস থেকে বের হয়ে টাঙ্গায় চেপে এতটা পথ অতিক্রম করে চলে এসেছিলাম।

ভাল মন্দ, উচিত অনুচিত কোন চিন্তাই যেন ছিল না এতক্ষণ মনের মধ্যে আমার, ছিল শুধু একটা তীব্র অন্ধ কামনার মনের তাগিদ। যে তাগিদ আমাকে ঠেলতে ঠেলতে এতদূরে নিয়ে এসেছিল।

কিন্তু লাউঞ্জে প্রবেশ করে সোফাটার উপরে বসে চারিদিকে একবার চোখের দৃষ্টি বোলাতেই অকস্মাৎ যেন মনে হলো লাউঞ্জে যে সমস্ত বাঙ্গা বসেছিল তাদের সবাকার চোখের তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টি আমার পরেই নিবদ্ধ। তারা যেন প্রত্যেকে আমার ভদ্র বেশের নীচে আসল চেহারাটা ধরে ফেলেছে।

প্রত্যেকের চোখের দৃষ্টির মধ্যে যেন একটি কথাই উচ্চারিত হচ্ছে, ছি, ছি, ছি! এবং যার ফলে মাথাটা আমার আপনা হতেই নুয়ে এলো।

মনে হতে লাগলো, ধরা পড়ে গিয়েছি, আমি সবার কাছে ধরা পড়ে গিয়েছি।

সবাই যেন আমার মুখের দিকে চেয়ে হাসছে। মনে হলো উঠে পালিয়ে যাই।

ছুটে ঘর থেকে বের হয়ে যাই। উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে অন্ধকারে মিলিয়ে যাই।

কিন্তু কিছুই করা হলো না।

যেমন বসেছিলাম তেমনি বসে রইলাম। আর বসে বসে ঘামতে লাগলাম।

ঐ অবস্থায় কতক্ষণ লোকটার পরে বসেছিলাম জানি না। হঠাৎ কানে এলো একটি কণ্ঠস্বর।

আপনিই বোধহয় আমাকে খুঁজছিলেন ক্যাপটেন!

মুখ তুলে তাকালাম।

সামনেই আমার দাঁড়িয়ে বালাজী রাও।

চোখাচোখি হলো দুজনার।

এত দেরি করে এলেন কেন? সেই কখন থেকে বসে আছি আপনার জন্য। বালাজী রাও বললে।

বোকার মতই বললাম, বসেছিলেন?

নিশ্চয়ই। সেই বিকেলে আপনার আসার কথা ছিল—উঠুন, চলুন—

মন্ত্রমুগ্ধের মতই উঠে দাঁড়ালাম।

বালাজী রাওকে অনুসরণ করে তার ঘরে গিয়ে ঢুকলাম।

চমৎকার সাজান ঘরটি।

ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বালাজী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে স্মিত হাসি হাসলো, you want to meet my wife! Is int!

ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকি বালাজীরাওর মুখের দিকে।

স্পষ্ট সোজা কথাই তারপর বললে বালাজী, I suppose you know the charge!

Yes!

টাকা এনেছেন!

হ্যাঁ—

সঙ্গে সঙ্গে হাত পাতল বালাজি রাও।

পকেট থেকে দশ টাকার নোটগুলো বার করে দিলাম।

টাকাটা আমার হাত থেকে নিয়ে বার দুই গুনলো বালাজী রাও তারপর মৃদু হেসে বলল, thanks।

। তিন ।

নোটগুলো পকেটে রাখতে রাখতে বালজী আবার হাসল।

একটু কিন্তু অপেক্ষা করতে হবে ক্যাপটেন—না না—বেশীক্ষণ নয়—just ten minutes। দশ মিনিট—কিন্তু আপনি দাঁড়িয়ে কেন ক্যাপটেন, বসুন—be seated be comfortable।

হাত ইসারায় বালাজী রাও একটা সোফা দেখিয়ে দিল।

বুকের ভেতরটায় তখনও একটু অস্বাভাবিক দুপ দুপুনি চলছিল, তবু বসতে সাহস হলো না যদি বসলে একবার আর উঠে দাঁড়াতে না পারি, তাই বসলাম না, দাঁড়িয়েই রইলাম।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেওয়ালের গায়ে টাংগানো ছবিগুলো দেখতে লাগলাম।

হঠাৎ একটা ছবি নজরে পড়লো।

বেশ বড় ছবিটা এবং আমার সামনেই একেবারে দেওয়ালের গায়ে টাঙানো ছিল।

দিশু কোলে মেরীর ছবি।

অনৈসর্গিক এক রূপ যেন ফুটে বের হচ্ছে ঐ নারীর চোখ মুখ থেকে।

চেয়ে রইলাম ছবিটির দিকে।

এবং সব কিছু পারিপার্শ্বিক ভুলে গিয়েই বোধ হয় চেয়েছিলাম, পাশ থেকে ফিস্ ফিস্ করে বালজীর কণ্ঠস্বর শোনা যেতেই চমকে উঠলাম।

টরেস ক্যাপটেন—

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই কাচের দরজা ঠেলে বের হয়ে এলো বিরাট দেহ, দৈত্য আকৃতিই বলা চলে, এক ব্রিটিশ অফিসার।

বুলডগের মত মুখখানা, ভারী এক জোড়া গোঁফ ওষ্ঠের উপরে সেই বুলডগের মত চ্যাপটা মুখখানাকে যেন আরো ভয়ংকর করে তুলেছিল।

ব্রিটিশ অফিসারটি রুমালে মুখ মুছতে মুছতে লাউঞ্জ থেকে বের হয়ে গেল।

ওর ওই রুমাল মুখ মোছা দেখে সঙ্গে সঙ্গে অনেক দিন আগেকার দেখা একটা দৃশ্য মনে পড়ে গিয়েছিল।

চিড়িয়ানায় একবার একটা বিরাট রয়েল বেঙ্গল টাইগারকে পরিতৃপ্ত ভোজনের পর খাচার মধ্যে বসে পায়ের থাবায় ঘসে ঘসে যেমন আরাম করে মুখ মুছতে দেখেছিলাম তেমনি করেই যেন ঠিক পাশবিক একটা পরিতৃপ্তির পর ওই ব্রিটিশ অফিসার রুমালে মুখ মুছতে মুছতে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

লোকটার গমন পথের দিকেই অন্যমনস্ক হয়ে চেয়েছিলাম।

বালাজী রাওয়ের ডাকাডাকি ওর মুখের দিকে ফিরে তাকালাম আবার।

Yes ! Go in Captain—ভিতরে যাও—

আমাকে যেতে হল না বালাজী যাওই যেন এক প্রকার আমাকে ঘিরে ঘরের দরজা খুলে ভিতরে ঠেলে দিল এবং দরজাটা টেনে বন্ধ করবার সময় বললে, কুড়ি মিনিট—

উৎকট আলো জ্বলছিল একটা ঘরের ঘরো।

সেই উৎকট আলোর ঘরের মধ্যে ঢুকে সামনের দিকে তাকাতেই যেন থমকে দাঁড়ালাম।

একটা বিরাট কৌচের পড়ে এলিয়ে আছে যেন প্রচণ্ড ঝড়ের তাণ্ডবে বিধ্বস্ত একটি রজনী গন্ধার স্তবক। বছর তেইশ থেকে চব্বিশের বেশী বয়স হবে না মেয়েটির। পরিধানে অতি সামান্য বস্ত্র। কোমড় থেকে জংঘা পর্যন্ত একটি পাতলা সাদা রেশমের অন্তর্বাস এবং গায়ে অনুরূপ ঢিলেঢালা বগল কাটা একটা ব্লাউজ।

সেই সামান্য পরিধেয়ের সুল্পতার তলা থেকে নিটোল যৌবন ঢল ঢল এক তনুদেহ যেন উগ্র এক কামনার লেলিহান শিখায় জ্বলছে।

কাঁকড়া কাঁকড়া রেশমের মত চুল কাঁধের পরে এসে লুটিয়ে পড়েছে।

অপরূপ সুন্দর মুখখানি।

এবং দুই চোখের পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে আমি ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সে আমার দিকে তাকিয়েছিল। মনে হলো সে চোখের চাউনিতে যেন একটা অসহায় ভয় একটা নীরব আকুতি সেই সঙ্গে একটা বেদনা মূর্ত হয়ে উঠেছে।

পরস্পর আমরা পরস্পরের দিকে চেয়েছিলাম।

হঠাৎ মনে হলো শুকনো ফুলের পাপড়ির মত মেয়েটির ওষ্ঠ দুটি বুঝি কাঁপছে।

তারপরই ক্ষীণ আড়ষ্ট কণ্ঠে বললে, পরিষ্কার ইংরাজীতে, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন আসুন—আমি জানি কেন আপনি এসেছেন।

সপাং করে যেন একটা চাবুকের ঘা এসে আমার মুখের পরে পড়ল ওর কথায়।

আমার সুতীব্র লালসা গত কয়েক দিন ধরে আমাকে যা প্রায় উন্মাদ করে তুলেছিল, যে পাশবিক লালসা আমাকে অক্সিলারস্ মেস থেকে ঐ হোটেলের ঘরে টেনে এনেছিল সহসা যেন মুহূর্তে হিম করে নিভে গেল।

আমার গ্রীবার মুখে যেন কে থুতু ছিটিয়ে দিল।

মেয়েটি আবার বলল, দাঁড়িয়ে আছেন কেন এখনো, বালাজী কি বলেনি আপনাকে মাত্র কুড়ি মিনিট সময়—

জবাব দিলাম এবারে তোমো মতে—জানি।

আলো কি ঘরের জ্বালা থাকবে না নিভিয়ে দেবো ?

জ্বালাই থাক, নিভুতে হবে না।

কিন্তু—

চরম কুৎসিত যা তারও বুঝি একটা লজ্জা আছে।

মেয়েটি বোধ হয় সেই কথাটা ভেবেই কিন্তু একটা বলতে উদ্যত হয়েছিল কিন্তু তাকে থামিয়ে দিয়ে আমি বললাম, আমি কেন এসেছি তুমি জান ?

জানি বৈকি ! আমার ঘরে রাতে যারা আসে—

না, সে জন্য তো আমি আসি নি—

মেয়েটি যেন বিস্ময়ে চমকে আমার মুখের দিকে কয়েকটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো তারপর বললে, তবে—তবে কেন এসেছেন।

মৃদু হাসলাম আমি। যদি বলি তোমার সঙ্গে পরিচয় করতে।

আমার সঙ্গে পরিচয় করতে ?

হ্যাঁ—

কিন্তু—

কি নাম তোমার ?

আমার নাম ?

হ্যাঁ—কি নাম ?

ভানুমতী।

বালাজী কে তোমার ?

আমার স্বামী।

সত্যিই সে তোমার স্বামী ?

হ্যাঁ,—

এখানেই বুঝি তোমরা থাকো ?

না।

তবে ?

যেখানে যখন ও নিয়ে যায় তখন সেইখানেই থাকি।

ভানুমতীর গলার স্বর মনে হলো যেন একটা নিষ্প্রাণ একটা বিশ্বাসের সুর দেখা দিয়েছে এতক্ষণে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম আর মাত্র মিনিট তিনের

বাকী আরো সব বললাম, কিন্তু কি করা যায় বলতো? সন্ধ্যা হয়ে এসেছে—অথচ সত্যিই তোমার সঙ্গে আমার আলাপ করবার ইচ্ছা ছিল।

আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে—

কি?

আপনি বাঙালী—

সত্যিই আমি বাঙালী।

আমিও বাঙালী।

কথাটা এবার পরিষ্কার বাংলায় বললে ভানুমতী।

তু-তুমি বাঙালী?

হ্যাঁ—

কিন্তু আর কথা বলা হল না ঘরের দরজার বাইরে থেকে নক্ পড়লো।

নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হয়েছে, দুয়ারে তাই আঘাত।

চলি—কেমন! Good night।

দরজা খুলে আমি বের হয়ে এলাম।

৫ চার

টাঙ্গার নম্বর ছোটেল থেকে বের হয়ে হাঁটতে হাঁটতে মেসের দিকে রওনা হলাম। গত কয়েক দিন পরে মাথার মধ্যে যে অসহ্য যন্ত্রণাটা চলছিল সেটা তখন আর নেই—মাথাও হালকা হয়ে গিয়েছে, শরীরটাও হালকা হয়ে গিয়েছে। একটা চরম লজ্জাকর অপমানের হাত থেকে আবার দরদ পৌরুষ রক্ষা পেয়ে যেন নিজের পরে নিজের বিশ্বাস আবার ফিরে পেয়েছে।

পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মেসে ফেরবার পথে সেদিন সত্যিই যেন আমার মনে হচ্ছিল দীর্ঘ রোগ ভোগের পর আবার সুস্থ হয়ে উঠেছি আমি। শরীরে কোথাও আর কোন ক্লেদ নেই কোন গ্লানি নেই। সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষ আমি।

কিন্তু ভানুমতীর কথা যেন কিছুতেই ভুলতে পারিনা।

তারপর দুটো দিন সর্বক্ষণ মেয়েটির সেই বিষণ্ণ কাতর সুন্দর মুখখানি আমার মনের সমস্ত পট জুড়ে অহর্নিশি ভাসতে থাকে। আর তারই পাশে পাশে ভাসতে থাকে বালাজী রাওর কুৎসিত মুখটা।

বাঙালী ঘরের মেয়ে ভানুমতী কেমন করে গিয়ে ঐ পশুটার হাতে পড়ল, কিছুতেই যেন তার কোন মীমাংসা খুঁজে পাই না।

মীমাংসাটা খুঁজে পেলাম আরো দুদিন পরে দ্বিপ্রহরে।

কয়েকটা টুকিটাকি জিনিষের দরকার ছিল তাই বাজারে মার্কেটিং করতে বের হয়েছিলাম।

একটা বড় ষ্টেশনারি দোকানে ঢুকে জিনিষগুলো কিনছিলাম হঠাৎ পাশ থেকে কানে এলো পরিচিত এক নারী কণ্ঠস্বর।

ভাল অডিকোলন আছে?

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতই যেন সেই কণ্ঠস্বর কানে যেতেই ঘুরে তাকিয়েছিলাম।

হ্যাঁ—ভুল হয় নি আমার।

ভানুমতীই।

অস্পষ্ট কণ্ঠ থেকে বোধ করি আমার বের হয়ে এসেছিল নামটা।

ভানুমতী।

কে?

ভানুমতী ফিরে তাকিয়েছে ততক্ষণে।

দামী সাদা একটা জর্জেটের শাড়ী পরিধানে, মাথার খোমটা, সেই উলংগ বীভৎস ভানুমতী নয়—কল্যাণীয়া কোন ঘরের বধূ যেন ভানুমতী!

আপনি?

কয়েকটা জিনিষ কিনতে এসেছিলাম।

কথাটা বলে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে ভানুমতীর চারদিকে তাকালাম কিন্তু না ভানুমতী একাই, বালাজী রাও সঙ্গে নেই তার।

তবু জিজ্ঞাসা করি, একা?

হ্যাঁ—

ইতিমধ্যে কাউণ্টারে সেলসম্যান চার পাঁচ শিশি অডিকোলন বের করে এনে কাউণ্টারে রেখে ভানুমতীকে লক্ষ্য করে বলে, দেখুন, কোন অডিকোলন চান?

তারই মধ্যে একটা দামী অডিকোলন বেছে নিয়ে দাম জিজ্ঞাসা করলে ভানুমতী —এটার দাম কত?

একশতটাকা।

এটাই দিন।

সেলসম্যান চলে গেল অডিকোলনটা প্যাকেটে বেঁধে

আনবার জন্য।

ভানুমতী?

ভানুমতী তার হাতের ব্যাগ থেকে টাকা বের করছিল আমার ডাকে আমার মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাল।

বালাজী রাওকে সঙ্গে দেখছি না!

সে বোম্বাই গিয়েছে—

ও। তা নিশ্চয়ই তোমার এখনও লাঞ্চ খাওয়া হয় নি!

না।

আমি যদি তোমাকে আজ দুপুরে আমার সঙ্গে কোন হোটেলে লাঞ্চ খেতে অনুরোধ করি তুমি আপত্তি করবে?

লাঞ্চ!

হ্যাঁ—কিন্তু—

ইতিমধ্যে সেলসম্যান প্যাকেট ও ভাউচার বই নিয়ে এসে হাজির হতেই ভানুমতি তিনটে নোট এগিয়ে দিল।

সেলসম্যান চলে গেল নোটগুলো নিয়ে।

কই ভানুমতী—আমার প্রশ্নের জবাব দিলে না তো।

বেশ চলুন—

দোকান থেকে বের হয়ে টাঙ্গায় চেপে একটা বড় কসমোপলিটন হোটেলে গিয়ে দুজনে আমরা প্রবেশ করলাম। এবং হোটেলের ম্যানেজারকে বলে নির্জন কিউবিক্যালে গিয়ে দুজনে দুটো চেয়ার টেনে নিয়ে মুখোমুখি বসলাম।

ওয়েটার মেনু কার্ড নিয়ে এলো।

কার্ডটা ভানুমতীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, তুমিই পছন্দ কর খাদ্যতালিকা।

না, না—আপনিই করুন, ভানুমতী বলে।

উঁহু। তুমি—any cold drinks।

না—আপনি নিন না।

উঁহু, তুমি নিলে নিতাম।

বেশ—তবে দুটো লিমনেড নিন—

খেতে খেতেই মুখোমুখি বসে আমাদের আলাপ চলতে লাগল।

এক সময় বললাম, তোমার বাড়ি কোথায় ভানুমতী?

যদিও বাঙালী আমি তবে বরাবর বাংলার বাইরেই লক্ষ্ণৌতে মানুষ আমি।

তোমাকে তুমি বলে সম্বোধন করছি বলে মনে কিছু করছো না তো?

না, না - মনে করবো কেন?

আচ্ছা ভানুমতী?

বলুন।

যদি কিছু মনে না করতো একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো ভাবছিলাম—

কি?

ভানুমতী সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল।

বালাজী রাও—

হ্যাঁ—ও দক্ষিণ ভারতের লোক—

ওর সঙ্গে তোমার—

আপনার খুব বিস্ময় লেগেছে না?

না, মানে—

আমার বাবা ছিলেন লক্ষ্ণৌতে রেলওয়ে কনট্রাকটার—ওরও লক্ষ্ণৌতে কনট্রাকটারীর বিজনেস ছিল। বাবার সঙ্গে পরিচয় ছিল—সেই সূত্রেই আলাপ। আরো আশ্চর্যের বিষয় কি জানেন!

কি।

ভালবেসেই আমরা পরস্পর পরস্পরকে বিবাহ করেছিলাম—

বলতে বলতে হঠাৎ যেন থেমে গেল ভানুমতী এবং কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, যাক সে সব কথা। that past—আজ আমার কাছে dead—অতীত আজ আমার কাছে মৃত—

তোমাদের নিশ্চয়ই রেজিস্ট্রী ম্যারেজ!

হ্যাঁ—বাড়ির সকলের অমতে লুকিয়ে গিয়ে ওকে রেজিস্ট্রী করে বিয়ে করেছিলাম।

হঠাৎ একটা কথা না বলে যেন আমি পারি না। কথাটা যেন অকস্মাৎই আমার মুখ থেকে উচ্চারিত হয়। তবে তুমি এখনো—মানে বলছিলাম নিশ্চয়ই তুমি তোমার বর্তমান জীবনে—

আপনি বলতে চান তো divorce করতে পারি?

হ্যাঁ—

না।

না! পরম বিস্ময়ে যেন ওর মুখের দিকে আমি তাকাই।

না—you don't know him। বালাজী রাওকে

আপনি চেনেন না ওর হাত থেকে এ জীবনে নিষ্কৃতি পাবার আর আমার কোন উপায়ই নেই আইনের সাহায্যে ওর কাছ থেকে আমি দূরে চলে আসতে পারি কিন্তু তাতে করেও তো আমি নিষ্কৃতি পাবো না। পৃথিবীর আর এক প্রান্তেও যদি যাই ও আমার পিছনে পিছনে দুঃস্বপ্নের মতই তাড়া করে বেড়াবে আমি জানি। আমি ঐকেবারে শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওর হাত থেকে আমার মুক্তি নেই। আমি জানি এই আমার নিয়তি ক্যাপটেন চ্যাটার্জি।

সেদিন শোনা হয় নি কিন্তু কয়েক দিন পরে আবার এক দ্বিপ্রহরে আমরা ঐ হোটেলেই পরস্পর মিলিত হয়েছিলাম সেই দিনই ওর সমস্ত ইতিহাস আমি শুনি।

শুধু করুণই নয় বিচিত্র সে ইতিহাস। এবং সে ইতিহাস শুনতে শুনতে বারবার একটি কথাই আমার মনে হয়েছিল। মিথ্যা বলে নি প্রথম দিন ভানুমতী আমার কাছে সত্যিই বালাজীরাও-এর হাত থেকে তার মুক্তি নেই। অন্ততঃ যতদিন সে বেঁচে থাকবে ঐ নরক যন্ত্রণা থেকে তার মুক্তি নেই। কেউ তাকে মুক্তি দিতে পারবে না। কারণ ঐ শয়তান বালাজী রাও যে বিষ তার দেহে সংক্রামিত করেছে সে বিষ হজম করার শক্তি ভানুমতীর কোন কালেই নেই পৃথিবীতে।

সত্যিই বুঝি বিচিত্র নারী মন।

নইলে যে মানুষটা তাকে একটা জঘন্য পশুর মত সারাটা জীবন কেবল দুঃসহ যন্ত্রণা আর পীড়নই দিল তার বাহ্যিক তার ভালবাসাকে অবশ করে অপমানিত করলো তারই দেওয়া বিষে বাকী জীবনটা কেমন করে তারই হাতের ক্রীড়নক হয়ে আছে।

কিন্তু সে কাহিনী তো রূপসী না শুনলে বোঝা যাবে না।

। পাঁচ ।

ভানুমতীর বাবা বিশ্বেশ্বর রক্ষিত লক্ষ্ণৌ শহরে অন্যতম ধনী ছিল।

তার তিন ছেলে এবং এক মেয়ে ঐ ভানুমতী।

প্রাচুর্য ও বিলাসের মধ্যে ভানুমতীরা জন্মাবধি মানুষ। শুধু বিলাসের প্রাচুর্যই তারা পায় নি সেই সঙ্গে শিক্ষাও পেয়েছিল।

বালাজী রাও ঐ কন্ট্রাকটারী বিজনেসের ব্যাপারেই ভানুমতীদের বাড়িতে মধ্যে মধ্যে যাতায়াত করতো।

ভদ্র বিনয়ী—ছিমছাম চেহারা। তার একটি বিশেষ গুণ ছিল অপূর্ব পিওনো ও ভাইওলীন বাজাতে পারত সে।

বালাজীর পিওনো বাজনা শুনে তার ইচ্ছা হয় বালাজীর কাছে পিওনো বাজানো শিক্ষা করবে।

বালাজীকে কথাটা একদিন প্রসঙ্গক্রমে বলায় সে সানন্দে সম্মত হয়ে যায়। বিশ্বেশ্বরেরও আপত্তির কারণ কিছু ছিল না।

মেয়েকে অত্যন্ত ভালবাসতেন বিশ্বেশ্বর—হেসে বলতেই সম্মত হলেন।

বালাজী আসতে লাগলো রক্ষিতের গৃহে ভানুমতীকে পিওনোর লেসন্ দিতে নিয়মিত। এবং সেই লেসন নিতে নিতেই ক্রমশঃ উভয়ের মধ্যে ভালবাসা জন্মায়।

বালাজীই তখন রক্ষিতের কাছে প্রস্তাবটা করে, সে ভানুমতীকে বিবাহ করতে চায়।

কিন্তু রক্ষিত কথাটা শুনে ভ্রূ দুটো কোঁচকালেন।

তারপর কেবল শান্ত কণ্ঠে বললেন, বালাজী, তোমাকে বিশ্বাস করেই আমার একমাত্র মেয়ে ভানুমতীকে তোমার কাছে পিওনোর লেসন্ নেবার অনুমতি দিয়েছিলাম। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি অতটা বিশ্বাস করা তোমাকে আমার উচিত হয় নি। আর কখনও যেন তোমাকে আমার বাড়ির চৌকাঠ না ডিঙ্গুতে দেখি—

বালাজী কোন কথা না বলে বেরিয়ে গেল বটে কিন্তু সাত দিন পরে বিশ্বেশ্বরের নিজের মেয়ে ভানুমতীই যখন এসে বললে তার বাপকে সে বালাজী রাওকে বিয়ে করবে স্থির করেছে বিশ্বেশ্বর বুঝতে পারলেন ব্যাপার ইতিমধ্যে অনেক দূর গড়িয়েছে।

তবু বিশ্বেশ্বর রক্ষিত চেষ্টা করেছিলেন ভানুমতীকে তার সংকল্প হতে ফিরাতে। কিন্তু ভানুমতী পরিষ্কার জবাব দিল, ইতিপূর্বেই নাকি তারা উভয়ে রেজিস্ট্রী অফিসে গিয়ে নাম রেজিস্ট্রী করে এসেছে—

বিশ্বেশ্বর একেবারে মাথায় হাত দিয়ে যেন বসে পড়লেন।

তাঁর একমাত্র আদরিনী কন্যার কাছ থেকে যে এত বড় আঘাত কোন দিন পাবেন এ যেন তাঁর স্বপ্নেরও অতীত ছিল। তবু মেয়েকে অনেক বোঝালেন, অনেক

অনুনয় বিনয় করলেন কিন্তু ভানুমতী সেই এক কথা।

বালাজী রাওকেই সে বিয়ে করবে।

বিশ্বেশ্বর অনন্যোপায় হয়েই তখন মেয়েকে নজর বন্দী করে রাখলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না, একরাত্রে ভানুমতী গৃহ থেকে পালাল। তারপরই সে গিয়ে মিলিত হলো বালাজী রাওয়ের সঙ্গে।

সে সময় চারিদিকে যুদ্ধের ঘনঘটা।

চারিদিকে যুদ্ধের কনট্রাক্টরের জন্য কনট্রাক্টাররা তখন যুদ্ধের অফিসে অফিসে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং যে যুদ্ধের কাঁচা মাল সরবরাহ বা অন্যান্য কনস্ট্রাকশনের ব্যাপারে কনট্রাক্ট পাচ্ছে অতি সহজেই সে ব্যাংক ব্যালেন্সকে ফাঁপিয়ে তুলছে।

কনট্রাক্টার বিশ্বেশ্বর রক্ষিতের তখন একটি মুহূর্ত সময় নেই, তিনি কেবল দিল্লী কলকাতা লক্ষ্ণৌ লাহোর করে বেড়াচ্ছেন। মিলিটারী মহলে তাঁর প্রতিপত্তিও অসাধারণ।

যত সব চোরেরা চোরেরা অফিসারদের দলে তার যেমন খাতির তেমনি প্রতিপত্তি।

নিজের কন্যা হলেও ভানুমতীকে তিনি ক্ষমা করতে পারেন নি এবং তাঁর প্রথম আক্রোশ গিয়ে পড়ল বালাজী রাওয়ের উপরে।

বালাজী রাওকে কনট্রাক্টারী লাইন থেকে সরিয়ে দেবেন বলে ইতিপূর্বেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছিলেন এবং বালাজী রাওও ইতিমধ্যেই বুঝতে পেরেছিল বিশ্বেশ্বর রক্ষিত থাকতে তার কনট্রাকটারী লাইনে থাকার আর কোন উপায়ই নেই। তাই বালাজী রাওও উপার্জনের অন্য কোন একটা পথ খুঁজে বেরাবার চেষ্টা করছিল।

ভানুমতীকে বিবাহ করে সোজা বালাজী লক্ষ্ণৌর বাস তুলে দিয়ে চলে গেল দিল্লী।

ভানুমতী ভেবেছিল, নতুন জীবনের স্বপ্ন নিয়ে বালাজীর সঙ্গে চলে এলাম দিল্লী। কনট্রিসেসে একটা বাড়ির দুখানা ঘর ভাড়া করে আমরা সংসার পাতলাম। কিন্তু দুবাসও গেল না বালাজীর হাতে যা সঞ্চিত অর্থ ছিল তা ফুরিয়ে এলো। বালাজী যে কোন একটা কাজের সন্ধানে তখন হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু মনের মত কাজ আর সে পায় না। যে কাজ পায় তা তার পছন্দ হয় না। দীর্ঘ দিন ধরে কনট্রাকটারী বিজনেস করতে করতে তার নেশা ধরে গিয়েছিল। সেই কনট্রাকটারী বিজনেসের আশায় আশায়ই সে ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

তারপর?

কিন্তু যাবার জন্য কিছুতেই সে সুবিধা করতে পারে না কোথাও। যেখানেই হাত বাড়ায় সেখানেই ব্যর্থকাম হয়। সেই সময়—

হাতে একটি পয়সা নেই। চারিদিকে ধার দেনা। নিষ্ঠুর অভাবের তাড়না। সেই সময় একদিন মদ্যপানে আকণ্ঠ মদ্যপান করে ঘরে ফিরে এলো বালাজী রাও।

অনেকক্ষণ ধরে স্বামীর জন্য অপেক্ষা করে করে চেয়ারটার উপরেই ঘুমিয়ে পড়েছিল বসে বসে ভানুমতী।

কলিং বেলের শব্দে উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল।

ভানুমতী, এত দিনে বোধহয় ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন—কথাটা বলতে বলতে টলছিল বালাজী, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছিল না

ভানুমতী ঐ প্রথম বালাজীকে ড্রিংক করতে দেখে কেমন যেন বিহ্বল ভাবে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

ধীরে ধীরে বললে, তুমি ড্রিংক করেছ—

আঃ ওসব কথা এখন যেতে দাও ভানুমতী। যা বলছি তাই শোন, বড় বড় একটা কনট্রাকট্ হাতের মুঠোর মধ্যে এসেছে। এই কনট্রাকটটা যদি পাইতো আবার পূর্বের দিন ফিরিয়ে আনতে পারবো সুধু তোমাকে একটু আমাকে সাহায্য করতে হবে—

আমাকে!

হ্যাঁ—বল, ভানুমতী, তুমি আমাকে সাহায্য করবে।

নিশ্চয়ই করবো—কি করতে হবে বল, আমি তোমার স্ত্রী—যা করতে বলবে তোমার সাহায্যের জন্য তাই করবো।

জানি। জানি করবে। আমি জানি, তুমি আমার স্ত্রী তখন তুমি আমার অবাধ্য হবে না

বল কি করতে হবে?

কর্ণেল সিং—তাঁরই হাতে কনট্রকটটা দেবার ভার।

কে কর্ণেল সিং?

বরেল আর্মি সাপ্লাই কোঃ'র বড় অফিসার

আমি তাকে করেছি—রাজী ও যে সে একেবারে হয়নি তা নয়। আমার কাল রাত্রে তাকে এখানে আমি নিমন্ত্রণ করতে চাই—

বেশত, কিন্তু— তারও জন্য তো খরচ আছে—

সে সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। সে জন্য তুমি ভেবোনা —তুমি শুধু—

হঠাৎ কেন যেন ভানুমতীর বুকের ভিতরটা দুরু দুরু করে ওঠে।

সে ভয়ে স্বামীর মুখের দিকে তাকায়।

বালাজী আবার বলে। তাকে শুধু তোমাকে একটা রাত্রির জন্য একটাইভনিং করতে হবে—

কি! কি বললে! আর্তনাদ করে ওঠে ভানুমতী।

ভানুমতী, পারবে না—পারবে না তুমি আমার জন্য এইটুকু। Just to give the Col, company—তাকে কেবল একটু সঙ্গ দেওয়া—তা ছাড়া আমি তো থাকবো। ভয়ই বা তোমার কিসের?

না, না—আমি—আমি পারবো না।

পারবে না! এতবড় একটা সুযোগ হাতের মুঠোর মধ্যে এসেও ফসকে যেতে চেয়ে! তোমার পায়ে ধরে সে একটু ড্রিংক করবে বইতো নয়। তাছাড়া সেও তো একজন ভদ্রলোক—

চেয়ারী ভানুমতী।

শেষ পর্যন্ত তাকে রাজী হতেই হলো।

স্বামী তার যদি আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে। স্ত্রী হয়ে তাকে সেই সাহায্যটুকু করতে পারবে না।

যাই হোক তার পরের দিন হোটেলের ঐ ঘরেই বালাজী সব ব্যবস্থা করলো কর্ণেল সিংকে ড্রিংক করাবার জন্য।

সন্ধ্যার কিছু পরেই বিরাট দৈত্যের মত চেহারা কর্ণেল সিং এসে উপস্থিত হলো।

স্ত্রীকে সাজিয়ে বালাজী অপেক্ষা করছিল কর্ণেলের।

স্ত্রীকে দিয়েই কর্ণেলকে অভ্যর্থনা করালো বালাজী।

বালাজী আর কর্ণেল ড্রিংক করছিল।

ভানুমতী এক গ্লাস লিমন স্কোয়াশ নিয়ে কর্ণেলের পাশে বসেছিল। ক্রমে যত রাত বাড়তে থাকে কর্ণেল যেন তেমন অভদ্র হয়ে উঠতে থাকে।

আর ঐ সময় হঠাৎ বালাজী রাও কাজের জন্য, তার ঘর থেকে বের হয়ে যায়। ওরা দুজন তখন ঘরে কর্ণেল আর ভানুমতী। ভানুমতীকে এক প্রকার জোর করেই কর্ণেল লিমনের সঙ্গে তার সঙ্গে তার মিশিয়ে দেয়।

এবং জোর করেই খাওয়ায় তাকে।

বালাজী ঘরে ফিরে এলো প্রায় ঘণ্টা পরে।

কিন্তু তখন ভানুমতীর যা সর্বনাশ হবার হয়ে গিয়েছে।

পশু কর্ণেল সিং তার চরম সর্বনাশ করে ঘর থেকে বের হয়ে গিয়েছে।

। ছয় ।

নেশার ঘোরে ভানুমতী তখন যদিও আচ্ছন্ন তবু সোফার উপরে বসে হাউ হাউ করে কাঁদছিল।

বালাজী ঘরে এসে ঢুকতেই ভানুমতী ছুটে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

কিন্তু পরের দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত ভানুমতী বেরুতে পারে না তার আগেই মেঝেতে উবুড় হয়ে পড়ে মাথার আঘাত পেয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়।

পরের দিন জ্ঞান তার ফিরে এলে ভানুমতী আবার হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকে। এবং কাঁদতে কাঁদতেই ফিট হয়ে যায়।

তারপর দুটো দিন ঘন ঘন তেমন ফিটই হতে লাগল ভানুমতীর।

অনন্যোপায় বালাজী একজন ডাক্তার ডেকে নিয়ে এলো।

ডাক্তার এসে মরফিন ইনজেকশন দিয়ে গেল ভানুমতীকে।

কি কুক্ষণেই যে ডাক্তার ভানুমতীকে মরফিন ইনজেকশন সেদিন দিয়ে গিয়েছিল।

কারণ আবার একদিন পরে ভানুমতী ফিট হতেই, বালাজী সেই ডাক্তারকে ডেকে এনে মরফিন ইনজেকশন দেওয়ালো।

অবশেষে বালাজীই একটা ইনজেকশনের সিরিঞ্জ ও অ্যাম্পুল কিনে নিয়ে এলো এবং ফিটের উপক্রম দেখা দিলে সেই ইনজেকশন দিত।

এবং এমনি করেই ভানুমতী একদিন তার অজ্ঞাতে মরফিনে এডিকটেড্ হয়ে গেল। প্রত্যহ সন্ধ্যায় দিতে তার মরফিন চাই-ই।

বালাজী কিন্তু ভানুমতীকে মিথ্যা কথা বলেছিল।

কোন রকম কনট্রাকটের ব্যাপারেই সে কর্ণেল সিংকে ডেকে বলেন নি। ডেকে এনেছিল তাকে তার কাছে স্ত্রীর দেহ বেঁচে টাকা উপায় করবার জন্য।

কারণ মিলিটারী কনট্রাকট নিতে যে ব্যাংক সিকিউরিটির প্রয়োজন সেটা তো তার ছিল না।

বলতে গেলে তো তখন কপর্দকহীন।

অবিশ্যি বালাজীর মাথাতেও ঐ বুদ্ধিটা তার প্রথম আসেনি।

বুদ্ধিটা দিয়েছিল তারই এক টাউট বন্ধু কেতনলাল।

সেই তাকে বলেছিল, কনট্রাকট এখন তোমার যা অবস্থা তুমি পাবে না। তাছাড়া মিঃ রক্ষিত, তোমার শত্রুর যতদিন বেঁচে আছে সে তোমাকে পেতে দেবে না। তার চেয়ে এক কাজ কর—

দেশবে দুহাতে তুমি এই যুদ্ধের বাজারে টাকা উপার্জন করতে পারবে।

কি করে? বালাজী শুধায়।

কি করে মানে? তোমার ঘরেইতো উপায় রয়েছে—

কি বলছো?

ঠিকই বলছি। তোমার ঐ স্ত্রী—

কেতনলাল!

Don't be sentimental বন্ধু! এক একটা রাত তোমার মুঠো ভরিয়ে দিয়ে যাবে বেটারা টাকায়।

না, না—সে আমি পারবো না।

তবে আর কি পচে মর। তাছাড়া অত Sentimentই বা তোমার কিসের ঐ স্ত্রীর পরে। ওর বাপের জন্যই তো তোমার আজ এই অবস্থা—। বেটা যেমন তোমাকে জব্দ করেছে তুমিও তাকে তেমনি জব্দ কর।

অবশেষে কেতনলালের প্ররোচনাতেই বালাজী রাও ঐ সর্বনাশা পথে পা বাড়িয়েছিল। শুধুই কি পরামর্শ কেতনলালের।

বিদ্বেষপর রক্ষিতের প্রতি একটা প্রতিহিংসার আগুনও কি তার মনের মধ্যে ধিকি ধিকি জ্বলেছিল না, কিন্তু কর্ণেল সিংয়ের কাছ থেকে পাওয়া এক রাতের টাকা কদিনই বা—দেখতে দেখতে ফুরিয়ে গেল।

তার উপর এক নতুন উপদ্রব।

ভানুমতীর মরফিন যোগান।

আবার কেতনলাল বালাজীকে পরামর্শ দিল।

এবং এবারে আর কোন বেগই বলতে গেলে পেতে হলো না বালাজীরাওর।

মরফিনের লালসার ফাঁদে ফেলেই অনায়াসে ভানুমতীকে সে করায়ত্ত করতে পারল।

মরফিনের নেশায় রোজ যখন ছটফট করছে ভানুমতী বেশ একটু রাত করেই বালাজী ঘরে ফিরলো।

এত রাত পর্যন্ত কোথায় ছিলে! ভানুমতী স্বামীকে শুধায়।

বালাজী কোন জবাব দেয় না স্ত্রীর কথায়, সোফার উপরে গিয়ে বসে আলবেলী ছাড়ে।

আমার বলবে কেন? ওঠ।

কেন?

বাঃ ইনজেকশন দেবে না! সেই সন্ধ্যা থেকে কি কষ্টে যে কিটটা আটকে রেখেছি—

অ্যামপুল তো নেই।

নেই। একটাও নেই?

না।

তবে কিনে নিয়ে এসো একটা।

হাতে একটাও পয়সা নেই কিনবো কি দিয়ে? বুঝতেই পারছো এত রাতে ডাক্তারের বিনা প্রেসক্রিপশনে ও জিনিষ কিনতে গেলে দুচার টাকায় হবে না।

কত লাগবে!

তা অনেক—চাইবে—

ফস্ করে ভানুমতী হাত থেকে অবশিষ্ট দুগাছি সোনার চুড়ির এক গাছি খুলে বালাজীর দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলে, এটা বিক্রী করে নিয়ে এসো—

ক্ষেপেছো, এত রাত্রে সোনার গয়না কোথায় বিক্রী করবো? কাল সকালে—

না, না—তুমি যাও—

হ্যাঁ তারপর ঘরে থানায় হাঙ্গামা করে দিক।

কিন্তু আমি, আমি যে সহ্য করতে পারছি না।

না পারলে কি হবে। সহ্য করতেই হবে। এক অবিশ্যি উপায় আছে—

কিন্তু কি উপায় ?

কর্তৃপক্ষের কাছে যাবেন ?

তবে—তার কাছেই যাও ।

সে এখনি দেবে কেন ?

ঐ সোনার চুড়িটা তাকে দিও—

না । তার টাকার অভাব কি ! সোনার চুড়ি সে নেবে না—

তবে ?

এই ঘরে যদি তাকে আসতে দাও—

না, না—না—

তবে আর কি হবে ?

কিন্তু হতভাগিনী ভানুমতী জানত না যে কামড় দেবে তার বলিষ্ঠ দেহের রক্তের মধ্যে ঢেলে দিয়েছে—সে বড় মারাত্মক ।

এত সহজে তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে না ।

শেষ পর্যন্ত তাই আত্মসমর্পণ করতেই হলো ভানুমতীকে ।

তারপরের ইতিহাসটা খুবই সংক্ষিপ্ত ।

ঐ রহিমের নেশার জালে । আটকা পড়ে ভানুমতীকে রাতের পর রাত পরপুরুষের কাছে তার দেহ তুলে ধরতে হয়েছে ।

এবং আজ দুই বছর ধরে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি চলেছে ।

আজ ভানুমতী পাগল ।

রাত বারটার পরে বালাজী রাও তাকে রহিম ইনফেকশন দেবে এই আশাতেই প্রত্যহ সন্ধ্যা রাত্রে যায়ে বালাজী তার ঘরে ঢুকিয়ে দেয় তাকেই ভানুমতীকে আলিঙ্গন দিতে হয় ।

দিনের বেলাটা এক রকম থাকে ভানুমতী ।

কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকার যত ঘনিয়ে আসতে থাকে নেশার জন্য সমস্ত শরীর মোচড় দিতে থাকে ।

অসহ্য যন্ত্রণায় সমস্ত শরীর যেন অবশ হয়ে আসতে চায় ।

কিন্তু উপায় কি তার ।

আজ সে বালাজীর হাতে সম্পূর্ণ বন্দিনী ।

দুচোখের কোণ বেয়ে ভানুমতীর ফোটায় ফোটায় অশ্রু ঝরে পড়তে থাকে ।

ভানুমতীর ইতিহাস যেন আমাকে একেবারে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল ।

ভাবছিলাম অর্থের নেশা মানুষকে কোন স্তরে, কোন অন্ধকার গহ্বরেই না টেনে নিয়ে গিয়ে নামাতে পারে ।

শুধু কি তাই ।

ভালবাসার এত বড় অপমান এ যেন কোন দিন কল্পনারও অতীত ছিল আমার ।

ভাবছিলাম বালাজী রাও কোন স্তরের মানুষ ।

যে হতভাগিনী একদিন তাকে ভালবেসেই এক নিশীথ রাতে তার চিরদিনের পিতৃগৃহ ছেড়ে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল তার সেই ভালবাসাকে কেমন করে বালাজী রাও এত বড় অপমান করলো ।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসেছিলাম ।

ভানুমতীও চুপ করে বসে বাইরের জানালাটার দিকে অন্যমনস্ক ভাবে তাকিয়ে ছিল ।

ভানুমতী !

বলুন !

ভানুমতী আমার মুখের দিকে ফিরে তাকাল ।

একটা কথা বলবো ?

কি ?

তুমি যোগেশ জাননা আমি একজন ডাক্তার । সেই ডাক্তার হিসাবেই আমি তোমাকে একটা কথা বলতে চাই—

বুঝতে পেরেছি আপনি কি বলবেন ক্যাঃ চ্যাটার্জী কিন্তু—

এ নেশা তুমি ছেড়ে দাও ভানুমতী । তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো ঐ নেশা আজ কোথায় এনে তোমাকে দাঁড় করিয়েছে । কি সর্বনাশ যে তুমি তোমার করেছো নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো ।

পারছি, পারছি ক্যাঃ চ্যাটার্জী, সব পারছি—কিন্তু—পারি না আমি পারি না । তুমি জাননা রোজ প্রতিদিন ভোরে ঘুম ভাঙ্গার পর মনে মনে আমি প্রতিজ্ঞা করি । নেশা আর আমি করবো না, এ নেশার এই খানেই শেষ । দূরে অনেক দূরে কোথাও পালিয়ে যাবো এও ভেবেছি । পালিয়ে গিয়েছিও কিন্তু শেষ পর্যন্ত আবার সন্ধ্যার অন্ধকার নামবার সঙ্গে সঙ্গে পাগলের মতই ফিরে এসেছি স্বামীর কাছে । আবার তার কাছে আত্মসমর্পণ করেছি ।

আবার রাতে তার নিয়ে আসা লোকগুলোর কাছে নিজের দেহকে তুলে দিয়েছি। পাশবিক যন্ত্রণা সহ্য করেছি তারপর রাত বারটা সেই বেজেছে ইনজেকশন নিয়ে সব ভুলে গিয়েছি। আমি আমি, তুমিও আমি সব। এযে কি দুঃসহ নরক যন্ত্রণা রাতের পর রাত সে শুধু তোমাকে কেন কাউকেই বোঝাতে পারব না আমি—তবু পারিনি—তবু এ থেকে মুক্তি আমি নিতে পারিনি—

পারবে—আমি বলছি ভানুমতী, চেষ্টা করলেই তুমি পারবে। আবার তুমি সুস্থ হতে পারবে—শুধু মনে জোর আন। নিজের পরে বিশ্বাস আনো। আচ্ছা ভানুমতী—আমি যদি একবার বালকৃষ্ণর সঙ্গে দেখা করি—

কোন ফল হবে না তাতে ক্যাঃ চ্যাটার্জী—

ফল হবে না।

না।

কেন ফল হবে না আমি তাকে বলবো—যে অর্থের জন্য সে একদিন ঐ বিষ তোমার দেহে সংক্রামিত করেছিল সে অর্থের নিশ্চয়ই আজ আর তোমাদের অভাব নেই।

তুমি জাননা ক্যাঃ চ্যাটার্জী, সেও আজ আমারই মত যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করছে। অর্থের জন্য সত্যিই সে একদিন আমাকে বিষ দিয়েছিল কিন্তু সে অর্থ তাকে সুখ দিতে পারেনি।

ভানুমতী।

হ্যাঁ ক্যাঃ চ্যাটার্জী, আজ সেও আমারই মত অন্য এক নেশায় প্রতি রাত্রে বুঁদ হয়ে থাকে।

নেশা।

হ্যাঁ—আমাকে ইনজেকশন দেবার পরই সে মদের বোতল নিয়ে বসে। মরফিনের নেশায় আমি তবু চোখ বুজে এক পাশে পড়ে থাকি কিন্তু তার সেটুকুও মেলে না। সমস্ত রাত্রি বিনিদ্র বসে বসে বোতলের পর বোতল শেষ করে। আর হাউ হাউ করে কাঁদে—আর বলে—কি বলে?

কেতনলাল, কেতনলালকে যদি কোন দিন পাই। আবার কোন দিন যদি তার সঙ্গে দেখা হয়তো তাকে গুলি করে মারব।

কথা বলতে বলতে ইতিমধ্যে বেলা কখন পড়ে এসেছিল বুঝতে পারি নি।

হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ভানুমতী বেড়ে ঠেলে উঠে দাঁড়াল।

উঃ এখানে আমাকে হোটেলে ফিরতে হবে ক্যাঃ চ্যাটার্জী।

চল তোমাকে আমি হোটেলে পৌঁছে দিয়ে যাব—

না, না—তার কোন প্রয়োজন নেই—আমি একাই চলে যেতে পারব। একাই চলে যেতে পারব।—

বলতে বলতে যেন ঝড়ের মতই ঘর থেকে বের হয়ে গেল ভানুমতী।

। সাত ।

ভানুমতীর সঙ্গে আর দেখা হয় নি। তার আগেই ব্যাপারটা ঘটে গেল!

তারপর হাসপাতালের কাজে কটা দিন খুবই ব্যস্ত ছিলাম। কোথাও বেরুবার ফুরসৎ পাই নি। কিন্তু তাহলেও ভানুমতীর কথা ভুলতে পারি নি।

সমস্ত কাজের মধ্যে বার বার ভানুমতীর করুণ মুখখানা ভেসে উঠছে।

আর যত ওর কথা ভেবেছি ততই মনে হয়েছে, পারবো কি না ওকে ওই সর্বনেশার হাত থেকে বাঁচাতে।

পারতেই হবে আমাকে যেমন করে হোক পারতেই হবে।

প্রয়োজন হলে বালাজী রাওয়ের সঙ্গেই দেখা করবো।

তাকেও বলবো বালাজী রাও, এখনো সময় আছে। নিজেও এই সর্বনেশে নেশা ছাড় আর স্ত্রীকে ছাড়াও।

দিন সাতেক বাদে হস্তার সময় বেরুবো বলে প্রস্তুত হচ্ছি বালকৃষ্ণ এসে আমার ঘরে ঢুকলো।

কোথাও বেরুচ্ছো নাকি চ্যাটার্জি।

বালকৃষ্ণ প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ একটু বেরুবো

তারপরই হঠাৎ বালকৃষ্ণ বলে, খবর শুনেছো?

কি খবর?

বল কি—পুণা শহরের most sensational খবর—

sensational খবর?

হ্যাঁ হে—মনে আছে তোমার সেই বালাজী রাওকে?

হঠাৎ যেন চমকে উঠি নামটা শুনে।

গলার টাইটার মত মিজিসার হঠাৎ থেমে গেল। বালকৃষ্ণের মুখের দিকে তাকিয়ে শুধালাম, বালাজী রাও?

হ্যাঁ হে—পুলিশ তাকে এ্যারেষ্ট করেছে—

এ্যারেষ্ট করেছে, কেন ?

তারপর বালকটি যা বললে তার সার মর্ম হচ্ছে, গত রাত্রে একজন ওয়েষ্ট আফ্রিকান কর্পোরাল বালাজী রাও এর হোটেলে যায়।

এবং ঘরোয়ীতে তার কাছ থেকে দেড়শটাকা নিয়ে বালাজী রাও সেই ওয়েষ্ট আফ্রিকান কর্পোরালকে তার স্ত্রী ভানুমতীর ঘরে ঢুকিয়ে দেয়, সময়টাও অবিশ্যি বলে দিয়েছিল।

ওয়েষ্ট আফ্রিকানটি ভানুমতীর ঘরে ঢোকার কিছুক্ষণ পরেই অন্য এক জন খদ্দের এসে হাজির। বালাজী রাও তাকে বসতে বলে।

এ দিকে কুড়ি মিনিট বেড়ে পঁচিশ মিনিট হয়ে যায়। কিন্তু ওয়েষ্ট আফ্রিকান কর্পোরাল ভানুমতীর ঘর থেকে বের হয় না।

অধৈর্য হয়ে বালাজী বন্ধ দরজা নক্ করে।

কিন্তু তাতে কোন ফল হয় না।

আবার সে নক্ করে।

তবু কোন সাড়া নেই।

বালাজী রাও তখন রীতিমত চটে গিয়ে আবার দরজায় নক করতেই ঘরের দরজা খুলে গেল এবং কর্পোরাল মুখ বের করে রুঢ় কণ্ঠে শুধোয়, Whats up ! কি ব্যাপার অতটুকু মত দরজায় ধাক্কা দিচ্ছো কেন ?

বালাজী রাও ও রুঢ় কণ্ঠে জবাব দেয়। Your time is up !

তাতে হয়েছে কি ?

হয়েছে কি মানে ! কুড়ি মিনিট সময় তোমার—আধ ঘণ্টা হয়ে গিয়েছে—

আরো এক ঘণ্টা আমার দরকার—dont disturb বলে দড়াম করে বালাজী রাওএর মুখের পরেই ওয়েষ্ট আফ্রিকানটি দরজা বন্ধ করে দেয়।

বালাজী রাও তখন রাগে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পিছনের দরজা দিয়ে গিয়ে ভানুমতী ঘরে প্রবেশ করতেই ওয়েষ্ট আফ্রিকান কর্পোরাল রোষের মত ঘুরে দাঁড়ায়।

গর্জন করে ওঠে—Get out !

বালাজী রাও বলে, তুমি গেট আউট—বলেই সে তার ঘরের মধ্যে ছুটে গিয়ে রিভলভার বের করে ড্রেসিংটেবিলের ড্রয় থেকে।

রিভলভার উঁচিয়ে বলে, বেরও এ ঘর থেকে।

ওয়েষ্ট আফ্রিকান কর্পোরালও সঙ্গে সঙ্গে তার দেওয়ালে ঝোলান কোমর বন্ধ থেকে পিস্তলটা নিতে যাবে বালাজী তাকে কায়দা করে।

গুলির শব্দে সমস্ত হোটেলের লোক ছুটে আসে।

গুলিটা অবিশ্যি ওয়েষ্ট আফ্রিকানটির ডান হাতের কব্জীতে লেগেছিল।

মারাত্মক কিছু হয় নি।

সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ আসে এবং দুজনকেই গ্রেপ্তার করেছে।

আমি প্রশ্ন করলাম ভানুমতী !

ভানুমতী আবার কে ?

বালাজীর স্ত্রী—

বলকি ! তুমি ওর নাম জানলে কি করে ?

যেমন করেই হোক জেনেছি—তার খবর বল ?

তাকেও এ্যারেষ্ট করে নিয়ে গিয়েছে। কিন্তু ব্যাপার কি বলত চ্যাটার্জী, তুমিও সেখানে হানা দিয়েছিলে না কি ?

কথাটা বলে বিচিত্র ভঙ্গীতে তাকাল বালকটি আমার দিকে।

হ্যাঁ, গিয়েছিলাম।

বল কি তুমি !

আমি আর কোন জবাব দিলাম না।

দিন দুই পরে শুনলাম ভানুমতীকে পুলিশ ছেড়ে দিয়েছে।

আর বালাজী রাও বিচারাধীন হাজতে বন্দী।

আরো মাসখানেক প্রায় শুনাতে ছিলাম কিন্তু সমস্ত পুনা শহরের সর্বত্র বহু অনুসন্ধান করেও ভানুমতীর কোন খবর নিতে পারি নি।

কেউ তার কোন খবর দিতে পারে নি।

মাস চারেক বাদ সংবাদ পত্র মারফৎই বালাজী রাওএর বিচারের ফলাফল জানতে পেরেছিলাম। পাঁচ বছরের জন্য তার সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল।

যুদ্ধও এক দিন থেমে গিয়েছিল—যুদ্ধের ইমারজেন্সী কমিশন শেষ করে কলকাতা শহরে প্রাকটিস শুরু করে দিয়েছিলাম।

দীর্ঘ ছয় বছর পরে আবার সেই রাত্রে গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলের কফিঘরে বালাজী রাওকে যে দেখতে পাবো এ স্বপ্নেও ভাবি নি।

আমার এক বন্ধু—সে সময়ের নাম করা চিত্র তারকা এসেছিল কলকাতায় একটা বাংলা ছবিতে অভিনয় করতে।

তারই আহ্বান এড়াতে না পেরে সেদিন রাত্রে গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলে তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম।

চেম্বারের কাজ সেরে বাড়িতে গিয়ে স্নান করে বের হতে বেরুতে রাত সোয়া দশটা প্রায় হয়ে গিয়েছিল।

বর্ষা কাল।

সন্ধ্যা থেকেই আকাশে ঘনঘটা করে বৃষ্টি নেমেছিল।

হোটেলের সামনে গিয়ে গাড়ি থেকে যখন নামলাম বৃষ্টিটা একটু ধরেছে বটে তবে একেবারে থামে নি।

ঝির ঝির করে ঝরছে তখন।

মধ্যে মধ্যে বিদ্যুতের ঝিলিক।

আর জলকণাবাহী এলোমেলো হাওয়া।

গাড়ি থেকে নামতেই একটা বেহালার সুর কানে এল।

দেখলাম পোর্টিকোর এক পাশে আবছা আলোয়ায় মধ্যে দাঁড়িয়ে কে একজন একেবারে তন্ময় হয়ে বেহালা বাজাচ্ছে।

চমৎকার মিষ্টি সুরটি।

ঘরকে দাঁড়িয়ে ছিলাম বুঝি নিজের অজ্ঞাতেই।

হঠাৎ কানে এলো মৃদু কণ্ঠ স্বর, Help me Sir—

ভিক্ষার অনুনয়।

সঙ্গে সঙ্গে তাকালাম লোকটার মুখের দিকে।

লোকটি আবার বললে, Help me Sir!

হোটেলের ভিতরকার আলো লোকটার নিম্নাঙ্গে এসে পড়েছে বটে তার ঊর্ধ্বাংশ আবছা অন্ধকার ভাল করে দেখা যায় না।

তবু যেটুকু দেখতে পাই, বয়েস হয়েছে লোকটার। এক মুখ ভর্তি কাঁচা পাকা দাড়ি। মাথায় একটা ফেল্ট ক্যাপ।

পরণে একটা পুরাতন তালি দেওয়া সার্ট।

গায়ের কোটের কলারটা ওল্টানো।

হেলপ্ মি স্যার?

লোকটা দু পা এগিয়ে এলো।

হোটেলের আলো তো এবার লোকটার মুখে স্পষ্ট দেখতে পেলাম।

পকেটে হাত চালিয়ে একটা টাকা বের করে দিতে যাবো হঠাৎ ঐ সময় দরজার পাশ থেকে দরওয়ান এগিয়ে এসে লোকটাকে ধমকে উঠলো, এই বালাজী, হটো যাও ইধার সে—নেই তো গোলি মার দুঙ্গা—

হঠাৎ লোকটা যেন সভয়ে দুপা পিছিয়ে যায়।

আর্ত কণ্ঠে বলে ওঠে, নেহি—নেহি Dont fire dont fire—

কিন্তু বালাজী নামটা শুনে আমি চমকে উঠেছিলাম।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতই যেন বালাজী নামটা আমার মনের মধ্যে একটা আলোর ঝলক ফেলে।

ছ বছর আগেকার একটা নাম যেন অকস্মাৎ মনে পড়ে যায়।

বালাজী!

লোকটা তখন বেহালাটা কাঁধে তুলে বাজাতে বাজাতে এগিয়ে চলেছে।

দ্রুত তার পিছনে গিয়ে ডাকলাম, শোন!

ঘুরে দাঁড়াল লোকটা বেহালা থামিয়ে বলল, Calling me Sir!

হ্যাঁ কি নাম তোমার?

My name!

হ্যাঁ—কি নাম তোমার?

বালাজী রাও—

তাহলে সেই!

তুমি তুমি কোন দিন পুণাতে ছিলে বালাজী?

দুনিয়ার অনেক জায়গাই এক সময় ছিলাম। আর পুনা—হ্যাঁ—পুনাতেও ছিলাম বৈকি—

পুনাতে তুমি ছিলে যুদ্ধের সময়।

ছিলাম কিন্তু Who are you! এত কথা জিজ্ঞাসা করছো কেন?

কারণ পুণাতে আমি তোমাকে দেখেছিলাম। তোমার স্ত্রীর নামই না ভানুমতী ছিল?

বালাজী কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলো।

তারপর হঠাৎ বেহালাটা আবার কাঁধে তুলে নিয়ে

বাজাতে বাজাতে এগিয়ে যাবার জন্য পা বাড়াতেই আমি ডাকলাম শোন, শোন—

বালাজী ঘুরে দাঁড়িয়ে তারপর রুক্ষ কণ্ঠে বললে, কেন বিরক্ত করছো আমাকে? Let me go! আমাকে যেতে দাও।

তুমি হেল্প চাইছিলে না!

দেবে দাও—

হাত বাড়াল বালাজী।

দেবো। কিন্তু Before that what about some drink!

Drink!

হ্যাঁ—

ড্রিংক ত আমি ছেড়ে দিয়েছি মিস্টার।

But what about some food—নিশ্চয়ই তুমি খাওনি কিছু?

: আট :

Food; সত্যই তুমি আমাকে খেতে দেবে? Not joking—উপহাস করছো না আমার সঙ্গে? সত্যই তুমি serious!

অন্ধকারে বালাজী হাত আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বলে গেল।

না, না—জোক করবো কেন, সত্যি সত্যিই বলছি। চল হোটেলে, এক সঙ্গে খাবো। আমরা।

হোটেলে?

হ্যাঁ—

এই গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলে?

হ্যাঁ—চল! Let us go!

So kind of you! চল—গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলে আজ কি যেন আছে ডিনারের জান?

না। চল না গিয়ে যেন দেখা যাবে।

But Mr., I like Indian dish। ভারতীয় খানা খাবো কিন্তু—

বেশ তো—তাই খাওয়া যাবে—What ever you choose we will take!

That's good; চল—

কিন্তু হোটেলের দরজার সামনে গিয়েই থমকে দাঁড়াল বালাজী রাও।

কি বলো চল?

না।

কেন, এই যে বললে যাবে?

এই বেশে কি যেতে পারি। হয়তো ওরা চিনে ফেলবে। কত দিন খেয়েছি—they all know me! না। আচ্ছা চল—Good night!

যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়াল বালাজী

মিঃ রাও শোন, শোন—

কি? তুমি কি দেখতে পাচ্ছো না এই—dress নিয়ে কি আমি ঐ হোটেলে যেতে পারি—they wont allow me। আমাকে বের করে দেবে—

আমার বাড়িতে যাবে?

তোমার বাড়িতে?

হ্যাঁ—সেখানে আমরা খাবো! চল—যাবে?

কি যেন ভাবল বালাজী তারপর বললে, তা যেতে পারি?

তাহলে চল! আমার গাড়ি আছে সঙ্গে—

ড্রাইভার রাস্তার অন্য দিকে গাড়ি পার্ক করে রেখেছিল রাস্তা ক্রস করে বালাজীকে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে উঠে বসলাম।

গাড়িতে উঠে বসার সঙ্গে সঙ্গেই আবার বৃষ্টি শুরু হয়।

চুপ চাপ দুজনে পিছনের সীটে বসে আছি।

ওয়াইপার দুটো উইণ্ড স্ক্রীনের গায়ের বৃষ্টির ধারা বিচিত্র একটা শব্দ তুলে মুছে চলেছে।

রাস্তার ইলেকট্রিক আলো দুপাশের মেটাল রাঁধার ভিজে রাস্তায় পড়ে যেন চিক চিক করছে।

একেবারে গাড়ির সমস্ত কাচ তুলে দিয়ে বৃষ্টির মধ্যেও কোনদিন আমি যেতে পারি না।

কেমন যেন দম বন্ধ হয়ে আসে।

খোলা জানালা পথে বৃষ্টির ছাট এসে গায়ে চোখে মুখে পড়ছে।

বাড়িতে এসে সৌঁছালাম যখন রাত প্রায় পৌনে এগারটা।

ইতিমধ্যেই পাড়াটা আমাদের অনেকটা নির্জন হয়ে এসেছিল। রাস্তাটা অবিশ্যি এমনিতেই রাত দশটার পর প্রায় বলতে গেলে খালি হয়ে যায় কারণ নতুন যে রেলটা রেল লাইনের মাথার উপর দিয়ে এপার ওপার যোগাযোগ

করছে সেটার দুদিকের রাস্তায় এখনো কাজ চলেছে।

রাস্তায় স্বাভাবিক মানুষ ও যানবাহনের চলাচল সেই কারণেই বেশ কিছুদিন থেকে বন্ধ।

তাছাড়া ঠিক বড় রাস্তার উপর আমার বাড়ি নয়।

বাঁ ধারে ঢুকে বাড়িটা।

গাড়ি থেকে নেমে কলিং বেল বাজাতেই ভৃত্য এসে দরজা খুলে দিল।

উপরে দোতলার ঘরে আলো জ্বলছিল দেখে বুঝতে পারছিলাম, গৃহিনী তখনো জেগেই।

ড্রয়িংরুমে বালাজীকে বসিয়ে উপরে গেলাম।

গৃহিনী একটু বিস্মিত হয়েই শুধায়, এত তাড়াতাড়ি ফিরলে যে? মোহন কুমার এত তাড়াতাড়ি তোমাকে ছেড়ে দিল?

একজনের খাবার হবে? শুধালাম।

এত রাত্রে আবার কাকে ধরে নিয়ে এলে।

এমন একজনের হঠাৎ দেখা পেয়ে গেলাম আজ হোটেলে ঢুকবার মুখেই যাকে মনে মনে দীর্ঘদিন থেকে খুঁজছিলাম—

কে—কাকে আবার মনে মনে দীর্ঘদিন ধরে খুঁজছিলে?

ভ্রু কোঁচকিয়ে তাকায় গৃহিনী।

পল্লে পল্লে আমিও তাকাই।

হঠাৎ যেন ঘরের নরম নীলাভ আলোয় গৃহিনীর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হলো, সাইত্রিশ বৎসর পার হতে চললে কি হবে, এখনো যেন হঠাৎ ঐ মুখখানি, যা গালের উপর কালো তিলটি মনে করিয়ে দেয় দীর্ঘ আঠের বছর আগেকার সেই মুখখানিই!

মৃদু হাসি।

হাসছো যে?

এমনিই। মনে আছে তোমায় গল্প করেছিলাম একদিন পুণার সেই বালাজীরাও আর ভানুমতীর কথা।

বলাই বাহুল্য যতটুকু স্ত্রীকে বলা যেতে পারে তার বেশী বলিনি।

গৃহিনী বলে ওঠে, সেই ভানুমতীকে সঙ্গে করে নিয়ে এলে নাকি।

না ভানুমতী নয় তার স্বামী বালাজী রাও।

গৃহিনীর কোঁচকানো ভ্রু যুগল পুনরায় সহজ হয়ে এলো।

লোকটা কুষ্ঠার্ত। খেতে দেবো বলে নিয়ে এসেছি সঙ্গে করে।

মোহন কুমারের ওখানে তুমি যাওনি।

না। কিন্তু লোকটা নীচে বসে আছে, আমি যাই—খাবারটা নীচে পাঠিয়ে দিও।

নীচে ড্রয়িংরুমে এসে মুখোমুখি বসলাম।

ঘরের উজ্জ্বল আলোয় আবার ওর মুখের দিকে তাকালাম।

ছয় বছর আগেকার সেই বলাজী রাওকে আজ আর সত্যিই চিনবার উপায় নেই।

বেহালাটা একপাশে নামিয়ে রেখেছিল।

দুহাত জড়ো করে কোলের মধ্যে বসেছিল সোফার মধ্যে যেন জড়োসড়ো হয়ে বালাজী রাও। মাথাটা বুকের উপর ঝুলে পড়েছিল।

মাথার পুরাতন ফেল্টটা হ্যাটটা খুলে পাশের সোফার উপরে রেখে দিয়েছে।

রুক্ষ তৈলহীন।

মুখ ভর্তি দাড়িতে কয়েকটা বৃষ্টির ফোঁটা লেগে রয়েছে। ঘরের আলো পড়ে সেই জলের ফোঁটাগুলো যেন চিক চিক করে জ্বলছে।

ঘুমিয়ে পড়লো নাকি লোকটা।

মৃদু কণ্ঠে ডাকলাম বালাজী!

উঁ, মুখ তুলে তাকাল বালাজী রাও।

ঘুমোলে নাকি?

না। মাথা নাড়ল বালাজী, আমি তো ঘুমাই না।

ঘুমাও না?

না। ছ বছর আমি ঘুমাই না।

কেন?

জানি না—only I can't sleep!

বলতে বলতে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল বালাজী, আমি যাই—

বাঃ যাবে কি, বোস, বোস না খেয়ে যাবে কি! খাবার আসছে তোমার। বাঁধা দিলাম আমি।

ওঃ হ্যাঁ—আচ্ছা, আচ্ছা—বালাজী আবার সোফায় বসে পড়ল।

বসে ঘরের এদিক ওদিক তাকাতে থাকে।

হঠাৎ ঘরের কোণে একটা কাচের শো কেসে সাজান ঔষধগুলির দিকে তাকিয়ে বলল, আপনারাতে অত ঔষধ দেখছি, তুমি বুঝি ডাক্তার?

হ্যাঁ—

Could you make me sleep Doc! কোন ঔষধ দিয়ে আমাকে ঘুম পাড়াতে পার?

ওঁ পারবো না কেন। নিশ্চয় পারি।

পার?

হ্যাঁ—

কিন্তু কি ঔষধ দেবে?

কেন কত ঔষধ আছে ঘরের—

কি তোমার 'ব্রোমাল', 'ভেরনল', 'সেকনল সোডিয়াম' —মনোহরিল—

তুমি এসব নাম জানলে কি করে বালাজী?

Because I have tried all of them! সব একে একে খেয়েছি, কিন্তু কিছু হয় নি। কিন্তু আমি জানি ডক্ কি হলে আমার ঘুম হবে?

জান!

জানি! I know—I know—

কি বলতো! হঠাৎ যেন মুখ দিয়ে আমার কথাটা বের হয়ে গেল, মরফিন!

হঠাৎ যেন চমকে ওঠে বালাজী।

সমস্ত শরীরটা তার কাঁপতে শুরু করে।

ঠোঁট দুটোও কাঁপছে।

তু-তুমি জানলে কি করে!

কি করে আর জানব। হঠাৎ মনে এলো নামটা—

সত্যি, সত্যি বলছো!

সত্যি বলছি।

হ্যাঁ, ডাক্তার, সত্যি—সত্যিই জানি একমাত্র ঐ মরফিনই আমাকে ঘুম পাড়াতে—only morphine—morphine can make me sleep! আর, এও আমি জানি ডক্—শেষ পর্যন্ত আমাকে একদিন ঐ morphine-ই নিতে হবে—এক আধ গ্রেণ নয়—দশ বার গ্রেণ মরফিন এক সঙ্গে।

কথাগুলো বলতে বলতে কি এক উত্তেজনায় যেন বালাজীর কণ্ঠস্বরটা বুজে আসে। তার সমস্ত কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দেয়।

অবাক বিস্ময়ে আমি ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকি।

জান ডক্—সর্বদা—সর্বক্ষণ আমি নিয়ে বেড়াচ্ছি কি?

ঐ মরফিন—look here I am carrying all the time these ampules with me—বলতে বলতে ছেঁড়া জামার পকেটে হাত চালিয়ে সত্যি সত্যি একটা ছোট কাগজের বাক্স বের করে তার ঢাকনাটা কম্পিত হাতে খুলতেই চোখে পড়ল আমার বাক্সের মধ্যে দশ বারটা মরফিন এ্যাম্পুল।

চেয়ে থাকি কেমন যেন বোবা দৃষ্টিতে এ্যাম্পুলগুলোর দিকে।

একদিন আমাকে ঘুমাতেই হবে ডক্। শেষ ঘুম—এই এ্যাম্পুলগুলোই দেবে আমাকে শেষ ঘুম। যে ঘুম, এ জীবনে আর কখনো ভাঙ্গবে না। Deep—sound sleep! কে? Who comes there?

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায় বালাজী।

প্রসন্ন খাবারের প্লেট হাতে ঘরে এসে ঢুকলো।

রোস, রোস—ও আমার চাকর, খাবার এনেছে তোমার।

বালাজী আবার সোফার পরে বসে পড়ল ধপ্ করে।

॥ নয় ॥

খাবারের প্লেটটা ঐখানে রাখ প্রসন্ন—বললাম আমি।

প্রসন্ন সামনের টেবিলে প্লেটটা নামিয়ে রেখে চলে গেল।

কিন্তু বালাজী খাবার স্পর্শ করে না।

যেমন বসেছিল তেমনি বসে থাকে।

তাগিদ দিই, কই নিঃ খাও—খাও—

হ্যাঁ—চমকে ওঠে বালাজী।

খাবার ঠাণ্ডা হয়ে গেল, শুরু কর।

খাবো?

কথাটা বলে কেমন যেন অসহায় দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল বালাজী।

হ্যাঁ খাও। শুরু কর—

কিন্তু তুমি! তুমি খাবে না ডক্।

আমি পরে খাবো। তুমি খাও।

বালাজী খেতে শুরু করে।

ওর খাওয়া দেখে মনে হয় যেন কতকাল ও খায় নি।

দেখতে দেখতে প্লেট শেষ হয়ে যায়।

আর কিছু খাবে?

না। আর না।

আর ধুপিস পাউরুটি আর কিছু মাংসের কারী দিক।

দেবে? আছে?

নিশ্চয়ই—

প্রসন্নকে ডেকে আরো কিছু কারী ও পাউরুটির পিস এনে দিতে বললাম। প্রসন্ন এনে দিল।

খাওয়ার পর হাত মুখ একটা ধবধবা রুমাল পকেট থেকে বের করে মুছে ফেলল।

ঢক ঢক করে এক গ্লাস জল শেষ করল।

পকেট থেকে সিগ্রেট কেস বের করে এগিয়ে ধরলাম, সিগ্রেট?

না।

কিন্তু তুমি তো এক সময় সিগ্রেট খেতে নিঃ রাও।

বেশ্যা তো আমি আর কার না ডক। তুমি জান না—এ বেশ্যাই—বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল বালাজী।

কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

বালাজী!

ইয়েস্ ডক!

তুমি এখন কোথায় থাক?

পথে!

পথে! কেন ঘর?

ঘর!

হ্যাঁ—

আছে কিন্তু—সেখানে গেলেও বেশীক্ষণ আমি থাকতে পারি না।

বালাজী!

কিছু বলছিলে?

তোমার স্ত্রী—ভানুমতী এখন কোথায়?

সে তো নেই—

নেই! মারা গেছে!

না না—মারা যায় নি বটে এখনো, তবে—

তবে?

She is living—but no—no—She is dead! হ্যাঁ—মৃত্যু—মৃত্যুই বই কি? কথা বলে না সে, নড়ে না—চড়ে না শুধু চেয়ে থাকে।

চেয়ে থাকে।

হ্যাঁ—আমি সহ্য করতে পারি না তার সে চোখের চাউনী! She drives me mad! ইচ্ছা করে—ঐ চোখ দুটো তার নখ দিয়ে টেনে উপড়ে ফেলি—কিন্তু তাও পারি না। তাও পারি না—যদি পারতাম, যদি পারতাম—বলতে বলতে দু হাতে মুখ ঢাকল বালাজী রাও।

শরীরটা কাঁপছে বালাজীর।

ছয় বছর আগে একদিন চদরাম ডেগান কুইনের কামরার মধ্যে দাঁড়িয়ে এই বালাজী রাওকেই হাসতে দেখেছিলাম এবং যে হাসি দেখে মনে হয়েছিল একটা বাঘের হাসি, আজ সেই বালাজী রাওকেই নিজের ড্রয়িং রুমের মধ্যে, সোফার পরে বসে ফুঁপিয়ে কাঁদতে দেখে মনে হচ্ছে একটা মানুষের কান্না। একটা মানুষ কাঁদছে!

আমি চুপ করে বসে রইলাম।

অনেকক্ষণ পর বালাজী মুখের ওপর থেকে হাত সরিয়ে আমার দিকে না তাকিয়ে উঠে দাঁড়াল, আমি যাই—

দাঁড়াও বালাজী, তুমি কিছু টাকা চেয়েছিলে না?

টাকা!

কথাটা বলে বালাজী আমার মুখের দিকে তাকাল।

দুচোখের কোণে তখনো তার অশ্রু চিহ্ন চিক চিক করছে।

হ্যাঁ, একটু বসো, আমি টাকা নিয়ে আসি—

না, মাথা নাড়ল বালাজী।

টাকা চাও না? শুধালাম আমি।

না। I dont want money! I dont want it any more! No no! যেন একটা আর্তনাদ করে ওঠে বালাজী রাও।

বালাজী!

আছে এখনো আমার অনেক টাকা আছে। ভানুমতী আমাকে অনেক টাকা দিয়েছিল, মুঠো মুঠো টাকা। সেই সব টাকা আজো ব্যাংকে জমা রয়েছে। আমি জানি ডক্টর দাবু, সে টাকা নিলে ভানুমতী আমাকে আর ক্ষমা করবে না—ক্ষমা করবে না। তার ঘরে আর আমি

ঢুকতে পারব না—আর তার সামনে গিয়ে আমি দাঁড়াতে পারবো না।

কথাগুলো বলতে বলতে আমাকে যেন কথা বলবার আর অবকাশটুকুও না দিয়ে হঠাৎ নীচু হয়ে বেতালাটা আর টুপিটা তুলে নিয়ে বালাজী ঘর থেকে যেন ঝড়ের মতই বের হয়ে গেল। কেমন যেন বিহ্বল আমি ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলাম।

মিনিট কয়ের মধ্যেই তাড়াহুড়ো ঘর থেকে বের হয়ে গিয়ে ডাকলাম, বালাজী, বালাজী—কিন্তু কোথায় বালাজী যাও।

হা হা করছে কোলাপসিবল গেটটা খোলা।

আর আকাশ অন্ধকার করে আবার ঝম ঝম করে বৃষ্টি নেমেছে।

বৃষ্টির ছাটে বারান্দা ভিজে থৈ থৈ করছে।

তারপর একটা মাস কত জায়গায় বালাজীকে খুঁজেছি!

কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় হোটেলে। হোটেলে যখনই গাড়ি থেমে গিয়েছে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকিয়েছি কিন্তু তার দেখা মেলেনি।

গ্রেট ইস্টার্নের দারোয়ানকেও জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সে বলেছিল, নেহি সার, উ পাগল বালাজীকে আর নেহি দেখা, না জানে কিধার চল গিয়া ও পাগল!

তবু কিন্তু নিরস্ত হই নি।

বালাজীর দর্শন আশায় সতৃষ্ণ দৃষ্টি আমার এদিকে-ওদিকে ঘুরে ফিরেছে।

মনে হয়েছে নিশ্চয়ই তার দেখা পাবো।

নিশ্চয়ই সে এই কলকাতা শহরেই আছে।

কিন্তু তার দেখা আর পাই নি।

বালাজী রাওকে আর দেখতে পাইনি কোন দিন।

সেই যে সে এক বৃষ্টি ঝরা রাতে আমার ড্রয়িংরুম থেকে ছুটে বের হয়ে গিয়েছিল আর তার সন্ধান কোন দিনই পাই নি।

তবে বালাজী রাওয়ের সন্ধান না পেলেও ভানুমতীর দেখা পেয়েছিলাম।

আরো পাঁচ বছর পরে লক্ষ্ণৌ শহরে ভানুমতীর দেখা পেয়েছিলাম।

হঠাৎ তার দেখা পেয়েছিলাম।

১ দশ ১

পূজোর ছুটিতে বরাবরই আমার কলকাতা ছেড়ে বের হয়ে পড়া অভ্যাস।

কলকাতা শহর ছেড়ে দুটো দিন কোথাও থাকতেও পারি না আবার বছরান্তে একবার কলকাতা শহরের বাইরে না গেলেও মনটা যেন ভরে না।

কেমন যেন ক্লান্ত বিষণ্ণ লাগে।

একঘেয়ে মনে হয় কলকাতার জীবনটা।

তাই বছরের মধ্যে যখনই হোক একবার কলকাতা থেকে বের হয়ে পড়ি।

সেবার যখন কোথায় যাব ভাবছি পূজোর সময়টা, বন্ধু নীরেনের একটা চিঠি পেলাম লক্ষ্ণৌ থেকে।

এক সঙ্গে বেলগাছিয়া মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করেছিলাম।

পাশ করবার পর আমি চলে গিয়েছিলাম আসাম, চাকরি নিয়ে ও আরো বছর খানেক বেঙ্গল মেডিকেল সার্ভিস নিয়ে এদিক ওদিক ঘুরে চলে গিয়েছিল বিলেত।

সেখান থেকে এম. আর. সি. পি ও মানসিক রোগের শিক্ষা নিয়ে ফিরে এসে লক্ষ্ণৌ মেডিকেল কলেজে চাকরি নিয়ে চলে গিয়েছিল।

নীরেনের চিঠিটা পেয়ে মনে হলো মন্দ কি, কটা দিন ওর ওখানেই কাটিয়ে আসা যাক। কার্তিকের শেষা-শেষী, ঠাণ্ডাও একটু পড়েছে ওখানে বেশ ভালই লাগবে।

গৃহিনীরও লক্ষ্ণৌয়েতে আপত্তি ছিল না।

কারণ তার কাকা লক্ষ্ণৌতে থাকতেন।

আগেই স্থির করলাম নীরেনের ওখানেই উঠবো এবং যে কটা দিন লক্ষ্ণৌ থাকবো তার বাসাতেই থাকবো।

সেই মত চিঠি লিখে দিলাম নীরেনকে।

হজরৎ গঞ্জে নীরেনের বাড়ি।

অনেকখানি জায়গা নিয়ে বেশ খোলামেলা বাংলো প্যাটার্নের বাড়িটা।

সামনে ফুলের বাগান।

তখন বরশুনী ফুলের সমা- নানা রং বেরংয়ের বরশুনী ফুলে বাগানটা যেন ঝলমল করছিল। গেটের সামনেই বড় রাস্তা।

ওখানে পৌঁছবার পর কটা দিন বেশ হৈ চৈ করেই কেটে গেল।

সেদিন সন্ধ্যার দিকে বাড়ির সামনে বারান্দায় দুটো বেতের আরাম কেদারায় বসে দুজনে পুরোনো দিনের গল্প করতে করতে চা পান করতে করতে, একটা দামী গাড়ি এসে বাড়ির সামনে দাঁড়াল। কেউ যেন তোমার কাছেই এলো মনে হচ্ছে নীরেন। বললাম আমি।

হুঁ। তাই তো মনে হচ্ছে—

সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকারে দেখা গেল একটি দীর্ঘ মূর্তি এগিয়ে আসছে গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকে, আমাদের সামনে এসে দাঁড়াতেই নীরেন তাকে সম্বোধন করে বললে, কি খবর মিঃ রক্ষিত?

চেয়ে দেখলাম ভদ্রলোকের বয়স চল্লিশ থেকে বেয়াল্লিশের মধ্যে।

লম্বা গড়ন।

অতীব সুশ্রী।

টকটকে গায়ের রং।

বাঙালীদের মধ্যে সচরাচর এমন চমৎকার সুশ্রী দেহ সৌষ্ঠব বড় একটা চোখে পড়ে না।

পরিধানে দামী ট্রপিক্যাল এ্যাসু কলারের সুট।

চোখে সোনার চশমা।

মিঃ রক্ষিত নীরেনের প্রশ্নে বললেন, দুদিন এখানে ছিলাম না—একটা কনট্রাকটের ব্যাপারে দিল্লী যেতে হয়েছিল। ডক্টর চক্রবর্তী, কালই ফিরেছি—ভানুমতীকে যেন কেমন মনে হচ্ছে—

নামটা কানে যেতেই যেন চমকে উঠি।

ভানুমতী।

এ যে আমার অত্যন্ত চেনা নাম।

তা ছাড়া সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়েছিল, ভানুমতীর মুখে শুনেছিলাম এই লক্ষ্ণৌ শহরেই তার পিতৃস্নেহ ছিল।

ভদ্রলোক ও রক্ষিত

ভানুমতীর বাবার নামটাও মনে ছিল, সঙ্গে সঙ্গে সে নামটাও মনে পড়ে গিয়েছিল। বিখ্যাত কনট্রাকটার বিনোদের রাক্ষিত।

ভদ্রলোকের মুখের দিকে চেয়েছিলাম।

নীরেন বলে, বসুন, দাঁড়িয়ে কেন মিঃ রক্ষিত।

মিঃ রক্ষিত সামনের খালি চেয়ারটার পরে বসলেন।

এর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই, আমার বন্ধু—ডাক্তার-প্রশান্ত চ্যাটার্জী—কলকাতায় প্র্যাকটিশ করে—

আর ইনি বড় বড় কনট্রাকটার, মিঃ রঞ্জন রক্ষিত। কনট্রাকটার ফার্ম রক্ষিত এণ্ড সন্সের ম্যানেজিং ডাইরেকটার।

নমস্কার।

হাত তুলে রঞ্জন রক্ষিতকে নমস্কার জানালাম।

নমস্কার।

প্রতিনমস্কার জানান রঞ্জন রক্ষিত।

নীরেন শুধায় ঐ সময়, কি বলছিলেন মিঃ রক্ষিত আপনার বোনের কথা?

আমার স্ত্রী বলছিল, রক্ষিত বলেন, গত বার বছর বাদে ওরই ক্রমশঃ যেন ভানু বোন ফিরিয়ে, আসছে। যেতেও চায় না। যাওয়ার ব্যাপারে যেন অত্যন্ত একটা বিতৃষ্ণা।

আর কিছুই যে করবার নেই সেতো আপনাকে আমি অনেক দিনই বলেছি মিঃ রক্ষিত।

জানি—তবু মন বোঝে না। জানেন তো ঐ একমাত্র বোন আমাদের—

ধনাঢ্য রাওের আর কোন সন্তানই নেই না?

না। বলছিলাম, একটু খেয়ে মিঃ রক্ষিত বলেন, যদি একবার সময় করে যেতেন।

বেশতো, চলুন—একটু অপেক্ষা করুন, আমি প্রস্তুত হয়ে আসি!

নীরেন বেশ বদলাতেই বোধহয় ভিতরে চলে গেল।

আমি যেমন বসেছিলাম তেমনি বসে রইলাম।

কিছুক্ষণ পরে নীরেন বেশ বদলে ফিরে এলো এবং রঞ্জন রক্ষিতের সঙ্গে তারই গাড়িতে বের হয়ে গেল।

রাত নটা নাগাদ রঞ্জন রক্ষিতের ড্রাইভার তারই গাড়িতে করে নীরেনকে পৌঁছে দিয়ে গেল।

আমি তখনো বাইরের বারান্দাতেই বসেছিলাম।

নীরেন এসে আমাকে ঐ ভাবে তখনো অন্ধকারে চুপ-চাপ বসে থাকতে দেখে শুধায়···এ কি রে—তুই তখন থেকে এখানেই বসে আছিস নাকি!

আমি সে কথার কোন জবাব না দিয়ে শুধোলাম,

ভানুমতীকে কেমন দেখলি বীরেন?

বীরেন বোকার মতো রঞ্জনের মুখের দিকে তাকায়, ভানুমতীকে তুই চিনিস নাকি?

পরিচয় হয়েছিল।

ভানুমতীর সঙ্গে?

হ্যাঁ—

কোথায়?

পুনায়।

হাঁ, হ্যাঁ—তুই তো মিলিটারী লাইনে ছিলি? কিন্তু কেমন করে তোর সঙ্গে তার পরিচয় হলো? ভানুমতীর অতীত ইতিহাসটা তুই জানিস কিনা জানি—কিন্তু ওর আত্মীয়রাও জানে কিনা জানিনা—কিন্তু কিছু কিছু ঐ রঞ্জন রক্ষিত—ওর ভাইয়ের মুখেই শুনেছি। বাপের অমতে মেয়েটি এক রাত্রে একটি অন্য জাতের ছেলেকে ভালবেসে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়—পালিয়ে যায়। তারপর দুই বছর বাদে পুনাতে একটা চলতি লাইনার সঙ্গে ভদ্রতে সেই ছেলেটি অর্থাৎ যার সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল, তার পাঁচ বছরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড হয়—

আর কিছু জানিস না!

হ্যাঁ—মেয়েটি মরফিন এ্যাডিকটেড্ হয়ে পড়েছিল।

কিন্তু কেন কি ভাবে এ্যাডিকটেড্ হয়েছিল জানিস কিছু?

না। তা অবিশ্যি জানিনা—ওর ভাইয়েরাও বলতে পারেনি!

আমি অনেক কিছু জানি?

সত্যি?

হ্যাঁ—

তবে আমাকে বল!

সংক্ষেপে তখন বালাজী রাও ও ভানুমতীর ইতিহাস আদি বলে সেলায়।

শুনতে শুনতে বীরেন যেন একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়।

এবং ইতিহাস শেষ হলে বলে, বিচিত্র? কতদিন আমি ভেবেছি কেমন করে মেয়েটি মরফিনে এ্যাডিকটেড্ হলো। এ্যাডিকশনের পিছনে যে এমন একটা মর্মন্তুদ ইতিহাস আছে কে জানত। Poor girl!

কিন্তু এখানে ভাইদের কাছে সে কতদিন আছে?

বেশী দিন নয় মাস সাত আট হবে। সেও এক বিচিত্র ঘটনা।

কি রকম?

যতদূর সংবাদ পাওয়া গিয়েছে মানে সংবাদ সংগ্রহ করা গিয়েছে, পুনাতে হোটেলে সেই দুর্ঘটনার পর থানা থেকে ভানুমতীকে ছেড়ে দেয়। ছাড়া পেয়ে ভানুমতী বোধ করি পুনা থেকে বোম্বাই যায়—কারণ বোম্বাইয়ের হোটেলে এবং নাইট ক্লাবগুলিতে মধ্যে মধ্যে ওকে দেখা গিয়েছিল মিলিটারী অফিসারদের সঙ্গে।

তারপর?

তারপর কিছুদিন পরে যুদ্ধ থেমে যায় এবং সম্ভবতঃ ভানুমতী দিল্লীতে চলে যায়। দিল্লীতেই একটা হোটেলে এক রাত্রে ভানুমতীকে এক পাঞ্জাবীর সঙ্গে বসে থাকতে দেখে চমকে ওঠে ওর ভাই রঞ্জন।

সত্যিই।

রঞ্জন কল্পনাও করতে পারে নি অতদিন পরে সে তার এক মাত্র বোন ভানুমতীকে ঐ হোটেলে দেখতে পাবে।

একটা কনট্রাকটের ব্যাপারে রঞ্জন একজন সরকারের বড় অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল সে রাত্রে ঐ হোটেলে ড্রিংক করতে।

দুজনে বসে ড্রিংক করছে ঐ সময় একজন মস্ত পাঞ্জাবী মিলিটারী অফিসারের হাতে হাত দিয়ে ভানুমতী এসে হোটেলের ঘরে ঢুকল।

এবং এসে বসালো তাদেরই পাশের টেবিলে।

হঠাৎ ভানুমতীর কণ্ঠস্বর কানে যেতেই চমকে তাকায় পাশের টেবিলে রঞ্জন।

কে? কে ও বসে?

চার বছর পরে দেখলেও বোনকে তার চিনতে কষ্ট হয় না।

ভানুমতীর সে সময়কার বেশ ভূষা, হাব ভাব—দেখে রঞ্জন মাথা নীচু করে গভীর লজ্জায়। এবং সেই খানেই বসে বসে সে স্থির করে যেমন করেই হোক ভানুমতীকে সে ঘরে নিয়ে যাবেই।

সতর্ক দৃষ্টি রাখে সর্বক্ষণ ভানুমতীর দিকে।

পাঞ্জাবী অফিসারটির সঙ্গে সে তখন ড্রিংক করছে।

যে অফিসারকে রঞ্জন কনট্রাকটের ব্যাপারে ড্রিংক দিতে

এসেছিলু হোটেলে এক সময় সে উঠে দাঁড়ায়।

রাত অনেক হলো মিঃ রক্ষিত চলুন যাওয়া যাক।

রঞ্জন তখন তাকে নীচে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে তুলে দিয়ে আবার হোটেলের ঘরে ফিরে আসে।

রাত প্রায় এগারটার পর ভানুমতী ও পাঞ্জাবী অফিসারটি উঠে দাঁড়ায়।

রঞ্জন ওদের পিছনে পিছনে চলে।

মিলিটারী অফিসারের সঙ্গে জীপ গাড়ি ছিল সেই গাড়িতেই ভানুমতীকে নিয়ে সে উঠে বসে।

রঞ্জনও নিজের গাড়িতে উঠে এবং ড্রাইভারকে আগের জীপ গাড়িটা অনুসরণ করতে বলে।

জীপটা এসে থামলো শিবাজী প্লেসে একটা বাড়ির সামনে।

সেখানেই ভানুমতীকে নামিয়ে দিয়ে মিলিটারী অফিসারটি ফিরে গেল।

দোতলা বাড়িটা।

কলিং বেল টিপতেই একজন ভৃত্য এসে দরজা খুলে দিল।

ভানুমতী গিয়ে ভিতরে প্রবেশ করল। দরজা আবার বন্ধ হয়ে গেল।

কয়েকটা মুহূর্ত রঞ্জন অপেক্ষা করে।

তারপরই এগিয়ে গিয়ে দরজার কলিংবেল টেপে।

ভৃত্য এসে দরজা খুলে দিল।

কাকে চাই!

ভানুমতী দেবী, এখানে থাকেন।

হ্যাঁ—লেকেন আজ তো দেখা হবে না সাহেব। মেম সাহেব রাত সাড়ে এগারটার পর আর কারো সঙ্গে দেখা করে না।

কিন্তু আমায় যে দেখা করতেই হবে—বলতে বলতে দুটো দশটাকার নোট পকেট থেকে বের করে এগিয়ে দেয় রঞ্জন ভৃত্যের দিকে।

তুমি একটু চেষ্টা করলেই হবে।

নোট দুটো পকেটে রেখে ভৃত্য বলে, একটু দাঁড়ান দেখি।

॥ এগারো ॥

একটু পরেই ভৃত্য ফিরে এল বলে, চলুন—

দোতলায় উঠে একটা সুসজ্জিত কক্ষে দাঁড়াল রঞ্জন রক্ষিত।

একটা সোফার মধ্যে গা ঢেলে দিয়ে বসে ছিল ভানুমতী।

সামনেই একটা টেবিলের পরে একটা সিরিঞ্জ ও একটা ভাঙ্গা ampoule।

ভানুমতী।

কে?

চোখ মেলে তাকাল ভানুমতী।

আমাকে চিনতে পারছিস ভানু? আমি দাদা—

দাদা! না—কেউ আমার নেই।

ভানু—

বলছি তো আমার নেই—get out, dont disturb me।

ভানু—

I say get out—

ভানু—

বাবদীন—চেঁচিয়ে ওঠে ভানুমতী।

রঞ্জন তৎক্ষণে এগিয়ে গিয়ে ভানুমতীর সামনে দাঁড়িয়েছে। কঠিন কণ্ঠে বোনের দিকে তাকিয়ে বলে, ওঠ ভানু আমি এখান থেকে তোকে নিয়ে যাবো।

টলতে টলতে উঠে দাঁড়ায়, না, না—না—

ভানু?

হাত বাড়িয়ে ভানুমতীর একটা হাত মুঠো করে চেপে ধরে রঞ্জন।

এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে ভানুমতী বলে, না—না—ছেড়ে দাও আমাকে—

না, ছাড়বো না।

শক্ত করে ধরে থাকে ভানুমতীর হাতটা রঞ্জন।

Let me go? Let me go—আমাকে যেতে দাও—হিস্টিরিগ্রস্তের মত হাতটা ঝাঁকি দিতে দিতে চেঁচাতে থাকে ভানুমতী।

ভানু—

যাবো না, আমি যাবো না—

রঞ্জনের হাতটা কামড়ে দেয় ভানুমতী।

একটা অস্ফুট যন্ত্রণাকাতর শব্দ করে হাতটা ছেড়ে দিয়েই রঞ্জন ভানুমতীর গালে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দেয়।

ভৃত্য চেঁচামেচিতে ছুটে এসে দাঁড়ায় ঘরের দরজায়।

ভানুমতী তখন চড় খেয়ে চেয়ারটার উপর বসে হাউ হাউ করে কাঁদতে শুরু করেছে।

ভৃত্যকে দেখে রঞ্জন বলে, তোমার কোন ভয় নেই—এ আমার বোন, মায়ের পেটের বোন—

আপনার বোন।

হ্যাঁ—এতদিন খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম একে, আজ ধরতে পেরেছি—

এবপ্রকার জোর করেই রঞ্জন দিল্লী থেকে ভানুমতীকে সঙ্গে নিয়ে আসে।

শুধু ঘরে শুনেছিলাম আমি নীরেনের কথা বললাম, তারপর ?

কিন্তু এখানে আসার পর হঠাৎ যেন কেমন শুরু হয়ে যায় ভানুমতী। দিনের বেলাটা অদ্ভুত শান্ত থাকে কিন্তু রাত বারটার পর থেকেই শুরু করে চেঁচামেচি। যাকে যা কিছু পায় ভেঙে চুরমার করে। ডাক্তারের রঞ্জনবাবু বোনের মানসিক রোগ ভেবে আমাকে একদিন বলে দেন। আমি গিয়ে সমস্ত ইতিহাস নিয়ে যা বুঝলাম—কেসটা মারাত্মক এডভেন্সড।

অনেক চেষ্টা করে ধীরে ধীরে ভাল করে আনছিলাম মেয়েটাকে কিন্তু—

কি ?

হঠাৎ সব ওলোট পালোট হয়ে গেল।

কেমন ?

ভেল থেকে বের হয়ে ভানুমতীকে খুঁজতে খুঁজতে এক রাতে বালাজী রাও এসে এখানে হাজির হলো।

বালাজী রাও তাহলে এখানে এসেছিল।

হ্যাঁ—

তারপর ?

বালাজী রাওকে দেখেই হঠাৎ ভানুমতী অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। সংবাদ পেয়ে ছুটে গেলাম।

তিন দিন অজ্ঞান অবস্থায় রইলো। তারপর জ্ঞান ফিরে এলো বটে কিন্তু—

কি থামলি কেন, বল ?

আজ সে পঙ্গু—শয্যাশায়ী—কথা পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছে—

হঠাৎ এরকম হলো কেন ?

জানি না, ডাক্তারী শাস্ত্র দিয়ে কোন মীমাংসাতেই আজ পর্যন্ত পৌঁছোতে পারিনি। আমরা ডাক্তাররা যে কতখানি helpless—ঐ ভানুমতীর ব্যাপারটা যেন মর্মে মর্মে আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে প্রশান্ত। ওও জানি—Slowly and slowly সে অবনতির দিকে চলেছে। কথা তো বলতে পারে না। তবে জ্ঞান পুরো মাত্রায়ই আছে। স্থির পাথরের মত দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে থাকে আর মধ্যে মধ্যে ঘরে কেউ ঢুকলে পায়ের শব্দে ফিরে তাকায়। আমার কি মনে হয় জান প্রশান্ত ?

কি ?

মনে হয় সে আজ বালাজীকে খুঁজছে! ও অজ্ঞান হবার দুদিন পরেই শুনেছি যে বালাজী এক রাতে হোটেলটা ছেড়ে কোথায় চলে গেল, আজো তার সন্ধান পাওয়া গেল না। তুই বলছে তাকে তুমি কলকাতায় দেখেছিলে ?

হ্যাঁ—

আর তার সঙ্গে পাওনি ?

না।

পরের দিনই নীরেনকে বললাম।

নীরেন।

কি ?

ভানুমতীকে একবার দেখতে পারি ?

বেশতো—রঞ্জনবাবুকে আমি টেলিফোন করে জানিয়ে দিচ্ছি।

বলাই বাহুল্য রঞ্জন রক্ষিত অমত করলে না এবং সেইদিনই সন্ধ্যায় নীরেনের সঙ্গে রঞ্জন রক্ষিতের বাড়ি গেলাম।

মিঃ রক্ষিত আমাদের যে ঘরে শয্যায় ভানুমতী শুয়েছিল সেই ঘরে নিয়ে গেলেন।

চমকে উঠলাম শয্যার দিকে তাকিয়ে।

ঐ কি সেই লাস্যময়ী যৌবনদৃপ্তা ভানুমতী।

শুধু যেন কংকাল একখানা শয্যার উপরে শুয়ে আছে।

কিন্তু চোখ দুটি।

চোখ দুটি আজো যেন তেমনি।

ভানুমতী আমার বুকের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে ছিল।

মৃদুকণ্ঠে ডাকলাম, ভানুমতী।

চেয়ে আছে ভানুমতী আমার বুকের দিকে।

চিনতে পারছো আমাকে ভানুমতী।

ভানুমতীর চোখের কোল বেয়ে বুকোটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

মাথায় ওর হাতটা রাখলাম।

আবার ডাকলাম, ভানুমতী।

চোখ বুজলো ভানুমতী।

আর বোজা চোখের বিনারা দিয়ে আরো বুকোটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

আর একটা দিনও লক্ষ্ণৌয় টিকতে পারলাম না যেন।

পরের দিন রাত্রের গাড়িতে উঠে বসলাম।

গাড়ি ছাড়লো।

লক্ষ্ণৌ ষ্টেশনের আলোক মালা অন্ধকারে ক্রমে ক্রমে মিলিয়ে গেল।

তারপর কতদিন কেটে গিয়েছে—ভানুমতীর খবর জানি না। আজো তৃষ্ণিত চোখ দুটি আমার রাস্তায় রাস্তায় বালাজী রাওকে খুঁজে বেড়ায়।

একটি পরিচিত বেহালার শব্দের জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকে।

— স ম্যা প্ত —

একটু আগেই ফোন এসেছিল—অনিমার ছোটো বোন শোনিমা—না, শোনিমা নয়, তার দু বছরের খুকী তনিমা আধবোলা টিকটিকি—তার ল্যাজের দিকটা—গিলে নীল হয়ে গেছে।

খবরটা শুনেই প্রাণকেষ্ট বলল 'টিকলে হয়'। তাকে বেশ একটু ভাবিতই দেখা গেল যেন।

'কেন, টিকটিকি গিললে কেউ বুঝি বাঁচে না?'

বোনঝির দুশ্চিন্তায় অনিমা নীল হয়ে যায় নিজেই।

'টিকটিকির কথাই বলছিলাম'। ভাষ্য করেছেন টীকাকার। 'বাঁচবে কি না সন্দেহ'।

সনির্বন্ধ অনুরোধ অবিজ্ঞাসত্তে ঠেলে গুরুতর কর্তব্যচ্যুতির দায়ে পড়ে, পাছে এক পারিবারিক অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায় সেই ভয়ে প্রাণকেষ্টকে তটস্থ থাকতে হয়। কখন তার দরজার কড়ায় কাঞ্জিলাল-বাবুর নাড়া আসে, সাড়া আসে, দয়া করে তিনি দেখা দিয়ে ধন্য করেন সেই আশায় সে উৎকর্ণ হয়ে থাকে।

অনিমার অন্তর্ধানের একটু পরেই কড়া নাড়ার আওয়াজটা এল। কড়ায়মতই এল। আর, কানে আসতেই সে দৌড়ে গেল দোর গোড়ায়। খুলল দরজাটা।

কিন্তু দরজাটা খুলেই সে দাঁড়িয়ে গেছে বিদ্যুৎ

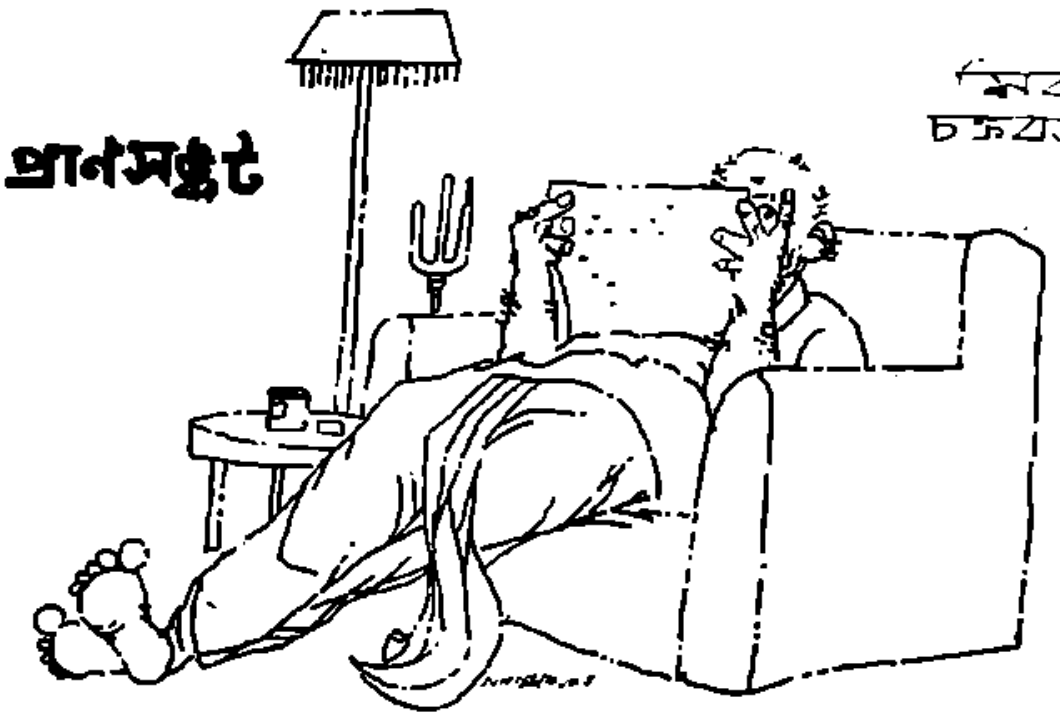

'দেখতে ছোলো মেয়েটাকে একবার। চললাম আমি। কাঞ্জিলালবাবু আসবেন জামা কাপড়ের মাপ নিতে। বলা রয়েছে তাঁকে। এক্ষুনিই এই সকালেই আসবার কথা। এলে তোমার গায়ের মাপটাপ দিয়ো—মাথা খাটিয়ে দেবে, বুঝলে? যাতে তিনি কাপড় চুরি করার ভাল না পান। আমার একটা ব্লাউজও দেবে, বুঝেছো? ছেঁড়া ব্লাউজটা। মনে থাকবে ত?'

প্রাণকেষ্টর মননশীলতার অনুর এক কৌটাও আস্থা নেই, তাই বার বার মনে করিয়ে দিতে হয়। এবং তার নিজের প্রতি নিজের আস্থাও ঐ অনুমাত্রাই, তাই ঐ স্পুটনিকের মতন। ভাগ্যিস, কড়াটা ছিলো। সেইটেকেই হাতলের মত পাকড়ে নিজেকে সামলেছে সে কোনোরকমে।

উনবিংশ শতকের পোষাক-দুরস্ত (এবং নিজেও উক্ত শতাব্দীর) কাঞ্জিলালের বদলে দেখা দিয়েছে বিংশ শতাব্দীর এক আধুনিকা—যাকে কিছুতেই বিংশতির বেশী বলে বোধ হয় না। দর্জীর দর্জির বদলে সোলাপী দোরেটার আঁটা মেয়েটিকে দেখে কাঞ্জিলালের সঙ্গে জড়িত অব্যবহিত কাজের কথাটা ভুলে যায় সে। তার হাতের তলায় হাতল কাঁপতে থাকে—টরে টক্কার মতই। সেই তারস্বরে কাঁপন তোলে তার মনে।

মেয়েটিই বুঝি ভুলিয়ে দেয়। মোলায়েম হেসে সে বলে—'বাবা এই তল্লাটেই আছেন। আমাকে আসতে বল্লেন এই বাড়িতে। আমাদের কলেজের ছুটি কিনা আজ। তাই বাবাকে আমি একটু সাহায্য করছি—তাঁর কিছু কিছু কাজ করে দিচ্ছি।'

কাজের কথায় কাঞ্জিলালের কথা তার মনে পড়ে। কিন্তু এমন মেয়ের দিকে চেয়ে জামার মাপ দেওয়ার কথা কি করে ভাবা যায়? গায়ে আঁটো সোয়েটারের উপর নজর পড়তেই সব কথা তার হারিয়ে যায়।—সমস্ত ভাবনা গায়েব হয়। এই অভাবনীয়ার হাতে আত্মসমর্পণ করে নিজের দেহের মাপ দেবার কথা সে ভাবতেই পারে না।

'বাবা এসে পড়বেন এক্ষুণি' মেয়েটি জানায়

'তুমি তাহলে ভেতরে এসে ব'সো না হয়?' একটু আমতা আমতা করেই সে আমন্ত্রণটা করে—'তাঁর আসা পর্যন্ত ততক্ষণ—কেমন?'

মেয়েটি ভেতরে আসে। প্রাণকেষ্টর মনে হয় যে মাপের সোয়েটার তার ঠিক খাপ খায় তার চাইতে দু সাইজের কম জামাই যেন সে গায়ে চড়িয়ে এসেছে। সোয়েটারের সেই চূড়ান্ত পরিণতির দিকে তাকানো যায় না।

অপরিচিতার সাথে আলাপ-বচনে কি করে এগুবে প্রাণকেষ্টর এখন সেই সমস্যা, কিন্তু মেয়েটি নিজেই যেন তার সমাধান করে। তাকের উপর থাকে থাকে পেয়ালা পিরিচগুলো দেখে সে উসকে ওঠে, 'বা, বেশ চমৎকার তো কাপগুলি। দুকাপ ওভ্যালটিন বানানো যাক্। কী বলেন?'

বলে প্রাণকেষ্টর বলার অপেক্ষা না রেখেই সে টেবিলের ধারে এগিয়ে হীটারটিকে জ্বালায়, জমাট দুধের টিন পাড়ে, চিনির বোতল নামায়। জলের কেটলী হীটারের ঘাড়ে চাপিয়ে ওভালটিনের কৌটোর দিকে হাত বাড়াতেই প্রাণকেষ্ট মৃদুস্বরে আপত্তি তোলে একটু, 'তোমার বাবা এলে পরে তখন করলে হোতো না?' বলতে যায় সে—'একেবারে তিন কাপ বানানো যেত এক সঙ্গে?'

বাঃ!···সবই তো মজুদ রয়েছে দেখছি!

'আবার করা যাবে বাবার। করতে কতক্ষণ?' জবাব দিয়েছে মেয়েটি: হীটার আছে, দুধ আছে, চিনি, ওভালটিন সবই তো মজুদ। সমস্তই রয়েছে দেখছি।'

তা আছে বটে। কিন্তু সেই সঙ্গে অনিমা ও রয়েছে। বোনঝির তাগিদ সেরে কখন সে এসে পড়ে ঠিক নেই—শোনিমাদের বাড়ী বেশী দূরে তো নয়। শোনালেই রক্ষে ছিল না, তার ওপরে এসে যদি নিজের চোখে দ্যাখে ওভালটিনের এই অপচয়—দুমূর্ল্য দুধ চিনি দিয়ে এই পরিচর্যা—পরের মেয়ের পরিতুষ্টি—মোটেই সে ভালো চোখে দেখবে না। অপরিচিতাদের উপর এমনিতেই তার বিষনজর কেন কে জানে, বিশেষ করে প্রাণকেষ্টর সঙ্গে যদি তাদের বিজড়িত দ্যাখে। তার উপরে এমন আঁটসাঁট শোয়েটারওয়ালীর প্রতি তার এই আঁটিসাঁটি যদি সে এসে দেখতে পায় তাহলে···না, প্রাণকেষ্ট সেকথা ভাবতে পারে না। ভাবতে প্রাণে কষ্ট পায়। তার বুকের ভিতরটা কিরকম করে। মেয়েটিকে দেখে মনের মধ্যে যে স্পন্দন জেগেছিল তাই

বুঝি তার হৃৎপঞ্জরে গড়ায়। বুক ধড়ফড় করে।

'তাহলেও তিনি আসুন না। এই তল্লাটেই আছেন বলছ তো, এসে পড়লেন বলে।' বলে প্রাণকেষ্ট আশা করে—তিনি আসার আগে তার নিকট তিনি এসে পড়বেন। এসে পড়ে সবদিক বাঁচাবেন—তার দিক, তাঁর নিজের দিক, এমন কি ঐ ওভ্যালটিনের দিকটাও।

'বাবার জন্যে আপনি ভাববেন না। ওভ্যালটিন তাঁর সয় না, তিনি বলেন, ও খেলে তাঁর গলা বুজে আসে, বক্তৃতার ভারী অসুবিধা হয় তাতে।'

কাঞ্জিলালের কাজ তো গায়ের মাপ নিয়ে বেড়ানো—বক্তৃতার স্থান তার কোন জায়গায় সে ভেবে পায় না। দর্জির কল ঠিক না চালালেও দর্জির কারখানা তিনি চালান। তাঁর নিজের কারখানা। কিন্তু দর্জিদের কাজ তো যন্ত্রিমাফিক, বক্তৃতার মধুর সুরে কিংবা উদাত্ত স্বরে প্রেরণা দিলে কতখানি সুরাহা হয়; তাদের হাত পা মানে, তাদের কলকবলিত জামা পায়জামার হাত পা কব্জুর এগোয় সেটা ভাববার কথাই।

প্রাণকেষ্ট ভাবে। কিন্তু মেয়েরা কখনো অভাবে থাকতে পারে না। সে এদিকে রেডিয়োটা খুলে দিয়েছে—

সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে, ফুলডোরে বাঁধা ঝুলনায়···ভুলো না···ভুলো না আ আ।···

প্রাণকেষ্ট নিজের চিত্তাসূত্র ধরে ঝুলছিল। সঙ্গীতের সূত্রপাতে তা ছিন্নভিন্ন হয়।

তপ্ত ওভালটিন সেয়ানায় পড়ে। মেয়েটি প্রাণকেষ্টর হাতে তুলে দেয়, নিজের মুখে তোলে।

দু চুমুক খাবার পর চমকে ওঠে প্রাণকেষ্ট—তরল পানীয় হঠাৎ যেন জমে তার গলায় গিয়ে আটকায়—অনিমাকে দেখা যায় আসতে। এই জমাটির মুখে, ঘরের মতই আসর।

'কেমন দেখলে তনুকে?' ঢোঁক গিলে সে বলে।

'ভালোই।' জবাব দেয় অনিমা—একটু ভুরু কুঁচকেই বুঝি: 'আস্ত আধখানা টিকটিকি গিলে চোখ মুখ কপালে উঠে গেছল। তারপর বমি করে ফেলতেই সেটা বেরিয়ে গেছে। মুখ চোখ ধুয়ে আবার বসে গেছে যেখানে যেমনটি ছিলো। যাক, এদিকে··· তোমার কব্জুর?'

তনুর কথার পর তন্বীর কথায় আসতে চায় অনু কি? সুতরাং কোনো জবাব দিতে পারে না প্রাণ। ওভালটিন যে বলবৃদ্ধিক্ষয় করে হাতে হাতে তার প্রমাণ পায়।

'আসবার পথে কাঞ্জিলাল-বাবুকে দেখলাম।' অনিমা প্রকাশ করে। 'আরেকটা বাড়ীতে যাচ্ছেন বললেন।'

'ও হ্যাঁ। কাঞ্জিলাল-বাবু। জামার মাপের জন্য আসবার কথা ছিলো বটে।' তাহলে আপনার দশা এখন কি মশাই প্রাণকেষ্টর মনে পড়ে তখন।

'বললেন সে এখানে এসে ডেকে ডেকে হদ্দ হয়ে গেছেন! দরজার কড়া নেড়ে নেড়ে হাত ব্যথা করে ফেলেছেন। সাড়া পাননি কারুর।'

বটে? তিনি এসেছিলেন তবে? কিন্তু তেমন তেমন কড়া আওয়াজও তার কানে এলো না, কানের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করে মর্মভেদী হোলো না—এই বা কেমন? এধারে অবশ্যি, মিনতি মাখা সুরে না ভোলার একটা আবেদন বাজছিল বটে, গানের সাড়ার

সঙ্গে প্রাণের টানাটা মিলে তার মনের পারাবার তোলপাড় করছিল—তাও ঠিক, কিন্তু এমন গীতি-নাট্যের মহড়ায় কড়া তদির এলেও সে টের পাবে না—অমন কড়াকড়ির কথাটা সে ভুলে যাবে, এই বা কেমন? এ কি কখনো হতে পারে?

জীবনের নানাবিধ রহস্যের মতই এও বুঝি আরেকটা। রহস্য ভেদে অসাধারণ প্রাণকেষ্ট অন্য কথা পাড়ে—নিজের এবং পরের কলিগ্রাফিটুকু—দুই পরিচয়ের মধ্যে পরিচয়-কাপনা করতে যায়—'আমার বৌ, শ্রীমতি কাঞ্জিলাল।'

মিলিসরে সে আওড়ায়।

শ্রীমতী কুমারীকে শ্রীমতী বলে পাচার করে অনিমার বিশ্রী মতির আঁচ থেকে যদি বাঁচা যায়! মেয়েটার বাঁকা সিঁথির মাঝে কোথাও সিঁদুরের রেখা আঁকা আছে কিনা তা কি তার বৌ তাকিয়ে দেখবে? দেখতে যাবে ভালো করে এই বাগের মাথায়? দুই (কি) মেল-গাড়ির ঠোকাঠুকি লাগার আগেই লাল নিশান দেখিয়ে কলিশান্ রোধা যায় যদি!

'বলুন শ্রীমতী কাঞ্জিলাল। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন।' মেয়েটি অনাবিল হেসে ওঠে: 'তারী খুশী হলাম আপনাকে দেখে। দাঁড়ান, আপনাকে এক পেয়ালা ওভালটিন্ বানিয়ে দি।' লাজিলাজি মুখে কেটলি থেকে গরম জল ঢালে: 'তবে কিছু মনে করবেন না। সত্যি সত্যি আমি ওঁর বৌ নই। উনি আমাকে নিয়ে ইয়ারকী করছেন।'

অনুর ভ্রূকুটিল কপালের ঈশান কোণে যে কালো মেঘের ছায়া দেখা দেছিল সেটারেখলা এখন তার সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ে। মুখর সেই ঘনঘটায় খালি চোখালো বিদ্যুৎই না, সেই সঙ্গে প্রাণকেষ্টর পিলেও বুঝি চমকাতে থাকে।

'আহা, একটু ভুল হচ্ছে তোমাদের,'—প্রাণকেষ্ট অনেক লেখকের মতো প্রুফের উপর ইমপ্রুভ্ করতে যায়—'ইনি—ইনিই আমার স্ত্রী। আর—' মেয়েটির দিকে তাকিয়ে—'আর তুমি—তুমি তো ভালোই জানো যে কাঞ্জিলালবাবুর মেয়ে তুমি।'

'মোটেই না, আমি কোনো কাঞ্জিলালের মেয়ে নই।' চোটপাট্ জবাব আসে শ্রীমতীর—'আমি কুমারী শর্মিলা সেন। শ্রীযুক্ত বিরূপাক্ষ সেন আমার বাবা। কাঞ্জিলাল কাঞ্জিলাল আনবেন না—আমাদের মধ্যে। এই পল্লীর থেকে আমার বাবা নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন—জানেন না? আমি তাঁকে সাহায্য করছি এই মাত্র। তাঁর হয়ে ক্যানভাস্ করছি এসে।'

'অ্যাঁ' আরেকখানা ক্যানভাস বুঝি প্রাণকেষ্টর মুখ পটে বিস্তৃত হয়। শাদাটে ক্যানভাস্।

'হ্যাঁ। বাবাও বেরিয়েছেন ক্যানভাসিংয়ে এই পাড়াতেই। আমাকে বললেন আটাশ নম্বর বাড়ীতে যাও। সেখানে খুব আদর পাবে।'

'সাতাশ নম্বর বাড়িতে যতটা আদর পেয়েছো ততটা তুমি সেখানে পাবে না। এ আমি দিব্যি গেলে বলতে পারি।' অনিমা বলে—মেয়েটির দিকে তীর্যক আর প্রাণকেষ্টর দিকে তীরবৎ দৃষ্টি হেনে।

'আটাশের বাড়ী? আহা, সে বাড়ী যে আমাদের ঠিক পাশেই গো।' প্রাণকেষ্ট এগিয়ে আসে—'আগে বলতে হয়। চলো, তোমাকে আমি দেখিয়ে দিয়ে বাড়ীটা।'

মেয়েটিকে নিয়ে সে এগোয়।

একটু চটপট যাও বাছা। এখানে তো ওভ্যালটিন বসিয়েছো।' অনিমা পেছন থেকে চেঁচায়, 'ওখানকার কেক বিস্কুট ফুরোবার আগে যদি যেতে পারো তবেই ভালো।'

'না, সে ভয় তোমার নেই।' যেতে যেতে প্রাণকেষ্ট জানায়-বিস্কুটের কারখানা ওদের। খাসা বিস্কুট—নামকাদা বিস্কুট সব। তোমার বাবা বলেছেন ঠিকই।' কুমারীর কানের কাছে সে ফিসফিস করে। অনিমার কুটকণ্ঠের বিষভাস্ত যতখানি বিস্কুটের পালিশ দিয়ে ঢাকা যায় সেই চেষ্টা ওর।

দরজার কাছে গিয়ে মেয়েটি ফিরে দাঁড়ায়। ক্যানভাসের ওপর তুলি বোলানোর মতই মোলায়েম আঁচড় কাটে: 'তাহলে আপনার দফা এখন কি মনাই?'

'সে আমি ম্যানেজ করবো।' মেয়েটির চোখের ওপর ওর চোখ পড়ে। কের ওর হাতের কাঁপুনি দরজার কড়ার কাঁপন তোলে, টরেটক্কার সুর বাজায়। ওর হৃৎপিণ্ডের তালে তালেই।

'তবে তোমরা যদি সত্যি সত্যি আমার ভোট চাও তাহলে আমার জন্য একটা অ্যাম্বুলেন্স পাঠিয়ো। নইলে খুব দস্তুর আমি হয়ত যেতে পারব না।

প্রাণের টান আর প্রাণ নিয়ে টানাটানি দুয়ের দ্বন্দ্বসমাসের মধ্যে পড়ে আরেক প্রাণান্তকর পর্বের জন্য সে প্রস্তুত হয়।

'ভাববেন না একটুও। সেই অ্যাম্বুলেন্সে নাস' হয়ে আমি আসবো, আপনার জন্যে। আসবো ঠিক, দেখবেন আপনি।'

ছবি

জরাসন্ধ

মুরারিপুকুর থেকে ফিরেই ভুবন একেবারে সোজা নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকেছিল। এর আগে যতবার গেছে, বেশ হাসিমুখ করে ফিরেছে। ওখানে কে কেমন আছে, তাই নিয়ে মায়ের সঙ্গে দুচারেটা কথাবার্তা বলে তারপর ঘরে ঢুকেছে জামা ছাড়তে। আজকের এই তফাৎটা সৌদামিনীর নজর এড়াল না। মনে মনে হাসলেন। টুলির সঙ্গে খুনসুড়ি-টুনি হয়ে থাকবে হয় তো। ঐ মেয়েটার উপরেই যে ছেলের মন পড়ে আছে, সেকথা তিনি জানেন। সেই জন্যেই কি মাসে দু একবার 'বরদা কাকার ওখান থেকে ঘুরে আসি' বলে বেরিয়ে পড়ে। ওরই মধ্যে একটু সাজ গোজ করে বেরোয়। বরদা কুণ্ডু ওঁদের আত্মীয় নয়, লতায় পাতায় জড়ানো একটা সম্পর্ক আছে, এই পর্যন্ত।

ছেলে বেরোচ্ছে না দেখে সৌদামিনী দরজার সামনে গিয়ে ডাকলেন, কী হল। এসেই শুয়ে পড়লি যে? শরীর খারাপ করেনি তো?

—না।

—ওরা সব কেমন আছে?

—ভালো।

—উঠে আয়। হাত মুখ ধুয়ে খেয়ে নে। রাত কম হয়নি; নটা বেজে গেছে।

—আমি খাবো না।

—কেন?

—খিদে নেই।

সৌদামিনী মনে করলেন ওরা নিশ্চয়ই মোটা রকম জলখাবার খাইয়ে দিয়েছে। ওদের নজর আছে ভুবনের দিকে। আগেকার দিন হলে অবশ্য বরদাকুণ্ডু তাদের ঘরে মেয়ে দিতে তিনবার ইতস্তত: করত। এখন আর সে কথা ওঠে না। জমি-জমা কাজ-কারবার সবই তো ওপারে ফেলে আসতে হয়েছে। তাছাড়া ছেলেও তাঁর ফেলনা নয়। মোটর ড্রাইভারি শিখে একশ পঁচিশ টাকা মাইনের চাকরি পেয়েছে। সরকারী লোন শিরে ধার্য্য গুঁজবার

জায়গা ও একটু করে নিয়েছে, তা বলতে গেলে, সহরের মধ্যেই। মেয়েটাকে যে সৌদামিনীর খুব পছন্দ তা নয়। একটু যেন বেশী বেশী করকর করে। কিন্তু কী করা যায়। ছেলের যখন মনে লেগেছে তার নিজের পছন্দ বা অপছন্দর কথা ওঠে না। তাছাড়া আজ কাল সব মেয়েই ঐ রকম। তাদের কাল কি আর আছে? পায়ের দিকে ছাড়া চাইবে না। সাত চড়ে রা করবে না—সে জাতের মেয়ে এখন পাবো কোথায়?

সৌদামিনী ঘরে ঢুকে ছেলের ছেড়ে ফেলা সার্ট, প্যাণ্ট আলনায় গুছিয়ে রাখতে রাখতে বললেন, 'খিদে নেই বলে একেবারে না খেয়ে থাকবি? দুখানা রুটি মুখে দিয়ে একটু জল খেয়ে তার পর শো।' ভুবন জবাব দিল না। দেয়ালের দিকে পাশ ফিরে পাশ-বালিশটাকে জড়িয়ে বেশ গোছগাছ করে শুল।

সৌদামিনী আর কথা বাড়ালেন না।

আসলে, ভুবনের তখন রীতিমত পেট জ্বলছে। কিন্তু তার চেয়েও বেশী জ্বলছে বুকের ভিতরটা। টুলির সেই কথাগুলো ঘুরে ফিরে তীক্ষ্ণ তীরের মত বিঁধছে। সেই বিশেষ খবরটা শোনাবার জন্যেই যেন তৈরী হয়ে বসে ছিল—"জানো! নরেশদার ছবি বেরিয়েছে কাগজে। দেখবে?" উত্তরের অপেক্ষা করেনি। উপরে পড়া বুলির জোয়ারে ছুটে গিয়ে ও ঘর থেকে নিয়ে এসেছিল একটা বাঁধানো খাতা; তার প্রথম পাতায় কত যত্ন করে লাগানো খবরের কাগজের পৃষ্ঠা থেকে কেটে নেওয়া একখানা ছবি—কোন্ এক 'মিতালি নাট্যসঙ্ঘের' 'শেষরক্ষা' অভিনয়ের একটি দৃশ্য। তিনজন অভিনেতা। তার মধ্যে কোনটা যে নরেশ ভুবন প্রথমে ঠাওর করতে পারল না। টুলিই দেখিয়ে দিল আঙুল দিয়ে। গর্ব-ভরে বলল, এই দ্যাখ, কী সুন্দর উঠেছে ছবিটা! তাই না?

—সখের থিয়েটারের ছবি! বেশ খানিকটা তাচ্ছিল্যের সুরে বলল ভুবন, 'আমি মনে করেছিলাম কী যেন।'

—'হলই বা সখের থিয়েটার? খবরের কাগজে ছবি বেরোন কি সোজা কথা নাকি! কজনের বেরোয়!'

'আরো দেখবে?'

পরের পাতায় ঐ মিতালি-সঙ্ঘেরই আর একটা কি অনুষ্ঠানের গ্রুপ ফটো। এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে নরেশ। 'নরেশদা বলেছে, আরো অনেক ছবি বেরোবে। বেরোলেই কাটিং এনে দেবে আমাকে।'—বাধা নেওয়া নেওয়া এই কথাগুলো যখন বলছিল টুলি, তার মুখের রেখা চোখের দীপ্তি, এবং কণ্ঠের সুরে যে ভাবটি ফুটে উঠেছিল তার একটি অর্থই করা যায়—খবরের কাগজে ছবি বেরোনর মধ্যে যে গৌরব, সেটা শুধু নরেশের নয়, তার এই সপ্তদশী ভক্তাটিও তার দম্ভে সম গরবিনী।

নরেশ যদি ঐ সময়ে ওখানে উপস্থিত থাকত, ভুবন কি করে বসত, বলা শক্ত। আপাততঃ যতটা সম্ভব বাক্য দ্বারা তাকে নস্যাৎ করে দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। সেই ভাবেই বলল, 'হুঃ, ভারি তো দুটো ছবি! ও রকম আকছার বেরোচ্ছে আজকাল। ইচ্ছে করলে সবাই দুচারখানা ছাপাতে পারে।'

—'পারে নাকি!' চোখে ও কপালে বিস্ময়ের কুঞ্চন তুলে হাসি হাসি মুখে বলেছিল টুলি 'বেশ তো চেষ্টা করে দ্যাখনা একবার?' বলেই আর দাঁড়ায়নি। খাতাটা বন্ধ করে দুহাতে বুকের উপর তুলে নিয়ে যৌবনোজ্জ্বল দেহে ভরঙ্গের দোলা দিয়ে চলে গিয়েছিল অন্য ঘরে। ভুবনের মনে হয়েছিল, যাবার সময় যেন এক তাল অবজ্ঞা ছুঁড়ে দিয়ে গেল তার মুখের উপর।

সকালে উঠে চা খেয়ে ভুবন কাজে বেরিয়ে গেল। কিন্তু মুরারিপুকুর 'দেশপ্রাণ কলোনীর' একখানি ছোট ঘরের একটি বিশেষ দৃশ্য তখনো তার মনের মধ্যে চেপে বসে আছে। ঐ নরেশ তার চির দিনের 'দুশমন;' 'শত্রু' বললে যেন সবটুকু বলা হয়না। ছেলেবেলা থেকে ওর কাছে সে শুধু হেরেই এসেছে। এক গ্রামের ছেলে একই ক্লাসে পড়ত। কিন্তু ভুবন পালের চেয়ে নরেশ সরকার সব পরীক্ষাতেই বেশ কয়েক ধাপ ওপরে। শম্ভুচরণের 'শাপের মন্তর' আগাগোড়া নির্ভুল আউড়ে দিত, ভুবন কিছুতেই পেরে উঠত না, উল্টো পাল্টা হয়ে যেত। ফলে পণ্ডিত মশায়ের কাছে নরেশের পাওনা ছিল পিঠ-চাপড়ানি, আর ওর কপালে জুটত কানমলা। পুরস্কার বিতরণী সভায় নরেশ সব চেয়ে ভালো আবৃত্তি করে প্রাইজ নিয়ে বাড়ি ফিরত। ভুবনের কাজ ছিল চেয়ার বেঞ্চি টানা,

সামিয়ানা খাটানো, আর 'প্রাইজ' বলতে হেডমাস্টার মশাই-এর মুখ ভেংচি।

এই টুলির সঙ্গে ভুবনের ভাব কি আজকের? এ পাড়া-ও পাড়া বাড়ি। কত বয়স তখন ওদের? নয় আর তেরো। অতটুকু মেয়ের কাই ফরমাস খেটে খেটে প্রাণান্ত। তালের ডোঙ্গায় চেপে 'ঝিনাইদহ' বিলের মাঝখান থেকে পাপলা ফুল তুলে আনতে হবে। কাশী বাড়ির পেয়ারা গাছের মগডালে চড়ে সব চেয়ে বড় পেয়ারাটা পাড়তে হবে, আর সারা গায়ে কাঁটার খোঁচা খেয়ে পাকা পাকা বেতফল সংগ্রহ করতে হবে বাড়ুয্যেদের ভুতুরে ভিটের বেত ঝোপের ভিতর থেকে। নুন আর লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে নতুন ধানির মধ্যে কেঁকে কেঁকে টুলিই সেগুলো জারাত এবং বড় ভাগটাই তুলে দিত তার হাতে। আপত্তি করলে 'খেলত নাও না? এত কষ্ট করে পেড়ে আনলে।' মাঝে মাঝে ওর ঠাকুরমার লুকোনো হাঁড়ি থেকে চুরি করে নিয়ে আদত কুলের আচার। কী মিষ্টি খেতে। কিন্তু তার চেয়েও মিষ্টি লাগত ওকে।

একদিন ঠাকুর মশাইদের বুড়ো বটগাছের তলায় সেই ঝোকরটার মধ্যে গায়ে গায়ে বসে ওরা কুলের আচার খাচ্ছিল। কদিন আগে ধুমধাম করে বাড়ুয্যে বাড়ির বড় মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। সেই সব দৃশ্য বোধহয় দুজনারই চোখের উপর ভাসছিল। খেতে খেতে ভুবন হঠাৎ বলে উঠল, 'তোতে আমাতে বিয়ে হবে। কেমন টুলি?'

ওর গায়ে একটা ঠেলা মেরে টুলি বলল, '

—'যাঃ কেন?'

—'বারে, লজ্জা করে না বুঝি?'

বরের পাশে জড়সড় হয়ে দাঁড়ানো সেফালিদির সেই ঘোমটা ঢেকা লজ্জা-রঙীন আনত মুখখানাই বোধহয় ওর মনের মধ্যে আনাগোনা করছিল।

সেদিনটা কি কারণে ছুটি ছিল। সকালের দিকে টুলিদের বাড়ি গিয়ে দেখে, সে ভীষণ ব্যস্ত। সামনে একখানা খোলা বই, আর হাতের কাছে একটা কাঁসার বাটির মধ্যে কতগুলো টুকরা টুকরা কাগজ ভিজছে। ও সেই দিকে গম্ভীর ভাবে তাকিয়ে আছে। ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে ভুবন জিজ্ঞাসা করল, ওগুলো কিরে?

—'জলছবি।'

—'কোথায় পেলি?'

—'নরেশদা দিয়েছে। এই এত-তো'—দুখানা হাত অনেকটা ফাঁক করে দেখাল টুলি, 'ওর ছোটমামা আছে কোলকাতায়। সে নিয়ে এসেছে। ন্যাখনা, কী সুন্দর!'

ভুবনের এ সব ভালো লাগল না। জলছবি না হাই তার যদি অমনি একটা ছোটমামা থাকত কোলকাতায় কলেজে পড়া—সে এর চেয়ে অনেক ভালো ভালো জিনিস এনে তাক লাগিয়ে দিতে পারত টুলিকে। আপাততঃ যখন সে সম্ভাবনা নেই, যে প্লান নিয়ে এসেছিল, সেইটাই বেশ লোভনীয় করে তুলে ধরল। বোসেদের খিড়কির পুকুরে কলকোপের আড়ালে বসে ছিপ দিয়ে পুঁটি মাছ ধরা। ওদের গোয়াল ঘরের চাল থেকে একখানা বোলতার চাকও ভেঙে এনেছিল। কাপড়ের আড়াল থেকে তুলে দেখাল। হাতে দুজায়গায় হুল ফুটিয়ে দিয়েছে বোলতাগুলো, তাও জানিয়ে দিল ঐ সঙ্গে। এই মাছ ধরার ব্যাপারে ভীষণ উৎসাহ টুলির। রুপোর মত চকচকে চওড়া চওড়া পুঁটিগুলো যখন ছিপের টানে ছটফট করতে করতে জল থেকে উঠে আসে, তার খুশি আর ধরেনা। মাছগুলো সে-ই খুলে নিয়ে খালুইতে রেখে দেয়। টোপ গেঁথে দেয় বশীর ভগায়।

আজ সেই সব কিছু যেন কানেই তুলল না। বোলতার কামড়ে ভুবনের হাতটা বেশ ফুলে উঠেছিল। সেদিকেও একবার ফিরে তাকাল না। বারেকবার তাড়া দিতেই পাকা গিন্নীর মত বলল, 'বাপরে! আমার কি এখন মরবার ফুরসত আছে? এই এতগুলো ছবি তুলতে হবে দেখছ না? পারলে হয়। ছিঁড়ে টিঁড়ে গেলে নরেশদা এসে বকবে।'

ভুবন বিরস মুখে উঠে চলে গেল। রাস্তায় পড়ে বোলতার চাকখানা কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ছড়িয়ে ফেলল। আর একবার হার হল নরেশের কাছে।

মনিব লোহার কারবার করেন! ভোর সকালে তাকে ভবানীপুর থেকে মানিকতলার কারখানায় পৌঁছে দিতে সমস্ত পথটা ভুবন সেই পুরনো দিনের মধ্যেই ডুবে

বইল। মনে মনে সংকল্প করল, এবার সে কিছুতেই হার মানবে না। টুলিকে না পেলে তার জীবন ব্যর্থ। তার বাবার কাছে গিয়ে প্রার্থী হয়ে দাঁড়ালে হয়তো তিনি বিমুখ করবেন না। কিন্তু সে পাওয়ায় সুখ নেই। ওরই কাছে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হবে। দেখাতে হবে, ঐ থিয়েটার-ওয়ালা নরেশের চাইতে সে কোন অংশে ছোট নয়। টুলি সেদিন তাকে প্রকারান্তে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দিয়েছে। সে চ্যালেঞ্জ সে গ্রহণ করল। কাগজে ছবি বেরোনই যদি কৃতিত্বের মাপকাটি হয়, ভুবন দেখিয়ে দেবে সেখানেও সে পিছনে পড়ে নেই।

একখানা নাম করা কাগজের বিজ্ঞাপন বিভাগে একটি কর্মীর সঙ্গে ভুবনের পরিচয় ছিল। পাড়ার এক ফটোগ্রাফারের স্টুডিও থেকে ছবি তুলিয়ে নিয়ে তার সঙ্গে দেখা করল। সে জানাতে চাইল, উপলক্ষ্যটা কী খালি খালি তো আর কারো ছবি ছাপা যায় না। ভুবন বোকাল, উপলক্ষ্য কিছু নয়। তোমরা যেমন টাকা নিয়ে বিজ্ঞাপন ছাপ, তেমনি ছবি ছাপবে। নিচে লেখা থাকবে—প্রসিদ্ধ লৌহ-ব্যবসায়ী বৃন্দাবন চন্দ্র সাহা এণ্ড কোম্পানীর সুযোগ্য মোটর ড্রাইভার শ্রীভুবন মোহন-পাল। খরচ পত্তর যা লাগে, দেবো।

বন্ধুটি হেসেই অস্থির বলল, 'না ভাই, এখানে ও সব চলবে না। অন্য কোনো ছোটখাট কাগজ ধ্যাখ।'

তাই করল ভুবন। অপেক্ষাকৃত কম-নামী কাগজের দ্বারস্থ হল। কেউ রাজী হল না। সকলের এককথা—ছবি ছাপাতে হলে একটা কিছু করা চাই। একজন ওকে পোটাকয়েক প্রশ্ন করে প্রস্তাব করল, 'এক কাজ করুন, 'হারান—প্রাপ্তি—নিরুদ্দেশ' কলামে একটা বিজ্ঞাপন দিন। তার সঙ্গে ছবি চলতে পারে।'

—'সেটা কী জিনিস?' জানতে চাইল ভুবন।

—'আপনার নাম কি?'

—'ভুবন মোহন পাল।'

—লিখুন,—'ভুবন পাল নামক বাইশ-তেইশ বৎসরের একটি যুবক বাড়ি হইতে না বলিয়া চলিয়া গিয়াছে। কেহ সন্ধান দিতে পারিলে নগদ একশত টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। এই সঙ্গে তাহার ফটো দেওয়া হইল। চার্জ পড়বে—'

চার্জ শুনবার জন্যে ভুবন আর অপেক্ষা করল না।

তাহলে এবারেও কি তাকে হার মানতে হবে—সেই চিরশত্রু নরেশ সরকারের কাছে? টুলির আশার জলাঞ্জলি দিয়ে নীরবে হটে আসতে হবে? মাঝে মাঝে মনে হয়, ওর এই বদখেয়ালের কাছে নতিস্বীকার করতে হবে, এই বা কেমন কথা? কাগজে যাদের ছবি বেরোয় না তারা কি মানুষ নয়? কিন্তু এ যুক্তি বেশীক্ষণ টেঁকে না। সেই গর্বোৎফুল্ল চোখদুটি মনে পড়ে—কী একাগ্র হয়ে চেয়ে আছে ফটোগুলোর দিকে! এর পরে নিজের একটা ছবির কাটিং না নিয়ে তার কাছে গিয়ে মুখ দেখাবে কেমন করে?

সৌদামিনী লক্ষ্য করছিলেন, কিছুদিন থেকে ছেলে যেন সব সময়েই মন মরা হয়ে থাকে। হাসে না, কথাবার্তা বলে না, পেট ভরে খায় না। দুটি ছোট ছোট বাচ্চা আছে বাসায়, ওঁর বিধবা বড় মেয়ের ছেলেমেয়ে। আগে নিয়ে হৈ চৈ করত, এখন ফিরেও দেখে না।

একদিন সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরতেই বললেন ছেলেকে—'তোর কী হয়েছে, বলতো?'

—'কী হবে?'

—'কুণ্ডু মশাইদের বাসায় গিয়েছিলি এর মধ্যে?'

—'না।'

—'তাহলে কালই একবার ঘুরে আয়। অনেকদিন থেকে খবর নেই।'

—'তারাও তো একবার খবর নিতে আসে না।'

—'কী যে বলিস! ওখানে খবর নেবার মত আছে কে? ঐ বুড়ো মানুষ আসবে নাকি এতটা পথ ট্যাং ট্যাং করতে করতে!'

আর বলতে হল না। পরদিন বিকেলেই বেরিয়ে পড়ল ভুবন। একটা নতুন আশা জাগল মনে—এতদিনে নিশ্চয়ই সেই ছবির ভূতটা ওর মাথা থেকে নেমে গেছে। মেয়েমানুষের ঝোঁক তো। বাঁধভাঙা বন্যার মত। যেমন বেগে আসে, চলেও যায় তেমনি তাড়াতাড়ি।

ঘুরারি পুকুরে পৌঁছে মনে হল, না এলেই বোধহয় ছিল ভালো। এবার শুধু ছবি নয়, যার ছবি সে-ই সশরীরে আসর জাঁকিয়ে বসে আছে। সামনে টেবিলের

উপর আরেকখানা কাটিং। বোঝা গেল ঐ নিয়েই এতক্ষণ আলোচনা চলছিল। কুণ্ডুদম্পতি এবং তার স্ত্রীও উপস্থিত। দুজনেই খুব তারিফ করলেন—ছবির এবং 'ছবিওয়ালার'। তাদের কন্যাটির মুখ দেখে মনে হল, 'নরেশদার' পরে এবার বোধহয় কেটে পড়বে। নরেশ একথা ও কথার পর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল 'কী রে, ছবি টবি উঠল নাকি কোনোখানে?' অর্থাৎ, তার প্রসঙ্গও বাদ পড়েনি। হয়তো সেদিন যা সে বলেছিল,

—দুই—

বৃন্দাবনবাবুর বাড়ি সে রাস্তায় তারই মোড়ের কাছে একজন উপমন্ত্রী থাকেন। তাঁর ড্রাইভার প্রায়ই আসত ভুবনের কাছে এবং একটানা দুঃখের কাহিনী বলে যেত—মন্ত্রীদের ড্রাইভারী করবার মত ঝঞ্ঝাটি কিছু নেই; শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা বাদল—বারোমাস মফঃস্বল। আজ মাকড়দহ, কাল আরামবাগ। শুধু সহর বন্দরে হলেও কথা ছিল না। দূর দূর গ্রামে চলে যেতে হয়। ফিরতে

'হারান—প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ' কলামে একটা বিজ্ঞাপন দিন। তার সঙ্গে ।

তাই নিয়েই দুজনের মধ্যে বেশ খানিকটা হাসাহাসিও হয়ে গেছে।

নরেশ একটু পরেই উঠে পড়েছিল। ভুবন আরো কিছুক্ষণ বসে যাবে এইটাই ওরা আশা করেছিলেন কুণ্ডু দম্পতি সেটা প্রকাশও করেছিলেন। কিন্তু সে আর বসতে পারেনি। একটিবার টুলির সেই হাসিহাসি মুখখানার দিকে চেয়ে আজকের হারটা যেন আরো তীব্র ভাবে লেগেছিল তার বুকে।

কখনো বেলা দুটো আর সে কি রাস্তা! কোনদিন যে কোন পগারে বেঘোরে প্রাণটা যাবে, না কালীই জানেন।

সেদিনও এই সব কথা হচ্ছিল। ভুবন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, তোমার মনিবের তো দেখি হরদম ছবি বেরোয় কাগজে।

—'তা বেরোবেনা?' বিরক্তি প্রকাশ করল ড্রাইভার 'মিটিংএ বক্তৃতা করতে উঠলেন, তো দুদিক থেকে তেড়ে

ওল ক্যামেরা। যত সব!'

—'তুমি কেন ছবি তোলাও না ঐ সঙ্গে?'

—'আমি? দূর, ছবি দিয়ে কী হবে? আর তাছাড়া আমার ছবি ওরা তুলবেই বা কেন?'

—'তবু যদি বল একবার মন্ত্রী মশাইকে?'

—'কেপেছ?'

ভুবনের উপর তার মনিব খুশী ছিলেন না। ইদানিং যে সে গাড়ি চালাতে চালাতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে, সেটা তাঁর লক্ষ্য এড়ায়নি। কয়েকবার সাবধান করে দিয়েছেন। একদিন তো অ্যাকসিডেন্ট হতে হতে অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছিল গাড়িটা। সুতরাং সে গিয়ে যখন চাকরি ছেড়ে দেবার প্রস্তাব করল, সাহা মশাই বিশেষ আপত্তি করলেন না। ওরেই একজন ভালো লোক যোগাড় করে দিতে বললেন। লোক তো হাতের মধ্যেই ছিল। মন্ত্রীর ড্রাইভারকে বলতেই সে রাজী হয়ে গেল। ভুবনের শর্ত ছিল মন্ত্রীর কারটি তাকে পাইয়ে দেওয়া। সেদিকেও কোনো অসুবিধা হল না। তিনিও এই আনস্মার্ট লোকটাকে নিয়ে বিরক্ত হয়ে পড়েছিলেন। ভুবনের আগ্রহ দেখে এবং রীতিমত টেস্ট ইত্যাদির পর খুশী হয়ে তাকেই নিয়ে নিলেন। বৃন্দাবনবাবুরও মন্ত্রীর ড্রাইভারটিকে পছন্দ হল।

মন্ত্রীর সঙ্গে মফস্বলে গিয়ে ভুবন প্রায়ই দেখে ক্যামেরাম্যানদের ভীড় আগেই পৌঁছে গেছে। কিন্তু ছবি তোলার সুযোগ হয় না। ফটো তো বাইরে নেওয়া হলনা, হয় প্যাণ্ডেল বা হল-এর মধ্যে, মন্ত্রী যখন বক্তৃতা করতে ওঠেন। সেখানে গণ্যমান্যরাই তাঁকে ঘিরে থাকে। ভুবনের মত লোকেদের প্রবেশাধিকার নেই।

একদিন হঠাৎ সুযোগ জুটে গেল। বক্তৃতার শেষে চা পার্টির আয়োজন করেছেন উদ্যোক্তরা। তারপরে একটা গ্রুপ ফটো নেবারও ব্যবস্থা আছে। ভুবন তাকে আগে আছে, ঠিক সময়ে লাইনে গিয়ে মিশে যাবে। অনেক লোকই সেই সুবিধা খুঁজছিল। এক ফাঁকে সেও তাদের দলে ভিড়ে গেল। একটু পাশের দিকে পড়ে গেল। তা আর কি করা যায়! ফটোগ্রাফাররা এসে ক্যামেরা ফিট করল। কালো ঘেরা টোপের মধ্যে বার দুই আসা যাওয়া করল। তারপর 'রেডি'? বলে খুলে ধরল মুখের ঢাকনা। ভুবনের মনে হল, এতবড় সাফল্য তার জীবনে আর আসেনি।

সন্ধ্যার মুখে বাড়ি ফিরেই ছুটে গেল মুরারিপুকুর। মন্ত্রীর গাড়ি চালার এ খবর আগেই জানিয়ে দিয়েছিল। এবার নিয়ে গেল আসল খবর। টুলি অন্য কি সব বিষয় নিয়ে কথা বলছিল। তার মাঝখানেই ভুবন বেশ খানিকটা গর্বের সঙ্গে বলে ফেলল, 'কাল কিংবা পরশু দিনের দৈনিক কাগজগুলো একবার দেখো।'

—'কেন? কী আছে তার মধ্যে?'

—'বিশেষ কিছু না। এমনিই একবার দেখো।'

—'ছবি বেরোচ্ছে নাকি তোমার?' সাগ্রহে জানতে চাইল টুলি। ভুবন তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, 'কী করবো? মন্ত্রীর টি পার্টি। লোকগুলো শুনলো না। জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল ক্যামেরার সামনে।'

টুলির মুখখানা খুশিতে ঝলমল করে উঠল। বলল, 'কোন কাগজে বেরোবে?

—'ধুস্সার, আনন্দবাজার এই সব বড় বড় কাগজে থাকবে নিশ্চয়ই।'

কিন্তু টি-পার্টির ছবি যখন বেরোল কাগজখানা হাতে করে বসে পড়ল ভুবন। মন্ত্রীর ডাইনে বাঁয়ে জন কয়েক করে লোক রেখে বাকী সব কাটা! টুলির কাছ থেকে আরেকবার অপদস্থ করবার জন্যেই যেন একযোগে ষড়যন্ত্র করেছে কাগজওয়ালারা।

কিন্তু হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। ভুবন এবারে ঠিক করল, তার মনিব যখন বক্তৃতা মঞ্চে মাইকের সামনে গিয়ে দাঁড়াবেন, তখন কোনো ফাঁকে তাঁর কাছে চলে যেতে হবে। কিন্তু ব্যাপারটা সহজ নয়। ভলাণ্টিয়ারের দল অত্যন্ত সজাগ। সর্বদা পথ আগলে থাকে। একদিন দেখল মন্ত্রী তাঁর এটাচি কেসটা গাড়িতে রেখে গেছেন। সেটা হাতে করে মঞ্চের পিছনে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। পরদার ফাঁক দিয়ে যেমনি দেখল, ফটোগ্রাফার এগিয়ে আসছে, ভয়ানক ব্যস্তভাবে ভলাণ্টিয়ারদের কাছে গিয়ে বলল, এটা উনি ভুল করে গাড়িতে ফেলে গেছেন, হয়তো কোনো দরকারি কাগজ পত্তর আছে।

মন্ত্রী বক্তৃতা করতে উঠেছিলেন। হঠাৎ সেখানে ড্রাইভারকে দেখে ভ্রূকুঞ্চিত করে তাকালেন। ভুবন

চামড়ার ব্যাগটা এগিয়ে ধরতেই ধমক দিয়ে উঠলেন, 'এটা তোমাকে কে আনতে বললে এখানে? যাও। যেখানে ছিল রেখে দাওগে।'

ফটোগ্রাফার বাধা পেয়ে আগেই হাত বাড়িয়ে নিয়েছিল।

সেদিন ভাগ্যে যে আরো দুর্দশা লেখা ছিল, সেটা তখনো বুঝতে পারেনি ভুবন। বুঝল, গাড়িতে ফিরে। বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়াতে হয়েছিল প্লাটফরমের পিছনে। সেই ফাঁকে হেডলাইট দুটো উধাও হয়ে গেছে এবং চাকার পাশে যে ঢাকনি লাগানো থাকে তারও চার-খানার মধ্যে তিনখানা নেই। তাকিয়েই মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। অন্ধকার রাত। অনেকখানি পথ। তার মধ্যে বেশ কিছুটা খানাখন্দ ভরা গ্রামের রাস্তা।

মন্ত্রী এসে সব দেখলেন এবং শুনলেন, কিন্তু ড্রাইভারকে কিছুই বললেন না। সভার উদ্যোক্তারা কোত্থেকে একটা মাত্র হেডলাইট নিয়ে এসে লাগিয়ে দিল। একচক্ষু বাহনটিকে অতি সাবধানে চালিয়ে বাড়ি ফিরতেই মন্ত্রীমশাই প্রথম মুখ খুললেন। গাড়ি থেকে নামতে নামতে বললেন, কাল থেকে তোমাকে আর দরকার নেই। এ কদিনের মাইনেটা ওবাসের পয়লা তারিখে এসে নিয়ে যেও।

ভুবনকে এবার বেশ কিছুদিন বাইরে বেরোতে দেখা গেল না। কিন্তু ঘরে বসে থাকলে সংসার শুনবে কেন? ছোট বড় মিলিয়ে পাঁচ পাঁচটি পেট। ঐ একজনের উপর নির্ভর অথচ চাকরি তো চাইলেই পাওয়া যায় না। ড্রাইভার বাবুরা কেউ কেউ পরামর্শ দিল, 'ট্যাকসি মালিকদের ঘর। ঘাটতে পারলে রোজগারও ভালো।' ভুবনের মনে মনে এই লাইনের উপর বরাবর একটা বিতৃষ্ণা ছিল। 'ট্যাক্সিওয়ালা' কথাটার মধ্যেই কেমন যেন একটা অবজ্ঞার গন্ধ জড়ানো আছে। যেখানে সেখানে যার তার হাতের ইংগিতে থেমে যাওয়া—সেও যেন মানুষের সাধারণ মর্যাদায় বাধে। বাড়ির গাড়ি যে চালায়, তার মনিব একজন বা একটা পরিবার, আর ট্যাকসি চালকের মনিব রাম শ্যাম যদু মধু সকলেই। এমন কি চৌরঙ্গীর মোড়ে ছেঁড়া পাজামা পরা ভিখারী ছেলেগুলো যখন প্যাসেঞ্জার-দের কাছ থেকে বখশিসের আশায় 'এই, ট্যাকসি' বলে হাঁক দেয়, তার মধ্যেও যেন একটা হুকুমের সুর বেজে ওঠে।

তবু ভুবনকে শেষ পর্যন্ত ট্যাকসির চাকরিই নিতে হল।

সেদিনটা বোধ হয় চৈত্র সংক্রান্তি। এলোমেলো উতলা বাতাস। হাওড়া স্টেশন থেকে প্যাসেঞ্জার নিয়ে ভুবন চলেছিল বালিগঞ্জের দিকে। একটি সুবেশ তরুণের পাশে লুবুধা তরুণী। সম্ভবতঃ সদ্যবিবাহিত স্বামী-স্ত্রী। একটা ধার ঘেঁষে যেন হয়ে বসেছিল তারা ভুবন পিছন ফিরে তাকায়নি। তবু মাঝে মাঝে ভেসে আসা দুটো একটা টুকরো কথা, একটুখানি চাপা হাসি, চুড়ির ঠুনঠুন, শাসন-ভরা মৃদুকণ্ঠ, তার সংগে দুইএর কড়া গন্ধ (সম্ভবতঃ নেয়েটির খোঁপায় জড়ানো মালা থেকে) সব মিলিয়ে তাকে যেন কোন মায়ালোকে নিয়ে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল, পিছনের আসনে যারা বসে আছে, তারা যে দুটি অপরিচিত নরনারী, একথা সত্য

হোম সিনেমা প্রজেক্টর

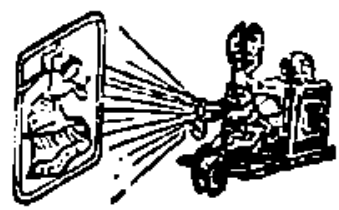

নিজের বাড়ীতে বসে যথার্থ সিনেমা দেখবার আনন্দ উপভোগ করুন। ৪" বা ইলেকট্রিকসিটি উভয়ের সাহায্যেই চালানো যায়। ৩৫ মিলিমিটার ফিল্ম, যা সিনেমায় ব্যবহার করা হয়, এতেও তা ব্যবহার করা যেতে থাকে। এতে স্ক্রীনের ওপর উজ্জ্বল কোকাস প্রতিফলিত হয়। পূর্ণালম্ব ছবির আকার ৪' × ৪ ফিট। নানা রংয়ের ছবি এতে স্বয়ংক্রিয় ভাবেই চলে ফেরা ও অভিনয় করে থাকে। প্রতিটি প্রোজেক্টরের সংগে ১০ গজ ফিল্ম ও সচিত্র নিয়মাবলী বিনামূল্যে দেওয়া হয়। মূল্য—১৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা, ভি, পি, চার্জ—৪ টাকা ৫০ নয়া পয়সা। স্পেশাল (ডি লুক্স) কোয়ালিটি অতিরিক্ত ফিল্ম—প্রতি গজ ৫০ নয়া পয়সা, স্ক্রীন—৩ টাকা। অগ্রিম ৫ টাকা অবশ্য প্রেরণীয়।

TECHNICAL STORES

117/592, PANDU NAGAR, KANPUR.

নয়, তাদের একজন সে নিজে, আরেকটি তার অনেক দিনের চেনা।

ওদের পৌঁছে দিয়ে ভবানীপুরে মল্লিকের গ্যারেজে গাড়ি ঢুকিয়ে দরজাগুলো বন্ধ করতে যাবে, হঠাৎ চোখে পড়ল পেছনের সীটে হেলান দিয়ে রাখা একটা মাঝারি সাইজের সুটকেস। লাগেজ ক্যারিয়ারে যে মাল ছিল, সেসব দেখে শুনে নামিয়ে নিতে ত্রুটি হয়নি। ভুলে গিয়েছিল শুধু নিজেদের চোখের সামনে সাবধানে রাখা আসল জিনিসটি। এমনিই হয়। ভুবনের দৃঢ় বিশ্বাস হল, ওর মধ্যে পরমা আছে। সঙ্গে সঙ্গে তার মনের কোণে জেগে উঠল লোভের কালো ছায়া—এই উদ্বৃত্তির গ্লানি থেকে মুক্তির আশ্বাস নিয়ে এসেছে ঐ বাক্সটা। পরক্ষণেই চোখের উপর ভেসে উঠল মেয়েটির সেই ক্ষণিকের দেখা মুখখানা। তখনই উঠে পড়ল গাড়িতে।

বাড়িটা মনে ছিল। সামনে গিয়ে হর্ণ দিতেই দরজা খুলে গেল এবং হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল একদল উদ্বেগ-চকল মেয়ে-পুরুষ। সেই তরুণটি এগিয়ে এসেছিল। ভুবন দরজা খুলে সুটকেসটা তার দিকে বাড়িয়ে ধরতেই সকলে সমস্বরে আনন্দ কলরব করে উঠল। ভিড়ের একপাশে মেয়েটিও এসে দাঁড়িয়েছিল। ভুবনের হঠাৎ মনে হল, সে নয়, হাসি চাঁদি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে টুলি।

বাড়ির কর্তা—সম্ভবতঃ বন্ধুটির শ্বশুর—দুখানা দশটাকার নোট তুলে নিয়ে বললেন, 'তুমি যে উপকার করলে টাকা দিয়ে তার দাম দেওয়া যায় না। তবু ছেলেপিলেদের জন্যে এই সামান্য—'

'মাপ করবেন' হাত জোড় করে বলল ভুবন। 'আপনারা খুশী হয়েছেন, সেইটাই আমার সব চেয়ে বড় পুরস্কার'।

"ও কখনো টাকা নেয়? দেখছ না, বাঙালী ভদ্দর-লোকের ছেলে"—বলতে বলতে একটি বর্ষিয়সী মহিলা, বোধহয় বাড়ির গৃহিণী, সামনে এগিয়ে এলেন। অনুনয়ের সুরে বললেন, "একবারটি ভিতরে আসতে হবে বাবা। একটুখানি মিষ্টিমুখ করে না গেলে, আমাদের মন মানছে না।"

এ অনুরোধ ভুবন এড়াতে পারল না।

জলযোগের পর সেই ছেলেটি এসে বলল, 'আপনার একটা ছবি নেবো।' ভুবন কিছু বলবার আগেই কর্তা ওদের থেকে যোগ করলেন, 'ছবিটা আর তার সঙ্গে একটা রিপোর্ট' কালই যুগান্তর অফিসে পাঠিয়ে দিস। বাবুকে আমার নাম করে বলিস যেন পরশুকার কাগজেই বেরোয়।'

ভুবন হঠাৎ এমন অভিভূত হয়ে পড়েছিল যে কোনো কথাই বলতে পারল না। তবে কি এতদিন পরে তার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন সত্যিই সফল হতে চলেছে? আজ কার মুখ দেখে ভোর হয়েছিল।

যখন তারা বিদায় দিলেন, তখন বেশ রাত হয়েছে। একটু আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। কাঁকা রাস্তা তার উপরে মন যে সুরে বিচরণ করছিল, গাড়ির বেগ কোথায় উঠল, একেবারেই খেয়াল ছিল না। হঠাৎ সামনে পড়ল একটা ভিখারী বুড়ী, যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে এসে দাঁড়াল একেবারে বামপাশের গা ঘেঁষে। দুর্দম বেগের মুখে সহসা পাশ কাটাতে গিয়ে তীব্র যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল এঞ্জিনটা। তারপর কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল ভুবন জানে না।

লোকজন এসে দেখল, একটা ল্যাম্প পোস্টের গায়ে আছড়ে পড়ে গাড়ির সামনেটা তালগোল পাকিয়ে গেছে। স্টিয়ারিং হুইলের ডাণ্ডাটা সোজা বিঁধে গেছে ড্রাইভারের বুকে।

অতবড় অ্যাকসিডেন্ট। বিস্তারিত বর্ণনার পাশে ভাঙা গাড়ি এবং নিহত ড্রাইভারের ছবিটাও পরের দিনের সবগুলো বড় বড় কাগজে ছাপা হল। কাঁচের টুকরো লেগে মুখটা দুতিন জায়গায় কেটে গিয়েছিল। তাহলেও টুলি মিস্ত্রীই চিনতে পেরেছে।

কোরিয়া যুদ্ধের পটভূমিকা

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ হইতে এশিয়া মহাদেশ মুক্তিলাভ করিলেও আজ পর্যন্ত (১৯৬২) কোথাও উহার জীবন সুস্থ, সুন্দর ও স্বাভাবিক হইতে পারে নাই। দীর্ঘ পরাধীনতাজনিত নানা গ্লানি যেমন এশিয়ার সমাজ-অভ্যন্তরে জমিয়া উঠিয়াছিল, তেমনি বৈদেশিক শক্তিপুঞ্জের চক্রান্ত ও বিরোধিতা (প্রকাশ্য কিম্বা চাপা) আজও চলিতেছে। ইহার অন্যতম প্রধান কারণ পশ্চিমী শক্তিপুঞ্জের এবং বিশেষভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিজমের আতঙ্ক। এই আতঙ্কের জন্য বছরের পর বছর যেমন ঠাণ্ডা লড়াই চলিতেছে, তেমনি গত ১৯৫০ সাল হইতে নানা স্থানে অতি তীব্র সংঘাত, এমন কি 'গরম লড়াইয়ের'ও মহড়া হইয়াছে। পূর্ব বা পূর্বপ্রান্তিক এশিয়ার কোরিয়া, ফরমোজা, জাপান ইত্যাদি ইহার দৃষ্টান্ত।

১৯১০-৪৩ সাল পর্যন্ত কোরিয়া যে দুঃখের দ্বারা ক্ষতবিক্ষত ও সর্বনাশগ্রস্ত হইয়াছে, তার জন্য একমাত্র দায়ী ঠাণ্ডা লড়াই। বহুতের বিরোধের জন্য একটি নিরপরাধ জাতি কি ভাবে বিপর্যস্ত হইতে পারে তারও দৃষ্টান্তস্থল কোরিয়া। এই পর্বতবহুল উপ-দ্বীপটি এশিয়ার একেবারে উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত। মানচিত্রের দিকে তাকাইলে মনে হইবে উত্তর-পূর্ব এশিয়া যেন কোরিয়ার মারফৎ জাপানের দিকে বন্দুক দেখাইতেছে! প্রকৃতপক্ষে চারি হাজার বছরের দীর্ঘ ইতিহাসসম্পন্ন কোরিয়া বহু দিন জাপানীদের অত্যাচার সহ্য করিয়াছে। বর্তমানে সমগ্র কোরিয়ার (উত্তর ও দক্ষিণসহ) লোক-সংখ্যা প্রায় ৩ কোটি ৩০ লক্ষ। কোরিয়ানরা কিম্বা কোরীয় জনগণ একটি অখণ্ড জাতি ও অখণ্ড দেশের অধিকারী এবং তারা এক ভাষা-ভাষী। কিন্তু অতীতের চৈনিক, রুশ ও জাপানী সাম্রাজ্যবাদ এই ক্ষুদ্র দেশটির উপর প্রভূত আধিপত্য বিস্তার ও অত্যাচার করিয়াছে। ১৯০৪-৫ সালের রুশ-জাপান যুদ্ধে পোর্ট আর্থার বন্দরের সংগ্রাম এশিয়াতে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছিল বটে, কিন্তু উহার মূল কারণ ছিল কোরিয়ার দখলদারির প্রশ্ন। সেই ঐতিহাসিক যুদ্ধে জয়ী ও গর্বিত জাপান কোরিয়া দখল করিয়া লইল। রাশিয়া উহা মানিয়া লইল এবং ১৯১০ সাল হইতে উহা জাপানী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। কিন্তু ১৯৪৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাপ-সাম্রাজ্যবাদের পতনের পর কোরীয় জনগণ একটি ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু গোড়াতেই মহাযুদ্ধের অংশীদারগণের জন্য তাহা ভণ্ডুল হইল। কারণ, ১৯৪৫ সালের জুলাই মাসে পটসডাম সম্মেলনে কোরিয়াকে ৩৮নং অক্ষরেখায় দ্বিখণ্ডিত করিয়া উহা সোভিয়েট রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দখলদারির মধ্যে ভাগ করিবার প্রস্তাব হইল। ১৯৪৫ সালের ১০ই আগস্ট সোভিয়েট সৈন্য উত্তর কোরিয়ায় প্রবেশ করিল এবং ৯০ লক্ষ অধিবাসী সহ ৪৮,৪৩৮ বর্গ মাইল দখল করিল। এবং আমেরিকান সৈন্যেরা দক্ষিণ কোরিয়া (আয়তন ৩৬,১৬০ বর্গ মাইল, জনসংখ্যা ২ কোটি ১০ লক্ষ) অধিকার করিল।

তারপর হইতে কোরিয়া রুশ-মার্কিন ঠাণ্ডা লড়াইতে জড়াইয়া পড়িল। ফলে, ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার জন-প্রতিনিধিগণ (একমাত্র সীংম্যান্ রী'র দল ছাড়া) পিয়ংইয়ংএ একত্র হইয়া অখণ্ড দেশ ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের যে সঙ্কল্প গ্রহণ করিল, তাহা ব্যর্থ হইল, যেমন উহার আগে ১৯৪৬ ও ১৯৪৭ সালে রুশ-মার্কিন জয়েন্ট কমিশনের চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়াছিল এবং এই সমস্ত ব্যর্থতার মূলে ছিল মার্কিন এবং 'জাতীয়তাবাদী প্রবীণ নেতা' ডাঃ সীংম্যান রী'র উস্কানি ও অপচেষ্টা।

১৯৪৮ সালের ডিসেম্বরে রুশ সৈন্যরা উত্তর কোরিয়া ছাড়িয়া চলিয়া গেল এবং পরের বছর গ্রীষ্মকালে আমেরিকানরাও দক্ষিণ কোরিয়া ছাড়িয়া চলিয়া গেল বটে, তবে সেখানে একটি 'মিলিটারি মিশন' রাখিয়া

গেল। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়া সম্পূর্ণ ভাবেই কোরিয়া ত্যাগ করিল। ইতিমধ্যে উত্তর কোরিয়ার কিম ইল সুঙয়ের নেতৃত্বে একটি কমিউনিস্ট গভর্ণমেণ্ট এবং দক্ষিণ কোরিয়ার সীংম্যান রীর নেতৃত্বে একটি প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তাবাদী সরকার প্রতিষ্ঠিত হইল। ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদ দক্ষিণ কোরিয়াকে স্বীকৃতি দানের জন্য সুপারিশ করিল। বলা বাহুল্য যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ কোরিয়াকে এবং সোভিয়েট রাশিয়া উত্তর কোরিয়াকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিল। ইউরোপে দ্বিখণ্ডিত জার্মানীর মত এশিয়ায় দ্বিখণ্ডিত কোরিয়ার দুই অংশেও তীব্র ও তিক্ত মত বিরোধ এবং সংঘাত দেখা দিল। এবং উভয়েই সমগ্র দেশের উপর ঐকাবদ্ধ সার্বভৌম রাষ্ট্রের দাবী জানাইল। এ ভাবে প্রতিদিন উভয়ের মধ্যে ঝগড়া বাড়িয়া চলিল এবং ১৯৫০ সালের গোড়াতেই ৩৮ নং অক্ষরেখার সীমান্তে এমন সমস্ত ঘটনা ও সংঘর্ষের সূত্রপাত হইল যে, সমগ্র অবস্থা অত্যন্ত উত্তেজনাজনক হইয়া পড়িল। অবশেষে সত্য সত্যই ২৫শে জুন (১৯৫০) ভোর রাত্রে হঠাৎ দ্বিখণ্ডিত কোরিয়ার কৃত্রিম সীমানা লঙ্ঘন করিয়া উত্তর অংশের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ সুরু হইল এবং উত্তর কোরীয় সৈন্যগণ দ্রুতবেগে দক্ষিণ কোরিয়ায় ঢুকিয়া পড়িল।

বলা বাহুল্য যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া আসিল এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের সিকিউরিটি কাউন্সিলের এক বৈঠক আহূত হইল। এই বৈঠকে সিকিউরিটি কাউন্সিল উত্তর কোরিয়ার প্রতি অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ করিবার এবং ৩৮ নং অক্ষরেখার সমস্ত সৈন্য প্রত্যাহার করিয়া আনিবার এবং এই প্রস্তাব কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে সমস্ত ইউ-এন সদস্যকে সাহায্য করিবার জন্য দাবী জানাইল। ২৭শে জুন সিকিউরিটি কাউন্সিলের পুনরধিবেশনে উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে 'Police Action' বা পুলিশী অভিযান গ্রহণের সিদ্ধান্ত হইল। কারণ, সে দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণকারী এবং এই আক্রমণকারীকে প্রতিরোধ ও দক্ষিণ কোরিয়াকে সাহায্যদানপূর্বক এই অঞ্চলের আন্তর্জাতিক শান্তি ও শৃঙ্খলারক্ষা করার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের সমস্ত সদস্যের নিকট আবেদন করা হইল। প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নৌ ও বিমানবহরকে তৎক্ষণাৎ রণক্ষেত্রে যাইবার এবং ৭নং মার্কিণ নৌবহরকে ফরমোজা দ্বীপ রক্ষার উদ্দেশ্যে চীনা সমুদ্রে চৌকি দেওয়ার জন্য হুকুম দিলেন। কিন্তু স্মরণে রাখা দরকার যে, রাষ্ট্রসঙ্ঘের সিকিউরিটি কাউন্সিলের প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইবার সুযোগ ঘটিয়াছিল একন্য যে, সোভিয়েট রাশিয়া এই সময় বৈঠকে অনুপস্থিত ছিল। কমিউনিস্ট চীনকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্যপদের বাহিরে রাখার প্রতিবাদে রাশিয়া তখন 'নিরাপত্তা পরিষদে'র বৈঠকগুলি বর্জন করিয়াছিল।

যদিও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে রাষ্ট্রসঙ্ঘের পক্ষ হইতে উত্তর কোরিয়াকে 'Aggressor' বা আক্রমণকারী বলিয়া ঘোষণা করা হইল এবং যদিও ভারত সরকারসহ পৃথিবীর অধিকাংশ গভর্ণমেণ্ট সোজাসুজি এই সিদ্ধান্ত মানিয়া লইল। তথাপি পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট ব্লক ছাড়াও অনেকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই। বরং দক্ষিণ কোরিয়ার সীংম্যান রীর চক্র এবং তার পিছনে মার্কিণ উস্কানিই যে প্ররোচনা দিয়াছে এবং উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে সীমান্তে প্রথম আক্রমণ ঘটাইয়াছে—এই মাইনরিটি অভিমতও জোরের সহিত ধ্বনিত হইয়াছে। যদিও প্রধানমন্ত্রী নেহরু সোজাসুজি উত্তর কোরিয়াকেই দোষী সাব্যস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে বোধহয় তিনি তাঁর ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং রাষ্ট্রসঙ্ঘের অন্যান্য সদস্যের মত ভারত সরকার কোরিয়ার যুদ্ধে কোন সৈন্য পাঠায় নাই, যুদ্ধের স্বপক্ষে কোন সহায়তা দেয় নাই, বরং যুদ্ধবিরতি ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রভূত সহায়তা করিয়াছে।

কোরিয়া যুদ্ধের ঘটনাবলীর (যাহা নিয়া আলাদা একটি সুবৃহৎ গ্রন্থ লেখা যাইতে পারে) এখানে বিস্তৃত আলোচনা ও বিশ্লেষণ সম্ভব নয়. যদি সম্ভব হইত, তবে দেখানো যাইত যে, ২৫শে জুনের আগে কি ভাবে এই শোচনীয় যুদ্ধের জন্য পটভূমিকা তৈয়ার করা হইয়াছে। কি ভাবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে 'ট্রুম্যান ডক্‌ট্রিন' (প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের মতবাদ ও নীতি) এশিয়ায় কমিউনিজম এবং শান্তি ও স্বাধীনতার বিরুদ্ধে নূতন করিয়া প্রয়োগ করা হইল এবং নেপথ্যে কারা এই ধ্বংসযজ্ঞের জন্য সমিধ আহরণ করিয়া রাখিয়াছিল, এই

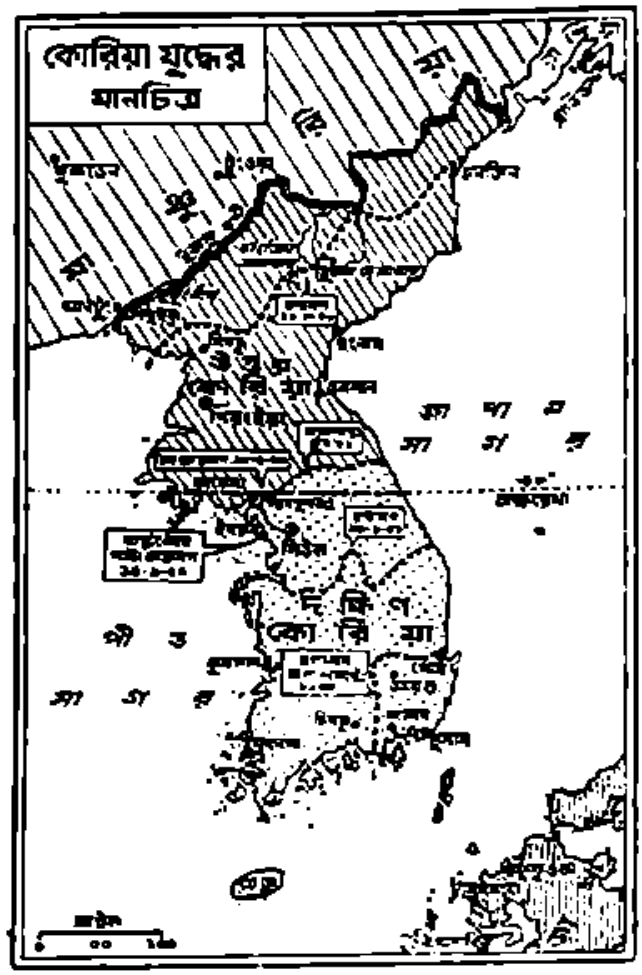

সম্পর্কে খাস মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতেও অনেক তথ্য প্রকাশ করা হইয়াছে. যদিও সেগুলি আমাদের দেশে তেমন পরিচিত নয়। আন্তর্জাতিক রাজনীতি-বিশারদ জনৈক মার্কিণ অধ্যাপক একখানি তথ্যবহুল গ্রন্থে* কোরিয়া যুদ্ধের পটভূমিকার উপর প্রচুর আলোকপাত করিয়াছেন। এই সম্পর্কে খুব সংক্ষেপে আভাস দিয়া বলা যাইতে পারে যে, ১৯৫০ সালের বসন্তকালে জেনারেল ম্যাক-আর্থার, জেনারেল চিয়াংকাইসেক ও ডাঃ সীংম্যান রী—এই তিন মূর্তির ত্রাহস্পর্শ যোগ ঘটিল প্রশান্ত মহাসমুদ্রের উপরে। এই ত্রি-মূর্তির সঙ্গে আসিয়া হাত মিলাইলেন ট্রুম্যানের "রিপাব্লিকান পরামর্শদাতা" জন ফস্টার ডালেস, যিনি প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের আমলের পররাষ্ট্রনীতিতে স্থনামধন্য হইয়াছিলেন। টোকিও বা জাপানের সর্বময় মার্কিণ প্রশাসক জেনারেল ম্যাক-আর্থার আগেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, এশিয়াতে একটা 'কঠোরদণ্ড নীতি' (a tough policy in Asia) অনুকরণ করিতে হইবে। জুন মাসে ডালেস সাহেব আসিয়া হাজির হইলেন দক্ষিণ কোরিয়ার। ৩৮নং অক্ষরেখা হইতে সামরিক অফিসারদের সঙ্গে দূরবীণ দিয়া 'লাল উত্তর কোরিয়া'র দিকে তাকাইলেন এবং তার-পর গেলেন টোকিওতে। সেখানে ম্যাক-আর্থার, জনসন ও ব্রাডলি—এই তিন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে সলাপরামর্শ হইল। ইহার আগে সীমান্ত পরিদর্শনের পর ডালেসের মুখ দিয়া বাহির হইল – 'positive action was impending' অর্থাৎ 'সক্রিয় পন্থা আসন্ন'। আর টোকিওতে ম্যাক আর্থারের দপ্তর সম্বন্ধে এই মনোভাবই দেখা দিল যে, দক্ষিণ কোরীয়গণই যুদ্ধ সুরু করিয়াছে। খ্যাতনামা মার্কিণ সাংবাদিক জন গন্থার তখন টোকিওতে ম্যাক-আর্থারের সঙ্গে ছিলেন। তিনি বলিতেছেন যে, একজন বিশিষ্ট অফিসারকে হঠাৎ টেলিফোনে ডাকা হইল এবং তিনি ফিরিয়া আসিয়া কানের কাছে ফিস ফিস করিয়া বলিলেন :

'A big story has just broken. The South Koreans have attacked North Korea.' অর্থাৎ এইমাত্র খুব বড় খবর পাওয়া গেল। দক্ষিণ কোরিয়া উত্তর কোরিয়াকে আক্রমণ করিয়াছে।†

সুতরাং কোরিয়া যুদ্ধ আরম্ভের জন্য কারা মূলতঃ দায়ী ও দোষী, তাহা নিরপেক্ষ বিচারে স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

যদিও পশ্চিমী প্রচারকার্যে জোর গলায় বলা হইয়াছে যে, উত্তর কোরিয়া কর্তৃক দক্ষিণ কোরিয়া আক্রমণে সোভিয়েট রাশিয়াই প্রকৃত উস্কানি ও উৎসাহদাতা এবং

*অধ্যাপক ডঃ ডি, এফ, ফ্লেমিং প্রণীত "The Cold War" নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে কোরিয়া যুদ্ধ সংক্রান্ত অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

† পূর্বোক্ত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

উত্তর কোরিয়ার পক্ষাবলম্বনে আসলে রাশিয়া এই যুদ্ধে ঢালাইতেছে, তথাপি একথা নিঃসন্দেহ যে, সোভিয়েট রাশিয়া এই যুদ্ধে কোন অংশ গ্রহণ করে নাই। এবং ১৯৫০ সালের জুলাই মাসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু কোরিয়ার যুদ্ধ বিরতি ও শান্তি প্রতিষ্ঠার আবেদন জানাইয়া যখন সোভিয়েট নায়ক মঃ স্টালিনের নিকট চিঠি পাঠান, তখন স্টালিন শান্তির স্বপক্ষে জবাব দেন, কিন্তু মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব শান্তি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। দুই রাষ্ট্রের বিপরীত মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক বৈষম্যও এখানে।

এই 'অনাবশ্যক যুদ্ধে' যাহা প্রকৃতপক্ষে হতভাগ্য কোরিয়ানদের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইল, তিন বছর ধরিয়া তার ধ্বংস তাণ্ডব চলিল। যদিও উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে এবং দক্ষিণ কোরিয়ার স্বপক্ষে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নাম করিয়া এই যুদ্ধ পরিচালিত হইল, তথাপি কার্যতঃ ইহা ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ। জাপানের 'মার্কিন অভিভাবক' জেনারেল ডগলাস ম্যাক আর্থার এই সৈন্যবাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন। কোরিয়ার এই যুদ্ধকে তিনটি প্রধান পর্যায়ে ভাগ করা যাইতে পারে :

প্রথমতঃ উত্তর কোরীয় সৈন্যদল কর্তৃক অতি দ্রুত দক্ষিণ কোরিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ এবং দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিওল দখল (২৯শে জুন), তারপর মার্কিন ও অন্যান্য সহযোগী রাষ্ট্র সৈন্য কর্তৃক উত্তর কোরীয় বাহিনীর অগ্রগতি রোধ এবং ১৫ই সেপ্টেম্বর ইনচন্ বন্দরে মার্কিন নৌ-সৈন্য দলের সাফল্য ও কৃতিত্বপূর্ণ অবতরণের দ্বারা যুদ্ধের গতি পরিবর্তন এবং উত্তর দিকে অভিযান। ২০শে অক্টোবর উত্তর কোরিয়ার রাজধানী পিয়ঙ্ ইয়ংয়ের পতন এবং মার্কিন সপ্তম বাহিনী কর্তৃক উত্তর কোরিয়ার সীমান্তবর্তী ইয়ালু নদী পার হইয়া মাঞ্চুরিয়ার সীমানায় পৌঁছানো।

দ্বিতীয়: চীন সরকার কর্তৃক সাবধানবাণী উচ্চারণ এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের সৈন্যবাহিনীকে ৩৮নং অক্ষরেখা পার হইয়া উত্তর দিকের অভিযানে নিষেধকরণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক সেই নিষেধ উপেক্ষা এবং ২৬শে নভেম্বর ২ লক্ষ চীনা "স্বেচ্ছাসৈন্য" কর্তৃক প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণ, মার্কিন ও রাষ্ট্রসঙ্ঘের সৈন্যদলের বিপর্যয় এবং উত্তরাঞ্চল হইতে দ্রুত পশ্চাদপসরণ (২৪শে ডিসেম্বর), দুর্দম চীনা বাহিনী কর্তৃক বন্যার বেগে অগ্রগতি, ৩৮নং অক্ষরেখা অতিক্রম এবং দক্ষিণ কোরিয়ার ৭০ মাইল অভ্যন্তরে প্রবেশ। রাষ্ট্রসঙ্ঘের জেনারেল এসেম্বলী কর্তৃক চীনকে 'আক্রমণকারী' বলিয়া ঘোষণা, রাষ্ট্রসঙ্ঘ বাহিনী কর্তৃক চীনা সৈন্যদের বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ এবং ৩৮নং অক্ষরেখার ওপারে চীনা বাহিনীর পশ্চাদপসরণ—৩রা এপ্রিল। ২২শে হইতে ৩০শে এপ্রিল (১৯৫১) ৬ লক্ষ চীনা সৈন্যের নূতন পাল্টা আক্রমণে রণক্ষেত্রে অচল অবস্থার উদ্ভব।

তৃতীয়তঃ, প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান কর্তৃক জেনারেল ম্যাক আর্থারের পদচ্যুতি—১১ই এপ্রিল, ১৯৫১। এবং ৩৮নং অক্ষরেখা বরাবর যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব উত্থাপন, ১০ই জুলাই ১৯৫১, কিন্তু আলোচনায় অচল অবস্থার সৃষ্টি।

২৭শে জুলাই, ১৯৫৩। কোরিয়ার যুদ্ধ বিরতির চুক্তি স্বাক্ষর ও যুদ্ধের অবসান।

তিন বছরের এই যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে মোট ৫৭ লক্ষ ২০ হাজার লোক কোরিয়ায় প্রেরিত হইয়াছিল। তার মধ্যে ২৮ লক্ষ ৩৪ হাজার স্থলসৈন্য, ১১ লক্ষ ৭৭ হাজার নৌবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত, ৪ লক্ষ ২৪ হাজার নৌ-সৈন্য, ১২ লক্ষ ৮৪ হাজার বিমানবহরের ও বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত, ৩৩,৬২৯ জন মার্কিন সৈন্য রণক্ষেত্রে নিহত, ২০৬১৭ জন মৃত (নানাভাবে), ১০,৩২,৮৪ জন আহত, অর্থাৎ মার্কিন পক্ষে মোট হতাহত ১,৪১,৪৩০ জন।

দক্ষিণ কোরিয়ার হতাহতের সংখ্যা (সামরিক) ছিল ১৩,১২,৮০৬ জন এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের অন্যান্য বাহিনীর (বৃটিশ ইত্যাদি) ১৭,২৩০— অর্থাৎ রাষ্ট্রসঙ্ঘের পক্ষীয় সকল দলের মোট হতাহতের সংখ্যা ১৪,৭৪,২৬৯ জন। হতাহত ও বন্দী লইয়া অপর পক্ষ (উত্তর কোরিয়া ও চীন) ১৫,৩০,০০০ সৈন্য হারাইয়াছিল। কিন্তু হিসাবটি এখানেই সম্পূর্ণ নহে। কারণ, আরও উল্লেখ করা দরকার এই যে, যুদ্ধ-ক্ষেত্রের মোট হতাহতের সংখ্যা ৩০ লক্ষেরও অধিক। ইহার মধ্যে দক্ষিণ কোরিয়ার মৃতের সংখ্যা ৪,১৫,০০৪ জন

এবং উত্তর কোরিয়া ও চীনের আরও অনেক বেশী।

ইহার সংগে সামরিক (উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া উভয়ের) হতাহতের সংখ্যা যোগ দিলে কোরিয়া যুদ্ধের মোট হতাহতের সংখ্যা দাঁড়াইবে প্রায় ৫০ লক্ষ। ইহার মধ্যে প্রায় ২০ লক্ষই প্রাণ হারাইয়াছিল। আর সেই সংগে ধন-সম্পত্তির ক্ষতির কথা উল্লেখ করিয়া বলা যায় যে, উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্যন্ত সমগ্র কোরিয়া ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছিল।

কোরিয়া যুদ্ধের এক বীভৎস দৃশ্য

কোরিয়া যুদ্ধের এই ট্রাজিডির জন্য মূলতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এবং বিশেষভাবে জেনারেল ম্যাক আর্থারের গোয়ার্তুমি, অবাধ্যতা, দাম্ভিকতা ও কমিউনিস্ট বিদ্বেষই দায়ী—যদিও সামরিক ও নৈতিক দিক হইতে শেষ পর্যন্ত কমিউনিস্ট পক্ষই জয়ী হইয়াছিল।

বহু নাটকীয় এবং অতি নাটকীয় ঘটনার সমাবেশ হইয়াছিল কোরিয়ার যুদ্ধে। জেনারেল ম্যাক আর্থার বার বার হুমকি দিয়াছিলেন যে, তিনি ইয়ালু নদী পার হইয়া মাঞ্চুরিয়ায় চীনাদের ঘাঁটির উপর বোমা ফেলিবেন এবং নৌ ও বিমানবহরের দ্বারা চীনকে আক্রমণ করিবেন। ম্যাক আর্থারের এই সমস্ত শাসানি ও গোয়ার্তুমির ফলে স্বয়ং ট্রুম্যান বিব্রত ও বিরক্ত হন এবং মিত্রপক্ষ বৃটেন ও অন্যান্য শক্তি তীব্র সমালোচনা করিতে থাকেন। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান হুকুম দেন যে, জেনারেল ম্যাক আর্থার তাঁর এবং ওয়াশিংটনের সদর দপ্তরের অনুমতি ছাড়া নীতি বা পলিসি সংক্রান্ত কোন বিবৃতি দিতে পারিবেন না। কিন্তু এই সমস্ত নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ম্যাক আর্থার তাঁর খামখেয়ালি মত চলিতে ও বিবৃতি দিতে থাকেন। তখন বাধ্য হইয়া প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান সংবিধানগত বিশেষ ক্ষমতা (তিনি স্বয়ং সুপ্রীম কমাণ্ডারও বটেন) অনুযায়ী জেনারেল ম্যাক আর্থারকে কোরিয়া ও প্রাচ্যখণ্ডের সমস্ত সামরিক নায়কত্ব হইতে বিতাড়িত করেন এবং অষ্টম বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল রিজওয়েকে তাঁর স্থলে নিযুক্ত করেন। সেদিনের পৃথিবীতে এই ঘটনায় নিদারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল।

আর একবার নিদারুণ চাঞ্চল্য এবং পৃথিবীব্যাপী তুমুল প্রতিবাদের ঝড় তুলিলেন স্বয়ং প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান যখন ৩০শে নভেম্বর, ১৯৫০, তিনি ঘোষণা করিলেন যে, কমিউনিজমের বিরুদ্ধে "পৃথিবীব্যাপী সমর সমাবেশ" প্রয়োজন এবং যদি রাষ্ট্রসংঘ চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার অনুমতি দেয়, তবে জেনারেল ম্যাক আর্থারকে এটম্ বোমা বর্ষণের ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারে।

বলা বাহুল্য যে, ট্রুম্যানের এই ঘোষণায় আমেরিকার

সমরসম্ভারে পরিপূর্ণ হইয়া ছুটিয়া যান ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্টকে ঠাণ্ডা করার জন্য। অবশ্য শেষ পর্যন্ত এটম্ বোমা বর্ষণের আর সুযোগ পাওয়া যায় নাই, কিন্তু এশিয়া সম্পর্কে ট্রুম্যান-এ্যাকে আর্থারের মনোভাব ও নীতি নিশ্চয়ই স্মরণীয়।

কোরিয়ার এই শোচনীয় যুদ্ধের আরম্ভে ভারতবর্ষের ভূমিকাও প্রশংসনীয় ছিল না। কারণ, 'আক্রমণকারী' উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে 'পুলিশী অভিযানের' যে সিদ্ধান্ত ২৫শে ও ২৭শে জুন, ১৯৫০, সিকিউরিটি কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত হইয়াছিল, ভারত সরকার যথোচিত সতর্কতা ও অনুসন্ধান ছাড়াই উহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবশ্য এই বিষয়ে তাঁরা প্রধানতঃ নির্ভর করিয়াছিলেন রাষ্ট্রসংঘের কোরিয়া কমিশনের ভারতীয় প্রতিনিধিদের রিপোর্টের উপর। কিন্তু কমিশনের ভারতীয় সদস্য মিঃ সি. কোন্দাপি এবং ডাঃ অনুপ সিং'য়ের আচরণ সন্দেহাতীত ছিল না। কোরিয়া যুদ্ধের উৎপত্তির বিবরণ সংগ্রহে তাঁরা "ব্যক্তিগত সংস্কার ও বস্তুনিষ্ঠ ধারণা"র দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিলেন।১

কিন্তু পরে প্রধান মন্ত্রী ও ভারত সরকার তাল সামলাইয়া উঠিয়াছিলেন। অকমিউনিষ্ট দুনিয়ার মধ্যে ভারতবর্ষই সর্বাগ্রে কোরিয়ার রণক্ষেত্রে 'মানে মাত্র' সৈন্যবাহিনী পাঠাইতেও অস্বীকৃত হয় এবং কোরিয়াতে শান্তি স্থাপনের জন্য প্রধান মন্ত্রী নেহরু বহু চেষ্টা করেন। এই কোরিয়া যুদ্ধ উপলক্ষেই আবার ভারতবর্ষের পররাষ্ট্র নীতির ঝোঁক ফিরিতে থাকে এবং উহা নয়াচীন ও সোভিয়েট রাশিয়ার অনুকূলে ঘুরিতে থাকে, অবশ্য পিকিংস্থিত তদানীন্তন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত মনীষী সর্দার পানিক্করের এই বিষয়ে যথেষ্ট দান রহিয়াছে। কারণ, চীন, তিব্বত ও কোরিয়া সম্পর্কে সর্দার পানিক্কর এমন অনেক নতুন তথ্য সরবরাহ করিয়াছিলেন, যার ফলে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু ঘোষণা করেন যে, কোরিয়াতে যাহাই ঘটুক না কেন, তাতে চীনের স্বার্থ জড়িত না হইয়া পারে না। সুতরাং কোরিয়া সমস্যা মিটাইতে

গেলে চীনের সহযোগিতা অপরিহার্য এবং এ জন্যই চীনকে রাষ্ট্রসংঘের সদস্যপদে গ্রহণ করা দরকার। যখন উত্তর কোরীয় সৈন্যেরা পরাজিত হইয়া পিছু হটিতে থাকে, তখন ভারত সরকার রাষ্ট্রসংঘকে অনুরোধ জানান ৩৮নং অক্ষরেখা পার না হওয়ার জন্য। কারণ, পিকিং হইতে রাষ্ট্রদূত সর্দার পানিক্কর শ্রীনেহরুকে জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, ৩৮নং অক্ষরেখা অতিক্রান্ত হইলে নবাচীন সরকার উহা চীনের প্রতি ঘোরতর বিপদরূপে গণ্য করিবে। সুতরাং এই লাইন অতিক্রমণ তাঁরা কিছুতেই বরদাস্ত করিবেন না। কিন্তু সর্দার পানিক্করের মারফৎ ভারতবর্ষের (এবং চীনের) এই সতর্কবাণীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্ণপাত করিলেন না এবং ম্যাক আর্থারের সৈন্যেরা যখন ইয়ালু নদী পার হইল, তখনও ভারতরাষ্ট্র আর একবার প্রতিবাদ জানাইল। কিন্তু রাষ্ট্রসংঘ বাহিনীর সেনাপতিরা দমিলেন না। পরে যখন চীনা সৈন্যদের হাতে প্রচণ্ড মার খাইয়া ম্যাক আর্থারের সৈন্যেরা বিপন্ন হইয়া গেল তখন আন্তর্জাতিক জগতে ভারতবর্ষের সতর্কবাণী ও ভবিষ্যৎবাণীর কদর বাড়িল। (এই প্রসঙ্গে সর্দার পানিক্করেরও যথেষ্ট সুনাম ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।) তারপর রাষ্ট্রসংঘের বৈঠকে কোরিয়া যুদ্ধাবসানের জন্য ভারতবর্ষ আরব-এশীয় ব্লকের মারফৎ অনেক চেষ্টা করিয়াছিল।

এই চেষ্টারই পরিণতিতে কোরিয়া যুদ্ধের জটিলতম প্রশ্ন 'যুদ্ধবন্দীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের' (repatriation of prisoners of war) সমস্যা শেষ পর্যন্ত মিটিয়া গিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে ১৯৫১ সালের জুন মাস হইতে যুদ্ধবিরতির যে প্রস্তাব লইয়া আলোচনা চলিতেছিল, এই 'যুদ্ধবন্দীদের প্রত্যাবর্তন' প্রশ্নে তাহা নিদারুণ অচল অবস্থার সৃষ্টি করিল। এবং দুই বছর ধরিয়া এই অচল অবস্থা চলিল, যাহা কোরিয়া যুদ্ধের ইতিহাসে একটি বিখ্যাত ঘটনা। যুদ্ধবন্দীদের অনেকেই এবং বিশেষভাবে কমিউনিস্ট উত্তর কোরিয়ার বন্দী সৈন্যের তাদের স্বদেশে ফিরিতে ইচ্ছুক নহে, ইহাই ছিল মার্কিন পক্ষের বক্তব্য এবং এই সমস্ত বন্দীকে জোর করিয়া উত্তর কোরিয়ায় পাঠাইলে উহা মানবতাবিরোধী ও গণতান্ত্রিক নীতি বিরোধী কার্য হইবে—এমন যুক্তি দেখান হইতেছিল। কিন্তু আন্তর্জাতিক আইনের নজির চীন ও উত্তর কোরিয়া দাবী করিতেছিল যে, সমস্ত যুদ্ধবন্দীকেই তাদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। এই বিরোধের মীমাংসার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষ এই মর্মে এক প্রস্তাব পেশ করে যে, একটি নিরপেক্ষ কমিশন গঠন করিতে হইবে এবং এই কমিশনের হাতে সমস্ত যুদ্ধবন্দীদের দায়িত্ব ছাড়িয়া দিতে হইবে। এই নিরপেক্ষ কমিশনে চীন এবং উত্তর কোরিয়ার প্রতিনিধিরাও থাকিবেন এবং এই প্রতিনিধিগণ স্বাধীনভাবে যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং তাদের প্রয়োজনমত পরামর্শ ও উপদেশাদি দিতে পারিবেন[১]।

১৯৫২ সাল হইতে পুরা এক বছর ধরিয়া যুদ্ধবন্দীদের এই সমস্যা লইয়া নানা প্রকার টানা হেঁচড়া চলিল এবং আন্তর্জাতিক জগতে নূতন উত্তেজনার সৃষ্টি হইতে লাগিল*

অবশেষে ১৯৫৩ সালের জুলাই মাসে চীনের উদ্যোগে যুদ্ধবন্দী সংক্রান্ত ভারতবর্ষের মূল প্রস্তাব গ্রহণের দ্বারা কোরিয়া যুদ্ধের অবসান ঘটে এবং ভারতবর্ষ, চীন ও সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে নূতন করিয়া সদ্ভাবের সৃষ্টি হয়। কিন্তু পশ্চিমী জগৎ ভারতের প্রতি সন্দেহাতুর এবং বিরূপ হইয়া উঠে, আর এশিয়া মহাদেশে কোরিয়া যুদ্ধের স্বরূপ মার্কিন পররাষ্ট্র নীতি আরও উগ্র এবং ঠাণ্ডা লড়াই তীব্র হইয়া উঠে, যার অন্যতম ফলস্বরূপ কাশ্মীরে শেখ আব্দুল্লা ভারত বিরোধী চক্রান্তে ধরা পড়িয়া ক্ষমতাচ্যুত ও বন্দী হন। কোরিয়া যুদ্ধ এশিয়াতে ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন বিস্তার করিয়াছিল।

---

১ এই সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণলাকর গুপ্ত প্রণীত 'Indian Foreign Policy' নামক পুস্তকের তথ্যমূলক ভূমিকা এবং ৯১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

*ভারতের বর্তমান প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী ভি. কে. কৃষ্ণমেনন ১৯৫২ সালের নভেম্বরে রাষ্ট্রসংঘের বিতর্কে বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ ইডেনের পক্ষ সমর্থন করিয়া মূল ভারতীয় প্রস্তাবের একটি সংশোধন আনিয়া লইয়াছিলেন। উহার ফলে চীনে ও রাশিয়ায় ভারতের বিরুদ্ধে অত্যন্ত বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল।

পান্থমালা

বিমল কর

ভোর রাতে দু একটা কাক ডেকে উঠলেই নিত্যানন্দর ঘুম ভেঙে যায়। ছাদের চিলে কোঠার মত পুবের ঘরটায় তিনি বাঁশিদেন। ঘুম ভাঙলেই বোজা চোখে নিত্যানন্দ তাঁর ইষ্ট দেবতার নাম স্মরণ করেন। বিছানায় উঠে বসে কিন্তু দিনের তাঁকে আরও পাঁচটা দেব দেবীর নাম আরো গলায় স্মরণ করে নিতে হয়। মাথার দিকে সতীলক্ষ্মী আয়নার মতন দেড় ফুটের জানলা দিয়ে বাইরে তাকালে দিনের আলো অথবা রাতের অন্ধকার কোনটাই স্পষ্ট দেখা যাবে না। জলো অন্ধকার আর আধ কয়লা বাইরের জগত তখনও ঘুমের ঘোরে। নিত্যানন্দ ওই অচেতন সংসারের দিকে এবার চোখ মেলে তাকাবেন। যে অদৃশ্য অনলস কাকটি তাঁকে এই নিস্তব্ধ ভোরে প্রত্যহ জাগিয়ে দেয় নিত্যানন্দ তার উদ্দেশ্যে মনে মনে কৃতজ্ঞতা জানান। তাঁর ধারণা, মানুষ রোদ উঠলে, রোদ অচেল হলে এবং রোদ পড়লে কাকের ডাক শোনে বলেই জানে না কাকের ডাকও কোকিলের ডাকের চেয়ে কিছু কম মধুর নয়। এমন করে যে পাখিটা আলোর আগে ডাক দিয়ে যায় মানুষ তারই ওপর সবচেয়ে বিরক্ত।

মেঝের ওপর পাতা ছোট বিছানাটা অভ্যস্ত হাতে গুছিয়ে রাখেন নিত্যানন্দ। ঘরের এক কোণায় কয়েকটা নিত্য প্রয়োজনীয় টুকিটাকির সঙ্গে বালি'র বৌটায় টুকরো করা নিমের দাঁতন রয়েছে। একটা দাঁতন তুলে, দড়ির আলনা থেকে গামছাটা টেনে নিয়ে তিনি দরজা খুলে ছাদে আসেন। তারপর নীচে চলে যান।

ভোরের আলো স্পষ্ট হবার আগেই নিত্যানন্দর ঘরে ঘণ্টির শব্দ শোনা যায়। একটি লাল পেড়ে সাদা সুতোর বস্ত্র পরে তিনি তাঁর ঠাকুরের পুজো করছেন। কাঠের ফ্রেমে কাচ দিয়ে বাঁধানো গুরুর ছবি তাঁর। গায়ে চন্দনের ফোটা। দুটি ধূপ জ্বলছে। একঝিনুক রেকাবিতে দু টুকরো গুড়ের বাতাসা, দু টি তুলসী পাতা, কড়ে আঙুল প্রমাণ গেলাসে গঙ্গা জল। নিত্যানন্দর চোখ প্রায় বোজা, ডান হাতে ছোট্ট ঘণ্টাটা নাড়ছেন আর মৃদু স্বরে স্তোত্রের মত গুরু-বন্দনা গাইছেন।

ছাদের উত্তরের দিকে সিন্দুকের মত ঘরটায় থাকে কালিদাস মাস্টার আর থাকেন পাঠক। ঘুম ভাঙতেই থাকেন তার মাথার বালিশটা কোল বালিশের মত পেটের কাছে টেনে নিয়ে, পরনের লুঙ্গিটা কোমরের কাছে জড়াতে জড়াতে বিরক্ত গলায় বলে, 'শালা।'

কালিদাস মাস্টার দু মুহূর্ত আগেই চোখ খুলেছে; চোখ খুলে উর্ধ্ব মুখে চেয়ে আদকাতরা মাথানো সরু কড়িকাঠটা দেখতে দেখতে ভাবছিল সকালের টিউশনিটার কবে মাস পুরবে। তার হিসেব মত আজ সপ্তাহেই মাস পুরেছে। তারপরও ছটা দিন বাড়তি। আজ যদি পড়াতে গিয়ে কালিদাস শোনে পঙ্কুবাবুর রাত-ডিউটি শেষ হয় নি তাহলে কি করবে কালিদাস। আজ ছদিন ধরেই পঙ্কুবাবুর রাত-ডিউটি চলছে। লোকটা নাকি রাত দুটোর অফিস শেষ করে তিনটে নাগাদ বাড়ি এসে শয্যা নেয়; ঘুম ভাঙতে বেলা দশটা। কালিদাস আটটা সাড়ে আটটার বেশী সে-বাড়িতে অপেক্ষা করবে তার উপায় নেই, বাজার পাড়ায় শ্রীবিলাস মুদির মেজো ছেলেটাকে পড়াতে যেতে হয়। ইংরেজী বর্ণমালার দশ পনেরখানা বই ছিঁড়েও সেই ছেলে ঘোড়ার পাতা ছাড়িয়ে আসতে পারল না। তবু শ্রীবিলাস মাসান্তে পনের টাকা হাতে তুলে দিতে কখনও ভুল করে না। কালিদাসের ভয় হচ্ছে হয়ত পঙ্কুবাবু এখন কোনদিনই দশটার আগে ঘুম থেকে উঠবে না। রেল পাড়ার টিউশনি এই রকম। মাস্টারদের মাস ফুরলেই রেলবাবুদের মাইট ডিউটি পড়ে।

কালিদাস বিছানায় উঠে বসতে বসতে নিত্যানন্দর ঘণ্টা বাজা থেমে যেতে শুনল। মনে মনে একটি কাতর নিবেদন ভগবানের পায়ে রেখে কালিদাস উঠে পড়ল। থগেনের দিকে যাতে তার দৃষ্টি না পড়ে উর্ধ্ব-চক্ষু হয়েই ঘরের দরজার কাছে এগিয়ে যাচ্ছিল কালিদাস।

খগেন বালিশসমেত বিছানার ওপর উঠে বসে আবার একবার নিত্যানন্দকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'শালা' বলেই হাত পা ফাঁক করে আছড়ে পড়া ব্যাঙের মত বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। কালিদাস ঘরের দরজা খুলে দিল।

দোতলার কোণের ঘরটায় ওরা তিনজন। চারু আর অনাথ এক সঙ্গে একটা ভাঙা তক্তপোশে শোয়; ফটিক আলাদা, মাটিতে বিছানা পেতে। বাইরে রোদ দেখা দিয়েছে এই বিবেচনায় চারু হাত বাড়িয়ে একটা দড়িতে টান দিল। দড়িটা গুলি সুতোর রীল-এর ওপর দিয়ে দেওয়ালের পেরেকের গা বেয়ে আরও বিবিধ গতিপথ দিয়ে দরজার ছিটকিনির সঙ্গে বাঁধা। চারু দড়িতে টান দিতে ছিটকিনি খুলে গেল। আওয়াজ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফটিক মেঝের বিছানো থেকে একটু গড়িয়ে যেয়ে গিয়ে দরজায় পায়ের ধাক্কা দিল। এই বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় দরজাটা আশ্চর্যভাবে খুলে হাতখানেক ফাঁক হয়ে থাকল। সেই ফাঁক দিয়ে ফটিক রোদ উঠেছে কিনা অনুমান করে বলল, 'অনাথ ওঠ।'

ওপর থেকে চারু বলল, 'একটা বিড়ি দে ফটকে।'

ফটিক মাথার পাশ থেকে বিড়ির বাণ্ডিল আর দেশলাই উঠিয়ে নিয়ে এক সঙ্গে দুটো বিড়ি ধরাল। ধরিয়ে একটা বিড়ি ডান হাতে তক্তপোশের দিকে বাড়িয়ে দিল। বালিশে মুখ গুঁজে অনাথ ঘুমের ভান করে পড়েছিল। ফটিক বিড়ি বাড়িয়ে দিতেই অনাথ বিড়িটা টেনে নিয়ে ফুঁকতে লাগল। চারু বলল, 'বারে, বাঃ!'

অনাথ দরজার দিকে তাকিয়ে খুব গম্ভীর গলায় জবাব দিল, 'বাসি গলায় বিড়ি খেলে তোর কাশি হবে। কাশি হলেই তুই যেয়েন্দ্র কবিরাজের বাড়ি তালমিছরি খেতে যাবি।'

নীচে থেকে ফটিক বিড়ি টানতে টানতে অট্টহাস্য হেসে বলল, 'এখনই তাল ফিরে—।'

'হেয়েন্দ্র কবিরাজ তো তালেরই ওষুধ।'

চারু অনাথের পেছনে সজোরে একটা লাথি মারল, মেরে বলল, 'তোর বেলায় যত খারাপ কথা।'

অনাথ আহত হবার মত শব্দ করে বিছানায় উঠে বসল। চারুকে দ্বিতীয়বার পা ছুঁড়তে হল না, অনাথ নেমে খোলা দরজা টেনে হাট করে দিল।

দোতলায় আরো খান তিনেক ঘর। তারই একটাতে স্কুলেপড়া ভাইকে নিয়ে ঘর বেঁধেছে বরেন। ভাইয়ের নাম বরেন। পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের চাকুরে বরেন। বেলা সাতটার মধ্যেই সাইকেল ঠেলে বেরিয়ে পড়তে হয়। সহরের শেষ প্রান্তে তার অফিস। পথ নিতান্ত কম নয়। অফিসে হাজির হলেই তার কাজ ফুরোয় না, সতের রকম কাজের ফিরিস্তি নিয়ে আবার সাইকেল ঠেলে বেরিয়ে পড়তে হয়। বাসায় ফিরতে বেলা দুপুর। টাটা রোদে বাসায় ফিরে কোনরকমে স্নান খাওয়া শেষ করে আবার বেরোতে হয়। বিকেল পড়ে সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসার বেলায় বরেন ছুটি পায়।

সকাল সকাল বেরোতে হয় বলেই বরেন ইতিমধ্যে উঠে পড়েছে। ভাইকে উঠিয়েছে। বরেন সবেমাত্র চোখমুখ ধুয়ে এল। ততক্ষণে বরেন কাঠের তক্তার ওপর থেকে ভেজানো চিড়ের গ্লাসটা নামিয়ে কলসীর জলে কয়েকবার ধুয়ে ফেলেছে। কলাইকরা বাটিতে ভেজা চিড়ে তুলে দিয়ে ভাইকে বলল, 'গুড় দিয়ে খেয়ে নে।'

বরেন ঝুলঝুলি থেকে গুড়ের কৌটো বের করল।

পরনের লুঙ্গি ছেড়ে হাফপ্যান্ট পরতে পরতে বরেন বলল, 'এলজাবরার সেই অঙ্কটা নিজে নিজে আবার করবি। অঙ্ক হয়ে গেলে ইংরাজীটা পড়বি। আমি তোর জন্যে একটা মানের বই নিয়ে আসব।' বলতে বলতে বরেন খাঁকি শার্ট গায়ে গলিয়ে নিল। 'কথায় কথায় কালিদাস মাস্টারের কাছে স্যার স্যার করে যাবি না। ও একটা গাধা। তিনবারে আই. এ. পাশ করেছে।' বলে বরেন ছোট ভাইয়ের দিকে সামান্য অহমিকার চোখে তাকাল, বলল, 'আমি দুবারে আই. এস সি পাশ করেছি—বুঝলি, আই, এস, সি—মানে বিজ্ঞান, তোর কালিদাস মাস্টারের মতন কালচু আই, এ, নয়।'

শীর্ণ নিরীহ বরেন অত্যন্ত বিস্বাদ মুখে ভেজা চিড়ের সঙ্গে গুড় চিবোচ্ছিল। তার চোয়াল ব্যথা করে। প্রত্যহ এই চিড়ে ভেজানো খার বলেই পালের ব্যথাটা আর কোনদিনই যায় না। রোজ তাকে সকালে কাজে

বেরোবার সময় দাদা তাকে পড়ার কথা মনে করিয়ে দেয়; রোজই বলে তোর ইংরাজীর মানের বই নিয়ে আসব, অথচ আনে না। সাতসিকে পয়সা দিলেই জগত্তারিণী ভাণ্ডারে ইংরাজীর মানের বই পাওয়া যায়। দাদা তাকে ইংরিজীর মানে যা বলে দেয় স্কুলে জ্যোতির্ময় বাবুর ক্লাসে সেই মানে বললে তিনি রেগে আগুন হয়ে যান। সেদিন ট্রান্সলেশনের ক্লাসে খাতা দেখাবার সময় নরেনের খাতা দেখে জ্যোতির্ময়বাবু হাসতে হাসতে চেয়ার সমেত উলটে মাটিতে পড়ে গেলেন। ব্যাপারটা এই, নরেন দাদার কাছে জিজ্ঞেস করে 'জামাইবাবু' শব্দটার ইংরেজী লিখেছিল সন্-ইন-ল। নরেন কি করে জানবে জামাই আর জামাইবাবু এক জিনিস নয়, দাদা তাকে যা বলেছিল সে লিখেছে। সেই থেকে জ্যোতির্ময়-বাবু তাকে ক্লাসে জামাইবাবু বলে ঠাট্টা করেন।

গলায় চিড়ে আটকে নরেনের কষ্ট হচ্ছিল। কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে খেল নরেন। দাদাকে বলল, আগামী হপ্তায় তার ইংরেজী পরীক্ষা, মানের বই না হলে খুবই মুস্কিলে পড়বে।

বরেন বসে বসে মোজা পরছিল। বলল, 'তোরা যে আজকাল কেমন ছেলে হয়েছিস মানের বই ছাড়া পড়াই হয় না। আমরা মানে না দেখেই সব পড়তাম।'

নরেন চিড়ের বাটিটা একপাশে রেখে গ্লাসের বাকি জল ঢক ঢক করে খেয়ে ফেলল।

মেসের চাকর গোবিন্দ চা নিয়ে এসেছিল। কলাই করা সেলাসে চা ঢেলে দিয়ে বলল, 'টাকা পুরতে আর এক আনা রইল বাবু।'

বরেন হিসেবের কথাটা শুনল কিনা বোঝা গেল না। বলল: 'বিড়ি আনিস নি?'

গোবিন্দ মাথা নাড়ল, না আনে নি। খাবার সময় নীচে থেকে বিড়ি নিয়ে নিতে বলে চলে গেল গোবিন্দ।

নিজের ভাগের ভেজানো চিড়ে কয়েকগ্রাসে গলঃকরণ করে বরেন চায়ে চুমুক দিল। মেস-খরচার মধ্যে চায়ের হিসেবটা পড়ে না। গোবিন্দ একটা ধুরন্ধর। মেসের এজমালী আগুনে খানিকটা জল ফুটিয়ে দুপয়সার চা-পাতার প্যাকেটের ধুলোর মত গুঁড়ো চা দিয়ে খুব চিনি ছুঁইয়ে না-ছুঁইয়ে চায়ের খরচায় দুপয়সা রোজগার করে নিচ্ছে। মুখে না বললেও গোবিন্দকে এভাবে যাবার উপায় নেই। সারা মাস বাদে দুবেলা চা দেয়, ধারে বিড়ি দেয়লাই। বাজারে পয়সায় চারটে বিড়ি হলে গোবিন্দ দেবে তিনটে। মেসবাড়ির সদর পেরোলেই চা পান বিড়ি রুটি বিস্কুটের দোকান, ওখানে অনেক ভাল চা, পয়সায় চারটে বিড়ি পাওয়া যায়। আর এই মেসের মধ্যে, মাত্র সদর দরজাটার ওপার এপারে কী ডাকাতিটাই না চালাচ্ছে গোবিন্দ। বলবার উপায় নেই? নগদা পয়সা দিতে পারলে কে আর গোবিন্দর দুবেলা এতবড় ছোচ্চুরি সহ্য করে।

চা খেতে খেতে বরেন দেখল নরেন বিছানাপত্র সরিয়ে স্কুলের বইখাতা টেনে নিয়েছে। বরেন কি ভেবে বলল, 'একটা বাড়ি ভাড়া করলে কেমন হয়রে নরু?'

নরেন দাদার মনের এই বাসনা মাঝে মাঝে শোনে,— বুঝতে পারে একটা বাসা ভাড়া করার ইচ্ছে দাদার খুবই। কিন্তু হবার কোন সম্ভাবনা নেই। তবু দাদার দিকে তাকিয়ে কি ভেবে নরেন বলে, 'বেশ হয়। মা ছোড়দি থাকতে পারে।'

বরেন কেন যেন ছোট ভাইয়ের ওপর ক্ষুব্ধ হয়। বাসা ভাড়া করলে যে মা ছোড়দি না থাকলেও আটকাবে না নরুর তা বোঝা উচিত। বরেন যদি বাসাই করে তবে চিনুকে না এনে মা সোনাকে কেন আনতে যাবে।

ভাদ্রের সকাল এমনি করেই শুরু হয় এখানে। যে রোদ আকাশের তলায় ঘোমটা খুলে ফেলেছে তার মুখের এককালি হাসি শূন্যের অলিগলি দিয়ে এই মেস বাড়ির দোতলাতে এতক্ষণে দেখা গেল। রোদটা অবশ্য পুবের দিকে কমলেশ আর সুবল চক্রবর্তীর ঘরের সামনে। এই পথ বেয়েই বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে এগিয়ে আসতে হয়। মাসিক পনের টাকা ভাড়া গুনতে পারে যারা তারাই যে সকালে প্রথম রোদটুকু পাবার অধিকারী সে বিষয়ে মেসবাড়ির কারো মনে সন্দেহ নেই। কোনদিন কেউ এ তর্ক এখানে তোলে নি কেন কমলেশরা তাদের ঘরে দু দুটো জানলা পেয়েছে। পনের টাকার দৌলতে কমলেশ সুবল সকালের রোদটুকুকে আটকে প্রথম নিজেদের প্রাপ্য

সম্মানটুকু নিয়ে নেয়। তারপর সে এঁটো রোদকে এগিয়ে যেতে দেয় দস্তিদারদের ঘরের দিকে।

দস্তিদাররা তোলা উনুনের তিন কিস্তের মত মাঝারি ধরনের ত্রিভুজ তৈরী করে জীবন কাটাচ্ছে। দস্তিদার পোস্টাপিসে চাকরি করে, চল্লিশ পেরিয়ে এখন কেমন নির্জীব হয়ে পড়েছে। তার অপর দুই সহবাসী দস্তিদারের সমবয়স্ক। পল্টুবাবু এই শহরের সিনেমা হাউসের 'ব্লাক মার্কেট'। মেয়েদের বেঁটে ছাতার মত ফুলে তার চেহারা। রং, লোকে বলে ছাতার কাপড়ের মতনই। ঐ ঘরের তৃতীয় ব্যক্তি রাধিকানন্দন, ছোট করে রাধিকাবাবু। দস্তিদার ও পল্টুর চেয়ে বয়সে হয়ত দু এক বছরের বড়ই। ভগবান অথবা জনকজননীর দেওয়া নামের মর্যাদা রাখতেই যেন রাধিকাবাবুর গলার স্বর অতি চিকন এবং তীক্ষ্ণ। মেয়েলি স্বর বলে ভ্রম হতে পারে। করণ লম্বা রোগা রাধিকাবাবুর কোন নির্দিষ্ট পেশা নেই। তিনি কখনও জলে কখনও স্থলে অর্থাৎ বছরের কয়েকটা মাস এক সিল্কি কোম্পানীর মেয়া পারাবার করা ছোট স্টীমারে বাবুর্চির কাজ করেন, কখনও এই শহরে সেরা কাপড়ের দোকানে বসে দোকান-মালিকের সঙ্গে পানজর্দা খেতে খেতে খদ্দেরকে কাপড় বিক্রী করেন, আবার এও দেখা গেছে রাধিকাবাবু ডাক্তার মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে মেয়েদের গান শেখাচ্ছেন। সমস্ত বিষয়ে যারা মাথা গলায় তাদের নিজেদের বলবার মত কোন পাত্র পাওয়া যায় না সাধারণ মানুষের এই বিশ্বাস। রাধিকাবাবুকে দেখলে বোঝা যেত এই বিশ্বাস যথোচিত নয়।

দোতলার শেষ ঘরটা বয়েনদের। আপাতত বয়েনরা তাদের ঘরে দুজন হলেও ওঘরে আর এক বাসিন্দে ছিল, জীবন ভাদুড়ী। গত আষাঢ় মাসে জীবন বাবের অসুখের টেলিগ্রাম পেয়ে বাড়ি গেছে। শ্রাবণের মাঝামাঝি তার চিঠি থেকে জানা গেল জীবনের বিয়ে; তারপর এই ভাদ্র মাসের আট দশটা দিন পেরিয়ে গেল জীবন এখনও ফিরল না।

সিঁড়ির মুখের গোড়ায় যে ঘরে কটিকরা থাকে সেই ঘরটাকে ঠিক ঘর বলা যায় না. অনেকটা যেন চিল কোঠা ধরনের। বোধ হয় এক সময়ে এই বাড়ির ওটা ছিল ভাঁড়ার অথবা ঠাকুর ঘর; এখন বাস ঘরে রূপান্তরিত হয়েছে।

নীচের তলায় রান্না খাবার ভাঁড়ার এই সব প্রয়োজনীয় ঘরগুলো বাদ দিয়ে অবশিষ্ট যা দশ পনের হাত জায়গা পাওয়া যায় তার পরিক মেসের ঠাকুর চাকর এবং ভবনাথরা।

ভবনাথের পরিচয় এই, বাজারে তার একটা মনিহারি দোকান আছে। দোকানের নাম 'জয়া-স্টোর্স'। ভবনাথের বউয়ের নামে দোকানের নাম হয়েছে বলে অনেকের ধারণা। মেসবাড়ির সকলেই জানে জয়া নামটা ভবনাথের বৌদির। একবার সেই বৌদিকে এরা দেখেছে। গতবছর এই রকম ভাদ্র মাসেই ভবনাথ জ্বরে পড়েছিল, অচৈতন্য জ্বর, বিকার বকছিল, ডাক্তারেরা জ্বর শেষে বাড়ির লোককে খবর দিতে বলেছিল। তখনই ভবনাথের বাড়ি থেকে জয়াকে আনানো হয়েছিল। মেসবাড়ির লোক অবাক হয়ে দেখেছিল হাতির দাঁতের মত সাদা অথচ শক্ত ঈষৎ শীর্ণ একটি মেয়ে যার পরনে বৈধব্যের বেশ। আরও লক্ষ করেছিল ভবনাথ এই মেয়েটিকে জয়া নামে ডাকে, প্রত্যুত্তরে মেয়েটি ভবনাথকে ভবনাথই বলে। সম্পর্কটা অনেকের কাছে রহস্যজনক মনে হলেও তারা কোন রহস্য উদ্ধার করতে পারে নি। ভবনাথের ঘরে ভবনাথের সঙ্গে থাকে তারই এক কর্মচারী, বসন্ত।

মেসবাড়ির এতগুলির প্রাণীর রোদ আলো হাওয়া জল এবং নিশ্বাস কেমন করে এ বাড়িতে সঙ্কুলান হয় এক ঈশ্বরই তা জানেন। অথচ এরা বছরের প্রত্যেকটি ঋতুতেই কেউ জ্বর, কেউ আমেশা, কেউবা ডিস্‌পেপসিয়া ও সর্দি কাশিতে মাঝে মাঝে ভুগলেও মোটামুটি বহাল তবিয়েতেই বেঁচে আছে। কেউ মরে নি, মরবে বলেও মনে হয় না। যেন এ বাড়িতে ঢোকার আগেই এদের জীবনীশক্তির তহবিলে মানুষের সম্ভাব্য সকল ব্যাধির প্রতিষেধক তারা সংগ্রহ করে নিয়েছিল। নচেৎ এখানে প্রবেশ করা যায় না। যে পথ দিয়ে এখানে আসা সে পথ কি কেউ দেখেছে! এমন গলি এ শহরে দ্বিতীয় আর দ্বিতীয় নেই।

গলির চেহারাটা দেখলে মনে হবে একটা

আবর্জনা ভর্তি বড় নালা। গলির মধ্যে পা দিলে নালির মতন ছোট ছোট গলিগুলো দেখা যায়, যেন এই পাড়াটা বাড়ি বাড়ি থেকে ময়লা এনে সদর গলিতে ফেলছে। আর সদরগলি সেই উপচে ওঠা নোংরা ময়লা দুর্গন্ধ এবং বিষ কোন রকমে বয়ে নিয়ে গিয়ে মিউনিসিপ্যালিটির রাজরাস্তাকে ঢেলে দিচ্ছে।

গলিটার নাম প্রকৃতপক্ষে যাই হোক লোকে জানে ঘাঁটি গলি বলে। এক সময় এ পাড়ার অর্ধেক জমিই ছিল ঘাঁটিদের; দু-চারখানা বাড়িও। আপাতত ঘাঁটিরা এপাড়া থেকে নিশ্চিহ্ন। ওই ঘাঁটিদেরই আদি বাড়ি এখন 'বাবুমেস'।

গলির প্রায় শেষপ্রান্তে আড়াইতলা মেসবাড়িটাকে দেখলে মনে হবে এর যে কোন ঘরের ছাদ, খিলান, কড়িবরগা এই মুহূর্তেই ভেঙে পড়তে পারে। জানলা, দরজা যদিও যথাস্থানে আঁটা আছে তবু তাদের চেহারা বিকৃত। কোথাও দরজার একটা পাট খোঁড়া পায়ে ঝুলছে, কোথাও দরজার মাথার কাঠে উই এবং ঘুন ধরে আধখানা ফোকলা হয়ে আছে। বিবর্ণ, ছাতাপড়া পাউরুটি রঙের এই মেসবাড়ি আর তার অধিবাসী মানুষগুলিকে নিয়ে কোন অদৃশ্য বিধাতা যে-কাহিনী রচনা করে চলেছেন কার সাধ্য তার বিবরণ দাখিল করে। প্রাণী জীবন আপন ক্রিয়ায় যে ভাবে বর্ধিত ও বিকশিত হয়, অবশেষে স্বাভাবিক ভাবেই জরার দশায় এসে মৃত্যুতে শেষ হয়, হয়ত সেই একই ক্রিয়াশক্তিতে এই মেসবাড়ির সমস্ত কাহিনী একদিন সুরু হয়েছিল, একদিন শেষ হবে।

॥ দুই ॥

এখন বেলা নটা।

মেসের রান্না ঘরের উনুনে মাছের কড়া চাপিয়ে ঠাকুর মাছের জন্যে দরজার কাছে এসে চেঁচামেচি করছিল। কলতলায় একপাশে কামিনী বি ক্ষিপ্রহাতে মাছ কেটে টুকরো করে দিচ্ছিল আর তার মেয়ে রমা কলতলার খসখসে মেঝেতে মাছের টুকরোর পিঠ ঘষে আঁশ ছাড়িয়ে বালতির জলে মাছ ধুয়ে দিচ্ছিল। কলতলার অন্য দিকে তিন কোণা চৌবাচ্চাটার পাশে দাঁড়িয়ে দত্তিদার স্নান করছে। পল্টুবাবু দাঁত মেজে গলায় হাত ঢুকিয়ে বিকট শব্দ করে করে জিভ পরিষ্কার করছিল। চারু এইমাত্র স্নানের জন্যে কলতলায় এসে দাঁড়াল।

দত্তিদার মাছ ধোয়া দেখতে দেখতে বলল, 'মাছটা কেমন চালানি মনে হচ্ছে রে।'

পল্টু আরও একবার বিকট শব্দ গলা দিয়ে বের করে জবাব দিল, 'পুরু চালানি কি, চারদিনের বাসি। কি রকম গন্ধ ছেড়েছে দেখছ না।'

সত্যি একটা আঁশটে গন্ধে উঠোন ভরা ছিল। কামিনীর বঁটির সামনে আঁশ, কটা অন্যান্য জঞ্জালের কাছে মাছি ভন ভন করছে। অন্যদিকে কলতলার নালা নর্দমা এখন অপরিষ্কার। এঁটো বাসন, ছাই, উচ্ছিষ্ট, এমন কি মেসবাড়ির ঘরদোরের অর্ধেক জঞ্জালও সেখানে জমে পড়ে আছে। কয়েকটা কাক সকাল থেকে রীতিমত এই উঠোনের আবর্জনাতেই তাদের আসর জমিয়ে বসে থাকে। আজো কাকের দল যথারীতি আবর্জনা ঘাঁটছিল ছড়াচ্ছিল, উড়ে উড়ে বসছিল। মাঝে মাঝে কামিনী বি বিরক্ত হয়ে কাক তাড়াচ্ছিল হুসহাস করে, আর বাবুরা কাছে থাকার দরুণ গলায় অথবা মনে মনে গালাগাল দিচ্ছিল কাকেদের।

একটা ভাঙা কুটো অ্যালুমিনিয়ামের গামলায় বালতি থেকে মাছের টুকরোগুলো উঠিয়ে নিতে নিতে গোবিন্দ কামিনী ঝি-র সঙ্গে এক পশলা ঝগড়া করে নিল। এই মেস থেকে কামিনী যা মাইনে পায় তাতে প্রত্যহ মেসের অন্যান্য কাজ সেরে তার পক্ষে মাছ কুটে দেওয়া, আঁশ ছাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। অথচ গোবিন্দ প্রত্যহ এমন সময় বাজার এনে ফেলবে যে তখন বাবুদের অফিস যাওয়ার বেলা, ঠাকুর কড়া বসিয়ে দিয়ে মাছের জন্যে চেঁচামেচি সুরু করবে, আর কামিনীকেই হাতের কাজ ফেলে দিয়ে মাছ কুটতে বসতে হবে। প্রত্যহ কামিনীকে দিয়ে এই কালতু কাজ করাবার অধিকার যে গোবিন্দর নেই কামিনী কাকের সঙ্গে ঝগড়া করতে করতে যে কথাটা বলে ছিল, গোবিন্দ তারই প্রত্যুত্তরে একটা ঝগড়া বাধাল।

চারু ছাই দিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে দত্তিদার এবং পল্টুবাবুর কথা শুনল, গোবিন্দর ঝগড়াও তার

ভ্রূভিগোচরে এল। চারু দস্তিদারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আজকের মাছটা লাল বাবুদের পুকুরের মাছ দস্তিদারদা।'

দস্তিদার গা মুছে গামছা পরে পরনের দুপাট করা কাপড়টা কেচে নিচ্ছিল। বলল, 'কে ছিপ ফেলেছিল, তুই?'

চারু হাসল। জবাব দিল, 'সে তো আমাদের গোবিন্দই ফেলে বসে আছে।'

পল্টুবাবু বলল, 'তা তোমরা সব ছোকরারা বাবু সেজে বসে থাকলে গোবিন্দ প্রকিটের চান্স ছাড়বে কেন।'

দস্তিদার বলল, 'সত্যি চারু তোরা তো এই বাজার টাজার সুলো করতে পারিস।'

চারু কোন জবাব না দিয়ে বুঝে শুধু একটু হাসল। দস্তিদারেরা আজ বলছে তোরা তো একটু দেখতে পারিস, যেন চারুরা যেন দেখতে চেয়েছিল, বাজারের ভার প্রত্যহ এক একজনের ওপর দিতে প্রস্তাব করেছিল, তখন সেই ব্যবস্থা এদের অনেকেরই পছন্দ হয় নি। আজ কমলেশ আর সুবল চক্রবর্তী দুজনে মিলে বেশ চালাচ্ছে বলে প্রকারান্তরে দস্তিদারেরা বুঝিয়ে দিতে চায় তাদের পচা মাছ বাইয়ে কি ভাবে কমলেশরা পয়সা মারছে। গোবিন্দ নির্বিকার। দাবার গুটির মত সে যখন যে খেলোয়াড়ের হাতে তখন তার। চারু মনে মনে হাসল। এই দেশের মানুষগুলো এইরকমই। ওই যে দস্তিদারদা যার মুখ দেখলে মনে হবে দেশের কোন বিষয়েই তার আগ্রহ বা উৎসাহ নেই, সেই দস্তিদারদাই মাসান্তে দেশের খাতায় প্রত্যেকটি পাই পয়সা হিসেবের দিকে চিলের মত চোখ করে তাকিয়ে থাকে।

রান্নাঘরে মাছ ভাজা চলছে। তার প্রবল গন্ধে চারু হঠাৎ যেন ক্ষুধা অনুভব করল।

দস্তিদারের স্নান শেষ হয়েছে। খড়ম পায়ে শব্দ করতে করতে সে চলে গেল।

পল্টুবাবু চৌবাচ্চায় মগ ডুবিয়ে চারুর দিকে তাকাল। বলল, 'চারুর আজ কটায়—?'

'বারটা থেকে।' চারু জবাব দিল।

'তবে এত তাড়াতাড়ি যে?'

'ছোটবাবুর বাড়ি হয়ে যেতে হবে।'

পল্টুবাবু দুতিন মগ জল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের গায়ে ঢালল: আঁজলা করে জল নিয়ে ভুঁড়িতে চাপড়াতে লাগল। বলল, 'তোমাদের ছোটবাবুর নামে নাকি মামলা হয়েছে?'

চারু হ্যাঁ বা না কিছু স্পষ্ট করে বলল না। কথাটা যে এই শহরে ক্রমশ রাষ্ট্র হয়ে যাচ্ছে চারু বুঝতে পারল। বস্তুতপক্ষে আজ এই যে চারু তাড়াতাড়ি স্নান করতে নেমেছে, কোন রকমে মুখে দুটো ভাত গুঁজে ছুটবে এর কারণ ওই মামলা। ছোটবাবুর সঙ্গে চারুকে বাস ধরে হীরাপুরের আদালতে ছুটতে হবে।

পল্টুবাবু গায়ে মাথায় কয়েক মগ জল ঢেলে টুকরো সাবান দিয়ে গা রগড়াতে লাগল। বলল, 'পয়সা থাকলেই ফুর্তি করা যায় না হে, মাথায় খানিকটা ঘিলু থাকা দরকার।'

চারু দাঁত মাজা শেষ করে মুখ ধুচ্ছিল। কামিনী কি মাছ কুটা শেষ করেছিল, এখন হাত ধুয়ে আবার বাসনের গাদায় গিয়ে বসেছে। কামিনীর মেয়ে রমা কোটা মাছের আঁশ বাটা দিয়ে টেনে টেনে জঞ্জালের কাছে জড় করছিল। রাশিকৃত আবর্জনার কাছে মাছি ভনভন করছে, কামিনীর তাড়না সত্ত্বেও সুচতুর কাকের দল জঞ্জাল থেকে উচ্ছিষ্ট টেনে নিচ্ছিল।

মাথায় জল ঢালতে ঢালতে পল্টুবাবু আধখানা চোখ বুজে আচমকা আধখানা সূর্য স্তোত্র বিড় বিড় করে পড়ে নিল। চোখের সামনে কামিনীর মেয়ে রমাকে এই মুহূর্তে পল্টুবাবু যেন একটু অন্য চোখে দেখতে পেল। রমার পিঠ, ঘাড় মাথা অনেকটা অনিলার মতন দেখতে। অনিলা কালো, কিন্তু গড়নটি এত ভাল যে পল্টুবাবু বিয়ের পর থেকে কখনও বউয়ের কালো রঙের জন্যে আপসোস করেনি। আজও করল না। বরং রমার মোটাবুটি অটি খোঁপা দেখে অনিলার মাথার চুলের কথা পল্টুবাবুর মনে পড়ল। অনিলার চুল হাটু ছোঁয়া। চুলের ভারে মাথাটা সব সময় এক পাশে হেলে থাকে। পল্টুবাবুর মনে পড়ল অনিলা খোঁপা বেঁধে বালিশে মাথা রাখতে পারে না, তার মাথায় ব্যাথা লাগে, কষ্ট হয়। এবার বাড়ি যাবার সময় পল্টুবাবু অনিলার জন্যে খানিকটা কাপাস তুলো নিয়ে যাবে। অনিলা যে সেই তুলো দিয়ে বালিশ তৈরী করে মাথায়

দেবে তেমন সম্ভাবনা নেই। তবু পল্টুবাবু নিয়ে যাবে, কারণ স্ত্রীর জন্যে আপাতত আর কিছু তার নিয়ে যাবার নেই।

অনিলার কথা ভাবতে ভাবতে পল্টুবাবুর স্নান সারা হল, মনে পড়ল শ্বশুরবাড়িতে একটা চিঠিও আজ লিখতে হবে।

মেসের যে ঘরে রান্না তারই লাগানো একফালি ঘরে খাবার ব্যবস্থা। চাটাইয়ের ছেঁড়া আসন, কাঁসার থালা, পেতলের গ্লাস, সাধারণ ভাত ডালের সঙ্গে একটা তরকারি আর মাছের ঝোল, কোনদিন বা পাতের শেষে বাবুদের মুখ বদলাবার জন্যে লাউ বা পেঁপের টক—চিরাচরিত এই ছবিটাই লোকে দেখে আসছে। আজও তার কোন ব্যতিক্রম ছিল না, দস্তিদার মাছের ঝোলের সঙ্গে ভাত মাখতে মাখতে বলল, 'পল্টু, তোমার ছিপটা নিয়ে চল একদিন ট্যাঙ্কে গিয়ে বসা যাক।'

পল্টুবাবু ডালের সঙ্গে খানিকটা পেঁয়াজ নিয়েছে, আজ অল্প আলু ভাতেও ছিল, ডাল পেঁয়াজ আলুভাতে আর লঙ্কা দিয়ে মিলিয়ে মিশিয়ে যে উপাদেয় খাদ্য তৈরী করছিল, তাতে মনে হল সে সম্ভবত আজ আর মাছ মুখে দেবে না। মাছটা সত্যিই আধপচা। তাড়াতাড়িতে ভাল করে ভাজাও হয় নি, ফলে কেমন একটা গন্ধ রয়েছে। মাছের ব্যাপারে পল্টুবাবু সাধারণ খুঁতখুঁতে।

পল্টুবাবুর জবাব না পেয়ে দস্তিদার আবার বলল, 'চল না, এই রোববার বসা যাক।'

মাথা নাড়ল পল্টুবাবু। বলল, 'এই রোববারে হবে না।'

'কেন? বাড়ি যাচ্ছ নাকি?'

'ইচ্ছে আছে।' পল্টুবাবু বলল। বস্তুত স্নানের পর হঠাৎ অনিলার কথা মনে পড়ায় কে জানে কেন মনটা বাড়িমুখো হয়ে গেছে। মাত্র বাইশ মাইল তফাতে অনিলা থাকে, ইচ্ছে করলে প্রতি সপ্তাহে যাওয়া আসা যায়। কিন্তু পল্টুবাবু যায় না। না যাবার কারণটা বড় অদ্ভুত। পল্টুবাবুদের সংসার ছড়িয়ে-ছিটিয়ে অনেকখানি। মা বাবা দাদা বউদি ছোট ভাই এবং বোনেরা এমন করে তার ওপর অধিকার ছড়িয়ে রেখেছে যে, বাড়ি গেলে স্ত্রীর সঙ্গে দুদণ্ড নিরিবিলি বসে কথা বলার উপায় নেই। মা ভাবে, ছেলে বউয়েতে মিলে আলাদা করে সংসার পাতার পরামর্শ করছে; বড়দা বউদিরা ধরে নেয়—ছেলে পুলে হবার বিষয়ে ওরা কোন গোপনীয় কথাবার্তা বলছে; এবং ছোট ভাই বোনরা এমন করে তাকায় যে পল্টুবাবুর সন্দেহ হয় তারা পল্টুবাবুকে অতিরিক্ত রকম স্বৈরণ ভাবছে। এছাড়াও সংসারে আর পাঁচটা কারণ রয়েছে যার জন্যে মাত্র একুশ বাইশ মাইল পথ পল্টুবাবুর কাছে শত মাইলের মত দীর্ঘ হয়ে আছে।

দস্তিদার মুখে ভাত নিয়ে বলল, 'তোমরাই সুখী। নাকের ডগায় বাড়ি, ছুটি করলেই যেতে পার।'

দস্তিদারের বাড়ি বিহারের এক প্রান্তে। বড় গাড়ি ছোট গাড়ি করে পুরো একটা দিন পথে কাটাতে হয়। বাড়িতে স্ত্রী, দুই ছেলে; মা বাবা এখনও জীবিত, সামান্য কিছু জমিজমা আর মাথা গোঁজার মত একটা জায়গা আছে। বাবা হোমিওপ্যাথি ডাক্তারী করে। জমি জায়গা, মাথার আশ্রয়, নাতি এদের কোনটাই ছেড়ে দেওয়া বাবার পক্ষে সম্ভব নয়। অগত্যা দস্তিদারকেই স্ত্রী-পুত্রের সান্নিধ্য পাবার আশা এখন ছেড়ে থাকতে হয়েছে।

দস্তিদার বলল, 'এত চেষ্টা করেও একটা ট্রান্সফার অর্ডার পাচ্ছি না পল্টু। এবার ভাবছি একটা সিক রিপোর্ট দিয়ে বাড়ি গিয়ে বসে থাকব। দেখি, গুঁতোয় পালারা বাবা বলে কিনা।'

খাবার ঘরে একে একে আরও দুতিনজন এসে গেছে। চারু, কালিদাস মাস্টার আর নরেন।

কালিদাস আজও সকালের টিউশনির মাইনেটা পায় নি। অনেকটা সময় অপেক্ষা করেও সে তার পরিশ্রমের টাকাটা পেল না। কালিদাসের মেজাজ স্বভাবতই খারাপ হয়েছিল। স্কুলের দমদ হয়ে গেছে, কোন রকমে মাথায় দুঘটি জল ঢেলে গামছা কাঁধে করেই কালিদাস খাবার ঘরে এসে ঢুকল।

চারু আসনে বসতে বসতে কালিদাসের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কি মাস্টার, চান করলে না?'

কালিদাস মাথা নাড়ল। 'না।' রুক্ষ গলায় বলল, 'এমন এক হারামজাদা লোকের পাল্লায় পড়েছি, ছেলে পড়িয়ে নিয়ে মাইনে দিচ্ছে না।'

চারু কালিদাসকে ভাল করে নজর করল। বলল, 'পড়ানো ছেড়ে দাও।'

'ছেড়ে দেবো, কিন্তু টাকাটা আদায় করতে হবে না। মাগনীতেই ছেলে পড়ানো হয়ে যাবে।'

'তাহলে তোমায় মামলা ঠুকে দিতে হয়।'

কালিদাস নিজের আসনে বসে থান কাল পাত্র ভুলে চিৎকার করে বলল, 'গার্জেনগুলোই পয়লা নম্বরের খচ্চড়।'

চারু কালিদাসের দিকে তাকাল। তারপর বোঁকা চোখে নরেনকে দেখল। নরেন মুখ নীচু করে খাচ্ছিল। কালিদাস স্যারের সব কথাই তার কানে গেছে। স্যার যে খারাপ কথাটা এই মাত্র বলল, নরেন সেই শব্দটা স্কুলে বাজারে পথে ঘাটে হাজার বার শুনেছে। তা সত্ত্বেও তার কানে কথাটা ভাল শোনাল না। তাছাড়া নরেন 'গার্জেন' শব্দটারও মানে বোঝে বলে শেষের পুরো কথাটাই তার খারাপ লেগেছে।

চারু কালিদাসকে লক্ষ্য করে বলল, 'তোমার কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই মাস্টার, কোথায় যে কি বল।'

কালিদাস রাগের মাথায় কি বলেছিল চারুর সতর্ক বাণীর পর তা খেয়াল করল। নরেন হেঁট মুখে খাচ্ছে। কেমন যেন লজ্জিত হল কালিদাস। অপ্রস্তুত বোধ করল।

ঠাকুর কালিদাসের পাতে ভাত দিয়ে গেল, জলের গ্লাস রেখে গেল গোবিন্দ।

'নরু, শনিবারের খেলা দেখবে নাকি?' চারু যেন নরেনকে অন্য কথা দিয়ে ভোলাতে চেষ্টা করল।

'কি খেলা—?' নরেন চোখ তুলল।

'তুমি জানো না।...আরে, এই শনিবারে রেলের মাঠে যে বিরাট ফুটবল খেলা।'

নরেন খেলাধুলোর ব্যাপারে তেমন উৎসাহী নয়। মাথা নাড়ল ও, না সে জানে না।

চারু বলল, 'আমি তোমায় টিকিট দেব, গিয়ে দেখে এস।'

কালিদাস দ্রুত হাতে খাচ্ছিল। বেলা দশটা প্রায় বাজে। আজ স্কুলে পৌঁছতে তার হয়ত দেরী হয়ে যাবে। প্রথম পিরিয়ডেই ক্লাস কোরের বাংলা। ছেড্ মাস্টার মশায়ের ঘরের সামনা সামনি ক্লাস কোরের বি সেকশন। দেরী হলে মাস্টার মশাইয়ের চোখে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এমনিতে কালিদাসের ওপর উনি তেমন সন্তুষ্ট নন। আই এ পাস বলে কালিদাসকে বেশ ছোট চোখেই দেখেন। নিতান্ত দয়া পরবশে চাকরিটা খান না।

দয়া। কালিদাস সব সময় বুঝতে পারে—জগতে তার সঙ্গে যাদের সম্পর্ক তাদের একদল তাকে দয়া করে, অন্যদল ঠকায়। এই দুয়ের বাইরে নিজেকে দেখতে পায় না কালিদাস।

কলতলায় কার হাত থেকে বুঝি বালতি পড়ে গেল। কামিনী ঝি আঁতকে উঠেছিল। বড় পিছল কলতলা। রান্নাঘর থেকে ঠাকুর বাইরে দৌড়ে গেল। না, কামিনী বা ননা নয়। কেউ পড়েনি। তেতলার খগেন পাঠক মাছ ধোওয়া বালতিটা টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে এক পাশে, দিয়ে চেঁচাচ্ছে।

ঘরে বসে খেতে খেতে চারু খগেনের চেঁচানি শুনছিল। 'এই বেলে গরু ছাগল থাকে না মানুষ, এটা একটা জাবর কাটার খাটাল না কি ভদ্রলোকের বাসস্থান' সে বিষয়ে ভীষণ সন্দেহ প্রকাশ করে খগেন কলতলায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করছিল। সমস্ত চিৎকারের লক্ষ্য অবশ্য কমলেশ আর সুবল।

এখুনি একটা ঝগড়া বাঁধবে। কমলেশ দোতলা থেকে নেমে আসবে, সুবল আসবে পেছনে পেছনে তার পর খগেনের সঙ্গে লেগে যাবে। যা প্রায় নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার।

নরেন খাওয়া শেষ করে উঠে পড়ল।

চারু ঘর ফাঁকা দেখে কালিদাসকে বলল, 'কি মাস্টার, তোমার মুখ মেট কাল বুঝি খুব টেনে এসেছিল?'

'কবে না আসে!' কালিদাস বিরক্ত হয়ে জবাব দিল।

'রোজ?'

'রোজ।...এই মাত্র ত ঘুম থেকে উঠল।'

'যেভাবে দেখেই বোঝা যায়। তা তুমি কিছু বল না?'

'কে বলবে। বললে ত লেগে যাবে!' ভাতের জন্যে ঠাকুরকে ডাক দিয়ে কালিদাস আবার বলল, 'লোকটা যে কি জ্বালায় আমিই তা জানি। একদিন ওকে আমি চিট করব।'

চারু হাসল মনে মনে। কালিদাসের সাধ্য নয় খগেনকে টিট করে। খগেন অন্য জিনিস। মাটি নরম পেলে আরও পা ডুবিয়ে দেবে। তার স্বভাব চারু জানে।

বাইরে কলতলায়, যেমন আশা করা গিয়েছিল, ঠিক সেই ভাবে ঝগড়া বাধিল।

'বাজে, চেঁচিও না—'কমলেশের গলা, 'এই মেসে না শোবার কেটে পড়লেই পার।'

'আলবাৎ চেঁচাব।···তোমার একলার মেস নাকি?'

'কার মেস, তার জবাব আমি তোমাকে দেব না। বালতিটা তুমি কোন মেজাজ নিয়ে ছুঁড়ে দিলে?' কমলেশ যেন কলতলায় এসে পড়েছে বলে মনে হল।

'তুমি কোন মেজাজ নিয়ে ওই বালতিটা ঘটের কলার মতন বসিয়ে রেখেছ?'

'আমি বসাই নি। তোমার ঘরের দরজায় ওটা ছিল না।'

'আমি তোমায় কিছু বলি নি। আমার পায়ের কাছে ছিল ফেলে দিয়েছি।'

'খগেন।'···কমলেশ রাগে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'মেসবাড়িটা তোমার তাড়িখানা নয়।'

'অ্যাই, চোপ রাও।' খগেনও চারগুণ জোরে চেঁচিয়ে উঠল, 'এই মেস বাড়িটা তোমার বাবার জমিদারী নয়।'

'শালা, শুয়ারের বাচ্চা···'

'চুতিয়া, জোচ্চোর কাঁহাকার···'

কলতলায় হাতাহাতি বেঁধে উঠল। আজ রণের আহ্বান প্রথম থেকেই এমন চড়া স্বরে বাঁধা ছিল, যে দু পক্ষ পরস্পরকে গালাগাল দিয়ে এগিয়ে যেতেই চারু বুঝতে পারল, একটা রক্তক্ষয়ী কাণ্ড ঘটবে।

ভাতের থালা ছেড়ে উঠে পড়ল চারু। কালিদাসও লাফিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

কলতলায় দু পক্ষ যখন ভাঙা বালতি আর মাদুরের আঁশ বঁটিটা নিয়ে হুঙ্কার ছাড়ছে তাদের মাথা মুখ অথবা বেশবাসেরও কোনো শালীনতা নেই তখন, ঠিক সেই মুহূর্তে বাবু মেসের ভাঙা দরজা দিয়ে এমন একটি অদ্ভুত দৃশ্য এসে কলতলায় থামল যে চারুর প্রথমে মনে হল ও বোধহয় তার দৃষ্টি ভ্রম।

চারু চোখের পাতা বার কয়েক ফেলল, খুলল আবার ভাল করে দেখল।

না, ভ্রম নয়; দুটি মেয়ে পদ্ম পেরিয়ে কলতলায় পা দিয়েছে, পিছনে বাক্স-বিছানা সমেত সাইকেল রিকশার লোকটা। চারু ত্রস্ত হয়ে খগেন আর কমলেশকে থামাতে গেল।

। তিন ।

শুধু দুটি মেয়েই নয়, একটি ছোট ছেলেও সঙ্গে ছিল। রিক্সাওলা বাক্স বিছানা তুলে দেবার পর টিনের ছোট সুটকেস আর সুটলি হাতে সবার পিছনে সে এসে দাঁড়িয়েছিল।

প্রথমে ধারণা হয়েছিল, বাড়ির নম্বর ভুল করে ওরা বাবুমেসে ঢুকে পড়েছে। এরকম ভুল হওয়া বিচিত্র নয়। কমলেশ এবং খগেন আপাতত বিস্মিত ও বিকল; তাদের রণক্ষেত্রে বিমূঢ়তা এবং শান্তি বিরাজ করছিল। কামিনী ও রমা মালার এক পাশে দাঁড়িয়ে, ঠাকুর রান্নাঘরের বাইরে, চারু এবং কালিদাস উঠোনে।

কিছুটা সময় এতগুলো লোক নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। শেষ পর্যন্ত চারু নিজেকে সামলে নিয়ে কোন রকমে বলল, 'কাকে খুঁজছেন?'

যে মেয়েটি চারুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল তার বিস্ময়ের ঘোর বুঝি তখনও কাটে নি। এবাড়িতে পা দিয়ে খগেন ও কমলেশের যে মূর্তি সে দেখেছে, সম্ভবত এখনও সম্পূর্ণভাবে তা ভুলতে পারছে না। চারুর প্রশ্নে নিজেকে যেন মোটামুটি ধুঁয়ে ফিরিয়ে আনতে পারল। বলল, 'এটা কি মেসবাড়ি?'

চারু মাথা নাড়ল।

মেয়েটি চারুর চোখে চোখে তাকিয়ে মৃদু গলায় বলল, 'এখানে নিত্যানন্দবাবু থাকেন না—?

মাথা নড়ল চারু। 'থাকেন। কিন্তু এখন তিনি নেই।'

'নেই।'

'না।' উনি সকালেই বেরিয়ে যান। দুপুরে আসেন, খাওয়া দাওয়া সেরে আবার চলে যান। ফিরতে ফিরতে রাত।' চারু যেন সামান্য বেশী কথা বলল।

মেয়েটি মন দিয়ে চারুর কথা শুনল, শুনে এমন চোখ করে তাকাল মনে হল যেন বলছে, তাহলে ?

চারুও সেই কথা ভাবছিল। ভাবছিল তাহলে এখন কর্তব্য কি। ভাবছিল এরা কে, কেন এসেছে, এখন এদের নিয়ে কি করা যায়।

কালিদাস মাস্টার দেরী হয়ে যাচ্ছে বলে চৌবাচ্চায় মুখ ধুতে গেল।

দেরী চারুরও হচ্ছিল। তাকে ছোটবাবুর সঙ্গে হরিণপুরের আদালতে যেতে হবে। মেয়েটির দিকে তাকিয়ে চারু বলল, 'নিত্যবাবু তো এখন নেই। আপনারা ওপরে গিয়ে অপেক্ষা করতে পারেন।' বলে চারু মুখ ফিরিয়ে গোবিন্দর দিকে তাকাল। 'নিত্যবাবুর ঘর তুই খুলতে পারবি ?'

নিত্যানন্দর ঘরে খুব পলকাস্তরের একটা তালা ঝোলে। গোবিন্দর কাছে যদিও চাবি নেই, তবু তালাটা খুলে দেওয়া তার অসাধ্য নয়। গোবিন্দ বলল, 'তালা ভাঙতে হবে।'

নিত্যানন্দর ঘরের তালা ভাঙা সংগত নয়, তবু চারু অন্য কোন উপায় খুঁজে পেল না। তালা ভাঙতে বলার আগে চারুর মনে হল, তার জেনে নেওয়া উচিৎ নিত্যবাবুর সঙ্গে এদের সম্পর্ক কি, কতটুকু। চারু বলল, 'আপনারা নিত্যবাবুর আত্মীয়—?'

'উনি আমাদের মেসোমশায়।' মেয়েটি বলল।

বড় মেয়েটির পিছনে প্রায় গা ঘেঁষে অন্য যে মেয়েটি দাঁড়িয়েছিল তাকে দেখলে ছোট বোন বলেই মনে হয়। মুখের আদল দুজনেরই প্রায় একরকম, বড়টি মাথায় একটু বেশী লম্বা, গায়ে সামান্য শীর্ণ, রঙ এরই বেশী পরিষ্কার ; ছোট বোনের গড়ন দোহারা, গায়ের রঙ শ্যাম, মুখশ্রী বড়র চেয়ে হয়ত একটু লাবণ্যভরা। সবার পিছনে ছেলেটি দাঁড়িয়ে আছে, চারু অনুমান করে নিল, সে এদেরই ভাই হবে। চারু বলল, 'তাহলে আপনারা ওপরে যান।' গোবিন্দর দিকে মুখ ফিরিয়ে হুকুম করল, 'নিত্যবাবুর ঘরের দরজাটা খুলে দে ; মালপত্রগুলো ওপরে তুলে দিস।'

এই বিচিত্র বাড়িটায় পা দিয়ে ভুল করেছে কিনা এইরকম এক মুখভঙ্গি করে মেয়ে দুটি গোবিন্দর সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল। চারু তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরে তার ঘরে চলে গেল।

খগেন পাঠক এতক্ষণ আদালতে কাঠগড়ার সিঁড়ানো আসামীর মতন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সমস্ত লক্ষ্য করছিল। প্রায় ভোজবাজির মতন তার চোখের সামনে যে কাণ্ড ঘটে গেল এখন তা অনুধাবন করে স্বগতোক্তির মতন বলল, 'শালা খুব মুরুব্বিগিরি করে গেল।'

কমলেশ যদিও এতক্ষণ খগেনের বিরোধী পক্ষ ছিল, কিন্তু এখন যেন তাকে খগেনের স্বপক্ষে মন্তব্য করতে শোনা গেল, 'কার ঘর, কে তালা ভাঙতে বলে।'

নিত্যানন্দর ঘরে বাক্স বিছানা টিনের সুটকেশ তুলে দিয়ে গোবিন্দ চলে যাবার পর ছোট ঘর যেন বোঝাই হয়ে গেল। এমন কিছু জিনিস নয়, একটা ত বাক্স, ছোট মতন বিছানা, গোলাপফুল আঁকা দেড় হাতের সুটকেশ আর পুঁটলি একটা—এতেই পা ফেলার জায়গা পাওয়া যাচ্ছিল না। চারটি মালপত্র আর তিনটি মানুষ—নিত্যানন্দর ঘর এমন করে জুড়ে নেবে প্রীতি ভাবে নি।

অগোছালো করে বাঁধা বাক্স বিছানার একপাশে প্রীতি বসেছিল, অন্য পাশে ইতি। প্রীতি বড়, ইতি ছোট। কাবু সুটকেশের পাশে উবু হয়ে এতক্ষণ বসেছিল, আর পারল না, উঠে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল।

প্রীতির গায়ে সাধারণ একটা শাড়ি ; বাসন্তী রঙের। জামাটা হালকা ছিটের। শাড়ির ধকলে বেশবাস মলিন দেখাচ্ছিল। ইতি ভুরে শাড়িটার পাশের দিকে কালি ঝুলি মাখিয়েছে একগাদা, আঁচলে চুলের জাগ। দু জনেই উস্কোখুস্কো, রেলগাড়ির ধুলো ধোঁয়ায় চুল রুক্ষ, মুখে ক্লান্তি, চোখের তলায় কালি লেগেছে যেন।

বিছানার ওপর বসে জিরিয়ে নিতে নিতে প্রীতি বলল, 'এখন কি করবি—?'

কি করবে ইতি যদি জানত তবে অথৈ জলে পড়া মানুষের মতন বসে থাকবে কেন ! ইতি কিছু জানে না। কিছু বুঝতে পারছে না। মেঝের দিকে ঝুঁকে কোমর ভেঙে বসে ইতি আঙুল দিয়ে নিজের পা টিপছিল, সোড়ালি আর হাঁটু টিপছিল। কাল সারারাত পা

ঝুঁদিয়ে বসে বসে তার দু পা কনকন করছে।

'এখানে এসে সোহরত ভাল করলাম না রে।' প্রীতি বলল, দুর্ভাবনা দুশ্চিন্তায় তার মুখ শুকনো দেখাচ্ছিল।

'তুমিই ত বললে—' ইতি মুখ না তুলেই বলল।

'বললাম অন্য কোথাও যাবার কথা মনে পড়ল না।' প্রীতি যেন এখন বিপদে পড়ে বলল।

মুখ তুলল না ইতি। দিদির দিকে তাকাল। 'তুমি আবার বলছ, মেসোমশাই চিনে উঠতে পারবে কি পারবে না—।'

কথাটা প্রীতি বলেছে আগে। একবার নয়, বহুবার। ট্রেনে আসতে আসতে সারাটা পথই খুঁত খুঁত করেছে। বলেছে, যাচ্ছি ত মেসোমশাই চিনতে পারলে হয়।

চেনার সমস্যাই বড় সমস্যা। নিত্যানন্দকে প্রীতিরা বেশী দেখে নি। ছেলে বেলায় হয়ত কয়েকবার, আর বড় হয়ে মাত্র তিনবার। শেষবার দেখেছে বছর দুই আগে। সেবারের দেখাটাই যা ভরসা। সেবারে নিত্যানন্দ অনেক দিন ছিল, দিন পনের প্রায়; প্রীতি মেসোমশাইয়ের সেবা শোনা করেছে, সেবা যত্ন করেছে। তাকে খুব ভাল লেগে গিয়েছিল মেসোমশাইয়ের। কাছে বসিয়ে অনেক গল্প সল্প করেছিলেন। ফিরে এসে চিঠিও লিখেছেন মাঝে মাঝে।

পুরোনো কথা মনে করতে করতে প্রীতি বলল, 'চিনতে পারার ত কথা। তবু—, যাওয়া আসা নেই বলেই ভয় হয়।'

'কোথায় বা যাবে!' ইতি তাদের সঙ্গে নিত্যানন্দর সম্পর্ক' ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক গলায় বলল।

কথাটা অসঙ্গত নয়। নিত্যানন্দর স্ত্রী যশোদা মারা গেছে আজ এক যুগ। তারও বেশী। তখন ত নিত্যানন্দ ছেলেমানুষ। পুরো আঠাশও বয়স নয়। যশোদা মাসির বিয়ে হয়েছিল কচি বয়সে, দু বছর পুরতেই মারা গেল। বাচ্চা কাচ্চা হত, হবার অবস্থাতেই অপঘাতে সংসারের মায়া কাটাল। যশোদার দিদি তখন ভগ্নীপতিকে অহোরাত্র সান্ত্বনা দিয়েছে। প্রীতির বয়স তখন বুঝি বছর দশেক। মেসোমশাইকে সে তাদের বাড়িতে আসতে যেতে থাকতে দেখেছে সর্বক্ষণ। শোকের পর্ব শেষ হলে, মা বাবা মেসোমশাইকে আবার বিয়ে করতে বলেছিল। প্রীতির মনে আছে মা, নিজেই উদ্যোগী হয়ে মেয়ের খোঁজ করত। মেসোমশাই রাজী হয়ে গিয়েছিল, তারপর একদিন কি হল, হঠাৎ কাউকে কিছু না বলে চলে এল। মা বাবা অবাক হয়েছিল, মা একটু লজ্জায় পড়েছিল নতুন সম্বন্ধটার জন্যে। বছর খানেকেরও বেশী কোনো খবর পত্র দিল না মেসোমশাই, তারপর একদিন আবার গিয়ে হাজির হল। তখনই মেসোমশাইয়ের স্বভাব ব্যাপার সব কেমন পালটে গেছে। কোথায় যেন মন্ত্র নিয়েছে, পুজো আর্চা করে, মাছ ছাড়া অন্য আমিষ খায় না।

সেই মেসোমশাই বাবা মারা যাবার পর একবার—আর বছর তিনেক আগে মা মারা যাবার সময় প্রীতিদের কাছে গিয়েছিল। সেই শেষ। আর দেখা হয় নি। তাদের চাক্ষুষ সম্পর্কের ইতিহাসটা তাই খুব স্পষ্ট নয়।

আজ যে প্রীতিরা মেসোমশাইয়ের কাছে এসেছে তা অকারণ নয়। সংসার বড় কাঁটন ঠাঁই। এখানে স্পষ্ট করে সরল করে কাউকে চেনা যায় না। আজ যে পাশের পাশে পাশ-বালিশের মতন আরামের আর অন্তরঙ্গতার বস্তু, কাল দেখবে সে সাপের গা থেকে ছোবল তুলেছে। তুমি কাকে বিশ্বাস করবে, কোথায় ভরসা রাখবে বল! প্রীতিরা তাদের গাঁয়ে গ্রামে আত্মীয় হিতৈষী কাউকে কাউকে পেয়েছিল, মা স্বর্গবাসী হলে আশ-বাড়ির অনেকেই খোঁজ খবর নিতে এসেছিল, কত সুকথা হিতকথা শুনিয়েছিল। প্রীতি মার কাছ থেকে আবাল্য এদের কথা শুনেছে। কাউকে সে নির্ভর করে নি, আঘাতও দেয় নি। সুরপতি মামা বেঁচে ছিল বলে—তার সাহসও ছিল। আত্মীয় নয়, তবু আত্মীয়ের অধিক ছিল সুরপতি মামা। যে যৎসামান্য বিষয় আশয়ে অন্যের লোভ ছিল, সুরপতিমামা সেটুকু বাঁচিয়ে দিয়েছিল প্রীতিদের। নয়ত প্রীতিরা কাদায় পড়ত। অসহায় অবস্থাটা মামার জন্যেই সামলে নিতে পেরেছিল। সেই সুরপতিমামাও মারা গেছেন গত জ্যৈষ্ঠ মাসে। প্রীতিদের বাধ্য হয়েই আজ মেসোমশাইয়ের শরণাপন্ন হতে হয়েছে। ...না, প্রীতিরা মেসোমশাইয়ের গলগ্রহ হতে আসে নি, এসেছে প্রয়োজনে পরামর্শ নিতে, কতক সংসারী বিষয় কি ভাবে সামলে নেবে তার উপদেশ নিতে।

প্রীতি হাই তুলল। ক্লান্তি ও অনিদ্রার দরুণ তার মাথা ধরেছিল। কপালের রগে আঙুল টিপে প্রীতি বলল, 'আমায় একটু জল খাওয়াবি, ইতি?'

নিতাইনন্দর ঘরে জলের ব্যবস্থা ছিল না। ইতি ঘরের চারপাশে তাকিয়ে দেখল। বলল, 'কি করে খাওয়াব, জল কই।'

'বাইরে গিয়ে দেখ না।'

'না বাপু, বাইরে ওই সাত মানুষের ভিড়ে আমি যেতে পারব না।'

'আচ্ছা, তোর আবার সব তাতেই বাড়াবাড়ি।' প্রীতি সামান্য বিরক্ত হল, 'কানুকে বল।'

ইতি কানুকে ডাকল। বাইরে ছাদে কানু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই বিচিত্র বাড়িটা দেখছিল। এ বাড়ির সবটাই তার কাছে রহস্য বলে মনে হচ্ছিল। কে কোথায় কোন ঘরে থাকে, কোথায় শোয়, কি খায়, কি করে—কানু ভেবে পাচ্ছিল না। ছাদের মাথার উপর আকাশটা ছোট, রোদ চড়ে আছে, ও-পাশের আলসের কাছে গিয়ে দাঁড়ালে নোঙরা ফেলা মাঠটা চোখে পড়ে। দু চারটে গাছও দূরে ওই মাঠে চোখে পড়ছিল কানুর।

ছোড়দির ডাকে সাড়া দিয়ে কানু ঘরে এসে দাঁড়াল। ইতি বলল, 'এই, নীচে গিয়ে এক গ্লাস—না বাপু তুই এক ঘটি খাবার জল আনতে পারবি। আমারও খুব তেষ্টা পেয়েছে।'

কানু মাথা নাড়ল। জল আনতে পারবে। মাথা নেড়ে কানু চলে যাচ্ছিল, ইতি বাধা দিল।

'কার কাছে চাইবি?' ইতি জিজ্ঞেস করল।

'লোকের কাছে।'

'লোক ত সবাই। শোন, ওই যে চাকরটা আমাদের বিছানা বাক্স তুলে দিয়ে গেল, তাকেই গিয়ে বলগে যা। বলবি, এক ঘটি খাবার জল আর-একটা গ্লাস দিতে।'

কানু চলে গেল। ইতি গায়ের আঁচল আলগা করে একটু বাতাস খেল। মাথার চুলের মধ্যে কয়লার গুঁড়ো জমেছে, চুলকোচ্ছিল। খোঁপা কটা খুলে নিয়ে মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলল, 'কখন মোসোমশাই আসবে কে জানে! ততক্ষণ এই ভাবে বসে থাকব।'

'উপায় কি।' প্রীতি জবাব দিল।

'আমাকে একবার বাথরুমে যেতে হবে।'

'জ্বালাস না আর।' প্রীতি বিরক্ত হয়ে বলল। 'আমার সারা গা নোঙরায় ঘিন ঘিন করছে, হাত মুখ ধুতে পারলেও বাঁচতাম।'

ইতি মাথা চুলকোতে চুলকোতে কি ভেবে হঠাৎ বলল, 'মোসোমশাই কি কাজ করে রে, দিদি?'

প্রীতি সঠিক ভাবে জানত না। বলল, 'শুনেছিলাম ত, কোথায় যেন খাজাঞ্চির কাজ করে।'

'কিসের কাজ?'

'খাজাঞ্চির। টাকা পয়সা জমা রাখা, দেওয়া থোওয়ার কাজ।'

'নিজে খুব কৃপণ, না—?'

'কৃপণ? কেন?'

'এই ঘরটা দেখ না। কি ঘর। কতটুকু! একে বারে নেড়া।' ইতি বলল, বলে ঘরের চারপাশে চোখ ফেলে এই ঘরের দীন হীন চেহারাটা যেন ইঙ্গিতে দিদিকে দেখাচ্ছিল।

প্রীতি কয়েক মুহূর্ত কোনো কথা বলল না। মোসোমশাইয়ের ঘর দেখে প্রীতিরও এ-কথা মনে হয়েছে, সে যা ভেবেছিল, আশা করেছিল, মোসোমশাই তা নয়। এত দরিদ্র শ্রীহীন ঘরে মোসোমশাই জীবন কাটান প্রীতি ভাবে নি। কল্পনাও করে নি। এখন যেন মনে হচ্ছে, না এলেই ভাল ছিল, মোসোমশাই হয়ত বিব্রত বোধ করবে।

'একা লোক—' প্রীতি বলল, যেন মোসোমশায়ের সম্মান বাঁচানোর জন্যেই বলল, 'একা লোক, কতটুকুই বা দরকার। তাছাড়া সাতকুলে ত কেউ নেই। এইভাবে কাটিয়ে দিচ্ছে।'

ইতি তাদের মোসোমশাইকে না দেখেছে এমন নয়; ঘনিষ্ঠ করে জানার সুযোগ তার হয়নি, সে মন বয়সও তার তখন ছিল না। মা মারা যাবার সময় ইতির বয়স ছিল চৌদ্দ, মোসোমশাইকে তখন যতটা দেখেছে ইতি তাতে মানুষটিকে খুব চুপচাপ শান্ত গম্ভীরই দেখেছে। দেখেছে মার পাশে বসে বসে হয়ত ঠাকুর দেবতার কথা বলছে না হয় কোনো পুরোনো কথা যা ইতির বোধ ও জ্ঞানের অগম্য।

কিছু বোধ হয় বলতে যাচ্ছিল ইতি, গোবিন্দ খাবার জল নিয়ে ঘরে এল। মেঝের খাবার ঘর থেকে জলের জাগটাই নিয়ে এসেছে, গ্লাসও।

প্রীতি জল পেল প্রথমে। গলা যেন শুকিয়ে ছিল এতক্ষণ। জল খেয়ে তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলল।

ইতি বেশী জল খেল না। জলঘরে না গিয়ে বেশী খেতে তার ভরসা হল না।

গোবিন্দকে বোধ হয় সন্তুষ্ট করার জন্যে প্রীতি বলল, 'তোমার বড় খাটাচ্ছি, না—? কি নাম তোমার?'

নাম বলল গোবিন্দ। উপাধি সমেত।

'তুমি কৈবর্ত্য?'

খুশীর মুখ করল গোবিন্দ। বলল, 'এখন বেসবাড়ির চাকরবাকরি করি, দিদিমণি।'

'দেশ কোথায়?'

'খাঁকুড়া।'

ইতি পাশের পাতা পর্যন্ত কাগজ টেনে নিয়ে চুপ করে শুনছিল কথাবার্তা। বলল, 'ও বাড়িতে কজন থাকে?'

'জন আঠারো।'

'আ-ঠা-রো! ও বাব্বা!...অনেক তাহলে। কখানা ঘর গো?'

'সাত আটটা ঘর।'

'বাবুরা চাকরি করে বুঝি?'

'আজ্ঞে ব্যবসাও করেন দুএক জন।'

বলব কি বলব না করেও ইতি বলে ফেলল, 'এখন কি সব খালি?'

মাথা নাড়ল গোবিন্দ: না খালি নয়। তবে, এখন দুচার জন বাবুই আছেন, বাকি সব কাজেকর্মে।

প্রীতি ছোটবোনের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছিল। অথচ তার যাবার আগ্রহ ছিল না, কি বলে কথাটা বোঝানো যায়।

'তোমার এ বাবুর আসতে কটা বাজবে?' প্রীতি শুধলো।

'বারোটার আগে বড় ফেরেন না, বাবু।'

'বারোটা।... এখন কটা বাজে?'

'সাড়ে দশটা হবে।' গোবিন্দ হিসেব করে নিয়ে বলল।

প্রীতি দেখল, এই মহলা জামা কাপড়ে, সর্বাঙ্গে নোংরা মেখে বেলা বারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করা মুশকিল। আর অপেক্ষা করলেই সব কিছুর সুরাহা সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যাবে না। সামান্য ইতস্তত করে বলল, 'আমরা সমস্ত রাত গাড়িতে এসেছি ঠায় বসে। কালিঝুলিতে গা ভরতি, মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে। কোথাও যদি চানটানের ব্যবস্থা হয়, গোবিন্দ, সেঁচে যাই।'

গোবিন্দ যেন এতক্ষণ এই কথাটা বলার জন্যেই অপেক্ষা করছিল। বলল, 'চারুবাবু সব বন্দোবস্ত করেই দিয়ে গেছেন। পাশের বাড়িতে দাই দিদিমণি থাকেন। সেখানে বলে দিয়েছেন:'

প্রীতি ইতি দুজনেই অবাক। তারা ভাবেনি, এর মধ্যে কেউ তাদের স্নানটানের ব্যবস্থাও করে দিয়ে থাকতে পারে। আশ্চর্য!

'কোন বাবু?' প্রীতি জিজ্ঞেস করল।

'চারুবাবু।' গোবিন্দ জবাব দিল। ওই যে বাবু আপনাদের সঙ্গে কথা বললেন—সেই বাবু। ও বাবু সব বন্দোবস্ত করে দিয়ে গেছেন।'

ভদ্রলোককে প্রীতির এতক্ষণে মনে পড়ল। ও বাড়িতে পা দিয়ে ওই লোকটির মুখ না দেখলে কথা না শুনলে প্রীতি সাহস করে ঢুকতেই পারত না।

চারুবাবুর কাণ্ডজ্ঞান দেখে আপাতত খুশী হল স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। ইতি দিদির চোখে চোখে তাকিয়ে ইশারায় যেন বলল, তবে চল না দিদি—ও-পাট চুকিয়ে আসি।

প্রীতি বিছানার ওপর থেকে উঠে দাঁড়াল।

। চার ।

নিত্যানন্দ তখনও অবাক। পায়ে হাত রেখে প্রণাম সেরে উঠে দাঁড়াল প্রীতি।

'এ কি! তোমরা!' নিত্যানন্দ বিমূঢ়। 'হঠাৎ—?'

ইতি সেই অবসরে মেসোমশাইকে প্রণাম করে নিল। কাকুও পা ছুঁয়ে নিয়েছে।

'আমরা সকালে এসেছি' প্রীতি বলল, 'স্টেশন থেকে আপনার মেস খুঁজে আসতে কত হয়রানি।

নিত্যানন্দ খাবার ভাল করে বড়র মুখ দেখলেন।

বিশ্বাস করা মুশকিল, কিন্তু চোখের সামনে যারা দাঁড়িয়ে আছে তারা যে রক্তমাংসের মানুষ সে বিষয়েও সন্দেহ নেই।

'গলির নাম বললেই নিয়ে আসত।' নিত্যানন্দ বললেন, 'আমার ঠিকানা তোমাদের কাছে ছিল ত।'

'ছিল, তারপর কোথায় হারিয়ে ফেলেছিলাম।' প্রীতি জবাব দিল, 'আবার যা মনে ছিল সেই ভরসা করে বেরিয়ে পড়েছিলাম।'

গলার জামাটা খুলতে লাগলেন নিত্যানন্দ। অতটা দূরে থেকে হঠাৎ তাঁর এই দুটি আত্মীয়া মেয়ে কেন এসেছে তিনি বুঝতে পারছিলেন না।

'আমার আগে একটা চিঠি লিখলে না কেন?' নিত্যানন্দ জামা খুলে ফেললেন।

প্রীতি সে কথার জবাব দিল না। অনেক দিন পরে মেসোমশাইকে আবার সে দেখেছে। আগের তুলনায় এখন যেন আরও একটু বেশী বয়স হয়েছে মনে হয়। নতুন আর সব আগের মতই। গলার স্বরও তেমনি আছে।

ইতির কাছে নিত্যানন্দ তখনও আত্মীয়ের মতন হয়ে ওঠে নি। অপরিচিত লাগছিল। মনে হচ্ছিল, ইতি যেন ওঁকে পথে ঘাটে দেখে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রীতি বলল, 'আপনার ফিরতে এত বেলা হয়, মেসোমশাই?'

'রোজ হয় না। আজ কাজেকর্মে খানিকটা দেরী হয়ে গেল।'

'স্নান যাওয়া করে আবার বেরোবেন?'

'অল্প বিশ্রাম নিয়েই বেরুব।'

'কখন ফিরবেন?'

'সন্ধ্যেবেলা। তা তোমরা ত দেখছি স্নানটান করে ফেলেছ?'

'হ্যাঁ। পাশের বাড়ি থেকে স্নান করে এসেছি।'

নিত্যানন্দ অবাক হয়ে তাকালেন। এই বাড়িতে পা দিতে না দিতেই পাশের বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক পাতাল কী করে ওরা।

মেসোমশাইয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে প্রীতিটা প্রশ্নটা বুঝতে পারল। বলল, 'আপনাদের, মেসবাড়ির যে চারুবাবু আছেন, তিনি ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

'চারু—!' নিত্যানন্দ যেন আপন মনে বললেন, দু মুহূর্ত বুঝি চুপচাপ, তারপর একটু যেন হাসলেন হালকা করে, 'তাই ত ভাবছি, এই ঘাট হট্টগোলে পা দিয়ে হঠাৎ তোমরা এমন কিটফাট হতে পারলে কি করে। ভাত খেয়েছ?'

'গোবিন্দ বলেছিল খেতে; খাই নি এখনও।'

'কেন, খেয়ে নিলে না কেন! অনেক বেলা হয়ে গেছে।'

'বা, আপনি ফিরলেন না, আমরা খেয়ে দেয়ে বসে থাকি।' প্রীতি এত আন্তরিক সরল গলায় বলল কথাটা যে নিত্যানন্দ দু দণ্ড মেয়ের মুখের দিকে অপলকে চেয়ে থাকলেন।

যথেষ্ট বেলা হয়েছে, দেখে নিত্যানন্দ তাঁর গামছা কাপড় সংগ্রহ করে নিতে নিতে বললেন, 'তাহলে চানটা সেরে আসি।···কানু খেয়েছে?'

প্রীতি মাথা নাড়ল, কানু খেয়েছে।

নিত্যানন্দ স্নান করতে চলে গেলে ইতি অন্যমনস্ক গলায় বলল, 'দিদি, মেসোমশাই যেন খুশী হলেন না।'

ছোট বোনের ঈষৎ ক্ষুব্ধ মনের দিকে তাকাল প্রীতি। কি দেখে ইতি বুঝল মেসোমশাই খুশী হন নি?

'কেন, কি দেখে বুঝলি? প্রীতি প্রশ্ন করল।'

'মনে হল। খুশীর মুখ ত দেখলাম না।'

'মেসোমশাইয়ের মুখ ওই রকম। লাফালাফি করে খুশী বোঝান না। তাছাড়া অবাকও হয়েছেন খুব।' প্রীতি বলল। তার মনে হল, তাদের এই অবস্থায় আচমকা দেখে মেসোমশাই যতটা অবাক হয়েছেন ততটা বিব্রতও হয়েছেন। বিব্রত হয়েছেন, এই বারোয়ারী মেস বাড়িতে তিনি কি করে মেয়ে দুটিকে রাখবেন সেই চিন্তায়।

প্রীতি নিজেও বিব্রত বোধ করছিল। সে মেসবাড়ি আগে দেখে নি; শুনেছে অনেক। আসবার আগে তার এমন কথা মনে হয় নি যে, আচমকা কোনো লোক গিয়ে পড়লে মেসবাড়ির আত্মীয়কে এমন বিপদে পড়তে হয়। প্রীতির ধারণা ছিল, বারোয়ারী বাড়ি এবং সংসার হলেও দু এক রাত মাথা গোঁজা যায় এমন ব্যবস্থা নিশ্চয় হবে। হাত করেক জায়গা, একটু জল-কলের আলাদা ব্যবস্থা যে মেসবাড়িতে হয় না প্রীতি অত ভাবতে পারেনি। এখন মনে হচ্ছে, যত দায়ে পড়েই হোক না কেন, প্রয়োজন

যতই থাকুক, এ-ভাবে এসে সে মেসোমশাইকে খুবই বিপদে ফেলেছে। কিন্তু এখন আর উপায় কি!

'তুই যতই বলিস আমার ভাল লাগছে না।' ইতি বলল। 'এখানে একটা দিনও কাটাতে পারবি না তুই।'

'আমার পারতে আটকাবে না। তুই পারলেই হল।' প্রীতি বিরক্ত হয়ে বলল।

প্রীতি হয়ত ঠিকই বলেছিল। খাওয়া দাওয়া সারা হলে নিত্যানন্দর সঙ্গে বসে কথা বলতে বলতে বোঝা গেল তিনি এই দুটি অপরিচিত মেয়েকে হঠাৎ নিজের ঘরে দেখতে পেয়ে বিব্রত হয়েছেন, অসুখী হন নি। বিব্রত হয়েছেন, এদের কোথায় রাখবেন, কি ভাবে রাখবেন সেই চিন্তায়। দুটি মেয়েই সোমত্ত, দুটিই অবিবাহিত। যে স্বতন্ত্র ব্যবস্থাটুকু এদের জন্যে দরকার এই বাবু মেসে তার ব্যবস্থা হওয়া অসম্ভব। তা ছাড়া নিত্যানন্দ নিজেও এই মেসে খুব একটা গা জড়াজড়ি করে থাকেন না। অসদ্ভাব কারও সঙ্গে নেই, অন্তরঙ্গতাও নয়। মেসের লোক কি বলবে, কি ভাববে, কোনো সুযোগ সুবিধে চাইলে দিতে রাজী হবে কি না—কে জানে!

নিত্যানন্দর মনে পড়ল, এই মেসে আর মাত্র একবার একটি মেয়ে এসেছিল। ভবনাথের বউদি জয়া। ভবনাথের অসুখটা এমন বেঁকা পথ ধরল যে, তার জন্যে ওর বাড়ির লোককে আনতে হয়েছিল।

জয়া আসায় মেসের বাসিন্দেরা কোনো আপত্তি করে নি। কেননা জয়া এসে তাদের নানা দায়-দায়িত্ব, সেবা শুশ্রূষার হাত থেকে বাঁচিয়েছিল। পুরো একতলাটা ছেড়েই দিয়েছিল যেন জয়ার জন্যে। যথা সম্ভব সুব্যবস্থা করে দিয়েছিল।

এই সব উচিত কাজ করা সত্ত্বেও মেসের কেউ কেউ অনুচিত কাজও করেছে। তারা জয়া এবং ভবনাথকে নিয়ে মুখরোচক গল্প তৈরী করেছে, পরস্পরের সঙ্গে লাগি তামাশা করেছে, এবং একটা ক্ষীণ কেচ্ছার কাহিনী জন-শ্রুতির মতন করে ছড়িয়ে দিয়েছে চুপিচুপি।

এই মেসে যারা আছে তারা সবাই চারু নয়, সবাই রাধিকাবাবু নয়। নিত্যানন্দের দুশ্চিন্তা হচ্ছে, কেমন করে তিনি এই মেসে এতগুলো পুরুষের চোখের সামনে দুটি সোমত্ত মেয়ের মান-সম্ভ্রম ব্যক্তিগত গোপনতা বজায় রাখতে পারবেন!

আপাতত এই সমস্যা নিয়ে তিনি মনস্থির করে ভাবতে পারছিলেন না। পরে ভাববেন। এখন দুটি মেয়ের হঠাৎ এখানে এসে হাজির হবার কথা শুনছিলেন।

মেঝেতে মাদুর পাতা। প্রীতি মাথার বালিশটা পেতে দিয়েছিল, নিত্যানন্দ শোন নি; হেলান দিয়ে বসে আছেন। একপাশে প্রীতি অন্যপাশে ইতি। কানু ঘর থেকে পালিয়ে গেছে, হয় ছাতে না হয় নীচে।

প্রীতির কথা শুনতে শুনতে নিত্যানন্দ বললেন, 'কিন্তু নিজের জায়গা ছেড়ে অন্য কোথাও থাকবি কি করে?' কথার ভাব ভঙ্গি থেকেই বোঝা যায় নিত্যানন্দ ইতিমধ্যে তাঁর বিব্রত এবং আড়ষ্ট ভাব অনেকটা কাটাতে পেরেছেন, সম্পর্কের দূরত্ব থেকে আত্মীয়ের ঘনিষ্ঠতায় আসতে পেরেছেন! তিনি প্রীতির সঙ্গে 'তুই' করে কথা বলতেও অসুবিধে বোধ করছেন না।

'আমাদের এখন পরের জায়গাই ভাল।' প্রীতি বলল, 'নিজের জায়গায় আর থাকতে ইচ্ছে নেই।'

'তা বললে কি চলে রে!···ওই জায়গায় ত এতকাল কাটল।' নিত্যানন্দ বোঝাবার চেষ্টা করলেন।

'এতকাল মাথার ওপর লোক ছিল, এখন কেউ নেই।'

'মাথার ওপর লোক না থাকে, তবু তোদের জানা-শোনা পরিচয়ের লোক ছিল।'

'তারাই ত এখন এমন ব্যবহার করছে।' রাগ এবং ক্ষোভের গলায় প্রীতি বলল।

'কি?' নিত্যানন্দ জানতে চাইলেন।

দু চার কথায় এ-জিনিস বোঝান যায় না। তা ছাড়া সব কথা খোলাখুলি এখন বলাও সম্ভব নয়। প্রীতি ভাবল সামান্য, বলল, 'আমাদের ওখানে কি বা আছে!'

নিত্যানন্দ এবার আশ্চর্য হলেন। চোখ তুলে, বললেন, 'কেন, ঘরবাড়ি, জমি জায়গা।

'ঘরবাড়ি বাবা আগেই বেচে দিয়েছিলেন।'

বলত বেচে দিয়েছিল প্রীতির বাবা। কই নিত্যানন্দ ত শোনেন নি। প্রীতির মা কথাটা কখনও বলে নি। 'কবে বেচল! আমি কিছু জানি না। তোর মাও বলে নি।'

বাবার অসুখের আগেই ওটা বেচে দিয়েছিল বাবা। বেচেছিল তার যুবতুতো ভাইয়ের কাছে।

'শান্তিপুরের সেই ভাই!'

'হ্যাঁ।'

'তিনি ত লোক ভাল শুনেছিলাম।'

'ভালই। এতকাল থাকতেও দিয়েছিল।...এখন নিজের অবস্থাও পড়ে গেছে ওটা আর কাউকে বেচে দিতে চান।'

'ও!' নিত্যানন্দ যেন ব্যাপারটা কিছু অনুধাবন করলেন। সামান্য থেমে শুধোলেন, 'তোদের জমি জায়গা?'

'জমি জায়গার জোরেই পেট চলছিল। কিছু কিছু তার ছাড়তে হয়েছে। বাকি যা আছে তাতে আর কদিন চলবে!'

সমস্যাটা যেন ওপর ওপর নিত্যানন্দ বুঝতে পারলেন। প্রীতির বাবা বসত বাড়ি বেচল; জমি জমা রাখল—এর কারণ নিত্যানন্দ ঠিক মতন বুঝতে পারলেন না। তবে একটা সন্দেহ তাঁর থাকল।

প্রীতি বলল, 'মারা মারা যাবার পর—আমাদের বাবার ওপর কারা যেন লোকে এখন নানা ভাবে লেগেছে।... এই সেদিনও...'প্রীতি বলতে গিয়ে থেমে গেল। ইতি তার দিকে চেয়ে রয়েছে। ইতির মুখের ভাবে হঠাৎ যেন কেমন অস্বস্তি আর লজ্জা লেগেছে।

নিত্যানন্দ অপেক্ষা করলেন। প্রীতির মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি ঘটনা দেখতে পেলেন, দেখতে পেলেন প্রীতি ইতির দিকে চোখ রেখে চুপ করে আছে। ইতিকে সামান্য লক্ষ্য করলেন নিত্যানন্দ।

প্রসঙ্গটা যে কিসের অনুমান করে নেওয়া যায়। নিত্যানন্দ অনুমান করে নিলেন, ইতিকে নিয়ে কোনো ইতরতা করেছিল কেউ। অসম্ভব নয়। বাবার ওপর অভিভাবকহীন দুটি যুবতী মেয়ে থাকলে প্রতিবেশীরা কিছু ইতরতা করবেই।

'তোদের না কোথায় একটা বাড়ি ছিল দাদুর!'

'নবদ্বীপে।'

'সে বাড়িতে কারা আছে এখন?' নিত্যানন্দ চিন্তা করছিলেন।

'ভাড়াটে ছিল। মাসে মাসে ভাড়ার টাকা আসত মামার কাছে। আজ দু-মাস ভাড়া পাই না। ভাড়াটেরা চলে গেছে।' প্রীতি বলল, বলে সামান্যক্ষণ চুপ করে থাকল, তারপর তার উদ্দেশ্য জানাল, 'আমরা নবদ্বীপে গিয়েই থাকব ঠিক করেছি! আপনাকে মেসোমশাই, আমাদের যাওয়া টাওয়া থাকার ব্যবস্থা করে দিয়ে আসতে হবে।'

প্রীতিদের এখানে আসার উদ্দেশ্য নিত্যানন্দ এতক্ষণে স্পষ্ট করে জানতে পারলেন। ওরা ওদের পুরোনো জায়গা ছেড়ে নতুন জায়গায় চলে যেতে চায়। এতকাল যেখানে কাটালো সেখানের প্রতি নানা কারণে ওরা বিরক্ত, বীতরাগ। নিত্যানন্দ সঠিকভাবে ওদের বিরক্তির কারণ জানেন না। তবে কথাবার্তা থেকে মনে হচ্ছে, প্রীতিরা বেশ বিপদেই পড়েছে। বসত বাড়ি অন্যের হাতে, জমি-জায়গার আয়ও বোধ হয় সংক্ষিপ্ত হয়ে এসেছে, দেখা শোনার লোকই বা কোথায়, নিজেদের কোন অভিভাবক নেই, পাড়া প্রতিবেশীদের সঙ্গে তেমন সদ্ভাব ওরা রাখে নি, হয়ত এই অবস্থার ওদের অসহায় পেয়ে কেউ কেউ দুর্ব্যবহারও করছে। প্রত্যহের এই অশান্তি এবং অস্বস্তি থেকে প্রীতিরা অন্য কোথাও পালিয়ে যেতে চায়।

ধীরে সুস্থে সমস্ত ব্যাপারটাই নিত্যানন্দকে খুঁটিয়ে ভাবতে হবে। এখন নয়। এখন অত ভালমন্দ তিনি ভাবতে পারছেন না।

'নতুন জায়গাতে কি আরও অসুবিধে হবে না রে?' নিত্যানন্দ বললেন। বলার সময় ইতির দিকে তাকালেন। ইতি কোনো কথা বলছে না, চুপ করে আছে।

ইতি নীরবই থাকল। জবাব দিল প্রীতি। বলল, 'অসুবিধে কি! জায়গাটা শুনেছি ভাল।...আপনি মধ্যে মধ্যে যাবেন আসবেন। আমরা থাকতে পারব।'

নিত্যানন্দ এই মুহূর্তে আর কিছু বললেন না। পরে তিনি ভেবে দেখবেন। একটা সংসারকে এক জায়গা থেকে তুলে আরেক জায়গায় নিয়ে গিয়ে বসানো মুখের কথা নয়। হঠকারিতা করার বয়সও তার নয়।

সোজা হয়ে বসতে বসতে নিত্যানন্দ বললেন, 'আমি তা হলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ি। কাজকর্ম চুকিয়ে বেলাবেলি ফিরতে পারলেই ভাল। তোদের একটা

থাকার ব্যবস্থা করতে হবে।'

প্রীতি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। বাবা ফোনে যে নিত্যানন্দের কথায় সম্মতি দিল। ইতি তাই ভুলছিল। ঘুমে তার চোখ বুজে আসছে। বেসোরখাই চলে গেলে ইতি এই মানুষের ওপর শুয়ে ঘুমোবে, যতক্ষণ না ঘুমের নেশা কাটে ততক্ষণ।

কানু বাইরে থেকে এসে ঘরে ঢুকল। কলতলায় বোধ হয় আছাড় খেয়েছে। প্যান্ট জামায় কলতলার নোংরা। হাতেও লেগেছে। কোনো রকমে কষ্ট দমনে কানু দিদির কাছে এসে দাঁড়াল।

॥ পাঁচ ॥

তেতলাটা ছেড়ে দিলেই সমস্যা মিটত। কালিদাস মাস্টার আর অগেন-এর ঘরটা পেলেই মেয়ে দুটি থাকতে পারত। তা ছাড়া তেতলাটা আলাদা হলেই থাকত, মেয়েদের অসুবিধে হত না। এক স্নান ও কলঘর। পাশের দাই দিদিমণির বাড়িতে চানু সে ব্যবস্থা করে দিতে পারত কালিদের জন্যে।

অথচ কালিদাস মাস্টার রাজী হওয়া সত্ত্বেও অগেন পাঠক হল না। সে ঘর ছাড়বে না। কমলেশও তাতে যোগ দিল। না, এই পাজুদে মানুষের মেস বাড়িতে মেয়েদের থাকা যায় না। এক বাড়ি এক সিঁড়ি একই জল কল, ছোঁওয়া ছুঁয়ি হয়ত হল না, কিন্তু কে কোথায় তাকাল উঁকি দিল, কার হাসি ঠাট্টা জোর হল—তাই নিয়ে পরে কথা উঠবে, নিত্যবাবু বলবেন তাঁর ঘরের মেয়েদের ইজ্জৎ নষ্ট করেছে অগেন। এই সোলবাদের মধ্যে ওরা কেউ যেতে রাজী না।

তা হলে ওরা যাবে কোথায়? থাকবে কি করে?

থাকার সমস্যা সমস্যাই নয়। কেন, শহরে অনেক 'তৃপ্তি নিবাস' হোটেল রয়েছে। সেখানে কত লোক বউ মেয়ে নিয়ে এসে ওঠে দু-চার দিনের জন্যে। নিত্য বাবু 'তৃপ্তি নিবাসে' গিয়ে ঘর ভাড়া করে রাখুন তাঁর শালীর মেয়েদের। পয়সা ছড়ালে আবার থাকার অভাব।

কমলেশের ঘরে সন্ধ্যে বেলায় কয়েক জনে মিলে মিশে ঠিক করে ফেলল, নিত্যবাবুকে এই বেলা পরিষ্কার কথায় জানিয়ে দেওয়া ভাল। কারণ সন্ধ্যে হয়ে গেছে, এবার রাত হলেই হয়ত বাসনা ধরবেন নিত্যবাবু।

কমলেশ নিজেই উঠল। গোবিন্দকে দিয়ে নিত্যবাবুকে ডেকে পাঠানোর চেয়ে তার নিজের যাওয়াই ভাল।

অগেনও উঠে দাঁড়াল। কমলেশ অগেনকে উঠতে দেখে বিরক্ত হল। বলল, 'তুমকে যাবার দরকার নেই। আমিই যাচ্ছি।'

অগেনের ইচ্ছে ছিল সেও যাবে। দুপুরে অনেক বকা নিত্যবাবুর শালীর মেয়েদের সে নিজের ঘর থেকে বেরোতে, নিজের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে দু-পাঁচবার কেশেছে, কিন্তু মেয়ে দুটোর একটাও কোনো রকম সাড়া শব্দ করে নি। বিকেল হলে ছাদে ঘন ঘন বেরিয়ে এসে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গোবিন্দকে ডেকেছে, তবু ও-তরফ নির্বাক। ছোট মেয়েটাকে ছাদে দু লহমা একবার চোখে চোখে দেখতে পেয়েছিল অগেন। মেয়েটা অগেনকে দেখল আর ঘরে ঢুকে গেল। তখন থেকেই অগেন চটে আছে। এত কি তোর ডাঁট রে। মেস বাড়িতে তেতলার অগেনের ঘরের মুখোমুখি থাকবি অথচ তাকাবি না! নিত্যবাবুর সামনে দাঁড়িয়ে বেশ গলা লম্বা করে অগেন দু কথা শোনাবার বাসনায় ছিল। মেয়ে দুটো শুনুক, অগেন ইচ্ছে করলে তাদের তেতলায় থাকতে দিতে পারত, কিন্তু দেবে না। সে মেয়ে কেংসা নয়, এই কথাটা নিত্যর শালীর মেয়েদের বুঝিয়ে দিয়ে অগেন একটা কুণ্ঠিত লাভ করার বাসনা গোপন করছিল।

কমলেশের কথায় অগেন বিন্দু সন্দেহ করল। 'মানে—!'

'মানে, কি আবার। আমি ত যাচ্ছিই; পেছন পেছন আবার আপনি কেন!' কমলেশ বেশ বিরক্ত।

কলাটার ঠেস আছে বুঝে অগেন আরও চটে উঠল। 'আপনি যাচ্ছেন ত আমার কি! তেতলাটা কি আপনার জমিদারি?'

কমলেশ কেসে গেল। এই লোকটা প্রত্যহ, প্রতি ব্যাপারে তার সঙ্গে লাগবে। আজ সকালে লাগিয়ে ছিল, আবার এখন। কমলেশ চেঁচিয়ে বলল, 'এই মেসের আমি ম্যানেজার।'

অগেন এমন একটা তাচ্ছিল্যের মুখ ভঙ্গি করল, যার অর্থ, যা যে যা—আর ম্যানেজারি ফলাস না।

সুবল চক্রবর্তী—কমলেশের বন্ধুমেট—ওকালোসের

একপাশে বসে গোঁফ চুমরাচ্ছিল আয়না হাতে করে। বরেণ আর চক্রবর্তীর একপাশে বসেছিল, তারাও উঠবে উঠবে করছিল। খগেন কমলেশের বচনায় ব্যস্তই কান পাতল।

কমলেশ বলল, 'আমি মেয়ে ছেলে নই মশাই, যে সন্ধে বোতল নিয়ে গিয়ে কথা বলতে হবে।...যা বলার চন্দ আমি এখনো বলব না হয় বলব না।'

'বলবেন না ত বলবেন না। অত মেজাজের কি আছে?' খগেন নিজ মূর্তি ধারণ করল।

'আঃ, খগেন—!' দস্তিদার বলল, 'ও বলতে যাচ্ছে আজের কথা তুমি মাতখান থেকে লাফাচ্ছ, কেন! চন্দ ও বলে আসুক, না হয় তুমি নিজে গিয়েই বলে এস।'

'ঘর আমার। দিলে আমি ছেব, না দিলে দেব না। বলার রাইট আমার বেশী, না ওর?' খগেন বলল।

'ওরে, ঘর আমার!...আপনার ঘর কি করে, মশাই। ভাড়া আপনি একা দেন? কালিদাস থাকে না?' কমলেশ বলল।

'থাকে ত থাকে, তাতে কার কি!'

'কালিদাস থাকতে দিতে রাজী।'

'আমি রাজী নই।'

দস্তিদার এই বাজে ঝগড়া থামবার চেষ্টায় আবার বলল, 'দেখ খগেন, তুমি অযথা চন্দলা কর না। তোমার আপত্তির জন্যেই ওদের রাখা যাচ্ছে না। এখন এই কথাটা নিত্যবাবুকে চন্দ তুমি গিয়ে বলে এস, না হয় কমলেশ যাক।'

খগেন বোধ চন্দ কিছু বলতেই যাচ্ছিল, হঠাৎ সুবল চক্রবর্তী বলল, 'খগেনবাবু কুমীর কুমীর খেলছেন, এক পা জলে এক পা ডাঙায়। না কি, মশাই।'

সুবলের বিদ্রূপ যেন খগেনের গায়ে হুল ফুটিয়ে দিল। খগেন জ্বলে গেল। লাফাতে লাগল চেঁচাতে সুরু করল। তার মুখের কথাবার্তা অশ্রাব্য হয়ে উঠল। 'নিজের ঘুঁটো দেখুন মশাই, পরেরটা পরে দেখবেন। আপনি কোন ধুরিষ্ঠির খগেন পাঠককে তা জানাতে হবে না। ও সব বোল চাল আমি জানি। মাথায় টিকি—মুখে মালের গন্ধ আমি অনেক দেখেছি।'

সুবলের স্বভাব কমলেশের ঠিক আলাদা। সুবল কখনও হুস্ করে চটে যা। সে নিরীহ শান্ত ভেজা-বেড়ালের মতন গোঁবেচারী ভাব করে বসে থাকে, মাঝে মাঝে কথার জবাব দেয়। খগেনের চেঁচামেচি অশ্রাব্য গালাগাল শুনতে শুনতে সুবল বলল, 'দেখুন মশাই, আমাদের বাবা মা খারাপ কিনিসটা ছেলে বেলা থেকেই লুকিয়ে রাখতে শিখিয়েছে। আপনার মতন মহারাজ কজন হতে পারে।'

ঝগড়াটা এই ভাবে চলছিল। বরেণ হঠাৎ বাধা দিয়ে বলল, 'লাঠালাঠির দরকার কি, ভোট হয়ে গেলেই হয়।'

'ভোট।' কমলেশ যেন বুঝল না কথাটা।

দস্তিদার বলল, 'ঠিক বলেছে বরেণ। ভোট লাগিয়ে দাও। তোমাদের এই হ্যাঁ না আর ভাল লাগে না।... মেস ত কারো একার নয়, সবাই যদি বলে থাকবে তবে ওরা থাকবে, আপত্তি করলে চলে যাবে।' বলতে বলতে দস্তিদার উঠে পড়ল।

খগেন ক্ষেপার মতন বলল, 'ভোট ফোট আমি কেয়ার করি না। আমি আমার ঘর ছাড়ব না। দেখি কোন শালা ছাড়ায়।'

এই শালা শব্দটা নিয়ে আবার কমলেশের সঙ্গে খগেনের লেগে গেল। এবার দুই তোকারি দিয়ে সুরু হল।

'শালা বললে কাকে?'

'আমার যাকে খুশি তাকে।'

'মুখ সামলে কথা বল। নয়ত

'যা যা—! মুখ আবার কে সামলায়।'

'তোর বাবা সামলায়।'

অতঃপর একটা হাতাহাতি সুরু হয়ে গেল। রাধিকা-বাবু এ সময় এসে না পড়লে হাতাহাতিটা রক্তপাতে গিয়ে দাঁড়াতে পারত।

চারু ফিরতে প্রায় আটটা বাজল।

মেসের দরজায় সাইকেল রিকশা, পর পর দুটো, গলিতে মিউনিসিপ্যালিটির আলো টিম টিম করে জ্বলে। রিকশা দেখে চারুর হঠাৎ মনে হল, কি রে বাবা, আবার কেউ এল নাকি! পরে নিজেই কেমন মনে মনে হাসল। ভাবল, নিত্যদার শালির মেয়েরা কি তাদের

মেসোমশাইয়ের সঙ্গে পরের ঘরে বেড়াচ্ছে। কোথাও গিয়েছিল না কি? কি কোথাও যাবে?

কলতলায় পা দিল চারু। নীচের তলাটা বেশ ফাঁকা। ভদনাথবাবু নটা দশটার আগে দোকান থেকে ফেরে না বলে তার ঘর তালা বন্ধ পড়ে থাকে। ঠাকুর চাকরের ঘরও অন্ধকার। এক রান্নাঘরেই যা আলো একটু। ওখানে রান্না চলছে, তার সঙ্গে ঠাকুর আর গোবিন্দর কথপোকথন।

রান্নার গন্ধটা এই মেসে একই রকম, এই মেসে কলতলার গন্ধটাও বরাবর সমান। চারু গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে লাগল।

কয়েক ধাপ উঠতেই কানুকে দেখতে পেল। পুঁটলি হাতে কানু নেমে যাচ্ছে। অন্ধকারে পা পা করে সে নামছিল।

চারু দাঁড়াল। নিত্যানন্দর আত্মীয়রা তবে চলে যাচ্ছে! আজ এসে আজই আবার।

'কি খোকা, কোথায় যাচ্ছ?' চারু দাঁড়িয়ে পড়ে জিজ্ঞেস করল।

কানু পুঁটলি হাতে দাঁড়িয়ে। মুখে কথা নেই।

'বাড়ি ফিরে যাচ্ছ আবার?' চারু শুধোলো।

মাথা নাড়ল কানু। 'না।'

'তবে?' চারু অবাক।

'জানি না। মেসোমশাই নিয়ে যাচ্ছে।' বলে কানু একটু যেন কি ভেবে নিল। 'হোটেল বাড়িতে।'

'হোটেলে—' চারু খুবই অবাক অবাক হল।

কানু বলল, 'হোটেল বাড়িতে গিয়ে আমরা ভাত খাব।'

কিছু না, তবু চারুর মনে হল, যেন কেউ তাকে ভীষণ এই অসম্মান করল। কানুর পুঁটলি তেমন ভারী নয়। তবু অন্ধকারে ছেলেটা হুমড়ি খেয়ে পড়তে পারে ভেবে চারু কানুর পুঁটলি হাতে করে নীচে নামিয়ে দিল। বলল, 'এখন এখানে থাক, গোবিন্দ তুলে দিয়ে আসবে।'

সিঁড়ি বেয়ে চারু সোজা তেতালায় উঠে গেল। খগেনের ঘর বন্ধ। নিত্যানন্দর ঘরে লণ্ঠন জ্বলছে, কথা বার্তাও শোনা যাচ্ছে। আকাশটা হাল্কা, মেঘের ফাঁকে কোথাও চাঁদ উঠে আছে।

চারু নিত্যানন্দর ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। 'নিতাদা—!'

ভেতরে, কথাবার্তা থামল।

নিত্যানন্দ দরজার কাছে এসে চারুকে দেখলেন, দেখে বেরিয়ে এলেন। 'চারু যে!'

'কি ব্যাপার নিতাদা, আপনি নাকি হোটেলে চলে যাচ্ছেন?' চারু বলল।

'আমি! না ভাই, আমি না। আমার দু তিনজন লোক—ও, তোমায় আর বলছি কেন, তুমি ত জানোই—ওই ওরা এসে পড়েছে হঠাৎ, তাই ওদের থাকার ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি।' নিত্যানন্দ বললেন।

'তা হোটেলে কেন?'

'এখানে থাকবে কোথায়?'

'এখানে'—চারু কি বলতে গিয়ে থামল। ভাবল কিছু। তেতলাটা দেখল চোখ বুলিয়ে। 'ওপরে থাকতে পারতেন।'

'না—না। তাতে সকলেরই অসুবিধে হত।'

'সুবিধের জন্যে ডাকবাংলো আছে। যারা সুবিধে চায় তারা ডাকবাংলোয় চলে যেত।'

নিত্যানন্দ তাড়াতাড়ি চারুকে বাধা দিলেন। একটা গণ্ডগোল মিটতে সারা সন্ধ্যে কেটেছে, আবার কি চারু আর এক গণ্ডগোল বাধাবে। নিত্যানন্দ বললেন 'তুমি আর এ নিয়ে চেঁচামেচি করো না। একটু আগে অকারণে খানিকটা অশান্তি হয়ে গেছে।'

ছাদে দাঁড়িয়ে চারু নিত্যানন্দর অস্পষ্ট মুখ লক্ষ্য করল। মেসে এরই মধ্যে একটা গণ্ডগোল হয়ে গেছে শুনে চারু বুঝতে পারল, নিতাদা সেই অশান্তি আর অশান্তির ভয়ে এই মুহূর্তে মেস থেকে তাঁর আত্মীয়দের সরিয়ে ফেলছেন। কানুর কথা মনে পড়ল চারুর। কানু বলেছে, তারা হোটেল-বাড়িতে গিয়ে ভাত খাবে।

চারু বিরক্ত এবং আহত বোধ করল। যেন এই মেসে কোনো অনুচিত ইতর কাজ করা হয়েছে, যার অসম্মান তাকে পীড়িত করছে। কারা গণ্ডগোল করেছে চারুর জানতে ইচ্ছে হল, কিছুটা সে অনুমানও করতে পারল।

'কি বলেছে—?' চারু শুধলো।

'বলে নি কিছু। আমি ওদের চেঁচামেচি থেকে

বুঝতে পারলাম।' নিত্যবাবু চারুকে যেন এই ব্যাপারটায় গা না দিতে অনুরোধ করছেন এমন গলায় বললেন। 'ও-সব কিছু না, চারু। মেস বাড়িতে অসুবিধে হয়, তাই আর কি বলছিল।'

'কে বলছিল, কি বলছিল কি—?'

'আহা, আবার ও-সব কে কি কেন। যা না চারু কেউ ত আর অন্যায় অসভ্য কিছু বলে নি। মেস বাড়িতে সুবিধে অসুবিধে আছে ত! সকলের দিকটাই দেখতে হবে।' নিত্যানন্দ চারুর কাঁধে হাত দিলেন, নিষেধ করলেন কোনো গণ্ডগোল করতে। 'আমি নিজেই মেয়ে দুটোকে কোথাও রাখার কথা ভাবছিলাম। ওদেরও ত অসুবিধে।' বলে একটু থেমে তাঁর ব্যবস্থার কথা বললেন, 'জ্ঞানচাঁদ বাবুকে বলে এসেছিলাম আজ। কাল বিকেল নাগাদ তাঁর ওই মাঠ কুড়িয়ার বাড়ির ওপরটা পাওয়া যেত। ওখানেই নিয়ে যেতাম সব।'

'এখন হোটেলে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ। আজকের রাতটা আর কাল সকালটা কাটিয়ে দেওয়া।'

'তৃপ্তি-নিবাস কেমন জায়গা আপনি জানেন না, নিত্যদা।'

'শুনি জায়গাটা তেমন ভাল না। তবে একটা দিনে কি আর আসবে যাবে। আমি সঙ্গেই থাকব।' নিত্যানন্দ এমন গলায় বললেন যেন চারুকে আশ্বাস দিলেন।

চারু মাথা নাড়ল। 'এই শহরের যত গুণ্ডা বদমাশ তাদের ঘোরাঘুরি ওখানে, যত মাতাল আর খারাপ লোক তারা ওই হোটেলের ঘর ভাড়া করে রাখে। এই ত, দিন পনেরো আগে ওখানে একটা মারপিট হয়ে গেছে।'

নিত্যানন্দ অথবা চারু লক্ষ্য করে নি, তাদের কথাবার্তার মধ্যে প্রীতিরা দুই বোনে দরজার পাশে আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল। কথাবার্তা শুনছিল।

নিত্যানন্দ বললেন, 'ওই হোটেলে ত লোকে মেয়েদের নিয়ে এসে ওঠে ঠোঠে শুনেছি।'

'ওঠে। কিন্তু কেমন মেয়ে নিয়ে এসে ওঠে আপনি জানেন না, জেনে দরকারও নেই।' চারু বলল।

সামান্য চুপচাপ। নিত্যানন্দও ভাবছিলেন।

চারু বলল, 'একটা রাত ত আপনি এখানেও কাটাতে পারতেন।'

'এখানে—' নিত্যানন্দ ইতস্তত করলেন, 'এখানে মানে তেতলার কথা বলছ!...তেতলায় থাকা যেত। তবে খগেনের ব্যাপার...বুঝতেই পারছ, ভাই। ওর ব্যাপার ট্যাপার...'

চারু কি ভাবছিল, হঠাৎ বলল, 'ঠিক আছে। আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।' বলে চারু একটু হাসল, 'আপনি চুপি চুপি চোরের মতন পালাচ্ছেন যেন!...আমি ত ছিলাম, আমার জন্যে অপেক্ষা করলেই পারতেন।'

নিত্যানন্দ চারুর কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু দোতলার গোলমালটা এমন বিশ্রী ভাবে কানে আসছিল, হাতে সিগারেট তিনি যে সব কথাবার্তা আড়াল থেকে শুনলেন তাতে আর অপেক্ষা করার ইচ্ছে হল না।

চারু চলে যাচ্ছিল। নিত্যানন্দ বললেন, 'এখানে থাকা কিন্তু চলবে না, চারু।'

'এখানে কেন, আমি পাশেই থাকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।...বাইরে হাটুরে একেবারে শুতে পাঠাবেন ওদের।...ভিখারী দুটো ছেড়ে দি।'

নিত্যানন্দকে দ্বিতীয় কোন কথা বলার অবকাশ দিল না চারু, সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

হাতে নিত্যানন্দ দাঁড়িয়ে থাকলেন। বোকার মতন। প্রীতি ঘর থেকে বাইরে এল। ইতি চৌকাঠে এসে দাঁড়াল।

প্রীতি আচমকা বলল, 'পাশের বাড়ি মানে সকালে আমরা যেখানে স্নান করেছিলাম, মেসোমশাই? সেখানে?'

'কি জানি!' নিত্যানন্দ জবাব দিলেন, 'চারুই জানে।'

। ছয় ।

রাতের খাওয়া দাওয়া শেষ হলে চারু অনাথ কাঁটক ঘরে এসে বিড়ি ফুঁকছিল।

অনাথ বলল, 'তুই কোনো কথাটি বললি না, চারু! তাজ্জব ব্যাপার।'

'কি বলব! বললেই ঝগড়া।'

'ঝগড়াই ত চাইছিলাম।' কাঁটক চারুকে ধমক দিল যেন। 'একবার তুই কথাটা তুলতিস তারপর ওই শালা ছোটলোকগুলোকে দেখতাম।'

চারু বিড়িতে লম্বা করে টান দিল। কথা বলল না।

অনাথও বেশ অপ্রস্তুত। বলল, 'এই যে তুই কিছু বললি না, ওরা মাথায় উঠে থাকল।...পেছনে দেখগে গিয়ে কত হাসি ঠাট্টা করছে।'

'পেছনে করছে! পেছনে লোকে কত কি করে তা নিয়ে ঝগড়া করা চলে না। সামনে কিছু যদি বলত—।' চারু শান্ত গলায় বলল।

'তোর এই সব বোস্টমদিগ্যি রাখ।' ফটিক অসহিষ্ণু। 'এই বেসবাড়ি কি কমলেশ আর খগেনদের বাপের কাছারি না কি! ...বড্ড মাথায় উঠে যাচ্ছে ওরা।'

অনাথও ক্ষোভ জানাল। 'ছি ছি, শালা যত হাড় হাবাতজাদা কি এখানে এসে জুটেছে, মাইরি। দুটো মেয়েকে এক রাত থাকতে বেওরা নিয়ে ওরা এখন ইতরামি করল।'

ইতরামি যে করতে তাতে সন্দেহ নেই। চারুর ইচ্ছে হয়েছিল, এক চোট লাগিয়ে দেয়। এই যে অভব্যতা, স্বার্থপরতা, নীচতা—এর একটা মোক্ষম জবাব সে দিয়ে দেয়। কিন্তু আবার একটা নোংরামি নিজের থেকে শুরু করতে তার শেষ পর্যন্ত ইচ্ছে হল না।

ফটিক তার বিছানা পাতছিল। পাততে পাততে বলল, 'এই বেস ছেড়ে দেবার জন্যে কত করে বলছি তোদের, তোরা শালা গা পাস না। কি আছে এখানে। কোন মধুতে এঁটে আছিস জানি না, মাইরি।'

মধু কোথাও নেই। থাকার কথা নয়। একমাত্র এই মধু যে, ওরা তিন বন্ধু গত চার বছর এখানে এই ঘরে রয়েছে।

'বেস ছেড়ে যাবি কোথায়?' চারু শুধোলো।

'যাগিপনা করিস না।—'ফটিক চটে উঠে বলল, যাবি কোথায়! এই শহরে আর শালা যাবার জায়গা নেই।... তুই বেরেছেলে, না, আমি অনাথ মেয়েছেলে যে একটা থাকার ডেরা খুঁজে বার করতে পারব না!

অনাথ গায়ে গায়ে কথা বলল, 'আমি একটা জায়গা দেখে এলাম সেবার, কানেই তুললি না।'

'কি জায়গা দেখে এসেছিলি!' চারু ঠাট্টা করল।

'খারাপ জায়গা?'

'গোপা পাড়া।'

'উরে, গোপা আর মানুষ নয়। তুই একটি মানুষ।'

'আমি কি বলছি গোপা মানুষ নয়।...তুই আবার চেয়ে এই শহরে পাড়া বেপাড়া ভাল চিনিস, অনাথ?' চারু বলল।

'মিউনিসিপ্যালিটি আফিসে চাকরি করিস বলে তুই-ই সব চিনিস। আমরা কিছু চিনব না, না—।'

'হ্যাঁ, তুই কিছু চিনিস না। আমি যা বলছি, শুনে নে। ওই গোপা পাড়াটা ভীষণ খারাপ। এখানে প্রতি বছর যত কলেরা বসন্ত হয় সারা শহরে তার অর্ধেক হয় না।'

অনাথ অদ্ভুত এক মুখভঙ্গি করল। করে বলল, 'আর তোর এই পাড়া একেবারে স্বর্গপুরে। তোর এই বাবু মেস একেবারে ওয়ালডর্ফ অ্যাস্টোরের হোটেল।...এখানে থাকলে, আমি বলছি তোকে, যক্ষা হবে, টি বি; কে জানে আমাদের হয়েই গেছে কি না!' বলে অনাথ বার কয়েক পরীক্ষামূলক কাশল।

চারু অনাথের ভঙ্গি এবং ভঙ্গিমা দেখে হেসে ফেলল। ফটিকও হাসল।

হাসি থামলে ফটিক বলল, 'তুই যাই বলিস চারু, আমরা যে কোনো জায়গায় একটা ছোট ঘর ভাড়া করে থাকতে পারি। কি এমন সাংঘাতিক শক্ত কাজ সেটা।'

কথাটা চারু স্বীকার করল মনে মনে। বরাবরই করেছে। একটা ঘর এই সহরে যোগাড় করে নেওয়া তাদের পক্ষে শক্ত নয়। কিন্তু ঘর পেলেই কি খাওয়া যায়? গোপা পাড়ার দিকে অনাথ যে বাড়িটার কথা বলেছিল—সেটা বাস্তবিকই মন্দ ছিল না. কিন্তু বাড়িটা দূরে পড়ত, অনাথেরই দূরে পড়ত, ফটিকেরও। অনাথ চাকরি করে ট্রান্সপোর্ট সিণ্ডিকেটে; অর্থাৎ যে পাঁচ সাত জন ব্যবসাদাররা এই এলাকায় তিরিশ বত্রিশ মাইল জায়গা জুড়ে রোড বাস আর লরি চালায়, তাদের হেড অফিসে। অফিসটা সেই ছোট রেল ব্রিজের কাছে, মানে এখান থেকেও দেড় মাইল। চার দফা যাওয়া আসা অনাথের। যদিও সে পথে বাস বা লরি দেখতে পেলে চেপে বসে। তবু সব সময় এই সুবিধে অনাথ নাও পেতে পারে। অনাথের সাইকেলও নেই। বুঝে সুঝেই চারু তখন না করেছিল।...ফটিকের কথাও ভেবে দেখার। ফটিক কাজ করে কারখানায়; তারও সকাল বিকেল কারখানার কাজ। দূরত্বও কিছু কম না। চারু ভেবে দেখেছিল

খোপা পাড়ার দিকে অন্যবিধেই বেশী, তার বন্ধুদেরই। কাজেই বড় হতে নি।

ফটিকের বিছানা পাতা শেষ। তক্তপোশের বিছানাটা চারু পেতে নিয়েছে। বার কয়েক হাত পাখা বুকের কাছে পেড়ে নিয়ে অনাথ বলল, 'শোন চারু, আমি বলছি, এই পাড়া নরদমা থেকে চল আমরা কেটে পড়ি।'

'কেটে পড়, আমি কি না বলেছি।'

'তোর কোনো গরজ দেখি না।'

'গরজ করলেই সব কাজ হয়।'

'যা রে বা, গরজ করলে হবে না ত কি বিছানায় চিৎপাত হয়ে শুয়ে থাকলে হবে?'

ফটিক তার বেরেতে পাতা বিছানায় বসে হাত পাখার বাতাস খাচ্ছিল। বলল, 'তুই মনের মধ্যে ফিলিপি ভাবছিস কেন! অত প্যাঁচ বুঝি না। যা বলার ক্লিয়ার করে বল।'

বিছানায় শুয়ে পড়ল চারু। কড়ি কাঠের দিকে মুখ করল। হাঁটু ভেঙে এক পায়ের ওপর অন্য পা চাপাল। তারপর বলল, 'তোরা একেবারে বাচ্চাদের মতন কথা বলিস।'

'বাচ্চার মতন কথা—!' অনাথ প্রতিধ্বনি করে বলল।

'হ্যাঁ, বাচ্চাদের মতনই। একটা ঘর জুটোলেই সব হয়ে যাবে না। একটা চাকরও চাই, রান্নাবান্না প্লাস অন্য সব কাজ করবে। ঘর ভাড়া, চাকরের মাইনে, তার খাওয়া খরচ, তার সঙ্গে আমাদের খাওয়ার খরচা ও সব মিলে কত পড়বে—হিসেব করে দেখেছিস? পঞ্চাশ ষাট টাকাও লাগতে পারে। অত খরচা করে আমরা থাকতে পারব।'

অনাথ এবং ফটিক বেশ জানে, এই টাকা খরচা করতে হলে তাদের কষ্ট হবে। চারু সংসারে এক রকম একা। কিন্তু অনাথ বা ফটিকের যে সংসার বাড়িতে রয়ে গেছে, মা বাবা ভাই বোন বিধবা পিসি তাতে মাস গেলে ওদের নিজের জন্যে যেন খরচা রেখে বাকিটা বাড়িতেই পাঠাতে হয়। পারলে আরও পাঠানো উচিত। ওরা পারে না।

কথাটা কেমন বেয়াড়া ভাবে ওদের সমস্ত উত্তেজনা, লাফালাফি, কথাবার্তা স্তব্ধ করে দিল। কেউ আর কথা বলল না।

শেষে ফটিকই বলল, 'আমাদের খরচা কিছু বেশী হবে, তা হোক। আমরা চাকর রাখব না। নিজেরাই রান্না করব। তবু, আমি বলছি চারু, এখানের চেয়ে সেখানে আরামে থাকতে পারব।'

চারু হঠাৎ হাসল। হেসেই বলল, 'আর দু চার মাস থেকে যা। আমি বিয়ে করি, একটা রান্না বান্নার ঝি লোক জুটে যাবে ত, তারপর বাড়ি বদলাব।'

চারুর হাসি অবশ্য দুই বন্ধুকে খুশী করল কি না কে জানে। অনাথ ঘরের লণ্ঠন বাতি নিবিয়ে দিল।

৪ সাত ৪

সকালে নিত্যানন্দের মেস ছেড়ে বেরুতে আজ দেরী হল। যত সকালে তিনি বেরিয়ে পড়েন অত সকালে প্রীতিভের সঙ্গে দেখা করে যাওয়া মুশকিল। পরের বাড়িতে গিয়ে ওই ভোরে ভোরে কি দেখা করা যায়!

রোদ উঠে যাবার পর মেসবাড়ি জেগে উঠলে নিত্যানন্দ চারুর ঘরে এলেন। অনাথ ফটিক তখন কাজে যাবার তোড় জোড় করছে।

ফটিক বলল, 'নিত্যদা, কাল অত কাণ্ড হয়ে গেল—আপনি একবার আমাদের বললেন না।'

নিত্যানন্দ হাসি মুখ করলেন। যেন বললেন, কাণ্ড আর কি! যেতে দাও, দাও।

জামাটা গায়ে গলাতে গলাতে অনাথ বলল, 'শুনুন দাদা, আমরা ঠিক করেছি এই মেসবাড়িতে আপনার আত্মীয়রা খাবেদাবে—থাকবে চারুর দিদির বাড়িতে। এর নড়চড় হবে না।'

নিত্যানন্দ না করতে যাচ্ছিলেন, ফটিক হাত নেড়ে বলল, 'আপনার ওই ভালমানুষি রাখুন। মেস কারও একার নয়, আমাদের সকলের। আজ যদি কোনো দরকারে আমার বাড়ির মা বোন কেউ এসে পড়ে আপনি তাড়িয়ে দেবেন। ওটি হবে না। ও-সব ছোটলোকমি চলবে না।'

নিত্যানন্দ বিপদে পড়লেন। ইতস্তত করে বললেন, 'কিন্তু আজ বিকেলে যে আমি জ্ঞানচাঁদবাবুর বাড়িটা পাব, ভাই।'

'কি করবেন সেই বাড়ি নিয়ে। কোন কাজে আসবে আপনার!'

'পাচ্ছি যখন—'

'দু'চার দিনের জন্যে ওই বাড়ি নিয়ে অতটা ছোটা-ছুটি করবেন! কোনো দরকার নেই। তা ছাড়া এই মেসে যদি একদলের ভেদ থাকে—আমাদেরও ভেদ থাকবে না কেন!'—

নিত্যানন্দ কিছু বললেন না। বলে আপাতত কোনো লাভ নেই। অনাথ এবং ফটিক দুই বন্ধুই এক সঙ্গে বেরিয়ে গেল কাজে।

'চারু, একবার যে ও বাড়ি যেতে হয়।' নিত্যানন্দ বললেন, 'আমার বেশ দেরী হয়ে যাচ্ছে। ওদের সঙ্গে দুটো কথা বলে যাই।'

'তাই তো। আচ্ছা, চলুন।' চারু বলল। বলে উঠে দাঁড়াল।

নিত্যানন্দ চারুকে লক্ষ্য করতে করতে বললেন, 'অনাথরা যে বড্ড গণ্ডগোল বাধাল, চারু।'

'গণ্ডগোলের কি!'

'আমি বাড়ির ব্যাপার ঠিক করেই ফেলেছিলাম।'

'এখানে অসুবিধে কিসের।···ওরা ও বাড়িতে রয়েছে, ওখানে থাকবে; এখান থেকে খাবার যাবে।' চারু গায়ে গেঞ্জিটা গলিয়ে নিল। ও বাড়িতেও খাওয়ার ব্যবস্থা অনায়াসে হতে পারত, কিন্তু তা হলে এই ভেদটা যে থাকে না, নিত্যদা।' বলে চারু হাসল।

ঘরের বাইরে এসে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে চারু নিজের থেকেই বলল, 'কোথায় আপনি মাঠ কুড়িয়া গিয়ে উঠবেন। তার চেয়ে এই ব্যবস্থাই ভাল।'

'ভাল। কিন্তু—'

'কিন্তুর কিছু নেই, নিত্যদা। বাড়ি গেলেই কি আপনার ঝামেলা মিটবে। খাওয়া দাওয়া নেই? আপনি কি সেখানে হাঁড়ি কুড়ি উনুন কিনে সংসার সাজিয়ে বসতে চান দু চার দিনের জন্যে?'

কথাটা নিত্যানন্দ ভেবেছেন আগেই। অসুবিধে যে প্রচুর তাও তিনি জানেন। তবু যখন উপায় নেই তখন ধর্মশালার সেই সংসার পেতে বসাই নিত্যানন্দ স্থির করেছিলেন। চারুর কথায় অসুবিধেগুলো আবার প্রকট হয়ে দেখা দিল।

মেস বাড়ির পাশে একটা বাড়ি, তার পরের বাড়িটাই হাই স্কিলমিস্ট্রেস। বাড়িটা দেড় তলা, এবং ছোট। দেড় তলার, অর্থ হল, ওপরে একখানা ঘর আর দু ফালি বারান্দা: মাথায় অ্যাসবেস্টাসের ছাদ।

নীচে খান দুই ঘর, খোওয়া পেটানো বারান্দা। এক ফালি ছোট রান্নাঘর, কলতলার পাশে বাড়ির উত্তর দিকের পাঁচিল। পাঁচিল ঘেঁষে একটা পেয়ারা গাছ।

লোকে বলে হাই স্কিলমিস্ট্রেস; ওটা মুখের ডাক, পেশার চেহারা করা ডাক। আসলে মহিলার নাম অমলা। বয়স ত্রিশ প্রায়। এই শহরের মিউনিসিপ্যালিটির মিডওয়াইফ। পাশ করা ধাত্রী বলে শহরে একটা পশারও আছে; মিউনিসিপ্যালিটির মাইনে ছাড়াও উপার্জন আছে মোটামুটি। বাড়িটা অমলার। সামান্য একটু ইতিহাস এই বাড়ির সঙ্গে জোড় করা আছে, যা অমলার ব্যক্তিগত জীবনেরও, আপাতত তার উল্লেখ অপ্রয়োজনীয়।

অমলার সঙ্গে চারুর সম্পর্ক একাধিক। প্রথমত দু'জনেই একই জায়গার চাকুরে, মিউনিসিপ্যালিটির মাইনে খাওয়া লোক, দ্বিতীয়ত ওদের দুজনের দেশ বাড়ি একই জায়গায়, সে সূত্রে একটা দূর সম্পর্ক আছে। তৃতীয়ত উভয়ের মধ্যে যে প্রীতির সম্পর্ক তাতে মনে হয় যেন পরস্পরের মধ্যে এক ধরনের পারিবারিক সৌহার্দ্যও রয়েছে।

অমলার বাড়িতে একটি মাত্র লোক; ঝি সৌদামিনী। তার হাতেই সংসার।

নিত্যানন্দকে সঙ্গে করে চারু অমলার বাড়ি এল। দরজা খোলা।

চারু ভেতরে ঢুকে পড়ল। 'আসুন, নিত্যদা। চলে আসুন।'

নিত্যানন্দ অপরের বাড়িতে ওভাবে ঢুকবেন কি না—ভাবছিলেন। অমলাকে তিনি দেখেছেন, মৌখিক ভাবে চেনেন; তবু তার অন্তঃপুরে ঢোকার সংকোচ ত্যাগ করতে পারলেন না।

চারু আবার বলল, 'চলে আসুন'। বলে চারু উঁচু গলায় অমলাকে ডাকতে লাগল।

এ-বাড়িতে চারুর গতিবিধি সর্বত্র। কিন্তু কি ভেবে চারু হুট করে উঠোন পেরিয়ে ঘরে ঢুকল না।

সৌদামিনীও নেই। তাকে দেখা যাচ্ছিল না। চারু অবাক হয়ে চারপাশ তাকাতে তাকাতে আবার ডাকল, "দিদি—।"

এবার প্রীতি বেরিয়ে এল, নীচের তলার ঘর থেকে। চারুর সঙ্গে চোখাচুখি হল। চারু পরে নিত্যানন্দের দিকে তাকাল।

নিত্যানন্দ উঠোনে দাঁড়িয়েই জিজ্ঞেস করলেন, কি রে! ঘুমোচ্ছিলি?"

মাথা নাড়ল প্রীতি। না, ঘুমোয় নি।

'ইতি কোথায়?' নিত্যানন্দ জিজ্ঞেস করলেন।

'কলঘরে।' প্রীতি বলল। বলে নিত্যানন্দর দিকে তাকিয়ে উদ্বেগের স্বরে বলল, 'কানুর কাল রাত থেকে খুব জ্বর এসেছে।'

'জ্বর!' নিত্যানন্দ অবাক হলেন। 'হঠাৎ জ্বর! কখন এল?'

'রাতে। এখনও খুব জ্বর।'

নিত্যানন্দের মুখে উদ্বেগ এবং দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটল।

চারু বলল, 'আপনি ঘরে যান, নিত্যদা। গিয়ে দেখুন।'

প্রীতিও ডাকল। 'আপনি একবার আসুন মেসোমশাই। গা টা দেখুন।'

নিত্যানন্দ উঠোন থেকে ঘরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন। নিজের ওপর যেন তাঁর ভরসা হচ্ছিল না, পিছন ফিরে চারুকে ডাকলেন, 'তুমিও এস, চারু।'

'আপনি যান। আমি একবার দিদির সঙ্গে দেখা করে আসছি।' চারু দোতলার সরু সিঁড়ি ধরল।

অমলা সকালে সামান্য পুজো পাঠ করে। কেন করে সে নিজেই জানে। পুজোপাট শেষ করে অমলা কাপড় বদলাচ্ছিল, চারু দোতলার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ডাকল, 'দিদি'।

'আসি।' অমলা ভেতর থেকে জবাব দিল।

দু মুহূর্ত পরেই অমলা ডাকল, 'এস।'

ঘরে ঢুকল চারু। সাধারণ একটা মিলের শাড়ি পরেছে অমলা। তার গায়ের রং কালো, কিন্তু মুখশ্রী মিষ্টি। মাথার চুলও বেশ। ঈষৎ ফোলা গোল মত মুখ, নাক সামান্য ছোট, হাসি ভরা চোখ।

চারু বলল 'তোমার সাড়া নেই পুজো করছিলে?'

'হ্যাঁ। ওই একটু মনে মনে।' অমলা হাসল।

'তোমায় কি কই?'

'ফেরোন এখনও? ওরা, সে যে কখন একটু জল-খাবার আনতে গেছে।'

'জল-খাবার—!'

'মেয়েদুটিকে সকালে একটু চা জল-খাবার দিতে হবে না!'

'ছেলেটার নাকি খুব জ্বর হয়েছে, দিদি?'

'রাত্রে একশো দুই উঠেছিল।...ম্যালেরিয়া আছে বোধ হয়।'

'তুমি জানো?'

'জানি না। প্রীতি এসে ডাকল আমায়।'

চারু কি ভাবল। ভেবে বলল, 'ছেলে রাত জেগে এসেছে—তারপর সারাদিন জিরোয় নি, জ্বরের আর দোষ কি।'

অমলা খাটে বসে। চারু ক্যাম্বিসের চেয়ারে।

'নিত্যদাকে নিয়ে এসেছি; উনি দেখা করে যাবেন।'

অমলা কিছু বলল না।

চারু আবার বলল, 'দিদি, ওরা দু চারদিন এখানেই থাকুক, বল কি! নিত্যদা একটা বাড়ি ঠিক করেছিল বাঠ কুড়ারি দিকে। সেখানে নানা অসুবিধে। আমার ভাবছি মেয়েরা এখানেই থাক, খাবার বেলবাড়ি থেকে দিয়ে যাবে।'

'বেল বাড়ির খাবার কেন?'

'না, মানে—'চারু ইতঃস্তত করল, 'এখানেও ব্যবস্থা হতে পারত। কিন্তু বুঝছ না, আমাদের একটা ইজ্জৎ আছে।'

'ইজ্জৎ, তোমার আবার কিসের ইজ্জৎ?' অমলা হাসি লুকিয়ে বলল।

'যা, মেসে আবার ইজ্জৎ নেই।...ওই কটা ছোট লোকের কথাই থাকবে না কি!'

অমলা হেসে ফেলল। উঠল খাট ছেড়ে। 'চা খাবে ত?'

'দিলেই খাব।'

'তবে বস। সরু যা দেরী করছে, আমিই চা করি গে।' অমলা চলে যাচ্ছিল, চারু ডাকল।

'তোমার কোনো অসুবিধে হবে না ত দিদি?' চারু বলল।

'কিসের অসুবিধে?'

'মেয়ে দুটি আর এখানে থাকবে দু চার দিন।'

অমলা দু পলক তাকিয়ে দেখল চারুকে। তারপর বলল, 'কর্তব্য ত আগেই করেছ, এখন আবার অত ন্যাকাপনা কেন।'

চারু বসে থাকল, তার হাসি পাচ্ছিল। অমলা দিদি মাঝে মাঝে চারুর ওপর খুব একটা বিদিগিরি ফলিয়ে নেয়। আজ সকাল থেকেই সেই রকম ভাব। কেন? বাড়িতে লোক রয়েছে বলে!

বসে বসে চারু ঘরের চারপাশ দেখতে লাগল। ঘরটা ছোট। কিন্তু ঝোলামেলা। তিন তিনটে জানলা। একদিকে অমলাদিদির খাট। একটা ছোট দেরাজ, দেরাজের মাথায় আয়না। দেলাইয়ের কলটা নীচে জল চৌকির ওপর রাখা। টুকটাক কত কি জিনিস অমলাদির। কোণে একটা দু ফুটের কাচের পাল্লা দেওয়া র‍্যাক রকম; তার মধ্যে নানা ওষুধপত্র।

ছেলেটার আবার জ্বর হল। কানুর কথা মনে পড়ল চারুর। বেচারী নতুন জায়গায় এসে ওর বাঁধিয়ে বসল। এ সময় এখানে খুব টাইফয়েড হয়। ও সব কিছু না হলেই রক্ষে। অমলা দিদি ম্যালেরিয়া বলছিল, ম্যালেরিয়া হলে কিনু কুইনাইন বড়ি গিলিয়ে দিলেই চলবে।

নীচে থেকে অমলা ডাকল। চারু বাইরে এল। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে দেখল নিত্যানন্দ প্রীতিদের ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন।

চারু নীচে এলে নিত্যানন্দ বললেন, 'একবার তুমি দেখ ত চারু।' নিত্যানন্দ বেশ উদ্বিগ্ন। 'জ্বরটা খুব চড়ে আছে।'

চারু ভেতরে ঢুকল। ঘরে প্রীতিরা দুই বোনই রয়েছে। তক্তপোশে পাতা বিছানায় কানু শুয়ে। জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্ন। মুখটা কেমন লালচে হয়ে আছে। চারু গায়ে হাত দিয়ে দেখল কানুর। হাত যেন পুড়ে গেল। ভীষণ জ্বর। চারু মুখ তুলে নিত্যানন্দর দিকে তাকাল।

'বেশ জ্বর বর?' নিত্যানন্দ বললেন।

'হ্যাঁ; থার্মোমিটার দিয়ে দেখতে হয়।'

নিত্যানন্দ প্রীতির দিকে তাকালেন। প্রীতি বলল, 'দিয়েছি। উনি কাল রাত্রেই থার্মোমিটার দিয়েছিলেন। একশো দুই উঠেছিল।'

'কাল উঠেছিল। এখন কত?' চারু শুধলো।

'সকালে আর দিই নি।'

'দিয়ে দেখুন।'

প্রীতি ইতিকে থার্মোমিটার বের করে ঝেড়ে দিতে বলল। অমলার ঘর থেকে কাল রাত্রে যে থার্মোমিটার আনা হল সেটা যে এই মুহূর্তে খুঁজে পেতে ইতিকে হিমসিম খেতে হবে কে জানত। ইতি খুঁজতে লাগল। প্রীতি বিরক্ত হচ্ছিল। নিতান্ত বাইরের লোক ঘরে আছে বলে ছোট বোনকে কিছু বলছিল না।

'ওর কি ম্যালেরিয়া আছে?' চারু নিত্যানন্দকে মাঝে রেখে প্রীতিকে শুধলো।

'কি জানি! মাঝে মাঝে জ্বর ত হয় দেখেছি!'

'খুব শীত করে জ্বর আসে? কাঁপুনি ধরে?'

'ধরে।'

'তবে ম্যালেরিয়া।···বুঝলেন নিত্যদা, এ একেবারে খাঁটি ম্যালেরিয়া। দিদিও বলছিল ম্যালেরিয়া।' বলে চারু প্রীতির দিকে এক পলক তাকাল, 'ম্যালেরিয়ার জায়গা বুঝি ওটা?'

প্রীতি মাথা নাড়ল। হ্যাঁ।

থার্মোমিটার খুঁজে পেল ইতি। পারা নামিয়ে দিদির দিকে এগিয়ে দিল। প্রীতি কানুর জ্বর দেখতে বসল।

'বরঞ্চ ডাক্তারকে একবার ডাকব না কি, চারু?' নিত্যানন্দ উদ্বেগের গলায় বললেন।

'ডাকবেন!' চারু ভাবল। 'এখন থাক না, এই বেলাটা দেখা যাক।'

'ও বেলা আবার তুমি কখন ফিরবে? আমি একলা—'

'আমি বেলা দশটা এগারোটা পর্যন্ত আছি, দেখি কেমন থাকে।···দরকার দুপুরে ত দিদি থাকে, জ্বর কম না পড়লে দিদি বরঞ্চ ডাক্তারকে খবর দেবেখন।'

নিত্যানন্দ কানুর দিকে তাকিয়ে থাকলেন। যেন কতটা জ্বর না শোনা পর্যন্ত তাঁর স্বস্তি হচ্ছে না।

ও-র সেই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে। প্রীতি থার্মোমিটার দেখে ইতিকে বলতে দিচ্ছিল, চারু হাত বাড়াল। 'দেখি একবার।'

ইতি চারুর হাতে থার্মোমিটার দিল। নজর করে দেখতে দেখতে চারু বলল, 'এক শো দুয়ের একটু কম। ...এখন এই ভাবে থাক খানিকটা দেখি।'

নিত্যানন্দ ভেবে পেলেন না, এর পর আর দাঁড়িয়ে থেকে তিনি কি করবেন। চারু থার্মোমিটার ইতির হাতে দিল।

'তবে এ-বেলাটা দেখা যাক—নিত্যানন্দ প্রীতির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কি বলিস?'

'তাই করাও হতে পারে।' ইতি বলল।

'তাও পারে।' চারু ইতিকে সমর্থন করল। কোনো ভাবনার কারণ নেই নিত্যদা। আপনি কাজে যান।'

বেলা হয়ে যাচ্ছিল। নিত্যানন্দর যাওয়া দরকার। প্রীতিকে বললেন, 'তোদের বাক্স ত আমার ঘরে, কাপড় চোপড় দরকার হবে না! এই নে ঘরের চাবিটা রাখ।'

কাপড় চোপড়ের দরকার সত্যিই ছিল। কাল রাত্রে এক পাঁড় জ্বরের তাড়া এ বাড়ি চলে এসেছে। এখন সকালে বাসি কাপড় ছাড়তে হবে, জ্ঞান আছে টুকটাক আরও কত কি দরকার। বাক্সটা এ বাড়িতে আনাতে পারলেই ভাল।

প্রীতি বলল, 'বাক্সটা এখানে আনানো যায় না, বেলোবশাই?'

নিত্যানন্দ কিছু বলার আগেই চারু জবাব দিল। 'হ্যাঁ, অনায়াসে। সেটাই ভাল।'

নিত্যানন্দ চারুর দিকে তাকালেন, 'তুমি তবে গোবিন্দকে দিয়ে ওদের বাক্সটা এখানে আনিয়ে দিয়ো, চারু।'

চারু ঘাড় নেড়ে সায় জানাল।

বেলা বেড়ে উঠছে। নিত্যানন্দ চলে গেলেন। পাশের ঘরে অমলা চা জলখাবার সাজিয়ে বারে বারে ডাকছে। চারু পাশের ঘরে গেল।

ঘরটা ছোট। দৌদামিনী থাকে এই ঘরে। তাছাড়া এই ঘরেই যাবতীয় খাওয়া দাওয়া ভাঁড়ার। অমলা মাটিতে বসে বসে চা তৈরী করেছে, ছোট কাচের প্লেটে জলখাবার সাজিয়ে দিয়েছে।

অমলা বলল, 'একটু তাড়াতাড়ি খাও, আমারও ও কাজে যেতে হবে।'

'তোমার আবার কাজ!' চারু অমলার হাত থেকে জলখাবারের প্লেট নিল। 'আমায় এ-সব খাওয়াবে। তা দাও, খেয়ে নি।'

'ওদের ডেকে আনলে না?' অমলা বলল।

'আমি আবার কি ডাকব। তুমিই ডাক।'

'ডাকছি ত কখন থেকে।'

'গলা চড়িয়ে ডাক।'

অমলা সত্যি সত্যিই গলা চড়িয়ে ডাকল।

চারু হেসে হেসে বলল, 'আজকের সকালটা এই রকম মিষ্টি মিষ্টি খেয়ে সুরু হল দিনটা বোধহয় ভালই যাবে কি বল?'

অমলা চারুর মুখের দিকে তাকাল। চোখের পাতায় হাসি। নীচু গলায় বলল, 'দেখ, কেমন যায়।'

কথার ইঙ্গিত বুঝে চারু জবাব তৈরী করছিল—ইতি ঘরে ঢুকল। চারুর আর জবাব দেওয়া হল না।

অমলা আড় চোখে চারুকে লক্ষ্য করে যেন খুব মজা পেল। তারপর ইতিকে বলল, 'কই গো ভাই, তোমার দিদিকে ডাক। আমায় যে বেরুতে হবে।'

মৃদু গলায় ইতি বলল, 'দিদি আসছে।'

৪ আট ৪

দিনটা চারুর ভাল মন্দ মিশিয়ে কাটল। মেস বাড়ি থেকে প্রীতিদের বাক্স এনে দিল চারু, দিয়ে দেখল কানু যেন আরও পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে, অমলা তার প্রত্যাহের কাজে বেরিয়ে গেছে, প্রীতির মুখে ভয় ভাবনা। কানু বার দুই কেঁপে কেঁপে উঠল জ্বরের তাড়সে। চারুরও আর সাহস চল না। কে জানে, দিনকাল যা খারাপ। মণ্ডল ডাক্তারকে ডেকে আনতে ছুটল চারু।

ভাদ্রের রোদ ভয়ংকর চড়া। সেই চড়া রোদে একটু বেলায় মণ্ডল ডাক্তারকে নিয়ে পৌঁছল চারু। কানুর জ্বর তখন ঘাম দিয়ে নামতে সুরু করেছে। চারু অবাক। এই দেখে গেল গায়ে ফোস্কা পড়ে যাওয়ার অবস্থা—ফিরে এসে দেখছে কানুর গায়ে ঘাম।

ম্যালেরিয়া। ম্যালেরিয়ার সঙ্গে ট্রেণে আসার দরুণ। মণ্ডল ডাক্তার ওষুধ দিয়ে দিল। বলল, 'ওষুধটা খাওয়াতে থাকুন। বিকেলে জ্বর ছেড়ে যাবে।'

মণ্ডল ডাক্তারের সঙ্গে চারুই আবার ছুটল ডিসপেনসারী, ওষুধ আনতে। ফিরতে ফিরতে বেশ বেলা। দশটা বেজে গেল।

'এখনই খাইয়ে দি?' প্রীতি জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, ওই মিকশ্চারটা এখনই, মিনিট পনের পরে ট্যাবলেটটা।'

ওষুধের শিশি হাতে করে প্রীতি ঘরে ঢুকল। চারু বারান্দায়। ঘরে ঢুকেই প্রীতি পিছন ফিরে তাকাল। 'আপনি চলে যাচ্ছেন?'

'বেলা হয়ে গেছে অনেক, আমার আবার অফিস।'

প্রীতি এক মুহূর্ত ভাবল 'আবার কখন খাওয়াব?'

'চার ঘণ্টা পরে। মানে পৌনে দুটো নাগাদ। চার ঘণ্টা পর পর। বড়িটা আবার সন্ধেবেলা।'

ইতিকে ওষুধ খাওয়াবার জল আনতে বলল প্রীতি। বলে চারুকে একবার ঘরে ডাকল।

'আমি টাকা পয়সা কিছু দিলাম না!' প্রীতি ইতস্তত করে বলল।

'সে নিত্যদা পরে দেবে।'

প্রীতি যেন কি ভাবল। 'কানুর মাথা ধুইয়ে দেব?'

'আজ।··· আজ বরং থাক। ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞেস করে নিলেই হত।'

'যা গরম এখানে, তার ওপর জ্বর। সারা দুপুর ছটফট করবে।'

'তবে অল্প করে দিন ধুইয়ে।'

প্রীতি তাকাল। দিম···, বাবা এত সম্মান দিয়ে তার সঙ্গে কথা! প্রীতিকে কেউ কখনও, দাস-দাসী ছাড়া এমন করে সম্মান জানায় নি। এই শব্দটা সে চারুকে আগেও ব্যবহার করতে শুনেছে কি! প্রীতির মনে হল চারুর সঙ্গে এ-যাবৎ যা দু পাঁচটা কথাবার্তা, প্রয়োজনে যে বাক্যালাপ, সেই কথাবার্তায় চারু বরাবরই সম্মান সূচক আপনি টাপনি ব্যবহার করে কথা বলেছে। কিন্তু প্রীতির কানে তার বিশেষ কোন অর্থ প্রবেশ করে নি, প্রীতি অত খেয়াল করে নি। এখনই যেন প্রথম করল।

কাঁধের পাশে আঁচলটা ঠিক করে নিতে নিতে প্রীতি বলল, 'আপনাকে বড় ভোগাচ্ছি।'

চারুর বেশ ভাল লাগল কথাটা।

সাধারণ মুখ করে সামান্য হাসল।

ইতি ওষুধ খাওয়ানোর জল নিয়ে এসেছিল। চারুর মুখের হাসি এবং দিদির আড়ষ্টতা লক্ষ্য করল ইতি।

চারু বলল, 'আমি তা হলে যাই।'

দুপুরে অফিসে বারবার প্রীতি ইতির কথা মনে পড়ছিল চারুর। একেই বলে ভাগ্য। কোথায় প্রীতি ইতি, আর কোথায় চারু। কে জানত এই ভাদ্রমাসে বাবুবেলে তাদের সঙ্গে চারুর দেখা হবে। কোনো যোগাযোগ নেই, পরিচয় নেই, দুই ভিন্ন প্রান্তের অধিবাসী তারা, তবু কী করে যেন দেখা হয়ে গেল, পরিচয়ও হল।

ব্যাপারটা অভূতপূর্ব কিছু নয়। জগতে এ-রকম দেখা পরে পরে হচ্ছে। তবু যেন চারুর মনে হচ্ছে, এই পরিচয় কিছুটা আলাদা। যেন দেখা হওয়াতেই সব শেষ হল না। আরও কিছু থেকে গেল।

নিজের এলোমেলো চিন্তা চারুকে এই দুপুরে খানিকটা হাসাল। তার ঘরের বাইরে জোড়া কাঁঠালগাছ, কাঁঠালগাছের তলাদ ঘন ছায়া। ছায়ায় মিউনিসিপ্যালিটির মেথর মেথরানীরা বসে আছে। আজ তাদের বাইনের দিন। ওদের কথাবার্তা কানে আসছিল না চারুর। বাইরে ঘুঘু ডাকছে। রোজই ডাকে।

সামান্য ঘুম ঘুম লাগছিল চারুর। নিজের চেয়ার টেবিল থেকে সে উঠে পড়ল। চেয়ারম্যানের কেরানী চারু, তার ঘরই আলাদা। অন্য পাশে রক্ষিতবাবু বসে আছেন, বসে বসে কাজ করছেন। চারু ঘর ছেড়ে বাইরে চলে এল।

মিউনিসিপ্যালিটির অফিসটা মনোরম। লাল ইঁটের রং করা বাড়ি, চারপাশে গাছপালা, ঘাস, দুচারটে ফুল-গাছও। নানা জনের দপ্তর। স্যানিট্যারির অফিসটাই বেশী, তাদের গুদোম আর হাবিজাবি নিয়ে বাড়িটার অর্ধেক ওরাই দখল করে রেখেছে। দোতলায় ট্যাক্স আর বিল্ডিং ডিপার্টমেণ্ট। নীচে সোজাসুজি উত্তরের দিকে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের ঘর।

বাইরে এসে চারু সাবানের কোম্পানি দিয়ে কলের জলে মুখ ধুয়ে নিল। একটু চা খেতে হবে। ভাদ্রের দুপুর বড়ই গরম লোক—এখনে ছায়া বলে রাস্তাটা ঠাণ্ডা লাগছিল। চায়ের তৃষ্ণা নিয়ে চারু পা পা করে অফিসের শেষ প্রান্তে চলে গেল।

প্রীতিদের কথা ভাবতে গিয়ে চারুর কানুর কথা মনে পড়ল। কেমন আছে ছেলেটা! জ্বর কি ছেড়ে আসছে! ছেড়ে গেলেই ভাল।...আচ্ছা যদি জ্বর আজ ছেড়ে যায়। আর জ্বর ছেড়ে গেছে বলে কাল পরশুই প্রীতিরা ফিরে যায়। পাগল না কি, তাই কি কেউ যেতে পারে! কানু যতদিন না খানিকটা সারলে মিছে ততদিন প্রীতিরা যেতে পারে না।

চা খেতে খেতে চারু কেমন নিজের বোকামিতে নিজেই হাসল। এই সব আজে বাজে কথা সে কেন ভাবছে! প্রীতিরা দু চার দিনের জন্যে এসেছে, চরম বিপদের কাছে পরকারেই এসেছে, কাজ ফুরোলেই চলে যাবে। ওদের সবটাই অস্থায়ী।

সিঁড়ি ভাঙতে চারু উঠে পড়ল। তার যেন ঈষৎ দুঃখ হল এই ভেবে যে, প্রীতিরা হঠাৎ এসেছে হঠাতই চলে যাবে।

বিকেল পাড়ে নেমে চারু বেরে ফিরল।

গলিতে রোদ নেই। আকাশের গায়ে পাতলা আঁশের মত রোদ লেগে আছে, দিন ফুরোনো রোদ। ছায়ার গায়, দাঁতদেঁতে গলি। পথের পাশে নালা আর উচ্ছিষ্ট করে দেওয়া বস্তা। চারু যেতে যেতে অন্যমনস্ক ভাবে গলিটা দেখছিল, তার অতি পরিচিত পথটা যাকে নিরিক্ষন। বলরামের চায়ের দোকানের পাশ দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ তার মনে হল, চারুরা যে কী নোংরা জায়গায় থাকে প্রীতিরা কি তেমন করে দেখেছে। বিকেল করে যেতে যেতে যদি এই আবর্জনা তারা দেখে থাকে—কি ভেবেছে কে জানে।

এ সব চিন্তা চারুর মনে আজকাল আর উদয় হয় না। আগে হত, যখন প্রথম এসেছিল। মন খারাপ হত, বিমর্ষ লাগত, ক্ষোভ হত। নিজেকে চারু, অকারণ এই অভিমানের বেদনা থেকে আরোগ্য করে তুলেছিল। অবস্থাকে আয়ত্ত করতে হয়, নিজে তার আয়ত্তের মধ্যে গিয়ে পড়তে নেই। চারু অভিমান ভুলে তার পারিপার্শ্বিককে আয়ত্ত করে ফেলেছিল, দুঃখ ভুলেছিল। আজ আবার হঠাৎ তার সেই দুঃখ এল। সেই হীনতা।

বলরামের চায়ের দোকান পেরিয়ে চারু দাঁড়াল। পাশে মুকুন্দর 'বিউটি সেলুন'। তিনটে চেয়ার, দুটো আয়না, কাগজের কয়েকটা ফুল, গোপিনীদের বস্ত্র হরণের একটা ছবি, আর গোটা দুয়ের বম্বাই-মেয়ের ছবি টাঙিয়ে মুকুন্দ বিউটি সেলুন করেছে। ভালই চলে। নিজের গালে হাত ঘসে ঘসে চারু দাড়ির কর্কশতা পরীক্ষা করল। এখন দোকান ফাঁকা। দাড়িটা কামিয়ে যাবে না কি! অনেক দিন সেলুনে এসে দাড়ি কামানো হয় নি।

কয়েকটি মেয়ে স্কুল থেকে ফিরছে। সঙ্গে কি। দশ বাড়ি ঘুরে ঘুরে ফেরা, ফিরতে দেরী হয়। চারু বড় মেয়েটিকে লক্ষ্য করল। একে ফ্রক পরা অবস্থায় এই গলিতে দেখেছে চারু, স্কুলে যেত: আজ তার শাড়ি পরা কিশোরী চেহারা দেখে চারু অনুভব করল—অনেক দিন তার এই গলিতে কেটে গেছে। চার বছর। না তারও বেশী, প্রায় পাঁচ।

মনে খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। চারু বিউটি সেলুনে ঢুকে পড়ল।

'আসুন, বাবু।' মুকুন্দ নিজেই ডাকল। তার দোকানে আর একজন মাত্র কর্মচারী। নড়বড়ে চেয়ার বাড়ন দিয়ে ঝেড়ে দিতে দিতে আয়নার দিকে ঠেলে দিল। বলল, 'চুল—?'

'না; দাড়ি। ভাল করে কামিয়ে দাও ত।' চারু চেয়ারে বসল।

মু বিষয়ের তোয়ালেটা বেশ ময়লা। তার গন্ধও কটু। চারুর গলায় তলায় সেই তোয়ালে বিছিয়ে দিয়ে মুকুন্দ ব্রাশে সাবান ঘষে নিল।

'মুকুন্দ।' চারু বলল।

'বাবু—'

'তোমার এই বাড়ন ঝাড়নগুলো পরিষ্কার করাও না কেন।'

'হপ্তায় একবার করে সোডা দিয়ে কাচিয়ে নি বাবু।' মুকুন্দ চারুর গালে সাবানের ফেনা তুলতে লাগল।

'তাও এত ময়লা।'

'আগে এক আনা ছিল, এখন দু পয়সা।' মুকুন্দ হিসেব দিল, 'চার পয়সা নাই খরচ হয়ে যায়, এক দাড়িতে দু পয়সা লাভ।' মুকুন্দ প্রচুর ফেনা তুলে এবার খুর হাতে নিল। 'ভয় কাটব, বাবু। এক একটা চুল দাড়ি যখন কাটি তার মরমে চুইরে পড়ে।'

চারু আর কথা বলল না। এই গলিতে যারা আসে—তাদের চুলে গালেও কি এত মরমে আর গন্ধ!

মুকুন্দ বেশ যত্ন করে চারুর দাড়ি কামিয়ে দিল। কিটকিরি ঘষে মুখ মুছিয়ে খস খসে করে খানিকটা পাউডার দিয়ে ফেলল। আবার মুছিয়ে দিল। আয়নায় চারু মুখ দেখল নিজের। খুব পরিষ্কার এবং ফরসা দেখাচ্ছে। চারুর রঙ আর ফরসা, দাড়ি কামাবার পর মুখ আরও মসৃণ ও ফরসা হয়ে গেল।

খুশী হল চারু। দু আনা পয়সা মুকুন্দর হাতে গুঁজে দিয়ে গলিতে নামল। এবং অনুভব করল বিকেল শেষ হয়ে গেছে। হালকা মেজাজে এক প্যাকেট সিগারেট কিনে একটা সিগারেট ধরাল। মাঝে মাঝে দু একটা সিগারেট খেলেও কতকাল যেন চারু এমনি করে বেপরোয়া ভাবে এক প্যাকেট সিগারেট কেনে নি। তিন চারটে সিগারেট অনাথ ফটিকের জন্যে রেখে দিতে হবে, রাত্রিরে খাওয়াবে ওদের! ওরা যে কি বলবে, চারু জানে।

ঢুকল না চারু, অমলার বাড়ি গিয়ে সদরে কড়া নাড়ল।

দরজা খুলে দিল ইতি। চারুর হাতে সিগারেট। ইতির চুল বাঁধা শেষ হয়েছে, গা ধুতে যাচ্ছে, হাতে কাপড় জামা। চারুকে দেখে ইতি যেন এ-অবস্থায় একটু সংকুচিত হল।

'কানুর খবর কি?' চারু শুধালো।

'জ্বর কমেছে।' ইতি জবাব দিল।

'কমেছে!...যাক্...।' চারু হাসি ছাড়ল, 'কত জ্বর হবে, দেখেছ?'

ইতি জানে না। মাথা নাড়ল। সে জানে না ঠিক।

অন্যমনস্ক ভাবে চারু ইতিকে দেখছিল। আচমকা কেন যেন চারুর মনে হল, ইতিকেই দেখতে বেশ ভাল, ওর দিদির চেয়ে ইতিই সুন্দরী। প্রীতি মাথায় বেশী লম্বা, গায়ে শাঁস যেন; ইতি মাথায় মানানসই, গড়নটি সুন্দর। রঙ প্রীতিরই পরিষ্কার, ইতি শ্যাম; তবু ইতির মুখের লাবণ্য শরীরের বাঁধুনির জন্যে ইতিকেই দেখতে ভাল লাগে। চারু ইতির ডল-মানা গাল, সুন্দর নাক চোখ ঠোঁট লক্ষ্য করল।

ইতি হেঁট মুখে দাঁড়িয়ে, চোখের দৃষ্টি উঠোনের মাটিতে। ওর সদ্য বাঁধা খোঁপার তলায় নরম চুলের বিলি কাটা ঘাড় দেখা যাচ্ছিল। চারু তাও লক্ষ্য করল।

'দিদি কোথায়? ঘরে?' চারু শুধালো।

ইতি মাথা নাড়ল। এই দিদি যে তার দিদি ইতি বুঝতে পেরেছে সহজেই। চারুকে যেন সঙ্গে করে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে প্রীতির কাছে পৌঁছে দিল।

প্রীতি জানালার কাছে বসেছিল। হাতের বোতাম। গলির মুখের জানালার ওপর-পাট খোলা। ঘর বেশ ফাপসা হয়ে এসেছে। প্রীতি বসে বসে তার এলো চুলের জট ছাড়াচ্ছিল। কানু বিছানায়।

চারু চৌকাঠের সামনে এসে দাঁড়াতেই প্রীতি ধড়ফড় করে উঠে বসল। গায়ের আঁচল সামলে নিয়ে দু পা এগিয়ে এসে দাঁড়াল।

কানুর বিছানার দিকে পা বাড়িয়ে চারু বলল, 'জ্বর নাকি কমে গেছে?'

কানু জেগে ছিল। এক দিনের ম্যালেরিয়া তার মুখ চোখ শীর্ণ করে দিয়েছে। চারু কানুর দিকে তাকিয়ে হাসল একটু, 'কি আসতে না আসতেই জ্বর! তুমিই কাণ্ড করলে।'

কানু বেচারী যেন এই জ্বরে নিজেই কেমন লজ্জা পেয়ে গেছে। অসহায়ের মত মুখ করে তাকিয়ে থাকল।

'রাত্রের দিকে ছেড়ে যাবে।' চারু কানুর কপালে হাত দিয়ে জ্বর পরখ করে বলল লক্ষ্য প্রীতি।

'ও বিস্কুট খেতে চাইছিল'—প্রীতি কথা বলার মতন আর কিছু পেল না।

'থাক না।' চারু বলল, এমন ভাবে বলল যেন সে ডাক্তার, পথ্য সম্পর্কে তার ধ্যান ধারণার অভাব নেই। সামান্য থেমে প্রীতির দিকে তাকিয়ে হাসি মুখ করল চারু, 'ছেলেবেলায় আমিও খুব ম্যালেরিয়ায় ভুগতাম। বোতল বোতল তি গুপ্ত খেয়েছি আর তারই সঙ্গে পাতা ভেতুল'· চারু হাসতে লাগল, 'সবই খেতাম।'

প্রীতি নীরবে চলল। 'সন্তু-দিকে বিস্কুট আনতে পাঠিয়েছি।'

সামান্য চুপচাপ। চারুর বলতে ইচ্ছে করছিল। কথা বলতে ইচ্ছে করছিল। 'আমার লিলিটি কোথায় গেল?'

অমলাদিদি বেরিয়েছেন।

'এখন? হঠাৎ—?'

'ডাকতে এসেছিল কে যেন।'

'ও!' চারু বুঝতে পারল কোনো বাড়ি থেকে ডেলিভারী কেসের জন্যে লোক এসেছিল ডাকতে।

কানুর বিছানার পায়ের দিকে চারু বসল। 'নিত্যদা দুপুরে এসেছিলেন।'

'হ্যাঁ—' প্রীতি ঘাড় কাৎ করল। 'মেসোমশাই এসে-ছিলেন। অনেকক্ষণ ছিলেন।'

'নিত্যদা খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলেন।' চারু হাল্কা গলায় বলল, 'সংসারী লোক নয় ত। ঝামেলা ঘাড়ে পড়লে···' কথাটা চারু শেষ করল না।

প্রীতি অনেকটা স্বচ্ছন্দ বোধ করছিল। স্বভাবে প্রীতি বেশ কিছুটা অনাডম্বর। তার চরিত্রে স্বভাবতই এই গুণটুকু আসার কথা। সংসারে তাকে নিজেই মাথা হতে হয়েছে, আড়াল অগোচরে থাকার ভাগ্য তার হয়নি। মা মারা যাবার পর থেকে প্রীতিই তাদের সংসারের সব। যদিও অভিভাবক হিসেবে দূর সম্পর্কের মামাটি ছিল তবু সে ইতির মতন পালিত বা লালিত হতে পারেনি, তাকেই ভাইবোনদের লালন পালন করতে হয়েছে, পাঁচ বিষয়ে মাথা ঘামাতে, পাঁচজনের সংগে মিশতে কথা বলতে হয়েছে। তার সংকোচ আড়ষ্টতা সাধারণত কম হবারই কথা। এত সত্ত্বেও চারুর কাছে প্রীতি সকালে খানিকটা আড়ষ্ট বোধ করেছে, এখনও করছিল। এর কারণ হয়ত এই, ঠিক চারুর মতন অনাত্মীয় অপরিচিত যুবক বয়সী পুরুষের সংস্পর্শে তাকে এভাবে আসতে হয়নি। তাছাড়া নতুন জায়গায় এসে নতুন একটি মানুষকে যেন প্রীতি নিজেদের স্বার্থে বার বার বিব্রত করছিল। ফলে কেমন একটা অস্বস্তি ও সংকোচ বোধ না করে প্রীতি পারেনি।

চারু ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। সন্ধ্যে হয়ে আসছে। ঘরটা ক্রমেই ঝাপসা হয়ে এল। প্রীতিকে পরিষ্কার করে দেখা যাচ্ছে না। 'নিত্যদার আত্মীয়স্বজন কেউ আছে বলে আমরা জানতাম না।' চারু বলল, 'অন্তত মানুষ নিত্যদা।'

'আমার মা বড় রোগা ছিল।' প্রীতি বলল, 'মাসিমা ছোট ছিল। আমি মাসিমাকে দেখেছি। বিয়ের পরই মারা যায়।'

চারু প্রীতিকে আধো-অন্ধকারে দেখছিল। 'প্রীতির কথায় চারু দুঃখের কেমন এক গন্ধ করল।

'মেসোমশাই সেই থেকে সংসার ছাড়া।' প্রীতি বলল।

স্ত্রীকে নিত্যদা খুব ভালবাসত: চারু ভাবল। ভাবল স্ত্রীর প্রতি নিত্যদার একনিষ্ঠ প্রেম ছিল।

বাইরে দৌলাহিন এল। তার গলা শোনা গেল। প্রীতি কি ভাবল। বলল, 'বলুন। আসছি—'

প্রীতি চলে গেল। চারু বসে থাকল। কানু একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তার বিস্কুট এসেছে, ক্ষুধার্ত কানুর পক্ষে আর চুপে থাকা সম্ভব নয়। বিছানায় উঠে বসতে বসতে কানু বলল, 'বাড়িয়ে আমি আলুমুড়ি খাব।'

কানুর কথা থেকে মনে হল, তার ধারণা চারুই বুঝি ওর পথ্যের ব্যবস্থাদাতা। চারু হাসল। ঝুঁকে চাপল। বলল, 'বেশ ত: খেয়ো।'

'দিদিকে বলে দেবেন কিন্তু।'

'তুমিই বলো।'

'আমি বললে দেবে না।' কানু নিঃসংশয়।

'আমি বললে দেবে?' চারু কৌতুক অনুভব করল।

'হ্যাঁ—' কানু সন্দেহ করল না।

'যা কি।' চারু কানুর মুখ, দেখছিল, সহাস্যে বলল, 'আমার কথা তোমার দিদি শুনবে কেন, কানুবাবু?

কানু বিন্দুমাত্র ভাবল না। বলল, 'শুনবে।'

ঘরে বাতি এসেছে খানিকটা আগে। প্রীতি বুঝি করে চারুকে চা এনে খাইয়েছে। সামান্য ইতঃস্তত করে চারু একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে টানছিল। বেতের মোড়ায় গিয়ে বসেছে সে, জানলার কাছে। ঘরে ইতি এবং প্রীতি দুজনেই বসে আছে। ইতি মাঝে মাঝে প্রীতিকে যেন কি বলছিল। প্রীতি বুঝছিল, তবু উঠে যাচ্ছিল না।

এই শহরের গল্প হচ্ছিল। চারু বলছিল, এই শহরে অবশ্য দেখার মতন কিছু নেই। তবে মাইল আষ্টেক দূরে মহেশ্বরীর মন্দির আছে, পাহাড় আছে একটা, তারই গায়ে। শুক্লোর সময় মেলা হয়, খুব ভিড়ও হয়। শুক্লো আর্চাও হয়। তবে সারা বছরই লোক যায় আসে দেখতে। আর আছে দক্ষিণের দিকে একটা নদী। নদীর মাঝ বরাবর একটা চরা আছে, একমাত্র ভরা বর্ষা ছাড়া চরটা কখনও ডুবে যায় না। লোকে বলে রাণীমার চর।

মহেশ্বরীর মন্দির আর রাণীমার চর দুটি নিয়েই গল্প আছে। লোক মুখের কাহিনী। চারু সেই গল্প বলছিল।

কোন রাজা নাকি কবে যুদ্ধ করতে যাবার সময় মস্ত এক ছাউনি ফেলেছিলেন ওই পাহাড়ের কাছে, তখন ওটা পাহাড় ছিল না, সমতল ভূমি ছিল। ছাউনিতে থাকার সময়ই অসুখ করল রাজার। ওদিকে শত্রুপক্ষ এগিয়ে আসছে ক্রমশ। একদিন রাজা মাঝরাত্রে উঠে ছাউনির বাইরে চলে গেলেন—অসুখের মধ্যেই। অনেক দূরে এসে তাঁর মনে হল কে যেন তাঁকে ডাকছে—। রাজা পিছু ফিরে তাকালেন, দেখলেন একটি মেয়ে, ঘন কালো গায়ের রঙ, হাতে এক টুকরো পাথর। রাজা বললেন, তুমি কে? এখানে এই জন মানবহীন জায়গায় এত রাত্রে কি করে এলে মা?···মেয়েটি বলল, আমি মহেশ্বরী আমার মন্দির নেই। যদি তুমি আমার একটা মন্দির করিয়ে দাও এখানে আমি তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করব। ···রাজা বললেন, দেখ মা, আমি তোমার মন্দির করিয়ে দেব, তুমি আমার যুদ্ধে জিতিয়ে দাও।···পরের দিন ভোর বেলায় উঠে সবাই দেখে চারপাশে যেন পাথরের পাহাড় হয়ে গেছে। রাজা সেই পাথরের আড়াল থেকে তাঁর শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করলেন। যুদ্ধে তাঁর জয় হল। মহেশ্বরীর মন্দির তৈরী করালেন তিনি। তারপর থেকে দিনে দিনে ওই জায়গাটা কালো পাথরের পাহাড় হয়ে গেল। লোকের ধারণা, পাহাড়টা নাকি ক্রমেই মাথায় বেড়ে যাচ্ছে।

গল্প শুনতে শুনতে ইতি বলল, 'মহেশ্বরী ত শিবের বউ গৌরী। মহেশ্বরী কালো হবেন কেন?'

জবাবে চারু হেসে বলল, 'কালীও ত শিবের বউ, কালী কেন কালো!'

ইতি চুপ করে গেল। প্রীতি হেসে ফেলল।

লজ্জা পেয়ে ইতি বলল, 'মন্দিরের মধ্যে মূর্তিটা কেমন দেখতে?'

'পাথরের মূর্তি। কালো পাথরের।'

'আমাদের নিয়ে চলুন একদিন।' ইতির খুব আগ্রহ, 'পাওয়া যাবে না।'

'অনায়াসে। বাস-এ যাওয়া যায়।

প্রীতি বলল, 'রাণীমার চরটা শুনি।'

'তোকে এবার গল্পে পেয়েছে দিদি।' ইতি প্রীতির দিকে তাকিয়ে হাসল।

'আমার আর কাজটা কি!' প্রীতি জবাব দিল।

'ওরা সেই কখন থেকে চুল ভিজিয়ে বসে আছিস! গা ধুতে যাবি না। সন্ধ্যে উতরে গেছে।'

প্রীতি ঈষৎ বিরক্ত হল। ইতি তখন থেকে বারে বারে ইশারায় এই কথাটা জানাচ্ছে তাকে। যেন প্রীতির গা না ধোওয়া পর্যন্ত ইতির স্বস্তি নেই। কেন তার কি এত মাথা ব্যথা। গা প্রীতির, ধুতে হবে কি না হবে সে বুঝবে!

চারুর মনে হল, সে এখানে থাকায়, প্রীতিকে যেন আটকে রেখেছে। কাজটা অনুচিত হয়ে গেছে।

চারু প্রীতিকে বলল, 'আমি উঠি এখন।'

প্রীতি অপ্রস্তুত বোধ করল। 'আমার কোনো তাড়া নেই। বসুন আপনি।'

'আর বসব না।···অনেকক্ষণ বেরে ফিরে এসেছে, এখন যাই।' চারু উঠে পড়ল, 'নিতাইদাও ফিরেছেন বোধ হয়, ওঁকে পাঠিয়ে দি।'

চারুর যেতে ইচ্ছে করছে না। নিজের অনিচ্ছা চারু অনুভব করতে পারল।

প্রীতিও কামনা করছিল, চারু আরও একটু বসুন। প্রীতি নিজের বাসনা অনুভব করছিল।

ইতি বুঝতে পারল, ওই মানুষটার সামনে থেকে দিদি নড়তে পারছিল না। কেন?

চারু যেতে যেতে বলল, 'রাণীমার চরের গল্পটা কাল হবে।'

দুই বোনই চারুর দিকে তাকিয়ে বসে থাকল।

। নয় ।

একটা সপ্তাহ কেটে গেল।

নিত্যানন্দ মোটামুটি মনস্থির করে ফেলেছেন। প্রীতিরা আপাতত ফিরে যাবে। পুজোর আগে আর নয়, পুজোর সময় নিত্যানন্দ যাবেন বাড়িতে, প্রীতিদের জমি জায়গা অন্য আর সব ব্যবস্থা শেষ করে ওদের নবদ্বীপে রেখে আসবেন। নবদ্বীপের বাড়িটা এর মধ্যে আর ভাড়াটাড়া যেন না দিয়ে দেয় কেউ, সেই মর্মে শাসন ঠাকুরকে একটা চিঠিও লিখে দিলে প্রীতি।

প্রীতি এই রকম ব্যবস্থাই চেয়েছিল। তার মনঃপূত হল। তবে প্রীতি ভেবেছিল পুজোর আগেই তারা দেশ ছাড়তে পারবে সেটা হল না। চলে ভাল হত। ইতিকে নিয়ে যে কুৎসিত কাণ্ড করেছে শ্বশুরবরা—তারপর আর সেখানে বেশী দিন থাকতে প্রীতির ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু উপায় কি! মেসোমশাই যখন সব অসুবিধে ভেবে নিয়েই ব্যবস্থাটা করেছেন—তখন প্রীতি না করতে পারে না।

নবদ্বীপের ব্যাপারে আর একটু সুবিধে হল চারুর কথা শুনে। চারু নাকি এক কালে নবদ্বীপে থেকেছে। তার জানাশোনা আছে। চারু আড়চোখে দেখিয়ে বলল, আপনার সঙ্গে আমি যাব, নিত্যদা। সব ব্যবস্থা করে যাবে।

যে কাজ নিয়ে এসেছিল প্রীতিরা, সে-কাজ ফুরোলো। এবার তবে ফিরতে হয়। ফিরতে বাস্তবিক আর ইচ্ছা করছিল না প্রীতির; এখানে সে যতটুকু আত্মীয়তা সহানুভূতি পেয়েছে, তার স্বাদ এবং মাধুর্য তাকে লোভী করে তুলছিল।

দুই বোনে কথা হচ্ছিল একদিন। প্রীতি বলল, 'ফিরতে আর ইচ্ছে করে না, নারে ইতি।'

'আমার যাবার দরকার নেই।' ইতি জবাব দিল।

'ওখানে ফিরে গিয়েও এখন দেড় দু-মাস। কেমন করে কাটাব, কে জানে!'

কি ভাবল ইতি। বলল, 'তুমি মেসোমশাইকে কেন বললে না!'

'কি?'

'আমরা যা হয় এখানে থাকতাম কদিন।'

'ওরা, তা কি বলা যায়। লোকের বাড়িতে যদি ভয়ে থাকা।'

'আহা, এখানে কেন আর বাড়ি ভাড়া পাওয়া যায় না। অন্য বাড়িতে থাকতাম।'

প্রীতি ছোট বোনকে নজর করে দেখল। ইতির চোখে মুখে প্রবল অনিচ্ছা এবং কাতরতা।

প্রীতি একটা কথা ভাবল। শ্বশুরবরা ইতিকে নিয়ে যে কেচ্ছা করেছে তার সমস্ত দোষ শ্বশুরদের। কিছুটা দোষ ইতিরও। ইতি একেবারে গঙ্গাজলে চান করে বসে থাকে নি। সেটেলমেণ্টের নতুন অফিসে যে ছোঁড়াগুলো এসে বসেছে, তার একটার সঙ্গে, ইতি খানিক মেলামেশা করেছেন। প্রীতির অগোচরেই বেশী। এখন ইতি সেই রঞ্জনী বলে ছেলেটিকে কি ভুলে গেল! না কি তার মেয়া হয়ে গেছে! অথচ যখন সোলমালটা বেধেছিল, নানা কথা কানে আসছিল, তখন প্রীতির মনে হয়েছিল, রঞ্জনীর জন্যে ইতির মুখে ভাত, রঞ্জনীর জন্যে ইতি কাঁদে।

ছোট্ট বোনকে, আড়চোখে দেখতে দেখতে প্রীতি বলল, 'তোর দেখছি এখানে বড় মন বসে গেছে।'

কথাটার মধ্যে কোথাও যেন একটু ঠাট্টা ছিল, কানে লাগে। ইতি বুঝতে পারল, মুখে দিদির দিকে তাকাল। ঠোঁটের ডগায় একটু কাঁপন উঠল, বলল, 'তোর মনই বা কি কম বসেছে!'

রাগ হওয়া স্বাভাবিক। ইতির কথা যে এত বিশ্রী হতে পারে প্রীতি ভাবে নি। মনে মনে বেশ রাগল প্রীতি। মুখে কিছু বলল না। ইতির স্বভাব সে জানে। ওকে যত বোকা, চুপচাপ, নিরীহ মনে হয়, ও মেয়ে তত নয়। যখন কথা বলে তখন ঠোঁট কাটা হয়েই কথা বলে। যখন জেদ ধরে তখন ওই মেয়ের জেদ লোহার মতন শক্ত।

সন্ধ্যে বেলা দু বোনে মতান্তর আরও একটু বাড়ল।

চারু এসেছিল। প্রীতি তখন নিত্যানন্দের সঙ্গে বসে কথা বলছে। ওপরের ঘরে অমলা। ইতি উঠোনে দাঁড়িয়েছিল।

একা একা উঠোনে ইতিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চারু হেসে বলল, 'কি, একলা দাঁড়িয়ে কেন?'

'এমনি। কি করব!' ইতি উদাস গলায় বলল।

'নিত্যদা এসেছেন না!'

'মেসোমশাই দিদির সঙ্গে কথা বলছেন।'

'কানুকে দেখলাম মেঘে। মরা সন্ধে বকবক করছে।

উঠোনে দোলার গাছের মাথায় চাঁদের আলো পড়েছে, নীচে দরু সরু ছায়া, ডাল-পাতার।

'আপনি কই মন্দির দেখাতে নিয়ে গেলেন?' ইতি বলল।

'বারে, আমি নিয়ে গেলাম না কই! তোমরা না গেলে!'

'আর কি তবে! হল না।' ইতি ঘাড় বেঁকিয়ে বলল।

'কেন?'

'আমরা ফিরে যাচ্ছি।'

'কবে?'

'জানি না। কাল পরশু। যেদিন দিদির মন চাইবে।' ইতির গলার স্বর অপ্রসন্ন। খানিকটা বুঝি অভিমানও রয়েছে।

চারু দেখল ইতিকে। বলল, 'দুদিন থেকে যাও, মন্দির টন্দির ঘুরিয়ে আনব।'

গায়ের আঁচলটা ইতি কাঁধ থেকে এমন করে খুলল, যাতে তার স্পর্শ লাগল চারুর গায়ে। পিঠের পাশে ভাল করে ঝুলিয়ে দিল আঁচল। ঘাড় তুলে বেঁকিয়ে ইতি যে ভঙ্গিটা করল, চারুর চোখে তার মনোহরতা কিছু কম নয়। দু পলক তাকিয়ে থাকল চারু।

'এ-যাত্রায় হল না।' ইতি বলল, 'কপালে নেই।'

'খুব হবে। কালই চল। কাল রবিবার! ছুটি আছে।'

'দিদি যাবে না।'

'কেন?'

'কী জানি!...ক'দিনই ত বলেছি। ওর কোনো চাড় নেই। বড্ড চুনো।'

চারু পিয়ারা গাছের ডাল দেখতে দেখতে হাসল। 'দিদি না যায় তোমায় নিয়ে আনব।'

ইতি চোখের মণি পাশে রেখে চারুকে নজর করল। যেন বলতে চাইল, কথাটা কি মন থেকে বললেন না মুখ থেকে।

অমলা ওপর থেকে ডাকল।

চারু বলল, 'চল, দিদির ঘরে গিয়ে বসি।' বলে চারু কি ভাবল। 'তাস খেলতে জান তুমি?'

'তাস।'

'বিবি টিবি কিছুই জান না?'

'দিদি জানে।'

'তুমি কি জান?' চারু হাসছিল।

'কিছু না।' ইতি বলল যেন অপ্রস্তুত হয়ে।

এক মুহূর্তে চারু একটা অনুমানের মত কাজ করল। ইতির পিঠে হাত দিয়ে ঠেলে দিল। হাসতে হাসতে বলল, 'চল, তাস না জানো লুডো খেলবে। অমলাদির ঘরে সব আছে।'

খেলা শেষ হতে রাত হল। চারু ওঠবার আগেই ইতি উঠল। প্রীতি নীচে। তাকে ডাকতে পাঠিয়েছে চারু কয়েক বার, প্রীতি আসে নি। বলেছে, মাথা ধরেছে বড়।

চারু মনে মনে কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এত কি মাথা ধরা যে প্রীতি আধ ঘণ্টার জন্যে ওপরে আসতে পারল না। এমন কিছু নয়, খেলা ত নামেই, আসলে সবাই মিলে খানিকটা গল্পগাছা করা। প্রীতি এল না। আজ বাদে কাল কি পরশু ত চলেই যাবে?

খেলা ভাঙলে ইতি চলে গেল। অমলাই যেন প্রকারান্তরে তাকে পাঠিয়ে দিল। তারপর মুখোমুখি বসে অমলা আর চারু অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল।

অমলা শেষ পর্যন্ত বলল, 'তুমি যেন কেমন ছটফট করছ চারু। ভাল লাগছে না।'

'ছটফট করছি! কই'—চারু বিস্ময়ের ভান করল।

'করছ ঠিকই, বলছ না।' অমলা ঠোঁট টিপে হাসল।

'তবে করছি।' চারু হাসবার চেষ্টা করল, 'তোমার যেমন কথা।'

সামান্য ভাবল অমলা। বলল, 'মেয়ে দুটি কেমন?'

চারু অমলার আলোচ্য প্রসঙ্গ বহুপূর্বেই অনুমান করেছে। হেসেই বলল, 'তুমিই বল।'

'আমার বলা তোমার ভাল লাগবে কেন, তুমিই বল, শুনি—'

চারু কিছু বলল না।

অপেক্ষা করে অমলা বলল, 'তোমার সঙ্গে প্রীতিকেই মানাবে।'

অন্যমনস্ক চোখে খানিকটা সময় তাকিয়ে থাকল চারু। তারপর বলল, 'কার ভাগ্যে কি মানায় কে জানে।'

কথাটা হালকা হল না ঠিক। কেউ কোনো কথা

বলল না। কেমন একটা বিশ্রী আবহাওয়ার ভার এল ঘরে।

নীচে নেবে উঠোন দিয়ে চলে যেতে যেতে চারু ভাবল একবার প্রীতিকে ডেকে জিজ্ঞেস করে যায়, ওরা কবে যাচ্ছে। উঠোনে দাঁড়িয়ে পড়েছিল চারু। হঠাৎ পিছু ফিরে প্রীতির ঘরের দিকেই যেতে হঠাৎ মনে হল এই প্রশ্নটা এখন কিছু জরুরী নয়। নিত্যদাকে জিজ্ঞেস করলেই জানা যাবে।

চারু সেবারা গাছের তলায় চাঁদের আলো দেখতে দেখতে চলে গেল।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে দুই বোনে অনেকক্ষণ চুপ করে ছিল। কানু ঘুমিয়ে পড়েছে। লণ্ঠনটা মিট মিট করে জ্বলছে এক কোণে। গরমের ভাব ছিল বেশ। জানালা খোলা।

প্রীতি আচমকা বলল, 'পরশু দুপুরে আমরা যাব।'

পরশু। ইতির বুকে যেন ঠিক করে শক্ত ছোট হাতুড়ির ঘা পড়ল। চুপ করে থাকল ইতি।

কথাটাকে আরও দৃঢ় করবার জন্যে প্রীতি আবার বলল, 'কাল সোডা সাবান আনিয়ে ময়লা কাপড়-চোপড়-গুলো কেচে নিও।'

আচ্ছা, ইতি মনে মনে উষ্ণ হয়ে বলল, আমি ময়লা কাপড় কাচব আর তুমি কি করবে?

পাশ ফিরল প্রীতি। ইতির উল্টো দিকে। আর কোনো সাড়া নেই।

ইতি অপেক্ষা করে করে বিরক্ত হল। 'পরশু যাবার কি আছে?'

'যাবে না ত কি এখানে বসে থাকবে!' প্রীতির গলা খুব সরল নয়।

'দিচ্ছে কে থাকতে!'

'তোমার এত ইচ্ছেটাই বা কেন?'

'ইচ্ছে তোমার নেই। ইতি বলতে পারত। বলল না।

বরং অন্য কৈফিয়ত দেখাল। 'মন্দিরটা আর আমার দেখা হল না। চলটাও ঘর।'

'চল এখন দেখা যায় না। ভরা ভাদ্দর মাস এটা।'

'মন্দির ত দেখা যায়।'

'যায় ত যাও দেখে এস।' প্রীতি ধারালো স্বরে বলল।

আবার খানিক চুপচাপ। ইতি ভাবল, এত রাগ দেখাল দাপট দেখাবার কিছু নেই দিদির। চারুকে সে দিদির হাত থেকে কেড়ে নিয়েছে না কি? এমন ভাব করছে দিদি যেন ইতি দিদির কোনো নিজের জিনিস চুরি করেছে।

প্রীতি ভাবছিল, ইতিটা বড় বেহায়া। বেলাজা আর ঘ্যাংলা। লোভী নয় শুধু লোলুপ। অসভ্য মেয়ে কোথাকার! বিরক্তিতে প্রীতির চোখ ভুরু কুঁচকে গিল অন্ধকারেই।

ইতির হাত গলার কাছে গিল। সরু হারটা আঙুলে পাকাল ইতি, দু চার পাক; খুলল। বুকের কাছটা চুলকে নিল। ঘামাচি উঠেছে বেশ, তারপর আস্তে করে জামার বোতাম খুলল। বুকটা কেমন করছে।

প্রীতি চোখ বুজে শুয়ে। দু পা আরও জোড়া করে ঘুমোবার চেষ্টা করল।

উসখুস করছিল ইতি। গরম লাগছে বোধহয়। হাত পাখা নাড়ল খানিক রেখে দিল। বিড় বিড় করে কিসের যেন বিরক্তি বোঝাল। তারপর উঠে বাইরে গেল।

প্রীতি ভাবছিল, কাল চারুর সঙ্গে ইতিকে মন্দির দেখতে পাঠিয়ে দেবে। যাক, দেখে আসুক। অত অস্থির হবার কিছু নেই। ইতি যা চাইছে পাবে।

কলঘর থেকে ইতি ফিরল। দরজা বন্ধ করে জল খেল অনেকটা। বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল।

প্রীতি ঘুমিয়েছে অনুমান করে ইতি বলল বিড়বিড়ে গলায়, 'সিঁধি কাটতে আমার বয়ে গেছে।'

কথাটা কানে গেল প্রীতির। আর আচমকা যেন বিশ্রী রাগ মাথায় চড়ে বসল। 'কি বললি?'

ইতি ভাবেনি দিদি জেগে আছে। দিদির গলা পেয়ে কেমন চমকে উঠল ইতি। ভয় পেল। চুপ করে থাকল।

'কি বললি তুই? বল।' প্রীতি আবার বলল, ধমকের গলায়।

ইতি তবু চুপ। যা বলে ফেলেছে, তা কি আর ঘুরিয়ে নেওয়া যায়। নিজের অলসা বুদ্ধির ওপর ইতির রাগ হচ্ছিল।

প্রীতি বিছানায় উঠে বসল। 'তোর বড় মুখ হয়েছে। ওই মুখ আমি বন্ধ করে দেব।'

ইতি চোখ বন্ধ করে পাশ ফিরে শুয়ে থাকল। তার সর্বাঙ্গ জ্বালায় যেন পুড়ে যাচ্ছে। অথচ কিছু বলার নেই।

'পুরুষ মানুষ দেখলে কিরে জল পড়ে, না?' প্রীতি বলল, বাঁকে গলা ভিজে ভারী শোনাচ্ছিল। 'বেহায়া, অসভ্য।'

'জল আবার কার পড়েছে—!' ইতি না বলে পারল না।

'কার আবার, তোমার।' প্রীতি বোনের দিকে অন্ধকারে তাকিয়ে বলল। তার তিরস্কারে নিষ্ঠুরতা ছিল।

ছোট হলেও অসম্মানবোধ আছে ইতির। তার মনে হল, দিদি তার গায়ের কাপড়টা যেন ঝটকা মেরে খুলে উলঙ্গ করে দিল। তার চরিত্রে কি আছে না আছে তার দিকে আঙুল দেখাল দিদি, নগ্ন করে। কেন? কিসের জোরে সে এ-সব কথা বলে! ইতি রেগে উঠল। এতক্ষণ তার মনে যে ভয় ভয় ভাব ছিল, অন্যায় বোধ, এখন দিদির এই নিষ্ঠুর ইতর আক্রমণে তা তিরোহিত হল ইতি বেহুঁশের মতন বলল, 'আমার একারই পড়ে— !'

'মানে? এ কথার মানেটা কি?' প্রীতি জ্ঞানহীনের মতন ছোট বোনের কাপড় জামা খামচে ধরে টানল। টোনে যেন উঠিয়ে বসিয়ে দিল বিছানায়। 'মুখের ওপর এত বড় কথা তোর।' হিংস্র প্রীতি অন্ধকারেই বোনের কাঁধ ধরে ঝাঁকিয়ে দিল। বলল, 'কি বললি তুই? তোর মুখ আমি ভেঙে দেব। বল তুই, কি তুই বলতে চাস?'

ইতি হাতের ধাক্কা দিয়ে দিদির হাত সরিয়ে দিল গা থেকে। সে যা বলতে চায় তা শুনলে দিদি খুশী হবে না।···তার কিছু অজানা নেই। দিদি যেন না ভাবে ইতি কচি খুকি।

ইতি কথা বলছে না দেখে প্রীতিই রাগের সাথে বলল, 'তোর লজ্জা করে না, বেহায়া কোথাকার।··· সেখানে এক কীর্তি করলি, যার জন্যে এই অবস্থা আমাদের। মুখ দেখাবার জো থাকল না।···ঘর বাড়ি ছেড়ে পালাতে হচ্ছে। আবার এখানে—।'

'কীর্তি করেছি কি না তুমি চোখে দেখেছ?' ইতির অসহ্য হল।

'চোখে দেখার কি আছে! পুরুষ পুরুষই দয়াময়রা পিছনে লাগতে এসেছিল!···তুই আবার কথা বলিস! গলায় দড়ি দিতে পারিস না।'

'আমি ত এখনও বলছি, তুমি আমার বিয়ে দিয়ে দাও।' ইতি জেদী হয়ে জবাব দিল।

'তা দেব না। ওই রজনী ছোঁড়াটার সঙ্গে তোমার বিয়ে দিয়ে দি, আর তুমি আমাদের জাত ধর্ম বংশ নষ্ট করে চলে যাও। স্বার্থপর পশু কোথাকার! বলতে তোর মুখে আটকাল না। বেহায়া···'

ইতি বলবে কি বলবে না ভাবল দু মুহূর্ত। অন্ধকারে দিদিকে সে দেখতে পারছে না, অনুভব করতে পারছে। ইতির ঠোঁটের গোড়ায় কথা এসে পড়ল। 'জাত ধর্মর কথা ভুলে আমার তুমি কিছু দেখিও না। তেমন জাত তুমিও নষ্ট করেছ।'

'কি—?'

'কি আবার!···আবার খুকি ভাব তুমি।···আমার বেলায় দোষ হয়, আর তুমি যখন দুর্গাবাবুর সঙ্গে···

ইতির কথা শেষ হবার আগেই প্রীতি অন্ধকারে বোনের মুখ লক্ষ্য করে চড় মারল। তারপর দুহাতে ইতির মাথার চুল খামচে ধরল। প্রীতির কোনো হুঁশ ছিল না, সে এখন ইতর এবং অধম হল, নিষ্ঠুর ও নির্মম। আঁচড়ে খামচে চড় চাপড় মারতে মারতে প্রীতি হাঁপাচ্ছিল। তার নিশ্বাস দ্রুত। বুক ধকধক করছে। মাথার মধ্যে শিরা দপদপ করছিল, আগুন হয়ে ছিল সর্বাঙ্গ। কাঁপতে কাঁপতে প্রীতি বলল, বিড়বিড় করে 'আমি তোকে মেরে ফেলব আজ। চামার মেয়ে কোথাকার, ছোটলোক। তোর এত বড় আস্পর্ধা তুই আমার কলংক বলিস।'

প্রীতির সমস্ত আক্রোশ রাগ নৃশংসতা একসময়ে শেষ মাত্রায় উঠে হঠাৎ কেমন শিথিল ঝিম হয়ে গেল। ইতিকে ছেড়ে দিল প্রীতি। দিয়ে বসে বসে হাঁপাতে লাগল। তারপর কেঁদে ফেলল।

ইতি আগেই কাঁদছিল।

দুই বোনে মুখোমুখি বসে কাঁদছে। কানু ঘুমোচ্ছে।

॥ ছয় ॥

পরের দিন সন্ধ্যের গোড়ায় চারু এল। বাড়ি ফাঁকা প্রীতি বারান্দায় বেতের মোড়া টেনে চুপ করে বসেছিল। উঠোনের দড়িতে এখনও কয়েকটা ছোট বাচ্চা

জিনিস পছন্দ হচ্ছে।

ইতিকে নিয়ে নিত্যানন্দ বাজারে গেছেন, কানু সঙ্গে আছে। শালীর মেয়েরা তাঁর কাছে এসেছিল, এই প্রথম, কাল চলে যাবে, নিত্যানন্দ ওদের শাড়ি কিনে দেবেন, জামার কাপড়, কানুর সার্ট প্যাণ্ট, টুকটাক আরও কিছু। নিত্যানন্দ চেয়েছিলেন প্রীতিও সঙ্গে যাক। প্রীতি যায় নি। সারাদিন কাচা কাচি করে, জল ঘেঁটে তার শরীর আর বইছিল না, তা ছাড়া হঠাৎ যেন সর্দি লেগে শরীরটা জ্বরে এসেছে। বাড়িতে থেকে গেল প্রীতি।

অবলাও বাড়ি নেই। দৌদামিনীকে সঙ্গে নিয়ে অবলা গেছে এই শহরের অন্য প্রান্তে। একটা নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। বড় জানা-শোনা বাড়ি অবলার, যে ছেলেটিকে মাস ছয়েক আগে ভূমিষ্ঠ হতে সাহায্য করেছিল—আজ তার অন্নপ্রাশন। না গিয়ে উপায় নেই।

ফাঁকা বাড়িতে প্রীতি একা বসে আছে। মনে হয় না—রাত নটার আগে কেউ ফিরবে। ইতিরা ত গেলই সামান্য আগে।

সদরে কড়া নড়ে উঠতে, প্রীতি সাড়া দিল, 'কে?'

'আমি।' চারুর গলা।

প্রীতি উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল।

উঠোনে পা দিয়ে চারু বাড়িটার ফাঁকা ফাঁকা লক্ষ্য করল। 'কি ব্যাপার?'

প্রীতি সংক্ষেপে অবলার কথা বলল। ইতিরও কথাও।

চারু যেন খুশী হল। প্রীতির সন্দেহ হল, চারু সব জেনে শুনেই এসেছে কি না। যদি এসে থাকে, প্রীতিও যেন আর একটু বেশী খুশী হয়।

'তা হলে তুমি একা?' চারু বলল। আজ ক'দিনেই চারু আপনি থেকে তুমিতে এসেছে।

প্রশ্নটা এবারের। প্রীতি যে একা সে ত দেখতেই পাচ্ছে চারু। প্রীতি নীরব থাকল।

উঠোনেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চারু একবার দোতলা দেখল, একবার আকাশ; পেয়ারা গাছের গায়ে আজ চাঁদের আলো আরও পরিষ্কার দেখাচ্ছে।

'তা হলে কালই—?' চারু স্বাভাবিক গলায় বলার চেষ্টা করল।

'হ্যাঁ।'

'কোন ট্রেন?'

'দুপুরে শুনেছি।'

চারু নিশ্বাস ফেলল। অন্যমনস্ক ভাবে পেয়ারা গাছের দিকে তাকিয়ে থাকল। 'তখন আমার অফিস—।' চারু যেন আক্ষেপ জানাল।

প্রীতি দাঁড়িয়েছিল। বেতের মোড়াটা বারান্দার কোণায় এগিয়ে দেবে কি না ভাবল।

'বসবেন না?' প্রীতি মোড়া এগিয়ে দিল।

চারু বসল না। তবে সরে এসে মোড়ার কাছে দাঁড়াল। চারুকে আজ খানিকটা উদাসী খুসকে দেখাল। দুপুরে হয়ত খুব ঘুমিয়েছে। হয়ত মাথায় তেলও দিতে ভুলে গেছে। মাথার চুল এলোমেলো।

'দেখতে দেখতে কটা দিন কেটে গেল, না—?' চারু বলল।

তা ঠিকই। প্রীতির মনে হল, কাল কি পরশুই যেন তারা এসেছিল। আটটা দিন হু হু করে কেটে গেল কেমন। অথচ প্রীতি অবাক হচ্ছিল, চারুর সঙ্গে তার পরিচয়কে এত সংক্ষিপ্ত বলে মনে হয় না। যেন তাদের আলাপটা অনেক দিনের।

'নবদ্বীপে যেতে যেতে তোমাদের অন্নপ্রাশন মাস হয়ে যাবে। না?' চারু জিজ্ঞেস করল।

'কি জানি। মেসোমশাই ত পুজোর সময় থাকছেন ওখানে, তারপর যা হয়!' প্রীতি বলল। বলে কী ভাবল সামান্য। 'অত দেরী হবে না।'

'নবদ্বীপে গেলে আমায় জানিয়ো। নিত্যদার কাছ থেকে অবশ্য আমি জানতে পারব।'

'আপনি যাবেন?'

'ইচ্ছে ত আছে।' চারু হাসল।

প্রীতির ইচ্ছে হল বলে, কেন? ইতির জন্যে?

'নবদ্বীপে আমার এক আত্মীয়ও আছে। নিজের কেউ না। আমার মার সম্পর্কে কি যেন হয়।' বলতে বলতে চারু হাই তুলল। মোড়াটায় বসল এবার।

প্রীতি দাঁড়িয়ে থাকল। উঠোনটা বেশ দেখাচ্ছিল। কাঁচা উঠোন, কিন্তু পেটানো, ঝকঝকে। পেয়ারাগাছের ওপাশে কয়েকটা বেলফুলের গাছ। একটাও ফুল নেই। জ্যোৎস্না উঠোন পেরিয়ে বারান্দার অর্ধেক এসেছে।

ঠাট্টা দেখতে দেখতে প্রীতি বলল, মন্দিরে যাবার ইচ্ছে ছিল।'

'হ্যাঁ, বলছিল আমায়। ওর খুব বেড়াবার শখ।'

'নিয়ে গেলেন না কেন?' প্রীতি সরল গলায় বলতে চাইল, অথচ তার গলার স্বর অন্য রকম হল।

'আমি নিয়ে যেলাম না! বাঃ!···তোমাদেরই দেখলাম পা নেই।'

'আমার যাওয়া মুশকিল। ওকে নিয়ে গেলে পারতেন।' প্রীতি দোতলার দিকে তাকিয়ে মৃদু গলায় বলল, 'আমার ওপর খুব রেগেছে।'

চারু প্রীতিকে দেখছিল। জ্যোৎস্নার হালকা আভায় প্রীতির মুখ খুব স্পষ্ট দেখাচ্ছিল। চারু কি ভেবে হেসে বলল, 'তোমার ওপর আমিও খুব রেগেছি।'

প্রীতি মুখ ফেরাল। চারুকে দেখল।

'কাল তুমি ওপরে এলে না কেন? অত ডাকলাম আমরা।' চারু বলল।

'মেসোমশাইয়ের সঙ্গে কথা বলছিলাম।'

'সে আর কতক্ষণ? তারপরও ত মাথা ধরার নাম করে শুয়ে থাকলে।'

প্রীতির বুক হঠাৎ কেঁপে গেল। যেন ধরা পড়ে গেছে প্রীতি। প্রকাশ করল না। বলল, 'মাথা ধরার নাম করে মানে—।'

'তোমার মোটেই মাথা ধরে নি।' চারু প্রীতির দিকে তাকিয়ে কথা বলছিল।

অস্বস্তি বোধ করল প্রীতি। কি করে চারু বুঝল তার মাথা ধরে নি? কে বলল চারুকে?

'আমি মিথ্যে কথা বলছি যা কি?' প্রীতি তেমন জোর পেল না গলায়।

'না; ধরলেও সামান্য ধরেছিল। তেমন কিছু নয়।···তুমি থাকলে খেলাটা জমত।'

খেলা জমত! চারু কি তাকে খেলা জমানোর জন্যে চেয়েছিল!

'ইতি কিছু জানে না। একেবারে কাঁচা।' চারু বলল।

'কি—!' প্রীতি খুব অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল হঠাৎ, সামলে নিল। 'ইতি জানে না।···ইতি ভালই জানে।'

'ধ্যাত্, কি যে বল তুমি! ইতি একেবারে বাজে।' চারু ব্যাপারটা লঘু করে দিল। একটা সিগারেট ধরাল এবার। তিন চারটে সিগারেট কিনে এনেছে চারু।

প্রীতি কথা বলল না। তার বসতে ইচ্ছে করছিল। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যায়। তা ছাড়া আজ অত কাচা কাচির পর তার কোমর পিঠ ব্যথা হয়ে আছে। বারান্দা পরিষ্কার। প্রীতি এখানে বারান্দার রেলে ঠেস দিয়ে বসতে পারে।

'আমরা মেসে এই তাস নিয়েই আছি। আমাদের ঘরে অনাথরা ফিরে এলে রোজ তাসের আড্ডা বসে।'

'রো—জ?' প্রীতি অকারণে বলল। বলে বারান্দার রেলে ঠেস দিয়ে বসে পড়ল।

'রোজই প্রায়।···মাঝে মাঝে সিনেমা দেখতে যাই।' চারু যেন নিজেদের জীবনের গল্প বলতে প্রস্তুত করছিল। 'আমাদের বড় একটা পয়সা লাগে না সিনেমা দেখতে।

'কেন?' প্রীতি অন্য কথা না পেয়ে কইলেন।

'পল্টুদা আছে। পল্টুদা সিনেমা অফিসের বুকিং ক্লার্ক'। তা ছাড়া এমনিতে রিভিউপত্র লেখে। পল্টুদার পয়সা কড়ি লাগে না।'

প্রীতি চুপ করে শুনছিল। বারান্দার ধারে বসে পড়ায় তার গায়ে মুখে চাঁদের আলো পড়ছে। পরিষ্কার রঙ, লম্বা ধরণের মুখ আলোয় ওকে সুন্দর দেখাচ্ছিল। সুন্দর ও শোভন।

চারু বলল, 'আমাদের মেসটা মজার। তোমরা অবশ্য খুব নিন্দে করবে।'

'কেন?'

'না, মানে তোমাদের সঙ্গে ব্যাপারটা ওরা ভাল করে নি।'

'আপনিও ত মেসে থাকেন।' প্রীতি মিষ্টি করে বলল।

'হাঁ, থাকি। আমরা অনেকেই থাকি।—আসলে কি জান, আমাদের মেসটাও ওই রকম, জগতে যা হয়, কিছু মন্দ কিছু ভাল।' চারু তাদের মেসের লোকদের কথা ভাবতে ভাবতে বলল। 'এক এক জনের যা কীর্তি আছে শুনলে তুমি হেসে মরবে। সে সব গল্প করাই হল না।'

প্রীতি কিছু ভাবছিল। চারুকে লক্ষ্য করে চারুর জীবনকে দেখতে চেয়ে কিছু ভাবছিল। বলল, 'এই

মেসে আপনি কতদিন আছেন?'

'চার পাঁচ বছর

'এই শহরে?'

আর একটু বেশী দিন।' চারু তার শহরে আসার দিন মেপে করল। এখনও তার বেশ মনে আছে দিনটার কথা। একেবারে মাঘের শীতে এখানে এসে হাজির হয়েছিল চারু। বলল, 'আমি প্রথমে এসে কি করতাম জান?'

প্রীতি তাকিয়ে থাকল।

'ঘিয়ের ব্যবসা।' চারু নিজেই হেসে উঠল। প্রীতি অবাক হয়ে চারুকে দেখছিল। হাসির কি আছে! হাসতে হাসতে চারু বলল, 'দোরে দোরে ঘি বিক্রি করে বেড়াতাম। ব্যবসাটায় দেড় হাজার টাকা লোকসান হয়ে গেল। ধার করে দিয়েছিলাম অনেক মহাজনের ধরবার আশায়, কেউ আর শোধ দিল না।'

প্রীতি কৌতূহল বোধ করছিল। অতগুলো টাকা লোকসান দেয়ে গেল মানুষটা। যেমন সর্বনাশের মানুষ। ব্যবসা কি ওর ধর্ম!

'ঘিয়ের ব্যবসা ফেল করল যখন তখন একটা পরিচিত দোকান দিলাম, ছিট কাপড় বেচতাম। সেটাও ফেল করল। আরও হাজার খানেক জলে গেল।' চারু এমন করে বলছিল যেন বিন্দুমাত্র অনুশোচনা নেই তার।

প্রীতি, এবার সামান্য কৌতুক করেই বলল, 'আপনার অনেক টাকা ছিল তবে।'

'অ-নেক! অনেক নয়; কিছু ছিল। হাজার তিনেক।' বলে চারু খানিক থামল, কি ভাবল যেন, গলার স্বর নরম হয়ে এল, বলল, 'টাকাটা কালতু এসেছিল, উড়ো টাকা, উড়ে গেল।'

প্রীতির ইচ্ছে হচ্ছিল জিজ্ঞেস করে টাকাটা কি করে পেয়েছিল চারু! কুড়িয়ে নাকি। নয়ত সেই টাকার জন্যে একটু দরদাবারও তার থাকল না কেন?

খানিকটা সময় চুপচাপ থেকে চারু বলল, 'লোকে যে বলে পাপ কখনও সয় না, বুঝলে প্রীতি, কথাটা একেবারে খাঁটি। অধর্ম সয় না। ফাঁকির জিনিস ভোগে আসে না।'

কথা না বলে প্রীতি তাকিয়ে থাকল।

চারু আপন খেয়ালে বলল, 'আমি নিজের জীবনেই দেখেছি, ধর্মের কল সত্যিই বাতাসে নড়ে।—আমার এক বন্ধু ছিল—দিউড়িতে থাকতাম তখন, দুজনে মিলে একটা ব্যবসা সুরু করেছিলাম। ব্যবসাটা ভালই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তারপর যে কী হল, একটা বাজে ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া সুরু হল। ওর মাথা বিগড়ে গিয়েছিল, আমারও গোঁ ধরে। দোকানটা ছিল আমার নামে। আমি জিতলাম, ও হারল। সেই দোকান বেচে টাকা নিয়ে আমি পালিয়ে এলাম।' চারু দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

প্রীতি বুঝতে পারছিল না, এর মধ্যে অধর্ম কোথায়। বলল, 'তবে আর অধর্ম নেই!

'অধর্ম নয়। দোকানটা ওর চোখের আর পরিশ্রমে দাঁড়িয়েছিল। আমি ত ফুকো ছিলাম।'

'তবে টাকা নিলেন কেন?'

চারু সে-কথার জবাব দিল না। অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকল। হয়তো তার পুরোনো কথা মনে পড়ছিল, সে ভাবছিল।

'তা এই মেসে আর কতদিন থাকবেন?' প্রীতি এবার হালকা গলায় বলল।

'মেসে—।' চারু প্রীতির দিকে তাকাল। তাকিয়ে থাকল কয়েক দণ্ড। তারপর হেসে বলল, 'দেখি। একটা আস্তানা গাড়ি কোথাও, তারপর—'

'তা—' প্রীতি মুখ ফসকে বলে ফেলল, 'সংসার পেতেই বসুন না।'

'সংসার।' চারু চোখে চোখে চেয়ে থাকল প্রীতির।

অস্বস্তি বোধ করল প্রীতি, চোখ ফিরিয়ে নিল। অথচ অনুভব করল, কথাটা যখন বলে ফেলেছে তখন আর চুপ করে থাকা যায় না। হাসি ঠাট্টার মধ্যেই কথাটা শেষ করতে হবে। 'বিয়ে থা করুন না। আমরা আবার যদি এসে পড়ি হঠাৎ, আপনার বাড়ি গিয়ে উঠব।' প্রীতি হাসল।

চারুর যে কথা মুখে আসছিল তা আর বলল না। বলতে বাধল। হয়ত প্রীতি তাতে অন্য রকম বুঝবে। ঠাট্টার স্বরে চারু জবাব দিল, 'আর কি তোমরা আসবে নাকি!—এই হঠাৎ এসে পড়েছ।'

'ওমা, কেন আসব না; আসব।' প্রীতি অযথা গলায়

জোর দিয়ে বলল। সদার দরজা বেশ বুঝতে পারছিল প্রীতি, এ কথার কোনো মানে নেই, মানুষ যেমন মানুষকে ভদ্রতা করে বলে, 'হ্যাঁ আসব'—এই কথাও তেমনি। কৃত্রিম। সৌজন্য শুধু।

বেড়ালের ভাগ্যে আবার শিকে ছিড়বে, বলছ! চারু হাসি মাখানো মুখে বলছিল। যদিও তার এই হাসি করুণ লুকোনো বেদনায় ভরা।

'ছিঁড়বে বই কি, একবার কেন, কতবার দেখুন। তখন আবার বেকার হয়ে না তাড়িয়ে দেব।'

'তা ঠিক। আবার বউ হয়ত ও-সব ঝামেলা ঝঞ্ঝাট পছন্দই করবে না। তোমারও ত···' চারু কথাটা শেষ করল না, হাসতে লাগল।

প্রীতি বুঝতে পেরেছিল। দু পলক স্তব্ধ চোখে চারুর মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল। জ্যোৎস্না তার পা বেয়ে মাটিতে নেমে গেছে। মাটির রং কেমন বিবর্ণ।

দুজনেই নীরবে বসে থাকল। চারু উদাস অন্যমনস্ক। প্রীতি ব্যথিত। বারান্দার সর্বস্থান জুড়ে ভাদ্রের আকাশের জ্যোৎস্না, বাতাসও ছিল সামান্য। পিয়ারাগাছের পাতাগুলো কাঁপছিল। এই বাড়ি নিস্তব্ধ। কোথাও কোনো শব্দ নেই। ওপর অন্ধকার, নীচেও বাতি জ্বলছে না বোধ হয় হয়ত প্রীতির ঘরে টিমটিমে বাতিটা কম জোর করে রাখা আছে। গলির কোনো কোনো শব্দ কদাচিৎ কানে আসছিল।

ওরা এই ভাবেই বসে থাকল। কথা না বলে, পরস্পর থেকে দূরে বসে। মনে মনে এই দুটি যুবক যুবতী নিজেদের হৃদয়জাত বোধে অনুভব করতে পারছিল, তারা পরস্পরকে নিকটতর করার আকাঙ্খায় কাতর। অথচ এই আকাঙ্খা প্রকাশ করা অথবা পূরণ করার কোনো উপায় তারা খুঁজে পাচ্ছিল না। এমন কি, এই মুহূর্তে ওরা একথাও অনুভব করছিল, তাদের অন্তরে যে দুঃখ ও বেদনা উপস্থিত হয়েছে তার বুঝি অন্ত নেই। হঠকারি করে এখন চারু প্রীতিকে কিছু বলতে পারে না, প্রীতিও ইতির মতন অসভ্য বিচ্ছিরী কিছু করতে পারে না। হয়ত, এই যে মন খারাপ, কেমন না-পাওয়া না-পাওয়া ভাব, কিছু খোয়ানোর দুঃখ—এ সমস্তই পরে একদিন আর ওদের মনে থাকবে না। যা মনে থাকলেও, হয়ত নিশ্বাস ফেলবে দুজনেই। চাপা নিশ্বাস।

চারু পকেট থেকে আরও একটা সিগারেট বের করল। কাল থেকে আবার বিড়ি টানবে চারু।

প্রীতি মুখ হেঁট করল।

চারু সিগারেট ধরিয়ে বলল, কেমন ব্যর্থ গলায়, হাসির স্বর করে, 'যাই বলো, এ কিন্তু বড় খারাপ।'

'কি খারাপ—' প্রীতি নিশ্বাসের সুরে বলল।

'এমনি করে দেখাটেখা হওয়া। এ যেন ধর্মশালার আলাপ। আজ দেখাশোনা হল, কাল আবার ভোঁ ভোঁ যার যেখানে যাবার চলে গেল।···এর চেয়ে দেখাটেখা না হওয়াই ভাল।'

প্রীতির ইচ্ছে হল বলে, আর এইরকম দুদিনের আলাপে ভাল লাগাও ভাল না। কে বলতে পারে, এই ভাল লাগার দুঃখ সারা জীবনেই আমাদের আর যাবে কি না!

চারু এবার আরও একটু হালকা গলায় বলল, কের মেসবাড়িতে তুমি যেন কেমন করে এলে—?

'ঝঞ্ঝাট বাঁধাতে?'

'না না। ঝঞ্ঝাট কি!···কেমন যেন মন খারাপ করিয়ে দিতে।···।' বলে চারু থামল একটু, তার মনে হল, প্রীতি যেন তার ফাঁকা ঘরে ভ্রমরের মতন এসেছিল। চারুকে কেমন বিহ্বল করে চলে গেল।

মোড়া থেকে উঠে দাঁড়াল চারু। ইতিরা ফিরে এল। সদরে তাদের গলা। চারু বলল, 'এ ভাবে আর এস না। বিশ্রী লাগে।'

প্রীতি সদর নেই দেখে সহসা বলে ফেলল, 'আমি আসব না চয়। আপনি কিন্তু যাবেন। নবদ্বীপে।'

ইতিরা খোলা সদর দিয়ে উঠোনে এসে দাঁড়াল।

— সমাপ্ত —

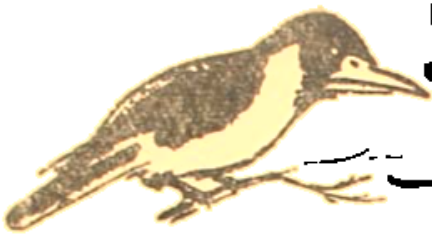

কাকাতুক

শ্রীদণ্ডবায়স

কলে জল পড়ে

কলে জল পড়ে, পাড় জলচর
নেমে আসে চ্যাং ব্যাং,
নয়ন জুড়িয়ে দেখা দেয় কভু
মরা ইঁদুরের ঠ্যাং।
ঝুড়ি পেতে তাই কলের তলায়
আশায় আশায় বসে আছি ঠায়
ঝুড়িতে কখন মৎস্যকন্যা
নেচে ওঠে ড্যাং ড্যাং।

অহো, বড় ব্যথা

বাংলা কাঁদিয়ে বিধান গেলেন স্বর্গ,
আমি রাজা হবো—বলে পারিষদবর্গ
চৌরঙ্গীতে হবে অভিষেক রঙ্গ,
'জয় বাঙ্গাল' বন্দনা গাবে বঙ্গ—
দিল্লীর চাচা হঠাৎ বসালো খড়্গ
অহো বড় ব্যথা—সখি, তোরা
মোরে ধরাগো।

মহাযাত্রা

কালীঘাটের জবা ছোঁয়াও
মাথায় ছিটোও গঙ্গাজল,
গিন্নী এসো, সার দিয়ে সব
দাঁড়াও ছেলে মেয়ের দল।
সবাই মিলে কোরাস ধরো
"শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর—"
স্টেট বাসেতে অফিস যাব
ফিরব কি না ফিরব ঘর!

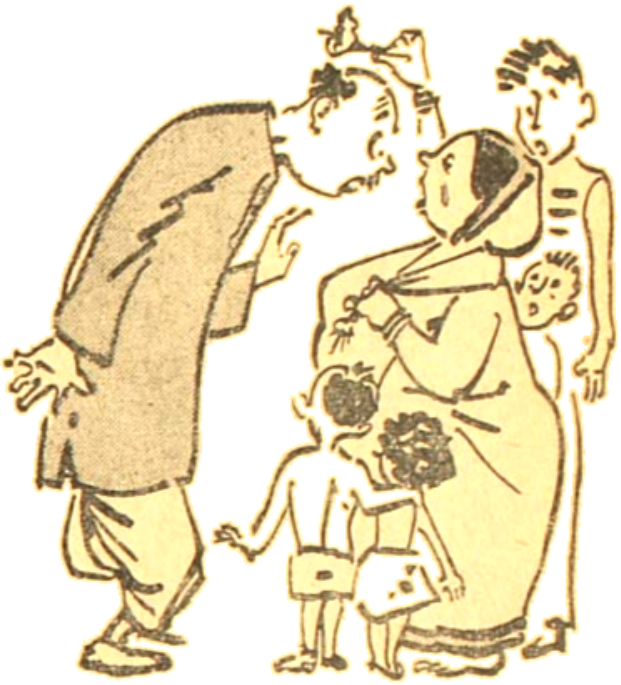

রামা হো

খাস্তা ঘাঁটতি? অনাহারে গাও গান
(আরে রামা—রামা হো!)
চাকরী বাগাবে? করো তবে সন্ধান
(আরে মামা—মামা হো!)
মানের বালাই? নাকে তবে নাও ঘষে
(আরে ঝামা—ঝামা হো!)
উন্নতি চাই? ধরে তবে রাখো কষে
(আরে ধামা—ধামা হো!)

পল্লী গীতির সুরে

ও পরাণের ষাঁড় রে
সহেনা যে আর রে,
নিদয় বঁধু ধরে তোরে
কারে যে পাচার রে !
আহা—এত কালো টাকা
সব—লাগে ফাঁকা ফাঁকা
কার খুরে সিঁদুর দিয়ে
হাবো ভব পার রে !

ক্ষতিপূরণ

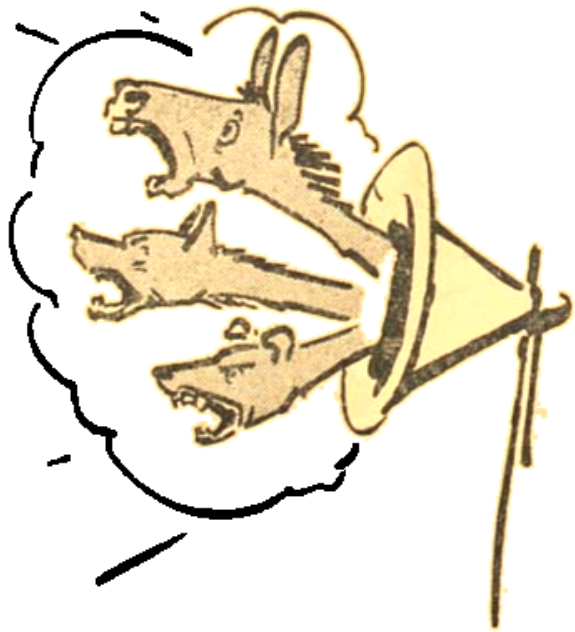

কলকাতা শহরেতে শেয়ালের ডাক নেই ঃ
চ্যাহো—চ্যাহো প্রাণ কাড়া
গাধাদের হাঁক নেই—
মানুষের হাতে পড়ে কুকুরেরা সভ্য
খ্যাঁক খ্যাঁক খেউ খেউ
হালো যে অলভ্য।
বেঁচে থাক মাইকেতে সিনেমার গীতালি
কুকুর-শেয়াল-গাধা এক সাথে মিতালি
[আমাদের আয়োজনে কোনোখানে
ফাঁক নেই।]

মতান্তরে

"যাদু এতো বড় রঙ্গ. যাদু
এতো বড় রঙ্গ.
চার কালো দেখাতে পারো.
যাবো তোমার সঙ্গ।"
"কাক কালো. কোকিল কালো.
কালো পোড়া হাঁড়ি।
সবার চেয়ে কালো কন্যা.
কাবুলিওলার দাড়ি
(যখন পয়লাতে সে আসে।)"
"যাদু এতো বড় রঙ্গ. যাদু
এতো বড় রঙ্গ
চার মরণ দেখাতে পারো.
যাবো তোমার সঙ্গ।"
"আফিং মরণ. দড়ি মরণ.
মরণ চাপা পড়া,
একেবারে নির্ঘাৎ মরণ
রেলগাড়ীতে চড়া—
(একবার চেপেই দ্যাখো।)"
[কন্যা এবারে 'স্পীক্‌টি নট !']

চাঁদ ও চাঁদা

লুনিকেতে চেপে চাঁদে চলে যাবে ?
তোমরাই সুখী দাদা.
চাঁদের জগতে আসে না তো কেউ
নিতে বারোয়ারী চাঁদা।

খুড়োর কল

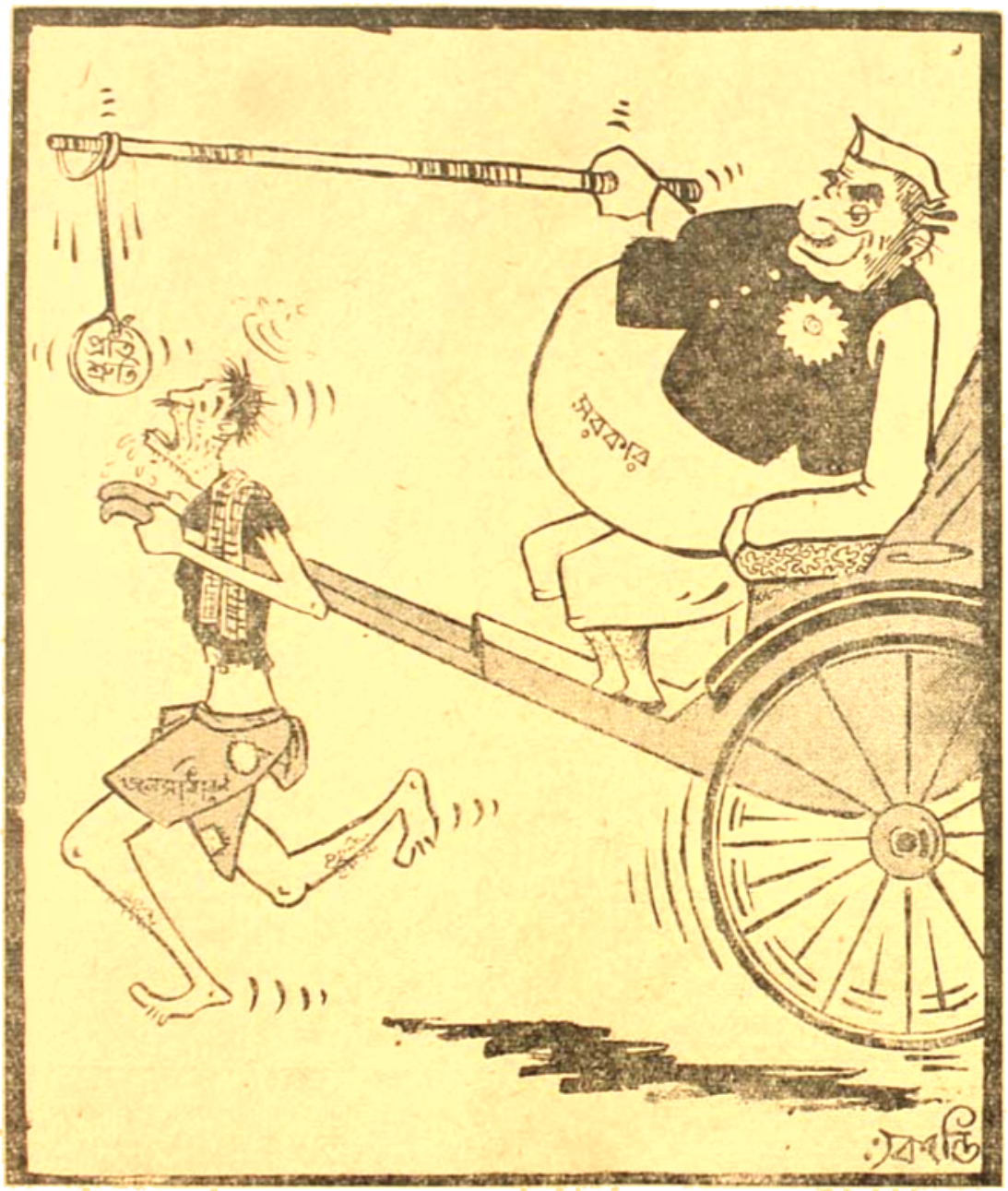

শিল্পী : কান্তিভূষণ

দুই সখী

আলোকচিত্র : অরুণ সেনগুপ্ত

শ্যামচাচার কইলো ভাইপো

নিত্যেশ মুখোপাধ্যায়

আমাদের আছে ভারতমাতা, ইংল্যাণ্ডের জনবুল ও মার্কিনীদের আঙ্কল স্যাম (শ্যাম)। এই শ্যামচাচার আপন বলতে কেউ ছিল না। যত রাজ্যের সব পাতান ভাইপো ভাইঝিরা দূর দূর জায়গা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, হল্যাণ্ড, ইটালী, আয়ারল্যাণ্ড, চীন-জাপান সব জায়গা থেকেই আমেরিকায় এসে 'কারো আমার কিরিও না' ভাব করে এখানে জমিয়ে বসেছে ভাইপোরা। শ্যামঘুড়ো লোক ভাল—ঝিনুকি না করে সবার আবদার সহ্য করে সবার জন্যই দরজা খুলে রেখেছেন। কিন্তু দেখা গেল ভাইপোরা কারোর নয়, সেক কাকাকে ভাইপোদের ঘপ্পরে পড়তে হল। পাতান ভাইপোরা এসেই একে অপরের উপর 'খুর ছাই' করতে সুরু করে দিলে। অনেকটা ভিড় ঠেলে ট্রেনের কামরায় উঠবার পর তখন অন্য যাত্রীদের ঘাও বাদাই করে সরিয়ে দেবার মত। প্রথমে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স হল্যাণ্ড ও জার্মানী থেকে আসত ভাইপোরা এসে পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে অন্যদের উপর খড়্গ হস্ত। তখন ইটালীয়, আইরিস ও স্পানীদের অবস্থা শোচনীয় ছিল। কিন্তু ক্রমে তারাও জাতে উঠল এবং অন্যান্য পেরারের ভাইপোদের মত সুযোগ-সুবিধা পেল। কিন্তু নিগ্রো ও পোর্তোরিকানদের অবস্থা আজও [illegible]নয়। অন্যেরা ঠেলা মেরে তাদের নীচে দাবিয়ে রাখতে চায়। সমাজে সমান অধিকার সমান নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্যে এরা এখন সচেতন হয়ে উঠেছে। শুধু রাস্তা পরিষ্কার করা, হোটেলে কাজ করা, লিফ্‌ট চালানো, বাড়ী তৈরী করা আর খাওয়ার মত নোংরা পরিবেশ করা, এইসব কায়িক কাজ নয়, সামাজিক জীবনে নানান মানসিক ভূমিকা গ্রহণ করবার প্রয়াস এসেছে নিগ্রোদের মধ্যে। সাদার সঙ্গে কালোর বৈষম্য ঘুচে মুছে নির্মূল করে দেওয়ার জন্য আজও আমেরিকায় অধিকারের সংগ্রাম চলছে।

অবশ্য নিগ্রো পরিত্রাসের চেষ্টা চলছে বহুদিন থেকে। এমনও সর্বাঙ্গীন তা সার্থক হয়নি। আমেরিকার কতগুলি জায়গা আছে সেখানে নিগ্রো-তারণ অত্যাধিক। নিউ ইয়র্ক সে তুলনায় অনেক সহনশীল। নিউ ইয়র্ক স্টেটে নিগ্রোদের অনেক দায়িত্বপূর্ণ কাজে দেখতে পাওয়া যায়। এমনকি সিটি বারোর প্রেসিডেণ্ট ছিল এক নিগ্রো মিঃ অ্যাক। বিচিত্র এই সহর নিউইয়র্ক। এর যেখানে নিগ্রোপল্লী সেটির নাম হার্লেম। সেখানে রাত্রে কোন শ্বেতাঙ্গ যেতে চাইবে না। এমনি কালো জুজুর ভয়। তাদের কবি, শিল্পী, ভাবুকদের সঙ্গে কথা কইলে জানতে পারবেন বর্ণবৈষম্যের দুঃখের খোঁচাটা কত ভয়ঙ্কর। জাত্যাভিমান একই দেশের মানুষকে কত তফাত করে দেয়। ইদানীং

উঁচুমহলের টনক পড়েছে। এক স্কুলে সাদাকালো ছেলেমেয়েরা পড়তে পারবে না, এক বাসে পাশাপাশি বসতে পারবে না, রেস্তরাঁয় পাশাপাশি খেতে পারবে না এমন অন্যায় "ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা ভাব" আমেরিকায় চলছিল। এই বর্ণবৈষম্য দূর করার জন্যে আইন করে কাজ সুরু করা হয়েছে। মিঃ কেনেডি সর্বপ্রথম তাঁর মন্ত্রি-সভায় একজন নিগ্রোকে স্থান দিয়েছেন। আইন করে মানুষের মন বদলান যায় না—এই বর্ণবৈষম্য দূর করার জন্যে চাই নির্মোহ মানসিক গঠন।

আমেরিকার কোন কোন জায়গায় অতি ভয়ঙ্কর নিগ্রো নির্যাতন আছে তা অনুমান করাও দুঃসাধ্য। জন ক্রিকিন নামে একজন শ্বেতকায় সাংবাদিক এক দুঃসাধ্য কাজ করে বসলেন। তিনি তাঁর দেশবাসীকে এই বর্ণবৈষম্য সম্বন্ধে সচেতন করে দেবার জন্য নিজের দেহে অক্সোরেলিন (Oxsoralin) নামক এক বিশেষ ঔষুধ ইনজেকশন করিয়ে কিছু-দিনের মত নিজের গায়ের রঙ অনেকপোঁচ গাঢ় করে ফেলেন এবং কালা আদমীর চেহারা নিয়ে সচক্ষে দেখবার জন্যে বর্ণবৈষম্যের খুঁটি-

গুলি লুসিয়ানা, মিসিসিপি, আলাবামা ও জর্জিয়া—পরিভ্রমণে যান। তাঁর বিবরণ পরে ১৯৬০ সালের সাপ্তাহিক টাইম পত্রিকার ২৮শে মার্চ তারিখের সংখ্যায় বার হয়েছিল। তিনি নিজে চোখে যা দেখেছেন যা শুনেছেন, সে সম্বন্ধে অনেক কথাই লিখেছেন যা পড়লে অতি ভালমানুষ লোকেরও রক্ত গরম হয়ে উঠবে। তাঁর অভিজ্ঞতার দুটি প্রসঙ্গ এখানে বলি। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার সুরুতে বলছেন যে নিজের গায়ের রঙ গাঢ় করে পরিভ্রমণ সুরু করার সময়ই তিনি প্রথম দেখতে পেলেন তাঁর দিকে শ্বেতাঙ্গ লোক মাত্রেই কেমন একটা 'ঘেন্নার চাহনী' দিতে সুরু করেছে। কোন কারণ নেই এমনিই, দেখবার সময় কালো লোকদের তারা ঘৃণা করেই দেখে থাকে। তারপর তাঁর যাত্রার সুরুতে একজন অতি সদাশয় ট্রাক ড্রাইভার তাঁকে যাত্রার খানিকটা পথ আগিয়ে দেয়। সেই সদাশয় শ্বেতকায় ড্রাইভারটি এ দেশে নিগ্রোদের বিড়ম্বনা দেখে সত্যই দুঃখিত। তার মনে হয় এই নিগ্রো নিগ্রহের অবসান হতে পারে যদি নিগ্রো পরিবারে শ্বেতকায়ের রক্ত নিয়ে আসা সম্ভব হয়। শুধু তাই নয় আপাতঃ কৃষ্ণকায় সাংবাদিকের কাছে এই ট্রাক ড্রাইভার এমন কথাও বলেছে যে তার উচিত তার স্ত্রীকে বাধ্য করতে যাতে তিনি ভবিষ্যতের কথা ভেবে সদাশয় শ্বেতকায় লোকের দাক্ষিণ্য বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করেন তাহলে বংশ-পরম্পরা এই কালোর অপবাদ ঘুচিয়ে ফেলতে পারবে।

নানাদেশ থেকে নানারকম লোক আমেরিকায় জমায়েত হয়েছে কিন্তু নিগ্রোদের সম্পর্কে বিশ্বাস কী তা প্রকাশ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। সাদা আমেরিকানদের নিজেদের মধ্যেও মতান্তর যে একেবারে নেই তা নয়। সবাই আমেরিকান কিন্তু যারা ফ্রান্স থেকে এসেছে তারা ফ্রেঞ্চ-আমেরিকান, যারা জার্মানী থেকে এসেছে তারা জার্মান-আমেরিকান। যারা হল্যাণ্ড থেকে এসেছে তারা ডাচ-আমেরিকান। যারা ইটালী থেকে এসেছে তারা ইটালীয়ান-আমেরিকান। আবার চীন থেকে এসেছে তারা চীনা-আমেরিকান। নানাদেশের নানা লোক এসে আমেরিকার নতুন সভ্যতার পত্তন করেছে। কিন্তু তাদের নিজের মধ্যে আচারগত বৈশিষ্ট্য থাকা

বিচিত্র কী? নিজের নিজের ধর্মাচরণে প্রভেদ আছে। কেউ ক্যাথলিক কেউ প্রটেস্টান্ট কেউ বা কেউ বা বৌদ্ধ। সাংস্কৃতিক ভাবভঙ্গীও নানাবিধ। মার্কিনে কেলেসে [redacted] জার্মান, ফ্রেঞ্চ, ইটালীয় চৈনিক রকম বেরকম [redacted]না। তাছাড়া এক পুরুষে যারা আমেরিকান বাপঠাকুরদার বাস্তু ত্যাগ করে নিজেদের জন্মভূমির সম্পর্ক ছিন্ন করে এই নতুন পৃথিবীর নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছে। তার মধ্যে মধ্যে ফেলে আসা দেশ ও ও আত্মীয় পরিজনদের জন্য কখনও কখনও পেছটান অনুভব করে।

কেউ কেউ বছরে ছুটীতে পুরোনো দেশ ও পুরোনো আত্মীয় বন্ধুদের দেখতে যায়।

সম্প্রতি ইস্রায়েলে নতুন রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে। ইহুদের নিজের দেশ বলে কিছু ছিল না এতদিন তাদের নিজেদের একটি পাকাপাকি ডেরা তৈরী হয়েছে। ইস্রায়েলের আর্থিক সাচ্ছল্য আশেপ। শোনা যায় নিউ ইয়র্কের ইহুরা আমেরিকায় বসে বসেই মাসে মাসে ইস্রায়েলকে প্রচুর অর্থ সাহায্য করে থাকে। নিউইয়র্কের ব্যবসা বাণিজ্য ও ঘর বাড়ির বেশী ভাগ মালিক হল ইহুরা। তাদের হাতেই পয়সা। এ নিয়ে বহুবার কাগজে বার হয় ইহুদের এই দুনৌকায় পা রাখা চলবে না।

একজন টার্কিশ আমেরিকানকে জানতুম। আমেরিকান বলতে যা বুঝায় তিনি তাই। তিনি নিজের ছেলেকে কিন্তু টপ টপ করে নিজের করে দিয়েছেন যেন হট করতে খট করে ও সাদা মেয়েসাহেবকে ঘরের বউ করে না আনে। কিন্তু এমন নেতি মনোভাব যারা দুপুরুষে বা তিন পুরুষে আমেরিকান তাদের মধ্যে নেই। তারা অনেক সংস্কার মুক্ত, বাপ ঠাকুরদার মত তাদের ইউরোপের কোন বিশেষ দেশ বা জায়গার প্রতি অধিক মমত্ব নেই। তারা নতুন পৃথিবীর নাগরিক, অন্য কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে আত্মিক যোগ নেই। তারা অনেক মুক্ত।

মারলিন ডিটরিককে কে না চেনেন। তিনি কিন্তু জন্মে আমেরিকান নন। বার্লিনে তাঁর জন্ম। পরে জার্মাণী ত্যাগ করে এসে মার্কিণ বাসিনী হয়েছেন। যেমন এক পুরুষে অনেকেই এমন আমেরিকান হয়েছেন। বলাবাহুল্য তাঁদের মনে আগেকার দেশকালের সময়ে জল-জল করে। মারলিন ডিটরিকও আমেরিকায় থেকেও বার্লিনকে ভুলতে পারে নি। গত মহাযুদ্ধের সময় তিনি আমেরিকার পক্ষ সমর্থন করে মার্কিণ সৈন্যদের মনোরঞ্জন করতে নানা জায়গায় নাচ গান করেছিলেন। সে খবর শুনে সমস্ত জার্মান ডিটরিককে ধিক্কার দিয়েছে। যুদ্ধ শেষ হবার পর ডিটরিক আবার বার্লিনে গান শোনাতে স্বেচ্ছায় এলেন ঊনোত্তিরিশ বছর পরে। বিখ্যাত টাইটে-নিয়া প্লাটন এ তাঁর জলসার আয়োজন হল। কম্পিত বক্ষে তিনি স্টেজে উঠলেন কিন্তু জার্মানরা ডিটরিকের যুদ্ধকালীন ব্যবহারের কথা ভুলতে পারেনি। হেক্কাগুহ থেকে পচাড়িম ইত্যাদি ডিটরিকের গায়ে বর্ষিত হতে লাগল। কিন্তু তাঁর কোন দিকে হুঁস নেই। প্রাণের গভীর থেকে সুরের বন্যায় শ্রোতাদের মন ভাসিয়ে দেবার জন্য তিনি গাইছেন সেই বিখ্যাত জার্মাণ সঙ্গীত Ich Bin von Kopf bia Fuss auf Liebe Eingestellt যার মানে আবার নতুন করে প্রেমে পড়ছি। তাঁর গান সবাইকে শেষ পর্যন্ত মোহিত করল চারিদিকে ধন্যি ধন্যি রব উঠল। গানের শেষে তাঁকে দশবার পর্দার বাইরে গিয়ে শ্রোতাদের অভিবাদন গ্রহণ করতে হল।

সেই অবিস্মরণীয় রজনীতে জলসার পর একজন রিপোর্টার মারলিন ডিটরিককে শুধিয়ে ছিল এই মুহূর্তে আপনার কী মনে হচ্ছে? তার উত্তরে ডিটরিক বলেছিলেন 'হোম টাউন' থেকে এ উচ্ছ্বাস এ আবেগ এ সম্মানের তুলনা হয় না। তিনি কায়মনোবাক্যে আমেরিকান, যুদ্ধের সময়ও জার্মাণীর পক্ষ সমর্থন করেননি তবু আমেরিকার বাসিন্দে, হলিউডের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনে মনে এখনও ভুলতে পারেননি বার্লিন তাঁর 'হোম টাউন'।

আমার স্মৃতি কথা

মুজফ্ফর আহ্‌মদ

[আমাদের পার্টি সভ্যদের অনেকে, আর পার্টির বাইরের আমার কোনো কোনো বন্ধুও, আমায় আমার স্মৃতিকথা লেখার জন্যে বারে বারে বলছেন। আমারও একান্ত ইচ্ছা যে আমি আমার রাজনীতিক জীবনের স্মৃতিকথা লিখি। তার জন্যে আমি কিছু কিছু দলিল-পত্রও জোগাড় করেছি এবং এখনও করছি। একচল্লিশ-বেয়াল্লিশ বছরের কথা কেউ শুধু স্মৃতির ওপরে নির্ভর করে লিখতে পারেন বলে আমার বিশ্বাস নেই। তিয়াত্তর বছর বয়স পুরো করে আমি চুয়াত্তরে পা বাড়াতে চলেছি। একে তো এই বয়স, তার ওপরে আবার আমার চোখে ছানি পড়েছে। এই অবস্থায় স্মৃতিকথা লেখা শেষ করতে পারব কিনা কে জানে? এ অনুরোধও আমার কেউ কেউ করেছেন যে আমার রাজনীতিক জীবনের স্মৃতিকথা লেখা শুরু করার আগে আমি আমার আগেকার জীবন সম্বন্ধে, আর সেই সময়কার দেশের অবস্থা সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে হলেও কিছু যেন লিখি। নীচে আমি তাই লিখতে যাচ্ছি।]

বঙ্গোপসাগরে ভাসমান একটি ছোট্ট দ্বীপের নাম সন্দ্বীপ। যুক্ত বঙ্গে এই দ্বীপটি নোয়াখালী জিলায় ছিল, দেশ ভাগ হওয়ার ক'বছর পরে তা চট্টগ্রাম (চাটিগাঁ) জিলায় গিয়েছে। বাঙলা ১২৯৬ সালের শ্রাবণ মাসের কোনও এক সোমবারে আমি এই দ্বীপের মুসাপুর গ্রামে জন্মেছি। আমাদের দরিদ্র পরিবারে কারুরই জন্ম-বার্ষিকী পালিত হতো না, আমার জন্ম-বার্ষিকীও কোনো দিন পালিত হয়নি। তাই, জন্মের তারিখ আমার মনে নেই, মায়ের মুখে শুনে শুধু সাল, মাস ও বারের কথাই আমার মনে আটকে রয়েছে। ১২৯৬ সালের শ্রাবণ মাসের ৭ই, ১৪ই, ২১শে ও ২৮শে তারিখ সোমবার ছিল। খৃস্টীয় সনের হিসাবে এই তারিখগুলি ১৮৮৯ সালের ২২শে জুলাই, ২৯শে জুলাই, ৫ই আগস্ট ও ১২ই আগস্ট। এই চারটি তারিখের মধ্যে কোন তারিখটি ছিল আমার প্রকৃত জন্মদিন তা জানার আর কোনও সম্ভাবনা নেই। সাধারণত আগস্ট মাসকেই আমি আমার জন্ম মাস বলে থাকি।

আমার পিতার নাম মনসুর আলী, আর মায়ের নাম চুনাবিবী। আমার পিতামহের নাম মুহম্মদ কাবেল আর মাতামহের নাম ছিল হরদার আলী ঠাকুর। সন্দ্বীপে ও চাটিগাঁর মুসলিমদের ভিতরেও ঠাকুর পদবী আছে। কবি আলাওলের কাব্যে সৈয়দ মাগন ঠাকুরের নাম আছে। মুসলমানদের নামে ঠাকুর পদবী খানিকটা আভিজাত্যের চিহ্ন। মাতামহের পরিবারে কিঞ্চিৎ আভিজাত্যের দাবী ছিল। ব্যাপারটি তেমন কিছুই নয়। আমাদের দ্বীপের মতো ছোট জায়গায় কোনও পরিবারের নামে একটি বা দুটি তৌজি থাকলেই সে পরিবার অভিজাত হিসাবে গণ্য হতো।

১৮২৭ সালে আমার পিতা জন্মেছিলেন। আমাদের দ্বীপের তখনকার দিনের রেওয়াজ অনুসারে তিনি কিছু বাঙলা ও পারসী লেখাপড়া শিখেছিলেন। তবে, বাঙলায় পরীক্ষা দিয়েই তিনি মোক্তারি পাস করেছিলেন। সন্দ্বীপের আদালতে তিনি আইনের ব্যবসায় করতেন। আমার শিশু বয়সে বৃদ্ধ হওয়ার কারণে তিনি আদালতে যাওয়া এক রকম ছেড়েই দিয়েছিলেন। আমি বাবা-মার কনিষ্ঠ সন্তান। আমাদের পরিবারের দারিদ্র্য ছিল অবর্ণনীয়। পিতার সমব্যবসায়ী লোকেরা প্রত্যেকেই অনেকটা ভূসম্পত্তির মালিক হতে পেরেছিলেন, কিন্তু পিতা তা হতে পারেননি।

আমাদের ওই অঞ্চলে মুসলিম শিশুদের প্রথম পাঠ শুরু হতো আরবীতে। আনুষ্ঠানিকভাবে আমারও তাই হয়েছিল। তবে, আরবী অক্ষর পরিচয় না করিয়ে কেবল মাত্র স্বরচিহ্নের সাহায্যে শিশুদের কোরান পড়ানোর যে-রীতি ছিল এবং তাতে শিশুদের যে বিপুল সময় নষ্ট হতো আমার বেলায় তা হয়নি। পরে বুঝতে পেরেছিলাম যে এদিক থেকে আমার বাবা খানিকটা প্রগতিশীল ছিলেন। তিনি শুরু হতেই আমায় অ-আ-ক-খ পড়িয়েছিলেন। আমি যখন সন্দ্বীপ নব্য ইংরেজি স্কুলে (পরে এই স্কুলের নাম সন্দ্বীপ কাগির্ল হাই-স্কুল হয়েছে) বাঙলা উচ্চ প্রাথমিক শ্রেণীতে পড়ছিলাম তখন আমায় পড়া ছেড়ে দিতে হয়। আমি ছিলাম শিশু, আর স্কুল ছিল আমাদের বাড়ি হতে অনেক দূরে। তার ওপরে স্কুলের সামান্য বেতন জোগানোর সামর্থ্যও আমার বাবার ছিল না। তাই, আমি যে স্কুল ছেড়ে দিলাম তার জন্যে আমাদের দারিদ্র্য-

পণ্ডিত পরিবারে কেউ তেমন হায়-আফসোস করলেন না। বাড়িতে বসে বসে আমার দিন বৃথা কেটে যাচ্ছিল। সেই সময়ে পরিবারে চাষ-বাসও হতোনা যে তার কাজে আমি লেগে যাব।

মুসলিম প্রধান সন্দ্বীপে মোল্লা-মৌলবীর অভাব নেই। গ্রামে গ্রামে পারসী-আরবী পড়ানোর ছোট ছোট মাদ্রাসা। মাদ্রাসায় পড়ার খরচও কম। আমি বাল্যের সীমা ছাড়াতে যাচ্ছিলাম। এই সময়ে অন্যদের দেখাদেখি আমি মাদ্রাসায় পড়া শুরু করে দিলাম। ইরানের কবি সাআদীর "গুলিস্তান" ও "বুস্তান" অনেকখানি পড়েছিলাম, কবি জামীর "ইউসুফ-ও-জুলায়খা" কাব্যের পড়া সবে শুরু করেছিলাম আর পড়েছিলাম কিছু কিছু আরবী ব্যাকরণ। এর মধ্যে এলো ১৯০৪ সাল। এই সময়ে আমার মনে প্রবল বাসনা হলো যে আমি ইংরেজি স্কুলে পড়ব। আমার অগ্রজরা তিন জন ছিলেন,—মুন্সী মহম্মদ আলী, মৌলবী মকবুল আহমদ ও মুন্সী খুরশীদ আলম। মৌলবী মকবুল আহমদ আমার মাঝে মাঝে কিঞ্চিৎ অর্থ-সাহায্য করতেন। তাঁকে পত্রযোগে আমার বাসনার কথা জানালাম, কিন্তু তাঁর নিকট হতে কোনও সাড়া পেলাম না। তার পরে কাউকে কিছু না বলে আমি বাকেরগঞ্জ জিলায় চলে গেলাম। নোয়াখালী জিলার ফলডাঙ্গের বামনী হতেই আমি বাকেরগঞ্জে গিয়েছিলাম। তখন বামনীর আমডারিয়া মাদ্রাসায় আমি পড়ছিলাম। বাকের-গঞ্জ জিলায় পায়ে হেঁটে অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়ালাম। বামনা ও বরগুনার কথা মনে আছে। পরে পৌঁছেছিলাম আমতলী থানার অধীন বুড়িরচর গ্রামে। এখানে এক-জনদের বাড়িতে থেকে ছোট-বড় ছেলেদের অ-আ-ক-খ পড়ানো শুরু করে দিলাম। বাকেরগঞ্জ জিলার নিরক্ষর গ্রামগুলিতে তখন নোয়াখালী জিলার অল্প শিক্ষিত লোকেরা এসে বিদ্যা বা অবিদ্যা দান করত। আমার ইচ্ছা ছিল এই ভাবে কিছু পয়সা রোজগার করে ওই জিলায়ই কোন না কোন হাইস্কুলে ভর্তি হয়ে যাব। অগ্রজ মৌলবী মকবুল আহমদ এসে একদিন আমার এই অজ্ঞাত বাস হতে খুঁজে বার করলেন, বললেন, হাইস্কুলে পড়তে দিবেন।

১৯০৬ সালের মার্চ মাসে আমি সন্দ্বীপ কার্গিল হাই-স্কুলের নীচের ক্লাসে ভর্তি হলাম। আমার তখন ষোল-সতের বছর বয়স। ক্লাসের ছোট ছোট ছেলেরা তা সত্ত্বেও আমায় ক্লাসে যে বসতে দিল, মাথায় চাটি মেরে তাড়িয়ে দিলনা, তার কারণ আমি তাদের তুলনায় বাঙলা অনেক ভালো জানতাম। মাদ্রাসায় পড়ার সময়ে আমি বাঙলার চর্চা কখনও ছেড়ে দিইনি। তার মানে, বাঙলা বই পেলে আমি পড়তাম, বাঙলা মাসিক বা সাপ্তাহিক কাগজ পেলে শুরু হতে শেষ পর্যন্ত না পড়ে ছেড়ে দিতাম না। মাসিক কাগজে নানান রকম প্রবন্ধ পড়া হতেই আমার মনে ইংরেজি শেখার আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল। আমি পড়তে চাইতাম মুসলিম সভ্যতার ইতিহাস। পরিচিতদের মধ্যে যাঁরা কলেজে পড়তেন তাঁরা আমায় বোঝালেন যে কম পক্ষে সৈয়দ আমীর আলীর "এ শর্ট হিস্টরি অফ দি সারাসেন্স" ও "দি স্পিরিট অফ ইসলাম"* না পড়লে আমি মুসলিম সভ্যতার কিছুই বুঝতে পারব না। ইংরেজি ভাষা শিখে তাতে একজন পণ্ডিত হয়ে যাব এই উদ্দেশ্য আমার ছিল না। আমার একান্ত বাসনা ছিল ইংরেজি বই পড়ে বুঝতে পারা।

১৯১০ সালে আমি সন্দ্বীপ কার্গিল হাই-স্কুল হতে নোয়াখালী জিলা স্কুলে চলে যাই। (বাঙলা দেশে জিলার সদরে যে গবর্নমেণ্টের স্কুল থাকত তাকেই বলা হতো জিলা স্কুল)। ১৯১০ সালে এই স্কুল হতে পরীক্ষা দিয়ে আমি মেট্রিকুলেশন পাস করি। আমার অজ্ঞাত বাসে যাওয়ার শাস্তি স্বরূপ ১৯০৭ সালেই বাড়ি হতে আমার বিয়ের ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু, বিয়ে আমায় কোনো দিন ঘর-সংসারের আওতায় বাঁধতে পারে নি। ১৯১০ সালেই আমি প্রথমে হুগলী কলেজে (এখন নাম হুগলী মোহসেন কলেজ) আই, এ, ক্লাসে ভর্তি হই। ওখানে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ওই বছরেই চলে আসি কলকাতায় বন্দাবাসী কলেজে। তখন হতেই আমি কলকাতায় স্থায়ী বাসিন্দা।

আই. এ. পরীক্ষায় ফেল করে আমি কলেজ ছেড়ে দিলাম। তখন আমার বিদ্যার্জনের হিসাব খতিয়ে দেখলাম যে বাঙলা আমি এক রকম লিখতে পারি, ইংরেজি বই পড়লে মোটামুটি বুঝতে পারি, উর্দু বই পড়লে

* (1) A Short History of the Saracens.
(2) The Spirit of Islam. (A History of the Evolution and the Ideals of ISLAM with a life of the prophet,) by—Syed Ameer Ali.

যদিও এক রকম বুঝতে পারি, তবে তা পড়তে বড় বেশী সময় লেগে যায়। অনেক চেষ্টায় ক্লাসিকাল পারসী ভাষা কিছু কিছু বুঝতে পারতাম, কিন্তু চর্চার অভাবে আমার সেই জ্ঞানটুকুও আজ ভোঁতা হয়ে গেছে। স্কুলে ও কলেজে আমার দ্বিতীয় ভাষা ছিল আরবী। ঘষতিয়ে দেখার ফলে এটা বেশ বোঝা গেলো যে আরবী আমি কিছুই শিখতে পারি নি।

১৯০৬ সালের মার্চ মাসে আমার ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগেই (১৯০৫ সালের ১৬ই আগস্ট তারিখে) লর্ড কর্জনের হঠকারিতায় বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ হয়ে গিয়েছিল। পূর্ব বঙ্গের সব কয়টি জিলা, দার্জিলিং জিলাকে বাদ দিয়ে উত্তর বঙ্গ, ও চীফ কমিশনার শাসিত আসাম প্রদেশকে নিয়ে পূর্ব বঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠিত হয়েছিল। পশ্চিম বঙ্গ, বিহার, ছোট নাগপুর ও ওড়িশ্যাকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল বঙ্গ দেশ। বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের পূর্বেও বাঙালাভাষী শ্রীহট্ট ও কাছাড় জিলা আসামের অন্তর্ভুক্ত ছিল। উত্তর বঙ্গ ও পূর্ব বঙ্গ আলাদা হয়ে যাওয়ার পরে যে বঙ্গদেশ থেকে গেলো তাতে বঙ্গভাষী লোকেরা সংখ্যা লঘু হয়ে পড়লেন। বঙ্গ ভঙ্গের বিরুদ্ধে তাই প্রচণ্ড আন্দোলন শুরু হলো। এই আন্দোলন সারা ভারতবর্ষকে নাড়া দিয়েছিল। পূর্ব বঙ্গ ও আসাম প্রদেশে বঙ্গভাষীদের সংখ্যাধিক্য তো ছিলই, সংখ্যাধিক্য ছিল মুসলমানদেরও। মুসলমানরা বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ মেনে নিলেন। পূর্ববঙ্গ ও আসামে চাকরি ও শিক্ষার ক্ষেত্রে যে সব সুবিধা তারা পেতে লাগলেন অবিভক্ত বাঙলায় তাঁরা তা পেতেন না। অবশ্য, এ সব সুযোগ-সুবিধার ভাগ পূর্ববঙ্গ ও আসামের হিন্দুরাও যে পেতেন না তা নয়। তবুও বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধ আন্দোলনে তাঁরা একাত্মভাবে যোগ দিলেন। কারণ, বঙ্গব্যবচ্ছেদ বঙ্গ সংস্কৃতিরও ব্যবচ্ছেদ ছিল। বড় বড় হিন্দু জমীদারদের মনে এই ভয়ও চুকেছিল যে মুসলিম প্রজা-প্রধান পূর্ববঙ্গে জমীদারী প্রথা না বিলোপ হয়ে যায়। তার ওপরে ধর্মগতভাবে হিন্দুরা খুবই সংখ্যা লঘু হয়ে পড়েছিলেন।

উত্তর বঙ্গের মুসলমানদের ভিতরে বঙ্গ ভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনে খুব অল্প সংখ্যক মুসলমান যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের ভিতরে মিস্টার আবদুর রসুল (ব্যারিস্টার), আবদুল হালীম গজনবী (পরে সার আবদুল হালীম গজনবী), মৌলবী মনিরুজ্জমান ইসলাম আবাদী, মৌলবী কাজেম আলী (কাজেমআলী মাস্টার নামে খ্যাত ছিলেন), সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, বর্ধমানের মৌলবী আবুল কাসেম, মৌলবী মুজীবুর রহমান ("দি মুসলমান" নামক ইংরেজি সাপ্তাহিকের সম্পাদক), মৌলবী মুহম্মদ আকরম খান (এখন ঢাকার "আজাদ" পত্রিকার মালিক), পাটনার মিস্টার আলী ইমাম (পরে সার আলী ইমাম), তাঁর ভ্রাতা মিস্টার হাসসান ইমাম, মিস্টার মুজহারুল হক, ব্যারিস্টার, (পরে পাটনার সাদাকত আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা), মৌলবী লিয়াকত হোসেন ও ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। আমি বঙ্গভঙ্গের পক্ষে কিংবা বিপক্ষে কোনো আন্দোলনেই যোগ দিই নি। তখন আমার যে বয়স ছিল তাতে কোনো এক পক্ষে যোগ দিলে আমার পক্ষে তা মোটেই বে-মানান হতোনা। আমার বয়সের ছেলেরা আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। তবে, সাম্প্রদায়িক কোনো ব্যাপারে আমি একেবারেই যোগ দিই নি একথা বললে অপলাপ করা হবে। বিশেষ মুসলিম জাতীয় দাওয়ার সভা-সমিতিতে আমি যোগ দিয়েছি। আমি সে সময়ে ধার্মিক মুসলমান ছিলাম। দিনে পাঁচবার নমাজ না পড়লেও রমজানের পুরো মাস উপবাস করতাম।

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধ আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ পণ্য বর্জন ও স্বদেশী জিনিস ব্যবহারের আন্দোলনও চলেছিল। এই আন্দোলন এতই প্রবল হয়েছিল যে উত্তর বাঙলায় রাজনীতিক আন্দোলনের নামই হয়ে গিয়েছিল স্বদেশী আন্দোলন। আজও দেশের লোক রাজনীতিক আন্দোলনকে স্বদেশী আন্দোলন বলেন। এখানে একটি কথা বলা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে এই সময়ে স্বদেশী আন্দোলনকারীদের নিকটে জাপানী পণ্যও স্বদেশী পণ্যরূপে পরিগণিত ছিল। আজ এই কথা শুনে অনেকে আশ্চর্য হবেন, কিন্তু কথাটা সত্য। স্কুল কলেজের ছাত্ররা স্বদেশী পণ্য ব্যবহারের আবেদন জানিয়ে দেওয়ালে ছাপানো

উপস্থিত থাকতেন। এই সকল ইংরেজদের জাপানী দ্রব্য ব্যবহারের বিশেষ আগ্রহ থাকত। ইউরোপ হতে আমদানী দেশলাই শ্রেষ্ঠ ব্রিটেনে তৈয়ার হতো না। তবুও জাপানের অপকৃষ্ট জাতি মার্কা ব্রিটানলাইটের পক্ষে প্রচার চলত যদিও এই দিয়াশলাই জ্বলতে চাইত না। প্রচারের ফলে লোকেরা তা কিনতেন এবং পরম নিষ্ঠার সঙ্গে জ্বালাবার চেষ্টা করতেন। ১৯০৪ সালের ঘোর জাপান যুদ্ধে জাপানের বিজয়ে ভারতের উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীর লোকেরা বিমুগ্ধ হয়েছিলেন। জাপানের কূটনীতিকেরা আগে হতেই ভারতে আসা যাওয়া শুরু করে দিয়েছিলেন। তাঁরা আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ওপরে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তারেও সমর্থ হয়েছিলেন। মোট কথা, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের ওপরে জাপানের নজর পড়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে জাপানের ভারত আক্রমণের চেষ্টা বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না। অনেক বছর আগে হতেই তার প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল। আমাদের ওপরে জাপানের বোমা যখন পড়ছিল তখনও আমাদের বহু দেশবাসী জাপানকে পরম বন্ধু হিসাবে গণ্য করেছেন।

সাপ্তাহিক "হিতবাদী"র সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ শুধু প্রথম স্বদেশী যুগের একজন বড় নেতা ছিলেন না, তিনি একজন সাহসী নেতাও ছিলেন। ১৯০৬ সালে বরিশালে প্রাদেশিক সম্মেলনের সময়ে বাকেরগঞ্জ জিলার ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট নিজের বাংলোয় ডেকে নিয়ে অপমানিত করার উদ্দেশে যখন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বসতে বললেন না তখন কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে জোর করে তাতে সুরেন্দ্রনাথকে বসিয়ে দেন। কাব্যবিশারদ সেই অল্প সংখ্যক ভারতীয়দের একজন ছিলেন যাঁরা মনে-প্রাণে ভারতের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা চাইতেন। ১৯৩০ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে আমি কাব্যবিশারদের "হিতবাদী"র সহকর্মী শ্রীকেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত দেখা করেছিলেন। ৯৭ বছর বয়সে পা বাড়ালেও তখনও তাঁর স্মৃতিশক্তি প্রখর ছিল। তিনি সহাস্যে, স্বাস্থ্যের অজুহাত দেখিয়ে কাব্যবিশারদকে ১৯০৭ সালে তাঁর সমমতের বন্ধুরা জাপানে পাঠিয়েছিলেন। (তাঁর স্বাস্থ্য সত্যই খারাপ ছিল, কিন্তু নীড়ায় তিনি ভুগছিলেন)। তবে তাঁদের আসল উদ্দেশ্য ছিল যে কাব্যবিশারদ জাপানে গিয়ে ভারতের মুক্তি-আন্দোলনের দূতের কাজ করবেন। অর্থাৎ, তাঁর কাজ হবে ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে জাপান কিভাবে কতটা সক্রিয় সাহায্য করবে তা জেনে আসা। জাপানে পৌঁছে কাব্য শাহ অনেক পদস্থ জাপানীদের সঙ্গে আলোচনা করার সুযোগ পান। তা থেকে তিনি বুঝতে পারেন যে মুক্তি-সংগ্রামে জাপান ভারতকে কোনো সাহায্য করবে না; পক্ষান্তরে, ইংরেজের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে জাপান একদিন ভারতকে জাপান সাম্রাজ্য-ভুক্ত করার অভিলাষী। কাব্যবিশারদ খুবই হতাশ হন। তাঁর মনে একটা সন্দেহ জেগেছিল যে অসুস্থতার কারণে তিনি হয়তো দেশে নাও পৌঁছুতে পারেন। তাই, পত্রে সবকথা লিখে সেই পত্র তিনি বিশেষ ঠিকানায় দেশে পাঠিয়ে দেন। এই পত্র পৌঁছেছিল। তার একটি কথা—"জাপান ভারতের বন্ধু নহে"—সেই সময়ে বাঙলার বহু সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছিল। দেশে ফেরার পথে কাব্যবিশারদ জাহাজে মারা যান।

হাঁ, স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করার দিকে একটা ঝোঁক আমারও ছিল। দেশী মিলের কাপড় আমি পড়তাম। সাধ্যমতো কুলোলে অন্য স্বদেশী জিনিসও আমি কিনতাম।

বাঙলার সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের অভ্যুদয় একটি স্মরণীয় ঘটনা। এটা ছিল গোপন আন্দোলন। বঙ্গভঙ্গের আগেই তাঁদের দল গড়ে উঠেছিল। অবশ্য বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন তাঁদের আরও বেশী প্রেরণা জুগিয়েছিল। এটা বিশেষ লক্ষণীয় যে বাঙলাদেশেই সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বেশী দানা বেঁধেছিল। বাঙলার বাইরেও তাঁদের কর্ম-প্রচেষ্টা চলেছে, কিন্তু বাঙলার মতো দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে আমার মনে যে পরিবর্তন আসছিল এবং সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে যে-রোমাঞ্চ ছিল, আমার মনে হয় হয়তো আমি তাতে যোগ দিতে পারতাম। কিন্তু তার পথে দুস্তর বাধা ছিল। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের প্রথম পর্যায় (১৯০৪-১৯১৭) কঠোরভাবে হিন্দু ধর্মানুশাসিত ছিল। এই বিপ্লব প্রচেষ্টার আমার স্থান হতো না। অতীতে আমাদের দেশে ধর্ম হতে বিচ্ছিন্ন কোনো রাজনীতিক আন্দোলন হয়নি।

সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের আন্দোলনই বা কি করে ধর্ম-নিরপেক্ষ হবে? এই আন্দোলনে প্রথম যাঁরা অগ্রণী হয়েছিলেন তাঁদের ভিতরে শ্রীঅরবিন্দকুমার ঘোষও একজন। আন্দামান হতে মুক্তি পেয়ে এসে তিনি প্রথম যে "আত্মকথা" লিখেছিলেন (এখন দুষ্প্রাপ্য) তাতে তিনি স্বীকার করেছিলেন যে হিন্দু রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাই তাঁদের অভিপ্রেত ছিল। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের আন্দোলন শুধু হিন্দু আন্দোলনও ছিল না, আসলে তা ছিল বর্ণ হিন্দুদের আন্দোলন। এই আন্দোলনে রোমাঞ্চ ছিল বলে শিক্ষিত যুবকেরা সহজে তাতে আকৃষ্ট হতেন এবং দেশের স্বাধীনতার নামে অকাতরে কারাবরণ করতেন এবং প্রাণও বলি দিতেন। অন্য দিক হতে বিচার করতে গেলে এর পেছনে একটা গভীর নৈরাশ্যও ছিল। বাঙালী শিক্ষিত যুবকদের পক্ষে, বিশেষ করে শিক্ষিত হিন্দু যুবকদের পক্ষে তখন হতেই জীবন-সংগ্রাম দুরূহ হয়ে উঠেছিল বলে তাদের ভিতরে একটা নৈরাশ্যের সৃষ্টি হচ্ছিল। নৈরাশ্য হতেই মানুষ ব্যক্তিগত খুন-খারাবির পথে যায়।

হিন্দু সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা ধর্মানুসারী যে ছিলেন, জেলে গেলে তাঁদের ভিতরে অনেকে যে প্রথমেই একখানা সন্ত্রাসকর্তৃক কালীর ছবি (an imposing picture of Goddess Kali) চেয়ে পাঠাতেন তার জন্যে আমি তাঁদের ওপরে কোনো দোষারোপ করতে চাইনে। ভারতবর্ষের রাজনীতির অবস্থাই ছিল এই রকম। মুসলমানদের হাত হতে ইংরেজের ক্ষমতা দখলের পরে মুসলমানরাও সুদীর্ঘ কাল ইংরেজের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও সংগ্রাম চালিয়েছেন। তাঁদের সংগঠন সন্ত্রাসবাদীদের চেয়ে অনেক বেশী সংহত ছিল, অনেক বেশী ছিল তাঁদের আন্দোলনের ব্যাপকত্ব এবং কৃষকরাও যোগ দিয়েছিলেন এই আন্দোলনে। কিন্তু এই আন্দোলনও ছিল মুসলিম ধর্মানুপ্রাণিত। তাঁদের সংগ্রামকে তাঁরা ধর্মযুদ্ধ মনে করেছেন। তাঁরাও চেয়েছিলেন মুসলিম রাজত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। পরবর্তী যুগে মাওলানা ওবায়দুল্লা প্রভৃতি আফগানিস্তানে যখন ভারতীয় বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন এবং অস্থায়ী ভারত গবর্নমেণ্টও স্থাপন করেছিলেন তখন তাঁরা হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি সকলের জন্যে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করতে চেয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁরা তাঁদের ফৌজের নাম দিয়েছিলেন খোদাই ফৌজ (Army of God)। এই খোদাই ফৌজে ব্রিটিশ ফৌজের মতো মেজর, লেফটেন্যাণ্ট কর্নেল ও মেজর জেনেরেল প্রভৃতি পদও ছিল।

সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের কর্ম পদ্ধতিকে আমরা সমালোচনা করি। কিন্তু তাঁদের বলিদানকে কে না শ্রদ্ধা করে পারেন?

বঙ্গ ভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন নিষ্ফল হয় নি। ইংল্যাণ্ডের রাজা ও ভারতের সম্রাট পঞ্চম জর্জ তাঁর অভিষেক উপলক্ষে ভারতে এসেছিলেন। ১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর তারিখে দিল্লীর দরবার হতে বঙ্গ ভঙ্গ রদ হওয়ার কথা তিনি ঘোষণা করলেন। আরও তিনি ঘোষণা করলেন যে ভারতের রাজধানী কলকাতা হতে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হবে। নূতন ব্যবস্থায় পূর্ব বঙ্গ, দার্জিলিং সহ উত্তর বঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গ (প্রেসিডেন্সী ও বর্ধমান বিভাগ) বঙ্গ প্রদেশে পরিণত হল। বিহার, ছোট নাগপুর ও ওড়িষ্যাকে নিয়ে গঠিত হলো নূতন বিহার ও ওড়িষ্যা প্রদেশ। বঙ্গ ভঙ্গের পূর্বে পুরো বাঙলা দেশ (পূর্ব বঙ্গ, উত্তর বঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গ), বিহার, ছোট-নাগপুর ও ওড়িষ্যাকে নিয়ে বঙ্গদেশ ছিল। আসাম আবারও চীফ্ কমিশনার শাসিত প্রদেশে পরিণত হলো। আসামে বঙ্গভাষী শ্রীহট্ট ও কাছাড় জিলা তো থাকলই, বঙ্গভাষী আরও অনেক এলাকা থেকে গেলো। বিহার ও ওড়িষ্যা প্রদেশেও বঙ্গ ভাষী বড় এলাকা চলে গেলো। এ সব সত্ত্বেও বঙ্গ ভাষী লোকেদের বিপুল সংখ্যাধিক্য নিয়ে বঙ্গদেশ গঠিত হয়েছিল। বঙ্গ ভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনে এটাই হয়েছিল সব চেয়ে বড় লাভ।

১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধে অন্তত মনে মনে ভারতীয় মুসলমানরা ইংরেজের বিরুদ্ধে ছিলেন। কারণ, মুসলীম সাম্রাজ্য তুর্কি ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু তা হলেও ব্রিটিশের পক্ষে যুদ্ধের চাকরি নিয়ে ভারতীয় মুসলমানরা ইরাক প্রভৃতি দেশে যেতে ছাড়েন নি। বঙ্গ ভঙ্গ রদ হওয়ার পরেও সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা তাঁদের আন্দোলনে আরও জোরে চালিয়ে যেতে লাগলেন। তাঁরা সাম্রাজ্যবাদী জার্মানীর নিকট হতে অস্ত্র ও অর্থ সাহায্য নিয়ে

ভারতে একটা অভ্যুত্থানের চেষ্টাও করেছিলেন। আগে হতে জানাজানি হয়ে যাওয়ায় তাঁদের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। যুদ্ধের সময় ভারতের ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট নানান রকম সাবধানতা অবলম্বন করে। তার মধ্যে ডিফেন্স অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট (ভারত রক্ষা আইন) একটি। এই আইনে সন্দেহবশে ভারতবর্ষে হাজার হাজার লোককে বিনা বিচারে বন্দী করে রাখা হয়। তা ছাড়া ১৮১৮ সালের ৩ নম্বর রেগুলেশনও প্রযুক্ত হয়েছিল। বাঙলা দেশেই বন্দীর সংখ্যা ছিল সর্বাধিক।

ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস কিন্তু যুদ্ধের প্রতি তাঁদের সমর্থন ও আনুগত্য জানালেন। যে চার বছর যুদ্ধ চলেছিল তার প্রতি বছরই কংগ্রেসের সারা ভারত পক্ষ হতে যুদ্ধের প্রতি আনুগত্য ঘোষিত হয়েছিল। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে ১৯১৮ সালে দিল্লীতে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হলো তাতে রাজানুগত্যের প্রস্তাব তো পাস হলোই, যুদ্ধের সকল সমাপ্তির জন্যে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টকে অভিনন্দন জানাতেও ভুল হলো না। এই সব কিছুর প্রতিদানে কংগ্রেসকে সম্মানিত করার উদ্দেশ্যে ১৯১৪ সালে মাদ্রাজের গবর্নর লর্ড পেণ্টল্যাণ্ড মাদ্রাজে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে যোগ দিলেন। ১৯১৫ সালে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে বোম্বের গবর্নর লর্ড উইলিংডন যোগ দিয়েছিলেন। ১৯১৬ সালে লখনউতে কংগ্রেসের যে বার্ষিক অধিবেশন হলো তাতে যোগ দিলেন যুক্ত প্রদেশের গবর্নর সার জেমস্ মেস্টন। তিনি যখন মণ্ডপে প্রবেশ করলেন তখন সমস্ত প্রতিনিধি এক সঙ্গে দাঁড়িয়ে তাঁকে সাদর সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন।

১৯১৭ সালে দেশে নানান রকম আন্দোলন শুরু হলো। রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তি আন্দোলন তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। খিলাফৎ আন্দোলনের আরম্ভও ১৯১৭ সালেই হয়, যদিও তা প্রবল রূপ ধারণ করেছিল ১৯২০ সালে। নিরুপদ্রব প্রতিরোধের কথাও ১৯১৭ সাল হতে হাওয়ায় ভাসতে থাকে। সভা সমিতির অধিবেশনের সংখ্যাও এই বছরে খুব বেড়ে যায়। ১৯১৬ সালে লখনউ কংগ্রেসের সফলতার ফলে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই এই সকল সভায় যোগ দিচ্ছিলেন। ১৯১৬ সাল হতেই আমি সকল প্রকার রাজনীতিক সভা ও মিছিলে যোগ দিতে আরম্ভ করি। ১৯১৭ সালে কলকাতায় কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের অধিবেশন হয়। সেবারেই আমি প্রথম কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের অধিবেশনে দর্শকরূপে যোগদান করি। এই দু'টি সংগঠনেরই তখন যে কানুন-কানুন ছিল তাতে ইচ্ছা করলেই আমি প্রতিনিধি হতে পারতাম, দর্শকরূপে যোগদান করাই আমি শ্রেয়স্কর মনে করেছিলাম।

১৯১৭ সালের ২০শে আগস্ট তারিখে ইংল্যাণ্ডে ভারতের সেক্রেটারি অফ্ স্টেট, অর্থাৎ ব্রিটিশ মন্ত্রীদের ভিতরে ভারতের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মিস্টার মণ্টেগু ঘোষণা করলেন যে ভারতবাসীকে দায়িত্বপূর্ণ শাসন ক্ষমতা দেওয়া হবে। এই ঘোষণার ফলে নিরুপদ্রব প্রতিরোধের যে সব কথাবার্তা চলছিল তা থেমে যায়। ১৯১৭-১৮ সালে মিস্টার মণ্টেগু ও ভারতের বড় লাট লর্ড চেম্‌সফোর্ড ভারতের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে ভারতীয়দের মতামত সংগ্রহ করেন। তাঁদের যুক্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হয়, ১৯১৮ সালের জুন মাসে। কংগ্রেসের একটি বড় অংশ এই রিপোর্টে লিখিত প্রস্তাব মেনে নিতে চাইলেন এবং অপরাংশ বললেন, প্রস্তাব মোটেই আশানুরূপ নয়। এই নিয়ে আলোচনার জন্যে ১৯১৮ সালের ২৯শে আগস্ট তারিখে বোম্বেতে সৈয়দ হাসান ইমামের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন হয়। মাহ্‌মুদাবাদের মহারাজার সভাপতিত্বে একই সময়ে বোম্বেতে মুসলিম লীগেরও এক অধিবেশন বসে। উভয় অধিবেশনের সিদ্ধান্ত একই রকম হয়েছিল। তার মোদ্দা কথা এই ছিল যে মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড রিপোর্টের প্রস্তাবগুলি নৈরাশ্যব্যঞ্জক ও অসন্তোষকর। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে স্ব-শাসন ছাড়া অন্য কোনো প্রস্তাবই গ্রহণীয় হতে পারে না, ইত্যাদি।

১৯১৭ সালের মার্চ মাসে রাশিয়ায় যে বুর্জোয়া বিপ্লব হয় তাতে জারের পতন ঘটে। তার পাঁচ মাসের ভিতরে যে মণ্টেগু ভারতকে দায়িত্বপূর্ণ শাসন ক্ষমতা দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন তার পেছনে এই বিপ্লবেরও কিছু প্রভাব নিশ্চয় ছিল। ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে রাশিয়ায় সর্বহারা বিপ্লব সফল হয় এবং তার ফলে মজুর শ্রেণীর পার্টি—কমিউনিস্ট পার্টির

অবিনায়কত্বে মেহনতী জনগণের শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। সঙ্গে সঙ্গেই ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট চেঁচাতে লাগল যে যুদ্ধ ফ্রণ্টে রাশিয়ায় ছাড়ন দরল। রাশিয়ার সর্বহারা বিপ্লবের প্রকৃত খবর যেন ভারতে আসতে না পায় তার জন্যে ভারতের ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট খুব কড়াকড়ি ব্যবস্থা করল। সঙ্গে সঙ্গে লেনিনের বিরুদ্ধে ও সোবিয়েৎ নেতাদের বিরুদ্ধে নানান ধরণের কুৎসারও প্রচার হতে থাকল। ইউরোপে তো যেতেন শুধু ভারতের ধনী লোকেরা কিংবা তাঁদের অনুগৃহীত লোকেরা। তাঁরা রুশ বিপ্লবের ওপরে নজর ছিলেন না। তা সত্ত্বেও সংবাদপত্রের বিরুদ্ধ খবরগুলির ভিতর হতেও ভালো খবর বের হয়ে পড়ত। তাছাড়া ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের তরফ হতে যা কিছু মন্দ বলে প্রচারিত হতো দেশের সাধারণ মানুষ ধরে নিতেন যে তার ভিতরে নিশ্চয় কিছু ভালো আছে। ১৯১৮ সালে আমাদের দেশের মজুরদের ভিতরেও চাঞ্চল্য দেখা দেয়। ওই সালের ১১ই নভেম্বর তারিখে প্রথম মহাযুদ্ধের বিরতি ঘোষিত হয়। নানাস্থানে মজুরদের ধর্মঘটও শুরু হয়ে যায়। ১৯১৯ ও ১৯২০ সালে তা বেড়েই চলল। রুশ বিপ্লব আমাদের দেশের মজুরদের সামনেও আশার আলো তুলে ধরেছিল। মজুর সংগ্রামের ভিতর দিয়েই ১৯২০ সালে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়।

যুদ্ধের সময় ডিফেন্স অফ্ ইণ্ডিয়া এক্ট যে পাস হয়ে ছিল সেকথা আগে বলেছি। এই আইনের মিয়াদ ছিল যুদ্ধ বিরতির পরে ছয় মাস। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট বুঝতে পেরেছিল যে যুদ্ধের শেষে ভারতে আন্দোলন বাড়বে। তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা করার জন্যে ১৯১৭ সালের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে সরকার একটি তদন্ত কমিটি গঠন করল। এই কমিটির মেম্বর ছিলেন তিনজন।(১) ইংল্যাণ্ডের কিংস বেঞ্চের জজ সার সিডনি রওলাট (সভাপতি), (২) মিস্টার কুমারস্বামী শাস্ত্রী (মেম্বর) ও (৩) মিস্টার প্রভাসচন্দ্র মিত্র (মেম্বর)। উদ্দেশ্য ছিল ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনগুলির সহিত সংসৃষ্ট অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রসমূহের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা এবং এইসব দমনের জন্যে কোন দমনকারী আইন প্রণয়ন করা যায় সেই বিষয়ে সুপারিশ করা। সভাপতির নামানুসারে এই কমিটি রওলাট কমিটি নামে খ্যাত হয়েছিল। ১৯১৯ সালের ২৯শে জানুয়ারী তারিখে রওলাট কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্টের সুপারিশ অনুযায়ী দুটি আইনের খসড়া ফেব্রুয়ারী মাসের শুরুতেই তৈরার হয়ে যায়। সাধারণভাবে খসড়া দুটি রওলাট বিল নামে খ্যাত হয়েছিল। আসলে খসড়া দুটির নাম ছিল (১) দি ইণ্ডিয়ান ক্রিমিনাল ল' এমেণ্ডমেণ্ট বিল নম্বর ১, ১৯১৯; (২) দি ক্রিমিনাল ল' এমার্জেন্সী পাওয়ার্স বিল নম্বর ২, ১৯১৯। ১৯১৯ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে আইনের এই খসড়া দুটি কেন্দ্রীয় আইন সভায় উপস্থিত করা হয়। দ্বিতীয় খসড়াটি শেষ পর্যন্ত পাস করানো হয়নি, তবে প্রথম খসড়াটি ১৯১৯ সালের মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে আইনে পরিণত হয়ে গেলো। শুরু হতেই গান্ধীজী প্রস্তাব করলেন যে এই আইনকে প্রতিরোধ করতেই হবে। দেশের নানা স্থান হতে সাড়াও তিনি পেলেন। প্রথমে এর প্রতিবাদে ৩০শে মার্চ তারিখে দেশব্যাপী হরতাল ঘোষিত হয়। পরে এই তারিখ পরিবর্তন করে ৬ই এপ্রিল করা হয়েছিল। কেন জানিনে, দিল্লীতে এই তারিখ পরিবর্তনের খবর পৌছয় নি। সেখানে ৩০শে মার্চ তারিখেই হরতাল হয়। এই মিছিলের ওপর গভর্নমেণ্ট সেদিন গুলি চালালো। দেশের অন্য সব জায়গায় ৬ই এপ্রিল তারিখে হরতাল পালিত হলো। কিন্তু ভারতের ব্রিটিশ সরকার গোলযোগ সৃষ্টি করল অমৃতসরে। ডক্টর সয়ফুদ্দীন কিচলু ও ডাক্তার সত্যপাল ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের অমৃতসর অধিবেশনের আয়োজনে ব্যাপৃত ছিলেন। ১০ই এপ্রিল তারিখে অমৃতসরের জিলা ম্যাজিস্ট্রেট (পাঞ্জাবে ডেপুটি কমিশনার বলা হতো) তাঁদের দু'জনকে নিজের বাড়ীতে ডেকে নিলেন। তারপরে তাঁদের কি করা হলো, কোথায় পাঠানো হলো তার কিছুই জনসাধারণকে জানতে দেওয়া হলো না। হতাশা ও ক্রোধে জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। গুলি চললো অমৃতসরেও। এবারে জনসাধারণের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেলো। তাঁরা কজন ইংরেজকে খুন করলেন এবং একটি ব্রিটিশ ব্যাঙ্কের বাড়ী পুড়িয়ে দিলেন।

১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল নববর্ষের দিন (বৈশাখী)

ছিল। এই দিকে চারটার রাস্তার লোক অমৃতসরে কম। চারটার লোক কম হয়েছিলেন ওখানকার জালিয়ানওয়ালাবাগে। সেখানে বক্তৃতা চলছিল। অমৃতসরে সামরিক আইন জারি হওয়ার কোনো ঘোষণা তখনও ছিল না। এই বাগের চার দিকে পাকা প্রাচীর। যাতায়াতের পথ মাত্র একটি। হঠাৎ ব্রিটিশ সামরিক অফিসার ডেনেরেল ডায়ারের পরিচালনায় ব্রিটিশ ও ভারতীয় সৈন্যরা সমবেত জনমণ্ডলীর ওপরে গুলি চালাতে লাগল। মোলোশ রাউণ্ড গুলি চালানোর পরে গুলি ফুরিয়ে যায়। ডেনারেল ডায়ার বুক ফুলিয়ে বলল, গুলি না ফুরিয়ে গেলে আরও গুলি চালানো হতো। লোকেদের বেরুবার কোনো পথ ছিল না। প্রায় চারশ লোক হত হলেন, আর আহত হলেন বারশ লোক। এটা সরকারি হিসাব। আসলে আরও অনেক বেশী লোক হতাহত হয়েছিলেন। পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারি হলো। অত্যাচার অপমানের স্রোত বয়ে চললো অমৃতসর, লাহোর (লাহোরেই সর্বাপেক্ষা বেশী), শেখুপুরা, গুজরানওয়ালা, গুজরাত ও কসুর প্রভৃতি স্থানের ওপর দিয়ে। বহুলোক প্রাণ হারালেন, বহুলোক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন, আর জেলের বাইরে যাঁরা থাকলেন তাঁরা যে-ভাবে নির্যাতিত ও অপমানিত হতে লাগলেন তা ভাষায় অবর্ণনীয়। পাঞ্জাবের সঙ্গে বাইরের জগতের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছিল। তবুও কিছু কিছু খবর বাইরে পৌঁছালো। পাঞ্জাবের লাঞ্ছনা ও অত্যাচারের প্রতিবাদে নানা স্থানে মিছিল বার হলো, আবার এই প্রতিবাদ মিছিল-গুলির ওপরেও গুলি চললো। কলকাতায়ও গুলি চলেছিল। নিহত হয়েছিলেন ছয় জন, আর আহত বারো জন। ব্রিটিশ সরকারের দ্বারা পাঞ্জাবের এই লাঞ্ছনা ও নির্যাতনের প্রতিবাদে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রিটিশ রাজার দেওয়া নাইট খেতাব বর্জন করলেন। আমাদের মানবতার অবমাননায় কবির হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিল। সে-সময়ে যে পত্র তিনি ভারতের ব্রিটিশ ভাইসরয়কে লিখেছিলেন তার ভাষা অতুলনীয়। রবীন্দ্রনাথের খেতাব বর্জনে বিশ্বে যে-চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল তাতে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টকে বেশ অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। তা এই থেকে বোঝা যায়েছিল যে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট বহুবের পর বছর কবির খেতাব বর্জন মেনে নিলেন না। ইংরেজেরা কবিকে দান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই লিখে চললেন। পাঞ্জাবের লাঞ্ছনার প্রতিবাদে গবর্নর জেনেরেলের একজেকিউটিব কাউন্সিলের সভ্য স্যর শঙ্করণ নায়ার তাঁর বার্ষিক চৌষট্টি হাজার টাকা বেতনের চাকরি ছেড়ে দিলেন বটে, কিন্তু ব্রিটিশ রাজার দেওয়া নাইট খেতাবটি ছাড়তে পারলেন না।

পাঞ্জাবে যা যা ঘটেছিল গান্ধীজী তাতে মনে দুঃখ পাননি এ কথা কেমন করে বলব? কিন্তু তিনি ঘোষণা করলেন যে সত্যাগ্রহের কথা বলে তিনি হিমালয় প্রমাণ ভুল করেছিলেন। তিনি বললেন, তাঁর প্রস্তাবের ফলেই যদি লোকেরা স্থানীয় বিশৃঙ্খলা ঘটাতে পেরেছে। তিনি তাঁর সত্যাগ্রহের প্রস্তাব তুলে নিলেন। পাঞ্জাবে কি ঘটে গেলো, আর গান্ধীজী কি বললেন! তিনি জনসাধারণকে গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নিলেন।

সব কিছুর শেষ আছে। পাঞ্জাবের লাঞ্ছনারও একদিন শেষ হলো। যাঁরা জীবন বলি না দিয়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন, এমনকি সামরিক আদালতের বিচারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডেও দণ্ডিত হয়েছিলেন, তাঁরা সকলে মুক্তি পেলেন। কলকাতার জনসাধারণ পাঞ্জাবের নেতৃ-বৃন্দকে যে-বিপুল সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন সেই রকম সম্বর্ধনা আমি কম দেখেছি।

অনেক আগে নির্ধারিত হয়েছিল যে, কংগ্রেসের ১৯১৯ সালের বার্ষিক অধিবেশন অমৃতসরে হবে। পাঞ্জাবে যা কিছু ঘটেছিল তার পরেও অমৃতসরে কংগ্রেসের অধিবেশন হওয়া উচিত, কি উচিত নয়, এই নিয়ে কথা উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত পূর্ব নির্ধারিত সিদ্ধান্তই বহাল থাকল। পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু সভাপতি নির্বাচিত হলেন। ইতোমধ্যে মণ্টেগু চেমসফোর্ড রিপোর্টের ভিত্তিতে ভারত সংস্কার আইন পাস হয়ে গিয়েছিল। একটি রাজকীয় ক্ষমা ঘোষণার ফলে রাজবন্দীরা এবং অনেক দণ্ডিত বন্দীও ছাড়া পেলেন। অনেকে বললেন, প্রদেশে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা কার্যে প্রয়োগ সম্ভব হবে না। আবার গান্ধীজী সহ অন্যরা ভাবলেন যতটুকু অধিকার পাওয়া গেছে তত-টুকুই কাজে লাগাতে হবে। দ্বৈত শাসনের মতটি যাওয়ার জন্যে অনেক নেতারই বহু দিন লাগা করতে লাগল।

এই আব-হাওয়ার অন্তর্তলে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হলো। বাল গঙ্গাধর তিলক ইংল্যাণ্ডে ছিলেন। সেখানে তিনি কথা দিয়ে এসেছিলেন, সংস্কার আইনের মারফতে যা কিছু পাওয়া গেছে সেটুকুই তিনি কাজে লাগাবার চেষ্টা করবেন এবং আরও বেশী পাওয়ার জন্যে চেষ্টা করতে থাকবেন। দেশের মাটিতে পা দিয়ে ভিন্ন রকম আব হাওয়া দেখে তিনি বলতে বাধ্য হলেন যে সংস্কার আইন মোটেই সন্তোষজনক নয়। কিন্তু অন্তর্তলর কংগ্রেসে যাওয়ার পথে তিনি এক কাণ্ড করে বসলেন। গঙ্গাপুর নামক রেলওয়ে স্টেশন হতে ভারত সংস্কার আইন পাস করার জন্যে অভিনন্দন জানিয়ে ব্রিটিশ রাজা বা রাজসভাকে একটি টেলিগ্রাম তিনি পাঠিয়ে দিলেন। এই আত্মম্ভরি নেতার অন্তর্তলর পৌঁছানোর তরও সইল না। টেলিগ্রামে তিনি একথাও জুড়ে দিলেন যে অভিনন্দন তিনি ভারতের জনসাধারণের তরফ হতেই পাঠাচ্ছেন। জানিনে, কোন জনসাধারণ তাঁকে এই অধিকার দিয়েছিলেন। টেলিগ্রামে একথারও উল্লেখ ছিল যে ব্রিটিশের তরফ হতে যতটা সাড়া পাওয়া যাবে ততটা সাড়া ভারতীয়েরাও দিবেন। এটাই ছিল তিলকের উদ্ভাবিত বিখ্যাত **Responsive Co-operation** বা পারস্পরিক সহযোগিতার প্রস্তাব।

এত কাল পরে আজও মনে হচ্ছে যে পাঞ্জাবের সামরিক আইনের লাঞ্ছনার পরে অন্তর্তলরে কংগ্রেসের যে-অধিবেশন হয়েছিল তা নিয়ে কোনোদিন কোনও ভারতবাসী আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করতে পারবেন না। এই অধিবেশন ভারতের মাথা বিশ্বের দরবারে হেঁট করে দিয়েছিল। পাঞ্জাবের বাইরে কোথাও কংগ্রেসের এই অধিবেশন হলে ভালো হতো। কিন্তু গরম বক্তৃতা যে কংগ্রেসে হয়নি তা নয়, কিন্তু আসল ব্যাপার ছিল ১৯১৯ সালের সংস্কার আইনকে কি করে কাজে লাগানো যায় তার প্রচেষ্টা। মিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশের (তখনও তিনি "দেশবন্ধু" হননি) পূর্ণ দায়িত্ব-সম্পন্ন গবর্ণমেণ্ট স্থাপনের প্রস্তাব, যাতে সংস্কার আইনকে নৈরাশ্যব্যঞ্জক ও অসন্তোষকর বলা হয়েছিল, সবজেক্ট কমিটিতে পাস হলেও প্রকাশ্য অধিবেশনে তাতে গান্ধীজীর সংশোধনী প্রস্তাব যোগ হয়ে প্রস্তাবটি আরও বেশী জলো হয়ে গেলো। সংশোধনীর দ্বারা প্রস্তাবে যে যোগ হলো তাতে এই দাঁড়ালো যে পূর্ণ দায়িত্ব-সম্পন্ন সরকার স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত তাকে পুরস্কৃত করার জন্যে জনসাধারণ সংস্কার আইনকে কাজে প্রয়োগ করবে।

কংগ্রেসের এই অধিবেশনে চাকরি ত্যাগ করার জন্যে সার শঙ্করণ নায়ারকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি প্রস্তাব পাস হলো। কিন্তু নাইট খেতাব ত্যাগ করার জন্যে রবীন্দ্রনাথকে নন্দিত করে যে প্রস্তাব পেশ হয়েছিল তা কংগ্রেসে তুলতেই দেওয়া হলো না। এটা ছিল কংগ্রেসের অন্তর্তলর অধিবেশনের আর একটি কলঙ্কজনক ঘটনা। কংগ্রেস তখনও ব্রিটিশের দেওয়া খেতাবের নেশায় বিভোর ছিল। তাই, রবীন্দ্রনাথ নন্দিত হলেন না।

॥ দুই ॥

সম্ভবত ১৯১১ সালে কলকাতার বিভিন্ন কলেজে অধ্যয়নরত কিছু সংখ্যক মুসলিম ছাত্রের উদ্যোগে "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি" নামক একটি সংগঠন জন্মগ্রহণ করে। যতটা মনে পড়ে ছয় খানসামার লেনে ছাত্রদের একটি মেসের ঠিকানা ছিল সমিতির আফিসের ঠিকানা। ১৯১৩ সালে আমি যখন প্রথম কলকাতায় আসি তখন এই সমিতির প্রাণের কোনও স্পন্দন ছিলনা বললেও চলে। আমার কলকাতা আসার কিছুদিন পরে আমরা কয়েকজন সমিতিটিকে উজ্জীবিত করে তোলার চেষ্টা শুরু করি। তাতে ছিলেন বাকেরগঞ্জ জিলার দক্ষিণ শাহরাজপুরের মুহম্মদ মোজাম্মেল হক সাহেব, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব (পরে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ), কলকাতা ট্রেনিং স্কুলের তখনকার হেডমাস্টার, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ কাজী ইমদাদুল হক সাহেব এবং আরও অনেকে। "দি মুসলমান" নামক ইংরেজি সাপ্তাহিকের সম্পাদক মুজীবুর রহমান সাহেব, তাঁর চাচাত ভাই রফীকুর রহমান সাহেব ও "মোহাম্মদী" নামক বাঙলা সাপ্তাহিকের সম্পাদক মৌলবী মুহম্মদ আকরম খানও সাহায্য করতেন। নূর লাইব্রেরীর মালিক মঈনুদ্দীন হোসায়ন সাহেব তো ছিলেনই। অবসর প্রাপ্ত স্কুলসমূহের ইনস্পেক্টর মৌলবী আবদুল করীম সাহেব ছিলেন সমিতির সভাপতি। মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক সাহেব বি-এ. পাস করার পরে সমিতিকে [illegible]

জন্যে বিশেষভাবে চেষ্টা শুরু হয়। তিনি সমিতির সম্পাদকও ছিলেন। সমিতির জন্যে তিনি একান্তভাবে পরিশ্রম করতেন। সহানুভূতিশীল ব্যক্তিরা কিছু কিছু মাসিক চাঁদা দিতেন। ৪১/১, মির্জাপুর স্ট্রীটে একখানা কামরা ভাড়া নিয়ে সমিতির প্রথম স্বতন্ত্র অফিস প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ঠিকানা হতেই সমিতির ত্রৈমাসিক মুখপত্র "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা" প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। কাজ যখন আরও প্রসারিত হলো তখন মির্জাপুর স্ট্রীটের একখানা ঘরে আর কুলিয়ে উঠছিল না। সাহসে ভর করে আমরা ৩২, কলেজ স্ট্রীটের বাড়ির দোতালার সামনের দিককার অংশ ভাড়া নিলাম। এখানে অনেক বেশী জায়গা ছিল।

"বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির" নামটি সাম্প্রদায়িক হলেও আসলে তা সাম্প্রদায়িক সংগঠন ছিল না। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠানও তা ছিল না। আমি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদেরও সভ্য ছিলাম। হয় তো একবার তার কার্যনির্বাহক কমিটিরও সভ্য হয়েছিলাম। এখন ভালো মনে পড়ছে না। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির মারফতে বাঙালীদের সামনে বিশেষ করে বাঙালী হিন্দুদের সামনে মুসলিম সভ্যতার নানান দিক বাংলা ভাষার তুলে ধরা হবে, এটাই ছিল সমিতির একটা বিশেষ উদ্দেশ্য। মুসলমানদের নিকট হতে অনেক বাঙালী হিন্দু তাই চাইতেন। সাধারণত শিক্ষিত বাঙালী হিন্দুরা মুসলিম সভ্যতা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানতেন না। বাঙালী মুসলমানরাও যে খুব বেশী কিছু জানতেন তাও নয়। বাঙলার মুসলমান পরিবারগুলির বিশেষ রীতি-নীতি ও চালচলন সম্বন্ধে প্রতিবেশী হিন্দুদের জ্ঞান সাধারণত সীমিত ছিল। ডক্টর সার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী [illegible] আমার নিকটে একথা স্বীকার করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, মুসলিম লেখকরা এমন সব উপন্যাস রচনা করুন যে-সবের ভিতর দিয়ে মুসলমান পরিবারগুলির ছবি সকলের চোখের সামনে ফুটে উঠবে। কাজী ইমদাদুল হক "আবদুল্লা" নাম দিয়ে এমনই একখানা উপন্যাসের রচনায় অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্য যে তাঁর জীবদ্দশায় তিনি তা শেষ করে যেতে পারেন নি।

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় হিন্দু লেখকদের লেখাও ছাপা হতো। সাহিত্য সমিতির সভায় হিন্দু কবি ও লেখকেরাও যোগ দিতেন। কবি শশাঙ্কমোহন সেন ও "হিতবাদী"র সম্পাদক যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (ডা: হীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পিতা) এবং আরও অনেকে সমিতির সভায় বক্তৃতা দিয়েছেন। হিন্দু গ্রন্থকারেরা সমিতির লাইব্রেরীতে তাঁদের বই দান করতেন। নীতি হিসাবে বিখ্যাত ঔপন্যাসিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর লেখা বই কোনও লাইব্রেরীতে দান করতেন না। কিন্তু বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির লাইব্রেরীতে তিনিও তাঁর সমস্ত পুস্তক দান করেছিলেন। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তাঁর "সাহিত্য" নামক মাসিক পত্রিকায় "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত লেখাগুলির সমালোচনা খুব আগ্রহ সহকারে করতেন।

আমি বৎসরাধিককাল নানান জায়গায় চাকরিও করেছিলাম। সবচেয়ে বেশীদিন কাজ করেছিলাম বাঙলা সরকারের ছাপাখানায়। ছাপাখানাটি তখন রাইটার্স বিল্ডিং-এ ছিল। এখানে কাগজের গুদামে আমি কাজ করতাম। মাসিক বেতন ছিল ত্রিশ টাকা। বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্টের অধীন বেঙ্গলী ট্রান-সলেটারের অফিসেও মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে এক মাস কাজ করেছিলাম। উর্দু হতে বাংলায় তরজমার কাজ। প্রেসিডেন্সী বিভাগের স্কুলসমূহের ইনস্পেক্টরের অফিসেও কাজ করেছিলাম একমাস। এর পরে আমার চাকরির জীবন শেষ হয়। কলেজে পড়ার সময়ে গরমের ছুটিতে একমাস খিদিরপুর জুনিয়র মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেছিলাম। আর এক গরমের ছুটিতে একমাস কাজ করেছিলাম কলকাতা কর্পোরেশনের ট্যাংরা স্লটার হাউসে। এখানে আমায় পশুবধ করতে হতো না। তবে পশুবধের টিকেট আমি ইস্যু করতাম।

১৯০৬ সাল হতে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত আমি কোনো না কোনো লোকের বাড়ীতে থেকে গৃহ শিক্ষকের কাজ করেছি। মাঝে মাঝে দু'চার মাস অবশ্য বাদ গিয়েছে। কলকাতার মুনশী আলীমুদ্দীন স্ট্রীটের নামকরণ (এখন শুধু আলীমুদ্দীন স্ট্রীট) যাঁর নামে হয়েছে চাঁদনীর ৩নং গুলবর লেনে তাঁর বাড়ীতে এক সংগে তিন বছর থেকেছি। মুনশী আলীমুদ্দীন তখন জীবিত ছিলেন

না। তাঁর দুই নাতি—(পৌত্র) মুনশী কমরুদ্দীন ও মুনশী কমরুদ্দীন জীবিত ছিলেন। এ বাড়ীতে যে সমাদর পেয়েছি তা কখনও ভুলবার নয়।

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির জন্যে তো আমি পরিশ্রম করছিলামই, ১৯১৮ সালের শেষ দিকে আমি তার সব সময়ের কর্মী হয়ে গেলাম। তখন থেকেই আমি ৩২, কলেজ স্ট্রীটে সাহিত্য সমিতির বাড়ীতে থাকা শুরু করি। আমি সমিতির সহকারী সম্পাদক ছিলাম। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা আমাকেই বার করতে হতো। যদিও শহীদুল্লা সাহেব ও মুহম্মদ মোজাম্মেল হক সাহেব পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন তবুও কাগজের জন্যে খুব বেশী কাজ তাঁরা করতেন না। পত্রিকার লেখা সংগ্রহ, তা ছাপানো ও ডাকে দেওয়া ইত্যাদি সবই কাজ আমায় করতে হতো। এই সময়ের একটি কাজের কথা আজও মনে পড়লে আমার বড় দুঃখ হয়। কবি কায়কোবাদের "মহাশ্মশান কাব্যের" সমালোচনার দুটি প্রবন্ধ আমি "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা"য় ছেপে ছিলাম। আমি ইচ্ছা করলেই এই সমালোচনা ছাপানো বন্ধ করতে পারতাম। সমালোচক ছিলেন সৈয়দ এমদাদ আলী। এক সময়ে "নবনূর" নামক মাসিক পত্রিকার তিনি সম্পাদক ছিলেন, পরে পুলিশে চাকরি গ্রহণ করেন। সমালোচনা যখন তিনি লিখেছিলেন তখন তিনি বেঙ্গল পুলিশের ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের ইনস্পেক্টর ছিলেন। তাঁর সংগে জীবনে কোনো দিন আমার দেখা হয়নি। লোক মারফতে কিংবা ডাকে তিনি লেখা দুটি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। লেখক হিসাবে তাঁর নাম ছিল বলে আমি তাঁর লেখা দুটি ছাপিয়ে দিই। পরে বুঝেছিলাম অন্যায় করেছি। সৈয়দ এমদাদ আলী "মহাশ্মশান কাব্যে"র কাব্যগুণ সম্বন্ধে এতটুকু আলোচনা করেন নি। সমালোচকের তা করাই উচিত। তিনি শুধু দেখিয়েছেন কোথায় এবং কিসে ইসলাম ও মুসলিমের অবমাননা হলো।

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার পরিচালনার সময়ে কাজী নজরুল ইসলামের সহিত পত্র লেখালেখির মারফতে আমার প্রথম পরিচয় হয়। পরে পরে নজরুলের একটি কবিতা ও দুটি ছোট গল্প আমরা কাগজে ছেপেছিলাম। সে তখন ৪৯নং বেঙ্গলী রেজিমেন্টের কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদার ছিল। ১৯২০ সালের শুরুর দিকে এই পল্টন যখন ভেঙে দেওয়া হলো তখন সে কলকাতায় এসে সাহিত্য সমিতির বাড়ীতে আমার সঙ্গেই থাকতে লাগল। সাহিত্য সমিতিতে কাজ করতে গিয়ে যতগুলি ইসলামকে বন্ধুরূপে পাওয়া আমার একটি বড় লাভ হয়েছিল। তার সম্বন্ধে আমার স্মৃতিকথা আমি অন্য এক পুস্তকে লিখেছি।* আমি প্রায় দেড় বছর বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির সব সময়ের কর্মী ছিলাম।

আমার জীবনের পেশা কি হবে,—সাহিত্য, না, রাজনীতি—এই নিয়ে ১৯১৯ সাল হতেই আমার মনে একটা প্রবল দ্বন্দ্ব চলে আসছিল। একটা কিছুতে নিজেকে বিলিয়ে দেব এটা ঠিকই করেছিলাম। তা না হলে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির সব সময়ের কর্মী হতে পারতাম না। তবে সাহিত্য ও রাজনীতির ভিতরে কোনটাকে বেছে নেব তা ঠিক করতে পারছিলাম না। যদিও সব ছেলেই একবার দু'বার হলেও কবিতা লেখার চেষ্টা করে, আমিও তা করেছিলাম, তবুও কবি হওয়ার স্বপ্ন আমি কখনও দেখিনি। কবি হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। গল্প লেখক কিংবা ঔপন্যাসিক হওয়ার কথাও কোনোদিন ভাবিনি। প্রবন্ধকার হওয়ার প্রবল বাসনা আমার আমার মনে ছিল,—মুসলিম সভ্যতার ওপরে প্রবন্ধকার। এই উদ্দেশ্যে নিজেকে তৈরার করার জন্যেই তো ইংরেজি খুলে পড়তে গিয়েছিলাম।

সভা-সমিতি ও মিছিলে যোগ দেওয়া, আর বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা ইত্যাদির মারফতে আমি একরকম রাজনীতিতে এসেই পড়েছিলাম। তবে সাহিত্য সমিতি ছেড়ে যাব ভাবলে মনটা তখনও টনটন করে উঠত। তার জন্যে অনেক ঘাটুনি আমি খেটেছিলাম। সমিতির অনেক দায়-দায়িত্বও আমি বহন করে চলেছিলাম।

ইতিমধ্যে ১৯২০ সাল এলো। আমি স্থির করে ফেললাম আর সাহিত্য সমিতি নয়। এখন হতে রাজনীতিই হবে আমার পেশা।

---

*কাজী নজরুল প্রসঙ্গে (স্মৃতিকথা)—বিংশ শতাব্দী প্রকাশনী—২০, ব্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৫।

শৈলজানন্দ
মুখোপাধ্যায়

নীহারিকা

ভারি বিপদে পড়েছে হরিশ বাড়ুজ্যে।

মেয়েটা রীতিমত বড় হয়ে উঠেছে। তার বিয়ে যেন আর না দিলেই নয়।

কিন্তু ছেলে কোথায়? যার তার হাতে তো আর অমন সুন্দরী মেয়েকে তুলে দিতে পারে না?

একে ভাল ছেলে পাওয়া যায় না, তার ওপর আবার আর এক বিপদ। টাকা চাই।

টাকার নাম শুনলেই হরিশের বুকের ভেতরটা কেমন যেন করতে থাকে।

তাই বলে ভাববেন না—তার টাকার অভাব। কলকাতার মত শহরে দু'দুখানা বাড়ি। জমানো টাকাও আছে কিছু। কিন্তু সে টাকা সহজে সে বের করতে চায় না। স্ত্রী থাকলেও বা খোঁচা দিয়ে বের করতো। কিন্তু স্ত্রী মরে গেছে অনেক দিন আগে।

এখন শুধু হরিশ নিজে, আর তার ওই সুন্দরী মেয়ে পারি।

একজন ঘটককে বলে রেখেছিল হরিশ।

'পাত্রের খোঁজ খবর যদি পাও তো দ্যাখো চেষ্টা করে মেয়েটাকে উদ্ধার করতে পার কিনা!'

সেই ঘটক সেদিন একটি পাত্রের কথা বলবার জন্য এসেছিল হরিশের কাছে।

হরিশের তখন নজর পড়েছিল তারই বাড়ির ওপর তলার যে ছেলেটি আজ বার দুয়েক হলো তার মা আর বোনকে নিয়ে ভাড়া এসেছে, সেই বিনোদের ওপর।

বিনোদ বি. এ. পাশ, দেখতে শুনতেও ভাল। কিন্তু হরিশ এখনও তার মনের কথা জানায় নি কাউকে। বিনোদ বা তার মা, বোন কেউ কিছুই জানে না।

তবু হরিশ ঘটককে খুব একটা আমল দেখালে না।

ঘটক বললে, 'ছেলেটি ভাল। টাম কোম্পানীর ইনস্পেক্টার।'

হরিশ বললে, 'আরে রাখো তোমার পাত্র। কোথাকার কে এক ব্যাটা ট্রাম গাড়ি চালায় তার সঙ্গে আমি মেয়ের বিয়ে দেবো?'

ঘটক বললে, 'না না, ট্রাম গাড়ি চালায় না। ট্রাম কোম্পানীর—'

হরিশ তার কথা শেষ করতে না দিয়ে বিরক্ত হয়ে বললে, 'থামো। থামো!' বলে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল হরিশ। এমন সময় ওপর তলা থেকে ধুপধাপ কাপড় আছড়ানোর শব্দ শুনে হরিশ আরও বিরক্ত হয়ে ওপর দিকে মুখ করে ডাকতে লাগল, 'ও মশাই! শুনছেন?—ও মশাই!—'

বিনোদ কি একটা কাজ করছিল। হরিশের ডাক শুনে তাড়াতাড়ি নেমে এল সিঁড়ি বেয়ে। হরিশের কাছে এসে বললে, 'আমায় ডাকছেন?'

—'হ্যাঁ, তোমাকেই ডাকছি।···ওই শোনো দেখি, নিজের কানে ভাল করে শোনো!' বলে হরিশ তার চুঁকোটায় কয়েকটা টান দিলে বেশ জোরে জোরে।

বিনোদ কি শুনবে কিছুই বুঝতে না পেরে হরিশের মুখের দিকেই তাকিয়ে রইল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে।

ওপরের কলঘরে বিনোদের বোন দীপিকা তেমনি ধুপধাপ করে কাপড় কেচে চলেছে।

হরিশ মুখ তুলে বিনোদের মুখের দিকে চেয়ে বললে,—'কি, শুনতে পাচ্ছ না? বলি ভাড়া বাড়িতে বাস কর, বাড়ির দাম ত জান না, বাড়ি করা কত কষ্ট তাও জান না! নিজের বাপ-ঠাকুর্দার ভিটে, নিজে রইলাম নীচে আর তোমাদের বসালাম মাথার ওপর, ভাড়া দেবার ত নাম নেই—আবার ধুপধাপ করে কি হচ্ছে কি শুনি!'

এই সামান্য কারণে এত হৈ চৈ করার জন্য বিনোদ একটু বিরক্ত হলো। বললে, 'হবে আবার কি? কাপড় কাচছে। কাপড় কাচলে বাড়ি ভাঙে না। আপনি থামুন।'

—'থামবো কি হে? তোমার কথায় থামবো? যাও, তোমার সঙ্গে আমি কথা কইতে চাই না। তোমার মাকে পাঠিয়ে দাও। যা বলবার আমি তাকেই বলবো।'

—'বেশ।' বলে বিনোদ আবার হন্ হন্ করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল।

ঘটক হরিশবাবুর মন মেজাজের অবস্থা বুঝে সেখানে আর বেশীক্ষণ বসে থাকা নিরাপদ মনে করলে না। হাতাটি বগলে পুরে বললে, 'আচ্ছা, আজ তা হলে আমি উঠি।'

—'যাবে মানে? এরই মধ্যে যাবে? এর মানেটা কি শুনি! বলি—তোমাকে কি ঘটকালির পারিশ্রমিক দেবো না মনে করেছ? বসো। আমি যে পাত্রের সন্ধান দেবো, দরকার হলে তোমাকে সেখানে যেতে হবে।'

অগত্যা ঘটক বসে রইল।

হরিশ আবার হুঁকোয় কয়েকটা টান দিয়ে মেয়েকে ডাকলে, 'শান্তি,—ও শান্তি!'

ভেতর থেকে বেরিয়ে এল শান্তি। সত্যিই অপরূপ সুন্দরী সে। শহুরে মেয়ের কোন ছাপ তার পোষাক-পরিচ্ছদে নেই। সাধারণ একটা ডুরে শাড়ী আর ব্লাউজের ওপর ফুল তোলা একটা সাধারণ সেমিজ তার পরণে। তাতেই কত সুন্দরীই না দেখাচ্ছে মেয়েটাকে। শাড়ীটা গাছ-কোমর করে পরা। হাতে একটা খুন্তি।

সংসারের মধ্যে তারা দু'জন—বাপ আর মেয়ে। কাজে কাজেই দু'বেলা রান্নার ভারটা তারই ওপর। রাঁধতে রাঁধতেই বাবার ডাক শুনে বেরিয়ে এসেছিল সে। শান্তির সবই ভাল, কিন্তু বড্ড মুখরা।

ট্যাঁক ট্যাঁক করে বললে, 'কি বলছ কি? রাঁধছি দেখতে পাচ্ছ না?'

যেমন মেয়ে তার তেমনি বাপ! কেউ কম যায় না। শান্তির চেয়েও একটু চড়া পর্দায় গলার তুলে হরিশ বললে—ঘটককে উদ্দেশ করে।—'দেখেছ? দেখেছ মেয়ের মূর্তি। এই হতভাগা মেয়ের কখনও বিয়ে হয়? এই জন্যেই ত বিয়ে হচ্ছে না।'

শান্তিরও জবাব একেবারে সপ্তমে সপ্তমে, 'না হোক গে। কি বলছ বলো!'

হরিশ তার রণচণ্ডী মূর্তি দেখে গলার আওয়াজটা একটু নামিয়ে নিলে।

'ওপরের গিন্নীকে ডেকে পাঠিয়েছি; তিনি হয়ত এখুনি আসবেন, তাঁর বসবার জন্যে একটা মোড়া এনে দে।'

হরিশের কথা শেষ হতে না হতেই ওপর তলার গিন্নী অর্থাৎ বিনোদের মা সেখানে এসে হাজির হলেন। শান্তি মোড়া আনতে যাচ্ছিল দেখে বাধা দিয়ে বললেন 'না না মোড়া আনতে হবে না। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই শুনছি, কি বলবেন বলুন।'

শান্তি তার বারণ শুনলে না। পাশের ঘর থেকে একটা মোড়া এনে গিন্নীর সামনে দুম করে রেখে দিয়ে চলে গেল।

হরিশ গিন্নীকে বললে, 'বসুন মা বসুন।'

বিনোদের মা বসলেন না, তেমনি সসঙ্কোচে দাঁড়িয়ে রইলেন।

দেখে হরিশ আবার বললে, 'না না, আপনি বসুন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোনা চলবে না। অনেক কথা।'

বিনোদের মা হরিশ বাঁড়ুয্যেকে এর আগে কয়েকবার দেখেছেন, কিন্তু এই ঘটকটিকে কখনও দেখেন নি। তাই ঘোমটাটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'ইনি কে? এঁকে ত চিনতে পারলাম না।'

হরিশ জবাব দেবার আগেই ঘটক বললে, 'আমি ঘটক মা, ঘটক। বিয়ের ঘটকালি করি।' বলে হরিশকে ঠেলিয়ে দিয়ে আবার বললে, 'ওঁর মেয়ের জন্যে একটা পাত্র—'

কথাটাকে তার শেষ করতে দিলে না, হরিশ চেঁচিয়ে উঠলো—'আরে রাখো রাখো তোমার পাত্র! কোথাকার কে এক ব্যাটা ট্রাম গাড়ি চালায় তার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দেবো?'

পাত্রটি সত্যিই ট্রাম গাড়ি চালায় না, ঘটক তা হরিশকে জানিয়েছে। কিন্তু ড্রাইভার আর ইন্সপেক্টরের তফাৎ হরিশ বুঝতে পারছে না দেখে ঘটক বেশ একটু প্রতিবাদের সুরেই বললে, 'আজ্ঞে ট্রাম গাড়ি চালাবে

কেন। ইন্সপেক্টার।'

হরিশ তার কথা কানে না তুলেই ধমক দিলে, 'থামো বাপু, থামো। তুমি বোসো ঐখানে চুপটি করে।'

বেচারা ঘটককে বিনা প্রতিবাদেই চুপ করে বসতে হলো।

হরিশ বেশ শান্ত মেজাজে বিনোদের মাকে বলতে আরম্ভ করল, 'শুনুন মা শুনুন! আমি কি আপনাদের কাছে কোন অন্যায় করেছি?'

হরিশের এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে বিনোদের মা যেন আকাশ থেকে পড়লেন। হঠাৎ এ প্রশ্নের যে কি কারণ থাকতে পারে তা তিনি ভেবেই পেলেন না। শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'সে কি! আপনি অন্যায় করবেন কেন? আমরাই বরং আপনার দু'মাসের ভাড়া দিতে পারি নি।'

—'আরে রেখে দিন ভাড়া। আপনার মা বাপের আশীর্বাদে ভাড়া আমি ডন্‌কেয়ার—। কিন্তু অন্যায়টা আমি কি করেছি? নিজে থাকি নীচের তলায় আর আপনাদের রেখেছি মাথার ওপর। ভাড়া মাত্র তিরিশ টাকা। তাও দু'মাসের বাকী। হ্যাঁ, তাগাদা অবশ্য মাঝে মাঝে করি। কিন্তু এ ছাড়া আর কিছু করেছি? আপনাদের বলেছি কি কোন দিন যে বাড়ি থেকে চলে যান।'

সবিনীতভাবে বিনোদের মা বললেন, 'না না, তা বলবেন কেন? আপনার মত লোক হয় না। আপনি খুব ভালো।'

বাইরের আচার-ব্যবহারের জন্যে এ প্রশংসা হরিশ আজ পর্যন্ত কারুর কাছ থেকে কোনদিনই পায় নি। আজই প্রথম বিনোদের মার মুখে শুনলে সে খুব ভাল লোক। শুনে আনন্দে তার যেন আর ধরে না। বললে, 'বাস বাস! তা হলেই হলো। আপনি ত স্বীকার করেন আমি ভাল লোক!'

—'একশোবার!'

—'তার ওপর আপনারা মুখুজ্যে আর আমি বাঁড়ুজ্যে। বলুন ঠিক কিনা?'

—'হ্যাঁ।'

—'তা হলে হয়ে যাক্।'

হরিশের এ কথার অর্থ বুঝতে না পেরে বিনোদের মা তার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলেন, 'কি হবে?'

একগাল হেসে হরিশ বলে, 'কেন? আপনার ছেলের বিয়ে!'

—'হ্যাঁ। সেই চেষ্টাই ত করছি। কিন্তু ছেলে যে কিছুতেই রাজী হচ্ছে না বাবা! বলছে—পড়বো।'

—'তা বেশ ত। পড়ুক না। আমি পড়াব।'

—'আপনি পড়াবেন?'

—'পড়াব না? নিশ্চয় পড়াব। আমার ওই একটা মাত্র মেয়ে—কত পড়বে পড়ুক না!'

এতক্ষণে বিনোদের মা বুঝতে পারলেন, হরিশ কি বলতে চায়। বললেন, 'ও! আপনার মেয়ের সঙ্গে বিনোদের বিয়ের কথা বলছেন বুঝি?

—'হ্যাঁ বলছি। কেন? আমার মেয়ে কি খারাপ? আমার মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিলে কি আপনার ভাত যাবে?'

—'না না, আমি সে কথা বলছি না। তবে ছেলেকে একবার জিজ্ঞেস করা দরকার।'

হরিশ ঘাড় নেড়ে বললে, 'হ্যাঁ, সে তো ঠিক কথা। তা বেশ, বিনোদকে জিজ্ঞেস করুন। আমার ওই একটি মাত্র মেয়ে, লাড-আহ্লাদের কোন ত্রুটি করব না। তা ছাড়া আমার এই একখানা বাড়ি, আরও একখানা বস্তু বাড়ি আছে। আর টাকা পয়সা যা আছে সবই ওই ও-ই পাবে।'

ভবিষ্যৎ সুখের কল্পনায় বিনোদের মার মন দুলে উঠল। বললেন, 'সে আপনাকে বলতে হবে না। আমি সবই জানি। বিনোদকে জিজ্ঞেস করে আপনাকে জানাব। আচ্ছা, এখন তা হলে আসি!'

বিনোদের মা চলে গেলেন। হরিশ পুনরায় হুঁকোটি এগিয়ে ধরলো। ঘটক দেখলে বেগতিক। তার পাখিটি হাত ছাড়া হয়ে যায়। তাই বার দুই আমতা-আমতা করে বললে, 'তা হলে আমার পাওনা—'

হুঁকোর আগুন নিভে গেছে। তবু একটা পুকনো টান দিয়ে চোখ কপালে তুলে হরিশ বললে, 'আরে রাখো তোমার টেরাম-কোম্পানীর ইয়ে। যদি ঘটকালি করে দু'পয়সা পেতে চাও ত ওই গিন্নীর সঙ্গে ওপরে

যাও।' বিনোদের সঙ্গে যদি বিয়ের ঠিক করে দিতে পার তা হলে আমি তোমাকে খুশী করে দেবো।'

—'আমার পাত্রটি তা হলে হলো না?'

—'না, হলো না। তোমার পাত্রের চেয়ে বিনোদ অনেক ভাল পাত্র। বি. এ. পাশ। যাও ওপর তলায় গিয়ে বিনোদকে ধরগে—।'

অগত্যা ঘটক গেল ওপর তলায়। হরিশও পান্তিকে ডাকতে ডাকতে ভেতরে চলে গেল।

বিনোদ মাকে হরিশবাবুর কাছে পাঠিয়ে দিয়ে ভেবেছিল, হরিশ বাড়িভাড়া লতিকার ঘুপচাপ করে কাপড় আছড়ানোর কথা ত বলবেই; ভাড়া বাকীর কথাটাও বলতে ছাড়বে না। কিন্তু তার মা যখন এসে সব কথা বললেন, বিনোদ তখন আশ্চর্য না হয়ে পারল না। বললে, 'বল কি মা! আমার সঙ্গে ওর মেয়ের বিয়ে দিতে চায়?'

—'হ্যাঁরে। বলে, ওর একটি মাত্তর মেয়ে, সাধ-আহ্লাদের ত্রুটি করবে না। তা ছাড়া এই একটা বাড়ি। আরও একটা বাড়ি আছে। বুড়োর টাকা পয়সাও আছে অনেক। তুই যতদূর পড়বি তার খরচ দেবে। আর ভবিষ্যতে ত ওর যা কিছু আছে সব তোরই হবে।'

—'তাই বলে ওই মেয়েটা তোমার বৌ হবে?'

—'কেন? মেয়েটা খারাপ কিসে? একটু চ্যাঁক চ্যাঁক করে কথা বলে এই তো? বিয়ের পর ঠিক হয়ে যাবে।'

—'না না মা, ও স্বভাব ওর জীবনে শোধরাবে না। এক একদিন দেখ না, মেয়েটা হাওয়ার সঙ্গে ঝগড়া করে।'

—'তা করুক সে। তবু এ সুযোগ হাত ছাড়া করা ঠিক হবে না। তোর আরও পড়ার শখ,—আমি সে শখ মেটাতে পারি নি, হরিশবাবুর মেয়েকে বিয়ে করলে সে সাধ তোর মিটবে। সেই সঙ্গে বাড়ি ঘর টাকা পয়সা, হরিশবাবুর মতন অভিভাবক সব পাবি।'

—'না না মা, ওমেয়েকে তুমি বিয়ে করতে বোল না। তাতে আমাদের যত কষ্ট হয় হোক। আর পড়ার কথা বলছ? গরীবের কি সব সাধ মেটে? যতটুকু পড়েছি তাতে চাকরী একটা যেমন হোক পাবো।' বলে বিনোদ দরজার দিকে মুখ ফেরাতেই দেখল ঘটক দাঁড়িয়ে। বললে, 'কে আপনি? কি চান?'

ঘটক জবাব দেবার আগেই বিনোদের মা বললেন, 'উনি ঘটক।'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি ঘটক, ঘটকালি করি।'

—'তা বেশ। ওকে বলুন গিয়ে—বিয়ে আমি করব না।'

—'সত্যি বলছেন।'

—'তবে কি আপনার সঙ্গে রসিকতা করছি? যান বলে দিন গে।'

ঘটক যেন একটু খুশীই হলো। বিনোদের কাছে এগিয়ে এসে চাপা গলায় বললে, 'তা হলে চুপি চুপি একটা কথা বলি শুনুন। এই বাড়িটা ছাড়া আর ওর কিসসু নেই। আর একটা বাড়ির কথা যা বলছে—সেটা ওর নিজের বাড়ি নয়—কাকার বাড়ি।'

—'যার বাড়িই হোক, ওর ওই মুখরা ঝগড়েটে মেয়েকে বিয়ে আমি করব না।'

ঘটক বললে, 'তা ঠিক বলেছেন। ও মেয়ে যার ঘরে যাবে তার ঘরে আর কান-চিল বসবে না, বিয়ে করতে চান আমাকে বলুন। আপনি যেমনটি চান, তেমনটি পাবেন। পড়তে চান পড়তে পাবেন। বিলেত যেতে চান, তাও যেতে পারবেন। খুব বড়লোক। বালীগঞ্জে প্রকাণ্ড বাড়ি। মেয়ে একবারে দুস্প্যাপিতিমে।'

বিনোদের মা বললেন, 'তারা আমাদের ঘরে বিয়ে কেন দেবে বাবা?'

—'দেবে মানে? তারা ত গরীবের ছেলেই চাইছেন। ছেলেটি কেবল বি-এ, এম-এ পাশ হলেই হলো—বাস্ আর কিছু চায় না।'

—'আমার ওই ছেলেটিই আছে বাবা। আর কিছু নেই।'

—'আর কিছুই দেখতে চাইবে না মা।' বলে ঘটক বিনোদের দিকে ফিরে বললে, 'আপনি আমার সঙ্গে চলুন একদিন। আমি সব দেখিয়ে শুনিয়ে ঠিক-ঠাক করে দিচ্ছি।'

বিনোদের বাবা তখন ভবিষ্যৎ সুখের কল্পনায় মন আনন্দচঞ্চল। বিনোদ কিছু বলবার আগেই বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। তোর সেই ডাক্তার-বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে মেয়েটিকে একদিন দেখে আয় বাবা।'

বিনোদ বললে, 'তুমি একাস্তই বিয়ে না দিয়ে ছাড়বে না মা?'

—'হ্যাঁ বাবা, একটা শ্বশুরের মতন শ্বশুর হোক, দেখা শুনা করবার একটা লোক হোক।'

মায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিনোদ আর কোন কথা বললে না। শুধু ঘটককে জানালে সে একদিন মেয়ে দেখে আসবে।

ঘটক খুব খুশী হলো। এমনি একটি পাত্রই সে খুঁজছিল কিছুদিন থেকে। যাবার আগে বিনোদকে বললে, 'আমি আর এ বাড়িতে আসব না বাবু আমার ঠিকানাটা আপনি লিখে রাখুন। আমি আজই ওদের খবর দিয়ে রাখছি। আপনার কাছ থেকে খবর পাওয়া মাত্রই আমি আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে দেখিয়ে নিয়ে আসব। লিখুন—আমার ঠিকানাটা লিখে রাখুন। আপনাদের পাশেই থাকি আমি। লিখুন, দিগম্বর ঘটক, তেত্রিশ নম্বর প্রাণনাথ পরামাণিক লেন। কলকাতা—'

কাগজ পেন্সিলে ঠিকানাটা লিখতে লিখতে বিনোদ বললে, 'জানি জানি, আর বলতে হবে না।'

বিনোদের মা ঘটককে বললেন, 'দেখো বাবা, কথার যেন নড়চড় না হয়।'

—'না না মা, সেকি কথা! এই আমার ব্যবসা। কথার নড়চড় করলে কি আর ব্যবসা চলে মা? এ বিয়ে হবেই। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।' বলে ছাতাটি বগলে নিয়ে ঘটক চলে গেল।

এমনটি যে হবে, হরিশ তা ভাবেনি। তাড়াতাড়ি শান্তির কাছে এসে বললে, 'যা ত মা চট করে একটা ভাল জামা-কাপড় পরে আয়।'

শান্তি অবাক! বললে, 'কেন বাবা? কোথাও বেড়াতে নিয়ে যাবে নাকি?'

—'যা যা, বেড়াতে নয়। ওপরের গিন্নী এখুনি তোকে দেখতে আসবেন। বিনোদের সঙ্গে তোর বিয়ের সব ঠিক করে ফেললাম। যা—যা, শুভস্য শীঘ্রং, আজই আমি গিন্নীকে দিয়ে আশীর্বাদটা সেরে নেবো।'

শান্তির মন খুশীতে ভরে ওঠে। লজ্জায়-সুন্দর মুখটা লাল হয়ে ওঠে। কিন্তু বাবার কাছে সেটা গোপন করবার জন্যে রাগ করে বলে, 'দেখছ না আমি রান্না করছি। চোখ নেই তোমার? এখন পারব না আমি জামা-কাপড় ছাড়তে।'

হরিশ বললে, 'না—না, রান্না পরে হবে। এখন যা বলছি তাই কর।'

শান্তি উনোনের পাশে হাতাটা ঠক্ করে নামিয়ে রেখে তার স্বভাবগত কাঁকালো কণ্ঠে বলে, 'তাহলে ডালটা তুমি সাঁতলে নিও। আমি পারব না।' বলে হন্ হন্ করে অন্য ঘরে চলে যায়।

—'বেশী দেরী করিস নে!' বলে হরিশ চিমটে দিয়ে আগুন তুলে কয়লার চাপায়।

আবার করে হুঁকোয় টান দিতে যাবে, এমন সময় ডালটা উথলে উঠে উপচে পড়ে। হরিশ হুঁকো নামিয়ে একটু জল ঢেলে দেয়।

আবার হুঁকোটা হাতে নিতে না নিতেই ডালটা উপচে ওঠে। হরিশ বিরক্ত হয়ে ডালের পাত্রটা উনোন থেকে নামিয়ে রাখে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই শান্তি এসে দাঁড়াল। খুব দামী শাড়ী ব্লাউজ সে পরেনি, তবে যা পরেছিল এটা তার চেয়ে একটু ভাল।

হরিশ দেখলে। দেখে বললে, 'বাঃ, সুন্দর মানিয়েছে।' বলে শান্তির হাতে ধরে বললে, 'আয় মা আয়। বিনোদের মাকে ডাকি!' বলতে বলতে বাইরের ঘরের দিকে চলে গেল।

দিগম্বর ঘটক তখন ওপর থেকে নেমে এসে তাদেরই অপেক্ষায় বসে আছে।

হরিশ তাকে দেখেই জিজ্ঞাসা করলে, 'কি ব্যবস্থা হলো? ওঁরা নীচে আসবেন? না আমরাই ওপরে যাব?'

দিগম্বর ঘটক মুখ ভার করে বললে, 'হোল না বাবু!'

—'হলো না?' হরিশ কিছুক্ষণের জন্যে একেবারে

স্তব্ধ হয়ে গেল। আনন্দ যতখানি হয়েছিল, ঠিক ততখানি রাগ হয়ে গেল তার। ওপরের দিকে মুখ করে বেগে বেগে ডাকতে লাগল, 'শুনছেন? ও ঠাকরুণ! ও ওপরের ঠাকরুণ, শুনছেন?'

কিন্তু ওপর তলা থেকে কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। হরিশ ওপর তলায় উঠলো তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে। শান্তি তখন ভেতরে চলে গেছে। ঘটক রয়ে রইল। ষ্টীম কোম্পানীর সেই ইন্সপেক্টর পাত্রটির এখানে বিয়ে দেওয়ার আশা এখনও ছাড়েনি সে।

হরিশ ওপর তলায় এসে ডাকলে, 'ও ঠাকরুণ।'

দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন বিনোদের মা।

তিনি কিছু বলবার আগেই হরিশ বললে, 'কি হলো?'

বিনোদের মা বললে, 'বিনোদ এখন বিয়ে করতে রাজী হচ্ছে না।'

—'ও! বেশ! তাকে বলে দেবেন, দু'মাসের ভাড়া বাকি পড়েছে, তা মিটিয়ে দিয়ে সাত দিনের মধ্যে যেন আমার বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। আমার বাড়িতে আর আপনাদের জায়গা হবে না। যদি সহজে বাড়ি না ছাড়েন ত আদালত থেকে লোক এনে অপমান করে তাড়াবো।' এই বলে আর মুহূর্তমাত্র সেখানে না দাঁড়িয়ে হন্ হন্ করে নীচে নেমে এল হরিশ। রাগে তখন তার চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠেছে।

দিগম্বর ঘটক সুযোগ বুঝে বার-দুই ঢোক গিলে বললে, 'আজ্ঞে, তাহলে না হয় আমার সেই পাত্রটি—'

—'আরে দুত্তোর তোমার টেরাম গাড়ির টং টং। মোটরগাড়ি চড়ে বেড়ায়, এমন পাত্রের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দেবো। যাও-যাও, সে তোমার দ্বারায় হবে না, তুমি যাও।'

দিগম্বর আর কিছু বলতে সাহস করলো না।

পরদিন দিগম্বর এসে উপস্থিত হলো বালীগঞ্জের অবিনাশ রায়ের বাড়িতে। অবিনাশ বাবু বিখ্যাত ব্যবসায়ী, মস্ত বড় লোক। তার সন্তান বলতে দুটি মাত্র মেয়ে। বড়টির বিয়ে দিয়েছেন, তারই মত একটা খুব বড়লোকের বাড়িতে। ছোট মেয়ে নন্দার বিয়ের জন্যেও এবার উঠে পড়ে লেগেছেন। অবিনাশবাবুর ইচ্ছা, বড়লোকের বাড়িতেই নন্দার বিয়ে দেন, কিন্তু তাঁর স্ত্রী মেঘমালা দেবীর ইচ্ছা ঠিক উল্টো। তিনি চান শিক্ষিত গরীবের ছেলে। তাঁর এ ইচ্ছার কারণ হলো,—বড়লোকের বাড়িতে বড় মেয়ের বিয়ে দিয়ে একতিল শান্তি পাননি তিনি। প্রচুর টাকা খরচ করে তাদের সব রকম চাহিদা মিটিয়েছেন, তবু তাদের মন পাওয়া ত দূরের কথা নিজের তারা পক্ষমুখ হয়েই আছে। ভালভাবে তত্ত্ব-আস্তি পাঠালেও মেয়েকে গঞ্জনা শুনতে হয়। তাই এবার প্রতিজ্ঞা করেছেন মেঘমালা দেবী, বড়লোকের বাড়ীতে আর নয়। তাই তিনি দিগম্বর ঘটককে নিযুক্ত করেছেন তাঁর মনোমত একটি পাত্র সন্ধান করতে।

অবিনাশবাবু এর বিন্দু বিসর্গও জানেন না। তিনি সুপাত্রের জন্যে দিনের পর দিন বিজ্ঞাপন দিয়ে চলেছেন খবরের কাগজে।

মেঘমালা দেবী ঘটককে বাইরের ঘরে বসে থাকতে দেখে ব্যস্তভাবে ছাদে উঠে গেলেন তার ভাই জগাকে ডাকতে।

মেঘমালা দেবীর মা-বাপ-মরা ভাই জগা, ওরফে, জগন্নাথ, বোন-ভগ্নীপতির অন্ন ধ্বংস করে, আর ঘুড়ি ওড়ায়। কোনরকম কাজ-কর্মের ইচ্ছাও নেই, ক্ষমতাও নেই। স্ত্রীর আদুরে এই ভাইটির অত্যাচার অবিনাশ-বাবুর মাঝে মাঝে অসহ্য লাগে। প্রতিবেশীদের নিত্যি নালিশ ত লেগেই আছে। কেউ বলে, জগার জন্যে মেয়েদের ছাদে ওঠবার জো নেই। কেউ বলে, মেয়েদের দিকে বেহায়ার মত চেয়ে থাকে, কেউ বা বলে, নানারকম অঙ্গভঙ্গী করে, গান গায় ইত্যাদি। এ অভিযোগ যে মিথ্যা, তা নয়। সব সত্যি জেনেও অবিনাশবাবু কোনও প্রতিকার করতে পারেন না। স্ত্রীর মুখ চেয়ে সব কিছু তাঁকে নীরবে সহ্য করতে হয়।

মেঘমালা ভাবলেন, এই সময় কর্তা বাড়িতে নেই, ঘটকের সঙ্গে কথাবার্তা সেরে নেন। তাই তাড়াতাড়ি ছাদে এসে ডাকলেন, 'জগা। জগা।'

জগা তখন ঘুড়ির কন্ বাঁধছিল আর তন্ময় হয়ে সুর ভাঁজছিল। বলল, 'দাঁড়াও, ঘুড়িটা ঠিক করে দিয়ে যাচ্ছি।'

—'ঘুড়ি পরে ঠিক করবি, ঘটক অনেকক্ষণ থেকে বসে আছে। আমার সঙ্গে আয়।

—'তা তুমি যাও না। আমি ঘটক নিয়ে কি করব?'

—'আমি একা কি ঘটকের সামনে গিয়ে কথা কইতে পারি?'

—'হুঁঃ! দুনিয়ার লোকের সঙ্গে একা কথা বলছ, আর ঘটকের বেলাতেই যত দোষ! অত যদি তাড়া ত' জামাইবাবুকে ডাকগে যাও।'

—'তিনি বাড়ি নেই। আর তুই ত জানিস, তাকে লুকিয়ে আমি পরীবের ছেলে খুঁজতে ঘটক লাগিয়েছি। লক্ষ্মী ভাই, চট করে আর একবারটি।'

জগা বিরক্ত হয়ে ঘুড়িটা রেখে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'দুত্তোর ঘটক! নে—'

মেঘমালা জগাকে সঙ্গে নিয়ে বাইরের ঘরে আসতেই দিগম্বর শশব্যস্ত হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। মেঘমালা তাকে বসতে বলে, একটি সোফায় বসলেন।

জগা ঘটকের সামনে এগিয়ে এসে বলল, 'তুমি মানে আপনি ঘটক?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'কই, তোমার বর কোথায়?'

দিগম্বর সবিস্ময়ে বলল, 'বর?'

—'হ্যাঁ হ্যাঁ, বর। নন্দার বর। জামাই—'

—'আজ্ঞে, তাঁকে ত' আজ আনিনি।'

জগার কথাবার্তায় দিগম্বর ঘটক বেশ একটু থতমত খেয়ে গেল। মেঘমালা ঘটকের অবস্থা বুঝে জগাকে বললেন, 'চুপ্ কর্ হতভাগা! মানুষের সঙ্গে কথা বলতেও জানিস না?' বলে ঘটককে বললেন, 'আপনি ওর কথা শুনবেন না। আপনার খবর বলুন, পেয়েছেন তেমন ছেলে?'

দিগম্বর উত্তর দিতে যাচ্ছিল, এমন সময় জগা তার কপালের বড় আবটা টিপে দিয়ে বলল, 'এটা কি হে তোমার কপালের ওপর?'

জগার এই ব্যবহারে মেঘমালা দেবী লজ্জিত হলেন। দিগম্বর থতমত খেয়ে বলল, 'আজ্ঞে, ওটা আব্।'

জগা হো হো করে হেসে বলল, 'দেখেছ দিদি?'

—'দেখেছি। তুই চুপ করে বোস্ এইখানে।'

দিদির ধমককে ভয় পায় না জগা। বলল, 'তোমার কপালের ওপর কপাল হে, বা-বা-বা।' বলে হাসতে হাসতে একটি সোফায় এসে বসল।

মেঘমালা ঘটককে প্রশ্ন করলেন, 'ছেলেটি দেখতে কেমন?'

—'আজ্ঞে, আপনি যেমনটি বলেছিলেন, ঠিক তেমনি। বি এ পাশ। পড়াশোনায় ভারী ঝোঁক আরও পড়তে চায়।'

—'আমি পড়াব। বাড়িতে কে কে আছে?'

—'মা আছেন! আর একটি অবিবাহিতা বোন আছেন। দায় বলতে ওইটিই!'

—'তা তাঁরা যদি রাজী হন, সে দায় আমিই উদ্ধার করে দেবো। আমার এই ভায়ের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে দিতে পারি।'

বিয়ের কথায় জগা লেচে উঠল, 'বারে-বাঃ। মেয়ে দেখব না বুঝি?'

মেঘমালা ভাইকে শান্ত করবার জন্যে বললেন, 'দেখবি বৈকি। নিশ্চয়ই দেখবি।'

জগা তড়াক করে ঘটকের কাছে উঠে গিয়ে বলল, 'কবে দেখাবে? চল, আজই দেখে আসি।'

মেঘমালা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আঃ, কি জ্বালাতন করিস জগা?'

জগা বলল, 'বা রে! পরশুদিন বিশ্বকর্মা পুজো সারাদিন হাতে ঘুড়ি ওড়াতে হবে। সময় পাব না যে।'

মেঘমালা আবার ধমকে বললেন, 'আবার চেঁচাস?'

জগা আর কিছু বলে না।

মেঘমালা প্রশ্ন করে ঘটককে, 'ছেলেটির বাড়ির অবস্থা কেমন।'

ঘটক বলল, 'ভাল নয়। আপনি ত বলেছিলেন—শুধু লেখাপড়া জানা হলেই হবে। তবে ছেলেটি দেখতে শুনতে খুব ভাল। বেশ মোটা সোটা সুন্দর—'

—'থাক। আর বলতে হবে না। বড়লোক কুটুম আমি চাই না, বড় মেয়ের বিয়ে দিয়ে বেশ শিক্ষা হয়েছে আমার। যতই যা দিই, পছন্দ আর হয় না।'

জগা তাড়াতাড়ি বলল, 'আর আমাকে যে মারতে এসেছিলো, সেটা বলো!'

মেঘমালা আবার তাকে ধমক দেন। জগা বোকার মত চেয়ে ঘর থেকে চলে যায়।

মেঘমালা ঘটককে বলেন, 'তাহলে আপনি ছেলেটিকে এনে মেয়ে দেখানোর বন্দোবস্ত করুন। মেয়ে পছন্দ হলেই আমি সব ঠিকঠাক করে ফেলবো।'

দিগম্বর বলল, 'রবিবার বিকেল চারটের সময় আসবো না। পাত্রের সঙ্গে তাঁর এক ডাক্তার বন্ধুও আসবেন।'

—'হ্যাঁ-হ্যাঁ, যে আসবে, নিয়ে আসবেন।'

এই কথা বলতেই বাইরে থেকে অবিনাশবাবুর গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। এ সময় তাঁর বাড়ি ফেরার কথা নয়। কিন্তু আজ হঠাৎ···মেঘমালা দেখ একটু চঞ্চল হয়ে উঠলেন, ঘটককে বিদায় করার সুযোগ ত' দূরের কথা, তাকে কোন কথা বলবার ফুরসৎ পেলেন না।

কতকগুলো খাম পোস্ট কার্ডে লেখা চিঠি হাতে অবিনাশবাবু চড়মুড় করে এসে উপস্থিত হলেন।

দরজায় ঢুকেই কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে, চিঠিগুলো দেখিয়ে মেঘমালাকে বললেন, 'এই দেখ, আজকের ডাকে পঁচিশখানা দরখাস্ত এসেছে, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে আবার ছেলের ভাবনা। একদিনে হাজার হাজার ছেলের খোঁজ পাওয়া যায়। এই দেখ, এই ছেলেটি কি লিখেছে দেখ!' বলে একখানা চিঠি মেঘমালার দিকে বাড়িয়ে ধরেন।

মেঘমালা দৃঢ় স্বরে বললেন, 'থাক্, আর পড়তে হবে না। পাত্র আমি ঠিক করে ফেলেছি।' বলে ঘটকের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'তাহলে ওই কথাই রইলো, রবিবার দিন ছেলেকে নিয়ে আসবেন। মেয়ে পছন্দ হলে ওইদিনই আশীর্বাদ করে ফেলবো।'

অবিনাশবাবু স্ত্রীর কথা শুনে চোখ কপালে তুলে বললেন, 'তার মানে?'

তেমনি দৃঢ় স্বরেই বললেন মেঘমালা, 'মানে আবার কি? আমার মেয়ের পাত্র ঠিক করবার কি আমার অধিকার নেই?'

—'আহা! সেকথা বলছিনে। কিন্তু কি রকম পাত্র, ঘর-দোর আছে কি না, এসব খবর ত' নেওয়া দরকার।'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে সব খবর নেওয়া হয়েছে। ঘর-দোর আছে, বনে বাস করে না।' বলে ঘটককে তাড়াতাড়ি বিদেয় করবার জন্যে তাকে উদ্দেশ করে বললেন, 'দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? আপনি যান। কথা ত হয়েই গেছে।'

দিগম্বর এই আদেশ পেয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। তাড়াতাড়ি যাবার জন্যে পা বাড়ায়।'

অবিনাশবাবু বাধা দিয়ে বলেন, 'না না, যাবে না। আগে সব কথা জিজ্ঞেস্ করি, তারপর যাবে।

দিগম্বর ভয়ে ভয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

মেঘমালা বলেন, 'কি জিজ্ঞেস্ করবে শুনি? পাত্র বড়লোক কি না জানতে চাও ত'? তা নয়।'

'—তবে?'

—'বড়লোকের ঘরে আর বিয়ে দেবো না।'

—'তাই বলে ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো নেই যাদের, তাদের ঘরে দিতে হবে নাকি? খেতে পাবে না, পরতে পাবে না—'

—'আমি খেতে দেবো—পরতে দেবো।'

—'লোকে বলবে কি?'

—'যে যা বলে বলুক। তুমি থামো।'

—'থামবো মানে? গরীবের ঘরে মেয়ের বিয়ে আমি দেবো না।'

—'আমার মেয়ে। আমি দেবো।'

—'আমার মেয়ে। আমি দেবো না—'

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তর্কাতর্কি যখন চরমে উঠেছে, সেই ফাঁকে দিগম্বর ঘটক পালাবার চেষ্টা করল।

অবিনাশ তাই দেখে চিৎকার করে বললেন, 'এই ঘটক শোনো!'

দিগম্বর থমকে দাঁড়াল।

অবিনাশবাবু বললেন, 'এ ছেলেকে খবরদার তুমি আনবে না।'

দিগম্বর ঘাড় নেড়ে ভয়ে ভয়ে বলল, 'আজ্ঞে বেশ, তাহলে আনবো না।'

মেঘমালা জোর দিয়ে বললেন ঘটককে, 'নিশ্চয়ই আনবেন।'

দিগম্বর একবার অবিনাশবাবুর মুখের দিকে তাকাল। তাঁকে নীরব থাকতে দেখে, মেঘমালার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আজ্ঞে তাহলে আনবো।'

অবিনাশবাবু কয়েকবারই প্রতিবাদ করলেন। কিন্তু

মেঘমালা নাছোড়বান্দা। শেষে ঘটককে তিনি বেশ জোরের সঙ্গেই জানিয়ে দিলেন—'আমি বলছি, আসছে রবিবারেই আপনি ছেলেকে নিয়ে আসবেন। আসতে হবেই—'

মেঘমালা স্বামীর ইচ্ছায় কোনদিনই এতখানি প্রতিবাদ করেন না, কিন্তু আজ তিনি যেন উঠে পড়ে লেগেছেন।

অবিনাশবাবুও একটু অবাক হয়ে গেলেন, মেঘমালার আজকের এই ব্যবহারে। কিন্তু তিনি আর একটি কথাও বললেন না।

মেঘমালার আদেশকেই শিরোধার্য করে দিগম্বর ঘটক ধ্যস্ত ভাবে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

সবেমাত্র বি-এ পাশ করেছে। এম-এ টা না দিয়ে বিয়ে করার ইচ্ছা বিনোদের ছিল না। বড়লোকের মেয়ের ওপর বিশেষ লোভ না থাকলেও এম-এ পড়ার খরচটা পাওয়া যাবে শুনে সে আর আপত্তি করতে পারল না। তার ডাক্তার-বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে দিগম্বরের সঙ্গে এসে উপস্থিত হলো অবিনাশবাবুর বাড়ীতে।

অবিনাশবাবু ব্যবসায়ী লোক, রবিবারেও তাঁর ছুটি নেই। কিন্তু মেঘমালার অনুরোধ এড়িয়ে আজ তিনি বেরুতে পারেন নি। একে স্ত্রী তার ওপর মেঘমালা দ্বিতীয়-পক্ষ। তা বলে গরীবের ঘরে মেয়ের বিয়ে দিতে এখনও রাজী নন্ তিনি। কিন্তু বিনোদকে দেখবা মাত্র তাঁর মতের জোরটা যেন একটু আলগা হয়ে এল। কিন্তু কথাবার্তার পর বিনোদকে জিজ্ঞেস্ করলেন, 'তুমি বি-এ পাশ করেছ?'

সলজ্জ বিনোদ বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'এম-এ পড়বে?'

—'ইচ্ছে ত' আছে।'

—'তারপর?'

তারপরের কথা কল্পনায় অনেক দেখেছে বিনোদ। অনেক স্বপ্ন আছে তার মনে। কিন্তু সে কথা ত' আর বলা যায় না।

বিনোদকে মুখ নাবাতে দেখে ডাক্তার বলল, 'তারপর ও আর কি বলবে? আপনিই হবেন ওর গার্জেন। আপনি যা বলবেন ও তাই করবে।'

শুনে খুব আনন্দিত হলেন অবিনাশবাবু। সে আনন্দে হোলোর হাসিতে গেল তাঁর গরীবের বাড়ী মেয়ের বিয়ে না-দেওয়ার মতটা। বিনোদের মত ছেলের গার্জেন হবো, আমার ছেলে নেই সে আনটাও ও পূর্ণ করবে। ইত্যাদি ভাবতে ভাবতে অবিনাশবাবু বেশ উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। ভেতরের দিকে মুখ করে ডাকলেন, 'ওই গো! নিয়ে এসো—নন্দাকে নিয়ে এসো তাড়াতাড়ি!'

মেঘমালা নন্দাকে পাঠিয়ে দিয়ে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে রইলেন।

অবিনাশবাবু আবার হেঁকে বললেন, 'এসো এসো, তুমিও এসো লজ্জা কিসের? এখানে ত' ছেলেরা আছে।'

মেঘমালা ঘোমটা টেনে ভেতরে এলেন। অবিনাশবাবুর কথাবার্তায় তিনি বুঝলেন, মত তাঁর বদ্‌লেছে।

দিগম্বর ঘটক একটু আগেই উঠে গেছে ভেতর বাড়িতে। তার পাওনা-থাওনার ব্যাপারে গিন্নীর সঙ্গে দেখা করতে। গিয়েই পড়েছে জগার সামনে।

জগা তাকে একা পেয়ে হুমকি দিল, 'জামাইয়ের বোনকে আনলে না?'

দিগম্বর আমতা আমতা করে বলল, জামায়ের বোন আসবে কেন?

ঢাউস খুড়ির লাটাইটা বেশ করে বাগিয়ে ধরে জগা বললে, 'মেরে ফেলব, তোমাকে আমি খুন করে ফেলব। দেখেছ এই লাটাই—তোমার আব কাটিয়ে দেবো।'

দিগম্বর নিশ্চিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'ওরে বাবারে, না! না!'

জগা ভেংচে উঠল। 'আবার মা মা করা হচ্ছে। মনে নেই দিদি সেদিন তোমাকে কি বললে? জামায়ের বোনের সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে হবে বললে না?'

চট্ করে একটু বুদ্ধি খাটিয়ে দিগম্বর বলল, 'ও হ্যাঁ মনে পড়েছে। কিন্তু দুটো বিয়ে ত' আর এক সঙ্গে হতে পারে না। আপনার ভাগ্নীর বিয়েটা হয়ে যাক্। তারপরই আপনার বিয়ে।'

এমন মোলায়েম করে কথাগুলো দিগম্বর বলল যে, জগা একেবারে গলে গেল। বলল, 'হবে ত ঠিক?'

—'নিশ্চয়ই হবে।'

—'এসো তবে, হাতে এসো।'

—'হাতে কেন?'

—'ঘুড়ি ওড়াবে।'

—'আজ্ঞে না, আমি আর একদিন ওড়াব। আজ আমার কাজ রয়েছে কিনা ওখানে। আপনার বিয়ে আমি ঠিক দিয়ে যাবো, ভাববেন না।'

জগার খুশী আর ধরে না। বলল, 'বেশ! কিন্তু মেয়েটিকে আমি দেখব।'

—'দেখবেন বৈকি। বিয়ের দিনেই দেখবেন!'

—'ঠিক দেখাবে ত'?'

—'আরে বাবা, কি বলেন হুজুর। আপনাকে মেয়ে দেখাব না। দেখবা মাত্র বিয়ে। বাস্।'

—'হ্যাঁ, মনে থাকে যেন। আমি চললুম। জামাই—বাবুকে বোলো না। দিদি বলে, ওটা পাগল!' বলে জগা মনের আনন্দে নাচতে নাচতে চলে যায় ছাদে।

তার হাত থেকে যে এত সহজে নিষ্কৃতি পাবে দিগম্বর তা ভাবে নি।

ওদিকে তখন অবিনাশবাবু ডাকছেন, 'কই হে, ঘটক কোথায় গেলে?'

—'আজ্ঞে যাই!' বলে ঘটক দু'পা এগোতেই মেঘমালার সঙ্গে দেখা। সাগ্রহে জিজ্ঞেস করে, 'বিয়ে তাহলে—'

মেঘমালা তার কথা শেষ করতে না দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ বাবা, এইখানেই দাও।'

সুযোগ বুঝে টোপ ফেলল দিগম্বর, 'আপনাকে সেই যে টাকার কথাটা বলেছিলাম—'

—'হ্যাঁ হ্যাঁ, সে আমি ঠিক করে রেখেছি।' বলে মেঘমালা তাঁর আঁচল থেকে দু'শ টাকা খুলে দিগম্বরের হাতে দিয়ে বলল, 'এই নাও। কত্তাকে বোলো না।'

জিভ কেটে দিগম্বর বলল, 'না না মা, কাক পক্ষীতেও টের পাবে না। এই চ্যাকে গুঁজলাম, একেবারে জামাইয়ের মায়ের হাতে গিয়ে দেবো।'

—'তাই দিও।' বলে নন্দার মা চলে যাচ্ছিলেন।

ঘটক বলল, 'আপনার ভায়ের বিয়ের কি ঠিক করব মা? উনি ত' এখুনি আমাকে মারতে এসেছিলেন।'

জগা একেই পাগল। তার ওপর এখন আবার গোদের ওপর বিষ ফোড়ার মত বিয়ের বাতিক চেপেছে ঘাড়ে। তাই বলে মেঘমালা ত' সত্যি সত্যি মত দিতে পারেন না। বললেন, 'ওর মাথায় একটু গোলমাল আছে। কে ওর হাতে মেয়ে দেবে?'

খদ্দের হাত ছাড়া হয় দেখে তাড়াতাড়ি বলল দিগম্বর, না না, ওকে মাথায় গোলমাল বলে না মা। ও রকম কত গোলমাল আমরা পার করে দিয়েছি।'

—'দেখ চেষ্টা করে।'

ওদিকে অবিনাশবাবু তখন ডাকের পর ডাক পাড়তে সুরু করেছেন, 'কই হে ঘটক, কোথায় গেলে?'

—'আজ্ঞে যাই।' বলে দিগম্বর ছুটল বাইরের ঘরের দিকে।

অবিনাশবাবু অস্থির মানুষ। ছটফটে করা তাঁর স্বভাব। তার ওপর বিয়ের কথাবার্তা পাকা হওয়াতে তাঁর আর আনন্দ যেন ধরে না। ডাক্তারকে বললেন, 'তাহলে ওই কথাই রইল। ভাল একটা দিন দেখে তোমাদের জানাবো। এই যে ঘটক তোমার কিছু বলবার আছে?'

ঘটক বলল, 'আজ্ঞে দেনা-পাওনার কথাটা কি শেষ হয়ে গেল?'

অবিনাশ বললেন, 'হবে না ত' কি তোমার জন্যে আটকে থাকবে? কোথায় গিয়েছিলে কোথায়?'

—'মায়ের কাছে।'

—'বেশ! তাহলে তোমার পাওনাটা ওইখান থেকেই নিও।'

ঘটক আর কিছু বলতে সাহস পেল না। বলল, 'আজ্ঞে।'

বিয়ের সব ঠিকঠাক হয়ে যেতেই বিনোদ ভবানীপুরে একটা বাড়ী ভাড়া ঠিক করে হরিণ বাঁড়ুজ্যের হাতে তার দুমাসের বাড়ী ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে বলল, 'এই নিন আপনার বাকী ভাড়াটা। আজই আমরা এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাচ্ছি।'

হরিণ অবাক হওয়ার চেয়ে আঘাত পেল বেশী। বলল, 'চলে যাচ্ছ?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ গাড়ী ডেকে এনেছি জিনিষপত্রগুলো আজ বয়ে নিয়ে, কাল সকালেই চলে যাব।'

—'কেন, চলে যাবে কেন? আমি তোমাদের কোনদিন চলে যেতে বলেছি?'

—'আজ্ঞে না।'

—'তবে? শান্তিকে বিয়ে করতে বলেছি বলে চলে যাচ্ছ?'

—'আজ্ঞে না।'

—'তা সবই যদি 'আজ্ঞে না।' তবে আমার বাড়ী ছেড়ে যাবে কেন? কম টাকায় এর চেয়ে ভাল বাড়ী পেয়েছ?

বিনোদ কোনো জবাব দিতে পারে না। কারণ, এখন যে বাড়ী সে ঠিক করেছে এ বাড়ীর তুলনায় সেটা কিছুই নয়। আর হরিশের সামনে বলতেও পারে না যে আপনি সেদিন মাকে বলেছেন আমাদের চলে যেতে। অগত্যা সে চুপ করে থাকে!

বিনোদরা চলে যাবে শুনে হরিশের অন্তরটা কেঁদে ওঠে। নাই বা করল সে শান্তিকে বিয়ে, রাখলই বা দু'এক মাসের ভাড়া বাকী, কিন্তু কেমন যেন একটু মায়া পড়ে গেছে তার বিনোদের ওপর। বিনোদকে চুপ করে থাকতে দেখে বলল, 'কই যাও দেখি কেমন বাহাদুর। আমি তোমাদের চলে যেতে বলেছি? ডাকো তোমার মাকে বলুক আমার সামনে এসে। আমি যদি কোনোদিন বলে থাকি—'

পায়ে কোনো কঠিন দিব্যি করে বসে ভেবে বিনোদ তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বলল, 'না না, সে কথা নয়।'

—'সে কথা নয় ত যাবে কেন? কিছুতেই আমি তোমাদের যেতে দেবো না।'

কথাগুলো শুনে শান্তি বেরিয়ে এসে বলে, 'কি চেঁচাচ্ছ বাবা, থাকু না কোথায় যাবে। আমাদের কি ভাড়াটের অভাব হবে নাকি? কালকে সাইন-বোর্ড ঝুলিয়ে দেবো, পরশু ভাড়া হয়ে যাবে।'

বিনোদ বলল, 'তা ত নিশ্চয়ই। ভাড়াটের কি অভাব আছে?'

ঝাঁঝালো কণ্ঠে শান্তি বলল, 'আপনার সঙ্গে আমি কথা বলেছি?'

—'আমার সঙ্গে কেন বলবেন? আমার সম্বন্ধে ত বলেছেন।'

শান্তি আরও রেগে যায়। হরিশকে বলে, 'দেখ বাবা, পায়ে পড়ে যদি কেউ কথা বলতে আসে ত' আমি তার কিছু বাকি রাখব না বলে দিচ্ছি। দুলে-বাগ্দি উঠিয়ে দেবো।'

লতিকা এতক্ষণ দাঁড়িতে দাঁড়িয়ে সবই শুনছিল। শান্তির কথা শুনে তরু তরু করে নেমে এসে বলল, 'দুলে-বাগ্দি ওঠাতে বুঝি তুমি একাই জান। না?'

হরিশ বলল, 'তোমাদের কাউকে ত আমরা ডাকিনি। কথা হচ্ছে বিনোদে আর আমাতে। তোমরা চলে যাও। ঝগড়া ঝাঁটি, চেঁচামেচি আমি ভালবাসি না। চলে যা শান্তি।'

শান্তি একবার কটমট করে বিনোদ আর লতিকার দিকে তাকিয়ে ভেতরে চলে যায়।

লতিকা বিনোদকে বলল 'এসো দাদা।'

বিনোদ বলল, 'তুই চল্, আমি কুলিদের নিয়ে যাচ্ছি।'

লতিকা চলে গেল। বিনোদের দেরী দেখে কুলি দু'জন তখন ভেতরে এসে দাঁড়িয়েছে।

একজন কুলি বিনোদকে জিজ্ঞেস করল, 'মালপত্তর কোথায় আছে বাবু?'

বিনোদ কিছু বলবার আগেই হরিশ হুঙ্কার দিয়ে উঠল, 'কিসের মাল-পত্তর? কি চাস কি তোরা?'

কুলি দু'জন হকচকিয়ে গেল। একজন বলল, 'আজ্ঞে, এই বাবুর মালপত্তর নিয়ে যাব, ঠেলাগাড়ী নিয়ে এসেছি।'

—'ঠেলাগাড়ী নিয়ে এসেছ, আবার ঠেলে নিয়ে চলে যাও।'

কুলিরা বলল, 'তাহলে আমাদের দাম দিয়ে দেন।'

—'কিসের দাম? এটা আমার বাড়ী, আমি ডেকেছি তোদের? বেরো, বেরিয়ে যা আমার বাড়ী থেকে।'

কুলি দু'জন ফিরে দেখে বিনোদ তখন ওপরে চলে গেছে। তারা কি করবে ভেবে পায় না। হরিশ আবার চিৎকার করে ওঠে, 'যা, বেরিয়ে যা আমার বাড়ী থেকে। আমার বাড়ী থেকে ভাড়াটে উঠিয়ে নিয়ে যাবে? এতবড় আস্পর্দা। বেরো, বেরো বলছি।'

কুলি দু'জন আর দাঁড়িয়ে থাকতে সাহস করল না। তারা বেরিয়ে যেতে ডাক্তার এসে ঢুকল, 'কি হলো, এত দেরী হচ্ছে কেন?'

ডাক্তারকে দেখে হরিশ আরও ক্ষেপে গেল। বলল,

'মেয়ে হবে না ? বলি তোমরা ভেবেছ কি ? ঝট্ করে টাকা দেবে আর চট্ করে বাড়ী ছেড়ে চলে যাবে ? তুমি ত বিনোদের বন্ধু তুমিই ত যত নষ্টের গোড়া। তুমিই টাকা ধার দিয়েছ, নইলে টাকা ও পেলে কোথায় ?'

ডাক্তার হরিশের স্বভাব জানত, তাই তার কথায় রাগ করলো না। ওপরটাই তার রুক্ষ, কিন্তু ভেতরটা এত ভাল যে, এমন লোক সচরাচর দেখা যায় না। ডাক্তার হাসিমুখে বলল, 'আপনি বুঝি শোনেন নি বিনোদের বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেছে যে।'

—'বিয়ে ? কে ঠিক করলে ? তুমি ?'

হাসতে হাসতে ডাক্তার বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিই ঠিক করে দিলাম। এতদিনে একটা গার্জেনের মত গার্জেন পাওয়া গেল বিনোদের।'

—'তা আমি কি দোষ করেছিলাম ? আমি কি গার্জেন হতে পারতাম না ? মেয়ে কি আমার শান্তির চেয়ে ভাল ?'

সত্যি কথা বলতে কি অবিনাশবাবুর মেয়ের কাছে শান্তি এমন কিছু নিকেশ নয়। কিন্তু তার কটকটে স্বভাবের জন্যেই বিনোদ রাজী হয় নি। সে কথা ত ডাক্তার মুখ ফুটে বলতে পারে না হরিশকে। তাই বলল, ভাল মন্দ নিজে গিয়ে দেখে আসবেন।'

—'আমি দেখতে যাব ? কেন যাব ? আমি যাব ভাড়াটের বৌ দেখতে ? বয়ে গেছে আমার।'

—'আপনিই ত এখন বিনোদের বর্তমান গার্জেন। আপনি না গেলে কি চলে ?'

—'যান যান, এখুনিত বাড়ী ছেড়ে চলে যাওয়া হচ্ছিল। গার্জেন, ভারি গার্জেন আমি !'

ডাক্তার কথাটা চাপা দেবার জন্যে বলে, 'না না, বাড়ী ছেড়ে চলে যাবে কেন ? বিয়ের জন্যে একটা আলাদা বাড়ী—'

হরিশ তার কথা শেষ করতে না দিয়ে বলল, 'না। বিয়ে এইখানে হবে। এই বাড়ীতে হবে।'

এরপর বিনোদের আর বাড়ী ছেড়ে যাওয়া উচিত নয়। রাগের বশে হরিশ একদিন না হয় বলেই ফেলেছিল বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে। আবার সেই যখন সে সব ভুলে গিয়ে বাধা দিলে তখন আর কি করা যায়।

শুধু যে বিনোদ রয়ে গেল তাই নয়। বিয়ের ব্যাপারে হরিশ না থাকলে বহুত সবই ফাঁকা থেকে যেত। শান্তির সঙ্গে বিয়ে হলো না বলে এখন আর তার কোন দুঃখ নেই। বরং আনন্দে আত্মহারা হয়ে চারিদিকে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। সে নিজে না বললে, বাইরের লোকের কারও বুঝবার উপায় নেই যে, সে বিনোদের কেউই নয়। সব দায়িত্ব যেন তারই।

লুচির ঝাঁকা নিয়ে পরিবেশন করতে করতে গলদ্ঘর্ম হয়ে উঠেছে। লোককে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতেও ছাড়ে না। বলে 'ভাড়াটের বিয়েতে এত কে করে বলুন তো ? আজ সাত দিন ধরে খেটে খেটে গতরের বাঁধন ছিঁড়ে গেল। করছি কি সাধে ? ছেলেটি ভাল তার ওপর বি-এ পাশ।'

কথাটা শুনে কনের মামা জগা ফস করে বলে বসলো, 'হ্যাঁ ভারী তো বি-এ পাশ।'

আর যায় কোথায়। ঝাঁকা হাতে হরিশ জগার পাতের কাছে বসে পড়ে বলল, 'কে হে তুমি ছোকরা, বি-এ পাশ, মানে কতদূর পড়েছ তুমি ? বলে আমি যখন ফোর্থ ক্লাসে পড়ি তখন পড়ে পড়ে মাথার চুল-গুলো সব উঠে গেল।' বলে তার মাথার টাকটা সবাইকে দেখিয়ে আবার বলল, 'তিন সের ছাগলাদ্য মেতো খেয়ে তবে মাথা ঠাণ্ডা হলো। বাবা বলল, আর পড়ে কাজ নেই। বি-এ পাশ এমনি মুখের কথা কিনা—এই নিন চারখানা লুচি।' জগার পাত খালি দেখে চারখানা লুচি দিয়ে—অন্য দিকে চলে গেল হরিশ।

বিয়ের পর বিনোদের বাড়ীটা বেশ সরগরম হয়ে থাকে প্রায় সব সময়েই। নন্দা দুটি সাথী পেয়েছে, লতিকা আর শান্তি তারা প্রায় সব সময়েই তার কাছে কাছে থাকে। হাসি-ঠাট্টা, গান-তামাসা লেগেই আছে।

এদিকে বিনোদের মা মুস্কিলে পড়েছে জগাকে নিয়ে। জগা প্রায় রোজ আসতে সুরু করেছে ভাগ্নীর শ্বশুর বাড়ী।

নন্দার লজ্জা হয়, 'কিন্তু মামাকে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না।'

সেদিন ওমনি জগা এসে জমিয়ে বসেছে বিনোদের মার কাছে। এমন সময় শান্তি এসে বলল, 'মাসীমা

তোমার বৌ কি সুন্দর গান গাইছে, শুনবে এসো।'

বিনোদের মা বললেন, 'তোমরা বৌকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করছ তার মধ্যে আমি কেন যাচ্ছা?'

জগা বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ তোমরাই কর। আমাদের এখন পরামর্শ হচ্ছে, তুমি বিরক্ত করতে এলে কেন?'

শান্তি চুপ করে থাকবার মেয়ে নয়। বলল, 'আ-মর। গায়ে পড়ে কথা বলছে দেখ না।' বলে নাক সিটকে চলে গেল শান্তি।

জগা বিনোদের মাকে জিজ্ঞেস করল 'এ মেয়েটি কে বলুন ত?'

—'ও এই বাড়ীর মালিক হরিশবাবুর মেয়ে!'

—'এই বাড়ীর মালিকের মেয়ে? ওর বাপ তা হলে বেশ পয়সাওলা লোক বলুন?'

সুযোগ বুঝে বিনোদের মা ভাবলেন যদি এ বিয়ে—পাগলাকে নিজের ঘাড় থেকে নামানো যায়। বললেন, 'তুমি ওকে বিয়ে করবে?'

জগার আর আনন্দ ধরে না। বিয়ে বুঝি হয়ে গেল এমনি ভাবে বলল, 'তা হ্যাঁ হ্যাঁ, কিন্তু আপনার মেয়ের কি হবে তা হলে? দুটো মেয়েকে একসঙ্গে বিয়ে করব?'

বিনোদের মা তার ভাব দেখে না হেসে থাকতে পারলেন না। মুখ ফিরিয়ে হাসি থামিয়ে তারপর বললেন, 'আমার মেয়ে দেখতে তেমন ভাল নয় ভাই, আর তা ছাড়া তার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে কেমন করে? তুমি হলে বিনোদের মামা শ্বশুর।'

জগার মোহ যেন কাদায় পড়ল। জগা কিছুক্ষণ ক্যাল ক্যাল করে বিনোদের মার মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'হবে না? তবে যে সেই ঘটক ব্যাটা বললে?'

—'ঘটক কি জানে? তোমার সঙ্গে এখন লতির বা সম্বন্ধে তাতে ত বিয়ে হতে পারে না।'

জগার এমন রাগ হতে লাগল ঘটকের ওপর যে কাছে পেলে হয়ত তার ঘাড়টা মটকে দিত। বলল, 'আচ্ছা, আমি দেখছি ব্যাটা ঘটককে। ব্যাটাকে যদি আমি ছাত থেকে নীচে না ফেলি ত আমার নাম জগন্নাথই নয়।' ও ব্যাটা আমাকে বললে কেন?'

সে যে কেন বলেছে—এক জগা ছাড়া সকলেই তা বোঝে। বিনোদের মাও বুঝলেন তবু বললেন, 'সত্যিই ত। বলা তার অন্যায় হয়েছে।'

বিনোদের মার সমর্থনে জগা উৎসাহিত হয়ে বলে, 'অন্যায় হয় নি? আমি ওদিকে সব ঠিক করে ফেলাম। আমার বন্ধুদের সব বলে ফেলেছি। এখন কি হবে তা হলে? আপনি এক কাজ করুন, ওই বাড়ীওয়ালার মেয়ের সঙ্গেই ঠিক করে দিন। আমি যাব?'

—'কোথায় যাবে?'

—'ওর বাবার কাছে।'

বিনোদের মা তাকে শান্ত করে বললেন, 'দাঁড়াও আমি আগে কথাবার্তা বলি।'

জগা ভাবে, দুই ছাই নন্দার বামা হয়েই যত জ্বালাল। এমন একটা কনে হাত ছাড়া হয়ে গেল। থাকুগে, ভাড়াটের মেয়ের বদলে বাড়ীওয়ালার মেয়েই যদি আসে তাই বা মন্দ কি?

যাবার সময় জগা বলে গেল, 'তাহলে যাই! আপনি ঠিক করে দেবেন কিন্তু।'

বিনোদ অনেকক্ষণ থেকে এঘর ওঘর করে কি খুঁজছে অথচ পাচ্ছেনা দেখে লতিকার সন্দেহ হলো, নিশ্চয়ই বৌদিকে খুঁজছে। তাই সে শেষন থেকে ঘরে ঢুকে মুচকি মুচকি হেসে বলল, 'কাকে খুঁজছ দাদা? বৌদিকে?'

—'যাঃ, বই খুঁজছি। আচ্ছা ফাজিল হয়েছিস ত।' বিনোদের কথা কানেই করল না লতিকা। যেমন হাসছিল তেমনি ভাবে ছুটে বেরিয়ে গেল বৌদির খোঁজে।

নন্দা তখন বাথরুমে স্নান করতে ঢুকেছে। লতিকার ডাকাডাকিতে স্নান বন্ধ রেখে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল। বলল, 'কি বলছ ঠাকুর ঝি?'

—'দাদা যে তোমাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান। আর তুমি এসে এখানে ঢুকে আছ?' বলে খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল লতিকা।

নন্দা একটু লজ্জিত হয়ে বলল, 'যাঃ—ও।'

—'যাও নয়, তাড়াতাড়ি এসো।'

—'হ্যাঁ, আমার খুঁজছে না আরও কিছু! তুমি যাও পার ত' খুঁজে দাও গে, যা খুঁজছে।'

এমন সময় ওঘর থেকে বিনোদ হেঁকে বলল, 'পেয়েছি রে লতি, আর কাউকে আসতে হবে না।'

—'চলো ত যাও এবার।' বলে নন্দা কলঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল।

বিনোদ একটা বই হাতে করে বেরিয়ে যেতে যেতে লতিকাকে বলল, 'আমি আজ একবার ওদের বাড়ী যাব, কাউকে কিছু বলতে হবে? জিজ্ঞেসা করে আয়।'

বিনোদ ইচ্ছা করেই কথাগুলো একটু জোরে জোরেই বলেছিল। নন্দা কলঘর থেকে শুনে বলল, 'না না কাউকে কিছু বলতে হবে না, যা বলতে হয় আমি নিজে গিয়ে বলব।'

—'বেশ তাহলে চল্লুম!' বলে বিনোদ চলে গেল।

লতিকা ভেবে ছিল, এই খোঁজাখুঁজির ব্যাপার নিয়ে বেশ একটা হাসি খুশীর ঢেউ তুলবে দাদা বৌদিকে নিয়ে। কিন্তু বিনোদ হঠাৎ চলে যেতেই সে নিরাশ হলো।

কলঘর থেকে নন্দা ডাকল, 'ঠাকুরঝি!'

লতিকা এসে বলল, 'কি বলছ বৌদি?'

—'কলের জল বন্ধ হয়ে গেছে।'

এ আর নতুন কথা কি? নীচের তলার কল খুললেই ওপরেরটা বন্ধ হয়ে যায়। লতিকা বলল, 'দেখছি। বলে নীচে নেমে এসে হাঁকতে সুরু করল, 'শান্তি! শান্তি।'

শান্তি কলতলায় চাল ধুচ্ছিল, সেখান থেকেই ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, 'কী কী! শান্তি শান্তি করে চেঁচাচ্ছে দেখ। কি বলছ কি?'

—'বলছি—চান করবার সময় নীচের কলটি কি তোমায় না খুললেই চলছিল না?'

—'তা তোমরা এ সময় চান করছ না কী করছ, আমি কেমন করে জানবো?'

—'তা জানবে কেন? মাসের শেষে ভাড়াটি ত' নিতে জানো বেশ!'

—'তাই বলে আমার কাজ কর্ম বন্ধ করে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকি, না?'

লতিকাকে কথায় কেউ কোনোদিন হারাতে পারেনি, তা শান্তি ত' কোন্ ছার। বিচিত্র ভঙ্গী করে লতিকা বলে উঠল, 'না না তোমাকে জগন্নাথ হতে হবে না। দয়া করে কলটি একবার বন্ধ করে দাও, বৌদি চান করছে।'

শান্তি আর কোন কথা না বলে কলটি বন্ধ করে দিল।

লতিকা সিঁড়িতে উঠতে উঠতেই জোর গলায় জিজ্ঞেস্ করল, 'জল এসেছে বৌদি?'

নন্দা উত্তর দিল। 'হ্যাঁ, এসেছে।'

ধোওয়া চালগুলো নিয়ে শান্তি রান্নাঘরে ঢুকে কোটা তরকারিগুলোর দিকে নজর পড়তেই বিরক্ত ভাবে বলল, 'ধ্যাৎ, এগুলো এখনও ধোওয়া হয়নি। এগুলো নিয়ে গেলে একদণ্ডে ধোওয়া হয়ে যেতো। আচ্ছা, মন হয়েছে আমার। বলে তরকারির থলোটি নিয়ে চলল আবার কলঘরের দিকে।'

নন্দার স্নান তখনও সারা হয়নি। আবার জল বন্ধ হয়ে গেল। নন্দা আবার ডাকল, 'ঠাকুরঝি!'

—'কি?'

—'আবার বন্ধ হলো।'

লতিকা রান্না ঘরের বারান্দায় ছিল। চট্ করে মাথার চুলগুলো খুলে গামছাটা হাতে নিয়ে বলল, 'একটু দাঁড়াও বৌদি আমি দেখাচ্ছি মজা।'

মজা দেখবার খুব আগ্রহ নেই নন্দার। কোন রকম করে ওরি ভেতর স্নানটা শেষ করে বলল, 'থাক, আর মজা দেখাতে হবে না। আমি সেরে নিয়েছি।'

লতিকা তখন নীচে চলে গেছে।

শান্তি মনের আনন্দে গুন্ গুন্ করে গান গাইছে আর তরকারি ধুচ্ছে কলের জলে। লতিকা যে কোন্ সময় তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে, সে খেয়াল নেই তার।

—'ধোয়া হলো?'

শান্তি তাড়াতাড়ি কলটা বন্ধ করে বলল 'হ্যাঁ।'

লতিকা বলল, 'তোর কি লজ্জাও নেই?'

—'কেন লজ্জা কিসের?'

—'এই দ্যাখ্, দেখাচ্ছি কিসের লজ্জা।' বলে তাক থেকে শান্তির সাবানটা নিয়ে কলঘরে ঢুকে পড়ল। শান্তি কিছু বলবার আগেই তার মুখের সামনে ধড়াম্ করে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

—'এই, দরজা বন্ধ করলি কেন?'

—'বেশ করলাম। এখন চান করব, কাপড় কাচব।'

—'আরে, আমার যে কাজ আছে।'

—'কলের জল বন্ধ হয়ে গেলে আসিস্। তখন খুলে

দেবো।'

—'সতি, ভাল হবে না বলে দিচ্ছি। বাবা এলে বলে দেবো।'

—'বলে আমার সব করবি।'

—'আমার সাবান মাখিয়ে কিন্তু।'

—'সাবান মাখবার জন্যেই ত' এলাম।'

—'দাঁড়া তোর মাকে বলে দিচ্ছি। দেখুন, শুনছেন—।'

সতিকা রন্ধনঘরের ভেতরে খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল।

নন্দার শ্বশুর বাড়ী আসাটা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে জগার। সে কেমন করে বুঝতে পেরেছে, নন্দার শাশুড়ী যা বলেছে, তা সত্যি নয়। অর্থাৎ সতিকার সঙ্গে তার যা সম্পর্ক,—তাতে বিয়ে হতে কোন বাধা নেই। আর বাধ কোথায়? সকাল সন্ধ্যে আসতে সুরু করেছে। এসেই কেবল সতিকার খোঁজ। 'কোথায় সে? কি করছে? ডাকো তাকে।'

সতিকা ইচ্ছে করেই তার সামনে বড় একটা আসে না। নন্দারও খুব লজ্জা করে। মায়ের পাগলামীতে সে নিজেও না পাগল হয়ে যায়।

সেদিন জগাকে এক কাপ চা দিয়ে বলল, 'নাও দাদা, চা খাও।'

চায়ে চুমুক দিয়ে জগা জিজ্ঞেস্ করল, 'তোর ঠাকুরঝি কোথায়? দেখতে পাচ্ছি না যে!'

সেই এক কথা। নন্দা বিরক্ত হয়ে বলে, 'চুপ চুপ, আস্তে বল। কাজ করছে।'

—'কাজ করছে? তা বেশ! কাজ শেষ হলে একবার ডেকে আনবি।'

নন্দা কথার মোড়টা অন্যদিকে ঘোরানোর জন্যে বলল, 'তা বেশ! তুমি এখনও খুব ঘুড়ি ওড়াচ্ছ ত'?

নন্দা জানে ঘুড়ির কথায় জগা অন্য মানুষ হয়ে যায়। জগা উৎফুল্ল হয়ে বলল, 'হ্যাঁ—একটা চাউস্ ঘুড়ি যা তৈরি করেছি একেবারে ইয়া, একদিন এখানে নিয়ে আসব। তোদের হাতে উড়িয়ে দেখিয়ে দেবো, ঠিক মনে হবে এরোপ্লেন যাচ্ছে উই আকাশে ভট্ ভট্ ভট্ ভট্' বলে ঘুড়ির ওড়াটা বোঝাতে গিয়ে তার হাতের চায়ের কাপডিসটা ঝন্ ঝন্ করে পড়ল মাটিতে।'

সতিকা জগার আসার খবর জানত না। হঠাৎ ঘরে ঢুকে বলল, 'কাপটা ভাঙলে ত' বৌদি।'

সতিকাকে দেখে লাফিয়ে উঠল জগা।

'এই যে, এসেছ। আমি ভেবেছিলাম। ভাল আছ?'

সতিকা রাগের সঙ্গে বিদ্রূপ করে বলল, 'হ্যাঁ—আর এক কাপ দেবো?'

জগা বিদ্রূপ বুঝল না। আর এক কাপ চা? সতিকা এনে দেবে? জগা কুলকিনারা ভেবে পায়না। তার আকুলি বিকুলি দেখে সতিকা না হেসে থাকতে পারেনা। মুখ ফিরিয়ে হাসতে হাসতে চলে যায় সেখান থেকে।

জগা হঠাৎ নিরাশায় ভেঙ্গে পড়ে বলে, 'এ্যাঁ, চলে গেল যে?'

লজ্জায় মরে যায় নন্দা। বলে 'যাক্‌গে, তুমি অমন করছ কেন? বলো! বাবা-মা, সব ভাল আছে ত?'

—'হ্যাঁ, ভাল আছে।' বলে জগার এতক্ষণে কাজের কথাটা মনে পড়ে যায়। 'তাড়াতাড়ি পকেট থেকে ক'খানা নোট বের করে নন্দার হাতে দিয়ে বলে, 'তোর বাবা এই পঞ্চাশটা টাকা তোর হাতে দিতে বলেছে। জামাইকে আর টাকা কড়ি কিছু দেবে না। দিদি একদম বারণ করে দিয়েছে।'

নন্দা বিশ্বাস করতে পারে না। বলে 'না বারণ করেছে?'

'হ্যাঁ। আমি কাল লুকিয়ে লুকিয়ে চুরি শুনে ফেলেছি।'

নন্দা মুষড়ে পড়ে। সত্য-মিথ্যা যাচাই করবার ইচ্ছা তার একবিন্দু আর থাকে না। স্নেহ যেমন অন্ধ, অভিমানও ঠিক তেমনি অবিবেচক। নন্দা জিজ্ঞেস্ করে 'তোমাদের জামাই আজ যায় নি ও বাড়ী'তে?'

—'কই না, আজ ত' যায়নি। পরশু গিয়েছিল। দিদি এমনি বড় বড় লেডিকেনি আনিয়ে দিলে দোকান থেকে।'

—'তুমি কখন বেরিয়েছ বাড়ী থেকে?'

—'অনেকক্ষণ।'

জগার কথার ওপরেই নন্দার শাশুড়ীর ডাক শোনা গেল, 'বৌমা!'

নন্দা তাড়া দিয়ে জগাকে বলল, 'দাদা, তুমি এখন বাড়ী যাও। আমার অনেক কাজ আছে।'

জগার কিন্তু এত তাড়াতাড়ি বাড়ী যাবার ইচ্ছে

ছিল না। বলল, 'বাড়ী যাব ?'

'হ্যাঁ বাড়ী যাও। বাবাকে বোলো, আমি ভাল আছি।'

—'তোর ঠাকুরকি ত' আর এলো না, কাপটা ভেঙ্গে ফেললায় বলে রাগ করল নাকি ? আমি কাল একটা কাপ এনে দেবো।'

জগার রকম-সকম দেখে নন্দা হতাশ হয়ে পড়ে। জোর করেই বলে, 'না না তোমাকে কাপ আনতে হবে না। তুমি এখন যাও ত, যাও।'

বহুকষ্টে জগা উঠল। যাবার সময় পেছন ফিরে বলে গেল, 'কাল সকালে আবার আসবো।'

জগাকে চলে যেতে দেখে নন্দার শাশুড়ী বৌকে আবার ডাকলেন. কুটুমের ছেলে বাড়ী থেকে শুধু চা খেয়ে চলে গেল কি নিন্দের কথা। বললেন, 'মাসাকে তোমার শুধু চা দিলে, খাবারটাবার কিছু আনিয়ে দিলে না কেন মা ?'

এ কথায় কিছু রাগ হবার নয়। কিন্তু নন্দার মেজাজটা একটু আগে থেকেই বিগড়ে গিয়েছিল। হঠাৎ শাশুড়ীর মুখের ওপরেই বলে ফেলল, 'আমি কি নিজে বাজারে গিয়ে কিনে আনবো ?'

শাশুড়ী বললেন, 'শোন কথা লতিকে বললেই ত হতো। এই দোরের কাছে দোকান, লতিই ত' আনে।'

লতিকা এই সময় এসে বলে, 'না না, ওকে আর খাবার কিনতে হবে না। কাপটা কিনে ভেঙ্গে। ও কি রকম লোক বৌদি, আমাকে দেখলেই কেমন করে। আমার এখন লজ্জা করে।'

লতিকার কথা শুনে মা বললেন, 'তুই থাম, হ্যাঁ বৌমা, তোমার মামার বাড়ীর অবস্থা কেমন ?'

জগার পাগলামীর জন্যে নন্দা নিজেই বিশেষ লজ্জিত, তাই শাশুড়ীর অযাচিত এই আগ্রহে সে খুশী হতে পারল না। বলল, 'কেন, ঠাকুরঝির সঙ্গে বিয়ে দেবেন ভেবেছেন না কি ?' কথাটা খানিকটা বিদ্রূপের মতন শোনালো।

লতিকা সেটা বুঝতে পেরে ফোঁস করে উঠল—'খবরদার মা, গলায় দড়ি দিয়ে মরব তাহলে।'

'তুই থাম্ মা, তুই থাম্। তোর বিয়ে দিতে যা পারলে পেলে আমাকেই গলায় দড়ি দিতে হবে।'

লতিকা বলল, 'হ্যাঁ, তুমি বল ওই পাগলটার কাছে, একে ত এমনিতেই ও আমাকে—'

লতিকাকে বাধা দিয়ে নন্দা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে—'না না পাগল নয়। পাগল কেন হবে ? ও এমনিই।'

লতিকা গজ্ গজ্ করে, 'না, পাগল নয়। মাথাটির গুণগান আর কোরোনা বৌদি। আমিও লোকটাকে বিয়ে করব না।'

লতিকার কথায় নন্দা অপমানিত বোধ করে। পাল্টা জবাব দিতেও ছাড়ে না। বলে, 'তোমার সঙ্গে বিয়ে যে দেবেই না ঠাকুরঝি, তুমি লাফাচ্ছ কেন ?'

কথাটা মেয়েকে বললেও লতিকার মার গায়ে লাগে। বলেন, 'কেন বৌমা, আমার মেয়ের চাকর হবার যুগ্যিও ত নয় তোমার ওই মামাটি। নেহাৎ আমার কপাল মন্দ, তাই তোমাকে বলছিলাম যদি—'

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই লতিকা চিৎকার করে ওঠে, 'তোমাকে কিছু বলতে হবে না মা। তুমি চুপ কর।'

লতিকা আরও কিছু শক্ত কথা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বিনোদের গলার আওয়াজ পেয়ে থেমে গেল।

লতিকাকে সামনে দেখে বিনোদ জিজ্ঞেস্ করল, 'তোর বৌদি কোথায় ?'

নন্দা শোবারঘরেই ছিল। বলল, 'এই ত আমি। কি বলছ ?'

কথাটা এখন না বললেও চলত কিন্তু বিনোদ যে এখন কেন কথাটা তুলল সেই জানে। বলল, 'বলছি, তোমার বাবাটি কি ? আজ তিন চার দিন ধরে রোজ যাওয়া আসা করছি টাকার জন্যে, টাকা দেবার নাম নেই।'

কথায় বলে, কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে। নন্দারও হলো তাই। জগার কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস না হলেও সে জন্যে মনে মনে তার ওপরেই অভিমান হয়েছিল। সেই বিরক্তির আভাস এতক্ষণ শাশুড়ী ননদের সঙ্গে কথাবার্তায় ফুটে উঠছিল। তার ওপর বিনোদের কথা-গুলো তার বুকে তীরের মত বিঁধল। পান খাল পাত্র ভুলে গিয়ে নন্দা বলে উঠল, 'তুমি কি শ্বশুরের কাছে টাকা নিয়ে সারাজীবন সংসার চালাবে ভেবেছ ?'

নন্দার হঠাৎ এই ভাবে কথা বলায় বিনোদ স্তম্ভিত হয়ে গেল। বিস্মিত হয়ে বলল, 'তার মানে ? তোমার কথা বলার ধরণটা ত' বেশ ভাল বলে মনে হচ্ছে না।'

—'চিরকাল এমনি করে কথা বলাই আমার অভ্যাস।'

বিনোদের বিস্ময় উত্তরোত্তর বেড়েই চলল। বলল, 'বিয়ের আগে তোমার বাবার সঙ্গে পাকাপাকি কথা হয়ে গেল—আমি—'

তার মুখের কথা টেনে নিয়ে বিদ্রূপের স্বরে নন্দা বলল, 'হ্যাঁ, আমি কাজ কর্ম কিছু করব না যেহেতু আপনার মেয়েকে দয়া করে বিয়ে করেছি—আপনি আমার সংসার চালিয়ে দেবেন।...পুরুষ মানুষ লজ্জা করে না?'

বিনোদ বলল, 'সংসার চালানো সংসার চালানো বলছ কেন? আমি পুতু পড়ার খরচ—'

নন্দা এবারেও তাকে কথা শেষ করতে দিল না। বলল, 'থাক, আর বুড়ো বয়সে পণ্ডতে হবে না।'

—'তারি যে কথা শিখেছ দেখছি।'

—'আমি তোমার নোলক-পরা বৌ নই।'

—'তা আমি জানি। তাহলে কি বলতে চাও, আমি পড়ব না?'

—'জানি না।'

নন্দা 'জানি না' বলে চুপ করলেও বিনোদের মেজাজটা গরম হয়ে উঠেছিল। বলল, 'জানি না কেন, অশান্তি করবার বেলায় ত' খুব ওস্তাদ, আর জিজ্ঞেস্ করলে জানি না বললে চলবে কেন, জবাব দাও।'

'পড়তে চাও পড়। কিন্তু আমার বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়ে কিছু করতে পাবে না।'

—'বিয়ের আগে তোমার বাবার সঙ্গে আমার পরিষ্কার কথা হয়েছিল। সেই মতোই আমি বিয়ে করেছি।'

—'বিয়ের আগে এই রকম কথা হয়েছে যদি জানতুম তাহলে আমিই এ বিয়ে ভেঙে দিতুম।'

নন্দা রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। বিনোদ ইচ্ছে করেই আর কোন কথা না বলে চুপ করে গেল।

লতিকা আড়াল থেকে সবই শুনছিল। দাদাকে অপমান সহ্য করে চুপ করতে দেখে এগিয়ে এসে বলল, 'তাহলে তোমার উচিত ছিল বিয়ের আগে সব কথা ভাল করে জেনে নেওয়া।'

নন্দা বলল, 'তুমি আবার আমাদের মাঝে ঝগড়া করতে এলে কেন ঠাকুরঝি?'

—'না, আসবে না। তুমি যত খুশী একা পেয়ে দাদাকে কথা শোনাবে, যা?'

—'কী শোনাচ্ছি তোমার দাদাকে?'

—'কি বাকী রাখছ শোনাতে?'

লতিকা এখন যেন অন্য মানুষ হয়ে গেছে। যে নন্দাকে দু'দণ্ড চোখের আড়াল করতে তার ইচ্ছে করে না, এখন তাকে আঘাতের পর আঘাত করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হলো না। বলল, 'গলার আওয়াজটি তো' তোমার কম নয়, সবই ত শুনতে পাচ্ছি। তোমার বাবা কি টাকা আমাদের এমনি দিচ্ছে নাকি? আর তার জন্যে তোমারই বা এত মাথা ব্যথা কিসের?'

নন্দার যে কিসের মাথা ব্যথা, তা সে নিজেই জানে। বিনোদ যে তার বাবার কাছে ছোট হচ্ছে, সে কিছুতেই সেটা সহ্য করতে পারে না। তার ওপর জগা এসে বলেই ত দিলে যে, তার বাবার মোটেই ইচ্ছে নয়, যে বিনোদ টাকা চাইতে আসে। বিনোদকে কি করে এত কথা মুখ ফুটে বলে নন্দা। লতিকাকে উদ্দেশ করে বলল, 'না, আমার মাথা ব্যাথা হবে না, হবে তোমার?'

বিনোদের আর ভাল লাগছিল না এ সব। বলল, 'লতি, যা এখান থেকে, ওর সঙ্গে পারবি না।'

—'তুমি না পারতে পার, আমি পারব।' বলে লতিকা গাছ-কোমর বেঁধে নিল চট্ করে।

নন্দাও রুখে উঠে বলল, 'মারবে নাকি?'

—'না, আগে তোমার মুখের কত জোর আছে দেখি, তারপর—'

—'আঃ লতি!' বলে বিনোদ একবার কটমট্ করে লতিকার দিকে চেয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ক্ষোভে, লজ্জায় নন্দার চোখে জল বেরিয়ে আসে। বলে, 'তোমরা দু'ভাই বোনে মিলে কি করছ বলো ত?'

নন্দার ওপর লতিকার আর এতটুকু সহানুভূতি নেই যেন। কঠোর তিরস্কারের ভঙ্গীতে বলল, 'ভাইকে বলতে হবে না, আগে বোনকে বলো।'

কান্নায় ভেঙে পড়ে বলে নন্দা: 'আমার স্বামীকেও কি আমার কিছু বলার উপায় নেই?'

—'না। যা-তা বলতে তুমি পাবে না।'

—'যা-তা কথা হলো? সক্ষম পুরুষ মানুষ শ্বশুরের কাছে হাত পেতে টাকা আনবে?

—'হ্যাঁ আনবে। তাতে কি হয়েছে কি?'

—'কি হয়েছে, তা' তুমি কেমন করে জানবে? তোমার বিয়ের পরে তোমার বউটি যদি চব্বিশ ঘণ্টা তোমার দাদার কাছে এসে কাঁদত, তাহলে তোমার কেমন মনে হবে বলতে পার?'

এদের ঝগড়া যখন চরমে এসে পৌঁছেছে, তখন আর বিনোদের মা না এসে থাকতে পারলেন না। এসে বললেন, 'কি হচ্ছে কি তোদের শুনি। ছি ছি ছি, লোকে শুনলে বলবে কি? আয়, সতি আয়!' সতি-কাকে টেনে নিয়ে চলে যান বিনোদের মা।

অসহায় নন্দা ক্ষোভে-লজ্জায়, দুঃখে অপমানে ভেঙ্গে পড়ে।

পাশের ঘরে গিয়ে বিনোদকে একা পেয়ে, তার কাছে কৈফিয়ৎ দিয়ে নিজেকে হাল্কা করতে চায়। বলে, —'আমি কেন এ কথা বলছি, তা তুমি জানো?'

মুখ অভিমানে বিনোদ বলে, 'চাই না আমি জানতে।'

—'শোন। ভেবেছিলাম, বলব না। কিন্তু এখন দেখছি না বলে উপায় নেই।'

বিনোদ বলে, 'বলছি ত আমি কিছু শুনতে চাই না।

—'না, তোমাকে শুনতেই হবে। তুমি যে আমাকে ভুল বুঝবে, সে আমি সইতে পারব না।' বলে আবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে নন্দা!

বিনোদ বলে, 'বেশ বল, কি বলবে বল।'

নন্দা নিজেকে সামলে নিয়ে ইতস্তত করে বলে, 'মা নিষেধ করেছে দাদাকে, তোমাকে টাকা দিতে।'

—'আমি বিশ্বাস করি না।'

—'অবিশ্বাসের কোন কারণ নেই, মা আমার নিজের মা নয়, সৎমা।'

'সৎমা!' বিনোদ অবাক হয়ে যায়। একথা ত' সে কোনদিন শোনে নি।

—'এতদিন বলনি কেন?'

—'বলতে বারণ ছিল।'

বিনোদ নন্দার দিকে চেয়ে শুধু 'ও' বলে থেমে গেল।

বিয়ের পর অনেক রঙিন স্বপ্ন দেখেছিল বিনোদ। হঠাৎ নন্দা তা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দিল।

বড়লোকের মেয়েকে বিয়ে করে বড়লোক সে হতে চায়নি। চেয়েছিল, একটু আন্তরিকের স্নেহ আর সেবাপরায়ণা শেষ করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হলো না। নন্দাকে সে কিছুমাত্র দোষ দিতে পারে না। কোন মেয়ে চায়, তার স্বামী কারো কাছে ছোট হয়?

স্বপ্ন দেখলে আর চলবে না বিনোদের। যে কোন উপায়ে তাকে রোজগারের পথ খুঁজে বের করতেই হবে।

বিনোদ পরামর্শ করবার জন্যে প্রথমেই গেল ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার তার কথা শুনে ঠাট্টা করে বলল, 'ও, বৌ এর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে বুঝি? চল, মিটিয়ে দিয়ে আসি।'

বিনোদ বলল, 'না না, ডাক্তার, তাদি নয়। শোন, পড়াশুনো আর আমার ভাগ্যে হবে না। পার ত' একটা চাকরীর ব্যবস্থা করে দাও।'

—'বেশ ত', তোমার শ্বশুরকে ধরোনা।'

—'না ডাক্তার, শ্বশুরের সাহায্য আমি নেবো না।'

ডাক্তার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কি যেন বুঝবার চেষ্টা করে। তারপর বলে, 'হঠাৎ তোমার কি হলো বলো ত? এম-এ পড়বে বলে বিয়ে করলে।'

—'ভুল হয়ে গেছে। এখন দেখছি, বিয়েটা না করলেই ভাল হতো।'

—'শ্বশুরের সঙ্গে ঝগড়া করেছ?

—'না।'

—'তবে চাকরীর জন্যে তাঁকে বলতে আপত্তি কি?'

—'সে তুমি বুঝবে না ডাক্তার। শ্বশুরের সাহায্য আমি নেব না।'

—'দেখ, ভালর জন্যেই বলছি। আজকালকার দিনে বড়লোকের উমেদারী ছাড়া ভাল কাজ হয় না।'

—'না হয়, রিক্সা টানবো, মাটি কাটবো, কুলির কাজ করব।'

ডাক্তারের কাছে কোন আশা না পেয়ে বিনোদ চলে যায় সেখান থেকে।

দিনের পর দিন চাকরীর চেষ্টায় ঘুরতে থাকে বিনোদ। বেশ কিছুদিন কেটে যায় তবু কোন সুযোগ করে উঠতে পারে না। অবশেষে একটা কারখানার কাজেই ঢুকে পড়ে।

দিন যায়। কত সোনালি স্বপ্ন ছিল তার। আজ কারখানার ধোঁয়ায় যে স্বপ্ন মিশে গেছে কালো হয়ে

কোন অন্ধকারের তলায়। অসহনীয় বোঝার মত কেটে চলেছে দিনগুলো।

কটা দিনেই মনে হচ্ছে যেন কটা যুগ কেটে গেছে। অন্ধকার থাকতে কারখানায় চলে যায় বিনোদ, কাক-পক্ষী টের পায় না। ফেরে যখন, তখন আবার রাতের অন্ধকার নেমে আসে।

কারখানা থেকে ফিরে বিনোদ ক্লান্ত শরীরে ঘরে ঢুকছিল তার মার ডাকে থমকে দাঁড়াল।

মা' কাছে এসে বললেন, 'এই ক'দিনেই একি চেহারা হলো রে তোর।'

বিনোদ একটু ম্লান হেসে কিছু না বলেই চলে যাচ্ছিল। মা' বললেন, 'এই রকম যদি খাটতে হয়, কাজ নেই এমন চাকরীতে ছেড়ে দে।'

বিনোদ বলল, 'না মা, অভ্যাস নেই বলেই এ রকম মনে হচ্ছে যা। দু'এক মাস কাজ করতে করতেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

—'না বাছা, দেখে শুনে আমার কেমন মনে হচ্ছে। তুই কি বৌ-মার সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি করে এই রকম করছিস?'

—'ঝগড়া আবার কখন করলাম মা?'

—'চব্বিশ ঘণ্টাই ঝগড়া হচ্ছে। কান তো আছে, সবই শুনতে পাই। বৌ-মার গলাটি ত' আর ছোট নয়।'

নন্দা কোথায় ছিল, হঠাৎ হাওয়ার মত এসে উপস্থিত হয়ে বলল, 'কি বলো?'

নন্দাকে হঠাৎ দেখে বিনোদের মা একটু চমকে গিয়েছিলেন। তার ওপর নন্দার প্রশ্নে যেন তিনি জ্বলে উঠলেন। বিনোদের কারখানার কাজ নেওয়া এবং দিনের পরদিন তার এই ভাবে শরীর ভেঙ্গে যাওয়ার জন্যে বিনোদের মা'র মনে একতিল শান্তি ছিল না। এবং তার জন্যে যে নন্দাই দায়ী, সে বিষয়েও তিনি নিঃসন্দেহ। বললেন, 'কিছু হয়নি মা, বলি, বিনোদের চেহারাটা একবার দেখেছ?'

শাশুড়ী ননদের কাছে এ রকম খোঁটা খেওয়া কথা আজকাল প্রায়ই নন্দাকে শুনতে হয়। তার যথাযোগ্য উত্তর দিতেও সে ছাড়ে না। বলল, 'দেখবার লোক যদি না-থাকত তো দেখতুম। দেখবার লোকের ত' অভাব নেই। মা' রয়েছে, বোন রয়েছে।'

লতিকা যেখানেই থাকুক, নন্দার কথার জবাব দিতে সাত কাজ ফেলেও ছুটে আসে আজকাল। এখনও তার ব্যতিক্রম হলো না। সামনে এসে কোমরে হাত রেখে রুখে উঠে বলে, 'বোনের কথা কি ছিষ্টি শুনি? দেখো বৌদি, খোঁটা দিয়ে কথা বোলোনা বলছি। ভাল কাজ হবে না।'

হাড় ভাঙ্গা খাটুনির পর বিনোদ আর দাঁড়াতে পারছিল না। তার ওপর এই ঝগড়া ঝাঁটি অসহ্য লাগে তার। বলে, 'আঃ, বলি তোরা কি আমাকে বাড়ীতে তিষ্টুতে দিবি, না না-খেয়েই বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাব?'

বিনোদের মা লতিকে বললেন, 'লতি, চুপ কর্।' লতি কিন্তু চুপ করল না। বলল, 'না না, তুমি জানোনা মা, বৌদি মাঝে মাঝে ভারি ইঁচাক্ ইঁচাক্ করে কথা বলে। বড়লোকের মেয়ে না ছাই! কথা পর্যন্ত বলতে জানে না।'

আজকাল এরা কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না। ঠোকাঠুকি ঝগড়া যেন এদের স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিনোদ আর সহ্য করতে পারে না। চিৎকার করে বলে, 'লতি'!

বৌকে কিছু না বলে লতিকাকে ধমক্। লতির তা অসহ্য লাগে। বলে, 'কেন? বৌকে শাসন করতে পার না?'

নন্দা বলে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, মা মেয়েতে বেশ ভাল করে শেখাও, এবার থেকে তাই করবে। কি আমার শাসন কর্তারে। করুক না কে আমায় শাসন করবে।'

লতিকা বড় বড় চোখ করে মার দিকে চেয়ে বলে, 'শুনলে, মা শুনলে? দাদা, তুমি শুনলে?'

—'হ্যাঁ, শুনলাম! কিন্তু কি করতে হবে আমাকে বল?'

লতিকার তার দাদার অসহায় অবস্থাটা অসহ্য লাগে। বলে, 'জানি না।' বলেই সে সেখান থেকে দুম্ দুম্ করে পা ফেলে চলে যায়।

নন্দা বলে, 'আমাকে ধরে ওদের সামনে জুতো মারতে হবে, পারবে?'

বিনোদ তখন মাথা হেঁট করে সেইখানেই বসে পড়েছে অবসাদ ও গ্লানিতে।

বিনোদের মা' যেতে গিয়েও ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন,

—'বৌমা ! ছি ছি ছি ছি, আমি বলতে এলুম এক-কথা, আর কি হয়ে গেল দেখ। আমি কি তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ে মরব না কি ? বলি, বিনোদের কেমন চেহারা হয়েছে চোখে দেখতে পাচ্ছ তো ?'

—'তোমাদের মা' আর মেয়ে ছাড়া চোখ কি কারও আছে যে দেখতে পাবে।'

—'ঘাট হয়েছে মা, আমার অপরাধ হয়েছে তোমার সঙ্গে কথা বলা। চোখ যদি থাকে ত' দেখ। সেই দেখতেই বলা হচ্ছে। আর বিনোদ, খাবি আয়।' বলে বিনোদের মা বিনোদের হাত ধরে উঠিয়ে নিয়ে যান খাবার ঘরে।

লতিকা বিনোদকে খাবার দিতে দিতে বলে, 'শুনছো, দাদা ?

—'কি ?'

—'ওই শোন, কান্না আরম্ভ হলো।'

—'কাঁদুক্ !'

—'কেন কাঁদবে কেন ? চুপ করাওগে যাও, হাত জোড় করে ক্ষমা চাওগে যাও।'

—'যাঃ, বাজে বকিস্‌নি।'

—'আচ্ছা দাদা তোমার বৌটা কি বলো ত', পাগল না কি ?

—'ও অমনি।'

বিনোদের মা বললেন, 'না বাবা, অনেক বড় লোকের মেয়ে দেখেছি, এমনটি কখনো দেখিনি। না জানে ভাল করে দুটো মিষ্টি কথা বলতে, না জানে কোন কাজ করতে। জানে শুধু কোমর বেঁধে ঝগড়া করতে।'

নন্দা সত্যিই বিছানায় পড়ে পড়ে কাঁদছিল। বিনোদের মা'র কথা কানে যেতেই উঠে এসে দরজার কাছে দাঁড়াল।

লতিকা তখন বিনোদকে শুনিয়ে শুনিয়ে মা'কে বলছিল, 'কিন্তু মা, এর জন্যে দায়ী দাদা।'

বিনোদ ধমক্ দেয়, 'চুই থাম্।'

—'ওই দেখ, দাদার শুধু মুখ ঝামটানি আমাদের কাছে। আমি দেখেছি, বৌকে দাদা কিছু বলতে পারে না।'

লতিকার কথায় বিনোদের মা চুপ করে থাকলেই পারতেন। কিন্তু দেশস্বভাব আজকাল এদের কারুরই নেই। বললেন, 'বলেই বা কি হবে ? অতবড় ধিঙ্গি মেয়ে শায়েস্তা হয় কখনও ?'

—'না হয় না। মেয়েমানুষ আবার বেটাছেলের কাছে শায়েস্তা হয় না, তুমি চুপ কর মা।' বলে গিস্‌গিস্ করতে করতে চলে যায় লতিকা।

বিনোদ বলে, 'লতিটাও কম যায় না মা, ওর কপালে অনেক কষ্ট আছে দেখো।'

মা বলেন, 'সেই ভাবনাই ত' দিনরাত ভাবছি। ও যে আবার কার হাতে পড়বে কে জানে ?'

—'ভেবোনা মা, ওর বিয়ের আমি সব কিছু ঠিক করে রেখেছি।'

—'কার সঙ্গে ? বৌ-এর সেই মামা না কে সেই ছোঁড়াটার সঙ্গে ?'

—'না। ডাক্তারের সঙ্গে।'

—'কিন্তু ডাক্তার যে বিয়ে করবে না বলছে।'

—'করে না করে সে আমি দেখে নেবো। বেশী গোলমাল কোরো না। খাবো।'

লতিকা কি শুনতে কি শুনল। দাদার পাতে তরকারি দিয়ে বলল, 'কেন ? বাড়ীর বৌ কেলেঙ্কারী করবে আর আমরা চুপ করে থাকবো ? লোকে শুনলে হাসবে না ?'

বিনোদ বলে, 'নাও। কি কথা হচ্ছে, আর ও কি শুনলে দেখো। এইটেই বেশী বজ্জাত।'

—'তা বজ্জাত হই আর যাই হই, আমি চুপ করে থাকতে পারব না দাদা। আরশি নিয়ে নিজের চেহারাখানা একবার ভাল করে দেখো, কি ছিলে, আর এই দু'দিনে কি হয়ে গেলে। তোমার ওই বড়লোকের মেয়ের দেদিকে নজর আছে ?'

নন্দা আর বাইরে থাকতে পারল না। ঘরে এসে বলল, 'আমি নজর দিয়ে কি করব, তুমি একটু নজর দাও, ভাইয়ের সেবা কর, আর আমার নামে বেশ করে লাগাও, তা হলেই হবে।'

বিনোদ বলল, 'আবার তুমি বেরিয়ে এলে কগড়া করতে ?'

বিনোদের সঙ্গে তর্ক করবার প্রবৃত্তি তার ছিল না। তবু চুপ করে থাকতে পারল না। বলল, 'কেন আসবো না? আমি কি কাউকে ভয় করি নাকি? কি এমন অন্যায়টা আমি করেছি শুনি? পুরুষ মানুষকে গায়ে গতরে খেটে রোজগার করতে বলেছি এই তো?'

ব্যাপারটা ঘোরালো হবার আগেই বিনোদ বলে, 'তা বেশ করেছ তুমি। থামো। বাড়ীর বৌ, গলাটা একটু কম কর।'

—'তুমিই ত' যত নষ্টের গোড়া। কাজ করতে বলেছি তা মা বোনকে দেখিয়ে দেখিয়ে এমন কাণ্ডটা করছ—কাজ করতে গিয়ে যেন একেবারে মরে গেলে।'

বিনোদ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'আমি মা বোনকে দেখাচ্ছি?'

—'দেখাচ্ছ না? হাড়ি কামাও না কেন? চাল কর না কেন?

—'তাড়াহুড়ো করে ওসব আমার ভাল লাগে না।'

—'তা ভাল লাগবে কেন? আমার বাবার কাছ থেকে টাকা এনে দিব্যি বসে বসে খেতে সবাই মিলে—তা হলেই খুব ভাল লাগতো, না?'

লতিকা আর চুপ করে থাকতে পারল না। বলল, 'তোমার বাবার তোষাক্কা আমরা করি না। আমার দাদা লেখাপড়া অনেক শিখেছে, রোজগার করতেও জানে।'

—'ওই তো, দেখতেই পাচ্ছি। দু'দিনেই কাবু হয়ে মা-বোনের আঁচল ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

বিনোদের খাওয়া মাথায় উঠে গেল। চিৎকার করে উঠল, 'লতি, তোরা থামবি না আমাকে বেরিয়ে যেতে হবে বাড়ী থেকে?'

বিনোদ সত্যি সত্যি খাওয়া ছেড়ে উঠে যায় দেখে লতিকা এগিয়ে যায় বিনোদকে পেছনে ফেলে। '—তুমি খেওয়া, যা করছ কর। তোমার বৌএর মুখ বন্ধ করতে তুমি তো পারলে না। আমি বন্ধ করে দিচ্ছি দেখ।'

নন্দাও রুখে দাঁড়ায়। 'কই কর দেখি—দেখি কেমন বাহাদুর।'

আবার কুরুক্ষেত্রের সূচনা হয় দেখে বিনোদের মা চঞ্চল হয়ে উঠলেন। বললেন, 'বৌমা, তুমি খাবে না কি?'

নন্দা বলে, 'তোমার মেয়েকে খাওয়াও আগে, তারপর আমি খাবো।'

লতিকা বলে, 'তোমাকে না খাইয়ে আমি খাবো না কিছুতেই। দাদা, বৌকে কিছু বলতে না পারো, কথা বন্ধ করে দাও ওর সঙ্গে, নতুন বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও, আর আনবার নামটি কোরো না, দু'দিনে চিট হয়ে যাবে দেখো—এই আমি বলে রাখলাম।'

নন্দা উপহাস করে বলে, 'ওরে আমার কে রে! আমাকে শাসন করবার মালিক উনি। উনি আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেবেন? আমি বাড়ীর বড়বৌ, আমাকে দূর করে দেবেন উনি বাড়ী থেকে।—তোকে যদি আমি বাড়ী থেকে ক্যাঁটা মেরে দূর করে না দিই ত—'

বিনোদের মা চেঁচিয়ে ওঠেন, 'বৌমা!'

—'আঃ—। ওই রইল আমার খাওয়া। তোরা ঝগড়াই কর।' বলে বিনোদ থালাটা ঝন্ ঝন্ করে ছুঁড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

মা ব্যস্ত হয়ে ডাকেন, 'বিনোদ।'

লতিকা ডাকে, 'দাদা'।

—'না, আমি তোমাদের কারো কথা শুনবো না।' বলে হন হন করে চলে যায় বিনোদ।

নন্দা কোনো কথা বলে না। ভাতের থালাটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে।

লতিকা তার কাছে এগিয়ে এসে বলে, 'হলো? তোমার সাধ মিটলো ত?'

নন্দা কোন কথা বলে না। তার দু'চোখ বেয়ে টপ টপ করে জল পড়তে থাকে।

মাসে মাসে বছর কেটে গেল। বিনোদের স্বাস্থ্যের কোন উন্নতি হলো না। বরং খারাপের দিকেই এগিয়ে গেল। দেহে মনে এতটুকু শান্তি নেই তার। দুনিয়াটা আজ তার কাছে ফাঁকা হয়ে গেছে। আশা, আকাঙ্খা, স্বপ্ন, সব ভুল সব ভুল। কারখানার লোহা-লক্কড় আর হাতুড়ি পেটার বিরাট কর্কশতার মধ্যে থেকে, হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে কোনরকমে সংসারের জোয়ালটা টেনে যাওয়া।

তাও বুঝি আর সে পারে না। শরীর অত্যন্ত দুর্বল

হবে পড়েছে। তারপর হঠাৎ একদিন কাশতে গিয়ে কফের সংগে একটু রক্তের ছিটে দেখে বিনোদ ভয়ে এতটুকু হয়ে গেল। ছুটলো তার ডাক্তার বন্ধুর কাছে।

শুনে ডাক্তার বলল, 'জানি তুমি এমনি করেই একদিন মরবে। তোমার এই একগুঁয়েমি জিদের জন্যেই তোমার সব শেষ হয়ে যাবে। এখনও তুমি সেই চাকরিই করছ? যা বারণ করবো তুমি তাই করবে?'

অত্যন্ত অসহায়ভাবে বিনোদ বলল, 'আমার অবস্থায় যদি পড়তে ডাক্তার, তা হলে একথা তুমি বলতে পারতে না।'

ডাক্তার বিনোদের মাথায় গায়ে হাত দিয়ে বলে, 'জ্বর হয়?'

—'হয় বোধহয়, ঠিক বুঝতে পারি না। সব সময়েই ত শরীরটে খারাপ খারাপ মনে হয়। কদিন ধরে বিকেলের দিকে—তারপর একটু একটু কাশি হচ্ছে। আজ হঠাৎ কাশতে গিয়ে একটু রক্ত—'

স্টেথিস্কোপটা লাগিয়ে ডাক্তার বলে, 'জোরে জোরে নিঃশ্বাস টানো।'

ডাক্তার ভাল করে পরীক্ষা করে বেশ একটু চিন্তিত হয়ে পড়ে। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে চাকরকে ডেকে বলে একটা ট্যাক্সি ডাকতে।

বিনোদ বলে, 'ট্যাক্সি কি হবে?'

—'তোমার বুকের একটা 'এক্স-রে' প্লেট চাই।'

বিনোদ কেমন যেন হয়ে যায়। সারা রাস্তা আর কোন কথা বলে না।

'এক্স-রে' দেখে ডাক্তার। বিনোদ রুদ্ধশ্বাসে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

ডাক্তারের মুখ গম্ভীর দেখে বিনোদ বোঝে, তবু জানতে চায়। বলে, 'চুপ করে রইলে কেন, বল?'

—'হ্যাঁ। যা ভেবেছিলাম তাই।'

—'টি বি'! বলে আঁতকে ওঠে বিনোদ।

ডাক্তার সান্ত্বনা দিয়ে বলে, 'ভয় নেই। এই আরম্ভ, সেরে যাবে।'

কষ্টের মধ্যেও বিনোদ ম্লান হেসে বলে, 'মিছে সান্ত্বনা দিও না ডাক্তার। টি-বি হলে মানুষ বাঁচে না আমি জানি।

—'হ্যাঁ তুমি সব জানো। আজকাল আর সেদিন নেই। এখন অনেক ভাল ভাল ওষুধ বেরিয়েছে। টি-বিতে এখন আর মানুষ মরে না। এখন যা বলি শোনো।

—'বল।'

—'সম্পূর্ণ' বিশ্রাম নিতে হবে।'

ম্লান হেসে বিনোদ বলে, 'বেশ। তারপর?'

—'ভাল ভাল পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে।'

এবারেও কেমন একটু হেসে বিনোদ বলে, 'খাব।'

ডাক্তার তার অবস্থা সবই জানে। একতাড়া নোট বের করে তার হাতে দিয়ে বলল, 'নাও, ধর।'

—'তা হয় না ডাক্তার। অসুখ আমার, তুমি তার জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করবে কেন?'

—'বেশী বকতে হবে না, নাও, ধর। সেরে উঠে না হয় ফেরৎ দিও।' বলে নোটের তাড়াটা ডাক্তার জোর করে বিনোদের পকেটে গুঁজে দেয়।

—'কিন্তু আমার এই অসুখের কথা কাউকে বোলো না ডাক্তার। যা জানতে পারলে—

—'কিন্তু একদিন ত জানতে পারবেই।'

—'সে যখন পারবে, তখন পারবে।'

—'ঠিক আছে। চলো তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

—'না ডাক্তার। তুমি সংগে গেলে, আমাকে এ অবস্থায় দেখে মা সন্দেহ করবে। তোমাকে যেতে হবে না। আমি একাই যেতে পারবো। বলে বিনোদ আর এক মুহূর্ত দেরী করল না। ওষুধের শিশিটা পকেটে পুরে বেরিয়ে পড়ল।

বাড়ী এসে যখন পৌঁছুল রাত তখন অনেক। ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতেই নন্দার সংগে দেখা।

নন্দা বলল, 'আজ এত দেরী হল যে?'

বিনোদ ওষুধের শিশিটা টেবিলে রাখতে রাখতে বলল, 'হুঁ'।

—'ওষুধ কেন? অসুখ করেছে নাকি?'

—'না'।

—'তা ওরকম করে কথা বলছ কেন?'

—'এমনি'। বলে বিনোদ ডাক্তারের দেওয়া নোট-গুলো নন্দার হাতে দিয়ে বলল, 'এই নাও।'

নন্দা কঙ্কার দিয়ে উঠল। 'যা বারণ করলাম তাই করলে ?'

—'মানে ?'

—'আবার তুমি বাবার কাছ থেকে টাকা আনলে ?

—'না, না, তোমার বাবার কাছ থেকে আনিনি।'

নন্দা এখন আর কাউকে বিশ্বাস করতে পারে না। বলল, 'না—আনোনি, রোজগার করে আনলে, আমার কাছে মিছে কথা বোলো না বলছি।

একেই বিনোদের শরীর এবং মনের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ তার ওপর জ্বালা তার আর সহ্য হলো না। চিৎকার করে বলে উঠল, 'আঃ, বলছি তোমার বাবার কাছে থেকে আনিনি। তবু খালি ঘ্যানোর ঘ্যানোর। দুনিয়াতে টাকা যেন শুধু ওর বাপেরই আছে। এ টাকা আমি ডাক্তারের কাছ থেকে এনেছি।'

নন্দার তবু বিশ্বাস চলো না। টাকাগুলো বুকের নীচে রেখে দিয়ে বলল, 'থামো, থামো, ভারী তো ডাক্তার, তার নিজেরই চলে না, তোমাকে এই এতগুলো টাকা দিলে। এ টাকা আমি রেখে দিলাম, কাল মামা এলে তার হাত দিয়ে বাবার কাছে ফেরৎ পাঠিয়ে দেবো।' বলে নন্দা চলে যাচ্ছিল।

বিনোদ ডাকল, 'শোন !'

নন্দা সেইখানেই ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'কি ?'

—'তোমাকে দেওয়াই আমার অন্যায় হয়েছে। দাও, টাকা দাও।'

—'না, আমি কিছুতেই দেবো না। এ টাকা আমি বাবাকে ফেরৎ দেবো।'

—'বলছি ও টাকা তোমার বাবার নয়—

নন্দা সে কথায় কান না দিয়ে চলে যায়।

—'এই দেখ – খবরদার—'বলে উত্তেজনায় কাশতে কাশতে বসে পড়ল বিনোদ। মুখে রুমাল চাপা দিয়ে কিছুক্ষণ একটু সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর নন্দার সুটকেশ, শাড়ী, ব্লাউজ যা এ ঘরে ছিল, সব এক জায়গায় জড়ো করতে করতে ডাকল, 'লতি ! লতি !'

লতিকা ছুটে আসে। 'কি বলছ দাদা ? একি এগুলো জড়ো করছ কেন ?

হাঁফাতে হাঁফাতে বিনোদ বলে, 'তোর বৌদিকে বল, এ-ঘর থেকে তার জিনিষ পত্র সব নিয়ে যাক্। আজ থেকে সে তোর কাছে থাকবে, এঘরে যেন না ঢোকে।'

লতিকা ভাবে এতদিনে তার দাদার সুমতি হয়েছে। এবার বৌদিকে নিশ্চয়ই ক্ষমা করা যাবে। খুশী হয়ে বলে লতিকা, 'হেঁ-হেঁ বাবা, শেষ পর্যন্ত আমার কথাই ঠিক হলো তো। এই কাজটি দু'দিন আগে করলেই পারতে ! কই, কোথায় গেল কোথায় ? বৌদি !—বৌদি !

নন্দা পাশের ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। 'কি বলছ কি ?'

শাড়ী-ব্লাউজগুলো তুলে নিয়ে নন্দার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে লতিকা বললে, 'তোমার যা আছে সব সরিয়ে নিয়ে যাও এ ঘর থেকে। দাদা বলছে, তুমি আর এ ঘরে কখনও ঢুকবে না।'

নন্দার মাথায় যেন বাজ পড়ল। একি শুনছে সে ? হঠাৎ যে এমনটা হবে তা সে ভাবেনি। বিনোদ তাকে ঢুকতে দেবেনা তার ঘরে !

নির্বাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ বিনোদের দিকে তাকিয়ে থেকে নন্দা বলল, 'তুমি বলছো ? চুপ করে রইলে যেন ? বল, তুমি বলছো ?'

বিনোদ কিছু না বলে একটু সরে গিয়ে পিছন ফিরে দাঁড়াল।

নন্দা বলল, 'বুঝেছি। নিজে বলবার সাহস নেই, তাই বোনকে দিয়ে আমায় এত বড় অপমান করালে ?'

বৌদির পরাজয়ে লতিকার আনন্দ আর ধরে না। বলল, 'কেন আর কামেলা বাড়াচ্ছ বৌদি, যাও, তোমার জিনিষপত্র তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিয়ে যাও।'

নন্দা রাগে জ্বলে ওঠে। বলে, 'তুই থাম্।'

—'ওঃ, থাম্ ! থামবো কেন ? আমি নিজেই তোমার জিনিষ বাইরে ফেলে দিচ্ছি।'—বলে লতিকা নিজেই জিনিষগুলো তুলতে যাচ্ছিল।

নন্দা গর্জন করে ওঠে। 'খবরদার বলছি আমার জিনিসে হাত দেবে না। আমি একবার ওর নিজের মুখ থেকে শুনতে চাই। বল, চুপ করে থেকো না বলছি—বল !'

অনন্যোপায় হয়ে বিনোদ ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি নিজে বলছি—তুমি যাও।'

ক্রোধে, লজ্জায়, অপমানে নন্দা কেমন যেন হয়ে গেল। নোটগুলো বের করে বিনোদের গায়ে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'এসে দিচ্ছি। এই নাও তোমার টাকা।' বলেই নন্দা আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না। সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলল।

লতিকা বলল, 'ওদিকে কোথায় যাচ্ছ?

—'আমার যেখানে খুশী! এ বাড়ীতে আর আমি থাকতে চাই না।'

লতিকা ছুটে গেল। 'বৌদি!'

বিনোদের দম বুঝি বন্ধ হয়ে যায়। দুর্বল শরীরে সামান্য কিছুতেই উত্তেজিত হয়ে পড়ে। বিনোদ কাশতে কাশতে বুকে হাত দিয়ে চেয়ারে কাৎ হয়ে পড়ল। কোন রকমে চিৎকার করে বলল, 'লতি! ওকে যেতে দে।' বলেই খক্‌খক্‌ করে কাশতে লাগল।

লতিকা তার কাশি শুনে ফিরে এল। বলল, বৌদি সত্যি সত্যিই চলে গেল দাদা। ওকে ফেরাতে—কথা তার শেষ হলো না। বিনোদের মুখে—এক ঝলক রক্ত উঠতে দেখে চমকে উঠে বলল, একি দাদা! রক্ত! দাদা! দাদা! মা। মা! তাড়াতাড়ি এসো।'

মা ছুটে আসেন। 'কিরে, কি হলো?

—'এই দ্যাখো মা', দাদার মুখ দিয়ে কাশতে কাশতে কি রকম রক্ত উঠলো।'

ভয়ে মা'র বুক কেঁপে ওঠে। বিনোদকে আঁকড়ে ধরে বলে, 'বিনোদ, কি হলো বাবা?'

বিনোদ নিজেকে সামলে নিতে চেষ্টা করে। বলে, 'কিছু হয়নি মা। লতি, এক গ্লাস জল এনে দে। মা, তোমরা যাও এখান থেকে।'

হতভাগিনী নন্দা বুঝল না, কেন বিনোদ তাকে তার কাছ থেকে দূরে রাখতে চায়।

এত রাত্রে নন্দাকে একা আসতে দেখে মেঘমালা অবাক হয়ে যান্। তাকে কিছু জিজ্ঞেস্ করবার আগেই নন্দা দোতলায় তার ঘরে ঢুকে খিল বন্ধ করে দেয়।

মেঘমালা ডাকেন। কিন্তু কোন সাড়া নেই। নন্দা তখন বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

মেঘমালার ডাকাডাকিতে অবিনাশবাবু এসে উপস্থিত হন্। তার পেছনে জগাও আসে।

অবিনাশবাবু বললেন, 'কি নন্দা নন্দা করে চেঁচাচ্ছ, নন্দা এখানে আসবে কোত্থেকে?'

—'এই মাত্তর এলো। হন্ হন্ করে এসেই দেখ কি কাণ্ড, দরজায় খিল বন্ধ করে দিলে, এত যে ডাকছি কিছুতেই সাড়া দিচ্ছে না।'

—'কি ব্যাপার কিছুই ত' বুঝতে পারছি না। এই রাতে একা—নন্দা!—নন্দা!

নন্দার তখন সাড়া দেবার মত ক্ষমতা নেই। রাগ, দুঃখ, অপমান সব তখন অশ্রু হয়ে বন্যার মত ঘরে চলেছে তার দু'চোখ বেয়ে। গলায় কোন স্বর ফোটে না শুধু একটা ব্যথা অনুভব করে।

মেঘমালা অবিনাশের ডাকাডাকিতে বাধা দিয়ে বলল, 'খুলবে না। আমি অনেক ডেকেছি।

অবিনাশ জগাকে বলল, 'এই জগা, তুই শীগগির্ একবার বিনোদের বাড়ী' যা ত', গিয়ে জেনে আয় কি ব্যাপার। নন্দা একা একা চলে এল কেন?'

জগা বলল, 'এক্ষুনি যাব?

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এক্ষুনি। যাবি আর আসবি। তাড়াতাড়ি।'

জগা চলে গেল। অবিনাশবাবু দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকেন, 'নন্দা! নন্দা!—

নন্দা এতক্ষণে নিজেকে একটু সামলে নিয়েছে। সাড়া দিল, 'কি বলছ বাবা?

—'দরজা খোল্।'

নন্দা চোখ মুছে পরণের কাপড়টা ঠিক করতে করতে দরজা খুলে দিলে।

মেঘমালা ও অবিনাশ ঘরে ঢুকলেন। নন্দা মাথা নামিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

অবিনাশ প্রশ্ন করলেন, 'একা একা শ্বশুর বাড়ি থেকে এমনি করে চলে এলি, কি হলো কি?'

নন্দা কোন জবাব দেয় না। তেমনি মাথা নামিয়ে চুপ করে থাকে।

মেঘমালা তাড়া দেন। 'কি হয়েছে বল্? শ্বশুর-বাড়ি থেকে এভাবে চলে আসাটা ত' ঠিক নয় মা।'

নন্দা বলল, 'ওরা আমাকে যে ভাবে অপমান করেছে, সেখানে আর আমার থাকা চলে না।

মেঘমালা বলেন, 'একি ছেলেমানুষী কথা মা! মেয়ে হয়ে জন্মেছিস্—একথা কি বলা সাজে?'

—'সাজুক্ না সাজুক্' এ অপমান আমি কিছুতেই সহ্য করব না।'

—'ও কথা বলতে নেই মা। মেয়েদের অনেক কিছুই সহ্য করতে হয়।'

—'আজ তুমি একথা বলবে তা আমি জানি। ভাল মানুষ দেখে তখন তাড়াতাড়ি আমাকে বিদেয় করবার জন্যে যার-তার সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে দিলে, এখন সহ্য করতে বলবে বৈকি!'

মেঘমালা দেবী মেয়ের কাছে এরকম অন্যায় ও রূঢ় আঘাত আশা করেন নি। বিস্মিতভাবে বলেন, ভাল মানুষ দেখে বিয়ে দিলাম, আজ তুই এই কথা বলছিস্ নন্দা?'

—'যতদিন বলাও নি মা ততদিন বলিনি, আজ আর না বলে থাকতে পারলাম না।'

মেঘমালা দেবী অবিনাশবাবুকে বললেন, 'শোন, মেয়ের কথা শোন।

অবিনাশবাবু কিছু বলবার আগেই নন্দা বলল, বাবাকে শুনিয়ে লাভ নেই মা। দোষ তোমার নয়, দোষ আমার অদৃষ্টের।'

অবিনাশবাবু কারও কথার কোন জবাব খুঁজে পান না। বিমর্ষ মনে বেরিয়ে যান সেখান থেকে।

মেঘমালা অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছেন নন্দার ব্যবহারে। বললেন, 'বুঝেছি মা, আমি তোর নিজের মা নই বলেই তুই এত কথা বলতে পারলি। ভগবান জানেন, সৎমেয়ে বলে আমি কখনো দেখিনি তোকে। তোর যাতে অনিষ্ট হয় তা আমি কোনদিন—

আর বলতে পারে না মেঘমালা, কান্নায় তাঁর গলাটা বন্ধ হয়ে আসে।

নন্দাও বোঝে, এসব কথা বলা তার উচিত হয়নি। কিন্তু আজ কেমন করে যে বলতে পারল, তা সে নিজেই বুঝে উঠতে পারে না। মেঘমালার চোখে জল দেখে নন্দা তাকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'আমাকে তুমি ক্ষমা কর মা। আমি জানি তুমি আমার সৎমা নও। বহু ভাগ্যে আমি তোমার মত মা পেয়েছি। কিন্তু আজ কি দুঃখে যে তোমাকে এসব কথা বলেছি, তা যদি তুমি না বুঝবে মা, কে আছে আমার, কার কাছে বলব?'—বলে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে নন্দা।

বিনোদের সে রাতে একটু বাড়াবাড়ি হলো। মা বোনের কাছে তার অসুখের কথা আর গোপন রাখতে পারল না।

শুনে মা কাঁদতে লাগলেন।

তার কান্নায় বিনোদের কষ্ট আরও বেড়ে গেল। মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'কেঁদোনা মা! আমি ভাল হয়ে উঠব।

ডাক্তার এসেও মাকে বোঝালো। ভাবনার কিছু নেই। প্রথমেই রোগ ধরা পড়েছে। তার উপর আমি এরকম কেস বাঁচিয়েছি কয়েকটা।

বিনোদ বলে, 'তুমি আশীর্বাদ কর মা, তাহলেই আমি ভাল হয়ে যাব।'

বৃদ্ধ-আবেগে মা কোন কথাই বলতে পারেন না। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে কাঁদতে থাকেন।

ডাক্তার জিজ্ঞেস্ করে, 'হেঁ আপনার এরম চলে গেল কেন মা?'

বিনোদ তাকে বাধা দিয়ে বলল, 'তার কথা আর তুলো না ডাক্তার।' বলেই বিনোদ আবার কক্ কক্ করে কাশতে থাকে। রক্তও ওঠে খানিকটা।

এমন সময় জগা এসে দাঁড়ায়। দেখে, বিনোদের মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে। ডাক্তার বসে আছে। লতিকা আর তার মা কাঁদছে। জগার আর বুঝতে কিছু বাকি রইল না। আর একমুহূর্ত সেখানে না-দাঁড়িয়ে তড়্ তড়্ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে ছুটল বাড়ির দিকে। তাকে কেউ কিছু বলতে বা জিজ্ঞেস্ করতে সুযোগ পেল না।

জগা বলতে বলতে যাচ্ছিল। 'ওরে বাবা, একি অসুখ। নন্দা ঠিক এই জন্যেই পালিয়েছে।'

হরিণ তার কথা শুনতে পেয়ে এগিয়ে এসে বলল, 'কি হলো?'

—'খন্না! খন্না! রাজ খন্না! আমাদের শিবু কাকার হয়েছিল, পনেরোদিন পেরুল না।'

—'আরে দুত্তোর শিবু কাকা, কি হলো তাই বল!'

—'সর্বনাশ হলো—মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে—খন্না!

—'কার মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে?

—'আমার এখন দাঁড়াবার সময় নেই মশাই, তাড়াতাড়ি ঘরটা বাড়িতে নিইগে। দেখুন, বিয়ে আর আমি এ বাড়িতে করব না।

—'ওঃ, কি আমার পাত্র রে, কে দাবছে তোমাকে বিয়ের জন্যে? অদৃষ্টটা কার তাই বল?'

—'যাও না, ওপরে গিয়ে দেখে এস। বিনোদের বক্সা হয়েছে।—পালাই এ বাড়ি থেকে।' বলে প্রায় দৌড়েই বেরিয়ে যায় জগা।

শান্তি গোলমাল শুনে একটু আগেই এসে দাঁড়িয়ে ছিল বলল, 'মজা বোঝ, তখন ত' খুব রাখলে বাড়িতে, বি-এ পাশ। যাও, এবার কি করবে কর।'

হরিশ বাড়ুজ্যে রীতিমত হেসে উঠল।

—'করব আর কি? বক্সা হয়েছে। আমাকে খেলে। বাস্ বাড়ি ভাড়া আর হলো না দেখছি। এরা আমার সর্বনাশ করলে। না না, বক্সা-টক্সা চলবে না এ বাড়িতে। বাড়ির বদনাম করতে আমি দেবো না। বলি, ও বিনোদ! বিনোদ!

হরিশ বোঝা বিনোদের ঘরে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার কি?'

বিনোদের মা' কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বলেন, 'এই দেখ বাবা—

—হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখেছি। শুনেছিও সব। আমার বাড়িতে যেটুকু বাকী ছিল, তাও হলো।'

ডাক্তার বলল, 'আপনার কোন ভয় নেই। আপনার বাড়ি আমি Disinfect করে দেবো।'

এদের অবস্থা দেখে হরিশের মাথায় তখন অন্য চিন্তা। বলল, 'আরে ছেড়ে দাও। ডিস্‌টিন্ ফিস্‌টিন্ আমিও করিয়ে নিতে পারব। এখন তুমি ওকে বাঁচাতে পারবে কি না সেই কথা বল?'

ডাক্তার বলল, 'আশা ত' করি।'

—'ও সব আশা করি টাশা করি শুনতে চাইনা ডাক্তার। কঠিন রুগী জোর করে ধরে রেখো না। না পার ত' সাফ্‌সাফ্ বল। আমি ওকে মরতে দেবো না। আমার ভাড়াটে, তার ওপর বি-এ পাশ। আমি ওকে বাঁচাবোই।'

হরিশের কথায় মনের মধ্যে বেশ একটু জোর পায় বিনোদের মা'। হরিশের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে তার অন্তর। বলেন, 'তাই দেখ বাবা চেষ্টা করে।'

—'দেখবো মানে? আমি আপনার কথাতেই দেখবো? তখন ত' আমার কথা শুনলেন না, যেখানে সেখানে ছেলের বিয়ে দিয়ে দিলেন। বৌ কই, আপনার সে বৌ কোথায়? ডাকুন তাকে শ্বাশুড়ীর সেবা করুক।'

—'সে কি আর আছে বাবা। ঝগড়া করে একা একাই এই রাতের বেলা বাপের বাড়ি চলে গেল।'

হরিশ অবাক হয়ে যায়। 'একা চলে গেল? বাড়ির বৌ একা চলে গেল?'

—'হ্যাঁ বাবা!'

হরিশ যেন দিগ্‌বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। চিৎকার করে বলে ওঠে, 'তা আমাকে ডাকতে পারলেন না কেউ? আমার বাড়ি থেকে বৌ পালিয়ে গেল? ভালই হয়েছে, আচ্ছা হয়েছে। দিন বড়লোকের বাড়ি বিয়ে দিন। আমার মেয়ে বাপ্পাল, আমার মেয়ে ঝগড়া করে।'

—না রুগীর ঘরে আর চেঁচাব না। বিনোদ! তুমি ভয় কোরো না। ভাল হয়ে যাবে। তোমাকে আমি মরতে দেব না। আর তুমি যদি বল, বৌ এখুনি এনে দিতে হবে। আমি যাব তোমার শ্বশুরের কাছে। বড়লোক-টড়লোক আমি মানি না। আমার কাছে সব ব্যাটা জব্দ। কথা শুনলে জলের মাছ ডাঙ্গায় পড়ে—তোমার শ্বশুর ত' শ্বশুর।'

হরিশ আবার ভুলে যায় যে এটা রুগীর ঘর। কথায় সঙ্গে তার গলাও চড়তে থাকে সপ্তমে। হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ায় মাঝপথে গলা নামিয়ে বলে, 'না রুগীর ঘরে আর চেঁচাব না।'

বিনোদের মা বলেন, 'না বাবা, ও বৌ আমার চাই না। আমার খুব শিক্ষা হয়েছে। ওরই জন্যে আমার ছেলেটার ব্যারাম ধরে গেল।

—'ওই শোন ডাক্তার শোন, তুমিই ত' বিয়ে দিয়ে ছিলে, দু'বই ভাল করে শোন। আমি যাচ্ছি একজন ভাল ডাক্তার ডেকে আনতে।'

বিনোদ বাধা দিয়ে বলে, 'না, আর ডাক্তার ডাকতে হবে না। এই ডাক্তারেই হবে।'

—'ভারি বোঝ তুমি। হবে বললেই হবে? ওই ত তোমায় ওমন ঘরে বিয়ে দিয়েছে। মানুষ চিনবার যার ক্ষমতা নেই, সে আবার রোগ চিনবে না ঘণ্টা।'

ডাক্তার তাকে জানে বলেই রাগ করতে পারে না।

বিনোদ বলে, 'অন্য ডাক্তার দেখাবার মত টাকা আমার নেই।'

হরিশ সখেদে কপাল চাপড়ে বলে, 'হায়রে কপাল! তোমার টাকা আমি চেয়েছি কোনদিন? তোমাদের মাথার ওপর রেখে কোনদিন বাড়ী ভাড়া চেয়েছি যে আমাকে টাকা দেখাচ্ছ? বলি, তোমার টাকা নেই, কিন্তু আমার ত' আছে। তোমাদের সঙ্গে কথা বলাই আমার দায় হলো দেখছি। যা থাক, রোগীর ঘরে আর বেশী চেঁচাব না। তুমি যেও না ডাক্তার, আমি আর একজন বড় ডাক্তার ডেকে আনতে যাচ্ছি।

জগা ফিরে এসে সব কথা খুলে বলল মেঘমালা আর অবিনাশবাবুর কাছে। শুনে তারা দুজনেই এতটুকু হয়ে গেলেন।

অস্ফুট স্বরে অবিনাশ বললেন, 'শেষ পর্যন্ত বিনোদের টি-বি হলো?

জগা লাফিয়ে উঠে বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ টি, বি। এই নামটাই আমার এতক্ষণ মনে পড়ছিল না। সেই যে দিদি, শিব,কাকার যেমন হয়েছিল, ঠিক তেমনি। নন্দার বরাত গেল। বিয়ে হতে না হতেই নন্দা বিধবা হতে যাবে।

মেঘমালা ধমক দেন, 'চুপ কর, নন্দা শুনতে পেলে এক্ষুনি দুঃখ করবে, কাঁদবে।'

নন্দা দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়ে ছিল। বলল, আমি সব শুনেছি মা! বা বললে, এ সব কি তুমি নিজে দেখে এলে বাবা?

—'হ্যাঁ। তুই পালিয়ে এসে খুব বেঁচে গেছিস্।

মেঘমালা নন্দাকে জিজ্ঞেস্ করে, 'তুই কি এ সব দেখে আসিস নি নাকি?

নন্দা কোন উত্তর দিতে পারে না। তার অন্তরটা গুমরে ওঠে। এখন সে বুঝতে পেরেছে, কেন বিনোদ তাকে তার ঘর থেকে তাড়াতে চেয়েছিল। কেন সে ঝগড়া করে তাকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিল। নন্দা আর স্থির থাকতে পারে না, ছুটে যেতে চায় বিনোদের কাছে। অবিনাশ বাধা দেন, মেঘমালা বাধা দেন, কিন্তু সে শোনে না। বাপ-মার বাধা, রাতের নির্জন পথে আপদ বিপদের ভয়, কিছুই সে গ্রাহ্য করে না, ছুটে বেরিয়ে যায় বাড়ী থেকে। অবিনাশবাবু মেঘমালা কি করবেন ভেবে পান না।

ট্রাম-বাস বন্ধ হয়ে গেছে। নন্দা যে কেমন করে এতটা পথ ছুটতে ছুটতে এসেছে সে নিজেই জানে না।

আলুথালু বেশে তাকে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে দেখে লতিকা ডাকে, 'বৌদি!'

নন্দা আজ কারও বাধা মানবে না, তাকে দূরে সরিয়ে দিতে চাইলেও সে যাবে না। বিনোদকে আজ সে বলবে, 'কেন সে তাকে দূরে রাখতে চায়? কেন সে অসুখের কথা তাকে আগে বলেনি?'

বিনোদ বিছানায় শুয়ে। নন্দা ঘরে ঢুকে উচ্ছ্বাসে ভেঙ্গে পড়ে। তার দুচোখে তখন অশ্রুর বান ডেকেছে।

কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বলে নন্দা, 'আমি জানি—আমি জানি। তুমি যে এমনি করে আমার সর্বনাশ করবে তা আমি অনেক আগে থেকেই জানি। তুমি যদি ভাল হবে ত আমার এত কষ্ট হবে কেন?' বলে কাঁদতে থাকে নন্দা।

লতিকা এসে দাঁড়িয়ে দেখে চোখ মুছে বলল; 'চলে যাও ঠাকুর কি, তোমরা আর কেউ এ ঘরে আসবে না। বেরিয়ে যাও এখান থেকে।'

লতিকা বলল, 'ঠিক আছে। ডাকছি আমি মাকে। দেখি মা এসে কি বলে? বলে লতিকা বাইরে আসে।

সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ করে দিয়ে নন্দা বলে, মাকে ডেকে আর পাড়া মাথায় করতে হবে না, এ ঘরে আমি কাউকে ঢুকতে দেবো না।'

বিনোদ বলে, 'আঃ খিল বন্ধ করলে কেন?

—'বেশ করলাম। তুমি থামো। আমি মলে আপদ যাবে, তাই বলে টি বি রুগীর সেবা করে তোমার অত সাধের বোনটি আর যায় কেন? বলে নন্দা দরজার কাছ থেকে সরে এসে বিনোদের কাছে মুখোমুখি হয়ে বসে পড়ে বলল, 'বলি তুমি আমার স্বামী না শত্রু? আমার ঘরে থাকা চলবে না, জিনিষ-পত্র বের করে নাও,

এইসব বলে আমাকে কি বিদেয় না করে দিলেই চলছিল না? আমাকে বাঁচিয়ে রেখে তোমার কি লাভ আমাকে বলতে পার? বলতে পার—এ রকম করে—

ওর কান্না দেখে বিনোদ আর স্থির থাকতে পারে না। বলে, 'চুপ কর, চুপ কর নন্দা।'

লোকে বলবে নন্দা কি ভেদী মেয়ে। কিন্তু বাস্তবিকই অদ্ভুত ওর ক্ষমতা। সেই যে এসে বিনোদের সেবা করতে সুরু করেছে তার আর বিরাম নেই। সারাদিন রাত একা অত বড় রুগীকে শুশ্রূষা করা বড় কম কথা নয়। নন্দার চোখে ঘুম নেই, শ্রান্তি নেই অবসাদ নেই।

বিনোদের অসুখের ভালমন্দ কিছুই বোঝা যায় না। যন্ত্রণায় বিনোদ কাতর, দিন দিন ক্ষীণ হয়ে পড়ছে যত ততই নন্দার জিদ যাচ্ছে বেড়ে।

বিনোদ বলে, একা একা আর কতদিন এমনি করে সেবা করবে নন্দা?

নন্দা বিনোদকে উল্টো চাপ দেয়: 'জানি আমি তোমার দু'চোখের বিষ। আমাকে তাড়াতে পারলে তুমি বাঁচ।'

সত্যিই নন্দার ও আচরণ খেয়াল। বিনোদের কাছে আর কাউকে সে ঘেঁষতে দেয় না, দেবেও না। বিনোদের মা অবাক হয়ে যান তার সেবা দেখে। দাদার কাছে থাকতে না পাওয়ার জন্যে একটু একটু রাগ হলেও বৌদিকে মনে মনে প্রশংসা না করে পারে না লতিকা।

অবিনাশবাবু ও মেঘমালা খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।

কি করবেন ভেবে ঠিক করতে পারছেন না। মেঘমালা বললেন, 'আমাদের এখন একজন বড় ডাক্তার নিয়ে গিয়ে—'

মেঘমালার কথা শেষ হবার আগেই অবিনাশ আক্ষেপ করে বললেন, 'নিয়ে যে যাব, তা সে হতভাগা মেয়ে কি করেছে জানো?'

—'কি করেছে?'

—'একটা দিনের জন্যেও বিনোদের কাছে আমাকে যেতে দিলে না।'

বিস্মিত হয়ে মেঘমালা বললেন, 'সে কি! জামাইকে তুমি দেখে আস নি?'

—'দেখবো কেমন করে? ঘরে ঢুকতে দেয়? আমিও প্রতিজ্ঞা করেছি—যা হয় হোক্—আমি আর যাব না।' অবিনাশবাবু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে কথাগুলো বলেন।

মেঘমালা বলেন, 'এসব রোগে ত অনেক টাকা খরচ হয় শুনেছি। অত টাকা ওরা কোথায় পাবে? কিছু টাকা পাঠিয়ে দিলে হয় না?

অবিনাশবাবু মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, 'জগার হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেবো। আমাকে আর কিছু বোলো না। আমার ভাল লাগে না।'

জগা প্রায়ই যায় সেই থেকে। নন্দা জগার হাত দিয়ে নিজের গয়না বাঁধা দেয়। মামাকে অনুরোধ করে কেউ যেন জানতে না পারে। বিনোদ অবশ্য সে কথা কিছুই জানতে পারে না।

অবিনাশবাবুকে নন্দা যে দিন বিনোদের ঘরে ঢুকতে না দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিল, সে দিন বিনোদ জিজ্ঞেস করেছিল, 'তোমার বাবাকে ও রকম করে তাড়িয়ে দিলে কেন?'

নন্দা বলেছিল, 'আমার খুশী।'

নন্দা কোন কথারই সঠিক জবাব দেয় না। এ যেন তার মজ্জাগত হয়ে গেছে।

জগাকে প্রায়ই আসতে দেখে বিনোদ ভেবে নিয়েছে, নন্দার বাবা টাকা দিয়ে পাঠাচ্ছেন। একদিন নন্দাকে জিজ্ঞেস করল, 'জগা তোমায় টাকা দিয়ে গেল, না?'

—'হ্যাঁ।'

—'তোমার বাবা পাঠিয়ে দিয়েছেন?'

—'হ্যাঁ।'

—'এই যে আমার ওষুধপত্র, সব খরচই কি তোমার বাবা দিচ্ছেন? এত টাকা তুমি পাচ্ছ কোথায়?'

—'যেখানেই পাই, তোমায় সে সব দেখবার ত দরকার নেই।'

নন্দা এইখানেই কথাটা চাপা দিতে চায় বলে, ওষুধ আনবার অছিলায় সরে যায় সেখান থেকে।

তিলে তিলে নিজেকে ক্ষয় করে স্বামীর সেবা করে নন্দা।

মাসের পর মাস কেটে যায়। নন্দার পরিশ্রম সার্থক হয়।

বিনোদ একদিন ডাক্তারকে বলে, 'মনে হচ্ছে আর আমার কোন অসুখ নেই। সেরে গেছি। না কি বল ডাক্তার?'

ডাক্তার বলে, 'হ্যাঁ। এবার কিছুদিনের জন্যে একবার চেঞ্জে যেতে পারলে ভাল হয়।'

বিনোদ হাসে। চেঞ্জে যাবার খরচ ত অনেক। অত টাকা কোথায়?'

ডাক্তার হাসতে হাসতে বলে, এতদিন যিনি জুগিয়েছেন তিনিই জোগাবেন।'

ইঙ্গিতটা শক্ত নয়। বিনোদ বুঝতে পারে। বলে, 'আমি ওকে কিছু বলতে পারব না। বলতে হয় তুমিই বল।'

ডাক্তার নন্দাকে কথাটা বলবার জন্যে তার আসার অপেক্ষা করতে লাগল।

নন্দা তখন বারান্দার একপাশে জগাকে নিয়ে গিয়ে গলা থেকে হারটা খুলে দিয়ে বলল, 'এইটে বিক্রি করে যা পাও আমাকে এনে দাও মামা।'

জগা বলে, জামাই ত ভাল আছে। আবার কেন?'

—'না মামা, আমার বিশেষ দরকার। এই নাও।'

—'আমি কিন্তু এর থেকে পাঁচ টাকা নেবো।' বলে জগা হারটা কোঁচড়ে গুঁজলো।

নন্দা বলল, 'তা নিও, যাও চট করে। দেরী কোরো না।'

জগাকে বিদেয় করে নন্দা বিনোদের ঘরের দিকে যায়। কিন্তু যাওয়া আর হয় না।

হঠাৎ কাশতে কাশতে এক ঝলক রক্ত এসে আঁচলে লাগে।

ডাক্তার ঘর থেকে নন্দাকে ডাকে, 'বৌদি! বৌদি!'

কাপড়ের দাগটা কোন রকমে লুকিয়ে ফেলে নন্দা এক কোণে সরে দাঁড়ায়।

ডাক্তার এসে বলে, 'স্বামীকে ত সারিয়ে তুললেন, এইবার আর একটু করুন, তা হলেই ব্যস্ আপনার জয়-জয়কার!'

—'কি করতে হবে শুনি।'

—বিনোদকে নিয়ে একবার কোথাও চেঞ্জে ঘুরে আসুন।'

—'কত টাকা খরচ হবে?'

—'বেশী দূরে যেতে হবে না। দেওঘর কিম্বা মধুপুর টধুপুর গেলেই চলবে। আমার এক মক্কেলের বাড়ি আছে দেওঘরে, বাড়ির ব্যবস্থা আমিই করে দেবো।'

—'ঠিক আছে। কত টাকা লাগবে সেইটে বলুন?'

—'তা শ'তিনেক।'

—'তা বেশ, টাকা আমি আনিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু আমাকে সঙ্গে যাবার জন্যে কেউ যেন টানাটানি না করে। আমি যেতে পারব না।'

অনেক কষ্টে বিনোদ সেরে উঠেছে। তার পাশে নিজের এই রোগ নিয়ে থাকতে চায় না নন্দা। এ রোগ বড় ছোঁয়াচে।

ডাক্তার জানতে পারে না নন্দার মনের কথা। এও হয়ত নন্দার আর একটা খেয়াল মনে করে ডাক্তার বলে, 'আপনি না গেলে চলবে কেন?'

নন্দা বলল 'এখন ত আর ইন্‌জেকশান এর কোন ভয় নেই। ঠাকুরঝি যাবে।'

—'কিন্তু আপনি না গেলে —'

বার বার ডাক্তারের একই কথায় নন্দা বিরক্ত হয়ে বলে, 'যদি আমার শরীরটা মানুষের শরীর ত। এত কষ্ট করে ওকে সারিয়ে তুললুম, শেষে আবার —

কথা শেষ করতে পারে না নন্দা। কাশির বেগ আসতেই মুখে আঁচল চাপা দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যায় সেখান থেকে।

ডাক্তার বুঝতে পারে না, কেন নন্দা যেতে নারাজ? ডাক্তার মনে মনে স্বীকার করে স্ত্রীলোকের চরিত্র বোঝা মুস্কিল। সেই দুঃখে আজও সে বিয়ে করে নি।

চেঞ্জে যাবার সব ব্যবস্থাই করে দিলে নন্দা। পাছে কেউ আবার ধরাধরি করে যাবার জন্যে তাই সে দূরে দূরে রইল। যাবার দিন বিনোদের হাতে টাকা কড়ি দিয়ে জগার সঙ্গে হঠাৎ বাপের বাড়ি চলে গেল।

তার যা ছেলে কেউ আর তাকে কিছু বলতে পারল না। লতিকা, বিনোদ গেল চেঞ্জে। ডাক্তারও তাদের সঙ্গে গেল।

বাপের বাড়ি এসে নন্দা সকলকে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়ায়। পাছে বাবা-মা তাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

কিছুতেই ডাক্তার দেখাবে না। কারও কথাই শুনবে না সে।

অবিনাশবাবু মেঘমালা তাকে দেখে চুপ করে থাকতে পারেন না। ডাক্তারকে খবর দেন।

নন্দা কিছুতেই ডাক্তারের সামনে আসতে চায় না। অবিনাশবাবু কাজে গেছেন। মেঘমালা আর জগা ডাকাডাকি করে। নন্দা খিল খোলে না।

মেঘমালাও নাছোড়বান্দা।

শেষ পর্যন্ত নন্দাকে খিল খুলতেই হয়।

কিন্তু ডাক্তারের সামনে সে কিছুতেই যেতে চায় না। বলে, কেন মিছিমিছি ডাক্তার ডাকতে গেলে বলো ত? কি দেখার কি? আমার কিচ্ছু হয় নি।'

মেঘমালা সস্নেহে তাকে কাছে টেনে বলেন, 'না হওয়াই ত চাই'ছি মা। কিন্তু দিন দিন যে রকম শুকিয়ে যাচ্ছিস, খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিয়েছিস, তার ওপর অত বড় একটা রোগীর কাছে এদিন থেকে এলি, ডাক্তার ভাল করে দেখেই বলুক না কিচ্ছু হয় নি। আর মা আর!'

—'আমি বলছি আমার কিছু হয় নি, তবু—

—'তা হোক। তবু তোকে আসতে হবে। আয়।' মেঘমালার পীড়াপীড়িতে নন্দা আর না গিয়ে পারে না।

চেম্বে গিয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল বিনোদ। তবু তার মন থেকে সন্দেহ যায় না। একা থাকলেই মাঝে মাঝে নাড়ী টিপে দেখে—জ্বর এলো কিনা!

ললিতা একদিন দেখতে পেয়ে চুপি চুপি ডাক্তারকে ডেকে এনে দেখাল।

ডাক্তার চুপি চুপি বিনোদের পেছনে এসে দাঁড়াল। বিনোদ তখনও নাড়ী দেখছে। হঠাৎ ডাক্তারকে দেখে অপ্রস্তুত হয়ে তাড়াতাড়ি একটা গান ভাঁজতে ভাঁজতে হাত দুটো এমন ভাবে নাড়াচাড়া করতে লাগল যেন সে নাড়ী দেখছিল তা কেউ বুঝতে না পারে।

ডাক্তার হাসতে হাসতে বলল, 'না না জ্বর তোমার হয় নি, হবে না, আমি বলছি তুমি সেরে গেছ, তবু তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না? চল একটু বেড়িয়ে আসি।'

—'চলো।'

বিনোদকে নিয়ে ডাক্তার বেরোতে যাচ্ছে, ললিতা দুধের গ্লাস নিয়ে হাজির।

—'দুধটা খেয়ে যাও দাদা।'

বিনোদ বিরক্ত হয়। 'দিনরাত খালি খাওয়া আর খাওয়া!'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও খেতে হয়। না হলে ডাক্তার একটি অপমান করবে।

বিনোদের দুধ খাওয়া হয়ে গেলে, আবার দু'জনে বেরোতে যাবে এমন সময় একজন প্রতিবেশী ভদ্রলোক আসেন, দুটি ছোট ছোট মেয়ে, তাঁর স্ত্রী, তাঁর কোলেও একটি মেয়ে।

ভদ্রলোক বললেন, 'এই যে বেড়াতে বের হচ্ছেন?'

ডাক্তার বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

ভদ্রলোক বললেন, 'যান। আমরা এইমাত্র ফিরলাম।'

বিনোদ আর ডাক্তার চলে যাচ্ছিল। ভদ্রলোক বললেন, 'আজকের কাগজ পড়েছেন?'

ডাক্তার বলল, 'আজ্ঞে না, কাগজ আমরা পাই না।'

ভদ্রলোক যেন চমকে ওঠেন। 'আরে সর্বনাশ!

কলকাতায় আজ দু'দিন ধরে কি কাণ্ডটাই চলছে। complete হরতাল। দলে দলে ইস্কুল-কলেজের ছেলেরা সব 'জয়হিন্দ-জয়হিন্দ' করছে আর গুলী চলছে মশাই, গুলী চলছে কত লোক যে মরে গেল তার ঠিক নেই।

ডাক্তার ও বিনোদ বিস্মিত হয়। বিনোদ বলে, 'তাই নাকি?'

ভদ্রলোক আক্ষেপ করে বললেন, 'আরে মশাই মানুষ মরলো বয়ে গেল। সবাই একদিন মরবে, কিন্তু আমি একেবারে মারা গেলাম।

ডাক্তার বলল, 'কেন, আপনার কি হলো?'

—'আমার কি হলো? আরে মশাই তিন তিনটে ওষুধের দোকান। তার ওপর পেটেন্ট ওষুধের একটা কারখানা। এই বাজারে সেগুলো দু' তিন দিন বন্ধ থাকলে কত লোকসান একবার ভেবে দেখুন দেখি।'

ডাক্তার বলল, আপনার ওষুধের দোকান, কারখানা আছে?'

—'হ্যাঁ। কেন, 'বি-বি,-বি ফার্মেসী; বি-বি-বি প্রোডাক্টসের নাম শোনেন নি?'

ডাক্তার বলল, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই শুনেছি।'

—'সব আমার। আমারই নাম হলো বিদ্যুৎ বরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-বি-বি। কিন্তু হলে কি হবে একা সব একা। এমন একটা বিশ্বাসী লোক নেই, যার ওপর ভার দিয়ে দু'দিন নিশ্চিন্ত হয়ে বাইরে থাকবো। এক ব্যাটা অকালকুষ্মাণ্ড শালা আছে—এই যে এর সহোদর।' বলে স্ত্রীকে দেখাল। স্ত্রী একটু লজ্জিত হয়ে পড়েন।

ভদ্রলোক বলেই চলেছেন, তারই ওপর দিয়ে এসেছি সব ছেড়ে, জানি শালা চুরি করছে দু'হাতে তার ওপর এই হরতাল—আমি মশাই মনে-প্রাণে মারা গেলাম।

বিনোদ আর ডাক্তার এই কদিনেই বুঝতে পেরেছে ভদ্রলোক কি রকম গল্প বাগিশ। তাঁর কাছ থেকে কেটে পড়বার জন্যে বিনোদ বলল, 'আমরা একটু ঘুরে আসি, তারপর আপনার সঙ্গে কথা হবে।

ভদ্রলোক যেন মর্মাহত হলেন। 'আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই ভাল। দুঃখের কথা যে মন খুলে বলব সে রকম লোক পাই না মশাই। তার ওপর—'

বিদ্যুৎবাবুর থামার কোন উদ্দেশ্যই নেই দেখে বিনোদ আবার বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, তার ওপর আপনার স্ত্রী একটুখানি অসুবিধে বোধ করছেন।'

বিদ্যুৎবাবু আবার নতুন উদ্যমে আরম্ভ করলেন, 'ওই এক অভিশাপ মশাই, ধরালো ত ধরালো একবারে সর্বনাশ রোগ টি-বি। ভাগ্যিস ওষুধের কারখানাটা ছিল তাই কোন রকমে সেরে উঠলো।'—বলে স্ত্রীকে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললেন, 'তুমি অমন জুজুবুড়ী হয়ে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ওই তো, বাড়ির ভেতর যাও না, ভাব সাব কর না।'

বিনোদ দেখল, এই সুযোগ। বলল, 'আপনিও বসুন, আমরা একটু ঘুরে আসছি।' বলে বিনোদ ডাক্তারকে ইশারা করে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়।

—'তা বেশ দেখুন, যাচ্ছেন যখন ডান দিকে একটু ঘুরে যাবেন। দেখে এলাম নাচ গান হচ্ছে।' বলে বিদ্যুৎবাবু বিনোদদের বাসার ভেতরে ঢুকে যান সদলবলে।

বিনোদ যেতে যেতে হাঁফ ছেড়ে বলে 'বাবু বাঃ।'

ডাক্তার বলে, 'চুপ কর। ওষুধের দোকান আছে, কারখানা আছে। আমি ডাক্তার তুমি বেকার। ওঁকে হাত করতে পারলে কাজ হবে। চলো ডান দিকেই যাওয়া যাক, কেমন নাচ গান হচ্ছে দেখি।'

ডাক্তার ও বিনোদ যখন বেড়িয়ে ফিরলো, বিদ্যুৎবাবু তখনো বসে আছেন বেশ আসর জমিয়ে। নাম্বার বয়সী দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীটিকে নিয়েই যা একটু মুস্কিল। হাত দাত ঘোমটা টেনে পুটলীর মত বসে থাকে ছেলে মেয়েগুলোকে নিয়ে।

তবু ওরই মধ্যে যতটা পারেন তাকে শোনাবার চেষ্টা করেন বিদ্যুৎবাবু। সতিকার কথার কম যায় না।

বিদ্যুৎবাবু চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বিনোদদের আসতে দেখে বললেন, 'এই যে আপনারা এসে পড়েছেন। আমি এখনও যাই নি।'

ডাক্তার বলল, 'বেশ করেছেন।'

বিনোদ একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বলল, 'সি' ডতে বসে কেন? এখানে বসুন।

বিদ্যুৎবাবু চেয়ারে বসে বললেন, ঠিক আছে। ওরা বেশ জমিয়ে নিয়েছে। আর আমি এইখানে বসে বসে ভাবছি, এখন কি করা যায়? কলকাতায় যে চলে যাব তারও ত উপায় নেই।'

ডাক্তার মনে মনে ছকে নিয়েছে কি ভাবে বিদ্যুৎবাবুকে বাগে আনবে। তাই তাঁর কথার পিঠেই বলল, 'না-না যাবেন না। রাস্তায় গোলাগুলী চলছে বলছেন।'

চোখ বড় বড় করে বিদ্যুৎবাবু বললেন 'তা ছাড়া গাড়ি ঘোড়া চলছে না। আবার নিজের গাড়ি আছে মশাই প্রকাণ্ড গাড়ি—সব করে কিনেছি। বালিগঞ্জ থেকে হাওড়া ইস্টিশান পর্যন্ত সে গাড়িই বা আসবে কেমন করে?'

বিনোদ বলল, যাক না আর দু-চারদিন। হরতাল ত চিরকাল থাকবে না, দু-চারদিনেই সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।'

বিনোদের কথায় বিদ্যুৎবাবু ভারী খুশী হলেন। বললেন, 'আপনার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক মশাই। দু-চারদিনেই সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, কি বলেন।'

বলে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'কাজ কারবার আবার ঠিক যেমন চলছিল, তেমনি চলবে, না কি, আপনার কি মনে হয়? এই দেখুন, আপনাদের সঙ্গে পরিচয় হলো, কিন্তু নাম তো জানলাম না?'

ডাক্তার পরিচয় দেয়, 'এর নাম বিনোদ, আমার বন্ধু। আর আমাকে ডাক্তার বলেই জানবেন।'

ব্যবসায়ী বিদ্যুৎ বাবু উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। 'ডাক্তার? কলকাতায় থাকেন?'

—'আজ্ঞে হাঁ।'

—'তাহলে আমার বি-বি-বি প্রডাক্টস্—'

—'জানি।'

—'না, শুধু জানলে ত চলবে না। ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রিপ্‌শনের ওপর আমি পাঁচিশ পারসেন্ট্ কমিশন দিয়ে থাকি। চালাতে হবে।

ডাক্তার দেখে আসল কথা পাড়বার এই উত্তম সুযোগ। বলে, 'চালাব। কিন্তু আপনাকেও একটি কাজ করতে হবে।'

—'কি কাজ বলুন?'

—'আপনার কারবার দেখবার জন্যে একজন খুব বিশ্বাসী লোক আমি দিতে পারি। কত মাইনে দেবেন বলুন?'

বিদ্যুৎবাবু কারবারী লোক। সত্যিই যদি একটা ভাল বিশ্বাসী লোক পাওয়া যায়, তাকে মাসে মাসে কিছু দিলেও লাভ ছাড়া লোকসান নেই। তবে তাঁর দিলটা দরাজ না হওয়ায় বললেন, 'দেড় শ' টাকা। আজকালকের বাজারে তিন তিনটে দোকান দেখবে—কারবার দেখবে—তার কমেই বা হবে কেন? কি বলেন?'

ডাক্তার একটু ভেবে বলল, 'হাঁ, তা ত' ঠিকই। বিদ্যুৎবাবু বুঝলেন টাকার অঙ্কটা ডাক্তারের ঠিক মনঃপূত হয় নি। বললেন, 'তবে কি জানেন, আমি একটু হিসেব করে চলি।'

ডাক্তার বলল, 'হাঁ, হিসেব করে চলা ভাল।'

—'কিন্তু চলেই, বা কি হচ্ছে বলুন? এই দেখুন প্রথম থেকেই আমার ইচ্ছে ছিল, আমার কারবারের নাম দেবো 'বি বি-বি এণ্ড সন্স, 'সাইন বোর্ড' পর্যন্ত লেখা হয়ে গেছল, কিন্তু স্ত্রী প্রসব করলেন একটি কন্যা।

বিদ্যুৎবাবু কথাগুলো এমন ভাবে বললেন, ডাক্তার দুঃখ না জানিয়ে পারল না, 'দেখুন ত' কি বিপদ। কি বিপদ। কি করলেন?'

—'বি-বি-বি এণ্ড ভটারস্, ত' লিখতে পারি না। বুঝে ফেললাম। তারপর আবার ওই যে দেখলেন, আমার কাছে যে দু'টি ছিল, দু'টিই মেয়ে। তারপর স্ত্রী গত হলেন।'

—'আপনার সঙ্গে যিনি ছিলেন?'

—'তারই সহোদরা, আমার দ্বিতীয় পক্ষ।'

ডাক্তারবাবুর কথাগুলো ডাক্তার ও বিনোদের শুনতে ভালই লাগছিল। তাই ডাক্তার আরও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতে থাকে।

'তাহলে ওঁর কোলে যেটি ছিল ওটিও কি—'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিদ্যুৎবাবু বলেন, 'মেয়ে।'

ডাক্তার মুখ চোখের ভাব এমন করে, যেন সেও খুব চিন্তিত এর জন্যে। বলল, 'দেখুন বিপদ, বি-বি-বি এণ্ড সন্স আর হলো না।

—'আজ্ঞে না।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ডাক্তার বলল, তাহলে ওই যে বিশ্বাসী একজন লোক রাখবার কথা হলো, সে বিষয়ে কি ভাবলেন?

— দেখুন, আমার স্ত্রীর আর একটি বোন আছে। সেইটিই শেষ। সেটি এখন আমার ঘাড়ে এসে পড়ছে। ভাবছি, এই মেয়েটিকে যে বিয়ে করবে, তাকেই আমি চাকরিটি দেবো।'

ডাক্তারের সমস্ত উৎসাহ যেন কোথায় মিলিয়ে গেল। বলল, 'তাহলে হলো না। আমি যার জন্যে বলছিলাম, তার বিয়ে হয়ে গেছে।' বলে ডাক্তার উঠে পড়ল।'

বিনোদ ভাবল, বিদ্যুৎবাবুকে কি করে বিদেয় করা যায়? বলল, 'কটা বাজলো ডাক্তার?'

ডাক্তার বলল, 'প্রায় দশটা।'

বিনোদ বলল, 'অনেক রাত হয়ে গেছে। নতি। নতি।—

বিদ্যুৎবাবুও উঠে দাঁড়ালেন। 'আমিও উঠি। কই গো, এসো এবার যাই আমরা। আর দেখুন, এই যে আমার শালীটির কথা বললাম না, পরমাসুন্দরী, আর তাছাড়া ঘরের কাজকর্ম—এই যে আমরা এখানে এসেছি গিয়ে দেখব রান্নাবান্না সব নিজের হাতে—

মেয়ে তিনটি নিয়ে তাঁর স্ত্রী ও নতিকা এসে দাঁড়াল। বিদ্যুৎবাবু স্ত্রীকে দেখে বললেন, 'এই যে তোমার বোনের কথাই বলছিলাম।'

স্ত্রী বললেন, 'ডাক্তারবাবুকে বলো না, ওঁর বিয়ে হয়নি।'

কথাটা ডাক্তারের কানে গেল। ডাক্তার চমকে ওঠে। কি সর্বনাশ! বিদ্যুৎবাবু ত তাহলে একুণি আবার জেঁকে বসবে। তাড়াতাড়ি এর একটা নিষ্পত্তি করবার জন্যে বলল, 'কে বলে আপনাকে?' লতিকা—

লতিকা হাসতে হাসতে বলল, 'হ্যাঁ, আমিই বললাম।'

ডাক্তার বলল, বিদ্যুৎবাবুকে, কিন্তু আমি ত ওষুধের দোকানের ম্যানেজারী করতে পারবো না।

বিদ্যুৎবাবু বললেন, 'আচ্ছা আচ্ছা কাল হবে সে কথা। কাল আমার শালীকে নিয়েই আসবো এখানে। আজ আসি তাহলে নমস্কার।'

তাঁরা চলে গেলে বিদায় নিতেই ডাক্তার লতিকাকে একা পেয়ে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করে 'আমার বিয়ের ঘটকালি করতে তোমাকে কে বললে?'

'বলেনি কেউ, মেয়েটি সুন্দরী। আপনার পছন্দ হবে।'

—'আমার কাকে পছন্দ হবে, না হবে তুমি জানো?'

—'জানি।' বলেই মুচকি হেসে চলে যায় লতিকা।

বিনোদ তখন নন্দাকে চিঠি লিখতে বসেছে; সুন্দরী একটি মেয়ে পাওয়া গেছে। যদি অনুমতি দাও তো বিয়ে করে ফেলি। ভাল একটা চাকরি পাওয়া যাবে।

অদ্ভুত চরিত্রের লোক এই বিদ্যুৎবাবু। পরদিন সত্যি সত্যিই শালীকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হলেন।

বিনোদ আর ডাক্তার দুজনেই অবাক। ছোট্ট একটি মেয়ে, দেখতে খুব ভাল নয়।

একটা চেয়ার দেখিয়ে বিদ্যুৎবাবু নিজেই শালীকে বললেন, 'দাঁড়িয়ে রইলি কেন? বোস্ এইখানে।'

মেয়েটি তখন একপাশে মাথা নামিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামছে।

বিদ্যুৎবাবু বললেন, 'দেখুন আপনারা, ডাক্তারবাবু, ভাল করে দেখুন, শালীকে একেবারে সঙ্গে করেই নিয়ে এলাম। আরে এখনো দাঁড়িয়ে রইল। বললে কথা শোনে না, বোস্।' বলে শালীর হাত ধরে টেনে জোর করে বসিয়ে দিলেন বিদ্যুৎবাবু।

বেচারার অবস্থা দেখে বিনোদের দয়া হলো। খুব বোনাইয়ের পাল্লায় পড়েছে যা হোক।

লতিকা জানালার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল।

বিনোদ বলে, 'আহা, ওকে আর অমন করে কষ্ট দিচ্ছেন কেন? ওকে ভেতরে পাঠিয়ে দিন। লতি! একে ভেতরে নিয়ে যা।'

বিদ্যুৎবাবু বললেন, 'আরে মশাই, ভেতরে যাবার আগে ভাল করে দেখুন। যা জিজ্ঞেস করতে হয় করুন। আপনাদের পছন্দ হলে তবে ত বিয়ে।'

বিনোদ বলে, 'পছন্দ আমাদের হয়ে গেছে। বেশ মেয়ে—চমৎকার মেয়ে।'

ডাক্তার বলে, 'কি যা তা বলছ বিনোদ? বিয়ে করবে কে?'

বিদ্যুৎবাবু সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'আপনি করবেন, আপনারই ত বিয়ে হয়নি। বিপিনবাবুর ত বিয়ে হয়ে গেছে।'

বিনোদ বিদ্যুৎবাবুকে নিয়ে বেশ তামাসা সুরু করে। বলে, 'ওই শোনো, আমার বিয়ে হয়ে গেছে উনি জানেন। কিন্তু আপনি আমাকে বারবার বিপিনবাবু বলছেন, আমার নাম বিনোদ।

'হ্যাঁ—হ্যাঁ বিনোদ! আচ্ছা বিনোদবাবু, আপনি বলুন, মেয়েটি ভাল কি-না।'

—'ভাল বলে ভাল, খুব ভাল।'

ডাক্তার বোঝে বিনোদ তার পিছনে বিদ্যুৎবাবুকে লাগিয়ে দিয়ে মজা করতে চায়।

বিদ্যুৎবাবু বলেন, 'যাক্ পছন্দ যখন হয়েছে, এখন ডাক্তারবাবুর দয়া, নিন কি জিজ্ঞেস্ করবেন করুন।'

বিনোদ বলে, 'নাও ডাক্তার, জিজ্ঞেস্ কর।'

—'আমি কি জিজ্ঞেস করব?

—'বারে, তুমি বিয়ে করবে, তুমিই জিজ্ঞেস্ কর!

—'কে বললে, আমি বিয়ে করব?

বিদ্যুৎবাবুকে দেখিয়ে বিনোদ বলে, 'উনিই ত বলছেন।

—'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি বলছি। আপনি বিয়ে করবেন। এই দেখুন কেমন সুন্দরী মেয়ে। রান্নাবান্না, ঘরের কাজ কর্ম সব করতে পারে। বোবা নয়, কালা নয়, খোঁড়া নয়। শুনুন—বল তোর নাম বল্।

অনেক কষ্টে, বিদ্যুৎবাবুর ধমকে মেয়েটি বলল, আহ্লাদী।'

বিদ্যুৎবাবু মাটিতে লাঠি ঠুকে খিঁচিয়ে ওঠেন। আহ্লাদী তো ডাক নাম। ভাল নাম বল্।'

বাড়িতে ঢুকে গিয়ে আহ্লাদী অতি কষ্টে বলে, শ্রীমতী চন্দনা দেবী।

একপাশে হেসে বিদ্যুৎবাবু তাঁর টাকমুক্ত মাথাটা ঘোরাতে ঘোরাতে বললেন, হুঁ্যা, চন্দনা দেবী। তাই বলে চন্দন নয়, খুব ধীর স্থির হেসে। ভাল ভাল রান্না কি কি রাঁধতে পারিস, বল।'

ভর্তৃপতির রকম দেখে আহ্লাদী কিক্ করে হেসে ফেলে। বলে, জানি না—যাও।'

বিদ্যুৎবাবু ভীষণ চটে যান। 'ধরবদার বলছি, হাসবি না। দেখেছিস? একটি চাড়ে তোর দাঁত আমি—

বিদ্যুৎবাবু সত্যি সত্যিই মারেন আর কি—।

বিনোদ বাধা দিয়ে বলে, 'আচাচা মারবেন না, মারবেন না। দেখুন ত বিয়ে হবে বলে কি বিপদেই ফেলেছেন ওকে। যাও যাও, তুমি ভেতরে যাও।

বিদ্যুৎবাবু বলেন, যাবে কি রকম? যা যা বলব প্রত্যেকটি কথায় করাব হেসে তারপর যাবে। খবরদার বলছি যাবি না।'

ডাক্তার বলে, 'না-না, ওকে আর কষ্ট দেবেন না। বিয়ে আমি করব না।'

কপালের ঘাম মুছে বিদ্যুৎবাবু বলেন, 'তিন তিনটে ওষুধের দোকান। সব কিছুর ইনচার্জ করে দেবো আপনাকে। তাছাড়া আপনি যে বিদেশী লোকের কথা বলছেন, তারও চাকরির ব্যবস্থা করে দেবো। আপনি বসবেন আমার ডাক্তারখানায়।

বিনোদ উস্কানি দেয়, 'ওই শোন ডাক্তার।'

ডাক্তার বলে, 'দেখুন, আপনি যে রকম বলছেন, তাতে আপনার শালীর পাত্রের অভাব হবে না, আপনি অন্য কোথাও চেষ্টা করুন।

বিদ্যুৎবাবু এত সহজে ডাক্তারকে ছাড়তে চান না। বলেন, 'তা আমি জানি। কিন্তু আমি ঠিক আপনার মত একজন ডাক্তার চাই।'

বিনোদ মিটমিটে শয়তানের মত মিটমিট করে বলে, 'সাধে কি উনি তোমাকে ধরেছেন? উনি ডাক্তার চান। ডাক্তার যখন চান, তখন তোমাকেই বিয়ে করতে হবে ভাই। কেন মিছিমিছি ওঁকে কষ্ট দিচ্ছ, বলে ফেলো।'

—'না মশাই বিয়ে আমি করব না। আপনি বাড়ী যান।' বলে ডাক্তার তাড়াতাড়ি ভেতরে চলে গেল।

বিনোদ পরমাত্মীয়ের মত বিদ্যুৎবাবুর কানের কাছে মুখে এনে বলে, 'করবে মশাই করবে। আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি দেখুন।' বলে চন্দনাকে বিনোদ বলে, যাও তুমি ভেতরে যাও। লতি। লতি।'

লতিকা সাড়া দেয়, 'যাই।' বলে পাশ কাটিয়ে আসতে গিয়ে ডাক্তারকে পাশ দিয়ে যেতে দেখে বলে, 'রাগ করছেন কেন? এত সুবিধা চাও ছাড়া করতে আছে? এমন সুন্দরী মেয়ে আপনি আর পাবেন কোথায়?

ডাক্তার তার দিকে চেয়ে কিছু না বলে চলে যায়।

লতিকা এসে চন্দনাকে ভেতরে নিয়ে যায়।

বিনোদ বিদ্যুৎবাবুকে বলে, 'আপনি যদি আমাকে আপনার দোকান আর কারখানার ম্যানেজার করে দিতে পারেন, আমি আপনার শালীর বিয়ে দিয়ে দিতে পারি।

—'ও, কাল তাহলে উনি আপনার কথাই বলছিলেন?

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। দেড়শো টাকায় হবে না। দুশো টাকা মাইনে দিতে হবে।

—'দেবো।'

—'বাস, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। কলকাতায় গিয়েই আমি আপনার সঙ্গে দেখা করব। আপনি কিছু ভাববেন না, আমি সব ব্যবস্থা করে দেবো।'

—'প্রথম মাসের মাইনে চাই কি আমি কালই advance করে দিতে পারি।

বিদ্যুৎবাবু পাকাপাকি একটা বন্দোবস্ত করে ফেলে নিশ্চিন্ত থাকতে চান। বিনোদও বলে, 'আমি আপনাকে কথা দিলাম। আজকের মত আপনার শালীকে নিয়ে আপনি বাড়ী চলে যান, ওর বিয়ের জন্যে ভাববেন না।

—'যাক মশাই, আপনি আমাকে বাঁচালেন। ডাক্তার বাবু কি আপনার আত্মীয়-টাত্মীয়?'

—'না না, এমনি বন্ধু লোক। তাহলেও আপনাকে ভাবতে হবে না।

—'ঠিক আছে, কাল আপনার এ্যাডভান্স টাকা আমি দিয়ে যাব। কইরে আহ্লাদী, আয়। হ্যাঁ—আসল কথাটাই যে জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি—আপনারা তাহলে কলকাতায় কিরছেন কখন?

—'আপনি যখন ফিরবেন।'

বিদ্যুৎবাবু খুশী হয়ে শালীকে সঙ্গে নিয়ে চলে যান।

লতিকা চুপি চুপি বিনোদকে জিজ্ঞেস করে, 'এটা কি করলে দাদা? আমি সব শুনেছি।'

—'হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক করেছি। ডাক্তার। ডাক্তার।'

লতিকা বলে, 'দ্যাখোগে যাও রাগ করে বসে আছে। তুমিও যেমন, ওই পুঁচকে মেয়েকে বিয়ে করবে ডাক্তার।'

ডাক্তারকে দেখে বিনোদ বলে, এই যে ডাক্তার, বিয়ে তোমাকে শেষ পর্যন্ত করতেই হলো।'

ডাক্তার বলল, 'বিয়ে যদি ওই মেয়েটাকে করতেই হয়, তাহলে তুমিই আর একবার করে ফেল, তোমার ত বৌ-এর সঙ্গে ভাল বনিবনা হয় না।'

বিনোদ হাসতে হাসতে বলে, 'দেখি চিঠিটা লিখছি। জবাব আসুক, অনুমতি পেলেই করব।'

—'সেই ভাল।' বলে ডাক্তার পাশের ঘরে চলে যায়।

লতিকা বিনোদকে বলে, 'দাদা, কেন তুমি ওই লোকটার সঙ্গে এরকম করলে বলতো? তোমার কথায় উনি বিশ্বাস করে গেলেন—কাল দেখো টাকা নিয়ে এসে হাজির হবেন।'

—'বেশ তো, টাকা নেবো।'

—'তারপর ওই মেয়েটাকে ডাক্তার বিয়ে করবে?'

—'করলেই বা তোর কি? তোর এত মাথাব্যথা কেন?'

বিনোদের ইঙ্গিতে লতিকা লজ্জা পায়। বিনোদ সেটা বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি কথাটা ঘোরাবার জন্যে বলে, 'ডাক্তার না করে আমার শ্যালাশ্বশুর আছে—জগা, তার সঙ্গে জুটিয়ে দেবো।'

জগার কথা মনে হতেই লতিকার হাসি পায়। হাসতে হাসতেই বলে, 'ঠিক বলেছ দাদা, চমৎকার হবে। কিন্তু মেয়ে দেখে তারও যদি পছন্দ না হয়?

—'তার আবার পছন্দ অপছন্দ আছে নাকি। কিন্তু খবরদার, ডাক্তারকে এখন কিছু বলিস নি।

ডাক্তারকে চা দিতে গিয়ে লতিকা বলল, 'ব্যাস, আপনার বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেল। নিন চা খান। ভাববার কিছু নেই। মেয়েটি ভাল।'

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ডাক্তার বলল, 'ঘটক কি করছে?

—'কে, দাদা?

—'হ্যাঁ দাদা, উনিই ত ঘটকালি করছেন।'

—'সেই যে দুশো টাকা দেবে বলেছিল, সেই টাকা দেবার জন্যে দাদাকে ওঁর বাড়ী ডেকে নিয়ে গেল।'

—'সত্যি?

—'হ্যাঁ হ্যাঁ সত্যি। দেখুন আপনি, দাদা বাড়ীতে নেই। যাবার সময় বলে গেল, ডাক্তারকে বলিস নি।'

—'আচ্ছা, এই সব হাসি ঠাট্টা শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে বলতে পারো? তোমার দাদা টাকাও না হয় নিলে, চাকরিও পেলে, কিন্তু শেষ রক্ষা হবে কেমন করে?'

—'আপনি বিয়ে করলেই শেষরক্ষা হয়ে যাবে।'

ডাক্তার একটু হেসে বলল, 'তুমিও শেষ পর্যন্ত পেছনে লাগলে নাকি?'

—'ক্ষতি কি, আর কতকাল বিয়ে না করে থাকবেন?'

—'আমার কথাটা না ভেবে নিজের কথাটা ভাবলেই পারো।'

একটু দূরে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকে লতিকা।

—'কি চুপ করে রইলে যে? তোমার দাদাকে ওই লোকটার কাছ থেকে টাকা নিতে বারণ কর। লোকটা ভাল নয়।'

—'কেন, ও কি করবে?'

—'আমাকে ও অতিষ্ঠ করে তুলবে।'

—'বেশ তো বিয়ে করবেন।'

—'তুমি খুশী হবে?'

লতিকা লজ্জিতভাবে ডাক্তারের দিকে একবার তাকিয়ে চলে যাচ্ছিল।

—ডাক্তার বলে, 'যেওনা, আমার কথার জবাব দিয়ে যাও।'

—'আমার খুশী হওয়া না হওয়ার উপর আপনার বিয়ে নির্ভর করছে?'

—'যদি বলি হ্যাঁ।'

—'বেশ, আমি বলছি আপনি ওকেই বিয়ে করুন আমি খুশী হবো।'

—'বেশ, তাহলে আমিও বলছি, আমি ওকেই বিয়ে করবো।'

—'তবে আর দাদা তার শ্যালাশ্বশুরের সঙ্গে বিয়ের কথা বলতে গেল কেন। আসুক বারণ করে দিচ্ছি।

—'কার সঙ্গে বললে।'

—'বৌদির দাদা, জগা।'

ডাক্তার হাসিতে ফেটে পড়ে বলে, 'জগা।'

'—হা-হা-হা, চমৎকার। ও তোমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল না?'

—'হ্যাঁ, আমাকে চেয়েছিল, আমাদের বাড়ীওয়ালার মেয়ে শান্তিকে চেয়েছিল।

—'কিন্তু কেউ তাকে বিয়ে করলে না। আহা বেচারা! এবার ঠিক হবে।'

বিনোদ এই সময়ে ঘরে ঢুকে বলে, 'কি ঠিক হবে? ডাক্তার, এই দেখ, দুশো টাকা নিয়ে এলাম। কলকাতায় গিয়েই তাহলে প্রথমে তোমার বিয়ের ঠিক করে ফেলি।'

—'কেন রসিকতা করছ? তোমার মামাশ্বশুর জগার সঙ্গেই মানাবে ভাল।'

বিনোদ লতিকার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কে বললে, জগার সঙ্গে বিয়ের ঠিক করেছি?'

লতিকা মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকে।

বিনোদ দুজনকেই শাসায়, একটু বাড়ী থেকে বেরিয়েছি অমনি দুজনে বলাবলি হয়ে গেল? চল তোমরা কলকাতায়, তারপর দেখাচ্ছি মজা।'

বিনোদের মা একা থাকেন। হরিশবাবু আর শান্তিই দেখাশোনা করে। আগের চেয়ে ঘনিষ্টতাও বেড়েছে বিনোদের অসুখ হওয়ার পর থেকে।

—'কই গো বিনোদের মা! কোথায়? বলতে বলতে হরিশ দোতলায় ওঠে।

ঠিক এই সময় হরিশের ডাক কানে গেলেই বিনোদের মা বুঝতে পারেন, বিনোদের চিঠি এসেছে। বললেন 'চিঠি এসেছে?'

—'হ্যাঁ, এই নাও।'

বিনোদের মা সংসারের কাজে ব্যস্ত ছিলেন, বললেন, 'রাখো ওইখানে।'

—'রাখবো কেন? পড় খবরটা শুনি। বিনোদ ত আমাকে চিঠি লিখবে না। কোথাকার কে বাড়ীওয়ালা —তাকে আবার চিঠি লিখতে যাবে কেন? আজকালকার লেখাপড়া জানা ছেলে, আমাদের মত লেকেলে বুড়োদের গ্রাহ্যিই করে না।'

বিনোদের মা বোঝেন, হরিশ কতখানি স্নেহ করে বিনোদকে। তাড়াতাড়ি চিঠি পড়ে বলেন, 'হ্যাঁ, ভাল আছে।

—'আরে ভাল ত থাকবেই। খারাপ থাকবে কেন? তারপর কি লিখছে বল?'

—'লিখছে, খুব ঘুরে বেড়াচ্ছে। শরীর খুব ভালই হয়েছে। আর এই যে লিখেছে, হরিশবাবু আর শান্তি কেমন আছে লিখো। হরিশবাবুকে আমার প্রণাম জানিও।

হরিশ পরম তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'হ্যাঁ, বিনোদ তোমার ভাল ছেলে। এরকম ছেলে আর হয় না। সাধে কি আর ওকে আমি জামাই—বাবলে, ওসব কথা আর কেন? হ্যাঁ ঠাকরাণ, শোনো, শোনো, তোমাকে আসল কথাই ত বলা হয়নি।

—'কি কথা?'

—'শান্তির বিয়ের সব ঠিক করে ফেললাম।'

আনন্দ ও বেদনা দুটোই এক সঙ্গে ফুটে ওঠে হরিশের মুখে। সংসারে ওই একটি মাত্র মেয়ে ছাড়া আর আপনার বলতে কেউ নেই।

—'কোথায় ঠিক করলে?'

—'সে অনেক দূর। নোয়াখালি জেলা। ছেলেটি ভাল। এই মাসেই বিয়ে।'

—'এই মাসে? বিনোদ ফিরে আসবে না?

—'তোমার ত বেশ আক্কেল ঠাকরান! বিনোদ ফিরে আসবে? অসুখ শরীর নিয়ে বিয়ে বাড়ীর ঝামেলার মধ্যে এসে পড়বে? সে ত আর চুপ করে থাকবার ছেলে নয়। শান্তির বিয়ে, কোমরে কাপড় বেঁধে লেগে যাবে কাজ করতে বারণ করলেও শুনবে না। তার চেয়ে আমি বলি কি, বিয়ের খবরটা তাকে দেবোই না। দিলেই ঠিক পালিয়ে আসবে। তুমিও যেন লিখে টিখে দিও না।

—'তা বেশ, বারণ করছ যখন লিখবো না।'

যাবার সময় ফিরে দাঁড়িয়ে হরিশ বলল, 'বিয়েটা তাহলে এইখানেই দিই, না কি বল ঠাকরাণ, মেয়ে বড় হয়েছে।

—'হ্যাঁ বাবা, ছেলে যদি ভাল হয়—'

—'ছেলে ভাল। আমি নিজে দেখলাম তো!'

—'তাহলে দিয়ে দাও।'

বিয়েটা ঠিক করে ফেলে হরিশের মনটা কেমন যেন খুঁত খুঁত করছে। তাই যাকে পাচ্ছে তাকেই জিজ্ঞেস করে ভালমন্দ বুঝে নিচ্ছে। বিনোদের মার সম্মতি আছে জেনে বলল, 'ঠিক বলেছ ঠাকরুণ! তা একটু দূরে হচ্ছে—মোদাখালি জেলা—তা হোক না দূরে। কাছে চাইলেই ত কাছে পাওয়া যায় না।'

—চাইলেই কি পাওয়া যায় বাবা! এই যে আমার লতির জন্যে চাইছি কি কম?

—'দর পেরকাশতির নিরন্ন। তাহলে দিয়েই ফেলি। হোকগে দূরে। না কি বল ঠাকরুণ?

—'হ্যাঁ বাবা, দিয়ে ফেল।'

বিনোদের মার কথা শুনে হরিশ জোর পায়। সমস্ত দুর্ভাবনা ঝেড়ে ফেলতে চায়। বলে, 'ব্যাস্ ব্যাস্ তোমরা দশজনে আশীর্বাদ কর। মেয়ে আমার সুখে থাকলেই হলো। তারপর মেয়েটা চলে যাবে—একাই থাকবো—আর একাই বা কেন? তোমরা ত রয়েছ। তাহলে দিয়েই ফেলি। কি বল ঠাকরুণ?

বিনোদের মা বোঝেন হরিশের অন্তরের বেদনা। কিন্তু সবদিক বিবেচনা করে দেখলে বিয়েটা দেওয়াই উচিৎ। তাই তিনি বললেন, 'হ্যাঁ বাবা দিয়ে দাও।'

'ব্যাস দিয়েই ফেলি।' বলে হরিশ চলে যায় নীচের তলায়।

নন্দাকে দেখে ডাক্তার যেদিন 'টি-বি' বলে রায় দিয়ে গেল। সেদিন থেকে অবিনাশবাবু আর মেঘমালার মনে এক তিল শান্তি নেই। জগা অবশ্য চিরকালই ভাবনা চিন্তা থেকে মুক্ত। ছোট ছেলের মত তার স্বভাব। তাই তার মুখেই শুধু একটু আধটু হাসি দেখা যায়। তাছাড়া এ বাড়ীর সবাই যেন হাসতে ভুলে গেছে।

নন্দা পড়ে থাকে বিছানায়। মেঘমালা তাকে দেখে কাঁদেন! অবিনাশবাবু দিনরাত মনমরা হয়ে থাকেন।

বিনোদের চিঠি এলেই জগা ছুটে নিয়ে আসে নন্দার কাছে।

'এই নে তোর চিঠি। দিদি দেখতে চাচ্ছিল, আমি বাবা চালাক ছেলে! বললাম কিছুতেই দেখবে না, নন্দা রাগ করবে। তোর সেই ঠাকুরঝি লতিকাও ত জামাইয়ের সংগে আছে, তার কথা কিছু লিখেছে?

এখনো লতিকাকে ভুলতে পারেনি জগা মামা। নন্দা শুয়ে শুয়ে চিঠি পড়ে। জগাকে বলে হ্যাঁ লিখেছে। তুমি কি চিঠিটা খুলে পড়েছ নাকি?

জগা জিভ্ কেটে বলে, 'না। মাইরি বলছি, খামের চিঠি খুলবো কেমন করে?'

চিঠি পড়তে পড়তে নন্দা হাত নেড়ে জানায়। বলে, 'তোমার আর কোন আশা নেই মামা।'

—'কেন? কি হলো?'

—'আমার ঠাকুরঝির বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেছে।'

—'কার সংগে?'

—'ডাক্তারের সংগে।'

'—হুঁ।' —বলে খুব গম্ভীর হয়ে পড়ে জগা।

অতি দুঃখেও নন্দা যা একটু হাসতে পারে এই জগার জন্যে। বলে, 'অমনি তোমার মুখ ভার হয়ে গেল? তুমি যে বলেছিলে ওদের বাড়ীতে বিয়ে করবে না।'

—হ্যাঁ—হ্যাঁ, করবই না তো। ওর দাদার টিবি—

নন্দা বোঝে, জগা মামা ওপরে যাই-ই বলুক, বেশ একটু আঘাত পেয়েছে লতিকার বিয়ের কথা শুনে। তার দুঃখে, তার অবস্থা দেখে নন্দার হাসি পায়। কিন্তু হাসলে হয়ত বিপত্তি ঘটতে পারে। যেটুকু উপকার জগাকে দিয়ে পাওয়া যায়, সেটুকু আর পাবার সম্ভাবনা থাকবে না। তাই শুধু বলে, 'টি-বি ত আমারও হয়েছে, কই তুমি ভয় পাচ্ছ না তো?

—'তুই ঘরের লোক। তোর কথা আলাদা।'

—'ওর দাদার অসুখ ত ভাল হয়ে গেছে। এই ত লিখেছে—শীগগির ফিরে আসবে কলকাতায়।'

—'তাহলে বিয়ে করা চলে? আর দাদার টি-বি হলো ত ওর কি, না কি বল?'

অতি কষ্টে হাসি চেপে নন্দা বলে, 'হ্যাঁ।'

জগা মোলায়েম সুরে প্রশ্ন করে, 'তবে যে বলছি, বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেছে ডাক্তারের সংগে?'

—ঠিকই না হয় হয়েছে। বিয়ে ত হয়নি।

এখনও তাহলে আশা আছে জেনে জগা আনন্দে নেচে ওঠে। বলে, 'তাহলে আসুক, তোর শাশুড়ীকে আর একবার—তুই যখন সেরে উঠবি, আমার বলার

চেয়ে তুই যদি জোর করে বলিস। থাক্ আর তোর সঙ্গে বেশী কথা বলব না। ডাক্তার বারণ করে গেছে, দিদি দেখতে পেলে বকবে। —ওই ত দিদি আসছে।

মেঘমালাদেবী জগাকে চিঠি নিয়ে চুকতে দেখেছিলেন। বললেন, 'হ্যাঁরে নন্দা, বিনোদ চিঠি লিখেছে?'

চিঠিখানা অন্য অনেক চিঠির সঙ্গে বালিশের তলায় রেখে দিয়ে নন্দা বলে, 'হ্যাঁ।'

—'তোর অসুখের খবর সে জানে?'

এতদিন হয়ে গেল নন্দার শ্বশুরবাড়ী থেকে কেউ খবর নিতে আসে না দেখে মেঘমালাদেবীর একটু সন্দেহ হয়েছিল, বোধ হয় নন্দা তার অসুখের খবর তাদের জানায় নি। তাই জিজ্ঞেস করলেন, 'তুই তোর অসুখের খবর জানাসনি তাদের?

নন্দা নির্বিকার ভাবে বলল, 'না, জানাই নি।'

মেঘমালা দেবী নন্দার এ কাজটা সমর্থন করতে পারেন না। নন্দা যখন ইচ্ছে করেই জানাবে না বুঝলেন, তখন বললেন, 'কিন্তু আমাদের ত' একটা খবর দেওয়া উচিৎ। দে, ঠিকানা দে।'

—'না।'

—'এটা কিন্তু ভাল হচ্ছে না নন্দা। মেয়েদের এত জেদ ভাল নয়।'

—'তা হোক, তুমি যাবো।'

—'প্রায়ই ত' চিঠি আসছে দেখছি, তোকে ত' কোনদিন জবাব লিখতে দেখি না।'

নন্দা শুকনো গলায় জবাব দেয়, 'না।'

মেঘমালা দেবী অবাক হয়ে বলেন, 'না কিরে! তুই নিজে লিখতে না পারিস, জগাকে দিয়ে না হয়, তুই ভাল আছিস এই খবরটাই লিখিয়ে দে।'

মার পীড়াপীড়িতে নন্দাকে তার মনের কথা বলতে হয়। মিনতি করে বলে, 'না মা, না। চিঠি পেলেই সে চলে আসবে। অনেক কষ্টে তাকে বাঁচিয়েছি। এখন সে ফিরে আসবার আগেই আমি যাতে চলে যেতে পারি সেই আশীর্বাদই কর।'

—'বালাই ষাট্। কি যা তা বলছিস তার ঠিক নেই। ডাক্তার বলেছে, আর মাসখানেকের মধ্যেই তুই সেরে উঠবি।'

নন্দা বিশ্বাস করে না যে সে আর সেরে উঠবে। বিনোদকে সেবা করে সারিয়ে তুলেছে নন্দা। এ রোগের প্রতিটি উপসর্গ তার পরিচিত। নিজের দিন দিন শুকিয়ে যাওয়া শরীরের দিকে তাকিয়ে বাঁচার আশা সে ছেড়েই দিয়েছে। তাতে দুঃখ নেই। বিনোদকে সে সারিয়ে তুলেছে, সেই আনন্দেই ভুলেছে তার সব জ্বালা যন্ত্রণা, মরণের ভয়। আজ বিনোদ সেরে উঠেছে। মনের আনন্দে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই আগেকার সুন্দর চেহারা তার, হয় ত' আরও সুন্দর হয়েছে। হয় ত' সে ভাবছে। নন্দা রাগ করে চিঠি দেয় না। কিন্তু সে যদি জানতো, তার নন্দা মৃত্যু-শয্যায়।...আর ভাবতে পারে না নন্দা, গলায় কেমন একটা অব্যক্ত ব্যথা অনুভব করে আর চোখ দু'টো জলে ভরে আসে।

নন্দার অসুখ দিনের পর দিন বেড়েই চলে। নন্দা বোঝে সবই। ডাক্তার আশ্বাস দেয়। বাবা-মা সান্ত্বনা দেন। নন্দা শুধু চুপ করে থাকে। এক একটা দিন কাটে, মনে হয় যেন এক একটা যুগ পার হলো। মৃত্যু তার হবেই জেনেও বিনোদকে জানাতে চায় না তার অসুখের কথা। নিয়মিত বিনোদের চিঠি আসে, সেগুলো জমা হয় নন্দার বালিশের তলায়। নন্দা সেগুলো বার বার পড়ে আর নিজের কথা জানাতে না পারার দুঃখে তার বুক ভেঙ্গে যায়। ভাবে, এখন হয় ত' সে জানে আমি রাগ করে উত্তর দিই না। কিন্তু যখন জানবে···? ক্ষতি কি? আমি ত' তখন অনেক দূরে চলে যাব।

সব আশা-আকাঙ্ক্ষার শেষ করে দিয়ে নন্দা শুধু মৃত্যুর দিন গুনতে থাকে।

এদিকে শান্তির বিয়ে দিয়ে একতিল শান্তি নেই হরিশ বাড়ুয্যের। বাড়িটাও ফাঁকা হয়ে গেছে, সেই সঙ্গে তার বুকটাও। দু'জনেই এত বড় বাড়িটাকে তারা সর-গরম করে রাখতো সব সময়।

শান্তি শ্বশুর বাড়ি চলে গেছে। হরিশকে বকাবকি করবার কেউ নেই। সেবা করবারও কেউ নেই। শান্তি চলে গেলে হরিশের বুকটা যে এমন ভাবে খালি যাবে এতটা সে ভাবেনি।

সব সময়েই চোখের সামনে ঘুরে বেড়াত শান্তি। সে থাকতে কোন কাজ করতে দিত না হরিশকে। একটু ব্যথা

বরলে, তার চিন্তার শেষ থাকতো না। সেই শান্তি আজ···

হরিশ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে ভাতের হাড়িটার জল ঢেলে, হুঁকো নিয়ে বসলো উনোনের পাশে।

এমন সময় কে যেন ডাকলো বাইরে থেকে, 'হরিশবাবু! হরিশবাবু!'

হরিশ তাড়াতাড়ি হুঁকো রেখে দরজা খুলতে যাবে, হঠাৎ নজর পড়লো ভাতের হাড়িটার ওপর। কোন সময় তার তলাটা ফেঁসে গেছে, জল দিতে গিয়েও টের পায়নি হরিশ এমন তার মনের অবস্থা। উনোনটা যে কখন নিভে গেছে কে জানে। এবেলা আর অদৃষ্টে ভাত নেই দেখছি। যাকগে চিঁড়ে খেয়েই থাকা যাবে।

বিরক্ত হয়ে আপন মনে গজগজ করতে করতেই দরজা খোলে হরিশ। কিন্তু সামনে বিনোদকে দেখে আনন্দে ফেটে পড়ে।

—'আরে, তুমি এসেছ? এরই মধ্যে চলে এলে! বা-বা-বা-বা! বেশ! বেশ! একেবারে ভাল হয়ে গেছ, কেমন? এসো এসো, তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।'—বলে বিনোদের হাত ধরে টানতে টানতে রান্নাঘরের ভেতরে নিয়ে গেল।

বিনোদ দেখলো, উনোনের উপর চড়ানো হাড়িটার চাল জল সব উনোনে পড়ে নিভে গেছে।

বিনোদ কিছু না বলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইল হরিশের মুখের দিকে।

হরিশ বলল, 'ও ওরকম আজকাল প্রায়ই হয়। বহুদিন ত' নিজের হাতে রান্না-বান্না করিনি। তার ওপর মনটা···

—'শান্তি কোথায়?'

—'তবে আর বলছি কি? বোসো। নেমন্তন্ন-চিঠিটা আমি ইচ্ছে করেই পাঠাইনি। আমি ত' জানি শান্তির বিয়ের চিঠি পেলে তুমি ছুটে চলে আসবে।

—'সে কি! শান্তির বিয়ে হয়ে গেছে?

—'নোয়াখালী জানো? নোয়াখালী! বহুৎ দূর! ট্রেন—তারপর ইস্টিমার—তারপর নৌকো—তারপর হাঁটা সে কি আর কাছে রে বাবা। মেয়েটাকে পার করে দিয়েছি একেবারে সাত-সমুদ্দুর তেরো নদীর পার। একাই আছি বাড়িতে। তা মেয়ে আর কার বাড়িতে চিরদিন থাকে বল!

বিনোদ এই কথা ক'টিতেই বুঝলো, হরিশের বুকে কত ব্যথা। শান্তি চলে যাওয়াতে কতখানি আঘাত পেয়েছে সে।

হরিশ চুপ করে আছে। বিনোদ বলল, 'তা জামাই কেমন হল?

হরিশ বলল, 'নোয়াখালির মস্ত বড় জমিদার।'

—'জমিদার?'

—'আহা, শোনোই না! জমিদারীর শরিক—মানে দু'আনির অংশীদার।

—'তা হোক, জমিদার তো?'

—'না—না, জমিদারের নায়েব।

—'নায়েব! তা হোক।'

—'হোক বললেই হোক। নায়েবের ছোট ছেলে।'

—'ছেলেটি কি করে?'

—'করবে আবার কি! কিছু করে না! মাথার ওপর বাপ আছে, দাদা আছে, আর আমি ত' আছিই।'

—'তা বেশ করেছেন। আসুন—আপনাকে আর রান্না করতে হবে না, আপনি আমাদের ওখানেই যাবেন।'

হরিশ আবেগে জড়িয়ে ধরে বিনোদকে। বলে, 'জানি জানি, আপন মনেই বলছিলাম—বিনোদ এলে কি আমাকে রেঁধে খেতে দেবে! চল, তোমার ছেলের কথা শুনি।

বিনোদ কলকাতায় পৌঁছেই বি-বি-বি এণ্ড কোম্পানীর সঙ্গে পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে ফেলেছে। সতিকার বিয়ের কথাবার্তাও পাকা। এখন আর একদণ্ড কুরসৎ নেই তার। নন্দাকেও এবার যেমন করেই হোক তার রাগ ভাঙিয়ে নিয়ে আসতে হবে।

বিনোদের মাও বললেন, 'আর রাগ করে থাকিস না বাবা, চাকরি পেয়েছিস, সতির বিয়ের ঠিক করেছিস এবার বৌমাকে নিয়ে আয়।'

নন্দাকে যে বিনোদ কতদিন আগে জানিয়েছে সে খবর আর মা কি করে জানবেন। বিনোদ বলল, 'খবর ত' জানাচ্ছি মা, কিন্তু সে আমাদের ওপর রাগ করে বসে আছে যে।'

—'তাহলে কি করবি? নিজে একবার যাবি?' বিনোদ তাকে চিঠি ফেলতেই যাচ্ছিল, বলল, 'দাঁড়াও, এই চিঠিটার জবাব আসে কিনা দেখি।

বলে বিনোদ চলে গেল। সিঁড়িতে হরিশের সঙ্গে

দেখা। বিনোদ এসে অবধি খুব বেশী ছুটোছুটি করছে হরিণ সেটা লক্ষ্য করছে। এই রোদের সময় আবার তাকে বেরুতে দেখে বলল, 'আরে যাও কোথায়? এই রোদ্দুরে মাথায় দিয়ে হন্ হন্ করে যাও কোথায়?'

—'এই চিঠি খানা পোস্ট করে আসি।'

—'তা ছাতি নেই বাড়িতে?'

—'ছাতি আর কোথায় কিনলাম।'

—'এই অসুখ থেকে সেরে উঠলে, এখন এত খাটা-খাটনী।...আমি ত' রয়েছি, আমাকে বললেই ত' পার। কার চিঠি?'—বলে বিনোদকে চুপ করে থাকতে দেখে বলল, বৌমার? ভাল, ভাল। এবার বৌমাকে নিয়ে এসো। কিন্তু তুমি কি চিরকাল ছেলেমানুষ থাকবে? আরে মেয়েরা চিঠি লিখলে আসে কখনো? শান্তিকে তিন তিন খানা চিঠি লিখেছি—আসছে? নিজে যেতে হবে, বুঝলে? নিজে যেতে হবে।'

—'কিন্তু—'

—'এর মধ্যে কিন্তু নেই। আমি সব জানি। বৌমা রাগ করে চলে গেছে, তোমার সেখানে যেতে কেমন কেমন লাগছে, আমি সব বুঝি। তা তুমি যাবে কেন, আমি তোমার গার্জেন রয়েছি, আমি যাব। তুমি কিছু ভেবোনা, আমি ঠিক তাকে ধরে নিয়ে আসবো। ওই চিঠিটা আমায় দাও।' বলে চিঠিখানা বিনোদের হাত থেকে খপ করে নিয়ে বলল, 'আরে টিকিট মেরেছ যে। ঠিক আছে, ও আমি তুলে নেবো। যাও, তুমি ঘরে যাও। রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে থেকোনা। যাও বলে হরিণ আর একমুহূর্ত দাঁড়াল না। বিনোদ কি যেন বলতে যাচ্ছিল কিন্তু হরিণ তখন বাড়ির বাইরে চলে গেছে।

অবিনাশবাবুর বাড়িতে এসে পৌঁছল হরিণ। এই রোদ মাথায় করে এসে যেন হাঁপিয়ে উঠেছে সে, ঘামে সব জামাটা ভিজে গেছে। বাইরের ঘরে ঢুকে কাউকে দেখতে না পেয়ে ডাকাডাকি সুরু করল। তাতেও কোন সাড়া না পেয়ে রাগ হলো তার। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'মেয়ে পাঠাবে না শ্বশুর বাড়ি। একি একটা কথা হলো নাকি? আমি যখন বলেছি নিয়ে যাব তখন মেয়ে আমি নিয়ে যাবই। কে আছে—বাড়িতে কে আছে! বাড়ি সাজিয়েছে, মেয়েকে আটকে রেখে, আবার বাড়ি সাজিয়েছে। ও মশাই—তবু কোন সাড়া শব্দ নেই। বাড়িতে কি লোকজন নেই?' কট করে ভেতরেও ত' ঢোকা যায় না। তাকেই বা কে?

আবার চিৎকার করতে সুরু করে হরিণ, ওঃ, বাড়ি! মেয়েকে যে শ্বশুর বাড়ি পাঠায় না, তার আবার বাড়ি! আমারও বাড়ি আছে। আমারও বাবার বাড়ি—

চেঁচামেচি শুনে চাকরটা বেরিয়ে আসে এতক্ষণে। তিরিক্ষি মেজাজে হরিণ বলে, তুমি কে হে?

চাকরটা হরিণের রকম-সকম দেখে ভড়কে যায়। বোকার মত খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করে, 'আপনি কে?'

—আমি যে-ই হই না, তোমার বাবু কোথায়?

বলতে বলতেই অবিনাশবাবু এসে পড়েন।

'এই যে আমি। কি বলছেন?'

অবিনাশবাবুকে পায় থেকে মাথা পর্যন্ত ভাল করে একবার দেখে নিয়ে হরিণ বলল, 'আপনিই ত অবিনাশ-বাবু, মানে আমাদের বিনোদের শ্বশুর।'

—'হ্যাঁ। কেন?'

—বলি, জামাই এল চেন্নাই থেকে ফিরে আর মেয়েকে নিয়ে বসে আছেন চুপটি করে। আমি আপনার মেয়ে, মানে আমার বৌমাকে নিতে এসেছি। এক্ষুণি আমার সঙ্গে তাকে পাঠাতে হবে। না নিয়ে আমি উঠছি না, এই বসলুম।'

অবিনাশবাবুকে রীতিমত হকচকিয়ে দিয়ে হরিণ নিজেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ে।

অবিনাশবাবু জানেন বিনোদের গার্জেন বলতে কেউ নেই। ইনি তা হলে কে? নিজের লোক ছাড়া ত কেউ এভাবে কথা বলতে পারে না। জিজ্ঞেস করতে বাধ বাধ লাগে।

—'আমার মেয়েকে নিতে এসেছেন!'

—'হ্যাঁ।'

—'বিনোদের বাড়ি থেকে এসেছেন?'

—'বিনোদের বাড়ি মানে? আমার বাড়ি। আমি বিনোদের বাড়িওয়ালা। আমি তার গার্জেন।

অবিনাশবাবু কি ভাবলেন তারপর বললেন, 'আসুন

আমার সঙ্গে।' বলে হরিণকে সঙ্গে করে নিয়ে যান নন্দার ঘরে।

নন্দা নিঝুম হয়ে বিছানার সঙ্গে মিশিয়ে আছে।

ভাঙ্গা গলায় বললেন অবিনাশবাবু 'ওই দেখুন।'

হরিণ বিস্মিত ভাবে চেয়ে থাকে নন্দার দিকে। কিছুক্ষণ কোন কথা বেরোয় না তার মুখ দিয়ে। একি চেহারা হয়েছে নন্দার! বিনোদের সৌরের এত অসুখ, অথচ ওরা তো কেউ জানে না।

হরিণ অস্ফুটে উচ্চারণ করে, 'ও অসুখ?'

– 'হ্যাঁ, টি-বি।'

–টি-বি! কিন্তু ওরা ত কেউ জানে না।

–'মা। নন্দা বারণ করেছিল জানাতে।' অবিনাশ-বাবু আর কিছু বলতে পারেন না, কান্নায় তার কণ্ঠরোধ হয়ে আসে।

হরিণ কি করবে কিছুই ভেবে পায় না। বেশ কিছুক্ষণ নন্দার দিকে তাকিয়ে থেকে এক সময় চলে যায় সেখান থেকে।

নন্দা এখন ওঠা বসার শক্তি হারিয়েছে। কথাও বেশী বলতে পারে না। পাশ ফিরতেও কষ্ট হয়। কঙ্কালসার দেহ বিছানার সঙ্গে যেন মিশে গেছে। সব সময়েই চুপচাপ পড়ে থাকে। শুধু মাঝে মাঝে মেঘমালাদেবীকে কাছে পেলে ধীরে ধীরে অতি কষ্টে জড়িয়ে জড়িয়ে বলে, 'মা, সে কি এলো?

–'কে মা?–' বলে মেঘমালা চেয়ে থাকে তার মুখের দিকে।

নন্দা আর কোন কথা বলে না। মনে হয় যেন সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

মেঘমালা ডাকেন। 'নন্দা! নন্দা!'

– 'উঁ।'

–'কার কথা বলছিলি মা? কে আসবে?

–'কেউ না।'—বলে একটু থেমে আবার বলে, 'ও সে এলো না।'

–'বিনোদকে ডেকে পাঠাব?'

নন্দা যেন চিৎকার করে বলতে চায় 'না, না' কিন্তু সে ক্ষমতা আজ নেই। অস্ফুট স্বর শুধু বেরিয়ে আসে, 'মা'।

আবার কিছুক্ষণ পরে নন্দা ডাকে, 'মা'।

–'কি মা?' বলে মেঘমালা আবার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে নন্দার মুখের পানে।

নন্দা কোন কথা বলে না।

মেঘমালা তার চিবুক ধরে নিজের দিকে তার মুখ ফিরিয়ে ডাকেন 'নন্দা'।

নন্দা কোন উত্তর দেয় না। একবার চোখ মেলে আবার ধীরে ধীরে বন্ধ করে।

মেঘমালা আবার ডাকেন, 'নন্দা! নন্দা! কিছু বলছিস মা?'

–'না'।–বলতেই আবার কাশি সুরু হয় নন্দার।

মেঘমালা আবার বলেন, 'বিনোদকে ডেকে পাঠাই?' বলে আর উত্তরের অপেক্ষা না করে জগাকে চোখের ইশারায় ডেকে নিয়ে যান মেঘমালা।

হরিণ বাড়ুজ্যে যখন হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বিনোদের ঘরে পৌঁছল, বিনোদ তখন নন্দার সম্বন্ধেই আলোচনা করছিল ডাক্তারের সঙ্গে।

হরিণ হন্তদন্ত হয়ে এসেই বলল, 'এসো।'

ডাক্তার, বিনোদ দুজনেই অবাক। হরিণের অবস্থা দেখে তারাও ব্যস্ত হয়ে উঠল।

বিনোদ বলল, 'কোথায়?

হরিণের এখন অন্য কথা বলবার অবসর নেই, ঝপ করে বিনোদের হাত ধরে বলল, 'এসো এসো শীগগির আমার সঙ্গে এসো।

বিনোদ ভাবল, বুঝি অবিনাশবাবু বা নন্দার সঙ্গে হরিণের ঝগড়া হয়েছে। বলল, 'ও, আমি না গেলে বুঝি আদবে না?'

—'না, ডাক্তার, তুমিও এসো।'

বিনোদ বা ডাক্তার কিছুই ভালভাবে বুঝতে পারল না। হরিণের ব্যস্ততা দেখে এইটাই শুধু বুঝল কিছু একটা ঘটেছে। তারা আর কোন প্রশ্ন না করে হরিণের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল।

নন্দার অবস্থা তখন অত্যন্ত খারাপ। বড় বড় ডাক্তার এসেছেন দুজন। তাঁরা পরীক্ষা করছেন অবিনাশবাবু ও মেঘমালা চেয়ে আছেন তাঁদের মুখের দিকে।

অবিনাশবাবু ডাক্তারদের ভাব গতিক দেখেই বুঝলেন আর কোন আশা নেই।

নন্দা তখনও মাঝে মাঝে বলছে, 'তুমি এসেছো ?

মেঘমালা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'আসছে মা আসছে আমি বিনোদকে খবর পাঠিয়েছি।

নন্দার সে কথায় কান নেই, সে আপন মনেই বলে চলেছে। 'না—না—না না, আমার কাছে এসো না, আমি অনেক কষ্টে তোমাকে বাঁচিয়ে তুলেছি। তুমি এসো না—

নন্দা আরও অনেক কথাই বলে চলে। কিন্তু তা এত অস্পষ্ট যে, বোঝা যায় না। শুধু শোনা যায় না-না-না-না।

এক সময় হঠাৎ যেন তার তন্দ্রা ভাঙ্গলো। চারিদিকে চেয়ে ব্যাকুলভাবে কি যেন, কাকে যেন খুঁজছে সে।

কি যেন বলতে চায় সে কিন্তু গলার স্বর বেরোয় না।

তার এদিক ওদিক তাকানো দেখে অবিনাশবাবু মেঘমালা তার দু'পাশে এসে বসেন।

মেঘমালা বললেন, 'কি বলবি মা বল, এই ত আমরা রয়েছি।

নন্দা তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। অবিনাশ বাবু সস্নেহে তাকে জড়িয়ে ধরে বলেন, আমাকে কিছু বলবি মা ?

নন্দা তাঁর দিক থেকেও দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। কাউকে কিছু বলে না নন্দা, ধীরে ধীরে তার চোখ দুটো বন্ধ হয়ে যায়। আবার শুরু হয় বুক ভাঙ্গা কান্না।

স্থির থাকতে পারেন না অবিনাশ আর মেঘমালা। নন্দার অবস্থা দেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন।

জগাকে কেউ কখনো কাঁদতে দেখেনি, সেও আজ না কেঁদে থাকতে পারছে না।

বিনোদ ঘরে ঢুকে স্তম্ভিত হয়ে গেল। পৃথিবীটা যেন সরে যাচ্ছে তার পায়ের তলা থেকে। বুকটা দু-দু করে উঠলো তার। ছুটে গেল নন্দার বিছানায়। জড়িয়ে ধরল নন্দাকে প্রাণের সবটুকু আবেগ দিয়ে। 'নন্দা! নন্দা! আমি এসেছি নন্দা, আমি তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি নন্দা!' বলেই সে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল।

অতিকষ্টে নন্দা চোখ মেলে চাইল তার মুখের দিকে, কিন্তু সব ঝাপসা সব অন্ধকার। শুধু তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল দুটি কথা, 'মা, ও এলো মা!'

ব্যাকুল হয়ে বিনোদ তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'আমি এসেছি আমি এসেছি নন্দা।

একি হলো ? নন্দা যে দেখতে চায়, শুনতে চায়, অনুভব করতে চায়। কিন্তু কোথা তার সে শক্তি ? কে কেড়ে নিল ? এযে অন্ধকার, বিশ্বব্যাপী ঘোর অন্ধকার।

—'কৈ মা, কোথা সে ? আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না—আলোগুলো জ্বেলে দাও, দরজা জানালা খুলে দাও—উঃ কি অন্ধকার, অন্ধকার।

বিনোদ বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে ডাকে, 'নন্দা! নন্দা!

বিনোদের ডাক এতক্ষণে কানে যায় নন্দার।

পরম তৃপ্তির আনন্দ ভেসে ওঠে তার মুখে।

—'তুমি এসেছো ? মা, আমার বাবার কাপড়টা তুলে দাও তো।—ওগো, তুমি আর কখনো আমায় তাড়িয়ে দিও না, আমি আর কখনো ঝগড়া করব না, আমি খুব ভাল হয়ে থাকবো। তুমি আমাকে তাড়িয়ে দেবে না বল—

নন্দার প্রতিটি কথায় বিনোদের যেন এক একটা করে পাঁজরা খসে পড়ছে। মুখে তার কথা নেই। দু'চোখ বেয়ে শুধু অশ্রুর ধারা।

নন্দা এতক্ষণ বেঁচে ছিল শুধু একবার তাকে দেখবার জন্যে আর এই কথাগুলো বলবার জন্যে। তার কাজ শেষ হয়েছে। আরও কিছু হয়ত বলতো কিন্তু কে যেন এসে তার বলা চাওয়া সব বন্ধ করে দিল। তার ক্ষীণ কণ্ঠ স্বর ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। গভীর শান্তি তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিল যেন। চলে গেল নন্দা। আর আসবে না। কাল থেকে আর সারা পৃথিবী খুঁজলেও পাওয়া যাবে না তাকে।

বিনোদ তার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ডুকরে কেঁদে উঠল।

—'নন্দা সাড়া দাও, কথা কও! আমি তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছিলাম।'

কিন্তু কোথায় নন্দা ? কে শুনবে তার কথা, কে যাবে তার সঙ্গে তার ঘরের লক্ষ্মী হয়ে ? নন্দা চলে গেছে একা—দূরে—বহু দূরে,—শত চিৎকারেও বিনোদের কথা সে আর শুনতে পাবে না।

— শেষ —

প্রাচীন আফ্রিকার সভ্যতা

অরুণ চট্টোপাধ্যায়

উনবিংশ শতকে উদীয়মান সাম্রাজ্যবাদের যুগে যে কয়জন সাহিত্যিক তদানীন্তন কালের বিবেক হিসেবে বিশ্বস্বীকৃতি লাভ করেন তাঁদের মধ্যে মার্ক টোয়েন অন্যতম। সাম্রাজ্যবাদের সংগে কেতাবী পরিচয় তাঁর ছিল না, লেনিনের সংগেও তাঁর জানা শোনা হয়নি। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদকে তিনি চিনেছিলেন এবং তিনি নিজেকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বলে ঘোষণা করেছেন। মার্কিন কোটিপতি মর্গ্যান ও রকফেলার বেলজিয়্যান রাজা লিওপোল্ডের কংগো ব্যবসা খরিদ করে নেওয়ার কিছুদিন পরে মার্কটোয়েন ১৮৯৭ সালে "বিবুরেখার অনুসরণে" নামে একটি ভ্রমণকাহিনী প্রকাশ করেন। সেই বইএর এক জায়গায় তিনি লিখছেন—

"বহু দেশে আমরা বর্বরকে বেড়ী দিয়ে বেঁধে অনাহারে রেখে হত্যা করেছি···বহু দেশে আমরা বর্বরকে খুঁটিতে বেঁধে পুড়িয়ে মেরেছি···তাকে এবং তার ছেলেমেয়ে ও মাকে কুকুর আর বন্দুক নিয়ে ধাওয়া করেছি···বহু দেশে আমরা বর্বরের জমি কেড়ে নিয়ে তাকে ক্রীতদাস বানিয়েছি, প্রতিদিন তাকে চাবুকে মেরেছি, তাকে আত্মসম্মান থেকে এমনভাবে বঞ্চিত করেছি যে মরণ ছাড়া তার আর আপনার জন কেউ থাকেনি··· খাটতে খাটতে যতক্ষণ তার প্রাণহীন দেহ ধুলোয় লুটিয়ে না পড়ে ততক্ষণ তাকে খাটিয়েছি।···দুনিয়ার যে বহু মজার জিনিষ আছে সেগুলির একটি হচ্ছে শ্বেতাঙ্গের ধারণা যে সে অন্য বর্বরদের চেয়ে কম বর্বর।"

এই 'মজার' ধারণার বশে শ্বেতাঙ্গরা বরাবর আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদের হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে আসছে। তাদের যে অতীতের কোন যুগে সভ্যতা ও সংস্কৃতি থেকে থাকতে পারে তা অস্বীকার করে এসেছে। এইসব অর্থলোলুপ উপনিবেশবাদীরা এই কথাই প্রচার করে আসছে যে শ্বেতাঙ্গদের পবিত্র পদধূলি পড়ার আগে আফ্রিকা ছিল এক অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ, মানবজাতির এক অসভ্য বর্বর অংশের পশুবর্বর্জিত বাসভূমি। শ্বেতাঙ্গদের আফ্রিকা বিজয়ের বদ্যাণে তাদের মতে আফ্রিকা ও আফ্রিকাতিগুলি নাকি উদ্ধার হয়ে গিয়েছে। ইউরোপীয় শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদ পোর্তুগীজ বণিকের আবির্ভাবের আগে আফ্রিকার কোন রকম সভ্যতার অস্তিত্ব স্বীকার করতে চায়নি।

শ্বেতাঙ্গ প্রভুজাতিগুলির এই মিথ্যা প্রচারের জলজ্যান্ত প্রমাণ হিসেবে এই প্রবন্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের জাতিবিদ্বেষ বিষাক্ত উপনিবেশ দক্ষিণ আফ্রিকার আদিম বান্টুজাতির ইতিহাসের উল্লেখ করা যেতে পারে। বান্টুজাতির আদিম সভ্যতার কথা এতদিন শ্বেতাঙ্গ ইতিহাসবেত্তা ও পুরাতাত্ত্বিকেরা স্বীকার করেন নি।

আমাদের ভারতবর্ষেও ব্রিটিশরা একই রকম আচরণ করেছিল। আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তারা আমাদের মনে অবজ্ঞা সৃষ্টি করার জন্য কম চেষ্টা করেনি। লর্ড মেকলে আরবী ও সংস্কৃত সাহিত্যকে ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন—"এক শেলফ্ ভাল ইংরাজী সাহিত্যের মূল্য ভারত ও আরবের সমগ্র সাহিত্যের সমান।" বিদেশী প্রভু ও তাঁদের মিশনারী তল্পিবাহকরা এইটেই আমাদের মনে গেঁথে দিতে চেয়েছিলেন যে পাশ্চাত্যের সবকিছুই ভাল, প্রাচ্যের সবকিছুই খারাপ।

আজকে যে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় ও কাফ্রি জাতি শ্বেতাঙ্গদের জাতিবিদ্বেষের অত্যাচারে জর্জরিত সেই দক্ষিণ আফ্রিকার সংগে ভারতের যোগসূত্র আজকের নয়। প্রায় আদিমকাল থেকেই বলা চলে আফ্রিকার বান্টুজাতির সংগে আমাদের সম্পর্ক। এই বান্টুজাতির

আমাদের দেশের তাঁতিদের মত শুধু বুড়ো আঙুল নয়, গোটা হাত কাটা গেছে সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচারে।

প্রাচীন সভ্যতা এবং ভারতের সঙ্গে তাদের আদান প্রদানের সম্পর্কে হালে পুরাতাত্ত্বিকেরা বহু তথ্য আবিষ্কার করেছেন।

ইতিহাসে দক্ষিণ আফ্রিকার বান্টু সভ্যতার আবির্ভাব, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণা রাজ্যগুলিতে গৃহযুদ্ধপূর্ব সভ্যতার আবির্ভাবের সঙ্গে তুলনীয়। অথচ প্রতীচ্যের পণ্ডিতরা বলতে চেয়েছেন যে পঞ্চদশ শতকে পর্তুগীজদের আবির্ভাবের আগে তাদের কোন ইতিহাসই খুঁজে পাওয়া যায় না। মাত্র শ'তিনেক বছর আগে তারা নাকি জঘন্যতর অবস্থায় লাম্বেসি নদী পার হয়ে সেখানে আসে। পঞ্চদশ শতকে পর্তুগীজরা ভারতে ও প্রাচ্যে মশলা উৎপাদক দ্বীপগুলিতে যাবার জলপথের সন্ধানে বার হয়ে নাকি আফ্রিকার লঙ্গর ফেলে এই বান্টু জাতিটিকে আবিষ্কার করে।

উপনিবেশলোভী শ্বেতাঙ্গ বণিকেরা দুনিয়ার সামনে দক্ষিণ আফ্রিকার এই আদিম অধিবাসীদের পশ্চাদপদ করার সাফাই দেবার জন্যে, তাদের অসভ্য বর্বরতা, অদ্ভুত আচার বিচার ইত্যাদি নানারকম আজগুবি গল্প ফাঁদে। বান্টুদের দেশ আত্মসাৎ করার জন্যে তারা এই যুক্তি দিয়েছে যে ওটা আসলে চিরকাল জনবিরল এলাকা ছিল, বান্টুরা সেখানে বহিরাগত মাত্র।

কিন্তু বান্টুরা দক্ষিণ আফ্রিকার বহিরাগত নয়। আজ একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে ৯ম শতাব্দীতে বান্টু সভ্যতার অস্তিত্ব। এ হল সেই সময় যখন ইউরোপের ইংলণ্ড ইত্যাদি দেশের লোক ছিল বর্বর ও অসভ্য। সেই সময় থেকে আরম্ভ করে আরবী, পারসিক ও চীনা পরিব্রাজক পণ্ডিতরা দক্ষিণ পূর্ব আফ্রিকার বান্টু শিল্প-সভ্যতার কথা উল্লেখ করে গিয়েছেন। সেখান থেকে সোনা ও হাতীর দাঁত রপ্তানী করা হোত। মিশর, চীন, ভারত ও অন্যান্য দেশে পণ্য আসত সোফালা, মোলম্বে ও জাঞ্জিবার থেকে। জাঞ্জিবার বন্দর নির্মাণ করেছিল আরবী বণিকেরা যারা এসেছিল বাহারিন দ্বীপ থেকে। দশম শতকে সোফালা ও জাঞ্জিবারের স্বর্ণ ব্যবসার উল্লেখ পাওয়া যায় বিখ্যাত পণ্ডিত অল্ মাসুদির লেখায়। যুবা বয়সে অল্ মাসুদি একদল ভারতীয় বণিকের সঙ্গে ভারত থেকে যাত্রা করে কিলওয়া ও জাঞ্জিবার হয়ে, সেখান থেকে চীনে যান। তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে সোফালা বন্দরকে "সোনার বন্দর" বলে বর্ণনা করা হয়েছে। স্থানীয় অধিবাসীরা খনি থেকে সোনা তুলত এবং পশু পালন করত। অল্ মাসুদির লেখায় তাদের

বলা হয়েছে 'জাঞ্জি'।

একাদশ শতকে জগদ্বিখ্যাত খোরাসানী পণ্ডিত অল্ বিরুনী আমুদরিয়ার সঙ্গম বিন্দু থেকে দক্ষিণ পূর্ব আফ্রিকা যান। জাঞ্জি জাতির বিষয়ে উল্লেখ করতে গিয়ে অল্ বিরুনী লিখেছেন যে তারা শুধু সোনা কেন, গণ্ডারের খড়্গ মুক্তা ও ক্রীতদাস রপ্তানী করত। তারপর বিখ্যাত সোমনাথ মন্দিরের প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে কাথিয়াবাড়ের সোমনাথ মন্দিরের প্রসিদ্ধি লাভ হয়েছিল এইজন্য যে "নাবিকেরা সে সময়ে ক্রমাগত সোফালা ও চীনে যাতায়াত করত।"

দ্বাদশ শতাব্দীতে ইদ্রিসিও এইসব ব্যবসা বাণিজ্যের বর্ণনা করেছেন। ত্রয়োদশ শতকে পরিব্রাজক আন্দালুসি সোফালাকে বন্দর না বলে অঞ্চল হিসেবে উল্লেখ করে লেখেন যে সেখানে সোনা ও লোহা উৎপন্ন হোত। চতুর্দশ শতকে ইতিহাসবেত্তা ইব্‌নু বাতুতা তাঞ্জিয়ার থেকে পূর্ব-আফ্রিকা হয়ে কিল্‌ওয়ায় গিয়ে শোনেন যে "সোফালা সেখান থেকে দুই সপ্তাহের রাস্তা এবং যেখান থেকে সোফালায় সোনা আসে সেখানে যেতে সোফালা থেকে এক মাস লাগে। তিনি সেখানে ভারতের সঙ্গে ক্রীতদাস ব্যবসার অস্তিত্ব দেখতে পান। ইব্‌ন বাতুতা লিখছেন, ভারতের সান্দাবার (সোপারা), হিনাবাড ও কালিকট বন্দরের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার বাণিজ্য চলত।

এইসব পরিব্রাজকের শ্রবণ কাহিনী থেকে আজ একথা প্রমাণিত যে দক্ষিণ আফ্রিকার আদি অধিবাসীরা শিল্পকার্যে নিযুক্ত ছিল; তারা উৎপাদন করত সোনা, লোহা ও তামা এবং সেই ধাতু রপ্তানী করে তার বিনিময়ে ভারত, চীন এবং প্রাচ্যের অন্যান্য দেশ থেকে পণ্য আমদানী করত। ক্যান্টন থেকে তখনকার দিনে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হয়ে, ভারতবর্ষ পার হয়ে মোম্বাসা, কিল্‌ওয়া, জাঞ্জিবার ও সোফালা পর্যন্ত বাণিজ্য চলত।

আজ মধ্যযুগীয় বান্টু সভ্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছে অন্তত ২৪টি পুরাতাত্ত্বিক খনন কার্য। বান্টুরা যে জটিল খনি শিল্প স্থাপনা করেছিল, পাথর দিয়ে যে প্রতিরক্ষার জন্য দুর্গ নির্মাণ করত, জল সেচ ব্যবস্থা রচনা করত এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্য করত, সে সম্পর্কে আজ আর কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এইসব প্রত্নতাত্ত্বিক ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়েছে ইনিয়াঙ্গা, নিউকোর্ক, গ্রো গ্রো, নানাতালি, খামি, জিম্বাবোয়ে ইত্যাদি বহু জায়গায়। ইনিয়াঙ্গায় পাহাড়ের ওপর একটি পাথরের দুর্গের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। তার সঙ্গে পাওয়া গিয়েছে কতকগুলি ঘরের বাসা যে গুলি ভূগর্ভে তৈরি হয়নি, হয়েছে জমির ওপর মাটির স্তূপ তৈরি করে তার মধ্যে। সেগুলির পাথরের

আফ্রিকায় সাম্রাজ্যবাদের নৃশংস অত্যাচারের একটি দৃশ্য।

দেওয়াল ও মেঝে। প্রত্যেক ঘরের মধ্যে যাওয়ার পাথরের তৈরি প্রবেশ পথ। সেখানে কতকগুলি গর্ত, আলো, বাতাস আসবার জন্যে। ঘরগুলি দুর্গেরই অংশ এবং সেগুলি ছাদের দিকে সারি সারি দেওয়ালের দ্বারা ঘেরা।

ইনিয়াঙ্গার অধিবাসীরা চাষবাসের জন্য নদীর উৎস মুখে পাথরের বাঁধ দিয়ে নদীর জলের মোড় ফিরিয়ে দিয়ে সেই জল নালা দিয়ে ক্ষেতে বইয়ে দিত। সেইসব নালা কাটার সময় জলপ্রবাহের গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য তারা যে রকম নিখুঁতভাবে জমি ক্রমশঃ ঢালু করত সে রকম নৈপুণ্য আজ এই বিংশ শতকেও খুঁজে পাওয়া ভার।

ইনিয়াঙ্গার বান্টু অধিবাসীদের বসতি ছিল কৃষি কেন্দ্রিক। তারা নানারকমের হাতিয়ার এবং গয়না নির্মাণ ও আমদানী করত। তাদের এইসব বসতি পরীক্ষা করে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে তারা অতীতের যাযাবর জীবন পরিত্যাগ করে প্রাক্-নাগরিক জীবনে এসে পৌঁছেছিল। এই নতুন জীবনে পা দিয়ে তারা চাষবাসের সঙ্গে সঙ্গে মাটির বাসন, ধাতুর বস্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র ও গয়না তৈরি করত এবং ব্যবসা বাণিজ্য করত।

নিউকোর্ক ভগ্নাবশেষের চেহারা একটু অন্যরকম। ৫০ বর্গ মাইলব্যাপী সেই ভগ্নাবশেষের দুর্গপ্রাকার পরিবেষ্টন করে আছে ১০টি পাহাড়কে (আমাদের দেশে রাজস্থানেও এই ধরণের হিন্দু যুগের ভগ্নাবশেষ আছে)। প্রত্যেকটি পাহাড়ের মাথায় ভিম্বাবোর জনবসতি। বসতির মধ্যে খড়ের ছাউনিওয়ালা সারি সারি কুটির। এইসব কুটিরের গড়নের সঙ্গে আজকের নাটাল, ট্রান্সভাল ও দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নের জুলু সোথো ইত্যাদি অধিজাতির বাসার কোন পার্থক্য নেই। উত্তর পূর্ব ট্রান্সভালে লেতাবা জেলার উপজাতীয় দলপতি মাসাউ যে দুর্গে তাঁর পাত্রমিত্র সভাসদ পারিষদদের নিয়ে থাকেন রোডেশিয়ার মধ্য যুগে ঐরকম দুর্গ ছিল।

আমাদের দেশের মতই আফ্রিকাতেও মধ্য যুগে যে গবাদি পশুর কদর ছিল কারাঙ্গার প্রাপ্ত কতকগুলি মাটির পাঁচলা থেকে তা বোঝা যায়। সেইসব পাঁচলার পাশে গরুর হাড় পাওয়া গিয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন পাত্রের গায়ে খোদাই করা গোমূর্তিও আছে।

বান্টুজাতি তাম্রশিল্পে যথেষ্ট উন্নতি করেছিল। উত্তর ট্রান্সভালের মেসিনা অঞ্চলে লিম্পোপো থেকে আরম্ভ করে ২৫ মাইল জুড়ে তামার খনি ছিল এবং বান্টু শ্রমিকরা যে তামা গলাতো তার সাক্ষ্য দিচ্ছে কতকগুলি চুল্লী, মাটির নল, ধামা ইত্যাদি। কোথাও কোথাও এইসব খনির গভীরতা ৮০ ফুট। শ্রমিকরা আগুন দিয়ে পাথর গরম করে তারপর সেখানে ঠাণ্ডা জল ঢেলে পাথর কাটিয়ে ধাতু নিকাশ করত। উনবিংশ শতকে জুলু উপজাতির সৈন্যরা যখন এই অঞ্চল আক্রমণ করে তখন এখানকার রাজা রাদাবুলানা এইসব খাদ মাটি দিয়ে বুঁজিয়ে দেবার হুকুম দেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার বৃহত্তম মধ্যযুগীয় ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে জিম্বাবোয়েতে। সেই ধ্বংসাবশেষের ঠিক মাঝখানে ডিম্বাকার একটি ইমারত আছে। প্রত্নতাত্ত্বিকরা প্রথমে সেটিকে মন্দির ভেবেছিলেন। পরে দেখা গেল যে সেটি মন্দির নয়, একটি দুর্গ বা রাজপ্রাসাদ। প্রাসাদের কাছে কিছু আরবী কাচ ও নানকিং-এর চীনা মাটির বাসনের টুকরা পাওয়া গিয়েছে।

প্রাসাদের পদতলে নানা আকার ও আয়তনের ঘরবাড়ী। বড় বড় বাড়ীগুলিতে বাস করত বান্টুজাতীয় সম্পত্তিপন্ন বণিকরা যারা আরবী বণিকদের সোনা দিয়ে তার বদলে পণ্য আমদানী করত।

জিম্বাবোয়ে রাজ্যের নাম ছিল মনোমোটাপান। মনোমোটাপানের রাজার যখন সোনার দরকার হোত। তখন তিনি খনিমজুরদের কাছে একটি গরু পাঠিয়ে দিতেন। যতজন মজুর রাজার জন্য খনি থেকে সোনা তুলত তারা সেই গরুর মাংস নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিত। বান্টুদের এই প্রথা আজও দক্ষিণ আফ্রিকার কোন কোন জায়গায় বেঁচে আছে।

জিম্বাবোয়েতে ঈগল পাখী, কুমীর ইত্যাদি খোদাই করা কড়ি বরগা পাওয়া গিয়েছে। ঈগলপাখী ছিল সেখানকার এক পবিত্র জীব।

জিম্বাবোয়েতে যে সব মৌখীন বিদেশী জিনিষ আমদানী করা হোত তার মধ্যে পারশিক সবুজ কাচ, নানা

রপ্তানীর পুঁতি ও মৃৎশিল্পজাত জিনিস বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চীনামাটির যে সব জিনিস সেখানে আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলি ষোড়শ শতাব্দীর মিং রাজত্বের আমলের। কিন্তু ভূগর্ভের আরো অনেক গভীরে খনন কার্য চালিয়ে ধ্বংসের নিচে যে চীনা-মাটির জিনিষ ও পুঁতি পাওয়া গিয়েছে সেগুলি দক্ষিণ ভারত ও মালয় থেকে ৮ম ও ৯ম শতাব্দীতে সেখানে রপ্তানী করা হয়েছিল।

বান্টু সমাজের কর্মসংগঠন ও সামাজিক সম্পর্ক নিয়েও যথেষ্ট গবেষণা হয়েছে। বান্টু সমাজের নেতা ও শাসক ছিলেন দেশের অর্থনৈতিক সম্পদের মালিকেরা। খনি নির্মাণ ও খাতুনিকাশের জন্য যন্ত্রপাতি ও অর্থব্যয় করার ক্ষমতা তাঁদের ছাড়া অন্য কারো ছিল না। মিস্ত্রীদের খনির সাজসরঞ্জাম উৎপাদন করার জন্য মজুরী দেওয়া হোত গরু দিয়ে। গোটা পরিবারকে পরিবারকে খনিতে কাজ করতে বাধ্য করা হোত। কোন কোন খাদে স্ত্রীলোক ও শিশুর কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে। মজুরী বাবদ সোনা বা অন্য ধাতু দেওয়া হোতনা। গরু কিম্বা নারিকেল এই ছিল মজুরী।

কোন কোন প্রত্নতাত্ত্বিক মনে করেন যে জিম্বাবোয়ের বান্টু সংস্কৃতির বিকাশ ও অগ্রগতির মূলে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যের অবদান সামান্য নয়। ভারতে বান্টুদের পণ্যের বাজার সম্প্রসারিত হওয়ার ফলে বান্টুদের অর্থনীতি ও শিল্পের এত উন্নতি সম্ভব হয়েছিল।

ষোড়শ শতাব্দীর পোর্তুগীজ ইতিহাসবেত্তাদের লেখা থেকে জানা যায় যে মনোমোটাপান রাজের সোনা ও হাতীর দাঁত রপ্তানী ব্যবসার ওপর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টার বিরুদ্ধে বান্টুজাতির অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায় ও বণিকরা বার বার বিদ্রোহ করেছিল। এই সব বিদ্রোহের পরিণামে মনোমোটাপান সাম্রাজ্য ক্রমশ সংকুচিত হতে থাকে এবং কতকগুলি স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উদ্ভব হয়।

ক্যাটন-টম্পসন এবং মাক-আইভর, এই দুজন বিশিষ্ট আফ্রিকাবিৎ জিম্বাবোয়ের বান্টু সভ্যতার ভগ্নাবশেষ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে সেখানকার "মাবুলী" কালোরঙের মৃৎপাত্রগুলি ভূগর্ভের নিম্নতম স্তর থেকে অর্থাৎ বান্টু সভ্যতার আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত অপরিবর্তিতই আছে। এই থেকে নিঃসংশয়ে বলা যায় যে বান্টুজাতি দক্ষিণ-আফ্রিকার বহিরাগত নয়। বরং সমস্ত কিছু দেখে শুনে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে বান্টু সভ্যতা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গড়ে উঠেছে।"

লিম্পোপো নদীর দক্ষিণে আজ যে জায়গার নাম দক্ষিণ-আফ্রিকা ইউনিয়ন সেইখানে ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ ফ্রী স্টেটের এলাকায় বান্টুদের কৃষি-শিল্প-ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত ছিল। পোর্তুগীজ উপনিবেশলোভীদের অভিযানের আগে তারা সেখানে সোনা, তামা, টিন, লোহা, শিসা ও অভ্রের খনিশিল্প স্থাপন করেছিল। টি, জি, ট্রেভর নামে একজন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক লিখেছেন যে, "রোডেসিয়ার প্রধান খনিজ পদার্থ ছিল সোনা, উত্তর ট্রান্সভালের ছিল তামা, বুশভেল্ডের ছিল টিন, লোহা, শিসা এবং অভ্র, লিডেনবার্গের ছিল সোনা এবং সোনা ও

—বেকারদের বিরাট সুযোগ—
ঃ ইলেকট্রিক এ্যাণ্ড রেডিও গাইড ঃ

বাড়ীতে বসে ইলেকট্রিক ইঞ্জিনীয়ারিং, রেডিও তৈয়ারী ও মেরামত, ওয়ারিং ইত্যাদি শিখুন। মাত্র ৫০৲ টাকায় বাড়ীতে বসে কি করে "ট্রানজিসটার রেডিও" তৈয়ারী করা যায় শিখুন। রেডিও এবং ইলেকট্রিক বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণের জন্য ৪০০ শত ছবিসহ এক অভিনব পুস্তক পাওয়া যায়। দাম মাত্র ৮'৫০ টাকা, ভি. পি. পি. খরচা অতিরিক্ত ২৲ টাকা।

নিম্নলিখিত বই পাওয়া যায় :

টেলারিং এবং কাটিং (ছবিসহ) ৫৲, সাবান এবং গন্ধ দ্রব্য তৈয়ারী—৫৲, ফটোগ্রাফী শিক্ষা—৫৲। লিখন এবং অঙ্কন, পরিবর্ধিত সম্পূর্ণ নূতন সংস্করণ ৪০০ শত ছবি সহ—৬৲। বিবাহিত জীবন ৮৮টি ছবি সহ ৫৲। ভি. পি. পি. খরচা অতিরিক্ত—১৲ প্রতিটি বইয়ের জন্য।

GLOBE BOOK DEPOT (N.P.-15)
HALKA No-23. ALIGARH CITY

শিলার মিশ্রধাতু। এইসব ধাতুর খনি নির্মাণের কাজ ইউরোপীয়দের সেখানে আবির্ভাবের বহু আগেই হয়েছিল। আই, শাপেরা তাঁর "Migrant Labour and Tribal Life" বই খানিতে লিখছেন :—

"ইউরোপীয়দের আবির্ভাবের আগে, এখানকার অধিবাসীরা ছিল সম্পত্তিপন্ন। প্রতিটি বান্টু পরিবার চাষ ও পশু পালন করে জীবিকা নির্বাহ করত, নিজের বাসা বাঁধত, নিজের জামা কাপড় ও বাসনপত্র তৈরি করত।...ইউরোপীয়দের আবির্ভাবের পর সেই আত্মনির্ভরশীলতা ভেঙ্গে পড়ে।"

এই বান্টুদের শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশবাদীরা পুরো-দস্তুর মানুষ বলে স্বীকার করতে চায়নি, তাদের চার হাজার বছর আগেকার বরবরদের পর্যায়ভুক্ত করতে চেয়েছে।

ইউরোপের বাইরে দক্ষিণ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া হচ্ছে দুটিমাত্র দেশ যেখানে ইউরোপীয়রা দলে দলে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করে এক শ্বেতাঙ্গ-কর্তৃত্ব সম্পন্ন শাসন কায়েম করে। দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গরা শুধু ঔপনিবেশিক শাসক, বণিক বা কুঠিয়াল নয়, তারা সেখানে একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। জাতিতত্ত্বের মার্ক্সবাদী সংজ্ঞা তাদের ক্ষেত্রে বহুলাংশে প্রযোজ্য। স্বাধীনতা লাভের আগেকার ভারতবর্ষ, চীন, ইন্দোনেশিয়া, ব্রহ্ম, মিশর, পূর্ব ও পশ্চিম আফ্রিকার ইউরোপীয়দের সম্পর্কে এ কথা বলা চলে না। দক্ষিণ আফ্রিকার ১ কোটি ৩০ লক্ষ লোকের মধ্যে ২১ লক্ষ হচ্ছে ইউরোপীয়। কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গের মধ্যে সম্পর্ক প্রভু ও ক্রীতভৃত্যের।

ইউরোপীয় উপনিবেশবাদী বণিকরা দক্ষিণ আফ্রিকার নেমে সর্বপ্রথমে আদিম বুশম্যানেদের সম্মুখীন হয়। বুশম্যানরা চাষবাস জানতনা। শিকারের দ্বারা খাদ্য সংগ্রহই ছিল তাদের পেশা। তারা শেষ পর্যন্ত ওলন্দাজদের ক্রীতদাসে পরিণত হয়।

দ্বিতীয় আদিম জাতির নাম হটেন্টট। তারা ছিল পশু-পালক।

তৃতীয় জাতিটিই হচ্ছে বান্টু। তারা চাষবাস, পশুপালন ও ধাতুনিষ্কাশন করত। তাদের সমাজ-ব্যবস্থা ছিল অনেক উন্নত। তারা কতকগুলি রাজ্যে বিভক্ত ছিল। তাদের সমাজে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের স্বতন্ত্র কর্মক্ষেত্র ছিল, শ্রেণী বিভেদের অংকুরোদ্গম হয়েছিল।

বান্টুরা ইউরোপীয়দের কাছে সহজে পরাজয় স্বীকার করেনি। একশো বছর ধরে তারা লড়াই করেছিল ব্রিটিশ ও বুয়োরদের বিরুদ্ধে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই 'বর্বর' জাতিকে মার্ক টোয়েন বর্ণিত সেই সভ্যতার আশীর্বাদের কাছে হার স্বীকার করতে হয় যার এক হাতে "কাচের পুঁতি আর একহাতে ধর্মগ্রন্থ, একহাতে বন্দুক, আর একহাতে স্তোত্রমালা, একহাতে সুরা, আর একহাতে প্রগতির মশাল, যার স্মৃতিস্তম্ভের গায়ে মড়ার মাথার একটি স্তূপের ছবি খোদাই করে দেওয়া উচিত।"

কিন্তু মার্ক টোয়েন যখন বিশ্বমানবের স্বার্থে তাঁর তরোয়ালের মত লেখনী তুলে নিয়েছিলেন তখন দুনিয়ায় সমাজতন্ত্র ও কৃষ্ণাঙ্গ জাতির মুক্তির স্বপ্ন নরক্তে স্রোতে স্বাদরুদ্ধ হয়ে ছিল। আজ দুনিয়ার এক-তৃতীয়াংশে সমাজতন্ত্র "নরমাংস-কুধিত" উপনিবেশবাদকে নির্মূল করে দিয়েছে, এশিয়া, আফ্রিকা ও লাটিন আমেরিকার যুগনিপীড়িত কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলছে তার দাসত্ব শৃংখল। সেই শৃংখল মোচন করে আফ্রিকা ও এশিয়ার মানুষ, ভারত ও বান্টুভূমির মানুষ আবার তাদের প্রাচীন মহত্বকে নতুন করে আবিষ্কার করবে।

লালঝিয়ানি

মন্টিপদ রাজগুরু

পাখুলাল কিম মেরে বসে আছে। সারা গা গতরে তখনও ব্যথা বুকের ভিতরে একটা ঝড় চলেছে। জীর্ণ নড়বড়ে খুঁটি হেলান দিয়ে বসে আছে পাখু চোখ বুজে।

কি একটা কঠিন কাজ করতে গিয়েছিল। চোখের সামনে ওই রোদ ছায়া ঢাকা মাঠ কালো বাগানের ছায়া, বেঁচে থাকার আনন্দ সব কিছু থেকে সে এক নিমিষে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল কি এক দুঃসহ জ্বালায় আর ব্যর্থ অভিমানে। তখনও কালো বউ-এর চীৎকার মাঝে মাঝে শোনা যায়।

ফিরে এলি কেনে? এ্যাঁ। বেশ তো বউড়ি গাছে ঝুলতিস।

রাগে অভিমানে না পথের কাঁটা সরে না যাওয়ার জ্বালায় বকছে কালো বৌ ঠাওর করতে পারে না পাখু।

ভাববার ক্ষমতাও তার নেই। অসুখের পর থেকে কেমন অনড় হয়ে গেছে। পায়ে হাতে তেমন জোর পায় না। আর কাজই বা দেবে কে? খাটো খাও দুনিয়ার এই নিয়ম। খাটতে না পারো খেয়ো না, বুড়ী মাও তাই বলতো

খাটতে পারো খাও।

না পারো তো জুলুর জুলুর চাও।

কালো বৌও তাই বলছে বারবার।

যে জীবনের প্রথম থেকেই পঙ্গু সে ওকথা প্রথম থেকে শুনে অভ্যস্ত, সইবার ক্ষমতাও তার সহজাত। কিন্তু

পাখুলাল তা ছিল না।

আজ চরম দুঃখ নির্যাতন আর অপমানের মাঝেও সেই দিনগুলোকে ভুলে যায়নি পাখুলাল।

সতেজ শালচারার মত লকলকে বাড় বাড়ন্ত গড়ন, নিটোল শরীর। কালো পাথর কোঁদা শরীর। পাখু-লালের তখন সারা গাঁয়ে খাতির। ওকে পুরো বার্ষিকী মজুর রাখতে চাইতো সবাই। কোন বদনেশা নেই পুরো খাটবে। কোদালের কোপে মাটি কাঁপতো। আর লাঙল ধরলে যে সে গরু সেই বজ্রমুষ্টির টান রাখতে পারতো না. গম্ভীর ভাবে কেটে বসতো লাঙলের ফলা মাটির বুকে. সেই চাপচাপ মাটির তাল ঠেলে লাঙল টানতে যে সে গরুর শিরদাঁড়া বেঁকে আঁতকস্তালে লাগবার উপক্রম।

দিন গেলে চার সের ধান, আর তেল মুড়ি। চার কুড়ি টাকা শিরোপা। বেশী দর চললেও চেরস্থ তেমন সতেজ গৌরব করা মুনিস রাখতে রিধা করতো না।

দু দু রোদ. দূরে তাম্রাভ কঠিন প্রান্তরে লি লি করছে। বন্ধ্যা মাটির বুক ফুড়ে উঠছে বন্ধী আগুনের হলকা, লাভরো বিসর্পিল রেখা রোদ যেন নেচে ফিরছে। চাপার পরেই সুরু হয়েছে মাঠের বীরানা। শুকনো মাঠ—তখনও বর্ষার মেঘ নামেনি. দু এক পশলা বৃষ্টি হয়েছে মাত্র, ঠাঁই ঠাঁই মাথা তুলেছে কচি বীজ ধানের চারা গুলো : কাছিমের পিঠের মত চালু মাঠ নেবে গেছে—ঘেমেছে এসেছে মাঠসড়নী ছোট্ট পাহাড়ী নদীটার ধারে : জল বয়ে যায় তাতে তিরতিরে জলধারা. আবার উঠে গেছে ওপারে ক্রমশ: দিগন্তর পানে গ্রামের সন্ধানে।

মাঠগড়ানী নদীটাই একটু সবুজের ইশারা নিয়ে বয়ে চলেছে। দুপাশে ওর ঘন বিষকরমচা—জার – দুএকটা আমগাছ। জলের ধারে ঠাণ্ডা মাটিতে জলে কুমড়ো কাঁকুড়, বিঙে ; আখের ক্ষেতগুলো বাতাসে মাথা নাড়ে শিরশিরিয়ে।

পাখুলাল মাথায় গামছাখানা জড়িয়ে আখবাড়ীর ভেলি খুঁড়ছিল। রোদছায়ার এই নির্জন সবুজ ঠাঁইটুকু যেন রোদপোড়া ওই বিশাল মাঠ থেকে আলাদা। পাখী ডাকে।···ঠাণ্ডা একটু সুন্দর ঠাঁই।

গুণগুনিয়ে গান ধরে—ভাদু পরব, তুষু—গাওনের সময় পাখুলাল গান গায় ; একটা ঘাঘরা পরে ভাদানের দিনে লাগাওনির দল নিয়ে নাচ গান করে। দেখেছে মেয়েরা ওর হাত ঘুরোনো আর গানের সংগে নাচ দেখে হেসে এ-ওর গায়ে পড়ে।

—লাল দুয়ানী!
লাল দুয়ানী কি চলো।
কালনেমে জল এলো
দোকানী দোকান তোলো।
লাল দুয়ানী—

হঠাৎ কার হাসির শব্দে পাখুলাল মুখ তুলে চাইল। আলের মাথায় দাঁড়িয়ে আছে পাখী। হাসছে খিল-খিলিয়ে। ঘাস কাটতে এসেছিল পাখী। বেলা ভোরে গেছে। চিড় চিড় করছে রোদ। সারা মাঠে কোথাও ঘাস নেই এই খরাবিতে। যোড়ের ধারেই ঘাস থাকে।

বোঝা বাঁধছিল ঠঠাৎ ওর গানের সুরে শুনেই চিনতে পারে। নির্জন ছায়াঘন নদীর ধার। চারিদিকে আখ বাড়ী আর গাছগাছালির সবুজ ঢাকা সুঁড়ি পথ দিয়ে শুকনো নদীটা একটা কালির মত চলেছে। তারই উপর নুইয়ে এসেছে অর্জুন বিষকরমচা গাছের ডালগুলো, নিবিড় ছায়া অন্ধকার ভরা ঠাঁইটার ওকে একলা দেখে কেমন ভয় লাগে—বুকে কাঁপে কি এক নিবিড় উত্তেজনায়।

পাখীর এই কণ্ঠ-এর স্বাদ জানা আছে, জীবনকে সে অনেকবার অনেক রূপে দেখেছে। অকারণেই মাথার চুল-গুলোকে গুছিয়ে নেয়—জলে হাত মুখ ধুয়ে সাফ সুতরো হয়ে কাঁচ-ধার জলে নিজের প্রতিবিম্বটার দিকে চেয়ে থাকে।

কেমন হাসছে সুন্দর একটি মেয়ে, চোখ দুটোও পানে চেয়ে নিজেই শিউরে ওঠে। কেমন যেন আগুন জ্বলছে।

—মরণ!

নিজের কণ্ঠস্বর নিজের কাছেই অচেনা বলে মনে হয়।

কি ভেবে এগিয়ে গেল আখবাড়ীর দিকে।

ওকে দেখে গান থামিয়ে চেয়ে থাকে পাখুলাল। হাসছে মেয়েটা।

এই থামলা কেনে?

পাখুলালের বিরক্তি আসে। বেহায়ার মত হাসছে। সোমত্থ মেয়েটা।

আলের মাথায় একটা গাছের ছায়ায় বসেছে।

—এলাম। তুমার গান শুনে উতলা হয়ে এলাম কি গো। ঘরে কি আর মন মানে।

কেমন চুপ করে যায় পাখুলাল।

পাখী ডাকছে ছায়ার আড়ালে। পাখী এগিয়ে আসে।

দলছাল মুখরা মেয়েটা বদলে গেছে। ওকে দেখেছে পাখু অনেকবার। গাঁয়ের এখানে ওখানে সর্বত্রই তার গতি। প্রেসিডেন্টবাবুকে সেদিন চোখ মটকে বলে—হাঁ করে দেখছ কি গো? গিলে ফেলাবা নাকি? এ্যাঁ।

কপট ভয়ে হাসছিল ও খিলখিলিয়ে

নানা কথাও শোনা যায়। তাই বিয়ে সাঙাও করেনি—হয়নি ওই পাখীর। একবার বিয়ে হয়েছিল কোথায়—তা পালিয়ে এসেছে। ওর পরিচয়-ইতিহাস অনেক রহস্যে ঢাকা তবু মিষ্টি লাগে ওকে।

পাখুর না বলা কথা বুঝতে দেরী হয় না পাখীর।

কেমন ঝড় বয় ওর মনে। অনেক পথ ঘুরে ক্লান্ত পথিক যেমন আশ্রয় চায়—চায় তৃষ্ণায় একটু পানীয়, খাদ্য। তেমনি ক্লান্ত পাখী ক্ষণিকের জন্য চেয়েছে ওকে নিবিড়ভাবে। মানুষ হিসাবে ওকে বিশ্বাস করা যায়।

কথা বলে কম—বদ নেশা নেই। মেয়েদের দিকে নজর নেই তা নিজেও বুঝেছে, দেখেছে। কচি সবুজ বলিষ্ঠ একটি মানুষকে তাই আজ চায় পাখী, বাসা বাঁধতে সে। ডালে ডালে উড়ে বেড়াতে ঘেন্না এসেছে।

—পাখী!

…এমনি একটি নিভৃত প্রকম্পকণ্ঠের নিবিড় ডাক শুনতেই চেয়েছিল সে। কাঁপছে ওর দেহ অসহ্য উত্তেজনায়।

রোদ পড়েছে সবুজ পাতায়—চলন্ত রোদ। ঝির ঝির বয়ে চলেছে নদীর ক্ষীণ স্রোতধারা। পাখী ডাকছে। চারিদিকে ধু ধু রোদ নির্জন মাঠ। তারই মাঝে একটু ছায়াতলে তারা দুজনে দুজনকে চিনেছে পরম তৃপ্তির সান্নিধ্যে।

সেই মুহূর্তটিকে ভোলেনি পাখু।

তারা সাঙা করবে কথাটা ছড়িয়ে পড়তে অনেকেই অবাক হয়। দত্তমশায় বলে—খাচ্ছিল তাঁতী তাঁত বুনে

বিপদ হল এঁড়ে গরু কিনে। ছোড়া মরবে এইবার।

বুড়ীমা কথাটা শুনে বুক চাপড়ে কাঁদতে থাকে তার বহু অতীতে হারানো স্বামীর উদ্দেশে। —ওগো দেখে যাও গো, কি সর্বোনাশ করলেক গো।

পাখী সেদিন বুঝতে পারে তার প্রকৃত দাম। সবাই তাকে মনে মনে ঘৃণা করে, কেউরা লোভ করে। তাই ঘর বসতে ওদের হিংসে। তাই দত্তমশায়কে বলে ওঠে :

—কিনে রেখেছে নাকি গো, যে যেতে দেবা না? ঘরভাঙানী দিহ।

দত্তমশায় হাসে, দাঁতগুলো অনেক পড়ে গেছে। মাথায় এতবড় টাক। সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছে : কি যে বলিস পাখী। গাঁয়েই তো থাকবি। তবু তো দেখতে পাবো।

—হাঁ, ওই পর্যন্তই।

পাখী এত বাধা না মেনেও ঘর বাঁধল পাখুর সংগে।

আলাদা একটু রূপসীও তুলেছিল তারা।

সেই ঘরখানাই আজ জীর্ণ নড়চড় করছে। চালে খড় নেই। বাখারির ফাঁক দিয়ে রোদ উঁকি মারে। নির্লজ্জ লোভী রোদ, শূন্য হাড়ি কটা তাও অর্ধেক ভেঙে গেছে।

পাখী বড় আশা নিয়ে ঘর বেঁধেছিল।

পাখুও বেশ ধুমধাম করেই বিয়ে করেছিল, পাখীকে জাতে তোলবার জন্যেই বুনিব বাড়ীতে কর্জ নিয়েছিল কয়েকমাপ ধান আর নগদ চারকুড়ি টাকা। জাত জেয়াত-দের মুখ বন্ধ করেছিল দুদিন মদ আর মাংসভাত খাইয়ে। বুড়ীটা সারাদিন মদ খেয়ে ঘরের কোণে পড়েছিল আর বুক চাপড়ে চেঁচিয়ে পরলোকগত স্বামীকে ডেকেছিল।

কেন যে সে মুখপোড়া আসছে না এখন চাঁদপারা বৌ দেখতে তার জন্য ও পালমন্দ করেছে শেষতক।

বিয়ের হাঙামা চুকেছে। সেলামে চালা সঙ্কেল পাখীরের প্রাণস্পন্দন ওই পাঁজলাটুকু নিঃশেষ হয়ে যেতেই তলানি পড়ে—বিস্বাদ তীব্র নেশা আনা জলাদা ভরানো সেই তলানি।

ক্রমশঃ পাখুলাল দেখেছে সেই সর্বনাশা ছবি।

একদিন শাল ছায়াঘন দুপুরে যে স্বপ্ন দেখেছিল আজ তা মিলিয়ে গেছে নিদারুণ আঘাতে।

দত্ত মশায়ের বাড়ীতেই পুরোবাসিক মুনিষ ছিল সেবার। চালু কারবারী লোক, দুর্গাপুরে কারখানা বসেছে—দামোদর নদী আর বাধা হয়ে নেই, এদিকে সোজা চলে আসছে মস্ত মস্ত ট্রাকগুলো। মালপত্র নামিয়ে দিয়ে যায়—নিয়ে যায় ধান, চাল, রাশিরাশি গুড় আনাজপত্র। দত্ত মশায়ের কারবার ফুলে ফেঁপে উঠেছে।

গ্রামেরও রূপ বদলেছে। যখন তখন আসছে ট্রাক-গুলো, তাদের গর্জনে শান্ত আকাশ ভরে ওঠে।

পাখীর নোতুন পাখনা গজিয়েছে। এতদিন বেশ ছিল, কটা বছর চোখ বুজে কাটিয়েছে! হঠাৎ চোখ খুলে দেখে শিউরে উঠেছে। পৃথিবীটা অনেক এগিয়ে গেছে, সে পিছিয়ে পড়েছে। শুধু পিছিয়েই পড়েনি যেন বাড়িদের দলে এসে ঠেকেছে।

তাই আজ ভাল লাগে না। পাখুর দিকে চেয়ে থাকে। ও যেন প্রাণহীন একটা কাঠপুতুল শুধু মুখ বুজে কাজ করতেই জানে। সারাজীবন ওরা পরের ভাঁবে খেকে মজুরীই করে যাবে।

হঠাৎ সেই পাখুই অসুখে পড়েছে। দিনমজুরির মজুর—না খাটলে মাইনে নেই। তার উপর ওষুধ-পথ্যও আছে। রমণ ডাক্তার দেখেশুনে বলে ওঠে।—টাইফয়েড হয়েছে। ওষুধ চাই।

কি ভাবছে পাখী।

বলিষ্ঠদেহ পাখুলাল কদিনেই আধখানা হয়ে গেছে। পাখীর কেমন যেন মমতা হয় লোকটার উপর।

কদিন ঘরেও কিছু নেই—ধান চালও শেষ হয়ে গেছে। বের হয় পাখী, দত্তমশায়ের আড়তের দিকে; তবু যদি কিছু পাওয়া যায়। বিনা ওষুধ-পথ্যতে লোকটা মরে যাবে।

আড়তের নির্জন একটা ঘরে দত্তমশায় বসে চালান দেখছিল—একে দেখে মুখ তুলে চাইল। ছোট্ট ঘরটায় আঁধার আর আলো মেলামেশি ভাব। পাখীর সেই রূপ যৌবন আর নেই। অনাহার আর ওই নোংরা পরিবেশে আসেকার লোভীন পাখী আজ হারিয়ে গেছে।

দত্তমশায় কারবারী লোক। দামকদর বোঝে। তাই বলে, পাখুর অনেক দেনা সে সব শুধবে কবে যে আবার আগায় নিতে এসেছিস?

—পাখী বিইয়ে গেছে। এককালে যার ছিল দুর্দম প্রতাপ, এসে দাঁড়ালে কৃতার্থ হতো দত্তমশায় সে আজ বদলে গেছে। পাখীকে আমলই দিল না।

দয়া করে একটা টাকা ছুঁড়ে দিয়ে বলে,

—যা, ওই নিয়ে যা। কাজের সময় কামেলা করতে আসিস না।

টাকাটা কুড়োবে কিনা ভাবছে পাখী।

তার দাম আজ মেউলিয়া ভিখিরীর পর্যায়ে নামিয়েছে ওই দত্তমশায়। অন্য সময় কাজ অকাজ এক হয়ে যেত। বের হয়ে এল পাখী।

মুখ তুলে দেখে দত্তমশায় পাখী চলে গেছে—টাকাটা নেয়নি। পড়ে আছে মেঝেতে। একটু অবাক হয়, দত্তমশায়।

পাখী শূন্য হাতেই বের হয়ে আসছে। বৈকাল বেলা আকড় নিশিন্দে গাছ ঘেরা ছায়াকালো পথে দাঁড়িয়ে একটা লরী, ধান বোঝাই হবে।

ড্রাইভার তার চেনা! ভুবণ! ভুবণও ওকে দেখে এগিয়ে আসে—আরে পাখী যে? ভাবলাম উড়েই গিইছিস।

পাখী ক্ষুণ্ণ মনে বের হয়ে আসছিল। মনে তার হাহাকার। কেমন আবছা অন্ধকার নেমেছে। সেই পাখীর অপমৃত্যু ঘটেছে পাখুলালের মত একটা সাধারণ মজুরের ঘরে এসে।

আজ ভাবে কি সে পেয়েছে? আগেকার জীবনই ছিল ভালো। এত ভাবনা—জ্বালা—অপমান ছিল না।

হঠাৎ ভুবণকে দেখে থমকে দাঁড়াল পাখী। কি ভাবছে!

ভুবণ বদলায় নি—দত্তমশায়ের মত দমকা টাকা পেয়ে ধরাকে সরা দেখেনি ভুবণ। তাই পাখীকেও ভোলেনি।

ওর চোখে তেমনি নেশা—তেমনি একটা নীরব কামনার সুর।

পাখী যেন ওরই উত্তাপে আবার প্রাণস্পন্দন খুঁজে পায়,

—কিন্তু টাকার দরকার ছিল—

ভুবণ খাঁকি প্যাণ্টের পকেটে হাতপুরে ঢলাঢোচা পাকানো নোট কখানা বের করে দেয়; গোটা পনেরো টাকা।

পাখীর হাত কাঁপছে।

কি ভাবছে সে। দুটো প্রবল আকর্ষণ তাকে দুদিকে টানছে। জানে এর কি দাম দিতে হবে।

কিন্তু শুধুই পথ্য তার নিজের খাওয়া! মন কেমন একাকার হয়ে যায়। ঘরের কল্পনাতে পেয়েছে শুধু দুঃখ আর যন্ত্রণা।

কি ভেবে হাত পেতে নিল টাকা কটা।

হাসছে ভুবণ—আসছে মেপে এসে আরোও কিছু দেবো পাখী। পরশু ফিরবো।

পাখীর হাতখানা খপ্ করে ধরে ফেলে। কাঁপছে পাখী থরথরিয়ে। অজান্তে দুফোঁটা চোখের জলও ঝরে পড়ে।

এ সব খবর জানেনা পাখুলাল।

সেরে উঠেছে। তেমন জোর পায়নি। পা দুটো কেমন সরু হয়ে গেছে।

সেই আগেকার যোয়ান পাখুলাল আজ কঙ্কাল বিকৃতদেহী মানুষ মাত্র।

চেয়ে থাকে পাখীর দিকে।

সেই পাখী আজ আবার বদলে গেছে। সারা দেহে এসেছে একটা বাড়ন্ত গড়ন। কেমন হাসি খুশী ভাব।

কাজকর্ম করে রামুনদের বাড়ীতে কানপেতে থাকে কবে আসবে ভুবণ, বাড়তি টাকা কটার জন্যে মন কেমন করে। ভুবণ খুব ভাল লোক।

পাখীর এই আনচান ভাব পাখুলালের নজর এড়ায় না। অর্ধ পঙ্গু লোকটির সব গেছে। মনের অতলে পঙ্কিল একটা সরীসৃপ পাক দিয়ে ওঠে মাঝে মাঝে।

—কোথা গিইছিলি অ্যাঁ? খুব যে গায়েন বের হচ্ছে দুর?

পাখী ওর ডাকে দাঁড়াল। পাখুলাল উঠে সোজা হয়ে চলবার চেষ্টা করছে। একটা বিকৃত জীব চলেছে—ঘৃণা হয় পাখীর।

ওর কাছেও যায় না। যেতে মন চায় না। উল্টে সন্দেহ আর ওই বিশ্রী সুরে কথা বলতে দেখে দাঁড়াল।

পাখুলাল বলে ওঠে সব জানি, স্বভাব যাবে কুথায়?

পাখী ফোঁস করে···মুরদ তোর বোঝা গেছে। বসে বসে খেছিস আবার চোপা!

—এ্যাও ! পাখুলাল হাতের লাঠিটা তুলে এগিয়ে যায় ।

—নরণ !

পাখীর চুচোখে নিবিড় ঘৃণা । অপদার্থ জীবটার ওই আস্ফালন তার কাছে অসহ্য । এখনও দয়া করে ওকে পুষছে পাখী ।

—কোথা গেছিস ?

পাখুলাল জবাব দিল না, অন্ধকারেই বের হয়ে গেল মুনিব বাড়ীর দিকে যদি কাজকম্মো কিছু দেয় ।

দত্ত মশায়ের বাড়ীর কারে ট্রাকখানায় মাল তোলা হচ্ছে । ধান, চাল আরও কত কি । একাই দুমণি বস্তা তুলতো সে—এখন পয়া আর মদনা তুলছে ধরাধরি করে ।

—সরে যা !

দত্তমশায় ওকে সরিয়ে দিল, পা দুটো টলছে । বলে ওঠে পাখুলাল ।—কাজ দেবেনা মুনিব ?

—আগে কোনর সোজা করে দাঁড়াতে শেখ, তারপর আসিস । সরে দাঁড়া ।

দত্তমশায় ওকে হাঁকিয়েই দেয় ।

অক্ষম—অসহায় আক্রোশে এই কথাটাই দত্তমশায়ও জানায়, পাখীর মতই ঘৃণাভরা কণ্ঠে ।

ফিরে আসছে পাখুলাল । কেমন ঝিমঝিম করছে সারা দেহ, আকাশের তারাগুলো জ্বলছে অসহ্য দীপ্তিতে । কোথায় দূরে মাঠে শিয়াল ডাকছে ।

বাড়ির কাছে এসে দাঁড়াল পাখু, কেমন ভয় ধরেছে । আবছা অন্ধকারে মুইয়ে পড়া জীর্ণ ঘরখানা কোন মতে দাঁড়িয়ে আছে । চালে খড়ও নেই । দৈন্য দশা ।

হঠাৎ উঠোনের কাছে পা দিতেই কাউকে বেগে বের হয়ে যেতে দেখে পাখুলাল থমকে দাঁড়াল । এগিয়ে গিয়ে লোকটাকে ধরবে তাও পারে না, প্যান্ট পড়া লোকটা বের হয়ে গেল বেগে ।

সামনেই পাখীকে দেখে এগিয়ে যায় ।

হাতের লাঠিটা অসহ্য উত্তেজনায় উপরে তুলেছে । বিকৃত ভাঙ্গা গলায় চীৎকার করে—কে এসেছিল, এ্যাঁ ?

পাখী চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে জবাব দেয় না । পাখুলাল ওর চুলের মুঠি ধরে ফেলেছে, কাঠি কাঠি হাত দুটোতে এসেছে দুর্বার শক্তি, হাঁকানি দিতে থাকে পাখুলাল । বল, বল কে এসেছিল ।

পাখীর সর্বাঙ্গ জ্বলে ওঠে, একটা ধাক্কায় ওকে সরিয়ে দেয়, জানে না পাখুলাল পাখী কি করে তাকে হারিয়ে তুলেছে, কত দাম দিয়ে ।

পাখুলাল অতর্কিত ধাক্কায় ছিটকে পড়ে শক্ত মাটিতে ।

কোন কথা বলে না । সমস্ত দাবী অধিকার ওই এক আঘাতে দূরে ছুড়ে ফেলেছে পাখী । পাখুলাল কান্না-ভেজা কণ্ঠে বলে—মারলি ! মারলি তুই আমাকে !

পাখী সরে দাঁড়াল । রাগ দুঃখ আর উত্তেজনায় সেও কাঁদছে তখনও ।

পাখুলাল আজ বুঝতে পেরেছে তার দাম এক কানা-কড়িও নয় । আজ সে বোঝামাত্র, কারোও উপর কোন দাবী নেই, তারও কোন অধিকার নেই । সারারাত ঘুমুতে পারেনি ।

ভোর বেলায় লোহার পাড়ার কালো মদনা—পদা আরও কারা দেখতে পায় বউড়ি গাছে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছে পাখুলাল, দুর্বল হাতের ফাঁস ঠিক মত লাগেনি,

তাই তখনও বেঁচে আছে। যন্ত্রণায় গোঁ গোঁ করছে।

ওরা দড়ি কেটে নামিয়ে আনে।

পাখুলাল বসে বসে কি ভাবছে।

সারা শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা, শূন্যঘর। বুড়ি গজ গজ করে।

—তুকে উই খেয়ে সেল রে। ছাপ খেয়ে সেল।

পাখুলাল জবাব দিল না।

ভোরের আবছা অন্ধকারেই পালিয়েছে পাখী। অনেক চেষ্টা করেছিল ঘর বাঁধার, কিন্তু দেখেছে পদে পদে বাধা। চোরাবালি এখানে। ঘর বাঁধা যায় না।

পাখুলাল আজ তার কাছে হারিয়ে গেছে, সেই মন—যে ঘর বেঁধে সুখী হতে চেয়েছিল সেও আজ মরে গেছে পাখীর।

জোড়াতালি দিয়ে বাঁচতে সে চায়নি। নিজেও অপমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচবার জন্যই পালিয়েছে এখান থেকে—এ জীবন থেকে নোতুন জীবনে।

পাখুলাল টেনে টেনে চলে।

গ্রামেও অন্ন জোটেনি, পতর গেছে ঘরসাও গেছে। আর আপোষ করে চলতে ও চায়নি। তাই পাখীও মরে গেছে হারিয়ে গেছে।

চোখের সামনে বাড়িখানা খসে পড়ল সেই বর্ষার জলেই, গলে গলে খসে পড়তে সুরু হয়েছিল আগে থেকেই। খসে ভূমিসাৎ হয়ে সেল বর্ষার সময়।

আশ্রয় নেই—আহার নেই।

এ মাটি তাকে ঠাঁই দেয়নি। তাই বের হয়ে পড়েছে পাখুলাল।

দুর্গাপুর স্টেশনের ধারে বসেছে—হাত পেতে বসে থাকে। চোখ দুটোর চাহনিতে একটা অসহায় জ্বালা ফুটে ওঠে। পা দুটো পঙ্গু হয়ে গেছে; সেই সঙ্গী সেই পুরোনো লাঠিটা। হাত পেতে বসে থাকে, আর মাঝে মাঝে আর্তকণ্ঠে চীৎকার করে পাখুলাল, দুটো পয়সার জন্যে যেন অবিরত আর্তনাদ করে চলেছে একটা বিগত যুগের মানুষ।

রোদ বাড়ে। হঠাৎ সেদিন একটা জিপ থেমেছে ইস্টিশনের বাইরে রাস্তায়। কারা বসে আছে গাড়িতে, কয়েকজন মেয়ে পুরুষ।

হাসাহাসি করছে।

ওদিকে চায় না পাখুলাল ও সব এখানে প্রায়ই দেখা যায়, নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। রোদে ঝিমুচ্ছে হঠাৎ একটা পরিচিত কণ্ঠের সুর ভেসে আসে গাড়ী থেকে। কে গান গাইছে।

এ গানও তার চেনা জানা-দেও গেয়েছে।

কেমন চমকে ওঠে পাখুলাল।

মেয়েটি গেয়ে চলেছে জিপে বসে, ওরা সবাই হাসাহাসি করছে।

ও লাল দুয়ারি,
লাল দুয়ারি কি হোল?
লাল দুয়ারি।
কালো মেঘে জল এলো
দোকানী দোকান তোলো।
লাল দুয়ারি!

কেমন উৎকর্ণ হয়ে ওঠে পাখুলাল। অতীতের সেই বলিষ্ঠ যোয়ান আজ পঙ্গু অক্ষম, গালে মুখে ঘন বিবর্ণ দাড়ি একরাশ চুল। পথের ভিখারী।

পাখী আজও বেঁচে আছে। আনন্দেই আছে।

জিপটা চলে সেল ওর সুর ক্রমশই মিলিয়ে যায়। হারিয়ে যায় আবার।

পাখুলালের চোখের সামনে অতীতের একটি স্বপ্নময় মুহূর্ত জেগে ওঠে কার নিবিড় শান্তি আনা স্পর্শ! কাইযোড়ের সবুজ ছায়া মেলা একটি নীরব দিন কতো আশাভরা দিন।

সব আজ হারিয়ে গেছে।

সে দিনগুলোও হারিয়ে গেছে কোনদিকে।

আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে একটা দূরগামী এক্সপ্রেস ট্রেন ঢুকছে স্টেশনে। পাখু চীৎকার করে চলেছে।

"সাহিত্য" পত্রিকা ও রবীন্দ্রনাথ

অনিন্দ্য জহুরেলার

সুরেশচন্দ্র সমাজপতির 'সাহিত্য' পত্রিকা শুরু কঠোর রবীন্দ্র বিরোধিতাই করেছে, এই রকম একটা ধারণা আমাদের মধ্যে চলতি আছে। কিন্তু কথাটা সর্বাংশে সত্য নয়। কঠোর রবীন্দ্র বিরোধিতা 'সাহিত্যে'র পাতায় পাতায় স্পষ্ট হয়ে আছে বটে, কিন্তু এই বিরোধিতা পত্রিকাটির জন্মকাল থেকেই দেখা দেয় নি। বরঞ্চ, জন্মকাল থেকে কিছুদিন পর্যন্ত 'সাহিত্য' রবীন্দ্র অনুরক্তির পরিচয়ই বহন করেছে। এমন কি রবীন্দ্রনাথ নিজেও এই পত্রিকার সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন একাধিক রচনা প্রকাশের দ্বারা। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে 'সাহিত্য' পত্রিকার এই যোগাযোগের দিকটি আজকের দিনে কম কৌতূহলের বস্তু নয়।

১২৯৭ সালে সুরেশচন্দ্রের সম্পাদনায় 'সাহিত্য' আত্মপ্রকাশ করে। বৈশাখ মাসেই এর প্রথম সংখ্যা বার হয়। এই সংখ্যার সম্পাদক রচিত, 'নববর্ষ' রচনাটির শেষে ঘোষণা করা হয়—"তবে এখন এস আমরা রবীন্দ্রনাথের সুরবহুর বীণা ঝঙ্কারের প্রতিধ্বনি করিয়া বলি,

'দেখা হতে যাও, পুরাতন।
দেখার নূতন খেলা আরম্ভ হয়েছে।
আবার বাজিছে বাঁশী আবার উঠিছে হাসি,
বসন্তের বাতাস বয়েছে।"

রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে রচনাকে রসঘন ও আবেদন-সমৃদ্ধ করার এই বোধহয় প্রথম উদাহরণ। এই দিক থেকে এই উদ্ধৃতির একটা ঐতিহাসিক মূল্য প্রকট হয়ে পড়ে। মনে রাখতে হবে তখনও রবীন্দ্রনাথ 'মানসী'র কবি হিসেবেও পরিচিত হন নি। মানসীর প্রকাশকাল হল ১২৯৭ সালের পৌষ মাস।

সাহিত্যের দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যার অর্থাৎ ১২৯৮ সালের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হয় 'মানসী' এবং 'রাজা ও রাণী'র সপ্রশংস সমালোচনা। এই লেখেন সম্ভ্রান্ত মহিলা কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী। তবে লেখিকার বক্তব্যের সঙ্গে সম্পাদক যে সম্পূর্ণ একমত হন নি সে কথা পাদটীকায় জানিয়ে দেওয়া হয়, এবং বারান্তরে এ বিষয়ে সম্পাদকের তথা 'সাহিত্যে'র বক্তব্য প্রকাশিত হবে তাও ঘোষণা করা হয়। কিন্তু বক্তব্য যে কারণেই হোক, আর প্রকাশিত হয় নি।

এই বছরেই রবীন্দ্রনাথের রচনা সাহিত্যে প্রথম প্রকাশিত হয়। এবং সাকুল্যে তিনটি রচনা। তার মধ্যে একটি স্বনামে, বাকি দুটি অনামায়। তবে বাৎসরিক সূচীপত্র মারফৎ স্পষ্টই জানা যায় যে অনামা রচনা দুটি রবীন্দ্রনাথেরই। স্বনামে প্রকাশিত রচনাটি হল 'মেঘদূত' নামক প্রবন্ধ, যা পরে 'প্রাচীন সাহিত্যে'র অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তবে অন্তর্ভুক্তির সময় প্রথম কয়েক অনুচ্ছেদ ছেঁটে ফেলা হয়েছে। প্রসঙ্গত বলতে পারি, এই প্রবন্ধের শুরুতেই কবি লিখেছিলেন, "আমি ইতিপূর্বেই মেঘদূত সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছি, কিন্তু তাহাতে অনেক কথা বলা হয় নাই।" এই 'ইতিপূর্বে' লিখিত যে প্রবন্ধের প্রতি কবির ইঙ্গিত রয়েছে সে প্রবন্ধের হদিশ আমরা পাই নি। প্রবন্ধটি বিশেষ অনুসন্ধানের অপেক্ষা রাখে।

অন্য দুটি রচনা নিতান্তই সাময়িক প্রেরণা প্রসূত। এই সময় চন্দ্রনাথ বসু, মধুসূদন শাস্ত্রী প্রভৃতি কয়েকজন হিন্দু ধর্মের বৈজ্ঞানিক ও নূতন আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেন। এই প্রেরণা তাঁরা পান শশধর তর্কচূড়ামণির কাছ থেকে। রবীন্দ্রনাথ এই নব্যহিন্দু আন্দোলন স্বাভাবিক কারণেই সমর্থন করতে পারেন নি; এমন কি প্রকাশ্যে মসীযুদ্ধেও লিপ্ত হয়েছেন। আলোচ্য রচনা দুটি নব্য হিন্দু আন্দোলনের বিরোধিতাসূচক। একটি রচনার শিরোনাম 'লেখার নমুনা'। নব্যহিন্দু আন্দোলনকারীদের যুক্তিহীন কেবায়িত ভাষার প্রতি কটাক্ষ করেই রচনাটি লিখিত বলে ধরে নিতে বাধা নেই। চিঠির আকারে রচনাটি লেখা। আরম্ভ হয়েছে এই ভাবে—"সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু, ধৃষ্টতা মার্জনা করিবেন, কিন্তু না বলিয়া থাকিতে পারি না, আপনারা এখনো লিখিতে শেখেন নাই। অমন মৃদু সম্ভাষণে কাজ চলে না। গলায় গামছা দিয়া লোক টানিতে হইবে। কিন্তু উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত অধিক ফলপ্রদ বলিয়া আমাদের এজেন্সি আফিস হইতে একটা লেখার নমুনা

পাঠাইতেছি।" লেখার নমুনা থেকে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা গেল—দেখিয়া বিস্মিত আশ্চর্য এবং চমৎকৃত হইতে হয়, কি বলিব, চক্ষে জল আসে, কান্না পায়, অশ্রু-সলিলে বক্ষ ভাসিয়া যায়, যখন দেখিতে পাই, যখন প্রত্যহ এমন কি প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করা যায়,—কি দেখা যায়! পোড়া মুখে কেমন করিয়া বলিব, কি দেখা যায়! বলিতে লজ্জা হয়, সরম আসে, মুখ ঢাকিতে ইচ্ছা হয়, উচ্চৈঃস্বরে ডাক ছাড়িয়া বলিতে ইচ্ছা করে, মাতঃ বসুন্ধরে, জননী, মা, মাগো, একবার দ্বিধা হও মা—একবার দুখানা হইয়া ভাগিয়া যাও মা, সন্তানের লজ্জা নিবারণ কর জননী!…"

অন্য রচনাটি 'প্রাচীন প্রস্তাবতত্ত্ব' শিরোনামে বার হয়। মধুসূদন শাস্ত্রী জানান যে প্রাচীন ভারতে গ্যালভানিক ব্যাটারি ছিল, এবং অক্সিজেন বাষ্পের নাম সংস্কৃত ভাষায় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ সরাসরি জানালেন, "প্রাচীন গ্রন্থ হইতেই স্পষ্ট প্রমাণ করিয়া দিব যে পুরাকালে গ্যালভানিক ব্যাটারি ভারতবর্ষে ছিল না এবং সংস্কৃত ভাষায় অক্সিজেন বাষ্পের নাম পাওয়া যায় না।" সাহিত্য সম্পাদক এই রচনার সঙ্গে মধুসূদন শাস্ত্রীর প্রতিবাদ-পত্র যুক্ত করেন। শাস্ত্রী মশাই উষ্মার বশে লিখলেন, —আমাদের ভারত ইতিহাস সমুদ্রের পাতিহাঁস, বঙ্গ-সাহিত্যকুঞ্জের গুঞ্জনোদ্যত কুঞ্জবিহারীবাবু কলম ধরিয়াছেন, অতএব প্রাচীন ভারত, সাবধান! কোথায় খোঁচা লাগে কি জানি! অপৌরুষেয়ের যদি কাণ্ড জ্ঞান থাকিবে, তবে নিজের মুখাভাতে দণ্ড প্রহার করিতে প্রবৃত্তি হইবে কেন?…আমাদের ওই আবড়াতলার দামড়া বাছুরটি প্রাচীন ভারতে গ্যালভ্যানিক ব্যাটারি ও অক্সিজেনের সংস্কৃত নাম খুঁজিয়া পাইলেন না। ধন্য তাঁহার স্বদেশ হিতৈষিতা!"

এর পর বৎসর অর্থাৎ ১২৯৯ সালের সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের তিনটি রচনা বার হয়। আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'সোনার বাঁধন' নামক সনেট যা পরে সোনার তরী কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই কবিতার প্রেরণায় কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন লেখেন 'সোনার শিকলি', 'রূপার বাঁধন' ও 'লোহার বাঁধন' সনেটত্রয়। এগুলি প্রকাশিত হয় ভাদ্র সংখ্যায়। প্রথমটির ভূমিকায় কবি লেখেন, "প্রিয় সাহিত্য! বলা বাহুল্য, আমার এ সনেটটি রবিবাবুর 'সোনার বাঁধন' কবিতার অনুকরণে লিখিত। প্রভেদ এই যে তাঁহার খাঁটি সোনা, আর আমার Chemical Gold. তা ভাই! যার যেমন ব্যাপার!" দ্বিতীয় সনেট, অর্থাৎ 'রূপার বাঁধন' কবিতারও একটু ভূমিকা ছিল। তাতে দেবেন্দ্রনাথ জানান, 'সোনার বাঁধন' পাঠ করিয়া কাহারও যে 'রূপার বাঁধন' ভাল লাগিবে এ প্রত্যাশা করি না। তবে পাঠিকারা যে মুখ বাঁকাইবেন, এমন বোধ হয় না; কারণ পরম্পরায় শুনিয়াছি, তাঁহারা উভয় বাঁধনেরই পক্ষপাতী।"

আষাঢ় সংখ্যাতেই রবীন্দ্রনাথের একটি গদ্য রচনা প্রকাশিত হয়। নাম 'নব্য লয়তত্ত্ব'। লেখাটি একটি প্রতিবাদ। চন্দ্রনাথ বসু সাহিত্যে 'লয়তত্ত্ব' নামক যে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন তার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা' পত্রিকায় 'চন্দ্রনাথ বসুর স্বরচিত লয়তত্ত্ব' নামে একটি রচনায় যথেষ্ট ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেন। সাহিত্য পত্রিকাতেই চন্দ্রনাথ বসু জানান যে লয়তত্ত্বটি তাঁর স্বরচিত নয়। রবীন্দ্রনাথ এবার সাহিত্যে তাঁর প্রতিবাদ পাঠিয়ে জানালেন যে 'স্বরচিত' কথাতে যদি চন্দ্রনাথ বসুর আপত্তি থাকে, তা হলে বলা যাক যে তত্ত্বটি নব্য লয়তত্ত্ব, কারণ যে লয়তত্ত্ব, চন্দ্রনাথ ব্যাখ্যা করেছেন তা হিন্দু শাস্ত্রগত নয়, নূতন একটা কিছু।

কার্তিক সংখ্যার সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের আর একটি গদ্য রচনা বার হয়। শিরোনাম, 'একটি পত্র'। রচনাটিতে কবি কাব্য সমালোচনা রীতি সম্বন্ধে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন। তিনি জানালেন, "সমালোচনা বলিতে যদি বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, মনস্তত্ত্ব, নীতিশাস্ত্র প্রভৃতি ন্যায়দণ্ড বলবল লইয়া কাব্যের অন্তঃপুর আক্রমণ বোঝায়, তবে আমার দ্বারা তাহা অসম্ভব। আমি এইটুকু বলিতে পারি, আমার কাছে কেমন লাগিল।" এই কটি কথা থেকেই কবির বক্তব্য বুঝতে পারা যায়। সমালোচনা ঘটিত তাত্ত্বিক আলোচনার একটি প্রাথমিক রবীন্দ্র রচনা হিসেবে লেখাটির একটি বিশেষ মূল্য আছে। লেখাটি কিন্তু আজও কোনো পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হয় নি।

১৩০০ সালের সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের নিজের রচনা মাত্র একটি দেখতে পাই। বৈশাখ সংখ্যায় 'রবীন্দ্রবাবুর পত্র' নামক লেখা। পত্রটির উদ্দেশ্য জানা যাবে এই

উদ্ধৃতি মারফৎ—"সাহিত্য সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু, চন্দ্রনাথবাবুর প্রতি আমার বিদ্বেষভাব আপনি যে রূপে প্রমাণ করিতে বসিয়াছেন, তাহা আপনার উপযুক্ত হয় নাই। 'হিং টিং ছট্' নামক কবিতায় আমি যে চন্দ্রনাথ বাবুকে লক্ষ্য করিয়া বিদ্রূপ করিয়াছি, ইহা কাহারও সরল বা অসরল কোনো প্রকার বুদ্ধিতে কখনো উদয় হইতে পারে তাহা আমার স্বপ্নেরও আগোচর ছিল। আপনি লিখিয়াছিলেন, 'অনেকেই বুঝিয়াছে যে এই বিদ্রূপ ও ঘৃণাপূর্ণ' কবিতার লক্ষ্য চন্দ্রনাথবাবু'—এই পর্যন্ত বলিতে পারি যাহারা আমার সেই কবিতাটি বুঝিয়াছে তাহারা সেরূপ বুঝে নাই।" এই পত্রের পাদটীকায় সম্পাদকের মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য। সম্পাদক জানান, "গতবর্ষের একাদশ-সংখ্যক সাহিত্যে 'তর্ক-বৈচিত্র্য' নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সেই প্রবন্ধ-প্রসঙ্গে মাননীয় শ্রীযুক্তবাবু রবীন্দ্র ঠাকুর মহাশয়ের এই পত্র। কিন্তু, এই পত্র, সাহিত্য সম্পাদককে কেন লেখা হইল, তাহা কেবল এক রবীন্দ্রবাবু ব্যতীত আর কাহারও বুঝিতে পারিবার সম্ভাবনা নাই।...তর্ক-বৈচিত্র্য প্রবন্ধ আমরা নিজে লিখি নাই। অতএব তাহার মতামতের জন্য আমরা দায়ী নহি।"

এর পর সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের আর মাত্র একটি লেখাই বার হয়। ১৩০৩ সালের বৈশাখ সংখ্যায় দেখা যায় কবির একটি গান—

"উৎসবে করেছ আজি এ আনন্দ রাতি,
বিকশিয়া তোমার আনন্দ-মুখ ভাতি।"

কিন্তু তাই বলে এই সময়ের মধ্যে সাহিত্যে রবীন্দ্র-অনুরক্তির নিদর্শন নেই, তা মোটেই নয়। ১৩০০ সালের পৌষ সংখ্যায় পাই—কবিবন্ধু প্রিয়নাথ সেনের 'মানসী'-সমালোচনা। প্রিয়নাথ সেন জানালেন, "আমাদের বিবেচনায় মানসী একখানি অতি উৎকৃষ্ট, অপূর্ব গ্রন্থ। অপর কোনও ভাষাতে এরূপ একখানি গ্রন্থের ভিতর এত উচ্চ দরের অথচ বিভিন্ন প্রকৃতির এতগুলি কবিতা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। কুড়ি বৎসরের ভিতর ইংরেজী বা ফরাসী ভাষায় এমন কোনও কবিতা-পুস্তক দেখিয়াছি কি?" এই ভূমিকার পর মানসীর ভাব ও ভাষা, এবং ছন্দের নতুনত্ব ও উৎকর্ষ বিচার বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে।

সাহিত্য পত্রিকার একটি আকর্ষণীয় বিভাগ ছিল, 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।' এই বিভাগে তৎকালীন বিখ্যাত মাসিক পত্রের অন্তর্ভুক্ত বিশেষ বিশেষ রচনার সমালোচনা করা হত। কাজটি সুরেশ সমাজপতির নিজের হাতেই ন্যস্ত ছিল। তখন রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা' পত্রিকা নিয়ে মেতেছেন, তাঁর নানা লেখা সে কাগজে বেরুচ্ছে। এই সব লেখার কিছু কিছু সমালোচনা 'সাহিত্যে'র পাতায় মুদ্রিত আছে। এই সমালোচনা গুলির মধ্যে রবীন্দ্র-অনুরাগ রীতিমত পরিস্ফুট। যে 'সোনার তরী' কবিতাটি অবলম্বন করে একদা দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রবল রবীন্দ্র-বিরোধিতার ঝড় তোলেন, সেই 'সোনার তরী' কবিতা প্রকাশিত হতেই সাহিত্য লেখে—"এবারকার সাধনায় আর একটি মহামূল্য অলঙ্কার শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সোনার তরী'। আমরা বহুদিন এমন সর্বাঙ্গ সুন্দর প্রকৃত কবিত্বময় কবিতা পড়ি নাই। আমরা উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না [সমগ্র কবিতাটি উদ্ধৃত হয়] ইহার কবিত্ব ও সৌন্দর্য রচনাতীত, তাহা কেবল হৃদয় দিয়া অনুভব করা যায়। তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা দুরূহ। রবীন্দ্রবাবু বহুদিন এমন কবিতা লেখেন নাই...তিনি 'সোনার তরী'র মত কবিতা লিখুন, তাঁহার সোনার লেখনী অমর হইয়া থাকিবে।" (১৩০০, শ্রাবণ)

'চিত্রা'র অন্তর্গত 'মৃত্যুর পরে' কবিতাটি (আজিকে হয়েছে শান্তি,—জীবনের ভুলভ্রান্তি, সব গেছে চুকে) ১২৮১ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার সাধনায় প্রথম প্রকাশিত হয়। ঐ সালের আষাঢ় সংখ্যায় সাহিত্যে সমাজপতি লিখলেন, "এই সুন্দর ও চিন্তাশীলতার পরিচায়ক কবিতার নিগূঢ় রহস্যরস কেবল অনুভবযোগ্য।"

'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের সম্বন্ধে লেখা হয়—'ক্ষুধিত পাষাণ' একটি অতি চমৎকার সুরচিত গল্প—একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া ছাড়া যায় না। এই গল্পের রচনাপ্রণালী যেমন সুন্দর—ইহার কল্পনাকৌশলও তেমনই মনোহর। বর্ণনা যেমন স্বাভাবিক, তেমনই কবিত্বপূর্ণ। গল্পটিতে পাঠকের আগ্রহ আদ্যন্ত জাগরিত থাকে,—এবং নিঃশেষে পাঠ করিয়াও কৌতূহল-পিপাসা নিবৃত্ত হয় না। এই গল্পের সেই মায়াময়ের, সেই তরুণী ইরাণী, সেই অরালী পর্বতের

শিখরে ঘনসন্ধ্যা প্রভৃতি কবির অতি সুন্দর সৃষ্টি—সত্য সত্যই যেন আরব্য উপন্যাসের স্বপ্ন।"

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুতে অনেকেই তাঁর জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ আলোচনা সম্বলিত রচনা প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথও ১৩০০ সালের বৈশাখ সংখ্যার সাধনায় 'বঙ্কিমচন্দ্র' নামক তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধটি লেখেন। পরের মাসে সাহিত্যের সমালোচনা-বিভাগে সমাজপতি মহাশয় এই প্রবন্ধের জন্যে রবীন্দ্রনাথকে সাধুবাদ জানান। তিনি লেখেন, "এবারকার সাধনায় সর্বপ্রধান প্রবন্ধ—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বঙ্কিমচন্দ্র'। বঙ্কিমবাবুর বিষয়ে এ পর্যন্ত যিনি যাহা বলিয়াছেন বা লিখিয়াছেন রবীন্দ্রবাবুর 'বঙ্কিমচন্দ্র' তাহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। বঙ্কিমবাবুর বিষয়ে আমরা এরূপ রচনা দেখিতে পাইব, সে আশা ছিল না। কিন্তু রবীন্দ্রবাবু বাঙলা সাহিত্যের মুখ রাখিয়াছেন। যথার্থ সাহিত্যসেবীর মতো তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যমূর্তির উজ্জ্বলে নিখুঁত চমৎকার ছবি আঁকিয়াছেন। আমরা সকলকে রবীন্দ্রবাবুর 'বঙ্কিমচন্দ্র' পড়িতে অনুরোধ করি।"

তবে রবীন্দ্র সাহিত্যের এই সব সপ্রশংস সমালোচনার মধ্যে কিঞ্চিৎ বিরূপতার স্বাদও মিশেল দিল দেখা যায়। যেমন, ১৩০০ সালের ভাদ্র সংখ্যার সাহিত্যে কবির 'শাস্তি' গল্প সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছিল,—"লেখক গল্পটি লিখিয়া কাহাকে শাস্তি দিতে চাহেন, বুঝিতে পারিলাম না যদি পাঠককে শাস্তি দেওয়াই তাঁহার লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে তাঁহার সে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইয়াছে।"

রবীন্দ্র-জীবনীকার বলেছেন, "'সাহিত্য' রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যে বিরুদ্ধে সমালোচনা বহু বৎসর যাবৎ যথানিয়ম প্রকাশ করিয়া সাময়িক সাহিত্য ক্ষেত্রে ধন্যবাদী হন, তাহার সূত্রপাত হয় হেমেন্দ্রপ্রসাদের···প্রবন্ধ হইতে।" হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ ১৩০৪ সালের সাহিত্যে চৈতালি কাব্য গ্রন্থের নিন্দাসূচক সমালোচনা প্রকাশ করেন। এরপর থেকে যে সাহিত্যে রবীন্দ্র-বিরোধিতা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, একথা ঠিক। তবে এই বিরোধিতা তীব্র ও নিয়মিত হয়ে দেখা দেয় ১৩০৯-১০ সালের পর থেকে। ১৩০৪ সালের পরেও রবীন্দ্র-কাব্যের ঝোরালো প্রশংসাসূচক সমালোচনা সাহিত্যের পাতায় দেখা যায়। 'ভ্রষ্টলগ্ন' কবিতাটি সম্বন্ধে লেখা হয়। "কবি অতি সুকৌশলে কতিপয় ছত্রের মধ্যে কোন অজ্ঞাত উপকথা-নন্দনের অধীশ্বরী স্বপ্নময়ী লীলাময়ী তরুণ হৃদয়ের মধুর করুণ প্রেমকাহিনী চিত্রিত করিয়াছেন। কবিতার সংকীর্ণ আয়তনে যতখানি পরিব্যক্ত, তদপেক্ষা অনেক অধিক অব্যক্ত কাহিনী কল্পনায় প্রতিবিম্বিত হয়। কবির কলাকৌশলে পাঠকের কল্পনা জাগিয়া উঠে, তখন সুপ্তোত্থিতা কল্পনা কখনও আবেগে অধীর হইয়া সেই প্রেমময়ী লাস্যময়ী মায়াময়ী মানসী স্বপ্ন-রাণীর আকাঙ্ক্ষা-চঞ্চল হৃদয়ের তালে তালে নাচিতে থাকে, পরক্ষণে নায়িকার সরমে সংকোচে মুগ্ধ হইয়া আপনাতে আপনি নিমগ্ন-মৌন হইয়া যায়। যখন 'অরুণ-সুন্দর, পথে রাজরথে তরুণ পথিক দেখা দিয়া' কাতরস্বরে ডাকিয়া যায়—'সে কোথায়,' 'সে কোথায়'—তখন 'সরমে মরিয়া' মানসী মূক হইয়া থাকে—বলিতে পারে না—'হতাশ পথিক, সে যে আমি, সেই আমি। 'তারপর, যখন ফিরিয়া ফিরিয়া বার বার ডাকিয়া বাহিত চলিয়া যায়, তখন চির-বিরহকাতরা 'শূন্য রাজপথ পানে চাহিয়া' জানলার তলে ধূলায় বসিয়া 'ত্রিযামা যামিনী' জাগিয়া একাকিনী গাহিতে থাকে—'হতাশ পথিক, সে যে আমি!' ইহাই মানব হৃদয়ের যুগযুগান্তব্যাপী বিরহকাব্য—জগতের নিষ্ঠুর সত্য। এই নিষ্ঠুর চিরসত্যের প্রতি তৃষিত মানবের কি প্রবল আকর্ষণ। কবি কাব্যকলার কুহকে যেন সেই চিরসত্যের নিদারুণ নিষ্ঠুরতা ঢাকিয়া দিয়াছেন;—যেখানে করুণার অশ্রুমন্দাকিনী জগতের মরুক্ষেত্র সিক্ত সরস স্নিগ্ধ করিয়া তুলিতেছে, কবি সেই পুণ্য-বিরহতীর্থে সেই চিরপুরাতন চিরনবীন চিরন্তন তৃষিতার মন্দির গড়িয়াছেন।" (১৩০৬, কার্তিক)

কোনো রবীন্দ্র কবিতার এমন রঙ্গন, সংবেদনশীল সার্থক সমালোচনা বদাচিৎ দেখা গেছে। ভ্রষ্টলগ্ন কবিতার আস্বাদন এই রচনায় যা পাওয়া যায় তাকে ছাপিয়ে আর বেশি কিছু অন্য কোনো রচনায় পাওয়া গেছে কিনা জানি না।

কিন্তু এইখানেই শেষ। রবীন্দ্র-সাহিত্যের এমন নিবিড় আস্বাদন উপলব্ধি প্রকাশ করা সাহিত্যের পক্ষে আর সম্ভব হয় নি। বরং এর পর থেকে সুরেশ সমাজপতির সাহিত্য পত্রিকা খোলাখুলিভাবে রবীন্দ্র-বিরোধিতার মুখর হয়ে ওঠে। এই রুচি-পরিবর্তনের কারণ নির্ণয় করা আমাদের সমালোচনার একটা আশুকর্তব্য বলে মনে করি।

মা-র শ্বশুর বাড়ী

চিত্তরঞ্জন ঘোষ

শরতের রোদে সোনা ঝিকিয়ে উঠলেই মা-র মন আনচান করে ওঠে। মন আর টেঁকে না শ্বশুরবাড়ীতে। বাপের বাড়ীর জন্য প্রাণ কাঁদে। কিন্তু যাওয়া কি চাট্টিখানি কথা! ছুটি বলতে ছুটি—বেরোব বললেই কি বেরোনো যায়! পুজো তো এক কাঁড়ি—তাদের পুষিয়ে দেওয়া কি কম ঝামেলা! আর বাড়ীর লোকেরা তো লোক নয়, যেন এক একটি অবতার। এক একটি পদ। আর বাড়ীর কর্তাই যদি শ্মশানে বসে ছাই মেখে ছাই পাঁশ গেলে, তবে আর ছেলেমেয়েদের কি বলা যায়।

এই সব কথা বিড় বিড় করতে করতে মা এসে দাঁড়ালেন বাড়ীর কর্তার কাছে। কর্তা তখন চোখ বুঁজে ভোম হয়ে বসে ত্রিভুবনের ভবিষ্যৎ চিন্তা করছিলেন।

মা বললেন, 'বলি এই সাত-সকালে হচ্ছে কি?'

কর্তা চোখ না খুলেই বললেন, 'সকাল আবার সাতটা হল কি করে? আমি তো দেখছি একটা।'

মা ঝংকার দিয়ে উঠলেন: 'তুমি একটাও দেখছ না। চোখ বুঁজে থাকলে কি—।

'চোখ খুলেছি। তুমি তোমার চোখে মুখে ঈষৎ স্নিগ্ধ হও।' কর্তা চোখ খুললেন। 'বল দেবী, আমি কী করতে পারি তোমার তুষার?'

'বলি, আমি কি এবার বাপের বাড়ী যাব না?'

'যাও। একটু বেশীদিন থেকো। তাহলে আমি এখানে একটু—'

'তুমি যাবে না?'

'না।'

'কেন?'

'তোমার পিত্রালয়ে দর্শনি চর্চার বড় অসুবিধা।'

'কেন? অসুবিধেটা কি?'

'শ্মশান-মশান নেই।'

'কেন? সে দেশের ঘাটের মড়ারা তবে যাচ্ছে কোথায়?'

'বৈদ্যুতিক কটাহে তাদের দগ্ধ করা হচ্ছে। আগে শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার একটা প্রলোভন ছিল—ভাল 'রাজকীয় বন্দ-ব্যাঘ্রে'র ছাল দিত পরবার জন্য, এখন দেয় নকল ছাল। আর নেপার যোগানটাও পাওয়া যেত ভাল—কিন্তু এখন আবগারীর বড় কড়াকড়ি।'

'তাহলে তুমি এখানেই থাক।' মা রাগ করে উঠলেন, 'ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে—ওদের নিয়ে আমি যাব।'

'তথাস্তু।' কর্তা ধ্যানস্থ হলেন।

মা এলেন গণেশের কাছে। গণেশ তখন শুঁড় দিয়ে পিঠের ধুলোমাখা খানসুলি চুলকোচ্ছিলেন।

মা বললেন, 'বাবা গণেশ, মামার বাড়ী যেতে হবে। গুছিয়ে-গাছিয়ে নাও।'

গণেশ তিন হাতে আড়মোড়া ভেঙে বললে, 'মামা-বাড়ীতে এবার আর যাব না ভাবছি।'

'কেন রে গণপা, তোর আবার কি হোলো?'

'মামাবাড়ীতে ভোজনের বড় অসুবিধে। মাছ পাঁচ টাকা। তাছাড়া সব খাবারে ভেজাল। মার্কিন ময়দা খেলে পক্ষাঘাত হবে।'

'পরীর মামাবাড়ীতে নয়তো দু'দিন একটু কমই খেলি।'

তাহলে আর গিয়ে সুখটা কি।'

'তুই কি মামাবাড়ীতে শুধু খেতেই যাস?'

'নয়তো কি? আর আমার কি সুখ? ছেলেরা সব আমার শুঁড় ধরে টানাটানি করে—যেন এটা একটা ল্যাজ। আর ছেলেবুড়ো সবাই যত হাঁদা-ভোঁদাকে ডাকে 'গোবর গণেশ' বলে। আমি বলুন, আমার মধ্যে গোবরটা আসে কি করে! আমার উদর একটু পুষ্ট বলে ট্রামে-বাসে উঠতে দেয় না লোকে, বলে—দুটো টিকিট লাগবে।'

'কিন্তু খোলবার সময় তোর কত সুবিধে বল। শুঁড় দিয়ে আঁকড়ে ধরলে তিনটে হাতের সুবিধে পাওয়া যায়।'

'ঘরে অত জায়গা থাকলে তো।'

'তাছাড়া তুই সিদ্ধিদাতা, তোর কত খাতির।'

'হ্যাঁ, সবাই এসে নেপা চায়।' বলে গণেশ উদর উর্ধ্বমুখী করে শুয়ে পড়ল।

মা বল্লেন, 'থাকো। শুয়ে শুয়ে আরও ঘুমনো হও।'

মা এলেন কার্তিকের কাছে। কার্তিক তখন গুন গুন করে টাই বাঁধছিলেন। মাকে দেখে ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'আবার কি বায়না মা তোমার?'

'আমি বুঝি তোদের কাছে শুধু বায়না নিয়েই আসি।'

'মাকী কান্না ছেড়ে চটপট বলে ফেল। সময় নেই।'

'কাতু, এবার মামাবাড়ী যাবিনে?'

'উটুন্। ছেলু। ভদ্দরলোকে যে কী করে থাকে ওখানে। ঘাম, মশা, মাছি, কলেরা, বসন্ত, জলাভাব, দুর্ভিক্ষ। উঃ! আর আমাকে কিনা একটা নাইনটিনথ্ ডেফ্‌নীর বাবু সাজিয়ে রাখে! অডাসিটি। আর মেয়েগুলো দস্তুরমত আনদিসিপ্লিনড্। আমি ব্যাচেলার থাকতে চাই।' মেয়েগুলো চোখ দিয়ে এমন খোঁচা মারে যে—'

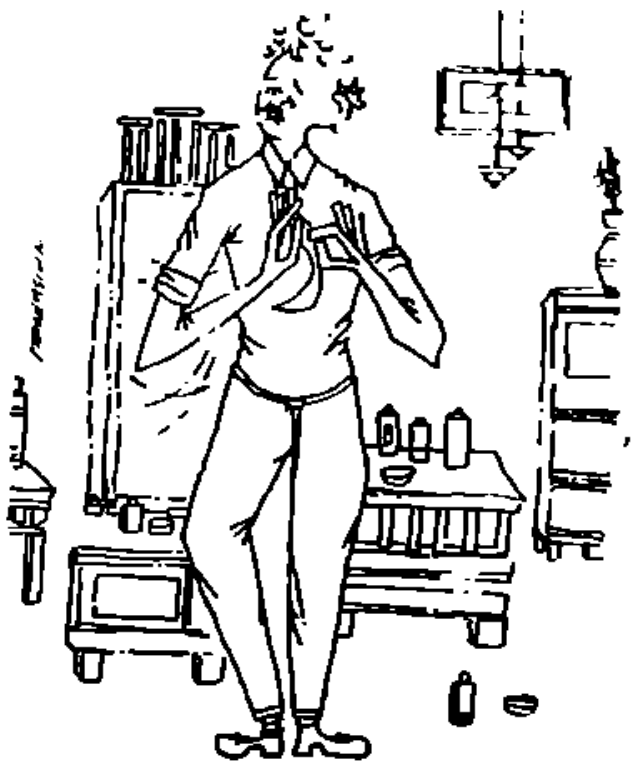

বলে যাব।···নাম···কার্তিককুমার।

'তা তুই কি আবার মিলিটারীতে যা কি নাকি?'

'নাঃ! খেয়া ধরে গেছে। বলে যাব।'

'কেন?'

'বন্ধুরা বলছে আমার চেহারাটা নাকি ভাল। ভাবছি তাই সিনেমায় নামব। নামও ঠিক করে গেছে—কার্তিককুমার।'

মা বললেন, 'যাও, আমার মেয়েরা বড় হয়েছে। ওদের নিয়ে যাব।'

'তাই যাও। এখন আর ক্যাচ্ ক্যাচ্ কোরো না। গানের মুড্‌টা নষ্ট করে দিলে। লা লা লা, লা লা লা। প্যার কিয়া তো ডরনা ক্যা···'

মা এলেন লক্ষ্মীর কাছে। লক্ষ্মী তখন নতুন ডিজাইনের গয়নাগুলো উলটে-পালটে দেখছিল।

মা বললেন, 'লক্ষ্মী, একটু গোছগাছ করে নে মা।'

'আমি রেডী।'

'বেশ, বেশ।' মা খুব খুশী।

'কি কি নিবি ?'

'কার কোট দুটো। সোয়েটার তিনটে। বোরা—'

'অত গরম কাপড় নিয়ে কী হবে ?'

'ও বাবা, সে দেশ খুব ঠাণ্ডা।'

'কি বলছিস তুই, আশ্বিন মাসে ঠাণ্ডা !'

'হ্যাঁ গো। তাছাড়া আমরা থাকব কয়েক মাস।'

'থাকবি কোথায়—মামাবাড়ীতে ?'

'ও লর্ড ! আমি যাচ্ছি সুইজারল্যাণ্ড। মামাবাড়ী যাব কোন দুঃখে ! জানো মা, নারায়ণ এবার বিজনেসে প্রচুর লাভ করেছে। ঐ অষ্টগ্রহ যজ্ঞ তোলো—তাইতে। মামাবাড়ীতে ভিখিরির ছেলেরা বড্ড বিরক্ত করে।'

মা আর কোন কথা খুঁজে না পেয়ে বললেন, 'লক্ষী, তোরা ঘরের নাম ঘরে ডাকিস কেন রে ?'

লক্ষী বলল, 'ওঃ ওল্ড মামী, তুমি একটুও মডার্ন হলে না।'

মা এলেন সরস্বতীর কাছে। সে তখন হুলাহুলা নাচ প্র্যাকটিস করছিল।

মা বললেন, 'এত বয়সে আবার নাচ কিসের লো সরি ?'

'ফাংশন আছে। তেরে কেটে তাক্ তাক্ তাক্—'

'কো থা য় ? নিউ এম্পায়ারে ?'

'না। কৈলাস এম্পায়ারে ! তারপর আমেরিকা সফরে যেতে পারি। দিন্ দিন্ তা, তেরে কেটে তাক।'

'এ বা র তা হ লে মামাবাড়ী যাবি না ?'

'এবার আমায় ক্ষেমা দাও মা। মামাবাড়ীতে বাইকে যা গান শোনাতে আরম্ভ করে, লোকে পা গ লা হ তে যা য়। তেরে কেটে তাক। তাক ধিন তাক ধিন্—'

মা মন্থর গতিতে গেলেন গোয়ালে—শিবরাম বণ্ডরাজের কাছে। সে মাকে দেখে হাঁক দিল, 'গাঁক— গাঁক—মা।'

মা বললেন, 'বাবা বণ্ডু, এবার তো একবার আমার বাপের বাড়ী যেতে হয়।'

'মা, এটি এবার পারব না। কিন্তু মনে কোরো না মা। আগে তোমার দেশ বণ্ড বিহারের অত্যন্ত প্রকৃষ্ট যায়গা ছিল। কিন্তু এবছরে সরকার বাহাদুর যথেচ্ছ বিহারী বণ্ডদের পাঁচশো জন মহাবলীকে বন্দী করে রেখেছেন পানাগড়ে ! আমি গেলে আমাকেও নির্ঘাৎ বন্দী করে রেখে দেবে।'

মা গেলেন অসুরের কাছে : 'বাবা অসুর, একবার তো যেতে হয়।'

'কোতা ? আপনার বাপের বাড়ী ?'

'হ্যাঁ, বাবা। তুমি আর 'মা' বোলো না।'

'আমি 'মা' বলব ? আপনি কী ক্ষেপেচেন মাইরি ? ওখেনে আমাদের এখন খুব সুবিধে-টুবিধে হয়েচে। অন্যবার শুধু ছোরা নিয়ে যাই, এবার চাকু-বোমা-সোডাবোতল নিয়ে যাব।'

'তাই যেয়ো বাবা।' মা একটি সঙ্গী পেয়ে আনন্দে আপ্লুত হয়ে গেলেন।

'সি ও র যা বো। আপনি নিস্ চিন্ত থাকুন।' অসুর চাকুতে শান দিতে লাগল।

মা নিশ্চিন্ত হয়ে গেলেন সিংহের কাছে। সিংহ তখন তার কেশরে শ্যাম্পু করছিল। সিংহ একটু কেশর-বিলাসী। মাকে দেখেই বলল, 'মা যে ! এমন অসময়ে ! ও বুঝেছি। না মা, এবার আমি যেতে পারব না। মনে আছে তো, গেলবারে পাজা ছ'টি মাস খাঁচায় বাস

সরস্বতী তখন নাচ প্র্যাকটিস করছিল।

করে এসেছি।'

'হ্যাঁ বাবা। গেলবার আসবার সময় হঠাৎ চিড়িয়াখানার বড়কর্তা এমনভাবে কেঁদে ককিয়ে ধরলে যে আর না বলতে পারলুম না। ওদের সিংহটা গিয়েছিল মরে। তাই কয়েক দিন—'

'কয়েক দিন বলে পাক্কা দু'মাস আটকে রেখে দিলে। নেহাৎ তোমার বাপের বাড়ীর লোক বলে! নয়তো দেখিয়ে দিতুম মজা।'

নন্দী-ভৃঙ্গীর কাছে যেতে তারা বললে, 'আপনি বাবা যাবেন। সেখানে বাবা তো ভাইয়োনেদের কাছ থেকে বিস্তর নানান রকমী তে বোম্বাই নাচ শিখেছি, কতদূর শেখা হোলো সেটা ওদের দেখিয়ে আসতে হবে।'

'বেশ বাবা বেশ।' মা পুলকিত।

নন্দী-ভৃঙ্গী নাচ প্র্যাকটিস করতে লাগল।

আলবৎ যাব

ইঁদুরও যেতে রাজী হোলো। বললে, 'নিশ্চয়ই যাব। মা, তোমার বাপের বাড়ীর দেশ মহান। ঐ একমাত্র দেশ যেখানে প্রবল প্রতাপান্বিত ইঁদুরদের ভয়ে বিড়ালরা তটস্থ।'

হাঁস যেতে রাজী হোলো না, কারণ—'অত্যন্ত জলের অভাব, সেই সঙ্গে শামুক-গেঁড়ী-গুগলির। তবু এতদিন ছিল কষ্ট লেক্—একটু জলবিহার করে গেঁড়ী-আহার করে আসতাম। এখন আর যাব কি জন্যে!'

পেঁচা উৎসাহ করে বললে, 'যাব। এর আগে চোখ ধাঁধানো বিদ্যুতের আলোয় বড় কষ্ট হোতো। এখন বিদ্যুৎশক্তির অভাবে ক্রমাগত ব্ল্যাকআউট চালু আছে। সুতরাং চোখ বুঁজে যাব।'

মহুয়ে যেতে রাজী হোলো না: 'মা, তোমার বাপের বাড়ীর লোকেরা আমাকে ভাবে তাদেরই মত মহুয়েপুচ্ছ-যুক্ত কাক বিশেষ। তারা আমার লেজ টেনে অস্থির করে তোলে: ভাবে, খুলবে।'

এইবার তাই মা এক্তার পার্টি আসছেন, তবে সংক্ষিপ্ত সংস্করণে।

মা বাক্‌সো-প্যাঁটরা গাঠরি-গাটরা বেঁধে যাত্রা করলেন। দুপাশে প্যাঁচা এবং ইঁদুর। পেছনে অসুর তারও পেছনে নন্দী-ভৃঙ্গী। এই এবারকার মা এক্তার পার্টি।

মা একটু মনমরা। কান খাড়া করে শুনছেন কখন আগমনী শোনা যায়।

হঠাৎ শুনলেন, পেছনে অসুর সুর ধরেছে: 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চল রে···'

নন্দী-ভৃঙ্গী গানের তালে তালে নাচ প্র্যাকটিস করতে লাগল—বোম্বাই নাচ।

মা আসছেন।

লোহার বাসর

আশা দেবী

মুখবন্ধ

সালটা ছিল ১৯৩১।

আজকের দিনে ঘরে বসে চিন্তা করলে অদ্ভুত মনে হয়। এই কলকাতার যেন তখন ভিন্নরূপ। ব্ল্যাক আউট, মিলিটারী, পুলিস, সাইরেন—আর ব্যাকল্ ওয়ালের পত্রলেখার কারুকলা কলকাতার সর্বাঙ্গে। আকাশের তাম্রবুক চিরে চিরে উঠছে পেত্নীর কান্নার মত সাইরেন। পথে পথে লোক ছুটছে ব্যাকেল ওয়ালের আশ্রয়ে বিকল মনোরথে। ঘরে ঘরে শিশুরা কেঁদে উঠছে—বাড়ীতে বাড়ীতে কানে তুলো গুঁজে দিয়ে ছেলেপুলেরা শান্ত। নববধূ ধায় ধরে কম্পমান বুকে প্রদীপ সন্তর্পণে—স্বামী তার হয়তো অফিসে তখন।

এরই এক বছর আগে যদি আপনি এই কলকাতায় এসে থাকেন তবে চমকে যাবেন। অর্জুন তখন বৃহন্নলা। পথে পথে হস্টেল—আর পথে পথে মেয়েদের আবাস। দক্ষিণাও সামান্য। কাজেই বিস্তহীন বিদ্যাকামীর দল ভীড় করতো এতেই। এই বিচিত্র আবাসের অন্তর আর বাহির ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। বাইরে থেকে এদের যতই নারী কল্যাণকামী মনে হতো—ভেতরে ভেতরে তারা তত প্রবল ব্যবসায়ী।

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীর প্রাণের কথাটিই এরা গ্রহণ করেছিলেন এখানের মালিকেরা লক্ষ্মীর ঝাঁপি লুট করে—পাঁচা মার লক্ষ্মী ঠাকরুণটীকে নিয়ে পর্যন্ত ব্যবসা চালাতো. সেই দিনের কথাই বলবো।

॥ এক ॥

সুকিয়া স্ট্রীট। পুরোনো ধরনের একটা বাড়ীর কাছে এসে গাড়ীটা থামলো।

প্রসন্ন স্নিগ্ধ সকাল। গাড়ীটা সেই ১১৮এ।১।২নং বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াতেই ওপরের কুল বারান্দা থেকে ত্রিশটা খোঁপা বাঁধা, চুল খোলা,—দুধারে বিনুনী করা মাথা ঝুলে এলো। অনুলেখা ধীরে ধীরে গাড়ী থেকে নেমে এলো. সঙ্গে নামলেন এক বৃদ্ধ। এক মুখ পানের পিচ একটি এঁটুলি কাটা কুকুরের মতকে পরিত্যাগ করে এগিয়ে এলেন অনুলেখাকে নিয়ে।

এটাই কি 'নারী নিবাস ?'

হ্যাঁ—ওপরে যান—সামনের প্রায়ান্ধকার সিঁড়ির দিকে পথিক অঙ্গুলি নির্দেশ করলো, বৃন্দাবন দাস অনুলেখাকে প্রায় ঠেলতে ঠেলতে ওপরে নিয়ে তুললেন। সঙ্কীর্ণ সিঁড়িটা অন্ধকার। এক পাশে কাঠখোলা একটা খোলার চটের তলায় অস্থায়ী আবাস স্থাপন করেছিল; স্বল্প দৃষ্টির জন্যে বৃন্দাবন দাসের লাঠির অতর্কিত আঘাতে তারা ছত্র ভঙ্গ হয়ে কেউ কেউ দণ্ডধারী বৃন্দাবনবাবুকেই অবলম্বন করলো।

যা বলো। যত সব আপদ -

অনু মুখে হাত দিয়ে মুক করে একটু হাসতেই বৃন্দাবনবাবু এক ধমক দিলেন।

হতভাগা আরশোলাগুলো ব্রাসের মত পা দিয়ে আমার গা ছুলে দিলে আর তোর পেলো হাসি—যত সব—

হাসি নি কাকাবাবু—

হাসি নি কাকাবাবু !—বৃন্দাবন সঙ্গে সঙ্গে দোয়ারের মত ভেংচি কেটে উঠলেন। কিন্তু সেই মুহূর্তেই ওপরের যে অসহায় ইলেকট্রিকের তারটা শূন্যে ঝুলছিল সেটা বৃন্দাবনবাবুর লাঠির আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে একেবারে স্বয়ং বৃন্দাবনবাবুর কণ্ঠ লগ্ন হলো।

তোর জন্যে আমায় মরতে হবে দেখছি—ও দারোয়ান ভাই—বলতে বলতেই তারের টুকরোটা ছিঁড়ে নীচে পড়ে গেল।

একেবারে আলিবাবার গল্পের মত যেন চিচিং ফাঁক হলো। বৃন্দাবনবাবু কথার উৎস খুলে গেল।

—কত সব পরের বোঝা আমার ঘাড়ে। আপদ আর কাকে বলে! সেই বলরাম কলকাতায় যাবে অমনি নিজে এলো, বিধবা মা টাকে আনলো। কেন রে বাপু? দেশে কি আর লোক নেই? যত ঝাই কেসতে ভাগ্যি কুলো—এই বৃন্দাবন।

কই ঘর দেখা—এই ঘর? চল চল—এগো! আমার যেতে হে আগে। তোকে দিয়ে কিছু হবে না।

একটা অন্ধকার ঘর। পুরোনো চুণ ওঠা দেয়ালে যেন কার রং ওঠা বিবর্ণ ছবি। একটা টেবিলের ধারে তিনটে চেয়ার সাজানো; একটায় এক ভদ্রলোক, বসে। বিরাট চেহারা মুখে, কটা গোঁফ, পরণে পাঁচ হাত ধুতি আর গায়ে একটা কোট। তার পেটের সব বোতামগুলো খোলা। বোধহয় নিজের বিয়ের শ্বশুর বাড়ী থেকে পাওয়া,—কাজেই কিঞ্চিৎ প্রাচীন হয়ে গেছে। মাথার ওপরে একটা কালো পাখা—পূর্বে সাদাই ছিল, অধুনা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ এবং তার ওপর নিশ্চিন্ত পারাবত দম্পতি বিশ্রম্ভ আলাপে মগ্ন। কিন্তু তাতে ব্যক্তিটির পঠন-পাঠনে কোন বিঘ্ন হচ্ছে না, কারণ তিনি আপাততঃ একটি দশ বছরের পুরোনো পত্রিকা নিয়ে "অতি বৃহৎ লাল মুলার" চাষ সম্পর্কে গভীর চিন্তায় মগ্ন।

—নমস্কার স্যার—

কে—? গম্ভীর গলায় আওয়াজ এলো, যেন একটা চোঙ্গা ফুঁকলো কেউ।

আমি স্যার বৃন্দাবন—, বৃন্দাবন দাস আর ও অনু—মানে অনুলেখা। আমরা ওকে ওই নামেই ডাকি কিনা;—বলেই বৃন্দাবন দাস নিজের হাতে লাঠিটা কোলের ওপর রেখে ঘোরাতে লাগলেন অনাসক্ত ভাবে।

বেশ—তা আমি কি করবো? চশমাটা নাকের ওপরে এসে পড়ায় ভদ্রলোক ভুরুর কাছে চোখ তুলে জিজ্ঞাসা ছুঁড়লেন।

—কিছুই করতে হবে না,—অনুকে আপনার হোস্টেলে রাখবো। সীট আছে?

কত টাকার সীট?

মানে যত কম হয় আর কি। বোঝেন তো সব। বিধবার মেয়ে। আমি আসছি কলকাতায় কাজে, ওরে পড়লে "বিন্দে তুই সঙ্গে নিয়ে যা মেয়েটাকে" কি করি বলুন। মেয়েটার চলচলে মুখ দেখে সঙ্গে নিয়ে এলাম, শেষে কিনা আমায় এক ভাঁড় চা-ও খাওয়াবে না, বলে—"দশ টাকার নোট ভাঙ্গানি নেই।" রাগে আমি চা তো খেলামই না উল্টে মাটির চা শুদ্ধ ভাঁড় চা-ওলার মাথায় ঢেলে দিলাম। করবো কী বলুন।

হুঁ, তা বটে—ভদ্রলোক জবাব দিয়ে পত্রিকার পরের পাতা ওল্টালেন। বৃন্দাবনকে দেখে বোধ হয় 'আলি' ড্রাম হেড' বাঁধা কপির কথা ভাবছিলেন তিনি।

কত দিতে হবে—?

৮৷৷০ প্লাস ৮৷৷০ সতের আপাততঃ। তারপর মাসে সাড়ে আট টাকা করে দিতে হবে। টিকিন পাবে না, চৌকী পাবে না। রাজি?

—রাজি, অনু টপ করে জবাব দিলে।

মহনার বুলি ফুটেছে দেখছি, কি স্থান মাহাত্ম্য!—এতক্ষণ চুপচাপ, এখন একেবারে রাধাকৃষ্ণ বলতে সুরু করেছে।—ভালো, আমি তো নিশ্চিন্ত মাত্র। যাই স্যার—এই রইলো টাকা—রসিদ ওকেই দেবেন। আমার আবার কিছু কেনা কাটার জন্যে যেতে হবে শ্যাংড়া পট্টিতে, শ্যাংরা কপাল কিনা—যাই উঠি। বসলে আবার উঠতে ইচ্ছে করে না। বুড়ো হচ্ছি তো। তার বেতো রুগী।

দাঁড়ান কাকাবাবু প্রণাম করি।—অনু প্রণাম করলো বৃন্দাবনবাবুকে। মাকে বলবেন আমি ভালোই আছি। চিঠি দেব। আপনি গিয়ে কিন্তু মার সঙ্গে অবশ্য দেখা করবেন।—এবার কথার ফাঁকে ফাঁকে ওর চোখে জলের কণা চিক চিক করে উঠলো।

এতে আবার কান্নার কি হলো—অ্যাঁ! কাঁদবিই যদি তবে এলি কেন বল—? বৃন্দাবনবাবু যেন উত্তরটা নিয়েই ছাড়বেন মনে হলো।

শিশির কণাগুলো সামান্য আঘাতেই ঝরে পড়লো টুপ টুপ করে পায়ের কাছে মেঝের ওপর।

এবার 'কারাও'-এর কঠিন হৃদয় একটু কোমল হলো: বলবো, তোর মার কাছে সব বলবো। বলবো মেয়ে তার ভারি শক্ত, সঙ্গে করে আনলাম—চারটে পয়সা চা খেতেও

দিলে না। সব বলবো বৌকি।

এবার কিন্তু এক চোখ জল নিয়েই অনু ফিক করে হেসে উঠলো। সেই চা-ওয়ালার মাথায় চা ঢেলে দেওয়ার কথা ওর হঠাৎ মনে পড়ে গেছে।

ছি-ছি-ছি। কেবল ছি-ছি। ভালো বাবা, ভালো। —বৃন্দাবন দাস সিঁড়ি বেয়ে গাড়ীতে নামলেন।

জেল খানায় যেমন নূতন কয়েদী এলে পুরোনো পাপীরা চারিদিকে শত জিজ্ঞাসাতুর দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে, ঠিক তেমনি করে অনুকে ঘিরে ধরলো বোর্ডিংয়ের মেয়েরা।

আজই এলে বুঝি? কত টাকার সীট?

কলেজে পড়বে বুঝি—একটি বিধবা মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন।

এলো রে, আবার একজন জুটলো হরিঘোষের গোয়ালে।

নানা কথার তরঙ্গ যেন বয়ে গেল ঘরের মধ্যে। ওরই মধ্যে একটি মেয়েকে একটু গম্ভীর প্রকৃতির মনে হলো। বললে, ওই তোমার বাক্স গেল বন্ধ রুমে, একটু দেখে নাও। আর কখনও তালা-চাবি না দিয়ে বাক্স রেখো না। তোমার বিছানাগুলো ওই ফেলে গেল বারান্দায়। এস—দেখ ওই জল চৌকীর ওপর ৮৷৷০ আট টাকার সীটের মেয়েদের বিছানা থাকে, তুমি ওদের দিয়েই তুলিয়ে নাও নইলে নিজে তুলতে পারবে না।

বেশ বিষণ্ণ বলে মনে হলো মেয়েটিকে। অনু কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলো—তোমার নাম কী ভাই?

বীথি—। সে কথা পরে হবে। যা বললাম আগে করে নাও তো। চাবি ভাল করে রেখো, হারায় না যেন।

বিছানা বাক্স ঠিক করে রেখে বাইরে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখলো, দীর্ঘ একটা বারান্দার এক ধারে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে বীথি।

তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি। এস। চল ওখানে বসি, অনেক কথা আছে। নূতন মফঃস্বল থেকে এসেছ, সব কথা তো জান না—তাই বলছি।

এটা বোর্ডিং নয়—মেসও নয়, হোটেলও নয়। এক রকম বাসা। ঘরগুলো লক্ষ্য করেছ? আসলে এটা হলো একটা বহু পুরোনো প্রাচীন স্কুল বাড়ি। নিয়ে স্কুল চলে—তাতে আমাদের থাকার ব্যবস্থা। আজ ছুটীর দিন বলেই তুমি কিছুই বুঝছ না। যে ঘরে তোমার বাক্স বিছানা রাখা হলো, সেই ঘরটী ছাড়া সব ঘরে ক্লাস হয়—মানে দিনের বেলা হৈ-হৈ ব্যাপার হৈ-হৈ কাণ্ড। আবার রাত্রে থিওলজিং স্টেজের মত সব পরিবর্তন হয়ে যায়, বসবার বেঞ্চি আর টেবিল জোড়া দিয়ে দিয়ে শোবার খাট তৈরী হয়।

অনু যেন বিস্ময়ে চেয়ে রইলো।

ভাবছো যদি সাড়ে আট টাকার সীটের কারুর জ্বর হয়? সারাদিন শুয়ে থাকতে হয়—তখন কী হবে? সেক্ষেত্রে কর্তারা প্রশ্ন তুলবেন, কেন জ্বর হলো—? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুবই কঠিন। কাজেই যার জ্বর হলো তাকে চারটে পর্যন্ত বসে বসে হাপু গাইতে হবে। একটি ঘরে মাত্র চারটি সীট আছে, সেখানে সাড়ে এগার টাকা দিতে হয়। তারা শোবার খাট পায়। সে ঘরে আমাদের প্রবেশ নিষেধ। সেখানে আমরা ছয়জন।

অনু স্তব্ধ হয়ে রইলো।

সুরঞ্জনবাবুকে দেখেছ?—বীথি বললে।

না তো? তিনি আবার কে?

তিনি এম, এ, পড়েন আর এখানে সকাল বিকেল কেরোসীন কাজ করেন। মেয়েদের সত্যিই তিনি বন্ধু —

এখুনি ডাক আসবে তোমার নিশ্চয়—করম কিল-আপ করতে হবে।—বলতে না বলতেই এক টুকরো কাগজ নিয়ে দারোয়ান অনুর সামনে এসে দাঁড়ালো You are wanted in the office immediately.

একটু যাবে ভাই আমার সঙ্গে? অনুর ভয় করছিল।

কোন ভয় নেই, সুরঞ্জনবাবু লোক ভালো। কাকাবাবু এতক্ষণ ওঁর বাড়ি চলে গেছেন। যাও না।

না ভাই, তুমিও একটু চল। এবারের জন্যে অনু সানুনয়ে অনুরোধ জানালো।

বীথি মিষ্টি করে হাসলো। বললে: সাহস আনতে হয়— যাও।

দিনের আলো তখন নিভে আসছে। অফিস ঘরের পশ্চিমের জানালা দিয়ে কমে যাওয়া আলো এসে ভরে দিয়েছে ঘরটিকে। পাখীর কিচমিচ শোনা যাচ্ছে সামনের নিম

গাছটা থেকে। ঘুঘুটো আর আকাশের কালো মিলে বাইরের দিকটা যেন কেমন ঘোলা ঘোলা লাগছে। সামনের সারকুলার রোডে তখন ছায়া মিছিল চলেছে—কত লোক যে রাস্তায় চলতে পারে—অনু অবাক হয়ে জানালা দিয়ে দেখতে লাগলো।

সুরঞ্জন ঘরে নেই, কাজেই ওকে অপেক্ষা করতে হচ্ছে না আদৌ পর্যন্ত। কাকাবাবু অর্থাৎ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট এতক্ষণ তাঁর নবনির্মিত গড়িয়াহাটার বাড়িতে পৌঁছে গেছেন। এই সময়টা অফিস দেখা-শুনো করে সুরঞ্জন। ও এলোই বাইরে থেকে একটু, তাই হাত মুখ ধুতে ভেতর গেছে।

অনু দৃষ্টি বুলিয়ে নিলো ঘরটার ভেতর।

একটা বিরাট টেবিলের সামনে একটা বিপুল মানানসই চেয়ার—সেটা আপাততঃ কাকাবাবুর অভাবে শূন্য হৃদয়ে হাহাকার করছে। তার পাশে একটা ছোট টেবিল একটা চেয়ার—সেটাই বোধ করি সুরঞ্জনবাবুর। সেই চেয়ারটার সামনে একটা চেয়ার টেনে অনু বসেছে। এইটেই দু নম্বর—অর্থাৎ আসল অফিস। নীচের ঘরে টাকাটা কে জমা নিলে, অনু বুঝতে পারল না।

সামনের দেয়ালে একটা লক্ষ্মীর ছবি আঁকা ক্যালেণ্ডার, তার সর্বাঙ্গে ঝুল। একটা মাকড়সা নিজের জন্যে জাল বুনে চলেছে। আর একটা টিকটিকি গভীর ধৈর্য সহকারে এই কর্মীটির কর্মাবলী পর্যবেক্ষণ করে চলেছে।

সামনে একটা জীর্ণ নীল পর্দা ঝুলছে—ওটাই বোধ হয় সুরঞ্জনবাবুর কক্ষের প্রবেশ দ্বার।

এই যে আপনি এসেছেন।—আপনিই অনুলেখা দেবী তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ,—অনু সুরঞ্জনবাবুর মুখের দিকে তাকালো।

অপূর্ব গায়ের রং ভদ্রলোকের, যেন মুঠো মুঠো ভোরের আলো। রোগা লম্বা—মাথায় উল্টো চুল—প্রশস্ত কপাল আর তার ওপর দুটি ঝকঝকে চোখ যেন বর্ষার ভরা নদী। পরিপূর্ণ যৌবনে আত্মমগ্ন। বেশ—ভদ্রলোকটি তো।

করমচটা ফিল-আপ করে দিন।—হাত বাড়িয়ে করমচটা অনুর হাতে দিলো সুরঞ্জন।

শুনলাম সারা সকাল আপনি কেবল কেঁদেছেন? সুরঞ্জনের মুখে কৌতুকের হাসি।

অনুর সমস্ত মুখখানা লাল হয়ে উঠলো। চেষ্টা করলো অনেক কিন্তু জবাবে কিছুই বলতে পারলো না সে। করমচটা হাতের ভিতর কাঁপতে লাগলো।

করমচটা ফিল-আপ করুন। এত ছিঁচ-কাঁদুনে মেয়েকে দিয়ে কোন কাজ হয়? কলকাতায় একা থেকে পড়াশুনা করবেন কী করে? নিন—বলুন সব, নাম, বাবার নাম, কোথায় পড়েন ইত্যাদি—

অনু প্রয়োজনীয় বিবরণ দিলো।

একবার যেন সুরঞ্জন কী ভাবলো। নামগুলো যেন একটু পরিচিত মনে হলো কিন্তু পরক্ষণেই অনু উঠে দাঁড়ালো সুরঞ্জনকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে না দিয়েই। বললে, যাই—আমি—?

আসুন—।

অনু ছুটে চলে গেল ওপরে।—কিন্তু পেছন থেকে ডাক এলো, একটু শুনুন।

অনু ফিরে দাঁড়ালো দোতলার সিঁড়ির ওপর। সুরঞ্জন সিঁড়ির কাছে এসে ডাকছে, শুনুন একটু—দরকার আছে।

অনু আবার ঘরে ফিরে গিয়ে সেই পরিত্যক্ত চেয়ারটা টেনে বসলো।

একটু চুপ করে থেকে সুরঞ্জন আরম্ভ করলো:

বাড়ীতো দেখছি জলপাইগুড়ি। আমার এক বন্ধু ওখানে থাকে, থাক্ সে কথা বলতে অবশ্য আপনাকে ডাকিনি। ডেকেছি একটা জরুরী ব্যাপার জানতে। দেখছি আপনি একেবারেই ছেলেমানুষ তার ওপর মা বিধবা আমার কিন্তু কর্তব্য আছে হোস্টেলের মেয়েদের সম্পর্কে, তাই অযাচিত একটা পরামর্শ দিচ্ছি—অন্যরকম ভাববেন না যেন। কলেজে পড়ছেন, বিদেশে এসেছেন—তার ওপর কলকাতা—বড় ভয়ংকর জায়গা। তাই জ্ঞান-বুদ্ধের ফল খাবার আগে সুহৃদ হিসেবে এ দীনের কিছু নিবেদন আছে।

অনু বড় বড়—ঘুম ঘুম চোখ মেলে স্থির হয়ে শুনতে লাগলো।

সুরঞ্জন একবার দরজার দিকে সতর্ক জলস্ত দৃষ্টি

ফেলে দিলো, তারপরে মৃদু গলায় বললে,—এ হোস্টেলের খবর পেলেন কোথায়?

আমাদের বাড়ির পাশে এক ভদ্রলোক আছেন, আমাদের অবস্থা খারাপ, কিন্তু আমি পড়তে চাই বলে তিনিই খোঁজ করে এই সস্তার হোস্টেলটার সন্ধান দিয়েছেন।

ভালো—কিন্তু ওখান থেকে যে খবর পেয়েছেন সেটা একেবারে ভুল খবর। এর বাইরের সাইন-বোর্ডটাই মানুষকে বিভ্রান্ত করে। এটা, যা ভেবেছেন তা নয়।

অনু চমকে উঠলো আর সঙ্গে সঙ্গে ওর মুখখানা যেন কাগজের মত সাদা হয়ে গেল।

ভয় পেলেন বুঝি খুব? পাবেনই জানতাম, কিন্তু ঠিক জানবার সুযোগ না দিয়েই আমি কিছু কিছু তথ্য আপনাকে দিতে চাইছি। এখানে যাঁরা আছেন বয়সে বোধহয় সবাই-ই আপনার চাইতে বড়। তাই এত ছেলেমানুষ দেখেই একটু সজাগ করে দেওয়া। দুটো কথা মনে রাখবেন—প্রথম এদের কোন দয়া নেবেন না। দ্বিতীয় শুধু লক্ষ্য করে যান কিভাবে ওরা চলাফেরা করে। ওদের সঙ্গে ভুলেও বাইরে যাবেন না, তবে বীথি দাসকে বিশ্বাস করতে পারেন উনি অত্যন্ত ভাল মেয়ে। যান, আজ আর কিছু বললে হয়তো এখুনি কেঁদে ফেলবেন, তেমনি তো মনে হচ্ছে। ভয় নেই—আমরা তো আছিই।

এ ভদ্রলোকই বা কে? কেনই বা অযাচিত উপদেশ দিলো ওকে? কেন ওর মনের ভেতর কতগুলো সন্দেহের বীজ অকারণেই রোপণ করে ওর মন মুহূর্তে সন্দিহান করে তুললো? সে কথা বার বার ভাবতে ভাবতে অনু ফিরে এলো নিজের ঘরে। এই লোকটার তো কোন দুরভিসন্ধি নেই—এমন চিন্তাও এক একবার ওর মনের মধ্যে উঁকি দিতে চাইল বৈকি।

॥ দুই ॥

সুকিয়া স্ট্রীটে সকাল হলো।

সামনের নিম গাছটা থেকে অজস্র কাকের হুল্লোড়ের সঙ্গে সঙ্গে ঐকতান বাদন সুরু করলো লরীর আওয়াজ। বাজারে সহরতলী থেকে তরি-তরকারী আসছে।

হোস্টেলের সামনেই বাজার, অনু বেরিয়ে এলো লরীর শব্দ আর চেঁচামেচি শুনে।

পুবে আকাশ তখনও কালো কালিতে ঢাকা। সারা কলকাতা তখন ঘুমে, আর এরই মধ্যে সুকিয়া স্ট্রীটের বাজারের সামনে যেন দক্ষযজ্ঞ লেগে গেছে।

একটা লরী এসে থেমেছে। তাতে ডাব আর থালার মত মতো বড় বড় পাত্রে চালাও তরি-তরকারী নিয়ে বসেছে দেহাতী মেয়ে পুরুষ। বাস থেমেছে বাজারের মুখে আর ড্রাইভার লরীর সবাইকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে গাড়ী চালিয়ে দিচ্ছে—কেউ পড়ে যাচ্ছে—কারুর ঠ্যাং ভাঙবার উপক্রম, কিন্তু ড্রাইভারের সে দিকে কোন লক্ষ্যই নেই। এক্ষুণি গিয়ে আর এক ট্রিপ নিয়ে আসতে হবে—তিনি ডিউটি করছেন।

একটি মেয়েকে এমনি করে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল যে তা নিয়ে যেন দক্ষযজ্ঞ বেধে গেল।

জন চার পাঁচ লোক ড্রাইভারকে মরণ আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরলো: আজ তোরই একদিন কী আমাদেরই একদিন। রোজ রোজ তোর জুলুম সহ্য করি, আজ আর সইবো না—চিমির পেটে বাচ্চা আছে—মরলে দুটো লোকের জান ফেরৎ দিবি?

ড্রাইভার যেন কি বলতে চাইলো কিন্তু সবার চিৎকারে তার নিরুপায় কণ্ঠ তলিয়ে গেল।

পুবের ছোপ ধরা আকাশে তখন প্রভাতী স্নিগ্ধ আলোর রেখা ফুটে উঠেছে—

হোস্টেলের ঘণ্টা বাজলো ঢং-ঢং-ঢং। এবার প্রার্থনার ডাক পড়েছে। দক্ষযজ্ঞের উপসংহার না দেখেই অনুকে চলে আসতে হলো গভীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও।

দোতলার হল ঘরে প্রার্থনা জন্যে জড়ো হয়েছে সবাই। সুপারিনটেনডেন্ট কাকাবাবু বসেছেন মাঝে স্থির গম্ভীর ভাবে—দুচোখ তাঁর বোজা।

মেয়েরা সুর করে ধরেছে: জয় হোক নব অরুণোদয় জয় জয়। এক কোণায় কালো কম্বল গায়ে ভূতের মত বীথি দাস। অনু হঠাৎ যেন কেমন অপ্রতিভ হয়ে গেল: একি বীথি, কম্বল গায়ে কেন? কাকাবাবু বকবে না?

বকবেন বৈকি—কিন্তু আমি বকুনি খাবার জন্যে মোটেই অপেক্ষা করবো না। আমি লম্বা দেব। যাবি?

চল—ছোট্ট স্বরে অনু বললে।

দুজনে ঘরের মধ্যে পালিয়ে এলো। অনু হাঁপাতে

বীণাতে জিজ্ঞেস করলো : পালিয়ে এলে যে ?

নইলে আমায় গান গাইতে হতো ;—মানে একটু দুষ্টুমির হাসি হেসে বললে : আমি গাইতাম আর সে গান শুনেই কাকাবাবুর যোগ-নিদ্রা ভঙ্গ হতো। কিন্তু পালিয়ে এসে সে কী ভালো কাজ করেছি, এখুনি দেখতে পাবে। একটা মজার ব্যাপার দেখাব, নিঃশব্দে দেখবে কিন্তু।

বেশ – চল।

সর্বজনীন পরন ঘরের এক কোণায়, এক টুকরো ভাঙ্গা পারা ওঠা আয়নায় মুখ রেখে ছেচল্লিশ বছর বয়েসের বিধবা বোর্ডার বীণা সাজছে। মুখে বয়েসের ছাপ পড়েছে, কোঁচকানো চামড়ার ভাঁজে ভাঁজে সস্তার স্নোর প্রলেপ দিচ্ছে। মাথায় এক গাছাও চুল নেই, একটি পরচুলার বেনী বিনুনী তাতে শোভা পাচ্ছে। ওর অদ্ভুত সং সাজছে বীণা রায়।

চোখে পুরু কাজল—পরনে লাল ব্লাউজের সঙ্গে নীল জরজেটের সাড়ী—; বীণা রায় প্রসাধন শেষ করে দাঁড়ের ময়নার মত মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিজের রূপ দেখে দেখে একেবারে মোহিত হয়ে যাচ্ছে যেন।

অনু যেন বিস্ময়ে হতবাক।

এবার একটা ঘুরওয়ালা জুতো পরে বীণা ময়ূরের মত ঘুরে ঘুরে নিজেকে দেখতে দেখতে হঠাৎ বিস্মিত অনুর পা-টা মাড়িয়ে দিলে।

চোখে দেখ না নাকি যে মেয়েটার অমন করে পা মাড়িয়ে দিলে ? বীথি কেঁকে উঠলো।

আহা—হা বড় দুঃখু লাগছে ভাই ? কিছু মনে কইরো না।—বীণা লজ্জিত হলো।

না না খুব লাগে নি—মুখে এক ঝলক দুষ্টুমির হাসি খেলে গেল অনুর। বাঃ—বেশ লাগছে আপনাকে।

অপূর্ব—যেন যাত্রা দলের সখী—বীথি টিপ্পনি কাটলো।

বলতে নাই ওই সব চুপ কর। ও হারোয়ান আমার ভিজিটার বুঝি—? যাই যাই। এক্ষুনি বাইরাইতে হইবো। বীণা দ্রুত বেগে ঘোঁড়াতে ঘোঁড়াতে বেরিয়ে গেল।

পেছনে একটা সুর উঠলো : দড়বড়ি ঘোড়া চড়ি কোথা তুমি যাও রে—

একি ব্যাপার—? অনু জিজ্ঞাসা করলো।

সামনের সীটের ওপর বসে বীথি বললে, ব্যাপার একটা কিছু আছে নিশ্চয় নইলে এমন হবে কেন। এই বলে শুরু করল : মেয়েটির বিচিত্র জীবন কাহিনী।

থাকতো পূর্ববঙ্গের এক গ্রামে। বাবা মা নেই, মামার বাড়ীতে মানুষ। বিয়ের কথা চলছে—বড় মেয়েকে সবাই চার ঘাড় থেকে নামিয়ে দিতে। মামাতো ভাইয়েরা কি যেন ব্যবসা করে, তাদেরই এক বন্ধু খুব যাতায়াত করতো ওদের বাড়ীতে। বেশ ভালো স্বাস্থ্য—ব্যবহারও ভালো। মামীমার যেন বিশেষ অনুগত। বাড়ী ঘর আছে দেশে। একদিন মামীমা বললেন, বিশ্বনাথ ছেলেটা বেশ। ওর বাড়ীর অবস্থাও মন্দ নয়।

মামা খেতে বসেছেন। একটা ঘোলসে মাছের মাথা চিবোতে চিবোতে মামা বললেন, বাড়ীতে কে কে আছেন জিজ্ঞাসা করেছিলে ?

হ্যাঁ, করেছি বৈকি। সবাই আছেন। বাবা, মা, ভাই বোন—অবস্থা ভালোই। ও বললে সম্বৎসরের খাবার ওদের জমিতেই হয়।

--ছেলেটিকে তোমার পছন্দ হয় ? পাতে একটু ঘি লেগে থাকা ঝোল চাটতে চাটতে মামা বললে।

মেয়ের তো রূপ দেখতে হবে—? ওই তো বিদ্যে বুদ্ধি—অকর্মা। এবার এর সঙ্গেই তুমি বিয়ে দাও। নইলে বয়স হয়ে যাচ্ছে, আর বিয়ে হবে না।

একটু ঘর বাড়ী দেখলে হতো না ? কার ছেলে, কি নাম, কি জাত—কি গোত্র –

অত করলে আর ওর বিয়েই হবে না। ভালো কাজে দেরী করতে নেই। তুমি আর অত শত চিন্তা করো না—ওর সঙ্গেই বিয়ে দাও। তারপর মেয়ের অদৃষ্ট –। আমাদের যে বিয়ে হয়েছে কত দেখে শুনে ?

তবু একটু খোঁজ খবর নেওয়া ভালো।

রেখে দাও খবর। বেশ কর – তুমি সামনের মাসেই বিয়ে দিয়ে দাও – তারপর ওর কপাল।

মামার সাধ্য ছিল না যে মামীমার কথার প্রতিবাদ করেন। কাঁচ পোকার মতো তেলাপোকা-রূপী মামার মাথা ধরে টেনে বেড়ান মামীমা এ বাড়ীতে তাঁর মতই চলন।

অন্ধকারে কাঁপ দেবার মত বীণার বিয়ে হয়ে গেল সাত দিনের নোটিশে। বাজনা বাজলো না,—লোক এলো না, ভিয়েনের গন্ধ ছড়ালো না বাতাসে—শুধু মামীমার বলবতী ইচ্ছের জোরে কালীঘাটে গিয়ে বিয়ে হলো শাঁখা সিঁদুর দিয়ে।

মেয়েদের একটা বয়স থাকে যখন তার মন থাকে ফাল্গুনের পলাশ বনের মত— রঙে রঙে রাঙা। বীণারও সেই বয়স—তবু সে জানতো—বেশী আশা করা তার পক্ষে বাতুলতা—। তবু মনে চন্দন—মাথায় টোপর, চেলি আর পায়ে আলতা—এ হয়তো বাদ পড়বে না।

কিন্তু কিছুই হলো না তার। শুধু বিয়েই হলো। বাসর ঘরে বীণা বললে স্বামীকে: আমি কিন্তু আর এখানে থাকবো না। তোমার বাড়ি আমায় নিয়ে চলো কালই।

হবে—হবে—এত ব্যস্ত কেন। আজই ফুলশয্যা গেল—কালই তোমায় নিয়ে চলে যাব, সেটা দেখাবে কেমন?

বেশ সুন্দর দেখাবে। জানোতো এ বাড়িতে আমার কী সুন্দর আদর অভ্যর্থনা।

কী করে জানবো—আমি এসেছি বাইরে বাইরে—এ সব কথা শুনব কি করে।

না জানো, আমার কাছে তো শুনলে—আমরা তাহলে পরশুই যাব।

বেশ দেখা যাবে—বিশ্বনাথ কপট নিদ্রায় অভিভূত হলো।

সাত দিনের জায়গায় একমাস কেটে গেল। বিশ্বনাথ বীণাকে দেশে নেবার কথাও মুখে আনে না। এদিকে মামীমার মূর্তি দিন দিন অগ্নিশর্মা হতে লাগলো, বীণার আর ওখানে থাকা চলে না। একদিন ও একেবারে ধরে পড়লো বিশ্বনাথকে: আমায় কাল নিয়ে যেতেই হবে।

বেশ, তুমি তৈরী থেকো বিকেলের গাড়িতে যাব আমরা।

কিন্তু একটা কথা। এই ময়লা জামা কাপড় নিয়ে যাবে কি করে। তুমি দাও তো পেঞ্জিটা আমি কেচে দিই। সকালেই শুকিয়ে যাবে।

বিশ্বনাথ কিছুতেই জামা আর পেঞ্জি খুলবে না বীণার সামনে। বীণাও ছাড়বে না।

শেষে যেই জামা খুলেছে, ও চমকে উঠলো। এত বড় একটা কাটা ঘা পিঠে কাঁধে তুমি বেড়াও।

ও কিছু না—বিশ্বনাথ বললে।

কিছু না মানে?—মনে হয় দারোগা অস্ত্র দিয়ে ঘা মেরেছে কেউ। কী করে হলো।

পড়ে গিয়েছিলাম। থাক ও কথা, আমার একটু কাজ আছে।—বলেই আর কথা না বাড়িয়ে বেরিয়ে গেল বিশ্বনাথ।

তারপর তিন মাস ওর আর কোন খবর পাওয়া গেল না। বীণার উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার শেষ নেই। কোথায় গেল ও—কেই বা খোঁজ করে,—কেই বা খবর করে—

শেষে একদিন খবর পাওয়া গেল। থানা থেকে এক পুলিশ অফিসার খোঁজ করতে এসেছেন। তাঁরা খোঁজ পেয়েছেন বিশু দাহা—খুনী আসামী এখানে আশ্রয় নিয়ে আছে—

মামীমা শুনে মূর্ছা গেলেন। পুলিশ ইন্সপেক্টার সেই কেয়ারীর ছবি আর পিঠের দাগের কথা যে ভাবে বর্ণনা করলেন তাতে বীণার আর কোন সন্দেহই রইলো না। শেষে সব শুনে ভদ্রলোক আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করে চলে গেলেন, মেয়েটার জীবনই নষ্ট হয়ে গেল।

বীণা তখন অন্তঃস্বত্ত্বা। ভাগ্যের এই বিড়ম্বনা—আর মামীমার ধিক্কার তাকে দিনের পর দিন যেন পাগল করে তুললো।

একটানা সে ভেবে চললো নিজের বিড়ম্বিত অদৃষ্টের কথা। আর যখনই ওর গর্ভের খোকার কথা মনে হতো তখনই ভাবতো, খুনীর সন্তান ও বয়ে বেড়াচ্ছে, বেরিয়ে হয়তো পরশুরামের মত মাতৃহত্যা করবে। করবেই, রক্তের তো একটা টান আছে।

খুনীর ছেলে ওর শরীরের অংশ নিয়ে বাড়ছে—প্রতি মুহূর্তে নিজের সত্তাকে জানান দিচ্ছে। ও যেন আর সহ্য করতে পারছে না। মনে হয় ছেলেকে গলা টিপে মেরে ফেলে যদি সামনে পায়। যে স্বামীর ওপর এতটুকু ভালবাসা বা শ্রদ্ধা নেই—তার ছেলে যেন চির শত্রু বলে মনে হলো বীণার।

ধীরে ধীরে ওর পাগলের লক্ষণ প্রকাশ পেল। তারপর সন্তান হবার পর আবার সব স্বাভাবিক হয়ে গেল।

কিন্তু আশ্চর্য পরিবর্তন এলো মামীমার, সে বীণার ছেলেকে বুকে তুলে নিলো। যেন অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়। তার সেই সুযোগে একদিন বীণা প্রাণের বাড়ির একটি মেয়ের দলে নীল আকাশে ডানা মেললো।

অনু যেন হাঁপিয়ে উঠেছে : কী ভয়ানক ব্যাপার।

ব্যাপারটা আগে একটু শোনো বীথি বললে।

বীণার অনেক হাত বদল হলো। তারপর ও এখানে এসেছে। সারা মাস এমনি করে পাগলের মত সেজে-গুজে বেড়ায় আর পয়লা দোসরা দেখবে ওর অদ্ভুত সাজ। মাথায় রুক্ষ চুল—ছেঁড়া কাপড়, খালি পা—ওকে যেন কারা সাহায্য করে প্রতি মাসে, সেটা ওর সেই মাসোহারা নেবার পোষাক।

সত্যি আশ্চর্য। মা হয়ে কী করে সন্তানকে ও ফেলে পালিয়ে আসতে পারলো।

পৃথিবীতে সবই হতে পারে, ভাই। বিড়ম্বনা দিয়ে যে জীবন ও সুরু করেছে তার পরিণতি তো কখনই স্বাভাবিক হতে পারে না। ওর জীবনের কুগ্রহ ছেলে না ওর স্বামী, এই দ্বন্দ্বই ওর মনে প্রবল। ও ভাবে ছেলে না থাকলে ও আবার বিয়ে করতো।

যে ভাবে ও দিন কাটাচ্ছে, তার চেয়ে বিয়ে তো অনেক ভালো।

ভালো নিশ্চয়, কিন্তু—বীথি একটু হেসে বললে, ওকে বিয়ে করবে কে? যে ঘর থেকে নিয়ে এলো, সে বস্তি বাড়ীতে রেখে সরে পড়লো। তারপর এই কদর্য জীবন ও বয়ে চলছে। এক একদিন রাতে কাঁদে, খুব কাঁদে। আর সবাই ওকে বকে, ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে—রাস্তায় গিয়ে কাঁদলেই হয়।

কাঁদবারও ওর জো নেই।

না—নেই।—বীথির গলার স্বর গম্ভীর হয়ে এলো : এই কদিন হলো, ওর ছেলেকে নিয়ে ওর মামীমা এখানে এসেছিলেন, ও বললে, ও ছেলে ওর নয়—ওকে ও চেনে না। একটু থেমে বীথি বললে, আসিস ভাই, রাজপুত্রের মত ছেলেটি দেখতে।

অনু দুটি বড় বড় চোখ দিয়ে চেয়ে রইলো বীথির দিকে, কোন কথা বললো না।

। তিন ।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে সুকিয়া স্ট্রীটে।

এখানকার এ আস্তানাটা প্রায় সবই বস্তি—কাছে দূরে ছড়ানো। হোটেলের বাড়িটা বিরাট একা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে—যেন চারদিকের জলতরঙ্গের মধ্যে লাইট হাউসের সংকেত নিশানা।

ছাত্রী নিবাসের উনুনে আগুন পড়েছে। নীচের তলার পেছনের দরজার পাশে একটি ছোট উঠোন। সেখান থেকে ক্রমাগত গানের সুর উঠছে রাসভ কণ্ঠে আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্বরে ত্রিশটি বালিকার গলায় বিকট প্রতিধ্বনি বাজছে :

সবকে খুশী রাখতা হ্যায়
হি-হি-হি-হি হাসতা হ্যায়—

পূর্ববংগের একটি অনাথা মেয়ে, মেয়েটির হাতে আর পায়ে একটু গলদ আছে আর একটু হাবাও বটে। বয়স সতের আঠার হবে। এ তারই বিদ্যাদান পর্ব।

ছাত্রী নিবাসের দুটি দরজা। একটি সদর—সেটা সুন্দর লোহার কোলাপসিবল গেট—সামনে ফুলের টব; তার পাশে দরোয়ানের আসন। সেটা এর বাইরের পোষাকী চেহারা।

এই দরজার পাশ দিয়ে আরো একটু এগোলে সোজা বসবার ঘর—তাঁতের ঘর—সেলাই ড্রইং-এর ক্লাস রুম। তার পেছনে আর একটা দরজা, সেটাই এর অন্তরঙ্গ রূপ।

বস্তিতে ক্লাস বসবার সময় এ দরজা খোলা হয়—, দরজার চটের পর্দা—বারান্দায় চাটাই পাতা। সেই হাবা মেয়েটি—সুধা, একাই ক্লাস করে এখানে। বিনিময়ে খাবার থাকবার পয়সা লাগে না ওর।

মেয়েদের তত্ত্বাবধান করে ও, ক্লিনিকের কাজও করে। দারুণ গরমের দিনে যখন সমস্ত বস্তির মধ্যে মহামারীর তাণ্ডব চলে, তখনই সুধার কাজ সুরু হয়। জলহীন বস্তির ঘরে ঘরে ঘুরে ঘুরে ও শেখায় কি করে কলের তলায় লাইন দিয়ে জল নিতে হবে। ঘরের সেঁকো নর্দমাগুলোতে ওষুধের গুঁড়ো ছিটায়। ছেলে-পিলেদের ঘরে ঘরে টিকে দেওয়ায়। বিশ্রী পুঁজ-পড়া ক্ষতগুলো নিজের হাতে ধুইয়ে দেয়—চোখের পিচুটি মোছায়। মাথার উকুন পরিষ্কার করে। সেবিকা কিম্বা

সুধা, তাই ওকে নিয়মানুসারে সদা প্রসন্ন থাকতে হবে।

ধীরে ধীরে নেমে এলো অনু ওই বারান্দাটার পাশে। নারায়ণগঞ্জের দাতমহলার এক একটা দরজা যেন খুলে যাচ্ছে আর এক একটা রহস্যময় ঘর অনুর চোখের সামনে ফুটে উঠছে। অনু অবাক হয়ে চেয়ে রইলো।

সুধা ঘুরে ঘুরে নাচছে। যেন একটা আলকাতরার পিপে চলেছে গড়িয়ে গড়িয়ে। হাসতে গিয়েও হাসি বন্ধ হয়ে গেল অনুর। এ যেন স্বামীর শবের পাশে বেহুলার নৃত্যকলা।

দেবদাসই বটে। সমস্ত মুখে যেন সুধার একটা করুণ আর্তি। পাশে একটা কলাই করা থালায় রাখা আছে খানিকটা ভেড়ার মাংস, কিছু মিষ্টি, তাতে মাছির দরবারে—আর তারই সঙ্গে মিশে আছে একটা উগ্র দুর্গন্ধ।

সমস্ত বারান্দার বাতাস যেন গন্ধের ভারে মন্থর। অনু একটু এগিয়ে এলো।

এস ভাই এস—সুধা ডাকলো।

তুমি তো বেশ নাচতে পারো—অনু যেন আর কোন কথা খুঁজে পেল না।

জলভরা মেঘের মধ্যে যেন এক ফালি রোদের ঝিলিক খেলে গেল।

না—ভাই। নাচতে কি জানি বাধ্য হয়ে নাচতে হয়।

এতক্ষন মুন্নি বসে বসে চট ছিঁড়ছিল নিপুণ হাতে। এবার তার বৈচিত্র্যের ঘটলো, ছুটি বহিনজী।—কতকগুলো বলদে দাঁত বেরিয়ে এলো ওর।

ছ্যাঁছুটি—যা। শিশুদল কলধ্বনি করে পালিয়ে গেল।

তুমি এখানে এলে কি করে? সুধা জিজ্ঞাসা করলো অনুকে।

এলাম—? যেমন করে তুমি এলে। কিন্তু তুমি এত নোংরা কাজ কর কেন? সত্যিই কি তোমার মন এতে সাড়া দেয়?

একটু হেসে সুধা বললে, আমি অনাথ আশ্রমের মেয়ে। আমার কেউ নেই। শুনেছি—আমি জন্মাবার পর কি করে যেন মেয়ে বদল হয়ে গিয়েছিল। মা আমাকে নিলেন না। হয়তো হাত পা ভাঙ্গা বলেই এমন খুঁতো মেয়ে ত্যাগ করবার একটা অজুহাত জোগাড় করলেন।

আমায় সবাই মিলে দিয়ে দিলে অনাথ আশ্রমে। একটু বড় হয়ে বুঝেছিলাম আমি নুলো বলে সবাই আমায় ঘৃণা করে। একে কুৎসিত তাতে নুলো।

এবার একটু হাসলো সুধা: মার বাবার খোঁজ করেছিলাম। বাবা উকিল। মা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছেন বৈরবী হয়ে। পরে খবর পেয়েছি উনি হরিদ্বারে আছেন এক ঊর্ধ্ববাহু সাধুর সঙ্গে।

আমার কিন্তু মাকে দেখতে ভারি ইচ্ছে করতো। রাতে যখন মস্ত চাঁদটা ফ্যাল ফ্যাল করে নিম গাছটার ওপর দিয়ে চেয়ে থাকতো—যখন মিঠি মিঠি জ্যোৎস্না নেমে আসতো ছাদের ওপর—তখন আমার মার কথা মনে হতো। ঘরের পাশের নিমগাছটা থেকে নিমফুলের বুনো গন্ধ চৈত্রের তপ্ত বাতাস বয়ে আনতো আর আমি হঠাৎ কেঁদে ফেলতাম মার কথা ভেবে ভেবে।

বার বার মনে হতো কেন ওরা আমায় নিলো না। কেন ওরা ওদের প্রথম সন্তানকে এমন করে ত্যাগ করলো।

তারপর অনেক চেষ্টায় শেষে একদিন খবর পেলাম আমার মা নাগা সন্ন্যাসীদের সঙ্গে কুম্ভ মেলায় গিয়েছিলেন। সেখানে কল্পবাস করতে গিয়ে রাতে ঘরে আগুন লেগে সব পুড়ে গেছে, তিনিও পুড়ে মারা গেছেন।

সেদিন খুব কেঁদেছিলাম আমি। আমার না দেখা মা-কে মনে করে বার বার বলেছি, কী অপরাধ আমার ছিল যার জন্যে তুমি এমন অস্বাভাবিক জীবন বেছে নিলে? কেন সবার সঙ্গে সবার মতন হয়ে রইলে না? যদিও দেখিনি, তবুও আমার না দেখা মার জন্যে আমার মন যে কেন এত ব্যাকুল হলো জানি না—। হয়তো সারা জীবন কিছু না পেয়ে মা-কে ঘিরে মনে মনে স্বর্গ রচনা করেছিলাম।

অনুর চোখে জল এসেছিল। সবাই এই হাবা মেয়েটাকে নিয়ে সব সময় ঠাট্টা করে কিন্তু ওর মনে যে এত ব্যথা আছে তার খবর ওরা কেউ-ই পেল না।

তুমি কিছু হাত খরচ পাও না?—অনু জানতে চাইলো।

না। খেতে থাকতে দেয় তার ওপর হাত খরচ?

তুমি কি স্বপ্ন দেখছো?

দেওয়া তো উচিত। তোমার কাপড় চোপড়?

টিউশনী ক'টা একটা দশ টাকার, তাতেই এক রকম চলে। কিন্তু আর ভালো লাগে না—। মাঝে মাঝে মনে হয় গলায় দড়ি দিয়ে মরি—

ছি—ভাই—অনু ওর চোখের জল মুছিয়ে দিতে যাচ্ছিল—

এই যে! তোমরা চলো, তোমাদের ড্রইংয়ের মাস্টার মশায় ডাকছেন—একটি মেয়ে এসে খবর দিলো।

যাচ্ছি যাও—

চারদিকে একবার সন্দিগ্ধ দৃষ্টি ফেলে সুধা বললে, ওরা চায় না যে, কোন বোর্ডারের সঙ্গে আমি কথা বলি। কেন জানো? আমি তো ওদের অনেক গোপন কথা জানি, পাছে ফাঁস করে দিই তাই ওদের অত ভয়।

কী ব্যাপার বলতো—? সবাই যেন কেমন ভাবে চলাফেরা করে এখানে। আচ্ছা ওই অফিসের ক্লার্ক ছেলেটি কেমন? অনু সুরঞ্জনের কথাটা জানতে চাইলো।

খুব ভালো; একেবারে খাঁটি মানুষ।—তবে উনি যেমন স্পষ্টবাদী তাতে বেশী দিন এখানে থাকতে পারবেন না বলেই মনে হয়, কর্তারা ওঁর ওপর খুশী নয়।

তাই নাকি?

যাক গে, অনেক বাজে কথা বললাম—কিছু মনে করো না ভাই। চলো যাই ড্রইং ক্লাশে, নইলে আবার বকুনি খেতে হবে।

চল—অনু বিষণ্ণ মুখে এগিয়ে চললো।

॥ চার ॥

ড্রইং ক্লাসে যেন একটা আনন্দবাজার।

বীণা থেকে আরম্ভ করে সবাই-ই যেন বয়েসটাকে 'হুববরল'র বুড়োর মতো উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে। সবাই চেঁচাচ্ছে, কেউ শুনবে না।

অপূর্ব মূর্তি এই ড্রইং মাস্টারের। অনু দেখল সেই কোট পরা লোকটি—এক নম্বর অফিসে যে টাকা জমা নিয়েছিল প্রথম দিন। মেয়ের দল যেন বৌমাছির মত ওঁকে ছেয়ে ফেলেছে।

সবার ওপরে উঠছে বীণার গলা: ওর কথা শুনে মনে হচ্ছে ওর বয়স যেন পাঁচ বছর।

—এই যে, ভালো তো?

—ঘাটা চোখের কাঁক দিয়ে ড্রইং মাস্টারের হাসি বিকশিত হলো।

—হাঁ, ভালোই।

যাঃ—যাঃ যেন।—কিন্তু কথাটা শেষ হলো না, দারোয়ান এসে খবর দিলো অফিসে অনুকে ডাকছে।

অনু বাইরে বেরুতে যাবে বীথি এসে হাত চেপে ধরলো, কোথায় যাচ্ছ?

অফিসে ডাকছেন কাকাবাবু।

যাও, কিন্তু হয়তো মিস্টার সেনের বাড়ীতে যেতে বলবেন এই রাতে—তুমি যেওনা কিন্তু।

কেন বলতো? অনু ডাগর ডাগর চোখ তুলে জিজ্ঞাসা করলো।

শুধু তুমিই নয়, এ বোর্ডিং-এর সবাইকে এক একবার এ পরীক্ষা দিতে হয়েছে।

অনুর মুখের ওপর আষাঢ়ের সন্ধ্যা নেমে এলো। ভয়ে চিন্তায় ধীরে ধীরে এগিয়ে চললো অফিসের দিকে।

কাকাবাবু বসেই ছিলেন। বললেন, এসো এসো তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি। একটা বিশেষ কথা আছে, তাই ডেকে পাঠিয়েছি।

একবার হিসেব করতে করতে সুরঞ্জন কাকাবাবুর দিকে তাকালো। সে চোখে যেন আগুনের ঝিলিক। কিন্তু পরক্ষণে দৃষ্টি সংহত করে আবার নিজের হিসেবে মন দিলো।

তোমাকে মিঃ সেন ডেকেছেন। তিনিই এ হোস্টেলের মালিক। একবার যাও না, দেখা করে এস—

এই রাতেই?

হ্যাঁ, দারোয়ান দিয়ে আসবে আবার নিয়ে আসবে—কিন্তু ভয় নেই।

না, ভয়ের কথা বলছি না—বলেই একবার সুরঞ্জনের সঙ্গে ওর চোখাচোখি হয়ে গেল। আর একটি মাত্র দৃষ্টিতেই অনু বুঝতে পারলো আর যাই হোক, যাওয়াটা তার কোনোমতে ঠিক নয়।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ অনু বললে, কাকাবাবু আমার শরীরটা বড্ড খারাপ, মাথার যন্ত্রণা

হচ্ছে ভয়ানক। অন্যদিন যাব।

গম্ভীর হয়ে নাকের কাছে নিকেলের চশমাটা এনে কাকাবাবু বললেন, না, আজই যাও।

না কাকাবাবু আজ আমার যাবার উপায় নেই, শরীর অত্যন্ত খারাপ লাগছে।

কী হয়েছে বলো—কাকাবাবু যেন একটা কিছু অনুমান করেছেন।

কেন জোর করছেন, ওঁর যখন শরীর দুস্থ নেই—

বলার সঙ্গে সঙ্গে যেন একেবারে ঘড়ের গাদায় আগুন লাগলো। কাকাবাবু একটা চিৎকার করে উঠলেন, তুমি সব জিনিষের মধ্যে নাক গলাবে না বলে দিলাম।

কী অপরাধ করেছি আমি? একটি অসুস্থ মেয়েকে জোর করে হোটেলের বাইরে নিয়ে যাবার কোন অধিকার নেই আপনার—সেই কথাটাই জানিয়ে দিচ্ছি।

আছে কি নেই সে আমি বুঝবো—কাকাবাবু রাগে কাঁপতে লাগলেন।

দেখুন কাকাবাবু, ব্যাপারটা আপনি সবই জানেন—অনু দেবী দয়া করে ওপরে যান। আপনি জানেন কাকাবাবু মিঃ সেন ক'দিন আগেও হোস্টেলের মেয়েদের কাছে ম্যাজিক ল্যাটার্ন দেখাবার নাম করে বিকৃত রুচির ছবি কতগুলো যৌন ব্যাধির প্রতিকার চিত্র দেখিয়ে গেছেন। ভদ্রলোকের রুচি কোন্ স্তরের এই সব ছবি কোন্ হোটেলে দেখান বলতে পারেন আমাকে? তাছাড়া ওঁর নামে কিছুদিন হলো নানা আলোচনার ঢেউ উঠেছে, আপনি দয়া করে এই নিরীহ মেয়েটিকে ওপথে ঠেলে দেবেন না।

সুরঞ্জনবাবু বড় বেশীদূর এগিয়েছেন—অশ্রুকণা দরজায় এসে দাঁড়ালো। কাকাবাবুর একমাত্র মেয়ে।

ঠিক বলেছ মা। সুরঞ্জন, তুমি বড় বেশী দূর এগিয়েছো। তোমার নামে আমি রিপোর্ট করবো।

বেশ। কিন্তু আমিও আপনার নামে সরকারের কাছে জানিয়ে দেব যে আপনি দুরকম খাতা—

সুরঞ্জন আমি তোমার বাবার বয়েসী—কাকাবাবু যেন এক মুহূর্তেই চুপসে গেলেন। আর সেজন্যে খোলা দরজায় একটা শীর্ণ ছায়া পড়লো।

উমা দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।

॥ পাঁচ ॥

সকাল বেলাই হোস্টেলে একটা চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। আজ ছুটীর দিন, কাজেই সবার পুলতানি করবার সময়ও যথেষ্ট আছে। উপাসনা হয়ে গেছে কিন্তু মেয়েরা তখনও ঘর ছেড়ে যায়নি। মেজের পাতা বুলোমাখা বিবর্ণ শতরঞ্চিটার ওপরে বসে তপ্ত আলোচনা চলছিল। কাল কাকাবাবুর জন্মদিন, তাঁকে মেয়েদের পক্ষ থেকে কিছু না দিলে তিনি ক্ষুণ্ণ হবেন। মেয়েদের তরফ থেকে তাঁকে কিছু উপহার জাতীয় দ্রব্য তিনি অনুরূপ ভাবেই আশা করে থাকেন; কাজেই কিছু টাকার প্রয়োজন এবং টাকার জোগাড়ের সোজা রাস্তা চাঁদা তোলা। এ কাজে বিশেষ অগ্রণী হোস্টেলের কাকাবাবুরই মেয়ে অশ্রুকণা। ওঁর আগ্রহ যথেষ্ট থাকলেও উদাসীনতার বর্মাবৃত হয়ে সবার কাছে অনিচ্ছা সত্ত্বেই চাঁদা তুলছিলেন যেন।

অশ্রুকণা ঘরে এসে ঢোকার আগে একটা চেঁচামেচি চলছিল সেখানে। বন্ধু বলছিল, তা যাই বল কাকাবাবুর জন্মদিনে একেবারে ওঁকে কিছু না দিলে আমাদের কর্তব্যেরই ত্রুটি হয়।

উমা রোগা আর বেশ কালো, এতক্ষণ ধরে একটা ছেঁড়া ব্লাউজ সেলাই করবার ব্যর্থ চেষ্টা করছিল। মেয়েটি স্বল্পভাষিনী সহজে মুখ খোলে না, কিন্তু যখন খোলে তখন কথাগুলো প্রায় বুলেটের মত বেরিয়ে আসে। গরীবের মেয়ে, অনেক ঘা খেয়ে শক্ত হয়ে গেছে, কাজেই পৃথিবীতে কাউকেই তার আর ভয় নেই এমন কি দুর্ধর্ষ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের স্ত্রী কাকীমা পর্যন্ত তাকে ভয় করে চলেন। ছেঁড়া ব্লাউজটার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে দাঁতে সুতোটা কামড়ে ধরে সে বললে, কর্তব্যটা কেবল এক তরফা হয় নাকি?

বন্ধু কোঁস করে উঠলো, তার মানে?

উমা সংক্ষেপে বললে, মানে আবার কি? কি করে আমাদের কাছ থেকে ওঁরা কিছু আদায় করবেন তারই ফন্দি-ফিকির। বেশ তো, নিজের জন্মদিনে খাইয়ে দিন না হোস্টেল সুদ্ধ মেয়েদের ভালো করে। সে সবের মধ্যে নেই, কেবল হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে নেবার চেষ্টা। তাছাড়া ওঁর জন্মদিনে পৃথিবী এমন কি ধন্য হয়েছে যে ঘটা করে সেটা সকলকে জানাতে হবে?

মন্টু ভয়ানক চটে গেল, বললে, যা মুখে আসে তাই যে বলছিস। জানিস উনি ঋষিতুল্য লোক।

যা—যা, উনি যদি ঋষি হন তাহলে আমি মহর্ষি। বলেই উমা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

উমার কথায় বীথি আর অনু দুজনেই হেসে ফেললো। মন্টু একটা অগ্নিদৃষ্টি অনুর ওপর ফেলে রুক্ষ স্বরে বীথিকে বললে, নিজের কানেই তো শুনলে সব। উমার কি এসব কথা বলা উচিত হলো? আমাদের মধ্যে তোমার বুদ্ধি বিবেচনাই তো সব চাইতে বেশী, তুমিই বলতো কাকাবাবুর মত মহৎ লোককে কি ওসব কথা বলতে আছে।

বীথি কী উত্তর দিতে যাচ্ছিলো, সেই সময় ঘরে ঢুকলো কাকাবাবুর আদুরে মেয়ে অশ্রুকণা এবং তার সঙ্গে সুমিতা, ওদের দেখেই ঘর সুদ্ধু সবাই চুপ করে গেল।

অশ্রুকণার বয়স আন্দাজ আঠারো উনিশ হবে। রং মোটের ওপর ফর্সা কিন্তু বাপ মার আদর খেয়ে খেয়ে শরীর যেভাবে মোটা হচ্ছে তাতে কিছুদিনের মধ্যেই বোধ হয় বেডিং-এর দরজা দিয়ে ঢুকতে পারবে না। প্রায় সব সময়েই তার মুখ চলে, টফি, চকোলেট বা লজেন্স একটা গালে পুরেই রেখেছে। মেয়েরা তাকে আড়ালে বলে, অশ্রুসরোবর। সুমিতা তার প্রিয় সহচরী, সব সময়ে চাটুকারিতা করে বলে কাকাবাবুর খুব সুনজরে আছে। যাবার সময় প্রায়ই তার পাতে দুখানা মাছ পড়ে। মন্টুরও অশ্রুকণার প্রিয়পাত্রী হবার বিশেষ চেষ্টা আছে, কিন্তু সুমিতার সঙ্গে পেরে ওঠে না বলে দুজনের মধ্যে বেশ একটু রেশারেশি আছে—অনু সেটা আগেই লক্ষ্য করেছিল।

অশ্রুকণা ঘরে ঢুকে চর্বিবহুল মোটা গলায় বললে, এখানে এমন চেঁচামেচি হচ্ছিল কিসের।

মন্টু কল কল করে বললো, দেখ না অশ্রুদি, কাকাবাবুর জন্মদিনে মেয়েদের পক্ষ থেকে উপহার দেবার কথা হচ্ছিল তাতে উমা যা মুখে আসে তাই বললে।

বীথি ব্যস্ত হয়ে বললে, ওসব কথা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে কী হবে, তুই চুপ কর।

মন্টু বললে, চুপ করবো কেন? সত্যি কথা বলাই উচিত। কাকাবাবুর দয়াতে এখানে যারা মাথা গোঁজবার জায়গা পেয়েছে তাদের একটা কৃতজ্ঞতা নেই? বলে কিনা কাকাবাবু খালি আমাদের কাছ থেকে আদায় করবার তালে থাকেন। কী আস্পর্ধা, আরো তিনি কি এমন কেউকেটা লোক যার জন্যে আমাদের ঘটা করে উৎসব করতে হবে?

অশ্রুকণার ফর্সা প্রকাণ্ড মুখখানা রাগে রাঙা হয়ে উঠলো। খসখসে গলায় সে বললে, বাবা তো আর জোর করে কারুর কাছ থেকে জন্মদিনে উপহার চান না। যারা ভালোবেসে ভক্তি করে তাঁকে কিছু দেবে তাই তিনি প্রসন্ন হয়ে নেবেন। এই নিয়ে এত ঘটনা করবার কী আছে?

বীথি বললে, সে তো ঠিকই। তবে তুমিও এ নিয়ে মন খারাপ করো না ভাই। জানোই তো উমা একটু পাগলাটে, ওর কথা ছেড়ে দাও।

সুমিতা এবার মুখ খুললো। তীক্ষ্ণ স্বরে বললে, পাগলাটেই বটে। অন্য কোন ব্যাপারে তো ওর কোন পাগলামি দেখা যায় না। কিন্তু কাকাবাবুকে অপমান করতে পারলে—

অশ্রুকণা মোটা মোটা ভ্রু দুটো কুঁচকে বললে, থাক থাক। ও সব কথা থাক। যাদের ইচ্ছে হয় আমার কাছে টাকা জমা দিয়ে যেয়ো। বাবা কারো কাছেই কিছু আশা করেন না—যারা ওঁকে ভালবাসে তারা নিজেদের প্রাণের টানেই দিয়ে যাবে। আর সুমিতা—বলে দুম—দুম করে পা ফেলে অশ্রুকণা আর সুমিতা বেরিয়ে গেল। মন্টুও এ সুযোগ ছাড়লো না, সেও সঙ্গে সঙ্গে অশ্রুকণাকে অনুসরণ করলো।

কাছাকাছি কোনো ঠাকুর বাড়িতে পুজো হচ্ছিল। মিনিট দুতিন চুপ করে বসে থেকে অনু আর বীথি তার কাঁসর ঘণ্টার শব্দ শুনলো। তারপর অনু বললে, এবার কাকাবাবু ঠিক উমাকে বোর্ডিং থেকে তাড়িয়ে দেবেন।

বীথি কি যেন ভাবছিল, উত্তর দিল না।

অনু আবার বললে, কথা বলছো না যে তুমি? এর পরে কি উমা বেশী দিন এখানে থাকতে পারবে? ওকে নিশ্চয়ই এখান থেকে চলে যেতে হবে।

বীথি অনুর মুখের দিকে স্বপ্নাচ্ছন্নের মত তাকিয়ে

থেকে অল্প একটু হেসে বললে, না।

না—কেন?

বীথি বললে, সে অনেক কথা।

কী অনেক কথা? অনুর কৌতূহল বেড়ে উঠলো। বীথি তেমনি রহস্যময় ভাবে হেসে বললে, সব কথাই কি তোমাকে বলা যায়, না সব কথাই তোমার শোনা উচিত। তবে আমি এ পর্যন্ত বলতে পারি উমার হাতে এমন অস্ত্র আছে যাকে কাকাবাবু মৃত্যুবাণ বলে ভয় করেন। যত দিন এ বোর্ডিং থাকবে ততদিন উমাকে এখান থেকে কেউ সরাতে পারবে না—একথা তুমি জেনে রেখো।

অনু আবার কী বলতে যাচ্ছিল বীথি বাধা দিয়ে বললে, না—আর নয় এর বেশী আর একটা কথাও জিজ্ঞাসা করবে না। জিজ্ঞাসা করলেও বলবো না।

অনু ক্ষুণ্ণস্বরে বললে, আচ্ছা। কিন্তু বীথির ওপরে একটা নিবিড় অভিমানে তার সমস্ত মন ভরে উঠলো। এতদিন ভাবতো বীথি তার একান্ত আপনার জন, তাদের দুজনের মধ্যে কোথাও কোনো আড়াল নেই, কোথাও গোপন করবার মত কিছু নেই। কিন্তু আজ সে বিশ্বাসের ওপরে কোথা থেকে এক টুকরো ছায়া ঘনিয়ে এলো।

আজ কাকাবাবুর জন্মদিন। হল ঘরের ভেতরে সারাদিন ধরে মেয়েরা আলপনা এঁকেছে। দেওয়ালের চারদিকে কাগজের মালা ও ফুল সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। হলের শেষ প্রান্তে একটা চৌকি পেতে তার ওপরে সাদা চাদর বিছিয়ে বেদীর মত করে দেওয়া হয়েছে, তার দুধারে ধূপ জ্বলছে। ঘরে উজ্জ্বল আলো, গলায় রজনীগন্ধার মালা দুলিয়ে, কপালে চন্দন পরে সাদা ধুতি আর উত্তরীয়ে আবৃত কাকাবাবু যেন পুরাকালের ঋষিদের মত ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছেন। এই মাত্র তিনি প্রার্থনা শেষ করলেন, তাই সকলেই চোখ বুজে বসে আছে এবং মিট মিট করে কেউ কেউ তাকিয়ে দেখছে। কেবল কাকীমা বজ্র দৃষ্টি মেলে লক্ষ্য করেছেন কারু কোথাও চোখ খোলা আছে কিনা।

অনু পেছনে বসে নিশ্চিন্তে বীথিকে চিমটি কাটছিল। এমন সময় বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হলো। কাকাবাবু নিজেদের চশমার সুতো বাঁধা দিকটা ভাল করে কাণে জড়িয়ে নিয়ে গম্ভীর গলায় ঘোষণা করলেন: এবার কুমারী অনুলেখা দেবী একখানি গান শোনাবেন।

এ নিশ্চয়ই অস্ত্রকণার কীর্তি। সেই প্রোগ্রাম তৈরী করে দিয়েছে। অনু সভায় বীথিকে বললে, এ কি সর্বনাশ।

সর্বনাশ আবার কিসের, গান শুনতে চাইছেন শোনাবে।—বীথি বললে।

আমি পারবো না।

কিন্তু কাকাবাবু আবার গম্ভীর গলায় ডাকলেন, অনু, চলে এসো। সেই সঙ্গে সঙ্গে হল শুদ্ধ মেয়ে এবং কাকীমার তীব্র দৃষ্টি তার মুখের ওপর এসে পড়লো। অগত্যা উঠতেই হলো অনুকে, দুরু দুরু বুকে সে এগিয়ে গেল বেদীর সামনে। কাছেই হারমোনিয়ম রাখা আছে, কম্পিত চিত্তে সামান্য কিছুক্ষণ সে সুর ঠিক করে নিয়ে গান ধরলো, "তাঁরে আরতি করে চন্দ্র তপন, দেব মানব বন্দে চরণ—"

প্রথমে গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল। তার পরেই তার আশৈশবের শিক্ষার আরম্ভ বিদ্যা আপনি সুরের মুক্তধারা হয়ে বেরিয়ে এলো। শ্রুতিনন্দী রবীন্দ্র সঙ্গীতের গম্ভীর উদার মাধুর্যে সমস্ত ঘর যেন মন্ত্রিত হয়ে উঠলো। উদাস সুরের অপূর্ব মাদুরীর মধ্যে অনুলেখা আত্মমগ্ন হয়ে গেল।

গান যখন শেষ হলো তখন সমস্ত ঘর নিস্তব্ধ। সবাই যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে বসে আছে। তারপর কাকাবাবুর কথাই প্রথম চটকা ভাঙলো। তিনি গদ গদ স্বরে বললেন, আহা-হা কী গানই গাইলে মা, যেন অমৃত বৃষ্টি করলে চারদিকে। আর একখানা হোক।

না-মা। আমায় ক্ষমা করবেন, বলে অনু দ্রুত পদে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল। তার হার লজ্জা করছিল এখন।

বাইরের বারান্দায় এসে সে রেলিং ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। সামনের বস্তি বাড়ির মাথার ওপরে চাঁদ উঠেছে। অল্প অল্প শিশিরে ভেজা বস্তির চালগুলো চাঁদের আলোয় চিক চিক করছে। দূরে মাণিকতলা খালের ধারে গাছের মাথাগুলো রুপালী জ্যোৎস্নায় অদ্ভুত দেখাচ্ছে। গান গাইতে গিয়ে অনুর কপালে কয়েক কোটা ঘাম জমেছিল এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া এসে সরেছে তা মুছিয়ে নিয়ে গেল।

এই যে, এইখানেই আপনি। ভেবেছিলাম আজ শেষ হলেই আপনাকে অভিনন্দন জানাব। কিন্তু এত আগেই যে চান্স পাব তা ভাবি নি।

অনু চমকে তাকালো। কখন সুরঞ্জন এসে ওর পাশে দাঁড়িয়েছে। সুরঞ্জন আবার বললে, টাকনবিক্যালের জনিল তাকে এই ঘরে থাকবারই চেষ্টা করেছিলাম, আপনার গান আমায় এখানে টেনে নিয়ে এলো। অবিশ্যি ঘরের ভেতরে গিয়ে শুনিনি বাইরে দাঁড়িয়েই শুনেছি। কিন্তু কী বলে যে কনগ্রাচুলেসন জানাব জানি না।

অনু লজ্জিত স্বরে বললে, কী যে বলেন তার ঠিক নেই।

সুরঞ্জন একটু চুপ করে রইলো। তার প্রশস্ত সুন্দর ললাটে কোঁকড়া চুলে আর সোনার ফ্রেমের চশমায় জ্যোৎস্নার আলো পাশে ঝলমল করতে লাগলো। একটা মৃদু নিশ্বাস ফেলে সুরঞ্জন বললে, কি যে বলছি সে কথা আমিও ভাবছি। গানটা ভাঙিয়ে দেওয়া হচ্ছে অনু দেবী, তার পর ঘরে যাবার নিষ্ঠুরতা যে কতখানি সে কি আপনি বুঝতে পারেন না?

অনুর পা থেকে মাথা পর্যন্ত সিরসির চমকে গেল। প্রায় অস্ফুট গলায় অনু বললে, সুরঞ্জনবাবু?

সুরঞ্জন আরো একটু সামনে সরে এসে গম্ভীর গলায় বললে, আরো কি ব্যাখ্যা করে বলবার দরকার আছে?

অনু কথা বলতে পারলো না। তার রক্তের মধ্যে তখন ঝড়ের মাতন সুরু হয়েছে। বস্তির টালির চালের ওপর দিয়ে শুক্লা ত্রয়োদশীর চাঁদ চিরন্তন নাটকের মঞ্চের ওপর চিরদিনের চেনা আলো ছড়িয়ে দিয়েছে।

সেই সময়েই পূর্ণ চন্দ্রের ওপর মেঘের ছায়া পড়লো। ওদের সামনে এসে অশ্রুকণা চর্বিবসা মোটা গলায় বললে, আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে সুরঞ্জনবাবু।

অশ্রুকণার এই হঠাৎ আবির্ভাবে অনু আর সুরঞ্জন দুজনেই চমকে উঠেছিল। কিন্তু সুরঞ্জন চমকটা সামলে নিলো; পর মুহূর্তেই অল্প একটু হেসে বললো, ব্যাপার কি অশ্রু?

অশ্রুকণার চোখ দুটো চক চক করে উঠলো, বললে, আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।

মুখের হাসিটা টেনে রেখে সুরঞ্জন বললে, বেশ তো নির্ভয়ে বলে ফেলো।

অশ্রুকণার মুখে তখন মেঘ নেমে এসেছিল, গম্ভীর গলায় বললে, ঠাট্টা নয়, সত্যিই দরকারী কথা আছে আমার।

বেশ তো, দরকারী কথাটা শোনাই যাক না, তাতে ভণিতার কী আছে?

কথাটা এখানে হবার নয় বলেই আসতে বলছি, আপনি দয়া করে আসুন না আমার সঙ্গে।

কাল হলে হয় না?

না—।

সুরঞ্জনের মুখের পেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠলো। এবারও সে হাসল কিন্তু সেই হাসিতে জ্বালা ছিল।

সুরঞ্জন আবার বললো, আমি বলি কথাটা কালই হবে। একটা রাতে এমন কোন মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যাবে না।

অশ্রুকণার চকচকে চোখে এবার এক রাশ আগুন বৃষ্টি হলো। হিস্রস্বরে বললো, দুজনের নিভৃত আলাপে ব্যাঘাত করলাম বুঝি? এতটা বুঝতে পারি নি। অপরাধ হয়ে গেছে, ক্ষমা করবেন।

বলেই যেমন হঠাৎ এসেছিল তেমনি ভাবে হঠাৎ বেরিয়ে গেল। হল থেকে তখন সমবেত স্বরে কোরাস শোনা যাচ্ছিল "আজি শুভদিনে, এ মধু পবনে"—

সমস্ত ব্যাপারটা এখন অদ্ভুত, সব কিছুর ভেতরে এমনি একটা অশুভ সংকেত আর অস্বস্তির ছোঁয়া আছে যে ভয়ে বিস্ময়ে অনু কিছুক্ষণ পাথর হয়ে রইলো। তারপর সুরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে বললো, আমি তবে যাই।

সুরঞ্জনের গলার স্বর এবার কঠিন হয়ে উঠলো, একটু দাঁড়ান ওর কথাগুলো শুনে আপনি কিছু মনে করেননি তো?

অনু শুকনো গলায় বললে না, মনে করব কেন? তবে উনি হয়তো রাগ করলেন। আপনি ওঁর সঙ্গে গেলেই পারতেন।

সুরঞ্জন ভ্রূকুটি করলো, চশমাটা খুলে নিয়ে রুমাল দিয়ে মুছতে মুছতে বললো, আমি ওদের বিনে মাইনের চাকর নই যে সব সময়েই সকলের হুকুম তামিল করবো। ওঁরা অনুরোধ করেছিলেন বলেই আমি ওদের সাহায্য করতে এসেছি। ইচ্ছে হলে

কালই আমি এখান থেকে চলে যেতে পারি।

শেষ কথাটায় অনু চমকে উঠলো। হঠাৎ বলে ফেললো সভয়ে না—না, আপনি যাবেন না।

সুরঞ্জন বললে, কেন?

যে ঝোঁকটা এসেছিল সেই ঝোঁকের মাথাতেই অনু বলে ফেললো: এ হোস্টেল যেমন—আর এরা যেমন লোক, আপনি চলে গেলে আমি এখানে থাকতে পারবো না।

কিন্তু কথাটা বলে ফেলেই তার শরীরের মধ্যে দিয়ে একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল। অসীম লজ্জায় সে দাঁড়াতে পারলো না। সে প্রায় ছুটেই পালিয়ে গেল সুরঞ্জনের সামনে থেকে। করিডোর দিয়ে বাঁক নেবার সময় ক্ষণিকের জন্যে তার চোখে পড়লো, সুরঞ্জন রেলিঙের পাশে তখনও তেমনি চুপ করে দাঁড়িয়ে—তার শুভ্র বেশবাসে জ্যোৎস্নার আলো পড়ে তাকে একটা সাদা পাথরের মূর্তির মত দেখাচ্ছে।

দূরে কাছে একটার পর একটা রাত বারোটার ঘণ্টা বাজছে। কোথা থেকে ঘণ্টার আওয়াজ রাত্রির বুকের ভেতর কয়েকটা ঢেউ তুলে অন্ধকারের ভেতর কাঁপতে কাঁপতে মিলিয়ে গেল। চিৎপুর সাইডিং থেকে মাল-গাড়ি শানটিং করার আওয়াজ আসছিল আর নিদ্রাহীন চোখে বিছানায় ছটফট করছিল অনু।

হোস্টেলের কোথাও একবিন্দু আলোর চিহ্ন নেই। ছেদহীন অন্ধকার আর মৃত্যুর মত ঘুমে চারিদিক আচ্ছন্ন হয়ে আছে, শুধু জানালার কাছে বাইরের তারার আলো মাথার কাছে রাখা অনুর কাচের গ্লাসটায় স্ফটিকের মত ঝিক ঝিক করে জ্বলছিল। পাশের বিছানায় বীথি ঘুমের ঘোরে বিড় বিড় করে কথা বলে উঠলো।

অনুর চোখের দৃষ্টি ওই কাঁচের গ্লাসটার ওপর স্থির হয়ে রইলো। অন্ধকারে ওটা যেন কোন এক চক্ষু দানবের হিংস্র চোখের মত জ্বলছে। ভারি অস্বস্তি বোধ হতে লাগল ওর। ইচ্ছে করলো উঠে গিয়ে সে কাঁচের গ্লাসটা সরিয়ে দেয়। কিন্তু শরীরে কোথাও যেন কোন উৎসাহ খুঁজে পেল না। তাছাড়া একটু আগেই বড় রাস্তা দিয়ে বিকট হরিধ্বনি তুলে একটা মড়া গেছে—তার একটা হুহুমানো ভয় তখনও তার বুকের মধ্যে কেঁপে কেঁপে ফিরছিল।

গ্লাসটার দিকে তাকিয়ে থাকতে না পেরে অনু চোখ বন্ধ করে থাকলো। কিন্তু বাইরের চোখ বন্ধ হলেই কি মনের চোখ বন্ধ হয়ে যায়? শুধু ওই একটা চোখ নয়, চারদিকে এখন তার আরো অনেকগুলো চোখ অন্ধকারে ঝকঝক করে উঠলো। মনে আছে ছেলেবেলায় একবার গ্রামের বাড়ীর উঠোনে মাঝ রাতে পাঁচ সাতটা শেয়াল দেখেছিল সে। অন্ধকারে সেগুলোকে দেখা যাচ্ছিল না, কেবল উঠোনের চারদিকে জোড়া জোড়া উগ্র উজ্জ্বল চোখ তার দিকে অশরীরী দৃষ্টির মত তাকিয়ে ছিল। ভয়ে তার শরীর হিম হয়ে গিয়েছিল—সে স্মৃতিকে আজও সে ভুলতে পারেনি।

এই মুহূর্তে তার মনের অন্ধকার প্রাঙ্গণে তেমনি জোড়া জোড়া চোখ ঘুরে বেড়াতে লাগলো। এই কলকাতা—এই হোস্টেল। এখানকার অদ্ভুত বাসিন্দারা: কাকাবাবু, কাকীমা, বীথা—আরো অনেকে। তা ছাড়া সহরের পথে পথে লোভীদের বর্বর দৃষ্টি চারদিক থেকে একরাশ মাংসাশী শ্বাপদের জ্বলন্ত চোখের বেড়াজালে যেন তাকে ঘিরে ধরতে চাইছে। বীথি কি একা তাকে বাঁচাতে পারবে এদের হাত থেকে? তাছাড়া বীথিও তো মেয়ে, তার শক্তি কতটুকু?

শুধু একজন আছে, এর ভেতরেও একটি বিরাট মানুষ—সে যেন তার বলিষ্ঠ বাহু দিয়ে ওকে আশ্রয় দিতে পারে। ওর সমস্ত ভয় দূর করে দিতে পারে। সে আর কেউ নয়, সে সুরঞ্জন।

সুরঞ্জন—

নামটা মনে পড়তেই অনুর দেহ মনে আবার এক ঝলক বিদ্যুৎ বয়ে যেতে লাগলো। নিজের অজ্ঞাতেই কেন সে মানুষটির ওপরে এতখানি বিশ্বাস করছে? কেন নির্ভর করতে চাইছে তার ওপরে? কেন থেকে থেকে অলস মুহূর্তে সুরঞ্জনের ছায়া ওর মনের ওপর ভেসে উঠছে? সুরঞ্জনের দৃষ্টিতে যেন আজকাল কি একটা নতুন দুর্বোধ্য ইংগিত খুঁজে পায় অনু? সন্ধ্যা-বেলা কেন সে ও কথাগুলো অমন করে বলে গেল বিদায় জানা তার দৃষ্টি অমনভাবে ঝলসে চলে উঠেছিল?

ঠিক সেই সময়েই অনুর চিন্তাটা হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে

থমকে গেল। ঘুমন্ত হোস্টেলের সমস্ত স্তব্ধতা ভেঙে খান খান হয়ে গেল নারী কণ্ঠের তীক্ষ্ণ কান্নার আর সঙ্গে সঙ্গে কাকাবাবুর গর্জন ছিটকে পড়লো তেতলার ঘর থেকে।

না—না। আর একটা কথাও তোমার শুনতে চাই না। কালকেই আমি তোমাকে দেরাদুনে পাঠিয়ে দেব।

॥ ছয় ॥

মেয়েরা সবাই এক সঙ্গে জেগে উঠেছিল। দু একটা ঘরের আলো জ্বলে উঠলো। পাশের বিছানায় বীথিকে বসতে দেখে অনু সভয়ে জিজ্ঞাসা করলো, কী হলো বীথি! এত চেঁচামেচি কেন?

বীথি কোন জবাব দেবার আগেই আবার পরিষ্কার কান্নার আওয়াজ পাওয়া গেল। এবার আর সে গলা চিনতে ভুল হলো না। কাঁদছে কাকাবাবুর আদুরে মেয়ে অভ্রুকণা। ইনিয়ে বিনিয়ে বলছে, বেশ সেই ভালো, আমায় কাল দেরাদুনেই পাঠিয়ে দাও বাবার কাছে, এখানে আর আমি থাকতে চাই না।

অনু চুপি চুপি বললে, কাকাবাবু অভ্রুদিকে বকছেন।

বীথি বললে, তাইতো দেখছি।

অভ্রুকণা কান্না ভরা গলায় আরো কী সব খানিকক্ষণ বলে গেল। তারপরই কাকীমা বোধ হয় চাপা গলায় দুজনকেই শান্ত করতে চেষ্টা করলেন। তারপর সব নিস্তব্ধতায় ডুবে গেল।

অনু বললে, কী হলো বীথি?

বীথি একটু বিরক্ত গলায় বললো, কী করে জানবো? ঘুমোচ্ছি রাতে চেঁচামেচি করে ঘুমটা চটিয়ে দিলো।

অনু বিস্মিত কৌতূহলে আবার বললে, কিন্তু কাকাবাবু অভ্রুদিকে কখনও বকতে পারেন তা ভাবাই যায় না।

বীথি আবার তেমনি বিরক্তি ভরে বললে, আদর দিয়ে একেবারে মাথায় তুলেছেন, হয়তো আকাশের চাঁদ চেয়ে আব্দার করে বসেছে তাই এখন ধমক দিচ্ছেন। কিন্তু ওসব কথা নিয়ে তোর মাথা ঘামিয়ে লাভ কী? শো—ঘুমো এখন। বলে বীথি একটা মস্ত হাই তুলে আবার শুয়ে পড়লো।

কিন্তু এত সহজেই ঘুম এলো না। অনেক রাত পর্যন্ত ছেঁড়া ছেঁড়া তন্দ্রার মাঝখানে তার চোখের সামনে বার বার ভেসে উঠতে লাগলো: তার আর সুরঞ্জনের দিকে আগুন-ভরা দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে অভ্রুকণা, সেই সঙ্গে বার বার মনে হতে লাগলো সন্ধ্যাবেলার সেই ঘটনাটার সঙ্গে রাতারাতি এই দুর্বোধ্য নাটকটির কোথায় যেন সম্পর্ক আছে।

পরদিন কলেজ যাওয়ার সময় অনু নিজের অজ্ঞাতেই একবার সুরঞ্জনের ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখলো। সেখানে ছোট্ট একটা তালা ঝুলছে! অকারণেই একটা বিষণ্ণতা তার মনকে স্পর্শ করে গেল।

কলেজের ক্লাসগুলোতে আজ থেকে থেকে সে অন্যমনস্ক হয়ে যেতে লাগলো। কী একটা অবাঞ্ছিত চিন্তা খানিকটা শারীরিক অসুস্থতার মত তার ওপর চেপে বসেছে। ঠিক কী যে সে ভাবছে—কী যে তার মনকে এমনভাবে পীড়িত করছে তা সে নিজেও বুঝতে পারছে না! অথচ বার বার সমস্ত মানসিক প্রশান্তি তার বিচলিত হয়ে যাচ্ছিল। অভ্রুকণা, সুরঞ্জন, রাতারাতি অভ্রুকণার দুর্বোধ্য কান্নার ইংগিত—সব মিলে কোথায় যেন কী ঘটতে চলেছে অথচ সে তা ভালো করে বুঝতে পারছে না।

কলেজ থেকে ফিরে চা খেয়ে সে মাকে একটা চিঠি লিখবে ভাবছিল। এমন সময় কাকাবাবুর চাকর বলরাম এসে হাজির হলো, বাবু ডাকছেন।

অনু আশ্চর্য হলো, ভয়ও পেল। সাধারণতঃ অত্যন্ত জরুরী ব্যাপার না হলে কাকাবাবুর ঘরে এমন ডাক কখনও কারুর পড়ে না। হোস্টেল সংক্রান্ত যে-কোন কাজ সুরঞ্জনই দেখাশুনা করে। বিশেষ কোন ঘটনা না ঘটলে কাকাবাবু কাউকে ডেকে পাঠান না। তাই তাঁর ঘরে ডাক পড়লে প্রত্যেকেই একটা অজানা ভয়ে শীর্ণ হয়ে ওঠে। আবার কি মিস্টার সেনের কাছে যেতে বলবেন? কী সর্বনাশ! সুরঞ্জন থাকলে তবু ভরসা ছিল, কিন্তু এখন?

বীথি বেরিয়ে গিয়েছিল। সে থাকলেও যেন মনের দিক থেকে খানিকটা জোর পেত অনু। অগত্যা নিরুপায় হয়ে দুরু দুরু বুকে কাকাবাবুর ঘরের দিকে এগোলো সে। কাকাবাবু তাঁর টেবিলে বসে কী যেন লিখছিলেন অনুকে ঘরে ঢুকতে দেখে গম্ভীর গলায় বললেন, বোসো।

কাকাবাবুর মুখের চেহারা এবং গলার ভঙ্গি অনুর ভাল লাগলো না। একটা চেয়ার টেনে সে সন্তর্পণে বসে পড়লো। তারপর মুখ নিচু করে অপেক্ষা করতে লাগলো। চিঠিটা লেখা শেষ করে কাকাবাবু ধীরে সুস্থে সেটাকে একটা খামে পুরলেন তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, দেশ থেকে তোমার দাদার আসবার কথা ছিল না?

অনু তেমনি মাথা নিচু করে বললে হ্যাঁ, কথা ছিল।

কবে আসবেন তিনি?

তার দাদার আসা নিয়ে কাকাবাবুর কৌতূহলের অর্থ অনু ঠিক বুঝতে পারছিল না। আশ্চর্য হয়ে অনু মুখ তুলে বললে দাদার আসতে বোধহয় অনেক দেরী হবে। আমি তো তাঁকে আসতে তাগাদা দিয়েছি।

কাকাবাবু খামখানার ওপরে ঠিকানা লিখতে লিখতে বললেন, তাঁকে একটু তাড়াতাড়ি আসতে বলো।

কেন?

কাকাবাবু এবার সোজা অনুর দিকে তাকালেন। চশমার ভেতর দিয়ে তাঁর চোখ দুটো যেন পাঁচার চোখের মত জ্বল জ্বল করতে লাগলো: তিনি এসে তোমাকে অন্য হোস্টেলে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করবেন।

অনুর বুকের মধ্যে একতাল বরফের ছোঁয়া লাগলো। এ কথা ঠিক যে মাত্র কয়েক দিন আগে এ হোস্টেল তার অসহ্য মনে হচ্ছিল। এখানকার এই অদ্ভুত পরিবেশ, বিচিত্র বেয়ের দল, তাদের বিচিত্রতর কার্যকলাপ, এগুলো তার সমস্ত স্নায়ুগুলোকে যেন পীড়ন করছিল। বীথি ছাড়া এখানকার কারো সঙ্গে তার মনের যোগ হয় নি—সে যেন অনুভব করতো একটা বিদেশী খাঁচার মধ্যে তাকে এনে বন্দী করে ফেলা হয়েছে। তারপরে কোথা থেকে এলো সুরঞ্জন। এই খাঁচার মধ্যে বয়ে নিয়ে এলো এক মুঠো দক্ষিণের বাতাস, যেন নীলকান্ত আকাশ থেকে এক ঝলক সূর্যের আভাস তার চোখে-মুখে এসে পড়লো। ধীরে ধীরে এখানকার প্রতি তার একটা মমতা জন্মে উঠেছিল। কলকাতার এই নিরাশ্রয় অপরিচিত অরণ্যে নিজের মতো করে একটুখানি নীড়ের আশ্রয় পেয়েছিল সে।

হঠাৎ কাকাবাবুর এই কথা তাকে যেন সেই আশ্রয় থেকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চাইলো।

বিবর্ণ মুখে প্রায়হীন গলায় অনু বললে, আপনি কি আমাকে হোস্টেল থেকে চলে যেতে বলছেন?

উমা এসে ঘরে ঢুকলো। কোন কথা না বলে একটা মোড়া টেনে নিয়ে এক কোণে চুপ করে বসে পড়লো। কাকাবাবু অন্যদিকে দৃষ্টিতে সে দিকে একবার তাকালেন, মনে হলো এই সময়ে উমার ঘরে আসাটা তাঁর ভাল লাগে নি। কিন্তু, উমাকে কোন কথা না বলে অনুর দিকে তাকিয়ে তিনি বলে চললেন,: আমি তোমাকে ঠিক চলে যেতে বলছি না, কিন্তু, আমার মনে হয় এখানে তোমার বোধহয় সুবিধে হচ্ছে না।

উমা একটা বাংলা মাসিক পত্রের পাতা উল্টাতে উল্টাতে মুহূর্তের জন্যে তাকিয়ে দেখলে। অনু দেখতে পেল তার ঠোঁটের একটা কোণ বেঁকে গেল একটুখানি।

অনু শুকনো গলায় বললে, আমার তো কোন অসুবিধা হচ্ছে না।

কাকাবাবু বললেন, হচ্ছে বৈকি। তুমি প্রার্থনায় যোগ দাও না। তা ছাড়া আরো দু-এক জনের মুখে শুনেছি হোস্টেলের এ্যারেঞ্জমেন্ট নিয়ে তুমি প্রায়ই খুঁত খুঁত করো। এ অবস্থায় তোমার এখানে থাকার সার্থকতা নেই। তুমি আর কোথাও একটা জায়গা ঠিক করে নাও।

ভয় কেটে গিয়ে এবার একটা অন্য অপমানে অনুর চোখ মুখ জ্বালা করে উঠলো। সোজা এবং স্পষ্ট গলায় অনু বললে, প্রার্থনা করা বা ক্লাস করা এখানে বাধ্যতামূলক নয়। আর হোস্টেলের ব্যবস্থার জন্যে প্রায়শঃ সবাই করে—আমার চাইতে বেশীই করে।

কাকাবাবুর পাঁচার মত চোখ দুটো চকচক করে উঠলো। কঠিন ভাবে তিনি বললেন, মিথ্যে তর্ক করো না। আর চার দিন পরেই মাস শেষ হচ্ছে তুমি পরশু থেকে আর কোথাও শিফ্‌ট করো।

অনু আরক্ত মুখে বললে, এর মধ্যে দাদা যদি না আসেন,—কাকাবাবু নিষ্করুণ গলায় বললে, নাই যদি আসেন তা হলে তুমি নিজেই একটা কিছু ঠিক করে নাও।

হঠাৎ উমা খিল খিল করে হেসে উঠলো। তার হাসিটা এমনি আকস্মিক, যে এক মুহূর্তে অনু আর কাকাবাবু দুজনেই চমকে উঠলো।

উমা বললে, অকারণে তো মেয়েটাকে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু এ নিয়ে যদি ও ইউনিভার্সিটিতে কমপ্লেন করে তা হলে ব্যাপারটা কতদূর গড়াতে পারে তা জানেন ?

কাকাবাবু যেন হঠাৎ নিভে গেলেন। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, সব ব্যাপারে তোমার কথা না বলাই ভালো উমা।

উমা আর হাসছিল না। কিন্তু বিচিত্রভাবে ঠোঁটের একটা কোণা বাঁকিয়ে বললে, সব ব্যাপারেই যে আমি কথা বলি না তা আপনি জানেন। কিন্তু একটা মিথ্যেকে সৃষ্টি করতে গিয়ে অনেকগুলো সত্যের আবরণ হয়তো খুলে যেতে পারে সে কথা ভুলবেন না। গণ্ডগোলটা যদি ঘরের ভেতরেই বাধে, তা হলে বাইরের লোককে দণ্ড দিয়ে আরো মিথ্যেকেই ঘনিয়ে তোলা হবে। বলেই উমা ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

উমার কথার একটা বর্ণও অনু বুঝতে পারলো না। কিন্তু পরম বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলো তক্ষুণি কাকাবাবু—শীর্ণ আর সঙ্কুচিত হয়ে গেছেন। তাঁর মুখের রং বহুরূপীর মত বদলাচ্ছে ঘন ঘন।

মিনিট অনেক পর কাকাবাবুর ঠোঁট দুটো একবার দুবার নড়লো। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, আচ্ছা, আপাততঃ তুমি তা হলে এই ঘরেই থাকো। তবে এখানকার নিয়মকানুন এবং ডিসিপ্লিন যথাসম্ভব মেনে চলতে চেষ্টা করো।

বিমূঢ়ভাবে অনু কিছুক্ষণ কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে থেকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নীচের হলে তখন প্রার্থনা শেষ হয়ে গান সুরু হয়েছে। সকলকে ছাপিয়ে অভ্রংকণার বেসুরো মোটা গলা ভেসে উঠছে, সেটা যেন দস্তুরমত কানে আঘাত করে। অনু ধীরে ধীরে হল ঘরের পাশের সিঁড়ি দিয়ে ছাদে নেমে গেল।

কয়েক পা এগোতেই অনুর পা থমকে গেল। শুভ্র বস্ত্রের পোষাক পরা উজ্জ্বল একটি দীর্ঘ মূর্তি এগিয়ে চলেছে দূরে দিয়ে। তাকে অনুর চিনতে ভুল হলো না। সে সুরঞ্জন। আর তখনই অনুর মনে হলো, আজ সারা দিন সুরঞ্জনকে সে দেখতে পায় নি, তার চোখ দুটো অকারণ কৌতূহলেই বার বার সুরঞ্জনের ঘরের বন্ধ জানলার ওপরে প্রতিহত হয়ে ফিরে এসেছে।

বীথি পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। বললো, ওকি দাঁড়ালি যে অনু ? বলেই বীথি দেখতে পেল ততক্ষণে বড় বড় পা ফেলে সুরঞ্জন একেবারে তাদের কাছে এসে পড়েছে। চকিতে বীথি আরো লক্ষ্য করলো, অনুর গালে লালের আভাস, তার চোখের তারা দুটি নেমে এসেছে মাটির দিকে।

তিন চারটে দিন কেমন যেন সব থমথমে হয়ে রইলো। সমস্ত হোস্টেলে এক ধরনের চাপা উৎকণ্ঠা যেন ছড়িয়ে পড়েছে। অনু অনুভব করেছে এখন যেন সব আগের মত চলছে না—কোথায় যেন সুর কেটে গেছে। একটা স্পষ্ট সন্দেহের মধ্যে এ কথাও তার মনে হচ্ছিল, হয়তো সে নিজেই কখন অজ্ঞাতসারে এই হোস্টেলের কোন এক মর্ম কেন্দ্রে আঘাত করে ফেলেছে।

সেই যে পথে চলে গেল, তারপর থেকে সুরঞ্জনের আর কোন খবর নেই। তার ঘরটার সেই যে একটা তালা ঝুলছিল ক'দিন ধরে তা আর স্থানচ্যুত হয় নি অর্থাৎ সুরঞ্জন আর আসছে না। হয় সে আর কোথাও আছে নইলে কলকাতার বাইরে চলে গেছে। ওই কথাটা ভাবলেই অনুর ভারি কষ্ট হয়। আর কেবলই মনে হচ্ছে কোথাও চলে যাওয়ার আগে নিশ্চয়ই অন্তত সুরঞ্জনের তাকে একবার বলে যাওয়া উচিত ছিল।

কিন্তু বাধা পাওয়া যে অর্থহীন অনু নিজেও কি সে কথা বোঝে ? সে কি হোস্টেলের আরো অনেক মেয়েদের মধ্যে একজন নয়, সুরঞ্জনের কাছে তার এমন কি বিশেষ মূল্য আছে যে সে কোথায় কবে যাবে না যাবে সে কথা অনুকে বলে যেতে হবে ? তবু—

ওই তবুটা মনকে ক্রমাগত পীড়া দেয়। অনু জানে—সংসারে সব জিনিষের মধ্যে এমনি এক একটা করে 'তবু' এসে দেখা দেয়—তাদের কোন অর্থ থাকে না কিন্তু দুর্বোধ্য যন্ত্রণা থাকে। তাদের যুক্তি দিয়ে বোঝা যায় না অথচ তাদের অস্বীকার করবার কোন পথই নেই।

যা খুশি করুক সুরঞ্জন—অনু জোর করে নিজেকে শাসন করতে চায়। কিন্তু বীথিরই বা হলো কি ? কিসের একটা চাকরীর বাক্সার সে আজ চার পাঁচ দিন ঘোরাঘুরি

করে বেড়াচ্ছে। সকালে উঠেই বেরিয়ে যায়, তারপর অনু কলেজে চলে গেলে ফিরে এসে কখন যায় আবার কখন বেরোয় অনু তা কিছুই জানে না। শেষ পর্যন্ত আসে সেই মটা সাড়ে মটায়—তখন তাকে যেমন বিরক্ত তেমনি ক্লান্ত দেখায়—কোন কথা বলতে গেলেই যেন সে তেড়ে ওঠে—! দাঁত খিঁচিয়ে বলে, যা জ্বালাস নি এখন। এক কোঁটা মেয়ে দুনিয়ার সব ভাবনা তোর না ভাবলেও চলবে। হয় লেখাপড়া কর নইলে শুয়ে পড়, বোদ্দা কথা কিছুতেই তুই কানের কাছে ঘ্যান ঘ্যান করবি না।

বলেই বীথি ঘুমিয়ে পড়ে, আর নাক ডাকতে থাকে। আজকাল অনুর মন মেজাজ ভালো নেই, নইলে অন্য সময় হলে সে ঠিক বীথির নাকে দেশলাইয়ের কাঠি ঢুকিয়ে দিতো। কিন্তু এখন যেন সব কিছুই তার নিরর্থক, সব কিছুই যেন বিস্বাদ বোধ হচ্ছে।

হ্যাং, কিছু ভালো লাগে না। কাকাবাবুর সেদিনের ব্যবহারের পরে এখানকার প্রত্যেকটি মুহূর্ত বিরক্ত হয়ে পড়েছে। এত অপমান সয়েও সে শুধু পড়ে আছে বরুণদার অপেক্ষায়, অথচ সেদিনের টেলিগ্রামের পরে আজ পর্যন্ত স্পষ্ট করে একখানা চিঠি পর্যন্ত এলো না। যাতে করে বোঝা যাবে তিনি কবে আসছেন। যদি সুরঞ্জন থাকতো!

না, সুরঞ্জন নয়। সে থাক আর নাই থাক তাতে অনুর কি আসে যায়? কেবল সবই অসহ্য লাগে কেমন—আর অসহ্য লাগে অশ্রুকণার ওই ভীষণ বিকট মুখখানার দিকে তাকালে। সেদিনের সেই কান্না আর চিৎকারের অর্থ অনুর আজও অজানা, তবু বুঝতে তার বাকী নেই যে সে ব্যাপারে তার কোন একটা ভূমিকা আছে এবং সে জন্যে অশ্রুকণা তাকে কোন মতেই ক্ষমা করতে পারছে না। কারণ এর মধ্যে যে দু-একবার অশ্রুকণার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে তাতে অশ্রুকণার তার দিকে চোখ পড়তেই সঙ্গে সঙ্গে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। আর ক্ষণিকের জন্য যে দৃষ্টি তার দিকে সে ছড়িয়ে দিয়েছে তা বিষ-মাখানো।

অনুর মাঝে মাঝে এমন নিরুপায় মনে হয় যে কিছু বলবার নয়। মনে হয় যেন এক অদ্ভুত অরণ্যের মধ্যে বাস করছে সে, যেখানে গোপন হিংসা যে কোন অসতর্ক মুহূর্তের অবকাশে তাকে ছোবল দিতে পারে।

এমনি অসহায় মুহূর্তগুলোতে তার মাকে মনে পড়ে। চোখে সেই অকৃপণ স্নেহনির্ঝর; হাতে বরাভয়—করে সাধন। চোখ ভরে যেন জল আসে ওর মার কথা ভেবে।

সেদিনও যখন পড়তে বসেছিল ঠিক সময়ে হঠাৎ মার কথা ওর মনে পড়ে দুচোখ বেয়ে ধারা বয়ছিল আর ঠিক সেই সময়েই ঘরে ঢুকলো উমা।

কাঁদছিস বুঝি?

অনু চমকে মুখ তুলে তাকালো। উমার ঠোঁটের কোণে সেই বিচিত্র হাসি—সে হাসি যেন মায়াবিনী রোমাঞ্চিসার রহস্যময় হাসি—যাকে কাকাবাবুও সমীহ করেন। এই অদ্ভুত প্রকৃতির মেয়েটিকে অনু তখনই বুঝতে পারে না বরং যেন ওর ভয়ই করে। তাই উমার সামনে কান্নাটা ধরা পড়ে যাওয়াতে সে সংকোচে আড়ষ্ট হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি চটপট চোখ মুছে ফেলে বলল, কই কাঁদছি না তো।

উমার মুখের হাসিটা মিলিয়ে গেল, চোখের দৃষ্টি যেন কেমন কোমল হয়ে এলো।

উমা বললে, শোন্, যেখান এসে পড়েছিস সেখানে মন নরম করে কাঁদলে চলবে না। শক্ত হয়ে দাঁড়াতে না পারলে তোকে গুঁড়ো করে ফেলে দেবে এরা। অনেক কেঁদে—অনেক ঠেকে আমি এই অভিজ্ঞতাই লাভ করেছি।

অনু জবাব দিল না জবাব দেবার কি আছে তাও ভেবে পেল না। হঠাৎ উমা অনুর কাঁধে হাত রেখে বললো, আমার সঙ্গে একটু আয়।

কোথায়—! অনুর চোখে বিস্ময়ের ছায়া পড়লো।

আয়, একটা জিনিষ দেখাবো তোকে। এ হোস্টেলের মেয়েরা তার খবর জানে না আমি ছাড়া। আয়!

অনু বিস্মিত হয়ে উঠে দাঁড়ালো। তারপর তার সঙ্গে ঘর থেকে বেরুলো। সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলো একতলায়। প্রকাণ্ড বাড়িটার এক ধারে দুতিনটে ঘর কতগুলো পুরনো জাবিচারে ভর্তি হয়ে অব্যবহার্য হয়ে পড়ে আছে, তারই একটা পুরনো দরজা খুলে উমা ডাকলো, ভেতরে আয়—

অনু সন্দিগ্ধ আর বিস্মিত হয়ে বললে, ওর ভেতরে কেন?

বললেই বুঝতে পারবি। উমা হেসে বললে, ভয় পাবার কিছু নেই এসেই দেখ না।

অনু সন্তর্পণে ঘরে ঢুকলো। একধারে ভাঙ্গা টেবিল চেয়ারের গাদি। গোটা দুই বুলোওলা জীর্ণ কাপেট, ঘরের মধ্যে আবছা অন্ধকার—তারই মধ্যে উমা গিয়ে একটা টেবিলের সামনে দাঁড়ালো।

আস্তাবলে ঘোড়ার খাবার পাত্রে যেন বিশ্ব প্রেমিক বিশুর জন্ম হয়েছে।

অপূর্ব একটি শিশু, আর তার পাশে বীণা শুয়ে উপুড় হয়ে কাঁদছে।

এর জন্যে তোমার কাকাবাবুকে ওর কত দিতে হয়েছে জান?—উমা ঝড়ের মেঘের মতো মুখে বললে।

ওর সমস্ত গয়না আর নগদ তিন হাজার টাকা। তোমাদের ঋষিতুল্য কাকাবাবুর একটা নূতন চেহারা দেখে নাও।

অনু যেন জরে পাথর হয়ে গেছে।

॥ সাত ॥

অন্ধকার ঘরের মধ্যে চুপ করে গালে হাত দিয়ে ভাবছিল অনু। উমাও তেমনি নীরবে বসে আছে সামনে। এই কদর্য আবহাওয়া যেন ওর সমস্ত রক্তে বিষক্রিয়া সুরু করেছে। ওর আর এখানে এক মুহূর্তও থাকতে ইচ্ছে করে না। মা ভাববেন বলে তাঁকে সমস্ত ব্যাপারটা জানায় নি। শুধু বরদাদা যদি এসে পড়তো একবার—

হঠাৎ মনে পড়লো গত কাল কাকীমা অকারণেই কী ভাবে সুধাকে গালাগালি দিলেন।

দোষের মধ্যে হোস্টেল থেকে রান্না হয়ে ওঁর ঘরে যাচ্ছিল সেই সময় সুধা দেখে ফেলেছে। উনি হোস্টেল থেকেও খাবার নেন আবার খাবার এ্যালাউন্সও নেন। এত কথা সুধার জানার কথা নয় তবু অকারণেই সুধাকে যা মুখে এলো তাই বললেন। সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর এমন কি হোটেলের বি পর্যন্ত সোঁ ধরলো। হয়তো কাকীমা ওকেও কোন দিন অকারণে এমনি করে গাল দেবেন। সুধার মা হয় কেউ নেই, দুর্ভাগ্য নিয়েই যেন সে জন্মেছে, কিন্তু সে তো আর ওর মত নয়। মা তাকে কখনও কালো মুখে কথা বলেন কি—এক মেয়ে বলে সে বড় আদুরে।

যার কথা মনে এলেই কেন যে ওর চোখে জল আসে!

সামনের খোলা জানালাটার মধ্য দিয়ে এক ঝলক বৈদ্যুতিক আলো এসে পড়ে উমার ছেঁড়া চাটাইটার ওপর আলো-আঁধারী খেলা সুরু করে দিয়েছিল।

ধপ করে চেয়ারে গুটিয়ে রাখা পা দুটো নামিয়ে নিয়ে উমা বললে, এত আলো এমন ছিঁচ কাঁদুনের মত কেঁদে জ্বালালে চলে? মনের কত কষ্ট চেপে রেখে মানুষকে এগিয়ে চলতে হয়—, বেঁচেও থাকতে হয় জানিস?

ধীরে ধীরে গলাটাকে নামিয়ে উমা বললে, আমার জীবনের কথা যদি শুনিস তাহলে বুঝবি জীবনে কী ভাবে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হয়। একটু চুপ করে থেকে উমা বললো, আমি এ বোর্ডিংএ কিসের জোরে আছি, তা জানিস?

অনু চোখের জল মুছে মাথা নেড়ে জানালে, না।

আজ তোকে সেই গল্পই বলবো—মুখের ওপরে স্মৃতির বিষণ্ণ ছায়া ঘনিয়ে এলো ওর। উমা বলে চললো, এখানে আমি যে আছি তা কাকাবাবু কাকীমা কিংবা অভ্রুকণা কেউ-ই সইতে পারে না, অথচ আমাকে এখান থেকে সরাবার ক্ষমতা কাকাবাবুর নেই। আর এখানে থাকবার জন্যে আমাকে এক পয়সাও খরচ দিতে হয় না।

কেন উমাদি?

সেই কথাই বলছি।

আমাদের দেশ পূর্ব বাংলায়, বহু দূরে এক গ্রামে। আমার দাদামশায় সেখানকার স্কুলের হেড মাস্টার ছিলেন। প্রায় ৪০ বছর আগে একটি অনাথ ছেলেকে তিনি বাড়ীতে এনে স্থান দেন। তার বাপ মা ছিল না, তার আত্মীয় স্বজনও তাকে খেতে পরতে দিত না। চোদ্দ-পনেরো বছরের এই ছেলেটির দুর্গতি দেখে দাদুর দয়া হলো। শুধু খাকতে খেতে দিলেন তাই-ই নয়, স্কুলে বিনা খরচায় পড়ার ব্যবস্থাও করে দিলেন। দাদুর দুই মেয়ে ছাড়া আর কোন ছেলে পিলে ছিল না। বড় মেয়েটির আগেই বিয়ে হয়ে গিয়েছিল—, ছোট মেয়েটিকে নিয়েই তাঁর সংসার। তার ভেতরে এই ছেলেটি এসে পড়ায় দাদু যেন একটি পুত্র সন্তান পেয়েছেন বলে মনে করলেন।

অনু মন্ত্রমুগ্ধের মত নীরবে শুনতে লাগলো উমার বলা গল্প। অন্ধকারের মধ্যে যেন উমার চাপা দীর্ঘশ্বাসের তপ্ত উচ্ছ্বাস অনুর গায়ে এসে লাগছিল। অনু চমকে

) চমকে উঠছিল।

দাদুর ছোট মেয়ে মা-মরা সন্তান বলে অত্যন্ত যত্নে লালিত পালিত হয়েছিল। দাদুর ইচ্ছে ছিল, এই ছেলে-টিকে নিজের মেয়েটির সঙ্গে বিয়ে দিয়ে চিরকালের মত বন্দী করে রাখেন। একদিন দাওয়ায় বসে যখন সে ম্যাট্রিকের পড়া তৈরী করছে আর দাদু মাদুরের ওপর আধখানা চোখ বুঁজে হুঁকোয় সুখটান দিচ্ছেন, তখন ছোট মেয়ে শ্যামার দিকে চোখ রেখে দাদু হাসতে হাসতে বললেন, ম্যাট্রিক পাশ করলেই আমি চার হাত এক করে দেব। আমিও বুড়ো হয়েছি। শরীরের যে অবস্থা তাতে আর নিজের ওপর বিশ্বাস নেই। বিয়ের পর তোরা নিজেদের পথ বেছে নিবি। তবে যা তোদের বুড়ো বাপকে ছেড়ে যেন চলে যাস নি। দাদুর গলার স্বর যেন ভারি হয়ে এলো। আর সঙ্গে সঙ্গে শ্যামা ঘরের ভেতর থেকে ছুটে পালিয়ে গেল।

এই শ্যামাই দাদুর মেয়ে তবে এর সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কী?—অনু বিস্মিত হয়ে বললো, আর কাকাবাবুর সঙ্গেই বা এর কী যোগ?

সব পরে হচ্ছে—মেটাকে আমার কাহিনীর জট বলে মনে করছো সেটা একটু পরেই ছেড়ে যাবে।—একটু রহস্যভরা বাঁকা হাসির রেখা উষার মুখের ওপর দিয়ে বিদ্যুতের অগ্নিরেখার মত খেলে গেল।

শ্যামার বিয়ে হয়ে গেল। দাদুর হাসিকান্নায় ভরা দিনগুলো বয়ে চললো নদীর স্রোতের মত। দাদুর জামাই পাশ করলে ম্যাট্রিক। কিন্তু দাদুর চোখের মণি—অন্ধের নড়িকে তিনি হাত ছাড়া করতে চাইলেন না—। চোখের আড়াল করলে পাছে মনের আড়াল হয়ে যায় এই ভয়ে দাদু তাঁকে গ্রামের স্কুলেই চাকরীর ব্যবস্থা করে দিলেন। রিটায়ার করলেন তার বছর দুই পরেই, তখন তিনি প্রায় অথর্ব হয়ে পড়েছেন।

দিন কেটে যায়—। বিকেলের পড়ন্ত রোদ যখন চিরোল-চিরোল নারকোল পাছের ফাঁক দিয়ে গোবর লেপা উঠনে এসে পড়ে দাদু যেন চোখে দুনিয়ার আলোছায়া দেখে চমকে উঠে বিকৃত গলায় চেঁচিয়ে ওঠেন, ওরে শ্যামা সন্ধ্যে জ্বাল—বড় অন্ধকার যেন নেমে আসছে। আলো জ্বাল—

কি হলো বাবা? মেয়ে ছুটে আসে।—অমন চেঁচিয়ে উঠলে কেন?

না-না, একটা শেয়াল উঠোন দিয়ে দৌড়ে গেল। একটু হেসে বললেন, আমি ভাবলাম ঘরেই বুঝি ঢুকে পড়লো। নিশিকান্ত এখনও ফেরে নি?

নিশিকান্ত কাকাবাবুর নাম।

না—স্কুলের প্রাইজ নিয়ে খুব ব্যস্ত। খবর পাঠিয়েছে ফিরতে দেরী হবে।—শ্যামা বললে, তোমার শরীর কি ভাল নেই বাবা? ঘরে এসে বসো না—শ্যামা বাবার কপালে হাত দিল কপালের উত্তাপ পরীক্ষা করে বললে, কৈ শরীর তো খারাপ নয়। তবে অমন করছো কেন?

না—উঠোনে যেন কালো ছায়া দেখলাম। ভাবলাম বুঝি নিশিকান্ত আসছে—তাই। ও সব কিছু নয়, বুড়ো হয়ে গেছি আর চোখে ছানি পড়বার পর ভালো করে কিছু দেখতেই পাই না—তাই দেখি একটা, ভাবি আর একটা।

একটু রাত করেই বাড়ী এলো নিশিকান্ত। তখন দাদুর নাক ডাকছে। শ্যামা ভাত নিয়ে আসনে বসে আছে একা।

এত রাত হলো যে আজ—? শ্যামা জিজ্ঞাসা করলো।

প্রাইজের বই কিনতে কাল কলকাতা যেতে হবে—স্কুলে একটা ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হলো। লোকটির কলকাতায় একটা বই-এর দোকান আছে। সঙ্গে যাবার জন্যে অনুরোধ করলেন তিনি। বললেন সস্তায় বই দেবেন, অনেক বই-এর স্টক আছে, বেছে বই নেওয়া যাবে।

বেশ তো! কিন্তু বাবার শরীর খারাপ। আমারও শরীর ভালো নয়।—

মাত্র দুদিনের ছুটি নিয়ে যাচ্ছি, ওই ভদ্রলোকের বাড়ীতে উঠবো। তোমার কোনও চিন্তা নেই।—নিশিকান্ত ডালের একটা পোড়া লঙ্কা ভাতে মাখতে মাখতে বললো, কী এতো চিন্তা করছো গালে হাত দিয়ে?

বই-এর সঙ্গে আবার বৌ না আসে।—একটু হেসে শ্যামা বললে।

বউ? এমন অবিশ্বাস কেন আমার উপর? আর এসব

অসম্ভব কথা ভেবে বা তুমি এত কষ্ট পাচ্ছ কেন?

শ্যামা ম্লান হাসি হাসল: না, একটু ঠাট্টা করেছি কেবল।—যাও যাও, ভাতগুলো একেবারে জল হয়ে যাচ্ছে।

—বাবাকে মত করাবার ভার তোমার—সকালে কিন্তু আমার সময় হবে না। তোমার শরীর খারাপের কথা বললে উনি অমত করতে পারেন, তাকে তুমি বাঁচিয়ে বলো। আর আসবার সময় নতুন আসবাবের জন্যে জোসনা-টুপি-মোজা সবই আসবে—এবার মুখে হাসি ফুটলো তো?

দুদিন বলে দশের দিন পরে ফিরলো নিশিকান্ত; প্রচুর বই—প্রাইজের নানা জিনিষপত্র নিয়ে। শ্যামা নিশিকান্তের খালি হাতের দিকে তাকিয়ে দেখলে বই ছাড়া সেখানে আর কিছুই নেই। কাল্পনিক টুপি মোজা শহরের কোলাহলে বুদ্বুদের মত মিলিয়ে গেছে।

এর পর নিশিকান্ত প্রায়ই নানা কাজে কলকাতায় যাতায়াত করতে লাগলো।

কেন? অনু কৌতূহলে জিজ্ঞাসা করলো।

কেন? একটা ঢোক গিলে উমা বললে, হাঁ বলছি—সবই যখন বলছি আমার বলা কিছুই বাকী থাকবে না। মনের বোঝা আমি আর একা বইতে পারছি না। আজ একে লঘু করতেই হবে—না করলে আমি আর বাঁচবো না অনু আমি আর বাঁচবো না!—বলতে বলতেই হঠাৎ ঝর ঝর করে বাঁধ ভাঙা নদীর মত কেঁদে ফেললো উমা:

নিশিকান্তই আমার বাবা—তোমাদের কাকাবাবু। শ্যামা আমার মা। আমি কেবল এক মাসের তখন কলকাতা থেকে খবর এলো বাবা লুকিয়ে পূর্ব পরিচয় গোপন করে সেই বইয়ের দোকানের মালিকের মেয়েকেই হুমায়ুন আসে বিয়ে করে এসেছে। ওরাও কিছু জানে না—আমরা তো না—ই।

তারপর—? একটা মুক্তা বিন্দুর মত টলটল করতে লাগলো জলের বিন্দু অনুর চোখে।

কাপড়ের আঁচল দিয়ে চোখ মুছে উমা বললে, দাদু মারা গেলেন সেই শোকে। আর তোমাদের কাকাবাবু মাকে আর আমাকে গ্রামের বাড়ীতে ফেলে রেখে এক অন্ধকার অমাবস্যার রাতে শেয়ালের মত পালিয়ে এলেন কলকাতায়।

আর কোন খবর নিলেন না কখনও? অনু বললে।

না—কখনও না। তারপরের উপসংহার অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। তোমাদের কাকাবাবুর এই হোটেলের খবর পেয়ে আমি মার অমতেই এখানে এসে উঠলাম, আর মা রইলেন বড়মাসীমার কাছে।

তোমাদের কাকাবাবুর সংগে আমার কনট্রাক্ট হলো আমি আমার পরিচয় দেব না কখনও—একটু বাঁকা হাসি মুখে ফুটে উঠলো উমার, তোমাদের সংগে আমাকে চিনেও কাকাবাবু বলে ডাকতে হয় নইলে—

নইলে তিনি আমাকে এক মুহূর্তও স্থান দেবেন না। তবে ঘাটাতে ভয় পান—জানো,—সম্মান, আইন সব কিছুকেই ভয় পান, কারণ এভাবে বিয়ে করা আইন বিরুদ্ধ।

কাকাবাবু তোমার বাবা?—অনু দপ করে জ্বলে উঠলো।

আর সংগে সংগে খোলা দরজায় একটা দীর্ঘ ছায়া পড়লো। সুরঞ্জন দাঁড়িয়ে আছে।

সুরঞ্জনকে দেখেই উমা চুপ করে গেল।

একটু অপ্রস্তুত হয়ে সুরঞ্জন বললে, বড় অসময়ে এসে পড়েছি। আপনাদের ডিস্টার্ব করলাম।

অনুর বিকৃত মুখের দিকে একবার তাকিয়ে উমা একটু হেসে বললো—বসুন, বসুন ডিসটার্ব কী? এই এই একটু গল্প করছিলাম বৈ তো নয়।

কিন্তু আমার একটু অনুর সংগে দরকার ছিল যে, সুরঞ্জন বললে।

উমা চট করে উঠে দাঁড়ালো, তাহলে আমি যাই অনু। একটু চাপা হাসিও যেন দেখা গেল ওর ঠোঁটের কোণায়। হয়তো অনু বলতে চাইছিল, "তুমিও থাকো না ক্ষতি কি", কিন্তু বলবার আগেই দেখলো উমা ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে।

সুরঞ্জন তখন দরজা দিয়ে ভিতরে এসে ঢুকেছে। নির্জনে এই কোণার ঘরটিতে এমনিভাবে একা মুখোমুখি দাঁড়াতে অনুর কেমন কুণ্ঠা বোধ হলো। চকিতে মনে হলো ব্যাপারটা আর কারু চোখে পড়লে হয় এর কোন রকম অর্থও দাঁড়িয়ে যেতে পারে।

কিন্তু কিছু বলবার আগেই সুরঞ্জন একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে বিনা ভূমিকায় সুরু করে দিলো : একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসুন, অত্যন্ত জরুরী কতগুলো কথা আছে।

বলুন না, আমি এখান থেকেই শুনবো।—কোণের জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়ে অনু জবাব দিলে।

একটু এগিয়ে আসুন। এমন কিছু কথা আছে, যা চেঁচিয়ে বলতে চাই না। —একটু হেসে চারদিকে একটা বাঁকা দৃষ্টি মেলে দিয়ে বললে—এ বাড়ীর দেওয়ালেরও তো কান আছে আপনি তো একথা ভালো করেই জানেন।

একটু এগিয়ে এসে একটা চেয়ারের হাতলে ভর দিয়ে অনু বললে, ব্যাপার কি বলুন তো। আমার বাড়ীর থেকে কোন দুঃসংবাদ পেলেন না তো? বরুণদার কোন খবর জানেন?

আপনি এ হোস্টেল ছেড়ে চলে যান অনুদেবী। দেরী করবেন না—সুরঞ্জনের মুখে চোখে চিন্তার ছায়া ঘনিয়ে এলো।

কেন বলুন তো? আপনার আজ কী হলো। কিছু ঘটেছে কি? কাকাবাবু কিছু বলেছেন? কী হলো বলুন তো? ভারী ভয় করছে আমার।

বিপদ কিছু নয়—তবে হতে কতক্ষণ? সে বিপদের মধ্যে আমি আপনাকে আর টানতে চাই না। আপনি অন্য হোস্টেলে চলে যান।—সুরঞ্জন বললো, আমাকেও দু-এক দিনের মধ্যেই এখান থেকে চলে যেতে হবে।

—বরুণদা না আসা পর্যন্ত আমাকে এখানে অপেক্ষা করতেই হবে। আপনি চলে গেলে অবশ্য আমি আর এখানে—বলতে বলতেই অনু থেমে গেল।

হ্যাঁ, আমিও আর আপনার এখানে থাকাটা উচিত মনে করি না।

সামনের খোলা জানালা দিয়ে এক মুঠো বসন্তের মিষ্টি বাতাস ঘরের মধ্যে আছড়ে পড়লো। বস্তীর মধ্যে কোথায় একটা অজস্র ফুলে ফুলে ছেয়ে যাওয়া গাছ হাওয়ায় দুলছিল, অন্ধকারে যেন তার একটা মৃদু আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। হঠাৎ আলোর ঝলক এক মুঠো নিম ফুলের মিষ্টি গন্ধ বয়ে নিয়ে এলো। কাদের খাঁচায় যেন বন্ধ একটা কোকিল প্রাণপণে কেবল চেঁচিয়ে মরছে—

খানিকক্ষণ বাইরের দিকে অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে থেকে অনু বললে, যেতে বলা তো খুব সোজা, কিন্তু যাওয়াটা আমার পক্ষে তত সোজা নয়। বিনা টাকায় তো কোন হোস্টেলে আমার থাকতে দেবে না। এতো টাকার যোগাড় এই দূর বিদেশে আমি কেমন করে করবো?

সেকথা আপনাকে ভাবতে হবে না—একটা মিষ্টি হাসির স্নিগ্ধতা ছড়ালো সুরঞ্জন।

আমার টাকা পয়সার কথা আমি ভাববো না, তো কে ভাববে?

এই ধরুন, আমি যদি ভাবি?—প্রসন্ন উদার হাসি হেসে সুরঞ্জন বললে।

কেন আপনি ভাবতে যাবেন? আর আপনার দেওয়া টাকাই বা আমি নিতে যাব কেন?—অনু শক্ত হয়ে দাঁড়ালো চেয়ারের হাতল ধরে।

সুরঞ্জন তবুও হাসছিল। বললে, আমি কি আপনার ওপর কোন দাবীই করতে পারি না?

কেন খামখা দাবী করতে যাবেন?

যদি দাবী সৃষ্টি করে নিই?—পরম নিশ্চিন্ত স্বরে সুরঞ্জন বললে।

অনুর হৃৎপিণ্ড থমকে দাঁড়ালো। রক্ত জমা হলো মুখের ওপর। পায়ের তলায় যেন দুলে উঠলো মেঝেটা।

জোর করে কি আমি দাবী সৃষ্টি করতে পারি না? সুরঞ্জন একটু কাছে এগিয়ে এলো।

মুহূর্তে অনুর মনে হলো সে যেন একটা অদ্ভুত অন্ধকারের মধ্যে পা দিতে চলেছে। সে অন্ধকারের যেমন আতঙ্ক, তেমনি আকর্ষণ। আর একটু অপেক্ষা করলে সে আর নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না। মনের ভেতরে যে দুর্বলতা তার তিলে তিলে সঞ্চিত হয়ে এসেছিল চোখের পলকে তা দীর্ণ হয়ে পড়বে। যেন অন্তিম চেষ্টায় নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনু বলে ফেললো—না, সে হয় না।

সুরঞ্জন নিভে গেল। তার চোখে মুখে এক সঙ্গে ব্যথা আর লজ্জার মিশ্র ছায়া ছড়িয়ে পড়লো। সুরঞ্জন বুঝতে পারলো, বরুণের বোন ভেবে—সাময়িক উত্তেজনায় সে অনেক বেশী এগিয়ে গেছে, অনেকখানি বেশী

অতিক্রম করে গেছে নিজের অধিকারের সীমা। যে জিনিষ আপনি আসে—তাকে কেউ জোর করে আদায় করে নিতে পারে না।

কয়েক মুহূর্তই দুজনে চুপ করে রইলো. ঘরখানা অস্বাভাবিক নীরবতা দিয়ে ঘিরে রইলো দুজনকে। এত সহজভাবে প্রত্যেক দিনের সহজ মেলামেশার যা এত স্বাভাবিক ছিল, মুহূর্তে তা কী করে এত জটিল হয়ে উঠলো সেই কথাই ভাবতে লাগলো অনু। কোন পরিচিতির পূর্বসূত্র কি সত্যিই আছে—আর থাকেই যদি তবে সুরঞ্জন তা স্পষ্ট করে বলে না কেন? একটা রোমাঞ্চকর হেঁয়ালী দিয়ে সবটাই যেন ঢেকে রাখতে চায় ও।

হঠাৎ যেন ভাবতে লাগলো অনু আর এক মুহূর্তও এ ঘরে নয়, এখুনি পালাতে হবে। হয়তো সুরঞ্জনও তাই ভাবছিল—

কিন্তু সমস্যার জটিল গ্রন্থি মোচন চলো পরক্ষণেই। দরজার ওপরে একটা কালো ছায়া এসে থমকে দাঁড়ালো যেন।

খুব অসময়ে এসে পড়েছি বোধ হয়!—তীব্র জ্বালা-ধরা একটা গলার আওয়াজ এলো—অভ্রুকণা এসে দাঁড়িয়েছে। চোখ দুটো জ্বলে জ্বলে করছে কুয়াশা কম্বুর মত। আর সঙ্গে সঙ্গে অনু অনুভব করলো, সে চোখ দুটো তাকেই গ্রাস করতে চায়।

শান্ত গম্ভীর চোখ তুলে সুরঞ্জন অভ্রুকণার দিকে চাইলো।

এসেই যখন পড়েছ, তখন সময়-অসময়ের প্রশ্ন আর ওঠে না।

একটু এদিকে এসো, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে—অভ্রুর গলায় মালিকের দাম্ভিকতা।

আমার এখন সময় নেই। চলুন অনুলেখা দেবী।

কক্ষনো না। আমার কথা না শুনে আমি তোমায় আজ কিছুতেই যেতে দেব না।

অপূর্ব একটা কোমল হাসি ছড়িয়ে পড়েছে অনুর চোখে মুখে—একটি অনাত্মীয়া নারীর সামনে এক মুহূর্তেই একটি অপূর্ব শুচিস্নিগ্ধতাকে যে আবিষ্কার করে ফেললো সুরঞ্জন। যাযাবরীর মত খানিকটা হেসে উঠে অনু বললে, আমি তবে যাই।

আপনি থাকুন, আমিই যাচ্ছি। চলো অভ্রু, দেখি তোমার কী চাই—

গাড়ী বারান্দাটা ঘুরে সামনের ড্রয়িংরুমটা পেরিয়ে অভ্রুকণা সিঁড়ির পাশের খালি ঘরটায় এসে দাঁড়ালো।

ব্যাপার কি বলো তো? তুমি কী বলতে চাও? সুরঞ্জনের গলায় তীব্র বিরক্তি ফুটে উঠলো।

খুব যে বিরক্ত হয়েছে দেখা যাচ্ছে—রসাভাসের বিঘ্ন ঘটালাম বুঝি? অভ্রুর ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসির রেখা ফুটে উঠলো।

দেখ অভ্রু, তোমার এত ভণিতা আমার ভালো লাগে না। অকারণে যাকে কথা আমি শুনবো না—যদি সত্যিই কিছু বলবার থাকে বলো, নইলে আমি চললাম।

সুরঞ্জন সিঁড়ির দিকে পা বাড়াতেই অভ্রুকণা ছুটে এসে পথ রোধ করলো: আহা, অত চটছো কেন? একটু ঠাট্টা বই তো নয়! কাজের কথা বলবো বলেই তো ডেকেছি। একটু স্থির হও, বলছি—অমন চটাচটি করলে কথা বলা যায়?—একগাল হেসে, যেন অভিনয় করছে এই ভাবে অভ্রু বললো, তুমি যে আমায় পড়াবে বলেছিলে, কই, পড়াও না তো একবারেই—গলার স্বরে আবদার জড়ানো ছিল ওর।

আর কী করে পড়াবো, বলো। ও তো আর বোতলে তৈরী করা ওষুধ নয় যে ঝাঁকিয়ে চক করে এক গাল গিলিয়ে দেব। পড়াশুনো গেলবার জিনিষ নয়। তবু আমি যথেষ্ট চেষ্টা করেছি, এবার তুমি নিজেই পড়ো। তোমাকে পড়ানো আমার সাধ্য নয়।

তার মানে, তুমি আমাকে আর পড়াবে না?—অভ্রুকণা নাগিনীর মত ক্রুদ্ধ দৃষ্টি মেলে ধরলো সুরঞ্জনের ওপর।

পড়াবো না সে কথা আমি কখনও বলিনি। তোমাকে সাহায্যও যথেষ্ট করেছি। কিন্তু তুমি কেবল ঘাই তুলবে আর তুড়ি দেবে সে তো আর হয় না—তুমি কিছুই করতে চাও না।

কিছুই করতে চাই না মানে? তোমায় আমাকে পড়াবার কথা ছিল, তুমি মোটেই পড়াতে চাও না—আমি কিছু বুঝতে পারি না?—অভ্রুকণার কথা দুলতে লাগলো।

আমি যথেষ্টই পড়িয়েছি। তোমার পড়াশুনায়

৬ কোন মন নেই। আর মন যে নেই তা তুমি নিজেও বেশ জানো। বার দুই টেন্টারমিডিয়েট ফেল করেছ—আর যে কতবার—

কথাটা থামিয়ে দিয়ে উত্তপ্ত গলায় অভ্র বললে: চাকরী নেবার সময় তো তুমি বাবাকে বেশ মিষ্টি মিষ্টি করে বলেছ যে আমায় পড়াবে, মনে আছে?—গলার আওয়াজে আবার মালিকানা ফুটে উঠলো।

এমন কোনো সর্ত ছিল বলে তো আমার মনে পড়ে না কখনও। তবে হয়তো মৌখিক অনুরোধ একটা থাকতে পারে ওঁর পক্ষ থেকে।

তার মানে, তুমি আমার পড়াশুনোর কোন দায়িত্বই করবে না?

এতদিন বহু চেষ্টা করেছি। এখন আমার নিজেরও বহু কাজ বেড়ে গেছে—আর সম্ভব নয়। কিন্তু তবু তো অসম্ভব সম্ভব করে চলেছি—যথাসাধ্য সাহায্য করছি বই কি।—সুরঞ্জন বিরক্ত কিন্তু শান্ত সুরে বললে: আর এ নিয়ে কথা কাটাকাটি করে কী হবে? তুমি নিজেই পড়ো, আমার আর সময় হবে না।

তা হবে কেন? ও মেয়েটাকে পড়াবার সময় তো হবে? অভ্রুকণার কথার ঘা দিয়ে একফলক বিষ বেরিয়ে এলো এবার।

কার কথা বলতে চাও? অনুর? ওকে তো আমি কখনও পড়াই না।

পড়াও না বটে, তবে গল্প তো চলে রাতদিন অফিসে বসে। তাতে তো খুব সময় হয়।—বাঁকা হয়ে দাঁড়ালো অভ্রুকণা

কী যে সব বাজে কথা বলছো তার ঠিক নেই। আমি কারুর সঙ্গেই গল্প করি না। আর যার কথা বলতে চাইছো তার সম্বন্ধে আমি কোন কথাই শুনতেও চাই না।—সুরঞ্জন চলে যেতে চাইলো, অভ্রুকণা আবার তার পথ আটকে দাঁড়ালো।

একটা কথা বলবো?—অভ্র কেঁদে ফেললো এবার।

নাটক না করে সোজা কথায় বলতে পারো না—কী চাও?—

সুরঞ্জন ফিরে দাঁড়ালো।

তুমি কি এত দিনেও বুঝতে পারো নি যে আমি কী চাই?—অভ্রুকণা কাঁদতে লাগলো।

দেখ অভ্র, তুমি শুধু শুধুই একটা গোলমাল বাধাবার চেষ্টা করছো।—এ সব আজে বাজে ভাবনা ছেড়ে দিয়ে পড়াশুনোয় মন দাও যে, তাতে তোমার ভালোই হবে।

আমার পড়াশুনো করতে একটু ভালো লাগে না।

সুরঞ্জনের চোখ মুখের রেখা শক্ত হয়ে গেল।

কিন্তু আপাততঃ তোমাকে এ ছাড়া আমার আর কিছুই বলবার নেই। আমি জানি তুমি কী চাও। অথচ এ কথা তুমিও জান না যে নিজের পড়াশুনো শেষ না করে আর কোন কথা ভাববার মত বিলাসিতা আমার নেই। এম-এ পাশ করে একটা চাকরী না জোটানো পর্যন্ত আমি তোমাকে কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারবো না।

অভ্রুকণা ফেঁপে উঠলো: শুধু আমার বেলাতেই তুমি কোন কথা দিতে পারো না। কিন্তু ওই পাড়াগেঁয়ে কালো মেয়েটার সম্বন্ধে তো কোন দুশ্চিন্তার আর শেষ নেই।

চকিতের জন্য সুরঞ্জনের গালে লালের আভা পড়লো। কিন্তু সে ক্ষণিকের দুর্বলতা। তার পরক্ষণেই তীব্র ক্রোধ ঝলক দিয়ে উঠলো ওর চোখে মুখে। নিজেকে একটু সংযত করে নিয়ে বললে: কেবল পাড়াগেঁয়ে কালো মেয়েটি কেন, এই হোস্টেলের প্রত্যেকটি মেয়ের সম্বন্ধেই আমার সমান সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়েছে। আমার চাকরীর এইটেই প্রধান অঙ্গ কিনা।

অভ্রুকণা ততক্ষণ চোখের জল মুছে ফেলেছে। তীব্র ব্যঙ্গের হাসি হেসে সে বললে: অঙ্গের চাইতে প্রত্যঙ্গটা একটু বেশী দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে—তাই তোমাকে বলতে হলো।

সুরঞ্জনের চোখ দুটো ঘৃণায় আবার দপদপ করে উঠলো। বললে: কথা বলবার আর্ট-টা খুব ভালোই আয়ত্ত করেছ অভ্র, কিন্তু ওতে আমাকে বিঁধতে পারবে না। যাই হোক, তোমার বক্তব্য যদি শেষ হয়ে থাকে তাহলে আমি যেতে পারি।

সুরঞ্জন পেছন ফিরতে যাচ্ছিল কিন্তু হঠাৎ অভ্রুকণা পেছন থেকে বাঘের মত তার পাঞ্জাবীর প্রান্ত আঁকড়ে ধরলো।

বিব্রত হয়ে সুরঞ্জন বললে: কী করবো, ছেড়ে দাও।

না এতো সহজেই তোমাকে ছাড়বো না। আমি একটা হেস্তনেস্ত করে ছাড়বো। আজ তোমার কাছে একটা স্পষ্ট জবাব চাই—বলো, এনগেজমেন্টটা করে রাখবো।

সুরঞ্জনের সমস্ত মুখে এক সঙ্গে হতাশা আর আতঙ্ক ফুটে উঠলো। অদ্ভুত উদ্ভ্রান্ত দেখাচ্ছে অভ্রকণার চেহারাটা। এই মুহূর্তে সে যে-কোনো একটা গণ্ডগোল বাধিয়ে বসতে পারে। সুরঞ্জন আস্তে আস্তে বললে, বলেছি তো এম.এ পাশ করবার আগে আমি কোন কথাই ভাবতে রাজি নই। একটা চাকরী-টাকরী না পাওয়া পর্যন্ত—

বাধা দিয়ে অভ্রকণা বললো: তোমার চাকরীর কী দরকার? তোমার বাবা লক্ষ্ণৌ সহরের এত বড় বিখ্যাত অ্যাড্‌ভোকেট। তুমি তাঁর একমাত্র ছেলে। সমস্ত জীবন যদি তুমি চাকরী নাই করো তাতেই বা তোমার কি যায় আসে।

আসে যায় না কিছুই, কেবল সুরঞ্জন ব্যানার্জির আত্ম-মর্যাদায় বাধে।

অভ্রকণা তীক্ষ্ণস্বরে বললে: এ সব শুধু তোমার আমাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা। আচ্ছা বেশ, তুমি এনগেজমেন্টটা করে রাখো, আমি না হয় দেড় বছর অপেক্ষাই করবো।

এর পরে সুরঞ্জন হয়তো বলতে পারতো: আচ্ছা ভেবে দেখি। হয়তো বলতে পারতো: আমাকে আরো দুচার দিন সময় দাও।—কিন্তু অভ্রকণার অসহ্য প্রবলতা তাকে উত্যক্ত করে তুলেছিল। যেন একটা অত্যন্ত কঠিন মর্মঘাতী কথা বলতে চাইছিল, কিন্তু কিছুতেই বলতে পারছিল না। তাছাড়াও তার মনের কোথায় একটা অত্যন্ত সুকোমল জায়গাতে খানিকটা তীব্র আঘাত করেছিল অভ্র কণা—যার জন্যে সুরঞ্জনের মত সহিষ্ণু ভদ্রলোকও অত্যন্ত কঠিন হয়ে গেল। ধীরে ধীরে সুরঞ্জন বললে: অপেক্ষা তুমি করতে পারো, সে তোমার দায়িত্ব। কিন্তু আমার দিক থেকে কোন প্রতিশ্রুতিই আমি তোমাকে দিতে পারবো না।

তবে মিছিমিছি অপেক্ষা করতে বলছো কেন!

বলছি এই জন্যে যে আপাততঃ তোমার হাত থেকে আমার নিস্তার পাওয়ার অত্যন্ত দরকার। আর তাছাড়া দুবছর পরেই দীর্ঘ সময়, আশা করা যায় হয়তো ক্রমশঃ আমি খানিকটা সহ্য করতে পারবো। হয়তো মনে হবে যে—তোমাকে বিয়ে করাটা পৃথিবীতে সব চেয়ে কঠিন কাজ নাও হতে পারে।—এমন অসম্ভব নিষ্ঠুরতার সঙ্গে সুরঞ্জন কথাগুলো উচ্চারণ করলো যে, কথাটা শেষ হয়ে গেলে সে নিজেই থমকে গেল।

আর থমকে গেল অভ্রকণাও। খানিকক্ষণের জন্যেই। তারপর হঠাৎ যেন ওর সমস্ত মুখের রক্ত সরে গিয়ে শ্বেত পাথরের মত সাদা হয়ে গেল। সারা শরীর আড়ষ্ট হয়ে গেল—আর যে হাতটা এতক্ষণ সুরঞ্জনের পাঞ্জাবীর কোণা ছুঁয়ে ছিল সেটা ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে খসে পড়লো। কয়েক মুহূর্ত বজ্রস্তব্ধ মেঘের মত কেটে গেল, তারপর একটা অদ্ভুত কাণ্ড করলো অভ্রকণা। বিকারের রোগীর মত একটা উন্মত্ত আক্রোশ জেগে উঠলো তার শরীরে। সামনেই টেবিলের ওপরে একটা কাঁচের পেপার ওয়েট ছিল, সেইটে তুলে নিয়ে সজোরে ছুঁড়ে মারলো সুরঞ্জনের কপালের ওপর। অসহ্য যন্ত্রণায় আর অসহ্য বিস্ময়ে কপালটা চেপে ধরে মেজের ওপর বসে পড়লো সুরঞ্জন। একটা কথাও বলতে পারলো না সুরঞ্জন না, কেবল হাতের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে নামতে লাগলো লাল রক্তের ধারা।

আর সেই সময়ে হোটেলের বাইরে একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল—অনুর দাদা বরুণবাবু এসে পৌঁছলেন এই মাত্র।

। আট ।

ট্যাক্সি থেকে নামলেন অনুর দাদা বরুণ রায়। আপন দাদা নন, পিসতুতো ভাই। বড়ো চাকুরে, বিদেশে থাকেন। ছুটিছাটায় মাঝে মাঝে আসেন, ভারী স্নেহ করেন তাঁর এই বোনটিকে। লম্বা ছিপ ছিপে গড়ন। পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে তার থেকে ঠিকানাটা মিলিয়ে নিয়ে আধখানা খাওয়া সিগারেটটা জুতোর তলায় চেপে হোটেলের দরজায় এসে দাঁড়ালেন।

কাকে চাই?—

আমি অনুলেখার দাদা। তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

ভেতর আসুন—দারোয়ান ভিজিটার্সের ঘরটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে বললে, বসুন—এই স্লেটে আপনার নাম ঠিকানা, আর যার সঙ্গে দেখা করতে চান তার নাম লিখে দিন, আমি বাবুর কাছে লিখিয়ে লিপিসহিকে ডেকে দিচ্ছি।

স্লেটটার সঙ্গে ঝোলানো মলমল সুতোর বাঁধা পেনসিল দিয়ে বরুণবাবু নিজের নাম আর অনুর নাম লিখে দিলেন।

লাইব্রেরীর খোলা জানালার কাছে বসে অনু পড়ছিল। কিন্তু সট এর পাতা থেকে মন কখন যে পালিয়ে গেছে আকাশের সীমানা ছাড়িয়ে তারও ঠিক নেই। মনের রুদ্ধ উচ্ছ্বাসে চোখের জলের ধারা যেন ঝরা হয়ে গালে গালে পড়ছে।

আজ সকালে সীমার জীবনের চরম নাটকের শেষ দৃশ্য অভিনীত হয়ে গেছে। হাত তালি দিতে যারা এসেছিল হেসে ফিরে গেছে। ছোট ছোট বালা পরা হাতের মুঠি শেষ পর্যন্ত ওর মুঠে ছিল—চোখ ভরা কাজল একটুও মোছে নি—মুখ ভরা পুরের মিষ্টি গন্ধ আর মুখ ভরা হাসি নিয়ে সে চলে গেল—যেমন নিঃশব্দে এসেছিল তেমনি। শুধু এক মুহূর্তের জন্য সীমাকে অনুর চোখে দেখাচ্ছিল, ওর মাথার কাছে রহিম বসে আর ঘরে ঝুমিটা থেকে পাগলের মত ওকে বুকের ভেতর চেপে ধরে আকাশে বার বার আশ্রয় খুঁজছিল।

সব চুকে-বুকে গেল যখন, তখন উষা লক্ষ্য করেছিল বিছানার উপর চুপ করে পড়ে থাকা মেয়ে সুধা কাল বৈশাখীর মত উদ্দাম হয়ে কাঁদছিল। আর মাঝে মাঝে পাথর-চাপা বুকটার হাত রেখে ডাকছিল, মা—মা—

কাকীমা একটা মুখ ঝামটা দিয়ে বললে, যত সব পাগলের কাণ্ড। তখনি বলেছিলাম এ সব বাজে মার্কা মেয়ে দিয়ে ক্লিনিকের কাজ চলবে না তবু জেদ ধরে ওকে রাখা হলো। ওর কান্না দেখলেও আমার রাগ হয়। কার ছেলে মোলো—আর কে কেঁদে মরছে—! যত সব—

অনুর আর সহ্য হলো না। উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই উষা বললে, কাঁদতেও বাধা আছে নাকি? চাকরী করবার সময় বোধ হয় ওর এই সব কনডিশান ছিল?

তোমার বড় মুখ উষা—একটু সংযত হয়ে কথা বলো।

আপনিও মনে রাখবেন আমি ক্লিনিকের কর্মী নই আর সেবাও আপনার চাকর নয়। নিষ্ঠুরতারও যে একটা সীমা আছে—আপনি যে মা—এ কথা বিশ্বাস করতে আমার প্রবৃত্তি হয় না—বলেই ঘরে ঘরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল—

দিদিমণি—? দারোয়ান একখানা স্লেট এনে ধরতেই 'বাড়ির পথে বিবাগী ছিয়া' এক মুহূর্তেই লাফিয়ে উঠলো. এক ছুটে একেবারে নীচে নেমে এলো।

কখন এলে বরুণদা? প্রণাম করে অনু জিজ্ঞাসা করলো।

আজই সকালে গাড়ী থেকে নেমেছি। তোর সঙ্গেই সবার আগে দেখা করতে এলাম, কেমন আছিস বল। পড়াশুনা কেমন চলছে।

ভালো। কিন্তু এখানে থাকতে পারছিনা বরুণদা। তুমি যদি তখন পশ্চিমে না থাকতে, তাহলে এই নরকে আমায় আসতে হতো না। তুমি আমাকে অন্য কোনো হোস্টেলে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করো। বলতে বলতে অনু কেঁদে ফেললো: আমাকে এখান থেকে যে কোরেই হোক অন্য জায়গায় নিয়ে যাও। এখানে কোন মানুষ থাকতে পারে না।

বরুণ ধীরে ধীরে অনুর মাথায় সস্নেহে হাত বুলাতে লাগলেন।

তোর একটা ব্যবস্থা করতেই তো আমি এখানে এসেছি। জলপাইগুড়িতে ফিরে মামীমার কাছে তোর চিঠি দেখলাম। মনটা তখন থেকেই খারাপ ছিল। তখুনি তোকে লিখলাম, আমি আসছি কলকাতায়। দু একটা হোস্টেলও দেখলাম। মন্দ নয়—এরই মধ্যে একটা তোর জন্যে ঠিক করে দেব, কোন চিন্তা নেই তোর। হরতকী বাগান লেনে একটা দেখে এসেছি, সেটা শুধু কলেজের মেয়েদের জন্যেই। সেইটেই ঠিক করে দেব তোর জন্যে।

তাই দিও। আমার আর এক মুহূর্তও এখানে থাকতে ইচ্ছে করছে না। আমাকে কালই এখান থেকে সরাবার ব্যবস্থা করো।

এত ব্যস্ত কেন, তাই হবে। সকাল এই ঘর, এগারো

বারোটায় আমি আসবো। তুই তৈরী হয়ে থাকিস যেন, আমি তোকে নিয়ে একেবারে নতুন হোস্টেলে রেখে আসবো—ভালো কথা, তোদের এখানে খাওয়া দাওয়া হয় কটায়?

অনু দিন দশটায় হয়, কাল রবিবার কিনা একটু দেরীও হতে পারে। তুমি বারোটায় এসো, আমি ঠিক হয়ে থাকবো।

বেশ, তাই হবে।

তুমি কিন্তু যাবার সময় অবশ্যই কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা করে সব কথা ভালো করে বলে যেও। তা নইলে যাবার সময় ঠিক গণ্ডগোল করবেন। ভদ্র পোশাকের ওপর এমন ভয়ঙ্কর লোক আমি কখনো দেখিনি।

থাক ও সব কথা। তুই তো আর এখানে থাকছিস না—চলেই যখন যাবি, তখন আর কথা বাড়িয়ে কি হবে। —বলে হাতের আধ পোড়া সিগারেটটা জুতোর তলায় পিষে ফেলল।

পাশ দিয়ে বীথি দৌড়ে গেল। একবার যেন ভিজিটারস্ রুমের দরজার দাঁড়িয়ে চোখ বড় বড় করে কী যেন বলতে চাইলো অনুকে। কিন্তু অনু তখন দাদার সঙ্গে কথা বলছিল তাই হাত তুলে বললো : পরে পরে হবে।

জানো দাদা, ওই যে মেয়েটিকে দেখলে—ওর নাম বীথি। ও আমাকে খুব ভালোবাসে। ওর টিফিন থেকে দুবেলা আমাকে খাওয়ায়। সব সময় আমাকে দেখে, পরামর্শ দেয়। ও বহুদিন এখানে আছে কিনা এদের সব খবর ও জানে। পরশু হয়েছিল কী জান? সন্ধ্যের সময় একটি মেয়ে এলো বাক্স বিছানা নিয়ে। আমরা মনে করেছি নতুন বোর্ডার এল বুঝি কেউ। কিন্তু বীথির তীক্ষ্ণ বুদ্ধি—একটু কথাবার্তার পরেই যেন কী করে বুঝতে পেরেছে এর মধ্যে গোলমাল আছে কিছু। রাতের বেলা বীথি কাকাবাবুকে জানিয়ে দিল যে ও পড়তে আসেনি, বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে। কিন্তু কাকাবাবু সে কথা শুনে বললেন, তুমি নিজের চরকায় তেল দাও গে, বোর্ডিং-এর সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট তুমি নও, আমি। যা করবার আমিই করবো। তুমি নিজের অধিকারের সীমা পেরিয়ে যাচ্ছ—আমি তোমাকে সতর্ক করে দিলাম।

তারপর? মেয়েটির অবস্থা কী হলো?

কী আর হবে—হুইল। বীথি বলল, কাকাবাবু অমনিই। টাকার জন্যে সব করতে পারেন। হয় তো ওদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ওদের কাছ থেকে উনি তিনগুণ চার্জ আদায় করবেন, কিন্তু রসিদের বেলায় বড় কড়া। রসিদে ও সবের কোন উল্লেখ না থাকলেই হলো।

সে কি! আমি তো এ সব ভাবতেও পারি না। এমন বোর্ডিং ও আছে?

অনু হাসল, এখানে আমি আসবার আগে আমারই সীটে একটি মেয়ে বলে মেয়ে থাকতো। তার গল্প আমি বীথির মুখে শুনেছি। ওর স্বামী ডাক্তার, আর ও নার্স ছিল। স্বামী ওকে বিয়ে করে বাড়িতে নিয়ে যায়। কিন্তু ভদ্রলোক আসলে আধ-পাগল আর সন্দেহ বাতিক-গ্রস্ত। শেষে ওকে এত মেরেছে যে হাত পা ভেঙ্গে দিয়েছে। তিন দিন একটা ঘরে বন্ধ করে রেখেছিল তারপর এক ভদ্রলোক খবর পেয়ে ওকে বের করে আনে, সুস্থ করে এই বোর্ডিং-এ নিয়ে আসে। ওর স্বামী যেন কি করে খোঁজ পায়—শেষে কী কাণ্ড। কিন্তু জানো, আমাদের এখানে এক ভদ্রলোক আছেন।—বলতে গিয়েই অনুর গাল দুটো লাল হয়ে এলো। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে লাগলো : তিনিই শেষে ভদ্র মহিলাকে এখান থেকে সরিয়ে দেন। মেয়েটিও বাঁচলো—সবাই বলেছিল, স্বামীর হাত থেকে কাকাবাবুর হাতে এসে পড়েছে—গরম কড়াই থেকে একেবারে আগুনে। ভদ্রলোকটির সহৃদয়তায় মেয়েটি রক্ষা পেলো।

বরুণ বললে, থাক, থাক, এতেই যথেষ্ট আর তোমাকে সুসমাচার শোনাতে হবে না।

হোস্টেলের দারোয়ান এসে একটুকরা কাগজ অনুর হাতে দিল। তাতে লেখা যাবার সময় যেন বরুণবাবু কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা করে যান। পরে আবার বিশেষ দিয়ে বলেছেন, ভুল যেন না হয়, তাঁর বিশেষ জরুরী কথা আছে।

দারোয়ান বেরিয়ে যেতেই দুটি মেয়ে ভিজিটারস্ রুমের পাশ দিয়ে হেঁটে গেল। যাবার সময় হাত নেড়ে তারাও অনুকে যেন কী গুরুতর কথা বলতে চাইলো।

অনুর কেমন একটা খটকা লাগলো। হয় তো কোন সাংঘাতিক ঘটনা ঘটেছে হোস্টেলে, তার জন্যেই, তাই এত চাঞ্চল্য হোস্টেলের মধ্যে।

আমার সঙ্গে একটু বেড়াতে যাবি?—তোর মনটা দেখছি ভালো নেই।

না বরুণদা, কালই যদি যেতে হয় তবে সব গোছ গাছ করে নিতে হবে তো আজই। এখন আর বেড়াতে গেলে চলবে না।

বেশ তুই তা হলে রেডি হয়ে থাকিস, আমি গাড়ি নিয়েই একেবারে আসবো।

বরুণবাবু উঠতে গিয়েই বললেন, ওহো, তোদের পরমারাধ্য কাকাবাবুর সংগে দেখা করে আসি গিয়ে। কি বাণী তিনি দান করেন দেখি।

দাদাকে প্রণাম করে ওপর তলায় উঠতেই চারিদিক থেকে মেয়েরা এসে ছেঁকে ধরলো তাকে, জানিস আজ কী সাংঘাতিক একটা কাণ্ড ঘটে গেছে।

অনুর বুকের মধ্যে যেন ধর ধর করে কেঁপে উঠলো। সে আর এগোতে পারলো না। রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে পড়লো।

অশ্রুকণাটা একটা ভাইনী—কী হয়েছিল জানি না, সুরঞ্জনবাবুকে একটা পেপারওয়েট দিয়ে এমন জোরে মেরেছে যে তার কপাল কেটে রক্তারক্তি হয়ে গেছে।

উঃ—বলে অনু সজোরে নিজের মুখ ঢাকলো।

মেয়েটি আবার বললো, তিনি আর এক মুহূর্তও দাঁড়ালেন না। কপালের কিনকি দিয়ে ওঠা রক্তের স্রোত পকেট থেকে রুমাল বের করে চেপে ধরে বেরিয়ে গেলেন। কাকাবাবু আর কাকীমা আবার সুরঞ্জনবাবুর সংগে ঝগড়া লাগিয়েছেন কেন জানি না। সকাল থেকে তিন-জনে কাকের মত সুরঞ্জনবাবুর সংগে কচকচ করছে, তারপর তো ওই ভাইনীটার কী হলো ও তো ভদ্রলোককে মেরেই বসলো—খুন করবারই মতলব ছিল বোধ হয়। ভদ্রলোক অল্পের থেকে বেঁচে গেছেন। যাবার সময় বলে গেলেন আর এই পাপপুরে ফিরবেন না।

আর ফিরবেনই বা কেন? ভদ্রলোকের ছেলে অমন খুনেদের কাছে কি করতে ফিরবেন? চাকরী করতে এসেছেন, প্রাণ তো খোয়াতে পারেন না—। হাসি বললে।

অনুর আর কোন কথা কানে গেল না। সমস্ত শরীরে যেন কেমন একটা অবশ করার প্রবাহ খেলে গেল। আঘাতটা যেন তারই কপালে লেগেছে এমনি একটা আর্তনাদ করে সে নিজের ঘরে ছুটে এসে বিছানায় কাঁদার ভারে এলিয়ে পড়লো। কালই তার যাবার দিন। বরুণদাও এসে গেছেন তাকে নিতে। এখান থেকে পরিত্রাণের কথা কতবার ভেবেছে সে কিন্তু যাবার দিন যখন সত্যিই ঘনিয়ে এলো তখন সত্যিই সুরঞ্জনের সংগে তার একবারও দেখা হবে না একথা সে ভাবতেও পারে না। কিছুতেই যেন বিশ্বাস করতে পারছে না এমন ভাবে একটা কথাও না বলে, একবার চোখের দেখাও না দেখে, সুরঞ্জনকে একটা ঠিকানাও না দিয়ে, তাকে চলে যেতে হবে।

(ক্রমশ)

আশ্চর্য মানুষের মন।

আজ ছয়মাস হয়ে গেছে অনু এই হোস্টেলে এসেছে। সবই ওর এখনকার খারাপ লেগেছে। প্রতি মুহূর্তে কামনা করেছে সে এখান থেকে চলে যাবে। এখানে মানুষ থাকতে পারে না। তবু দীপুর সংগে পরিচয় হয়েছে—সে তাকে ছোট বোনের মত আশ্রয় দিয়েছে, সুরঞ্জন অযাচিত দাক্ষিণ্যের আকর্ষণে তাকে জড়িয়ে ধরেছে পাকে পাকে। সে কখনও কল্পনাও করতে পারেনি এমনি করে আবার কখনও চোখের জল আদরে হোস্টেলের জন্যে।

অথচ, কি অপরূপ এই হোস্টেল।

বিরাট একটা স্কুলবাড়ী, এগারটায় ক্লাস বসে। তখন যেন সমস্ত স্কুলবাড়ীটা গম গম করে। আর বোর্ডিংএর মেয়েরা—যারা কলেজের ছাত্রী নয়—তারা তখন ছাদে, নয় এগারটাকার ঘরে বেদেদের মত ঘুরে বেড়ায়। অনু যেদিন কলেজ থাকে, ও বেঁচে যায়। নইলে ছাদের এক কোণায় যেখানে নিমের গাছটা আছে সেখানে সঙ্গে বসে ভপ্ত বাতাসে উড়ে আসা নিমফুলের গন্ধে নিজের বাড়ীর স্বপ্ন দেখে, নইলে দেখে পাশের বাড়ীর মোটা গিন্নীর বাঁচি দিয়ে ঘর-বানানো কাকের বাসায় কাকের ছেড়ে বাচ্চাটা ম্যা ম্যা করে ডাকছে। ওর মুখের ভেতরটায় যেন কেমন লাল লাল দেখাচ্ছে, এখনও বাচ্চা আছে—বড় কাকের সমস্ত পরভানীগুলো এখনও আয়ত্ত করতে পারেনি।

বেলা গড়িয়ে যায়, কাচের মত চকচকে রোদে পোড়া আকাশের রং বদলায়, রোদের তাপ কমে আসে—চায়টে বাজে। স্কুলের ঘণ্টা পড়ে, ছুটি হয়। নীড়হারা পাখিরা যথাস্থানে ফিরে আসে আবার সেই অদ্ভুত পর্য্যায় রচনা চলে মেসেদের।

বেঞ্চি জোড়া দিয়ে দিয়ে—কেউবা টেবিল জুড়ে।

প্রথম প্রথম অনুর ভারি খারাপ লাগতো। তার চাইতেও বিচিত্র লাগত এখানকার খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা।

একটু দূরের একটা বাড়ী ছিল, সেটাতে রান্না হতো। এখানে স্কুল ছিল বলে রান্নার ব্যবস্থাটা ওঁরা ও বাড়ীতেই করেছিলেন। আর খাবার আনতো ভীম বলে একটা ছোট্ট দুর্বল ঠাকুর।

সে দৃশ্য ছিল অদ্ভুত।

অনু একবার দেখেছিল পুরীতে জগন্নাথের রান্না—হাঁড়ির ওপর হাঁড়ি। ঠিক তেমনি করে আসতে থাকে পর পর তিন জন। কখনও কখনও আসে দাদু—কোনো বৃদ্ধ ব্যক্তি নয়—হোস্টেলের কি। মাথায় হাত দিয়ে হন হন করে।

সেদিনই রাতে মজা। দাদুর সংগে ভীমের যে কী একটা আভ্যন্তরীণ বিরোধ আছে কেউ জানে না। ওকে দেখলেই বলে, যা সেক্রেণ্ডরের কাছে যা—এখানে কেন? সেক্রেণ্ডর মানে শ্রীকান্ত—হোস্টেলের চাকর।

দাদুও ছাড়ে না, বলে ওর খাইপিস হয়েছে, ওর কাছে যাবনুনি?

যাবি না কেনে—

না, যাবুনি।

তবে আমাকে আর বেলা বকাস নে। চ্যাকাও দেব না—আমার সংগে আর কথাও কবনি। চুরি করে খাওয়াবার বেলা সেক্রেণ্ডর আর ওর অসুখের ওষুধ আনার জন্যে আমি। এত বোকা আমায় পাস নি তুই!

দে-না একটু অষুধ এনে—আমি তোর মশলা করে দেব, কাপড় কেচে দেব—রাতে পা টিপে দেব বলেই ক্যাক্‌করে এক গাল হেসে ফেলে দাদু।

বাটকেঃ বাকী অংশ বোঝা যায় না—তবে এইটেই টুকরো টুকরো হয়ে নানাভাবে কানে আসে।

যাই হোক, হাঁড়িতে করে খাবার আসে। পথে ছেলের দল চেঁচিয়ে ওঠে: চলল জয়নগরের মোয়া—সস্তায় যাচ্ছে—দিয়ে যান—দিয়ে যান—

দাদু সিংহিনীর মতো গর্জন করে: আ···মর—মুখে আগুন

আর সেই হাঁড়িতে কী থাকে? ফ্যান মেশানো ডাল, অদৃশ্যপ্রায় মাছের তরল্পিত ঝোল, সুন্দরবন উজাড় করা এক তরকারী—তাতে দু-একটা আকস্মিক জীব-জন্তুর মতো কখনো কুচো চিংড়ি।

ভাত ফুরিয়ে গেলে আবার ওবাড়ী থেকে আনতে পনের মিনিট। তার আগেই অধিকাংশ মেয়ে থালা ছেড়ে উঠে যায়—কেবল দু-একজন কিছুতে হাল ছাড়ে না। তাদের মধ্যে হাবা মেয়ে দুধা একজন।

এই হোস্টেল। আর এরই লাভ থেকে বালীগঞ্জে বাড়ী তৈরী হচ্ছে কাকাবাবুর।

তবু মুক্তির সময় এর বন্ধনও যে বুকে এমন টনটন করে বাজতে থাকবে—অনু কি তা বুঝতে পেরেছিল কোনোদিন।

॥ দশ ॥

কাকাবাবু বক্র দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিলেন অশ্রু কণার দিকে। অশ্রু কণা কথা বলছিল না, কেবল টেবিলের ওপরে ঝুঁকে পড়ে রুমাল দিয়ে নাক চোখ মুছে ফেলছিল আর বেজায় জোরে জোরে ফোঁস ফোঁস করে আওয়াজ করছিল, অর্থাৎ কাঁদছিল। কাকীমা সতর্ক দৃষ্টিতে নিঃশব্দে মাস্তানীর মত সমস্ত ব্যাপারটাকে যেন উপলব্ধি করতে চাইছিলেন।

প্রচণ্ড একটা ধাক্কার ভিতর খুলে কাকাবাবু প্রায় আধ আউন্সের মত নাস্য সজোরে নিজের নাকের মধ্যে চালান করিয়ে দিলেন হুঁত বেগে। তারপর মেঘমন্দ্র স্বরে বললেন, একটু ধৈর্য নেই? মা, যে কাণ্ডটা করে বসলে তার ফলটা ভেবে দেখেছ?

অশ্রুকণা শ্লেষ্মা ধরা গলায় হাউ হাউ করে যেন কী বললো ঠিক বোঝা গেল না। কাকীমা এতক্ষণ যেন বেড়ালের মাছ পাহারায় লিপ্ত ছিলেন, এবার সমস্ত ব্যাপারটার গুরুত্ব উপলব্ধি করে মেয়ের পক্ষ নিলেন। বললেন: ছেলে মানুষ, রাগের মাথায় হঠাৎ একটা কাণ্ড করে—

গর্জন করে কাকাবাবু স্ত্রীকে থামিয়ে দিলেন : ছেলে মানুষ ? লোকের কাছে কুড়ি বছর বললে কী হয়, মেয়ের তো আসলে চব্বিশ বছর পেরিয়ে গেছে। এখনও খুকি। একেবারে দুধ-পোষা যে ইঁট পাটকেল মেরে লোকের মাথা ভেঙে দেবে ? এখন যদি সুরঞ্জন পুলিশ কেস্ করে তাহলে মুখ দেখাবে কী করে, শুনি ?

এবার কাকীমা চটে গিয়ে নিজমূর্তি ধারণ করলেন : হুঁ—পুলিশ কেস্ করবে। নিজের কেলেঙ্কারীর ভয় নেই ওর ?

কাকাবাবু বললেন : হুঁ, সেইটেই ভরসা—তোমাদের কেলেঙ্কারীর ভয় না থাকলেও তার আছে : কারণ, তার শিক্ষা-দীক্ষা অন্য রকম।

কাকীমার মুখ কালো হয়ে গেল। কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে এক বার যেন তিনি দুই চোখ দিয়ে আগুন বৃষ্টি করলেন : তার মানে, তুমি কী বলতে চাও ? —রণ দামামা শুনে যেন যুদ্ধের ঘোড়ার পায়ে শব্দের তরঙ্গ উঠলো : তুমি বলতে চাও সবারই শিক্ষা-দীক্ষা আছে, আর আমার মেয়ের সেটা নেই ?

কাকাবাবুর মুখের রং যেন জবাফুলের মত লাল হলো। বললেন : নেই যে সে কথা কী নূতন করে বলতে হবে আবার ? যার কাছ থেকে যে রকম ট্রেনিং পেয়েছে, তাতে—

এবার কাকীমার মুখ খোলার পালা। তীব্র ব্যঙ্গের সুরে কাকীমা বললেন : তুমি আমার ট্রেনিং এর দোষ দিচ্ছ ? বলতে তোমার লজ্জা করে না ? চিপোক্রিট কোথাকার, নিজের কথা কখনও ভেবে দেখ না ? এই হোস্টেলের নামে তুমি কিসের কারবার ফেঁদে বসেছ শুনি ? আমাকে খাটিও না—সব ফাঁস করে দেব। আমার তখনই বোঝা উচিত ছিল যে বিবাহিত হয়েও যে লোক মিথ্যা কথা বলে আর এক জনকে বিয়ে করে—

জোকের মুখে নুন পড়লো যেন। মুহূর্তে কাকাবাবু যেন একেবারে ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেলেন। তটস্থ হয়ে বললেন : থাক-থাক মেয়ের সামনে আর ওসব বাজে কথা বলতে হবে না। যা হয়ে গেছে তা নিয়ে এতদিন পরে আর ঘাঁটাঘাঁটি করে কী হবে ? আমি ভেবেছিলাম যে, এই যে একটা কুৎসিত ব্যাপার ঘটে গেল, এর পরে সুরঞ্জন কি আর অশ্রুকে ক্ষমা করতে পারবে ?

কাকীমা মুখভঙ্গী করে বললেন : ক্ষমা আবার কিসের শুনি ? সুরঞ্জন যা খুশী করবে, ওই নতুন মেয়েটার সঙ্গে চলাচলি করবে আর অশ্রুকে নিঃশব্দে তাই বরদাস্ত করতে হবে—অশ্রু এত কিছু অপরাধ করেনি। তা ছাড়া বলতে গেলে সুরঞ্জন তো ওকে এক রকম কথাই দিয়েছে। আর এখন অশ্রুর ওর ওপর একটা দাবী জন্মে গেছে। এর পরেও যদি সে অন্য মেয়ের পেছনে ছোটে তাহলে অশ্রু তা কোনোমতেই সহ্য করবে না।

—তা বলে মানুষ খুন করতে হবে ?—কাকাবাবু সভয়ে জানতে চাইলেন।

এতে আবার খুনের কী হলো, শুনি ? রাগের মাথায় না হয় একটা পেপার ওয়েট ছুঁড়েই মেরেছে—মিসআণ্ডার-স্ট্যাণ্ডিং হলে ও-রকম কত হয়। তা ছাড়া কথা যখন অশ্রুকে একবার দিয়েছে—

কাকাবাবু ভ্রূ কোঁচকালেন। বললেন : কথা কি সে দিয়েছে ? তোমার মেয়েই তো নেচেছে বেশী। অকারণে বারবার তার গায়ের ওপর গিয়ে পড়েছে।

কোঁস ফোঁসানি কান্নার মধ্যেও অশ্রু এবার ফোঁস করে উঠলো : আমিই বুঝি লোকের গায়ে গিয়ে পড়ি, আর ওর বুঝি কোনই দোষ নেই ?

কাকাবাবু বললেন : সহজ ভাবে মিশেছে এই তার দোষ। তাকে আমি ভালো করেই জানি। গৃহিনীর দিকে তাকিয়ে কাকাবাবু বললেন : আমি তোমাকে বলছি শান্তি—আগাগোড়া ভুল তোমাদেরই হয়েছে। সুরঞ্জনের মনের কথা না বুঝে অনেক বেশী আশা করেছিল অশ্রু, আজ তার দাম তো দিতেই হবে।

অশ্রু এবার কান্না ধরা গলায় কী যেন বলতে যাচ্ছিল কাকীমা থামিয়ে দিলেন : আশা এখন সবাই করে, সেটা কথা এখন কিছু অন্যায় হয়নি। তাছাড়া আমিও তোমাকে বলে রাখছি আমি সুরঞ্জনের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দেবই দেব। তুমি এবার একটু গা-ঝাড়া দাও দিকি। মেয়ে তো তোমারও বটে। এমন হাত-পা ছেড়ে থাকলে কি বিপদের দিনে চলে ? একটা কাণ্ড যখন ঘটেই গেছে তখন তার সংশোধন তো করতে হবে। তুমি ঠাণ্ডা হও, আর একদিন একবার সুরঞ্জনের সঙ্গে দেখা করে ওর বেশ সুন্দর

'ব্লাশি করে বুঝিয়ে বলো। আর অভ্রুকেও বলো করে নিয়ে যাও ওর কাছে যা হয়ে গেছে তার জন্যে অভ্রু ওর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবে।

অভ্রুর গলা দিয়ে যেন গোটা দুই হিক্কা উঠলো। অদ্ভুত তীক্ষ্ণ গলায় অভ্রু বললো: আমি যাব না—কখনো যাব না। উঃ, বাপ চাইবো? কেন বাপ চাইবো শুনি?

এবার কাকীমা বীভৎস ভাবে দাঁত খিঁচিয়ে উঠলেন: না—বাপ চাইবে না? নাটক করবার সময় সে সব মনে থাকে না, উড়িয়ে কোথাকার? অসভ্য ব্রেনলেস্ মেয়ে—সব কাজ পণ্ড করে দিয়ে এখন ন্যাকামো হচ্ছে। শোন তুমি অভ্রুকে নিয়ে একবার এখুনি সুরঞ্জনের কাছে নিয়ে যাও। নইলে সমস্ত ভেস্তে যাবে।

ঠিক এমনি সময়ে পর্দা সরিয়ে দাদু ঢুকতে গেল। কাকাবাবু চীৎকার করে উঠলেন: কি চাই শুনি? আসবার সময় জিজ্ঞাসা করে ঢুকতে পার না?

দারোয়ান এসেছে—বলেই দাদু এক ছুটে নিয়ে পালিয়ে গেল।

বানরের মত মুখ দাঁত বের করে দাঁড়িয়ে কেন? কী চাই—? দাদুকে না পেয়ে যেন সমস্ত বিরক্তি ভেঙে পড়লো দরোয়ানের ওপরেই।

দারোয়ান জড়োসড়ো হয়ে বললে: একজন গাঙ্গুলীবাবু দেখা করতে চান।

আঃ, গাঙ্গুলীবাবু আর গাঙ্গুলীবাবু। এরা আমার বাধা খারাপ করে দেবে। আচ্ছা—আফিসে বসতে বল আমি, আসছি। কাকাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন বিরক্ত মুখে। কাকীমা বললেন: তাহলে সুরঞ্জনের কাছে যাবার কী করলে?

দাঁড়াও রে বাপু, দাঁড়াও। আমি একলা মানুষ একটু দম ফেলতে দাও।—এই বলে সাময়িক ভাবে পারিবারিক সমস্যার সমাধান করে দিয়ে কাকাবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আফিস ঘরে বসে ছিলেন অনুর দাদার বন্ধুবাবু। কাকাবাবুকে দেখে হাত তুলে অল্প একটু নমস্কার করলেন। বললেন: আমি অনুলেখার দাদা বন্ধুবাবু।

মুখের ওপর এক পোঁচ কালি টেনে এনে বিকৃত মুখে চেষ্টাটা টেনে নিয়ে কাকাবাবু বললেন। তারপর একটা অসীম গাম্ভীর্য এনে অফিসিয়াল সুরে বললেন: হুঁ, আপনার কথা শুনেছি—আরো কিছু আগেই আপনার আসার কথা ছিল।

বন্ধুবাবু বললেন: তা ছিল, কিন্তু নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় আসা হয়নি। আমি পশ্চিমে চাকরী করি—সহজে বাংলা দেশে আসা সম্ভব হয় না। যাই হোক, এবার কাজের কথাটাই সেরে নেওয়া যাক। আমার বোনের জন্য আমি অন্য হোস্টেলে একটা সীট ঠিক করেছি। আমি কালই ওকে সেখানে নিয়ে যেতে চাই।

কাকাবাবুর চোখ দুটো ক্রূরতায় চকচক করতে লাগলো। বললেন: এসেছেন ভালোই হয়েছে—নইলে আমিই আপনার বোনকে বিমুক্ত করবার জন্যে চিঠি দিতাম।

বন্ধুর ভুরু কোঁচকালেন: কেন?

দেখুন একটা কথা বলবো, কিছু মনে করবেন না। উই আর স্ট্রাংক, ঠিক এই টাইপের মেয়ে আমাদের হোস্টেলে রাখার সুবিধা হবে না।

বন্ধুর মুখের পেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠলো, স্থির অপলক দৃষ্টিতে কাকাবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললো: কী টাইপের বলছেন?

তার দৃষ্টির সামনে কেমন অস্বস্তি অনুভব করলেন কাকাবাবু। বাপা নামিয়ে বললেন, মানে ওর একটু পুরুষের সঙ্গে মাখামাখি করবার অভ্যাস আছে কিনা।

বন্ধুর চোখ দুটো এবার জ্বল জ্বল করে জ্বলে উঠল কঠোর গম্ভীর গলায় বললেন, আমার বোনকে আপনার চাইতে বোধহয় আমি বেশী করেই জানি। আপনি যা বলছেন তা যে কত বড় মিথ্যে সেটুকু বোঝবার মত বুদ্ধিও আমার আছে। আর এই জন্যেই মনে করি আর এক মুহূর্তও আপনার হোস্টেলে আমার বোনের থাকা উচিত নয়।

কাকাবাবু একেবারে নিভে গেলেন। কিন্তু তিনি পাকা লোক, নিজের ঝোঁক তবু ছাড়লেন না। যেন ছ মাসের রুগীর মত দুর্বল গলায় চিঁচিঁ করে বললেন: আপনি বিশ্বাস করছেন না। কিন্তু একটু খোঁজ করলেই জানতে পারতেন আমাদের হোস্টেলে একটি অল্প বয়সী কর্মচারী আছে—সুরঞ্জন ব্যানার্জি' তার নাম।

ছেলেটি দেখতে সুদর্শন—ইংরাজীতে এম, এ পড়ে। সে আমার কাছে অভিযোগ করেছে যে আপনার বোন তাকে সব সময় অত্যন্ত বিরক্ত করছে এবং ইনডিসেন্টলি তাকে—

বজ্র গম্ভীর স্বরে বরদাবাবু বললেন : থাক, চুপ করুন। গীতা হাতে নিয়েও যদি পাপ করেন তবুও আমি এ কথা বিশ্বাস করবো না। যেখানে আবহাওয়া নোংরা—সেখানে সব কিছুই নোংরা হয়ে ওঠে।

কাকাবাবু একটা ঢোক গিলে বললেন : কিন্তু সুরঞ্জন যে বললে—

বরদাবাবু তাঁকে থামিয়ে দিয়ে তেমনি কঠিন গলায় বললেন : কে আপনার সুরঞ্জন আর কী তার ব্যাপার তা আমার জানবার বিন্দুমাত্রও কৌতূহল নেই। আমি আমার বোনকে খুব ভাল করে জানি সেইটুকুই আমার পক্ষে যথেষ্ট। থাক সে সব কথা, আপনি হিসেব পত্র করুন, আপনার সমস্ত পাওনা মিটিয়ে আমি এক্ষুনি অনুকে এখান থেকে নিয়ে চলে যাব। ভেবেছিলাম, কালই নিয়ে যাব—কিন্তু দেখেছি এক মুহূর্তেও আর দেরী করা যায় না।

কাকাবাবু যেন আগত একটা ঝাপটকে গিলে ফেললেন : সত্যি কথাটা—

একটা কালো ছায়া দরজার পড়লো—। উমা এসে দাঁড়িয়েছে : মিথ্যেকে বার বার সত্যি সত্যি বলে চিৎকার করলে মিথ্যে কখনও সত্যি হয় না—

উমা—কাকাবাবু যেন পাগলের মত চিৎকার করে উঠলেন আর সেই চিৎকারে যেন ঘর কেঁপে উঠলো—।

বীথি অনুর গলা জড়িয়ে ধরে কেঁদেই ফেললো : তুই চলে যাবি অনু? সত্যিই আমাদের ছেড়ে চলে যাবি?

অনুর চোখেও জল এসে গিয়েছিল। চোখ মুছে অনু বললে : কিন্তু এখানে তো আর থাকা যায় না বীথি। তুমি তো জানো।

বীথি আস্তে আস্তে বললো : হ্যাঁ সবই জানি। শুধু তুই কেন, এ হোস্টেলে কোন মেয়েরই থাকা উচিত নয়।—একটু চুপ করে থেকে আবার বললো আমাদের কথা ভুলে যাবি না তো?

নিবিড় মমতায় বীথির হাতখানা জড়িয়ে ধরে অনু বললে : তোমাকে ভুলতে পারি বীথি? তুমি এখানে না থাকলে আমি নয়েই যেতাম।

বীথি আবার চুপ করে রইলো। তারপর মৃদু গলায় বললে : তুই চলে গেলে আর একজনেরও খুব কষ্ট হবে—সুরঞ্জনবাবু।

নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে অনুর মুখ পাংশু হয়ে গেল, একটা তীব্র যন্ত্রণার প্রবাহ যেন মোচড় দিয়ে উঠলো বুকের মধ্যে। আর ঠিক সেই সময় চাকরটা এসে বললে : অনুদির দাদা বললেন, পাঁচ মিনিটের মধ্যে উনি যেন তৈরী হয়ে নেন, এখুনি ওঁকে লোর্ডিং থেকে নিয়ে যাবেন। বাবু ট্যাক্সি আনতে গেছেন।

—এগার—

'কান্না হাসির দোল দোলানো' একটা পালা শেষ হয়ে গেল অনুর জীবনে।

নতুন হোস্টেল—নতুন পরিবেশ। সত্যিই যেন সরস্বতী তাঁর আসনটি মেলে রেখেছেন। পরিচ্ছন্ন ঘরে ছিমছাম করে সীট—সুন্দর বন্দোবস্ত। কলেজের ছাত্রীর দল—পড়াশুনো করে, আড্ডা দেয়, গান গায় কখনো কখনো। সব সহজ সব স্বাভাবিক।

তবু বীথিকে মনে পড়ে। জানতে কৌতূহল হয় বীথির কী হলো। কেমন আছে হারা মেয়ে সুধা, কি হলো উমার। দুঃস্বপ্নের মত দিনগুলোর বুকে আলোর রেখা হয়ে ফুটে ওঠে সুরঞ্জনের মুখ।

সুরঞ্জন! বুকের ভেতরটা ব্যথায় টনটন করে—অভিমানে চোখে জল আসে। যাওয়ার সময় একবার দেখা পর্যন্ত হলো না। চলতি পথে অনেক কিছু দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়। কিন্তু সবই কি হারায়? বুকের ভেতর কে যেন তখন অদৃশ্য শিকড় ছড়িয়ে যায় উপড়েও ফেলা যায় না—অথচ—

না—সুরঞ্জনের কথা আর সে ভাববে না।

তবু না ভেবেও পারা যায় না। কাল সারাটা রাত ধরে বসন্তের হাওয়া এসেছে জানালা দিয়ে, ত্রয়োদশীর চাঁদ উঁকি দিয়েছে অনুর জানালা দিয়ে। অন্য সীটে ঘাড় ইয়ারে পড়া মেয়েটি জেগে জেগে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ছিল :

ভুলে থাকা সে তো না ভোলা
বিন্দুটির মতো যার থেকে তোর বিস্তার যে ভোলা।
নয়ন সমুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছো যে ঠাঁই'—

অনুর দারা মনে শুধু গুন গুন করছে লাইনগুলো : নয়নের মাঝখানে নিয়েছো যে ঠাঁই—

কে সে? সুরঞ্জন?

ক্লান্ত একটা বিশ্রাম শরীর নিয়ে বিকেলে কলেজ থেকে ফিরলে অনু। কী যে হয়েছে, লেকচারের একটি বর্ণও যেন ঢোকেনি মাথায়। অনু বিমর্ষ হয়ে জানালার পাশে বসেছিল—দেখছিল নীল আকাশে বিকেলের রোদ রঙের খেলায় মেতে রাঙতী রঙে রাঙিয়ে তুলছে।

দারোয়ানের সেলাম ঠুকে এল : ভিজিটার।

বাংলায় লেখা 'বরুণ রায়'—ইংরাজিতে আর একটা 'এন ব্যানার্জি'।

কে এন ব্যানার্জি? বরুণদার কোন বন্ধু হবে হয়তো। খুশী মনে নেমে এল অনু। বরুণদার এই সময়ে আসবার কথা আছে বটে। চার পাঁচদিন আগে হলপাইগুড়ি থেকে চিঠি দিয়েছে ছুটি ফুরিয়ে এল তার। বিন্দুমাত্রই কিরতে হবে চাকরীর জায়গায় যাবার সময় কলকাতা হয়ে অনুকে নেলে যাবে।

পাখীর মত হালকা পায়ে অনু ঢুকলো ভিজিটার্স রুমে। ডাকল : বরুণদা।

কিন্তু ডেকেই সে থমকে গেল। বরুণের পাশে বসে আছে খদ্দরের পাঞ্জাবী পরা একটি উজ্জ্বল দীর্ঘ মূর্তি। হাসিতে দুচোখ চকচক করে উঠছে তার। সুরঞ্জন।

দরজার হাত রেখে অনু দাঁড়িয়ে পড়লো। বুকের ভেতরে যেন তুফান উঠছে।

বরুণদা বললে : আরে লজ্জা কেন? মানিক যে লক্ষ্ণৌয়ের নিরঞ্জনবাবুর ছেলে। ওর দাদা দেবরঞ্জন আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আজ সকালে ট্রেণ থেকে নেমেছি হ্যারিসন রোডে ওর সঙ্গে দেখা। খাসা ছেলে—আমি তো ঠেকেছি ওকেই তোর লোকাল গার্জিয়ান করে রেখে যাব। মানিক সুরঞ্জনের ডাক নাম। কিন্তু এ ছাড়া কোন নামেই বা ওকে মানাতো।

অনু চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রইল। বুকের দোলা যেন তার কিছুতেই থামতে চাইছে না।

সুরঞ্জন হেসে বললে : পরিচয়ের দরকার নেই বরুণদা—অনু দেবী আমাকে চেনেন।

চেনেন! কি রকম?

আমি ওঁর আগের হোস্টেলে কাজ করতাম।

—ওহো। বরুণের কী একটা বিদ্যুৎ চমকের মতো মনে পড়লো। তা হলে হোস্টেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তোর সম্পর্কে কী একটা বলতে গিয়ে—

হ্যাঁ দাদা, সে অনেক কাহিনী। একটা শক্ত জাল পাতা হয়েছিল, ছিঁড়ে পালিয়েছি অনেক কষ্টে। পরে খুলে বলবো। আর অনু দেবী হলপাইগুড়ির নেমে শুনে আমার আপনার কথা মনে পড়েছিল, তারপর একবার উনি আপনার নামও করেছিলেন। সেই থেকে আমি ওঁকে চিনে নিয়েছিলাম—আপনার বোন বলে একটু বেশী ইনটারেস্টও হয়তো নিয়ে থাকবো। অনেক দুঃখের দান দিতে হয়েছে সে জন্যে।

আই সী—আই সী।

অনু তখনো চুপ করে দাঁড়িয়েছিল এক ভাবে। সুরঞ্জন তাকালো তার দিকে।

—আপনিও বসুন অনু দেবী, আপনার পুরোনো ছাত্রী নিবাস সম্পর্কে কিছু তথ্য দেই আপনাকে। শুনে খুশী হবেন।

অনু চেয়ারে এসে বসলো দুটো চোখ মেঝের দিকে। সুরঞ্জন হেসে বললে : ছাত্রী নিবাসে তালা পড়েছে। অনুর পা থেকে মাথা পর্যন্ত চমকে উঠলো। বরুণ বললে, মানে? তালা পড়লো কেন?

সে এক বিশ্রী ব্যাপার। উমা চৌধুরী বলে একটি মেয়ে থাকতো ওখানে—সাতাশ, আটাশ বছরের মতো বয়েস। একটু স্পষ্টভাষী—কাউকে গ্রাহ্য করত না। সেদিন কী নিয়ে সুপারিণ্টেণ্ডের সঙ্গে তার কথা কাটাকাটি হয়—বুড়ো সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট টেম্পার হারিয়ে মেয়েটিকে চাবুক দিয়ে বসেন। মেয়েটি তখুনি বেরিয়ে গিয়ে লালবাজার থানায় কি জানি সব খবর দেয় তারপর সোজা চলে যায় ইউনিভার্সিটিতে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ আর ইউনিভার্সিটি থেকে এনকোয়ারী আসে। তিন দিনের ভেতরেই তালা বন্ধ হয়ে যায়। ওর প্রোসিডেণ্ট

মিঃ সেন আবার সিমেটের মেম্বার। তাকে যেন ইউনিভার্সিটি কী একটা কড়া চিঠিও দেছেছে।

অনুর যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল।

সত্যি?

আর দিন তিনেক থাকলে নিজের চোখেই দেখতে পেতেন মাইকটা।

বরুদা বললে: ঠিক হয়েছে; অনেক আগেই ও হোস্টেলে তালা বন্ধ হওয়া উচিত ছিল।

অনু আর্ত স্বরে বললে: ওরা সবাই কোথায় গেল?

কাকাবাবু সপরিবারে যেন ডুব দিয়েছেন। প্রায় পলাতক বলা চলে। যে দুতিনটি কলেজের মেয়ে ছিল ইউনিভার্সিটি তাদের অন্যান্য হোস্টেলে রাখিয়ে দিয়েছে। বাকীরা বাসা ভাড়া পাখীর মত যে যার পথ দেখেছে।

অনুর সমস্ত মন ব্যাথায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

কিন্তু বীথি, সুধা, বীণা, উমা ওরা কোথায় গেল?

সুরঞ্জন চুপ করে রইলো। এদের কারু কারু সম্পর্কে তার নিজেরও কিছু সহবেদনা ছিল। একটু পরে নিঃশ্বাস ফেলে বললে: এই বিরাট কলকাতায় ওদের কোথাও না কোথাও জায়গা হয়ে যাবেই। ঠিক ওরকম হোস্টেলেরও কোনো অভাব হবে না।

বরুদার উমা-বীথির জন্য কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না।

মাথা নেড়ে বললে, চলোম যাব—আপদের শান্তি হোয়েছে। কিন্তু যে কথা বলছিলাম: মাণিক তোকে আবার যেনের লোকাল গার্জিয়ানি করে যাব। ওটা যেমন ছেলেমানুষ তেমনি ভীতু—কলকাতার কিছু বোঝে না। তুই-ই ওকে একটু দেখাশুনা করিস। আপত্তি নেই তো?

—আপত্তি আমার নেই কিন্তু আপনার বোন—

পাগল নাকি—কী বলিস? বরুদা হেসে উঠলেন। কিরে তুই আবার আপত্তি করবি নাকি? বাচিলার মানুষ হঠাৎ অসতর্ক হয়ে অন্যমনস্ক ভাবে বলে ফেললেন, আরে মানিকের মত সুপাত্র—

চমকে উঠে চেয়ার শুদ্ধ নড়ে উঠলো সুরঞ্জন আর সিঁদুরের মতো লাল মুখ নিয়ে সেই যে ছুটে পালালো অনু, বরুদার গলার ডাকেও সে আর ফিরলো না।

বাইশ বছর পর।

লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সস্ত্রীক বেড়াতে এসেছেন কলকাতায়। ধর্মতলার মোড়ে ট্রাফিকের সংকেতে হঠাৎ এক জায়গায় ট্রাফিক দাঁড়িয়ে পড়লো। চমকে উঠলো অধ্যাপকের স্ত্রী।

ওগো—ওগো কত বদলে গেছে কলকাতা, তবু বস্তির ওপরে সেই বাড়ীটা এখনো মাথা তুলে রয়েছে। চিনতে পার?

অধ্যাপক সুরঞ্জন স্ত্রীর একখানা হাত সস্নেহে তুলে নিলো মুঠোর ভেতর।

নিশ্চয় চিনতে পারি অনু, ওই মৈত্যপুরীতেই তো আমার বন্দিনী লক্ষ্মীকে আমি দেখেছিলাম। সে কথা কী কখনও ভুলতে পারি?

ট্রাফিক পুলিশ হাত নড়ালো, গাড়ি চলতে আরম্ভ করলো আবার। আর পেছনে বস্তির উপর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রইল সেই পুরোনো জীর্ণ বাড়িটা—কলকাতার আরো অনেক হাজার হাজার বাড়ির মতো যার কোনো একান্ত পরিচয় নেই।

— শেষ —

আকাশে ওড়ার পাখা

জগদীশ ভট্টাচার্য

তুমি আমার আকাশে ওড়ার পাখা।
দেহ সীমানার মর্ত্যকেলি থেকে
জ্যোতির্ময় মহাবিশ্বে
দিয়েছ আমাকে মুক্তি।
সেখানে দিব্য প্রেম চিরসুন্দরের
লীলা সহচর॥

আমি ছিলুম
স্বর্গচারী নভ-বিহঙ্গ।
উড়ে বেড়াতুম
শিব-সুন্দরের অনন্ত ভুবনে।
দেখতুম সেই স্বপ্ন
মর্তলোকের কোনো চোখ
কোনো দিন যা দেখতে পায় না॥

একদিন আমার পাখা গেল হারিয়ে।
নেমে এলুম ধরণীর ধূলিতে;
বন্দী হলুম দেহের কারাগারে।
আজন্ম শোধ করেছি তারি ঋণ,
তারি দাবি দাওয়া॥

তারপর এল তোমার স্বপ্ন।
কারাগারের লৌহ পিঞ্জরের অর্গল গেল খুলে।
আমি ফিরে পেলুম আমার হারানো পাখা,
আর আমার ওড়ার আকাশ॥

চৈত্রী, সংক্রান্ত

শিবকুমার চক্রবর্তী

আদি গঙ্গা নয়, এ যে নালা
জল উঠে ভাদ্রের কোটালে
ভাসায় চাতাল, খিড়কি গলি, নোংরা-পাঁশ
বস্তু-জলা

এক নষ্টনারী হেঁটে যায়, ছপ্ ছপ
কাদায়-ছিটায়
সেন্ট্রাল জেলের থেকে মাঝ রাতে পেটা ঘণ্টা বাজে
বলে, 'হয়েছে সময়'

আর এক নারী যায়, জীবিকায়
শিকারী-পাড়ায়
রোজ হাঁটে, রোজ দিনপঞ্জী পাল্টায়
কপালের শিরা ওঠে, বাসিরক্তে
বস্তুতঃ ঝিমায়

এই নারী দৃষ্টিহীন, দৃষ্টির—
বিভ্রম, কিছু আছে
তাই নিয়ে আত্মপর অহর্নিশি যাচে, ফের ঘুমায় ও
ওঠে, ঘুমায় ও জেগে উঠে, তার
চোখে আঁটে হীন, পরকলা।

বিদূষক

অচ্যুৎ চট্টোপাধ্যায়

চিরদিন বিদূষকের ভূমিকা অভিনয় করে গেলুম :
দর্শকের কাছ থেকে পুরস্কার পেলুম
অকুণ্ঠ প্রশংসা আর করতালি।
রঙ্গমঞ্চ যখন সম্পূর্ণ খালি
হয়, তখন বসে বসে ভাবি,
আমি মেটাই তাদের দাবী,
যারা পয়সা দিয়ে হাসতে চায়।
কিন্তু তারা যে আমায় কাঁদায়,
এ কথা জানে না ভাগ্যবানেরা,
আমার বাইরেটাই দেখেছে এরা।
ভেতরটা আমার জ্বলে পুড়ে খাক
হয়ে যায়, এ কথা জানে কি ? না থাক,
একমাত্র ঈশ্বরকেই শোনাবো সে কথা,
যদি কোনো দিন প্রসন্ন হন দেবতা !

পোষ মানে না

অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়

পোষ-না মানা বুনো বেড়াল, দুষ্টু বেড়ালটা
ছটফটেদের নদ্য নণি' ব্যস্ত পাগলটা
খাবার দেব, খাবার দেব দৌড়ে চলে আয়
বাজেট কাটা পায়ে ফুটলে কাল্‌কো চেপে আয়।
কাল্‌কোর তোর কষ্ট হলে ভেণ্টিব্যুলে আয়,
কষ্টা মিনিট—পল অনুপল গুনতে গুনতে আয়,
দুধ-মাখা ভাত শুকিয়ে গেল, শুকিয়ে গেল যে !
লক্ষ্মী সোনা মাণিক আমার, দেরী করিস নে।
কাটা ঘায়ে মলম দেব
কাঁদতে চোখে রুমাল দেব
যেখানে ব্যথা সেখা যাব,
তবুও মাথা ঝাঁকাস ?
শিকলি দিয়ে রাখব বেঁধে
দেখি কেমন পালাস।

হে আমার ভ্রষ্ট পারিজাত

কাশ্যপ মুনি

সেই সব লোকশ্রুত নক্ষত্রের কথা বাদ দাও
কারণ আমরা বহুবার পতন দেখেছি তার
তৃষ্ণা অকপট বলে মরুভূমি পার হয়ে দেখি
সান্ত্বনার দীঘি হল আমাদের লক্ষ কনীনিকা
আমরা কোথাও তবু সম্পর্কিত হই নি কখনও।

আমি এখন আমার অনুগত বলে তার মুগ্ধ মুখ
তুলে বলতে পারি : দ্যাখো দ্যাখো
সেই স্রোত-সন্নিধ্যের
প্রসন্ন বয়ান সময়ের হীরকে চন্দনে দীপ্ত
দুরাশার মত পদতলে অবতীর্ণ দৃশ্য আলো সমাকুল
পুনরুজ্জীবিত শরীরে পল্লব পুষ্ট চন্দ্রকলা
করতলে রেখার মতন বহু নদী কীর্তনীয়া।

হে সুপ্তি হে জাগরণ বরাভয় ঘোষণা চাই না
আকাশে উপলমণি মেঘ নিচে সমুক্ত চারণ ভূমি
থাক কাটা জলের ওপর ধ্বনিপুঞ্জ, রঙ, পাখি
আমাদের বহিভূত অসামান্য কল্লোল কলাপ
সমতল দিয়ে চলে গেছে গোলাপে নুনে ও ধ্যানে।

হে জীবন হে আমার ভ্রষ্ট পারিজাত দাও, দাও
প্রসারিত সর্বভূতে তুমি যে আগুন ধরিয়ে দিয়েছ
যা শতাব্দীর প্রবাল প্রাকারে বন্দনায় উচ্চারিত
তাকে দাও,—নিয়ে যাই মানুষের প্রার্থী উপকূলে।

অন্বেষা

শ্যামসুন্দর দে

দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াছি আমি—চেয়েছি আমার
এক মুষ্টি শস্য দাও, দাও শ্বেত সরিষা
মৃত পুত্র ক্রোড়ে নিয়ে মৃত্যু হীন জীবন
লভিবারে শিশুটির। ললাটে অঙ্কিত
মৃত্যুর জয় তিলক মুছিবারে দ্বারে দ্বারে
ফিরি আমি অন্বেষায় এক মুষ্টি শস্য।
সকালের রোদ ক্লান্ত বিদায়ের বিষণ্ণতা
সন্ধ্যার আঁধার ঘেরে রাতের তারকা
আকাশ বিস্তীর্ণ পথে যাত্রা করে শুরু।
আমার মনেতে বাজে ব্যর্থতার মূর্ছনা
এক মুষ্টি শস্য নেই পৃথিবীর ভাণ্ডারে
এক মুষ্টি শস্য নেই মৃত্যুহীন কোন ঘরে।

আমার কুমারী মন আবেগে স্পন্দিত
প্রতীক্ষার কাল গুণে মধুময় অবসান
প্রথম পরুষ স্পর্শে মেলে ধরে
অনুরাগ শতদল—বর্ণচ্ছটা
আমার রক্তের স্রোতে আগমনী গান
একটি শিশুর হাসি ভালবাসায় পৃথিবী
আনন্দের রূপে মগ্না, মধুময় জীবনের কাল।
যখন শরীরী রূপ দুইটি বাহুর বেষ্টন
আমাকে ঘিরিয়া রাখে, ভুলে যাই পৃথিবীকে
ভুলে যাই মানুষের ক্ষীণ আয়ু অবসর
স্মৃতির ভীষণ জ্বালা—নিরবধি
মৃত্যুর তস্কর রূপ দেখিলাম চুপি চুপি
রোদের সকাল ঢাকে কালো মেঘের ঘোমটায়।

ভৃঙ্গারে অমৃত বারি চেয়েছিলেম হে বুদ্ধ
আমার মৃত পুত্রটি হোক সঞ্জীবিত
ভৃঙ্গারে রয়েছে সুধা, আমার আকুতি।
দ্বারে দ্বারে ফিরি আমি নির্দেশিত বাণী
এক মুষ্টি শস্য চাই সেই গৃহ হতে
নতশির মৃত্যু যেথা। তোমার প্রার্থনা
ফল ভারে নম্র হবে লতা তোমার কাননা।

দিন চলে যায় অন্বেষণে রাত্রি নেমে আসে
নক্ষত্রের বেদীমূলে আমার ব্যর্থতার ডালি
দিবসের সঞ্চয়ন যত অভিজ্ঞতা।
এখন আমার চোখে সকালের প্রার্থনা
গেরুয়া আকাশ জুড়ে আলোর পরিক্রমা
আলোর আঘাতে শুরু যুদ্ধের সকাল—

আমার সারাটা মন জুড়ে ফুলের সুবাস।

সাঙ্গীতিক জ্ঞানের অর্থ

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

সঙ্গীতকে শুধুই শ্রবেন্দ্রিয়ের সাহায্যে শুনে প্রাণে আনন্দ অনুভব করার শক্তি থাকলেই যে সাঙ্গীতিক জ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায় একথা ঠিক নয়, আবার একথাও ঠিক নয় যে, সঙ্গীতের উপর অনুরাগ ও ভালবাসা থাকার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রচার প্রচেষ্টার সংশ্লিষ্ট থাকলেও সঙ্গীতিক জ্ঞানলাভ করা যায় না। সাঙ্গীতিক জ্ঞান যে সঙ্গীতবিদ্যার খুঁটিনাটির সঙ্গে সম্পর্কিত এ বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ নেই। কিন্তু মতদ্বৈধ হোল সেখানে যেখানে কোন মানুষ যদি বলেন সঙ্গীত সম্বন্ধে এই গ্রন্থ আমি অধ্যয়ন করেছি, অমুক উস্তাদের কাছে এত বৎসর আমি শিক্ষা করেছি, অমুক সঙ্গীত সম্মিলনীর সঙ্গে আমার নিবিড় সম্পর্ক, অথচ সঙ্গীতের সুর, রস ও আদর্শবোধ থেকে তিনি বঞ্চিত। উস্তাদ ও বৎসরের অভিজ্ঞতার চেয়ে বরং বন্ধু ও আদর্শবোধের মূল্যই অধিক। সাঙ্গীতিক জ্ঞান একদিক থেকে তাই যেমন সহজাত, অপর দিক থেকে তেমনি অর্জিত বলা যায়। তাই মনে রাখতে হবে, সাঙ্গীতিক জ্ঞানের বেলায় সহজাত ও অর্জিত বৃত্তি-দুটির মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই, বরং মিলনের ভাবই আছে পূর্ণমাত্রায়। তবে সাঙ্গীতিক জ্ঞানে সত্যকারভাবে অধিকারী হোতে হলে আনুষ্ঠানিক বৃত্তি বা সংস্কারের যেমন উপযোগিতা আছে তেমন উপযোগিতা আছে গুণীসংস্পর্শ, সঙ্গীতসম্পর্কে আলাপ-আলোচনা, সঙ্গীতের গ্রন্থাদি পাঠ, সঙ্গীত-প্রতিষ্ঠান ও সঙ্গীতের সকল-কিছু উপাদানের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকা। তারপর সর্বোপরি সঙ্গীতের মর্মকথা বা আদর্শের অভিজ্ঞান লাভ করা আসল কথা। সঙ্গীতের ঔপপত্তিক বা শাস্ত্রীয় জ্ঞান যেমন সাঙ্গীতিক জ্ঞানের পক্ষে অপরিহার্য তেমনি সঙ্গীতের প্রত্যক্ষ সাধনার মতো শাস্ত্র ও সাধনার মধ্যে মিল থাকা প্রয়োজন, কেননা শাস্ত্র ও সাধনা এই উভয়ের মিলিত অভিজ্ঞতাই সাঙ্গীতিক জ্ঞানের সংস্কার ও গঠনকে সচেতন ও সুদৃঢ় করে।

জ্ঞান কোনদিনই বস্তুনিষ্ঠ হয় না তা মানুষের মনেই থাকে বৃত্তি বা গুণরূপে, বস্তুর সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে ও মিলনই সৃষ্টি করে মানুষের বস্তুর জ্ঞান। সাঙ্গীতিক জ্ঞানটির বেলায়ও তাই। সঙ্গীতশিল্পনিষ্ঠ থাকে না জ্ঞান কোনদিন, শিল্পীর সঙ্গে সঙ্গীতের নিবিড় সম্বন্ধই মানুষের মধ্যে আনে সাঙ্গীতিক জ্ঞান। তাই কথা হোল সেই সম্পর্কের বা স্বরূপসম্বন্ধটি কেমন। কোন একটি গানকে ঠিক ঠিকভাবে বুঝতে ও উপভোগ করতে হলে যেমন গানের সাহিত্য, ছন্দ, সুর এবং সুরগত রস ও ভাবের সত্যকার পরিচয় থাকা চাই, তেমনি এই পরিচয় লাভ করতে গেলে শিল্পীকে প্রত্যক্ষভাবে সাঙ্গীতিক সকল উপাদানগুলির সম্বন্ধেও অভিজ্ঞতা লাভ করতে চাই। রাগকে চিনতে গেলে রাগমাত্রেরা থাট বা মেলের পরিচয় লাভ করতে হবে। থাট বা মেলের যে রসসঞ্চারী ভাব তার সঙ্গেও পরিচয় থাকা চাই। তারপর বাদী, সংবাদী, অনুবাদী ও বিবাদী স্বরসম্পর্কেরও অভিজ্ঞতা চাই। যদি বলি শ্রোতার পক্ষে ওসব খুঁটিনাটির জ্ঞান না হোলেও চলে, কেননা রাগের সূক্ষ্মগতি বা বিলাস মাধুর্য জানলেই হবেই। এবং বহুদিন গান শোনার অভিজ্ঞতা থেকেও ভাল শ্রোতা হওয়া সম্ভব। অবশ্য এ জিজ্ঞাসার উত্তরে একটু মাত্র বলা যায় যে, ভাল শ্রোতার অভিধানেই হোল তাঁর সাঙ্গীতিক জ্ঞানের গভীরতা থাকা। ভালো ভালো সুস্বরের বিলাসজ্ঞান ও বহুদিন গান শোনার অভিজ্ঞতা থেকে সত্যকার গানের রূপ, রস ও আদর্শ অনুভব করা কঠিন। কোন্ রাগ কোন্ রস ও ভাবের প্রকাশক, কোন্ রাগ কোন্ পরিবেশ ও মনঃসন্দনের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত তাদের সম্বন্ধে সুস্থ চিন্তা না থাকলে গান ও রাগকে কিভাবে ধরাছোঁয়া সম্ভব তা বোঝা কঠিন। সঙ্গীতের উৎকৃষ্ট শ্রোতার পক্ষেও যে সাঙ্গীতিক জ্ঞানের একান্ত প্রয়োজন তা বলাই বাহুল্য।

সাঙ্গীতিক জ্ঞানের পক্ষে আর একটি বিশেষ প্রয়োজন সঙ্গীতের বিকাশবৈচিত্র্যপূর্ণ ইতিহাসের সম্যক জ্ঞান লাভ করা। যেমন নায়কৌশিকের আবির্ভাব সমাজে

কতদিন থেকে, সামাজিক কোন পরিবেশ-সংঘাতের ভিতর তার বিকাশ লাভ সম্ভব হয়েছে, বালরকৌশিকের পূর্বরূপের সঙ্গে পরবর্তীর সাদৃশ্য ও সাধর্ম্য কতটুকু, পূর্বরূপের সঙ্গে পরবর্তীর যদি কোন সাধর্ম্যই থাকে তবে তাদের ব্যাকরণে ও রসরূপেও কি সাধর্ম্যসৃষ্টি হওয়া সম্ভব—এ সকল ইতিহাসগত প্রশ্নের মীমাংসার প্রয়োজন আছে যথার্থ সাঙ্গীতিক জ্ঞানের পক্ষে। যদি বলি সঙ্গীতকে বোঝার ও অনুভূতির ক্ষেত্রে রাগসৃষ্টি কেমন করে হোল ও কখন হোল এসব প্রশ্নের অবতারণা অবান্তর, কেননা ঐতিহাসিক জ্ঞানের চেয়ে সঙ্গীতকে বোঝার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও সাধনালব্ধ জ্ঞানেরই মূল্য বেশী। কাশীর ইতিহাস পড়া ও কাশীর সৃষ্টি করে থেকে এসব প্রশ্নের সার্থকতাই বা কোথা কাশী যে ব্যক্তিগতভাবে দর্শন করে কাশীসম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতা যে লাভ করেছে তার কাছে। এই যুক্তির অথবা প্রশ্নের প্রয়োগিকতা অবশ্য স্বীকার করতেই হবে, কিন্তু যুক্তি বা প্রশ্নের সপক্ষকল্পে একথাও আবার বলা যেতে পারে যে, বালরকৌশিকের যে রূপ আমাদের কাছে আজ সুপরিচিত তার সৃষ্টি কি বর্তমান সমাজেই সম্ভব হয়েছিল,—না অতীতেও ছিল এর বিকাশ এবং ক্রমবিবর্তনশীল সমাজের সৃষ্টি ও রুচি অতীতকে বরণ করেই তার মাঝে এনেছে এক নূতনতর রূপ। মর্মী শিল্পী ও শ্রোতার এখানেই তো প্রয়োজন অতীত ও বর্তমানের মধ্যে তুলনামূলক জ্ঞান লাভ করা এবং সেই জ্ঞান হয় প্রামাণিক ঐতিহাসিক দৃষ্টি যদি থাকে প্রসারিত। ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য অতীতকে বর্তমানের বুকে টেনে আনা এবং বর্তমানের সঙ্গে অতীতের যোগসূত্র রচনা করে মোটা একটি জ্ঞানের ধারা সৃষ্টি করা। ইতিহাসের দর্পণেই আমরা দেখি অতীতকে, মধ্যকে ও বর্তমানকে অবশ্য একটি অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে এবং সেই অভিজ্ঞতারই প্রয়োজন হয় সাঙ্গীতিক জ্ঞানের পক্ষে।

সাঙ্গীতিক জ্ঞানের প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় আমাদের জানা দরকার সেটি হোল সঙ্গীতে যাকে বলি আমরা ঔপপত্তিক বা থিওরী তা শুধু নির্জলা ব্যাকরণের রূপ নয়, ব্যাকরণের সঙ্গে সঙ্গে থাকে গানের সাহিত্য, ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, দর্শন প্রভৃতি। এদের বাদই শাস্ত্র এবং সাধনা এদের থেকে আলাদা। এরা সাধনার সহায়ক, এ জন্য সঙ্গীত সাধনাপ্রধান হোলেও সঙ্গীতের ঔপপত্তিক অংশের জ্ঞান অর্জন করতে হয় শিল্পীকে এবং শ্রোতাকেও। সাঙ্গীতিক উপাদান হোল ঔপপত্তিক অংশ। শ্রোতা যাঁরা তাদের শিল্পীদের মতো পুরোপুরি সাধনাত্মক জ্ঞানের প্রয়োজন না হোলেও মোটামুটি সাধনাংশের অভিজ্ঞতা তাঁদের মধ্যে থাকা চাই, তবেই ঠিক ঠিক সঙ্গীতের বোদ্ধা ও শ্রোতা হওয়া সম্ভব। সাঙ্গীতিক জ্ঞানই শিল্পী ও শ্রোতাকে ঠিক ঠিকভাবে সঙ্গীতের পথচারী করতে সক্ষম।

এখন প্রশ্ন হোতে পারে পুরোপুরী সাঙ্গীতিক জ্ঞানের অধিকারী না হোলেও কি শিল্পী ও শ্রোতা হওয়া সম্ভব নয়? কিন্তু তা হলেই কথা ওঠে যে মোটামুটি ও আউলোর জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা নিয়েও সঙ্গীতের ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করা যায় কিনা। সাধারণ ক্ষেত্রে হয়তো এই সম্ভবনাকে গ্রহণ করা যেতে পারে, কিন্তু জীবন-প্রসারতার ক্ষেত্রে এবং জীবনে সর্বোন্নতির ক্ষেত্রে মাঝারি বা মোটামুটি জ্ঞানের কোন সার্থকতাই থাকে না। ভারতীয় সঙ্গীত কোনদিনই কথা ও সুরের রসবিহীন কাঠামোকে নিয়ে সার্থক নয়। অধ্যাত্মজ্ঞানকামী ভারতবাসী কোনদিনই সঙ্গীতের কঙ্কালের পূজায় আত্মতুষ্ট নন, তিনি চান রাগরূপের কঙ্কালের রস ও ভাবসমৃদ্ধ রক্ত-মাংসের আধারে সুর-সরস্বতীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে। প্রাণের সঙ্গেই শিল্পীসাধকের চিরদিনের পরিচয়, প্রাণদেবতার আরাধনাই তার কাম্য। তাই সমগ্র জীবন-অভিজ্ঞতাকে শিল্পী চান প্রত্যক্ষ সাধনার সহকারী করতে, কেননা তারই প্রসাদে তিনি পাবেন তাঁর জীবন-দেবতার সন্ধান এবং সেই সন্ধানেই হবে তাঁর সাধনার চরিতার্থ লাভ। শ্রোতার পক্ষেও ঠিক ঐ এক কথা। সাঙ্গীতিক জ্ঞানই শিল্পী ও শ্রোতাকে সঙ্গীতের মর্ম-কথার সেই যথার্থ পরিচয়। ভারতে আজ সর্বত্র অভিজাত ও দেশীয় সঙ্গীতের অনুশীলন সুস্পষ্ট, তাই সঙ্গীত-সাধনায় যাঁরা পথচারী তাদের মধ্যে জাগ্রত হোক আশা ও আকাঙ্ক্ষা সাঙ্গীতিক জ্ঞানকে ঠিকভাবে জীবনে সফল করার জন্য। ভারতীয় সঙ্গীত আত্মসমাধির কোন দিনই নয়, শ্রম সাপেক্ষই তার সাধনা। তবে শ্রমের সঙ্গে, নিষ্ঠা ও পবিত্রতার সম্পর্কে আনে সঙ্গীত সিদ্ধির পথে সাফল্য।

তালের মাতাল

নীরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

যদিও বিভাস আর সন্তোষকে সাহিত্যকৃতিত্বের জন্য প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যকর্তা ব্যক্তিরা তেতটা আমল দেন তবু উৎসাহী 'এ্যাংরি ইয়ংম্যান' বলে তারা দারা-বহলে একটা প্রশ্রয়ের বেঞ্চি আদায় করে ছেড়েছে। ওরা আন্ত কথা বলে না, সামান্য পানসে বস্তুরা করা ওদের নীতির পরিপন্থী এবং লেখবার সময়ও তেমনি 'বলিষ্ঠ' 'লবিজোক্ত' Raw লেখাই ওদের রীতি। এর জন্য ওদের চাঁদা তুলে পাঁচক পত্রিকাই প্রকাশ করতে চাইছে। ওরা বলে—'আমরা মানি না—' কি ওরা মানে না? কেন! মানে না, মানে, মানা মানে যাক গে, ওদের চরিত্র বা আর চেষ্টা করে যখন তার মানতেই হবে, তখন—থাক। তার চেয়ে বিভাস আর সন্তোষের একটি সহজ গল্প বলি, তাতে যদি ওদের চরিত্রে একটা দিকে নোঙরাতি ফেলা যায়—!

শনিবার। বিকেল। চৈত্রশেষ। বৈশাখ, মানে এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহ!

বিভাস বিশুর বিরাট নিয়ে লাইট হাউসের একতলায় ঢুকল। বিনা-পয়সায় একটু শীতল কক্ষের আরাম, ব্যস, তা ছাড়া সন্তোষের সঙ্গে এখানেই দেখা হয়। নিত্য নয়, নিয়মিত: শনি এবং রবিবারে। অন্য তিনদিনে কফিহাউস।

সামনে, কাচের ফ্রেমে আটকানো ছবিতে আধাউলঙ্গ মেয়েটির দু'পায়ের মধ্যিখানে একটা আঙ্গিলা মাখা নজর দিয়ে মনে মনে সে বলল—যত্তো সব ছিনাল। আসলে তোমাদের সেই আদিম, বর্বর প্যাসন নেই আমি জানি। আমি জানি এদেশে তোমাদের মতো মেয়েরা উঁচু দেখিয়ে ধান-ভানতো, আর ওদেশে তোমরা পর্দার ছবি হয়ে পটীয়সী হও। থাকো তুমি কাচের ফ্রেমে ঠ্যাং তুলে। যেদিন এই বেয়ারা এসে কাচ খুলে তোমায় টেনে হিঁড়ে-খুঁড়ে বাতিল করবে সেদিন আর তোমার ওই কামনজংঘাকলাওটি চলবে না।

বিভাস আবিষ্কার করল তার মন যতই বক্রতাকু করুক না কেন চোখ দুটো অবাধ্য জানোয়ার হয়ে থাকবার

চাটুয়ে বেন। বুইলেন! ভালো আল-পাশে সম্ভোষ নেই। সে থাকলে ঠিক ধরে ফেলত, 'শালা!' বড় হৈ-হুল্লোড় করতে সম্ভোষের। বিভাস সন্তর্পণে চোখ তুলে এদিক-ওদিক দেখল। পাতারীর নীচে সম্ভোষটা গায়ের সঙ্গে লেপ্টে গেছে। শীতল-পাড়ার বাথানের অন্ধকারে দেহাতের অগ্নিপ্রত্যাশের ওঠা নামার চেয়ে সরকার ভালো এইটি সংখ্যাতত্ত্বী এক বলক সুস্থ বাতাস ফেলে রেখে সন্তর্পণে উঠে গেল। সম্ভোষ যদি এসে পড়ে তাহলে লুকিয়ে নিলে এক চোট খিস্তি করা যেত। চটে গেল বিভাস, তামাম দুনিয়ার ওপর চটল। কেন না এক-একা মনে মনে বিস্তি ভনে না, রতির বিকল্প, কতকটা অপ্রাকৃতিকের মতোই গ্যাসফ মুক্তি।

শিউন থেকে একটা চাপ অনুভব করল বিভাস। মুখ ফিরিয়ে এক রত্না অশ্লীল মন্তব্য খালাস করে বলল—চলু একটু ঠাণ্ডা হয়ে নে ওরা থাক, তারপর রাঁধবানী গিয়ে অতীন সাহুর সিস্টেম ফেলার করা।

সম্ভোষ একটা চারমিনার এগিয়ে দিয়ে কি যেন বলতে গিয়ে বাধা পেল, একটি সন্তরণ-ছটার মতো গিরোলিনী মেয়ে তাকে দেখে হাত তুলে নমস্কার করে এগিয়ে এল—এই যে সন্তোষবাবু! আপনাকে এভাবে পেয়ে যাবো আশা করি নি।

—কেন? আপনি কি আমাকে পাবার কথা ভেবে ছিলেন নাকি!

বিভাস অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে কথাগুলো পাকা ছেলের মতো শুনছে। কণ্ঠস্বরে আবেদন রয়েছে মেয়েটির। ভালো গাইতে পারে নাকি?...কি বলল? কাল সন্ধ্যেবেলা দেখা করতে! আচ্ছা। সন্তোষের পরিচিত মেয়ে মহলের স্টক বিভাসের জানা আছে। কিন্তু এটি সে লিস্টের বাইরে। আরো একটা মজার ব্যাপার; বিভাসের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছে না: 'ছোটলোক'।...

আর কয়েকটি মিনিটের মধ্যে বিভাসের বিরক্তি বিদ্বেষের মালিন্যে ঘুরে হ'ল।

সন্তোষ মেয়েটিকে হাসি মুখে বিদায় দিয়ে সিগারেট বাড়িয়ে দিল। বিভাস নিল, বলল—নেহাত ভদ্দরলোকের ছেলে তাই হাত-পেতে নিলুম। নেমন্তনের সঙ্গে—

সন্তোষ হো হো হেসে জবাব দিল—ক্যালো কুকুরের মতো ভেতে আসছ, তার আগে বিস্তান্তটাই বলতে দাও।

—থাক আমার আগ্রহ দরকার নেই।

—মাইরী তোর গা-ছুঁয়ে বলতে পারি, ওর নামও জানি নে। আর সেই যেদিন তুই বুলেবারাপুরের মীটিং করতে গেলি সেই সন্ধ্যেতেই হরিপদ ধরে নিয়ে গেল, বললে, দত্তুর মতো ভালো আবৃত্তি করে, এ্যাকট্রেস, একটু-আধটু সিনেমাও মাঝে মাঝে ছবিতে থাকে। তা গিয়ে ফ্যাসাদে পড়লাম, টাকা ত নিলই না—চালাও নিরন্তর, আমাকে যেতে হবে, ওর লাইফস্টোরি শুনতে হবে, আর, ওর লেখা গল্পও শুনতে হবে।

বিভাস হো-হো করে হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে বলল—তা'লে ওখানেও যাও! কালে কালে হ'ল কি হে! রসের নাগরীতে গাধী পিটছে! হ্যাঃ—তা ভাল খাচ্ছ ত!

—তুই ফেলেছিস, পাগলীর লেখা গল্প শুনতে হবে। আসল মালেই কাঁকি। তা তোর যদি মনে লেগে থাকে তুই যেতে পারিস। ব-লাইকের ক্রেতার।

—বাট্! বেচারী হাঁ করে তোমার জন্য বসে থাকবে।

—থাক না। প্রেমকে আমি বড় ভেট্ করি, তুমি জানো ওই আঠার মতো চটচটে কারেন্সী পেয়ে লাইফটাই ম্যাডাম্যাস্কার করে দেবে। সেদিন বিয়ে-থা জানা-শোনা। হুদ্দ হালাখান। প্লাট ইজ্ নো লাইফ। আমার জন্ম, বিন্দু পরদা করার জন্য, ডন্টা-ডর্ন্টি, ড্যান্ড্রাফ, বদ্দিমিয়ানীর মতো, সাম্ থিং লাইক লাইফ ফাইভ! এই সব শ্যাওলাদের ছাতাপড়া ব্যাঙের ছাতা—ছোঃ!

বিভাস বলল—এনাফ। চলো একটু গলা ভিজিয়ে রাঁধবানী যাবো।

—কিন্তু তার আগে একটা ক্রিক দেখার চান্স দিলে কেমন হয়।

বিভাস ভুরু কুঁচকিয়ে বলল—নন্‌সেন্স! তুই বড় বাজে সময় পিচিয়ে ফেলিস বেচো।

এ্যাকচুয়ারে বাজে নয়। কখনো প্রাইজ দেখি নি, তাই নিতাইদাকে বললুম। সেও হাজির থাকবে।

—কোথায়?

—ইণ্টারন্যাশনাল ইস্কুলে।

—ব্যাৎ! মেয়েদের ইস্কুল?

—তা ত জানিনে। তবে প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনের

গল্প খাওয়াদাওয়া ও রয়েছে এপার ওপার সমান।

—আরে সন্তোষ শেষে শরৎবাবুর নভেলের নায়কের মতো তোরও লুচি বেগুনভাজাতেই মন ভরে গেল! হায়, হায়! ইস্কুলের প্রাইজে যাচ্ছিস, ওর পর বিয়েতে হাসতেও—

—আরে তাই হয় নাকি। ইস্কুলের প্রাইজ নয়, সাহিত্যিকদের প্রাইজ দেবে নিউজ পেপারের তরফ থেকে।

—আই সী! তাই বলো। তা সেখানেও ইনভিটেশন কার্ড লাগে।

তাতে কি আমরা যাবো। কে রোখে দেখাই যাক না।

এটা মন্দ নয়। না হয় একটা হৈ চৈ লাগানো যাবে। ব্যাপারটা তোমার চেনা?

সন্তোষ ঘাড় কাৎ করে জবাব দিল—মোটামুটি একটা আন্দাজ আছে, মডেল দিলেই কাজকারবার হবে। তা ছাড়া বাংলা দেশের চাই-কুনড়োরা যাবে ত গাড়ির ভাই দেখলেই মালুম পাওয়া যাবে।

একটা পাইট নিয়ে দুজনে ভাগাভাগি করে বাঁয়ার দিয়ে গলা ভিজিয়ে ওরা দুজনে উঠে পড়ল। প্রাইজের আসরে যেতে হবে।

নেহাতই একটা স্কুল বাড়ি। গেট আগলে একটিও পেয়াদা নেই। কেউ কার্ড দেখতে চাইল না। সন্তোষ আর বিভাস পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। তাদের চোখে ব্যঙ্গভরা নিষ্প্রভ ম্লানিমা। চাপা গলায় বিভাস বলল—'আস্কা' ফাঁসালেই পড়া গেল। এ কি রকম নিয়ম, এবার চাপরাশও পর্যন্ত করল না?

সন্তোষ হাসল—চিনে ফেলেছে, গেটে দুনীতি সরকারের নেজ ছেলেটা বাঁড়িয়ে ছিল, গল্পের বই ছাপার জন্যে অনেকবার ওর কাছে গিয়েছি যে—

হল ঘরে ঢুকে ওরা একটা ফাঁকা টেবিল খুঁজতে লাগল। বসবার জন্যে সারি সারি চেয়ার নয়, এক একখানি চৌকো টেবিলকে ঘিরে চার দিকে চারখানি চেয়ার। অপর প্রান্তে 'আয়াদাঁটি নিচু এবং অপরিসর—সার'ক ভাবে আহারের কাজের জন্যই এই অস্থায়ী ব্যবস্থা।

প্রায় সবাইকেই সন্তোষ আর বিভাস চেনে। তা বলে সবাই ওদের চেনেন না। ওরা অনেকের কাছেই অপরিচিত। আর যে কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে তাঁরা আজ ওদের দেখতেই পাচ্ছেন না।

বিভাস বলল—কেবল সাহিত্যিকই নয়, এখানে দেখছি কাগজওয়ালারাও আছিস। সন্তোষ ঘাড় কাৎ করে জবাব দিল—আরে, খবরের কাগজগুলোই ত প্রাইজ দিচ্ছে।

—যাক, সেটা আমার জানা আছে। 'মানেচ্ছে' বাবু একজন কাগজের দোকানদার, ওরে গড্ডল, পাকা-কাগজ। জানো, একবার আমি কাগজ কিনতে গেছি, বিলাপাতি ভুল করার জন্যে মানেচ্ছে বাবুকে বললাম 'ভাবিতার বই ছাপবো, জানেন ত ওতে সবটাই লোকসান, সস্তায় দিন—বললে কি জানো? বললে, 'মানেচ্ছে, ওতে মানেচ্ছে কোবতে যাবার পওয়া বন্ট না করে একটু দুরে যাও সেই পওয়ায়। মানেচ্ছে 'হোরা-বলা শালিকের মতো চ্যাচরাটা মেরামত করে নাও বাপু। মানেচ্ছে তা'লেই কোবতে রোগ সেরে যাবে, মানেচ্ছে! কোবতের জন্যে মানেচ্ছে ব্লাডের দর লাগবে।'

সন্তোষ বলল—কে? কোনটা তোমার মানেচ্ছেবাবু? চিনে রাখি।

ওই যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডান দিকে বসে মহাবীর সরকারের সঙ্গে কথা বলছে!

—আরে ওই তোমার মানেচ্ছে! ওকেও আমরা বাই সরকার বলি, যখনই এ্যাণ্টিক চাও, জবাব। টাকা দিয়ে দালাল মারফৎ কেনো, কাগজ পাবে। পাছে ধার বাকীতে কাগজ কিনি, সেইজন্যে।

ছাপাখানার লোক, ট্রাক সেকার, খবরের কাগজ এবং প্রকাশক মহলেরও অনেক তা-বড় আমলা আর সাহিত্যিক আর অনেক মহিলা সভা শোভা করেছেন।

বেয়ারার সেবায় গম্ভীর সন্তোষ বলল—এরা সব পাঠিকা। ভ্যানিটি ব্যাগ অটোগ্রাফের খাতা রয়েছে।

গুন গুন গুঞ্জনের মধ্যেই সভার কাজ শুরু হয়ে গেল।

এখানে বলে রাখা ভালো যে, খবরের কাগজের দেখক কর্মচারী এবং খাতকদের উপর এক ভদ্রলোক সরকারী হুকুকী-দুকুকী চালে কর্তৃত্বকারী করেন। পৈতৃক নামের পরিবর্তে ওয়াকেবহাল মহলে এই ভদ্রলোককে আখ্যা দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার বলেই উল্লেখ করে থাকে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার। বাজখাঁই গলায় ঘোষণা করে উক্ত

সরকার মশাই বললেন—আমি প্রস্তাব করি আজকের এই সভার ভারাচাঁদ চট্টোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করুন।

সমর্থন পর্ব চুকল।

তারপর উদ্বোধন সংগীত শুরু হল। গুজন কিন্তু বাজল না। এক এক জন ভিপ আসেন আর এক পঞ্চম সোরগোল ওঠে। অবশ্য সভাপতির বক্তৃতার সময় হট্টগোল কম ছিল। আসল কাজ পুরস্কার।

কাঁধে গোসাপটী চাদর, বেশ সুদর্শন এক ভদ্রলোক মাইক ধরল করে সভাপতির পাশে দাঁড়িয়ে আখরোট কাঠের একটি করে ছোট বাক্স এগিয়ে দিচ্ছেন, প্রাপকের নাম ঘোষণা করছেন। এবং পুরস্কার প্রাপ্ত সাহিত্যিক বাক্সটি হাতে নিয়ে নমস্কার করবার পর, সুদর্শন ব্যক্তিটি বলছেন—'এই পুরস্কারের মর্যাদা এক হাজার টাকা।'

কবিতার জন্য পুরস্কারটির 'মর্যাদা' পঁচিশ টাকা শুনে সন্তোষ বলল—শালা, কবিতার মর্যাদাই ফাক। ভাগ্যে হরি ঠাকুর বেঁচে নেই।

বিভাস গজরাতে লাগল—বেকুবের কাণ্ড ছাখো, পুরস্কারের মর্যাদা বাড়ছে টাকা দিয়ে। এই না হলে—

সে উঠে দাঁড়াল। তার চোখে মুখে ভাস্কর ভাব।

সন্তোষ ব্যস্ত হাতে বিভাসের পাঞ্জাবী আঁকড়ে ধরে বলল—এাই, বস, কি হচ্ছে!

—না, বসব না। এরকম অপমান বরদাস্ত করা চলে না।

এবার তার কাঁধে চাপ দিয়ে সন্তোষ বসিয়ে বলল—এ বছরটা যেতে দে। যখন তুই প্রাইজ পাবি তখন—

—মাইরী বাংলা দেশে এ এক নতুন তামাশা শুরু হয়েছে। আটখানা দোকান আর একখানা সেন্ট্রাল প্রাইজ—বেঁচে থাকলে দেখা বন্ধ না করলে প্রাইজের হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। চল আর এখানে বসব না, টালীগঞ্জে যাই।

—দাঁড়া আর একটু দেখে নিই।

—বুঝেছি তোর লোভ আছে প্রাইজের ওপর।

—না, মানে, শালা এক হাজার টাকা কুড়িয়ে পাওয়া গেলে কষিন কুতিটা জবরে।

পুরস্কার বিতরণ খতম হল।

বিভাস বলল—এবার পুরস্কার পাওয়া সাহিত্যিকরা কি শোনান দেখা যাক।

কিন্তু তাঁদের কোনো কথা বলতেই দেওয়া হল না। সিধে ধন্যবাদের পালা।

—শোন শোন ভৌনবাবু কি বলেন।

সন্তোষের খাতিরে বিভাস চুপ করল। ভৌনেন্দু নাথ ঠাকুরের কথা বলার আইটা সে পছন্দ করে।

ভৌনেন্দু নাথ শুরু করলেন—এখানে এসিছিলুম একটু বলে দুটি কথা শুনবো বলে। কিন্তু সভার কর্তাব্যক্তিরা ছাড়লেন না. দুটি কথা আমায় বলতেই হবে। তাঁরা আমার ঘাড়ে সভাপতিকে ধন্যবাদ দেওয়ার দায়িত্ব চাপিয়েছেন। এখন দুটি কথা না বললে ছাড়ান নেই। শান্তিতে চুপ করে থাকবার জো'টি নেই। ঢেঁকীর দশাই এই—

অস্থিরভাবে মেঝেতে জুতো ঘষে বিভাস মন্তব্য করল—ন্যাকো একবার, সভার তরফ থেকে ধন্যবাদ দিচ্ছেন যেন ঘর থেকে দশ হাজার টাকা দান করছেন। কারুর কি একটু শোভনতা, সৌজন্য নেই।

চলল ঠাকুরবাড়ির পুরানো কালের দক্ষিণের বারান্দার গল্প, আড্ডা আর মৈঠকের সুললিত বর্ণনা সাত আট মিনিট ধরে। তারপর আমেরিকা, রাশিয়ার প্রসঙ্গ—।

বিভাস উঠে দাঁড়াল—সন্তোষ তুমি ভাই বস আমি উঠি। সভাপতির কপালে ধন্যবাদ আজ আর জুটবে না। আপনার ঢাকই সবাই পেটাতে ওস্তাদ।

অনেক অনুনয় বিনয় করেও সন্তোষ তার বন্ধুকে ঠেকিয়ে রাখতে পারল না। অগত্যা তাকেও উঠে পড়তে হল। হলের বাইরে একটা বিরাট উঠোনে অনেকগুলি মানুষ এধার-ওধার ছড়িয়ে রয়েছে। আন্দাজে জরীপ করল সন্তোষ, হলের ভেতরে হয়তো এর চেয়ে জনসংখ্যা কমই হবে। একদিকের দেয়াল ঘেঁষে সারি দিয়ে জন কয়েক পরে বিপন্ন মুখ করে দাঁড়িয়ে, দুজন ফোটোগ্রাফার ক্যামেরা বাগিয়ে তাক করছে, শিকারের মুহূর্তের। সকলের পিছন থেকে হাঁ হাঁ করে ছুটে এলেন 'পশ্চিমবঙ্গ সরকার—আপনারা সব মাটি করবেন চীনে-বাজার পত্রিকার প্রাইজ আগে ডিক্লেয়ার করা হয়েছিল, সেটা ভুলে গেলে সিনিয়রিটি বজায় থাকবে না। চীনে বাজারের এ্যাকাউণ্টে যে তিনজন প্রাইজ পেয়েছেন তাঁরা আগে দাঁড়াবেন, তারপর শ্রীগৌরাঙ্গমতি

পত্রিকার প্রাইজ উইনারেরা সব হাঁড়িয়ে যান। অর্ডার বলে একটা কথা আছে ত!

সার্কাসের মতো একজন বশম্বদ বিনয়ী-প্যাড্ বললেন—আপনার স্যার ট্রেন আছে!

বলা বাহুল্য ইনি চীনেবাজার সৈনিকপত্রের উমেশচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন।

ওপাশ থেকে শ্রীগৌরাঙ্গ পত্রিকার পঙ্কেন্দুবালিনী স্মৃতি পুরস্কার প্রাপ্ত মহাপতিবাবু বললেন—আচ্ছা সরকার মশাই কোনদিক থেকে সাহিত্য প্রথম ধরা হবে? মানে শুরু—

সরকার মশাই লাইব্রেরী-ক্লেনের চশমাটা হাতে নিয়ে খদ্দরের পাঞ্জাবীর আচিলে, ঘসতে ঘসতে বলে দিলেন ফোটোগ্রাফারকে—নেবে দিন মশাই। ফায়ার—

বিভাস হো-হো শব্দে হেসে উঠল—ধন্যবাদ জ্ঞাপনের চেয়ে এটা অনেক জনপ্রিয়। থ্যাঙ্কু মিস্টার সরকার। ছবি ত বাংলা খবরের কাগজেই ছাপা হবে! কাউকে চেনা যাবে না

'পশ্চিমবঙ্গ' সরকার পিছন ফিরে দেখে বললেন—আপনারা না খেয়ে চলে যাচ্ছেন নাকি! দাঁড়ান—

—মাফ করবেন।

বলেই সন্তোষের হাত ধরে হিড়-হিড় করে টেনে পথের ওপর এনে ফেলে বিভাস বলল—উঃ, আচ্ছা ফাঁড়ায় পড়া গেছিল।

সন্তোষ জিভ দিয়ে ঠোঁটের নোনতা ঘামটা মুছে বলল—কাট্‌' ক্লাস কাটলেট আর সিঙ্গাড়া ছিল কিন্তু—

থাক. ওদিকে বাঁশবনীর রিহার্সেলটাই মাটি। আজ ট্রাই করতে হবে, যদি অতীন আজ কাল্‌ না হয়—হাতে মাত্তর কালকের দিনটি সময়।

—কেন? কাল, পরশু, যে কোনো দিনই ত হতে পারে।

বিভাস মাথা নাড়ল—তোমার যেমন বুদ্ধি! অতীনের ওয়াইফ পরশু হাজারীবাগ গেছে, কাল বাদ পরশু আবার ফিরে আসবে। তখন ইমপসিবল্—

—অতীন যায় নি?

না ঘরে—বসে বসে আঙুল চুষছে আর ছেলের কাছে খিঁচুনী খাচ্ছে।

—আই সী! ওর সেই সিস্টার-ইন-ল আছে ত।

বিভাস বুড়ো আঙুল উঁচিয়ে 'কচিকলা' ইঙ্গিতে জবাব দিল। তাদের সামনে কয়েকটি কলকণ্ঠমুখরা মেয়ে তানপুরা বগলে করে রাস্তা আগলে দাঁড়িয়ে। কোনো মিউজিক স্কুল আছে খুবই কাছেই।

ঠুং ঠাং রিকশার সারেঙ্গী শুনে সন্তোষ ফুটপাথ ধরে চলতে শুরু করল। বিভাস আড় চোখে মেয়েগুলির 'আপাদ চক্ষু' জরীপ করে সিগারেটের জন্য পকেটে হাত দিল।

সন্তোষ হাত পাতল। তারপর তাহিকে চোখ কুঁচকে বললে—তা হলে—এই হল সোল্ডেন অপরচুনিটি। শালা অতীন এখন ক্রাইসিসে তাজা পাঁপরখানি হয়ে আছে। দু-এক পেগ গিলিয়ে দিতে পারলেই কেল্লা ফতে! পেটের কথা চুরমার হয়ে বেরিয়ে পড়বে!

বিভাস আগুন ফালিয়ে জবাব দিল—তা আর বলতে! তাজা দগদগে ঘা গুলো দেখা যাবে। মাইরী এর চেয়ে রিয়াল লাইফ স্টোরী খুঁজে বার করতে পারবে না। ও শালা কস্মিন্‌ কালে বই ছোঁয় নি, ওর দৌড় ওই জর্দা পান পর্যন্ত, দু-পয়সার বুরোদ। বল কি গেলানো যাবে!

—সে ভার আমার ওপর ছেড়ে দাও। বৌ ত নেই যে!

আফশোসের সুরে বিভাস হাওয়ায় ধোঁয়া ছেড়ে বলল—হুঁ! কিন্তু ও রকম মেয়েকে পটানো কি করে? আমি ত ভেবেই পাই না। বিদ্যে, বুদ্ধি, হিম্মৎ, মুরোদ কোনো দিক দিয়েই ত মেলে না।

সন্তোষ হাওয়ায় হাত ঝুঁড়ে বলে—দাও, এখন বলো, সীতা কার পিতা! আরে পাঁটা! মহাকবি সেক্সপীয়রই ত বলেছেন—

—কী বলেছেন সেক্সপীয়র? শুনি।

—মানে, বিউটি দি বীস্ট! অর্থাৎ কি না হবে তোমার ওয়াইফটা হচ্ছে সেই সুন্দরী অ্যাস্ট্রবী আর বীজগণিতের পরীক্ষাতে অতীন হল এ্যাস্ত, এই অতীন নামক এ্যাস্তটি ব্রাকেটের বাইরে। বুঝলে পন্টক! ব্র্যাকেটে রইল ওয়াইফের বিউটি আর রইলেন তিনি, যাঁর সঙ্গে হাজারীবাগে হাওয়া খেতে যান ওয়াইফটি।

বিভাস দাঁত খিঁচিয়ে বলল—সব ব্যাপারে চ্যাংড়ামী ভালো লাগে না। এটা তোমার কস্টিনস্টির সাবজেক্ট

নয়। অতীনের হাত ধরিয়া বসিয়া দিয়া যে প্রশ্নটা [illegible] তোমার লাল রাস্তাদের দিলে কেউ চৌচির হয়ে যাবে, এই বলে দিলাম। কাটকে না পোষে ত আমায় বল কেটে দিও।

সন্তোষ নাক কুঁচকে বলল—কেবল হটবং হটবং গাইটেই মাতাল যে তুই! ওখানে কাটলেট বিলাড়া সঙ্গে সব ভাজাভুজি করে চেয়ে রইল—গায়ে হাত ঠেকাতে দিলে না। এখন নিজের চীনে বাদামের বন্দোবস্ত করো, নইলে বাদা কাটিয়ে দেবো।

বিভাস হাসিল। পকেটে হাত দিয়ে যা উঠল সন্তোষের হাতে দিয়ে বলল—যাও, আর জ্বালিয়ো না। ওর পর অতীনের পিছনে যে কতো খরচ তার ঠিক কি।

অতীন লজ্জায় হেসে কেউ কল্পনাই করতে পারবে না যে তার মনটা সমুদ্রের মত অতল, তোমার অজানা রহস্য। পরস্পরা অত্যন্ত সাধারণ চেহারার ছোকরাটা মহাকবির সঙ্গে। কথা বলতে গেলে যেমন ভয়ার্ত কুণ্ঠিত দেখায় তার কণ্ঠস্বর।

বিভাস আর সন্তোষকে চা'য়ের চক্রে দেখে সে অসহায় ভাবে বলল—আজ আমার এত বড় সৌভাগ্য, একসঙ্গে আপনাদের মতো এতোজোড়া সাহিত্যিক আমাদের ঘরে, কিন্তু—কিন্তু—কিন্তু বেবী যে বাড়িতে নেই। সে শুনলে খুব রাগ করবে।

—কেন?

বিভাসের প্রশ্নে অতীন বিব্রত হল।

বাস্ত তাকে বলল—আপনারা বসুন, চা টা একটু হোক। কিন্তু বেবী—

সন্তোষ বলল—ব্যস্ত হচ্ছেন কেন। আমরা জানি আপনার কি কষ্ট।

বিভাস জোগান দিল—দ্যাখো বন্ধু, সত্যি কথা বলতেই এতদূরে তেড়ে আসা। তুমি জানো আমরা সমাজের জং-ধরা চটাওঠা সংস্কারের টুঁটি টিপে শেষ করে দেবার ব্রত নিয়ে কলম খাড়া রেখেছি।

ঘাড় বাঁকা মাটিতে প্রায় লুটিয়ে দিয়ে অতীন বলল—ও সারটেনলি। আপনাদের কতো সুবিধে, আপনারা লিখতে পারেন। আমি যদি পারতাম, তা হলে—

দীর্ঘশ্বাস ফেলে অতীন ঘরের পাখার দিকে তাকাল। পরক্ষণে বলল—যাক, এবার চায়ের দিকে করি।

—নো! আমরা তোমার বাড়িটাকে রেস্তোরাঁ গণ্য করি না। তা ছাড়া তোমার বেবী নেই।

—তা অবিশ্যি নেই। তবে আমি করেছি।

সন্তোষ ফোড়ন কাটল—সাড়ী দু-পাট করে লুঙ্গী হিসেবে পরলেও আপনাকে কেউ আপনার বেটারহাফ্ বলে ঠাওরাবে না মিস্টার বসু।

অতীন করুণ দৃষ্টিতে আপন পরিচিত বাসন্তী খানা দেখল। বিভাস কটু করে বলল—এই মাটিতে নূতন হয়েছিল হাত গড়াগড়ি। তা তোমার সেই রঙ্গিনীটি কোথায় গেলেন?

অতীন চুপ করে রইল।

সন্তোষ প্রশ্ন করল—কি হল বলাই! গুম্ মেরে যে—

—থাক ওসব কথা। আসুন একটু গল্প গুজব করি। এখন কোথা থেকে আসছেন বলুন।

বিভাস অতীনের হাত চেপে ধরল—দ্যাখো বন্ধু মায়ের কাছে মামুলোবাজী করতে এস না। সিধে মত খোলসা করে কথা বলবে ত বলো, নইলে চল্লাম।

অতীনের চোখের কোণে জলের আভাস, সে বোজা গলায় ভিজে ভিজে দুটি কথা উচ্চারণ করল—

আমি। আমি ডিভোর্স স্যুট করব, নইলে সুইসাইড—

বিভাসের দিকে অর্থ পূর্ণ দৃষ্টিতে সন্তোষ তাকাল।

বিভাস তার পিঠে হাত রেখে সান্ত্বনা দিল—তুমি ছেড়ো না ভাই, হাল ছেড়ো না।

—অসম্ভব, আপনি যদি আমার দশায় পড়তেন তা হলে এ কথা বলতে পারতেন না বিভাস দা।

সন্তোষের গলায় মোটা বক্তৃতার ওজস্বিতা, সে বলল দা, বরদোস্ত করা বিষ্ণু নয়। কিন্তু, ব্যাপারটা কি, একটু না জানলে ত ওরে আউট চিন্তা করা যাচ্ছে না মিস্টার বসু।

দুই মুঠোতে চুলের ঝাঁকি ধরে অতীন মাথা নাড়ল—না, পারব না। আমি বলতে পারব না।

বিভাস মাথা নাড়ল—ছিঃ, এ সব কি বলবার মতো কথা! তুমি বিছুতেই বল না—

—কিন্তু বিভাস দা আমি যে আর সইতে পারছি না। বেবী আমার বেবী—

—আপনি দেবদাস পড়েছেন দা অতীনবাবু!

সন্তোষ আনমোনে কথাটা উচ্চারণ করল।

—আমি! দেবদাস দশ বার পড়েছি। পঞ্চাশ বার সিনেমাতে দেখেছি, তার মধ্যে তেতাল্লিশ বার বেবীর সঙ্গে।

…প্রশ্ন করল সন্তোষ বিয়ের আগে না পরে?

…আগে মাত্র সাত বার।

সন্তোষ বিজ্ঞ ভাবে ঘাড় নাড়ল দু'।

কৌতূহলী অতীন জিজ্ঞেস করল…আপনি কি কিছু একটা ক্লু পেয়েছেন সন্তোষবাবু? অমন করে দু' করলেন যে—

—ক্লু? হাঁ তা বলতে পারেন। আচ্ছা কয়েকটা প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর দেবেন?

বিভাস বাধা দিল—বেচারী একেই নিজের জ্বালায় ভুগছে—এর ওপর তুমি আবার পুলিশের মতো জেরা শুরু করে দিলে সন্তু।

অপ্রস্তুত সন্তোষ জবাব দিল না। গম্ভীর ভাবে সিগারেটে ধরিয়ে টানতে লাগল।

অধীর অতীন অনুকূল ভাবে বলল—আপনি বিভাসদার কথা গায়ে মাখবেন না সন্তোষবাবু। উনি আমাকে স্নেহ করেন, কিন্তু বেবীকে ভালোবাসেন। বেবীর নামে নিন্দে উনি সইতে পারেন না। অথচ বেবীর নামে নিন্দে করতে আমার কলিজা ফেটে রক্ত ঝরে। নিন্দে আমি করি না। যা সত্যি তার ওয়ান পার্সেন্ট মুখ ফুটে বেরিয়ে যায়।

সন্তোষ মাথায় হাত দিয়ে মাটিতে বসে পড়ল—বাই জোভ্, পনেরো ওয়ান পার্সেন্ট! তাই বলো। বেরেছে! এভাবে বেশি দিন চালালে আর দেখতে হবে না—

ভীত অতীন খাঁ চত্রে বলল—ক্যা—ক্যা ক্যানো?

—সেটা নেহাতই শুনতে চান?

—নিশ্চয়ই!

—মানে, আপনাকে আর সুইসাইড্ করবার জন্যে ব্যস্ত হতে হবে না। চাপা মানসিক ইরে, মানে অবদমনের রিঅ্যাকশনে হয় আপনি পাগল, আর না হলে ক্যান্সারে—

তাকে কথা শেষ করতে দিল না বিভাস। হঠাৎ গর্জে উঠল—তুমি থামো সন্তোষ। ওসব থিওরি পুরনো হয়ে গেছে। ফ্রয়েড, ইয়ুঙ্গ, কি এ্যাডলার আজকাল ব্যাকডেটেড্। কিনসেও পরের লেটেস্ট থিওরি বলছে,—সে এরকম ক্ষেত্রে মানুষ যে কি করবে তা সঠিক নির্ণয় করা শক্ত তবে দেখা গেছে প্রায় ফাইনাল্ সল্যুশন হিসেবে থার্ড পার্সেন্ট কেসে সে তার মোস্ট বিলাভেড্কে মার্ডার—

বিকট চিৎকারে অতীন বক্তব্য শেষ করতে দিল না—না—না—অসম্ভব!

বলেই সে ঠক্ঠক্ করে কাঁপতে লাগল।

বিভাস সান্ত্বনা দিল—আহা তুমি অতো উতলা হচ্ছ কেন। শতকরা বাকী পঞ্চাশের মধ্যে তুমি পড়তে পারো ত।

সন্তোষ আড় চোখে অতীনের মুখখানা দেখে নিয়ে বিভাসকে ইশারায় কি যেন বোঝাতে চাইল। বিভাস উঠে দাঁড়াল—আচ্ছা আমরা এখন আসি ভাই। তোমার চিন্তার কোনো কারণ নেই, এযুগের মহৌষধ মহর্ষি বৈপায়ন থেকে শুরু করে সেণ্ট নিকোলাস্ অবধি সকলেই এ নিয়ে গবেষণা করে একটি মাত্র রেমেডি আবিষ্কার করে মানব সমাজকে দিয়ে গেছেন। আমাদের দেশের আশঙ্কিত সমাজও সেই আর্য ব্যবস্থার আশ্রয় নিয়ে দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছে। থাকগে, তোমার বেবী ত এখনো ফিরল না, দেখা—

অতীন অকূল পাথারে পড়ল—আপনারা আমাকে এভাবে ফেলে চলে যাবেন না, দোহাই দাদারা। আমার কেউ নেই।

বিভাস বলল—ছিঃ, অমন কথা বলতে নেই অতনু! তুমি পুরুষ মানুষ একথা ভুললে চলবে কেন?

—অতনু নামটা মরে গেছে দাদা, ও নাম ভুলেও মুখে আনবেন না। নইলে আজ বেবী মধ্যবিত্তের কাছের দোহাই পেড়ে বম্বাতের হিলম্যানে চড়ে, হাজারীবাগে যায়! ও, হো-হো-হো:

সন্তোষ অতীনের হাত ধরল। অতীন সামলে নিল—ছিঃ, এসব আমি কি বলছি!

বিভাস একটু জোর গলায় স্বগতোক্তি করল—হাউ নোব্‌ল্!

সন্তোষ অত্যন্ত অন্তরঙ্গ সুরে অতনুকে উপদেশ দিল—দেবদাসের মতো মদ ধরা দরকার আপনার বুঝলেন অতনুবাবু।

—মদ? না, না, ওটা বলবেন না দাদা।

—জানতাম এছাড়া আপনি অন্য জবাব দিতেই পারেন না। তাই এতক্ষণ বলি কিন্তু কিন্তু ইত্যাদি অনুলি হেমেডি—

—সর্বনাশ। বেবী যদি জানতে পারে তাহলে—

তার পরের ইতিহাস আলোচনার কোনো প্রয়োজন নেই। ওরা তিন জনে যে চ্যাম্পি করে রওনা হল, বিশুদ্ধ মদের দোকানে না ঢুকে নাচ গান পানের সেরা সোনা হোটেলে ঢুকল বা দু-তিন পেগ টানবার পরও অতীন বেহেড্ মাতাল হল না—এসব আমাদের না জানালেও চলবে। বা একথা বলার দরকার নেই যে, অতীনের পেটের সব কথা শুনে নেওয়ার পর আজিল্য ভরে তাকে ট্রাম ধরে বাড়ি যেতে হুকুম করে বিভাস। আর অতীন সদর স্ট্রীটের কাছাকাছি একটা বাড়িতে ঢুকে পড়ল। কেন না, আমাদের কাহিনীর পক্ষে ওগুলি (অবান্তর না হলেও) অবান্তর। আমাদের মূল প্রতিপাদ্য ছিল, বিভাস আর সন্তোষের চরিত্রের একটি দিকে মোনরাতি ফেলার চেষ্টা, সোনা চরিত্রের ঘটনাটি বলতে বসলে আমার ধৈর্যের কথা বাদ দিলেও পাঠকের সহনশীলতার প্রশ্নটা ত আর ফেলে দেওয়া চলে না। অতএব আমাদের লক্ষ্যরেখা ধরেই চলা ভালো।

রাত প্রায় বারোটা বাজে। বেড রোডের সামনে চৌরঙ্গীর চওড়া ফুটপাথটার অজস্র হাওয়া আর অসীম হেমন্তে নিস্তব্ধতা।

সন্তোষ আকাশের দিকে হাত ছুঁড়ে দিয়ে বলল—অতীনের বৌ, শালী, মদন আর বিভাস এদের সবাইকে জড়িয়ে একখানা দারুণ উপন্যাস যা জমবে।

বিভাস জড়ান গলায় ডাকল—সন্তা—আ—

—নেঃ সিগ্রেট নে।

—না নেবো না।

—নে বলছি।

বিভাস নিল না। সন্তোষ তার হাতে গুঁজে দিতে গেল জোর করে। সিগারেটটা মাটিতে পড়ে গড়িয়ে গেল। বিভাস গম্ভীর ভাবে মাটি থেকে সেটা কুড়িয়ে নিয়ে ঠোঁটে গুঁজল। তারপর আস্তে বলল—অতীনের মোটিভেশানে যদি কখন ঠোকরেছে ত তোমার হাত খোঁজা করে দেবো! শালা চালাকির জায়গা পাওনি! আমার কপিরাইট—

সন্তোষ বুক ঠুকে জবাব দিল—কোন শালা আমার রোখে! আজ শেষ পর্যন্ত মালের কড়ি কে জুগিয়েছে। যা কিছু আসল যা তা ত শেষের দিকেই—

—দ্যাখ খুব খারাপ হচ্ছে!

—বেশ তাহলে তুমি সোভার দিক নিয়ে লেখো, আমি শেষের—

বিভাস হঠাৎ সন্তোষের পাঞ্জাবীর কাঁধ খিমচে ধরে বলল—বরদোয়! লেখা একটা স্যাংটিফাইড্ ব্যাপার।

—আঃ ছাড় বিভে. ভালো হচ্ছে না। তুই আমার বাকি স্বাধীনতায় হাত দিলে বরদাস্ত করব না বলে দিচ্ছি।

—তুস্তার আবার বাকি স্বাধীনতা।

মুখ সামলে কথা বলবি! শালা অতীনের ওয়াইফের সঙ্গে তলে তলে ইয়ে করবে আবার—ইমর্যালিটি থেকে লেখা চলে না।

—কে ইমর্যালিটি! আমি?

—আলবৎ। নইলে অতীন বাজে কথা বলতে সাহস করে তোর মুখের ওপর!

—ওসব পার্সোন্যাল ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে এসো না।

—একশোবার বলব। টুথ ইজ টুথ।

—মেরে পত্তা উড়িয়ে দেবো সন্তা, এখনো—

তার মুখ থেকে সিগারেট পড়ে গেল। সন্তোষ একেবারে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ায়।

তারপর?

তারপর হাতাহাতি রক্তারক্তি।

দুজনেই ফুটপাথে ধরাশায়ী হল। মাথার ওপরে আকাশে অজস্র তারা আর একমাত্র চাঁদ বোধ করি ওদের দেখে একটু হেসেছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশের গাড়ি এসে ওদের তুলে নিয়ে চলে গেল।

আমার কাঁধে ভর দাও। না পার ত বয়ে নিয়ে যাব। বল।

—কোথায় প্রভু?

—কেন আমার গৃহে।

—প্রভু!

—কোন ভয় নেই লল্লা।

—প্রভু—প্রহরীরা—

—কোন ভয় নেই। তোমায় ধরে নিয়ে যেতে পারবে না তারা। দেব না। ভেবো না তুমি।

—আপনার বিপদ হবে। না-না।

—চুপ কর।

—কি বললেন? কি করে বাঁচাবেন প্রভু? একটা ভিখারিণী পরস্ত্রী কন্যার জন্য আপনি শুদ্ধ জাতিচ্যুত হবেন?

—জাতিচ্যুত! না! স্থির নিষ্পলক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রঙ্গনাথন বললেন—না। তবুও তোমাকে ছেড়ে দেব না। আবার বললেন উচ্চতর কণ্ঠে—না। তোমাকে কোন কালে ছেড়ে দেব না। না।

লল্লা তার উন্মাদের মত। দেহ তার কাঁপছে। হাতে তার অগ্নিতাপ। শঙ্কিত কণ্ঠে লল্লা বললে—প্রভু।

রঙ্গনাথন বললেন—ভয় পেয়ো না। আমাকে ক্ষমা করো না লল্লা। প্রয়োজন হয় তোমার জন্য জাতিচ্যুত হব। আমি পণ্ড হব। তোমাকে ছাড়তে আমি পারব না।

লল্লাকে বলে বুকের মধ্যে আকর্ষণ করলেন রঙ্গনাথন। যৌবনের যে নিতালীলায় অকস্মাৎ এবং শীতাতপে—বাতাসের স্পর্শে—গতি—পরিবর্তিত হয়, সূর্যের স্পর্শে নব তাপের সঞ্চার হয়, পৃথিবীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে কামনা জাগে, সেই তাপে কামনায় রঙ্গনাথনের এত কালের সব সংকল্প ভেসে গেল।

লল্লার অধরোষ্ঠের উপর নিজের অধরোষ্ঠ স্থাপন করে মুক্ত করে দিলেন তাকে, নিজেও মুক্ত হয়ে গেলেন। কয়েক মুহূর্ত পর তাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন—কামনার কাছে আমি পরাজিত হয়েছি, মাথায় করে নিয়েছি তাকে কিন্তু আমি কামার্ত পশু নই লল্লা। তোমাকে আমি বিবাহ করব।

নিজের গলা থেকে তুলসীর মালাগাছি খুলে তার গলায় পরিয়ে দিয়ে বললেন—সমুদ্র পাখী সেজে তোমাকে বরণ করলাম আমি। প্রয়োজন হয় আমি জাতিচ্যুত হব। আমি জানি সমাজ জাতিচ্যুত করলেও বন্দরাজ ত্যাগ করবেন না। একান্তে দূরে চলে যাব দুজনে। পরস্ত্রী নয়, ব্রাহ্মণী হবে তুমি।

লল্লা তার পায়ে লুটিয়ে পড়ল। বললে—আপনিই আমার বন্দরাজ।

—নয় তা চলে লক্ষ্মী। আবার তাকে তুলে বুকে ধরলেন। তারপর বললেন—চল।

—না। শান্ত কণ্ঠে লল্লা বললে—বড় ভাল লাগছে এখানে। কি সুন্দর চাঁদ। অপরূপ জ্যোৎস্না। সমুদ্রের কি রূপ।

—বেশ, এই সমুদ্র বেলাভূমে হোক আমাদের বাসর।

সস্নেহে রঙ্গনাথ লল্লাকে নারিকেল কুঞ্জতলে বসিয়ে দিয়ে তার পাশে বসলেন।

একটি উচ্ছ্বসিত উত্তাল তরঙ্গ বেলাভূমে আছড়ে পড়ে তাঁদের পা পর্যন্ত এসে স্পর্শ করে ফিরে গেল।

রঙ্গনাথন বললেন—আজ পূর্ণিমা সমুদ্র উতরোল হয়ে উঠেছে।

বাসর ঘরে শোভা বাসর পর্যায় তাঁরা দুজনেই তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন। ঘুম ভাঙল পাখীর কলরবে। সামুদ্রিক পাখীর দল ভোরের মধু জ্যোৎস্নার দল বেঁধে চক্রাকারে উড়তে সুরু করেছে আকাশ থেকে ঝরে পড়া শুভ্রদল আকাশ কুসুমের মত। ফলহারী বিহঙ্গেরা গাছের মাথায় মাথায় কলরব করছে। যে দু একটি শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট গাছ আছে তার পত্র পল্লবের মধ্যে ছোট পাখীরা দলবদ্ধ শিশুর মত প্রভাতী কাকলীতে মুখর হয়ে উঠেছে। পূর্বে অন্তহীন সমুদ্রের যেখানে আকাশ সমুদ্র-জলে অবগাহনে নেমেছে—সেখানে দীর্ঘায়িত একটি পাণ্ডুর রেখা জেগেছে; তারই মধ্য-কেন্দ্রে ঈষৎ উজ্জ্বল দিকে এক স্থানে সে পাণ্ডুরতা বর্তুলাকারে ক্রমশ আয়তনে বাড়ছে। পূর্ব দিগন্তে একপাশে আকাশে জ্যোৎস্না ম্লান বিবর্ণ হয়ে গেছে, আকাশের প্রথম পদ-সীমার একটু উপরে শুক্রতারা নীলাভ জ্যোতিতে হাসছে।

এ পাশে পশ্চিম দিগন্তে দিগন্তপায়ী পূর্ণ চন্দ্র। রক্তাভ পাণ্ডুর হয়ে এসেছে। কিন্তু তার জ্যোৎস্না এখনও পশ্চিম দিগন্ত থেকে আকাশের ত্রিপাদ পর্যন্ত আলো করে রেখেছে। সে জ্যোৎস্না পড়ে রয়েছে শাখা-প্রশাখাহীন দীর্ঘ শীর্ষ নারিকেল বৃক্ষগুলির পশ্চিম ভাগে. শীর্ষ দেশ থেকে তলভূমি পর্যন্ত আলোকিত করে। পূর্বভাগে বালুচরে সমুদ্রগর্ভ পর্যন্ত জেগে রয়েছে অস্পষ্ট ছায়া। পশ্চিম দিগন্তাগত খানিকটা জ্যোৎস্না এসে পড়েছে শবরীর মুখের উপর। নিশ্চিন্ত নিদ্রায় আচ্ছন্ন লল্লা।

প্রথম ঘুম ভাঙল রঙ্গনাথনের। রাত্রি শেষ হয়েছে। আর এক দণ্ডের মধ্যেই ওই পাণ্ডুর মণ্ডলটি ঈষৎ রক্তরাগে ভরে উঠবে। তারপর সে রক্তরাগ একদিকে সমুদ্রের জল একটি বিন্দুকে কেন্দ্র করে পরিধিতে আকাশের ঊর্ধ্বলোক পরিব্যাপ্ত করবে এবং কেন্দ্রে গাঢ় থেকে গাঢ়তর হতে হতে জবাকুসুম সংকাশ সূর্য মাথা তুলবেন। যেন সমুদ্র—বক্ষতল থেকেই সূর্যদেব উঠে আসছেন। তারপর একসময় লাফ দিয়ে উঠবেন আকাশে—সমুদ্রের নীল তরঙ্গ শীর্ষে রক্তরাগের ছটা বাজবে।

পাশে শবর কন্যা এখনও নিদ্রিতা। রঙ্গনাথন তার মুখের দিকে তাকালেন। বারেকের জন্য চিত্ত যেন নিজের উপরেই বিরূপ হয়ে উঠল রঙ্গনাথনের। ভাবাবেগে এ তিনি কাল কি করেছেন?

হে বরদরাজ, এ কি করলে? তোমার চরণতলে কাল বিষ-জর্জরিতা চেতনাহীনা এই কন্যাকে আশ্রয় দেবার সময় বলেছিলাম—এতে যদি অপরাধ হয় তবে সে অপরাধের দণ্ড আমাকে দিও। দোষ তো এর নয়। আমার। তুমি কি আমাকে মোহগ্রস্ত করে আমার ব্রত ভঙ্গ করিয়ে তপস্যাচ্যুত করিয়ে তারই দণ্ড দিলে? স্থির হয়ে গেছেন তিনি, পাষাণ হয়ে গেছেন যেন। দিবালোক যত স্পষ্ট হচ্ছে পৃথিবী, যত বাস্তব রূপে প্রকাশিত হচ্ছে তত তিনি যেন পঙ্গু হয়ে যাচ্ছেন। এ কি করেছেন তিনি। ধরা করতে গিয়ে একি বন্ধনে নিজেকে শৃঙ্খলিত করেছেন? লল্লাকে ডাকতে পারছেন না তিনি। চোখ মেলেই লল্লার নিদ্রা-জড়িমা-মুক্ত চোখে সমুদ্র-বক্ষে রক্তিম সূর্যের আবির্ভাবের মত প্রেমের দীপ্তি ফুটে উঠবে। তার সারা মুখ কোমল অনুরাগচ্ছটায় অনুরঞ্জিত হবে। সলজ্জ হাসির রেখায় ঠোঁট দুটি বিকশিত হবে। কি করবেন তিনি তখন?

লল্লার গলায় তাঁর গলার বৈষ্ণব জনের মালাটি পড়ে রয়েছে।

অকস্মাৎ রঙ্গনাথন যেন বেত্রাহতের মত অধীর হয়ে উঠলেন। লল্লাকে একটি বৃশ্চিকে দংশন করেছিল—তার মনে হল তাঁকে যেন সহস্র বৃশ্চিকে দংশন করেছে।

কি করবেন তিনি? লল্লা যেন এখনও তাঁকে বৃশ্চিকের মত ধরে আছে। লল্লার একখানি হাত তাঁর কোলের উপর সত্যই পড়ে ছিল। তিনি আতঙ্কিত ব্যক্তির মতই হাতখানাকে সজোরে কোল থেকে বালুচরের উপর ছুড়ে ফেলে দিলেন। লল্লা সেই আঘাতেই চোখ মেলল। লল্লা ঘুম-ভাঙা দৃষ্টির মধ্যে আঘাতের বেদনা বোধও ছিল না। ছিল শুধু প্রসন্ন অনুরাগ। নিদ্রাঘোরের মধ্যে সে আঘাতটা পূর্ণমাত্রায় অনুভব করে নি, এবং অনুমানও করেনি বা করবার কোন কারণ ঘটে নি তার। চোখ মেলে চেয়ে সে স্মিতহাস্যে বললে—প্রভু! বোধ হয় তার মনে হয়েছিল রঙ্গনাথন তাকে ডাকছেন। রঙ্গনাথন তখন উঠে দাঁড়িয়েছেন। প্রভু বলে সাড়ার মধ্যে লল্লার প্রশ্ন ছিল—কি বলছেন প্রভু? কিন্তু রঙ্গনাথনের বলার কিছু ছিল না। পরিপার্শ্বে নিহিত চোর যেমন ভোরের আলোয় জেগে উঠে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালায় তেমনি ভাবে তিনি পালিয়ে গেলেন। লল্লা উঠে দাঁড়াল। তার বিস্ময়ের অবধি ছিল না। এমন করে ছুটে পালালেন কেন? প্রহরী? চঞ্চল হয়ে উঠল সে। পরমুহূর্তেই তার সব চঞ্চলতা স্থির হয়ে গেল। মনে পড়ে গেল—কাল রঙ্গনাথন তাকে ঘরে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, বলেছিলেন—কিসের ভয়? তুমি আমার পত্নী! তুমি যাবে আপনার গৃহে।—

তা হ'লে? তা হলে?—

সে যে বিশ্বাস করতে পারছে না! তার কণ্ঠে যে এখনও তাঁরই পরানো মালা—বৈষ্ণব জনের মালাখানি দুলছে! তবে?

পাথরের মূর্তির মতই সে দাঁড়িয়ে রইল। প্রহরীর ভয় আর তার নেই। নিয়ে যাক, তারা তাকে ধরে নিয়ে যাক। করুক নির্যাতন করুক—লাঞ্ছনা করুক।

সূর্য উঠবে। একটি মণ্ডলাকার রক্তানুরঞ্জন ধীরে ধীরে আকাশলোকে পরিব্যাপ্ত হচ্ছে, পাখীরা দূর দূরান্তরে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চলেছে। সমুদ্রবক্ষে নৌকা দেখা দিয়েছে। দূর উত্তরে বন্দরাজ বন্দরে জাহাজের মাস্তুল দেখা যাচ্ছে। বড় বড় নৌকা পাল তুলে বের হচ্ছে। ছোট বাহ-ধরা নৌকো সারি সারি ছুটেছে গভীর সমুদ্রের দিকে। মানুষের কোলাহল শোনা যাচ্ছে। সূর্য উঠছে। কিন্তু সে কোথায় যাবে? দিনের আলোয়—কি করে সে পথে বের হবে? সে সব বুঝেছে! আর কিছু তার অগোচর নেই। এই হল! এই বুঝি নিয়ম! সূর্য উঠল। আলো রৌদ্র হয়ে ফুটল—উত্তাপের স্পর্শ লাগল দেহে। সেই স্পর্শে সে সচকিত হয়ে উঠল। যেতে হবে—কোথাও যেতে হবে। অনেক দূরে, অনেক দূরে। পালাতে হবে তাকে। দ্রুতপদে সে বনবীথির ঘন-সন্নিবিষ্ট নারিকেল তালের কাণ্ডগুলির মধ্য দিয়ে চলতে লাগল। দক্ষিণ মুখে!

আবার সকালে জোয়ার আসছে। তার পদচিহ্নগুলি ধুয়ে দিয়ে গেল জোয়ারের জলোচ্ছ্বাস।

• • •

বলনাথন বেত্রাহতের মত ছুটে আসছিলেন।

প্রহরী দুজনও সকালে ঘুম ভেঙে তাঁকে না পেয়ে উৎকণ্ঠিত হয়ে তাঁকে খুঁজতে বেরিয়েছিল। তাঁকে দেখে আশ্বস্ত হল, কিন্তু তাঁর অবস্থা দেখে তাঁকে প্রশ্ন করলে-কি হয়েছে আচার্য? ভোর বেলা উঠে কোথায় গিয়েছিলেন? সমুদ্র-কূলে বুঝি?

তিনি বললেন—এ্যাঁ—? হ্যাঁ!

বলেই তিনি তাদের পিছনে ফেলে প্রায় ছুটে এসে ঘরে আপন শয্যার উপর গড়িয়ে পড়লেন। সর্বাঙ্গের বাদু কলা করে পড়ল শয্যার উপর। কিন্তু তার পীড়া অনুভব তিনি করলেন না। মুখ গুঁজে পড়ে রইলেন।

এ কি মর্ম পীড়া! এ কি করলেন! হে বদরাজ! এ কি শাস্তি দিলে তুমি! আবার উঠলেন। উঠে ভাণ্ডার ঘরের দরজা ঠেলে পূজার ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেন। কিন্তু প্রবেশ করতে গিয়েও প্রবেশ করতে পারলেন না।

স্নান করতে হবে তাঁকে। বেরিয়ে এলেন। কুড়ুমণিকে এবং প্রহরী দুটিকে বললেন—আমি স্নান করতে যাচ্ছি সমুদ্রে। মধ্যপথ থেকে ফিরে এলেন। যেতে পারলেন না। লল্লা। লল্লা নিশ্চয় নারিকেল কুঞ্জ তলে এখনও পড়ে আছে। কাঁদছে। তাঁকে দেখলেই সে 'প্রভু' বলে এগিয়ে আসবে। পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদবে।

ফিরে এসে বললেন—না কুড়ুমণি—শরীর আমার অসুস্থ। সমুদ্রস্নান সহ্য হবে না। কূপ থেকে জল তুলে স্নান করে—পূজার ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলেন। ঘরখানি এখনও লল্লার অবস্থানের চিহ্নে মলিন হয়ে আছে। সযত্নে তিনি সমস্ত কিছু পরিষ্কার করে—পূজার আয়োজন করে পূজায় বসলেন। কিন্তু হল না, পূজা হ'ল না। চোখ বন্ধ করলেই লল্লাকে দেখছেন। একটি দিনে লল্লা যেন শত মূর্তিতে নিজেকে তাঁর মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

লল্লা—গোশালায় খুঁটী ধরে দাঁড়িয়ে আছে—ম্লান মুখে সজল চোখে—ক্লিষ্ট শ্যামলতার মত।

লল্লা—বিড়ালি রূপ থেকে যন্ত্রণাকাতর ভয়ার্ত মুখে বের হয়ে আসছে।

লল্লা—বৃশ্চিক বিষে—চেতনাহীন হয়ে ভেঙে পড়েছে।

লল্লা—তাঁর বাহুর উপর।

লল্লাকে তিনি বদরনাথের সম্মুখে শুইয়ে দিয়ে বলছেন—তোমারই চরণপ্রান্তে একে সমর্পণ করলাম প্রভু! তুমি তাকে রক্ষা করতে পারলে না দেবতা? বুকের ভিতরটা তাঁর কেমন করে উঠল। চোখ থেকে জল গড়িয়ে এল দরদর ধারে! পরমুহূর্তেই তিনি চমকে উঠলেন। চোখ দুটি খুলে গেল। বিস্ফারিত হয়ে উঠল। মনের ভিতর থেকে বিপরীত প্রশ্ন জেগে উঠল। দেবতা তো তাকে তারই হাতে দিয়েছিলেন। দেবতা তো প্রতারণা করেন নি!

ওঃ। লল্লার সেই মুখ মনে পড়ছে। সেই দৃষ্টি মনে পড়ছে। তাঁর নিজের মাল্যখানি তার গলায় যখন পরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন—কামনা আমার আছে, কিন্তু কামার্ত পশু নই আমি। লল্লা, তোমাকে ছাড়তে পারব না আমি। এই মালা পরিয়ে তোমাকে সমুদ্র সাক্ষী রেখে বরণ করছি—তুমি আমার পত্নী—সেই মুহূর্তের লল্লার সেই অপরূপ সুষমা-দীপ্ত, প্রসন্ন, ক্লান্ত মুখ খানি মনে পড়ছে। সারা ঘরখানিতে এখনও লল্লার দেহ গন্ধ পাচ্ছেন তিনি।

লক্ষ্মী, লক্ষ্মী, লক্ষ্মী। সারা অন্তর ভরে লক্ষ্মীকে আহ্বান করে উঠল তাঁর মন। লক্ষ্মী। লক্ষ্মীকে তিনি ভালবাসেন। লক্ষ্মীকে তিনি পত্নী বলে গ্রহণ করেছেন। বরদরাজের যে প্রেরণায়, যে ইঙ্গিতে ওই নাম তিনি রচনা করেছিলেন—কৃষ্ণচক্রের অন্তরালে যে দেবতা বাস করেন—সেই দেবতাই বাস করেন বৈকুণ্ঠে—সে দেবতা বাস করেন বৈকুণ্ঠে—তিনিই বাস করেন কৃষ্ণবর্ণ চন্দ্রের অন্তরালে—সেই প্রেরণাতে তিনি তাকে গ্রহণ করেছিলেন। হৃদয়ের অকপট, অকুণ্ঠিত, ছলনাহীন কামনা—যে কামনার পূর্ণতা নারী পূর্ণ হয় পুরুষের মধ্যে, পুরুষ পূর্ণ হয় নারীর মধ্যে সেই অকুণ্ঠিত পবিত্র কামনার ফল তিনি তাকে গ্রহণ করেছিলেন। ভুল? ভুল করেছেন তিনি পালিয়ে এসে। ভুল। পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে। ভুল সংশোধন না হলে—জীবনের সে ক্ষত আর পূর্ণ হয় না।

হে বরদরাজ—এ কি মতিভ্রান্তিতে তুমি ছলনা করলে?

কেন? কেন? কেন এমন ভ্রান্তি হল তাঁর? এত বড় আঘাতে তিনি বিচলিত হন নি, মিথ্যা বলেন নি। কারুর ভয়ে তাঁর উপলব্ধ সত্যকে অসত্য বলেন নি। কিন্তু তাঁর জীবনের চরমতম সত্যকে কি করে, কেন তিনি এই ভাবে মুহূর্তের ভ্রান্তিবশে সাগর-বালুবেলায় ফেলে দিয়ে চোরের মত পালিয়ে এলেন?—

আসন ছেড়ে উঠে পড়ছিলেন। আবার বসলেন। প্রণাম করে বললেন—লক্ষ্মীকে ফিরিয়ে আনতে চললাম প্রভু। লক্ষ্মী আমার জীবনের চরম সত্য। তাকে আমি ভালবাসি। তাকে আমি চাই তোমার প্রসাদের মত। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তিনি চললেন—সমুদ্র তটের দিকে। প্রহরী দুটিকে বললেন—আমি চললাম—সমুদ্রতটে। তটভূমি ধরে আমি যাব মান্দ্রাজ পর্যন্ত। তোমরা ফিরে যাও।

কুড়ুম্বিকে বললেন—ঘর রইল। ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো।

সাগর তটভূমে এসে দাঁড়ালেন।

রৌদ্র-ঝলমল সাগর জল—রৌদ্র এবং রৌদ্র করোজ্জ্বল সাগর-জলস্পর্শের প্রদীপ্ত বেলাভূমি পরম শুচিতায় পরিব্যাপ্তি দেবতার অঙ্গনের মত প্রসারিত। নারিকেল সুপারি বৃক্ষের—তরবারির মত দীর্ঘ পাতাগুলি—কিরু-মিক করছে। দূর সমুদ্রের বুকে শঙ্খ উঠেছে—তাদের আবোলতোলে। সমুদ্র কল্লোল অবিরাম—অশ্রান্ত। কাঁদছে?

কারুর মনে হচ্ছে তাঁর এই মুহূর্তে।

শূন্য বালুচরে লক্ষ্মী তো নেই।

তিনি হাঁটতে সুরু করলেন—উত্তর মুখে।

প্রথমে যাবেন লক্ষ্মীদের গ্রামে। তারপর মান্দ্রাজ। মান্দ্রাজে মাইলাপুরে—পার্থসারথি মন্দিরে দেখবেন। তারপর বলাবলীপুরম। তারপর কাঞ্চীভেরম। লক্ষ্মীকে না পেলে যে হবে না তাঁর। না হলে যে সব মিথ্যা হয়ে যাবে। জীবন মিথ্যা হয়ে যাবে।

• • •

বেলা প্রথম প্রহর পার হচ্ছে। সমুদ্র নৌকায় নৌকায় ভরে গেছে। সমুদ্রের দিকে তাকিয়েই ভাবছিলেন তিনি। একটি বড় যাত্রী বাহী নৌকা থেকে হাত তুলে কারা নমস্কার করলে। তাদের মধ্যে দৈবিক ধারিণী এক প্রৌঢ়া। তিনি চিনলেন। পুরী থেকে ফেরার পথে পার্থ সারথি দর্শনের জন্য মান্দ্রাজে নেমেছিল। সে দিন রাত্রে গান শুনে প্রৌঢ়া এসে তাঁকে হাত ধরে বলেছিল শতায়ু হও। তারা ফিরছে আজ। পথে সমুদ্রতটে তাঁকে দেখে চিনে অভিবাদন করছে। কিন্তু চিন্তামগ্ন রঙ্গনাথন যেন দেখেও দেখলেন না। প্রত্যাভিবাদন না করেই উত্তর মুখে হাঁটতে সুরু করলেন। লক্ষ্মী! লক্ষ্মী! ঘোণেক্কের গ্রামের প্রবেশ পথে থমকে দাঁড়ান নি—কিন্তু ঘোণেক্কের বাড়ির দরজায় থমকে দাঁড়ালেন। গ্রামের পুরুষেরা অধিকাংশই বাইরে গেছে কাজে। মেয়েরা বিস্মিত হল। তারা পথ থেকে সরে দাঁড়াল, আপন আপন ঘরের ভিতর গিয়ে উঁকি মেরে দেখতে লাগল। আচার্য একজন প্রবেশ করেছেন তাদের গ্রামে। চোখ মুখে তাদের উত্তেজনা ফুটে উঠল।

—হে বরদরাজ! হে ভগবান।

ঘুন্টানেরা ঘরে ঢুকল না, পথের পাশে সরে দাঁড়াল। রঙ্গনাথন যত অগ্রসর হলেন ঘোণেক্কের দরজার দিকে তত যেন দুর্বল হয়ে পড়তে লাগলেন। অকস্মাৎ এক সময় যেন সম্পূর্ণ পরাভূত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন! তাঁর বুকের ভিতর আলোড়ন উঠেছে আবার। কি বলবেন তিনি? কি করে বলবেন? কি করে বলবেন লক্ষ্মীকে

তিনি কার রাজ্যে সন্ধ্যে সাক্ষী করে—শেষ হল না মনের প্রশ্ন। একজন খৃস্টান যুবক উত্তেজিত উদ্ধত ভঙ্গিতে পাশের গলি পথ থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল তার সামনে। মুখটি উদ্যত করে বললে—কেন প্রবেশ করেছ তুমি আমাদের পল্লীতে? কি প্রয়োজন তোমার? গোপনে দর্শন, কাকে দর্শন করতে এসেছ?

চোখ বুজলেন রঙ্গনাথন। মনে মনে বরদরাজকে স্মরণ করে নিজের মনকে দৃঢ় করতে চেষ্টা করলেন। মনের মধ্যে যে অস্থি জন্মেছিল যার শিখা গ্রাম প্রবেশ করার থেকেই নিতে আসছে ধীরে ধীরে তাতে আবেগ এবং সংকল্পের ইন্ধন ও হবি দিয়ে তাকে জ্বালবার চেষ্টা করলেন!

যুবকটি বললে—তোমাকে কে আঘাত করলে আর তুমি নাম করলে আমাদের!

চমকে উঠলেন রঙ্গনাথন, বললেন—না! আমি কারও নাম করি নি! আমি কাউকেই তাদের চিনতে পারি নি। অসত্য আমি বলি না।

ধীরে ধীরে পাশে লোক এসে জমেছিল। তাদের মধ্য থেকে একটি নারী কণ্ঠস্বর বলে উঠল—উনি বলেন নি, বলেছে লল্লা। সমস্ত খৃস্টানদের সে শত্রু। শবরদেরও সে ঘৃণা করে—সেই বলেছে! আমি—সোড়া থেকে বলছি। তার কথাতেই কোত্তোয়ালীতে আমাদের জোয়ানদের ধরেছে।

রঙ্গনাথনের মনে আগুন জ্বলল আবার। তিনি প্রশ্ন করলেন—কাকে ধরেছে? কবে ধরেছে?

—মাদ্রাজ শহরে থাকে আমাদের যে সব জোয়ানেরা তাদের দশজনকে ধরেছে। আজ ভোরে। লোক এই কিছুক্ষণ আগে সংবাদ এনেছে।

আর একজন বললে—ন্যাকা সাজছে। কিছু যেন জানে না।

অন্য জনে বললে—গ্রামে ও এসেছে—আমাদের মুখ দেখে চিনতে। ওকে ধর—ধর ঘরে বন্ধ কর। রাতে—।

কলরব করে উঠল লোকেরা। কিছু লোক পালিয়ে গেল। রঙ্গনাথন তখন মনের বল ফিরে পেয়েছেন। বললেন—বরদরাজের নাম নিয়ে বলছি—আমি কিছুই জানি না। লল্লাও কিছু জানে না। আর তোমরা লল্লা কোথায়? তাকে কি তোমরা সন্দেহ করে আটকে রেখেছ? দোষটা তোমাদের, সত্য বল?

নির্ভীকতা শুধু আক্রমণকারীকে প্রতিহত করে না খানিকটা পশ্চাদপদও করে দেয়। এই নির্ভীকতার সঙ্গে সহৃদয় আকৃতি থাকলে আক্রমণকারীর বিদ্বেষকেও নষ্ট করে। বিস্ময় জাগায়।

তাই হল। এরা রঙ্গনাথনের কথায় স্তব্ধ হয়ে সবিস্ময়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। রঙ্গনাথন বললেন—আমাকে একটি সত্য কথা বল—লল্লা কোথায়? আমি নিজে এখনি কোত্তোয়ালীতে যাচ্ছি। নিশ্চিন্ত থাক—আমি মিথ্যা বলব না। তারা সঙ্গে সঙ্গেই ছাড়া পাবে। বল।

একজন প্রৌঢ় এসে বললে—মেরীর নামে শপথ করে বলছি আচার্য, লল্লা কোথায় আমরা জানি না। সে তো গ্রাম পরিত্যাগ করেছে তার মায়ের মৃত্যুর পর।

—আজ! আজ সকালে। আজ সকালে সে আসে নি?

—না আচার্য। শপথ করে বলছি। বিশ্বাস করুন।

রঙ্গনাথন আর দাঁড়ালেন না। তিনি মাদ্রাজের পথে ছুটলেন।

একি বাধা। এ কি বিঘ্ন—তাঁর গতিকে অন্যদিকে ভিন্ন মুখে আকর্ষণ করছে। লল্লার স্থান থেকে বিরত হয়ে তাঁকে যেতে হবে কোত্তোয়ালী। সেখানে তারা যে কি করবে—কতক্ষণ তাঁকে আটকে রাখবে কে জানে। লল্লা কোন দূর দূরান্তরে ছুটে পালাচ্ছে লজ্জায়, ঘৃণায় তাঁর প্রতি ঘৃণায়। লল্লাকে যে তাঁকে ধরতে হবে, বলতে হবে—লল্লা, আমি বুঝেছি; দোষলল্লার প্রতি আমার কেটেছে, সমাজের ভয় আমার নেই। তোমার মধ্যে আমার জীবনের লালসাকে তো নয়—আমার ভালবাসাকে পেয়েছি। ভালবাসার কাছে ভ্রান্তি, ভয় সব তুচ্ছ। আমাকে ক্ষমা কর। ফিরে এস।

সে পথে এ কি বাধা!

কোত্তোয়ালীতে তখন শ্রীনিবাসন তাঁর প্রতীক্ষা করছিলেন। এর মধ্যে তাঁর কাছে সওয়ার চলে গেছে। কোত্তোয়ালীর কর্মচারীরা সোপন তদন্ত করে দশজন শবর

খৃস্টান এবং পাঁচজন শৈবকে ধরেছেন। এরা নামে শৈব হলেও ধর্মের কোন ধার ধারে না—আসলে দুষ্ট প্রকৃতির লোক।

শ্রীনিবাসনের ঘরের বারান্দায় ষোলেক বসে আছে, একজন ফাদার বসে আছেন: মাদুরাপুরের শিবমন্দিরের একজন প্রতিনিধি বসে আছেন। আচার্য চিদাম্বরমও এসেছেন।

শ্রীনিবাসন বললেন—কোথায় গিয়েছিলেন আচার্য? সওয়ার ফিরে এসে বললে—আপনি মাদ্রাজ রওনা হয়েছেন প্রাতঃকালেই পূজা সেরেই?

রঙ্গনাথনের দৃষ্টির মধ্যে একটি প্রখরতা বিচ্ছুরিত হচ্ছিল।

লঙ্গার কামনা—নিজের অনুশোচনা তাঁকে অধীর করে তুলেছে। একটা উন্মত্ত বিদ্রোহ তাঁকে ক্ষিপ্তপ্রায় করে তুলেছে। নিজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, সমাজ ধর্ম সব কিছুর বিরুদ্ধে। কোতোয়ালীর বিরুদ্ধেও। কারণ কোতোয়ালী লঙ্গাকে খুঁজছে। মিথ্যা সন্দেহে খুঁজছে। ষোলেকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, আচার্য চিদাম্বরমের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ। সবাই, সবাই যেন কেতু—যার জন্য তিনি লঙ্গাকে ফেলে কুৎসিৎ প্রকৃতির ভীরু চোরের মত পালিয়ে এসেছেন। মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন জাগছে একটা; আশ্চর্য, একটি নারীর জন্য এ কি উন্মত্ততা! সঙ্গে সঙ্গে সে উন্মত্ততা প্রবলতর হয়ে চীৎকার করে উঠছে—হ্যাঁ, লঙ্গাকে না পেলে আমি উন্মাদ হয়ে যাব! এখন অর্ধোন্মাদ। পরে পূর্ণোন্মাদ হয়ে যাব।

প্রখর কণ্ঠেই বললেন রঙ্গনাথন—আপনি রাজ কর্মচারী। আপনি আপন অধিকারের মানুষদের রাজকর্মের প্রয়োজন মত চালিত করতে চান। কিন্তু মানুষের হৃদয় তো সে প্রয়োজনে চলে না। বরদরাজের অনুজ্ঞায় হৃদয়ের প্রয়োজনে আমি গিয়েছিলাম ষোলেকদের পল্লীতে। সেখানে সংবাদ পেলাম আপনারা সন্দেহবশে কয়েকজন মাদ্রাজের বাসিন্দা ওই গ্রামের যুবকদের ধরেছেন। কয়েকজন শৈবধর্মানুরাগীকেও ধরেছেন। সংবাদ পেয়েই আমি ছুটে আসছি। আমি তো বারবার বলেছি—আমি তাদের কাউকে চিনতে পারি নি এবং সন্দেহও কাউকে করি না। সুতরাং কেন অনর্থক সন্দেহ বশে—

বাধা দিলেন শ্রীনিবাসন—আচার্য রঙ্গনাথন, দেশের আইন যা তা আপনি মানতে বাধ্য! ধর্মতও বাধ্য। নয় কি?

চুপ করলেন রঙ্গনাথন। একটু নীরব থেকে বললেন—বেশ, বলুন কি করতে হবে?

—যাদের সন্দেহ বশে আমরা ধরেছি—তাদের দেখুন। চিন্তা করে মনে মনে মিলিয়ে বলুন কারও সঙ্গে আকার আয়তন অবয়ব দৃষ্টিগত কোন সাদৃশ্য আছে কি না?

—চলুন।

কোতোয়ালীর পশ্চাদ্ভাগে একটি খোলা জায়গায় প্রহরাধীন লোক কয়েকজনকে এনে দাঁড় করানো হল। রঙ্গনাথন সামনে এসে দাঁড়ালেন।

শ্রীনিবাসন বললেন—ভাল করে দেখুন।

রঙ্গনাথন তাকালেন তাদের দিকে। বিচিত্র। একবার মুখখানা পাংশু হল—পর মুহূর্তে কঠিন হল, পর মুহূর্তে বাঘাটা কাঁকি দিলেন অকারণে। খৃস্টান শবরদের দেখা হয়ে গেলে বললেন—না, মাননীয় শ্রীনিবাসন আমি কারুর সঙ্গে কোন মিল দেখতে পাচ্ছি না। এরা কেউ নয় বলেই আমার বিশ্বাস।

মানুষগুলির মধ্যে আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটল এক মুহূর্তে। স্মিত হাসি ফুটল মুখে—প্রসন্ন হয়ে উঠল মুখ। দৃষ্টি এমন কিছু বললে যা রঙ্গনাথনের কাছে অবিস্মরণীয় হয়ে উঠল।

শ্রীনিবাসন বললেন—ছেড়ে দাও এদের। চলুন এবার ওদিকে চলুন। খানিকটা দূরে দাঁড়িয়েছিল শৈবধর্মানুরাগীরা। সেখানেও সেই একই ঘটনা ঘটল।

রঙ্গনাথন বললেন—এবার আমাকে মুক্তি দিন, আমি যাই।

শ্রীনিবাসন বললেন—আপনি ইচ্ছাপূর্বক চিনতে চাইলেন না রঙ্গনাথন।

—ইচ্ছাপূর্বক চিনতে চাইলাম না? প্রশ্ন করলেন—বোধহয় নিজেকেই করলেন। তারপর বললেন—না।

—আর যেন দোষীকে ধরতে না পারার জন্য আমাকে দোষ দেবেন না।

—না। দিই নি, দেব না। আমি আসি মাননীয় রাজপ্রতিনিধি। আমার দাঁড়াবার সময় নেই।

—কোথায় যাবেন?

—আমি? অনেক স্তব্ধ থেকে বললেন—ঠিক জানি না। উদ্দেশ্যহীন যাত্রা শ্রীনিবাসন! বিস্মিত হবেন না। বরদরাজের অনুজ্ঞা—স্বপ্নের নির্দেশ—আমাকে তাড়না করে ছোটাচ্ছে।

বাইরে আসতেই পাণ্ডীটি উঠে বললেন—আপনি সত্যবাদী। ঈশ্বর আপনার উপর খুসী হবেন। ধন্যবাদ আপনাকে।

যোশেফ বললে—আচার্য রঙ্গনাথন আপনাকে শ্রদ্ধা করি আমি। আমরা এ কথনও ভুলব না।

রঙ্গনাথনের চোখ দুটি মুহূর্তের জন্যে বিস্ফারিত হল—কোন চিন্তার প্রতিফলন পড়ল। তারপর বললেন একটা অনুরোধ করব তোমাকে?

—বলুন আচার্য। আমরা অকৃতজ্ঞ নই।

—লল্লা যদি ফিরে আসে তাকে বলো সে যেন আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমার জন্য আমার ঘরে অপেক্ষা করে। বলো আমার পূজার ঘরে যে বরদরাজের ছোট মূর্তি আছে—তার সেবার অধিকার তাকে আমি দিয়ে গেলাম।

—আচার্য! প্রবল বিস্ময়ে অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করে উঠল যোশেফ। সমবেত জনমণ্ডলীরও বিস্ময়ের সীমা রইল না।

রঙ্গনাথনের চোখে অর্দ্ধোন্মাদের চোখের অস্বাভাবিক দৃষ্টি। তিনি বললেন—কাল রাত্রে আমার বরদরাজ এই আদেশ করেছেন।

—বরদরাজ আদেশ করেছেন?

ওদিক থেকে আচার্য চিদাম্বরম বলে উঠলেন—হাঁ-হাঁ করবেন বইকি! কালের মহিমা। কলিযুগ, হিন্দু কাল বহু দিন বিগত, মুসলমান কালেও দেবতা এমন আকাঙ্খা প্রকাশ করেন নি। এবার এসেছে শ্বেত ইংরাজ। এবার দেবতারাও ম্লেচ্ছাচারে অনাচারে রুচি না হলে কাল-মহিমা প্রকট হবে কেন? কিন্তু আচার্য রঙ্গনাথন—দেবতার এ আদেশ আমরা মানব না। দেবমূর্তি কলুষিত হলে আমরা তা নিক্ষেপ করি নদী গর্ভে। সমুদ্র গর্ভে। এই কলুষ অশুচি-অভিলাষী তোমার দেব মূর্তিটিকে তুমি সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ কর—নতুবা তোমাকে ক্ষমা করব না আমরা। তুমি পতিত—শবতুল্য হলে আজ থেকে।

রঙ্গনাথন বললেন—জয় বরদরাজ স্বামী। তোমার অমৃত প্রসাদ আমাকে দাও! জয় প্রভু!

তিনি বেরিয়ে এলেন কোতোয়ালী থেকে। চললেন পার্থ সারথির দিকে।

মন্দিরে তিনি ঢুকলেন না। যে দিকে ভিক্ষার্থীরা থাকে সেখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। জিজ্ঞাসা করলেন—লল্লাকে দেখেছ?

—না তো প্রভু।

মায়লাপুরে কপালীশ্বর শিবনিকেতনের আশপাশের ভিক্ষার্থীদেরও ওই প্রশ্ন করলেন—

—লল্লা? লল্লা কোথায় জান?

—কই না তো!

চল, তবে মহাবলীপুরম। পথ চলতে চলতে হঠাৎ স্মরণ হল এক বস্ত্রে কপর্দকহীন হয়ে বেরিয়ে এসেছেন তিনি।

কয়েক মুহূর্তের জন্য থেকে দাঁড়ালেন। তারপর আবার চলতে সুরু করলেন। এই ভাল। এই শ্রেয়। ফিরে গিয়ে অর্থ এবং কাপড় চোপড় আনতে যে সময় যাবে তার মধ্যে লল্লা কত—কত দূরান্তরে চলে যাবে। লল্লার জন্য তিনি অধীর উন্মাদ হয়ে যাচ্ছেন মুহূর্তে মুহূর্তে। ধর্ম নয়, কর্তব্য নয়, তার থেকেও বড় কিছু। জীবনের তৃষ্ণা, শুধু তৃষ্ণা নয় অমৃত তৃষ্ণা।

চলো মহাবলীপুরম!

মহাবলীপুরমেই বা কই লল্লা? সে তো আসে নি।

চলো কাঞ্চীভেরম।

কাঞ্চীভেরমেই বা কই লল্লা? কাঞ্চীভেরমে শুধু এইটুকু শুনলেন—তাঞ্জোরে অনেক যাত্রী গেছে। ভিক্ষুক দলও গেছে। সেখানে বিরাট উৎসব।

চলো তাঞ্জোর। একমাত্র বস্ত্র ধূলি-মলিন হয়ে গেল; দাড়ি গোঁফে সমাচ্ছন্ন হয়ে গেল মুখ; পাদুকা ছিন্ন হয়ে গেল, ফেলে দিলেন। উত্তরীয়খানি থেকে তৈরী করলেন ভিক্ষার ঝুলি। গান রচনা করলেন—সুর যোজনা করলেন, সেই গান গেয়ে ভিক্ষার্থীরি রঙ্গনাথন চললেন। অমৃত প্রসাদ দাও হে দাও—জয় বরদরাজ হে! হায় কোথায় অমৃত প্রসাদ।

হায়—কোথায় অমৃত প্রসাদ!

অমৃত হয়-তো কথার কথা। না! একবার তো

তার পৌরুষ অনুভব করেছিলেন। মুখের কাছে পাত্রখানি ধরে মুগ্ধ হয়ে বসেই ছিলেন তারপর ফেলে দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর আর মিলন না। সন্ততও এরকমই মেলে। যে পান করে সে অমর হয়—সে ফেলে দেয়—তার আর মেলে না। তৃষ্ণার্ত ধরিত্রী শোষণ করে নেয়; অথবা পরিত্যক্ত পাত্রের আশের বন্যাল রৌদ্র পান করে দেয় হয়। পড়ে থাকা পাত্রখানিতে তার আর কোন চিহ্ন পর্যন্ত মেলে না। শূন্য পাত্র খানি হাতে নিয়ে তখন উপলব্ধিতে আসে আসল সত্য। 'সব মিথ্যা' এটাই সত্য।

• • •

জীবনে এই কয়েক বৎসরের মধ্যে যে কতবার এই কথা রত্নাবলীর মনে হল—তার সংখ্যা তাঁর মনে নেই। তাঞ্জোরে মনে হয়েছে। মাদুরায় মনে হয়েছে। প্রতি স্থানেই মনে হয়েছে—এই কথা। আজও নিজের বীণা-খানির উপর হাত রেখে এই কথাই ভাবছেন।

চার বৎসর পর। চার বৎসরের মধ্যে বহু পরিবর্তন ঘটে গেছে তাঁর জীবনে। সংসারে সব মিথ্যা! তাঞ্জোর ফিরে তিনি বিতাড়িত হলেন—মন্দির চত্বরে প্রবেশ করতে দেওয়া হল না। তাঁর আসবার পূর্বেই মাদুরাতে আচার্য চিদাম্বরেশের কথা তাঞ্জোরে পৌঁছে গিয়েছিল। রত্নাবলী যখন পৌঁছে ছিলেন—তখন সেখানে বার্তা পৌঁছোয় নি। তিনিই সে দিন সেই মাদুরাই থেকে মহাদেবীপত্তনের পথে। কাঞ্জীভেরমেও তিনি যাত্রা করতে বিলম্ব করেন নি। কাঞ্জীভেরম থেকে যাত্রা করে পথে তিনি বিলম্ব করেছিলেন। তিনি সমুদ্রতটের দিকে ফিরেছিলেন পথ থেকে। স্থির করতে চেয়েছিলেন তটভূমে এখন একটি কিশোরীর মৃতদেহ কি কেউ পড়ে থাকতে দেখেছে?—কয়েক দিন পর মনে হয়েছিল, না। সে তা করবে না। তার বাবা তাকে বলে গেছে—সে রত্নরাজের প্রসাদ পাবে। তার মা তাকে বলে গেছে কোন দেব মন্দিরের চারিপাশ প্রদক্ষিণ করে গোপুরমের বাইরে দাঁড়িয়ে তার সুন্দর কণ্ঠে বন্দনা গাইলেই জীবন চরিতার্থ হবে। সে তো সমুদ্রে ঝাঁপ খাবে না! আবার ফিরে তাঞ্জোরেই গিয়েছিলেন। তখন তিনি একেবারে ভিক্ষুক!

সোপানের উপরে কাঞ্জীভেরমের একজন শৈব-পাণ্ডা—একদল তীর্থযাত্রী সঙ্গে করে তাঞ্জোরের শিব-মন্দিরের পাণ্ডাদের হাতে দিচ্ছিলেন। তিনি তাঁকে দেখেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। এই ব্যক্তি তার নিজের বংশরাজ মূর্তিকে খৃস্টান পরদেশের হাতে দিয়েছে। নিজে খুঁজে বেড়াচ্ছে এক পরদেশীকে। এ লোকটা গায়ক কিন্তু কি গান করে জান? গান করে পরম ব্রহ্মণে ভেদ নেই। এ পাষণ্ড—পাষণ্ড—! এর পদার্পণে মন্দির অপবিত্র হবে!

মন্দিরে তিনি প্রবেশ করেন নি। প্রয়োজনও ছিল না। বল্লা থাকলে মন্দিরের বাইরেই থাকতে। কিন্তু ব্রাহ্মণদের ইঙ্গিতে নানান জনে তাঁকে নানা লাঞ্ছনায় লাঞ্ছিত করেছিল। বিদ্রূপের আর অন্ত ছিল না। ভেঙে পড়েছিলেন আর একবার।

বল্লার কথা আর এমন করে উন্মাদের মত ভাবেন না। ফিরে যান মাদুরাতে। একটি বৃক্ষতলে সারারাত্রি পড়েছিলেন। মনে মনে মনে মনে বলেছিলেন—চল না। পারলাম না! বল্লা, বল্লা।

পরদিন তাঞ্জোর ত্যাগ করে মাদুরাতের পথে খানিকটা এসে আবার ফিরেছিলেন। বল্লাকে না পেলে বেঁচে তাঁর লাভ নেই। এর পর কিন্তু তাঁর আর সন্ধানের কোন শৃঙ্খলা ছিল না। পথে পথে চলেছিলেন—যে দিকে বেশী লোক চলে সেই দিকে—যে স্থান পড়ে সেই স্থানে গিয়ে খুঁজেছেন। গান গেয়ে ভিক্ষা করেছেন, কিছু সঞ্চয় করেছেন, আবার চলেছেন।

আটমাস ঘুরেছিলেন। পূর্ণোন্মাদই তিনি তখন।

সারাদেশে অরাজক। একে একে হিন্দু মুসলমান রাজবংশ সব দিক থেকে সমুদ্রতটের নারিকেল তালবৃক্ষের মত উৎপাটিত হয়ে পড়ছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলির ভাই কর্ণেল ওয়েলেসলি ঝড়ের মত বিক্রম নিয়ে একের পর এক মারহাঠা টিপুসুলতান—ত্রিবাঙ্কুর রাজ শক্তিকে পরাভূত করছে। ওদিকে—পিণ্ডারী—ঠগ—চোর ডাকাতে দেশ পরিপূর্ণ। এর মধ্যে পূর্ণোন্মাদ বলেই তাঁর ঘোরা সম্ভবপর হয়েছিল। দেহে শ্রীও তখন পথের ধুলোয় ঢাকা পড়েছে; মলিন বেশ বাসে এবং কাঁধের ভিক্ষার ঝোলাই

ছিল অন্ধকার কক্ষ। আর একটি অন্ধ ছিল—সে তার গান। সেই লোক তারা করণাই করেছে। তারপর এক ঘটনা ঘটল। তিনি তখন শ্রীরঙ্গমে। সেই অবস্থাতেই গোদাদেবীর উপাখ্যান নিয়ে গান রচনা করে মনে মনেই শুধু গেয়ে চিকা করতেন। তাঁর বড় ভাল লেগেছিল এ উপাখ্যান। বিষ্ণুভক্ত পেরিয়ার কন্যা গোদা; গোদাদেবী, তাঁকে স্বপ্নাদেশ দিয়ে শ্রীরঙ্গনাথস্বামী বিবাহ করেছিলেন। কোথায় যেন লঙ্কার সঙ্গে মিল দেখতে পেতেন। মধ্যে মধ্যে ভাবতেন—লঙ্কা আর নেই। সেও এই ভাবে বরদরাজের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। অর্থ তাঁর কিছু জন্মেছিল। শ্রীরঙ্গনাথ স্বামীর বিশাল মন্দিরের গুরে গুরে বিনাস্ত চত্বরের মধ্যে পাগলের মত ঘুরতেন—লঙ্কা! লঙ্কা! লঙ্কা।

একদিন একজন লোক তাঁকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। বাঈ সাহেব ডাকছেন। প্রশ্ন করেছিলেন ক্রুদ্ধ ভাবেই—কে বাঈ?

নাম শুনে সম্ভ্রমে মাথা নত করেছিলেন। সঙ্গীতজ্ঞ হিসেবে সে নাম তাঁর স্মরণে ছিল। বিখ্যাত সরস্বতী বাঈ; সঙ্গীতজ্ঞদের আম্মা। মা! তিনি শ্রীরঙ্গনাথ স্বামী দর্শনে এসেছেন, দুদিন তাঁর গান শুনেছেন। শুনে ডেকেছেন।

পঞ্চকেশী বৃদ্ধা, সরস্বতী বাঈ। তিনি তাঁকে পুত্র বলে সম্বোধন করেছিলেন। প্রশ্ন করেছিলেন—এমন মূলধন থাকতে ভিক্ষা কর কেন? প্রথমটা বুঝতে পারেন নি। তারপর ধীরে ধীরে তাঁর উত্তপ্ত স্পর্শে বিগলিত হয়েছিলেন।

তিনি তাঁর পিঠে মসিন বস্ত্রের উপর পরম স্নেহে হাত রেখে বলেছিলেন—দেবতাকে দেখি?

সে অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

তিনি বলেছিলেন—সে কি নেলে পুত্র? আমি তো বলতে পারব না। জানি না। আমার জীবনে তো—। একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন—প্রথম জীবনে রূপ আর কণ্ঠের জন্য বিক্রী হয়েছিলাম। রাজা সুলতানের মনোরঞ্জন করতে গিয়ে দেবতার মনোরঞ্জন করা যায়, সেও অল্পক্ষণ বা দিনের জন্যে। হৃদয় মেলে। মন মেলে না। এ বয়সে এসেছি দর্শন করতে বিগ্রহ। তার বেশী কিছু না।

তবুও তিনি কিছু বলতে পারেন নি তাঁকে। তারপর বলেছিলেন—আমি খুঁজছি একজনকে।

—মানুষ?

—হ্যাঁ।

—নারী?

—হ্যাঁ।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে গঠিত

মুখ্যমন্ত্রীর ছাত্র কল্যাণ তহবিলে

(In the aid of the Chief Mininster's Student Welfare Fund)

আপনার যথাসাধ্য দান

পশ্চিমবঙ্গের অসংখ্য দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের
নিত্য প্রয়োজন ও বহুল কল্যাণে
যথার্থ সহায়ক হইবে।

উপরোক্ত বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য শ্রী এস. পি. ভর্মা মহ

—তোমার স্ত্রী ?

—হ্যাঁ ।

—হারিয়ে গেছে ?

—হ্যাঁ ।

সরস্বতী বাঈ বলেছিলেন—পুত্র ! ঈশ্বর হলে বলতাম হয় তো পেতে পার । কিন্তু এ ক্ষেত্রে বলছি আর তো পাবে না তাকে ।

—পাব না ?

—না । সে যুবতী । বেশ অরাজক । অরাজক বলেই বা কেন, পুরুষদের মধ্যে লম্পট কামুক বেশী । নরখাদকের চেয়েও তারা হিংস্র । হারিয়ে গিয়ে থাকলে পাবে না । বলতাম না চুপ ছিল কণ্ঠ ছিল—

—তারও আছে ।

—তবে আর কি ? সে হয় মরেছে নয় হাটে বাজারে বিক্রী হয়ে গেছে । খুঁজতে খুঁজতে দেখা হয় তো পাবে কিন্তু সেও তোমাকে চিনবে না, তুমিও চিনতে পারবে না, চিনতে পারলে আত্মহত্যা করবে ।

রঙ্গনাথন উন্মাদের মত উঠে চলে যাবতে চেয়েছিলেন । কিন্তু আম্মা তাঁর হাত ধরে বলেছিলেন—আমি আম্মা, পুত্র । যেও না আমার কথা শোন । তোমার এমন কণ্ঠ, এমন গান । বস । পথে মরলে বড় কষ্ট পাবে । বস । গান গাও । শোনাও আমাকে কিছু ।

—পারব না । মার্জনা করুন ।

বৃদ্ধা বলেছিলেন, তাহলে আমি গাই শোন । বলেই তাঁর বীণা নিয়ে বসেছিলেন । গেয়েছিলেন রঙ্গনাথ স্বামীর স্তোত্র ।

পন্নাধিরাজে-পরুড়াধিরাজে বিরিঞ্চিরাজে পুরন্দরাজে ত্রৈলোক্যরাজেহখিলোকরাজে শ্রীরঙ্গরাজে রমতাং মনোমে ।

লক্ষ্মী নিবাসে জগতাং নিবাসে-উৎপল বাসে রবিবিম্ব বাসে—ক্ষীরাব্ধিবাসে ফণিভোগবাসে শ্রীরঙ্গবাসেরমতাং মনো মে ।

শান্ত স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন শ্রীরঙ্গনাথন । আম্মা বলেছিলেন—কিছুদিন আমার কাছে থাক । সুস্থ হও । তুমি অসুস্থ ।

ছিলেন তিনি । তার পরামর্শেই তিনি পাশ্চাত্য কেলে দক্ষিণী মার্গ সংগীত নতুন করে চর্চা করেছিলেন । মাস চারেক পর । তখন তাঁরা পণ্ডীচেরীতে । সোল-যোদ তখন ঘনিয়ে উঠেছে দক্ষিণ পথের উত্তর অংশে । দক্ষিণ পথ'ও তার ঢেউ এসেছে । তেলেগু সিদ্ধিয়া হোলকার এক সঙ্গে মিলে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দাক্ষিণাত্যে আসছে । সরস্বতী বাঈ শেষ মহীশূর যুদ্ধে শ্রীরঙ্গপত্তনে ছিলেন । সে রক্তপাত লুঠতরাজের স্মৃতি তাঁকে বিবশ করেছিল । বলেছিলেন—পুত্র, মানুষ যখন যুদ্ধ করতে নামে তখন রাক্ষস হয়ে যায় । আমি জানি । চল । পণ্ডীচেরী ফরাসী এলাকা ; সেখানে চল ।

পণ্ডীচেরী থেকেই তিনি এক দিন আম্মা সাহেবের কাছে বিদায় নিয়ে যাত্রাজে ফিরেছিলেন । স্থল পথে নয়, সমুদ্র পথে বড় মালবাহী নৌকায় । আম্মা তাঁকে অর্থ দিয়েছিলেন আর একটি বীণা দিয়েছিলেন । বলেছিলেন—পুত্র, মনকে বাঁধো । তাকে আর পাবে না । এই দুনিয়ায় হারানোই নিয়ম । মানুষ হারাতেই আসে । বেঁচেও যদি থাকে তবুও ঠিক তাকে আর পাবে না ।

একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন—ঈশ্বর খুঁজতে বারণ করবার অধিকার আমার নেই । নিজে এই বৃদ্ধ বয়সে ওই ছাড়া তো বাঁচবার পথ দেখি না । তবুও বারণ করছি । তোমার মূলধন আছে । ওই ভাণ্ডারে যদি চিরকাল রাখতে পার তবে যে সুখ পাবে সে চোখের জলের সুখ ।

একটু চুপ করে থেকে আবার বলেছিলেন—তার থেকে তুমি ঈশ্বরকে খুঁজো । না—পেলেও দুনিয়া তেতো হবে না । তাকে পুরু জীবনেই মেলে না, মরণেও মেলে ।

মাদ্রাজ এসেছিলেন ।

ঘোসেফরা দেখা করেছিল । আচার্যেরা দেখা করেন নি । তাঁর বসবাসের পাথর ইট দাঁড়িয়েছিল আর কিছুই ছিল না । কারা লুটতরাজ করে নিয়ে গেছে ।

তিনি হেসেছিলেন । দুঃখ হয়েছিল পুরু দেবতার মূর্তিটির জন্য । তিনি ওই ভাঙা ঘরেই থাকতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সে সম্ভবপর হয় নি । সব শেষে প্রশ্ন করেছিলেন—ঘোসেফ—ইয়া ?

—সে আর আসে নি আচার্য ।

চুপ করেছিলেন রঙ্গনাথন ।

ঘোসেফ প্রশ্ন করেছিল—তুমি কোথায় গিয়েছিলে আচার্য ?

—তারই সন্ধানে ।

—লক্ষ্মী ?

—হাঁ যোশেফ। আমি তোমার কাছে সত্য বলব। তাকে আমি বরেরাজের নাম নিয়ে সমুদ্র-সাক্ষী করে বিবাহ করেছিলাম। সেই দিন রাত্রে যে দিব—সংক্ষেপে সব বলেছিলেন তিনি যোশেফকে। বলেছিলেন আমার অপরাধ। আমার অপরাধে—। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিলেন তিনি।

যোশেফ সবিস্ময়ে বলেছিল—তুমি পতিত হয়েছ—রঙ্গনাথন ?

রঙ্গনাথন বলেছিলেন—না যোশেফ লক্ষ্মীকে ব্রাহ্মণী পত্নী বলে গ্রহণ করেছিলেন।

যোশেফ আক্ষেপ করে বলেছিল—হতভাগিনী, সে হতভাগিনী। নির্বোধ। সে আমার কাছে এল না কেন ? একটু পর সে প্রশ্ন করেছিল—কিন্তু তুমি এখন কি করবে রঙ্গনাথন ?

—ঠিক তো জানি না।

যোশেফ বলেছিল—তুমি আর মান্দ্রাজে থেকো না রঙ্গনাথন। এ কথা প্রকাশ হলে—

—তাতে তো আমি লজ্জিত হব না যোশেফ। পতিত তো আমি হয়েই আছি।

লজ্জিত তিনি সত্যই হন নি। মান্দ্রাজকে তিনি জয় করেছিলেন। গানে। পালা গান গান নি। মার্গ সঙ্গীত গেয়ে তিনি নতুন করে মানুষকে জয় করেছিলেন। মন্ত্রমুগ্ধের মত ; সঙ্গীত-বিলাসী ধনীর নিমন্ত্রণে শুধু মানুষের আদরে। লোকে বলেছিল—রঙ্গনাথন পাগল হয়ে সিদ্ধি লাভ করেছে গানে।

আচার্য চিদাম্বরম বলেছিলেন—তুমি একটা প্রায়শ্চিত্ত কর রঙ্গনাথন।

রঙ্গনাথন হেসে বলেছিলেন—মার্জনা করবেন আচার্য!

এর পরও কয়েকটি স্থানে নিমন্ত্রণ তিনি পেয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সম্মান—এবং সম্মানী মূল্য। কিন্তু ভাল লাগল না। বেরিয়ে পড়েছিলেন বীণা নিয়ে। মান্দ্রাজ থেকে কোম্পানীর জাহাজে এসেছিলেন কলকাতা। কলকাতা থেকে বেরিয়েছিলেন—তীর্থে। বাংলাদেশ থেকে উত্তর ভারতের পথ তখন হিংস্রের মত বিপদ সংকুল ছিল না। দু বৎসর তীর্থে তীর্থে বেড়িয়ে এসেছিলেন পুরী। ভাল লেগেছিল স্থানটি। বড় ভাল লেগেছিল। মহাপ্রসাদ যে দেয় তার হাত থেকে নিয়ে যে খেতে হয়। আঠারোনলের দেবতা নীল মাধব। তেমনি ভাল লেগেছিল—ভুবনেশ্বর। এখানেই থেকে গেছেন সেই অবধি। বেশীর ভাগ থাকেন—পুরীধামে—পুরুষোত্তমের রাজধানীতে। শবর পল্লীর অতি নিকট সমুদ্রতটে একখানি ঘর নিয়েছেন। ওই মান্দ্রাজের ঘরের মতই। অর্থের তো অভাব ছিল না। আশপাশের বড় বড় স্থানে নিমন্ত্রণ তিনি পেতেন। লোকে ভাল বাসত। মধ্যে মধ্যে পুরীতে সবার জন্য তিনি সেই পুরোনো পালা গাইতেন। কয়েকজন বন্ধুকেও তিনি আপনার মত করে নিয়েছিলেন। তিনি গান ধরেন—মানুষের কল্পকর্মের অন্তরাল তিনি বাস করেন তিনিই বাস করেন বৈকুণ্ঠে। তিনি বাস করেন বৈকুণ্ঠে তিনিই বসবাস করেন কল্পকর্ম মানুষের অন্তর লোকে। তিনিই নীলমাধব। বাস করেন সমুদ্রতটে।

জয়ধ্বনি ওঠে। জয় পুরুষোত্তম! জয়! জয়! জয়!

গান শেষ করে রাত্রে শয়ন করে কাঁদেন—লক্ষ্মী। লক্ষ্মী।

লক্ষ্মী হারিয়ে গেছে। আমরা দরবর্তী বাঈ ঠিক বলেছেন—মানুষ আসে দুনিয়ায় হারাবার জন্য! সব হারায়।

মধ্যে মধ্যে পালিয়ে আসেন ভুবনেশ্বরে। বিশেষ ক'রে যখন যাত্রী সমাগম হয়—তখন এখানে এসে আশ্রয় নেন। বিন্দু সরোবরের কাছে একটি আশ্রয় দেখে নেন। এখানকার পাণ্ডারাও তাঁকে ভালবাসে—তারা ঠিক করে দেয়। তিনি সারা দিনটা ঘুরে কাটান। বীণাটি হাতে বেরিয়ে যান। চলে যান দুর্গম—উদয়গিরি খণ্ডগিরি পর্যন্ত। সর্পসংকুল হিংস্র শ্বাপদ-সংকুল স্থান। তবু যান।

ক'দিন হ'ল আজও তিনি বসে আছেন ভুবনেশ্বরে। চলে এসেছেন পুরী থেকে। বসন্ত পূর্ণিমায় মহাপ্রভুর দোলযাত্রা উৎসব। রথযাত্রার মত ভিড় না হলেও ভিড় অনেক হয়। বসে আছেন বিন্দু সরোবরের ধারে। কোথায় পুষ্পিত হয়েছে চম্পকবৃক্ষ! মদির গন্ধ আসছে। কাছে একটি নিম্ন গাছকে আশ্রয় করে একটি লতা পীতবর্ণ পুষ্পস্তবকে যেন ভেঙে পড়তে চাইছে। বেলা প্রায় এক প্রহর! কোলের উপর

বীণাটি রয়েছে, তাতে সুর তিনি তারে কণ্ঠার দিয়ে সুর তুলছেন। কি বাজাচ্ছেন—সে সম্পর্কে খুব সচেতন নন! আঙুল তাঁর বাজিয়ে চলেছে অবচেতন মনের খেয়ালে। তিনি নিজে ভাবছেন—সব মিথ্যা এইটেই সব থেকে বড় সত্য।

পুষ্পস্তবক আঙ্কুর করে বনা নবমল্লিকারা গুঞ্জন করছে। প্রমত্ত হয়ে গুঞ্জন করছে। বীণাতে তাঁর আঙুল ওই গুঞ্জন ঝঙ্কারকে তুলে চলেছে।

একটি কলরব এসে কানে পৌঁছুল।

তিনি চোখ তুললেন। কলরবের ভাষা তাঁকে আকৃষ্ট করেছে। তামিল ভাষার কথা বলছে। দক্ষিণের যাত্রী এই সময় আসে বেশী। এই ইংরেজ রাজত্বে নিজাম শিশুরাজ্যের তাণ্ডবের মধ্যে সব পথ বিপদ সঙ্কুল। সমুদ্র পথ আষাঢ় মাসে বন্ধ বিক্ষুব্ধ। তাই নৌকা করে তারা এই বসন্তোৎসব কোলযাত্রার সময় বেশী আসে। তামিল-ভাষী যাত্রী। স্বাভাবিক ভাবেই তিনি উৎসুক দৃষ্টিতে তাকালেন। একদল নারী পুরুষ। সন্ন্যাসিনী একজন। অনাবৃত বক্ষ, মাথার রুক্ষ কেশভার চূড়া ক'রে বাঁধা। ওকে? গলায় তুলসীর মালা! ওকে?

মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেলেন তিনি!

লল্লা! লল্লা সন্ন্যাসিনী! কণ্ঠে তার তাঁরই দেই তুলসীর মালা। গৈরিক-বাসা - শীর্ণা, তপস্বিনী। আয়ত দৃষ্টিতে বৈরাগ্য। সে লল্লার—এ লল্লার অনেক প্রভেদ! তবু—ও লল্লা! লল্লা তাঁকে দেখে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে! স্থির দৃষ্টিতে দেখছে! নিষ্পলক স্থির দৃষ্টি।

যাত্রীরা তাকে বলছে—কি হ'ল? এস। কল্যাণী। কল্যাণী!

লল্লা নিরুত্তর।

তিনি চীৎকার ক'রে ডাকতে চাচ্ছেন, কিন্তু কণ্ঠ কি তাঁর রুদ্ধ হয়ে গেল?

হে বরদরাজ—হে রঙ্গনাথস্বামী—ভাষা দাও, ভাষা দাও।

লল্লা নড়েছে! স্থিরদৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে কম্পিত পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে। সে কাছে এসে নত-জানু হয়ে বসল। তিনি এবার বললেন—কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে গেছে তাঁর—বললেন—লল্লা।

সে হাত জোড় ক'রে স্মিত হেসে বললে—আমি কল্যাণী। কন্যাকুমারীকার দেবী কুমারীমাতার মন্দির পরিমার্জনা করি—আর মাতার দৃষ্টান্তে তপস্যা করি। বরদরাজকে আমার কামনা। লল্লাকে আমি জানতাম। সে সেদিন সমুদ্র জলে ডুবে মরতে গিয়েছিল। তাকে তুলেছিলেন—কন্যাকুমারীর সন্ন্যাসিনী মাতা—তাঁরা নৌকায় ফিরছিলেন—পার্শ্বসারথি দর্শন করে। লল্লাকে তুললে সে বাঁচে নি প্রভু। সে মরে গেছে। মরবার সময় এইটি আমার কাছে গচ্ছিত রেখে গেছে। আপনাকে দেবার জন্যই দিয়ে গেছে। আমি আপনাকে জানি!

বলে গলার মালাগাছি খুলে—তাঁর পায়ের তলায় রেখে—প্রণাম করলে।

রঙ্গনাথন জড়িত কণ্ঠে আর একবার বললেন—লল্লা।

—আমি কল্যাণী। আমি আমি প্রভু।

লল্লা চলে যাচ্ছে। মালা গাছি পড়ে রয়েছে। তিনি স্থানুর মত বসেই রইলেন।

চোখ বন্ধ হয়ে গেল তাঁর। বোধ হয় আপনা থেকেই। চোখের ভিতর জল ছল ছল করছে। রঙ্গনাথন আর্ত কণ্ঠে ডাকলেন—কল্যাণী!

সে আহ্বানে না দাঁড়িয়ে পারল না সন্ন্যাসিনী—

রঙ্গনাথন প্রশ্ন করলেন—চোখ থেকে তখন অশ্রুধারা উদ্গত হয়েছে। আর্তস্বরেই বললেন—পৃথিবীর কি সবই মিথ্যা? সন্ন্যাসিনী সহসা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলে না! আকাশের দিকে তাকিয়ে উত্তর খুঁজে নিয়েই বললেন—না প্রভু, সব সত্য! বৃক্ষশাখার বৃন্তে পুষ্প কলিও সত্য—বিকশিত দল পুষ্পও সত্য। আবার ঝরে যাওয়া ফুলও সত্য। এবার আসি! সব সত্য!

চোখ বন্ধ করেই বসে রইলেন রঙ্গনাথন। চোখ খুলতে সাহস হল না। শুধু আঙুলগুলি চলছে বীণার তারের উপর। পদ পদ কি মিলিয়ে যাচ্ছে?

হঠাৎ মনে হল—এ কি, কি বাজাচ্ছেন তিনি?

ক্ষীণ একটি হাস্যরেখা ফুটে উঠল তাঁর ওষ্ঠ প্রান্তে।

এ তো বসন্ত রাগ!

—শেষ—

মর্ত্যসীমার বাইরে

পৃথিবী ছাড়িয়ে দূরে আরও দূরে

গৌরদাস মুখোপাধ্যায়

মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কৌতূহলী মানুষ তার চারপাশের প্রাকৃতিক রহস্যের উদ্‌ঘাটনে নিজেকে বার বার নিয়োজিত করেছে। নীল আকাশের নীচে মহাবিশ্বের নিত্তব্ধ পৃথিবীর মধ্যে গ্রহ উপগ্রহ উল্কা ধূমকেতু সূর্য তারা নক্ষত্রমণ্ডল ছায়াপথ নীহারিকাদের রূপ রংএর রহস্য বারম্বার আহ্বান জানিয়েছে মানুষের দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও কবি মনকে। তাইতো মানুষ হতে চেয়েছে মহাশূন্যের মহাতীর্থযাত্রী ; দুর্নিবার তার পণ!—দ্রুত হতে দ্রুততর যানে দেশ হতে দেশান্তরে দূর হতে আরও দূরে মহাশূন্যের পথে পাড়ি দিয়ে বার বার কেবল পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেই সে ক্ষান্ত হবে না। চাঁদের দেশের সীমানা ছাড়িয়ে পৃথিবীর অভিকর্ষের বাঁধন ছিঁড়ে ভারশূন্য অবস্থার অবাধে ভেসে চলবে সে অমৃতের সন্ধানে গ্রহ হতে গ্রহান্তরে সৌরলোক হতে অন্য নক্ষত্রলোকে নির্বিঘ্নে স্বচ্ছন্দে মহানন্দে। দরকার মত সে আশ্রিয় নেবে চাঁদের দেশে, মোঙর বাঁধবে মঙ্গল বা শুক্র গ্রহে, কোনও গ্রহে আবার সন্ধান করবে জীবনের অস্তিত্বের বা অন্য লোকেও মনুষ্যজীবনের সম্ভাবনাকে করবে সে পরীক্ষা নিরীক্ষা। হয়তো কালপুরুষ ও ও ধ্রুবতারার সঙ্গে তার ঘটবে সাক্ষাত নিত্যকালী, নীহারিকা ও ছায়াপথের অসংখ্য আলোকমালা থাকবে তার নাগালে।

উল্লিখিত পটক্ষেপে দেশকাল ও ব্যাপ্তির দুর্লঙ্ঘ্য বাধা বিপত্তি অতিক্রমণে চলেছে অতিসূক্ষ্ম পারিপার্শ্বিক গবেষণার ব্যবহারিক প্রয়োগ, মূল বিজ্ঞান লব্ধ জ্ঞানের ব্যবহার এবং সুশিক্ষিত কুশলী যান্ত্রিক ও উঁচু মানবতা-বোধ সম্পন্ন দুঃসাহসী বীরদের আত্মনিয়োজন। এই পারমাণবিক যুগে মহাকাশাভিযানে জয়যাত্রার পথে এ পর্যন্ত কিন্তু সব থেকে বেশী সাফল্য ও প্রাধান্য লাভ করেছে সোভিয়েত রাশিয়া। আজ থেকে মাত্র পাঁচ বছর আগেকার কথা ১৯৫৭ খৃঃ আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ বিজ্ঞান বর্ষের ৮ই অক্টোবরে সোভিয়েত রাশিয়া হাকল্যের

পৃথিবী ছাড়িয়ে দূরে আরও দূরে

প্রথম মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়ে একটি বিশ্বচাঁদ বা কৃত্রিম উপগ্রহ,—পৃথিবীর সহযাত্রী 'স্পুৎনিক—১'। উচ্চবেগ সম্পন্ন রকেট হতে স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক কৌশলে কৃত্রিম এই উপগ্রহটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে অবিশ্বাস্য বেগে উৎক্ষিপ্ত হয়ে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টানের সঙ্গে সমতা রক্ষা করে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে লেগে গেল। প্রথম স্পুৎনিকটি অবশ্য খুব ছোট ছিল,—ওজনে মাত্র ৮৩ কিলোগ্রাম। তারপর ৩রা নভেম্বর ১৯৫৭ তাঃ মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হল রাশিয়া নির্মিত দ্বিতীয় কৃত্রিম উপগ্রহ স্পুৎনিক—২ যেটি প্রথমটির তুলনায় অনেক বড় ও ভারী—ওজনে ৫০৮ কিলোগ্রাম। কেবল বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিই নয় এর একটি বিশেষ আধারে বাহিত হ'ল 'লাইকা' নামের মহাবীর কুকুর। মহাকাশে অভাবনীয় উচ্চতা পর্যন্ত "লাইকা" উড্ডয়ন করতে সমর্থ হয়েছিল। তারপর ছুটল স্পুৎনিক —৩ আরও অনেক ভারী ও বড়, ওজনে ১৩২৭ কিলোগ্রাম —১৯৫৮ খৃঃ ১৫ই মে তাঃ। প্রথম বিশ্বচাঁদ স্পুৎনিক—১ এর আয়ু কুরিয়েছিল ৯২ দিনে ১৪০০ বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করবার পর এবং মোট ৭ কোটি কিলোমিটার পথ ঘুরে। স্পুৎনিক—২ এর দৌড় চলেছিল ১৬২ দিন ধরে, মোট ১০ কোটি কিলোমিটার পথ ঘুরে বার বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে। স্পুৎনিক—৩ পৃথিবী প্রদক্ষিণ চালায় ৬৯১ দিন ধরে, মোট ১০,০৫৬ বার এটি পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে এবং সবশুদ্ধ প্রায় ৪৫ কোটি কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে। অবশ্য রাশিয়া কর্তৃক অভাবনীয় সাফল্যের পরও এমেরিকাও কয়েকটি কৃত্রিম চাঁদ মহাকাশে উৎক্ষেপণ করতে সমর্থ হয়,—যেমন ৩১শে জানুয়ারী ১৯৫৮ তাঃ 'এক্সপ্লোরার' নামের কৃত্রিম চাঁদটিকে এবং ১৭ই মার্চ ১৯৫৮ তাঃ 'ভ্যানগার্ড" নামের উপগ্রহকে। স্পুৎনিক গুলির আধারে স্বয়ংক্রিয় সূক্ষ্ম যন্ত্র-সংস্থান, রেডিয়ো টেলিভিশন প্রভৃতি রক্ষিত হয় ; এবং এই সকল যন্ত্রের মারফতে মহাকাশে তেজস্ক্রিয়তা এবং সূর্যের রশ্মিমণ্ডলী সম্বন্ধে বহু অজানা রহস্য ও মূল্যবান বৈজ্ঞানিক তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়।

মহাকাশ আবিষ্কারের পথে স্পুৎনিকের উৎক্ষেপন যদিও বৃহৎ ও মহৎ ঘটনা, তবুও প্রথম স্পুৎনিককে আজ অতি ক্ষুদ্র ও সামান্য বলেই মনে হয়।—রকেটের তৈরী একটি ১৩ ইঞ্চি ব্যাসের গ্লোব যা রেডিয়ো ষ্টেশন ও কতকগুলি সামান্য যন্ত্রপাতি নিয়ে সর্বপ্রথম নির্দিষ্ট কক্ষ-পথে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে সমর্থ হ'ল। তারপর বহু পর্যায় বিশিষ্ট রকেটব্যবস্থা ক্রমে উন্নতশীল এবং স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রসহায়ে ঊর্ধ্বাকাশে তুলতে থাকে। আলোর গতিপথ অনুসরণ, নিয়ন্ত্রণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, দিক-নির্ণয় এবং ব্রেক ব্যবস্থা ক্রমেই আরও সূক্ষ্মতর হতে থাকল। ফলে ৪ঠা অক্টোবর ১৯৫৯ তাঃ পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণের বেড় পেরিয়ে মহাকাশ-রকেট 'লুনিকের' মহাশূন্যে ক্রমান্বয়ে দূরে হতে দূরতর বেগে পরিভ্রমণ সম্ভব হ'ল। এবং পূর্ব পরিকল্পিত পথে 'চন্দ্র' প্রদক্ষিণ করতে সক্ষম হ'ল এই 'লুনিক'। লুনিকে রক্ষিত স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরাতে ধরা পড়ল চন্দ্রের অপর পিঠটির যথার্থ স্বরূপ। ঐ পিঠটিকে আমরা এ যাবত কখন দেখতে পাই নি। এবং রেডিও-টেলিভিশনের সাহায্যে অপূর্ব কৌশলে পৃথিবীতে প্রেরিত হ'ল চন্দ্রের অপর পিঠটির যথার্থ ফটো। তাছাড়া চন্দ্রের রাজ্যে সর্বপ্রথম প্রোথিত হ'ল সোভিয়েত দেশের মৈত্রীর বিজয়-পতাকা।

তারপর সম্ভব হ'ল শুক্র গ্রহের দিকপানে ভারী এক

স্পুটনিক হতে এক দূরপাল্লার মহাকাশ-রকেটের যাত্রা। এ ছাড়া আরও বহু মহাযান মহাকাশে নানা পর্যবেক্ষণ করে পৃথিবীর এলাকায় নির্দিষ্ট পথে আবার ফিরেও এল।

এর পর ১লা জানুয়ারী ১৯৫৯। ঐ দিবসে রাত্রির অন্ধকারে সোভিয়েতের চেকপ্রজাতন্ত্রীয় সম্বলিত মহাযান 'লেনুতা' অর্থাৎ 'স্বপ্ন' পেল বাস্তব রূপায়ন। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব কাটিয়ে চন্দ্রের আকর্ষণকেও অতিক্রম করে, পৃথিবী ও চন্দ্রের এই দুই গ্রহের অন্তরবর্তী মহাশূন্যে নিজস্ব এক কক্ষপথে ক'রে এই কৃত্রিম গ্রহটি সুরু করে দিল অন্যান্য গ্রহদের মত সূর্য প্রদক্ষিণ। মনুষ্যকৃত এই কৃত্রিম গ্রহটি সৌরপরিবারের অন্যতম সদস্য পদ লাভ করে নিজ কক্ষপথে প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ৩২ কিলোমিটার গতিবেগে ১৫ মাসে একবার করে সূর্য প্রদক্ষিণ করে চলেছে।

মহাকাশের প্রযুক্তি বিদ্যা ও ইঞ্জিনীয়ারিং মত বিকাশ লাভ করতে লাগল পৃথিবীর চারদিকের মহাজগৎ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানও তত উন্নত হতে থাকল। স্পুটনিক লেবরেটরী ও মহাকাশ-রকেট সমূহের দ্বারা মিলিত পর্যবেক্ষণের ফলে তথাকথিত মহাশূন্য সম্বন্ধে এল নতুন নতুন তথ্য। ফলে, মহাকাশ জয়ের আশা অর্থাৎ মহাকাশে বাসা বাঁধা ও কাজ করার সম্ভাব্যতা সূচিত হ'ল পৃথিবীর মানুষের কাছে। জীবাণু হতে কুকুর জীবগুলির দেহগঠনের উপর বিবিধ পরীক্ষা ও গবেষণার ফলে মহাযোমযানে জীবন ধারণ ও স্বাভাবিক কাজকর্ম চালাবার নিশ্চিত ব্যবস্থার উদ্ভাবন সম্ভবপর হ'ল। এর পর মহাকাশবিহারে বিশ্ব পরিক্রমার উদ্দেশ্যে বিশ্বের প্রথম মনুষ্যবাহী ও মনুষ্যচালিত ভস্তোক-১ নামের মহাযোমযানটি সাফল্যের সঙ্গে উৎক্ষিপ্ত হল মহাকাশের পথে ১২ই এপ্রিল ১৯৬১ তাং। সোভিয়েত দেশের বীর-নাগরিক যেজর য়ুরি গাগারিন স্বীকৃতি লাভ করলেন প্রথম মহাকাশচারী রূপে। ৮৯·১ মিনিট সময়ে একবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করবার পর য়ুরি গাগারিন চালিত মহাযোমযানটি আরও ১৯ মিনিটকাল নিম্ন কক্ষপথে অবস্থান করে। এবং রেডিও-টেলিভিশনের মারফত ভূপৃষ্ঠের সঙ্গে তার যোগাযোগ অব্যাহত থাকে।

পরিবারের জন্য
সেরা উপহার

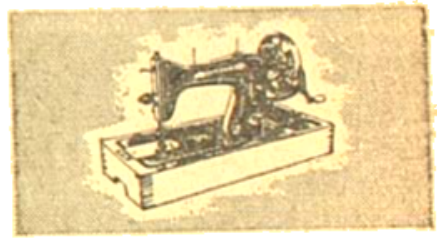

উৎসব তো উপলক্ষ্যে উপহার দেওয়ার সময় আর উষা সেলাই কলের চেয়ে ভালো উপহার কি হতে পারে! একটি উষা সেলাই কল বাড়ীতে থাকলে কত উপকার হয়। আধুনিক ডিজাইনে গড়া প্রতিটি উষা মেশিনে অনেক রকম সুবিধা। ব্যবহার মাত্র। উষার শুধু সেলাই হয় না, উষার সেলাই করাটা আনন্দময়ও বটে।

সুবিধাজনক কিস্তির সর্ত স্থানীয় বিক্রেতার নিকট জেনে নিন।

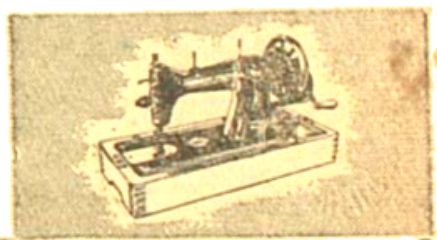

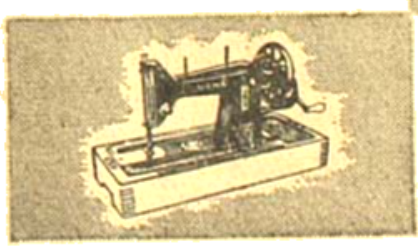

উষা কিনুন-
আরামে সেলাই করুন

উষা
সেলাই কল

চিত্রিত মেশিনগুলি ছাড়া ছুট এবং কোচিং ধরনের পাওয়া যায়।

বর ইণ্ডিয়া ইণ্ডাস্ট্রিজ ওয়ার্কস লিঃ, কলিকাতা-৩১

মুক্ত পরিবেশের চিহ্নের এক চুলও এদিক ওদিক বিজয়াভিযান এবং পরদিন পাভেল পপোভিচের নেই। যদি গাগারিনের মহাযোমযানটি নির্দিষ্ট সুরু হল বিচিত্র মহাকাশবিহার। মহাযান উপবৃত্তাকারের কক্ষপথে পৃথিবী পরিভ্রমণ করল, এই দুটি মহাকাশে নির্দিষ্ট কক্ষপথে পরস্পরের কক্ষপথটির 'অনুভূ' অর্থাৎ পৃথিবী থেকে সব কাছের দূরত্ব ছিল ১৭৫ কিলোমিটার এবং 'অপভূ' অর্থাৎ সব থেকে দূরত্ব ছিল ৩০৮ কিলোমিটার।—তারপর তিনি নিরাপদে অবতরণ করলেন পৃথিবীর বুকে নির্দিষ্ট স্থানে।

এর চার মাস পর দ্বিতীয় মহাযোমযান ভোস্তক-২ এ মহাকাশে আরও জোরালো অভিযান চলল পৃথিবীর দ্বিতীয় মহাকাশচারী সোভিয়েত নাগরিক মেজর যেরম্যান তিতোভের। তিতোভ চালিত ভোস্তক—২ মহাযানটি ২৫ ঘণ্টা ১৮ মিনিট কাল মহাকাশে অবস্থান করে ১৭ বার পৃথিবীর প্রদক্ষিণ করল। অবশ্য এরপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও কার্পেন্টার, শেপার্ড ও জন গ্লেন মহাকাশ বিহারে অল্প বিস্তর সাফল্য লাভ করলেন।

তারপর এল মহাকাশচারণের দুটি বিশেষ স্মরণীয় দিন—১৯৬২ খৃস্টাব্দের শনিবার ১১ই আগস্ট ও রবিবার ১২ই আগস্ট। প্রথম দিন ভোস্তক—৩ এ আন্দ্রিয়ান নিকোলায়েফের সুরু হল মহাকাশে

দুটি মহাকাশে নির্দিষ্ট কক্ষপথে পরস্পরের সঙ্গতি রক্ষা করে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে থাকে। বেতারে নিয়ন্ত্রিত যোগাযোগ স্থাপিত হল মহাযোম দুটির মধ্যে। নিকোলায়েফের মহাযানটি প্রায় ২৫ ঘণ্টা ধরে এবং পপোভিচেরটি প্রায় ২১ ঘণ্টা যাবত পৃথিবী প্রদক্ষিণ রত রইল। নিকোলায়েফ পৃথিবী প্রদক্ষিণ করলেন ৬৪ বার এবং পপোভিচ ৪৮ বার। "মহাজাগতিক ভ্রাতৃ যুগল" নিজ নিজ "নক্ষত্র গৃহের" কেবিন সন্নিবিষ্ট টেলিভিশন সেট্ এর পরদায় পরস্পরকে দেখতে পেলেন। মর্ত্যবাসীরাও নিজ নিজ ঘরে বসে ঐ দুই নির্ভীক মহাকাশচারী-নিকোলায়েফ ও পাপোভিচের ছবি দেখতে পান টেলিভিশন সেট্ এ; তারা এও দেখতে পান যে নিকোলায়েফ তাঁর ভোস্তক-৩ মহাযানের মধ্যে চেয়ার থেকে উঠে চারদিকে চলা ফেরা করতে সক্ষম অত উচ্চে দেহের ভারশূন্য অবস্থায় এরূপ ভাবে চলা ফেরা করা মাটিতে শিশুর প্রথম পদক্ষেপের ন্যায় তাৎপর্যপূর্ণ। একযোগে পূর্ব-নির্দিষ্ট কক্ষ পথে মহাকাশবিহারী দুজন মহাকাশচারীর দুটি পৃথক মহাযানে পৃথিবী পরিক্রমণ, পারস্পরিক সংযোগ রক্ষা, পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে তাদের রেডিও-টেলিভিশান মারফত আদান প্রদান, নির্বিঘ্নে সুস্থ শরীরে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন, ইত্যাদি ঘটনাগুলি অদূর ভবিষ্যতের মহাকাশচারণের ব্যাপারে উজ্জ্বল সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। ফলে, এ কথা নিশ্চয়ই বলা যেতে পারে যে সে দিন আগতপ্রায় যখন ম্যানুভারের কৌশল, অক্লেশে কক্ষ পরিবর্তন, একত্রে সম্মিলিত হওয়া এবং মহাকাশে নানা রকমের নির্মাণ ও গঠনমূলক কাজ সমবেতভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হবে। এ বিষয়ও প্রায় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে যে চন্দ্রে যাওয়া আসার জন্য যে প্রচণ্ড রকম সহ্য করতে হবে তা সইবার শক্তি হয়তো মানুষের আছে। সুতরাং যদি আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই মহাকাশচারী মানুষ চন্দ্রে বা পৃথিবীর নিকটবর্তী গ্রহগুলিতে পৌঁছুতে পারে তাতে আশ্চর্যে বিমূঢ় হওয়ার আর অবকাশ নেই। গ্রহে গ্রহে জীবনের দেহরূপের অস্তিত্বের প্রশ্নটি বিশেষ অনুসন্ধানের বিষয়। শুক্র ও মঙ্গল গ্রহে কি জীবন আছে? থাকলে তার রূপ ও রকম কেমন?

চতুরঙ্গ

কার্তিক ১৮৮৪ শকাব্দ

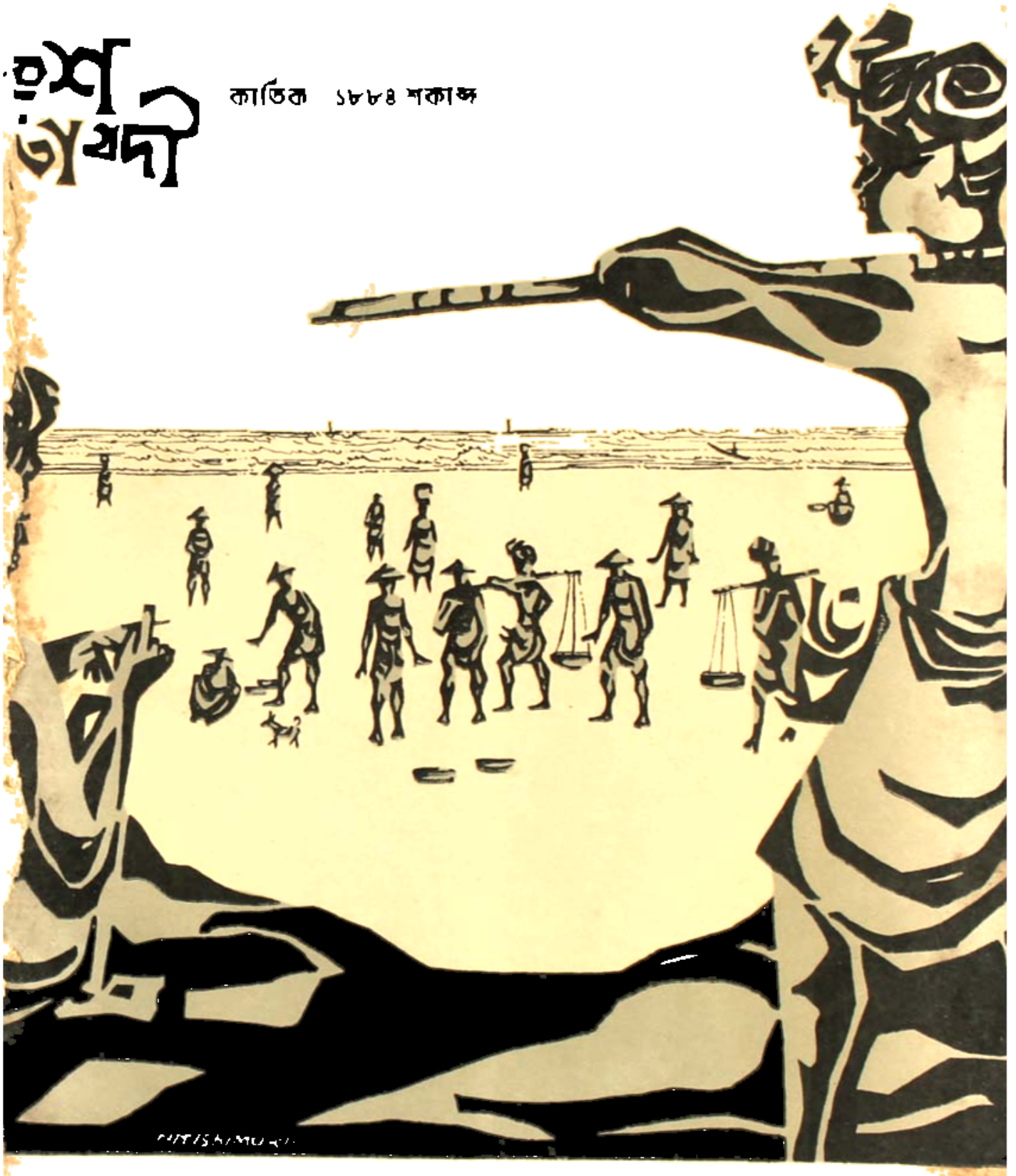

অগ্রাধিকার
অগ্রাধিকার
অগ্রাধিকার

কেউ হয়তো ভীষণ অসুস্থ ···
অবিলম্বে সংবাদ পাঠাতেই হবে,
***প্রায়রিটি টেলিগ্রামে* সেই খবর পাঠান।**

অসুস্থতা, দুর্ঘটনা অথবা মৃত্যুর সংবাদ অগ্রাধিকার টেলিগ্রামে পাঠানো যায়।

এটি, সমস্ত রকম এক্সপ্রেস ও জরুরী বার্তার ওপরে অগ্রাধিকার পাবে, কিন্তু এর জন্য খরচ সাধারণ এক্সপ্রেস টেলিগ্রামের মতোই

এ রকম টেলিগ্রাম করার সময় "*প্রায়রিটি*" কথাটি লিখে দিন।

আপনাদের আরও সেবা করতে
আমাদের সাহায্য করুন

তার ও তার বিভাগ

সূচীপত্র

বিংশ শতাব্দী
সপ্তম বর্ষ : ৫ম সংখ্যা
কার্তিক ১৮৮৪

লেখক		বিষয়
সম্পাদকীয়	৭২৯	আমাদের কথা
অসীম কুমার চক্রবর্তী	৭৩০	জীবকোষ (বিজ্ঞান)
প্রফুল্ল সরকার	৭৩৬	জন্ স্টাইনবেক্ (বিশ্ব-সাহিত্য)
নবেন্দু ঘোষ	৭৪১	সুখ নামে শুক পাখী (বড় গল্প)
জগদীশ ভট্টাচার্য	৭৫৭	বালগোপালের ব্রজধামে (প্রবন্ধ)
আবদুল আজীজ আল্-আমান	৭৬৯	কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (জীবনী)
রেখা বড়ুয়া	৭৭৬	অভ্যাস (গল্প)
ই. ইলিয়েনকভ	৭৮১	মহান মানবতাবাদ (প্রবন্ধ)
তুষার চট্টোপাধ্যায়	৭৮৪	দূরত্ব চাহিনা (কবিতা)

সদ্য প্রকাশিত উপন্যাস

ডাঃ বিশ্বনাথ রায়ের

মুক্ত বিহঙ্গ

অসাধারণ উপন্যাস
মনোরম প্রচ্ছদ
দাম—৪৷০

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
দেহ দেউল ৩৲
সুপ্তিসাগর ৪৷৷০
জরাসন্ধের
আবরণ ৩৷৷০
ধনঞ্জয় বৈরাগীর
দুয়োরাণী ২৷৷০
শৈলেশ দে-র
বধূ ৩৲

কথাকলির সাহিত্য সম্ভার

প্রবোধকুমার সান্যালের
অবিস্মরণীয় সাহিত্যকীর্তি
চিত্র-বিচিত্র ৭৲

ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তের ভূমিকা সম্বলিত ও
অসিত গুপ্ত প্রণীত
এই বিশ্বের কথাসাহিত্য
ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত ও সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত
কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত। দাম—১৪·০০

বারীন্দ্রনাথ দাশের নতুন উপন্যাস
অতনু ও জীবন দেবতা ৪৷৷০
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের
নক্ষত্রের জ্বাল ৫৲
গল্পের চেয়েও রোমাঞ্চকর—
উপন্যাস অপেক্ষাও মনোজ্ঞ।

প্রশংসনীয় উপন্যাস

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের
তারার আঁধার ৩৷৷০
বিমল করের
মল্লিকা ৩৲
সুবোধ ঘোষের
কান্তিধারা ৩৲
সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের
শ্রীমতী ৪৲
বারীন্দ্রনাথ দাশের
দুলারীবাঈ ৪৲
আশাপূর্ণা দেবীর
উত্তরলিপি ৪৲
শক্তিপদ রাজগুরুর
কাঁচ-কাঞ্চন ৪৲
নীহাররঞ্জন গুপ্তের
জতুগৃহ ৪৲

কথাকলি ঃ ১,পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা-৯ | কথাকলির বই সব দোকানেই পাবেন

লেখক		বিষয়
প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়	৭৮৪	আমি মুসাফির (কবিতা)
অনিতাভ চট্টোপাধ্যায়	৭৮৪	কিশোরী (কবিতা)
কথক ঠাকুর	৭৮৫	চিত্রবাসিতা (গল্প)
অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়	৭৯০	সর্বভাষা কবি সম্মেলন (প্রবন্ধ)
হর দত্ত	৮০১	অনিকেত প্রেম (গল্প)
অমল হালদার	৮০৬	কিউবার ডঃ ফিডেল কাস্ত্রো (প্রবন্ধ)
রবীন্দ্র গুহ	৮০৯	বকুল শিমুল (গল্প)
দানিল দানিন	৮১৭	লিও লান্দাউয়ের জীবনরক্ষার কাহিনী (বিচিত্রা)
অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়	৮২০	কোন ছবি চলবে (রঙ্গজগৎ)
অজয় বসু	৮২৫	জাকার্তা ক্রীড়ায় ভারত (খেলাধূলা)
মোদ সেনগুপ্ত	৮২৯	ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জী (সংকলন)

অঙ্গসজ্জা

নীতিশ মুখোপাধ্যায়

★ পূজায় গ্রন্থমের সাহিত্য অর্ঘ্য ★

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের

ভারতে জাতীয় আন্দোলন

মৈত্রেয়ী দেবীর

বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ

মংপুতে রবীন্দ্রনাথ

ডেল কার্নেগির

দুশ্চিন্তাহীন নতুন জীবন

প্রতিপাত্ত ও বক্তুলাভ

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়ের

অদ্ভুতের উপাখ্যান

বিশ্বদেব বিশ্বাসের

কাঞ্চনজঙ্ঘার পথে

বাঘের চোখ লীলা মজুমদার

আজব নগরী শ্রীপান্থের

চিত্তরঞ্জন দেবের

তারাপীঠের একতারা

শচীবিলাস রায়চৌধুরীর

ডাকটিকিটের জন্মকথা

পরিমল গোস্বামীর

স্মৃতি চিত্রণ ৭·০০

রোল নম্বর ২০৫ (কিশোর পাঠ্য) ২·৫০

সাহিত্য • শিল্প • সংস্কৃতি বিষয়ক সাহিত্যিক অভিজ্ঞানুরাগ সেবায় নিবেদিত পত্রিকা

॥ ৮·৫০ ॥

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী প্রমুখ পঁচিশজনের লেখা

বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না ৩·০০

হাসি রায়ের

মধুজীবনীর নতুন ব্যাখ্যা ৭·০০

মণি মুখোপাধ্যায়ের

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ২·৭৫

—উপন্যাস ও নাটক—

নরেন্দ্র বৈরাগীর

মরুকন্যা ৭·০০ মধুরাই ২·৫০

এক মুঠো আকাশ ৫·০০ নাটক ২·০০

এক পেয়ালা কফি (নাটক) ২·৫০

আর হবে না দেরী (নাটক) ২·৫০

ফেরারী ফৌজ (নাটক) উৎপল দত্ত ২·৫০

সূর্যশিখা (উপন্যাস) মায়া বসু ৩·৫০

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের

সমুদ্র জয় মন ৩·০০

শিশুদের জন্য প্রকাশিত কিশোর পাঠ্য

দাক্ষিণাত্যের ঘোড় ২·২৫

গ্রন্থম ঃ ২২।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

ক্রেতাদের পূজার বিশেষ কমিশন দেওয়া হবে। পুস্তক তালিকার জন্য লিখুন।

আপনি জানেন কি?

এখন থেকে ক্রমবর্ধমান নির্দ্দিষ্টকালীন জমা পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ১০ এবং ১৫ বছরের জমাতেও, জীবন বীমার প্রিমিয়াম ও প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের মতোই আয় করে রেহাই পাওয়া যাবে।

এ ছাড়া, ১০ এবং ১৫ বছরের জমায়, চক্রবৃদ্ধি হারে বার্ষিক শতকরা যথাক্রমে ৩·৮ এবং ৪·৩ টাকা করমুক্ত সুদ দেওয়া হয়।

আপনার নিকটবর্ত্তী পোষ্ট অফিস থেকে অন্যান্য বিবরণ পাবেন।

জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা

৯৯ ৬৯/৩৭৭

"সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই"

বিংশ শতাব্দী

কার্তিক
১৮৮৪
সপ্তম বর্ষ
৫ম সংখ্যা

আমাদের কথা

সমগ্র ভারতবর্ষ আজ এক গভীর সংকটের সম্মুখীন হইয়াছে। ভারতের উত্তর সীমান্তে যে আগুন এতদিন ধিকিধিকি জ্বলিতেছিল আজ তাহা দাবানলে পরিণত হইয়াছে। গত ২০শে অক্টোবর চীনা সৈন্যরা ব্যাপকভাবে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছে। লাডাক ও নেফা—উভয় অঞ্চলেই ভারতভূমির একাংশ তাহারা দখল করিয়াছে।

এই পরিস্থিতিতে চীনাদের ভারতভূমি হইতে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত ভারত ক্ষান্ত হইতে পারে না। ভারতবর্ষ সামরিক দিক দিয়া শক্তিশালী না দুর্বল এ প্রশ্ন আজ বিদায় হইয়া গিয়াছে—টিকা জাতির আত্ম-সম্মানের প্রশ্ন।

সীমান্তের ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতি দ্রুত আবর্তিত হইতেছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীযুক্ত মেননকে পদত্যাগ করিতে হইয়াছে। ভারতবর্ষে মার্কিন ও ব্রিটিশ রণ-সম্ভার আসিতেছে। দেশে জরুরী পরিস্থিতি ঘোষিত হইয়াছে এবং ভারত রক্ষা আইন চালু হইয়াছে। সমগ্র জনসাধারণ শত্রুদের সহিত মোকাবেলা করিতে প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে। আজ সমগ্র জাতি যেরূপ সংঘবদ্ধ হইয়াছে এরূপ আর কখনও দেখা যায় নাই। প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর সুযোগ্য নেতৃত্বে ভারতবর্ষ শত্রু কবল মুক্ত হইবে—এ বিশ্বাস দৃঢ়তর হইবার কারণ ঘটিয়াছে।

শুধু ভারতবর্ষের পরিস্থিতি নহে, সমগ্র বিশ্ব-পরিস্থিতি আজ খুবই জটিল। কিউবায় মার্কিন অবরোধ এবং সোভিয়েত জাহাজের উপর খবরদারীর ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া পৃথিবী তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রবেশ করিতে চলিয়াছিল। সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী নিকিতা ক্রুশ্চেভের প্রজ্ঞা অথবা দুর্বলতা (যে নামেই অভিহিত করা হউক না কেন) বিশ্বকে তৃতীয় মহাযুদ্ধের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছে। মর্যাদার নূতন স্বরূপ বিশ্বযুদ্ধ অথবা বিনা মর্যাদায় শান্তি উভয়ের মধ্যে তিনি শান্তিকে বাছিয়া লইয়াছেন। বিশ্বযুদ্ধ আপাতত এড়ান গিয়াছে কিন্তু কতদিন যাইবে সে সম্পর্কে সন্দেহ আছে।

চীনকে ভারতবর্ষ হইতে না হটান পর্যন্ত আমরা ক্ষান্ত হইব না। কিন্তু সতর্ক থাকিতে হইবে ভারতবর্ষকে যেন বিশ্ব যুদ্ধের মধ্যে টানিয়া লওয়া না হয়। ভারত চীন সীমান্তের ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া বিশ্ব যুদ্ধ বাধিলে তাহা সমগ্র এশিয়া তথা ভারতের পক্ষে মর্মান্তিক হইবে।

চীন ও ভারতের সংঘর্ষকে কেন্দ্র করিয়া অবশ্য যে দিকে যাইতেছে তাহাতে এই সতর্কতার প্রয়োজন আছে। এই সঙ্কটমুহূর্তেও যেন আমরা ক্ষোট নিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র ও শান্তির আদর্শ পরিত্যাগ না করি।

সর্বশেষে, আমরা জাতির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সর্বসাধারণকে সর্বস্বপণের আহ্বান জানাইতেছি।

জীবকোষ

অসীম কুমার চক্রবর্তী

যে কোন জিনিষ দেখেই মনে হয় একটা মাত্র বস্তুকেই দেখছি, কিন্তু বিশ্লেষণভাত্ত্বিক মন নিয়ে দেখতে গেলে হয়ত দেখতে পাব এই আপাত-সরল একটা বস্তু ভিন্ন ধরনের কতগুলো বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত। এই যেমন ধরুন একটা জনকাল দালানের কথা, দেখে মনে হয় বাঃ বাড়ীটা তো বেশ, কিন্তু একটু ভাবলেই বাড়ীটার একক রূপের বদলে মনে হবে বাড়ীটা বহু ইট দিয়ে তৈরী। হাতে ধরা বইটা বেশ, কিন্তু বইটা কতগুলো পৃষ্ঠার সমন্বয় মাত্র। তেমনি খালি চোখে একটা মানুষকে দেখে মনে হয় ভগবানের সৃষ্ট একটা মাংসের জীবন্ত মাত্র। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের অনুসন্ধানী চোখে একটা পূর্ণাঙ্গ মানুষ প্রায় পঁচিশ কোয়াড্রিলিয়ন অর্থাৎ ২৫,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ কোষ বা সেল (Cell) দিয়ে তৈরী। এই কোষ বা সেল বাড়ী তৈরী ইটের মত ছোট ছোট হলেও একটি প্রাণী গঠনের একক (বা Unit) হিসেবে একটি বাড়ী তৈরীর ইটের সঙ্গে তুলনীয়। তবে এই কোষ বস্তুতপক্ষে অতি ক্ষুদ্র, সাধারণতঃ খালি চোখে তাদের দেখা যায় না।

এই জীবজগতের অর্থাৎ প্রাণবন্ত গাছপালা, জীবজন্তু সমস্ত কিছুই মূলত একই বস্তুতে অর্থাৎ কোষের সমন্বয়ে গঠিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে এ সত্য জানা ছিল না। তবে সেল বা কোষের নামকরণ হয়েছে সপ্তদশ শতাব্দীতে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রজার বেকনের (Roger Bacon) পাণ্ডুলিপির কয়েকটা অংকন দেখে মনে হয় তিনি সম্ভবত কোন জাতীয় কোন বস্তু নিরীক্ষণ করেছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অনুবীক্ষণ যন্ত্র (ছোট বস্তুকে বহুগুণে বর্ধিত করে দেখাবার যন্ত্র) আবিষ্কারক রবার্ট হুকেকেই কোষের আবিষ্কর্তা হিসেবে স্মরণ করা হয়। তাঁর নিজের তৈরী অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে তিনি বহু রকম বস্তু দেখতেন আর নিজের মনেই নূতন আবিষ্কারের আনন্দে মশগুল হয়ে থাকতেন। একদিন একটি কর্ক (ছিপির জন্য ব্যবহৃত) হতে একটি অংশ কেটে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায় রেখে দেখতে পান যে ঐ কর্কটির গায়ে অসংখ্য ছোট ছোট ফাঁকা কুঠুরি। প্রত্যেকটিই দেয়াল দিয়ে ঘেরা। রবার্ট হুকের (Robert Hooke) মনে হল এ যেন জেলখানার ছোট ছোট এক একটি প্রকোষ্ঠ, তাই তিনি জেলখানার ছোট প্রকোষ্ঠের নামানুসারে কর্কের এক একটি প্রকোষ্ঠের নাম দিলেন সেল (Cell) [বাংলায় কোষ]। এই সেল (Cell) শব্দটি ল্যাটিন সেলা (Cella) কথা থেকে এসেছে। সেলা (Cella) মানে একটা ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ। রবার্ট হুক তার এই নূতন তত্ত্বকে ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত করেন।

প্রকৃতপক্ষে রবার্ট হুক কোষের সব কিছুই দেখতে পান নি, তিনি কেবল বাইরের দেয়ালগুলিই দেখেছিলেন,

ভেতরের 'জীবন্ত পদার্থ'গুলি কম' শুকোবার সঙ্গে সঙ্গেই শুকিয়ে গিয়েছিল।

১৮৩০ খৃস্টাব্দে ইংরেজ উদ্ভিদতত্ত্ববিদ রবার্ট ব্রাউন (Robert Brown) সেলের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র একটা গোলাকার বস্তু দেখতে পেয়ে তার নাম দিলেন নিউক্লিয়াস। এর পরে কোষ নিয়ে গবেষণার ইতিহাস অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলে।

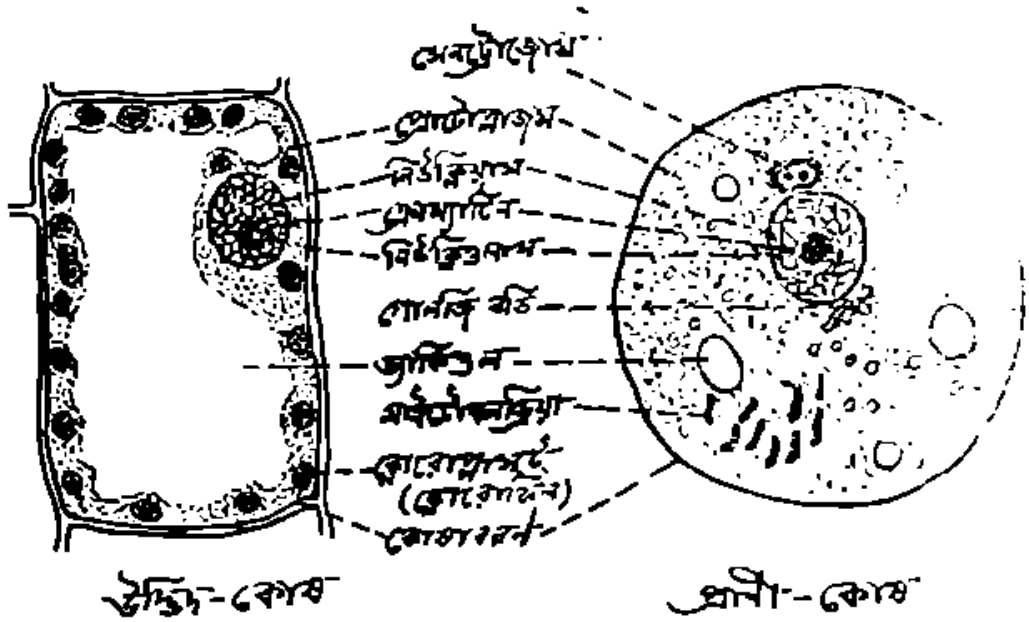

১৮৩৮ খৃস্টাব্দে ফরাসী উদ্ভিদ তত্ত্ববিদ শ্লেইডেন (Schleiden) এবং প্রাণীতত্ত্ববিদ শোয়ান (Schwann) তাদের বিখ্যাত "সেল থিয়োরী" (Cell Theory) বা "কোষ তত্ত্ব" প্রকাশ করেন। এই তত্ত্বের মূল কথা হল উদ্ভিদ এবং প্রাণী জগতের সবাই কোষ দিয়ে তৈরী, কোষেরা আপনা হতে উদ্ভূত হতে পারে না—পূর্ববর্তী কোন কোষ হতেই নূতন কোষের জন্ম সম্ভব।

একটি কোষ জীবনের প্রতীক ধর্মী প্রায় সবগুলো কাজ করতেই সক্ষম—যথা খাদ্য গ্রহণ, শ্বাসক্রিয়া, অব্যবহার্য এবং দূষিত পদার্থ পরিত্যাগ, বংশবৃদ্ধি, উত্তেজিত হওয়া ইত্যাদি। কিন্তু এত কাজে সক্ষম কোষগুলি আকারগত ভাবে খুবই ক্ষুদ্র, সাধারণতঃ অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে কোষ দেখা অসম্ভব। তবে খালি চোখেও কোন কোন সময় কোষ দেখা যায়—যেমন হাঁসের ডিম, মুরগীর ডিম প্রভৃতি। এ সমস্ত ডিমগুলি একটি মাত্র কোষ দিয়ে তৈরী, এ হিসেবে অস্ট্রিচ্ পাখীর ডিমকে আমাদের দেখা সবচেয়ে বড় কোষ বলা যেতে পারে।

একটি কোষ তার কাজের দিক থেকে একটি কেমিকেল ফ্যাক্টরী বা রাসায়নিক কারখানার সাথে তুলনীয়। এ কারখানায় শুধুমাত্র এক ধরনের জিনিসই তৈরী হয় না। এখানে বহু রকমের কাজ একসঙ্গে সমাধা করা হয় বহু রকমের রাসায়নিক পদার্থ তৈরী করে।

আমরা অতি ক্ষুদ্র একটা ট্রানজিস্টার রেডিও কিংবা খুব ছোট একটা ক্যামেরা দেখে আশ্চর্য হয়ে ভাবি এত ছোট যন্ত্রটা কি ভাবে তৈরী করা হল এবং এর চেয়ে ছোট যন্ত্র বোধহয় কোনরকমেই হতে পারে না। একটা কোষের সামগ্রিক রূপ জানবার পর এ বিষয়ে আমাদের ধারণাটা পাল্টে যায়। জীবদেহে এমন অনেক কোষই আছে যার ব্যাস এক মিলিমিটারের এক সহস্র ভাগের পাঁচ সাত ভাগ মাত্র। অন্যান্য কোষগুলো এ মাপের চেয়ে কিছু বড় হলেও আমাদের ব্যবহারিক জীবনে দেখা যে কোন জিনিষের চেয়ে অনেক অনেক ছোট। সর্বদাই কোষ মাপের একক হিসেবে ধরা হয় এক মিলিমিটারের এক সহস্র ভাগের এক ভাগকে (ইংরেজীতে বলা হয় "মাইক্রন")।

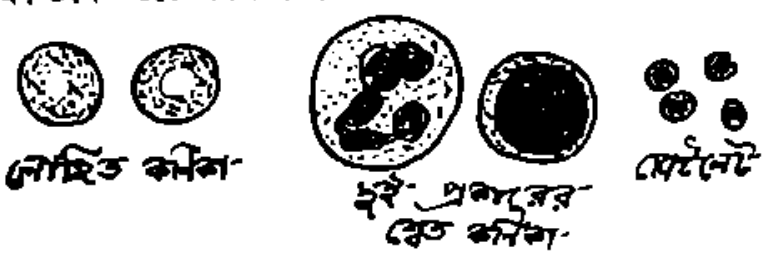

মানুষের রক্তের বিভিন্ন কোষ

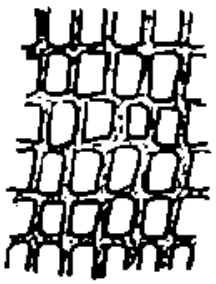

রবার্ট হুকের দেখা কর্কের কোষ প্রাচীর

এবার এই ক্ষুদ্র কোষের বিভিন্ন অংশ আলোচনা করা যাক। একটা কোষের প্রধান অংশ তিনটি—প্রোটোপ্লাজম বা প্রোটোপ্লাজম, নিউক্লিয়াস এবং কোষাবরণ।

প্রোটোপ্লাজমের পরিমাণই কোষের মধ্যে সব চেয়ে বেশী, ইহা প্রকৃতিগত ভাবে জেলীর সঙ্গে তুলনীয়। প্রোটোপ্লাজমের উপাদান আর আমাদের খাদ্যের মধ্যে বস্তুগত সাদৃশ্য বর্তমান। আমাদের খাদ্য তালিকাভুক্ত প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা, ফ্যাট স্নেহ পদার্থই প্রোটোপ্লাজমের গঠন-শৈলীর মূল উপাদান। এর সঙ্গে থাকে অল্প পরিমাণ খনিজ লবণ এবং ভাইটামিন। কিন্তু এ সমস্ত বস্তুর মধ্যে শতকরা জলের পরিমাণই সর্বাধিক।

নিউক্লিয়াসকে কোষের কেন্দ্রবিন্দু এমন কি প্রাণবিন্দুও বলা যায়। কারণ নিউক্লিয়াস সাধারণতঃ কোষের মাঝামাঝি অবস্থান করে এবং নিউক্লিয়াসটি সরিয়ে দিলে কিছুক্ষণের মধ্যে কোষ বা প্রোটোপ্লাজমের মৃত্যু অর্থাৎ কার্যশক্তি হারিয়ে ফেলা অবশ্যম্ভাবী। নিউক্লিয়াস সাধারণতঃ গোলাকার বা ডিম্বাকৃতির, নিউক্লিয়াসের চারপাশে থাকে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন নামক পর্দার আবরণ। আর সাধারণ অবস্থায় নিউক্লিয়াসের ভিতরকার নিউক্লিওপ্লাজম নামক পদার্থের মধ্যে থাকে ক্রোম্যাটিন নেটওয়ার্ক (Chromatin network) নামক একটা জালের মত বস্তু, এবং অতি ক্ষুদ্র গোলাকৃতি নিউক্লিওলাস। কোষ বিভাজনের (Cell Division) সময় এই ক্রোম্যাটিন নেটওয়ার্ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দড়ির মত ক্রোমোজোমের (Chromosome's) আকার ধারণ করে, এই ক্রোমোজোমই বংশগত ধারার (Heredity) বাহক (এ সম্পর্কে ভিন্ন স্থানে বলা যাবে)। নিউক্লিয়াসের নির্দেশ ক্রমেই প্রোটোপ্লাজম তার বিভিন্ন কাজ করে যায়। তবে প্রোটোপ্লাজম ব্যতিরেকেও নিউক্লিয়াসের বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। অর্থাৎ নিউক্লিয়াস এবং প্রোটোপ্লাজম পরস্পর নির্ভরশীল। নিউক্লিয়াসে প্রোটোপ্লাজমের মত বিভিন্ন বস্তুর সঙ্গে "নিউক্লেইক এ্যাসিড" নামক বিশেষ এক ধরণের রাসায়নিক পদার্থ থাকে।

কোষাবরণ প্রধানতঃ স্নেহজাতীয় পদার্থ এবং প্রোটিনের সমন্বয়ে গঠিত। এটা অত্যন্ত পাতলা একটা আবরণ, প্রোটোপ্লাজমের চারপাশে জড়িয়ে থাকে, অর্থাৎ এই কোষাবরণই প্রতিটি কোষের আকৃতি দান করে বলে বলা যায়। উদ্ভিদ কোষের আবরণে "সেলুলোজ" নামক আরেক ধরণের পদার্থ কোষাবরণের দৃঢ়তা দান করে। কাজের দিক থেকে এই আবরণটির যথেষ্ট গুরুত্ব। এই পর্দার ইচ্ছানুসারেই বাইরের বিভিন্ন পদার্থের বিশেষ কয়েকটি কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং কোষের ভিতরকার বর্জ্যগুলো বস্তু বাইরে বেরিয়ে যায়। এই আদান প্রদানের কাজটা সুষ্ঠু ভাবে সম্পাদিত না হলে কোষের ভিতরকার কার্যাবলী সুশৃঙ্খল ভাবে সমাধা হতে পারে না, ফলে সময় সময় কোষের মৃত্যু অনিবার্য হয়ে ওঠে।

কোষের এই প্রধান তিনটি অংশ ছাড়া কোষের অভ্যন্তরে আর কয়েকটি অঙ্গের সাক্ষাৎ মেলে, তাদের কোষের বিভিন্ন কার্যাবলীর জন্য নির্ধারিত যন্ত্র বা সম্পাদক রূপে বর্ণনা করা যায়।

প্রথমেই মনে পড়ে সেনট্রোজোমের (Centrosome) কথা। ক্ষুদ্র একটা গোলাকার বস্তু নিউক্লিয়াসের পাশেই তার অবস্থান; তবে উদ্ভিদ কোষে এদের সাক্ষাৎ মেলে না। প্রাণীদেহের কোষ বিভাজনের সময় এই সেনট্রোজোম একটা অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠে।

নিম্নশ্রেণী কোষ — মিলিয়াযুক্ত কোষ

দুই প্রকারের আবরণী কোষ

নিউক্লিয়াসের কাছাকাছি জালের মত অতি ক্ষুদ্র একটা অংশের নামকরণ করা হয়েছে গোলগি বডি (Golji body)। এই অংশটি কোষের নিঃসরণ প্রক্রিয়ায় (Secretion) সাহায্য করে বলে জানা গেছে, তাছাড়া বিশেষ কয়েক ধরণের রাসায়নিক পদার্থ গোলগি বডির গায়ে অনেক সময় জমা হয়ে থাকে।

প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে সেনট্রোজোম এবং গোলগি বডি ছাড়া কোষের আরেকটি অতি প্রয়োজনীয় অংশের সন্ধান মেলে, তার নাম মাইটোকনড্রিয়া (Mitochondria)। কোন কোষেই এর বাঁধাধরা কোন সংখ্যা নেই, সময়ে সময়ে এর সংখ্যা কোন কোন কোষে হাজারের উপরে। মাইটোকনড্রিয়া প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে এদিক সেদিক সর্বত্রই ছড়িয়ে থাকে। মাইটোকনড্রিয়ার চেহারাটা অনেক রকমের হতে পারে। মাইটোকনড্রিয়াকে বৈজ্ঞানিকদের ভাষায় বলা যেতে পারে এ যেন এনজাইমের একটা প্যাকেট। এই এনজাইমগুলির (এক প্রকারের রাসায়নিক দ্রব্য) সাহায্যে মাইটোকনড্রিয়া কোষের প্রয়োজনীয় শক্তি উৎপন্ন করে। প্রাণীর দেহে শক্তি বলতে যা বোঝায় তার উৎসস্থল হল এই মাইটোকনড্রিয়া। সেদিক থেকে মাইটোকনড্রিয়া "পাওয়ার হাউসের" সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু উদ্ভিদ কোষে সূর্যের কিরণই শক্তির উৎস, সে জন্য সেখানে মাইটোকনড্রিয়ার কোন প্রয়োজন নেই, তবে সৌর শক্তিকে গ্রহণ করবার জন্য আছে সবুজ কণিকা বা ক্লোরোফিল (Chlorophyll)।

প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে মধ্যে উপরোক্ত বিশেষ অংশ ছাড়া আর কতকগুলো পদার্থ পাওয়া যায়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কোষের সৃষ্ট বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য যেগুলো একটা জীবের জীবন ধারণের জন্য একান্ত প্রয়োজন। তাছাড়া আছে ভ্যাকিওল (Vacuole)

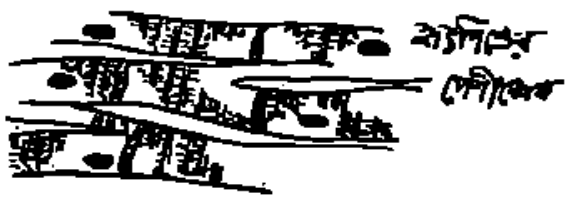

তিন প্রকারের মাংসপেশী কোষ

স্নায়ুকোষ

নামক কতগুলো বিভিন্ন চেহারার অতি ক্ষুদ্র থলি। এই ভ্যাকিওলের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের জিনিস যথা খাদ্যদ্রব্য, দূষিত পদার্থ, জল ইত্যাদি পাওয়া যায়। কোষের অভ্যন্তরে কোনক্রমে অধিক জল প্রবেশ করে চাপের ফলে কোষটাকে যাতে না ফাটিয়ে দেয় যে জন্য ভ্যাকিওল অধিক জলটা সংগ্রহ করে কোষের বাইরে বেরিয়ে যায়। তবে ভ্যাকিওলের আকার উদ্ভিদ কোষেই বড় হয়ে থাকে। এ সমস্ত বস্তু ছাড়া বিভিন্ন কোষে সময় সময় রঞ্জক পদার্থ থাকে, যেমন প্রাণীদেহের রক্ত লাল রং লাল কোষের অভ্যন্তরস্থ "হেমোগ্লবিন পিগমেন্ট" নামক রঞ্জক পদার্থের উপরে নির্ভর করে। গাছের পাতার রং, ফলের রং প্রভৃতি কোষস্থ "প্লাস্টিড" নামক কণিকার আত্মপ্রকাশ বলে ধরা হয়।

এবার দেখা যাক একটা জীবের মধ্যে কোষের সমন্বয় কি ভাবে হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে উদ্ভিদ দেহের বদলে প্রাণীদেহের কথা দিয়েই সুরু করা যাক, উদ্ভিদ আর প্রাণীদেহে কোষ সংযোজন বা সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য এক অর্থাৎ বহু সহস্র কোষের সুশৃঙ্খল অবস্থান এবং কার্য সম্পাদনে একক জীবের (উদ্ভিদ কিংবা প্রাণী) গঠন। এই সংগঠন প্রক্রিয়ায় কতগুলি কোষ একত্রিত হয়ে সৃষ্টি করে টিসু (Tissue) বা পেশী এবং কয়েকটি টিসু মিলে হয় একটা অরগ্যান (Organ) বা যন্ত্র, আর এই কয়েকটি যন্ত্রের সমন্বয়েই গড়ে উঠে একটা প্রাণী বা উদ্ভিদ। উদ্ভিদ এবং প্রাণীদেহের "টিসু" এবং "অরগ্যানের" গঠন শৈলী আলাদা বলেই উদ্ভিদ এবং প্রাণীর চেহারায় এত প্রভেদ। তবে বিভিন্ন প্রাণীর ক্ষেত্রে টিসু এবং অরগ্যানের মূল গঠন শৈলীতে কোন তফাৎ না থাকলেও আকৃতি এবং অবস্থানের কিছুটা হেরফেরের জন্যই তাদের বিভিন্ন রূপ।

প্রাণীদেহে প্রধানতঃ চার রকমের টিসু বা পেশী

প্রকীট

যায়—আবরণী পেশী, মাংসপেশী, সংযোগকারী এবং ভার বহনকারী পেশী এবং স্নায়ুতান্ত্রিক পেশী।

আবরণী পেশী শরীরের ভিতরকার এবং বাইরেকার বিভিন্ন যন্ত্রের আবরণ হিসেবে থাকে। কোষের কার্য আকৃতির জন্য আবরণী পেশীর মধ্যে বিভিন্ন প্রকারভেদ আছে। আবরণী পেশীর মধ্যে সিলিয়েটেড এবং নিঃস্রাবী কোষগুলিই উল্লেখযোগ্য। সিলিয়েটেড কোষগুলোর এক ধারে সিলিয়া নামক অতি ক্ষুদ্র লোমের মত কতগুলো সচল অংশ আছে। সিলিয়াগুলির স্বতঃস্ফূর্ত চালনার ফলে কোষের বাইরেকার বিভিন্ন বস্তু বিশেষ একটা দিকে চালিত হয়। এ ধরণের কোষের স্থান বিশেষে আমাদের শ্বাসনালীর অভ্যন্তরস্থ আবরণীটিতে। এই কোষগুলো তাদের সিলিয়া চালনে বহিরন্ত মলাকে শ্বাসযন্ত্রে প্রবেশে বাধা প্রদান করে।

মাংসপেশীর সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত, মাছের বা পাঠার মাংস, আমাদের শরীরের মাংস সবই বৈজ্ঞানিকের ভাষায় মাংসপেশী। তবে মাংসপেশীর গঠন কৌকর্যে অংশ গ্রহণকারী কোষের কথা অনেকেরই জানা নেই। মাংস পেশীর কোষ আকৃতিগত ভাবে তিন প্রকার এবং কর্মানুসারে দুই প্রকার। কর্মানুসারে বিভক্ত শ্রেণী দুইটির নাম—ঐচ্ছিক এবং অনৈচ্ছিক অর্থাৎ যথাক্রমে ইচ্ছাধীন এবং ইচ্ছার বাইরে। ঐচ্ছিক কোষ দিয়ে গড়া মাংস পেশীকেও ঐচ্ছিক পেশী বলা হয়। ঐচ্ছিক পেশীকে আমরা ইচ্ছানুসারে চালাতে পারি এবং তারা সাধারণতঃ হাড়ের (Bone সঙ্গে সংযুক্ত থাকে এবং আমাদের বিভিন্ন ধরনের গতিশীল কর্মে সহায়তা করে। [illegible] পেশী কোষগুলোর গায়ে কতগুলো আড়াআড়ি [illegible] ইংরেজীতে এই পেশীটিকে বলা হয় [illegible] মাংস" (Striped Muscle)। অনৈচ্ছিক [illegible] এ ধরণের আড়াআড়ি কোন চিহ্ন বা ধারার গঠিত মাংসপেশী। আমাদের ইচ্ছা বহির্ভূত যন্ত্রগুলি যথা খাদ্যনালী, জরায়ু, গর্ভাশয় প্রভৃতি তৈরী করে। হৃৎযন্ত্রের মাংসপেশীকোষ অনৈচ্ছিক পেশীকোষ হলেও অন্যান্য অনৈচ্ছিক কোষ হতে কিছুটা ভিন্ন ধরণের। এই কোষগুলো বা পেশীটি ঐচ্ছিক এবং অনৈচ্ছিক পেশী-কোষের সমন্বয়ে তৈরী।

সংযোগকারী এবং ভারবহনকারী পেশী কোষগুলি সাধারণতঃ বিশেষ ধরণের কতগুলো পদার্থ তৈরী করে তাদের কার্য সম্পাদন করে। ভারবহনকারী পেশী কোষগুলো ক্যালসিয়াম কারবনেট এবং আরও কতগুলো পদার্থ নিঃসৃত করে হাড় বা কঙ্কালের সৃষ্টি করে, কোষগুলো তাদের উৎপন্নজাত পদার্থের মধ্যে ই আটকা পড়ে থাকে। সংযোগকারী পেশীর কোষগুলিও বিভিন্ন ধরণের তন্তু বা ফাইবার সৃষ্টি করে। তাদের সৃষ্ট তন্তুগুলি শরীরস্থ বিভিন্ন পেশী এবং কোষকে যথাযথ জায়গায় রাখতে সাহায্য করে, তা ছাড়া এই সমস্ত কোষই লিগামেণ্ট এবং টেণ্ডন নামক অত্যন্ত শক্তি-সম্পন্ন তন্তু তৈরী করে। লিগামেণ্ট একটা হাড়ের সঙ্গে আরেকটা হাড়ের সংযোগ সাধন করে, আর টেণ্ডনের সাহায্যে একটা মাংসপেশী হাড় কিংবা অন্য মাংস পেশীর সঙ্গে যুক্ত থাকে।

সংযোগকারী পেশী বা টিসুর দলে একটা তরল পদার্থও পড়ে। সে পদার্থটি হল প্রাণীদেহের অতি প্রয়োজনীয় বস্তু—রক্ত। রক্তও কতগুলি কোষের সমন্বয়ে গঠিত। কোষগুলি প্রধানত দুই প্রকার—লোহিত ও শ্বেত কণিকা, এর সঙ্গে থাকে প্লেটলেট নামক কতগুলো কোষ। এই সমস্ত কোষগুলি প্লাজমা নামক একটা তরল পদার্থে ভেসে বেড়ায়। লোহিত কণিকার লাল রং এবং এর সংখ্যাধিক্যের জন্যই রক্তকে লাল দেখায়। লৌহ সংঘটিত রাসায়নিক পদার্থ হিমোগ্লোবিনের জন্যই রক্ত কণিকাগুলি লাল বর্ণ ধারণ করে। তবে সাদা (বা ঈষৎ নীলাভ) রক্তও কতগুলি প্রাণীকে যেমন আমাদের পরিচিত চিংড়ীমাছে পাওয়া যায়। এখানে রক্ত কণিকায় লাল হিমোগ্লোবিনের পরিবর্তে আছে তামা সংঘটিত পদার্থ হীমোসায়ানিন।

[illegible] প্রতি

চুয়ান্ন লক্ষ লোহিত কণিকা থাকে, নারী দেহে ঐ হিসাব অনুযায়ী থাকে প্রায় আটচল্লিশ লক্ষের মত। লোহিত কণিকার প্রধান কর্তব্য হল ফুসফুস হতে নেওয়া অক্সিজেন বা অম্লজান গ্যাসকে প্রতি কোষে পৌঁছে দিয়ে প্রতি কোষের শ্বাস কার্যে উৎপন্ন কার্বন-ডাই অক্সাইডকে নিয়ে এসে ফুসফুসে ছেড়ে দেওয়া। স্তন্যপায়ীদের রক্তে সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল পূর্ণবয়স্ক (রক্ত নালীতে যা বাহিত হয়) লোহিত কণিকার মধ্যে নিউক্লিয়াস নেই। সাধারণতঃ নিউক্লিয়াস ব্যতীত একটা কোষের অধিক সময় বেঁচে থাকা অসম্ভব, সেক্ষেত্রে এই নিউক্লিয়াসহীন এক একটা কোষ প্রায় ১২০ দিন বেঁচে থাকে। এ ব্যাপারটা বৈজ্ঞানিক মহলের একটা গবেষণার বিষয়বস্তু। তবে স্তন্যপায়ী ছাড়া অন্যান্য প্রাণীর রক্ত কণিকায় নিউক্লিয়াস বর্তমান, তা ছাড়া স্তন্যপায়ীদের লোহিত কণিকার অপূর্ণাঙ্গ অবস্থায় তার মধ্যেও নিউক্লিয়াস থাকে।

শ্বেত কণিকা সংখ্যার দিক থেকে লোহিত কণিকার তুলনায় অনেক কম, মানুষের রক্তে গড়ে প্রতি একটি শ্বেত কণিকা পিছু প্রায় সাত শত লোহিত কণিকা। শ্বেত কণিকার আকার অনুসারে তাদের পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। এদের প্রধান কাজ চলে বাইরে থেকে আসা কোন পদার্থ, জীবাণু বা কণা প্রভৃতিকে গিলে খেয়ে ফেলা কিংবা "এ্যান্টি বডি" তৈরী করে, এদের বিনাশ করা। রক্তের প্লেটলেট নামক কোষেরা কোন স্থানে রক্ত ক্ষরণ হতে থাকলে রক্ত জমাট বাধায় সহায়তা করে।

স্নায়ুতান্ত্রিক পেশী কোষগুলির গঠনে বেশ খানিকটা অভিনবত্ব আছে। কোষদেহের গা হতে সাধারণতঃ দু'দিকে দড়ির মত কয়েকটি অংশ বেরিয়ে থাকে, একটার নাম এ্যাক্সন (Axon) আরগুলোর নাম ডেন্ড্রাইট (Dendrite); এ্যাক্সনের মারফৎ এক কোষ হতে উত্তেজক বার্তা প্রেরিত হয় আরেক কোষে, আর ডেন্ড্রাইট বাইরে থেকে সংগ্রহ করা বার্তা কোষে সঞ্চারিত করে। এ ধরণের কোষগুলি একটার পর একটা জুড়ে স্নায়ুতন্ত্রের সৃষ্টি করে।

এ সমস্ত কোষের কাহিনীর পরে আর দু' চারটা কোষের কথা বলেই এই আলোচনা শেষ করব। প্রথমেই বলতে চাই শুক্রকীট বা স্পার্ম সেলের (Sperm cell)

কথা। পুরুষ প্রাণীতেই এই শুক্রকীটের সন্ধান মেলে। নারী দেহে সন্তান উৎপাদনকারী অণ্ডকোষ বা ডিম্বের সমতুল্য এই শুক্রকীট। কিন্তু আকারের দিক থেকে অতি ক্ষুদ্র। প্রতিটি শুক্রকীটই বিশেষ এক ধরণের কোষ, এদের গঠনটা প্রধানতঃ তিনটি ভাগে বিভক্ত— মাথা, গলা ও লেজ। মাথায় থাকে নিউক্লিয়াস এবং অল্প পরিমাণ প্রোটোপ্লাজম, মাথার পরে খুব ছোট একটা গলা, সবশেষে লেজ; আর লেজ নাড়িয়েই তারা চলাফেরা করে বা অণ্ডকোষের সন্ধানে সামনের দিকে এগিয়ে চলে।

এর পরে যাদের কথা বাকী রইল তারা হল এককোষী প্রাণী। এদের দেহ বলতে বোঝায় একটি মাত্র কোষ, এই একটি কোষই আমাদের মত সব রকমের কাজ করতে পারে। তারা চলাফেরা করে প্রোটোপ্লাজমের তৈরী পা পিউডোপোডিয়া, নয়ত ফ্ল্যাজেলা নামক শুক্রকীটের লেজের মত একটা অংশ দিয়ে কিংবা সিলিয়া নামক ক্ষুদ্র লোমের মত বস্তু দিয়ে।

আমাদের এই পঁচিশ কোয়াড্রিলিয়ন কোষে তৈরী দেহটার জন্মও একটা মাত্র কোষ থেকে। সে কোষটির নাম নিষিক্ত ডিম্বকোষ বা জাইগোট (অনিষিক্ত ডিম্বকোষ এবং একটি শুক্রকীটের মিলনে সৃষ্টি)।

এ সমস্ত আলোচনার শেষে স্বভাবতঃ প্রশ্ন উঠতে পারে আমাদের দেহের প্রাণটা কোথায় আছে। প্রথম কথা হল বর্তমান যুগ পর্যন্ত কোন বৈজ্ঞানিকই প্রাণের সংজ্ঞা দিতে পারেন নি। তবে এটা ঠিক কোটি কোটি কোষে গড়া দেহে সনাতন প্রথায় বিশেষ কোন একটা স্থানে সত্যিকার প্রাণের সন্ধানে মিলবে না, প্রাণের সন্ধানে দেহের প্রতিটি কোষের ভিতরটাই খুঁজতে হবে। দেহের কোষগুলো প্রাণবন্ত থাকলেই আমরা জীবন্ত, একটি জীবের তার দেহ কোষের মৃত্যুরই নামান্তর মাত্র। দেশ বিদেশের বৈজ্ঞানিকেরা কোষে কোষে প্রাণের সন্ধান করে ফিরছেন। এ সন্ধান সার্থক হলে বোধকরি মানুষ হবে তথাকথিত সৃষ্টিকর্তা ভগবানের প্রতিপক্ষ।

জন্ স্টাইনবেক্

প্রফুল্ল সরকার

সাহিত্যে এ বছরের নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন আমেরিকান্ ঔপন্যাসিক জন্ স্টাইনবেক। ১৯৩০ থেকে ১৯৪২ সালের মধ্যে এই পুরস্কার পেলেন আমেরিকান তিনজন ঔপন্যাসিক ফকনার (১৯৪০), হেমিংওয়ে (১৯৫৪) এবং বর্তমানে ১৯৬২ সালে স্টাইনবেক। বিশ্বসাহিত্যে বার বার এই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ আমেরিকান উপন্যাসকারদের কল্পনাশক্তি, সমাজ ও জীবনবোধ, মৌলিক চিন্তাধারা ও নতুন নতুন গঠন-শৈলী ও আঙ্গিক নিয়ে সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরিচয় বহন করছে। আমেরিকান সাহিত্যের ইতিহাস খুব বেশী দিনের নয়, কিন্তু তার অগ্রগতি ও সাফল্য বিস্ময়কর।

আমেরিকান সাহিত্যে স্টাইনবেক একটি বিশিষ্ট নাম। তাঁর উপন্যাসের চরিত্রের মতো তাঁর নিজের জীবনও রোমান্টিক ও বহু বৈচিত্রে ভরা। কালিফোর্ণিয়ার স্যালিনাসে তাঁর জন্ম ১৯০২ সালে। তাঁর জন্মস্থানের চারপাশের জীবন থেকে তিনি কৃষিজীবী আর ক্যানারীর শ্রমিকদের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা পেয়েছিলেন। ১৯১৯ থেকে ১৯২৫ পর্যন্ত স্টানফোর্ড য়ুনিভার্সিটিতে পড়েছিলেন, কিন্তু ডিগ্রীর দিকে ঝোঁক না থাকায় যেমন তেমন ভাবে লেখাপড়াই করেছেন। লেখক হবার বাসনা মনে ছিল গোড়া থেকেই, য়ুনিভার্সিটির ম্যাগাজিনে মাঝে মাঝে লিখতেন। তারপর জীবিকার জন্যে যখন যা পেয়েছেন তাই ক'রেছেন। আর সাহিত্যের মালমশলা সংগ্রহ ক'রেছেন নিচুতলার মানুষদের জীবন থেকে। কখনও তাঁকে দেখা গেছে গরু-ঘোড়ার খামারে কাজ করছেন, কখনও কাজ করছেন ছুতোরের, কখনও বা রঙ মিস্ত্রীর। বাড়ী তৈয়ারী কাজেও তাঁর দক্ষতা ছিল; তিনি নিজেই বলেছেন, লেগে থাকলে উন্নতি ক'রতে। নিউইয়র্কে খবরের কাগজের রিপোর্টারও করেছিলেন কিছুদিন। তারপর অসুস্থ হয়ে আবার কালিফোর্ণিয়ায়

ফিরে আসেন, এবং নির্জন পার্বত্য পরিবেশের মধ্যে লেক টাহো, জমিদারী এস্টেটে তত্ত্বাবধায়কের কাজ করেন। নির্জন পরিবেশে তাঁর জীবন-বোধে সুদূরে প্রসারী পরিবর্তন হ'তে লাগলো। তিনি লিখেছেন, এই নির্জন হ্রদের চারপাশে বরফ গলে গলে পড়তো আর আমার মন থেকেও ঘৃণাবোধের শেষ কণাটুকু পর্যন্ত গলে যেতে লাগলো। বহুকাল তিনি নিজের জন্যে স্থায়ী আস্তানা গড়তে পারেন নি। জীবনে বহুকাল ভ্রাম্যমাণ ছিলেন বলেই পথের কথা, পথের আশেপাশে সাধারণ মানুষের জীবনের কথা তিনি তাঁর বইয়ের পর বইয়ে নিখুঁত ভাবে আঁকতে পেরেছেন। তাঁর প্রথম বই "ক্যাপ অফ গোল্ড", বের হ'য় ১৯২৯ সালে আর তাঁর সাম্প্রতিকতম বই 'দি উইন্টার অফ আওয়ার ডিসকনটেন্ট' গত বছর প্রকাশিত হয়েছে। এই তিনদশক পরিধির মধ্যে তিনি বহু উপন্যাস ও ছোট গল্পের বই লিখেছেন। তার মধ্যে আছে, 'অফ মাইস এণ্ড ম্যান', 'ইট্ এ গড আননোন', 'দি সাসচারস অফ ইডেন', 'দি মুন ইজ ডাউন', 'টর্টিলা ফ্ল্যাট', 'ক্যানারি রো', 'ইস্ট অফ ইডেন' প্রভৃতি আরো অনেক বই। 'অফ মাইস এণ্ড ম্যান' তাঁর প্রথম সার্থক রচনা। নিউ ইয়র্কের 'বুক অফ দি মান্থ ক্লাব' বইটি নির্বাচিত করেন, এবং এ 'বেস্ট সেলার' এর সম্মান পায়। এক মাটারলুস নিউইয়র্কের থিয়েটারে দীর্ঘকাল রাতের পর রাত পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে চলেছিল। কিন্তু তার পরের বই ১৯৩৯ এ 'গ্রেপস অফ র‍্যাথ' তাঁকে নিউ ইয়র্কের গণ্ডী ছাড়িয়ে আমেরিকার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত বিখ্যাত করে দিল। তাঁর নাম ফিরতে লাগলো লোকের মুখে মুখে। তাঁর আর কোন বই এই উপন্যাসের মতো তাঁর সমগ্র শিল্প, দর্শন, জীবন ও সমাজ-বোধকে এমন উজ্জ্বল দর্পণের মতো ধরতে পারেনি। এই বই প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সর্বস্তরের আমেরিকানদের মধ্যে যে তুমুল আলোড়ন চলেছিল তা অভূতপূর্ব। কোন একটি বইয়ের জন্যে এতো বিরোধিতা, এত সমাদর এর আগে খুব কমই দেখা গিয়েছে। সমাজের ওপর-তলার আঘাত "ঘৃণা ও রোষের" লেবেল আঁটা এই বই লক্ষ লক্ষ আমেরিকান পরিবারের ঘরে ঘরে পড়া হয়েছিল। তুমুল বিরোধিতার চাপে কালিফোর্ণিয়ার বইটি সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়ে গেল। কিন্তু এর অব্যাহত সর্ব গামিত্ব রোধা যায় নি। সেই সময়কার কথা প্রসঙ্গে একজন সমালোচক বলেছেন: " .....Burned and banned, borrowed, smuggled but above all bought, the grapes of wrath began to cause a sort of national aesthetic frenzy".

সমস্ত বিরোধিতা সত্ত্বেও এই বই 'ফিফটিন্থ প্রাইজ' পেলো পরের বছর। প্রগতিশীল পাঠক ও সমালোচকেরা এই বইকে শুধু সেই বছরের নয়, সেই দশকের সেরা বই বলে অভিনন্দন জানালেন। এই বইকে আমেরিকান ক্লাসিক সাহিত্য 'আংকল টমস কেবিন ও মবি ডিক'এর সঙ্গে সম মর্যাদায় তুলনা করা হোল। সিনেমা স্বত্বের দাম চড়লো পঁচাত্তর হাজার ডলারে! লুক আর লাইফ ম্যাগাজিনে এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করা হয়েছিল— "too hot for Hollywood" কিন্তু ৮ লাইনের নির্মাতারা নিরস্ত হবার নয়, তারা দশলক্ষ ডলার খরচা করে এই কালজয়ী বইকে রূপালী পর্দায় রূপায়িত করলেন।

সময়টা তখন ১৯৩৯ আর ১৯৪০ এর মধ্যে গড়াচ্ছে। এবং স্টাইনবেকের বয়স তখন মাত্র সাইত্রিশ বছর। বিংশতাব্দীর এই তৃতীয় দশক আমেরিকান সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য। পুরোনো চিন্তাধারা, সমাজ ও জীবন সম্বন্ধে নতুন মূল্যায়নে একটা যুগান্তকারী হয়ে আসছিল। ১৯২০ থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত যে মুনাফা স্ফীত ও সাম্রাজ্যের মধ্যে আর্থিক সচ্ছলতা দেখা দিয়েছিল, সেই তৃতীয়ের আছড়ে পড়া, ভাবিয়ময়, উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় লাডনারের উপন্যাসগুলিতে আমেরিকার দেওয়া 'ছ্যাক যুগ'। তারপর এলো ১৯২০ সালের সর্বগ্রাসী আর্থিক সংকট। সমাজের সর্বস্তরের ওপর বিশেষ করে নিচুতলার লোকগুলোর ওপর তার সর্বনাশা অন্ধকার নৈরাশ্যের ছায়া পড়লো সন্দেহ নেই, কিন্তু আমেরিকান লেখকরা নতুন করে জীবনের পথ খুঁজে পেলেন। দ্বিতীয় দশকের উচ্ছল ভোগবাদের মধ্যে ছিল একটা আত্মিক শূন্যতা বোধ যাকে শ্লেষ ও ব্যাঙ্গে বিঁধে দিলেন সিনক্লেয়ার লুইস এবং বিরোধিতার জন্যে তিনি পুলিৎজারের প্রাইজ পেয়েও প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ইনিই প্রথম আমেরিকান

ঔপন্যাসিক যিনি ১৯৩০ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়ে ছিলেন এবং বিশ্বসাহিত্যে আমেরিকার নাম উজ্জ্বল করে ছিলেন। যুদ্ধোত্তর দশকের সংকটের সংঘাতে চারদিকে ভেঙ্গে পড়া অর্থনৈতিক 'কাঠামোর চাপে সমাজের সর্ব স্তরে মনে যখন আরো জটিল ভাঙনের ফাটল দেখা গেল, লেখকেরা নতুন মূল্যবোধে সচেতন হলেন। এক সীমায় লাভনার তার আর এক সীমায় স্টাইনবেক। মধ্যে হেমিংওয়ে, প্যাসস্, ফকনার ও টমাস উলফ। স্টাইন বেকই প্রথম আমেরিকান যিনি মার্কিন সাহিত্যে নির্ভীক নির্ভেজাল শ্রেণী সংগ্রামের কথা শুনিয়েছিলেন। মার্ক্সকে একেবারে ছুড়োরের মোর গোড়ায় হাজির করে ছিলেন। সমাজের নিচু, নিঃস্ব, অপরিণত মনের লোক গুলোর মধ্যে যে অফুরন্ত জীবনীশক্তি রয়েছে, কিন্তু প্রচলিত আইন ও অর্থনীতির এক্সপেশে যাঁতাকলে নিষ্পেষণে তারা বেঁচে থাকবার সম্বল আর আহরণ পাচ্ছে না, যদিও তারা অহরহ সংগ্রাম করছে, আশা করছে, ছেড়ে যাচ্ছে তবু মরছে না। এই সামাজিক অন্যায় অবিচারের ওপর একদিকে নির্মম ক্রোধ আর একদিকে ঐ নিচুতলার লোকগুলোর জন্যে সুগভীর মমত্ববোধ, এই দুইয়ে মিলে 'গ্রেপস অফ রাথ'এর সৃষ্টি হয়েছিল।

গ্রেপস্ অফ র‍্যাথে আমেরিকার অসংখ্য ভূমিহীন ভ্রাম্যমান চাষীমজুরের জীবন ও সমস্যার বাস্তবচিত্র দেওয়া হয়েছে। এরা দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত কাজ, খাদ্য, আশ্রয়ের সন্ধানে দল বেঁধে কখনও বড় মোটর ট্রাকে, কখনও ভাঙ্গা ঝরঝরে মোটরে ঘুরে বেড়ায়, এদের মধ্যে নেয়ে পুরুষ শিশু সবাই আছে। পথ চলতে চলতে কখনও ফল কুড়োয়, কখনও বা ভুট্টা, শাকসব্জী, পিঁয়াজ, মিষ্টি আলু। বড় বড় কৃষি-ফার্মে এদের চাহিদাও আছে। কিন্তু এদের কেউ বিশ্বাস করে না, জমির মালিক ম্যানেজারেরা এদের ভয় করে পারে মিলে মিশে দল গড়ে এরা বেশী মজুরী চায়, স্থানীয় সরকারী কর্মচারীরা এদের বাউণ্ডুলে ভেবে সতর্ক হয়। আর যারা সম্পন্ন ভদ্রলোক তারা এদের ছোটলোক বলে অবজ্ঞা করে। স্টাইনবেকের মূল বক্তব্য যে এরা যাই-ই হোক্, এদের সম্মানজনক ভাবে বেঁচে থাকবার অধিকার আছে, দেশের বণ্টন-ব্যবস্থায় এদের সমান অধিকার আছে।

জমির মালিকত্ব নিয়ে বলেকজনের দখলের বিরুদ্ধে তাঁর নালিশ। এরা দাম চড়াবার জন্যে ইচ্ছে মতো জমির চাষ আবাদ বন্ধ রাখে, বহুজনের বেকারি ও অনাহারের কারণ হয়। আমেরিকার কৃত্রিম অভাব সৃষ্টির ভুয়ো অর্থনীতিকে তিনি প্রচণ্ড আক্রমণ করেছেন এই উপন্যাসের পাঁচিশ পরিচ্ছেদে। সেখানে তিনি দেখিয়েছেন যে দাম পাছে না পড়ে যায়, লাভের অংশ না কমে যায়, তার জন্যে বেশী ফলনের আলু, ভুট্টা, কফি, গম বিদেশের বাড়তি শূয়োর গুলোকেও নষ্ট করে ফেলা হচ্ছে, অথচ চারদিকে ক্ষুধার্ত, বৈরাশাপীড়িত বহু হতভাগা লোক অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। স্টাইনবেকের মতে এই হোল বিপ্লবের পথ। সেখানে তিনি লিখেছেন:

"In the souls of the people the grapes of wrath are filling and growing heavy, growing heavy for the vintage."

এদের সমস্যার সমাধান হতে এখনও অনেক বাকী। আমেরিকার এক শ্রেণীর সমালোচকের উক্তি যে এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু, তা সাময়িক ব্যাপার নিয়ে এবং আমেরিকান পাঠকদের এই বই পড়ার আজ প্রয়োজন নেই। এই বৃহৎ উপন্যাসের এই মূল্য নির্ধারণ মোটেই ঠিক নয়। যতদিন নিচুতলার মানুষগুলো তাদের দুর্দান্ত প্রাণশক্তি নিয়ে তাদের স্ব-নির্ধারিত সুখ দুঃখ দয়া বিবেকবুদ্ধি, হিংসাবৃত্তি; নিষ্ঠুরতা নিয়ে বাঁচবার সংগ্রামে বার বার হার স্বীকার করবে, যতদিন না তাদের সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান না হয়, ততদিন এই বইয়ের প্রয়োজনীয়তা নিঃশেষ হয়ে যাবে বলে মনে হয় না। হুইটম্যানের সেই কবিতার লাইনটি—

'...This is no book,
who touches this, touches a man.'

এই বই সম্বন্ধে সর্বাংশে প্রযোজ্য। স্টাইনবেকের সমাজ সচেতনতা জীবনবোধ এই অর্থে বিশ্বজনীন।

'গ্রেপস অফ র‍্যাথ' পঞ্চের উপন্যাস ও ১৯৩০ সালের অর্থনৈতিক সংকট অনাবৃষ্টি ও ধূলি-ঝড়ের মুখে পড়ে দরিদ্র সম্বলহীন জোড-পরিবারের ওকলাহোমা ছেড়ে

কাজ ও খাদ্যের সন্ধানে কালিফোর্নিয়ার কৃষি অঞ্চলে অভিযানের কাহিনী। যানটি একটি ভাঙা-চোরা অতি প্রাচীন ছাউনি গাড়ী। আরোহীর অতিভার গাড়ীর পক্ষে দুর্বহ ও বিপজ্জনক। উপন্যাসের আরম্ভ এক দুর্যোগের রাতের বর্ণনা দিয়ে। হাতাহাতির সময় খুন করার অপরাধে টম জোড ন্যেল খাটছিল। শর্তাধীনে মুক্তি পেয়ে মা, বাবা, ঠাকুমা, ঠাকুর্দা, বন্ধু তুতপূর্ব পাদরি কেসি, প্রতিবেশী আংকল জন, নোয়া, রোজ অফ সারণ শিশু বুথি আর উইনফিল্ড সকলকে নিয়ে অভিযানের সুরু। অ্যাল, আপার ভরপুর প্রাণবন্ত ছোকরা, মোটর চালাবার ভার তার ওপর। দল চলেছে গ্রাম থেকে শহরের পর শহর ছড়িয়ে হাইওয়ে, ৬৬ ধরে। এই হাইওয়ে ৬৬'র মতো ঐতিহাসিক পথ সমসাময়িক কথা-সাহিত্যে বোধ হয় আর একটিও নেই। অন্যান্য পাত্রপাত্রীদের মতো এই ছাউনি গাড়ীটাও যেন এই উপন্যাসের একটি চরিত্র। হয়তো তার আরোহীদের প্রতীক। তেরোর পরিচ্ছেদে তার বর্ণনা আছে—

"Al was one with his engine every nerve listening for weaknesses, for the thumps or squeals, hums and chattering that indicates change that may cause a break-down. He had become the soul of the car."

তারপর দুর্ঘটনার পর দুর্ঘটনা ঘটতে লাগলো। হয়তো পরিণাম পরাজয়ের পূর্বাভাস। ঠাকুমা, ঠাকুর্দা, দুজনেই পরে মারা পড়লো। কিন্তু মৃত্যুর জন্যে থামলে চলবে না, এগিয়ে যেতেই হবে। ঐ অবস্থায় মাল পত্তরের ওপর স্থান করে নিয়ে চলে রোজ আর কোনি ফাঁক পেলেই মিলিত হোত লুকিয়ে চুরিয়ে। নতুন জীবনের আভাস আসে ভ্রূণের অঙ্কুরের মধ্যে। এর মধ্যে পথে একদিন নোয়া পালিয়ে গেল। যেরেটি ভীরু কিন্তু দুর্বল-স্বভাবের। তারপর একদিন দল কালিফোর্নিয়ায় পৌঁছে গেল। কিন্তু মালিক, সেরিফ ও ডেপুটি-চক্রের কারসাজিতে কাজ পাওয়া গেল না। যদি বা কখনও কখনও পাওয়া যায় তো মজুরিতে পোষায় না। সরকারী ক্যাম্পে আশ্রয় মিললো কটা দিন। কিন্তু তারপর আবার আরম্ভ হলো অনাহারের পালা। কোনি তার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী রোজি কে ফেলে পালিয়ে গেল এর মধ্যে। অপটু-ভাবে হাতে চালাতে গিয়ে কেসি খুন হলো। টম জোড সুযোগ পেয়ে কেসির হত্যাকারীকে একদিন শেষ করে দিলে। ওকলাহোমা ছেড়ে টম প্যেল-কানুনের শর্ত ভেঙেছিল, ধরা পড়বার আগে সে ফেরার হলো। কিন্তু এই বিভ্রান্ত ভবঘুরে বেকারদের মিলিত সংগঠিত করবার কাজে টম চালিয়ে যাবে এ ইঙ্গিত লেখক দিয়েছেন। শেষ পরিচ্ছেদে রোজ একটি মৃতশিশু প্রসব করলে। কিন্তু জীবন চলিষ্ণু, তাকে চলমান রাখতে হবে। অনাহার-ক্লিষ্ট একটি লোককে রোজ তার স্তনের দুধটুকু খাওয়াতে লাগলো।

পথের এই বিচিত্র কাহিনীর মধ্যে প্রথিত স্টাইনবেকের দুর্গভীর বাস্তববোধ ও হৃদয়াবেগ। গোটা পনেরো পরিচ্ছেদটা তার তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী ও সংবেদনশীল মনের বিশিষ্ট উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সাধারণ গ্রামালোকদের দেশজ ভাষা, অমার্জিত অথচ স্বতঃস্ফূর্ত গ্রাম্য রসিকতা, জীবনের নিরাবরণ জান্তব রূপ অতি দক্ষতার সঙ্গে আঁকা হয়েছে। এই দরিদ্র দলটির পাশে পাশে শহরের ওপর তলার ঝলমল জীবনকে লেখক ক্ষুরধার ব্যঙ্গে বিঁধেছেন :

"The big cars on the highway, languid heat raddled ladies, small nuclenses about whom revolve a thousand accoutrement ; creams, ointments to grease themselves, coloring matter in phials— black, pink, red, white, green, silver, to change the color of hair, eyes, lips, nails, brows, lashes, lids ; oils, seeds pills to make the bewels more. A bag of bottles, syringes, pills, powders, fluids, jellies to make their sexual intercourse safe, odorless unproductive."

স্টাইনবেক সেই সব মানুষের জীবনের নিখুঁত ছবি এঁকেছেন তাঁর উপন্যাসের পর উপন্যাস ধারা জান্তব জীবনের সুখ দুঃখ ক্লান্তিবিস্মৃতির উর্ধ্বে আর কিছুর সন্ধান রাখে না। যারা নিজেদের গণ্ডীর মধ্যে সৎ, সংগ্রামশীল, প্রাণশক্তির অসীম স্ফূর্তিতে ঝলমল,

বেপরোয়া আর উচ্ছৃঙ্খল। তারা ওপর ওপর হিংস্র জন্তুর মতো ভয়ংকর মনে হলেও তাদের মধ্যে দয়া, কোমলতার কোন অভাব নেই। তাদের মধ্যে অফুরন্ত সৃজনশক্তির উৎস আছে। স্টাইনবেক এ বিশ্বাস পেয়েছিলেন তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা থেকে, এবং এ বিশ্বাস তাঁর পুষ্ট হয়েছিল এমার্সনীয় দর্শন থেকে বা হুইটম্যানের কবিতার ছত্রে ছত্রে পরিব্যাপ্ত হয়ে এসেছিল। তাঁর "ক্যানারি রো" 'টর্টিলা ফ্ল্যাট', ইন ডুবিয়াস ব্যাটল'-এর সব বইয়ে এই রকম অসংখ্য চরিত্রের ভিড়। এত অপরিণত মনের চরিত্র নিয়ে তিনি লিখেছেন যে কোন কোন সমালোচক তাঁকে—'প্রিমিটিভিস্ট' অর্থাৎ আদিম জীবনবাদী,—এই আখ্যা দিয়েছেন। পৃথিবীর যে কোন দেশে, যে কোন সমাজে এই শ্রেণীর অসংখ্য মেয়ে পুরুষ, উঠতি বয়েসের ছেলে ছোকরারা রয়েছে। এদের পিছিয়ে থাকার মূলে সমাজই দায়ী। এটা এমনই একটা জীবন সত্য যাকে অস্বীকার করে দূরে সরে যাবার নয়। তিনি বড় চরিত্র আঁকতে পারেন নি, বা সত্যিকার ট্রাজেডীর সৃষ্টি করেন নি—সমালোচকেরা তাঁর এই ত্রুটির উল্লেখ প্রায়ই করেন। প্রচলিত বড়ত্ব বা মহত্ত্বের মাপ কাঠি দিয়ে ঐ অপরিণত বাউণ্ডুলেদের জীবনকে মাপতে যাওয়া বিচার অসংগতির নামান্তর। আর ট্রাজেডী? তা এরিস্টোটলীয় সূত্রে ধরা যাবে না। গ্রীক ট্রাজেডীর নিয়তি এখানে আধুনিক অর্থনীতির কারসাজি। স্টাইনবেকের ট্রাজেডীর মূলসূত্র কেতাবী সংজ্ঞায় ধরা যাবে না।

এই সব বেলাইন, বে-আইন জীবনের সফল ব্যাখ্যাকার ও চিত্রকর হিসেবে স্টাইনবেক পৃথিবীর অন্যতম বিশিষ্ট লেখক।

মানুষের অন্তর্নিহিত সৎপ্রবৃত্তির ওপর তাঁর এত গভীর বিশ্বাস ছিল যে যেখানে তিনি পুরোপুরি অসৎ চরিত্র আঁকতে গিয়েছেন সেখানেই বিফল হয়েছেন; যেমন তাঁর দীর্ঘ চৌদ্দ বছরের পরিশ্রমে লেখা তাঁর সুবৃহৎ উপন্যাস 'ইস্ট অফ ইডেন'' এর ক্যাথি চরিত্র। ক্যাথির মতো অসৎ মেয়ে পাঠকের কাছে অবাস্তব প্রাণহীন বলে মনে হয়। এরই পাশাপাশি 'টর্টিলা ফ্ল্যাট' বা 'ক্যানারি রো'র আপাতঃ অসৎ চরিত্রগুলি কত সত্য ও জীবন্ত।

স্টাইনবেকের সমগ্র সাহিত্যকর্মের মধ্যে তাঁর মানসিকতা, কল্পনা ও দৃষ্টিভঙ্গীর বৈচিত্র্য পাঠককে আকর্ষণ করবে। 'টু এ গড্ আননোন' উপন্যাসের কাব্যিক অতীন্দ্রিয় ভাবানুভূতির প্রকাশ, 'পার্ল', উপন্যাসে হেমিংওয়ের দি ওল্ড ম্যান্ এ্যাণ্ড দি সী'র মতো কাহিনীর অন্তরাল চিরায়ত জীবন সত্যের প্রতীকী সংকেত, 'দি ওয়েওয়ার্ড বাস্'-এ জুয়ান চিকয়ের মতো বাস্-ভ্রাইভারের বিস্ময়কর চরিত্র চিত্রণ, 'দি গ্রীন্ অফ হেন্ অফ পিপল, কোর'-এ তাঁর প্রাণবন্ত মধুর কৌতুকরসের দৃষ্টি তাঁর শিশুদৃষ্টির উদার বিস্তৃতির পরিচয় বহন করে। তাঁর মানসিক প্রবণতা মূলতঃ লিরিকধর্মী। সাধারণ কাহিনীর আধারে গভীর জীবন-সত্যের সংকেত ও প্রতীক-দৃষ্টির আগ্রহ তাঁর বহু লেখায় দেখা যাবে।

চরিত্র ও কাহিনীর গঠনে ফকনারের মতো তিনি নৈর্ব্যক্তিক, কিন্তু ফকনারের মতো হৃদয়াবেগ বর্জন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। কিন্তু এ আবেগ সূক্ষ্ম ও বলিষ্ঠ। পাঠকের মনে আপনা আপনিই সাড়া জাগায়। সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ 'গ্রেপস অফ র‍্যাথ'এ মায়ের কাছে বিদায় নিয়ে চলে যাবার সময় টম জোড'এর শেষ কথা গুলি—

"Then it don' matter. Then I'll be wherever you look. Wherever they's a cop beatin' up a guy, I'll be there. It easy knowed, why, I'll be in the way kids laugh when they're hungry an' they know supper's ready. An' when our folks eat the stuff they raise an' live the houses they build—why, I'll be there..."

লাইনগুলি যেন গভীর আবেগে কম্পিত উজ্জ্বল সংকেত। শুধু টম জোড'এর কথা নয়, স্টাইনবেক ও যেন তার সঙ্গে কথা বলছেন। এর চেয়ে গভীর কথা তিনি আর তাঁর কোন উপন্যাসে বলেন নি।

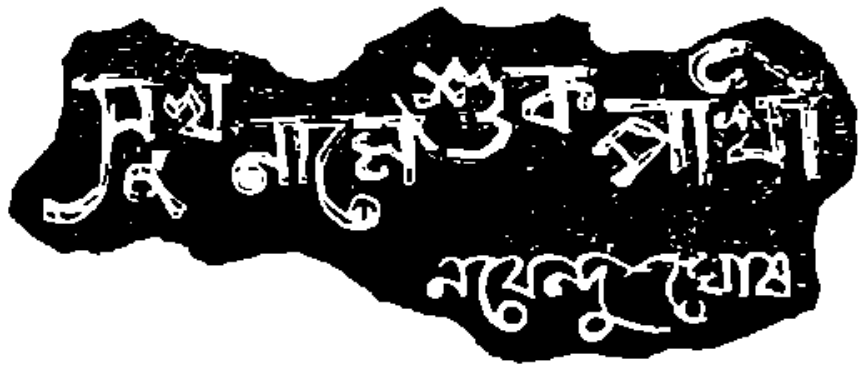

রাও হঠাৎ থমকে দাঁড়াল, কাতরকণ্ঠে বলল, "আর পারছি না ব্যানার্জী।"

আমরাও থামলাম আমি, নিম্বলকর আর চৌবে। আর সুন্দরলাল ও রূপলাল—আমাদের দুজন গাড়োয়ালী কুলি—যারা হৃষিকেশ থেকে আমাদের সঙ্গে আছে।

কেদারনাথ দর্শন করে আমরা বদরিকাশ্রমের দিকে চলেছি। ভোর পাঁচটার সময় যোশীমঠ থেকে আমরা যাত্রা করেছিলাম। কালরাতেই রাও বলেছিল যে তার খুব মাথা ধরেছে। ভেবেছিলাম দুটো এ্যাসপ্রো খেলেই সে ঠিক হয়ে যাবে। যাত্রার সময়ে দেখা গেল যে তার একটু জ্বর মত হয়েছে। আমরা যোশীমঠেই থাকতে চেয়েছিলাম কিন্তু রাও রাজী হয়নি। পথ চলতে তার উৎসাহই সবচেয়ে বেশী। তাই থামিনি আমরা। যোশীমঠ থেকে বেরিয়ে প্রথম দু'মাইল উৎরাই বলে কোনো কষ্ট হয়নি কিন্তু বিষ্ণুপ্রয়াগে পৌঁছবার পরেই আকাশ অন্ধকার হয়ে গেল। দূরের গিরিশৃঙ্গগুলো মেঘে ঢাকা পড়ল, বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। তার সঙ্গে শনশন হিমেল হাওয়া। সঙ্কীর্ণ পথ ক্রমেই পিচ্ছিল ও চড়াই হয়ে উঠতে লাগল। রাওকে জিজ্ঞেস করাতে সে বলল যে চলতে থাকাই ভাল। আরো একমাইল আরোহণের পর 'বলদেও' চটিতে একটু জিরিয়ে আবার যাত্রা শুরু হল। বৃষ্টি সনাসনি ঝির ঝির করে পড়তে লাগল। মেঘের ছায়ায় চারদিক থমথমে হয়ে উঠল। হাওয়ার ঝাপ্টায় চিরগাছগুলো দুলতে লাগল। মনে হল যেন চারদিককার পর্বতশ্রেণী হঠাৎ হাওয়ার ঝাপ্টায় জেগে উঠে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছে। ক্রমে রাওয়ের কষ্ট হতে লাগল। কিন্তু থামবার উপায় নেই। তাই তিন মাইল সমতল পথ চলার পর অলকানন্দা'র তীরে অবস্থিত 'ঘাট' চটিতে পৌঁছে আবার জিরোলাম। রাওয়ের জ্বর তখন একশ। দিল্লী থেকে আমরা ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করার জন্য অল্প ব্র্যাণ্ডি কিনেছিলাম, তার থেকেই খানিকটা তাকে খাইয়ে দেওয়ায় সে একটু চাঙ্গা বোধ করল। এখানে সে থাকতে রাজী হল না। আর দুমাইল পরেই পাণ্ডুকেশ্বর, সরকার হলে সেখানেই থামা হবে ঠিক হল। সুতরাং আবার যাত্রা শুরু করলাম। কিন্তু মাইলখানেক চলার পর বৃষ্টি আর হাওয়া বেড়ে গেল। দুস্তরপক্ষী হাওয়া। বর্ষাতির নীচে আমাদের গরম ওভারকোট, কোট, সোয়েটার, শার্ট আর তুলোর জেকী, উলের মোজা আর দস্তানা, বুট, গরম ট্রাউজার আর মাঙ্কি-ক্যাপ—শীতের হাত থেকে বাঁচবার জন্য আমরা কোনো ত্রুটিই রাখিনি—তবু আমাদের হাড়ের ভেতর পর্যন্ত কনকনানি শুরু হয়ে গেল

এমন সময়েই রাও থমকে দাঁড়াল, কাতরকণ্ঠে বলল, "আর পারছি না ব্যানার্জী"—

নিম্বলকর বলল, "আরো একটু ব্র্যাণ্ডি খাও রাও"

তাই খেল রাও। সেই ঝিরঝির বৃষ্টি আর শনশন হাওয়ার মধ্যেই দাঁড়িয়ে জিরোতে লাগল সে।

কুলিদের মধ্যে যে বয়সে বড় সেই রূপলাল বলল, "সাব, অন্তর আতা বীল হৈ—চলু চী হে"—

আমি রাওকে বললাম, "হাঁটতে না পারলে আমরা ধরে নিয়ে যাব তোমাকে"—

রাও হাসল, বলল, "দাঁড়াও, ব্র্যাণ্ডি একটু কাজ করেছে, এক্ষুনি তোমাদের ঘাড়ে চড়ব না।"

রাও পা বাড়াল।

রূপলাল হাঁকল, "জয় বদরী বিশালা—আ—আ—"

আমরাও তার প্রতিধ্বনি তুলে চলতে শুরু করলাম। চলতে চলতে চলতে রাওকে উৎসাহিত করার জন্য নিম্বলকর হাসির গল্প বলতে শুরু করল, চৌবে আর আমি রাওকে দুদিক থেকে ধরে রইলাম। বাতাস আর

সৃষ্টি অন্ধকার করে তিন তিন করে অবশেষে পাণ্ডুকেশ্বরে পৌঁছলাম আমরা। বেলা তখন প্রায় একটা।

যোশীমঠের ধর্মশালা থেকে আমরা চিঠি দিয়ে রেখেছিলাম, তারই জোরে একটি ধর্মশালার দোতলায় ওঠার ও খাবার আমরা। বিছানা বিছিয়ে রাওকে শুইয়ে দিয়ে দেখা গেল যে তার জ্বর একশ'দুই। আমাদের সঙ্গে কাজ চালাবার মত ওষুধের ব্যবস্থা ছিল। নিম্বলকর এ সব বিষয়ে বাস্তবপ্রজ্ঞ লোক। রাওকে ওষুধ দিয়ে আমরা স্থির করলাম যে তার জ্বর না ছাড়া পর্যন্ত আমরা পাণ্ডুকেশ্বরেই থাকব। মাত্র সাড়ে এগারো মাইল দূরে বদরীকাশ্রম, কিন্তু উপায় কি? বদরীন রায়ণের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। রাও সুস্থ হলেই তাঁর ডাক পড়বে ধরে নিলাম।

বেলা হয়েছিল আর রান্না করলাম না আমরা। আমাদের সঙ্গে নিজেদের তৈরী রুটি ছিল তাই বাইরের একটি দোকান থেকে আলুর দম, মুগের দাড়ু ও গরম চা এনে দিনের খাওয়া শেষ করে কম্বল মুড়ি দিয়ে আমি ও চৌধরে ঘুমিয়ে পড়লাম। রাও আর নিম্বলকর এসবের ধার ধারে না।

আমরা চারজন চার প্রদেশের লোক। আমি চাকা জেলার বাঙালী, নিম্বলকর সোলাপুরের মারাঠা, রাও কাকীনদের রাজ্যের আর চৌধরে মধ্যপ্রদেশের গাজীপুর জেলার লোক। আমরা চারজন চার প্রান্তের হলেও কিন্তু নানাবিষয়ে আমাদের মিল আছে—আমরা চারজনই সংসার-বিরক্ত ধরিত্র গৃহস্থ, চারজনই সোলাপুরে থাকি এবং চারজনেই কেলকরস্ স্কুলের পুরোণো শিক্ষক, চারজনেই বয়সে পঞ্চাশোত্তর এবং চারজনই বর্তমানে হিমালয়ের দুর্গমতীর্থের অভিযাত্রী।

দলের মধ্যে বয়সে সবচেয়ে বড় বিনায়ক নিম্বলকর। স্ত্রীর সঙ্গে তার বনিবনাও নেই। সে তার সোলাপুরের জীর্ণ পৈত্রিক বাড়ীতে তার বিধবা দিদিকে নিয়ে একা থাকে। তার স্ত্রী নাগপুরে তার দুই চাকুরে ছেলেদের সঙ্গে থাকে। নিম্বলকর এখনো কেলকরস্ স্কুলে মারাঠা পড়ায়। দ্বিতীয় মধ্যাপক রাও—সে পড়ায় ভূগোল। বছর পাঁচেক আগে তার বন্ধ্যা স্ত্রী মারা যাওয়ার পর থেকে সে একেবারে নিঃসঙ্গ। তৃতীয় মানুষ চৌধরে অবিবাহিত। সবে কাকে ডালহৌসি পার হয়ে ব্রহ্মভাটার মত ডালতে ডালতে পাঁচিশ বছর আগে সোলাপুরে গিয়ে অঙ্কের মাস্টারী শুরু করে, আজকাল হিন্দীও পড়ায় সে। চতুর্থ আমি, আমার ব্যবসা কী। নাগপুরে বাপমাকে পুষিয়ে নানাঘাটের জল খেয়ে সোলাপুরে গিয়ে কুড়ি বছর ধরে ইংরেজী পড়াচ্ছি। বিয়ে-থা করার সময় আর হয়নি, আত্মীয়স্বজন কোথায় কে আছে তারও খোঁজ নেবার সময় পাইনি আর। সোলাপুরের এই চারজন গরীব ইস্কুল মাস্টার হঠাৎ একদিন সংসার সম্পর্কে তীব্রভাবে বীতরাগ হয়ে পড়ে স্থির করলাম যে কেদার-বদরী তীর্থে যাব। তারই ফলে আজ কেদার-দর্শন শেষ করে বদরীকাশ্রমের পথে চলেছি আমরা।

জানলা দিয়ে দূরের পাহাড়গুলোকে দেখা যাচ্ছিল। মেঘের ছায়ায়, বৃষ্টির ধারায় তা অস্পষ্ট, গম্ভীর। বৃষ্টি আর ছাওয়ার শব্দে আমাদের মনে কেমন যেন এক বিষণ্ণতা ঘনীভূত হয়ে উঠল। কে কি ভাবতে শুরু করল তা আমি বলতে পারব না। আমি শুধু আমার কথাই জানি। সোলাপুর থেকে প্রায় দেড়হাজার মাইল দূরে বসে মনে হল যে জগৎ ও জীবনটা এক নিরবচ্ছিন্ন দৈতবাদের প্রবাহ। দিন ও রাত, আলো ও অন্ধকার, জনতা ও নির্জনতা, হিংসা ও ভালবাসা, বন্ধন ও মুক্তি—অনবরত দুটি বিপরীতমুখী ধারা চলেছে পাশাপাশি। তাদের সংঘাতেই এই ব্রহ্মজগৎ ও মানুষের জীবন স্পন্দমান, চলমান···

ঠিক এমনি সময়ে গান ভেসে এল। তার গান যে এই গল্পের নায়ক। এতক্ষণ ধরে শুধু তার গল্প বলার জন্যই তো নিজেদের কথা বলে ভূমিকা তৈরী করলাম।

গান ভেসে এল,

"চল হংসা বা দেস জহঁ পিয়া বসৈ চিতচোর
সুরত সুহাসিন হৈ পনিহারিন, ভরৈ ঠাঢ় বিন ভোর
বহি দেসবা বাদর না উমড়ে, বিরবিন বরসৈ মেহ।
চৌধারেরে বৈর রহোনা, জ.ভীজহু নিসেঁহ॥"

গান শুনে চমকে উঠলাম। গলার আওয়াজ যে খুব মিষ্টি তা বলতে পারা যায় না, কর্কশ, কাটাকাটা কিন্তু

তার মধ্যে একটা তীব্রতা ও একটা মনের আবেগের উচ্ছ্বাস ছিল, একটা উন্মাদের মত্ততা ও ধ্যানের গম্ভীরতা ছিল।

এতক্ষণে রাও চোখ মেলে বলল, "লোকটা বেশ গাইছে তো।"

নিন্দলকর বলল, "খুব দরদ আছে গলায়—বৈরাগ্যের দরদ"—

চৌবে কান পেতে বলল, "কবীরের গান গাইছে লোকটা"—

আমরা চুপ করে গান শুনতে লাগলাম। বাইরে বৃষ্টি সমানে পড়ে যাচ্ছে, আকাশের মেঘ আর দূরের পাহাড় একাকার হতে চলেছে। এই অদৃশ্য গায়ক এ কোন দেশের গান গাইছে? তা কি হিমালয়ের দুর্গমতার মধ্যে কোথাও আত্মগোপন করে আছে। রাতাসের শন্‌শন্ শব্দ হঠাৎ যেন এই গানের সুরের স্পর্শে বৈরাগ্যের দীর্ঘশ্বাস হয়ে উঠল। মনে হতে লাগল যে বিছিহিছি বলে আছি, বিদ্যুৎ খেয়ে আছি। নিরন্তর চলা উচিত। বেলাবেলা, কৈলাস-মানস সব ছাড়িয়ে, আকাশের সীমানা পার হয়ে, বেদনের বেদা-নন্ত বলতে অন্য কোনোখানে পৌঁছোতে হবে। সেখানে—

গান থেমে গেল। হিমালয়ের নীচাকার কিংবা উচ্চতার আমাদের ঘিরে আবার বিরহিণীর বৃষ্টি পড়তে লাগল আর শন্‌শন্ হাওয়া বইতে লাগল। কম্বল মুড়ি দিয়ে আমরা দেখতে লাগলাম কেমন করে মেঘাবৃত দিনের আলো ম্লান হয়ে আসতে লাগল।

কিন্তু খানিকবাদেই আবার গান ভেসে এল,

"বালম আও হমারে গেহরে, তুম বিন দুখিয়া দেহরে।
সবকোই কহে তুম্হারী নারী, মোকো রহ সন্দেহ রে॥

গানে সেই একই মর্মস্পর্শী মাধুর্য, সেই একই উন্মত্ততা। কে গাইছে? লোকটির বিষয়ে আমাদের কৌতূহল বাড়তে লাগল।

সে গানও শেষ হল। আমরা রাওকে আর এক দফা গরম দিয়ে চা তৈরী করে শীত তাড়াবার চেষ্টা করে আবার আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলাম।

আধঘণ্টা বাদে আবার গান ভেসে এল,

"রহনা নহি দেশ বিরানা হৈ।
যহ সংসার কাগদকী পুড়িয়া, বুঁদ পড়ে ঘুল জানা হৈ।"

সেই কবীরের রচনা। চৌবে বারবার বলতে লাগল। রাও এবারও তিন্নী স্বর নিয়েই উঠে বসল। আকাশের উদাসীন আবহাওয়া বিচিত্র এক আবেগে থরথর কাঁপতে লাগল। কে, কে গাইছে?

আমরা বুলালালকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম। বুলালাল জানাল যে নীচেকার এক চটিতে কে একজন পাগল মত লোক গাইছে। অর্থাৎ বুলালালের কথায় কিছুই বোঝা গেল না।

ক্রমে অপরাহ্নে অন্তর্ধান করল। অতিদ্রুত সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে রাত হল। হিমালয়ের মহান ধ্যান গাঢ়তর হয়ে উঠল। অন্ধকারে টিম্‌টিম্ করে জ্বলতে লাগল আমাদের ঘরের ল্যাম্পিকেন আর রান্নার উদ্যোগ করতে করতে শীতে কাঁপতে কাঁপতে আমরা আবার গান শুনতে পেলাম।

"দুলহিনি তোহি পিয়কে ঘর জানা।
কাহে রোবো কাহে গাবো কাহে করত বহনা।"

এমন সময় ধর্মশালার ম্যানেজার কপিলপ্রসাদ এলেন আমাদের খোঁজ নিতে। আমাদের পরকার পড়লে আরো কাঠ কিংবা কম্বল দিতে চাইলেন তিনি। সদাচারী প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ, আমাদের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ গল্প করলেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "ধর্মশালার লাগোয়া ঐ ডানদিকের চটিতে কে একজন গান গাইছে কপিল প্রসাদজী"—

কপিল প্রসাদ হেসে বললেন, "হ্যাঁ, তিন চার দিন ধরে আছে লোকটি, বদরীকাশ্রমের যাত্রী কিন্তু অসুখ হওয়ায় পড়ে আছে। নিরাসক্ত উদাসীন, মনে হয় যেন শিক্ষিত লোক। কিন্তু বেশভূষার হতদরিদ্র। পরনে গেরুয়া ধুতি পাঞ্জাবী আর সঙ্গে দুটি ছেঁড়া কম্বল—একটি পেতে শোয়, আর একটি গায়ে দেয়। একটা গেরুয়া রঙের থলিতে খানকয়েক বই আর একটা চশমা—এই লোকটির সম্বল। ঘণ্টার ঘণ্টায় গান গায় আর মাঝে মাঝে গাঁজা খায়। সব গানই কবীরের রচনা। হয়ত কবীরপন্থী, কিংবা সহজিয়া—আসলে কী তা জানি না আর জানার আগ্রহও নেই মশাই। ভগবানের রাজ্যে কত বৈচিত্র্য—কে কোন বেশে, কোন ভাবে তাঁকে খুঁজছে তা জেনে আমার দরকার কি? তাঁকে খুঁজছে, তাঁর মন্দিরে

মাথা নৌকোর কানা পর্যন্ত চড়ছে—বাবা, ওই যথেষ্ট। লোকটার আর একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম—বিয়ে চেহারার বাহার নেই। দু'দিন আগে একজন ধর্মপ্রাণা বুড়ী কাল দুটো রুটি দিয়েছিল, তার থেকে একটা ছেঁড়া দিয়ে একটা খেয়েছিল।"

মন শুনে ভাবলাম যে কাল একবার লোকটিকে দেখব দূর থেকে।

কপিল প্রসাদ নিজের বাসায় চলে গেলেন। পাণ্ডুকেশ্বর একটি বড় গ্রাম। সেখানে বেশ কয়েক ঘর শুক্লদ্য বাস করে। এই গ্রামেই পঞ্চপাণ্ডবের পিতা মহারাজ পাণ্ডু তপস্যা করেছিলেন। গ্রামে দু'টি মন্দির আছে। সন্ধ্যার পর সেখান থেকে শঙ্খ ঘণ্টার শব্দ ক্ষীণভাবে ভেসে এল। ক্রমে রাত হল, রাত গভীর হল, পাণ্ডুকেশ্বর গ্রাম কন্দরের তলায় গভীর ঘুমে অচেতন হল। আমাদের ঘরেও ঘুম এল। শুধু আমি জেগে ভাবতে লাগলাম যে জীবনের উদ্দেশ্য কি? তা কি শুধু বহুদূর পোলা-পুরের স্কুলে ইংরেজী পড়াবার জন্য!

এমন সময় আবার গান শোনা গেল,—

"দুগবা পিঞ্জরবা ছোড়ি ভাগা।
ইস্ পিঞ্জরে মেঁ দস্ দরবাজা দস্ দরবাজে কিবরবা লাগা।"

এবার যেন সেই অদৃশ্য গায়কের গলায় ক্লান্তি ধ্বনিত হ'ল। গানের আওয়াজ যেন ক্ষীণ মনে হল। মাঝে মাঝে তার গান বাইরের অন্ধকার—ঘনঘনকারী বাতাসের মধ্যে হারিয়ে যেতে লাগল। যেন কোন মুমূর্ষু পাখীর ডাক মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে আর হারিয়ে যাচ্ছে। গান শুনে কেমন যেন কান্না পেতে লাগল আমার। মনে হল যেন সবই নিরর্থক, মনে হল যেন এই জীবন এক অর্থহীন খেলা, এই দেহ বহুবর্ণময় নানা বাসনার তৈরী একটি পিঞ্জর এবং এই পিঞ্জর থেকে মুক্তি পাওয়ার নামই সুখ।

সুপ্রভাতের আগে ঘুম ভেঙ্গে গেল। নিম্বলকারের শিরস্ত্রাণ কানে এল। উঠে বসলাম কাঁপতে কাঁপতে। রাওয়ের কপাল ছুঁয়ে মনে হল জ্বর নেই।

চৌবেও জেগে ছিল, সে বলল, "এখন জ্বর আটানব্বই মত—যানও হচ্ছে, মনে হচ্ছে চিন্তার কিছু নেই।"

রাও হেসে বলল, "মনে হচ্ছে আজ যাত্রা করলে বদরীকাশ্রম পৌঁছে যাব।"

চৌবে বলল, "পাগল নাকি—আজে এগারো মাইল চড়াই—তাছাড়া আবহাওয়া কেমন থাকবে কে জানে।"

কিন্তু যানিকক্ষণের মধ্যেই পাখীদের কাকলি শোনা গেল। একটা জানালা খুলতেই দেখা গেল যে আকাশ পরিষ্কার। কিন্তু হাওয়া আছে, হাত পর্যন্ত কেঁপে উঠল। তাড়াতাড়ি আবার জানালা বন্ধ করে দিলাম।

আরো কিছুক্ষণ পরে পাণ্ডুকেশ্বর গ্রামে প্রাণের সাড়া জাগল। আমরা পরপর দু'গেলাস চা খেয়ে শীতবস্ত্রের ভারে প্রায় নুয়ে পড়ে রাও ছাড়া আমরা তিনজন বাইরে বেরোলাম। বাইরে জমে যাবার মত ঠাণ্ডা। বৃষ্টিস্নাত হিমালয়ের শিখরগুলো যেন ঝালরা বাপ্পে মোড়া। আমরা ঠিক করলাম যে আজকের দিনটাও পাণ্ডুকেশ্বরে থেকে আগামীকাল বদরীনাথের উদ্দেশে যাত্রা করব।

বাইরে সুন্দরলালের দলের দেখা হল। একপাল হেসে সে জানাল যে চামোলি চটির ওদিকে রাতে তুষারপাত হয়েছে হালকা মত।

চৌবে চটে গেল, "এ খবরে তোমার কি আছে হে, এঁ্যা?"

সুন্দরলাল আরো হাসল, তারপর বলল, "আও এক খবর হায় সাব—দোসরা চটিমে উয়োহ আদমি মর গয়া—একদম খতম্"—

"কৌন আদমি?"

"উয়োহ সাধু—যো গানা গাতা থা।"

সেকি! কাল রাত্রিতে সে যে গান গেয়েছিল তা কি তার বন্দী আত্মার শেষ গান?

নিম্বলকর বলল, "লোকটা আমাদের আচ্ছা ফাঁকি দিল তো—চল একবার গিয়ে দেখে আসি।"

সুন্দরলাল বলল, "নেহোৎ লোগ আদা জায় সাব—থানামে খবরভি ভেজ দিয়া"—

ধর্মশালা থেকে প্রায় পঞ্চাশ গজ নীচে, ডানদিকে, রাস্তার কাছাকাছি যে চটিটা, তারই শেষ প্রান্তের ঘরটিতে লোকটি মারা গেছে। আমরা গিয়ে দেখলাম যে ইতি-মধ্যেই দশ বারোজন লোকের ভীড় জমেছে। আমাদের ধর্মশালার ম্যানেজার কপিল প্রসাদও সেখানে হাজির হয়েছেন।

কপিল প্রসাদ বললেন, "লোকটির হার্টফেল হয়েছে মনে হচ্ছে যে বুড়ী গত দুদিন ধরে লোকটিকে রুটি খাওয়াত সেই বুড়ীই আজ সকালে দেখে যে এই শীতেও লোকটির ঘরের দরজা খোলা পড়ে আছে। সেই আবিষ্কার করে যে লোকটি মারা গেছে। পুলিশে খানিক আগেই খবর গেছে।

চটির সেই ঘরের দরজা দিয়ে উঁকি মারলাম আমরা। একটা ছেঁড়া কম্বল ঘরের পাথরে-বাঁধানো মেঝের ওপর পাতা, তারই ওপর লোকটির মৃতদেহ বাঁদিকে কাৎ হয়ে পড়ে আছে। শরীরের ওপরে যে কম্বলটি ছিল তা কোমর পর্যন্ত নেমে গেছে, বাঁহাতটা বাঁদিকের বুকে চেপে ধরা আছে, ডান হাতটা মেঝের ওপর প্রসারিত। চোখ দুটো ওপরে উঠে আছে, যেন মরবার আগে সে কিছু লক্ষ্য করেছিল। মরে কাঠ হয়ে আছে লোকটা—শুকপাখী পিঞ্জর ছেড়ে পালিয়ে গেছে।

যে বুড়ী সেই লোকটিকে রুটি খাইয়েছিল সে-ও একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। ছল ছল চোখে বুড়ী বলল, "অভাগা ঘোর গড়ায় এসে মরল, তবু দর্শন দিলে না মদনী নারায়ণ!"

"কে লোকটা? কি নাম ওর?" নিম্বলকর প্রশ্ন করল।

কপিল প্রসাদ জবাব দিলেন, "কেউ জানে না—পুলিশ এসে থলি ঘাঁটলে হয়ত কিছু জানতে পারবে।"

থলিটা বিছানার কাছেই পড়েছিল। তাতে কয়েকটা বই, কয়েকটা ছোট ছোট কৌটো। থলির পাশে একটা দেশলাই ও একটা পাঁচার কলকে। মাথার দিকে এক জায়গায় কিছু ছাই পড়ে আছে।

লোকটির রং মসলা, দীর্ঘকায় রুগ্ন দেহ, গলায় একটা রুদ্রাক্ষের মালা, মুখে কাঁচা পাকা দাড়ি আর মাথায় একরাশ রুক্ষ ও আধ পাকা চুল বেনীর মত করে বাঁধা। বাঁ চোখের ভুরুর ওপর একটা ছোট্ট কাটা দাগ চেহারাটাকে একটু অস্বাভাবিক করে তুলেছে। পরণে তাঁলি-দেওয়া গেরুয়া ধুতি ও পাঞ্জাবী। পায়ের কাছে মোটরের টায়ার থেকে তৈরী করা এক জোড়া চপ্পল।

কে লোকটা?

আকস্মিক, পেছন থেকে রাওয়ের গলা ভেসে এল। আমরা ঘুরে দেখলাম রাও এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের পেছনে।

নিম্বলকর রেগে গেল, "তুমি আবার কার সঙ্গে এখানে এসেছ কেন?"

মৃত লোকটির দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে ছিল রাও, সেদিকেই চোখ রেখে সে জবাব দিল, "দেখতে—লোকটার গান কাল বড় ভাল লেগেছিল।"

দেখতে দেখতে রাও আবার বলল, "হুঁ"—তারপর ঘুরে চটির বারান্দার অন্য প্রান্তে গিয়ে দাঁড়াল।

আমরা রাওয়ের পেছু নিলাম।

চৌবে বলল, "তোমার শুয়ে থাকাই উচিত রাও।"

রাও হাসল, "শরীর ঠিক হয়ে গেছে ভাই, মিছি মিছি রোগী সাজিয়ে রেখো না আমায়। আজই আমরা বদরীকাশ্রম যাত্রা করব নিম্বলকর।"

নিম্বলকর বলল, "আচ্ছা চল, রেস্তোরাঁয় গিয়ে আর এক প্রস্থ চা খেতে খেতে সে কথা নিয়ে আলোচনা করা যাক।"

চা খেতে খেতে আমি প্রশ্ন করলাম, "রাও তুমি ঐ মৃত লোকটিকে দেখে 'আশ্চর্য' আর 'হুঁ' বলেছিলে কেন বলত?"

চৌবে বলল, "তাই নাকি? শুনিনি তো"—

আমি বললাম, "বল রাও"—

রাও বলল, "বলছি। তোমরা সকালে চলে যাবার পর আমার একা শুয়ে থাকতে খারাপ লাগছিল, তাই সুন্দরলালকে ডেকে গল্প করতে করতে ঐ লোকটির মারা যাবার খবর পেয়ে লোকটিকে দেখার ইচ্ছে হল। কাল দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত লোকটির দরদ ভরা গান শুনে মনে মনে যে ব্যক্তিত্বের ছবি এঁকেছিলাম তার সঙ্গে কতটা মেলে তা যাচাই করার লোভ আর এড়াতে না পেরে আমিও বেরিয়ে পড়লাম। চটিতে গিয়ে লোকটিকে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। আমি একজন লোককে চিনতাম, দেখলাম তার সঙ্গে অদ্ভুত মিল আছে লোকটির। তাই বলেছিলাম 'আশ্চর্য'। তারপর আরো ভাল করে দেখে মনে মনে যখন নিশ্চিত বুঝলাম যে এই মৃত গেরুয়াধারীই আমার সেই পূর্ব-পরিচিত ব্যক্তি তখন বললাম 'হুঁ'। আর কিছু জানতে চাও?"

আমি বললাম, "জানার পালা তো এইবার শুরু রাও—কে তোমার এই পূর্ব-পরিচিত লোকটি? কি

করতে যে? কবে তোমার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল? সব খুলে বল।"

নিন্দলকর বলল, "হ্যাঁ রাও বল।"

চৌবে বলল, "আমিও কানখাড়া করে আছি রাও।"

রাও একটু বিষণ্ণ হেসে বলল, "বলছি বলছি। তবে গল্পটা শুনে তোমাদের মন ভরবে না। নিতান্তই দুঃখের গল্প।"

আমি বললাম, "লোক দুঃখ, আমরা সেই আশ্চর্য দেশের লোক যেখানে দুঃখকেও রস বলে স্বীকার করা হয়। তুমি বল।"

রাও বলল, "তথাস্তু।" সে একটু ভাবল, তারপর একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বলল, "ঠিকই বলেছ ব্যানার্জী—দুঃখও রস। রসো বৈ সঃ—এই হচ্ছে আমাদের দেশের শাস্ত্রবাক্য—কিন্তু তা পুরোপুরি বুঝতে গেলে যে অনাসক্তি চাই তা আমাদের নেই বলেই দুঃখ দুঃখই থেকে যায়, রসে আর পরিণত হয় না। সেই অনাসক্তি অর্থাৎ সেই বিচিত্র রসবোধ থাকলে জগৎ সংসারটাকে এক বিশাল রঙ্গমঞ্চ বলে মনে হত যেখানে নিরন্তর সংখ্যাতীত নাটক অভিনীত হচ্ছে। সে সব নাটক তোমাদের নাট্যশাস্ত্রের ফরমুলা মেনে চলে না—সেখানে বজ্রপাতের মত নির্মমতা নিয়ে ঘটনা ঘটে—"

নিন্দলকর তর্জনী তুলে বলল, "ভূমিকা সংক্ষিপ্ত কর রাও"—

রাও হেসে মাথা নেড়ে বলল, "তাই করছি। তবে আর একটা কথা না বলে পারছি না। কি দরকার ছিল আমার অদৃষ্ট হয়ে এই পাণ্ডুকেশ্বর গ্রামে কাল পড়ে থাকার? কি দরকার ছিল আজ বিশ বছর বাদে শিবশঙ্কর পিল্লাই এর মৃত দেহের সামনাসামনি হওয়ার?"

নিন্দলকর প্রশ্ন করল, "লোকটির নাম শিবশঙ্কর পিল্লাই?"

রাও জবাব দিল, "হ্যাঁ।"

"বিশ বছর আগে তুমি কোথায় ছিলে?"

রাও বলল, "তখন আমি কাঞ্চীপুরমে—নিজের শহরে। সেখানেই শিবশঙ্কর পিল্লাই এর সঙ্গে আমার আলাপ হয়।"

রাও এবার ভূমিকা শেষে গল্প বলতে শুরু করল:

বিশ বছর আগে নয়—আসলে বাইশ বছর আগে থেকে শুরু করতে হবে। তখন দেশ পরাধীন ছিল। সেই জ্বালায় আমিও আর সবার মত জ্বলতাম। তাই মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে আমি, গ্র্যাজুয়েট হবার পরই সংসারের তাগিদ এবং আদর্শের তাগিদে একটি প্রাইভেট স্কুলে শিক্ষকতার কাজ নিলাম। মন ভরল না বলে নিলাম যে শিক্ষার মাধ্যমে ছাত্রদের দেশপ্রেমের শিক্ষা দেওয়া নাকি বড় কাজ। স্কুলের মালিক অতি বৃদ্ধ শ্রীরাঘবন আইয়ার এক বছর বাদে মারা যাবার পর স্কুল পরিচালনার ভার নিলেন তাঁর প্রৌঢ় ও দুর্যোগ্য ছেলে শ্রীমাধবন আইয়ার। তিনি এককালে নামজাদা কংগ্রেস-কর্মী ছিলেন, লব্ধপ্রতিষ্ঠ স্বাধীন। পিতার আদর্শের সঙ্গে তাঁর মূলগত মিল ছিল কিন্তু কার্যসূচীর ব্যাপারে পার্থক্য ছিল বহুবিধ। শ্রীরাঘবন চাইতেন শিক্ষিত করতে, শ্রীমাধবন চাইতেন সত্যিকারের মানুষ করতে। এমন মানুষ যে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের বিবরে সদা-সর্বদা দায়িত্ব অনুভব করবে। সুতরাং শ্রীমাধবন এসে স্কুলের ভার নিতে গিয়েই শিক্ষা পদ্ধতির ব্যাপারে উঠে পড়ে লাগলেন। শিক্ষকদের ডেকে তিনি ছাত্রদের সঙ্গে ব্যবহার সম্পর্কে নানা বিধিনিষেধ প্রস্তাব করতে লাগলেন। তা শুনে আমাদের প্রত্যেক জ্বলাল যে আমরা এক পাগলের পাল্লায় পড়েছি। সর্বোপরি, প্রত্যেককে ডেকে তিনি প্রশ্ন করতে লাগলেন, "আপনি কি সুখী?"

এ আবার কেমন প্রশ্ন?

অধিকাংশ শিক্ষকেরাই বলল যে তারা সুখী নয়। শুনলাম তা শুনে শ্রীমাধবনের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল।

অবশেষে আমারো ডাক পড়ল।

হেডমাস্টারের ঘরে একা বসে ছিলেন শ্রীমাধবন। মাঝারি দীর্ঘ স্বাস্থ্যবান মানুষটি, মাথা জোড়া টাক, চোখে মুখে দৃঢ়তার স্পষ্ট ছাপ। আর তাঁর ঈষৎ পিঙ্গল চোখের তারার অদ্ভুত এক ঔজ্জ্বল্য, বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না।

দু' একটি মামুলি কথার পর শ্রীমাধবন প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা মিঃ রাও, আপনি কি সুখী?"

আমি তৈরী ছিলাম, চটপট জবাব দিলাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি সুখী।"

শ্রীমাধবন একটু ঝুঁকে আবার প্রশ্ন করলেন; "আপনি কেন দুঃখী ?"

"আজ্ঞে ?"

"আপনার কেন মনে হয় যে আপনি দুঃখী ?"

কি বেয়াড়া প্রশ্ন। রীতিমত ঘেমে উঠলাম. তারপর অনেক ভেবে শেষে বলে ফেললাম, "আজ্ঞে আমার কোনো অভাব নেই। মা বাবা আছেন, বাড়ীর অবস্থাও ভালো' —

সেই উজ্জ্বল দুই পিঙ্গল চোখ দিয়ে শ্রীমাধবন যেন আমার কালিকটা ধরে ফেলে বললেন, "হুঁ—আচ্ছা আপনি এবার যেতে পারেন, নমস্কার।"

প্রায় ছুটে বেরিয়ে এলাম। মিথ্যে কথা বলার জ্বালায় কিছুক্ষণ ছটফট করলাম। আসলে আমি তো দুঃখী নই।

পরদিন থেকে শ্রীমাধবনের পাগলামো আর এক ধাপ বাড়ল। যারা যারা দুঃখী নয় বলেছিল সেইসব শিক্ষকদের তিনি তার নানা রকম ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে একই মাইনে দিয়ে স্কুল থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। বলা বাহুল্য আমার চাকরি রয়ে গেল এবং আমার মত যারা সত্যকে গোপন করেছিল তারাও। সব মিলিয়ে মাত্র চারজন শিক্ষক রইল, আর বাকী সবার মাইনে বাড়ল। আবার নতুন করে শিক্ষক নিয়োগের পালা সুরু হল। দূর দূর থেকে আশা নিয়ে এল লোকেরা কিন্তু তাদের শতকরা আটানব্বই জনই অসুখী। অতএব আবার লোক ডাকো। এইভাবে স্কুল চালাবার জন্য নূন্যতম শিক্ষক জোগাড় হতেই প্রায় ছ'মাস কেটে গেল। সব শেষে এল শিবশঙ্কর পিল্লাই।

পিল্লাই কেরলের লোক। কিন্তু তার বাপের সঙ্গে সে ঘুরেছে নানা জায়গায়। ছোট বেলায় ছিল কুইলনে, আট বছর বয়সের পর কেটেছে উত্তর প্রদেশে আর বিহারে, তারপর ম্যাট্রিক পাশ করে কলেজের পড়া পড়েছে মাদ্রাজে। মালয়ালম্, হিন্দী, তামিল এবং ইংরাজীতে তার প্রায় সমান দখল। শিক্ষকতা করে সে ইংরিজীর। কাকীপুরমের সেই শিবশঙ্কর পিল্লাইয়ের সঙ্গে পাণ্ডুকেশ্বর গ্রামের ওই চটিতে মৃত শিবশঙ্কর পিল্লাইয়ের চেহারার মিল থাকলেও পার্থক্যও অনেক আছে। বিশ একুশ বছর আগে পিল্লাইয়ের বয়স তখন সাতাশ আটাশ হবে। চকচক করছে গায়ের উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, জ্বলে জ্বলে করছে দুটি বুদ্ধিদীপ্ত চোখ আর মুখের ওপর ছেয়ে আছে একটি নিষ্পাপ নিষ্কলুষ দীপ-শিখার মত প্রশান্তির আলো।

প্রথম দর্শনেই প্রেমের মত বন্ধুত্বও হয়। কিংবা তোমরা বলতে পারো যে রাশিগত মিলই হয়ত ছিল— সে যাই হোক, দু'একদিনেই পিল্লাই এর সঙ্গে আমার বেশ ভাব হয়ে গেল। লোকটিকে আমার ভাল লাগল। নম্র, কথাবার্তা কম বলে কিন্তু যতটুকু বলে তা শুনতে এবং ভাবতে ভাল লাগে।

একদিন আমি জিজ্ঞেস করলাম, "ইণ্টারভিউ এর সময় শ্রীমাধবনকে কেমন লাগল ?"

পিল্লাই জবাব দিল, "ব্যক্তিত্বে এবং চিন্তায় বেশ স্বতন্ত্র ভদ্রলোক।"

"সে কি মশাই—পাগল মনে হল না ?"

পিল্লাই অবাক চোখে তাকাল, "কেন বলুন তো ?"

"আপনাকে তিনি প্রশ্ন করেন নি—আপনি কি সুখী ?"

"হ্যাঁ, করেছিলেন।"

"আপনি কি জবাব দিয়েছিলেন ?"

"বলেছিলাম যে আমি সুখী।"

"আপনি কি সত্যি সুখী মিঃ পিল্লাই ?

"নিশ্চয়। আমি মিথ্যে কথা বলি না মিঃ রাও।"

"আপনি কেন ভাবেন যে আপনি সুখী ?'

"এ প্রশ্নও শ্রীমাধবন করেছিলেন।" পিল্লাই হাসল, তার সুখে চোখে হঠাৎ একটা স্নিগ্ধতা ছড়িয়ে পড়ল, একটু থেমে সে বলল, "আমি তাঁকে বলেছিলাম যে আমি ভালবেসেছি এবং ভালবাসা পেয়েছি বলে সুখী।"

কিছু যদি মনে না করেন তো জিজ্ঞেস করি—আপনি কি ভালবেসেছেন—সেকি"—

পিল্লাই মিষ্টি হেসে বলল, "আমার ভালবাসা আমার গর্বের বস্তু তাই সে বিষয়ে বলতে দ্বিধা বা লজ্জা নেই। মিঃ রাও। আমি আমার স্ত্রীকে ভালবেসেছি। তাকে ভালবেসে, তার ভালবাসা পেয়ে আমি এখন সবাইকে সব কিছুকেই ভালবাসতে পেরেছি। আমার লোভ দূরে গেছে, ক্রোধ উড়ে গেছে. আমি এখন জীবনের লক্ষ্য ও অর্থ খুঁজে পেয়েছি।"

"আপনার কথা শুনে শ্রীমাধবন কি বললেন ?"

"আমার কথা শুনে তিনি হাসলেন, মনে হল যেন প্রীত হলেন, তারপর বললেন, মিঃ পিল্লাই, আপনি আরো ভাল বাসুন, আরো পবিত্র হোন, এই ভালবাসার জোরেই আপনি ভগবানকে জানতে পারবেন।"

আমি হেসে বললাম, "সুখী কিনা এ প্রশ্ন তিনি সবাইকেই করেছেন তা আপনি জানেন ?"

পিল্লাই মাথা নাড়ল, "না তো। প্রশ্ন শুনে আমি একটু অবাক হয়েই ভেবেছিলাম যে তিনি কেন একথা জিজ্ঞেস করলেন ? এখন আপনার কথায় মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই কোনো গূঢ় কারণ আছে।"

"তা আছে, নইলে যারা সুখী নয় তাদের তিনি ছাড়াতেন না।"

"এর অর্থ কি আপনি জানেন মিঃ রাও ?"

"না।"

পিল্লাই একটু অন্যমনস্ক ভঙ্গীতে বলল, "কিন্তু জানতে হবে মিঃ রাও, আমি একদিন শ্রীমাধবনকে সরাসরি জিজ্ঞেস করব।"

পিল্লাই এর সঙ্গে বেশ ভাব হল আমার। অন্যান্য শিক্ষকদের সঙ্গেও তার সম্প্রীতির অভাব দেখা গেল না। তার শিক্ষা ও ভাল পড়াবার ক্ষমতায় সবাই মুগ্ধ হল। কিন্তু একটা জিনিষ সবারই লক্ষ্য করতে লাগলাম। পিল্লাই পুরোপুরি প্রাণ খুলে কথা কয় না বা মেশে না। আসলে সে মিশতেও চায় না। মিশলেও যেন একটা দেওয়ালের ওপিঠ থেকে মুখ তুলে কথা বলে। সে যেন স্বয়ং-সম্পূর্ণ।

অন্যান্য শিক্ষক বন্ধুরা অবশ্য বলল যে পিল্লাই একটু নাকউঁচু লোক। অনেক ভাষা জানে, ভাল পড়ায়, সর্বোপরি স্কুলের মালিক শ্রীমাধবন তাকে একটু সুনজরে দেখেন বলে সে একটু অভিজাত ও স্বতন্ত্র সাজার চেষ্টা করছে। এই সব ভেবে ও-আলোচনা করে, পরনিন্দার চাটনি চেটে আমরা পিল্লাই এর দূরে-দূরে ভাবটাকে শেষ পর্যন্ত মানিয়ে নিলাম। তবে মিথ্যে কথা বলব না, আমার সঙ্গে বিশেষ একটু প্রীতির সম্পর্কই মিলত পিল্লাই। একমাত্র আমার কাছেই সে তার হৃদয়ের দরজা একটু আধটু ফাঁক করে ধরত। অবশ্য সে স্বেচ্ছায় তা করত না, আমার তাড়না অনেকখানি দায়ী ছিল তার জন্যে।

প্রায় মাস ছয়েক শিবশঙ্কর পিল্লাই একটা মেসে ছিল। একটু মনমরা থাকত সে। তার স্ত্রী মাদ্রাজে তার শ্বশুর বাড়ীতে ছিল তখন। আমিও তখন বিবাহিত সুতরাং পিল্লাই এর মনের অবস্থাটা আঁচ করে আমিও বাসার খোঁজে ছিলাম। অবশেষে আমাদের পাড়াতেই একটা দোতলা বাড়ীর নীচের তলার একটা ফ্ল্যাট তার জন্যে ঠিক করলাম। দুটো কামরা, রান্নাঘর, বাথরুম, নিঃসন্তান পিল্লাই দম্পতির পক্ষে তা যথেষ্ট।

বাসা ঠিক হতেই চার দিনের ছুটি নিয়ে মাদ্রাজ গেল পিল্লাই এবং বৌকে নিয়ে এল। আমি তাকে অভ্যর্থনা জানাতে স্টেশনে গেলাম ও তার স্ত্রীকে প্রথম দেখলাম। পিল্লাইয়ের চেহারায়, বেশভূষায় যে পরিমাণ আভিজাত্য ছিল তার স্ত্রীর মধ্যে সেই পরিমাণে তা কম ছিল। পিল্লাইয়ের স্ত্রী শান্তা'র মধ্যে ইয়োরোপীয় হাব ভাবটাই বড় হয়ে নজরে পড়ল আমার। আর চোখে পড়ল তার রূপ। মহিলা যেন অফুরন্ত পদ্ম কুঁড়ির একটি দীঘি। একটু লম্বাটে গড়ন তার, দীর্ঘ গ্রীবা, কনক চাঁপার মত সুবরণী। আর চোখ দুটোতে কেমন যেন অসল এক ঘুম-ঘুম ভাব—কিন্তু হঠাৎ খিল খিল করে হাসলে তাদের আশ্চর্য রূপান্তর ঘটে—তখন মনে হয় যেন সেগুলো কোনো ধাবমান হরিণীর চোখ।

তারপর থেকে শিবশঙ্কর পিল্লাই যেন একটু বদলাল। যে দেয়ালের ওপিঠ থেকে সে কথা বলত তা যেন আর একটু উঁচু হয়ে গেল। বার দুয়েক আমি সস্ত্রীক পিল্লাইদের বাসায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। আমাদের আদর-অভ্যর্থনার ব্যাপারে পিল্লাইরা কোনো ত্রুটিই ঘটতে দেয় নি। তবু মনে হল আমরা যেন অবাঞ্ছিত। অনেক দূর থেকে যেন ওরা কথা বলত। আর শান্তা'র সেই বিলিতি চংয়ের চিবোন চিবোন কথা। তৃতীয়বার বৌকে বলতেই সে আমার ওপর ক্ষেপে গেল, "যেতে হয় তুমি যাও, আমি আর কোনো দিন যাবনা ওদের ওখানে। আমাদেরো মান ইজ্জৎ আছে। আগে আসুক ওরা আমাদের বাসায় তারপর ওকথা ভেবে দেখব।" বলা বাহুল্য পিল্লাইরা আমাদের বাসায়

আসে নি। অবশ্য আমি বার কয়েক তারপরও ওদের ওখানে গেছি। হাজার হোক সহকর্মী' এবং এক পাড়াতেই থাকি। তা ছাড়া পিল্লাই লোকটা গুণী, জ্ঞানী। কিন্তু আমারো ধৈর্যের শেষ হল একদিন। সত্যি আর যাওয়া উচিত নয়। পিল্লাইয়ের অবস্থাটা কবীরের ভাষায়—'আটহু পহর মতবাল লাগী রহৈ'। আমি গেলেও সে আমার সঙ্গে কথা বলত শান্তার দিকে তাকিয়ে, তার চোখ ঘুরত বৌয়ের চলা ফেরার সঙ্গে সঙ্গে। যেন একটা সূর্যমুখী ফুল সূর্যের দিকে তাকিয়ে আছে। যেন শেকস্‌পীয়রের রোমিও তার জীবনের সূর্য জুলিয়েটের দিকে তাকিয়ে আছে। আমি ভূগোলের শিক্ষক—আমি মৌসুমী বাতাসের গতি-বিধির কথা জানি, মেরুপ্রদেশের বিবরণ দিতে পারি, কোথায় জুবুরীরা মুক্তো তোলে, কোন পর্বতশৃঙ্গের কত উচ্চতা সে কথা বলতে পারি কিন্তু মানুষের মনের গহন-লোকের কথা বিশ্লেষণ করা বা সে সব কথা সাজিয়ে-গুছিয়ে বলার ক্ষমতা আমার নেই। এক কথায় শুধু এটুকুই বলতে পারি যে পিল্লাইকে প্রেমে ডগমগ দেখতাম এবং মনে হত যেন আমি একটি নিতান্ত বেরসিকের মত তাদের নিভৃত-নিকুঞ্জে হানা দিয়েছি। সুতরাং ওদের বাড়ীতে যাওয়া বন্ধ করে দিলাম আমি।

স্কুলে শিক্ষকেরা হাসাহাসি করত পিল্লাইদের নিয়ে। তাদের নেতা ছিল রামমূর্তি'। পরনিন্দা করার ব্যাপারে তার একটা উৎকট উৎসাহ ছিল। ক্যারিকেচারের ভঙ্গীতে পিল্লাই দম্পতিকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করে কয়েক মাস বেশ জমিয়ে রাখল সে। হাসাহাসিটা আরো বাড়ল পিল্লাইয়ের গান গাওয়া শুনে। বৌকে নিয়ে আসার পর থেকে পাড়ার লোকেরা প্রায়ই শুনত যে তানপুরা বাজিয়ে পিল্লাই রাতে গান গাইছে। মিথ্যে কথা বলব না, তার গলা কিন্তু মিষ্টি আর নরম ছিল। আমিও রাস্তায় দাঁড়িয়ে পিল্লাইয়ের গান সে সময় শুনেছি। সে সবই ভালবাসার গান। ভাল লাগার পর রামমূর্তিদের সঙ্গে হেসেছি তার প্রেমে পাগল ভাবের জন্য। কাল সারা দিন ও রাত পর্যন্ত পিল্লাইয়ের যে গলা তোমরা শুনেছ, তার থেকে অতীতের পিল্লাইয়ের গলায় মিষ্টতা টের পাওয়া যাবে না। সে যুগে যে বিড়ি খেত না সে পরে নিয়মিত গাঁজা টানলে কণ্ঠস্বরের যে অনিবার্য বিকৃতি হওয়া উচিত তাই আমি শুনেছি আমরা গত কাল। কর্কশ, ফাটা-ফাটা গলা অথচ তা দরদের ছোঁয়াচে কান আমাদের কাছে অভিভূত হওয়ার মতই মধুর মনে হয় নি কি? তা হলে অনুমান কর যুবক পিল্লাইয়ের গানের কথা। পাড়া ঘুমোবার উদ্যোগ করত তখন সে গান গাইত। শুনতে শুনতে আমি অনুমান করতাম সূর্যমুখী হঠাৎ মধুর হয়ে মধুরী বনকে মোহিত করার জন্যে সেরম মেলে নাচছে।

'আটহু পহর মতবাল লাগী রহৈ।' যেন সব সময়েই একটা নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে থাকত পিল্লাই। স্কুলে যখন সে পড়াত মনে হত যেন জ্বর নেমেছে তার ওপর। ছাত্ররা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনত তার কথা। সত্যি কথা বলতে কি, পিল্লাই ছাত্রদের ভালবাসত। বাছাই করে ভাল ভাল ছেলেদের সে বাড়ীতে ডেকে নিয়ে যেত, তাদের খাওয়াত, তাদের সঙ্গে ক্যারম খেলত, তাদের গল্প শোনাত। সকাল বিকেল তিন চারটি ছেলে পড়তেও যেত তার কাছে। রামমূর্তি'রা বলাবলি করত, "আই আইও কী চালাক লোক দেখেছ? টিউশন জোগাড় করার জন্যই ছোঁড়াদের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে ডোসা খাওয়ায়।"

সামাজিকতায় ধার ধারত না পিল্লাইরা। অবশ্য মাঝে মাঝে বেরোত স্বামী স্ত্রী। সিনেমা যেত নয়ত শহরতলীর নিস্তব্ধতার স্বাদ পেতে যেত। লোকজনেরা শান্তাকে দেখে মৃদু গুঞ্জনধ্বনি তুলত। রামমূর্তি'রা বলত, "পিল্লাই যখন বৌকে নিয়ে বাইরে বেরোয় তখন তার মুখচোখের চেহারা দেখেছ? যেন ফেটে পড়ছে অহঙ্কারে—দুনিয়ার একমাত্র সুন্দরী যেন শুধু তারই বৌ—আই আইও।"

এইভাবে মাস কয়েক কাটার পর লক্ষ্য করলাম যে পিল্লাইয়ের মনে হঠাৎ একটা সখ জমেছে। বাগানের সখ। তার ফ্ল্যাটের সামনেকার জমিটুকু বাঁশের বেড়া দিয়ে আলাদা করে নিয়ে মাটি কুপিয়ে সে হঠাৎ উঠে পড়ে লাগল। কিছুদিনের মধ্যেই লক্ষ্য করলাম যে ডিবিয়া, গোলাপ, প্যানসি ফ্লাওয়ার দিব্যি বেড়ে উঠেছে তার বাগানে। তারপর বর্ষা শুরু হতেই তা ফুলে

ফুলে ছেয়ে গেল। একদিন সকালবেলা হাঁটতে হাঁটতে তার বাগানের সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়াতে বাধ্য হলাম। আশ্চর্য সুন্দর তিন চারটি সূর্যমুখী ফুল ফুটেছে তার বাগানে। গাছগুলো প্রায় ছ'সাত হাত উঁচু এবং তাদের প্রত্যেকের মাথায় মাঝারি সাইজের থালার মত একটি করে সূর্যমুখী ফুল। আশ্চর্য উজ্জ্বল তাদের হলুদ রংয়ের পাপড়িগুলো। আমি বাগানের ভেতর না ঢুকে পারলাম না।

আমার ডাক শুনে পিন্নাই বেরিয়ে এল। ফুলের প্রশংসা শুনে খুব খুশী হল। আমাকে ভেতরে নিয়ে গেল সে। পান্না কফি এনে দিয়ে বিলিতি ভদ্রতা অনুযায়ী স্বাস্থ্য নিয়ে দু'চারটে প্রশ্ন করল, তারপর রান্নার অজুহাত দেখিয়ে চলে গেল।

পিন্নাই বলল, "আমার বাগান তোমার ভালো লেগেছে দাও?"

"হ্যাঁ পিন্নাই।"

"আমার মাথায় এ সব নিয়ে কোনো ভাবনাই ছিল না, বুঝলে, শ্রীমাধবনের বাগান দেখেই হঠাৎ খেয়াল চাপল।"

"শ্রীমাধবনের সঙ্গে তোমার তাহলে নিয়মিত দেখা হয়?"

"নিয়মিত না দাও, মাসে দু'মাসে একবার যাই। আমরা গরীব লোক, আমাদের সময় অঢেল কিন্তু ওঁদের সময়ের দাম আছে তো। ভালো কথা দাও, তোমার প্রশ্নের জবাব আমি পেয়েছি।"

"কোন প্রশ্ন?"

"সেই যে—শ্রীমাধবন কেন জানতে চান আমরা সুখী কিনা।"

আমি সোজা হয়ে বললাম, "কি বলেন শ্রীমাধবন?"

"বলছি। কথাটা অবশ্য তিনচার মাস আগেই বলা উচিত ছিল তোমায় অথচ তা হয়ে ওঠেনি। একদিন শ্রীমাধবনের সঙ্গে দেখা করতে গেছি। আবার এই দেখা করতে যাওয়া কিন্তু কর্তব্যজ্ঞার ব্যাপার না দাও। আশা করি একথা স্বীকার করবে যে আমি পাগলদের সেতে পারি পড়ানোর ব্যাপারে—সুতরাং আমি ভদ্রতাজ্ঞির কথা ভাবি না। ওতে আত্মপ্রত্যয় কমে যায়। আমি যাই শ্রীমাধবনের চরিত্রের টানে। যাই বল না কেন, লোকটি সদাশয়, দেশপ্রেমিক ও জ্ঞানী। সেদিন গিয়ে দেখি যে শ্রীমাধবন তাঁর বাগানের এককোণে এক সারি সূর্যমুখী গাছের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রতিটি গাছেই আবার আমার বাগানের মতই মস্ত বড় বড় সূর্যমুখী ফুল ফুটে আছে। সারা বাগান যেন সোনালী আভাতে ঝকমক করছে। আমাকে দেখেই শ্রীমাধবন ইশারায় আমায় থামতে বলেন ও পা টিপে টিপে তাঁর কাছে যেতে বললেন। লক্ষ্য করলাম যে, তিনি যেন কিছু দেখছেন। পা টিপে টিপে তার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি হাত তুলে একদিকে দেখালেন। সেদিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। মস্ত বড় একটি সূর্যমুখী ফুলের বোঁটার ওপর বসে একটি টিয়াপাখী ঈষৎ কুঁকে-পড়া ফুলটার পরাগ ও বীজ ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে। বিচিত্র একটি ছবি। গাঢ় হলদে রংয়ের ফুলের ওপর গাঢ় সবুজ রংয়ের একটি পাখী, তার লাল টুকটুকে বাঁকা ঠোঁট দিয়ে কদম ফুলের মত রোমাঞ্চিত পরাগের চাকাতে ঠোকর মারছে। অনেকক্ষণ ধরে সেই টিয়া পাখীটা ফুলের পরাগ ও বীজ খেল, তারপর হঠাৎ উড়ে শূন্যের মধ্যে দু'বার পাক খেয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

শ্রীমাধবন আমার দিকে তাকালেন। তাঁর দু'চোখে বিচিত্র এক ঔজ্জ্বল্য। বললেন, 'দেখলে?'

আমি মাথা নেড়ে বললাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ—দুর্লভ একটি ছবি বলে মনে হল।'

'না না—দুর্লভ নয়। সুখী লোকদের ফুলের বাগানে শুকপাখীরা নিশ্চয় আসবে। এই আমার বিশ্বাস। ঐ শুকপাখী হচ্ছে সুখের প্রতীক। ভাল-বাসলে মানুষের হৃদয়েও অমনি সূর্যমুখী ফুল ফোটে, সুখ নামে শুকপাখী এসে তার পরাগ ও বীজ খেয়ে যায়। তখন তুমি যদি বাগান কর, সূর্যমুখী ফুল ফোটাও দেখবে যে ঐ পাখীও উড়ে এসে বসেছে তোমার ফুলের বোঁটায়।'

'শ্রীমাধবন—আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।'

'বল।'

'আমরা সুখী হলে না হলে শিক্ষক-জীবনের কি আসে যায়?'

শ্রীমাধবন হাসলেন, 'তাহলে মাঝে মাঝে ভেবেছ যে আমি পাগল?'

আমি বললাম, 'আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি শ্রীমাধবন—' আমার কথার আন্তরিকতা তাঁকে স্পর্শ করল, তিনি ছোট্ট একটা কৌতুক ভাবগায় বলে বললেন। 'আমি তা জানি। হয়ত আমি পাগলই শিবশঙ্কর কিন্তু তবু আমি এ পাগলামো ছাড়ব না। আমার বিশ্বাস জানো? যার জন্য সুখে ভরপুর এমনময় সেই শিক্ষকই শিশুদের শিক্ষা দেবার অধিকারী। বিরক্ত, দুঃখী, ব্যর্থ, হতাশ লোকদের মনে অসংখ্য রকমের অস্বাভাবিক জটিলতা জন্মায়। তারা ভালবাসা পায়নি বা ভালবাসতে পারেনি বলেই সেই জটিলতা থেকে মুক্ত হতে পারে না এবং মুক্তি পায় না বলেই তারা হিংসা করে, পরকে নিগ্রহ করে জীবনের ভারসাম্য বজায় রাখে। ফলে হিংসা ছড়ায়, হিংসা বিস্তৃতি লাভ করে। এই সব লোকেরা যদি শিক্ষক হয় তাহলে ছাত্র ছাত্রীদের মঙ্গল কোথায়? জ্ঞানে তখন শূন্যতা ও বোকা হয়ে ওঠে, আনন্দ ও অমৃত হয় না।'

রাও আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। শ্রীমাধবনের কথা ও যুক্তি আমার হৃদয়কে উদ্বুদ্ধ করল। সেইদিন থেকেই আমি বাগান তৈরী করতে সুরু করলাম। আমার এই বাগান শ্রীমাধবনের বাগানেরই অনুকৃতি। আজ আমার বাগানেও ভালবাসার সূর্যমুখী ফুটেছে।'

সব শুনে পাগল বলে মনে হল, তবু তার আন্তরিকতা, তার আত্মতৃপ্তিকে অবমাননা করার সাহস হল না আমার, বললাম, "এবার তোমার বাগানেও শুখপাকী আসবে পিল্লাই।"

পিল্লাই ভারী মিষ্টি হাসল। আর সেই সঙ্গে খিল খিল হাসি শুনলাম পাশ্বার।

"আপনি ওঁর সব কথা বিশ্বাস করলেন মিঃ রাও?"

পাশ্বার চোখে ধাবমান হরিণীর চঞ্চলতা।

আমি বিনীত কণ্ঠে বললাম, "করলাম বিশেষ পিল্লাই—কারণ কথাগুলো বড় সুন্দর।"

তারপর দিন সাতেক কেটে গেছে। শ্রীমাধবন তথা পিল্লাই-এর কথা মাথায় ঘুরেছে বারকয়েক কিন্তু তা নিয়ে অভিভূত হবার কোনো কারণ খুঁজে পাই নি। সেদিন স্কুলে টিফিন পিরিয়ডে পিল্লাই আমাকে একপাশে নিয়ে উত্তেজিত গলায় বলল, "জানো রাও—কাল বিকেলে একটা শুকপাখী এসে ছিল আমার বাগানে, বসেছিল একটা সূর্যমুখী ফুলে।"

পিল্লাইয়ের চোখে বিচিত্র এক আনন্দে জ্বলতে দেখলাম। তার হাত থেকে ছাড়া পেয়ে আমি হাসলাম। এমন পাগল না হলে যে শ্রীমাধবনের প্রশংসা পাওয়া ভার। দিন কাটতে লাগল। ক্রমে পিল্লাইয়ের পাগলামো বা বাতিক আমাদের কাছে পুরোন ও সহজ হয়ে এল। দিনরাতের চাকা ঘুরে চলল, আমাদের নিত্যদিনের শিক্ষক-জীবনের চাকাও। পিল্লাইয়ের সেই আসার পর থেকে প্রায় দু'বছর কেটে গেল।

একদিন রামমূর্তি আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলল, "রাও তোমার এ পিল্লাইয়ের কিছু হয়েছে।"

"কি হল?"

"কি হল তা জানিনা তবে কিছু একটা নিশ্চয়ই হয়েছে—তোমার সঙ্গে তো একটু বেশী ভাব—জানবার চেষ্টা করো না।"

সেদিন ছুটির পর পিল্লাইকে ধরলাম। সে তখন রাস্তা দিয়ে হন হন করে এগিয়ে গেছে।

"পিল্লাই—শোন—"

পিল্লাইয়ের কানে আমার ডাক পৌঁছোল না। আমি গলা চড়িয়ে ডাকলাম। এবার সে চমকে পেছন দিকে তাকাল, আমায় দেখতে পেল।

"এই যে রাও—"

"কি ভাবছিলে বড় যে আমার ডাক কানেই যায় না?"

"নাহ—এমনি একটু—"

"তোমার চোখ মুখ এত শুকনো কেন পিল্লাই? মনমেজাজ ভাল তো?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ ভালই—কিন্তু মনে কোরোনা রাও, আমার একটু তাড়া আছে—"বলেই সে নিতান্ত অভদ্রের মতই মুখ ঘুরিয়ে আমি যেদিকে যাব তার বিপরীত দিকের এক গলিতে ঢুকে পড়ল। নিশ্চয়ই রামমূর্তির ধারণাই ঠিক।

ক'দিন পরে রামমূর্তিই আবার ফিস্‌ফিস্ করে বলল, "তোমার ঐ পিল্লাইয়ের নির্ঘাৎ মাথার গোলমাল হচ্ছে।"

আমি বুঝতে পারলাম না, জিজ্ঞেস করলাম, "কি হল আবার?"

"শ্রীনিবাসনের আইন অমান্য করছে পিল্লাই—ছাত্রদের মারের শুরু করেছে।"

"সেকি!"

"হাঁ।"

রামমূর্তির কথাই যে ঠিক তা পরে জানতে পারলাম। শুনলাম যে পিল্লাই রীতিমত মারধর করে পড়াচ্ছে আজকাল। পড়ানোও তার আগের মত নেই আর। ছাত্রদের সে শাস্তি দিচ্ছে নানা রকমের। কারো দু'আঙুলে পেনসিল ঢুকিয়ে আঙুলে চাপ দেয়, কারো জুলফি ধরে ওপরদিকে টানে, কাউকে টিকিনে যেতে না দিয়ে দশপাতা ভাতের লেখা লিখতে দেয়, কাউকে বা অন্য কোন ছাত্র দিয়ে কান মলিয়ে দেয়। চড় চাপড়, নীল ডাউন করা তো আছেই।

ভাবছিলাম পিল্লাইকে কিছু বলব। কিন্তু যানখানেক ধরে সে আমাকে এড়িয়ে চলছিল বলে সময় করতে পারছিলাম না।

আমি বলার আগেই সেদিন হেডমাস্টার ডেকে পাঠালেন তাকে এবং ছাত্রদের ওভাবে শাস্তি দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন।

পিল্লাই বিনীত কণ্ঠে বলল, "আমি যা কিছু করছি তা কর্তব্য-বোধেই করছি।"

"তার মানে? আপনি কি মারধর করাতে বিশ্বাস করেন?"

"আগে করতাম না—এখন করি।"

"কিন্তু আমি তা বিশ্বাস করিনা মিঃ পিল্লাই—শ্রীনিবাসনও করেন না। কথাটা মনে রাখবেন।"

"আজ্ঞে আচ্ছা।"

সেদিন পিল্লাইকে আমি দু'চারটে কথা বলার চেষ্টা করলাম।

পিল্লাই আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বলল, "নিজের চরকায় তেল দাওগে যাও।"

আমি হাল ছেড়ে দিলাম। বোধ হয় সেদিন থেকেই পিল্লাই মদ খাওয়া শুরু করল। প্রথমে পাড়ার লোকেরা জানল, পরে কানাকানি হতে হতে আমরাও জানলাম। আমি শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। কি হল পিল্লাইয়ের? মাস খানেক এই ভাবেই কেটে গেল।

একদিন রাতে আমার এক আত্মীয়-বাড়ী থেকে অনেক রাতে বাড়ী ফিরছিলাম আমি। হঠাৎ এক মোড়ে পিল্লাই আমার সামনে পড়ে গেল। সে তখন টলছে।

"পিল্লাই!—"

সে তর্জনী তুলে জড়িত কণ্ঠে গর্জে উঠল, "খবরদার, তোমার পয়লায় মদ খাইনা আমি যাও—খবরদার আমার কিছু বোলো না।"

আমি কিছু বললাম না। আমার ঘৃণা হল। পিল্লাই টলতে টলতে একটা গলিতে ঢুকে পড়ল।

পরদিনই ঘটনা চরমে পৌঁছোল। বেলা তিনটে নাগাদ হঠাৎ স্কুলে হৈ হৈ কাণ্ড। পিয়নেরা ছুটে এসে খবর দিল যে দশম শ্রেণীর শ্রীনিবাসন মার খেতে খেতে অজ্ঞান হয়ে গেছে পিল্লাই-এর ক্লাসে। হেডমাস্টার ও আমরা ক'জন ছুটে গেলাম। শ্রীনিবাসন নামক ছাত্রটির চোখে মুখে জল ঢেলে তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনা হল। চড়ের চোটে বাঁদিকের গাল তার ফুলে গেছে। অন্যান্য ছাত্রদের জিজ্ঞেস করে জানা গেল যে চোদ্দ বছরের শ্রীনিবাসন কি একটা পড়া না বলতে পারায় পিল্লাই তাকে চড় মারে। শ্রীনিবাসন তাতে প্রতিবাদ জানায় ও রুখে দাঁড়ায়। ফলে পিল্লাই রাগে অন্ধ হয়ে এলোপাথাড়ি মারতে থাকে শ্রীনিবাসনকে ও সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। শ্রীনিবাসনকে গাড়ীতে চড়িয়ে একজন শিক্ষকের সঙ্গে তার বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া হল। পিল্লাই পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে বসে ছিল। তাকে তিরস্কার করতে গিয়ে হেডমাস্টার আবিষ্কার করলেন যে পিল্লাই মদ খেয়েই স্কুলে এসেছে।

আমরা ঘেন্নায় সেখান থেকে সরে গেলাম। তারপর কি হল জানিনা।

সেদিন রাত এগারোটার সময় যখন সবে ভাবছি যে ঘুমোতে গেলে হয় এমন সময়ে দরজায় দুম্ দুম্ শব্দ হল। দরজা খুলে দেখলাম পিল্লাই দাঁড়িয়ে। বেচেছে মাতাল হয়ে।

"যাও, তোমার সঙ্গে দুটো কথা আছে।"

"কাল এসো পিল্লাই।"

"না না যাও—আজ—আজই বলি—ভেবেছ যে এমন মাতাল হয়েছি যে অসংলগ্ন কথা বলব।"

"আচ্ছা বেশ বল"—

"আজ আমার চাকরি গেল।"

"তার মানে?"

"আজ শ্রীমাধবন আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আমি সন্ধ্যেবেলা গিয়েছিলাম। তিনি আমার দিকে কয়েক সেকেণ্ড স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে প্রশ্ন করলেন, 'পিল্লাই, সত্যি কথা বল—তুমি কি সুখী?' আমি জবাব দিলাম, 'না।' শ্রীমাধবন বললেন, 'তাহলে কাল থেকে তুমি আর ইস্কুলে পড়াতে আসবে না।' আমি বললাম, 'আচ্ছা।' ব্যস্, তারপর বেরিয়েই বেঙ্কটেশের দোকানে গিয়ে চার পেগ চড়িয়েছি। আচ্ছা চলি, গুড নাইট গুডম্যান"—

আমি ডাকলাম, "পিল্লাই—শোন—"

"বল।"

"তুমি সুখী নও কেন?"

"সে কথা জিজ্ঞেস কোরো না—সে কথা বলা যায় না। আমার অবশিষ্ট সন্ধ্যাটুকু আর নষ্ট কোরো না যাও। চলি—out out brief candle—"

শেকস্‌পীয়ারের 'ওথেলো' নাটক থেকে আবৃত্তি করতে করতে চলে গেল পিল্লাই।

সারারাত ঘুম এল না। সকালে দুটি ছাত্র পড়াই, বিকেলে আর একটি। তাছাড়া স্কুল। স্কুলে গিয়ে আড়াই বছর বাদে এই প্রথম কেমন যেন ফাঁকা লাগল। পিল্লাই নেই। রামমূর্তিদের কপট সহানুভূতির কথা শোনার ধৈর্য ছিল না তাই সরে গেলাম। কিন্তু সেদিন ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও পিল্লাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে আর পারলাম না।

পরের দিন সকালে উঠেই গেলাম তার বাড়ী। শান্তা বাইরের ঘরে একজন বুড়ো লোকের সঙ্গে কথা বলছিল, আমায় বসতে বলল। বুড়ো লোকটি পুরোহিত নারায়ণী—শান্তা পরিচয় করিয়ে দেওয়ায় জানলাম যে তিনিই পিল্লাইএর শ্বশুর। ভদ্রলোক যে পণ্ডিত এবং অমায়িক তা তার কথাবার্তার বোঝা গেল। পিল্লাইএর খোঁজ নিয়ে জানলাম যে সে ভোর থেকেই বাড়ীতে নেই। তার চাকরি নিয়ে কোনো কথা ওরা বলল না, আমারও সে কথা তুলতে ভরসা হল না। আমি বেরিয়ে এলাম। বাগানে পা দিয়েই থমকে দাঁড়ালাম আমি। বাগানের একপাশে লাউ আট ফুট লম্বা চারটি সূর্যমুখী গাছে বড় বড় পাঁচ ছ'টি ফুল ফুটেছে।

হঠাৎ খিলখিল হাসি শুনে চমকে উঠলাম। পেছন দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে জানালার পেছনে শান্তা এসে দাঁড়িয়েছে, হাসছে।

"সূর্যমুখী ফুল দেখছেন বুঝি মিঃ রাও—দেখুন। টিয়া পাখী এলেই খবর দেব আপনাকে—হিহিহি—"

ভেতর থেকে তার বাবার তিরস্কার ভেসে এল, "শান্তা!"

শান্তা তবুও হাসছে। তার চোখে ধাবমান হরিণীর চঞ্চলতা।

আমি নিঃশব্দে বেরিয়ে এলাম।

সারাদিন অস্বস্তিতে কাটল। সন্ধ্যেবেলা আবার গেলাম পিল্লাইয়ের খোঁজে।

একডাকেই সাড়া পেলাম তার, "এসো এসো ভেতরে এসো রাও।"

বাইরের ঘরে ঢুকতেই দেখলাম যে টেবিলের ওপর মদের বোতল আর গেলাস নিয়ে বসে বসে মদ খাচ্ছে সে।

আমি স্তব্ধ হয়ে চেয়ারে বসে পড়লাম।

পিল্লাই হেসে বলল, "কিছু বোলো না রাও—আরো কিছুদিন মদ খাবার পয়সা আছে আমার। ভাল কথা, শান্তা আজ দুপুরের মাদ্রাজ চলে গেছে তার বাবার সঙ্গে—ভদ্রলোক বড় মানুষ তবু মেয়ের টেলিগ্রাম পেয়ে এসেছিলেন। মেয়ের জীবন নষ্ট হতে দেবার পাত্র তিনি নন তাই মেয়েকে তিনি নিয়ে গেছেন।"

আমি কোনো কথা খুঁজে পেলাম না।

"রাও"—

"বল"—

"বাগানে এবারও সূর্যমুখী ফুল ফুটেছে দেখেছ?"

"দেখেছি।"

পিল্লাই হঠাৎ হাসতে শুরু করল। ভদ্রলোকের মাস্টার হয়ে সে হাসির বর্ণনা আমি করতে পারব না, তোমায় কিছু বলে কোর না।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, "পিল্লাই, আমি যাই।"

পিল্লাই হেসে বলল, "সেই ভাল রাও যাও। আমি শিক্ষিত লোক তা তো জানোই সুতরাং তোমার

সহানুভূতি আর উপদেশগুলো তোমার ঘড়ি পকেটেই রেখে যাও। প্রত্যেক মানুষই একা তার জীবনকে সামাল দেয়—অতএব—গুড নাইট রাও।"

পিল্লাই এর বাড়ী থেকে প্রায় চোখ বুজে বেরিয়ে এলাম। সূর্যমুখী ফুলগুলোর দিকে আমার আর তাকাবার ইচ্ছে হল না।

তারপর আর যাই নি। আমি পিল্লাই এর চরিত্র টের পেয়েছিলাম। একটা অমনণীয় দৃঢ়তা ছিল তার মেরুদণ্ডে। তাই নিরর্থক চেষ্টায় নিজেকে ভারাক্রান্ত করার ইচ্ছেকে আমি দমন করলাম।

তারপর ক'দিন পরে শুনলাম যে বাজারের কাছাকাছি এক বটগাছের তলায় উত্তর ভারতের একজন দাড়িওয়ালা সাধুর আবির্ভাব ঘটেছে। লোকটা নাকি গাঁজা খায় আর কবীরের ভজন গায়। শুনলাম পিল্লাই দেশী মদ খেয়ে মাতাল হয়ে সেই সাধুর ওখানে গিয়ে বসে থাকে।

তারপর একদিন শুনলাম সেই সাধু চলে গেছে। আরো শুনলাম যে পিল্লাইও নিরুদ্দিষ্ট হয়েছে। তার ঘরের দরজা খোলা পড়ে আছে।

শুনে তার বাসায় গেলাম। দেখলাম দরজা জানালা খোলা। জিনিষ পত্র, কাপড় জামা, বই খাতা, হাঁড়ি বাসন সব পড়ে আছে, এখনো চুরি যায় নি।

বাইরে নতুন কয়েকটা চারা গাছের ডগায় গাঢ় হলুদ রংয়ের বড় সূর্যমুখী ফুলগুলো হাওয়ায় দুলছে, দুলছে।

রাও থামল। ধর্মশালার কামরার মধ্যে ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধতা ঘনাল।

নিম্নলকর ভুরু কুঁচকে বলল, "কিছু বুঝলাম না। ব্যাপারটা কি?"

চোবে বলল, "হ্যাঁ—যেন পিল্লাই বললে গেল?

রাও বলল, "বলছি—যা বললাম তা আমার চোখে দেখা বা জানা। পিল্লাই নিরুদ্দিষ্ট হওয়া পর্যন্ত আমিও ভাবতাম যে কি হল? আসল ঘটনা কি? সত্য কি? এইভাবেই তিন মাস কাটার পর আমাদের বাড়ীতে নতুন এক ঝি এল। বুড়ী কুপাই। সে পিল্লাইদের ওখানেও কাজ করত। সে আসার ক'দিন বাদেই আমার স্ত্রী একদিন ডেকে বলল, 'কুপাই এর কাছে শোন তোমার বন্ধু আর বন্ধুর বৌ এর গল্প'—। কি কথা? কি গল্প? আমি বুড়ীকে বললাম সব কথা বলতে। বুড়ী বলতে শুরু করল।"

বুড়ী বলল যে সে সকালে ন'টায় গিয়ে বেলা একটা পর্যন্ত কাজ করে বাড়ী ফিরে যেত, তারপর আবার যেত বেলা চারটেয় এবং সন্ধ্যা সাতটা আটটা পর্যন্ত থাকত। প্রথম প্রথম যখন সে কাজ করতে শুরু করল তখন সে পিল্লাইদের ভালবাসার ধরণ দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। যেন দু'টি কপোত কপোতী। বিশেষ করে পিল্লাইকে তার খুব ভাল লাগত। বড় ভাল মানুষ। বৌটি একটু মেন-মেন-মার্কা। তা হোক, ভালবাসা তো ছিল। কিন্তু সে যখন দেখত যে শান্তা বসে কিংবা শুয়েই কাটার বেশীর ভাগ সময় আর পিল্লাই-ই সব কিছু সামাল দেয়, এমন কি মাঝে মাঝে রান্নাও করে তখন তার খুব খারাপ লাগত। একদিন সে প্রতিবাদও করেছিল। তাতে পিল্লাই বুড়ীকে রান্নার দায়িত্বটুকু নিতে বলে এবং পাঁচ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দেয়। বুড়ী রাজী হয়েছিল।

এই ভাবেই দিন কাটছিল। প্রায় দু'বছর বাদে একদিন সে চমকে উঠল স্বামী স্ত্রীর ঝগড়া শুনে। রান্না ঘর থেকে সে শুনতে পেল দু'একটা কথা।

পিল্লাই বলছিল, "না, আমি এ সব পছন্দ করি না।"

শান্তা সগর্জনে জবাব দিয়েছিল, "খবর্দার আমার স্বাধীনতায় হাত দিও না—এর ফল ভালো হবে না।"

ব্যাপারটা বুঝতে পারল না বুড়ী কুপাই কিন্তু এর পর থেকে পিল্লাইয়ের মুখ চোখের চেহারা দেখে সে আঁচ করল যে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে একটা ঝড় উঠেছে। শান্তার মুখ দেখে সে অবশ্য কিছুই বুঝতে পারে নি। সে কি, তার অত বোঝার দরকারই বা কি? স্বামী স্ত্রীতে অমন হয়েই থাকে ভেবে সে প্রথমটায় মাথা ঘামায় নি। কিন্তু ক'দিন বাদে আবার একটি ঘটনা ঘটল। সে দিন সন্ধ্যায় কুপাই রান্না ঘরে কাজ করছিল। শান্তা জল খেতে ঢুকেছিল সেখানে। এমন সময়ে দরজার গোড়ায় পিল্লাই এসে দাঁড়াল, গম্ভীর গলায় বলল, "একবার এ ঘরে এসো শান্তা—কথা আছে।"

শান্তা ঘাড় বেঁকিয়ে তাকাল স্বামীর দিকে, শান্ত কণ্ঠে বলল, "আসছি।"

বুড়ীর সে দিন কৌতূহল হল। সে শান্তার পেছু পেছু গিয়ে শোবার ঘরের দরজার কাছে আড়ি পাতল।

ঘরের ভেতরে পিল্লাই শান্তাকে জিজ্ঞেস করল, "আজ আমি স্কুলে যাবার পর কে এসেছিল বাসায়?"

শান্তা ধীর কণ্ঠে বলল, "কেউ না!"

"গণেশন আসে নি?"

"না।"

"তা হলে এই সিগারেট কোত্থেকে এল?"

"কি আবোল তাবোল বলছ—হাত মুখ ধোও গে।"

"শান্তা সত্যি কথা বল।"

"তুমি আমার মাথা খারাপ করবার চেষ্টা করো না শিব—তোমার সঙ্গে বাঁপিয়ে পড়ে আমার জীবন নষ্ট হয়ে গেছে। আর কষ্ট দিও না আমায়।"

"তুমি দুষ্টু নও শান্তা?"

"বাজে বক্ বক্ করো না —"

হঠাৎ বুড়ী পিল্লাই-এর চাপা গলা শুনতে পেল, যেন সে দাঁতে দাঁত চেপে হিংস্রতায় অধীর হয়ে বলল, "কেন? কেন তুমি আমাকে আর ভালোবাসোনা শান্তা?"

"ছেড়ে দাও—নইলে চেঁচাব আমি—ছাড়ো বলছি—"

তারপর আর কোন কথা শুনতে পায়নি কুপাই বুড়ী। কিন্তু যেটুকু শুনল তাতেই তার কৌতূহল বেড়ে গেল। মানুষের দুর্বলতা খুঁজে বের করার জন্য, দরকার হলে তা তৈরী করার জন্য সাধারণ মানুষের মনে একটা প্রবৃত্তি আছে। বুড়ী কুপাইয়েরও সেই প্রবৃত্তি ছিল। সে যতক্ষণ পিল্লাই-এর বাড়ীতে কাজ করত ততক্ষণ চারদিকে নজর রাখতে লাগল। যে সব বাচ্চারা পড়তে আসত তাদের ওপর পর্যন্ত। ক্রমে বাড়ীতে বাচ্চাদের আসা বন্ধ হয়ে গেল। পিল্লাই মদ খাওয়া শুরু করল। বুড়ী সব দেখে যেতে লাগল, দেখতে লাগল কেমন ধীরে ধীরে একটা সংসার ভেঙ্গে ভেঙ্গে যেতে লাগল।

দুপুরবেলায় বুড়ী পিল্লাইদের বাসায় থাকে না। নিজের বাসায় যায়। কিন্তু বুড়ী সহজ পাত্রী নয়, আট ন'বছরের এক নাতনীকে সে রাস্তায় বসিয়ে যেত পিল্লাই-য়ের বাসার ওপর নজর রাখার জন্য।

বুড়ীর অধ্যবসায়ের ফল অবশেষে ফলল। একদিন তার নাতনী বলল যে বেলা তিনটে নাগাদ একজন সাহেবী পোষাক পরা সুদর্শন লোক একটা ট্যাক্সি থেকে নামল। বাসা থেকে কিছু দূরে। সে সিগারেট টানছিল। গাড়ী থেকে নেমে এদিক ওদিক তাকিয়ে সে সিগারেটটা রাস্তার মাঝখানে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দ্রুত পায়ে পিল্লাই-য়ের বাগানে গিয়ে ঢুকল। দু'বার কড়া নাড়াতেই শান্তা এসে দরজা খুলে দিল। লোকটা একঘন্টা বাদে আবার বেরিয়ে চলে গিয়েছিল।

রাও বলল, "পিল্লাই ব্যাপারটা জানতে পেরেছিল, বুঝতে পেরেছিল কে শান্তার প্রণয়ী। বুড়ীর কথা শুনে মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল আমার। আমি তার সব কথা শুনিনি, তাকে বলতেও দিইনি। নরনারীর অবৈধ আচরণের কথা নিয়ে আলোচনা করলে মানুষের চরিত্র দুর্বল হয়। আমি যা বুঝবার তা বুঝলাম। বুঝলাম ভালবাসার অভাবে জীবন কেমন ছন্নছাড়া হয়ে যায়। বুঝলাম যে ভালবাসা একাধারে অমৃত ও গরল। ভাগ্যবানের জীবনে তা অমৃত, দুর্ভাগার জীবনে তা হলাহল।"

রাও থামল। ঘরের মধ্যে স্তব্ধতা আবার থম্‌থম্ করতে লাগল। আমরা কোনো মন্তব্য করতে সাহস পেলাম না।

পায়ের শব্দে তাকালাম। কপিলপ্রসাদের সঙ্গে দরজার সামনে একজন বাক্যবদনী সাব-ইন্সপেক্টর এসে দাঁড়ালেন।

"ভেতরে আসতে পারি?" দারোগা জিজ্ঞস করলেন।

আমি বললাম, "অবশ্যই—আসুন।"

কপিল প্রসাদ ও দারোগা ঘরে ঢুকে আমাদের বিছানায় বসলেন।

দারোগা বললেন, "একজন লোক মারা গেছে চাটিতে।"

নিন্দলকর বলল, "আজ্ঞে আমরাও দেখেছি তাকে।"

"লোকটির থলি হাতড়ে কয়েকটা বই আর কয়েকটা চিঠি পেলাম।"

রাও প্রশ্ন করল, "কি কি বই?"

"একটি শেক্‌সপীয়রের গ্রন্থাবলী। বাকীগুলো ধর্ম-বিষয়ক। চিঠিগুলো লোকটিরই হাতে লেখা—মনে

হচ্ছে মালয়ালী ভাষায় লেখা—আপনারা কেউ হয়ত পড়ে দিতে পারেন ভেবে কষ্ট দিতে এলাম।"

রাও বলল, "আমরা আপনাকে সাহায্য করতে পারলে খুশী হব—দিন চিঠিগুলো—আমি মালয়ালী পড়তে জানি।"

চিঠিগুলোর ওপর একবার নজর বুলোল রাও। সব মিলিয়ে পাঁচটি। বিবর্ণ চিঠিগুলো। বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন তারিখে লেখা। প্রথম চারটিতে কোনো নাম নেই কার উদ্দেশ্যে লেখা। রাও সেগুলো তর্জমা করে শোনাতে লাগল। সেগুলোর বক্তব্য প্রায় একই। শিপ্পাই শাস্ত্রাকে উদ্দেশ করে লিখছে যে সে তাকে ভুলতে পারছে না, ভুলতে পারছে না। সে লিখছে যে তিন চারটি চিঠি দিয়েও জবাব পায়নি সে, চিঠিগুলো সব ফেরত পেয়েছে। সে কিছুই চায় না, একবার দেখা করতে চায়, দুটো সাধারণ কথা বলতে চায়। সে সন্ন্যাসী হয়েও শান্তি পাচ্ছে না। সন্ন্যাস তার বৃথা। প্রতিপদে, প্রতি শ্বাসে তার মনে পড়ছে যে সে তার নারীকে হারিয়েছে। শেষ চিঠিটা উল্লেখযোগ্য।

রাও পড়ল, "তোমাকে চিঠি লিখি কিন্তু তা পোস্ট করা হয় না। ঠিকানা জানিনা যে। তবু লিখি কারণ আমার বুকের ভেতর তোমার একটা ঠিকানা আছে। তোমায় হারিয়ে ভেবেছিলাম যে আমি ভগবানকে ভাল বাসব। আমার হৃদয়ে আবার আনন্দের ফুল ফুটবে, সেই ফুলের ওপর সুখের শুকপাখী এসে তার লাল লাল বাঁকা ঠোঁট দিয়ে আমার আনন্দের বীজবপন করবে। কিন্তু তা হোল না। কবীরের ভজন গেয়ে পথে পথে ঘুরে, পৃথিবীর অনন্ত বৈচিত্র্যের পথে প্রাধ্যমান হয়েও আমি তাকে ভালবাসতে পারলাম না। দুস্তরা মায়া হয়ে তুমি তাকে আবৃত করে রয়েছ। কিন্তু কাল থেকে নতুন এক উপলব্ধি আমার হয়েছে। আমি সত্যিকারের ভালবাসতে পারিনি তোমায়। পারিনি কারণ আমি ভালবেসেই শান্তি পাইনি, তোমার কাছে প্রতিদানে অনবরত ভালবাসা চেয়েছি। আমার সমস্ত জ্বালা শুধু চাওয়ার জন্যই। তাই আজ থেকে আর চাইব না কিছু, শুধু তোমাকে ভালবেসেই যাব রত্নমালা—"

রাও হঠাৎ থেমে গেল, দারোগার দিকে তাকিয়ে বলল, "মৃত ভদ্রলোকের নাম কি?"

দারোগা বললেন, "বইগুলোতে লেখা আছে শ্রী সি. ডি. রামচন্দ্রন্।"

রাও চিঠিগুলো ফেরৎ দিল দারোগা সাহেবকে।

দারোগা জিজ্ঞেস করলেন, চেনেন নাকি লোকটিকে?"

রাও মাথা ঝাঁকাল, "আজ্ঞে না।"

ধন্যবাদ জানিয়ে দারোগাসাহেব ও কপিল প্রসাদ বিদায় নিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই শবদেহকে পোষ্ট-মর্টেমের দিকে চালান দেওয়া হবে। পোষ্ট-মর্টেম করার জন্য।

নিম্বলকর মৃদু কণ্ঠে বলল, "এ লোকটা তো শিব শঙ্কর শিপ্পাই নয় রাও।"

রাও মৃদু হেসে বলল, "আমার ভুল হয়েছিল, অমিল ওগুলোকে আমি বড় করে দেখিনি তখন।" একটু চুপ করে থেকে আবার সে বলল, "কিন্তু এ লোকটাও তো শিব শঙ্কর শিপ্পাই নিম্বলকর।"

নিম্বলকরের সঙ্গে আমরাও নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালাম। আমরা চারজন স্নেহহীন প্রৌঢ় শিক্ষক পরস্পরের দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইলাম। বাইরের দিকে তাকালাম আমি। জানালা দিয়ে দূরের পর্বতশৃঙ্গগুলোকে দেখা যায়। তাদের মাথায় পুঞ্জ পুঞ্জ ধোঁয়াটে মেঘ। যেন বিশাল কতকগুলো ধূমুচি জ্বলছে বন্দনী বিশালের পুজোর জন্য।

হঠাৎ নিজের অন্তঃসার শূন্যতাকে আবিষ্কার করে আমি ভয় পেলাম। রঙ্গনীনারায়ণকে স্পর্শ করার জন্য তো আমি এ জীবনে জপ করিনি। আমরা কেউ করিনি।

নিম্বলকরের ঠোঁট নড়ে উঠল, বিড় বিড় করে সে বলল, "ভাই সব, আমরা আজই সবাই ফিরে যাব।"

— স মা প্ত —

॥ ভগ্নহৃদয় ॥

। এক ।

রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় মুদ্রিত গ্রন্থের নাম 'ভগ্নহৃদয়'। ভগ্নহৃদয়কে কবি বলেছেন 'গীতি-কাব্য'। এ গ্রন্থরচনার আরম্ভকালে কবির বয়স আঠারো বৎসর। 'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছেন, "বিলাতে আর একটি কাব্যের পত্তন হইয়াছিল। কতকটা ফিরিবার পথে কতকটা দেশে ফিরিয়া আসিয়া ইহা সমাধা করি। "ভগ্নহৃদয়" নামে ইহা প্রকাশ হইয়াছিল।" ১২৮৭ সালের কার্তিক থেকে ফাল্গুন সংখ্যায় 'ভারতী'তে এই গ্রন্থের প্রথম দু'টি সর্গ প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থখানি অবশ্য ৩৪ সর্গে সমাপ্ত। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৮১ সনের ২৬শে জুন। ভগ্নহৃদয় পুনর্মুদ্রিত হয়নি। কিন্তু এর কিছু-কিছু গান রবীন্দ্র-সংগীত-সংগ্রহে স্থান লাভ করেছে।

ভগ্নহৃদয়ে ভগ্নহৃদয় তরুণ-তরুণীর ভিড়। বনফুলে ছিল চারটি চরিত্র : কমলা, নীরদ, বিজন ও নীরজা। কবিকাহিনীতে মাত্র দুটি : কবি ও নলিনী। ভগ্নহৃদয়ে চরিত্রসংখ্যা বারো। কবি, অনিল, মৃণালা, ললিতা ও নলিনী : এই কটি মুখ্য ; আর চপলা, লীলা, সুরুচি, মাধবী এবং সুরেশ, বিজয়, বিনোদ প্রভৃতি গৌণ।

ভগ্নহৃদয়কে যদিও কবি বলেছেন গীতি-কাব্য, আসলে কিন্তু ওর প্রকাশভঙ্গি নাটকের। কবির নিজের বর্ণনা কিছু নেই। সবই নায়ক-নায়িকার কণ্ঠে, কখনো সংলাপের, কখনো গানের ভাষায়, প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু নাট্যকাহিনী ওতে বিশেষ কিছুই নেই। সকলই হৃদয়াবেগ। তাই ভূমিকায় কবি বলছেন, "এই কাব্যটিকে কেহ যেন নাটক মনে না করেন। নাটক ফুলের গাছ। তাহাতে ফুল ফুটে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে মূল, কাণ্ড, শাখা, পত্র এমন কি কাঁটাটি পর্যন্ত থাকা চাই। বর্তমান কাব্যটি ফুলের মালা, ইহাতে কেবল ফুলগুলি মাত্র সংগ্রহ করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, গৃহীত প্রত্যেকটিতেই ফুলের উল্লেখ করা হইল।" রবীন্দ্র-কবি-প্রতিভা যে কাব্য সংগীত-নাটক—বাণী-শিল্পের এই ত্রিবেণীসংগমে পরিপূর্ণ ভাবে আত্মপ্রকাশ করবে তারই পূর্বাভাস বহন করছে ভগ্নহৃদয়। এ কাব্যে নরনারীর হৃদয় প্রবেশে অনুপ্রবেশে কবির গতিভঙ্গি অনেকখানি স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল।

কবি ও অনিল দুই বন্ধু। মৃণালা অনিলের বোন, কবির বাল্যসহচরী। ললিতা অনিলের প্রণয়িনী। কিন্তু ভগ্নহৃদয়ের নায়িকা হল নলিনী। কাব্যের পাত্রপরিচয়ে কবি তাকে বলেছেন, "এক চপল-স্বভাবা কুমারী।" সে 'বৃন্তচ্যুত পুষ্পসম আপনাতে আপনি' বিকশিত হয়ে উঠেছে। নলিনী পুরুষের প্রেয়সী। তার আকর্ষণে 'ত্রিভুবন যৌবন চঞ্চল'। মুগ্ধ কবি মধুমত্ত ভৃঙ্গের মতো উন্মাদ সংগীতে তাকে ঘিরে সঞ্চরণ করে ফিরছে। কিন্তু নলিনী 'বিকশিত বিশ্ববাসনার অরবিন্দ মাঝখানে' পাদপদ্ম স্থাপন ক'রে হিল্লোল-হিল্লোল। সে নৃত্য ভাঙ্গে, কিন্তু হৃদয়ের আবেদনে ধরা দেয় না।

। দুই ।

অনিলের ফুলশয্যার সংবাদ দিয়ে প্রথম সর্গ আরম্ভ হয়েছে। মৃণালার সখী চপলা ভীষণ বনের মধ্যে প্রিয়সখীকে একাকিনী ও অন্যমনস্কা দেখে বলছে—

মনে আছে, অনিলের ফুল-শয্যা আজ ?
তুই-বেথা বসে রবি, কত আছে কাজ !

ফুলশয্যা সাজাবার প্রস্তাবে মৃণালা সখীকে বলছে—

সূর্যমুখী ফুল সখি আমি ভালবাসি বড়,
দুচারিটি তুলে এনে আজিকে করিস্ ভড়!
মনে বড় সাধ তার দেখে রবি-মুখ পানে,
রবি যেথা, মাথা তার সেথা যায় সেইখানে:
তবু মনোআশা হায়, মনেই মিশায়ে যায়,
মুখখানি তুলিতে নারে সরমেতে জড়সড়!
সে ফুলে দাজাবি দেহ লাজময়ী ললিতার,
লতাবতী পাতা দিয়ে ঢাকিবি শয়ন তার;
কমল আনিয়ে তুলি, লাজে-রাঙা পাপ্‌ড়ি গুলি
গাঁথি গাঁথি বিরচিয়া দিবি খোঁপাটার ধার!
পাতা-ঢাকা আধ-ফুটো লাজুক গোলাপ দুটো
আনিস্, দুলায়ে দিবি সুচারু অলকে তার!
সহসা রজনীগন্ধা প্রভাতের আলো দেখে
ভাবিয়া না পায় ঠাঁই কোথা মুখ রাখে ঢেকে,
আনুস সে ফুলগুলি যতনে আনিস তুলি,
তাই দিয়ে গেঁথে গেঁথে বিরচিবি কণ্ঠহার।

ফুলশরকে রচনার জন্যে নির্বাচিত পুষ্পচয়নের এই বর্ণনাটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার মতো। ওর মধ্য দিয়ে মুরলার মনটি ধরা পড়েছে। তার সুকুমার হৃদয়ানুরাগের গোপন সংবাদটি জানবার জন্যে প্রিয়সখী চপলা যখন অনুরোধ জানালো তখন মুরলা বলছে, যে-গোপন কথা সর্বদা লুকায়ে রেখে সে ইষ্ট-দেব-মন্ত্র-সম অনুক্ষণ পূজা করে সে-কথা মুখ ফুটে প্রকাশ করা তার পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়।

ক্ষুদ্র এই কুসুমটি পৃথিবী-কাননে,
আকাশের তারকারে পূজে মনে মনে—
দিন দিন পূজা করি শুকায়ে পড়ে সে ধরি,
আজন্ম নীরব প্রেমে যায় প্রাণ তার—
তেমনি পূজিয়া তারে, এ প্রাণ যাইবে হা রে
তবুও লুকানো রবে একথা আমার!

কিন্তু পাঠকের কাছে মুরলার প্রিয়পরিচয় অজানা নেই। কবিকে দেখে তার স্বগতোক্তিতে তার অন্তর্লোক নির্বারিত হয়েছে। অন্ধকার বনভূমিতে কবি একা-একা 'জীবন্ত স্বপ্নের মতো' ঘুরে বেড়াচ্ছে। কবির দৃষ্টিতেও মুরলা বনবালা। তাকে চপলা ফুল দিয়ে বনবালার মতো সাজিয়ে দিক্—এই কবির মনোগত আকাঙ্ক্ষা। মুরলাকে বিষয় বিরসবদন দেখে কবি জিজ্ঞাসা করছে, তার হৃদয়ে কিসের যন্ত্রণা। তার মনে হয়েছে, হয়তো যৌবনের বসন্ত-সমীরে মুরলার মানস-কুসুম বিকশিত হয়ে উঠেছে। কবি তাই বলছে—

ভালবাসো, ভালবাসা করহ গ্রহণ;
তাহলে হৃদয় তব পাইবে জীবন নব,
উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসময় হেরিবে ভুবন।

একথা শুনে মুরলা মনে মনে বলছে, কবি যদি তাকে এতটুকু ভালবাসত তাহলে কি তার মনের কোনো কথা, তার কোনো ব্যথা তার কাছে লুকানো থাকতে পারত? 'প্রেমের নয়ন থেকে প্রেম কি লুকানো থাকে?' কিন্তু বুকে যাই থাক্, মুরলা মুখ ফুটে কোনো কথা কবিকে বলতে পারবে না।

কবি বলছে বহুদিন থেকে তার হৃদয়ও অশান্তির আলয় হয়ে উঠেছে। চরাচরব্যাপী এই ব্যোম-পারাবার যদি সহসা তার আলোক হারিয়ে ফেলে তাহলে যেমন ঘোর বিপ্লবের সৃষ্টি হয় কবির চিত্তলোকেও হয়েছে তাই। এই বলে কবি অষ্টাদশাক্ষর মহা-পয়ারে তার আত্মকাহিনী প্রকাশ করেছে। কবির এই আত্মকথা সন্ধ্যাসংগীতের গীতিকবির স্বগতোক্তির পূর্বাভাস বলেই মনে হয়। কবি বলছে,—

নব-জাত উল্কা-নেত্র মহাপক্ষ গরুড় যেমন
বসিতে না পায় ঠাঁই চরাচর করিয়া ভ্রমণ,
উচ্চতম মহীরুহ পদভরে ভূমিতলে লুটে,
ভূধরের শিলাময় ভিত্তিমূল বিদারিয়া উঠে,
অবশেষে শূন্যে শূন্যে দিবারাত্রি ভ্রমিয়া বেড়ায়,
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ঢাকি ঘোর পাখার ছায়ায়;
তেমনি এ ক্লান্ত হৃদি বিশ্রামের নাহি পায় ঠাঁই,
সমস্ত ধরায় তার বসিবার স্থান যেন নাই;

কবিচিত্তের এই উপমান—এই নবজাত মহাপক্ষ গরুড়ই পরবর্তী জীবনে, 'কাহিনী' গ্রন্থে, 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় মহাকবি-কণ্ঠোচ্চারিত মহাছন্দের উপমান হয়েছে। কবি-কাহিনীর কবির হৃদয়ের উপমান হয়েছিল সমুদ্র। ভগ্ন-হৃদয়ের কবিও বলেছে—

প্রাণের সমুদ্র এক আছে যেন এ দেহ আকারে,
মহা উচ্ছ্বাসের সিন্ধু রুদ্ধ এই ক্ষুদ্র কারাগারে

মনের এ মুগ্ধস্রোত ফেলেছিনা কবি বিস্তারিত
সমস্ত জগৎ যেন চাহে কবি করিতে প্লাবিত!
অনন্ত আকাশ যদি হত এ মনের ক্রীড়া স্থল,
অগণ্য তারকারাশি হত তার খেলেনা কেবল,
চৌদিকে দিগন্ত আসি রুদ্ধিত না অনন্ত আকাশ,
প্রকৃতি জননী নিত্যে পড়াত কালের ইতিহাস,
দুরন্ত এ মন শিশু প্রকৃতির স্তন্য-পান করি
আনন্দ-সংগীত স্রোতে ফেলিত গো শূন্যতল ভরি,
উষার কনকস্রোতে প্রতিদিন করিত সে স্নান,
জ্যোছনা-মদিরা দ্বারা পূর্ণিমায় করিত সে পান,
ঘূর্ণ্যমান কটিকার মেঘমাঝে বসিয়া একেলা,
কৌতুকে ফেলিত যত বিদ্যুৎ-বালিকাদের খেলা
দুরন্ত কটিকা ছোটা এলোচুলে বেড়াত নাচিয়া
তরঙ্গের শিরে শিরে অধীর চরণ বিক্ষেপিয়া।

কবি তাঁর যৌবনলগ্নে 'কড়ি ও কোমল' কাব্যে বলেছিলেন 'আমার যৌবনস্বপ্নে ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ', 'মানসী' কাব্যে বলেছিলেন, তাঁর বাসনা 'শূন্যে সোম অপরিমান মদালস করিতে পান', তরুণমনের উদ্ভূতাংশে তারই প্রাক্‌চেতনা পরিলক্ষিত হবে। কবিমনের বিশ্বসংগীতের আবেদন যে অনুভূতির সৃষ্টি করেছে তাকে ভাষা দিয়ে কবি বলছে :

তটিনীর কলস্বর, পল্লবের মরমর,
শত শত বিহগের হৃদয়ের আনন্দ উচ্ছ্বাস,
সমস্ত বনের স্বর মিলে হত একতর,
একপ্রাণ হয়ে তারা পরশিত উন্নত আকাশ,
তখন সে সংগীতের তরঙ্গে করিয়া আরোহণ,
মেঘের সোপান দিয়া অতি উচ্চ শূন্যে গিয়া
উষার অরুণ-ভাল পারিত গো করিতে চুম্বন!

কিন্তু এক দিকে কল্পনার এই ঊর্ধ্বাভিসার, অন্যদিকে কবির চেতনা—মাটির শৃঙ্খল দিয়ে তার চরণ শৃঙ্খলিত :— কল্পনা ও বাস্তবের এই দ্বন্দ্বে কবিমন ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। বিক্ষতহৃদয় কবির আক্ষেপ সংগীত দিয়ে প্রথম সর্গ সমাপ্ত হয়েছে। গানের ভাষায় কবি বলছে, মুরলার সাথে খেলা করে কি আনন্দেই না তার ছেলেবেলা কেটেছে! তখন সে বুঝতে পারেনি সে মুরলাকে কত ভালবাসত। যখন তার কপাল ভাঙল, ছেলেখেলার স্বপন ফুরালো, দলিত মন নিয়ে সে হল প্রবাসী, তখন সে বুঝতে পারল মুরলাকে সে কত ভালোবাসে। এই শৈশব-সৌখ্যের কল্পনা স্বভাবতই 'মানসসুন্দরী' কবিতার শৈশবের খেলার সঙ্গিনীকে মনে করিয়ে দেয়। মুরলার প্রতি কবির বাল্যপ্রণয়ের কল্পনায় মানসসুন্দরীকেই বারবার মনে পড়ে।

॥ তিন ॥

দ্বিতীয় স্বর্গে ক্রীড়াকাননে নলিনী ও সখীগণের সঙ্গে পাঠকের সাক্ষাৎ হল। অনিলের ফুলশয্যায় যেতে হবে তাই চলছে নলিনীর প্রসাধন। সখীরা বলছে উৎসব উপলক্ষে বিনোদ, প্রমোদ, সুখের অশোক, বিজয়েরা সমবেত হবে, সুতরাং মনমনোহারী সাজসজ্জায় নলিনীর সজ্জিত হওয়া চাই। সখীরা একটি একটি করে ভক্ত-যুবকের নাম করছে আর নলিনী এক এক করে তাদের প্রতি নিজের মনোভাব প্রকাশ করছে। বলাই বাহুল্য মন-দেওয়া নেওয়া তার কাছে লঘুচপল খেলা মাত্র।

তৃতীয় সর্গে আছে মুরলা ও অনিলের কথোপকথন। অনিল তার আদরের বোন মুরলাকে বলছে, কেন সে কবিকে ভালোবেসে তার হৃদয়ের এত ভালোবাসা জলাঞ্জলি দিল।

যে জন রেখেছে মন শূন্যের উপরে,
আপনারি ভার নিয়া উলটিয়া পালটিয়া
দিনরাত যেই জন শূন্যে খেলা করে,

এমন আত্মমগ্ন মানুষকে ভালবেসে কেন যে তার জীবন বিসর্জন দিতে বসেছে। কবির প্রতি অনিলের ভর্ৎসনা সংযমের সীমানা অতিক্রম করেছে। তাকে সে নির্দয় পশু বলতেও কুণ্ঠিত হয় নি।

চতুর্থ সর্গটি কবিকণ্ঠের আটটি গানের মালা দিয়ে গড়া। প্রতিদিন বিপাশার তীরে সে একটি মুখ দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। এ আকর্ষণকে কবি দ্বিতীয় গানে বলছে তার সৌন্দর্যতৃষা—

আর কিছু নহে, এ ভাব আমার
কবির সৌন্দর্য-তৃষা,
কল্পনা-শুভ্র-বিভল কবির
মনের মধুর নেশা।

পঞ্চম গানে কবির মনে জিজ্ঞাসা জেগেছে—সত্যই কি সে তাকে ভালবাসে? না তার রূপরাশি দেখে সে আত্মবিস্মৃত হয়েছে? এ ভালবাসা, না রূপমোহ? অষ্টম গানটিতে কবির অনুরাগের আলম্বন-স্বরূপিণীকে চিনতে পারা গেল। জানা গেল এই চপলস্বভাবা নলিনীই কবির প্রণয়ের পাত্রী।

পঞ্চম সর্গের স্থান কানন, কাল রাত্রি। কাননের একপ্রান্তে আছে অনিল আর ললিতা, অন্য প্রান্তে নলিনী, তার সখীগণ এবং নলিনীর মুগ্ধ ভক্তবৃন্দ। ক্রীড়াময়ী ললিতার লাজনম্র দাম্পত্য-প্রণয়ের চিত্রটি মনোজ্ঞিরাম। এই মধুর দাম্পত্য চিত্রের পাশেই আঁকা হয়েছে লীলা-চপল নলিনীর ছলনা নিয়ে নির্মম খেলার আলেখ্যটি। বিজয়ের সঙ্গে নলিনীর প্রেম-প্রেম খেলার ছবিটি সার্থক তুলিতে অঙ্কিত। নলিনী বিজয়কে বলছে কামিনীর উচ্চশাখা থেকে কয়েকটি ফুল তুলে দিতে। বিজয়ের জিজ্ঞাসা, "কি পাইব পুরস্কার?"

উত্তরে নলিনী বলছে,—

পুরস্কার ?— মরি লাজে !
একটি কুসুম যদি ঠাঁই পায়
আমার অলক মাঝে,—
একটি কুসুম মুখে পড়ে যদি
এ মোর কপোল পরে,
একটি পাপড়ি ছিঁড়ে পড়ে পায়ে
শুধু মুহূর্তের তরে,
তুলে যদি রাখি একটি কুসুমে
রচিতে এ কণ্ঠহার—
তার চেয়ে বল আছে ভাগ্যে তব
আর কি বা পুরস্কার !

স্বভাবতই নলিনী-বিজয়ের এই কথোপকথন 'চিত্রা' কাব্যের 'আবেদন' কবিতায় সুগভীর কাব্যমাধুর্যে মণ্ডিত হয়েছে। সেখানে অবশ্য দেবীর কাছে ভক্তের আবেদনের স্বরূপ ভিন্ন, প্রাপ্তির তাৎপর্যও ভিন্ন। কেননা ভগ্নহৃদয়ে বিজয় যখন নলিনীকে ফুল তুলে দিল তখন সেই ফুল পদতলে বিদলিত করে গর্বভরে নলিনী বলছে, আমি যে অনুগ্রহ করে চরণে বিদলিত করলাম, এতেই তুমি পুরস্কৃত হলে।

ষষ্ঠ সর্গে আত্মভোলা কবির আত্মরতির নির্মমতাই অভিব্যক্ত হয়েছে। মুরলাকে ডেকে কবি বলছে,—

শোন্ বলি, মুরলা লো, আয়ো আর কাছে,
শুনা এ হৃদয় মোর ভাল বাসিয়াছে !

পরম আগ্রহ ভরে মুরলা জানতে চাইল তার কবি তার সখা কাকে ভালবেসেছে। উত্তরে কবি জানাল, 'মধুর নলিনী সম নলিনী বালারে।' একথা শুনে মুরলার হৃদয় বিদীর্ণ হল নিঃসন্দেহ। কিন্তু কবির প্রতি তার ভালবাসা আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিলেশ-বর্জিত। প্রেমের প্রীতিই তার শ্রেষ্ঠ কাম্য। প্রকাশ্যে সে বলছে,—

আহা কবি তাই হোক্—সুখে তুমি থাক।
এমন প্রণয়ে মন স্পর্শ করে নাথ !

একদিকে এই প্রিয়জন-প্রীতিকামনা, অন্যদিকে প্রেমবঞ্চিত বিদীর্ণ হৃদয়ের আর্তনাদ,—এই সর্গে মুরলার অন্তর্দ্বন্দ্বটি ভগ্নহৃদয়ের কবি সুনিপুণ তুলিতে অঙ্কন করেছেন। সবচেয়ে মিষ্ঠুর দৃশ্য হল যখন কবি মুরলার সামনেই নলিনীকে প্রেমনিবেদন করছে। নলিনীর অপরূপ রূপরাশি দেখিয়ে কবি মুরলাকে বলছে,—

বল্ দেখি এত হাসি—এত মিষ্ট সুধারাশি,
হেন মুখ, হেন আঁখি দেখেছিস কোথা ?

মুরলা বলছে, এমন সুন্দরী সে আর কখনো দেখেনি। কবির প্রেমের যোগ্য পাত্রী এছাড়া আর কি হতে পারে !

কবিপ্রেমের এই নির্মম আলেখ্য-চেতনার শেষে চপলার কণ্ঠে গানের ভাষায় ভগ্নহৃদয়ের কবি বলছেন,—

জীবনের খেলা খেলিছে বিধাতা
আমরা তাহার খেলেনা,

খেলাই বাহুল্য, এখানে 'মায়ার খেলা'র আভাস ভেসে এসেছে।

৫ চার

ভগ্নহৃদয়ে মধুর দাম্পত্য প্রণয়, মৌল প্রেম ও চপল প্রেমের আলেখ্যগুলি হৃদয়ের আলো-আঁধারি লীলার রূপবৈচিত্র্য হিসাবে সুবিন্যস্ত কুশলতায় গ্রথিত হয়েছে। সপ্তম সর্গে অনিল ও ললিতার দাম্পত্য-প্রণয়ের কুঁড়িটি কি ভাবে ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে উঠেছে তারি বর্ণনার মধ্যে করা। অষ্টম সর্গে মুরলা ও চপলার কথোপকথনের মধ্য দিয়ে নলিনীর প্রতি কবির প্রেমাকর্ষণের কাহিনীটি বলা হয়েছে। চপলা ভাবছে নলিনীর প্রেমে আত্মহারা কবির দুর্গতির কথা চিন্তা করে চপলা বলছে :

শুনেছি সে জ্যোতি আলেয়ার চেয়ে
কপট, চপল নাকি,
পথিকের পথ ভুলাবারি তরে
জ্বলি উঠে থাকি থাকি।
শুনেছি সে সাদা, সারাটি জীবন
চড়িয়া পাষাণ-রথে,
চাকার দলিয়া চলিবারে চায়
হৃদয়-বিছানো পথে।
শুনেছি সে নাকি একটি একটি
হৃদয় গণিয়া রাখে,
কি কুক্ষণে আহা, কবি আমাদের
ভাল বাসিয়াছে তাকে !

চপলার এই কথায় ব্যথিত হয়ে মুরলা তাকে এমন করে বলতে নিষেধ জানালে। সখীকে সান্ত্বনা দেবার ছলে চপলা বলল, কমলার মুখে সে শুনেছে পাষাণহৃদয়া নলিনীও নাকি অবশেষে ভালোবেসেছে কবিকে।

নবম সর্গে এই কথাই নলিনীর গানে পরিস্ফুট হল। নলিনী গান গেয়ে সখীদের বলছে :

কি হল আমার ? বুঝিবা সজনি
হৃদয় হারিয়েছি।
প্রভাত-কিরণে সকাল বেলাতে
যবে লোহে সখি গোহিনু খেলাতে,
যবে কুড়াইতে, যবে ছড়াইতে,—
যবের মাঝারে খেলি বেড়াইতে,
যব-কুল দলি চলি বেড়াইতে,
সহসা সজনি, চেতনা পাইয়া
সহসা সজনি দেখিনু চাহিয়া,
রাশি রাশি ভাঙ্গা হৃদয় মাঝারে
হৃদয় হারিয়েছি।

কবির প্রতি নলিনীর নবোদ্গত এই প্রেমের আলোয় ভগ্নহৃদয়ের হৃদয়-বিদারক-নাট্য নবসন্ধিতে উপনীত হল।

(ক্রমশঃ)

কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

আব্দুল আজীজ আল্-আমান

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সেই জাতের যা কেবল উন্নত-শীর্ষ হ'য়ে আপনাকেই প্রকাশ করে না সাথে সাথে আড়াল করে অন্য সকলকে। তবুও এই সর্বগ্রাসী কবি-প্রতিভার মধ্যে জন্মগ্রহণ করে যে ক'জন আপন স্বরূপ-স্বাতন্ত্র্য ও কলাবিশুদ্ধতার জন্যে বিশেষ স্মরণীয় হ'য়ে আছেন তাঁদের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল এবং নজরুল প্রধান। এঁদের তিন জনেরই কবি-মানসে হ'য়েছিল তীব্রক দৃষ্টি-ভঙ্গীর ছায়াপাত। এক একজন পূর্বকালুগ দৃষ্টি-কোণ থেকে বাস্তবতাকে প্রত্যক্ষ করেছেন ফলে রচনায় বিভিন্নতা অনিবার্য হ'য়ে উঠেছে। কাব্য-রচনার প্রারম্ভিক উন্মাদনায়ই এক অভিনব বীর্য-দীপ্ত জীবন-জিজ্ঞাসা কবি ত্রয়ীকে করে তুলেছিল প্রশ্ন-চঞ্চল, দিয়েছিল সত্য ভাষণের ঐশ্বিলা স্পর্ধা। দুঃখবাদী যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কাব্যে এই স্পর্ধা অপূর্ব ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত হ'য়েছে।

রবীন্দ্রনাথের খেয়া-গীতাঞ্জলির আধ্যাত্মিকতার যুগে যতীন সেনগুপ্তের বাংলা কাব্যে প্রবেশ। কাব্য-জীবনের প্রথম হ'তে রবীন্দ্রনাথের এই আধ্যাত্মিকতামুখীন বাঙ্ময়ের কল্পনা-বিলাসের বিরুদ্ধে যতীন্দ্রনাথের মনে একটি সচেতন বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত হ'য়ে উঠেছিল। কেননা শিল্পক্ষেত্রে যখন চলেছে এমনি রোম্যান্টিক স্বপ্নরচনার প্রয়াস তখন সমাজে চলেছে অত্যাচার নির্যাতনের পাশবিক সমারোহ। অবশ্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দুন্দুভি তখনও বেজে ওঠেনি তবুও ধ্বান্তবৈভিক-বিলাস মত্ততায় সমাজ-জীবনের সর্বত্রই একটা বিক্ষোভ ঘনীভূত হ'য়ে উঠেছে, জীবন পথের আনাচে কানাচেই দেখা দিয়েছে প্রশ্ন-সংকুল কাটল-রেখা। একদিকে দৈনন্দিন জীবন যাত্রার এই ভাষণ-মুখী অবক্ষয় অন্যদিকে শিল্প সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মমুখী কল্পনা-বিলাস। সমাজ-সাহিত্যের সমকালীন এই গরমিল যতীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তিনি সহজেই বুঝে নিয়েছিলেন সমাজ ও সাহিত্যের মধ্যে বিরাট এক শূন্যতার সৃষ্টি হচ্ছে। সাহিত্য কেবল দুঃখ-সুখ তন্ময় মনের বিলাস-কেলির লীলাভূমি নয়—সম্মুখে যে কঠোর সংসার তার আবেদনকে কবি সাহিত্যিক এড়িয়ে যাবেন কোন সাহসে? কাব্য-রচনার প্রারম্ভিক লগ্নে এই প্রশ্নই যতীন্দ্রনাথের কবি-মানসে জিজ্ঞাসার জীবন্ত আলোড়ন এনেছিল।

তৎকালীন বাংলার ভাবন-মুখী গ্রামীন সমাজের সাথে অন্বয়লগ্ন থাকায় এই প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা তীব্রতম রূপে উঠে এসেছিল। কবির নিজের কথায় এই প্রশ্নচঞ্চল মনের সুন্দর রূপ ধরা পড়েছে। জমিদারী ঘাতিকে কবিকে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যেতে হতো। এবং "এই চলতে গিয়েই ত প্রত্যক্ষ করলাম বাংলা দেশকে। বাঙলা দেশের গ্রামকে। কি আনন্দে! এই বাংলার পল্লী সম্বন্ধে কতো কবিতা লিখেছি। ...নদীমাতৃক শস্য শ্যামলা বাংলার উল্লাস-মুখরিত বাংলা দেশ। এখানে রাশি রাশি ভাষা ভাষা ধান কাটা সারা হয়। বাঙলার বধূর বুক ভরা মধু ইত্যাদি আরো কতো ঐশ্বর্য আমি বর্ণনা করি। হায়! আমার ভাগ্য মন্দ। এর একটিও কী চোখে পড়লো? আমি তো দেখলাম ঠিক বিপরীত। নদী মাতৃক বাংলা দেশের নদী আজ মরে গেছে। খাল ডোবা যে দিকে তাকাই পানায় ভর্তি। শস্য-ক্ষেত্র খাঁ খাঁ করছে। চাষীরা সর্বহারা, নিঃস্ব, বোমা ফিরতি, শরণার্থী। আর বাঙলার বধূ—তাদের ছেলেমেয়ে ছেলেবেচাকে ফেলে ইজ্জত নিয়ে পালিয়ে বেঁচেছে। গ্রীষ্মের রাক্ষুসে দুপুরে উপরুক্ত প্রান্তর ঠাঁ ঠাঁ করতে থাকতো। আর এই নদীমাতৃক বাংলার বধূদের চোখেমুখে এক করুণ জ্বালার জন্য পরস্পর মারা-গরল বর্ষণ করতো। উপায় নেই তাদের। হয়তো স্বামীপুত্র মালেরিয়ায় ভুগছে। উনুনে বালি ফুটে যাচ্ছে।...চোখে পড়েনি শুধু বাংলার সেই কারারূপ।"

যতীন্দ্রনাথের কবি-মানসের স্বরূপ এবং জন্ম লগ্নের বলিষ্ঠ চিন্তার উন্মেষ ও স্বীকৃতিতে সুন্দরতর মহিমায় বাক্-বদ্ধ হয়েছে। একটু লক্ষ করলে আর একটি গভীরতর উপাদান আমরা এই উক্তিটির মধ্যে পাই—সেটি হলো রবীন্দ্রনাথের বাষ্পাকুল স্বপ্নবিলাসের বিরুদ্ধে যতীন্দ্রনাথের সচেতন আত্মার বলিষ্ঠ বিদ্রোহ। তিনি নিজস্ব স্বরে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন সাহিত্য যদি কোন বাস্তব ভিত্তিভূমিতে সুদৃঢ় না হতে পারে তাহলে তার পতন অনিবার্য। এবং এই রুমোহিত কেলি-বিলাস ও কোমল কল্পনায় জাতীয় জীবনের অন্তরাত্মা স্বপ্নলালনের নরম সুরে ঘরে নিরীর্যের অতল গহ্বরে আত্মাহুতি দেবে। তাই তিনি নটরাজের ভাবন-মুখী পর-পাতের দীপ্ত যোদ্ধার বাংলা সাহিত্যের মন্দির-বিচরণ কোমল বক্ষকে তীক্ষ্ণোজ্জ্বল করে তুলতে চাইলেন। দেখা দিল রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিরুদ্ধে তরুণ কবি কুলের বলিষ্ঠ বিদ্রোহ। এগিয়ে এলেন যতীন্দ্রনাথ মোহিতলাল, নজরুল। রুদ্ধ-বাণী যতীন্দ্রনাথের হাতে সহস্র চলা আধুনিক বাংলা কাব্যের প্রাণোৎকৃত, ভোগবাদী মোহিতলালের আপ্লুতিভঙ্গির পরিবর্তনায় উৎকুল্লতর হলো এ কাব্যের জয়-যাত্রা, বিদ্রোহী কবি নজরুল কাজী সাহেবের আগ্নেয় শপথ ও বহ্নিময় আত্ম-বিকাশে এ কাব্য আপন স্বরূপে পরিপূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠলো।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশক বাঙালীর পক্ষে জীবন-জিজ্ঞাসার যুগ। এই যুগে সব কিছুই চঞ্চল এবং প্রশ্ন-ব্যাকুল। স্বাভাবিক জীবন-ধারা নানান অভাব-অভিযোগে, বাধার-বেদনায়, অসন্তুষ্ট ও অশান্ত হয়ে উঠেছিল। যতীন্দ্রনাথের কবি-মানস প্রান্তিক চেতনে এই অসন্তুষ্ট প্রশ্ন-সংকুল আবেষ্টনীতে। অধ্যাপক রথীন্দ্রনাথ রায়ের ভাষায় যতীন্দ্রনাথের কবি-মানস-লালনের পরিচিতিকু সুন্দর রূপে বিধৃত হয়েছে : "নূতন জিজ্ঞাসা পুরাতন ভাবধারার বিরুদ্ধে ঘাতিয়ার সংগ্রহে যখন অতি ব্যগ্র, সেই সময় বিশ্বযুদ্ধের করাল সংকেত সমাজ ও সাহিত্যের গতিবেগকে পট পরিবর্তনের এক অভ্রান্ত নিশানা দিল। মধ্যবিত্ত জীবনের মর্ম সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হলো উনিশ শতকী ভাব জীবনের গতিবেগের "গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর" রূপান্তরিত হলো "মরুমায়া"র "মরীচিকা"র। যতীন্দ্রনাথের কবি মানসের জন্ম লগ্নে নব-জিজ্ঞাসার সেই প্রাথমিক অংগীকার নূতন প্রতিশ্রুতিতে স্বাক্ষরিত।"

বিশ্বযুদ্ধের করাল সংকেত সমাজ ও সাহিত্য জীবনে পট পরিবর্তনের সূচনা এনেছিল সত্য কিন্তু এই বিশ্ব-যুদ্ধের প্রভাব যতীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রধান হয়ে ওঠে নি, এমন কী মোহিতলালের মধ্যেও নয়। বিশ্বযুদ্ধের গরল-নির্যাস গ্রহণে তিনি স্বক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন তিনি কাজী নজরুল ইসলাম।

যতীন্দ্রনাথের কবি মানস গঠনে বিশ্বমহাযুদ্ধ তো বিশেষ কোন ছায়াপাত করতে পারেই নি—এমন কি মার্ক্সীয় মতবাদও নয়। কেননা যে সময় যতীন্দ্রনাথ কাব্য-রচনা করেন সে সময় বাংলায় মার্ক্সবাদের বিশেষ প্রসার

বটে নি। ব্যক্তিগত আলাপ-আচরণে অভিজ্ঞতার এবং বিভিন্ন প্রমাণ পরিচয় উদ্ধৃতি করে ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় যতীন্দ্রনাথকে গান্ধীবাদী বলেই ঘোষণা করেছেন। সুতরাং বিশ্বযুদ্ধ কিংবা মার্ক্সীয় মতবাদ নয় যতীন্দ্রনাথের অন্তর্যাত্রার সূত্র তাহিবতর পয়তাল্লিশটি জাগ্রত হয়েছিল ষোলশ শূন্য গ্রামের মেয়াদখাটা মানুষের অসহায় আর্তনাদে, বেদনা-ম্লান কৃষাণের তপ্ত নিঃশ্বাসে, অন্তহীন গৃহবন্দীর মর্মভেদী হাহাকারে। একটি সচেতন পর্যবেক্ষণ দৃষ্টিই তাঁকে করে তুলেছিল দুঃখবাদী, বিদ্রোহী।

॥ দুই ॥

ম্যাক্সীম গোর্কীর "মাদার"-এর তের বৎসর বয়স্ক কিশোর নায়ক বাঁধা ধরা পিতৃভক্তির পথ পরিত্যাগ করে যেমন একদিন সরল-রুচি হাতুড়িটি দিয়ে পিতার অন্যায়ের বিরুদ্ধে হাতুড়ী তুলে ধরেছিল তেমনি 'অলস রসে আবেশ বশে'-এর চিরপ্রাতন সম্ভোগ ও স্বপ্ন-বিলাসের পথ পরিত্যাগ করে যতীন্দ্রনাথ দুঃখের কণ্টকাকীর্ণ পথে পদচারণা করে সকলকে চমকিত করে দিয়েছিলেন। বাংলা কাব্য সাহিত্যে যতীন্দ্রনাথের আবির্ভাব তাই একটা প্রবল ব্যতিক্রম বলে ধরা যেতে পারে। কবি হিসেবে যতীন্দ্রনাথের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে তাঁর রচনাতে কোন আবরণ ছিল না, তাঁর চিন্তেও এতটুকু সংশয়ের স্থান ছিল না—তাঁর যা বলার তা তিনি দ্বিধাহীন অসংকোচ চিন্তেই প্রকাশ করতেন। কল্পনার মায়ালোকে তিনি অবশ্য ঘুরে বেড়ান নি—কিন্তু তাতেই তাঁর বক্তব্য মর্মভেদী হয়েছে। তাঁর কাব্যের আর একটি বিশেষ লক্ষণীয় দিক সুস্থ, সরল মানসিকতার প্রকাশ। কোন তত্ত্ব বা আদর্শের চাপে এ মনোবিকতা-বোধ রবীন্দ্র সুলভ অমৃত চেতনার পর্যবসিত হয় নি। অত্যন্ত স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ হয়ে পাঠকের গহন মনে স্পর্শ করেছে। সচেতন মনের এই শিল্প-কর্ম, বজ্র কঠোর দুঃখবাদের এই ছন্দিত রূপায়ণ—বাংলা কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে যতীন্দ্রনাথের এক বিরল মর্যাদা দান করেছে।

যতীন্দ্রনাথের কাব্যে এই যে দুর্লভ দুঃখবাদের প্রবর্তনা দেখি এ দুঃখবাদের স্বরূপ কী? যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ প্রচলিত দুঃখবাদের বিপরীত। প্রচলিত দুঃখবাদ হল জীবন ও জগতে বিতৃষ্ণ হয়ে পলায়নী মনোবৃত্তিরই নামান্তর। মায়াবাদীদের মত দুঃখবাদীরাও জগৎ ও জীবনকে বেদনা ব্যথার উৎস-ভূমি জেনে অনন্য সুন্দর সকল রূপ-রস শব্দ-স্পর্শ হতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে মুক্তির কল্প-সংকেতের অপেক্ষায় দিন গোণে। এ দুঃখবাদ একদিকে যেমন পলায়নবাদের পরিপোষক অন্য দিকে তেমন নেতিবাচক। 'না'-ই প্রচলিত দুঃখবাদের মূলমন্ত্র, 'কিছু নেই' এই সার মর্মই এ দুঃখবাদের মর্মমূল হতে ধ্বনিত হয়ে ওঠে। কিন্তু যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ পলায়নী মনোবৃত্তির পরিপোষক নয়—এ দুঃখবাদ পার্থিব-সৌন্দর্য ও জীবন রসকে গভীর ভাবে উপলব্ধি এবং আকণ্ঠ পান করার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ দুঃখবাদ বন্ধন পীড়িত জগৎ ও জীবনের মর্ম-বেদনায় নৈরাশ্য ক্রন্দন নয় জগৎ ও জীবনকে করাল-গ্রাস হতে বন্ধন মুক্ত করার আত্মা-পণব। তাই এ দুঃখবাদের অন্তরালে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত প্রবাহিত হয়েছে জীবন-রসের সঞ্জীবনী ধারা। কবি প্রাণের একটি গভীর ঐকান্তিকতা ও প্রবল অনুভূতি এ দুঃখবাদের অন্তর্মূল হতে সঞ্চার করে তাকে মহান ও ভয়াল-মাধুর্য-দীপ্ত করে তুলেছে।

চলমান জীবনে নৈর্ব্যক্তিক কর্ম-প্রবাহে যা দুঃখের বিপরীত দুঃখ বলেই প্রতীয়মান হয়—শিল্পের মহান পটভূমিতে তাই হয়ে ওঠে রস। এবং রস-সৃষ্টিই কবিতার প্রাণ। সুতরাং যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ নতুনতর রস-সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে। এই রসই আনন্দ-রূপে পাঠক চিত্তকে দুর্নিবার আবেগে দুলিয়েছে। এ প্রসঙ্গে মোহিতলালের মন্তব্য বিশেষ রূপে স্মরণ-যোগ্য। "সাধারণ জীব চেতনার বা অধ্যাত্ম দর্শনে দুঃখ যে বস্তুই হোক্, কাব্যে দুঃখ শুধু দুঃখই নয়, তাহা একটা রসও বটে। যদি তাহাই না হয়, তবে দুঃখের কবি বলিলে কোন অর্থই হয় না; যেমন দুঃখ কাব্য হয়ে ওঠে না, অতএব যতীন্দ্রনাথের এ দুঃখ একটি অনুভূতি রসেরই প্রকাশ ভেদ মাত্র।" ধর্মশাস্ত্রে অধ্যাত্ম-সাধনার বিভিন্ন পন্থার কথা উল্লিখিত হয়েছে—বন্ধু কিংবা সখা ভাবেও যেমন ভগবানকে উপাসনা করা যায় তেমনি শত্রু বা

বিরোধী হয়েও অধ্যাত্মিকতার সীমারেখা উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব। একদিকে আছে প্রেম বাধুর্য, ভক্তি ভালবাসার সুন্দরতর রূপ অন্যদিকে আছে ভয়াল ভীষণতার মাঝে শৈশবসুলভতা। যতীন্দ্রনাথের কাব্য এই শৈশবসুলভতার মাঝেই সরল ও নিরোগী হয়ে উঠেছে। শান্তভাবে ভজনা করে কবি বরণ করেছেন কবিতা-কুমারীর লাবণ্য দীপ্ত তনু মন। দুঃখবাদী যতীন্দ্রনাথের কবিতার সুন্দরতর সার্থকতা এখানে। যতীন্দ্রনাথের এই দুঃখের পথে পদচারণার, এই দুঃখবাদী হওয়ার মূলে যে কারণগুলি অন্তরাল হতে বেশ সক্রিয় করেছে সেগুলি সম্পর্কে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। কারণগুলির একটি হলো প্রাক মহাযুদ্ধের পটভূমিতে প্রশ্ন সংকুল ধ্বংসমুখী সমাজ জীবনের বিপর্যয় এবং অপরটি হলো তৎকালীন বিশ্বের বেদনা পীড়িত সমাজ চিত্রকে এড়িয়ে সমকালীন সাহিত্যের রোমান্টিকতার প্রতি প্রবণতা। সাহিত্যের পৃষ্ঠায় অঙ্কিত হয়েছে "হে মোর দেশ শ্যামল অ।"-এর উচ্ছ্বসিত অপূর্ব চিত্র কিন্তু পল্লীতে পল্লীতে প্রবল করে কবি দেখেছেন মরার সুরভির "বিষম ধূপ" শেকালী মালোর স্থলে "কণ্টক মালা" আর "রোগে বন্ধনে তাপে ক্রন্দনে" মলিন অশ্রুর ব্যর্থ হাহাকার। সাহিত্যের পৃষ্ঠায় এত বড় ভাঁকি কবি যতীন্দ্রনাথ সহ্য করতে পারেন নি—তাই তিনি নিদারুণ ভাবে হয়ে উঠেছিলেন দুঃখবাদী। দুঃখের মধ্য দিয়ে "জীবনের যথার্থ অনুরাগী এই কবি তাই জীবনের শত-দীপ্তি বহ্নি-জ্বালায় জ্বলেছেন—বক্রকটাক্ষের কুটিল ভ্রূ ভঙ্গীতে তাহাই অর্ধ-ঢাকা সাজিয়েছেন।"

কবির দুঃখবাদের কারণটি ভক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের ভাষায় সুন্দর হয়ে ফুটেছে। কবির প্রথম কাব্য "হরী চকা"র সূচনাকাল ১৩১০—তখন তিনি ভরা যৌবনে পদার্পণ করেছেন। কিন্তু ঠিক ভরা যৌবনেই দেখা গিয়েছে "তাঁহার তীব্র বিদ্রূপ-বিরক্তি এবং ভস্ম-ভূষণ রুক্ষ জটাধারী বিদ্রোহী মূর্তি"। জীবন জিজ্ঞাসার কঠোর তপের তাপে ইন্দ্রিয়গুলিকে তিনি যৌবনেই যেন শুষ্ক করিয়া আত্ম সংবরণ করিয়া লইয়াছিলেন, একটি সহজাত তীক্ষ্ণ ধ্যানদৃষ্টির মধ্যে সকল ইন্দ্রিয় বৃত্তি যেন আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। একদিকে অন্তর্বিহীন জীবন জিজ্ঞাসার উদগ্রতা—অন্যদিকে সত্যকার সমাধান লাভের ব্যর্থতা এবং তাহারই সঙ্গে চারিদিক হইতে শুধু সত্য শিব ও সুন্দরের নামে আত্ম-প্রবঞ্চনার আয়োজন ও প্রলোভন যৌবনেই কবিকে ক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছিল। ফলে বিশ্ব সংসারের 'রূপ'টাকে তিনি কোথাও উপভোগ করিতে পারিলেন না,—'বিরূপ'টাই তাঁহার কাছে বড় হইয়া উঠিল।" রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধের 'অসংখ্য বন্ধন মাঝে লভিব মুক্তির স্বাদ' বলে যখন রবীন্দ্রনাথ মুক্তি আস্বাদনে ব্যস্ত তখন যতীন্দ্রনাথ উদার অসীম নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে মুক্তি অনুভব করতে পারেন নি। অনুভব করতে তো পারেন নি বরং অসীম বন্ধন দ্বারা আকাশের মাঝেও দেখেছেন অসংখ্য বন্ধন :

চারিপাশে ঘেরা অসীমের বেড়া নীলের প্রাচের খাড়া
আলো আধারের গরাদে বসান অপার বিশ্ব-কারা।

নিখিল বিশ্বে কবি কোথাও মুক্তি দেখতে পাননি সর্বত্রই দেখেছেন অত্যাচার বিষাতনের মর্মন্তুদ দুঃখবাহন। কল্পনায় বুঁদ হয়ে সংকীর্ণ মশারির মধ্যে শয়ন করে মশারির আদি-অন্ত নেই বলতে তিনি রাজী নন :

অভাবের দাবো বাক্যের কীসে বুনে
বামুনী প্রেমের নেট মশারিটা টাঙিয়ে নে।
তার মাঝে শুয়ে বল মশারির নেই আদি
অনন্ত, অছেদ্য, অভেদ্য ইত্যাদি।

এমন মিথ্যা ভাষণ কবির পক্ষে কোন দিনই সম্ভব হয় নি। যাকে তিনি স্পষ্ট মিথ্যে বলে উপলব্ধি করেছেন, যাকে তিনি অসত্য বলে জেনেছেন—চোখ বন্ধ করে তাকে তিনি সত্য সুন্দরের প্রতীক বলেন কী করে? তাই তো অন্তর হ'তে বচন আহরণ করে 'অলস রসে আবেশ বশে' চিরাচরিত পথে পদচারণা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। তাই তো তিনি বাংলার অলস-লালস কোমল-রম্য ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন বহ্নি-দীপ্ত 'মরুশিখা'র।'

কবির দুঃখবাদের সুর যেমন সমকালীন কাব্যাদর্শ ও কাব্যরীতির বিরুদ্ধে ধ্বনিত হয়েছিল তেমনি এই দুঃখবাদ-বিদ্রোহ ধ্বনিত হয়েছিল সৃষ্টিকর্তা বিধাতা পুরুষের বিরুদ্ধেও। পূর্বেই বলেছি কবি ছিলেন

অপরাজেয় মানবতাবাদী। সৃষ্টিকর্তার হাতে সেই মানুষের নির্মম লাঞ্ছনা হতে দেখে কবির বুকেও জ্বলে উঠলো অনির্বাণ দীপশিখা। কবি লক্ষ্য করেছেন মানুষ আপন দুঃখ-দারিদ্র, আপন ব্যথা-বেদনার চার পাশে একটা কল্পিত সৃষ্টিকর্তাকে খাড়া করে তার পদপ্রান্তেই পরাভব স্বীকার করছে। এই কল্পিত সৃষ্টিকর্তার জন্যেই মানুষ আপন-স্বরূপে, আপন বীর্য-গরিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারছে না। এই অলীক স্রষ্টাই যেন মানুষকে করছে বেরূপগুহীন, প্রবঞ্চনা। বিধির বিধানকে তাই তো কবি আকুল আবেগে আহ্বান জানাতে পারেন নি—বিধির বিধান মাঝে যে মহাবন্ধন আছে তাতেই কবি পীড়িত, ব্যথিত :

কবি নহি আমি, কবিনি ছন্দে গ্রথিত
যে বিধি-বিধান প্রতিবিধানের অতীত।
আমি নহা বন্ধনে ব্যথিত।

এই যে তাঁক্ষ্ণ বাণী-বিন্যাস—এ তো কেবল বিধির বিধানের জন্যে কেবল ক্ষোভ প্রকাশ নয়—এ যে বিধির বিরুদ্ধে কবির সচেতন বিদ্রোহ ঘোষণা। কবি বলেছেন এই সৃষ্টির পিছনে যদি কোন সৃষ্টিকর্তা থাকেন তিনি অন্ধ এবং বধির; এবং তিনি কর্মকার জাতীয়। ব্যথা-বেদনার মাঝে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন গভীর মুক্তি, বেদনাকেই তিনি জীবনের সম্বল চেয়েছিলেন, 'বেদনায় ব্যথা দেবার তোমায় নিবিড় করে ধরিব হে' এই ছিলো কবির ঘোষণা। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ বেদনা বহ্নির মাঝে কোন গভীরতর মুক্তি খুঁজে পাননি। দুঃখের আকাশের মাঝে তিনি দেখেছেন সৃষ্টিকর্তার নির্মম পেষণ। 'লোহার ব্যথা' কবিতায় কর্মকারের (সৃষ্টিকর্তা) নিষ্ঠুর লোহার (সৃষ্টজীব) অন্তরভেদী ক্রন্দন অনল-অক্ষরে স্বাক্ষরিত হয়েছে :

ও ভাই কর্মকার!
রাত্রি সাক্ষী, তোমার উপরে দিলাম ধর্মভার,—
বহু গো বন্ধু কহ কানে কানে, আপনার প্রাণে বুঝি,
'আমি না থাকিলে ব্যথা যেত কিনা তোমার
দিনের পুঁজি?
তুমি না থাকিলে আমার বন্ধু কিবা হ'ত তাহে ক্ষতি?
কৃতজ্ঞতা কি পাঠাইছ তাই ব্যথিতের দারকাঠে।

এ প্রসঙ্গে গ্রন্থের পরিচয়লিপি লেখক মহাশয় বলেছেন :

"বিধাতার আত্মরতির তাগিদে তাঁহার এই বিশ্বলীলা,—যে বিশ্বলীলা সম্ভব হইয়াছে 'আমা'কে দিয়া; কিন্তু সে আত্মরতির লীলা পরিপূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই এই 'আমি' টি যদি সৌহ-যন্ত্রের নায় নিরন্তর সংসারের তাপে জ্বলিয়া জ্বলিয়া হাতুড়ির পিটানি দ্বারা কেবলই 'হইবা' উঠিতে না থাকে। লীলাময়ের অনাদি-লীলার শরিক হইয়া উঠিবার ইহাই পুরস্কার!"

কবির এই দুঃখবাদী বিদ্রোহের সুর প্রকৃতির বুকেও সঞ্চারিত হয়েছে। কবি মাত্রই প্রকৃতির পূজারী। প্রকৃতির অপরিসীম সৌন্দর্য-লীলা, বিপুল বৈচিত্র্য প্রত্যেক কবির কল্পনায় বেগ-সঞ্চার করেছে। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ ব্যতিক্রম। প্রকৃতির অবিমিশ্র সৌন্দর্যময়ী ও মাধুর্যময়ী মূর্তি কবির জীবনে বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি—তিনি প্রকৃতির কোমল রূপ না দেখে দেখেছেন তার রুদ্র-ভীষণ মূর্তি। প্রকৃতির এই উদাম বন্যরূপ তার 'রুক্ষ রুক্ষ-রুক্ষ' বিশিষ্ট ভাষায় প্রেরণা করিকে আকৃষ্ট করেছে বেশী। তবে প্রকৃতির প্রতি কবির আকর্ষণ যে আদৌ ছিল না তা' নয়, কিন্তু যতখানি ছিল অচেতনে আকর্ষণ ঠিক ততখানি ছিল সংসারের সচেতন বিকর্ষণ।' তিনি দেখেছিলেন প্রকৃতির মধ্যে তার নিত্য-বিধান অপেক্ষা অনিয়ম আচারের প্রাবল্য, শোভা সৌন্দর্য অপেক্ষা রুক্ষতা-ভীষণতার তীব্রতা। শেষ পর্যন্ত প্রকৃতির শেষের-রূপে মায়াময় কোমলতা অপেক্ষা গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নের খর-দীপ্ত-নির্মমতাই কবির দৃষ্টিতে সত্য হয়ে উঠেছিল। "মরুশিখা"র দুঃখবাদী কবিতায় তাই তো তিনি ঘোষণা করেছেন :

মিথ্যা প্রকৃতি, মিছে আনন্দ, মিথ্যা রঙিন সুখ;
সত্য সত্য সংসারে সত্য জীবের দুঃখ।

শ্রাবণ-নিশীথের বাদল-ধারা, শ্রাবণ-সন্ধ্যার মায়াঘন ঝিলিমিলি রবীন্দ্রনাথের মানস-কল্পনায় কতবার, কত ভঙ্গীতে, কত বিচিত্র ভাবেরই না উদয় হয়েছে। শ্রাবণের অবিরল বাদল-ধারার কখনো তিনি শুনেছেন মানুষের চিরন্তন বাণী, কখনো শুনেছেন পূরবীর সুর, কখনো পেয়েছেন সুধার-ধারা। কিন্তু যতীন্দ্রনাথের কাছে

প্রসঙ্গের দ্বারা 'ক্ষুব্ধ অন্তরের ক্রন্দন হৃদয়ের সান্ত্বনা গান' রূপে ধরা দিয়েছে।

শ্রাবণ-নিশীথের বজ্র-গর্জনের ঝুমটি কবির নিকট ধরা পড়েছে বনান্তরালের পাবক দ্বারা যামিনীর বিদ্রোহী গর্জন রূপে :

কান পেতে শোনো দেখি গহন-অরণ্যে কি
গর্জে পাবক-হারা যামিনী?

বিদ্যুৎ-ঝলকও তাঁর কাছে কোন তরুণীর লাবণ্য-শ্রী অপেক্ষা বাঁশ পাড়ার জঁহির পাড়ার—তা' বেদেনী মেয়ের বিদ্যুৎ যামিনীরই চকল কথা :

ও কোন বেদিনী মেয়ে অমন কাঁদুনি গেয়ে
গেলাইছে বিদ্যুৎ-নাগিনী।

প্রকৃতির হয় ঋতুর মধ্যে 'মধুর মধুরতি' শরৎ এবং 'কুঞ্জ-কুসুমিত' বসন্ত যতীন্দ্র-কবি মানসের যুদ্ধ-দ্বার-প্রান্ত হ'তে নিষ্ফলে ফিরে গেছে—যার ভেদ করে অন্তঃপুরে প্রবেশ করার ছাড়পত্র পেয়েছে একমাত্র গ্রীষ্ম এবং শীত। প্রথমেই বলেছি কবি রুদ্রের উপাসক, নির্মমতার পূজারী। গ্রীষ্ম ও শীত এই দুই কালেই প্রকৃতির নির্মমতা ও ভীষণতা উৎসবরূপে প্রকাশ পায়। গ্রীষ্ম আসে তার খর-রৌদ্র অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করতে করতে আর শীত আসে তার নির্মমতর পিঙ্গল জটাজাল নিয়ে। এই দুই চরম কাল তাই কবির আনন্দ-সহচর হ'তে পেরেছে।

সাহিত্যের মধ্যে আমরা প্রকৃতির দুটি রূপের সন্ধান পাই—একটি রূপের মধ্যে প্রকৃতি, প্রকৃতি থেকে আপন সৌন্দর্য সম্ভার ও মহিমাকে বিশিষ্টভাবে ব্যঞ্জিত করে দেয় অপর রূপে সে আর প্রকৃতি থাকে না—মানুষের দোসর হয়ে তার জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত হ'য়ে পড়ে। যতীন্দ্রনাথ মানুষের কবি—মানুষের কথা বাদ দিয়ে তিনি কোন দিন প্রকৃতি ক চিন্তা করতে পারেন নি। মানুষের ভালমন্দের পটভূমিতে প্রকৃতিকে বসিয়ে তিনি তার রূপ আস্বাদন করেছেন। বলাবাহুল্য এখানেও তিনি দেখেছেন মানুষের ওপর প্রকৃতির জান্তব হিংস্রতার নির্মমোজ্জ্বল রূপ। প্রকৃতি ছলে বলে কৌশলে সর্বদা মানুষের ওপর অত্যাচারের কাজেই লিপ্ত। প্রকৃতি মানুষের আরাধ্য, প্রকৃতি মানুষকে শিক্ষা দেয় এবং তার চরিত্র গঠন করে এ সব শুভো কথা যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন না। তাঁর মতে মানব সৃষ্টির দেয়া, প্রকৃতি তার অনেক নিম্নে। সুতরাং :

বাহিরের এই প্রকৃতির কাছে মানুষ শিখিবে কি বা?
মায়াবিনী ঘরে বিপদ যাত্রী করিছে রাত্রি দিবা।

অদীক স্রষ্টার যেমন মানুষের পরাভবের জন্য দায়ী, তেমনি প্রকৃতিও মানুষকে আত্মবিশ্বাস ও বীর্যবান হওয়ার পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সৃষ্টি করে। আপন প্রভাব দিয়ে প্রকৃতি সর্বদা নানা ভাবে-ব্যঞ্জনায় মানব-সমাজকে সেই অদীক স্রষ্টার অভিমুখে নিয়ে যায়। তাই কবি বলেন নিখিল বিশ্বটা যেন সেই অদীক স্রষ্টার ব্যবসা-ক্ষেত্র এবং প্রকৃতি তার বিজ্ঞাপন। সুতরাং প্রকৃতির মধ্যে যদি কিছু শিক্ষনীয় বিষয় থাকে তা' হলো জীবন-সংগ্রামে 'ছলে বলে কলে' দুর্বলকে ধ্বংস করে সেই স্তূপের ওপর সবলের আত্মনির্ভর প্রতিষ্ঠা। প্রকৃতির বিরুদ্ধে তাইতো কবির বাণী-বহ্নির প্রকাশ :

ছলে বলে কলে দুর্বল হেথা প্রবল অত্যাচার,
এ যদি সত্য হয় তবে ছাড়া, কারো চমৎকার!

যতীন্দ্রনাথ বলিষ্ঠ মানব-প্রেমিক কবি। এই নিতেজাল অটুট মানব প্রীতির জন্যেই তিনি হয়েছেন দুঃখবাদী, এবং ঠিক এই একই কারণে তিনি অবিশ্বাসী কবি। কোন ধর্মেই তাঁর আস্থা ছিল না কেন না তাঁর মতে 'ধর্ম হলো মানুষের দুর্বলতার পরম পরাজয়। আঘাতের পর আঘাতের দ্বারা মানুষ যদি তার মানুষরূপে সোজা দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে তবেই সে ধার্মিক হয়ে ওঠে—তখন সে চায় আত্মসমর্পণ।' এই আত্মসমর্পণের নিগূঢ় অর্থ হলো জীবনের সমুদয় বঠোর দায়িত্ব ও কর্তব্যকে এড়িয়ে যাওয়া। সুতরাং দুর্বল এবং ভীরু চিত্তই হলো ধর্মের সমরণক্ষেত্র। সৃষ্টি এবং ধর্মকে যারা নিখাদ সত্য-শিব-সুন্দরের প্রতীক বলে গ্রহণ করতে না পারলো তারাই হয়ে গেল অধার্মিক এবং অবিশ্বাসী। কিন্তু এই অধার্মিক ও অবিশ্বাসীর অপবাদে কবির দুঃখ নেই কেননা কবি জানেন 'শতকরা নিরানব্বই জন' তাঁরই দলে। নিয়ম-নীতিতে, প্রেম-ধর্মে সর্বত্র একটি সৌহার্দ্যের ও তোড়াতালি প্রধান হয়ে উঠেছে এবং এ ফাঁকি ধরা পড়লে দুষ্ট জীব নিরুপায় হয়ে তা প্রেম দিয়ে ঢাকতে চায় :

"বধূ", "শিশা"র খেজুর বাগানে', 'বাঁশির গান', "রূপসী"র 'পাহাড়ের পথে', 'কেতকী' প্রভৃতি কবিতায় বিভিন্ন দৃশ্যের উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। খেজুর গাছের কণ্ঠে মালি বসিয়ে তার যে স্বচ্ছ শোণিত 'রস' বার হয় তাই পান করে রসখোর, তাড়িখোরের বাড়ে উল্লাস :

রোদের এখানে খেজুর-বাগানে কেঁজে কেঁজে
নিশি ভোর ;
না জানি সেখানে ছেলে বুনে কোন রসখোর
তাড়িখোর ।

'হাসির এই যে রসখোর এবং তাড়িখোর সম্বন্ধে বাক্যাংশের সংক্ষেপ ও শব্দ চয়নচাতুরী লোকের মনস্তত্ত্বের সঙ্গেই যুক্ত—সেই রসখোর এবং তাড়িখোরের পূর্বাপরসঙ্গতির যে বিন্যাসে তাঁর সমস্তরূপ।'

'জাগরণ আলো' এবং 'সন্ধ্যাতারা' কবিতা দুটিতে শৈশব স্মৃতি কবিমানসে উজ্জ্বলভাবে সংযোজিত। 'ঈষৎ-আলোকে বিহার' করে' কোন এক অর্ধ-রাত্রি প্রদীপ-প্রজ্বালিত করিয়া দুটী আসন্ন হয় সোহাগে মুখোমুখি আসনে বসিয়া কোমল স্নিগ্ধ 'সকল' ভালবাসার প্রতি। সন্ধ্যাতারা সম্বন্ধে কবি তাঁর সর্বাভূতী কল্পনাকে ডানায় ডানায় চলে দেখা-হওয়া-মাত্রাতার কবির আশঙ্কা লিখে :

কত না সকাল ছিল তার কালে, কত কাল ছিল গত।
ফেরে- ফের ছিলে, কপালের কপালে লিখে ছিল
সেরাতন্ত্র।

ঘ্রাণ-সন্ধানের করে প্রাণ দাঁপা,—সেই-ত চরম সুখ,
কত জীবনের পরম স্বর্গ মিলন-মণ্ডিত বুক।

অনেকগুলি কবিতায় কবির এই শোষণ-বিরোধী দীপ্ত ঘোষণার বক্তব্যকে স্বাক্ষর। তাঁর নব নব স্বপ্নে জীবনেও যে নতুন চেতনা এসেছিল কবিতাগুলি সে চেতনারই অনন্য রূপায়ণ। বস্তুতঃ এই কবিতাগুলির মূল শিরে কবি-হৃদয়ের যে উত্তপ্ত নিঃশ্বাস অনুধাবন এবং ঐতিহাসিক মর্মপীড়ন যন্ত্র দীপ্ত ঘোষণায় আত্মপ্রকাশ করেছে তা' নয়া দুনিয়ার কবিদের পত্তনের প্রারম্ভিক নিশ্চয়ী বাণী। এসব কবিতা দুঃখবাদী কবির হৃদয়-জ্বালার বহ্নি দীপ্ত অভিজ্ঞান।

। চার ।

শ্যামল বাংলার কোমল বুকের 'রোমান্টিক আব-হাওয়ার এক বিশেষ গুণ আছে—সে আপনার আরক রসে ভুলিয়ে সবাইকে ঠিক আপনার মত করে ফেলে। কত জনই উত্তপ্ত দেহমনে অনির্বাণ বিদ্রোহী বহ্নি আপন ললাট পরে জ্বালিয়ে গভীর আস্ফালনে তার কোমল বুকে পদার্পণ করেছে কিন্তু সে বহ্নি-বহ্নি শেষ পর্যন্ত দীপা মেয়ের মত নির্মল হয়ে উঠেছে। তুষারাচ্ছাদিত বাংলার মৃত্তিকার কোমল-স্পর্শে শেষ পর্যন্ত সকলেই আপন ঘেরোত্তাপ হারিয়ে স্নিগ্ধ-শীতল হয়ে পড়েছে। এই জন্যেই শৌর্য-বীর্যের আদিম প্রতীক চণ্ডি মঙ্গলাগারের বীরোদ্ধত মস্তক নামিয়ে পড়েছে মনসা দেবীর চরণ তলে, বিদ্রোহী কালাপাহাড় নজরুলও শেষ পর্যন্ত আপন 'বিদ্রোহী সত্তার দীপ্ত-প্রোজ্জ্বল 'ইসরাফিলের সিঙ্গা' ভুলে 'মরুভূমি মুরালী'তে ভুলাইন আমির তান, প্রলয়বাদী রুদ্রবীণাও যৌবনোত্তর মনে প্রেমের ঝঙ্কার হারিয়ে "রঙ্গমাতা"র মরীচিকার বক্ষ বিদীর্ণ করে মরুদ্যানে ফিরে এসেছেন পদ্মা তীরের জীবন ভালোবাসা মানুষের কাছে। তাঁর হৃদয়োত্তাপের শিথিলতা লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে 'সাতাশ' কাব্য গ্রন্থে—অবশ্য "রঙ্গমাতা" কাব্য গ্রন্থই যার তীক্ষ্ণ আপাতঃ-বিদ্রোহের অন্তরাল টেনে আর একটি কোমল মনে অন্তরঙ্গ রাগিণীতে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছে। "রবীন্দ্রিকা"র 'বেহালা' কবিতায় এই সুরে পরিবর্তনের আভাসটি ধরা পড়েছে :

আমি রোদের কোন্ জীবনে,
দূর অতীতের কোন্ ভুবনে,
ছিলাম কোন গুণীর হাতের বেহালা।
অন্ধকারের কান্না হাসি,
মুখে যে বোল উঠ্‌ছে ভাসি—
এ বুঝি সেই পূর্ব জনমের বেহালা।

এ কবিতাকে রোমান্স-রাজ্যের রাজপুত্র রবীন্দ্রনাথের বলতে অস্বীকার করবে কে?

'চৈতালী' রবীন্দ্রনাথের এই সুর পরিবর্তনকে ভাষার শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় কবির স্বধর্ম চ্যুতি না বলে বলেছেন এই পরিবর্তন কবি-মানসের ক্রম-পরিণতি। এই পরিবর্তন যদি রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে লক্ষণীয় হয়ে না উঠতো তা' হলে শিল্পী হিসেবে তাঁর মৃত্যু হতো প্রথম তিনখানা কাব্যগ্রন্থ রচনার পরই। কেননা এই সুর পরিবর্তন না হলে প্রথম তিনখানি কাব্যগ্রন্থের ভাব, ভাষা, ছন্দ পরবর্তী কাব্য গুলিতে লক্ষণীয় হয়ে উঠতো ফলে তা' চর্বিত-

চরণ ছাড়া আর কিছুই হ'তো না। তাই এই সুরে পরিবর্তন কবির পক্ষে মঙ্গলের। এই পরিবর্তনই কবির মনদিগন্তে নতুন সৃষ্টির উৎস-দুয়ার খুলে দিয়েছে। যতীন্দ্রনাথের কাব্যেও এই সুরে পরিবর্তন বার বার বিভিন্ন ভাবে সংঘটিত হয়েছে। বার বার ঋতু-পরিবর্তনের মাঝেই রবীন্দ্র-কাব্য বিরল সৌন্দর্যের লীলা-কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। 'মেঘনাদ বধ' কাব্য রচনার অত্যাশ্চর্য সাফল্যের পর কবির বন্ধু-বান্ধব তাঁকে আর একটি বীর রসাশ্রিত কাব্য রচনার জন্যে বার বার অনুরোধ করেন কিন্তু মাইকেল মধুসূদন দত্ত সবাইকে জানালেন 'A fresh attempt would be something like a repetition'—সুতরাং সবাইকে চমকিত করে তিনি লিখলেন 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য'। মধুসূদনের কবি মনের সুর পরিবর্তন দুঃখের দাবদাহে ঝলসিত কবি যতীন্দ্রনাথের পক্ষে মঙ্গলপ্রসূ হয়েছে।

এখন এই সুরে পরিবর্তন কী এবং কিসের তা যতীন্দ্রনাথের যৌবনোত্তর কাব্যগুলি হতে আমরা নির্ণয় করার চেষ্টা করবো। মোটামুটি ভাবে এই পরিবর্তন সূচিত হয়েছে তিন দিক থেকে—প্রকৃতি সম্পর্কে, প্রেম সম্পর্কে এবং রোমান্টিকতা সম্পর্কে।

প্রথম যৌবনের কবিতাগুলিতে আমরা দেখে এসেছি প্রকৃতিকে অসীক দ্রষ্টার বিজ্ঞাপন বলে কবি যতীন্দ্রনাথ বার বার তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। মানব শিশুর সমস্ত সৌর্য-বীর্য প্রকৃতি হরণ করে মানবের স্বাবলম্বী হওয়ার পথে প্রকৃতি যেন মস্ত বড় বাধা। সুতরাং এ প্রকৃতি কখনো মানুষের বন্ধু হতে পারে না। কিন্তু যতীন্দ্রনাথের উত্তর কাব্যে এই দৃষ্টিভঙ্গীর বিশেষ পরিবর্তন ঘটেছে। যৌবনোত্তর কাব্যগুলিতে বিশ্ব প্রকৃতির অত্যন্ত সহজ ও করুণ সুন্দর অভিব্যক্তি সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'আষাঢ়-মধ্যাহ্ন' কবিতায় পাই কবির একটি আস্বাদন মধুর রূপ মুগ্ধ মনের পরিচয়—যে অসীম নীল আকাশ একদিন কবির কাছে কারাগার হয়ে উঠেছিল আজ সেই অসীমের উদারতায় কবি দৃষ্টি হারিয়ে ফেলেছেন। প্রকৃতি এখানে কবির অন্তরঙ্গ বন্ধু :

তপ্ত দেহ, ঘুম ঘন, নিবিড় নীল গগন, বাতায়নে
লৌহ-গণ্ড-সারি,
মাঠ-পরে মাঠ শুধু আষাঢ়েও করে ধূ ধূ।
হে সুন্দর, হে বন্ধু আমারি!
। আষাঢ়-মধ্যাহ্নঃ সায়ম্ ।

এখানে নিষ্প্রাণ আষাঢ়-মধ্যাহ্নের বিরল সৌন্দর্য কবির রূপ দৃষ্টিতে অনন্য সুন্দর হয়ে উঠেছে। এ প্রকৃতি সুন্দর, এ প্রকৃতি মনোহর, এ প্রকৃতি কবির চির-আরাধ্য।

প্রথম জীবনে কবির অবচেতন মনে প্রকৃতির ওপর যতটা আকর্ষণ ছিল সচেতন মনে ছিল তদপেক্ষা বহু গুণ বেশী বিকর্ষণ। কাব্য জীবনের উষা-লগ্নে প্রকৃতি সম্বন্ধে কবির দৃষ্টি ভঙ্গী অবিশ্বাস ও বিদ্রূপতায় পর্যবসিত। জীবনকে তীর্যক দৃষ্টি ভঙ্গীতে দেখার কবির প্রথম জীবনে সমগ্র অন্তর্লোক ব্যাপী অভিমান-বিষ্কার-বেদনা ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল এবং সেই ঘনীভূত বেদনাবোধই প্রকৃতি সম্বন্ধে কবির স্বচ্ছ দৃষ্টিতে স্বাচ্ছন্ন করেছিল। তাই অসীম প্রকৃতির প্রতি ছত্রে ছত্রে যে দুর্লভ রোমান্টিকতার সুর এবং মঙ্গলের বাণী উচ্চারিত তা কবির শ্রুতিপথে বিস্তৃত হয় নি; কিন্তু কবির উত্তর কাব্যে এই সুর সুন্দর হয়ে ধরা পড়েছে। তাই প্রথম জীবনে যিনি 'শাওন-রাতি'তে মেঘের গুরু গুরু ডাকে শুনেছিলেন শাবক হারা বাঘিনীর গর্জন, বিদ্যুৎ-ঝিলিকে দেখেছিলেন নাগিনীর নৃত্য "শাওন"-এ সেই কবিই শ্রাবণের অবিরল ধারা-পাতনে শুনেছেন পথহারা বৈরাগীর একতারার গান, বিদ্যুৎ ঝিলিকে দেখেছেন মোহিনীর ঘোমটার ফাঁকে ফাঁকে একটুকরো হাসি :

শাওন এল ওই
হৈ হৈ শাওন এল ওই।
পথহারা বৈরাগী রে তোর
একতারাটা কই?
হৈ হৈ শাওন এল ওই।
শাওন গাঙের ভাঙন বেয়ে
ঘট্ ভরি কাঁখে
কোন বিজলী ডেকে গেল

ঘোমটারি কাঁকে।
ঐ যে শাওন এল ওই।

প্রকৃতির ছয় ঋতুচক্রের মধ্যে কেবল মাত্র দুই চরম ভাবাপন্ন ঋতু—গ্রীষ্ম ও শীত—প্রথম যৌবনে কবির দৃষ্টিকে আকর্ষণ করেছিল। বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, বসন্ত বার বার বিচিত্র রূপে কিছু এসেছে কবির কল্পনালোকে চাকতে। রূপসৃষ্টে তো তিনি বার বার উপেক্ষা করেছেন, তাই তো তিন পাতা এই বসন্ত রূপ-ভাস্কর কবিকে তাঁর রেখে যেতে পারেনি কিন্তু ঈশ্বর প্রদত্ত বসন্তের জন্যে ব্যাকুলতা তীব্র ভাবে রয়ে গিয়েছে। রূপ পাগল পরিবেশের মত বসন্তের রঙ্গ রসের লোলাপী বিলের রূপ রূপে আবেগে প্রাণের জন্য কবির অন্তরাত্মা এক সাড়ম্বরে মুক্তির জন্য উঠেছে। ফাল্গুনের রোমাঞ্চ কণ্টক বিলের কিশোর মনের চেতনার জন্যে তাই তো কবির উৎকণ্ঠার অবধি নেই :

ছাড়ে ধরা পাণ্ডু চুল
বিশাখার ফাল্গুনে,—কত দূর?
সাতটীক্ষ্ণ নারাকাশাতে তার
কুহু বলি চমকি উঠিছে কোন্
বেদনা বিধুর
দক্ষিণ সমুদ্রগামী দীপান্তের সুর!

। চির ভূমি : নিশাথা।

যে শীত একদিন রিক্ত সন্ন্যাসীর মত শিল্প-ঐশ্বর্যকাল নিয়ে সৌন্দর্যপ্রী কবির চোখের সামনাকে বেশ সঞ্চার করেছিল—সেই শীতকে উপেক্ষার জন্য আজ কবির মন ব্যাকুল। যৌবনের রক্তোত্তাপ চলে গেছে—কবি আজ ভুহিন কাতর :

এত শীত—
আমার অন্তরে এত শীত!
অকূল ভবিষ্য আর অনাদি অতীত
দুই হিমসাগরের ক্ষীণ ব্যবধান
এই মোর বর্তমান
অবলুপ্ত,—
চিরান্তর যোজক প্রয়াস।

যে প্রীষ্মের মধ্যাহ্ন-সূর্যের তেজোদৃপ্ত একদিন যৌবন-দীপ্ত কবির বলিষ্ঠ প্রতিবাদের তীক্ষ্ণাগ্র হাতিয়ার হয়ে উঠেছিলো সেই রহি জ্বালা আজ কবির কাছে দুঃসহ :

বিদায় হল যে যে সুদূরসহ
যে মোর ভ্রমর বেলার রঙ্গ
বন্ধ এ বুকে পাখা, ভাষি আনো
পল্লবের গন্ধবহ।

। ভ্রমর : সাগর।

আজ আর নিদাঘের তেজোদৃপ্ত নয়, শীতের তুহীন কাতর নিস্তব্ধ পরিবেশও নয়—কবির আজ একান্ত প্রয়োজন পল্লবের গন্ধবহ। কবিমন আজ রূপপিপাসার তীব্রতম আবর্তণে আলোড়িত বিক্ষুব্ধ। বসন্তের রূপ-উচ্ছল পুষ্প-প্রণয়কে উপেক্ষার জন্যে আজ কবিমন বেদনা-ম্লান, বর্ষার সজল মেঘমালার আহ্বানকে এড়িয়ে আসার জন্যে আজ কবি-মানস বেদনা-বিধুর হয়ে উঠেছে। যৌবনোত্তীর্ণ জীবনের প্রৌঢ়-সন্ধ্যায় কবি-মনের উপলখণ্ডে আজ অপরাহ্নিক ছায়াচ্ছন্নতার মধুর-কোমল আবেশ সুন্দর হয়ে উঠেছে। গ্রীষ্ম নয়, শীত নয়—হেমন্ত সন্ধ্যার স্বপ্নঘন পেলব-মসৃণ মিলি-মিলিতে কবি এক সুদূর সুন্দরের ধ্যানে মগ্ন :

বসন্তে উপেক্ষিনু ফুলে ফুলে মিনতি
বর্ষার মেঘে মেঘে আহ্বান,
হেমন্ত সন্ধ্যায় মাঠে মাঠে মন ধায়
কোন সুদূরে কবি সন্ধান।
হেমন্ত সন্ধ্যার বন্ধু!

। হেমন্ত সন্ধ্যায় : নিশাথা।

এখানে কেবল একটি রূপপাগল পথিকের রূপ-ব্যাকুলতা নয়-একটি অনন্য-সুন্দর দুর্লভ চিত্র আপন গরিমায় মন্ত্র-মনোহর হয়ে উঠেছে। এখানে কবি মানস সম্পূর্ণ রোমান্টিকতার অনুরাগী। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির মধ্য দিয়ে আজীবন এই সুন্দরের ধ্যানই করেছেন। যে কবি একদিন প্রকৃতির মধ্যে দেখেছেন দলন্ত বন্ধন, অনুভব করেছেন অমঙ্গলের লক্ষ চিহ্ন, যে অমঙ্গল-সংকেত এবং বন্ধন-ব্যূহ বিদীর্ণ করার জন্য ছিল কবির অতন্দ্র প্রয়াস—আশ্চর্য, আজ সেই কবিই প্রকৃতির লক্ষ কোটি বন্ধনকে মন্ত্র-মন্থরে বরণ করার জন্যে আবেগ-ব্যাকুল, প্রকৃতির মাঝেই আজ তিনি দেখেছেন সুন্দরের রূপ-মূর্তি, মঙ্গলের রূপ-প্রবাহ। প্রথম জীবনে বসন্তে, বর্ষায়

সুন্দরের মরুরতর আহ্বান নির্মম রুক্ষতার ও যৌবন-দীপ্তির রুক্ষতার প্রত্যাখ্যানের পর আজ হেমন্ত-সন্ধ্যার কোমল-বক্ষের বুশাল্পনার মাঝে মহান-সুন্দরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ার এ কী দুর্বার আকাঙ্ক্ষা! প্রকৃতি সম্বন্ধে কবির মানস পরিবর্তন এখানে সুন্দর হয়ে ধরা পড়েছে।

হেমন্ত সন্ধ্যার গোধূলি-লগ্নে কবি অস্পষ্ট ভাবে যে সুন্দরের সন্ধান পেয়েছেন সে সুন্দরের সবটুকু আপন হৃদয়-দেউলে গ্রহণ করার জন্যে কবি ব্যাকুল। শেষের দিকে প্রেম যৌবনের নিষ্ঠুরতার জন্যে তীব্র অনুশোচনা ও অপরিসীম বেদনাবোধ কবি কণ্ঠে আকুল আবেগে ভেঙে পড়েছে। প্রকৃতি সম্পর্কে প্রথম যৌবনের এই নির্মম ব্যবহার কবির নিকটেও বেদনাবহ হয়ে উঠেছে। তাই তো তিনি নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করেছেন :

শুধা শ্যামল সজল বনের হরিণী তুমি,
কবে কি কারণে করিলে বরণ ধূসর উষর এ মরুভূমি?

আজ আর ঘর দীপ্ত মরুভূমির বহ্নি দাহন নয়—শস্য-শ্যামল সজল বনের স্নিগ্ধ ছায়াই কবির কাম্য। প্রথম জীবনে কবির নিকট প্রকৃতি উদ্ধত, অমঙ্গল প্রতীক, অসুন্দর আর আজ শান্ত, মঙ্গলময়ী, মধুর। এই রুক্ষ হতে অরুক্ষে, অমঙ্গল হতে মঙ্গলে, অসুন্দর হতে সুন্দরে উত্তীর্ণ হওয়ার মর্মমূলেই নিহিত রয়েছে প্রকৃতি সম্বন্ধে কবির মানস পরিবর্তনের সুস্পষ্ট পরিণতি।

। পাঁচ ।

জীবনের উষা লগ্নে কবির কাছে প্রধান হয়ে উঠেছিল জড়ের আবেদন। চেতনা ও জড়ের মধ্যে তিনি জড়কেই প্রধান করে দেখেছিলেন। তাই প্রথম জীবনে তিনি যেমন দুঃখবাদী তেমনি জড়বাদীও। বস্তুতঃ তাঁর দুঃখবাদ এই জড়বাদ হতেই উৎপন্ন। দুঃখবাদ জড়বাদেরই রূপকল্পের মাত্র। চেতনার ধ্বংস শ্মশানে জড়ের নৃত্য স্পন্দন কবির কাছে সত্য হয়ে উঠেছিল বলেই কবির কাছে প্রেমের বিশেষ কোন মূল্য ছিল না। প্রেমের স্মৃতিকাগার চেতনা। প্রথম জীবনে এই চেতনা কবির নিকট মিথ্যে হয়ে ওঠায় প্রেমের আবেদনও মিথ্যে হয়ে উঠেছিল। তাই তিনি ঘোষণা করেছিলেন 'প্রেম বলে কিছু নাই।' কিন্তু 'সায়ম্' কাব্য গ্রন্থ হতে কবির এই জড়বাদী দৃষ্টি ভঙ্গীর মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে। প্রথম জীবনে তাঁর মনে হয়েছিল জড় হতেই চেতনের উদ্ভব এবং জড়ের বুকেই চেতনের লয় কিন্তু যৌবনোত্তর যুগে তাঁর মনে হয়েছে জড় চেতনের ভগ্নাংশ মাত্র, চেতনের বুকেই রচিত হয় জড়ের শ্মশান চিতা। সুতরাং উত্তর কালে কবির কাছে এই প্রেমের স্বরূপ উদ্ঘাটন হয়ে ওঠার নিয়তির মত অনিবার্য কারণে শত বর্ণ রাগে প্রেমও বিকশিত হয়ে উঠেছে। 'সায়ম্' কাব্য গ্রন্থ হতে তাই তো তিনি আর প্রেমকে অস্বীকার করতে পারেন নি। বরং প্রেম তার সুকোমল অনুভূতির সাথে সমুদয় সৌন্দর্য ও মাধুর্যের আরতি আপনার কবির চিত্তকে প্রেম ব্যাকুল করে তুলেছে। তাই আপাতঃ রুক্ষতার অন্তরালে যে রূপ পিপাসা চাপা ছিল প্রৌঢ় জীবনে সেই রূপ পিপাসা প্রবলতর আকার ধারণ করেছে। এই রূপ পিপাসার অভ্যন্তরলোকে তিনি অবলোকন করলেন সুন্দরের জ্যোতির্ময় মূর্তি। যতীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতা এই সুন্দরের মহান প্রতিষ্ঠায় বর্ণোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

প্রেমের কবিতায় এই সুন্দরের মহান প্রতিষ্ঠা ছাড়াও আর একটি বিশেষ লক্ষণীয় দিক হলো এই কবিতা-গুলির স্মৃতিধর্মিতা। যৌবনে প্রেমকে অস্বীকার করায় যৌবন রাগে রঙীন হয়ে সজীব ও জীবন্ত রূপে প্রেম কবির কাছে ধরা দেয় নি—ধরা দিয়েছে স্মৃতিরূপে। স্মৃতি-রূপের সুরভিতেই কবি উপলব্ধি করেছেন প্রেম মৃগনাভির স্বর্গীয় বৈভব। সুতরাং কবির প্রেম কবিতার একপ্রান্তে আছে স্মৃতির স্পর্শ অন্য কোটিতে আছে প্রৌঢ়ত্বের ম্লানতা। কবিতাগুলিতে প্রৌঢ়ত্বের স্পর্শ আছে বলেই যৌবন ধর্মী প্রেম কবিতার অসাধারণ উজ্জ্বলতা এবং সীমাতিক্রমী আতিশয্য হতে এসব কবিতা মুক্ত। কবিতাগুলি একদিকে যেমন আতিশয্যহীন সহজ সুন্দর অন্যদিকে তেমনি সংহত সুকুমার। এবং স্মৃতির ভিতর দিয়ে কবি প্রেমকে আস্বাদন করেছেন বলেই যোবহর্ষ একটি করুণ বেদনার সুর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। কোন কোন কবিতায় যৌবনের নির্মম

আচরণের জন্যে তীব্র অনুশোচনাও লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথের 'পূরবী' কাব্যের প্রেম বিষয়ী কবিতাগুলিও স্মৃতি আশ্রয়ী কিন্তু সেখানে অনুশোচনার এমন তীব্র দাহন নেই। কিন্তু যতীন্দ্রনাথের প্রেম কবিতায় এই তীব্র বেদনাবোধ ও অনুশোচনাই প্রধান হয়ে উঠেছে :

নিবানো দীপের ব্যথা হয়ে জমা
যার দুটি আঁখি হল নিরুপমা,
ধরা পাপক্ষির মিতি নিবেদন
তাহার ওষ্ঠা ধরে।

কিংবা :

দাঁড়াইয়া আজি জীবন সীমায়
তনয় তনয়া অনু সুষমায়
হেরি নব বেশে
তব কল্যাণ রূপ,
ভাবা মন্দিরে দীপ শিখা ঘিরে
আরতি গন্ধ ধূপ।

। প্রত্যাবর্তন : ত্রিযামা ।

'ত্রিযামা' কবির জীবন সায়াহ্নের গোধূলি লগ্নের কবিতা গ্রন্থ। স্মৃতি মধুর কল্পনা রঙীন দিনগুলির সাথে কবির হৃদয়ভেদী একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস সংযুক্ত হয়ে অধিকাংশ কবিকে বেদনা বিধুর করে তুলেছে। যে বলিষ্ঠ প্রেম সুষমাকে তিনি যৌবনে করেছেন অস্বীকার আজ বার্ধক্যের দীর্ঘ নিশ্বাসে কবি তাকেই অর্চনা করেছেন মনে প্রাণে :

তোমায় যৌবন সেজে
তুমি আমি আছি বেঁচে
এ বড় বিস্ময় ;
আজি ওই তনু মন
কামনাহীন বৃন্দাবন
শুধু স্মৃতিময়।

। পলাশ ভস্ম : ত্রিযামা ।

বহু অস্বীকৃত প্রেমকে কবি নতুনতর মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছে যৌবনোত্তর যুগে। প্রেমে আজ কবি গভীর বিশ্বাসী। জীবন ব্যাপী আজ কেবল প্রেমেরই বস্ত্রোচ্চারণ। মন্ত্র তন্ত্র কিংবা ধর্মাচরণ কোন কিছুরই প্রয়োজন নেই—তাঁর মুক্তি প্রেমের ভিতর দিয়ে এবং সে প্রেমের দীক্ষা তিনি গ্রহণ করেছেন প্রিয়ার নিকটে :

হে আমার জ্যোতি, হে আমার সতী,
গৃহিনী সচিব সখী হে প্রিয়া,
যে মন্ত্র তুমি কহ কানে কানে
আমার মুক্তি তাহাই দিয়া।

প্রেমাসক্তি জীবনাসক্তিতে এবং জীবনাসক্তি শেষ পর্যন্ত দেহাসক্তিতেও পর্যবসিত হয়েছিল—কবির কতক-গুলি কবিতায় এই দেহাসক্তির কথা প্রকাশিত হয়েছে। 'সায়ন্' কাব্য গ্রন্থে "রংপুর স্টেশন" কবিতাটির মর্মমূলে স্পন্দিত হয়েছে এই দেহাসক্তির কথা :

তবু দূরে হবে ছাড়াছাড়ি
এই যে জীবন রাতি
ক্ষীণ দীপ জ্বালি
কাটাই দুজনে—
দুহু কোড়ে দুহু কাঁদি বিচ্ছেদ ভাবিয়া,
ও রজনী হবে ভোর।

কয়েকটি প্রেম কবিতায় লঘু চাপল্য এবং হাস্য-রসিকতা স্থান পেয়েছে—প্রৌঢ় গৃহিনীর সঙ্গে প্রৌঢ় গৃহীর কথাবার্তায় হাস্য কৌতুকের সুন্দর ব্যঞ্জনা ধরা পড়েছে। "ত্রিযামা"-র "প্রেম ও কবিতা" র মধ্যে :

কামেলা এড়াতে সতী তুমি নাকি সম্মতি
বিয়ের করিতে বাসা ভিন্ন,
কিছু কিছু খোরাকীর আশা পেলে সে নাকি
এখনি বাঁধন করে ছিন্ন।

কিন্তু এই তরল পরিহাস সুরে যতীন্দ্রনাথের প্রেম কবিতার মর্মমূল ধ্বংসিত হয় নি, এখানে প্রেম কবিতার সার্থকতা নয়—এই তরল পরিহাসের খণ্ড ভূমি অতিক্রম করে কবির প্রেম কবিতার অনুরণন দূর দিগন্তে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। বিরহের মাঝেই কবি প্রেমের গভীরতর রূপ দেখেছেন। কালিদাস যে নির্বাসিত প্রেমের গান গেয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ আজীবন ব্যাপী যে বিরহ বিধুর যুগল প্রেমের বন্দনায় সরব কবি যতীন্দ্রনাথও সেই প্রেমের দুর্লভ স্পর্শে মহিমান্বিত হতে চেয়েছেন :

দুর্লভ কর বন্ধু আমার
দুর্লভ কর হে,

অপরিচয়ের বিস্মৃতি পার
কর অতি ধন্য তারে আমার,
ধবনীল রাগে নবীন বিরহে
দুর্লভতর হে।

এইখানেই যতীন্দ্রনাথের স্মৃতি-মন্থর প্রৌঢ় প্রেম নিবেদনের সামগ্রিক সার্থকতা।

। ছয় ।

যে কারণে যতীন্দ্রনাথ প্রেম ও প্রকৃতিকে মানুষের হিতাকাঙ্ক্ষী রূপে গ্রহণ করতে পারেন নি—সেই কারণেই তিনি রোমান্টিকতাকেও আপন গহন হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসনে বসাতে পারেন নি। তাঁর বিশ্বাস ছিল কবিতায় রোমান্টিকতার আতিশয্য মানব কুলের বলিষ্ঠ চরিত্র গঠনের সহায়ক নয়—অর্থাৎ শূন্যগর্ভ বাষ্পাকুলতা আত্মবঞ্চনারই নামান্তর। এই আত্মপ্রবঞ্চনার কথা তিনি ঘোষণা করেছেন 'সায়ম' এর 'রবি প্রণাম' কবিতায় :

শূন্য মুখে বাষ্পভরা,
বারংবার ঘুরে মরা
বিবিবদ্ধ আহিকে বাধিকে।
এই পূজারতি মাঝে
এ দীপ লাগে যে কাজে
তাহে বন্ধু না পাই সান্ত্বনা,
যত জ্বালি মনে হয়
জ্বালায় এ অপব্যয়
কেবলই ত আপনা বঞ্চনা।

। রবি প্রণাম : সায়ম্ ।

দূর অদীমলোক থেকে যে অজানা বার বার রবীন্দ্রনাথকে ডাকিয়েছে, কাঁদিয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত ফাঁকি দিয়েছে—এমন অজানা রহস্যের পিছনে যতীন্দ্রনাথ কোন দিনই ফেরেন নি। যতীন্দ্রনাথের মতে এই অজানা রহস্য অলীক স্বপ্ন মাত্র—এর কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। অজানার উন্মাদনা নয় 'সম্বুখেতে যে কষ্টের সংসার' সেটাই আসল সত্য। তাই যাঁরা অজানা রহস্যের পিছনে উন্মাদ হয়ে ফেরেন—ওড়ার আবেগে তাঁদের দেহটা পিছনে পড়ে থাকে কিনা কবি স্নেহ-পূর্ণ কণ্ঠে সেটা দেখে নিতে বলেছেন। আসলে প্রথম জীবনে কবি বক্র-কটাক্ষ দিয়ে সকল কিছুই দেখেছিলেন বলেই জীবনের গভীরতর সত্য অপেক্ষা দুঃখের দিকটাই তাঁর দৃষ্টিতে প্রধান হয়ে উঠেছিল—জীবনের এই 'কালো' রূপের অন্তরালেই সকল সৌন্দর্য-সুষমার সমাধি রচিত হয়েছিল। রবীন্দ্র-জীবনে বার বার বিভিন্ন রূপেতে যে অসীম রহস্যময়ীর নীরব পদ সঞ্চার হয়েছে, সে অসীমের লীলা খেলায় কবির জীবন-বেলা বার বার উদ্বেল হয়ে উঠেছে—সেই চির বন্ধুর স্বরূপকে চেনার জন্যে,...সেই লীলা বাদুকীর কথা বলার জন্যে সহস্র সহস্র কবিতা লেখার পরও কবি বলেন :

যে কথা বলিতে চাই,
বলা হয় নাই,...
সে কথা বলিতে পারি এমন সরল বাণী
আমি নাহি জানি।...
যে আনন্দ বেদনায় এ জীবন ভরে
বারে করেছে উদাস
হৃদয় খুঁজিছে আজি তাহারই প্রকাশ।

। বলাকা : ৪১ নং কবিতা ।

রোম্যান্টিক-বিরোধী কবি যতীন্দ্রনাথের পক্ষে শ্লেষ প্রয়োগ করার এই তো সুযোগ। অমনি তাঁর কণ্ঠে শোনা যায় :

প্রভাত হইতে যে কথা বলিতে চাহিতেছি
নিজ পলা,
সন্ধ্যা বেলাও ভগ্ন কণ্ঠে সে কথা হবে না বলা।
কেন এ প্রলাপ ভাই?
যে কথা তোমার হল নাকো বলা, নেই নেই
কথাটাই।

। ঘুনের ঘোরে : ৪র্থ শ্লোক : নবীচিকা ।

এখানে যতীন্দ্রনাথ কেবল রবীন্দ্র-বিরোধীই নয় রোম্যান্টিক-বিরোধীও। আসলে প্রথম জীবনে বাস্তব দিকটা কবির দৃষ্টিতে প্রকট হয়ে ওঠায় জীবন ও জগৎ সম্পর্কে কয়েকটি 'চরম' কথা সবাইকে শুনিয়ে দেওয়ার প্রবল ইচ্ছা যতীন্দ্রনাথকে পেয়ে বসেছিল—তাই সকল রূপরসের বন্ধ বিদায় হয়ে সরব হয়ে উঠেছে কবির আপাতঃ-রুঢ় করুণ কণ্ঠ। তিনি বহুবার বলেছেন কবিতা ভোগ বিলাসের সামগ্রী নয়—তাই লোক মুখে

তিনি কাঞ্চীপুরের কবি প্রিয়াকে রাজ সভার নটী বলে রটিয়ে দিয়েছেন।

লোকের মুখে দেশ বিদেশে রাত'া গেল রটি'
কাঞ্চীপুরের কবি প্রিয়া কাঞ্চীরাজের নটী।

। কবি জাতক কথা : ত্রিযামা ।

তাই তিনি শেষ পর্যন্ত কবি প্রিয়া ছন্দাহতীর বীণা যন্ত্রে নিত নিশিথে ভোগ বিলাসিনী কবি প্রিয়াকে দাহন যন্ত্রণার দণ্ড করেছেন—এখানেই ধ্বংস হয়েছে ভোগ বিলাসীনীর বিষাক্ত মূর্তি'। এই কবিতার ভিতর দিয়ে কবি প্রকারান্তরে রোম্যান্টিকতার বিরুদ্ধে চরম বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন।

কিন্তু রোম্যান্টিকতা এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই বিরোধ শেষ পর্যন্ত কবি রক্ষা করতে পারেন নি। 'সাগর' কাব্যগ্রন্থ হতে যে সমন্বয়ের সুর কবি কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল তারই পূর্ণ পরিণতি দেখি 'ত্রিযামা'য়। প্রকৃতি সম্পর্কে সুর পরিবর্তনের কবিতায় আমরা দেখেছি কবির বীণা যন্ত্রে গুঞ্জিত হয়ে উঠেছে অজানা রহস্যেরই সুর মূর্ছনা—কিন্তু এই অজানার বিরুদ্ধেই তো কবির আজীবন বিদ্রোহ! অবশ্য 'সাগর' এর পূর্বেই কবির কণ্ঠে এই সুর বিশেষ রূপে লক্ষণীয় হয়ে ওঠেনি—রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মিলও তাঁর 'সাগর' এর পূর্বে সংঘঠিত হয় নি।

রবীন্দ্রনাথ আজীবন চেতনাশ্রয়ী, কিন্তু যতীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে ছিলেন জড়বাদী—এখানেই রোম্যান্টিকতা ও রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে তাঁর বিরোধ। কিন্তু শেষ জীবনে তিনি চেতনাশ্রয়ী—এখানেই তিনি রোম্যান্টিকতা এবং রবীন্দ্রনাথের সাথে তাঁর বিরোধের অবসান এখানে। 'ত্রিযামা'র 'পঁচিশে বৈশাখ' কবিতাটি রোম্যান্টিক-রবীন্দ্র উভয়-বিধ বিরোধাবসানের সুস্পষ্ট ঘোষণা পত্র :

নবীন ফাল্গুন দিন সকল বন্ধন হীন উন্মত্ত অধীর,
উড়ায়ে চঞ্চল পাখা পুষ্প রেণু গন্ধবাহী দখিন সমীর
সহসা আসিয়া ত্বরা রাঙায়ে দিয়াছে ধরা
যৌবনের রূপে
সেথায় উতলা প্রাণে সুদূর-মগন গানে
কবি এক জাগে।...
উঠিছে ঝিল্লির গান তরুর মর্মর তান নদী কলস্বর।
প্রহরের আনা গোনা যেন রাত্রে যায় শোনা
আকাশের পর।
উঠিতেছে চরাচরে অনাদি অনন্ত স্বরে সংগীত উদার,
সে নিত্য গানের সনে মিলাইয়া লও মনে
জীবন তাহার।
দেখ তারে বর্ণে বর্ণে প্রভাত-সহস্র পর্ণে
প্রস্ফুট আলোকে,
পরিচয় লহ তার মহাযৌন তমিস্রার নক্ষত্র পুলকে।

কবিতাটি তো রবীন্দ্র প্রশান্ত বটেই তাছাড়া যেন রোম্যান্টিক তুলির বিচিত্র-রঙীন বর্ণ বিন্যাসে আঁকা এক খানি বিচিত্র মনোরম চিত্র এ্যালবাম্।

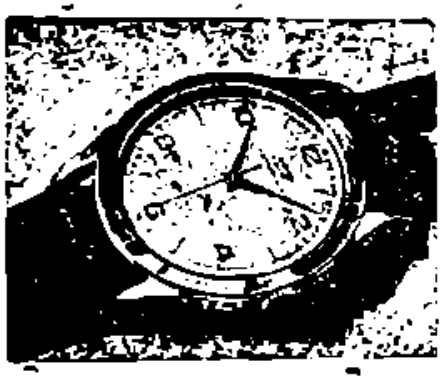

রিপেয়ারিংএ আমাদের এত সুনাম কেন?

- আমরা প্রত্যেক ঘড়ির জন্য অরিজিনাল পার্ট'স ব্যবহার করিয়া থাকি।
- যে ঘড়ির জন্য যে কারিগর অভিজ্ঞ সেই ঘড়ির জন্য সেই কারিগর দ্বারাই মেরামত করান হয়।
- আমাদের কারিগরেরা প্রায় সকলেই দুইস কার্থে ট্রেনিংপ্রাপ্ত।
- ক্রমবর্দ্ধমান মূল্য বৃদ্ধি সত্ত্বেও আমরা পূর্বের চার্জেই মেরামত করিতেছি।
- ঘড়ি মেরামতের প্রয়োজনে আমাদের সহিত পরামর্শ করিতে অনুরোধ জানাইতেছে।
- মফঃস্বলের জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা আছে।

চৌধুরী'জ

ঘড়ি, পেন ও চশমা বিক্রেতা
নেতাজী সুভাষ রোড, কলিঃ-১
ফোন : ২৩-৩৬১৩

প্রথম জীবনে কবি ছিলেন আস্তিক—ঈশ্বরে বিশ্বাস তো দূরের কথা সেই পরোক্ষ 'অন্তর্যামীর' বিরুদ্ধেই তো তাঁর যত বিদ্রোহ। কিন্তু শেষ জীবনে তিনি আস্তিক—ঈশ্বরে পূর্ণ নির্ভরশীল। 'নামহ', 'ত্রিধারা'র অনেক-গুলি কবিতায় এই নির্ভরতার বাণী ঘোষিত হয়েছে। আস্তিক মনের পরিচয় 'গান্ধীবাণী' কবিতায় সুন্দর রূপে ধরা পড়েছে :

প্রত্যাশার মত প্রত্যয় জন্মেছে অন্তরে,
তাই টঙ্কার তোলা না লাগিলে
পাতাটিও নাড়ি মড়ে।
প্রতি নিশ্বাস সহ
বুকে ভরে মোরা করি যে গ্রহণ
তাঁহারই অনুগ্রহ।

এ 'গান্ধীবাণী' নয়—যতীন্দ্রবাণী। আস্তিকের বাণীতে ঈশ্বরের এমন অন্তরঙ্গ পরিচয় কখনো সম্ভব নয়। এই আস্তিকতাও তাঁর রবীন্দ্র-বিরোধ মীমাংসার আর একটি দিক। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম জীবনে কবির বিরোধ থাকলেও শেষ জীবনে ঐকান্তিক নিষ্ঠাই প্রধান হয়ে উঠেছে। অধ্যাপক রথীন্দ্রনাথ রায়ও প্রসঙ্গক্রমে দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ করেছেন। তাঁর মূল্যায়ন মন্তব্যটি এই "যতীন্দ্রনাথ প্রথম যৌবনে রবীন্দ্রনাথের যে বিরোধিতা করেছেন, তার মূলে কোথাও দোষ বিরোধ ছিল না—রবীন্দ্রনাথের প্রতি অসাধারণ অনুরাগই তাঁকে রবীন্দ্র অভিমানী করে তুলেছিল। সেই অভিমান কবির পরিণত কবিতার পরম অনুরাগেই পরিণত হয়েছে, কবি তাঁর স্বরূপে ফিরে এসেছেন।"

প্রথম যৌবনে রোমান্টিকতার সাথে বিরোধ থাকলেও শেষ জীবনে সে বিরোধ যে বিদূরীত হয়েছে সে সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি। কিন্তু এ ছাড়াও যতীন্দ্র-নাথের মধ্যে আর একপ্রকার রোমান্টিকতার প্রকাশ ঘটেছে—শশিভূষণ দাসগুপ্ত মহাশয় যাকে বলেছেন 'নব রোমান্টিকতা' এবং রথীন্দ্রনাথ রায়ের ভাষায় 'রোমান্টি-কতার রকম ফের'।

যতীন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা এমন কতকগুলি কবিতা পাই যেগুলির মধ্যে আপাতঃ দৃষ্টিতে কোন রোমান্সের আবেদন নেই বলে মনে হয়—কিন্তু একটু গভীর দৃষ্টিতে দেখলে সেই সব কবিতার মধ্যেও 'নব রোমান্টিকতার' অপূর্ব দীপ্তি চোখে পড়ে। বহুপ্রশংসিত 'বেদিনী' কবিতাটি এই ধরনের কবিতার একটি :

কাশফুল হাওয়া নয়রে বেদিনী, দখিন
হাওয়া এ নয়
ঈশান কোণের জলদ কন্যা বিদ্যুৎ নিঃশ্বাস বয়।...
অস্তাচলের এই কাল বৈশাখী ভেঙে দিল তোর ঘর,
সাপের কাঁপিটে মাথার চাপিয়ে বেদেনীর
হাত ধর।...
হাওয়ার উজানে দিক ঠিক রেখে আঁধারে
আঁধারে চল,
আকাশে খেলায় লম্বা লম্বা সাপ পায়ের
সাপুড়ে চল।

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হবে কবিতাটি একটি বাস্তব চিত্রবাহী রোমান্টিকতা শূন্য বাস্তব কবিতা। বাস্তব-বোধের জন্যে 'জলদ কন্যা বিদ্যুৎ নিঃশ্বাস', 'ভাঙা ফাটাফুটো হৈতল', 'ছাগলের দড়ি', 'সাপের কাঁপি', 'লম্বা লম্বা সাপ' সবই আছে কিন্তু বিদ্যুতের ঝিলিক যে কবির কাছে লম্বা লম্বা সাপ হয়ে ওঠে তাঁর মত রোমান্টিক কবি আর কে? অনির্দেশ্য রহস্যের শিহরণে ঘরে রোমান্সের সৃষ্টি নয় বরং অতি স্থূল। একান্ত বাস্তব বস্তুর মাধ্যমে উজ্জ্বল রোমান্সের সঞ্চারণই হলো 'নব রোমান্টিকতার' প্রধান লক্ষণ। 'বনশ্রী' কবিতাটিও এই শ্রেণীর কবিতা—সেখানে পাহাড়ী নদী, বাঘ বাইসনে জল খাওয়া, গায়েণীর ডাক, পথ হারা গাড়ীর হাম্বা রব সবই আছে তবুও কবিতাটি যতীন্দ্রনাথের রোমান্টিক ভাবুকতার সীমা-স্বর্গ স্পর্শ করেছে। একান্ত বাস্তব জীবনের ওপর কবি এনেছেন রোমান্টিকতার সুরে মূর্ছনা। 'নব রোমান্টিকতার' আমেজে কবিতাটি অপ্সরা মনোহর হয়ে উঠেছে।

১ সাত ১

এ কথা নিঃসন্দেহেই বলা চলে গঠন রীতির দিক দিয়ে যতীন্দ্রনাথের কবিতা যদি শুধু। কোন দুর্বল অংশ তাঁর কবিতায় প্রবেশাধিকারের ছাড়পত্র পায় নি।

যতীন্দ্রনাথ ছিলেন সংযত শব্দচেতন শিল্পী। এই সংযতচেতন মনের প্রমাণ পরিচয় তাঁর কবিতার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে আছে। তাঁর কবিতার গঠন রীতি ইংরাজি কঠিন বাঁধুনি জানিত। তিনি 'সনেট' লিখে হাত পাকিয়ে নিয়েছিলেন 'ইটালিক' লিখে। "কবিতার ক্ষেত্রে মাটির ঘরের প্রতি কোন প্রকৃতি ছিল না যতীন্দ্রনাথের; কাদা মাটিকে বাড়িয়া ছানিয়া প্রয়োজনমতো বিশেষ বিশেষ ছাঁচে ঢালিয়া—তাহাকে ভাবনার তাপে তাপে শক্ত করিয়া পোড়াইয়া লইয়া তবে সেই উপাদানেই তিনি বিশেষ কবিতার আকার প্রকার গড়িয়া তুলিতেন।" এই 'ইটালিক' গঠনে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। 'ঘুম ঘোরে' কবিতাটি রচনার জন্যে তাই সুদীর্ঘ চার পাঁচ বছর সময় অতিবাহিত হয়েছে। একটি কবিতার পিছনে (তাহা নয়) চার পাঁচ বছর সময় বাংলার অন্য কোন কবি করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

কিন্তু ছন্দ ও গঠন রীতি সম্পর্কে তাঁহার সতর্কতা সত্ত্বেও প্রথম তিন খানি কাব্য গ্রন্থে কেবলমাত্র মাত্রাগত ত্রুটি-বিচ্যুতি ছন্দ রসিকদের নিকট বিরক্তিকর ও একঘেয়ে হয়ে উঠেছে। দু' একটি কবিতার ছন্দের অমল সরল থাকলেও তা পাঠক মনে নতুনতর কোন আস্বাদন বৈচিত্র্য এনে দিতে সক্ষম হয় নি। তবে 'মরু' বালা গ্রন্থ ছন্দ কেবল মাত্র বিষয় বস্তুতে নয়, গঠন রীতিতেও বিচিত্র ভঙ্গীর পরিচয় ঘটেছে। 'সারঙ্গ' 'তিলোমা' 'বলাকা'র ব্যবহৃত ছন্দের মত কিছু মুক্ত বহু ছন্দ লক্ষ্য করা যায়। তিনি নতুন ধরনের অন্ত্যমিল-প্রয়োগের সৃষ্টি করেন। ভাষার সাংকেতিকতা সম্পর্কে কবি ছিলেন একান্ত সচেতন এবং ভাষাকে ঘিরে তিনি অনেক শক্তি সম্পন্ন সংকেত ধর্মের সৃষ্টি করেছেন। কবিতার মধ্যে তিনি প্রচুর উপমা অলংকারের ব্যবহার করেছেন—কিন্তু উপমা প্রয়োগের মধ্যে যতীন্দ্রনাথের 'কবি ব্যক্তিত্ব' সুন্দর রূপে ধরা পড়েছে। উপমাগুলি তিনি সংগ্রহ করেছেন একান্ত জানা চেনা বাস্তব জীবন হতে—অথচ প্রয়োগ নিপুণতায় তাদের লক্ষ্য অব্যর্থ হয়ে উঠেছে। তিনি অনেক আট-পৌরে শব্দ ব্যবহার করেছেন। ইতিপূর্বে কেউ-ই অভিজাত শব্দগুলির পাশে এমন আট-পৌরে শব্দের সুসমাঞ্জস্য পূর্ণ প্রয়োগ সাধন করতে পারেন নি। কবি যতীন্দ্রনাথের পক্ষে বাংলা কবিতার ছন্দে শব্দ প্রয়োগ ক্ষেত্রে এ এক দুঃসাহসিক পদক্ষেপ। মাঝে মাঝে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ প্রবলতার জন্যে তাঁর কবিতায় বলিষ্ঠ বক্রোক্তি এবং শাণিত স্পষ্টোক্তির লক্ষ্যভেদী প্রয়োগ অব্যর্থ হয়ে উঠেছে। বিদ্রূপাত্মক কবিতার পরিহাস নৈপুণ্য, বক্র বিদ্রূপ এবং শ্লেষ সমৃদ্ধ বাক-বৈদগ্ধ বিশেষ রূপে লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। তবুও বাঁধুনি এবং সংযমের অভাব হয় নি কোথাও। যতীন্দ্রনাথের কাব্যরীতি সম্পর্কে অধ্যাপক রথীন্দ্রনাথ রায়ের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য: "তাঁর কবিতায় বিভিন্ন জাতীয় শব্দের শ্রীক্ষেত্র রচিত হয়েছে। তৎসম শব্দ থেকে আরম্ভ করে দৈনন্দিন জীবনের অনভিজাত শব্দ পর্যন্তও তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু কবি আশ্চর্য কৌশলে সব ক'টা সব মিলিয়ে সুকুমার ও সুগঠিত কাব্যরূপ রচনা করেছেন। যতীন্দ্রনাথের কবিতায় শিথিলতার স্থান নেই বললেই হয়। রবীন্দ্রনাথের পর কাব্য রূপে এমন আতিশয্যহীন সংযত গাঢ় ক্লাসিকাল গুণ বিরল দর্শন। কবিতায় শব্দ বৈচিত্র্য যতই থাক না কেন ইঞ্জিনীয়ার কবি তাকে অনায়াসে কংক্রিট করে তুলতে পারেন।"

যতীন্দ্রনাথ কিছু গদ্য কবিতাও লিখেছেন—কিন্তু সার্থক গদ্য কবিতা তাঁর কাব্যে বড় নেই, অধিকাংশ মিলহীন ভগ্ন পয়ার মাত্র।

সর্বশেষে স্মরণ করি যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ। কিন্তু দুঃখবাদ পরবর্তী জীবনে ভেঙে চুরে নতুন রূপে, যদি দৃষ্টতা না হয় তা হলে বলি—সুখমুখী রোমান্টিক বাদে পরিণত হয়েছে। তবুও যতীন্দ্রনাথের বহু পরিচয় তিনি দুঃখবাদী এবং এই পরিচয়ই তাঁর সর্বশেষ, সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত পরিচয়। কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে যদি যতীন্দ্রনাথের এই বিরল ব্যতিক্রম দৃষ্টি না হতো তা হতে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নামটির পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য অনেক বাঙালী পাঠকের হতো না। হয় তো ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে তাঁর নামটিও কালান্তর-লীলায় অস্পষ্টতার তর অতিক্রম করে অবলুপ্ত হতো।

অভ্যাস

রেখা বড়ুয়া

দীপালি গাঙ্গুলিকে আমি অনেকবার দেখেছি এই ক'বছরে—নানা স্থানে নানারূপে। কিন্তু এত দেখেও আমার কেমন যেন বিস্ময় রয়ে গেছে। কোনটি ওর আসল রূপ কে জানে। ও নিজে হয়ত জানে।

এ্যামেচার ক্লাবগুলির স্ত্রী ভূমিকায় অভিনয় করে ও। নতুন নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে অভিনয় আজকাল পুরোপুরি বাস্তব ধর্মী হয়ে উঠেছে। কল্পনার কোন অবকাশ নেই সেখানে। মঞ্চ সজ্জাও বাস্তবানুগ। মোটর গাড়ি সেটেশন তৈরী করতে রঙ্গমঞ্চে টেনে আনা হচ্ছে ভাঙা মোটর গাড়ী, রান্না ঘরে আলোর ক্যারিকুরিতে প্রস্তুত করা হচ্ছে কলের উনোন। এ অবস্থায় অভিনয়ের ব্যাপারেই বা গোঁজামিল চলে কি করে। স্ত্রী ভূমিকায় পুরুষের আত্মপ্রকাশ তাই নিতান্ত হাস্যকর হয়ে উঠেছে। কোন কিছুতেই আর ফাঁকি সইতে রাজী নয় দর্শকেরা। এতএব সন্ধান কর এমন অভিনেত্রীদের যারা কিনা অভিনয় ক্ষমতা এবং চলনসই চেহারার অধিকারী অথচ হায়াছবির নায়িকাদের মত উঁচু চালের নয়। হাত বাড়ালেই পাওয়া যাবে অবশ্য যদি সে হাতে দয়া থাকে খান কয়েক দাবারি সাইজের নোট।

মূল্য এদের বেশী নয়, তবুও দুর্মূল্য এরা, কারণ এদের কোন বিকল্প নেই। অমুক এ্যাণ্ড কোম্পানী অথবা তমুক ব্যাঙ্ক লিমিটেডের কর্মীরা বাৎসরিক আনন্দ প্রকাশ করতে চায় অভিনয়ের মাধ্যমে তখনই প্রয়োজন হয় এদের। এরা কিন্তু এটুকু ভালই বোঝে যে এদের যা হলে এদের চলবে না। মহিলা সদস্যদের কাছে গিয়ে নায়িকার ভূমিকা নিতে অনুরোধ করবার বড় তেত্রিশ ইঞ্চি ছাতিতে। কাজেই দর্শক দাও এদের ধারে। প্রথমেই টানা পোড়েন চলে টাকার অঙ্ক নিয়ে। দুপক্ষই যথেষ্ট সচেতন থাকে নিজেদের লাভক্ষতি সম্বন্ধে টাকার খরচ বাঁচাতে গিয়ে অনেক কথা খরচ করতে হয় ক্লাবের সেক্রেটারীকে।—আমারা গত বছর কিন্তু চল্লিশই দিয়েছিলাম রমা মল্লিককে।

—তা হলে রমা মল্লিকের কাছেই যান, রাগত ভাবে হয়ত মুখ ঘুরিয়ে নেয় তরুণোদের বসা মেয়েটি।

আবার ক্ষেত্র বিশেষে উত্তরটা হয়ত মার্জিত হয়। সস্তা কাঠের তৈরী পোকার হাতলে আঁচড় কাটতে কাটতে মুখ না তুলেই একটু বিশ্রি হাসে আর একজন। তারপর বলে, কিছু মনে করবেন না, আমাকে আবার একটু বেরোতে হবে।

ফল উভয় ক্ষেত্রেই হয়, টাকার অঙ্কে আর একটি সংখ্যা যোগ হয়, যা নিয়ে হয়ত বুড়ো ছেলের জন্যে একটা টনিক কেনা যায় অথবা ছোট ভাই-এর স্কুলের বাকী মাইনেটা দেওয়া যায়।

মাসে চার পাঁচটা শো থাকলে রিহার্সালে যেতে হয় অনেকবার। বলতে গেলে সারা মাস ধরেই চলে। অবশ্য চা খাবার আর ট্রাম বাসের খরচটা দিতে ওরা কার্পণ্য করে না, এইটুকুই যা লাভ। এত গেল সাধারণদের কথা। যারা একটু অসাধারণ তাদের মূল্য যে বেশী তা বলাই বাহুল্য। এদের মধ্যে যারা সত্যিই ভাল অভিনয় করে তাদের কথা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। বাজেটে টান না থাকলে সবাইই চায় এদের। ফলে এদের অবসর থাকে কম, আয়ের অঙ্কটাও নিতান্ত কেলনার থাকে না। রিহার্সেল-এর দিনে অনেক সময় সহজ ভূমিকা হলে বিনা নোটিশে অনুপস্থিত হয়ে কর্মকর্তাদের শিরঃপীড়ার কারণ হয় এরা। তবু কেবল অভিনয়ের গুণে এদের চাহিদা কমে না।

ওই রকমের একজন অভিনেত্রী হল দীপালি গুহ। ওকে আমি প্রথম দেখি "আলমগীরে" জাহানারা রূপে। দর্শকের দারিতে মোহভঙ্গ না হবার মত দূরত্বে আমি বসেছিলাম। ওর অভিনয় সেদিন মুগ্ধ করেছিল দর্শকদের। মাথার টায়রার কুটো পাথরগুলোর সঙ্গে যেন পাল্লা দিয়ে জ্বলেছিল ওর চোখ দুটো। স্বীকার করতে লজ্জা নেই অভিনয় শেষে বন্ধু সুরেশকে উপলক্ষ্য করে সে দিন যে সাজ ঘরে ঢুকেছিলাম তা কেবল দীপালিকে কাছ থেকে একবার দেখবার বাসনায়। দেখা মিলেছিল মেয়েদের সাজ ঘরের প্যাসেজের ধারে। দেখলাম, সেই একই রূপ। জরি জড়ানো বেণী পিঠের ওপর, দু কানে ঝাড় লণ্ঠনের মত কুটো পাথরের বর্ণচ্ছটা, তারই একটার সঙ্গে বুঝি বা জড়িয়ে গেছে দুগাছি চুল। হাত দিয়ে তাই টেনে ছাড়াতে ছাড়াতে কর্মকর্তাদের অভিনন্দন এবং প্রশংসা গ্রহণ করছিল ও। বাইরের ভল্গীটা অবশ্য ছিল অবহেলার। ডান গালের নীচে একটা তিল জ্বলজ্বল করছিল। কে জানে হয়ত মেকআপম্যানের অবদান ওটা। আমার সামনে দিয়েই সাম্রাজ্ঞীর ভল্গীতে চলে গিয়েছিল ও জরিদার ওড়না লুটিয়ে।

এর পরে আরও অনেক নাটকে দেখেছি ওকে। কোনটায় সাধারণ গৃহস্থ কন্যা কোনটায় বা সমাজের উচ্চস্তরের ফ্লার্ট গার্ল রূপে। সবই অপূর্ব। মনে হয় ওর সমস্ত সত্তা যেন মিশে যায় ভূমিকাটির সঙ্গে। দেখে দেখে এক সময় আবার মনে হয়েছিল ও জন্ম অভিনেত্রী, ওর নিজস্ব কোন সত্তা নেই, অথবা ও হয়ত একই রূপের বিভিন্ন প্রকাশ, সবগুলোই সত্যি।

সেবারে পুজোর আগে আমাদের অফিসের কর্মীরা মিলে একটি সামাজিক নাটকের অভিনয়ের জন্যে তৈরী হচ্ছিলাম। নায়িকা চরিত্রটি একটু কঠিন। সুখী সংসারের বৌ একটি আকস্মিক দুর্ঘটনায় স্বামীপুত্র হারিয়ে পাগল হয়ে যাবে এই হল নায়িকার পরিণতি।

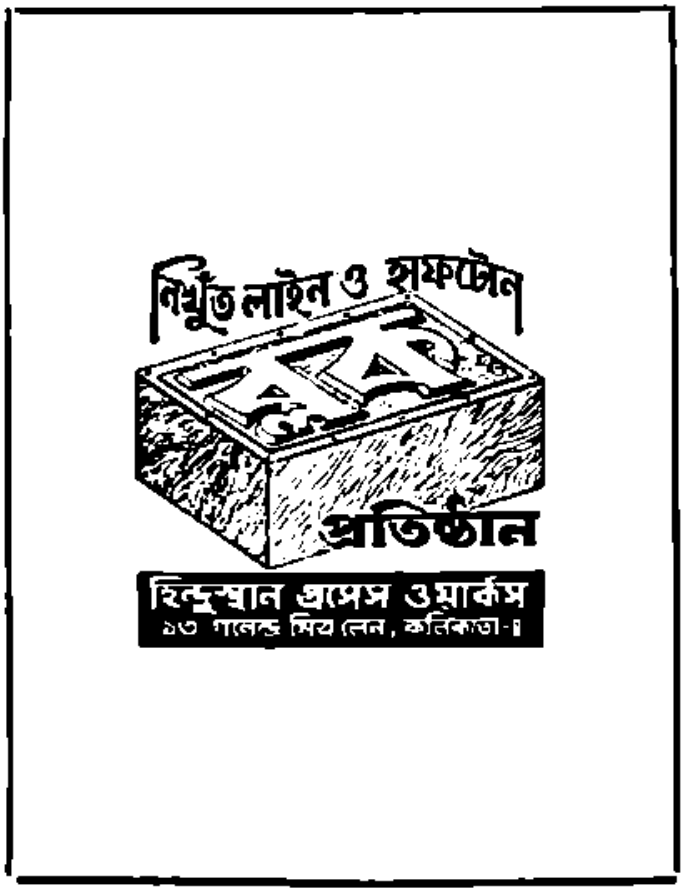

পরিচালক নির্মল সিংহ চিন্তায় পড়েছেন কাকে দেওয়া যায় ভূমিকাটি। আমি প্রস্তাব করলাম দীপালির নাম। এন্টারটেনমেণ্ট সেকশনের পঞ্চাননবাবু বললেন আরে মশাই ওর নাম করবেন না, যে ডাটি ও মেয়েছেলের। হাতে কাঁচা পয়সা পাচ্ছে ত'—ওকে এনে সামলাতে পারবেন না।

নির্মল সিংহ পরিচালকজনোচিত গাম্ভীর্য সহকারে বললেন, তা ভাল অভিনয় দেখতে গেলে ডাটি ত' একটু সইতেই হবে, তবে আমি ভাবছি ও পাট ওর সুট করবে কিনা।

—যা বলেছেন মাইরি, ভেসলিনের বিশ্ব বখাটে নেপাল বলে, লিপস্টিক, নাইলন এসব না হলে কি ওনাকে মানায়?

নেপালের কথায় কেউ মূল্য দিল না এবং শেষ পর্যন্ত দীপালিকেই ডাকা হল।

রিহার্সেলএর দিনগুলো ঠিক ঠিকই এল ও। অধিকাংশ সময় চুপ করে বসে সবার অভিনয় দেখল, মন্তব্য করল না কোন। ওর নিজের অংশ এলে নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কথাগুলো বলে গেল। মনে হল তাও যেটুকু করল তা কেবল দয়া করে নায়ককে সুযোগ দেবার জন্য। এই ভাবেই চলল। স্টেজ রিহার্সেলেএর দিনও যে-কে সেই। প্রমাদ গণলাম আমরা। নির্মল সিংহের মুখ শুকোল। ওর নাম প্রস্তাব করেছিলাম বলে নিজেকেই বেশী অপরাধী মনে হল আমার।

যাই হোক অভিনয়ের দিনে ঘণ্টা খানেক সময় থাকতে ও এল। এত দিন ওকে দেখেছি উগ্রপ্রসাধিতা এবং সুসজ্জিতা। আজ ওর সারা অবয়বে প্রসাধনের লেশ মাত্রও ছিল না। রুক্ষ চুলগুলো এলো করা পরণে একখানা আধা ফর্সা সাদা তাঁতের সাড়ী। কোনদিকে না চেয়ে ভিতরে চলে গেল ও।

যথা সময়ে অভিনয় আরম্ভ হল, আমরা আবার নতুন করে দেখলাম পুরোনো দীপালি গুহকে। অপূর্ব অভিনয়। ওর শেষ পাগল হয়ে যাবার সিন দেখে আমার মনে হল, যে ও হয়ত অভিনয় করছে না। অন্ততঃ এই মুহূর্তে ত' নয়ই। ও যা বলছে, যা করছে তা ওর অন্তরের তাগিদেই করছে। ও সত্যিই সর্বহারা, ওর যে সব ছিল তা এই মুহূর্তে ওর কাছে চরম সত্য। পাদপ্রদীপের ওপাশের মানুষ গুলোর অস্তিত্ব সম্বন্ধে ও আর সচেতন নেই।

অভিনয় শেষ হল। সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তল্পি-তল্পা গুছোতে। আমাদের ট্রেজারার গেলেন মাইকম্যান, ব্রেক আপ ম্যান, মিউজিসিয়ান আর অভিনেত্রীদের বিল মেটাতে। ছোট ভূমিকা ছিল যারা সেন এর, তাকে যথারীতি খাবারের বাক্স দিতে গিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম দীপালীর কথা। শুনলাম ও পুরে আছে মাথা ধুরছে বলে। খানিক বাদে যখন নিজের ছোট্ট সুটকেসটা হাতে করে ও বেরিয়ে এল তখন ওকে দেখে সত্যিই অসুস্থ মনে হল। কপালের একটা পাশ দেখলাম একটু কেটে গেছে আছড়ে পড়ার দরুন। ওকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন নির্মল সিংহ অপূর্ব নিবেদন গুহ, অপূর্ব আপনার অভিনয়—দেখে বিশ্বাস হয় না যে আপনি অভিনয় করছেন।

—তাই বুঝি? ক্লান্ত হেসে বলল দীপালি তার পর টাকা নিয়ে প্রায় টলতে টলতে বেরিয়ে গেল।

আমি বললাম, অদ্ভুত ক্ষমতা কিন্তু ভদ্রমহিলার।

—না হে ক্ষমতা টমতা নয়, স্রেফ অভ্যেস। করতে করতে অভ্যেস হয়ে যায়, অনবরত এই করছে ত'। একি আর তোমার আমার মত যে নমাসে ছমাসে একবার,—বলল শৈলেন। দীপালির সঙ্গে ব্যারক হতে গিয়ে বড় নিষ্প্রভ হয়ে গেছে বেচারা।

কিছুদিন বাদে বন্ধু দমরেশএর অনুরোধে আমাকে যেতে হল দীপালির বাড়ী।

—তুই আগে গিয়ে মোটামুটি কথা বলে আয় তারপর আমি আমাদের সেক্রেটারীকে নিয়ে গিয়ে একেবারে এ্যাডভান্স করে আসব, দমরেশ বলল।

রাজী হলাম এবং পরের রবিবার সকালে হাজির হলাম দীপালির বাড়ীতে। ভেজানো দরজার সামনে একটু ইতস্ততঃ করতে হল। দরজায় একজোড়া কড়া থাকা নিতান্তই উচিত ছিল, কিন্তু তা নেই দেখলাম। ধাক্কা একটু ঠেলতেই, খুলে গেল। ঘরে খানকয়েক কাঠের চেয়ার আর মোড়া রয়েছে। তার মাঝে দাঁড়িয়ে ভাবছি কি বলে ডাকি এমন সময় কিছু নেপথ্য সংলাপ আমার

কাবে এল। আমার অন্তমন বলছিল শোনা উচিত নয়, কিন্তু তবু না শুনে আমার উপায় ছিল না কারণ পুরুষ কণ্ঠটি ছিল অত্যন্ত বেপরোয়া এবং প্রবল।

—ওঃ নবাবের বেটী, অহঙ্কারে একেবারে মটমট করছেন। এই সব মেয়ে মানুষকে জুতিয়ে সিধে রাখতে হয়।

—যতদিন হাতে জোর ছিল তাও ত' করেছ, তবে সেদিন ত' আর নেই। এখন আর বাড়িও না তাহলে শেষ পর্যন্ত তোমাকে দয়া করার প্রবৃত্তিটুকুও হয়ত আমার থাকবে না, মৃদু অথচ দৃঢ় নারীকণ্ঠ।

—ওরে আমার দয়াময়ীরে, কুৎসিত ভাবে ভেংচে উঠল পুরুষটি, কে দয়া দেখাচ্ছেন, কেন শিলিগুড়ি এতদিন আমার পয়সায়? তোর কোন—

—খেয়েছি তোমার পয়সায়, কিন্তু দিনের পর দিন বলেছি ভগবান এমন একটা কিছু করে দাও যাতে জুতো আর ভাত, কোনটাই দেবার ক্ষমতা এই অমানুষটার না থাকে। ভগবান যে কালা নন তা ত' দেখতেই পাচ্ছ। কথার শেষ মৃদু অথচ তীক্ষ্ণ বাঙ্গের হাসি। এবার আর আমার দীপালির গলা চিনতে ভুল হয় না।

—তবেরে হারামজাদী—সপাটে ভাঙল একটা কাঁচের শিশি, বোধহয় হুইস্কি মারার পরপ।

—এই দেখ আমার শুরু হল, পাগল করে দেবে বৌটাকে হতভাগা। বাইরের দরজা ঠেলে ব্যস্ত ভাবে ঢুকলেন এক প্রৌঢ়া বিধবা। বোধ হয় স্নান করে এসেছেন নদী থেকে। আমাকে দেখে একটু থমকে দাঁড়ালেন তারপর বললেন, কে বাবা তুমি, কি চাই?

দীপালি দেবীর গলায় একটু কাঁপ ছিল, অত্যন্ত সহজ ভাবে বলি।

তুমি বোস বাবা আমি দেখছি, ব্যস্ত ভাবে চলে গিয়েছিলেন কাঁচভাঙার পরেই ওদিকের গোলমাল বন্ধ হয়েছিল শুধু পুরুষ কণ্ঠটির বীরত্বের গোঙানীতে পরিণত হয়, ওরে বাবারে আবার মারলরে, ইত্যাদি।

কিছুক্ষণ বাদে আবার এলেন ভদ্রমহিলা, বললেন, তোমরা দাঁড়িয়ে কেন, আসছে বৌমা, ছিষ্টি ছাড়া কাণ্ড কারখানা করেছে হতভাগা, কি বলব বাবা পেটের ছেলে তবু মনে হয় ও মরলে আমি বাঁচি। বিয়ে হওয়া ইস্তক বৌটাকে কি জ্বালায় জ্বালাচ্ছে, মদ খেয়ে লিভার পচে গেছে বলতে বসেছে। তবু ওর স্বভাব বদলালোনা, চব্বিশ ঘন্টা ডোমডোকলার বাড়ীর মত ঝুটোপাটি লেগে রয়েছে—ভগবানকে বলি আর কেন এবার আমার মুক্তি দাও, আর সহ্য না—

—মা, দরজায় এসে দাঁড়ায় দীপালি গুহ, সাধারণ একটা দাড়ী পরণে, মাথায় আঁচল তোলা। বলে, আপনি একটু বসবেন ওঘরে? আমি এঁর সঙ্গে কথাটা শেষ করে যাচ্ছি, ওঁর ব্যথাটা, আবার বেড়েছে। কণ্ঠস্বরে স্পষ্ট দুশ্চিন্তার ছাপ অথচ ঠোঁটের কোণে একটু অতি সূক্ষ্ম বিদ্রূপের হাসি যেন এখনও লেগে রয়েছে।

—এই যে যাই বা চোখ দুটো আঁচলে মুছে চলে যান প্রৌঢ়া।

—আপনার স্বামী অসুস্থ? নিতান্ত কিছু বলতে হয় বলেই হয়ত বলি।

—হ্যাঁ, আজ দুবছর শয্যাশায়ী, কোমর হয়ে যায় ওর দৃষ্টি। বলে, সবই আমার কপাল, না হলে উনি সুস্থ থাকলে কি আর আমাকে টাকা রোজগারের ধান্দায় বেরোতে হয়। আমার দেখার ভুল নয়, স্পষ্ট দেখি চোখের কোণে জল চিকচিক করে ওঠে ওর। জানিনা কেন নিজেকে সংযত করতে পারলাম না, নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই বলে ফেললাম, আমি অনেকক্ষণ এসেছি, আপনারা ব্যস্ত ছিলেন তাই ডাকিনি।

বিদ্যুতের মত ক্ষুরধার হয়ে উঠল ওর দৃষ্টি। একমুহূর্ত তীক্ষ্ণ চোখে চাইল ও আমার চোখের দিকে তারপর ঠোঁটের কোণে উঁকি দিল সেই পুরোনো হাসিটা কিন্তু সে কেবল কয়েকটি মুহূর্তের জন্যে। তারপর বসবার ভঙ্গী শিথিল হয়ে এল হাত দুখানা অন্ধ করল কোলের ওপর আর চেয়ারে পিঠ ঠেকিয়ে ক্লান্ত ভাবে একটু থামল ও।

আমার মনে হল এখন যদি নির্মল সিংহের মত বলি, অপূর্ব আপনার অভিনয় নিখুঁত হয়েছে, অপূর্ব, দেখে বিশ্বাস হয় না যে আপনি অভিনয় করছেন, তাহলে হয়ত ঠিক এই রকম ক্লান্ত হেসে চোখ দুটো তুলে ও বলবে, তাই বুঝি?

মহান মানবতাবাদী

ই. ইলিয়েনকভ

জাঁ জাক রুসোর হাস্যরসাত্মক অপেরা "দা ভিলেজ অব ভিলেজ"-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠান হয়েছিল ফন্টেনেব্লোতে ফরাসী রাজসভার সম্মুখে। এর সাফল্য হয়েছিল বিপুল। এই অনুষ্ঠানের পরে রাজা পঞ্চদশ লুই তাঁর প্রাসাদে এক সম্বর্ধনার আয়োজন করেছিলেন, তাতে অপেরার রচয়িতাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

কিন্তু সেই রচয়িতা সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন নি। গর্বিত সেই রচয়িতার এই অবজ্ঞা প্রদর্শনের ফলে তাঁকে আজীবন পেনশন লাভ থেকে বঞ্চিত হতে হয়; রাজা তাঁকে পেনশন দেবেন বলে স্থির করেছিলেন। জাঁ জাক রুসো প্রভাবশালী কোনো সম্ভ্রান্ত অভিজাত ব্যক্তি ছিলেন না, তিনি ছিলেন জেনেভার এক ঘড়ি নির্মাতার দরিদ্র সন্তান। সারা জীবনের জন্য জীবিকার উপহার প্রত্যাখ্যান করে, রুসোকে গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান করতে হয়েছিল সঙ্গীত রচনা করে। তাঁর "ব্রাত্য" গর্ব এবং নৈতিক নিষ্ঠার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন মার্ক্স; তিনি লিখেছেন, এই গর্ব এবং নিষ্ঠা রুসোকে শাসক শক্তির সঙ্গে কোনো রকম এমন কি কাল্পনিক— আপোষ করা থেকেও রক্ষা করেছে।

রুসো ছিলেন এক মহান চিন্তাবীর, দার্শনিক, লেখক, সঙ্গীতকার, কবি, বিজ্ঞানী এবং সমসাময়িক রাজনীতির ভাষ্যকার; তিনি তাঁর সমগ্র হৃদয় মন সাধারণ মানুষের স্বাধীনতার আদর্শে উৎসর্গ করেছিলেন। উপরে বর্ণিত ঘটনার কিছুকাল আগে প্রকাশিত হয় তাঁর পত্রিকা "অধিকার সমূহের উপর বিজ্ঞানের প্রভাব" (১৭৫০ খৃষ্টাব্দ); এবং তা কিন্তু আকাদেমীর পুরস্কার লাভ করে। তাঁর সমসাময়িক সমাজের গভীর দ্বন্দ্ব সংঘাত পর্যবেক্ষণ করে তিনি সামাজিক বৈষম্য, ধনী ও দরিদ্রে বিভক্ত মনুষ্য সমাজ প্রভৃতি সকল অশুভ ঘটনার কারণ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

স্বেচ্ছাচারী অলস মানুষগুলির সমাজ এবং তাদের ভুয়ো বিজ্ঞান আর কলাশিল্পকে তিনি নিন্দা ভর্ৎসনা করেছেন, নিন্দিত করেছেন তাদের কথিত কৃষ্টির জাঁকাল কিন্তু আসার ভুক্ততাকে। যে অবিচল দৃঢ়তা

নিয়ে তিনি তাঁর সমালোচকের ভূমিকা বজায় রেখে গেছেন তা সত্যি দুর্লভ: সুচিকার্যখোচিত কোট, ফিতে লাগানো চটি এবং কুশাণ ছেড়ে তিনি সাধারণ নাগরিকের সাদামাটা পোষাককেই মাথায় তুলে নিয়েছেন। এমন কি নিজের ঘড়িটি পর্যন্ত তিনি বিক্রয় করে দিয়েছিলেন।

শ্রেণীর ভাগ্য বর্ণ শিক্ষকদের সঙ্গেই রুসোর মতের মিল ছিল না; তাঁরা মনে করতেন যে, রুসোর মতামত এবং অচল ব্যবহার নিতান্তই একটা উদ্ভট রকমের, যার উৎস হল অযুক্ত কল্পনা। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে এই মহান প্রেমিকের ভাবধারার বনিয়াদ ছিল অত্যাচারী-দের সম্পর্কে তাঁর ঘৃণার ওপর। তাঁর ভাবধারা ছিল আদল সর্বত্রগামী রাজ ক্ষমতার পিষ্টী করা কঠিন পদ প্রহরণ নিষ্পেষিত, অভিশাপ ও উচ্চকিত বুর্জোয়া শ্রেণীর তোষামোদে নিষ্পেষিত মানবস্থার আর্তনাদ।

সেকালে নিম্ন কৃষকেরা পীরেনীস, প্রোভেন্স, ল্যাংগুয়েডক এবং ব্রিটানীতে বিদ্রোহ করেছিল। সরকার কৌজী অভিযান চালিয়ে সে বিদ্রোহ দমন করে দিয়েছিলেন এবং বিদ্রোহের নেতাদের ফাঁসী দিয়ে মেরেছিলেন।

তখন রুসো ধ্বনিত করেছিলেন এই কথা: "বিশেষ করে অভিজাত এবং ধনী সম্প্রদায় থেকে সাবধান হও।"

এ কথা বলা যায় না যে, সমসাময়িক লেখক ও দার্শনিকগণ সমাজ-তোলপাড় করা সংঘাত সম্পর্কে কিংবা জনগণের দুঃখ যন্ত্রণা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না।

নীতিবাগিশরা বলতে লাগলেন, যেহেতু শাসক এবং আইন প্রণেতারা মানবিক প্রকৃতির প্রতি কোনো মনোযোগ দেন নি এবং যে হেতু যুক্তিবদ্ধ সমাজ নিয়ামক নিয়ম নীতি জানতেন না সেই কারণেই সব গোলমাল সৃষ্টি হয়েছে।

তাঁরা বললেন, মানুষের একটি অন্তরতম এবং সর্বাপেক্ষা স্বাভাবিক গুণ হচ্ছে তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি। মানুষ এক একজন সম্পত্তি অধিকারী মালিক। আজো পর্যন্ত বুর্জোয়া প্রচার সাহিত্যে এই বুলিই কপচানো হয়ে থাকে।

রুসো তাঁর "ডিসকোর্স অন দ্য অরিজিন এণ্ড দ্য ফাউণ্ডেশনস"-এ (১৭৫৪ খৃষ্টাব্দ) বুর্জোয়া শ্রেণীর এই প্রিয় ভাবধারার সমালোচনা করেছেন।

এই দার্শনিক সমাজ বিকাশের গভীর স্বাভাবিক মর্ম অনুধাবন করেছিলেন, এবং সেই থেকে পদক্ষেপ সুরু করে সকল অত্যাচার পীড়নের বিরুদ্ধে জনগণের বৈপ্লবিক বাসকতা কার্যাবলীকে মূর্ত করে তুলেছিলেন।

তিনি যে সমাজে বাস করতেন তখনো অবশ্য সে সমাজে শ্রমজীবী জনগণকে সকল শোষণ ও অত্যাচার থেকে মুক্ত করার উপায় ও অবস্থা সৃষ্টি হয় নি। কাজেই রুসো স্বপ্ন-কল্প সমাধান ছাড়া সমাজ সংস্কারের অন্য কোনো উন্নততর কর্মসূচী উপস্থাপিত করতে পারেন নি।

রুসোর আদর্শ ছিল এমন এক রাষ্ট্র যেখানে "সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী আর জনগণের মধ্যে স্বার্থের কোনো পার্থক্য থাকবে না, এবং যেখানে রাষ্ট্রযন্ত্রের সকল কার্যকলাপের লক্ষ্য

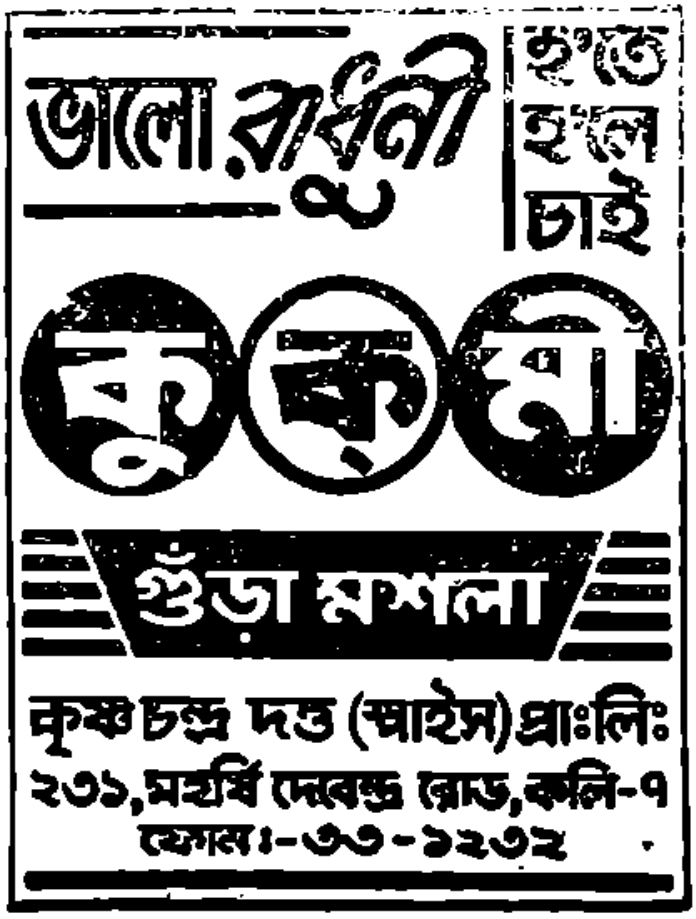

হবে সার্বিক সুখের ব্যবস্থা করা।..."

রুসোকে তাঁর ভাবধারার জন্য প্রচণ্ড আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তাঁর উপন্যাস "এমিলি" ঘাতকদের হাতে ভস্মীভূত হয়েছে, এবং গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য তিনি পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। প্রুশিয়াতে ধর্মযাজকরা গোঁড়া ধর্মাচারীদের ক্ষেপিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর বিরুদ্ধে এবং তারা তাঁর বাড়িতে ইঁট পাথর ছুঁড়েছিল।

কিন্তু রুসোর প্রতি জনগণের ভালোবাসার শক্তি ছিল শত্রুদের ঘৃণার চেয়েও অনেক বেশী। তাঁর ভাবধারা হৃদয়ে স্থান দিয়ে জনগণ কৃতজ্ঞতা বোধ করেছে। তারা তাঁর গ্রন্থাবলী কিনে নিয়েছে। তা কোবিনদের ভবিষ্যৎ নেতারা তাঁকে দেখার সুযোগ পেলেই উৎসাহিত বোধ করতেন। রুসোর অনুগামীরা ছিলেন অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীর গণতান্ত্রিক মুক্তি আন্দোলনের নেতা এবং মত প্রচারকগণ। ওয়াশিংটন ও জেফারসন, রোবসপীয়ের ও সাঁ-জাস্ট, বাবুফ ও কুরিয়ে, গ্যারিওলডি ও লিংকন, হারজেন ও চের্নিশেভস্কি প্রমুখ সবাই রুসোর ভাবধারা থেকে প্রেরণা লাভ করেছিলেন। ইতিহাসে রুসোর ভূমিকার কথা স্পষ্টতই অতিরঞ্জিত করে নেপোলিয়ান বলেছিলেন যে রুসো ছাড়া ফরাসী বিপ্লব হত না। আসল কথাটা হচ্ছে এই যে বিপ্লবের ফলে রুসোর ভাবধারাই জনগণের "অধিকার ঘোষণার" বনিয়াদ রচনা করেছিল; আর এই সবল ভাবধারার প্রভাব মুছে ফেলবার জন্য পরবর্তী কালে নেপোলিয়ানকে দৃঢ় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়েছে।

যুদ্ধ ও শান্তি সম্পর্কে রুসোর মতামত বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে। যুদ্ধকে মানব প্রকৃতির অঙ্গ হিসাবে দেখানোর চেষ্টার সমালোচনা করে রুসো দেখিয়েছেন—যুদ্ধ জিনিষটা বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিরোধ সংঘাতেরই একটা রূপ নয়, যুদ্ধ হল বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘাতের প্রকাশ। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বিরোধ মীমাংসার উপায় হিসাবে যুদ্ধের বিরোধিতা করে রুসো সাঁ-পীয়ের এর রচিত "চিরস্থন শান্তির প্রকল্প" অনুমোদন করেছিলেন। এই প্রকল্পের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন: "বিভিন্ন শক্তির মধ্যে শান্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হলে আমরা কত না সমৃদ্ধ হতে পারতাম!"

ফরাসী মুক্তি আন্দোলনে এবং ফরাসী সংস্কৃতিতে রুসোর প্রভাব ছিল বিপুল। রাদিশেভ রুসোর গ্রন্থাবলী থেকে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিতে সমর্থ হয়েছিলেন। হারজেন তাঁকে জ্যাকোবিন একনায়কত্বের পুরোধা বলে বিবেচনা করেছেন আর চের্নিশেভস্কি তাঁকে বলেছেন "বিপ্লবী ডেমোক্র্যাট"।

সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার ভাবধারা, তাঁর দ্বারা উদ্বুদ্ধ জনগণের রাষ্ট্রের ভাবধারা, যার পতাকা তলে সমবেত হয়ে ফ্রান্সের কৃষক ও কারিগরগণ লড়াই করেছিলেন সেই ভাবধারা যে পরবর্তীকালে বাস্তবে বুর্জোয়া শ্রেণীর রাজত্ব প্রতিষ্ঠার আদর্শে রূপান্তরিত হয়েছে, সেটা রুসোর অপরাধ নয়। রুসোর বিয়োগান্ত পরিণতির মূল নিহিত রয়েছে মানব ইতিহাসেরই বিয়োগান্ত পরিণামের মধ্যে। তিনি পদক্ষেপ করেছিলেন দূর ভবিষ্যতে রুসো আদর্শেই বুর্জোয়া শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

এই মহান মানবতাবাদীর আদর্শের রূপায়ণ ঘটছে কমিউনিজমের বিজয়লাভের জন্য শ্রমজীবী জনগণের সংগ্রামেরই মধ্যে যে কমিউনিজমের পতাকায় খচিত রয়েছে: "সকলের জন্য শান্তি ও সংস্থান, সকলের জন্য স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী, সকলের জন্য সুখ ও সমৃদ্ধি।"

• •

মস্কোর জনগণ জাঁ জ্যাক রুসোর ২৫০তম জন্ম বার্ষিকী পালন করেছেন। মৈত্রী ভবনে এক সমাবেশ হয়েছে। তাতে উদ্বোধনী ভাষণ দিয়েছেন অধ্যাপক এ. জেড. ম্যানফ্রেড, যিনি সোভিয়েত-ফ্রান্স সমিতির বোর্ডের একজন সদস্য। এরপর "মহান ফরাসী মানবতাবাদী জাঁ জাক রুসো"—এই বিষয়ে আলোচনা করেন অধ্যাপক জি. এ. কুরসানভ ডি. পি. এইচ।

এই অনুষ্ঠানে ফরাসী ও সুইজারল্যাণ্ড দূতবাসের সদস্যরা যোগ দিয়েছিলেন।

["সোভিয়েৎস্কাইয়া রোসিয়া", ২৮শে জুন—১৯৬২]।

দূরত্ব চাহি না | তুষার চট্টোপাধ্যায়

সহিষ্ণু ধূপের মত কেন আর জ্বালা না নীরবে ?
কেন প্রতিশ্রুতি ভাঙ্গে। মধুপের অতর্কিত হাতে
সনাতন অন্ধকার কেন দাও ? প্রত্যাশার স্তবে
উদ্ধারের সব আশা নিভে যায় অলীক আঘাতে।
কুসুমেরা ঝরে যায় ম্রিয়মান নীরব অন্তরে
অসম্ভব দাবী নিয়ে আমি ম্লান প্রতীক্ষিত দূরে।

প্রত্যাশার দূরে থাকা ভাল। জানি প্রকৃতি রীতি
নিয়মে নির্ভুল বড়। তথাপিও তোমার নিকটে
অযুত অবাধ্য চাওয়া। সারাক্ষণ স্বভাবের ভীতি
মনের গভীরে পুষি। তবু নিত্য হৃদয়ের তটে
নানাবিধ অভিমান। বিপরীত ইচ্ছার প্রকাশে
মিছাই বিচ্ছেদ কাম্য দূরত্বের রিক্ত প্রতিভাসে।

দূরত্ব চাহি না আর। অবিচ্ছিন্ন হৃদয় সকাশে
পরস্পর ডুবে যাই উপগত দীপ্ত অবকাশে॥

আমি মুসাফির | প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়

কেন আমি মুসাফির লিখি আর কেন গাই গান ?
সে কথাটি জেনে নিতে যদি কেউ পেতে থাক কান
পথের ধূলায় তলে নেমে এসো ধূলো মাখা গায়
শোন বসে সেই কথা, নতুন পুষ্পিত বট ছায়ে !
প্রতিদিন বস্তু পুঞ্জে পথে পথে ঠেলে যেয়ে ব্যথা
গান হয়ে সুরে সুরে মরে ঘুরে বিন্দু বিন্দু কথা
সিন্ধু পানে ছুটে যায়, নাহি জানে আপন বারতা
জীবন সীমার প্রান্তে মৃত্যু আনে গভীর স্তব্ধতা।

ফিরে আসি ব্যথা ভরা আলো আর আঁধার সংসারে
গান রচি কাব্য রচি বিস্মৃতির অতল আধারে
অন্ন নাই, প্রাণ নাই, আলো নাই মুক্ত বায়ু
আকাশে কুসুম রচা আনন্দ উচ্ছল পরমায়ু।
জীবন মৃত্যুর চেয়ে তবু ত জানি বহুগুণ বড়
প্রত্যয়ে বিশ্বাসে ভরা কণ্ঠে বলি মৃত্যু তুমি সরো।

কিশোরী | অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

সহজ তো নয় তোমার কাছে আসা
বক্ষে তব, তোমার মনে মনে—
পুষ্ট, প্রিয় যুগল ঢেউয়ে ভাসা।

গোপন কামে চোখের সর্বনাশা
সরালপাখি উড়াও উপবনে
ঝরাও জলে কম্প বাহুর ভাষা।

তন্বী কটির কোমল আক্রমণে
দেখাও দূরে মায়াবিনীর বাসা
ঘর-রক্তের চপল চংক্রমনে।

বাতাস বুঝি ছুঁয়ে যায় চুম্বনে
সহজ তো নয় তোমার কাছে আসা,
কি সুখ দোলে ওষ্ঠে···সংগোপনে—

আশা আমার, তুমি আমার আশা।

ফটোটায় যেন বড্ড বেশী ধুলো জমেছে। অনেকদিন মোছা হয় নি। চোখে লাগে। শুতে যেতে ঘুম থেকে উঠতে বসতে রোজই চোখে পড়ে। ধুলো জমে জমে কখন যে চশমে ছোপ পড়ে গেছে টের পায় নি। আজ চমকে খেয়াল হোল। কেমন যেন ঘোলা লাগে। খাটের ওপর উঠে ফটোটা নামিয়ে আনলো গৌতম।

মুখে কোন তিল ছিল না। ধুলোর বিন্দু জমে থুতনীর নিচে তিল হয়েছে। ভুরাট চল চল মুখের লাবণ্য

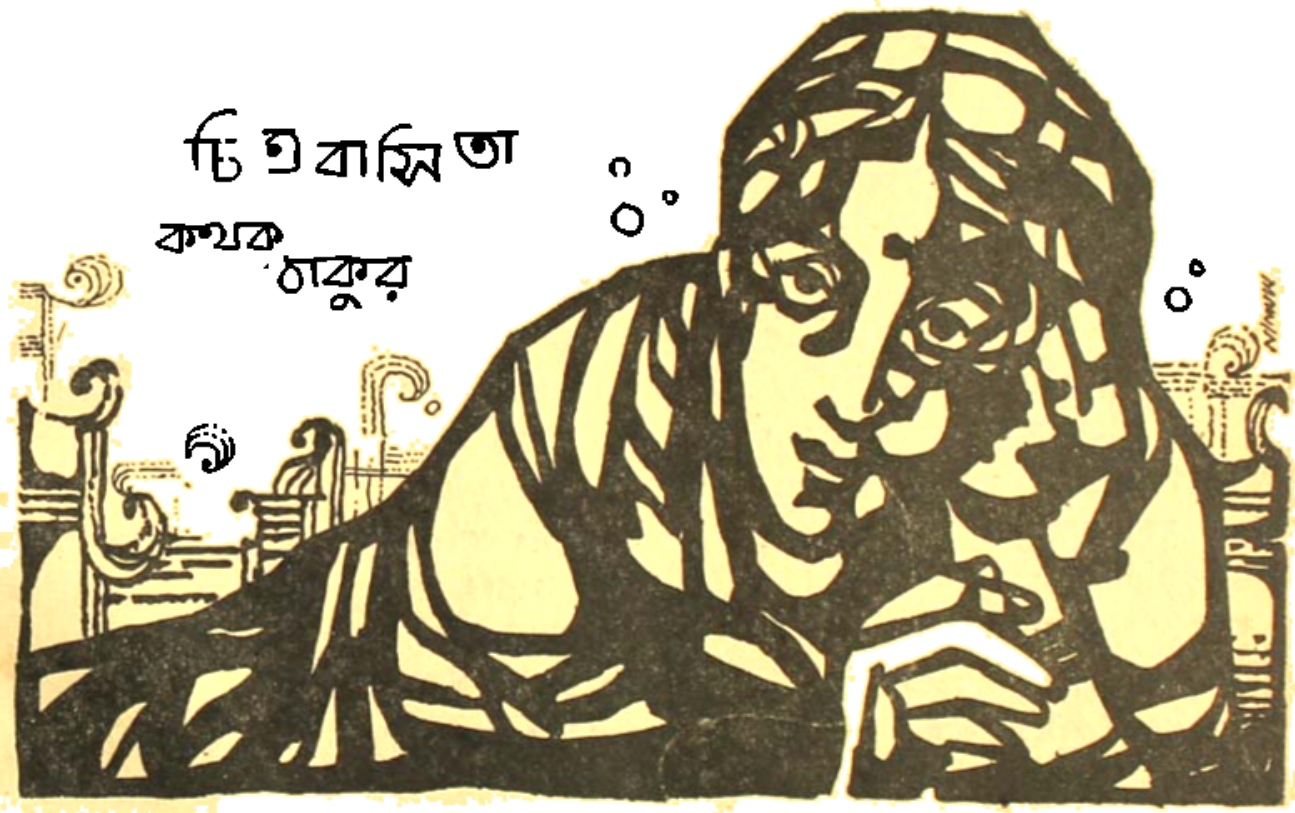

কপালের নীচে ধুলো-বিন্দুর তিলটি অদ্ভুত চোখে বসেছে কাঁচের ওপর দিয়ে। মোছা যায় না—মুছতে ইচ্ছা করে না। কপালে টিপটা আগেও ছিল। ধুলো-বিন্দুর তিলটির সংগে অদ্ভুত ম্যাচ করেছে।

একটা ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে ফটোর কাঁচটা আস্তে আস্তে ঘষে ঘষে মুছতে লাগলো গৌতম। তিলটাকে এড়িয়ে।

না—সেই টানা চোখ ঠিক আছে। সোল কাঁধ আর ঝাপা গলার নীচে কণ্ঠীও চোখে পড়ে না। দামী বেনারসীর ফাঁক দিয়ে ত্রিভুজ খোলা গলার ওপর স্বর্ণ-চিকও তেমনি আছে। কানের পাতলা গোল দুলে দাগ পড়ে নি। কপাল-ঢাকা ঝোলানো কুচকুচে কালো চুলেও ছোপ লাগে নি। ধুলোর পরদা মুছতে মুছতে পরিষ্কার দেখতে পেলো গৌতম। না—প্রতিমাকে চিনতে ভুল হয় না।

গৌতমের পেশম তুলে চেয়ে আছে।

: সকাল বেলা আবার কি নিয়ে বসলে? যাবে না? ভাত চাপিয়ে প্রশ্ন করল প্রতিমা।

: আজ বাজারে না গেলেই নয়? যা হোক করে চালিয়ে দাও না আজ।

তিল বাঁচিয়ে ফটোটা মুছতে মুছতে বলল গৌতম।

: না—একটু যাচ্ছ না হলে চলবে না—রোজ ডিম খাওয়া যায় নাকি? একটু মাছ আনোগে যাও—

বাবাও বলছিলেন !

হাতটা জলে ধুয়ে শাড়ীর খুঁটে মুছে উঠে তড়তড়িয়ে বলে গেলো প্রতিমা ।

না—পুরো মোছা হোল না ! গুম মেরে বসে রইলো গৌতম । এই ফটো সে মুছতে বলেছে ?

এক মুহূর্তে কাঁচের ওপর ধুলো-বিন্দুর তিল মিলিয়ে গেলো ।

হাঁড়ি ঠেলা আর বাজার করাই চিনেছে প্রতিমা । মন বোঝে না ।

বিরক্ত হোল গৌতম ।

দেরাজ-তাকের এক কোণে নিতান্ত অবহেলায় রাগ করে সরিয়ে রাখলো ফটোটাকে । ছুঁড়ে ফেলে ভেঙে দিতেও পারতো—কিন্তু কষ্টে সামলালো ।

তারপর আলনা থেকে একটানে জামাটা নামিয়ে গায়ে চাপালো । আলনার আর সব কাপড়-জামা ছিটকে পড়লো এদিক-ওদিক । স্লিপারটা কাজের সময় খুঁজে পাওয়া যায় না । দরজার স্ক্রীন সরিয়ে একটা গোঁ নিয়ে খুঁজতে গেলো সেটা ।

কোঁক সামলানো গেল না । প্রতিমা ঢুকছিলো ঘরে—একটা প্রচণ্ড ধাক্কায় ছিটকে পড়লো ।

: কি হয়েছে তোমার ? এতো রাগ কেন ? দিলে তো নতুন চুড়িটা ভেঙে ? কিনে কিছু দেওয়ার নাম নেই—নষ্ট করতে পারো !

তেতে উঠলো প্রতিমা ।

ভ্রূ কুঁচকে দেখলো গৌতম । ঘুমা হয় । কেবল দোষারোপ করেই কথা । মুখে মিষ্টত্ব নেই ।

মা হয় গালটা একটু ভেঙেছে । কণ্ঠী একটু উঁচু হয়েছে । হাত দুটোর সামনেটা একটু শক্ত কোঁই হয়েছে—আঙুলগুলো শক্ত হয়ে কালসিটে পড়েছে প্রতিমার । তাই বলে কি মনটাকেও শুকিয়ে দিতে হবে ? আসলে যৌবন বলে ওর কোনকালেই কিছু ছিলো না ।

মন বোঝার কোনও চেষ্টাও কোনদিন ও করেনি ।

আগে রূপ ছিলো । সেই রূপের আবর্তে গুণের কথা কেউ ভাবে নি । যে ভাবে চলেছে, যে কথা বলেছে, যে কাজ করেছে তাকেই গুণ বলে মনে হয়েছে । প্রশ্ন জাগে নি । রূপে-গুণে দ্বন্দ্বাতীত ছিল প্রতিমা ।

এখন খুঁটিয়ে দেখতে সাধ করেছে । বড় লালা-মাটা । কি কথা কখন কি ভাবে বলতে হয় জানে না । জানার চেষ্টাও করে না ।

লোকে না জানলে দেখে বা ঠেকে শেখে । প্রতিমা ঠেকেও শেখে না । আসলে ওর সে আগ্রহই নেই । এই পাঁচ বছরেও কিছু শিখলো না । অথচ বুদ্ধির তীব্রতা যা থাকলে শুধু সরলতা দিয়ে কি চলে ?

মনটা খচ্‌খচ্‌ করে গৌতমের ।

কোন জবাব না দিয়ে বাজারের ঝুলিটা নিয়ে বেগে বেরিয়ে গেল সে ।

আর একটু দম নিলো প্রতিমা । আজ সমস্ত দিনটাই নির্বাক থাকবে গৌতম । ভাত খাওয়ার সময় কথা বলবে না । অফিসে যাওয়ার সময় চেয়ে দেখবে না । মেয়েদের বায়না শুনে হাসবে না ।

সব হিসেব করা জানা কথা ।

আগে অভিমান হোত । এখন গায়ে লাগে না । গায়ের কাপড় সামলে উঠে ঘরে ঢুকলো প্রতিমা ।

ছোট মেয়েটা কান্না জুড়ে দিয়েছে ।

তাক থেকে ড্রিয়িং বইটা আনতে গিয়ে ফটোটা চোখে পড়ে গেলো । এ ফটো এখানে কেন ? কে বসালো ?

নিশ্চয়ই গৌতমের কাণ্ড । সকালে তাহলে এই নিয়েই ছিলো !

গাটা শির-শির করে উঠলো প্রতিমার । গালে এক ঝলক রক্তের ছোপও পড়লো বোধহয় । ড্রেসিং টেবিলটার লম্বা আয়নায় যা চেয়ে পারলো না । উল্টো তাকে ফটোশুদ্ধ নিজের সমস্ত চেহারাটাই ধরা পড়লো আয়নায় ।

না—কোন মিল নেই ।

মিল থাকবে কি করে ।

আজ পর্যন্ত একটা রান্নার ঠাকুর রাখা গেলো না । দুবেলা হাঁড়ি ঠেলে মেয়েদের কাঁথা-জামা কেচে বেলা তিনটের ভাত খেলে আর শরীর থাকে কারোর ? তারপর পান থেকে চুন খসলে তো কথাই নেই ! চাকরীর একঘেয়ে । চীৎকার-চন্নাবাজীতে পাড়ার

লোক জড়ো হয়। আত্ম থাকে না। ঘরের খবর বাইরে জানাজানি হয়। অথচ এই ছয়মাসে না পেলো একটা সিনেমা দেখার সময় বা একটুখানি ঘুরেফিরে স্বাধীনভাবে দোকান-পাট করার ফুরসৎ। এ বয়সে কে যা কি করে?

সেদিন গড়িয়াহাটায় মোড় দিয়ে বাপের বাড়ীর পথে যেতে দেখলো তো কত। এই যে গণ্ডায় গণ্ডায় নানা বয়সী ঝুরঝুরে ঝিন্‌ঝিনে নানারকমের মেয়ের পাল পেখম তুলে দোকানে দোকানে পথে পথে ভীড় করে চলে তাদের কি ঘর নেই—সংসার নেই? না—থাকলেও করে না?

সে যাই হোক কটোর মুখের হাসিটা বড় ভালো লাগলো না প্রতিমার। যেন তাকেই বিদ্রূপ করছে।

প্রতিমার এই কটোটা যখন তোলা হোল তখন সেও আর পাঁচটা মেয়ের মতন ফুর ফুর করে দোকানে দোকানে কিছু না কিনেও ঘুরতো। কিছু না কিনলেও খাতির করে দোকানীরা আগ্রহ নিয়ে বসাত—পাঁচটা রং-বেরংয়ের জিনিস ঘাঁটাঘাঁটি করতে দিতো।

আজকাল আবার যেতেও ভরসা হয় না। দোকানীরা কেয়ার করে না।

মানুষের চেহারাটাই এখন সব। যে যতো মোটা তার খাতির ততো বেশী। সেই মোটা হতে পারলো না প্রতিমা।

গৌতম কেন জানি ঐ কটোটাকেই নাড়াচাড়া সুরু করেছে আজকাল।

অন্যান্য প্রতিমাকে দেখেও দেখে না।

নিজের কটোর দিকে গভীর ভাবে চেয়ে রইলো প্রতিমা। ছোট মেয়ের কান্না কানে গেলো না।

তা গর্ব হয় বই কি। অপরিচিত লোকে কটো দেখে তারিফ না করে পারে না। গৌতমের মত ক্লাস টু গেজেটেড অফিসারের উপযুক্ত স্ত্রী বলে ভাবতে কারোর বেগ পেতে হয় না। নিত্য দুবেলা হাড়ি ঠেলে প্রতিমা—কটো দেখে কে বলবে একথা?

না হয় গৌতম শিক্ষিত উপযুক্ত। প্রতিমাই বা কম যায় কিসে? এই কটোটাই তো তার সাক্ষী। হতে পারে সে শুধুই ম্যাট্রিক—কিন্তু রূপ তো ছিলো। তবে দু'বেলা হাঁড়ি ঠেলতে হবে কেন? আর হাঁড়ি ঠেলতেই যদি হয় তবে এতো অবজ্ঞা আর উপেক্ষাই বা কেন?

অফিসার হয়ে গৌতমই বা কি করতে পারলো এমন?

তবে এতো রাগ কেন? যার এতো রাগ তার সংসার করা কেন?

যেখানে সেখানে যেমন তেমন করে কটোটা রাখলেই হোল?

কি স্বার্থপর গৌতম।

হঠাৎ একটা গভীর মমতায় তুলে নিলো নিজের কটোটা প্রতিমা। তারপর চেয়ারে উঠে দেয়ালের গায়ে আবার ঝুলিয়ে দিলো তাকে।

তিল-ফিল কিছু তার চোখে পড়লো না। এলো-মেলো খণ্ডিত চিন্তার ঘূর্ণাবর্তে চোখ কাপসা হয়ে এলো।

অথচ কাঁদতেও পারে বাচ্চাটা! রূপ গুণ সংসার বোঝে না। সে সব মাথায় তুলে তার কান্না থামাতে হয়।

বিরক্ত হয়ে ফিডিং বটলটা আনতে গেলো প্রতিমা।

বাবা ডাকলেন: বউমা দেখোতো বাইরে কে ডাকছেন।

কি বিপদ! নিশ্চয়ই অফিসের কেউ হবে।

এই অবস্থায় এই মসলা ধোয়া কাপড়ে সামনে যাওয়া যায় না। জানতে পারলে গৌতম চেঁচিয়ে যা তা করে ছাড়বে। এ ব্যাপারে তার প্রেস্টিজ জ্ঞানটা বড় টন টনে।

ছেলেকে পাঠিয়ে দিয়ে রান্না ঘরে গিয়ে এক রকম লুকোল প্রতিমা। নিতান্ত দুভাগা। গৌতম ফিরলো আবার ঠিক এই সময়েই। অফিসার মানুষ। একে হাতে বাজারের থলো তায় প্রতিমার শাড়ীতে রান্নার শত কোল-ঝলসার দাগ ভরা।

ভ্রূ কুঁচকোল গৌতম।

অথচ লোকটাকে স্বাগত না জানিয়ে রেহাই নেই। প্রতিপত্তি, প্রভাব, যোগাযোগ সবই আছে লোকটার। এ সব লোককে হাতে-বশে রাখতে হয়। যা দিনকাল পড়েছে! বিরক্ত হলেও অমায়িক হাসিতে ফেটে পড়লো গৌতম: আও ভাই কেবল-কিষণ! সুবে সুবে ইয়ে বাজার বা ঝামেলায়ে কাঁহা গিয়া।

পাঞ্জাবী সহকর্মী। ক্ষমতাশীল লোক। নতুন

বন্ধুটীতে এসে আলাপ হয়েছে। একেবারে বাড়ীতে দেখা করতে এসেছে। ঘরে এনে বোকালো গৌতম। অন্য কোন ফালতু বসবার ঘর নেই। দাঁত কামড়ে অসুবিধা উড়িয়ে দিতে হয়।

ভারিক্কি লোকের দাড়া পেয়ে বাচ্চটাকে নিয়ে আগেই কোণে রাখার ঘরটায় ঢুকে পড়েছে প্রতিমা। অভ্যাস হয়ে গেছে।

: আরে বা :—তোমারা ঘর তো বহুৎ আচ্ছা হ্যায়।

ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে খাটের ওপর ছেলে বসে হেঁউ হেঁউ করে যেন বলল কেবল কিষেণ।

: আউর ইয়ে ফটো কিস্‌কো ?

যে আসে তারই আগে নজরে পড়ে প্রতিমার ফটোটাকে।

: বাই বেটার হাফ ব্রাদার !

কেমন যেনো একটা গর্ব বোধ করলো গৌতম।

সুৎকুতে চোখ নামিয়ে আনলো কেবলকিষেণ। য়ানু লোক। সামলে নিলো সঙ্গেই। মুখার্জী অর্থাৎ গৌতম মুখার্জী মামুলী বাঙ্গালী নেহি। উস্‌কা বিবিকা ভি বাঙ্গালীসে এ্যায়সাই য়ালুর হোতা হ্যায়।

: ছেরা বৈঠো কেবল কিষেণ—বিবিতো আভি ঘরমে নেহি হ্যায়। নোকর বাচ্চাকোৎ ভি কাচা গিরা পাক্কা নেহি !

: হা-এ্যায়সাই হোতা হ্যায় আজকাল। নোকর নেহি মিলতা। বহুৎ আফশোস কি বাত হ্যায় কি তোমারা বিবিকা সাত নোলাকাত নেহি হুয়া ! একরোজ দোনো মিলকে আ যাও না হামারা ঘর মে। হামারা ওয়াইফ ভি এ্যায়সাই বোলতা হ্যায়। উস্‌কো তো বহুৎই খুস্‌ হোগা।

নিতান্ত সরল অমায়িকতাই মনে হোল কেবল-কিষেণের কথার ধরণে।

তবে ওর ওয়াইফের নামে দমে গেলো গৌতম। ভদ্রমহিলা ভুঁড়ি নিয়ে বেজায় মোটা জানিয়েল। তার ওপর বাকপটু জাহাবাজ অদস্তুর ধূর্ত মহিলা। কথা টেনে বের করেন।

প্রতিমাকে নিয়ে সেই কেবলকিষেণের গিন্নীর দ্বারস্থ হওয়ার কথা ভাবতেও গাটার কটা দিয়ে ওঠে। কেবল-কিষেণ তো টাঙ্গানো ফটোর প্রতিমাকেই দেখে গেলো। আসল প্রতিমাকে তো ধাপ্পা দিয়ে লুকিয়েই রাখতে হোল। সেই প্রতিমাকে দেখলে কি আর কেবল-কিষেণই যেতে বলতো ? না খাতির বাড়তো ?

এ সব লোকের কাছে ছোট হলে চলে না। সমানে পাল্লা দিয়ে চাই কি ওপর-ওঠা টেক্কা মেরে বশ করে ফেলতে হয়। ফালতু লোককে, হীনমন্য চেহারাকে কেউ মানে না। চাকরী জীবনে বরাবর দেখে এলো গৌতম। হোক না সে অফিসার মাথাওয়ালা লোক। চেহারায় সাজগোজে ভার না থাকলে কাটে না।

: চা ভাই মেরাল রাখনা জারেগা একরোজ।

উঠতে উঠতে বলল কেবলকিষেণ।

: ও-সিয়োর ! ওয়েল'ব্রাদার হোপ টু মিট এগেন ! গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলো গৌতম।

না পাঞ্জাবী মহলে কথাটা আলোচনা হবেই। গৌতমের ওয়াইফ রিয়েলি চারমিং !

আধপোড়া সিগারেটটার শেষ টান দিয়ে একটা ঠাসকা খুশীর তরলতাপ ঘরে ঢুকলো গৌতম।

কিন্তু কি করছে কি প্রতিমা ?

বসলা মাখা শাড়ীর আচলটা টেনে জড়িয়ে নিয়েছে কোমরে। পাতলা সবুজ ব্লাউজটা ঠেলে বেরিয়েছে বুক কুঁয়ে। শুকনো দেহের রুক্ষতায় আর শাড়ী ব্লাউজের টানা হেঁচায় কেমন উদ্ভ্রান্ত দেখালো প্রতিমাকে।

একটা রুক্ষ শুকনো সৌন্দর্য। ঠিক পাইন গাছের মতো। শিলং-এর রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে যেমন মনে হয়।

কি হয়েছে কে জানে। হা করে চেয়ে রইলো গৌতম। ফটো নামাচ্ছে প্রতিমা।

: দেবো দূর করে দেবো এই ফটো ! এইটের জন্যই যতো অশান্তি ! ফোঁস্‌ ফোঁস্‌ করতে লাগলো প্রতিমা। উদ্যত নাগিনী।

: আমি যেন একটা মানুষ না ! কি—না বিবি ঘরমে নেহি হ্যায় ! আমি লোকের সামনে গেলে বাবুর মান যায় !

গজ গজ করতে করতে একটা ঠেলা মেরে দড়িটা পেরেকের ওপর তুলে ফটোটা নামিয়ে ফেললো প্রতিমা।

এই দেখো! কি করছো কি? আবার ভূত চেপেছে মাথায়?

চা হা করে উঠলো গৌতম।

ভূত চাপবে না তো কি? নিজের স্ত্রীকে কে এমন হেনস্তা করে শুনি? আমি না হয় গণ্ডমূর্খ। নিজেতো শিক্ষিত। তার কি এই পরিচয়? এই যে আমার চেহারার এই হাল—এর জন্য কি শুধু আমিই দায়ী? আজকাল ছেলেরা বউদের জন্যে কত কি করে। আর তুমি? শুধু নিজের সুবিধাটুকু নিয়েই রইলে। স্বার্থপর। মানুষের সহ্যেরও একটা সীমা আছে। আজ এর একটা হেস্তনেস্তো করে তবে ছাড়বো।

চেঁচাতে চেঁচাতে দুম করে খাটের ওপর থেকে ফটো নিয়ে লাফ দিয়ে পড়লো প্রতিমা। উদ্ধত বুকটা নড়ে চড়ে উঠলো। উদ্দেশ্য খারাপ। কি করে বসে কে জানে। শংকিত হলো গৌতম।

দৌড়ে গিয়ে জাপটে ধরলো প্রতিমাকে। একটা ঘূর্ণিত ধস্তাধস্তি। গাটা ঝি ঝি করে উঠলো প্রতিমার।

: ছাড়ো শিগগীর!

দুহাতে ফটোটা চেপে ধরে একটা ঝটকা মারলো প্রতিমা।

: না ছাড়বো না। কি করতে পারো দেখি!

হাসতে হাসতে হঠাৎ গলে পড়লো গৌতম।

: আবার হাসি! লজ্জা করে না? একটা ভণ্ড!

বিরক্তিতে ঠেলে বেরোতে চাইলো প্রতিমা গৌতমের শক্ত পেষণ থেকে। হায় সর্বনাশ! পাড়ে পা আটকে গেলো কি করে। হুমড়ি খেয়ে পড়লো দু'জনে। সঙ্গে সঙ্গে ফটোটাও।

: ভেঙ্গেই ছাড়লে শেষ পর্যন্ত! একটা সিঙ্গোর-জ্বালিয়ে খেলে চিরকাল!

চোঁচিয়ে কেটে পড়লো গৌতম।

ভগ্ন ফটো—বিদীর্ণ রূপ।

ধক ধক করে উঠলো প্রতিমার বুকটা। ফটোটাকে ভাঙ্গতে তো সত্যিই আর সে চায় নি। তবে রোষ একটা কিছু যে হয়েছিল সে কথা ঠিক। তাই বলে গৌতমই বা এমন দাঙ্গাবাজি করতে গেলো কেন? কিন্তু কে বুঝবে এ কথা?

আক্রোশে মনটা হাহাকার করে উঠলো প্রতিমার।

তা হোক গে। যা হয়েছে ভালোই হয়েছে। উচিত শিক্ষা হয়েছে লোকটার।

ফটোতে রূপ লাগিয়ে বেঁচে থেকে কি লাভ? যদি জীবন্ত না বাঁচা যায়?

ভেঙ্গেছে ভালোই হয়েছে। আপদ গেছে।

কিন্তু মন মানে কই? থাকার মধ্যে তো ঐ একটা ফটোই ছিলো।

লোক দেখে প্রশংসা করতো। নিজের মনের গহনে সযত্ন ছাপিয়ে সেই রূপ কেন্দ্র বিন্দু হয়ে জ্বলতো।

সেই ফটোটা ভাঙ্গলো!

আক্রোশ কার না হয়?

: তোমার জন্যই তো ভাঙ্গলো!

বলতে গিয়ে গলাটা ধরে এলো প্রতিমার। কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো ওর চোখের কোণ বেয়ে গালের ওপর।

: তা তো বলবেই!

মুখটা ঘুরিয়ে নিলো গৌতম। ফটোটা চোখে পড়ে। বিদীর্ণ কাঁচের ভেতর রেখার রেখায় কেমন বিচিত্র বীভৎস ছবির মুখটা। আচমকা সত্যকার প্রতিমাই মনে হোল। শুকনো গালে চোখের কোল-বসা কালি মেরে যাওয়া প্রতিমাকে রাগলে আজকাল ঐ বিদীর্ণ ফটোর মতই দেখায়।

এক একটা সময় আসে যখন সমস্তই একাকার হয়ে যায়। এই মুহূর্তটা সেই রকমের।

ভুলে গেলো গৌতম সে অফিসার। আর ঐ বিদীর্ণ ফটোটা সেই অফিসারের স্ত্রী।

অসীম মমতায় ভরে গেলো গৌতমের মন। অফিসার নয়—সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক মমতা।

ভাঙ্গা কাঁচের ছড়ানো টুকরোগুলো খুঁজে খুঁজে একত্র করতে বসলো গৌতম।

না ভালোই হোল। এমনিতেই ধুলো জমে জমে ঝাপসা হয়ে গিয়েছিলো। ফ্রেমটা ঠিক আছে।

নতুন করে আরেকটা কাঁচ বসালেই হবে।

সর্বভাষা কবি সম্মেলন

অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়

ইয়োরোপ, আমেরিকার যে কোন অঞ্চলে আজকের দিনে বেতার অনুষ্ঠান জাতীয় জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, জাতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে বেতারের অবদান অফুরন্ত। লণ্ডনের বি বি সি গত পঞ্চাশ বছরেরও বেশী কাল ধরে ইংলণ্ডের সাহিত্য, সংগীত, শিল্পচর্চা, বিজ্ঞান অনুশীলন, নাটক ও অভিনয় নৈপুণ্যের যে সৃজনশীল পীঠভূমি হয়ে রয়েছে, শুধু তাই নয়, বি বি সি যেন বিগত পঞ্চাশ বছরের ইংলণ্ডের সংস্কৃতির মানস মুকুর, বি বি সির সুবিস্তৃত ও বহু বিচিত্র অনুষ্ঠানসূচী যেন সাম্প্রতিককালের ইংরেজী সমাজ ও সংস্কৃতিকে উপযুক্ত ছাঁচে ঢেলে দেখেছে। কিন্তু আমাদের দেশের অল ইণ্ডিয়া রেডিওর বেলায় এ কথা কখনো বলা যাবে না যে অল ইণ্ডিয়া রেডিও কোনও প্রকারে, কোনও ভাবে ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে উজ্জীবিত করেছে। অথচ ভারতবর্ষের মতো বহু বৈচিত্র্যময় দেশে শুধু মাত্র প্রথম শ্রেণীর অনুষ্ঠান পরিবেশন করা নয়, অল ইণ্ডিয়া রেডিওর বহু শিল্প বস্তু সৃষ্টি করার সম্ভাবনাও কত সুপ্রচুর। ভারতের প্রতিটি অঞ্চল নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ। রাজস্থানের লোকগীতি, হিমাচল প্রদেশের লৌকিক কিংবদন্তী ও কাহিনী, পাঞ্জাবের লোক নৃত্য, তারপর কেরল মাদ্রাজ অন্ধ্রের বিশ্ব বিখ্যাত কথাকলি, ভরত নাট্যম্ ও কুচিপুড়ী নাচ, দক্ষিণ ভারতের সরস রমণীয় দেবদেউলগুলোকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠা পূজা, আরতি ও দেব বিগ্রহের বেশ করণের ঐতিহ্য, বিভিন্ন দেবদেউলের সেই সব বিস্ময়কর সংগীত স্তম্ভ (পর পর স্তম্ভগুলোর উপর কাঠি দিয়ে ঘা দিয়ে গেলে সা রে গা মা পা ধা নি ধনি অনুরণিত হয়) আর লোকচক্ষুর অন্তরালে দেবদাসীদের গোপন সাধনা, আবার এদিকে মণিপুরী নাচ, আসামের আদিবাসীদের ঐতিহ্য, বাংলাদেশের কীর্তন গম্ভীরা বাউল ভাটিয়ালী ধামালী পাঁচালী ছড়ার রাজকীয় সম্পদ, উত্তর ভারতের নবাবী সংস্কৃতি ও বাদশাহী যুগের সংগীত ও চিত্রকলার রেওয়াজ, মথুরা বৃন্দাবন আগ্রা আলিগড় মীরাটের পেশাদারী শিল্পী আভিজাত্য, কাশী গয়া অযোধ্যা হরিদ্বার হৃষিকেশে উজ্জ্বল ভক্তিরসের ভাববন্যা, অজন্তা ইলোরা বাঘ সাঁচী ভারহুতের অনিন্দ্যসুন্দর সব গুহাচিত্র আর শিল্প কর্ম শুধু মাত্র ভারতবর্ষের নয়, সমস্ত পৃথিবীর মনুষ্য সমাজের গর্বের বস্তু। এই সব বিষয়গুলোর উপর ভিত্তি করে কত সব তথ্য নির্ভর ও প্রভূত আনন্দোদ্দীপক অনুষ্ঠানসূচীই না অল ইণ্ডিয়া রেডিও সংকলন ও সম্প্রচার করতে পারেন। ভারতের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ধারার যথাযথ ভাবে পরিশীলন ও অনুশীলন অল ইণ্ডিয়া রেডিওর জাতীয় কর্তব্যও বটে, কিন্তু খুবই দুঃখের বিষয় আমাদের নিজস্ব সরকারের বেতার বিভাগ এখনো পর্যন্ত এই ক্ষেত্রে তেমন উল্লেখযোগ্য কিছুই করে উঠতে পারে নি। কেন করে উঠতে পারে নি তার কারণ অনেক। প্রভূত পরিমাণে সরকারী

অর্থ ব্যয় করে, নানা ধরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করে ও প্রতিটি ছোট খাটো বিষয়ের জন্যও কমিটি বসিয়ে, কমিশন আহ্বান করে, সুবিজ্ঞ বিশেষজ্ঞদের ডেকেও যাহা যাহার তাহা আজো অবধি তেপান্তর তরেই রয়ে গিয়েছে। বেতার বিভাগের অকৃতকার্যতার বহু কারণের মধ্যে খুবই লক্ষণীয় কারণ হলো স্বজন পোষণের নিদর্শক প্রবৃত্তি, তোষামোদ-প্রিয়তা, কুৎসিত চাটুকারিতা ও পদলেহন অভ্যাসকে আরো শানানো করে, মদত যুগিয়ে ও দালালীকে বেশ জমিয়ে প্রশ্রয় দেওয়া। এই পরিবেশ কি কখনো সুকুমার চারু শিল্পের সৃজনভূমি হতে পারে?

জনসাধারণের প্রয়োজনের দিক থেকে অল ইণ্ডিয়া রেডিওর সব চেয়ে বড় কাজ হল সংবাদ সম্প্রচার। ভারতের প্রতিটি আঞ্চলিক ভাষা ও অনেকগুলো বিদেশী ভাষা মিলিয়ে সবশুদ্ধ ছেচল্লিশটি ভাষায় প্রতিদিন অল ইণ্ডিয়া রেডিও থেকে সংবাদ প্রচারিত হয়ে থাকে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্যমান প্রায় ত্রিশটি বেতার ষ্টেশন থেকে বেতারের মূল কেন্দ্র নিউ দিল্লী থেকে প্রচারিত সংবাদ আবার পুনঃ সম্প্রচারিত হয়ে থাকে। সাধারণত ইংরেজীতে ও প্রতিটি বেতার কেন্দ্র যে অঞ্চলে বিদ্যমান সেই কেন্দ্রের আঞ্চলিক ভাষায় সংবাদ সম্প্রচারিত হয়। আকাশ বাণীর এই সংবাদ সম্প্রচারের সত্যিকারের একটি সার্থক উপযোগিতা ব্রডকাস্টিং-এর ভাষায় যাকে বলা হয় ইউটিলিটি ভ্যালু তা আছে। আকাশ-বাণীর সংবাদ সম্প্রচারের যে ব্যাপক ও বহুধা বিস্তৃত কার্যক্রম এর ছক তৈরি হয় বিগত যুদ্ধকালীন সময় থেকে। ১৯৩৯ সালের আগস্ট সেপ্টেম্বর থেকেই তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধ প্রতিরোধকারী প্রচার-মূলক চর্চার জন্য অল ইণ্ডিয়া রেডিওকে পুরোপুরি ভাবে কাজে লাগানোর জন্য তৎপর হয়ে উঠেন এবং সেই সময় থেকেই সুরু হয় ইংরেজী ও ফরাসী, জার্মান, রাশিয়ান, চীনা, জাপানী, সঙ্কেতী, বর্মীজ, মালয়ী, সিংহলী প্রভৃতি বিদেশী ভাষায় এবং ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় দেশী বিদেশী নানা সংবাদ সম্প্রচারের একনিষ্ঠ অনুশীলন। অল ইণ্ডিয়া রেডিও থেকে দেশী বিদেশী সংবাদ সম্প্রচার সম্পর্কে প্রথম যুগে কথা উঠেছিল, দেশের লোকে যখন ইংরেজী ও নানা ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত দৈনিক সংবাদপত্র প্রতিদিন পাঠ করছে, সেই অবস্থায় বেতার সংবাদ শ্রোতারা আগ্রহ সহকারে আর শুনবে কেন? অথবা যারা বার্তাভুক্ তারা তো খবরের কাগজেই দেশ বিদেশের খবর রোজ পড়ছে, অহরহ খবরাখবর জানছে, তাদের আর রেডিও খুলে খবর শোনার প্রয়োজন কি? কিন্তু ধীরে ধীরে দেখা গেল বিচিত্র মানুষের মানসিক রুচি। যে খবর তারা সংবাদপত্রে পাঠ করে, সে খবরই তারা আবার রেডিও খুলে কানে শুনতে চায়। অথবা বেতার সম্প্রচারে যে খবর তারা কানে শোনে সে খবরই আবার তারা ছাপার হরফে দেখতে চায়, দেখে তৃপ্তি পায়। কাজেই বেতারের সংবাদ সম্প্রচার দৈনিক সংবাদ পত্রের প্রতিযোগী না হয়ে তার পরিপূরকই হয়ে দাঁড়াল।

সংবাদ সম্প্রচারের দিকটা এখন পর্যন্ত আকাশবাণীর অন্যতম সার্থক প্রচেষ্টা, কিন্তু নাটক, কথা, ভাষণ, কবিতা ও সংগীত প্রচারের ক্ষেত্রে আকাশবাণীর ত্রুটির অন্ত নেই। বিগত আট নয় বৎসর ধরে আকাশবাণী থেকে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে নানান্ ধরণের অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সেরা শিল্পীদের সারা ভারতবর্ষের শ্রোতা সাধারণের সামনে উপস্থাপিত করা এবং এক এক অঞ্চলের এক একটি বিশেষ ক্ষেত্রে যে বৈশিষ্ট্য, যে অনুপম বৈচিত্র্য সেই সম্পর্কে দেশের সকল অঞ্চলের সমস্ত শ্রেণীর শ্রোতাদের অবহিত করে তোলাই হল এই সব সর্বভারতীয় অনুষ্ঠানগুলোর মূল উদ্দেশ্য। প্রতি মাসের প্রত্যেকটি শনিবার রাত সাড়ে নয়টায় নিয়মিত ভাবে সম্প্রচারিত কণ্ঠ ও যন্ত্র সংগীতের রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান, উল্লেখযোগ্য নানা ধরণের বিষয়বস্তুকে উপজীব্য করে সম্প্রচারিত ন্যাশনাল প্রোগ্রাম অব্ টকস্ (রাষ্ট্রীয় কথিকা অনুষ্ঠান), সর্বভারতীয় নাটক অনুষ্ঠান তারপর রেডিও সংগীত সম্মেলন, বেতার সপ্তাহ, সাহিত্য সমারোহ, আকাশবাণী কবি সম্মেলন ইত্যাদি সারা ভারত ব্যাপী প্রচারিত বাৎসরিক অনুষ্ঠানগুলো সাম্প্রতিক কালের মধ্যে বিশেষ ভাবে সুধী জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

বার্ষিক অনুষ্ঠানগুলো প্রথম অবস্থায় যে ভাবে শ্রোতাসাধারণের প্রচুর প্রশংসা আর অভিনন্দন লাভ করেছিল, সেই তুলনায় গত দুই তিন বৎসর ধরে এদের আকর্ষণ অনেক হ্রাস পেয়েছে, এদের বৈচিত্র্যও অনেক ম্লান হয়েছে। কেন এমন হয়েছে তার বহু কারণের মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য কারণ হল বেতারের অনুষ্ঠান পরিকল্পনাকারী ও প্রযোজকগোষ্ঠীদের সেই মজ্জাগত 'শাসিকতা', স্বজন পোষণ প্রবৃত্তি আর সেই চিরদিনের দলগত ব্যাপার। প্রতিটি সর্বভারতীয় ভিত্তিতে পরিকল্পিত বার্ষিক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করার জন্য প্রতিটি আঞ্চলিক বেতার কেন্দ্র যে সকল শিল্পী কবি সাহিত্যিকদের নাম প্রস্তাব করে পাঠান, কখনোই তাঁরা সেই সেই অঞ্চলের শিল্পী জনের মধ্যে প্রতিভূ স্থানীয় নন, দুই একটি ক্ষেত্রে ক্বচিৎ দুই একটি ব্যতিক্রম ছাড়া। তাই বেতার অনুষ্ঠান বৈচিত্র্যের এই অবনতি!

১৯৫৪ র প্রজাতন্ত্র দিবসের পূর্ব দিন রাত্রিতে আকাশ বাণী কবি সম্মেলনের সমস্ত ভারতবর্ষের প্রতিটি আঞ্চলিক ভাষার অন্যতম প্রখ্যাতনামা কবির স্বরচিত কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান প্রথম অধিবেশন হয়। সেই বছর থেকে প্রতি বছরেরই প্রজাতন্ত্র দিবস পূর্ব দিন এই কবি সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয়ে আসছে। প্রথম অবস্থায় যা ছিল একটি সর্বভারতীয় ভিত্তিতে পরিকল্পিত অনুপম বৈচিত্র্যময় মহতী অনুষ্ঠান, ক্রমে তা নিতান্তই ঘরুয়ী, একেবারে সাধারণ পর্যায়ের তথাকথিত "রেডিও প্রোগ্রাম" হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ, প্রতিটি আঞ্চলিক বেতারকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত পরিকল্পক দিল্লীর খোদ দপ্তরের স্টুডিয়ো থেকে স্বরচিত কবিতা পাঠের জন্য যে "কবিকে" পাঠিয়েছেন, তিনি তাঁরই মনোনীত "কবি"। কবির কাব্য সৃষ্টি সম্পর্কে দেশের পাঠক সাধারণের রুচি ও মনের প্রতিক্রিয়া যাই হোক না কেন, কবির কবিতা রেডিওর টিকসু প্রোডিউসারের ভালো লাগলেই হল, কবি তাঁর স্ব-গোষ্ঠীর একজন হলেই হল। শুনতে পাই দিল্লীর মূল বেতার কেন্দ্র থেকে প্রজাতন্ত্র দিবস পূর্ব দিনের মহতী কবি সভায় স্বরচিত কবিতা পাঠের জন্য একাধিক বার আমন্ত্রিত হয়েও কবি বিষ্ণু দে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছেন।

এ বছরের কবি সম্মেলনে (১৯৬১, ২৬শে জানুয়ারী) হতাশ হয়েছি অনেক অক্ষম কবির কবিতা পাঠ শুনে। বরাবরকার মতো এ বছরেও প্রতিটি সংবিধান স্বীকৃত ভারতীয় ভাষার একজন ক'রে প্রখ্যাতনামা কবি স্বরচিত কবিতা পাঠ ক'রে শোনান। প্রথমেই কবি কালিদাসের "কুমার সম্ভবম্" মহাকাব্য থেকে হিমালয় বর্ণন অংশটি সংস্কৃত কবিতার নিদর্শন হিসেবে আবৃত্তি ক'রে শোনান জানকীবল্লভ শাস্ত্রী। জানকীবল্লভ তারপর আবার কালিদাস থেকে আবৃত্তি করা অংশটুকুর তাঁর নিজের করা হিন্দী কাব্যানুবাদ শোনালেন। এরপর অসমীয়া ভাষায় "প্রতিদান" নামে কবিতা শোনালেন সৈয়দ আবদুল মালিক, "মুঁ আসছি" নামে ওড়িয়া কবিতা পড়ে শোনালেন ওড়িয়া মহিলা কবি শ্রীমতী তুলসী দাস। এরপর উর্দুতে একটি স্বরচিত গজল পড়ে শোনালেন শ্রীআনন্দ নারায়ণ 'মুল্লা', তারপর ক্রমান্বয়ে কানাড়া ভাষায় স্বরচিত "দীপাবতার", কাশ্মিরী কবিতা "সুনুন তা জিন্দাগী," গুজরাতী কবিতা "ভাদালো," তামিল কবিতা "আন্নাই জগদম্বিকাই" তেলেগু কবিতা "নিবেদন," পাঞ্জাবী কবিতা "অমর হরাতী," বাংলা কবিতা "পাথরের ফুল," মারাঠী "বাহুল্য," মালয়ালাম কবিতা "চুভন্নিপ্পে লোকম্" পড়ে শোনালেন যথাক্রমে শ্রীবিশ্বম্ভর মজাদী, শ্রীমুক্তাকুক্কর আত্রেয়, শ্রীবাল মুকুন্দ ভাভে, শ্রীজি, আপ্পুলিপ্পম, শ্রীকাটুরী ভেঙ্কটেশ্বর রাও শ্রীতখৎ সিং, শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক মহেশ পত্তগাওকর ও শ্রীজি. কুমার পিল্লাই। সব শেষে দুইজন প্রতিষ্ঠাবান হিন্দী কবি ভগবতী চরণ বর্মা "জীবন যাত্রী" নামে কবিতা এবং ভবানী প্রসাদ মিশ্র "কবিতাকে যাচক সে" নামে কবিতা পড়ে শোনালেন। এ বছরের কবি সম্মেলনে পঠিত বিভিন্ন ভাষার কবি কুলের মধ্যে অনেকেরই স্বরচিত কবিতা একান্ত নিম্ন পর্যায়ের কবিতা, কবিতার গন্ধমাত্র শূন্য, বিষয়বস্তু খাপ ছাড়া, কোথাও কোথাও ভাবালুতার বাষ্পে ঠাসা। কি রকমের কবিতা কবি সম্মেলনে পড়া হয়েছিল, তার অন্যতম নজীর হিসেবে প্রথমেই ভবানী প্রসাদ মিশ্রের "কবিতা কে যাচক সে" শীর্ষক হিন্দী কবিতাটির সম্পূর্ণটা এখানে উদ্ধৃত করা হল—

আহারের পর দিনে দু'বার..

সব ঋতুতে স্বাস্থ্য লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়

দু' চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চামচ মহাদ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন) সেবনে আপনার স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে। পুরাতন মহাদ্রাক্ষারিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সর্দ্দি, কাসি, শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ ক'রতে অত্যধিক ফলপ্রদ। মৃতসঞ্জীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বর্দ্ধক ও বলকারক টনিক। দু'টি ঔষধ একত্র সেবনে আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলব্ধ স্বাস্থ্য ও কর্ম্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে।

সুদৃঢ় স্বাস্থ্যগঠনের জন্য সাধনার অবদান

সাধনা ঔষধালয় • ঢাকা

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আয়ুর্বেদ-আচার্য্য, ৩৯, সোয়াদপাড়া রোড, কলিকাতা-৩৭

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন), এম,সি,এস, (আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

তুমহারে কবিতাঁমে হামারী হাঁয়...
কিঁউ কি হম্ ভী কহী···
হমনে ভী কবিতামেঁ তারীফ কর হ্যায় লিখ লিখ কর,
ঘুঁটয়োঁ পর
কে দেখে উতার কর
কবিতামেঁ!
প্রাচীন কবিয়োঁ নে জ্যায়সে কী থী···
কবিতামেঁ!
নহী, নহী আগে নহী
উপমা নহী হ্যায় ঠিক···
তথা ভী গলত হ্যায়
যহ তো এহসা কী হুয়া,
জ্যায়সে তানসেন কা বংশজ কোই
গায়কী কী দৃষ্টি সেঁ
গলত গলত হ্যায়।

মতলব নহী আপ সমঝে ইস কবিতা কা?
মতলব কো কবিতা কো আপনে জানা হ্যায় নিতা সম্বন্ধী।
কবিতা নগর···পঢ়ী হো অগর
দিনকর কী পুস্তক কবিতা কে বারেঁ মে আপনে
আপ কহতে হাঁয় অচ্ছী হ্যায়···
লেকিন হম কহতে হ্যায়
কবিতা বেচারী হয়
অচ্ছী হ্যায়, সুংদরী হ্যায়, বয়রী হ্যায়।
ও হো, তব তো
হম জিতনা সমঝে যে
যহ উসমে ভী গহরী হ্যায়।

ভবানী প্রসাদ মিশ্রের এই কবিতাটির চেয়ে অপেক্ষাকৃত ভালো ভগবতী চরণ বর্মার অন্য হিন্দী কবিতাটি—সেই কবিতাটির শিরোনামা হ'ল "জীবন যাত্রী"; অবশ্য "জীবন যাত্রী" কবিতাটিও উনিশ শতকের পটভূমিকায় লেখা—হিন্দী কাব্য সাহিত্য এখনো তো উনিশ শতকের উচ্ছ্বাস প্রবণতার প্রকোষ্ঠে সীমিত হয়ে রয়েছে: রোমান্টিক যুগের স্বপ্নবিলাস এখনো হিন্দী কবিদের চোখ থেকে ঘুচে যাচ্ছে'যায় নি।

ভগবতী চরণ বর্মার "জীবন যাত্রী" কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করা হ'ল:

উঁচী নীচী সংকরী
পথরীলী রাহো পর।
চলনা হ্যায় বহুত কঠিন, পিণ্ডলী ভর জাতী হ্যায়,
অউর যৌবনী ভী বন বন জাতী ছাতী হ্যায়।
বাহর আলোকিত রবি হ্যায়-শশি
হ্যায়—তারে হ্যায়
হম অপনে অন্দর আঁধিয়ারে সে হারে হ্যায়।
মন কিতনা ভারী হো
আখেঁ কিতনী নম হো
প্রাণোঁ মেঁ কাঁটো সে
চুভতে কিতনে ভ্রম হো।
পর হমকো চলনা হ্যায়—চলতে হী রহনা হ্যায়
দূর ক্ষিতিজ পর ধুন্ধলী বনকর ছোঁ যো জাতী,
অন্তহীন—লক্ষাহীন
অনজানী রাহোঁ পর।
চলনা হ্যায় বহুত কঠিন
লেকিন হম চলতে হ্যায়
উঁচী নীচী সংকরী
পথরীলী রাহো পর।
এসে হম অকসর ইস সব পর হঁস দেতে হ্যায়
ব্যাপ্ত সে নহী হমকো হঁসনে কী আদত হ্যায়।
লেসে কুট পড়তে হ্যায় অধরোঁ মেঁ
আঁখোঁ মে···
জানে কয়া হমকো রো দেনে সে নফরত হ্যায়।
লেকিন ইতনা সচ হ্যায়
বমবার মিট জানা হ্যায়
ফুলোঁ কা খিল যা হী
উনকা মুরঝানা হ্যায়।
মিট জাতে দিন হ্যায়-অউর মিট
জাতী রাত হ্যায়
বহু বহু জল জাতী-গল জাতী বরসাতে হ্যায়,
চলতী হ্যায় সাথেঁ চলতা রহতা কাল সবর
ও চলতী রহতী নিত সুখ দুখ
কী রাতেঁ হ্যায়।

কিস্ ভী হম কারেম হ্যাঁয়
হমসে ফগ কারেম হ্যায়।
বনতী মিটতী রহ কুছ ঐসী গিরী চাহোঁ পর।
চল না হ্যায় বহুত কঠিন
লেকিন হম চলতে হ্যায়,
উঁচী নীচী সংকরী
পথরীলী রাহো পর।
হমকো ভী লগতা হম কুছ বহকে বহকে হ্যায়
অপনা বিশ্বাস শিথিল-অপনা স্বর ধীমা হ্যায়,
বরফী প্রতি পগ পর জো হমসে কৈরা জাতী
বহ তো বস অপনে হী সপনোঁ কী সীমা হ্যায়।
দিক ভ্রম হ্যায় উসকা ভী
জিস্কো তো দিশা জ্ঞান।
গিরনে কা ভয় উসকো
উঁচী জিসকী উড়ান।
অনজানী দুনিয়া কা হর ক্ষণ অনজানা হ্যায়।
জীবন কা হর ক্ষণ উলঝা সা অনসুলঝা হ্যায়।
ঐসী অসীম সংস্কৃতি মেঁ কিসকা অস্তিত্ব পূর্ণক
অপনে কো খো দেনী অপনে কো পানা হ্যায়।
হম উঠতে রহতে হ্যায়
হম গিরতে রহতে হ্যায়
প্রস্ফুটিত উমংগো পর
ঘুটতী সী আঁহোঁ পর
চলনা হ্যায় বহুত কঠিন
পর হমকো চলনা হ্যায়,
উঁচী নীচী সংকরী
পথরীলী রাহো পর।

হিন্দী ও সংস্কৃত ছাড়া আরো বারোটি কবিতা পাঠ করে শোনানো হয় এই কবি সম্মেলনে। কোন ভাষার কবিতাই সত্যিকারের সার্থক সৃষ্টি নয়, কোন কবিতার মধ্যেই ছিল না উচ্চাঙ্গের কাব্যাদর্শের ব্যঞ্জনা! হিন্দী কবিতা দুইটির নিদর্শন এখানে উদ্ধৃত করা হয়েছে, অন্যান্য ভাষার কবিতাগুলোর মধ্যে তবু পাঞ্জাবী, কাশ্মিরী, গুজরাতী, কন্নড় বিশেষ করে বাংলা ভাষায় পঠিত কবিতা কয়টি ভালো, পাঠক মনে এই কয়টি ভাষার কবিতাগুলো সত্যিই যেন যথার্থ কাব্যানুভূতি সৃষ্টি করে। এখানে পর পর এই পাঁচটি ভাষার কবিতা সম্বন্ধে উদ্ধৃতি দেওয়া হল :

প্রথমেই উদ্ধৃত করা হ'ল কাশ্মিরী ভাষায় রচিত কবিতাটি।

কাশ্মিরী ভাষায় রচিত এই কবিতাটির লেখক — মুহম্মদ আজিম ;

মৌত হবস কাহ্ ক সৌখ করিহে জম গাশস নালমতি
পোশ বথরুক রং বনি শবন বুক মিরমি হাবিহে
অজনি গরদনি বলকু বিরিহে কুকলেন দুখ কোব হিরু
হা কুমির সুখ ছোট রনি অখ মিঠ লহরা আবিহে।

নাগ বাদন মেহ জায়ন আরণ কওয়ারণ রজু বুজিম,
অপরিমিস কথতাম সোহরন গাদি বুজনাবান খি জোদ,
ডল দহস পেঠ অখ দমাহ আমায় কর খচ্‌চর নজর
চুখ দিবি মৌলম দিলস অখ ষষ্ঠি দশ অখ মোহুঠ দোদ।

নাগরাজন হঞ্জু কথ তুজিম আম ওবর হায়ন বুন্ধ খেয়লি
বুহুত রিম ক্যাহ্ পাষাণ হিয় অখ ষীলিস নরম,
ছোত ওবুর হা হার হঞ্জু রোশমী বুড়নি যা জামবার,
কাল ওবুক জাল হা যা ডলপরী চন্দি পাঠা মন,

আসমানস কুন নজর কর বুঢ় দেখ তা দিগর সেট,
বুহ ম সতন রপান হুগাথ দোঞ্জুল বনা বান আকতার,
ত্রাব সপায়মলিম কুন নজর দোহে লৌসবুন সোকনা নজর,
কোদরতন মুচরাওমুচ সৌর্ হার বরকন হন্দকিতাব,

হা বাখল মোহদ অন্তর যা বেরি পেঠ রোজেখ দমা,
তাও হচ খজি নায় যে মি বখতন চওয়ান আদাল ছি আও
হল বুকুখ বুতরাচহুক মৌসবোয় হু বতা হোদ করাণ,
জন হু আসান লোস্ কুঠ অনহারি শোকুক ভীহুঠ খাব।

যারহা কিয়ুহুখ নিদাতম অখ দবালা এবিসে
যা পকুকু লসিখ খবিৎ সবজার পেঠ বনবারে জাহেঁ
বলি গহান বদনস ত সবজারস অন্দর ক্যাহ্ লেনে দেন ?
ক্যাহ বনিয়ে কাহ পান কুহ সারণ হিরোকা বোয় জাহেঁ ॥

কারিনাতুকবাড ভক্তারিব বাক্তিমারা পেচ চেতস,
শারিরস লোর ভিন্দগী চুপ শারিরস মোতচ বরাত,
চারবন হক্ক কাছমুচ মাচরেন কিছুন বরবন ছনিৎ,
তারবন চক্ক, চুনি লাগিথ মৌজ অথতাবচ বি রাও,

রাচ ছুদ নাবর চেতুমনুব-ব-দুব দিলুক লপ্দিচোম তেজ,
নাঠিনতৈন খাবন হিতুম জুর ছুন, চেচথ চরবত করনি,
কেবল বৈরী কস ছিল রোব অথ খাবন ছদিস পহরদ অন্দর
কোদরতকি খানোশ আলব পের মেঠাচ মুশকিল দরনি ।

দুশমনী ? রাবন, তমাছ, নকরত চারাচ্ খাইরে থোক
দাহলি নাসল মেক্ক ছ রুচল ছাদি আসান বেসুমত্ত,
ভিন্দগী বদলেরি খুমারা হেথ চিকন খামোদ রাত,
ছারি থক এরাম রটান অসলুক ছলম বেরথতিরার,

রাচরাদি কারী খেতালন পর গওনি পচ পাক সদ
রাচকারো গমন চন্দিদ তলাকস ছোঁক দিবুন
রাচ ছুদ কারী বেসোথ নজরন সু বদতি আলবুনি,
বিরেমী হংকাকচ পংদ তুল ছুদ ছোত কুচুন হাবান
দু বিয়োন,

জুনি চুন্দ পরতব চলান অসকল দিলুক আরাম হৈথ,
জন বহুস কাবিতাম আসান পরদুতুলমুত চাক দিখ,
পহরকেন মুমতেন পরন সলপান লুছ চিবু লীমাব চিবু,
চোল আসান নেন্দরী আবুত দিল আলাত সজ্জু দিল,

জাঁহ ছুথা বুজমুত খুবকোলবুন ন অথতাবুব খুসন,
যেলি সংগর রলিন পৈবান পরতব ত নুরচ সোথ প্রেব,
আনু সাথর জন এরাবচ আদান ছুর রাবন তাপু টেচ
রাম চেম্বন সাথর লজি খুনস অন্দর বালান ছুর দব,

জাঁহ ছুথা চিরোতমুত জা সুরিস আসলমুশিপ
জাঁহ কুথ বুছমুত টেচল খোসবুন বৌছা পিনবুনি করান,
জাঁহ ছুথা বুছমুত কাতিস তল কোকরি আবিরুল
স্মৃতি খিরোলা
জাঁহ ছুথা বুছুচ ভিন্দগী বছস তল মোর সোর করান,

কার ঘেনিবালিয়ে ছথা থ বমুচ সামন নজর,
বুছ বেরি গম নানাবারন মকুল কিথ্ কলেথ রোজান
ছির খোস
কারনাতুক তীন্ ছুম বাসান ঘর—গোরিয়োমুত লুছমুত,
কাঁহ বনী আদম ছুথুর চকরাবি বুথ থা আবি রোন,

নজরি গামুতি আসনর নিক নিক গুরন আবস অন্দর,
সোকেন সোদরন ডোলিথ ছাটি ক্যাহ মারান তল,
বুজমুত আসিয়ে কনব জাহমাহ তুলরেন ছুম্ব পরুর,
পনমির দমিরন অন্দর ক্যাহ জোর বল ছাওন ছুদিল,

বুছ ন মুদয় গতিথ হো কারীগর কতিক্ষ মারান ছ ওল,
বুছ অ হো চমর ক্যা আশরাবান আপ দোন মৌসুম বচ্চন,
বুছ ছুতেন ছুথ কুমজি মেঠ লুববুনি চাহ কুমীর
বুছ ছুনিস বনহারি হক্ক রঅথ মারিমজু ভবি হারতন,

থা করথ জিগর বনস অন্দর বেহক জাঁহ সাথ পতি,
হারি সাথর বাব চেরিবি ত্রীর ক্যাহ ছু সী সী গছান,
দোন চেহন অন্দর ছ জন লীনস গছান দরবাজ বথি
আসি মা হিআসান হি কাঁহ জংলী পরী মস বাপরান,

আংগনদ মঞ্জু আদিথর কোতর থিয়োলা কল থিয়োবভুত,
চিত্রনমুত আসি খবর ক্যাহ রাবলুক লবনুক বেরাল,
গছ দিবান ফিরুব গছ দিবান মহির কথন নোজুক কথন,
বুছ অছন রোহ ছুন থিরিরঅগ অথ চসীন তরবচ মিদাল

সোথ বারেন ছুন সেঠাহ কেঁহ কুবমুত ছহয় পারাবর,
অথ অগর ফির দিখ বুছক ছুসনুক অজোবর আলমা,
বস ইশারা অথ দিময় আগস অন্দর অছ পান বুছ,
কাজিগর ছুসনুক অদর গমু হচ খুশী খোশবুন গমা,

হোশ সান রোজ থ অগর পদরাহি রুদুখ অত্রতরংগ
সাজ বজনাবির দিলস মঞ্জু মারিমোস্থ তর পাশবুন,
দিল প্রছির রোদ পরময় নোজুক অমারন আলবথ,
দামনস রোদ ছুসন কিস পাকথ ন থক্ক বাতক ন কুন,

পরন ডালিথ হাবি নর ছুসন কি ককত কে রংগ অজ,
যার সঞ্জু তুলথা কথা তথ অহমানস দরি ন দিল,

মোখতফিদ হায়স অন্দর বলি অখ ক্যা জরুন অখ
মোখত ফোল,
কিপ কথন মঞ্জু রাবরাবির তিছ বেরদবো কিরতে দিল,

জিন্দগী হুখ্রিস মোদর তস জিন্দগী হয় লুবরুকি,
কারগাতম মঞ্জু হুর অখ অখরহু হসীন তয় যারি মঞ্জু,
চুসন চানিস না হুসনস আসুন বনাবান চুসন বুহু
দোহা তদুন্দ বেকার আমুন রেমি ন চুসনস মায় মঞ্জু

কারনাতুক চুসন হাবুমে, হায় সুন্দ অলিমুক প্রকাশ
বুহোকাচ দোবানগী তথ নাটিজারুন রকি কটি ত জান,
রিম রলাবোখ রিম ছি অখ, রিম জিন্দগী হঞ্জু
যেনি যোনন,
রোদ অখা একাব কি সাবর জিন্দগী সলাহি বোবাল।

কাশ্মিরী কবিতাটির প্রথম কয়েকটি অনুচ্ছেদের মর্মার্থ নিম্নরূপ :

হে আমার অদম্য বাসনা, তোমার আশা অন্তহীন ; জ্যোৎস্নারাতে চাঁদের মায়াকে তুমি চাও কণ্ঠে ধারণ করতে। তুমি চাও ফুলের পাপড়িতে নানা বর্ণের সমারোহ সৃষ্টি করতে, ভোরের প্রথম আলো শিশির বিন্দুতে যেমন শোভা পায়, তেমনি তুমি হতে চাও। তুমি চাও সোনালি চাঁদের ত্রীবায় পালক হতে, কোকিলের মতো কুহু কুহু আওয়াজ করতে।

আমার হৃদয় সাগরের অন্তহীন সব কথা নদীর জল-কল্লোল আর ঝরণার জলধারার স্বপনে জেগে উঠে। জলের উপর ঢেউয়ের পর ঢেউ জেগে ওঠে, ঢেউয়ের কেনায় যেন প্রেমিক হৃদয়ের বেদনার আভাস। আকাশের আঙিনায় রং বেরংয়ের মেঘের খেলা, মেঘেরা যেন সব নানা রংয়ের বসন পোশাক আসাক ; কিন্তু এই বিচিত্র বর্ণের বসন তার জন্য ? নীল পরীদের জন্য সাদা মেঘের পোশাক আর ব্যথার রাণী যে পরী তার জন্য নীল রংয়ের পোষাক।

বর্ষা থেমেছে, আকাশে সূর্য উঠেছে ; রঙীন ইন্দ্রধনু আকাশে জ্বল জ্বল করছে দিগন্তে কিরণমালা এমনি দেখাচ্ছে মনে হয় যেন প্রকৃতি পাঠ করছে সোনা রংয়ের এক পুঁথি। আজ বসন্তের সকাল, ক্ষেতে ক্ষেতে সোনা ফলেছে, হাওয়াতে ফুল কলির শিহরণ, মাটি থেকে সুগন্ধ উঠছে, মনে হয় যেন মাতৃ-কল্পনার সত্য জেগে ওঠা কোন স্বপ্ন শিশু মাত্র জন্ম লাভ করেছে।

কাশ্মিরী কবিতার পরে পাঞ্জাবী ভাষায় রচিত কবিতাটিও ভালো : কবিতাটির শিরোনামা "অমর-চন্দ্রাতী" আর এই কবিতার লেখক পাঞ্জাবী কবি ইলেন তথত্ সিং। সমস্ত কবিতাটি নীচে উদ্ধৃত করা হল :

যনা ন পহিলী কিরণ দা মাতম,
বিরহ' জী উদাস তেরা।
ইবে ছী ফুটটে হমেশ সবী
সদা ইবে ছী চড়ে সবেরা।
ইবে ছী পহিলী উষা-কিরণ নু
ন ঘার জাদা চায় রূপ হনেরা।

সদা লইখাস ত্যাগ দেবে
তুফান দা মুহরলা ছুলটা
ইবে বরেতে চ সোপ ছো তে
অগেতরী আস দী তিমক নু
নিরাশা ধুচা দে ছো কিরী বিচ
পবাচ জাবন তেঁ কোন রোকে ?

ন কর পিয়া উস কিরণ দা মাতম,
জিহদা মবুর অন্ত জিন্দগী যে,
বনা হায় জীবন দা মৌত জিন দী
সদা ভরে নাসবান জগ বিচ
বিনা শহীদী পরীখিয়া দে
অমর হয়াতী বনী হ্যায় কিন দী ?

বিরহ দে বল বেখ, কিন্তু ইস তে
নবেঁ উজালে দা নুর লহিকে
ফজুল হ্যায় সোগ রুখ দী অড় দা
ন কর পিয়া ইক কিরণ দা মাতম্
খিয়াল কর ইস কিরণ পিছাড়ী
উমড় রহে রোশনী দে হর দা।

যনা ন পহিলী কিরণ দা মাতম্
কি ইস কিরণ দী অমিট শহীদী,

' সজীব মুরত হ্যায় বীরতা কী,
মনা না পহিনী কিরণ কা মাতম্
কি ইস অদিস লোক কী পরী কা
মহান সঙ্গীত হ্যায় অনাদী.....

এই পাঞ্জাবী কবিতাটি সাধারণ পর্যায়ের পাঞ্জাবী কাব্য সাহিত্য থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সাম্প্রতিক পাঞ্জাবী কাব্য খুব বেশীরকম বস্তু-সর্বস্ব। বর্ণন, বিষয় চিত্রন, কথায় কথায় ঘটনার মিছিল এঁকে যাওয়া ইত্যাদি এখনকার পাঞ্জাবী কবিতার মুখ্য উপজীব্য। সেই জাতীয় কাব্য রচনার পরিবেশের মধ্যে এই জাতীয় গভীর ভাবনাসঙ্গের কবিতা সত্যিই বিচিত্র। এখানে তখত্ সিংয়ের "অমর ছবাতী" কবিতার ভাবার্থ দেওয়া হল :

মনে প্রথম যে ব্যথা জাগে, সে ব্যথাকে কখনো স্থায়ী বলে মানতে নেই। প্রথম অবস্থাতেই মনে যে শোক আসে, আসে ব্যথা, তা নিতান্তই সাময়িক। মানুষের মন ব্যর্থ, উদাস; প্রতিদিনই প্রভাতের আলো ফুটে উঠে, রাতের অন্ধকার কেটে গিয়ে নতুন আলো দেখা দেয়। সব সময়ই চাই আত্মত্যাগ, দুঃখী আত্মা মনুভূমিতে বিলীন হয়ে যায়। প্রথম শোনা ধ্বনিকে কেউ বন্ধ করতে পারে না। প্রথম দুঃখকে মেনে নিও না, দুঃখেই জীবন গড়া। দুঃখপূর্ণ নশ্বর জীবনে মৃত্যুই হল সঞ্জীবনী রসের আধার। জীবন বলি না দিলে অমর হওয়া যায় না। দেখ, গাছে গাছে চিকণ সবুজ পাতায় কেমন করে নতুন আলোর স্পর্শ লাগে। একটু মনোযোগ দাও, দেখতে পাবে আলোকেরই জয়।

প্রথম শোককে মনেতে নেই, তাই হল বীরত্বের দ্যোতক, তাতেই হয় জীবনের সার্থক বলিদান। এই অদৃশ্য লোক সুন্দর আর অন্তহীন সংগীতে ভরপুর।

পাঞ্জাবী কবিতাটির মতো গুজরাতী ভাষার কবিতাটিও একটি সার্থক সৃষ্টি। বিরাট এক মহীরুহ, যজ্ঞ আয়োজক এক বনস্পতিকে অবলম্বন করে রচিত এই গুজরাতী কবিতাটি। কবিতাটির মধ্যে একই সঙ্গে বক্তব্য বিষয়ের সরল বৈচিত্র্য আর ভাবময় গম্ভীর পরিবেশকে উপজীব্য করে কবিতার মুখ্য ছায়ার আলপনা পাঠক মনকে অভিভূত করে। কবিতাটির গুজরাতী নাম "বেডলী" আর কবি হলেন বালমুকুন্দ দবে। নীচে গুজরাতী কবিতাটির সম্পূর্ণটুকুর উদ্ধৃতি দেওয়া হল :

সরবরণী পালে এক বড়লী খেদুর উমী
পাছে পাছে দীলো সে কুঞ্জার।
চহাড়ে রে ছেলে বড়লী রাতে রে চড়তী বোলে
ডালে ডালে পংখীনা গুঞ্জার,
ভীতর গোপায়া এনা মূল রে রোপায়া চোসম
বেদী রে পাতালী উণ্ডী যোয়।
নীচো রে কালো বড়লী উঁচো রে কালো এনী
টীচেরে তোলায়া সারা ব্যোম।
বেলা বড়বাইযোলা এবা রে গুঞ্জারা পীলা
মমতা কেরা মরিয়া সগন।
কবিনে কবিতা আহী এবা রে খেচোয়া এনা
খড়িয়া রে লেবায়া লগন।
ঝীলা রে বীলা ক্ষেতর বাগে অদীঠা আহী
মৃগলো রে ভোলে বাঁকে শিগ।
ধনগনতো আবে মীঠো মানীসর মোহলী নে
ভালো পড়ী আবে রে মোরিংগ।
শিবয় এ কালী ঘিংগী অমর গংগানী ধারা।
রমনী রে মুকী ধরতী চোক
বড়লে ধরতীনী গংগা এবী রে উছালী ছেক
হিমালে পহোচাড়ী রাখ্যো লোক।
প্রল্লেনাং পানী জ্যা রে ভুক্কণে দুনিয়া সারী
খাবে রে জলজলমা বন্দোল।
বোংগদর বড়লো ত্যোরে অডুব্যো অড়োল উমো
অনরে থে করণে রে অংযোল।

গুজরাতী কবিতাটির বাংলা অর্থ করলে এমনি দাঁড়ায়:—

স্থির নিশ্চল মস্ত এক দীঘির ধারে দাঁড়িয়ে আছে এক বিরাট গাছ, সে গাছের পাতায় পাতায় সবুজের শ্যাম সমারোহ, সারা দিন ধরে সেখানে নানা দৃশ্যের মিছিল: সন্ধ্যার অন্ধকারে গাছ ঝিমোয়, পাখীরা কূজন করে গাছের ডালে ডালে।

মাটির ভেতর গাছের শেকড় চলে গেছে চারদিকে,

পাতাল পর্যন্ত রান্তা করে, উপরে নীচে গাছের প্রসার। বিরাট বটের বাপক সমারোহ, আকাশ ছোঁয়া তার বিস্তার। স্নিগ্ধ, শীতল মমতায় ছায়া বিছিয়েছে সেই গাছ, এই পরিবেশ লোককে আকর্ষণ করে: কবি এল, কবিতাও এসে পৌঁছুল, দুয়ের পরিণয় বন্ধন হল গাছের ছায়ায়।

শত শত রান্না হচ্ছে এখানে অদূরে। যোগসঙ্গের মৃদু গুঞ্জন এখানে, মুক্ত মন এ পরিবেশে হয় অভিভূত।

গন্ধে বিভোর হয়ে এখানে সাপ আসে, আনন্দে বিহ্বল বণিকণ্ঠ মনুষ্যেরা এখানে দুখে আনন্দে নাচতে আসে।

জটাধারী শিব যেমন গঙ্গার ধারা ধরণীর দিকে বইয়ে দিয়েছিলেন, ঠিক তেমনি এই বিরাট গাছের অসংখ্য ডাল পালাকে আশ্রয় করেও যেন জলধারা মাটির বুকে নেমে আসে।

যখন মহাপ্রলয় আসে সব কিছু বন্যার জলে ভেসে যায়, উপরে নীচে চারদিকে জল, শুধু জল; তখনো যোগীশ্বরের মতো এই অক্ষয় অমর বটবৃক্ষ স্থানুবৎ দাঁড়িয়ে থেকে প্রলয় বর্ষণের জলে স্নাত হতে থাকে।

গুজরাতী, পাঞ্জাবী ও কাশ্মিরী এই তিনটি ভাষার কবিতার মতোই কন্নড় ভাষার কবিতাটিও একটি সার্থক রচনা। কন্নড় ভাষার কবিতাটির নাম "দীপাবতার" আর কবি হলেন সিদ্ধয় স্বামী: এখানে "দীপাবতার" কবিতাটির সম্পূর্ণটা এখানে উদ্ধৃত করা হল:

হবিবনিতিহে গগন সুত্ত হত্ত কড়েগে
অলেয়বন্নবরারী অপল অগল,
নুরার দারিসল্ল হোদিয় হোগিবে পুর
বক্ক বক্কাকারে গোল গোল,
আ অনন্ত তেগে কে চাচি লাগিবু
গ্রহ গ্রহগলাচে দূর
ওন্দু বেলকিন দারি হিড়িদু সাকু
জন্মান্তরকু বিদুকন্দু তীর!

অন্তরিক্ষ দি বেলকু বরলাট বাড়িহুদু
গুহু গম্মন্তিনলি বন্ন বীরি
অন্দ হিরুদেহল্লিনিন্ন তেজোরাশি
কৈবাড়িসিরুবন্থ সূত্রধারী,
বেলকিনমরাবতিয় কুণ্ডুকোতরিসিরুবু
মুক্ত মুক্তিবে নুকু ছন্দ কন্দু
হোর লোরগে নিন্তু রবিগন্ন কুনি মিদরেণু
ই ওলগে কান বহুদেখু মন্দু।
কন্তলেয় কালকৈ বৈলকিনমুসন চিন্নকি
মেরেবেবেবেণু তিন্তু আসেহোন্তু,
কুরতনৈকো হেসি ভূমিতন্তরিসিতু
উদুরু উদুরিগু বাই বিরুত লিন্তু
কগপাল্ল কোরেদু শাসনব কেন্তিনেন্তুব
ভন্দুরব দারিদুব অহমহমিকে
ইকন্তু কণ্ডদু তন্তদেন্তুব বন্তকে
অদংকে তলে দর্প দহবাবলকে।
যে দুরেন্দবনু বিন্দ সোলু শাশ্বত মিথদু
যুগ যুগ দুল নডেদুবন্দন্তুত!
ই চিরন্তন বেলকু বন্তলেয় হোরাট
কন্দু মলকিন বাট পদুরু ইদুনু
রেতো রেতো হাগে নডেদু হোরটিদে লোক
নরলি হো বলাড়িহুদু হগলু ইরলু,
অন্যায় অধিকার কুরতন কুনি···
হাবশকিতরো নেলকে ইলিয় বহুদু
রণচণ্ডি চামুণ্ডি
দুষ্ট দর্পনকেন্দু খড়্গ পানি
হাড়িহরিসন্তু মেলিরুব দৈববাণী
কন্তলেয় লোকদোলগেন্তলু কুনি দিন্তু,
শৈতান সন্ততিয় কেকে হাকি
কুড়িদু মদোন্মত্ত
নেলেনে গর গর তিরুগি অন্তব্যস্ত।

নবরাত্রি জগলিরলি নুরু নন্দাদীপ
মনদ কালিকে কলেদু মুড়ি বন্দিদে ইল্লি
শান্তি তলসিন কিরণ বিশ্বরূপ!
বরুব বেলকনু হিড়িদু কুড়িদু বিড়ুবন্তেবে
তেরেদু নিন্তিদে জগদ অন্তরাল!
তন্ত তুটি পকলেদ'ন চলকু অবতরি সিলোদু

অরলি নিলয়ে,
বেজেগিছল ভৈরবি
নব ঘন-ঝঙ্কারি তীব্র ঝঙ্কারবাণি
অনগুতিছল শৈল্য শ্যামল দেবি
চন্দ্রিমেদলেমলন্নি চন্দ্রিনবতারবাণি
গিড় গিড়ন্দি কাই গোচল ছন্দ,
মেরেপিন্তু বেলকিন ভেরু নিশারবাণি
ভন ভাত্রে নে বেণুবন্দু—
রোম রোমগলন্নি ঝিক্ক ঝঙ্কারবাণি
কণ্ড কন্তিরে নীলি বাদিনলি বলকিসুখ
বেলক বণ্যার কলর,
মের নয়ন রগললি রসোৎকর্ষ হরুষ
মনদ মনে মনেরন্নি রেন্দ,নিতিঁরে কানো
যেনো দীপস্তম্ভ।
কন্তেলেয় কুলবেল্ল চুড়ুকিকো হুদেয়নী
রাবুদো পাতালবালাগুড়ি
কেসে কে কুড়ি মেলেরেবেকী তের
মুট্টবেকো অল্লি মাদগটিই
কণ্ঠ কণ্ঠগল জয়গাল ঘোষ
সাগি বরবেবিন্দু দোনে বাটি।

হবির নিস্তিরে গগন সুত্তু হন্তু কড়েগে
অলয় বল্লবরারো আল অগল,
নুবারু দারিগলু ছরিদু হোগিবে পুর
বক্র বিক্রাকার সোল গোল,
আ অনন্ত ভেদে কৈচাচি নিস্তিরবু
গ্রহ গ্রহগলাচে দূরে
বন্দু বেলকিন দারি হিড়িদু হোদরু সাকু
জয়ান্তরকু নিলুকদন্থ তীর।

কন্নড় ভাষায় "দীপাবতার" নামে এই কবিতাটির প্রথম কয়েকটি স্তবকের অর্থ নীচে দেওয়া হ'ল :

আকাশের বিস্তার অন্তহীন, চারদিকে সব কিছু ছড়িয়ে পড়ছে। আকাশের এই অনন্ত বিস্তারের কে পরিমাপ করতে পেরেছে? অনন্তের দিকে অসংখ্য পথ, যে কোন একটি পথ ধরে গেলেই গ্রহ মণ্ডলীর বাইরে তুমি চলে যেতে পারো। নব গ্রহের সীমানার শেষ নেই' পরিমাপ-হীন আকাশের কোন স্তরই নবগ্রহ মণ্ডলকে ধরে রাখতে পারে না। আকাশের অসীম বিস্তার দিনরাত লুকোচুরি খেলছে, কোন অদৃশ্য শক্তি যেন এই বিরাট আকাশ মণ্ডলকে ধারন করে রেখেছে। এক জন্মে নয় জন্ম জন্মান্তর ধরেও এই অসীম আকাশের কিছুই জানা যাবে না। আমরা সাধারণ চোখে আকাশের প্রকৃতির অনেক কিছুই দেখতে চাই, কিন্তু আকাশের সেই মহাজ্যোতি শুধুমাত্র হৃদয়ের গভীর অন্তর্দৃষ্টির দ্বারাই পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব। বাইরে অন্তহীন অন্ধকার, সত্যের আলোকে এই অন্ধকার ঢেকে ফেলেছে। এই পাপরূপ অন্ধকার আমাদের আশাহত করে দিচ্ছে, পৃথিবীর মাটি ত্রাহি ত্রাহি আওয়াজ তুলে চীৎকার করছে। অন্ধকারই যেন সব কিছু শাসন করছে, অন্ধকারের কোন লজ্জা নেই; অহঙ্কারের যে অন্ধকার তাই সব কিছু করছে। অহঙ্কারের শাসক অত্যন্ত অত্যাচারী, শিলালিপির উপরে খোদাই করে করে অহঙ্কারের শাসক আত্মপ্রচার করছে, নিজের কাজ সম্বন্ধে নিজেই সে জানে না। এ-ও জানে না সে যে আজকে জয়লাভ করলেই হল না, কালই হয়তো তার আবার পরাজয় হতে পারে।

আলো আর অন্ধকার, সত্য আর অসত্য, দুঃখ আর সুখের মধ্যে দিন রাতই দ্বন্দ্ব চলছে, তবু তো মানুষের প্রগতি তা'তে বন্ধ হয় নি! যখনই অন্যায় অত্যাচার খুব বেশী হয়েছে, তখনই জেগে উঠেছে কোন মহাশক্তি। অনাবৃষ্টি হলে মানুষের কত দুঃখ কষ্ট হয়, আবার যখন প্রচুর ঝড়বৃষ্টি হতে থাকে তখন মানুষের দুঃখের হয় অবসান; তেমনি মনে সব সময়ই এই আশা যেন থাকে যে অত্যাচার উৎপীড়ন যতই হোক না কেন, অত্যাচারের তীব্র পীড়নের মধ্যেও একদিন আবির্ভাব হবে সেই পরম পুরুষের, যিনি মানুষের ত্রাতা, যিনি মুক্তিদাতা।

(ক্রমশঃ)

ইউনিভার্সিটি প্রাঙ্গণের উঁচু উঁচু পারপাতের ছায়ায় বসে কথা দিয়েছিল সুকৃত—একটা হীরে কিনে দেবে সুতপাকে।

হেসে সুতপা বলেছিল—হীরে কেন, অন্য কিছু দিলেও তো চলবে?

কথাটা ঠিক বুঝতে না পেরেও উত্তর দিয়েছিল সুকৃত—না হীরেই দোব একটা। খাঁটি হীরে। আমাদের মতো কাঁচের টুকরোকে কোনদিন হীরে বলে ভুল না করো সেই জন্য।

একটা কাঁচ ভাবছে

সুতপা চৌধুরী। বড় জোর হীরের টুকরো ভাবতে পারি। হেসেছিল সুতপা।

কখন আসছো? সন্ধ্যের দিকে? জানতে চাইলো সুকৃত।

হ্যাঁ ঠিক সন্ধ্যের পর। তোমার বাসায় গিয়ে দেখা করবো!

বৌবাজারে তখন সন্ধ্যা ছুঁই ছুঁই করছে। নিওন আর ফ্লুরোসেন্ট আলোয় হাসছে দোকানগুলো।

চোখ ঝলসানো একটা জহরতের দোকানের সামনে এসে গাড়ীটা প্রথ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। জনারণ্যের ভীড় ঠেলে উচ্ছল হাসি ছড়াতে ছড়াতে এগিয়ে গেল দুটি তরুণ তরুণী।

—এইতো আমরা এসে পড়েছি সুতপা। দোকানের সামনে আসতেই চোখে পড়ল চোখ ঝলসানো মণির দ্যুতি। হীরে, চুণী, পান্নার মেলা।

সুতপার দৃষ্টি ততক্ষণ আটকে গেছে নীল ভেলভেট বাক্সে আটকানো একখণ্ড হীরের দিকে চেয়ে।

—দেখছো কেমন সুন্দর এটা?

—এর একটা আংটী বানিয়ে নিলে ভারী সুন্দর মানাবে তোমাকে। দোকান কর্মচারীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, দাম কতো পড়বে এটার?

মৃদুল হাসি হেসে দোকান কর্মচারীটি বললেন—তিনশো টাকার মতো।

সুতপা চৌধুরী। ব্যারিষ্টার সত্য চৌধুরীর মেয়ে। নগর কোলকাতার উঁচু তলার মধ্যমণি ওরা। পরণে লাল রঙের ওপর ধেবা চিকন্ সাড়ী। হাতে মণি বলয়। ব্লাউজে বন্দী আঠারোটি বসন্তের একটি যৌবন। অত্যুজ্জ্বল আলোর সামনে দাঁড়িয়ে কেমন যেন ঘুম ঘুম ভাব নেমে আসে সুকৃতের। হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করল ওর। সুতপার গোটা বরতনুতে যেন আগুন লেগেছে। সে আগুন রূপের, মাতাল যৌবনের। শুধু জ্বালাতে জানে।

শো কেসে সাজানো একটা পাথর সেটিং কুণ্ডলের বিপুল চাতুর্যের তারিফ করছিলো সুতপা। সেই অলস অবসরে প্রথম ছুঁয়ে দেখলো সুকৃত ওর পাড়ীর আঁচল। আজ যেন প্রথম তন্ময়তার সংগে আবিষ্কার করলো গোটা দেহ যমুনায় থরো থরো করে কাঁপছে নিবিড় যৌবনের ঢেউ। স্বাগ্নিক সুতপা। উদ্ভ্রান্ত সুকৃত।

দোকানের হিসেব চুকিয়ে দিল সুকৃত। হীরের বাক্সটাকে পকেটে ভরে রাস্তায় নামল ওরা। একটা সিগ্রেট ধরাল সুকৃত। আনন্দ উদ্বেলতায় অনেক বৃত্ত রচনা করে সে ধোঁয়া মিলিয়ে গেল হাজার মানুষের ভীড়ে।

—চলো এবার। গাড়ীতে স্টার্ট দিতে দিতে বলল সুতপা।

—কোথায় যাবে, ইডেন, না ভিক্টোরিয়ায়?

চিরচেনার গোলদীঘির ধারেই চলো না আজ। দূরে সে দূরেই থাক। কাছের ঝিলিমিলে চলো আজ নতুন করে খুঁজিগে। নরম হাতে কঠিন স্টিয়ারিং। কথা কাটাতে পারলো না সুকৃত।

বৌবাজারের মোড় ঘুরে ছুটে চলল গাড়ী কলেজ স্ট্রীট ধরে। চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে যাচ্ছে কলেজ স্ট্রীটের অভিজাত বিপনী। সুতপার চুলের ভগ্নাংশ উড়ছে বাতাসের সংগে পাল্লা দিয়ে। ভাসছে সুগন্ধী তেলের গন্ধ। সুকৃতের উন্মত চেতনাকে বারবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে সুতপার ক্ষণিক স্পর্শ। নীরবতাকে প্রথম ভাংগলে সুকৃত। কিছু খাবে না?

—না, উত্তর দেয় সুতপা। খেলে মন রোমান্টিক হয় না কখনও জানো না বুঝি? মুখে পড়া একগুচ্ছ চুলকে নরম হাতে সরিয়ে নেয় সুতপা। চোখের রিমলেস গগলসটাকে ঠিক করে নিয়ে বলল, আচ্ছা বলতো, রোমান্স বড়ো, না, রুটি বড়ো? গাড়ীটা গতি শ্লথ হয়ে এল।

সুতপার সাড়ীর আঁচলটাকে আলতো করে নাড়তে নাড়তে বললো সুকৃত—এ এক কঠিন প্রশ্ন সুতপা। ওটাকে স্থান, কাল, পাত্র হিসেবে বিচার করতে হয়। গাড়ীটা দাঁড়িয়ে গেল। পার্কের একটা নির্জন কোণে বসল দুজনে। সাড়ীর আঁচলটাকে ঘোরাতে ঘোরাতে বলল সুতপা—বলতে পারলে না তো?

পঞ্চম ঋতুর হিম হাওয়ায় কেঁপে উঠলো দুজনে। মিলনের চরম আনন্দে এক অন্যের হাত চেপে বসে রইলো।

জলের বুকে সন্ধ্যা নেমে গেছে কতক্ষণ। হাই পাওয়ারের বাল্ব হতে বিচ্ছুরিত হচ্ছে আলোর বর্ণালী। জীবনের একটা ফেলাযিত আশাকে ওরা ভাসিয়ে দিল জলে। ঢেউ ওঠে আর ভাঙ্গে। জলের বুকে লক্ষ হীরা কেঁপে ওঠে।

—এখন সুন্দর পরিবেশে দার্জিলিং কিংবা সিমলাতেও পাবে না তুমি। হেসে বলল সুকৃত।

টুকরো কথার আলাপে আরো পূর্ণতর হোল দুজনে। সুতপার দেহে নবোষ্ণ প্রাণের স্পর্শ।

—কাল কটায় ক্লাস আছে? জানতে চাইলো সুতপা।

—এগারটায় এস, ক্লি'র ক্লাস। উনি বোধ হয় নেবেন না। সুতপা! আজ আর অন্য কোন কথা নয়, শুধু উচ্ছল হাসি আর উজ্জ্বল স্বপ্ন দিয়ে জীবনের সব সে আশাকে তুমি রূপ দেবে না সুতপা?

কমলা ঠোঁটে লজ্জা জড়িয়ে গেল সুতপার। আবেশে চোখ দুটো জড়িয়ে এলো। তারপর বললো—দোব।

সুতপার মাথার চুলে আঙ্গুল চালাতে চালাতে বলল সুকৃত—তোমার মাঝে আমাকে নতুন করে খুঁজতে দাও। নতুন জীবন আর নতুন মিলন নিয়ে এসো আমরা সুরু করি আগামী জীবন। এই নীল নির্জন সন্ধ্যায় অগণিত তারাকে সাক্ষী রেখে কথা দাও তুমি আমার হবে।

বলতে গিয়েও কোন কথা বলতে পারলো না সুতপা।

তুমি কি আজ কিছুই বলবে না সুতপা? কেন? কিসের বাধা?

কানের কাছে মুখটা এনে চুপি চুপি বলল সুতপা: Love is no shadow.

প্রণয়ের কথা শুনে একটা ঘরশুমী ফুল ফুটে উঠলো আরক্তিম লজ্জায়। রাধাচূড়োর গাছের ফাঁক থেকে টুকরো আলো ছড়িয়ে দিল সুতপার মুখে। সুকৃতের আঙ্গুলগুলো নাড়তে নাড়তে সুতপা বলল। কিন্তু তো জানো আমার বাবাকে, আমাদের খ্যাতি আর আভিজাত্যের কথা।

আহত হোল সুকৃত। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলল: আমি তো অস্বীকার করছিনা সে কথা। বংশের আভিজাত্য দিয়ে কোন মানুষের মূল্যায়ন হয় শুনেছো? প্রেমের কোন মাপকাঠি নেই। আভিজাত্য আর বংশে গৌরব দিয়ে তাকে খণ্ডিত করা যায় না। সে এক, অনন্য। চাঁদের আলোয় কলঙ্ক আছে, কিন্তু আমার প্রেমে তা নেই। তুমি আমাকে ঠেলে দিও না।

—না আমি তা' বোঝাতে চাইনি সুকৃত। ভুল করে কিছু বলে থাকলে আমায় মাপ ক'রো তুমি। যদি তোমার প্রেমকে অস্বীকার করতুম তবে পার্কের এই নির্জন কোণে কোনদিনই আমাকে তুমি পেতে না।

তোমার ব্যক্তিত্ব, তোমার ইনটেলিজেন্সী আমাকে মুগ্ধ করেছে। সেই মুগ্ধ আবেশে জন্ম নিয়েছে একটি প্রেম। অবিশ্বাস তুমি আমাকেও করোনা সুকৃত। তুমি হবে আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। সাক্ষী রইলো পাম আর ক্রোইনের গাছটা।

—আমি জানতুম সুতপা আমরা এক আইডিওলজীতে বিশ্বাসী। একই স্রোতে ভেসে চলেছি আমরা।

একটা অনিকেত প্রেম পথ খুঁজে পেল। সুকৃত আবিষ্কার করল নতুন সুতপাকে।

—তুমি একটা চোর। সবুজ ঘাসকে দাঁতে কাটতে কাটতে বলল সুতপা।

—আমি! কি বলতে চাইছো তুমি?

হ্যাঁ, এই নির্জন পার্কের ধারে একটা নারীর মনকে তুমি চুরি করেছ। সুরেলা হাসি হাসল সুতপা।

—ভালোবেসে নারীর মনকে ছিনিয়ে নেওয়াই পুরুষের কাজ। ভাগ্যিস ভগবান আমাদের সে অমোঘ অস্ত্রটা দিয়েছিলেন। উচ্চ হাসির সংগে তাল মিলিয়ে নড়ে উঠলো পামগাছগুলো।

প্যান্টের পকেট থেকে হীরেটাকে আস্তে আস্তে বের করল সুকৃত। তারপর খপ্ করে সুতপার হাতটা ধরে পরিয়ে দিল।—আমাদের প্রথম মিলনের দিনটির স্মারক-চিহ্ন হবে। হাজার আলোর আলোকিত হোল কয়েকটি মুহূর্ত। বিমুগ্ধ ভাবে তাকাচ্ছে সুকৃত। নারীত্বের চরম লজ্জায় নেমে নেমে উঠেছে সুতপা।

একটি নারীকে জয় করার আনন্দে মেতে উঠেছে সুকৃত। একটি শুভ্র হৃদয়কে আপন কোরে পেলো সুতপা।

সুতপাকে অনেক রাতে লিফ্‌ট দিয়ে ফিরে এল সুকৃত বাসায়। সুতপার সান্নিধ্যের অক্ষয় মুহূর্তগুলোর ভাবনায় মগ্ন সুকৃত। কেড়ে নিয়েছে ওর ঘুম। চোখে ভাসছে শুধু একটি মধুর প্রেমের আর্তি।

সকালে উঠে ক্লাসে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছে সুকৃত। গত রজনীর মধুর রেশ মিষ্টি ভায়লিনের সুরের মতো এখনও আচ্ছন্ন করে রেখেছে ওকে। কালোপাড় তাঁতের ধুতির সংগে সিল্কের পাঞ্জাবীটা পরবে আজ। সুতপাও নিশ্চয় ওর ফেভারিট স্কাই ব্লু শাড়ীর সংগে শিউলী ফুল তোলা গোলাপী ব্লাউজটাও পরবে। মিলিয়ে দেখবে

ও

ন'য়েন।

একটা টেলিগ্রাম দিয়ে চলে গেল। টেলিগ্রামটা

কয়েক মুহূর্ত ভাবার পর ছিঁড়ে

কেবল ওপরে লেখা আছে—ডেকরিটি। কাম্ সুন।

সুচরিতা ঘর কয়েক পড়লো হীরু। তলিয়ে গেল

অতলান্তে শুধু এক চিন্তাই বারবার মনকে নাড়া দিয়ে

যায়—ডেকরিটি সুন।

হোতা বেরিয়ে

এক মাস পর ফিরে এসেছে সুকৃতি

কিরতে পারেনি সুচরিতাকে। লিখবেই বা কি করে

বসে হাসপাতালে কি দুর্দিনই না গেছে

সুচরিতাকে টেবিল রেখেই বাইরে এল একটি

ট্যাক্সীও পেয়ে গেল

হোতা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে থমকে

সুচরিতার বাবার মুখোমুখি এসে চমকে

করতে করতে বললেন—কে সুকৃতি?

মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলল—দেশের বাড়িতে তাকাতি হয়ে···

—বেশ। কথাটা শেষ না হতেই বললেন তিনি। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। এসো ভেতরে। সত্য চৌধুরীকে অনুসরণ করল সুকৃত। বিরাট বড় ঘরে ঢুকল দুজনে। আলমারি ভর্তি আইন বই। দাওয়ার জানালায় দামী ভাঁজের পর্দা। এক কোণে সযত্ন-রক্ষিত গ্রীক আর্টে প্রস্তুত কঠিন প্রস্তর মূর্তি। দেওয়ালে ভর করে উঠেছে অর্কিড। জানালার ভাঁজে দুলছে লতানো পাতাবাহার। ঘর ভর্তি সোফা আর কাউচ।

শ্যামর চামড়া দিয়ে মুড়ে লেখার চশমাটাকে মুছতে মুছতে বলল সত্য চৌধুরী—তুমি তপাকে ভালোবাসতে? গাম্ভীর্যের কাঠিন্যে মুখ ভরে উঠেছে। আবার বললেন—আইমিন্ তুমি ওকে বিয়ে করতে?

সহজ জবাব দিয়েছিলো সুকৃত—হ্যাঁ। পরিণামে এক চঞ্চল অধ্যায়ের উদ্ঘাটন আশংকায় কেঁপে উঠল ওর বুক।

—কিন্তু মাই ডিয়ার বয়, তুমি জানতে না এ বিয়ে সামঞ্জস্যহীন। তোমার বংশ পরিচয় আমি পেয়েছি তোমার বই এর কোণে লেখা ঠিকানা দেখে। ভুলে যেও না ব্যারিস্টারের চোখে ফাঁকি কেউ দিতে পারে না। তারপর চুরুটটাকে দাঁতে চেপে নিয়ে বললেন—জীবনের তুচ্ছ আনন্দে তোমরা মেতে ওঠো। সত্য চৌধুরী আভিজাত্যকে বিসর্জন দেবে না কোনদিন। সব পিতাই চায় তার মেয়ে ভালো ঘরের ঘরণী হোক। এটা বোঝার বয়স তোমার নিশ্চয় হয়েছে আশা করি। তারপর গলার স্বরে স্বাভাবিক পর্দা নামিয়ে এনে বললেন—তপার বিয়ে হয়ে গেছে। গত শনিবার দিন। দিল্লীতে। এক ব্যারিস্টারের সঙ্গে। প্রয়োজন হলে ওপরে গিয়ে দেখা করতে পার। আমি খবর পাঠিয়ে দিয়েছি। একটা লম্বা টান দিলেন চুরুটে। সুকৃত বুঝল, গ্রীক আর্টে প্রস্তুত মূর্তির চেয়েও কঠিন সত্য চৌধুরী।

ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা উপরে উঠলো সুকৃত। দ্রুতগতিতে। সুতপাও নিশ্চয় এতক্ষণে তার আগমনী সংবাদ পেয়ে গেছে। হয়তো প্রতীক্ষা করছে একটা চরম ট্রাজেডীর মুখোমুখি হবার জন্য।

সুতপার ঘরের সামনে আসতেই দেখলো, দুটী হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসে আছে সুতপা।

—সুতপা। চোখের কোণের রুদ্ধ অশ্রু বেরিয়ে এল। অশ্রুত্যাগ করছে সুকৃত।

কেন তুমি আমাকে জানাও নি, কেন তুমি এমন করে ভেঙ্গে দিলে আমার স্বপ্ন বিলাসকে। কাঁচের চুড়ির মতো টুকরো টুকরো করে। জবাব দাও।

একটি নারী কাঁদছে। অতীতের একটি মহৎ প্রেমের আত্মহত্যায়।

হীরেটাকে হাতের মধ্যে নিয়ে বলল—ফিরিয়ে নাও, তোমার দান। তুমি বুঝবে না আমি কতো অসহায়। তোমার প্রেমের দানকে অস্বীকার করার ক্ষমতা আমার নেই। ফিরিয়ে নাও। কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো সুতপা সেন।

ওর মোমরাঙা শরীরটায় বাক্সহীন অনুভূতি।

সম্বিৎ ফিরে পেল সুকৃত। বলল—না, তোমাকে ছুঁতে নেই, তুমি যে সুতপাকে বাঁধা হয়ে গেছ সুতপা। ধুলোর ঘর আমি তৈরী করতে চেয়েছিলুম। ঝড়ের ঝাপট সইতে পারবে কেন? ভালোবাসার স্মারক চিহ্ন ফিরিয়ে নিতে নেই। তাতে তোমার অকল্যাণ হবে। তুমি দূরে চলে গেলেও হৃদয়ের গভীরে অক্ষয় হবে তোমার স্মরণ। হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত এই শুভেচ্ছার ধনকে তুমি ফিরিয়ে দিও না। হীরের মতো দীপ্তি নিয়ে বেঁচে থাক আমাদের প্রেম।

সন্ধ্যে আনা রজনীগন্ধার গুচ্ছ পড়ে রইলো মাটিতে। একটা বিচ্ছেদের সাক্ষী হয়ে। কাঁদছে একটি নারী। কাঁদছে একটি পুরুষ। যেন কাঁদছে একটি বৃহৎ প্রেম।

নিথর, নিস্পন্দ সুতপা। ক্যানভাসে আঁকা ছবির মতো।

কিউবার ডঃ ফিডেল কাস্ত্রো

অমল হালদার

অসামান্য মানুষ কাস্ত্রো নাটকের মতো ঘটনা-সংকুল তাঁর জীবন, উপন্যাসের মতো আগ্রহ উদ্দীপক।

১৯৫২-র এপ্রিল মে মাস। ক'হপ্তা আগে (১০ই মার্চ) বাতিস্তা সৈন্যবাহিনী হাত করে কিউবায় ক্ষমতা চেপেছে। কিউবার রাজধানী হাভানার আদালত কোর্টে এলেন ২৬ বছরের এক যুবক। তাতে আর্জি অভিযোগ নানা। বললেন, বাতিস্তা কোড অব সোশ্যাল ডিফেন্সের ছ-টা নির্দেশ লঙ্ঘন করেছে আইনতঃ তার একুনে ১০৮ বছর শাস্তি প্রাপ্য। বললেন—তর্কশাস্ত্র এই একথাই বলে, যদি কিউবায় আদালত বলে কিছু থাকে তবে বাতিস্তার শাস্তি হওয়া উচিত; আর যদি বাতিস্তা শাস্তি না পায়, যদি এখনও সে রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের প্রধানমন্ত্রীর সেনাপতির প্রভু হয়ে থাকে বা সামরিক, অসামরিক কর্তাকর্তা বা শাসন ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতার অধিকারী থাকে, তবে বুঝতে হবে আইন-আদালত কিউবায় নেই সব উৎপাটিত হয়েছে। এটা নিষ্ঠুর সত্য। আর তাহলে তবে শীগগির নেমে আসুন চোগা চাপকান খুলে ফেলুন গদী ছাড়ুন বিচারকদের।

বক্তৃতা তা নয় যেন বুলেট। বাতিস্তার শাসনকে চ্যালেঞ্জ করে যে যুবক তার মাথা নিশ্চয়ই খারাপ। কিন্তু ঐ যুবকই ডঃ ফিডেল কাস্ত্রো আইনে যিনি ২৪ বছর বয়সেই ডক্টরেট দর্শন ও ইতিহাসে যিনি বিদগ্ধতা অর্জন করেছেন। আর পরবর্তীকালে বিপ্লবের নায়ক—হিসাবে চৌত্রিশ বছর বয়সেই দুনিয়ার রাষ্ট্র প্রধানদের অনেকের ঘুম কেড়ে নিয়েছেন। অনেকের প্রশংসা অর্জন করেছেন। কিন্তু উঠতিবয়সে সবসময় চেনা যায়। ১৯৪৫ সালে কাস্ত্রো. ১৯ বছর বয়েসে বি-এ পাশ করেন। তখন Colegio Belen year Book তাঁর সম্বন্ধে লেখে—লেখাপড়া. সংক্রান্ত ব্যাপারে বিষয়ে কাস্ত্রো দুর্ধর্ষ। অনিবর্চনীয় তার বিদ্যালয়িক জীবন। তিনি একজন সত্যিকার খেলোয়াড় দাহসিকতা ও গৌরবের সঙ্গে সর্বদা শিক্ষায়তনের

সম্মান রেখেছেন। তিনি জানেন কেমন করে সকলের প্রশংসা ও প্রীতিভাজন হতে হয়।

১৯৬০ সালে জাতিসংঘে মেনন্সের পর ম্যারথন বক্তৃতায় কাস্ত্রো—কিন্তু ছাত্র জীবনে তিনি ছিলেন অনর্গল বক্তা বাগ্মিতায় তিনি ডাক্তার ছেলেকে একত্র করে ডমিনিকান রিপাবলিকের ডিকটেটরকে হটাবার জন্য বাঁপ দেন। কিন্তু ব্যর্থ হলেন গ্রেপ্তার এড়াবার জন্যে অতলান্তিকের কয়েক মাইল সাঁতার দিয়ে পরে ওঠেন। এ ১৯৪৭-এর ঘটনা। পরে এক নাটক এবং তা বিষাদাত্মক। ১৯৭৮ সালে সতীর্থা এক দর্শনের ছাত্রীকে বিয়ে করেন। তাঁর শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা প্রথমে ভেবেছিল কাস্ত্রোর এই রাজনীতি করাটা নিছক ভাববিলাসিতা। পরে দেখা গেল যখন তাদের ধারণা ভ্রান্ত, তখন ১৯৫০ সালে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলো। কাস্ত্রোর পুত্রের বয়স দশ বছর।

আদালতে যখন কাস্ত্রোর কথা টিকলো না তখন কাস্ত্রো দেখলেন, বাতিস্তাকে নির্মূল করার উপায় বিপ্লব চলালো প্রস্তুতি গোপনে গোপনে। চারদিকে বাতিস্তার চর। ধরা পড়লে দমনপীড়ন, মৃত্যু। তবু চলালো কাজ ফৌজ গঠন করা ট্রেনিং দেওয়া সদা পরামর্শ। ফৌজীর সংখ্যা হলো মাত্র দু'শ জন যুবক আর দু'টি তরুণী সবাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। বয়স কমবেশি ২৬ বছর; সঙ্গে আছেন কাস্ত্রোর ভাই রাউল বয়স ২২ বছর। রাউল এখন মন্ত্রি-সভার সদস্য প্রধান সেনাপতি। ২৬শে জুলাই, ১৯৫৩। কিউবার দ্বিতীয় বৃহত্তম সামরিক ঘাঁটি মোনক্যাডা আক্রান্ত হলো। কিন্তু ব্যর্থ হলেন কাস্ত্রো—সাথীরা ধরা পড়লেন, গুলিতে নিহত হলেন, অত্যাচারের চরমতায় সকলে শিউরে উঠলো। সান্তিয়াগো সহরের বিশপ বললেন, বিপ্লবীদের বিচার করো, এমন করে, বিপ্লবী অবিপ্লবীর রক্তে দেশ ভাসিও না।

বাতিস্তা বাকি চলো: কিন্তু কাস্ত্রোকে জীবন্ত ধরা চলবে না—এই গোপন সার্কুলার ও ফৌজে প্রচারিত হলো।

কিন্তু কাস্ত্রোর ভবিতব্যই যে আলাদা। একদিন দেখা গেল দু'জন সশস্ত্র কাস্ত্রো এক পাহাড়ের পাদদেশে নিহিত। পাহারাদারদের নেতা লেফটেন্যান্ট সাহিয়া ছাড়া আর কেউ চিনতো না কাস্ত্রোকে। সে কাস্ত্রোকে সার্চ করার ছলে সাহিয়া কানে কানে বলে দিলেন, আসল নাম বল না, মারা পড়বে। এই সাহিয়া কাস্ত্রোর সহপাঠী ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। ধরা দিলেন রাউল ও অন্যান্যরা। বিচার সুরু হলো কাস্ত্রোর আরও শতাধিক লোকের, কেউ বিপ্লবী কেউ সাধারণ নাগরিক। লোকারণ্য আদালত। চারদিক সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী। সান্তিয়াগো সন্ত্রস্ত। আসামীর কাঠগড়ার হাতে হাতকড়া কাস্ত্রো, তবু মাথা তাঁর গর্বভরে যেমন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিলেন ঠিক কুড়ি বছর আগে (১৯৩৩) নাৎসীদের তৈরী কোর্টে ডিমিট্রভ। ডিমিট্রভ যেমন করে অপরাধী করে দিলেন তাঁর বিচার কর্তাদের, কাস্ত্রো তেমনি করলেন। সমগ্র বিচারে যেন আসলে বাতিস্তাই অভিযুক্ত। প্রকাশ্য বিচার বেশী দিন চলেনি, কারন প্রথম দিনই জেরার মুখে এমন সব কথা বেরুতে লাগলো কাস্ত্রোর মুখ থেকে যা বাতিস্তার গাত্রদাহকর। অতএব

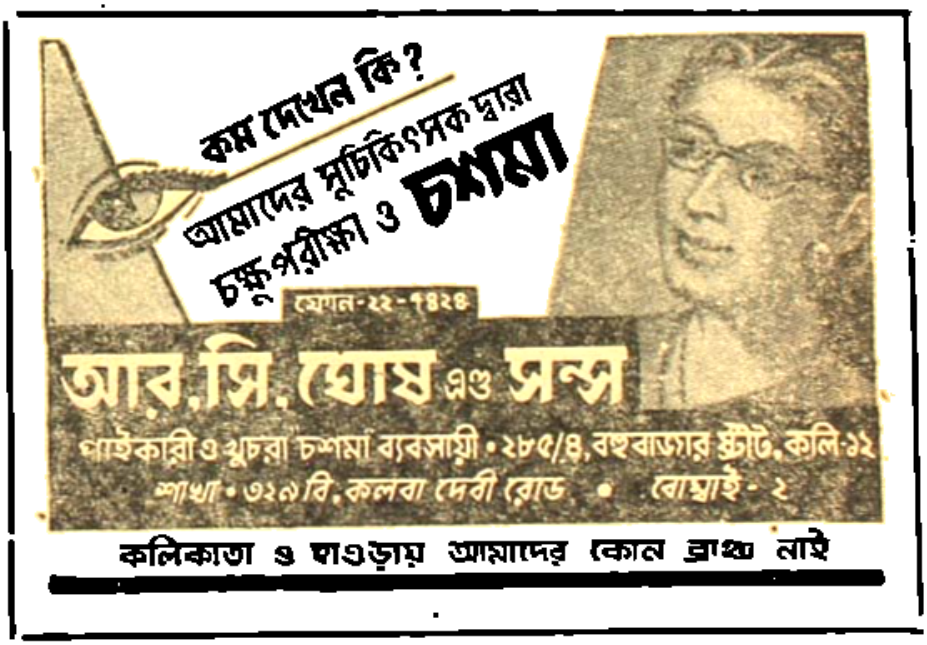

সরকারী উকিল দ্বিতীয় দিন ঘোষণা করলেন কাস্ত্রো অসুস্থ। ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে একটি নারী কণ্ঠ বলে উঠলো 'কাস্ত্রো সম্পূর্ণ সুস্থ।' একটি মহিলা এগিয়ে এলেন ডঃ মার্মোরেস, কাস্ত্রোর কাহিনীর অন্যতমা। বলেই তিনি মাথার চুলের ভেতর থেকে বের করলেন কাস্ত্রোর এক চিরকুট—জেলের নির্জন কুঠরী থেকে লেখা। চিঠিটা আগুনের অক্ষরে লেখা, মেয়েটিও আগুনের ফুলকি। রাতিস্তার বুকে শেল বিঁধল। শেষে গোপন কক্ষে বিচার বসলো—কাস্ত্রো উপস্থিত হলেন। ২৭ বৎসরের যুবক কাস্ত্রো সেদিন পুরো পাঁচ ঘণ্টা বিনা নোটে, আইনের বইয়ের সাহায্য না নিয়ে বক্তৃতা করলেন যেমন দু'বছর আগে ভাতি সংঘে পুরো সাড়ে চার ঘণ্টা বিনা নোটে বক্তৃতা করেছিলেন। তৎসত্ত্বেও সেই বক্তৃতা গলিত লাভাস্রোতের মতো রাতিস্তাকে ধ্বংস করতে উদ্যত হলো। শেষ করলেন কাস্ত্রো এই বলে··· Sentence me, I don't mind. History will absolve me, সে রাতে ছাড়া পেলেন কাস্ত্রো, জুলাইয়ে মেক্সিকোতে গেলেন, রাউল গেছেন আগেই। উদ্দেশ্য, অস্ত্র-সম্পদ সমর্থন সংগ্রহ করতে কিউবার বিপ্লবের জন্য, বাইরে থেকে বিপ্লব সংগঠিত করবেন। নাটকের আর অঙ্ক সুরু হলো।

জোগাড় করলেন লোকজন। একজন বৃদ্ধ প্রবাসী কিউবান, কর্ণেল বেরো, ট্রেনিং দিতে লাগলেন; মনের মতো একজন সাথী পেলেন, নাম গুয়েভারা, আর্জেন্টিনার লোক পেশা চিকিৎসা। তিনি অন্য এক রাজনৈতিক মামলার নথি, দাবিকিৎসক চলেন সুরেমাপতি কাস্ত্রোর দলে পড়ে। রসদ সংগ্রহ চলো অর্থও প্রচুর। কিন্তু ধরা পড়লেন: পুলিশ রাস্তার নাকখানে গাড়ী থামলো কাস্ত্রোর। বামালসহ ধরা পড়ে জেলে গেলেন। এরপর কখনও ধরা পড়েন, কখনও বা ছাড়া পান। এইভাবে কাটলো কিছুদিন। হঠাৎ কাস্ত্রো ঘোষণা করলেন মেক্সিকো থেকে কী তাঁর উদ্দেশ্য। সকলে অবাক, সব ফাঁস করে দিলে মাথা পাগল লোকটা।

কাস্ত্রো বললেন, 'এ আমার এক বিশেষত্ব, যদিও জানি সামরিক দিক থেকে এটা ক্ষতিকর। কিন্তু এ যে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ।'

মাত্র ৮৪ জনকে সাথী নিয়ে জাহাজ চড়লেন কাস্ত্রো। ঠিক চলো ৩০শে নভেম্বর (১৯৫৬) তারিখে কাস্ত্রো কিউবায় পৌঁছালেই সারা দেশে সাধারণ ধর্মঘট তখন সেনাবাহিনী আক্রমণ করা যাবে। কিন্তু জাহাজ বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে বিপন্ন হলো, জাহাজে ৩০শে নভেম্বর কাটলো, বেতারে খবর পেলেন কোন কোন জায়গায় সৈন্যবাহিনীর ওপর আক্রমণ সুরু হয়েছে। কাস্ত্রো বিচলিত হলেন, বিপদের ওপর বিপদ, একজন সাথী জাহাজ থেকে সমুদ্রে পড়ে গেছেন, খুঁজে উদ্ধার করতে সময় গেলো। শেষে ডিসেম্বর মাসলেন এক অজ্ঞাত প্রান্তে কিউবার। নেমেই বললেন "রাতিস্তার-দিন শেষ।"

এর পরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত নয়। ডিসেম্বর ১৯৫৬ থেকে ১লা জানুয়ারী ১৯৫৯ যদিও খুব বেশী সময় নয়, কিন্তু কাস্ত্রোর কথাই ঠিক: সমগ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য সমর্থনেও রাতিস্তার দিন শেষ হলো।

কষ্টের শেষ নেই: তার ওপরে যে ইক্ষু ক্ষেতে লুকিয়েছিলেন সেখানে ব্যাতিস্তার বিমানবাহিনী আগুনে বোমা ফেলতে লাগলো। কাস্ত্রো আদেশ দিলেন ছোট ছোট দলে ছড়িয়ে পড়তে; কাস্ত্রোর সঙ্গে দু'জন রাউলের সঙ্গে দু'জন। বোমায় মারা পড়লেন অনেকে, আহত হলেন অনেকে; ডঃ গুয়েভারা নিজেই আহত অবস্থায় চিকিৎসা করতে লাগলেন। বোমা পড়া বন্ধ হলে দেখা গেল। ৮২ জনের জন অবশিষ্ট আছেন। কাস্ত্রো বলে উঠলেন, রাতিস্তার তিন ডাকার সুগঠিত সৈন্য।

কাস্ত্রোর জীবন নাটকের মতো নাটক। এটাই তাঁর জীবনের মূল মন্ত্র যে জন্যে কাস্ত্রো আজ আমেরিকার বিরুদ্ধে এতো সোচ্চার। কাস্ত্রো তাই ক্রুশ্চেভের বন্ধু, বিপ্লবে বিশ্বাসী। মজার কথা, কিউবার কম্যুনিস্ট পার্টি এ বিপ্লবের কোন অধ্যায়েই কাস্ত্রোর সহযোগী ছিল না। কিন্তু সাম্প্রতিক দেশ কিউবা, ডঃ ফিডেল কাস্ত্রো বৃদ্ধ (তাঁর পুরোনামে) অসামান্য কাস্ত্রোর কথা বলতে গিয়ে কিউবার কথা অনুল্লেখ রয়ে গেল।

বকুল মিনুল

রবীন গুহ

সে ভেবেছিল তাকে গলা টিপে হত্যা করবে।

আধোঘুম আধোজাগরণের মধ্যে টিপে টিপে পিঠের নীচের ছারপোকা মারার মত অন্ধকারের মধ্যে তার মুখরকণ্ঠ একমুহূর্তে স্তব্ধ করে দেবে। তারপর নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়বে, বার বার ছারপোকা কামড়াবার যন্ত্রণা হঠাৎই বন্ধ হয়ে গেলে আমরা যেমন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ফের আরাম করে ঘুমুই, তেমনিভাবে সেও ঘুমুবে। তারপর খুব ভোরে, যখন তার ঘুম ভাঙবে নিজের ঘরে ; ঠিক এইমাত্র যেমন করে সে ছুটে এসেছে।

একটু আগে পর্যন্তও ওরা ফিসফিস করে কথা কইছিল।

বাইরে উঠোনের উত্তরদিকে উঁচু একটা বকুলগাছ। সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে অসংখ্য তারা। গাছের মাথায় বুড়ি চাঁদ। উঠোনের অন্যদিকে ফুল-বাগান। দড়ু বাঁশের কঞ্চিবাঁধা বেড়ার পাশে পাশে গাঁদাফুল, দাওয়ায় উঠবার সিঁড়ির পাশে লাল গোলাপ।

প্রথমেই ছারপোকা মারারমত সেই গলা টিপে হত্যা করার কথাটা স্মরণ হতেই এক ছুটে বাথরুমে দৌড়ে যাবে। দুর্গন্ধ মুছে ফেলার জন্য গা-ঘোরা সাবান দিয়ে হাত ধোবে। চোখের কাছে আঙুলগুলো তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখবে, গন্ধ শুঁকবে। মাংস কাটা হাত ধুতে গিয়ে লোকে যেমন ঘষে ঘষে নোখের ফাঁকের লালচে-কালচে রক্ত তোলে, তেমনি করে আঙুল ঘষে ঘষে হাত ধোবে। তারপর কিরতিছুট্ দৌড়ে আসবে অন্য আরো দু-দু জায়গায় লম্বা লম্বা রজনীগন্ধার ঝাড়। সুগন্ধি সুপবাতি জ্বালিয়ে দেয়ালে পুঁতে রাখলে ধীরে ধীরে যেমন ঘরের বাতাস উতল করে তোলে—পর্দায়, দেয়ালের ছবিতে, ঘরের অন্যান্য আসবাব-পত্রের শরীর ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় : তেমনি গন্ধ ভাসছে বাইরের দাওয়ায়। বকুলগাছের কচিপাতা, দাওয়ার মাটি, কুয়োতলার নোংরা নালাটা, কঞ্চিবাঁশের বেড়ার ধার, ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়। তারপর ঘরের দেয়ালে লাগে,

কাঠের পাল্লায়, শেষে হঠাৎই ঈষৎ ফাঁক করা দরজার ফাঁকা দিয়ে ছুটে করে ঘরে ঢোকে। ওরা লম্বা লম্বা শ্বাস টেনে নিঃশ্বাস নেয়।

"এই শুনছো ?"

"কি ?"

"কেমন মিষ্টি গন্ধ—তাই না ?"

"হ্যাঁ। বোধহয় রজনীগন্ধার।"

"না না। গোলাপ।"

"সেই লাল গোলাপ।"

"দূর্। লাল আবার দেখলে কোথায় ? লাল ঠিক নয়, লালের সঙ্গে কালচে মিশেল।"

"খুব গাঢ়। আহা, কি সুন্দর।"

"হ্যাঁ, মেঘ নেই, চাঁদও সুন্দর।

"আর ?"

"আর তুমি। তুমি—"

"এই সরো—সরো—"

"কেনো ?"

"দেখছো না, বুঝি চাঁদ গাছের মাথা পেরিয়ে এসেছে।"

ওরা চুপ হল।

দরজার আরো কাছঘেঁষে, কপাটের ফাঁকে উঁকি দিয়ে দাঁড়াল সে। ওরা পাশাপাশি, জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে। অনিতার একটা হাত শীতকাঁপা কুঁকড়ে থাকা সাপের মত বিমলেন্দুকে জড়িয়ে আছে। মাথার পিছনদিককার চুল দেখা যায়, অনিতার চুলের খোঁপা গোলাপানো খড়কুটোর মতো।

সে আবার এগোল। দরজার পাল্লাটা সামান্য ফাঁক করল। দু হাতের খড়খড়ে থাবা দুটো বুকের কাছে উঁচু করে সে এগোল। এই সময় বকুলতলার ওদিক থেকে একটা বাদুড়ে আকাশে উড়তেই ওরা ভয় পেল। অনিতা এবার পুরোপুরি লেপটে গেল বিমলেন্দুর বুকের সঙ্গে। শেওলাধরা গাছের গুঁড়ির গোকার মত, কুচো কেচোরমত।

বকুলতলার ওদিকটা পুনর্বার খুব নিঃস্তব্ধ হয়ে উঠল। নিমগাছের নীচের ঘরা মানকচুর জোপটা, সেঁদো গাছগুলো, পোড়ো পাঁচিলটা !—খুব অন্ধকারময় এবং নিঃস্তব্ধ।

"মিতা ?"

"উঁ।"

"চাঁদ তো ডুবল না, এবার একটু কথা বলি ?"

"বলো।"

"ওটা কি মাস জানো ?"

"জানি, ফাগুন।"

"তাই বুঝি এত আগুন ?"

"কিসে ?"

"আকাশে, চাঁদের আলোয় বকুল গাছে, হাওয়ায়।"

"আর ?"

"আর আমাদের শরীরে।"

"কি সর্বনাশ ! সরো সরো, পুড়ে যাবে।"

ওরা একটু সরে সরে শুল। বকুলগাছের পাতার ফাঁকে চঞ্চল হাওয়ার কিসফিসানি। ধুলো উড়ছে। ধুলোর সঙ্গে শুকনো পাতা। এবার বুঝি বৃষ্টি নামবে। দিনেশ আতঙ্কিত হল।

কালকেও বৃষ্টি নেমেছিল, ঠিক এমনি সময় যখন অনেকক্ষণ গল্প করে-করে ওদের চোখে তন্দ্রা নেমেছিল। বিমলেন্দু সম্ভবত ঘুমিয়ে পড়েছিল, কেননা অনিতা ওকে উদ্দেশ্য করে তিন-তিনবার কথা বলেও কোনো সাড়া পায় নি।

অন্ধকার ঘর নিঃস্তব্ধ। বিমলেন্দু এখন কি করছে ? অনিতা কোনো কথা কইছে না কেন ? তা হলে কি ঘুমিয়ে পড়ল দুজন ? দিনেশ আলতো একটা হাত রাখল দরজার পাল্লার উপর।

"এই—এই"

"কি ?"

"দ্যাখো দরজাটা খুলে গেল।"

"হ্যাঁ। বকুলগাছটা দেখা যাচ্ছে।"

"কি সুন্দর মাথা নেড়ে নেড়ে দুলছে, না ?

"হ্যাঁ, এবার [illegible]

"যাচ্ছে না

"ঠাণ্ডা [illegible]

"না [illegible]

হয়? দিনেশ এগোল। আর ঠিক এই সময় বিদ্যুৎ চমকাল, এবং অন্ধকারের মধ্যে পরপর বাহুড়ের জ্বলজ্বলে কটা চোখের মত এক জোড়া চোখ হঠাৎ নিভে যেতে দেখল বিমলেন্দু।

ওরা দু'জনেই লাফিয়ে খাটের উপর উঠে বসেছে। দু'জনেই এক মুহূর্ত চুপচাপ।

বিমলেন্দুই প্রথম কথা বলল—'চোর'।

'দূর, চোর না ছাই।' পেট ভরে খেয়েও মিথ্যা কথা বলার মত করে বলল অনমিতা।

'না না, আমি ঠিক দেখেছি।'

'আমিও দেখেছি।'

'কার মতো?' বিমলেন্দুর কণ্ঠে সন্দেহের রেশ।

'কার মত আবার, বকুল গাছটার।'

বিমলেন্দু ব্যস্ত হয়—'তুমি ঠাট্টা করছ। আমি বাইরেটা দেখে আসছি।'

'না।' অনমিতা ঝপ্ করে একখানা হাত ধরে ফেলল বিমলেন্দুর—একা নয়, আমিও যাবো।'

দু'জনেই খাট থেকে নামল। বাইরে তখন বেজায় বৃষ্টি নেমেছে। বিমলেন্দু প্রথমেই তাকাল দিনেশের ঘরের দিকে। ওদিকটা খুব অন্ধকার। সেই অন্ধকারে কিছুই দেখতে পেল না ওরা।

বিমলেন্দুকে খুব গম্ভীর আর বিভ্রান্ত দেখাচ্ছিল। অনমিতার হাসি পেল। চোর না ছাই! চোর দাড়ার জন্য প্রাণপন চেষ্টা করছে দীনেশ। অনমিতা ওর সেই ইচ্ছাটি অনেক আগেই ধরে ফেলেছে। ওর বোবা মুখের ছায়া হিংসুটে চোখের দৃষ্টি, টেনে টেনে হিস্ হিস্ করে হাঁটার ভঙ্গি অনবরতই জানিয়ে দিয়েছে তার মনের কুৎসিত ইচ্ছাটাকে।

অন্ধকার ভয়ানক কুটিল। আলোর মধ্যে মানুষ নিষ্পাপ, সরল স্বাভাবিক। যুক্তিতে নিষ্ঠুর, রীতি-নীতিতে সহজবোধ্য। অন্ধকার পেলেই নতুন জন্মের শব্দ শোনা মাত্রের মত চঞ্চল হয়ে ওঠে। শরীরের অনভ্যস্ত ক্রিয়াগুলো ধপ্ ধপ্ করতে থাকে। রক্তের সাগরে তুফান ঢেউ ওঠানামা করে। আদিম নিষ্ঠুরতার লক্ষ্য শরীর আকুলিবিকুলি করে। বিমলেন্দুর করে, দীনেশের করে, এমন কি অনমিতা নিজেও না করে পারে না। অথচ এজন্য ঘৃণা হয়, নিজেকে ধিক্কার দেয়, পাপিল ইচ্ছাগুলোকে বমনে।

দিনের আলোয় বকুলগাছটা অন্যরকম দেখায়। যেমন রাত পোহালে শাঁখ কালো কুৎসিত বউয়ের মত।

হাত মুখ ধুয়ে একটা বেতের চেয়ার নিয়ে সেই বকুলতলায় রোদ্দুর পোহায় দীনেশ। গাছের শুকনো দু'একটা পাতা টুপটাপ মাথার ওপর ঝরে পড়ে। চড়ুইগুলো ছোট ছোট দাদা বলের মত ত্রিংত্রিং নাচে। কখনো নির্ভয়ে হেঁটে হেঁটে দীনেশের পায়ের কাছে চলে আসে। তারপর কোলের ওপর বিছানো খবরের কাগজে কুচ্‌কুচ্ শব্দ হতেই ফুরুৎ করে উড়ে যায়।

উড়ে উড়ে এক সময় বসে গিয়ে অনমিতার রান্না-ঘরের দাওয়ার ওপর। অনমিতা তখন তাকের ওপর থেকে কাপ প্লেট, গুঁড়ো দুধ, চিনির কৌটো নামিয়ে উনোনের পাশে রাখে। বার বার জল চাপানো বাটির ওপর থেকে ঢাকনাটা তুলে তুলে দ্যাখে। আর এইসব কাজ করতে করতে মাথাটা ঝুঁকিয়ে তাকায় দীনেশের দিকে। হিস্ হিস্ শব্দ করে দীনেশকে শুনিয়ে শুনিয়ে চড়ুই তাড়ায়।

চড়ুইটা ফের উড়ে উড়ে বসে গিয়ে বকুলতলায়। দীনেশ কাগজ বন্ধ করে চেয়ারের হাতলে সামান্য কাৎ হয়ে কিমোয়। চায়ের কাপ হাতে বাগানের পাশ দিয়ে রোদ্দুরে নেমে আসে অনমিতা। দীনেশের হাতে কাপটা তুলে দেওয়ার আগে তাদের শোবার ঘরের দিকে তাকায়। ওর চোখ বিমলেন্দুর উপস্থিতি খোঁজে। বিমলেন্দু কাছে থাকলে অভিনয় করে, জোরে জোরে হাসে—ওমা! ঘুমিয়ে পরলেন নাকি? উঠুন উঠুন, চা এনেছি।

দীনেশ ওর বোবা ঝোবা চোখ তুলে তাকায়। অনমিতার অভিনয় দক্ষতা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যাচাই করে। আর যে দিন বিমলেন্দু ধারে কাছে থাকে না কল ঘরে কিম্বা বৈঠকখানায় বসে দাড়ি কামায়, বেঁটে ছাতা হাতে দীর্ঘ দিন দশটা পাঁচটা কেরানীগিরি করার পর হঠাৎই বিয়ে হয়ে যাওয়া মেয়ের মত ছোট ছোট পা ফেলে দীনেশের দিকে এগোয় অনমিতা।

"শুনছো?" অনমিতা ফিস্ ফিস্ করে কথা বলে।

ধড়মড় করে লাফিয়ে ওঠে দীনেশ। একটু অবাক

হয়, এক মুহূর্তে। তারপর গলা পাকানো কাপড়টা কোলের ওপর বিছিয়ে নিয়ে মুড়ির বাটি আর চায়ের কাপের দিকে হাত বাড়ায়। অনমিতার হাত খুব প্রসারিত হয় না। যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকু না। প্রথম শাড়ি পরতে শেখা মেয়েটি পাড়ার সবচেয়ে ভাল লাগা ছেলেটির দিকে এক গ্লাস জল এগিয়ে দিতে গিয়ে যতটুকু হাত প্রসারিত করে ঠিক ততটুকু। ইচ্ছা অনিচ্ছা মেশানো একটা অসম্পূর্ণ ইংগিত। আসলে জল বা চায়ের তৃষ্ণাটুকু সেটা নয়। তৃষ্ণা অন্য কিছুর। কিন্তু কি সেই অন্য কিছু?

কি চায় দীনেশ? যা চায় তার কিছুই তো নতুন নয় তার কাছে। তবে কেনো অমনি বোবা বোবা চোখ তুলে অনেক অনেক ইচ্ছা অনিচ্ছার ভাব নিয়ে তাকায় সে তার দিকে? খুব সরল, খুব সোবেচারা। চায়ের কাপে ঠোঁট ছুঁইয়ে চুক চুক করে শব্দ তোলে দীনেশ। মুঠো ভর্তি মুড়ি তুলে নিয়ে আকাশের দিকে চা করে মুখের মধ্যে ঢেলে দেয়। কচ্‌কচ্‌ করে চিবোয়। ভাবটা খুব সরল, খুব যেন সোবেচারা। কিন্তু ঐ সরল এবং সোবেচারা স্বভাবের মধ্যেই চরম হিংস্রতার স্বরূপ দেখতে পায় অনমিতা। যেন একটা খাঁচায় পোরা বাঘ। শীতের দিনে সকাল বেলা কচি কচি ঘাসের ওপর পা গুটিয়ে রাইয়ের ওপর থুতনি রেখে রোদ পোহাচ্ছে। সামনে গতরাতের বিরাট একটা বাসি মাংসের টুকরো। আরাম করে টেনে টেনে গন্ধ শুঁকছে। মুখ বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে দাঁতে দাঁতে কিস্‌ কিস্‌ শব্দ করছে। ইচ্ছা করলেই একথাবা দিয়ে কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে মস্ত টুকরোটা ধারাল দাঁত দিয়ে এক মুহূর্তে ছিন্ন ভিন্ন করে দিতে পারে। গিলে ফেলতে পারে, আবার সময় মত উগরে এনে খুবে খুবে চিবুতে পারে। ইচ্ছা করলেই···অনমিতা চঞ্চল হল; তার মনের বক্তব্যটা স্পষ্ট হল। দীনেশের সামনেও যে যেন একটুকরো বাসি মাংস। দীনেশ ইচ্ছা করলেই এক থাবা দিয়ে তাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে যেতে পারে। চুষে চুষে স্বাদ নিতে পারে, আবার স্বাদ বন্ধ করে বাসি খাবার পেটের মধ্য থেকে উগরে আনার মত করে থাবা দিয়ে দূরেও সরিয়ে দিতে পারে।

সব পারে। তিল তিল করে যন্ত্রণা দিতে, কাঁদাতে, যন্ত্রণা দিতে। সব-সব পারে দিনেশ।

কিন্তু অনমিতা জানে না, দিনেশ তা করবে না। সে যা শাস্তি দেওয়ার পরিকল্পনা মনে মনে পোষণ করছে, তা দীর্ঘমেয়াদী নয়, অনমিতার পক্ষে তা খুব লজ্জাকরও নয়। কিন্তু নির্মম। ভয়ানক নিষ্ঠুর সে শাস্তি।

দিনেশ ঠিক করে রেখেছে অনমিতাকে গলা টিপে হত্যা করবে।

মুড়ি চিবুতে চিবুতে বারবার রান্নাঘরের দিকে ফিরে তাকায়। অনমিতা পেছন ফিরে মস্ত একটা উঁচু পিঁড়ির উপর বসে সাপের ফণার মত একটা বঁটি নিয়ে তরকারি কোটে। ওর পরণের লাল পেড়ে শাড়ি আঁটো করে শরীরে জড়ানো। কোমর থেকে ঘাড় পর্যন্ত পিঠের দিকটা ঢেউ খেলানো। এই স্থূল শরীরটা বিমলেন্দুর ছোঁয়া পেয়ে তুলোরমত তুলতুলে হয়। আকাশের বুড়ি চাঁদ দেখে, অন্ধকারে বকুলগাছের ছায়া দেখে কবিত্ব করে।

ফাঁকা আকাশ নিতান্তই ফাঁকা। পায়ের নীচে মজবুত মাটি চাই। না হয় যতই কাজের কথা বলা

হোম সিনেমা প্রজেক্টর

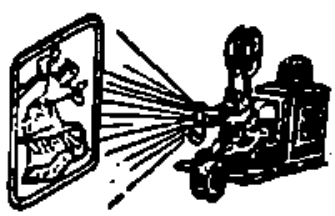

নিজের বাড়ীতে বসে যখন খুশি সিনেমা দেখবার আনন্দ উপভোগ করুন। টর্চ বা ইলেকট্রিকসিটি উভয়ের সাহায্যেই চালানো যায়। ৩৫ মিলিমিটার ফিল্ম, যা সিনেমায় ব্যবহার করা হয়, এতেও তা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এতে স্ক্রীনের ওপর উজ্জ্বল ফোকাস প্রতিফলিত হয়। পূর্ণাঙ্গ ছবির আকার ৪"×৪" ফিট। নানা রংয়ের ছবি এতে ফ্লুরেসেন্টের ভাবেই চলেফেরা ও অভিনয় করে থাকে। প্রতিটি প্রোজেক্টরের সঙ্গে ১০ গজ ফিল্ম ও সচিত্র নিয়মাবলী বিনামূল্যে দেওয়া হয়। মূল্য—১৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা, ভি, পি, পি, চার্জ—৪ টাকা ৫০ নয়া পয়সা। স্পেশাল (ডি লুক্স) ফোয়ালিটি অতিরিক্ত ফিল্ম—প্রতি গজ ৫০ নয়া পয়সা, স্ক্রীন—৩ টাকা। অগ্রিম ৫ টাকা অবশ্য প্রেরণীয়।

TECHNICAL STORES

117/592, PANDU NAGAR, KANPUR.

হোক ন্যাকামোর মত মনে হয়। অনমিতার ন্যাকামো বিমলেন্দুর নির্লজ্জতা।

"আর পারি না, আমি মরে যাবো।" ন্যাকামির স্বভাবটা নতুন নয়, দিনেশ জানে, অনমিতার এগুলো মজ্জাগত।

"মরেই যদি যাবে তো এমনভাবে কেনো! তুমি সোহাগ করে আমার কণ্ঠহার হয়ে চোখ বুজলে, আইন আমার গলায় ফাঁসির ছাদ পরিয়ে দেবে।"

"না না, ঠাট্টা নয়। এ ভাবে আর থাকা যায় না।"

"কি ভাবে?"

"এই ভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে অন্ধকারে কাঁপাকাঁপি করায় আনন্দ নেই।"

"বেশ তো! চলো তবে আলোয় গিয়ে লাফালাফি করি।"

"হাঁ, তাই করব। সামাজিকভাবে নির্লজ্জ হতে চাইলে লজ্জা করলে চলে না।"

"বাঃ বাঃ! তোফা, সুন্দর বলেছো।"

এতদিন অন্ধকারে যেসব ভয়ে ভয়ে লুকিয়ে করেছি, সবার সম্মতি নিয়ে এবার তা নির্বিবাদে ঝকঝকে আলো জ্বালিয়ে উপভোগ করব।"

"সম্মতি পাবে?"

"কাকিমা সেদিন তোমাকে আমাকে অন্ধকারে সিঁড়ির গোড়ায় দেখতে পেয়েছেন।"

"য়্যা! বলো কি?" বিস্ময়ে হুমড়ি খেল দীনেশের কণ্ঠ।

নির্ভরে জবাব দিল অনমিতা—"হ্যাঁ, সে দেখার কাজ হয়েছে।"

"বর-কনে পছন্দ হয়েছে?"

"অতটা এখনও জানতে পারিনি। তবে কাকার কানে উঠেছে।"

ছেঁড়াখোঁড়া একটা হাফশার্ট নেড়েচেড়ে দেখার মত দীনেশ পুরনো কথাগুলো মনে মনে নাড়াচাড়া করতে লাগল। পুরো আড়াই ঘণ্টা সদর রাস্তার মোড়ে অপেক্ষা করার পর দীনেশের গোল মুখখানা যখন প্রায় বকেরমতো লম্বা হয়ে উঠেছে তখন দেখা মিলল অনমিতার।

বললে—"আমায় ওরা পছন্দ করেছে।"

দীনেশ ঠাট্টা সহ্য করল—"আমিই বা অপছন্দ করলাম কই।"

অনমিতা আবার বলল—"হবু শ্বশুর মস্ত ব্যবসাদার। তিল-তিসির কারবার আছে। সম্প্রতি কাঁচড়াপাড়ায় একটা পোলাট্রি ফার্ম খুলেছে।"

"যার হাল্লা। তুমি তো ওমলেট খুব ভালোবাসো।"

"কাকার সঙ্গে গল্প করছিল, দুধ থেকে মাখন গলিয়ে ওরা ঘি তৈরী করে।"

"তোমার কপাল ভাল।"

"অমন কপালের মুখে আগুন।" এতোক্ষণে অনমিতা বুঝে উঠল।

আশ্চর্য মানুষ। বুঝেও না বোঝার ভান। এই কি সময় নাকি দিল বিকিয়ে দিলদরিয়া হওয়ার!

অনমিতা টেবিলের কাঁচে ছবি আঁকে। দীনেশ সিগ্রেট ধরায়।

"একটা কিছু আজই ঠিক করে ফেলো।"

"তা বটে, ছাড়াছাড়ি নয়ত কাড়াকাড়ি। তোমার কি পছন্দ?"

"আমার আবার পছন্দ কি! তোমার নিয়েই আমার সন্তুষ্টি। তুমি মন জীবনং, তুমি মন ভূষণং।"

দীনেশ জোরে জোরে হেসে উঠল—"আমি কিন্তু কাড়াকাড়িই পছন্দ করি।"

যেন ঠিক প্রথম কথার রেশ টানল—"ইনিয়ে বিনিয়ে কাজ আদায় হয় না, ছিনিয়ে নিতে হয়। মনে জোর থাকলে সবতাতেই জয়ী হওয়া যায়, তা সে রণেই হোক আর প্রেমেই হোক।"

তার মানে, তুমি বলতে চাও হামাগুড়ি দিয়ে এগোলে চলবে না, বুক চিতিয়ে চলতে হবে?"

"হ্যাঁ, ঠিক ধরেছো।"

"তার মানে পোটলাপুটলি বেঁধে পগারপার?"

"না, ঠিক তা নয়, আপাতত গঙ্গার ওপার। চন্দননগরে আমাদের একটা বাড়ি আছে। নদীর ঠিক গা-ঘেঁষা ছোট একটা টিনের চালা। চারদিকে মাটির দেয়াল। সামনেটা ছোট উঠোন। পুব-পশ্চিমে মস্ত দুটো শিমুল গাছ। পেঁজা পেঁজা তুলোরমত ভেজা-ভেজা ফুলের জাজিম গাছের তলায়।"

বাচ্‌ব। আমি সেই ফুলের ভাজিনে শুয়ে শুয়ে আকাশ দেখবো।"

"ওর পাশেই কিন্তু একটা পচা ডোবা আছে।"

"দুর্গন্ধের কথা বলছো? পুরুষের মুখের গন্ধের চেয়ে পচা ডোবার গন্ধ বরং ভালো।"

দীনেশ অনমিতার চোখের ওপর চোখ রাখল। আলোচনার মোড় ঘুরে যাচ্ছে দেখে অনমিতা অন্যকথা পাড়ল।

তুমি তো কলকাতা চাকরি করতে যাবে, আমি দুপুরবেলা ঘরে বসে কি করব?"

"হাওয়ায় মাদুর বিছিয়ে শুয়ে শুয়ে আমার কথা ভাববে।"

"যদি ঘুম আসে?"

"স্বপ্ন দেখবে।"

"কেমন স্বপ্ন কিছু আঁচ করতে পারো?"

"পারি বৈকি। এক ঝাঁক ছেলেপুলে তোমায় ঘিরে কিচিরমিচির করছে। তুমি গম্ভীর হাসিকাস করছ। ওরা কেউ কেউ তোমার মাথার পাকা চুল তুলছে, কেউ কেউ হাঁড়ায় কাটা পায়ের মরা চামড়া তুলছে, প্যাট প্যাট করে ঘামাচি মারছে—তুমি চোখ বুজে মাস শেষের বাজার খরচের কথা ভাবছো।"

"অন্য কিছুও তো হতে পারে।" যেমন ধরো—

পারে, কিন্তু হবে না।" একমুঠি খই মুড়ি ভেজে-ভুজে মস্ত একটা প্লেটে ছড়িয়ে দেওয়ার মত কথা কয়টি হাওয়ার মধ্যে উড়িয়ে দিল দীনেশ।

যাই হোক, ওরা শেষ পর্যন্ত পালাল।

সেই পচা ডোবার পাশে শিমুলতলায় শুয়ে একটুপ জামাকাপড়ের মত দীনেশ অনমিতার ধনুশ শরীরটা বুকে তুলে নিল। দু'জনে আকাশের দিকে তাকিয়ে বুড়ি চাঁদ দেখল। গংগার ঢেউ দেখল। গাংচিল, বুনোহাঁস উড়ে যেতে দেখল। ঘন হাওয়ার ধাক্কা খেয়ে বৃন্তখসা শিমুলফুল ওদের মাথার ওপর টুপটাপ করে পড়ল।

আরো প্রায় বছরখানেক পরে সেই শিমুলগাছের লাল আভার ছায়া পেরিয়ে বহু উপরকার পুরো নীল আকাশটাই একদিন ভেংগে পড়ল অনমিতার মাথার ওপর। দীনেশের মধ্যমশ্রেণীর চাকুরিতে উন্নতি হল। এবং ট্রান্সফার।

কোথায় যেতে হবে? চিঁচিঁ করে কথা বললেও প্রায় চীৎকারের মত শোনাল অনমিতার কণ্ঠস্বর।

"দণ্ডকারণ্য এইমাত্র একটা দণ্ডাদেশ শোনা আসামীর মুখের ছায়া নিজের মুখে ফোটাতে চাইল দীনেশ।

অনমিতা বলল—"তা হলে ছেড়ে দাও।"

দীনেশ বলল—"কি ছাড়ব? আর একটু পরিষ্কার করে বলো, চাকরি না, তোমাকে?"

অনমিতা রাগতে গিয়ে কেঁদে ফেলল। ওর সেই চোখের জল স্রোত হয়ে গংগায় মিশে যান ডাকল। দীনেশ সান্ত্বনা দিয়ে বলল—'তোমায় যেমন ছাড়া সম্ভব নয়, এমন দামি চাকরিটাও খোয়ানো অসম্ভব। দুশো থেকে তিনশো পঞ্চাশ, ভাবতেই গা ছমছম করে। তা আমি বলি কি, দুই-ই থাক, তুমিও রইলে, চাকরিটাও থাকল—আমি শুধু দিনকয়েকের জন্য হাতছাড়া হলাম।"

যে আকাশ ভেংগে পড়েছে ভেবে তুমি আতংকিত, পাহাড়ের চূড়োয় উঠে সেই আকাশ আবার আমরা

—বেকারদের বিরাট সুযোগ—

ঃ ইলেকট্রিক এ্যাণ্ড রেডিও গাইড ঃ

বাড়ীতে বসে ইলেকট্রিক ইঞ্জিনীয়ারিং, রেডিও তৈয়ারী ও মেরামত, ওয়ারিং ইত্যাদি শিখুন। মাত্র ৫০৲ টাকায় বাড়ীতে বসে কি করে "ট্রানজিসটার রেডিও" তৈয়ারী করা যায় শিখুন। রেডিও এবং ইলেকট্রিক বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণের জন্য ৪০০ শত ছবিসহ এক অভিনব পুস্তক পাওয়া যায়। দাম মাত্র ৮'৫০ টাকা, ভি. পি. পি. খরচা অতিরিক্ত ২৲ টাকা।

নিম্নলিখিত বই পাওয়া যায়ঃ

টেলারিং এবং কাটিং (ছবিসহ) ৫৲, সাবান এবং গন্ধ দ্রব্য তৈয়ারী—৫৲, ফটোগ্রাফী শিক্ষা—৫৲। লিখন এবং অংকন, পরিবর্ধিত সম্পূর্ণ নূতন সংস্করণ ৪০০ শত ছবি সহ—৬৲। বিবাহিত জীবন ৮৮টি ছবি সহ ৫৲। ভি. পি. পি. খরচা অতিরিক্ত—১৲ প্রতিটি বইয়ের জন্য।

GLOBE BOOK DEPOT (N.P.-15)

HALKA No-23, ALIGARH CITY

একদিন ঠুকে ঠুকে নতুন করে তৈরী করে নেব।

শেষ পর্যন্ত তাই ঠিক হল। খুব শুভ একটা দিনক্ষণ দেখে দীনেশ চলে গেল কলকাতায়।

কিন্তু এক সপ্তাহ ত' কেটে গেল। তারপর এক দুই। দুয়ে দুয়ে চার। অনমিতা টেলিগ্রাম করল। উত্তর নেই। অনমিতা ছুটল কলকাতার কমলটাকশন্স কোম্পানীর বড়সাহেবের কাছে। তিনি অবাক হলেন—'বলেন কি? মিস্টার দাস তো সেই কবেই সেখান থেকে কলকাতা ফিরে এসেছেন। কোম্পানী তার টিকিটের টাকা দিয়েছেন, সন্ধ্যা স্টেশনে সি-অফ করেছে—অন্তত তাই তো আমি শুনেছি।"

ভালো আকাশ ঠুকে ঠুকে পুরোপুরি গিয়ে আরো ভেঙেচুরে একেবারে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল। গলার পুল পেরিয়ে চন্দননগর ফিরে আসার সময় অনমিতার মনে হল কালের মতো হাবুডুবু খেতে খেতে সে এগিয়ে চলেছে।

পরের ইতিহাস খুবই সংক্ষিপ্ত। গলার পার হওয়া অনমিতা আবার একদিন পোটলাপুটলি নিয়ে গলার এপারে চলে এলো।

কলেজের বিদ্যেটুকু খুব কাজে লাগল। দুপুরের রোদে অনেক দৌড়ঝাঁপ করে একটা চাকরি জুটিয়ে নিল মার্কাটাইল কোম্পানীতে। সারাদিন কাজের ফাঁকে ফাঁকে খোলা জানালা দিয়ে এখানেও সে আকাশ দেখে, অবশ্য শিরীষগাছের মাথার উপরের সে আকাশের সঙ্গে এ আকাশের কোনো মিল নেই। এখানকার আকাশ ঐ টাইপিস্ট মেয়েটির পরণের ছাইরঙ শাড়িরঙের ধোঁয়া ধোঁয়া। কেমন যেন ঘোলাটে মুখ।

এমনি একদিন আফিস ছুটির পরেও অনমিতা যখন দু হাত মুঠি করে উদাস দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়েছিল, হঠাৎ পেছন থেকে এগিয়ে এসে সেই মুষ্টিবদ্ধ হাতের উপর হাত রাখল বিমলেন্দু। চমকে উঠল অনমিতা। দুটো হাতই আটকা না থাকলে হয়ত চটে গিয়ে চড় বসিয়ে দিত বিমলেন্দুর গালে। কিন্তু তার বদলে ঘৃণায় ঠোঁট উচিয়ে থুথু দিতে দিতে গিয়ে অন্য ঠোঁটে আটকা পরল।

পালাই পালাই করার সম্মতি দেওয়ার আগে অনমিতা অবশ্য অনেক পালাই-পালাই করল। কিন্তু বিমলেন্দুর ইচ্ছার কাছে কিছুই প্রায় টিকল না।

তারপর এই কদিন ধরে চন্দননগর কলকাতার প্রায় ক্রমাগত যাতায়াত চলছে। এমন কিছু জরুরী কাজে কলকাতা এসেছিল বিমলেন্দু, ফেরার পথে ধৈর্যকখানা বাজার থেকে অনমিতার দেওয়া ফর্দ মিলিয়ে মিলিয়ে কিছিম কিনছিল, হঠাৎ পাশের লোকটিকে দেখে চিৎকার করে উঠল—"আরে, দীনেশ না। দীনু—"

লোকটি কোনো উত্তর না দিয়ে নির্বিবাদে পেছন ফিরে চলে যাচ্ছিল, বিমলেন্দু খপ্ করে জামার কলার চেপে ধরল—'ফিরে পালাচ্ছিস্ যে? চিনতে পারছিস্ না?

তথাপি কোনো উত্তর নেই। তবে কি ভুল হল নাকি?

না, ভুল হওয়ার ত কথা নয়। আরো কাছে এগোল বিমলেন্দু—ফিরে, কথা বলছিস না যে?'

এবার চাপা একটা কোঁ কোঁ শব্দ বেরুল দীনেশের গলা দিয়ে। বিমলেন্দু চমকে উঠল। ওর চোখ এবং নাকমুখের চামড়া কুঞ্চিত হল।

এদিক ওদিক তাকিয়ে এক রকম জোর করেই দীনেশের একখানা হাত ধরে টানতে টানতে ঢুকল এসে একটা চায়ের দোকানে। তারপর কিছুটা হাবে ভাবে, কিছুটা হোয়েদির মারফৎ জানতে পারল দীনেশের দুর্ভাগ্যের কথা।

সমস্তটা শুনে বিমলেন্দু আর ছাড়ল না দীনেশকে। সব ওজর আপত্তি অগ্রাহ্য করে ওকে ধরে নিয়ে এলো কল্যাণীতে।

"কোথায় যাবি আর? কলকাতায় তো তোর কেউই নেই। চল আমার সঙ্গে ওখানকার ডাক্তাররা সব বন্ধুলোক, আমি তোর চিকিৎসা করাব—"

সামান্য ঠোঁট ফাঁক করে হাসল দীনেশ।

ট্রেন থেকে নেমে কয়েক কদম হাঁটলেই বিমলেন্দুর বাড়ি। ফুলবাগানের গেটের পাল্লায় হাত রেখেই হাঁকাহাঁকি সুরু করল বিমলেন্দু। লম্বা চুলের কিতার এক অংশ দাঁতে চেপে অন্য অংশ খোঁপায় জড়াতে জড়াতে ছুটে আসছিল অনমিতা, দীনেশের সঙ্গে চোখাচোখি

হাতেই জোর পোড়ার হুমড়ি খেয়ে পড়ল। নীচের মাড়ির একটা দাঁত দিয়ে রক্ত বেরুল। হাতের শাঁখা ভেঙে চুরে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল। দীনেশ এবং বিমলেন্দু ধরাধরি করে ওর অচৈতন্য শরীরটা পাঁজা কোলে করে ঘরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল।

জ্ঞান আসার অনেক পরেও অনেকক্ষণ বেহুঁশের মত নিঃসাড় হয়ে বিছানা আঁকড়ে পড়ে রইল অনমিতা। তারপর, বহুক্ষণ পর দীনেশ এবং বিমলেন্দু যখন বৈঠকখানা ঘরে জমাট হয়ে বসে গল্প করছে, সে তখন বিছানা ছেড়ে উঠে কাপড় বদলালো। শাড়ির রঙ মিলিয়ে ব্লাউজ পরল। গালে মুখে পাউডার মেখে প্রসাধন করল। তারপর দু'হাতে দু'কাপ চা নিয়ে এলো বৈঠকখানা ঘরে। এবং প্রকৃত পক্ষে ঠিক সেই মুহূর্ত থেকেই এই নাটকে অনমিতা চরিত্র অভিনয়ে প্রধান হয়ে উঠল।

আর দীনেশ ভাল মন্দ কিছু না ভেবেই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে বসল, সে তাকে হত্যা করবে। মানুষের মন যখন খুব কঠিন কোনো চিন্তায় মগ্ন থাকে তখন সে বিনাশও করে, ক্ষমাও করে।

গলা টিপে হত্যা করার কথাটা তার সহজ মনে হল। বিমলেন্দু দুপুরে যখন বাড়ি থাকবে না, কিম্বা খুব ভোরে অনমিতা যখন বকুল তলায় ফুল কুড়োবে। ভোরে, অথবা রাত্তিরে—সারা রাত দিন একজন বুদ্ধিমান মানুষ অসহায় একটি নারীকে হত্যা করার জন্য ওত্ পেতে রইল।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর বৈঠকখানা ঘরে শুয়ে শুয়ে মনের সঙ্গে যুক্তি করল। সন্ধ্যায় উঠোনে চটাহাটি করল, রাত্তিরে দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে রইল—মন এবং শরীরকে এতটুকু বিশ্রাম দিল না।

সে কি ছটফটানি। অসহ্য যন্ত্রণা।

দাওয়ার কোণে একটা পিঁড়ির উপর বসে বাঁকা হয়ে চুলের গোড়ায় তেল লাগাতে লাগাতে সে ছটফটানি দেখল অনমিতা।

ওর হাঁটাচলা, উঠোন পেরিয়ে বাথরুমে ঢুকবার সময় পেছন ফিরে তাকানোর ভঙ্গিটা বার বার যেন চিৎকার করে জানিয়ে দিচ্ছিল—না, ক্ষমা নয়, ক্ষমা নয়। আমি তোমাকে হত্যা করব। এখন না হয় পরে, কাল, পরশু, যেদিন হোক—"

কিন্তু কাকে হত্যা করবে সে মোটেই শঙ্কিত হল না।

খাওয়া দাওয়া সেরে ছোট্ট একটা দুপুরির টুকরো মুখে পুরে লাল চটিটা পায়ে গলিয়ে সে এলো তার ঘরে। চাদর জড়িয়ে শুয়ে থাকার ভান করেছিল দীনেশ। শরীরে শরীর ছুঁতেই লাফিয়ে উঠল। এক মুহূর্ত সময় নিল।

দু'হাতের দশটা আঙুল একসঙ্গে আঁকড়ে ধরেছিল অনমিতার কণ্ঠনালীটা। অনমিতা সহসা টাল সামলাতে না পেরে বিছানার উপর কাৎ হল। একটু বাঁকা হয়ে চাপা হল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে, সামান্য নিঃশ্বাস ফেলে, চেপে চেপে খুব তরল কণ্ঠে উচ্চারণ করল কথা কটি—"এ তুমি কি করতে যাচ্ছো। আমায় শাস্তি দিতে চাও দাও, কিন্তু আদাড়া করে আমাকে এখন শাস্তি দেওয়ার তো কোনো উপায় নেই। আমার শরীরে যে আর একজনার প্রাণ আছে, অসহায় শিশু, তার সঙ্গে লড়াই করা তোমার কিন্তু সাজে না।"

সৃষ্টি যদি শক্তি হয়, ধ্বংসও শক্তি। ছলনাও শক্তি।

আলিঙ্গনে যদি লজ্জা না থাকে উন্মোচনেই বা লজ্জা কী?

বুক থেকে তলপেট পর্যন্ত শাড়ির আবরণ সরিয়ে ফেলে উন্মোচিত হল অনমিতা—বিশ্বাস না হয় এই দ্যাখো। আমার সৈন্য, তোমার শত্রু। তবে আমরা কিন্তু শান্তিকামী সৃষ্টির দূত, ক্রান্তির। এবার তুমি যা খুশি তাই করো।—হত্যাও, শুশ্রূষাও, যেমন খুশি শাস্তি দাও—আমি ভয় পাবো না।"

আগুন থেকে হাত সরিয়ে নিল দীনেশ। অনমিতার শরীরটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে এক ছুটে বাইরে বেরিয়ে এলো—নিকোনো উঠোন পেরিয়ে ফুল বাগানে, সেখান থেকে বকুলতলায়। তারপর বিরাট উঁচু সেই গাছের দিকে মুখ তুলে কচি কচি পাতার ফাঁক দিয়ে তাকাল আকাশের দিকে। সকাল বেলার সেই চড়ুইদুটো ভয় পেয়ে উড়ে যেতেই কয়েকটা বাসি বকুল ঝরে পরল দীনেশের চোখের উপর।

লিও লান্দাউয়ের জীবনরক্ষার কাহিনী

দানিল দানিন

(এবার পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন সোভিয়েত পদার্থবিজ্ঞানী লিও দাভিদোভিচ লান্দাউ। সোভিয়েত বিজ্ঞান পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য অ্যাকাডেমিশিয়ান গারাউ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পদার্থবিজ্ঞানীদের অন্যতম হিসাবে সর্বত্রই স্বীকৃত। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "থিওরেটিক্যাল ফিজিক্স" বিশ্বের সর্বভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং সর্বদেশের উচ্চতর পদার্থবিদ্যার ছাত্রদের পক্ষে এই বইটি একটি অপরিহার্য পাঠ্য-পুস্তক।

গত জানুয়ারি মাসে (১৯৬২) লিও লান্দাউ এক মোটর দুর্ঘটনায় আহত হয়ে মৃত্যুর মুখোমুখী হন। কিন্তু সোভিয়েত চিকিৎসক ও অন্যান্য কয়েকটি দেশের বিজ্ঞানীদের যে সমবেত প্রয়াসে লান্দাউয়ের ক্ষেত্রে মৃত্যুকে হার মানতে হয়, এক বহুৎ আখ্যায়িকার বিষয়বস্তু। এখানে সোভিয়েত সাংবাদিক দানিল দানিন সেই কাহিনী সংক্ষেপে বলেছেন।)

এই বছরের গোড়ার দিকের ঘটনা। জানুয়ারি মাসির ৭ তারিখ, রবিবার সকাল সাড়ে এগারোটায় সারাবাধিক পদার্থবিদ্যা নগরী সুবিখ্যাত দুবনার পথে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল। তার জন্যে কাউকে দোষ দেওয়া যায় না। আবহাওয়া ছিল জঘন্য। সারাটা পথ বরফে জবাট। একটি মেয়ে পথ পার হয়ে বাসস্টপের দিকে ছুটছিল। গাড়ীর ব্রেক চাপা হল সজোরে, আর গাড়ীটা পথ পিছলে দ্রুতগামী এক ট্রাকের ওপর গিয়ে পড়ল। সংঘর্ষ নিবারণের কোনো উপায় ছিল না। গাড়ীর একটা দিক ভেঙ্গে মুচড়ে ভেতরে ঢুকে গেল, আর সবল ধাক্কাটা গিয়ে লাগল যে ব্যক্তি সেদিনের সীটে ডান ঘেঁসে বসেছিলেন তাঁর ওপর।

এই ব্যক্তি হলেন অ্যাকাডেমিশিয়ান লিও লান্দাউ, কিংবা শুধু "দাউ"—যে নামে তিনি গত ত্রিশ বছরের বেশী কাল ধরে পদার্থ বিজ্ঞানীদের মধ্যে পরিচিত।

এক ঘন্টা অ্যাম্বুলেন্সে করে তাঁকে সবচেয়ে কাছের হাসপাতালে—মস্কোর ক্লিনিক্যাল ক্লেলার ৫০ নং হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। স্ট্রেচার লিফটে করে তোলা হল সাত তলায়—সেন্ট্রাল ক্লেডিক্যাল ক্যাপরেটিভ ইনস্টিটিউটের ট্রমাটোলজি ক্লিনিকে। ডিউটির ডাক্তার লিদিয়া পানচেংকো ঝুঁকে পড়লেন রোগীর ওপর—যাঁকে প্রাণহীন বলে মনে হচ্ছিল। এই হল সূচনা, লান্দাউয়ের পুনরুজ্জীবনের জন্য আমাদের চিকিৎসকদের অসাধারণ, সত্যিকারের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের সূচনা।

রবিবারটা কারু পুনরুজ্জীবন প্রয়াসের পক্ষে শ্রেষ্ঠ দিন বলা চলে না। এইদিন ইনস্টিটিউট সব বন্ধ থাকে, লাবরেটারী কর্মীরা ছুটিতে, যাঁদের ওপর পুনরুজ্জীবন নির্ভর করে তাঁরা সপ্তাহান্তিক ছুটি উপভোগ করেছেন। সৌভাগ্যের বিষয়, ট্রমাটোলজি ক্লিনিকের অধ্যক্ষ প্রোফেসর ভালেনতিন পালিয়াকফ সেদিন একজন রোগীকে দেখতে এসেছিলেন; আগের দিন তিনি তার দেহে অস্ত্রোপচার করেছেন। ডিউটির ডাক্তার তাঁকে তৎক্ষণাৎ লান্দাউয়ের কাছে নিয়ে গেলেন। রুগ্নের একটা নিদারুণ অসমান যুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাবলী গ্রহণ করা হল। পক্ষাঘাত-বিরোধী চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ প্রক্রিয়াত্মক চিকিৎসা চালানো হল।

ইতিমধ্যে হাসপাতাল থেকে টেলিফোন পেয়ে সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদেমির পদার্থবিদ্যা বিষয়ক সিবেরিয়ান ইনস্টিটিউটে লান্দাউয়ের সহকর্মী এবং বন্ধুরা ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন। নিকোলিন সাগাড় থেকে মস্কোয় ছুটে এলেন অ্যাকাডেমিশিয়ান পিওৎর কাপিৎসা। সবাই খুঁজতে লাগলেন অধ্যাপক এভগেনি লিফশিৎসকে—যিনি লান্দাউয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং লেনিন পুরস্কার প্রাপ্ত বৃহৎ "তত্ত্বগত পদার্থবিদ্যা" পাঠক্রমের সহ-রচয়িতা। এইভাবে মৃত্যুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে খোলা

চল "দ্বিতীয় রণাঙ্গন"—সেবেস্তপোল।

চিকিৎসাবিজ্ঞান অকাদমির সদস্য এবং বিশিষ্ট নিউরোপ্যাথিস্ট নিকোলাই গ্রাশ্চেনকফকে নিযুক্ত করা হল লান্দাউয়ের জীবন রক্ষাকারী বাহিনীর অধিনায়ক রূপে। তিনজন চিকিৎসাবিজ্ঞানীর প্রথম পরামর্শ সভা সর্বপ্রথম বসল বিকাল ৪টায়; এর পর থেকে তাঁরা অবিরত রোগী পর্যবেক্ষণে রত রইলেন। এই তিনজন হলেন গ্রাশ্চেনকফ, পালিয়াকফ এবং বিখ্যাত নিউরো সার্জন অধ্যাপক প্রিগরী কাশিরিনস্কি।

পরামর্শ করে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা কঠিন এক রোগ-লক্ষণ নির্ণয় করলেন। এর বারোটি পয়েন্ট। প্রত্যেকটি পয়েন্টে ১১টি স্ক্রাকচার দেখা যায়, এর মধ্যে আছে নার্ভার সেলের স্ক্রাকচার এবং স্নায়ুর সরু শিকড়ের স্ক্রাকচার। এরপর রোগীর অবস্থা ক্রমেই খারাপ থেকে আরো খারাপ হতে থাকে: শ্বাস প্রশ্বাসের গতি, হৃৎপিণ্ডের গোলমাল, কিডনির অসুস্থতা, টুমাটিক নিউরোসিস্থিয়া, আর তাই থেকে দেখা দিয়েছে ডবল ব্রাঙ্কিওপ্লিমনিয়া এবং আন্ত্রিক প্যারোলিসিস। ১লা ফেব্রুয়ারী নিকোলাই গ্রাশ্চেনকফ বললেন: "বিশ বছরের ডাক্তার-জীবনে আমি অনেক দেখেছি, কিন্তু এই প্রথম এমন একটা জটিল ট্রমাটিক কেস দেখলাম। দাউ যে তিন সপ্তাহ বেঁচে আছেন এটাই একটা অবিশ্বাস্য বিস্ময়!

ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলাম, এই বিস্ময় থেকে কোন আশার কারণ পাওয়া যায় কিনা। গ্রাশ্চেনকফ, কাশিরিনস্কি, পালিয়াকফ এবং থেরাপিউটিস্ট অধ্যাপক এ, এম, দাসির এই প্রশ্নের সরাসরি কোনো জবাব দিলেন না। কিন্তু এ তাঁদের নৈরাশ্য নয়, এ শুধু সতর্কতার অভিব্যক্তি। বোধ হয় বিজ্ঞানীদের খানিকটা সংস্কারগত সতর্কতা, যাঁরা জানেন যে শত্রু এখনো পুরোপুরী পর্যুদস্ত হয় নি।

মার্চ মাসেই এটা স্পষ্ট বোঝা গেল, লান্দাউয়ের আঘাত থেকে জীবনের শক্তি বেশী। আরো জানা গেল যে, লান্দাউ তাঁর মস্তিষ্কের কোনো নির্দিষ্ট স্থানীয় আঘাতে আহত হন নি। ছয়মাস ধরে প্রতিদিন, প্রতি রাত্রিতে, প্রতি মিনিটে তা ঘটে চলল। ডাক্তার, নার্স ও টেকনিশিয়ানদের অপরিসীম নিঃস্বার্থ সেবার এ এক ঐন্দ্রজালিক বিস্ময়ের ঘটনা। সোভিয়েত দেশের অন্তত: পঞ্চাশজন বিশিষ্ট চিকিৎসক ঘন্টায় আর মিনিটে ভুলে দিনরাত লান্দাউয়ের জীবন-রক্ষার জন্যে সংগ্রাম চালিয়েছেন।

কিন্তু ডাক্তাররাও তাঁদের পক্ষ থেকে পদার্থবিদদের সম্পর্কে ঠিক একই কথা বলেছেন। তাঁরাও তাঁদের নাম, পদবি এবং উপাধির কথা উল্লেখ করেছেন।

বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানীরা, ঔষধপত্রের সম্পর্কে কোনো কিছু না জেনেও আকাদমির বিরুপ সদস্যগণ, ডি, এস-সি ও এম, এস-সি, গণ ৫৪ বৎসর বয়স্ক লান্দাউয়ের সমবয়স্ক বিজ্ঞানীরা ও তাঁর ছাত্ররা এবং তাঁর ছাত্রদের অতি তরুণ ছাত্ররা—স্বেচ্ছায় সব কাজ চেয়ে নিয়েছেন। কেউ মাতা বহন করেছেন, কেউ চালিয়েছেন গাড়ী, কেউ আলাপ আলোচনার কাজ করেছেন, কেউ সরবরাহের বা সেক্রেটারির কাজ কেউ অন্য ডি, টি, দিয়েছেন, কেউ কাট ফরমাস খেটেছেন, কেউ টেচার বহন করেছেন। তাঁদের সদর কেন্দ্র স্বতঃস্ফূর্তভাবে গঠিত হয়ে প্রধান চিকিৎসকের অফিসে ঘাঁটি গেড়ে ছিল এবং চিকিৎসকদের প্রত্যেকটি ইচ্ছা ও জরুরী নির্দেশ বিনা বাক্য ব্যয়ে ঘড়ির কাটা ধরে পালন করার এক্তেজী হয়ে উঠেছিল এই কেন্দ্রটি।

এই স্বেচ্ছামূলক "জীবনরক্ষা সমিতিতে" যোগ দিয়ে ছিলেন সাতাশীজন তত্ত্ববিদ এবং গবেষণাকারী। যে সকল লোক এবং ইনস্টিটিউট যে কোন মুহূর্তে কাজে আসতে পারে তাদের টেলিফোন ও ঠিকানা বর্ণানুক্রম অনুসারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। এই লিস্টিতে আছে ২২০টি টেলিফোন নম্বর। এর মধ্যে আছে হাসপাতাল, মোটর ডিপো, বিমান বন্দর, শুল্ক বিভাগ, কারাগার, মস্তিদপ্তর এবং এমন অনেক জায়গা যেখানে পরামর্শদাতা ডাক্তার পাওয়া যেতে পারে।

সব থেকে গুরুতর সংকটজনক দিনগুলিতে সাততলা হাসপাতালের সামনে দাঁড়িয়ে থাকত আট থেকে দশখানা গাড়ী; দাউ-এর মরণাপন্ন অবস্থা দেখা দিয়েছিল চারদিন।

১২ই জানুয়ারি যখন কৃত্রিম শ্বাসযন্ত্রের ওপরই সব কিছু নির্ভর করছিল, তখন তত্ত্ববিদদের একজন কিভ-ক্যাল প্রব্লেমস ইনস্টিটিউটের ওয়ার্কশপে তক্ষুণি তা তৈরী করে দেবার প্রস্তাব করেন। তার কোনো প্রয়োজন ছিল না, এ প্রস্তাব ছেলেমানুষিও বটে, কিন্তু এর পেছনে

যে নিষ্ঠা সে কী আশ্চর্য! পদার্থবিদগণ পলিওমাইলাইটিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট থেকে মেসিনটি দিলেন, নিজেরা তা বহন করে নিয়ে এলেন ওয়ার্ডে যেখানে লান্দাউ শ্বাসকষ্টে মুমূর্ষু হয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা তাঁদের সহকর্মী, শিক্ষক ও বন্ধুর জীবন রক্ষা করেছেন।

সমগ্র ঘটনা পদার্থবিদগণের এক আশ্চর্য ভ্রাতৃত্ববোধের নিদর্শন। 'পরামর্শ' সভায় যেদিন খানিকটা আশার কথা শোনা গেল সেদিন গ্রাচেনকফ তাঁদের বলেছিলেন: "দাউ বেঁচে উঠলে তার অর্ধেক কৃতিত্ব আপনাদের।"

সাধারণ ব্যবস্থা সবই গ্রহণ করার পর এক বিশেষ ব্যবস্থা পরীক্ষা করে দেখার কথা মনে হয়। এই বিশেষ ব্যবস্থা সম্ভব হতে পারে চেকোস্লোভাকিয়ায় এবং ব্রিটেনে।

কাপিৎসা তৎক্ষণাৎ তিনটি টেলিগ্রাম পাঠান তাঁর তিনজন পুরাতন সহকর্মীর কাছে: লণ্ডনে সুবিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী ব্ল্যাকেটের কাছে; প্যারিসে রহাবিজ্ঞানী লাক্ভার সহকারী করাদী বিজ্ঞানী বিকার্টের কাছে; এবং কোপেনহ্যাগেনে নিলস বোরের পরিবারের কাছে। কাপিৎসা বোরের নিকট টেলিগ্রাম পাঠান নি এই বৃদ্ধ শিক্ষককে তিনি বিচলিত করতে চাননি। কিন্তু পরদিন তাঁরই কাছ থেকে এল এক ছোট টেলিগ্রাম; তাতে বলা হল—ঔষধ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কেউ ঠিক নামটি জানতেন না, আর বোর পাঠিয়েছিলেন এমন একটা ঔষধ যা ঠিক উপযুক্ত ছিল না। বিকার্ট প্রাগে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান কর্মী ইউনিয়নে সে তাঁর পরিচিত সেক্রেটারিকে টেলিফোন করেন। সেক্রেটারি অধ্যাপক শোরেম-এর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং শোরেম প্রয়োজনীয় জিনিষটি মস্কোয় পাঠিয়ে দেন।

ব্রিটেন থেকে সাহায্য এসেছে আরো আগে। কাপিৎসার টেলিগ্রাম লণ্ডনে ব্ল্যাকেটের কাছে পৌঁছোয় নি, সেটি তৎক্ষণাৎ ব্রিটেনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরমাণু-বিজ্ঞানী জন ক্রফটের নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হয়; ক্রফট জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। ইতিমধ্যে এডগেনি লিফশিৎস অক্সফোর্ডের বিজ্ঞান সম্পাদক, তাঁর পুরানো বন্ধু ম্যাকস্ওয়েলকে টেলিফোন করেন; এই ম্যাকস্ওয়েলই লান্দাউ ও লিফশিৎসের লেখা বিরাট গ্রন্থ "তত্ত্বগত পদার্থবিদ্যা" ব্রিটেনে প্রকাশনার ব্যবস্থা করেছেন। ক্রফট ও ম্যাকস্ওয়েল তাঁদের সমস্ত সম্পত্তি জড়ো করলেন; পরদিন লণ্ডন বিমান বন্দরে ইউ—১০৪ বিমানখানাকে খানিকটা দেরী করতে হয়, সেই বিমানে করেই বস্কোতে আসে একটি ছোট পার্সেল—তার উপরে লেখা "মিঃ লান্দাউয়ের জন্য।"

ম্যাকস্ওয়েল তখন নিজেই বিপন্ন ছিলেন; ছোটর দুর্ঘটনায় আহত হয়ে তাঁর পুত্র কয়েকদিন যাবৎ হাসপাতালে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিল। তিনি তাঁর আপন তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে জানতেন যে, পরে অ্যান্টিবায়োটিক্স দরকার হবে।

শেরেমেতিয়েভো বিমান বন্দরে ঔষধের পার্সেল আসতে লাগল বেলজিয়াম থেকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে, জার্মানী থেকে। এই বিমান বন্দর থেকে ৫০নং হাসপাতালে ঔষধের পার্সেল বহন করে আনার কাজ নিয়েছিলেন অধ্যাপক ইয়াকভ্ স্বরোদিনস্কি।

কিন্তু লান্দাউয়ের জীবন রক্ষা হয় একটি ঔষধের অক্সিজেনের সাহায্যে—সেটির সন্ধান পেয়েছিলেন আচার্য ভ্লাদিমির এপেলবাউম। তিনি এবং নিকোলাই সেমিয়নফ দুর্ঘটনার দিনই ঔষধটি তৈরী করার সিদ্ধান্ত করেছিলেন, সৌভাগ্যক্রমে আরো একটি সহজ উপায় পাওয়া যায়। এপেলবাউম-এর ছাত্ররা লেনিনগ্রাদে একটি তৈরী অ্যাম্পুল পান। ম্যাকস্ওয়েলের পার্সেল এসে পৌঁছানোর আগেই ডাক্তাররা ঢোট পেয়ে যান।

ওপরে যে বিবরণ দেওয়া হল তা এই সকল আশ্চর্য ঘটনার প্রারম্ভিক এবং কঠিনতম অবস্থার বর্ণনা। তারপর প্রবীণ নিউরো সার্জন পেনফিল্ডের সভাপতিত্বে এক আন্তর্জাতিক চিকিৎসা পরামর্শ সভার অধিবেশন হয়। আর একটি চিকিৎসা নিকেতন—বহুদেনকো ইনস্টিটিউট অব নিউরো সার্জারির—ডাক্তার এবং নার্সরাও লান্দাউয়ের শয্যা পার্শ্বে বিনিদ্র রজনী যাপন করেছেন। এই পুনরুজ্জীবিত রোগীর আরোগ্য ও সেবা ও চিকিৎসা এখনো চলেছে।

ডাক্তার এবং পদার্থবিদগণের আলোচনায় পরামর্শে সেই মহৎ শব্দটি আশার কথাটি ঠিক মুহূর্তে প্রথম এসেছিল আজ তা নিরূপণ করা কঠিন।

কিন্তু সে আশা সত্য হয়েছে—এইটেই সব থেকে বড়ো কথা।

চিত্রজগৎ

কোন ছবি চলবে

অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়

গত পড়তা একটা হিসেব নিলে দেখা যাবে, অধিকাংশ ছবি ভাল চলে না এবং ভাল চলে না। তবুও আমাদের সিনেমা ব্যবসা চলছে। প্রথম কারণ, একটা ছবি 'হিট' করলে তিনটে নতুন ছবির জন্ম হয়। আর একটা কারণ এই লিপ-ব্যবসার দলে একবার যারা জড়িয়ে পড়েছেন, তাদের অন্য কিছু করা সম্ভব নয়। এই লাইনের অদ্ভুত একটা মোহ, একটা নেশা, একটা থ্রিল রয়েছে। আমার মনে হয় একটা ছবির চিত্র-নাট্যে যে নাটক থাকে সেই ছবি করার ব্যাপারে বোধহয় তার চেয়ে ঢের বেশী নাটক হয়ে থাকে। প্রথম দৃশ্যে ছবির প্রডিউসার হোপাড করা, প্রডিউসার সাধারণত আসে সারপ্রাইজের মাধ্যমে। হঠাৎ একটা লোক এলো হাজার কুড়ি পঁচিশ টাকা নিয়ে। পরিচালক বললে—ঠিক আছে, বাকি টাকাটা ডিস্ট্রিবিউটার দেবে। ভদ্রলোক তো পঁচিশ হাজার নিয়ে নেমে পড়ল, দরকার এক লাখ পঁচিশ। দু'বিঘে ছবি তুলেই পঁচিশ হাজার ফুটেরাই হয়ে গেল। দ্বিতীয় দৃশ্যে দারুণপন্থ ডিস্ট্রিবিউটার পাওয়া যাবে কি যাবে না। পাওয়া গেল। এবার ক্লাইমেক্স, ডিস্ট্রিবিউটার গল্প শুনে, দু'রিল ছবি দেখে যে যে আর্টিস্টি ঠিক করে দিলেন—তাতে ছবির যা বাজেট তার দশ আনা আর্টিস্টদের ভাগে গেল ছ আনার বাদ বাকি অন্য টেকনিশিয়ান, ফিল্ম, স্টুডিও, ল্যাবরেটারি। কন্টিউন, সেট সেটিং, মিউজিক, খাওয়া দাওয়ার খরচ এবং আরো অনেক কিছু। এরপর শেষ দৃশ্যে হ্যাপি ক্লাইমেক্স—ছবি রিলিজ করল কারার দিনে দর্শক হাসছে, হাসির দৃশ্যে পাল্লাগালি দিচ্ছে। ছবি ফ্লপ করল। এই হল আমাদের শতকরা নব্বইটি চলচ্চিত্রের ইতিবৃত্ত।

কোন ছবি চলবে, কোন ছবি চলবে না এ কথা বলা মুস্কিল। তবে একটা কথা সহজেই বোঝা যায়। ভাল গল্পের ছবি ভাল চলে। যে ছবি চলছে, সেই ছবিই

রূপলাবণ্যের উৎস
ফিজো প্রসাধনী
লোকনাথ কেমিক্যাল
কলিকাতা—২৮

বাজে সস্তা, চিক স্টান্টের। আর যে ছবি চলছে না, যে ছবি উঁচুদরের এ কথা স্বীকার করি না। বস্তুত আমাদের দেশের এখন যাঁরা বড় বড় পরিচালক—তাঁদের ভাল ছবি ভাল ভাবে চলেছে বলেই তাঁরা আজ এতো বড়। সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালী 'হিট' করেছে। তপন সিংহের 'কাবুলিওয়ালা' প্রচুর পয়সা দিয়েছে। অনেকে হয়তো নাক উঁচু করে মন্তব্য করবেন—প্রথম চলে নি। কাগজে লেখা লিখির পর চলল, আমি একথা মানি না। 'কাঞ্চনজঙ্ঘা', 'অপিকের অতিথি' সম্বন্ধে প্রেস কাগজ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। তবু ভাল চলল না। দোষটা দর্শকের ঘাড়ে না দিয়ে দোষটা অন্য কোথাও।

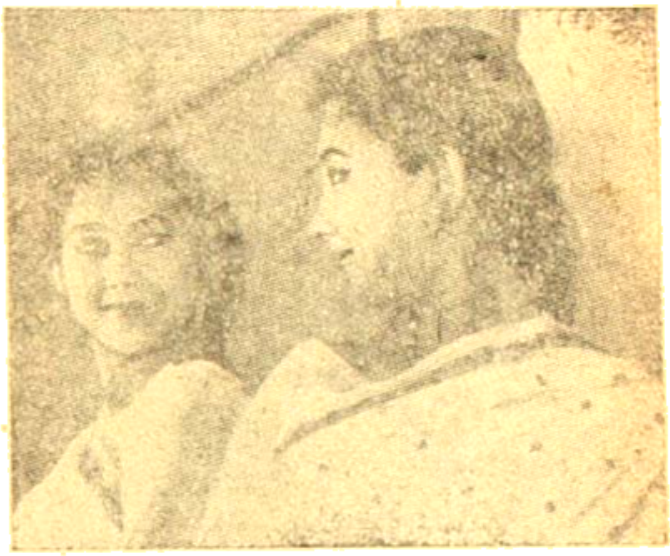

আবার অনেকের ধারণা বড় বড় আর্টিস্ট থাকলেই ছবি 'হিট' করবে। তাহলে 'দুহক' 'কাঞ্চা' 'রাজাসাজা' ছবির এই পরিণাম হত না, তাতে আমাদের সবচেয়ে বড় স্টার নায়ক ছিল কিন্তু ছবি চলে নাই হেলে।

ছবি চলে, তিনটি জিনিসের গুণে প্রথম ভাল গল্প, দ্বিতীয় ভাল চিত্রনাট্য, তৃতীয় ভাল পরিচালনা, এই ত্রিবেণী সঙ্গম যেখানেই হয়েছে সেখানে ছবি হিট করেছে।

আমরা সাধারণতঃ দুধরণের ছবি দেখি। এক শ্রেণীর বাস্তবধর্মী ডকুমেন্টারি ছবির মতন নাটকত্বীন ঘটনাহীন একটা জোলো গল্পের চিত্র-রূপ—যার নাম দিচ্ছে—নিও রিয়েলিজিম, বা নিউ ওয়েভ, আসলে ছবির বক্তব্য খুবই দুর্বল—মনকে স্পর্শ করে না।

দ্বিতীয় ধরনের ছবি হল বড় বড় নাম করা স্টারদের নিয়ে একটা অবাস্তব গল্প, যাতে তারা শুধু গাছেই উঠছে না, গাছে উঠে হনুমানের মতন দুপ দুপ করছে। এ ছবিটি দর্শক নিচ্ছে না। একটা কথা সর্বদা মনে রাখতে হবে যে দর্শক ছবি দেখছে, তারা ইতিপূর্বে রামায়ণ মহাভারতের ভাল ভাল বলিষ্ঠ গল্পতে ছবি দেখা দর্শক, তাদের কাছে অতি আধুনিক নিউ ওয়েভের বাস্তব গল্প, বা বহু স্টার-লাঞ্ছিত অবাস্তব কাহিনী, খুবই ম্যেলো মনে হচ্ছে। সিনেমা একটা আর্ট-আর্টের মূল কথা হল সত্য শিব সুন্দর। যে ছবির গল্পে এই তিনটির প্রকাশ মানুষের সুখ, দুঃখ হাসি কান্না, ত্যাগ, ভক্তি, হিংসা বিদ্বেষ, প্রেম, ভালবাসার মধ্যে দিয়ে রূপ নেবে সেই ছবিই দর্শক গ্রহণ করবে। প্রত্যেক দর্শক প্রতিটি কাহিনীর মধ্যে নিজের আপন সুখী এবং দুঃখী সত্তাকে খুঁজে পাবার চেষ্টা করে। আসলে হৃদয়কে নাড়া দিতে হবে। বিবেকানন্দ বলেছেন 'হেড' এবং হার্টের ভেতর হার্ট (Heart) কেই বেছে নেবে। কারণ হৃদয় আছে সত্য। এবং সুন্দর যেখানে শিবত্ব লাভ করেছে যে ছবিতে তাই চবে, সেই ছবি চলবে।

টুকরো খবর—

সাহিত্যিক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের গল্প "সাত পাকে বাঁধা" চিত্রের কাজ সুরু করেছেন অজয় কর—আর. ডি. বনশালের তত্ত্বাবধানায়। এ চিত্রের নায়ক নায়িকার ভূমিকায় বাংলা দেশের দুই শক্তিশালী শিল্পী অভিনয় করেছেন যথাক্রমে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও সুচিত্রা সেন। শ্রীমতী সেন দীর্ঘ দিন বাদে আবার চিত্রাবতরণ করলেন। 'সাত পাকে বাঁধা' চিত্রের ক্যামেরা ম্যান এবার প্রখ্যাত বিশু চক্রবর্তী মহাশয়। বিশুবাবু দীর্ঘ দিন অনুপস্থিতির পর আবার কাজ সুরু করলেন এবং সুরু করলেন বিখ্যাত ক্যামেরাম্যান ও পরিচালক

বিশ্বজনখ্যাত পরিচালক—সত্যজিৎ রায়

অক্ষয় কর মহাশয়ের নামে। যোগাযোগটা চমকপ্রদ—কারণ বিশ্ব চক্রবর্তী মহাশয় কৃতী ক্যামেরাম্যান তো বটেই, চিত্রপরিচালক হিসাবেও তাঁর সুনাম আছে 'অয়াচক পৃথিবী' ও অন্যান্য চিত্রে। এ চিত্রের সংগীত পরিচালনা করছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

• •

মৃণাল সেন পরিচালিত 'অবশেষে' চিত্রের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে টেকনিশিয়ান স্টুডিওতে। আলোকচিত্র গ্রহণ করছেন 'নীল আকাশের নীচে' খ্যাত শৈলজা চট্টোপাধ্যায়। বসন্ত চৌধুরী ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় 'অবশেষে'র নায়ক নায়িকা; এ ছাড়া একটি জোরালো পার্শ্ব চরিত্রে আছেন অনুপকুমার। সংগীত পরিচালক হিসাবে রবীন চট্টোপাধ্যায় এ চিত্রের গৌরব বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবেন—বিশ্বাস করার যুক্তিসংগত কারণ আছে।

• •

ঋত্বিক ঘটক পরিচালিত 'সুবর্ণরেখা' চিত্রের কাজ শেষ হয়েছে। বর্তমানে সম্পাদক রমেশ যোশী 'সুবর্ণরেখা'র শেষ পর্যায়ের মাটকীয় বিন্যাসে কাজ করে চলেছেন পরিচালকের নির্দেশে। প্রখ্যাতনামা অভি ভট্টাচার্য এ চিত্রের প্রধান ব্যক্তি ও নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন মাধবী মুখোপাধ্যায়। ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ এ চিত্রের সংগীত পরিচালক এবং আলোকচিত্র গ্রাহক হচ্ছেন দিলীপ মুখোপাধ্যায়।

• •

ডাঃ বিশ্বনাথ রায় রচিত "চৌধুরী বাড়ি"র চিত্রনাট্য প্রস্তুত করেছেন রাজেন তরফদার। প্রযোজক অমর দত্তের হয়ে "চৌধুরী বাড়ি" পরিচালনা করবেন রাজেন তরফদার। আলোকচিত্র গ্রহণ করবেন শৈলজা চট্টোপাধ্যায় ও সংগীত পরিচালনার থাকবেন রবীন চট্টোপাধ্যায়। যতদূর জানা গেছে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করবেন অনিল চট্টোপাধ্যায়। 'চৌধুরী বাড়ি' চিত্রের কাজ খুব শীঘ্র রাধা ফিল্ম স্টুডিওতে সুরু হবে বাংলা দেশের বহু জনপ্রিয় অভিনেতা সমন্বয়ে।

•

অগ্রগতি গোষ্ঠী তাঁদের ছবি 'নতুন দিগন্তে' চিত্রের কাজ সমাপ্ত করেছেন। শিশির মল্লিকের প্রযোজনায় এই

আগামী কয়েকটি চিত্রের নায়িকা—অনুভা গুপ্তঠাকুরতা

চিত্রের সংগীত পরিচালনা করেছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়। বসন্ত চৌধুরী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অসিতবরণ, বিকাশ রায়, কমল মিত্র ও সন্ধ্যা রায় প্রমুখ বহু জনপ্রিয় শিল্পী "নতুন দিগন্তে" অভিনয় করেছেন। বর্তমানে অগ্রসৃত গোষ্ঠী তাঁদের পরবর্তী আকর্ষণ 'বাদশা' চিত্রের প্রাথমিক কাজে ব্যস্ত রয়েছেন।

• •

সুধীর মুখোপাধ্যায় তাঁর পরবর্তী চিত্র সুরু করতে উদ্যোগী হয়েছেন। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় রচিত ও চিত্র-নাট্যায়িত "ত্রিধারা" গল্পটি অনতিবিলম্বে টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওতে সুরু হচ্ছে সুলতা চৌধুরী ও বিশ্বজিৎকে নায়ক নায়িকার ভূমিকায় রেখে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় 'ত্রিধারা'র সংগীত পরিচালক মনোনীত হয়েছেন এবং আলোকচিত্র গ্রাহক হিসাবে এসেছেন বিভূতি চক্রবর্তী। পরবর্তী সংখ্যায় এ চিত্র সম্বন্ধে বিশদ তথ্য দিতে পারবো আশা রইলো।

*

পরিচালক পীযূষ বসু তাঁর পূর্ব ঘোষণা অনুসারে শঙ্কু মহারাজ লিখিত একটি উপন্যাস চিত্রায়িত করবেন স্থির হয়েছিল—কিন্তু বর্তমানে তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত বদল করে সুসাহিত্যিকা লীলা মজুমদারের "বকধার্মিক" নামে একটি হাসির গল্প চিত্রায়িত করতে মনস্থ করেছেন। আলোকচিত্র গ্রাহক হিসাবে থাকছেন দীনেন গুপ্ত। সংগীত পরিচালনা করবেন সম্ভবত হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। চিত্রটির কাজ অনতিবিলম্বে সুরু হচ্ছে স্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ স্টুডিওতে।

• • •

সমরেশ বসুর গল্প অবলম্বনে চিত্র নাট্যায়িত 'দুইনারী' চিত্রের কাজ শেষের দিকে। জীবন গাঙ্গুলীর পরিচালনার চিত্রটি বর্তমানে ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে সুটিং হচ্ছে। প্রখ্যাত রবীন্দ্র সংগীত গায়ক দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় এ চিত্রের সংগীত পরিচালক। তিনি নিজে একটি গান গেয়েছেন এ ছবিতে। নির্মল কুমার 'দুইনারী'র উত্তম পুরুষ, কাজল গুপ্ত ও সুপ্রিয়া চৌধুরী রয়েছেন বড় দুটি চরিত্রে। অন্যান্য ভূমিকা-

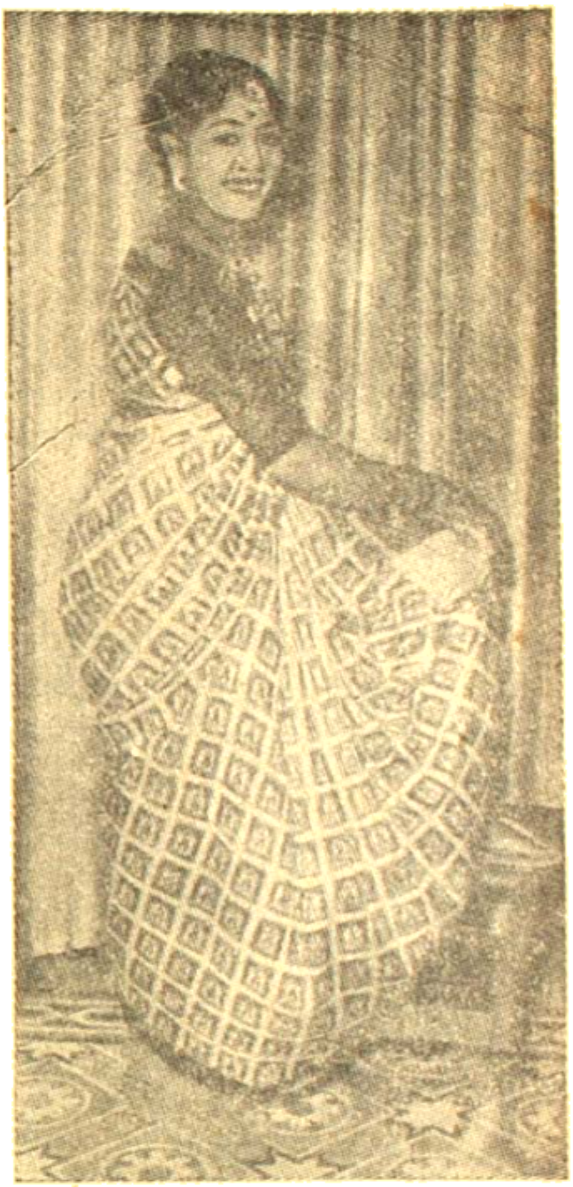

একটি বিশিষ্ট ভূমিকায়—সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

গুলিতে বিকাশ রায়, জ্ঞানেশ, শেফালী বন্দ্যোপাধ্যায় ও হরিধন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পীগণ রূপদান করছেন। আলোকচিত্র গ্রহণ, সম্পাদনা ও শিল্পনির্দেশে রয়েছেন যথাক্রমে দীনেন গুপ্ত, কমল গাঙ্গুলী ও প্রসাদ মিত্র।

• •

দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির পর পরিচালক মানু সেন সম্প্রতি চিত্র গ্রহণে ব্রতী হয়েছেন। উত্তম কুমারের পূর্ব ঘোষিত প্রযোজিত চিত্রগুলির সর্বপ্রথমটি পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন মানু সেন। প্রধান ভূমিকা দুটিতে

উত্তম কুমার ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় অবতরণ করছেন। আলোকচিত্র গ্রহণ করছেন কানাই দে।

উত্তম কুমার বোম্বে যাচ্ছেন হিন্দি ছবি প্রযোজনা করতে। উত্তম কুমার বোম্বের জনৈক পরিচালককে দিয়ে সূচনা করছেন 'অগ্নি পরীক্ষা' চিত্রের হিন্দি সংস্করণ। প্রধান ভূমিকা দুটিতে উত্তম কুমার স্বয়ং এবং ওয়াহিদা রেহমান চরিত্রচিত্রণ করবেন। প্রখ্যাত সংগীত পরিচালক নৌশাদ সংগীত পরিচালনা করবেন বলে সম্প্রতি কলকাতায় খবর পাওয়া গেল।

প্রযোজনামা তপন সিংহ নিয়মিত শুটিং করছেন তাঁর "নিশুতি রৈকতে" চিত্রের। আলোকচিত্র গ্রহণ করছেন বিমল মুখোপাধ্যায়। প্রধান চরিত্রগুলিতে রয়েছেন বোম্বের অনিল চট্টোপাধ্যায়, শর্মিলা ঠাকুর, রুমা গুহ ঠাকুরতা, রাধামোহন প্রভৃতি। সংগীত পরিচালনা করছেন কালীপদ সেন।

"এক টুকরো আগুন" চিত্রের কাজ সমাপ্তপ্রায়। পরিচালনা করছেন বিনু বর্মন। আলোকচিত্র করছেন দেওজী ভাই এবং সংগীত পরিচালনা করছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। অভিনয় করছেন জনপ্রিয় শিল্পী বিশ্বজিৎ, তন্দ্রা বর্মণ, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুভা গুপ্তা প্রভৃতি। ছবিটি শীঘ্রই মুক্তিলাভ করবে।

বিশ্বনাথ ভট্টাচার্যের প্রযোজনায় রাজকুমার মৈত্রের এক কাহিনী অবলম্বনে চরিদাস ভট্টাচার্য তাঁর সর্বাধুনিক চিত্র "শেষ অঙ্ক" চিত্রের কাজ শেষ করে বর্তমানে সম্পাদনায় ব্যস্ত আছেন। এ ছবির আলোকচিত্র গ্রাহক কানাই দে। অভিনয় করছেন উত্তম কুমার ও শর্মিলা ঠাকুর। জানা গেছে এর চিত্র কাহিনী নেওয়া হয়েছে বিখ্যাত ইংরেজী চিত্র "টুচেজ এ ক্রুকেড শ্যাডো" থেকে।

আইন বনাম নায়িকা

কিছুদিন আগে আমাদের দেশে একখানি বিদেশী পুস্তক নিয়ে তীব্র আলোড়নের সূত্রপাত হয়েছিল পুস্তকটির অশ্লীলতার কারণে। ভারতীয় শুল্ক বিভাগ পুস্তকটিকে এ দেশে আসা বন্ধ করতে প্রয়াস পেয়েছিল ফলে কালোবাজারে তৎক্ষণাৎ বইটির দাম লাফিয়ে গিয়ে প্রতি কপি তিরিশ থেকে চল্লিশ টাকা। আর সেই বইটির নাম হচ্ছে "ললিটা"—লেখক হচ্ছেন ভ্লাদমির নভোকোভ।

শুধু আমাদের দেশেই নয়—ইউরোপ আমেরিকায় এ বই নিয়ে কৈ-চৈ হয়েছে যথেষ্ট—শেষ পর্যন্ত পুস্তকের কাহিনীকে নিয়ে তৈরী হয়েছে হলিউড থেকে এক রঙীন চিত্র "ললিটা"। এর নায়িকার ভূমিকায় যে মেয়েটি অভিনয় করেছে তার বয়স কাহিনী অনুসরণে ষোল বছর সাধারণদর্শক স্কুলের ছাত্রী নাম তার সুলিবন। 'ললিটা' এখন সারা আমেরিকায় প্রদর্শিত হচ্ছে কিন্তু নায়িকা সুলিবন যে ছবি তাকে সেখানে দেখতে পাবে না। স্থানীয় আইনে আমেরিকার মেয়েরা সাবালিকা হয় আঠারো বছর বয়সে এবং "ললিটা" চিত্রটি শুধুমাত্র প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য সুতরাং সুলিবনকে দেখতে যখন হাজার হাজার মানুষ 'ললিটা' দেখতে যাবে তখন চিত্রের নায়িকাকে কোন প্রেক্ষাগৃহে ঢুকতে দেওয়া হবে না। এ হচ্ছে "চন্দ্র রাজার দেশে পবন মন্ত্রী"র সিদ্ধান্ত। হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না।

বিমর্ষ সুলিবন যে অংশটুকু অভিনয় করেছে সেটুকু বাস্তবিক তার দেখা উচিত নয় যারা বইটা পড়েছেন এবং হলিউড চিত্রের নৈতিক জ্ঞান সম্বন্ধে যারা ওয়াকিবহাল তাঁরা সে কথা এক বাক্যে স্বীকার করবেন, কিন্তু কেন তাকে সেই অংশে অভিনয়ই বা করতে দেওয়া হল, এই হচ্ছে সুলিবনের প্রশ্ন।

অতএব সুলিবন ব্রিটেন চলেছে। সেখানে 'ললিটা' অনতিবিলম্বে মুক্তিলাভ করছে। যদিও ব্রিটিশরা 'মরালের' প্রশ্নে ভীষণ কড়া তবুও তারা মেয়েদের ষোল বছরেই সাবালিকার সম্মান দেয় সুতরাং সুলিবনের বর্তমান বয়স যখন ষোল বছরের কিছু বেশী তখন সে লণ্ডনে অনায়াসে বসে তার নিজের অভিনীত চিত্র দেখতে পাবে।

খেলাধুলা

জাকার্তা ক্রীড়ায় ভারত

অজয় বসু

যে অবাঞ্ছিত রাজনীতি খেলাধুলোর মহান আদর্শ ভুলিয়ে পথ বিশেষকে ধুলো দিয়ে মাতামাতি করার উদকানি জুগিয়েছে, সে প্রসঙ্গ এড়িয়ে আজ জাকার্তার মঞ্চে ক্রীড়াবিদ ভারতীয় ভূমিকার সমীক্ষায় হাত দিচ্ছি।

সন্দেহ নেই, জাকার্তায় খেলাধুলো হয়েছে যতো রাজনীতি মাথা চাড়া দিয়েছেও ততো। তবু পাশ কাটাচ্ছি এই জন্যে যে রাজনীতিকে সূত্র করে কথা কাঁদতে গেলে অন্য বিষয়ে আর সমালোচনা মাথা গলাতে পারবে না। জাকার্তার রাজনীতির এতো কথা জমে আছে যে সুরু করলে কথা সারা করে তোলা কঠিন।

চতুর্থ এশিয়াড উপলক্ষ্যে জাকার্তায় আয়োজিত আন্তর্জাতিক ক্রীড়ায় ভারত পাকিস্থানের হাত থেকে হকির শ্রেষ্ঠ সম্মান পুনরুদ্ধার না করতে পারলেও, সামগ্রিক বিচারে এবং বাস্তবানুগ নিরিখে ভারতীয় ভূমিকা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে।

যে দিনের বিশ্ববিজয়ী ভারতকে গত পাঁচ বছরের মধ্যে উপর্যুপরি তিনবার পাকিস্থানী প্রতিদ্বন্দ্বিতার সামনে মাথা নীচু করতে হয়েছে। বারবের এই বিপর্যয় যেমনা-দায়ক। পক্ষান্তরে ভারত অসুখী। কিন্তু এই অনভিপ্রেত পরিবর্তনকে মেনে নেওয়া ছাড়া আজ আর উপায়ান্তরই বা কি আছে!

ভারতীয় হকির মান দিনে দিনে নেমেছে। আজ আমাদের জাতীয় দুর্দিন। সেই দুর্দিনের অপরিহার্য সঙ্গী হলো দুর্ভাগ্য। তাই জাকার্তায় হকি ফাইনালের দিনেও দুর্ভাগ্যের এক চোখোমী থেকে ভারতীয় দল রেহাই পায় নি। দলের সেন্টার হাফ শ্যামসুন্দর চরণিৎ আহত হয়ে মাঠ ছাড়ার পর বদলে ভারতীয়কে একজন পাকিস্থানীর সঙ্গে খেলতে হয়েছে। অবশ্য এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সংখ্যাগুরুর সঙ্গে সংখ্যালঘুর এঁটে উঠতে পারার কথা ছিল না। তাই ভারতীয় দলও হালে পানি পায় নি।

তবে সে দিনের সেই গুরুত্বপূর্ণ আসরে ভারতীয় দলের পক্ষে পুরোপুরি এগারোজনই যদি উপস্থিত থাকতেন তা হলেও ভারত পাকিস্থানকে হার মানাতে পারতো কিনা সন্দেহ। এ সন্দেহ প্রত্যক্ষদর্শীদের মন থেকে আজও ঘুচে যায় নি। কারণ ক্রীড়াগত দক্ষতার পরিচয়ে

হেরিবার সঙ্গে ভারতের ফুটবল খেলার একটি দৃশ্য

ঘটতি যে কোথায় এ কথা বুঝে শুধরে দেবার উপায় বাৎলাতে পারেন একমাত্র তাঁরাই যাঁরা নিজেরা দেখেছেন এবং খেলাধুলোর খুঁটিনাটি সম্পর্কে ওয়াকেবহাল। কিন্তু হুল, চাটুরী এবং রুচিবিহীন চক্রান্তের কোপে সত্যিকারের খেলোয়াড়দের অস্তিত্ব নির্মূল করে রাখার অপচেষ্টা এখনও থামে নি। সুতরাং এই অবক্ষয়ের জের যে ভারতকে টানতে হবে তাতে আর সন্দেহ কি! জাকার্তায় ভারতীয় হকির বিপর্যয় বেদনাদায়ক সত্যি, কিন্তু বোধহয় তা আমাদের অপ্রত্যাশিত নয়।

জাকার্তা ক্রীড়ায় ভারতীয় ফুটবলের সাফল্য প্রত্যাশিত ছিল না, তাই চূড়ান্ত চ্যাম্পিয়নের সম্মানে লাভ করতে পেরে আমরা স্বাভাবিক কারণেই অতি মাত্রায় উৎফুল্ল বোধ করছি। অনেকে ফুটবলের সাফল্যের সান্ত্বনায় হকিবেদ পর্যন্ত ভুলতে চাইছেন।

এশীয় ক্রীড়ায় একেবারে সূত্রপাতে ভারত ফুটবলে শীর্ষস্থান পেয়েছিল। তখন অবশ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার ধার তেমন ছিল না এবং প্রতিযোগী সংখ্যাও ছিল নাম মাত্র দুটি। অন্তর্বর্তী দুটি এশিয়াডে ভারতীয় ফুটবলকে পিছিয়ে থাকতে হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে জাকার্তায় ভারতীয় ফুটবলের শীর্ষাসন দখলের দৃষ্টান্তটি রীতি মতো আশ্বাসজনক।

ফুটবলের এই সাফল্যের জন্যে ভারতীয় দলের কোচ জনাব এস এ রহিমের কৃতিত্বই বোধহয় সব চেয়ে বেশী। প্রশিক্ষণে ও অনুশীলনে তিনি ভারতীয় খেলোয়াড়দের উপযুক্ত ভাবে গড়েছেন এবং ব্যক্তিগত প্রতিভার মূল্যায়নে দলের সামর্থ বাড়াতে নতুন নতুন পরীক্ষা নিরিক্ষারও তাঁর কুণ্ঠা জাগে নি। জাকার্তায় তাঁরই নির্দেশে দলের গঠন বিন্যাসে আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল এবং সে পরিবর্তনে ফল ফলেছে। বুঝতে অসুবিধে হয় না যে জনাব রহিম খেলোয়াড়দের শুধু তত্ত্বাবধানই করেন না, দলের কল্যাণে চিন্তাও করেন।

হকি এবং ফুটবল ছাড়া আর মাত্র একটি দলগত প্রতিযোগিতায় ভারত অংশ গ্রহণ করেছিল। সেটি হলো

জাকার্তায় পাকিস্তান দলই দর্শকদের; ভারতীয় দর্শকদেরও মনের গভীরে রেখাপাতে সমর্থ হয়েছিল।

আমাদের আক্ষেপের কথা এই যে ক্রমাবনতি লক্ষ্য করেও জাতীয় হকির কর্ণধারেরা অবস্থার উন্নয়নে সঠিক পথের হদিশ পাচ্ছেন না। যে কজন কর্মকর্তার প্রশাসনিক ব্যবস্থার দৈন্যে ভারতীয় ১৯৫৮ সালে এশীয় চ্যাম্পিয়নের আখ্যা পায় নি, ১৯৬০ সালের অলিম্পিকে বিশ্ব বিজয়ীর মর্যাদা খুইয়েছিল এবং আবার এই বাষট্টি সালের প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবকাশে দ্বিতীয় সারিতে পিছিয়ে রইলো, তাঁরা আজও ভারতীয় হকির নিয়ামক সংস্থার ওপরতলায় বহাল তবিয়তে বিরাজমান।

এদের অধিকাংশেরই খেলা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান নেই। ওরা নিজেরা খেলেন নি, তবে জোট বাঁধা আয়োজনের দৌলতে প্রশাসনিক অধিকার হাতে নিতে পেরেছেন। ওদের দাপাদাপিতেই ভারতীয় হকির নিয়ামক সংস্থার চৌহদ্দির মধ্যে সত্যিকারের খেলোয়াড়ের কোনো অস্তিত্ব নেই। অথচ এই ভারতেই যুগে যুগে ভজন ভজন জাত হকি খেলোয়াড় আবির্ভূত হয়েছেন।

ভলিবল। এবং সে ক্ষেত্রেও রৌপ্যপদক ভারতের সংগ্রহশালায় জমা পড়েছে। চার বছর আগে টোকিওর আয়োজনে ভারতীয় ভলিবল পেয়েছিল তৃতীয় স্থান। এবারে উঠেছে আর এক ধাপ উঁচুতে।

জাকার্তা ক্রীড়ার মুষ্টিযুদ্ধে এবং বিশেষ ভাবে মল্ল যুদ্ধে ভারতীয়দের সাফল্য স্মরণীয়। মুষ্টিযুদ্ধে প্রতিযোগী ছিলেন মাত্র যে তিনজন তাঁরা সবাই একটি করে পদক অর্জন করে ঘরে ফিরেছেন। এল সরকারের সংগ্রহ রৌপ্য, বডি ভিনুদোর ব্রোঞ্জ এবং শ্রেষ্ঠ সংগ্রহ স্বর্ণ পদক পন্ন বাহাদুর যাদবের।—পন্ন বাহাদুর এশিয়ার শ্রেষ্ঠ মুষ্টি যোদ্ধার স্বীকৃতিও লাভ করেছেন আর একমাত্র লক্ষ্যবিদ হরিচরণ সাউ এনেছেন ফুলবোরের ব্রোঞ্জ পদক পদক। ভাগ্যে কেউ বঞ্চিত হন নি।

মল্লবীরদের সাফল্য আরও উল্লেখযোগ্য। সাতজন ভারতীয় মল্ল এবার জাকার্তায় উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁদের প্রত্যেকেই কোনো না কোনো পদক লাভ করেছেন। ক্ষেত্র বিশেষে এক একজনের সংগ্রহ একাধিক পদক। জাকার্তায় মল্ল যুদ্ধের দুটি বিভাগ ছিল। প্রথমটি ফ্রিস্টাইল, দ্বিতীয়টি গ্রীকো রোমান পদ্ধতির কুস্তি। এর মধ্যে গ্রীকো রোমান পদ্ধতির কুস্তি আমাদের দেশে অপ্রচলিত। তবু ভারতীয় মল্লবীরেরা উভয় বিভাগেই সমানে দক্ষতা দেখিয়েছেন।

আমার মনে পড়ছে যে ১৯৫২ সালে হেলসিঙ্কি থেকে ফিরে ভারতীয় অলিম্পিক কুস্তিদলের কোচ শ্রীরাণিক গুহ বলেছিলেন যে গ্রীকো-রোমান কুস্তিতে ভারতীয়দের সাফল্যের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। আজ দেখছি, তাঁর পূর্বাভাস ভুল ছিল না। মাত্র কদিনের চেষ্টাতেই ভারতীয় মল্লবীরেরা এক আন্তর্জাতিক গ্রীকো রোমান প্রতিযোগিতার প্রথম আবির্ভাবে সফল হয়েছেন।

এ দৃষ্টান্ত রীতি মতো আশ্বাসজনক। উচ্চ মানের কুস্তিতে একদা ভারত ছিল সারা বিশ্বে অগ্রগণ্য। কালক্রমে ভারতীয় কুস্তির সুনাম হারিয়ে গেলেও জাকার্তা ক্রীড়া উপলক্ষ্যে একালের ভারতীয় মল্লরা সে সুনাম ফিরিয়ে আনার বলিষ্ঠ প্রতিশ্রুতি রাখতে পেরেছেন, সন্দেহ নেই।

জাকার্তা ক্রীড়ার যোগদানকারী ভারতীয় মল্লবীরদের

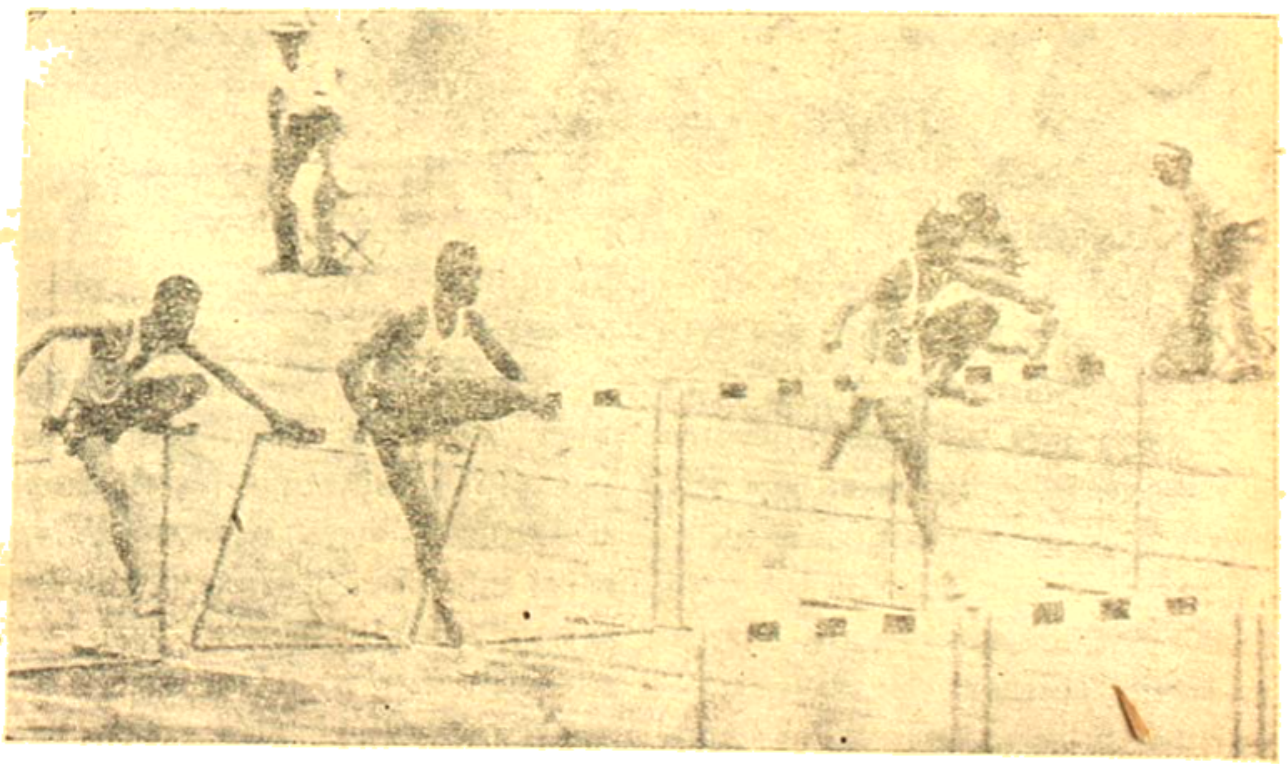

'Obstacle race'-এর একটি দৃশ্য

মধ্যে গণেশ আন্দালকার, মারুতি মানে ও মালতীর ব্যক্তিত্ব বিশেষ স্মরণীয়, কারণ ওদের প্রত্যেকের সংগ্রহে স্বর্ণ সংখ্যাও একাধিক পদক। হেভীওয়েট আন্দালকার গ্রীকো-রোমানে স্বর্ণ ও ফ্রিস্টাইলে রৌপ্য, লাইট হেভী মারুতি মানে ফ্রিস্টাইলে স্বর্ণ ও গ্রীকো-রোমানে রৌপ্য, ফ্লাইওয়েট মালওয়া গ্রীকো-রোমানে স্বর্ণ ও ফ্রিস্টাইলে ব্রোঞ্জ লক্ষ্য করেছেন। এ ছাড়া স্বর্ণভাগ্যে বঞ্চিত থাকলেও উদয় চাঁদ ও সুখন সিংয়ের একাধিক পদক সংগ্রহে অসুবিধে হয় নি।

অবশিষ্ট বিভাগ অ্যাথলেটিক। সেখানেও ভারতীয়দের সাফল্যের স্বাক্ষর উজ্জ্বল।

টোকিওতে অনুষ্ঠিত তৃতীয় এশীয় ক্রীড়ায় ভারতীয় অ্যাথলেটরা পেয়েছিলেন ৪+২+২ পদক আর এবারে জাকার্তায় ৪+৪+৪। স্বর্ণপদকের সংখ্যা অবশ্য বাড়ে নি, কিন্তু রৌপ্য ও ব্রোঞ্জের সংখ্যা বেড়েছে। এই ফাঁকে সারা এশিয়ার অ্যাথলেটিকের সামগ্রিক মানেরও যথেষ্ট উন্নয়ন ঘটেছে। সুতরাং বাড়তি মানের পরিপ্রেক্ষিত বাড়তি পদক সংগ্রহের দৃষ্টান্তের বাড়তি মূল্যও সহজে উপলব্ধি করা যায়।

জাকার্তায় স্বর্ণ সংগ্রহে সফল অ্যাথলিট হলেন মিলখা সিং, মাহিন্দর সিং, ভারদোক সিং ও গুরুবচন সিং এবং রিলে দৌড়ে চারজন প্রতিনিধি—মিলখা, মাখন, হলদিং ও জগদীশ সিং।

মিলখা সিং এশিয়ার পুরানো চ্যাম্পিয়ন। টোকিওতে তিনি দুটি বিভাগে জয় করেছিলেন। ওপরে শীর্ষাসন পেয়েছেন মাত্র একটি বিভাগে অর্থাৎ চারশ মিটার দৌড়ে। দুশো মিটারের পদক তাঁর হাত ছাড়া হয়েছে কিছুটা নিজের দোষে এবং কিছুটা সংগঠকদের অব্যবস্থায়। সংগঠনিক অব্যবস্থার মিলখা সিংকে দুশো মিটার দৌড়ের সেমিফাইনালেই সমান সমান প্রতিদ্বন্দ্বীদের মোকাবিলা করতে হয়। আইন অনুযায়ী কিন্তু ফাইনালের আগে এতোগুলি সমপর্যায়ের দৌড়বীরের একই অনুষ্ঠানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা ছিল না।

ভারদোক দশ হাজার মিটার, মাহিন্দর পনেরোশো মিটার দৌড়ে এবং গুরুবচন সিং ডেকাথলনে শীর্ষস্থান পেয়েছেন।

ডেকাথলন বিজয়ী গুরুবচন সিংই বর্তমানে ভারতের সব চেয়ে সম্ভাবনাময় অ্যাথলিট। দশটি বিভাগীয় প্রতিযোগিতায় মোট ৬৭৩৫ পয়েন্ট করে গুরুবচন এবার দ্বিতীয় প্রতিযোগী জাপানের সুসুকে সুজুকির সঙ্গে ৪৪০ পয়েন্টের ব্যবধান গড়ে তুলেছিলেন।

এ প্রসঙ্গে অবশ্য উল্লেখযোগ্য যে ইন্দোনেশীয় সংগঠকদের রাজনীতিক পাঁচের বাঁধন কেটে তাইওয়ানের বিশ্ববিশ্রুত অ্যাথলিট ইয়াং চুয়ান কুয়াং জাকার্তায় হাজির হতে না পারায় গুরুবচনের পক্ষে ডেকাথলনে শীর্ষস্থান পাওয়া সহজ, হয়তো বা সম্ভবপর হয়েছে। কারণ এশীয় ক্রীড়ায় ডেকাথলনের রেকর্ডটি (৭১০১) ইয়াং চুয়ান কুয়াংয়েরই সৃষ্টি।

ইয়াং চুয়ান কুয়াং রোম অলিম্পিকে দ্বিতীয়স্থান পেয়েছিলেন ৮০৫৪ পয়েন্টের মূলধনে এবং জাকার্তা ক্রীড়ার কদিন আগে আমেরিকার জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে শীর্ষাসন অধিকার করেছিলেন ৮২৪৯ পয়েন্টের ভিত্তিতে। সুতরাং জাকার্তায় তিনি উপস্থিত থাকলে ডেকাথলনের স্বর্ণপদকে গুরুবচন সিং ভাগ বসাতে পারতেন না। তবে তাই বলে গুরুবচনের সাফল্যকে ছোট করে দেখারও হেতু নেই। তাই ইয়াং চুয়ানের সঙ্গে গুরুবচনের তুলনা করার কারণ নেই। কেননা ইয়াং চুয়ান কুয়াং বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় অ্যাথলিট। পক্ষান্তরে আন্তর্জাতিক উন্নতমানের পরিপ্রেক্ষিতে গুরুবচনের অস্তিত্ব কোথায়? শুধু গুরুবচনই বা কেন, একা মিলখা সিং ছাড়া এশিয়ার আর দ্বিতীয় অ্যাথলিট কে আছেন যিনি সমকালীন বিশ্ব শ্রেষ্ঠত্বের পর্যায়ভুক্ত?

থাক্, সে কথা। সব শুদ্ধের বিচারে জাকার্তা ক্রীড়ার সমস্ত বিভাগ মিলিয়ে ভারতের সংগ্রহ ১০+১৩+১০। ভারতের কোনো বিভাগীয় প্রতিযোগী বা প্রতিযোগিনীকে জাকার্তা থেকে শূন্য হাতে ফিরতে হয় নি। ম্যানিলা এবং টোকিওর অনুপাতে ভারতীয়দের জাকার্তা ভূমিকা যে অপেক্ষাকৃত সফল সে কথা অনস্বীকার্য। বিশ্ব ক্রীড়ার জন্য আসরে না হোক্, এশিয়ার আঞ্চলিক অনুষ্ঠানে ভারত যে যোগ্যের ভূমিকা নিতে পেরেছে, তাতেই রয়েছে আমাদের সান্ত্বনা।

ঐতিহাসিক ঘটনা পঞ্জী

© প্রমোদ সেনগুপ্ত

নভেম্বর

১লা—১৭৫৫, পর্তুগালের রাজধানী লিসবন শহরে প্রচণ্ড ভূকম্পন।

—১৮৫৮, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে ভারতের শাসনভার বৃটিশ সাম্রাজ্ঞীর নিকট হস্তান্তরিত।

—১৯৫০, ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু।

—১৯১৬, ভাষার ভিত্তিতে ভারতের রাজ্যের পুনর্গঠন।

২রা—১৯৫০, আইরিশ নাট্যকার জর্জ বার্ণার্ড শ'র মৃত্যু।

৩রা—১৮৫৪, বোম্বাইয়ে প্রচণ্ড সামুদ্রিক ঝড়।

৪ঠা—১৮৭১, কলিকাতা হাইকোর্ট ভবনের অভ্যন্তরে জনৈক মোপলা বন্দীর হস্তে বিচারপতি মিঃ নরম্যান নিহত।

—১৯১৮, জার্মানীর কিয়েল ও হামবুর্গ বন্দরে কাইজারের শাসনের বিরুদ্ধে বিপ্লবের আত্মপ্রকাশ।

৫ই—১৬০৫, ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভবন ধ্বংসের চক্রান্তকারী "গান পাউডার প্লট"—নেতা গাই ফক্সের প্রেপ্তার ও প্রাণদণ্ড।

৫ই—১৮৭০, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জন্ম।

—১৯৪৬, দিল্লীর লালকেল্লায় আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দীদের বিচার সুরু।

—১৯৫২, মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদে মিঃ ডোয়াইট আইসেনহাওয়ারের নির্বাচন।

৬ই—১৯১৪, কাইরোস্থ ব্রিটিশ মন্ত্রী লর্ড মর্লে মিশরীয় সন্ত্রাসবাদীদের হস্তে নিহত।

—১৯৫০, নেপালের মহারাজ কর্তৃক কাঠমাণ্ডুস্থিত ভারতীয় দূতাবাসে আশ্রয় গ্রহণ—নেপালে সামন্ত-তান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সূচনা।

—১৯২৬, ফরাসী সরকার কর্তৃক নির্বাসিত মরোক্কোর সুলতান সিদি বেন ইউসুফের সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

৭ই—১৯১৭, রুশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লব সুরু।

—১৯২৪, সুদানের গভর্ণর জেনারেল স্যার লী ষ্ট্যাকে মিশরীয় সন্ত্রাসবাদীদের হস্তে নিহত।

৮ই—১৬৭৪, ইংরাজ কবি জন মিলটনের মৃত্যু।

—১৮৭১, বৃটিশ বাহিনী কর্তৃক কাবুল ধ্বংস।

—১৯১০, রুশ ঔপন্যাসিক লিও টলষ্টয়ের মৃত্যু।

—১৯৪২, উত্তর আফ্রিকায় মিত্রশক্তির সৈন্যবাহিনীর অবতরণ।

৯ই—১৯১৮, জার্মানীর কাইজার দ্বিতীয় উইলহেলমের সিংহাসন ত্যাগ—জার্মানীতে সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।

—১৯৩২, মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদে মিঃ ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টের নির্বাচন।

—১৯৩৭, ব্রিটেনের শ্রমিকদলীয় প্রথম প্রধানমন্ত্রী মিঃ র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের মৃত্যু।

—১৯৪০, ব্রিটেনের "হিটলার-তোষণ" নীতির

প্রবর্তক প্রধানমন্ত্রী মিঃ নেভিল চেম্বারলেনের মৃত্যু।

—১৯৫২, ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসিডেন্ট ডাঃ শেম ভাইজমানের মৃত্যু।

১০ই—১৪৮৩, জার্মান ধর্মসংস্কারক ও প্রোটেস্টান্ট মতবাদের প্রবর্তক মার্টিন লুথারের জন্ম।

—১৭৯১, রুশ সাম্রাজ্ঞী ক্যাথারিন দি গ্রেটের মৃত্যু।

—১৯৩৮, আধুনিক তুরস্ক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা কামাল আতাতুর্কের মৃত্যু।

—১৯৪৭, রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী ট্রেনারেল ট্রিগভে লী'র পদত্যাগ।

১১ই—১৮২১, রুশ ঔপন্যাসিক ফিওডর ডস্টয়েভস্কীর জন্ম।

—১৯১৮, জার্মানীর আত্মসমর্পণ ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান।

১২ই—১৮৪৭, অস্ত্রোপচার কার্যে 'ক্লোরোফর্ম'-এর প্রথম ব্যবহার।

—১৯৩০, লণ্ডনে ভারতের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কীয় প্রথম গোলটেবিল বৈঠকের উদ্বোধন।

১৩ই—১৯১০, ইংরাজ ঔপন্যাসিক রবার্ট লুই স্টিভেনসনের মৃত্যু।

১৪ই—১৮৮৯, প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরুর জন্ম।

১৫ই—১৯২০, জেনেভায় লীগ অব নেশনসের প্রথম বৈঠক।

—১৯৪৯, গান্ধী-হত্যাকারী নাথুরাম গডসের ফাঁসী।

১৬ই—১৯২০, ভারতে ১৯১৯ সালের আইনানুযায়ী গঠিত ব্যবস্থা পরিষদসমূহের প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠান।

১৭ই—১৮৬৯, সুয়েজ খালের উদ্বোধন।

—১৯১৭, ফরাসী ভাস্কর অগাস্তে রোদাঁর মৃত্যু।

১৯২১, প্রিন্স অব ওয়েলসের আগমনের প্রতিবাদে বোম্বাই শহরে হরতাল ও দাঙ্গাহাঙ্গামা।

—১৯৫২, কাশ্মীরে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ও সদর-ই-রিয়াসৎ পদে করণ সিং-এর শপথ গ্রহণ।

১৮ই—১৪৯৭, ভাস্কো-ডা-গামা কর্তৃক উত্তমাশা অন্তরীপ আবিষ্কার।

১৯শে—১৮২৮, অস্ট্রীয়ান সঙ্গীতকার ফ্রানৎস শুবার্টের মৃত্যু।

২০শে—১৯৫৪, 'হাঙ্গেরিয়ানে' গোয়েরিং, রিবেনট্রপ প্রমুখ নাৎসী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার আরম্ভ।

২১শে—৬৯৪, ফরাসী দার্শনিক ফ্রাঁসোয়া ভলতেয়ারের জন্ম।

১৯২১, দাক্ষিণাত্যে রেল কামরায় শ্বাসরুদ্ধ হইয়া ৫৬ জন মেপেলা রাজবন্দীর মৃত্যু।

—১৯৪৫ কলিকাতায় আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারের প্রতিবাদকারী ছাত্র শোভাযাত্রার উপর পুলিশের গুলীবর্ষণ।

২২শে—১৭৭৪, ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্থাপয়িতা লর্ড ক্লাইভের আত্মহত্যা।

—১৮১৯ ইংরাজ ঔপন্যাসিক জর্জ ইলিয়টের জন্ম।

২৩শে—১৮০৪, ইংরাজ বাহিনীর সহিত গোয়ালিয়রের সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর।

—১৯৩৭, বৈজ্ঞানিক আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর মৃত্যু।

২৪শে—১৮৩২, ইতালীয় দার্শনিক গিসনোৎসার জন্ম।

—১৯২২, ফরাসী রাজনীতিক জর্জ ক্লেমেঁসোর মৃত্যু।

—১৯৩৪, দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের মৃত্যু।

—১৯৪১, ইতালীয় প্রভুত্ব হইতে আবিসিনিয়ার মুক্তিলাভ।

—১৯৪৯, অর্থনীতিবিদ ডাঃ বিনয় সরকারের মৃত্যু।

২৫শে—১৯৫৬, জার্মানী ও জাপান কর্তৃক এণ্টি-কমিন্টার্ণ চুক্তি স্বাক্ষর।

—১৯৪৯, গণপরিষদ কর্তৃক ভারতের খসড়া সংবিধান অনুমোদন।

২৬শে—১৮১৭, ব্রিটিশ বাহিনী কর্তৃক নাগপুর অধিকার।

—১৯৪২, সুইডিশ পর্যটক সেভেন হেডিনের মৃত্যু।

২৭শে—১৮৪৪, ক্রিমিয়ার যুদ্ধারম্ভ।

১৯৪২, চেকোস্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট নেতা—গ্লানস্কী ও ক্রেমেন্টিস দেশদ্রোহের অভিযোগে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত।

২৯শে—১৯৪৭, রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক প্যালেস্টাইন বিভাগ অনুমোদন।

—১৯৪৯, সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু।

—১৯৪৯, চীনা গণবাহিনী কর্তৃক চুংকি অধিকার।

৩০শে—১৬৬৭, ইংরাজ সাহিত্যিক জোনাথন ক্রুইকটের

জন্ম।

—১৮৩৫, মার্কিন সাহিত্যিক মার্ক টোয়েনের জন্ম।

—১৮৫৮, বিজ্ঞানাচার্য ডাঃ জগদীশচন্দ্র বসুর জন্ম।

—১৮৭৪, ব্রিটেনের যুদ্ধকালীন প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলের জন্ম।

—১৯০০, ইংরাজ ঔপন্যাসিক অস্কার ওয়াইল্ডের মৃত্যু।

—১৯০৯, ঐতিহাসিক ও রাজনীতিক রমেশচন্দ্র দত্তের মৃত্যু।

—১৯৩৯, রুশিয়া কর্তৃক ফিনল্যাণ্ড আক্রমণ।

—১৯৫৫, রুশ প্রধানমন্ত্রী বুলগানিন ও কমিউনিস্ট নেতা ক্রুশ্চেভ কর্তৃক কলিকাতায় বৃহত্তম জনসভায় ভাষণ দান।

ডিসেম্বর

১লা—১৯৪১, ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীনে বঙ্গের মুসলীম লীগ মন্ত্রিসভার পদত্যাগ।

২রা—১৮০৫, অস্টার্লিজের যুদ্ধে ফ্রান্সের নিকট রাশিয়া ও প্রুশিয়ার পরাজয়।

—১৮৫২, লুই নেপোলিয়ন কর্তৃক নিজেকে ফ্রান্সের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা।

—১৯১৮, শিক্ষাব্রতী ডাঃ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু।

৩রা—১৮০০, হোহেনলিণ্ডেনের যুদ্ধে ফ্রান্সের নিকট অষ্ট্রিয়ার পরাজয়।

—১৯৩৮, দার্শনিক ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের মৃত্যু।

৪ঠা—১৬৪২, ফরাসী রাজনীতিক কর্ডিনাল রিশলুর মৃত্যু।

—১৭৯৫, ইংরাজ গদ্যলেখক টমাস কার্লাইলের জন্ম।

৫ই—১৭৯১, অস্ট্রিয়ান সঙ্গীতবিদ উলফগ্যাঙ মোৎসার্টের মৃত্যু।

—১৮৭০, ফরাসী ঔপন্যাসিক আলেকজান্দার দুমার মৃত্যু।

১৯৪৪, গ্রীসে ব্রিটিশ সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদীদের বিদ্রোহ।

—১৯৫০, দার্শনিক শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের মৃত্যু।

১৯৫১, চিত্রকর ও শিল্প সাহিত্যিক ডাঃ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু।

৬ই—১৮৮৯, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিদ্রোহী রাজ্যসমূহের রাষ্ট্রপতি জেফারসন ডেভিসের মৃত্যু।

৭ই—৪৩ (খৃষ্ট পূর্ব), রোমান দার্শনিক ও রাজনীতিক সিসেরোর মৃত্যু।

—১৮২৯, ভারতে সতীদাহ বিরোধী আইন জারী।

—১৯১৬, ব্রিটেনে অ্যাসকুইথ মন্ত্রীসভার পদত্যাগ ও লয়েড জর্জের নেতৃত্বে নূতন মন্ত্রীসভা গঠন।

—১৯৪১, জাপানী বিমান কর্তৃক হাওয়াই দ্বীপের পার্ল হারবার বন্দরে প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ।

—১৯৫২, তিউনিসিয়ার ফরাসী সৈন্য ও জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে প্রবল সংঘর্ষ।

৮ই—১৯৩০, রাইটার্স বিল্ডিংসের অলিন্দে সন্ত্রাসবাদীদের সহিত সংঘর্ষের ফলে কারাবিভাগের ইনস্পেক্টর জেনারেল মিঃ সিম্পসনের মৃত্যু।

—১৯৫৮, সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও গোয়েন্দা পুলিশ বাহিনীর প্রধানের পদে ল্যাভরেন্তি বেরিয়ার নিয়োগ।

—১৯৪১, ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জাপানের যুদ্ধঘোষণা।

৯ই—১৬০৮, ইংরাজ কবি জন মিলটনের জন্ম।

—১৮৫৬, বিধবা-বিবাহ আইনানুসারে ভারতে প্রথম বিবাহ অনুষ্ঠান।

—১৯১৭, ব্রিটিশ বাহিনী কর্তৃক জেরুসালেম অধিকার।

১০ই—১৮৯৬, সুইডিশ বিজ্ঞানী আলফ্রেড নোবেলের মৃত্যু।

—১৯৪১, জাপানী বিমানহানায় ফলে সিঙ্গাপুর বন্দরে ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজ "প্রিন্স অব ওয়েলস" ও "রিপালস" নিমজ্জিত।

—১৯৫২, জেনারেল নজীব কর্তৃক মিশরের সংবিধান বাতিল।

১১ই—১৯৩৬, ব্রিটিশ সম্রাট অষ্টম এডওয়ার্ডের সিংহাসন ত্যাগ।

১৯৪১, ফজলুল হক কর্তৃক বঙ্গদেশে লীগবিরোধী

কোয়ালিশন মন্ত্রী মণ্ডলী গঠন ।

বলশেভিকের নিকৃষ্ট ব্যক্তিদের ঘোষণা

—১৯১৬, ভারতের অপরাপরের জাতীয় নেতা ডাঃ আম্বেদকরের মৃত্যু ।

—১৮৮৯, ইংরাজ কবি রবার্ট ব্রাউনিংয়ের মৃত্যু ।

১৩ই—১৭৮৪, ইংরাজ সমালোচক ও গদ্যলেখক ডাঃ স্যামুয়েল জনসনের মৃত্যু ।

—১৭৯৯, জার্মান কবি হেনরিক হাইনের জন্ম ।

১৪ই—১৭৯৯, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনের মৃত্যু ।

—১৯৪৩, দেশদ্রোহের অপরাধে রুশ রাজনীতিক লাভরেন্টি বেরিয়ার প্রাণদণ্ড ।

১৫ই—১৯৫০, ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লৌহ মানব বল্লভভাই প্যাটেলের মৃত্যু ।

—১৯৫২, অন্ধ্র রাজ্য গঠনের দাবীতে অনশনকারী শ্রীরামুলুর মৃত্যুবরণ ।

১৬ই—১৭৭০, জার্মান সঙ্গীতকার বিথোভেনের জন্ম ।

—১৯১৬, রুশ রাজপরিবারের লোকেদের হাতে গুপ্তচর সন্ন্যাসী রাসপুটিনের মৃত্যু ।

—১৯৩১, সন্ত্রাসবাদীদের গুলিতে কুখিয়ার ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ স্টিভেন্সের মৃত্যু ।

—১৯৪৫, জাপানের সমরবাদী প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স কোনোয়ের আত্মহত্যা ।

—১৯৫২, সমগ্র অন্ধ্রদেশে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির বিরুদ্ধে হরতাল ও গণবিক্ষোভ ।

১৭ই—১৮০৭, মার্কিন কবি জন হুইটিয়ারের জন্ম ।

—১৮৩০, দক্ষিণ আমেরিকার স্বাধীনতাকামী দেশ সমূহের একচ্ছত্র নেতা সাইমন বলিভারের মৃত্যু ।

১৯০০, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'কিটি হক' শহরে রাইট ভ্রাতৃদ্বয় কর্তৃক পৃথিবীর প্রথম বিমানপোত চালনা ।

২০শে—১৮১৭, মেহিদপুরের যুদ্ধে ইংরাজ বাহিনীর নিকট ইন্দোরের হোলকারের বাহিনীর পরাজয় ।

—১৯৪২, কলিকাতায় প্রথম জাপানী বিমানহামলা ।

—১৯৪৪, বাসদাদ চুক্তির বিরুদ্ধে সিরিয়ার রাজধানী দামাস্কাসে প্রবল গণবিক্ষোভ ।

২১শে—১৮০৪, ব্রিটিশ রাজনীতিক বেঞ্জামিন ডিসরেলীর জন্ম ।

—১৮৭৯, রুশ বিপ্লবী নেতা জোসেফ স্ট্যালিনের জন্ম ।

২২শে—১৯৭৮, জাপানের যুদ্ধকালীন প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজোর প্রাণদণ্ড ।

২৩শে—১৯১২, সন্ত্রাসবাদীদের বোমার আঘাতে ভারতের বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ আহত ।

২৪শে—১৮৬৩, ইংরাজ উপন্যাসিক উইলিয়াম থ্যাকারের মৃত্যু ।

—১৯৪২, ফ্রান্সিস্ত সন্ত্রাসবাদীদের গুলিতে ফরাসী নৌ সেনাপতি এডমিরাল দারলার মৃত্যু ।

২৫শে—১৬৪২, ইংরাজ বৈজ্ঞানিক স্যার আইজাক নিউটনের জন্ম ।

১৯৪১, জাপানীগণ কর্তৃক হংকং দখল ।

২৬শে—১৮৭৬, পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মহম্মদ আলী জিন্নার জন্ম ।

২৭শে—১৯৪৯, স্বাধীন সাধারণতন্ত্ররূপে ইন্দোনেশিয়ার জন্ম ।

—১৯৫২, রাজকোটে বিক্রয়কর বিরোধী শোভাযাত্রার উপর পুলিশের গুলীবর্ষণ ।

২৮শে—১৮১৬, মার্কিন রাজনীতিক উড্রো উইলসনের জন্ম ।

—১৯৪৮, সন্ত্রাসবাদীদের গুলীতে মিশরের প্রধান মন্ত্রী নোকরাশি পাশার মৃত্যু ।

২৯শে—১৮০৯, ইংরাজ রাজনীতিক উইলিয়াম গ্ল্যাড-স্টোনের জন্ম ।

৩০শে—১৮৬৪, ইংরাজ কবি রাডিয়ার্ড কিপলিঙের জন্ম ।

—১৯৪৭, রুমানিয়ার রাজা মাইকেলের সিংহাসন ত্যাগ ও রুমানিয়ান পিপলস রিপাবলিকের প্রতিষ্ঠা ।

—১৯৫০, ভারত সরকার কর্তৃক জন গণতন্ত্রী চীনকে স্বীকৃতিদান ।

৩১শে—১৯২৮, এক বৎসরের মধ্যে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস দাবী করিতে কংগ্রেস কর্তৃক বড়লাটকে চরমপত্র প্রদান ।

বিংশ শতাব্দী

অগ্রহায়ণ ১৩৬৯
(১৮৮৪ শকাব্দ)

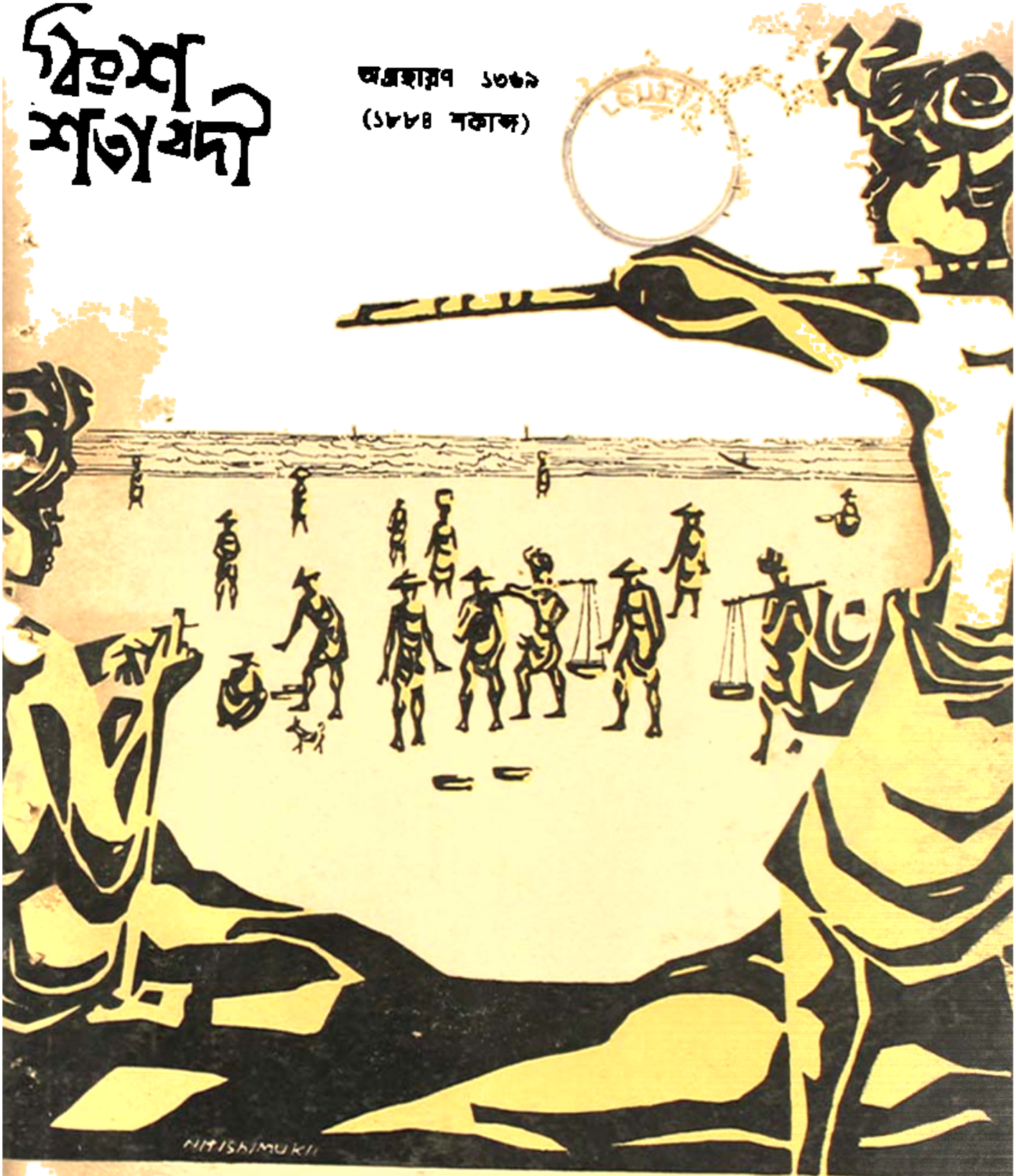

রোটনা

বিবিধ ভারতী

প্রতি সপ্তাহে ৬৫½ ঘণ্টা লঘু অনুষ্ঠান প্রচার করে।

বিবিধ ভারতী

ভারত এবং ভারতের বাইরের শ্রোতাদের কাছ থেকে প্রতি সপ্তাহে হাজার হাজার চিঠি পায়।

বিবিধ ভারতী

সর্ব্বাধিক শ্রোতার মনোরঞ্জনকারী ভালো জনপ্রিয় অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে।

সূচীপত্র

বিংশ শতাব্দী
সপ্তম বর্ষ : ৬ষ্ঠ সংখ্যা
অগ্রহায়ণ ১৮৮৪

লেখক		বিষয়
সম্পাদকীয়	৮৩৩	আমাদের কথা
	৮৩৪	জার্মান রাষ্ট্রপতি ডক্টর হাইন্‌রিস্ লুবকে (প্রবন্ধ)
কৃষ্ণানন্দ দে	৮৩৬	অব্যয় (কবিতা)
বিনয় হাজরা	৮৩৬	রাতের কবিতা (কবিতা)
শেখ আব্‌দুল জব্বার	৮৩৬	ক্লান্তি লগ্নে (কবিতা)
চিত্তরঞ্জন ঘোষ	৮৩৭	বাংলাদেশের লোকচর্যার এক অধ্যায় (প্রবন্ধ)
অমল হালদার	৮৫৯	চিত্রশিল্পী লেওনার্দো-দা-ভিন্‌চি (শিল্পকথা)
অমলকুমার সরকার	৮৬৫	শহীদ (কবিতা)
জীবিতেশ চক্রবর্তী	৮৬৫	ভ্রাম্যমানের প্রতি (কবিতা)

॥ উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক উপন্যাস ॥

সমরেশ বসুর
অয়নান্ত ৬॥০

জরাসন্ধের
আবরণ ৩॥০

বিমল করের
মল্লিকা ৩৲

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
মুগ্ধিসাগর ৪॥০ **দেহদেউল** ৩৲

শক্তিপদ রাজগুরুর
কাঁচকাঞ্চন ৪৲

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
জতুগৃহ ৪৲

বারীন্দ্রনাথ দাশের
অতনু ও জীবন দেবতা ৪॥০

সুবোধ ঘোষের
কান্তিধারা ৩৲

ধনঞ্জয় বৈরাগীর
দুয়োরাণী ২॥০

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের
তারার আঁধার ৩॥০

শৈলেশ দে-র
বধূ ৩৲

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের
আধুনিক গান ৫৲
২৫০টি গানের সংকলন

ডাঃ বিশ্বনাথ রায়ের
মুক্ত বিহঙ্গ ৪॥০
অপূর্ব উপন্যাস—মনোরম প্রচ্ছদ

প্রবোধকুমার সান্যালের
চিত্র-বিচিত্র ৭৲
উপন্যাস, গল্প ও ভ্রমণকাহিনীর সংকলন

কথাকলি : ১, পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা-৯ | কথাকলির বই সব দোকানেই পাবেন

লেখক		বিষয়
মনি গঙ্গোপাধ্যায়	৮৬৬	এই মাটির মানুষ (জীবনী)
লিওনিড লিওনভ	৮৭৩	আমরা বাঁচবো (সোভিয়েত চিত্রনাট্য)
দিলীপ দত্ত	৮৯১	শাড়ি (গল্প)
অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়	৮৯৫	সর্বভাষা কবি সম্মেলন (প্রবন্ধ)
অর্ণব মজুমদার	৮৯৭	বৈজয়ন্তী ও কৃষ্ণনাথ (গল্প)
চিত্তরঞ্জন দেব	৯০৩	পল্লীগীতি ও উত্তর-পশ্চিমবঙ্গ (সংগীত)
অর্ণব সেন	৯১৯	সকাল সন্ধ্যার পাখি (গল্প)
	৯২৪	বিজ্ঞান বিচিত্রা (বিচিত্রা)
তাপস গুপ্ত	৯২৬	ভালবাসা (কবিতা)
মিলন দত্ত	৯২৬	নাটক (কবিতা)
দীপংকর চক্রবর্তী	৯২৬	নাটমঞ্চ (কবিতা)
বিনয় মজুমদার	৯২৭	নির্লিপ্ত সোনালী নয় (কবিতা)
মলয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৯২৭	আজও (কবিতা)
সুকৃতি রায়চৌধুরী	৯২৭	নীলকণ্ঠ (কবিতা)
অজয় বসু	৯২৮	দ্বৈত অ্যাথলেটিকিস (খেলাধূলা)
রঞ্জন মজুমদার	৯৩১	রঙ্গজগৎ—

অঙ্গসজ্জা

নীতিশ মুখোপাধ্যায়

"সোভিয়েত দেশ"-এর

গ্রাহক হোন

১৯৭২ সনের ১লা ডিসেম্বর হইতে বিশেষ সুলভ হারে "সোভিয়েত দেশ"-এর গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়া বিনামূল্যে বাংলাদেশ শিক্ষার পাঠশালা ও নবারুণের উপহার স্বরূপ রঙ্গবেরঙ্গে চিত্রিত, সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত সাত পৃষ্ঠার একখানা সুদৃশ্য দেওয়ালপঞ্জী গ্রহণ করুন। পূর্ববর্তী বৎসরের ন্যায় এবারেও এজেন্টগণকে কমিশন ছাড়াও বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হইবে।

চাঁদার সাধারণ হার

বাংলা, উড়িয়া, অসমীয়া ও অন্যান্য দশটি ভারতীয় ভাষায়।

১ বৎসর	টাকা	৪·০০
২ বৎসর	টাকা	১০·০০
৩ বৎসর	টাকা	১৫·০০

ইংরাজী

	টাকা
	টাকা
	টাকা

চাঁদার বিশেষ সুলভ হার

বাংলা, উড়িয়া, অসমীয়া ও অন্যান্য দশটি ভারতীয় ভাষায়।

১ বৎসর	টাকা	৪·০০
২ বৎসর	টাকা	৭·০০
৩ বৎসর	টাকা	১০·০০

ইংরাজী

	টাকা
	টাকা
	টাকা

বিস্তারিত বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ—

"সোভিয়েত দেশ" কার্যালয়

১/১, উড্ স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬

সমরায়োজনে চাই সোনা

কোথায় দিতে হবে :-

স্বাধীন ভারতের অধিবাসী যে কোন ব্যক্তি, ব্যবসায়ী ও অন্যান্য সংস্থা নিম্নলিখিত ব্যাঙ্ক-শাখাগুলির মাধ্যমে তা জমা দিতে পারেন :

—বোম্বাই, কলকাতা, মাদ্রাজ, দিল্লী, বুধন ডিট্রিক্ট ও কানপুরস্থিত ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার অফিস সমূহ। এই ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার যে কোন অফিস অথবা এর সহযোগী ব্যাঙ্কসমূহ, যথা :- ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, বিকানীর, কচ্ছ, বাঁকীপুর, ত্রিবাঙ্কুর, লোয়ার ও আপার ইণ্ডিয়ার ব্যাঙ্ক সমূহ।

সোনা জমা দেওয়ার পর আপনি নিম্নলিখিত যে কোন সুবিধা পেতে পারেন :

—সোনা জমার রসিদ।

—সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, ব্যাঙ্ক অব বরোদা, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, ন্যাশনাল এণ্ড গ্রিণ্ডলেজ ব্যাঙ্ক, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ক্রেডিট এণ্ড ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া ব্যাঙ্ক, ইণ্ডিয়ান ওভারসীজ ব্যাঙ্ক, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সিণ্ডিকেট ব্যাঙ্ক, বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, ইউনাইটেড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল

'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'

বিংশ শতাব্দী

অগ্রহায়ণ
১৮৮৪
সপ্তম বর্ষ
৬ষ্ঠ সংখ্যা

আমাদের কথা

গত ২১শে নভেম্বর চীনারা একতরফাভাবে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করিয়াছে এবং সেই অনুসারে গত ১লা ডিসেম্বর হইতে ভারতবর্ষের কোন কোন অঞ্চল হইতে তাহারা সৈন্য অপসারণ শুরু করিয়াছে।

চীনাদের এই প্রস্তাব কতটা আন্তরিক সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। শীতকালে ভারতবর্ষের মধ্যে তাহাদের পক্ষে আর অনুপ্রবেশ করা সম্ভব ছিল না, ইহা নিশ্চিতভাবে সত্য। প্রবল তুষারপাতে তাহাদের সরবরাহ-ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হইত এবং পরিণামে একটি দৃঢ় ও সংঘবদ্ধ জাতির নিকট পরাজয় বরণ করা ছাড়া তাহাদের গত্যন্তর ছিল না। কূটাগ্রবুদ্ধি চীনারা এই অবস্থা উপলব্ধি করিয়া পরবর্তী গ্রীষ্ম পর্যন্ত সময়ক্ষেপের উদ্দেশ্যেও এই যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করিয়া থাকিতে পারে। পরন্তু একতরফা ভাবে যুদ্ধ বিরতি ও সৈন্যাপসারণের ঘোষণা করিয়া বিশ্ববাসীর নিকট সাধু বনিবার চেষ্টাও ইহার সহিত জড়িত থাকিতে পারে।

চীনাদের প্রস্তাব বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে ভারতবাসীর উৎফুল্ল হইবার কারণ নাই। প্রথমত চীনারা যে প্রস্তাব দিয়াছে তাহা তাহারা কতদূর কার্যকরী করিবে তাহা বলা কঠিন। এখন পর্যন্ত এমন কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই যাহাতে তাহাদের আন্তরিকতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। তাহাদের ঘোষণার পর কয়েক সপ্তাহ অতিক্রান্ত হইয়াছে কিন্তু কোন কোন স্থান হইতে কিছু সৈন্য হটাইয়া লইলেও তাহারা এ পর্যন্ত তাহাদের প্রতিশ্রুত স্থানে ফিরিয়া যায় নাই। দ্বিতীয়ত তাহাদের প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী করা হইলেও উত্তর পূর্ব অঞ্চলে, তাহারা ম্যাকমোহন লাইনের উত্তরে চলিয়া যাইবে বটে কিন্তু লাদাকে তাহারা তাহাদের অধিকৃত অঞ্চল পরিত্যাগ করিবে না।

ভারতবর্ষ শান্তি চায়। সে শান্তিবাদী দেশ, এ ব্যাপারে সন্দেহ নাই। কিন্তু শান্তি অপেক্ষা আত্মসম্মান ভারতবর্ষের নিকট অনেক বড়। আত্মসম্মানের বিনিময়ে শান্তি ক্রয় করিতে আমরা প্রস্তুত নহি, একথা চীন সরকার এখনও বুঝিয়া না থাকিলে তাহাদের ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া দরকার।

পণ্ডিত নেহরু সঙ্গতভাবেই বলিয়াছেন, চীন যদি যথার্থই শান্তি ও আলাপ আলোচনা চায় তবে তাহাকে বর্তমান সংঘর্ষ সুরু হইবার পূর্ব অবস্থায় অর্থাৎ এই বছরের ৮ই সেপ্টেম্বরের অবস্থানে ফিরিয়া যাইতে হইবে। চীনের উদ্দেশ্য বিচারের ইহাই হইবে মাপকাঠি। আমরা পণ্ডিত নেহরুর এই বক্তব্যের পূর্ণ সমর্থন করি।

ফেডারেল জর্মানীর রাষ্ট্রপতি ডক্টর হাইন্‌রিস্‌ লুবকে

১৮৯৪ সালের ১৪ই অক্টোবর তারিখে ওয়েস্ট-ফালিয়ার অন্তর্গত এন্থ লাইডেনে ডক্টর হাইনরিস্‌ লুবকের জন্ম হয়। ১৯১৩ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিনি বন, বের্লিন এবং মুনস্টার বিশ্ব বিদ্যালয়ে জরীপ বিদ্যা, পরিকল্পনা-প্রণয়ন-বিদ্যা, কৃষি-বিজ্ঞান, দর্শন শাস্ত্র, প্রশাসন-বিজ্ঞান, অর্থনীতি ও গৃহনির্মাণ বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। হাইনরিস লুবকে ছিলেন একজন মেধাবী ছাত্র। জরীপ বিদ্যায় শেষ এবং পরিকল্পনা প্রণয়ন বিদ্যার সর্বোচ্চ পরীক্ষায় তিনি কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সুরু হওয়ার সাথে সাথে সাময়িকভাবে তাঁর ছাত্র জীবনের অবসান ঘটে। ১৯১৪ সালের ১লা আগষ্ট তিনি এই বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করেন এবং ১৯১৮ সাল পর্যন্ত তাঁকে বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর বিরুদ্ধে মারাত্মক যুদ্ধে লিপ্ত থাকতে দেখা যায়। প্রথম মহাযুদ্ধে তাঁর অসাধারণ বীরত্বের স্বীকৃতি হিসাবে তাঁকে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর "লৌহক্রস" প্রদান করা হয়। তিনি একজন কৃতী লেফটেনান্ট হিসাবে তাঁর এই সৈনিক জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

১৯২৩ সাল থেকে ডক্টর লুবকে জার্মানীর কৃষি সংগঠন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তাঁর অসাধারণ প্রচেষ্টায় ১৯২৬ সালে জার্মানীর সম্মিলিত কৃষক সমিতি এবং "বাউয়ারলাণ্ড" নামক বৃহৎ কৃষক বসতি এলাকাটি গড়ে ওঠে।

★ পূজায় গ্রন্থমের সাহিত্য অর্ঘ্য ★

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের
ভারতে জাতীয় আন্দোলন ১০·৭৫
মৈত্রেয়ী দেবীর
বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ ৭·৫০
মংপুতে রবীন্দ্রনাথ ৭·৫০
ডেল কার্নেগির
দুশ্চিন্তাহীন নতুন জীবন ৫·৫০
প্রতিপাত ও বন্ধুলাভ ৪·৫০
বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়ের
অমৃতের উপাখ্যান ৩·৮০
বিশ্বদেব বিশ্বাসের
কাঞ্চনজঙ্ঘার পথে ২·৫০
বাঘের চোখ লীলা মজুমদার ২·৫০
আজব নগরী শ্রীপান্থের ৩·৫০
চিত্তরঞ্জন দেবের
তারাপীঠের একতারা ৩·৭৫
শচীবিলাস রায়চৌধুরীর
ডাকটিকিটের জন্মকথা ৮·০০
পরিমল গোস্বামীর
স্মৃতি চিত্রণ ৭·০০
রোল নম্বর ২০৫ (কিশোর পাঠ্য) ২·৫০

সাহিত্য • সংস্কৃতি • শিল্প
গ্রন্থম
॥ ৮·৫০ ॥

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুবোধ চট্টোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী প্রমুখ পঁচিশজনের লেখা
বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না ৩·০০
বাণী রায়ের
মধুজীবনীর নতুন ব্যাখ্যা ৭·০০
মণি গঙ্গোপাধ্যায়ের
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ২·৭৫
—উপন্যাস ও নাটক—
ধনঞ্জয় বৈরাগীর
মক্কেল ৭·০০ মধুরাই ২·৫০
একমুঠো আকাশ ৫·০০ নাটক ২·০০
এক পেয়ালা কফি (নাটক) ২·৫০
আর হবে না দেরী (নাটক) ২·৫০
ফেরারী ফৌজ (নাটক) উৎপল দত্ত ২·৫০
সূর্যশিখা (উপন্যাস) মায়া বসু ৩·৫০
গৌরীশংকর ভট্টাচার্যের
সমুদ্র নয় মন ৩·০০
• শিবরামের সদ্য প্রকাশিত কিশোর পাঠ্য
ঘাড়নাড়ির ছোড় ২·২৫

গ্রন্থম ঃ ২২।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

ক্রেতাদের পূজার বিশেষ কমিশন দেওয়া হবে। পুস্তক তালিকার জন্য লিখুন।

॥ ফেডারেল রাষ্ট্রপতি লুবকের জীবনী

১৯৩১ সালে হাইনরিস লুবকে প্রুশীয় প্রাদেশিক বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হন। কিন্তু ১৯৩৩ সালে কর্তৃপক্ষ তাঁকে সরকারী দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক কারণে তাঁকে পর পর দুবার গ্রেফতার করেন। সর্বশেষে তাঁকে ২০ মাস ধরে কারাগারে অবস্থান করতে হয়। কারাবাসের পর হাইনরিস লুবকে সৌর বসতি এলাকা স্থাপন এবং শিল্প কারখানা নির্মাণ সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৫৭ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত তাঁকে এইসব কাজে ব্যাপৃত থাকতে দেখা যায়।

১৯৪৫ সালে ডক্টর লুবকে জার্মানীর অন্যতম রাজনৈতিক পার্টি ক্রিশ্চ্যান ডেমক্র্যাটিক ইউনিয়নে যোগদান করেন এবং এই বছরের গ্রীষ্মকালে ব্রিটিশ সামরিক সরকার কর্তৃক গঠিত ওয়েস্ট ফালিয়ার প্রাদেশিক বিধান সভা এবং ১৯৪৬ সালের ২রা অক্টোবর নর্থ রাইন ওয়েস্টফালিয়ার প্রাদেশিক বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪৭ সালের ৬ই জানুয়ারী থেকে ১৯৫২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ডক্টর হাইনরিস লুবকে জার্মান ফেডারেল সাধারণতন্ত্রের অন্যতম অঙ্গরাজ্য নর্থ রাইন ওয়েস্টফালিয়ার কৃষি ও খাদ্যমন্ত্রী হিসাবে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন। নর্থরাইন ওয়েস্টফালিয়ার মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করার পর তিনি বনের জার্মান রাইফ আইজেন সংঘের অ্যাটর্নি জেনারেল নিযুক্ত হন। ১৯৫৩ সালের ২৮শে জুলাই বনের রাইনীয় ফ্রীডরিস বিলহেলম্ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি ফ্যাকাল্টি তাঁকে অনারারি ডক্টর উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৯৪৯ সালের ১৪ই আগস্ট ডক্টর হাইনরিস লুবকে প্রথম জার্মান বুন্দেসটাগের সদস্য এবং ১৬ই অক্টোবর খাদ্য, কৃষি এবং বন কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯৫৩ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর তাঁর সিগলবার্গের নির্বাচন ক্ষেত্র থেকে তিনি দ্বিতীয়বার জার্মান

রাষ্ট্রপতি ডক্টর হাইনরিস্ লুবকে

বুন্দেসটাগের সদস্য নির্বাচিত হন এবং এই বছরের ২০শে অক্টোবর জার্মান ফেডারেল সাধারণতন্ত্রের চ্যান্সেলর ডক্টর কনরাড আডেনাউয়ার তাঁকে খাদ্য, কৃষি এবং বন দপ্তরের মন্ত্রী নিযুক্ত করেন।

১৯৫৯ সালের ১লা জুলাই ক্রিশ্চ্যান ডেমক্রেটিক ইউনিয়ন এবং ক্রিশ্চ্যান সোশ্যাল ইউনিয়নের প্রস্তাব অনুসারে বের্লিনের ফেডারেল সম্মেলনে ডক্টর হাইনরিস লুবকে বিদায়ী রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক থিয়োডোর হুয়েসের জায়গায় জার্মান ফেডারেল সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

আশা করা যায় ভারত ভ্রমণ তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হয়ে থাকবে।

অব্যয় | কৃষ্ণানন্দ দে

মৃত্তিকা শরীর ছেনে করি বলে সুখের কেয়াতি
নিষ্পত্র গাছের মূলে রস জমে, পরিণামী ফলে ;—
ফলন্ত বিশ্বাসী হয়ে ফুলে ফলে সম্ভাবিত সাথী,
মৃত্যুর গহ্বরে বসে তাই স্বয় স্মৃতি মুছে চলে।
বিশ্ব ঋতুর কোপে বিশ্বাসে বিষের ছায়া কেঁপে
রূপ রস গন্ধে করে সুকুমার যৌবন পীড়িত,
সাময়িক অপমৃত্যু কামনার কটিদেশ ব্যেপে
মৃন্ময়ী রূপের বুকে চুরি করে স্বার্থসুখ যত।

দর্শনের পুঁথি নেড়ে যোগসূত্র বোকাবুঝি হলে,
মৃত্তিকা ঋতু ও প্রেমে জীবনের তন্নিষ্ঠ আকার ;
অবিলোপী সত্তাটুকু নিরপেক্ষ যুক্তির কবলে
বাঁচে দেখি, প্রেম বলে অদ্বিতীয় অভিধার পারে।

মৃত্যু তাই প্রেমে নয় বাসা বাঁধে শরীরী অধ্যায়ে—
পরাজিত সৈনিকের স্মৃতিরাখা বেদনার ঘায়ে।

রাতের কবিতা | বিনয় হাজরা

নিভুল নিয়মে তার সমস্ত প্রহরী
একটু সারল্যে আর্দ্র হোল।
সেই নিবিড় মসৃণ অন্ধকারে
আমরা এক নিপুণ, নিটোল স্থৈর্যে
প্রতিষ্ঠিত হতে চেয়ে
অনায়াসে গড়ে তুলতে পারলাম
কৃত্রিম নিদ্রার এক পরম নিভৃতি।

অতৃপ্তির পরমাণু তৃপ্তিকে জেনে নেওয়া হলে
শ্রান্তিতে আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম।

আর আনন্দের পরমাণু বেদনাকে জানা হোল
ভোর হলে—সূর্যোদয় দেখে

ক্লান্তি লগ্নে | শেখ আবদুল জব্বার

আমার গতির বেগ তুমি নাও,
মন্থর যন্ত্রের ভার কাঁধে তুলে—আরো বেগে

এখনো সমাপ্তি সোপান নাগালের অনেক সুদূর—

তোমার ঘামের বিন্দু ফুল হোক,
উষ্ণ নিশ্বাস হোক আমার সুগন্ধি
তোমার পায়ের ছন্দে নিশ্চিন্ত ঘুম যাব বলে,
ক্লান্তি-লগ্নে

আমার গতির বেগ তুমি নাও।

দ্যাখ, আমি ঊর্ধ্বমুখ সময়ের জটিল আড়ালে
আমার ভালোবাসার কথা মন্ত্র হয় ; শুদ্ধ শক্তিময়
আর আমি ত্রি-নেত্র মহাযানে উত্তোলিত
পৃথিবীর আশ্চর্য সাম্রাজ্যে

মহামিলনের দিকে, সংগ্রামের দিকে চেয়ে চেয়ে
পরিণামশীল হয়ে, জল হয়ে যাব,
সময়ের ধুলোয়, হাওয়ায়—

স্তব্ধতার ফুলগুচ্ছে ঢেকে গেলে আমার কফিন।

বাংলাদেশের লোকচর্যার এক অধ্যায়

চিত্তরঞ্জন ঘোষ

'ফোকলোর' কথাটা আজকাল আমাদের কাছে যথেষ্ট পরিচিত। কিন্তু শব্দটার জন্ম খুব বেশী দিনের নয়। মাত্র শ'খানেক বছর এর বয়স। ইংল্যাণ্ডের ফোক-লোর সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ডব্লু, জে, টমাস্ ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম এই শব্দটির উদ্ভাবন করেন। এর পরে শব্দটির ব্যাপক প্রচলন হয়।

'ফোকলোর'-এর যথাযথ বাংলা প্রতিশব্দ নেই। সম্প্রতি প্রবন্ধের ভাষাবিদ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'লোকযান' শব্দটির ব্যবহারের কথা বলেছেন। মহাযান, হীনযান, ইত্যাদির অনুসরণে শব্দটি রচিত। ব্যুৎপত্তির দিক থেকে এর মানে দাঁড়াবে—লোকসমাজের জীবন-পদ্ধতি। সুনীতিবাবুর ভাষায়,—I think "Loka-yana" would do a good Indian equivalent, In imitation of "Maha-yana," "Hina yana," "Vajra-yana," "Deva-yana," etc., in as much as, it means "A way of Life (yana) among the people (Loka)" which is carried down by tradition without any book learning or sophistication. (Indian Folklore, Vol. I. No. I. P. IV.)

কিন্তু মহাযান, হীনযান, বজ্রযান ইত্যাদির ভাবানুসরণে 'যান'-যুক্ত শব্দে একটা বিধি-নির্দিষ্ট জীবন-পদ্ধতি বোঝাতে পারে, কারণ পূর্বোক্ত 'যান'-গুলি সুনির্দিষ্ট তত্ত্ব ও অনুশাসনের ভিত্তিতে রচিত। রাজনীতিক্ষেত্রে 'ইজ্‌ম্' বা—'বাদ' পদাংশ যেমন, ধর্মীয় ক্ষেত্রে 'যান' অর্থের দিক দিয়ে অনেকটা তেমনি। কিন্তু লোকসমাজের জীবনপদ্ধতি ঠিক কোনো সুসংগঠিত 'ইজ্‌ম্'-ভিত্তিক নয়, বরং অনেক শিথিল। লোকসমাজের জীবনপদ্ধতি তাদের সমবেত জীবন-প্রয়াস থেকে স্বতঃ উদ্ভূত। আর ধর্মীয় ক্ষেত্রে 'যান' বা রাজনীতিক্ষেত্রে 'ইজ্‌ম্' একজন বা একটা দলের থেকে প্রসূত। পরে সেটা জনসাধারণের মধ্যে প্রয়োগ ও পরীক্ষার প্রয়াস চলে। সুতরাং 'যান'-এ এক বা মুষ্টিমেয় কয়েক জনের মতামত বৃহত্তর জনমানসের অভিমুখী। আর ফোকলোর ঠিক তা নয়, বরং কিছুটা পরিমাণে তার বিপরীত; এখানে সমবায় ঐতিহ্যের বিষয় উত্তর-পুরুষে প্রবাহিত। ফোকলোর সমাজ-সৃষ্ট, আর 'যান' মোটামুটিভাবে ব্যক্তিসৃষ্ট। সুতরাং 'যান' শব্দাংশ ব্যক্তিসৃষ্টির ভাবানুষঙ্গ জাগাতে পারে।

এখানে তাই দ্বিতীয় আর একটি শব্দ প্রস্তাব করছি—'লোকচর্যা'। এই শব্দে ভালভাবেই লোকসমাজের সামগ্রিক জীবনাচরণের অর্থ দ্যোতিত হতে পারে।

বাংলাদেশে লোকচর্যা-চর্চার প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেন রেভারেণ্ড লালবিহারী দে, রবীন্দ্রনাথ, দীনেশচন্দ্র সেন, দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার প্রভৃতি।

বাংলাদেশের লোকচর্যার একটি বিশেষ বিষয়—ব্রত—এই প্রবন্ধের আলোচ্য।

সব অনুষ্ঠানেরই সুরুতে একটা মন্ত্রপাঠরূপের প্রথা আছে। এই প্রবন্ধও সুরু করছি রবীন্দ্রনাথের একটি প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দিয়ে:

'—অনেকের নিকট এই সকল ব্রতকথা ও ছড়া নিতান্ত তুচ্ছ ও হাস্যকর বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা গম্ভীর প্রকৃতির লোক এবং এরূপ দুঃসহ গাম্ভীর্য বর্তমানকালে বঙ্গ সমাজে অতিশয় সুলভ হইয়াছে।

'বালকদিগের এমন একটি বয়স আছে যখন তাহারা বাল্য-সম্পর্কীয় সকল প্রকার বিষয়কেই অবজ্ঞার চক্ষে দেখে, অথচ পরিণত বয়সোচিত গাম্ভীর্যও তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক হয় না। তখন তাহারা সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকে পাছে কোন সূত্রে কেহ তাহাদিগকে বালক মনে করে। বঙ্গ-সমাজের গম্ভীর সম্প্রদায়েরও সেই দুর্গতি উপস্থিত

হইয়াছে। তাঁহারা বঙ্গ-ভাষা, বঙ্গ-সাহিত্য, বঙ্গদেশ-প্রচলিত সংস্কার ব্যাপারের প্রতি অবজ্ঞামিশ্রিত কৃপা-কটাক্ষপাত করিয়া আপন প্রকৃতির অতলস্পর্শ গাম্ভীর্য এবং পরিণতির প্রমাণ দিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। অথচ তাঁহারা আপন অভ্রভেদী মহিমার উপযোগী আর যে কিছু মহৎ কীর্তি স্থাপিয়া যাইবেন এমন কোন লক্ষণও প্রকাশ পাইতেছে না।

'য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাসে যথেষ্ট মনোযোগ করিয়া থাকেন এবং ছড়া, রূপকথা প্রভৃতি সংগ্রহেও সংকোচ বোধ করেন না। তাঁহাদের এ আশংকা নাই পাছে লোকসাধারণের নিকট তাঁহাদের মর্যাদা নষ্ট হয়। প্রথমত, তাঁহারা জানেন যে, যে সকল কথা ও গাথা সমাজের অন্তঃপুরের মধ্যে চিরকাল স্থান পাইয়া আসিয়াছে, তাহারা দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ না হইয়া যায় না—দ্বিতীয়তঃ, যাহারা স্বদেশকে অন্তরের সহিত ভালবাসে তাহারা স্বদেশের সহিত অন্তরঙ্গরূপে পরিচিত হইতে চাহে, এবং ছড়া, রূপকথা, ব্রতকথা প্রভৃতি ব্যতিরেকে সেই পরিচয় কখনও সম্পূর্ণতা লাভ করে না।—'

রবীন্দ্রনাথের সমকালীন 'ধর্ম-সমাজের গম্ভীর-সম্প্রদায়'-এর প্রভাব-প্রতিপত্তি বর্তমানে ক্ষীণ, কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলা দেশের ব্রত সম্পর্কে তেমন আলোচনা হয় নি। 'সাধনা' পত্রিকা সম্পাদনাকালে রবীন্দ্রনাথ নানা ধরনের লোকসাহিত্য সংগ্রহ ও প্রকাশে প্রবৃত্ত হ'য়েছিলেন। তাঁর প্রেরণায় কিছু ব্রতও সংগৃহীত হ'য়েছিল। এ ব্যাপারে তাঁর প্রধান সহায় ছিলেন অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়—তাঁর ব্রত-সংকলন পুস্তক-আকারে প্রকাশিতও হ'য়েছিল রবীন্দ্রনাথ-লিখিত ভূমিকার জয়টীকা ললাটে নিয়ে। এই বইখানিই বোধহয় প্রথম ব্রত-সংকলন গ্রন্থ। এর পরে আরো কয়েকখানি এই জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশিত হ'য়েছিল। বাংলাদেশের সমগ্র ব্রতের বিবরণ এর কোনটিতেই নেই, তা সত্ত্বেও প্রচেষ্টা হিসেবে এ-গুলি স্মরণীয়। কিন্তু আজকাল এই ধরনের সংগ্রহের প্রচেষ্টা অত্যন্ত বিরল, অথচ ব্রতানুষ্ঠান দিনের পর দিন অতি দ্রুতগতিতে বাংলাদেশ থেকে মিলিয়ে যাচ্ছে। সেই জন্যে এই মুহূর্তে যথাসম্ভব-সম্পূর্ণ একটি সংকলনের কাজে হাত দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। আর ব্রতগুলি বিশ্লেষণ করে এর মধ্যে 'দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ' কিছু আছে কিনা তাও দেখা দরকার।

পূর্বোল্লিখিত সংকলনগুলি সবই অসম্পূর্ণ; তাছাড়া সম্পাদনায়ও ত্রুটিপূর্ণ। সব সংকলনই প্রায় সমস্ত ব্রতকে নির্বিচারে খাঁটি ব্রত বলে গ্রহণ করেছেন, ফলে আসলে-নকলে এমন মিশে গেছে যে ব্রতের আসল রূপটি খুঁজে বার করা কঠিনই হয়ে গেছে। সংকলন গ্রন্থে কোন বিচার-বিশ্লেষণের স্থান তাঁরা দেন নি। তাঁরা ভাবতেন যে বালিকাদের হিন্দু-ধর্মীয় রীতিনীতি শিক্ষা দেওয়ার জন্য ব্রতগুলি উদ্ভাবিত। অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় এ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন যে 'সমগ্র হিন্দুশাস্ত্র পাতাবার মন্থন করিলেও এগুলির অনুকূলে অনুষ্টুপ্‌ছন্দে রচিত একটিও শ্লোক উদ্ধার করিতে পারা যায় না।' কিন্তু তিনিও শেষ পর্যন্ত বলেছেন, 'এই সমস্ত ব্রতোপাখ্যান হইতে আমাদের রমণীগণ স্বামীভক্তি, দেবভক্তি, ভ্রাতাভগিনীর প্রতি স্নেহ-মমতা, ইন্দ্রিয়-সংযম, ধৈর্য, তিতিক্ষা প্রভৃতি বিবিধ রূপ শিক্ষালাভ করিয়া থাকেন। এমন কি ভগিনী নিবেদিতারও ধারণা: 'Nothing could be more perfect educationally than the Bratas which Hindu Society has preserved and hands to its children in each generation, as perfect lessons in worship

এই ধর্মাচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গির ফলে ব্রতকে তাঁরা মাথায় করে রেখেছিলেন, কিন্তু ব্রত নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাননি। ধর্মানুষ্ঠান পালন করে এবং বালিকাদের শিক্ষা দিয়েই তাঁরা তুষ্ট ছিলেন, ফলে ব্রত সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক আলোচনায় এঁরা মন দেন নি। তাঁরা কিছু কিছু ব্রতের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে বালিকাদের হাতে তুলে দিয়ে তাঁদের শ্রম সার্থক বিবেচনা করেছেন। ফলে রবীন্দ্রনাথ নির্দেশিত বৈজ্ঞানিক-চর্চার পথে বিশেষ কাজ হয় নি। অবশ্য এঁদের সংকলনের মধ্যে পরবর্তী গবেষকদের জন্য বেশ কিছু মালমসলা জোগাড় করা ছিল তা অস্বীকার করা যায় না।

বেশ কিছুদিন পরে ঠাকুর বংশেরই আর এক কৃতী-পুরুষ বাংলাদেশের ব্রত নিয়ে বৈজ্ঞানিক আলোচনা

করেছেন ; অবনীন্দ্রনাথের 'বাংলার ব্রত' আকারে ক্ষুদ্র, সংগ্রহ ও আলোচনায় অসম্পূর্ণ, কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটি লুপ্ত অধ্যায়কে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার আলোকে উজ্জ্বল করে তোলবার প্রথম দৃঢ়খল প্রয়াস—এ দিক দিয়ে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানির গুরুত্ব রয়েছে।

এ কথাটা গোড়াতেই মনে রাখা দরকার যে ব্রত নারীদের শিক্ষা দেওয়ার একটি কর্ম বা উপায় নয়। ব্রত হচ্ছে মূলত প্রাক-আর্য যুগের অনগ্রসর কৃষিনির্ভর মানুষদের যাদুশক্তিতে (magic) বিশ্বাসী সামাজিক অনুষ্ঠান। কোন বালিকাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য এর উৎপত্তি হয় নি, উৎপত্তি হয়েছিল সেই পশ্চাৎপদ মানুষদের সামাজিক প্রয়োজনে। পরে অবশ্য ব্রাহ্মণ-ধর্ম শিক্ষা দেওয়ার জন্য স্মার্তরা ব্রতানুষ্ঠানটিকে ব্যবহার করেছেন —তাতে ব্রতের স্বরূপ ঢাকা পড়েছে পৌরাণিক আবরণে। সেই আবরণটিকেই যদি আমরা সত্য বলে গ্রহণ করি, তবে ব্রতের আসল পরিচয় লাভ সম্ভব হবে না। বরং সেই আবরণকে সরিয়ে একেবারে অন্তঃস্থলে প্রবেশ করা দরকার।

কিন্তু মুস্কিল এই যে, বহুদিনের সংস্পর্শে সেটি আর আবরণ মাত্র নেই, একেবারে মিশে গেছে। এখন বিশ্লেষণ করে এর পৌরাণিক অংশকে ছেঁকে নেওয়া এবং লৌকিক অংশকে আলাদা করে দেখা অত্যন্ত দুরূহ। এ ব্যাপারে আমরা দুটো দিক থেকে প্রধানত সাহায্য পেতে পারি। প্রথমত যে ব্রতগুলিতে পুরাণের হাতের স্পর্শ বিশেষ লাগে নি, অনেকটা আদি রূপেই যে-গুলির পাশাপাশি রেখে তুলনামূলকভাবে বিচার করলে অনেক অনালোকিত অংশে কিছুটা আলোকপাত করা সম্ভব। দ্বিতীয়ত, মানুষের যে ধরনের সমাজের মধ্যে ব্রতগুলির জন্ম, সেই সমাজ সম্পর্কে, তার আচার-ব্যবহার, কামনা-ভাবনা, বিশ্বাস-অবিশ্বাস ইত্যাদি সম্পর্কে একটু জেনে নিতে হবে, তাহলে তাদের অনুষ্ঠানগুলির উৎস খুঁজে পেতে সুবিধা হবে। এবং এই জ্ঞান ব্রতকে বিশ্লেষণ করে বোঝাবার পক্ষে প্রচুর সহায়তা করবে। সেই পুরাতন সমাজের অনুসন্ধানে বাংলাদেশ ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অনগ্রসর মানুষের ইতিহাস আমাদের সাহায্য করবে।

সেই পুরানো মানুষের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে সে তখনও প্রাকৃতিক কার্যকলাপের মূলকে আবিষ্কার করতে পারে নি, প্রকৃতিকে জয় করতে পারে নি। যে প্রাকৃতিক শক্তির সামনে সে ছিল অত্যন্ত অসহায়। প্রকৃতিকে নিজের সুবিধা অনুযায়ী কাজে লাগাবার জন্যে একটি উপায় সে গ্রহণ করেছিল—সেটি হল ইন্দ্রজাল বা যাদুশক্তি বা ম্যাজিক। আজকে আমরা ম্যাজিক কথাটি সাধারণত যে অর্থে ব্যবহার করে থাকি, ঠিক সে অর্থ নয় এর, আরও অনেক ব্যাপক ব্যঞ্জনা এই শব্দটির। বর্তমানে ম্যাজিক কথাটির অর্থের অবনতি ও সংকোচন ঘটেছে। অথবা, অন্যভাবে বলতে বলতে হয়, আধুনিক কালের সংকীর্ণ অর্থ-সম্পন্ন শব্দটির দ্বারা প্রাচীন কালের একটি ব্যাপক বিশ্বাস ও প্রক্রিয়াকে বোঝানো হচ্ছে।

বৃষ্টি চাই, তাই বৃষ্টির অনুকরণ করে একটা অনুষ্ঠান করা হল, ঘড়া ঘড়া জল ঢালা হল, বা মুখ দিয়ে চারদিকে জল ছিটিয়ে দেওয়া হল,কিংবা পাতের জলা কুটো করে তাইতে জল ভরে একটা বৃষ্টি-বৃষ্টি খেলা করা হল ; বিশ্বাস, এই সকল বৃষ্টির প্রভাবে আসল বৃষ্টি হবে। শত্রুকে মারতে চাই, পুতুলের তার এক কুশ-পুত্তলিকা, তাইতে তীর বিদ্ধলাম ; বিশ্বাস, এর ফলেই শত্রু তার নিজের জায়গাতে থেকেই নিহত হবে। এ দুটিই ম্যাজিকের উদাহরণ। আগেকার দিনের মানুষদের এ জাতীয় বিশ্বাস ছিল এবং অনুরূপ অনুষ্ঠানও তারা করেছে।

এ ছাড়াও আর একরকমের ম্যাজিক আছে। আমাদের মেয়েরা আজও তাদের মাথার পরিত্যক্ত চুল ফেলবার আগে তাতে একটু থুথু দিয়ে দেয়। কেন না, ঐ পরিত্যক্ত চুল কোন খারাপ লোকের হাতে পড়লে সে ইচ্ছা করলে মেয়েটির ক্ষতি করতে পারে। সেটা যাতে না করতে পারে তাই থুথু দেওয়া। এই বিশ্বাস, যে কাটবার পরও চুল বা নখ (বা দেহের সংস্পর্শের অন্য কোন বস্তু) ইত্যাদির সঙ্গে লোকটির সম্পর্ক থাকে, চুল বা নখে যা করা হবে তার ফল লোকটাতে বর্তাবে।

এই দু' ধরনের ম্যাজিকের দুটো আলাদা নাম দিয়েছেন ফ্রেজার। প্রথম শ্রেণীর নাম দিয়েছেন 'সাদৃশ্য-

মূলক (বা অনুকরণমূলক) ম্যাজিক', কারণ এর অন্তর্নিহিত চিন্তাধারাটা হচ্ছে এই যে, একটা বিশেষ রকমের অনুষ্ঠান অনুরূপ অন্য আর একটির সৃষ্টি করে (like produces like)। দ্বিতীয় শ্রেণীর নাম 'সংযোগ-মূলক ম্যাজিক', কারণ এর অন্তর্নিহিত চিন্তাধারাটি হচ্ছে, কোন বস্তু বা একটি মানুষের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে থাকে, ছিন্ন-সম্পর্ক হলেও তা পারস্পরিক প্রভাব থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না।

আর এই দুই শ্রেণীর ম্যাজিকের একটি সাধারণ নাম দেওয়া হয়েছে—সহানুভূতিমূলক ম্যাজিক (sympathetic magic), কারণ দুটি আলাদা ঘটনা বা বস্তুর মধ্যে একটা গূঢ় সহানুভূতি কল্পিত হয়েছে।

দেহকে সুস্থ ও খাদ্যসম্ভার পর্যাপ্ত রাখবার জন্যই এই ম্যাজিক—মানুষের জীবন যাত্রাকে সহজ করবার জন্য এই প্রয়াস। এ চেষ্টা অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশেও হয়েছে—তার স্বাক্ষর আছে ব্রতে এবং অন্যবিধ বহু অনুষ্ঠানে। ব্রতে পূর্বোক্ত দু'রকম ম্যাজিকেরই চিহ্ন আছে—অবশ্য প্রথম ধরনটাই ব্যাপক।

একটা উদাহরণ নিয়ে অন্য দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের অনুষ্ঠানগুলি মিলিয়ে দেখা যাক।

বৃষ্টি প্রাণধারণের পক্ষে অপরিহার্য। খাদ্যসম্ভারের জন্যই প্রধানত এর প্রয়োজন; তাছাড়া আমরা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মানুষেরা প্রখর তাপ থেকে আত্মরক্ষা ও প্রয়োজনীয় গাছপালাকে রক্ষার জন্যও বৃষ্টির স্নিগ্ধ সিক্ত স্পর্শ কামনা করি। সেইজন্যে প্রায় সমস্ত আদিম সমাজেই বৃষ্টিকে পৃথিবীর বুকে নিয়ে আসবার চেষ্টায় নানারকম যাদুশক্তি-বিশ্বাসী অনুকরণমূলক পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া প্রচলিত ছিল। রাশিয়ার ভোরপাট-এর নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চলে অনাবৃষ্টির সময় তিনজন লোক একটি প্রাচীন পবিত্র বৃক্ষ-কুঞ্জের 'কার' গাছে উঠত; তাদের একজন একটি লৌহপাত্রে হাতুড়ি পিটিয়ে বজ্রপাত ও মেঘগর্জনের অনুকরণ করত; আর একজন বিদ্যুৎ-চমকের অনুকরণে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করে উড়িয়ে দিত; আর তৃতীয় ব্যক্তি জল-পাত্র থেকে একটি পল্লব-গুচ্ছে জল নিয়ে চারিদিকে ছিটিয়ে-ছড়িয়ে দিত। তাদের বিশ্বাস ছিল—এতেই বৃষ্টি হবে।

স্লোভাক গ্রামে অনাবৃষ্টির হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য মেয়ে-বৌরা রাত্রে নগ্নগাত্রে গ্রাম-প্রান্তে গিয়ে মাটিতে জল ঢালে।

নিউগিনির পশ্চিমে ভল্‌মহেরা নামক বৃহৎ দ্বীপটিতে বৃষ্টি নামাবার জন্য একজন যাদুশক্তি-সম্পন্ন লোক একটি বিশেষ গাছের ডাল জলে ডুবিয়ে তারপর সেই জল চারিধারে ছিটিয়ে-ছড়িয়ে দেয়।

নিউ ব্রিটেনের লোকেরা লাল ও সবুজ লতা পাতাকে একটি কলাপাতায় মুড়ে জলে ভিজিয়ে মাটিতে পুঁতে রাখে এবং মুখে জল নিয়ে বৃষ্টিধারার অনুকরণে বাইরে ছিটিয়ে দেয়। তারা মনে করে, এইতেই বৃষ্টি নামবে এবং মাটি থেকে ফুলে-ফলে-ফসল জন্মে উঠবে।

উত্তর-আমেরিকার ওমাহা ইণ্ডিয়ানদের ফসল যখন অনাবৃষ্টিতে শুকিয়ে যায় তখন তাদের পবিত্র 'মহিষ সমাজ' (Buffalo Society) একটি বড় পাত্র জল-পূর্ণ করে সেটাকে ঘিরে চারবার নাচে। একজন খানিকটা জল মুখে নিয়ে বৃষ্টির মত ছড়িয়ে দেয়; তারপর পাত্রটি উলটে দেওয়া হয়, জল গড়িয়ে চলে মাটির উপর দিয়ে, নর্তকরা মাটিতে পড়ে সেই জল পান করে, মুখে তাদের লাগে কাদা, তারপর আবার সেই জল তারা ছড়িয়ে দেয়।

উত্তর-আমেরিকার মাইচেঙ্গু। এখানে বৃষ্টির দরকার হলে যাদুশক্তি সম্পন্ন লোকেরা নৃত্য আরম্ভ করে; মুখে তাদের থাকে এক-একটি পাইপ, যার ডগাটা গজিয়ে; এই ছিদ্রগুলির মধ্যে দিয়ে তারা তাদের মুখে-নেওয়া জল ফোয়ারার মত ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করে দেয়।

অনাবৃষ্টি বেশী তীব্র হলে ম্যাসিডোনিয়ার গ্রীকরা বালক-বালিকাদের একটি মিছিল বার করে—এরা সে তল্লাটে সব ইঁদারা ও ঝর্ণার কাছ দিয়ে ঘুরে আসে; মিছিলের সামনে থাকে ফুলে-সাজানো একটি মেয়ে—থামবার জায়গাগুলিতে তার সাথীরা তাকে জলে ভিজিয়ে দেয়। এই সময় তারা যে গান গায় তার খানিক অংশ এখানে তুলে দেওয়া গেল:

Perperia all fresh bedewed
Freshen all the neighbourhood;
By the woods, on the highway,
As thou goest, to God now pray;

O my God, upon the plain.
Send thou us a still small rain
That the fields may faithful be,
And vines in blossom we may see ;
That the grain be full and sound.
And wealthy grow the folks around,

অনাবৃষ্টির সময় দাক্ষিণাত্যরা একটি মেয়ের সাধারণ পোশাক খুলে ফেলে তাকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত পাতা, লতা-পাতা ও ফুলের পোষাক, এমন কি তার মুখও ঢেকে দেওয়া হয় সজীব সবুজের পর্দায়, এই পোষাকে তখন তাকে বলা হয় ডোডোলা (Dodola)। সে একদল মেয়ে নিয়ে গ্রামের মধ্যে নিয়ে যায়, প্রত্যেক বাড়ীতে থামে, সেখানে নাচে ও গান গায় (Dodola Song)। একটা গান তাদের এইরকম :

We go through the village ;
The clouds go in thy sky ;
We go faster,
Faster go the clouds ;
They have overtaken us,
And wetted the corn and the vine.

ভারতবর্ষে পুণাতে অনেকটা এই রকমের অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে। বৃষ্টির প্রয়োজন হলে সেখানে বালকরা তাদের একজনকে পাতার পোষাক পরায়, তার নাম 'বৃষ্টির রাজা' (King of Rain)।

তারা তখন গাঁয়ের সব বাড়ী ঘুরে বেড়ায়—বাড়ীর কর্তা বা গিন্নীরা তাদের 'বৃষ্টির রাজা'-র মাথায়-গায়ে জল ঢেলে দেয় এবং কিছু খাবারও দেয়।

সয়হুল—ওরাও'দের বাসন্তী-পশু-উৎসব—অনুষ্ঠিত হয় চৈত্র মাসে। এই উৎসবের একটি অঙ্গ হচ্ছে, মেয়েরা গান গাইতে গাইতে যখন 'পাহানে'র (প্রধান) 'আংগনে' আসে, তখন সেখানে আগে-থেকে-প্রস্তুত মেয়ে-পুরুষেরা কলসী কলসী জল ঢেলে মেয়েদের ভিজিয়ে দেয়। এ ছাড়াও এই দীর্ঘ উৎসবটিতে আরো বহুবার 'পাহান ও 'পূজার'দের (পাহানের সহকারী) জলে সিক্ত করে দেওয়া হয়, এই সমবেত সিক্ত মানুষদের নৃত্যগীত চলে এর সঙ্গে। এটি করা হয় বৃষ্টির প্রাচুর্যের জন্য।

ছত্তরপুরে ইঁদুর ও মেয়ের দুটি মূর্তির পা উপর দিকে ও মাথা নীচের দিকে করে এইরকম পরস্পর অবস্থায় রাখা হয়।

হোসঙ্গাবাদে একটি জল-ভরা মাটির কলসী রাখে পর পর চারটি মাটির তালের ওপর বিদ্ধ করে রাখা হয়। চারটি মাসের নাম অনুসারে এই মাটির তাল-গুলির নাম দেওয়া হয়। মেটে কলসী থেকে জল চুইয়ে চুইয়ে সারা রাত সব মাটিই ভিজে যায় (পাত্রটি Porous বলে), তখন বুঝতে হবে যে "ঐ মাসগুলিতে বৃষ্টি হবে।"

মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমায় অনাবৃষ্টি হলে শিবদেবের মন্দিরে কলসী ভরে জল ঢেলে ঢেলে বিগ্রহকে জলে মগ্ন করে দিলেই নাকি বৃষ্টি হয়। মন্দিরে সব কুটো-কাটা এবং দরজা বন্ধ করে দিয়ে জল বন্দি করানো হয়।

বাংলার পূর্বাঞ্চলে খুব তীব্র অনাবৃষ্টি হলে গাঁয়ের লোকেরা নগ্ন সংকীর্তন বার করে। সংকীর্তন-দল বাড়ি বাড়ি ঘোরে এবং প্রত্যেক বাড়িতে তাদের উপর জল ছড়িয়ে দেওয়া হয়। জল তাদের গা বেয়ে মাটিতে পড়ে, সেই ভেজা কাদা-মাটিতে তারা নৃত্য গীত করে।

পূর্ব-বাংলারই আর একটি অনুষ্ঠান—'মেঘরাজার কুলা নামানো।' প্রধানত কৃষকশ্রেণীর (বিশেষ করে নমঃশূদ্র) মেয়েরা এটি করে। তারা প্রত্যেকে এক-একটি কুলো সারি সারি ফুল দিয়ে সুন্দর করে সাজায়, এইগুলি মাথায় নিয়ে গান গাইতে গাইতে বাড়ি বাড়ি ঘোরে। গৃহস্থেরা তাদের ঘরের চালার ওপর জল ঢেলে দেয়, সেই জল গড়িয়ে পড়ে ঠিক বৃষ্টি ধারার মত। মেয়েরা তাদের কুলো মাথার ঐ ধারার নিচে গিয়ে দাঁড়ায়, কুলোয়—কিছুটা গায়-মাথায়—জল পড়ে। এদের একটা গান :

অ্যাদে লো ব্যাঙাবাণী,
হাত-পা ধুইয়া ক্যালা পানি,
চিনা ক্যাতে চিন-চিনানি,
ধান ক্যাতে হাটু-পানি,
ধরা না লো পূর্ণিমার চাঁদ,
ঝরু-ঝরাইয়া বৃষ্টি নাম।

উপরের অনুষ্ঠানগুলিতে একটি জিনিস সাধারণ—সব জায়গাতেই বৃষ্টি যাতে হয় সেই চেষ্টায় একটি নকল বৃষ্টি সৃষ্টি করা হচ্ছে। তাদের বিশ্বাস, এইতেই আসল বৃষ্টি ওরে।

আমাদের ব্রতেও ঠিক এই জিনিসটা পাচ্ছি। যেমন ধরা যাক বসুধারা ব্রতটির কথা—এটিও করা হয় বৃষ্টির কামনায়। যে আলপনা আঁকা হয় এ ব্রতে তাতে প্রধান হচ্ছে আটটি তারা; তারার বসতি আকাশে, মেঘেরও তাই, হয়তো সেই ভাবানুষঙ্গে তারা আঁকা হয়। মাটির ঘটের তলায় ফুটো করে তাইতে জল ভরে বৃষ্টি-ধারার মত বট, পাকুড়, তুলসী ইত্যাদি গাছে (অভাবে ডালে) জল ঢালা হয়। কামনা জানানো হয়:

গঙ্গা গঙ্গা ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ বাসুকি
তিন কূলে ভরে যাও ধনে জনে সুখী।

কারণ সারা পৃথিবী তখন যে—

কাল বোশেখী আগুন বয়ে।
কাল বোশেখী রোদে পোড়ে।
গঙ্গা শুকু শুকু, আকাশে ছাই।

তাই ব্রত, তাই জলধারায় সিঞ্চিত করা হল বট, তুলসী।

বট আছেন, পাকুড় আছেন, তুলসী আছেন পাটে,
বসুধারা ব্রত করলাম তিন বৃক্ষের মাঝে।
নায়ের কূলে কূল, বাপের কূলে কূল,
শ্বশুরের কূলে তারা,
তিন কূলে পড়বে জলগঙ্গার ধারা।
পৃথিবী জলে ভাসবে,
অষ্টদিকে কাঁপুই খেলবে।

আর একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। নখচুটের ব্রত। এতে দ্বিতীয় স্তরের ম্যাজিকের দেখা মিলবে। এটি চৈত্র মাসের যে-কোন দিন করণীয়। চার বছর করতে হয়। চারজন (পরের বছরগুলিতে আট, বারো ও ষোলজন যথাক্রমে) এয়োকে নিমন্ত্রণ করে বাড়িতে নিয়ে আসে ব্রতিনী; তারপর একটা লাল রংয়ের গামছা উঠানে পেতে দিতে হয়, নাপিত-বৌ (তাকেও ডাকা হয়) তার উপরে কয়েকটি কড়ি রাখে, একটি পুতুলের মত চিত্র আঁকে এবং এয়োদের নখ (ও তৎসংলগ্ন মাংসাদি) কেটে ঐ গামছার উপর রাখে, কোন কোন জায়গায় চুলের প্রান্তভাগ থেকেও সামান্য একটু কাটা হয়। বহু স্থানে ব্রতিনীর নখচুলও কেটে দেয় নাপিত-বৌ; কিন্তু সর্বত্র এটা প্রচলিত নয়। এই নখচুল দুই ভাগ করে গামছার দুই প্রান্তে বাঁধে নাপিত বৌ, সেটা ব্রতিনী কাঁধে তুলে নেয়, তারপর সকলে সমবেত-ভাবে নদীতে যায়। ব্রতিনী তখন তার কাঁধের ভার নামায় এবং প্রশ্ন করে:

'আমার নখমাংসের ভার উলিল?'

নাপিত-বৌ উত্তর দেয়—'উলিল'

এই রকম বলতে হয় তিনবার। তারপর নখ-চুল জলে ফেলে দিয়ে স্নান ও পরে ভোজন। এটি করা হলে স্বামীসোহাগিনী হয়ে স্বচ্ছন্দে বাস করে নারী।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, এ ব্রতের মূল সংযোগমূলক ম্যাজিক। কোন খারাপ লোক (অর্থাৎ যাদুশক্তি-সম্পন্ন) যাতে ছিন্ন নখ-চুলের সাহায্যে কোন ক্ষতি না করতে পারে তার আনুষ্ঠানিক প্রচেষ্টা এর মধ্যে। জলে একটা প্রহরী-শক্তি কল্পিত এ ব্যাপারে—এই বিশ্বাস সমস্ত দেশেই আছে। তাই ছিন্ন চুল হয় কোন পবিত্র দেবস্থানে বা জলে দেওয়া হয়। পৃথিবীর সকল দেশেই এর দৃষ্টান্ত আছে। আমাদের প্রতিবেশী শ্যামদেশে চুল কলাপাতার মধ্যে বেঁধে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয় এই বিশ্বাসে যে ওর সঙ্গে সব অসুখ-বিসুখও ভেসে চলে যায়। আবার সুদূর আয়র্লণ্ডের এ বিশ্বাস আছে যে কারুর চুল দিয়ে যদি কোন পাখী বাসা তৈরী করে তবে তার সারা বছর মাথার যন্ত্রণা হবে।

আমাদের ব্রতটির বৈশিষ্ট্য, এটি করা হচ্ছে স্বামী-সোহাগ লাভের জন্য! সেটি পাওয়ার পক্ষে যা বাধা, তা হয় তো ঐ নখ চুলের সঙ্গে ভেসে যেতে পারে এবং পরোক্ষভাবে ব্রতিনীকে তার ঈপ্সিত বস্তু পেতে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু ম্যাজিকে সাধারণত প্রত্যক্ষ সাদৃশ্যমূলক ঘটনার জোর দেওয়া হয়; কারণ আদি মানুষের বুদ্ধি অপরিণত ছিল বলে তার পক্ষে পরোক্ষ জিনিস বোঝা বা সেই অনুযায়ী কাজ করা খুবই মুস্কিল ছিল। কিন্তু এখানে সেই প্রত্যক্ষ অনুষ্ঠানটি কোথায়?

ওরাওঁরা তাদের সন্তানদের নামকরণ উৎসবের সময়

বাচ্চাটির চুল কেটে নদীতে ভাসিয়ে দেয় এই বিশ্বাসে যে, নদীপথে সাগরে গিয়ে যথাসময়ে এই চুলের সঙ্গে বাচ্চাটির ভাবী স্বামীর (বা স্ত্রীর) চুলের মিলন ঘটবে। এখানে দেখতে পাচ্ছি, দেহের অংশ-বিশেষের মিলন ঘটাচ্ছে এরা মানুষ দুটি মিলনের প্রচেষ্টায়। এই ধরণের কোন বিশ্বাসের স্মৃতি 'নবছুটের ব্রতে'র অন্তরালে ক্ষীণভাবে জীবিত কি না আজ সে কথা নিশ্চিত করে বলা খুবই দুরূহ।

কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে কামনাটি ব্যক্ত হয়েছে ছড়ায়, অর্থাৎ ব্রতের মন্ত্রে :

পাট গাছটির মত চুল হবে,
দুধে আলতার বরণ হবে।
ধেঁচিকড়ির গতর হবে,
মধুপোরা গতর হবে,
বাঁশীর মত নাক হবে।
নদীর মত গড়ন হবে,
ছোট ছোট পা হবে।
গোল গোল হাত হবে,
চাঁদপানা মুখ হবে।

স্বামীর সোহাগ পাবার জন্য নারী সুরূপ কামনা করছে। সোহাগ ও সুরূপ—ফল ও কারণ : এই দিক থেকে ভেবেছে তারা।

সুরূপ কামনা করে গুজরাটের মেয়েরা একটি ব্রত করে : তার নাম সুরূপা দ্বাদশী ব্রত। এটা কিন্তু ঠিক নয়, কারণ এখানে সুরূপা হবার চেষ্টায় শুধু বিরূপতাকে দূর করা হয়।

কিন্তু বসুধারা ব্রতে বা নবছুটের ব্রতে ম্যাজিক যতটা স্পষ্ট, প্রত্যেকটি ব্রতে হয়তো তা নয়। অনেকগুলির সঙ্গে কিছু পূজাআর্চা মিশে আছে। তাছাড়া, সাধারণ লোকের মধ্যে ব্রত একটি ধর্মানুষ্ঠান বলেই পরিচিত।

যে-সব মনীষী ধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করেছেন, তাঁরা বলেন যে ধর্ম ম্যাজিকের পরের সৃষ্টি।

ধর্ম কথাটি নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং আমরা এখানে ধর্ম বলতে কি বুঝেছি সেটা একটু সংক্ষেপে বলে নেওয়া দরকার, নইলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হওয়া আশ্চর্য নয়। ধর্মের মূল বিশ্বাস হচ্ছে অতি-প্রাকৃত শক্তিতে, যে শক্তি প্রকৃতি এবং মানুষের ওপর কর্তৃত্ব করে; এবং প্রার্থনা, উপহার দান, বলিদান ইত্যাদি দ্বারা সেই শক্তিকে তুষ্ট করে মানুষ তার জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পেতে পারে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ধর্মের দুটো দিক; একটা হচ্ছে থিয়োরেটিক্যাল অর্থাৎ অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস, আর একটা হচ্ছে প্র্যাক্‌টিক্যাল অর্থাৎ সেই শক্তিকে তুষ্ট করবার জন্য শক্তির প্রচেষ্টা।

এই দুটো দিকের মধ্যে প্রথমটি এসেছে সমাজে আগে, দ্বিতীয়টি পরে; কারণ একটি শক্তি কল্পিত হবার আগে তার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করা সম্ভব নয়।

ধর্মের সঙ্গে এই ধারণাটা মিশে আছে যে প্রকৃতির আইন-কানুন অলঙ্ঘনীয় নয়, এ নিয়মের রাজত্বে সব কিছুই পরিবর্তন-সাধ্য, শুধু সেই দেবতাটিকে মিষ্ট-বাক্যে বা পাণ্ডিত্যোধিকে খুশী করে ভুলিয়ে করিয়ে নেওয়া।

ম্যাজিক কিন্তু বিশ্বাস করে প্রকৃতির নিয়ম অলঙ্ঘনীয়। বৃষ্টির অনুকরণে মুখ দিয়ে জল ছিটিয়ে দিলে বৃষ্টি হবে—এটাকেও সে প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যেই ধরত। একটা যে কৃত্রিম ও একটা প্রাকৃতিক ঘটনাটির কারণ (cause) নয়, তা সে জানত না। ম্যাজিকের মূলে ভ্রান্ত ভাবানুষঙ্গ (mistaken association of ideas)। প্রথমটি যদি ঠিক-ঠিকভাবে ঘটানো যায়, তবে পরেরটিও ঘটতে বাধ্য—প্রাকৃতিক নিয়মকে সে এত অলঙ্ঘনীয় (rigid) ভাবত যে এর ব্যতিক্রমের কথা সে কল্পনাই করতে পারত না। সেই জন্য বলার ভঙ্গির পার্থক্য আছে দু' দলের। ম্যাজিক-বিশ্বাসী বলে—'আমার অনুষ্ঠান সঠিক হ'লে বাকীটাও সঠিক হয়, হবে, হতে বাধ্য।' ধর্ম-বিশ্বাসী বলে, 'ভগবান (বা কোন বিশেষ দেবতা), তুমি আমায় এটা দাও, কি ওটা কর ইত্যাদি।'

পূর্বে সারবিয়ানদের 'ডোডোলা (Dodola Song)' যেটি উদ্ধৃত করেছি সেটিতে ম্যাজিক বিশ্বাসীদের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি—আমরা গাঁয়ের মধ্যে চলেছি,

আকাশেও চলেছে মেঘ, আমরা দ্রুত যাচ্ছি, মেঘও চলেছে দ্রুত, মেঘ এগিয়ে চলেছে আমাদের ছাড়িয়ে, ভিজিয়ে দিয়েছে আমাদের কপাল, আমাদের দ্বাক্ষালতা।

কিন্তু ম্যাসিডোনিয়ার গ্রীকদের গানটিতে ধর্ম-বিশ্বাসীদের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে।

O my God, upon the plain,
Send thou us a still, small rain ;"

কিন্তু এদের অনুষ্ঠানটিতে ম্যাজিক স্পষ্টভাবে রয়েছে। এখানে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ম্যাজিকের সঙ্গে ধর্মের একটা মিশ্রণ ঘটেছে।

ঠিক এমনি মিশ্রণ ঘটেছে আমাদের 'মেঘমালাপীর কুলা বানানো'তে ; মেঘকেও খানিকটা দেবী বানিয়ে ফেলা হয়েছে। যদিও অনুষ্ঠানটি পুরোই যাদু-অনুষ্ঠান।

এমনি মিশ্রণ আছে বসুধারা ব্রতের ছড়াটিতে। সুরুতে পৌরাণিক দেবদেবীর নামগুলি ঢুকেছে। আবহাওয়া ও বৃষ্টির প্রসঙ্গে গঙ্গা, ইন্দ্র ও বরুণের নাম আসা খুবই স্বাভাবিক। আকাশে বসতি বলে চন্দ্রও এলেন—বাদ্‌কি কেন—ছড়ার মিলের খাতিরে? যাই হোক এদের উদ্দেশে প্রার্থনা জানানো হল। কিন্তু বট-পাকুড়ে জল ঢেলেই ছড়ায় ম্যাজিক-বিশ্বাসীর কণ্ঠ কথা কয়ে উঠেছে। 'বসুধারা ব্রত করলাম তিন বুকের মাঝে', অতএব 'পৃথিবী জলে ভাসবে।'

কিন্তু নখদুটের ব্রতে মিশ্রণটা ঘটে নি। এখানে নাপিত-বৌ বলছে, 'তোমার নখ-মাংসের ভার উলিল ;' বাস্, তাহলেই 'উলিল' অর্থাৎ নামল, এর জন্যে কোন দেবতাকে 'নামাও' বলে অনুরোধ করবার দরকার নেই। ছড়াতেও বলা হচ্ছে, 'পাটগাছটির মত চুল হবে।' ধর্মবিশ্বাসী বলত তার দেবতাকে 'পাটগাছটির মত চুল কর।'

কিন্তু ছড়ার থেকেই হোক, কি অনুষ্ঠানের দিক থেকেই হোক, একেবারে নির্ভেজাল ব্রতের সংখ্যা খুব কম। কারণটা বোঝা অবশ্য কিছু কষ্টকর নয়। ম্যাজিকের যুগের পরে ধর্ম সমাজে বহুদিন—আজ পর্যন্ত—আধিপত্য বিস্তার করে আছে। তা ছাড়া ধর্মের উৎপত্তির দিন থেকেই কমবেশী কিছু কিছু ম্যাজিক অনুষ্ঠান তার সঙ্গে মিশে ছিল।

ধর্মের উৎপত্তির কারণ নিঃসন্দেহে ম্যাজিকের ব্যর্থতা। প্রকৃতিকে আয়ত্তাধীন করবার চেষ্টাতেই মানুষ ম্যাজিক সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু তার অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে সে দেখল যে তার অনুষ্ঠান বার বার বন্ধ্যা বলে প্রতিপন্ন হচ্ছে। আগে তার ধারণা ছিল যে সে প্রকৃতিকে ইচ্ছা ও প্রয়োজন মত নিয়ন্ত্রণ করতে পারে ; কিন্তু ক্রমে তাকে সে ভুলের স্বর্গ থেকে বিদায় নিতে হল। সেদিনের মানুষের উদ্বেগ ও অস্থিরতা আমরা কিছুটা কল্পনা করতে পারি—পায়ের তলায় তার বিশ্বাসের ভিত্তিভূমিতে ফাটল ধরেছে, চারিদিকে সংশয় ও অনিশ্চয়তার অকূল সমুদ্র, প্রাকৃতিক বিরুদ্ধতার ঢেউ বার বার তার গায়ে আছড়ে এসে পড়েছে, বিক্ষুব্ধ ও হতবুদ্ধি মানুষ তখন নতুন বিশ্বাসের কোলে মাথা রেখে নিশ্চিন্ত হতে চাইল।

সেই বিশ্বাসই ধর্ম। এই বিশ্বপ্রকৃতি যদি আমার কথা মত না চলে, তবে এটা জন্য আর কেউ নিশ্চয়ই চালাচ্ছে, এবং সেই আর কেউ নিশ্চয়ই আমার চেয়ে ও প্রকৃতির চেয়ে বেশী শক্তিসম্পন্ন, এই হল তার মনোভাব। প্রকৃতির যে অংশ মানুষের কাছে অজ্ঞাত, তার কাছে মাথা নত করল মানুষ এবং তার নিজের কল্পনা থেকেই দেবতার সৃষ্টি করল।

এ দিক দিয়ে বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের মৌলিক তফাৎ। প্রকৃতিকে নিজের কাজে লাগাবার চেষ্টার দুটো দিক আছে ; একটা হল মানুষের অক্ষমতার দিক, দুর্বলতার দিক, নেতিবাচক (Negative) দিক—এরই উপরে ধর্মের ভিত্তি ; আর একটা দিক হল এর উল্টো অর্থাৎ সেই চেষ্টার ইতিবাচক (Positive) দিক—এরই উপরে বিজ্ঞানের ভিত্তি। এই বিরোধের জন্যই, বিজ্ঞানের যখন বিশেষ বিকাশ হয় নি, তখন সমাজে ধর্মের আধিপত্য খুব বেশী ছিল, আবার বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের প্রভাব খর্ব হচ্ছে। বিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত চিন্তাটা এই যে, বিশ্বটা হচ্ছে প্রাকৃতিক নিয়মে নিয়ন্ত্রিত বাস্তবিক বিকাশ পদ্ধতি, এবং এই পদ্ধতির জ্ঞান অর্জন করে তবেই তাকে প্রভাবিত করা যেতে পারে। ধর্মের দিক থেকে যে ঘটনা ঈশ্বরের ইচ্ছা মাত্র, বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সেটা প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ উপায়ে বাস্তবিক ভাবে বিশ্লেষণযোগ্য। ধর্মের

চোখ অতিপ্রাকৃত শক্তির দিকে, বিজ্ঞানের চোখ প্রাকৃত শক্তির দিকে।

বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের যেমন তফাৎ, আবার ম্যাজিকের সঙ্গেও তার তফাৎ আছে। ম্যাজিক এক ভ্রান্ত ভাবানুষঙ্গ দ্বারা চালিত, এবং প্রকৃতির নিয়মের ধ্রুবতায় বিশ্বাসী। ধর্ম প্রাকৃতিক নিয়মের নমনীয়তায় বিশ্বাসী।

এই বিরোধ সত্ত্বেও কিন্তু ধর্মের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিক জিনিসটা সমাজে বিলুপ্ত হয়ে গেল না। কারণ ছিল তার।

প্রথমত, কোন বিশ্বাসই সমাজ থেকে রাতারাতি মুছে যায় না, বিশেষ করে অনগ্রসর সমাজে তো নয়ই। দ্বিতীয়ত, অনুষ্ঠিত কার্যাবলীর অব্যবহিত পরে বা একটু দেরীতে ঈপ্সিত ঘটনা ঘটত বহু স্থানে—ঘটত অবশ্য প্রাকৃতিক নিয়মেই। যেমন, বৃষ্টির আহ্বানে কোন ম্যাজিক অনুষ্ঠান করা হল, বৃষ্টি, একটু দেরীতে হলেও হবে নিশ্চয়ই—প্রকৃতির বিধান সেটা। আর কোন সময় যদি নিরংকুশ ব্যর্থতা আসতই, তবে মানুষ ভাবত যে তার অনুষ্ঠানের ত্রুটি ঘটেছে।

তৃতীয়ত, ম্যাজিক অনেক সময় কিছুটা মনোবল বাড়াত। এবং সেই মনোবল বাস্তব সাফল্য আনতে সহায়তা করত। মনোবল অবশ্য বৃষ্টিকে ডেকে আনতে পারে না। কিন্তু ফসলের বৃদ্ধির জন্য মানুষের যে অনুকরণ-মূলক নৃত্য তার মূলে বিশ্বাস ছিল যে এর প্রভাবেই ফসল বাড়বে; এবং এই বিশ্বাস থেকে তারা যে মনোবল পেত তাতে তাদের কাজ করবার উৎসাহ বেশী আসত ও পরিণামে কিছু বাস্তব সাফল্য-ও ইনাম মিলত।

প্রধানত এই কারণগুলির জন্যই ম্যাজিক সমাজ থেকে একেবারে অবলুপ্ত হ'য়ে গেল না। দু'য়ের মধ্যে যেন আপোষ হল। দু'য়ের মিশ্রণ ঘটল—একসঙ্গে হাত ধরাধরি করে চ'লতে লাগল তারা। এই মিশ্রণের উদাহরণ আগেই দিয়েছি—ম্যাসিডোনিয়ার গ্রীকদের অনুষ্ঠানটি, বা আমাদের 'মেয়্যারাণীর কুলা নাচানো', অথবা আমাদের বন্ধুবারা ব্রত। বিরোধ সত্ত্বেও আপোষ, এ আমাদের আজকের জীবনে ধর্ম ও বিজ্ঞানের আপোষ-চেষ্টার মত। ছেলের অসুখ হ'লে আমরা ডাক্তার ডাকি, মানতও করি।

এই মিশ্রণ কতকগুলি ব্রতে এমন একাত্ম হ'য়ে ঘটেছে যে তার বিশ্লেষণ দুষ্কর; কতকগুলি ক্ষেত্রে আবার ধর্ম ম্যাজিক-অংশকে প্রায় মুছে ফেলেছে। তা সত্ত্বেও, সব ব্রত ভালভাবে দেখবার পর এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছতে হয় যে ব্রতের মূলে প্রেরণা যুগে ম্যাজিক। সেইটাই তার জাত-পরিচয়, তার পরে নানা ধর্ম অবশ্য তাকে দীক্ষিত করে রঙ-বেরঙের কৌটা তিলকের ছাপ দিয়ে তার চেহারাটা খানিক পালটে দিয়েছে।

ধর্মের দু' স্তর রঙ লেগেছে ব্রতে। এক, প্রাক্-আর্য ধর্ম, দুই আর্য-ব্রাহ্মণ্য ধর্ম।

ব্রত মূলত প্রাক্-আর্যদের জিনিস বলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম তাকে প্রথমে স্বীকার করতে চায় নি। এমন কি ব্রাহ্মণ্যধর্ম-বিরোধী বৌদ্ধরাও চায় নি। বৈদিক গ্রন্থে বা কোন প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র, ধর্মসূত্র প্রভৃতির কোথাও কোন লোক-সমাজ-চলিত ব্রতের স্বীকৃতি নেই, উল্লেখও নেই। বৌদ্ধ সম্রাট অশোক পরিষ্কার ভাষেই বলে গেছেন যে তিনি গ্রামাঞ্চলের লোকপ্রিয় ধর্মের আচারানুষ্ঠান অপছন্দ করতেন; বিশেষ করে তীর খারাপ লাগত নারীসমাজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানগুলি। এ সমস্ত পরিত্যাগ করে অশোক-অনুমোদিত ধর্ম-মঙ্গলের আশ্রয়ে আসবার জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছিলেন। নারীদের অনুষ্ঠানগুলি বলতে ব্রতানুষ্ঠানও অন্তর্ভুক্ত ছিল বলেই মনে হয়।

কিন্তু লোক অনুষ্ঠানগুলি দেশের মানুষের জীবনের সঙ্গে একেবারে মিশেছিল—সে-গুলি থেকে মানুষ-গুলিকে আলাদা করা ছিল অসম্ভব; অথচ বিরোধ ও সংঘাত সত্ত্বেও পাশাপাশি বাস করার ফলে আর্য অনার্যের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে একটা বোঝাপড়াও হচ্ছিল। অনার্যরা যখন আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মের গণ্ডীর মধ্যে ক্রমে ক্রমে গৃহীত হতে আরম্ভ করল, সঙ্গে সঙ্গেই তারা সেই গণ্ডীর প্রবেশ-দ্বারে তাদের আচার-ব্যবহার বিশ্বাস ত্যাগ করে এল না; কাজেই স্মার্তদের সেগুলি মেনে নিতে হ'ল। বিষ্ণুপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, অগ্নিপুরাণ প্রভৃতিতে অনার্য ব্রতকে স্থান দেওয়া হ'ল এবং ব্রাহ্মণরা এতে পৌরোহিত্যও আরম্ভ করলেন; স্বভাবতই এতে ব্রাহ্মণ্য প্রভাবও প্রচুর পড়ল। এ প্রভাব সত্ত্বেও মূলের দিকে তাকিয়ে অবশ্য এদের লৌকিক ব্রত ব'লতে আপত্তি নেই। তাহলে দেখা যাচ্ছে, লৌকিক ব্রতের তিনটি শ্রেণীবিভাগ আছে।

প্রথম, যে ব্রতে তার জন্ম-কালের ধার্মিক-অংশটা বেশ কিছুই আছে, কেবল ধর্মের আড়ালে চাপা পড়ে যায় নি। দ্বিতীয়, যাতে আর্থধর্মেরও ছায়া পড়েছে।

কিন্তু এ-গুলি হচ্ছে অতি-সূক্ষ্ম শ্রেণীবিভাগ। সাদাসাটা ভাবায় বললে ব্রত দু'রকমের। এক, লৌকিক ব্রত, এতক্ষণ যার কথা বলেছি এবং সূক্ষ্মভাবে ভাগ করলে যার তিনটি ভাগ। এ ছাড়া আর এক প্রকার ব্রতের নাম দেওয়া যেতে পারে, পৌরাণিক ব্রত। স্মার্তরা লৌকিক ব্রতের জনপ্রিয়তাকে লক্ষ্য করে মূলত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দেব-দেবী বা অনুষ্ঠানকে ব্রতের ছাঁচে ঢেলে জনপ্রিয় করবার চেষ্টা করেছেন—এই ব্রতগুলিই পৌরাণিক ব্রত। ব্রতের নাম আছে এতে, কিন্তু ব্রতের প্রাণ নেই; লৌকিক ব্রতের অনুকরণে এ-গুলি কৃত্রিমভাবে তৈরী করা মোটে ছিনিস। এ-গুলির স্বরূপ আবিষ্কার বিশেষ শক্ত নয়। যেমন, জন্মাষ্টমী ব্রত, কৃষ্ণ-মাহাত্ম্য প্রচারের চেষ্টায় এটি পরিকল্পিত।

কতকগুলি ব্রত ব্রাহ্মণেরা সৃষ্টি করেছেন শুধুমাত্র নিজেদের ধনপ্রাপ্তির জন্য! যেমন, গুপ্তধন ব্রত। স্বপ্নাদেশের মধ্যে সোনাদানা বা টাকাপয়সার 'গুপ্তধন' দেওয়া হয় ব্রাহ্মণকে। আদিত্যসিংহাসন ব্রতের অনুকরণে সৃষ্ট হল আইওংক্রান্তি ব্রত ও ব্রাহ্মণাদর ব্রত।

কতকগুলি পৌরাণিক ব্রতে আবার বিশেষ তিথির মাহাত্ম্য প্রচার করা হয়েছে। যথা, অঘোরচতুর্দশী, ভূতচতুর্দশী ইত্যাদি। এই তিথি-মাহাত্ম্য প্রচারে লৌকিক ব্রতও কিছুটা প্রভাবিত হয়েছে—অনেক লৌকিক ব্রত নির্দিষ্ট তিথিকে আশ্রয় করেছে। এ ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে পরবর্তী যোজনা। সোড়ায় লৌকিক ব্রতগুলি তিথি মেনে হ'ত না, হত ঋতু মেনে। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির এক এক চেহারা—সেই বিভিন্ন মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে প্রাচীন কালের মানুষের যে আচার-ব্যবহার-অনুষ্ঠান ক'রত তাই বিবৃত হয়ে আছে ব্রতে। এক এক ঋতুতে এক এক রকম তার মানসিক প্রতিক্রিয়া, এবং আলাদা তার অনুষ্ঠান।

অনুষ্ঠানের বিভিন্নতাও লৌকিক ব্রতের একটি বৈশিষ্ট্য। পৌরাণিক ব্রত যে উদ্দেশ্যেই করা হোক না কেন, তার অনুষ্ঠান একই। লৌকিক ব্রত নানা রকমের, তার অনুষ্ঠানও তত রকমের। পুণ্যিপুকুরে পুকুর কেটে তাকে জল দিয়ে ভরে দেওয়া দরকার, তোষলা ব্রতে গোবরের সাহায্যে তিনটি তুলসী রোপণ করতে হবে, শস্যপাতা ব্রতে শস্যের অংকুরোদ্গম করাতে হবে, নখছটের ব্রতে আবার ব্রতিনীর নখমাংসের ভার নামবে; শুধু এই ক্রিয়ার নয়, আলপনায়, ছড়ায়, গীতে, নৃত্যে ব্রতিনীর কামনা একটা বিকশিত রূপ নেবে।

পৌরাণিক ব্রত কিন্তু এমন নয়; সেখানে কামনা যাই হোক, অনুষ্ঠান প্রায় একই। 'ব্রতমালাবিধানে' আমলকীদ্বাদশী ব্রতের বিধান এই রকম: প্রথমে স্বস্তিবাচনপূর্বক "ওঁ সূর্যেসোমঃ" ইত্যাদি মন্ত্র পড়া, তারপর সঙ্কল্প—ওঁ অমোতামি মাসে মাসি শুক্লে পক্ষে দ্বাদশ্যাম্তিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকা দেবী (শূদ্রের বেলায় দাসী) পুত্রপৌত্রাদ্যনবচ্ছিন্ন সন্ততিধনধান্য-সৌভাগ্যাদি প্রাপ্তয়ে বিষ্ণুলোক-গমনকাম্য অদ্যারভ্য একবর্ষ পর্যন্তং প্রতিমাসীয় শুক্লদ্বাদশ্যাং গন্ধপত্যাদি দেবতাপূজাপূর্বকং বা লক্ষ্মীকবিষ্ণুপূজামলকীযুক্ত-ভোজ্যদানপূর্বকং ব্রহ্মপুরাণোক্ত বিধিনামলকীদ্বাদশীব্রত-মহংকরিষ্যে—এর পরে সামান্য কাণ্ডের অন্য অনুষ্ঠানগুলি, তার পরে ব্রতকথা শোনা। এই হ'ল ব্রহ্মপুরাণোক্ত আমলকীদ্বাদশী ব্রত। অন্যপুরাণোক্ত অন্যান্য ব্রতও মোটামুটি এই রকমই। সামান্য অদল-বদল হয়তো আছে—কিন্তু সে ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। ঐ সামান্য-কাণ্ডটি সব পৌরাণিক ব্রতেই আছে। সামান্যকাণ্ডটি কিন্তু মোটেই সামান্য নয়; এর মধ্যে আছে—(১) মন্ত্রসহ আচমন, (২) আতপতণ্ডুল নিয়ে ব্রাহ্মণদ্বারা স্বস্তিবাচন, (৩) কর্মারম্ভ, (৪) সংকল্প, (৫) ঘটস্থাপন, (৬) পঞ্চগব্য শোধন, (৭) শান্তিমন্ত্র, (৮) সামান্যার্ঘ, (৯) আসনশুদ্ধি, (১০) ভূতশুদ্ধি, (১১) ন্যাসাদি—মাতৃকান্যাস, করন্যাস, অঙ্গন্যাস ইত্যাদি, (১২) বিশেষার্ঘস্থাপন। ভূমিউৎসর্গ এবং ব্রাহ্মণকে দান-ধ্যান করবার ও দক্ষিণা দেবার রীতি এই সময়। তারপর 'রোচনার্থে ফলশ্রুতি', ব্রতে যাতে রুচি আসে, সেই-জন্য এই ব্রত করার ফলটি শোনা। এটি শোনা হত ব্রতকথার মাধ্যমে।

পৌরাণিক ব্রতকথারও দু'একটা বেশ বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমে আরম্ভ হবে 'অমুকেন উক্ত' বলে; এই অমুকটি হয় শিব, বা কৃষ্ণ, বা ভীষ্ম ইত্যাদি ধরনের পৌরাণিক লোক; কৃত্রিম ব্রতের ধাতে কেউ সন্দেহ প্রকাশ না করে সেইজন্যে এঁদের নাম জুড়ে দেওয়া হল। এই পদ্ধতির প্রভাব কিছুটা লৌকিক ব্রতেও এসে পড়েছে—ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম গ্রহণ করবার দরুন এদের কপালে পুরাণখ্যাত নামের ছাপ দিয়ে দেওয়া হত।

পৌরাণিক ব্রতকথা শেষ হত সাধারণত ইহলোকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-প্রাপ্তিতে ও অন্তে বৈকুণ্ঠ-লাভের নিশ্চয়তায়। তারপরে ভয় দেখানো থাকত—এ ব্রত না করলে অনন্ত নরকভোগ, কুম্ভীপাক ইত্যাদি। লৌকিক ব্রত যখন সৃষ্টি হয়েছিল তখন মানুষ বৈকুণ্ঠ-লাভের জন্য তেমন ব্যস্ত ছিল না, ব্যস্ত ছিল বেঁচে থাকবার জন্য; আর তখন সমস্ত সমাজের এতে সক্রিয় সহযোগিতা ছিল বলে কাউকে কুম্ভীপাকের ভয় দেখানোর প্রয়োজন হত না।

খাঁটি ব্রাহ্মণ্য, এই কথাটা বোঝাবার জন্য যেমন ঐ পুরাণখ্যাত নামগুলি জুড়ে দেওয়া হয়েছে, তেমনি যজুঃ ও সামবেদের কিছু অনুষ্ঠান ও মন্ত্রও রয়েছে পৌরাণিক ব্রতে; এরা বেদের মহিমা পায় নি, আবার লৌকিক ব্রতের সারল্যও পায় নি। এতে বেদ বা ব্রত কোনটারই প্রাণস্পন্দ নেই। বেদে সমস্ত আর্যজাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা, কল্পনা-চিন্তা, কামনা-বাসনা ইত্যাদির স্পন্দন অনুভব করা যায়; আর লৌকিক ব্রতে প্রাক্-আর্য জাতির চিন্তা-ভাবনা, কামনা কল্পনার পরিচয় আছে, কারণ এগুলি বাংলাদেশের একেবারে মাটির কাছের জিনিস।

পৌরাণিক ব্রতের দুটি অংশ—সামান্যকাণ্ড ও ব্রতকথা। আর লৌকিক ব্রতে থাকে: (১) আহরণ অর্থাৎ বিশেষ ব্রতটির জন্য যে জিনিষগুলি দরকার সেগুলি জোগাড় করা; (২) আচরণ, সে ব্রতের যে আলপনা সেটি আঁকা, গাছের ডাল পোঁতা, পুকুর তৈরী করা ইত্যাদি; (৩) ছড়া, এগুলিকে বলা যেতে পারে এদের মন্ত্র, আলপনার একটি বিশেষ প্রতিচ্ছবিকে ছুঁয়ে যাবতে হবে ব্রতের ফুল দিয়ে, এবং সেই ছুঁয়ে যাকা অবস্থাতে বিশেষ প্রতিচ্ছবি সম্পর্কিত ছড়াটি বলতে হবে। মাঘমণ্ডল ব্রতের ছাতার প্রতিচ্ছবিতে ফুল ধরে বলা হয়:

মুই পুজি গুত্তির ছাতি
যর লাগি থাকউক সোনার ছাতি।

(৪) ব্রতকথা বা শুধু 'কথা', ব্রতের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক কাহিনী।

অবশ্য সব ব্রতে এই চারটি অঙ্গই যে থাকে এমন নয়। কমও থাকে।

লৌকিক ব্রতকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে এটা শুধু ম্যাজিক মাত্র নয়, শুধু ধর্ম বা উৎসবও নয়, এটা একটা মিশ্র ধরণের আর্টও বটে; ব্রতের মধ্যে বীজ অবস্থায় আছে চিত্রকলা, সাহিত্য, সঙ্গীত, এমন কি নৃত্য পর্যন্ত; যতদিন এরা সাবালক ছিল ততদিন এক যৌথপরিবারে এরা বড় হয়েছে, সবাই মিলে-মিশে এক অভিভাবকত্বে বসবাস করেছে, বড় হওয়ার পর এক ঘরে সবার ঠাঁই হওয়া সম্ভব ছিল না, তাই নিজেদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এরা স্বতন্ত্র হয়েছে। লৌকিক ব্রতে এরা অপরিহার্য। অনুষ্ঠানের অঙ্গ এগুলি। পৌরাণিক ব্রতে তা নয়। পৌরাণিক ব্রতে আলপনা যা হোক দিলেই হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে, না দিলেও হয়, কারণ আলপনার সঙ্গে অনুষ্ঠানের কোন যোগ নেই, কেবল অলংকরণের জন্যই এর দরকার। মন্দিরগাত্র কারুকার্যখচিত হোক, বা একেবারে কারুকার্যহীন হোক মন্দির-বিগ্রহের পূজা ঠিকই হয়। কিন্তু লোনার ছাতির কামনা থাকলে 'গুত্তির' (চালপুঁড়োর অর্থাৎ পিটুলির) ছাতি আঁকতেই হবে লৌকিক ব্রতে।

তেমনি লৌকিক ব্রতে ছড়া না হ'লে চলে না, সেটিই মন্ত্র। কিন্তু পৌরাণিক ব্রতের পুরাণ থেকে মন্ত্র যার নিয়েছে, তাই ছড়া তার পক্ষে অপরিহার্য নয়।

পৌরাণিক ব্রতের মন্ত্র সংস্কৃত—সেগুলি পড়ে দেবার জন্যে আসে পুরোহিত। লৌকিক ব্রতের মন্ত্র বা ছড়া বাংলা—একেবারে মেয়েলি বাংলা, সবটাই বলে মেয়েরা, তারই পুরোহিত।

লোকসমাজ ব্রাহ্মণ্যভাব দ্বারা প্রভাবিত হবার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য ব্রাহ্মণ-পুরোহিতরাও লোকানুষ্ঠানের কিছু

কিছু জায়গায় প্রবেশ করেছে। তা সত্ত্বেও লোক সমাজের বহু অনুষ্ঠানে তাদের ডাক পড়ল না, প্রবেশাধিকার পেল না তারা। কিন্তু অনুষ্ঠানগুলি লোকসমাজে এমনভাবে মিশে আছে যে তাকে স্বীকার না করেও উপায় নেই, তাই প্রবেশদ্বারের বাইরে দাঁড়িয়েই গলাজল ছিটিয়ে দিয়ে 'শুদ্ধ' করে নিতে বাধ্য হলেন শাস্ত্রকারেরা। বললেন, 'দেশানুশিষ্টং কুলধর্মশ্চ, সগোত্রধর্মং নহি সংত্যজেচ্চ' (—ব্যাসদেব)। স্মার্ত রঘুনন্দন মুনি-ঋষির বাক্য-প্রমাণ না পেয়ে মেয়েদের অনেক ব্রত-আচার-অনুষ্ঠানকে 'লোকিকব্যবহারসিদ্ধা' বলে মেনে নিয়েছেন।

লৌকিক ব্রতের একটা বিশেষ সামাজিক দিক আছে। ব্রতিনী যেন এখানে একা নয়, সমস্ত সমাজই তার সঙ্গে মিশে রয়েছে। তার কামনাও যেন শুধু নিজের কামনা নয়, গোটা সমাজের কণ্ঠস্বর তার মধ্যে। লৌকিক ব্রত করার বিধি অনেকে মিলে; পৌরাণিক ব্রতে একজনের নামে সংকল্প করা হয়। কিন্তু এখানে যেন সকলেরই সংকল্প। সংকল্পের মধ্যে একটা স্বার্থপরতা আছে—ব্রতের ফলটা আর কারুর নয়, শুধু আমার—এই ভাবটা রয়েছে সংকল্পের আড়ালে; সংকল্প করাবেনও ব্রাহ্মণ-পুরোহিত, অর্থাৎ তাঁকে দক্ষিণা-দানে তুষ্ট করবার সামর্থ যার আছে সেই পৌরাণিক ব্রতের অধিকারী। লৌকিক ব্রতের এমন বাধা নেই। বনের ফুল আর একটু চাল-পোলা যোগাড় করতে পারলেই হল, তাহলেই নারী-কুল দল বেঁধে গলা মিলিয়ে সমাজের মঙ্গল-কামনার গান গেয়ে উঠতে পারে। লৌকিক ব্রতের দুই প্রধান কামনা শস্য ও সন্তান—অনগ্রসর কৃষিসমাজের দুই মৌলিক কামনা। পৌরাণিক ব্রতের কামনা বৈকুণ্ঠলোক; যেখানে বৈকুণ্ঠলোক ছেড়ে পার্থিব কামনাও কিছু আছে, সেখানেও অনুষ্ঠান ব্যক্তিগত প্রার্থনা-উপাসনার চেয়ে বেশী কিছু নয়। কিন্তু লৌকিক ব্রতে তার ছড়ার মধ্যে সামাজিক কামনা আজ নানা প্রবাহে কিছুটা মুছে গেলেও তার অনুষ্ঠানের সামাজিক রূপ আজও বিদ্যমান। একত্রিত-ভাবে করা হয় তো বটেই, তা ছাড়া ব্রতের স্থানটিও লক্ষ্য করবার মত। লৌকিক ব্রত করা হয় সাধারণত উঠানে, বা নদীতীরে; বা এই ধরণের খোলা জায়গায়, যেখানে প্রবেশের পথ অবারিত, উদার আকাশের ছত্র-ছায়ায় সেই অনুষ্ঠান: পৌরাণিক ব্রতের স্থান গৃহাভ্যন্তরে, সেখানে চার দেওয়ালের সীমা বড় সংকীর্ণ—সবার ঠাঁই হয় না; লৌকিক ব্রতের চার দেওয়াল এ-দিকে মিশেছে গিয়ে দিগন্তের বুকে। একটি ব্যাপার একজনের মধ্যে বন্দী, আর একটি অনেকের মধ্যে রয়েছে ছড়িয়ে।

লৌকিক ব্রতের জন্ম যে সমাজে, সে সমাজ ছিল দৃঢ়সংবদ্ধ (integrated)। গোটা সমাজটাই যেন এক সঙ্গে চলে-ফেরে, হাসে-কাঁদে; জীবন মরণ সবার এক সূত্রে বাঁধা। তখনকার অনুষ্ঠান রূপের প্রাণে প্রাণ পেয়েছিল। পরে ধীরে ধীরে সমাজ সেই সংহতি হারাতে আরম্ভ করেছে, সামাজিক উৎসব ছেড়ে ব্যক্তিক উপাসনা ও প্রার্থনা তখন প্রাধান্য পেতে সুরু করেছে। তাছাড়াও পৌরাণিক ব্রত উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া জিনিস, আর লৌকিক ব্রতের জন্ম এ দেশের মাটির অন্তঃস্থল থেকে মানুষের জীবনের মধ্যে থেকে।

লৌকিক ব্রতের তুলনায় পৌরাণিক ব্রতের জন-প্রিয়তাও খুব কম। উপরের চাপে এ মাটিকে স্পর্শ করেছে বটে, কিন্তু মাটির মধ্যে শিকড় চালিয়ে দিয়ে প্রাণরস বা দৃঢ় ভিত্তি কোনটাই পায় নি।

আগেই বলেছি, লৌকিক ব্রতের অনুষ্ঠানটা মোটা-মুটি সামাজিক থাকলেও, ছড়ায় ঢুকেছে কিছুটা আমি-আমি ভাব। কিন্তু তা সত্ত্বেও মাঘমণ্ডল ব্রতে আমরা 'শত বইন'-এর সাক্ষাৎ পাব :

আয় লো শত বইন জলে রে যাই;
জলে রে যাইয়া লো আপাটি খেলাই।

কিংবা, খাও খাও লাউল গোটা চারি ভাত;
আমরা শত বইনে কেলায়-নে পাত।

অনেক জায়গায় 'আমরা' বলেই কামনাটা বলা হচ্ছে :

আমরা পূজা করি পিঠালির কুটুই,
আমাগো হয় যেন সোনার কুটুই।

পূর্বঙ্গের তারাব্রতের ছোল (বহু অর্থে, আঞ্চলিক অর্থে নয়) 'বত্তি'র দেখা পাওয়া যাবে :

ষোল ষোল বত্তির হাতে সোল সরা দিয়া,
ষোলা যাই ইন্দ্রপুরীর নাটুয়া হইয়া।

এ ধরণের উদাহরণ আরো অনেক জড় করে দেওয়া যায়।

দুটো দিকের এই মিশ্রণে বিস্মিত হবার কিছু নেই;

এর মধ্যে রয়েছে—বহুসংবদ্ধ সমাজের মানস-কামনা এবং আপনা-হয়ে-আসা সমাজের (পুরো Disintegrated নয়, সেটা সামন্ততান্ত্রিক সমাজে হয় নি, হয়েছে শিল্পকেন্দ্রিক ধনবাদী যুগের সমাজে) ব্যক্তিক প্রার্থনা-উপাসনা, এই দুই প্রান্তিক পর্যায়ের অন্তরবর্তীকালীন পথযাত্রার স্বাক্ষর। দাঁড়ি পাল্লায় তুললে অবশ্য লৌকিক ব্রতের সামাজিক দিকটা এখনও ভারী হবে।

যেমন ওরাওঁদের ধানচারা পোঁতবার আগের উৎসব 'হরিআরি' অর্থাৎ সবুজের উৎসব। এটি হবার আগে কেউ ধানচারা পুঁততে পারে না। অনেকে অবশ্য উৎসবের দু'একদিন পরে নিজেরা ব্যক্তিগত 'হরিআরি' করে। আগে করার নিয়ম নেই। একদিন সম্পত্তি বলতে ছিল শুধু সামাজিক সম্পত্তি—তাই মানুষের কামনাও ছিল সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য ও সম্পদ-বৃদ্ধি, এবং তারই জন্যে প্রজাবৃদ্ধি; ক্রমে সমাজের কাঠামো ভাঙালো ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে ভিত্তি করে, তার কামনাও হ'ল ব্যক্তিক। কিন্তু পুরোপুরি ব্যক্তিক পর্যায়ে পৌঁছতে সময় লেগেছে; এখানে দেখছি সামাজিক দিক ক্ষয়ে যেতে সুরু করেছে, আর ব্যক্তিক দিক একটু একটু করে মাথা তুলছে—ঠিক আমাদের লৌকিক ব্রতেরই মত। তবে মাথাটা একেবারে উন্মুক্ত নয়, সমাজের প্রাধান্য তখনও বাহাল—এই সময়কার ছাপ পড়েছে আমাদের ব্রতেও।

ইউরোপীয় কৃষকদের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান 'মে-পোল'-এও ছোট ছোট 'মে-বৃক্ষ' এনে বসানো হয় সব বাড়ির দরজার সামনে আর একটা বড় 'মে-বৃক্ষ' বসানো হয় গ্রামের মধ্যিখানে।

॥ দুই ॥

উপরের আলোচনাটি ব্রত-আলোচনার ভূমিকা।

এ সম্পর্কে আরো দু'টি-একটি প্রশ্ন আছে; সে-গুলিকে আমাদের এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। প্রশ্নগুলি এই:

—সমাজে ম্যাজিকের উৎপত্তি যে ধর্মের আগে হয়েছে তার প্রমাণ কি?

—ব্রত ও ব্রাত্যে কি কোন সম্পর্ক আছে?

—ব্রত মেয়েদের একচেটিয়া কেন?

একে একে প্রশ্নগুলি নেওয়া যাক্।

প্রথম প্রশ্ন।

ম্যাজিকের মূলে মনের ভাবানুষঙ্গের ক্ষমতা। এ ক্ষমতা অতি-অপরিণত মনেও দেখা যায়। এমন কি, পশুপ্রাণীর মধ্যেও সাদৃশ্য বোঝা, এবং সেটাকে কাজে লাগাবার ক্ষমতা বর্তমান। কিন্তু তাদের পক্ষে নিশ্চয়ই প্রাকৃতিক দৃশ্যের অন্তরালে কোন অদৃশ্য শক্তিমান প্রাণীর কল্পনা সম্ভব নয়। এর জন্য অধিক চিন্তাশক্তির প্রয়োজন।

এই মতবাদ হাতে-কলমে পরীক্ষিত ও সমর্থিত হয়েছে আদিম অধিবাসীদের জীবন থেকে। অষ্ট্রেলিয়ার আদি-বাসীরা আদিমতম—মানুষের জ্ঞানের পরিধি আজ পর্যন্ত যতটুকু সেই হিসেব অনুসারে। এই আদিমতম মানুষ-দের মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই;—তাদের বসবাস ঈশ্বরের রাজত্বের বাইরে, তারা ঈশ্বরকে সেলাম করে না, পূজা-প্রার্থনা বলিদান কিছুই দেয় না, ঈশ্বরের কোন খবরই তাদের মস্তিষ্কে নেই। কিন্তু ম্যাজিকের বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান তাদের মধ্যে ব্যাপক।

মানব-সংস্কৃতির বস্তুগত দিকে যেমন একটা প্রস্তর-যুগ রয়েছে, তেমনি তার মনীষার (intellect) দিকে রয়েছে একটা ম্যাজিক যুগ।

ম্যাজিকের নেতিবাচক দিকটাকে বিকশিত করল ধর্ম, আর ইতিবাচক দিকটাকে বিজ্ঞান। শৈশবকাল এ দুটো এক সঙ্গে মিশে ছিল অভিন্নভাবে। আদি-বিজ্ঞানীরা সকলেই পুরোহিত; তাদের বিজ্ঞানের জ্ঞান আচ্ছন্ন হয়ে ছিল ম্যাজিকের চিন্তাধারায়।

পুরোহিতের হাতে সমস্ত অধিবাসীদের মঙ্গলের একটা দায়িত্ব থাকত; ধর্মের প্রথম যুগে এই পুরোহিতকে সবাই পূজা করত, ঈশ্বরকে নয়; ঈশ্বরের মত একটা অপ্রত্যক্ষ অদৃশ্য অ্যাবস্ট্রাক্ট কিছুর ভাবে তাদের কল্পনায় আসত না, চোখের সামনের জলজ্যান্ত ঈশ্বর পুরোহিতকে তারা বুঝত। প্রথম যুগে পুরোহিত ও ভগবানকে ভাবা হত অভিন্ন, পরবর্তীকালে পুরোহিতরা ভগবানের অবতার বা পৃথিবীতে ভগবানের প্রতিনিধি হিসাবে পূজা পেতেন। নানা বস্তু, খাদ্য-সম্ভার ইত্যাদি দিয়ে তুষ্ট করা হত পুরোহিতকে; দেবতাকেও তাই করা হয়। দেবতা ও পুরোহিতের অভিন্নত্বের প্রচুর চিহ্ন 'অসভ্য' সমাজ-

গুলিতে আজও বর্তমান আছে। আমরা আজও ব্রাহ্মণকে দান-ধ্যান করে বা খাইয়ে ভাবি দেবতা তুষ্ট হলেন।

পুরোহিত ও ঈশ্বরের চরিত্রধারা-অবশ্য ক্রমে পরস্পর যখন বিশ্লিষ্ট হতে আরম্ভ করল, তখন সেভার দিকে পুরোহিতের চরিত্রবৈশিষ্ট্যগুলিই ঈশ্বরে আরোপিত হল: অনুব্রত সমাজের অপশক্তিমান (malevolent) দেবতা পরিকল্পনার মূলে এই পুরোহিতদের গুণাবলীর বিরাট অভাব আছে। মনে রাখতে হবে যে এ পুরোহিত শিখাসূত্র পরিশোভিত, কৃষ্ণতনু, ভুল-সংস্কৃত-পড়া, ছাঁদা-বাঁধা আজকের টুলো পণ্ডিত বা ভটচায বামুন নয়, সে একাধারে ঐন্দ্রজালিক, পুরোহিত ও গোষ্ঠিপতি।

তখনকার দেবতার অবশ্য অপশক্তিমান রূপ হবার আরো একটা বড় কারণ আছে। সে যুগে মানুষ তখনও প্রকৃতিকে জয় করে উঠতে পারে নি, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সামনে সে তখন অসহায়, প্রকৃতি তখন তার কাছে নির্দয়, হিংস্র; প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা দেবতারাও হলেন তাই, কারণ প্রাকৃতিক বিরূপতা তো তাঁদেরই চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ।

পরে প্রকৃতি যখন সদয় হয়েছে, প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা দেবতাদের চরিত্রও ক্রমে সদয় হিসাবে কল্পিত হয়েছে। এই দুই ধারার মিশ্রণ প্রায় সব প্রাক-আর্য দেবদেবীতে লক্ষ্য করা যায়।

। তিন ।

দ্বিতীয় প্রশ্ন—ব্রত ও ব্রাত্য প্রসঙ্গে। শব্দ দুটোর ধ্বনি-সাদৃশ্য আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু দুটোর মধ্যে মূলত সামাজিক দিক দিয়ে কি কোন সম্পর্ক ছিল?

এই সম্পর্কে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেন, 'আর্য-ব্রাহ্মণ সংস্কৃতি যাঁহাদের বলিয়াছে 'ব্রাত্য' বা পতিত তাঁহারা কি ব্রতধর্ম পালন করিতেন বলিয়াই ব্রাত্য বলিয়াই অভিহিত হইয়াছেন এবং সেইজন্যই কি আর্যরা তাঁহাদের পতিত বলিয়া গণ্য করিতেন? বোধহয় তাহাই।' এ প্রসঙ্গে ডঃ রায় আরো বলেছেন, 'অসংখ্য আর্যরা ছিলেন বহুব্রতী আর্যদের বাহিরে যাঁহারা ব্রতধর্ম পালন করিতেন, ব্রতের গূঢ়া যাদুশক্তি বা ম্যাজিক বিশ্বাস করিতেন তাঁহারাই হয়তো ছিলেন ব্রাত্য।'

ডঃ রায় 'ব্রত' শব্দটি কেবলমাত্র অনার্যদের অনুষ্ঠানেই আরোপ করেছেন। কিন্তু ব্রত তো আর্যদেরও ছিল (দু'জাতের ব্রতে মৌলিক পার্থক্য অবশ্য ছিল)। দুটোরই সাধারণ নাম একটা—ব্রত; এবং এ শব্দটা নিঃসন্দেহে আর্যভাষা সম্ভূত; আর্য-ভাষা গ্রহণ করবার আগে অনার্যদের হয়তো এর আলাদা নাম ছিল, পরে আর্যদের দেওয়া নামটিই চলে গেছে। সুতরাং ব্রত করত বলেই ব্রাত্য বলা হত এ কথা বলা চলে কি? তাহলে তো আর্যরাও তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

পতঞ্জলি তাঁর মহাভাষ্যে ব্রতের সংজ্ঞা দিয়েছেন 'ব্রিয়তে ইতি অনেন' অর্থাৎ ব্রত দ্বারা নির্বাচন করা হয়; কি করণীয় কি গ্রহণীয় এটি বাছাই করাই ব্রত। পতঞ্জলি ব্রতকে গ্রহণ করেছেন 'নিয়ম' বা 'নিয়ম' অর্থে। এই ব্রত (একে বলা যাক 'নিয়ম-ব্রত') আর্যদের মধ্যে ছিল, তারা এ দেশে এসে এখানকার লোকের আচার-আচরণ দেখল অন্যরকম, এদের তারা ডাকল 'অন্যব্রত' বলে। অন্যব্রত কথাটাই প্রমাণ করে যে আর্যদের এক ধরণের ব্রত ছিল।

(এখানে মনে রাখতে হবে যে এই নিয়ম-ব্রত ও পৌরাণিক ব্রত এক নয়। নিয়ম-ব্রত আর্যদের মধ্যে ছিল, তারা এ দেশে এসে দেখল লৌকিক ব্রত—যা ম্যাজিক ও ধর্মের সংমিশ্রিত (magico-religious) সামাজিক অনুষ্ঠান এবং যাতে কামনাটা অনুকরণাত্মক ক্রিয়ায়, চিত্রে, গীতে, ছড়ায়, নৃত্যে ইত্যাদির মধ্যে বেশ দেখা যায়। এই লৌকিক ব্রতের জনপ্রিয়তাকে লক্ষ্য ক'রে শাস্ত্রকাররা তার অনুকরণে হিন্দু দেবদেবীকে জনপ্রিয় করবার জন্য যে নকল ব্রত গড়লেন তাকে বলেছি পৌরাণিক ব্রত।)

ব্রাত্য-প্রসঙ্গে আরও দু'-একজনের মতামত নেওয়া যাক—দেখা যাক তাঁরা কি বলেন।

ডঃ সুকুমার সেন পাটনায় তাঁর এক সম্প্রতি-দত্ত অভিভাষণে বলেছেন যে, যে দু'দল আর্য ভারতে প্রাচীন-কালে এসেছিল তার প্রথম দলটিই ব্রাত্য-আর্য। এরা পরবর্তী দলটির চাপে কোণঠাসা হ'য়ে ভারতের পূর্বাঞ্চলে আশ্রয় করেছিল। এদের আচার-ব্যবহার

পরবর্তী আর্যদের থেকে কিছুটা পৃথক ছিল। এদের ভাষার জন্যেই পূর্বী প্রাকৃত কিছুটা বেশী পুরাতন অন্য প্রাকৃতের চেয়ে। এই পূর্বাঞ্চল থেকেই ব্রাহ্মণ্য-বিরোধী যে-সব ধর্মমতের আবির্ভাব হয়েছিল, তার মূলেও এদের প্রভাব আছে। ব্রাত্য কথাটি এসেছে ব্রাত (সম্প্রদায়, গোষ্ঠী বা community) থেকে। ব্রাত্য-আর্যরা ছিল খুব গণতান্ত্রিক—তাদের সমাজ চলত ব্রাত-ভিত্তিতে। ব্রাহ্মণ্য-আর্যদের সমাজ চলত গ্রাম-ভিত্তিতে তাই এরা গ্রাম্য বা গ্রামীণ, আর ওরা ব্রাত্য।

ব্রাত্য-প্রসঙ্গে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মত হচ্ছে, 'বিহার অঞ্চলে যে সব আর্যরা প্রথম এসে বসবাস করে, তারা মরুবাসী কৃষাণ জাতীয় ছিল না তারা ছিল যাযাবর বা ভবঘুরে, তারা তাদের ঘোড়া গরু ছাগল ভেড়া নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াত, পশ্চিমা মরুবাসী চাষী আর্যরা তাদের নাম দিয়েছিল 'ব্রাত্য'। তারা অবশ্য আর্যভাষা ব'লত,...আর তাদের ধর্মও ছিল বৈদিক ধর্ম থেকে আলাদা—খুব সম্ভব তারা শিবের উপাসনা করত, তারা বৈদিক যাগযজ্ঞ হোম অগ্নিপূজা ইত্যাদি করত না, আর ব্রাহ্মণ পুরোহিতকেও মানত না। বেদরাগী পশ্চিমা আর্যরা এই সব কারণে তাদের অবজ্ঞা করত, আর ব্রাহ্মণ গ্রন্থে তাদের সম্বন্ধে নানান নিন্দার কথা লিখে গিয়েছে। বৈদিক আর্যরা এদের শুদ্ধি করে বেদরাগী ক'রে নিত খুব;—যে অনুষ্ঠানের দ্বারা এরা বৈদিক দীক্ষা নিত, সে অনুষ্ঠানের নাম ছিল 'ব্রাত্য-স্তোম'। খুব সম্ভব এই ব্রাত্যরা অনার্য দ্রাবিড় লোকদের সঙ্গে কতকটা মিশে গিয়েছিল, সে যুগে জাতিভেদের এত কড়াকড়ি নিয়ম ছিল না, আর ব্রাত্য-আর্যরা মধ্যদেশীয় আর্যদের দ্বারা স্বীকৃত বর্ণভেদ মানতই না।...আর এটা খুবই সম্ভব যে, তারা বৈদিক ধর্ম গ্রহণ ক'রলেও, সে ধর্ম তাদের মধ্যে তেমন দৃঢ় হয়ে বসতে পারে নি।'

এঁদের মতের কিছুটা সাদৃশ্য আছে। এঁরা ব্রাত্যকে ব্রতের সঙ্গে সম্পর্কিত করেন নি।

সুনীতিবাবু [illegible] ব্রতের সম্পর্ক; সুতরাং যারা 'মরুবাসী কৃষাণ জাতীয়' নয়, তাদের যাযাবর জীবনে ব্রতের উদ্ভব হওয়া খুব স্বাভাবিক নয়।

ব্রাত্য সম্পর্কে নানা উৎস থেকে আর যে খবর পাওয়া যাচ্ছে, তা খুবই গোলমেলে এবং তার সঙ্গে কোন ক্ষেত্রেই ব্রতের সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

অথর্ব-বেদের পঞ্চদশ কাণ্ডে ব্রাত্যের অনেক প্রশংসা আছে। কিন্তু এ ব্রাত্য হয়তো ব্রাত্য জাতির সঙ্গে এক নয়, কারণ এখানে পরম এক ব্রাত্যের কথা বলা হ'য়েছে। প্রশ্নোপনিষদেও এই রকম দেখা যায়।

যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন (১।৩৭-৩৮)—ব্রাহ্মণের ষোলো বছর, ক্ষত্রিয়ের বাইশ বছর ও বৈশ্যের চব্বিশ বছরই উপনয়ন সংস্কারের চরম কাল। উক্ত কালের পর উপনয়ন সংস্কার না হ'লে তারা সাবিত্রী পতিত হ'ল বলে 'ব্রাত্য' এবং পতিত হ'ল। এদের 'ব্রাত্য স্তোম' নামক যজ্ঞ না ক'রলে আর কোন ধর্মেই অধিকার থাকবে না।

বশিষ্ঠ (১১), পারস্কর (২।৬।১০), আপস্তম্ব (১।২।২৯)—এঁরা বলেছেন—ব্রাত্যদের উপনয়ন করাবে না, অধ্যয়ন করাবে না, যাজন ক'রবে না, বিবাহ করবে না, তাদের কাছে যাবে না, ইত্যাদি। অর্থাৎ একঘরে ক'রে রাখবার বিধান দিয়েছেন এঁরা।

মনু ব্রাত্যদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন (১০।২০)—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য স্ববর্ণা স্ত্রীতে যে যে পুত্র উৎপাদন করে, তারা যদি উপনয়ন-সংস্কার-রহিত হয়, তবে তাদের 'ব্রাত্য' এই নামে অভিহিত করবে।

উপযুক্ত শাস্ত্রকারদের বক্তব্যের সঙ্গে সুনীতিবাবুর মতের কিছুটা মিল আছে; তিনিও বলেছেন, ব্রাত্য আর্যরা ব্রাহ্মণ-পুরোহিতকে মানত না এবং বর্ণভেদও মানত না।

আপস্তম্ব বলেছেন (১।১।২৮)—পিতামহের কাল থেকে যারা ব্রাত্য হ'য়ে আসছে (অর্থাৎ তিন পুরুষ ধরে), ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ তাদের অন্ত্যজবর্ণী বলে নির্দেশ করেছেন।

এই নির্দেশ কি কোন ব্রাহ্মণ-ব্রাত্য সংঘর্ষের স্মৃতি বহন ক'রছে? অবশ্য বলা হয়েছে যে ব্রহ্মহত্যা না করলেও যে অন্য বলা হয়, তা শুধু ব্রাত্যদের উপর ব্রহ্মহত্যার মত [illegible]

নির্দিষ্ট হয়েছে ডুবানলাদিত মৃত্যু। অবশ্য স্বর্ণ বা ধেনু ইত্যাদি ব্রাহ্মণকে দান করেও প্রায়শ্চিত্ত করা যেতে পারে।

মনু বলেন (১০।২১)-২৪—ব্রাত্য-ব্রাহ্মণ থেকে যে পুত্র জন্মে সে হয় অতি নিকৃষ্ট ভূর্জকণ্টক জাতি. উক্ত ভূর্জকণ্টক জাতিকেই কোন কোন দেশে আবন্ত্য, বাট-ধান, পুষ্পধ, শৈখ বলে থাকে; ব্রাত্য-ক্ষত্রিয়ের পুত্রেরা হয় ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছিবি, নট, করণ, খশ, দ্রবিড় ইত্যাদি; ব্রাত্যবৈশ্যের পুত্রেরা হয় সুধন্বাচার্য, কারুষ, বিজন্মা, মৈত্র, সাত্বত ইত্যাদি।

মনু ব'লছেন, ব্রাত্য-ক্ষত্রিয়েরা দু'বড় হ'য়ে যায়; সুনীতিবাবু বলেছেন, 'খুব সম্ভব এই ব্রাত্যরা অনার্য দ্রাবিড় সোকদের সঙ্গে কতকটা মিশে গিয়েছিল।' এইটুকু মিল দেখে যতটুকু আশার কারণ আছে, তার থেকে বেশী আছে হতাশ হবার কারণ মনুর এই আলোচনায়। তিনি এখানে 'জাতির' নামগুলি একেবারে নির্বিচারে বসিয়ে দিয়েছেন; পেশাগত (যথা, করণ), দেশগত (যথা, আবন্ত্য), জাতিগত (যথা, দ্রাবিড়) ইত্যাদি নানা দিকের শ্রেণী এর মধ্যে চুকিয়ে সব তালগোল পাকিয়ে দিয়েছেন; ফলে ইতিহাসের দিক দিয়ে এর মূল্য বিশেষ কিছু নেই ব'লসেই চলে।

অবশ্য কেউই ব্রতকে ব্রাত্যের সঙ্গে সম্পর্কিত করেন নি।

ব্রাত্যদের সম্পর্কে গবেষণা এখনও করবার আছে। সেই গবেষণায় যদি ব্রতের সঙ্গে ব্রাত্য সম্পর্কিত হয়, তবে সেই তথ্যের ভিত্তিতেই সেটা স্বীকৃতি পেতে পারে, বড়জোর নয়।

ডঃ নীহাররঞ্জন রায় নিজেও বলেছেন, 'ব্রতের সঙ্গে ব্রাত্যদের সম্বন্ধ কোন অকাট্য প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠা করা কঠিন, তবে এই অনুমান একেবারে অযৌক্তিক ও অনৈতিহাসিক নাও হইতে পারে।'

এ প্রসঙ্গে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন যে ব্রত এবং 'বরণ' দুটো শব্দেরই মূল ধাতু, উভয় অনুষ্ঠানেই ম্যাজিকের বিশ্বাস আছে, উভয় অনুষ্ঠানই মূলত মেয়েদের।

এতে কিন্তু ব্রতের সঙ্গে ব্রাত্যের সম্পর্ক নিরূপিত হয় নি।

॥ চার ॥

তৃতীয় প্রশ্ন—ব্রতে মেয়েদের একাধিপত্য কেন? ব্রতের উদ্ভবের দিকে লক্ষ্য রেখে এর উত্তর খুঁজতে হবে।

নতুন কৃষি-শেখা মানুষ বিজ্ঞান জানত না ব'লে শস্য ও সন্তান প্রাপ্তির ব্যাপারে অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সঙ্গে তাকে জীবনযাপন করতে হত। নতুন-কৃষি শেখা মানব সমাজের এই দুটোই মূল কামনা। কৃষি আবিষ্কারের আগে মানুষকে যাযাবর জীবন যাপন করতে হত; তখনও শস্য উৎপাদনের কৌশল সে আবিষ্কার করতে পারে নি; শিকার, পশুপালন ও ফলমূল-আহরণ তখন তার কাজ; মুখ্যত সে সংগ্রাহক তখন, উৎপাদক নয়; এই সময় শস্য বৃদ্ধির কামনায় কোন অনুষ্ঠান করা তার পক্ষে অসম্ভব—এ ভাবনা তখন তার মাথায় আসবারই কথা নয়; আর যাযাবর জীবনে সন্তান তো একটি বোঝা-বিশেষ—সহজ চলাচলের বাধা ও অকর্মণ্য হয়েও খাদ্যভুক্। কিন্তু কৃষি-সমাজে সন্তান কৃষিকাজের সহায়ক।

সন্তান-ধারণে নারীই সক্ষম, এবং শস্য উৎপাদনের প্রথম আবিষ্কারকও খুব সম্ভবত নারী। যে সব মনীষী প্রাচীন সমাজ সম্বন্ধে গবেষণা ক'রেছেন, তাঁদের প্রায় সকলেরই মত যে কৃষিকাজ নারীর আবিষ্কার। নারী তার গৃহের (তা সে যে ধরনের গৃহই হোক না কেন) আশেপাশে মাটির মধ্যে ফলমূল রক্ষিত করে রাখবার চেষ্টার ভেতর থেকেই কৃষি আবিষ্কার করেছে। (যে ফলমূল মাটির তলা থেকে খুঁড়ে বার করা হয় তার নাম কন্দ, আমাদের দেশে যে লক্ষ্মী পূজা প্রচলিত তাকেও বহু অঞ্চলে প্রবীণেরা বলেন কন্দপূজা; থেকেও এ মনে হয় যে লক্ষ্মী মানুষের কাছে তাঁর ধান্যমূর্তির আগেই বোধহয় কন্দমূর্তিতে দেখা দিয়েছিলেন।) প্রথমে ছোটখাটভাবে কৃষিকাজ (বাগান-ক্ষেত বা garden-tillage জাতীয়) মেয়েরাই আরম্ভ করেছিল, পরে পুরুষেরা সেটা গ্রহণ করেছে।

"আফ্রিকার জুলুদের বর্ণনায় ক্রিগ বলছেন, আজকের দিনে ওই নিয়মটি (অর্থাৎ কৃষিকাজ মেয়েদেরই হবে,) ইয়োরোপীয় সভ্যতার প্রভাবের ফলে বহুলাংশে শিথিল হয়েছে; বলদ-জোড়া লাঙলের ব্যবহার শুরু হওয়ার ফলে চাষের কাজ পুরোপুরি পুরুষদেরই হয়ে দাঁড়াচ্ছে, কেননা

মেয়েরা পশুকে ব্যবহার করতে পারে না।

'এনসাইক্লোপিডিয়া অব রিলিজন অ্যাণ্ড এথিকস'এও কৃষি-আবিষ্কার প্রসঙ্গে স্বীকার করা হয়েছে এ আবিষ্কার পুরুষেরা করে নি—মেয়েরাই করেছিল: 'হাইবের পুরুষেরা যখন বনজঙ্গলে শিকারে নিযুক্ত, বা যুদ্ধে রত' মেয়েরা তখন শিশুদের নিয়ে বাস-ভূমির আশপাশে ঘুরে বেড়ায়। কাঠের টুকরো পাথরের কুড়ুল দিয়ে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তেই কৃষিকাজ আবিষ্কার করেছিল। এই কৃষিকাজের রীতিমত উন্নতি হবার আগে পর্যন্ত কাজের দায়িত্বটা মেয়েদের হাত থেকে পুরুষের হাতে যায় নি।' নজির হিসাবে লেখক দেখাচ্ছেন, মধ্য ব্রেজিলে কৃষিকাজ যে মেয়েরাই আবিষ্কার করেছিল সে-কথা স্টেইনেন ইতিপূর্বেই প্রমাণ করেছেন। এবং জেন হ্যারিসনের লেখা থেকে উদ্ধৃতির সাহায্যে দেখানো হয়েছে, আমেরিকার আদিবাসীদের একটি কুসংস্কারের মধ্যে ওই স্মৃতিটিরই পরিচয় পাওয়া যায় যে, কৃষিকাজ শুরুতে শুধুমাত্র মেয়েলি ব্যাপারই ছিল: ওদের ধারণায় মেয়েরা ভুট্টা বুনলে এক-এক বুন্তে তিন-তিন ভুট্টা হয়। কেন হয়। কেননা মেয়েরা জানে কেমন করে ফলবতী করা যায়। শুধু তারাই জানে গাছও কি করে ফলের জন্ম দেবে।

"রথাট' ব্রিফল্ট এরের পর এক উদাহরণ দিয়ে দেখাচ্ছেন, মেয়েরাই যে কৃষিকাজ আবিষ্কার করেছিল তার স্মৃতি নানান দেশের আদিম মানুষের নানা উপকথায় আজো টিঁকে রয়েছে। চেরোকি জাতির লোকেরা এখনও বিশ্বাস করে, পৃথিবীর প্রথম নারীই বনের মধ্যে শস্য আবিষ্কার করেছিল, যারা খাবার সময় সেই নারী নির্দেশ দিয়ে যায়, যে, মাটির উপর দিয়ে তার শবদেহ টেনে নিয়ে বেড়াতে হবে—তাহি সেই শবদেহের স্পর্শে শস্য-শ্যামল হয়ে উঠবে। চেইয়েনদের মধ্যেও বিশ্বাস যে, একজন মেয়েই প্রথম শস্য আবিষ্কার করেছিল। ব্রেজিল টুপিদের উপকথায় আছে, একটি কুমারী মেয়ে একবার অন্তঃসত্ত্বা হয়; তার গর্ভজাত শিশুটির মৃতদেহ থেকেই পৃথিবীর প্রথম শস্য জন্মায়। আফ্রিকার দক্ষিণ ও পশ্চিম অঞ্চলে নানা আদিবাসীদেরও বিশ্বাস, শস্য আবিষ্কার করেছিল পৃথিবীর এক আদি নারী।

"এই জাতীয় উপকথার ঐতিহ্যকে নিশ্চয়ই উড়িয়ে দেওয়া যায় না।..."

ব্রিফল্ট কৃষি সম্পর্কে বলেছেন যে, এটা ছিল 'Provinces of Woman'

B. O. R. Ehrenfels তাঁর 'মাদার রাইট ইন ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে পর্যাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রমাণ করেছেন যে, ভারতবর্ষেও কৃষিকাজ নারীর আবিষ্কার।

কৃষি-আবিষ্কার সমাজের অগ্রগতির পথে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ কৃষি-প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে নানা পরিবর্তন ও বিভিন্ন নতুন জিনিসের উদ্ভব হ'ল। সমাজের উপর কৃষির সামগ্রিক প্রভাবের আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক; তবে এই সময়েই সমাজে যাদুবিশ্বাস সম্পর্কিত চেতনা ও অনুষ্ঠান ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে তাতে সন্দেহ নেই।

পশুপালনের তুলনায় কৃষিকাজ জিনিসটা অনেক শক্ত। পশু তার নিজের তাগিদেই চ'রে বেড়ায় ও সংখ্যায় বাড়ে। চারণক্ষেত্র থাকলে এ ব্যাপারে মানুষের আর বিশেষ মাথা ঘামাবার কিছু নেই। কিন্তু কৃষির কার্যশৃংখল অনেক দুরূহ, সময়-সাপেক্ষ, এবং অ-বৈজ্ঞানিকের কাছে ভয়াবহ রকমের অনিশ্চিত; জমি তৈরী করা ও বীজ বোনা থেকে ফসল পাকা পর্যন্ত মানুষকে মানসিক স্থৈর্যের ও ধৈর্যশীলতার পরিচয় দিতে হয়। বীজ থেকে ফলের পথ-পরিক্রমার বিজ্ঞান যার কাছে অজ্ঞাত, তার কাছে এ বড় শক্ত পরীক্ষা—বিশেষ ক'রে এই অনিশ্চিত বিষয়ের সাফল্যের উপর তার জীবন-মরণ নির্ভর করছে। এই ফসল ফলিয়ে তোলার তাগিদে সে ফসল ফলাবার, বৃষ্টি আনবার জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করবার নকল অনুষ্ঠান করত—যে কৃত্রিম অনুষ্ঠান বাস্তব সাফল্য আনবে বলে তার ধারণা ছিল।

কৃষি-সমাজেই যে যাদু-বিশ্বাসের প্রসার—এ বক্তব্যের সমর্থনে একটি উদাহরণের উল্লেখ করা হ'ল:

'অসভ্য মানুষদের মধ্যে সর্বত্রই দেখা যায় অন্যান্য কাজের তুলনায় কৃষিকাজকে কেন্দ্র করেই যাদুবিশ্বাস ও যাদুবিশ্বাসগত অনুষ্ঠানের উপর নির্ভরতা সবচেয়ে বেশী। সিউডো-ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে খৃস্টান পাদ্রীরা নানাভাবে খৃস্টধর্ম প্রচারের চেষ্টা করেও এই অসভ্য

মানুষগুলির মনে বিশ্বাস একটুও টলাতে পারে নি, অথচ এ বিশ্বাসে চুনকাম হয়ে যেতে লাগল যখন ইয়োরোপীয়রা সে দেশে গিয়ে চাষবাস শুরু করল। ইয়োরোপীয়দের কৃষিকাজ দেখে ওদের বিশ্বাস এভাবে চুনকাম হয়ে যেতে লাগল কেন? কেননা, ওরা দেখল কোনো রকম জাদু-অনুষ্ঠানের উপর নির্ভর না করেই ইয়োরোপীয়রা ফসল ফলাতে পারছে এবং সে-ফসল গুণ বা পরিমাণ কোনো দিক থেকেই নিকৃষ্ট নয়। তাই খৃস্টান পাদ্রীরা হাজার বক্তৃতা দিয়েও তাদের মনের যে বিশ্বাস টলাতে পারে নি, ইয়োরোপীয়দের কৃষিকাজ পরিদর্শন সে বিশ্বাসকে উৎপাটিত করতে পারল। পিউবেলো-ইণ্ডিয়ানদের এই কাহিনীটি থেকেই অনুমান করা যায়, পিছিয়ে পড়ে থাকা মানুষদের মনে,—এবং অতএব এগিয়ে আসা মানুষদের পিছনে ফেলে আসা পর্যায়েও,—কৃষিকাজ কত গভীরভাবে জাদুবিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত এবং জাদুবিশ্বাসগত অনুষ্ঠানের উপর নির্ভরশীল। অবশ্য ব্রিফল্ট শুধুমাত্র এই দৃষ্টান্তটির উপরই নির্ভর করেন নি। আরো বহু তথ্য সংগ্রহ করে দেখিয়েছেন, পৃথিবীর পিছিয়ে পড়া পর্যায়ের মানুষদের কাছে জাদুবিশ্বাসের অনুষ্ঠান বাদ দিয়ে কৃষিকাজ একান্তই অসম্ভব।...ব্রাউ' ব্রিফল্ট বলেছেন, মেয়েরাই কৃষিকাজ করত, ফলে স্বভাবতই জমির উর্বরতা বৃদ্ধির কামনায় জাদু অনুষ্ঠান ও ধর্মানুষ্ঠানগুলি মেয়েদেরই একচ্ছত্র ছিল।' টমসনও বলেছেন, গোড়ার কৃষি-আবিষ্কর্ত্রী হিসাবে জাদু অনুষ্ঠান প্রধানত মেয়েরা করত।

সন্তান-জননিকা হিসাবে নারী উর্বরতার প্রতীক ব'লে বিবেচিত হ'য়েছে, সেটাও কৃষি-ম্যাজিক অনুষ্ঠানে নারীর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার অন্যতম কারণ।

আমাদের দেশের ব্রতও এই ধরণের জাদু-অনুষ্ঠান।

জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জাদু-অনুষ্ঠান মোটামুটি-ভাবে বলতে গেলে দু' রকমের। এক, ক্ষুদ্র (miniature) ভাবে মাটিকে সবুজ সম্পদে ভরে তোলা; যেমন আমাদের তোষলা ব্রত, সোরেরে গুলি পাকিয়ে তাইতে সবুজ দুর্বাঘাস রোপণ করে দেওয়া হয়, আর ছড়িয়ে দেওয়া হয় তুষ-কুঁড়ো ইত্যাদি। ক্ষুদ্র ক্ষেত্রের এই সাফল্য বৃহত্তর ক্ষেত্রেও এক নিগূঢ় জাদু-শক্তির সাহায্যে প্রভাব বিস্তার ক'রবে এই হচ্ছে বিশ্বাস।

দ্বিতীয় ধরণের অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রচলিত—বিশ্বের প্রায় সর্বত্র। জমির উর্বরতা বৃদ্ধির এই অনুষ্ঠানগুলি ছিল মানুষের বংশ বৃদ্ধির বা নবজাতকের উপলক্ষে অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকলাপের অনুকৃতি। সমাজের স্ত্রী-প্রধানের যৌন-জীবনকে দেখা হ'ত ঐন্দ্রজালিক আচার-অনুষ্ঠান হিসাবে। পৃথিবী যাহাতে সন্তানসম্ভবা হয় তারই জন্য যেন স্ত্রী-প্রধান গর্ভধারণ করতেন। (প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ব্রতের সঙ্গে যেসব দেবতা জড়িয়ে মিশিয়ে গিয়েছেন তাঁদের বেশীর ভাগই স্ত্রী দেবতা।) ওঁরাওদের সরহুল উৎসবের শেষে প্রতি বৎসর পাহান (প্রধান) ও পাহানাইনের (প্রধানের স্ত্রী) 'বিবাহ' দেওয়া হয়; তাদের বিশ্বাস এতে পৃথিবী ফলবতী হবে।

সন্তান উৎপাদন ও শস্য উৎপাদন দুই-ই উৎপাদন, অতএব দুইয়ের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে, এক আরেককে প্রভাবিত করে, একটি ফললে আর একটিও ফলবে এই হচ্ছে আদি মানুষের যুক্তি। নারীর কাছে সন্তান ধারণের বিশেষ ক্ষমতা, অতএব শস্য ফলাবার ক্ষমতাও তার আছে (বিশেষত, তার হাতেই যখন মাটির প্রথম ফসল ফলেছে।

বাভারিয়া ও অষ্ট্রিয়ার কৃষকরা মনে করে যে বৃক্ষের প্রথম ফলটি সন্তানবতী রমণীকে দিলে ফলন ভাল হবে। ওরিনোকোর ইণ্ডিয়ানরা বীজ বপন করার ছেলে কোলে নারীদের দিয়ে; একজন পাদ্রী এর কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তারা বলেছিল 'Father, you don't understand these things.....you know that women are accustomed to bear children and that we men are not. When the women sow, the stalk of the maize bears two or three ears the root of the yucca yields two or three basketfuls, and everything multiplies in proportion. Now why is that? Simply because the women know how to bring forth, and know how to know make the seed which they sow

bring forth also. Let them sow then : we men dont know as much about it as they do.

সুমাত্রাতেও দান দেওয়া হয় মেয়েদের দিয়ে। গ্রীক ও রোমানরা পশুপালনের চেষ্টায় ফলিয়ে সন্তানবতী রমণীদের বলিদিতেন করত।

ভারতবর্ষে ছোটনাগপুরে আনুষ্ঠানিক হলকর্ষণের দিন কৃষকদের সঙ্গে দেখা করেন জমিদারের জন্য অথবা ভগ্নী এবং তাদের গমের পিঠে খেতে দেন ; এটাও অনুষ্ঠানের অঙ্গ। পাঞ্জাবে প্রথম বীজ বোনার দিন মেয়েরা ক্ষেতের কিনারায় মিষ্টি-অন্ন খেতে দেয় এবং তারপর তিন চার পরে মেয়েরা ক্ষেতের বুক দিয়ে হাঁটে ও টেকোতে একটা সুতো জড়াতে থাকে।

এছাড়াও কৃষির পক্ষে অপরিহার্য বৃষ্টিকে আহ্বান করে যে সমস্ত মাঙ্গিক অনুষ্ঠান চলিত ছিল, তাতেও মেয়েদের যথেষ্ট আধিপত্য ছিল ; এ বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্বে যে উদাহরণগুলি দিয়েছি তাতেই এর প্রমাণ মিলবে। এখানে আরো দু একটি দেশী উদাহরণের উল্লেখ করছি।

উত্তর প্রদেশের গোরখপুর জেলায় ১৮৭৫-৭৪ খৃষ্টাব্দের বৃষ্টিহীনের সময়, অনাবৃষ্টিকে তাড়িয়ে ফসল ফলিয়ে তোলবার চেষ্টায় মেয়েরা দলবদ্ধভাবে রাত্রে নগ্নগাত্রে লাঙল নিয়ে ক্ষেতে আনুষ্ঠানিকভাবে হলকর্ষণ করেছিল।

উত্তর প্রদেশের মির্জাপুর জেলায় চুনার যখন দীর্ঘস্থায়ী অনাবৃষ্টির কবলে, তখন একদিন (২৪শে জুলাই, ১৮৯২) রাত্রে তিনজন কৃষক রমণী নগ্নগাত্রে ক্ষেতে গেল দুইজন কোয়ালীর বলদের মত কাঁধে লাঙলের পর বাকী তৃতীয়জন লাঙল চালাতে লাগল।

উত্তরবঙ্গে অনাবৃষ্টি তীব্র হলে রাজবংশী মেয়েরা নগ্নগাত্রে নৃত্য করত তাদের বৃষ্টি দেবতা 'কুভুমদেব'-এর সামনে।

খুব সম্প্রতিকালের একজন প্রত্যক্ষদর্শী বাংলাদেশের এই নগ্নগাত্রী নৃত্যের একটি বর্ণনা দিয়েছেন।,

আমাদের দেশে ঘরের বৌকে বলা হয় ঘরের 'লক্ষ্মী' ; বৌ সন্তানবতী হবে, ফলে পরিবারের বৃদ্ধিকাও হবে শস্যবতী, খুব সম্ভব এই ধারণার বশেই বৌকে মূর্তিমতী লক্ষ্মী বলে মনে করা হয়। আবার উলটো দিকে বন্ধ্যা বধূ হচ্ছে অলক্ষ্মী, সমাজ তাকে দেখে নীচু দৃষ্টিতে, সামাজিক অধিকারও তার কম। অবিবাহিত যুবকের টাকা থাকলেও আমরা তাকে বলি 'লক্ষ্মীছাড়া'। স্ত্রী-ভাগ্যে এম আগে এ বিশ্বাস আজও আমাদের আছে।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, (সন্তান-সংক্রান্ত তো বটেই), প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শস্য-সংক্রান্ত যাদুমূলক অনুষ্ঠানে মেয়েদের একাধিপত্য ছিল। ব্রতও এই ধরনেরই অনুষ্ঠান।

ক্রমে কৃষি যখন পুরুষের হাতে চলে গেল, তখন কৃষিসংক্রান্ত যাদুমূলক অনুষ্ঠানও অল্পস্বল্প বিস্তর অন্যান্য দেশে পুরুষের কাছে হস্তান্তরিত হল। কিন্তু আমাদের দেশে তা হয় নি ; কৃষি পুরুষের হাতে গেছে, কিন্তু অনুষ্ঠানগুলি হাত-বদল হয় নি। পুরুষ কৃষি গ্রহণ করল, কিন্তু মস্তিষ্কের উৎপাদনী শক্তির বিজ্ঞান তখনও তার অজ্ঞাত, ঐ অনুষ্ঠানের অবলুপ্তি ঘটল না, আর পুরুষ তা মেয়েদের হাতে রাখাই নিরাপদ মনে করল। প্রসঙ্গত মনে রাখতে হবে যে আমাদের দেশে তথা প্রাচ্যে ঘাতুতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার চূড়ান্ত বিকাশ হয়েছিল। সে ব্যবস্থা ক্রমে ভেঙে পড়েছে নানা কারণে, কিন্তু তার ধ্বংসাবশেষ আজো জায়গায় জায়গায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে : ব্রতে মেয়েদের একাধিপত্য হচ্ছে এমনি একটি স্মৃতি-স্তম্ভ। বিভিন্ন সমাজ-শক্তির প্রভাবে এবং নানা স্তরের নানা হাতিয়ারে পুরুষের জীবনের ও বিশ্বাসের অনেকখানি বদলে গেছে, তাহচ্ছে হয়েছে, কিন্তু নারীসমাজ মানব-জীবনের আদি স্মৃতিকে আজও বহন করে।

(অবশ্য নারীও এই স্মৃতিকে আর বেশী দিন বহন করবে না। কারণ, আজ আর আমাদের সমাজ প্রকৃতির দাক্ষিণ্যনির্ভর কৃষিসমাজ মাত্র নয় ; বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি তার প্রখর, প্রকৃতিকে জয় করবার নানা কলাকৌশল তার হাতে, সমাজের ভারকেন্দ্র কৃষিক্ষেত্র থেকে শিল্প ক্ষেত্রে অপসরণোন্মুখ। এই সামাজিক পারিপার্শ্বিক ব্রত লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে ও যাবে তাতে সন্দেহ নেই।)

অনগ্রসর কৃষিসমাজে দুই মূল কামনা—শস্য ও সন্তান ; একে কেন্দ্র করেই ব্রতানুষ্ঠানের উৎপত্তি।

পরে সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নানা কামনা যুক্ত হয়েছে এর সঙ্গে, নতুন ব্রত তৈরী হয়েছে নতুন কামনার সাফল্য আনবার জন্যে, নতুনদের সামনে মেয়েরা তাদের অন্য সকলের পরনো বন্ধ করে দেয় নি; অন্তঃপুরের স্নেহ-সিঞ্চনে নবজাতকেরা লালিত হয়েছে।

ব্রত করবার সময় মেয়েরা অভিভাবকদের কোন অনুমতি নেয় না; সত্যি কথা বলতে কি, বাড়ির কর্তারা জানতেই পারে না মেয়েরা কখন কি ব্রত করে। অথচ আশ্চর্য, মনু বলছেন যে অভিভাবকদের অনুমতি ব্যতীত মেয়েদের ব্রত পালনে অধিকার নেই। তিনি বলছেন, কুমারী কন্যা পিতার, বিবাহিতারা স্বামীর, বিধবারা পুত্রের অনুমতি নিয়ে যেন ব্রত করে। স্মার্তপ্রবরের এই নির্দেশ মানা করবার বিশেষ কোন উৎসাহ মেয়েদের মধ্যে লক্ষিত হয় না। মনুর জন্মের আগে থেকে ব্রত তাদের জীবনের সঙ্গে মিশে রয়েছে, মনুর নির্দেশ তারা জানেও না, মানেও না।

ছেলেরা করে এমন ব্রত দু'একটি অবশ্য পাওয়া যায়। (এগুলি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন ও অঞ্চল-বিশেষের হ'তে পারে)—যেমন, কুলাইর ব্রত। বাঘের হাত থেকে গরু-বাছুর যাতে রক্ষা পায় সেই কামনায় রাখাল ছেলেরা করে ব্রত। অবশ্য এর অনুষ্ঠানের সঙ্গে সাধারণ মেয়েলি ব্রতের অনুষ্ঠানেরও কিছু ফেরফের আছে। যেমন, এ ব্রতের আলপনার দরকার হয় না, ফুল ধরে ছড়া বলবারও দরকার নেই। অবশ্য মেয়েলি ব্রতেও আলপনা নেই; সুতরাং মাত্র এই অল্পস্বল্পতার অজুহাতেই কুলাইকে ব্রতের চৌহদ্দির বাইরে দাঁড় করিয়ে জাতিচ্যুত বা অব্রাহ্য করে রাখা সম্ভব নয়।

॥ পাঁচ ॥

পূর্বে আলোচিত দুই ধরণের প্রজনন শক্তির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সম্বন্ধে আর একটু বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

সন্তান প্রজননশক্তির দ্বারা শস্য উৎপাদনী শক্তিকে প্রভাবিত করবার চেষ্টায় কি ধরনের অনুষ্ঠান হত তার কিছুটা আভাস দিয়েছি। এই ধরনের কর্মকাণ্ডে কিছুটা যৌন-স্বেচ্ছাচারের স্থানও ছিল অনেক জাতির মধ্যে। এটাকে তারা খারাপ চোখে দেখত না, বরং প্রয়োজন মনে করত। আমাদের দেশে ওরাওঁদের সরহুল উৎসবে এর স্থান আছে—পৃথিবীকে ফলবতী করবার চেষ্টায়। ওরাওঁ ভাষায় সরহুলের অন্য নাম 'খদ্দি' বা 'সেকেলবেহা', যার অর্থ পৃথিবীর বিবাহ।

ক্রমে এই সম্পর্কটা আর একমুখী রইল না, পারস্পরিক হ'য়ে দাঁড়াল অর্থাৎ শস্য উৎপাদনী শক্তিরও সন্তান-প্রজনন শক্তির উপর প্রভাব আছে এই বিশ্বাসের জন্ম হ'ল। কোন শক্তিরই প্রকৃত বিজ্ঞান তখন মানুষের ছিল না।

তাই, বৃক্ষের প্রভাবে নারী গর্ভবতী হতে পারে, এই বিশ্বাস বহু আদিম জাতির মধ্যেই আছে। মাওরিদের ট্যুহো (Tuhoo) কৌমের বন্ধ্যা নারী সন্তানলাভের আশায় একটি বিশেষ বৃক্ষকে আলিঙ্গন করে। ব্যাভারিয়ার বহু স্থানে নবরুম্পতির শুভে সবুজ শাখা এবং পল্লব-গুচ্ছ ঝুলিয়ে সাজিয়ে রাখবার প্রথা আছে; যে গৃহে স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা সে গৃহকে বাদ দেওয়া হয়, সে ক্ষেত্রে লোকে বলে যে স্বামীই 'বে-গুচ্ছ' সাজিয়েছে। দক্ষিণ স্লাভোনিয়ার বন্ধ্যা নারী সন্তান-লাভের আশায় 'সেণ্ট জর্জের দিবস'-এর আগে একটি সদ্যফল বৃক্ষের উপর একটি মড়ুন সেমিজ রেখে দেয়, পরদিন ভোরে সূর্যোদয়ের আগে সে সেমিজটা পরীক্ষা করে দেখে, যদি কামাটার উপর দিয়ে কোন জীবন্ত প্রাণীর চলবার ছাপ সে লক্ষ্য করে, তবে খুশী হয়ে সে সেমিজটা পরে, কারণ আগামী এক বছরের মধ্যেই সে ঐ প্রাণীটির মতো সফল হবে। কারাকিরগিজদের বন্ধ্যা নারী সন্তান লাভের আশায় একটা নির্জন আপেল গাছের তলায় গড়াগড়ি দেয়।

অনুরূপ বিশ্বাস আমাদের দেশেও আছে। আমাদের উপকথায় কত বন্ধ্যার যে ফল মূল লতা পাতার সাহায্যে সন্তান হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। ফুলকর ব্রতের (পরে বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য) ব্রতকথার কুমারী মেয়ের নাভিতে ফুল বেলপাতা লাগায় সে অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিল। আমাদের দেশের অনেক জায়গায় বন্ধ্যা বৌর সন্তানলাভের আশায় গাছের ডালে ঢিল বেঁধে রাখে—এই ঢিলগুলি নকল ফলের প্রভাবে তাদের সন্তান হবে, এই হচ্ছে তাদের বিশ্বাস।

মানুষ ফলের আকাঙ্ক্ষায় গাছ পালার বিয়েও দিত—যেন তারা একটি মানুষ, বিয়ের পর তাদের সন্তান হবে অর্থাৎ ফল ফলবে। এমন কি পুরাকালে অনেক দেশের লোক কোন্ গাছটি পুরুষ, কোনটি মাগী, তাও বলে দিতে পারত। সে স্বর্ণযুগ হয়তো গত, কিন্তু এখনও আমাদের দেশের অনেক জায়গায় নতুন আমগাছের বিয়ে (তেঁতুল বা ঐ ধরনের গাছের সঙ্গে) না দিয়ে তার ফল খাওয়া হয় না। ওরাওঁরা ফলের গাছের, এবং বছরের প্রথম ধান-চারা রোপণের সময় ধানচারাগুলির বিবাহ দেয়। 'ক্রিস্টমাস্ ঈভ'-এ ভার্মাণ কৃষকরা গাছে ফল ফলাবার জন্য খড়ের দড়ি দিয়ে দুটো গাছ এক সঙ্গে বেঁধে তাদের বিয়ে দেয়। আমাদের দেশের 'আচরা ব্রতে'ও কলা ও কুলগাছ একসঙ্গে বেঁধে তারপর মাটিতে পুঁতে ছড়া বলতে হয়। এর মূলেও গাছের বিবাহ দেওয়ার অনুষ্ঠান রয়েছে কি? প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এ ব্রত মেয়েরা করে ভাল স্বামী পাওয়ার জন্য অর্থাৎ সন্তানজনন শক্তি বৃদ্ধির কামনায় এই ব্রত।

মোলুক্কাস্-এ (Moluccas) যখন গাছে ফুল ধরে, তখন সেখানে কোনরকম গোলমাল বা শব্দ করা বারণ, কারণ ওতে গাছ ভয়ে অকালে ঝারাপভাবে 'প্রসব' করতে পারে। অ্যাম্বয়নোতে (Amboyna) যখন ধানের শীষ ধরে তখন বলা হয় যে 'গর্ভ' হয়েছে এবং 'গর্ভ' নষ্ট হবার আশংকায় সেখানে কোনরকম শব্দ করা নিষেধ।

গাছের (এবং ফুলের) আর এক রকম 'বিয়ে' আছে, যাকে পুরোদস্তুর 'অসবর্ণ বিয়ে' বলা চলে। এ বিয়ে গাছে (বা ফুলে) ও মানুষে। অবিবাহিত ওরাওঁ যুবককে যদি কোন বিধবাকে বিয়ে করতে হয়, তবে প্রথমে একটি ফুলকে 'বিয়ে' করে নিতে হবে তার, তার পরে 'দ্বিতীয় স্ত্রী' হিসেবে বিধবাটিকে গ্রহণ করতে পারবে। নিম্ন হিমালয় অঞ্চলে যদি কেউ তৃতীয়বার বিয়ে করতে চায়, তবে তাকে আগে একটি আকন্দ গাছ বিয়ে করে নিতে হবে। পাঞ্জাবের কোনো লোককে তৃতীয়বার বিয়ে করবার আগে একটি বাবুল বা আক্ গাছকে বিয়ে করে নিতে হয়। গুজরাটে জাতিবিশেষের বরঞ্চা কন্যার বিয়ে বাপ বা ভাই দিয়ে উঠতে পারে না, তখন গুচ্ছ ফুলের সঙ্গে তার বিয়ে দেওয়া হয়; পরের দিন শুকিয়ে যাবার আগেই সেই ফুলগুচ্ছকে পাতকুয়োর জলে ফেলে দেওয়া হয় এবং গতকালের কনে সিঁদুরে মুছে বৈধব্য গ্রহণ করে। মুণ্ডারিদের বরবধূ বিয়ের আগেই যথাক্রমে আমগাছ ও মহুয়া গাছকে বিয়ে করে নেয়; সিঁদুর পরানো, আলিপনা গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা ইত্যাদি হচ্ছে এ বিয়ের অনুষ্ঠান। কুরমী বরও বিয়ের দিন সকালে আগে একটি আমগাছকে বিয়ে করে, এবং পরে কনে মহুয়া গাছকে। নেপালের দেওয়ার মেয়েদের ছোটবেলায় একটি বেলফলের সঙ্গে বিয়ে হয়; বিয়ের পর বেলটি কোন পবিত্র নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। বাংলাদেশের হাউতিয়াদের মধ্যেও বিয়ের আগে আম গাছকে দিয়ে করে নেবার প্রথা আছে। বাংলার অনেক অঞ্চলে তৃতীয়বার বিবাহ করতে হলে বরকে আগে একটি গাছ বিয়ে করে নিতে হয়।

এই 'অসবর্ণ' বিয়ের মূলে টোটেমিজম্ সম্পর্কিত কারণ ছাড়াও আছে দুই প্রকার উৎপাদনী শক্তির অভিন্নতা সম্পর্কে বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের ছাপ আমাদের দেশের অনেক দেব দেবী, ব্রত-পূজা ও আচার অনুষ্ঠানে পড়েছে।

উড়িষ্যার তুলাবতী আসলে গাছপালার দেবী, কিন্তু তার কাছে প্রার্থনা জানালে সন্তান-কামনার আর্জিও তিনি মঞ্জুর করেন। মানুষকে বস্ত্র-বস্ত্র যোগাবার ভার উড়িষ্যার কর্মা দেবতার, কিন্তু সন্তান-কামনায়ও মেয়েরা কর্মা-পূজার দিন উপবাস করে। করম পূজার সময় ওরাওঁ মেয়েরা 'করম-ঝুড়ি'তে নানা প্রকারের শস্যের সঙ্গে সন্তানের প্রতিনিধি হিসাবে শশাও রাখে। দিল্লী অঞ্চলের

বর্তমানের প্রয়োজন
বেশী কাজ
বেশী সঞ্চয়
বেশী উৎপাদন

ভুঁইয়া বা খেতপালের (অযোধ্যার ঐনি দেবী, নাম ভুঁইয়া রাণী) পূজা করা হয় কয়েক ঘরে তোলবার সময়, বিবাহকালে এবং ছেলে হলে; মায়েরা রবিবারে বাচ্চাদের ভুঁইয়ার থানে দিয়ে যায়।

বাংলাদেশেও মৈমনসিংহ জেলায় ক্ষেত্র (ক্ষান্তর) ব্রত করা হয় সন্তানের মঙ্গল-কামনায়।

পায়রীকে অনেক অঞ্চলে বলা হয় ধানগাছের সাধ খাওয়ার উৎসব।

তুলা সংক্রান্তিকে উড়িষ্যায় বলা হয় গর্ভধা সংক্রান্তি, কারণ ধানগাছ তখন শস্য-গর্ভা হয়।

অম্বুবাচীর কথা আগেই উল্লেখ করেছি। বাংলাদেশে ৭ই আষাঢ় থেকে তিন দিন ও উড়িষ্যায় জ্যৈষ্ঠ-সংক্রান্তি থেকে তিন দিন অম্বুবাচী—পৃথিবীর ঋতুকাল অর্থাৎ নবধর্ষণসমাগমে পৃথিবীর শস্য সম্ভাবনা জেগে ওঠে। আসামেও এই উপলক্ষ্যে কামাখ্যার মেলা হয়। কামাখ্যা নামের ব্যাখ্যা হিসেবে ঐতিহাসিক রাজমোহন নাথের মতটি স্মরণযোগ্য। 'কামাখ্যা পাহাড়ের··· প্রস্রবণ···। সেই ধারা ছোটো প্রবল এবং ভিতরের স্তরে hacmatite (খনিজ রক্তাভ ধাতু)-এর সংস্পর্শে এসে সেই জলের ধারা লোহিত লাল। ···খাসিয়াদের সরল বিশ্বাস হলো ধরিত্রী ঋতুমতী হয়েছেন, তার প্রমাণ ঐ প্রস্রবণ—কা নেই খা, মায়ের জলের ধারা।

উড়িষ্যায়ও অম্বুবাচী বেশ বড় উৎসব, সেখানে এর নাম উৎসব। এই সময় পৃথিবীর গায়ে কোন রকম আঘাত দিতে নেই—হলকর্ষণ বীজবপন ভূখনন নিষিদ্ধ। উড়িষ্যায় এর পর পৃথিবীকে (অর্থাৎ মহালক্ষ্মীকে) শুচি স্নান করানো হয়।

ভীলরা বীজ বোনবার আগে খেতের মাটিতে বা পাথরে সিঁদুর দেয়, অর্থাৎ মাটি যেন রজস্বলা হল।

আমাদের শিব একদিকে বৃষবাহন ও অপর দিকে তিনি লিঙ্গমূর্তি। শিবের গাজনের সময় ছড়া গাওয়া হয়, তাতে তাঁকে চাষবাস করতে দেখা যায়, শূন্যপুরাণেও শিবকে দেখি তিনি তাঁর প্রধান সহকারী ভীমকে নিয়ে চাষের কাজে ব্যস্ত। রামেশ্বর ভট্টাচার্যের কাব্যেও শিব বিশ্বকর্মাকে দিয়ে তাঁর হাতের ত্রিশূল ভাঙিয়ে কোদাল, কাল এই সব চাষের সরঞ্জাম তৈরী করিয়ে নিয়েছেন। আবার অন্যদিকে মন্দিরে মন্দিরে তাঁর লিঙ্গমূর্তি; ভাল স্বামীর কামনায় মেয়েরা আজও শিবপূজা করে।

শুধু বাংলা দেশে নয়, ভারতের অন্য অংশেও শিবের এই দ্বিরূপী মূর্তির সাক্ষাৎ মেলে। কাংড়া জেলায় মেয়েরা বৈশাখ মাসে যে 'রলী কা মেলা' করে, সেখানে শিব ও পার্বতীর ক্ষুদ্র মৃৎ মূর্তি বসানো হয় দশ দিনের সঞ্চিত দূর্বাঘাসে প্রোথিত বৃক্ষশাখার উপরে। এত পায়গা থাকতে শিবকে ঘাস ও বৃক্ষশাখায় বসানোতে বোঝা যাচ্ছে যে পূর্বে শিব গাছপালা ইত্যাদিরই দেবতা ছিলেন, যদিও এখন বলা হয় যে মেয়েরা 'রলী কা মেলা' র অংশ গ্রহণ করে, বাংলার শিবপূজারিণীদের মতই ভাল বরের কামনায়।

উপরের উদাহরণগুলি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে সন্তানের জন্ম ও ফসলের জন্ম এই দুয়ের মধ্যে একটা যোগ আছে বলে প্রাচীন মানুষেরা মনে করত, এবং একটির দ্বারা অপরটিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করত।

সন্তানের জন্ম দেখে তারা অভ্যস্ত ছিল, ক্রমে ফল ফসলের জন্ম সম্বন্ধে যখন বিশেষভাবে অবহিত হল, তখন সন্তান জন্মের মত করে অন্যবিধ উৎপাদনটিকেও তারা বুঝতে চাইল। ফসলের জন্মটাকে মানুষ ঠিক ঠিক সন্তানের জন্মের সঙ্গে মিলিয়ে নিল। তখনকার মানুষের নানা অনুষ্ঠানে নারীর ফলপ্রসূতা ও প্রকৃতির ফলপ্রসূতা মিশে গেল; একটির সম্পর্কিত অনুষ্ঠান অপরটিকেও প্রভাবিত করবে এই বিশ্বাসে তারা বিভিন্ন অনুষ্ঠান সৃষ্টি করেছে।

এই দু' রকমের প্রজননশক্তিকে যে অত্যন্ত ঘনিষ্ট মনে করা হত তার প্রমাণ অন্যদিক থেকেও কিছু কিছু পাওয়া যায়। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা বলেছেন যে আদিমকালের নিড়ানি পুরুষের জননাঙ্গের অনুরূপ ছিল। ভাষাতাত্ত্বিকেরা বলছেন, লাঙ্গল শব্দের উৎপত্তি খুব সম্ভবতঃ লিঙ্গ শব্দ থেকে।

প্রত্নতাত্ত্বিকদের এই অনুমান আমাদের বক্তব্যের পরিপোষক।

শিল্পকথা

চিত্রশিল্পী লেওনার্দো-দা-ভিনচি

অমল হালদার

লেওনার্দো-দা-ভিনচি (Leonardo-da-Vinci) ইতালীর চারুশিল্প জগতে বিপ্লব এনেছিলেন এবং একজন বিখ্যাত শিল্পী ছিলেন, এই পরিচয়টা হয়ত অনেকের কাছেই জানা, কিন্তু মহাপুরুষ শব্দটির মানে যদি একবার আমরা ভেবে দেখি, তবে, লেওনার্দো একটি মহান যুগের একজন মহাপুরুষ ছিলেন, এই কথাটির সবচেয়ে সংক্ষেপে তাঁর সবচেয়ে খাঁটি পরিচয়। একজন মহাপুরুষ কেন মহান? একটা মহান যুগের, অর্থাৎ একটি যুগান্তকারী বিরাট ঐতিহাসিক ঘটনার বিশেষ কোনো কোনো দিককে যদি নিজের বুদ্ধি ইচ্ছা ও রুচি অনুযায়ী কেউ গড়তে পারে তবেই কি সে মহান? শুধু তাই নয়, ঐতিহাসিক ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি সেই যুগের সবচেয়ে বড় ও গোড়াকার সামাজিক প্রয়োজন ও চাহিদাগুলিকে যিনি সচেতনভাবে, স্পষ্টভাবে বুঝতে পারেন এবং ভবিষ্যতে কি করা দরকার, কেমনভাবে এগোনো দরকার, তা বৈজ্ঞানিকভাবে যুক্তি করে মন প্রাণ দিয়ে আবেদন করে, জনসাধারণকে বোঝবার চেষ্টা করেন এবং সেই জন্য যিনি বিস্তীর্ণভাবে পথ প্রদর্শক হয়ে এগিয়ে আসেন, তিনি সেই যুগের একজন চিন্তাবীর, কর্মবীর এবং সেই জন্যই তিনি মহান। এটা ঠিক যে, কোন একটি মহান যুগের বড় বড় পরিবর্তন ও অগ্রগতির পিছনে আছে একাধিক মহাপুরুষের প্রতিভা বুদ্ধি ও পরিশ্রম, কিন্তু ইউরোপের নবজাগরণের মত এত বড় বিপ্লব ও নবযুগ আগমনের পিছনে কোন একটি ব্যক্তির প্রতিভার দান বিশেষভাবে চোখে পড়ে এই প্রশ্ন করলে নিঃসন্দেহে উত্তর দেওয়া যায়: লেওনার্দো দা ভিনচির।

লেওনার্দোর ব্যক্তিগত প্রতিভা বিরাট ছিল এটা বলবার দরকার নেই: কিন্তু সেই প্রতিভা আরও উজ্জ্বল হয়েছিল শিকলভাঙা যুগের গুণে। সবাই জানেন ইউরোপে মধ্যযুগ পর্যন্ত ছিল রোমান ক্যাথলিক চার্চের সর্বগ্রাসী আধিপত্য। যদিও ১৩ শতকে আরিস্তোতেলীস এবং সাধারণভাবে গ্রীক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদের পুরো বইপত্র উদ্ধার হবার কালে ইউরোপে খাঁটি বিদ্যাচর্চার সূত্রপাত হল, তবুও ১৪ শতকের নবজাগরণের আগে-পর্যন্ত গ্রীক দর্শনকে ও বিজ্ঞানকে যুক্তি দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে দেখার কোঁক স্পষ্ট করে দেখা দেয়নি।

রোমান চার্চের রাষ্ট্র-অনুমোদিত বিজ্ঞান ও দর্শন ছিল অবৈজ্ঞানিক খৃস্টান মতামতের সঙ্গে মিশ্রিত কিছক যুক্তিবাদী তার্কিক গ্রীক বিজ্ঞান ও দর্শন কোনো তত্ত্ব

যদি মেনে নেওয়া বিশ্বাসের সীমা ছাড়িয়ে যাবার উপক্রম করত তা হলে সেই তত্ত্ব ও তাত্ত্বিককে এক সঙ্গে দমন করা হত। বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও বিচারের ওপর ভিত্তি করে যে সব তত্ত্ব মাথা তোলার চেষ্টা করত, সেই সব তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছত, সেখান থেকে চার্চের অস্তিত্বের সার্থকতা বিষয়ে সন্দেহের সুরু হতে পারে। সর্বগ্রাসী চার্চের নেতৃবৃন্দ তা মেনে নিতে পারেননি, কারণ মেনে নিলে শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্র-নায়কত্বের ভিত্তি ভেঙে পড়বে। শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ ও কাল মহামারী সামাজিক ও অর্থনৈতিক ওলট-পালট সৃষ্টি করাতে, যদিও বিদ্যাচর্চার জন্য যে ধৈর্য দরকার তা ইউরোপে ছিল না, তবুও চার্চের বিরুদ্ধে বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির ও বিচার বুদ্ধির বিদ্রোহ এবং চার্চের আন্তর্জাতিক গ্রাস থেকে বেরিয়ে এসে জাতিসত্তা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা আস্তে আস্তে জোরালো হয়ে উঠেছিল।

উত্তর ইতালিতে এই রকম সময়ে একটি জাতি উপনিবেশ স্থাপন করে একাই বোধ হয় একটি নাগরিক সভ্যতার পত্তন করে। সাধারণভাবে চারদিকে যে সামন্ত সমাজ ছিল তার ভিত্তি ছিল গ্রামীন সভ্যতার ওপর। নাগরিক সভ্যতার সুযোগের ওপর ভিত্তি করে ইতালিতে বিদ্যার ও মনুষ্যত্বের অপূর্ব স্ফুরণ সুরু হল শিল্পে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে। নবজাগরণের প্রথম দিকে নানা প্রভাবের মধ্যে বিশেষভাবে সাহিত্যিক প্রতিভা যুক্তির স্বাধীনতার পথ তৈরী করে। মানববাদী ও যুক্তিবাদীরা ধর্মীয় সংস্কারের মুঠো থেকে বিদ্যাচর্চাকে মুক্ত করার ফলে বিজ্ঞানীদের পক্ষে নির্ভীকভাবে বিদ্রোহী হয়ে বাস্তব সত্য বলবার ও লিপিবদ্ধ করার পথ সহজতর হল। ইতালির অগ্রগামী নাগরিক সভ্যতার প্রভাব উত্তর ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। এই সময়ে প্রবল হয়ে ওঠে ভৌগলিক আবিষ্কারের তাগিদে। আরবী ও ইহুদী জ্যোতির্বিদ্যার ওপর ভিত্তি করে পোর্তুগীজরা প্রথম সমুদ্র পাড়ি দেয় নতুন দেশের খোঁজে। নতুন দেশের আবিষ্কারের ফলে বাণিজ্য ব্যবসার বিস্তারলাভ করার পথ খুলে গেল। দেশজ, মধ্য যুগীয় শিল্প বৈজ্ঞানিক যান্ত্রিক শিল্পে উন্নীত হবার প্রেরণা পেল; এর ফলে ইউরোপে অর্থাগম ও অর্থ সৃষ্টির পথ প্রশস্ত হতে লাগল এবং এই অর্থ-বৃদ্ধির ফলে বিদ্যাচর্চার সময় সুযোগ ও ধৈর্য লাভ করা সম্ভব হল।

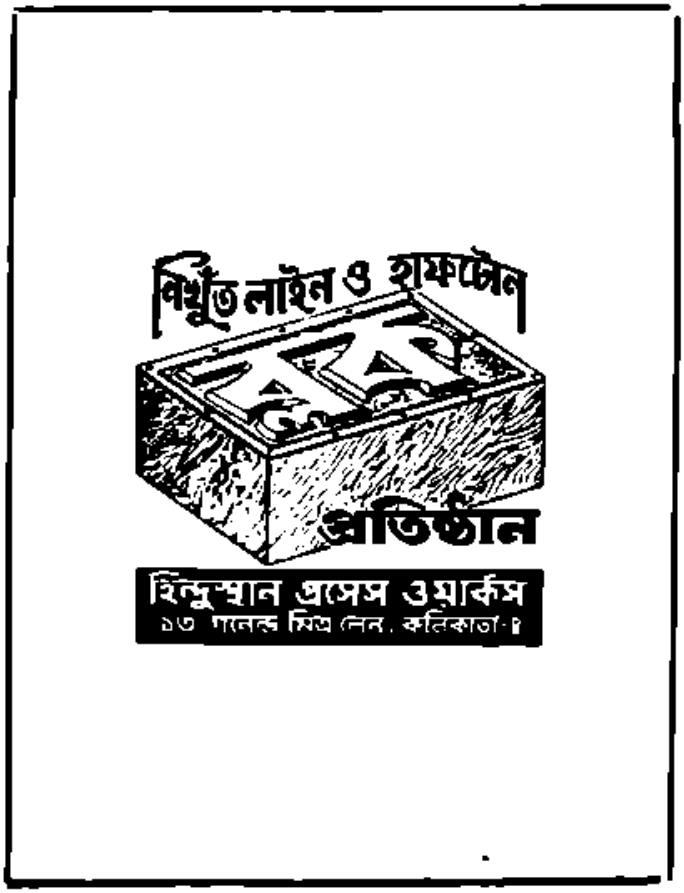

এই যুগ-সন্ধিক্ষণে, যখন ইতালিতে চারুশিল্প উচ্চস্তরে উঠেছে এবং বিজ্ঞান বিজয় গর্বে নতুন শক্তি নিয়ে পদক্ষেপ করতে সুরু করেছে তখন লেওনার্দোর আবির্ভাব। তাঁর মধ্যে আশ্চর্যভাবে প্রকাশ পেয়েছে তখনকার চারুশিল্প জগতের ও বিজ্ঞান জগতের চাহিদা। তাঁর জীবনের গোড়ার কথা বিশদভাবে বলার আগে সংক্ষেপে তাঁর পরিচয় দিতে হলে বলা দরকার তিনি ছিলেন চিত্রশিল্পী, ভাস্কর যন্ত্রবিদ স্থপতি, পদার্থবিদ প্রাণীবিদ, দার্শনিক এবং সংগুলি দিকেই তাঁর প্রতিভা উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। তবে তার ব্যক্তিগত প্রতিভাকে সম্পূর্ণ-ভাবে মেনে নিয়ে এটাও বলা দরকার যে লেওনার্দোর সময়ের কিছু পূর্বে গালিলিওর জীবনকালের প্রায় একশো বছর আগে ইতালিতে সমদর্শী একটি গোষ্ঠী পুঁথিগত বিদ্যার চাইতে বেশী বুঝেছিলেন বাস্তব সত্য অনুসন্ধানে আরিস্তোতেলীয়ের মতামত আঁকড়ে না থেকে বেশী জোর

দিয়েছিলেন পর্যবেক্ষণের ওপরে, বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির ওপরে। যেমন, আলবেত্তি, (১৪০৪-১৪৭২) গণিত চর্চা ও বস্তু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার পথ দেখেছিলেন; ফ্লোরেন্সে লেওনার্দো, 'পাওলো তগকানেল্লির' (মৃত্যু ১৪৮২) সংস্পর্শে এসেছিলেন, যিনি জ্যোতির্বিদ হিসাবে কলম্বসের সমুদ্র পাড়ির অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলেন গণিত-বিদ্‌ 'লুকাপাচিওলির' সংস্পর্শে লেওনার্দো এসেছিলেন; অ্যানাটমি (দেহের পেশী ও হাড়ের সংগঠন) বিষয়ক গবেষণায় লেওনার্দো আন্তোনিও দেলা তরু এর সাহায্য পেয়েছিলেন। দ্যুরের (Duerer) প্রভৃতি শিল্পীরাও অ্যানাটমি চর্চা করেন এবং লেওনার্দোর সঙ্গে শিল্প জগতে প্রকৃতিবাদের (অর্থাৎ মোটামুটিভাবে বলতে গেলে, ছবির মধ্যে সমস্ত প্রকৃতিকে ও প্রাকৃতিক প্রকাশকে অনুগতভাবে ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস) প্রতি মনোনিবেশ করেন। ব্যাপক অর্থে দার্শনিক হিসাবে লেওনার্দোর প্রতিভার কথা চাপা পড়ে থাকার কারণ হচ্ছে যেসব অপেক্ষাকৃত নগণ্যবিস্তৃত খসড়া নোটবই থেকে তাঁর সর্বতোমুখী চিন্তাশক্তির প্রমাণ পাওয়া গেছে, সেগুলিকে তিনি বই-এর আকারে সাজিয়ে গুছিয়ে প্রকাশ করে যেতে পারেন নি; তা ছাড়া, তার বিশেষত্বপূর্ণ হস্তলিপির মর্মোদ্ধার করতে বেগ পেতে হয়েছিল।

লেওনার্দোর জন্ম হয় খৃঃ—১৪৫২ সালে ফ্লোরেন্স ও পিসার—মধ্যবর্তী ভিন্‌চি শহরে। তিনি ছিলেন পিয়ারো-দা-ভিন্‌চি নামক জনৈক প্রতিষ্ঠাবান আইন-জীবী এবং আতারিণা নামক একটি কৃষক রমণীর অবৈধ সন্তান। ছোটবেলা থেকে বিজ্ঞানের দিকে তাঁর ঝোঁক ছিল। চৌদ্দ বছর বয়সে তাকে ফ্লোরেন্সের জনৈক অভিজ্ঞ ও প্রতিভাবান স্বর্ণকারের কাছে কারিগরী শিখতে দেওয়া হয়। তাঁর লেখাপড়াও কোনো বিদ্যা-লয়ের অঙ্গনে হয়নি। যে শিক্ষা তাঁর জ্ঞানের ভিত্তিতে তৈরী করেছিল, সে শিক্ষা পুঁথির শিক্ষা নয়—কারিগর শিল্পীর শিক্ষা। চোখে দেখার, হাতে ছোঁয়ার সিধে অভিজ্ঞতা তার কাছে ছিল বেশী মূল্যবান্‌। তিনি যন্ত্রবিদ্‌ ও স্থপতি হিসাবে তাঁর পরিকল্পনাগুলিকে যেমন, বৈজ্ঞানিক উপায়ে রাস্তা, খাল, দুর্গ প্রসাদ মিলান্‌ গীর্জার গম্বুজ ইত্যাদি তৈরীর পরিকল্পনা কাজে পরিণত করতে সম্পূর্ণভাবে সক্ষম হননি। কিন্তু তিনি রেখে গেছেন হাজার-হাজার পৃষ্ঠা খসড়া, যেগুলি অসংখ্য নক্সা ও ছবিচিত্রে পূর্ণ। তা ছাড়া চিত্র শিল্পের বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর একমাত্র বই পারাগোন (Paragone)।

এবং অন্যান্য লেখা ও নোট-বই থেকেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, বহু বিষয়ে তিনি নূতন দৃষ্টি ও পথ খুলে দিয়েছেন এবং প্রকৃতির সাধারণ সূত্র বিষয়ে দখল ও প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক শাখাতে খাঁটি অনুসন্ধান রীতি বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। কারিগরী প্রয়োজনের জন্য তিনি ঝুঁকে ছিলেন পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার দিকে। যে ঔপন্যাসিক উচ্চ শ্রেণীর হাতে-কলমে পরীক্ষা বিষয়ে ঘৃণা পোষণ করত এবং নিছক তাত্ত্বিক বচ্‌কা'চকে 'বিজ্ঞান বলে ঘোষণা করত, তাদের উল্লেখ করে তিনি তীব্রভাবে তাঁর নোট-বইয়ে লিখেছেন "ওদের মত আমার হয়ত বড় বড় বই-বচয়িতাদের উদ্ধৃত করার শক্তি নেই, কিন্তু যে অভিজ্ঞতা ওদের গুরুদের পথ-প্রদর্শনী, সেই অভিজ্ঞতার আলোতে আমি যা জেনেছি তা অনেক বড় এবং অনেক বেশী সার্থক ও মূল্যবান। ওরা অহঙ্কারে ফুলে ওঠে, কিন্তু ওদের গৌরব নিজেদের পরিশ্রমে নয়, অপরের পরিশ্রমে"। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, গ্রীক ন্যায়শাস্ত্রের (Scholasticism) যুক্তিবাদ মানুষের মনকে অন্ততঃ এই শিক্ষাটা দিতে পেরেছিলেন যে, বিশ্ব দুজ্ঞেয় নয়, কিন্তু যে সমাধানগুলি ন্যায়-শাস্ত্রজ্ঞরা দিয়েছিলেন তা অকেজো হয়ে পড়ল যখন মানুষের ঝোঁক গেল পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার দিকে। প্রাচীন গ্রীক বিজ্ঞানীদের মধ্যে আর্কিমিদীস্‌ খাঁটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। লিওনার্দোর সময়ে আর্কিমিদীসের বই প্রকাশিত হয়নি এবং সেগুলির ভাল খসড়াও পাওয়া কঠিন ছিল। লিওনার্দোর যে বন্ধু-বান্ধব ও পৃষ্ঠপোষকরা তাঁকে সেই রকম কোন খসড়া যোগাড় করে দিতে পেরেছেন, তাদের নাম তিনি নোট-বইয়ে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন এবং সেই "ব্রহ্মান্‌ সিরাকুসবাসীর (অর্থাৎ আর্কিমিদীস্‌) প্রতিভার উদ্দেশে তাঁর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। এইখানে বিশেষভাবে বলা দরকার যে, তিনি যতখানি জোরের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার প্রয়োজন বিষয়ে দৃষ্টি

আকর্ষণ করেছেন, ঠিক তেমনি কোনের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের প্রয়োজন বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, শুধু পরীক্ষামূলক অনুসন্ধানই যে বিজ্ঞানের চরম লক্ষ্যস্থল

এই বিষয়ে তাঁর সুস্পষ্ট মতামত তাঁর পারগোন ও নোট-বইয়ে পাওয়া যাবে তাঁর কাছ থেকে এই তাত্ত্বিকের মনোভঙ্গি প্রকাশ পায়।

কোন অনুসন্ধানকে খাঁটি বিজ্ঞান বলা চলে না। যতক্ষণ না পর্যন্ত তা গাণিতিক বিচারের দ্বারা যাচাই করা হচ্ছে, যদি বলো যে, যে বিজ্ঞান সৃষ্টি হচ্ছে মন থেকে এবং যা শেষ হচ্ছে মনের ভেতরে, সে বিজ্ঞানও সত্য হচ্ছে, তবে তা মানতে পারি না,—কারণ সেই মানসিক যুক্তি তর্কের মধ্যে পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার স্থান নেই—যে জিনিষকে বাদ দিয়ে কোন কিছুই নিশ্চিতভাবে জানা যেতে পারে না।"

তিনি আরও লিখেছেন: বিজ্ঞান (তত্ত্ব) বিষয়ে যারা উদাসীন এবং শুধু প্রয়োগ ও পরীক্ষাতে মত্ত, তাদের অবস্থাটা হচ্ছে—হালবিহীন বা কম্পাসবিহীন জাহাজের চালকের মত, অর্থাৎ কোন দিকে জাহাজ যাইছে তার স্থিরতা ও নিশ্চয়তা নেই সব সময়ে তত্ত্বের দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রয়োগ ও পর্যবেক্ষণ প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। কিন্তু যে বিজ্ঞানের সৃষ্টি পরীক্ষা থেকে হয়নি এবং যা শেষ একটা স্পষ্ট পরীক্ষা দিয়ে যাচাই না হচ্ছে, সে বিজ্ঞান বৃথা এবং ভ্রান্ত।" বস্তু-বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের গাণিতিক ভিত্তি প্রয়োজন এ বিষয়ে তিনি সচেতন হলেও, কোনো মূল সূত্রের গাণিতিক রূপ (যেমন সমীকরণ) তিনি দিয়ে যেতে পারেননি। তাঁর অনুগামী গালিলিও এই "গণিতীকরণ" সম্ভব করলেন এবং এর ফলে যথার্থ আধুনিক বস্তু-বিজ্ঞানের সূত্রপাত হল।

যখন আমরা লেওনার্দোর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও মনোভঙ্গি বিচার করার পরে তাঁর আসল কাজের বিচার করি, তখন তাঁর বৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টি আমাদের চমৎকৃত করে। বস্তু-বিজ্ঞানে (পদার্থবিদ্যা) যে জড়তা-সূত্র (Principle of Inertia) গালিলিও অনেক পরে হাতে-কলমে প্রমাণ করলো, সেই সূত্রের আভাস লেওনার্দো দিয়ে গিয়েছিলেন, "ইন্দ্রিয় দিয়ে যে জিনিষকে অনুভব করা যায়, তা নিজে স্থান পরিবর্তন করতে পারে না প্রত্যেক বস্তু যে দিকে নড়ছে, অর্থাৎ স্থান পরিবর্তন করছে, সেদিকে তার একটা ওজন আছে।" তিনি জানতেন যে, একটা পতনশীল বস্তুর গতি সময়ের সঙ্গে বাড়তে থাকে। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে শক্তির উৎস ছিসাবে বস্তুর বিরামহীন গতি বাস্তবভাবে পাওয়া অসম্ভব। লীভারের গাণিতিক ভিত্তি তিনি বুঝেছিলেন এবং তিনি মনে করতেন যে, লীভার হচ্ছে সরলতম যন্ত্র, আর অন্যান্য যন্ত্র এই লীভারেই জটিলতর সংগঠন। তরল পদার্থের স্থিতিবিদ্যা এবং গতিবিদ্যা তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি; খালের মধ্যে জলের ধারা ও জলের ঢেউয়ের প্রগতি বিষয়ে, শব্দ-তরঙ্গের প্রগতি বিষয়ে তাঁর গবেষণার পরিচয় পাই আলোক রশ্মির আচরণ অনেক দিক দিয়ে শব্দ-তরঙ্গের মত এবং আলোর ক্ষেত্রেও একটা তরঙ্গবাদ যে প্রযোজ্য হতে পারে, এই আভাস তিনি দিয়েছেন অতিপ্রাকৃত বা আকস্মিক

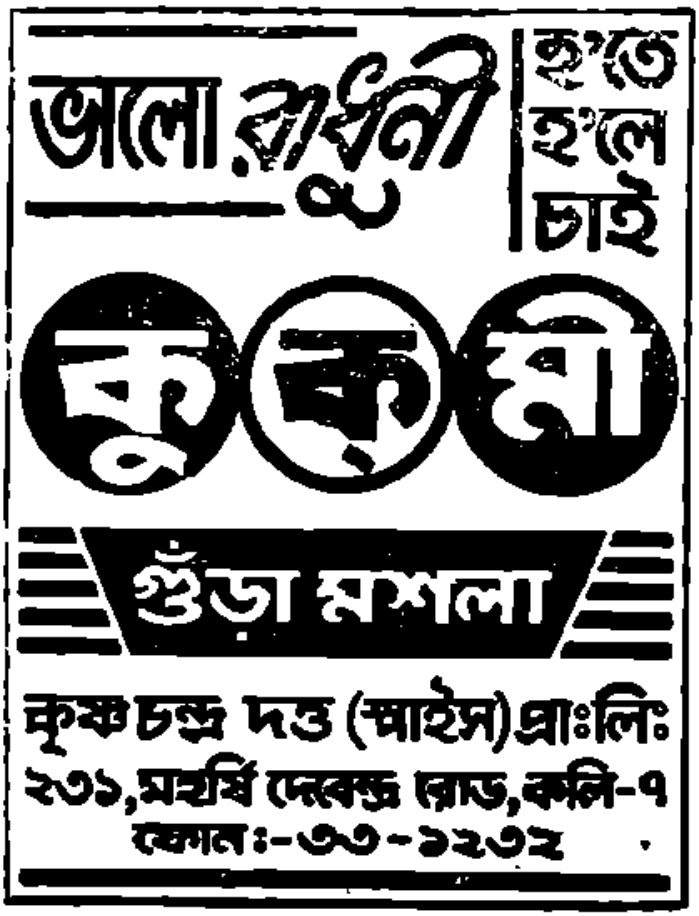

দৈব পরিবর্তনে তার যে বিশ্বাস ছিল না, তা বুঝতে পারা যায় শিলীভূত প্রাগৈতিহাসিক সামুদ্রিক জীবের সম্বন্ধে তাঁর মতামত দেখে। তাঁর মতে: শিলীভূত জীবগুলি বিশ্বের "নোআ" প্লাবনের চল্লিশ দিনের মধ্যে উচ্চ পর্বতের ওপর স্থানান্তরিত হয়নি, বিশ্বের পৃথিবীর পৃষ্ঠে ক্রম-পরিবর্তনের ফলে নতুন নতুন জায়গায় পর্বতশ্রেণী মাথা তুলেছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রেও তিনি তাঁর সমসাময়িক জ্ঞানতপস্বীদের চাইতে অগ্রসর ছিলেন। চোখের গঠন ও ক্রিয়া তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন হার্ভে'র (Harvey) প্রায় এক শতাব্দীরও আগে রক্ত চলাচলের সাধারণ প্রণালীটি বুঝতে পেরেছিলেন।

আলকেমী গণৎকারী জ্যোতিষ বিষয়ে তাঁর কোন শ্রদ্ধা ছিল না, তাঁর মতে প্রকৃতি মানুষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, বাঁধাধরা অপরিবর্তনীয় প্রয়োজন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

লেওনার্দোর মধ্যে আমরা দেখি কুসংস্কারমুক্ত মন। ধর্মতত্ত্বের দিক দিয়ে তিনি সাধারণতঃ যেতেন না। যদিও বা কিছু বলেছেন, তাও ভাবে গদগদ হয়ে নয়। বরং চার্চ বিষয়ে কোনো কথা তুলেছেন, তখন চার্চের অসারতা ও অসারতাকে খোলাখুলিভাবে নিন্দা করেছেন। যে অল্পকাল পোপের রাজত্বে ঔদার্য ও বদান্যতা দেখা দিয়েছিল, সেই কালের মানুষ না হলে লেওনার্দোর পক্ষে ঐ রকম নিভার স্বাধীনতা কল্পনা করা সম্ভব হত না। এরপর রোমান চার্চ আবার ভীষণ প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে এবং মার্টিন লুথারের (Luther) যে সংগ্রামের পথ দেখেন, সেই পথ বেয়ে ধীরে ধীরে ও বহু কষ্টে স্বাধীনতা লাভ হয়।

লেওনার্দোর বালক বয়সেই ছবি আঁকার প্রতিভা দেখে ভেরোক্কিয়ো (Verrocchio) নামক সে যুগের বড় শিল্পী লেওনার্দোকে তাঁর শিল্প বিদ্যালয়ে ঢুকিয়ে নেন ১৪৭০ সালে। ১৪৭৬ সালে তিনি ফ্লোরেন্সে খুব কম ছবিই শেষ করেছিলেন। কিন্তু এই সময়ে থেকে যে কয়েকটি ছবি যেমন "বিজ্ঞ ব্যক্তি ত্রয়ের শ্রদ্ধা নিবেদন" (Adoration of the magi) পাষাণের মাঝে খৃষ্ট-মাতা (Vergin among the Rocks) তিনি সৃষ্টি করেছিলেন সেগুলির শিল্পমাধুর্য অপূর্ব কিন্তু কেবল ফ্লোরেন্সের শিল্প গোষ্ঠীতে থেকে চিত্র-শিল্প চর্চা করে তিনি সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি। যে ধরনের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও অনুসন্ধানের এবং তার ব্যবহারিক প্রয়োগের আকাঙ্ক্ষা তাঁর মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে, সে ধরনের পরীক্ষা ও প্রয়োগ সম্ভব নয়, যদি প্রচুর অর্থবল না থাকে। এই অর্থবলের সন্ধান পেলেন মিলানের ডিউক লুদোভিকো ইল মোরোর রাজত্বে, এই রাজত্বে তখন রাজস্ব ছিল ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সের মিলিত রাজস্বের সমান। উন্নত কৃষি ও উন্নত হস্তশিল্প (বিশেষ করে অস্ত্র) তৈরী থেকে এই রাজস্ব পাওয়া যেত। কিন্তু এই সমৃদ্ধির ভিত্তি ছিল স্বৈরাচারী চণ্ডনীতির ওপর, তার ওপরে ছিল অপব্যয়: জনসাধারণের সমর্থন হারিয়েছিল এই সরকার। ১৪৮২ সালে লেওনার্দো এই সরকারের কাছে দরখাস্ত করেছিলেন যে, তিনি যুদ্ধ বিগ্রহের সব রকম অস্ত্র তৈরী করতে পারেন এবং তা ছাড়াও তিনি মার্বেল ব্রোঞ্জ, মাটির মূর্তি তৈরী করতে পারেন ও চিত্রশিল্পেও পারদর্শী। মিলানেই লেওনার্দোর যন্ত্র বিজ্ঞানির প্রতিভার স্ফুরণ হয়েছিল। এই চর্চার সঙ্গে সঙ্গে চিত্রশিল্পের বিজ্ঞান চর্চাও তাঁকে চারুশিল্প-জগতে নূতন স্থান দিয়েছে। তাঁর মতে ছবি আঁকা সত্যিই একটা বিজ্ঞান। ছবি হচ্ছে প্রকৃতির সন্ধান। আলো ও ছায়ার ঢাকা যে সমুদ্র, ডাঙ্গা, গাছপালা প্রাণী, ঘাস, ফুল আমরা দেখছি, সেই প্রকৃতি সৃষ্টি বাস্তব সত্তার অনুগত অনুকরণ হচ্ছে ছবি।

ছবি আঁকা জিনিষটা লেওনার্দোর কাছে একটা বৈজ্ঞানিক সমস্যা অর্থাৎ একটা গতিহীন, পরিবর্তনহীন সমতল ক্ষেত্রের ওপর জীবন্ত, গতিশীল, স্পন্দিত ঘনতা বিশিষ্ট প্রকৃতিকে ফুটিয়ে তোলার সমস্যা। তার সাফল্য হচ্ছে আলো ছায়ার বিন্যাসের (Chiaoscura) মধ্য দিয়ে এবং প্রকৃতির রঙের নিখুঁত অনুকরণের মধ্য দিয়ে বাস্তব অস্তিত্ব ও গতির রূপ সৃষ্টি। এই-সাফল্যেই তার প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অন্তর্দৃষ্টি পর্যবেক্ষণ সার্থক হয়েছে।

পুঁজির বৃদ্ধি ও স্ফীতি (Concentration of capital) শুরু হবার ফলে এবং উৎপাদন প্রণালী উন্নতির পথে যাবার ফলে যখন বড় বড় কামান বাহিনীর ব্যবহারে সম্ভব হল, অর্থাৎ যুদ্ধের বিজ্ঞানে বিপ্লব আরম্ভ হল, তখন লেওনার্দো তাঁর কাজের সুযোগ পেয়েছিলেন। নয় রকম ক্ষেপণ যন্ত্রের (Missiles mortars) বিষয়ে তিনি গবেষণার সন্ধান পেয়েছিলেন এবং বস্তু-বৈজ্ঞানিক সূত্রে ও গবেষণার সঙ্গে চলো সেই—ব্যবহারিক গবেষণার যোগসাধন করেছিলেন। যুদ্ধে বিজ্ঞানের উন্নতির প্রয়োজন যেমন তাঁর অনেক কাজের প্রেরণা জুগিয়েছিল, তেমনি যুদ্ধ তাঁর কীর্তি ধ্বংস করতেও ছাড়েনি। ইতালীয় নগরগুলিতে জনসাধারণের সমর্থনপুষ্ট পরশ্রম ভোগী শাসক শ্রেণীর স্ফীত অর্থভাণ্ডার বিদেশী আক্রমণকারীদের লোভ বাড়িয়েছে। মিলান দখল করেছে ফরাসীরা। ফ্রান্সিসকো স্ফোরজার অশ্বারূঢ় মূর্তির জন্য ষোল বছর পরিশ্রম করে যে বিরাট ব্রোঞ্জের ঘোড়া লেওনার্দো তৈরী করেছিলেন, তা ফরাসী সৈন্য বাহিনীর হাতে ধ্বংস হয়। ১৪৯৯ সালে মিলান ত্যাগ করার আগে 'সান্তা মরিয়া দেলে গ্রাজী' নামক গীর্জার দেয়ালে "যীশুর শেষ ভোজন" (Last supper) নামে যে বিশ্ববিখ্যাত ছবি লেওনার্দো আঁকেন তা অপরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল এবং শেষকালে গত বিশ্বসমরে বোমার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

মিলান্ ত্যাগ করার পর থেকে তাঁর জীবনে সুখ আসেনি। ১৫০৬ পর্যন্ত—ফ্লোরেন্সকে কেন্দ্র করে তিনি নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। এই রকম বৈচিত্র্যহীন জীবনেও তিনি "মোনালিসার" দুর্বোধ্য ও শান্ত স্মিত হাসি তুলিতে প্রকাশ করতে পেরেছিলেন (১৫০০—১৫০৬)। নিষ্ঠুর চক্রান্তকারী সিজার বর্জিয়া যখন রোমাঞ্জার (Romagna) কর্তা ও নিষ্ফল অভিযান চালাচ্ছিলেন তখন বছরের জন্য লেওনার্দো তাঁর প্রধান যন্ত্রবিজ্ঞানী ছিলেন। যুদ্ধের নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতার অভিজ্ঞতা তাঁকে মনস্তাত্ত্বিক করে তোলে, তিনি বর্জিয়ার চাকরী ছেড়ে ফ্লোরেন্সে ফিরে আসেন এবং এই স্থানে তিনি "আংঘিয়ারির যুদ্ধ" (Battle of Anghiari) নামে একটি ছবি আঁকেন। এই ছবিতে (অসম্পূর্ণ হলেও) তিনি গতি আবেগ এবং যুদ্ধের নিষ্ঠুরতা বীভৎসতা বর্বরতার প্রতি তার ঘৃণা অপূর্বভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

১৫১৫ সালের পর তিনি ১ম ফ্রান্সিসের আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং একটি খালের পরিকল্পনা বিষয়ে মনোনিবেশ করেন। ১৫১৯ সালে ফ্রান্সে তাঁর মৃত্যুর আগেই রাফায়েলো ও মিকেল আনজেলো ইতালির শিল্পাকাশে উদয় হওয়াতে যুদ্ধ লেওনার্দোর আলো ঢাকা পড়ে এসেছিল। ইতালির নবজাগরণ নাগরিক সভ্যতার প্রথম মুক্তির কোলাহল। কিন্তু সমস্ত সমাজের মাঝখানে এই সভ্যতার অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল সঙ্কীর্ণ ও দুর্বল তাই ইতালি সমস্ত ইউরোপকে জাগিয়ে দিল বটে, কিন্তু নিজেকে বাঁচাতে পারল না। লেওনার্দোর কাছ থেকে হয়তো জগত আরও আশা করতে পারত কিন্তু ইতালির নবজাগরণের মুক্তি প্রায় তাঁর জীবনকালের মধ্যেই স্তিমিত হয়ে এসেছিল।

বহু রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যে সমস্ত ১৬শতক ব্যাপি ইতালিতে বিজ্ঞানের একটা জোয়ার রয়েছে। চার্চ বিরোধী সৌরকেন্দ্রিক ও কয়েকটি বৈজ্ঞানিক মত প্রকাশ করাতে ব্রুনোকে (Bruno) ১৬০০ সালে পুড়িয়ে মারা হয় এবং তারপর গালিলিওকে কারাবরণ করতে হয় এবং এর ফলে ইতালির বৈজ্ঞানিক প্রগতি ব্যাহত হয়, কিন্তু তার আগেই উত্তর ইউরোপের বাণিজ্য জগতে সেই বিজ্ঞানের বীজ রোপিত হয়ে গিয়েছিল। বেকন, দেকার্ত, হাইগেন্স হুইগেনস, নিউটন তাঁদের নূতন রকম সংগঠন অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান ও পরিষদ নিয়ে এগিয়ে এলেন বিজ্ঞানের বিপ্লবকে সম্পূর্ণ করতে, যে বিপ্লবের অগ্রদূত হিসাবে আমরা শ্রদ্ধা জানাই লেওনার্দো দা ভিনচিকে।*

*Dampier-এর History of Science Bernal-এর দা ভিনচি বিষয়ক প্রবন্ধ এবং কয়েকটি চারুশিল্পের ইতিহাসকে ভিত্তি করে এই প্রবন্ধ।

শহীদ। | অমলকুমার সরকার

কোষবদ্ধ তরবার ছিল
অপমানে লজ্জায় আহত :
আলস্যের ঘুমঘোরে অর্ধ-অচেতন।
মালিন্যের অন্ধকারে একাকী নিশ্চুপ !

অমা রাত্রি। লোভের বুভুক্ষা নিয়ে দস্যু এল :
সঙ্গে তার শান্তিবেশী মৃত্যুর নিশান,—
হিংস্র কুটীল হাস্য তরঙ্গিত হল চারিদিকে,
সুপ্তির প্রশান্তটুকু ভেঙ্গে খান্-খান্।

তারপর বজ্রদন্তে তৃপ্ত করে খুনের পিপাসা,—
শিশুঘাতী, নরঘাতী পশুর উল্লাসে আর
নরভোজী অসভ্যের আদিম আকাঙ্খায়
নির্লজ্জ প্রকাশ পেল বর্বর জিঘাংসা।

আর নয়। আর সুপ্তি নয়। সূর্য উঠে গেছে বহুক্ষণ :
মেঘে-মেঘে বিস্ফুরিত রক্তের লালিমা।
শূন্যে ধর তুলি কোষমুক্ত প্রদীপ্ত কৃপাণ ;
কাপুরুষ নহ তুমি, তুমি যোদ্ধা দৃপ্ত বলীয়ান্।
মাতৃভূমি মুক্ত কর, প্রাণ দিয়ে শোধ তার ঋণ,
অন্য কিছু নহ তুমি : তুমি শুধু মাতার সন্তান :
ভালে এঁকে জয়-টীকা গর্বিত বুকক,
মৃত্যুরে বরণ কর স্বাধীনতা-বেদীতলে
তুমি আজ অমর শহীদ !

ভ্রাম্যমানের প্রতি | জীবিতেশ চক্রবর্তী

গোলাপের গন্ধে যদি মন ভরে ওঠে
রজনী গন্ধার পানে চেও না।
দুয়ারের পাশে যদি দোপাটিরা ফোটে
কুটজের খোঁজে তুমি যেও না।
আসঙ্গ লালসা সব যদি মিটে যায়
গৃহিণীর কবোষ্ণ আশ্লেষে
কি পাবে নতুন করে প্রেমের আশায়
বারবণিতার ঘরে এসে ?
পিপাসার জল যদি ঘড়াতেই থাকে
দীঘিতে আবার কেন যাবে ?
নীতংসে গৃহের প্রেম যদি বেঁধে রাখে
বলো মন—কি লোভে পালাবে ?
একটি ফুলের মধু যদি ভরে দেয়
সারা জীবনের মধুচাক,
ফুলে ফুলে ঘুরে ঘুরে পাখায় পাখায়
রামধনু আশা তবে থাক।

'এই মাটির মানুষ'

মণি গঙ্গোপাধ্যায়

"জন্ বলেছেন—ঈশ্বরের ইচ্ছায় পাষাণেও প্রাণ প্রতিষ্ঠা হতে পারে। তাই যদি হয় তা হলে ঈশ্বরের পুত্র তুমি, তুমি কেন পারবেনা পাষাণকে রুটিতে রূপান্তরিত করতে!"

কুয়াশাচ্ছন্ন আবরণ ভেদ করে ধ্বনিত হল মায়ার মোহিনী কণ্ঠস্বর। সন্ধ্যার আঁধার নেমেছে দূরন্ত মরুভূমির বালুবন বুকে। উত্তপ্ত বালুকার বুকে শীতলতার স্পর্শে উঠছে সূক্ষ্ম ধোঁয়ার আস্তরণ, ধরিত্রী বুঝি স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ছে। যিশুর অন্তরে কিন্তু স্বস্তি নেই। জর্ডনের তীর থেকে পালিয়ে বিভ্রান্ত যিশু আশ্রয় নিয়েছিল নির্জন মরুভূমির গভীরে। ধ্যানের রেশ অপসারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়েছিল বিস্তৃত বালির সমুদ্র। মন আকুল হয়ে উঠেছিল ফুল, ফল, পাখী, মানুষ ভরা শ্যামলা ধরিত্রীর স্পর্শের আশায়—সেই স্পর্শেই তো সে শিশুকাল থেকে অনুভব করেছে ঈশ্বরের অস্তিত্ব। কিন্তু জর্ডনের তীরে দাঁড়িয়ে শোনা ঈশ্বরের আহ্বানও তো মিথ্যা নয়। সে ডাক তার বুকের দরজায় আঘাত দিয়ে বলে গেছে—"হে—আমার প্রিয় পুত্র।" আবার, আবার যদি বক্ষের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে ঝঙ্কার না তুলে মন্ত্রিত হয় সেই আহ্বান! এই মরুভূমির নিঃসঙ্গ পরিবেশে—পায়ের তলায় যেখানে বালির রাশি আর মাথার ওপর উদার নীলাকাশ। ধ্যানের গভীরে আবার হারিয়ে গেল যিশু। সময় কোথা দিয়ে উড়ে চলে গেল, কোথায় হারিয়ে গেল প্রিয়-পরিবেশে ফিরে যাবার ইচ্ছা। বোধিলাভের পূর্বে সে ফিরে যাবেনা লোকালয়ে।

দীর্ঘ উপবাসে দেহ হল ক্ষীণ। যিশুর জীবনে এই প্রথম শারীরিক নিগ্রহের মাঝে নিশানার সন্ধান। নিশানা আসেনি তা নয় কিন্তু তার অর্থ এখনও অজানা। চাই সেই নির্দেশ যার কষ্টিপাথরে যাচাই হবে তার নিজের মূল্য। দিন যায়, রাত যায়, যিশুর দেহ হয় ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর। বাইরের আলো তার চোখে যত ম্লান হয় তত উজ্জ্বল হয় তার চৈতন্যের দীপ্তি। কখনও আলোর সমুদ্রে মগ্ন হয় তার সমগ্র সত্তা। কখনও দেহের দুর্বলতার সুযোগে মন হারিয়ে যায় শূন্যতার অন্ধকারে' দোলে স্বপ্ন আর বাস্তবের আলোছায়ায়। কোন দুযোগে মোহের আবরণে মন হয় আচ্ছন্ন, স্বপ্নের জগৎ দেয় হাতছানি।

সুযোগ বুঝে শয়তান কানে কানে শোনায় তার যাদুমন্ত্র "ঈশ্বরের পুত্র তুমি, কেন পারবে না পাথরকে রুটিতে রূপান্তরিত করতে। এই নাও, নাও না এই পাথরটা, দেখ না চেষ্টা করে।"

বাসনার তীব্র তাড়নায় হঠাৎ বাধা পড়ল। বালুর সমুদ্রে ঝড় উঠেছে, দেহ শিউরে উঠছে বালুকণার কশাঘাতে। পাষণ্ড নয়, সাধধানবাণী। শান্ত, সংযত যিশুর অন্তরের গোপন গভীরে উৎসারিত হল উত্তর—"মানুষ শুধু রুটি খেয়েই বাঁচবে না; তার চাই ঈশ্বরের আশীর্বাদ।"

লজ্জায় মুখ আড়াল করে পালিয়ে গেল শয়তান। কিন্তু এত সহজে কি হাল ছেড়ে দেবে শয়তান, অবসান হবে মোহরাত্রির!

ইতিমধ্যে মরুভূমির প্রান্তে পর্বতের গুহায় আশ্রয় নিয়েছে যিশু। আত্মচিন্তায় মগ্ন মনে আবার একদিন যাত্রার বাঁশী বেজে উঠলো। বাঁশীর সুরে মধু ঢেলে কে যেন বলছে—"এই তো কয়েক পা গেলেই পর্বতের চূড়া আর তার পাশেই গভীর খাদ। তুমি যদি সত্যিই ঈশ্বরের পুত্র হও তা হলে পড় চূড়া থেকে ঝাঁপিয়ে। তোমার শাস্ত্রেই তো আছে, ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করবেন, দু'হাত বাড়িয়ে টেনে নেবেন তাঁর বুকে।"

শুনতে শুনতে আত্মবিশ্বাসের অহমিকায় থর থর করে কেঁপে উঠলো যিশুর দেহ। লোভের প্রচণ্ড আকর্ষণ বুঝি আর বাধা মানে না—নিজের শক্তিকে পরখ করার, বিভূতির ভূষণে মণ্ডিত হওয়ার লোভ। এই অস্থির মুহূর্তে আবার অন্তর দেবতা পাঠালেন তাঁর উত্তর—"শাস্ত্রে এ কথাও লেখা আছে—তুমি লোভের পথে ঈশ্বরকে লাভ করবার আশা করো না।"

তবু, মায়ার মরুভূমিতে ক্ষণে ক্ষণে দিকহারা হওয়ার বুঝি শেষ নেই দিনের আলোয় একের পর এক মরীচিকা আকর্ষণ করে, রাতের অন্ধকার নিয়ে আসে অসংখ্য মোহের তাড়না। ক্রমশঃ বাড়ি ফিরে যাবার বাসনা যিশুকে পেয়ে বসলো। বার বার মনে হল কি প্রয়োজন তার এই বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হবার? তার চেয়ে···। শয়তান যেন বসেছিল এই সুযোগের অপেক্ষায়। দুর্বল দেহ, চঞ্চল মন যিশুর চোখের সামনে হঠাৎ প্রসারিত হল এক অপূর্ব দৃশ্য। সমাগরা ধরিত্রীর সব সম্পদ থরে থরে সাজানো। শয়তান কানে কানে বলল—"তুমি যদি আমার উপাসনা কর তা হলে তুমিই হবে এই বিপুল সম্পদের অধীশ্বর।"

উন্মত্তের মত তার সমস্ত শক্তি দিয়ে যিশু চীৎকার করে উঠল—ঈশ্বরই আমার একমাত্র উপাস্য তাঁর কাজই আমার কাজ।"

সম্বিত ফিরতেই মনে পড়ল শয়তানের ইসারা আর তার নিজের উত্তর। তার নিজের মুখ দিয়ে পরম প্রতিকার বাণী বলিয়ে নিয়েছেন ভাগ্যদেবতা। আর সন্দেহের বোধহয় অবকাশ নেই, প্রয়োজন নেই নির্দেশের অপেক্ষা।

প্রশান্ত মন, জ্যোতির্ময় দেহ নিয়ে যিশু ফিরে চলেছে নাজারেথে। ইচ্ছে করেই এরা অন্য পথে হাঁটা শুরু করেছে যাতে জনের সঙ্গে আবার দেখা না হয়। দেখা হল না কিন্তু সংবাদটুকু ঠিকই এলো। পাশের বাঁক পেরিয়ে ভয়ার্ত একদল পথিক ছুটতে ছুটতে সামনে এসে পড়ল।

—কি, কি হয়েছে তোমাদের? এমন করে পালাচ্ছ কেন?

যিশুর প্রশ্নে থমকে দাঁড়িয়ে উত্তর দিল একজন—"ওই দূরে দেখছোনা হেরড অ্যান্টিপাসের বিদেশী সৈন্যের সার দিয়ে চলেছে।"

—তাতে তোমাদের কি? তোমরা পালাবে কেন?

—বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছে যে।

—কাকে? কে আবার বন্দী হল?

—পুণ্যিদাতা জন।

হর্ষ আর বিষাদের এক বিচিত্র অনুভূতির সাগরে তলিয়ে গেল যিশুর সত্তা। পাগলের মত মানুষটাকে নির্বাক, নিশ্চল দেখে আবার প্রাণভয়ে ছুটতে শুরু করল যাত্রীর দল। যিশুর জীবনের পথে আবার ছায়া ফেলেছেন জন। যিশুর মনে হল—এই তো বিশ্বস্ততার নির্দেশ। তাকে জনের পথে যেতে হবে, পূর্ণ করতে হবে জনের শূন্য আসন। "তোমার পতাকা যারে দাও"—শাস্ত্রোক্ত সেই দিব্যপুরুষের

আবির্ভাব বুঝি আসন্ন। থেকে থেকে তীব্রতর অনুভূতির বিদ্যুৎ শিহরণ ছড়িয়ে পড়ল বিশুর সারা দেহে। পেশীতে পেশীতে অনুভূত হল প্রত্যয়ের স্বাক্ষর।

স্বাভাবিকতা ফিরে পেতে বিশুর দেরী হল না। আবার সে এগিয়ে চলল বাড়ির পথে, তার চিন্তার ধারা কিন্তু প্রবাহিত হল নূতন স্রোতে। এই প্রথম সে শুরু করল পরিকল্পনা—কেমন করে সে তার কাজ আরম্ভ করবে, কোথায় আরম্ভ করবে। মনে মনে যাচাই করল তার অল্পসংখ্যক অন্তরঙ্গ বন্ধুকে, যাদের কাছে খুলে বলা যাবে মনের কথা, আশা করা যাবে সহযোগিতা। একজনকেও পছন্দ হল না। পথ যত শেষ হয়, ততই প্রসারিত হয় চিন্তার পরিধি—নূতন নূতন চিন্তা। গুরু যা এতদিন বলেছেন এবং এরপর সে যা করবে—এই দুয়ের তুলনায় অন্তর আলোড়িত হয়। জনের পক্ষে পুরোহিতদের আঘাত দেওয়া বোধহয় ঠিক হবেনি। ওদের থেকে দূরে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। আর একটু নরম ভাষা, একটু নম্র ব্যবহারে সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করা হয়তো সহজ হবে। তাদের সংসারের কি হবে! তার ভায়েরা কি পারবে চালিয়ে নিতে! হুতোরশালার ভার কে নেবে!

আচ্ছন্নের মত বাড়ির প্রাঙ্গণে পা রেখে বিশু শুনলো বাড়ির সকলে পাশের এক সহরে গেছে ভোজের আমন্ত্রণে। দ্বিধাগ্রস্তের মত দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করল বিশু—সেও কি সোজা উৎসবের আসরে চলে যাবে! দীর্ঘ উপবাসের পর উৎসব মন্দ লাগবে না। শেষ পর্যন্ত যাওয়াই স্থির করল।

ভোজসভায় প্রবেশ করে কিন্তু বিশু বিস্মিত হল। এ কোন অপরিচিতদের মাঝখানে এসে পড়ল সে। প্রত্যেকেই প্রচুর মদ্যপান করেছে। তরুণ আর তরুণীর দল হো হো করে হেসে উঠছে, হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ছে পরস্পরের গায়ে। দলের মধ্যে ভাই আর বোনেরাও রয়েছে। কারুকেই কিন্তু আর আগের মত আপনার জন বলে মনে হচ্ছে না। ওই তো দূরে মা বসে আছেন। মার মুখখানা ভার কেন? পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই মা বললেন—উৎসব আর জমবে না। এদের মদ ফুরিয়ে গেছে।

মায়ের এই কথা শুনে, কথার মধ্যে তুচ্ছ বিষয়ে প্রচ্ছন্ন হতাশার সুর কানে আসতেই এক অব্যক্ত ব্যথার সম্বন্ধে নিজেকে ক্ষণিকের জন্য হারিয়ে ফেলল বিশু। মনে হল সে এদের, এই সব আত্মীয়-পরিজনদের কেউ নয়। দূরে, অনেক দূরে, তার এই পরিচিত পরিবেশের বাইরে নূতন সব মুখ, অদ্ভুত সব কণ্ঠ তাকে ডাকছে। কোলাহলের আঘাতে চমক ভাঙ্গল। মদের অভাবে কটূক্তি শুরু করেছে অতিথিরা। হঠাৎ চৈতন্যে নতুন ইসারা চমকে উঠল। মদ না পেলে এই মানুষগুলোর মন কিরে আসবে না—এই তো! ধ্যানস্থ বিশুর দেহ তার অন্তরনিহিত শক্তির ইসারায় বার বার কেঁপে উঠল। অন্তরের গভীরে বসে কে যেন সঙ্কেত পাঠাচ্ছে, চৈতন্যের কোণে কোণে তারই বিদ্যুৎচমক। এই উৎসুক নরনারীর দলকে এই মুহূর্তে প্রভাবান্বিত করা যায়, এদের উপর আরোপ করা যায় আদর্শ আর অনুজ্ঞা। এরা হয়তো সচকিত হয়েছে কিন্তু এইসব মূঢ় মানুষের দল মুহ্যমান হবে অলৌকিক শক্তির বিকাশে। জনের চেয়ে যিনি শক্তিমান হবেন তিনি কেন পারবেন না জলকে সুরায় রূপান্তরিত করতে?

এই প্রথম বিশু অনুভব করল তার অন্তরে দৈবশক্তির আবির্ভাব।

হঠাৎ কোলাহল ভেঙ্গে পড়ল আসরে। মদ পাওয়া গেছে! মদ পাওয়া গেছে!—কে জানতো রান্নাঘরের জলের কলসীতে মদ লুকানো থাকবে! রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে রাঁধুনিটা তারস্বরে ঘোষণা করছে তার এই আশ্চর্য আবিষ্কারের কাহিনী।

সমাগত সকলের দৃষ্টি চকিতে একবার ফিরল বিশুর পানে। অকম্পিত দেহ নাজারেথের তরুণ দাঁড়িয়ে আছে, দৃষ্টি রাঁধুনির দেহে স্থিরনিবদ্ধ। এ কি অলৌকিক কাণ্ড! কোন্ মন্ত্রবলে নিজের মনের কথা এমন সঞ্চারিত হল ওই রাঁধুনির মুখে!

দৈবনির্দিষ্ট প্রথম পরীক্ষায় সফল বিশু তখনও দাঁড়িয়ে। নিষ্কম্প, নিরুত্তর নাজারেথের তরুণ বিশু, অন্তর তার দিব্যজ্যোতিতে ভাস্বর। তার সম্বল শুধু এই ভাবটুকু। এই সামান্য সম্বল নিয়ে এই সব মূঢ়

মানুষকে নূতন জীবনের আলো দেখাবার দায়িত্ব কি গ্রহণ করা যায়?

এই প্রথম নাজারেথের যিশু প্রকাশিত হলেন ইহুদী-দের প্রার্থিত দৈবপুরুষের মহিমায়।

। তিন ।

"বিশ্বাস রাখ এই সুসমাচারে।"

বিদেশীর কণ্ঠে এই বাণী শুনে বিস্মিত হ'ল শ্রোতার দল। গ্যালিলির সমুদ্রতীরে ক্যাপারনাম বন্দর। ব্যবসার কেন্দ্রস্থল। নাবিক, ব্যবসায়ী, শ্রমিক, ভ্রমণকারী-বিচিত্র সব মানুষের মিলনক্ষেত্র। রবিবারের উপাসনা সভায় স্থানীয় লোকের সঙ্গে বিদেশীরাও যোগ দেয়। ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ সকলেই বক্তৃতা শোনে অথবা শোনার ভাণ করে। সাধারণত বক্তৃতার ভার পড়ে কোনো বিদেশীর উপর স্থানীয় সকলেরই বিশ্বাস বিদেশীর মুখেই জেরু-জালেম প্রদত্ত শাস্ত্র-বাণীর কোনো নূতন ব্যাখ্যা মিললেও মিলতে পারে।

ক্যাপারনাম থেকে নাজারেথ মাত্র এক দিনের পথ। এত কাছের মানুষ বলেই তো এই তরুণের মুখে নূতন কিছু শোনবার ভরসা পাওয়া যায় না। প্রথম প্রার্থনা শুরু থেকেই সন্দেহ হচ্ছে শ্রোতাদের। কি মৃদু প্রার্থনার স্বর, যেন নিজের মনের সঙ্গে কথা বলা। আগে ধর্ম-প্রচারকদের পরিচিত বসন নেই। আজকাল অনেক দৈবপুরুষ, অনেক নতুন "এলিজা" দেখা দিচ্ছেন। কিন্তু এই মানুষটির মধ্যে পরিচিত কোনো চিহ্নই নেই! সন্ন্যাসীর অপাবরণ নেই, দৃষ্টিতে নেই বিষাদের ভার, বাণীতে নেই রুদ্রের জ্বালা।

"সময় পূর্ণ হয়েছে। ঈশ্বরের রাজ্য ওই সমাগত। পাপীরা অনুতপ্ত হও; বিশ্বাস রাখ এই সুসমাচারে।"

সুসমাচার! সাবধান-বাণীর আতঙ্ক নেই, নেই স্বীকারোক্তির বা শুদ্ধিস্নানের আহ্বান। সকলের বোধগম্য ভাষায় বলছেন। কিন্তু প্রত্যয়ে দৃঢ় প্রতিটি কথা।

"যার বিশ্বাস জাগবে তারই আশা উজ্জ্বল হবে সাফল্যের সম্ভাবনায়।"

সরল জেলে আর কৃষকেরা পুরোহিতদের কূটতর্কের বেড়ায় নিশ্বাস নিতে পারছিল না। সুসমাচার! নতুন মানুষের সহজ কথা তাদের কাছে বয়ে নিয়ে এলো মুক্তির বাতাস। তাদেরই আপনজনের মত ইনি এইমাত্র বললেন—জেলেরা সমুদ্রে জাল ফেলে, মাছ ওঠে নানা রকমের। তেমনি ঈশ্বরের রাজ্যেও থাকবে নানা ধরণের লোক—কেউ ভাল আর কেউ মন্দ।

এ শাস্ত্রের ব্যাখ্যা নয়, আখ্যানের মাধ্যমে মানুষের মনে জাগিয়ে দেওয়া নূতন আশ্বাস। রূপকাখ্যান। একটার পর একটা রূপকাখ্যান বলে চলেছেন। সেই বীজ রোপনকারীর আখ্যান, যে বীজ এমনভাবে ছড়ালে যে কিছু পড়ল পথের ধারে, কিছু কাঁটাবনে, কিছু পাথরের ওপর আর কিছু ভাল মাটিতে। অসংখ্য উৎসুক কৃষকের মনের মত কথা।

এক একটি কাহিনী শেষ হয়, বলেন তাঁর অন্তর্নিহিত উপদেশটুকু, বোঝিয়ে দেন মানুষের কি কর্মের কি ফল।

রূপকাখ্যানের বুঝি শেষ নেই। সেই জীর্ণবস্ত্রের কাহিনী, যাতে নূতন কাপড়ের তালি দেওয়া অন্যায়। সেই গৃহিণীর গল্প, যিনি হারানো টাকা খুঁজতে সৃষ্টি করেছিলেন তুমুল তোলপাড়। পর্দার আড়ালে মহিলারা নড়ে চড়ে বসল। এ সবই যে তাদের ঘরকন্নার ঘটনা। আজ নতুন কথা শোনা হল, শোনাবার মত সব নতুন কথা। ঘোমটার আড়াল থেকে আবিষ্ট হয়ে দেখতে দেখতে মনে হল—বক্তা তাদেরই একজন। তাদের আপনজন।

সুবিন্যস্ত দাড়ি আর সুন্দর কালো চুলে কি সুন্দর দেখতে! কেমন মধুর কণ্ঠস্বর!

সমাগত কয়েকজন পণ্ডিত আর পুরোহিত প্রথমে বিস্মিত তারপর বিরক্ত হলেন। নবাগত বিদেশীর বক্তৃ-তার ভঙ্গীটা সত্যিই নতুন। রাস্তায় দাঁড়িয়ে পরিচিতের সঙ্গে আলাপের ধরণে ভাষণ দিচ্ছে। এইসব ভবঘুরে প্রচারক নিজের গ্রামের গণ্ডীর মধ্যে থাকলে মাথা ঘামাবার কিছু নেই। কিন্তু এরা পথ-পরিক্রমায় বার হলেই বিপদ। নতুনের টানে অজ্ঞ মানুষেরা আকৃষ্ট হয়; তখন স্থানীয় পণ্ডিতেরা আর পাত্তা পায় না। এই তরুণ তো এখনই সকলের বেশ প্রিয় হয়ে উঠেছে? এরপর কয়েক সপ্তাহ স্বচ্ছন্দে এইসব সরল শ্রোতার কাঁধে চেপে কাটিয়ে দেবে।

হঠাৎ সারা ঘর চকিত করে ধ্বনিত হল এক তীব্র চীৎকার। অজ্ঞান হয়ে পড়েছে একজন শ্রোতা। মুখ দিয়ে সাদা ফেনার মত গোঁজলা বার হচ্ছে। হাত-পা ছুঁড়ে লোকটা চীৎকার করছে "তুমি নাজারেথের যিশু। তোমাকে আমি চিনি। তুমি আমাদের ধ্বংস করতে এসেছো। আমি জানি, তুমি সেই ঈশ্বর প্রেরিত দৈবপুরুষ।

দৈবপুরুষ!

যিশুর দেহের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে কি তীব্র ঝনঝনা। রোমকূপ ব্যস্ত করে কি অসহ্য রোমাঞ্চ! তবে কি এই অর্ধ-অচৈতন্য লোকটির মুখেই প্রকাশ পেল শত শত শ্রোতার মনের ভাব-তাদের অধিকাংশের আনুগত্য আর একাংশের বৈরীতা! বন্দনা আর ঘৃণা!

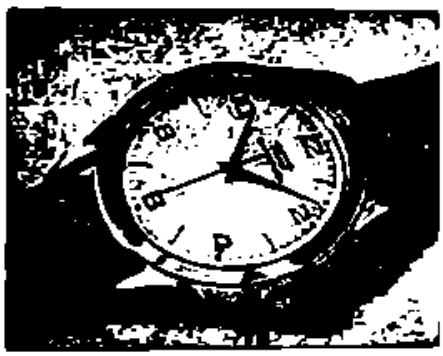

রিপেয়ারিংএ আমাদের এত সুনাম কেন?

- আমরা প্রত্যেক ঘড়ির জন্য অরিজিনাল পার্টস ব্যবহার করিয়া থাকি।
- যে ঘড়ির জন্য যে কারিগর অভিজ্ঞ সেই ঘড়ির জন্য সেই কারিগর দ্বারাই মেরামত করান হয়।
- আমাদের কারিগরেরা প্রায় সকলেই সুইস ফার্মে ট্রেনিংপ্রাপ্ত।
- ক্রমবর্ধমান মূল্য বৃদ্ধি সত্ত্বেও আমরা পূর্বের চার্জেই মেরামত করিতেছি।
- ঘড়ি মেরামতের প্রয়োজনে আমাদের সহিত পরামর্শ করিতে অনুরোধ জানাইতেছে।
- মফঃস্বলের জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা আছে।

চৌধুরী'জ

ঘড়ি, পেন ও চশমা বিক্রেতা
নেতাজী সুভাষ রোড, কলিঃ-১
ফোন : ২৩-০৬৭৩

ক্ষণিকের জন্য রোমাঞ্চিত দেহে বিশ্বচিমুচ যিশু দাঁড়িয়ে রইলেন। এই প্রথম জনতার সামনে তাঁর চিন্তার ফল প্রকাশের প্রচেষ্টা। ক্যানা শহরের ভোজসভায় মায়ের অনুযোগ শুনে, মত্ত মানুষের বিচিত্র ব্যবহারে মনে জেগেছিল বৈরাগ্য।

নাজারেথের ক্ষুদ্র গণ্ডী ছেড়ে পা বাড়িয়েছিলেন বাইরের পৃথিবীতে। তারপর এসেছেন এই জনবহুল শহরে। বক্তৃতার প্রারম্ভে প্রথম দারির পণ্ডিতদের চোখে প্রশ্নের কুটিল রেখা তাঁকে বিচলিত করেছিল। পরক্ষণেই কিন্তু আত্মবিশ্বাস তাঁকে প্রবুদ্ধ করেছে, আকর্ষণ করেছে সহজ সরল দীবর আর কৃষক শ্রোতাদের অধীর আগ্রহ। যদি এদের জাগানো যায়, জানানো যায় তাঁর সাধনালব্ধ সত্য!

হঠাৎ এই ভরদ্বপ্রহরের চীৎকার, শ্রোতাদের মুখে শঙ্কার ছায়া, চাঞ্চল্য আর কোলাহলের মাঝে দাঁড়িয়ে যিশুর অন্তর আচ্ছন্ন হল বিষাদের মেঘে। ঠিক এইরকম হয়েছিল, ভোজের আসরে মা যখন বলেছিলেন "এদের মদ ফুরিয়ে গেছে।"

দ্রুত পদক্ষেপে যিশু সেই ভরদ্বপ্রহরের লোকটির দিকে এগিয়ে গেলেন। জনতা সম্ভ্রমের সঙ্গে পথ ছেড়ে দিল। বসলেন লোকটির পাশে। বজ্রমুষ্ঠিতে ধরলেন তার কাঁধদুটো। তীব্র দৃষ্টি আলোর রেখার মত অসুস্থ মানুষটির মুখের পরে স্থিরনিবদ্ধ হল। কণ্ঠস্বরে ধ্বনিত হল কঠিন আদেশের সুর—শান্ত হও, উঠে পড়। ধীরে ধীরে লোকটির নিশ্বাস স্বাভাবিক হল। যিশুর চোখের আলোর স্পর্শে যেন কেটে গেল তার মোহান্ধকার। বিস্মিত জনতার মন বলে উঠল—আশ্চর্য! তবে তো এই মানুষটির আদেশে অপদেবতা অসুস্থ মানুষটাকে ছেড়ে চলে গেছে! উঠে বসলো লোকটি। যিশু সংহত চিত্তে অসুস্থ মানুষটির মনে সঞ্চারিত করেছেন তাঁর বিশ্বাস। বিশ্বাসের বাতাস পেয়ে মনের আকাশে হয় মেঘমুক্তি। আর সেই তো মোহগ্রস্ত মানুষের রোগমুক্তি।

প্রস্থানরত মানুষের ভীড় দিয়ে ঘর ছেড়ে যিশু বার হয়ে গেলেন। দেহ-মন আচ্ছন্ন করে নেমেছে অপার ক্লান্তি। আনন্দের অনুমাত্র অন্তরে অবশিষ্ট নেই। শূন্য, সব শূন্য। আচ্ছন্নের মত লোকালয় ছেড়ে আশ্রয় নিলেন

হ্রদের তীরে। মাটির বুকে লুটিয়ে পড়লেন—মায়ের বুকে মুখ গুঁজে শিশু যেমন সন্ধান করে অমৃতের।

পড়ন্ত সূর্যের ম্লান আলোয় দূরে সমুদ্রের জল চিক্ চিক্ করছে। আশেপাশে ছবির মত ছোট ছোট জনপদ। হ্রদের তীরে বসে দেখছিলেন যিশু। সমুদ্র দেখলেই মনে পড়ে যায় রোমের কথা, সম্রাট টাইবেরিয়াস আর শাসন-কর্তা হেরডের কথা। একটু দূরেই নূতন শহর টাইবেরিয়াস, প্রাদেশিক শাসনকর্তা হেরড অ্যান্টিপাসের রাজধানী। হেরডের কারাগারেই বন্দী হয়ে আছেন শুদ্ধিদাতা জন। পরক্ষণেই মনে হয়, এরা সব তুচ্ছ। যেখানে তাঁর প্রেরণার উৎস, সেখানে কোনো ধনী বা শাসকের সামান্যতম মূল্যও নেই।

অমূল্য এই অনুভূতি দিয়ে আহরণ করা অপূর্ব সব অভিজ্ঞতা! ভাসা ভাসা কোনো জিনিস দেখা যিশুর স্বভাব নয়। তাঁর কবিদৃষ্টিতে সব কিছুই বিকশিত হয় নূতন ব্যঞ্জনায়। সর্বত্রই আপাত অনৈক্যের মাঝে ধরা পড়ে এক অন্তর্নিহিত ঐক্য। সামান্যতম বস্তু প্রতিভাত হয় অসামান্য অর্থ নিয়ে, মস্তিষ্কের কোষে কোষে তোলে চিন্তার গুঞ্জন।

গোধূলির আবছা আলোয় জলের বুকে ছায়ার মত ভাসছে মাছধরা নৌকার সার। টানা জালে কখনো চিক্ চিক্ করছে মাছ—পরক্ষণেই জাল খালি হয়ে ভরে উঠছে নৌকার খোল। এবার জেলেরা জোরে দাঁড় ফেলে ফিরে আসছে ডাঙ্গায়। রাতের আঁধার ঘনিয়ে এলো বলে।

দু'জনের সঙ্গে আলাপ হল। জনের শিষ্য অ্যান্ড্রু আর তার ভাই সাইমন। এই সাইমনই যিশুর ভবিষ্যতের প্রিয় শিষ্য পিটার। আরো দু'জন পাশে এসে দাঁড়াল। জেমস্ আর জন। এরা প্রত্যেকে বক্তৃতার সময় উপস্থিত ছিল, যিশু এদের পরিচিত তাঁর অন্তরোৎসারিত সুসমাচার এদের অন্তর স্পর্শ করেছে। তাঁর সঙ্গে এরা আত্মীয়তা পাতাতে উৎসুক। যিশু সাইমনের নিমন্ত্রণে সাড়া না দিয়ে পারলেন না।

সাইমনের ঘরেও রুগী—জ্বরে তার শয্যাশায়ী শাশুড়ী শয্যাসঙ্গিনী। ঘরভর্তি মানুষগুলোর মুখে নীরব আবেদন। একজন রুগীকে তিনি সুস্থ করেছেন: যদি দয়া করে এই বৃদ্ধার প্রতি করুণা দেখান! এদের চোখের ভাষা বুঝতে যিশুর কষ্ট হয় না। কিন্তু কষ্ট হয়, বুক ভারী হয়ে ওঠে এই অবাঞ্ছনীয় কর্মের তাগিদে। তা হলে কি এদের কাছে তাঁর মূল্য নির্ধারিত হবে অলৌকিক কার্যকলাপের মাপকাটিতে?

এতো তিনি চাননি। কিন্তু এর থেকে বুঝি নিস্তারও নেই। যাদু দিয়েই এই সব মূঢ়, মূঢ় মানুষকে জাগাতে হবে। যিশু রোগীর চোখে চোখ মেলালেন। যিশুর আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই রোগিনীর বুক ভরে উঠেছিল এক অভূতপূর্ব বিশ্বাসের প্রেরণায়। এই দৃষ্টি বিনিময়ের মুহূর্তে, রুগী আর যোগী, কামনা আর করুণা, দুই প্রবল ইচ্ছাশক্তির স্রোতে ভেসে গেল রোগের গ্লানি। রোগমুক্ত বৃদ্ধা ছেলে উঠে বসলেন।

সাইমনের আতিথ্য নিয়ে দিন স্বচ্ছন্দে চলে যাচ্ছিল। অবশ্য অন্তরে সঙ্কোচ আর সন্দেহ ছিলই। প্রত্যহ কুটিরের দরজায় অসংখ্য পঙ্গু, কতাক্ত, অন্ধ মানুষের ভীড় হয়। যিশু সবাইকে সান্ত্বনা দেন—এই আমার ঈশ্বরাদিষ্ট কাজ। আরোগ্যের প্রচেষ্টায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। কেউ সেরে ওঠে, কেউ যন্ত্রণা থেকে সাময়িক মুক্ত হয়। কেউই কিন্তু তাঁর আন্তরিক স্নেহ আর সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হয় না। সকলকে বলেন—"নিরাময়ের প্রধান উপকরণ হচ্ছে ঈশ্বরে বিশ্বাস।"

আর্ত মানুষের কাছে বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের প্রশ্ন অবান্তর। তাঁর দৈবশক্তির কথা অতিরঞ্জিত ও পল্লবিত হয়ে দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। কুটিরের দরজায় ভীড় বেড়ে চলে। শেষে একদিন বাধ্য হয়ে সূর্যোদয়ের আগেই চুপি চুপি যিশু ক্যাপরনাম পেছনে ফেলে ধরলেন পায়ে চলার পথ। যাদু দিয়ে যোগ্যতা অর্জন তাঁর কাজ নয়। মানসিক সাম্য ফিরে পেতে হবে। প্রয়োজন নির্জন, নির্বান্ধব কোনও স্থান।

অজ্ঞাতবাস কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হল না। নিরক্ষর, সহজ, সরল মানুষরা তাঁকে খুঁজে বার করলো। পুরুষদের সঙ্গে এলো নারীরা। ক্যাপরনামের অদূরে হ্রদের তীরে যিশুকে ঘিরে আর্ত মানুষের আসর আবার বেশ জমে উঠল। পুরুষরা মাছ ধরতে যায় হ্রদ।

নারীরা বেলাভূমে বসে জাল বোনে। তাদের পাশে বসে যিশু বোনেন কাহিনীর জাল। ঝিনুকে রোদের আলো ঠিকরে পড়ে, বাতাসে চুল উড়ে চোখ ঢেকে দেয়, ঢেউ এসে ছলাৎ করে গড়িয়ে পড়ে তীরের গায়ে। এই পরিবেশে যিশুর অন্তরের দুয়ার খুলে যায়। স্বর্গীয় নিকন তুলে তাঁর কণ্ঠ থেকে ঝরে পড়ে আলোর মত উজ্জ্বল, মুক্তোর মত শুভ্র আর নিটোল এক একটি রূপকাখ্যান। এখানে সবই সহজ। এখানেই তো বলা যায় স্বর্গরাজ্যের কথা!

অন্তরের বিপুল উদ্দীপনার আলোয় পৃথিবীটা মনে হয় কত ছোট। হ্রদের তীরে তীরে কয়েক পা হেঁটে গেলেই এক একটি গ্রাম, জলে এক ঘণ্টা নৌকা বাইলেই পৌঁছন যায় হ্রদের ওপার। এক নূতন প্রেরণায় যিশু শুরু করলেন হ্রদের আশেপাশের সহর আর গ্রাম পরিক্রমা। সকলে তাঁর কাছে এগিয়ে আসুক এ তাঁর কামনা নয়। তিনিই যাবেন তাদের কাছে। পরিক্রমা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়। পার্শ্বচরের সংখ্যা বেড়ে চলে। ক্রমশঃ বিস্তৃত হয় তাঁর প্রভাবের পরিধি।

যিশু লক্ষ্য করেন—এই সব মাটির মানুষদের মধ্যে দর্শনের প্রবল, কৌতূহল প্রচণ্ড। সহজেই এরা তাঁর মত প্রাজ্ঞানান তাপসের ডাকে সাড়া দিয়েছে, তাঁকে অনুসরণ করছে, ঝরে পড়েছে তাঁর অনুরক্ত। ভক্তি এদের সহজাত, বিশ্বাস এদের মর্মগত। অধিকাংশই জেলে, না আছে সম্পত্তির টান, না সংসারের বন্ধন। দৈনন্দিন জীবনের অন্ধকার থেকে নূতন অভিজ্ঞতার আলোয় নিশ্বাস নেবার আশায় এরা সানন্দে শুভ সংবাদদাতার অনুগামী হয়েছে। কোন্ অলক্ষ্য শক্তির ইসারায় এদেরই সঙ্গে গড়ে উঠেছে তাঁর আত্মার আত্মীয়তা।

উপত্যকা বেয়ে পাহাড়ী অঞ্চল থেকে নেমে আসে শক্ত দেহ, সুস্থ মন, মানুষের দল। নূতন কবিরাজকে, নবীন যাদুকরকে, তারা দেখবে। শুনবে তাঁর মধুক্ষরা বাণী। নদীর তীরে অসংখ্য তীর্থযাত্রীর সমাগম। একটা জেলে ডিঙ্গির ওপর উঠে দাঁড়ান যিশু। একটু ঠেলে দিলেই ডিঙ্গিটা জলে ভাসে আর দোলে। শুরু হয় তাঁর মন দোলানো ভাষণ। নদীর স্রোতের মৃদু কল্লোলের সঙ্গে, মিষ্ট বাতাসের বাহনে, একটির পর একটি রূপকাখ্যান এসে ভেঙ্গে পড়ে মুগ্ধ শ্রোতাদের মনের দুয়ারে।

অনেক বিশ্লেষণের পর এই সব সরল মানুষের মনের সুপ্ত, সচেতন তারে ঝঙ্কার তোলবার সূত্রটি আয়ত্ত করেছেন যিশু। গল্পের ছলে না বললে, রূপকের সাহায্যে রূপায়িত না করলে স্পর্শ রাখা যায় না এদের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে।

এরা যে কথা যেমন ভাবে শুনতে চায়, সেই কথা ঠিক তেমনিভাবে শোনাতে হবে। শ্রোতাদের মধ্যে নারী আর শিশুর অভাব নেই। বক্তব্য তাই সহজতর, সরলতর করতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রয়োজন হলে অসুস্থকে আরোগ্যের প্রচেষ্টাও করতে হবে। এদের মনের দরজায় গিয়ে দাঁড়াবার পথে কোন বাধাতেই ক্ষান্ত হলে চলবে না। ইহুদিদের শাস্ত্রমতে ঈশ্বর নিরাকার, তাঁর রূপ কল্পনা পাপ। যিশু কিন্তু এদের সামনে নিরুদ্বেগে কথা দিয়ে ছবির পর ছবি আঁকেন—"স্বর্গে" ঈশ্বর সম্রাটের মহিমায় বসে আছেন সিংহাসন আলো করে, পৃথিবী তাঁর পদবিশ্রামের উপকরণ। ঈশ্বর এক দ্রাক্ষাকুঞ্জের অধীশ্বর, একজন বন্ধুবৎসল গৃহস্বামী, একজন বহু ক্রীতদাসের মালিক।

যিশু বড় সহরে ভুলেও যাবেন না। টাইবেরিয়াস সহর তাঁর দেখা হয়নি। তাঁর মনে হয়—শক্তি আর সম্পদের লোভে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে-চলা সহরে মানুষদের তাঁর কথা শোনবার সময়, সুযোগ, সুমতি, কিছুই নেই। আরো দক্ষিণে জুডিয়ার রয়েছে ইহুদীদের সুবিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র। সেখানে পুরোহিতদের একাধিপত্য। শাস্ত্রের ব্যাখ্যায়, ক্রিয়া-কাণ্ডের কলরোলে সেখানকার আকাশ-বাতাস মুখর। এই পুরোহিতদের সঙ্গে একাধিক বার তাঁর সংঘর্ষ হয়েছে। এদের তিনি জানেন। এরা তাঁর শত্রু।

যিশু জেরুজালেম থেকে অনেক দূরে রইলেন।

[ক্রমশঃ]

আমরা বাঁচবো

(সোভিয়েত চিত্রনাট্য)

লিওনিড লিওনভ

সমকালের মানুষ তার বুদ্ধির, বিবেকের, আশা, আকাঙ্ক্ষার, প্রচেষ্টা আর উদ্যমের যা কিছু মিলিত সাধনা সাফল্য সবরূপে যার অনাগত কালের উদ্দেশ্যে। ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে সভ্যতার পূর্ণতার বাণী এই শাশ্বত সত্যকেই বহন করে চলেছে যুগে যুগান্তরে। মানুষের অমরত্বের স্বাদ এই সত্যেরই সহজাত। কিন্তু আধুনিক মিঃ ম্যাকফিনলেরা এই সত্যকে গ্রহণ করতে দ্বিধাগ্রস্ত। অনাগত কাল, সেতো অনেক দূর। সভ্যতার অগ্রগতি সেতো অকল্পনীয়, অবাস্তব। তাহলে মানুষ কি আর ভালোবাসবে না তার প্রকৃতির স্বভাবে? তাই হয়তো বিভ্রান্ত মন শুধু ফিরে ফিরে এই ভালোবাসার প্রশ্নটাকে, বিশ্বাসের গভীরতাকে যাচাই করে নিতে চায় শিশু মনের মাধ্যমে, ভবিষ্যত পৃথিবীর নাগরিকদের জীবনে। আমাদের মিঃ ম্যাকফিনলে সেই অগণিত দ্বিধাগ্রস্ত, সংশয়াকুল মানুষদেরই একজন।

পাড়ায়, ছোট ছোট পড়শীদের মধ্যে ম্যাকফিনলের জনপ্রিয়তা সত্যিই বিস্ময়কর। রাস্তায়, মাঠে ঘাটে সবসময়েই তার সহযাত্রী একদল নানা বয়সের ছেলেমেয়ে। রাস্তার মোড়ে কিম্বা পার্কের বেঞ্চে ম্যাকফিনলের সাথীরা তাকে ঘিরে থাকে অসীম বিস্ময়ে আর অকারণ পুলকে। তার সঙ্গের নানা টুকিটাকি জিনিসের দিকে তাদের নজর এতো বেশি যেন মনে হয় যে কোন মুহূর্তে তারা নিজেদের মধ্যে মালিকানা নিয়ে একটা তুমুল হট্টগোল বাধাতে পারে। কলমুখরিত একদল তরুণ বন্ধুর মাঝে স্মিতমুখে ম্যাকফিনলের প্রশ্নপূর্ণ ভঙ্গি, এ অঞ্চলের প্রতিটি বয়স্কলোকেরই অতিপরিচিত দৃশ্য। অনেকটা ঠিক যেন চেরীগাছে বসে থাকা একদল প্যারোর মতো।

কোন কোন কল্পনাপ্রবণ মনে ম্যাকফিনলের এই তরুণ সঙ্গীপরিবৃত ছবি মনে হয় ভবিষ্যতেরই কোন একটা শুভ ইঙ্গিত। ব্যক্তিগত জীবনে নিঃসঙ্গ ম্যাকফিনলের তাঁরা একটা পরিপূরণের ছায়া এর মধ্যে খুঁজে পান। অন্যদিকে ম্যাক বসে থাকে অসীম কৌতূহলে রাস্তার দিকে চেয়ে, আর মনে মনে নানা কথায়, কাহিনীর জাল বোনে। ওই তো একজন মাঝ বয়সী মহিলা মাঠের মধ্যে এসে পড়লেন। বেশ শক্ত সমর্থ চেহারায় একটা বাঁধুনি আছে। তারপর মহিলাটি এসে দাঁড়ালো তার সামনে। ম্যাক উঠে পড়ায়! তারা দুজনে হাতে হাত দিয়ে হাঁটে চারিদিকে! সেজেগুজে ছেলের দল, একে একে, দুয়ে দুয়ে, সার বেঁধে আসছে! যেন ম্যাকফিনলেরা চলেছে কোথাও দল বেঁধে! কেমন যেন একটা পরিপূর্ণতার ভাব! কিন্তু না, সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় নিজের পরিচিত সংস্কার আর বিশ্বাসের কথা, কিম্বা খুঁটিয়ে পড়া খবরের কাগজের জোরালো, বড়ো বড়ো শিরোনামার কাহিনী...ওই যে বোল্ডার কোম্পানীর বিজ্ঞাপনটির পরিচিত বয়ান: "সঞ্চয় করার জন্যে বা মরণের জন্যে তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই! জীবন তার তালে বয়ে চলেছে! আপনার জীবনীর বোল্ডার এণ্ড কোম্পানীর সঙ্গে ব্যবস্থা করে রাখুন!" কিম্বা "আরামদায়ক। লাভজনক আর নিরাপদ বোল্ডারদের ন্যালডাভোরিয়া।" কিম্বা আরেকটা একটু বেশি স্পষ্ট হেঁয়ালি: "আপনার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা খুবই কম! বোল্ডার ন্যালডাভোরিয়মের প্রথম দু হাজার আসনের টিকিট নিঃশেষিত! আগামী কাল আপনার আর নাও আসতে পারে!" মনটা ভাবতে ভাবতে ভাবনার তলায় হারিয়ে যায়।

* *

রাতের খাওয়ার পালা শেষ করে ম্যাক বসলেন সেদিনের কাগজখানা টেনে নিয়ে। কিন্তু একি! বড়ো বড়ো জ্বলজ্বলে শিরোনামায় ছাপা রয়েছে: "ইন্দোনেশিয়ার দারুণ লড়াই। অতন্ত্র বাসার বোমার [illegible]

অস্ত্রশস্ত্রে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ।" আরেক জায়গায়: "যুদ্ধখাতে ব্যয়বৃদ্ধি! ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণের জন্যে আরো ৩০ মিলিয়ন ব্যয় মঞ্জুর।" আরেকটা খবর: "হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণ। বিস্ফোরণ স্থলে অর্ধ কিলোমিটার পরিমিত ভয়াবহ গহ্বর সৃষ্টি।" আর এরই পাশে ছোট একটা খবর কালো বর্ডারে চোখে পড়ার মতো করে ছাপা। "আটলান্টিক শক্তিবর্গের সেনাপতিদের শলাপরামর্শ।"

চোখ দুটো ক্লান্ত হয়ে ওঠে। কাগজখানাকে এক-পাশে ঠেলে ম্যাক উঠে পড়ে। ঘরময় একটু পায়চারি করে। তারপর এসে বসে টেলিভিশনের সামনে। ধীরে ধীরে চাবিটা ঘোরাতে থাকে। পর্দার ওপর ছবি ভেসে ওঠে···একটা বিমানবাহী জাহাজের যাত্রা হলো সুরু। ধারাবিবরণী চলেছে। বক্তার কণ্ঠস্বরে কেমন যেন একটা ঘাবড়া সুর। মন্তব্যও যথেষ্ট শ্লেষপূর্ণ। তিনি বললেন: "এই আত্মরক্ষার বাদস্বাহীন বিমানবাহী পোত আমাদের আণবিকবিভাগে গতকালের শব্দযুগতির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। বায়ের তুলনায় এদের কার্যকরিতা আজ আর যথেষ্ট বলে করার কারণ নেই।"

সত্যিই তাই! গতকালের যুদ্ধ আজকের যুদ্ধের সম্ভবনার কাছে পিকনিক করার মতো ব্যাপার। সেখানে ছিল দৈত যুদ্ধের মহড়া, কামানটানার তোড়জোড়, ক্যাম্পের সামনে আগুন জেলে ভোজসভার হুল্লোড়, অপরিমিত পান ভোজনের আনন্দ, আর অতি উৎসাহীদের জন্যে ঘড়ের গাদার আড়ালে ঘনায়মান অন্ধকারে অপরিচিত দেশের অপরিচিতার কারোক আলিঙ্গনের হাতছানি। মহাযুদ্ধের দামটে সেই ছবি বদলে গেল। বিজ্ঞানে আর ব্যবহারিকজ্ঞানে হাত মেলাল যুদ্ধের তীব্রতা, ব্যাপকতাকে মানুষের সহ্যশক্তির আয়ত্তের বাইরে নিয়ে যেতে। দুনিয়ার চেহারাটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ রাতারাতি এমনভাবে বদলে দিল যেন এক দশকের আগে ও পরের জীবনটাকে একেবারে অচেনা মনে হয়।

টেলিভিশনের চাবি অসহিষ্ণু ম্যাকবিনলের হাতের চাপে কেঁপে কেঁপে ঘুরতে থাকে। আরেকটা ছবি এবার ভেসে এলো।

রাতের আকাশের বুক চিরে সার্চলাইটের আলোটা এপার ওপার করছে। সেই আলোর রেখায় মূর্ত হয়ে উঠলো ছায়াগুড়ি দিয়ে চলা কয়েকটা মানুষ। কটা হবে একটা, দুটো, তিন,···ছ'টা লোক নিঃশব্দে যাচ্ছে। সঙ্গে তাদের প্রত্যেকের ছোট ছোট প্যাকেট আরকি সব সাজ সরঞ্জাম।···ওকি তারা একটা পুলের আড়ালে সব থেমে গিয়ে কি করছে! কি যেন তারা বসিয়ে দিল তার-পর আবার চুপিসাড়ে একটা দড়ির মতো টেনে টেনে পিছু হঠতে লাগলো। কি ওটা টাইম বোমা! তাইতো দেখি! ওধার থেকে সাঁজোয়া গাড়ীর একটা কনভয় আসছে। তারপর, তারপর দারুণ এক বিস্ফোরণের শব্দ রাতের অন্ধকারকে খান খান করে ভেঙে দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে কট কট করে এধার থেকে যেন হাজার হাজার মরণ কাঁপিয়ে পড়ল লাল আলো জেলে রাতের অন্ধকারের বুকে।

ম্যাকবিনলের হাত কাঁপতে থাকে, কিন্তু তবুও সে চাবি ঘোরায় টেলিভিশনের। কিছুটা স্বস্তি চাই, একটু শান্তি চাই, একটু ঘুমিয়ে পড়ার মতো নিরুত্তাপ আকাশ চাই।

চাবিটা ঘুরছে ক্রমাগত। থেকে থেকে টুকরো টুকরো কথার রেশ ভেসে আসার আগ্রহে, ম্যাকের হাত ধরে মিনতি জানায়। ম্যাক থামবে কি থামবে না ভাবতে ভাবতেই তারা আবার হারিয়ে যায়। ভিড় করে আসে আরেক ঝাঁক শব্দ। মেশিনগানের গুলির মতো। যেন সব কথাগুলোর মধ্যে একটাই শব্দ উঠছে কট কট কট।

কতো ছবি ভেসে ওঠে, টেলিভিশনের বুকে। ম্যাকের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়। একটু ফাঁক নেই, একটু বিরতি নেই, একটানা একরাশ কথা, আর ছবি, ভেসে ওঠে আর হারিয়ে যায়। সব কথারই মানে এক, সব ছবিরই অভিব্যক্তি এক। কাঁপা কাঁপা হাতটা টেলিভিশনের চাবি থেকে খসে পড়ে। কেমন যেন সব ফাঁকা ফাঁকা মনে হয়। ঘরটা, বিছানাটা, টেবিল, চেয়ার, দরজা জানলা সব গুলো একবার দারুণ বেগে ঘুরে উঠেই সব একাকার হয়ে যায়। ম্যাক চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ে। তারপর·····

·····তারপর ম্যাক চলতে থাকে, জোর কদমে। কাঁধে রাইফেল, গলায় ঝোলানো ব্যাগে কত রকমের

টুকিটাকি। কোমরে বাহুদের বেল্ট। থেকে থেকে হাত দিয়ে দেখে সব ঠিক আছে কিনা? তারা ছুটছে, সমানে ছুটছে সামনের দিকে। থামবে না, কাজ শেষ না করে থামবে না, এই তাদের শপথ। কিন্তু তবু থেমে পড়ে ম্যাক। কি যেন দারুণ জোরে এসে তার মাথার ওপরে কেটে পড়ে। হাতের রাইফেল তোলার আগেই সে লুটিয়ে পড়ে মাটীতে। তার সঙ্গীরা, তারা গেল কোথায় ম্যাক জানে না। জানতে পারেও নি কোন দিন।.....

যখন তার ঘোর কেটে যায়, একটু সম্বিত ফিরে আসে ম্যাক যেন হামাগুড়ি দিয়ে আত্মরক্ষার ভঙ্গীতে এগিয়ে যায়, জলের গেলাশটার দিকে। জানলার বাইরে বোল্ডার কোম্পানীর সাবধানী বিজ্ঞাপনটা তখনও জোরালো হয়ে জ্বলছে।

ম্যাকের মতো আরো যারা দেশের দিকে দিকে ছড়িয়ে আছে তাদের কাছে আকস্মিক ভয়াবহ মৃত্যুর সম্ভবনাটা সর্বক্ষণ বুকে বোঝার মতো চেপে থাকে। মানসিক উত্তেজনার এই সুযোগে বাজারে বেরুতে থাকে হরেক রকম দাওয়াইয়ের কবমুলা। কি করলে, কি খেলে মানুষ পরিত্রাণ পাবে তার অস্তিত্বের এই যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতি থেকে। এই রকমই একটা পরিত্রাণের পথ খুঁজতে গিয়ে, গবেষকরা ম্যাককে ডেকেছিলেন বিশেষজ্ঞের মতামত দেওয়ার জন্যে।

মস্ত বড়ো একটা হলে সভা বসেছে। নানা জ্ঞানী গুণীজন উপস্থিত। আলোচনা সুরু হলো। সভাপতি মশায় মিঃ কিনরে নামে এক বিজ্ঞানীকে আহ্বান জানালেন, তাঁর আবিষ্কারের বিবরণী পেশ করতে। মিঃ কিনরে ধীর পদে উঠে এলেন মুখে তাঁর একটা আত্মতুষ্ট ভাব। তিনি বলতে সুরু করলেন: 'আজকের জীবনের জটিলতার জন্যে মানুষের স্নায়ুর ওপর চাপ পড়ছে খুব বেশি।—বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করতে না পারলে এই স্নায়বিক চাঞ্চল্য কমবে না। তাই ধরুন এমন যদি কোন ট্যাবলেট খাওয়া যায়, যাতে মানুষ দিনের মধ্যে খুশি মতো আত্মস্থ হয়ে থাকতে পারে তাহলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। আমি তাই একটা ট্যাবলেটের কথা বলছি, ধরুন তার নাম হলো 'স্বপ্ন'। ওটা খাওয়ার অল্প পরেই পাকস্থলীতে গিয়ে একটা বিস্ফোরণ ঘটাবে। না, না, ঘাবড়াবার কিছু নেই এতে। সেই বিস্ফোরণের প্রতিক্রিয়া আপনার সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রী গুলো এমন আঘাত পাবে যে তারা অবশ হয়ে পড়বে। আপনি প্রায় অজ্ঞানের মতো কিমিয়ে থাকবেন। তখন যদি বাইরে আণবিক বোমার বিস্ফোরণও ঘটে, তাতেও আপনার ঝিমুনি ভাঙ্গবে না। তাহলে দেখা যাচ্ছে ট্যাবলেটের গুণে আত্মস্থ হয়ে আমরা বাইরের দুনিয়াকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে পারি। মিঃ কিনরে তাঁর বক্তৃতা শেষ করলেন। সভাপতি মশায় তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বল্লেন: "যদি যে ট্যাবলেট খাবে তার ব্যক্তিগত অস্তিত্বের কথা আমরা উপেক্ষা করতে চাই, তা হলে এর চেয়ে ভালো কোন ওষুধ আর হতে পারে না। কারমাকো-পিয়ার ইতিহাসে এটা একটা বিরাট সংযোজন। ব্যক্তিগত ভাবে আমি অবশ্য আর দেশ দুইস্কির সঙ্গে খানিকটা স্ট্রিকনিন বেশি পছন্দ করবো।

সভাপতি মশায় তারপর সমবেত জনগণকে জিজ্ঞাসা করলেন তাঁদের কোন বক্তব্য বা প্রশ্ন আছে কিনা? বিষ বিশেষজ্ঞের মতামত পড়তে চাওয়ায়, তিনি রুলিং দিলেন যে তার কোন দরকার নেই। জনৈক সৌম্য দর্শন বৃদ্ধ মন্তব্য করলেন: এই প্রথম বোধহয় রসায়ণবিদ্যায় এমন একটি ট্যাবলেট প্রস্তুত প্রণালী আবিষ্কৃত হলো যা সমস্ত মানুষের ক্রয় ক্ষমতার নাগালের মধ্যে।

আরেকজন বিজ্ঞানী তাঁর কেশহীন মাথা দুলিয়ে জিগ্যেস করলেন, আচ্ছা মিঃ কিনরে এই ওষুধের প্রতিক্রিয়ার কথা তো কিছু শুনতে পেলাম না।

মিঃ কিনরে যেন প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। তিনি তড়িৎগতি উঠে এসে জবাব দিলেন এর ফলাফল সম্পর্কে প্রচুর পরীক্ষায় এটাই জানা গেছে যে জীবদেহের ওপর এর কোন অনিষ্টকর প্রতিক্রিয়া নেই। কেবল ওষুধ খাওয়ার পর লোকে দারুণ হাসতে সুরু করে, যা ধীরে ধীরে উপস্থিত সমস্ত লোকের মধ্যে সংক্রমিত হয়। আর হাসির বেগ আস্তে আস্তে এমন এক স্তরে পৌঁছায় যখন তারা তাদের পরিবেশের কথা সম্পূর্ণ ভুলে যায়। শুধু তাই নয় পরে এমনই অবস্থা দাঁড়ায় যে আর ওষুধ খাওয়ার

দরকার হয় না। ওষুধের শিশিটা দেখলেই অনুরূপ ক্রিয়া সুরু হয়ে যায়। তবে হ্যাঁ, এর একটা ত্রুটীও আছে, সেটার কথাও বলে রাখা দরকার। সেটা হলো এই ওষুধের ক্রিয়া এক নাগাড়ে প্রায় ছ'মাস কাল চলতে পারে। আপনারা যদি চান তো আমি এখনই পরীক্ষা করে দেখাতে পারি।

দু'একজন করে অনেকেই আস্তে আস্তে ওষুধের ক্রিয়া চাক্ষুষ দেখতে চাইলেন। তখন একজন রোগাটে, পাগলাটে লোককে আনা হলো মঞ্চের ওপর। মিঃ ফিনয়ে একটু দূর থেকে ওষুধের শিশিটা তাকে দেখালেন। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লোকটী যেন দারুণ হাসিতে ফেটে পড়ল। আরো দেখা গেল যে সেই হাসির বেগে হলের সমস্ত লোক তখন এর ওর গায়ে হেসে গড়িয়ে পড়ছে, আর যেন ধীরে ধীরে তার থেকে একটা চাপা কান্না মেশানো স্বর ভেসে আসছে। হেসে লুটিয়ে পড়া লোকটিকে মঞ্চের উপর থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হোল।

আরেকদিন আরেকটা আলোচনার ব্যবস্থা করা হলো আণবিক এক গবেষণা নিয়ে। আণবিক যুদ্ধের কবল থেকে এড়িয়ে যাওয়ার পথ খোঁজার এটাকেও যুগান্তকারী বলা যেতে পারে। বক্তা বেশ খোশমেজাজে বলে যাচ্ছেন: ছোটবেলা থেকেই তো আপনারা মনে মনে আকাশচারী হতে চেয়েছেন। ভেসে যাওয়া মেঘের মতো, বাতাসে মিলিয়ে যাওয়া পাখীর মতো। আজকে বিজ্ঞান আমাদের সেই আশা অনেকটা পূরণ করেছে। মনে করুন যদি আমরা সবাই যুদ্ধ বাধার সঙ্গে সঙ্গেই কিম্বা একটু আগে শব্দের গতিতে মহাশূন্যে উঠে যাই, যেখানে দু'বছরে আমরা যতো 'সময়' অতিক্রম করবো তা পিছনে ফেলে থাকা পৃথিবীর অন্তত কয়েক শ বছরে সমান হবে।

বলতে বলতেই তিনি ইঙ্গিত করলেন আর বোর্ডে একটা সমীকরণের ছবি দেখা গেল। ছবি সংখ্যাগুলোকে গণিতিক নানা সূত্রের সাহায্যে যখন তিনি ব্যাখ্যা করে চলেছেন, ঠিক তখনই হলের কোন থেকে একটা অসহিষ্ণু কণ্ঠ শোনা গেল···

আচ্ছা কিসের করতে পারি কি সভাপতি মশায়, এই কাল্পনিক কথা ছেড়ে, আমরা যুদ্ধ বন্ধ করার জন্যে বাস্তবীকরণ বা ঐ জাতীয় সোজা পথ কি বেছে নিতে পারি না।

সভাপতি মশায় টেবিলে সজোরে হাতুড়ি ঠুকে বললেন, অর্ডার, অর্ডার, আমরা সস্তা প্রোপাগ্যাণ্ডা শুনতে আসি নি। তিনি বক্তাকে তাঁর আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করলেন।

বক্তা আবার সুরু করলেন: আমাদের সমকালের মানুষের রূঢ় বাস্তবতাকে এড়িয়ে যেতে চান। তাঁদের জন্যে বলছি যে আমাদের পরমবন্ধু ডঃ রিচার্ড লাস্টিগ্ সমুদ্রের তলদেশে দীর্ঘদিন নিরাপদে অবস্থান করতে পারে এমন এক ধরণের রকেট তৈরী করেছেন, যাতে বসবাস করে আমরা মাটির পৃথিবীর ভয়াবহতাকে এড়িয়ে যেতে পারি।

এই সুবিশাল রকেটগুলির মধ্যে আমাদের অভ্যস্ত জীবনের প্রয়োজনীয় সমস্ত উপকরণ রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মহাকাশে যে রকেট পাঠানোর কথা বলছিলাম তারই একটা আগামী কয়েক শ' বছরের জন্যে মহাশূন্যে যাত্রা করেছে, কেপ ক্যানাভেরাল থেকে। আপনারা নিশ্চয়ই এই রকেট পরীক্ষার কেন্দ্রটির কথা জানেন। ছাড়ার সময় কি একটা স্থানীয় যান্ত্রিক গোলযোগের জন্যে, শূন্যে ওঠার অল্প পরেই রকেটের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আর আমাদের জীবিত কালে আর তাদের খবর আমরা পাব না। তারা এতক্ষণে সৌরমণ্ডলের সীমাও অতিক্রম করে গেছে।

একটু থেমে তিনি আবার সুরু করলেন: আপনারা যদি চান তো আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই যে রকেটটি পাঠানো হবে, তা সচক্ষে দেখে ভবিষ্যতের ভয়াবহতার হাত এড়াতে পারেন। পরীক্ষকরা আমাদের রকেটে দু'টি আসন দিতে রাজী হয়েছেন।

একটা প্রশ্ন ভেসে এলো শ্রোতৃমণ্ডলী থেকে: মনে হয় ভাড়ার হার বোধহয় সমাজের উঁচু তলার লোকদেরই কেবল নাগালে আছে? বক্তা: না, পরীক্ষকরা দুটী আসনেই বিনা ভাড়ায় যাত্রী নিতে স্বীকৃত আছেন।

সভাপতি মশায়: আপনাদের কেউ যদি এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে চান তা হলে আমার কাছে নাম পাঠাতে পারেন।

সভাপতির কথায় হলের কলগুঞ্জনটী হঠাৎ যেন

স্তব্ধতার মধ্যে হারিয়ে গেল।

মিঃ ম্যাকফিনলে এই সব আলোচনা সভায় নিয়মিত আমন্ত্রিত হতেন। তাঁর করণীয়ও কিছু থাকে এই সব সভায়। তিনি অবিশ্যি কথা বড় একটা বলেন না। একদিন তাঁর চোখে পড়ল কাগজের একটা ছলে ছলে শিরো নামাঃ "হিমালয়ের অন্তরালে বোল্ডার কোম্পানীর নোতুন স্যালভেটোরিয়াম", 'স্বাস্থ্য সম্মত, নিরাপদ ব্যবস্থা', 'উৎসাহী ব্যক্তিরা যোগাযোগ করুন'।

সংবাদদাতা লিখেছে সমকালের দুনিয়ার ভয়াবহতা থেকে মুক্তি পাওয়ার সবচেয়ে সুন্দর ব্যবস্থা বোধহয় বোল্ডার কোম্পানীই করেছেন। দেহ ও মনের অবিকৃত স্বাভাবিকতা বজায় রাখতে এর চেয়ে উপযোগী কোন ব্যবস্থা কল্পনাই করা যায় না। কোকুইলিন প্রথার বিস্ময়কর প্রয়োগ সাফল্যে মানুষের ভবিষ্যৎ নিশ্চিন্ত।

কোকুইলিন প্রথাটি একটা আকস্মিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। এই আবিষ্কারই স্যালভেটোরিয়ামের সম্ভবনাকে সফল করেছে। কানাডার এক অখ্যাত শহরে, প্রৌঢ় মিঃ কোকুইলিন ছিলেন এক অবজ্ঞাত শিক্ষক। বিজ্ঞানের ছাত্র তিনি। বাড়ীতে তাঁর একটা ছোট ল্যাবরেটারী আছে। একদিন সেই ঘরে বসে এটা ওটা নিয়ে আপন মনে মিশিয়ে মিশিয়ে দেখছিলেন। টিউবের মধ্যে নাড়া চাড়া করতে করতে একদিন সেগুলো মিলে মিশে এক ধরণের স্বচ্ছ গ্যাসে পরিণত হল। বিচিত্র তার গন্ধ। মিঃ কোকুইলিন সরকারের শিক্ষাদপ্তরকে তাঁর আবিষ্কারের কথা জানালেন। তারা সব শুনে সাব্যস্ত করলে লোকটি নির্ঘাৎ পাগল। খবরের কাগজগুলো প্রৌঢ় লোকটীকে নিয়ে কিছুদিন বেশ সরস খবর পরিবেশন করল।

কিন্তু একদিন এক দুর্ঘটনা মিঃ কোকুইলিনকে বিখ্যাত করে দিল। দৈবাৎ তারের মুখ আলগা থাকায় সেদিন তাঁর ল্যাবরেটারী ঘরটী গ্যাসে পূর্ণ হয়ে ছিল। মিঃ কোকুইলিন এর কিছুই জানতেন না। তিনি দরজা খুলে ঘরে ঢুকে আর দরজা বন্ধ করার সময় পেলেন না। ভারী হাওয়া তাঁকে অজ্ঞান করে ফেলল। আর তার থেকেই বোঝা গেল তাঁর আবিষ্কৃত গ্যাসের বিশেষত্ব। তিনি যেন গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেলেন। তাঁর শরীরে বাড়ীর গতি স্বাভাবিক অথচ ঘুম আর ভাঙে না। কানাডার মেডিক্যাল পরিষদ শত চেষ্টাতেও তাঁর ঘুম ভাঙাতে পারেনি। ছ'মাসের মধ্যে প্রৌঢ় কোকুইলিন বিস্ময়কর ভাবে প্রৌঢ়ত্ব থেকে যৌবনে ফিরে এলেন ঘুমের ঘোরে। আর তারই সঙ্গে সঙ্গে কানাডার সেই অখ্যাত শহরে অবজ্ঞাত শিক্ষকের দরিদ্র গৃহটী সারা বিশ্বের বৈজ্ঞানিকদের তীর্থক্ষেত্র হয়ে গেল।

মিঃ কোকুইলিনের ল্যাবরেটরীতে তিনি আজো শুয়ে আছেন, একটী কাচের আধারে। তাঁর শরীরে নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গে চারেক রকম রকম যন্ত্রের তার লাগানো। সেই যন্ত্র গুলি শরীরের নানা ক্রিয়ার স্বাভাবিকতা সমস্ত সময় পর্যবেক্ষণ করছে। আর দেখা যায় মাঝখান কোকুইলিনেক, শীর্ণকায়া, বৃদ্ধা এক মহিলা, গলায় কাল ফিতে ঝোলানো প্যাঁশনে। ল্যাবরেটরীতে তিনিই সকলকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দেখিয়ে দেন। তাঁর বহুবার বলা ঘটনার বর্ণনাটি বেশ বিস্ময়ের রেশটাকে আজো বজায় রেখেছে। যেহেতু এই গ্যাসটীর উপাদানগুলির পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ আজো সম্ভব হয়নি তাই মিঃ কোকুইলিনের গাঢ় ঘুম ভাঙানোর কোন চেষ্টাও সফলভাবে করা যায়নি। তিনি ঘরের কোণে টাঙানো মিঃ কোকুইলিনের একটা ফটো দেখিয়ে বলেন, দেখুন তফাৎটা কোথায়। ছবির চেহারা আর ঘুমন্ত কোকুইলিনের চেহারার মধ্যে কতো তফাৎ। যেন একেবারে অন্য মানুষ! আর শুধু কি মানুষটাই, এই যে ফুলগুলো দেখছেন তাঁর দেহের কাছে কিম্বা ওই যে সাণ্ডউচের টুকরো সবই তিন বছরের পুরানো। কিন্তু দেখুন তারা একটু বিকৃত হয়নি। সুতরাং কোকুইলিন গ্যাস যে সমস্ত জৈব পদার্থের উপর সমান কার্যকরী তাতে আর সন্দেহ নেই! গ্রাহাম কোকুইলিন গর্ব মেশানো, সংশয়হীন, সম্মতি প্রত্যাশী দৃষ্টি নিয়ে সমবেত দর্শকের দিকে তাকান। তাঁর চোখ দুটো সবার মুখের উপর দিয়ে বুলিয়ে যেন একবার।

* * *

যুদ্ধ বিধ্বস্ত পৃথিবীতে যেখানে আরেকটা আরো ব্যাপার অংশগ্রহক যুদ্ধের ছায়া নেমে আসছে সেই সময়ে একদিন টেলিভিশনের পর্দায় সজীব, জাগ্রত মিঃ কোকুইলিনের ছবি ভেসে আসতে লাগল। একটা নয়, একের

পর এক অগ্নুৎপতি, নানা রঙের, নানা পরিবেশের। কোথাও তিনি হোটেলে বসে খাচ্ছেন, কখনো বা সঙ্গী সাথী নিয়ে বারে বসে আনন্দ করছেন, আবার কখনো বা রীতিমতো যুবক মনলোভা একদল স্বল্পাবৃতা তরুণী নিয়ে, সাগর সৈকতে প্রাণের ফোয়ারাধ, আবেশে, আনন্দে ভাসমান। আর শেষ ছবি হলো পেটেন্ট অফিস থেকে কাগজপত্র হাতে বেড়িয়ে আসা সজীব, প্রাণবন্ত, উচ্ছল এক মিঃ কোকুইলিনের।

* * *

তারপর আরেকটা খবর B.S. কোকুইলিন গ্যাসের পেটেন্ট কিনে নিয়েছে।

চারদিকে সাড়া পড়ে গেল, B.S., B.S., কি সেটা? কোথায় সেটা? কি তাদের কাজ?

কিন্তু প্রতীক্ষা দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার দরকার হলো না। কাগজের প্রথম পাতায় আরেকটা খবরে একদিন আবার সকলে চমকে উঠল! B.S., বোল্ডার স্যালভেটোরিয়াম!! বোল্ডারের প্রদর্শিত মুক্তি পথ!!!

বোল্ডার, বোল্ডার কোম্পানী, কোটী কোটী টাকার প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলো প্রায় রাতারাতি। সারা পৃথিবীর সমস্ত বড় বড় রাসায়নিক ও ইস্পাতের কারখানার সঙ্গে তাঁরা চুক্তিবদ্ধ। আর তার প্রতিষ্ঠাতা অশীতি পরে স্যাম বোল্ডারারই, সঙ্গে সঙ্গে সারা পাশ্চাত্যের নিতান্ত পরিচিত মানুষ হয়ে উঠলেন। সারা পৃথিবী জুড়ে তাঁর কারবার। মাটীর গভীরে, সমুদ্রের অতলে, দুর্গম পর্বতের নিভৃতে তিনি গড়ে তুলেন নিরাপদ আবাস—ম্যাস্কচুয়ারী। সেগুলির কোনটা প্রশান্ত মহাসাগরের অতলে, কোনটা বা হিমালয় রকি পর্বতের স্নেহচ্ছায়ায় ঘেরা। স্যাম বোল্ডার বস্তু বিশে শতাব্দী ভীত, শঙ্কিত মানুষের ত্রাতা।

বোল্ডার কোম্পানীর অফিসে দিনরাত নানা মানুষের সারি। তাদের কেউবা সাদা, কেউ বাদামী, কেউবা কালো কিম্বা পীত! সবাই ব্যগ্র, তার আবেদনপত্র যথাস্থানে পৌছল কিনা জানতে। বাঁচার দারুণ আগ্রহে, মৃত্যু ভয়ে ভীত মানুষ ছুটোছুটি করতে লাগল। এই নিদারুণ পৃথিবীর নিভৃতে কোণে একটু ঠাঁই পাওয়ার জন্যে, যাতে সেই ভয়ঙ্কর দিনটির অনেক আগে তারা ঘুমিয়ে পড়ে, অনেক পরে এক নতুন পৃথিবীতে নব যৌবন নিয়ে ফিরে আসতে পারে।

ওদিকে তখন কাগজের শিরোনামাগুলো সেই নাম না জানা দিনের আশঙ্কাকে বাস্তবে পরিণত করার প্রস্তুতির খবরে খবরে মুখরিত হয়ে উঠেছে। আণবিক ও হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের যেন মিছিল চলেছে। ধোঁয়ার তেজস্ক্রিয় জটা মাথার যেন এক বিরাটকায় দৈত্য সারা পৃথিবীর এক কোণ থেকে অন্য কোণে দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে। বোল্ডার কোম্পানীর কাগজপত্রে তাই হয়ে উঠলো কোম্পানীর বিশিষ্ট প্রতীক চিহ্ন।

•

মাত্র এক বছর আগেও একথা বোধহয় কল্পনাতীত ছিল যে এই সবল, সুস্থ, দর্পিত চেহারাগুলোর পিছনে লুকিয়ে আছে, এমন এক নিদারুণ ভয়। শেয়ারের বাজারে কোটী কোটী টাকার ছিনিমিনি খেলা সুরু হয়ে গেল। আর বোল্ডার কোম্পানী দেহের মাপে এক এক টুকরো জায়গায় তার দর্পিত কিন্তু ভীত প্রাণটুকুকে টিকিয়ে রাখার জন্যে দাবী করতে লাগলো কল্পনাতীত টাকা। আগাম টাকা দাও, বাঁচার ফুরসত তাহলে মিলতে পারে যা হলে আর কোন আশা নেই। গোলযোগের আঁচটুকুও গায়ে লাগাতে যদি না চাও, যদি চাও ঘুমের মেয়াদকে নিরাপদ সীমার ওপারে নিয়ে গিয়ে আরও অপেক্ষা করতে, তাহলে তার মূল্য আরো জবরদস্ত।

স্যাম বোল্ডারের কোম্পানী জনগণকে তাদের সেবার সম্যক পরিচয় দেওয়ার জন্যে আয়োজন করলেন এক আলোচনা সভার। বিরাট হল। গ্যালারীতে তিল ধারণের স্থান নেই। সবাই উন্মুখ হয়ে বসে আছে বোল্ডারদের কাছ থেকে পরিত্রাণের পথের ইঙ্গিত পেতে। আমাদের মিঃ ম্যাকফিনলেকে আবার দেখতে পেলাম এই সভাগৃহে। চারিদিকের চাপা উত্তেজনার মধ্যে কেমন যেন বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে সে।

হলের মঞ্চের উপরে জটা ওয়ালা তেজস্ক্রিয় মেঘের ছবি, সারা দেওয়াল জুড়ে বিস্তৃত। শান্ত, ধীর আবেগশূন্য কণ্ঠে, বোল্ডার কোম্পানীর জনৈক পদস্থ প্রতিনিধি তাঁদের পরিকল্পনার কথা বলে যাচ্ছেন। কথা গুলোর

যেন অনেকটা ইস্পাতের ঘর্ষণের মতো হিস হিস শব্দ। তাঁর বক্তৃতা প্রায় শেষ হয়ে এলো। তিনি যেন শেষের পাতার ক্রম লভ্যের দিকে চেয়ে বলেন :

বন্ধুগণ আমরা সেবার প্রতিদানে যে মূল্যের কথা বলছি তা মানুষের ভবিষ্যতের কথা ভাবলে সত্যি অকিঞ্চিৎকর। তবে আমরা আমাদের গ্রাহকদের সুবিধার্থে সিদ্ধান্ত করেছি যে দূরতম ভবিষ্যতের যে দিনটিতে আপনার ঘুম ভেঙে উঠবেন সেদিন তারা যে ঘরের সদস্যই হোন না কেন, তাঁদের সকলের জন্যে আমাদের কোম্পানী দেবেন একটি সুন্দর প্রাতরাশের প্যাকেট, এক প্যাকেট সিগারেট, সেইদিন দেশে যে অর্থ ব্যবস্থা চালু থাকবে, তার দশটী ডলার, সমস্ত বিপদরোধক এক সেট পোষাক কারণ আপনাদের পরনের জামা কাপড় ততদিনে ভাল না থাকারই কথা।

অবিশ্যি আপনারা যাঁরা নিজেদের সম্পদ সেই অনাগত সুখের দিনে ভোগ করতে চান, তাঁদের জ্ঞাতার্থে বলা হচ্ছে, বোল্ডার কোম্পানীতে তাঁদের টাকা জমা থাকলে, ফিরিয়ে নেওয়ার দিনে তাঁরা চলতি সুদের হারের তিনগুণ সুদ সমেত আসল টাকা ফেরৎ পাবেন। আর তা ছাড়া আমাদের নিয়মাবলী অনুযায়ী সবচেয়ে স্বল্পকালীন যে আসন তার মেয়াদ মোটে আড়াই শ' বছর। আপনারাই হিসেব করে দেখুন নিত্য প্রয়োজনীয়ের খরচ বাবদ এই সময়ে আপনাদের কত টাকা ব্যয় হতো, যা বোল্ডার কোম্পানী বাঁচিয়ে দিচ্ছে।

বক্তা নীরব হলেন। তারপরই ঘোষণা করা হলো স্যালভেটোরিয়ামের ব্যবস্থাটা কি রকম তার চাক্ষুষ বিবরণ শ্রোতাদের দেওয়া হবে। দেওয়ালে টাঙানো পর্দায় একটা ছবি হঠাৎ ঝলমলিয়ে উঠল।

একজন মোটা সোটা চেহারার, আমুদে লোক। প্রাচ্য দেশীয়। তার ধারণা নেই যে কেউ বা কারা তার ছবি তুলছে। তার ইতস্তত ভাব, ভয়, আশঙ্কা কেমন ধীরে ধীরে আনন্দের আবেশে কেটে যাচ্ছে। সুন্দরী সুবেশী তরুণীরা তার পোষাক খুলে দিয়ে তাকে সাবান গোলা জলে স্নান করাল প্রথমে। তারপর তার শরীরের নানা জায়গায় জুড়ে দেওয়া হলো নানা রকমের তার। আর দেহটাকে ঘিরে নামল ধারা বর্ষণ আর গ্যাসের প্রবাহ। লোকটাকে বেশ বিব্রত কিন্তু খুশি লাগছে। আর তার পরিচারিকারা যেন সবাই স্বর্গলোকের দেবী।

সারা হলটায় একটা বিস্ময়ের গুঞ্জনে ভরে উঠল।

বোল্ডার কোম্পানীর প্রতিনিধির গলা হঠাৎ মাইকে ভেসে আসল। মাননীয় দর্শকগণ নিশ্চয়ই লক্ষ্য করছেন যে কিভাবে আমাদের স্যালভেটোরিয়ামের সদস্যদের আমরা দৈহিক ও মানসিক ক্লেদমুক্ত করে নিই। মানসিক ক্লেদ মনে রাখবেন আমাদের সমকালের দুর্দশার একটা অন্যতম কারণ। এই পদ্ধতি পৃথিবীর বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদের দ্বারা পরিচালিত অধ্যাপক লুক্রিসের ও ভারতীয় অধ্যাপক রামকৃষ্ণও, মানুষের সুখের যে দশ দশার কথা বলেছেন, যার শেষে পৌঁছলেই নির্বাণ লাভ, আমাদের এই অতি সাধারণ মক্কেলও তার সাতে নয় দশায় অক্লেশে পৌঁছেছে। আপনারা নিশ্চয়ই আমার সমর্থন করবেন যে দেহী মানুষকে সম্পূর্ণ নির্বাণ তরে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। কারণ দেহ থাকলেই কর্তব্য থাকবে, আর কর্তব্য হলো পরম নির্বাণ লাভের অন্তরায়।

ছবিতে তখন আবার দেখান হচ্ছে লোকটাকে শোওয়ানো হয়েছে একটা স্ট্রেচারে, তার সারা দেহ বেগুনে কাপড়ে জড়ানো। তারপর চাপা দেওয়া হলো আসমানী রঙের আরেকটা কাপড়। তারপর সেই কাপড় জড়ানো মানুষটীকে একটা খাপের মধ্যে রাখা হলো, আর যন্ত্রের সাহায্যে তাকে জীবাণু মুক্ত করা হলো। তারপর সেই খাপটাকে শুইয়ে দেওয়া হলো আরেকটী বড় খাপে, আর তার দরজা বন্ধ করা হলো, যেন অনেকটা কৌটোর ঢাকনী বন্ধ করার মতো। ঢাকনীর গায়ে কাচ লাগানো, ভিতরটা তাতে দেখা যায়। তারপর যন্ত্রের সাহায্যে কৌটোর ভিতর থেকে হাওয়া বের করে নিয়ে, কোকুইলিন গ্যাসের নল খুলে দেওয়া হল। একটা সুরেলা শব্দ, কাচের ভিতর দিয়ে দেখা গেল ঘুমন্ত মানুষটা অপার শান্তিতে হাসছে।

• • •

খবরের কাগজের পাতায় বড়ো বড়ো হেডলাইনের চোখ ঝলসানো খবরগুলো কাঁচ একটু স্তিমিত হয়ে এলে, একদিন মিঃ ম্যাকিনলি হঠাৎ মিস বিটলের কাছে প্রস্তাব

করার মতো মনের জোর ফিরে পেলেন।

সেটা ছিল একটা শনিবার। সারাটা দিন দৈনন্দিন কাজের ঝোঁকাটাও বেশ হাল্কা মনে হয়েছিল তার। লম্বপক্ষ দিনটা কোথা দিয়ে কেমন করে শেষ হবে যাওয়ার আগেই মনে পড়ল মিস্ বিটল অপেক্ষা করবে সন্ধ্যে বেলায়। কিন্তু অফিস থেকে বের হওয়ার আগে ম্যানেজারের ঘরে একটা আলোচনার টুকরো টুকরো কথাগুলো কানে এসে বাজল। আলোচনাটা হচ্ছে গতকালের যুদ্ধ আর একালের যুদ্ধ নিয়ে। পৃথিবীটা কত এগিয়ে গেছে অল্প সময়ের মধ্যে। আগে যুদ্ধ হতো কোন অগ্রিম প্রতিবেশির বেয়াদপি শায়েস্তা করার জন্যে। অধিকতর শক্তি নিয়ে তার ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়লে, চূড়ান্ত আকস্মিকতায় তারা আর লড়াই করার সময় পেত না। অনেক কম ত্যাগ স্বীকার করে, কম খরচে লড়াই চালানো যেত। কিন্তু আজ? লড়াই মানেই ধ্বংসের বিপুল বিস্তার। বিজেতা জিনিসের পার্থক্য সেখানে বড়ো কম। অনেক কম সময়ে রীতিমত চমকে দেওয়ার মতো সাফল্যের সম্ভাবনা অবশ্যই আজ বেশি। আর তাই শত্রুর সুবিধা হয় এতে কিছুটা। তাদের দেশে অল্প প্রাণই বেঁচে থাকতে পারবে, যাদের লক্ষ্য করতে হবে পরাজয়ের গ্লানি। বোতাম টিপে এতো বড়ো বিজয়, একটা রীতিমত লোভের ব্যাপার।

অবিশ্যি প্রতিপক্ষও যদি সেইরকম প্রস্তুত হয়ে থাকে তাহলে লড়াইটা একতরফা নাও হতে পারে। আর তাতেই বা ক্ষতি কি? দুই পার্থিব প্রতিপক্ষ মহাশূন্যের বিরাট বিস্মৃতির মধ্যে তখন চিন্তা করতে পারবে। যুদ্ধটা কিভাবে শুরু করলে, ফলটা আরো তাড়াতাড়ি পাওয়া যেতে পারতো।

ম্যাকফিনলের কানে এলো ম্যানেজারের গলা, তুমি মনে হচ্ছে নিরস্ত্রীকরণের প্রসঙ্গ আনতে চাও?

'আদপেই না'। অন্য কণ্ঠ উত্তর দেয়। আমি চাই লড়াই যদি হয় হোক, তাকে বাধা দেওয়ার সার্থকতা কোথায়? তবে কিনা লড়াইটা আনবিক না হয়ে যদি কিছুটা পুরানো ধাঁচের হয়, তাহলে যে-কোন মুহূর্তে কিছু না করে মরার ভয় থাকবে না বলে, একবার পড়ে দেখা যেত, জোর কার কতটা বেশি। যার যেমন খুশি, সে তাই করুক, তেমনি করেই লড়াই হোক। তাতে হয়তো কষ্ট আছে অনেক বেশি, কিন্তু কিছু না করে মরার চেয়ে কিছু করে মরা অনেক ভালো।

আমার মতে যুদ্ধের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার হলো মানসিক লড়াই। লোকের মনে জাগাতে হবে যে আত্মরক্ষার চেয়ে বড়ো ধর্ম আর নেই। তার জন্যে সর্বস্ব পণ করতে হবে। আর তার পাশাপাশি জাগিয়ে তুলতে হবে, পরিচিত, অভ্যস্ত জীবনের প্রতি, অস্তিত্বের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা।

ম্যানেজার: তোমার প্রস্তাবটা অবিশ্যি বেশি গবেষণা আজো করা হয়নি। বেশ বলা হচ্ছে, চালিয়ে যাও।

অপর কণ্ঠ: আপনাদের উচিত হবে যুদ্ধের জন্যে কেবল অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করা নয়, যুদ্ধের পরে বিরাট একদল পঙ্গু মানুষের বাহিনী সৃষ্টি করা হয়। আপনারা পাগল করে দেন মানুষকে, যার ভালো-মন্দ বোধ থাকবে না। বাইজানটিয়ামের সম্রাট দ্বিতীয় বেসিলের কাহিনী মনে আছে। যিনি শত্রুকে প্রাণে না মেরে অন্ধ করে দিতেন। আমার মাথায় আরো অনেক পরিকল্পনা আছে। আপনারা সেগুলো বিচার করে দেখতে পারেন।

ম্যানেজারের ঘরের শব্দ যে বাইরে বেশ জোরেই ভেসে আসছে, সেটা মিঃ ম্যাকফিনলে অনেকক্ষণ লক্ষ্য করেন নি। হঠাৎ চোখ পড়তেই দেখেন যেন দারা অফিসের লোক ভিড় করে এসেছে ঘরের পাশে। ম্যানেজারের কেমন যেন মনে হলো বাইরে অনেক লোকের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। তিনি হঠাৎ ধমকে উঠলেন, আপনাদের নিজের নিজের জায়গা ছেড়ে এখানে আসতে কে বলেছে? মিঃ ম্যাকফিনলে আপনি কর্মসূচীগুলো ঠিক করে রাখুন, আমাদের পার্টিদের আজ চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করতে আসার কথা।

মিঃ ম্যাকফিনলের মনে হলো চোখের সামনেটা তাঁর হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গেল। আর তার মধ্যে ভেসে উঠলো। মিস বিটলের অনুযোগ ভরা মুখ। যেন সে বলছে: ম্যাক আজো কি তুমি একটু সময় মতো আসতে পারলে না। আমি আট মিনিটেরও বেশি অপেক্ষা করছি। অবিশ্যি আমার বয়সের মেয়ের পক্ষে আট মিনিট অপেক্ষা

কথা কিছু নয়। কিন্তু বারেবার বয়সের কথাটা আমার মনে করিয়ে দিয়ে তুমি কি আনন্দ পাও, আমায় বলবে?

মিঃ ম্যাককিনলে বলার চেষ্টা করে, দেখ, আমার বয়সে আর এই যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া একটু শক্ত নয় কি?

মিস বিটল প্রতিবাদ করে ওঠে, দেখ যুদ্ধ যুদ্ধ করো না। যুদ্ধ হবে না আর। তোমার ভবিষ্যত সন্তানদের সুখে নিশ্চিন্তিতে বাঁচার সুযোগ দাও ম্যাক!

ম্যাককিনলে যেন চমকে ওঠে, কথাটা শুনে। মাথাটা চনচন করে উঠলো। চোখ চেয়ে দেখলেন, কোথায় মিস বিটল। অফিস ঘরে ফাইল হাতে করে তিনি বসে আছেন। হাতের ফাইলটা ঠেলে সরিয়ে রেখে, ম্যাক বাইরে বেরিয়ে এলেন। তখন অফিস ছুটির ডিঙ্গ নেমেছে সিঁড়িতে। ম্যাকের কোন এক সহকর্মী সিঁড়িতে দ্রুত হারমান ম্যাককে লক্ষ্য করে একটা কথা ছুঁড়ে দিল, 'আমাদের বুড়ো সন্ন্যাসীর আইবুড়ো নাম এবার ঘুচল'।

রাস্তায় নেমে ম্যাককিনলে ব্যস্ত হয়ে উঠলো, একটা ট্যাক্সি চাই, এক্ষুণি, বিটল অপেক্ষা করে আছে অনেকক্ষণ তার জন্যে। ট্যাক্সি নিয়ে ম্যাক ছুটলো তার গন্তব্য-স্থানের দিকে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে বোল্ডার কোম্পানীর বিজ্ঞাপন, কে একজন বিখ্যাত ধনী আগামী চার চাকার বছরের জন্যে স্যালভেটোরিয়ামের আসন নিয়েছেন। ম্যাকের মন সেদিকে গিয়েও ফিরে এলো। ট্যাক্সি চলেছে তীব্রবেগে। উনিশ মিনিট দেরী হয়ে গেছে। কে জানে বিটল কি ভাবছে, তার দেরী দেখে। ওঃ কি আশ্চর্য আবার ট্রাফিক জ্যাম! কে জানে কতক্ষণ আটকে থাকতে হবে! ম্যাক ট্যাক্সি ছেড়ে ট্রলী বাসে চেপে বসে, তাড়া-তাড়ি যেতে হবে, যেরকম করেই হোক।

নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে, ম্যাক দূর থেকে দেখতে পায় অস্থির ভাবে পায়চারি করতে করতে বারেবার ঘড়ি দেখছে মিস বিটল। মুখে তার হতাশার ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ম্যাক একটু দূর থেকে মিস বিটলকে না দেখার ভান করে কাগজ পড়তে থাকে।

উঃ যুদ্ধ, যুদ্ধ, যুদ্ধ! যেন এছাড়া আর কোন কথা নেই। কাগজে কিছু লেখার নেই। একটা হেডলাইনের ওপর চোখটা আটকে যায় "পরং কালের পূর্বে মহাযুদ্ধের সম্ভবনা নাই।" আবার আরেকটা খবর "হাইড্রোজেন বোমার বাতাসে অস্তিত্বের সম্ভবনা।"

মিঃ ম্যাককিনলের সংশয়াকুল মনটা আবার দুলে উঠলো। না, না, না, বিয়ে নয়, ঘর সংসার নয়, মিস বিটল নয়, কেউ নয়। তাকে একা থাকতে হবে। আর কারো জীবন নষ্ট করার অধিকার তার নেই। ম্যাককিনলে মিস বিটলের দিকে না এগিয়ে পাশেই একটা সেলুনে ঢুকে পড়লেন। তারপর তিনটে রীতিমতো কড়া ড্রিঙ্কের অর্ডার দিয়ে জানলার ধারের একটা টেবিলে এসে বসলেন। খোলা জানলা দিয়ে অদূরে মিস বিটলের অপেক্ষমান দেহটা তখনও দেখা যাচ্ছে। এতো পরিবর্তন ঘটে গেল, সময়ও কেটে গেছে অনেকটা। প্রায় ছাব্বিশ মিনিট!

মিঃ ম্যাককিনলের মুখটায় ধীরে ধীরে ভাবান্তর হতে থাকে। প্রথমে বেশ গম্ভীর, ভাবাক্রান্ত, তারপর একটা বুকফাটা কান্নার অসহ্য আবেগ দমন করার আপ্রাণ প্রচেষ্টা। ধীরে ধীরে নেমে আসে একটা বিস্তৃত ভাব। ততক্ষণে সামনের গ্লাসগুলো শেষ হয়ে এসেছে। একটা চরম ঔদাসীন্যের ভাব নিয়ে ম্যাক চেয়ে থাকে জানালা দিয়ে। মিস বিটলের বিদেহী মনটা মিঃ ম্যাককিনলের কাছে অকুণ্ঠ মিনতি জানায়। এখনও দেরি হয়নি ম্যাক, লক্ষীটী এসো! তুমি তো জান, আমার কোথাও যাওয়ার তাড়া নেই।

মিঃ ম্যাককিনলে চেষ্টা করেন মন থেকে মিস বিটলের কথাটা মুছে ফেলতে। একটা অবাস্তবিকের অনুভূতি। কিন্তু এড়াতে চাইলেও মিস বিটলের বিদেহী মনটা, তার মনের দুয়ারে বারেবার আঘাত করতে থাকে। ম্যাক চুপ করে থেকো না, প্লিজ, কথা বলো……আমি অপেক্ষা করে আছি… হয়তো আরো……

ম্যাক জোর করে মনকে সরিয়ে আনার চেষ্টা করে অন্য প্রসঙ্গে। পাশের টেবিলে কারা যেন কি একটা মুখরোচক খবর নিয়ে মুখর হয়ে উঠেছে। আর সেলুনের দেওয়াল ঘড়িটা অবিরাম টিক টক করে সময়ের সমুদ্রে সাঁতরে তীরের ঠিকানা খুঁজে ফিরছে।

অবাধ্য মনটা চোখ দুটোকে আবার জানলার গায়ে আটকে দেয়। মিস বিটল একটা ওষুধের দোকানের

গায়ে হেলান দিয়ে তখনও দাঁড়িয়ে আছে। কতক্ষণ, কতক্ষণ অপেক্ষা করছে সে। ম্যাক ঘড়ির দিকে চায়। ওঃ রাত এক ঘণ্টা কেটেছে এতক্ষণে। ঘড়ির কাঁটাও কি বিরক্ত হয়ে চলতে ভুলে গেল নাকি ?

আরে দোকানদার কি যেন বলছে ওকে। সরে যেতে বলছে মনে হয়। ঠিক তাই। "দোকানের বিজ্ঞাপন হিসাবে আপনাকে মনোনীত করার আমার কোন লাভ নেই মিস।" মিস বিটল সরে দাঁড়ায়।

একটা মাতাল নাবিক যেতে যেতে মিস বিটলকে ধাক্কা দিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। মনে হয় সে ওকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। হাতের ভঙ্গিতে কোনও বারের যাওয়ার কথা বলছে। পকেটের নোটের গোছা তুলে দেখাচ্ছে রাজী করানোর জন্যে। মিঃ ম্যাকফিনলের হাতটা আপনা থেকেই পাকিয়ে টেবিলে একটা ঘা বসিয়ে দেয়। মনে হলো মিস বিটল তাকে অপেক্ষা করতে বলে, চারদিকে হতাশ দৃষ্টিটা বুলিয়ে নেয়। কিন্তু নাবিক শিরায় শিরায় উদ্দাম রক্তের তরঙ্গ আছড়ে পড়ছে। তার অপেক্ষা করার সময় নেই। মিস বিটল দূরে থেকে তার গলা ভেসে আসে আবার একটু সনির্বন্ধ অনুরোধ করলো মনে হয়। "দোহাই তোমার একটু দাঁড়াও! বরং একটা কাজ করো, আমার হেটা ধরে একটু জোরে কাঁকুনি দাও। জোরে, আরো জোরে। ও নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছে। ওকে তো জানি আমি! লুকিয়ে কোথাও নজর রেখেছে আমার উপর। তাই যদি হয়, তাহলে এখনি রেগে ছুটে আসবে!" মাতাল নাবিকটা ঠিক সেই রকমই করে। আর মিস বিটল ব্যাকুল ভাবে চেয়ে দেখে চারদিকে। না! কেউ নেই কোথাও!

মিঃ ম্যাকফিনলে টুপিটা কপালের উপর টেনে নামিয়ে আনেন। তারপর একমনে আপনমনে কামড়াতে কামড়াতে, দাঁতে জোরে চেপে ধরেন। মিস বিটল মাতাল নাবিকটার হাত ধরে ঝুলতে ঝুলতে চলে যায় চোখের বাইরে। তাদের টুকরো কথার বিলীয়মান রেশটা আবার ম্যাকের কানে বাজে। "আর এক মিনিট দাঁড়াবে না। একটু বসি আর।" "তার কোন মানেই হয় না, তুমি কি সারা সন্ধ্যেটা অপেক্ষা করতে চাও নাকি," হ্যাঁ সারাদিন, সারা রাত তারপরের রাত তারপরেও, কি দরকার তার ঠিকানাটা দাও, বদমায়েসের মাথায় বিন্দু এক ঘুঁসিতে বের করে দিয়ে আসি, কান্না ভেজা গলায় মিস বিটল বলে, "বলো না, বলোনা ওকথা বলোনা, বোধহয় ভালো মানুষ ওই একটাই আর বেঁচে আছে।"

সেলুনে মিঃ ম্যাককিনলে নির্বিকার গ্লাসের পর গ্লাস হুইস্কি শেষ করে চলেছে। তারপর একসময় টলতে টলতে উঠে বেড়িয়ে আসে সেলুন থেকে। কণিক একটা দোকানের সামনে দাঁড়ায় তারপর আবার চলতে শুরু করে। কিন্তু না, আবার দোকানটার সামনে ফিরে আসে। নানা রকমের বস্ত্রপাতি সাজানো আছে পর পর। কব্জাইয়ের একটা চশমার দিকে চোখটা টানতে থাকে।

সেদিনও ম্যাক যথারীতি তার অতি পরিচিত মাঠের মাঝে গিয়ে একবার দাঁড়ায়। চেনা লোকেরা শুভেচ্ছা জানায়, ছেলের দল ভিড় করে আসে। কিন্তু তোবড়ানো টুপিটা তুলে অভিবাদন ম্যাক বাড়ীর পথ ধরে।

• • •

এরই পর একদিন মিঃ ম্যাককিনলের কাছে আমন্ত্রণ এসে গেল। তিনি যদি চান তো বোম্বাই কোম্পানীর স্যালভেটোরিয়ামের সব ব্যবস্থা, সুযোগ সুবিধা চাক্ষুষ দেখে আসতে পারেন। নির্দিষ্ট দিনে মিঃ ম্যাক উপস্থিত হলেন নির্দিষ্ট স্থানে। কিছুটা পরে সাতজন সুবেশী ভদ্রলোকদের পিছন পিছন তিনি চললেন এগিয়ে, লোহার প্রাচীরে ঘেরা একটা জায়গার দিকে। দূর থেকে সেটাকে ক্রিমেটোরিয়াম বলে মনে হচ্ছেল।

ফটকের কাছে আসতেই, কোম্পানীর একজন কর্মচারী এসে, সামনের সাতজন ভদ্রলোককে তাঁদের পোষাক খুলে, কোম্পানীর নামাঙ্কিত এক প্রস্থ পোষাক পরতে দিলেন। মিঃ ম্যাকের দিকে প্রশ্নের ভঙ্গিতে চাইতেই, তিনি পরিচয় দিলেন যে তাঁর নাম হল মিঃ ম্যাককিনলে, লাইসেন্স দানকারী সর্বোচ্চ সংস্থা থেকে তিনি আসছেন। তারপর তিনিই পাল্টা প্রশ্ন করলেন : কই বেশি ভিড় দেখছি না তো ?

কর্মচারীটি জবাব দিল : দিনে আমরা গোলমাল এড়ানোর জন্যে ভিড় করতে দিই না। পুষ্পস্তবকরা সাধারণতঃ আসেন সন্ধ্যের পর।

ম্যাক : কেন ? চুরিটুরি হয় নাকি ?

কর্মচারী : না, না, অনেকে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে বিনি পয়সার সব সুযোগ নিতে চায় কিনা, তাই।

একথা শুনে সকলে একবার চারপাশে চেয়ে দেখলেন। সারি সারি অনেক মুখ। হতাশার জীবন্ত ছবি এক একটা। নানা বয়সের মুখ, শিশু, যুবক, যুবতী, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা।

কে একজন বল্লেন : পুলিশ ডাকলেই তো হয়!

কর্মচারী : না ওরা তো সহজে কিছু করে না। কেবল দেখবেন অসহ্য কৌতূহল নিয়ে চেয়ে আছে। তাই···

এমন সময় এয়ার অফিসের বাস থেকে নেমে আসলেন, আরেক দল যাত্রী। কর্মচারীটি বললে, এঁরা এখন ইউরোপ থেকে আসছেন, যদিও এঁদের দেশে আমাদের মতো ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

আবার কে একজন বল্লেন ; দুই যুদ্ধের অভিজ্ঞতাই এঁদের এতোটা সচেতন করে তুলেছে।

সকলের চোখের উপর দিয়ে একদল লোক, কোন এক যুদ্ধ অভিজাত স্বজন, পরিজন, পোষা পশু পাখী, নার্স, ডাক্তার, গভর্নেস সহ, চোখের সামনে দিয়ে সার-বেঁধে এগিয়ে গেলেন, কোম্পানীর একজন কর্মচারীর নেতৃত্বে।

সাতজনের ভদ্রলোকের সঙ্গে মিঃ ম্যাক চেপে বসলেন একটা অতলগামী লিফ্‌টে। লিফ্‌ট হুহু করে নীচের দিকে নামতে লাগল। কর্মচারীটি জানিয়ে দিলেন যে, মাত্র থেকে আট কিলোমিটার নীচে সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়। কোন রকমের ঝুঁকি নিতে আমরা রাজী নই। বোম্বার কোম্পানীর কর্মচারীদেরও যে অনুরূপ সুযোগ-সুবিধে, কিছু কম খরচে দেওয়া উচিত। এ কথাও কেউ কেউ বল্লেন। আচ্ছা, একটা কথা, ধরুন তিন'শ বছর থাকা যায়, এমন একটা সেলের জন্যে কত কি আপনারা নিয়ে থাকেন?

কর্মচারী : সেটা নির্ভর করে সেলের অবস্থান, পরিবেশের উপর। টাকার অঙ্কটা সেই অনুপাতে তিন থেকে পঞ্চাশ হাজার ডলার পর্যন্ত ওঠানামা করে। অবিশ্যি আমাদের কতগুলি প্রদর্শনী সেল আছে। তাদের চাহিদাটাও বেশি।

মিঃ ম্যাক এতক্ষণ ছেলেমানুষের মতো অধীর উত্তেজনায় কাঁপছিলেন।

তিনি হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন : আচ্ছা বলতে পারেন সাত শ' ডলার ব্যয়ে এর মধ্যে কোথাও ঠাঁই পাওয়া যায় কি না?

কর্মচারীটি : না শোনার মতো করে উত্তর দিলেন : আজ্ঞে?

ম্যাক : না কিছু না! এই একটু কৌতূহলী হয়ে পড়েছিলাম, আর কি!

কর্মচারী : এই দেখুন সেদিন মনাকো থেকে ৩৫০টি সেলের অর্ডার এসে পড়লো। ব্যাপার কি জানেন, যত সব বড়লোক, তাদের অমরত্বের লোভটা তত বেশী। আচ্ছা আমরা এসে গেছি, আসুন এই দিকে।

লিফ্‌টের বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলেন তাঁরা, চকচকে দেওয়াল, লোহার থাম, ঢালাই ছাদের তলায় নানা অলিগলি পথ। মাঝে মাঝে দেওয়ালে ছায়া পড়েছে। কর্মচারীরা যাতায়াত করছে। কোথা থেকে ফিরে ফিরে হাওয়া আসছে। সম্পূর্ণ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা। কে যেন বলে উঠ্‌লো, কি সুন্দর লিলির গন্ধ ভেসে আসছে বাতাসে।

ঘুরতে ঘুরতে তাঁরা এক জায়গায় থামলেন। দরজার উপর ছোট্ট কাচ লাগানো। ভিতরটা দেখা যায়। একটি মেয়েকে তৈরী করা হচ্ছে দীর্ঘদিন থাকার উপযুক্ত করে। কয়েকটি অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে অনেকটা নানের মতো সাজ-পোষাক পরা, তাকে ডলাই মলাই করছে প্রায় অর্ধ উলঙ্গ করে। যাত্রীরা দরজার ফাঁকে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে গেলেন। কর্মচারীটি বল্লেন, না, না, এখানে দাঁড়াবেন না। আমাদের সময় কম, আর তা ছাড়া দেখবারও আছে আরো অনেক কিছু।

ওই দেখুন সেলগুলো। ওদের সেলের গায়ে, মাটিতে নানা ছাপ, ছবি আঁকা। এখানে আসার আগে যাঁরা যে জীবনযাত্রার লোক ছিলেন, তাঁদের সমগ্র পরিচয় সেলের দেওয়ালে, মেঝেতে উৎকীর্ণ। এই যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, আমাদের ঠিক নীচের তলাতেই ঘুমিয়ে আছেন উক্ত মণ্ডলের একজন ভূম্যধিকারী, তাঁর

পঞ্চাশ বেগমের হারেম সমেত। যৌবনের উষ্ণতাকে খুন ভেগে উঠেও যাতে অবিকৃত উপভোগ করতে পারেন, তার পাকাপাকি ব্যবস্থা সমেত তিনি এখানে এসেছেন।

দলটিকে নিয়ে বোল্ডার কোম্পানীর কর্মচারী ঘুরে ঘুরে দেখাতে থাকেন। কিন্তু তারই ফাঁকে কখন মিঃ ম্যাক সরে পড়েছেন।

প্রথমে একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে তিনি আত্মগোপন করলেন। তারপর দ্রুত পায়ে ইতস্তত: ঘুরতে ঘুরতে দেখেন তিনি উপস্থিত হয়েছেন সেই ঘরে, যেখানে ভবিষ্যতের যাত্রীদের উদ্যোগপর্ব সমাধা করা হচ্ছে। মিঃ ম্যাক মনের সমস্ত উত্তেজনা, ছলনা গোপন রেখে, পরিচালকদের নির্দেশ মতো সমস্ত প্রাথমিক ক্রিয়াকলাপগুলো সেরে নিলেন। তারপর এক সময় এসে উপস্থিত হলেন সেই নানের পোশাক পরা সুন্দরী মেয়েদের কাছে যাদের হাতের আঙুলের চাপে অসহ আনন্দের আবেশে তাঁর মনটা চেতনার স্তর পেরিয়ে কোথায় তলিয়ে যেতে লাগল।

মনটা যখন তাঁর প্রায় স্বর্গরাজ্যের দোরগোড়ায় এসে পড়েছে এমন সময় কি যেন হ'ল। দুজন নিখুঁত পোশাক পরা লোক, কোম্পানীর কর্মচারীই হবে, এসে হাজির সেই ঘরে। তারা পরস্পর দ্রুত দৃষ্টি বিনিময় করলো, তারপর যে টেবিলে ম্যাক শুয়েছিলেন, সেই টেবিলসমেত ম্যাককে টেনে নিয়ে গেল অন্য ঘরে। তারপর একটি অপরিসর লিফটের মতো জায়গায় নিয়ে এসে তাঁকে দাঁড় করাল। কে একজন তাঁর পোশাকগুলো ছুঁড়ে দিল। কয়েকটা মুদ্রা ট্রাউজারের পকেট থেকে মেঝেতে পড়ে আওয়াজ তুললো ঠুন্ ঠুন্। আর যেন তখনই লিফটের দরজাটা আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেল। ম্যাককে নিয়ে লিফটা সবেগে উঠতে লাগলো উপরের দিকে। তারপর সমস্ত ব্যাপারটা বোঝার আগেই কে বা কারা যেন ম্যাককে ছুঁড়ে ফেলে দিল লিফট থেকে বাইরে, কতগুলো নরম জিনিসের উপর। খোলা আকাশের নীচে পড়ে ম্যাক অনুভব করলেন যে জায়গাটা আবর্জনার স্তূপ। তাঁর সবই বোধহয় ঠিক আছে! পরীরে আঘাতও কোথাও কিছু লাগেনি।

ওঃ না, একপাটি জুতো খোয়া গেছে এই স্বর্গরাজ্যের অভিযানে। কোথায় যেন একটা গোলমালের শব্দ আসছে। ম্যাক ঘুঁড়িয়ে ঘুঁড়িয়ে সেই দিকে চলতে সুরু করলেন।

এক বিরাট, উত্তেজিত জনতা চলেছে, হাতে তাদের মশাল, মুখ আকাশের দিকে তোলা। চারপাশের ঘন অন্ধকারে তাদের মশালের আলো যেন উজ্জ্বলতার চেয়ে অন্ধকারের জমাট ভয়াবহতাকে আরো অসহ করে তুলেছে। কোথায় যাচ্ছে তারা? ম্যাকের মুখেও উদ্বিগ্ন দৃষ্টি। বোল্ডার কোম্পানীর স্যালভেটোরিয়ামের দিকে? আরে ব্যাপার কি?

মিঃ ম্যাক রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই উত্তেজিত জনতার মিছিল দেখলেন। ধুলোয় ধূসর তাদের পা। নানা পেশার, নানা শ্রেণীর লোক তারা। তাদের সঙ্গে নানা ফেস্টুন, পোস্টার। মান ধ্বনি দিতে দিতে তারা এগোচ্ছে। "টেক খোঁড়া চলবে না", "মরতে হলে সবাই একসঙ্গে মরবো", "যুদ্ধবাজদের আগে খতম করো; আমাদের ছেলেমেয়েদের বাঁচাও।" কিন্তু তারা বেশীদূর যেতে না যেতেই, সাইরেন লাগানো পুলিশের গাড়ী এসে হাজির। মিছিলের সামনের পথটুকু তারা সম্পূর্ণ ঘিরে ফেললো। তারপর হঠাৎ আক্রমণ করলো জনতাকে। পুলিশ বাহিনীর চাপ সহ্য করে মিছিলটা একমুহূর্তও টিকতে পারলো না। ছত্রভঙ্গ হয়ে যে-যেদিকে পারলো পালাতে লাগলো। পরে শোনা গেছিল, প্রায় সব জায়গাতেই, যেখানে বোল্ডার কোম্পানীর স্যালভেটোরিয়ামের ব্যবস্থা ছিল, উত্তেজিত জনতার আক্রমণ সবখানেই ঘটেছিল। এতবড়ো কলা ও ব্যবসা বোল্ডার কোম্পানীর। বোধহয় এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী পরিকল্পনা। প্রতিযোগীদের চোখ টাটাবেই। সিনেট স্টক এক্সচেঞ্জ ও কেন্দ্রীয় শিল্প সংস্থার কাছ থেকে প্রতিবাদের স্মারকলিপি পেলেন।

বোল্ডার কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতার কাছে সিনেটের আহ্বান গেল। ব্যক্তিগত আলোচনার জন্যে, তাঁর উপস্থিতি প্রয়োজন। সংবাদপত্রের শিরোনামায় পরদিন দৃষ্টি আকর্ষণকারী বাক্যবিন্যাস। "শয্যাশায়ী বোল্ডার

অবিচলিত," "নবযুগের ঘোষেস, সাত কিলোমিটার নীচে স্বর্গরাজ্য," "বোল্ডারের শেষ মুহূর্ত, জীবন-যন্ত্রণা।" অবশেষে আসলো সিনেটের ২৮শে আগস্টের সেই অবিস্মরণীয় সভার দিন।

জনাকীর্ণ সিনেট সভা। সিনেটর ও সাধারণ দর্শকদের উপস্থিতিতে হলঘরটা জমজমাট। বক্তা একজন বোল্ডারের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও জ্বালাময়ী ভাষায়, অভিযোগের পাহাড় গড়ে তুললেন, তাঁর বিরুদ্ধে। তাঁর ভাষায়, ঘটনার বর্ণনায়, অভিযোগের সংস্থাপনায় এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি হলো যে সভার সমস্ত লোকের মনে হলো এর প্রতিবাদ আর হয় না। ধীরে ধীরে সভাপতি সুরু করলেন তাঁর বক্তব্য। বিখ্যাত মিঃ এম. করপোরেশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বোল্ডারের অনুপস্থিতিতেই। অভিযোগকারীর বক্তব্যের প্রতিপাদ্য সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে বলেই, আমি তাকে দোষী সাব্যস্ত করছি। এই প্রতিষ্ঠানটি তার বিশ্ববাপী শাখা প্রশাখার মাধ্যমে সে মানুষের মনে সমকালের জীবন ছেড়ে ভবিষ্যতের ক্রোড়ে আশ্রয় নেওয়ার জন্যে প্রলোভন দেখাচ্ছে। আমাদের পরিচিত অনেক লোকের কথা আমরা জানি, যাঁদের এই প্রতিষ্ঠান প্রলোভনে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে। অদম্য তার শক্তি, অথচ প্রহেলিকার আচ্ছন্ন তার সমস্ত আচরণ। তাই আমাদের মত সাধারণ মানুষের সমাজে আসবার সাহস নেই। আমরা অনুমান করতে পারি, তার ভয়ের পরিমাণ তার অপরাধেরই সমানুপাতিক।

আমরা শুনেছি এই ঘৃণ্য মানুষটির জীবনদীপ আজ প্রায় নির্বাপিত। আমরা অনুমান করতে পারি তার মনের মধ্যে যে শয়তানের বাস, সেই শয়তানটা নিশ্চয়ই আজ হতাশায় ভ্রূকুটী করে আছে। যদিও মানুষের সমাজে সে আজ "মৃত", তবুও সেই "মৃত" ব্যক্তির বিচারই আমাদের আজ করতে হবে।

একটী কণ্ঠ : মৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই কলঙ্ক লেপনের প্রেরণা আপনার কোথা থেকে আসলো?

সভাপতি : কোনও কোনও মৃত ব্যক্তি জীবনে এতই কলঙ্কের অধিকারী যে আর কলঙ্ক লেপনের সুযোগ সেখানে থাকে না। আমাদের অভিযুক্ত ব্যক্তি সেই শ্রেণীর। আমাদের প্রহরা ও বিধাতার আশীষে আমরা যে জীবন ও সভ্যতার অধিকারী, তারই উত্তরাধিকারদাবী করছে অভিযুক্ত ব্যক্তির যথাযোগ্য শাস্তি।

আরেকটি কণ্ঠ : প্রতিষ্ঠানের নামটী জানতে পারি কি, যার কথা বলা হচ্ছে?

অপর কণ্ঠ : বি, এস, করপোরেশনের নাম আমাদের আইনে অনুমোদিত।

সভাপতি : এই জঘন্য প্রতিষ্ঠানের উৎসস্থল হলো মস্কো, যে দেশের শাসকগোষ্ঠী আমাদের স্বদেশে ভীতি ও হতাশার বিস্তার ঘটিয়ে আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে দুর্বল করে দিতে চায়। তারা আমাদের দেশের বিশ্বাস-প্রবণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থে অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপে প্রবৃত্ত দিচ্ছে। তাই আমি প্রস্তাব করছি···

তৃতীয় কণ্ঠ : আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে যে বোল্ডার কোম্পানী সৈন্যবাহিনীর কোন লোককেও তাদের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে গ্রহণ করে না। আর স্যাবোটেজ বিরোধিতার যা খরচ, তা সাধারণ মানুষ, শ্রমিকের সাধ্যাতীত।

বহুকণ্ঠে : শশ্! চুপ্!

ঠিক সেই মুহূর্তেই দুজন আধা সামরিক বি, এস পোষাকে লোকের অবির্ভাব ঘটল সিনেটের সভায়। তারা এসে নিপুণভাবে সমস্ত সভায় তাদের প্রভাব এমন বিস্তার করে বসলো, যেন কোন একজনের আগমন প্রতীক্ষায় এতগুলি লোক উদগ্রীব। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সেইদিক দিয়ে ধীর মন্থর গতিতে একটা শোভাযাত্রা এসে পড়লো সভায়। একজন ডাক্তার দুজন নার্সের পোষাক পরা নার্স, একজন পাদ্রী ও দুই বিপুলকায় সেক্রেটারী সমভিব্যহারে উপস্থিত হয়েছেন মি, এম, করপোরেশনের প্রতিষ্ঠাতা মিঃ বোল্ডার। নগ্ন দেহ, অশীতিপর বৃদ্ধ এক মানুষ। সাদা দাড়ি আর ঘন কুঁচকে পড়া ভ্রূর মধ্যে চোখ দুটো জ্বলছে জান্তব দীপ্তিতে।

সভায় ঢুকতে ঢুকতে মিঃ বোল্ডার স্মিতহাস্যে বলেন, আমার দেরীর জন্যে নিশ্চয়ই আপনারা আমায়

বার্থকা বিচার করে ক্ষমা কোরবেন। আমি বন্ধু, বিমানে উঠে আমি আপনাদের শমনে সাড়া দেওয়ার জন্যে আসতে পারি না। আমি দেবদূতদের সঙ্গে আকাশ-চারী হতে পারি। সেই দৃষ্টিকোণ বিচরণ করতে আমার প্রায়ই মনে হয়েছে, এই পৃথিবীর যা কিছু আমাদের চোখের সামনে দৃশ্যমান তাদের স্থায়িত্ব কি কেবল ইট, কাঠ, পাথর, লোহার জন্যে। মোটেই নয় মানুষ তার চিন্তায়, ভাবনায়, সুখে দুঃখে, স্বপনে, জাগরণে তার কল্পনা দিয়ে তাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। তাই পুঁথির, গ্রন্থের মধ্যে মানুষ যেমন অনাগত কাল বেঁচে থাকে, তেমন আর কোথাও নয়, কিছুতে নয়। চিন্তা করুন কি সে শক্তি, যা পৃথিবীর মধ্যে সঞ্জীবনী মন্ত্র এনে দিয়েছে?

মিঃ বোল্ডার থামলেন মুহূর্তের জন্যে। শ্রোতাদের মুখের উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে এবার তার জবাব দিলেন: সেই শক্তি হলো বিশুদ্ধ আত্মা। কিন্তু সেটা কি এই দেহ, অথবা ভস্মীভূত দেহের ছাই, যা হাওয়ায় ভেসে যায়।

আবার থামলেন তিনি ঘরে একটা অস্বস্তিকর স্তব্ধতা। আবার সুরু করেন তিনি: এখানে আসার পথে আমি শুনছিলাম, যে সব বিশেষণে আপনারা আমায় বিশেষিত করেছেন। আমি বিশ্বব্যাপী পরাজয়ী, পলায়নী মনোবৃত্তির স্রষ্টা। মূর্খ সব, এই যুদ্ধ তোমাদের সামনে পরিত্রাণের পথ দেখাতে এসেছে। সে পথ কোথায় গেছে হয়তো তার সঠিক খবর তারও জানা নেই। কিন্তু এমন কোথাও নিশ্চয়ই যেন আণবিক যুদ্ধের ভয়াবহতা তাদের স্পর্শ করবে না। আমি জানি সারা পৃথিবীর মানুষকে আমার নিজের খরচে সেই পরিত্রাণের পথ দেখাতে আমি পারবো না। আর পারলেই বা কি হবে? কার জন্যে এসব করবো? একদল মূর্খ, মস্তিষ্কহীন আত্মসর্বস্ব মানুষের জন্যে? কি লাভ এতে? এই যে ছোকরা এতক্ষণ আমায় যন্ত্রের গালাগাল বলছিল, সে হঠাৎ হাওয়ায় কোথায় মিলিয়ে গেল?

সভাপতি; ইতস্তত করে সেই সভার মাঝ ধরে ডাকলেন। শ্রোতাদের মধ্যে একজন উঠে দাঁড়াতেই সভাপতি বলেন; আপনি সামনে এগিয়ে আসুন। মাননীয় মিঃ বোল্ডার আপনাকে দেখতে পাচ্ছেন না।

মাস্টারের সামনে দুষ্টু ছেলের মতো পায়ে পায়ে তরুণ বক্তা এগিয়ে গেল মিঃ বোল্ডারের দিকে।

মিঃ বোল্ডার: আমার তরুণ বন্ধু। ব্যক্তিগত ভাবে আমার তোমার বিরুদ্ধে কিছুই বলার নেই। আমরা যে যুগে জন্মেছি সে কালের মানুষ চিন্তাশীল ছিল, কর্মী ছিল। তোমার মা সেই রকম কোন সন্তানের জননী হতে পারলে গর্ববোধ করতেন। তুমি একটা মহামূর্খ। আমি তোমাকে একটা গোপন তথ্যের কথা বলবো, সেই রকম গোপন বিষয় যে রকম থার্মমিটার আজো অনেক মানুষের কাছে গোপন রহস্যের উৎস হয়ে আছে। আমাদের পৃথিবী পাপে পরিপূর্ণ। সমাজ ধনী দরিদ্রে বিভক্ত। একদল কেবলই চায়, যত পায় তাদের লোভের মাত্রা ততই বেড়ে যায়। আরেকদল চায়, কিন্তু পায় না কিছুই। আমাদের আধুনিক সভ্যতার এই পরিপ্রেক্ষিতে এটা অনিবার্য যে একদিন আকাশ থেকে নেমে আসবে মৃত্যুর ধারা অবিরাম ভাবে। অগ্নিবৃষ্টি হবে। কেউ বাঁচবে না একমাত্র বিশুদ্ধ আত্মা ছাড়া। আমরা আজ যাই করি না কেন, আমাদের পৃথিবী সেই দিনের পর নোতুন রূপ ধারণ করবে। কেবল পড়ে থাকবে ধ্বংসাবশেষের পরে এক জাতীয় কীটানু, যারা মহাসমুদ্রের তলদেশে স্তরে স্তরে জমে আবার গড়ে তুলবে নোতুন কালের পৃথিবী। এই হল আমার বলার কথা। আমি বিশেষ কিছু বলতে আসিনি। এসেছি এই সভার শ্রোতৃমণ্ডলীকে দেখতে আর জানতে সভ্যতার নিয়ামক কারা, ধন্যবাদ।

মিঃ বোল্ডার থামলেন। তারপর সদলে যেমন নিঃশব্দে এসেছিলেন, তেমনই চলে গেলেন। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সুরু হলো প্রচণ্ড কোলাহল, মারামারি, আগামী কালের পৃথিবী গড়ার একচেটিয়া কর্তৃত্ব লাভ করবে কারা।

* * *

মিঃ বোল্ডারের বক্তৃতার প্রভাব কোথায় কেমন পড়েছিল না জানতে পারলেও মিঃ ম্যাকফিসল বিশেষ প্রভাবিত হয়ে ছিলেন তার প্রমাণ যথেষ্ট। নিজের ঘরে দোর বন্ধ করে ম্যাক ব্যস্ত হয়ে পড়লেন বোল্ডার প্রদর্শিত পরিত্রাণের পন্থা তাঁর কাছে কতোটা দুর্গন্ধ, সেটা হিসেব নিকেশ করে যাচাই করে নিচ্ছে। সম্পদে, চেকে, টাকায়,

ব্যাঙ্কের পাশবইয়ে যেখানে যতো অঙ্ক বোঝক সংখ্যা আছে, সব তিনি যোগ দিয়ে ফেল্লেন। নিজের যোগ্যতার মূল্যটা এর আগে কোনদিন এমনি করে যাচিয়ে দেখেন নি। মনের হাওয়াটা কোন দিকে বইছে

ও: কি জ্বালা ? দরজায় টোকা দেয় কে ?

পুরুষের পরুষ কণ্ঠ শোনা গেল, হ্যালো ম্যাক ! আরে আমি অ্যাবট, কি ব্যাপার ঘরে আটক কেন ? আরে তোমার নীচের ফ্লাটে, গৃহকর্ত্রী তাঁদের বিয়ের রজত জয়ন্তী উদযাপন করছেন, আর তুমি কিনা এখানে বসে ! এসো, এসো ভদ্রদি ! তোমারও তো আসার কথা !

ম্যাক : ধন্যবাদ, তোমার মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য। আমি একটু পরে যাচ্ছি !

অ্যাবট : সবাই এসে গেছে কিন্তু। ঠিক আছে, কাজ শেষ করেই না হয় এসো।

ম্যাক তখন একদৃষ্টে কাগজের সংখ্যাটার দিকে চেয়ে তন্ময়। এক লাখ সাতশ' আশী ডলার। ও: তাহলে আমার আন্দাজ দেখা যাচ্ছে একটু খানি।

পিশুকণ্ঠ : মিঃ ম্যাক না, বাবা জিগ্যেস করলেন, তুমি কি একটু পানের আসরে আসবে না ?

ম্যাক : সোনা ছেলে। গিয়ে বলো তাঁদের আমার শরীরটা বিশেষ ভালো নেই।

আচ্ছা, ম্যাক ভাবতে থাকেন, তাঁর পৈতৃক ও উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া কিছু টাকা কড়িও আছে। তাইতো সেগুলোর দাম ধরা হয়নি। কত হতে পারে ২০০ ডলার, না একটু ১৭০ না ১৪০ ডলার ! আচ্ছা ঠিক আছে মিনেস ১২০ ডলার তো বটেই। আচ্ছা আর কি আছে তাঁর ? কিছু যদি জিনিষ বিক্রি করে দেওয়া যায়। ঘরের সব তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন বিক্রি করার মতো কোন জিনিষটার দাম আর যোগ করা যায়। কিন্তু দরজায় আবার টোকা পড়ল।

গৃহকর্ত্রী : মিঃ ম্যাক কিনলে আমার মেয়েটা বল্লে, আপনার শরীর খারাপ ? আমাদের খুব খারাপ লাগছে। আপনি বাইরে আসুন না একবার, আপনাকে ভালো করে দেখি।

মিঃ ম্যাক এতটার জন্যে তৈরী ছিলেন না। এক লক্ষাধিক টাকা কড়ি কাগজপত্র ড্রয়ারে পুরে, দোর খুলে দিলেন। গৃহকর্ত্রীকে দেখে মনে হলো তিনি সিনেমা থেকে আসছেন। তাঁর পরণে তখন অ্যাপ্রন।

ম্যাক : সকাল থেকেই শরীরটা বিশেষ ভালো নেই মিসেস ক্লিন। আর তাছাড়া কাগজের খবর লেখা মাথা সব সময় ঝিম ঝিম করেছে।

ক্লিন : সে কথা বলতে ! কি যে হচ্ছে আর কি যে না হচ্ছে, তা আর বলার যো নেই। আর সেই জন্যেই আমাদের মতো লোকের এ সময়ে একটাই পথ খোলা আছে। ভেবে কি হবে, আসুন একটু পানাহার কোরবেন।

ম্যাক : মিস বিটল আছে নাকি ওখানে ?

ক্লিন : না, না, সে তো আছই কোথায় ছুটিতে গেছে শুনলাম।

ম্যাক : ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি ! বলতে না বলতেই ম্যাক তার পিতামহীর পুরোনো কালের নেকলেসটা টেনে বের করে মেলে ধরলেন মিসেস ক্লিনের সামনে : আমার সামান্য উপহার।

ক্লিন। খুশিতে উচ্ছল মুখে বল্লেন, ম্যাক বড়ো খরচের হাত আপনার।

হ্যারী, আমি আন্তরিক ভাবে কামনা করি আপনি খুব সুখী হোন।

ভাগ্যের হাতে বা খামখেয়ালের কাছে চরম আত্ম সমর্পণের আগে মিঃ ম্যাক সংভাবে, আইন মাফিক বোল্ডার কোম্পানীর অফিসে আরেকবার পরিত্রাণের পথ খুঁজতে গেলেন। অফিসের সামনের ঘরে অনুসন্ধান বিভাগ। সারি সারি নম্বর আঁটা জানলার ওপারে ব্যস্ত, কর্মরত মানুষ। একটা জানলায় ম্যাক তাঁর মতো সাধারণ স্বল্পবিত্ত অবিবাহিত লোকের পরিত্রাণের পথে খরচ কতো জিগ্যেস করতে না করতেই, ওপার থেকে সাড়া হলো, ৪২নং কাউন্টারে যান, এটা সামগ্রিক পরিবার পরিকল্পনার ব্যাপার। ৪২নং কাউন্টারে একই প্রশ্নের জবাব এলো, নীচের তলার মি ষ্টকার এর সদুত্তর দিতে পারেন।

ষ্টকার আগ্রহের সঙ্গে জানালেন, আমি আপনার কোন উপকারে আসতে পারলে সৌভাগ্য মনে করবো। আসুন আমার সঙ্গে, আমাদের কতগুলি নোতুন স্কীম দেখাই।

আপনার মতো যাঁরা সাহস রাখেন, তাঁদেরই জন্যে এ ব্যবস্থা। গত ছ'মাসে এটাই আমাদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য। কাগজে দেখেননি, তারা তো এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

তারপর নোতুন ব্যবস্থার গুণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্টকার বলেন যে এত কম খরচে এত বেশি স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে পরিত্রাণ লাভের কোন পথ আর আছে বলে তাঁর জানা নেই। এবিশ্যি আত্মহত্যা ছাড়া! তিনি ম্যাককে মানুষের দেহের মাপে তৈরী বহনযোগ্য স্যালভেটোরিয়ামের সার দেখাতে লাগলেন। কি সুন্দর ব্যবস্থা, আগাগোড়া। আর কি সুন্দর ব্যঞ্জনাময় নাম তাদের। ওই দেখুন না "লুপ্ত সৌন্দর্য ও সাউটীরক্ষী" (ওর মধ্যে একটি অপূর্ব সুন্দরী মেয়ের ঘুমন্ত দেহকে পাচারা দিচ্ছে নানা ভাবে সাজিয়ে রাখা সাউটী লোহার ফলক, পাশেরটার নাম হল "আত্ম কেন্দ্রিকও নিঃসঙ্গতাকাম" (সম্পত্তিপন্ন, খামখেয়ালী অবিবাহিতদের জন্যে ওটা)। তার পরেরটা "স্বর্গের সোপান" (এটা নববিবাহিতদের জন্য দুইটী আসন যুক্ত)। "অনন্তকাল" "শান্ত বিশ্রাম" আরো কত কি নাম এদের। স্টকারের সঙ্গে চলতে চলতে ম্যাকের কানে কোন এক নবদম্পতির কথার টুকরো ভেসে এলো। মিঃ স্টকার এরই মধ্যে একটা একক আসন সংগ্রহ করার জন্যে ম্যাককে পরামর্শ দিলেন।

ম্যাক: ব্যাপার কি জানেন, যত দেখছি ততই নিজের মনের ভিতর থেকে একটা অসহায়তার ভাব, নিঃসঙ্গ জীবনের বোকার ভারটা চেপে ধরে মনটাকে।

স্টকার: আমি দুঃখিত মিঃ ম্যাক। আচ্ছা এইটা দেখুন। নিঃসঙ্গ মুহূর্তগুলো সহনীয় করার জন্যে এর মধ্যে রেকর্ড প্লেয়ার বসানো আছে একটা। এটা নিশ্চয়ই আপনার মনোমত হবে?

ম্যাক: দেখুন আমি ঠিক মনস্থির করতে পারছি না। অবশ্যই আমি আপনার প্রস্তাব বিশেষ বিবেচনা করে দেখবো।

অফিসের বাইরে এসে ম্যাকের মনে হলো মাটীর গভীরে নিশ্চিন্ত শয়ানে ভয়াবহ পরিণাম এড়াবার মতো অর্থ তার নেই। কিন্তু বোমার ঘায়ে যদি ধূলি কণার মতো আকাশে ভেসে বেড়াতে হয়, তাহলে? কিন্তু টাকা চাই। সেটাই পরিত্রাণের পথ দেখাতে পারে। ম্যাকের মন মরিয়া হয়ে উঠলো।

সেইদিন কোন এক সুবেশী সম্পত্তিপন্ন লোকের পকেটে ম্যাক হাত করলেন। কিন্তু মা. পুলিশটা সব ভণ্ডুল করে দিল। রাস্তায় যেতে আসতে ওই যে বড়ো বাড়ীটা পরে, ওর মালিককে ভয় দেখিয়ে কিছু টাকা আদায় করা যায় না। যেই ভাবা সেই কাজ। নির্দিষ্ট স্থানে হাজার দশেক ডলার না রেখে দিলে পরিণাম অন্ধকার। এই মর্মে চিঠি চলে গেল। টাকাও হয়তো এলো। সেই জায়গায় দেখা গেল মোটা খাম পড়ে আছে। কিন্তু অনতিদূরে দেখা গেল খুব লম্বা, একটা লোক পাহারায় করতে করতে নজর রাখছে খামটার ওপর। ডিটেকটিভ্। খামটা হাতে আর তোলা গেল না!

মিঃ ম্যাক হাটে বাজারে, কাফে, কারাবে, ষ্টেশনে রাস্তায়, যত্রতত্র ঘুরতে লাগলেন একই ফিকিরে। এই রকম ঘুরতে ঘুরতেই ম্যাকের জীবনে এলো চরম প্রতীক্ষার দণ্ড।

একদিন সন্ধ্যে বেলার কথা। ভ্রাম্যমান ম্যাক এসে ঢুকল একটা বিউটী পার্লারে। নানা বয়সের মেয়ের ভিড়ে ভিতরটা তার গিজ্‌গিজ্ করছে। অধিকাংশ বয়স্কা মেয়েদের সংখ্যাই বেশি। পড়ন্ত যৌবনের আলগা রাশটাকে টেনে ধরার ব্যাকুল প্রচেষ্টায় অসংভবের হাতছানিতে সাড়া দিতেও বোধহয় বাধা নেই। ম্যাক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। একজন সুসজ্জিতা মহিলার অলংকরণের দিকে চোখটা চলে গেল। ম্যাকের মনে হলো এর সঙ্গে বোধহয় আলাপ জমানো যায়। আর গায়ের গহনা যদি মেকী না হয় তাহলে স্বর্গরাজ্যের দোর কতটুকু। সুরু হলো আনাগোনা, পথ চেনা। একদিন, দুদিন, পরের দিন, রোজ ম্যাক ছায়ার মতো অনুসরণ করে চলছে তার লক্ষ্যকে।

মহিলা কেবল সুবেশী নন, সুদেহীও বটেন। কালো পোষাক প্রায়ই থাকে সর্বদা। বোধহয় কোন শোকের পালা চলেছে। ম্যাকের অধ্যবসায় হয় ফল এতদিন ফললো। একটা কাফের কোণে মহিলাটি আহারে নিবিষ্ট। ম্যাক বিনয় বিগলিত হয়ে অনুমতি চাইল। এখানে বসতে

পারি কি যদি আপত্তি না থাকে ?

এক টেবিলে বসা থেকে আলাপ, প্রাথমিক পরিচয়, তারপর টেবিলের পর টেবিল পার হয়ে গেল তারা দিনের পর দিন। একদিন জিগ্যেস করলো, আচ্ছা যদি কিছু মনে না করেন, আপনাকে এত বিমর্ষ দেখি কেন রোজ। সেটাতো আমারও প্রশ্ন আপনাকে, মহিলা প্রত্যুত্তরে বলেন। ম্যাকের মনে হয় শোকের আঘাত ভুলতে তার সাথীর এই নিরন্তর পথ পরিক্রমা। তাই সমব্যথীর সুরে জবাব দেয়, জীবনটাই নাটক কি না তাই। কেবল পালা বদলের পালা চলছে। কেবল যাওয়া আর আসা। কিন্তু আপনার কি হয়েছিল ?

দুর্ঘটনা মহিলার। সংক্ষিপ্ত জবাব। জানেন আমার সমস্ত মনটা ভেঙ্গে উড়িয়ে দিয়ে গেছে। তিনি নীরব হলেন।

আমারও সেই একই কথা, ম্যাক বলে উঠেন গভীর সমবেদনার সুরে। দীর্ঘদিন ধরে আমার সঙ্গী ছিল সে। হ্যাঁ তা হবে বই কি ন' বছরের ও বেশি হবে, মহিলা যোগ করেন।

কি আশ্চর্য্য, এযে অদ্ভুত মিল। আমার হারানোর ব্যথার গভীরতাও যে ঠিক তাই, ম্যাক জবাব দেন।

আরো দুঃখের কি জানেন। এই তো মাত্র গত সপ্তাহে আমরা ফটো তুলাম একসঙ্গে। আর আজ সে নেই, মহিলার গলায় কান্না যেন ভেঙ্গে পড়ে।

ফটো তুলেছেন সেদিন ? আছে নাকি আপনার কাছে ? দেখি। দেখি ?—

সহানুভূতি মেশানো কৌতূহলে ম্যাক চঞ্চল হয়ে উঠেন।

মহিলাটি হাতব্যাগ খুলে খুঁজতে থাকেন। এক-তাড়া ঝকঝকে নোট বেরিয়ে আসে। তার সঙ্গে একটা ফটোগ্রাফ। ম্যাক হাত বাড়িয়ে গভীর আগ্রহে তুলে নেয়। চামড়ায় মোড়া ছবি। একটা খুব চকচকে রোমওয়ালা বুলডগ্ তার দিকে চেয়ে থাকে।

বিশ্বরের ধাক্কা যতই জোরালো হোক না কেন, ম্যাকের লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। বরং স্বল্প লক্ষ্যী ম্যাকের ঘনিষ্ঠতা ক্রমেই ভিতরে ভিতরে অর্থহীন হাসি হাসতে থাকে। তার অমায় ঘরের জমজমাট চেহারাটা কেমন যেন দ্রুত ফিকে হয়ে আসে।

মিঃ ম্যাকফিনলে যেন নব-যৌবনের আবেগে টগবগ্ করে ফুটে উঠতে চান। বাকে কাবারে বিগত যৌবন প্রৌঢ় ম্যাক আর প্রৌঢ়া মহিলার। যাঁর নাম হলো মিসেস শ্যামওয়ে, একটা মিষ্টি হয়ে দাঁড়াল ফুটিতে। মিসেস শ্যামওয়ের মুখর জীবনের মুখরতায়, ম্যাকের চোখে ভেসে ওঠে একটা পুরো ছবি, যেখানে ভালো-লাগা, মন্দলাগার চেয়েও আরো অন্য কিছুর হাতছানি তখন প্রবল হয়ে উঠেছে।

মিঃ ম্যাকফিনলে জানতে পারেন মিসেস শ্যামওয়ে বিধবা। নিঃসন্তান। ভরা, বাড়ীতে তাঁর অঢেল আকর্ষণ, উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। মিঃ ম্যাক নীতি-বাগীশ কোনদিনই ছিলেন না। কিন্তু ভরা, ভরাবীর কথায় মনটা কেমন যেন একটু কুঁকড়ে যায় তাঁর। কিন্তু তাতেই বা কি যায় আসে। জীবন ভরার চাল দিয়ে তো আর তার দান ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। ম্যাক তখন সেই ভরাতে মেতেছেন।

একদিন ঘুরতে ঘুরতে মিসেস শ্যামওয়ে প্রস্তাব করলেন, কোথাও গিয়ে খাওয়া দরকার। তিনি রীতি-মতো ক্ষুধার্ত। ম্যাকও সায় দিলেন যে, তাঁরও যেন মনে হচ্ছে খাওয়া হয়নি অনেকক্ষণ।

হোটেলে ঢুকে ম্যাক বাহাই করা খাবারের অর্ডার দিতে দিতে ভাবলেন, আচ্ছা অনেক দিনতো হলো। যে ভাবে যে কথায় তরুণ তরুণীরা মন দেওয়া নেওয়ার

কারখানা ও কৃষিক্ষেত্রে
জাতির প্রতিরক্ষায়
অস্ত্রেরই সমাগোত্র

কথা বলে, তারা সেই স্তরও পিছনে ফেলে এসেছেন অনেক দিন। এরাতে মনোযোগে মনের কথাটাকে পাকাপাকিভাবে পেশ করার দোষ কি ?

ম্যাক : আচ্ছা তুমি কি কখনো, কাউকে ভালোবেসে ছিলে ?

স্যামওয়ে : না, কোনদিনই বোধহয় নয়।

ম্যাক : তাহলে বিয়েটা ?

স্যামওয়ে : সেটাই যেন কেমন করে একদিন হয়ে গেলল ওটা আমার কিসেরের বাইরে ছিল ? আর তা ছাড়া স্বামীর ঘর আমি নামে করেছি। স্বামীতো সারাটা জীবনই ঘোড়ার পিছনে ঘুরে কাটালেন, এদেশে ওদেশে। আর তাতেই কাজ চলো।

ম্যাক : আশ্চর্য ! এমন সুন্দরী স্ত্রীর দিকে না চেয়ে, মানুষ ঘোড়ার পিছনে ছোটার কি অদ্ভুত আবেগ অনুভব করে কে জানে !

আচ্ছা তুমিও চাওনি তার দেখা পেতে ?

স্যাম : কেন ? কিসের জন্যে ?

ম্যাক : সত্যি। শিকাগো কলকাকলীতে মুখর একটা ছোট্ট শান্ত নীড়, তোমার ভালো লাগে না স্যাম ?

স্যাম : কোনদিনই ওভাবে ভেবে দেখার চেষ্টা করি নি। আমার স্বামী বলতেন যা আমার নেই, তার ভালো-মন্দের বিচার আমি করতে যাব কেন ? তা ছাড়া তার বিশ্বাস ছিল, মানুষ সন্তানের কথা বলে, আসলে ঠকাতে চায়।

ম্যাক : এই রকম কথা আমারও না শোনা নয়।

কথা বলতে বলতে ম্যাকের মনে হলো, তার জীবন লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। মনের সুর হারিয়ে গেছে। কে জানে নিয়তি এই পরিবর্তনের কোন খেসারত দাবী করবে ?

হোটেলের যে দিকে বসে তারা কথা বলছিল, তার কাছাকাছিই স্টেজ। একটা সুন্দরী মুলাতো প্রায় নগ্ন দেহে নেচে যাচ্ছে তাদের কাছ দিয়ে। বাজনার তালে তালে তার সুঠাম দেহের গতি ভঙ্গিমায় সমস্ত ক্লাব সরগরম। মিসেস স্যামওয়ে একদৃষ্টে স্টেজের দিকে চেয়ে আছে, আর সকলের মতো। বোধহয় মিঃ ম্যাকক্লিনলে এখানে একমাত্র ব্যতিক্রম। তার চোখজোড়া যেন আটকে আছে মিসেস স্যামওয়ের খাড়ের কুঁকড়ে পড়া চামড়ার উপর, চুলের পাশে ধূসর রঙের ছোপের উপর। ধীরে ধীরে তাঁর মুখ রেখাবহুল হয়ে পড়ে। চিন্তার সাগর পেরিয়ে যেন তিনি যতই কূলের দিকে এগোতে থাকেন, ততই সঙ্কল্পের দৃঢ়তায় মুখের পরিবর্তন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। হঠাৎ সেটা বোধহয় মিসেস স্যামওয়ের চোখে পড়ে যায়।

অনেকক্ষণ ধরে ম্যাকের দিকে চেয়ে তিনি জিজ্ঞেস করেন একটুও গোপন না করে, আমায় বলবে ম্যাক, কি ভাবছিলে ?

ম্যাক : হ্যাঁ !

স্যাম : বল তো, কি তোমার এমন চিন্তা, যা এই মুহূর্তেও অভিভূত করে রাখে ?

ম্যাক : মনে হচ্ছিল কি জানো মানুষ প্রায়ই তার খোলসটা ছেড়ে বেরিয়ে আসার সুযোগটার সদ্ব্যবহার করতে পারে না।

স্যাম : তোমার খেয়ের সঙ্গে কি আমিও জড়িয়ে আছি ম্যাক ?

ম্যাক : এ কথা শুধু তুমি, আমি কেন আমরা সকলেই জড়িয়ে গেছি। আমি মনস্থির করে ফেলেছি··· হ্যাঁ ঠিক তাই···আর কদিন পরেই আমি আর থাকবো না। না, না, ভয় পেয়ো না, আমি কোন স্যালভেটোরিয়ানে চলে যাব !

স্যাম : এটাও একটা নতুন রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরাই কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু গত তিন মাস ধরে সেখানে ঠাঁই নিয়েছে। তোমার দূরদর্শিতার প্রশংসা করি মাত্র। শুধু যদি সত্যিই আসে, তাহলে হাজারো চাপের মধ্যে দুঃসহ জীবন নিয়ে এখানে বেঁচে মরে থাকার চেয়ে, স্যালভেটোরিয়ামের আশ্রয় অনেক আকর্ষণীয়। তাহলে এসো না কেন, আমরা দুজনেই যাই ? দেরী করে লাভ কি ? একজোড়া তৃপ্ত, ভবিষ্যতের সুখে সুখী কপোত কপোতীর মতো, আমরাও না হয় আগামী তিনশ' বছর ঘুমিয়েই কাটিয়ে দেব। তাতে যদি তোমার আপত্তি না থাকে, তাহলে চলো কালই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করি।·····*

* অনুবাদক—বাদর সরকার

এই অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই সবাই চিনে ফেলেছে।

মাত্র সেদিন এসেছে। পাঁচ মাসের বেশিও হবে না। পার্সোনাল সেক্সানের টাইপিস্ট। অসীমা মিত্র। এখানে যেন নতুন আসে নি। বেশ কয়েক বছর আগেকার। অন্য মেয়েরা এতো তাড়াতাড়ি পরিচিতি লাভ করে নি। এমন কি সেলস্ সেক্সানের মিনতি মুখোপাধ্যায়কেও এখন পর্যন্ত সবাই চেনে না। চেনা উচিত ছিলো। কারণ মিনতিই এই অফিসের সবচেয়ে আধুনিক মহিলা। মেয়েরা অসীমাকে দেখে। হিংসে করে। কি আছে মেয়েটার মধ্যে? ওকে নিয়ে সবজায়গায়ই আলোচনা। পুরুষ। পুরুষদের মধ্যেও। কেউ প্রশংসা করে। কেউ নিন্দা। কেউ ধন্যবাদ।

অসীমা সুন্দরী নয়। চেহারাটাও তেমন শ্রী নয়। মনে রাখার মতো মোটেই নয়। গায়ের রঙ কালো। দীর্ঘাঙ্গী। মুখে গাম্ভীর্যের ছাপ। বয়সের সঙ্গে গাম্ভীর ভাবটা যেন বেমানান। চোখে সৌন্দর্য আছে অসীমার। শুধু একটা অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। একটা বিশেষত্ব। এইটুকুই সম্বল। নিত্য-নতুন সাজগোজ করে না। চোখে গহীন চশমা পরতে দেখা যায় নি কোনদিন। গলাটা খালি। নিরস্ত্র মরুভূমির মতো। কান দুটো অলঙ্কারহীন। দু'হাতে দু'টো বালা জড়ো রয়েছে গোল হাতে। অসীমা রঙ বেরঙের শাড়ি পরে না। একই রঙের ছাপা শাড়ি পরে। অন্ততঃ এই কয়েক মাসের মধ্যে কেউ ওকে এই একই রঙের ছাপা শাড়ি ছাড়া অন্য রকম পরে আসতে দেখে নি।

চিঠিটা টাইপ করছিলো অসীমা। কয়েকটা অক্ষরের ওপর আঙুল পড়ছে। যেন নাচছে। একবার উপরে উঠছে। আবার নিচে। একটা ছন্দ তৈরী হচ্ছে। শব্দগুলোর জন্ম হচ্ছে। জন্ম নিচ্ছে। শব্দ থেকে লাইনে। সাদা কাগজের বুকে কালো, লাল অক্ষরগুলো হাসতে হাসতে বসছে। কারু সঙ্গে কারু মিল নেই। প্রত্যেকের চেহারা আলাদা। অথচ সবাই মিলে একটা ভাব প্রকাশ করছে। একান্নবর্তী পরিবারের মতো মিলে মিশে বসা রয়েছে।

—মেয়েটার বোধ হয় ট্রেডমার্ক হ'বার ইচ্ছে।

টাইপরাইটারের বেসুরো শব্দের মাঝেও কথাগুলো শুনতে পেলো অসীমা। হাতের আঙ্গুলগুলো অবশ হতে চাইলো। একটা দুর্বার অবসাদ। শিথিলতা। রক্ত চলাচল যেন মুহূর্তের মধ্যে বন্ধ হয়ে যাবে। বুকটা কাঁপছে। দ্রুত। রেলের চাকার মতো। কোথায় যেন প্রসাদ ধ্বণা ছড়িয়ে পড়লো। মুখের রক্ত বোধ হয় উবে গেছে। বিবর্ণ কাগজের মতো ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে মুখটা। সামনে আয়না থাকলে দেখা যেতো। মেশিন থেকে হাতটা গড়িয়ে পড়লো টেবিলের প্রান্তে। অসীমার আঙ্গুল নড়ছে না। টাইপ রাইটারটা নিশ্চুপ। আঘাতটা যেন মেশিনটার বুকেও লেগেছে। এতক্ষণ শব্দ করতে করতে, কথা বলতে বলতে যন্ত্রণার বোবা হয়ে গেছে। অসীমা অনড়। মাথার উপরে বৈদ্যুতিক পাখা ঘুরছে। সোঁ সোঁ শব্দ। তবু ঘাম ঝরছে। কপালে জমছে বিন্দু বিন্দু। নাকের ডগায় ঘাম। ব্লাউজের ভেতরে গরম ভাব। অস্বস্তি। রুমাল তুলতে পর্যন্ত ভুলে গেছে অসীমা। কাজ করার শক্তি কোথায় হারিয়ে গেলো? পরনের ছাপা শাড়িটার প্রান্তটা তুলে ধরলো চোখের সামনে। শাড়িটার সুতোয় সুতোয়, তার ছাপা রঙে দৃষ্টিটা নিবদ্ধ। একটা কিছু যেন আবিষ্কার করতে চাইলো।

স্কুল ফাইন্যাল পাশের খবর নিয়ে যেদিন বাড়ী ঢুকলাম—উঃ সেদিনটা,—ভীষণ। আর অন্ধকার। বাবার শান্ত চেহারা। চিরদিনের জন্য ঘুমিয়েছিলেন সাদা ধবধবে বিছানায়। পরিষ্কার বিছানা না হলে বাবার ঘুম হতো না। আমি বিছানা না করলে খুঁত খুঁত করতেন। মা খোঁটা দিতেন। বাবা রাগ করতেন না। শুধু হাসতেন। বাবার চুল একটাও পাকে নি। তবুও কেমন করে মৃত্যু এসে বাবাকে ছিনিয়ে নিলো। মায়ের হাতের শাঁখাটা যখন জোর করে ভাঙ্গা হলো—মা স্থির হয়েছিলেন। চোখের জল শুকিয়ে গেছে। একটা নিদারুণ স্তব্ধতা থম্ থম্ করছিলো। সারা ঘর জুড়ে। ঝড়ের আগের মুহূর্তের মতো বিমূঢ় হয়ে ছিলো সবাই। মায়ের হাতটা শাঁখার ধারালো টুকরোর আঘাতে কেটে গিয়েছিলো। রক্ত। রক্ত। রক্ত। সেই রক্ত দিয়ে সেদিন মায়ের ভাগ্যটা অন্যরকম ভাবে লেখা হয়ে গেলো। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মা সিঁথির সিঁদুরটা ঘষে ঘষে তুলছিলেন। বিধবা। আমি দেখতে পারছিলাম না। কুমারী মন ফোঁস ফোঁস করেছে। যন্ত্রণায় কেঁদে উঠেছে। মাকে বাধা দেওয়ার জন্য মনটা বলে উঠেছিলো। পারি নি। পারি নি। ঠোঁট কেঁপেছে। প্রথা। আইন। সংস্কার। না কুসংস্কার! হিন্দুধর্ম আর সমাজ।

বাবুল বিকেল হলেই বাবাকে খুঁজে বেড়াতো। মৃত্যু কি জিনিষ ওকে বোঝাতে পারি নি—দিদি বাবা আসবে না? আসল সত্যটা মুখ ফুটে বলতে পারি নি। চুপ করে গেছি। ক্রমাগত প্রশ্নের চাপে মাঝে মাঝে মাথা নেড়েছি। আসবে বাবা। আসবে। শান্ত হ'তে চায় নি। বাবুল। শান্তা ওকে নিয়ে বেড়াতে বের হতো। জামা প্যাণ্ট পড়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তো বাবুল—বাবার দেশে যাবো? শান্তার

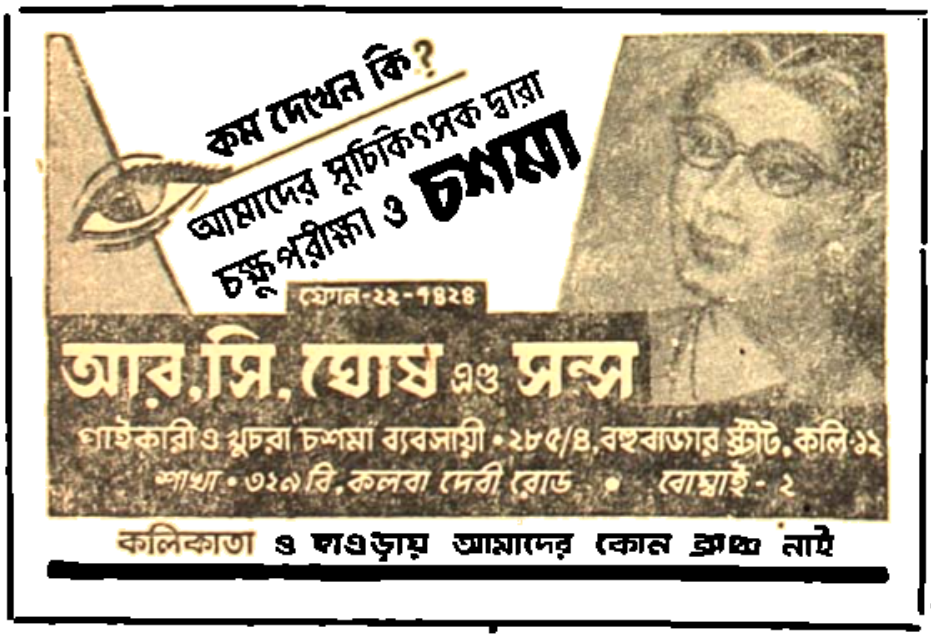

চোখ লাল হয়ে উঠতো। বাবুলকে পাঁজাকোল করে বেরিয়ে পড়তো রাস্তায়। বাবুল কাঁদতো। পা ছুঁড়তো। মা উদাস হয়ে দেখতেন। বাবুলের পা ছোঁড়া আর শান্তার ঘরের গতি।

বিকেলের রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকতেন মা। ঘরা রোদের দিকে। পাড়ার সবাই ফিরছে অফিস থেকে। নকুলবাবু। বিশুবাবু। সন্ধ্যা ঘনায়মান। বিমলী বাতির চোখের দৃষ্টিটা পড়েছে রাস্তার উপর। ভীড় বাড়ছে। কোলাহল। মা যেন কার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমি জানতাম। আমি জানতাম মা কাকে খুঁজছে। পর্ণশ্রীর প্রতীক্ষা। পর্ণশ্রী তুমি মরবে না। তোমার মৃত্যু নেই। মায়ের লম্বা চুলে হাত রেখেছি। অথচ অবহেলায় এতো সুন্দর চুলগুলো নষ্ট হলো। মা। ওমা।

—কে তুমি এলে, এতো দেরী কেন? মায়ের গলার স্বরটা শুনে ঘরের নিস্তব্ধ পরিবেশটাও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছিলো।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলো।—তুই, অরু, আয়। আমার বুকটাও খালি মনে হতো। দুঃখ, কষ্ট আর যন্ত্রণা। অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়েছি। কপালে হাত রেখেছি। ভাগ্য মানতে বাধ্য হলাম। একটা মৃত্যু গোটা সংসারটাকে কেমন করে ডুবিয়ে দিলো! বাবা কতোবড় আঘাত!

চাকুরীটা না পেলে মরে যেতাম। এখনও কি বেঁচে আছি? শুধু প্রাণ থাকার নামই কি বাঁচা? বাবুলের স্কুলের পড়াশুনা। ভবিষ্যত। বাড়ীভাড়া, লাইট-চার্জ। শান্তার পড়াশুনা। ভবিষ্যত। আমার নিজের অদৃষ্ট। ভবিষ্যত। আমার আবার ভবিষ্যত কি? বর্তমানেই ভবিষ্যত। তবুও···। রেখার স্বামী কি সুন্দর দেখতে। রেখাকে ওর পছন্দ হয়েছে। স্কুলের সবচেয়ে বোকা মেয়েটা। এখন কতো চালাক হয়েছে। স্বামীর সঙ্গে সিনেমায় যাচ্ছিলো—"যাস্ একদিন। তুই কিন্তু খুব গম্ভীর হয়ে গেছিস্!" আমি হাসতে চেষ্টা করছিলাম। পারি নি। কেন? বিবাহিত জীবনে সুখ কি? বন্দনা দি। জীবনটা নাকি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। অফিসে খেটে গিয়ে বাড়ীতেও খাটে। ব্যক্তিস্বাধীনতা তাহলে রইলো কোথায়? স্বাধীনতা জিনিসটা আসলে মানসিক ব্যাপার। বন্দনাদি সারাদিন সংসারের ঝামেলার কথা বলে। গল্প করে। কিন্তু তবুও শনিবারে একটা বাজতে না বাজতেই কাগজপত্র গুছিয়ে রাখে। বেরিয়ে যায়। স্বামীর সাথে একসঙ্গে ফিরবে। সুখের ওনারী। আদম ও ইভ। আদিম আকর্ষণ। ঘরসংসার। এতটুকু বাসা আর শান্তি।

—এই কি ভাবছিস্রে? নন্দিতার গলার স্বরে চমকে ওঠে অসীমা। টিফিন হয়ে গেছে। কাজ ফেলে রাখ। বাইরে ঘুরে আসি। অসীমা, নন্দিতা, শ্যামলী আর শম্পা। ক্যান্টিন। টেবিল আগলে বসে চারজন। নিরুত্তাপ জীবনে একটু উত্তাপ আসে। হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর আধঘণ্টা সময়কে এক কাপ চা দিয়ে গরম করে।

—রিয়েলি ইউ আর লাকি এনাফ্, অসীমা-শম্পা চারে চুমুক দেয়।

—আমাদের পরে এসেও তোমার কতো নাম। সবাই তোমাকে চেনে—নন্দিতা যোগ করলো।

—অসীমা, অসীমা। সারাটা অফিসে তোমার কথা। বিভাসবাবু তো সেদিন বলেই বললেন—অসীমা মিত্রের চলার ছন্দ আছে। শ্যামলী বললো। আড়চোখে তাকিয়ে।

—নট অনলি দ্যাট, অসীমা ইজ এ্যাপ্রিসিয়েটেড ফর হার সিনসিয়রিটি। স্টাইল নেই। অথচ ব্যক্তিত্ব আছে। সব সময় সাদাসিদে। একই রঙের শাড়ি পড়ে—শম্পা বললো।

—কিন্তু যাই বলিস ভাই, এক রকমের এতগুলো কেনার মধ্যে কোন যুক্তি নেই। কটা এই রঙের শাড়ি কিনেছিস? অসীমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো নন্দিতা।

অসীমা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। এতোগুলো কথার কোন জবাব তার মুখে নেই। কি বলবে? চায়ের কাপটা মুখ থেকে নামিয়ে টেবিলে রাখলো। গরম পানীয় খেয়েও শরীরটা গরম হলো না। হতে চাইলো না। হাতদুটো ধরে টেবিলে পাক দিলো চায়ের কাপটাকে। অনেকগুলো মুখ, অনেক কথা। টুকরো টুকরো বক্তব্য ভেসে উঠলো।

চাকুরী জীবনের এই পাঁচটা মাস। অনেক ব্যথা আর যন্ত্রণার স্মৃতি। মেয়েটার ট্রেডমার্ক হবার ইচ্ছে। অন্য সব মেয়ের চেয়ে অন্য ধরণের। ঘরে প্রোডাকশন। এটাও একটা স্টাইল। হাঁটে কিন্তু ছন্দোবদ্ধভাবে। মাটিতে যেন পা পড়ে না। শাড়িটা সাপের মতো একে বেঁকে চলে। অসীমা শুনেছে। অনেক। অনেক। মানুষের বক্তব্য। মন্তব্য। মুখস্থ হয়ে গেছে। অসীমা নির্বিকার। দীঘির শান্ত জল বাতাসের দোলায় চঞ্চল হয় নি।

—হোয়াটস দ্যা রং উইথ ইউ—এই, কিরে চুপ করে গেলি কেন? অসীমার গায়ে ধাক্কা দিলো নন্দিতা।

—আশ্চর্য ইউ আর সো কোল্ড! এখনই এমনি—দেখ অতো গম্ভীর হওয়া ঠিক নয়। বন্ধুদের সঙ্গে হৈহুল্লোড় করবি না?

—না, তুই একেবারে অচল! বয়সের সঙ্গেও তাল রাখতে পারবি না। নাকে দড়ি দিয়ে বলদের মতো ঘোরাবে।

চারটি প্রাণী একসঙ্গে হো হো করে হেসে উঠলো। আর কটার এই মুহূর্তটাকে নিয়ে উপভোগ করছে।

—কালের কথাটা বলি। পরশু ছুটির দিন। স্বাধীনতা দিবস। আমরা সবাই মিলে কিন্তু করছি। অসীমা, ইউ মাস্ট বি দেয়ার। প্রত্যেকবার এড়িয়ে যাও। এবার ছাড়ছি না। ডিউটিফুল উইল বি নোটিফাইড টু মরও। নন্দিতা অসীমার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিলো।

—থি চিয়ার্স ফর নন্দিতা সেন। শ্যামলী, শম্পার স্বর ক্যান্টিনের মিলিত কোলাহলে হারিয়ে গেলো।

—কথা দিলাম। আমিও থাকবো। অসীমা বললো সকলের স্বর যখন থামলো।

—থ্যাংকু—টিফিন আওয়ার্স ইজ ওভার!

পনেরোই আগস্ট। স্বাধীনতা দিবস। বাংলা দেশ উনিশশো সাতচল্লিশ সালে ইংরেজের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছে। আন্দোলন। গুলী বারুদ। জেল-ফাঁসী ক্ষুদিরাম, মাস্টারদা, সুভাষ বোস, প্রীতিলতা, অসহযোগ আন্দোলন। বাপুজী। জহরলাল। তিন রঙের পতাকা উড়ছে আকাশে। রাস্তায় মিছিল। কুচকাওয়াজ। বাজির শব্দ। অফিস, আদালত বন্ধ। স্বাধীনতার আনন্দ। বাদ্য বাজছে। মেহগনির ছবিতে ফুলের মালা। আজ ফিস্ট। নন্দিতা, শ্যামলী, শম্পা। ওরা আসবে বলেছিলো। আসি যাবো। যেতে হবে। শাড়িটা পাল্টাতে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেলো অসীমা। পাথরের মূর্তির মতো। ব্লাউজ উঠতে গিয়ে ছিঁড়ে গেছে একটা অংশ। অনেক রকম ভাবে পড়ে দেখলো। বারবার পড়লো। খুললো। চেষ্টা করেও ছেঁড়া জায়গাটা ঢাকতে পারলো না। বাক্স থেকে টাকা বের করলো অসীমা। একটা শাড়ি কিনবো। আধুনিক ডিজাইনের। টাকাটা গুনে হাতে নিলো। বাবুল। এ মাসে বাবুলের স্কুলের মাইনে দিতে হবে। গত মাসে বাকি পড়েছে। একবার বাকি পড়লে তার স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেবে। বাবুল। বাবুলের ভবিষ্যৎ। থাকবো না। পারবো না। একটা সুঁচ আর সুতো নিয়ে ছেঁড়া শাড়িটাকে তিপ্ করতে বসলো অসীমা। রাস্তা দিয়ে স্বাধীনতা দিবসের মিছিল যাচ্ছে। আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। আমার দাদা অবিস্মর মিত্র বিপ্লবীদের আন্দোলনে শহীদ হয়েছেন। পুলিশের গুলিতে চওড়া বুকটা ফুটো হয়েছিলো। পাশের ঘরে মা হাঁফানীর কষ্টে ছটফট করছেন। রাস্তা ঘর থেকে রাস্তার টুং টাং আওয়াজ ভেসে আসছে। অসীমা মিছিল দেখছিলো। সুঁচটা ফুটে উঠলো হাতে। যন্ত্রণা। নন্দিতা, শ্যামলী, শম্পার আসবার আশা করেনি অসীমা।

—এই তোমার কথার দাম। আমরা বসে বসে—নন্দিতার কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হয়ে গেলো। তিন জোড়া চোখের দৃষ্টিতে অসীমা ভয় পাওয়া হরিণীর মতো চঞ্চল হয়ে উঠলো। এই পৃথিবী থেকে পালিয়ে যেতে পারলে অসীমা বাঁচতো। এক হাতে সুঁচ-সুতো আর এক হাতে ছেঁড়া শাড়িটা নিয়ে অসীমা দাঁড়িয়ে আছে। নন্দিতা, শ্যামলী আর শম্পা চোখের দৃষ্টি রাস্তার দিকে ফেরালো। অসীমা কাঁপছে। ঠোঁটদুটো নড়ছে। অসীমার পরণে জীর্ণ সাদা থান।

সর্বভাষা কবি সম্মেলন

অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৯৬২ সালের কবি সম্মেলনে পঠিত সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বাংলা কবিতাটি নিশ্চয়ই একটি ভালো কবিতা। কবিতাটির শিরোনামা, "পাথরের ফুল"। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পরে সুভাষবাবু এই কবিতাটি লিখেছিলেন এবং "পরিচয়" পত্রিকায় কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। কবিতাটির হিন্দী অনুবাদ কিন্তু একেবারেই আশানুরূপ হয় নি। এই কবিতাটির হিন্দী অনুবাদ করেছিলেন হংসকুমার তেওয়ারী। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের "পাথরের ফুল" কবিতাটির হিন্দী অনুবাদ করার ভার যোগ্যতর অনুবাদকের উপর ন্যস্ত হলে কবিতাটির উপর উপযুক্ত মর্যাদা প্রদর্শন করা হত। অনেক ভালো ভালো বাংলা গান ও কবিতা হিন্দী অনুবাদের কড়িকাঠে কি ভাবে যে ঝুলতে থাকে তার নজীর দেখানো হলে সুকুমার রায়ের "য-ব-র-ল"র মতো রচনাও হার মেনে যাবে। এমনকি ভারতের বিশ্বকবিও এই ঝোলাঝুলি থেকে রেহাই পান নি। এই তো সেদিন রবীন্দ্র শত-বার্ষিকী উপলক্ষে বিশ্বকবির কত গান, কত কবিতা হিন্দীতে অনূদিত হয়েছে আর তার এক-একটি নিদর্শন বিচিত্র। আকাশ বাণী খুব ঘটা করে রবীন্দ্র-নাথের ১০১টি প্রসিদ্ধতম গান হিন্দীতে অনুবাদ করে গানের মালা সাজিয়েছেন। এক-একটি অনুবাদের নমুনা দেখলে, অবাক হওয়া শুধু নয়, ভয় পেয়ে যেতে হয় ভবিষ্যতের কথা ভেবে। "রোদন ভরা এ বসন্ত, সখি" হিন্দী অনুবাদে হয়েছে, "দুঃখমে ভরা এ বসন্ত···"; "রোদন ভরা" আর "দুঃখমে ভরা" কি এক হল? রাষ্ট্রভাষার সূক্ষ্ম আবেদনের বালাই নেই।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের "পাথরের ফুল" কবিতাটির সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি এখানে দেওয়া হল :

ফুলগুলো সরিয়ে নাও
আমার লাগছে।
নালা
জমে জমে পাহাড় হয়
ফুল
জমতে জমতে পাথর।
পাথরটা সরিয়ে নাও
আমার লাগছে।
এ আর
আমি সেই দশাদই জোয়ান নই
রোদ না, জল না খাওয়া না···
এ শরীরে আর
কিছুই সয় না।
মনে রেখো
এখন আমি মার আদুরে ছেলে···
একটুতেই গলে যাবো।
যাও বলে
সেই কোন সকালে বেরিয়েছে···
উঠতে উঠতে সন্ধ্যে হল।
রাস্তায়
আর কেন আমায় দাঁড় করাও?
অনেকক্ষণ ধেয়ে থাকার পর
গাড়ী এখন চিকিয়ে চিকিয়ে চলেছে।
বোঝে

ফুলের দোকানে ভিড়।
লোকটা আজ কার মুখ দেখে উঠেছিল?

— ২ —

ঠিক যা ভেবেছিলাম
হুবহু মিলে গেল।
সেই রূপ, সেই রুচী, সেই মালা, সেই মিছিল…
রাত পোহালে
সভা উভাও হবে।
: একমাত্র ফুলের গলা জড়ানো কাগজে
লেখা নামগুলি বাদে :
সবকিছুই হুবহু মিলে গেল।
মনগুলি যখন নরম…
এবং
এই হচ্ছে সময়।
হাত একটু বাড়াতে পারলেই
ঘাট খরচটা উঠে আসবে।
এক কোণে ছেঁড়া জামা পরে
লুকনো চোখে
দাঁতে দাঁত দিয়ে
ছেলেটা আমার
পুঁটুলী পাকিয়ে বসে।
বোকা ছেলে আমার,
ছি ছি এই তুই বীর পুরুষ?
শীতের তো সবে শুরু…
এখনই কী কাঁপলে আমাদের চলে?
ফুলগুলি সরিয়ে নাও,
আমার লাগছে।
মালা
জমে জমে পাহাড় হয়
ফুল
জমতে জমতে পাথর।
পাথরটা সরিয়ে নাও
আমার লাগছে।

— ৩ —

ফুলকে দিয়ে
মানুষ বড় বেশী মিথ্যে বলার বলেই—
ফুলের উপর কোন দিনই আমার
টান নেই।
তার চেয়ে আমার পছন্দ
আগুনের ফুলকি…
যা দিয়ে কোন দিন কারো মুখোশ হয় না।
ঠিক এমনটাই যে হবে,…
আমি জানতাম।
ভালবাসার কেনাগুলো এক দিন
উথলে উঠবে
এ আমি জানতাম।
যে…বুকের
যে…আধারেই ভরে রাখি না কেন
ভালবাসাগুলি আমার…
আমারই থাকবে।
রাতের পর রাত আমি জেগে থেকে দেখেছি
কতক্ষণে কী ভাবে সকাল হয়,
আমার দিনমান গেছে
অন্ধকারের রহস্য ভেদ করতে।
আমি একদিন, এক মুহূর্তের জন্যে ও
ঘুমিনি।
জীবন থেকে রস নিংড়ে নিয়ে
বুকের ঘটে ঘটে আমি ঢেলে রেখেছিলাম
আজ তা উথলে উঠল।
না।
আমি আর শুধু কথার ফুল্ট নই
যেখান থেকে সমস্ত কথা উঠে।
যেখানে যায়…
কথার সেই উৎসে,
নামের সেই উৎসে
জল মাটি—হয়ে যায়
আমি নিজেকে মিশিয়ে দিতে চাই।
কাব বদল করো।
এবার, তুপাকার কাঠ আমাকে দিক।
আগুনের একটি রমণীয় ফুলকি
আমাকে ফুলের সমস্ত ব্যথা
ভুলিয়ে দিক।

"যামিনী বিরহদুনে যানস
তক্ক কুট্মলিত ভূবি তরুহে।
বিন্দু বিন্দু মকরন্দ লোলুপ
পথিনীং মধুপ এব যাচতে।"

[রাত্রি যখন নামে। কোরকের মত পদ্মের পাপড়িরা যখন অবরোধ সৃষ্টি করে মধুর ভাণ্ডারে। তখন তিরাসী ভ্রমরের সমস্ত দম্ভ প্রয়াস নিষ্ফল।]

না। কোনো মহাকাব্যের উদ্ধৃতি নয়। চিঠি। আজ হতে প্রায় সাড়ে তিন শ' বছর আগের লেখা একটি পত্র কাব্যের অবিকল অনুকৃতি মাত্র।

কিন্তু এ চিঠি কোনো প্রেমিক মনের নিছক উচ্ছ্বাস নয়। অথবা কোনো রসগ্রিয় রসিক মর্মান্তিক কৌতুকও নয়।—এ চিঠি এক বিচিত্র কাহিনীর অংশ।

পত্র লিখেছিল পূর্ব বাংলার এক বিশিষ্ট ভূস্বামী কৃষ্ণনাথ সার্বভৌম। আর সে চিঠির উত্তর দিয়েছিল দানুকা গ্রামের একটি মেয়ে—তার নাম বৈজয়ন্তী।

"পুন্নাগ চম্পক লবঙ্গ সরোজমল্লি
মালতী যুথি রসিকস্য মধুব্রতস্য।
যৎ কুন্দবৃন্দকটে কেবলেপি পক্ষপাতঃ
সর্বংসহস্য মহতো হি মহত্ব হেতুঃ।"

[সুগন্ধময় ফুলের নির্যাস যার অনায়াসলব্ধ।—সেই ভাগ্যবান তুমি। তথাপি আমার মত সামান্য কুন্দ পুষ্পের প্রতি তোমার যে গভীর অনুরাগ, সে শুধু তোমারই···মহত্ব।]

এ পত্রটিরও উত্তর দিয়েছিল কৃষ্ণনাথ। আর তার জবাবে পেয়েছিল অনুষ্টুপ ছন্দের একটি রোমান্টিক পত্রকাব্য। কিন্তু তার আগে এমন কতকগুলি পত্র লিখেছিল বৈজয়ন্তী,—যেগুলির কোনোটিই দেখতে পায়নি কৃষ্ণনাথ। লেখার সঙ্গে সঙ্গেই ছিঁড়ে ফেলেছিল। ভাসিয়ে দিয়ে এসেছিল আরিয়াল খাঁর অতল জলের গভীরে।

কি কথা লেখা ছিল সেই পত্রগুলির পাতায়?—না, সে কথা বলতে পারে না ইতিহাস। সে শুধু জানে সেই পত্রগুলি ছিল স্বামীত্যক্ত একটি কালো মেয়ের

অনেক আশা আকাঙ্ক্ষার নীরব নিস্তরঙ্গ রোমন্থন।

···প্রতিদিন সন্ধ্যায় প্রদীপের সামনে চুপি চুপি এসে দাঁড়াতো বৈজয়ন্তী। দরজা বন্ধ করে সন্তর্পণে নামিয়ে আনতো লিখন সামগ্রী। তারপর পত্র লিখতে বসতো স্বামী কৃষ্ণনাথকে। কিন্তু পাঠাতে পারতো না। মনের লজ্জায় কুঁকড়ে উঠতো। ছিঁড়ে ফেলতো তার কুন্দ-সৌরভের সাক্ষ্যগুলিকে।

এক বছর আগে।

বাসর ঘরে প্রদীপের আলোতে মুখোমুখি বসেছিল সামাইদের মধুর মূর্ছনা স্তব্ধ ঘরে থেমে গেছে অনেক আগেই। মৌন রাত্রির তারাগুলো আকাশের

কানে কানে কথা বলছিল তখন।

—তুমি খুশি হয়েছ বৈজয়ন্তী? চন্দন চিত্রিত মুখখানিকে ধীরে ধীরে তুলে ধরে কৃষ্ণনাথ।

উত্তর দিতে পারে না বৈজয়ন্তী। মনের কথাগুলো শুধু মুখর হয়ে ওঠে নীরব চোখে গহনতায়। লজ্জা ঢাকে কৃষ্ণনাথের বুকে মুখ লুকিয়ে।…

পরদিন অপরাহ্নে।

সুসজ্জিত পাল্কী এসে থামলো কোটালী পাড়ার প্রান্তে। আমন্ত্রিত গ্রামবধূরা বরণ করতে এসেছে তাকে। কোটালী পাড়ার আকাশে, বাতাসে, জলে, মাটিতে তখন খুশির দ্যোতনা।…

বাহুবন্ধ আর শিল্পী অটা নখ দিয়ে বৌ দেখলেন কৃষ্ণনাথের মা। চিবুক ছুঁয়ে আদর করলেন পুত্র-বধূকে।—কিন্তু সেই মুহূর্তে তাঁর মুখটা কি এক ভাবনায় যেন বিকৃত হয়ে গেল।

—চমকে উঠলো বৈজয়ন্তী। দেখলো গুলাপী শাশুড়ীর মনের মধ্যে যেন কি এক অশুভ চিন্তা সন্তর্পণে গোপন হবার জন্য বিবর খুঁজে বেড়াচ্ছে।

সেই ইচ্ছাটাকে অভিব্যক্তিতে জানতে পারলো পরদিন সন্ধ্যায়।

দ্বিতলের ঘরে কৃষ্ণনাথের কাছে চুপি চুপি উঠে আসছিল। হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো দরজায় হাত দিতে গিয়ে। কি লজ্জা! ঘরে শাশুড়ীর সঙ্গে কথা বলছে কৃষ্ণনাথ। নিঃশব্দে চলে যাবার জন্য পিছিয়ে আসে। আর ঠিক সেই সময়ই শাশুড়ীর কণ্ঠ দিয়ে বার হয়ে আসে এক ঝলক গরলের দাহ। চমকে উঠে নিথর হয়ে যায় বৈজয়ন্তী।

—"না, ঐ কালো কুৎসিৎ বৌ নিয়ে ঘর করতে পারবো না আমি। ওকে ওর বাপের বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আয়। আমি আবার বিয়ে দেবো তোর।"…

থর্ থর্ করে কাঁপছিল বৈজয়ন্তী। কাঁপছিল তার কল্পনায় গড়া সারা জীবনের বর্ণালী স্বপ্নলোক। পক্ষাঘাতগ্রস্ত স্নায়ুর অবসন্নতায় টলতে টলতে নীচে নেমে এলো অভিশপ্ত কালো রংয়ের দেহটাকে বয়ে।

অষ্টমঙ্গলার বাসরিক অনুষ্ঠান হিমশীতল মৃত্যুর মত বৈজয়ন্তীর সমস্ত দেহ মনে এক বিষাক্ত যন্ত্রণার জ্বালা ছড়িয়ে শেষ হয়ে গেছে বিগত কাল। কিন্তু জানতে দেয়নি। পাষাণের মত উৎসবের বুকে হলাহলকে নীরবে সহ্য করে গোপনে কেঁদেছে বৈজয়ন্তী।

আসন্ন সর্বনাশের কথা যেমন বলতে পারেনি কৃষ্ণনাথ, তেমনি বৈজয়ন্তীও প্রশ্ন করে জেনে নিতে পারেনি তার অভিমতকে। কৃষ্ণনাথ জানে,—বৈজয়ন্তী জানে না তার অদূরাগত দুর্ভাগ্যকে। দুঃখ হয় তার। কষ্ট হয়। অথচ তার দুর্বল হাত দুটিতে এতখানি দৃঢ়তা নেই যা দিয়ে আসন্ন ঝড়কে ঠেকানো যায়।

সমস্ত কিছু খুলে বলবার জন্য মনে মনে প্রস্তুত হয়ে উঠেছে কৃষ্ণনাথ। মনের নিদারুণ লজ্জাকে দুহাতে ঠেলে কঠোর হবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে স্ত্রী বৈজয়ন্তীর। কিন্তু না, বলতে পারেনি।

বৈজয়ন্তীর ঠাণ্ডা চোখের গভীর অন্ধকারে কথা হারিয়ে ফেলেছে কৃষ্ণনাথ। ফিরে এসেছে অন্তর্দ্বন্দ্বের মাঝখানে।

—না, কিছুতেই বৈজয়ন্তীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলতে পারবে না—"তুমি পরিত্যক্তা"।

"তোমার দাম্পত্য জীবনের আজই শেষ দিন বৈজয়ন্তী"।

তা'র চেয়ে পালিয়ে যেতে চায় কৃষ্ণনাথ। চুপি চুপি নিজেকে আড়াল করে নিষ্কৃতি পেতে চায় এক জোড়া নিরাপরাধ চোখের মৌন ভর্ৎসনা থেকে।

ঘরের মধ্যে একা বসেছিল বৈজয়ন্তী। ভাবছিল। ভাবনার জটিল ক্রিয়া বিক্রিয়া গুলো জীবনের নিয়ম চালচিত্রের পাষাণে মাথা কুটছিল। বন্ধ লুকানো ঘরে ঘরে মেঘের মত এলোমেলো হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছিল বৈজয়ন্তীর অশান্ত স্নায়ুগুলো।

—বৈজয়ন্তী—।

সহসা কৃষ্ণনাথের ডাকে চিন্তার সূত্রগুলো ছিঁড়ে যায়। ত্বরিতে উঠে দাঁড়ায়।

আস্তে আস্তে কাছে এসে দাঁড়ায় কৃষ্ণনাথ। নিবিড় হয়। অনুরাগের স্পর্শ দিয়ে কাছে টেনে নেয় বৈজয়ন্তীকে।

কথা বলতে পারেনা বৈজয়ন্তী। এমনকি স্বামীর চোখের দিকে তাকাতে পারেনা পর্যন্ত। ভয় হয়। একটা দারুণ আতঙ্কের সঙ্কোচনে নিষ্পেষিত হয় তার স্বাভাবিক বৃত্তিগুলো। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে সে।

—তোমার কাছে বিদায় চাইতে এলাম বৈজয়ন্তী।—

প্রণাম করে পায়ের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বৈজয়ন্তী। কৃষ্ণনাথ ভাবে তা'র অন্তর্ধ্যানের চিন্তায় কাতরা বৈজয়ন্তী।

—"আসি তবে"।—চলে যাচ্ছিল কৃষ্ণনাথ।

—"দাঁড়াও" বৈজয়ন্তীর ডাকে বড়ের আভাস।

চমকে ওঠে কৃষ্ণনাথ। তার দুরু দুরু বুকের গভীরে আতঙ্কের দৈত্যটা ঘড়া তোলে।

কঙ্কন বাজু আর মৌক্তিক মালার একটি আভরণ পাত্র তুলে ধরে বৈজয়ন্তী।—"এগুলো নিয়ে যাও।"

—"কেন?" অভ্যাসের অর্থহীন শব্দ।

—"তোমার নতুন বৌকে পরিয়ে দিও।" উত্তাপহীন ঠাণ্ডা গলায় বলে—"টুলো পণ্ডিতের মেয়ে আমি—মুক্তা-ভরণে প্রয়োজন নেই আমার—।" এগুলো নিয়ে যাও তুমি।

"—না।" গভীর সমাহিত কণ্ঠে কৃষ্ণনাথ বলে—"তা' হয়না বৈজয়ন্তী।"

এবার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে অভিমানের আগ্নেয়গিরি ফুঁসে ওঠে।—বলে,—"কেন? দম্ভ দিয়ে অপরকে করুণা বিতরণ করতে চাও বলে?"

"—ছিঃ—বৈজয়ন্তী।"—কৃষ্ণনাথের কণ্ঠ দিয়ে এক ঝলক কান্না ঝরে পড়ে। বলে, "সাগরের জলে ভরাডুবি হলেও সাগর তা'র জন্য বিন্দুমাত্র দোষী নয় বৈজয়ন্তী।"

"—ভুল বুঝোনা আমাকে।"

চলে যায় কৃষ্ণনাথ।

দিন যায় মাস যায়, শেষ হয়ে আসে রবির উত্তরায়ণ। একে একে আর প্রতিটি দন্তশূলকদিন বাঁধ অভিমানের যন্ত্রণা ছিটিয়ে অপসারিত হয় বৈজয়ন্তীর যৌবনআকুর পাতা হতে।

ক্লান্ত হয়ে পড়ে বৈজয়ন্তী। আহত তা'র সংযোগন লালিত এক রোমাঞ্চ-ঘন উচ্চকিত প্রতীক্ষার আশা। মনে হয় এক নিষ্ঠুর ছলনার কুহকে বিভ্রান্ত হয়ে এক চরম মিথ্যার উপর নির্ভর করে থেকেছে সে এতদিন। বুঝতে পারে বৈজয়ন্তী। বুঝতে পারে চতুর কৃষ্ণনাথের ছল-প্রণয় তাকে ঠকিয়ে গেছে চিরদিনের মত।

—তবে? তবে, কিসের আশায়, কোন মধু ভবিষ্যতের জন্য সে অপেক্ষা করে থাকবে আর?—ভাবছিল বৈজয়ন্তী। ভাবছিল, পুষ্পহীন নিষ্ফলা লতিকার মত বেঁচে থেকে লাভ কি? জীবনের সার্থকতা কোথায়?—তার চেয়ে যদি ভোরের শিশিরের মত শুকিয়ে যায় সে? শূন্য হয়ে যায়, হারিয়ে যায় খরস্রোতা আরিয়াল খাঁর গভীর অতলে?—চমকে উঠলো বৈজয়ন্তী।

এমনি করে মনের দংশে অহরহ যুদ্ধ করতে করতে একদিন ক্লান্ত হয়ে পরাজয় বরণ করে নিল সে।—মৃত্যুর অবৈধ কামনা হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকলো তাকে।

পূর্ব আকাশে শুকতারাটা দপ দপ করে জ্বলছিল তখন।

চুপি চুপি বাইরে এসে দাঁড়ালো একটি কালোছায়া। এবং সেই আবছা অন্ধকারে অস্পষ্ট ছায়াটা এগিয়ে চললো মৃত্যুসহ ভয়ংকর আরিয়ালখাঁর দিকে।

অন্ধকার। অনেক অন্ধকার তখন আরিয়ালখাঁর জলে ছুটো ছুটি করছিল। সেই ভয়াল অন্ধকারের গর্ভে হারিয়ে যেতে চাইলো বৈজয়ন্তী। তিতিক্ষার সমস্ত হিসাব নিকাশকে চুকিয়ে দিতে চাইলো নিঃশেষ করে।

কিন্তু পারলো না। "সাগর জলের" রহস্য সহসা আশার মোহ দিয়ে পিছু ডাকলো তার।—মৃত্যু ফিরে গেল!

নতুন করে বেঁচে ওঠার জ্বালায় শিউরে উঠলো। উজ্জীবিত নিদারুণ আকুতিতে ভেঙ্গে পড়লো বৈজয়ন্তী। —আছাড় খেয়ে লুটিয়ে পড়লো আরিয়ালখাঁর নরম ওটপক্ষে। মনে মনে ককিয়ে উঠলো—"একি করলে ঠাকুর!"—সুপ্ত উঠছিল।

আরিয়ালখাঁর কালো জলের দর্পনে তার প্রতিচ্ছায়া। ধীরে ধীরে পৌষিম হয়ে উঠছিল নাগরাসুকীর কথা গুলো। যেন সমুদ্র মথনের গরল নিঃশ্বাসের জ্বালায় লাল হয়ে উঠছে সকালের পৃথিবীটা।

তাড়াতাড়ি জলে নেমে সুখ হতে চাইলো বৈজয়ন্তী। ধুয়ে ফেলতে চাইলো মনের অবসাদকে। কিন্তু না, খরস্রোতা আরিয়ালখাঁর জলে মনের আগুন নিভলো না একটুও। বরং আত্মপ্রবঞ্চনার জ্বালায় বিষায়িত হলো সে।

ফিরে আসছিল।

হঠাৎ নদীর দিকে চোখ পড়তে এক মর্মান্তিক যন্ত্রনাকে প্রত্যক্ষ করলো বৈজয়ন্তী। মনে হলো চণ্ডাল সূর্যটা তার সিঁথির দিকে চেয়ে আরিষ্টালের সঙ্গে গা টেপা টেপি করে হাসছে। এবং সেই কম্পিত বিদ্রূপের জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠলো তার চেতনা। আর আশ্চর্য। সেই মর্মান্তিক যন্ত্রণার আগুনের আলোতে পথ খুঁজে পেলো সে। ভাবলো,—না, এইভাবে তিল-তিল করে শুকিয়ে মরবে না সে। ভাবলো, যে করেই হোক—এই অপঘাতের পাপ হতে মুক্তি তাকে পেতেই হবে।

সেই দিন সন্ধ্যায়।

মনের সমস্ত কুণ্ঠাকে ঝেড়ে ফেলে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালো বৈজয়ন্তী। দ্বার রুদ্ধ করে সন্তর্পণে নামিয়ে আনলো মদীপাত্র। খুলে ধরলো ভূর্জপত্রের একটি খণ্ড।

ভেবেছিল কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা দিয়ে কৃষ্ণনাথের বুকে উত্তাপ সৃষ্টি করবে। জ্বালিয়ে তুলবে চতুর পুরুষের ছলনা এ সর্বস্ব ব্যর্থ প্রেমের আবরণকে।

কিন্তু তা পারলো না। আস্তে আস্তে নম্র হয়ে যেতে লাগলো তার স্নায়ুর অগ্নি কণা।

হঠাৎ চমকে উঠলো বিদুষী বৈজয়ন্তী। দেখলো, তার মনের গোপন আর্তনাদ জিজ্ঞাসার দেহ নিয়ে কাব্য হয়ে গেছে কখন।

"জীত ধর্ম সহায় জিতব্যজন ব্যাবরে।
যশকায় মহাকায়ঃ সাহ মারভা দীয়তে।"

[যে ধর্ম শুধু তোমার অধিকারকে স্বীকার করে, সে-কি তুচ্ছ যশক দ্বারা লুণ্ঠিত হবে (প্রিয়তম)।]

পরদিন গোপনে পত্রখানি পাঠিয়ে দিয়ে প্রতীক্ষা করে। দারুণ উদ্বেগে আন্দোলিত হয় তার ভয়ার্ত বুক খানি। ...যদি লজ্জাহীনা একটি বধূর দীর্ঘশ্বাসকে প্রত্যাখান করে কৃষ্ণনাথ? যদি তার জন্য এক বিন্দুও ঠাঁই না থাকে কৃষ্ণনাথের বুকে? তাহলে?...

না। যুবক কৃষ্ণনাথের ভীরু বুকের আড়ালে অনেক ঠাঁই ছিল বৈজয়ন্তীর জন্য। সতের শতকের পুরুষসর্বস্ব কুশ্রী সামাজিকতা তাকে একচুলও টলাতে পারে নি হৃদয়ের স্বপ্নমুখ থেকে।

কৃষ্ণনাথের মা অনেক সম্বন্ধ এনেছিলেন ঘটকদের নিপুণ দৌত্যের সহায়তায়। কিন্তু তাদের সকলকে

নিরাশ করেছিল কৃষ্ণনাথ।

—বিয়ে? না মা না, সে হয় না। হেসেছিল কৃষ্ণনাথ। সম্পূর্ণ এক অপরিচিত হাসির ধূসরতায় ম্লান হয়ে গিয়েছিল তার চোখ দুটি।

তার মাও হেসেছিলেন মনে মনে। ভেবেছিলেন পুত্রের এই মোহদৌবল্য মন্দ হতে ক'দিন! এবং সেই আকাঙ্ক্ষিত দিনের জন্য প্রবল উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন বর্ণরেখা এক ভয়ংকর মনের আড়ালে।

কিন্তু সফল হোল না তাঁর প্রতীক্ষা। দিনের পর দিন কেটে গেল, কিন্তু সেই প্রেতায়িত হাসির রহস্য লগ্ন ছাড়লো না কৃষ্ণনাথের। কতবার কত ছল প্রসঙ্গের মধ্যে দিয়ে মনের ইচ্ছাটাকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন তিনি। কিন্তু সেই অদ্ভুত হাসির মর্মান্তিক রৌদ্র নেত্র তাঁকে চমকে দিয়েছে বার বার। নীরবে ফিরে এসেছেন কৃষ্ণনাথের সম্মুখ হতে।

—না, এমনটা তো তিনি চাননি। কৃষ্ণ জননী ভাবেন, একি হোলো? সর্বহারা বৈরাগীর মত উদাসীন পুত্রের দিকে চাইলে চোখ ফেটে জল আসে তাঁর।

তথাপি বিজিত মন হিংসার অভিমানে বিজয়ী হতে চায়। কৃষ্ণনাথের সৃষ্টি ছাড়া মনের বর্ণমালাকে মাতৃত্বের দাবীতে শুরু করে দিতে চান তিনি। আবার পুত্রক করুণ মুখের দিকে চেয়ে কান্না আসে তাঁর।

সেদিন অপরাহ্নে চুপ করে বসে অনেক কথাই মনে পড়ছিল তাঁর। ভাবছিলেন। ভাবছিলেন আত্মঘাতী যুদ্ধের আঘাতে অনেক জ্বালায় কুণ্ড সৃষ্টি হয়েছে। আর কেন?—পরাজয়ের বেদনা মনের যন্ত্রণার কাছে ক্রমশঃ ছোট হয়ে যাচ্ছে।

দ্বিতলের সোপান বেয়ে নেমে আসছে কৃষ্ণনাথ। ধীরে ধীরে নেমে আসছে। উদাস। যেন কোন অভিশপ্ত মায়ালোকের উন্নসিত নূপুর নিক্কনে ঢেলে দিয়েছে তার সমস্ত অনুভূতিকে। উৎকর্ণ বিভোর বিহ্বলতা যেন এগিয়ে চলেছে তার একান্ত-বিহ্বলীর কাকলীকে লক্ষ্য করে।

এমনি প্রতিদিন।

প্রতিদিন ঠিক এমনি সোধূলী সন্ধ্যার নীচে নেমে আসে কৃষ্ণনাথ। দিগন্তে একবার এসে দাঁড়ায় তার সাধের কৃষ্ণচূড়ার ছায়ায়। নির্বাক: স্বপ্নাবিভূত। তারপর আবার ফিরে যায় দ্বিতলের ঘরে। যে ঘরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বধূ বৈজয়ন্তীর গাঢ় নিবিড় স্পর্শ। কল্পনার চোখ মেলে-বৈজয়ন্তীকে কাছে পায়। রাত্রির কৃষ্ণঘন অন্ধকারে দেখে বিয়োগ বিধুরা শ্যামলী বৈজয়ন্তীর কুন্তলিত এলোচুলের সমারোহ।

এমনি করে দিন কাটে।

নিরালম্বী কৃষ্ণনাথ দিন কাটায় উপরের পুঁথিঘরে। শুধু এখানে এসে সাময়িক একটু শান্তি পায় সে।—শকুন্তলার সঙ্গে কথা বলে। কথা বলে বাসবদত্তার সঙ্গে। তপস্যাবিভূত জীবন বেদনা এমনি করে পুঁথির আড়ালে নিজেকে ঢাকবার চেষ্টা করে অবিরত। নিজেকে ভুলে যেতে চায় কৃষ্ণনাথ, কিন্তু পারেনা। রামগির্যাশ্রমের বিরহী যক্ষের সমস্ত আকুতি যেন দুরুক কৃষ্ণনাথের মনের গহনে গুমরে গুমরে কাঁদে। কাঁদে অরণ্যকন্যা পতি পরিত্যক্তা শকুন্তলার সমস্ত আর্ত অনুভূতি।

আর আশ্চর্য। সে কান্নার নিভৃতদেশে অতি সঙ্গোপনে এক বিচিত্র সৃষ্টির সুর বাজে। অন্তঃসলীলা মাধুর বেদনা কখন যেন রঙের কারুতে চিত্রিত হয়ে অনুপ্রেরণা দান করে থাকে। কৃষ্ণনাথ চৌধুরী বিভোর হয়ে যায় সৃষ্টির আনন্দে। রচনা করে এক বিচিত্র কাব্যগ্রন্থ।

একদিন।

হঠাৎ ঘরকে দাঁড়ালো কাব্যের কাহিনী। অনুকূল ছন্দের শ্লোক দিয়ে এক নারী মনের বর্ণনায় ব্যস্ত হয়েছে—পুরুষ কৃষ্ণনাথ। কিছুতেই ফুটিয়ে তুলতে পারছে না এক উষ্ণিন্ন যৌবনা প্রেমিক হৃদয়ের গোপন অভিব্যক্তিকে।

বন্ধ হয়ে গেল কাব্য রচনা।

প্রতিদিনের মত সাধের কৃষ্ণচূড়ার অবসন্ন ছায়ার দিকে হেঁটে চললো কৃষ্ণনাথ। অন্ধকার ধীরে ধীরে ডানা মেলছে তখন। সেই অস্পষ্ট আলোকে দেখলো, এক নারী মূর্তি যেন তারই প্রতীক্ষায় চুপ করে বসে আছে। ভাবলো, হয়তো কোনো ভিক্ষার্থিনী।—ভূস্বামী কৃষ্ণনাথের কাছে কিছু প্রার্থনার আকাঙ্ক্ষায় বসে আছে।

—কি চাই মা?—কাছে গিয়ে প্রশ্ন করলো বৃদ্ধাকে।

সচকিতে উঠে দাঁড়ালো বৃদ্ধা। তারপর ত্রস্ত হাতে বস্ত্রাঞ্চল হতে বার করে আনলো এক খণ্ড সোনালী ভূর্জপত্র। এবং কৃষ্ণনাথের দিকে সযত্ন সন্তর্পণে তুলে ধরে আস্তে আস্তে বললো—"চিঠি"।

না চিঠি নয়। যেন এক মুঠো কান্নাকে ছুঁড়ে মেরেছে তরুণ কৃষ্ণনাথের বুকে। এবং পড়তে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে যায় কবি কৃষ্ণনাথ। আশ্চর্য! অনুষ্টুপ ছন্দের যে শৈলী দুরূহ বিনিদ্র রাত্রির অনুশীলনে আয়ত্ত করতে পারেনি সে, তা কেমন অপূর্ব ভাবে ফুটে উঠেছে বৈজয়ন্তীর পত্রে।

'অপূর্ব'! ছন্দের অপরূপ কারুতে মুগ্ধ হয়ে যায়। হলোস্তীর্ণ শিল্পকৃতির সঙ্গে যে অনুক্ত কাহিনী জড়িয়ে আছে তার দিকে চোখ ফেরায়। দেখে, এক বিরহিনী নারী হৃদয়ের চরমতম বেদনা সুকুমার কাব্যের স্বর্ণনূপুরে রুনুঝুনু করে বাজছে। আর—, আর মনে হয় উপেক্ষিত অবহেলিত এক তৃণাঙ্কুর কখন যেন পত্র পুষ্পে ভরে গিয়ে, মনের সমস্ত আকুতি দিয়ে তাকে ডাকছে।

ঢেউ উঠলো কবি কৃষ্ণনাথের বুকে।—না, আর নয়। তার অপেক্ষায় অপেক্ষামানা একটি একান্ত যৌবনের ডাককে উপেক্ষা করার মত ক্ষমতা নেই তার প্রেমে সন্ন্যাসীনি বন্ধু বৈজয়ন্তীর উষ্ণ রক্ত কণিকাকে আর সে বিন্দু বিন্দু করে নষ্ট হতে দেবে না। এবং —ব্যর্থ হতে দেবেনা তার প্রথম কাব্য গ্রন্থ সাধের "আনন্দ লতিকা"কে।

পত্র লিখতে বসলো কৃষ্ণনাথ।

কয়েক দিন পর।

দ্বিতলের ঘরে শুয়েছিল কৃষ্ণনাথ। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল গভীর রাত্রে। উঠে বসলো বিছানার উপরে। আজ কয়েকদিন ধরে এক গোপন ভাবনার দ্বন্দ্বে ডুবে ছিল সে। সেই ভাবনাটা অন্তরিক্ষে আকর্ষণ করেছে তাকে। যেন এই বিশ্রুতি রাতের নিঃসঙ্গতায় একা পেয়ে গেছে তাকে।

দণ্ড, পল, প্রহর গড়িয়ে যায়। কিন্তু ঘুম আসেনা কবির চোখে। এক বন্ধুহারা চিন্তার রোমাঞ্চ তার চোখের সমস্ত ঘুমকে কেড়ে নিয়েছে আজ।

—আর একটু পরে—ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে চলে যাবে ধানুকার পথে। নিয়ে আসবে তার বৈজয়ন্তীকে। দীর্ঘদিনের পর মিলিত হবে তারা নতুন বাসর স্বপ্নে। কিন্তু···

কিন্তু কবি কৃষ্ণনাথের দ্রষ্টামনের অন্তরালে অন্য এক প্রজ্ঞা ভাবনার ঢেউ খেলে। এবং সেই চিন্তার সমস্যাকে সমাধানের পথ খুঁজে ফেরে নানা পত্রকের অন্ধকারে। ভোর হয়ে আসছে। সূর্যের অকৃপণ আভায় মহাশূন্যের গাঢ় অন্ধকার ছিঁড়ে ছিঁড়ে পড়ছে মাটিতে। রাত্রিটা পুড়ছে। পুড়ছে কবি কৃষ্ণনাথের সমস্ত দুর্বলতা।

—সমাধান পেয়েছে কৃষ্ণনাথ। দ্বিধা নেই, দ্বন্দ্ব নেই, আর কোনো জটিলতাই নেই সমাধানের প্রশ্নে।—পাঠ-কক্ষের দিকে প্রদীপ হাতে এগিয়ে চললো কৃষ্ণনাথ। সযত্ন রক্ষিত পেটিকার-মধ্য হতে বের করে আনলো আনন্দ লতিকার অসমাপ্ত পুঁথি আর বৈজয়ন্তীর লেখা কয়েকটি পত্র কাব্য। পাশা পাশি খুলে ধরলো পত্র এবং পুঁথিকে। কৃষ্ণনাথ আর বৈজয়ন্তীর-দুই কবিকৃতিকে পাশাপাশি রেখে বিচার করতে বসলো সমালোচক কৃষ্ণনাথ।

শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে বিস্মিত হয়েছে কৃষ্ণনাথ।—মুহূর্ত চুপ করে কি যেন ভাবলো। তারপর কাব্যের পুঁথিটা শক্ত হাতে তুলে ধরলো প্রদীপের জ্বলন্ত শিখায়। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে ছাই হয়ে গেল "আনন্দ লতিকা কাব্য"।

তারপর? তারপর নূতন করে সুরু হয়ে ছিল রচনা। দ্বৈত মননের আলোক ভাবনায় নূতন করে আরম্ভ হয়ে ছিল তার কাহিনী।—কবি বৈজয়ন্তী আর কবি কৃষ্ণনাথ যৌথ ভাবে রচনা করেছিল সে কাব্য।

আর কোনো দিন থমকে দাঁড়ায়নি কাহিনী। নারী আর পুরুষ মনের সমস্ত সত্তার উপলব্ধিতে পুষ্ট হয়ে সৃষ্টি হয়েছিল সে। সৃষ্টি হয়ে ছিল সপ্তদশ শতাব্দীর অন্যতম সংস্কৃত সাহিত্য "আনন্দ লতিকা কাব্য"

(১৬৫২ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত)।

সংগীত

পল্লীগীতি ও উত্তর-পশ্চিমবঙ্গ

চিত্তরঞ্জন দেব

গম্ভীরা

অতীত পুরাকীর্তির দেশ হল মালদা। বিস্মৃত-প্রায় বহু রাজত্বের উত্থান পতন, হিন্দু-বৌদ্ধযুগের লুপ্তপ্রায় সোনালী দিনগুলির স্বপ্ন মধুর বহুশ্রুত কাহিনী ভীড় করে রয়েছে এর প্রতি ধূলিকণায়। অতীতের ফেলে আসা দিনগুলির ধ্বংসস্তূপ খুঁজে সন্ধানীরা হয়ত ইতিহাসের অনেক উপাদানই পাবেন। শুনবেন হিন্দু রাজন্যবর্গের প্রতাপের কাহিনী, মোগল যুগের ভাস্কর্যের কথা, বৌদ্ধ যুগের দর্শনের বারতা।

এই বৌদ্ধ শাসনের ভিতরই এক সময় অংকুরিত হয় বর্তমানের গম্ভীরা উৎসব-যা হিন্দু ধর্মের পুনরভ্যুত্থান-কালে রূপ নিল উত্তরবঙ্গের মালদা জেলায় গম্ভীরা, জলপাইগুড়িতে গম্ভীরা, পশ্চিমবঙ্গে গাজন ও পূর্ববঙ্গে নীলপূজারূপে।[১] উড়িষ্যার কোন কোন অঞ্চলে একেই বলে গাইষাত্রা।

অনেকে বলেন গম্ভীর শব্দ থেকেই "গম্ভীরা" কথার উৎপত্তি। গম্ভীর হল মহাদেবের নাম। গম্ভীর অর্থে শান্ত, ধীর, স্থির—এসব কটি বিশেষণই শিবের উপর চাপিয়ে দেওয়া যায়। কারও কারও মতে গম্ভীর অর্থ পদ্ম। কেউ কেউ বলেন, এ হল গাম্ভারী নামক এক প্রকারের গাছের নাম। বিহারে এ গাছকেই বলে 'গাওহার'। মানিক দত্ত কবি বা কঙ্কনের চণ্ডীতেও কোন্ কোন বৈষ্ণব গ্রন্থে 'গম্ভীর' শব্দের অর্থ দেয়া হয়েছে 'দেবগৃহ' বা 'দেব মণ্ডপ' বলে। কিন্তু এ বিষয়ে এখনও কোন স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু শিব যে বুদ্ধ মূর্তিরই সুসংস্কৃতরূপ এ বিষয়ে খুব বেশী আলোচনার প্রয়োজন নেই। হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থান কালে বুদ্ধমূর্তি শিবমূর্তিতে এবং আদ্যামূর্তি ভগবতীরূপে বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও পালপার্বণের মধ্য দিয়ে ক্রমান্বয়ে শৈব ধর্মে রূপ নিতে শুরু করল।

পাল রাজত্বের প্রতিষ্ঠার সময় থেকে এ দেশে ধর্ম বিপ্লব উপস্থিত হয় এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের গোঁড়ামীর ফলে বৌদ্ধ ধর্মের অবসানকালে শৈব ধর্ম ধীরে ধীরে প্রাধান্য লাভ করে। এই সময় সংঘাত শুধু হয় বৌদ্ধতান্ত্রিকতা ও শৈবতান্ত্রিকতার ভিতর। কালক্রমে মুসলমানদের হিন্দু দেবালয় ধ্বংস ও হিন্দুদের ধর্মান্তর গ্রহণের মধ্যে হিন্দু ধর্ম আচরিত ধর্মরূপে নীচুতলার জোগ্য হয়ে পড়ল।

এই সমবয়কার প্রতিষ্ঠিত সমাজে যে শিবের পূজা ও উৎসব হত তাই আজকের দিনের শিবের গাজন নীল পূজা ও গম্ভীরা নামে খ্যাত।

বল্লাল সেনের সময় যখন হিন্দু সমাজ নবভাবে গঠিত হল তখন থেকেই শিবের গাজন, গম্ভীরা, গমীরা ও নীল পূজা হিন্দুগণের আচরিত ও অনুষ্ঠিত উৎসবের মধ্যে পরিগণিত হতে আরম্ভ করল। তবে এই উৎসবে পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়, বাগদি, বানুক, চাঁই, রাজবংশী, নমঃশূদ্র প্রভৃতি জাতিরই উৎসবের আধিক্য দেখা যেত। কিন্তু কালক্রমে এই উৎসব বিশেষ করে মালদার গম্ভীরা জনপ্রিয়তা অর্জন করে সভ্য সমাজের মধ্যে প্রসারিত হয়েছে।

মালদার গম্ভীরা উৎসব চৈত্রমাসের সংক্রান্তিতে আরম্ভ হয় এবং বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাস অবধি চলে। এই উপলক্ষে একটি মণ্ডপ তৈরী করে তাতে শিবপূজার ব্যবস্থা করা হয়। মণ্ডপটিকে প্রাচীনকালে দালান হত পদ্মফুল দিয়ে। পরবর্তী কালে পদ্মফুলের অভাবে কাগজের ফুল দিয়ে সাজাবার ব্যবস্থা হয়। মণ্ডপের সম্মুখে শোভা পেতে থাকে সাজসজ্জা এক নানা রকমের ছবি। এই সব ছবি সবই দেশীয় পটুয়াদের আঁকা এবং এর ভিতর পটুয়া শিল্পের চরম উৎকর্ষতার নিদর্শন পাওয়া যায়।

মালদার গম্ভীরা, জলপাইগুড়ির গমীরা, পশ্চিমবঙ্গের গাজন ও পূর্ববঙ্গের নীল পূজো যে প্রকৃতপক্ষে একই জিনিসের বিভিন্ন নাম ও কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই জাতীয় উৎসব তিব্বতেই নয় আমাদের ভিতরও অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। তা ছাড়া য়ুরোপ, আফ্রিকা, ব্যাবিলন, গ্রীস ও মিসর দেশেও পুরাকালে এই রকমের উৎসব অনুষ্ঠিত হত। গ্রীস দেশে এই উৎসবকে ফেলিকোরিয়ার উৎসব বলা হত এবং বেকস্‌দেবের পুত্র প্রায়েপস্‌ দেবের সময় ঐ প্রকার উৎসবে পথের পাশে শিব লিঙ্গ শোভা পেত এমন খবরও পাওয়া যায়। প্রাচীন রোমান ধর্মে তেমাব দেবতাকে এশিয়া মাইনরের ফ্রিটাইটগণ পূজো করতেন। এই দেবতার সঙ্গে প্রাচীন ভারতের রুদ্র ও শিবের সাদৃশ্য আছে। এই দেবতার বাহনও বৃষ। জার্মানীর ফ্রাঙ্কফুর্ট অঞ্চলে এইরূপ একটি বৃষমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। মিসর দেশেও আসীরিস দেবতা ও বৃষবাহনের যে উৎসব হত তাও গম্ভীরা প্রভৃতির অনুরূপ। মহাভারতে শিবপূজো ও উৎসবে বর্তমানে প্রচলিত গম্ভীরা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের সঙ্গে সাদৃশ্য মেলে। চীন পরিব্রাজক ফা-হিয়ান ও হিউ-এন-সাঙ এর লিখিত বিবরণেও এর উল্লেখ আছে। তাঁরা বৌদ্ধতান্ত্রিকতানুলক্ষ যে সব উৎসব ও শোভাযাত্রা দর্শন করেন, তা থেকেও গম্ভীরা প্রভৃতি উৎসবের ক্রমবিকাশের যথেষ্ট ইতিহাস পাওয়া যায়।

মালদার গম্ভীরা উৎসব অনুষ্ঠান প্রধানতঃ চারদিন ধরে চলতে থাকে এবং প্রত্যেকদিন শিবাদি দেবতার পূজোর ব্যবস্থা থাকে। প্রথম দিনকে বলা হয় ঘটভঙ্গ। কারণ, এই দিনে ঘট স্থাপনা করে গম্ভীরা মণ্ডপে শিব পূজো দেওয়া হয়।

দ্বিতীয়দিন হল 'ছোট তামাশা'। এইদিনে ঢাক ঢোল প্রভৃতি বাজনা সহ রাত্রে গম্ভীরা মণ্ডপের সম্মুখে নানা রকমের নৃত্যাদি দেখাবার ব্যবস্থা হয়।

তৃতীয় দিন অর্থাৎ 'বড় তামাশার' দিনে প্রতি শুদ্ধ চিত্তে ও শুদ্ধাচারে শিব ভক্তগণ কতৃক কাঁটাভাঙ্গা ও কুল ভাঙ্গা পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এইদিনে শিব ভক্ত বা বালগণ উপোসী ও সংযমী হয়ে গম্ভীরা মণ্ডপে রক্ষিত কাঁটা গাছ বুকে ধারণ করে শিব স্তবাদি পাঠ করে। পরে তারা এই কাঁটার বিছানায় দেহ লুটিয়ে দেয়। ঐ দিনে বিকেলে বাণ ফোঁড়া পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ শিব ভক্তগণ লোহার তৈরী ত্রিশূলের সূক্ষ্ম ভাগ কোমরে বিদ্ধ করে এবং তাতে তেলে ভেজান কাপড় জড়ায়। পরে এতে দেয় আগুন ধরিয়ে। এবং এর মধ্যে ধুনো ছিটিয়ে দিয়ে আগুন দ্বিগুণ প্রজ্বলিত করে এবং বাদ্যসহ এক গম্ভীরা থেকে অন্য গম্ভীরায় নাচ গান দেখিয়ে বেড়ায়। এর সঙ্গে পূর্ববঙ্গের নীল সন্ন্যাসীদের ঘাঁটিকাপ, কাঁটা-কাপ, কুল ভাঙ্গা প্রভৃতির সঙ্গে তুলনা করা চলে। পূর্ববঙ্গের নীল সন্ন্যাসীরাও অনেক সময় নীলের মণ্ডপের সম্মুখে জ্বলন্ত কাঠ কয়লা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর গড়াগড়ি করে। একেই বলে 'কুল ভাঙ্গা', 'কুল' অর্থে আগুনের ফুলকী। 'কুল' কুলকারই অপভ্রংশ।*

* নীল পূজো ও উৎসব সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণের জন্য এই গ্রন্থকারের "পল্লীগীতি ও পূর্ববঙ্গ" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

তিব্বতী সাহিত্যেও গম্ভীরা প্রভৃতি উৎসবের অনুরূপ নৃত্যাদির উল্লেখ দেখা যায়। এই দিন মালদা অঞ্চলে এই উপলক্ষে যে নানা রকমের সঙ বের হয় তার সঙ্গে কোলকাতার জেলেপাড়ার সঙ এবং ঢাকার কালী কাচের সঙ্গে তুলনা করা চলে। এর উপকারিতা এই যে সামাজিক দুর্নীতির বিষয় লোক সমক্ষে প্রচারিত হওয়ায় লোকে দুর্নীতি হতে দূরে থাকে। এই রকমের সঙ সমাজ সংস্কারের দিক থেকেও হিত বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। বাগ যজ্ঞ ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এই রকম সঙও শোভাযাত্রার প্রচলন প্রাচীন কাল থেকেই দেখতে পাই। এই সঙ দেখার ব্যাপারে সকল সমাজের লোকেরই উৎসাহ দেখা যায়।

এইদিন রাত্রে গম্ভীরা মণ্ডপের সম্মুখে মুখোশ পরে চামুণ্ডা, কালী, নরসিংহ এবং নানা সাজে সেজে শিবদুর্গা, রাম লক্ষ্মণ, ঘোড়া, পৈরী (পরী) প্রভৃতির নাচ দেখান হয়। ঢাকায় এই ধরণের নাচকে বলে 'কালীকাচ' কাচ অর্থে সঙ। এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এই নাচের ব্যাপারে সর্বত্রই ঢাক কাঁসি ও ঢোলের বাজনাই প্রধান স্থান অধিকার করে এবং উৎসাহদানের জন্য সর্বত্রই পুরস্কার বিতরণ করে নৃত্য শিল্পের উন্নতির ব্যবস্থা আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা উচিত মালদার কালী, নরসিংহ প্রভৃতি গম্ভীর প্রকৃতির নৃত্যাদি দেখাবার কালে অপর ব্যক্তিগণ নৃত্যরত ব্যক্তির সম্মুখে ধনুচির ধোঁয়া মুখোশের ছিদ্র পথে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে তাকে শান্ত করে। এই রকম নাচ ও বাজনা চলে সারা রাত ধরে।

চতুর্থদিনে গম্ভীরা মণ্ডপে শিব পূজো ছাড়াও নীল ও আদ্যারা পূজোর ব্যবস্থা থাকে এবং রাত্রে গম্ভীরা গান অর্থাৎ বোল বাহি বা বোলই আরম্ভ হয়। এই গানে মালদহের নিজস্ব ভাষা ও স্থানীয় লোক সংগীতের বিশিষ্ট সুর ব্যবহৃত হয়। গানের বিষয়বস্তুকে বলে 'মুদ্দা'। নাটকীয় ভংগীতে অতি সাধারণ সাজে সেজে প্রথমে শিব বন্দনা গায়, পরে অভিনয় আরম্ভ করে এবং পালা গান শেষে বাৎসরিক বিবরণী গেয়ে থাকে।

গম্ভীরা গানে সমাজনীতি, রাজনীতি ও ধর্ম-নীতিও বর্তমান। এই উৎসবে 'আলকাপ' নামে নানা প্রকার কাহিনী ও রঙ্গরস সহযোগে উপদেশমূলক পালা গানও গীত হয়ে থাকে।

নিজস্ব গম্ভীরাছাড়া 'ছত্রিশী' বা বারোয়ারী গম্ভীরাও আছে। গ্রাম্য মাতব্বরগণ গ্রাম্য সালিশীর সাহায্যে যে অর্থ সংগ্রহ করে এবং রাজা জমিদার কর্তৃক প্রদত্ত নিষ্কর ভূমি থেকে যে অর্থ পাওয়া যেত তাই দিয়েই ছত্রিশী বা বারোয়ারী গম্ভীরার ব্যয় সংকুলন হত। এই ছত্রিশী বা বারোয়ারী গম্ভীরার দ্বারা পল্লীবাসীরা একতাবদ্ধ, কর্তব্য-পরায়ণ এবং দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন হয়। গম্ভীরার বার্ষিক বিবরণী গানে সামাজিক দুর্নীতির নিন্দা করা হয় বলে সমাজসংস্কৃতির দিক থেকেও এর মূল্য বড় অল্প নয়। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ও গম্ভীরা গান একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে ছিল। বহু লোক-কবি ও শিল্পী এই গানের জন্য সরকারের কোপ দৃষ্টিতে পড়ে আদালতের সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু তাই বলে গম্ভীরা গান বন্ধ হয়নি। মালদার লোক-কবিরা আজও বছরে বছরে নতুন নতুন গান বাঁধছে নব নব সমস্যা নিয়ে এবং নির্ভীক কণ্ঠেই গেয়ে চলেছে জনসাধারণের মাঝে দাঁড়িয়ে।

গম্ভীরা পর্বের চতুর্থদিন রাত্রে। লোক জমায়েত হয় গম্ভীরা মণ্ডপের সম্মুখে। এসে জড়ো হয় গম্ভীরা গায়ক ও বাজনার দল। সঙ্গে আসে ঢাকী ঢুলি ও কাঁসি। মূল বালা এসেই প্রথমে সুরু করেন নিম্ন বন্দনা :—

জল বন্দ থল (স্থল) বন্দ বন্দ শিবের কুড়্যা
আট হাত মৃত্তিকা বন্দ চন্দ সূর্য জুড়্যা,
লাউসেন দত্তের বেটা কাউসেন দত্ত,
যে জন আনিল ধরার মহেশ্বর ভূত,
তাঁর চরণে করি দণ্ডবত—
(শিবনাথ কী ?)

উপস্থিত জন মণ্ডলী বালার প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিধ্বনি করে ওঠে,—মহেশ।

বালা এই ভাবে তিন বার প্রশ্ন করে শিবনাথ কী ?

উত্তর শুনতে পায়, ম-হে-শ।

এরপর মূল গায়ক সুরু করে গান। প্রথমেই বর্ণনা করে শিবের চেহারার ; সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রকৃতিরও—

ভোলা বেশ ভালত মজা
এ কেমন তোমার পূজা।
কবলি ভ্যাকম একি রকম

ঠিক যেন ভ্যাক ভাঁকুর বাজা
এ কেমন তোমার পূজা ॥
বুলবুকাসানে আছ আসানে
শ্মশানে ইয়া বশানের রাজা
এ কেমন তোমার পূজা ॥
(ভোলা হে) আবার পয়া কপনি
আছ আপনি
চুল্যা চুল্যা খাচ্ছ গাঁজা
এ কেমন তোমার পূজা ।
(আবার) কুচনি পত্তার বেড়াও ঘুর্যা
কখনও বা দামড়ার চড়্যা (শিব)
টানে টানে পয়্যা দো-টানে
চটানে পয়্যা চুলকাই জুজা ।
কেন বাঘছাল ন্যাড়ার খাপটা
ভূষণ আলসে গহনা ভ্যাপটা (শিব)
দেখ দেখ বাইজ্যার ব্যাটা
গণপার বাপটা
ঠিক যেন কোন গুণী রোজা
এ কেমন তোমার পূজা ।

এই খানে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন হবেনা গম্ভীরার এই শিব ঠাকুর পুরাণোক্ত শিব নন। তিনি গণ দেবতা। চাষবাস করেন, মাছ মারেন, কাপড় কেনেন হাল চাষ করেন। কাজেই বছর শেষে তাঁর পূজোরও যেন ব্যবস্থা রেখেছে আবার সঙ্গে সঙ্গে ধরে নিয়েছে এই শিব ঠাকুরই তাদের পূর্ব পুরুষ (বাবা), কাজেই তাদের অভাব অভিযোগ সবই নিবেদন করে তাঁর কাছে। অভাবে পড়লে অভিমান করে দুটো স্পষ্ট কথাও তাঁকে শুনিয়ে দিতে কসুর করে না। প্রকৃতপক্ষে গম্ভীরার এই শিব পূজোর পদ্ধতির মধ্যে শাস্ত্রীয় কিছু থাকলেও এর গানের ভিতর তেমন কিছু নেই। এখানে লোক কবিরা একটি লোককে শিব সাজিয়ে আসরে দাঁড় করার ঠিকই, কিন্তু সে উপলক্ষ্য মাত্র। তাঁকে উপলক্ষ্য করেই এই সব সমাজ সচেতন লোক কবিরা একের পর এক বর্ণনা করে যায় তাদের দুঃখ দুর্দশা।

লোক কবিরা বলছে হে মহাদেব তুমিত বেশ মহা আরামেই বাস করছ, আর গিন্নি ভাং খেয়ে বেড়াচ্ছ। কিন্তু আমরা যে কি কষ্টে দিন কাটাচ্ছি এদিকে তুমি মোটেই চেয়ে দেখছ না। সুতরাং এবার তুমি তোমার লীলা খেলা বন্ধ কর :—

শিব তোমার লীলা খেলা কর অবসান
বুঝি বাঁচেনা আর জান।
অনাসৃষ্টি কর্যা সৃষ্টি
মাটি করলা নষ্ট হে,
দুষ্টি থাকতে কষ্টি কর্যা
দেখছ বাকি কষ্ট হে,
মিষ্ট কথায় তুষ্ট কর্যা
শিষ্ট লোকের ইষ্ট মার্যা
করিনা মোদের সৃষ্টি হারা
শুন বলি স্পষ্ট কর্যা ।
তারপরে ম্যালেরিয়ার
হইলাম হালা কান
বুঝি বাঁচেনা আর জান ।
অন্নদা মা ভিক্ষা তোমার
করবে কি আর দান হে
সময় কালে না চর্যা জল
অসময়ে ফলল ফসল
ও সব মুশুরী কলাই গ্যাল ডুব্যা
ক্ষেতের ফসল মল
আর সেল ধান হালা গেল
ক্যামনে করি গান
বুঝি বাঁচে না আর জান।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি গম্ভীরার শিব ঠাকুর উপলক্ষ্য মাত্র। প্রকৃতপক্ষে মালদার লোক-কবিদের আবেদন সম্পূর্ণভাবে দেশবাসী তথা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দরবারে। তাই তাদের গানে সাময়িক কথা ও সমস্যার কথাও থাকে খুবই বেশী পরিমাণে। একবার মালদায় বন্যায় প্রভূত পরিমাণে শস্যের ক্ষতি হয়। সেই বছরের গম্ভীরা গায়কদল শিবকে উদ্দেশ করে বলতে শুরু করল :—

এবার কি খাবা হে বাবা
পুরাল (খড়) চাবাও বন্যা,
কোন মুলুকের বন্যা এলো

মোর বাবা হে
মোর বাছা হে।
কোন দোষনা বাতাস আস্যা হে
পুয়াল চাবাও বস্যা।
আমের গাছের ডাণ্ডা খাড়ু
ভাঙ্গই ধানের আশ ছাড়ু,
ভাতিয়ার বিল হাতিয়ায় নিলে
মোর বাবা হে
মোর বাছা হে
কোন দোষনা বাতাস আস্যা হে
পুয়াল চাবাও বস্যা।

বন্যায় শস্যের ক্ষতি হওয়ায় কৃষাণেরা যেমনি শিবের কাছে আবেদন পেশ করেছিল তেমনি অন্য একবার অনাবৃষ্টির জন্য যখন মোটেই শস্য হলনা দেশে প্রায় দুর্ভিক্ষ লাগার উপক্রম তখনও মালদার লোককবিরা শিবকে উপলক্ষ্য করে বলতে আরম্ভ করল :—

শিব কি করিব হে এবার
বাঁচবে না প্রাণ
টাকা প্যারের চাউল হয়্যা
লাইগ্যা গ্যাল টান
বাঁচবে না আর প্রাণ॥
আমাদের দ্যাশের আস্ত কলটি
সেও হল মাটি
পল্‌ পুশা (শোকা) পাহি দিসা
ধর হল খাটি হে,
ধর হল কুড়ি পঁচিশ
পল্‌-পুশা লাগছে যে দিস্‌।
এ ক্যামন হল দ্যাশের ধারা
বল বাঁচব ক্যামনে মোরা!
কৃষকেরা ভাবছে বইস্যা
উপায় কি বা করি হে,
ধান কলাই হোলনা ভাই
হোলনা জল বরি হে
আর ক্যামনে রোপণ করি
জল বিনা সব মইল গরু বকরী
এ কি হল বিষম জ্বালা
ক্যামনে বাঁচবে ছেইলা পিলা।
গরীবেরা ভাবছে বইস্যা
উপায় কি বা করি হে
এক সের ধর চাউল হয়্যা
না খ্যায়্যা সব মরি হে।
ভুট মটর ঘোরার খানা
ধর হল যে মখিন ছানা
এ কষ্টে পরদা গেল বরে
রাজ্য চলবে ক্যামন করে
দিনে দিনে হল কঠিন
ক্যামনে পাব ত্রাণ
শিব কি করিব হে এবার
বাঁচবে না আর প্রাণ।

লোককবিদের এক জন ব্যঙ্গ করে বলছে দেখ ভাই আমাদের এই সব দুঃখ কষ্টের মূলেই হচ্ছে ওই বুড়োটা অর্থাৎ শিব ঠাকুর। সুতরাং এসো আমরা আজ্ঞা করে ওঁকে চেপে ধরি। বলি, আমাদের দুঃখের কথা :—

ধর ধর ধর দিস না ছাড়্যা
লিয়া চলেক সংগে করা
ওই বুড় ব্যাটা দিলে বড়ই দুঃখ (হে)
(দিলে বড়ই দুঃখ)।
বাপ বুনিলে দেয় না পানী
ওই বুড়ব্যাটা বড়ই পনি
সদাই রাখে মোদের প্যাটে ভুখ (ই) (২)।
দানড়ার উপর চড়্যা বুড়হা
কুচনী পাড়ার বেড়াও ঘুর্যা
চাট্‌ কুহারা জানেই কতই সুক (ই)
(জানেই কত সুক)।

স্বাধীনতা আন্দোলনে ও গম্ভীরার দান যে অনেকখানি এ কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। যুগে যুগে স্বাধীনতা আন্দোলনের যখন যে ঢেউ উঠেছে, মালদার লোক কবিরা সাড়া দিয়েছে। এই ত মাত্র সেদিনের কথা। ১৯৪৭ সালে ভারতবাসীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইংরেজের শয়তানী চক্রান্তে পড়ে ভারত যখন ভাগ হল তখনও মালদার লোককবিরা চুপ করে বসে নেই। স্বাধীনতা লাভের পরও ভারতবাসীর আশা

নিবে নিভীক কণ্ঠে গেয়ে উঠল খালদার বিরুদ্ধ গম্ভীরা গায়ক দল :—

বাপরে বাপ জান বাঁচান হোলো দায়
শ্যানে শ্যানে কোলাকুলি
নল খাগড়ার গ্রাম দায়
জান বাঁচান হল দায় ।
ধন্য বৃটিশ রাজের চাল
ওসে করলে বাজেয়াল
শ্যাষে বাঘার ঘাঁয়ে পাগল হয়্যা
উড়াজাহাজে হাওয়া খায়
বাপরে বাপ জান বাঁচান হল দায় ।
চার্চিল ছন্দেরই বেশে
(ওরে) অট্টালিকাতে বসে
চপ কাটলেই চুষে
এট্লিকে ফের কেটলী বানায়্যা
সেই জলেতে চাহা (চা) আর (বাপরে) ।

গম্ভীরা গায়কদল এই পর্যন্ত বলেই ক্ষান্ত হতে চায়নি । ছত্রিশী বা বারোয়ারী গম্ভীরার মারফৎ তারা সামাজিক দুর্নীতির কাহিনী আরও স্পষ্ট আরও জোরাল ভাবে প্রকাশ করেছে :—

দ্যাশের কত যে নেতা
তাদের বড় বড় কথা
পায়্যা স্বাধীনতা লাড্ডু
কুনঠে হয়্যা সেন্দু গাড্ডু
দেইখ্যা তাদের স্বার্থপরতা
আইসে হামাদের বাধা
শ্যাষে ঘরে আগুন লাগাইয়্যা দিয়া
সোনার ভারত করলে খান
হিন্দুস্থান আর পাকস্থান ।

রাজনৈতিক গানের জন্য কত গম্ভীরা গায়ক ও গীতিকারকে যে আদালতের সম্মুখে হাজির হতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই । কিন্তু তাই বলে তাদের কণ্ঠ কোনদিনই স্তব্ধ হয়নি-এ কথা কিন্তু আগেই উল্লেখ করেছি । তাই তারা এখনও স্পষ্ট অথচ নির্ভীক কণ্ঠেই গেয়ে চলে দেশের অনাচার অবিচারের প্রতি লেখা বিদ্রূপ করে । কারণ তাদের গানত আর ছাপার হরপে প্রকাশিত হয় না—গান থাকে মনের মাঝে লুকিয়ে সেখানে সরকারী আইনের এক্তিয়ারের বাইরে । সুতরাং শিবঠাকুরকে উপলক্ষ্য করে তাদের আর গাইতে বাধা কী দেশের শাসনযন্ত্রের বিরুদ্ধে ? :—

আজ ভাল মানুষির দিন গিয়াছে
ওহে পশুপতি ।
তিন চোখে কি দ্যাখতে পাওয়া
মোদের কি দুরগতি ।
জাল জালিয়াত বিশ্বজুয়্যা
ব্লাক মার্কেট বাজারভইর‍্যা
গাড়ী চালায় বাড়ী হাঁকায়
জ্বালায় বিজলী বাতি ।
বিদ্যা বুদ্ধি ধর্ম সেবা
রসাতলে গেল ডুব্যা
হিংসা বিবাদ দলাদলি
হায়রে কি দুর্মতি ।
ন্যাংটা হয়্যা প্যাংটো মুখে
মরলো যে সব গরীব লোক
তাই তো মোরা ন্যাংটা ভোলার
কাছে জানাই নতি ।

অনেক সময় ছদ্মবেশের আড়ালেও তারা তাদের মনের কথা শুধুমাত্র ইঙ্গিতে প্রকাশ করে থাকে । কোন একবার স্থানীয় বড় দারোগার অত্যাচারে যখন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল গ্রামের লোক অথচ মুখ ফুটে এর প্রতিবাদও করতে পারছে না তখন এইসব অসহায় জনসাধারণের অব্যক্ত মনোবেদনা প্রকাশ করবার ভার নিল বিরুদ্ধ লোককবির দল । তারা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সামনে

সমরায়োজনে
চাই
স্বর্ণালঙ্কার
জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে
মুক্তহস্তে দান করুন

দাঁড়িয়ে গান শোনাবার অছিলায় কৌশলে বর্ণনা করে যেতে লাগল, সাহেব তুমি যদি তোমার এই অত্যাচারী বড় দারোগাকে না সামলাও তা হলে আমরা মেয়ে তার হাড় ভেঙ্গে দেব তখন আর বাড়ি বাড়ি ঘুরে ঘুরে অনুসন্ধান চালালেও তার কোনই সন্ধান পাবে না। এখানে শিব অর্থে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বুড়ো এঁড়ে অর্থে বড় দারোগা বলে ধরে নিতে হবে :—

শিব সাজলা রে তোর বুড়ো এঁড়ে
তাড়িয়ে দারে চিঁদ রে।
তোর কাঁধে ঝোলে ভিক্ষার ঝুলি
গলায় ভরা বিষ রে॥
কোঁচেরা সব পল্লা করে
(তোর) এঁড়ে দিবে খোঁয়াড়ে ভরে
তখন বাড়ি বাড়ি মাতন করে
জরিমানা দিব রে॥

নেক সময় অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায়ও বলে থাকে :—

স্বরাজ্য যদি পাই হে ভোলা
কতো দিব মাণিকের কথা
নইলে আইব্যার কথা
বিল্কি আলো—
বানিয়া চইল দেশপ্রীতি
কি বলব ভাই দেশে গীতি
কাঁচ দিয়া কাঞ্চন নিলা
চাতে দিবা খোলা।

যোলান গানের পর শুরু হল আলকাপ। আলকাপ গানের বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটু আগেই উল্লেখ করেছি। ছোট ছোট নীতিকথা মূলক গল্প কিংবা লঘু রসের পরিবেশন। একটানা এইসব গুরু গম্ভীর গান শুনবার পর শ্রোতৃবৃন্দ একটু নির্মল হাসির খোরাকের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে লোকশিল্পীরা সে খবর জানে। তাই তারা একটি ছেলেকে মেয়ে সাজিয়ে নিয়ে আসরে এনে হাজির করে। বলে বরল ঐ মেয়েটিকে যেন বিয়ে দেওয়া হয়েছে একটি কালা স্বামীর সঙ্গে। চোরাই বৌটি তার স্বামীকে হাট থেকে এক গাদা জিনিস আনবার জন্য ফর্দ বলে দিয়েছে। কিন্তু বেচারী কালা স্বামীটি হাট থেকে কিনে নিয়ে এলো সব উল্টো পাল্টা জিনিস। তখন বউটির মনের অবস্থা কি রকম হয় সহজেই অনুমান করা যায়। কাজেই সে সময় তার পক্ষে মনের দুঃখে বলা খুবই স্বাভাবিক :—

স্বপুর বাড়ি আস্যা হামার
জ্বান হইলো কালা পালা
কি করব ভালা।
স্বামীর গুণ আর বলব কত
সকলে কে আর হামার মত টে
দুই কনেতে বহেরা এত
শুনেতে পায় কাঁচ কলা।
বিলুদ বারের গন্ধের হাটে
সহদু ক্যাথার সুতা লিতে টে
(আবার) তরল অলতা পাঁয়ে দিতে
আশী, কাঁকই, কাটা টে
পাল্লা পাইরা গোদাবরী
লাল না হয় ভাল সাড়ি (শাড়ী)
আর এট টা ভাল মাথবার বাটি
না হয়ত অ্যাল ম্যালানের ধুটি।
সুতার বদল লিয়া আইলা
পাঁয়ে দিবার জুতাটে
(আবার) অলতা ছাড়া লিলে মড়া
লণ্ঠনের এক শইলতা টে।
(আবার) আশী ছাড়্যা বড়শী কিনলে
কাঁকই ছাড়্যা মাকই লিলে
না লিয়া মাথায় দিবার কাটা
লিলে লারিওলের এক ঝাঁটা।

আপনার সঞ্চয়
বীরের সহায়
জাতীয় প্রতিরক্ষা
সার্টিফিকেটে
লগ্নী করুন

গোদাবরী সাক্ষী হইলো
সত্যনার পাঁচিতে,
(আবার) পাছা পাইয়া শুনলে মজা
বাইছা বাইছা কিয়াতে ।
না লিয়া সে ত্যালের বাটি
লিলে মরা তালের পাটি,
না লিয়া আলমযালানের ঘাট
লিলে মাছ কুটার এক বাঁট ।
মরার কাণ্ড দেইখ্যা বন্ধু লাগে
হাঁড়ি ফেইল্যা মারনু রাগে টে
বা চোখেতে লাইগ্যা মরা
এক চোখেতে দেখে টে,
তাও কি মরার দিশা হইলো
রথের মেলা দেখতে গেলো
মরাকে আনতে কহনু মুলা
মরা লিয়া আইলো কুলা,
রাগেতে লাকাঁড়ি ফেল্যা, খাইয়া মরাক
লাংরা কয়্যা দিনু ফেল্যা
দ্যাখত ঠ্যালা ।

স্বাধীনতা তথা বঙ্গ বিভাগের (১৯০৭ খৃঃ অঃ) পরই উদ্বাস্তুতে ছেয়ে ফেলল পশ্চিম বঙ্গের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত। তখন সব জায়গাতেই প্রচুর পরিমাণে ভুয়া সেবা সমিতির দেখা দিতে লাগল। মালদার লোক-কবিদের সে দিকেও নজর পড়ল। তাই তারা মালদা শহরেরই কোন একটি ফাঁকিবাজ সেবা প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে ব্যঙ্গ করতেও ছাড়ল না।

মনে করুন যেন কোন কেতা দোরস্ত হালাক্যাপানের ভ্যানিটি ব্যাগ ধারী মেয়ে এসেছে চাঁদা চাইতে। তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় সে যেন নিজের স্বরূপ নিজেই প্রকাশ করে দিচ্ছে :—

আইলাম দুপহরের রোদে তাইতা পুড়্যা
দ্যাওনা চাঁদা জলদি কর্যা,
• •
সুবিধা বাদীর দলে
আমার মত মেয়ে ছেলে
লোক ঠকাইয়া হচ্ছে দেশের সেবা ।
যারা শুধু কাজ করে
দিবা রাত্র খেটে মরে
আমি তাদের বলি আস্ত ভেড়া
এ দুনিয়ায় কেবা আছে "স্বার্থ" ছাড়া" ।

আলকাপ গানের ভিতর অনেক সময় এই ধরনের লঘুরসের পরিবর্তে অন্য ধরনের গানও শোনা যায়। এই সব গান প্রায়ই দ্বৈত ভাবে গাওয়া হয়। একজন গায়েন মাধ্যমে প্রশ্ন করে অপর জন উত্তর দেয়। দুজনের গানের অংশ একত্র করেই একটি গান সম্পূর্ণ হয়। অনেক সময় জলপাইগুড়ি প্রভৃতি অঞ্চলের গানের মত এ সব গানের ভিতরও পল্লবিত প্রেমের কাহিনীও শোনা যায়। মনে করা যাক একটি বউ নদীর ঘাট থেকে জল নিয়ে ফিরে এলে তার অবিন্যস্ত কেশবাস দেখে তার ননদিনী প্রশ্ন করছে এবং সেও যেন তার উত্তর দিয়ে যাচ্ছে :—

ননদী :—ফুল কোথায় পেলিলো ছোট বউ
সাঁঝের বেলায় ।
চুল কেন তোর এলো-মেলো
পিঠে কেন তোর ধুলো ।
এমন সুন্দর রূপ দেখি
চোখ দুটো কেন ফুলো
(লো ছোট বউ সাঁঝের বেলায়) ।
বউদি :—ভাশুর হামার যাবে বলে
পাত কাটিতে গেলাম
বগা ধরে (কলাপাতার আগা) টান মারিতে
আছাড় খেয়ে পড়লাম ।
জল আনিতে গেলাম হামি
সাহান বান্দার (সিমেন্ট করা) ঘাটে,
যাইতে ছিল চাঁপার ফুল
তুল্যা লিলাম হাতে ।
(লো ননদী সাঁঝের বেলায়) ।

একবার শহরে এক ডোমনী (ডোমের মেয়ে) এলো পাখা বিক্রি করতে। এক বণিক সেই ডোম-নারীর রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। শেষটায় তার কাছে করল প্রেম নিবেদন। এই হল একটি গানের বিষয়বস্তু। এটিও দ্বৈত সংগীত :—

ডোমনী :—আমি পহরের ডোমিন
কে খাছ সৌখীন
লও গো পাখা খান।
গরমে বাতাস করিলে
ঠাণ্ডা হবে প্রাণ
(বাবুজি ঠাণ্ডা হবে প্রাণ)।
:—দেখি আনত পাখা
দেখতে কেমন বাঁকা
কোথাকার ডোমনী।
পাখা পছন্দ হলে, দিতে পারি
দাম কত শুনি।
ডোমনী :—আমি ডোম ছেড়ে কোন খানে যাবন
পাখা নিবা লাও
না হয় চল্যা যাও
ভাবের কথা আমি শুনবনা
ও সব ঠাটের কথা আমি শুনবনা।
রসিক :—আমি তোমায় ছেড়ে থাকতে পারব না।
ছাড় ডোমের আশা,
পাখা বেঁচা পেশা
হেঁসে হেঁসে কথা বল ভালাইওনা।
ডোমনী :—তবে শুনরে দাদু
সুখের সুখী আমি যে কেমন,
কুটিনা ছাটিনা আমি এ জনমে খান,
চালের চাউল আর ঘাটের পানি
উঠায় খায় আর পান।
সাধার দিয়ে গোলাবী তৈল
নিত্য করি স্নান।
ডোমরাজা মনের সুখে
বাঁশীতে গায় গান,
ক্যামন কন্যা আমি তোমার
যৈবন করি দান।
(রে দাদু যৈবন করি দান)।
ডোমের কত গুণ আমার কাছে শুন,
কারও ধার ধারে না
করে না মহাজনের দেনা,
জমিদারে দেই না খাজনা।

রসিক :—তবে তোর চেয়ে আমি বড়—
ভেবে দেখ মনে
হাজার টাকা দিয়া
মালকিনা কুইলানে।
জুতা পরি, বাবুগিরি করি,
গাড়ি ভাড়া করা মাল ফেলি দোকানে।
সাহেব চাপান বিক্রি করি বসা দোকানে।
ছাড় ডোমের আশা পাখা বেঁচা আশা
হেঁসে কথা বল ভালাইওনা ডোমাইন।
তবে আয় সুন্দরী তাড়াতাড়ি কোর না দেরী
হাতে পরতে চুরি দিব দাইট টাকার শাড়ী।
মাকে দোনার লোলক দিব লেপে এক ভরি,
তুই যে হামার ছোড়ান চাবি,
তুই যে চাবার টাকার ভালমারী।

গম্ভীরার পালা গানগুলির অধিকাংশই রাজনীতি অথবা সমাজনীতি ঘেঁষা। লোককবিরা প্রতি বছরই নতুন নতুন পালাগান বাঁধে। এর মধ্যে একজন সাজে শিব বাদ বাকী সব নানা সাজে সজ্জিত। কেউ বা হন গান্ধীজি, কেউ বা নেতাজী, জহরলাল, চার্চিল বা ভিক্টোরিয়া সাহেব। এখনও যা নতুন কোন ঘটনার প্রয়োজনীয় পাত্রপাত্রী। আগেই বলেছি এদের সমস্ত বক্তব্যই এরা প্রকাশ করে শিবকে উপলক্ষ্য করে। পালা গানেও তার ব্যতিক্রম নেই। চারণ কবি মুকুন্দরামের স্বদেশী যাত্রার সঙ্গে যাঁরা পরিচিত আছেন তাঁরা অনায়াসে গম্ভীরার এই ধরণের পালা গানের কল্পনা করে নিতে পারবেন। এই গম্ভীরা গায়কদল শিবকে আসরে নিয়ে এসে তাঁর কাছে সমালোচনা করতে থাকে 'হিন্দু কোড বিল', 'অস্পৃশ্যতা', সরকারী পরিকল্পনা (পঞ্চ-বার্ষিকী), 'ভূদান যজ্ঞ' ইত্যাদি।

অনেক সময় গ্রাম্য কুসংস্কারের বিরুদ্ধেও এই ধরণের ছোট খাট পালা বানিয়েনিয়ে তার গীত ও অভিনয়ও করে থাকে। মালদার কোন কোন অঞ্চলে এমন ব্যবস্থার প্রচলন ছিল (হয়ত বা এখনও আছে), কোন গ্রামে যেন বসন্তরোগ মহামারী রূপে দেখা দিত তখন গাঁয়ের নিরক্ষর লোকেরা ছুটত শীতলা ঠাকুরের কাছে। তিনি স্বপ্নাদেশ দেন (সবই তৈরী, মন গড়া) অমুক বসন্ত রোগী

বা রোগীনীর উপর মায়ের (শীতলা) ভর হয়েছে, সুতরাং সবলোক ছুটল সেই বসন্ত রোগীর বাড়ি। ঠাকুর মশাইও চললেন তাদের সঙ্গে সঙ্গে। সেই রোগী বা রোগিণীকে তখন শুরু করা গেল দেবতার মত করে পুজো করতে। শুধু তাই নয়, সেই বসন্ত রোগীর যখন বসন্তের গুটি শুকিয়ে মামড়ী করবার সময় হয় তখন একদিন ঘটা করে তার পুজো দেওয়া হয়। রোগী তার সম্মুখে রাখা ভোজ্যবস্তুর কিছুটা খেয়ে তার ভুক্তাবশিষ্ট বিলিয়ে দিতে শুরু করে দর্শনার্থীদের ভিতর। ভক্তগণও মহা শ্রদ্ধা-ভক্তি সহকারে সেই প্রসাদ উদরস্থ করতে থাকে এবং সঙ্গে করে বাড়িতেও নিয়ে আসে তাদের বাড়ির সমস্ত রোগীকে খাইয়ে দেবার জন্য।

এটা যে কত বড় অশাস্ত্রীয় এবং অসামাজিক প্রথা তা বোধ হয় আর বলবার প্রয়োজন নেই। কারণ যে সময় বসন্ত রোগী কাছ থেকে (মামড়ী ঝরবার সময়) মারাত্মক আশঙ্কা করা হচ্ছে সেই সময়ই সেবে রোগ বীজাণুকে বয়ে নিয়ে আনা হচ্ছে ঘরে। মালদার লোককবিরা গাঁয়ের এইসব কুসংস্কারাচ্ছন্ন শীতলা ঠাকুরদের নোংরামীর বিরুদ্ধেও ছোটখাট পালা গান রচনা করেছে :—

"শীতলা দেবীর কৃপায়
আমরা হইলাম সবার
তাও কি মোদের ঘুম ভাঙ্গে না
দেবীর নামে দিস দোহাই।
কত দেশের চাষা ভণ্ড
করে সর্বনাশের কাণ্ড
তারা দেবীর নামে পরসা চায়।
(আবার) এট পাথরে সিঁদুর লেপ্যা
বাড়ি বাড়ি লোক ঠকায়।
কারো মায়ের দয়া হলে
তার পূজা দেয় সকলে
তারা এমনি কর‍্যা রোগ ছড়ায়
(আবার) রোগী হয় সেই বসন্ত দেবী
তার হাতে সব প্রসাদ খায়।"

মালদার কোচ পলিয়া নামে একটি অনুন্নত সম্প্রদায়ের বাস আছে। চলিত কথায় তাদের বলে বাঙাল। তাদের পোষাক পরিচ্ছদ সবই আদিম সমাজের অনুরূপ। কিন্তু গমীরা গান এ সমাজের মধ্যেও প্রসার লাভ করেছে। এখানে জলপাইগুড়ির গম্ভীরার মত শিবের উপস্থিতিটা সব সময় খুব প্রয়োজনীয় নয়, গানটাই প্রধান। পূর্বোল্লিখিত গম্ভীরা গানগুলির সবই শিবের সম্মুখে গীত হয়ে থাকে কিন্তু (কোচ পলিয়া সমাজে গম্ভীরা ঠাকুরের পূজোপদ্ধতি পূর্ববর্ণিত মতে হলেও যখন তারা এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়িতে গান গাইতে যায় তখন তাদের সঙ্গে সব সময় শিবমূর্তি থাকে না। তারা তাদের গান সোজাসুজিই বলে থাকে। এদের একটি গানে জানা যায় এই শ্রেণীর মেয়েরা এক সময় বোকরা ও মেকলী (বোকরা—বক্ষবন্ধী, মেখলী—ঘাঘরার মতই হাটু পর্যন্ত ঢাকা যায় এই রকম বেশবাস) নিয়েই সন্তুষ্ট থাকত। মোটা ভাত মোটা কাপড় পড়তেই তারা ছিল অভ্যস্ত। এখন সেই ঘরের বৌরাও আর ও সবে সন্তুষ্ট থাকতে চায় না। তারাও আজ শহরের মেয়েদের মত ভাল শাড়ী, রং বেরংয়ের চুড়ি, সুন্দর ব্লাউজ পরতে চাইছে। এখন আর তারা চিড়াকোটা—মুড়িভাজার কাজে লিপ্ত হতে চায় না। এই রকম একটি বৌ তার স্বামীকে বলছে, তাকে এখন থেকে আর বৌ বলতে পারবে না শহরের মেয়েদের মত তাকেও ওগো বলে সম্বোধন করতে হবে :—

মোকে আনি দে বো গুলবাহার
বোকরা মেকলী গরধু না মুই আর।
(মুই) আং ধি অংরের চুড়ি হাতত
দিয়া বোমায় নু বাহার।
বিধি আনা পেইকী (ব্লাউজ) গায় দিয়া
সাধ হয়াছে সাজিব মুই
শহরয়া মায়্যা।
কুটমু না মুই মিহি চিড়া
দিবুনা মুই ঢেকিৎ পাহাড়।
ভদ্দর লোগে (বৌ-কে) কহেন গো
মোকে আর তা নি কহ
বেন কুঠি যাহেন বো।
ধরে বইস্যা থাকমু না মুই
বেড়াৎ যামু তিন পাহাড়।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, গম্ভীরার ভিতর বহু দূরের সংমিশ্রণ ঘটেছে। এবং এইটেই হল গম্ভীরা গানের

বৈশিষ্ট্য। তাই অধ্যাত্মিক গম্ভীরা গানেরও সন্ধান মেলে।

আষাঢ়ের আগমনে ধরণী সিক্ত হয়। গম্ভীরা পরবেরও পরিসমাপ্তি ঘটে সে বছরের মত। কিন্তু বাতাসের বুকে ভর করে আধ্যাত্মিক গম্ভীরা গানের দু চার কলি কখনও বা পুরো গানটিই ধ্বনিত হতে থাকে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে :—

"নানা দিন্ না আইড্যাক ছাড়া (হে)
(নানা দিনা আইড্যাক ছাড়া।)
কাম নামের তোর দুষ্টু আইড্যা
তোকে বান্ধা ফান্দা ফান্দা হে
এমন মানব জনিনটা
দিল পণ্ডমাল কর্যা (হে)
(নানা দিন না আড্যা ছাড়া)॥
ঠাকুর বাবার দেওয়া
চৌদ্দ পোলাডুমি
তাতে ধনালের বীজ
বুন্যা ছিলাম আমি
ও তার অঙ্কুর হতে না হতে
চুক্যা মন্দি ক্যাতেতে
(ওইলাখ) মূল ডগাটা লিছে ছিড্যা হে
নানা দিন না আইড্যাক ছাড়া।
(আমার) ধর্মের ছাড়া খুব শক্ত ছিল
অতি বুদ্ধি পাপে তা নরক হল
নানা হে—
(এক) মশাই মালী আছে (জল) বিন্দু নাহি ছাড়ে
দিন রাত মোহ ঘুমে থাকে পড়্যা হে
নানা দিন না আইড্যাক ছাড়া।

গম্ভীরা

এই কথায় মালদার গম্ভীরা জলপাইগুড়ির গম্ভীরা পশ্চিমবঙ্গের গাজন আর পূর্ববঙ্গের নীল সবই চৈত্র উৎসবের আঞ্চলিক নাম মাত্র। গম্ভীরা আর গম্ভীরার পুজো পদ্ধতি এক হলেও আরম্ভ ও শেষের একটু ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। গম্ভীরার শুরু হয় চৈত্র সংক্রান্তির দিন এবং বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত এর জের চলে। কিন্তু জলপাইগুড়ির গম্ভীরা চৈত্র সংক্রান্তির তার পাঁচ ছ'দিন আগে শুরু হয় এবং সংক্রান্তির দিনই এর শেষ। তাই জলপাইগুড়ির পল্লী অঞ্চলে দেখা যায় কেউ সংক্রান্তির পাঁচ ছ'দিন আগে স্থানীয় জনসাধারণ বিশেষত চাষীবাসী মানুষেরা একটা নির্দিষ্ট মাঠে এসে উপস্থিত হয়। তাদের সঙ্গে আসে শিবমূর্তি, পুরোহিত ঢাকী, ঢুলি, কাঁসি ইত্যাদী। এই শিবমূর্তি তারা স্থাপন করে কোন এক শুভদিন দেখে এবং এই উৎসব-অনুষ্ঠানকেই এ অঞ্চলে বলে গম্ভীরা উৎসব ও গম্ভীরা ঠাকুর।

গম্ভীরা শব্দ যে গম্ভীরা শব্দেরই অপভ্রংশ এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। অনেকে বলেন যেহেতু জলপাইগুড়ির পল্লীবাসীরা যুক্তাক্ষর বড় একটা উচ্চারণ করেন তাই। গম্ভীরা শব্দই গম্ভীরা নামে প্রচলিত। কারও কারও মতে গম্ভীরা উৎসব গম্ভীরার চাইতেও পুরাতন। এ সব গবেষণার বিষয়। আপাতত: আমাদের উৎসবের দিকে এগিয়ে যাওয়া যাক।

গম্ভীরা মূর্তি (শিব) প্রতিষ্ঠার পর এক দল লোক থাকে যারা প্রতি বছরই এই উৎসবকে অবলম্বন করে বাড়ি বাড়ি ঘুরে নৃত্যসহযোগে গান বাজনা করে থাকে। এই গানকেই এ অঞ্চলে বলে গম্ভীরা গান।

এই শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠার সময় এই গায়ক দলও উপস্থিত থাকে। পুরোহিত ঠাকুরত' পুজো শেষ করে ঘট থেকে জল ছিটিয়ে দেন এই সব গায়কদের মাথায়। তারাও শিবমূর্তি ও পুরোহিতকে প্রণাম করে বাড়ি বাড়ি ঘুরে গান গাইবার জন্য বের হয়ে পড়ে। সঙ্গে থাকে বাজনাদারের দল। এই গান শিব প্রতিষ্ঠার পর যেদিন থেকে খুশী গাইতে পারে তাতে কোন দোষ নেই। কিন্তু চৈত্র সংক্রান্তির দিনই এই সম্পর্কিত গানের শেষ। এর পর আর নতুন বছর না আসা পর্যন্ত কেউ এ গান গাইতে পারে না। তাতে নাকি গম্ভীরা ঠাকুর দোষ ধরেন এই রকমই চলতি প্রবাদ।

মূর্তি প্রতিষ্ঠার পর সংক্রান্তি পর্যন্ত যারা ঘুরে ঘুরে এ গান গেয়ে থাকে তাদের এই সময় স্নান অথবা পোষাক বদলান নিষেধ। মাছ মাংস পিঁয়াজ ও রসুন সকল সময় আমিষ ও উত্তেজক বস্তু খাওয়া বন্ধ। শুধু মাত্র দুধ কলা ও গাঁজা সিদ্ধি খাওয়ার বিধান আছে। এই গায়ক দলের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের নীল সন্ন্যাসী ও পশ্চিমবঙ্গের গাজন

সন্ন্যাসীদের মিল খুঁজে পাবেন এ কথা বলা বাহুল্য।

গায়ীরা গানে বলে, যে শিব বিরহক গানই হয় তা নয়। এ সম্পর্কে কোনও বাঁধা ধরা নিয়মও কিছু নেই। এক কথায় সব রকম গানই চলে। তবে এই সব গানের মধ্যে পরকীয়া-প্রেমের আধিক্য বড় বেশী মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়।

মনে করা যাক একটি অবিবাহিতা মেয়ে আক্ষেপ করে বলছে তার দিদিমাকে, দিদিমা আমার সাধ আহ্লাদের দিন চলে যাচ্ছে। আমার জন্য আর দই চিঁড়ে রেখো না (দই ও চিঁড়ে জলপাইগুড়ি অঞ্চলের খুব প্রিয় খাদ্য)। খাবার জন্য চালের গুড়ো কর (কারণ, বুড়ো বুড়িরা চিবার মত শক্ত জিনিস খেতে পারে না, তাই তারা চালের গুড়ো খায়) আমি তাই খাওয়া আরম্ভ করব। আমার সাধ আহ্লাদের দিন আর থাকছে না। আর তা ছাড়া দিদিমা এই বাসায় (বাড়ি) বয়স্ক অবিবাহিত এক যুবক রয়েছে। সে ঠিক একদিন আমায় নিয়ে পালিয়ে যাবে। কারণ, সে যখনই আমাকে দেখছে তখনই শুধু হাসছে :—

ও মোর আবেগে (দিদিমা),
চাউলের (চালের) দিন মোর যাছে গো বয়া।
না খাও আরো দৈহি-চুড়া,
করেক আরো চাউলের গুড়া।
আঁরো বাড়িতে চেংগেরা (যুবক) আছে
যেলায় (যখনই) দেখে সেলায় (তখনই) হাসে
কুনদিন (কোনদিন) বা মোক (আমাকে)
ধরিয়া যাবে।

কখনও বা শোনা যায় টাকার লোভে পড়ে কোন একটি অল্প বয়সী মেয়েকে বিয়ে দেওয়া হয়েছে এক বৃদ্ধের সঙ্গে (জলপাইগুড়ির পল্লী অঞ্চলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিয়ের সময় মেয়েরাই পণ পেয়ে থাকে)। নব বিবাহিত যুবতী বধূটি তাই আক্ষেপের সঙ্গে বলতে শুরু করেছে তার মার কাছে, মা, তুমি যে টাকা পণ আমাকে বিয়ে দিলে, ইচ্ছে হচ্ছে তোমাকে এখন ডাইনীর বাড়ি মারি। তুমি এই পৃথিবীতে কি এই বুড়ো ছাড়া আর কোন লোক পেলে না যাকে জামাই করতে পারতে। মাগো তুমি শেষটায় আমায় কিনা একটা বুড়োর সাথে বিয়ে দিলে। তুমি কি আমায় এমনই বুড়ি মনে করেছ নাকী? যেখানে বিয়ে দিয়েছ, সেখানে আমাকে কনে বউ বা নতুন বৌ বলে ডাকবার কেউ নেই। সবাই আমায় ডাকে, জ্যেঠিমা, খুড়িমা বলে। তুমিই বল মাগো, আমাকে কি খুব বুড়ো বলে মনে করছ? আমাকে সব সময়ই বুড়োদের মত পান সুপারী ছেঁচতে হচ্ছে কারণ ওই বুড়ো মিনসে সব সময়ই সেই ছেঁচা পান মুখে দিয়ে চিবুতে থাকে। এই করতে করতেই ত আমার সারাটা জীবন চলে যাবে। তাই বলছি মাগো তোমার আক্কেলের কপালে ও ঝাঁটা মারি :—

তোর টাকা খাইয়া তোর মুখত বাধিনি
ভাংগাও (ঝাঁটা)
তোর গে আই।
এমন বেসালেন জামেই (জামাই)
যার মুলকত (দুনিয়া) বয়গে পালেন নাই।
ও আই টাকার লোভে বুড়াক দিলেন
আর মুলকত বর নাই পালেন
মোকে কি সবাই লেগে বুড়ি আই।
সগায় কাছে জেবাই খুড়াই,
কাহো কাছে বুড়ি আই, বুড়ি আই
নদারী (নতুন বউ) কবার গে মানষি নাই।
ও আই (মা) দাকি বুড়ি গুয়া পান
বুড়া বয়ের ফেদে লান
গুয়া (সুপারী) ডুমাইতে (ছেঁচিতে বা কাটিতে)
যাবে জান।

এ গানের উল্টোটিও শোনা যায়। বাপ মা টাকার লোভে পড়ে কোন একটি বয়স্কা মেয়েকে বিয়ে দিয়েছে একটি অল্প বয়সী ছেলের সঙ্গে। এই নব বিবাহিতা যুবতীটি তাই আক্ষেপের সঙ্গে বলছে, আমার মন দুঃখে ভেঙ্গে পড়ছে। চোখের সামনে আমার সবই খাঁ খাঁ করছে। আমার বাবা ও মা শেষটায় কিনা আমায় বিয়ে দিল এক বাবালকের সঙ্গে!! রাগে মেয়েটি বলতে শুরু করে, আমার বাবা, মা ও পাড়ার লোক সবাই মরে যাক। আর যে ঘটক এই বিয়ে দিয়েছে তাকে জংগলে বাঘে ধরে খাউক। আমার বাবা যাকে খবর দেও, তারা যেন একটা গরু কিনে পাঠিয়ে দেয়। সেই গরুর দুধ খেয়ে

তাদের নাবালক জামাই যেন তাড়াতাড়ি যুবক হয়ে উঠতে পারে :—

ও মন মোর কান্দেরে
দেখিয়া পাথারে।
বাপ মায়ে মোক বেচেয়া বালেক
নাবালক জামাতারে।
বাপ মরুক, মাও মরুক রে
মরুক পাড়ার লোক,
কাঙোয়া (খটক) মরাক বাঘে খাউক
নিঠুয়া (গহন) পাথারে (জংগলে)।
বাপ যাওক জানাও মরুরে
কিনিয়া দেবাউক গাই,
তাহার দুধে যায়া মানুস হউক
নাবালক জামাই।

এইবার মনে করুন একটি যুবকের স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছে। কাজেই তার ধারণা সব সময়ই একটা উদাস ভাব। তার বৌদি এসে ডাকছে খেতে এসো ঠাকুরপো। যুবকটি উত্তর দিচ্ছে, বৌদি, তোমায় কি আর বলব বল, কে আর আমায় আদর করে ডেকে খাওয়াবে। বৌটা মরে গিয়ে আমায় প্রায় পাগল করে রেখে গেছে। যখনই তার মুখখানি মনে করছি, তখন আর কিছুতেই মন বাঁধা মানছে না :—

ও ভদি (বৌদি) কিবা কহিব তোক থাকিয়া
কেবা খায়ায়া দিবে আসিয়া।
ও লো ভদি শুন আদি
শুন লো মোর কাথা (কথা) আজি
নজারিটা (নতুন বৌ) মরিয়া কইয়াছে কাউয়া (পাগল)
কিবা থাকিবক মুই চায়্যা
মনত আর বান্ধন মানে না।

এক সময় ছিল যখন এই গম্ভীরার প্রায় সব গানই ছিল শিব বিষয়ক। কিন্তু কালক্রমে এর ভিতর প্রেম বিরহ সংগীত ও স্থান পেতে পেতে শিব বিষয়ক গান প্রায় গৌণ-ই হয়ে পড়ে। সভ্যতা ও শিক্ষার প্রসারের ফলে স্থানীয় নিরক্ষর পল্লীবাসীরাও সভ্যতার আলোর সংস্পর্শে এসে পড়ে। তাই আধুনিক গানেও মালদার গম্ভীরা গানের মত বাৎসরিক বিবরণী শুনতে পাওয়া যায়। শুনতে পাওয়া যায় তাদের দৈনন্দিন সুখ দুঃখের, অভাব অভিযোগের খবর। তারাও আজ স্পষ্ট এবং নির্ভীক কণ্ঠেই নিবেদন করে তাদের মনের কথা তাদের বক্তব্য জনসাধারণের দরবারে। পার্থক্য শুধু এখানে গম্ভীরার মত শিবকে উপলক্ষ্য হিসেবে দাঁড় না করিয়ে সোজাসুজিই বক্তব্য বলে যায়। তাই অত্যাধুনিক গম্ভীরা গায়কের কণ্ঠে শোনা যায় ভণ্ডদের নেতাদের বিরুদ্ধে সাবধান বাণী :—

"হামার কথা শুনেছে ভদরা
চাষী মানষি ন্যাখা পড়া নাই শিখি
ভদরা হল্যা শহর কলকাতাবাসী
অঁ হুঁ.....

হামরা হলান চাষী মানষী
যেই বুলাইছ সেই বুইলাছি
আইস্যাছে ভোটের পালা
খায়ায়া দিমু কাঁচা কলা।"

গাজন

চৈত মাস পড়তে না পড়তেই কোলকাতা এবং শহর-তলীর উপকণ্ঠে শোনা যায় গাজন সন্ন্যাসীদের কণ্ঠস্বর, 'বাবা তারক নাথের চরণের সেবা লাগে—মহাদেব।'

প্রকৃতপক্ষে তখন থেকেই শুরু হয় গাজন সন্ন্যাসীদের সন্ন্যাস ব্রত একেবারে সংক্রান্তি পর্যন্ত। এই সময় মধ্যে এই সন্ন্যাসী বা শিবভক্তদের মাথায় বা গায় তেল দেওয়া নিষেধ, গৈরিক বসন পরতে হয়, সংগে থাকে উত্তরীয় তার রংও গৈরিকই। তা' ছাড়া গলায় থাকে এক মোটা কাশি সুতো অনেকটা কাচা গলায় দেবার মত। আর তাদের হাতে থাকে তামার বালা। গোটা মাস-ভর তারা দল বেঁধে বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ায় 'বাবা তারকনাথের বা শিবনাথের নামে। সমস্ত হাট অঞ্চলই এই গাজনের আওতায় পড়ে। অবশ্য শিবের গাজন বলতে বাঙলার প্রায় সর্বত্রই প্রচলিত। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই এর সমধিক উৎকর্ষতা লাভ করেছে। সংক্রান্তির কয়েকদিন আগে এরা সংযম অবলম্বন করে ও হবিষ্যান্ন খায়। সংক্রান্তির দিন একেবারে শিবের

উপবাস থেকে গাজন তলার গিয়ে পূজো দিয়ে তাদের সে বছরের মত অনুষ্ঠান সমাপ্ত করে।

যে হেতু মালদার গম্ভীরা পূর্ববঙ্গের নীল ও দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের গাজন একই জিনিসের বিভিন্ন নাম সেই হেতু এর পূজো পদ্ধতি ও অনুষ্ঠান সবই একই রকমের। এজন্য আর বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নেই। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে পূর্বোক্ত উৎসবের সঙ্গে কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করা যায়। পূর্ববঙ্গের নীল পূজোর নীল সন্ন্যাসীদের সঙ্গে থাকে নীলের পাট,- চলতি কথায় বলে পাট গোঁসাই। এই পাট অর্থে সিংহাসন। অর্থাৎ মহাদেবের বসবার আসন। পশ্চিম-বঙ্গের গাজন সন্ন্যাসীদের সঙ্গে থাকে ত্রিশূল অথবা চিমটা আর সেই সঙ্গে থাকে এক গোছা খাটো বেত। বেত অবশ্য নীল সন্ন্যাসীদের সঙ্গেও থাকে। কিন্তু গম্ভীরা বা গমীরা গায়কদলের সঙ্গে এ সব কিছুই থাকে না। নীল ও গাজনের গানের বিষয়বস্তু প্রধানতঃ শিব দুর্গা ও হর-পার্বতী-সংক্রান্ত। কিন্তু গম্ভীরা বা গমীরার তা নয়। বিশেষ করে গমীরা, নয়ই। তাই মালদার গম্ভীরার শিবকে যেমনি গণদেবতা আখ্যা দেওয়া চলে নীল বা গাজন ঠাকুরকে (মহাদেব) তেমনটি বলা চলে না। এর ভিতর জন জীবনের সুখ-দুঃখের কথা থাকে খুবই কম। আধুনিক কালে অবশ্য নীল এবং গাজনের ছড়া গানের ভিতরও কিছু কিছু আধুনিক সমস্যার বিষয় আলোচনা চলছে। তবে তাও ধরপাবতীর কাহিনীর মধ্য দিয়েই। এ দিক থেকে বিচার করলে গম্ভীরার স্থান অনেক উচ্চে সন্দেহ নেই। বীরভূম বাঁকুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে ধর্ম ঠাকুরের পূজো ও গাজন হয়ে থাকে। ধর্ম ঠাকুরের গাজন ও শিবের গাজন অভিন্ন। যদিও ধর্ম ঠাকুরের গাজনের উৎপত্তি হল সূর্য পূজো থেকে। তা হলেও ঐ একই দিনে দুটি অনুষ্ঠানই সম্পাদিত হওয়ায় বর্তমানে ধর্ম ঠাকুরের গাজন আর শিবের গাজন এক বলেই পরিচিত হয়ে আসছে।

প্রসঙ্গত বলা যায় গাজনের ছড়া ও গানেও নীলের গানের মত কোনও পালা গান নেই। খণ্ড খণ্ড বিভিন্ন গান, বিভিন্ন অঞ্চলে শুনতে পাওয়া যায়। এইসব গান একত্রিতভাবে মিছিল করে সাজালে হয়ত একটা পুরো কাহিনীর সন্ধান পাওয়া যায়।

মনে করা যাক মহাদেব যোগনিদ্রায় আসীন। ভক্তগণ তাঁর কাছে যোগ-নিদ্রা ভঙ্গের জন্য ব্যাকুল প্রার্থনা জানাচ্ছেন :—

"প্রভু, যোগনিদ্রা কর ভঙ্গ, দেবকের দেব রঙ্গ
পরিহার তোমার চরণে।
কার্তিক গণেশ কোলে, শয়নে আছে নিদ্রা ভোলে
আমরা তোমার প্রণাম করিব কেমনে॥
নিদ্রা ত্যজ দেবরাজ বসহ খট্টার মাঝ
নিরন্তর সেবা রাখহ রাম ভাসে।
প্রভু, তুমি দেব অধিপতি, হরি ব্রহ্মা করে স্তুতি
অন্য দেব কোনখানে লাগে।"

উপরোক্ত গীতটি ধর্মের গাজন এবং শিবের গাজন উভয় ক্ষেত্রেই শোনা যায়। মুর্শিদাবাদের পল্লী অঞ্চলে শিবের গাজন উপলক্ষে যে সব গীত প্রচলিত আছে তার মধ্যে অনেক সময় নিরক্ষর দরিদ্র পল্লীবাসীদের মনের বাসনাও শোনা যায়। এক লোককবি শিবের বিবাহ বর্ণনাচ্ছলে বলছে, শিবের বিয়ে হতে চলেছে। তাঁর শ্বশুর ত রাজা লোক, সেখানে খাবার-দাবারের প্রচুর আয়োজন। সুতরাং সেখানে যদি সৌঁছন যায় তা হলে বেশ মোটা রকমের কলারটাই হবে। কিন্তু সে যে দেবতাদের ব্যাপার, তা ছাড়া রাজবাড়ি ত', কাজেই ওখানে ঢোকা যাবে কি করে?

লোককবি নিজেই তার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে :—

"ভূতেদের পাছা ধরি
যাব আমি কৈলাস পুরী,
পাতুয়া রসোগোল্লা
যত চাবি তত্তই পাবি
চলনা ক্যানে।"

চব্বিশ পরগণার টাকী প্রভৃতি অঞ্চলে শিবের গাজন উপলক্ষ্যে একটি গানে দেখা যায় মহাদেব বিবাহ করতে চলেছেন একেবারে নতুন বরের বেশে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, মহাদেব ইতিপূর্বেই গঙ্গাদেবীকে বিবাহ করেছেন। লোককবি তাঁকে পরামর্শ দিচ্ছেন, সতীনে সতীনে বিবাদ যখন অবশ্যম্ভাবী তখন দু'জনাকে দু'জায়গায় রাখাই

সমসাময়িক এবং এজন্য কার কোথা স্থান তাও তারা নির্দেশ দিয়েছেন :—

ভাগের ভোলা শিব তোমার
এ কি মোহন বেশ,
মাথাতে পরেছে বুকুট
নেইকো জটার লেশ।
বাঘ ছাল কোথায় গেল
কোথায় গেল হাড়ের মালা,
মাথার সাপ কি বনে গেল
হয়ে কালা পালা ॥
রাজার মেয়ে করলে বিয়ে
হলে রাজার জামাই,
ঘরে আছে গঙ্গামাই
তুলনা তার নাই।
কিন্তু বাবা বলি তোমা
করি প্রণিপাত,
দুই সতীনে বিবাদ হলে
না হয় বিলম্বাদ।
শুন বলি ওগো ঠাকুর
পেন্নাম দ্বিচরণে,
গঙ্গামাই মাথায় রেখো
সৌরী গো ছদনে ॥

অনেক সময় অকাল বিশেষে গাজনের গানের ভিতর গুরু প্রশস্তিও শুনতে পাওয়া যায়। গুরুবাদী বৈষ্ণবদের মত তাঁরা গুরুকেই তাদের ধ্যান ধারণার প্রধানতম উপকরণ বলে বিশ্বাস করে :—

প্রণাম গুরুদেব, অখিল ভুবনে সেবা
গুরু চতুর্ভুজ সিংহ অপরূপ।
যাঁহার চরণ ধরি, এ ভব সংসার তরি,
গুরু হন ব্রহ্মার স্বরূপ।
(আহা) অন্ধের লোচন গুরু, ভক্ত বাঞ্ছা কল্পতরু
ভক্ত জনার প্রতি গুরুর দয়া।
শিবের সেবক নন্দী, শিবের চরণ বিন্দি
আর বন্দি মা মুক্তামায়া ॥
গুরু গোঁসাই কর দয়া, দেহ মোরে পদ ছায়া
ও রাঙ্গা চরণ বিনে গতি নাই।
অন্তিম কালে, যমদূত যায় লয়ে
সেবক বলিয়ে প্রভু রেখো রাঙ্গা পায়।

গাজনের দলে তারকেশ্বরের একটা বড় সম্পর্ক রয়েছে তা আমরা এ প্রসঙ্গে প্রথমেই দেখিয়েছি। মনে হয় গাজন উপলক্ষ্যে তারকেশ্বরেই বোধ হয় সব চাইতে বড় মেলা ও উৎসব হয়ে থাকে। বহু ধর্ম প্রাণ নরনারী এই সময় আসে তাদের মানসিক শোধ করতে। ধন্যও বটে। এই সময় গাজন সন্ন্যাসী ছাড়াও তারকেশ্বরের ভিখারী ও বৈরাগীরাও যাত্রী সাধারণের কাছে যে তারকেশ্বরের পাঁচালী শুনিয়ে থাকে তার ভিতর দিয়ে তারকেশ্বরের সৃষ্টির কথা অতি চমৎকার ভাবে বর্ণিত হয়েছে। তারা খঞ্জনী বা একতারা সাহায্যে অর্ধশিক্ষিত নর নারীর সমক্ষে গাইতে থাকে :—

শুন শুন ভক্তগণ হয়ে এক মন।
অপূর্ব বারোর কথা হয়ে শ্রবণ ॥
বন্দির ভলার মধ্যে কেপা পশুপতি।
চারি দিকে উলু খাগড়া বেনার বসতি ॥
কুরুক কাটে ধান্য রাখালে কুড়ায়।
আনন্দে শম্ভুর শিরে ধান্য ভেনে যায়॥
এই রূপে গেল দিন দ্বাদশ বৎসর।
মহাগর্ত হৈল চরের মস্তক উপর ॥
মাথার ব্যাথায় শম্ভু হইয়ে কাতর।
ভাবিলেন মুকুন্দ ঘোষে আসি তারকেশ্বর ॥
তারকনাথ শিব আমি, কাননে বসতি।
অবনী ভেদিয়া যাহা আমার উৎপত্তি ॥
তারকেশ্বরে শিব রূপে কানন নিবাসী।
মোর পূজা কর ভক্ত হইয়া সন্ন্যাসী ॥
কহিয়া দিতেছে দুঃখ এর চিত্ত হরে।
দেখিলেন মুকুন্দ ঘোষ কাননে আসিয়ে ॥

গুজবে কান দেবেন না
গুজব রটাবেন না

কপিলার বুদ্ধে তুষ্ট ভোলা মহেশ্বর
মৃত্তিকা খুঁড়িয়া দেখে অপূর্ব পাথর।
কেহ খোঁড়ে হস্ত কেহ খোঁড়ে দিয়া বাড়ী।
পাথর দেখিয়া বলে, চৈল ছেরা গাড়ী।
জটাধারী ত্রিপুরারী দেখিয়া নিজ রঙে।
রাজা বলে রাখি রাম নগরের গড়ে।
শত কোড়া নিয়োজিল কাটিবারে মাটি।
যত খোঁড়ে শম্ভু বাড়েন, যেন পুষ্করণীর জাটি।
খুঁড়িতে খুঁড়িতে শম্ভুর অন্ত নাই পায়।
যত খোঁড়ে শম্ভু, তত পাতাল দিকে ধায়।
ভক্ত দুঃখ পায়, শম্ভু জানিয়ে অন্তরে।
বসিলেন নিশি শেষে রাজার শিয়রে।
সন্ন্যাসী হইয়া মূর্তি কহেন তখন।
শুন রাজা তারাহর আমার বচন।
অকারণে দুঃখ পেয়ে মোরে কেন খোঁড়।
গয়া গঙ্গা বারাণসী আদি মোর ঘর।
শুনিয়া নৃপতি হইল আনন্দে অস্থির।
ভগলে কাটায়ে দিল, এক অপূর্ব মন্দির।
আন ধাম বুছিলেন, তোরা নারিকেল।
তান ভাগে সরোবর দিছি মাথা জল।
পাথরে বান্ধিয়া দিলেন মরীচির গড়া।
জলেতে কুম্ভীর ভাসে, ডাকে কড়া কড়া।
নীলদিনে সরোবরে গঙ্গার জোয়ার।
পাতকী তারিতে তবে হইল অবতার।
মধ্যখানে তারকনাথ চারিদিকে জলা।
ভক্তগণ দিবে পূজা, কালা কুলের মালা।
বালি গড়ি পশ্চিমেতে বিরাজে বিভ্রাম।
পাতকী তরাতে প্রভু তারকেশ্বর নাম।
মনে হয় মৃত্যুঞ্জয়, এক চল্লিশ সালে।
বৃহদ্ধর্মে পড়িলেন, শ্রীকলের মূলে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য অপরাপর গাজনতলার মত এখানে চড়কগাছ ঘোরান প্রভৃতি ব্যাপার নেই। তবে কুলবাপ, বাঁটিবাপ, কাঁটাবাপ, শেষে দুধ পুকুরে বাপ প্রভৃতি প্রচলিত আছে। তাছাড়া এখানে সংক্রান্তির আগের দিন "লীলাবতীর" সহিত শিবের বিবাহ উৎসব প্রচলিত আছে। এ সম্পর্কে অনেক কাহিনীও প্রচলিত আছে তবে সে হল অন্য প্রসঙ্গ।

মুর্শিদাবাদের গাজনের ছড়ায় অনেক সময় শিব বিষয়ক গান ছাড়াও সাধারণ ঘর গৃহস্থালীর কথাও থাকে। এ সব নিতান্তই গৌণ। প্রসঙ্গত মুর্শিদাবাদে গাজন উপলক্ষে যে সব গান হয় তার ভিতর শিব বিষয়ক গান গাওয়া হয় তার একটি নমুনা শুনুন, অবশ্য এ সব গান শুধু মাত্র ক্ষণিকের তরে শ্রোতৃবৃন্দের মন একটু প্রফুল্ল করে নিছক হাসির খোরাক জোগায় মাত্র।

মনে করুন কোন একটি বৌ পুঁইশাক তুলতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে গেছে। কাছাকাছি মাঠের মধ্যে বসে কাজ করছিল তার ভাশুর। কিন্তু তিনি কেন তাকে মাটি থেকে তুলে ধরলেন না এ জন্যই তার আর আক্ষেপের অন্ত নেই :—

"পুঁইশাক তুলতে গেনু
পা পিছলে পড়ে গেনু
দেখলে ভাশুর তুলালে নাকো
তোর ভেরের ঘর করনু নাকো
হ্যাক দোম হ্যাক দোম
কাঁথা পেতে দে মারি ঘুম।"

নীল, গাজন, গম্ভীরা ও গম্ভীরা মূলত এক জিনিস হলেও নীলের গানের ও উৎসবের সঙ্গে অপর তিনটি উৎসবের একটা মোটা পার্থক্য রয়েছে, সেটা হল, নীলের শেষে অনেক জায়গায় শ্রীকৃষ্ণের দশ অবতার স্তোত্র আবৃত্তি করে শোনান হয়। কিন্তু গাজন, গম্ভীরা বা গম্ভীরা গানে এরূপ কোনও ব্যাপার নেই। তাছাড়া পূর্ববঙ্গের কোথাও কোথাও শাক্ত পরিবারে নীলপূজোর নীলপূজোর দিনে নীল ঠাকুরের সঙ্গে সৌরী পূজোও হয়ে থাকে সুতরাং সেখানে ছাগ বলির প্রথাও থাকে। গাজন, গম্ভীরা, বা গম্ভীরায় এরূপ ব্যাপার কখনও দেখা যায় না। অবশ্য ধর্মঠাকুরের কাছে কোন কোন অঞ্চলে ছাগ বলির প্রথা আছে তা বাদ দিলে গাজন, গম্ভীরা ও সম্পূর্ণভাবেই শৈব অনুষ্ঠান এর ভিতর বৈষ্ণবীয় বা শাক্ত ভাবধারার অনুপ্রবেশের সুযোগ পায়নি।

'সময়ের স্রোতে আমি আমার নৌকো ভাসিয়েছি। নদীর বুকে জলের টান। সেই টানে আমি ভেসেছি। আমি তো জানি না আমি কোথায় যাব। তবে আর আমি ভাবব না। চিন্তার মন খাইয়ে আমি আমার চৈতন্যকে করব অবশ।' অনুপম নীল পাহাড়ের বিষণ্ণ বেদনাময় আকাশ পটের দিকে চেয়ে ভাবত।

পাহাড়ের পর পাহাড়। অন্তহীন বিষণ্ণ ধূসর বিস্তার। দূরে বনানীর আভাস দিগন্তে। সেখানেও ক্যাকাশে ম্লান বিবর্ণতা। ছাই রঙের ধূসর বিস্তার পেরিয়ে কোথায় কতদূরে কলকাতা! এখানে শুধু সকাল বিকেলের নির্জন শূন্যতা। শালবনের অন্ধকার পেরিয়ে শুখা নদীর খাদ পেরিয়ে, ডিমা নদীর চর বেয়ে যে রাস্তাটা কোনক্রমে গিয়ে পৌঁচেছে শিবেবাড়ির হাটে সেখান থেকেও রেল স্টেশন মাইল দশেক।

পাথরের দুর্গচূড়ের বাড়িটার নিচের ঢালে তার কাঠের বাংলো বাড়ি। উত্তর সীমান্তের পর আর ভারতের সীমানা নেই। তার বাংলো বাড়ির জানলা দিয়ে সে ভুটান এলাকার মঠের চোকাঠটা দেখতে পেত। সাদা রঙের কাঠের চোকাঠ ঘরটার সামনে সন্ধ্যের দিকে জমত ছোটখাট একটি আড্ডা। পাহাড়ী কুলিদের ভিড় সেখানে। ওদিকে তার ডানদিকে আর একটা পাহাড়ের চূড়োয় কালীমন্দির, সেখানে সন্ধ্যের আরতি হতো। নিথর সন্ধ্যের আলো-আঁধারিতে ঘণ্টার শব্দ সেই নির্জন বিষণ্ণতার ওপর দিয়ে শান্তভাবে গড়িয়ে এসে তার ক্ষিপ্ত ক্লেশ-পীড়া চৈতন্যে একটু আধটু ঢেউ তুলত। তারপর একসময় মন্দিরের এক-মাত্র পুরোহিত মোটা মোমবাতি আর প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখে নিচে নেমে আসতেন। সে জানলা দিয়ে অনেক-রাত পর্যন্ত সেই আলোর কাঁপন দেখতে পেতো।

একটি মাত্র বেয়ারা, একটি কেরানী, দুটি টিনের ঘর, এই তার অফিস। কেরানী সতীশবাবুর সঙ্গে তার আলাপ জমে ওঠেনি। অফিসের কাজ শেষ হলে তিনি তাঁর পাহাড়ী ঘোড়া নিয়ে ফিরে যান পাঁচ মাইল দূরে কাঠের আড়তে। বেয়ারা জং-বাহাদুর এখানেই থাকে, অনুপমের ঘরের চাকর, অফিসের বেয়ারা, দুই-ই সে।

আজ দুখানা চিঠি এনেছিল ডাকওয়ালা। একটি

অফিসের, অন্যটা রুমির । দুটো চিঠিই অনুপম খুলেছে অফিসে । রুমির চিঠিটা সংক্ষিপ্ত । কিইবা লেখার আছে ? তাছাড়া সেওতো দীর্ঘ চিঠি দেয়নি । তবু রুমি যদি বড়ো চিঠি লিখত তাহলে ভাল লাগত ? রুমি লিখেছে সবই গতানুগতিক । অনুপম অফিসের জানলা দিয়ে বাইরে দিকে চেয়ে ভাবল, নতুনত্ব কি রোজ মধু দেয় ?

অফিস থেকে ঘরে ফিরে এসে সে দেখল তখনও বাতি জ্বলেনি । রুমির চিঠিটা আর একবার খুলবে ভেবেছিল । কিন্তু এতো অভ্যাস । অনুপম চিঠির কথা ভুলতে চাইল অভ্যাসের কথা ভেবে । হ্যাঁ, অভ্যাস । সে ক্লান্ত শরীর বিছানায় এলিয়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করল । এমনি অভ্যাস বশে বছরের পর বছর সে চিঠি খুলে দুবার পড়েছে, তিনবার পড়েছে । সেতো অনেক বছর হয়ে গেল । তখন ভাল লাগত, নতুনত্ব ছিল । আজও সে ভাবে ভাল লাগবে, কিন্তু তা ভুল, ভ্রান্তিবিলাস । কেন ভাল লাগত ? রুমি কি বদলে গেছে ? অনুপম চিন্তার ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে স্মৃতির হ্রদে নামতে পারে । দু'বছর আগে সে কলকাতা ছেড়ে যেবার বাইরে যায় সেবার রুমি চোখের জল ফেলেছিল । তখন তো সবে শুরু, তাই কি ? নাকি ভালবাসার খেলা ? কিংবা সে ছেলেমানুষ ? এখনও স্পষ্ট মনে আছে সে যাওয়ার আগে শেষবারের মতো রুমির হাত ধরল । রুমি মাথা নিচু করল । চোখে আঁচল চাপা দিল । কিন্তু রুমি পরে স্বীকার করেনি, সে কেঁদেছিল ।

দু'বছর পরে আবার সে কলকাতায় এল, রুমি তখন বদলে গেছে অনেকখানি । বাইরের ঘরে অনুপমকে বসিয়ে রেখে সে চলে গেল কোথায় । ফিরল বেশ কিছুক্ষণ পরে । অনুপম জিজ্ঞেস করেছে, 'কোথায় ছিলে এতক্ষণ ?

রুমি হেসে বলেছে, 'ছিলাম ভেতরে ।'

'এখানে বসো না । কথা বলি ।'

রুমি আবার হেসে উঠেছে । 'আহা, দিদিরা রয়েছে না ! ভাববে কি বলোতো ? আর এখানে বসে আমি কি তোমার মুখের দিকে চেয়ে চুপচাপ বসে থাকব ? চেহারাটা তো যা করে এনেছ দেখবার মতো !'

অনুপম বিরক্ত হয়ে বলেছে, 'বেশ তো, তুমি ভেতরে যাও আমি বাড়ি চললাম ।' অনুপম উঠে দাঁড়াতেই রুমি এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়েছে ।

'কোথায় যাবে, বাড়ি ? ওঃ, খুব যে রাগ হয়েছে দেখছি । বসো, চা খেয়ে যাবে ।'

'থাক্ ।' অনুপম এগিয়ে যেতে গেছে । ঠিক তখনই রুমি ওর পাঞ্জাবী মুঠো করে ধরেছে ।

'বলো ।' রুমি ওর হাত ধরে বলেছে, 'এতদিন পরে এসে তুমি এমন করবে ?' অনুপম রুমির চোখের দিকে চেয়ে দেখেছে বিষাদের ছায়া । সে আর যায়নি, বসেছে আবার হ্যাঁ, আসলে সে পালাতে পারেনি । 'কিন্তু আমি যদি সেদিন চলে যেতে পারতাম ? তা পারিনি সেই আমার দুর্বলতা । রুমিকে আমি উপেক্ষা করতে পারিনি । অথচ অনেক বিষয়েই রুমির সঙ্গে আমি একমত হতে পারিনি ।'

'রুমির মতো একটা অতি সাধারণ মেয়ের কাছ থেকে পালিয়ে আসা খুবই সোজা ছিল । কেতকী সে সুযোগ আমাকে দিয়েছিল । কিন্তু আমি নিইনি । কেন নিলাম না ?' 'না, আমি নিতে পারিনি ।'

বৃদ্ধ বাজারের বাতিটা জ্বালিয়ে রেখে গেল । আর দিয়ে গেল এক কাপ চা । অনুপম বিছানা থেকে উঠে চায়ের কাপটা হাতে নিল । চায়ে চুমুক দিয়ে ও বুঝল চা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে । কয়েক চুমুকেই ও চা শেষ করল । এখন অন্ধকার, কলকাতায় রুমি এখন কি করছে ? এখন তার চুল বাঁধা হয়ে গেছে । হয়ত সে বেড়াতে বেরিয়েছে কিংবা গান গাইছে । সেতার বাজানো শিখতেও পারে । ওকে সিঁদুর পরলে কেমন যেন লাগে । রুমিকে ও বারণ করেছিল । রুমি বলেছে, 'সিঁদুর তো তোমার অনুরাগের প্রতীক । পরতে দোষ কি ?' রুমি ওর কথামতো কোন কাজ করবে না, এতো জানা কথা ।

বিয়ের বছর দুই আগের কথা । তখন অনুপম চাকরি করছে কলকাতায় । সন্ধ্যেবেলা রুমিকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিল দক্ষিণেশ্বরে । গঙ্গার ধারে বসে অনুপম বলেছে 'জানো রুমি, আমি ছবি আঁকছি আজকাল ।'

রুমির হাতের ওপর হাত রাখতেই রুমি হাত সরিয়ে

দিয়েছে। 'দেখো তোমার ছেলেমানুষী এখনও গেল না। ওসব ছবি এঁকে তোমার কি লাভ শুনি? চাকরিতে উন্নতির চেষ্টা কর। তোমার অফিসের পরীক্ষার তো আর মোটে বারো দিন বাকি। ভাল চাকরি না পেলে কিছুই হবে না।'

অনুপম বিরক্ত হয়ে বলেছে, 'ও চাকরিই বুঝি সব! ভাল চাকরি না পেলে বুঝি তুমি আমাকে বিয়ে করবে না?'

রুমি বলেছে, 'তোমার বাস্তব বুদ্ধি একেবারেই নেই। টাকা না থাকলে ভালবাসায় কিছু হয় না।'

অনুপম বিদ্রূপের সুরে বলেছে, 'বেশ তো ভাল চাকুরে দেখে একজনের গলা ধরে ঝুলে পড়ো না। আমার সঙ্গে চলাচলি কেন?'

রুমি বলেছে, 'তুমি একেবারে বোকা। একটু উপদেশ দিলেই রেগে যাও। তোমার ভালোর জন্যে বললাম আর রাগ হয়ে গেল।' রুমি উঠে দাঁড়িয়েছে।

সেদিন সন্ধ্যেটা আর ভাল লাগে নি। কেমন একটা বিরক্তিতে ভরে গেছে সারা মন।

রুমির চেহারার মধ্যে কোন অসাধারণত্ব নেই। সাধারণ চেহারা। খুব কালো নয়, তবে ফর্সাও নয়। রোগা। শান্ত চোখ। পুকুরের নিথর জলের মতো। কপালের ওপর একটি দুটি উড়োপড়া চুল। রুমিকে অনুপম যখন দেখে তখন রুমি সবে স্কুল ছেড়েছে। কিন্তু এক বছর গেল চলে। সে শুধু ক্লান্ত হলো। ভালবাসা পুরনো হলো।

বিয়ে তারা করতে পারত অনেক আগে। কিন্তু হয়নি। শুধু রুমির জন্য। রুমি পড়াশুনা শেষ না করে বিয়ে করবে না। তবু কি শেষ পর্যন্ত পড়ল রুমি? এম. এ. পরীক্ষা দিল না আর। হ্যাঁ, রুমি যেবার বি. এ. পাশ করল সেবার অনুপম লিখেছিল: আর দেরী করে লাভ কি? রুমি লিখেছে: এর মধ্যে বিয়ে করে লাভ কি? বিয়ে মানেই নানা বন্ধন। সুতরাং আর কিছুদিন অপেক্ষা করা যাক না। বিয়ে একদিন করতেই হবে। অনুপম তখন শিলং-এ। একা একা দিনগুলো আরও ক্লান্তিকর হলো তার কাছে। কিন্তু রুমি তো বুঝল না। সে সপ্তাহে দু'খানা করে ভারি খামে চিঠি দিয়েছে। কিন্তু উত্তর এসেছে মাসে একখানা, দু'খানা অনেক হালকা খামে।

তবু তাকেই বিয়ে করতে হলো। অনুপম জানত সে পালাতে পারবে না। কেতকীর সঙ্গে তাই দেখা না হওয়াই উচিত ছিল। কেতকীর সঙ্গে শিলং এ দেখা হয়েও কিছু হলো না। অনুপম জানত রুমি তার শিরায়। অনেক সমুদ্র ঘুরে শেষ পর্যন্ত সে রুমির কাছেই ফিরে আসবে। কারণ তার অন্য আশ্রয় নেই, রুমিকে ছাড়া সে অন্য আশ্রয়ের কথা ভাবতে শেখেনি।

পালাবার সুযোগ পেয়েও সে পালায় নি। কেতকীকে সে বলেছিল, 'আমি নিরুপায়।' এর উল্টোটাই তার বলা উচিত ছিল। আজ সে ভাবে কেতকীর আবেগ, ব্যাকুলতা, উদ্দীপনা তাকে আবার বাঁচাতে পারত। রুমির শান্ত চোখ, নির্বিকার মুখ, আবেগহীন কথা তাকে বেঁধে রাখল। সে পালাবে ভেবেও পালাতে পারে নি। রুমি তাকে কি দিল? দীর্ঘ আট বছরের ভালবাসার বোঝার শুধু ক্লান্তি সে।

বিয়ের পর সে এল না এখানে। অনুপমও আসতে বলে নি। এখানে রুমিকে এনে কি হবে? এই ছন্নছাড়া চাকরি, লোকালয়হীন নির্জনতা, সমাজবর্জিত জীবন রুমি কেমন করে মেনে নেবে? না, রুমি এ পারবে না। কিংবা রুমিকে সে এই জীবনে আনার কথা ভাবতে পারে নি।

সারা দুপুর ঘরে ফাইলের মধ্যে সে মুখ গুঁজে বসে থাকত। যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগের হিসেব তার কাছে একটা নেশার মতো মনে হত: অঙ্ক সে ভালবাসত! কিন্তু এও সে জানত, জীবনের অঙ্ক সে মেলাতে পারবে না। অতখানি ধৈর্য তার ছিল না। তবু সে তার গণিত-প্রতিভা সম্বন্ধে সচেতন ছিল।

কিন্তু সেদিন তার অঙ্ক মিলল না। হিসেবের খাতায় সে যখন শুদ্ধিপত্র বসিয়েছে তখন সে দেখল তার ভুল গোড়াতেই। তারপর হিসেব মিলিয়ে বাইরে আসতে আসতেই সে বাথার ওপর চোখ তুলল। কিচ্‌কিচ্‌ শব্দ, ডানার ঝাপট, বাতাস কাটার শোঁ শোঁ, তার কানে পৌঁছল। সবুজ টিয়ার ঝাঁক। এক ঝাঁক টিয়া কিচ্‌কিচ্‌ শব্দে উড়ে গেল পাহাড়ের দিক থেকে নিচের দিকে। এই প্রথম সে দেখল।

পরে সে জেনেছিল এমন টিয়ার ঝাঁক রোজ সকালে যায় পাহাড়ে, ফেরে সন্ধ্যেবেলায়। এর সত্যতা সে বুঝেছে পরের দিন সকালে। সে ভেবেছিল আজ সে দেখবে: তাই ভোরবেলা সে আর ঘুমোয়নি। জানলা দিয়ে আকাশের দিকে চেয়েছিল: তখনি শুনতে পেল ডানার শব্দ, বাতাস কাটার শোঁ শোঁ আওয়াজ। সে মুখ তুলে জানালা দিয়ে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল আকাশের দিকে। এক সময় কালো হয়ে গেল পাখিগুলো, মিলিয়ে গেল বিন্দুর মতো হয়ে। সে মুখ ফেরাল পাহাড়ের দিকে। নীলাভ পাহাড়, ঘন সবুজ অরণ্য। ভোরবেলার আলোর নীচে ঝকঝক্ করছে পাথর, ঝর্ণার রেখা।

'কিন্তু তুমি এখানে নেই। তোমার মন ভাসছে টিয়াপাখিদের মতো?' সে মনে মনে বলে হাসল। অনুপম নির্বিকার চোখে বসল চেয়ারে। না, সে আর কিছু ভাববে না। সময় বয়ে যাক্। পাহাড় নীল হোক্। সূর্যের আলো বর্ণালী এঁকে দিক জলের নীচে নুড়ি পাথরগুলোর ওপর। কালিঝোরার কালো জল গিয়ে মিশুক শঙ্খি নদীর জলে। সে নিশ্চেতন হয়ে থাকবে। না, ভাববে না। সময় আমাকে আছড়ে ফেলতে চায়, আমি জানি। কিন্তু তা সে পারবে না। 'সময়ের ঢেউয়ের তালে আমি ভেসে যাব, কোথায় তা আমি জানি না। সন্ধ্যেবেলা টিয়ার ঝাঁক আমার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাবে। আমি আবার দেখব। বছরের পর বছর রুমির স্মৃতি বোকা টেনে আমি ক্লান্ত।'

জং বাহাদুর বলে, 'হুজুর, এরা পাহাড়ে যায় ধানা খেতে। বছরের পর বছর এমন যাচ্ছে। বাড়ছে কমেই।'

না, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই, আজ একটা টিয়া উড়তে পারছিল না বলে নিচে নেমে পিছিয়ে পড়েছিল একটু। অনুপম তার সুন্দর লাল ঠোঁট, সবুজ লেজ, ডানা—সবই দেখতে পেল। এবং পাখিটি তার ভাল লাগল।

পরের দিনই সে জং বাহাদুরকে বলেছিল, 'আচ্ছা ধরা যায় না ওই টিয়াপাখি দু'একটা?'

জং বাহাদুর বলেছে, 'তা কেন যাবে না? কিন্তু ও হলো বনের চিড়িয়া। খাঁচায় বাঁচবে না হুজুর।'

'কেন বাঁচবে না?' অনুপম বিরক্ত হয়েছে। পেলে ঠিকই বাঁচবে। সে বলেছে।

'কিন্তু সাহেব ধরবেন কেমন করে? অত উঁচু দিয়ে যায়।'

অনুপম আর কোন কথা বলেনি।

কিন্তু সেদিন ঘুম ভেঙে উঠে সে অবাক হলো। উঁচু উঁচু গাছগুলোর নিচে তখন কুয়াশার সাদা সাদা চাদর। ঠাণ্ডা শিশিরের ছোঁয়ায় ঘাস কোমল-সবুজ। পাহাড়টা লাগুর নীল। তখনই দূর থেকে শোঁ শোঁ শব্দ তার কানে এল, সে ছুটে গেল জানলার কাছে। হ্যাঁ, আসছে সেই টিয়াপাখির ঝাঁক। একটা অর্ধবৃত্ত রচনা করেছে পাখির রঙে আঁকা। ভোরবেলার ঠিমেল হাওয়া, কুয়াশা, নিকুম গাছের ওপর দিয়ে উড়ে এল পাখিগুলো। হঠাৎ সেই অর্ধবৃত্ত থেকে নতুন ছোট্ট মেঘের মতো একটা রঙ ছিটকে বেরিয়ে এল, একটা লাল ঠোঁট টিয়াপাখি ঘুরপাক খেল নীল শূন্যে, একবার ডাকল, তারপর সোজা নেমে এল নিচে। বসল ঠিক বাড়ির সামনে শিমুল গাছটার সবচেয়ে উঁচু ডালে। একবার ঠোঁট ঘসল। অনুপম পাখিটার দিকে চাইল অবাক হয়। তার কোমল-সবুজ রঙ, ঘন লাল ঠোঁট, লম্বা লেজ, আশ্চর্য সুন্দর ভালবাসা বলে মনে হলো। ঠিক তখুনি আর একবার ডেকে উড়ে গেল পাখিটা তার উড়ন্ত আসিয়ে যাওয়া দলের দিকে। অর্ধ-বৃত্তের পেছনে উড়তে উড়তে চলে গেল পাখিটা।

অনুপম সেদিন ডাকল জং বাহাদুরকে।

'শোনো, টিয়াপাখি তোমাকে ধরতেই হবে।'

'কেমন করে হুজুর?' জং বাহাদুর মাথা নিচু করল।

'জাল পাতো।'

'অতো উঁচুতে? অতো জাল কোথায় পাব? হুজুর, পাখি যদি চান তো আমি এনে দিতে পারি শিলেবাড়ির হাট থেকে। ওখানে আসে পাখিওলারা।'

'না, ও পাখি চাই না। আমি চাই বুনো পাখি।'

'দেখি চেষ্টা করে হুজুর।'

'হ্যাঁ, দেখো। দরকার হলে জাল কিনে এনো।'

কিন্তু হলো না। জং বাহাদুর জাল পেতেছিল এ গাছ থেকে ওগাছ। অনেক লম্বা জাল। অনেক খরচ পড়েছিল। জং বাহাদুর জানত তার বাবু যাদুখোরালি। তাই সে অত বড়ো জাল পেতেছিল। তবু পাখি ধরা গেল না। অনেক উঁচু দিয়ে জানা কাপড়ে উড়ে গেল পাখির দল 'সকাল সন্ধ্যে'। জং বাহাদুর আর অনুপম দিনের পর দিন হাঁ করে চেয়ে রইল আকাশের দিকে। অনুপম আরও অবাক হলো।

তাই জাল আরও করা হলো বাঁশ দিয়ে দুপুরবেলা। এগাছ থেকে ওগাছ। সরু সুতোর জাল আকাশে ফাঁদ পেতে রইল। জং বাহাদুর দাঁড়িয়ে ছিল বিকেলে। দু'একটা পাহাড়ী ছেলে মজা দেখবার জন্যেই বুঝি এসেছিল।

বিকেল হওয়ার আগেই অনুপম ফিরেছিল। তার ঘরের জানলা দিয়ে একদৃষ্টি চেয়ে ছিল পাহাড়টার দিকে। পাহাড়ের চূড়োর ওপর মেঘ জমছিল। সাদা সাদা মেঘগুলো নিচু হয়ে ভাসতে ভাসতে এসে জড়িয়ে যাচ্ছে পাহাড়ের গায়ে। তারপর ঝিমিয়ে শুয়ে পড়ছে। ঠিক ঐখান দিয়ে ভেসে আসবে পাখির ঝাঁক। অনুপম স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল পাহাড়ের দিকে। না, সে দেবে না পালিয়ে যেতে। আকাঙ্ক্ষার ব্যর্থতা সে সহ্য করতে পারে না। মিষ্টি সবুজ রঙ, লালচে-ঠোঁট টিয়াপাখিটা সেদিন যেন ব্যঙ্গ করবার জন্যই তার গায়ের ওপর এসে বসেছিল। কিন্তু আজ তাকে ধরবেই। জালটা অনেক উঁচু করা হয়েছে। এই সন্ধ্যের আলো-আঁধারিতে ঘরে ফেরার তাড়ায় পাখিগুলো নিশ্চয় দেখতে পাবে না সেই জাল যদি না আরও উঁচু দিয়ে উড়ে যায়। 'হ্যাঁ, উড়ে উড়ে পালাবে? সবাইকে ফাঁকি দেবে? আমি সেই সময়। কেমন করে পালাবে তুমি?'

অনুপম মনে মনে বলল। 'কেউ পারবে না পালাতে। বুমি পারে না, কেতকী পারবে না, আর তোমরা পারবে? তোমরা আমাকে চেন কি? কোথাইবা পালাবে? সকালসন্ধ্যের এই ওড়াওড়া খেলা দেখে দেখে আমি ক্লান্ত। আমি এখানে থাকতে চাই নিরুপদ্রবে, নিশ্চিন্তে। আমি আমার চেতনাকে করব শান্ত নিশ্চল। হ্রদের মতো। না হলে হ্রদের নিচেতলার লুকোনো আমি কেমন করে দেখতে পাব? কিন্তু তোমরা সেই ঝাঁঝাবর পাখি যারা মানুষকে কেবল ওড়ার কথা মনে করিয়ে দাও। আমি সবাইকে ভুলতে চাই, ওড়া ভুলতে চাই, আমার রক্তের ঝাঁঝাবরী নেশাকে চিরার মধ্যে ঘাইয়ে আমি নিশ্চল করতে চাই। কিন্তু ওরে দুষ্টু পাখিরা, তোমরা শুধু রঙ! তোমরা উড়ে উড়ে আমায় ডাকো কেন? আমি যে তোমাদের পেতে চাই। সবাইকে আমি জয় করতে পিছিয়ে যাব তোমাদের ভয়ে? আমার আকাঙ্ক্ষা কত ভয়াবহ তা তোমরা জানো না। জানবে আজ।'

সূর্যটা ডুবে গেছে। আকাশ জোড়া ম্লান ধূসর রঙের বিস্তার। পাহাড়টা যেন কালচে নীল। মিলিয়ে গিয়েছে গাছের ছায়া। ধীর নিঃশব্দ পায়ে অন্ধকারের অশরীরী দৈত্যটা এগিয়ে আসছে। কুয়াশাগুলো মিলিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারের গায়ে। কিঁকিঁর ডাক শোনা যেতে লাগল। অনুপম ব্যাকুল হয়ে চাইল আকাশের দিকে। হ্যাঁ, আসছে, সে দেখতে পেল আকাশ জোড়া দৃষ্টি ছড়িয়ে!

'বাবুজি আজকের ডাক।' ডাকওয়ালা এসে দাঁড়াল অনুপমের পাশে।

অনুপম চিঠিটা তুলে নিল। হাতের লেখাটা দেখে সে চিনেছে। বুমির চিঠি। ছোট চিঠি। শো শো শব্দ তার কানে এল। পাখিগুলো উড়ে গেল জালের অনেক ওপর দিয়ে। অনুপম চেয়ে রইল। বুমি যেন পাখি হয়ে উড়ে গেল অনায়াসে, অবহেলায়। কিন্তু সেদিন সেই পাখিটা এসে বসেছিল শিমুল গাছের সব চেয়ে উঁচু ডালে। অনুপম দেখেছিল।

'আমি তাকে ধরতে পারিনি। সে এসেছিল। আমি বুমিকে তো আসতে লিখিনি।'

অনুপম ভাবল, না, কি হবে পাখি ধরে? এই ঝাঁঝাবর পাখিগুলো উড়ে উড়ে যাক সকাল সন্ধ্যে। সকাল-সন্ধ্যের এই পাখি ওড়া সে দেখবে। সময়ের স্রোতের ধারে বসে সে দেখবে জোয়ার ভাটা, কদাচ কখনও দেখবে একটি দ্বীপ। সেই চিরায়ত দ্বীপের নাম ভালবাসা।

বিজ্ঞান বিচিত্রা

বাকশক্তিহীনদের কথা বলার একটি অভিনব যন্ত্র সম্প্রতি উদ্ভাবিত হয়েছে এবং পৃথিবীর সকল স্থানেই বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মাধ্যমে এই কৃত্রিম ইলেকট্রনিক যন্ত্রটি সরবরাহ করার ব্যবস্থা হয়েছে।

বেল টেলিফোন লেবরেটরিজ কর্তৃক প্রথমতঃ এই যন্ত্রটি উদ্ভাবিত হয়। এর পরে যাদের বাকযন্ত্র বা কণ্ঠনালীর উর্ধ্বভাগ অস্ত্রোপচার করে সরানো হয়েছে অথবা বাগযন্ত্র অসাড় হয়ে পড়েছে তাদের জন্য ওয়েস্টার্ন ইলেকট্রিক কোম্পানী এটি নির্মাণ করেন। ঐ কারখানায় তৈরী এই যন্ত্রটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় পাওয়া যেতো। ঐ কোম্পানী মুনাফার উদ্দেশ্য নিয়ে এটি তৈরী করেন নি।

রাষ্ট্রসংঘের অন্তর্ভুক্ত বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার ১১২টি রাষ্ট্রের যে-কোন অধিবাসীর নিকট থেকে অর্ডার পেলে তাকে এই যন্ত্রটি সরবরাহ করা হবে। বিশেষ সংস্থার যে ছটি আঞ্চলিক দপ্তর আছে তাদেরই মাধ্যমে ওয়াশিংটন ডিসির প্যান আমেরিকান সেনিটারী ব্যুরোর নিকট এই অর্ডার দিতে হবে। প্রত্যেকটি কৃত্রিম বাগযন্ত্রের সঙ্গে পাঁচটি ভাষায় লিখিত নির্দেশপত্রও প্রেরণ করা হবে। প্রতিটি যন্ত্রের মূল্য ৪৫ ডলার।

* * * *

১৯৬৪ সালের পর থেকে জীববিদ্যা সংক্রান্ত একটি আন্তর্জাতিক কার্যসূচী রূপায়ণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক ভূপদার্থ বিজ্ঞান বৎসরে যে-রকম কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল ইহা হবে অনেকটি সেরকম তবে এই কার্যসূচী হবে তিন থেকে পাঁচ বছরের জন্য। যুক্তরাজ্য ও সোভিয়েত ইউনিয়ন-সহ ৩২টি রাষ্ট্র এই কার্যসূচীতে অংশ গ্রহণ করবেন এবং ঐ সময়ে বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা মানুষ ও পশুর কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে বিশ্বের খাদ্য ঘাটতি সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করবেন।

* * * *

সাধারণ পেনিসিলিন যে-সকল রোগীর দেহে কার্যকরী হয় না তাদের চিকিৎসায় অক্সেসিলিন নামে একটি নূতন অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ প্রয়োগ করে বিশেষ ফল পাওয়া গিয়েছে। নিমোনিয়া রোগে আক্রান্ত ছয়টি রোগী, মস্তিষ্ক ও ঘাড়ে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত

জমিতে বেশী ফসল ফলান
জোয়ানদের শক্তি বাড়ান

পাঁচটি রোগী এবং আগুনে পোড়া তিনটি রোগী এই ঔষধ গ্রহণ করে আরোগ্যলাভ করেছে। পেনিসিলিনের তুলনায় এই কৃত্রিম পেনিসিলিন বা অক্সেসিলিন পাঁচ আটগুণ অধিক শক্তিশালী। এই ঔষধ সেবন করতে হয় এবং এতে সামান্য প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়ে থাকে।

সিয়াটেলস্থিত ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব মেডিসিনের চিকিৎসকবৃন্দ এই সংবাদ দিয়েছেন। অক্সেসিলিনের আবিষ্কার চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিশেষ প্রগ্রগতি সূচীত করছে বলে তাঁরা মন্তব্য করেছে।

* * * *

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থার পক্ষ থেকে আর্থার রিসার্চ কাউণ্ডেশান নামে মার্কিন সংস্থা প্রথম যে মানুষটি চন্দ্র উপগ্রহে অবতরণ করবে তারই জন্য চন্দ্র উপগ্রহের জমির অবস্থা পর্যালোচনা করে দেখছেন।

এই পরিকল্পনা অনুসারে তিন থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে চন্দ্রের উপরিভাগের অবস্থা সম্পর্কে তথ্যাদি সংগৃহীত হবে।

এই সকল তথ্যের ভিত্তিতে চন্দ্রের উপরিভাগের জমি যে-রকম হতে পারে সে-রকম কৃত্রিম জমি তৈরী হবে। তারপর সেই জমিতে বিমানের অবতরণ, যাত্রা, ড্রিলিং, নুড়ল্স খনন, মোটর চালিত চাকা সমন্বিত গাড়ীর চলাচল প্রভৃতি বিষয়ে পরীক্ষা করে দেখা হবে। প্রধানতঃ ও প্রথমতঃ সেই জমিতে কি ধরনের দাতব পদার্থ রয়েছে সে সম্পর্কেও পরীক্ষা করা হবে।

এরপরে চাঁদের উপরে পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়, বিস্ফোরণের প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি বিষয়ে পরীক্ষা করে দেখা হবে।

* * *

মহাশূন্যের তেজস্ক্রিয় বলয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মার্কিন বিমান বাহিনী অতি ক্ষুদ্র একটি কৃত্রিম উপগ্রহ মহাশূন্যে প্রেরণ করেছেন। এর ওজন দেড় পাউণ্ডেরও কম। বিগত ২৪ জুলাই মহাকাশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক পরীক্ষার ফলে যে কৃত্রিম বলয়ের সৃষ্টি হয়েছে এবং পৃথিবীকে ঘিরে যে ভ্যান অ্যালেন বলয় রয়েছে তাদের তেজস্ক্রিয়তা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহই এই পরিকল্পনার লক্ষ্য।

এর আগে ২৭শে অক্টোবর এই উদ্দেশ্যেই জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা পক্সসন একসপ্লোরার নামে আর একটি কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে প্রেরণ করেছেন।

* * * *

ভ্লাদিভোস্তক।—সোভিয়েত সামুদ্রিক গবেষণা জাহাজ "ভিতিয়াজ" তার ৩৫তম অভিযান শেষ করে গত সপ্তাহে এখানে নোঙর করেছে। এবারকার অভিযানে ভিতিয়াজ-এর বিজ্ঞানীরা ভারত সমুদ্রে ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান গবেষণার কাজ চালিয়ে এই সমুদ্রের জলতল দেশে অনেকগুলি পাহাড়, পর্বতশ্রেণী ও গহ্বর আবিষ্কার করেছেন। বর্ণালী বিশ্লেষণের সাহায্যে এই সর্বপ্রথম তাঁরা লৌহ ও ম্যাগ্নানিজ সমাহরণের সংযুক্তি নির্ধারণ করেছেন। ভারত সমুদ্রে এই লৌহ ও ম্যাগ্নানিজ ১০ হইতে ১২ সেণ্টিমিটার ব্যাসের গোলকে সমাহৃত হয় এবং এগুলিতে ৩৮টি পর্যন্ত রাসায়নিক মৌল পদার্থের সমন্বয় ঘটতে দেখা গিয়াছে।

গত ২৬শে নভেম্বর তারিখে এখানে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভিতিয়াজের বিজ্ঞানীদল জানান যে তাঁরা গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতুতে ভারত সমুদ্রের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে বিষুব ও ক্রান্তিবলয়ীয় এলাকায় ব্যাপকভাবে সামুদ্রিক গবেষণামূলক অভিযান চালাইয়াছেন। এই অঞ্চলের সামুদ্রিক প্রাণী ও উদ্ভিদ সম্বন্ধে তাঁরা বহু মূল্যবান নূতন তথ্য ও নমুনা সংগ্রহ করেছেন। সেই সঙ্গে তাঁরা বেশ কিছু ভৌগলিক তথ্য অনুশীলন করেছেন, তা এই অঞ্চলে নৌচারণ ব্যাপারেও বিশেষভাবে সহায়ক হইবে।

ছয়মাসব্যাপী এই অভিযান চালানো হয় সোভিয়েত সামুদ্রিক অভিযান—কার্যসূচী ও ভারত সমুদ্র অনুশীলনের জন্য আন্তর্জাতিক ভূবিদ্যা সমিতির কার্যসূচী অনুযায়ী। ভিতিয়াজে সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের সঙ্গে গবেষণার কাজে সহযোগিতা করার জন্য অংশগ্রহণ করেন ভারতীয়, অস্ট্রেলিয়, জাপানী, মার্কিন ও অন্যান্য বিদেশী সমুদ্র বিজ্ঞানীগণ।

ভালবাসা | তাপস গুপ্ত

ভালবাসা একদিন এসেছিলে তুমি এই শুষ্ক
অন্ধকার হৃদয়ের নিবিড় অরণ্যে চুপিসারে
যেমন গোধূলি মেশে মুগ্ধগাঢ়বন্ধতায়
নিঃশব্দ স্বপ্নের মতো রাত্রির বিশাল বাহুডোরে।
অজস্র গোলাপ আর ছায়াকুল, সমুদ্র-আকাশ,
রাজহংস অবারিত কামনার স্বচ্ছ সরোবর—
অভিমান সুপ্ত যেথা শীতল শান্তির করতাপে
হয়েছিল আলোকিত তোমার নিভৃত আগমনে।

তারপর চলে গেলে বিস্ময়ের স্মৃতিটুকু রেখে
নিয়তির নিয়ন্ত্রণে কতদূর অস্তমিত পাড়ে—
যেথায় অদৃশ্য হ'য়ে খেলা করে সর্বদিনরাত
অসীম রহস্য বুকে নিরবধিকাল শুধু হেসে।
ভালবাসা, চেয়ে রও আলেখ্যের মতো চেতনায়
যদিও নিয়েছ ফিরে, ছিন্ন ক'রে মায়া সর্ববিধ॥

নাটক | মিলন দত্ত

যবনিকার উত্তোলন আসন্ন। মঞ্চের উপর
রঙমাখা রাজারানী পাত্রমিত্র সচকিত ভীত
কী এক গভীর প্রত্যাশার স্বর্ণসূত্র প্রসারিত
অন্তরের গহনে অমুচ্চার সংলাপ নিথর।
নাটকের যবনিকা উত্তোলিত। মঞ্চ সবর
কুশীলব নানারঙ আলোকের ছায়া প্রেক্ষাপটে
কী আশ্চর্য প্রাণবান। সমুদ্রের সুনির্বান তটে
অমৃত মন্থনে রত পাশাপাশি দেবতা দানব।

গ্রীষ্মরুদ্ধ অন্ধকার। উইংসের তন্তুনিরালাতে
সখীবৃন্দ সৈন্যদল অধমৃত-মৃত ভিড় করে।
অভিনয়ে স্তব্ধবাক। অজানিতে দর্শকের সাথে
হাততালি দিতে থাকে নেপথ্যের অন্ধকার ঘরে।

শেষ অংক সমাপ্ত। ওই গাখো সারি সারি মুখ
রক্ত তোলা বীভৎস। প্রত্যাশার রিক্ত নিরুৎসুক।

নাটমঞ্চ | দীপংকর চক্রবর্তী

স্মরণে কবির উক্তি : এ জগৎ সত্যের প্রতীক
নাটমঞ্চ, আমি তুমি নরনারী দক্ষ অভিনয়ে
হাসি কান্না হৃদয়ের উল্লাস বিষাদে যতকিছু
সূক্ষতর চিত্রহয়, পরিণত যন্ত্রণা প্রত্যয়ে।

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী, লক্ষ্মী আজ পণ্যের প্রতিমা
কোলকাতা দ্বিধাহীন লম্পটের হাত ধরে পথে
নাচে রোজ। দেখি লাস্যে, প্রতিদিন অপ্রতিদ্বন্দ্বী রজনী
সবারে করেছে সংগী, স্বর্ণগন্ধী মহাজনী রথে।
এ জগৎ নাটমঞ্চ : তারও চেয়ে সত্য এই মানুষের মন
প্রিয়তর নাট্যরূপে সংঘাতে সংলাপে অপরূপ
(রংগস্থল বধ্যমঞ্চ ?) চেতনার জটিল প্রেক্ষিতে
নটনটী সমাসীন, হাটে বলে, একান্ত স্বরূপ।

অজ্ঞানতা নির্বিকার : চেতনারা শূকরের পেটে
খাবি খায়, নাচ্য চলে দৃঢ়তর অবচেতনায়
কামান্ধ রজনী জাগে উদগ্র বিক্ষিপ্ত সত্তায়
কোলকাতা নাটমঞ্চ : নরনারী বেঁচে যায়
মনুষ্যত্ব হেঁটে॥
মহাজন, স্থির থেকো, সত্য আজ কেন জানি
উদ্দাম হয়েছে॥

নির্লিপ্ত সোনালী নয় | বিমল মজুমদার

নির্লিপ্ত সোনালী নয়, শ্যামল আর্দ্রতা পেতে চাই।
অথচ সমুদ্রগর্ভে সূর্যলোক না পাওয়ার ফলে
শৈবালশ্রেণীর মতো সকালে সোনালী, সঙ্কোপন।
অজ্ঞাত ব্যবসা করি, শুনি, বহু ক্লান্ত হাত আছে:
কেউ এসে বলে না তো নিরাময় ভোটের মতন
সুস্থির সিদ্ধির কথা, কোনো কেউ এসে বলে না তো।
কখনো, অজ্ঞাতসারে পিছনে, শরীরে কালা লাগা,
অথবা অসাবধানে নাকে রক্ত মাখানোর মতো
অদৃশ্য, কৌতুকাবহ কারণে বিপন্ন আমি আজ।
অসৎ জনতা মৃক, মাঝে মাঝে বিশুষ্ক চাকরী
খুঁজে ফিরি নিরুপায় সৈনিকের মতো একা একা
থাকার বাসনা নিয়ে: জনতাও বলে, বেশ যাও।
সরল সারস মরে সকৌতুক গুলির আঘাতে।
সমুদ্রে শৈবালশ্রেণী সূর্যালোক কখনো পেল না।

আজও | মলয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম বাসরনিশির লজ্জারুণ নূতনত্বে তুমি
সুহাসিনী উষার মতো আজও মনোহর
প্রথমের ভীরু সেই কম্প্রবক্ষের ভাষা
কান পেতে শুনি আজো—চিরনূতন···চিরনূতন···

আধো-পরিচয়ের অস্ফুট রহস্য আজো যেন
দুজনার মাঝে
চেনার হয়না শেষ, থির্ থির্ কুয়াশার পর্দাটা কাঁপে
নবপরিণীতা তুমি আজো—অক্ষুণ্ণঘাটিত···চিরনূতন···

নীলকণ্ঠ | সুকান্তি রায়চৌধুরী

নীলকণ্ঠ, আর পান করো না বিষ।
সীমান্তের পারে অহর্নিশ
শুনছো না কোলাহল?
দেখছো না হলাহল
উঠছে নিত্য অত্যাচারের
স্বার্থবুদ্ধি আর বিভেদের
রাশি রাশি।
প্রেম হ'ল বাসি;
বিষাক্ত ভাগন
মুখোস করেছে উন্মোচন।
সেজেছিল মিত্র যত হিংস্র বৈরী।
ভুলেছে শপথ। আমরাও তৈরী।
নীলকণ্ঠ, আমাদের ঘৃণায় আর ধিক্কারে
যদি আজ চারিধারে
বিদ্বেষ—গরল শুধু ওঠে,
আবেগের চোটে
বাড়ায়ো না হাত।
ঘটে যদি শোণিতপাত
তবুও নয়। কেন না উদ্বাস
সে বিষে কণ্ঠ হবে লাল।

খেলাধুলা

দ্বৈত অ্যাথলেটিকিস

অজয় বসু

এই অনুষ্ঠান আমরা প্রত্যক্ষ করেছি মাত্র, উপভোগ করতে পারিনি। ভারত বনাম পশ্চিম জার্মানীর দ্বৈত অ্যাথলেটিকদের কথা বলছি।

নিতান্ত অসময়েই ভারতের মাটিতে এই রাষ্ট্রিক অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতার প্রথম অনুষ্ঠান হয়ে গেল। উত্তর চীনের নয় সশস্ত্র আক্রমণ যে মুহূর্তে ভারতীয় জীবনধারার শান্তি ক্ষুণ্ণ করেছিল সেই মুহূর্তেই ভারত-ভূমিতে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম জার্মানীর ক্রীড়াবিদেরা। ওঁদের সফর তাই আমাদের দেশের মাঠ ময়দানের আসর জমাতে পারে নি। জাতীয় সঙ্কট-কালে খেলাধুলো নিয়ে মেতে থাকার মেজাজ কারই বা থাকে!

ওতে মেজাজের অবস্থিতি ছিল দর্শকদের, সেই দলে ভারতীয় অ্যাথলিটদেরও। এদেশের শীর্ষস্থানীয় ভারতীয় অ্যাথলিটদের, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনেই সেনাবাহিনী-ভুক্ত। তাঁদের সামনে ছিল দাঁতভাঙা চীনকে প্রতিহত করার আহ্বান। সেই চাপে স্বাভাবিক কারণেই তাঁদের কিছুদিন ক্রীড়াভূমিতে জার্মান প্রতিদ্বন্দ্বিতার বোকাবিলার গুরুত্বও ছোট হয়ে গিয়েছিল। তবু তাঁরা ক্রীড়া প্রতিদ্বন্দ্বিতার অংশ নিয়েছিলেন অতিথি আপ্যায়নের, নিয়মরক্ষার তাগিদে। অনেক ক্ষেত্রে ভারতীয় অ্যাথলিটরা যে আশানুরূপ দক্ষতা দেখাতে পারেন নি তার কারণও সম্ভবতঃ তাঁদের আশা ও মনের অবস্থিতি।

উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার টানে প্রতিযোগীদের ক্রীড়া-মানের ক্রমান্বতির পথ প্রশস্ত হয়। এই আশাতেই অপেক্ষাকৃত দুর্বলেরা সবলতর প্রতিপক্ষের সামনে দাঁড়াতে চায়। সেই চাওয়াতেই আমরা দাঁড়িয়েছিলাম জার্মান ক্রীড়াবিদ্‌দের মুখোমুখি। কিন্তু পরিকল্পিত প্রতিযোগিতার অবকাশে অভিপ্রেত ফসল আমাদের হাতে এসে উঠতে পারে নি। এই আয়োজনে যে সম্ভাবনা ছিল চীনা গোলা-বারুদের উত্তাপে তাও ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে।

খতিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে পশ্চিম জার্মান অ্যাথলিট দলের ভারত সফরের শেষ অধ্যায়েই যেন ভারতীয় দলের অবস্থা রীতিমতো অসহায় হয়ে উঠেছিল। সময় যতো এগিয়েছে ভারতীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার চাপও ততোই শিথিল হয়ে পড়েছে। কারণ কি? এর কারণও সীমান্ত পরিস্থিতির পরোক্ষ প্রভাব। সীমান্তের অনিশ্চয়তায় ভারতীয় জীবনের অস্থিরতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয় ক্রীড়ার প্রতিনিধিরাও নিজেদের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিলেন। জাতীয় জীবনের

অস্থিরতার প্রভাব ব্যাপক। আমাদের অ্যাথলিটরাও তা থেকে রেহাই পান নি।

পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবকাশে ভারতীয় অ্যাথলিটরা যদি তাঁদের ক্রীড়া জীবনের শ্রেষ্ঠ পরিচয় নাও রাখতে পেরে থাকেন তা হলেও তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না। হয়তো আমরা নিজেরাই বাস্তবানুগ বুদ্ধি বিবেচনার পরিচয় রাখতে পারবো না।

আক্ষরিকের কথা এই যে, যে গুরুত্বপূর্ণ ক্রীড়া-অনুষ্ঠানে ভারতীয় অ্যাথলিটদের স্বার্থে ব্যাপক উদ্যোগ নেওয়া দরকার ছিল, কার্যতঃ তা নিষ্ফল হয়ে গেল। তবে এই দ্বৈত প্রতিদ্বন্দ্বিতার শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার ধারা একেবারে নিষ্ফল হয়ে যাবে, এমন নৈরাশ্য প্রশ্রয় পাওয়াও উচিত নয়। আশা রাখি, আজকের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতাকে ভবিষ্যতে ভারতীয় অ্যাথলিটরা আয়ত্ত করতে পারবেন। আজ তাঁরা সফল হতে না পারলেও জাতীয় সঙ্কট অবসানে আজকের শিক্ষার মূলধনে তাঁরাই পারবেন বহুস্তর সাফল্যে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে।

এমনিতেই সহজ, স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে আয়োজিত আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে ভারতের পেরে ওঠার কথা ছিল না। কারণ দল হিসেবে পশ্চিম জার্মানী প্রবলতর পক্ষ। ইউরোপের অনুপাতে এশীয় ক্রীড়ার সামগ্রিক মান এখনও অনেক অনুন্নত। আর জার্মানী ইউরোপের এক সুযোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী।

গত সেপ্টেম্বরে বেলগ্রেডে অনুষ্ঠিত ইউরোপীয় অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতার সাফল্যের অভিযানে জার্মানী পেয়েছিল তৃতীয় স্থান। তৃতীয় স্থানাধিকারী সেই জার্মান দলে অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ অ্যাথলিট ভারত সফরে আসেন নি। ভারতীয় ক্রীড়ামানের পরিপ্রেক্ষিতে মোটামুটি ভালো গঠিত একটি দলকে ভারতে পাঠানো হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল এই যে এই দলের সঙ্গে ভারতীয়দের প্রতিদ্বন্দ্বিতা যাতে জমে উঠতে পারে তারই ব্যবস্থা করা।

কিন্তু সে পরিকল্পনাও সফল হয়নি। কেন হয়নি তার কারণ আগেই বিশ্লেষণ করেছি। দুপক্ষে অনুষ্ঠিত সাতটি প্রতিযোগিতার অবকাশে জার্মান দলটিই নিরঙ্কুশ শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

বিস্তারিত হিসেবে দিল্লীর প্রথম আয়োজনে পশ্চিম-জার্মানীর অ্যাথলিটরা দশটি বিভাগে, ভারতীয়েরা আটটিতে; বোম্বাইয়ে ও কলকাতায় জার্মান অ্যাথলিটরা বারোটিতে ও ভারতীয়েরা পাঁচটিতে; কলকাতায় জার্মান ক্রীড়াবিদেরা চোদ্দটিতে আর ভারতীয়েরা তিনটিতে, মাদ্রাজে জার্মান অ্যাথলিটরা বারোটিতে ও ভারতীয় প্রতিনিধিরা ছটিতে, হায়দ্রাবাদে জার্মানরা এগারোটিতে, ভারতীয়েরা ছটিতে এবং বোম্বাইয়ে আগন্তুকেরা বারোটিতে ও ভারতীয়েরা পাঁচটিতে জয় লাভ করতে পেরেছিলেন।

জয় পরাজয়ের এই হিসাবতালিকা ভারতের পক্ষে আশাব্যঞ্জক অবস্থাটি নয়। এবং বলা যেতে পারে যে দল হিসেবে ভারত পশ্চিম জার্মানীর কাছে বার বার হেরে গেলেও বিক্ষিপ্ত ভাবে অনেকগুলি ভারতীয় অ্যাথলিট ব্যক্তিগত ক্রীড়ামানের ক্রমোন্নতির স্বাক্ষর রাখতে পেরেছেন এই সুযোগেই। ভারতের সামগ্রিক পরাজয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয়দের রেকর্ড-ভাঙার এতগুলি নজীর কম উজ্জ্বল নয়।

দ্বৈত অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতার সুযোগে যাঁরা নব নজীর সৃষ্টির কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তাঁদের নাম হীরেন ইরাণী, বলকার সিং, মাহিন্দর সিং, নাগ ভূষণ, রাজ শেখরণ, আতৈব সিং এবং ভারতীয় রিলে (৪×৪০০ মিটার) দল।

হীরেন ইরাণী ও বলকার সিংয়ের ক্রমোন্নতির লক্ষণ একান্ত সুস্পষ্ট। কারণ ওঁরা দুজনেই একাধিকবার পুরাণো রেকর্ড অতিক্রমে সফল হয়েছেন। ৫১ ফুট সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি দূরে গোলক নিক্ষেপ করে ইরাণী দিল্লীতে এবং বোম্বাইয়ে রেকর্ড ভাঙেন। ভারতীয় দলনায়ক বলকার সিং যোধপুরে জাতীয় রেকর্ড এবং কলম্বুরে জাতীয় তথা এশীয় রেকর্ড অতিক্রম করেন। দিল্লীতে মাহিন্দর সিং পনেরোশ মিটার দৌড়ে ও ভারতীয় দল রিলেতে জাতীয় রেকর্ড ভাঙেন।

আতৈব সিং সেন্ট স্টেট সাড়ে তেরো ফুটের বাধা অতিক্রম করে ছিলেন বোম্বাইয়ে এবং নাগ ভূষণ ও রাজ

শেষবার হায়দরাবাদে দুশৌমিটার দৌড়ে এশীয় রেকর্ডটিকে সেদিনে ফেলে রেখে এগিয়েছিলেন।

এইসব দৃষ্টান্তের সাক্ষ্য রয়েছে। আর আছে স্বল্প পাল্লার হাউল দৌড় ও হাইজাম্পে গুরবচন সিং ও ব্রড জাম্পে সত্যনারায়ণের সাফল্যের নিদর্শনে। গুরবচন সিং সাধারণত ডেকাথলন প্রতিযোগিতার অংশ নিয়ে থাকেন। জাকার্তাক্রীড়ার তিনি ডেকাথলন চ্যাম্পিয়ন। কৈত অ্যাথলেটিকে ডেকাথলনের ব্যবস্থা ছিল না। তাই তিনি যোগ দিয়েছিলেন স্বল্পপাল্লার হাউল দৌড় ও হাইজাম্পে এবং প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই জার্মান প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে ধার মানিয়ে ছিলেন। দিল্লীর প্রথম আয়োজনে তিনি দুটি বিভাগেই জাতীয় রেকর্ড স্পর্শ করেন।

লতা বাবারও প্রতি অনুষ্ঠানেই ব্রডজাম্পে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিলেন এবং তাঁর ব্যক্তিগত কৃতিত্বের নজীর আন্তর্জাতিক ক্রীড়ামানের অনুপাতেও তেমন নিম্নস্তর নয়। কলকাতায় আসরে জার্মান প্রতিযোগী প্রথম ব্যানার্জি'ও ব্রডজাম্পে জার্মান প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে পরাস্ত করেছিলেন। প্রথম এখন ভারতের জাতীয় দলে জায়গা পাননি তাই তাঁর সাফল্যের এই দৃষ্টান্তটি বোধ করি আরও উল্লেখযোগ্য।

রোম অলিম্পিকে চতুর্থ স্থানাধিকারী সর্বকালের সর্বোত্তম ভারতীয় অ্যাথলিট মিলখা সিংয়ের অবসর গ্রহণের সময়ও যে অত্যাসন্ন, এই সত্যটিও অ্যাথলেটিকদের অবকাশে উপলব্ধি করা গিয়েছে। জলন্ধরের অনুষ্ঠানে মিলখা সিং তাঁর নিজের বিভাগেই অর্থাৎ চারশ মিটার দৌড়ে জার্মানীর হান্স জোয়াকিম রেসকের কাছে পরাজিত হওয়ার দৃষ্টান্তেই এই উপলব্ধির বহু সমর্থন পাওয়া গিয়েছে।

আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিক দুনিয়ায় রেসকে পরিচিত নন কিন্তু মিলখা সিং শুধু পরিচিত নন্ রীতিমতো প্রতিষ্ঠিতও। তবু মিলখা অল্পখ্যাত প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে হার মেনেছেন। পশ্চিম জার্মানীর মঞ্চে প্রতিযোগিতার অবকাশে কোনো ক্ষেত্রেই মিলখা সিং তাঁর পূর্ব কৃতিত্বের পরিচয় রাখতে পারেন নি। সুতরাং অসঙ্কোচে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে সক্রিয় অ্যাথলেটিক থেকে মিলখা সিংকে শীঘ্রই সরে যেতে হবে। এবং তার অবসরে ভারতীয় অ্যাথলেটিক জগতে যে বিরাট ফাঁক দেখা দেবে সে শূন্যতা ভরে উঠার কোনো আশ্বাসই বর্তমানে নেই।

কৈত প্রতিযোগিতার সুযোগে পশ্চিম জার্মানীর যে-কজন অ্যাথলিট সত্যিকারের উচ্চমানের ক্রীড়া-নিপুণতার নজীর ভারতীয় দর্শকদের সামনে তুলে ধরেছিলেন তাঁদের মধ্যে স্বল্প পাল্লার দৌড়বীরদের নামই সবার আগে উল্লেখযোগ্য। কারণ স্বল্প পাল্লার দৌড়ে তাঁরা নিয়মিত যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তা একমাত্র বিশ্বের শীর্ষপর্যায়ের অ্যাথলিটদের পক্ষেই দেখানো সম্ভবপর।

হেনজ্ স্নুম্যান ১০·৫ ও ১০·৪ সেকেণ্ডে একশ মিটার, ২০·৮ সেকেণ্ডে ও ২১·৫ সেকেণ্ডে দুশো মিটার, পিটার গ্যামপার ১০·৫ সেকেণ্ডে একশ মিটার এবং আলফ্রেড চিবক ১০·৫ ও ১০·৪ সেকেণ্ডে একশ দৌড়েছেন। কম সময়ে দৌড়বার এইসব নজীর অভিনন্দনযোগ্য। এই নজীরের মূল্যায়নে ওরা নিজেই আরও বড়ের প্রতি-যোগিতা জয় করতে পারতেন। ওঁদের সম্পর্কে আর একটি কথা বলা যেতে পারে যে এই তিনজন অ্যাথলিটের প্রত্যেকেরই দৌড়বার ভঙ্গীটি যেমন সহজ তেমনি সাবলীল। অনেক পরিশ্রম, শিক্ষা ও অনুশীলনের বিনিময়েই যে ওরা এমন সহজ ও সুন্দর হয়ে উঠতে পেরেছেন।

কিন্তু ইভেন্টের হ্যামার ও ডিসকাস নিক্ষেপে এবং শটপুটেও জার্মান ক্রীড়াবিদরা ছিলেন ভারতীয়দের অনুপাতে অনেকটা এগিয়ে, আন্তর্জাতিক মানের খুবই কাছাকাছি। জার্মান তরুণ হান্স ফসল ২৯১ ফুট ৪ ইঞ্চি দূরে হ্যামার ফেলেছেন এবং ভিয়েট্রিক উরবাক ১৭২ ফুট ৪ ইঞ্চি দূরে ডিসকাস নিক্ষেপ করেছেন ও শটপুটে ৫৭ ফুট ২ ইঞ্চির দূরত্ব অতিক্রম করেছেন। এসব দৃষ্টান্ত মনে রাখার মতো। সময় অনুকূল থাকলে বিদেশী ক্রীড়াবিদদের সাফল্যের এই উজ্জ্বল নজীর-গুলিকে আমরা অকুণ্ঠচিত্তে আরও উপভোগ করতে পারতাম, সন্দেহ নেই।

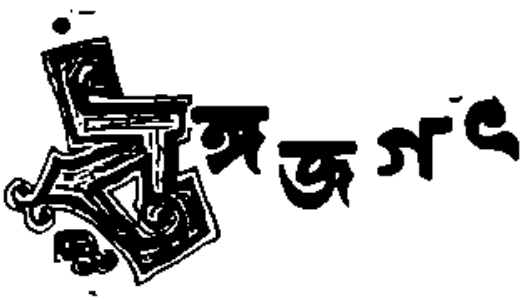

রোমাঞ্চচিত্রের নবদিগন্ত "রক্ত পলাশ"

চিত্রনাট্যকার

পরিচালনা—পিনাকী মুখোপাধ্যায়। সংগীত পরিচালনা—শ্যামসেন্ট মুখোপাধ্যায়। চিত্রনাট্য—প্রণব রায়। শব্দগ্রহণ—বাণী দত্ত। আলোকচিত্র পরিচালনা—অনিল গুপ্ত। আলোকচিত্র গ্রাহক—জ্যোতি লাহা। সহকারী পরিচালক—দিলীপ দে চৌধুরী। অভিনয়—শ্রীমান বাসুদেব, অনিল চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, দীপক মুখোপাধ্যায়, শিশির বটব্যাল, জীবেন বসু, রেণুকা রায়, কমল মিত্র।

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে চলচ্চিত্র এক মহা সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। কী ধরনের ছবি দর্শকেরা পছন্দ করেন এবং কী কী ধরনের গল্প ও অভিনেতৃ নির্বাচন করে ছবি করলে তা' ধরতে পারে—এদানিং এ নিয়ে এক তুমুল গবেষণা আলোড়ন পড়ে গেছে চিত্রউৎপাদকদের মধ্যে। এ ধরনের অনিশ্চিয়তা ইতিপূর্বে যে দেখা দেয়নি তা যেমন বলা যায় না, তেমন এ কথাও বলা যায় না চলচ্চিত্রের মত এক বিশেষ আর্টফর্ম কোন নিশ্চিত ফর্মুলাতে শিল্প সৃষ্টি করবে সর্বদা। দর্শক সাধারণের রুচি বোঝা ভার—কখনও তাঁদের রায় সিরিয়াস্ নাটকে কখনও বা তরল কৌতুক তামাশাপ্রধান নাটকে। আর এই জন্যই যেমন বস্তাপচা রোমান্টিক গল্প কখনও কখনও চলছে (চলছে মানে—মারাত্মক রকম ভালো চলছে) আবার কখনও কখনও 'অভিযান'এর মত ক্লাসিক ও সিরিয়াস্ ধরনের নাট্যমণ্ডিত চিত্রও চলেছে। অবস্থাটা বিশ্লেষণ করা চলে মুখে যা কালি বলবে ভালোই, কিন্তু বাস্তব অবস্থা এ দেশের চিত্র উৎপাদকদের ক্ষেত্রে কখন অটিল হয়ে পড়েছে।

তাই সাম্প্রতিক বাংলা ছবি মুক্তির পথ খুঁজছে। হোসে ও মাদ্রাজের দর্শক ক্রমাগত পাল্লা দিয়ে চলবার ক্ষমতা ইতিমধ্যেই বাংলাচিত্রের নিঃশেষ হয়েছে—আদর্শ ও বক্তব্যের প্রশ্নে তা' বটেই অর্থকরী দিক দিয়েও. সুতরাং অধিকাংশ বাংলা ছবি যদি পথ খোঁজার চেষ্টায় অন্ধকারের মধ্যে শুধুমাত্র হাতড়াতেই থাকে ও বেরিয়ে আসার উপযুক্ত পথ না পায় তা হলে মৃত্যু অনিবার্য। দামিনীবালার নেতা শোনালেও কথাটি বাস্তব অবস্থাকেই ইঙ্গিত করে।

পিনাকী মুখোপাধ্যায় পরিচালিত রোমাঞ্চ চিত্র "রক্তপলাশ" চিত্রটিও সেই চেষ্টারই শুভ নামান্তর। কাহিনী নির্বাচনে ও উপস্থাপনায় বৈচিত্র দাবী করতে পারে চিত্রটি। আমাদের এদেশে রহস্য রোমাঞ্চ এবং অপরাধমূলক চিত্র ইতিপূর্বে বেশ কয়েকটি প্রদর্শিত হয়েছে, কিন্তু গতানুগতিক উপস্থাপনায় সেগুলির কোনটিই বিশেষভাবে রসোত্তীর্ণ হতে পারে নি। মেলোড্রামাটিক ও অবিশ্বাস্য ঘটনাক্রমে কাহিনীর উপস্থাপনা সাময়িকভাবে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে কিন্তু স্থায়ীভাবে মনে দাগ কাটতে সক্ষম হতে পারে না। 'রক্তপলাশ' চিত্রটি সেদিক দিয়ে নিঃসন্দেহে এক ব্যতিক্রমের সূচনা করেছে। তরুণ পরিচালক ইতিপূর্বে তাঁর বিভিন্ন ছবিতে যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন সেগুলি সীমাবদ্ধ ছিল বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা ও

নরনারীর প্রেম ভালোবাসা সম্পর্কিত সম্পচিত্রে। কিন্তু বর্তমান চিত্রটি তার অতীতের সর্বপ্রকার অভিজ্ঞতার বাইরে দৃষ্ট এমনই এক ধরনের চিত্র যা প্রকাশের মুন্সিয়ানা অপর সব ছবিগুলি থেকে পৃথক। রোমাঞ্চ চিত্র বিশ্বাসযোগ্যভাবে উপস্থিতকরণ কাহিনীর বৈচিত্রপূর্ণ বিন্যাস সাধন ও ঘটনাক্রম সংগতিপূর্ণ রেখে মাঝে মাঝে চমকের প্রবলতা আনয়ন ইত্যাদি ব্যাপারে তিনি নিঃসন্দেহে দক্ষতার পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছেন। সব থেকে বড় কথা – এই মুহূর্তে তিনি এমনই এক ধরনের চিত্র আমাদের উপহার দিয়েছেন যে ছবি তার নিজ গুণেই দর্শকদের আকৃষ্ট করবে এবং প্রযোজককে লাভবান করিয়ে আরও দু'খানি সফল বাংলা ছবি করতে অনুপ্রাণিত করবে।

কাহিনী বলা হয়েছে শিশুমনস্তত্ত্বীন জনৈক বালকের দৃষ্টিভংগীতে। ঘটনাচক্রে বালকটি এক অপরাধ অনুষ্ঠানের প্রত্যক্ষ সাক্ষী হয়ে পড়েছিল—ডাকু নামে এই বালকটি এক স্নায়বোধবোধী হত্যাকাণ্ড (?) অনুষ্ঠিত হতে দেখেছিল। সেই হত্যাকাণ্ডকে উপলক্ষ করে পুলিশ যখন অপরাধীকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল তখনই বালক ডাকু পুলিশের নজরে আসে, ধৃত ডাকু কিন্তু পুলিশের কাছে প্রথমে সমস্ত ঘটনা অস্বীকার করে—পরে সে যে ঘটনাটি ঘটতে দেখেছে এটুকু স্বীকার করা ছাড়া অন্যান্য ঘটনাগুলি বেবালুমে গোপন করে যায়। পুলিশ অনুসন্ধান করতে করতে এক বিরাট দলের সন্ধান পায় যারা যে আইনী চোরাই চালানের দল বলে চিহ্নিত। নিহত ব্যক্তির বোন 'নীলা'র সঙ্গে পুলিশ ঘটনাচক্রে আসল অপরাধীর এক সম্পর্ক খুঁজে পায় এবং জানতে পারে উক্ত ব্যক্তি শঙ্কর ব্যানার্জী কানাই এক সম্ভ্রান্ত বংশের উচ্চশিক্ষিত ও মেরিন অফিসার হিসাবে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত জনৈক অবিবাহিত যুবক।

মেরিন অফিসার শঙ্কর ব্যানার্জী জাহাজে তখন কলকাতার ডকে মাল বোঝাই সম্পর্কিত ব্যাপারে নিযুক্ত ছিল—স্বভাবতই শঙ্কর যে কলকাতার নিজের বাড়ীতে থাকবে মনস্থ করে টাকি নিয়ে যাবার সময় চলেছিল বাড়ীর উদ্দেশ্যে। পথিমধ্যে জনৈক সুরেশ্বরী ছুরিকাঘাতে আহত যুবককে অনিচ্ছাসত্ত্বেও টাক্সিতে তুলে ফেলে ও নিজের বাড়ীতে এনে ফেলে নিতান্ত দয়াপরবশ হয়ে। খবর পেয়ে আহত যুবকটির বোন নীলা আসে দাদার খবর নিতে। সেখানেই শঙ্করের সাথে নীলার দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ ও প্রাথমিক প্রেমের সূচনা।

পারস্পরিক মন দেওয়া যখন চূড়ান্তে এবং শঙ্কর যখন নীলাকে বিবাহের প্রস্তাব দিতে উদ্যত সেই মুহূর্তে জলভরা চোখে নীলা তার পারিবারিক কাহিনীর গ্রন্থি উন্মোচন করে শঙ্করের কাছে। নীলার দাদা এক চোরাইচালান দলের সাথে জড়িত ও সে কারণে বহু অপরাধের সহায়ক। ঐ দলটি নীলার দাদার প্রভাবে নীলাকেও পর্যন্ত তাদের বে-আইনী উদ্দেশ্য সিদ্ধির কাজে লাগাতে উদ্যুত। শঙ্কর সব শুনে ক্রুদ্ধ হয় এবং নীলার অজ্ঞাতে সে একদিন নীলার ফ্লাটে তার দাদাকে ধরে ও সমস্ত ব্যাপারের জন্য কৈফিয়ৎ তলব করে। কিছু বচসা ও ক্রুদ্ধ বাকবিনিময়ের মধ্যে উত্তেজিত শঙ্কর যখন ঘুঁসি মারে তখন নীলার দাদা পিস্তল হাতে শঙ্করকে পাল্টা আক্রমণ করে বসে এবং প্রবল ধস্তাধস্তির মধ্যে অতর্কিতে একটি গুলি ছুটে গিয়ে নীলার দাদার প্রাণান্ত ঘটায়।

পুলিশ বহু অনুসন্ধানের পর জানতে পারে যে কাহিনীর নায়ক শঙ্কর সেদিনই জাহাজযোগে আইনকে ফাঁকি দিয়ে দূর দেশে পাড়ী জমিয়েছে তখন পুলিশ সদলবলে জাহাজ চড়াও করে। সেখানে শঙ্করকে বহু কষ্টে ধরে কলকাতায় চালান দেওয়া হয়। সেই সংগে ধরা পড়ে চোরাই চালানের দলটি।

আদালতে বিচার সুরু হয়। ঘটনার একমাত্র

নিতান্ত প্রয়োজনে
কিনুন
জিনিষের মূল্যবৃদ্ধি
প্রতিরোধ করুন

প্রত্যক্ষদর্শী বালক ভানু। সুতরাং তার জবানবন্দীর উপর সমস্ত বিচার নির্ভর করে। সরকার পক্ষের উকিলের কড়া সওয়ালের মুখে ভানু শঙ্করকে নির্দোষ বলে। তারপর কোর্টের হলেলে ছেলেটি যেখানে হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত হয়েছিল—সেই ঘটনাস্থলে পুনরাভিনয় করে দেখায়। সমস্ত ঘটনাটি এনাইরেস্টের মধ্যে দিয়ে বালক ভানু প্রকাশ করে এবং তাতে বিচারকের সিদ্ধান্ত হয় যে শঙ্কর নির্দোষ ও ঘটনাটি একটি দুর্ঘটনা বৈ কিছু নয়। শঙ্কর বে-কসুর মুক্তিলাভ করে।

সমস্ত চিত্রে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছে ভানু চরিত্রে শ্রীমান বাসুদেব। এমন চমৎকার বিশ্বাসযোগ্য অভিনয় তার মতো একটি আট নয় বছরের ছেলের পক্ষে করা সত্যই দুরূহ। দর্শকের সমস্ত সহানুভূতি কেড়ে নিয়ে ভানু বাংলা চিত্রে এক অভিনব চরিত্র সৃষ্টি। এর পরই আসে শক্তিমান অভিনেতা অনিল চট্টোপাধ্যায়ের নাম। তাঁর ভগ্নীতে অপূর্ব অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে যে চরিত্রটি তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন শেষ দিন পর্যন্ত সে চরিত্রটির কথা আমাদের মনে থাকবে। অন্যান্য চরিত্রগুলির প্রায় প্রত্যেকটি সুঅভিনীত।

আলোকচিত্র পরিচালনায় এ চিত্রে নাটক উপযোগী মুডি ফটোগ্রাফ গ্রহণ করেছেন অনিল গুপ্ত। তাঁর দক্ষ হাত আর একবার প্রমাণ করলো যে তিনি এদেশে এক বিপুল শক্তিধর ক্যামেরাম্যান।

সংগীত আছে দুটি। চমৎকার, কিন্তু ক্যাবারে নাচের ব্যাপারটি সমর্থনযোগ্য নয় বলেই শুধু বলছি না আবহ সংগীতের মেজাজ যথেষ্ট স্বচ্ছ নয় বলে আমার মনে হয়েছে। এরকমের রোমাঞ্চ চিত্রে আবহ সংগীতের যথেষ্ট ক্ষেত্র আছে মানবেন্দ্রবাবু যদি আর একটু দম নিতেন নিজের কাজে তাহলে নাটক আরও হৃদয়গ্রাহী হতে পারতো। তবুও এ ছবিতে তাঁর পূর্ব দুবার লক্ষ্যণীয় আছে সে কথা মুক্ত কণ্ঠেই বলছি।

প্রতিভাবান অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

ত্রুটি আছে ছবিতে অনেক জায়গায় অনেক ক্ষেত্রে ট্রিটমেন্ট সম্বন্ধে তারা উচিত ছিল কারণ সুযোগ ছিল আরও বেশী, তবুও যা হয়নি এ ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে তা নিশ্চয়ই সম্ভব হবে তাদের আর পুনরাবৃত্তি হবে না এই আশা পোষণ করেই এদেশের জন্য প্রচেষ্টা হিসাবে সার্থক চিত্র "রক্তপলাশ" ও তার কলাকুশলীবর্গকে অভিনন্দন জানাচ্ছি আন্তরিক ভাবে।

টুকরো খবর—

আর. ডি. বনশালের প্রযোজনায় বাংলাদেশের, বরকেনিষ্ঠতম পরিচালক পার্থপ্রতিম চৌধুরী সুরু করেছেন তাঁর প্রথম চিত্র "হারাসুর" গত ৩০শে ডিসেম্বর। আশাপূর্ণা দেবীর কাহিনীকে চিত্রনাট্য করেছেন স্বয়ং

● অভিজ্ঞ চক্ষু চিকিৎসক
● রকমারী ফ্রেম
● বিদেশী লেন্স
● সুলভ মূল্য

স্বাগত জানাই

১৭২এ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড
(সাদার্ণ এ্যাভেনিউর মোড়)
কলিকাতা ২৬

ছবিঘর

পার্শ্বচরিত্র। চিত্রনাট্যটি এক কথায় অনবদ্য। প্রধান চরিত্রটিতে অভিনয় করছেন শর্মিলা ঠাকুর। পার্শ্ব চরিত্র গুলিতে রয়েছেন যথাক্রমে নির্মলকুমার, পাহাড়ী সান্যাল, বিকাশ রায়, ভানু ব্যানার্জী, রবি ঘোষ, অরুণ মুখার্জী, দিলীপ মুখার্জী, ললিতা, অনুভা, ও কল্যাণী ঘোষ। আলোক চিত্র, সম্পাদনা ও শিল্পনির্দেশনা করছেন যথাক্রমে বিশু চক্রবর্তী, তরুণ সেন ও কার্তিক বসু।

• • •

অজয় কর পরিচালিত আর, ডি, বনশাল প্রযোজিত ছবিটির মুখরক্ষা প্রায় সমাপ্ত হয়ে এসেছে। প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করছেন যথাক্রমে সুচিত্রা সেন ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

• • •

শেষ হয়েছে এক টুকরো আগুন চিত্রটি। আগামী সপ্তাহেই মুক্তিলাভ করছে কলকাতা ও শহরতলীর বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে। আর, ডি, বনশাল প্রযোজিত চিত্রটি পরিচালনা করেছেন বিনু বর্ধন। সংগীত, আলোকচিত্র ও শিল্প নির্দেশনা করেছেন যথাক্রমে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, দেবজী ভাই ও কার্তিক বসু। প্রধান ভূমিকা দুটিতে অভিনয় করেছেন অনুভা গুপ্তা ও কালী বন্দ্যোপাধ্যায়।

• • •

পরিচালক গুরু দত্তজী তাঁর প্রথমচিত্র রমাপদ চৌধুরী রচিত 'বীণের বাম টিয়ারং' চিত্রের আউটডোরে বেরিয়েছেন সদলবলে দক্ষিণ ভারতের সমুদ্রকূলের উদ্দেশ্যে। সঙ্গে ক্যামেরাম্যান অনিল গুপ্ত, শিল্প নির্দেশক কার্তিক বসু, সংগীত পরিচালক রবীন চট্টোপাধ্যায় অভিনেতা নিরঞ্জন, সত্যেন ভট্টাচার্য, সন্ধ্যা রায়, দিলীপ রায় প্রমুখ প্রায় আশী জনের একটি বিরাট দল, দীর্ঘ দু'মাস ধরে দাক্ষিণাত্যের বনে জঙ্গলে পাহাড়ে সমুদ্রে ছুটিং চলবে "বীণের বাম টিয়ারং" চিত্রের।

• • •

পরিচালক বিনু বর্ধন "একটুকরো আগুন" চিত্রের কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর নবতম পিকচার্স এর ব্যানারে চিত্র সুরু করেছেন নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিওতে গত নভেম্বর মাসে। সমরেশ বসু লিখিত এই চিত্রটির নাম "বিভাস"। চিত্রনাট্য সম্পাদন করেছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। সংগীত ও আলোকচিত্র পরিচালনায় আছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও বিজয় ঘোষ। প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করছেন উত্তমকুমার। নায়িকা চরিত্রে অনৈকা নবাগতাকে দেখতে পাওয়া যাবে এ চিত্রে।

বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে "বিভাস" উপন্যাস শারদীয় "বিংশ শতাব্দী" (১৩৬৮) প্রকাশিত হয়েছে।

• • •

চিত্ত বসুর আগামী চিত্রের নাম গৃহ সন্ধানে। চিত্রনাট্য করেছেন প্রদীপ দাশগুপ্ত। বর্তমান চিত্রনাট্যকারের অপর দুটি মুক্তি প্রতিক্ষিত। চিত্ত বসু পরিচালিত মুখছায়া চিত্রের নাট্যকার ও সহযোগী পরিচালকই প্রদীপ দাশগুপ্ত। খুব শীঘ্রই তিনি নিজে একটি চিত্রপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। আমরা তাঁর সফলতা কামনা করি।

• • •

নারায়ণ পিকচার্স • পরিবেশনায় পরিচালক কনক মুখোপাধ্যায় তাঁর 'মায়ার সংসার' চিত্রের শ্যুটিংয়ের পর • সুরু করেছেন স্বরচিত গল্প ও চিত্রনাট্য

"আকাশ প্রদীপ" চিত্রের কাজ। মুখোপাধ্যায় বিশ্বজিৎ এ চিত্রের নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন এবং পূর্ববঙ্গ ক্যামেরার সেওজ জাই ও সংগীত পরিচালনায় রবীন চট্টোপাধ্যায় মনোনীত থাকবেন।

নারায়ণ শিকদারের প্রযোজিত আর একটি ছবি বর্তমানে মুক্তি প্রতিক্ষিত। সলিল দত্ত পরিচালিত উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া চৌধুরী অভিনীত 'সপ্তপদী' চিত্রটি বর্তমানে এডিটিং টেবিলে শেষ পর্যায়ের সম্পাদনায় ব্যস্ত। রবীন চট্টোপাধ্যায় সুরযোজিত এই চিত্রের আলোকচিত্র শিল্পী বিজয় ঘোষ।

"মৃত্যুর চোখেও জল"

খবর এলো নবদ্বীপ হালদার পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল চৌষট্টি বছর। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মতে মৃত্যুর কারণ হার্টফেল। মৃত্যুর সময় পার্শ্বদেশে কেউ বিশেষ কেউ উপস্থিত থাকতে পারেন নি—তিনজন নিকট স্বজন কয়েকজন; শেষরাত্রের দিকে প্রত্যুষ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি পার্শ্বে তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করলেন।

বাংলা দেশে নবদ্বীপ হালদারকে কে না চেনে। বিগত তরুণ বয়স থেকে দর্শক মনে তিনি নিয়মিত চিত্তে ও মনে অভিনয় করে আসছিলেন—তাঁর সেই বিখ্যাত গলা সারা বাংলাদেশে হাসারোল তুলে পর পর দুই নগর বন্দর প্রান্তরকে সচকিত করে দিয়ে গেছে—একবার যারা শুনেছে লোকে বলেছে নবদ্বীপ হালদার। সেই অতিপরিচিত বিদ্ধ হাস্যরসিক শিল্পীর কণ্ঠ আর কেউ শুনতে পাবে না—শুনতে শুনতে হেসে লুটোপুটি খেয়ে কেউ কেউ আর বলবে না 'ওরে বাবু থামা থামা আর পারছি না।' পর্দার বুকে তাঁর আঁড়ালো দেখতে গিয়ে আর সেই সুপরিচিত সহজ্জনের হাসারোল ছাড়িয়ে প্রকম্পিত করেও তুলবে না কারণ নবদ্বীপ হালদার অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হলেন।

ঈপ্সিত বয়সে মৃত্যু হলেও নবদ্বীপ হালদারের মৃত্যু এক ট্রাজিক স্তরকে উদ্ঘাটিত করে দিয়ে গেছে। মৃত্যুর পর ঘটিতস্থানে দেখা গেছে তিনি নিঃস্ব অবস্থায় ছিলেন। রোগশয্যা থেকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করবার মতো অর্থও শেষের অবস্থায় ছিল না—ছিল না যেখানে চিকিৎসা করে তোলবার জন্য প্রয়োজনীয় উচ্চ ক্রয়ের অর্থ। একদিকে স্থান ও চিকিৎসার ভরণপোষণের জন্য এই জনপ্রিয় শিল্পীকে জীবনের শেষের কয়েকটি দিন রাত মনোদুঃখে ও অনাহারে ও অর্ধাহারে কাটতে হয়েছে—কাঁদতে কাঁদতে দেহ শিথিল হয়ে এলেও কঠিন জীবনযন্ত্রে তাঁকে ক্ষণকালের জন্যও ছেড়ে দেবে না। জীবনের শেষের দিকে যখন তিনি আর নিয়মিত চিত্রে বা মঞ্চে অভিনয় করতে নিতান্তই অপারগ হচ্ছিলেন তখন অনাহারকে এড়াবার জন্য তিনি একটি ট্রেনিং স্কুল খুলেছিলেন। নাম ছিল তার "নবদ্বীপ হালদারের কমিক ট্রেনিং স্কুল"। ছাত্রেরা আসত তাঁর কাছে হাসাবার ট্রেনিং নিতে। তিনি তাদের শেখাতেন কীভাবে হাসতে হয় কী ভাবে হাসতে হাসতে হেঁচে ফেলতে হয় এবং কী ভাবে কাঁদতে গিয়ে হেসে ফেলে পুনরায় হেসে হেসে কান্না হয়ে যেতে হয়। হাসির বহর ফেরে করুণ-রস বীর রস—বলাবাহুল্য অনাবিল হাসানো এই ছিল ট্রেনিংএর মেথডোলোজির কথা।

একটি আধময়লা ধুতী আর তেতোরিকে বহরা কতুয়া গায়ে দিয়ে একটি ভাঙা মতরঞ্চির উপর বসে নবদ্বীপ-

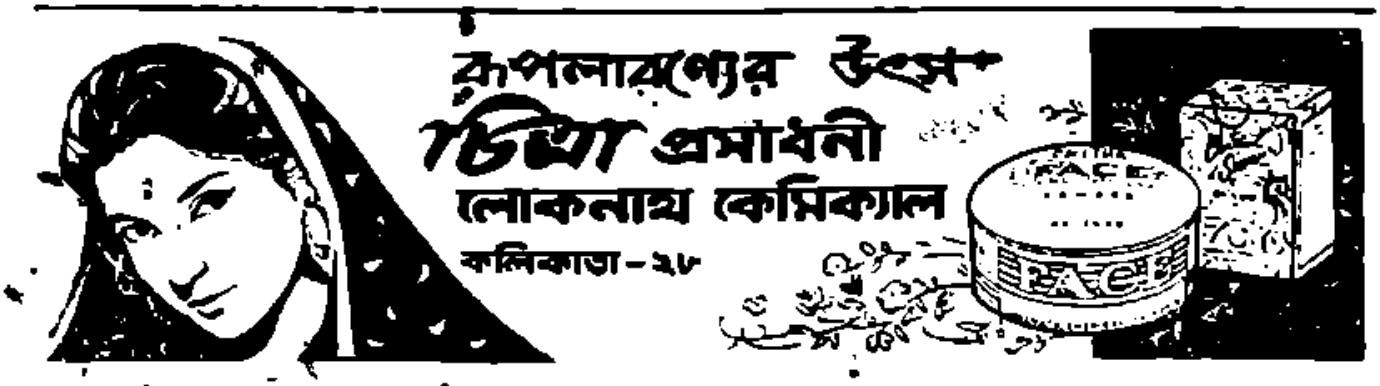

...ভাবছ উৎপল তরফদারের ইন্দ্রিয়াতুর শিল্পী মনের কথা। ...মৃত্যুর আলিঙ্গন ...তবুও নবদ্বীপ হালদারের মতো ...তাঁর শিল্পী জীবনের ...তিনি প্রত্যেকদিন ...পরিপার্শ্বকে প্রতিদিন ...এবং হাসির খোরাক ...হাসতে শিখিয়ে ...

...রোডের এক ...বাড়ীর বারান্দায় ...আড্ডা বসে ...কখনও কি ...দেখতো তাকে ...ব্যথা কারণ ...নবদ্বীপ হালদারের ...ট্রেনিং দিয়েছে ...অনিবার্য বলে। ...নবদ্বীপ হালদারের ...হল না, মৃত্যুর ...রোগক্লীষ্ট দেহটি ...পথে পরিচর্যা ...অন্য এবং ...বেঙ্গল, বাংলা ...সকলের অজ্ঞাতসারে ...এক জগতে।

...নবদ্বীপ হালদারের ...মনে পড়ছে ...চার্লি চ্যাপলিনের ...'লাইম লাইট' ...মানুষ হাসাবার ...শেষ প্রান্তে গিয়ে ...সকল হল তখন ...দেশ থেকে—শিল্পের ...শিল্পী জীবনের ...গুণমুগ্ধ দর্শক ...

...উৎপল তরফদারের ইন্দ্রিয়াতুর শিল্পী মনের কথা।